প্রবাসী ১৩৩২ বৈশাখ—আশ্বিন

২৫শ ভাগ, ১ম খণ্ড

বিষয়-সূচী

চিত্র-সূচী

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

বনদেবী
শিল্পাচার্য্য শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

২৫শ ভাগ
১ম খণ্ড

বৈশাখ, ১৩৩২

১ম সংখ্যা

পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫
ক্রাকোভিয়া জাহাজ

মার্সেল্‌স্‌ বন্দরে নেমে রেলে চড়লেম। পশ্চিমদেশের একটা পরিচয় পেলেম ভোজন-কামরায়। আকাশে গ্রহ-মালার আবর্ত্তনের মতো থালার পর থালা ঘুরে ঘুরে আস্‌ছে, আর ভোজ্যের পর ভোজ্য।

ঘরের দাবী পথের উপর চলে না। ঘরে আছে সময়ের অবসর, ঘরে আছে স্থানের অবকাশ। সেখানে জীবন যাত্রার আয়োজনের ভার বেশি ক'রে জ'মে ওঠবার বাধা নেই। কিন্তু চল্‌তি পথে উপকরণভার যথাসম্ভব হাল্‌কা করাই সাধারণ লোকের পক্ষে সঙ্গত। হরিণের শিঙ বটগাছের ডাল-আবডালের মতো অত অধিক, অত বড়, অত ভারী হ'লে সেটা জঙ্গম প্রাণীর পক্ষে বেহিসাবী হয়।

চিরকাল, বিশেষত পূর্ব্বকালে, রাজা-রাজড়া আমীর-ওমরাওরা ভোগের ও ঐশ্বর্য্যের বোঝাকে সর্ব্বত্র সকল অবস্থাতেই ভরপুরভাবে টেনে বেড়িয়েছে। সংসারের উপর তাদের আবদার অত্যন্ত বেশি। সে-আবদার সংসার মেনে নিয়েছে, কেন না এ'দের সংখ্যা তেমন বেশি নয়। রেলগাড়ির ভোজনশালায় থালার সংখ্যা, ভোজ্যের পরিমাণ ও বৈচিত্র্য, পরিচর্য্যার ব্যবস্থা, এত বাহুল্যময় যে পূর্ব্বকালের রাজকীয় সম্প্রদায়ই পথিক-অবস্থাতেও তা দাবী কর্‌তে পার্‌ত। এখন জনসাধারণের সকলের জন্যে এই আয়োজন।

ভোগের এত বড় বাহুল্যে সকল মানুষেরই অধিকার আছে এই কথাটার আকর্ষণ অতি ভয়ানক। এই আকর্ষণে দেশজোড়া মানুষের সিঁধকাঠি বিশ্বভাণ্ডারের দেয়াল ফুটো করতে উদ্যত হয়; লুব্ধ সভ্যতার এই উপদ্রব সর্ব্বনেশে।

যেটা বাহুল্য তা'তে ছোট বড় কোনো মানুষের কোনো অধিকার নেই এই কথাটা গত যুদ্ধের সময় ইংলণ্ড ফ্রান্স জর্ম্মণী প্রভৃতি যুদ্ধরত দেশকে অনেকদিন ধ'রেই স্বীকার কর্‌তে হ'ল। তখন তারা আপনার সহজ আয়োজনের অনুপাতে নিজের ভোগকে সংযত করেছিল

তখন তারা বুঝেছিল মানুষের আসল প্রয়োজনের ভার খুব বেশি নয়। যুদ্ধ অবসানে সে কথাটা ভুল্‌তে দেরি হয়নি।

অনতিপ্রয়োজনীয়কে প্রয়োজনীয় ক'রে তোলা যখন দেশসুদ্ধ সকল লোকেরই নিত্য সাধনা হয় তখন বিশ্বব্যাপী দস্যুবৃত্তি অপরিহার্য্য হ'য়ে ওঠে। লোকসংখ্যা-বৃদ্ধির সমস্যা নিয়ে পাশ্চাত্যেরা অনেকেই উদ্বেগ প্রকাশ ক'রে থাকেন। সমস্যাটা কঠিন হ'বার প্রধান কারণ হচ্ছে, সর্ব্ব সাধারণেরই ভোগ-বাহুল্যের প্রতি দাবী। এত বড় ব্যাপক দাবী মেটাতে গেলে ধর্ম্মরক্ষা করা চলে না, মানুষকে মানুষপীড়ক হ'তেই হয়। সেই পীড়ন কার্য্যে ভালো ক'রে হাত পাকানো হয় দূরস্থ অনাত্মীয় জাতির উপর দিয়ে। এ'র বিপদ এই যে, জীবন-ক্ষেত্রের যে-কিনারাতেই ধর্ম্মবুদ্ধিতে আগুন লাগানো হোক্ না সে-আগুন সেইখানেই থেমে থাকে না। ভোগী স্বভাবতই যে-নিষ্ঠুরতার সাধনা করে তার সীমা নেই, কারণ আত্মম্ভরিতা কোথাও এসে বল্‌তে জানে না, "এইবার বস্ হয়েছে।" বস্তুগত আয়োজনের অসঙ্গত বাহুল্যকেই যে সভ্যতার প্রধান লক্ষণ ব'লে মানা হয় সে-সভ্যতা অগত্যাই নরভুক্। নররক্ত-শোষণের বিশ্বব্যাপী চর্চ্চা একদিন আত্মহত্যায় ঠেকবেই এ'তে আর সন্দেহ করা চলে না।

রেলগাড়ির ভোজনশালায় একদিকে যেমন দেখা গেল ভোগের বাহুল্য, আর একদিকে তেমনি দেখলেম কর্ম্মের গতিবেগ। সময় অল্প, আরোহী অনেক, ভোজ্যের বৈচিত্র্য প্রচুর, ভোজের উপকরণ বিস্তর,—তাই পরিবেষণ-কর্ম্মের অভ্যাস অতি আশ্চর্য্য দ্রুত হ'য়ে উঠেছে। পরিবেষণের যন্ত্রটাতে খুবই প্রবল জোরে দম দেওয়া হয়েছে। যেটা এই পরিবেষণে দেখা গেল পাশ্চাত্যের সমস্ত কর্ম্ম-চালনার মধ্যেই সেই ক্ষিপ্রবেগ।

যে-যন্ত্র বাহিরের ব্যবহারের জন্য, তার গতির ছন্দ দম দিয়ে অনেকদূর পর্য্যন্ত বাড়িয়ে তোলা চলে। কিন্তু আমাদের প্রাণের আমাদের হৃদয়ের ছন্দের একটা স্বাভাবিক লয় আছে, তার উপরে দ্রুত প্রয়োজনের জবরদস্তি খাটে না। দ্রুত চলাই যে দ্রুত এগোনো সে কথা সত্য হ'তে পারে কলের গাড়ির পক্ষে, মানুষের পক্ষে না। মানুষের চলার সঙ্গে হওয়া আছে; সেই চলাতে হওয়াতে মিল ক'রে চলাই মানুষের চলা, কলের গাড়ির সে উপসর্গ নেই। আফিসের তাগিদে মুহূর্ত্তের মধ্যে এক গ্রাসের জায়গায় চার গ্রাস খাওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু সেই চার গ্রাস ঘড়ি ধ'রে হজম করা কলের মনিবের হুকুমে হ'তে পারে না। গ্রামোফোনের কান যদি ম'লে দেওয়া যায় তবে যে গান গাইতে চার মিনিট লেগেছিল তাকে শুন্‌তে আধ মিনিটের বেশী না লাগ্‌তে পারে কিন্তু সঙ্গীত হ'য়ে ওঠে চীৎকার। রসভোগ করবার জন্যে রসনার নিজের একটা নির্দ্ধারিত সময় আছে; সন্দেশকে যদি কুইনীনের বড়ীর মতো টপ ক'রে গেলা যায় তা হ'লে বস্তুটাকে পাওয়া যায়, বস্তুর রস পাওয়া যায় না। তীরবেগে বাইসিক্‌ল্ ছুটিয়ে যদি পদাতিক বন্ধুর চাদর ধরি তা হ'লে বাইসিক্‌লের জয় পতাকা হাতে আস্‌বে, কিন্তু বন্ধুকে বুকে পাবার উপায় সেটা নয়। কলের বেগ বাইরের দরকারে কাজে লাগে, অন্তরের দাবী মেটাবার বেলায় অন্তরের ছন্দ না মান্‌লে চলে না।

বাইরের বেগ অন্তরের ছন্দকে অত্যন্ত বেশি পেরোয় কখন? যখন বাহ্য প্রয়োজনের বড় বাড় বাড়ে। তখন মানুষ পড়ে পিছিয়ে, কলের সঙ্গে সে তাল রাখ্‌তে পারে না। য়ুরোপে সেই মানুষ ব্যক্তিটি দিনে দিনে বহু দূরে প'ড়ে গেল; কল গেল এগিয়ে। তাকেই সেখানকার লোকে বলে অগ্রসরতা, প্রোগ্রেস্।

সিদ্ধি, যাকে ইংরেজিতে বলে সাক্‌সেস্, তার বাহন যত দৌড়ে চলে ততই ফল পায়। য়ুরোপের দেশে দেশে রাষ্ট্রনীতির যুদ্ধ-নীতির বাণিজ্য-নীতির তুমুল ঘোড়-দৌড় চল্‌ছে জলে স্থলে আকাশে। সেখানে বাহ্য প্রয়োজনের গরজ অত্যন্ত বেশি হ'য়ে উঠ্‌ল তাই মনুষ্যত্বের ডাক শু'নে কেউ সবুর করতে পার্‌ছে না। বীভৎস সর্ব্বভুক পেটুকতার উদ্যোগে পলিটিক্‌স্ নিয়ত ব্যস্ত। তার গাঁঠ-কাটা ব্যবসায়ের পরিধি পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছে। পূর্ব্বকালে যুদ্ধ বিগ্রহের পদ্ধতিতে ধর্ম্ম-বুদ্ধি যেখানে মাঝে মাঝে বাধা খাড়া ক'রে রেখেছিল, ডিপ্লমাসি সেখানে আজ লাফ-মারা hurdle race খেলে চলেছে। সবুর সয় না যে। বিষবায়ুবান যুদ্ধের অস্ত্ররূপে যখন এক পক্ষ ব্যবহার করলে

তখন অন্য পক্ষ ধর্ম্ম-বুদ্ধির দোহাই পাড়্‌লে। আজ সকল পক্ষই বিষের সন্ধানে উঠে পড়ে লেগেছে। যুদ্ধকালে নিরস্ত্র পুরবাসীদের প্রতি আকাশ থেকে অগ্নিবাণ বর্ষণ নিয়ে প্রথমে শোনা গেল ধর্ম্ম-বুদ্ধির নিন্দাবাণী। আজ দেখি ধার্ম্মিকেরা স্বয়ং সামান্য কারণেই পল্লীবাসীদের প্রতি কথায় কথায় পাপ-বজ্র সন্ধান করছে। গত যুদ্ধের সময় শত্রুর সম্বন্ধে নানা উপায়ে সজ্ঞানে সচেষ্টভাবে সত্য গোপন ও মিথ্যা প্রচারের সয়তানী অস্ত্র ব্যবহার প্রকাণ্ড ভাবে চল্‌ল। যুদ্ধ থেমেছে কিন্তু সেই সয়তানী আজও থামে নি। এমন কি, অক্ষম ভারতবর্ষকেও প্রবলের প্রপাগাণ্ডা রেয়াৎ করে না। এই সব নীতি হচ্ছে সবুর-না-করা-নীতি—এ'রা হ'ল পাপের দ্রুত চাল,—এ'রা প্রতি পদেই বাহিরে জিৎছে বটে কিন্তু সে জিৎ অন্তরের মানুষকে হারিয়ে দিয়ে। মানুষ আজ নিজের মাথা থেকে জয়মাল্য খুলে নিয়ে কলের গলায় পরিয়ে দিলে। রসাতল থেকে দানব বল্‌ছে, বাহবা।

রথীরে কহিল গৃহী উৎকণ্ঠায় ঊর্দ্ধস্বরে ডাকি
"থাম', থাম', কোথা তুমি রুদ্রবেগে রথ যাও হাঁকি,
সম্মুখে আমার গৃহ।"
রথী কহে, "ঐ মোর পথ,
ঘুরে গেলে দেরী হবে, বাধা ভেঙে সিধা যাবে রথ।"
গৃহী কহে, "নিদারুণ ত্বরা দে'খে মোর ডর লাগে,
কোথা যেতে হ'বে বল'।"
রথী কহে, "যেতে হবে আগে।"
"কোন্‌খানে," শুধাইল।
রথী বলে, "কোনোখানে নহে,
শুধু আগে।"
"কোন্ তীর্থে, কোন্ সে মন্দিরে," গৃহী কহে।
"কোথাও না, শুধু আগে।"
"কোন্ বন্ধু সাথে হবে দেখা?"
"কারো সাথে নহে, যাব সব-আগে আমি মাত্র একা।"
ঘর্ঘরিত রথবেগ গৃহভিত্তি করি দিল গ্রাস;
হাহাকারে, অভিশাপে, ধূলিজালে ক্ষুভিল বাতাস
সন্ধ্যার আকাশে। আঁধারের দীপ্ত সিংহদ্বার বাগে
রক্তবর্ণ অস্তপথে ছোটে রথ লক্ষ্যশূন্য আগে॥

ক

ক্রাকোভিয়া জাহাজ—
৯ ফেব্রুয়ারী ১৯২৫

বিষয়ী লোক শতদলের পাপ্‌ড়ি ছিঁড়ে ছিঁড়ে একটি-একটি ক'রে জমা করে, আর বলে "পেয়েছি।" তার সঞ্চয় মিথ্যে। সংশয়ী লোক শতদলের পাপ্‌ড়ি একটি একটি ক'রে ছিঁ'ড়ে ছিঁ'ড়ে তাকে কেটে কুটে নিংড়ে মুচ্‌ড়ে বলে "পাইনি।" অর্থাৎ সে উল্টো দিকে চেয়ে বলে, "নেই।" রসিক লোক সেই শতদলের দিকে "আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি।" এই আশ্চর্য্যের মানে হ'ল পেয়েছি পাইনি দুইই সত্য। প্রেমিক বল্‌লে"লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়ে জুড়ন না গেল।" অর্থাৎ বল্‌লে লক্ষযুগের পাওয়া অল্পকালের মধ্যেই পেয়েছি আবার সেই সঙ্গেই লক্ষযুগের না-পাওয়াও লেগেই রইল। সময়টা যে আপেক্ষিক, রসের ভাষায় সে কথাটা অনেকদিন থেকে বলা চল্‌ছে, বিজ্ঞানের ভাষায় আজ বলা হ'ল।

যখন ছোট ছিলেম, মনে পড়ে বিশ্বজগৎ আমার কাছে প্রতিদিন অন্ধকার রাত্রির গর্ভ থেকে নূতন দেহ ধ'রে জন্ম নিত। পরিচয় আর অপরিচয় আমার মনের মধ্যে এক হ'য়ে মিলেছিল। আমার সেই শিশুকাল পথিকের কাল। তখন পথের শেষের দিকে লক্ষ্য খুঁজিনি, পথের আশেপাশে চেয়ে চেয়ে চল্‌ছি, যেন কোন্ আবছায়ার ভিতর থেকে আচমকা দেখা দেবে একটা "কি জানি," একটা "হয়তো।" বারান্দার কোণে খানিকটা ধুলো জড়ো ক'রে আতার বীচি পুঁ'তে রোজ জল দিয়েছি। আজ যেটা আছে বীজ কাল সেটা হ'বে গাছ, ছেলেবেলায় সে একটা মস্ত "কি জানি"র দলে ছিল। সেই কি জানিকে দেখাই সত্য দেখা। সত্যের দিকে চেয়ে যে বলে জানি সেও তাকে হারায়, যে বলে জানিনে সেও করে ভুল, আমাদের ঋষিরা এই বলেন। যে বলে খুব জানি সেই অবোধ সোনা ফেলে চাদরের গ্রন্থিকে পাওয়া মনে করে, যে বলে কিছুই জানিনে সে তো চাদরটাকে সুদ্ধ খুইয়ে বসে। আমি ঈশোপনিষদের এই মানেই বুঝি। "জানিনা" যখন "জানির" আঁচলে গাঁঠছড়া বেঁধে দেখা দেয় তখনি মন বলে ধন্য হলেম। পেয়েছি মনে করার মত হারানো আর নেই।

খ

এই জন্যেই ভারতবর্ষকে ইংরেজ যেমন-ক'রে হারিয়েছে এমন আর য়ুরোপের কোনো জাত নয়। ভারতবর্ষের মধ্যে যে-একটা চিরকেলে রহস্য আছে সেটা তার কাছ-থেকে স'রে গেল। তার ফৌজের গাঁঠের মধ্যে যে বস্তুটাকে কষে বাঁধ্‌তে পারলে সেইটেকেই সে সম্পূর্ণ ভারতবর্ষ ব'লে বুক ফুলিয়ে গর্দীয়ান্ হ'য়ে ব'সে রইল। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তার বিস্ময় নেই, অবজ্ঞা যথেষ্ট আছে। রাষ্ট্রীয় স্বার্থের বাইরে ইংরেজ ভারত সম্বন্ধে যত অল্প আলোচনা করেছে এমন ফ্রান্স করেনি জর্ম্মণি করেনি। পোলিটিশনের চশমার বাইরে ভারতবর্ষ ইংরেজজাতির গোচরে আছে একথাটা তার দৈনিক সাপ্তাহিক মাসিক কাগজ পড়ে দেখ্‌লে বোঝা যায় না।

এর একমাত্র কারণ, ভারতবর্ষে ইংরেজের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি। প্রয়োজন সাধনের দেখা নিছক পাওয়ারই দেখা, তার মধ্যে না-পাওয়ার আমেজ নেই। এই জন্যেই এ'কে সত্যের দেখা বলা যায় না। এই দেখায় সত্য নেই ব'লেই তা'তে বিস্ময় নেই, শ্রদ্ধা নেই।

প্রয়োজনের সম্বন্ধ হচ্ছে কেবলি গ্রহণের সম্বন্ধ, তাতে লোভ আছে আনন্দ নেই। সত্যের সম্বন্ধ হচ্ছে পাওয়া এবং দেওয়ার মিলিত সম্বন্ধ, কেননা আনন্দই মন খুলে দিতে জানে। এই কারণেই দেখ্‌তে পাই ভারতবর্ষের প্রতি ইংরেজের ব্যক্তিগত বদান্যতার অদ্ভুত অভাব। একথা নিয়ে নালিশ করা বৃথা, এইটেই স্বাভাবিক। ইংরেজের লোভ যে-ভারতবর্ষকে পেয়েছে ইংরেজের আত্মা সেই-ভারতবর্ষকে হারিয়েছে। এইজন্যেই ভারত-বর্ষে ইংরেজের লাভ, ভারতবর্ষে ইংরেজের গর্ব্ব, ভারতবর্ষে ইংরেজের ক্লেশ। এইজন্যে ভারতবর্ষকে স্বাস্থ্য দেওয়া, শিক্ষা দেওয়া, মুক্তি দেওয়া সম্বন্ধে ইংরেজের ত্যাগ দুঃসাধ্য, কিন্তু শাস্তি দেওয়া সম্বন্ধে ইংরেজের ক্রোধ অত্যন্ত সহজ। ইংরেজ ধনী বাংলা দেশের রক্ত-নেংড়ানো পাটের বাজারে শতকরা চার পাঁচশো টাকা মুনফা শু'ষে নিয়েও যে-দেশের সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্যে এক পয়সাও ফিরিয়ে দেয় না, তার দুর্ভিক্ষে বন্যায় মারী মড়কে যার কড়ে আঙুলের প্রান্তও বিচলিত হয় না, যখন সেই শিক্ষাহীন স্বাস্থ্যহীন উপবাসক্লিষ্ট বাংলাদেশের বুকের উপর পুলিসের জাঁতা বসিয়ে রক্তচক্ষু কর্ত্তৃপক্ষ কড়া আইন পাস করেন তখন সেই বিলাসী ধনী স্ফীত মুনফার উপর আরামের আসন পেতে বাহবা দিতে থাকে, বলে "এই ত পাকা চালে ভারত শাসন।"

এইটেই স্বাভাবিক। কেননা ঐ ধনী বাংলা দেশকে একেবারেই দেখ্‌তে পায়নি, তার মোটা মুনফার ওপারে বাংলাদেশ আড়াল প'ড়ে গেছে। বাংলাদেশের প্রাণের নিকেতনে যেখানে ক্ষুধাতৃষ্ণার কান্না, বাংলাদেশের হৃদয়ের মাঝখানে যেখানে তার সুখদুঃখের বাসা, সেখানে মানুষের প্রতি মানুষের মৈত্রীর একটা বড় রাস্তা আছে, সেখানে ধর্ম্মবুদ্ধির বড় দাবী বিষয়বুদ্ধির গরজের চেয়ে বেশি একথা জানবার ও ভাববার মতো তার সময়ও নেই শ্রদ্ধাও নেই। তাই যখনি দেখে দরোয়ানীর ব্যবস্থা কঠোরতর করা হচ্ছে তখনি মুনফা-বৎসলেরা পুলকিত হ'য়ে

ওঠে। Law and order রক্ষা হচ্ছে দরোয়ানীতন্ত্র, পালোয়ানের পালা ; Sympathy and respect হচ্ছে ধর্ম্মতন্ত্র, মানুষের নীতি।

অবিচার করতে চাইনে, রাজ্যশাসন মাত্রেই law and order চাই। নিতান্ত স্নেহ প্রেমের এলাকাতেও কানমলার বরাদ্দ থাকে। রাজ্যে ছটফটানির বৃদ্ধি হ'লে সাধারণ দণ্ডবিধি অসাধারণ অবৈধ হ'য়ে উঠ্‌লেও দোষ দিইনে। একপক্ষে দুরন্তপনা ঘটলে অন্যপক্ষে দৌরাত্ম্য ঘটা শক্তিমানের পক্ষে গৌরবের বিষয় না হ'লেও সেটাকে স্বাভাবিক ব'লে মেনে নেওয়া যেতে পারে। আসল কথা, কোনো শাসনতন্ত্রকে বিচার করতে হ'লে সমগ্র রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রকৃতি বিচার করা চাই। যদি দেখা যায় দেশের সকল মহলেই দরোয়ানের ঠেসাঠেসি ভিড়, অথচ তৃষ্ণায় যখন ছাতি ফাটছে, ম্যালেরিয়ায় যখন নাড়ী ছেড়ে যায়, তখন জনপ্রাণীর সাড়া নেই ; যখন দেখি দরোয়ানের তক্‌মা, শিরোপা, বকশিশ, বাহবা সম্বন্ধে দাক্ষিণ্যের অজস্রতা, কোতোয়ালি থেকে সুরু ক'রে দেওয়ানি ফৌজদারী কোনো বিভাগের কারো দুঃখ গায়ে সয় না, কারো আবদার ব্যর্থ হ'তে চায় না, অথচ ঘরের ছেলের প্রাণ যখন কণ্ঠাগত, তখন আত্মনির্ভর সম্বন্ধে সৎপরামর্শ ছাড়া আর কোনো কথা নেই, অর্থাৎ গলায় যখন ফাঁস তখন দুর্গানাম স্মরণ করা ছাড়া আর কোনো উপদেশ যেখান থেকে মেলে না সেখানে পরিমাণের অসঙ্গতিতেই দরোয়ানটাকে যমদূত ব'লে সহজেই মনে হয়। যে-পাকা বাড়িটাতে সুহৃদ সহায় আত্মীয়ের চেয়ে পাহারা-ওয়ালার প্রভাবই বেশি সেই জায়গাটাকেই তো চল্‌তি ভাষায় জেলখানা ব'লে থাকে। বাগানে তো ইচ্ছে ক'রেই লোকে কাঁটাগাছের বেড়া দেয় সে কি আমরা জানি নে ? কিন্তু যেখানে কাঁটাগাছেরই যত আদর, ফুলগাছ শুকিয়ে মরে গেল সে বাগানে আমাদের মনে যদি উৎসাহ না হয় তাহ'লে মালী সেটাকে আমাদের অবিবেচনা মনে করে কেন ? যদি শাসনকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কি চাওনা দেশে law and order থাকে, আমি বলি খুবই চাই, কিন্তু life and mind তার চেয়ে কম মূল্যবান নয়। মানদণ্ডের একটা পাল্লায় বিশ পঁচিশ মোন বাটখারা চাপানো দোষের নয় অন্য পাল্লাটাতে যে-মাল চাপানো হয় তাতে যদি আমাদের নিজের স্বত্ব কিছু থাকে। কিন্তু যখন দেখি এ পক্ষের দিকটাতেই যত রাজ্যের ইট পাথর, আর মালের পনেরো আনাই হ'ল অন্য পক্ষের দিকে, তখন ফৌজে-পুলিসে গড়া মানদণ্ডটা অপমানদণ্ড ব'লেই ঠেকে। নালিশ আমাদের পুলিসের বিরুদ্ধে নয়, নালিশ আমাদের এই ওজনের বিরুদ্ধে; নালিশ, আগুন জ্বলে ব'লে নয়,রান্না চড়ানো হয় না ব'লে। বিশেষত সেই আগুনের বিল্ যখন আমাদেরই চোকাতে হয়। চুলিতে কাঠের খরচটাই এত সর্ব্বনেশে হ'য়ে ওঠে যে হাঁড়িতে চাল ডাল জোগাবার কড়ি বাকি থাকে না। সেই অবস্থায় যখন পেটের জ্বালায় চোখে জল আসে তখন যদি কর্ত্তা রাগ ক'রে বলেন, "তবে কি চুলোতে আগুন জাল্‌ব না," ভয়ে ভয়ে বলি, "জাল্‌বে বই কি, কিন্তু ওটা যে চিতার আগুন হ'য়ে উঠ্‌ল।"

যে-দুঃখের কথাটা বল্‌ছি এটা জগৎ জুড়ে আজ ছড়িয়ে পড়েছে, আজ মুনফার আড়ালে মানুষের জ্যোতির্ম্ময় সত্য রাহুগ্রস্ত। এই জন্যেই মানুষের প্রতি কঠিন ব্যবহার করা তাকে বঞ্চনা করা এত সহজ হ'ল। তাই পাশ্চাত্যে পলিটিক্‌সই মানুষের সকল চেষ্টার সর্ব্বোচ্চ চূড়া দখল ক'রে বসেছে। অর্থাৎ মানুষের ফুলে'-ওঠা পকেটের তলায় মানুষের চুপ্‌সে-যাওয়া হৃদয় পড়েছে চাপা। সর্ব্বভুক্ পেটুকতার এমন বিস্তৃত আয়োজন পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোনো দিন এমন কুৎসিত আকারে দেখা দেয়নি।

গ

আমাদের রিপু সত্যের সম্পূর্ণ-মূর্ত্তিকে আচ্ছন্ন করে। কামে আমরা মাংসই দেখি আত্মাকে দেখিনে, লোভে আমরা বস্তুই দেখি মানুষকে দেখিনে, অহঙ্কারে আমরা আপনাকেই দেখি অন্যকে দেখিনে। একটা রিপু আছে যা এ'দের মত উগ্র নয়, যা ফাঁকা। তাকে বলে মোহ, সে হচ্ছে জড়তা, অসাড়তা। আমাদের চৈতন্যের আলো ম্লান ক'রে দিয়ে সে সত্যকে আবৃত করে। সে বিঘ্ন নয়, সে আবরণ। অভ্যাস অনেক সময় সেই মোহরূপে আমাদের মনকে আবিষ্ট করে।

কুয়াশায় পৃথিবীর বস্তুকে নষ্ট করে না, তার

আকাশকে লুপ্ত করে। অসীমকে অগোচর করে দেয়। অভ্যাসের মোহ মনের সেই কুয়াশা। অনির্ব্বচনীয়কে সে আড়াল করে, বিস্ময় রসকে শুকিয়ে ফেলে। তাতে সত্য পদার্থের গুরুত্ব কমে না, তার গৌরব কমে যায়। আমাদের মন তখন সত্যের অভ্যর্থনা কর্‌তে পারে না। বিস্ময় হচ্ছে সত্যের অভ্যর্থনা।

ডাক্তার বলে প্রতিদিন একই অভ্যস্ত খাওয়া পরিপাকের পক্ষে অনুকূল নয়। ভোজ্যসম্বন্ধে রসনার বিস্ময় না থাক্‌লে দেহ তাকে গ্রহণ কর্‌তে আলস্য করে। শিশু ছাত্রদের একই ক্লাসে একই সময়ে একই বিষয় শিক্ষার পুনরাবৃত্তি করানোতেই তাদের শিক্ষার আগ্রহ ঘুচিয়ে দেওয়া হয়।

প্রাণের স্বভাবই চির-উৎসুক। প্রকৃতি তাকে ক্ষণে ক্ষণে আকস্মিকের স্পর্শে চঞ্চল ক'রে রাখে। এমন কি, এই আকস্মিক যদি দুঃখ আকারেও আসে তাতেও চিত্তের বড় রকমের উদ্বোধন ঘটে। সীমার অতীত যা, আকস্মিক হচ্ছে তারই দূত, অভাবনীয়ের বার্ত্তা নিয়ে সে আসে, চেতনাকে জড়ত্ব থেকে মুক্তি দেয়।

আমাদের দেশে তীর্থযাত্রা ধর্ম্ম সাধনার একটি প্রধান অঙ্গ। দেবতাকে যখন অভ্যাসের পর্দ্দায় ঘিরে রাখে তখন আমরা সেই পর্দ্দাকেই পূজা করি। যাদের মন স্বভাবতই বিষয়ী ধর্ম্মচর্চ্চাতেও যারা বস্তুকে বেশি দাম দেয়, তারা দেবতার চেয়ে পর্দ্দাকেই বেশি শ্রদ্ধা করে।

তীর্থযাত্রায় সেই পর্দ্দা ঠেলে দিয়ে মন পথে বেরিয়ে পড়ে। তখন প্রতিদিনের সীমাবদ্ধ জানাকে চিরদিনের অসীম অজানার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা সহজ হয়। প্রতিদিন ও চিরদিনের সঙ্গম স্থলেই সত্যের মন্দির।

এবারে তাই পথের দুই পাশে চাইতে চাইতে বেরিয়েছিলুম। অভ্যাসের জগতে যা'কে দেখেও দেখিনে, মন জেগে উঠে বল্‌লে সেই চির-অপরিচিত হয়তো কোথায় অজানা ফুলের মালা প'রে অজানা তারার রাত্রে দেখা দেবে। অভ্যাস ব'লে ওঠে, "সে নেইগো নেই, সে মরীচিকা।" গভীর বাইরেকার বিশ্ব বলে, "আছে বই কি, তাকিয়ে দেখ। দেখা হ'য়ে চুকেছে মনে করে' দেখা বন্ধ কর, তাইত দেখা হয় না।" তখন ক্ষণে'ক্ষণে মনে হয় "দেখা হ'ল বুঝি।" পথিকের প্রাণের উদ্বোধন সেই, কি-জানি। সেই কি-জানির উদ্দেশে গান লিখেছি। জীবনের সকল নৈরাশ্য, সকল বিড়ম্বনা, সকল তুচ্ছতার অবসাদ অতিক্রম ক'রেও সেই কি-জানির আভাস আলোতে ছায়াতে ঝলমল ক'রে উঠ্‌ছে পথিক তারই চমক নেবার জন্যে তার জানা ঘরের কোণ্ ফেলে পথে বেরিয়েছে।

২৪ ডিসেম্বর ১৯২৪
বুয়েনোস্ আইরেস্

ওগো আমার না-পাওয়াগো, অরুণ আভা তুমি,
আঁধার তীরে স্বপনকে মোর কখন্ যে যাও চুমি।
পাওয়া আমার নীড়ের পাখী
আধেক ঘুমে ওঠে ডাকি
তোমার ছোঁয়ায় বুঝি!
লক্ষ্যহারা ডানা মেলে
যায় সে উ'ড়ে কুলায় ফেলে,
অকারণে ফেরে আকাশ খুঁজি।

ওগো আমার না-পাওয়াগো, সন্ধ্যা মেঘের ফাঁকে
পাওয়ারে মোর ডাকো তুমি করুণ আলোর ডাকে।

তাই সে হঠাৎ ওঠে কেঁদে,
পারিনে তা'য় রাখ্‌তে বেঁধে,
দূরপানে রয় চেয়ে।
শোনে বুঝি আকাশ তলে
পারের খেয়া ভে'সে চলে,
সারিগানের ধুয়ো কে যায় গেয়ে॥

ওগো আমার না-পাওয়াগো, কখন্ অন্ধকারে
লুকিয়ে এসে আঘাত কর' পাওয়ার বীণার তারে।
কাহার সুরে কাহার গানে
যায় মিশে যে তালে তানে
ভাগ করা নয় সোজা ;
সবাই যখন অর্থ খোঁজে,
বলে, "বোঝাও কি হ'ল যে,"
আমি বলি, "কিছু না যায় বোঝা।"

ওগো আমার না-পাওয়াগো, সজল সমীরণে
কদম রেণুর গন্ধে মেশা বাদল বরিষণে
আমার পাওয়ার কানে কানে
মনের কথা বলি গানে,
সে শুনে কয়, "এ কি।"
কি জানি গো কিসের ঘোরে
তারে শোনাই কিম্বা তোরে
বুঝ্‌তে নারি যখন ভেবে দেখি॥

ক্রাকোভিয়া জাহাজ
১১ ফেব্রুয়ারি
১৯২৫

বৈষ্ণবী আমাকে বলেছিল, "কার বাড়িতে বৈরাগীর কখন অন্ন জোটে তার ঠিকানা নেই ; সে অন্নে নিজের জোর দাবী খাটে না, তাইতো বুঝি এ অন্ন তিনিই জুগিয়ে দিলেন।" এই কথাই কাল বলছিলেম, বাঁধা পাওয়ায় পাওয়ার সত্য ম্লান হয়ে যায়। না-পাওয়ার রসটা তাকে ঘিরে থাকে না। ভোগের মধ্যে কেবলমাত্রই পাওয়া, পশুর পাওয়া ; আর সম্ভোগের মধ্যে পাওয়া না-পাওয়া দুইই মিলেছে, সে হ'ল মানুষের।

ছেলেবেলা হ'তেই বিদ্যার পাকা বাসা থেকে বিধাতা আমাকে পথে বের ক'রে দিয়েছেন। অকিঞ্চন বৈরাগীর মতো অন্তরের রাস্তায় একা চল্‌তে চল্‌তে মনের অন্ন যখন-তখন হঠাৎ পেয়েছি। আপন মনে কেবলি কথা ব'লে গেছি, সেই হ'ল লক্ষ্মীছাড়ার চাল। বল্‌তে বল্‌তে এমন কিছু শুন্‌তে পাওয়া যায় যা পূর্ব্বে শুনি নি। বলার স্রোতে যখন জোয়ার আসে তখন কোন্ গুহার ভিতরকার অজানা

সামগ্রী ভেসে ভেসে ঘাটে এসে লাগে। মনে হয় না তাতে আমার বাঁধা বরাদ্দের জোর আছে। সেই আচম্কা পাওয়ার বিস্ময়ই তাকে উজ্জ্বল ক'রে তোলে, উল্কা যেমন হঠাৎ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে এসে আগুন হ'য়ে ওঠে।

পৃথিবীতে আমার প্রেয়সীদের মধ্যে যিনি সর্ব্বকনিষ্ঠ তাঁর বয়স তিন। ইনিয়ে বিনিয়ে কথা ব'লে যেতে তাঁর এক মুহূর্ত্ত বিরাম নেই। শ্রোতা যারা, তারা উপলক্ষ্য; বস্তুত কথাগুলো নিজেকেই নিজে শোনানো; যেমন বাষ্পরাশি ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে গ্রহতারারূপে দানা বেঁধে ওঠে, তেমনি কথা-বলার বেগে আপনিই তার সজাগ মনে চিন্তার সৃষ্টি হ'তে থাকে। বাইরে থেকে মাষ্টারের বাচালতা যদি এই স্রোতকে ঠেকায় তাহলে তার আপন চিন্তাধারার সহজ পথ বন্ধ হ'য়ে যায়। শিশুর পক্ষে অতি মাত্রায় পুঁথিগত বিদ্যাটা ভাবনার স্বাভাবিক গতিকে আটকিয়ে দেওয়া। বিশ্বপ্রকৃতি দিনরাত্রি কথা কইছে, সেই কথা যখন শিশুর মনকে কথা কওয়ায় তখন তার সেই আপন কথাই তার সব চেয়ে ভালো শিক্ষা প্রণালী। মাষ্টার নিজে কথা বলে, আর ছেলেকে বলে, চুপ। শিশুর চুপ-করা মনের উপর বাইরের কথা বোঝার মতো এসে পড়ে, খাদ্যের মতো নয়। যে-শিশু-শিক্ষা-বিভাগে মাষ্টারের গলাই শোনা যায়, শিশুরা থাকে নীরব, সেখানে আমি বুঝি মরুভূমির উপর শিলবৃষ্টি হচ্ছে।

যাই হোক্, মাষ্টারের হাতে বেশি দিন ছিলেম না ব'লে আমি যা-কিছু শিখেছি সে কেবল বল্‌তে বল্‌তে। বাইরে থেকেও কথা শুনছি, বই পড়্‌ছি; সে কোনো দিনই সঞ্চয় করবার মতো শোনা নয়, মুখস্থ করবার মতো পড়া নয়। কিছু-একটা বিশেষ ক'রে শেখবার জন্যে আমার মনের ধারার মধ্যে কোথাও বাঁধ বাঁধিনি। তাই সেই ধারার মধ্যে যা এসে পড়ে তা কেবলি চলাচল করে, ঠাঁই বদল করতে করতে বিচিত্র আকারে তারা মেলে মেশে। এই মনোধারার মধ্যে রচনার ঘূর্ণি যখন জাগে তখন কোথা হ'তে কোন্ সব ভাসা কথা কোন্ প্রসঙ্গমূর্ত্তি ধ'রে এসে পড়ে তা কি আমি জানি?

অনেকে হয়তো ভাবেন ইচ্ছা করলেই বিশেষ বিষয় অবলম্বন ক'রে আমি বিশেষ ভাবে বল্‌তে বা লিখ্‌তে পারি। যাঁরা পাকা বক্তা বা পাকা লেখক তাঁরা পারেন; আমি পারিনে। যার আছে গোয়াল, ফরমাস করলেই বিশেষ বাঁধা গোরুটাকে বেছে এনে সে দুইতে পারে। আর যার আছে অরণ্য, যে-গোরুটা যখন এসে পড়ে তা'কে নিয়েই তার উপস্থিত মতো কারবার। আশু মুখুজ্জে মশায় বল্‌লেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করতে হ'বে। তখন তো ভয়ে ভয়ে বল্‌লেম, আচ্ছা, তার পরে যখন জিজ্ঞাসা করলেন, বিষয়টা কি, তখন চোখ বুজে ব'লে দিলেম, সাহিত্য সম্বন্ধে। সাহিত্য সম্বন্ধে কী যে বল্‌ব আগেভাগে তা জানবার শক্তিই ছিল না। একটা অন্ধ ভরসা ছিল যে, বল্‌তে বল্‌তেই বিষয় গড়ে উঠ্‌বে। তিনদিন ধ'রে বকেছিলেম। শুনেছি অনেক অধ্যাপকের পছন্দ হ'ল না। বিষয় এবং বিশ্ব-বিদ্যালয় দুইয়েরই মর্য্যাদা রাখতে পারি নি। তাঁদের দোষ নেই, সভাস্থলে যখন এসে দাঁড়ালেম তখন মনের মধ্যে বিষয় ব'লে কোনো বালাই ছিল না। বিষয় নিয়েই যাঁদের প্রাত্যহিকের কারবার, বিষয়হীনের অকিঞ্চনতা তাঁদের কাছে ফস্ ক'রে ধরা প'ড়ে গেল।

এবার ইটালিতে মিলান্ সহরে আমাকে বক্তৃতা দিতে হয়েছিল। অধ্যাপক ফর্ম্মিকি বারবার জিজ্ঞাসা করলেন, বিষয়টা কি? কি ক'রে তাঁকে বলি যে, যে-অন্তর্য্যামী তা জানেন তাঁকে প্রশ্ন করলে জবাব দেন না। তাঁর ইচ্ছা ছিল যদি একটা চুম্বক পাওয়া যায় তবে আগেই সেটা তর্জ্জমা ক'রে ছাপিয়ে রাখবেন। আমি বলি, সর্ব্বনাশ; বিষয় যখন দেখা দেবে চুম্বক তার পরেই সম্ভব। ফল ধরবার আগেই তার আঁঠি খুঁজে পাই কি উপায়ে? বক্তৃতা সম্বন্ধে আমার ভদ্র অভ্যাস নেই, আমার অভ্যাস লক্ষ্মীছাড়া। ভেবে বল্‌তে পারিনে, বল্‌তে বল্‌তে ভাবি, মৌমাছির পাখা যেমন উড়্‌তে গিয়ে গুন্‌গুন্ করে। সুতরাং অধ্যাপক হ'বার আশা আমার নেই, এমন কি, ছাত্র হবারও ক্ষমতার অভাব।

এম্‌নি ক'রে দৈবক্রমে বৈরাগীর তত্ত্ব-কথাটা বুঝে নিয়েছি। যারা বিষয়ী তারা বিশ্বকে বাদ দিয়ে বিশেষকে খোঁজে। যারা বৈরাগী তারা পথে চল্‌তে চল্‌তেই বিশ্বের সঙ্গে মিলিয়ে বিশেষকে চি'নে নেয়। উপরি পাওনা ছাড়া তাদের কোনো বাঁধা পাওনাই নেই। বিশ্বপ্রকৃতি স্বয়ং যে এই লক্ষ্য-

ীন বৈরাগী—চল্‌তে চল্‌তেই তার যা-কিছু পাওয়া। ঢ়ড়ের রাস্তায় চল্‌তে চল্‌তে সে হঠাৎ পেয়েছে প্রাণকে, াণের রাস্তায় চল্‌তে চল্‌তে সে হঠাৎ পেয়েছে মানুষকে। লা বন্ধ ক'রে যদি সে জমাতে থাকে তা হ'লেই সৃষ্টি 'য়ে ওঠে জঞ্জাল। তখনি প্রলয়ের ঝাঁটার তলব ড়ে।

বিশ্বের মধ্যে একটা দিক আছে যেটা তার স্থাবর বস্তুর র্থাৎ বিষয়-সম্পত্তির দিক্ নয়; যেটা তার চলচ্চিত্তের নিত্য কাশের দিক্। যেখানে আলো ছায়া সুর, যেখানে নৃত্য ীত বর্ণ গন্ধ, যেখানে আভাস ইঙ্গিত। যেখানে বিশ্ববাউলের কতারার ঝঙ্কার পথের বাঁকে বাঁকে বেজে বেজে ওঠে, যখানে সেই বৈরাগীর উত্তরীয়ের গেরুয়া রঙ বাতাসে াতাসে ঢেউ খেলিয়ে উড়ে যায়। মানুষের ভিতরকার বরাগীও আপন কাব্যে গানে ছবিতে তারি জবাব দিতে তে পথে চলে, তেমনি তারোই গানের নাচের রূপের সের ভঙ্গীতে। বিষয়ী লোক আপন খাতাঞ্চিখানায় ব'সে খন তা শোনে তখন অবাক হ'য়ে জিজ্ঞাসা করে, "বিষয়টা ী? এ'তে মুনফা কী আছে, এ'তে কী প্রমাণ করে?" অধরকে ধরার জায়গা সে খোঁজে তার মুখ-বাঁধা থলিতে, তার চামড়া-বাঁধানো খাতায়। নিজের মনটা যখন বৈরাগী হয়নি তখন বিশ্ববৈরাগীর বাণী কোনো কাজে লাগে না। তাই দেখেছি খোলা রাস্তার বাঁশিতে হঠাৎ-হাওয়ায় যে-গান বনের মর্ম্মরে নদীর কল্লোলের সঙ্গে সঙ্গে বেজেছে, যে-গান ভোরের শুকতারার পিছে পিছে অরুণ আলোর পথ দিয়ে চ'লে গেল, সহরের দরবারে ঝাড়-লণ্ঠনের আলোতে তারা ঠাঁই পেল না; ওস্তাদেরা বল্‌লে, "এ কিছুই না," প্রবীণেরা বল্‌লে, "এর মানে নেই!" কিছু নয়ই ত বটে, কোনো মানে নেই, সে-কথা খাঁটি; সোনার মতো নিকষে কষা যায় না, পাটের বস্তার মতো দাঁড়িপাল্লায় ওজন চলে না। কিন্তু বৈরাগী জানে, অধর রসেই ওর রস। কতবার ভাবি, গান তো এসেছে গলায় কিন্তু শোনাবার লগ্ন রচনা করতে তো পারিনে; কান যদি বা খোলা থাকে আন্‌মনার মন পাওয়া যাবে কোথায়? সে-মন যদি তার গদি ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়তে পারে তবেই তো যা' বলা যায় না তাই সে শুনবে, যা জানা যায় না তাই সে বুঝবে।

আণ্ডেস্ জাহাজ
১৮ অক্টোবর
১৯২৪

আন্‌মনা গো, আন্‌মনা,
তোমার কাছে আমার বাণীর
মালাখানি আন্‌ব না।
বার্ত্তা আমার ব্যর্থ হবে,
সত্য আমার বুঝ্‌বে কবে,
তোমারো মন জান্‌ব না,
আন্‌মনা গো, আন্‌মনা॥

লগ্ন যদি হয় অনুকূল মৌন মধুর সাঁঝে,
নয়ন তোমার মগ্ন যখন ম্লান আলোর মাঝে,
দেব তোমায় শান্তসুরের সান্ত্বনা,
আনমনা গো, আনমনা॥

জনশূন্য তটের পানে ফির্‌বে হাঁসের দল ;
স্বচ্ছ নদীর জল
আকাশ পানে রইবে পেতে কান
বুকের তলে শুন্‌বে ব'লে গ্রহতারার গান ;
কুলায়-ফেরা পাখী
নীল আকাশের বিরামখানি রাখ্‌বে ডানায় ঢাকি'।
বেণুশাখার অন্তরালে রবির অস্ত যাওয়া
মেঘে মেঘে বুলিয়ে যাবে শেষ বিদায়ের চাওয়া
স্তব্ধ হবে ক্ষুব্ধ হাওয়ার দোলা,
তখন তোমার মন যদি রয় খোলা ;
তখন সন্ধ্যাতারা
পায় যদি তার সাড়া
তোমার উদার আঁখিতারার পারে ;
কনক-চাঁপার গন্ধ-ছোঁওয়া বনের অন্ধকারে
ক্লান্তি-অলস ভাব্‌না তোমার ফুল-বিছানো ভুঁয়ে
মেলিয়ে ছায়া এলিয়ে থাকে শুয়ে ;
ছন্দে গাঁথা বাণী তখন পড়্‌ব তোমার কানে
মন্দ মৃদুল তানে,
ঝিল্লি যেমন শালের বনে নিদ্রা-নীরব রাতে
অন্ধকারের জপের মালায় একটানা সুর গাঁথে।
এক্‌লা তোমার বিজন প্রাণের প্রাঙ্গণে
প্রান্তে ব'সে একমনে
এঁকে যাব আমার গানের আল্‌পনা,
আন্‌মনা গো আন্‌মনা ॥

বুএনোস্ আইরিস।
৪ ডিসেম্বর
১৯২৪

মৌমাছির মতো আমি চাহি না ভাণ্ডার ভরিবারে,
বসন্তেরে ব্যর্থ করিবারে।
সে তো কভু পায় না সন্ধান
কোথা আছে প্রভাতের পরিপূর্ণ দান।

তাহার শ্রবণ ভরে
আপন গুঞ্জনস্বরে,
হারায় সে নিখিলের গান।

জানে না ফুলের গন্ধে আছে কোন্ করুণ বিষাদ,
সে জানে তা' সংগ্রহের পথের সংবাদ।
চাহেনি সে অরণ্যের পানে,
লতার লাবণ্য নাহি জানে,
পড়েনি ফুলের বর্ণে বসন্তের মর্ম্মবাণী লেখা।
মধুকণা লক্ষ্য তার, তারি কক্ষ আছে শুধু শেখা॥

পাখীর মতন মন শুধু উড়িবার সুখ চাহে
উধাও উৎসাহে।
আকাশের বক্ষ হ'তে ডানা ভরি তার
স্বর্ণআলোকের মধু নিতে চায় নাহি যার ভার,
নাহি যার ক্ষয়,
নাহি যার নিরুদ্ধ সঞ্চয়,
যার বাধা নাই,
যারে পাই তবু নাহি পাই,
যার তরে নহে লোভ, নহে ক্ষোভ, নহে তীক্ষ্ণ রীষ,
নহে শূল, নহে গুপ্ত বিষ॥

ক্রাকোভিয়া জাহাজ
১২ ফেব্রুয়ারি
১৯২৫

জন্মকাল থেকে আমাকে একখানা নির্জ্জন নিঃসঙ্গতার ভেলায় মধ্যে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। তীরে দেখ্‌তে পাচ্ছি লোকালয়ের আলো, জনতার কোলাহল; ক্ষণে ক্ষণে ঘাটেও নাম্‌তে হয়েছে, কিন্তু কোনোখানে জমিয়ে বস্‌তে পারিনি। বন্ধুরা ভাবে তাদের এড়িয়ে গেলুম, শত্রুরা ভাবে অহঙ্কারেই দূরে দূরে থাকি। যে-ভাগ্য-দেবতা বরাবর আমাকে সরিয়ে সরিয়ে নিয়ে গেল, পাল গোটাতে সময় দিলে না, রসি যতবার ডাঙার খোঁটায় বেঁধেছি টান মেরে ছিঁড়ে দিয়েছে, সে কোনো কৈফিয়ৎ দিলে না।

সুখদুঃখের হিসাব-নিকাশ নিয়ে ভাগ্যের সঙ্গে তকরার ক'রে লাভ নেই। যা হয়েছে তার একটা হেতু আছে, সেই হেতুর উপর রাগ কর্‌লে হওয়ার উপরেই রাগ্‌তে হয়। ঘড়া রাগ ক'রে ঠং ঠং শব্দে যদি বলে "আমাকে শূন্য ক'রে গড়েছে কেন," তার জবাব হচ্ছে "তোমাকে শূন্য কর্‌বে ব'লেই ঘড়া করেনি, ঘড়া কর্‌বে ব'লেই শূন্য করেছে।" ঘড়ার শূন্যতা পূর্ণতারই অপেক্ষায়; আমার

একলা-আকাশের ফাঁকটাকে ভর্ত্তি করতে হ'বে, সেই প্রত্যাশাটা আমার সঙ্গে সঙ্গে লেগে আছে। দৈবের এই দাবীটিই আমার সম্মান; এ'কে রক্ষা করতে হ'লে পুরাপুরি দাম দিতে হবে।

তাই শূন্য আকাশে একলা ব'সে ভাগ্য-নির্দ্দিষ্ট কাজ ক'রে থাকি। তাতেই আমার হওয়ার অর্থটা বুঝি, কাজেই আনন্দও পাই। বাঁশির ফাঁকটা যখন সুরে ভ'রে ওঠে তখন তার আর কোনো নালিশ থাকে না।

শরীরে মনে প্রাণের দক্ষিণ হাওয়া যখন জোরে বয় তখন আত্ম-প্রকাশের দাক্ষিণ্যেই আমার যথেষ্ট পুরস্কার মেলে। কিন্তু যখন ক্লান্তি আসে, যখন পথ ও পাথেয় দুইই যায় ক'মে অথচ সামনে পথটা দেখতে পাই সুদীর্ঘ, তখন ছেলেবেলা থেকে যে-ঘর বাঁধবার সময় পাইনি সেই ঘরের কথা মন জিজ্ঞাসা করতে থাকে। তখনি আকাশের তারা ছেড়ে দীপের আলোর দিকে চোখ পড়ে। জীব-লোকে ছোট ছোট মাধুরীর দৃশ্য যা তীরের থেকে দেখা দিয়ে স'রে স'রে গিয়েছে চোখের উপরকার আলো ম্লান হ'য়ে এলে সেই অন্ধকারে তাদের ছবি ফুটে ওঠে, তখন বুঝতে পারি সেইসব ক্ষণিকের দেখা প্রত্যেকেই মনের মধ্যে কিছুনা-কিছু ডাক দিয়ে গেছে। তখন মনে হয়, বড় বড় কীর্ত্তি গ'ড়ে তোলাই যে বড় কথা তা নয়, পৃথিবীতে যে-প্রাণের যজ্ঞ সম্পন্ন করবার জন্যে নিমন্ত্রণ পেয়েছি তাতে উৎসবের ছোট পেয়ালাগুলি রসে ভ'রে তোলা শুনতে সহজ, আসলে দুঃসাধ্য!

এবারে ক্লান্ত দুর্ব্বল শরীর নিয়ে বেরিয়েছিলুম। তাই অন্তরে যে-নারীপ্রকৃতি অন্তঃপুরচারিণী হ'য়ে বাস করে ক্ষণে ক্ষণে সে আপন ঘরের দাবী জানাবার সময় পেয়েছিল। এই দাবীর মধ্যে আমার পক্ষে কেবল যে আরামের লোভ তা নয়, সার্থকতার আশাও রয়েছে। জীবন-পথের শেষদিকে বিশ্বলক্ষ্মীর আতিথ্যের জন্যে শ্রান্ত চিত্তের যে-ঔৎসুক্য সে কেবল শক্তির অপচয় নিবারণের আগ্রহে, পাথেয় পূর্ণ ক'রে নেবার জন্যে। কাজের হুকুম এখনো মাথার উপর অথচ উদ্যম এখন নিস্তেজ, মন তাই প্রাণশক্তির ভাণ্ডারীর খোঁজ করে। শুষ্ক তপস্যার পিছনে কোথায় আছে অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার?

দিনের আলো যখন নিবে আসছে, সামনের অন্ধকারে যখন সন্ধ্যার তারা দেখা দিল, যখন জীবনযাত্রার বোঝা খালাষ ক'রে অনেকখানি বাদ দিয়ে অল্প কিছু বেছে নেবার জন্যে মনকে তৈরি হ'তে হচ্ছে তখন কোন্‌টা রেখে কোন্‌টা নেবার জন্যে মনের ব্যগ্রতা। আমি তাই লক্ষ্য ক'রে দেখ্‌ছি। সমস্ত দিন প্রাণপণ চেষ্টায় যা-কিছু সে জমিয়েছিল, গ'ড়ে তুলেছিল, সংসারের হাটে যদি তার কিছু দাম থাকে তবে তা সেইখানেই থাক্, যারা আগ্‌লে রাখ্‌তে চায় তারাই তার খবরদারী করুক; রইল টাকা, রইল খ্যাতি, রইল কীর্ত্তি, রইল প'ড়ে বাইরে; গোধূলির আঁধার যতই নিবিড় হ'য়ে আস্‌ছে ততই তারা ছায়া হ'য়ে এল; তারা মিলিয়ে গেল মেঘের গায়ে সূর্য্যাস্তের বর্ণচ্ছটার সঙ্গে। কিন্তু যে-অনাদি অন্ধকারের বুকের ভিতর থেকে একদিন এই পৃথিবীতে বেরিয়ে এসেছি সেখানকার প্রচ্ছন্ন উৎস থেকে উৎসারিত জলধারা ক্ষণে ক্ষণে আমার যাত্রা-পথের পাশে পাশে মধুর কলস্বরে দেখা দিয়ে আমার তৃষ্ণা মিটিয়েছে, আমার তাপ জুড়িয়েছে, আমার ধূলো ধুয়ে দিয়েছে, সেই তীর্থের জল ভ'রে রইল আমার স্মৃতির পাত্রখানি। সেই অন্ধকার অপরিসীমের হৃদয়-কন্দর থেকে বারবার যে বাঁশির ধ্বনি আমার প্রাণে এসে পৌঁচেছিল, কত মিলনে, কত বিরহে, কত কান্নায়, কত হাসিতে; শরতের ভোর বেলায়, বসন্তের সায়াহ্নে, বর্ষার নিশীথ রাত্রে; কত ধ্যানের শান্তিতে, পূজার আত্মনিবেদনে, দুঃখের গভীরতায়, কত দানে, কত গ্রহণে, কত ত্যাগে, কত সেবায়,—তারা আমার দিনের পথে সুর হ'য়ে বেজেছিল, আজ তারাই আমার রাত্রের পথে দীপ হ'য়ে জ্ব'লে উঠ্‌ছে। সেই অন্ধকারের ঝরণা থেকেই আমার জীবনের অভিষেক, সেই অন্ধকারের নিস্তব্ধতার মধ্যে আমার মৃত্যুর আমন্ত্রণ: আজ আমি তাকে বল্‌তে পারব, হে চিরপ্রচ্ছন্ন, আমার মধ্যে যা-কিছু তুমি তোমার গভীরের ভিতর থেকে তারার মতো প্রকাশ করেছ, রূপে ও বাণীতে, তাতেই নিত্যকালের অমৃত; আমি খুঁজে খুঁজে পাথর কুড়িয়ে কুড়িয়ে কীর্ত্তির যে-জয়স্তম্ভ গেঁথেছি, কালস্রোতের ভাঙনের উপরে তার ভিৎ। সেইজন্যেই আজ গোধূলির ধূসর আলোয় একলা

ব'সে ভাবছিলুম রঙীন্ রসের অক্ষরে লেখা যে-লিপি তোমার কাছ-থেকে ক্ষণে ক্ষণে এসেছিল ভালো ক'রে তা পড়া হয়নি, ব্যস্ত ছিলুম। তার মধ্যে নিমন্ত্রণ ছিল। কোথায়? কারখানাঘরে নয়, খাতাঙ্কিখানায় নয়, ছোট ছোট কোণে যেখানে ধরণীর ছোট সুখগুলি লুকানো। তাই আজ পিছন ফিরে তাকিয়ে মনে মনে ভেবে দেখ্‌ছি, কতবার বঞ্চিত হলুম। জনতার জয়ধ্বনির ডাকে কতবার অন্য মনে গভীর নিভৃতের পাশ দিয়ে চ'লে এসেছি; মায়ামৃগের অনুসরণে কতবার সরল সুন্দরের দিকে চোখ পড়্‌ল না। জীবন-পথে আশে পাশে সুধায় কণা-ভরা যে-বিনামূল্যের ফলগুলি পাতার আড়ালে ঢাকা ছিল, তাদের এড়িয়ে উপবাসী হ'য়ে চ'লে এসেছি ব'লেই এত শ্রান্তি, এত অবসাদ। প্রভাত যেখান থেকে আপন পেয়ালা আলোতে ভ'রে নেয়, রাত্রি যার আঙিনায় ব'সে প্রাণের ছিন্ন সূত্রগুলি বারে বারে জুড়ে তোলে ঐ লুকিয়ে-থাকা ছোট ফলগুলি সেই মহান্ধকারেরই রহস্যগর্ভ থেকে রস পেয়ে ফ'লে উঠ্‌ছে, সেই অন্ধকার "যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ।"

মস্ত যে-সব কাণ্ড করি, শক্ত তেমন নয় ;
জগৎ-হিতের তরে ফিরি বিশ্বজগৎময়।
সঙ্গীর ভিড় বেড়ে চলে ; অনেক লেখাপড়া,
অনেক ভাষায় বকাবকি, অনেক ভাঙা গড়া।
ক্রমে ক্রমে জাল গেঁথে যায়, গিঁঠের পরে গিঁঠ,
মহল পরে মহল ওঠে, ইঁটের পরে ইঁট।
কীর্ত্তিরে কেউ ভালো বলে মন্দ বলে কেহ,
বিশ্বাসে কেউ কাছে আসে, কেউ করে সন্দেহ।
কিছু খাঁটি, কিছু ভেজাল মসলা যেমন জোটে,
মোটের পরে একটা কিছু হ'য়ে ওঠেই ওঠে॥

কিন্তু যে-সব ছোট আশা করুণ অতিশয়
সহজ বটে শুন্‌তে লাগে, মোটেই সহজ নয়।
একটুকু সুখ গানের সুরে ফুলের গন্ধে মেশা,
গাছের ছায়ায় স্বপ্ন দেখা অবকাশের নেশা,
মনে ভাবি চাইলে পাব, যখন তারে চাহি,
তখন দেখি চঞ্চলা সে কোনোখানেই নাহি।
অরূপ অকূল বাষ্পমাঝে বিধি কোমর বেঁধে
আকাশটারে কাঁপিয়ে যখন সৃষ্টি দিলেন ফেঁদে,
আদ্যযুগের খাটুনিতে পাহাড় হল উচ্চ,
লক্ষযুগের স্বপ্নে পেলেন প্রথম ফুলের গুচ্ছ॥

আণ্ডেস্ জাহাজ
১৯ অক্টোবর
১৯২৪

বহুদিন মনে ছিল আশা
ধরণীর এক কোণে
রহিব আপন মনে ;
ধন নয়, মান নয়, একটুকু বাসা
করেছিনু আশা।
গাছটির স্নিগ্ধ ছায়া, নদীটির ধারা,
ঘরে-আনা গোধূলিতে সন্ধ্যাটির তারা,
চামেলির গন্ধটুকু জানালার ধারে,
ভোরের প্রথম আলো জলের ওপারে।
তাহারে জড়ায়ে ঘিরে
ভরিয়া তুলিব ধীরে
জীবনের ক'দিনের কাঁদা আর হাসা ;
ধন নয়, মান নয়, এইটুকু বাসা
করেছিনু আশা॥

বহুদিন মনে ছিল আশা
অন্তরের ধ্যানখানি
লভিবে সম্পূর্ণ বাণী ;
ধন নয়, মান নয়, আপনার ভাষা
করেছিনু আশা।
মেঘে মেঘে এঁকে যায় অস্তগামী রবি
কল্পনার শেষ রঙে সমাপ্তির ছবি,
আপন স্বপন-লোক আলোকে ছায়ায়
রঙে রসে রচি দিব তেমনি মায়ায়।
তাহারে জড়ায়ে ঘিরে
ভরিয়া তুলিবে ধীরে
জীবনের ক'দিনের কাঁদা আর হাসা।
ধন নয়, মান নয়, ধেয়ানের ভাষা
করেছিনু আশা॥

বহুদিন মনে ছিল আশা

প্রাণের গভীর ক্ষুধা

পাবে তার শেষ সুধা ;

ধন নয়, মান নয়, কিছু ভালোবাসা

করেছিনু আশা।

হৃদয়ের সুর দিয়ে নামটুকু ডাকা,

অকারণ পাশে এসে হাতে হাত রাখা,

দূরে গেলে একা ব'সে মনে মনে ভাবা,

কাছে এলে দুই চোখে কথাভরা আভা ;

তাহারে জড়ায়ে ঘিরে

ভরিয়া তুলিবে ধীরে

জীবনের ক'দিনের কাঁদা আর হাসা ;

ধন নয়, মান নয়, কিছু ভালোবাসা

করেছিনু আশা।

জুলিয়ো চেজারে জাহাজ
১০ জানুয়ারী
১৯২৫

উদয়াস্ত দুই তটে অবিচ্ছিন্ন আসন তোমার,

নিগূঢ় সুন্দর অন্ধকার !

প্রভাত-আলোকচ্ছটা শুভ্র তব আদি শঙ্খধ্বনি

চিত্তের কন্দরে মোর বেজেছিল, একদা যেমনি

নূতন চেয়েছি আঁখি তুলি ;

সে তব সঙ্কেত-মন্ত্র ধ্বনিয়াছে, হে মৌনী মহান,

কর্ম্মের তরঙ্গে মোর ; স্বপ্ন-উৎস হ'তে মোর গান

উঠেছে ব্যাকুলি ॥

নিস্তব্ধের সে আহ্বানে, বাহিয়া জীবনযাত্রা মম,

—সিন্ধুগামী তরঙ্গিনী সম—

এতকাল চলেছিনু তোমারি সুদূর অভিসারে

বঙ্কিম জটিল পথে সুখে দুঃখে বন্ধুর সংসারে

অনির্দ্দে[illegible]

কভু পথতরুচ্ছায়ে খেলা-ঘর করেছি রচনা,
শেষ না হইতে খেলা চলিয়া এসেছি অন্যমনা
অশেষের টানে ॥

আজি মোর ক্লান্তি ঘেরি' দিবসের অন্তিম প্রহর
গোধূলির ছায়ায় ধূসর।
হে গম্ভীর, আসিয়াছি তোমারি সোনার সিংহদ্বারে
যেখানে দিনান্ত-রবি আপন চরম নমস্কারে
তোমার চরণে নত হ'ল।
যেথা রিক্ত নিঃস্ব দিবা প্রাচীন ভিক্ষুর জীর্ণবেশে
নূতন প্রাণের লাগি তোমার প্রাঙ্গণ-তলে এসে
বলে "দ্বার খোলো ॥"

দিনের আড়ালে থেকে কি চেয়েছি পাইনি উদ্দেশ
আজ সে সন্ধান হোক্ শেষ।
হে চির-নির্ম্মল, তব শান্তি দিয়ে স্পর্শ কর চোখ,
দৃষ্টির সম্মুখে মম এইবার নির্ব্বারিত হোক্
আঁধারের আলোক-ভাণ্ডার।
নিয়ে যাও সেইখানে নিঃশব্দের গূঢ় গুহা হ'তে
যেখানে বিশ্বের কণ্ঠে নিঃসরিছে চিরন্তন স্রোতে
সঙ্গীত তোমার ॥

দিনের সংগ্রহ হ'তে আজি কোন্ অর্ঘ্য নিয়ে যাই
তোমার মন্দিরে, ভাবি তাই।
কত না শ্রেষ্ঠীর হাতে পেয়েছি কীর্ত্তির পুরস্কার,
সযত্নে এসেছি বহে সেইসব রত্ন অলঙ্কার,
ফিরিয়াছি দেশ হ'তে দেশে।
শেষে আজ চেয়ে দেখি, যবে মোর যাত্রা হ'ল সারা,
দিনের আলোর সাথে ম্লান হ'য়ে এসেছে তাহারা
তব দ্বারে এসে ॥

রাত্রির নিকষে হায় কত সোনা হ'য়ে যায় মিছে,
সে বোঝা ফেলিয়া যাব পিছে।
কিছু বাকি আছে তবু, প্রাতে মোর যাত্রা সহচরী
অকারণে দিয়েছিল মোর হাতে মাধবী-মঞ্জরী,
আজো তাহা অম্লান বিরাজে।
শিশিরের ছোঁওয়া যেন এখনো রয়েছে তার গায়,
এ জন্মের সেই দান রেখে দেব তোমার থালায়
নক্ষত্রের মাঝে॥

হে নিত্য নবীন, কবে তোমারি গোপন কক্ষ হ'তে
পাড়ি দিল এ ফুল আলোতে।
সুপ্তি হ'তে জেগে দেখি, বসন্তে একদা রাত্রি-শেষে
অরুণ কিরণ সাথে এ মাধুরী আসিয়াছে ভেসে
হৃদয়ের বিজন পুলিনে।
দিবসের ধূলা এ'রে কিছুতে পারেনি কাড়িবারে,
সেই তব নিজ দান বহিয়া আনিনু তব দ্বারে
তুমি লও চিনে॥

হে চরম, এর গন্ধে তোমারি আনন্দ এল মিশে,
বুঝেও তখন বুঝিনি সে।
তব লিপি বর্ণে বর্ণে লেখা ছিল এরি পাতে পাতে,
তাই নিয়ে গোপনে সে এসেছিল তোমারে চিনাতে,
কিছু যেন জেনেছি আভাসে।
আজিকে সন্ধ্যায় যবে সব শব্দ হ'ল অবসান
আমার ধেয়ান হ'তে জাগিয়া উঠিছে এরি গান
তোমার আকাশে॥

১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫
ক্রাকোভিয়া জাহাজ

বাংলা ভাষায় প্রেম অর্থে দুটো শব্দের চল্ আছে; ভালোলাগা, আর ভালোবাসা। এই দুটো শব্দে আছে প্রেম সমুদ্রের দুই উল্টোপারের ঠিকানা। যেখানে ভালোলাগা সেখানে ভালো আমাকে লাগে, যেখানে ভালোবাসা সেখানে ভালো অন্যকে বাসি। আবেগের মুখটা যখন নিজের দিকে তখন ভালোলাগা, যখন অন্যের দিকে তখন ভালোবাসা। ভালোলাগায় ভোগের তৃপ্তি, ভালোবাসায় ত্যাগের সাধন।

সংস্কৃত ভাষায় অনুভব বল্‌তে যা' বুঝি তার খাঁটি বাংলা প্রতিশব্দ একদিন ছিল। এতবড় একটা চল্‌তি ব্যবহারের কথা হারাল কোন্ ভাগ্যদোষে বল্‌তে পারিনে। এমন দিন ছিল যখন লাজবাসা ভয়বাসা বল্‌তে বোঝাত লজ্জা অনুভব করা, ভয় অনুভব করা। এখন বলি, লজ্জা পাওয়া, ভয় পাওয়া। কিল্ খাওয়া, গাল্ খাওয়া যেমন ভাষার বিকার, লজ্জা পাওয়া, ভয় পাওয়াও তেম্‌নি।

কারো পরে আমাদের অনুভব যখন সম্পূর্ণ ভালো হ'য়ে ওঠে, ভালো ভাবায় ভালো ইচ্ছায় মন কানায় কানায় ভর্ত্তি হয় তখন তাকেই বলি ভালোবাসা। পূর্ণ উৎকর্ষের ভাবকেই বলা যায় ভালো। স্বাস্থ্য যেমন প্রাণের পূর্ণতা, সৌন্দর্য্য যেমন রূপের পূর্ণতা, সত্য যেমন জ্ঞানের পূর্ণতা, ভালোবাসা তেম্‌নি অনুভূতির পূর্ণতা। ইংরেজিতে good feeling বলে এ তা নয়, এ'কে বলা যেতে পারে perfect feeling.

শুভইচ্ছার পূর্ণতা হচ্চে নৈতিক, তার ক্রিয়া ব্যবহারের উপর; ভালোবাসার পূর্ণতা আত্মিক, সে হচ্ছে মানুষের ব্যক্তি স্বরূপের (personality) পরমপ্রকাশ; শুভইচ্ছা অন্ধকারে যষ্টি, প্রেম অন্ধকারে চাঁদ। মায়ের স্নেহ মায়ের শুভইচ্ছা মাত্র নয়, তা তাঁর পূর্ণতার ঐশ্বর্য্য। তা অন্নের মতো নয়, তা অমৃতের মতো। এই অনুভূতির পূর্ণতা একটি শক্তি। ভালোবাসার বিষয়ের মধ্যে অসীমকে বোধ করবার শক্তি, ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে অপরিমেয়কে দেখতে পাওয়া এবং স্বীকার করাই অপরিমেয়কে সীমার মন্দিরে জাগিয়ে তোলবার শক্তি।

নিজের অস্তিত্বের মূল্য যে-মানুষ ছোট ক'রে দেখে আত্ম-অবিশ্বাসের অবসাদেই সে নিজের সম্পদ উদ্ঘাটিত করতে ভরসা পায় না। বিশ্ব আপনার সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রত্যেক মানুষকে গ্রহণ ও ধারণ করে, মানুষের অন্তরে এই মস্ত সত্যটির অনুবাদ হচ্ছে প্রেম। ব্যক্তিবিশেষকে সে ডাক দিয়ে বলে, "তুমি কারোর চেয়ে কম নও, তোমার মধ্যে এমন মূল্য আছে যার জন্তে প্রাণ দেওয়া চলে।" মানুষ যেখানে আপন সীমা টেনে দিয়ে নিজকে সাধারণের সামিল ক'রে অলস হ'য়ে ব'সে থাকে প্রেম ব্যক্তিবিশেষের সেই সাধারণ সীমাকে মানে না, তাকে অর্ঘ্য দিয়ে বলে, তোমার কপালে আমি তিলক দিয়েছি, তুমি অসাধারণ। সূর্য্যের আলো বৃষ্টির জল যেমন নির্ব্বিচারে সর্ব্বত্রই মাটির জড়তা ও দৈন্য অস্বীকার করে, মরুকে বারবার স্পর্শ করে, তাকে শ্যামলতায় পুলকিত ক'রে তোলে, যে ভূমি রিক্ত তারো সফলতার জন্তে যেমন তাদের নিরন্তর প্রতীক্ষা, তার কাছেও যেমন পূর্ণতার দাবী, মানুষের সমাজে প্রেম তেম্‌নি সব জায়গাতেই অসীম প্রত্যাশা জাগিয়ে রাখে। ব্যক্তিকে সে যে-মূল্য দেয় সে-মূল্য মহিমার মূল্য। অন্তর্নিহিত এই মহিমার আশ্বাসে মানুষের সৃষ্টি-শক্তি নানাদিকে পূর্ণ হ'য়ে ওঠে; তার কর্ম্মের ক্লান্তি দূর হ'য়ে যায়।

এই ব্যক্তিগত প্রেমের বাহন নারী। ইতিহাসের অপ্রকাশিত লিখন যদি বের করা যেত তাহ'লে দেখ্‌তে পেতেম নারীর প্রেমের প্রেরণা মানুষের সমাজে কী কাজ করেছে। শক্তির যে-ক্রিয়া উদ্যত চেষ্টারূপে চঞ্চল আমরা তাকেই শক্তির প্রকাশরূপে দেখি, কিন্তু যে-ক্রিয়া গূঢ় উদ্দীপনারূপে পরিব্যাপ্ত তার কথা মনেই আনিনে। বিস্ময়ের কথা এই যে বিশ্বের স্ত্রীপ্রকৃতিকেই ভারতবর্ষ শক্তি ব'লে জেনেছে।

সকলেই জানে এই শক্তিরই বিকারের মতো এমন সর্ব্বনেশে বিপদ আর কিছুই নেই। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভীমের হৃদয়ের মধ্যে অদৃশ্য থেকে দ্রৌপদী তাঁকে বল জুগিয়েছেন। বীর আণ্টনির হৃদয় অধিকার ক'রে ক্লিওপাট্রা তাঁর বল হরণ ক'রে নিল। সত্যবানকে মৃত্যুর মুখ থেকে উদ্ধার করেন সাবিত্রী, কিন্তু কত নারী পুরুষের

সত্য নষ্ট ক'রে তাকে মৃত্যুর মুখে নিয়ে গেছে তার সংখ্যা নেই।

তাইতো গোড়ায় বলেছি প্রেমের দুই বিরুদ্ধপার আছে। একপারে চোরাবালি, আরেকপারে ফসলের ক্ষেত। একপারে ভালোলাগার দৌরাত্ম্য, অন্যপারে ভালোবাসার আমন্ত্রণ। মাতৃস্নেহের মধ্যেও এই দুই জাতের প্রেম। একটাতে প্রধানত আসক্তি নিজের পরিতৃপ্তি খোঁজে,—সেই অন্ধ মাতৃস্নেহ আমাদের দেশে বিস্তর দেখ্‌তে পাই। তাতে সন্তানকে বড় ক'রে না তুলে' তাকে অভিভূত করে। তাতে কোনো পক্ষেরই কল্যাণ নেই। যে-প্রেম ত্যাগের দ্বারা মানুষকে মুক্তি দিতে জানে না, পরন্তু ত্যাগের বিনিময়ে মানুষকে আত্মসাৎ কর্‌তে চায় সে-প্রেম ত রিপু। একপক্ষকে ক্ষুধার দাহে সে দগ্ধ করে অন্যপক্ষকে লালায়িত আসক্তি দ্বারা লেহন ক'রে জীর্ণ ক'রে দেয়। এই মাতৃলালন-পাশের পরিবেষ্টনের মধ্যে যারা চির-অবরুদ্ধ আমাদের দেশে তাদের সংখ্যা বিস্তর। তাদের শৈশব আর ছাড়্‌তে চায় না। আসক্তি-পরায়ণ মাতার মূঢ় আদেশ-পালনের অনর্থ বহন ক'রে অপমানের মধ্যে অভাবের মধ্যে চির-জীবনের মতো মাথা হেঁট হ'য়ে গেছে এমন সকল বয়স্ক নাবালকের দল আমাদের দেশে ঘরে ঘরে। আমাদের দেশে মাতার ক্রোড়-রাজত্ব বিস্তারে পৌরুষের যত হানি হয়েছে এমন বিদেশী শাসনের হাত কড়ির নির্ম্মমতার দ্বারাও হয়নি।

স্ত্রীপুরুষের প্রেমেও সেই একই কথা। নারীর প্রেম পুরুষকে পূর্ণশক্তিতে জাগ্রত কর্‌তে পারে কিন্তু সে-প্রেম যদি শুক্লপক্ষের না হ'য়ে কৃষ্ণপক্ষের হয় তবে তার মালিন্যের আর তুলনা নেই। পুরুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ তপস্যায়; নারীর প্রেমে ত্যাগধর্ম্ম সেবাধর্ম্ম সেই তপস্যারই সুরে সুর মেলানো; এই দুয়ের যোগে পরস্পরের দীপ্তি উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। নারীর প্রেমে আরেক সুরও বাজ্‌তে পারে, মদনধনুর জ্যায়ের টঙ্কার, সে মুক্তির সুর না, সে বন্ধনের সঙ্গীত। তাতে তপস্যা ভাঙে, শিবের ক্রোধানল উদ্দীপ্ত হয়।

কেন বলি পুরুষের ধর্ম্ম তপস্যা? কারণ, জীবলোকের কাজে প্রকৃতি তাকে নারীর তুলনায় অনেক পরিমাণে অবকাশ দিয়েছে। সেই অবকাশটাকে নষ্ট করলেই তার সবচেয়ে ফাঁকি। পুরুষ সেই অবকাশকে আপন সাধনার ক্ষেত্র করেছে ব'লেই মানুষের উৎকর্ষ জৈব প্রকৃতির সীমানা অনেক দূরে ছাড়িয়ে গেল। প্রকৃতির দাবী থেকে মুক্তি নিয়েই পুরুষ জ্ঞানকে ধ্যানকে শক্তিকে অসীমের মধ্যে অনুসরণ ক'রে চল্‌ছে। সেইজন্যে পুরুষের সাধনায় চিরকালই প্রকৃতির সঙ্গে বিরুদ্ধতা আছে। নারীর প্রেম যেখানে এই বিরোধের সমন্বয় ক'রে দেয়, কঠোর জ্ঞানের বেদি-প্রাঙ্গণে সে যখন পূজা-মাধুর্য্যের আসন রচনা করে; পুরুষের মুক্তিকে যখন সে লুপ্ত করে না, তাকে সুন্দর ক'রে তোলে; তার পথকে অবরুদ্ধ করে না, পথের পাথেয় জুগিয়ে দেয়; ভোগবতীর জলে ডুবিয়ে দেয় না সুরধুনীর জলে স্নান করায়, তখন বৈরাগ্যের সঙ্গে অনুরাগের, হরের সঙ্গে পার্ব্বতীর শুভপরিণয় সার্থক হয়।

বিচ্ছেদের ভিতর দিয়েই শক্তি কাজ করবার ক্ষেত্র পায়। চাঁদ ও পৃথিবীর মাঝখানে যে-বিরহ আছে তারই অবকাশে পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্রকে চাঁদ কথা কওয়ায়। স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের মাঝে বিধাতা একটি দূরত্ব রেখে দিয়েছেন। এই দূরত্বের ফাঁকটাই কেবলি সেবায় ক্ষমায় বীর্য্যে সৌন্দর্য্যে কল্যাণে ভ'রে ওঠে, এইখানেই সীমায় অসীমে শুভদৃষ্টি। জৈবক্ষেত্রে প্রকৃতির অধিকারের মধ্যে মানুষের অনেক সৃষ্টি আছে কিন্তু চিত্ত-ক্ষেত্রে তার সৃষ্টির অন্ত নেই। চিত্তের মহাকাশ স্থূল আসক্তির দ্বারা জমাট হ'য়ে না গেলে তবেই সেই সৃষ্টির কাজ সহজ হয়। দীপ-শিখাকে দুই হাতে আঁকড়ে ধ'রে যে মাতাল বেশি ক'রে পেতে চায়, সে নিজেও পোড়ে, আলোটিকেও নিবিয়ে দেয়।

মুক্ত অবকাশের মধ্যে পুরুষ মুক্তি সাধনার যে-মন্দির বহুদিনের তপস্যায় গেঁথে তুলেছে পূজারিণী নারী সেই-খানে প্রেমের প্রদীপ জ্বালবার ভার পেল। সে কথা যদি সে ভুলে যায়, দেবতার নৈবেদ্যকে যদি সে মাংসের হাটে বেচ্‌তে কুণ্ঠিত না হয়, তা হ'লে মর্ত্তের মর্ম্মস্থানে যে-অমরাবতী আছে তার পরাভব ঘটে, পুরুষ যায় প্রমত্ততার রসাতলে, আর নারীর হৃদয়ে যে রসের পাত্র আছে তা' ভেঙে গিয়ে সে রস ধূলাকে পঙ্কিল করে।

২৮ ডিসেম্বর ১৯২৪
সান্ ইসিড্রো

পূর্ণতার সাধনায় বনস্পতি চাহে ঊর্দ্ধপানে ;
পুঞ্জ পুঞ্জ পল্লবে পল্লবে
নিত্য তার সাড়া জাগে বিরাটের নিঃশব্দ আহ্বানে,
মন্ত্র জপে মর্ম্মরিত রবে।
ধ্রুবত্বের মূর্ত্তি সে যে, দৃঢ়তা শাখায় প্রশাখায়
বিপুল প্রাণের বহে ভার।
তবু তার শ্যামলতা কম্পমান ভীরু বেদনায়
আন্দোলিয়া উঠে বারম্বার ॥

দয়া কোরো, দয়া কোরো, আরণ্যক এই তপস্বীরে,
ধৈর্য্য ধর, ওগো দিগঙ্গনা,
ব্যর্থ করিবারে তায় অশান্ত আবেগে ফিরে ফিরে
বনের অঙ্গনে মাতিয়ো না।
একি তীব্র প্রেম, এ যে শিলাবৃষ্টি নির্ম্মম দুঃসহ,—
দুরন্ত চুম্বন-বেগে তব
ছিঁড়িতে ঝরাতে চাও অন্ধ সুখে, কহ মোরে কহ,
কিশোর কোরক নব নব ?

অকস্মাৎ দস্যুতায় তারে রিক্ত করি নিতে চাও
সর্ব্বস্ব তাহার তব সাথে ?
ছিন্ন করি লবে যাহা চিহ্ন তার রবে না কোথাও,
হবে তারে মুহূর্ত্তে হারাতে।
যে লুব্ধ ধূলির তলে লুকাতে চাহিবে তব লাভ
সে তোমারে ফাঁকি দেবে শেষে।
লুণ্ঠনের ধন লুঠি সর্ব্বগ্রাসী দারুণ অভাব
উঠিবে কঠিন হাসি হেসে ॥

আসুক তোমার প্রেম দীপ্তিরূপে নীলাম্বর-তলে,
শান্তিরূপে এস দিগঙ্গনা।
উঠুক স্পন্দিত হ'য়ে শাখে শাখে পল্লবে বল্কলে
সুগম্ভীর তোমার বন্দনা।
দাও তারে সেই তেজ মহত্ত্বে যাহার সমাধান,
সার্থক হোক্ সে বনস্পতি।
বিশ্বের অঞ্জলি যেন ভরিয়া করিতে পারে দান
তপস্যার পূর্ণ পরিণতি॥

উঠুক তোমার প্রেম রূপ ধরি তার সর্ব্বমাঝে
নিত্য নব পত্রে ফলে ফুলে।
গোপনে আঁধারে তার যে-অনন্ত নিয়ত বিরাজে
আবরণ দাও তার খুলে।
তাহার গৌরবে লহ তোমারি স্পর্শের পরিচয়,
আপনার চরম বারতা।
তারি লাভে লাভ কর বিনা লোভে সম্পদ অক্ষয়,
তারি ফলে তব সফলতা॥

রক্তকরবী*

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজ আপনাদের বারোয়ারী সভায় আমার "নন্দিনী"র পালা অভিনয়। প্রায় কখনো ডাক পড়ে না, এবারে কৌতূহল হয়েছে। ভয় হচ্ছে, পালা সাঙ্গ হ'লে ভিখ মিল্‌বে না, কুত্তা লেলিয়ে দেবেন। তারা পালাটাকে ছিঁড়ে কুটিকুটি করবার চেষ্টা করবে। এক ভরসা, কোথাও দন্তস্ফুট করতে পারবে না।

আপনারা প্রবীণ। চশমা বাগিয়ে পালাটার ভিতর-থেকে একটা গূঢ় অর্থ খুঁটিয়ে বের-করবার চেষ্টা করবেন। আমার নিবেদন, যেটা গূঢ় তাকে প্রকাশ্য করলেই তার সার্থকতা চ'লে যায়। হৃৎপিণ্ডটা পাঁজরের আড়ালে থেকেই কাজ করে। তাকে বের ক'রে তার কার্য্য-প্রণালী তদারক করতে গেলে কাজ বন্ধ হ'য়ে যাবে। দশমুণ্ড বিশহাতওয়ালা রাবণের স্বর্ণলঙ্কায় সামান্য একটা বন্য বানর ল্যাজে ক'রে আগুন লাগায় এই কাহিনীটি যদি কবিগুরু আজ আপনাদের এই সভায় উপস্থিত করতেন তা হ'লে তার গূঢ় অর্থ নিয়ে আপনাদের চণ্ডীমণ্ডপে একটা কলরব উঠ্‌ত। সন্দেহ করতেন কোনো একটা সুপ্রতিষ্ঠিত বিধি-ব্যবস্থাকে বুঝি বিদ্রূপ করা হচ্ছে। অথচ শত শত বছর ধ'রে স্বভাব-সন্দিগ্ধ লোকেরাও রামায়ণের প্রকাশ্যে যে-রস আছে তাই ভোগ ক'রে এলেন—গোপনে যে-অর্থ আছে তার ঝুঁটি ধ'রে টানাটানি করলেন না।

আমার পালায় একটি রাজা আছে। আধুনিক যুগে তার একটার বেশি মুণ্ড ও দুটোর বেশি হাত দিতে সাহস হ'ল না। আদিকবির মতো ভরসা থাক্‌লে দিতেম। বৈজ্ঞানিক শক্তিতে মানুষের হাত পা মুণ্ড অদৃশ্যভাবে বেড়ে গেছে। আমার পালার রাজা যে সেই শক্তিবাহুল্যের যোগেই গ্রহণ করেন, গ্রাস করেন, নাটকে এমন আভাস আছে। ত্রেতাযুগের বহুসংগ্রহী বহুগ্রাসী রাবণ বিদ্যুৎ-বজ্রধারী দেবতাদের আপন প্রাসাদ-দ্বারে শৃঙ্খলিত ক'রে তাদের দ্বারা কাজ আদায় করত। তার প্রতাপ চিরদিনই অক্ষুণ্ণ থাক্‌তে পারত। কিন্তু তার দেবদ্রোহী সমৃদ্ধির মাঝখানে হঠাৎ একটি মানবকন্যা এসে দাঁড়ালেন, অম্‌নি ধর্ম্ম জেগে উঠলেন। মূঢ় নিরস্ত্র বানরকে দিয়ে তিনি রাক্ষসকে পরাস্ত করলেন। আমার নাটকে ঠিক এমনটি ঘটেনি কিন্তু এর মধ্যেও মানবকন্যার আবির্ভাব আছে। তা ছাড়া কলিযুগের রাক্ষসের সঙ্গে কলিযুগের বানরের যুদ্ধ ঘট্‌বে এমনও একটা সূচনা আছে।

আদি কবির সাতকাণ্ডে স্থানাভাব ছিল না এই কারণে লঙ্কাপুরীতে তিনি রাবণ ও বিভীষণকে স্বতন্ত্র স্থান দিয়েছিলেন। কিন্তু আভাস দিয়েছিলেন যে তারা একই, তারা সহোদর ভাই। একই নীড়ে পাপ ও সেই পাপের মৃত্যুবাণ লালিত হয়েছে। আমার স্বল্পায়তন নাটকে রাবণের বর্ত্তমান প্রতিনিধিটি একদেহেই রাবণ ও বিভীষণ; সে আপনাকেই আপনি পরাস্ত করে।

বাল্মীকির রামায়ণকে ভক্ত পাঠকেরা সত্যমূলক ব'লে স্বীকার করেন। আমার পালাটিকে যাঁরা শ্রদ্ধা ক'রে শুনবেন তাঁরা জানবেন এটিও সত্যমূলক। ঐতিহাসিকের উপরে প্রমাণের ভার দিলে ঠকবেন। এইটুকু বললেই যথেষ্ট হ'বে যে, কবির জ্ঞান-বিশ্বাস-মতে এটি সত্য।

ঘটনা-স্থানটির প্রকৃত নাম নিয়ে ভৌগোলিকদের কাছে মতের ঐক্য প্রত্যাশা করা মিছে। স্বর্ণলঙ্কা-যে সিংহলে তা নিয়েও আজ কত কথাই উঠেছে। বস্তুত পৃথিবীর নানা স্থানে নানা স্তরেই স্বর্ণলঙ্কার চিহ্ন পাওয়া যায়। কবিগুরু যে সেই অনির্দ্দিষ্ট অথচ সুপরিনির্দ্দিষ্ট স্বর্ণলঙ্কার সংবাদ পেয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। কারণ সে-স্বর্ণলঙ্কা যদি খনিজ সোনাতেই বিশেষ একটা স্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকৃত তা হ'লে ল্যাজের আগুনে ভস্ম না হ'য়ে আরো উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ত।

স্বর্ণলঙ্কার মতোই আমার পালার ঘটনা-স্থানের একটি ডাক নাম আছে। তাকে কবি যক্ষপুরী ব'লে জানে। তার কারণ এ নয় যে সেখানে পৌরাণিক কুবেরের স্বর্ণ-সিংহাসন। যক্ষের ধন মাটির নীচে পোঁতা আছে। এখানকার রাজা পাতালে সুরঙ্গ-খোদাই ক'রে সেই ধন হরণে নিযুক্ত। তাই আদর ক'রে এই পুরীকে সমঝ্‌দার লোকেরা যক্ষপুরী বলে। লক্ষ্মীপুরী কেন বলে না?

* কবির অভিভাষণ

কারণ, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বৈকুণ্ঠে, যক্ষের ভাণ্ডার পাতালে।

রামায়ণের গল্পের ধারার সঙ্গে এর যে-একটা মিল দেখ্‌ছি তার কারণ এ নয় যে,রামায়ণ থেকে গল্পটি আহরণ করা। আসল কারণ, কবিগুরুই আমার গল্পটিকে ধ্যান-যোগে আগে থাক্‌তে হরণ করেছেন। যদি বলো প্রমাণ কি? প্রমাণ এই যে, স্বর্ণলঙ্কা তাঁর কালে এমন উচ্চ চূড়া নিয়ে প্রকাশমান ছিল কেউ তা মান্‌বে না। এটা-যে বর্ত্তমান কালেরই, হাজার জায়গায় তা'র হাজার প্রমাণ প্রত্যক্ষ হ'য়ে আছে।

ধ্যানের সিঁধ কেটে মহাকবি ভাবীকালের সামগ্রীতে কি রকম কৌশলে হস্তক্ষেপ করতেন তার আর-একটি প্রমাণ দেব।

কর্ষণজীবী এবং আকর্ষণজীবী এই দুই জাতীয় সভ্যতার মধ্যে একটা বিষম দ্বন্দ্ব আছে এসম্বন্ধে বন্ধু-মহলে আমি প্রায়ই আলাপ ক'রে থাকি। কৃষি-কাজ থেকে হরণের কাজে মানুষকে টেনে নিয়ে কলিযুগ কৃষি-পল্লীকে কেবলি উজাড় ক'রে দিচ্ছে। তা ছাড়া, শোষণ-জীবী সভ্যতার ক্ষুধা-তৃষ্ণা দ্বেষ-হিংসা বিলাস বিভ্রম সুশিক্ষিত রাক্ষসেরই মতো। আমার মুখের এই বচনটি কবি তাঁর রূপকের ঝুলিতে লুকিয়ে আত্মসাৎ করেছেন সেটা প্রণিধান করলেই বোঝা যায়। নব-দূর্ব্বা-দল-শ্যাম রামচন্দ্রের বক্ষ সংলগ্ন সীতাকে স্বর্ণপুরীর অধীশ্বর দশানন হরণ ক'রে নিয়েছিল সেটা কি সেকালের কথা, না একালের? সেটা কি ত্রেতাযুগের ঋষির কথা, না আমার মতো কলিযুগের কবির কথা? তখনো কি সোনার খনির মালেকরা নব-দূর্ব্বাদল-বিলাসী কৃষকদের ঝুঁটি ধ'রে টান দিয়েছিল?

আরো একটা কথা মনে রাখ্‌তে হবে। কৃষী-যে দানবীয় লোভের টানেই আত্মবিস্মৃত হচ্ছে ত্রেতাযুগে তারই বৃত্তান্তটি গা-ঢাকা দিয়ে বলবার জন্যেই সোনার মায়ামৃগের বর্ণনা আছে। আজকের দিনের রাক্ষসের মায়ামৃগের লোভেই তো আজকের দিনের সীতা তার হাতে ধরা পড়্‌ছে; নইলে গ্রামের পঞ্চবটচ্ছায়াশীতল কুটীর ছেড়ে চাষীরা টিটাগড়ের চট্‌কলে মর্‌তে আস্‌বে কেন? বাল্মীকির পক্ষে এসমস্তই পরবর্ত্তী কালের, অর্থাৎ পরশ্ব।

বারোয়ারীর প্রবীণ মণ্ডলীর কাছে একথা ব'লে ভালো করিলেম না। সীতাচরিত প্রভৃতি পুণ্যকথাসম্বন্ধে তাঁরা আমাকে অশ্রদ্ধাবান্‌ ব'লেই সন্দেহ করেন। এটা আমার দোষ নয়, তাঁদেরও দোষ বল্‌তে পারিনে, বিধাতা তাঁদের এই রকমই বুদ্ধি দিয়েছেন। বোধ করি সেটা আমার সঙ্গে বারে বারে কৌতুক করবার জন্যেই। পুণ্য-শ্লোক বাল্মীকির প্রতি কলঙ্ক আরোপ করলুম ব'লে পুনর্ব্বার হয়তো তাঁরা আমাকে এক-ঘরে করবার চেষ্টা করবেন। ভরসার কথা আমার দলের লোক আছেন, কৃত্তিবাস নামে আর এক বাঙালী কবি।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে উঠ্‌ল। আধুনিক সমস্যা ব'লে কোনো পদার্থ নেই, মানুষের সব গুরুতর সমস্যাই চিরকালের। রত্নাকরের গল্পটার মধ্যে তারই প্রমাণ পাই। রত্নাকর গোড়ায় ছিলেন দস্যু, তারপরে দস্যুবৃত্তি ছেড়ে ভক্ত হলেন রামের। অর্থাৎ ধর্ষণবিদ্যার প্রভাব এড়িয়ে কর্ষণবিদ্যায় যখন দীক্ষা নিলেন তখনই সুন্দরের আশী-র্ব্বাদে তাঁর বীণা বাজ্‌ল। এই তত্ত্বটা তখনকার দিনেও লোকের মনে জেগেছে। এককালে যিনি দস্যু ছিলেন তিনিই যখন কবি হ'লেন তখনই আরণ্যকদের হাতে স্বর্ণ-লঙ্কার পরাভবের বাণী তাঁর কণ্ঠে এমন জোরের সঙ্গে বেজেছিল।

হঠাৎ মনে হতে পারে রামায়ণটা রূপক কথা। বিশেষত যখন দেখি রামরাবণ দুই নামের দুই বিপরীত অর্থ। রাম হ'ল আরাম, শান্তি; রাবণ হ'ল চীৎকার, অশান্তি। একটিতে নবাঙ্কুরের মাধুর্য্য, পল্লবের মর্ম্মর, আর-একটিতে শান-বাঁধানো রাস্তার উপর দিয়ে দৈত্যরথের বীভৎস শৃঙ্গ-ধ্বনি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও রামায়ণ রূপক নয়, আমার রক্ত-করবীর পালাটিও রূপকনাট্য নয়। রামায়ণ মুখ্যত মানু-ষের সুখদুঃখবিরহমিলন ভালো-মন্দ নিয়ে বিরোধের কথা; মানবের মহিমা উজ্জ্বল ক'রে ধরবার জন্যেই চিত্র-পটে দানবের পটভূমিকা। এই বিরোধ একদিকে ব্যক্তি-গত মানুষের, আরেক দিকে শ্রেণীগত মানুষের। রাম ও রাবণ একদিকে দুই মানুষের ব্যক্তিগত রূপ, আরেক দিকে

মানুষের দুই শ্রেণীগত রূপ। আমার নাটকও একইকালে ব্যক্তিগত মানুষের, আর মানুষগত শ্রেণীর। শ্রোতারা যদি কবির পরামর্শ নিতে অবজ্ঞা না করেন তা হ'লে আমি বলি শ্রেণীর কথাটা ভু'লে যান। এইটি মনে রাখুন, রক্তকরবীর সমস্ত পালাটি নন্দিনী ব'লে একটি মানবীর ছবি। চারিদিকের পীড়নের ভিতর দিয়ে তার আত্মপ্রকাশ। ফোয়ারা যেমন সঙ্কীর্ণতার পীড়নে হাসিতে অশ্রুতে কলধ্বনিতে উর্দ্ধে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে তেমনি। সেই ছবির দিকেই যদি সম্পূর্ণ ক'রে তাকিয়ে দেখেন তা হ'লে হয়তো কিছু রস পেতে পারেন। নয় তো রক্তকরবীর পাপড়ির আড়ালে অর্থ খুঁজতে গিয়ে যদি অনর্থ ঘটে তা হ'লে তার দায় কবির নয়। নাটকের মধ্যেই কবি আভাস দিয়েছে যে, মাটি-খুঁড়ে যে-পাতালে খনিজ ধন খোঁজা হয় নন্দিনী সেখানকার নয়; মাটির উপরিতলে যেখানে প্রাণের যেখানে রূপের নৃত্য, যেখানে প্রেমের লীলা নন্দিনী সেই সহজ সুখের, সেই সহজ সৌন্দর্য্যের।

বিদায় বাসনা

শুভ্র কোন শরতের নিশা অবসানে,
মরণের পানে
চাহিতে হইবে মোরে ক্ষীণ দীপালোকে ;
নিভে যাবে মরমের সর্ব্ব শোক জ্বালা,
কোন মৃত্যুমালা
স্বর্গ হতে বক্ষে লভি যাব স্বপ্নলোকে।
সেদিন কুয়াসা-মাখা ধূসর আকাশে
ক্ষণিকের ত্রাসে
থেমে যাবে পাখীদের আনন্দ কাকলি ;
শিশিরের অশ্রুজলে সিক্ত হবে ধরা,
সুখ সুপ্তি ভরা
ধরণীরে চমকিয়া উল্কা সম চলি
যাব আমি ; প্রভাত আলোর যবনিকা
মুহূর্ত্তের লিখা
অন্তরে বরিয়া দিবে আমারে বিদায়।
অন্তরীক্ষ মুখর হইবে ক্ষণতরে
কি আবেগ ভরে,
পূর্ণ হবে সৃষ্টির চরম অভিপ্রায়।
* * *
হে প্রেয়সি, তোমারে হেরিব সেই প্রাতে
অকম্পিত হাতে
দিতেছ আমারে শেষ পথের পাথেয় ;
অনন্ত বেদনা মাখা স্নিগ্ধ আঁখি দুটি
উঠিবে গো ফুটি
ঊর্দ্ধাতারা সম। প্রিয়ে, বলিবে, "অদেয়
তোমারে এ মহাক্ষণে মোর কিছু নাই"
আমি কব, "চাই
তোমার নিকটে, ওগো শেষ এক দান :—
আমি চলে গেলে তুমি রবে চিরতরে
শুভ্র বেশ ধরে,
ও সৌন্দর্য্যে রবে শুধু অযত্নের স্থান।

হে সঙ্গিনী, যাত্রাকালে পূর্ণ করি দাও ;
নিঃশেষে জ্বালাও
মোর চক্ষে শেষবার তব রূপশিখা ;
মরণের বর্ণহীন কোলে দাও আঁকি,
পাংশুতারে ঢাকি,
প্রাণ ছবি দিয়ে বরতনুর তুলিকা।
ঝলকি উঠুক তব অঙ্গেতে প্রলয়,
হীরক বলয়
মরকত, পদ্মরাগ, কনক মেখলা,
নূপুর, কঙ্কণে তোল গুঞ্জন ঝঙ্কার,
ভাঙো অহংকার
অশনির, দুলাইয়া কুণ্ডল চঞ্চলা।
দুলাইয়া সুবর্ণ খচিত নীলবাস
চরম আশ্বাস
আনি দাও অন্তরে আমার হে সুন্দরী।
মুকুতা বন্ধনে বেঁধে কৃষ্ণ কেশপাশ
কর উপহাস
স্মিত হাস্যে হৃদি হতে মৃত্যু ভয় হরি।
জাগাইও শিরায় আরবার ওগো প্রিয়ে,
তব স্পর্শ দিয়ে
পূর্ব্বরাগ মদিরার তীব্র মাদকতা
নিস্তেজ নয়ন রেখে তব নয়নেতে
তোমার কর্ণেতে
বলে যাব মৃদুকণ্ঠে বিদায়ের কথা।"
* * *
তারপর প্রদোষের আধ রক্তিমেতে
শিথিল করেতে
ধরিব তোমার হস্ত শেষ সম্ভাষণে
নিভাইব ধীরে তব রূপ উন্মাদনা,
হায় সুলোচনা,
নিষ্প্রভ করিয়া যাব সর্ব্ব আভরণে॥

নিশান*

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

সেমেন্ ইভানফ রেলওয়ের রেলপথ-রক্ষকের কাজ করিত। তাহার বাস কুটীর এক ষ্টেশন হইতে ১২ মাইল এবং আর-একটা বাস কুটীর আর-এক ষ্টেশন হইতে ১০ মাইল দূরে ছিল। গত বৎসর ৪ মাইল দূরে একটা বয়নের জাঁতা-কল স্থাপিত হইয়াছিল। বনভূমির গাছ-পালার পিছন হইতে উহার উচ্চ ধূম-চোংগুলো কালো দেখাইতেছিল। ইহা অপেক্ষা নিকটে, মানুষের বাসস্থান নাই।

সেমেন্ ইভানফ একজন রুগ্ন, ভগ্ন-স্বাস্থ্য ব্যক্তি। ৯ বৎসর পূর্ব্বে সে যুদ্ধে গিয়াছিল। সে একজন অফিসারের আর্দালির কাজ করিত; যুদ্ধের সমস্ত সময়টা সে সেই অফিসারের সঙ্গেই ছিল। সে অনাহারে থাকিত, শীতে জমিয়া যাইত, উষ্ণ সূর্য্য-কিরণে দগ্ধ হইত এবং তুষারের সময় কিংবা জলন্ত উত্তাপের সময় সে ৪০ হইতে ৫০ মাইল পর্য্যন্ত মার্চ্ করিত। অনেক সময় গুলি-বর্ষণের মধ্য দিয়া তাহাকে চলিতে হইয়াছে—কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় একটি গুলিও কখনো তাহার শরীর স্পর্শ করে নাই।

একবার তাহার রেজিমেণ্ট প্রথম সারিতে ছিল; এক সপ্তাহ ধরিয়া দুই পক্ষ হইতেই অবিরাম গুলিবর্ষণ হইয়াছিল;—গর্ত্তের এই দিকে রুশীয় সৈন্য-সারি এবং গর্ত্তের ওপারে তুর্কীয় সৈন্য-সারি সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত গুলি বর্ষণ করিয়াছিল। সেমেনের অফিসারও সম্মুখস্থ সারিতে ছিল; দিনের মধ্যে তিনবার করিয়া সেমেন্, রেজিমেণ্টের পাকশালা হইতে গরম চা ও খাদ্য গর্ত্তের মধ্যে লইয়া যাইত। খোলা জায়গা দিয়া সেমেন্ হাঁটিয়া চলিত; তাহার মাথার উপর দিয়া সোঁ-সোঁ শব্দে গুলি চলিত এবং তত্রস্থ পাথরগুলো ফাটাইয়া দিত। সেমেন্ ভয়ত্রস্ত হইয়াও চলিতে থাকিত; কাঁদিত, তবু চলিতে থাকিত। অফিসার বরাবরই গরম-গরম চা পাইত।

সেমেন্ বিনা-আঘাতে যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসিল; কিন্তু তা'র পা ও বাহুতে বাতের বেদনা হইল। সেই সময় হইতে সে অশেষ কষ্ট ভোগ করিয়াছে। তাহার প্রত্যাগমনের একটু পরেই তাহার পিতার মৃত্যু হয়; তা'র পর তা'র একটি ৪ বৎসর-বয়স্ক ছোটো ছেলেও কণ্ঠ-রোগে মারা যায়। সে ও তা'র স্ত্রী এক্ষণে একাকী—সংসারে তা'র আর কেহই রহিল না।

যে-জমিটুকু উহাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল, সেই জমির চাষেও উহারা সফল হইল না—ফুলো হাত-পা লইয়া পারৎপক্ষে চাষ করা বড়ই কঠিন। তাই তাদের নিজের গ্রামে কিছু করিতে না পারিয়া, ভাগ্য অন্বেষণের জন্য তা'রা নূতন কোনো জায়গায় যাইবে বলিয়া স্থির করিল। সেমেন্ কিছুকাল সস্ত্রীক ডন্-নদীর ধারে বাস করিল; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কোথাও কিছু করিয়া উঠিতে পারিল না। অবশেষে তা'র স্ত্রী দাসীবৃত্তি অবলম্বন করিল এবং সেমেন্ পূর্ব্বের ন্যায় আবার ভব-ঘুরে হইয়া দাঁড়াইল।

একবার কোনো কার্য্যোপলক্ষে তাহাকে রেল-পথে যাইতে হয়, সেই সময় একটা ষ্টেশনের ষ্টেশন-মাষ্টার তা'র নজরে পড়িল। মনে হইল যেন সেই ষ্টেশন-মাষ্টার তাহার পরিচিত। সেমেন্ একদৃষ্টে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল, সেও সেমেনের মুখ আগ্রহের সহিত দেখিতে লাগিল। সে ছিল তার রেজিমেণ্টের একজন অফিসার। সে বলিয়া উঠিল "তুমি ইভানফ্ নাকি?"

"হাঁ মহাশয়, আমি ইভানফ্।"

"তুমি এখানে কি ক'রে এলে?" তখন সেমেন্ তাহার দুর্দশার সমস্ত বিবরণ তাহার নিকট বলিল।

"আচ্ছা বেশ, এখন তুমি যাচ্ছ কোথায়?"

"আমি তা বল্‌তে পারিনে, মশায়।"

"সে কি কথা? তুমি ত ভারি অদ্ভুত লোক, কোথায় যাচ্ছ বল্‌তে পারো না?"

---

* রুশীয় লেখক V. M. Garshin হইতে।

"হাঁ ঠিক্ তাই মশায়, কেননা আমার কোথাও যাবার নেই। আমাকে কোনো একটা কাজের তল্লাস কর্‌তে হবে, মশায়।"

ষ্টেশন-মাষ্টার একটুকু তাহার দিকে তাকাইলেন, তাহার পর ভাবিতে বসিলেন। একটু ভাবিয়া বলিলেন, —"আচ্ছা ভাই, আপাতত তুমি এই ষ্টেশনেই থাকো। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, তুমি যেন বিবাহিত। তোমার স্ত্রী কোথায়?"

"হাঁ মশায় আমি বিবাহিত। আমার স্ত্রী কুরুকের একজন সদাগরের বাড়ীতে কাজ করে।"

"আচ্ছা তা হ'লে, তোমার স্ত্রীকে এখানে আস্‌তে লেখো। আমি তা'র জন্য একটা ফ্রী-টিকিটের বন্দোবস্ত কর্‌ব। শীঘ্র এই লাইনে একটা বাস-কুটীর তৈরী হবে, আমি এই বিভাগের পরিদর্শককে ঐ জায়গাটা তোমাকে দিতে ব'লে দেবো।"

সেমেন্ উত্তর করিল, "বহু ধন্যবাদ মহাশয়।"

এইরূপে, সেমেন্ ষ্টেশনেই রহিয়া গেল। ষ্টেশন-মাষ্টারের পাকশালার কাজে সাহায্য করিতে লাগিল। সে কাঠ কাটিত, উঠান ঝাঁট দিত, প্লাট্‌ফর্ম্ ঝাঁট দিত। দুই সপ্তাহের মধ্যেই তাহার স্ত্রী আসিয়া পৌঁছিল এবং সেমেন্ একটা হাত-গাড়ীতে চড়িয়া তাহার নূতন গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল।

কুটীরটা নূতন ও বেশ গরম; সেখানে প্রচুর জ্বালানি কাঠ ছিল। আগেকার প্রহরী ছোটোখাটো একটি বাগান তৈরী করিয়াও গিয়াছিল, এবং লাইনের দুইধারে বিঘেখানেক চাষের জমিও ছিল। সে যেন যার পর-নাই আহ্লাদিত হইল। সে এখন একটা নিজস্ব গৃহের স্বপ্ন দেখিতে লাগিল; একটা ঘোড়া ও একটা গরু কিনিবে মনে করিল।

যাহা-কিছু দর্‌কার সমস্তই তাহাকে দেওয়া হইল— একটা সবুজ নিশান, একটা লাল নিশান, লণ্ঠন,—সঙ্কেত-বাঁশী, হাতুড়ী, ইস্ক্রু আঁটিবার যন্ত্র, একটা বক্রাগ্র শাবল, একটা কোদালি, ঝাঁটা, পেরেক, বোল্ট্, এবং রেলওয়ের নিয়ম-কানুন লেখা দুইটা বই। প্রথম-প্রথম সেমেন্ রাত্রে ঘুমাইত না, কেননা সে ক্রমাগত নিয়ম-কানুনগুলো আবৃত্তি করিয়া অভ্যাস করিত। দুই ঘণ্টার মধ্যে কোনো ট্রেন আসিবার কথা থাকিলে, সে তাহার পূর্ব্বেই একটা চক্র দিয়া আসিত এবং তাহার প্রহরী কুটীরের ছোটো বেঞ্চের উপর বসিয়া, সমস্ত নিরীক্ষণ করিত, এবং কান পাতিয়া সমস্ত শুনিত—রেল্‌গুলো কাঁপিতেছে কি না, নিকটবর্ত্তী চলন্ত ট্রেনের কোনো শব্দ শোনা যাইতেছে কি না।

অবশেষে সমস্ত নিয়ম-কানুন তাহার কণ্ঠস্থ হইয়া গেল; যদিও সে অতি কষ্টে পড়িতে পারিত, এবং প্রত্যেক কথা বানান করিয়া পড়িত, তবু কোনোপ্রকারে সে ঐ সমস্ত কণ্ঠস্থ করিল।

এ-সমস্ত ঘটিয়াছিল গ্রীষ্মকালে। কাজটা শক্ত ছিল না, ঠেলা-কোদালি দিয়া বরফ কাটিয়া একস্থানে জড় করিতে হইত না; তা-ছাড়া ঐ রাস্তা দিয়া ট্রেন কদাচিৎ যাতায়াত করিত। সেমেন্, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দুইবার করিয়া তাহার নির্দ্দিষ্ট পাহারার জায়গার উপর দিয়া হাঁটিয়া চলিত, কোথাও ইস্ক্রু আল্‌গা হইলে তাহা আঁটিয়া দিত, সরু চেলাকাঠ কুড়াইয়া লইত, জলের নল এগ্‌জামিন্ করিত, তাহার পর তাহার ক্ষুদ্র গৃহটিতে গিয়া ঘরকন্নার কাজ দেখিত। একটা বিষয়ে সে ও তা'র স্ত্রী দুজনেই বড়ই বিরক্ত হইয়াছিল। উহারা যাহা-কিছু করিবে বলিয়া স্থির করিত, সেই বিষয়ের জন্য একজন সর্‌কারী কর্ম্মচারীর অনুমতি লওয়া আবশ্যক হইত। সেই কর্ম্মচারী আর-একজন কর্ম্মচারীর সম্মুখে বিষয়টা পেশ করিত,—অবশেষে, যখন সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, সেই সময় অনুমতি দেওয়া হইত। তখন এত বিলম্ব হইয়া যাইত, যে, উহা কোনো কাজে আসিত না। ইহারই দরুন, সময়ে-সময়ে সেমেন্ ও তাহার স্ত্রীর বড়ই একলা-একলা ঠেকিত।

এইরূপে দুইমাস কাটিয়া গেল; এই সময় খুব নিকট-বর্ত্তী প্রতিবাসীদের সহিত, তাহারই মতন রেল-প্রহরীদের সহিত সেমেনের আলাপ পরিচয় হইতে আরম্ভ হইল। উহাদের মধ্যে একজন খুবই বৃদ্ধ, তাহার জায়গায় আর একজন লোক বসাইবে বলিয়া রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষেরা অনেক দিন হইতে ভাবিতেছিল। সে তাহার পাহারা-

কুটীর হইতে নড়িতে পারিত না; তাহার কাজকর্ম্ম তাহার স্ত্রীই দেখিত। আর-একজন রেল-প্রহরী যে ষ্টেশনের খুব কাছে থাকিত, তাহার বয়স খুব অল্প, তাহার শরীর পাৎলা ও পেশল। রোদ ফিরিবার সময় উভয়ের পাহারা-কুটীরের মাঝামাঝি পথে, সেই ব্যক্তির সহিত সেমেনের প্রথম সাক্ষাৎ হইল। সেমেন তাহার টুপি খুলিয়া, মাথা নোয়াইল। তার পর বলিল—"আমি তোমার স্বাস্থ্য কামনা করি, প্রতিবাসী।"

প্রতিবাসী আড়চোখে চাহিয়া দেখিল। "কেমন আছ?" উত্তরে এই কথা বলিয়া আবার নিজের পথে চলিতে লাগিল।

পরে স্ত্রীলোকদের মধ্যেও দেখাসাক্ষাৎ হইল। সেমেনের স্ত্রী 'আরিনা' তাহার প্রতিবাসীকে শিষ্টতার সহিত অভিবাদন করিল; কিন্তু এই প্রতিবাসিনীও কহিয়ে-বলিয়ে লোক না হওয়ায় দুইচারিটা কথা বলিয়াই সে চলিয়া গেল। একবার তাহার সহিত সেমেনের সাক্ষাৎ হওয়ায় সেমেন্ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"বাছা, তোমার স্বামী এরকম আলাপ-বিমুখ কেন?"

সে নীরবে খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া, বলিল:—"সে তোমাদের কাছে কি কথা বল্বে? প্রত্যেকেরই নিজের-নিজের দুঃখকষ্ট আছে—ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন!"

আর-এক মাস অতীত হইল, উহাদের ঘনিষ্ঠতা আরো বৃদ্ধি হইল। এক্ষণে, যখন রেল-লাইনের ধারে সেমেন ও ভাসিলির মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ হইত, তখন উহারা রেলের ধারে বসিয়া পাইপ ফুঁকিত এবং পরস্পরের অতীত জীবনের কথা, নিজ-নিজ অভিজ্ঞতার কথা বলিত। ভাসিলি বেশী কিছু বলিত না, কিন্তু সেমেন তাহার সামরিক জীবনের কথা, তাহার নিজ গ্রামের কথা বলিত:—"আমার এই বয়সে আমি অনেক দুঃখকষ্ট ভোগ করেছি—আর ঈশ্বর জানেন, আমার বয়সও বেশী নয়। বিধাতা আমার কপালে বেশী সুখ-সৌভাগ্য লেখেননি। আমার যা প্রাপ্য, ভগবান্ আমাকে দিয়েছেন। তাই নিয়েই আমাকে থাকৃতে হবে, ভাইটি আমার।"

ভাসিলি পাইপের ছাই খালি করিবার জন্য, রেলের উপর পাইপ্‌টা ঠুকিয়া বলিল—"আমার জীবন কিংবা তোমার জীবন কুরে-কুরে যে খাচ্ছে সে আমাদের ভাগ্য-লক্ষ্মীও নয়, বিধাতাও নয়—কুরে-কুরে খাচ্ছে লোকেরা। কোনো পশুই মানুষের চেয়ে বেশী নিষ্ঠুর বা লোভী নয়। নেকড়ে বাঘ নেকড়ে বাঘকে খায় না—কিন্তু মানুষ জ্যান্তো মানুষকে খায়।"

"ভাই, নেকড়ে বাঘ নেকড়ে বাঘকে খায়—এই বিষয়ে তুমি ভুল করছ।"

"আমার জিবের আগায় যা এল তাই ব'লে ফেল্লুম। যাই হোক্, কোনো পশুই মানুষের চেয়ে বেশী হিংস্র নয়। মানুষের দুষ্ট বুদ্ধি ও লোভ না থাক্‌লে, জীবন ধারণ করা সম্ভব হ'ত। প্রত্যেক লোকই কি ক'রে তোমার মর্ম্মস্থানটা আঁকড়ে ধর্‌বে, তা'র থেকে একটুক্‌রো মাংস ছিঁড়ে নিয়ে গিলে' ফেল্‌বে—সেই সন্ধানেই আছে।"

সেমেন্ একটু চিন্তা করিয়া বলিল—"বল্‌তে পারিনে ভাই—তা হ'তেও পারে। যদি তা হয়, সে ভগবানেরই বিধান।"

"আর, যদি তা হয়,তোমাকে ব'লে কোনো ফল নেই। যে-লোক সমস্ত অন্যায় অবিচার ঈশ্বরের উপর আরোপ করে, আর নিজে নিশ্চেষ্ট হ'য়ে ধৈর্য্যের সহিত তা সহ্য করে, সে মানুষ নয় ভাই—সে একটা জানোয়ার। আমার যা বল্‌বার ছিল, সব আমি বল্লুম।" এই কথা বলিয়া বিদায়-সম্ভাষণ না করিয়াই সে চলিয়া গেল। সেমেন্‌ও উঠিয়া তাহাকে ডাকিতে লাগিল—"ভাই প্রতিবাসী, কেন তুমি আমাকে গাল-মন্দ করছ?"

কিন্তু প্রতিবাসী একবার ফিরিয়াও দেখিল না—সে নিজের পথ ধরিয়া চলিয়া গেল। সেমেন্ যতদূর দৃষ্টি যায়, তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল,—দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলে, সে বাড়ী ফিরিয়া তাহার স্ত্রীকে বলিল—"দেখ, আরিন্, আমাদের ঐ প্রতিবাসীটি কি ভয়ানক হিংস্র লোক!" তথাপি উহারা পরস্পরের প্রতি রুষ্ট হয় নাই। আবার যখন দেখা হইল, তখন—যেন কিছুই হয় নাই এইভাবে ঐ একই বিষয় লইয়া আবার উহাদের কথা আরম্ভ হইল।

ভাসিলি বলিল—"হাঁ ভাই, যদি লোকের জন্য না হ'ত, তা হ'লে কখনই এইসব কুটীরে আমাদের বাস

করতে হ'ত না। লোকের দরুনই আমাদের এইসব 'কুটীরে বাস করতে হচ্ছে।"

"যদি কুটীরেই আমাদের বাস করতে হয়—তা'তেই বা কি ?"

"এইসব কুটীরে বাস করা তেমন কিছু খারাপ নয়—তুমি ত অনেক দিন বাস করেছ—কিন্তু তোমার ত কিছুই লাভ হয়নি। একজন গরীব লোক, যেখানেই থাকুক না কেন—রেলওয়ে কুটীরে কিংবা অন্য জায়গায়—তাহার জীবনটা কি-রকম বলো দিকি ? ঐসব জোঁক তোমার জীবনটা শুষে' খায়, তোমাকে টেনে তোমার সমস্ত রস-কস্ বের ক'রে নেয়, আর যখন তুমি বুড়ো হ'য়ে পড়েছ, তা'রা তোমাকে জঞ্জালের মতন বাইরে ছুঁড়ে ফেলে' দেয়। তুমি কত মাইনে পাও ?"

"বেশী নয় ভাসিলি—১২ টাকা মাত্র।"

"আর আমি পাই ১৩৷৷০—আচ্ছা, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, এর কারণ কি ? আফিসের উপ-নিয়ম অনুসারে একই হারে টাকা পাবার কথা—অর্থাৎ মাসিক ১৫ টাকা, আর আলো ও কয়লা। কে বলো দিকি তোমার জন্যে নির্দ্দিষ্ট করলে ১২ টাকা, আর আমার জন্যে নির্দ্দিষ্ট করলে ১৩৷৷০ টাকা ? এর কারণ কি ? তোমাকেই জিজ্ঞাসা করি। আর তুমি বলো কিনা এরকম জীবন-ধারা খারাপ নয়। আমার কথা ভালো ক'রে বুঝে' দেখ, আমি ৩ কিংবা দেড় টাকার জন্য ঝগড়া করছিনে। যদি এরা আমাকে সমস্ত টাকাটাই দেয়, তা হ'লেই বা কি ?—গত মাসে আমি ষ্টেশনে ছিলুম, ঘটনাক্রমে ডিরেক্টার সেই সময় ঐখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। ষ্টেশনেই তাঁর সঙ্গে দেখা হ'ল। একটা সমস্ত রেলগাড়ী তিনি নিজে দখল ক'রে বসেছিলেন। ষ্টেশনে নেমে প্ল্যাটফর্ম্মের উপর দাঁড়িয়ে দেখ্তে লাগ্লেন—না আমি এখানে আর বেশীক্ষণ থাকব না। যেখানে আমার চোখ যায় আমি সেইখানেই যাবো।"

"কিন্তু কোথায় যাবে তুমি, ভাসিলি ? এইখানেই থাকো। এর চেয়ে ভালো জায়গা কোথাও পাবে না। এখানে তোমার গৃহ আছে, উত্তাপ আছে, এক টুক্‌রো জমিও আছে। তোমার স্ত্রী বেশ কর্ম্মিষ্ঠা—"

"জমি! আমার জমিটা তোমার দেখা উচিত—সেখানে একগাছা কাঠিও নেই। এই বসন্তকালে আমি কিছু কোপি রোপণ করেছিলুম, একদিন বিভাগ-পরিদর্শক ঐখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বল্লেন,—একি? আমাকে রিপোর্ট করনি কেন ? অনুমতির জন্য অপেক্ষা করলে না কেন ? এখনই সমস্ত খুঁড়ে ফ্যালো। এর একটু চিহ্নও যেন না থাকে।—তখন তিনি মদের নেশায় ভোঁ হয়েছিলেন, অন্য সময় হ'লে তিনি একটি কথাও বল্‌তেন না। তিন টাকা জরিমানা!"

কয়েক মুহূর্ত্ত ভাসিলি নীরবে তাহার পাইপ ফুঁকিতে লাগিল; তার পর নিম্নস্বরে বলিল—"আর-একটু বেশী হ'লেই আমি একেবারেই তা'র দফা রফা করতুম।"

"ভাই প্রতিবাসী, তোমার মাথা বড় গরম, এই পর্য্যন্ত আমি বল্‌তে পারি।"

"না, আমার মাথা গরম নয়, আমি যা বল্‌ছি, সে-সমস্তই ন্যায়বিচারের হিসেবে। তিনি আবার আমার লাল-পানপাত্রটা চান। আমি বিভাগের সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের কাছে এই বিষয়ে নালিশ করব। তখন দেখা যাবে!"

বস্তুতঃ সে নালিশও করিয়াছিল।

একদিন বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক লাইনের আগাম পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তিন দিনের মধ্যে কতকগুলি প্রধান লোক রেল-রাস্তা তদারক করিবার জন্য আসিবেন। সমস্তই, যেখানে যেমনটি হওয়া উচিত বেশ গুছাইয়া রাখিতে হইবে। তাঁহাদের আসিবার আগে নূতন কাঁকর আনাইয়া, দুরমুশ করিয়া রাস্তা সমান করা হইয়াছে, রেল পাতিবার কাঠগুলা এগ জামিন করা হইয়াছে, লোহার গুটিকাগুলা দৃঢ়রূপে আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে, মাইল-খোঁটাগুলো নূতন করিয়া রং করা হইয়াছে এবং খানিকটা হলদে বালি চৌমাথার উপর ছড়াইয়া দিতে হুকুম দেওয়া হইয়াছে। এমন-কি, একজন স্ত্রী তা'র বুড়োকে, একটা ছোটো ঘাসের জমি ছাঁটিয়া ছুঁটিয়া ঠিক করিবার জন্য তাহার কুটীর হইতে জোর করিয়া বাহির করিয়া দিয়াছে। বৃদ্ধ কুটীর ছাড়িয়া কোথাও যাইত না। সেমন সমস্ত সুশৃঙ্খল করিবার জন্য প্রাণপণে খাটিয়াছে, এমন কি তার কোর্ত্তাটাও মেরামৎ করিয়াছে, তাহার তাম্র চাপরাশ্‌টাও ঘষিয়া-মাজিয়া ঝক্-ঝ'কে করিয়া তুলিয়াছে।

ভাসিলিও খুব খাটিয়াছে। অবশেষে একটা হাতগাড়িতে তত্ত্বাবধায়ক-মহাশয় আসিয়া পৌঁছিলেন। ৪ জন লোক ঘণ্টায় ২০ মাইল করিয়া গাড়িটা টানিয়াছে। গাড়িটা ছুটিয়া সেমেনের কুটীরের দিকে আসিল। সেমেন্ সম্মুখে লাফাইয়া পড়িয়া সামরিক কেতায় অভিবাদন করিয়া বলিল, সব ঠিক। দেখিয়া মনে হইল, সব ঠিক্-ঠাক আছে। রেল-কর্ম্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এখানে কি অনেক দিন আছ?"

"মে মাসের দোসরা তারিখ থেকে এখানে আছি হুজুর।"

"আচ্ছা বেশ, ধন্যবাদ। আর, ১৬৪ নম্বরে কে আছে?"

যে-পরিদর্শক তাঁর গাড়ীতে একত্র আসিয়াছিল, সে উত্তর করিল—"ভাসিলি।"

"ভাসিলি, যার নামে তুমি রিপোর্ট্ করেছিলে?"

"হাঁ, সেই।"

"আচ্ছা, ভাসিলির চেহারাটা একবার দেখা যাক্—এগিয়ে চল।"

কুলিরা হাতল ধরিয়া ঝুঁকিয়া পড়িল—লাইনের নীচে দিয়া গাড়ি সাঁ-সাঁ করিয়া চলিল। গাড়িটা যখন অদৃশ্য হইয়া গেল, তখন সেমেন্ মনে-মনে ভাবিল, এদের সঙ্গে আমাদের প্রতিবাসীর একটা যুদ্ধ বাধ্‌বে দেখ্‌ছি।"

আর দুই ঘণ্টা পরে সেমেন্ রোঁদে বাহির হইল।

সে দেখিল, লাইনের উপর দিয়া হাঁটিয়া একজন তাহার দিকে আসিতেছে এবং তাহার মাথার উপর একটা সাদা জিনিস দেখা যাইতেছে। সেমেন্ চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া উহা দেখিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। দেখিল—ভাসিলি। ভাসিলির হাতে এক গাছা ছড়ি আছে। একটা ছোটো পুঁটুলি কাঁধের উপর দিয়া ঝোলানো রহিয়াছে এবং তাহার একটা গাল সাদা রুমাল দিয়া বাঁধা। সেমেন উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায় যাচ্ছ প্রতিবাসী?"

ভাসিলি যখন আরও কাছাকাছি হইল, সেমেন্ দেখিল সে খড়িমাটির মতো ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছে, আর চোখ লাল হইয়াছে। যখন সে কথা কহিতে আরম্ভ করিল, তাহার স্বরভঙ্গ হইল। সে বলিল—"আমি সহরে যাচ্ছি—মস্কোয়ে—শাসন-বিভাগের প্রধান আফিসে।"

"প্রধান আফিসে? তুমি নালিশ কর্‌তে যাচ্ছ নাকি? আমি বল্‌ছি ভাসিলি, যেও না। ভুলে যাও—"

"না ভাই, আমি ভুল্‌ব না। দেখ, আমার মুখের উপর আঘাত করেছে, যতক্ষণ না রক্ত গড়িয়ে পড়্‌ল ততক্ষণ আঘাত করেছে। আমি যতদিন বাঁচি, আমি কখনই ভুল্‌ব না—তা-ছাড়া অম্‌নি-অম্‌নি যেতে দেবো না।"

সেমেন্ উহার হস্ত ধারণ করিয়া বলিল—"ছাড়ান্ দেও, ভাসিলি। আমি সত্য বল্‌ছি, তুমি কোনো প্রতিকার কর্‌তে পার্‌বে না।"

"প্রতিকারের কথা কে বল্‌ছে? আমি বেশ জানি আমি কোনো প্রতিকার কর্‌তে পার্‌ব না। নিয়তির কথা তুমি যা বলেছিলে তাই ঠিক। আমার নিজের বিশেষ কিছুই ভালো কর্‌তে পার্‌ব না—কিন্তু কোনো একজনের ত ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়ানো চাই।"

"কিন্তু তুমি কি আমাকে বল্‌বে না, কেমন ক'রে এসব ঘট্‌ল?"

"কেমন ক'রে ঘট্‌ল?—তবে শোনো, তিনি এসে ত সব পরিদর্শন কর্‌লেন—এই মৎলবেই গাড়ীটা এইখানে রেখে দিয়েছিলেন—এমন-কি, আমার ঘরের ভিতরটা পর্য্যন্ত দেখ্‌লেন। আমি আগে থেকেই জান্‌তুম্ তিনি খুব কড়া হবেন—তাই আমি সমস্তই বেশ গুছিয়ে রেখে-ছিলুম। তিনি যখন চ'লে যাচ্ছেন সেই সময় আমি বেরিয়ে এসে নালিশটা দায়ের কর্‌লুম। তিনি তখনই অগ্নিমূর্ত্তি হ'য়ে ব'লে উঠ্‌লেন;—এখানে এখন সর্‌কারির পরিদর্শন হবে, আর তুমি কিনা তোমার সব্‌জি-বাগান-সম্বন্ধে নালিশ কর্‌তে এসে? আমরা রাজমন্ত্রীদের জন্য প্রতীক্ষা কর্‌ছি, আর তুমি কি সাহসে তোমার বাঁধা কোপির কথা নিয়ে এলে!—আমি আর আত্ম-সংবরণ কর্‌তে না পেরে একটা কথা ব'লে ফেল্‌লুম—কথাটাও তেমন কিছুই খারাপ নয়—কিন্তু এই কথায় তিনি রেগে উঠে আমাকে মার্‌লেন—এরকম ব্যাপার যেন নিত্যনিয়মিত এখানে হ'য়ে থাকে, এইভাবে আমি দাঁড়িয়ে রইলুম। ওরা চ'লে গেলে তার পর

আমার হুঁস্ হ'ল। আমার মুখ থেকে রক্তটা ধুয়ে চ'লে এলুম।"

"আর তোমার বাসগৃহের কি হ'ল?"

"আমার স্ত্রী সেখানে আছে। সে-ই আমার কাজ-কর্ম্ম দেখ্‌বে। এখন ঐ পাজিরা যদি পথে কোনো বিপদে পড়ে ত খুসি হই।—বিদায় সেমেন্, আমি ন্যায়বিচার পাবো কি না বল্‌তে পারিনে।"

"তুমি সমস্ত পথটা হেঁটেই যাবে নাকি?"

"আমি ষ্টেশনের লোকদের বল্‌ব, আমাকে মাল গাড়ীতে যেতে দিতে; আমি কালই মস্কোয়ে পৌঁছব।"

দুই প্রতিবাসী পরস্পরের নিকট বিদায় লইয়া নিজের-নিজের পথে চলিয়া গেল। ভাসিলি বহুকাল গৃহছাড়া হইয়া রহিল। তা'র হইয়া সমস্ত কাজ তা'র স্ত্রীই করিত। কি রাত্রে, কি দিনে সে ঘুমাইত না—তা'র চেহারা দেখিলে মনে হয়, খুব ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তৃতীয় দিনে পরিদর্শকেরা চলিয়া গেলেন; একটা এন্‌জিন্, গার্ডের গাড়ি, দুইটা খাসগাড়ি চলিয়া গেল—ভাসিলি তখনো অনুপস্থিত। চতুর্থ দিনে, সেমেন্ ভাসিলির স্ত্রীর সহিত দেখা করিল। তাহার সমস্ত মুখ কাঁদিয়া-কাঁদিয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে। তাহার চোখ লাল হইয়া উঠিয়াছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার স্বামী ফিরেছে কি?"

সে কেবল হাত নাড়িল, একটা কথাও বলিল না।

সেমেন্ যখন বালক ছিল তখন হইতেই সে উইলো-কাঠের বাঁশী তৈরী করিতে জানিত। সে বৃন্ত হইতে মজ্জাটা পুড়াইয়া বাহির করিয়া ফেলিত; ছোটো-ছোটো আঙুল দিয়া যেখানে ছিদ্র করা দর্‌কার, সেইখানে ছিদ্র করিত, এইরূপে এমন নৈপুণ্যের সহিত বাঁশী তৈয়ারী করিত যে, তাহাতে সব সুরই বাজানো যাইত। এখন সে তাহার অবসর-মুহূর্ত্তে এইরূপ বাঁশী তৈয়ারী করিয়া, তাহার কোনো আলাপী গার্ডের দ্বারা, ঐসব বাঁশী সহরে পাঠাইয়া দিত। প্রত্যেক বাঁশী একপয়সায় বিক্রী হইত। পরিদর্শনের পর তৃতীয় দিনে, তাহার স্ত্রীকে বাড়ীতে রাখিয়া, সে ৬টার ট্রেন্ ধরিতে গেল, এবং তা'র ছুরী লইয়া উইলো গাছের কাঠ কাটিবার জন্য বনে প্রবেশ করিল। সে তাহার বিভাগের শেষ প্রান্তে আসিয়া পড়িল। সেইখানে রাস্তাটা হঠাৎ একটা বাঁক লইয়াছে। আরো আধ মাইল দূরে একটা বড় জলাভূমি ছিল; তাহার চারিধারে তাহার বাঁশীর উপযোগী বেশ বড়-বড় গুল্ম জন্মিয়াছিল। সেমেন্ এক গোচ্ছা কাঠি কাটিয়া লইয়া, আবার সেই বনভূমির ভিতর দিয়া হাঁটিয়া বাড়ী গেল। তখন সূর্য্য প্রায় অস্তোন্মুখ হইয়াছে। চারিদিকে শ্মশান-বৎ নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছে। কেবল পাখীদের কিচিমিচি ও বায়ুতাড়িত শুষ্ক বৃক্ষশাখার পতনশব্দ শুনা যাইতেছে। আর-একটু গেলেই রেল-লাইনে পৌঁছানো যায়। হঠাৎ তাহার মনে হইল, যেন লোহায়-লোহায় ঠেকিয়া ঠন্‌ঠন্ শব্দ হইতেছে। সেমেন্ দ্রুতপদে চলিতে লাগিল। মনে-মনে ভাবিল—"এটা কিসের শব্দ হ'তে পারে?—কেননা সে জানিত ঐ বিভাগে সে-সময় কোনো মেরামতের কাজ হইতেছিল না। সে বনভূমির কিনারায় আসিয়া পড়িল। তাহার সম্মুখে রেলওয়ের বাঁধ খুব উঁচু হইয়া উঠিয়াছে। সে দেখিল, সেই বাঁধের মাথায়, লাইনের উপর, একজন লোক উঁচু হইয়া বসিয়া কি কাজ করিতেছে। সেমেন্ ধীরে-ধীরে বাঁধের উপর উঠিতে লাগিল; তাহার মনে হইল যেন কেহ "বোল্ট-নটু"গুলো চুরি করিবার চেষ্টা করিতেছে। তার পর দেখিল, লোকটা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার হাতে একটা বক্রাগ্র শাবল ছিল; সে চট করিয়া শাবলটা রেলের নীচে ঢুকাইয়া দিল এবং একদিকে খুব একটা ঠেলা দিল। সেমেন্ চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল। সে হাঁক দিতে চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না। দেখিল, সেই লোকটা ভাসিলি; সেমেন্ ছুটিয়া নিকটে যাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু তখন ভাসিলি বাঁধের অন্য দিকে শাবল প্রভৃতি যন্ত্রাদি লইয়া গড়াইয়া চলিয়াছে।

"ভাসিলি! ভাসিলি ভাই আমার, ফিরে এস! শাবলটা আমাকে দেও! আমি রেলটা আবার ঠিক জায়গায় বসিয়ে দিই। কেউই জান্‌তে পার্‌বে না। ফিরে এস, এই মহাপাপ হ'তে আপনাকে বাঁচাও!"

কিন্তু ভাসিলি একবার ফিরিয়াও দেখিল না; সে বরাবর বনভূমির ভিতর চলিয়া গেল।

সেমেন্ স্থানচ্যুত রেলের উপর দাঁড়াইয়া রহিল ; তা'র কাঠিগুলা তা'র পায়ের কাছে পড়িয়া রহিল। যে ট্রেন্‌টা আসিতেছিল সে মালগাড়ী নয়—সে প্যাসেঞ্জার ট্রেন্; থামাবার মতো তাহার কাছে কিছুই ছিল না। তাহার কাছে নিশান ছিল না। সে রেলটা ঠিক জায়গায় বসাইতে পারে না—খালি-হাতে সে রেল-গোঁজগুলা বাঁধিতে পারে না। প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি আনিবার জন্য তাহার কুটীরে ছুটিয়া যাইতে হইবে। নহিলে প্রাণ-বাঁচানো ভার!

সেমেন্ তাহার গৃহের দিকে বেদম ছুটিতে লাগিল। মধ্যে-মধ্যে যেন পড়িয়া যাইবে এইরূপ মনে হইল—অবশেষে বনভূমি পার হইয়া গেল, আর ১০০ কদম গেলেই তাহার কুটীর-গৃহে আসা যায়—সেই সময় হঠাৎ কারখানার শিটি শুনিতে পাইল। এখন ৬টা, ৬টার দু'মিনিট পরেই ট্রেন্‌টা ঐখান দিয়া চলিয়া যাইবে। ভগবান্! রক্ষা করো এই নির্দ্দোষীদের। তাহার চোখের সাম্‌নে সে যেন দেখিতে লাগিল—এঞ্জিনের বাঁ-চাকাটা কাটা রেলটাকে এখনি আঘাত করিবে, কাঁপিয়া উঠিবে, একদিকে হেলিয়া পড়িবে, রেলপাতা কাষ্ঠখণ্ডগুলোকে চুরমার করিয়া ভাঙিয়া ফেলিবে, আর ঠিক এইখানে রেলটা বাঁকিয়া গিয়াছে; এবং বাঁধটা রহিয়াছে। এইখানে এঞ্জিন, গাড়ী—সব একসঙ্গে নীচে পড়িয়া যাইবে, ৭৭ ফুট উচ্চ স্থান হইতে পড়িয়া যাইবে। তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীগুলো লোকে-ভরা, তাহার ভিতর ছোটো ছেলেরাও আছে। উহারা এখন শান্তভাবে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছে! না, সে তাহার কুটীর-গৃহে পৌঁছিয়া, আবার ফিরিবার সময় পাইবে না।

সেমেন্ তাহার গৃহে ছুটিয়া যাইবার মৎলব ত্যাগ করিল; সে পথ হইতে ফিরিয়া আরো দ্রুতপদে রেল-লাইনে ফিরিয়া আসিল। তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। কি ঘটিবে সে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, কাটা-রেল পর্য্যন্ত সে ছুটিয়া আসিল। তাহার কাঠিগুলা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সে নীচু হইয়া একটা কাঠি কুড়াইয়া লইল। কেন যে কুড়াইল তাহা সে জানিত না। আরো আগে ছুটিয়া গেল। তাহার মনে হইল, ট্রেন্‌টা কাছে আসিয়াছে। সে একটা দূরের শিটি শুনিতে পাইল—রেলের কাঁপুনি শুনিতে পাইল। রেল তালে-তালে ও শান্তভাবে কাঁপিতেছে। তাহার ছুটিবার আর শক্তি ছিল না। সাংঘাতিক স্থান হইতে প্রায় ৭০০ ফুট আসিয়া সে থামিল। হঠাৎ তাহার মাথায় একটা মৎলব আসিল। সে তাহার টুপি খুলিয়া তাহা হইতে একটা রুমাল লইল। পায়ের বুট হইতে একটা ছুরি বাহির করিল, তার পর ক্রুশের চিহ্ন ইঙ্গিত করিয়া ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ যাচ্ঞা করিল। তাহার ছুরি দিয়া তাহার বাম বাহুর একটু উপরে এক কোপ মারিল, তপ্ত রক্ত-স্রোত ছিট্‌কাইয়া পড়িল। সেই রক্তে রুমালটা ডুবাইল, প্রসারিত করিয়া বেশ সমান করিয়া লইল। পরে উহা তাহার কাঠিতে বাঁধিল, এইরূপে একটা লাল নিশান তৈয়ারী করিয়া সেই নিশান দোলাইতে লাগিল। তখন ট্রেন্‌টা দেখা যাইতেছে। এঞ্জিন-চালক তাহাকে দেখিতে পায় নাই, আরো নিকটে যাইতে হইবে। কিন্তু ৭০০ কদম দূরে অমন একটা ভারী ট্রেন সে কখনই থামাইতে পারিবে না!

তাহার বাহু হইতে ক্রমাগত রক্তস্রাব হইতেছিল—সেমেন্ তাহার পার্শ্বদেশ হাত দিয়া চাপিয়া ধরিল, কিন্তু তাহাতেও রক্ত বন্ধ হইল না। নিশ্চয়ই কাটাটা একটু গভীর হইয়াছিল। সে চারিদিক্ অন্ধকার দেখিল। তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। তাহার চোখের সাম্‌নে যেন কতকগুলো কালো মাছি ঘুরিতেছিল। তার পর সমস্ত একবারেই অন্ধকার হইয়া গেল; উচ্চ ঘণ্টাধ্বনি তাহার কানে টিং-টিং করিয়া বাজিতেছিল—আর সে ট্রেন্ দেখিতে পাইল না, আর সে ট্রেনের শব্দ শুনিতে পাইল না। কেবল একটা কথা তাহার মাথায় জাগিতেছিল; "আমি আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিব না, আমি পড়িয়া যাইব, নিশানটা ফেলিয়া দিব; আমার উপর দিয়া ট্রেন্‌টা চলিয়া যাইবে!—ভগবান্! ভগবান্! আমাকে রক্ষা করো, আমাকে উদ্ধার কর্‌তে কাউকে পাঠাও—" তা'র অন্তরাত্মা একেবারে খালি হইয়া গিয়াছিল, নিশানটা তাহার হাত হইতে খসিয়া পড়িল। কিন্তু ঐ রক্তময় নিশান মাটিতে পড়ে নাই। একজনের হস্ত উহা ধরিয়া ফেলিল এবং নিকটে অগ্রসর ট্রেনের সম্মুখে উহা তুলিয়া ধরিল। চালক উহাকে দেখিতে পাইয়া এঞ্জিনটা থামাইল।

লোকেরা ট্রেন্ হইতে ছুটিয়া আসিল; শীঘ্রই একটা ভিড় জমিয়া গেল। উহারা দেখিল,—একজন লোক রক্তাক্ত-কলেবর হইয়া, অচেতন হইয়া উহাদের সম্মুখে শুইয়া আছে—আর-একটি লোক তাহার পাশে দাঁড়াইয়া আছে; একটা কাঠিতে বাঁধা একটুকরা রক্তাক্ত ন্যাকড়া তাহার হাতে রহিয়াছে।

ভাসিলি জনতাকে নিরীক্ষণ করিয়া মস্তক অবনত করিল। সে বলিল—"আমাকে গেরেপ্তার করো. আমিই এই রেল-লাইন কাটিয়াছি।"

সুন্দর-দূত

শ্রী কালিদাস নাগ

ওহে চির-সুন্দরের দূত!
চির-বিদায়ের লীলা, নিষ্ঠুর অদ্ভুত
কেন বারবার
তব সাথে জেগে ওঠে, ক্রন্দনে ভরিয়া চারিধার?
মোরা ত বেঁধেছি বাসা রোদন-সিন্ধুর তটমূলে
বেদনার বন্যা তাহে ক্ষণে-ক্ষণে গর্জ্জি' ওঠে দুলে,
কেঁপে ওঠে বুক;—
জাগিতে না জাগিতেই দেখি ঘোর প্রলয় যে নামে,
দিগ্বিদিকে মরণের মুখ!
তৃণসম ক্ষীণ তুচ্ছ ভঙ্গুর আরামে
ছেয়েছিনু বাসা,
জড় করি' পিপীলিকা-প্রায়
পলে-পলে সুখ তৃপ্তি আশা ভালোবাসা—
চকিতে মিলায়
অতল নিরয়-তলে; অহেতুক কাল ভূকম্পনে
চূর্ণ-ধ্বংস হয় সৃষ্টিরাশি!
সব ফে'লে শুধু একমনে
প্রিয়জনে বুকে নিয়ে বাহিরিয়া আসি
কোনো মতে প্রাণটি রক্ষিতে;
দেখি চারিভিতে
দাবানল বেড়িয়াছে মৃত্যুর প্রাচীরে,
পুড়ে' ছাই হই সবে—নামে শান্তি মৃত্যু-সিন্ধু-তীরে!

এসব সয়েছি মোরা; ক্রূরতম মরণের সাথে
করিয়াছি পরিচয়,
দেখিয়াছি, পাষাণ-হৃদয়,
প্রাণের পুতলি সব ভস্ম হ'তে কাল বজ্রাঘাতে
তবু যবে তুমি এলে হেথা—
"জয়ী প্রাণ চিরপ্রাণ! চিরসুন্দরের দূত আমি"
ফুকারিলে গম্ভীর নির্ঘোষে, কেন সেথা
দলে দলে ছুটে গেনু? জানে অন্তর্যামী!
ক্ষণতরে লেগেছিল ধাঁধা;—
কবা সত্য কেবা মিথ্যা—ধ্বংস না সৃষ্টির বাণী
রচেছিল বাধা
তোমার মোদের মাঝে, অবিশ্বাস আনি
লক্ষ নিদর্শন তা'র;
বিচ্ছেদের রক্ত অশ্রুধার
অন্ধ করেছিল দৃষ্টি,
বলেছিল দয়া প্রেম প্রাণভরা সৃষ্টি,
শুধু ছায়া, শুধু মরীচিকা!
নিষ্ঠুর জীবন-নাট্যে শেষ যবনিকা
দেখাইবে শেষ দীপ্তি-সাথে
জয়ধ্বজা মরণেরই হাতে,
মৃত্যুই একান্ত সত্য—শেষ পটে লিখা!
তুমি এলে—সুমোহন সমুন্নত ললাটে তোমার
বহি' নব আশা-অরুণিমা!

তুমি এলে—তব আঁখি অপূর্ব্ব উদার
দেখাইল মৃত্যুমাঝে অমর্ত্ত্য গরিমা,
অনন্তের নিঃশঙ্ক ইঙ্গিত,
তব কণ্ঠে ঝঙ্কারিল মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেমের সঙ্গীত!
একান্ত ধ্বংসের ভয় ধীরে পাশরিলে,
চকিতে খুলিলে
অভিনব প্রাণের চেতনা,
শাশ্বত সত্যের রূপ দেখিনু অনন্যমনা
অন্তর্গূঢ় ব্যথার আলোকে;—
প্রাণ দিয়ে যাহা-কিছু গড়েছি মধুর,
রূপ আশা ভালোবাসা ধ্যান স্বপ্ন সুর,
চিরপ্রতিবিম্ব তা'র প্রাণেতে ঝলকে!
আনত স্বর্গের মতো আনন বঁধুর
ঢেকে দেছে চিরতরে মায়া যবনিকা,
তাই ত সে মৃত্যুহারা প্রেমের কণিকা
ভ'রে আছে চিদাকাশ তারায়-তারায়
স্মরণের অচ্ছেদ্য ধারায়!
এতটুকু তুচ্ছ প্রাণ বিরাট্ প্রলয়ে উপহসি'
ভীষণ ধ্বংসের ক্রূর মর্ম্মস্থলে পশি'
বলে গর্ব্বভরে "আমি নূতন জীবন,
অমর যৌবন-মন্ত্রে বিরচিব নূতন ভুবন!"
সেই ভালো—এ দুর্দ্দিনে তব সাথে নব পরিচয়
ওহে সুন্দরের দূত! নাহি ভয়,
গাবো তব কণ্ঠে মোরা কণ্ঠ মিলাইয়ে
জল স্থল আকাশ ভরিয়ে
চিরসত্য চিরসুন্দরের জয় জয়!

* * *

তাই ত এসেছি মোরা তোমারে বরিতে,
ভক্তি প্রীতি অর্ঘ্যেতে ভরিতে
তোমার তরণী।
সুখদুঃখ-ভরা এই সুন্দর ধরণী
তুমি যে বেসেছ ভালো;
তাই যবে মোরা তারে করিয়াছি কালো
আমাদের কাম ক্রোধ লোভ মোহ পাপ কালিমায়
মর্ম্মাহত হ'য়ে তুমি অসহ্য ব্যথায়
বাহিরে এসেছ ছুটে',
কভু বীরবলে যত গুপ্ত দ্বার টুটে'
চেয়েছ ভাঙ্গিতে একা সে বীভৎস মেলা
মরণের খেলা;
কভু হতাশের ভরে ফুকারেছ 'হে মোর সুন্দর!
চূর্ণ করো গ্লানিস্তূপ—আজ তুমি হও দণ্ডধর!"
কভু মিনতির সুরে চেয়েছ ভুলাতে
গিয়েছ বুলাতে
প্রাণের পরশমণি আমাদের পাষাণ-হৃদয়ে;
কভু ভয়ে-ভয়ে
ঊর্দ্ধপানে কর-জোড়ে কল্যাণ মেগেছ—
মোদের উপেক্ষা-মাঝে অচঞ্চল প্রেমেতে জেগেছ।
মনে আছে, মনে রবে তব যাওয়া-আসা,
অন্তহীন আশা-ভালোবাসা!
কৃতজ্ঞ হৃদয়
পেয়েছে তোমার পরিচয়,
জেগেছে মরণ ঘুম হ'তে
শান্তি প্রীতি প্রাণের আলোতে।
তাই তব তরীখানি ঘিরে'
ফিরে'-ফিরে'
বেড়িতেছি স্নেহ-ফাঁস—তৃণপাশ দিয়ে,
কার সাধ্য? কে তোমারে—যাক দেখি নিয়ে!

* * *

জানি ছিঁড়ে' যাবে এই পেলব বাঁধন
মোদের একান্ত চাওয়া সহস্র কাঁদন
পারিবে না একঘাটে তোমারে রাখিতে;
তোমার আঁখিতে
পড়েছে নূতন আলো—নব পূর্ব্বাচলের আহ্বান!
দুলিয়া ছুটিল তরী—মোদের বাঁধন খান্-খান্!
মিলাল তোমার মুখ! শুধু তব কল্যাণ-নির্দ্দেশ
প্রভাত-ললাটে জাগে—সব হ'ল শেষ!
তবু জানি আসিবে আবার;
অসুন্দর দানব দুর্ব্বার
যখনই জাগিবে হেথা ধ্বংসিতে সৃষ্টিরে
আমাদের তীরে
তখনই লাগিবে তব তরী;
আমাদের প্রাণ মন ভরি'
আবার শুনাবে তুমি উদার মহান্
মৃত্যুঞ্জয়ী গান;—
"আমি অনন্তের দূত! জাগো সবে, নাহি নাহি ভয়,
চিরসত্য চিরশিব চিরসুন্দরের জয় জয়!"

জাপান
১৯২৪

দু-আনি

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মেহেরপুরের অভিরাম গাঙ্গুলী যখন মরিল লোকে বলিল, ক্ষতি কি? আপদ্ গেছে। অভিরাম যে অকালে মরিবে এ তথ্য নাকি অনেক দিন হইতেই তাহারা জানিত। অভিরাম বাঁচিয়া থাকিলে এক-দিন হয় সে ফাঁসিকাঠে ঝুলিত, নয় লাঠির চোটে তা'র মাথার খুলি ফাটিত, নয় ত মাতাল অবস্থায় পাহাড় থেকে পড়িয়া হাড়গোড় গুঁড়া হইয়া সে কাহুন্দি হইয়া যাইত! এম্‌নিধারা মৃত্যুই ছিল তা'র ন্যায্য পাওনা, আর পাওনাগণ্ডা সকলে বুঝিয়া পায়, ন্যায়নিষ্ঠ মানুষ ইহাই দেখিতে ভালোবাসে।

কিন্তু মানুষ মরিলে তাহাকে ন্যায়বিচারের মানদণ্ডে ওজন করিবার প্রবৃত্তিটা আমাদের স্বভাবতই কমিয়া আসে, তাই প্রতিবেশীরা তা'র মৃত্যুর পর আর দূরে-দূরে সরিয়া রহিল না। তাহারা আসিয়া মৃতদেহের চারিপাশে ভিড় করিয়া দাঁড়াইল।

অভিরামের চোয়ালটা ব্যাণ্ডেজে বাঁধা, মুখের উপর কেমনধারা একটু হাসি লাগিয়া আছে। সেখানে দাঁড়াইয়া মৃত লোকটির জীবনের নানা অদ্ভুত কার্য্যকলাপের কথা স্মরণ করিয়া তাহারা সে-সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা সুরু করিয়া দিল। কারণ, নানা হাস্যকর অদ্ভুত কাহিনী যেমন অভিরামের স্মৃতিকে আচ্ছন্ন করিয়া ছিল, তেম্‌নি আবার এমন সব কাহিনীও ছিল যা অতি ভয়াবহ কিন্তু মোটেই হাস্যকর নয়।

যাই হোক, এখন অভিরাম মরিয়াছে, এখন তা'র জন্য একটু দুঃখ প্রকাশ করিলে ক্ষতি নাই। অভিরামের যে-বংশে জন্ম হইয়াছিল, সে-বংশ সম্মানের যোগ্য। সে-বংশ তুচ্ছ নয়, সে-বংশে কত সাধু এবং কত সয়তান জন্মিয়াছিল, কত মারামারি কাটাকাটি খুনোখুনি-ব্যাপার সে-বংশে ঘটিয়াছে, সে-বংশের ইতিহাসের পাতায়-পাতায় কত দুর্জ্জয় সাহসের কাহিনী ছড়ানো আছে। কালক্রমে ধীরে-ধীরে এমন বংশের অধঃপতন বড়ই করুণ, বড়ই মর্ম্মস্পর্শী! গাঙ্গুলীরা কত বড় বনেদী ঘর, পাড়ার বড়ালরা সে-কথা জানে। সে-বংশের নানা খবর, কত কুটিল হিংসা ও জটিল প্রণয়ের কাহিনী মুখুজ্যেরা ভালোরকম জানে। রায়গোষ্ঠী এবং বাঁড়ুয্যে-গোষ্ঠীর মতন বনেদী বংশ, এমন-কি আজকালকার হঠাৎ-নবাব দলের অনেকেও তাদের অনেক খবর রাখে।

অভিরামের মৃত্যুর পর গাঙ্গুলী-পরিবারের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া উঠিল। চালচুলো কিছুই নাই, ঘরে হাঁড়ি চড়ে না, এম্‌নি ভাব। কিন্তু এমন দুরবস্থাও তাহাদের সহিয়া গেছে, অভিরামের মৃত্যুর পূর্ব্বেও যে এর চেয়ে বিশেষ সুবিধার অবস্থা ছিল এমন মনে হয় না। অত কথা কি, অভিরামের যখন জন্ম হয়, তখনও অবস্থা প্রায় এম্‌নিধারাই ছিল। পরের দান তা'রা এতবার এতপ্রকারে লইয়াছে যে এখন আর পরের কাছে হাত পাতিতে তাহাদের কুণ্ঠা হয় না। পাড়াপ্রতিবেশীর ছোটোখাটো দান তা'রা কৃতজ্ঞতার সহিত না লইলেও, সাগ্রহে গ্রহণ করে। কখনো দু'চারটে আলু-পটোল, কখনো খানকতক বাতাসা, কখনো বা খানিকটা পাটালি বা কয়েকটা খৈয়ের মোয়া, এম্‌নি-সব সামান্য জিনিসই তা'রা পাইত, টাকাকড়ি বড় একটা পাইত না।

একদা এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিল। এক প্রতিবেশী গাঙ্গুলী-পরিবারে সহানুভূতি জানাইতে আসিয়া করুণার আতিশয্যে অভিরামের কনিষ্ঠা কন্যা লক্ষ্মীর হাতে হঠাৎ একটা ঝক্‌ঝকে রূপার দু-আনি দিয়া ফেলিল, তার পর সেটা আর ফিরাইয়া লইতে তা'র মন সরিল না।

পিতার কাছে লক্ষ্মীর শিক্ষার ত্রুটি হয় নাই, অর্থ লইয়া ঠিক কি করিতে হয়, সে তাহা জানিত। আশপাশে কেহ নাই দেখিয়া পা টিপিয়া-টিপিয়া সন্তর্পণে পিতার মৃতদেহের পানে অগ্রসর হইয়া তার হাতের মুঠার মধ্যে সে দু-আনিটি গুঁজিয়া দিল। অভিরামের হাত জীবনে কখনো অর্থ প্রত্যাখ্যান করে নাই, মৃত্যুর পরও তাহা দু-আনিটি প্রত্যাখ্যান করিল না।

অভিরামের সৎকার হইয়া গেল।

পরদিন পরলোকে একদল হতভাগার সঙ্গে অভিরামকেও বিচারকের সম্মুখে হাজির করা হইল। সেখানে সে তা'র পাওনাগণ্ডা আর একবার বুঝিয়া পাইল। তা'র সরব এবং সজোর আপত্তি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া পেয়াদারা তাহাকে নিরূপিত স্থানে ধরিয়া লইয়া গেল।

প্রকাণ্ড হাত বাড়াইয়া বিচারক হাঁকিল, নীচে নিয়ে যাও! তখন অভিরামকে বাধ্য হইয়া নীচেই যাইতে হইল।

ধস্তাধস্তির সময় দু-আনিটি পড়িয়া গেল, অপমানে ক্ষিপ্তপ্রায় অভিরাম তাহা লক্ষ্য করিল না। সে নীচে নামিতে লাগিল, অনেক অনেক নীচে। দৃষ্টির বাহিরে স্মৃতির ওপারে কোলাহলময় আঁধারের পাথারে তা'রই মতন অদৃশ্য বহু অভিশপ্ত আত্মার সঙ্গে-সঙ্গে সে ডুবিয়া গেল।

এধারে তরুণ দেবদূত কঞ্চুকী পথ চলিতে-চলিতে দেখিতে পাইল, পাথরের মাঝে রূপার দুআনিটি চিক্‌চিক্ করিতেছে। সে সেটি তুলিয়া লইয়া নানামতে ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া এপাশ-ওপাশ করিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিল। কখনো বাহু প্রসারিত করিয়া দূর হইতে সেটিকে দেখিল, কখনো আবার চোখের উপর আনিয়া গভীর মনোযোগের সহিত

সেটিকে নিরীক্ষণ করিল। দু-আনিটি পাইয়া সে অবাক্ হইয়া গিয়াছিল।

আপনমনে সে কহিতে লাগিল, বাঃ বাঃ কি সুন্দর! কী চমৎকার! এমন খাসা জিনিষ ত কখনো দেখিনি! এই বলিতে-বলিতে উত্তরীয় প্রান্তে দু-আনিটি শক্ত করিয়া বাঁধিয়া সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া সে গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল।

যে-মুহূর্তে অভিরাম জানিতে পারিল তা'র দু-আনিটি হারাইয়াছে তন্মুহূর্তেই তা'র কর্কশ কণ্ঠধ্বনি অন্ধকার শূন্য ভেদ করিয়া উর্দ্ধলোকে উৎক্ষিপ্ত হইল।

চীৎকার করিয়া সে বলিল, আমার টাকা চুরি গেছে, স্বর্গে আমার টাকা চুরি গেছে!

সে চীৎকার আর থামে না। কখনো ক্রোধের সুরে কখনো বিদ্রূপের সুরে তা'র প্রশ্ন উর্দ্ধলোকে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া উঠিতে লাগিল—আমার শেষ দু-আনিটি কে নিলে রে, কে নিলে? আমার শেষ সম্বল কে চুরি করলে রে, কে চুরি করলে? চারিদিকে আঁধার শূন্যের পানে ফিরিয়া সে প্রশ্ন করিতে লাগিল, গরীবের শেষ দু-আনিটি কে চুরি করলে রে, কে চুরি করলে?

এই নূতন ক্ষতির শোকে অভিরাম তা'র নরকবাসের যন্ত্রণা অনেকটা ভুলিয়া গেল। তা'র মনের একটা খোরাক জুটিয়াছে। তা'র অন্তরের নিদারুণ ক্রোধের জ্বালা নরকের বহ্নিরশ্মির জ্বালাকে ছাপাইয়া উঠিল। স্বর্গের বিরুদ্ধে তা'র একটা মস্ত অভিযোগ আছে, সে-অভিযোগ মিথ্যা নয়, যথার্থ, এই চিন্তা তা'র মনে নূতন শক্তি ও উৎসাহের সঞ্চার করিল। তবে কেন সে মুখ বুজিয়া থাকিবে? সে স্থির করিল, সে কিছুতেই আর চুপ করিবে না, কপালে যা আছে ঘটুক! সে চীৎকার করিয়া প্রচার করিয়া দিবে, স্বর্গে যাঁরা বাস করেন তাঁরা সকলেই সাধু নহেন!

নরকের প্রহরীরা নানাবিধ নিষ্ঠুর উপায়ে তা'র মুখ বন্ধ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু অভিরাম দমিল না। অবশেষে এমন হইল যে নির্ম্মম যমদূতেরা পর্য্যন্ত হতাশ হইয়া পড়িল। তাহাদের সর্দ্দার ক্রোধভরে আক্ষেপ করিতে লাগিল, মেহেরপুরের পাপীগুলো তা'র চুচক্ষের বিষ! হাড় ভাজা-ভাজা করলে! মুখ ভার করিয়া শ্রান্তদেহে সে পাপীদের সায়েস্তা করিবার যন্ত্র একখানা গোল করাতের উপর বসিয়া পড়িল। পরনের লেংটি ভেদ করিয়া করাতের ছুঁচলো দাঁতগুলো তা'র গায়ে বিঁধিতে লাগিল।

আপনমনে সর্দ্দার গজগজ করিতে লাগিল, গাঙ্গুলী-বেটারা অতি নচ্ছার, পাজির হদ্দ! এদের জন্য কোনো চুলোয় পাঠাতে পারে না? মরতে এখানে পাঠায় কেন? বিশ্রামান্তে উঠিয়া আবার সে অভিরামের উপর কাবুলী-দাওয়াই প্রয়োগ করিতে সুরু করিল।

কিন্তু সব নিষ্ফল! অভিরাম মুখ বন্ধ করিল না। তা'র প্রশ্ন অবিরাম ভেরীনিনাদের মত উর্দ্ধলোকে উঠিতে লাগিল। সে প্রশ্ন গিরিগুহার মাঝে-মাঝে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইয়া ফিরিতে লাগিল, পাহাড়ের অসংখ্য ফাটল দিয়া সে-প্রশ্ন সশব্দে নির্গত হইতে লাগিল, গিরিশীর্ষ হইতে সানুদেশে এবং তথা হইতে আবার শীর্ষদেশে সে-প্রশ্ন লাফালাফি সুরু করিয়া দিল। দুঃখের কথা বলিতে কি, অভিরামের নরকের সহচরেরাও এই অভিনব ব্যাপারে বিশেষ কৌতুক বোধ করিয়া তা'র সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া একযোগে চীৎকার আরম্ভ করায় কোলাহল এমন প্রচণ্ড ও ভয়াবহ রূপ ধারণ করিল যে স্বয়ং নরকরাজও আর তা বরদাস্ত করিতে পারিলেন না।

তিনি বলিলেন, তিনি তিন রাত চোখের পাতা বুজতে পারেননি, আর ত সহ্য হয় না! গত্যন্তর না দেখিয়া অনিদ্রাক্লিষ্ট নরকরাজ উর্দ্ধলোকে একদল দূত পাঠাইলেন।

তাহাদের দেখিয়া বিচারক রুদ্রসেন অবাক্ হইয়া গেল। সে তখন বিরাট্ জানুর উপর কনুই রাখিয়া বসিয়াছিল, তা'র অতিকায় মাথাটি যে হাতের উপর ন্যস্ত ছিল তাহা দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ক্রোশাধিক হইবে।

সে জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপার কি?

সর্দ্দার-দূত বলিল, আজ্ঞে, আমাদের রাজামশাই তিন তিন রাত ঘুমতে পারেননি! বলিয়া সে দাঁত বার করিয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল, কথাটা তা'র নিজের কানেই এম্নি অদ্ভুত ঠেকিল।

রুদ্রসেন বিরক্ত হইয়া বলিল, তা'র ঘুমের কি প্রয়োজন? এই ত আমি, সৃষ্টির আরম্ভ থেকে আজ পর্য্যন্ত কখনো ঘুমুইনি, আর সৃষ্টির শেষ পর্য্যন্ত কখনো ঘুমুবও না! ক্ষণেক থামিয়া কহিল, তবে নালিশটা অদ্ভুত বটে! তা, তোমার প্রভুর মানসিক অশান্তির হেতুটা কি?

যমদূত কহিল, আজ্ঞে, নরক একেবারে ওলটপালট হ'য়ে গেছে। জল্লাদেরা ব'সে-ব'সে ছোটো ছেলের মতন ভেউ-ভেউ ক'রে কাঁদছে! সর্দ্দারেরা হাত-পা মে'লে উদাস-ভাবে চুপ-চাপ ব'সে আছে। বাকি সবাই ছুটোছুটি হুটোপাটি লাগিয়েছে, কেউ বা মারামারি কামড়া-কামড়ি করছে, কেউ বা দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে ভুরু কুঁচ্‌কে বসে' আছে। সে আর কি বল্‌ব! পাপীগুলো চীৎকার চেঁচামেচি হাসাহাসি করছে, শাস্তির ভয় আর তাদের নেই!

বিচারক বলিল, তা, এতে আমি কি করতে পারি?

সর্দ্দার-দূত বলিল, তা'রা ন্যায়বিচার চায়।

বিচারক বলিল, তা ত তা'রা পেয়েছে। এখন দ'ণ্ডে মরুক!

সর্দ্দার মাথা চুলকাইয়া আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া বলিল, আজ্ঞে, তা'রা দগ্ধাতে রাজি নয়।

রুদ্রসেন উঠিয়া বসিল।

সে বলিল, আইনের একটি স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্ব হচ্ছে, ব্যাপার যতই জটিল হোক, তা'র আদিতে আছে মাত্র একব্যক্তি। সে ব্যক্তিটি কে?

—আজ্ঞে, সে হচ্ছে অভিরাম। মেহেরপুরের গাঙ্গুলীদের অভিরাম। পাজির পা-ঝাড়া! হপ্তাখানেক আগে তা'কে চূড়ান্ত শাস্তি দেওয়া হয়, তা'তেও সে সায়েস্তা হয়নি।

জীবনে এই প্রথম রুদ্রসেন বিচলিত হইল। হঠাৎ সে মাথা চুল্‌কাইয়া ফেলিল, এমন কাজ আর কখনো সে করে নাই।

সে বলিল, চূড়ান্ত শাস্তি দেওয়া হয়েছিল? তা হ'লে ত মুস্কিলের কথা! আমি চিরকালের জন্তে তা'র নরকবাসের আদেশ দিয়েছি। তার চেয়ে ভালো বা মন্দ আর কিছুই করা যায় না। এ-কথা বলিবার পরও যমদূতেরা দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া সে ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, এ-সম্বন্ধে আর কি কর্‌বার আছে!. যাও যাও চ'লে যাও, বিরক্ত কোরো না! সে দূতদলকে বলপ্রয়োগে স্বর্গ হইতে নিষ্কাশিত করাইয়া দিল।

কিন্তু গোল ইহাতে মিটিল না। খবরটা ভীষণ সংক্রামক ব্যাধির স্তায় অচিরে নরকের আঁধারলোকে ছড়াইয়া পড়িল, অবশেষে লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি কণ্ঠে ধ্বনিত হইতে লাগিল সেই এক প্রশ্ন—দু'আনি চুরি কর্‌লে কে? দু-আনি চুরি কর্‌লে কে? অসংখ্য অভিশপ্ত পাপী নির্য্যাতনের অবকাশে সেই কোটিকণ্ঠ-উৎসারিত বিরাট্ ধ্বনি শুনিতে লাগিল।

অতঃপর নরকে একটি নূতন আবেদনের খস্‌ড়া প্রস্তুত হইল। তাহাতে লেখা হইল—হারানো দু-আনিটি তা'র মালিককে প্রত্যর্পণ না করিলে নরকের দ্বার রুদ্ধ করা হইবে, ভবিষ্যতে সেখানে আর কোনো পাপীর স্থান হইবে না। সে আবেদনে একটু প্রচ্ছন্ন ভীতি প্রদর্শনের চেষ্টাও যে না ছিল তা নয়। ৬ নম্বর দফায় উক্ত হইল, নরকের আবেদন অগ্রাহ্য হইলে অতঃপর স্বর্গেরও কিঞ্চিৎ অসুবিধা ঘটিতে পারে।

আবেদনে কিছু ফল ফলিল। স্বর্গের মহলে-মহলে বড়-বড় জয়ঢাক পিটিয়া প্রচার করা হইল, যক্ষরক্ষ দেবদূত অপ্সর-অপ্সরা, কিন্নর বা কিন্নরী যে কেহ ১০ই শ্রাবণ দুপুরের পর একটি দু-আনি কুড়াইয়া পাইয়াছে সে-ই উক্ত দু-আনি অবিলম্বে রুদ্রসেনের কাছারিতে জমা দিবে! দোষীকে ক্ষমা করা হইবে এবং তাহাকে এক খানি প্রাপ্তিস্বীকারপত্র লিখিয়া দেওয়া হইবে!

দু-আনি ফেরত পাওয়া গেল না।

তরুণ দেবদূত কঞ্চুকী ঘুরিয়া ফিরিতে লাগিল। নিজেকে তা'র কেমন যেন অদ্ভুত ঠেকিতেছিল। কৃতকর্মের জন্ত সন্তাপের পরিবর্ত্তে তা'র রাগ হইতে লাগিল। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া যতই ভাবে ততই সে মনে-মনে জ্বলিতে থাকে। তা'র মাথার সোনালী জটাগুলি কাঁধের অনেক নীচে ঝুলিতেছে। একটা জটার ডগা মুখের মধ্যে পুরিয়া চিবাইতে-চিবাইতে কঞ্চুকী উন্মনা হইয়া বেড়াইতে লাগিল। চলিতে-চলিতে তা'র পা প্রতিদিন অগোচরে একই দিকে ফিরিয়া যায়—সুদীর্ঘ প্রশস্ত ভ্রমণপথ বাহিয়া সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া কারুকার্য্যখচিত সুদৃশ্য পাষাণ-প্রাচীরের পাশ দিয়া সেই সমুচ্চ নির্জ্জনতার অভিমুখে যেখানে রুদ্রসেন মন্যুমেণ্টের মতন নিশ্চল বসিয়া থাকে।

মন্থরপদে সে সেখানে আসিয়া পৌঁছিত। তার পর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গম্ভীরমুখে একদৃষ্টে রুদ্রসেনের মুখের পানে তাকাইয়া থাকিত। বিচারককে যথারীতি অভিবাদন করিয়া সে বলিত, ভগবানের আশীর্ব্বাদ লাভ করুন! রুদ্রসেন কথা কহিত না, ঈষৎ মাথা নোয়াইত, কারণ সে বড় ব্যস্ত, তা'র অবসর নাই।

কিন্তু কথা না কহিলেও রুদ্রসেন তাহাকে লক্ষ্য করিত, কঞ্চুকী যেখানে দাঁড়াইত সেইদিকে তা'র বিরাট্ অক্ষিপল্লব সঞ্চালিত হইত, কয়েক মুহূর্ত্তের জন্ত উভয়ে উভয়কে লক্ষ্য করিয়া দেখিত সেই অনন্ত বিচারকার্য্যের সূক্ষ্মতম অবকাশে।

কখনো-কখনো ক্ষণকালের জন্ত কঞ্চুকী বিচারকের উপর হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া পাপীদের উপর স্থাপন করিত। দেখিত, কেহ সঙ্কোচে জড়সড় হইয়া পিছু হটিতেছে, কেহ বা আগ্রহের আতিশয্যে সম্মুখে ঝুঁকিতেছে। ভালো ও মন্দ সকলেই ভয়ে কাঁপিতেছে, কার অদৃষ্টে কি আছে কেহই জানে না। পরস্পরের পানে তাহারা চাহিতেছে না, তাদের দৃষ্টি প্রকাণ্ড আব্‌লুস কাঠের সমুচ্চ আসনে উপবিষ্ট বিচারকের উপর নিবদ্ধ, সেখান থেকে কোনো-মতেই তা'রা দৃষ্টি ফিরাইতে পারিতেছে না। কোনো-কোনো পাপীকে দেখিয়া মনে হইত তা'রা যেন বিচারফল বুঝিতে পারিয়াছে, তাহাদের ভবিষ্যৎ যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছে, কুণ্ঠা এবং ভয়ে তাদের মুখ বিবর্ণ পাণ্ডুর। কেহ-কেহ সংশয়ের দোলায় দুলিতেছে, তাহারা উৰ্দ্ধে বিচারকের পানে উঁকি দিয়া দেখিতেছে আর আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বের মাঝে পড়িয়া আঙুল কাম্‌ড়াইয়া ক্ষতবিক্ষত করিতেছে। মুক্তির আশা যাহাদের মনে জাগিতেছে, তা'রাও সভয়ে পার্থিব জীবনের স্মৃতির গহন হইতে খুঁজিয়া-খুঁজিয়া দুষ্ক্রিয়াগুলি বাহির করিয়া মনে-মনে তাদের গুরুত্ব ওজন করিয়া দেখিতেছে। শেষে, সত্য-সত্যই বিচারকের মুখে মুক্তির আদেশ শুনিয়া তা'রা যে অশেষ সুখের অধিকারী হইল এবং অতঃপর স্বর্গের সুগম পথে অনন্তকাল বিচরণ করিতে পারিবে তাহা বুঝিয়াও ভয়ে-ভয়ে বাহির হইতেছে, পিছন ফিরিবার সাহস তাহাদের নাই। তা'রা উৎকর্ণ হইয়া আছে, কি জানি, বলা ত যায় না, হয়ত এখনি শুনিবে, দাঁড়াও! ও পথে নয়, এই পথে যাও।

এম্‌নি করিয়া প্রতিদিন কঞ্চুকী বিচারকের নিকটে গিয়া দাঁড়ায়। একদিন রুদ্রসেন ক্ষণকাল তা'র পানে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া বিরাট্ হাত তুলিয়া ইঙ্গিত করিয়া বলিল, যাও, ঐখানে পাপীদের পাশে গিয়ে দাঁড়াও।

রুদ্রসেন জানিতে পারিয়াছে। পাপীর অন্তরে দৃষ্টিপাত করাই তা'র কাজ, তাদের মানস-সরোবর হইতে মাছের মতন গোপন রহস্য আবিষ্কার করাতেই তা'র কৃতিত্ব।

ঠোঁটের মধ্যে সোনালী জটা চাপিয়া ধরিয়া ভালোমানুষের মতন কঞ্চুকী সম্মুখে অগ্রসর হইল। তা'র পর প্রসারিত পক্ষদুটি গুটাইয়া লইয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। তা'র দুপাশে দুই পাপী দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া বিস্ফারিত চোখে কম্পিত কলেবরে অস্ফুটস্বরে কাঁদিতেছিল।

কঞ্চুকীর পালা আসিলে রুদ্রসেন বহুক্ষণ এক— —— —— তাকাইয়া বলিল, এখন বলো।

কঞ্চুকী ফুঁ দিয়া মুখ হইতে জটাপ্রান্ত উড়াইয়া দিয়া উচ্চকণ্ঠে কহিল, কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস যে পায় তা'রই, ও ত আমার সম্পত্তি! এই বলিয়া সে বেপরোয়াভাবে বিচারকের পানে রূঢ়দৃষ্টিতে তাকাইতে লাগিল।

রুদ্রসেন কহিল, ওটি ফেরত দিতে হবে।

কঞ্চুকী কহিল, সাহস থাকে ত কাউকে এসে নিতে বলো! সহসা কঞ্চুকীর মাথা ঘিরিয়া মুহুর্মুহু বিদ্যুদ্বিকাশ হইতে লাগিল, চকিতের মধ্যে সে বজ্রপাণি হইয়া দাঁড়াইল।

সে রূপ দেখিয়া জীবনে দ্বিতীয় বার রুদ্রসেন ফাঁপরে পড়িল। মাথা চুলকাইয়া বলিল, তাই ত, কি করা যায়। পর মুহূর্ত্তেই কর্ত্তব্য স্থির করিয়া শাস্ত্রীদের পানে তাকাইয়া গর্জ্জিয়া উঠিল, ওকে এই দিকে ধ'রে নিয়ে এস!

শাস্ত্রীরা আদেশ পালনের জন্য অগ্রসর হইল। কঞ্চুকী ফিরিয়া দাঁড়াইল। উদ্বেলিত জ্বালাময় তা'র জটাজাল, পদতলে প্রলয়ঙ্কর বজ্র, চারিপাশে লেলিহান অগ্নিশিখার সংহার মূর্ত্তি। ব্যাপার দেখিয়া প্রাণ-ভয়ে শঙ্কিত শাস্ত্রীদল মুখ ফিরাইয়া আর্ত্তনাদ করিয়া দৌড় দিল।

রুদ্রসেন আপনমনে কহিল, ভারি মুস্কিলেই পড়া গেল! ক্ষণেকের জন্য সে রুষ্টনয়নে কঞ্চুকীর পানে তাকাইয়া রহিল, তার পর সিংহাসনের উপর হাতের ভর দিয়া তা'র বিশাল বপু ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিল। সৃষ্টির আদি হইতে সেদিন পর্য্যন্ত রুদ্রসেন কখনো আসন ত্যাগ করে নাই, সেই প্রথম। নিমেষের মধ্যে ঝড়ের মতন সম্মুখে অগ্রসর হইয়া এক মুহূর্ত্তে সে বিদ্রোহীকে সায়েস্তা করিয়া দিল। বজ্রবিদ্যুৎ তা'র পাষাণ-কঠিন দেহের সংস্পর্শে আসিয়া পরাভূত হইয়া গেল। নিশীথ জ্যোৎস্না ও শীতের শিশিরের মতন তা'রা নিষ্প্রভ নিস্তেজ হইয়া পড়িল। রুদ্রসেন কঞ্চুকীকে ছোটো একটা পাখীর মতন অনায়াসে বুকের কাছে তুলিয়া লইল, তা'র পর তদবস্থায় ফিরিয়া আসিয়া রুষ্টকণ্ঠে আদেশ দিল, এইবার সেটাকে ধ'রে নিয়ে আয়। তা'র পর স্থির হইয়া সিংহাসনে বসিল।

আদেশ পাইয়া শাস্ত্রীরা মেহেরপুরের অভিরাম গাঙ্গুলীকে ধরিয়া আনিবার জন্য তীরের মতন নরকের দিকে ছুটিয়া গেল। এদিকে পরাভূত কঞ্চুকী রুদ্ধ আক্রোশে নিয়তির সেই অমোঘ বক্ষে বার-বার বৃথাই অগ্নিবাণ চূর্ণ করিতে লাগিল। এখন সে হতশ্রী, ভগ্নপক্ষ, আনমিত তার হিরণ্যবর্ণ জটাজাল; কেবল তা'র রোষরক্ত দৃষ্টি নির্ভয়ে রুদ্রসেনের বুকের উপর নিবদ্ধ।

শাস্ত্রীরা অবিলম্বে অভিরামকে হাজির করিল। সে যেন দুঃখদুর্দ্দশার প্রতিমূর্ত্তি—শীতার্ত্ত তরুর মতন নগ্ন উলঙ্গ, আলকাতরার মতন কালো, অস্ত্রাঘাতে তা'র সারাদেহ ছিন্ন-ভিন্ন, কেবল কণ্ঠ বাদ। সেখান দিয়া অবিরাম উচ্চস্বরে তা'র সেই এক প্রশ্ন ধ্বনিত হইতেছে।

আলোকের রাজ্যে সহসা পৌঁছিয়া ধাঁধা লাগিয়া গিয়া ক্ষণেকের জন্য তা'র বাক্‌রোধ হইল। তা'র পর যখন দেখিল বিচারক কঞ্চুকীকে একটা বাসি ফুলের মতন অনায়াসে বুকের কাছে ধরিয়া রাখিয়াছে, তখন সে ভাবিতে লাগিল, এ কি স্বপ্ন দেখিতেছি? নিজের চোখকে সে বিশ্বাস করিতে পারিল না।

রুদ্রসেন বলিল, ওকে এদিকে নিয়ে এস।

শাস্ত্রীরা অভিরামকে সিংহাসনের ধাপের নীচে উপস্থিত করিল।

তাহার পানে ফিরিয়া রুদ্রসেন বলিল, তোমার একটা ছু-আনি হারিয়েছে। সে ছু-আনি এই লোকটির কাছে আছে।

অভিরাম কঞ্চুকীর দিকে তীব্রদৃষ্টিতে চাহিল।

রুদ্রসেন আসন ছাড়িয়া আর-একবার দাঁড়াইয়া উঠিল। তা'র পর বিরাট্ বাহু অর্দ্ধচন্দ্রাকারে ঘুরাইয়া একটা ঝাঁকানি দিল। অমনি দেবদূত কঞ্চুকী শূন্য ভেদিয়া একটা পাটকেলের মতন ছুটিয়া গেল।

'যাও, ছোটো ওর পিছনে' রুদ্রসেন নত হইয়া এই কথা বলিয়া অভি-রামের পা ধরিয়া বন্‌বন্ করিয়া দূর-দূরান্তরে ঘুরাইয়া ছাড়িয়া দিল। অভিরাম পড়িতে লাগিল, নীচে, নীচে, আরও নীচে, কোন্-এক অন্তহীন অতলে, যেন কক্ষভ্রষ্ট এক ধূমকেতু।

রুদ্রসেন বসিল। হাতের ইসারা করিয়া সহজ সুরে বলিল, পরের আসামী হাজির করো।

হুহু করিয়া কঞ্চুকী নীচে নামিতে লাগিল, এত দ্রুত যে তাহাকে দেখিতে পাওয়া দুষ্কর। কখনো দুই বাহু প্রসারিত হওয়ায় তাহাকে ক্রুসের মতন দেখাইতেছে, কখনো নীচুমাথায় তাহাকে দেখিয়া মনে হইতেছে যে যেন এক ডুবুরি, মহাব্যোমে ডুব দিতেছে; আবার কখনো তার মাথা ও পায়ের গোড়ালি জুড়িয়া যাওয়ায় মনে হইতেছে সে যেন একটি জীবন্ত ফাঁশ। লুপ্তবাক্ এবং দর্শন ও শ্রবণশক্তিবিরহিত দেব-দূত কঞ্চুকী রুদ্ধনিশ্বাসে অসহায়ভাবে পড়িতে লাগিল, আর তা'র অনুগমন করিতে লাগিল মেহেরপুরের মস্ত পাপী অভিরাম গাঙ্গুলী।

কেমন সেই যাত্রা, কে তা বর্ণনা করিতে পারে? আঁখির পাতা যেরূপে পর্য্যায়-ক্রমে খুলিয়া ও মুদিয়া যায়, তেমনি করিয়া ক্ষণে-ক্ষণে কত সূর্য্যের প্রকাশ ও বিলয় ঘটিতে লাগিল কে তা'র হিসাব রাখে? কত ধূমকেতু অকস্মাৎ জ্বলিয়া উঠিল, আবার তেমনি অকস্মাৎ অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল; কত চাঁদ ক্ষণে দেখা দিয়া ক্ষণে নির্ব্বাণ পাইল—আর সমস্ত ব্যাপিয়া বিরাজ করিতে লাগিল অনন্ত আকাশ, অসীম স্তব্ধতা এবং অন্ধকার অচল শূন্য। গভীর অখণ্ড নীরবতা ভেদ করিয়া তাহারা পড়িতে লাগিল, আর তাহাদের ঘিরিয়া রহিল বৃহস্পতি ও শনি, মধুর-হাসিনী শুকতারা, সুন্দরী বিবসনা চন্দ্রমা আর শ্যামলা হিরন্ময়ী রূপসী ধরণী। সুদূর হইতে দেখিয়া মনে হইতেছিল, ধরণী যেন নিস্পন্দ হইয়া একাকিনী মহাশূন্যে বিরাজ করিতেছে। সে যেন পথের উপর ভিড়ের মা বা হঠাৎ-দেখা একখানি সুন্দর মুখ। নিঝরের কলোচ্ছাসের মতন সে কমনীয়, অব্যাহত স্তব্ধতার মাঝে সঙ্গীতের মতন সে চিত্তহারী। সমীরণ-কম্পিত নীলাম্বুর উপর সাদা পাল যেমন সুন্দর, সে তেমনি সুন্দর! সে যেন তৃষাদগ্ধ মরুমর্ম্মে এক সবুজ বনস্পতি। সে অপরূপ, সে অপূর্ব্ব, দূর-দূরান্তে সে উড়িয়া চলিয়াছে। আঁধারের যবনিকা ছিন্ন

করিয়া যেন উহার উন্মেষ হইয়াছে, আর ধরণী পুলকিত বিহঙ্গের ন্যায় গান গাহিতে-গাহিতে উড়িয়া চলিয়াছে। ধীরে অতি ধীরে সে গাহিতেছে, বেতস বনের সুরে সুর মিলাইয়া, বেণুকুঞ্জের সুরে সুর মিলাইয়া। সেই সূক্ষ্ম সঙ্গীত ক্রমশ গভীর হইতে গভীরতর হইতে লাগিল, উচ্চ হইতে উচ্চতর গ্রামে উঠিতে লাগিল, অবশেষে তাহা একটি বিরাট্ মূর্চ্ছনায় পরিণত হইয়া আনন্দরসধারায় নিখিল ব্রহ্মাণ্ডকে মগ্ন করিয়া দিল। ধরণীকে দেখিয়া এখন আর তারকা বলিয়া মনে হয় না, বিহঙ্গের সঙ্গে আর তা'র তুলনা চলে না, সে যেন সপক্ষ শৃঙ্গধারী এক অতিকায় জীব! সেই অতিকায় জীব ঝড়ের দাপটে লাফাইয়া চলিয়াছে, তা'র ফুৎকারে বিদ্যুতের-ঘূর্ণার সৃষ্টি হইতেছে, চলার পথ সে রাক্ষসের মতন গ্রাস করিতেছে, উন্মাদের মতন দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া দারুণ শঙ্কা বা ক্রোধের তাড়নায় যেন সে উড়িয়া চলিয়াছে—সে দৃশ্য ভয়ঙ্কর।

ধুপ করিয়া তাহারা পৃথিবীর উপর পড়িল—চূর্ণ হইয়া গেল না, সেটুকু পুণ্যবল তাদের ছিল। মেহেরপুর গ্রামের সীমানার ঠিক বাহিরে বাঁকা পথটি যেখান দিয়া পাহাড়ে গিয়া পৌঁছিয়াছে সেইখানে দুজনে আছাড় খাইয়া পড়িল। পড়িয়া বার-দুই ঝাঁকানি খাইতে-না-খাইতেই অভিরাম উঠিয়া দাঁড়াইয়া টপ্ করিয়া কঞ্চুকীর ঘাড় চেপিয়া ধরিল। তার পর ঘুষি উঠাইয়া হাঁকিল, এইয়ো! বা'র কর্ আমার দু-আনি!

দেবদূত কঞ্চুকী হাসিয়া ফেলিল। সে কহিল, দু-আনি? সে কোন্ কালে প'ড়ে গেছে। রাখ্‌বে কোথায়? আমার দিকে একবার চেয়ে দেখ।

তখন অভিরাম সরিয়া দাঁড়াইয়া ভালো করিয়া কঞ্চুকীর পানে তাকাইল। দেখিল, তা'র দশাও অভিরামেরই মতন...নবজাত শিশুর মতন সে নগ্ন।

অভিরাম পথের ওপারে একটা ঝোপের আড়ালে গিয়া বসিল। সে বলিল, প্রথম যে লোক এ-পথ দিয়ে যাবে, তা'র কাপড়খানি যদি আমায় না দিয়ে যায়, তা হ'লে তা'র ঘাড় ম'টুকে দেবো!

দেবদূত কঞ্চুকী পথ পার হইয়া অভিরামের পাশে গিয়া দাঁড়াইল।

"আমিও ছাড়্‌ছিনে। দ্বিতীয় ব্যক্তি কে-এ পথ দিয়ে যাবে তা'র কাপড়খানি আমি নেবো।" এই বলিয়া ঝোপের আড়ালে সে-ও বসিয়া পড়িল।*

* মূল-রচয়িতা আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধ লেখক জেম্‌স্ স্টিফেন্‌স্।

সভ্যতা

শ্রী সজনীকান্ত দাস

[সন্ধ্যার অন্ধকারে গড়ের মাঠে বসিয়াছিলাম—মনে হইতেছিল চঞ্চল ধরণী শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। অর্দ্ধ-অন্ধকারে যানবাহনাদির গতিও তেমন প্রকট ছিল না। সহসা মাঠের চারিদিকে অসংখ্য দীপ জ্বলিয়া উঠিল;—অমনি মনে হইল সকলই উদ্দাম গতিতে ছুটিয়াছে—বর্ত্তমান সভ্যতার তাড়নায়। গঙ্গার ওপারে চিম্‌নীর ধোঁয়া এবং অবিশ্রান্ত বাঁশীর শব্দে সভ্যতাকে আরও বীভৎস মনে হইল। মনের সেই অবস্থায় এই কবিতাটি লিখিত, সভ্যতার ইহা একটি দিক্ মাত্র]

হে সভ্যতা হে বাত্যা প্রবল,
দুর্জ্জয় গর্জ্জন তুলি',
উড়াইয়া যুগান্তের মোহাচ্ছন্ন ধূলি
ছুটিয়াছ অবিরল।

শিহরিছে শ্রান্ত মহাকাল ধ্বংসমুখী প্রবাহে তোমার;
ক্লিষ্ট-পিষ্ট এ-ধরণী ওই তব বেগে দুর্নিবার।
ঝঞ্ঝার গর্জ্জনে ঘোর ধরণীর ক্রন্দন মিলায়,
তোমার প্রচণ্ড নৃত্য দিকে-দিকে ধায়
করি' ধূলিসাৎ শুষ্ক অতীতের কত সযত্ন সঞ্চয়;
হে দুর্জ্জয়, হে মহাপ্রলয়,
জয় তব জয়!

আমি ব'সে আছি এই বিস্তীর্ণ প্রান্তরে অর্দ্ধ অন্ধকারে,
হেরিতেছি ধীরে-ধীরে রজনীর অন্ধকার আসে গ্রাসিবারে

দিবসের ম্লান-আলো, কালো হ'য়ে আসে চারিধার :—
ক্ষণতরে পরে ধরা মৌন স্তব্ধতার
স্নিগ্ধ ম্লান আবরণ,
শান্ত হ'য়ে আসে ক্ষুব্ধ মন ;
আকাশে স্তিমিত তারা গাঢ়তর করে অন্ধকার ;
সহসা উঠিল জ্বলি' বক্ষে শূন্যতার
শত-শত বহ্নিদীপ ;
আঁধারের ললাটেতে পরাইল অগ্নি-টিপ
মায়া জাদুকরী যেন মায়ামন্ত্র-বলে।
অমনি হেরিনু জলে-স্থলে
প্রচণ্ড তাড়না তব, হে সভ্যতা হে চিরচঞ্চল
হে বাত্যা প্রবল !
যতদূর দৃষ্টি যায়—
বিচিত্র আলোর মালা এ-নয়ন ছায়,
কভু জ্বলে কভু বা মিলায়
রক্ত, নীল, পীত, শ্বেত বিদ্যুতের আলো।
ধরণী-গরল-ধোঁয়া গগনের বক্ষ করে কালো।
সারি-সারি হর্ম্ম্যরাজি উচ্চে শির তুলি'
ভুলিতেছে ধরণীর ধূলি
ভুলিতেছে ভিত্তি নিম্নে মৃত্তিকা-গহ্বরে !
থরে-থরে
ছুটে প্রাণপণ
মানুষের অসংখ্য বাহন—
তোমার অপূর্ব্ব সৃষ্টি।
কোথা কিছু নাহি স্থির যতদূর চলে দৃষ্টি,
চলেছে নিখিল বিশ্ব অস্থির চঞ্চল পদক্ষেপে
অশান্ত উদ্দাম নৃত্যে ধরা উঠে কেঁপে।
গতি-মদে আত্মহারা
অবিশ্রাম ছুটিছে তাহারা ;
ধনগর্ব্বে যন্ত্র-বলে
আনিছে সকল সৃষ্টি নিজ করতলে।
বিশ্বের সৌন্দর্য্য সব টুটিয়া লুটিয়া
চলেছে ছুটিয়া,
মুহূর্ত্ত দাঁড়াতে নাহি চায়—
কে মরিছে চক্রাঘাতে, ধূলাশায়ী হ'ল কে ঝঞ্ঝায়,
পথপার্শ্বে কে করে ক্রন্দন,
দারিদ্র্য-বন্ধন
ভিক্ষা-ঝুলি দিল কারে,
মৃত্যুর নিষ্ফল হাহাকারে
কে কোথায় হতেছে জর্জ্জর,
দেখিবার নাহি অবসর
ঝটিকার বেগ তব সম্মুখে ঠেলিছে অনিবার।

শুনিতেছি বারম্বার
যন্ত্র-তরণীর বংশীধ্বনি
গঙ্গাবক্ষ করে আলোড়ন।
গগন-প্রাঙ্গণ
উঠিছে কাঁপিয়া
থাকিয়া-থাকিয়া
বিচিত্র যন্ত্রের কত বিচিত্র ধ্বনিতে !
কে পারে গণিতে
এই শব্দ তরঙ্গের মাঝে
কোথা বাজে
নিখিলের অস্ফুট ক্রন্দন
আকুল স্পন্দন,
স্তব্ধ মূক প্রকৃতির মৌন 'হায় হায়,'
অসীম গগনপ্রান্তে কোথায় মিলায়
তোমার প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাঘাতে !
তারি সাথে-সাথে
শুনিলাম বংশী-ধ্বনি যন্ত্র-কারাগারে
নররূপী যন্ত্র যত চলে সারে-সারে
ডালি দিতে
মনুষ্যত্ব-শেষ-কণাটুকু ওই তব বাঁশীর ইঙ্গিতে।
দুর্গস্তূপে শুনিলাম কামান-গর্জ্জন
শূন্যতার বক্ষ চিরি' তোমারি তর্জ্জন
ক্ষীণপ্রাণ মানুষের ক্ষুদ্র প্রাণ নিতে
বিরাট্ তোমার যন্ত্র ব্যোমমার্গ রহে তরঙ্গিতে।
দেখিলাম সারি-সারি তালে-তালে চলে
দলে-দলে

মানুষ—কামান সৈন্য মৃত্যুদূত পশু-নর যত—
খুঁজিতেছে অবিরত
মরণ-মারণ;
হৃত-মনুষ্যত্ব চাহে মৃত্যু অকারণ!
মুহূর্ত্ত তিষ্ঠিতে নারে কেহ, তাড়না তোমার
মোহ দুর্নিবার
ফেলেছে মোহান্ধ বিশ্বে ঘোর ঘূর্ণীপাকে,
শান্তি, প্রেম, বন্ধুপ্রীতি পিছে প'ড়ে থাকে।

এই তব গতিবেগ শ্রান্তিহীন প্রবাহের মাঝে
আমি ব'সে আছি মোর ভীত চিত্তে বাজে
অতীতের বিস্মৃত-রাগিণী।
হে সভ্যতা, হে কাল-নাগিনী
তব বিষজ্বালা বিশ্বদেহ করিছে জর্জ্জর,
তব ওষ্ঠাধর
স্পর্শ করিতেছে যাহা
বিষ-দগ্ধ নীল তাহা—
মরিতেছে বিষাক্ত মরণ,
যুগান্তের শিক্ষাদীক্ষা লভিছে অনন্ত বিস্মরণ!

সচকিত, উজ্জ্বলিত ত্যজিয়া প্রান্তর
বাহি' পথ চক্রেতে মুখর
অতীতের স্নিগ্ধ-স্মৃতি গঙ্গাতীরে দাঁড়াইনু আসি',
নয়ন-সম্মুখে গেল ভাসি'
কত শত শতাব্দীর শ্যাম শান্ত ছবি!
বিশ্বকবি
ক্ষণেকের তরে শুনাইল অতীতের গান!
অমনি শিহরি' উঠে প্রাণ
সুন্দরের দুর্গতি হেরিয়া;
গিরিকন্যা জাহ্নবীরে ফেলেছে ঘেরিয়া
শুষ্ক কাষ্ঠ প্রস্তর কঠিন—
স্মৃতি ক্ষীণ
স্মরণে আনিছে তা'র অতীতের প্রিয় ইতিহাস।
দেখিলাম দুই তীরে ফেলিতেছে কৃষ্ণ ধূম্রশ্বাস
যন্ত্র-দৈত্য যত
অবিরত
ধূম্রোদ্গারে—শূন্য বক্ষ আকাশের কালো হ'য়ে আসে,
শীর্ণগঙ্গা ম্লান হয় ত্রাসে।

ফিরিয়া আসিনু আমি ক্লান্তদেহে চিন্তাশ্রান্তমনে
বসি' মোর ক্ষুদ্র গৃহ-কোণে
চিত্তে ব্যথা জাগে—
তীক্ষ্ণ দন্তাঘাতে তব পীড়িতের বক্ষরক্তরাগে
ধরণী করিছ রাঙা, হে সভ্যতা, রাক্ষসী, দানবী!
করাল কবলে তব মানব মানবী
এ উহার করে অকল্যাণ
ধরাবক্ষ হয়েছে শ্মশান;
অবিশ্বাস ঘরে-ঘরে;
তোমার দুর্জ্জয় ঝড়ে
বিশ্বাসের দৃঢ় ভিত্তি করে টলমল!
হে বীভৎস, হে মহাপ্রবল,
তব ঝঞ্ঝা গর্জ্জনের মাঝে
রোগযন্ত্রণার আর দুর্ভিক্ষের হাহাকার বাজে।
লোভীর লুব্ধতা বাড়ে,
শক্তিমান্ অশক্তের চিত্ত বিত্ত কাড়ে,
দারিদ্র্য ফিরিছে পথে-পথে
পিষ্ট নিপীড়িত হ'য়ে সর্ব্বধ্বংসী তব জয় রথে
তোমার পেষণ-যন্ত্র চলিছে নিয়ত;
ভাগ্যহত
শ্রমিকের দেহ-রক্ত-কণা
বিন্দুমাত্র দেহে রহিল না;
পূর্ণ করি' সুরাপাত্র লুব্ধ বণিকের
মিটাইছে তৃষ্ণা ক্ষণিকের।
জাতিতে-জাতিতে আর সোদরে-সোদরে
হানে পরস্পরে
অবিশ্বাস-লুব্ধতার বিষাক্ত কুঠার।
পরিপূর্ণ ভাণ্ডার যাহার
নিতেছে সে ছলে বলে
প্রবঞ্চনা মিথ্যার কৌশলে

দরিদ্রের প্রাণরূপী ভিক্ষা-অন্নগ্রাস,
এই একই ইতিহাস
সর্ব্বদেশে সর্ব্ব ঘরে-ঘরে
তব শ্যেন-দৃষ্টি যেথা পড়ে !

পুরুষে নারীতে দ্বন্দ্ব—গৃহে হাহাকার,
গৃহ, গৃহ নহে আর,
পান্থাবাস যেন পথ-মাঝে
কল্যাণের স্নেহস্পর্শ নাহিক বিরাজে,—
স্বার্থের সংঘাতে সবে পরার্থ বিস্মৃত,
স্নেহ নাই, প্রীতি নাই, প্রেম তাও মৃত।
কদর্য্যতা পণ্য হ'য়ে বিকাইছে পথে-পথে
সুরা-অহিফেন-রূপে আরো কতমতে।
তব ঝঞ্ঝা-গর্জ্জনের মাঝে
শ্মশানের অট্টহাসি বাজে

স্তব্ধ কর্ণেতে আমার
হে সভ্যতা, ঘূর্ণী দুর্ণিবার
সম্বরো, সম্বরো রুদ্র লীলা আনো আনো ফের
স্নিগ্ধ-শান্ত গতি তব অতীত যুগের।
সংসারীর পুণ্যতপোবন
তুষ্ট প্রীত মন
দাও দাও ফিরে'।
জ্ঞানের সুস্নিগ্ধালোকে রাখো সব ঘিরে'।
দেশে-দেশে দাবানল জ্বালি'
প্রকৃতির বক্ষে লেপি' কালি,
ছুটিও না আর
বিস্তারি' প্রশান্ত শূন্যে লেলিহান জিহ্বাগ্র তোমার।
মানুষের মনুষ্যত্ব চূর্ণ-চূর্ণ করি' গতিমুখে
ছুটিও না রুদ্রনৃত্য-সুখে
শান্ত ক'রে আনো ধীরে অশান্ত প্রলয়,
হে সভ্যতা, দারুণ দুর্জ্জয় !

রবীন্দ্রনাথের বাণী

শ্রী হেমলতা দেবী

রবীন্দ্রনাথ আজ বিশ্বময় সুপরিচিত। আমার আলোচ্য বিষয় রবীন্দ্রনাথের বাণী। এই বাণী হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করাই এক গভীর সাধনা। তাহাতে জীবনের উন্নতি না হইয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের রচনা অনেকের নিকট অবোধ্য বলিয়া মনে হয়—আমিও স্বীকার করি, রবীন্দ্রনাথের লেখা সর্ব্বসাধারণের নিকট সহজবোধ্য নয় ; তাহার দুইটি কারণ আছে, প্রথম, যিনি অনন্তের বার্ত্তা শুনাইতেছেন তাঁহার বার্ত্তা এত গভীর ও এত ব্যাপক, যে, পরিষ্কার করিয়া রেখা টানিয়া তাহা বুঝানো কঠিন। রবীন্দ্রনাথের বাণী গভীর বলিয়াই সমগ্রভাবে, সহজে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। কিন্তু আমার নিজের কথা বলিতে পারি যে, এই যে গভীরতা এবং সেই-হেতু ইহার যে অবোধ্যতা তাহাই আমাকে অধিক আকর্ষণ করে। বুঝিতে চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি, মনন-শক্তি ও ধারণা করিবার শক্তি বাড়িয়া গিয়াছে এবং বুঝিতে গিয়া আমার আত্মা বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। এখন রবীন্দ্রনাথের রচনার অবোধ্যতা আমার নিকট দোষ নহে, বরং অসাধারণ আকর্ষণের বস্তু বলিয়া মনে হয়। যাহা পাঠ করিলে, চিন্তা-শক্তি জাগ্রত হয় তাহাই যথার্থ পাঠ্য।

রবীন্দ্রনাথের রচনার অবোধ্যতার দ্বিতীয় কারণ—তাঁর গদ্যপদ্য লিখিবার ভঙ্গী সম্পূর্ণ নূতন-ধরণের। রবীন্দ্রনাথের লেখার ভঙ্গী তাঁর নিজস্ব—তাঁহাতে তাঁর ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে, আমরাই পড়িতে-পড়িতে

তাঁহার সহিত সুপরিচিত হইয়াছি। লোকে রবীন্দ্রনাথের ভঙ্গীটুকুই শেখে এবং তাহাই জাহির করিয়া আপনাকে রবীন্দ্রের ভক্ত বলিয়া পরিচয় দেয়, কিন্তু তাঁর শিক্ষা আত্মস্থ করিতে কয় জন পারিয়াছে?

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা নানা দিকে খেলে। অতি সংক্ষেপে তাহার কিছু-কিছু পরিচয় দিতেছি:—

প্রথমত:—হাস্য-পরিহাসে, ব্যঙ্গ-কৌতুকে রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্য্য দক্ষতা দেখাইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ সুরসিক; কিন্তু তাঁর ব্যঙ্গ-কৌতুকের ভিতর কিছুমাত্র তিক্ততা নাই—বিদ্রূপের ভিতর এমন কিছু নাই যাহা মর্ম্মে বিদ্ধ হয় কিম্বা গাত্রজ্বালা উপস্থিত করে। রসিকতা অনেকের আছে বটে, কিন্তু এমন ভদ্রতা-শিষ্টতা-সুরুচি-সঙ্গত ব্যঙ্গ-কৌতুক করিতে কাহাকেও দেখি নাই।

দ্বিতীয়ত:—গল্পোপন্যাস। রবীন্দ্রনাথ বিস্তর গল্প ও অনেকগুলি উপন্যাস লিখিয়াছেন,—যথা, রাজর্ষি, বৌ-ঠাকুরাণীর হাট, চোখের বালি, নৌকাডুবি, গোরা, ঘরে-বাইরে ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের ছোটো-ছোটো গল্পগুলি নিখুঁৎ সুন্দর। ছোটো গল্প লেখায় রবীন্দ্রনাথ সিদ্ধহস্ত! লোকে তাঁর বড়-বড় উপন্যাসগুলির খুঁৎ ধরিলে ধরিতে পারে, কিন্তু তাঁর ছোটো-ছোটো গল্পগুলি যেন এক-একটি উজ্জ্বল মাণিক, বা বিকশিত পারিজাত। ঔপন্যাসিক-রূপে রবীন্দ্রনাথের স্থান কোথায়, সে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব না, তবে নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, এক্ষেত্রে তিনি সামান্য নহেন এবং মানবচিত্ত অঙ্কনে তিনি অসাধারণ নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন।

তৃতীয়ত:—গীতিনাট্য—আমার পরম সৌভাগ্য আমি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার রচিত কোনো-কোনো গীতিনাট্য অভিনয় করিতে দেখিয়াছি। রবীন্দ্রনাথের মধুর কণ্ঠের গান এবং নিপুণ অভিনয় আমাদের চিত্তে যে অপূর্ব্ব ভাবের উদ্রেক করিয়াছিল, তাহার প্রভাব আজিও হৃদয় হইতে মুছিয়া যায় নাই। রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকি প্রতিভা নামক গীতি-নাট্য হইতে আরম্ভ করিয়া কালমৃগয়া, মায়ার খেলা, রাজা ও রাণী, বিসর্জ্জন, ইত্যাদি করিয়া ক্রমে ফাল্গুনী ও মুক্তধারা ও রক্তকরবীতে আসিয়া পৌছিয়াছেন। এক-একটি মূলভাব লইয়া এই গীতিনাট্যগুলি রচিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে বিশেষত্ব—কবির চিত্তের পরিণতির সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর নাট্যগুলির অপূর্ব্ব পরিণতি। ফাল্গুনীতে দেখাইলেন, চিরপুরাতন যাহা তাহাই কি করিয়া চিরনূতন হইতেছে। এক পুরাতনকেই হারাইয়া মানুষ তাহাকে কি করিয়া নিত্য নূতন ভাবে পাইতেছে তাই কবি গাহিয়াছেন:—

> তোমায় নতুন ক'রে পাবো ব'লে
> হারাই ক্ষণে ক্ষণ,
> ও মোর ভালোবাসার ধন!
> দেখা দেবে ব'লে তুমি
> হও যে অদর্শন,
> ও মোর ভালোবাসার ধন!

আর মুক্তধারার কথা কি বলিব? ইহার ভিতর দেশের বর্ত্তমান অবস্থার সুন্দর রূপকছবি দেখিতে পাই। মুক্তধারার ধনঞ্জয় বৈরাগীর ছবিটি মহাত্মা গান্ধীকে পদে-পদে স্মরণ করাইয়া দেয়। যদিও বর্ত্তমান আন্দোলনের অনেক পূর্ব্বে ইহা লিখিত হইয়াছিল, তথাপি দেখিতেছি রাম না হইতেই রামায়ণ হইতে পারে। ধনঞ্জয় বৈরাগী কবির মানস সৃষ্টি—আর আমরা দেখিতেছি প্রত্যক্ষ গান্ধী আর যেন সব শিবতরাইয়ের লোক—মুক্তধারা কোথায় আবদ্ধ রহিয়াছে, তাহা আমাদের মুক্ত করিতে হইবে।

রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যের পরিণতির কথা বলিতে গিয়া—আর-একটি কথা মনে পড়িল, সেটি রবীন্দ্র-নাথের প্রতিভার বিশেষত্ব। বাস্তবিক বলিতে কি, সেটি রবীন্দ্রনাথের চিত্তের অপূর্ব্ব পরিণতির নিগূঢ় তত্ত্ব। রবীন্দ্রনাথের চিত্তে একটি নিত্যবহমানা ধারা আছে; তাহা কিছুতেই শুষ্ক হয় না, এবং কিছুতেই আবদ্ধ হইতে চাহে না। রবীন্দ্রনাথ প্রাণময়তা, সজীবতা, সরলতা, সচলতার উপাসক—সোজা কথায় বলিতে গেলে স্বাধীনতাই তাঁহার মূলমন্ত্র। কোনো রীতি, কোনো প্রথা, কোনো সংস্কার জমাট হইয়া যাওয়া সম্বন্ধে তাঁর প্রাণের

একটা বিভীষিকা আছে। তাঁর নিত্য সজীব নিত্য চলন্ত মন কিছুতেই বাঁধা পড়িতে চায় না। নূতন পথে ছুটিতে তাঁর চিত্তের একটা সহজ গতি সহজ আনন্দ আছে। তাই এই বয়সে তাঁহার চিত্তে নিত্য-নূতন ভাবের ধারা প্রবাহিত হইতেছে। সজীবতা নবীনতা প্রাণময়তা তাঁহার বড় স্পৃহনীয়!

চতুর্থত:—সমালোচনা। যথার্থই রবীন্দ্রনাথের ন্যায় এমন সমালোচক আর দেখি নাই। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে এমন আশ্চর্য্য বিশ্লেষণ করিবার শক্তি আর দেখি নাই। খুঁৎ ধরিতে দোষ দেখাইতে তাঁর মত দক্ষতা কচিৎ দেখা যায়। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় দোষ দেখাইয়া দিলেও মর্ম্মে তাহা বিদ্ধ হয় না, সমালোচনার তীব্র বিষে কাহারো অন্তর জ্বলিয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের আঘাতও কি করিয়া এমন কোমল হইতে পারে ইহা এক আশ্চর্য্য কথা।

পঞ্চমত:—রবীন্দ্রনাথের কবিতা। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা নানাদিক্ দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কবিত্ব-শক্তিই হইল রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ শক্তি। রবীন্দ্রনাথ যদি আর কিছু না হইতেন, তবু কবীন্দ্র হইতেন। মেঘ যেমন বর্ষণের দ্বারা আপনার পরিচয় দেয়, তেম্‌নি রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরিচয় দিয়াছেন—তাঁর বীণার ঝঙ্কারে। কবির চিত্তের ছবিখানি কবিতার ভিতরে যথার্থরূপে প্রতিফলিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ কবি হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কবিত্ব-শক্তি তাঁহার অস্তিত্বের মূলে। রবীন্দ্রনাথকে জন্মকবি কেন বলিতেছি? বাস্তবিক রবীন্দ্রনাথের ন্যায় পারিপার্শ্বিক অবস্থা কাহারো পক্ষে এত অধিক প্রতিকূল হইতে পারে না। আমরা চিরদিন শুনিয়া আসিয়াছি—প্রকৃতির রম্য কাননে, নির্ঝরিণীর তটে, গিরিকন্দরেই কবিত্বের জন্ম হইয়া থাকে। কলিকাতার ইষ্টক-প্রাচীরের মাঝখানে সহরের কোলাহলের মধ্যে যে এত বড় কবি জন্মিতে পারে, ইহা এক আশ্চর্য্য কথা। কলিকাতার চিৎপুর রোডে, কবিত্ব-শক্তির উদ্দীপনা হওয়া দূরে থাক, তা'র সমাধি এখানে হইতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কবির হৃদয়, কবির চক্ষু, কবির সৌন্দর্য্য-জ্ঞান ও শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; কাজেই হাঁসকে জলে-দুধে দিলে যেমন সে দুধটুকু খাইয়া জল ফেলিয়া দেয়, রবীন্দ্রনাথ তেম্‌নি প্রাচীর-ঘেরা ঘরে বসিয়া পুষ্করিণীর ধারে বটগাছ আর কয়েকটি নারিকেলগাছ দেখিতে-দেখিতে কবি হইয়া উঠিলেন।

উপকরণ অন্তরেই ছিল; বাহিরের আয়োজনের কোনো আবশ্যকতাই ছিল না। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে হর্ম্ম্যমালার পশ্চাতে সূর্য্যোদয়, হর্ম্ম্যমালার পশ্চাতে সূর্য্যাস্ত কলিকাতার ধূলি-ধূসরিত গগনে তাহার শেষ রশ্মিপাত। কবি আপনার মনের মতন স্বপ্নরাজ্য নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতেই সুখে বিহার করিতেন। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় এমন দুঃখের শৈশব কম শিশুর থাকে। বাড়ীর অন্তঃপুরে প্রবেশ নিষেধ—বাড়ীর বাহিরে পদার্পণ নিষেধ! জগতের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই নাই। কিন্তু এমন অবস্থার ভিতরেও রবীন্দ্রনাথের কবি-হৃদয় বাড়িতে লাগিল। ৭।৮ বৎসরের বালক কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিলেন। তখনকার কবিতা এইরূপ:—

> রবিকরে জ্বালাতন আছিল সবাই
> বরষা ভরসা দিল আর ভয় নাই।

আর-একটি

> আমসত্ত্ব-দুধে ফেলি, তাহাতে কদলী দলি,
> সন্দেশ মাখিয়া দিয়া তা'তে
> হাপুস হুপুস শব্দ চারিদিক্ নিস্তব্ধ
> পিঁপিড়া কাঁদিয়া যায় পাতে।

এইসকল বালক-কবির রচনা নিতান্ত প্রাঞ্জল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। রবীন্দ্রনাথের যাহা-কিছু শিক্ষা গৃহেই হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই আমাদের জাতীয় কবি। কবিতাই তাঁহার প্রাণ।

কবিত্বের প্রধান দুই উপকরণ কল্পনা ও সৌন্দর্য্য-বোধ। এই উভয় উপকরণ রবীন্দ্রনাথে আশ্চর্য্য পরিমাণে আছে। রবীন্দ্রনাথের কবি-কল্পনা নানা ঐন্দ্রজালিক মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছে—আর সৌন্দর্য্য-বোধ শক্তিতে রবীন্দ্রনাথ অদ্বিতীয়। সৌন্দর্য্য বোধ-শক্তি তাঁহার অস্তিত্বের সহিত

মিলাইয়া আছে। রবীন্দ্রনাথের কবিকল্পনা ও সৌন্দর্য্য-বোধ-শক্তির অপূর্ব্ব পরিণতিই বাঙালী জাতির পরম সম্ভোগের উপকরণ আনিয়া দিয়াছে। কবিত্বের আবেগে রবীন্দ্রনাথ লেখনী ধরিয়াছিলেন—জীবন ভরিয়া কত কি লিখিয়া গিয়াছেন—তখন কেহ গ্রাহ্য করিয়া তাহা পড়েও নাই—কবিতা ক্রমে উজান বাহিয়া অমৃতধামের দ্বারে আসিয়া উপনীত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা কি দিব্য পরিণতি লাভ করিয়াছে। সৌন্দর্য্য-জ্ঞান হইতে সহজে কি এমন করিয়া সেই পরম সুন্দরের দর্শন মেলে! এইখানেই রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্ব ও বিশেষত্ব—এইজন্যই রবীন্দ্রনাথের এত সমাদর আমাদের নিকট! কালিদাসের দেশে আর কিছু না হোক কবির অভাব কোনো কালেই হয় নাই। বোধ হয় আমার বলিবার অধিকার নাই এবং বলিলে তাহা নিশ্চয়ই আমার ধৃষ্টতা হইবে, যে আমার বিবেচনায় রবীন্দ্রনাথ কালিদাস সেক্‌স্‌পিয়ার হইতেও বড় কবি। অতীতে এবং বর্ত্তমান যুগে জগতে এত বড় কবি জন্মগ্রহণ করে নাই। কালিদাসের লেখার ভিতর প্রাকৃতিক জগতের কি মনোহর চিত্রই দেখিতে পাই—এবং সেকস্‌পিয়র মানবের হৃদয়-বস্তুটিকে ঠিক বুঝিয়াছিলেন, চিত্রও আঁকিয়াছেন অতি নিপুণ। অতি সূক্ষ্মদর্শী অতি অপূর্ব্ব কবি তিনি। ধর্ম্মভাব, ভগবানের কথা যে তাঁর রচনায় নাই তাহা নয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ন্যায় এমন করিয়া শেষ পর্য্যন্ত টানিয়া যাইতে তিনি পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথ প্রাকৃতিক জগতের সৌন্দর্য্য-বোধে কালিদাস এবং মানব-প্রকৃতি-অঙ্কনে সেকস্‌পিয়রকেও পরাস্ত করিয়াছেন। তাঁহার ভিতর কালিদাস এবং সেক্‌স্‌পিয়ারের যুগল মূর্ত্তি বর্ত্তমান—তাহা ভিন্ন তাঁদের উভয়ের ভিতর যাহা ছিল না—তাহা তাঁহার আছে—তাহা ঋষিত্ব। রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য্য-পিপাসু মন যেখানে গিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে—সেখানে আর কোনো কবি কোনো দিন উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই, যদিও ইংরেজ কবিদিগের মধ্যে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের লেখা আধ্যাত্মিকতায় ভরপুর। মানুষ পরম তত্ত্বে নানা উপায়ে উপনীত হইতে পারে—হইয়াছে—এবং হইবে—কিন্তু সৌন্দর্য্যসাগরে ভাসিতে-ভাসিতে রবীন্দ্রনাথের ন্যায় এমন করিয়া কূল কেহ পায় নাই। কবিতার—শুধু কবিতার স্রোতে ভাসিয়া এমন করিয়া পরমপদ কেহ পায় নাই। কম বিস্ময়কর ব্যাপার!

ষষ্ঠত—গান। রবীন্দ্রনাথের স্বর্গীয় প্রতিভা নানা-ভাবে আপনার পরিচয় দিয়াছে বটে, কিন্তু গীতরাজ্যে রবীন্দ্রনাথ এদেশে একাই যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন। এসম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে এইরূপ লেখা আছে :—

"আমাদের পরিবারে শিশুকাল হইতে গানচর্চ্চার মধ্যেই আমরা বাড়িয়া উঠিয়াছি। আমার পক্ষে তাহার একটা সুবিধা এই হইয়াছিল, অতি সহজেই গান আমার সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল।" লোকে গীত রচনা করে, তার পর সুর বাছিয়া দেওয়া হয়, আর রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে সুরের ধারায় গানের কথা আপনা-আপনি আসিয়া অতি সহজে যথাস্থানে বসিয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের গানের কথার সঙ্গে সুরের সামঞ্জস্য বড় আশ্চর্য্য! আর কিছুর জন্য না হোক সুরের মোহে লোকে রবীন্দ্রনাথের গান গায়। আর যদি রবীন্দ্রনাথ কিছু না করিতেন, কেবল গানগুলি রচনা করিয়া সুর দিয়া যাইতেন, তাহা হইলেও তিনি বাংলা দেশে অমর হইয়া থাকিতেন। এখন পথে-ঘাটে, হাটে-মাঠে, পণ্ডিত-মূর্খ, পুরুষ-নারী, বালক-বালিকা, হিন্দু-খৃষ্টান সকলে রবীন্দ্রনাথের গান গাহিয়া অপার আনন্দ সম্ভোগ করে। গানের ভাব বুঝুক না বুঝুক সুরের মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া লোকে শোনে। আমি বলি রবীন্দ্রনাথের গানই রবীন্দ্রনাথের বাণী বাংলা-দেশে প্রচার করিবে। বাংলা দেশে এখন রবীন্দ্রনাথ-যুগ চলিতেছে। রবীন্দ্রনাথ কবিতা ও সঙ্গীতের ভিতর দিয়া যে-বাণী তাঁর স্বদেশবাসীকে শুনাইতেছেন তাহা ভাষা এবং সুরের মোহ কাটাইয়া সকলে এখনও ঠিক বুঝিতে পারিতেছে না—কেননা বাণীটি বড় গভীর। রবীন্দ্রনাথের জীবনব্যাপী কবিতা ও সঙ্গীতের মধ্য দিয়া একটি গভীর বাণী দিন-দিন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। তাহাই এখন আমি বুঝাইতে চেষ্টা করিব। রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও সঙ্গীতের ভিতর দিয়া

যে বাণী ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা তিনি নিজেই একটি কথায় ব্যক্ত করিয়াছেন।

"আমার কাব্য-রচনার একটি মাত্র পালা। সে-গানের নাম দেওয়া যাইতে পারে, সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন-সাধনের পালা।"

কথাটি ত একছত্রে হইয়া গেল, কিন্তু এই পালাটি বুঝাইবার জন্য রবীন্দ্রনাথকে অজস্র পুস্তক, অফুরন্ত গান, পুঞ্জ-পুঞ্জ কবিতা লিখিতে হইতেছে। এই ভাবটি প্রাণে লইয়া রবীন্দ্রনাথ যে সঙ্গীতটি রচনা করিয়াছেন তাহা এই :—

"সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।"

সীমার ভিতর অসীমের আভাস কি করিয়া আসে, তাহা বুঝাইবার জন্য তিনি কত গান, কত নাট্য, কত কাব্য লিখিয়াছেন।

"ক্ষুদ্রকে লইয়াই বৃহৎ, সীমাকে লইয়াই অসীম, প্রেমকে লইয়াই মুক্তি। প্রেমের আলো যখন পাই, তখনি যেখানে চোখ মেলি সেখানেই দেখি সীমার মধ্যেও সীমা নাই।"

এই যে সীমার ভিতর অসীমের আভাস লাভ ইহাই রবীন্দ্রনাথের সমুদায় গান ও কবিতার একটি মাত্র ধ্বনি। এই যে সীমার মধ্যে অসীমকে দেখা তাহা রবীন্দ্রনাথের লেখা হইতে আমি একটু বুঝাইতে চেষ্টা করিব। ভগবান্ অসীম আমরা সসীম ও ক্ষুদ্র, আমরা যে-সকল বস্তু দিয়া পরিবেষ্টিত রহিয়াছি সবই সসীম এবং ক্ষুদ্র—কিন্তু অনন্ত অসীম, কি করিয়া আমাদের অধিগম্য হইতে পারে? যে উপায়ে অনন্তের সাধনা সম্ভব তাহা রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করিয়াছেন এবং নানা-প্রকার আভাসে তাহা বুঝাইতেছেন। আমি এখানে তাঁহার 'জীবনস্মৃতি' হইতে উদ্ধৃত করি।—

"বাহিরের প্রকৃতিতে যেখানে নিয়মের ইন্দ্রজালে অসীম আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন সেখানে সেই নিয়মের বাঁধাবাঁধির মধ্যে আমরা অসীমকে না দেখিতে পারি, কিন্তু যেখানে সৌন্দর্য্য ও প্রীতির সম্পর্কে হৃদয় একেবারে অব্যবহিতভাবে ক্ষুদ্রের মধ্যেও সেই ভূমার স্পর্শ লাভ করে, সেখানে সেই প্রত্যক্ষবোধের কাছে কোনো তর্ক খাটিবে কি করিয়া?"

জগৎ রচনায় সৌন্দর্য্য এবং প্রেমের পরিচয় সুস্পষ্ট পাওয়া যায়—একথা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন, এই সৌন্দর্য্য এবং প্রেমের পথেই, আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে প্রতিক্ষণে অনন্তের সাড়া পাই—তা'র স্পর্শ পাই। যার সৌন্দর্য্য-বোধ নাই এবং প্রাণে প্রেম নাই অনন্তের পরিচয় তা'র পক্ষে পাওয়া অসম্ভব। কিন্তু এমন দুর্ভাগ্য নরকুলে বিরল? ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র তৃণের ভিতর এবং অতি তুচ্ছ ঘটনার ভিতর অনন্তের আভাস পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ পরিষ্কার বলিয়াছেন—যেমন "এই যে প্রকাশমান জগৎ, এ আর কিছু নয়, তাঁর মৃত্যুহীন আনন্দই রূপ ধারণ ক'রে প্রকাশ পাচ্ছে।" "আনন্দই তাঁর প্রকাশ, প্রকাশই তাঁর আনন্দ! তিনি যদি প্রকাশেই আনন্দিত, তবে আমি আনন্দের জন্য অপ্রকাশের সন্ধান করব। তাঁর আনন্দের সঙ্গে যোগ না দিয়ে আমি কিছুতেই আনন্দিত হ'তে পারব না। এর সঙ্গে যেখানেই অপরের যোগ সম্পূর্ণ হবে, সেখানেই আমার মুক্তি হবে, সেইখানেই আমার আনন্দ হবে। বিশ্বের মধ্যে তাঁর প্রকাশকে অবাধে উপলব্ধি ক'রেই আমি মুক্ত হবো। ভব-বন্ধন অর্থাৎ হওয়ার বন্ধন ছেদন ক'রে মুক্তি নয়, হওয়াকেই বন্ধনস্বরূপ না ক'রে মুক্তিস্বরূপ করাই হচ্ছে মুক্তি। কর্ম্মকে পরিত্যাগ করাই মুক্তি নয়—কর্ম্মকে আনন্দোদ্ভব কর্ম্ম করাই মুক্তি। তিনি যেমন আনন্দ প্রকাশ করেছেন, তেমনি আনন্দেই প্রকাশকে বরণ করা, তিনি যেমন আনন্দে কর্ম্ম করছেন তেমনি আনন্দেই কর্ম্মকে গ্রহণ করা —এ'কেই বলে মুক্তি। কিছুই বর্জ্জন না ক'রে সমস্তকেই সত্যভাবে স্বীকার ক'রে মুক্তি। সেই মুক্তি বৈরাগ্যের মুক্তি নয়—সেই মুক্তি প্রেমের মুক্তি, ত্যাগের মুক্তি নয়, যোগের মুক্তি। লয়ের মুক্তি নয়—প্রকাশের মুক্তি।"

এই জগতের সকল বস্তু সম্ভোগ করিতে হইবে, বিশ্বস্রষ্টা সম্ভোগের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু সম্ভোগের প্রকার-ভেদেই পাপ এবং পুণ্য। বর্ত্তমান যুগে ইহার চেয়ে বড় কথা আর হইতে পারে না। মুক্তির বার্ত্তা এমন

করিয়া ব্যাখ্যা কে কবে করিয়াছে ? প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য মানুষ মাত্রেরই মন মুগ্ধ করে। কেননা এইপ্রকারে অনন্ত অসীম তাঁর আনন্দ তাহাদের নিকট ব্যক্ত করিতেছেন, নতুবা এ আনন্দ আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করিত না। প্রেম যদি হৃদয়ে না জাগ্রত হয়, তাহা হইলে সসীমের ভিতর দিয়া অসীমের আভাস আমরা পাইতে পারি না। প্রেমই হইল অসীম ও সসীমের সেতু—প্রেম হৃদয়ে না জন্মিলে ক্ষুদ্র হইতে অনন্তে পৌঁছিবার আর কোনো পথ থাকে না। ইহাই হইল রবীন্দ্রনাথের গভীর বাণী। অতি ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র তুচ্ছ ঘটনা যেমন সূর্য্যোদয়, বৃক্ষের ফুল, আত্মীয়-স্বজন, ভালোবাসা, ঘরকন্নার সুখ-দুঃখ, এসব একদিক্ দিয়া দেখিলে অতি তুচ্ছ, অতি সামান্য ঘটনা, কিন্তু যেই প্রেম হৃদয়ে জাগে, সৌন্দর্য্য সহজেই উপভোগ করি, চক্ষু খুলিলেই বিনা-চেষ্টায় আনন্দিত হইয়া উঠি—আর তখনি সেই সঙ্গে-সঙ্গে সকল সুখ, সকল সৌন্দর্য্যের উৎসকে স্মরণ করি। তখন আবার সীমার ভিতর অসীমকে দেখার সাধনা আরম্ভ হয়। সৌন্দর্য্য বোধ ব্যাপারটি অতি স্বাভাবিক হওয়া দর্কার ; কেহ কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে পারে না, সুতরাং এখানে তর্ক-যুক্তি খাটে না। সৌন্দর্য্য অনুভব করিবার জিনিষ, বুঝাইবার নয়। আবার রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, অনন্তের ভাবনা প্রাণে ঠিক ধরা না গেলেও তা'র আভাসই মানুষকে এমন অনির্ব্বচনীয় সুখ-শান্তি আনিয়া দেয়—প্রাণকে এমন সরস সুন্দর করে যে মানুষের হৃদয় সেই রসেই বাঁচিয়া থাকে এবং বর্দ্ধিত হয়। ভগবানের অনন্ত স্বরূপ অনেকে উপলব্ধি করিয়াছেন,—এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ নন। তিনি বুঝাইয়াছেন অনন্ত কি করিয়া আমাদের নিকট ক্ষণে-ক্ষণে প্রকাশিত হন, তাঁহাকে প্রতি ক্ষুদ্র পদার্থের ভিতর ক্ষুদ্র ঘটনার ভিতর মধুরভাবে অনুভব করা যায়। ইহা বলিয়াই রবীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হন নাই—অনন্ত অগম্য যিনি তিনি যে আমাদের কাছে ধরা দিবার জন্য কি করিয়া নিত্য মনোহরণ বেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, তাহাও রবীন্দ্রনাথ প্রাণ দিয়া অনুভব করিয়াছেন। 'শান্তিনিকেতনে' আছে :—

"একটা জায়গায় আমাদের পাওয়ার পন্থা আছে। সে হচ্চে যেখানে ঈশ্বর স্বয়ং নিজেকে ধরা দিয়েছেন। সেখানে আমরা তাঁকে পাই, কেননা তিনি নিজেকে দিতে চান ব'লেই পাই। কোথায় পাই ? বাহিরে নয়—প্রকৃতিতে নয়, বিজ্ঞানতত্ত্বে নয়, শক্তিতে নয়—পাই জীবাত্মায়। কারণ সেখানে তাঁর আনন্দ, তাঁর প্রেম, সেখানে তিনি নিজেকে দিতেই চান। যদি কোনো বাধা থাকে ত সে আমাদের দিকে—তাঁর দিকে নয়।" এইজন্যে যে প্রেমের ক্ষেত্রে ঈশ্বর আমাদের কাছে ধরা দেন—এই ধরা দেওয়ার দরুন্ তিনি আমাদের কাছে ছোটো হ'য়ে যান না—তাঁর পাওয়ার আনন্দ নিরন্তর প্রবাহিত হয়—সেই পাওয়া নিত্যনূতন থাকে।"

আজকালকার লেখার ভিতর রবীন্দ্রনাথের এই ভাবটি দিন-দিন স্ফুটতর হইয়া উঠিতেছে। ভগবান্ কেমন করিয়া আসেন ?—

তোরা শুনিসনি কি শুনিসনি তাঁর পায়ের ধ্বনি,
সে যে আসে আসে আসে।
যুগে-যুগে পলে-পলে দিনরজনী,
সে যে আসে আসে আসে।
গেয়েছি গান যখন যত
আপন-মনে ক্ষ্যাপার মত—
সকল সুরে বেজেছে তা'র আগমনী ;
সে যে আসে আসে আসে।

* *

দুখের পরে পরম দুখে
তারি চরণ বাজে বুকে,
সুখে কখন বুলিয়ে সে দেয় পরশমণি ;
সে যে আসে আসে আসে।

আমরা কি এমন করিয়া তাঁর নিঃশব্দপদসঞ্চারে আসা দেখেছি ? ভগবানকে হৃদয়ে পাইয়া কবি বলিয়াছেন :—

তিনি প্রাণে না এলে কি এত শোভা হয়েছে জগতে, নইলে কি ফুলের এই রং—আমি ব্যথা পেয়েছিলাম যখন তখন তিনি আমায় তাঁর স্পর্শ জানিয়েছেন। দুঃখ-সুখের আঘাত দিয়ে ভগবান্ নানা উপায়ে আমাদের সাধনা কর্ছেন। আমরা যে কেবল তাঁর জন্য কেঁদে মরি তা নয়, আমাদের মন হরণ কর্বার জন্য তিনি নিত্য ভিখারীর

মতো তাকিয়ে রয়েছেন, কবে কোন্ দিন কোন্ শুভক্ষণে তাঁর দিকে চোখ পড়ে।" তাই ত কবি গাহিয়াছেন :—

হে অন্তরের ধন
তুমি যে বিরহী, তোমার শূন্য ভবন।
আঁধার ঘরে তোমায় আমি
একা রেখে দিলাম স্বামী
কোথায় যে বাহিরে আমি
ঘুরি সর্ব্বক্ষণ।

আমাকে না হইলে যে তাঁর চলে না। তাই ত কবি গাহিয়াছেন :—

তাই তোমার আনন্দ আমার পর, তুমি তাই এসেছ নীচে,
আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হবে যে মিছে।

অনন্ত অপার সম্ভোগের বস্ত, কবি নিত্য অনুক্ষণ তাহা সম্ভোগ করিয়া গাহিয়া উঠিয়াছেন—সে গান কত বিচিত্র হইয়া ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে—সেই মিলনের ভিতর কবির এ অভিজ্ঞতা লাভ হইল যে জীবাত্মাই যে বিরহী—জীবের প্রাণই যে অব্যক্ত ক্রন্দনে কাঁদিতেছে তা নয়, পরমাত্মাই জীবের হৃদয় পাইবার জন্য চির বিরহী হইয়াই দ্বারে-দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।

প্রেমের নিয়মই, এই প্রেম প্রতিদান চায়—আমরা ভগবানের জন্য কাঁদিয়া মরি, আমাদের প্রাণ হাহাকার করিয়া কাঁদে, তাঁর কি কাঁদে না? তিনি যে আমাদের প্রেম হাত পাতিয়া ভিক্ষা করিতেছেন,—দিলে কৃতার্থ হন,এই হইল তাঁর সৃষ্টির আনন্দ—পরিপূর্ণ আনন্দের এইটুকু অভাব আছে—আমাকে নইলে সব বৃথা।

রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভিতর এই বাণী দিন-দিন স্ফুটতর হইল। বৈষ্ণব-কবিদিগের ভিতর ভগবানের সঙ্গে জীবের প্রেমের লীলার অনেক বর্ণনা আছে। ভক্তের ভগবান্, ভক্তের দাস ভগবান্ কোলের শিশু—ভগবানের সঙ্গে কত মধুর লীলা বৈষ্ণব কবিরা বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু এমন করিয়া নিষ্ফল আবর্ত্ত সৃষ্টি না করিয়া, মোহের মত্ততা রচনা না করিয়া,এমন সহজ সুন্দর স্বাভাবিক ভাবে ভগবানের প্রেমের লীলাকে বর্ণনা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ কি আশার বাণী—কি চিত্ত-উন্মাদিনী বাণী ঘোষণা করিয়াছেন—

"দেবি! অনেক ভক্ত এসেছে তোমার চরণতলে
অনেক অর্ঘ্য আনি'।
আমি অভাগ্য এনেছি বহিয়া নয়নজলে
ব্যর্থ সাধনখানি।"

জগত সিদ্ধির গৌরব ঘোষণা করিয়াছে, কিন্তু কবে এমন করিয়া ব্যর্থ সাধনার গৌরব গাহিয়াছে! চিত্তে যে প্রসন্ন সংকল্প যে নীরব ভাষা লুকাইয়া আছে, তাহাও বিফলে যাইবে না, তা'রও মূল্য আছে! কার কাছে? যিনি হৃদয়বিহারী তাঁর কাছে।

সর্ব্বশেষে রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্মোপদেশ ও তত্ত্ব-কথার বিষয় দু এক কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। "শান্তি-নিকেতন" নামে রবীন্দ্রনাথের যেসকল ধর্ম্মোপদেশ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া বুঝা যায়, রবীন্দ্রনাথ কেবল কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ নহেন তিনি তত্ত্বজ্ঞানী ও উচ্চ-দরের দার্শনিক পণ্ডিত। এমন সহজভাবে এমন গভীর ধর্ম্মকথা বড় বিরল। একাধারে, একজনের ভিতর, এতগুলি শক্তির সমাবেশ কি সহজে দেখা যায়?

রবীন্দ্রনাথ ললিত-কলার একজন শ্রেষ্ঠ সাধক। ছবি ও গান-সম্বন্ধে জাপানের প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :—

"ছবি জিনিষটা হচ্ছে অবনীর, গান জিনিষটা গগনের; অসীম যেখানে সীমার মধ্যে সেখানে ছবি—অসীম যেখানে সীমা-হীনতায় সেখানে গান। কবিতা উভচর—ছবির মধ্যেও চলে, গানের মধ্যেও উড়ে। কেননা কবিতার উপকরণ হচ্ছে ভাষা। ভাষার একটা দিকে অর্থ, আর-একটা দিকে সুর, এই অর্থের যোগে ছবি গ'ড়ে উঠে—সুরের যোগে গান।"

এই কথাগুলি পড়িয়া, আমার নিকট রবীন্দ্রনাথের একটা গানের অর্থ পরিষ্কার হইয়া গেল :—

"দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে,
আমার সুরগুলি পায় চরণ, আমি পাই না তোমারে।"

এই গানের প্রকৃত অর্থ বুঝিবার জন্য আমি অনেক চেষ্টা করিয়াছি অর্থাৎ সুর জিনিষটায় অনন্তের আভাস আছে—গানের কথাগুলি যা ব্যক্ত করে, তা'র চেয়ে গানের সুর অনেক অধিক প্রকাশ করে। কবির হৃদয় যাহা ধারণা করিতে পারে না, যাহা তিনি ভাষায় ব্যক্ত করিতে অক্ষম,

তাহা তাঁহার গানের সুরে ব্যক্ত হয়, তাই সুরগুলি যেন ভগবানের চরণ পর্য্যন্ত যাইতেছে—কিন্তু মন তাঁহাকে ধরিতে পারিতেছে না। অবশ্য এ ব্যাখ্যা আমার নিজেরই, কবির মনের ভাব কি, জানি না। এখানে আবার একটা অবান্তর কথা আসিয়া পড়িল। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির ইংরেজী অনুবাদ পাশ্চাত্য জগতে বড়ই আদৃত হইয়াছে। বহু দিন পূর্ব্বে সংবাদ-পত্রে পড়িয়াছিলাম, যে, ঋষি টলষ্টয় কয়েকটি ভবিষ্যৎবাণী করিয়া গিয়াছেন। তাহার মধ্যে ইউরোপীয় মহাসমর একটি। আর-একটি ভবিষ্যৎবাণীর কথা আমার প্রাণে গাঁথা আছে; তাহা এই যে, মহাসমরের পর ইউরোপে এক নবধর্ম্ম প্রচারিত হইবে, যাহা ভারতীয় ব্রহ্মবাদের অনুরূপ। এই কথাটা আমার স্মৃতিপটে মুদ্রিত হইয়াছিল। তাহার পর যখন দেখিলাম রবীন্দ্রনাথের গীতগুলির অনুবাদ পাশ্চাত্য জগতে বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে, তখন হঠাৎ মনে হইল, তবে কি রবীন্দ্রনাথই ইউরোপে ব্রহ্মবাদ প্রচারের উপায় হইবেন? ইউরোপের বক্ষে তিনিই কি এক নবধর্ম্মের বীজ বপন করিবেন? টলষ্টয়ের ভবিষ্যদ্‌বাণী এখনও ভবিষ্যদ্‌বাণী। কখন্ তা সফল হইবে, জানি না।

মানব-হৃদয়রূপ যন্ত্রটির যতগুলি তার আছে, রবীন্দ্রনাথ তা'র সবগুলি বাজাইতে পারেন। শিশুর প্রাণ, যুবকযুবতীর প্রেমাকুল হৃদয়, শোকার্ত্তের ভগ্ন হৃদয়, প্রবীণ তত্ত্বজ্ঞানীর জিজ্ঞাসু মন, ভক্তের ভাবুকতাময় আকুলতা, স্বদেশ প্রেমিকের উদ্দীপনা প্রভৃতি সকল ভাবেরই খাদ্য তিনি জোগাইতে পারেন। চকিতের মতন মুহূর্ত্তের তরে মানব-হৃদয়ে যেসকল ভাব ভাসিয়া যায়, তাহাও তিনি কবিতার ভিতর গাঁথিয়া দিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের বাণীর আর-একটি অপরূপ মাধুর্য্যের কথা বলিয়া আমি শেষ করিব। সে কথাটি এই—রবীন্দ্রনাথের হাতে পড়িয়া জীবনের দুঃখ শোক আমাদিগের নিকট অতি সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। মৃত্যু, জরা, রোগ, শোক, মানবজীবনের বিভীষিকা—রবীন্দ্রনাথ এসকলের বিষদন্ত ভাঙিয়া দিয়াছেন। কেবল তাহাই নয়, কবি যেন তাহাদিগকে এক অপরূপ সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছেন। এই ভাবে পূর্ণ হইয়া গাহিয়াছেন—

"দুখের বেশে এসেছ ব'লে তোমারে নাহি ডরিব হে,
যেখানে ব্যথা তোমারে সেথা নিবিড় করি' ধরিব হে।"

কিম্বা

"এই করেছ ভালো নিঠুর, এই করেছ ভালো
এম্‌নি ক'রে হৃদয়ে মোর তীব্র দহন জালো।"

রবীন্দ্রনাথের পরমার্থ সঙ্গীত, স্বদেশী সঙ্গীত লোকে সুরের মোহে গায়—না-বুঝিয়া অনেকে গায়, গাহিতে গাহিতে কথাগুলি হৃদয়ে প্রবেশ করে। দশজনে লঘুভাবে গাহিবে, একজনের হৃদয়ের গভীর প্রদেশে গিয়া সেই বাণী প্রবেশ করিবে, সেখানে যে ধর্ম্মতরু উদ্গত হইবে, তাহার প্রভাব কতদূর বিস্তৃত হইতে পারে, তাহা চিন্তা করিলে প্রাণে আশা ও আনন্দ জাগিয়া উঠে।

প্রতিভার আদর যে-দেশে নাই—সেখানে কি কখন প্রতিভার স্ফুরণ হয়? যে-জাতি মহৎ গুণের আদর করিতে জানে না, সেখানে মহৎ ব্যক্তির আবির্ভাব বিরল! যেখানে বীরত্বের আদর নাই সেখানে কি বীর জন্মায়? যেখানে কাব্যের আদর নাই সেখানে কি কালিদাস, সেক্‌স্‌পীয়র বা রবীন্দ্রনাথ জন্মায়? যে-দেশে স্বদেশ-প্রেম জাগ্রত হয় নাই, সেখানে কি ম্যাট্‌সিনি বা গান্ধী জন্মায়, যে-দেশে তপস্যা নাই সে-দেশে কি বুদ্ধ জন্মায়? বড় লোকের জন্মগ্রহণ তাঁর স্বদেশের মহত্ত্বের পরিচায়ক, জাতীয় চরিত্রে যাহার আভাস-মাত্র নাই, মহৎ চরিত্রে তা'র পূর্ণ বিকাশ অসম্ভব। আজ ভারতের এই ঘোর দুর্দ্দিনে বাংলা দেশে রবীন্দ্রনাথের ন্যায় বিশ্বকবির অভ্যুদয় কত বড় গৌরব এবং শ্লাঘার বিষয় তাহা আমি বলিতে পারি না। রবীন্দ্রনাথ জগৎসভায় নিগৃহীত দীন ভারতের মুখ উজ্জল করিয়াছেন, তাই আমরা সকলে গৌরবান্বিত হইয়াছি।

..ন্দুর ধর্ম্মান্তর গ্রহণ *

অদ্য আমি যে কয়েকটি কথা বলিবার জন্য আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছি, জানি তাহার কোন-কোন কথা স্বধর্ম্মে নিষ্ঠাবান্ আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর্গের মনে কষ্ট দিতে পারে। ইহা জানিয়াও আমি উহা বলা আবশ্যক বিবেচনা করিতেছি। আমি স্বয়ং হিন্দু, এবং আমরণ হিন্দুই থাকিব। আমি ব্রাহ্ম-ধর্ম্মকে হিন্দু ধর্ম্মেরই অন্তর্গত বলিয়া মনে করি, এবং পৃথিবীর প্রচলিত অপরাপর ধর্ম্মসমূহের ইতিহাস আলোচনা করিয়া আমি এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, তাহাদের কোনটিই হিন্দু ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে। তথাপি প্রচলিত হিন্দু-মতকে আঘাত দ্বারা কেন ক্ষতবিক্ষত করিতেছি ইহার উত্তর এই যে, দেহ ব্যাধিগ্রস্ত হইলে যেমন সময়-সময় রক্ত মোক্ষণ আবশ্যক হইয়া পড়ে, সেইরূপ হিতৈষী ভিষক্‌সমাজ শরীরের গ্লানি দূর করিবার জন্যই কখন-কখন অস্ত্রোপচার করিতে বাধ্য হন। তাহাতে সুফল না হইলে ভিষকের নিপুণতাকে আপনারা দায়ী করিবেন, অস্ত্রোপচারের আবশ্যকতা অস্বীকার করিবেন না।

যেসকল কারণবশতঃ হিন্দু সাধারণতঃ ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে, কার্য্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের নানা অঞ্চলে বাস করিয়া তাহারই একটি কারণ পুনঃপুনঃ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। তাহা যৌন অনুরাগ। হিন্দু বিধবা যুবতীকে মুসলমানের প্রেমে পড়িয়া মুসলমানী হইতে দেখিয়াছি, পিতা মাতা ভ্রাতা বর্ত্তমানে, তাহাদের বিরুদ্ধাচরণ সত্ত্বেও ঐরূপ করিতে দেখিয়াছি। হিন্দু-যুবককে মুসলমানীর প্রেমে পড়িয়া মুসলমান হইতে দেখিয়াছি, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত উভয় শ্রেণীর মধ্যে ঐরূপ দেখিয়াছি। যে হিন্দু-বিধবা ব্রত-নিয়ম, সংযম-উপবাস, পূজা-পার্ব্বণ, আচার-নিষ্ঠা, জপ-তপ, তন্ত্র মন্ত্র, দেব-দ্বিজে ও বেদ পুরাণে শ্রদ্ধা-ভক্তি, জন্মগত সংস্কার প্রভৃতি লইয়া এমন-একটি বিশিষ্ট পারিপার্শ্বিক আবেষ্টন ও বংশানুক্রমিক মনোভাবের মধ্য দিয়া গঠিত হইয়া উঠে যে, তাহার নিকট বিধর্ম্মীর সংস্পর্শ বিষবৎ পরিত্যাজ্য বলিয়া বোধ হয়, তাহার এবম্বিধ অভাবনীয় পরিবর্ত্তনে প্রেমের অথবা যৌন আসক্তির অপ্রতিহত শক্তি লক্ষ্য করিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছি। আরও লক্ষ্য করিয়াছি, হিন্দু-সমাজ এইজাতীয় ঘটনাগুলিকে কিরূপ গভীর উপেক্ষার চক্ষে দেখিয়া থাকে। কোন মুসলমানের ধর্ম্মান্তর গ্রহণে মুসলমান সমাজ যেরূপ বিচলিত হইয়া উঠে, হিন্দু-সমাজ ঠিক তাহার বিপরীত। হিন্দু মুসলমান হইলে অতি আদরের সহিত সে ইস্‌লাম সমাজে গৃহীত, এবং মুসলমানগণ মসজিদে প্রকাশ্য সভা করিয়া তাহাদের আনন্দ ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া থাকে। অথচ স্বধর্ম্মে নিধন শ্রেয় ও পরধর্ম্ম ভয়াবহ এরূপ উক্তি হিন্দু-সমাজেই বেশী শুনিতে পাওয়া যায়। স্বধর্ম্মে বিশ্বাস যে জাতির মধ্যে এত প্রবল, তাহার পক্ষে এহেন গভীর ঔদাসীন্য আপাতদৃষ্টিতে অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া মনে হয় সন্দেহ নাই।

কিন্তু ভাবিয়া দেখিতে গেলে, ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। বরঞ্চ এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। হিন্দু নিজের মুক্তি লইয়াই ব্যস্ত, অন্যের ভাবনা ভাবিবার তাহার অবসর নাই। তাহার দর্শনমূলক সভ্যতা তাহাকে একান্ত অন্তর্মুখী ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পক্ষপাতী করিয়াছে। জীবনের লক্ষ্য মুক্তি, তাহা ব্যক্তিগত সাধনার বিষয়, জাতিগত নহে। ঐহিক চিন্তা-মাত্রেই চিত্ত বিক্ষেপকর, প্রত্যেকে স্ব-স্ব আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য চেষ্টা করিবে, পরের চরকা তৈলসিক্ত করিতে যাওয়া শক্তির অপব্যয় মাত্র। সুতরাং 'প্রত্যেকে আমরা পরের তরে' একথা হিন্দু মনে করে না। জাতীয় ইতিহাস রচনায় হিন্দু কখনও অনুসন্ধিৎসা দেখায় নাই, ইহকালের ক্ষণস্থায়ী ঘটনাপুঞ্জে কোন-প্রকার কৌতূহল প্রদর্শনকে সে অজ্ঞ ও ইতরজনোচিত মোহ-মাত্র মনে করিয়াছে। মুমুক্ষু হিন্দুর এবম্বিধ মজ্জাগত জড়তা লক্ষ্য করিয়া বিবেকানন্দ পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন,

* মাদারীপুর লাইব্রেরী-গৃহে পঠিত।

মুক্তির বাপ নির্ব্বংশ হোক। হিন্দুর এই দার্শনিক আদর্শ অনুসারে প্রতিবাসীর ধর্ম্মমত লইয়া মস্তিষ্ক আলোড়ন করা পণ্ডশ্রম মনে হওয়ারই কথা। ধর্ম্মগত ঐক্যপ্রসূত সহানুভূতি এক্ষেত্রে বিকাশের অবসর লাভ করিতে পারে না।

এস্থলে হিন্দুর উদাসীনতার আর-একটি হেতু এই যে, জাতিভ্রষ্ট হিন্দুর স্বধর্ম্মে পুনঃপ্রতিষ্ঠা এতকাল একেবারেই অসম্ভব ছিল। ব্রাত্যদোষ অলঙ্ঘনীয় ও দুরপনেয়, কিছুতে সে কলঙ্কের কালিমা মুছিবার নয়, বিগত কয়েক শতাব্দী যাবৎ এই মতই হিন্দু-সমাজে উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। হিন্দু একবার অহিন্দু হইলে চিরকাল তাহাকে অহিন্দু থাকিতে হইবে, ধর্ম্মচ্যুত হিন্দুর পক্ষে পুনরায় হিন্দু-সমাজে স্বাধিকার-লাভ কল্পনার অতীত বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিতেছিল। সুতরাং একবার পাতিত্য দোষ ঘটিলে তাহা লইয়া বাদানুবাদ নিতান্তই সময়ের অপব্যবহার, সে সম্বন্ধে চিন্তা করা একেবারেই নিরর্থক। কারণ পতিত যে, সে চিরকালই পতিত থাকিবে, হিন্দু-সমাজ কিছুতে তাহাকে পুনর্গ্রহণ করিতে পারে না। এই যখন হিন্দু-সমাজের সনাতন রীতি, তখন স্বধর্ম্মভ্রষ্ট ব্যক্তির সম্বন্ধে ঔদাসীন্যই বুদ্ধিমানের ব্যবস্থা।

হিন্দুসমাজে ইহাই সনাতন রীতি কি না, পরে দেখা যাইবে। আপাততঃ দেখা যাউক, যৌন আসক্তি ব্যতীত আর কি-কি কারণে সচরাচর হিন্দু স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া থাকে।

আদমসুমারির বিবরণে জানা যায়, নিম্নশ্রেণীর হিন্দু-গণের ধর্ম্মান্তর গ্রহণের প্রধান হেতু ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য, ঘৃণা, এবং স্থলবিশেষে নিপীড়ন। নিম্নস্তরস্থ হিন্দুর পক্ষে অবস্থা পরিবর্ত্তন দ্বারা সমাজে উচ্চস্থান গ্রহণ একরূপ অসম্ভব। স্বীয় জাতির গণ্ডী অতিক্রম করিয়া সে কখনো উচ্চবর্ণের সম্মানিত আসনের দাবি করিতে পারে না। যোগ্যতাকে একেবারে ঠেকাইয়া রাখা যায় না, হিন্দুও তাহা পারে নাই, তবে তাহার ন্যায্য প্রাপ্য হইতে অনেকটা বঞ্চিত করিয়াছে। মুসলমান-সমাজ সাম্যের আদর্শে গঠিত, খৃষ্টীয় সমাজে যোগ্যতার সমাদর আছে। চর্ম্মকার প্রভৃতি হিন্দুসমাজের সর্ব্বনিম্নস্তরের জাতিসমূহের মধ্যে যেরূপ ব্যাপকভাবে খৃষ্টধর্ম্মগ্রহণের হুজুগ দেখা দিয়াছে, হিন্দুধর্ম্মে থাকিয়া তাহাদের সামাজিক মর্য্যাদা লাভের অসম্ভাব্যতা ও হীন বর্ণ বলিয়া তাহাদের প্রতি উচ্চ-বর্ণসমূহের জুগুপ্সা উহার প্রধান হেতু। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ জীব ও ব্রহ্মের অভেদ প্রতিপাদক জনসাধারণের বোধগম্য ভাষায় লিখিত বৈদান্তিক গ্রন্থ। সেখানেও চণ্ডালের প্রতি যে বিজাতীয় ঘৃণা জন্মান্তরবাদের দৃষ্টান্তগুলির মধ্য দিয়া সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে মনে হয় অবনতজাতিসমূহের আত্মসম্মানবোধ জাগরিত হইলে হিন্দুদর্শনের সাহায্যে তাহাদের স্বধর্ম্মে আত্মরক্ষা করা সহজ হইবে না। শূদ্রাদির বেদে অনধিকার সম্বন্ধে বেদান্তাচার্য্য মহাত্মা শঙ্করের মতবাদও মোটেই উদার নহে। ভাবরাজ্যে ও পারলৌকিক ক্ষেত্রে আর্য্যদর্শন পরম উদার হইলেও লৌকিকক্ষেত্রে জাতিভেদের দৃঢ়নিগড়ে আবদ্ধ। সুতরাং হিন্দুজাতির এক-একটি সমগ্র উপবিভাগের মধ্যে, খৃষ্ট-ধর্ম্মের দ্রুত বিস্তারে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। এই অগ্রসরের বেগ যে কত দ্রুত, তাহা Dr. Maurice T. Price প্রণীত Christian Missions and Oriental Civilization—A Study in Culture-contact নামক গ্রন্থ হইতে জানা যায়। এক পঞ্চনদ প্রদেশে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ৪,০০০ অবনত হিন্দু খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করে; ১৯০১ সালে ৩৭,০০০, ১৯১১ সালে ১৬৩,০০০ হিন্দু খৃষ্টান হয়। ইলোর প্রদেশে দশ বৎসরে দেশীয় খ্রীষ্টানদিগের নিকট হইতে মিশনরিদের আয় ৪০০০৲ টাকা হইতে ২১,০০০৲ টাকায় বর্দ্ধিত হইয়াছে। তথাকথিত অন্ত্যজজাতীয় হিন্দুদের মধ্যেই এই মিশনরিগণ সমধিক কৃতকার্য্যতা লাভ করিতেছেন। প্রথমতঃ দুইচারিজন করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিত, পরে দশে-দশে, শতে-শতে করিত, অবশেষে হাজারে-হাজারে করিতেছে, এবং এক-একটি সমগ্র গ্রাম যিশুখ্রীষ্টের ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার জন্য প্রার্থী হইতেছে। At first the baptisms were by units, then tens and hundreds and then, at last, by thousands, and even whole villages came forward and asked to be enrolled in the Christian Church."

ক্ষুধিতকে অন্নদান, বিপন্নের সাহায্য, পীড়িতের চিকিৎসা ও শুশ্রূষা, অজ্ঞের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রভৃতি নানাবিধ উপায়ে অর্থশালী খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণ নিরন্ন, রুগ্ন, আর্ত্ত, নিরক্ষর ও অসংহত হিন্দুজাতিকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেছেন। মুসলমান সঙ্ঘবদ্ধ, তাহার ধর্ম্মবন্ধন শিথিল নহে; সুতরাং যদিও অধ্যাত্মতত্ত্বে ইস্‌লামধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় অগ্রসর নয়, তথাপি খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রবল আক্রমণ তাহার আত্মরক্ষার দৃঢ় প্রাচীর ভেদ করিয়া মুসলমান সমাজের বলক্ষয় করিতে পারে নাই। হিন্দুধর্ম্ম proselytizing নহে, অর্থাৎ অন্যধর্ম্মের পরাভব দ্বারা আত্মমত প্রচার করায় তাহার উৎসাহ নাই; যদিও বা কেহ-কেহ হিন্দু-ধর্ম্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে আগ্রহবান্ থাকেন, বিধর্ম্মীকে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিতে কেহই উপদেশ দেন না; এমন-কি, যদি কেহ এরূপ ইচ্ছুক থাকে, তবে হিন্দুসমাজ তাহাকে গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ হয়। রাজকীয় প্রসাদলাভাশায় মুসলমান-রাজত্বে অনেক উচ্চশ্রেণীর হিন্দু স্বেচ্ছায় মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, রাজজাতি তাহাদিগকে উচ্চপদে বরণ করিয়া সম্মান দান করিয়াছে। কিন্তু যে রাজপুতানার ক্ষত্রবীর্য্য মুসলমানে কন্যাদান করিতে বিমুখ হয় নাই এবং মোগল সম্রাটদিগের দক্ষিণ বাহুস্বরূপ পরিগণিত হইত, সায়ণ-মাধবের স্মৃতিবিজড়িত যে সমৃদ্ধ বিজয়নগর সাম্রাজ্য আকবরের সমসাময়িক কালে তুঙ্গভদ্রা হইতে সমগ্র দক্ষিণাপথের বিশাল ভূভাগে বিস্তৃত ছিল, ঔরঙ্গজীবের "পার্ব্বত্য মূষিক" ছত্রপতি শিবাজীর গৈরিক কেতন যে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে উড্ডীন হইত, ইহার কোন পরাক্রান্ত হিন্দুরাজ্যেই একটি মুসলমানকেও হিন্দুধর্ম্মে গ্রহণ করা হইয়াছে, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দেয় না। বস্তুতঃ হিন্দু কেবল বর্জ্জন করিতেই জানে, গ্রহণ করিতে পারে না।

হিন্দু অপর-একটি কারণেও ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয়। কালাপাহাড়ের দেবমূর্ত্তি-ধ্বংস প্রবণতা তাহাকে যে অগৌরবের অমরত্ব প্রদান করিয়াছে, তাহার মূলে হিন্দুসমাজের প্রতি কোন দারুণ বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি লুক্কায়িত ছিল, এ-বিষয়ে প্রচলিত কিম্বদন্তীর মূলে কিছু সত্য নিহিত থাকারই সম্ভব। কথিত আছে, অনিচ্ছাকৃত মুসলমান-সংস্রব-জনিত অপরাধ হেতু, পুনঃপুনঃ কাতর প্রার্থনা-সত্ত্বেও অনুদার হিন্দুসমাজ তাহাকে পুনরায় হিন্দুসমাজে গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলে, শিক্ষিত শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণতনয় কালাপাহাড় হিন্দুর প্রধান তীর্থস্থানের দেবমূর্ত্তিসমূহ ধ্বংস করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়। আমার স্বগ্রামের ইতিহাস হিন্দুসমাজের কাপুরুষোচিত সঙ্কীর্ণতা-সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করে। নদীমাতৃক পূর্ব্ববঙ্গে মেঘনার একটি ক্ষুদ্র শাখার তীরে এই গ্রামটি অবস্থিত। যখন আরাকান দেশীয় মগ দস্যুগণ মেঘনার ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র শাখাগুলি বাহিয়া উভয় পার্শ্বস্থ গ্রামের তটভাগ লুণ্ঠন করিয়া চলিয়া যাইত, তখন এই গ্রামের নদীকূলে কয়েকঘর ব্রাহ্মণ বাস করিত। গ্রামের মধ্যে অবস্থিত হিন্দুদিগের পক্ষে পলায়ন যতটা সহজসাধ্য ছিল, তটভূমির সন্নিহিত উক্ত ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে অতর্কিত আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা ততটা সুকর না হওয়ায়, তাহাদিগকে মগের উৎপীড়ন কিয়ৎপরিমাণে সহ্য করিতে হইত। দস্যুগণ চলিয়া গেলে, পলায়নপর গ্রামবাসীরা ফিরিয়া আসিয়া ঐ হৃতসর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণপরিবার-কয়টিকে "একঘ'রে" করিয়া তাহাদের বীরত্ব প্রদর্শন করে এবং তদবধি ঐ-কয়ঘর ব্রাহ্মণ "মগী ব্রাহ্মণ" নামে পরিচিত হইয়া জল অনাচরণীয় হইয়া থাকে। ঈদৃশ অনুদারতার ফলে তাহারা যে মুসলমান হইয়া যায় নাই, ইহাই আশ্চর্য্য। শুনা যায়, বিগত মপ্‌লা বিদ্রোহের সময় বহু-সংখ্যক হিন্দুকে বলপূর্ব্বক মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করা হইয়াছে এবং যদিও হিন্দুর বিবেক এখন এতটা উদ্বুদ্ধ হইয়াছে যে তাহাদিগকে স্বধর্ম্মে পুনর্গ্রহণের কথা উঠিয়াছে, তথাপি দ্রাবিড় দেশে অস্পৃশ্য বিচার এত তীক্ষ্ণ যে, সেখানে এই প্রস্তাব সামান্যমাত্রই কার্য্যে পরিণত হইতে পারিয়াছে। বস্তুতঃ মহম্মদ গজনী ও মহম্মদ ঘোরীর আমল হইতে টিপুসুলতানের কাল পর্য্যন্ত কত হিন্দু যে, অনিচ্ছায় স্বধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া হিন্দু-সমাজের জাতি ক্ষয়কর অনুদার অনুশাসনের ফলে চিরকালের জন্য ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। হিন্দুধর্ম্মের অপরিণামদর্শিতা ও সঙ্কীর্ণতা আজিও হিন্দু-সমাজের কি সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে, বাংলা সাপ্তাহিক

সংবাদপত্রের স্তম্ভ হইতে উদ্ধৃত নিম্ন-লিখিত ঘটনাটি দ্বারা তাহা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

অনুদার সমাজ চাহি না

(সঞ্জীবনী, ২রা মাঘ, ১৩৩১)

শিকারপুরের তিন মাইল দক্ষিণে তাজপুর গ্রামে কোন হিন্দু বাসিন্দা নাই। অধিবাসীরা সকলেই অশিক্ষিত কৃষিজীবী মুসলমান। ইহাদের কর্ম্মকার অর্থাৎ লৌহকারের বিশেষ অভাব হওয়ায় শিকারপুর গ্রামের পূর্ব্বদিকে হাউলায়া নদীর পরপারে ধর্ম্মদহ হইতে তারাপদ কর্ম্মকার নামক জনৈক যুবককে লইয়া যায়। সে সেখানে প্রায় চারি বৎসরকাল উক্ত কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া মুসলমান ভ্রাতাদের লৌহদ্রব্যের অভাব মোচন ও স্বীয় জীবিকার্জ্জন করিয়া আসিতেছিল। গত অগ্রহায়ণ মাসে আমরা সংবাদ পাইলাম তারাপদ কোন মুসলমান বালককে লৌহকারের কর্ম্ম শিক্ষাদান করিতে অসম্মত হওয়ায় কয়েকজন মুসলমান জোর করিয়া তারাপদকে নমাজ পড়াইয়া মুসলমান করিয়াছে। তারাপদ ধর্ম্মদহে তাহার আত্মীয়-স্বজন ও স্বজাতিবর্গের নিকট সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিয়া অত্যন্ত অনুতপ্ত চিত্তে সকলের নিকট তাহাকে পুনরায় স্বধর্ম্মে লইবার জন্য কাতর প্রার্থনা করিয়াছে। কিন্তু তাহার স্বজাতিবর্গও নবশাখ আদি হিন্দুরা কোনও ক্রমেই তাহাকে সমাজে পুন গ্রহণ করিতে স্বীকার করে নাই।

আমরা তারাপদকে ডাকাইয়া পাঠাইলে একদিন সে আমাদের নিকট আসিল। হতভাগ্য তারাপদ চারি পাঁচ দিবস অভুক্ত ছিল। আমরা বহু চেষ্টা করিয়াও সামান্য দুগ্ধ ব্যতীত অন্য কিছু তাহাকে আহার করাইতে পারিলাম না। পরদিন সংবাদ পাইলাম, তারাপদ নাই ; কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

প্রায় মাস খানেক পরে জানিতে পারিলাম তারাপদ তাজপুরে যাইয়া স্ব-ইচ্ছায় মুসলমান হইয়াছে। বিরাট জনতার সহিত বিশাল আয়োজনে তাজপুরের মসজিদে তাহাকে মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত করা হইয়াছে। অনেক হিন্দু মজা দেখিবার জন্য সেখানে উপস্থিত হইয়াছিল। তারাপদ নাকি সেখানে বলিয়াছিল "আমি বহু ব্রাহ্মণের পায়ে মাথা খুঁড়িয়াছি ও বহু গ্রামে যাইয়া আমার স্বজাতিদের দ্বারে-দ্বারে কত কাতর প্রার্থনা করিয়াছি কিন্তু সকলেই আমাকে কুকুরের মত বিতাড়িত করিয়াছে। আমি বেশ বুঝিয়াছি হিন্দু মানুষ নহে, সে সয়তান, সে বেইমান। আর আমার ইসলাম উদার, উন্নত ও মহান্। আমি পবিত্র ইসলামের আশ্রয় লইলাম, সয়তানকে সমূলে বিনষ্ট করিবার জন্য।"

হিন্দু সমাজপতিগণ একটু স্থির-মস্তিষ্কে চিন্তা করিবেন কি ?

শ্রীসুখময় চৌধুরী।
সেক্রেটারী হিন্দুসংগঠন সভা।
শিকারপুর (নদীয়া) *

যৌন-প্রেম হিন্দুনারীর ধর্ম্মান্তর-গ্রহণের অন্যতম কারণ বলিয়া উপরে কথিত হইয়াছে। উহার আর-একটি শোকাবহ হেতুও আছে। হিন্দুনারীর সতীত্ব-সম্বন্ধে সমাজ অতিমাত্রায় সপ্রতিভ। ফলে এই সতীত্ব এমনই ক্ষণভঙ্গুর হইয়া পড়িয়াছে যে, সামান্য একটু ঈর্ষ্যা বা কুৎসার বাতাসও উহা সহ্য করিতে পারে না, ঈষৎ

প্রবন্ধপাঠের পর জনৈক মুসলমান উকীল তাঁহার স্বীয় অভিজ্ঞতা হইতে দুইটি ঘটনার উল্লেখ করেন। (১) অল্প কয়েকদিন হইল তিনি স্থানীয় ফৌজদারী আদালতে গিয়া দেখিতে পান, একজন হিন্দু মুসলমান-ধর্ম্মগ্রহণপ্রার্থী হইয়া, কোন হিন্দু ঐ-কার্য্যে তাহাকে বাধা না দেয়, এজন্য এক আবেদনহস্তে দাঁড়াইয়া আছে! একটি হিন্দু মুহুরী তাহাকে ঐ-দরখাস্ত লিখিয়া দিয়াছে। যথারীতি দক্ষিণা পাইলে হিন্দু মোক্তার-বাবুগণ হাকিমের নিকট তাহার আবেদন সমর্পণ করিয়া বক্তৃতা করিতে প্রস্তুত, কিন্তু সে নিতান্ত দরিদ্র বলিয়া তাহা দিতে পারে নাই। উকীল-সাহেব দয়াপরবশ হইয়া হাকিমের নিকট তাহার দরখাস্তের বিষয় বলিতেছিলেন, তখন বহু হিন্দু মোক্তারবাবুগণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু কেহ তাহার ধর্ম্মান্তরগ্রহণ সম্বন্ধে কোন কৌতূহল প্রদর্শন করেন নাই। ঘটনাটি ভালোরূপ অনুসন্ধান করিয়া দেখিবার জন্য কেহ হাকিমের নিকট সময় চাহিলে তিনি আপত্তি করিবেন না একথা বলা-সত্ত্বেও উপস্থিত কোন হিন্দু সে-বিষয়ে আগ্রহান্বিত হন নাই। অথচ তাঁহার এই অনিচ্ছাকৃত বিলম্বহেতু দেওয়ানী আদালতে তাঁহার এক মুসলমান মক্কেলের অর্থদণ্ড হওয়ায় সে তাঁহাকে অনুযোগ দেওয়ার পর ইহার কারণ জানিতে পারিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিল, যদি তাহার আরও অর্থদণ্ড হইত তথাপি উকীল-সাহেবকে সে এই সৎকার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিত না। পরে অনুসন্ধানে তিনি জানিতে পারিলেন সমবয়স্ক কোন মুসলমান বন্ধুর বাড়ীতে আহার করার অপরাধে তাহাকে 'একঘ'রে' করা হয়, তিনমাস পাড়া-পড়্শীর দ্বারে-দ্বারে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া বেড়াইলেও তাহাকে সমাজে স্থান দেওয়া হয় না। অধুনা সে রীতিমত কলমা পড়িয়া মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে। জানি না সমবেত হিন্দুভদ্রমণ্ডলী হিন্দুসমাজের গ্লানিজনক এই করুণ-রসাত্মক কাহিনীটিতে হাস্যরসের কি উপাদান পাইয়াছিলেন, কিন্তু ইহা সত্য যে উহার বিবৃতিকালে সভায় একটি হাস্যের রোল উত্থিত হইয়াছিল। (২) বিগত পৌষমাসে তিনি এক মুসলমান মক্কেলের বাড়ী গিয়া দেখিলেন, সেখানে মাত্র ৩।৪ ঘর মুসলমানের বাস, চারিদিকে সমৃদ্ধিসম্পন্ন দ্বিতল অট্টালিকাবাসী হিন্দুদিগের বাড়ী। সেখানে একটি নমঃশূদ্র যুবতী তাহার স্বামীবাড়ী হইতে বলপূর্ব্বক তাহার একটি আত্মীয় কর্তৃক নীত হওয়ার সময় ঐ-মুসলমান পল্লীর নিকটে আসিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলে তাহারা উহাকে তাহার আত্মীয় ও সঙ্গীদের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া অনতিদূরে তাহার স্বামীবাড়ী সংবাদ প্রেরণ করে, কিন্তু কোন ফল হয় না। স্ত্রীলোকটি

আন্দোলনেই উহা সংক্ষুব্ধ ও বিচলিত হইয়া পড়ে। ষষ্টিবৎসর বয়সে তৃতীয় পক্ষের দারপরিগ্রহ করিয়া দশ বৎসরের বালিকার জন্ম সতীমাহাত্ম্য রচনা করা কেবল আমাদের দেশেই সম্ভবপর। অথচ পরিতাপের বিষয় এই যে, যাহাদিগের সতীত্ব-সম্বন্ধে আমরা এতটা সতর্ক ও সচেতন, তাহাদের নারীধর্ম্মের অবমাননাকারীর সমুচিত শাস্তিবিধানে আমরা একান্ত পরাঙ্মুখ; বরঞ্চ লাঞ্ছিতা বা ধর্ষিতা নারীর উপরই আমাদের সামাজিক শাসনদণ্ড

দুইরাত্রি বৃক্ষতলে যাপন করিয়া ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া মুসলমান হইতে চাহে, কিন্তু সংখ্যাল্পতাপ্রযুক্ত মুসলমানগণ ভয়ে স্বীকৃত হয় না। (৩) এই সংবাদ পাইয়া তথাকার খৃষ্টান পাদ্রী তাহাকে খৃষ্টান করিয়া লয় এবং আশ্রয় দেয়। তৎপর তাহার রূপযৌবনে আকৃষ্ট হইয়া একটি নমঃশূদ্রযুবক খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তাহাকে বিবাহ করিয়াছে। ঐ-অঞ্চলে নাকি বহু নমঃশূদ্র খৃষ্টান হইয়া যাইতেছে। (৪-৫) তৎপরদিন উকীল-সাহেব অল্পকয়েকদিন যাবৎ সন্নিহিত গ্রামে আরও দুইজন হিন্দু মুসলমান হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাইয়াছেন বলিলেন, তন্মধ্যে একজন সঙ্গতিপন্ন। তিনি আরও বলিলেন, তাঁহার পরিচিত যে কয়েকটি হিন্দু তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের কেহই ধর্ম্মভাবের প্রেরণায় ঐরূপ করে নাই। মুসলমান সমাজের একতা ও হিন্দুদের মধ্যে মিলনশক্তির অভাবেরও উল্লেখ করিলেন। একজন হিন্দুশাস্ত্রাভিজ্ঞ বক্তা এরূপ পরধর্ম্মাবলম্বীকে হিন্দুর অস্পৃশ্য ও "গর্ভস্রাব" আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। উকীল-সাহেব বলিলেন মুসলমান হিন্দুসমাজকে এরূপ গর্ভপাত করিতে বলে না—তবে তাহারা এরূপ গর্ভপাত হইতে দেয় কেন? মুসলমান ত তাহার স্বধর্ম্মাবলম্বীকে খৃষ্টান হইতে দেয় না। সকলধর্ম্মেরই লক্ষ্য ও গম্যস্থান এক, তবে খাদ্যাখাদ্য লইয়া এতটা ধর্ম্মবিচার কেন? যে-সকল হিন্দু জাতিচ্যুত হইয়া ঘূরপাক খাইতে থাকে এবং অবশেষে মুসলমান হইতে বাধ্য হয়, হিন্দুসংগঠনসভা স্থাপিত হইলে তাহাদের একটা সুব্যবস্থা হইতে পারে বলিয়া তিনি ঐরূপ সভাস্থাপন করিতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু এবিষয়ে হিন্দুজাতির গভীর ঔদাস্য দূর করা সহজ নয়, তাঁহার সহিত আলাপে ইহা বুঝিতে পারিলাম। (৬) সম্প্রতি মহকুমার বুকের উপরে একটি বিধবা ব্রাহ্মণযুবতী প্রতিবাসী হিন্দু যুবকগণের উৎকট সহানুভূতির বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া স্থান হইতে স্থানান্তরিত হইয়াও অপমর্ষণের হস্ত হইতে রক্ষা পায় নাই, ফৌজদারী আদালতে এই অভিযোগ হইয়াছে। সভার অপর এক ভদ্রলোক বলিলেন রংপুরের মুসলমান গুণ্ডাদের হস্ত হইতে প্রত্যাবৃত্ত এই মহকুমার সমীপবর্ত্তী গ্রামবাসী শ্রীমতী সুহাসিনী দেবীকে তাহার স্বামী গ্রহণ করিলেও গ্রাম্যসমাজ কর্ত্তৃক এখনও সে পরিগৃহীত হয় নাই। জনৈক ভদ্রলোক মৈমনসিংহ হইতে লিখিয়াছেন যে তাহাকে দেখিলে এবং তাহার করুণ-কাহিনী শুনিলে অশ্রুসম্বরণ করা যায় না। (৮) অপর একজন হিন্দু উকীল বলিলেন চরমানাইয়ের সর্ব্বজন-বিদিত দুর্ঘটনার সমসাময়িক কালে একটি কুরূপ নমঃশূদ্রের সুন্দরী যুবতী-পত্নীকে ঐস্থানের কয়েকজন মুসলমান বলপূর্ব্বক লইয়া গিয়া মুসলমানী করে। বহু নমঃশূদ্র ঢাল-তরবারি সহ উপস্থিত হইয়া তাহাকে মুসলমানবাড়ী হইতে উদ্ধার করে এবং ঐ গ্রামে জমিদার-কথিত উকিল-বাবুর বাড়ী রাখিয়া যায়। যতদিন স্ত্রীলোকটি উহার বাড়ীতে ছিল, দলে-দলে বৈষ্ণবী ও বাজারের বেশ্যা এবং মুসলমান আসিয়া তাহাকে ফুসলাইয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিত, অবশেষে মুসলমানরাই কৃতকার্য্য হয়। (৯) তিনি আরও বলিলেন মহকুমার নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোকের যুবতীপত্নী ছিল। কার্য্যোপলক্ষে প্রায়ই তাঁহাকে স্থানান্তরে থাকিতে হইত, ইত্যবসরে গ্রাম্য যুবকগণ অসচ্চরিত্রা স্ত্রীলোকটির প্রতি কুৎসিতবাক্য প্রয়োগ করিত, এবং স্বামী বাড়ী আসিলে তাঁহাকে নানাবিধ নির্য্যাতন করিত। ক্রমে ইহা অসহ্য হইয়া উঠিলে সে সম্প্রতি একদিন এখানে পলাইয়া আসিয়া কোন ব্রাহ্মণ মোক্তার-বাবুর আশ্রয় ভিক্ষা করে। অকৃতকার্য্য হইয়া পরে কলিকাতা যায়। জনৈক স্থানীয় মুসলমান তাহার খোঁজ পাইয়া সেখানে গিয়া তাহাকে বিবাহ করে। অতএব দেখা যায়, সভার উপস্থিত উল্লিখিত তিনজন ভদ্রলোকের নিকট সম্প্রতি-সংঘটিত স্থানীয় যে নয়টি ঘটনার বিবরণ জানা গেল, তাহাতে সংশ্লিষ্ট তিনটি পুরুষ এবং তিনটি স্ত্রীলোক মুসলমান-ধর্ম্ম এবং একটি পুরুষ ও একটি নারী খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, একটি হিন্দুবিধবা অপহৃত হইয়াছে, অপর-একটি ব্রাহ্মণমহিলা তাহার নিগ্রহকারী মুসলমান-দানবের কবল হইতে উদ্ধারলাভ করিয়াও এবং স্বামী-কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াও অদ্যাপি সমাজে স্থান পায় নাই। ধর্ম্মান্তর গ্রহণ বা অপহরণের যে কয়েকটি কারণ দেখা যাইতেছে, তাহাতে গ্রাম্য-সমাজে রূপযৌবন লইয়া হিন্দুনারীর অসহায় অবস্থায় ধর্ম্মরক্ষা করিয়া থাকা কতদূর কঠিন তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। স্পর্শদোষ ও খাদ্যাখাদ্য-বিচারসম্বন্ধে অতিরিক্ত কঠোরতা ঐরূপ ধর্ম্মান্তর গ্রহণের একটি প্রধান হেতু, তাহাও আমরা দেখিতে পাইতেছি। হিন্দুসমাজভুক্ত বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীগণ হিন্দুনারীকে কিরূপে কুপথে প্রলুব্ধ করে, তাহাও জানা যাইতেছে। হিন্দুধর্ম্মের আধ্যাত্মিকতা, আনুষ্ঠানিক পবিত্রতা ও হিন্দু-ললনার সতীত্বগৌরবের সমর্থন করিয়া সভার যে সকল হিন্দু বক্তা উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছিলেন, তাঁহারা ঐ-সকল ঘটনার কতকগুলি নিশ্চয়ই অবগত ছিলেন। তথাপি অন্তঃসার-শূন্য ধর্ম্মগরিমা আমাদিগকে এতই অন্ধ ও হৃদয়হীন করিয়া ফেলিয়াছে যে, সমস্যাটি যে কতটা আসন্ন হইয়া পড়িয়াছে ও গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা তাঁহারা ভালোরূপ ধারণা করিতে পারিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। অথচ বিখ্যাত বৈদিক ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের আবাসভূমি কোটালিপাড়া পরগণার কেন্দ্রস্থল এই মহকুমায় সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার জন্ম যে একটিমাত্র টোল আছে, সাহিত্যানুরাগী ও প্রাচীন সভ্যতার শ্রদ্ধাবান্ লর্ড রনাল্ডশে যাহার সম্বন্ধে সহানুভূতি-

সম্পূর্ণ উদ্যত হইয়া উঠে। প্রত্যেক হিন্দুস্ত্রী সমাজের এই প্রকৃতি ও মনোভাব বিশিষ্টরূপে অবগত আছে; সে জানে যে, অসত্য হইলেও পরপুরুষ কর্ত্তৃক অপমানের অপবাদই তাহাকে সমাজ এবং স্বামী ও পিতৃগৃহ হইতে বহিষ্করণের পক্ষে প্রচুর। সুতরাং যদি কোন পাশব-প্রকৃতি পুরুষ বলপূর্ব্বক তাহার ধর্ম্মনাশের চেষ্টা করে এবং সে তাহা প্রতিরোধ করিতে অক্ষম হয়, তাহা হইলে তাহা লইয়া গোলমাল না করিয়া নীরবে সহ্য করাই সে অনেক সময় শ্রেয় মনে করে। যদি উক্ত ঘটনা কোন কারণে প্রকাশিত হইয়া পড়ে বা পড়িবার সম্ভাবনা থাকে, এবং বিশেষতঃ অত্যাচারী যদি মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী হয়, তাহা হইলে সমাজচ্যুত হইয়া ঘৃণিত বারবনিতাবৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ অপেক্ষা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক তাহার নিপীড়কের অঙ্কলক্ষ্মী হইয়া বিবাহিতার সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত থাকা স্বভাবতঃই সে অধিকতর বাঞ্ছনীয় মনে করে।

যদিও বিধবাবিবাহ-সম্বন্ধে কিছু বলা এ-প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে তথাপি হিন্দুবিধবার ধর্ম্মান্তর গ্রহণের উপরোক্ত কারণ পর্য্যালোচনা করিলে ঐ প্রসঙ্গের যৎকিঞ্চিৎ উল্লেখ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। সেদিন গিয়াছে, যখন হিন্দুপত্নী ভর্ত্তৃহীন হইলে যৌথপরিবারের কর্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত হইয়া অবশিষ্ট জীবন সম্মানের সহিত যাপন করিতে পারিতেন। একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা এখন প্রায় নামে মাত্র পর্য্যবসিত হইয়াছে, এবং পতিহীনা নারীর অবস্থা এখন অনেক স্থলেই শোচনীয়। এই পরিবর্ত্তনের যুগে হিন্দুসমাজ তাহার জন্য কি ব্যবস্থা করিতেছে তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। আমরা স্ত্রীজাতিকে অবলা বলিয়া থাকি। এই অবলা নারী এখন অনাদৃতা ও অসহায়া এবং পূর্ব্বেরই ন্যায় আত্মরক্ষায় অসমর্থা, বিপন্না, অর্থকরী শিক্ষায় বঞ্চিতা। মনে রাখিতে হইবে, পুরুষের ন্যায় তাহাদেরও দেহধর্ম্ম বলিয়া একটা জিনিস আছে। তাহাদিগকে আমরা স্বাবলম্বন শিক্ষা দিই না, সুতরাং তাহাদিগের ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করিতে পারে এবং তাহাদিগকে অপমানের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারে, এরূপ হিতৈষী বান্ধব চাই। বিপত্নীক পুরুষ পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়াও যেরূপ ধার্ম্মিক সজ্জন হইতে পারে, বিধবা নারী পত্যন্তর গ্রহণ করিয়াও সেরূপ হইতে পারে এবং হইয়া থাকে। তাহার জন্য আমরণ বৈধব্য ব্যবস্থার গুরুতর দায়িত্ব গ্রহণ করার যোগ্যতা ও অধিকার হিন্দু পুরুষের আছে কিনা তাহাও বিবেচ্য। বঙ্গীয় পুরুষজাতি স্বয়ং অসিদ্ধ থাকিয়া কি-প্রকারে নারীজাতিকে সাধন-পথে দীক্ষিত করিবেন—রোগী কি কখনও আর্ত্তের শুশ্রূষার ভার গ্রহণের যোগ্য? পুরুষজাতির জন্য যথেচ্ছা দারপরিগ্রহের দ্বার অবাধ ও উন্মুক্ত রাখিয়া কতক স্ত্রী-লোকের জন্য বিপরীত বিধি প্রণয়ন এক হিন্দু সমাজেরই বিশেষত্ব। যে হিন্দুবিধবা সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়জয়ে অক্ষম, পরাশরসংহিতা প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্রে তাহার জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা থাকিলেও, বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ তাহার জন্য ধর্ম্মান্তর গ্রহণ বা গণিকাবৃত্তি অবলম্বন ব্যতীত অন্যপথ উন্মুক্ত না রাখিয়া জাতীয় মঙ্গল বৃদ্ধি করিতেছেন কি না, তাহাও বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। জনবল জাতীয় অস্তিত্ব ও সভ্যতা-বিস্তারের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। বিধবাবিবাহ নিবারণ দ্বারা হিন্দু একদিকে স্বজাতিক্ষয়ের পথ প্রশস্ত করিতেছেন, অপরদিকে আদর্শের পবিত্রতা রক্ষা ব্যপদেশে সমাজে পাপস্রোত প্রবাহিত করিতেছেন। যদি সমাজের হিতকল্পে একনিষ্ঠ পুরুষ অপেক্ষা সতীরমণীর আদর্শ উচ্চতর রাখা আবশ্যক বিবেচিত হয়, তাহা হইলেও বলিতে হইবে, অধিকাংশ বিবাহিতা নারী ইন্দ্রিয়সংযম-বিষয়ে পুনর্ভূ

জ্ঞাপক মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, হিন্দু-ধর্ম্মানুরাগী স্থানীয় নেতাগণ তাহার উন্নতিকল্পে যত্নবান্ বলিয়া শুনা যায় না। মুসলমান মক্তবসমূহের সাহায্যে স্থানীয় মুসলমানগণ সমধিক যত্নশীল, উকীল-সাহেবের নিকট অবগত হইলাম। এরূপ নির্জ্জীব সমাজের অক্ষম আস্ফালনকে তেজস্বী সজীব মুসলমানসমাজ পরম উপেক্ষার চক্ষে দেখাই স্বাভাবিক, এবং পুনঃপুনঃ আঘাত ও অপমানে জর্জ্জরিত হইয়াও যে-জাতির মধ্যে প্রাণের স্পন্দন ও জাগরণের সাড়া অনুভূত হয় না, তাহার নির্লজ্জ আত্মম্ভরিতা ও ধর্ম্মগৌরব ঘোষণা ও বিধর্ম্মীর প্রতি ঘৃণা যে তাহাকে কঠোর জীবন-সংগ্রামে আত্ম-রক্ষায় কিছুতেই সক্ষম করিবে না, তাহা প্রমাণ করিবার পক্ষে লোক চক্ষুর অন্তরালে গ্রামে-গ্রামে যে সকল ঘটনা প্রত্যহ হিন্দু-জাতির বলক্ষয় করিতেছে, একটি ক্ষুদ্র মহকুমার আধুনিক ইতিহাস হইতে সঙ্কলিত তাহার উপরোদ্ধৃত কয়েকটি উদাহরণই যথেষ্ট মনে করি।

নারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর নৈতিক আসন দাবি করিতে পারেন, তাহার প্রমাণ নাই। বস্তুতঃ এক-হিসাবে সমগ্র নারীজাতি পূর্ণব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষিত হইয়া মানব-সমাজের বিলোপসাধন না করা পর্য্যন্ত সতীত্বের আদর্শ পূর্ণতালাভ করিতে পারে না। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের আদর্শ পূর্ণব্রহ্মচর্য্য নহে, তাহা যতই আধ্যাত্মিক হোক না কেন। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের পর গার্হস্থ্যাশ্রম, এবং গার্হস্থ্যাশ্রমের শ্রেষ্ঠত্ব-সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রে বহু উপদেশ আছে। পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা—যৌন প্রবৃত্তিকে নিয়মিত করিয়া সমাজহিতে নিয়োজিত করাই বিবাহসংস্কারের উদ্দেশ্য, যৌন প্রবৃত্তির সম্পূর্ণ বিলোপসাধন উহার উদ্দেশ্য নহে। গীতায় অর্জ্জুন সত্যই বলিয়াছেন, "চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ! প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ং। তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করং॥" যে অভ্যাস ও বৈরাগ্যদ্বারা এই মনোবিকারের নিগ্রহ হইতে পারে বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা কি কেবল বিধবাদের জন্য ব্যবস্থিত হইলেই সামাজিক পবিত্রতা রক্ষা হইবে? এসম্বন্ধে ভর্ত্তৃহীনা রমণীদের কি কিছুই বলিবার নাই, কেবল পুরুষজাতিই কি তাহাদের জন্য বিধিপ্রণয়নের অধিকারী থাকিবে? বস্তুতঃ প্রত্যেক স্ত্রীলোকেরই একবার বিবাহিত হইতে হইবে, এবং কোন স্ত্রী পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারিবে না, এই উভয় বিধি দ্বারাই মানবপ্রকৃতির প্রতি অত্যাচার করা হয়। একটি হারীত বচন হইতে জানা যায়, অতিপূর্ব্বে দুই শ্রেণীর স্ত্রীলোক ছিল, চির-কুমারী ব্রহ্মবাদিনী—যাঁহারা উপনীত হইয়া বেদাধ্যয়ন করিতেন, এবং সদ্যোবধূ,—যাঁহারা গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বন করিতেন। এখন সমাজে চির কৌমার্য্য লুপ্ত হইয়া গৌরীদানের ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে। বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হইলেই সকল বিধবা পুনরায় বিবাহ করিবে না, অন্যান্য দেশেও তাহা করে না। নারীজাতির স্বাভাবিক অপত্যস্নেহ সন্তানবতী রমণীকে সাধারণতঃ পত্যন্তর-গ্রহণে বিমুখ করিবে। যাহারা তাহা না করে, বুঝিতে হইবে যে তাহার পক্ষে দিধিষূ হওয়ার আবশ্যকতা আছে। গণিকাবৃত্তি অপেক্ষা তাহা অশেষ গুণে বরণীয়, পুনর্ভূ হওয়ার নিমিত্ত ধর্ম্মান্তর-গ্রহণ অপেক্ষা স্বধর্ম্মে নিয়ত থাকিয়া পত্যন্তর গ্রহণ হিন্দু-সমাজের হিতকামী মাত্রই শ্রেয় মনে করিবেন।

নিপীড়িতা বা ধর্ষিতা নারীর এবং বলপূর্ব্বক অন্যধর্ম্মে-দীক্ষিত পুরুষের হিন্দুসমাজে পুনর্গ্রহণ নিষিদ্ধ, এই রীতিটি সনাতন কি না, এখন তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। প্রাচীনকালে এসম্বন্ধে শাস্ত্রবিধি কি ছিল, তাহা নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি দ্বারা কথঞ্চিৎ প্রতিপন্ন হইবে।

> ন স্ত্রী দুষ্যতি জারেন ....
> বলাৎ পরোপভুক্তা বা চোরহস্তগতাঽপিবা। ......
> ন ত্যাজ্যা দূষিতা নারী, নাস্যাস্ত্যাগো বিধীয়তে।
> পুষ্পকালমপাস্যায় ঋতুকালেন শুধ্যতি॥
> স্ত্রিয়ঃ পবিত্রমতুলং, নৈতা দুষ্যতি কেনচিৎ।
> মাসি মাসি রজোহ্যাসাং দুষ্কৃতান্যপকর্ষতি॥
>
> অত্রি-স্মৃতি, ৫ম অধ্যায়।
>
> ব্যভিচারাৎ ঋতৌ শুদ্ধির্গর্ভে ত্যাগো বিধীয়তে।
>
> যাজ্ঞবল্ক্য, ১। ৭২
>
> (প্রায়শ্চিত্তবিধি)
> অথ সংবৎসরাদূর্দ্ধং ম্লেচ্ছৈর্নীতো যদা ভবেৎ।
> প্রায়শ্চিত্তে তু সংচীর্ণে গঙ্গা-স্নানেন শুধ্যতি॥
> বলাদ্দাসীকৃতা যে চ ম্লেচ্ছচণ্ডাল-দস্যুভিঃ।
> অশুভং কারিতা কর্ম্ম গবাদিপ্রাণিহিংসনম্।
> উচ্ছিষ্টমার্জ্জনং চৈব তথা তস্যৈব ভোজনম্।
> তৎস্ত্রীণাঞ্চ তথা সঙ্গং তাভিশ্চ সহভোজনম্।
> মাসোষিতে দ্বিজাতৌ তু প্রাজাপত্যং বিশোধনম্।
> ম্লেচ্ছান্নং ম্লেচ্ছসংস্পর্শো ম্লেচ্ছেন সহ সংস্থিতিঃ।
> বৎসরং বৎসরাদূর্দ্ধং ত্রিরাত্রেণ বিশুধ্যতি॥
> গৃহীতা স্ত্রী বলাদেব ম্লেচ্ছৈর্ব্বা স্বীকৃতা যদি।
> গুর্ব্বীন শুদ্ধিমাপ্নোতি, ত্রিরাত্রেণেতরা শুচিঃ। ইত্যাদি।
>
> দেবল-স্মৃতি।

কথিত আছে, খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে যখন মহম্মদ-বিন-কাশিম প্রথম সিন্ধুদেশ আক্রমণ করিয়া বহু হিন্দু-সন্তানকে বলপূর্ব্বক মুসলমান ও মুসলমানী করেন, তখন নব্বইটি শ্লোকে গ্রথিত দেবলস্মৃতি রচিত হয়। ইহার ফলে প্রায় তিন শতবৎসর পর মহম্মদ গজ্‌নি ধূমকেতুর ন্যায় ভারতগগনে উদিত হইয়া যখন হিন্দুর দেবালয় ও ধর্ম্ম-বিনাশে প্রবৃত্ত হন, তখন সিন্ধু-প্রদেশে মুসলমানের স্মৃতি-পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছিল। যদি হিন্দুসমাজ তখন একান্ত-

রক্ষণশীল থাকিত, তাহা হইলে তত দিনে সিন্ধুদেশ মুসলমান-প্লাবিত হইয়া যাইত সন্দেহ নাই। প্রাচীনপন্থী সমাজ-পণ্ডিতগণকে এই-প্রসঙ্গে আমি বলিতে চাই, অতিরক্ষণশীলতার ফল যে "বজ্র-আঁটুনি ফস্কা গেরো" হইয়া দাঁড়ায়, তাহার দৃষ্টান্ত আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, গোঁড়া হিন্দু-পরিবারের একাধিক ব্যক্তিকে আমি মুসলমান-ধর্ম্ম-গ্রহণ করিতে দেখিয়াছি। অন্ধবিশ্বাসের অতিরিক্ত কঠোরতাই ইহার হেতু বলিয়া মনে হয়। একদিন অনার্য্য শক, হুণ প্রভৃতি জাতি আর্য্যাবর্ত্তের পশ্চিমে, এবং প্রাচীন দ্রাবিড়-জাতি দাক্ষিণাত্যে সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। তাহারা ভারতবর্ষ হইতে পলায়ন করিয়াছে, ইতিহাস এরূপ সাক্ষ্য দেয় না। বিশাল হিন্দুজাতির গণ্ডীর মধ্যেই তাহারা আত্মবিলোপ করিয়াছিল। শঙ্করাচার্য্য ভারতের সুদূর পশ্চিম প্রান্তে (সম্ভবতঃ আফগানিস্থান-অন্তর্গত হিন্দুর তীর্থ হিংলাজ প্রদেশে) বহু অনার্য্যজাতিকে হিন্দু-ধর্ম্মে আনয়ন করিয়াছিলেন, এবং ভারতবাসী বৌদ্ধদিগকেও স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, এরূপ কথিত আছে। বক্তিয়ার খিলিজি বৌদ্ধ বিহারগুলির ধ্বংস সাধন করিয়া বঙ্গবিজয় করিলে, বহু বৌদ্ধ দেশপ্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া আত্মরক্ষা করে, ইহা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। বল্লাল সেন অনেক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীকে হিন্দু-সমাজে স্থানদান করেন, এইরূপ কিম্বদন্তীও আছে। মুসলমান-প্রাধান্যবশতঃ বঙ্গে যখন হিন্দুর সামাজিক বন্ধন-একান্ত শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল, "যবনীগমন", যবনান্ন-গ্রহণ এবং মুসলমান কর্ত্তৃক হিন্দুনারীর অপমর্ষণ যখন দৈনিক ঘটনায় পরিণত হইয়াছিল, তখন গুণের পরিবর্ত্তে দোষের সমতাদ্বারা মেলবন্ধন করিয়া দেবীবর ঘটক হিন্দু-সমাজকে রক্ষা করিয়াছিলেন। 'মেলমালা' 'গোষ্ঠীকথা', প্রভৃতি গ্রন্থে এই সামাজিক বিপ্লবের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার শিক্ষিত হিন্দুসমাজে গোমাংস ভক্ষণ কিরূপ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, রাজনারায়ণ বসুর "সেকাল ও একাল" গ্রন্থে তাহার উল্লেখ আছে। সকলেই জানেন, তখন বহু হিন্দু খৃষ্টান হইয়া যাইতেছিলেন। কেশব সেনের ব্রাহ্মধর্ম্ম তখন হিন্দুসমাজের কি মহদুপকার সাধন করিয়াছিল, রামতনু লাহিড়ীর জীবনচরিত-লেখক Sir Roper Lethbridge-এর নিম্নোদ্ধৃত উক্তিটিতে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে:—"When many a Hindu mind was cleared of the superstitions of ages, and prepared to receive the seed of the Gospel, in came Keshab, dispossessed the Christian missionary of the soil he had fitted for cultivation, and used it for his own purposes" অর্থাৎ যখন বহু হিন্দুর মন যুগযুগান্তরের কুসংস্কার মুক্ত করিয়া খৃষ্টধর্ম্মের বীজবপনের উপযোগী করা হইয়াছিল, তখন কেশব আসিয়া তাহাদের কর্ষিত ক্ষেত্র হইতে খৃষ্টীয় প্রচারকদিগকে বিতাড়িত করিয়া তাহা নিজকার্য্যসাধনে প্রয়োগ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ "আপদ্ধর্ম্ম" হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রেরই একটি বিশেষ অঙ্গ, বিপৎকালে সাধারণবিধি প্রযুজ্য নহে, তজ্জন্য বিশেষবিধি আবশ্যক, এই নীতি হইতে উহার সৃষ্টি। Protection through imitation, অনুকরণ দ্বারা আত্মরক্ষা, ইহা বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতারও একটি বিশেষ নীতি। আপদ্ধর্ম্মের বিধি-অনুসারেই প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রবক্তাগণ ধর্ষিতা স্ত্রীর পুনর্গ্রহণ অনুমোদন করিয়াছেন, কেবল গর্ভিণী নারীর পরিবর্জ্জন ব্যবস্থিত হইয়াছে। ইউরোপে বিগত মহাসমরে ঠিক এইরূপ যৌন সমস্যার উদ্ভব হইয়াছিল। তখন পাশ্চাত্যজাতিসমূহ গর্ভিণী রমণীদিগকেও বর্জ্জন করেন নাই, war-baby অর্থাৎ "সামরিক শিশু" আখ্যায় অভিহিত করিয়া, তাহাদের সন্তানদিগকে জারজের দুরপনেয় কলঙ্ক হইতে মুক্তি দিয়া ব্যবস্থাপক সভায় আইনপ্রণয়নপূর্ব্বক বৈধ সন্তানরূপে সমাজে গ্রহণ করিয়াছেন। মহাভারতে দেখা যায়, কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে ভারত যখন নিঃক্ষত্রিয় হইয়াছিল, তখন ব্রাহ্মণজাতি কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়াণীর ঔরসে ক্ষত্রিয়-জাতির পুনরভ্যুদয় ঘটিয়াছিল। অতএব যতদিন হিন্দুসমাজ সজীব ছিল, ততদিন আপৎকালের যথাযোগ্য ব্যবস্থাও ছিল, এখন তাহার স্মৃতি-পর্য্যন্ত লোপ পাইতে বসিয়াছে। কেবল উত্তর-পশ্চিম ভারতে আর্য্যসমাজ "শুদ্ধি"-প্রথা দ্বারা হিন্দুজাতিকে কথঞ্চিৎ আত্মরক্ষায় সক্ষম রাখিয়াছেন, বঙ্গদেশে উহার একান্ত আবশ্যকতা-সত্ত্বেও উক্ত অনুষ্ঠান এদেশে এ-পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই।

আপনারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, আমি হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজকে সমানার্থকরূপে ব্যবহার করিয়াছি। তাহার কারণ এই যে, হিন্দুধর্ম্মের কোন নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ বা মতবাদ বা সংজ্ঞা নাই। কাহারও-কাহারও মতে জাতিভেদ মানিয়া চলা, গোমাংস ভক্ষণ না করা, ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য স্বীকার করা, এবং বেদের অপৌরুষেয়ত্বে বিশ্বাস প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের এই চতুর্ব্বিধ লক্ষণ। কিন্তু ডাক্তার গৌড়ের নূতন আইন-অনুসারে অসবর্ণ বিবাহ করিয়াও নিজকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেওয়া চলে, বিলাত-প্রত্যাগত হিন্দুগণ, যাহারা এখন অনেকস্থলে সমাজে গৃহীত হইতেছেন, গোমাংস ভক্ষণ-সম্বন্ধে বৈদিক রীতি অবলম্বন করিতে দ্বিধা করেন না, দাক্ষিণাত্যের অব্রাহ্মণগণ হিন্দুধর্ম্ম মানিয়াও সমাজে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য মানিতে অসম্মত, এবং বেদ-সম্বন্ধে অধিকাংশ ইংরেজী-শিক্ষিত হিন্দুই আস্থা-বিহীন ও তাহার অভ্রান্তত্ব স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। সুতরাং ইহার কোন-একটি লক্ষণই প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের বিশিষ্ট লক্ষণ নহে। ইহা দেখিয়া কোন-কোন চিন্তাশীল পণ্ডিত বলেন যে, হিন্দুধর্ম্ম সামাজিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ কোন দেশে বা কালে অধিকাংশ হিন্দুর মধ্যে যে সামাজিক বিধিব্যবস্থা প্রচলিত, তাহাই সে-দেশের বা সে-কালের হিন্দুধর্ম্ম। হিন্দুধর্ম্মের এই বিশেষত্ব যদিও তাহাকে ইস্‌লামধর্ম্মের ন্যায় মতের ঐক্য-জনিত একটি দৃঢ়-সম্বদ্ধ শক্তিতে পরিণত হইতে দেয় নাই, তথাপি তাহার সময়োপযোগী পরিবর্ত্তনশীলতা তাহাকে অন্যান্য ধর্ম্মের সহিত জীবনসংগ্রামে টিকিয়া থাকিবার ক্ষমতা দিয়াছে। তাহারই ফলে অতিপ্রাচীন আসিরীয়া, মিশর ও বাবিলন, এবং প্রাচীন গ্রীক ও রোমক সভ্যতা লুপ্ত হইয়া গেলেও, সুপ্রাচীন ভারতীয় আর্য্যজাতি আজিও তাহার বিশিষ্ট সভ্যতা ও ঐতিহ্য লইয়া জগৎসমক্ষে সগর্ব্বে তাহার অস্তিত্বজ্ঞাপন করিতেছে। কাল তাহার সেই গৌরবজ্যোতি অনেকটা পরিম্লান করিয়াছে সত্য, কিন্তু পুনরায় পূর্ব্বাকাশে উষার অরুণরাগের সঞ্চার হইয়াছে, আবার ভারতের সভ্যতার ধারা যুগব্যাপী জড়তা ত্যাগ করিয়া উন্নতির মার্গে প্রবাহিত হইবে তাহার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, বর্ত্তমানযুগেও সময়োপযোগী পরিবর্ত্তন-সাধনদ্বারা হিন্দুধর্ম্মের এই টিকিয়া থাকিবার শক্তির পরীক্ষা হইবে, এবং এই পরীক্ষায় সে বিজয়ী হইয়া তাহার 'সনাতন' নামের সার্থকতা সম্পাদন করিবে।

সকলেই জানেন, আচারকাণ্ড প্রত্যেক ধর্ম্মেরই একটি প্রধান অঙ্গ। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মে উহা যত বড় স্থান পাইয়াছে, পৃথিবীর আর কোন ধর্ম্মে এত নহে। এই আচারকাণ্ড লইয়াই স্মৃতিশাস্ত্রসমূহ রচিত। সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়, ধর্ম্মমত মানুষকে তত পৃথক্ করে না, আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি ধর্ম্মের বহিরঙ্গ যতটা করিয়া থাকে। এইজন্য ধর্ম্মের আনুষ্ঠানিক বিভাগটি যত স্থিতিস্থাপক হয়, ততই সমাজের পক্ষে কল্যাণজনক। নারদ বলেন, 'ব্যবহারো হি বলবান্,' এবং ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ সকলেই আমাদিগকে পিতৃপিতামহ-প্রদর্শিত সন্মার্গ অবলম্বন করিয়া চলিতে উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু ব্যবহারজীবী মাত্রই জানেন যে, বৌধায়ন আপস্তম্ব নারদ হইতে আরম্ভ করিয়া মেধাতিথি জীমূতবাহন কুল্লুকভট্ট পর্য্যন্ত হিন্দুর ব্যবহারশাস্ত্রে বহুপরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। যেমন হিন্দুদর্শনে নাস্তিক্য হইতে বহুদেব-বাদ পর্য্যন্ত সর্ব্ববিধ ধর্ম্মমতের স্থান আছে, সেইরূপ স্মৃতিকারদের সম্বন্ধেও বলা যায়, 'নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং'। ইহা হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ মানুষ বিচার-বুদ্ধি-বিশিষ্ট জীব, সুতরাং কোন দুই-ব্যক্তির মতই সর্ব্বথা এক হইতে পারে না। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, 'স্মৃত্যোর্বিরোধে ন্যায়স্তু বলবান্ ব্যবহারতঃ', এবং বৃহস্পতি বলিয়াছেন, 'কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ। যুক্তিহীনে বিচারেতু ধর্ম্মহানি প্রজায়তেঃ॥' সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, আচার-ক্ষেত্রেও তাঁহারা ন্যায় ও যুক্তির প্রাধান্য স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। জৈমিনি আচারকাণ্ডকে জ্ঞানকাণ্ডের উপরে স্থান দিলেও তাঁহার সূত্রগুলিতে পরস্পরবিরোধী বৈদিক বিধিসমূহের মীমাংসাকল্পে যেসকল নিয়ম রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে এমন-সব যুক্তির আশ্রয় লইতে হইয়াছে, যে তাহা অনেক সময় নিতান্ত আধুনিক বলিয়া মনে হয়। আবার ধর্ম্মসূত্রসমূহের সহিত ভাষ্যকারদিগের তুলনামূলক সমালোচনা করিলে দেখা যাইবে, তাঁহাদের কুশাগ্রধী অলক্ষ্যে

হিন্দুসমাজে অবস্থানুযায়ী নবনব ব্যবস্থা অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছে। প্রাচীন গৃহ্যসূত্র ও ধর্ম্মসূত্র প্রণেতাগণের গ্রন্থপাঠে জানা যায়, পুরাকালে অনুলোম ও প্রতিলোম উভয়বিধ বিবাহ প্রচলিত ছিল, অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেও অনুলোম বিবাহ বিধিসিদ্ধ ছিল, এবং মেধাতিথি, মিতাক্ষরা, স্মৃতিচন্দ্রিকা, বিবাদরত্নাকর, মাধবীয়, সরস্বতী-বিলাস, মদনপারিজাত, কুল্লুকভট্ট, এমন-কি দায়ভাগ পর্য্যন্ত কোন ভাষ্য বা ভাষ্যকারই ঐরূপ বিবাহকে অসিদ্ধ বলেন নাই। বিজ্ঞানেশ্বরের কালেও মধ্যে-মধ্যে ঐরূপ বিবাহ হইত বলিয়া তিনি লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ক্রমে দেশাচারই প্রবল হইয়া উঠিল, হিন্দুরাজশক্তির অভাবে হিন্দুর ব্যবহারশাস্ত্রের ক্রমবিকাশ রুদ্ধ হইয়া গেল, 'বচন শতেনাপি বস্তুনোঽন্যথাকরণাশক্তেঃ' জীমূতবাহন এই Factum Valetএর নীতিদ্বারা যৌথ পরিবারে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিলেও ঐ নীতির অপপ্রয়োগদ্বারাই প্রাচীনযুগের উদার ব্যবস্থাগুলির খর্ব্বতাসাধন করা হইল, এবং ক্রমে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আক্ষেপ সত্য হইয়া উঠিল যে, হিন্দু শাস্ত্রানুশাসন মানে না, দেশাচারের নিকট সে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়াছে। সুতরাং আমরা চাই নবযুগে নূতনসংহিতা। রঘুনন্দনের সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের স্মৃতিকারগণের বংশ লোপ হয় নাই, প্রিভি কৌন্সিল ও হাইকোর্টের বিচারপতিগণ সেই স্থান অধিকার করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা গৌণভাবে নিতান্ত অসম্পূর্ণরূপে ভয়ে-ভয়ে যে-পরিবর্ত্তন সাধন করিবেন, আমরা তাহা নির্দ্দোষ ও সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দররূপে ব্যবস্থাপক সভায় বিধিবদ্ধ করিয়া লইয়া সমাজে প্রচলিত করিব। হিন্দুজাতির আত্মরক্ষার নিমিত্ত ইহা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। বড়োদারাজ্যে এরূপ আইন-সঙ্কলনকার্য্য বহুকাল আবদ্ধ হইয়াছে, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় ডাক্তার গৌড়ও এই কার্য্যে কিয়ৎ-পরিমাণে ব্রতী হইয়াছেন। আক্ষেপের বিষয়, আইন-ব্যবসায়ী শিক্ষিত হিন্দুগণের নিকট তিনি আশানুরূপ সাহায্য পাইতেছেন না।

বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা লর্ড্ রনাল্ড্‌শে তাঁহার নব-রচিত গ্রন্থে লিখিয়াছেন, ভারতবর্ষে যে-দুটি বিশাল জাতি পাশাপাশি বাস করে, তাহাদের লইয়া 'নেশন' গড়িয়া উঠিবার প্রধান অন্তরায় এই যে, তাহাদের একটির সহিত আর-একটির কোন আত্মীয়তার বন্ধন নাই, যেহেতু বৈবাহিক আদানপ্রদান-সম্বন্ধে হিন্দুধর্ম্ম একান্ত বিমুখ। যদিও কাফেরের নিকট কন্যাদানে মুসলমান-সমাজও কম বিমুখ নহে, তথাপি ভারতে এই দুই প্রধান ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে যে কোন বৈধশোণিতসম্পর্ক স্থাপিত হইতে পারে না, ইহা ভিন্ন-দেশীয় পর্য্যটক মাত্রেরই নিতান্ত অদ্ভুত বলিয়া মনে হইবে, এবং ইহা যে ভারতে একজাতিগঠনের প্রধান বিঘ্ন, তাহা বিচক্ষণ রাজপুরুষের দৃষ্টি এড়াইতে পারিবে না। অসবর্ণ বিবাহের প্রচলন দ্বারা হিন্দুজাতির মধ্যে যথেষ্ট রক্তসংমিশ্রণ ঘটিয়াছে বলিয়াই বর্ণ-সাঙ্কর্য্য সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রে অনেক নিন্দাবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ 'অমিশ্রজাতি'আকাশকুসুমেরই ন্যায় অলীক কল্পনা-মাত্র। এখনও কোন-কোন হিন্দুরাজার অন্তঃপুরিকাগণের মধ্যে মুসলমান মহিলা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের সন্তান রাজান্তঃপুরে জন্মগ্রহণ করিলে হিন্দু বলিয়া পরিগণিত হয়। কোন-কোন জীবিত হিন্দু নরপতির মাতার পরিচয় লইলে নাকি মুসলমান নামের সাক্ষাৎলাভ করা যায়। সেদিনও 'ভরার মেয়ে' বঙ্গীয় কুলীন ব্রাহ্মণের কুল অলঙ্কৃত করিয়াছে, এবং 'জল'কে 'পানি' এবং প্রদীপকে 'চেরাগ' বলিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে বাধ্য হই-হইয়াছে, কিন্তু তজ্জন্য হিন্দুসমাজ হইতে বিতাড়িত হয় নাই। মুসলমান-প্রাধান্যের যুগে হিন্দুসমাজে কত মুসলমান সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? যদিও মিশ্রগ্রন্থে ও ঘটক-কারিকায় তাহার কতক পরিচয় পাওয়া যায়, এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে 'পাঠান বৈষ্ণব'-গণের প্রসঙ্গ দেখিতে পাই, তথাপি আভিজাত্যগর্ব্বিত ইতিহাস রচনা-বিমুখ হিন্দুসমাজ এসকল ঘটনা যথাসাধ্য গোপন করিয়াই গিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। বিশুদ্ধ শোণিতের স্পর্দ্ধা পৃথিবীর কোনজাতিই করিতে পারে না, হিন্দুজাতিও নহে। বাংলার সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণের উৎপত্তি ও বিলোপের খাঁটি ইতিহাস উদ্ধার করিতে পারিলে এ-বিষয়ে অনেক নূতন তথ্য জানা যাইত। কান্যকুব্জাগত পঞ্চব্রাহ্মণ হইতেই বা কিরূপে বঙ্গে ব্রাহ্মণবংশের এত বিস্তৃতি হইল, ইহাও বিবেচ্য। মুসলমান-জাতির

সহিত ঔদ্বাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে তাহাতে অগৌরবের কিছুই নাই, যদি উভয় পক্ষে আদানপ্রদান চলে। "শুদ্ধি" অনুষ্ঠান দ্বারা যাহাদিগকে হিন্দু করা হইতেছে, তাহাদের বিবাহ হিন্দুসমাজেই চলিবে। হিন্দু যেমন ইস্‌লাম ধর্ম্মগ্রহণ করিয়া মুসলমান সমাজের সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়, মুসলমান সেইরূপ স্বেচ্ছায় হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দুসমাজের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইলে ক্ষতি কি? স্ব-স্ব ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া বিবাহক্ষেত্রে মিলিত হইবার বাধাই বা কেন থাকিবে? হিন্দু-গৌরব রাজপুত ললনাগণ স্বধর্ম্ম রক্ষা করিয়াই ত মোগল সম্রাট্‌গণের জননী হইয়াছিলেন। বিভিন্ন খৃষ্টীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্মস্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া সর্ব্বদা এইরূপ বৈবাহিক আদানপ্রদান চলিয়া থাকে। অবশ্য এরূপ যৌন-মিলন কোন দেশেই খুব বেশী হয় না, কিন্তু ইহা হিন্দুর পক্ষে একান্ত নিষিদ্ধ না হইলে উভয়-ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে ধর্ম্মগত বিদ্বেষ অনেকটা প্রশমিত হইত, এবং ভারতীয় 'নেশন'-গঠন অপেক্ষাকৃত সুকর হইত। ক্রমাগত এক পক্ষের ক্ষয়বশতঃ হিন্দুজাতির যে সংখ্যা হ্রাস ও শক্তিলোপ হইতেছে, তাহাও নিবারিত হইত।

কেহ-কেহ মনে করিবেন, এরূপ হিন্দুজাতি থাকিয়া ফল কি? যদি খোল ও নল্‌চে উভয়ই বদ্‌লাইতে হয়, তবে হিন্দুর হিন্দুত্বের কি অবশিষ্ট থাকিবে? কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হিন্দু ধর্ম্ম বলিতে অধিকাংশ হিন্দুর ধর্ম্মমত ও আচরণ বুঝায়। খৃষ্টান ও মুসলমান উভয়েরই নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম-বিশ্বাস (creed) আছে, হিন্দুর তাহা নাই; বৌদ্ধ ও হিন্দুর জাতিগত সাদৃশ্য না থাকিলেও ধর্ম্ম ও দর্শনগত সাদৃশ্য আছে। হিন্দুর এই মতাগত স্বাধীনতা উদারতা এবং তাহার অন্তর্ম্মুখী সভ্যতাই হিন্দুধর্ম্মের বিশেষত্ব রক্ষা করিবে। জাতীয় ঐক্যের তিনটি প্রধান উপাদান ধর্ম্ম, আচার ও বংশ (race)। অধিকাংশ ভারতীয় হিন্দুমুসলমানের বংশগত ঐক্য আছে, কিন্তু বৈবাহিক বিনিময়ের অভাব-প্রযুক্ত জাতীয় মিলনের পক্ষে তাহা প্রবল নহে। অতএব উহাদের মধ্যে বৈবাহিক আদানপ্রদান স্থাপন করিতে হইবে। আচারগত পার্থক্য বিভেদ-রচনার সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল। স্ব-স্ব অযৌক্তিক অনুষ্ঠানগুলি বর্জ্জন করিয়া উভয় ধর্ম্মাবলম্বীকে আচার-ক্ষেত্রে মিলিত হইতে হইবে। তখন হিন্দুর ধর্ম্মমতের উদারতা ও আধ্যাত্মিক সভ্যতাই তাহার বিশিষ্টতা রক্ষা করিবে, এবং সেই বিশিষ্টতাই তাহার ধর্ম্মস্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিবার পক্ষে যথেষ্ট হইবে, কিন্তু জাতীয়তা-গঠনের পরিপন্থী হইবে না। খৃষ্টধর্ম্মের বিভিন্ন শাখাসমূহের মধ্যে পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বেও রক্তগঙ্গা প্রবাহিত হইত, কিন্তু এখন ধর্ম্মস্বাতন্ত্র্যের অস্তিত্ব-সত্ত্বেও উহা তাহাদের মধ্যে কোন বিরোধসৃষ্টি করে না, বিভিন্ন race এর মধ্যে বৈবাহিক আদানপ্রদান চলে, এবং সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান-সম্বন্ধে সমগ্র পাশ্চাত্য জগৎ সম্পূর্ণ একত্ব লাভ করিয়াছে। আমাদিগকেও হিন্দুধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া সামাজিক ও বৈবাহিক ক্ষেত্রে অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীর সহিত এক হইতে হইবে।

কিন্তু এই আশা ফলবতী হইতে বহুবিলম্ব আছে। বর্ত্তমানে এই আশা শশবিষাণবৎ স্বপ্নের বিষয়মাত্র। প্রতি-পক্ষ বলিতে পারেন, হিন্দুধর্ম্মের স্বাতন্ত্র্যরক্ষার এমন কি প্রয়োজন আছে? হিন্দুজাতি বিলুপ্ত হইয়া অন্য কোন জাতিতে পরিণত হইলে দোষ কি? অবশ্য যেসকল হিন্দু ইস্‌লাম কিম্বা খৃষ্টধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠতর মনে করিয়া তাহা অবলম্বন করেন, তাঁহাদের বিরুদ্ধে আমাদের বলিবার কিছুই নাই। ধর্ম্মসম্বন্ধে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আছে, কারণ উহাই মানুষের পরম পরমার্থ। যদিও অধিকাংশ লোকের ধর্ম্ম জন্মগত, তথাপি প্রত্যেক ধর্ম্মের এমন কতকগুলি গুণ আছে, যাহা সেই ধর্ম্মকে তাহার অনুচরদিগের নিকট প্রিয়তম করিয়াছে। সেইসকল গুণদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া কোন হিন্দু উক্ত ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে চাহিলে অন্য কোন প্রকৃত হিন্দু তাহার বিপক্ষাচরণ করিবে না। কোন মুসলমান বা খৃষ্টান ঐরূপ হিন্দুধর্ম্মের গুণে মুগ্ধ হইয়া হিন্দু হইতে চাহিলে অপর কোন প্রকৃত মুসলমান বা খৃষ্টানের তাহাতে আপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু আমরা পূর্ব্বে ধর্ম্মান্তর গ্রহণের যে-সকল কারণের উল্লেখ করিয়াছি, ধর্ম্মবিশ্বাসের পরিবর্ত্তন তাহাদের অন্তর্গত নহে। সমগ্র মানবজাতি যখন ধর্ম্মস্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দিয়া, স্ব-স্ব ধর্ম্মের বিশেষত্বের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া, বিশ্বহিত ও বিশ্বপ্রেমের মহান্ ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া হাতধরাধরি করিয়া

সভ্যতার উচ্চ হইতে উচ্চতর গ্রামে আরোহণ করিবার জন্য সচেষ্ট হইবে, তখন হিন্দুধর্ম্ম বা হিন্দু-জাতিরও কোন আবশ্যকতা থাকিবে না, এবং তখন 'হিন্দু', 'মুসলমান', 'বৌদ্ধ', 'খৃষ্টান' প্রভৃতি ধর্ম্মস্বাতন্ত্র্য-বোধক নামগুলিও লুপ্ত হইয়া যাইবে। কিন্তু যতদিন সেই মহামানবের উদার মৈত্রীর যুগ না আসিতেছে, ততদিন পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম্মের ন্যায় হিন্দুধর্ম্মেরও প্রয়োজন আছে, এবং সেই হিন্দুধর্ম্মের গোপ্তা ও ব্যাখ্যাতাস্বরূপ হিন্দুজাতিরও আবশ্যকতা আছে। ধর্ম্মজগতে বৈচিত্র্য ও বৈষম্য কৌতুহল উদ্রিক্ত করিয়া ধর্ম্মোন্নতির সহায়তা করে, যদি তাহা অত্যন্ত তীব্র হইয়া বিদ্বেষ জন্মাইয়া সহানুভূতির বীজ অঙ্কুরেই বিনষ্ট করিয়া না দেয়। যেহেতু আমি মনে করি যে,ভারতের এই প্রাচীন আর্য্যজাতি, যাহার বংশধরগণ এখন হিন্দুনামে পরিচিত, আদিযুগে জগৎকে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করিয়াছে, তাহাকে শ্রেয় ও প্রেয়ে প্রভেদ শিক্ষা দিয়াছে, পরা ও অপরাবিদ্যায় দীক্ষিত করিয়াছে, সংযম ও ত্যাগের মহিমা প্রচার করিয়াছে; তাহার সেই শিক্ষাদীক্ষা সাধনা এখনও পূর্ণ হয় নাই, এখনও জগৎকে তাহার অনেক দেয় আছে, যেমন অনেক বিষয়ে বর্ত্তমানে অধিকতর উন্নত শিষ্যস্থানীয় জাতিসমূহের নিকট তাহার অনেক শিক্ষণীয়ও আছে; আবার পাশ্চাত্য জাতিসমূহের মহাসমরপ্রসূত নৈতিক অবনতির এই দুর্দ্দিনে হিন্দুজাতির বিশিষ্ট দান তাহাদের পক্ষে যেমন আবশ্যক, পূর্ণমানবতা-বিকাশের জন্য ভারতীয় অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের পক্ষেও সেইরূপ আবশ্যক; পক্ষান্তরে তাঁহাদের সাম্য, মৈত্রী, ঐক্য, মানবহিতব্রত প্রভৃতি অনেক সদ্‌গুণ হিন্দুজাতির মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইলে তবেই হিন্দু ভারতে পূর্ণমানবতা-বিকাশে সহায়তা করিতে পারিবে;—এই-সকল কারণবশতই আমার দৃঢ় বিশ্বাস হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু-জাতির বিলোপের এখনও সময় হয় নাই, বিশ্বোন্নতির জন্য এবং নিজের আধ্যাত্মিক বিকাশের জন্য হিন্দুর ধর্ম্মগত বিশিষ্টতা রক্ষার আবশ্যকতা আছে। জেনেভা নগরের রাষ্ট্রমহামণ্ডলে (League of Nations) ভারতীয় প্রতিনিধি সার মহম্মদ রফিক্ সেদিন বিশ্বসভ্যতাক্ষেত্রে ভারতের দানপ্রসঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের এই বিশেষত্বের উল্লেখ করিয়াছিলেন। হিন্দুর স্বধর্ম্মকে সর্ব্ববিধ উপায়ে উন্নত ও সময়োপযোগী ও আত্মরক্ষার অনুকূল করিয়া লইয়া তাহার শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক আদর্শগুলিকে জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া বিশ্বসভ্যতার এক নূতন অধ্যায় উদ্ঘাটিত করিতে হইবে। ইহাই হিন্দুর 'মিশন', ইহাই তাহার কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্যসাধনের জন্য ক্ষুদ্রহৃদয়দৌর্ব্বল্য ত্যাগ করিয়া একদিকে তাহার লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান ও সামাজিক ব্যবস্থা-গুলিকে সংস্কৃত ও সার্ব্বভৌমিক আদর্শে গঠিত করিয়া জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলকে সমভাবে ক্রোড়ে স্থান দিতে হইবে, অন্যদিকে তাহার বিশেষ-বিশেষ উচ্চভাবগুলিকে জগৎসমক্ষে প্রচার ও জাতীয় জীবনে প্রতিফলিত করিয়া সাফল্যের মহিমায় মণ্ডিত করিতে হইবে। তাহার পর যখন সর্ব্বজাতিসমন্বয়ের, Parliament of Man এবং Federation of the Worldএর দিন আসিবে, তখন হিন্দু তাহার কর্ত্তব্য সমাপন করিয়া বিশ্বহিত-যজ্ঞে অন্যান্য জাতির সহিত মিলিত হইয়া তাহার ধর্ম্মস্বাতন্ত্র্যকে আহুতি দিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিবে না।

—জনৈক হিন্দু

ঝড়

শিল্পাচার্য্য শ্রী নন্দলাল বসু

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]
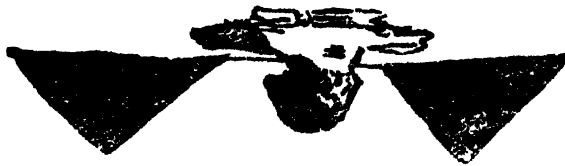
বৰ্ত্তমান রুশ-সাহিত্য

শ্রী বুদ্ধদেব বসু

দেশের সঙ্গে দেশের এবং জাতির সঙ্গে জাতির যে মৈত্রী এবং প্রীতির সুমধুর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তা অনেকটা সাহিত্যের মধ্য দিয়েই। সেইজন্তেই, বিদেশের সাহিত্য-সম্বন্ধে আমাদের যথা-সম্ভব জ্ঞানলাভ করা দরকার।

য়ুরোপের সাহিত্যের মধ্যে ইংরেজী ও ফরাসী হচ্চে সব চাইতে প্রাচীন এবং সম্পৎশালী। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে অন্য কোনো সাহিত্যকেই তুচ্ছ কি নগণ্য ব'লে অবহেলা করা চলে না। বেলজিয়ান সাহিত্যিকদের মধ্যে মরিস্ মেটারলিঙ্ক্ ও জার্ম্মান সহিত্যিকদের মধ্যে হারমান্ জুডারম্যান্ এই তিনটি নামই সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। মেটারলিঙ্ক্‌কে কেবলমাত্র সাহিত্যিক বল্‌লে তাঁকে অনেক ছোটো করা হয়। য়ুরোপ আজ তাঁকে ঋষির স্থান দিয়েচে। ধর্ম্ম এবং নীতি বিষয়ে তাঁর মতামত যুগান্তর এনেচে বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না; আজকের দিনে তাঁর 'শিষ্যের' সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। তাঁর 'Blue Bird' তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তা'র পর নরোয়ে, স্পেন্—এদেরও ঠেল্‌বার জো নেই। সাহিত্য-বিষয়ে নরোয়ে খুবই কৃতিত্ব দেখিয়েছে, বল্‌তে হবে। এ-পর্য্যন্ত দু'জন নরোয়েজিয়ান্ সাহিত্যে নোবেল্ প্রাইজ পেয়েচেন—ক্নুট হাম্‌সন্ (Knut Hamsun) এবং জোহান্ বোয়ার্ (Johan Bojer)। নরোয়ের মতন ক্ষুদ্র দেশের পক্ষে এ অতি গৌরবের বিষয় বল্‌তে হবে। স্পেন্‌ও এ-বিষয়ে খুব পিছনে প'ড়ে নেই। স্পেনের নাট্যকার বেনাভাৎ সান্তো (Benavente) নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন।

কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে সবচেয়ে অগ্রণী হচ্চে রুশিয়া—অবশ্য ইংলণ্ড আর ফ্রান্স বাদে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর আগে রুশ-সাহিত্য ব'লে কোনো-একটা কথা ছিল না। এই সোয়া-শো বছরের মধ্যে রুশিয়াতে যত সাহিত্য-রথী জন্মেচেন, তুলনা ক'রে দেখ্‌তে গেলে, তা ইংলণ্ডের চাইতে ঢের বেশী। আর, রুশ-সাহিত্যের মধ্যে যেমন একটা গতি আছে, প্রাণ আছে, আবেগ আছে, যা পৃথিবীর অন্য কোনো সাহিত্যেই বোধ হয় নেই। রুশিয়া প্রতীচ্যের দেশ হ'লেও প্রাচ্যের সঙ্গে তার প্রাণের যোগ আছে। প্রাচ্যের প্রভাব রুশ-সাহিত্যের উপর যেমন পড়েচে, তেমন আর কোনো সাহিত্যেই পড়েনি। রুশিয়ার শিক্ষা এবং সভ্যতা, কর্ম্ম এবং সাধনার সঙ্গে ভারতবর্ষ বিশেষতঃ, বাঙলার অনেকটা মিল আছে। সেইজন্তই বোধ হয়, রুশ সাহিত্যের দিকে আমাদের মনোযোগ একটু আকর্ষিত হয়েচে।

১৯০৫ সাল থেকেই রুশ বিপ্লবের সূত্রপাত। সেই দারুণ বিশৃঙ্খলা, নিষ্ঠুর উৎপীড়ন ও রক্তের স্রোতের মধ্যে রুশিয়ার সাহিত্য সেই যে মিলিয়ে গিয়েছিল, আজ পর্য্যন্তও সে পুনর্জীবন লাভ কর্‌তে পারেনি। রুশিয়ার শ্রেষ্ঠতম জীবিত সাহিত্যিক হচ্চেন ম্যাক্সিম্ গোর্কি; কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে যেমন এ-যুগের বলা যায় না, তাঁকেও তেমন সোভিয়েট্ আমলের বল্‌তে পারিনে। তাঁর প্রতিভা এর পূর্ব্বেই বিকশিত হয়েছিল; তাঁর সবচেয়ে নামজাদা বইগুলো এর আগেকার লেখা। টল্‌ষ্টয় খুব দীর্ঘজীবী ছিলেন—তিনি মারা যান্ ১৯১০ খৃষ্টাব্দে—কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে তিনি কোনো বিখ্যাত বই লেখেননি; কাজেই তাঁকেও বাদ দেওয়া চলে। আধুনিক লেখকদের মধ্যে চেখভ্ অন্যতম—কিন্তু ১৯০৪ সালেই তাঁর মৃত্যু হয়; কাজেই, আধুনিক বল্‌তে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ অংশ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম অংশের লেখকদের বুঝ্‌তে হবে।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ডষ্টয়েভস্কি মারা যান। দু'বছর পর, তুর্গেনিয়েভ্ তাঁকে অনুসরণ করেন। এই দুই সাহিত্য-রথীর অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে-সঙ্গেই রুশ-সাহিত্যের প্রবল জোয়ারে যেন একটু ভাঁটা প'ড়ে এল। সে-সময়ে তা'র গতি একেবারে থেমে গিয়েছিল বল্‌লেও অত্যুক্তি হবে না। এই অবস্থার পরিসমাপ্তি হয় ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে যখন রুশ-জাপানের সংঘর্ষ বাধে। কিন্তু এই যুগে যে-সব লেখক জন্মেছিলেন, তাঁদের প্রতিভা কারো চেয়ে কম, এ-কথা মনে কর্‌লে ভয়ানক ভুল করা হবে।

এ যুগের খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের হাতে গুণে' নাম করা যায়—চেখ্‌ভ (Chekov), গার্‌সিন্ (Garshin), করোলেন্‌কো (Karolenko) এবং সব-শেষে ম্যাক্সিম্ গোর্কি (Maxim Gorki)। আর-এক জনের নাম Merezhkovsky (বাঙলা হরফে এর নাম লেখা অসম্ভব)। তবে তাঁর লিখ্‌বার বিষয় এবং ধরণ সম্পূর্ণ নতুন-রকমের—এ'দের মধ্যেও আবার শ্রেষ্ঠতম হচ্চেন—গোর্কি এবং চেখভ।

অনেকের মতে, চেখভ হচ্চেন এক জন উঁচুদরের খাঁটি আর্টিষ্ট; আবার কারো-কারো কাছে তাঁর মূল্য একেবারেই কিছু না। তাঁর বিশেষত্বই হচ্চে এইখানে যে, হয় তাঁকে খুব বড় ব'লে মান্‌তে হবে, নয় তাঁকে নিতান্তই বাজে ব'লে অবজ্ঞা কর্‌তে হবে—এ-দুয়ের মাঝখানে তাঁর কোনো স্থান নেই।

চেখভ্‌কে ঔপন্যাসিক না ব'লে নাট্যকার বলাই ভালো। তাঁর স্বল্প পরিসর জীবনের অধিকাংশই স্বদেশের বাইরে ক্রিমিয়াতে Yalta নামক স্থানে একাকী কাটাতে হয়েছিল। তাঁর দুরারোগ্য রোগ ছিল; ডাক্তারদের অনুশাসনে তাঁকে স্বদেশ হ'তে চির-নির্ব্বাসন বরণ কর্‌তে হয়েছিল। এইসব কারণেই তিনি খুব বেশী-কিছু লিখ্‌তে পারেননি; কিন্তু তিনি যেটুকু রেখে গেছেন, তা রুশ-সাহিত্য যতদিন আছে, ততদিন পর্য্যন্ত কেউ ভুল্‌তে পারবে না।

চেখ্‌ভের নাম উচ্চারণ কর্‌লেই, সঙ্গে-সঙ্গে আর-একটি নাম মনে পড়ে—সেটি হচ্চে মস্কো আর্ট্ থিয়েটার বস্তুতঃ, এই 'মস্কো আর্ট' থিয়েটার'কে বাদ দিলে চেখ্‌ভকে কোথাও খুঁজে' পাওয়া যাবে না;—তাঁর জীবনের সমস্ত কৃতিত্ব, সমস্ত সাধনা ও তাঁর সিদ্ধির জন্ম তিনি এই নাট্য-সংঘের নিকট ঋণী। অখ্যাতির অন্ধকার থেকে এই সংঘই তাঁকে যশের স্নিগ্ধ, উজ্জ্বল আলোকে টেনে আনে, এই সংঘই তাঁকে নিজকে চিন্‌বার সুযোগ দেয়।

চেখভের নাটক প্রথম রঙ্গমঞ্চে দেখানো হয় ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে। নাটকখানার নাম হচ্চে The Sea Gull (সিন্ধু-শকুন)। সেণ্ট্ পিটার্‌সবার্গএর (বর্ত্তমানে লেনিনগ্রাড্) আলেক্‌জাণ্ডার থিয়েটারে Vera Komissarjevsky কর্ত্তৃক প্রথম এ-খানা অভিনীত হয়। দর্শক যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা সেটাকে হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিলেন। তার পর Abramoff's Theatreএ তাঁর আইভানফ্, Wood Demons (বনদৈত্য) নামক নাটক দু-খানা অভিনীত হয়। এদের অবস্থাও 'সিন্ধু-শকুনের' চাইতে খুব বেশী ভালো হ'য়ে ওঠেনি। এই অনাদর ও উপেক্ষায়

চেখভের মন দুঃখ ও নিরাশায় ভ'রে উঠ্‌ল, এবং তা'র ফলে, তাঁর স্বাস্থ্যও ভেঙে পড়্‌তে লাগ্‌ল। নিজের ওপর তিনি বিশ্বাস হারাতে লাগ্‌লেন, এবং নাট্যকাররূপে তাঁর কোনো ক্ষমতা আছে কি না, সে-বিষয়ে তাঁর সন্দেহ হ'তে লাগ্‌ল। অবশ্য এর পরে 'মস্কো আর্ট থিয়েটার' কর্তৃক অভিনীত হ'য়ে সেই "সিন্ধুশকুনই" দর্শকদের মুগ্ধ ও চমৎকৃত করেছিল, এবং 'অক্ললভানিয়া' সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁকে চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত ক'রে দিয়েছিল। নাট্য-সাহিত্যে তাঁর হাত নেই, এ-ধারণা তাঁর মনে কেমন যেন বদ্ধমূল হ'য়ে গিয়েছিল। মস্কো আর্ট থিয়েটারের কর্তৃপক্ষগণ যখন তাঁকে নতুন নাটক লিখ্‌বার জন্য তাগিদ দিতেন, তখন তিনি বারবার নিজের অযোগ্যতার কথাটা উল্লেখ করতে ভুল্‌তেন না; অথচ, নাট্য-সাহিত্যের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক আকর্ষণ এত গভীর ছিল যে, একটু পীড়াপীড়ি করলেই তিনি, যে-সমস্ত ভাব তাঁর মনের অলিতে-গলিতে ঘুরে'-ঘুরে' বের হবার পথ খুঁজত সে-গুলোকে নাট্যাকারে লিপিবদ্ধ ক'রে ফেল্‌তেন।

'The Three Sisters' (তিন ভগিনী) ও 'The Cherry Orchard' (চেরি-বাগান) তিনি এইভাবে 'মস্কো আর্ট্‌ থিয়েটার'এর জন্য লিখেছিলেন, এবং এই বই দু-খানাতেই তাঁর প্রতিভার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায়। চেখভের লেখার বিশেষত্ব হচ্চে এই যে, তিনি রুশিয়ার শিক্ষিত মধ্য শ্রেণীর জীবনের চিত্র অতি সুনিপুণ ও সুন্দর ক'রে আঁক্‌তেন। তাঁর লেখা পড়্‌লে প্রথমেই একটা জিনিষ খুব বেশী ক'রে মনে হয়—সেটা হচ্চে একটা সকরুণ দুঃখের সুর—একজন সমালোচক যাকে বলেছেন grey tone। দুঃখ জিনিষটাই তাঁর ধাতে সইত বেশী, কিন্তু তা-সত্ত্বেও তিনি যে কত বড় আনন্দের ঋষি ছিলেন, তা পরে দেখাবো। তাঁর একটা বিশেষত্ব ছিল এই যে, তিনি খুব রিয়ালিষ্টিক্‌ (বস্তুতান্ত্রিক) ছিলেন। জীবনটাকে তিনি ঠিক যথাযথরূপেই দেখ্‌তেন; তবে সংসারটা যেমন, তিনি যে কেবল সংসারের ঠিক সেইরূপই আঁক্‌তেন তা নয়, সংসারটা যেমন হওয়া উচিত, সেই 'সব পেয়েছির দেশে'র আভাও তাঁর লেখায় পাওয়া যায়। তাঁর সব নাটকেই তিনি মানব-প্রকৃতির ও বিশেষ ক'রে মধ্য শ্রেণীর লোকের মনস্তত্ত্বের ছাত্র বলে' নিজের পরিচয় দিয়েছেন। রাজনীতির ধার তিনি বড় একটা ধার্‌তেন না, কিন্তু হৃদয় ছিল তাঁর সমুদ্রের মতো উদার আর মায়ের বুকের মতোই কোমল। স্বদেশ ও স্বজাতির দুঃখে তিনি ব্যথিত হ'তেন। তাঁর সময়ে 'ভদ্রলোক'দের মধ্যে কোনো উৎসাহ, আশা, বা উদ্দীপনা ছিল না, এবং এই অবসাদের ফলে দেশবাসীর অনেক দুঃখ পেতে হবে, এ তিনি ঠিক বুঝ্‌তে পেরেছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে, রুশিয়া একদিন তা'র মুক্তি-পথ খুঁজে' বার করতে পারবে, এই আশাও তাঁর হৃদয়ে ছিল। তাঁর সমস্ত বই-তে এই বাণীরই প্রতিধ্বনি জেগে উঠেচে। মানুষের বাইরের ফেনিল জীবন-প্রবাহের অন্তরালে আনন্দের যে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারা নিঃশব্দে ব'য়ে চলেচে, তা'র পরিচয় চেখভ দিয়েছেন তাঁর 'The Three Sisters' (তিন ভগিনী) নাটকে। তিনটি বোন মস্কোর আলো-উৎসব-ভরা জীবন-যাত্রা থেকে অনেক দূরে ক্ষুদ্র প্রাদেশিক এক সহরে প'ড়ে আছে—সেই আনন্দ-লোকের ঝিলিমিলির সঙ্গে নিজেদের হীন অবস্থা তুলনা ক'রে তা'রা ব্যথিত হচ্চে; সেখানকার উৎসবে যোগদান করবার স্বপ্নে তা'রা মশগুল—এই হচ্চে বইটির মূল ঘটনা। চেখভ যখন এ বইখানি লেখেন তখন তিনি Yalta-তে; স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করবার তাঁর নিজের অন্তরের অপরিপূর্ণ সাধটিকে তিনি এই তিন বোনকে দিয়ে অতি চমৎকার ফুটিয়ে তুলেচেন। বিষয়টি নিতান্তই সামান্য, কিন্তু সু-দক্ষ আর্টিষ্টের হাতে প'ড়ে এ-ই কি সুন্দর হ'য়ে উঠেচে তা ভাব্‌লে অবাক্‌ হ'তে হয়। গল্পটির প্রথম হ'তে শেষ পর্য্যন্ত পাত্রপাত্রীদের বাহ্যিক জীবনে বিশেষ কোনো পরিবর্ত্তন ঘটেনি, কিন্তু মনের ওপর দিয়ে বহু ঝড় ব'য়ে গেছে এবং মানসিক জীবনের সেইসমস্ত ঘাতপ্রতিঘাতের অতি চমৎকার চিত্র বইটিতে দেওয়া হয়েছে।

চেখভের শেষ এবং একহিসাবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বই হচ্চে 'Cherry Orchard' (চেরি বাগান)। মস্কো আর্ট্‌ থিয়েটারের কর্তৃপক্ষদের একান্ত অনুরোধ ঠেল্‌তে না পেরেই তিনি এ-বইখানি লেখেন, এবং এ নাটক অভিনীত হবার সময় তিনি অভিনয়-গৃহে উপস্থিত ছিলেন। জীবনে এই তিনি প্রথম তাঁর নিজের নাটক অভিনীত হ'তে দেখেন, এবং এই তাঁর শেষও বটে; কেননা, যে-বৎসর "চেরি বাগান" অভিনীত হয়, সেই বৎসরই তাঁর জীবনলীলা সাঙ্গ হ'য়ে যায়।

চেরি বাগান নাটকটি ভারি করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী—এই ভাব-সেতারের তারগুলো সবই যেন দুঃখের সুরে বাঁধা। এ-বইয়ের পাত্রপাত্রীরা সব জীর্ণ, শ্লথ ও ক্লান্ত—তাদের আশা নেই, আকাঙ্ক্ষা নেই, জীবনের কোনো লক্ষ্য নেই—তা'রা অত্যন্ত কোমল ও মৃদুস্বভাব, জেগে ওঠ্‌বার ক্ষমতা তা'রা হারিয়েচে। কিন্তু মানব-জীবনের সমস্ত ব্যর্থতা ও ক্ষণভঙ্গুরতা সত্ত্বেও তিনি বিশ্বকে মনুষ্যত্বের চিরন্তন করুণ সঙ্গীত শুনিয়েচেন। এইজন্যই তিনি বিশ্ব-মানবের শ্রদ্ধার অধিকারী।

চেরি বাগানে চেখভ দেখিয়েছেন যে, যিনি খাঁটি আর্টিষ্ট, তিনি যথার্থ ঋষিও বটেন। জড়তা ও আলস্যের চাপে সমগ্র রুশিয়া তখন টলমল করচে, চেখভ তা দিনের আলোকের মতো স্পষ্ট উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তিনি আগে থেকেই চীৎকার ক'রে বলেছিলেন—'সাবধান! সাবধান!! তোমরা ধ্বংসের পথে অগ্রসর হচ্চ।' পনেরো বছর পরে কি ঘটবে, তা যেন তিনি আগে থেকেই স্পষ্ট বুঝ্‌তে পেরেছিলেন। তাই দেশের সম্মুখে তিনি তা'র চিত্র এই নাটকের মধ্য দিয়ে অনাবৃত উন্মুক্ত ক'রে ধরেছিলেন; দেশ সে-চিত্র দেখেছিল, কিন্তু কেন যে দেশ ঋষির সে-বাণী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেনি, সেটা ভেবে দেখ্‌বার বিষয়।

চেখভের লেখার বিশেষত্ব হ'চ্চে এই যে, তা অতি কোমল, অতি মৃদু—খুব একটা দীপ্তি বা উত্তেজনা তাঁর লেখায় পাওয়া যায় না। তিনি যেন অতিশয় ভয়ে-ভয়ে লিখ্‌তেন, সুরটা কোথাও একটু কড়া হবার চেষ্টা করলেই তিনি সেটা বদ্‌লে ফেল্‌তেন। তিনি কেবল পুরবীই গেয়েছেন—দীপকের ঝঙ্কার তাঁর লেখায় একটিবারও ধ্বনিত হ'য়ে ওঠেনি। আর-একটি বিষয় হ'চে, তাঁর পারিবারিক জীবন-যাত্রার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বর্ণনা করবার অসাধারণ ক্ষমতা; এই ক্ষমতার জন্য কাউন্ট্‌ টল্‌ষ্টয় তাঁকে ফোটোগ্রাফার্‌ বলেচেন। তিনি ফোটোগ্রাফার্‌ হ'তে পারেন, কিন্তু তা'র আগে তিনি একজন খাঁটি আর্টিষ্ট; তা'র রঙের রেখা কোমল হ'তে পারে, কিন্তু তা'র মধ্যেই বিশ্ব-মানবের জীবনের সুর অতি আশ্চর্য্য-রকম ফুটে' উঠেচে। তিনি দুঃখবাদী ছিলেন, কিন্তু তাঁর আন্তরিক সহানুভূতি ও মৃদু হাস্য-রসে সেই দুঃখবাদ অনেকটা চাপা পড়েছিল। তা নইলে, তাঁর সৃষ্ট অসংখ্য চরিত্র—ব্যবসাদার, ছাত্র, সরাইওয়ালা, ইস্কুলমাষ্টার, বিচারক—এদের সবাকার দুঃখের কাহিনী অমন চুপ ক'রে শোনা সম্ভব হ'ত না। তাঁর বই অভিনয় করার একটি বিশেষ ভঙ্গী আছে—সুখের বিষয় 'মস্কো আর্ট থিয়েটার' সেই ভঙ্গীটি অর্জ্জন করতে পেরেছিলেন।

চেখভের বইয়ে কোনো প্লট্‌ নেই। কথাটা একটু নতুন—কাজেই বুঝিয়ে বলা দরকার। ডিকেন্স্‌ যে-রকম প্লট্‌ নিয়ে গল্প লিখ্‌তেন, সে-রকম প্লট্‌ চেখভ বর্জ্জন করেছিলেন। প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত একটা কিছু ধারাবাহিকরূপে বলা, বিচিত্র বিভিন্ন ঘটনাবলীকে একটা সম্বন্ধের সূত্রে বেঁধে শেষ পরিচ্ছেদে একেবারে এক ক'রে দেওয়া এই ছিল ডিকেন্সের প্লট্‌। তাঁর নায়কনায়িকার হয় মিলন, নয় মরণ, বা ঐ-রকম সুনিশ্চিত একটা-কিছু হবে, একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে তাদের

ফেলে রেখে তিনি কখনোই গ্রন্থের পরিসমাপ্তি করতেন না। কিন্তু চেখভের বইয়ে সবই কেমন যেন খাপছাড়া, একটির পর একটি দৃশ্য চলছে, কিন্তু তাদের মধ্যে যেন কোন ঐক্য নেই। তার পর, নায়ক-নায়িকা ব'লে যে-কথাটা চিরপ্রচলিত হ'য়ে আসচে, সেটাকেই চেখভ যেন বাদ দিয়ে চলতেন, মনে হয়। তাঁর নাটকে হাজার লোক জটলা করচে—প্রত্যেকেই ভিন্ন-ভিন্নভাবে অনুপম। তা'র মধ্যে সুখ, দুঃখ, আশা, ভয়, প্রেম, ভালোবাসা সবই আছে—অথচ, মজা হ'চ্চে এই যে, কোনো বিশেষ-দুটি লোককে অন্য সমস্ত চরিত্র থেকে তফাৎ ক'রে বিশেষরূপে দেখা চলে না; কে যে নায়ক, আর কে যে নায়িকা, তা বোঝা অসম্ভব। সাধারণতঃ আমরা দেখি, নাটক-নভেলে কোনো-একটি বিশেষ লোক হ'চ্চে আসল; তা'কে ফুটিয়ে তোলবার জন্যেই গ্রন্থকার অন্য সমস্ত চরিত্রের অবতারণা ক'রে থাকেন। কিন্তু চেখভের চরিত্র-গুলি প্রত্যেকেই আসল, প্রত্যেকের মধ্যেই একটি বিশেষত্বের ছাপ আছে; কাকেও বাদ দেওয়া চলে না, অবজ্ঞা করা চলে না। বইএর আরম্ভ ও শেষ দুটিই হঠাৎ;—বইএর শেষে দেখা গেল যে, যে-সব চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে তিনি এতক্ষণ প্রয়াস পেয়েচেন, তাদের কোথায় কোন্ অনিশ্চয়তার মধ্যে যে ফেলে গেলেন, তা বোঝা গেল না। বিশেষ-কিছুই একটা ঘটল না; কারো মৃত্যু হ'ল না, কোনো প্রণয়ী-প্রণয়িনীর বিবাহও হ'ল না। অথচ, বইটা শেষও হয়েচে। এ-অবস্থায়, চেখভ কি বলতে চেয়েছেন, তা সহসা বোঝা যায় না। চেখভ একটি নতুনধরণের প্লটের সৃষ্টি করেন—তা'তে ধারাবাহিকতা নেই, পরিসমাপ্তি নেই—আছে শুধু বাস্তব জীবন থেকে নেওয়া কতকগুলো অসংলগ্ন চিত্র। সেই চিত্রগুলো সত্যকার জীবনের অনুরূপ হয়েচে কি না, সেইটেই দেখবার বিষয়।

মানুষের জীবন সম্বন্ধে চেখভের ধারণা প্রণিধানযোগ্য। সংসারটাকে তিনি চিড়িয়াখানাও মনে করতেন না, নন্দন-কাননও মনে করতেন না- যা মনে করতেন, তা হ'চ্চে অদ্ভুত, নিরুপম, আশ্চর্য্য এবং সুন্দর। পূর্ব্বেই বলেচি যে, পাঠকদের সামনে তিনি জীবনের যে-চিত্র উপস্থিত করতেন, তা শুধু যা সত্যি এবং বাস্তব, তা নয়;—যা ভবিষ্যতে হবে, যা হওয়া বাঞ্ছনীয়,তা'রও একটা চিত্র তিনি সঙ্গে-সঙ্গে আঁকতেন। যথার্থ আর্টের লক্ষণই হ'চ্চে এই যে, তা পাঠকদের একটি বৃহত্তর, অথচ সঙ্কীর্ণতর জীবনের আভাস দ্যায়। এই হিসেবে চেখভ একজন পাকা ওস্তাদ, শিল্পী-গুরু। মানব-জীবনের হাজার দুঃখের তাপেও আনন্দের ফুলটি যে একেবারে শুকিয়ে যায় না, এ-কথার আভাস তাঁর প্রত্যেক বইতেই পাওয়া যায়।

চেখভের লেখার মধ্য দিয়ে আমরা তাঁর স্বচ্ছচরিত্রের পরিচয় পাই। যা-কিছু অসুন্দর, যা-কিছু অপবিত্র, যা-কিছু গ্লানিকর, তা-সবার উপরে ছিল, তাঁর দারুণ বিতৃষ্ণা। ভয়কে তিনি ঘৃণা করতেন;—সত্যকার জীবনের প্রতি আর্টিষ্টের যে-ভয়, সে-ও তাঁর ঘৃণার হাত এড়িয়ে যেতে পারেনি। সত্যকে ভয় না ক'রে চোখোচোখি দেখা—তাঁর মতে এই ছিল যথার্থ মানুষের যোগ্য কাজ। তিনি মনে করতেন যে, মানুষের কল্পিত কোনো স্বপ্নই—তা সে যতই অদ্ভুত, যতই ভয়ঙ্কর এবং যতই সুন্দর হোক—আমাদের বাস্তব-জীবনের মতো আশ্চর্য্য-সুন্দর হ'তে পারে না। মানুষ একদিকে কত অজ্ঞ, কত মূর্খ, ও কত নিষ্ঠুর ও অন্যদিকে কত সহিষ্ণু ও কত তেজস্বী হ'তে পারে, তিনি তা জানতেন। তাঁর মানসিক স্বাস্থ্য ছিল চমৎকার, কিন্তু তাঁর যক্ষ্মারোগগ্রস্ত দেহ সে-স্বাস্থ্য উপভোগ করতে পারেনি। তবু জীবনটাকে তিনি ভালোবাসতেন—অমন নিবিড় ও একান্ত ভালোবাসা কবিচিত্তেই সম্ভব।

আমাদের দেশে, রুশ-লেখকদের মধ্যে লোকে টলষ্টয়ের পরেই বোধ চেনে—ম্যাক্সিম গোর্কিকে। তাঁর লেখা চেখভের লেখার মতন মৃদু নয়, তা সূর্য্যের মতো তেজস্বী, খড়্গের মতো ধারালো—কোথাও একটুখানি ছোঁয়া লাগলেই জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে নিঃশেষ ক'রে ছাড়বে। ভাষায় অমন পারিপাট্য, অমন সরস, সতেজ ভঙ্গী, অমন জোর বিশ্ব-সাহিত্যে আর কোথাও খুঁজে' পাওয়া যাবে কি না, সন্দেহ। সে বাধা মানে না, তা'র গতি নিরঙ্কুশ, নির্ঝরের মতো স্বচ্ছ, অনাবিল, সমুদ্র-স্রোতের মত উদ্দাম, ঝড়ের মতো ভয়ঙ্কর।

ম্যাক্সিম গোর্কির আসল নাম হ'চ্চে Alexi Maximovitch Peshkoff। কিন্তু বই লিখবার সময় তিনি ঐ-নাম গ্রহণ করেন। রুশ-ভাষায় 'গোর্কি' কথার মানে হচ্ছে 'তিক্ত'। আজকের দিনে, তাঁর 'গোর্কি'-নাম দুনিয়ার এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পরিচিত। জীবনে তিনি অনেক দুঃখ পেয়েছিলেন, অনেক নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন;—তাই সার্থক হয়েছিল তাঁর গোর্কি নামকরণ।

তাঁর বাল্য-জীবনের ইতিহাস ভারি করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী। তাঁর বাপ তামার বাসনের কাজ করতেন—ভয়ানক গরীব ছিলেন। ছেলেবেলায়,তাঁকে এক মুচির বাড়ীতে শিক্ষানবীশ হ'তে হয়েছিল—কিন্তু মুচি তাঁকে এম্নি ভয়ানক প্রহার করত যে, তিনি সেখান থেকে পালাতে বাধ্য হন। তা'র পর, এক দর্জ্জির বাড়ীতে কাজ নেন,—সেখান থেকে মস্কোতে গিয়ে রুটিওয়ালা হন। এম্নি ক'রে সেই তরুণ বয়সেই তাঁর জীবনের পাত্রটি দুঃখের রসে কানায়-কানায় ভ'রে' ওঠে। যে-বয়সে মানুষের হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলি বিকশিত হ'য়ে উঠতে থাকে, সেই বয়সেই তিনি নিষ্ঠুর, কঠোর, ও নির্ম্মম হ'য়ে ওঠেন। তাঁর সেই সময়কার জীবন-যাত্রার কাহিনী শুনলে চক্ষে জল আসে। মাটির নীচে অন্ধকার, ছোটো-ছোটো, স্যাঁৎসেঁতে, ভিজে কুঠুরীতে সহরের সমস্ত রুটি-ওয়ালারা স্ত্রী-পুত্র নিয়ে বাস করত—তা'রই একটি তিনি দখল করেছিলেন। কিন্তু, প্রতিভা বিশ্ব-বিজয়ী—সমস্ত পৃথিবীর দারুণ প্রতিকূলতাকে উপহাস ক'রে প্রতিভা জয়লাভ করবেই করবে। তা'রই পরিচয় আমরা পাই, যখন কুঠুরীর সেই পশু-জীবনের মধ্য থেকে বেরিয়ে এল তাঁর সবচেয়ে জোরালো বই Twenty Six and One। এইভাবে কয়েক বছর বাস করার পর, তাঁর জীবনে মস্তবড় একটা পরিবর্ত্তন আসে;—তিনি ক্রিমিয়াতে ফিওডোসিয়া নামক স্থানে Longshoreman হ'য়ে চ'লে যান। মাটির নীচে প'চে-প'চে মরার চেয়ে তিনি শারীরিক ক্লেশ ও নিদারুণ দারিদ্র্য বরণ ক'রে নেন। সেখানে তিনি সাত বছর ছিলেন এবং এই সময়ে নানা চরিত্রের লোকের সম্পর্কে আসেন—তা'র মধ্যে চোর,ডাকাত,খুনে, গাঁটকাটা ইত্যাদি নিকৃষ্ট স্তরের জীব সমস্তই ছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই শুষ্ক, কঠোর জীবনই তাঁকে তাঁর সব-চাইতে সুন্দর, সরস, সুমধুর ও কবিত্বপূর্ণ লেখার প্রেরণা দিয়েচে। কল্পনার সোনার কাঠির ছোঁয়া দিয়ে তিনি সেই কদর্য্য জগৎকে স্বর্গলোকের মায়াপুরীতে পরিণত করেছেন।

ফিওডোসিয়া থেকে Nijhny Novgorodএ চ'লে যান; সেখানে বিরাট ভল্গা-নদীর তীরের জীবন যাত্রা কুৎসিত হ'লেও তা'র মধ্যে মাধুর্য্যের অভাব ছিল না। এইখানে গোর্কির বহু প্রতিভাশালী লোকের সহিত পরিচয় হয়;—তাঁরাও অর্থোপার্জ্জন করবার জন্য এখানে-সেখানে তাসা-দলের মতো ঘু'রে বেড়াচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁর যথার্থ সঙ্গী ছিল অজ্ঞ, মূর্খ, নিপীড়িত, দীন-দরিদ্র—রুশ-ভাষায় যাদের বলে 'বোসাকি' (অর্থাৎ, যারা খালি-পায়ে চলে)। তিনি তাদের সঙ্গে একত্র আহার করতেন, পকেটে যখন দু-চারিটি কোপেক্ থাকত, তখন তাদের সঙ্গে মাটির নীচের কুঠুরীতে একসঙ্গে ঘুমুতেন; যখন পয়সা থাকত না, তখন তাদের মতো কারো দরজার পাশে বা জেটিতে শুয়ে শীতে কাঁপতেন। এই সব লোকদের 'নগ্নপদ'ই তাদের গৃহহীনতা ও একান্ত অসহায়তার

পরিচায়ক। ম্যাক্সিম্ গোর্কি তাঁর 'The Lower Depths'এ এইসব লোকদের চিত্রই এঁকেছেন।

খাঁটি রুশ চরিত্র জানতে হ'লে এইসব লোকদের জানা দরকার। রুশীয় জীবন-যাত্রার প্রতিকূল অবস্থা তাদের ঘরছাড়া করেচে—সমাজের নির্দ্দিষ্ট স্থান থেকে তা'রা বিচ্যুত। তা'রা না করতে পারে, এমন কু-কর্ম্ম নেই; তারা পাসপোর্ট্ ছাড়া ভ্রমণ করচে,তা'রা জেল্‌ফেরতা কয়েদী কেউ বা জেল্‌খানার শিক ভেঙে পালিয়েছে, নিরাশা ও দারিদ্র্য তাদের চোর, মাতাল, বদমাস ক'রে তুলেচে; তাদের মধ্যে যার একটু-আধটু শিক্ষা আছে, সে-ই তা'র বিবেক-বুদ্ধি ও সু-প্রবৃত্তিকে গলা টি'পে মারচে।

এইসব লোকের সঙ্গে গোর্কি ঘনিষ্ঠভাবে বাস করেচেন, নিজ হৃদয় দিয়ে তাদের হৃদয় স্পর্শ করেচেন, তাদের বুঝ্‌তে ও চিন্‌তে পেরেছেন। তথা-কথিত উচ্চশ্রেণীর লোকের মতো তিনি ত দূর থেকেই নাক-সিঁটকে চ'লে যান্‌নি; তাদের সঙ্গে একাত্মবোধ জাগিয়ে তুলেচেন—ঐ পশুগুলির সঙ্গে তাঁর প্রভেদটুকু ঘুচিয়ে দিয়ে তিনি ওদের সঙ্গে এক হ'য়ে যেতে পেরেছিলেন। সেইজন্যই তাঁর লেখা এত জোরালো; এত মর্ম্মস্পর্শী, এত করুণ। সেইজন্যই তাঁর বই-তে সমাজের নিম্নতম স্তরের চিত্রই পাই—বিশ্ব-জগতের কাছে নিন্দা, অপমান, অবজ্ঞা ও আঘাত পেয়ে-পেয়ে যারা সত্যি-সত্যি মানুষের স্তর থেকে নেমে গেচে, তাদের কথা অমন সুন্দর অমন মর্ম্মস্পর্শী ক'রে বল্‌তে জগতের আর কোনো সাহিত্যিকই পারেন-নি। এইখানেই ম্যাক্সিম্ গোর্কির বিশেষত্ব, এবং এইজন্যই তিনি বিশ্বে সু-পরিচিত।

মানব জীবন-সম্বন্ধে গোর্কির সুবিপুল অভিজ্ঞতা তিনি তাঁর প্রত্যেকটি বইয়ে ফুটিয়ে তুলেচেন—অতি সুনিপুণভাবে। তাঁর বইয়ের পাত্রপাত্রীরা সবই তাঁর চেনা। রুশিয়ার উচ্চ শ্রেণীর লোকরা এইসব অতি নিম্ন-স্তরের লোকদের বিষয় সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। কিন্তু গোর্কি তাঁর জ্বালাময়ী লেখা দিয়ে তাঁদের চোখ ফুটিয়ে দেন। তিনি দেখিয়ে দেন যে, এদের মধ্যে সর্ব্বত্রই অভাব, অনটন, অস্বচ্ছলতা, দুঃখ দারিদ্র্য, পাপ। এই অমূল্য জীবনগুলি এইভাবে অনাদরে, অবজ্ঞায় নষ্ট হ'তে দিয়ে উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা কি ভয়ানক অন্যায়ই না করেচে! আমাদের দেশের কবিদের মতন তিনি কেবল নাকী সুরে কেঁদেই ক্ষান্ত হননি; তিনি রুদ্র রোষে জ্ব'লে উঠেছেন,—তিনি ভীরু নন্, তিনি হ'চেন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি; যখন যা সত্য ব'লে বুঝেছেন, মুক্তকণ্ঠে নির্ভয়ে তাই-ই বলেছেন! তাই, অবজ্ঞাত সমাজের পতিত জীবনের কাহিনী বল্‌বার সময় তিনি নীতি-সংহিতার শাসন মেনে পদে পদে লেখনীকে সংযত করেননি; তিনি যথার্থ চিত্র এঁকেছেন—তাদের পাপ, তাদের গ্লানি, তাদের লজ্জাকর ঘৃণ্য জীবন-যাত্রার কথা তিনি কিছুতেই বাদ দেননি—নিজকে এবং বিশ্বকে ফাঁকি দেননি।

বিপ্লবের পূর্ব্বে, রুশিয়ার সুবিপুল দারিদ্র্য ও উদ্দাম বিলাসিতার বৈলক্ষণ্য খুব বেশি-রকম চোখে পড়্‌ত। এই বৈলক্ষণ্য যাঁরা উপন্যাসে স্পষ্ট ক'রে ফুটিয়ে তুলেছেন, তাঁদের মধ্যে ম্যাক্সিম্ গোর্কি অন্যতম। কিন্তু এই বৈষম্যের চিত্র তিনি নির্ব্বিকারচিত্তে আঁক্‌তে পারেননি। তাঁর নিদারুণ ক্রোধ-বহ্নিতে রুশিয়ার মধ্য ও উচ্চ শ্রেণীর উদাসীন লোকরা ঝল্‌সে আহত হ'য়ে ওঠেন। প্রকৃত পক্ষে, তাঁর 'Lower Depths' নাটক বিপ্লবের দিকে বহু লোকের মনকে আকর্ষণ করে। গোর্কি তাঁর বই-য়ে যে-সব সামাজিক অবস্থা প্রতিফলিত করেচেন তা'র পরিবর্ত্তন হ'তে পারে, কিন্তু তা'র মধ্যে যে সূক্ষ্মদর্শিতা ও মানব-জাতির প্রতি যে সহানুভূতি ও প্রেম আছে, তা এই বইগুলিকে চির-অমর ক'রে রাখ্‌বে।

গোর্কির লেখা-সম্বন্ধে এখানে একটা কথা বল্‌তে চাই। প্রায় সমস্ত রুশ বইয়েই একটি জিনিষ যা দেখা যায়, তা অমন সুন্দরভাবে আর কোনো সাহিত্যেই দেখা যায় না। সেটি হচ্ছে, উপন্যাসের পারিপার্শ্বিক অবস্থা। একখানা উপন্যাস বিশ্লেষণ ক'রে দেখ্‌লে, তার মধ্যে কতগুলো জিনিষ পাওয়া যায়—যথা, প্লট্, চরিত্র-অঙ্কন, দৃশ্যাবলী—ইত্যাদি। এই জিনিষগুলোর সমষ্টি কর্‌লেই একখানা উপন্যাস হয়। এগুলো সবই পরিমাণ-মতো তা'র মধ্যে থাকা দরকার—কোনো-একটা বাদ দিলেই বইটে তেমন রুচিকর হয় না। এসব হচ্ছে উপন্যাসের মাল-মশলা, বা উপাদান। দৃশ্যাবলী ব'লে যে জিনিষটির উল্লেখ করেছি, তা'কেই ইংরেজীতে বলা হ'য়ে থাকে background বা atmosphere অর্থাৎ, যে-সব পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা দৃশ্যাবলীর মধ্যে গল্পের ঘটনাগুলো ঘটে, সেইগুলি। সমালোচকরা বলেন যে, এই background যিনি যত সুন্দর ক'রে আঁক্‌তে পার্‌বেন, তাঁর উপন্যাস তত সুপাঠ্য হবে।

রুশ-সাহিত্যের বিশেষত্ব হ'চ্চে তা'র অনুপম সুন্দর background. এবিষয়ে সে জগতের অন্য সমস্ত সাহিত্যকে হার মানিয়েচে। টল্‌ষ্টয়, তুর্গেনিয়েভ্, ডষ্টয়েভস্কি, এরা সকলেই background রচনায় ওস্তাদ, তবে তুর্গেনিয়েভ্‌কে এ-বিষয়ে শিল্পীগুরু বলা চলে। ম্যাক্সিম্ গোর্কিও নেহাৎ কম নন্। তাঁর 'Creatures That Once Were Men' (একদিন যারা মানুষ ছিল) এবং Seventy Six and One' (ছাব্বিশ আর এক) এই বই দু-খানিতে তাঁর প্রতিভার সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাওয়া যায়। তিনি কেবল বাস্তব জীবনের পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলি অঙ্কন ক'রেই ক্ষান্ত হননি- তিনি প্রকৃতিকে দিয়ে "ব্যাক্-গ্রাউণ্ড" তৈরী করেছেন, তিনি সমুদ্রের বুকে ঝড় তুলেচেন, অন্ধকার রাত্রিতে তাঁর নায়ককে সেই সমুদ্রের বুকে একখানি ছোট্ট নৌকোর মধ্যে ছেড়ে দিয়েছেন—এসব ক্ষেত্রে তাঁর তুলনা নেই।

গোর্কির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বই হ'চ্চে তাঁর 'The Lower Depths' নাটকটি। বইটির নাম রুশ-ভাষায় হচ্চে 'Na Dnye' অর্থাৎ সবচেয়ে নীচে। 'Nachtasyi' অর্থাৎ 'রাত্রিবাস'। কিন্তু ইংরেজি ভাষায় এর নাম হ'ল 'Lower Depths'. 'মস্কো আর্ট্ থিয়েটার' কর্ত্তৃক এই নাটকখানি অভিনীত হ'য়ে খুব সুনাম অর্জ্জন করে। এই বইটির মতো জোরালো বই গোর্কি আর একখানাও লেখেননি। এই নাটকখানি প'ড়ে চেকভ গোর্কিকে লিখেছিলেন, 'আমি তোমার নাটকখানি পড়েছি। এ একেবারে নতুন, এবং ভালো যে খুবই হয়েচে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। দ্বিতীয় অঙ্কটি চমৎকার হয়েচে—সবচেয়ে ভালো এবং সবচেয়ে জোরালো। এটি—বিশেষতঃ এর শেষ দিক্‌টি—পড়্‌বার সময় আনন্দে আমি প্রায় নৃত্য করেছিলাম।

গোর্কির 'Creatures That Once Were Men (একদিন যারা মানুষ ছিল) একই-ধরণের বই—এইটার নামই তা'র যথেষ্ট পরিচয়। যেসব নরনারী কোনো সময় 'মানুষ' ছিল, কিন্তু দারিদ্র্য যাদের পশুতে পরিণত করেচে, তাদের জীবনের চিত্র তিনি এঁকেচেন—তা'র সমস্ত কদর্য্যতা, বীভৎসতা সমস্তই এঁকেছেন—কিছুই বাদ দেননি। কিন্তু তা'র সঙ্গে একটুখানি সহানুভূতির ছোঁয়া আছে ব'লে বইটি পড়্‌তে ঘৃণায় দেহ কণ্টকিত হ'য়ে ওঠে না, সমবেদনায় বুক ভ'রে ওঠে, চোখ ফেটে কান্না আসে।

তাঁর 'Twenty Six and One' (ছাব্বিশ আর এক)—এতেও সেই একই জীবনের চিত্র পাই। ছাব্বিশ জন মজুর গাধার মতো দিনরাত খাটচে, পশুর মতো জীবন যাপন করচে, কিন্তু তাদের ঐ বুভুক্ষু, তৃষিত বুকের মধ্যেও যে প্রণয়ের স্থান থাকতে পারে, একথাটাই তিনি এ বইয়ে প্রমাণ করেছেন। এই ছাব্বিশ জন সহকর্ম্মী একই মেয়েকে ভালোবেসে ফেলেছে—অথচ, তাদের মধ্যে একটুখানি ঈর্ষা বা বিদ্বেষ নেই। মেয়েটি রোজ তাদের কাছে রুটি কিনতে আসে—সেই সুত্রেই

পরিচয়। সবাই নিজ মনে-মনে জানে—'প্রিয়া, আমার প্রিয়া।' কিন্তু ঐ রুটি নিতে আসবার সময়টুকু ছাড়া আর তাদের দেখাশোনা হয় না—কথাবার্ত্তা তো দূরের কথা। একদিন সেখানে এক মিলিটারী অফিসার এলেন, তাঁর নেক্-নজর পড়ল ঐ মেয়েটিরই ওপর—মেয়েটি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী, অথচ ঐ ছাব্বিশ জন তা'কে সন্দেহ ক'রে একদিন সবাই মি'লে খুব অশ্লীল ও অভদ্ররূপে গাল দিলে। মেয়েটি চুপ ক'রে সব শুনলে, শেষে শুধু বললে, 'হায় রে হতভাগ্য বন্দীরা!' তার পর থেকে সে আর রুটি নিতে আসে না।

এ'কে একটি ছোটো গল্প বললেই চলে, কিন্তু এইটকুর মধ্যেই লেখক যে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, তা ভাবলে অবাক্ হ'তে হয়। গল্পের কোথাও একটু দোষ নেই, ভুল নেই—মেয়েটির শেষ কথাটির মধ্যে সমস্ত গল্পটির মূল কথা দেওয়া হয়েছে—সে হ'চ্চে তা'রা হতভাগ্য এবং তা'রা বন্দী। এই একটি কথা ব'লেই তিনি তাদের সমস্ত অন্যায়, সমস্ত পাপকে সহনীয় ক'রে তুলেছেন এবং পাঠকের মনটি তাদের জন্য সহানুভূতি ও করুণায় ভিজিয়ে তুলেছেন। তাই, বইটি শেষ ক'রে ঐ ইতর, জঘন্য জীবগুলোর জন্য এক ফোঁটা চোখের জল না ফে'লে পারা যায় না। গোর্কির বিশেষত্বই হচ্চে এইখানে—তিনি পতিতদের জীবন-কাহিনী বলবার সময় পাঠকদের মনে ঘৃণার উদ্রেক করেন না, সহানুভূতি এবং করুণার উদ্রেক করেন।

মানব-জীবনের প্রতি তাঁর এবং তাঁর নায়কদের মনোভাব পূর্ব্বতন সমস্ত রুশ ঔপন্যাসিকদের চেয়ে বিভিন্ন। তাঁর নিষ্ঠুর এবং বিদ্রোহী নায়কেরা হ্যামলেট অভিনয় করেনি—তা'রা দয়া-দাক্ষিণ্য, মনুষ্যত্ব ও বিনয়ের মধ্য দিয়ে জীবন সমস্যার সমাধান খুঁজে পায়নি—তা'রা নির্ম্মম, তা'রা প্রতিহিংসাপরায়ণ—'যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন' তাদের জীবনের মূলমন্ত্র। কিন্তু এদের পূর্ব্বে রুশ-সাহিত্যে যে সব চরিত্র সৃষ্ট হয়েছে তাদের সঙ্গে এদের তফাৎ খুব বেশী নয়। বাজারভ (Bazarov), পিটার দি গ্রেট (Peter the Great), লেরমেনটভ (Lermentov)—এদের সঙ্গে গোর্কির বিদ্রোহী নায়কদের তুলনা চলে।

প্রকৃতিকে তিনি সম্পূর্ণভাবে দেখেছেন—রুশীয় কথা-সাহিত্যে ভূদৃশ্য আঁকবার চির-প্রচলিত ভঙ্গীর পরিবর্ত্তন গোর্কির মধ্যেই প্রথম দেখা যায়। তাঁর বই পড়লে মনে হয়, যেন সাহিত্যের মধ্যে একটা নতুন হাওয়া বইচে; অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজ কবিদের প্রকৃতি-বর্ণনা পড়ার পর ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, বায়রন্, শেলী এবং কোলরিজের কবিতা প'ড়ে যেরূপ মনে হয়, গোর্কির লেখা পড়লেও সেইরূপ মনে হয়।

চেখভ আঁকতেন রুশিয়ার মধ্যশ্রেণীর চিত্র, আর গোর্কি বলতেন তাদের জীবনের কাহিনী—যারা ভবঘুরে, যারা কুলী-মজুর, যারা চোর, খুনে, ডাকাত—সংসারে যাদের আপন বলতে কেউ নেই। তাঁর বলবার ভঙ্গীটিও নতুন ও অদ্ভুত।

রুশীয় গদ্য ও কথা-সাহিত্যের প্রধান ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখলে Merezhovskyকে সাহিত্য-ক্ষেত্রে অতুলন ব'লে মানতেই হয়। তিনি প্রধানতঃ সমালোচনা- ও ইতিহাস-মূলক উপন্যাস লিখতেন—ইংলণ্ডের ওয়াল্টার পেটার্‌এর সঙ্গে তাঁর অনেকাংশে মিল আছে। য়ুরোপে তাঁর সব চাইতে নামজাদা বই হচ্চে একটি তিন খণ্ডে সমাপ্ত গদ্য-নাটক, 'The Death of the Gods' (দেবগণের মৃত্যু,) The Resurrection of the Gods (দেবগণের পুনরুত্থান) ও The Antichrist (খৃষ্টের প্রতিদ্বন্দ্বী)—এই বইখানি য়ুরোপের প্রায় সব ভাষাতেই অনূদিত হয়েছে। ঐতিহাসিক সত্যকে অবলম্বন ক'রে তিনি তা'র উপর অতি চমৎকার কল্পনার রং ফলিয়েছেন। তাঁর সমালোচনার বইগুলিতেই তিনি সবচেয়ে বেশী কৃতিত্ব দেখিয়েছেন; টলষ্টয়, ডষ্টয়েভস্কি ও গোগোল্-এর সম্বন্ধে তাঁর বইগুলি প্রণিধানযোগ্য। প্রকৃত পক্ষে, তিনিই রুশিয়ার প্রথম সমালোচক। তাঁর পূর্ব্বে সাহিত্যিক সমালোচনা গালাগালিরই নামান্তর ছিল মাত্র। তিনিই প্রথম রুশ-সাহিত্যে যথার্থ সমালোচনার প্রবর্ত্তন করেন। এইজন্যে, রুশ-সাহিত্য তাঁর কাছে চির-ঋণী।

রুশ-জাপান যুদ্ধের সময় দুই জন কথা-সাহিত্যিক লিখতে আরম্ভ করেন। প্রথমতঃ কুপ্রিন্ ব'লে এক সৈন্য-বিভাগের কর্ম্মচারী 'The Duel' (দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ) নামক উপন্যাসে স্ব-বিভাগের এক কর্ম্মচারীর জীবন-যাত্রা অতি সুন্দর ও যথাযথরূপে আঁকেন। লিওনিড আনড্রিভ Leonid Andrievনামক ঔপন্যাসিক আমাদের দেশে খুব বেশী অপরিচিত নন। তিনি কুপ্রিন্‌এর সমসাময়িক। তিনি ছোটো গল্প, নাটিকা ও যুদ্ধের চিত্র নিয়ে সাহিত্যের আসরে নামেন। তাঁর 'The Red Laugh (রাঙা হাসি) নামক বই বোধ হয় তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। এতে তিনি যুদ্ধের যে বর্ণনা দিয়েছেন, অমন আর কোথাও কোনো সাহিত্যে আছে কি না সন্দেহ। তাঁর 'The Seven That Were Hanged' বইখানাও উল্লেখযোগ্য—মনস্তত্ত্বে অসাধারণ তাঁর রচনা-ভঙ্গী খুব জমকালো; শব্দ-ঝঙ্কার ও বর্ণ-বৈচিত্র্য অতুলন বললেই চলে। বর্ণনা শক্তিও তাঁর অসাধারণ। রুশিয়ার পারিবারিক বা গার্হস্থ্য জীবনের চিত্র টলষ্টয়ের মতো তিনি দিতে পারেননি; তাঁর লেখা অনেকটা বস্তুনিরপেক্ষ (abstract) কতগুলো ভাব ফুটিয়ে তোলাই তাঁর লেখার উদ্দেশ্য। তাঁর ওপর মেটারলিঙ্কের প্রভাব খুব বেশী পড়েছে। তাঁর বলবার স্বচ্ছ, সরল, জোরালো ভঙ্গীটি অননুকরণীয়।

সমস্ত য়ুরোপ রুশ লেখকদের সমাদর করচে—ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের পাশে টলষ্টয়, তুর্গেনিভ ও ডষ্টয়েভস্কিকে স্থান দিচ্চে। এখন আর রুশ-সাহিত্য হীন, অবজ্ঞাত নয়—বিশ্ব-সাহিত্যে তা'র অতি উচ্চ স্থান। এখন রুশ-ভাষায় একখানি ভালো বই লেখা হ'লে আমরা তা প'ড়ে আনন্দ পাই, বিখ্যাত রুশ-লেখকরা কেউ আমাদের অপরিচিত নন। রুশিয়ায় ক্ষমতাশালী লেখক অতি অল্প সময়ের মধ্যে অনেক জন্মেচেন—এটা একটা আশ্চর্য্যের বিষয়। রুশভাষার সমস্ত বই বিশেষতঃ কবিতা এখনো ইংরেজিতে অনূদিত হয়নি। এখনো কত অজস্র রত্ন যে আমাদের চক্ষু এবং মনের আড়ালে রয়েছে, তা আমরা জানিও না।

নষ্টচন্দ্র

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

বিকালবেলা। পশ্চিমের জান্‌লা দিয়ে সোনালি-রঙের পড়ন্ত রৌদ্র ঘরের ভিতরে অনেক দূর পর্য্যন্ত এসে পড়েছে। আলোর দিকে মুখ ক'রে সাম্‌নে একখানা বড় আয়না পেতে একটি সতর-আঠার বছরের ছেলে একটা বড় কাঁচের বাটিতে জল আর ল্যাভেণ্ডার মিশিয়ে এক-একবার মাথায় মাখ্‌ছে আর বিবিধ ভঙ্গিতে টেড়ি বাগাবার চেষ্টা কর্‌ছে। তা'র চুলে ইচ্ছামতো তরঙ্গ ও আবর্ত্তময় টেড়ি হচ্ছে না ব'লে সে বিরক্ত হ'য়ে ক্রমাগত টেড়ি ভাঙ্‌ছে আর ল্যাভেণ্ডার-জল দিয়ে-দিয়ে আবার বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত টেড়ি কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে। ছেলেটির বর্ণ উজ্জ্বল-গৌর, মুখভাব নিতান্ত মেয়েলি, কোমল ও সুন্দর; তা'র সর্ব্বাঙ্গে সৌখীন বিলাসিতার পারিপাট্যের চিহ্ন দেদীপ্যমান; তা'র পরনে শান্তিপুরের মিহি কালাপেড়ে ধুতি পরিপাটিভাবে কোঁচানো চুনট-করা; গায়ে ডুরে ছিটের শার্ট্‌, এরারুট আর মোম দিয়ে শক্ত চক্‌চকে ইস্তিরি-করা; জামায় সোনার বোতাম, হাতে সোনার হাতঘড়ি সোনার বন্ধনীতে বাঁধা; পায়ে বার্ণিশ-করা নূতন চক্‌চকে পাম্প্‌শু। তা'র আয়না চিরুণি বুরুশ প্রভৃতিও বেশ দামী। ছেলেটির সুন্দর সৌখীন চেহারার সঙ্গে এই সব বিলাসোপকরণ বেশ খাপ খেয়েছিল; কিন্তু যে-বাড়ীর যে-ঘরে ব'সে সে এই বিলাস-প্রসাধন সম্পন্ন কর্‌ছে তা'র সঙ্গে সেও খাপ খায়নি, তা'র সাজসজ্জাও মানায়নি এই বাড়ীতে তা'র অবস্থানকে গ্রাম্য উপমা দিয়ে বল্‌তে পারা যায়—গোবরে পদ্মফুল ফুটেছে। বাড়ীটি ছোটো, অতি পুরাতন, জীর্ণ, নোনা লেগে ইটগুলো নানা জায়গায় ক্ষ'য়ে-ক্ষ'য়ে গেছে, ঘরের ভিতরে-বাহিরে চুনবালি খসে' পড়েছে, কোথাও-কোথাও বা পড়ো-পড়ো হ'য়ে ফেঁপে আছে, আর যেখানে এঁটে লেগে আছে সেখানকারও চুনকামের রঙ্‌ বয়সের আতিশয্যে হল্‌দে হ'য়ে উঠেছে। দীর্ঘকাল গুরুভার বহন ক'রে কড়ি-বরগা জখম হয়ে ঝুঁকে পড়েছে, আর তাদের স্বয়ং কাজ চালাবার শক্তি নেই দে'খে তাদের তলায় বাঁশের খুঁটি ঠেক্‌নো দেওয়া হয়েছে; ঘরের মেঝে অনেক জায়গাতেই খুঁড়ে গর্ত্ত-গর্ত্ত হ'য়ে গেছে, যে-যে জায়গায় গভীর হ'য়ে খুঁড়ে গেছে হাঁটুতে-চল্‌তে পাছে হোঁচট্‌ খেতে হয় তাই সেই-সেই জায়গায় মাটি ভরাট ক'রে গোবর জল দিয়ে লেপে নিকিয়ে চৌরস করা হয়েছে; গর্ত্তগুলি ভরাবার জন্যে চারটি খোয়া আর দুটি-খানি সিমেণ্ট মাটি সংগ্রহও হ'য়ে ওঠেনি দেখা যাচ্ছে। ঘরের একপাশে একটা অনেক কালের পুরানো কৃষ্ণমূর্ত্তি দেরাজ-আল্‌মারি, তা'র দুদিকের কার্ণিশ ভেঙে উড়ে গেছে, দেরাজের টানার গায়ে গা-চাবির কল আর হাতল লাগানো ছিল, এখন তাদের পূর্ব্ব অবস্থিতির স্মরণ-চিহ্ন-স্বরূপ কেবল কতকগুলি ফুটো-মাত্র দেখা যাচ্ছে, তা'তে কাজ হয় না, কিন্তু কাজের ব্যাঘাত ঘটে অনেক, তাই সেই-সব ফুটোর ভিতর দিয়ে আরস্থলার অবাধ-প্রবেশ নিবারণের জন্য ছেঁড়া খবরের কাগজ গুঁজে-গুঁজে দেওয়া হয়েছে; কালের কৃপায় সে-কাগজের রং বালি-কাগজের মতন পিঙ্গল হ'য়ে উঠেছে; দেরাজটার একটা পায়া নেই, তা'র জায়গায় একটা জীর্ণ আধ্‌লা ইট গোঁজা আছে; দেরাজের পাশে একটা গড়্‌গড়ে ঘোড়াঞ্চির উপর বসানো আছে একটা অতিপ্রাচীন কালের পট্‌পটে টিনের প্যাঁট্‌রা, তা'র ডালাটা তুম্‌ড়ে তুব্‌ড়ে নৌকার খোলের মতন হ'য়ে গেছে; সেই প্যাঁট্‌রার পাশেই সাজানো রয়েছে একটি ঝক্‌ঝকে মাজা পিতলের পিল্‌সুজের উপর রেড়ির তেলে-ভরা একটি পিতলের প্রদীপ। ঘরের অপর পাশে একটি পুরাতন খাটের উপর স্বল্প শয্যা বিছানো, সেটি ধোয়া-চাদরে ঢাকা, কিন্তু খাটের ছত্রীর উপর তোলা মশারিটি জীর্ণ মলিন; খাটের পাশেই কড়ি থেকে ঝোলানো রয়েছে একটি পুরাতন কড়ির আল্‌না, তা থেকে অনেক কড়িই খ'সে গেছে, অনেক কড়ি ভেঙেও গেছে; আল্‌নার উপর

ইঁদুরের অবতরণ নিবারণের জন্যে লম্বমান রজ্জুর মাঝখানে যে দুখানি শরা উবুড় ক'রে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছিল তা'র একখানার খানিকটা ভেঙে গেছে। কিন্তু সেই বিশ্রী পুরাতন আল্‌নার উপরে শোভা পাচ্ছে, ধব্‌ধবে ধোয়া জরির বুটিদার ঢাকাই কাপড়ের একটি পিরান, জরি-পাড় একখানি ধুতি ও জরি-পাড় একখানি রেশ্‌মী চাদর। ভাঙা দেরাজের উপরেও সাজানো আছে আতর গোলাপজল ল্যাভেণ্ডার পমেটম্‌ পাউডার্‌ আর এসেন্‌সের বিবিধ-প্রকারের শিশি-কৌটা। এই ঘরটিতে দারিদ্র্য ও ঐশ্বর্য্য অভাব ও বিলাসিতা যেন গলাগলি হ'য়ে বিরাজ করছে—এ যেন আলো ও ছায়ার অপূর্ব্ব রহস্যময় খেলা।

হঠাৎ সেই ঘরে এসে প্রবেশ করলে একটি যুবক। তা'র বয়স একুশ-বাইশ বৎসর হবে। চেহারা দেখ্‌লেই বুঝতে পারা যায় যে, ছেলেটি আগের বর্ণিত বালকটিরই বড় ভাই; এরও গায়ের রং উজ্জ্বল-গৌর, তপ্ত-কাঞ্চনের মতন; কিন্তু এই যুবার সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত বালকের চেহারার মধ্যে বিশেষ-একটা পার্থক্যও প্রথম দর্শনেই চোখে পড়ে—এই যুবকের দেহ বলিষ্ঠ উন্নত সুগঠিত পেশীপুষ্ট, মুখে পৌরুষ ও দৃঢ়তার সহিত কোমলতার ছাপ দেদীপ্যমান; তা'র বেশভূষায় যত্নমাত্র নেই—তা'র মাথার চুল স্বভাব-কুঞ্চিত কিন্তু আঁচ্‌ড়ানো নয়, তা'র কাপড় ছেঁড়া, মোটা এবং ধদ্য-ধোয়াও নয়, কোঁচার কাপড়টাতেই তা'র দেহ আবৃত। সেই যুবা ঘরে এসে দাঁড়াতেই তা'র ছায়া বালকের সম্মুখস্থ দর্পণে প্রতিবিম্বিত হ'ল; ঘরে লোক আসার পায়ের শব্দ শু'নে ও দর্পণে আগন্তুকের প্রতিচ্ছায়া পড়্‌তে দেখে' বালক একটু বিব্রত ও লজ্জিত হ'য়ে বিচিত্রকারুকার্য্যময় টেড়ি রচনার দুশ্চেষ্টা থেকে প্রতিনিবৃত্ত হ'য়ে আগন্তুকের দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখ্‌লে।

আগন্তুক-যুবক ভ্রাতার বিব্রত মুখ ও অসমাপ্ত প্রসাধনকে উপেক্ষা ক'রে ব্যস্তভাবে বল্‌লে—অনিল, শিগ্‌গীর এস, মা তোমাকে ডাকছেন.........

মুখ বিরস ক'রে অনিল বিরক্তস্বরে কেবল বল্‌লে—যাচ্ছি.........

যুবক আগের মতন ব্যস্তভাবেই বল্‌লে—আর দেরি করবার সময় নেই অনিল, মার অবস্থা খুব খারাপ হ'য়ে এসেছে......তুমি শিগ্‌গীর এস......

এই কথা বল্‌তে বল্‌তে যুবক ঘর থেকে দ্রুতপদে বেরিয়ে চ'লে গেল। অনিল মুখ বিকৃত ক'রে ক্ষিপ্র-হস্তে টেড়ি-রচনা সমাপ্ত করতে প্রবৃত্ত হ'ল। তা'র সমস্ত মনটাই যেন আবার প্রসাধনের দিকে ঝুঁকে পড়্‌ল।

যুবক অনিলের ঘর থেকে বেরিয়ে যে-ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলে সেখানে দারিদ্র্যের ও দুঃখের একাধিপত্য। তাদের ভীষণ ভ্রুকুটির উপর সুখ ও সচ্ছলতার স্নিগ্ধহাসি কোথাও এতটুকু রেখাপাত করতে পারেনি। একখানি জীর্ণ তক্তপোষের উপর সামান্য ছিন্ন মলিন শয্যায় শুয়ে আছেন একজন মুমূর্ষু মহিলা; তাঁর বয়স যে কত তা তাঁর চেহারা দে'খে আন্দাজ করা কঠিন; তাঁকে যুবতীর মমী বলাও চলে, আবার জরাজীর্ণ বৃদ্ধা বলাও চলে। তাঁর দেহ শুষ্ক-শীর্ণ; দারিদ্র্যের দুর্ভাবনা ও অনশনের অত্যাচারে প্রাণ যেন বহু দিন সে জীর্ণ আবাস ছেড়ে গেছে। কিন্তু এখনও তাঁকে দেখ্‌লে বুঝ্‌তে পারা যায় যে এককালে তাঁর এই মৃতপ্রায় দেহে কি অনুপম সৌন্দর্য্য ও লাবণ্য ছিল।

যুবক ঘরে এসে দেখ্‌লে, মা নিস্পন্দ হ'য়ে শুয়ে আছেন, জীবিত কি মৃত অনুমান করা যায় না। সে ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে গিয়ে মুখের উপর ঝুঁকে প'ড়ে নাকের কাছে হাতের উল্টাপিঠ পেতে নিশ্বাস পড়্‌ছে কি না, পরীক্ষা করতে লাগ্‌ল; পুত্রের হাত মাতার মুখে ঠেকে যেতেই মা চম্‌কে উ'ঠে চক্ষু ঈষৎ উন্মীলিত ক'রে অতি ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—কে? অনিল?

প্রাণের সাড়া পেয়ে যুবকের মুখ-চোখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ল; সে মাতাকে জীবিত দে'খে আশ্বস্ত ও প্রফুল্ল হয়ে বল্‌লে—না মা, আমি অনল।

মা আবার জিজ্ঞাসা করলেন—অনিল কি বাড়ীতে নেই?

অনল কি উত্তর দেবে ভেবে ইতস্ততঃ করছিল। যেন প্রশ্নটা এড়াবার জন্যই সে মার শয্যার পাশে মাটিতে ব'সে, একটা ভাঙা পাথর-বাটিতে মকরধ্বজ ও মৃগনাভি বেদানার রসের সহিত একটা জাঁতির ডাঁটি দিয়ে মাড়্‌তে

লাগ্‌ল। তা'র পর কি ভেবে বল্‌লে—অনিল বাড়ীতে আছে, আস্‌ছে।

মার চৈতন্য আবার আচ্ছন্ন হ'য়ে এল, তিনি আবার নিস্পন্দ হ'য়ে গেলেন। পুত্রের সম্বন্ধে সব আগ্রহ অচৈতন্যের ঘোরে ঢাকা প'ড়ে গেল।

অনল ক্ষিপ্রহস্তে ঔষধ মেড়ে হাতে ক'রে নিয়ে মার মুখের কাছে ঝুঁকে ডাক্‌লে—মা,......

মা আবার চম্‌কে উ'ঠে চোখ ঈষৎ মে'লে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—অ্যাঁ? অনিল এল?......

সেই ক্ষীণ কণ্ঠ থেকে আবার ব্যগ্র ঔৎসুক্যের স্বর বেজে উঠ্‌ল।

বিষণ্ণ মুখ ফিরিয়ে অনল বল্‌লে—অনিল আস্‌ছে, তুমি ততক্ষণ বেদানার রসটুকু খেয়ে নাও ত...

মুমূর্ষুর মুখে ম্লান ক্ষীণ হাসির একটু রেখা দেখা দিলে, তিনি বল্‌লেন—বেদানার রস? কোথায় পেলি অনল?

মার মুখে হাসির আভাস দে'খে অনলের দুই চোখ অশ্রুজলে ভ'রে উঠেছিল, সে রোদন সম্বরণ কর্‌বার চেষ্টা কর্‌তে-কর্‌তে বল্‌লে—তা আমি যেখানেই পাইনে কেন, তুমি খাও ত......

মুমূর্ষুর ক্ষীণ কণ্ঠেও দৃঢ়তার স্বর ধ্বনিত হ'ল—তুই নিজে উপোষ করে' আমাকে বেদানার রস খাওয়াচ্ছিস্, তোর প্রাণ শোষণ ক'রে কিনা আমাকে বাঁচ্‌তে হবে?......

অনল কোমল অথচ দৃঢ় স্বরে ভর্ৎসনার আভাস দিয়ে বল্‌লে—তুমি অত বোকো না, আমি যা দিচ্ছি লক্ষ্মী মেয়ের মতন খেয়ে ফেল ত। এতদিন তুমি আমাদের খাইয়েছ, আমরা ত জিজ্ঞাসা করিনি ঐ-সব খাবার তুমি কোথায় পেলে। এখন আমার খাওয়াবার পালা এসেছে, তুমি কিছু জিজ্ঞাসা কর্‌তে পাবে না।

অনলের মা দীর্ঘনিশ্বাস ফে'লে ঔষধটুকু খেয়ে বল্‌লেন —অনল, তোকে আমি পেটে ধরিনি; অনিল হবার আগেই তুই আমাকে মা ব'লে ডেকে মা হওয়ার আনন্দের আস্বাদ জানিয়েছিলি; অনিল হওয়ার পরেও আমি কোনো দিন তোর চেয়ে অনিলকে বেশী আপনার বা অধিক প্রিয় মনে কর্‌তে পারিনি; তুই বড় হ'য়ে উ'ঠে একাই আমার ছেলে-মেয়ে শ্বশুর-শাশুড়ী বাপ-মা—সকলের অভাব পূরণ করেছিস্......

মার মুখে নিজের প্রশংসা শু'নে অনল ব্যস্ত হ'য়ে কি ক'রে এই প্রসঙ্গ চাপা দেবে ভাব্‌ছিল, এমন সময় অনিল টেড়ি-কাটা সমাপ্ত ক'রে ফিট্‌ফাট্ বাবু হ'য়ে সেই ঘরে এসে প্রবেশ কর্‌লে। অনিলকে দে'খেই অনল ব'লে উঠ্‌ল—মা, অনিল এসেছে......

মা কম্পিত দুই হাত তু'লে দুই ছেলেকে ডাক্‌লেন—তোরা দুজনে আমার কাছে এসে দু-পাশে বোস্।

দুই পুত্র মার কোলের কাছে দু-পাশে গিয়ে বস্‌ল। মা দু-হাতে দুই ছেলের হাত ধ'রে অনিলের হাত অনলের হাতের উপর ধীরে-ধীরে রেখে বল্‌লেন—অনল, অনিলকে তোর হাতে দিয়ে যাচ্ছি, তুই একে দেখিস্।....তোকে বল্‌বার দর্‌কার ছিল না, তুই একে দেখ্‌বিই। কিন্তু অনিল ছেলেমানুষ, ওর বুদ্ধিশুদ্ধিও ভালো নয়, তোর কাছে ওর পদে-পদে অপরাধ ঘট্‌বে, ওর নির্ব্বুদ্ধিতা আর দুর্ব্বুদ্ধিতার জন্যে ও হয়ত অপকর্ম্মও ক'রে ফেল্‌বে, তোকে সেই-সব মার্জ্জনা ক'রে.........

অনল মাকে বাধা দিয়ে ব'লে উঠ্‌ল—মা, অনিল যে আমার ভাই, এ-কথা কখনো আমি ভু'লে যাবো ব'লে কি তোমার মনে হচ্ছে?

পুত্রের প্রচ্ছন্ন তিরস্কারে সচেতন হ'য়ে মা বল্‌লেন— না। আর আমি তোকে কিছু বল্‌ব না, তোকে কিছু বল্‌বার দর্‌কার নেই।...অনিল, তোকে আমি তোর দাদার হাতে-হাতে দিয়ে গেলাম, দাদার উপদেশ আর আদেশ মেনে চলিস্, মনে রাখিস্ মর্‌বার আগে তোদের মা তোকে এই অনুরোধ ক'রে যাচ্ছে।

অনিলের মা ঔষধের উত্তেজনায় এত কথা বল্‌তে পার্‌লেও তা'র প্রতিক্রিয়ায় একেবারে অবসন্ন হ'য়ে নিঃঝুম হ'য়ে পড়্‌লেন। ক্রমশঃই তাঁর অবস্থা খারাপ হ'তে লাগ্‌ল, মৃত্যু ধীরে-ধীরে তাঁকে গ্রহণ কর্‌ছিল।

অনিলের মন বাইরে যাবার জন্যে ছট্‌ফট্ কর্‌লেও মরণাপন্ন মাকে ফে'লে সে যেতে পার্‌ছিল না,—মায়ের প্রতি মমতার জন্য ততটা নয়, যতটা অনলের ভয়ে। তা'র এত যত্নের ও সাধের প্রসাধন ও সজ্জা যে নিরর্থক হ'ল এই

আপ্‌শোশে তা'র অন্তর ভরাট হ'য়ে উঠেছিল ব'লে তা'র মাতার বিচ্ছেদ-বেদনাও সেখানে স্থান পাচ্ছিল না। তাদের গ্রামের দু-ক্রোশ দূরবর্ত্তী বাসুন্দিয়া গ্রামের জমিদার প্রফুল্ল-বাবুর সখের থিয়েটারে সুশ্রী অনিল নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করে; সেই জমিদারের অনুগ্রহেই তাঁর পরিত্যক্ত বসন-ভূষণ ও প্রসাধন-দ্রব্য প্রসাদ পেয়েই অনিলের বিলাস-বাসনা চরিতার্থ হয়; আজ তাদের থিয়েটারের ড্রেস্‌রিহার্স'লি হবার কথা, আজকের দিনে আটক্‌ প'ড়ে অনিলের মন এমন বিরস ও মায়ের প্রতি বিরক্ত হ'য়ে উঠেছিল যে, মায়ের মৃত্যু-শোকের চেয়েও থিয়েটার কর্‌তে যেতে না পারার দুঃখ তা'র কাছে ক্রমে প্রবলতর হ'য়ে উঠ্‌ছিল। তা'র কেবলই মনে হচ্ছিল—সে যে এখনও গেল না, এতে বাবু না জানি কত বিরক্ত হচ্ছেন।

সেই রাত্রে অনিলের মার মৃত্যু হ'ল।

মাতার এই অসাময়িক মৃত্যুতে অনিল অত্যন্ত দুঃখিত ও বিরক্ত হ'ল। মা যখন তাদের ছেড়ে চ'লে গেলেন তখন প্রথমটা তাঁর বিয়োগব্যথাই তাকে আকুল করেছিল, কিন্তু সে ব্যথা অতি ক্ষণিক। তা সে সহজেই কাটিয়ে উঠ্‌ল। তা'র দুঃখ ও বিরক্তির কারণ হ'ল এই যে তা'র ইচ্ছাসত্ত্বেও লোকনিন্দার ও দাদার শাসনের ভয়ে সে এই অশৌচ অবস্থাতে থিয়েটার কর্‌তে পার্‌লে না, অধিকন্তু তা'র বহু কালের যত্নে পমেটম্‌ ও ল্যাভেণ্ডার-জলের সিঞ্চনে কুঞ্চিত আবর্ত্তিত কেশদাম নির্ম্মূল ক'রে মুণ্ডিত ক'রে ফেল্‌তে হ'ল। মাতৃশোক যখন সে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছে, তখনও তা'র এই শোক দূর হয়নি, কারণ চুল তা'র তখনও জেলখানার কয়েদীর কেশের চেয়ে দীর্ঘ নয়।

*

* *

বিমাতার মৃত্যুর সময় অনল কল্‌কাতায় এম্‌-এ আর আইন পড়্‌ছিল; আর অনিলের বয়স বেশী হ'য়ে গেলেও সে গ্রামের স্কুল উত্তীর্ণ হ'তে তখনও পারেনি।

থিয়েটার আর বিবিধ প্রসাধনের দিকে অনিলের মনোযোগ যতখানি ছিল, লেখা-পড়ার দিকে তা'র সিকিও ছিল না। বলাই বাহুল্য যে সে সেই বৎসর এণ্ট্রান্স্‌ পরীক্ষায় ফেল্‌ কর্‌লে। ঠিক সেই সময়ই হঠাৎ বাসুন্দিয়ার জমিদার প্রফুল্ল-বাবুর মৃত্যু হ'ল; কাজেই তাঁর সখের থিয়েটার আপনা হ'তেই ভেঙে লুপ্ত হ'য়ে গেল। সুতরাং অনিলের গ্রামে থাকার আর কোনো প্রলোভন রইল না। এই বৈচিত্র্যহীন জীবন তা'র কাছে অসহ্য হয়ে উঠ্‌ল। সে দাদাকে গিয়ে বল্‌লে—দাদা, এখানকার গেঁয়ো স্কুলে ভালো পড়া হয় না; এখানে থাক্‌লে পাশ হওয়া শক্ত হবে; আমি পড়্‌তে কল্‌কাতায় যাবো।

অনল ভাইয়ের মুখের দিকে ক্ষণকাল শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে অন্যমনস্কভাবে বল্‌লে—আচ্ছা।

এই ছোট্ট একটু আচ্ছার পিছনে যে কতখানি আত্মত্যাগ প্রচ্ছন্ন হ'য়ে ছিল, তা অনিল বুঝ্‌তে পার্‌লে না। অতটা অন্তর্দৃষ্টি থাক্‌লে এমন আব্দার সে কর্‌তে পার্‌ত না।

অনিল কল্‌কাতায় পড়্‌তে গেল, সঙ্গে-সঙ্গে অনল পড়া ছেড়ে দিয়ে বাড়ীতে এসে বস্‌ল; তাদের সামান্য জমি-জমা থেকে যা আয় হ'ত, তা থেকে অল্প কিছু নিয়ে আর নিজে দুবেলা প্রাইভেট ছেলে পড়িয়ে কিঞ্চিৎ উপার্জ্জন ক'রে অনল কল্‌কাতায় নিজের পড়ার খরচ চালা'ত। ভাই যখন কল্‌কাতায় পড়্‌তে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ কর্‌লে, তখন সে তা'কে 'না' বল্‌তে পার্‌লে না; সে নিজে কল্‌কাতায় পড়্‌ছে, ভাইয়ের কল্‌কাতায় পড়্‌বার ইচ্ছায় সে যদি বাধা দেয়, তা হ'লে ভাই তা'কে হয়ত স্বার্থপর ভাব্‌বে, এই মনে ক'রে, অনল ভাইয়ের প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ সম্মত হ'তে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু দুই ভাইয়ের কল্‌কাতায় পড়ার খরচ চালাবার মতন আয় তাদের ছিল না, আর অধিক উপার্জ্জন কর্‌বারও কোনো পথ অনল খুঁজে পেলে না। অনিল যে তা'র মতন ছেলে পড়িয়ে নিজের পড়ার খরচ চালাতে পারে এ-সম্ভাবনা অনলের মনে উদয়ই হ'ল না। তাই সে নিজের পড়া ছেড়ে দিয়ে খরচ কমিয়ে ভাইয়ের পড়ার খরচ যোগাতে প্রবৃত্ত হ'ল।

পৌষ মাস। দুপুর বেলা। অনল বাড়ীর রকে রৌদ্রে ব'সে নিজের ছেঁড়া কাপড়-জামাগুলো সেলাই কর্‌ছে। ছিন্ন বস্ত্রের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে শীতের বাতাস তা'কে

কাঁপিয়ে তোলে; মেরামৎ না করলে সেই কাপড়-জামায় শীত কাটানো অসম্ভব।

বড়দিনের ছুটিতে অনিল বাড়ীতে এসেছে। তা'র পরনে সুচিক্কণ ধুতি, গায়ে ভালো বনাতের বুক-খোলা কোট, গলায় রেশ্‌মী মাফ্‌লার, পায়ে চকচকে নূতন পাম্প্‌ শু। এই বিলাস-সজ্জার কতক জমিদার প্রফুল্ল-বাবুর উচ্ছিষ্ট প্রসাদের বকেয়া জের, আর কতক অনলের আত্ম-ত্যাগ ও স্নেহের দানের অপব্যবহার। অনিল বাইরে থেকে বেড়িয়ে এসে দাদাকে বল্‌লে—দাদা, আমি কাল কল্‌কাতায় যাবো।

অনল সেলাই ছেড়ে মুখ তু'লে অনিলের দিকে বিস্মিতভাবে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—কেন? এখনও ত চারদিন ছুটি বাকি আছে।

অনিল বল্‌লে—তা আছে, কিন্তু 'নিউ ইয়ারস্‌ ডে'-তে আলিপুরের জু-গার্ডেনে ফ্যান্‌সি ফেয়ার দেখ্‌তে যেতে হবে। কাল না গেলে দেরি হ'য়ে যাবে যে।

অনল একটা দীর্ঘনিশ্বাস চেপে কেবল বল্‌লে—আচ্ছা।

অনিল আবার বল্‌লে—আমার গোটা-দশেক টাকা চাই দাদা।

অনলের সেই একই উত্তর—আচ্ছা।

অনিল হয়ত অনলের মুখে একটা জিজ্ঞাসার ভাব প্রকাশ পেতে দেখেছিল, কিম্বা তা'কে প্রথম কল্‌কাতায় পাঠাবার সময় তা'র দাদা যে তিনটি মাত্র উপদেশ দিয়েছিল—অসৎ সঙ্গ ও প্রলোভন থেকে দূরে থেকো, অপব্যয় কোরো না, আর মন দিয়ে লেখাপড়া কোরো—সেই উপদেশ-তিনটি হয়ত এখন তা'র মনে প'ড়ে গেল; তাই একটা আকস্মিক লজ্জায় তা'র মনটা সঙ্কুচিত হ'য়ে উঠ্‌ল। 'ঠাকুর-ঘরে কে?' এই প্রশ্নের উত্তরে যে মহাপুরুষ 'আমি ত কলা খাইনি' ব'লে বাংলা প্রবচনের মধ্যে অমর হ'য়ে আছেন, তা'রই মতন তাড়াতাড়ি সে বল্‌লে—ফ্যান্‌সি ফেয়ারে আমাদের স্কুলের মাষ্টার মশায়রাও যাবেন; সেখানে দুদিন যেতে মোটে দু টাকা খরচ হবে; সকল বিষয় দেখা-শোনাও ত শিক্ষার অঙ্গ। আর বাকি টাকা দিয়ে এক জোড়া জুতো কিনব।

অনল এবার ভাইকে প্রশ্ন না ক'রে আর চুপ ক'রে থাক্‌তে পারলে না—তোমার ত তিন জোড়া জুতো—পাম্প্‌ শু, ব্রোগ আর চটি—নূতনই আছে; আবার জুতো কি হবে?

অনিল বল্‌লে—এক-জোড়া টেনিস্‌ শু কিন্‌তে হবে, এই টেনিস্‌ খেলার সিজ্‌ন্‌ এসেছে কি না।

অনল একটু কুণ্ঠিত স্বরে বল্‌লে—এই-সব জুতো প'রে খেলা যায় না?

অনিল দাদার মূর্খতায় মুচ্‌কি হেসে বল্‌লে—না, এ-সব জুতো প'রে খেলা দস্তুর নয়।

অনল ভাইয়ের নূতন জুতো কেনায় যে পরোক্ষ ঈষৎ আপত্তি উত্থাপন করেছে তা'র জন্যেই যেন লজ্জিত-কুণ্ঠিত হয়ে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলে—তা হ'লে ত একটা টেনিস্‌ র‍্যাকেটও কিন্‌তে হবে?

দাদার এই প্রশ্ন শু'নে অনিল মনে করলে দাদা অধিক ব্যয়ের ভয়ে এই প্রশ্ন করছে; তাই সে একটু বিরক্তস্বরে বল্‌লে—না, আমি র‍্যাকেটের টাকা চাইনে, আমি একটা র‍্যাকেট জোগাড় ক'রে এসেছি।

অনিলের কথা শু'নে অনল আশ্বস্তও হ'ল, সঙ্গে-সঙ্গে ব্যথিতও হ'ল; সে যে ভাইয়ের নির্দ্দোষ খেলার জন্যে একটা র‍্যাকেট জোগাতে পরাঙ্মুখ ও অপারক এই কথা মনে হওয়াতেই অনল নিজের কাছে কুণ্ঠিত ও অপরাধী হ'য়ে ব্যথিত হয়ে উঠ্‌ল। সে তাড়াতাড়ি উঠে নিজের বাক্‌স খু'লে দেখ্‌লে তা'তে তেরটি টাকা আছে; এই টাকা সে নিজের এক-জোড়া কাপড় জামা ও জুতো কেন্‌বার জন্যে অনেক কষ্টে সঞ্চয় ক'রে তুলেছিল। সেই তেরটি টাকাই বাক্‌স থেকে সে বার ক'রে নিলে। টাকা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আস্‌তেই ঘরের সাম্‌নের একপাশে স্থানে-স্থানে-তালি-মারা সেলাইয়েরও-অতীত-হ'য়ে-ছিঁড়ে-যাওয়া ধূলায় ধূসর নিজের একমেবাদ্বিতীয়ম্‌ জুতা-জোড়ার উপর নজর পড়্‌ল; সেদিক্‌ থেকে সে তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বাইরে এসে অনিলের হাতে সেই তেরটি টাকাই স'পে দিলে এবং মনে-মনে সঙ্কল্প করলে—যেমন ক'রেই হোক অনিলকে একটা টেনিস্‌র‍্যাকেট কি'নে দিতে হবে; এই র‍্যাকেট তা'র নিতান্ত প্রয়োজন, অথচ অনিল অভিমান

ক'রে বা অন্ত যে কারণেই হোক্ এই প্রয়োজনীয় সামগ্রীটি যে তা'র কাছে চায়নি এর বেদনা তা'র অন্তরকে পীড়িত ক'রে তুল্ছিল। তা'র কেবলই মনে হ'তে লাগ্ল যে, চাওয়ার অতিরিক্ত যদি না দিতে পারি তা হ'লে অনিলের প্রতি আমার সমস্ত স্নেহই ত মিথ্যা ; তা'র স্নেহ যে মিথ্যা নয় তা নিজের কাছেই প্রমাণ কর্বার জন্যে অনল চঞ্চল হ'য়ে উঠ্ল। সঙ্গে-সঙ্গে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের 'পণরক্ষা' গল্পের বংশী ও রসিকের কথা মনে হ'য়ে অনলের মন কেমন শোকাচ্ছন্ন হ'য়ে পড়্ল।

অনল জুতো-জামা পরা ছেড়ে দিয়ে নিজের খরচ কমিয়ে ফেল্লে ; আহারের বাহুল্যও সে ত্যাগ করলে। কিন্তু এর পরেও সে হিসাব ক'রে দেখ্লে যে, একটি টেনিস্-র‍্যাকেট কিন্বার মতন টাকা জমতে এতদিন লাগ্বে যে ততদিনে এবারকার টেনিস্ খেলার সিজ্ন্ ফুরিয়ে শেষ হ'য়ে যাবে। তখন অনলের হঠাৎ মনে পড়্ল এবার সে প্রাইভেট এম্-এ পরীক্ষা দেবে ব'লে ফি-এর কতক টাকা সংগ্রহ ক'রে বাক্সর একেবারে তলায় যেন নিজের লুব্ধ দৃষ্টির অগোচরে লুকিয়ে রেখেছে। কিন্তু সেও ত অতি সামান্য, সেই কয়েক টাকায় ত ভালো টেনিস্ র‍্যাকেট পাওয়া যাবে না! অনল পরীক্ষা দেবার সঙ্কল্প ছেড়ে দিয়ে কোথাও একটি চাক্‌রি সংগ্রহ কর্বার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্ল, ভাইকে একটা সামান্য খেল্না যদি সে না দিতে পারে, তবে কিসের তার ভালোবাসা?

অনলের ভাগ্যক্রমে একটা চাকরিও চট্ ক'রে জুটে গেল ; অনিলের মুরুব্বি বাসুন্দিয়া গ্রামের জমিদার প্রফুল্ল-বাবুর মৃত্যুর পর তাঁর জমিদারি কোর্ট্ অব ওয়ার্ড্‌সের অধীনে রাখ্বার জন্যে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্ ইচ্ছা জানিয়েছেন। জমিদারের স্ত্রী চেষ্টা করছেন যাতে জমিদারি কোর্ট্ অব ওয়ার্ড্‌সের অধীনে না যায় ; এই সূত্রে ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে চিঠি লেখালেখি কর্বার জন্যে একজন ইংরেজি ও আইন জানা লোকের আবশ্যক হয়েছিল। অনল এইকথা লোক-পরম্পরায় শুন্বা-মাত্রই বাসুন্দিয়ার জমিদারের প্রবীণ দেওয়ান রাজকুমার-বাবুর সঙ্গে গিয়ে দেখা করলে এবং মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনের এই চাক্‌রিটি সংগ্রহ ক'রে উৎফুল্ল হ'য়ে বাড়ী ফিরে এল।

১৭ই পৌষ ১লা জানুয়ারী অনল জমিদারী সেরেস্তার গোমস্তার কাজে নিযুক্ত হ'ল। নিযুক্ত হ'য়েই সে কথা-প্রসঙ্গে তার সহকর্মীদের কাছ থেকে জেনে নিলে, তা'রা বাংলা-মাস হিসাবে মাইনে পেয়ে থাকে, না ইংরেজী মাস হিসাবে। যখন সে শুন্‌লে যে বাংলা মাস হিসাবেই তাদের মাইনে দেওয়ার রীতি, তখন তা'র আনন্দও হ'ল চিন্তাও হ'ল—আর চৌদ্দ-পনের দিন পরে সে মাইনে পাবে ভেবে তা'র যেমন আনন্দও হ'ল, তেমনই তের দিনের বেতন যা সে পাবে তা'তে অনিলের জন্যে র‍্যাকেট কেনা কেমন ক'রে হবে ভেবে সে চিন্তিত এবং বিমর্ষও হ'য়ে উঠ্ল। সে হিসাব ক'রে দেখ্লে, এই তের দিনের মাইনে সে ২২।৶১০ আনা পাবে ; আরো এতগুলি টাকা হ'লে তবে একখানি ভালো র‍্যাকেট হয়।

মাসকাবারে মাইনে পেয়েই অনল দেওয়ান রাজকুমার-বাবুর কাছে একদিনের ছুটি নিয়ে কল্‌কাতা রওনা হ'ল। তার মাইনের সব-টাকা, নিজের একজামিনের ফি-এর জন্য সামান্য সঞ্চয় এবং প্রজাদের বাড়ীতে প্রত্যহ হাঁটা-হাঁটি ক'রে আদায়-করা কিছু খাজনা একত্র ক'রে মোট বায়ান্ন টাকা পৌনে তের আনা ট্যাঁকে গুঁজে সে কল্‌কাতায় গেল, নিজে একটি র‍্যাকেট কি'নে নিজের হাতে অনিলকে দিয়ে তার প্রফুল্লতাটুকু দে'খে আস্‌বে ব'লে।

কল্‌কাতায় পৌঁছে পথ থেকে একটা র‍্যাকেট কি'নে নিয়ে অনল অনিলের মেসে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। অনল দূর থেকেই দেখ্লে, অনিল মুখ ম্লান ক'রে তা'র কেওড়া-কাঠের তক্তপোষের উপর চুপ ক'রে ব'সে কি ভাবছে। দাদাকে কোনো খবর না দিয়ে অকস্মাৎ এসে উপস্থিত হ'তে দে'খে অনিল মুখ আরো বিষণ্ণ ও বিরক্ত ক'রে তাড়াতাড়ি উ'ঠে দাঁড়াল। অনল অনিলের মুখের বিষণ্ণতা লক্ষ্য ক'রেও তা'কে মোটে আমল দেয়নি, কারণ অনিলকে তৎক্ষণাৎ প্রফুল্ল ক'রে তোল্‌বার সোনার কাঠি সে ত সংগ্রহ ক'রে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছে। অনল ঘরে ঢু'কে ঘরে আর কেউ নেই দে'খে আরো খুশী হ'য়ে হাসিমুখে বল্‌লে—এই দেখ্ অনিল, তোর জন্যে কি নিয়ে এসেছি!

অনল হাত বাড়িয়ে র‍্যাকেটখানা অনিলের সাম্‌নে ধর্‌লে।

অনিলের মুখে হর্ষ বা সন্তোষের একটু চিহ্নও ফু'টে উঠ্‌ল না,সে র‍্যাকেট খানা নিয়ে একটা অতি তুচ্ছ সামগ্রীর মতন তক্তপোষের একপাশে রেখে দিলে। দাদার অসাধারণ আত্মত্যাগে মহীয়ান্ ও অমূল্য সেই স্নেহ-নিদর্শনটির প্রতি লক্ষ্য না ক'রেই অনিল ব'লে উঠ্‌ল—দাদা, তুমি এসেছ ভালোই হয়েছে, আমি তোমার কথাই ভাব ছিলাম·········

অনিল তা'র স্নেহ-উপহারকে উপেক্ষা করাতে অনলের মনে যে দুঃখ জেগে উঠ্‌তে পারৃত, তা আত্মপ্রকাশ করৃবার অবকাশই পেলে না; এমন সামগ্রী উপহার পেয়েও অনিলের আনন্দ না হওয়াটা অনলের কাছে এমন অস্বাভাবিক বিসদৃশ বোধ হয়েছিল যে তা'র বিস্ময় ও কৌতূহল সমস্ত মন জু'ড়ে ফে'লে দুঃখকে সেখানে আমলই পেতে দিলে না। বিস্মিত আশাহত অনল অনিলকে জিজ্ঞাসা করৃলে—তোর কি হয়েছে রে?

অনিল মাথা নীচু ক'রে মুখ ভার ক'রে বল্‌লে—আমি টেস্‌ট্‌ একজামিনেশনে ফেল্ করেছি; আমাকে অ্যালাও করে নি······

অনেকখানি আনন্দ পাবার আশায় একদিনের জন্য অনল দেশ ছেড়ে এসেছিল। এসেই এমন দুঃসংবাদে তা'র মনটা অত্যন্ত দ'মে গেল; তবু সে মুখে উৎসাহ ও আশ্বাস দিয়ে বল্‌লে—তা'তে আর কি হয়েছে? আর-এক বছর ভালো ক'রে পড়ো·········

অনিল এবার মাথা তু'লে দৃঢ়স্বরে বল্‌লে—আমি এখানে আর পড়্‌ব না·········

অনল বিস্মিত হ'য়ে অনিলের মুখের দিকে চেয়ে রইল; দেশে পড়ার অনিচ্ছা হওয়াতে অনিল গত বৎসর কল্‌কাতায় এসেছিল; এবার আবার কল্‌কাতা ছেড়ে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিতে আর কোন্ দেশে যে অনিল যেতে চাইবে তা ঠিক আন্দাজ করৃতে না পেরে অনল অবাক্ হ'য়ে রইল।

অনিল বল্‌তে লাগ্‌ল—আমি আমেরিকায় যাবো······

অনিলের চাঁদ-চাওয়া অসম্ভব আকাঙ্ক্ষা শু'নে অনল আশ্চর্য্য হ'য়ে ব'লে উঠ্‌ল—আমেরিকায় যাবে? কল্‌কাতার পড়ার খরচই জোগাতে পারা যায় না, আমেরিকার খরচ জোগাড় হবে কোথা থেকে?

অনিল বল্‌লে—ভারতবর্ষের অনেক ছেলে ত সেখানে গিয়ে নিজে উপার্জ্জন ক'রে লেখা-পড়া শিখ্‌ছে।

অনল মনে-মনে অবিশ্বাসের হাসি হেসে ব'লে উঠ্‌ল—"কে? তুমি নিজে উপার্জ্জন ক'রে লেখাপড়া শিখ্‌বে?" কিন্তু মুখে প্রকাশ্যে সে বল্‌লে—কিন্তু সেখানে গিয়ে পৌছতেও ত পাথেয় ও পুঁজিতে অন্তত হাজার-খানেক টাকা চাই?

অনিল ব'লে উঠ্‌ল—আমাদের বাড়ী আর জমি-জায়গায় আমার অংশ আমাকে ভাগ ক'রে দিন, আমি তাই বেচে পুঁজি ক'রে নিয়ে জাহাজের খালাসী কি খান্‌সামা যা-হয়-কিছু-একটা হ'য়ে যাবোই যাবো······

অনিলের মুখে সর্ব্বাগ্রে সম্পত্তি-ভাগের প্রস্তাব শু'নে অনল মর্ম্মাহত হ'ল। কিন্তু মুখে বল্‌লে—কোনো কাজই ক্ষণিক উত্তেজনার বশীভূত হয়ে হঠাৎ করা উচিত নয়। শান্ত হ'য়ে কিছুদিন ভেবে-চিন্তে দেখ, তা'র পর যা ভালো মনে হয় কোরো।

অনিল অসহিষ্ণুভাবে ব'লে উঠল—আমি পনর দিন ধ'রে এই কথাই কেবল ভাব্‌ছি, এ আমার স্থির সঙ্কল্প। এ'র নড়্‌চড়্‌ নেই।

অনল বল্‌লে—আচ্ছা, আমি মোটে একদিনের ছুটি নিয়ে এসেছি, আমাকে আজ‌কেই ফি'রে যেতে হবে। তুমিও কেন আমার সঙ্গে চলো না? তোমার ত এখানে আর কোনো কাজ নেই?

অনিল বল্‌লে—আমাকে যাবার উপায় খুঁজে বা'র করৃতে হবে। এখন আমি এখান থেকে কোথাও যেতে পারৃব না।

অনল বল্‌লে—আচ্ছা, আমি শিগ্‌গীর একদিন এসে তোমার সঙ্গে দেখা করৃব।

অনল তখনই অনিলের মেস থেকে বিদায় হ'ল; অনিল দাদাকে একটু বিশ্রাম করৃতেও বল্‌লে না, তা'র খাওয়া হয়েছে কি না এবং এখন সে কোথায় যাবে তাও জিজ্ঞাসা করৃলে না।

অনল বাড়ী ফি'রে গেল। তা'র সকল কাজের মধ্যে

মনের ভিতর কেবল এই কথাই ঘু'রে-ঘু'রে উদিত হচ্ছিল যে, অনিল তা'র সঙ্গে বিষয় ভাগ ক'রে নিতে চেয়েছে।

দিন পনর পরে অনল আবার কল্‌কাতায় এসে অনিলের সঙ্গে দেখা কর্‌লে, এবং অনিলকে কিছু না ব'লে তা'র হাতে একখানা কাগজ দিলে।

অনিল দেখ্‌লে সেই কাগজখানা একখানা রেজেস্টারি-করা দলিল। অনিল কৌতূহলী হ'য়ে সেই দলিলের ভাঁজ খুল্‌তে খুল্‌তে অন্যমনস্কভাবে অনলকে জিজ্ঞাসা কর্‌তে লাগ্‌ল—সম্পত্তি ভাগ-বাটোয়ারার দলিল বুঝি?

অনল শুধু বল্‌লে—হুঁ।

অনলের উত্তর শু'নে অনিলের মন বিরস বিরক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল; সে মনে-মনে ভাব্‌তে লাগ্‌লে—দাদার কি অন্যায় ধূর্ত্তামি! আমাদের কি-কি বিষয় আছে তা আমাকে একবার জানালে না! আমাকে যৎকিঞ্চিৎ দিয়ে একেবারে ফাঁকি দিয়ে সার্‌বার মত্‌লব! ধাপ্পা-বাজিতে ঠক্‌বার পাত্র অনিল নয়!......

দলিল খানিকটা পড়্‌তে-পড়্‌তেই অনিলের মুখের ভাব একেবারে বদ্‌লে গেল কিন্তু; তা'র মুখে আনন্দ, বিস্ময়, লজ্জা ও সম্ভ্রম একসঙ্গে খেলা কর্‌তে লাগ্‌ল। সে দলিল প'ড়ে দেখ্‌লে, তা'র দাদা পৈতৃক সম্পত্তির নিজের ভাগ সমস্তই ভাই অনিলকে সুস্থশরীরে স্বচ্ছন্দচিত্তে দান করেছেন, এতে যদি কখনো তিনি নিজে বা তাঁর স্থলাভিষিক্ত অপর কেউ বা তাঁর ওয়ারিশানেরা দাবি-দাওয়া করে, তবে তা বাতিল ও না মঞ্জুর হবে।

অনিল দলিল পড়া শেষ ক'রেও কোনো কথা বল্‌তে পার্‌লে না, মুগ্ধ দৃষ্টিতে দাদার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল; তা'র ইচ্ছা কর্‌ছিল দাদার পায়ের উপর লুটিয়ে প'ড়ে একটি প্রণাম করে; কিন্তু তা'র সেই আচরণ দাদার কাছে স্বার্থ-সিদ্ধির আনন্দ ব'লে প্রতিভাত হ'তে পারে মনে ক'রে সে ক্ষান্ত হ'য়ে রইল।

অনল অনিলের আনন্দ ও লজ্জায় লাল মুখের দিকে তাকিয়ে স্নিগ্ধকণ্ঠে বল্‌লে—আমাদের যা-কিছু আছে সব তোমার। এই সমস্তই এত সামান্য যে তা'তে তোমার আমেরিকায় যাবার খরচ কুলানো দুষ্কর। তুমি যদি আর একটা বছর অপেক্ষা ক'রে আমাকে সময় দাও, তা হ'লে আমি দিবারাত্রি প্রাণপণ পরিশ্রম ক'রে কিছু টাকা রোজ্‌গারের চেষ্টা দেখ্‌তে পারি।

অনিল প্রফুল্লমুখে বল্‌লে—আমার টাকার দর্‌কার নেই দাদা, আমি বাঙালী-পল্টনে ভর্ত্তি হয়েছি, শিগ্‌গীরই মেসোপটেমিয়া রওনা হবো।

অনল চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে ব'লে উঠ্‌ল—অ্যাঁ! বলিস্ কি! করেছিস্ কি? এর আগে আমাকে একবার জিজ্ঞাসাও কর্‌লিনে? মা যে তোকে আমার হাতে স'পে দিয়ে গেছে, তোর প্রাণের উপর ত তোর আর কোনো অধিকার ছিল না, অনধিকারে তুই এমন কাজ কেন কর্‌লি?...

অনলের বড়-বড় চোখ দিয়ে বড়-বড় ফোঁটায় অশ্রুপাত হ'তে লাগ্‌ল।

অনিল দাদার চোখের জল দে'খে আর কাতর বাক্য শু'নে প্রীত ও লজ্জিত হ'য়ে বল্‌লে—ভয় কি দাদা? এত লোক যে যুদ্ধে যাচ্ছে সবাই ত আর মর্‌বে না। বড়-বড় যুদ্ধে যত লোক মারা যায় তা'র চেয়ে বেশী লোক মারা যায় বাংলা দেশের ম্যালেরিয়ায় কিংবা সাপের কামড়ে।

অনিল দাদাকে সান্ত্বনা দিলে বটে, কিন্তু দাদার স্নেহের পরিচয় পেয়ে তা'রও মনটা উদ্বিগ্ন হ'য়ে গেল।

(ক্রমশঃ)

কারখানাবাদী ও স্বাচ্ছন্দ্যবাদী

শ্রী অশোক চট্টোপাধ্যায়

যে-কোনো প্রতিষ্ঠানের রূপ ভালো করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলে তাহার ভিতর দুইজাতীয় উদ্দেশ্যের প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়:—একটি যথার্থ, সত্য, প্রধান বা মূল উদ্দেশ্য এবং অপরটি আনুষঙ্গিক, সুবিধাগত, প্রথাগত

বা উপ-উদ্দেশ্য। কলিকাতার ট্রামগাড়ীগুলির সত্য, প্রধান বা মূল উদ্দেশ্য যাত্রীদিগকে শীঘ্র স্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া। গাড়ীর বর্ণ অথবা তাহার চালকের মস্তকের টুপির আকার এ-সবই আনুষঙ্গিক, সুবিধা বা প্রথাগত ব্যাপার। ট্রামগাড়ীর গতির প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া যদি কেহ তাহাদের আকার, বর্ণ অথবা অপর কোনো বৈচিত্র্যে মগ্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে ট্রামগাড়ীর সত্য উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে সে-ব্যক্তির প্রকৃষ্ট জ্ঞানের অভাব আছে। ধর্ম্মমন্দিরের প্রধান উদ্দেশ্য পূজা। যদি কোনো স্থলে মন্দিরে পূজার ব্যবস্থা না করিয়া কেহ তাহার স্থাপত্য অথবা ভিতরের কারু-কার্য্যের জন্যই প্রাণপাত করে, তাহা হইলে ধর্ম্মমন্দিরের সত্য উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান মাত্রেরই প্রধান উদ্দেশ্য, মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করা। যদি কোনো অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান এই উদ্দেশ্য-সাধনে সক্ষম না হয়, তাহা হইলে তাহার অপর গুণ বা সৌন্দর্য্য থাকিলেও অর্থনৈতিক দিক্ দিয়া তাহার কোনো মূল্য আছে বলা চলিবে না।

ধরা যাউক, একজন ব্যবসাদার জঙ্গলে লোক পাঠাইয়া নানা-প্রকার গাছ কাটিবার ও সেইসকল গাছ হইতে তক্তা তৈয়ারী করাইয়া কলিকাতায় বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করেন। এই ব্যবসায় হইতে তাঁহার যথেষ্ট লাভ হয়। নতুবা তিনি কখনই এ-ব্যবসায় করিতেন না। তাঁহার নিজের ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্যের দিক্ দিয়া দেখিলে এই ব্যবসায় যত চলে ততই মঙ্গল; কিন্তু যদি দেখা যায় যে-জঙ্গলে যে-সকল শ্রমজীবী গাছ কাটিবার জন্য যায়, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই জ্বর অথবা জানোয়ারের হস্তে প্রাণ দিতেছে, এবং যাহারা বা বাঁচিয়া যাইতেছে তাহারাও উপযুক্ত খাওয়া, পরা ও বেতন পাইতেছে না; তাহা হইলে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের দিক্ দিয়া সেই কাঠের ব্যবসায়ের মূল্য খুবই কম বলিতে হইবে।

ব্যক্তিগত ও ক্ষুদ্রগণ্ডীগত স্বাচ্ছন্দ্য এবং সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য, এই দুইএর মধ্যে বিশেষ একটা পার্থক্য আছে। সে পার্থক্য প্রকৃতিগত নহে, শুধু পরিমাণগত; অর্থাৎ ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্য যেভাবে যেসকল অবস্থার উপস্থিতিতে বর্ত্তমান থাকে, সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যও ঠিক সেইভাবে ও সেইসকল অবস্থার উপস্থিতিতেই উৎপন্ন হয়; প্রভেদ এই যে, প্রথম ক্ষেত্রে অবস্থাগুলি কেবলমাত্র ব্যক্তিতে নিবিষ্ট, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তাহা সমস্ত সমাজে ব্যাপ্ত।

স্বাচ্ছন্দ্য আসে নানা-প্রকার জিনিষের ভিতর দিয়া। মানুষকে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকিতে হইলে তাহার উপযুক্ত খাদ্য, বস্ত্র, আবাস, অবকাশ, বন্ধু-বান্ধব-পরিবার-পরিজন, স্বাধীনতা, সম্মান ইত্যাদির প্রয়োজন আছে। এইসকলের অভাবে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব ঘটে। কোনো অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সামাজিক মূল্য বিচার করিতে হইলে দেখিতে হইবে, সেই প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য বাড়িল কতটা এবং কমিলই বা কতটা। সেই প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিগত বা ক্ষুদ্র গণ্ডীগত মূল্য এবং তাহার সামাজিক মূল্য যে বিভিন্ন একথা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে। অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানমাত্রেরই মূল, সত্য বা প্রধান উদ্দেশ্য সামাজিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বর্দ্ধন, সুতরাং কোনো অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান সামাজিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সাধন না করিয়া অন্য কোনো গুণবাহুল্য দেখাইলে আমরা তাহাকে অর্থনৈতিক দিক্ দিয়া নির্ব্বিবাদে বর্জ্জন করিতে পারি।

বর্ত্তমান কালে ভারতের সর্ব্বত্রই ইন্‌ডাস্‌ট্রিয়াল্ প্রোগ্রেস্, ইন্‌ডাস্‌ট্রিয়ালিজ্‌ম্ অথবা কার্‌খানাবাদ একটা বিশেষ ধর্ম্মমতের মতোই সকলের বাক্যে ও মনে দ্রুত বাড়িয়া উঠিতেছে। ইহার প্রধান কারণ আমাদের অর্থনৈতিক দৈন্য ও ভারতবর্ষকে ইংরেজের গত দুই শতবর্ষ ধরিয়া শুধু কাঁচামাল সরবরাহ করিবার জন্য বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা। বর্ত্তমানের ইন্‌ডাস্‌ট্রিয়ালিজ্‌মের জয়ঢাক অবশ্য শুধু ভারতীয়ের হস্তে বাজিতেছে না, ইংরেজই তাহার প্রধান বাদ্যকর। ইংরেজের এই মত-পরিবর্ত্তনেরও কারণ আছে। ইংরেজ এখন এমন অবস্থায় পড়িয়াছে যে, সে মত পরিবর্ত্তন না করিলে তাহার নিজেরই "অবস্থা"-পরিবর্ত্তনের বিশেষ ভয় আছে; সুতরাং ভারতে ইংরেজ ইতিহাসে আবার একবার "ফিট অভ্ জেনেরসিটি" অথবা বদান্যতার তড়্‌কার (নামটা শুনিতে খারাপ কিন্তু ব্যাপারটা তদপেক্ষাও খারাপ) আবির্ভাব হইয়াছে। দুই-

শত বর্ষ ধরিয়া শুধু "চাষ কর আনন্দে, তোমরা চাষ কর আনন্দে" এই বাণী অনর্গল বর্ষণ করিয়া ইংরেজ আমাদের মনে এমন একটা "চাষ-প্রীতির সঞ্চার করিয়াছে যে, এখন "ফ্যাক্টরী-গঠনেই মুক্তি" এইকথা ইংরেজ-মুখপ্রসূত হইলেও আমরা আমাদের বহুদিনের রুদ্ধ মনোবৃত্তিগুলিকে স্ফূর্ত্তি দিবার জন্ম তাহাই ধ্রুব সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছি।

ইয়োরোপের বর্ত্তমান অবস্থা যে-প্রকার তাহাতে সম্ভাবী শত্রুর এয়ারোপ্লেন ও কামানের এলাকার মধ্যে কোনো-প্রকার ধন-সম্পত্তি না রাখাই বাঞ্ছনীয়। ইয়োরোপের পশ্চিমের দেশগুলির প্রায় প্রত্যেকটিই কারখানা চালাইয়া অর্থোপার্জ্জন করে। এইসকল কারখানাই ঐ দেশগুলির প্রধান সম্পদ্। তাহারা এইসকল কারখানাতে প্রস্তুত দ্রব্য-সম্ভার এসিয়া ও আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে বিক্রয় করিয়া পরবর্ত্তী স্থানগুলিরই কাঁচামাল আহরণ করিয়া জাতীয় ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিয়া থাকে। কারখানাগুলি গোলা বা বোমার সাহায্যে শত্রুপক্ষ যে-কোনো মুহূর্ত্তে উড়াইয়া দিতে পারিলে এইসকল দেশের প্রভূত ক্ষতির সম্ভাবনা। সুতরাং যদি কোনো উপায়ে কারখানাগুলি সম্ভাবী যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বহুদূরে স্থাপন করা যায় তাহা হইলে এইসকল বণিগ্‌ধর্ম্মী জাতিদের বিশেষ সুবিধা হয়।

ইংরেজজাতির সম্বন্ধে উপরের কথাগুলি বিশেষরূপে প্রযোজ্য। ইংরেজজাতি-সম্বন্ধে ইহা ছাড়া আর-একটি কথা বিশেষ করিয়া ভাবিবার আছে। ইংলণ্ড একটি দ্বীপ এবং তাহার জনসংখ্যার পরিমাণে সেই দ্বীপে স্বদেশসম্ভূত খাদ্যসামগ্রীর বিশেষ অভাব। আজকালকার যুদ্ধের-অবস্থা এরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, কোনো দ্বীপের পক্ষে বাহির-হইতে-আমদানি-করা খাদ্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকা আত্মহত্যার শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়াও ধরা যাইতে পারে। সুতরাং ইংলণ্ড এখন প্রাণরক্ষার জন্যই দেশের মধ্যে চাষ-বাস করিয়া যথেষ্ট খাদ্য উৎপাদন করিতে চায়। একদিকে দেশের মূলধন (অর্থাৎ কারখানা, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি) শত্রুপক্ষের গোলার এলাকার বাহিরে রাখা ও অপর দিকে দেশের চাষ-আবাদ বৃদ্ধি করা; এই দুইটি প্রয়োজনের ধাক্কায় পড়িয়া ইংলণ্ড আজকাল যাহাতে তাহার ধন-সম্পত্তি উপনিবেশে ও সাম্রাজ্যের অন্যান্য স্থলে রক্ষিত হয় এবং যুদ্ধ হইতে দেশে খাদ্যের অভাব না ঘটে তাহার বিশেষ চেষ্টা করিতেছে। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে যে কারখানাবাদের প্রচার-চেষ্টা হইতেছে তাহার মূলেও যে ইংরেজের শাশ্বত "জেনেরসিটি" নাই তাহা নহে। অবশ্য ইংরেজের উপকার হইলেই যে, আমাদের ক্ষতি হইতেই হইবে এমন কোনো কথা নাই। কিন্তু এইরূপ হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশী। কারণ উপকার জিনিসটা কেহ বিশেষ করিয়া চেষ্টা না করিলে কাহারও হয় না, এবং এ-সকল ক্ষেত্রে ইংরেজের নিজের স্বার্থ বজায় রাখিবার চেষ্টার ফলে আমাদের উপকার না হইলে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। ইংরেজ আমাদের অপকার করিবে, এ-কথা প্রমাণ করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, তবে ইংরেজের পক্ষে ভারতীয় কারখানাবাদের সমর্থন স্বার্থ-বিরুদ্ধ নহে, এইকথা মনে রাখা প্রয়োজন।

প্রত্যেক জাতির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের আদর্শের মধ্যে কতকগুলি বিশেষত্ব দেখা যায়। এই বিশেষত্ব জাতির প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক নানান্ অবস্থার উপর নির্ভর করে। যথা, ইংলণ্ডের মতো শীতপ্রধান ও অহিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী দেশের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য পশম ও গো-মাংসের যেরূপ প্রয়োজনীয়তা, ভারতের পক্ষে সেইসব দ্রব্যের সেইরূপ প্রয়োজনীয়তা আশা করা যায় না। চির-স্বাধীন ও ব্যক্তিত্ববাদী দেশে স্বাচ্ছন্দ্যের দিক্ দিয়া শুধু হুকুম তামিল করিয়া জীবন অতিবাহন করা যতটা কষ্টকর হইবে, চাকর ও প্রভুর সম্পর্কীয় ব্যবস্থা যে-দেশে বহুকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে সে-দেশে তাহা ততটা দুঃসহনীয় হইবে না। দৈহিক ও অপর-প্রকার পরিচ্ছন্নতা যে দেশে যতটা আদৃত হয়, সে-দেশে আধুনিক ফ্যাক্টরী জীবন (কুলি লাইন ইত্যাদি এই জীবনের সহিত অচ্ছেদ্যবন্ধনে বাঁধা) তত অসুখের কারণ হইবে। শান্তিপ্রিয় ও পারিবারিক সুখের জন্য সতত লালায়িত যে জাতি, সে-জাতির পক্ষে সহরের উত্তেজনা ও পরিবারবিচ্ছিন্ন জীবনযাত্রা অস্বাচ্ছন্দ্যময় হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, একটা জাতির সভ্যতা, আদর্শ, ধর্ম্ম, ইতিহাস, রীতিনীতি ইত্যাদি সকল

কিছু উত্তমরূপে দেখিয়া তৎপরে বলা যায় যে, সেজাতির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কি-প্রকার অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা-প্রণালী সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ। অবশ্য সভ্যতা আদর্শ রীতিনীতি—এ-সকলের কোনোটিই অপরিবর্ত্তনীয় নহে। তবে এ-সকল ক্ষেত্রে পরিবর্ত্তন সময়সাপেক্ষ।

ভারতবর্ষের আদর্শ ও সভ্যতা বিশেষরূপে পারিবারিক শান্তিময় ও ব্যক্তিত্ব-প্রধান। ভারতবাসীর নিকট সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বলিতে ঐশ্বর্য্য-সম্ভার যে বুঝায় না তাহা নহে। উপযুক্ত খাদ্য, বাসস্থান, বস্ত্র, অবকাশ, শিক্ষা ইত্যাদি ব্যতীত কোনো জাতিই সুখী হইতে পারে না, কিন্তু শুধু বাস্তব ঐশ্বর্য্য হইলেই যে সুখ হয় না, একথা ভারতবাসী যতটা পরিষ্কাররূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে, অন্যান্য জাতিরা ততটা করে নাই। অর্থাৎ ভারতবাসী **যে-কোনো উপায়ে** ঐশ্বর্য্যশালী হইলেই সুখী হইবে না।

যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ—অঙ্ক শাস্ত্রের এই চারিটি নিয়মের মধ্যে ভারতবাসী তাহার মন যোগ ও বিয়োগে নিবিষ্ট করিয়াছে, পাশ্চাত্যের মানুষ করিয়াছে গুণ ও ভাগে। অর্থাৎ ভারতবাসী তাহার জীবনে শ্রেয় যাহা, তাহার অনন্ত বৈচিত্র্যের প্রত্যেকটি কণাকে ক্রমশঃ একত্র গ্রথিত ও যুক্ত করিতে ও হেয় যাহা, তাহা হইতে জীবনকে ক্রমশঃ বিযুক্ত করিতে চায়। শ্রেয় এবং হেয় কি, তাহার বিচারে আদর্শ ভারতবাসীর জীবনের অনেকখানি সময় নিযুক্ত হয়। পাশ্চাত্যের মানুষ যাহা পায় তাহাই গুণ করিয়া বাড়াইতে চায়। "আরো চাই, আরো চাই" ইহাই অধুনা পাশ্চাত্যের বাণী এবং আরো পাইলে তাহার বিভাগই (কে কতটা পাইবে) অধুনা পাশ্চাত্যের সমস্যা। যাহা পাইলাম তাহা পাইবার উপযুক্ত জিনিষ কি না, এ-কথা ভাবিয়া পশ্চিম দেশের লোক সময় নষ্ট করে না। কাজেই পাশ্চাত্য-পন্থার অনুসরণ করিয়া ভারতবাসীর পক্ষে সুখী হওয়া সহজসাধ্য নহে। তাহা হইতে হইলে তাহাকে নিজের মনের উপর "মেড্ ইন্ ইংল্যাণ্ড" ছাপ দিয়া লইতে হইবে।

আমাদের পক্ষে কারখানাবহুলজীবন বা আধুনিক উপায়ে ঐশ্বর্য্য-বর্দ্ধন অনাবশ্যক এবং ঘৃণীয় এ-কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমি বলিতে চাই এই যে, যে-কোনো উপায়ে কারখানা গড়িয়া দেশে ঐশ্বর্য্য উৎপাদন করিলেই দেশবাসীর মঙ্গল হইবে না। অপর দেশীয় বণিক্ যদি নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য এদেশে আগমন করে এবং ভারতবাসীর দারিদ্র্য ও অজ্ঞানতার আড়ালে বিরাট্ কারখানা গড়িয়া তুলিয়া ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ্ ও জনবল নিষ্পেষিত করিয়া তৎপ্রসূত ঐশ্বর্য্যের অধিকাংশ আত্মসাৎ করে, তাহা হইলে, শুধু কারখানা হইল এই সান্ত্বনাটুকু ব্যতীত আর কিছুই ভারতবাসী লাভ করিবে না। ক্ষতির দিকে তাহার ভাগ্যে বরং কিছু বেশী ঘটিতে পারে। একদিকে কারখানাজীবনের কদর্য্যতা, পরিবার-বিচ্ছিন্নতা, অশান্তি, যন্ত্রের ন্যায় ব্যক্তিত্বহীনতা, অস্বাস্থ্য, অত্যাচার ইত্যাদি এ-দেশের ব্যক্তির জীবন বিষময় করিয়া তুলিবে, অপর দিকে জাতীয় সম্পদের উপকরণগুলি বিদেশীর সিন্দুক ভারাক্রান্ত করিতেই নিযুক্ত হইবে। এই-প্রকার "ঐশ্বর্য্য" জাতির জীবনে একটা বীভৎস স্বপ্নের মতোই ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে। সুখের দিক্ দিয়া ইহা অবাস্তব ও কষ্টের দিক্ দিয়া তাহা প্রচণ্ড।

আমরা যদি শেষ-অবধি কারখানাই চাই, তাহা হইলে সে কারখানার মালিক হইব আমরাই। সে-কারখানা-জীবন এরূপভাবে গড়িতে হইবে যাহাতে একই স্থানে অথবা কাছাকাছি জায়গায় পুরুষ ও স্ত্রী শ্রমিক চালিত কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়; অর্থাৎ যাহাতে পারিবারিক জীবন ভাঙ্গিয়া না যায়। শ্রমিকদিগকে যাহাতে শুধু "ফ্যাক্টর্ অফ্ প্রোডাক্শন্" অথবা ঐশ্বর্য্য-উৎপাদনের উপকরণ-রূপেই ব্যবহার না করা হয়, যাহাতে ঐশ্বর্য্য উৎপাদন যে তাহাদেরই উপকারের জন্য, ইহা সর্ব্বদা প্রমাণ করিয়া দেখানো হয়, এমন-সকল উপায়ও অবলম্বন করিতে হইবে। শ্রমজীবীর বাসস্থান, খাদ্য, বস্ত্র ও জীবনধারা যাহাতে উৎকৃষ্ট হয়, তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে এবং সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে জাতির সকল মানুষের উৎকর্ষের মধ্যেই জাতীয় স্বাচ্ছন্দ্যের স্থিতি এবং শুধু কারখানার চিম্‌নি, কয়লার খনির সুড়ঙ্গ, ও যন্ত্রের তীব্র ঝঙ্কার থাকিলেই সে উৎকর্ষ আবির্ভূত হয় না।

মনের রোগ

শ্রী গিরীন্দ্রশেখর বসু, ডি-এস্‌সি, এম্‌-বি

কথায় বলে,—শরীরং ব্যাধিমন্দিরং। মানুষের শরীর যে নানা রোগের আধার, তাহা কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হয় না। এ-বিষয়ে আমরা সকলেই অল্পবিস্তর ভুক্তভোগী। কিন্তু মানুষের মনেরও যে অসুখ হয়, একথা বিশ্বাস করিতে অনেকেই রাজি হইবেন না। শরীরের যেমন কলেরা, বসন্ত, জ্বর, অজীর্ণ মাথা-ধরা প্রভৃতি রোগ হয়, মনেরও তেমনই নানা বিকার দেখা যায়। শরীর স্থূল বস্তু বলিয়া শরীরের রোগ সকলেরই নজরে পড়ে; কিন্তু মন অতি সূক্ষ্ম পদার্থ, এই কারণে মনের অসুখ সহজেই আমাদের দৃষ্টি অতিক্রম করে। 'অমুকের মন খারাপ' 'অমুক পুত্রশোকে কাতর' 'অমুকের সহজেই রাগ হয়'—এ-সব ব্যাপার আমাদের নিকট নূতন নহে, এবং মনের অসুখ বলিলে আমরা সচরাচর এইগুলিই বুঝিয়া থাকি। কিন্তু এ-ধরণের মনের অসুখ ছাড়াও আরও কত-রকম মনের গোলমাল আছে, যাহার খবর আমরা বড়-একটা রাখি না। অবশ্য পাগ্‌লামি যে মনের রোগ তাহা সকলেরই জানা আছে। এইজন্য অন্যান্য মনোবিকারকেও আমরা চলিত কথায় পাগ্‌লামিরই গণ্ডীভুক্ত করি। রাম-বাবু আর-সব বিষয়ে হয়ত খুব সাহসী পুরুষ, কিন্তু একা পথে বাহির হইলেই তাঁহার মাথায় যেন বজ্রপাত হয়। জিজ্ঞাসা করিলে বলেন,—'একলা পথ চলিতে কেমন একটা ভয় হয়, গাড়ী চাপাই পড়ি, না আর-কিছু দুর্ঘটনা ঘটে—এই ভাবনাই মনকে বিব্রত করিয়া তোলে।' সাধারণে হয়ত ইহাকে রাম-বাবুর মনের "দুর্ব্বলতা" বলিয়াই ব্যাখ্যা করিবেন। কেহ বা বলিবেন,—রাম-বাবুর মাথা খারাপ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা যে একটা রোগ এবং উপযুক্ত চিকিৎসা করাইলে সারিতে পারে,—একথা আমরা কয়জন জানি?

বিধবা হইবার পর হইতে ভোলার মা'র একটা পরিবর্ত্তন দেখা গেল। তিনি কাহারও ছোঁয়া কিছু খান না, স্নানের পর কেহ ছুঁইয়া দিলে পুনরায় স্নান করেন, সব জিনিষই বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখেন। ক্রমে তাঁহার শুচিতার মাত্রা বাড়িতে লাগিল। দশবার হাত না ধুইলে মন খুঁত্‌খুঁত্‌ করে; সদাই শঙ্কিত—পাছে কিছু অপবিত্র জিনিষ ছুঁইয়া ফেলেন। রাস্তায় বাহির হইলে, অতি সন্তর্পণে বকের মতন পা তুলিয়া চলেন। কিন্তু এমনই বরাত, এততেও মনে হয়, বুঝিবা কিছু মাড়াইলেন এবং সন্দেহ-ভঞ্জন করিবার জন্য পা হইতে জিনিষটা হাতে তুলিয়া লন, শেষে শুঁকিতে গিয়া নাকে লাগান। তখন অন্ততঃ দশ-বারো বার স্নান না করিলে শরীর পবিত্র বোধ হয় না। পাঠক বলিবেন,—এ-রকম তাঁহারা অনেক দেখিয়াছেন, এ আবার রোগ কি? এ ত শুচিবাই, একটা বাতিক মাত্র। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই বাতিকও এক-রকম ব্যাধি। শুচিবাই যে কতটা কষ্টকর—ইহা যে গৃহে কত অশান্তি আনয়ন করে—তাহা অনেকের ধারণাই নাই। আমি একবার ১৬।১৭ বৎসরের একটি বালককে দেখিতে যাই। শৌচের সময় হাতে মাটি করিতে বালকের মনে হইত, বুঝিবা হাতে ময়লা রহিল। এই জন্য একবার হাতে মাটি করিলে তাহার মন তৃপ্ত হইত না;—কেবলই মনে হইত ময়লাটা বুঝি ছড়াইয়া গেল; অগত্যা তাহাকে দ্বিতীয়বার সারা হাতটাতেই মাটি দিতে হইত। এইরূপে ক্রমে-ক্রমে তাহাকে গোটা শরীরে মাটি মাখিয়া বারবার ধুইতে হইত। সকাল ৭টা হইতে মাটি মাখিতে-মাখিতে ৪টা বাজিয়া যাইত। ইহার ফলে প্রতিদিনই তাহার খাওয়া-দাওয়ার নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইত।

শুচিবাই যে কেবল আমাদের দেশের বিধবাদের মধ্যেই আছে, তাহা নহে। সকল শ্রেণীর স্ত্রীপুরুষের ভিতরই এই রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। তবে রোগটা স্ত্রীলোকদেরই বেশী হয়। বিলাতেও শুচিবাইগ্রস্ত লোকের অভাব নাই।

মানসিক রোগের বিবরণ শুনিলে, অনেকেই তাহা হাস্যকর ব্যাপার বলিয়া মনে করেন, কিন্তু ভুক্তভোগীর পক্ষে যে তাহা কতটা কষ্টকর, তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে অনুমান করা অসম্ভব। কলিকাতার কোন অফিসে এক ভদ্রলোক কাজ করেন। তিনি ডেলি প্যাসেঞ্জার। অফিসে যাইবার উপক্রম করিলেই তাঁহার মনে নানা দুশ্চিন্তার উদয় হয়; তিনি অনবরত 'কালী কালী কালী কালী......' উচ্চারণ করিয়া মন হইতে সেই চিন্তা দূর করিবার চেষ্টা করেন; এরূপ না করিলে তাঁহার পক্ষে পথ চলা অসম্ভব। সময়-সময় এমনও হয় যে সকালে অফিসের জন্য বাহির হইয়া মধ্যপথে আট্‌কাইয়া যান এবং অপরাহ্ণে কর্ম্মস্থলে পৌঁছান। কেবল কার্য্যদক্ষতার গুণেই তাঁহার চাকুরি বজায় আছে। তাঁহার এই আচরণে অনেকেই তাঁহাকে বিদ্রূপ করেন, কিন্তু তিনিই জানেন ইহাতে তাঁহার কি কষ্ট। একজন রোগী আছেন, তাঁহাকে কোন কাজ করিবার পূর্ব্বে ১ হইতে ৫১ পর্য্যন্ত গুণিতে হয়; এই কারণে তিনি যে কিরূপ বিব্রত হন, তাহা সহজেই অনুমেয়। সহস্র চেষ্টা করিয়াও এবং নিরর্থক জানিয়াও—তিনি এই ঝোঁক পরিত্যাগ করিতে পারেন না। আবার গণনার অবকাশ না দিয়া, জোর করিয়া তাঁহাকে দিয়া কোন কাজ করাইলে, তাঁহার অসহ্য মানসিক উদ্বেগ হয় ও তাহার ফলে তিনি মূর্চ্ছা যান। এক রোগিণীর গণনার বাতিক এতই বেশী ছিল যে, সকল জিনিষই তাঁহাকে বারবার গণিতে হইত। আমি চিকিৎসার জন্য যাইলে প্রতিদিন তিনি আমার জামায় কতগুলি বোতাম আছে, অন্ততঃ পাঁচ-ছয়বার গণিতেন। তরকারী কুটিয়া কতগুলি টুকরা হইল, তাহাও তাঁহাকে গণিতে হইত। আর এক রোগিণীর দেব-মন্দিরে যাইলেই মনে হইত বুঝিবা তিনি দেবতাকে অপমান করিলেন। অগত্যা তাঁহাকে বারবার পূজা-অর্চ্চনা করিয়া মন ঠাণ্ডা করিতে হইত। এক রোগিণীর দেব-দর্শন করিলেই, অথবা দেবতার কথা মনে উঠিলেই, মানত করিতে ইচ্ছা হইত; মানতের মাত্রা ক্রমশঃ এতই অসম্ভব হইয়া পড়িত যে, দিবারাত্র তিনি মানসিক অশান্তি ভোগ করিতেন।

কখন-কখন এরূপ ঝোঁক রোগীর কাজে না দেখা দিয়া, চিন্তায় দেখা দেয়। তখন নানারূপ দুশ্চিন্তা তাহাকে সর্ব্বদা পীড়ন করিতে থাকে। শত বুঝাইলেও রোগীর মন হইতে এরূপ চিন্তা দূর করা যায় না। চিন্তাগুলি যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, রোগী অনেক সময়ে তাহা নিজেই বুঝিতে পারে, কিন্তু মনকে সে চিন্তা হইতে মুক্ত করিবার ক্ষমতা তাহার নাই। কাহারও মনে হয়, সে বুঝি কোন অমার্জ্জনীয় অপরাধ করিয়াছে; কাহারও বা 'নিজের সন্তানকে মারিয়া ফেলিব' বলিয়া ভয় হয়; কাহারও বা গুরুজন দেখিলেই অসম্মানসূচক কথা মনে আসে; কাহারও মনে সর্ব্বদাই অকথ্য ভাব জাগে। রোগী সময়-সময় কোন বিষয়ে নিশ্চিত ধারণা করিতে পারে না;—বাক্সে চাবি বন্ধ করিয়া মনে হয় 'বুঝিবা বন্ধ করি নাই'; চিঠি ডাকে দিয়া মনে হয় বুঝিবা ঠিকানা লিখিতে ভুল হইয়াছে, ইত্যাদি। কোন-কোন রোগীর সামান্য কারণেই অতিরিক্ত ভয় হয়;—কাহারও রোগের কথা শুনিলেই মনে হয় বুঝিবা সেই রোগ তাহাকে আক্রমণ করিল; অসুখ হইলেই মনে করে বুঝি বা সারিবে না। কেহ বা বীজাণুর ভয়ে সদাই শঙ্কিত। কেহ অন্ধকারে একেবারেই থাকিতে পারে না। কেহ আকাশে মেঘ উঠিলে বা বিদ্যুৎ চম্‌কাইলে বজ্রাঘাতের ভয়ে মূর্চ্ছা যায়। কেহ খোলা জায়গায়, কেহ বা বন্ধ ঘরে থাকিতে পারে না; কেহ মাকড়সা বা আরসোলা দেখিলে ঘর হইতে পলায়; কেহ বা কলিকাতা শহরে দোতলার উপর থাকিয়াও সর্ব্বক্ষণ সর্পভয়ে সন্ত্রস্ত! এইরূপ কত-প্রকারের অদ্ভুত ভয় যে রোগীদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

হিষ্টিরিয়া রোগী অনেকেই দেখিয়াছেন। হিষ্টিরিয়াও একপ্রকার মানসিক ব্যাধি। মনের রোগ হইলেও ইহার বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে নানা শারীরিক লক্ষণ প্রকাশ পাইতে পারে;—পেটে ব্যথা, মাথায় ব্যথা, বুক ধড়্‌ফড় করা, হাত-পা অসাড় হইয়া যাওয়া, ফিট, পক্ষাঘাতের ন্যায় লক্ষণ, অন্ধতা, বধিরতা ইত্যাদি। শারীরিক লক্ষণ ব্যতীত হিষ্টিরিয়ায় অনেক-প্রকার মানসিক লক্ষণও প্রকাশ পায়; রোগী অকারণে বা সামান্য কারণে হাসে বা কাঁদে; একবিষয়ে অতিরিক্ত স্বার্থপরতা, অপর-বিষয়ে অদ্ভুত

নিঃস্বার্থ ভাব দেখায়, কখন-কখন পাগলের ন্যায় কথাবার্ত্তা বলে; কখনও বা বহুদিন যাবৎ জড়ের ন্যায় নিশ্চল অবস্থায় থাকে।

আরও একপ্রকার মানবিক ব্যাধি আছে, তাহাতে রোগীর মনে নানা-প্রকার সন্দেহের উদয় হয়; রোগী মনে করে তাহার খাদ্যের সহিত কেহ বিষ দিতেছে; পুলিশ তাহার পিছনে লাগিয়াছে বা অন্য লোকে তাহার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতেছে; কেহ তাহাকে অয়্যারলেস্ দ্বারা বা হিপ নটাইজ করিয়া অনিষ্টের চেষ্টা করিতেছে, তাহার স্ত্রীর চরিত্র নষ্ট হইয়াছে, ইত্যাদি। কেহ মনে করে সে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, বলবান্, রূপবান্ বা ধনী, কেহ বা নিজেকে জগদ্গুরু বলিয়া প্রচার করে। কেহ মনে করে তাহার শরীর একেবারে শূন্য হইয়া গিয়াছে, কাহারও বা নিজের শরীর কাঁচের তৈয়ারী বলিয়া মনে হয়; সে নড়িতে-চড়িতে ভয় পায়, পাছে ভাঙ্গিয়া যায়।

কখন-কখন মানসিক ব্যাধি অতিরিক্ত ধর্ম্ম-কর্ম্মে আগ্রহ, ব্যবসায়ে আগ্রহ, চর্‌কা বা পলিটিক্সে আগ্রহরূপে দেখা দেয়, কখনও বা আহার, বিহার বা ব্যায়ামে রোগী বাতিকগ্রস্ত হয়; চিকিৎসকদিগের মধ্যেও সময়-সময় এরূপ বাতিকগ্রস্ত লোক দেখিতে পাওয়া যায়; এরূপ চিকিৎসকের হাতে পড়িলে কখনও বা রোগীকে দুই সন্ধ্যা রুটি, অথবা কেবল দুগ্ধ বা ফল খাইয়া থাকিতে হয়, কেহ বা কেবল মাংস খাইতেই পরামর্শ দেন, কেহ বা গরম জল ঠাণ্ডা করিয়া খাইতে বলেন; কাহারও বা কেবল উপবাসই ব্যবস্থা।

মানসিক ব্যাধি যে কত বিভিন্ন মূর্ত্তিতে দেখা দিতে পারে, উপরের বিবরণ হইতে পাঠক তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাইবেন। আপাতদৃষ্টিতে এইসকল ব্যাধির লক্ষণগুলির মধ্যে একটা শৃঙ্খলা আছে বলিয়া মনে হয় না। মানসিক ব্যাধির রহস্য চিকিৎসকদিগেরও অনেক দিন পর্য্যন্ত অজ্ঞাত ছিল; এজন্য পূর্ব্বোক্ত-প্রকারের কোন ব্যাধি দেখিলে তাঁহারা সাব্যস্ত করিতেন যে,যকৃতের দোষে, কোষ্ঠবদ্ধতা বা শারীরিক কোন গ্রন্থির (glands) ক্রিয়া বিপর্য্যয়ে তাহার উৎপত্তি। শারীরিক কারণ ভিন্ন কেবল *মানসিক কারণে যে ব্যাধি উৎপন্ন হইতে পারে, একথা চিকিৎসক-মণ্ডলী সহজে বিশ্বাস করেন নাই; হিষ্টিরিয়ায়* যখন কোনই শারীরিক বৈলক্ষণ্য খুঁজিয়া বাহির করা গেল না, অথচ রোগীর উপদ্রবের অন্ত নাই দেখা গেল, তখন অনেক চিকিৎসকই বলিতে লাগিলেন, হিষ্টিরিয়া রোগ নহে—বদমায়েসি মাত্র, রোগী মিথ্যা করিয়া অসুখের ভাণ করে। এখনও এরূপ মত পোষণ করেন, এমন চিকিৎসকের অভাব নাই। রোগী হয়ত দুই বৎসর শয্যাগত, নড়িতে-চড়িতে অক্ষম—নানারূপ চিকিৎসায় কোন ফল হয় নাই, এমন সময় ঘরে আগুন লাগিল, অমনি রোগী নিজে উঠিয়া দৌড়িয়া পলাইল। এরূপ অবস্থায় রোগী যে মিথ্যা ভাণ করিতেছিল, এরূপ মনে করা বিচিত্র নহে।

বিভিন্ন মানসিক ব্যাধিগুলির লক্ষণ বিশেষ করিয়া বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে যে সবগুলিতেই একটা যৌক্তিকতার অভাব আছে; কলিকাতার বাড়ীতে দোতলার উপর সাপের ভয়ে ভীত হওয়া বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে, কিন্তু এই রোগীরই অন্যান্য ব্যাপারে যথেষ্ট বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়; অতএব এই একটি বিষয়েই অযৌক্তিকতা কেন দেখা দিল, ভাবিবার বিষয়। রোগী দেখিতেছে যে হাজার-হাজার লোক নির্ব্বিঘ্নে চলা-ফেরা করিতেছে, অথচ তাহার নিজের বেলাই রাস্তা চলিতে ভয় হয়; এই ভয় যে কতটা অসঙ্গত, তাহা অনেক সময় রোগী বুঝিতে পারে, কিন্তু যেখানে রোগীর আত্মাভিমান অধিক, অথবা রোগ প্রবল, সেখানে রোগী নিজের কাছেও নিজের অস্বাভাবিকতা স্বীকার করিতে চায় না। জিজ্ঞাসা করিলে বলে—"রাস্তায় কি কখন লোক চাপা পড়ে না? আমি যে গাড়ী চাপা পড়িয়া মরিব না, ইহার কিছু নিশ্চয়তা আছে?" আমার এক রোগী ছিলেন, তিনি খবরের কাগজে যখনই গাড়ী-চাপা-পড়ার সংবাদ পাঠ করিতেন, তখনই সেটি সযত্নে কাটিয়া খাতায় আঁটিয়া রাখিতেন; কেহ তর্ক করিতে আসিলেই সেই সুবৃহৎ খাতাখানি খুলিয়া দেখাইয়া আত্মপক্ষ-সমর্থনের চেষ্টা করিতেন। ১০ হাজারের মধ্যে হয়ত একটা লোক গাড়ী-চাপা পড়িয়া মারা পড়ে; জনসাধারণ ৯৯৯৯ জন নির্ব্বিঘ্নে চলা-ফেরা করে মনে রাখিয়া

সাবধানে পথ চলেন; কিন্তু যে-একটি লোক চাপা পড়িয়া মরে, রোগীর মন তাহার দিকেই ঝুঁকিয়া পড়ে; সহস্র তর্কেও তাহাকে তাহার ভুল বোঝান যায় না। অনেকে মনে করেন, বুঝি তর্কের দ্বারা রোগীর মনের দুর্ব্বলতা দূর করিতে পারিবেন; কিন্তু তাহা একেবারেই ভুল। চিকিৎসকের শাণিত তর্কসমূহ রোগের বর্ম্ম ভেদ করিয়া কিছুতেই প্রবেশলাভ করিতে পারে না। এক রোগী আমাকে একবার প্রশ্ন করিলেন,—'আপনি ঋজুপাঠ পড়িয়াছেন?' আমি বলিলাম,—"হাঁ, কেন?' তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ঋজুপাঠে দেখিয়াছেন পূর্ব্বে চৌদ্দ বৎসর ব্যাপী অনাবৃষ্টি হইত, এখনই বা হয় না কেন? আমি যে জানি না, সেকথা আমাকে স্বীকার করিতে হইল। তখন রোগী আমাকে বলিলেন যে, তিনি দিন-রাত জপ-তপ করিতেছেন। এই জপের প্রভাবেই অনাবৃষ্টি বন্ধ আছে। আমি বলিলাম,—'দিন-কতক জপতপ ছাড়িয়া দিয়া দেখুন না—বৃষ্টি হয় কি না।' তিনি বলিলেন,—'এ কাজ আমার দ্বারা কখনই হইবে না, ইহাতে পৃথিবীর সমূহ অনিষ্ট হইবে।' আর-এক রোগী মনে করিতেন, চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহ-উপগ্রহ তাঁহার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ চলিতেছে। তিনি এ-সম্বন্ধে একখানা পুস্তিকাও লিখিয়াছিলেন।

এইসকল রোগীর সহিত কথা-বার্ত্তা কহিলে হঠাৎ তাঁহাদের মানসিক বিকৃতির সন্ধান পাওয়া যায় না। অপর সকল বিষয়েই তাঁহারা যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিবেন, কিন্তু কোনরূপ তর্কের দ্বারা তাঁহাদের বদ্ধমূল ধারণাগুলির উচ্ছেদসাধন করা অসম্ভব। কেন এরূপ হয়, প্রোফেসর ফ্রয়েডই সর্ব্বপ্রথম তাহার সন্তোষজনক উত্তর দেন। কি উপায়ে ফ্রয়েড মনোজগতের অদ্ভুত রহস্যগুলি উদ্ঘাটন করেন, তাহার বিবরণ বড়ই কৌতুহলপ্রদ। বারান্তরে তাহার আভাস দিবার ইচ্ছা রহিল।

ফ্রয়েডের মতে আমাদের মনের মধ্যে অনেক অবৈধ ইচ্ছা লুক্কায়িত থাকে। এই-সকল ইচ্ছার অস্তিত্ব সাধরণতঃ আমাদের নিকট অজ্ঞাত। কোন কারণে অবৈধ ইচ্ছাগুলি মনে ফুটিবার চেষ্টা করিলে আমরা ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান বা সামাজিক অনুশাসনের সাহায্যে সেগুলিকে তখনই মনের অন্তস্তলে নির্ব্বাসিত করি। অনেক সময় অসামাজিক ইচ্ছাগুলি প্রবল হইয়া আমাদিগকে তদনুযায়ী কার্য্যে চালিত করিবার চেষ্টা করে। তখন মনের মধ্যে একটা তুমুল দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। একদিকে ধর্ম্ম ও সমাজ-শাসন, অন্যদিকে দূষণীয় প্রবৃত্তির তাড়না। প্রবৃত্তি জয়ী হইলে লোকে সমাজদ্রোহী হইয়া পাপ-পঙ্কে নিমজ্জিত হয়। প্রবৃত্তি পরাভূত হইলে মানুষ ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হয়। কিন্তু এই অসামাজিক ইচ্ছাগুলি বিনষ্ট না হইয়া যদি কেবল মনের অন্তস্তলে নির্ব্বাসিত হয়, তাহা হইলে সুবিধা পাইলেই সেগুলি ছদ্মবেশে পুনরায় মনে উঠিয়া থাকে। ইহাতেই মানসিক রোগের উৎপত্তি। মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে ইহাই ফ্রয়েডের আবিষ্কার।

রুদ্ধ ইচ্ছাগুলি অবিকৃত অবস্থায় প্রকাশ পাইলে পাছে পুনরায় নির্ব্বাসিত হয়, এইজন্য সেগুলি নানারূপ ছদ্মবেশে দেখা দেয়। ছদ্মবেশের ফলে অসামাজিক ইচ্ছাগুলি এমনই রূপান্তর প্রাপ্ত হয় যে, তাহাদের স্বরূপ আমরা বুঝিতে পারি না। মানসিক চিকিৎসার ফলে প্রবৃত্তিগুলির ছদ্মবেশ ধরা পড়ে; তখন রোগী তাহার নিজের মধ্যে এরূপ অবৈধ ইচ্ছার অস্তিত্বের কথা উপলব্ধি করিয়া মনে কষ্ট পায়। ফলে তাহার মনে পুনরায় একটা সাময়িক বিপ্লবের সৃষ্টি হয়। এই মানসিক সংগ্রাম রোগীর জ্ঞাতসারে ঘটায়, সে চিকিৎসকের সাহায্যে সহজেই দূষণীয় প্রবৃত্তিগুলিকে জয় করিয়া তাহাদের সমগ্র শক্তি সামাজিক পথে নিয়োজিত করিতে পারে। এইরূপেই মানসিক ব্যাধি আরোগ্য হয়।

ফ্রয়েডের মত বুঝিতে হইলে দুইটি বিষয় স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। (১) আমাদের অজ্ঞাতসারে রুদ্ধ ইচ্ছা মনের মধ্যে কার্য্যকরী অবস্থায় থাকিতে পারে। (২) এই ইচ্ছা ছদ্মবেশে অথবা প্রতীকের সাহায্যে, আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। উদাহরণ দ্বারা বিষয়-দুইটি বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

প্রত্যহ বৈকালে বেড়াইতে যাই। আজ বেড়াইতে বাহির হইবার সময় মনে কেমন একটা অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিলাম। কিন্তু ইহার কারণ বুঝিতে পারিলাম না। রাস্তায় হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, আজ একব্যক্তিকে একটা জিনিষ দিতে প্রতিশ্রুত আছি,—সেই জিনিষটা

সঙ্গে লইতে ভুল হইয়াছে। কথাটা মনে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে মনের অস্বাচ্ছন্দ্যভাব কাটিয়া গেল। পাঠক লক্ষ্য করিবেন, এখানে অপরকে জিনিষ দিবার ইচ্ছা আমার মনের মধ্যে প্রথমটা অজ্ঞাতসারেই ছিল, এবং অজ্ঞাত থাকা-সত্ত্বেও মানসিক উদ্বেগের সৃষ্টি করিয়াছিল। এই মানসিক উদ্বেগ তর্কদ্বারা বা অন্য কোন উপায়ে মন হইতে দূর করা যায় না। ইহা দূর করিবার একমাত্র উপায়—রুদ্ধ ইচ্ছার স্বরূপ জ্ঞাত হওয়া। অনেক সময় দুঃস্বপ্ন দেখিবার পর, আমরা স্বপ্নের কথা ভুলিয়া যাই, কিন্তু মনে একটা অবসাদ অনুভব করি। মনে হঠাৎ কেন অবসাদ আসিল, তাহার কারণ আমরা নির্ণয় করিতে পারি না। কিন্তু কোন ঘটনায় সেই দুঃস্বপ্নের কথা মনে পড়িয়া গেলে,—সঙ্গে-সঙ্গে মনও হাল্‌কা হইয়া যায়।

একব্যক্তি কোন স্থানে গিয়া অতিশয় প্রলোভনের মধ্যে পড়ে। এই প্রলোভনের কবল হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য সে একমনে এক-দুই গণিতে থাকে। ঘটনাটি পরে তাহার স্মৃতি হইতে মুছিয়া যায়। অনেক দিন পরে এক নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে যাওয়ার পর হইতে, তাহার মনে হঠাৎ গণিবার ঝোঁক উঠিল—ক্রমে তাহা মানসিক ব্যাধিতে পরিণত হয়। চিকিৎসার ফলে, প্রলোভনের বিস্মৃত স্মৃতি যখন লোকটির মনে পুনরায় জাগ্রত হইল, তখন হইতেই তাহার গণনার ঝোঁকও কমিয়া আসিল। সব-সময়ে গণনার ঝোঁক যে এইরূপেই উৎপন্ন হয়, তাহা নহে।

এক স্ত্রীলোকের নিজের ঘর পরিষ্কার করিবার ঝোঁক অত্যন্ত বাড়িয়া উঠে। ঘরের জিনিষপত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিবার জন্য তিনি সর্ব্বদাই ব্যস্ত। কেহ ঘরের কোন দ্রব্য সামান্য স্থানচ্যুত করিলে তাহার মনে দারুণ উদ্বেগের সঞ্চার হইত। এই বাতিকের জন্য স্ত্রীলোকটির পক্ষে সংসারের অন্য কাজকর্ম্ম করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। চিকিৎসার সময়, মানসিক বিশ্লেষণের ফলে দেখা গেল, স্ত্রীলোকটির মনে কোন সময় অপবিত্র ভাবের উদয় হয়। তিনি তাহা মন হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া যাহাতে মনে কোনরূপ কলুষভাব উদিত না হয়, তাহাতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। কিছুদিন পরেই তাঁহার মনে ঘর-পরিষ্কারের ঝোঁক অতিমাত্রায় দেখা দিল। ঘর-পরিষ্কারের চেষ্টা বাস্তবিক পক্ষে শরীর পবিত্র রাখিবার চেষ্টার রূপান্তর মাত্র। তর্ক করিয়া—হাজার বুঝাইয়াও—রোগীকে ঘর পরিষ্কার কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করা যায় নাই। এক্ষেত্রে রোগীর ঘর, রোগীর নিজদেহের প্রতীকরূপে দেখা দিয়াছিল। লেডি ম্যাক্‌বেথের হাত হইতে রক্তের দাগ ধুইয়া ফেলিবার ব্যর্থ চেষ্টাও এই জাতীয়। অতিরিক্ত সাপের ভয়, ভূতের ভয় প্রভৃতির মূলেও এইরূপ কোন-না-কোন বিশেষ কারণ নিহিত থাকে।

শ্রীরামদাস বাবাজীর চরিত-সুধা গ্রন্থে (৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৫৫-৫৭) একটি বড় কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ আছে। ললিতা দাসী খাইবার সময় এক বিড়ালকে বাঁ-হাতে চড় মারিয়াছিলেন। অপরাহ্ণে তাঁহার বাঁ-হাতে অসহ্য যন্ত্রণা হইতে লাগিল—হাত অবশ হইয়া গেল। কেন যে এরূপ হইল, ললিতা দাসী বুঝিতে পারিলেন না। দুইদিন গেল তবুও যন্ত্রণা কমে না। একদিন রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় ললিতার হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল যে, তিনি বিড়ালকে চড় মারিয়াছিলেন—তাহারই শাস্তিস্বরূপ হাত অবশ হইয়াছে। "যেমন এই কথা মনে হওয়া, অমনি হাতের বেদনা বারো আনা কমিয়া গেল ও হৃদয়ের অবসাদ দূর হইল। পরদিবস প্রভাতে উঠিয়াই ললিতা বেশ সুস্থভাবে সেবার কার্য্যাদি করিতে লাগিল।"

হিষ্টিরিয়া রোগের ব্যথা, পক্ষাঘাত প্রভৃতিও এই-ধরণের।

প্রবন্ধটি পড়িয়া পাঠক হয়ত ধারণা করিবেন যে মানসিক রোগের নিদান বুঝি অতি সোজা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন মানসিক ব্যাধির উৎপত্তির মূল কারণ নিরূপণ করা যে কিরূপ জটিল ব্যাপার, তাহা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। সাধারণ পাঠকের সুবিধার জন্য ব্যাপারটির একটা মোটামুটি আভাস দিবার চেষ্টা করিয়াছি মাত্র।

কষ্টিপাথর

চালুক্যরাজ পুলকেশি ও পারস্যরাজ দ্বিতীয় খসরু

পারস্যের সহিত ভারতের সম্বন্ধ খুব প্রাচীন ও ঘনিষ্ঠ হইলেও, খৃষ্টের পরবর্ত্তী যুগে এই দুই রাজ্যের মধ্যে রাজনৈতিক সম্পর্কের পরিচয় বেশী নাই। সুতরাং পুলকেশি ও খসরু পরস্পরের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন—ইহা একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

পণ্ডিতপ্রবর ফার্গুসন্ নানাবিধ যুক্তির সাহায্যে সিদ্ধান্ত করিলেন যে, এই চিত্রগুলি ৬১০ ও ৬৩০-৪০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে অঙ্কিত হইয়াছে; সুতরাং তিনি সহজেই স্থির করিলেন যে চিত্রোক্ত পারস্যদেশীয় সম্রান্ত লোকটি পারস্যরাজ দ্বিতীয় খসরু, কারণ ইঁহার রাজত্ব-কাল ৫৯১ হইতে ৬৩৮ খৃঃ অঃ। কিন্তু ভারতবর্ষীয় যে-রাজা সিংহাসনে বসিয়া পারস্য-দেশীয় দূতের সম্বর্দ্ধনা করিতেছিলেন তিনি কে, তাহার কিছুই স্থিরতা করিতে পারিলেন না। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত বুলার্ বলিলেন, মুসলমান ঐতিহাসিক তাবারির গ্রন্থের এক অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, পারস্য-রাজ দ্বিতীয় খসরুর ষট্‌ত্রিংশৎ রাজ্যবর্ষে ভারতবর্ষের রাজা 'পরমেশ' তাঁহার নিকট পত্রসহ দূত পাঠাইয়াছিলেন। দূতের সঙ্গে তাঁহার প্রত্যেক পুত্রের জন্য নানাবিধ উপঢৌকন ও একখানি করিয়া পত্র ছিল। সিরুয়িয়ে নামে তাহার যে পুত্র দুই বৎসর পরে তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত ও বন্দী করিয়াছিল, তাহার নামীয় পত্রের আবরণের উপর ভারতীয় অক্ষরে লেখা ছিল 'গোপনীয়'। ইহা দেখিয়া রাজার মনে সন্দেহ হয় এবং তিনি ভারত-বর্ষীয় একজন লেখক আনাইয়া সিল-মোহর ভাঙ্গিয়া পত্র খুলিয়া পাঠ করেন। পত্রে লেখা ছিল—

"উৎসব করো, আনন্দ করো—তোমার পিতার রাজত্বকালের আটত্রিশ বৎসরের সময় তুমি সমস্ত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইবে।

ইতি

'পরমেশ।'"

তাবারির গ্রন্থোক্ত 'পরমেশ' কে, অতঃপর ইহারই আলোচনা হইল। নোল্ডেকে বলিলেন যে, পহ্লবী লিপিতে র ও ল দেখিতে একই রকম, আর আরবী ও পহলবী ভাষায় 'ক' স্থানে 'ম' আদেশ হয়; সুতরাং তাবারির গ্রন্থোক্ত 'পরমেশ'কে 'পুলকেশি' বলিয়া ধরা যাইতে পারে। পুলকেশি খসরুর সমসাময়িক, উভয়েই ফার্গুসনের প্রস্তাবিত ৬১০-৬৩০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বর্ত্তমান ছিলেন; সুতরাং ফার্গুসনের অনুমান সম্পূর্ণ-রূপে সমর্থিত হইল এবং পারস্যরাজ দ্বিতীয় খসরু ও চালুক্যরাজ পুলকেশি পরস্পর পরস্পরের নিকট দূত ও পত্র প্রেরণ করিতেন, ইহা অবিসংবাদিত সত্য বলিয়া গৃহীত হইল।

এই আলোচনার ফলে 'পরমেশ—পুলকেশি' এই কষ্ট-কল্পনা করিবার পূর্ব্বে, 'পরমেশ' কোনো সংস্কৃত শব্দের 'পহ্লবী' রূপ মাত্র কি না ইহাই আলোচনা করা সম্পূর্ণরূপে বৈজ্ঞানিক প্রণালীর অনুমোদিত। 'পরমেশ' যে পুলকেশি নহে, পরন্তু রাজ-পদবীরূপে সর্ব্বদা ব্যবহৃত সংস্কৃত 'পরমেশ' অথবা পরমেশ্বরেরই অপভ্রংশ মাত্র ইহা পণ্ডিতমণ্ডলী ক্রমশঃ স্বীকার করিতেছেন।

সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত ফুশে অজন্তার চিত্রাবলীর আলোচনা করিয়া বলিয়াছিলেন, যে বিশিষ্ট পোষাক ও পরিচ্ছদ ও আকৃতি দেখিয়া ফার্গুসন্ পূর্ব্বোক্ত চিত্রাবলীর লোকগুলিকে পারস্য-দেশীয় বলিয়া স্থির করিয়াছেন; অনুরূপ পোষাক, পরিচ্ছদ ও আকৃতি অজন্তার প্রায় সকল চিত্রের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং কোনো একখানি চিত্রকে পারস্যদেশীয় রাজার চিত্র বলিয়া অনুমান করা নিতান্তই ভ্রমাত্মক। ফুশে খুব দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন যে, অজন্তার চিত্রাবলী সকলই ধর্ম্ম-মূলক, ইহার মধ্যে ঐতিহাসিক চিত্রের সন্ধান করা নিতান্তই ভুল।

অতঃপর প্রশ্ন এই যে, তাবারির গ্রন্থ মতে যে ভারতীয় রাজা ৬২৬ খৃঃ অব্দে দ্বিতীয় খসরুর নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, তিনি কে? 'পরমেশ' অথবা পরমেশ্বর সাধারণ রাজোপাধিসূচক চিহ্ন মাত্র, সুতরাং ইহা দ্বারা যে-কোনো রাজাই সূচিত হইতে পারেন। ৬২৬ খৃঃ অব্দে ভারতবর্ষে দুইজন প্রতাপশালী রাজা ছিলেন—আর্য্যাবর্ত্তে হর্ষবর্দ্ধন এবং দাক্ষিণাত্যে পুলকেশি। ইঁহাদেরই মধ্যে কেহ যে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা একরকম অনুমান করা যাইতে পারে। কারণ খসরু উক্ত রাজাকে ভারতবর্ষের রাজা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আর খুব প্রতাপশালী রাজা না হইলে, পারস্য-সম্রাটের সহিত সমান চালে চলা একরকম অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। যদি এ দুজনের মধ্যে কেহ, দূত প্রেরণ করিয়া থাকেন, তবে খুব সম্ভবতঃ তিনি হর্ষবর্দ্ধন। এবিষয়ে কোনো স্থির সিদ্ধান্ত করা যায় না, কিন্তু নিম্নলিখিত কারণগুলি এই অনুমানের সমর্থন করে।

১। হর্ষবর্দ্ধনের রাজ্যসীমা পুলকেশির রাজ্যসীমা অপেক্ষা খসরুর রাজ্যের অধিকতর নিকটবর্ত্তী।

২। এই দুই রাজ্যের মধ্যে যে যাতায়াতের সুগম পথ ছিল ও সচরাচর আদান-প্রদান চলিত, তাহার প্রমাণ আছে। হর্ষচরিত হইতে জানা যায়, হর্ষবর্দ্ধন পারস্যদেশীয় অশ্ব ব্যবহার করিতেন। লামা তারা-নাথ লিখিয়াছেন যে পারস্যরাজ মধ্যদেশের রাজাকে অশ্ব উপঢৌকন দিয়াছিলেন।

৩। হর্ষচরিতে উক্ত হইয়াছে যে, হর্ষবর্দ্ধনের সেনাপতিগণ বলিতেন, 'পারস্য-দেশ জয় করা ত অতি সহজ'। ইহাতে পারস্য-দেশের সহিত হর্ষের রাজনৈতিক সম্বন্ধ সূচিত হইতেছে।

লামা তারানাথ বলেন, হর্ষ মুলতানের নিকট একটি কাঠের মন্দিরে বহু পার্শীকে তাহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ সহ পোড়াইয়া মারেন। এই ঘটনা সত্য হউক আর না হউক, এই কিংবদন্তী হইতে পারস্য দেশের সহিত হর্ষের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অনুমান করা যাইতে পারে।

হর্ষের সহিত পারস্য দেশের সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রমাণ উল্লিখিত হইল। পুলকেশির সহিত পারস্য দেশের সম্বন্ধ ছিল এরূপ কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। সুতরাং অন্তবিধ প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত, হর্ষবর্দ্ধনই খসরুর নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

(মানসী ও মর্ম্মবাণী, চৈত্র ১৩৩১) শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার

প্রাচীন মিশরে নারীর স্থান

প্রাচীন মিশরের পারিবারিক জীবনে মাতৃতন্ত্র প্রথা প্রচলিত ছিল—

অর্থাৎ সন্তান মায়ের নামে পরিচিত হইত, সম্পত্তির উত্তরাধিকারী পুত্রের পরিবর্ত্তে কন্যারা হইত।

বিবাহের দ্বারা সম্পত্তি যাহাতে হস্তান্তরিত না হয়, সেইজন্যই প্রধানতঃ মিশরে ভ্রাতা-ভগিনীতে বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। এক-সময়ে পারস্য হইতে ব্রিটন্ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র রক্ত-সম্বন্ধে আবদ্ধ আত্মীয়গণের মধ্যে বিবাহ হইত। মিশরে কোনো কোনো সময়ে পিতা নিজের কন্যাকেও বিবাহ করিতেন। পিরামিড-কর্ত্তা রাজা স্নেফরু ও সুবিখ্যাত বিজয়ী-রাজা দ্বিতীয় রামসেস্ তাঁহাদের নিজ নিজ কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

নারীই যখন সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইবে, তখন মাতাপিতাকে বৃদ্ধ বয়সে ভরণ-পোষণ করিবার ভারও তাহাকে গ্রহণ করিতে হইত। গ্রীকগণ যখন মিশরে ভ্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন, তখন নারীর ক্ষমতা এইরূপ দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন। খৃষ্টপূর্ব্ব চারি সহস্র বৎসর হইতে খৃষ্টের জন্মিবার পাঁচশত বৎসর পর্য্যন্ত প্রায় অধিকাংশ সময়েই মাতা হইতে রাজ্য কন্যায় বর্ত্তাইত।

কিন্তু এইরূপ নিয়ম প্রচলিত থাকিলেও আমরা মিশরের ইতিহাসে একজন মহীয়সী মহিলা ব্যতীত অন্য কোনো নারীকে সিংহাসনে আরোহণ করিতে দেখিতে পাই না। তাঁহার নাম হাটসেনও। তাঁহাকে কিরূপ দ্বন্দ্ব বিবাদ করিয়া সিংহাসন লাভ করিতে হইয়াছিল তাহা পর্য্যালোচনা করিলেই আমরা বুঝিতে পারিব যে, প্রাচীন মিশরে সাধারণের কার্য্যে নারীর হস্তক্ষেপ করা কতদূর কঠিন ব্যাপার ছিল।

হাটসেনও আমাদের সুলতানা রাজিয়ার ন্যায়, পুরুষের বেশ ধারণ করিয়া সভাধিরোহণ করিতেন। পুরুষের বেশে পথে শোভাযাত্রা করিয়া বাহির হইতেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, মিশরে সে-যুগে নারী তাহার নিজের অধিকারে সিংহাসনে উপবেশন করিতে পারিত না। পরবর্ত্তী যুগে জগৎ-প্রসিদ্ধ সুন্দরী ক্লিওপেট্রা নিজেই রাজ্ঞী হইয়াছিলেন ও নারীবেশেই সমস্ত কার্য্য পরিচালনা করিতেন।

হাটসেনওই জগতের ইতিহাসে প্রথম বিখ্যাত রাজ্ঞী। মিশরের চিরন্তন কুসংস্কার অপনোদিত করিয়া তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন যে, নারীও পুরুষের ন্যায় রাজ্য শাসন করিতে পারে।

সাধারণতঃ ফারোয়া বা মিশররাজ তাঁহার ভগিনীকে বিবাহ করিতেন। সেই ভগিনীই হইতেন প্রধানা রাজ্ঞী। রাজা অনেকগুলি বিবাহ করিতেন। কিন্তু তাঁহাদের পুত্র কেহ রাজ-সিংহাসন দাবি করিতে পারিত না। প্রধানা মহিষীর পুত্রই রাজা হইত। রাজার মৃত্যুর পর পুত্র নাবালক হইলে রাজ্ঞীই তাঁহার অভিভাবকরূপে সমস্ত কার্য্য নিষ্পন্ন করিতেন। সুতরাং মিশরে অন্যান্য নারীর সাধারণের কার্য্য করিবার ক্ষমতা না থাকিলেও রাজ্ঞীর ছিল।

সম্ভ্রান্ত লোকেরাও বহু স্ত্রী বিবাহ করিতেন। পুরোহিতদের একটির বেশী বিবাহ করিবার নিয়ম ছিল না। সাধারণ লোকেও একটি মাত্র পত্নী গ্রহণ করিত।

স্বামী সর্ব্বদা স্ত্রীকে সম্মান করিয়া চলিতেন। স্ত্রী তাঁহার ব্যক্তিগত সম্পত্তি লইয়া যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারিতেন। স্ত্রী না হইলে মিশরে কোনো আধ্যাত্মিক বা সামাজিক ব্যাপার সম্পন্ন হইত না। প্রাচীন স্তূপ প্রভৃতিতে স্বামীর সহিত সমানভাবে স্ত্রী অঙ্কিত হইয়াছে। স্ত্রীর চিত্র সঙ্গে না থাকিলে স্বামীর পরলোকে সদ্গতি হইবে না এইরূপ ধারণাও তখন প্রবল ছিল।

স্বামী যেমন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে পারিত, স্ত্রীও তেমনি স্বামীকে পরিত্যাগ করিতে পারিত।

শিক্ষিতা মহিলারা নিজেই ব্যবসা বা মোকদ্দমা চালাইতে পারিতেন। সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েদের মধ্যে সুশিক্ষা প্রদান করা হইত। মিশরে স্ত্রীশিক্ষার ক্রমশঃ প্রসার হইতেছিল এবং খৃষ্টের জন্মের পর সাধারণ ঘরের মেয়েরাও লিখিতে-পড়িতে পারিত।

মিশরে গরীবের ঘরের মেয়েরা শুধু যে গৃহকর্ম করিত তাহা নহে. তাহাদিগকে মাঠে যাইয়া ধান হইতে চাল করিতে হইত, বোঝা মাথায় করিয়া বাড়ী আনিতে হইত। তাহারা শিকারের পাখীও হাতে করিয়া বহিয়া আনিত। বাজারে যাইয়া জিনিষপত্র খরিদ করাও তাহাদের কাজ ছিল। মিশরে নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকের মধ্যে অবরোধ-প্রথা ছিল না। কেবল সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরাই অবরোধের মধ্যে বাস করিত।

সম্ভ্রান্ত ঘরে রন্ধন, পরিবেষণ, হিসাব পত্র রাখা, গান বাজনা দ্বারা মনস্তুষ্টি বিধান করা প্রভৃতি কাজ পুরুষ চাকরেরাই করিত। গ্রীকযুগে উত্তর মিশরের মেয়েরা কিন্তু বাহিরে খুব বাহির হইত।

সম্ভ্রান্ত পরিবারে ভোজ বা আনন্দ-উৎসবের সময়ে মেয়েরা ঘরের বাহিরে আসিয়া অতিথি সৎকার করিতেন। ভোজ-সভায় বসিয়া পুরুষদের সহিত মদ্যপান করা নারীর পক্ষে দোষাবহ ছিল না।

ধর্ম্ম-জগতেও নারীর স্থান খুব উচ্চ ছিল। নারী বহু মন্দিরের পুরোহিতের পদে বৃতা ছিলেন। আর প্রত্যেক মন্দিরেই কতকগুলি নারী দেবদাসীরূপে থাকিয়া দেবতার তুষ্টিবিধানার্থ নৃত্যগীত করিত।

নৃত্যকলাদি শ্রেণী-বিশেষেই নিবদ্ধ ছিল; নর্ত্তকীদের কলাবিদ্যায় পটুতা অসাধারণ ছিল।

মিশরে নারীজাতি মায়ের সম্মান সর্ব্বদাই পাইতেন। গার্হস্থ্য জীবনে নারীর স্থান খুব উচ্চ ছিল বলিয়াই মিশর উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

শ্রী বিমানবিহারী মজুমদার

(মানসী ও মর্ম্মবাণী, চৈত্র ১৩৩১)

—

হিন্দু-শাসননীতি

শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ জায়সবাল Hindu Polity নামে সম্প্রতি একটি প্রচুরগবেষণামূলক পুস্তক বাহির করিয়াছেন। কলিকাতার ক্যাপিটাল্ পত্রিকায় বইটির একটি সমালোচনা বাহির হইয়াছে। সমালোচনায় বইটির প্রকৃষ্ট পরিচয় আছে।—

জায়সবাল মহাশয়ের সিদ্ধান্ত এই—অতি প্রাচীনকালে ভারতে গোষ্ঠী বা জনসভার সাহায্যে জাতির জীবন ও কর্ম্মের অভিব্যক্তি ঘটিত। এমন-কি বৈদিক যুগে—মানব-সভ্যতার আদিযুগে—এরূপ অনুষ্ঠানের প্রচলন ছিল। সেই যুগেই প্রতিনিধিমূলক অনুষ্ঠানের ধারণা হিন্দুর জন্মিয়াছিল।

ভারত মহাদেশে অথবা ভারতের উত্তরভাগে অনেকগুলি গণতন্ত্র রাজ্য ছিল। প্রত্যেকেরই স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য এবং স্বাধীন ব্যবস্থা ছিল। শাসন-ব্যবস্থা মূলত কিন্তু এক ছিল—সর্ব্বসাধারণের মতামত সব ক্ষেত্রেই প্রধান গণ্য হইত। স্বাধীন বলিতে যাহা বুঝায় ভারতবাসীরা সম্পূর্ণরূপে তাহাই ছিল।

এইসব প্রাচীন গণতন্ত্রে যাঁহারা সভাপতি থাকিতেন তাঁহাদের ক্ষমতা ছিল প্রভূত। তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য মন্ত্রীগোষ্ঠী ছিল; এবং আধুনিক গণতন্ত্রের ব্যবস্থার মতন প্রত্যেক মন্ত্রীর কর্ম্ম স্বতন্ত্র ছিল। প্রস্তাব, আলোচনা ও ভোট ছিল, এখন যেমন ইংলণ্ডে হাউস্ অব্ কমন্স্‌এ আছে। সুতরাং জগতে আজ নূতন কিছুই নাই। গণতন্ত্রের ধারণা হিন্দুর মস্তিষ্কে প্রথমে জাগিয়াছিল এবং সেজন্য হিন্দুরা স্বাভাবিকই গর্ব্বের অধিকারী।

আলেক্‌জাণ্ডার যখন ভারতে আসিয়া গ্রীক্ সভ্যতার মহিমা বিস্তার

করিতেছিলেন তখন কয়েকটি প্রবল হিন্দু গণতন্ত্র তাঁহাকে বাধা দিয়াছিল। ভারতীয়েরা তখন মানুষের মতন ছিল—দেহ শক্ত ও সুগঠিত, সুশ্রী, সাহসী, যুদ্ধ নিপুণ। ইহাদিগের সহিত যুদ্ধে আলেক্‌জাণ্ডারের সৈন্যদিগকে হটিতে হইয়াছিল। এই যুদ্ধ সমানে-সমানে যুদ্ধ। গ্রীক্ বৃত্তান্তসমূহে দেখা যায় তখনকার হিন্দু গণতন্ত্রগুলি সুব্যবস্থিত ছিল—সকল লোকই ছিল স্বাধীন, জগতের যে কোনো জাতির সঙ্গে লড়িতে সক্ষম।

পরে কালক্রমে ভারতে রাজার উদ্ভব হয়। রাজা বলিতে এক-শাসনের যে-কঠোরতা বুঝায় তখনকার রাজা আখ্যায় তাহা ছিল না। যথেচ্ছাচারী রাজার উদ্ভব হয় পরে। হিন্দুর ধারণামতে রাজা প্রজার দাস, প্রজার মনোরঞ্জন করিতে সিংহাসনে উপবিষ্ট। তাঁহাকে পরামর্শ দিবার জন্য কতকগুলি মন্ত্রী থাকিবে; কিন্তু তাহারা রাজার ইচ্ছার অধীন নয়। গ্লাড্‌স্টোন্ সম্বন্ধে উক্তি আছে যে, তিনি মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে বলেন—"রাজ্ঞী, আমি ইংলণ্ডের জনসাধারণের প্রতিনিধি।" মন্ত্রী ছাড়া আর-এক দল লোকের কথা রাজাকে শুনিতে হইত। তাঁহারা বনবাসী তপস্বী ব্রাহ্মণ; তাঁহারা রাজাকেও ক্রোধদৃষ্টিতে শাসন করিতে ভয় পাইতেন না। সে-কালে বনসমূহ এবং বনকুটীর-সমূহই ছিল জনসাধারণের প্রবল মতামতের লালন-গৃহ; আবার সেগুলি ছিল প্রাচীন ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়।

হিন্দু রাজাকে প্রজার প্রতি কর্ত্তব্য আনুগত্যের সহিত সাধন করিতে হইত; প্রজার মঙ্গলের জন্য, তাহাদের নৈতিক, আর্থিক ও সামাজিক মঙ্গলের জন্য রাজার জীবন-ধারণ।

—

বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিশিক্ষা

তিনটি কারণে কৃষিবিদ্যাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকাভুক্ত করা উচিত। প্রথম—অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য ইহার অঙ্গীভূত; দ্বিতীয়—মনুষ্য জাতির বাঁচিয়া থাকার পক্ষে ইহার প্রয়োজনীয়তা; তৃতীয়—ইহার উন্নতি সম্ভবপর। এমন-কি যে বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিশিক্ষার ব্যবস্থা নাই তাহাকে বিশ্ববিদ্যালয় বলা চলে কি না সন্দেহ, এবং তাহা কালের গতির পশ্চাতে।

অক্‌স্‌ফোর্ড, কেম্‌ব্রিজ, এডিন্‌বারা, প্রভৃতি প্রাচীন ব্রিটিশ বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলি এবং কানাডা ও আমেরিকার প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কৃষিশিক্ষার শ্রেণী রাখিতে লজ্জিত নয়। যে হার্‌বার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কলা ও জ্ঞানানুশীলনের ক্ষেত্ররূপে পরিচিত সেখানেও অধ্যাপক ষ্টোরার্ কৃষি-সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা দেন; সে-বক্তৃতাগুলি এখনও অধীত হয়।

অন্য দেশের ছাত্রদের জীবনের সঙ্গে ভারতীয় ছাত্রদের জীবনের তুলনা করিলে দেখা যাইবে, ভারতীয় ছাত্রদের কর্ম্মক্ষেত্র কত সঙ্কীর্ণ। ভারতের গ্র্যাজুয়েট্-যুবকরা অধিকাংশই কর্ম্মহীন। কৃষিকার্য্য শিখিলে ভারতীয় গ্র্যাজুয়েটরা অনায়াসে বেশ স্বাধীন জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারিবে; তাহাদের আত্মসম্মানের কোনো হানি হইবে না।

অতএব ভারতের প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের উচিত কৃষিশিক্ষার শ্রেণী খোলা বা কৃষি-কলেজ স্থাপন করা।

(এলাহাবাদ ইউনিভার্‌সিটি ম্যাগাজিন্)

এস হিগিন্‌বটম্

—

জাতি ও জনসাধারণ

গতবার জাপানে গিয়া শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সার্ব্বজাতিক মিলন সম্বন্ধে যে-বক্তৃতা দেন তাহা বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্‌লি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। তাহারই কিয়দংশ আমরা সঙ্কলন করিয়া দিলাম।—

পাশ্চাত্য দেশে জনসাধারণই তাহাদের সাহিত্য, চিত্রকলা, সঙ্গীত এবং নৃত্যকলার সৃষ্টি করিয়াছে। গ্রীসের প্রধান নাট্যকার ও চিত্রকরদের মধ্য দিয়াই জনসাধারণের মনোভাব অভিব্যক্ত হইয়াছে; দান্তে, শেক্‌স্‌পিয়র ও গ্যেটের মধ্য দিয়াও ঐ মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে; আপনাদের দেশেও সর্ব্বসাধারণের চিত্ত আপনাদের গৃহে তাহার প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, গৃহগুলিকে শান্ত সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত করিয়াছে;—আপনাদের ব্যবহারে যে সমুন্নত আত্মসংযম তাহাতে তাহার প্রভাব; আপনাদের উৎপাদিত সকল দ্রব্যে প্রয়োজনীয়তার সহিত সৌন্দর্য্যের যে-সমন্বয় তাহা ঘটাইতে তাহার প্রভাব; আপনাদের অননুকরণীয় চিত্রকলা ও নাট্যাভিনয়ে তাহার প্রভাব।

কিন্তু নেশ্যানের এই সমস্ত সৃষ্টি—ধ্বংসসাধনের ও ধনবৃদ্ধির যন্ত্রপাতি—কূট-রাজনীতির প্রকাশ্য ও গোপন আচরণ—এইসবের মূল্য কি? এগুলির সম্মুখে নৈতিক বন্ধন পরাহত এবং পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃভাব বিনষ্ট হইতেছে। এগুলি গ্রহণ করিতে আপনারা প্রলুব্ধ হইয়াছেন অথবা আপনাদিগকে প্রায় বাধ্য করা হইয়াছে। আর ভারতবাসী আমরা আপনাদিগকে এজন্য ঈর্ষ্যা করিতেছি এবং এগুলির যাহা হাতের কাছে আসে তাহাই গ্রহণ করিতে আমরা প্রস্তুত। যে-দেশে মহান্ ঋষিগণ জন্মগ্রহণ করিয়া মৈত্রী ও মুক্তির বার্ত্তা প্রচার করিয়াছিলেন সেখানে আজ অকরুণা, মিথ্যা ও অতিবাদের নীচতা এবং আত্মসুখের লোভ জাগিয়া উঠিতেছে। যখনই নেশ্যানের মনোভাব প্রাধান্য লাভ করিয়াছে তখনই করুণা ও সৌন্দর্য্য লোপ পাইয়াছে এবং মানুষের পরস্পরের মিলনের যে উদার বন্ধন তাহা মানুষের চিত্ত হইতে বিতাড়িত হইয়াছে। এই মনোভাব সহর ও সহরের বাজারের কদর্য্যতা মানুষের মনে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছে এবং তাহার চিত্তে বিকাররূপ দানবকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছে। যদিও আজ এই নেশ্যন ভাবের জগতের সর্ব্বত্র মানুষের মনে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তথাপি পোকা যেমন যে ফল ভক্ষণ করে সেই ফলেরই মধ্যে মরিয়া যায় তেম্‌নি ইহাও ধ্বংস লাভ করিবে। ইহা লোপ পাইবে নিশ্চয়; কিন্তু দুর্ভাগ্য এই, ইতিমধ্যেই ইহা হয়ত শতাব্দীর সংযম ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার ফলে সৃষ্ট অতুল মূল্যবান্ অনেক সামগ্রী ধ্বংস করিয়া ফেলিতে পারে।

আমি জাপানবাসী আপনাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতে আসিয়াছি,—যে-জাপানে বসিয়া আমি ন্যাশন্যালিজ্‌মের বিপক্ষে বক্তৃতা লিখিয়াছিলাম এবং এমন সময়ে লিখিয়াছিলাম যখন লোকে আমার মতামত উপহাস করিয়াছিল। তাহারা মনে করিয়াছিল আমি শব্দটির অর্থ জানি না, এবং জাতি ও রাষ্ট্র এই দুইটি শব্দের গোল পাকাইয়া ফেলিয়াছি। আমি কিন্তু আমার বিশ্বাস ত্যাগ করি নাই। আর এই যুদ্ধের পরে জাতির এই মনোভাবের, এই সর্ব্বচিত্তকঠোরকারী সমষ্টীভূত আত্মম্ভরিতার নিন্দা কি চারিদিকে আপনারা শুনিতে পাইতেছেন না?

আর একবার আমি আপনাদিগকে সেই কথা স্মরণ করাইয়া দিতে আসিয়াছি। আমার আশা, আমি এই দেশে এমন কয়েকটি ব্যক্তি খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিব যাহাদের মধ্যে মহৎ ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করিবার ভরসা রাখিবার সাহস আছে। জাপান তাহার প্রকৃত স্বরূপ খুঁজিয়া বাহির করুক,—সে-স্বরূপ কেবল পরের নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিবে না, নিজের জগৎ সৃষ্টি করিবে,—সে-জগৎ মানুষকে যাহা দিবার তাহা দিতে ঔদার্য্য দেখাইবে। আপনাদের মহত্ত্ব স্বীকার করিয়া
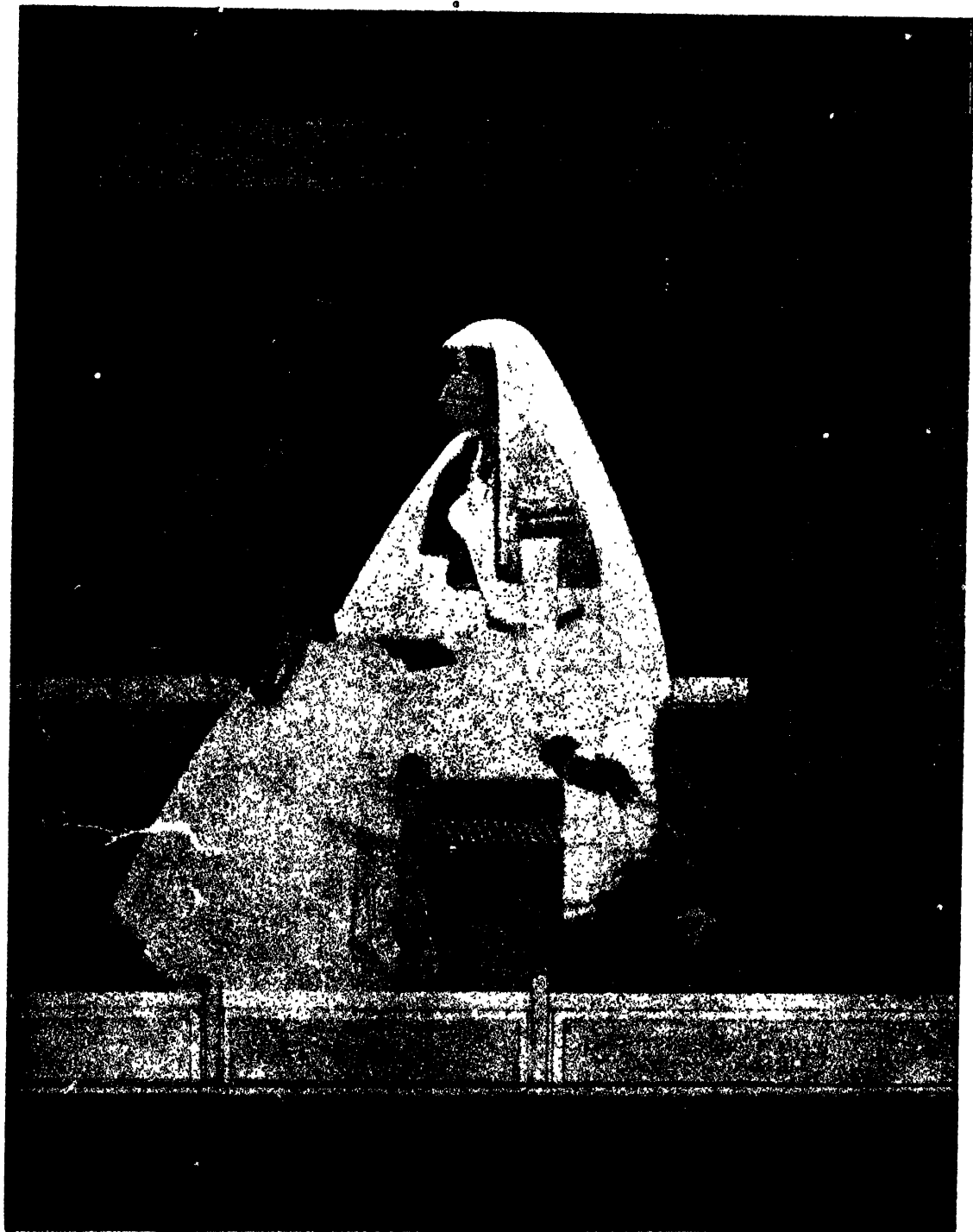
জেবউন্নিসা

চিত্রশিল্পী শ্রী সুরেন্দ্রনাথ কর

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

এসিয়ার সমস্ত জাতি গর্ব্বান্বিত হউক; সে-মহত্ব পরাজিতকে দাস করিয়া রাখার উপর যেন প্রতিষ্ঠিত না হয়, কেবলমাত্র নিজেদের স্থখের জন্ত অর্থ-আহরণের উপর যেন তাহার ভিত্তি না থাকে,—সে-অর্থ সর্ব্বকালের মানব কর্ত্তৃক গৃহীত হয় না এবং ঈশ্বর তাহা প্রত্যাখ্যান করেন।

জাপানী নারীর জীবিকার পথ

অনেক জাপানী নারী ব্যবসায় কাজ করে বা অনেকের বিভিন্ন পেশা আছে। কেবল প্রয়োজনের খাতিরে কাজ করে এমন নারীই যে আছে তাহা নয়; স্বামীর সহিত বিচ্ছেদের আশঙ্কায় বা তাহার পরলোকগমনের পরকালের জন্ত এবং নিজের বিবাহ খরচ নিজে সংগ্রহ করিবার জন্ত উপার্জ্জন করে, এমন নারীও আছে।

অনেক নারীই টাইপিষ্টের কাজ করিতে ব্যগ্র। একাজে খুব চাহিদা। যাহারা একটু অপেক্ষাকৃত শান্তপ্রকৃতির সেইরূপ নারীরাই কেরাণীর কাজ পায়। ব্যাঙ্ক, সওদাগরী আপিস ও অন্তান্ত আপিসে নারী-কেরাণী আছে। এসব জায়গায়ও কাজের চাহিদা বাড়িতেছে।

নারীরা জিনিষপত্র বিক্রয়ের কাজও করে। টেলিফোনের কাজ মেয়েদের একচেটিয়া। শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষয়িত্রীর কাজ নারীদের প্রিয় ও উপযোগী। প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয় প্রভৃতিতে মেয়েরা ঐ কাজ করে।

পুরাকাল হইতে ধাত্রীর কাজ নারীরা করিয়া আসিতেছে। কেবল সন্তান-প্রসব-কালে মাতার কাছে থাকিবে, শুধু কাজের এইটুকু জন্ত ধাত্রীর ব্যবসায়ের লাইসেন্স্ আজকাল নারীরা পায় না, আগে পাইত। আজকাল ধাত্রীদের আইন-সঙ্গত অনুমোদন চাই। সন্তান-পালন-সম্বন্ধীয় হাঁসপাতালে বা ধাত্রীদের আপিসে শিক্ষা পাওয়া চাই এবং লাইসেন্স্-পরীক্ষার পাশ করা চাই।

নার্স্‌দিগকে হাঁসপাতালের বা নার্স্ সমিতির কাজ করিতে হয়।

চুল বাঁধুনীদের কাজেই বোধ হয় সবচেয়ে বেশী উপার্জ্জন হয়; সমাজে কিন্তু তাহারা নীচে। প্রাচীনকাল হইতে একাজ স্ত্রীলোকেরা করিয়া আসিতেছে। এদের স্বামীরা একবারে এদের অনুগত, তাহারা উপার্জ্জনশীল স্ত্রীদের দাস হইয়া থাকে। জাপানী নারীদের চুল-বাঁধা প্রায় ১৫০ রকমের, তবে আজকাল পাঁচটির প্রচলন আছে। টোকিও এবং ওসাকা সহরে চুল-বাঁধুনীদের কয়েকটি বিদ্যালয় আছে। সেখানে ছয় মাস বা এক বৎসর চুল বাঁধা শিক্ষা দেওয়া হয়।

মেয়েদের সাজাইয়া দেওয়ার পেশাও মেয়েদের। একাজটি নূতন। এ-কাজ যাহারা করে তাহারা বিবাহের সময় ও অন্ত শুভ কাজে মেয়েদের সাজাইয়া দেয় শরীর পরিষ্কার করিয়া দেয়। একাজে মূলধন অপেক্ষাকৃত বেশী চাই, কিন্তু চুলবাঁধার কাজ অপেক্ষা ইহাতে আয় বেশী।

ফুল-সজ্জা ও পরিচারিকারা চায়ের উৎসবে এবং জাপানী-সঙ্গীত যাহারা শিক্ষা দেয় তাহাদিগকে তিন বৎসর এসব বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিতে হয়।

বিদেশী-সঙ্গীত যাহারা শিক্ষা দেয় তাহারা দেশীয়-সঙ্গীত শিক্ষয়িত্রীদের অপেক্ষা বেশী বেতন পায়।

সেলাইএর কাজ প্রাচীন সময় হইতেই মেয়েদের দ্বারা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

গৃহপরিচারিকাদের কাজ মেয়েদের প্রিয় কাজ নয়, কারণ তাহাতে অপেক্ষাকৃত অল্প বেতনে সমস্ত দিন কাজ করিতে হয়। সূতা কাটার ও হোটেল প্রভৃতিতে পরিচারিকার কাজের আদর আছে। বড়-বড় সহরে একটি নূতন কাজের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার নাম হাকুৎসু-ফু। একাজ যাহারা করে তাহারা একটা নির্দ্দিষ্ট কালের জন্ত নিয়োগ পাইতে চায়। তাহারা সাধারণ পরিচারিকাদিগের মতন কাজ করে।

হোটেল প্রভৃতির পরিচারিকাদের কাজ দেওয়া হয় ১৬-২০ বৎসর বয়স্ক সুন্দরী মেয়েদিগকে।

মাটির ও মোমের জিনিসপত্র করার কাজ আজকাল মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত; পূর্ব্বে ছিল না।

মিস্ নোবুকো কোডা জাপানে প্রথম বিদেশী-সঙ্গীত-শিক্ষয়িত্রী।

কেন্‌জ্যান্ নোনাকার কন্তা জাপানী নারী চিকিৎসকদের প্রথম।

সুশ্রী মেয়েরা সিনেমায় বক্তৃতার কাজ বেশ আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করে।

(জাপান ম্যাগাজিন্)

প্রতিভা

জগতের লোকে সাধারণতঃ ইহা মনে করিয়াই সন্তুষ্ট যে, প্রতিভা এমন একটি জিনিষ যাহা প্রকৃতির নিয়ম-নিরপেক্ষ হইয়া, তাহার অনুবর্ত্তন না করিয়াই উদ্ভূত হয়। প্রতিভার জাগরণ, যে-আধারের মধ্য দিয়া ইহা নিজেকে প্রকাশ করে, এবং ইহার প্রকাশের রূপ—এসমস্ত বিনা বিতর্কে অবশ্যম্ভাবী ও অবর্ণনীয় বলিয়াই গৃহীত। সাধারণ পাঠকেরা কৌতুক বোধ করিতে অথবা আনন্দিত বা বিস্ময়ান্বিত হইতেই ব্যগ্র, কিন্তু চিন্তা করিতে রাজি নয়। সেইজন্ত তাহারা প্রতিভাকে একটা সম্পূর্ণ অদ্ভুত জিনিষ বলিয়া মনে করে।

প্রতিভার আবেষ্টন ও তাহার প্রকাশ—এই দুইটির মধ্যে স্পষ্ট একটা অসামঞ্জস্য থাকিতে দেখিলেই অধিকাংশ লোকে সন্তুষ্ট। অসামঞ্জস্য যত বেশী বিস্ময়ও ততোধিক। কোনো কৃষক যদি কবি হয় বা পুলিশের লোক যদি চিত্রকর হয় তাহা হইলে জগতের লোকে খুব বাহবা দেয়। কবির ব্যক্তিত্ব বা জীবনকাহিনী তাহার কবিতার সহিত খাপ খায় না—এমন হইলেই সাধারণ লোকে ঠিক মনে করে।

রচনা-বিষয়ের সরলতা ও প্রকাশের সরলতা মাঝামাঝি বুদ্ধির কাজ বলিয়া গণ্য; যে গ্রন্থের সরলতা যত বেশী সে-গ্রন্থকে তত কম শক্তি-প্রসূত মনে করা হয়। যে যত বড় প্রতিভাবান্ হইবে সে যেন তত খাপ-ছাড়া ও পাগল-গোছের হইবে। মৌলিকত্ব, সৃষ্টিশক্তি, কল্পনাশক্তি ধারণাশক্তি, চিন্তাশক্তি, আধ্যাত্মিক-শক্তি ও সৃষ্টির আবেগ প্রভৃতির দিক্ দিয়া সাংসারিক লোকে প্রতিভার বিচার করে না। এ পন্থা তাহাদের কাছে বড় ক্লেশকর। মোটামুটি জ্ঞানে বুঝিতে পারাই তাহাদের কাছে প্রতিভার মানদণ্ড। তাহারা প্রতিভাকে একটা মানসিক ব্যাধি বলিয়া মনে করে। বাস্তবিক কিন্তু চসার, স্পেন্সার, শেক্সপিয়র, মিলটন, ওডার্স্‌ওয়ার্থ প্রভৃতি ইংরেজি কাব্যের বড়-বড় স্রষ্টাগণের এমন কার্য্যকরী জ্ঞান ও সাধারণ-বুদ্ধি ছিল যাহা সাংসারিক লোকেরও ঈর্ষার বিষয়। চসার তাঁহার ক্যান্টারবেরি টেলস্এ লেখেন জাহাজে মাল-বোঝাইর বিল তৈরী করার মাঝে-মাঝে, অন্তান্ত নানা কাজের অবকাশে। আয়র্লণ্ডের ডেপুটি-গবর্ণরের সেক্রেটারী থাকিতে-থাকিতে স্পেন্সার ফেয়ারী কুইন্ লিখিবার মতলব করেন। শেক্সপিয়র ছিলেন থিয়েটারের বক্তা এবং ম্যানেজার ও বণিক্; তিনি যখন ম্যাক্‌বেথ লিখিতেছিলেন তখন কিছু টাকার জন্ত একজনের নামে মোকদ্দমা চালাইতেছিলেন। মিলটন্ স্কুলে মাষ্টারের কাজ করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে করিতে এরিওপ্যাজিটিকা লেখেন। ওয়াড্‌স্‌ওয়ার্থের বিচার-বুদ্ধি ছিল প্রচুর, কল্পনাশক্তি ছিল সংযত এবং কবিতা সম্বন্ধে কার্য্যকরী বুদ্ধি খুব ছিল। অবশ্য পাগল কবি যে না হইয়াছে এমন নয়।

যেমন কলের গুণ দেখা হয় তাহার উৎপাদনের ক্রততা দেখিয়া তেমনি অনেকে প্রতিভার বিচার করে তাহার রচনার ক্রততা দেখিয়া। তাহাদের ভ্রান্ত ধারণা এই—কবিরা বিনা আয়াসে তাঁহাদের বড়-বড় কাব্য সৃষ্টি করিয়া থাকেন। তাহারা এমন কবির কথা শুনিতে ভালোবাসে যাহাদের লেখার বিরাম নাই। তাহাদের কাছে সে-কবি আদর পায় না যে আমোদ-প্রমোদ ভালবাসে না এবং অত্যধিক পরিশ্রমে দিন কাটায়।

এই মানদণ্ডে আট বৎসরে রচিত গ্রের এলিজি কবিতাই নয়। কিন্তু প্রতিভা যাহা তাহা অপরিসীম পরিশ্রম করিতে পারে। শেক্স্‌পিয়রের রচনার ক্ষেত্র যেমন বিস্তৃত, তাঁহার জ্ঞানও তেমতি বিস্তৃত। তিনি নিশ্চয়ই সর্ব্বগ্রাসী পাঠক ছিলেন, মানুষ এবং ঘটনা-প্রবাহের তিনি বিচক্ষণ ও অধ্যবসায়শীল পর্য্যবেক্ষক ছিলেন। প্রতিভার কয়েকটি উপাদান হইতেছে—মৌলিকত্ব, কল্পনাশক্তি, চিত্তব্যাপকতা, অনুভূতিপ্রবণতা, সরলতা, সমবেদনা, ভাবাবেগ, প্রকাশ, দক্ষতা, সঠিক মাত্রাজ্ঞান, সঙ্গীতের একটি সহজ কোমল বোধ। কিন্তু এ সমস্তই ব্যর্থ, যদি প্রতিভার মধ্যে সেই অসীম মনঃশক্তি, সেই আত্মবিলোপী লক্ষ্যসাধননিষ্ঠা—না থাকে, যাহার দ্বারা ঐসমস্ত উপাদান অনুশীলিত হইতে পারে এবং যাহা অমর কাব্য সৃষ্টিতে শক্তি যোগাইয়া থাকে। যে-প্রতিভার সৃষ্টি বুদ্ধিবৃত্তি বৰ্দ্ধিত করে, ভাবাবেগ আলোড়িত করিয়া তুলে এবং কল্পনাকে প্রদীপ্ত করে সে-প্রতিভা কেবল যে যথার্থ চিন্তা করে, গভীরভাবে অনুভব করে এবং উ কল্পনার বশবর্ত্তী তাহা নয়, সে-প্রতিভা অমানুষিক পরিশ্রমও করে।

(চেম্বার্সের্ জার্নাল্) উইলিয়াম্ ডগ্‌লা

বাঙ্গালী মহিলার পৃথিবী-ভ্রমণ

শ্রী অবলা বসু

ছেলে-বেলা হইতেই ইচ্ছা ছিল, আমার এই সামান্য জীবন যেন দেশসেবায় নিয়োগ করিতে পারি। এই আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার কোনো গুণই আমার ছিল না, কিন্তু দেবতার আশীর্ব্বাদে আমার কল্পনার অতীত সার্থকতা জীবনে লাভ করিয়াছি। বহুদেশ ভ্রমণ করিয়া দেশসেবার নানা উপাদান সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। সেকথা বলিতে গেলে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিতে হয়। সেই বৎসরে আচার্য্য বসু মহাশয় অদৃশ্য-আলোক-সম্বন্ধে তাঁহার নূতন আবিষ্ক্রিয়া বৈজ্ঞানিক সমাজে প্রদর্শন করিবার জন্য ব্রিটিশ এসোসিয়েশনে আহুত হন। তাঁহার সহিত আমিও যাই; এই আমার প্রথম ইয়োরোপ যাত্রা। ইহার পর ১৬ বার তাঁহার সহিত পৃথিবীব্যাপী ভ্রমণে বাহির হইয়াছি। আমার ভ্রমণকালের মধ্যে পৃথিবীর ইতিহাস নানা-ভাবে ভাঙ্গিয়াছে ও গড়িয়াছে, এক আমার বয়সেই ইয়োরোপে কত পরিবর্ত্তন দেখিলাম। এদেশে একটি মানুষের জীবনে এমন বিপুল পরিবর্ত্তন কখনও দেখা যায় না।

বিলাতে পৌঁছিয়াই আচার্য্য লিভারপুলে সমাগত ব্রিটিশ এসোসিয়েশনের বৈজ্ঞানিক সম্মিলনে বক্তৃতা দিতে নিমন্ত্রিত হন। বক্তৃতার দিন হলটি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক দ্বারা পূর্ণ দেখিলাম। তাহার মধ্যে Sir J. J. Thomson (স্যর জে, জে টম্‌সন), Oliver Lodge (অলিভার লজ) ও Lord Kelvin (লর্ড্ কেল্‌ভিন) ছিলেন। আমি বাঙ্গালীর মেয়ে সভয়ে উপরের গ্যালারিতে অন্যান্য দর্শকবৃন্দের মধ্যে বসিলাম। এতকাল ত ভারতবাসী বিজ্ঞানে অক্ষম এই অপবাদ বহুকণ্ঠে বিঘোষিত হইয়াছে, আজ বাঙ্গালী এই প্রথম বিজ্ঞান-সমরে বিশ্বের সম্মুখে যুঝিতে দণ্ডায়মান। ফল কি হইবে ভাবিয়া আশঙ্কায় আমার হৃদয় কাঁপিতেছিল, হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া আসিতে ছিল। তার পর যে কি হইল সে-সম্বন্ধে আমার মনে স্পষ্ট কোনো ছবি আজ আর নাই। তবে ঘন-ঘন করতালি শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম যে পরাভব স্বীকার করিতে হয় নাই বরং জয়ই হইয়াছে। দেখিলাম একজন বৃদ্ধ লাঠিতে ভর করিয়া গ্যালারিতে উঠিয়া আমাকে অভিবাদন করিয়া আচার্য্যের আবিষ্ক্রিয়া-সম্বন্ধে বহুবিধ প্রশংসা করিলেন। জানিতে পারিলাম ইনিই অদ্বিতীয় বৈজ্ঞানিক লর্ড্ কেল্‌ভিন। ইনি অত্যন্ত আদর করিয়া আমাদিগকে তাঁহার গ্লাসগোর (Glasgow) ভবনে নিমন্ত্রণ করিলেন। অলিভার লজ মহাশয়ও নানারূপে আমাদের সম্বর্দ্ধনা করিলেন। তাঁহারা দুজনেই আচার্য্যকে ইংলণ্ডে থাকিয়া অধ্যাপক হইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু ভারতবর্ষের হাওয়া ছাড়া তিনি কাজ

করিতে অসমর্থ বলিয়া আচার্য্য তাঁহাদিগকে অসম্মতি জানাইলেন।

ইংলণ্ডের বিজ্ঞানবিদ্‌দের মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া গেল, নানাস্থানে সান্ধ্য ভোজনে নিমন্ত্রিত হইলাম। প্রসিদ্ধ রাসায়নিক ডাক্তার গ্ল্যাড্‌স্টোন্‌-এর বাড়ীতে এইরূপে নিমন্ত্রণে আহূত হইয়া ভোজন-সভাতে বসিয়া শুনিলাম একজন নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক (যাঁহাকে ভারতসচিব বিশেষজ্ঞ-স্বরূপে ভারতবর্ষে প্রেরণ করিয়াছিলেন) পার্শ্বস্থ বন্ধুকে বলিতেছেন—এই "চন্দ্রবসু" লোকটি যাহার কথা আজকাল লোকে এত বলিতেছে সে কে হে? ভারতীয় লোক আবার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করিবে? অসম্ভব! তাহাদিগকে ছোটো টেস্‌ট্‌ টিউব দিয়া পরীক্ষা করাইয়া তাহার স্থানে বড় টেস্‌ট্‌ টিউব দিলে আর তাহারা সেই পরীক্ষা করিতে পারে না—ভারতবাসী নকলে মজবুত, কিন্তু বিচার-বুদ্ধি খাটাইয়া হাতে-কলমে ব্যবহার ত কখনো করিতে পারে না!" পার্শ্বের লোকটি বিখ্যাত রাসায়নিক র‍্যাম্‌সে (Ramsay)। তিনি বলিলেন—"চুপ করো—তুমি কিছুই জানো না—ভারতবাসী বহু শতাব্দীর সাধনাতে তাহাদের চিন্তাশক্তি এত প্রখর করিয়াছে যে চিন্তাশীলতায় তাহাদের সমকক্ষ হইতে আমাদের বহুদিন লাগিবে। আমাদের সৌভাগ্য যে ইহারা এ-পর্য্যন্ত নিজের হাতে পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করে নাই। যখন শিখিবে তখন ব্রিটনের আধিপত্য চলিয়া যাইবে। তবে এই "চন্দ্রবসু" দৈবক্রমে এইরূপ সার্থকতা লাভ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সিদ্ধিতে আমাদের ভয়ের কারণ নাই।" ক্রমে গ্লাড্‌স্টোন্‌ পরিবারের সহিত আত্মীয়তা বাড়িয়া গেল, তাহাদের সুখদুঃখের কথা শুনিতে লাগিলাম। ডাক্তার গ্ল্যাড্‌স্টোন্‌ বিপত্নীক ছিলেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা পিতার সেবার জন্য বিবাহ করেন নাই; ইংলণ্ডে এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যায়; কখনও কন্যা পিতার জন্য, কখনও পুত্র মাতার জন্য আজীবন কৌমার্য্যব্রত পালন করেন। বর্ত্তমান বাঙ্গালী রাসায়নিকদের গুরু Dounau সাহেব বিবাহ করেন নাই, মাতা ও কুমারী ভগ্নীদের লইয়াই তাঁহার পরিবার। বিবাহের কথা তুলিলেই হাসিয়া বলেন, এমন মা ও বোন থাকিতে আমার তত্ত্বাবধান করিতে অন্য কাহারো কি আবশ্যকতা? বিবাহ করার খাতিরেই বিবাহ করার ভক্ত ইহারা নহেন। আদর্শের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই তাঁহারা জীবনপথে অগ্রসর হন।

এই পরিবার ইংলণ্ডের অভিজাত-বংশের (aristocracy) সহিত সংসৃষ্ট; সুতরাং শ্রমজীবীদের সম্বন্ধে তাঁহাদের মনে পূর্ব্বে বেশ কুসংস্কার ছিল। কিন্তু এই পরিবারেই এমন ঘটনা হইল, যে তাঁহাদের এক কন্যা আভিজাত্যের অভিমান ত্যাগ করিয়া এক দরিদ্র শ্রমজীবীকে বিবাহ করিলেন এবং তাঁহার জীবন শ্রমজীবীদের উন্নতিকল্পে উৎসর্গ করিলেন। সেদিন হইতে কন্যার পরিবারে ঘোর বিষাদ—তাঁহার নাম আর কেহ করিতে পাইত না। কিন্তু কন্যা পতিগৃহে নব উৎসাহে শ্রমজীবীদলের কেন্দ্রস্বরূপ হইলেন, তাঁহার দরিদ্রগৃহে নানাদেশের কর্ম্মীরা আশ্রয় উৎসাহ ও বিশ্রাম পাইতেন। এই কন্যা যাঁহার সহধর্ম্মিণী হইয়াছিলেন তিনিই ছবৎসর পূর্ব্বের ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী র‍্যাম্‌জে ম্যাক্‌ডোনাল্ড্‌।

ইহার পরে লণ্ডনের প্রসিদ্ধ রয়্যাল ইন্‌স্‌টিটিউশনের শুক্রবাসরীয় বক্তৃতা দিবার জন্য আচার্য্য নিমন্ত্রিত হন। এইস্থানে বক্তৃতা দেওয়া অত্যন্ত সম্মানের চিহ্ন। তরলগ্যাসের (Liquid gas) আবিষ্কর্ত্তা প্রসিদ্ধ Sir James Dewar তখন ইহার কর্ত্তা ছিলেন। তিনি রয়্যাল ইন্‌স্‌টিটিউশনএরই উপরের তলাতে বাস করিতেন। সেদিন আমাদের সান্ধ্য ভোজনে নিমন্ত্রণ করিয়া বহু সম্মানিত লোকের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। এই প্রথম আমার বৈজ্ঞানিক সামাজিক সম্মিলনে নিমন্ত্রণ, তাহার ফলে অনেকের সহিত বন্ধুতা-সূত্রে আবদ্ধ হইলাম। বঙ্গনারীর এই প্রথম বৈজ্ঞানিক জগতে প্রবেশ। সত্যকথা বলিতে কি, পূর্ব্বে আমার ধারণা ছিল যে, বৈজ্ঞানিকদের স্ত্রীরাও সকলেই বুঝি খুব বিদুষী। এইসব নিমন্ত্রণে গিয়া সে ধারণা ক্রমে-ক্রমে চলিয়া গেল—তবে বৈজ্ঞানিকদের স্ত্রীরা যে খুবই পতিপ্রাণা ও পতির সেবাতে নিযুক্তা ইহার সাক্ষ্য দিতে পারি। লর্ড কেল্‌ভিন নিজের সম্বন্ধে অত্যন্ত অসাবধান ছিলেন, তাঁহার পত্নী তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া সর্ব্বদাই তাঁহার সেবা করিতেন।

রয়্যাল ইন্‌স্‌টিটিউশনেরএর প্রবর্ত্তক আদিগুরু Davy (ডেভি) ও Faraday (ফ্যারাডের) যন্ত্রপাতি সেখানে সযত্নে রক্ষিত হয়। শুক্রবার দিন তাহার প্রদর্শনী হয় এবং যদি সেখানে কেহ কোনো নূতন-কিছু দেখাইতে চান তাহাও শুক্রবার দিন দেখানো হয়। আমরা আহারান্তে এইসব দেখিয়া বক্তৃতা-গৃহে গেলাম। সভাপতির পার্শ্বে আমি বসিলাম, যে-স্থানে ডেভি ও ফ্যারাডে বক্তৃতা দিতেন, সেই হলে ও সেই টেবিলে যখন এই তরুণ বাঙ্গালী বক্তৃতা দিতে দাঁড়াইলেন তখন আনন্দে আমার জীবন সার্থক মনে হইল। ভারতের জয়-পতাকা আবার নূতন করিয়া বিশ্বের সম্মুখে তোলা হইল, মনে করিলাম। অন্যান্য সভার রীতির মতন এই সভাতে বক্তার পরিচয় দেওয়ার রীতি নাই, কারণ এখানে যিনি বক্তৃতা দেন তাঁহাকে সকলেই জানে। সুতরাং ঘড়িতে ৯টা বাজিবামাত্র আচার্য্য বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। একঘণ্টা নীরবে সকলে বক্তৃতা শুনিলেন এবং বক্তৃতা-অন্তে সকলেই আচার্য্যকে ঘিরিয়া অভিবাদন করিলেন। Lord Raleigh (লের্ড্ র‍্যালে) বলিলেন যে এরূপ নির্ভুল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা কখন হয় নাই,—দু-একটি ভুল হইলে মনে হইত যেন জিনিষটা বাস্তব ; এ যেন মায়াজাল। আমি যখন আচার্য্যের সহিত ইংলণ্ডে যাই তখন জড়পিণ্ডবৎ ছিলাম, আজকালকার মেয়েদের মতন চালাক-চতুর ছিলাম না, একটি কথাও বলিতে পারিতাম না, কিন্তু এইসব লোকের সংস্পর্শে আসিয়া দেখিতে-দেখিতে অনেক শিখিলাম। এই রয়্যাল ইন্‌স্‌টিটিউশন্‌এর কার্য্য-পদ্ধতি দেখিয়া তখন হইতেই আমাদের দেশে এরূপ কোনো স্থান করিবার বাসনা আমার মনেও উদয় হইল এবং বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের সূচনা ও কল্পনা তখন হইতেই আরম্ভ হইল। দেশে যাহা-কিছু কাজ করিয়াছি তাহাও বিদেশ-ভ্রমণের অভিজ্ঞতারই ফল।

পথের দেখা

শ্রী শান্তা দেবী

সংসারে প্রায় সব মানুষের মধ্যেই অল্পবিস্তর পাগ্‌লামি দেখা যায়। একটা কিছু খেয়াল না হইলে যেন তাহারা বাঁচিতে পারে না। জগৎসুদ্ধ লোক কলের ছাঁচে ঢালা নকল শিল্প-সৃষ্টির মতো যদি হুবহু একই ধরণে স্নান আহার উপার্জ্জন অধ্যয়ন আমোদ বিলাস মাপিয়া যথাযথভাবে করিত, তবে জগতে বৈচিত্র্যের বালাই থাকিত না। সৃষ্টির একঘেয়ে রূপ দেখিয়া মানুষের চোখে জালা ধরিয়া যাইত। তাই বিধাতা মানুষের মাথায় পাগ্‌লামির ছিট দিয়া তাহাদের সহস্র রূপ খুলিয়া ধরিলেন।

অনসূয়ার পাগ্‌লামি ছিল বিদ্যা। তিন বছর বয়স না হইতেই সে বই পড়িবার জন্য পাগল হইয়া উঠিয়াছিল, কারণ দেড় বছর বয়সেই তাহার প্রিয় খেল্‌না ছিল প্রকৃতি-বাদ অভিধান ও বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী। কাঠের খেল্‌না মাটির পুতুল কি টিনের বাঁশী ত তাহার পছন্দ হইতই না, বই খাতাও পাৎলা হাল্কা-রকমের হইলে সে ঠোঁট ফুলাইয়া ঘাড় বাঁকাইয়া অভিমান-ভরে সব দূরে ঠেলিয়া দিত। যে পুস্তকের ভারে তাহার শিশু-দেহ টলমল না করিয়া উঠিত, দুই হাতে তেম্‌নি গুরুভার কিছু আঁকড়াইয়া না ধরিতে পারিলে তাহার গর্ব্ব ক্ষুণ্ণ হইত, আনন্দ স্ফূর্ত্তি-হীন হইয়া পড়িত। কাজেই অনসূয়া যে সরস্বতীকে হার মানাইবার খেলায় ভবিষ্যতে মত্ত হইয়া উঠিবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি আছে? অল্পবয়সেই সে বি-এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল। পিতামাতা বলিলেন :—পড়াশুনা ত সাঙ্গ হ'ল, এইবার ঘর সংসারের কাজে মন দাও, নিজের ঘর ত কর্‌তে হবে। অনসূয়া যেন আকাশ হইতে পড়িল। সে বলিল, "সে কি! বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কম ক'রেও পনের

ষোলো বিষয়ে এম্‌-এ পড়ানো হয়,আমার ত এখনও একটাও পড়া হয়নি, এরি মধ্যে পড়াশুনা সাঙ্গ হ'ল কি ক'রে ?" অনসূয়া দর্শনশাস্ত্রে ডুব দিল ; দুই বৎসর পরেই সে-সাগর পার হইয়া আসিয়া সে আবার ইতিহাসের বিপুল বোঝা লইয়া বসিল। বিশ্ববিদ্যালয় আবার আর-একটা খেতাব দিয়া অনসূয়াকে খুসী করিয়া দিলেন। অর্থনীতিতেও একটা ডিগ্রী লইয়া সে দেখিল এখনও আরো অনেক সাগর মন্থন করিয়া খেতাব আহরণ করা যায় বটে, কিন্তু এখানে একটা মস্ত বিপদ্ আছে। যত বিদ্যাই সে আয়ত্ত করুক না কেন, সবেরই সেই এক এম্ এ উপাধি। এ-ক্ষেত্রে নূতনত্ব কিছু নাই। উপাধি-অর্জ্জনের ফাঁকে-ফাঁকে অনসূয়া সঙ্গীত-চর্চ্চাও করিয়াছিল ; কিন্তু বাংলা দেশে সঙ্গীতের কোনো খেতাব নাই, কোনো যশও তেমন নাই। সুতরাং নূতন আর-একটা অলঙ্কারে নামটা ভূষিত করিবার জন্য এবং সম্পূর্ণ অন্যধরণের আর-একটা বিদ্যা দখল করিবার জন্য সে ঠিক করিল ডাক্তারি পড়িবে। কলিকাতায় পড়িবার চেষ্টা করিল, সুবিধা হইল না। কিন্তু তাই বলিয়া অনসূয়া কি হাল ছাড়িবার মেয়ে! সে দিল্লী যাইবার সব ব্যবস্থা করিয়া বসিল। হইলই বা অজানা অচেনা দেশ! মানুষের দেশ ত! যেমন করিয়া হউক সেখান হইতে চিকিৎসা-শাস্ত্রের একটা ডিগ্রী লইয়া আসিতে হইবে। অনসূয়া হিসাব করিয়া দেখিল ডিগ্রী লইবার পর তাহার যত বয়স হইবে তাহাকে খুব একটা কিছু প্রবীণ-জনোচিত বয়স বলা চলে না। সুতরাং তা'র পর ইউরোপে গিয়া তৃতীয় আর-একটা কিছু পথে ডিগ্রীর বহর আর কিছু বাড়াইয়া আনাও চলে। খুসী হইয়া অনসূয়া বাক্‌স পেঁট্‌রা গুছাইতে বসিল, দিল্লী পৌছাইয়া দিবার সঙ্গীও ঠিক করিল। একেবারে একলা পথ-চলার অভ্যাস তাহার ছিল না ; কারণ এই পথ-চলার বিদ্যাটাকে অনসূয়া দুর্ল্লভ দুরধিগম্য বিদ্যা মনে করিত না। তাই সেটা আয়ত্ত করা তাহার হইয়া উঠে নাই।

যাত্রার দিন কি-একটা পর্ব্ব-উপলক্ষে ছুটি ছিল। ছুটির সুযোগে দেশে-বিদেশে ছুটিবার নেশায় কলিকাতা সহর চিরকালই অধীর হইয়া উঠে। সেদিনও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। অনসূয়া ষ্টেশনে নামিয়াই দেখিল তাহার মাথার উপর সহস্র সুটকেস ট্রাঙ্কের তরঙ্গ বিপুল উল্লাসে দুলিয়া উঠিতেছে, আশে-পাশে সপ্তসহস্র রথী তাহাদের পুঁটলী ধামা, ধুচুনী, বস্তা ও কেনেস্তরার অস্ত্রশস্ত্র লইয়া তাহাকে ঘিরিয়াই যেন এক অভূতপূর্ব্ব ব্যূহ রচনা করিতেছে ; পায়ে-পায়ে কেবলি সাদা, কালো, শ্যাম ও গৌর, সহস্র চরণ আসিয়া ঠেকিতেছে; বুট-জুতা, শু-জুতার গুঁতায় তাহার সৌখীন মার্কিন পাদুকা ক্ষত-বিক্ষত হইয়া উঠিতেছিল, তাহার উপর নাগরা ও নগ্নপায়ের ধূলাকাদা ও পঙ্ক পড়িয়া তাহার শুচিবায়ুগ্রস্ত মন ক্ষুব্ধ পঙ্কিল হইবার জোগাড়। প্লাটফরমের লৌহ-দরজা বন্ধ ; যাত্রীদল তাহার কঠিন বুকে গিয়া আছ্‌ড়াইয়া পড়িতেছে, কিন্তু তাহাকে টলাইতে পারিতেছে না। এখনও যে সময় হয় নাই ; দয়া কি সুবিধার খাতিরে সময়ের বাঁধা নিয়ম ত ভাঙা যায় না। জনারণ্য অধৈর্য্য হইয়া কণ্ঠস্বরে ও বাহুর আস্ফালনে, রুদ্ধ আক্রোশ প্রকাশ করিতে লাগিল। ভীড়ের ভিতর নারীজাতির সংখ্যা অতি সামান্য ; দুচারিটি মেয়ে এদিক্-ওদিক্ ছড়াইয়া ছিল তাহারা ক্রমে সরিয়া-সরিয়া অনসূয়ার পাশ ঘেঁসিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। অশান্তির কল-কল্লোলের ভিতর সেইখানে একটু শান্তির আভাস পাওয়া যাইতেছিল। ফিরিঙ্গি টিকিট্-কালেক্টরের নজর পড়িল সেই দিকে। হঠাৎ তাহার মনটা নরম হইয়া উঠিল। সে বলিল, "মেয়েদের ভিতরে আসিতে বলুন।" লোহার দরজা একটুখানি ফাঁক করিয়া রাস্তা করিয়া দিতেই অনসূয়া ও আর তিন-চারটি মেয়ে ভিতরে ঢুকিয়া আসিল; তাহাদের সঙ্গী পুরুষদের ভাগ্যও সুপ্রসন্ন হইল। 'পথি নারী বিবর্জ্জিতা' বলিয়া যাহারা সঙ্গিনীহীন হইয়া যাত্রা করিয়াছিল তাহারা মধ্যপথে তেম্‌নি আটক হইয়া পড়িয়া রহিল। ভীড়ের দিনে সঙ্গিনীরা যে নিছক অসুবিধাই বাড়াইয়া তোলে না, ইহা বুঝিয়া দু-দশজন মনে-মনে নিজেদের কৃতকর্ম্মের জন্য অনুশোচনা করিতে লাগিল। কিন্তু সঙ্গীদের উদ্যত ছাতা হুঁকা লোটা ও সোঁটার গুঁতায় তাহাদের মনে করুণ রস বেশীক্ষণ স্থান পাইল না। কোলাহল ও অধীরতা বাড়িয়াই চলিল।

লৌহ দরজার পারে লম্বা প্লাটফরম্‌টায় এতক্ষণ জন-

প্রাপ্তি ছিল না। অনারণ্যের ধারের এই মরুভূমিটার জন্ত তাই এতগুলি মানুষের মন এমন লালায়িত হইয়া উঠিতেছিল। খোলা জায়গা পাইয়া মেয়েরা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। কিন্তু মানুষ যত পায় তত চায়; যতক্ষণ দাঁড়াইবারও ঠাঁই ছিল না, ততক্ষণ বসিবার কথা কাহারও মনে আসে নাই; এইবার বসিবার আসনের খোঁজ পড়িয়া গেল। মাত্র দুইটা বেঞ্চ্ ছিল প্লাট্‌ফরমে। মেয়েরা দেখিল তা'র দেড়খানাই তাহাদের পুরুষ সঙ্গীরা দখল করিয়া বসিয়াছে। সুতরাং তাহাদের বসিতে পাইবার আশা কম। বেঞ্চির ঠিক মাঝখানে একটা লোহার হাতল আসনটাকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া রাখে। অনসূয়া দেখিল, এম্নি আধখানা বেঞ্চি শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে। সে লুব্ধদৃষ্টিতে সেই দিকে তাকাইল। দুটি পুরুষ পাশেই বসিয়াছিল, অনসূয়ার দৃষ্টিতে আনন্দে পুলকিত হইয়া তাহারা আসনে আরো এলাইয়া পড়িল। মানুষ-দুটিকে ডাকিয়া বলিলেও যে তাহারা নড়িবে না এবং তাহারা থাকিলে অন্য মেয়েরা সে-আসনে কখনই সহজে বসিবে না, ইহা বুঝিয়া অনসূয়া একলাই বাকি অর্দ্ধাসন দখল করিয়া বসিল। অন্য তিনটি মেয়ে কেহ মেঝের উপর উবু হইয়া, কেহ বা মোটের উপর পা ছড়াইয়া বসিয়া পড়িল। অনসূয়ার দুঃসাহস দেখিয়া স্ত্রীপুরুষ সকলেরই বিস্মিত দৃষ্টি তাহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। তাহার সঙ্গীটি তখন প্লাট্‌ফর্মের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পায়চারি করিয়া সময়ের সদ্ব্যবহার করিতেছিলেন।

ঝুঁটিবাঁধা ছোটো একটি মেয়ে হঠাৎ তাহার মাকে ঠেলা দিয়া বলিয়া উঠিল, "মা, দেখ্ দেখ্, মেম মামা বাবুর মতো হাতে ঘড়ি বেঁধেছে। ওর ঘড়িটি কেমন রাঙা, নয় মা! মামা-বাবুরটা সাদা 'বচ্ছিরি।"

মা বলিল, "দূর পাগ্‌লি, ও মেম কেন হবে রে! ওবে বাঙালী। সোনার ঘড়ি হাতে দিয়েচে, বড় লোকের মেয়ে হবে বোধ হয়। অমন চেঁচিয়ে কথা ক'স্‌নি, শুনলে কি ভাব্‌বে!'

মাতাপুত্রীর কথোপকথন অনসূয়ার কানে সবটাই আসিয়াছিল। সেও কৌতূহলী হইয়া তাহাদের দিকে তাকাইল। সবুজ-রঙের একটা নূতন টিনের বাক্সের উপর চাঁদনীর তৈরী লালডোরা-কাটা ফ্রক গায়ে সাত-আট বৎসরের একটি শীর্ণ বালিকা মা'র মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বসিয়াছিল। তাহার পায়ে বার্ণিশ-করা জুতার উপরই ঝাঁঝ মল চড়ানো, মাথায় উবু ঝুঁটির উপর হাড়ের ফরাসী শিরোভূষণ, ফ্রকের পিছনের হুক ছিঁড়িয়া পিঠের হাড় দেখা যাইতেছে। বালিকার লুব্ধ নয়ন অনসূয়ার সাজ-পোষাক যেন গ্রাস করিয়া ফেলিতে চাহিতেছিল। বালিকার মাতার মাথার কাঁচা-পাকা চুল ছোটো করিয়া ছাঁটা, পরনে সরু ফিতাপাড় আধ্‌ময়লা ধুতি, গায়ে পাটকিলে রঙের অতিপুরু একটা পুরুষোচিত আলোয়ান। দেখিলে মনে হয়, মেয়েটি তিন-চার দিন অস্নাত-অভুক্ত-ভাবে কেবল পথে-পথেই ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। কন্যার মতো লুব্ধভাবে না হইলেও মাতাও যে অনসূয়াকে আপাদ-মস্তক পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছিল, তাহা সেদিকে চোখ ফিরাইলেই যে কেহ বুঝিতে পারে।

অনসূয়া সেদিকে চাহিতেই মাতা লজ্জিতভাবে এক-বার মুখ নামাইয়া তা'র পরই মুখ তুলিয়া কথা জমাইবার উপায় খুঁজিতে লাগিল। একটু ইতস্তত করিয়া সে বলিল, "আপনি কোথায় যাচ্ছেন?" অনসূয়ারও গল্প করিবার সখ জাগিয়া উঠিল, সে বলিল, "যাচ্ছি অনেক দূর, দিল্লী; আপনি কখনও গিয়েছেন?" খুকীর মা বলিল, "না, ভাই, ওসব হিল্লি-দিল্লী যাওয়া কি আমাদের কপালে লেখে, না আমাদের হাড়ে পোষায়? তবে হাঁা, আমাদের ভাই-ভাজ গেছ্‌ল বটে ওদিকে। তা'রা ত সারা পিথিমিটাই ঘুরেছিল। সেই কোন্ নক্কা ছিক্কেত্তর পইরাগ, তা'র পর গে দার্জ্জিলিং পাহাড় আরো কত-কি-সব দেখেছে। এমন দেশটির নাম্ কর্‌তে পার্‌বে না, যেখানে তা'রা যায়নি।"

ভ্রাতৃগর্ব্বে পুলকিতা ভগিনীর কথায় বাধা দিয়া অনসূয়া বলিল, "আপনার স্বামী আপনাকে কোথাও বেড়াতে নিয়ে যান্ না?"

মা কথার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই খুকী তাড়াতাড়ি বলিল, "হাঁা মা সেই যে বাবা দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী নিয়ে গেছ্‌ল. সেইটা বলো না।" মেয়ের কথায় কর্ণপাত না করিয়া আঁচলে উদ্যত অশ্রু মার্জ্জনা করিতে-করিতে মেয়ের মা

বলিল,"আর ভাই, সে কথা বলো কেন? আমার কপালে কি সেসব সুখ আছে? কপাল আজ দু'মাস হ'ল পুড়েছে। তা'র উপর আজ তিনি দিন হ'ল বর্দ্ধমানে শ্বশুর মারা পড়েছেন; সেখানে চলেছি তাঁর শেষ কাজ করতে।" অনসূয়া লজ্জিত ও ব্যথিত হইয়া ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিল খুকীর মা'র হাত দুখানা নিরাভরণ সিঁথিতে সিঁদুরও নাই। সে সহানুভূতির সুরে বলিল, "আপনার বড় কষ্ট দেখ্‌ছি। শ্বশুরবাড়ীতে আপনাকে দেখ্‌বার-শোন্‌বার আর বুঝি কেউ নেই। মেয়েটিও ত ছোটো, মানুষ ক'রে তুল্‌তে অনেক সময় লাগ্‌বে। তা'র ব্যবস্থা কে করবেন?" খুকীর মা দার্শনিকের মতো হাত নাড়িয়া সুর করিয়া বলিল, "সংসারটাই এম্‌নি ভাই, ভেবে কি করব? জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি। আমি যদি আজ মরি, তা হ'লেই বা ওদের কে করবে! আছি তাই ভাগ্যি, তা'র পর যা থাকে অদেষ্টে।"

অনসূয়া হতাশ হইয়া পড়িল। ইহার পর কি বলা যায় সে ভাবিয়া খুঁজিয়া পাইতেছিল না। বিধবা নিজেই আবার কথা পাড়িল। শোকে তাহার উৎসাহ কিছু কমাইয়াছে মনে হইল না। "কার সঙ্গে যাচ্ছেন অত দূরে? আপনার কে হন উনি?" যাহার সঙ্গে অনসূয়া যাইতেছিল, তাহার একটা কিছু পরিচয় দেওয়া শক্ত ছিল না, কারণ সব মানুষেরই একটা পরিচয় থাকে। কিন্তু তিনি যে অনসূয়ার ঠিক কে হন, তাহা তাহার জানা ছিল না; বলিতে হইলে দুজনেরই বংশতালিকা খোঁজ করিতে হইত। কিন্তু রমণীটির কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি দেখিয়া ও প্রশ্ন শুনিয়া সঙ্গীর সঙ্গে একটা সম্পর্ক-পাতানো তাহার নিতান্ত প্রয়োজন বোধ হইল। অনসূয়া চট্ করিয়া বলিয়া বসিল, "আমার ভাই হন উনি।"

বিধবা বলিল, "সোয়ামীর কাছে যাচ্ছেন বুঝি?" অনসূয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল "না।" বিধবা এ উত্তরে সন্তুষ্ট না হইয়া বলিল, "তবে বুঝি বাপের কাছে? ভাই নিতে এসেছিল, না?" অনসূয়া বলিল, "না, আমার বাবা দিল্লীতে থাকেন না; তিনি কল্‌কাতাতেই থাকেন।" বিস্মিত হইয়া বিধবা বলিল, "ওমা, তবে দিল্লী যাচ্ছ কেন গা খামকা? বেড়াতে যাচ্ছ বুঝি? তা সোয়ামী-পুত্তুর ফে'লে যাচ্ছ কি ক'রে ভাই?" অনসূয়া বলিল, "নেই ব'লেই ফে'লে যেতে পারছি। সেখানে আমি বেড়াতে যাচ্ছিনে, পড়্‌তে যাচ্ছি।" বিধবা অকস্মাৎ অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া বলিল, "ও বেম্মজ্ঞানী বুঝি! এখনও বিয়ে-থা করোনি! পাশ দিয়েছ নাকি ভাই?" অনসূয়া বলিল, "হ্যাঁ, পাশ দিয়েছি।" খুকীর মা বলিল, "ক'টা, একটা না দুটো?" অনসূয়া বলিল "ছয়টা।" বিধবার চক্ষু-দুটি বিস্ময়ে সন্দেহে ও কৌতূহলে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল; সে বলিল, "ও বাবা, ছ'টা পাশ দিয়েছ! আবার কি পড়্‌বে ভাই, ব্যারিষ্টারি না জজিয়তি? অনেক টাকা উপায় করবে না? তা হ্যাঁ ভাই তোমার বাপ-মা আছেন ত? তাঁরা মেয়ের বিয়ে দেবেন না নাকি?" অনসূয়া হাসিয়া বলিল, "কি জানি?" সঙ্গিনী তাহার কথা বিশ্বাস করিল না। হঠাৎ দৃঢ়তার সহিত বলিল, "জানেন বই কি! আমাকে বল্‌বেন না, না? হ্যাঁ ভাই, আপনার ভাই-বোন ক'টি?"

অনসূয়া বলিল, "তিন বোন তিন ভাই।"

সঙ্গিনী বলিল "তাদের বিয়ে হয়নি?"

অনসূয়া বলিল, "ভাইদের হয়নি, বোন-দুটির হয়েছে।" অনসূয়ার মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহাকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অনসূয়ার সঙ্গিনী বলিল, "আপনার কোথাও বিয়ের কথাবার্ত্তা হচ্ছে না? কিছু কি ঠিক হয়েছে? পাকাপাকি কথা হ'য়ে গেছে নাকি?" অনসূয়া হাসিয়া কিছু বলিল না। মেয়েটি আবার জেরা সুরু করিল, "আপনার বোনেরা বিয়ে করেছেন, আপনিই কি আর করবেন না? বাপ-মা শুনবেন কেন? বলুন না, সব ঠিক হ'য়ে গেছে? কোথাও কথা হচ্ছে ত?"

অনসূয়া বলিল, "কি জানি? আমি ওসব খোঁজ রাখিনে।"

ষ্টেশনে পাকড়াইয়া তাহার নাড়ী-নক্ষত্র জানিয়া লইবার ইহার আগ্রহ দেখিয়া অনসূয়া অবাক্ হইয়া গেল। কি করিয়া কথা ফিরাইবে ভাবিতে লাগিল। বিধবার কিন্তু কৌতূহল অদম্য। সে নূতন সূত্র খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল, কি করিয়া আবার কথা তোলা যায়। কিছুক্ষণ

যেন ভাবিয়া লইয়া সে বলিল, "আমার ভাই বিয়ে করেছিল ঢাকায়। তা'রা ব্রেহ্মজ্ঞানী নয়, কিন্তু এম্‌নি-ধারাই লেখা পড়া করে। সে মেয়ে বেশ ডাগর হয়েছিল, পাশের পড়া পড়্‌ছিল ইস্কুলে। আমার ভাইয়ের ভারি পছন্দ হয়েছিল মেয়েকে; তাই তা'র বাপ-মা আর পড়ালে না, ইস্কুল ছাড়িয়ে বিয়ে দিয়ে দিলে; নইলে আপনার মতো অনেক পাশ দিতে পারৃত।"

অনসূয়া উৎসাহিত হইয়া বলিল, "তা আপনার ভাই বৌকে আরো লেখাপড়া শেখালেই পারৃতেন! কত মেয়ে ত বিয়ের পর লেখাপড়া শিখে তিনটে-চারটে পাশ করৃছে। আমাদের সঙ্গে একটি মেয়ে পড়্‌ত, সে বিয়ের আগে কথামালা পর্য্যন্ত…"

বাধা দিয়া সঙ্গিনী বলিল, "পড়াবে কি ভাই? সে বৌ কি আমাদের কপালে টি'কৃল? সে আজ এক বছর হ'ল মারা পড়েছে। আর বরের যখন মনে ধরেছে তখন আর পড়্‌বারই বা কি দরৃকার? খাবার পরৃবার ত আর ভাবনা নেই।" যখনই অনসূয়া উৎসাহের আবেগে অনেক কথা বলিতে যায়, তখনই মৃত্যুর উল্লেখে তাহার কথার সূত্র ছিঁড়িয়া যাইতে দেখিয়া সে দমিয়া গেল। অথচ দেখিল মৃত্যু-ব্যথা ইহাকে কিছুমাত্র কাতর করে না। সে শুধু বলিল, "আপনার ভাইও দেখ্‌ছি আপনারই মতো দুঃখে পড়েছেন। কি আর করৃবেন বলুন, মরণকে ত ঠেকানো যায় না।"

তাহার সঙ্গিনী বলিল, "হ্যাঁ তা দুঃখু বই কি! অমন বউ নিয়ে দুদিন সাধ-আহ্লাদ করৃতে পেলে না। তবে ওরা ব্যাটা ছেলে ওদের কথা আলাদা। একটা যায় আর-একটা আসে। তেমনটি হোক আর না হোক, বউ একটা জু'টেই যায় বে'র যুগ্যি ছেলে কি আর প'ড়ে থাকে! বাবা ত গেল অঘ্‌রানে আমার ভায়ের বিয়ে দিয়েছেন। সে প্রথমে করৃতে চায়নি, বাবা কিছুতেই ছাড়্‌লেন না; বাপের কথা ত ফেল্‌তে পারে না; বিয়ে করৃতে হ'ল। এবউ, আর সেই সে-বউ! আকাশ আর পাতাল! ভাইয়ের আমার এ'কে মোটেই মনে ধরেনি। ধরৃবে কেন? একি তার যুগ্যি! পাড়াগাঁয়ের মেয়ে! আমার ভাই বলে—না জানে দুটো কথা বল্‌তে, না জানে ভালো ক'রে একখানা কাপড় পরৃতে, না জানে হাঁটতে-চল্‌তে, না জানে কিছু! এ মেয়ে নিয়ে আমি কি করৃব! বাবা বলেছিলেন বিয়ে করৃতে, করলাম। ব্যস্, আর আমার কোনো দায় নেই। আমি ও জড়পুঁটুলি ঘাড়ে ক'রে বেড়াতে পারৃব না। সে তোমরা জেনে রাখো, এ আমার পরিষ্কার কথা।—ভাইয়ের আমার ব্রহ্মসমাজের মতো ধরণ কিনা, সবই তা'র ওই-রকম অভ্যেস হ'য়ে গেছে। বাবার যেমন জেদ! তা'কে কিনা একটা অজ পাড়াগাঁয়ে মুখ্‌খু মেয়ে জুটিয়ে দিলেন। সে নেবেই না ত ঘরে। দেখ্‌তে গিয়েই অপছন্দ করেছিল। ও বলে, এইবার আমি নিজে দে'খে-শু'নে পছন্দ ক'রে ঠিক মনের মতো একটি বিয়ে করৃব। ওর ব্রহ্মসমাজের উপরই ঝোঁক আছে। অম্‌নিটি ও চায়।"

অনসূয়ার মনে নারীসমস্যার ও সমাজ সংস্কারের নানা তর্ক জাগিয়া উঠিল। প্রতিদ্বন্দ্বী মনের মতো না হইলেও চুপ করিয়া থাকা তাহার পক্ষে শক্ত হইতেছিল। অনসূয়া বলিল, "নিজে দে'খে-শু'নে বিয়ে করাই ত ভালো। এই কথাটা আপনার ভাইএর আগেই ভেবে দেখা উচিত ছিল। যাকে পছন্দই হ'ল না, তা'কে বাবার কথায় বিয়ে ক'রে এখন অন্য মেয়ে খুঁজ্‌তে গেলে তা'র দশা কি হবে সেটাও ত ভাব্‌তে হবে।"

বিধবা কথাটা ঠিক বুঝিল কি না সন্দেহ। সে বলিল, "তা'র জন্যে ভাবনা কি! সে মেয়েকে ত আমার ভাই নেবেই না বলেছে, নূতন বৌকে সতীনের জ্বালা পোয়াতে হবে না; সেদিকে আমার ভাই ঠিক আছে। সে তোমাদের সমাজে যেত' কিনা! ও সব বোঝে-সোঝে।"

অনসূয়া হাসিয়া বলিল, "তা নয় হ'ল; কিন্তু পুরানো বৌ বেচারা যাবে কোথায়? আমি তা'র কথাই বল্‌ছিলাম।"

বিধবা আবার বলিল, "তা'র জন্যে অত ভয় কিসের? সে তা'র বাপ ভেয়ের কাছে থাকৃবে, এত জানা কথা। তাদের মেয়ে তা'রা রাখ্‌বে কি না রাখ্‌বে, তা'র ভাবনাও কি আমরা ভাব্‌তে যাবো? মেয়ে পছন্দ হয়নি, নিইনি; এখন তা'র সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক

কি? আমার ভাই ত বলেইছে—আমিত আর নিজে বিয়ে কর্‌তে যাইনি যে আমায় কিছু বল্‌বে? বাবা সম্বন্ধ করেছিলেন, মেয়ের বাপ মেয়ে দান করেছিল। সে তাদের কথা তা'রা দুই বুড়ো বুঝ্‌বে। আমি পিতৃসত্য পালন ক'রে খালাস, মেয়ে ঘরে নেবার কোনো কথা আমার সঙ্গে হয়নি। এর পর আমি নিজের মনের মতো মেয়ে দে'খে ঘরে আন্‌ব।"

অনসূয়া এমন অকাট্য যুক্তির আর কোনো উত্তর না দিয়া বলিল, "কিন্তু মেয়ের ত একটা পছন্দ আছে। মেয়ে যদি আপনার ভাইকে পছন্দ না করে?"

বিধবা প্রথমটা বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "ও, ঘরবরের কথা বল্‌ছেন? তা আমাদের ঘর ভালোই, কুলীন কায়েত, তিনকুলে কোথাও এতটুকু খুঁৎ খুঁজে পাবে না কেউ। বাপের জমিজমা আছে, একখানা বাড়ী আছে গ্রামের সদরে। আর যদি বলো, আইন-আদালতের কথা, তবে সে-দিকেও আমার ভাই শক্ত আছে। নতুন বৌ আন্‌বার আগেই পুরোনো বৌকে সাত টাকা মাসোরা বরাদ্দ ক'রে দেবে। তা হ'লে আর টুঁ শব্দটি কর্‌বার উপায় থাক্‌বে না। তার পর গিয়ে গাঁই-গোত্রের কথা যদি বলে, তবে বলি, আমরা কি আর জানিনে যে ব্রাহ্মসমাজে ওসব মানে না। সেসব জেনে-শু'নেই না ভাই এগোচ্ছে। ভাইকে আমার অপছন্দ কর্‌বার কিছু নেই। পুরুষ বেটাছেলে, তা'র ত আর রং মেজে চুল চি'রে দে'খে নিতে হবে না।"

পৌরুষের এমন অটল মহিমার কাছে মাথা হেঁট না করিয়া যে উপায় নাই ভাবিয়া ভ্রাতৃসৌভাগ্যবতী রমণী অনসূয়াকে কথার উত্তর দিবার সময় না দিয়াই হাসিয়া বলিলেন, "তোমার বয়স কত হয়েছে ভাই?" হঠাৎ তাহাকে এমন প্রশ্ন করিতে শুনিয়া অনসূয়া বিপদ্ গণিয়া বলিল, "আমার বয়স অনেক হয়েছে। তা'র গাছপাথর নেই।"

মেয়েটি বলিল, "আমার সঙ্গে ঠাট্টা! আইবুড়ো মেয়ের আবার বয়স কি! কতই আর হবে, সতের কি আঠারো।"

অন্ততঃ আট-নয় বৎসর বয়স কমিয়া যাওয়াতে অনসূয়ার মনটা এতই খুসী হইয়া উঠিল যে সত্যনিষ্ঠার খাতিরেও সে এ-কথার প্রতিবাদ করিতে পারিল না। বলিল, "হ্যাঁ, কাছাকাছিই বলেছেন।" বিধবা বলিল, "তবে আর বেশী কি? আজকাল কত বামুন কায়েতের ঘরে কুড়ি বছরের মেয়েও প'ড়ে আছে দেখা যায়। এ ত হামেশাই হয়।" একটু দম লইয়াই মেয়েটি আবার পূরা উৎসাহে কথা সুরু করিল, "তোমার বাপের নাম কি? কি কাজ করেন? দেশ কোথায়? কতটাকা মাইনে পান? তা হ্যাঁ ভাই, আপনার সমাজ ছেড়ে কায়েতের ছেলে বেম্ম-সমাজে গেলেন কেন? কিছু গোলমাল আছে নাকি? আর থাক্‌লেই বা কি? কল্‌কেতা সহরে কে কা'কে চিন্‌ছে বলো! টাকা দিলেই গুরু পুরুত বামুন নাপিত সব হাতের মুঠোয় এসে যায়।" তাহার সম্বন্ধে মহিলার উৎসাহ ক্রমশই বাড়িয়া যাইতেছে দেখিয়াও অনসূয়া আর বাধা দিবার কিম্বা কথা ঘুরাইয়া লইবার চেষ্টা করিল না। একলা ষ্টেশনে বসিয়া কাটানোর চেয়ে এমন শ্রুতি সুখকর আলোচনাটা তাহার কাছে অনেক ভালো লাগিতেছিল। অনসূয়া সাধ্যমত প্রশ্নের উত্তর দিয়া চলিতে লাগিল। পিতৃপরিচয় বংশপরিচয় আর্থিক পরিচয়, সকলই যখন বিধবার মনের মতো হইল, তখন সে আবার অনেকক্ষণ ধরিয়া নীরবে অনসূয়ার মুখের দিকে তাকাইয়া লইয়া অকস্মাৎ চোরা চাহনিতে পাশের বেঞ্চের দিকে চক্ষু ফিরাইয়া ঈষৎ অঙ্গুলি হেলাইয়া অনসূয়াকে চুপি-চুপি বলিল, "ঐযে আমার ভাই। দেখ্‌ছ না!"

এতক্ষণ অনসূয়া ভগিনীর সহিত কথা বলিতেই ব্যস্ত ছিল, ভাইকে ফিরিয়া দেখে নাই। এইবার একবার চকিতে চাহিয়া দেখিয়া লইল। ব্যগ্র একজোড়া চক্ষু এতক্ষণ ধরিয়া পিছন দিক্ হইতে যে তাহাকেই গ্রাস করিতেছিল, তাহা সে জানিত না, চাহিবা-মাত্র বুঝিয়া দৃষ্টি নামাইয়া লইল, কিন্তু যতখানি দেখা দরকার তাহা দেখা তাহার হইয়া গিয়াছিল। বেঞ্চির হাতলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া পূর্ণবয়স্ক একটি পুরুষ চক্ষু ও কর্ণের সাহায্যে অনসূয়ার পরিচয় লইবার চেষ্টা করিতেছিল। লোকটির মাথার চুল উঠিয়া কপাল ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু তাহার উপরও বুরুষ চালনার চিহ্ন দেখা যায়; সস্তা স্বদেশী ক্রীমে ব্রণবহুল মুখখানা তৈলাক্ত

হইয়া উঠিয়াছে। গায়ে বুক খোলা কালো বনাতের কোট ও মোম পালিশ করা ঢালের মতো সার্টের বাহার গিল্‌টির বোতামে আরো উজ্জল হইয়া উঠিয়াছে। শান্তিপুরে ধুতি, পাম্প্ শু সূক্ষ্মাগ্র ছড়ি ও মণিবন্ধের ঘড়ি প্রভৃতি আধুনিক বিলাসের সব উপকরণেই সে দেহ সজ্জিত করিয়াছিল; রুমালে একছটাক এসেন্স্ ঢালিতেও যে ভুল হয় নাই তাহাও দূর হইতেই বুঝা যাইতেছিল! কিন্তু এত চেষ্টাতেও পক্ষ্মহীন বর্ত্তুলাকার চক্ষুর দৃষ্টি তাহার স্নিগ্ধ মার্জ্জিত কি উজ্জল করিতে পারে নাই; দেহ-সজ্জায় আধুনিক সভ্যতার অনেক ছাপ মারিয়া আসিলেও ভাবে-ভঙ্গীতে তাহার সভ্যতা যতটুকু ছিল,সবটা প্রাগৈতিহাসিক, অসভ্যতাটুকুই যে কেবল খাঁটি আধুনিক, তাহা তাহাকে চোখে দেখিয়া এবং এত বিস্তৃত পরিচয় শুনিয়া বুঝিতে কাহারও বাকি থাকে না।

অনসূয়ার সঙ্গিনী হঠাৎ বলিল "ছেলেবেলা বলাইএর রং আরো মাজা ছিল, এখন কাজে-কর্ম্মে রোদে ঘু'রে-ঘু'রে রং পোড় খেয়ে গেছে। বড় খোকাকে দেখ্‌লে বুঝ্‌বে বলাই সে বয়সে কেমন ছিল।" বলাই এর ঐশ্বর্য্য যে কেবল স্ত্রীভাগ্যে শোভিত তাহা নয়, পুত্র-সম্পদও তাহার আছে জানিয়া অনসূয়ার উৎসাহ আবার বাড়িয়া গেল। সে বলিল, "আপনার ভাই-পো আছে বুঝি?" ভাইপোদের পিসি বলিল, "হ্যাঁ, বেটের কোলে দুটি আছে বৈকি; বেঁচে থাক্ তারা; বৌ-এর জন্যে ত আর তাদের ফে'লে দিতে-পার্‌ব না। বৌ যিনিই হোন, অত আদর সইবে না।"

অনাগতা বধূর ননদিনীর ঝঙ্কারটা শুনিয়া অনসূয়া খুসী হইল। বধূর ভাগ্যে যে কেবলি আদর-সোহাগ জুটিবে না, তাহা বুঝিতে তাহার বাকি রহিল না। সে হাসিল। তাহার হাসি দেখিয়া সঙ্গিনী বলিল "তা ছেলের ঝক্কি ত আর বৌকে সইতে হবে না; বাড়ীতে দাসী-চাকর আছে তা'রাই দেখ্‌বে। ভাইয়ের আমার পয়সার অভাব নেই।"

এবার অনসূয়ার কৌতূহলও জাগিল। সে বলিল, "আপনার ভাই বুঝি খুব লেখা-পড়া শিখেছেন? কি করেন তিনি?"

ভগিনী বলিল, "তা শিখেছে বই কি! পাশের পড়া পছন্দ করে না,তাই একটা পাশ দিয়ে আর-একটা পড়্‌তে-পড়তেই ছেড়ে দিলে। কিন্তু ইংরিজী যা বলে আর বক্তিমা যা করে, সাহেব। অমন পারে না। আমার ভাই নামজাদা লোক, ম নাম শুনেছ নিশ্চয়।"

অনসূয়া বিস্মিত হইয়া বলিল, "কি জানি, দে'খে ত চেনা-চেনা লাগছে না। কোথায় বক্তৃতা করেন আপনার ভাই? কাউন্সিলে, না স্বদেশী সভায়? আমি ত স্বদেশী বক্তাদের সবাইকে দেখেছি; তবে তাঁরা ত প্রায় সকলেই বাংলায় বক্তৃতা করেন। কাউন্সিলে ইংরেজী বক্তৃতা হয় বটে, সেখানেও ত মেয়েদের ভোট দেবার তর্কাতর্কির সময় গিয়েছি, যাঁরা বক্তৃতা কর্‌লেন তাঁদের মধ্যে ত আপনার ভাইকে দেখেছি মনে হচ্ছে না। উনি খুব পণ্ডিত লোক বুঝি! বাইরে বুঝি বেশী বেরোন না! সারাদিন কি পড়া-শুনা নিয়েই থাকেন?"

অনসূয়া মনে-মনে ভাবিল, মানুষটাকে দেখিয়া ত বিশেষ বিদ্বান্ মনে হইতেছে না, ইহার মস্তিষ্কের গঠন, চোখের দৃষ্টি, চলিবার কি বসিবার ভঙ্গী কোথাও ধীশক্তি কি প্রতিভার কোনো লক্ষণ দেখা যাইতেছে না; কিন্তু তবু হয়ত লোকটা নামজাদা পণ্ডিতই হইবে। কত দেশ-বিখ্যাত নেতার চেহারা ত দীনদুঃখী মজুরের মতো আছে, কত রাজা-মহারাজার ত ভোজপুরী দারোয়ানের মতো চেহারা, কত বাগ্মী ত মুদীর দোকানের মালিকের মতো বিশালবপু, তবে তাহার এই অনাবিষ্কৃত পণ্ডিতটিই বা কেন জমিদারের প্রসাদপুষ্ট কর্ম্মবিমুখ বিলাসী ভবঘুরের মতো না দেখিতে হইবে? বাহিরের খোলসে কি হয়? ভিতরে হয়ত ইহার বিশ্ব-বিদ্যার আলো অন্তর উজ্জল করিতেছে। কেতাবে সে প্রতিভাশালীদের কপাল, চোখ নাকের বর্ণনা অনেক পড়িয়াছে, কিন্তু বাস্তব জগতে দেখিয়াছে প্রতিভাবান্‌রা শতকরা পঞ্চাশ জনই কেতাবের আইন চেহারায় অমান্য করেন, তাই ইহাতে সে বিশেষ বিস্মিত হইল না। বিদ্যাপাগল অনসূয়ার মন এই পণ্ডিতটির পরিচয় জানিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। পণ্ডিতের পরিচয় কি উদ্দেশ্যে যে তাহার ভগিনী দিয়েছে, সে-কথা তখনকার মতো অনসূয়া ভুলিয়া গেল। তাহার

মন নব বিদ্যার্ণবের অন্বেষণে ডুবুরীর মতো সকল অপরিচয়ের তলায় তলাইয়া রত্ন উদ্ধারে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। "আপনার ভাই কোথায় ইংরেজী বক্তৃতা করেন বলুন ত? কোন্ সভায়, কি বিষয়ে? আপনি শুনেছেন নাকি কখনও?"

গর্ব্বিতস্বরে বিধবা বলিল, "না ভাই, ওসব মহা-মহা রথীর মাঝখানে আমি কোথায় যাবো! তবে ছোটোখাটো জায়গায় দুচার-বার লুকিয়ে শু'নে এসেছি বটে। কলেজে ইস্কুলে সভায় রাজরাজড়ার বাড়ীতে কত জায়গায় আমার ভাই বক্তৃতা করে, তা'র কি ঠিক আছে?

রাজারাজড়ার বাড়ীতেও যে ইংরাজী বক্তৃতা দিবার কি কারণ ঘটিতে পারে অনসূয়া ভাবিয়া পাইল না। সে বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "বড়মানুষের বাড়ীতে পণ্ডিত ডেকে বক্তৃতা শোন্‌বার চলন হয়েছে নাকি? তা ত আগে জান্‌তাম না; কি-রকম বক্তৃতা বলুন ত সে! যে ডাকে তা'র বাড়ীতেই যান উনি বক্তৃতা শোনাতে!"

সে বলিল, "তা ভাই, পেট চালাতে হবে ত? আগে থেকে বায়না নিয়ে যাবে না, সেও কি কখনও হয়? তুমি কি ভাই কখনও সভায় যাওনি। বেহ্ম-সমাজের মেয়ে পুরুষ লোকের সাম্‌নে ত বেরোও, তবে আমার ভেয়ের বক্তৃতা শোনোনি বল্‌লে বিশ্বেস করি কি ক'রে! ওই যে ভাই, সেই বক্তৃতা, যাকে 'কমিক' না কি বলে তাই। এবার বুঝেছ? আমার ভাই বলাইচাঁদ বিশ্বাসের মতো হাসির কথা কেউ বল্‌তে পারে না।"

অনসূয়ার চমক্ ভাঙিল। তাহার পণ্ডিতটি যে পয়সা লইয়া ভাঁড়ামির ব্যবসায় করেন এমন খবরটা সে এতক্ষণেও আন্দাজ করিতে পারেনি। ভাবিয়া নিজের উপরই তাহার অশ্রদ্ধা হইতেছিল। এই তাহার বুদ্ধি! কিন্তু এমন একটা আবিষ্কারের আনন্দে তাহার হাসিও পাইতেছিল। প্রজাপতি যে তাহার উপর আজ সুপ্রসন্ন তাহা বুঝিতে তাহার বাকি রহিল না। সে আপন-মনে মুখ ফিরাইয়া হাসিতে লাগিল।

বলাই চাঁদের দিদি অনসূয়ার মৌন মুখ ও সলজ্জ হাসির মনোমত অর্থ করিয়া বলিল, "তোমার সঙ্গে ভাই আমার অনেক কথা আছে। তোমার নামটি কি তাও ত বল্‌লে না। আচ্ছা, আমরা ত একগাড়ীতেই যাচ্ছি। নিরিবিলি কথা হবে এখন। পাকাপাকি সব ব'লে ফেলা ভালো। ওই ত গাড়ী এসে পড়্‌ল।"

গাড়ী আসিতেই বলাইচাঁদ অগ্রসর হইয়া আসিয়া হঠাৎ নমস্কার করিয়া হাসিয়া বলিল, "এই যে এইদিকে মেয়ে গাড়ী, আপনারা এদিকে আসুন।"

অনসূয়া তাহার সঙ্গীকে বলিল, "আপনার সঙ্গে আমার অ্যানাটমির নোটটা মিলিয়ে নিতে হবে ভালো ক'রে। চলুন, সেকেণ্ড্ ক্লাশে ছেলেদের গাড়ীতে একসঙ্গে ওঠা যাক্। মেয়ে গাড়ীতে গেলে বড় সময় নষ্ট হয়; সে সময়ে একটা সবজেক্ট আগাগোড়া প'ড়ে ফেলা যায়। দিল্লী ত কম পথ নয়। পরের একটা ষ্টেশনে গিয়ে এক্‌সেস্ ফেয়ার দিয়ে টিকিট ঠিক ক'রে নিলেই চল্‌বে।" অর্থনীতিতে পণ্ডিতা মিতব্যয়ী অনসূয়ার এই প্রস্তাবে তাহার সঙ্গী কিছু বিস্মিত হইল বটে, কিন্তু প্রতিবাদ করিল না। কারণ প্রতিবাদ কিম্বা তর্ক করিয়া অনসূয়াকে কেহ আজ পর্য্যন্ত বশ করিতে পারে নাই। তর্কশাস্ত্রে তাহার অগাধ বিদ্যা ছিল এবং সে-বিষয়ে তাহার অহংকার ছিল ততোধিক। বন্ধুজনে সে অহংকার খর্ব্ব করিতে বিশেষ চেষ্টা করিত না।

বলাই চাঁদ দিদিকে মেয়ে-গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া সেকেণ্ড্-ক্লাশের টিকিট কাটিবে কি না ভাবিতে লাগিল।

সুর-সমাপ্তি

শ্রী সুধীরকুমার চৌধুরী

ওরে মোর অবশ সঙ্গীত, ওরে অবসন্ন পাখী মোর, আজি
কোন্ সে তিমিরতলে তৃষিত নিশ্বাস ওঠে বাজি'
তব ক্লান্ত-পক্ষ-আলোড়নে। আজ শোণিতাক্ত তব চঞ্চুপুটে
কি মুগ্ধ অরুণ আশা বিন্দু' বিন্দু হ'য়ে ওঠে ফুটে
নির্ম্মম পেষণে নিরাশার।—জানি গুটাবে না ডানা,
অভয় ভৈরব রবে প্রভাতের দ্বারে দেবে হানা
একদা এ তমোরাত্রি-শেষে।—জানি খু'লে যাবে দ্বার,
আপনি দাঁড়াবে হেসে আজিকার প্রলয়-আঁধার
তব মনোহরণের মুখের গুণ্ঠন অপসারি',
নিমেষে নিঃশেষ ক'রি দেবে তোর স্বপন-পসারী
অজানার বক্ষভরা গোপন সঞ্চয় তা'র যত।
—সেদিন পথের ক্লান্তি পোষ-মানা পশুটির মতো
পড়ি' র'বে তৃপ্তবক্ষে একপাশে মৌন-মূক, মুখে তোর চাহি',
নীরব সম্ভ্রমে।

জানি, জানি আমি, যদি এ তিমির পথ বাহি'
আমি মগ্ন হ'য়ে যাই বিস্মৃতির গভীর গহ্বরে,
তুমি তবু হারাবে না, তোমার আকুল কণ্ঠ ভ'রে
অগীত সঙ্গীতগুলি বেঁচে মোর রবে চিরদিন,
আমার প্রাণের প্রীতি শিহরিবে সুরলয়-হীন
বনানীর ঝিল্লীরবে, মোর স্বপ্ন রবে জাগি'
স্তব্ধ রাত্রে তারাহারা আলোক-বিবাসী
আকাশের সুপ্ত বক্ষ ভরি' দিবানিশি
মোর চিত্ত ব্যাকুলতা নিলীন হইয়া র'বে মিশি'
উদাসীন প্রান্তরের অন্তহারা দিগন্তবিস্তারে;
কেউ তা'রে চিনিবে না', কাছে ডেকে শুধাবেনা তারে,
তবু এ ধরার প্রিয় ধূলিতলে সবাকার চরণে চরণে
দলিত পত্রের মতো মর্ম্মরিয়া অযুত মরণে
বারম্বার মরিবে সে। এ ধরার সব গীত গানে
সুরহীন যেই সুর পাড়ি দেয় অশ্রুতের পানে,
যে আশা ভয়ের মতো আপনাতে আপনি শিহরে,
যে প্রেম মিলন লাগি' দূরে-দূরে বিমনা বিহরে
বিরহের ছায়া অনুসরি', যেই পূজা তা'র হোমানল জ্বালি'।
আবেগে পূজার মন্ত্র ভোলে, যে অম্লান কুসুমের ডালি
সযতনে ভরা হয়, মালা গাঁথা থেকে যায় বাকী,—
জানি সে-সবার মাঝে চিরতরে আমি যাবো রাখি'
আমার সুরের তৃষা ভরি'।

কবে আমি গেছি থেমে,
উদার আকাশ হ'তে গহন জীবন-পথে নেমে
বাঁধিয়াছি নীড়, মোরে বাঁধিয়াছে সহস্র গ্রন্থিতে
এ ধরার প্রিয় ভূমি শত লতাজালে, চারিভিতে
ভালোবাসিয়াছে তা'র পরিচিত যত তরুরাজি
ঋতুতে-ঋতুতে মোরে নব-নব পত্রে-পুষ্পে সাজি'
রুধিয়া কণ্ঠের সুর সুরসাল স্বাদু ফলে-ফলে।
—তুমি গেছ চ'লে
তিমির-দিগন্তে চাহি' আর্ত্তকণ্ঠে বিদারি' আকাশ
আমারই আশার পথ ধ'রি। তাই থেকে-থেকে এবক্ষের শ্বাস
তোমার পাখার শব্দে বেজে ওঠে,তোমার তিমির পথ-রেখা
এ হৃদয়ে বেদনায় আঁকা প'ড়ে, থেকে-থেকে যায় যেন দেখা
সুদূর স্বপ্নের মতো আলোকের অস্ফুট আভাস
উদাস উন্মুখ তন্দ্রাতীরে, তোমার সঙ্গীত-অবকাশ
স্তব্ধতার স্পর্শ যেন লাগে, মোর স্তব্ধ বক্ষ ভরি'
সুরহীন বেদনায় দেহে-মনে আমারে আবরি'
পরিচিত স্নেহে।

হায়-এ কাহার অভিশাপে
এ-বক্ষের শত তন্ত্রী খরতর শিহরণে কাঁপে
বেদনার পরশে-পরশে, তবু সুর নাহি জাগে!
মরণ ঘুমের মতো, ছায়ার চুমোর মতো লাগে
চেতনার সারা দেহে; কোথা ঘুমপাড়ানিয়া গান
শোকাকুল পূরবীর? বেদনায় হ'য়ে খান-খান

পঞ্জরের ঝনন-রণন ?
শিরায় শোণিত-শিহরণ
করতালি-দ্রুততালে মরণের রণভেরী-নিনাদের সাথে ?
কোথা শুব্ধ রাতে
দূরে-দূরে নাম ধ'রে বাঁশীর মিনতি তা'র হায় !

হায়রে পথিক পাখী, ওরে অসহায় !
এ অশ্রু-সাগরে তোর কোথা কূল,কোথা পাখা গুটাবার ঠাঁই,
দুবাহু বাড়ায়ে তোরে কোথা বক্ষে ধরিবারে পাই,
লই হৃদয়ের কাছে, মাথাটি কোলের 'পরে রাখি'
আবেশ-আলসে যবে মু'দে আসে তোর দুই আঁখি
বলি তোর কানে-কানে,—এই মোর ভালে ছিল লেখা,
সারাটি জীবন ধরি' যে-সুর তোমার কাছে শেখা
সেই সুরে ঢেলে গড়ি আশা সাধ আয়োজন যত
হাসিকান্না ঘৃণা ভালোবাসা। করি সঙ্গীতের মত
যা-কিছুরে পরশিতে পাই। এ-বুকের সবচেয়ে কাছে,
যেকথাটি যে ব্যথাটি সরমে মরমে মরি' আছে,
সঙ্গীতের আভরণে সুরে ছন্দে তালে মানে লয়ে
সাজায়ে বাহিরে তা'রে আনি,—নহে মোর হৃদয়-নিলয়ে
পড়ি' রহে কুণ্ঠিত গোপনে।
যত আশা বিকাশে স্বপনে
হিমাচ্ছন্ন প্রভাতের মুকুলিত বনবীথি-সম,
কণ্ঠের সম্পদে তব হয় সে শোভন মনোরম,
তখন তাকাই তা'র মুখপানে, ভালোবাসি তা'রে,
নহে একধারে
অনাদরে ফে'লে রেখে ভু'লে যাই। যত প্রিয়বাণী,
প্রিয় দুঃখ প্রিয় সুখ, সবচেয়ে প্রিয় মুখখানি,
সুরের পরশে তা'র সবাঙ্গারে পাই সব-কাছে।
যে-ছায়া লুটায় পাছে,
যে-আলো সম্মুখে জলে,
সঙ্গীতের ডোরে বেঁধে আনি তা'রে হৃদয়ের তলে
মিলন বাসরে,
সুরের আসরে
ছোট আশা ছোট সাধ ছোট কথা ছোট ব্যথা যত,
হয় সবে মহীয়ান্ রাজাসনে সম্রাটের মত।

ওরে পাখী,
আরো কত কথা তোরে বলিতে সলিলে ভরে আঁখি।—
জানি না সে কোন্ সুর, নাহি জানি কি যে তা'র মানে,
শুধু এ মর্ম্মের তারে প্রখর বেদনা তা'র হানে
আঘাতে-সঙ্ঘাতে-অভিঘাতে। দিনে-দিনে
তুমি যদি কাছে থাকো পদে-পদে লই তা'রে চি'নে,
আপনি পরশ করি সুরের পরম পরিচয়ে। ওরে পাখী,
হৃদয়ের নীড়ে থাকি'
আমার এ হৃদয়েরে আমা-হ'তে বেশী তুমি জানো,
তুমিই বাহিরে আনো
যে-আশাটি যে-ভাষাটি আমার দৃষ্টিরে দেয় ফাঁকি।…

আজিকে তোমারে আমি ফি'রে ডাকি।—
ওরে পলাতকা ভাষা মোর, ভাষা আজি কোথা
খু'জে পাই
তোমারে ফিরিয়া ডাকিবারে! আমি শুধু পথপানে চাই,
কেবল দিবস গুনি, কেবল বসিয়া রহি দ্বারে,
তুমি মোরে ডাকো ডাকো তোমার পাথার হাহাকারে,
টুটিয়া অর্গল-বদ্ধ অন্ধ আঁখি সলিলের স্রোতে
তোমার পথের পাক্ দিশা, মোর মোহাতুর হৃদিতল হ'তে
আলোক-পিপাসু যত আশা সাধ আয়োজন সবে
দলে-দলে বাহিরাক্ বিপুল পুলক কলরবে,
অসমাপ্ত যত পূজা, আরব্ধ আধেক আরাধনা,
ব্যর্থ প্রেম-নিবেদন, নিরাশার নিষ্ফল সাধনা
এ-জীবনতট হ'তে তোমার ইঙ্গিতে দিক্ পাড়ি
জীবনাতীতের পথ চাহি', যেপথে আপনি নাহি পারি
আপনারে ল'য়ে যেতে সেই পথ তুমি দাও ঢাকি'
আমার তৃষার সুরে, আমা হ'তে লও লও ডাকি'
আমার সর্ব্বস্ব ধনে, এ জীবনে ফোটে না যা গানে
মরণ এড়িয়া যাক্ নব জীবনের পথ-পানে,—
এ-ধরার তৃপ্তি বহি' আমি ফিরি কাঙালের সাজে,
সমাপ্তি লভুক তা'রা তোমার সর্ব্বস্বধন মাঝে।

গান

তোমায় চেয়ে আছি ব'সে পথের ধারে
সুন্দর হে।
জম্‌ল ধূলা প্রাণের বীণার তারে-তারে,
সুন্দর হে।
নাই যে কুসুম মালা গাঁথ্‌ব কিসে,
কান্নার গান বীণায় এনেছি যে,
দূর হ'তে তাই শুন্‌তে পাবে অন্ধকারে,
সুন্দর হে।
দিনের পরে দিন কেটে যায় সুন্দর হে,
মরে হৃদয় কোন্‌ পিপাসায় সুন্দর হে।
শূন্য ঘাটে আমি কি যে করি,
রঙীন পালে কবে আস্‌বে তরী,
পাড়ি দেবো কবে সুধারসের পারাবারে
সুন্দর হে॥

৬ ফাল্গুন
১৩৩০

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি

II র্সা-র্জা । র্জা -া র্ঋা -া I র্সা -া । ণা-দা দা -া I পা -া । পা-জ্ঞা পা-মা I
তো ০ মা য় চে ০ য়ে ০ আ০ ছি ০ ব ০ সে ০ আ০

পা-দা । পা-ণা দা-পা I মা -া । মা-পমা জ্ঞা-রা I জ্ঞা-রা । -জ্ঞা-রা -জ্ঞা-মা I
ছি ০ ব ০ সে ০ প ০ থে র্‌ ধা০ ০০ রে ০ ০ ০ ০ ০

জ্ঞা -া । সা-জ্ঞা রা -া I সা -া । -া -া -া -া I দ্‌া -া । ণ্‌া-সা সা -া I
সু ন্‌ দ ০ র ০ হে ০ ০ ০ ০ ০ জ ম্‌ ল ০ ধূ ০

সা -া । সা-ঋা ণ্‌া -া I সা-জ্ঞা । জ্ঞা -া জ্ঞা-রা I জ্ঞা -া । মা -া মা-পা I
লা ০ প্রা ০ ণে র্‌ বী ০ ণা র্‌ তা ০ রে ০ বী ০ ণা র্‌

মা-পা । মা-ণা দা-পা I জ্ঞা-রা । জ্ঞা-রা-জ্ঞা-মা I জ্ঞা -া । সা-জ্ঞা রা -া I
তা ০ রে ০ তা ০ রে ০ ০ ০ ০ ০ সু ন্‌ দ ০ র ০

সা -া । -া -া -া -া II
হে ০ ০ ০ ০ ০

II র্সা-র্জ্ঞা । র্জ্ঞা-র্ঋা র্ঋা-র্সা I র্সা -া । র্সা -া র্সা-র্ঋা I ণা -া । র্সা-ঋা ণা-র্সা I
না ই　যে॰ ॰ স্থ ॰　সু র্　মা ॰ লা ॰　গাঁ থ্　ব ॰ কি ॰

দা -ণ । -া -া -পা-দা I মা -া । দা -া ণা -া I র্সা -া । র্সা -া র্সা-র্ঋা I
সে ॰　॰ ॰ ॰ ॰　কা ন্　না ॰ র ॰　গা ন্　বী ॰ ণা য়

ণা -া । র্স-র্জ্ঞা র্ঋা -া I র্সা -া । -া -া -া -া I র্সা-জ্ঞা । জ্ঞা -া র্ঋা -া I
এ ॰　নে ॰ ছি ॰　যে ॰　॰ ॰ ॰ ॰　দূ র্　হ ॰ তে ॰

র্সা -া । ণা -া দা-পা I পা -া । পা-জ্ঞা পা-মা I পা-দা । পা-ণা -দা-পা I
তা ই　শু ন্ তে ॰　পা ॰　বে ॰ পা ॰　বে ॰　গো ॰ ॰ ॰

মা -া । মপা-মা জ্ঞা-রা I জ্ঞা-রা । -জ্ঞা-রা -জ্ঞা-মা I জ্ঞা -া । সা-জ্ঞা রা -া I
অ ন্　ধ ॰ কা ॰　রে ॰　॰ ॰ ॰ ॰　সু ন্　দ ॰ র ॰

সা -া । -া -া -া -া I দ্‌া -া । ণ্‌া-সা সা -া I সা -া । সা-ঋা ণ্‌া -া I
হে ॰　॰ ॰ ॰ ॰　জ ম্　ল ॰ ধু ॰　লা ॰　প্রা ॰ ণে র্

সা-জ্ঞা । জ্ঞা -া জ্ঞা-রা I জ্ঞা -া । মা -া মা-পা I মা-পা । মা-ণা দা-পা I
বী ॰　ণা র্ তা ॰　রে ॰　বী ॰ ণা য়্　তা ॰　রে ॰ তা ॰

জ্ঞা-রা । -জ্ঞা-রা -জ্ঞা-মা I জ্ঞা -া । সা-জ্ঞা রা -া I সা -া । -া -া -া -া II
রে ॰　॰ ॰ ॰ ॰　সু ন্　দ ॰ র ॰　হে ॰　॰ ॰ ॰ ॰

II সা-মা । মা -া মা -া I মা-পা । মা-ণা দা-পা I জ্ঞা-রা । জ্ঞা -া জ্ঞা-ঋা I
দি ॰　নে র্ প ॰　রে ॰　দি ন্ কে ॰　টে ॰　যা য় কে ॰

সা-ঋা । জ্ঞা -া -া -সা I সা-ঋা । জ্ঞা -া ঋা -া I সা -া । -া -া -া -া I
টে ॰　যা ॰ ॰ য়　সু ন্　দ ॰ র ॰　হে ॰　॰ ॰ ॰ ॰

সা-দা । দা -া পা -া I পা-দা । পা-র্সা ণা-দা I দা-পা । মা -া পা -মা I
ম ॰　রে ॰ হৃ ॰　দ য়　কো ন্ পি ॰　পা ॰　সা য় পি ॰

জ্ঞা-রা । জ্ঞা -া -া -সা I সা-ঋা । জ্ঞা -া ঋা -া I সা -া । -া -া -া -া I
পা ॰　সা ॰ ॰ য়　সু ন্　দ ॰ র ॰　হে ॰　॰ ॰ ॰ ॰

র্সা-র্জ্ঞা । র্জ্ঞা -া র্ঋা -া I র্সা -া । র্সা -া র্সা-র্ঋা I ণা-র্জ্ঞা । র্জ্ঞা -া র্ঋা -া I
শূ ॰　ন্য ॰ ঘা ॰　টে ॰　আ ॰ মি ॰　কি ॰　যে ॰ ক ॰

র্সা -া । -র্সা -র্ঋা -ণা I ণা -া । র্সা-র্জ্ঞা জ্ঞা -া I র্ঋা -া । র্সা -া র্সা-র্ঋা I
রি ॰　॰ ॰ ॰　র ॰　উী ন পা ॰　লে ॰　ক ॰ বে ॰

ণা -া । র্সা-ঋা ণা-র্সা I পা -া । -া -দা -া -া I দা-র্সা । র্সা-ণা পা-দা I
আ স্ বে ০ ত ০ রী ০ ০ ০ ০ ০ পা ০ ড়ি ০ দে ০

দা-পা । পা -া পা-জ্ঞা I পা-মা । পা-মা পা-দা I পা ণা । -দা -া -া -পমা I
ব ০ ক ০ বে ০ সু ০ ধা ০ র ০ সে ০ র্ ০ ০ ০

মা -া । মপা- মা জ্ঞা-রা I জ্ঞা-রা । -জ্ঞা রা জ্ঞা-মা I জ্ঞা -া । রা-জ্ঞা রা -া I
পা ০ রা ০ বা ০ রে ০ ০ ০ ০ ০ সু ন্ দ ০ র ০

সা -া । -া -া -া -া I দা -া । ণা-সা সা -া I সা -া । সা-ঋা ণা -া I
হে ০ ০ ০ ০ ০ অ ম্ ল ০ ধূ ০ লা ০ প্রা ০ ণে র্

সা-জ্ঞা । জ্ঞা -া জ্ঞা-রা I জ্ঞা -া । মা -া মা-পা I মা-পা । মা-ণা দা-পা I
বী ০ ণা র্ তা ০ রে ০ বী ০ ণা র্ তা ০ রে ০ তা ০

জ্ঞা-রা । -জ্ঞা-রা -জ্ঞা-মা I জ্ঞা -া । সা-জ্ঞা রা -া I সা -া । -া -া -া -া II II
রে ০ ০ ০ ০ ০ সু ন্ দ ০ র ০ হে ০ ০ ০ ০ ০

শ্রী অনাদিকুমার দস্তিদার

রূপ-রেখার রূপকথা

শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রং আর রং, রংএর পাশে রং, রংএর উপরে রং, রংএর তলায় রং, রেখা হার মান্‌লে—বনের গাছ রেখাকে খুঁজে-খুঁজে দশদিকে হাত বাড়ায়—রং এসে তা'র হাত চেপে ধরে, বনলতা লতিয়ে ওঠে রেখার ছন্দ ধ'রে—রং তা'কে পরিয়ে দেয় ফুলের পাতার রঙীন ঘোমটা,—জল সে রেখার উদ্দেশ ধ'রে চ'লে পথের ঝাঁকে-বাঁকে জল-তরঙ্গের সুরে-সুরে—রং এসে তা'র চোখে আলো-মাখা নীল আবীর ছড়িয়ে দিয়ে হাস্‌তে থাকে। বাদল-দিনের বিদ্যুৎরেখা বৃষ্টিধারা-রেখার বিজয় দুন্দুভি বাজিয়ে দেয় আকাশ জুড়ে, রং ধনুকে টঙ্কার দেয়—রংএর দলবল সাত রংএর জয়-ধ্বজা উড়িয়ে আসে বাতাসে, দিক্ জুড়ে রেখার উপরে রংএর জয় ঘোষণা প'ড়ে যায়।

বিশ্ব জুড়ে রংএর খেলা। প্রজাপতির পাখ্‌না শক্ত হ'য়ে বল্‌তে গেল—আমি চাই রেখা। রং তা'কে আগাগোড়া রংএর, ডোরা রংএর ফোঁটায় সাজিয়ে দিয়ে বল্‌লে, সত্যি নাকি? রংএর ধমকে হরিণের চোখের কাজল-রেখা বাঘের গায়ের উল্‌কী-রেখা বনের ছায়ায় লুকিয়ে গেল, এমন যে খুঁজেই পাওয়া যায় না। উদাসিনী রেখা পাহাড় ভেঙে চ'লে যায় আকাশের কাছে দুঃখ জানাতে, রং সেখানে এসে পড়ে সকাল-সন্ধ্যা—মেঘের রথে, রঙীন কুয়াসার ধূলো উড়িয়ে! পাহাড়-তলায় নদী সে রেখাকে বুকে ধ'রে নিতে চায় দূর সমুদ্রের দিকে, ঝরণার জল রেখাকে নিয়ে পালিয়ে চলে পাহাড় ছেড়ে মাঠের দিকে, দুজনকেই রং বলে, পথের শেষে রঙীন নীল সমুদ্র, মাঠের

ফোয়ারার ধারে

চিত্রশিল্পী—শ্রী সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত

প্রবাসী প্রেস—কলিকাতা।

শেষে রঙীন মরীচিকা, যতদূর যাবে ততদূর আমাকেই দেখ্‌বে।

রেখা ভয়ে কাঁপে নদীর বুকে, ঝরণার জলে, মাঠের পথে, রং এসে হঠাৎ তা'র গায়ে সকাল-সন্ধ্যা সাত রংএর ছায়া, নীল আকাশের ছায়া, চল্‌তি মেঘের ছায়া ফেল্‌তে-ফেল্‌তে চ'লে যায়, দিগ্‌দিগন্তরের সীমা-রেখা ডু'বে যায় রংএর সমুদ্রে!

রেখা ঠাঁই পায় না, রংএর প্রকাশে সংসার ভ'রে যায়। রেখার বেদনা সৃষ্টির শিরায়-শিরায় টন্‌টন্ ক'রে প্রকাশ হ'তে পারে না, রং এসে রেখা দিয়ে লেখা বিশ্বের মনের কথা ধু'য়ে দেয়, মু'ছে দেয়, জানাতে দেয় না, খু'লে বল্‌তে দেয় না একবারও।

উদাসী মানুষ একা ফেরে বনে বনে মাঠে-মাঠে, নদীর ধারে, পর্ব্বতে-পর্ব্বতে, ঝরাপাতার বুকের শিরে-শিরে রেখাকে সে দেখ্‌তে পায়—ধূলায় মলিন উদাসিনী, নদী-চরে স্রোতের লেখায় রেখাকে সে খু'জে পায়—পাহাড়ে-পাহাড়ে ঝরণার পথে রেখাকে সে দেখ্‌তে পায়—উন্মাদিনী,—ছায়ায় দেখে সে রেখার ছবি, আলোয় দেখে সে রেখার রূপ।

উদাসী মানুষের চোখ চেয়ে দেখে—আকাশে বকের পাঁতি বাতাসে রেখার রূপ টান্‌তে-টান্‌তে উ'ড়ে যায়। দেখে সে—রেখার কথা বল্‌তে-বল্‌তে গুম্‌রে কাঁদে মেঘ, শোনে সে—জল ঝরে দিকে-দিকে একটানা সুর দিয়ে, স্রোত কয় রেখার কথা, পাহাড়ের কোণে মেঘ চল্‌তে-চল্‌তে ব'লে যায় তা'কে রেখার কথা, সমুদ্রের ঢেউ বালির উপরে আছ্‌ড়ে প'ড়ে জানায়—রেখাকে সে চিরদিনের মতো ক'রে পাচ্ছে না, পাহাড় মেঘ আর কুয়াসার মধ্যে থেকে চেয়ে থাকে উদাসী—উদাসী মানুষের দিকে—জানায় সে রেখাকে পেয়েও না পাওয়ার দুঃখ!

উদাসী মানুষের বুকে বাজে রেখার জন্যে বিশ্বের বেদনা, সে সে-বেদনা ব্যক্ত কর্‌তে পারে না, চুপ ক'রে রেখার ধ্যান করে। তা'র আপনার ছায়া তা'র পায়ের কাছে প'ড়ে-প'ড়ে রেখার কথা বলে, কিন্তু বল্‌তে পারে না মানুষ কি দেখ্‌ছে, মনের মধ্যে কা'কে দেখ্‌ছে সে আপন-ছায়ায়। উদাসী মানুষ ঘরে ফেরে, সেখানে দেখে সে তা'র আপন জনকে—হাসির রেখা তা'র দুখানি ঠোঁটের মাঝে কান্নার করুণ রেখা, তা'র দুটি চোখের তীরে-তীরে, আল্‌তার রক্ত-রেখা তা'র চরণ-কমলের কিনারায়। উদাসী মানুষ গালে হাত দিয়ে ব'সে মাটিতে রেখা লেখে, তা'র আপনজন—সেও মাথা হেঁট ক'রে অর্দ্ধসমাপ্ত রেখার পর রেখার দিকে চেয়েই থাকে—রাতের অন্ধকারে কাজল রং এসে দুজনকে দুজনের আড়াল ক'রে দেয়, জলের ঝাপ্‌টা এসে মাটিতে ধরা-রেখার লেখা-রূপ মু'ছে দিয়ে যায়। দুজনের মনের কথা দুজনের কাছে ধরা দেয় না। সকালের আলোয় উদাসী সে চ'লে যায় ঘর ছেড়ে, উদাসীনের বিরহিণী ব'সে থাকে একলা পর্ব্বত-গুহায়! এম্‌নি কতদিন যায়, কত রাত যায়, উদাসী চলে রেখার খোঁজে, বিরহিণী থাকে উদাসীনের চলার পথের রেখামাত্র-শেষ চিহ্নটির দিকে একলা চেয়ে। এম্‌নি বার-বার গেল উদাসী রেখার খোঁজে, বার-বার ফির্‌ল ঘরে হতাশ হ'য়ে। মানুষের বুকের মধ্যে সুরে-সুরে রেখা গুম্‌রে কাঁদে, হাতের কাছে টানে-টানে রেখা মাটিতে লুটোপুটি যায়, বলে, আমাকে নিয়ে বাঁধো, আমাকে নিয়ে বাঁধো। উদাসী মানুষের রূপবান্ ছেলে সে ঘরের কোণে বড় হ'য়েই শুন্‌তে পায় রেখার কান্না, চ'লে যায় সে রূপ-কথার রাজপুত্র রংএর দুর্গে বন্দিনী ঘুমন্ত রেখাকে জাগিয়ে তু'লে ঘরে আন্‌তে—সে কত দিন যায়, কত কাল যায়, রং হাসে দিকে-দিকে রক্ত আলোর অট্টহাস। রেখার প্রেমে পাগল নীল আকাশের চাঁদের রেখাকে ধরার ফাঁদ হাতে নিয়ে ছেলে পথে ফেরে, বাঁশি বাজায়, গান গায়, ছবি লেখে, কথা গাঁথে, ঘু'রে-ঘু'রে নাচে! যেতে, যেতে রংএর পাগ্‌লীর সঙ্গে দেখা হয় একদিন রেখার জন্যে পাগল রূপবান্ ছেলের, দুজনকে দুজনের মনে ধ'রে যায়, এ দেয় ওকে হোলী-খেলার পিচ্‌কারি, ওদেয় তা'কে চোখের পাতায় কাজল-লতা, দুজনে মি'লে খেলা-ঘর পেতে ব'সে যায় রূপকথার রাজত্বে গিয়ে।
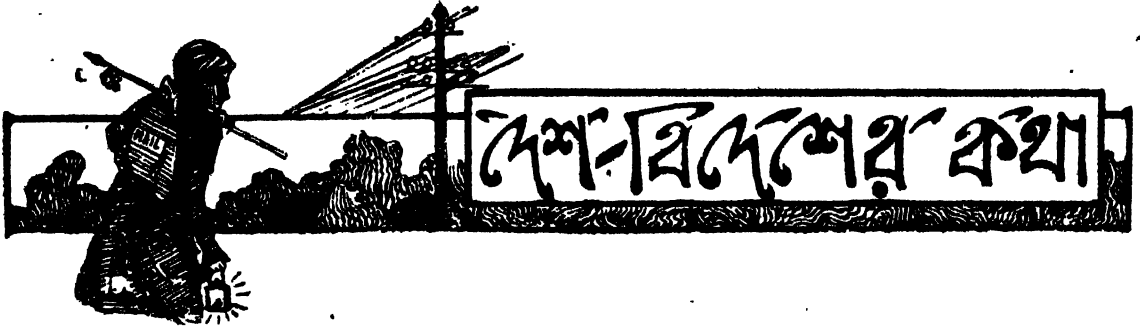
বাংলা

শিক্ষা—

১৯২৩।২৪ সনের বঙ্গীয় শিক্ষা-বিভাগের সরকারী বিবরণী সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য-বর্ষে বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১ হাজার ৮ শত ৩৯টি বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি দেখা যায়। এ-বৎসরে বিদ্যালয়ের মোট সংখ্যা ৫৬০০১টি তন্মধ্যে ৪২৭৬১টি বালকদের এবং ১৩২৪০টি বালিকাদের। আলোচ্য-বৎসরে বিদ্যালয়গামী ছাত্রসংখ্যা ১৬৯২৬৮৮ ও ছাত্রী সংখ্যা ৩৬৪৩৭৪ জন ছিল।

বিদ্যালয়গুলির জন্য আলোচ্যবর্ষে ৩ কোটি ৪৪ লক্ষ ৪৮ হাজার ৩ শত ৭ টাকা ব্যয় হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রাদেশিক সরকারের তহবিল হইতে ১ কোটি ৩০ লক্ষ ৯ হাজার ৪ শত ৮৬ টাকা, জিলাবোর্ড প্রদত্ত অর্থ ১৪ লক্ষ ৮৯ হাজার ২ শত ৩৪ টাকা এবং মিউনিসিপ্যালিটী কর্ত্তৃক দান ৩ লক্ষ ৩০ হাজার ৩ শত ৫৪ টাকা। ইহা-ভিন্ন ছাত্রদত্ত বেতন হইতে ১ কোটি ৪০ লক্ষ ১৬ হাজার ৩ শত ৬৪ টাকা এবং অন্যান্য লোক কর্ত্তৃক দান ৫৬ লক্ষ ২ হাজার ৮ শত ৬৯ টাকা। আলোচ্যবর্ষে বাহিরের লোকের দান বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং সরকারের সরকারী দান কমিয়াছে।

বিশ্ব-ভারতী সংবাদ—

বিশ্ব-ভারতী পল্লী-সেবাবিভাগ হইতে একটি পাঠসঞ্চারী লাইব্রেরী স্থাপন করা হইয়াছে। শ্রীনিকেতনের নিকটবর্ত্তী ১৫খানা গ্রামের অধিবাসীরা এই লাইব্রেরী ব্যবহার করিতেছেন। আমাদের দেশে এইধরণের পল্লী-পাঠাগার স্থাপনের উপযোগিতা যে কত তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। দেশবাসী বিশ্বভারতীর পল্লী-সেবা বিভাগকে সাহায্য করিয়া উৎসাহিত করিবেন। গ্রন্থকারগণ নিজ-নিজ পুস্তক দ্বারা এই পাঠাগারের পুষ্টিসাধন করিতে পারেন। পুস্তকাদি পল্লী-সেবা-বিভাগ শ্রীনিকেতন, সুরুল এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ—

গত ১৫ই মার্চ্চ কলিকাতার উপকণ্ঠে যাদবপুরে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে জাতীয় শিক্ষাপরিষদের ঊনবিংশ প্রতিষ্ঠা-দিবস-উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। ১৯ বৎসর পূর্ব্বে ১৯০৬ সালে স্বদেশী আন্দোলনের বিপুল আশা ও উৎসাহের মধ্যে বাংলা জাতীয়-শিক্ষা পরিষৎ প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। গৌরীপুরের জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, স্বর্গীয় রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক ও পরলোকগত মহারাজা সূর্য্যকান্তের অর্থে ইহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল আর স্বর্গীয় ডাঃ রাসবিহারী ঘোষের শেষ দান ইহাকে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ৺গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺আশুতোষ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি অক্লান্তকর্ম্মীর চেষ্টাতেই স্বদেশীযুগের এই প্রতিষ্ঠানটির এত উন্নতি হইয়াছে। পরিষদের শিল্প ও বিজ্ঞান-শিক্ষা বিভাগে প্রায় সাতশত ছাত্র আছে; পরিষদের কর্ম্মকর্ত্তারা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃষিবিদ্যা, সাধারণ সাহিত্য শিক্ষা ইত্যাদি বিভাগ খুলিবার জন্য চেষ্টিত হইয়াছেন। বর্ত্তমানে পরিষদের যে আয় আছে তাহাতে এ-সমস্ত কল্পনা কার্য্যে পরিণত করা কঠিন।

কলিকাতা অন্ধ-বিদ্যালয়—

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত লালবিহারী সাহা মাত্র একজন ছাত্র লইয়া কলিকাতা অন্ধ-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টার ফলে বিদ্যালয়টির এই দীর্ঘকালের মধ্যে অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। গত ১৭ই চৈত্র তারিখে বাংলার গবর্ণর কলিকাতার উপকণ্ঠে বেহালায় এই বিদ্যালয়ের নূতন গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছেন। নূতন গৃহটি নির্ম্মাণ করিতে ব্যয় হইয়াছে ৬৩ হাজার টাকা। ইহার সমস্ত টাকাই সাধারণের প্রদত্ত। বাংলা সরকার এই বিদ্যালয়টিতে ৫০হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

নারী শিক্ষা সমিতি—

বাংলার সর্ব্বত্র বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া বর্ত্তমানকালোপযোগী শিক্ষাপ্রদান, বিধবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া বিধবাদিগকে শিক্ষা-দ্বারা মহিলা শিক্ষয়িত্রী, ধাত্রী ও শিল্পকর্ম্মী প্রভৃতি কাজ করাইবার জন্য কয়েকবৎসর হইল নারীশিক্ষা সমিতির প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে এই সমিতির অধীনে ২৫টি বালিকাবিদ্যালয় চলিতেছে ও দুই হাজার ছাত্রীকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। একজন হিন্দু-বিধবার নেতৃত্বে বিদ্যালয়ের বাণী-ভবনে দরিদ্র নিরাশ্রয়া বিধবাদিগকে স্থান দিয়া শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। সীবন, বয়ন, স্বাস্থ্যরক্ষা, গৃহকর্ম্ম প্রভৃতি শিক্ষাপ্রদানেরও বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সমিতির কাজ চালাইবার জন্য অন্ততঃ ১ লক্ষ টাকা দরকার। তন্মধ্যে মাত্র ১৪ হাজার টাকা উঠিয়াছে। এই সদনুষ্ঠানটির সাহায্যের জন্য শ্রীযুক্তা অবলা বসু একটি আবেদন বাহির করিয়াছেন। ইহার সাহায্য-কল্পে যিনি যাহা দিবেন তাহা তাঁহার নামে ১০৫নং আপার সার্কুলার রোডে পাঠাইবেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন—

আগামী ২৭শে ও ২৮শে চৈত্র মুন্সীগঞ্জে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ষোড়শ অধিবেশন হইবে। মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় উহার সভাপতি হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (সাহিত্য-বিভাগ) শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার (ইতিহাস-বিভাগ) পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী (দর্শন-বিভাগ) ও ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী (বিজ্ঞান-বিভাগ) শাখা-সভাপতি-পদে বৃত হইয়াছেন।

অন্ন ও বস্ত্র—

দেশে এবার আশাতীত-রকম ফসল হওয়া-সত্বেও আমাদের অভাব ঘুচিতেছে না। ত্রিপুরা-হিতৈষী লিখিয়াছেন—

গত ১.... কুমিল্লাতে চাউলের মণ ৮৲, ৮।০ পর্য্যন্ত বিক্রয় হইয়াছে। চৈত্র মাসেই চাউলের দর ৮৲, এবার আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে যে কি অবস্থা হইবে তাহা এখনকার অবস্থা দেখিয়াই কতকটা কল্পনা করিতে পারা যায়।

বঙ্গের সর্ব্বত্র হইতেই এইরূপ খবর পাওয়া যাইতেছে। অন্ন-বস্ত্রের অভাবের তাড়নায় লোকের কতদূর অবনতি ঘটে তাহা নিম্নলিখিত সংবাদটি হইতেই বুঝা যাইবে।

স্বরাজ সংবাদ দিতেছেন :—

গত ২৮শে চৈত্র ঢাকা জেলায় শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বসু নামক জনৈক ভদ্রঘরের শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবক দিনাজপুরে আত্মহত্যা করিয়াছে। দিনাজপুরের কোনো দোকানে সে পেটের দায়ে চুরি করিতে ঢুকিয়াছিল, ধৃত হইবার সম্ভাবনা হওয়ায় দারুণ লজ্জার হাত হইতে এড়াইতে নিজের পকেট-ছুরি দ্বারা স্বীয় কণ্ঠে পুনঃপুনঃ আঘাত করে। এমনি শোচনীয় উপায়ে পেটের ও লজ্জার দায় হইতে একই কালে যুবক পরিত্রাণ পাইয়াছে।

বঙ্গীয় খাদি-প্রতিষ্ঠান বক্তৃতা, আলোক চিত্র প্রদর্শন, খদ্দর প্রদর্শনী ও চর্‌কা-উৎসবাদির সাহায্যে খদ্দরের প্রচারের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টিত হইয়াছেন। তাঁহারা এক উপায়ে বস্ত্র সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করিতেছেন। অন্য চেষ্টাও হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই প্রসঙ্গে আমরা নিম্নলিখিত সংবাদটি উদ্ধৃত করিলাম—

বালিকার কৃতিত্ব—নাটোরের শ্রীযুক্ত আশুতোষ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কন্যা কুমারী অপর্ণা দেবী খুব সরু সূতা কাটিয়া মহাত্মার নিকট হইতে প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। অল্‌ ইণ্ডিয়া খাদি-বোর্ড্‌ সম্প্রতি অপর্ণাকে একখানি স্বর্ণপদক প্রদান করিয়াছেন।

স্বাস্থ্য—

বাংলাদেশে ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, যক্ষ্মা, বসন্ত ইত্যাদি রোগে প্রতি-জেলায়, প্রতিগ্রামেই বৎসরের পর বৎসর লোকক্ষয় হইতেছে। গত ২১শে মার্চ্চ্‌ আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু কেন্দ্রীয়-ম্যালেরিয়া-নিবারণী-সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে যে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহা প্রণিধান যোগ্য।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বলিয়াছেন যে ম্যালেরিয়া দূর করা দুঃসাধ্য কার্য্য নয়; আমরা যদি সকলে সমবেতভাবে চেষ্টা করি তবে এই ব্যাধি দেশ হইতে দূর করিতে পারি। ইংলণ্ড, ইটালী, জাপান প্রভৃতি দেশ হইতে ম্যালেরিয়া মানুষের সমবেত-চেষ্টার ফলেই দূরীভূত হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশের গৃহস্থ ও কৃষকেরাও নিতান্ত অলস নহে। তাহাদের প্রধান দোষ অজ্ঞতা ও ঔদাসীন্য। যদি তাহাদিগকে গৃহসংলগ্ন জঙ্গল কাটিতে ও রাস্তা পরিষ্কার রাখিতে শিখানো যায়, তবে বোধ হয় বাঙ্গলার গ্রাম হইতে সহজে ম্যালেরিয়া দূরীভূত হইতে পারে।

বাঙ্গলা দেশকে ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর হইতে মুক্ত করিতে হইলে, কেবলমাত্র বিদেশী আম্‌লাতন্ত্র গবর্ণ্‌মেণ্টের দয়ার দিকে চাহিয়া রহিলে চলিবে না, আমাদের জীবনমরণ সমস্যার সমাধান আমাদেরই করিতে হইবে।

তিনি বলেন, দেশপ্রসিদ্ধ ডাঃ গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নেতৃত্বে কো অপারেটিভ-ম্যালেরিয়া-নিবারণী-সমিতির শাখাপ্রশাখা বাঙ্গলার গ্রামে-গ্রামে যেরূপ বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে, ইহাতেই বাঙ্গালী জাতীয় আত্মরক্ষার প্রয়াস দেখিতে পাইতেছেন। ডাঃ নীরদবন্ধু ভট্টাচার্য্যের নেতৃত্বে বঙ্গীয় স্বাস্থ্য-সমিতি, কালাজ্বর নিবারণের জন্য যে উদ্যম করিতেছেন, তাহাও এইসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন যে মানুষের মন তাহার দেহের উপর অসীম প্রভাব বিস্তার করে; মানুষের মন যদি অবসন্ন হইয়া পড়ে, ভাঙ্গিয়া যায়, তবে তাহার দেহও ভাঙ্গিয়া পড়ে। একথা কেবল ব্যক্তির পক্ষে নহে, জাতির পক্ষেও পরম সত্য। আচার্য্য বসু তাই বলিয়াছেন যে, জাতীয় স্বাস্থ্য ফিরিয়া আনিতে হইলে, এইসব আনন্দের উৎস আবার খুলিয়া দিতে হইবে; আমাদের যে-সব জাতীয় উৎসব ও আনন্দ অনুষ্ঠান আছে, জাতীয় খেলাধূলা আছে, সেগুলি পুনর্জ্জীবিত করিতে হইবে। আচার্য্য বসু বলিয়াছেন যে তাঁহার গবেষণা বিদ্যালয়ের (বসু বিজ্ঞান-মন্দির) শিক্ষার্থীগণকে তিনি প্রত্যহ দুই ঘণ্টা লাঠিখেলায় ব্যয় করিতে দিতেছেন; ইহার ফলে তাহাদের স্বাস্থ্যও যেমন ভালো থাকে, তাহাদের কর্ম্মক্ষমতা, হস্তপদের ক্ষিপ্রতা ও দক্ষতাও তেম্‌নি বাড়িয়া যায়। তিনি আশা করেন, প্রত্যেক স্কুল-কলেজের পাঠশালা-বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে এইরূপ লাঠিখেলা ও ব্যায়াম শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইবে।

বঙ্গীয় বিধবা-বিবাহ-সহায়ক সভা—

কলিকাতায় সম্প্রতি বঙ্গীয় বিধবা-বিবাহ-সহায়ক সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভা বাংলা দেশে বিধবা-বিবাহ প্রচলন করিবার জন্য অনেক বিধি গ্রহণ করিয়াছেন।

অস্পৃশ্যতা—

কলিকাতায় বাংলাদেশের চর্ম্মকারদের এক সভা হইয়া গিয়াছে। বাংলা দেশে ৪ লক্ষ চর্ম্মকারের বাস। উহারা প্রস্তাব করিয়াছে—

এই সমাজ হিন্দু হইয়াও হিন্দুর অধিকারে, এমন-কি মনুষ্যের অধিকারে বঞ্চিত; হিন্দুবর্ণাশ্রমের ধোপা নাপিত প্রভৃতি সামাজিক অধিকারে বঞ্চিত, দেবমন্দিরের, তীর্থস্থানের দ্বার আমাদের প্রতিরুদ্ধ; এই সম্মিলন স্থির করিতেছে যে ঋষিসমাজ আর নির্জ্জিত থাকিতে প্রস্তুত নহে এবং যদি হিন্দুসমাজে থাকিয়া তাহারা মানুষের জন্মগত অধিকারে বঞ্চিত থাকে, তবে যে-সমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিলে উহা পাওয়া যাইবে সেইরূপ সমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিবে।

সভায় এই সমাজে বিধবা-বিবাহ বিধি-বদ্ধ করা, বাল্যবিবাহপ্রথা ও মাদকদ্রব্য ব্যবহার-প্রথা ত্যাগ করা, সমাজের আর্থিক ও শিক্ষাবিস্তার বিষয়ক কএকটি প্রস্তাবও গৃহীত হয়।

বঙ্গে নারী-নিগ্রহ—

অপরিসীম লজ্জা ও কলঙ্কের কথা বাংলা দেশে এখনও নারীনির্য্যাতনের সংখ্যা কমে নাই। উত্তরবঙ্গের রংপুর ও পূর্ব্ববঙ্গের ময়মনসিংহ এই দুই জেলাই নারী-নির্য্যাতনের জন্য প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। দুঃখের বিষয় নির্য্যাতিতা নারীদের রক্ষার জন্য যাঁহারা প্রাণপণে চেষ্টা করেন, সমাজে তাঁহাদিগকে পুনর্গ্রহণের জন্য সাহায্য করেন, দেশের একদল লোক ইহার প্রতিকূল আচরণ করিতেছেন। এই গোঁড়ার দল দেশের ও সমাজের শত্রু। এই-প্রসঙ্গে একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি :—

রঙ্গপুরের সহকারী সেসন জজের নিকট মাকর সেখ নামক এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে সুমন্তা নাম্নী একটি হিন্দু বালিকাকে স্বামীর অনুপস্থিতিতে অপহরণ করিয়া লইয়া যাইবার যে অভিযোগ আনা হইয়াছিল, তাহার বিচার ৫ জন জুরীর সাহায্যে শেষ হইয়াছে। অভিযোগে প্রকাশ যে বালিকাটি চীলমারি থানার অন্তর্গত মোহনগঞ্জ-নিকরপুর নামক ব্রহ্মপুত্রের তীরস্থ একটি গ্রামে তাহার স্বামীর বাড়ীতে ছিল। ঘটনার দিন রাত্রিতে তাহার স্বামী এবং শাশুড়ী অনুপস্থিত ছিল। আসামীও এই সুযোগে তাহাকে অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। বালিকাটির চীৎকারে কয়েকজ

মুসলমান প্রতিবেশী উপস্থিত হইয়া দুর্বৃত্তদিগকে তাড়া করেন, তাহারা উঁহাকে ব্রহ্মপুত্রের চরের উপর ছাড়িয়া দিয়া পলায়ন করে।

জজ অধিকাংশ জুরীদের সহিত একমত হইয়া আসামীর প্রতি তিন বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদান করিয়াছেন। মুসলমান গ্রামবাসীদের এই সৎসাহস প্রশংসনীয়।

বাংলায় ডাকাতি—

প্রতিমাসে বাঙ্গলাদেশের যে ডাকাতির সংখ্যা বাহির হয়, তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, বর্ত্তমান বৎসরে এই পর্য্যন্ত নানা অর্থাভাব থাকা সত্বেও ডাকাতির সংখ্যা কমই হইতেছে। বর্ত্তমান বৎসরে যত ডাকাতি হইতেছে, গত বৎসর প্রতিমাসেই উহা হইতে বেশী ডাকাতি হইত। নিবারণের একটি কারণ এই যে, বর্ত্তমানে গ্রামবাসিগণ অনেক স্থানেই সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া ডাকাতদের বাধা দিতেছে। এই-বৎসরে এ-পর্য্যন্ত ৩২টি ডাকাতিতে গ্রামবাসিগণ ডাকাতগণের সঙ্গে লড়িয়া উহাদিগকে বিতাড়িত করিয়াছে। আর ৪ স্থানে গ্রামবাসিগণ সময়মত সংবাদ দেওয়াতে ডাকাতগণ ধরা পড়িয়াছে।

আবগারী আয়—

আমরা কয়েক বৎসর হইতে শুনিয়া আসিতেছি বাংলা সরকার অসহযোগীদের মতোই মাদক-নিবারণের জন্য চেষ্টিত। কিন্তু চেষ্টাটা কাজে কেমন হইয়াছে তাহার নমুনা দেওয়া গেল। কেবলমাত্র কলিকাতা সহরের হিসাব এই তালিকায় দেওয়া হইল—

	'২৪-'২৫	'২৫-'২৬
দেশী মদ—	৪৬	৪৪
তাড়ি—	২৫	২৫
বিদেশীমদ—	৩৩	৩৬
ঐ সাধারণ—	৩৫	৩৫
রেস্তোরাঁ	২৩	২৩
হোটেল—	৯	৯
বিদেশীমদ—	৫	৪
আফিম্—	২৯	৩০
গাঁজা—	৩৪	৩৪
সিদ্ধি—	১৩	১৩
চরস—	৩	৩
মোট	২৫৫	২৫৬

কলিকাতা করপোরেশন স্থির করিয়াছেন যে কলিকাতা নগরে মদ, গাঁজা, আফিং ইত্যাদি বিক্রয়ের জন্য যেসকল দোকান আছে তাহা তুলিয়া দেওয়ার জন্য করপোরেশনের পক্ষ হইতে গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হউক। ঔষধার্থে লাইসেন্স্‌প্রাপ্ত ডিস্পেন্সারিতে মাত্র অল্প-পরিমাণে এইসকল মাদক দ্রব্য রাখা হইবে; লোকের নেশার প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য কেহ উহা বিক্রয় করিতে পারিবে না, ইহাই এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। গবর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাব-অনুসারে সত্বর কার্য্য করিবেন এরূপ ভরসা নাই। যাহা হউক এই বিষয়ে ক্রমে জনমত গঠিত হইলে শেষে সুফল ফলিতে পারে।

প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের শ্বাসরোধ—

গত ৬ই মার্চ্চ তারিখের ইণ্ডিয়া গেজেটে চন্দননগরের প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের শ্বাসরোধ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ভারত সরকারের বক্রদৃষ্টি ভারত-সাম্রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া ভারতবাসী বলিয়া পরিচিত ফরাসী-প্রজাতন্ত্রের ভারতীয় প্রজাদের দেশহিতকর কর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানের প্রতি বজ্র হানিতে সুরু করিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে ফরাসী সরকার প্রবর্ত্তক মাসিক কাগজখানির তিনমাসের জন্য প্রচার বন্ধ রাখিয়াছে। এবার ভারত সরকার প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউসের প্রকাশিত ও প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের সাধনা প্রেসে মুদ্রিত যাবতীয় পুস্তকের ব্রিটিশভারতে প্রচার নিষিদ্ধ করিয়াছে।

কুমিল্লা অভয় আশ্রম—

কুমিল্লা অভয় আশ্রমের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। আশ্রমের নীরব কর্ম্মীগণ ধীরে ধীরে আশ্রমটিকে গড়িয়া তুলিতেছেন। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে আশ্রমের জন্য কাজ করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহা দেশ-সেবক মাত্রেরই অনুকরণ-যোগ্য।

আশ্রমে এখন ২০ জন সেবক আছেন। তন্মধ্যে ৮ জন চিকিৎসা বিভাগে, ৯ জন খদ্দর বিভাগে এবং ৩ জন শিক্ষা ও কৃষি বিভাগে। অন্যান্য বিভাগের সেবকগণকেও শিক্ষাবিভাগে কিছু সময়ের জন্য কাজ করিতে হয়। কাজের পরিমাণানুযায়ী আশ্রমে সেবকসংখ্যার অভাব। সমস্ত বিভাগকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিতে আরও অন্ততঃ ১০ জন সেবকের প্রয়োজন।

আশ্রমে বর্ত্তমানে কার্য্যের সুবিধার জন্য ৫টি বিভাগ আছে। (১) চিকিৎসা বিভাগ। (২) চরকা ও খদ্দর বিভাগ। (৩) শিক্ষা বিভাগ। (৪) গ্রন্থাগার ও পাঠভবন। (৫) কৃষি, গোপালন ইত্যাদি।

গত ১ বৎসরে বয়ন-বিভাগের তত্ত্বাবধানে ২১০১৩॥৶ টাকার খদ্দর উৎপন্ন হইয়াছে।

বর্ত্তমানে অবৈতনিক শিক্ষায়তনের ছাত্রসংখ্যা দেড় শতের অধিক। তন্মধ্যে ১২০জন আশ্রম বিদ্যালয়ের। মেথর-পাড়ার বিদ্যালয়ের ছাত্র, ছাত্রী ২২জন এবং আশ্রমস্থিত নৈশবিদ্যালয়ের .০ জন।

গত বৎসর পাঠাগারে প্রায় দেড় হাজার পুস্তক ছিল। এই বৎসর আরও প্রায় দুইশত বাড়িয়াছে। গত দুই বৎসরে ৫২৯৫৬॥৶৫ হাজার টাকা খরচ হইয়াছে। আশা করি আমাদের স্বদেশবাসিগণ যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া কর্ম্মীদিগকে উৎসাহ দিবেন।

শ্রী প্রভাত সান্যাল

—

ভারতবর্ষ

মুডিম্যান কমিটি—

ভারতের নব-প্রবর্ত্তিত শাসন সংস্কারের "ভ্রমপ্রমাদ" প্রভৃতির আলোচনা ও তাহার প্রতিকারের উপায় নির্দ্ধারণ করিবার জন্য মুডিম্যান কমিটি বসিয়া ছিল, দীর্ঘকালব্যাপী গবেষণা ও দরিদ্র ভারতবাসীর বহু অর্থ নাশ করিয়া তাঁহারা এতদিন পরে একটা 'রিপোর্ট' বাহির করিয়াছেন। দিল্লীর "হিন্দুস্থান টাইম্‌স্" মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই রিপোর্ট অবিলম্বে "ডাষ্টবিনে" ফেলিয়া দেওয়া উচিত। এই যে নিষ্ফল আয়োজনে ভারতের দরিদ্র প্রজাদের শোণিত-তুল্য হাজার-হাজার টাকা ব্যয় হইল, ইহার জন্য দায়ী কে? বিলাতের ভূতপূর্ব্ব শ্রমিকগবর্ণমেণ্ট ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনকারীদিগকে কথঞ্চিত শান্ত করিবার জন্য এই ধামাচাপা-দেওয়া কমিটি নিয়োগ করিয়াছিলেন।

মণ্টেগু-প্রবর্ত্তিত রিফর্ম বা শাসনসংস্কারে ভারতের লোকেরা সন্তুষ্ট হয় নাই। কেননা, এই দ্বৈত শাসন-প্রণালীতে স্বায়ত্তশাসনের নামগন্ধও নাই, ইহার ফলে কাউন্সিল বা এসেম্বলী প্রভৃতি প্রতিনিধি সভাকে কোনোরূপ প্রকৃত ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই, এবং তথাকথিত দেশীয় মন্ত্রীরা এই প্রণালীতে নামে কাউন্সিলের নিকট তাঁহাদের কার্য্যের জন্য দায়ী হইলেও কার্য্যতঃ খোদ গবর্ণরের অধীন,

তাঁহাদের স্বাধীনভাবে কিছু করিবার যো নাই, ইচ্ছা থাকিলেও দেশের কোনো উপকার করিবার সাধ্য তাঁহাদের নাই।

মুডিম্যান কমিটির সম্মুখে যেসমস্ত "দেশী মন্ত্রীরা" সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই (বাঙ্গলা ছাড়া) একবাক্যে এইসমস্ত মত ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহারা স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, মণ্টেগু-প্রবর্ত্তিত দ্বৈত-শাসন প্রণালী অনুসারে মন্ত্রীদের স্বাধীনভাবে কাজ করা অসম্ভব—দ্বৈত-শাসনতন্ত্র ব্যর্থ।

মুডিম্যান কমিটির প্রেসিডেণ্ট ছিলেন স্যার আলেকজাণ্ডার মুডিম্যান তাহা ছাড়া আরও ৮ জন সদস্য ছিলেন। তাঁহারা সকলে একমতাবলম্বী হইয়া রিপোর্ট দিতে পারেন নাই। স্যার মহম্মদ সফী, বর্দ্ধমানের মহারাজা, স্যার আর্থার ফ্রুম, স্যার মনক্রিয়েথ স্মিথ এবং স্বয়ং প্রেসিডেণ্ট—এই পাঁচজন একটি রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন এবং ডাঃ তেজ বাহাদুর সপ্রু, শ্রীযুক্ত শিবস্বামী আয়ার, ডাঃ পরাঞ্জপে ও মিঃ জিন্না ইহাঁরা চারিজনে একটি স্বতন্ত্র রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন।

পাঁচজন সদস্য বা অধিকাংশ সদস্য স্বীকার করিয়াছেন যে, যে-সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিতে গবর্ণমেণ্ট কমিটিকে নিয়োগ করিয়াছেন, তাহা অতি সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ, তাহার দ্বারা রিফর্শ্মের আমূল পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করা সম্ভব নয়, অথচ এরূপ আমূল পরিবর্ত্তন না করিলেও দেশবাসী সন্তুষ্ট হইবে না।

যে চারিজন দেশীয় সদস্য স্বতন্ত্র রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন, তাঁহারা এইরূপ সঙ্কীর্ণ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াই সন্তুষ্ট হন নাই। রিফর্শ্মের যে আমূল পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন, তাহার যে গোড়াতেই গলদ, তাহাও ব্যক্ত করিয়াছেন এবং যে উপায়ে তাহা সম্ভব, তাহাও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রিফর্ম ব্যর্থ হওয়ার কারণ তাঁহারা প্রদর্শন করিতে ভুলেন নাই।

কেবল যে কমিটির চারিজন দেশীয় সদস্যই এইরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা নহে। বিহার-গবর্ণমেণ্ট ও যুক্ত-প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট কমিটির নিকট যে মেমোরেণ্ডাম বা মন্তব্য পেশ করিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহারা এই কথা খোলাখুলিভাবে বলিয়াছেন। বিহার-গবর্ণমেণ্ট লিখিয়াছেন—

'বিরুদ্ধ সমালোচকদিগকে শান্ত করাই যদি গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য হয়, তবে ছিটে-ফোঁটা প্রতিকার করিয়া কোনো ফল হইবে না। ভারতের রাজনীতিকগণ দ্বৈত-শাসনপ্রণালীর পরিবর্ত্তন করিয়া তাহার স্থানে প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য স্থাপন না করিলে সন্তুষ্ট হইবেন না। ইহাই প্রকৃত সমস্যা এবং ইহারই সমাধান করিতে হইবে।"

যুক্ত প্রদেশের গবর্ণমেণ্টও এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন; তাঁহারা বলিয়াছেন যে, রিফর্শ্মের মরচে-পড়া ভাঙা চাকায় তেল দিয়া অচল গাড়ী চালানোর চেষ্টা একেবারেই অসম্ভব।

ভারতের লোকতত্ত্ব—

মিঃ মার্টেন, আই, সি, এস, ১৯২১ সালের ভারতের আদম-সুমারীর কর্ত্তা ছিলেন। সুতরাং এবিষয়ে বিশেষজ্ঞ বলিয়া তিনি খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। সম্প্রতি এই 'বিশেষজ্ঞ' আই, সি, এস্ মহাশয়, বিলাতে ভারতের লোকতত্ত্ব সম্বন্ধে—গবেষণামূলক কয়েকটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন। মিঃ মার্টিন বলিতেছেন—ভারতের লোকসংখ্যা অত্যধিকরূপে বাড়িয়া গিয়াছে, আর ইহার ফলেই ভারতে দারিদ্র্য ও ব্যাধি খুব বৃদ্ধি পাইতেছে। অতএব ভারতের জনসাধারণের অবস্থা ভালো করিতে হইলে, তাহাদের দুঃখ ও দুর্দ্দশা মোচন করিতে হইলে লোকসংখ্যা কমাইবার চেষ্টা করা উচিত।

মিঃ মার্টেন কি উদ্দেশ্যে এরূপ কথা বলিতেছেন জানি না, তবে তাঁহার মত যে ভুল এবং প্রকৃত তথ্যের (facts) উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, একথা বলা যাইতে পারে। বিলাতের—সাম্রাজ্যপ্রেমিকগণ মিঃ মার্টেনের এই নবাবিষ্কৃত মতের সুযোগ লইয়া ভারতের দুঃখ-দারিদ্র্য-সম্বন্ধে পরম গম্ভীরভাবে নানা উপদেশ বর্ষণ করিতে সুরু করিয়াছেন। মিঃ মিল্‌নী নামক একজন পার্লামেণ্টের সদস্য তাঁহাদের মধ্যে সকলের চেয়ে বেশী উৎসাহী।

লাহোরের সনাতন ধর্ম্ম কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ব্রিজনারায়ণ সম্প্রতি ভারতের লোকতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া একখানি সুন্দর গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। এই গ্রন্থে মিঃ মার্টেনের ভ্রমাত্মক মতগুলি বহুল-পরিমাণে খণ্ডিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ব্রিজনারায়ণ দেখাইয়াছেন যে, ভারতের লোকসংখ্যা অতিরিক্ত হয় নাই, অথবা ভারতের কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি ধনোৎপাদনের পথগুলি এতটা অবরুদ্ধ হয় নাই যে, সে আর অতিরিক্ত লোক পোষণ করিতে পারে না; বরং ভারতের কৃষি, শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতি পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যদেশের তুলনায় এখনও অনুন্নত ও পশ্চাৎপদ, ইহার উন্নতি ও প্রসার বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ারও যথেষ্ট অবসর আছে।

অধ্যাপক ব্রিজনারায়ণ দেখাইয়াছেন—ভারতের লোক সংখ্যার ব্যাপকতা (Density) ইউরোপের অন্যান্য অনেক দেশের অপেক্ষা যথেষ্ট কম। নিম্নের তালিকা হইতেই একথার সত্যতা বুঝা যাইবে:—

দেশের নাম	প্রতি বর্গ মাইলে গড়ে—লোক-সংখ্যা
ভারতবর্ষ—	১১৭
বেল্‌জিয়ম—	৬৬৬
ইংলণ্ড ও ওয়েলস—	৬৫০
হল্যাণ্ড ও ডেনমার্ক—	৫১৩
জার্ম্মানী—	৩৩২

ইউরোপের ঐসমস্ত দেশে লোকসংখ্যা অতিরিক্ত হইয়াছে, এরূপ কথা কেহই বলে না। সুতরাং মিঃ মার্টেনের ন্যায় বিশেষজ্ঞের মতে ভারতবর্ষে লোকসংখ্যা যে কেন অতিরিক্ত বলিয়া গণ্য হইবে, তাহার কোনো কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

ভারতে লোকসংখ্যা অতিরিক্ত হয় নাই এবং একমাত্র ফ্রান্স ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোনো সভ্যদেশের তুলনায় এখানকার লোক বৃদ্ধির হারও বেশী নহে—অনেক কম। আদমসুমারীর বিবরণ হইতে আমরা বরং দেখিতে পাইতেছি যে ভারতের লোকসংখ্যা ক্রমে হ্রাস পাইতেছে, বৃদ্ধির হার প্রতিবৎসর কমিয়া যাইতেছে। দারিদ্র্য ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, যক্ষ্মা প্রভৃতির ফলে বাঙ্গলার প্রায় প্রতি জেলায় লোকক্ষয় হইতেছে, অনেক স্থলে জনশূন্য হইয়াছে; জন্মের হার অপেক্ষা মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পাইতেছে এবং সর্ব্বোপরি বাঙ্গালীজাতির জীবনীশক্তি এত হ্রাস হইয়া পড়িতেছে যে, জীবন সংগ্রামে তাহাদের পক্ষে আত্মরক্ষা করা দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ভারতের প্রকৃত ব্যাধি যাহা, তাহা অধ্যাপক ব্রিজনারায়ণ নিরূপণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

(১) ভারতের জন্মের হার পৃথিবীর মধ্যে অনেক দেশের অপেক্ষা বেশী—প্রায় হাজারকরা ৪৫ জন। তেমনি এদেশের মৃত্যুর হারও সর্ব্বাপেক্ষা বেশী—হাজার-করা ৩৭ জন। এই দুই-ই অস্বাভাবিক অবস্থার পরিচয় দেয়। যে-সব দেশে অবস্থা স্বাভাবিক, লোকের জীবনীশক্তি বেশী, সেখানে জন্মের হার ও মৃত্যুর হার উভয়ই ইহা অপেক্ষা কম। তাহার ফলে সেইসব দেশে লোকসংখ্যার বৃদ্ধির হার যেরূপ, ভারতবর্ষে বৃদ্ধির হার তাহা অপেক্ষা অনেক কম। আমরা এত অধিক জন্মের হার বা এত অধিক মৃত্যুর হার চাই না। আমরা চাই, উভয়ই কমাইতে এবং লোকসংখ্যার বৃদ্ধির হার বাড়াইতে কিন্তু জাতির জীবনীশক্তি না বাড়িলে তাহা হইতে পারে না।

(২) ভারতের লোকের আয়ু গড়ে পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যদেশের লোকের অপেক্ষা অনেক কম, মাত্র ২৩ বৎসর। লোকসংখ্যার প্রতিহাজারে দশ বৎসরের নিম্নবয়স্ক শিশুর সংখ্যাই বেশী, পঞ্চাশ

বৎসরের ঊর্দ্ধ বয়স্ক লোকের সংখ্যা কম। ইহা জাতির জীবনীশক্তি-হীনতার লক্ষণ।

(৩) ভারতবর্ষে শিশুমৃত্যুর হার পৃথিবীর যে কোনো সভ্যদেশ অপেক্ষা বেশী।

লোকসংখ্যার অতিরিক্ত বৃদ্ধি ভারতের দারিদ্র্য ও ব্যাধির কারণ নহে; দারিদ্র্য, ব্যাধিই এবং নিরক্ষরতা ভারতের লোকসংখ্যা ক্ষয় করিতেছে।

ভারতের বস্ত্র শিল্প—

ল্যাঙ্কাশায়ারের বণিকগণ ভারতীয় নিকৃষ্ট শ্রেণীর তুলা লইয়া সস্তায় ভারতে কাপড় সরবরাহ করিবার জন্য সম্প্রতি নূতন আয়োজন করিতেছেন, ল্যাঙ্কাশায়ারের এই নূতন অভিযানের ফলে ভারতের আধুনিক বস্ত্র শিল্পের অবস্থা কি দাঁড়াইতে পারে তৎসম্বন্ধে সম্প্রতি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মজুমদার তাঁহার মতামত দিয়াছেন। মিঃ মজুমদার গত ১৫ বৎসর যাবৎ ভারতের বিভিন্ন কাপড়ের কলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন। বোম্বে বিরামগাঁও, হুবলী প্রভৃতি বহু স্থানে বিভিন্ন মিলে তিনি উইভিং মাষ্টারের কাজ করিয়াছেন এবং সম্প্রতি আহমদাবাদের নিউ জাহাঙ্গীর ভকীল মিল্‌সের ম্যানেজার পদে অধিষ্ঠিত আছেন সুতরাং এই বিষয়ে যে তাঁহার মতের বিশেষ মূল্য আছে তাহা বলাই বাহুল্য।

মিঃ মজুমদার বলেন যে, ভারতের সঙ্গে কাপড়ের প্রতিযোগিতায় ল্যাঙ্কাশায়ারের অনেক অসুবিধা সহ্য করিতে হয়। প্রথমতঃ ভারত হইতে তুলা কিনিয়া জাহাজ ভাড়া দিয়া বিলাতে লইয়া যাইতে হয়। সেখানে অত্যধিক মজুরী দিয়া কাপড় তৈয়ার করিয়া আবার জাহাজ ভাড়া দিয়া এদেশে পাঠাইতে হয়। তাহার তুলনায় এদেশীয় কল-ওয়ালাদের সুবিধা অনেক, কেননা তাহারা বাড়ীর কাছেই তুলা খরিদ করিতে পারে, তার পর মজুরদের বেতন বিলাতী মজুরদের তুলনায় অনেক কম। এই অবস্থায় ইহাই মনে হয় যে, ভারতীয় কলওয়ালাদের সঙ্গে হয়ত ল্যাঙ্কাশায়ারের বণিকগণ মোটা কাপড়ের প্রতিযোগিতায় নাও টি কিতে পারে। কিন্তু গত কয়েক বৎসর যাবৎ জাপানী কলওয়ালারা যেভাবে ভারতীয় এবং ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতেছে তাহাতে উপরোক্ত ধারণা লইয়া-বসিয়া থাকা একেবারেই নিরাপদ নহে। ভারতীয় বস্ত্র-শিল্পকে ল্যাঙ্কাশায়ার যে ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই ধ্বংস করিয়া দিতে পারে, তৎসম্বন্ধে মিঃ মজুমদার নিম্নলিখিত কারণগুলি নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

(১) আমরা পরাধীন বলিয়া এ-দেশের বস্ত্র-শিল্প কোনো প্রকার সরকারী সাহায্য পাইবে না। সমস্ত স্বাধীন দেশেই দেখা যায় যে জন-সাধারণের প্রতিনিধিস্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যখনই দেশের কোনো শিল্প ধ্বংসোন্মুখ হয় তখন উহাকে সাহায্য করিয়া থাকেন। এ দেশের গবর্ণমেণ্ট বিদেশী বলিয়া ভারতের স্বার্থ অপেক্ষা ল্যাঙ্কাশায়ারের স্বার্থ ই উহার কাছে অগ্র-গণ্য। একমাত্র 'কটন এক্‌সাইজ ডিউটীর' জন্যই ভারতের অনেক কল পঙ্গু হইয়া আছে। আমি যে-মিলে কাজ করি, উহার মূলধন ৬ লক্ষ টাকা; কিন্তু উহাকে বৎসরে লক্ষাধিক টাকা 'এক্‌সাইজ ডিউটী' দিতে হয়। যদি এই 'ডিউটী' উঠাইয়া দেওয়া হয় এবং রপ্তানী তুলা ও আমদানি বস্ত্রের উপর কিছু ট্যাক্স্ ধরা হয় তাহা হইলে ভারত ১০ বৎসরের মধ্যে নিজের কাপড় নিজে তৈয়ার করিয়া লইতে পারিবে। কিন্তু এ-দেশের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় সে আশা সুদূর-পরাহত।

(২) জাপান-সরকার জাপানী বণিকগণ যাহাতে ভারতের কাপড়ের বাজার দখল করিয়া লইতে পারে তজ্জন্য নানাভাবে বস্ত্র-ব্যবসায়ীগণকে সাহায্য করিতেছেন। এদেশে মাল পাঠাইতে বণিকদিগকে জাহাজ ভাড়া একপ্রকার দিতে হয় না বলিলেও চলে। যদি ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্রশিল্প বাস্তবিক পক্ষেই বিপন্ন হয় তাহা হইলে ব্রিটিশ সরকারও তাহাদিগকে জাপানী সরকারের মতো সহায়তা করিবেন।

(৩) ভারতীয় বণিকদের ব্যবসায়-বুদ্ধি এই বিষয়ে অন্যান্য দেশের তুলনায় খুবই কম। ভারতীয় বস্ত্র-ব্যবসায়ীদের অনেকেরই ব্যবসায় সম্বন্ধে তেমন অভিজ্ঞতা নাই। অবস্থা বিবেচনায় সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করা ভবিষ্যৎ স্বার্থের জন্য আপাততঃ স্বার্থ পরিত্যাগ করা, সহযোগী বণিকদের বিপদ্ হইতে ত্রাণ করিবার জন্য নিজেদের লাভস্পৃহা কিছু দিন ত্যাগ করা ইত্যাদি তাহারা জানে না। কলওয়ালা সমিতি হয়ত বহু বিচার-বিতর্কের পর আজ একটা মন্তব্য গ্রহণ করিলেন, কিন্তু পরদিনই দেখা গেল যে ৫ জন কলওয়ালা তাহা মানিয়া চলিতেছেন না। এই অবস্থায় সঙ্ঘবদ্ধভাবে ল্যাঙ্কাশায়ার বা অন্যদেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অগ্রসর হওয়া ভারতীয় বণিকদের ঘটে না। প্রত্যেকেই নিজের সুখ-সুবিধা বুঝিয়া কাজ করে। ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে দূরদৃষ্টি বা বস্ত্রশিল্পকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস উহাদের মধ্যে খুব কম দেখা যায়।

(৪) ভারতীয় বণিকদের যথেষ্ট অর্থ থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় তুলার বাজারের উপর তাহাদের কোনো আধিপত্য নাই। যদি বণিকগণ সঙ্ঘবদ্ধ-ভাবে কাজ করিতে পারিতেন তাহা হইলে বিদেশী কোনো বণিক আসিয়া ভারতীয় তুলা সহজে লইয়া যাইতে পারিত না। এই বিষয়ে বণিকদের পৃথগ্‌ভাবে একটি মিলিত প্রতিষ্ঠান গড়িবার চেষ্টা এখনই করা উচিত।

মিঃ মজুমদার বলেন যে, ভারতীয় বণিকদের কাঁচা মাল পাওয়া যে-প্রকার সহজ, তাহাতে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিলে এবং তুলার বাজার দখল করিয়া লইলে গবর্ণমেণ্টের বিনা সাহায্যেও ভারতীয় বস্ত্রশিল্প কতক-দিন টিকিয়া থাকিতে পারিবে। বর্ত্তমানে ভারতের, বিশেষভাবে বোম্বাইয়ের কলওয়ালাগণ যেভাবে নিজ-নিজ ইচ্ছামত চলিতেছেন, তাহাতে জাপান ও ইংলণ্ডের যুগপৎ প্রতিযোগিতার ফলে অচিরে ভারতের বস্ত্রশিল্প বিনষ্ট হইবে তাহারই আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে।

ইতিমধ্যেই বোম্বাইয়ের একটির পর আর-একটি কাপড়ের কল বন্ধ হইবার খবর আসিতেছে।

কার্পাস-শুল্ক।—

ভারতবর্ষে যে কার্পাস উৎপন্ন হয় এবং ব্যবহৃত হয়, তাহার জন্য সরকারকে একটা শুল্ক দিতে হয়। আমলাতন্ত্র দেশের বস্ত্রশিল্প সমূলে বিধ্বস্ত করিয়া বিলাতী কাপড়ের একচেটিয়া ব্যবসায় করিবার জন্য যে-সমস্ত জঘন্য নীতি অবলম্বন করিয়াছিল, তা'র মধ্যে এই কার্পাস শুল্ক একটি। দেশ-জাত কার্পাসের উপর শুল্ক ধার্য্য হওয়ায় কার্পাসের এবং সঙ্গে-সঙ্গে সূতা ও কাপড়ের দাম বাড়িয়া গেল। পক্ষান্তরে বিলাতী বস্ত্রের উপর কোনও আমদানি-শুল্ক না থাকায় তাহা ভারতের বাজারে সস্তা দরে বিক্রয় হইতে লাগিল। এইভাবে প্রতি-যোগিতায় দেশীয় বস্ত্র-শিল্প একেবারে লুপ্ত হইয়া গেল। গত স্বদেশী-আন্দোলনের ফলে বস্ত্রশিল্পের পুনরুদ্ধার হইয়াছিল বটে, কিন্তু এই শুল্কের গুরুভারের চাপে তাহা বিলাতী বস্ত্রের সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারে নাই। তদানীন্তন বড়লাট লর্ড, হার্ডিঞ্জের নিকট ইহার প্রতিকারের প্রার্থনা জানাইলে, তিনি সুযোগ-সুবিধামতে উহা উঠাইয়া দিতে প্রতিশ্রুত হন। কিন্তু ভারতের দুর্ভাগ্য-বশতঃ সে সুযোগের সন্ধানও পাওয়া গেল না। অথচ এদিকে বোম্বাই ও আহ্‌মদাবাদের বহু কাপড়ের কলওয়ালা এই দেশীয় শিল্পের রক্ষাকল্পে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন। তাই এবার ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে এই শুল্ক রদের আলোচনা হয়। স্বরাজ্য সদস্যগণ ছাড়া মিঃ জিন্নাহ্, পণ্ডিত মালব্য ও পুরুষোত্তম দাসের মতন বুদ্ধিমান্ অস্বরাজীগণও ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

কিন্তু স্বরাষ্ট্র-সচিব স্যার বেসিল ব্লাকেট সবাইকে তুড়ি মারিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন।

স্বাদেশিকতা—

মহাত্মা গান্ধী 'স্বদেশী' বলিতে যাহা বুঝেন তাহা সম্প্রতি ইয়ং ইণ্ডিয়াতে লিখিয়াছেন। স্বদেশীর মধ্যে সঙ্কীর্ণতার স্থান নাই। যাহা আমাকে পুষ্ট করে না তাহা স্বদেশী নহে, যাহা আমার পুষ্টিতে অন্তরায় তাহাও আমার স্বদেশী নহে। মহাত্মা বলিতেছেন:—আমার স্বদেশী সঙ্কীর্ণ নহে, কেননা আমার শ্রীবৃদ্ধিসাধনের জন্য যে-যে বস্তু আবশ্যক, তাহা আমি পৃথিবীর যে-কোনো অংশ হইতে ক্রয় করিয়া থাকি। কিন্তু যাহা আমার নিজের পরিপুষ্টির বিরোধী, প্রাকৃতিক নিয়মে যাহাদের প্রতি আমার প্রথম দৃষ্টি দেওয়া উচিত, তাহাদের ক্ষতি করিয়া আমি কাহারও নিকট হইতে কোনো বস্তু ক্রয় করিতে রাজি নই—তাহা যতই সুন্দর হউক না কেন। পৃথিবীর সর্ব্বদেশ হইতে আমি সংসাহিত্য এবং উৎকৃষ্ট গ্রন্থসমূহ ক্রয় করিয়া থাকি। আমি ইংলণ্ড হইতে অস্ত্র চিকিৎসার আবশ্যক যন্ত্রাদি ক্রয় করি, অষ্ট্রীয়ার আল্‌পিন ও পেন্‌সিল এবং সুইজারল্যাণ্ডের ঘড়ি কিনি। কিন্তু আমি ইংলণ্ড বা জাপান কিম্বা অন্য কোন দেশ হইতে এক ইঞ্চি কার্পাস-বস্ত্র ক্রয় করিব না, কেননা ইহা লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর সর্ব্বনাশ করিয়াছে এবং করিতেছে। ভারতবাসীদের হাতে কাটা সুতায়, তাহাদের দ্বারা তৈয়ারী কাপড় না কিনিয়া যত ভালোই হউক না কেন, বিদেশী বস্ত্র খরিদ করা আমি পাপ বলিয়া মনে করি। অতএব আমার 'স্বদেশী' প্রধানতঃ হাতে বোনা খদ্দর হইতে আরম্ভ হইয়া ভারতে-প্রস্তুত অন্যান্য দ্রব্যকেও গ্রহণ করিয়াছে। আমার দেশাত্মবোধও 'স্বদেশীর' মতোই উদার। সমগ্র জগতের উপকারের জন্যই আমি ভারতবর্ষের অভ্যুত্থান চাহি। অন্য কোন জাতির ধ্বংসের উপর ভারতবর্ষের অভ্যুত্থানের ভিত্তি রচিত হউক, ইহা আমি চাহি না।

ভারতবর্ষের ঋণ—

ভারতবর্ষের 'জাতীয় ঋণ' অসম্ভবরূপে বাড়িয়া যাইতেছে। সরকারী-রাজস্ব-সচিব, এক প্রস্তাব আলোচনা প্রসঙ্গে এই ঋণের বৃদ্ধির হারটা খুলিয়া বলিয়াছেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে এই ঋণের পরিমাণ ছিল ৫৫১ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা, আর ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ্চ তাহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১০২৪ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের ঐ তারিখ পর্য্যন্ত ঋণগুলি একত্র করিলে দাঁড়ায় ১২৫ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা। প্রাদেশিক কতকগুলি ঋণ হইতে সরকারের কিঞ্চিৎ অর্থাগম হইতেছে, ইহা ধরিয়া লইলেও, লাভের প্রত্যাশা নাই এমন ঋণের পরিমাণ ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ২৬ কোটি ৫৮ লক্ষ ছিল এবং ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে তাহার পরিমাণ ২৮১ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা দাঁড়াইবে। ঋণের টাকার এই অসম্ভব ও অসঙ্গত বৃদ্ধির কারণ অনুমান করা খুব কঠিন নয়। আমলাতন্ত্র নিজেদের খেয়ালমত ব্যয়-বাহুল্য এবং অনেক জাতীয়তার বিরোধী-স্কীম কাজে পরিণত করিবার জন্য এই ধারকরা টাকা ভারতবর্ষের ঘাড়ে চাপাইয়াছেন—ইহার সুদ অবশ্য দরিদ্র কর-দাতাদেরই দিতে হইবে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে শতকরা ৭৲ টাকা সুদে লণ্ডনে যে ঋণ করা হইয়াছে, তাহা ভারতে টাকা লাগাইবার জন্য বিলাতের ধনীদিগকে একটা সুযোগ দেওয়া মাত্র। যে সর্ত্তে লণ্ডনে এই ঋণ লওয়া হইয়াছে,—দক্ষিণ আমেরিকার নগণ্য কোন রাষ্ট্রও এভাবে ঋণ লইতে অপমান বোধ করিত। অন্যান্য দেশের সহিত তুলনায় আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা যেরূপ শোচনীয়, তাহাতে এইরূপ বেপরোয়া ঋণ করিবার আমলাতন্ত্রের ক্ষমতাকে সংযত করা উচিত। গয়া কংগ্রেস ১৯২২ খৃষ্টাব্দের পর ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের স্বেচ্ছাকৃত ঋণের দায়িত্ব জাতির পক্ষ হইতে অস্বীকার করিয়া দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। আমাদের রাজনীতিকগণ সেই রাষ্ট্রীয় সমিতির সিদ্ধান্তানুযায়ী গয়াকংগ্রেসের পরবর্ত্তী ঋণগুলি-সম্পর্কে নিজেদের স্বাধীন-মত ব্যক্ত করিয়া আমলাতন্ত্রের চৈতন্য সম্পাদন করুন।

বন্দীর অভিযোগ—

বেসিন জেল হইতে দুইজন রাজবন্দী ভারত-সচিবের নিকট যে আবেদন করিয়াছিলেন, আবেদন-কারীরা তাহাতে প্রকাশ্যভাবে ও অতি স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন যে, বাঙ্গালা দেশে আজকাল যে-সমস্ত রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, বিপ্লববাদ বা হত্যা প্রভৃতির কথা শোনা যায়, তাহা প্রকৃতপক্ষে Agent provocateur বা পুলিশের গুপ্তচরদের সৃষ্ট বা উদ্ভাবিত; তাহারাই তরলমতি, দেশপ্রেমিক যুবকদের সঙ্গে মিশিয়া তাহাদের দ্বারা এইসমস্ত কুকার্য্য করায় এবং ভীষণ (?) বিপ্লববাদের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। আবেদনকারীরা এইসমস্ত গুপ্তচরদের নাম করিতে ও তাহাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের প্রমাণও দিতে চাহিয়াছিলেন। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু তাঁহার এসেম্বলীর বক্তৃতায় এই আবেদনের কথার উল্লেখ করিয়া হোমমেম্বরকে এ সম্বন্ধে যথার্থ উত্তর দিতে আহ্বান করিয়াছিলেন; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, হোমমেম্বর সে-সমস্ত কথার কোনো উত্তর না দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ বলিয়া মনে করিয়াছেন।

সম্প্রতি পূর্ব্বোক্ত আবেদনকারী রাজবন্দীদ্বয়ের মধ্যে একজন ভারতীয় এসেম্বলীর সদস্যগণের উদ্দেশ্যে এক পত্র লিখিয়াছেন। পত্রখানি "ফরোয়ার্ড" প্রকাশ করিয়াছেন। উহাতে লেখক তাঁহাদের পূর্ব্ব আবেদনে উল্লিখিত কথাগুলি দৃঢ়তার সঙ্গে পুনরাবৃত্তি তো করিয়াছেনই, Agent provocateur বা পুলিশের গুপ্তচরদের বিরুদ্ধে আরও অনেক ভীষণ অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন। যদি তাঁহার পত্র-লিখিত বৃত্তান্ত শতাংশের এক অংশও সত্য হয়, তবে তাহা গবর্ণমেণ্ট ও দেশবাসী সকলের পক্ষেই কেবল কলঙ্ক নয়, ভয়ের বিষয়। কোনো সভ্যদেশে ও সভ্য সমাজে, সভ্য গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীনে এরূপ ভীষণ ব্যাপার অবাধে চলিতে পারিলে সেখানে অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছে মনে করিতে হইবে। এই পত্র-লিখিত অভিযোগগুলির সত্যাসত্য নির্ণয় হওয়া উচিত। কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব পুলিশ কমিশনার স্যর রেজিন্যাল্ড ক্লার্ক Agent Provocateur-দের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন এবং রুশিয়া, জার্ম্মানী, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে এই শ্রেণীর পুলিশের গুপ্তচরদের কার্য্যকলাপের যেসমস্ত পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে পত্রলেখক রাজবন্দীর কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার মতো নিশ্চয়ই নহে।

পত্রলেখক বলিয়াছেন,—"যাহাকে আমরা Agent Provocateur বা গুপ্তচর বলিয়া জানি, এমন একজন ব্যক্তি, অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে একটি হিংসা-মূলক বিপ্লববাদীদল গঠন করে। বাঙ্গালা দেশের কতকগুলি স্বদেশ-প্রেমিক, আদর্শবাদী যুবক তাহার প্রলোভনে পড়িয়া বিপথগামী হয় এবং ঐ গুপ্তচরটি তাহাদের দ্বারা সময় ও সুবিধা বুঝিয়া কতকগুলি হিংসামূলক অত্যাচার, হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি করায়। ইহার ফলে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কঠোর দমননীতি অবলম্বন করিবার পথ প্রস্তুত হয়।"

"গুপ্তচরের সৃষ্ট এই বিপ্লববাদীদলকে নৈতিক প্রভাবের বলে ব্যর্থ বা শক্তিহীন করিতে পারেন দেশে এমন যে যে ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহাদের সকলকেই যথাসময়ে বন্দী করা হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে ব্যক্তি শাঁখারীটোলা হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল, আলিপুর ষড়যন্ত্রের মোকদ্দমা-সম্পর্কে একটা সনাক্তের তালিকায় যাহার নাম ছিল, কানপুর বোলসেভিক ষড়যন্ত্রের মোকদ্দমায় বার্লিন হইতে লিখিত একখানি পত্রে যাহার নামের উল্লেখ দেখা যায় এবং এদেশে গোপনে অস্ত্রশস্ত্র আমদানি করার সম্পর্কেও জড়িত বলিয়া পুলিশের কাছে যাহার নাম করা হইয়াছে,—সেই ব্যক্তিকে এ পর্য্যন্ত বন্দী করা হয়

নাই। সে রেগুলেশন, অর্ডিন্যান্স প্রভৃতির কবল হইতে মুক্তি পাইয়া নির্ব্বিঘ্নে বিচরণ করিতেছে।"

পত্রলেখক এমন কথাও বলিয়াছেন যে, একটা রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের মুক্ত আসামীকে যেভাবে খুন করা হইয়াছে (বোধ হয় মির্জ্জাপুর বোমার মামলার আসামীর হত্যার কথা), তাহা নিতান্ত সন্দেহজনক এবং ঐ ব্যাপার Agent provocateurদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে; গবর্ণমেণ্টকে লজ্জা হইতে রক্ষা করিবার জন্যই তাহারা এরূপ কার্য্য করিয়াছে।

Agent provocateur-এরা এদেশে বিপ্লববাদীদল গড়িয়া ষড়যন্ত্র ইত্যাদি করিতেছে, পত্রলেখক কেবল এইপর্য্যন্ত লিখিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; তিনি বলিয়াছেন যে, ভারতের বাহিরে লোক পাঠাইয়াও এইরূপ ষড়যন্ত্রের আয়োজন করা হইতেছে। লেখক বলিতেছেন—"আমরা জানি যে, দুইজন ভূতপূর্ব্ব "অন্তরীণ" বাঙ্গালীকে (ইহারা অন্তরীণ অবস্থাতেও নানা বিষয়ে পুলিশের সহায়তা করিতেছিল) গুপ্তচর বিভাগ হইতে খরচ দিয়া ইউরোপে পাঠানো হইয়াছে। এই দুইজন লোকের কার্য্য কলাপের সুযোগ লইয়া এদেশে অনেক কাণ্ড করা হইতেছে। ইহাদের মধ্যে একজনকে কানপুর বোল্‌শেভিক মোকদ্দমায় 'ভ্যানগার্ডে'র ম্যানেজার বলা হইয়াছে। ঠিক সময়ে বিদেশ হইতে বিপ্লববাদ-মূলক পুস্তিকা ইত্যাদি সেন্সারের কড়া নজর এড়াইয়া এদেশে আসিতে লাগিল এবং উহাদের আগমন-বার্ত্তা "কম্যুনিক" বা ইস্তাহার যোগে সংবাদপত্র প্রভৃতিতে ঘোষিত হইতে লাগিল। ("দি রিভ্যলিউশনারী" প্রভৃতির জন্মরহস্যের সঙ্গে ইহার কোনো সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয়?)

পত্রলেখক বলিয়াছেন যে, তাঁহারা প্রকাশ্য বিচার চান, তাঁহাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের প্রমাণ চান, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহা করিতেছেন না। এদিকে ঐ সমস্ত গুপ্তচরেরা তাহাদের ইচ্ছামত মিথ্যা ষড়যন্ত্র ও প্রমাণাদি সৃষ্টি করিয়া নির্দ্দোষ লোককে দণ্ডভোগ করাইতেছে, পত্রলেখক, গবর্ণর লর্ড লিটনের সম্বন্ধে অত্যন্ত অপ্রিয় মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। লর্ড লিটন, বিনা-প্রমাণে পত্রলেখক ও অন্যান্য রাজবন্দীদিগকে যে, ষড়যন্ত্রকারী, হত্যাকারী, out-law ইত্যাদি বলিয়াছেন, এজন্য পত্রলেখক তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন।

পরিশেষে পত্রলেখক এসেম্বলীর সদস্যগণকে গবর্ণমেণ্টের নিকট নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রশ্ন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন:—

"ভূতপূর্ব্ব রাজবন্দী শিশিরকুমার ঘোষের কার্য্যকলাপ কিরূপ? ১৯২১ সালে সে সমস্ত বাঙ্গলাদেশ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছিল কি না এবং সেই বাবদ তাহাকে টাকা দেওয়া হইয়াছিল কিনা? সেই ভ্রমণের কি উদ্দেশ্য ছিল? শাঁখারীটোলা হত্যাকাণ্ডের কয়েকদিন পূর্ব্বে মিঃ টেগার্ট তাহাকে (শিশির ঘোষকে) ডাকাইয়াছিলেন,—ইহা কি সত্য? ইহা কি সত্য যে, সি, আই, ডি, বিভাগের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল (ডি, আই, জি) 'কোনো হত্যাকাণ্ডে' হরেন ও শৈলেনের নামে মোকদ্দমা তুলিয়া লইবার জন্য ফরিয়াদী পক্ষকে (prosecution) আদেশ দিয়াছিলেন? গবর্ণমেণ্ট তৎসম্বন্ধীয় চিঠিপত্র উপস্থিত করিবেন কি? ভূতপূর্ব্ব অন্তরীণ রাম ভট্টাচার্য্য ও সুহৃদ রায়কে ইউরোপে যাইবার জন্য টাকা দেওয়া হইয়াছিল কি না? তাহারা ইউরোপে এখন কিরূপভাবে এবং কাহার প্রদত্ত খরচায় বাস করিতেছে? তাহারা ইউরোপে কি কার্য্য করিতেছে? ক্ষিতীশ বিশ্বাস আমেরিকায় কি করিতেছে? ইহা কি সত্য যে, ঐ চারিজন ব্যক্তিই তাহাদের "অন্তরীণ" অবস্থায় পুলিশের গুপ্তচরের কার্য্য করিত?"

নতুন সংবাদ-পত্র:—

মধ্য প্রদেশের নরসিংপুরের ডেপুটি কমিশনার মিঃ বোর্ণের নাম বিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছে। সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশ কাউন্সিলে মিঃ সুকলা প্রমাণ-প্রয়োগ-সহকারে দেখাইয়া দিয়াছেন যে, মিঃ বোর্ণ নিজের ও আমলাতন্ত্রের মতামত প্রচার করিবার জন্য 'নরসিং' নামক একখানি কাগজ বাহির করিয়াছেন। এই কাগজের সম্পাদক নামে একজন দেশীয় ব্যক্তি থাকিলেও, কার্য্যতঃ মিঃ বোর্ণই সর্ব্বেসর্ব্বা; তিনিই প্রবন্ধ লেখেন, বন্দোবস্ত করেন, কাগজ চালান ইত্যাদি।

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে—

মহাত্মা গান্ধীর অভিমত

মিলন-বৈঠকের সাব্‌কমিটি হিন্দু-মুসলমান সমস্যা-সম্বন্ধে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারায় মহাত্মা গান্ধী 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রে লিখিয়াছেন এই সমস্যার সমাধানের কোনো উপায় দেখা যায় না। প্রত্যেকে অপরকে অবিশ্বাস করে, এ-অবস্থায় সমবেতভাবে কাজ করা অসম্ভব। উভয়পক্ষে মিলনের জন্য উৎসুক হইয়া যথাসম্ভব স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে। যাহা হউক হতাশ হইবার কারণ নাই। একবার বিফল হইলেও দ্বিতীয়বার সফল হওয়া যাইবে। যাঁহারা অপরকে বিশ্বাস করেন ও স্বধর্ম্মে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা অবশ্যই এই সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট থাকিবেন। কোনো সমাধানেই যেন সরকারের শক্তির সাহায্য লওয়া না হয়। বাহিরে জাতীয়ভাবে মিলন হওয়া প্রয়োজন।

স্বেচ্ছাসেবকের যোগ্যতা—

মহাত্মা গান্ধী, শ্রীযুত এন, এস, হার্ডিকার কর্ত্তৃক সম্পাদিত "দি ভলাণ্টিয়ার" পত্রিকায় "স্বেচ্ছাসেবক কে? সম্বন্ধে একটি ছোটো প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। "স্বেচ্ছাসেবকগণই ভারতের ভাবী সৈন্যবাহিনী হইবে, কাজেই তাহাদিগকে মনোনীত করার সময় বিশেষ মনোযোগ আবশ্যক। প্রত্যেক স্বেচ্ছাসেবককেই দৈহিক ব্যায়াম শিক্ষা করিতে হইবে,—তদ্বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই এবং সুশিক্ষিত সৈন্যের ন্যায় তাহাকে তাহার বিভিন্ন-প্রকার গতিবিধিতে জনসঙ্ঘের সহিত কি-প্রকার ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা শিক্ষা করিতে হইবে এবং আহত ব্যক্তিকে কি-প্রকারে প্রাথমিক সাহায্য-প্রদান করা উচিত, তাহাও তাহার পক্ষে জানা থাকা উচিত। এতদ্ভিন্ন স্বেচ্ছাসেবকগণকে নিম্নলিখিত গুণাবলীর অধিকারী হইবে হইবে:—

১। তাহারা সত্যবাদী, সচ্চরিত্র এবং অহিংস হইবে।

২। উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর আজ্ঞানুবর্ত্তিতা ও শৃঙ্খলাযুক্ত নিয়মাধীনে থাকিতে হইবে।

৩। তাহাদের স্বদেশবাসিগণের মধ্যে যাহারা সর্ব্ব-নিম্নশ্রেণীর লোক তাহাদেরও প্রতি সম্মান ও সৌহার্দ্দ প্রদর্শন করিতে হইবে।

৪। হিন্দুস্থানী ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিতে সক্ষম হইতে হইবে।

৫। প্রতিমাসে অন্যূন ২০০০ গজ সূতা কাটিতে ও তুলা ধুনিতে হইবে।

৬। অন্ততঃ তাহাদের নিজেদের খাদ্য নিজের রন্ধন করিতে সক্ষম হইবে।

৭। অস্পৃশ্যতা-দোষ হইতে মুক্ত থাকিতে হইবে।

৮। হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যে পূর্ণবিশ্বাসী হইবে।

ডাকমাশুল বৃদ্ধির ফল:—

পোষ্টাফিসের মাশুল বৃদ্ধি করার ফলে খাম, পোষ্টকার্ড বিক্রী যথেষ্ট কমিয়া গিয়াছে। মাশুল-বৃদ্ধির পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দে ৬১৩,

৯২১,৩৩৭ খানছ খামের চিঠি এবং ৬৪৮,৪৭০,৯৩২ খানা পোষ্ট্‌কার্ড্‌ ব্যবহৃত হইয়াছিল আর মাশুল বাড়িবার পর ১৯২৩-২৪ খৃঃ, ৫১৯,২৩৯,৪৪২ খানা খাম ও ৫৩১,৯০৬,২০৪ খানা পোষ্ট্‌কার্ড্‌ বিক্রয় হইয়াছে। সংবাদ আদান-প্রদানের এই অপরিহার্য্য উপায়ের উপর ট্যাক্স্‌ বৃদ্ধি করিয়া গরীব জনসাধারণকে অধিক অর্থ প্রদান করিতে বাধ্য করা অতি হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক। এই দুর্নীতিমূলক উপায়ে আয় বৃদ্ধি করিয়া আম্‌লাতন্ত্র আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারেন, এমন-কি ক্ষমতার গর্ব্বও করিতে পারেন। কিন্তু অপ্রতিবাদে এই হৃদয়হীনতা সহ্য করার ফলে কত দরিদ্র যে আত্মীয়স্বজনের কুশল অবগত হইবার ইচ্ছা ক্ষোভের সহিত অর্থাভাবে ত্যাগ করিয়াছে, তাহার খোঁজ কে লইবে?

লবণ কর :—

লবণের ট্যাক্স কমিল না; অথচ পেট্রলের ট্যাক্স্‌ কমিল। পেট্রল মোটর-গাড়ী চালাইতেই প্রধানতঃ ব্যয় হয়। মোটর ধনীদিগের এবং সাহেবদিগের। অর্থশালী ধনীরা দুইচার পয়সা গ্যালনপ্রতি বেশী অক্লেশেই দিতে পারেন। কিন্তু এই ট্যাক্স কমাইয়া বজেট ঠিক রাখিতে অর্থশাস্ত্র-পণ্ডিত ব্লাকেট সাহেবের কোনো কষ্টই হইল না। এবং এম্‌-এল্‌-এরাও বেশ নির্ব্বিবাদে ইহা পাশ' হইতে দিলেন।

কর্‌ণেল ও'ব্রায়েন :—

কর্‌নেল ও'ব্রায়েনের নাম ভারতবাসী শীঘ্র ভুলিতে পারিবে না। পাঞ্জাবে সামরিক আইনের আমলে এই ব্যক্তি, স্যর ও'ডায়ারের মন্ত্র-শিষ্যরূপে গুজরান্‌ওয়ালা এবং শেখপুরা জেলায় যে বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন, তাহা সেখানকার হতভাগ্যেরা শোণিতাক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছে। কংগ্রেস তদন্ত-কমিটির নিকট সাক্ষ্যে ও'ব্রায়েনের পৈশাচিক নিষ্ঠুরতার পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্প্রতি এই গোরাপুঙ্গবকে লাহোরের কমিশনার করা হইবে এই সংবাদে পাঞ্জাবীরা অত্যন্ত চঞ্চল হইয়াছেন। আম্‌লাতন্ত্র, এই কুপোষ্যটিকে পালিবার জন্ত কোনো ব্যবস্থা করিতে কি [illegible],—এই ব্যক্তির দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ, পঞ্জাববাসীদের নিকট [illegible] হইবে ও পুরাতন ক্ষতে আঘাতের মতো হইবে।

যক্ষ্মার প্রতিবিধান—

মাদ্রাজের মেডিপ হিল স্বাস্থ্যনিবাসের প্রধান চিকিৎসক ডাঃ মধু একটি জনসভাতে বক্তৃতায় বলেন যে ইউরোপ, আমেরিকাতে যক্ষ্মা রোগের প্রাদুর্ভাব ক্রমশঃ কমিতেছে, কিন্তু ভারতে উহা দিন-দিন ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া উঠিতেছে। কিভাবে এদেশে যক্ষ্মার বৃদ্ধি রোধ করা যায়, তদ্বিষয়ে ডাঃ মধু একটি বিস্তৃত কার্য্য প্রণালীর বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি ২৫ বৎসর ইংলণ্ডে এইভাবে কার্য্য করিয়া সম্প্রতি ভারতে উহার প্রচলনের জন্ত চেষ্টা করিতেছি। যদি গবর্ণমেণ্ট্‌ ও জনসাধারণ আমাকে এই বিষয়ে সাহায্য করেন, তাহা হইলে শীঘ্রই আমার এই কার্য্য-প্রণালী সফল করিয়া তুলিতে পারিব।

লর্ড্‌ রেডিংএর বিলাত যাত্রা—

লর্ড্‌ রেডিং বিলাতে ভারত-সচিবের সহিত এবং মন্ত্রি-সভার সহিত পরামর্শ করিবার জন্ত যাইতেছেন, ইহা সরকারী-ভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে। ভারতবর্ষের স্বরাজের দাবি বা রিফর্ম্মের রিফর্ম্ম-সম্পর্কে হুজুরদের মত কি তাহা মুডিম্যান-কমিটির রিপোর্টেই ত বেশ বুঝা যাইতেছে। অবশ্য লর্ড্‌ রেডিং ১৯২১ খ্রীঃ অব্দের শেষভাগে "puzzled and perplexed"—হইয়াও গত ৪ বৎসর বিশাল বিশৃঙ্খল রিফর্ম্মটি শব্দায়মান গরুর-গাড়ীর মতো ভারতের বুকের উপর দিয়া চালাইয়াছেন—সেজন্ত বুড়া বয়সে তাঁহার ক্লান্ত হওয়া আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু মহামান্ত বড়লাটের লণ্ডন যাতায়াতের ব্যয় গরীব ভারতবাসীর ট্যাক্স্‌ হইতে কেন ব্যয় হইবে? তবে বাজারে গুজব যে, আমাদের রাজনীতিকগণের বড় আশার 'প্রভিন্‌স্যাল আটোনমি' বা প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য দিবার নাকি বন্দোবস্ত হইবে। আর-এক দফা রিফর্ম্ম আসিলে—আর যাহাই হউক জাতীয় দলের একদল লোক তাহার পিছনে ছুটিবেন এবং স্বরাজ-আন্দোলনের গতি প্রহত হইবে। এই কৌশলজাল বিস্তারের চেষ্টা করা কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নহে।*

হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

* বিবিধ সাময়িক পত্রিকা হইতে সঙ্কলিত।

দর্পণের কথা

শ্রী কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর গৃহস্থালীর দিকে নজর থাকা স্বাভাবিক। যে বিশেষ দেবীটির বিষয় লিখিতেছি তাঁহার অধিকন্তু সকল ব্যাপারেই একটু মৌলিকত্বের চেষ্টা দেখা যাইত। আস্‌বাব, তৈজসপত্র, প্রত্যেকটি ঘরের সজ্জা ও অন্য অনেক বিষয়েই তাঁহার সজাগ দৃষ্টি ছিল, যে, যেন সবই বেশ সঙ্গত, অথচ নূতনত্বের পরিচায়ক হয়। বংশগত সুরুচির সঙ্গে সুশিক্ষা, বহুদেশ ভ্রমণ ও দর্শন, বিশিষ্ট বন্ধুদের সঙ্গলাভ—এই সকল তাঁহাতে একত্রিত হওয়ায় তাঁহার রুচি ও সৌন্দর্য্য-বোধশক্তি দুইই ক্রমে মার্জ্জিত হয়।

গৃহস্বামী ঘরোয়া ব্যাপারে নিজের মতামত বড় একটা জানাইতেন না। জানাইলেও বিশেষ ফল হইত না। তাঁহার অবস্থা ভালোই ছিল, কাজেই সুশীল, সুবোধ, শান্তিপ্রিয় বঙ্গ-সন্তানের সনাতন প্রথা-মতে ঘরের সকল বিষয়েই গৃহিণীর মত মানিয়া চলিতেন।

একদিন তাঁহার এক শিল্পী-বন্ধু বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিলেন। নানা বিষয়ে আলাপ হইবার পরে শিল্প-বিষয়ে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল। শিল্পী সেইসূত্রে গৃহসজ্জায় ভারতীয় শিল্পকলার বিষয় বলিতে আরম্ভ করিলেন। এইবিষয়ে গৃহস্বামিনীর বিশেষ উৎসাহ ও আগ্রহ দেখা
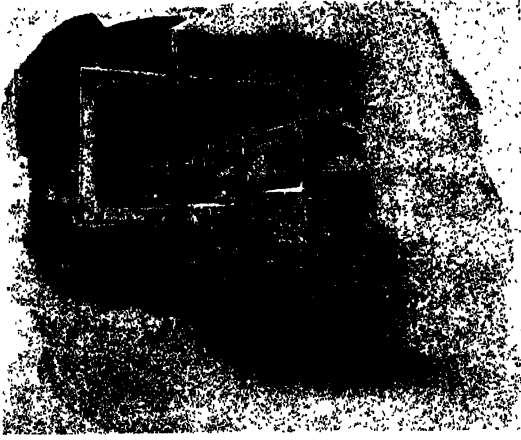
গলিত কাচপূর্ণ পাত্র চুল্লী হইতে যন্ত্র দ্বারা পালিশ করিবার টেবিলে লইয়া যাওয়া হইতেছে

গেল। তাঁহার অনুরোধে শিল্পী বন্ধুকে কয়েকটি ছবি আঁকিয়া বিষয়টি বুঝাইতে হইল এবং ফলে তিনি ঐরূপ কোন-একটি জিনিষের নক্সা দিবেন এইরূপ অঙ্গীকার করিয়া আসিলেন।

দিন-কয়েক পরে একটি আয়নার নক্সা আসিল। সেটি গৃহকর্ত্রীর পছন্দ হওয়ায় তিনি খুসী হইয়া নক্সাটি তাঁহার আস্‌বাব-ওয়ালাকে দিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই একখানি সুন্দর আয়না সেই বাড়ীর কোন বিশেষ ঘরের শোভাবর্দ্ধন করিতে লাগিল।

শুনিয়া মনে হয়, এ আর কি একটা বড় কথা? এক-খানা আয়নার দর্‌কার, সেখানার নক্সা একজন আঁকিয়া দিলেন আর আস্‌বাবের দোকানে তাহা তৈয়ারি হইল। অলমতিবিস্তরেণ!

আজকালকার দিনে চারিদিকেই বড়-বড় বাজার, দোকান, হাটে লক্ষ-রকম কার্‌বার চলে। দেশ বিদেশের জিনিষ, শত সহস্রপ্রকারের কার্‌খানার জিনিষ, প্রত্যেক শহরেই সর্‌বরাহ ও ক্রয়-বিক্রয় চলিয়াছে। যখন যাহা প্রয়োজন উপযুক্ত-পরিমাণ রজত-খণ্ড মজুত থাকিলে, তাহা পাইতে কিছুই কষ্ট করিতে হয় না। সে-জিনিষ কে কোথায় কি-প্রকারে প্রস্তুত করিল তাহা জানিবার কোনই প্রয়োজন নাই। আর সেদিন নাই, যখন সামান্য কাচের চুড়ি পরিবার সখ মিটাইবার জন্য হুমায়ুন বাদ্‌শার সাম্রাজ্ঞীকে সুদূর আরবদেশ হইতে চুড়িওয়ালা আনাইয়া নিজের প্রাসাদে রাখিতে হইয়াছিল। সেদিনও নাই যখন টাভার্নিয়ের ন্যায় বিদেশী "ফেরিওয়ালা" কয়েক-বৎসর-কালের মধ্যে এদেশ হইতে অতুল ঐশ্বর্য্য লইয়া গিয়াছিল।

একাল এইরূপ আশ্চর্য্য, যে, যে-দর্পণের কাহিনী লেখা হইতেছে, তাহার বিষয় কল্পনা করিবার পূর্ব্বেই তাহার জন্মলাভ হইয়াছিল বলিলেই চলে।

কিন্তু কোথায় এবং কি-প্রকারে?

আয়নার কাচটি, সুদূর চেখোস্লোভাকিয়া দেশের এক কাচের কার্‌খানায় ধূম, ধূলি ও উত্তাপের মধ্যে জন্মলাভ করে। ইহার জন্য বিশেষ-বিশেষ খাদ ও খনি হইতে বিশুদ্ধ বালি ও চূণ আসে। সে বালি ও চূণে লোহা ম্যাগ্নেশিয়া ইত্যাদি ধাতুর সংস্পর্শ ছিল না এবং উদ্ভিজ্জ-

গলিত-কাচ ঢালাই

বা প্রাণিজ কোনওপ্রকার ময়লা বা অভ্রচূর্ণ মাটি ইত্যাদির পরিমাণও যতদূর-সম্ভব কম ছিল।

সোডা ও সোডিয়ম্‌ সল্‌ফেট কাচের বিশেষ উপকরণ, তাহার জন্য বৃহৎ রাসায়নিক কারখানা সকলে ফরমাইস
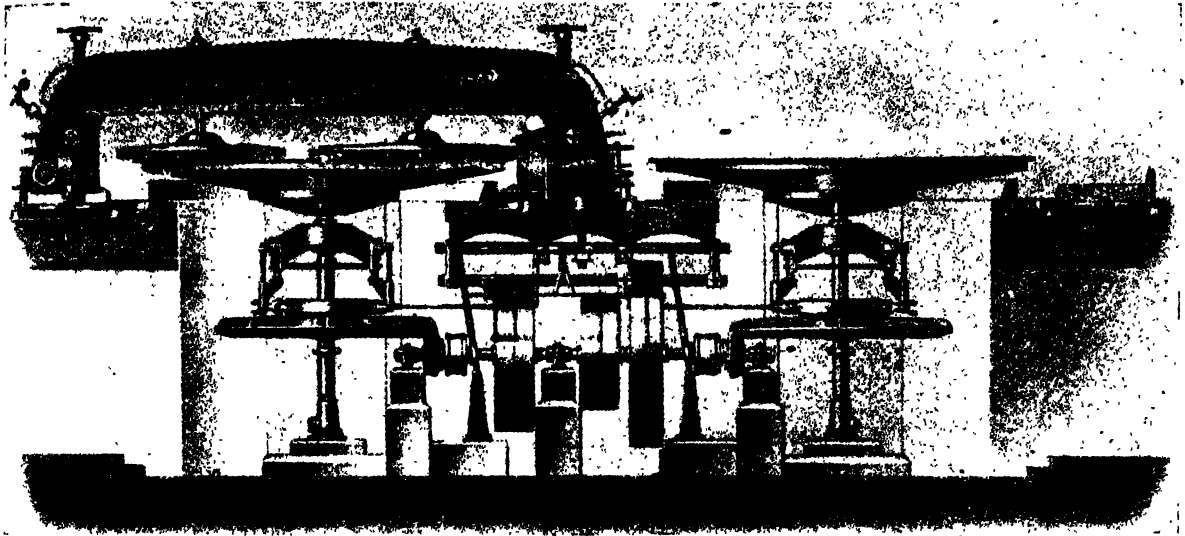
কাচের চাদর পালিশ করিবার যন্ত্র

করা হয় এবং বিশেষ বিশেষ ব্যবসায়ীদের কাছে সেলেনিয়ম ক্ষার ইত্যাদি দুষ্প্রাপ্য রাসায়নিক পদার্থের জন্ম যাইতে হয়। কাচের চুল্লীতে গ্যাসের আগুন দর্‌কার। সেই গ্যাস তৈয়ারি করার জন্ম "চাঙড়" না বাঁধে এরকম কয়লা বিশেষ খনি হইতে আসে। তাহার পর কাচের মশলা-হিসাবে খুব ভালো হাল্কা কাঠকয়লা দর্‌কার-মত কাঠকয়লাওয়ালার কাছ হইতে আনানো হয়।

এইসকল জিনিষ প্রথমে কারখানার রাসায়নিকেরা খুব ভালো করিয়া পরীক্ষা করেন, পরে সেগুলি মিশ্রণাগারে পাঠানো হয়। সেখানে খুব যত্নের সহিত ওজন করিয়া উপযুক্ত-পরিমাণে জিনিষগুলি মিশানো হয়। পরিমাণ যথা—

বালি (বিশুদ্ধ সাদা)	১০০০ ভাগ
চূণ	৪১০ "
সোডিয়ম্ সল্‌ফেট	৪০০ "
কাঠকয়লা	১০ "
সোডা	৪০ "

তাহার পর এইসকলের সঙ্গে কার্‌খানার রসায়নাগারের ব্যবস্থামত উপযুক্ত-পরিমাণ সাদা করার মশলা মিশানো হয়। সবগুলি ভালো-রকম মেশানো হইলে সে-সমস্ত মালমশলা বড়-বড় মুখখোলা টবের মতন পাত্রে ভরা হয়। এই পাত্রগুলি (glassmaker's pots) এক-প্রকার উত্তাপসহ মাটির তৈয়ারী। পাত্রগুলি আগেই গরম করা থাকে। কাচের উপকরণে পূর্ণ হইবার পরে সেগুলি কাচের চুল্লীর ভিতর বসানো হয়। সেখানের প্রচণ্ড উত্তাপে (১৫৫০° হইতে ১৬৫০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড) এইসকল নানা-প্রকার পদার্থ ধীরে-ধীরে গলিতে আরম্ভ করে। গলিয়া ইহা প্রথমে ফেনিল ফুটন্ত ভাব, পরে "দানাদার" তরল (মধুর মতন) ভাব এবং অবশেষে ২০ থেকে ২৬ ঘণ্টা পরে তরল স্বচ্ছ বিমল ভাব ধারণ করে। এই গলিত কাচের রাশি তখন পাত্রসুদ্ধ "উত্তোলক" যন্ত্রের (power crane) সাহায্যে ঢালাইয়ের টেবিলে লইয়া যাওয়া হয়। টেবিলটি লোহা ও ইস্পাতের তৈয়ারী এবং তাহার উপরভাগ বেশ সমতল। গলিত কাচ তাহার উপর ঢালিয়া পাত্রটি পুনর্ব্বার ভরিবার জন্ম মিশ্রণাগারে পাঠানো হয়।

কাচের রাশি ঠাণ্ডা হইয়া ক্রমে যখন "ঠাসা" ময়দার মতন হয়, সেই অবস্থায় একটি প্রকাণ্ড লোহার বেলন তাহার উপর কলের সাহায্যে চালানো হয়। বেলনটির দ্বারা এই কাচের স্তূপ "লুচি বেলা" করিয়া দর্‌কার-মত মোটা কাচের চাদরে পরিণত করা হয়।

ব্রহ্মদেশীয় সেগুনের সবল চারা—ছয় মাস বয়স

এই অবস্থায় কাচের চাদরটি বড়ই ক্ষণভঙ্গুর হইয়া থাকে। কারণ যে কোন ঘন ও শক্ত (solid) জিনিষ বিষম গরম অবস্থা হইতে হঠাৎ ঠাণ্ডা হইলে পরে, তাহার সকল অংশ সমানভাবে ও সমান-অনুপাতে ঠাণ্ডা না হওয়ায় কোন জায়গা বেশী, কোন জায়গা কম সঙ্কুচিত হয়। ইহাতে সেই দ্রব্যটির স্থলে-স্থলে বিষম চাপ উপস্থিত হয় এবং সেইসকল জায়গা পরে অল্প আঘাতেই বা আপনা-আপনিই ফাটিয়া যায়।

সেইজন্য বেলনের কাজ শেষ হইলেই চাদরটিকে চাপ-শোধক চুল্লীতে (annealing ovens) পাঠানো হয়। সেখানে তাহাকে প্রথমে গরম করিয়া নরম অবস্থায় আনিয়া অতি ধীরে ঠাণ্ডা করা হয়।

সেগুন-বৃক্ষ বন্ধল কাটিয়া এবং শুকাইয়া কাটিবার পর তাহার কাণ্ডের অংশ।
পুরাতন বৃক্ষ শিকড় হইতে নূতন বৃক্ষের জন্ম

ইহার পর পালিশ করা আরম্ভ হয়। পালিশের যন্ত্র একটি বড় লোহার কাঠামে অনেকগুলি লোহার চাকৃতি বসানো একটি কল। এই চাকৃতিগুলি এঞ্জীন বা মোটরের জোরে খুব দ্রুত চালানো যায়। এই যন্ত্রটি ইচ্ছা-মত ওঠানো-নাগানো যায়।

কাচের চাদর পালিশ করার সময় প্রথমে চাদরটি পালিশ করার লোহার টেবিলের উপর প্যারিস প্লাষ্টার দ্বারা সংলগ্ন করা হয়। তাহার পর পালিশ যন্ত্র ক্রমে নীচে আনা হয়। যন্ত্রের সব-কটি লোহার চাকৃতি চাদরের উপর সমানভাবে বসিলে পরে কল চালানো হয়। চাকৃতিগুলি বিষম জোরে ঘুরিয়া কাচের উপর-ভাগ ঘষা-মাজা আরম্ভ করে। ঘষার সময়ে প্রথমে মোটাদানার বালি (জলে মিশানো) পরে ক্রমে মিহি বালি কাচের উপর ক্রমাগত ছিটানো হয়। এই বালিতে কাচ
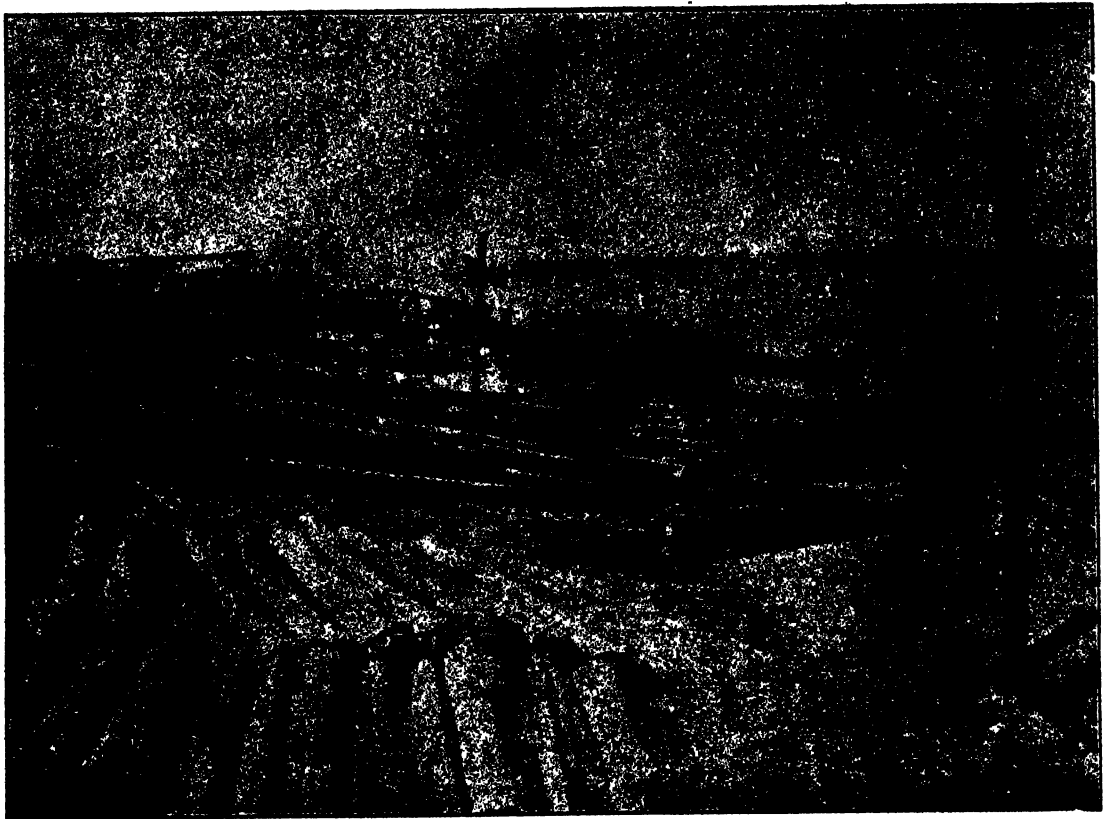
রেঙ্গুন নদী তীরস্থ করাত কলের পাশে সেগুন কাষ্ঠ রাশি

অল্পে-অল্পে কাটিয়া সমান হইয়া আসে। যখন খুব মিহি বালি দিয়া ঘষার পর কাচের উপরটা একেবারে মসৃণ হয় তখন পালিশযন্ত্রে লোহার চাকৃতির বদলে মোটা ফেল্ট্‌-কম্বলের চাকৃতি বসানো হয় এবং বালি ধুইয়া ফেলিয়া রুজ্‌ পাউডার দ্বারা বালির আঁচড়ের দাগ উঠাইয়া খুব চক্‌চকে পালিশ দেওয়া হয়।

চাদরের একপিঠ পালিশ হইবার পরে সেটি উল্টাইয়া অন্য পিঠ হইতে প্যারিস প্লাষ্টার পরিষ্কার করিয়া সেদিকও পালিশ করা হয়।

এইরকম করার পর কাচটি বিক্রী করার মতন হয়। তখন খরিদ্দারে দরকার-মত চাদরটি ছোটো-বড় করিয়া হীরকযুক্ত ছুরি দিয়া কাটিয়া ফেলা হয়।

আজকাল "বেভেল" করা আয়নার খুব চলন। সেই জন্য চাদরটি পালিশ করিবার এবং কাটিবার পর চারিপাশ বেভেল করা হয়।

বেভেল কাটা টেবিল একটা সাধারণ লোহার গোল টেবিলের মতন। কেবল তাহার উপরের অংশটা খুব জোরে ঘোরানো যায়। কাজ করার সময় একটা বড় লোহার চাকৃতি (face plate) টেবিলের উপর আঁটিয়া দেওয়া হয়। তাহার পর চাদরের এক পাশের ইস্কি-খানেক যন্ত্রের সাহায্যে টেবিলের উপরে বেশ সরলভাবে চাপিয়া ধরা হয়। টেবিলটি ঘুরিতে আরম্ভ হইলেই তাহার উপর খুব মিহি বালি কিম্বা এমেরি গুঁড়া (Emery powder) এবং জল ক্রমাগত ছিটানো হয়। এইরকমে ছুরি শান দেওয়ার মতন চাদরের পাশে শান দেওয়া হয়। চাদরের একপাশের খানিকটা অংশ এইভাবে কাটা হইলে যন্ত্রের সাহায্যে অন্য অংশ সরাইয়া আনা হয়। এইরূপে চারি পাশ কাটা হইবার পর বেভেল টেবিলের উপর লোহার চাকৃতির বদলে কাচের চাকৃতি বসানো হয় এবং এমেরি গুঁড়ার বদলে এমেরি

হস্তী দ্বারা সেগুনের "স্লীপার" কাঠ সাজানো হইতেছে। (ব্রহ্মদেশের কাঠ গোলা)

"ময়দা" (Emory flour) ব্যবহার করা হয়। কাচের চাকৃতি দিয়া ঘষার পর কাঠের চাকৃতি এবং রুজ গুঁড়া (rouge powder) দ্বারা কাটা অংশ পালিশ করিলে পরে বেভেল করা শেষ হয়।

ইহার পর কাচের চাদরটি আয়না তৈয়ারি করার উপযুক্ত হয়।

আয়না তৈয়ারি করার উপায় অসংখ্য-প্রকার। প্রত্যেক কারিগর এবং প্রত্যেক কারখানা নিজ-নিজ প্রথা ব্যবহার করেন এবং মাল, মশলা ও কাজের নিয়ম যতটা সম্ভব গুপ্ত রাখেন (trade secrets)।

কিন্তু প্রধানতঃ দুইচারটির বেশী উপায় বা প্রথা চলিত নাই। উহারই মধ্যে অল্প-কিছু প্রভেদ করিয়া প্রত্যেকে নিজের-নিজের মতন কাজ করেন। সিল্‌ভার নাইট্রেট (Silver Nitrate) নামক রৌপ্য-লবণের জলীয় দ্রব ও যে-কোন উপযুক্ত অম্লজানহারী (reducing agent) পদার্থের সাহায্যে, কাচের একপিঠে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় রৌপ্য পাতনই (Silver deposition) সর্ব্বপ্রধান প্রথা।

প্রথমে কাচটি খুব যত্নের সহিত পরিষ্কার করা দরকার। ময়লা (রৌপ্য-পাতন-ব্যাপারে যে কোন অদরকারী জিনিষকে ময়লা বলা চলে) এই কার্য্যের মহাশত্রু। আয়নার কাচটি বিশুদ্ধ জল এবং ভালো সাবান দ্বারা বেশ পরিষ্কার করিয়া মাজাঘষা দরকার। মাজাঘষা নরম কাপড় দিয়া করা উচিত, যাহাতে কাচে আঁচড় না পড়ে। পরে পরিষ্কার জলে সাবান ধুইয়া বিশুদ্ধ সোরা দ্রাবক (Nitric acid) দ্বারা ধোওয়া দরকার। পাঁচ-ছয় মিনিট পরে বিশুদ্ধ জলের স্রোতে দ্রাবক ধুইয়া ফেলিয়া "চোঁয়ান" জল (distilled water) দ্বারা ধোওয়া উচিত।

এইরকমে পরিষ্কৃত কাচটি পরে একটি পরিষ্কার পাত্রে চোঁয়ান জলে ডুবাইয়া রাখিতে হয়।

রৌপ্যপাতনের জন্ত নিম্নলিখিত উপকরণগুলি প্রস্তুত করিতে হয়।

রৌপ্যলবণ-দ্রব। প্রতি আউন্স জলে (distilled water) দশ-গ্রেন্-পরিমাণ সিল্‌ভর্ নাইট্রেট দ্রবীভূত কর। এইরূপে উপযুক্ত-পরিমাণ দ্রব প্রস্তুত হইলে তাহাতে অতি ধীরে-ধীরে (ফোঁটা-ফোঁটা ঢালিয়া) বিশুদ্ধ আমোনিয়া-দ্রব (Liquid ammonia, strong) প্রয়োগ কর। প্রত্যেক ফোঁটার সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত দ্রবরাশি ভালোভাবে নাড়িয়া মিশানো উচিত। কিছু-পরিমাণ আমোনিয়া প্রয়োগের পরে দ্রবরাশি অল্প ঘোলা হইবে, কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই সে ঘোলাভাব দূর হইয়া যাইবে। ইহার পর আর কয়েক ফোঁটা আমোনিয়া ঢালিলেই সমস্ত দ্রবরাশি স্থায়ীভাবে ঈষৎ ঘোলা ভাব ধারণ করিবে। এখন এইসমস্ত মিশ্রিত দ্রবরাশিকে ফিল্টার কাগজের সাহায্যে ছাঁকিয়া লও। এই উপকরণ বহুকালস্থায়ী।

অম্লজানহারী দ্রব (reducing solution)। ইহা সাধারণত পরিস্রুত বিশুদ্ধ জলে (distilled water) রোশেল্ লবণ Rochelle salt—sodium potassium tartarale দ্রবীভূত করিয়া প্রস্তুত করা হয়। প্রতি আউন্স জলে ২৫ গ্রেন্ বিশুদ্ধ রোশেল্ লবণের গুঁড়া দেওয়া প্রয়োজন।

এই উপকরণটি দুই-একদিন মাত্র ঠিক থাকে।

উপরোক্ত উপকরণ-দুইটি প্রস্তুত হইলে পরে আয়নার কাচটি রৌপ্যপাতনের টেবিলের উপরে দৃঢ়ভাবে আঁটা হয়। এই টেবিলের উপরিভাগ খুব পরিষ্কার, সমতল এবং ইচ্ছামত যে-কোন দিকে কাৎ করা যায়, এবং বাষ্পের সাহায্যে গরম করা যায়।

টেবিলে কাচটি আঁটিবার পর, কাচের চারিপাশে একটি মোটা মোম-কাগজ বা মোম-জামার ফিতা লাগাইয়া দেওয়া হয়। এই ফিতাটি কাচের পিঠ হইতে অল্প বাহির হইয়া থাকায় কাচের টুক্‌রাটি একটি বারকোশ বা চারিকোণযুক্ত থালায় পরিণত হয়।

এই কাচের "থালায়" প্রতি বর্গফুট মাপে ১৫০ ঘন সেন্টিমিটার (200. cc.) রৌপ্য-লবণ দ্রব, ৫০ ঘঃ, সেঃ (50. cc.) রোশেল্ দ্রব এবং ২৫০০ ঘঃ সেঃ (2500. cc.) চোঁয়ানো জল (distilled water), এই হিসাবে মিশাইয়া ঢালিয়া দেওয়া হয়। প্রায় ত্রিশ মিনিট পরে টেবিল কাৎ করিয়া উপকরণগুলি ফেলিয়া দিয়া আর-একবার (উপরোক্ত-প্রকারে প্রস্তুত) নূতন উপকরণে পূর্ণ করা হয়। আর ত্রিশ মিনিট পর ইহাও ফেলিয়া দিয়া কাচের পিঠ খুব ভালো করিয়া জলে ধোওয়া হয়। তাহার পর ইহা চোঁয়ান জলে (distilled water) পূর্ণ করিয়া কয়েক ঘণ্টা রাখা হয়। সর্ব্বশেষে জল ফেলিয়া দিবার পর মোম-কাগজের ফিতা খুলিয়া কাচটি শুখানো হয়।

পরদিন রৌপ্যপাতিত পিঠ (silvered surface) শ্যাময় চামড়া দ্বারা ঘষিয়া বেশ মসৃণ করা হয়। ঘষিবার শেষ সময়ে খুব অল্প-পরিমাণ অত্যন্ত মিহি রুজ গুঁড়া (শুষ্ক) আয়নার পিঠে ছিটানো হয়। ইহা দ্বারা পালিশ করিবার পর রৌপ্যপাতিত অংশ খুব কড়া বার্ণিশ দ্বারা বার্ণিশ করা হয়।

এখন ফ্রেমে আঁটিলেই সব কাজ শেষ।

ফ্রেম অংশের জন্মবৃত্তান্তে ও কাচ অংশের জন্মবৃত্তান্তে অনেক প্রভেদ।

কাচের জন্মলাভ হয় কারখানার ধূম ধূলি উত্তাপ ও বিষম কোলাহলের তাণ্ডবনৃত্যের মধ্যে। ফ্রেম-অংশ যে সেগুন বা সাক্ বৃক্ষের শরীর হইতে প্রস্তুত তাহার জন্ম নিবিড় নিস্তব্ধ উত্তর ব্রহ্মদেশের প্রাচীন অরণ্যে।

কি আশ্চর্য্য জীবন-কাহিনী এই সেগুন বৃক্ষের! ইংরেজিতে চলিত কথায় বলে, বিড়ালের নয়টা প্রাণ। অর্থাৎ বিড়াল নয়বার মরিবার পর তাহার আয়ু শেষ হয়। কিন্তু এই সেগুন বৃক্ষের সত্যসত্যই নবাধিক প্রাণ।

সেগুনের চারা বীজ হইতে জন্মলাভের পর বৎসরকাল মাত্র জীবিত থাকে। তাহার পর প্রতিবেশী ও প্রতিদ্বন্দ্বী বৃক্ষগুল্মের আক্রমণে ইহার জীবন শেষ হয়। কোন-কোন ক্ষেত্রে শিকড়টি বাঁচিয়া থাকে ও ক্রমেই মাটির নীচে বৃদ্ধি লাভ করে। পরের বৎসর এই শিকড় হইতে
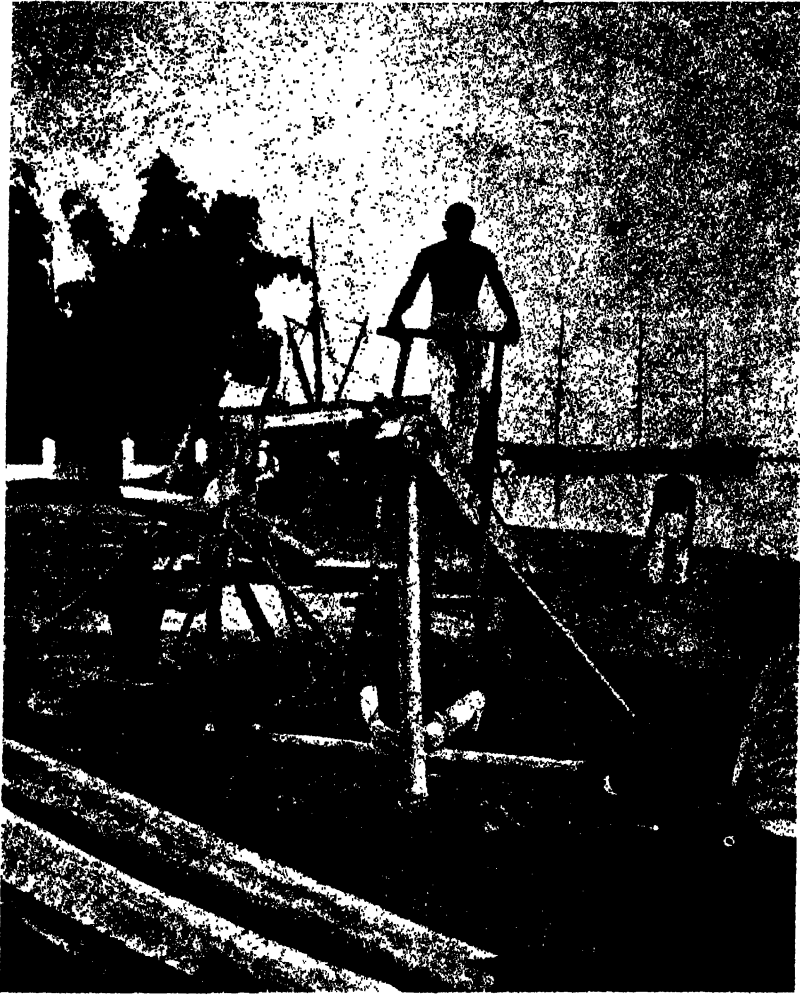
হাতে-চালানো করাতে কাঠ চেরা

আর-একটি চারা মাটি ভেদ করিয়া দিনের আলো দেখে। কিন্তু ঐ জন্মও অল্পকালের জন্য মাত্র। এইরূপে বহুবার জন্ম-মৃত্যুর পর শিকড়টি বড় হইয়া মাটির অনেক নীচে পর্য্যন্ত ভেদ করিয়া সরস স্থলে পৌঁছায়। তাহার পর যে-চারাটি জন্মায় তাহার ভরণ-পোষণ উপযুক্ত-মত হওয়ায়, জীবন-সংগ্রামে সে জয়লাভ করে। তখন সে বৎসরের পর বৎসর বৃদ্ধিলাভ করিয়া বিশাল বৃক্ষরূপ ধারণ করে।

কিন্তু তখনও তাহার জীবন নিরাপদ্ নহে। আগুন, কীট পতঙ্গের আক্রমণ, আগাছা লতা এবং সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ শত্রু বটজাতীয় পরগাছা, এইসকলই তাহার প্রাণ-নাশের চেষ্টা সর্ব্বদাই করে।

এইসকল সঙ্কট অতিক্রম করিতে পারিলে তবে ইহা ব্রহ্মদেশীয় বনস্পতি সুমহান্ বৃক্ষে পরিণত হয়। আমরা জীবিত বৃক্ষগুলিই দেখি বলিয়া যে-সকল শতসহস্র চারা ও ক্ষুদ্র বৃক্ষ প্রতিবৎসর প্রাণ হারায় তাহাদের কথা ভুলিয়া যাই।

সে যাহা হউক, ক্রেম-অংশের অথবা ফ্রেম

অংশের জন্মদাতা সেগুন বৃক্ষটির জীবন-কাহিনী বলা যাউক।

দুই শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে এই বৃক্ষের বীজটি মাটিতে পড়ে। পৃথিবীতে তখন পরিবর্ত্তনের কাল, বিনাশের কাল ও পুনর্জ্জন্মের কাল। ভারতবর্ষে তখন একদা-প্রবল-পরাক্রম বিশাল মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংসের পথে চলিয়াছে। রঙ্গালয়ের দৃশ্য পরিবর্ত্তনের ন্যায় রাজ-রাজত্বের উত্থান ও পতন ক্রমাগত সমস্ত দেশে চলিয়াছে। মারাঠাগণ তখন প্রবল, ও ইংরাজ সবে রঙ্গমঞ্চে অবতরণ করিয়াছে, যদিও ক্লাইভ তখনও দুগ্ধপোষ্য শিশু-মাত্র। ফরাসী ও পোর্ত্তুগীজ এদেশে সাম্রাজ্য লাভের চেষ্টায় চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত এবং ইয়োরোপীয় অর্থলোলুপ সৈনিকের দলে ক্রমে দেশ ছাইয়া পড়িতেছে।

ফরাসী সাম্রাজ্য সম্রাট্ "সূর্য্যপ্রভ" চতুর্দ্দশ লুইয়ের অধীনে চরম উন্নতিতে আসিয়া অবনতির দিকে মুখ ফিরাইয়াছে। রাজ্ঞী অ্যানির মৃত্যুতে সবে ইংলণ্ডে ষ্টুয়ার্ট রক্তের শেষ চিহ্নের ইংলণ্ড্-সিংহাসন হইতে লুপ্ত হওয়ায় হানোভর বংশ পদার্পণ করিতে উদ্যত।

জর্ম্মানি অপিচ অষ্ট্রোজর্ম্মান সাম্রাজ্য তখনও বর্ত্তমান। সে সিংহাসনে ষষ্ঠ চার্ল্স্ উপবিষ্ট হোহেন্ৎসোলার্ন্ (Hohenzollern) সম্রাট্-বংশ তখনও ভবিষ্যতের ক্রোড়ে রহিয়াছে, "মহান" ফ্রেডেরিক্" তখনও শৈশবাবস্থায়।

রুষদেশ তখন তিমিরাচ্ছন্ন, "মহান্" পিটার সাম্রাজ্য ব্যাপ্তি চেষ্টায় ব্যস্ত, সবে-মাত্র তাঁহার ইয়োরোপ-মুখে "বাতায়ন" প্রস্তুত হইয়াছে।

এইরূপ পৃথিবীব্যাপী বিপ্লবের সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়া এই ক্ষুদ্র সেগুন বৃক্ষ অল্পে-অল্পে জীবনের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। কয়েকবার জন্মমৃত্যুর পর ইহার জীবনযাত্রা বেশ সরল গতিতে আরম্ভ হইল।

প্রতিবৎসর এক ইঞ্চি পরিমাণ বেড় এবং কয়েক ইঞ্চি দৈর্ঘ্য বাড়িয়া অনেক বাধাবিঘ্ন বিপদ্ অতিক্রম করিবার প্রায় দুই শতাব্দীর পর ইহার পূর্ণত্ব প্রাপ্তি হইল।

অত্যুন্নতশির, বিশালকায়, মহাভুজ, প্রায় বারফুট পরিধি এবং প্রথম শাখা মাটি হইতে ৮০ ফুট উচ্চে, এই তরুরাজ সত্যসত্যই ইহার বৈজ্ঞানিক Tectona grandis ("বিরাট্ সেগুন") নামের উপযুক্ত হইয়াছিল।

কিন্তু মানুষ সর্ব্বগ্রাসী এবং তাহার প্রয়োজনেরও অন্ত নাই। সুতরাং অন্যান্য কার্য্যোপযোগী বৃক্ষের ন্যায় ইহাকেও মানুষের কাজে ব্রতী হইতে হইল।

প্রথমে ইহার মাটির কাছের অংশের বল্কল (ছাল) বৃত্তাকারে কাটিয়া (girdling) তিনচার-বৎসর-কাল রাখিয়া দেওয়া হইল। এইরূপে শুকাইবার পর (seasoned) তাহাকে কাটিয়া-ছাঁটিয়া হাতীর সাহায্যে টানিয়া নদীতে ফেলা হইল এবং নদীর স্রোতে ধীরে-ধীরে কয়েক মাস পরে রেঙ্গুন সহরে লইয়া আসা হইল।

সেখানের এক করাত-কলে (Saw-mill) ইহা হইতে একটি বৃহৎ স্কয়ার (Square), একরাশি ছাঁটকাট বা স্ক্যান্টলিং (Scantling) এবং খুব বড় এক-টুক্‌রা লগএণ্ড্ তৈয়ার হইল। রেঙ্গুন হইতে চালান্ হইয়া কলিকাতার গঙ্গার ধারে কাদায় কিছুদিন থাকিবার পর এক কাঠের গোলায় ইহা আসিল। সেখানে গুজরাটী করাতীগণ ইহাকে কাটিয়া নানা-প্রকার "সাইজ" কাঠে ও তক্তায় পরিণত করিল।

পূর্ব্বোক্ত গৃহস্বামিনীর ফরমাইস পাইবার পর আস্‌বাব-ওয়ালা এই কাঠের গোলায় আসিয়া তাহার প্রয়োজন মত "সাইজ" বাছিয়া লইয়া গেল।

সেই কাঠ হইতে ছুতারমিস্ত্রী, বাটালী-কাজমিস্ত্রি পালিশমিস্ত্রী ইত্যাদির হস্তে শিল্পী-কল্পিত দর্পণের আবির্ভাব হইল।

* * * *

একখানি দর্পণ নির্ম্মাণ! ইহা এমন-কি বিশেষ ব্যাপার?

ইহার জন্য যে কত কৌশল, কত পরিশ্রম, কত আয়াস-লব্ধ দ্রব্য, কত কলকারখানা, বৈদ্যুতিক ও বাষ্পীয় যন্ত্র, কত সহস্র নিপুণ শ্রমিক ও কত হস্তী অশ্ব এবং মহিষ, বিভিন্ন অবস্থায় প্রয়োজন হইয়াছে, তাহা কি সহজে বিশ্বাস হয়?

মহত্তর ভারত

শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

ইংরেজীতে "গ্রেটার ব্রিটেন্" বলিয়া একটা কথা চলিত আছে। পৃথিবীর যে সব দেশে ইংরেজরা উপনিবেশ স্থাপন করিয়া সেগুলিকে আপনাদের দেশ করিয়া লইয়াছে, এবং তাহার মধ্যে যে-সব দেশ এখনও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত আছে, সাধারণতঃ সেইসকল দেশের সমষ্টির নাম গ্রেটার্ ব্রিটেন্। ইংরেজী গ্রেট্ শব্দটির মানে মহৎও হয়, বৃহৎও হয়। গ্রেটার ব্রিটেনের অর্থ সুতরাং বৃহত্তর ব্রিটেন্ কিম্বা মহত্তর ব্রিটেন্ দুই-ই হইতে পারে। বৃহত্তর ব্রিটেন্ অর্থেই সম্ভবতঃ ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কারণ ইংরেজরা এ-পর্য্যন্ত যে-সব দেশে গিয়া তথায় পুরুষানুক্রমে বসবাস করিতেছে, সেইসকল দেশের লোকেরা সমষ্টিগত-ভাবে এ-পর্য্যন্ত মানুষের কোনপ্রকার ভাব চিন্তা ও কর্ম্মের ক্ষেত্রে এমন-কিছু করে নাই, যাহা ইংলণ্ডবাসী ইংরেজদের কোন কীর্ত্তি অপেক্ষা মহত্তর; ব্রিটিশ উপনিবেশগুলির কোন মানুষও কোনও কার্য্যক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে এমন-কিছু করেন নাই, যাহা সেই কার্য্যক্ষেত্রে ইংলণ্ডবাসী ইংরেজদের কীর্ত্তি অপেক্ষা মহত্তর। অথবা অন্য প্রকারে বলিতে গেলে বলা যায়, উপনিবেশগুলির দ্বারা ইংরেজ জাতির মহত্ত্ব বা গৌরব বৃদ্ধি পায় নাই; বরং তাহারা এ-পর্য্যন্ত ইংরেজদের অগৌরবেরই কারণ হইয়া আছে। ইংরেজদের উপনিবেশগুলির আয়তন ইংলণ্ড অপেক্ষা বড়। এইজন্য তাহাদিগকে বৃহত্তর ব্রিটেন্ বলা যাইতে পারে।

আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্ আগে ব্রিটিশ উপ-নিবেশ ছিল। পরে ঐ রাষ্ট্রগুলি বিদ্রোহ করিয়া স্বাধীন হয়, এবং ইউনাটেড্ ষ্টেট্স্ নামক সাধারণতন্ত্রে আপনা-দিগকে পরিণত করে। ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্‌কে দুই-একটি বিষয়ে ইংলণ্ড অপেক্ষা মহত্তর বলা যাইতে পারে। যেমন রাষ্ট্র-নীতিক্ষেত্রে ইংলণ্ডে আমেরিকার আব্রাহাম লিঙ্কনের সমকক্ষ বা তাঁহা অপেক্ষা মহত্তর কোন লোক জন্মগ্রহণ করেন নাই। কিন্তু ইউনাটেড্ ষ্টেট্স্ স্বাধীন হইয়া যাওয়ায় উহাকে আর গ্রেটার্ ব্রিটেনের অন্তর্ভূত বলা চলে না।

আধুনিক কালে ও মধ্যযুগে যেমন ইংলণ্ড, ফ্রান্স, স্পেন, প্রভৃতির সভ্যতা নানা দেশে বিস্তৃত হয়, প্রাচীনকালে তেম্‌নি ভারতবর্ষের ও গ্রীসের সভ্যতা নানা দেশে বিস্তার
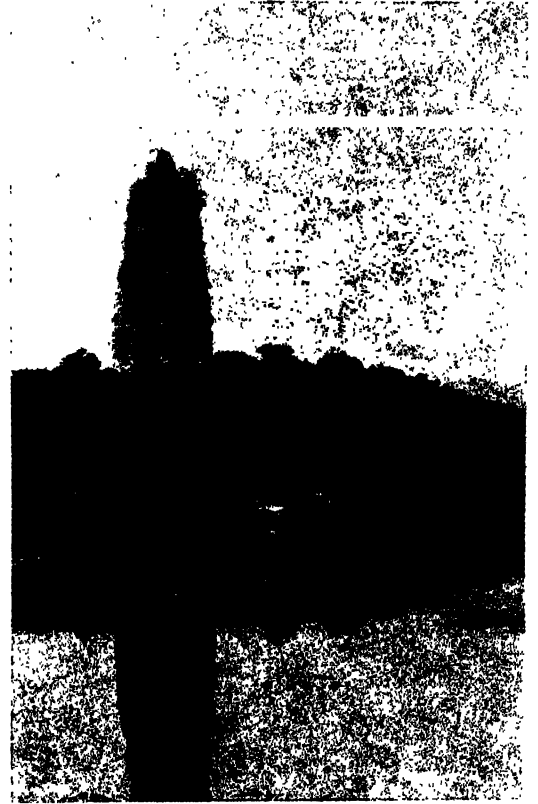
চীনের বজ্রকূট মন্দির

লাভ করিয়াছিল। আধুনিক প্রাচীন ইউরোপীয় সভ্যতার বিস্তার ও প্রাচীন ভারতবর্ষীয় সভ্যতার বিস্তারের প্রণালী ও প্রকৃতিতে প্রধানতঃ একটি প্রভেদ লক্ষিত হয়। ইউরোপীয় সভ্যতার বিস্তার প্রধানতঃ রাজ্যবৃদ্ধি ও ধনলাভের চেষ্টার পরোক্ষ ফল। এই চেষ্টা করিতে গিয়া ইউরোপীয়েরা অনেক

দেশের আদিম অধিবাসীদিগকে নির্মূল বা প্রায়-নির্মূল করিয়াছে, এবং অবশিষ্ট লোকদিগকে অধীনতা-পাশে বদ্ধ ও নিঃস্ব করিয়াছে। তাহার পর তাহারা উপনিবেশ-গুলিকে হোয়াইট ম্যান্স্ ল্যাণ্ড্ বা শ্বেত মানুষের দেশ আখ্যা দিয়াছে।

প্রাচীন কালে ভারতবর্ষের লোকেরা সবাই সাধু ছিল, কেহ কখন স্বদেশে বা বিদেশে কোন অপকর্ম্ম করে নাই, ইহা বলা আমাদের অভিপ্রেত নহে; সমষ্টিগত-ভাবে প্রাচীন ভারতবর্ষের লোকদের সম্বন্ধে মোটামুটি যাহা সত্য, তাহাই আমরা বলিতে চাই।

ইংলণ্ড, ফ্রান্স্ প্রভৃতি দেশ যেমন অন্য অনেক দেশকে নিজেদের অধীন করিয়া রাখিয়াছে, এবং এইসকল পরাধীন দেশের শাসননীতি যেমন লণ্ডনে ও প্যারিসে নির্দ্ধারিত হয় ও তদনুসারে কাজ হয়, ভারতবর্ষের কোন রাজা বা সম্রাট্ সেভাবে কোন বিদেশকে জয় করিয়া ভারতবর্ষস্থিত কোন রাজধানী হইতে উহার শাসননীতি নির্দ্ধারণ বা রাষ্ট্রীয় কার্য্য পরিচালন কখনও করিয়াছিলেন বলিয়া ইতিহাসে কোন প্রমাণ নাই।

ভারতবর্ষের মধ্যে এক-দেশের ও এক-জাতির সহিত অন্যদেশের ও অন্য জাতির যুদ্ধ এবং তাহাতে জয়পরাজয় প্রাচীন কালে অবশ্যই হইত। সে-সম্বন্ধে মানব অর্থাৎ মনু প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রে এই বিধি দৃষ্ট হয়, যে, কোন রাষ্ট্র বিজিত হইবার পর, উহার শাসনভার উহারই প্রাচীন রাজবংশীয় কোন ব্যক্তির উপর অর্পণ করিতে হইবে। এই বিধি কেবল কেতাবে আবদ্ধ ছিল না। ভারতবর্ষ-সম্বন্ধে প্রাচীনতম মুসলমান লেখক সুলেমান্ নামক এক-জন সওদাগরের উক্তি শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ জায়স্বাল তাঁহার হিন্দুপলিটি বা হিন্দুশাসননীতি নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহার তাৎপর্য্য এই, যে, ভারতীয় রাজারা প্রতিবেশী রাজাদের রাজ্য অধিকার করিবার নিমিত্ত তাহাদের সহিত যুদ্ধ করে না;...কোন রাজা কোন রাজ্যে প্রভুত্ব স্থাপন করিবার পর উহার শাসনভার উহার রাজ-পরিবারভুক্ত কোন ব্যক্তিরই উপর অর্পণ করে, জায়স্বাল তাঁহার পুস্তকে আরিয়ান কর্ত্তৃক মেগাস্থেনীসের পুস্তক হইতে গৃহীত নিম্নলিখিত মর্ম্মের কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন:—"কথিত আছে, হিন্দুরাজাদিগকে তাহাদের ন্যায়বুদ্ধি ভারতবর্ষের সীমার বাহিরের কোন দেশ জয় করিবার চেষ্টা হইতে বিরত রাখিত।"

জায়স্বাল বলেন, কেবল এইরূপ কোন কারণ দ্বারাই ইহা বুঝা যায়, যে, যদিও চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য তৎকালীন সমুদয় রাজা অপেক্ষা শক্তিশালী ছিলেন ও তাঁহার পরবর্ত্তী দুই-জন মৌর্য্যবংশীয় রাজাদের আমলেও মৌর্য্যসাম্রাজ্য সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী ছিল, এবং যদিও তাঁহাদের প্রতিবেশী সেলিউকস্ বংশীয়দের সাম্রাজ্য দুর্ব্বল ও ধ্বংসোন্মুখ ছিল, তথাপি তৎকালীন ভারতবর্ষের স্বাভাবিক সীমা হিন্দুকুশ অতিক্রম করিয়া অভিযান করিবার কোনও প্রবৃত্তি তাঁহারা প্রদর্শন করেন নাই।

ভারতবর্ষে বসিয়া বিদেশের উপর প্রভুত্ব করিবার এবং রাজকর্ম্মচারীর ও বণিক্‌দিগের সহযোগিতা দ্বারা বিদেশের অর্থ শোষণ করিয়া ভারতবর্ষে আনিবার প্রবৃত্তি প্রাচীন ভারতবর্ষীয় কোন রাজার বা জাতির লক্ষিত হয় নাই।

ভারতীয় প্রভাব ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, আনাম, কোচিন, কাম্বোডিয়া প্রভৃতির উপর বিস্তৃত হইয়াছিল। যবদ্বীপ, বলীদ্বীপ, সুমাত্রা প্রভৃতির উপরও ঐ প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। হয়ত ভারতীয় কোন-কোন রাজা বা রাজপুত্র বা অন্য-কোন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ঐসকল দেশে উপনিবেশ ও রাজত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা তাহার পর ঐ-ঐ দেশেরই লোক হইয়া গিয়া-ছিলেন, এবং ভারতীয় ও তত্তৎদেশের লোকের মিশ্রণে নূতন-নূতন জাতির উদ্ভব হইয়াছিল। তাহাদের সভ্যতাও ঠিক্ ভারতীয় সভ্যতা নহে। ভারতীয় সভ্যতার প্রবল প্রভাব তাহাতে লক্ষিত হয়; কিন্তু তাহা ভারতীয় সভ্যতা হইতে ভিন্নও বটে। ঐসকল দেশের প্রাচীন স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের যে-সব নিদর্শন এখনও দণ্ডায়মান আছে, তাহাতে ভারতীয় শিল্পের প্রভাব বিদ্যমান থাকিলেও, তাহার স্বতন্ত্র গৌরব আছে। সেই-সেই দেশের জাতীয় প্রতিভা ঐ গৌরবের কারণ। এই জাতীয়তার মধ্যে ভারতীয় উপাদানের প্রাধান্য এত বেশী, যে, যবদ্বীপের অধিবাসীরা মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া থাকিলেও বর্ত্তমান সময়েও ভারতীয়ত্বের ছাপ তাহাদের উপর

রহিয়াছে। পূর্ব্বে-পূর্ব্বে অনেক পর্য্যটক ও গ্রন্থকার ইহা লক্ষ্য করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সম্প্রতি সী এফ্ এণ্ড্রুজ্ সাহেব কারেণ্ট্ থট্ নামক মাসিকে একথা লিখিয়াছেন।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষীয় সভ্যতার প্রভাব যে-সব দেশের উপর পড়িয়াছিল, তাহার মধ্যে চীন সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। এই দেশ এখনও স্বাধীনভাবে বর্ত্তমান, ইহার সভ্যতাও এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। চীন নানা প্রকারে ও নানা দিকে ভারতবর্ষের নিকট ঋণী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন চীনে গিয়াছিলেন, তখন তাঁহার অভ্যর্থনা-উপলক্ষে তথাকার একজন প্রধান পণ্ডিত অধ্যাপক লিয়াং চি চাও যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি ভারতের নিকট চীনের ঋণের বিষয় খুলিয়া বলেন। তাঁহার বক্তৃতা গত ১৩৩১ সালের কার্ত্তিক মাসের ইংরেজী বিশ্ব-ভারতী ত্রৈমাসিকে মুদ্রিত হইয়াছে।

ভারতীয় প্রচারকেরা পুরাকালে চীনে গিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন, এবং চৈন অনেক পরিব্রাজক ভারতবর্ষে আসিয়া এখানে ধর্ম্ম এবং কোন-কোন বিদ্যা শিক্ষা করেন, ইতিহাসে তাহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

অধ্যাপক লিয়াং চি চাও বলেন :—

"During a period of 700 to 800 years, we lived like affectionate brothers, loving and respecting one another.

"And now we are told that, within recent years, we have at length come into contact with civilised (!) races. Why have they come to us? They have come coveting our land and our wealth; they have offered us as presents cannon balls dyed in fresh blood: their factories manufacture goods and machines which daily deprive our people of their crafts. But we two brothers were not like that in the days gone by. We were both devoted to the cause of the universal truth, we set out to fulfil the destiny of mankind, we felt the necessity for co-operation. We Chinese specially felt the need for leadership from our elder brothers, the people of India. Neither of us were stained in the least by any motive of self-interest—of that we had none.

"During the period when we were most close and affectionate to one another, it is a pity that this little brother had no special gift to offer to its elder brother; whilst our elder brother had given to us gifts of singular and precious worth, which we can never forget.

"Now what is it that we so received?

"1. India taught us to embrace the idea of absolute freedom—that fundamental freedom of mind, which enables it to shake off all the fetters of past tradition and habit as well as the present customs of a particular age,—that spiritual freedom which casts off the enslaving forces of material existence. In short, it was not merely that negative aspect of freedom which consists in ridding ourselves of outward oppression and slavery, but that emancipation of the individual from his own self, through which men attain great liberation, great ease and great fearlessness.

"2. India also taught us the idea of absolute love, that pure love towards all living beings which eliminates all obsessions of jealousy, anger, impatience, disgust and emulation, which expresses itself in deep pity and sympathy for the foolish, the wicked and the sinful,—that absolute love, which recognises the inseparability of all beings. 'The equality of friend and enemy', 'The oneness of myself and all things.' This great gift is contained in the Da Tsang Jen (Buddhist classics). The teachings in these seven thousand volumes can be summed up in one phrase: *To cultivate sympathy and intellect, in order to attain absolute freedom through wisdom and absolute love through pity.*

"3. But our elder brother had still something more to give. He brought us invaluable assistance in the field of literature and art..............."

তাৎপর্য্য। "আমরা সাত আট শত বৎসর পরস্পরকে ভাল বাসিয়া ও শ্রদ্ধা করিয়া স্নেহশীল ভাইয়ের মত বাস করিয়াছিলাম।

"এখন আমাদিগকে বলা হইয়াছে, যে, আধুনিক কালে আমরা এতদিন পরে তবে সভ্য (!) জাতিদের সংস্পর্শে আসিয়াছি। তা'রা আমাদের নিকট কেন আসিয়াছে? তাহারা আমাদের ভূমি ও আমাদের ধনে লোভপ্রযুক্ত আসিয়াছে; তাহারা আমাদিগকে তাজা রক্তে রঞ্জিত কামানের গোলা উপহার দিয়াছে; তাহাদের কারখানায় নির্ম্মিত পণ্যদ্রব্য ও কল প্রত্যহ আমাদের দেশের লোকদিগকে তাহাদের শিল্প হইতে বঞ্চিত করিতেছে। কিন্তু অতীত কালে আমরা দুই ভাই এরকম ছিলাম না। আমরা উভয়েই বিশ্বজনীন সত্যের প্রতিষ্ঠা ও প্রচারে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলাম; আমরা মানবজাতির লক্ষ্যস্থানে পৌঁছিবার জন্ত যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলাম; আমরা পরস্পরের সহযোগিতার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলাম। আমরা চীনেরা আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভারতীয়দের নেতৃত্ব ও পরিচালনার প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভব করিয়াছিলাম। আমাদের উভয়ের মধ্যে কেহই বিন্দুমাত্রও স্বার্থপরতার প্রেরণার দ্বারা কলঙ্কিত হই নাই—উহা আমাদের মোটেই ছিল না।

"যে সময়ে আমাদের মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠতা ও স্নেহ ছিল, তখন, দুঃখের বিষয়, এই ছোট ভাইয়ের বড় ভাইকে দিবার বিশেষ-কিছু ছিল না; বড়

তাই আমাদিগকে যে অসামান্য ও অমূল্য উপহার-সকল দিয়াছিলেন, তাহা আমরা কখনও ভুলিতে পারি না।

"আমরা কি পাইয়াছিলাম ?

"১। ভারতবর্ষ আমাদিগকে পূর্ণ স্বাধীনতার ভাব শিক্ষা দিয়াছিল—সকল স্বাধীনতার ভিত্তীভূত সেই মানসিক স্বাধীনতা যাহা আমাদিগকে পরম্পরাগত ও অভ্যাসের এবং বর্ত্তমান কোন যুগেরও রীতিনীতির শৃঙ্খলা ভাঙিয়া ফেলিতে সমর্থ করে,—সেই আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা যাহা দৈহিক ও জাতীয় জীবনের দাসকারী শক্তিকে ঝাড়িয়া ফেলিতে সমর্থ করে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, ইহা সেই (বাহ্য বন্ধনের) অভাব-আত্মক স্বাধীনতা নহে যাহার অর্থ শুধু বাহ্য অত্যাচার ও দাসত্ব হইতে অব্যাহতি অর্জ্জন, কিন্তু ইহা সেই স্বাধীনতা যাহার মানে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের "অহং" হইতে মুক্তি, যদ্দ্বারা মানুষ মহা মোক্ষ, মহা স্বাচ্ছন্দ্য ও মহা নির্ভীকতা লাভ করিতে পারে। [যাঁহারা অজ্ঞতা বা ভ্রম বশতঃ মনে করেন, স্বাধীনতার ভাব ভারতবর্ষের নিজস্ব জিনিষ নহে কিন্তু বিদেশ হইতে আমদানি, তাঁহারা চীন পণ্ডিতের এই উক্তির অর্থ উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিবেন। প্রবাসীর সম্পাদক।]

"২। ভারতবর্ষ আমাদিগকে পূর্ণ প্রেমের ভাবও শিক্ষা দিয়াছিল, সকল জীবের প্রতি সেই নির্ম্মল প্রীতি যাহার প্রভাবে সকল-রকমের ঈর্ষ্যা ক্রোধ, অধৈর্য্য, বিরক্তি ও প্রতিযোগিতার ভাব দূরে যায় যাহা নির্ব্বোধ, দুর্বৃত্ত ও পাপীর প্রতি গভীর করুণা ও সহানুভূতির আকারে প্রকাশ পায়, —সেই পূর্ণ প্রেম যাহা সর্ব্বভূতের অভেদ্যতা স্বীকার করে, স্বীকার করে 'মিত্র ও শত্রুর সাম্য' 'আমার ও সকল পদার্থের একতা।' ভারতের এই মহৎদান বৌদ্ধ শ্রেষ্ঠগ্রন্থরাজিতে নিবদ্ধ আছে। এই সাত হাজার খণ্ড গ্রন্থের উপদেশের সার-মর্ম্ম এই :—

জ্ঞান যাহা পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য এবং করুণা যাহা পূর্ণ প্রেম লাভের জন্য সহানুভূতি ও বুদ্ধির অনুশীলন।

"কিন্তু আমাদের বড় ভাইয়ের ইহা ছাড়া আরও কিছু দিবার ছিল। তিনি আমাদিগকে সাহিত্যের এবং শিল্প ও কলার ক্ষেত্রে অমূল্য সাহায্য দিয়াছিলেন।..."

সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে ভারতবর্ষ চীনকে যে-সকল বিদ্যা শিখিতে বা তাহাতে উন্নতিলাভ করিতে সাহায্য করিয়াছিল, অধ্যাপক লিয়াং চি চাওএর মতে তাহা সংগীত, স্থাপত্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্য্য ও তক্ষণ, নাটক-রচনা ও অভিনয়, কবিতা ও উপন্যাস কাহিনী-আদি রচনা, জ্যোতিষ ও মাসবর্ষাদি গণনা, চিকিৎসা, বর্ণমালা ও লিপি-উদ্ভাবন, গদ্য লিখিবার উৎকৃষ্ট রীতি, হেতুবিদ্যা, শিক্ষাদানপদ্ধতি, সামাজিক নানা প্রতিষ্ঠান-রচনা, ইত্যাদি।

স্থাপত্যের বিষয় বলিতে গিয়া অধ্যাপক মহাশয় চীনদেশে প্রাচীন কালে ভারতীয় রীতিতে নির্ম্মিত বহু মন্দিরের উল্লেখ ও তাহাদের সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার মধ্যে বজ্রকূট মন্দির একটি।* এই মন্দির কয়েক মাস পূর্ব্বে ধসিয়া গিয়াছে। বর্ণমালা-উদ্ভাবন-সম্বন্ধে চীন অধ্যাপক মহাশয় বলেন, যে, যদিও চীনপ্রবাসী ভারতীয় পণ্ডিতদের চীন-দেশকে নূতন বর্ণমালা ও লিপি দিবার চেষ্টা সফল হয় নাই, তথাপি উহা চীনদিগকে এই বিষয়ে নানা-প্রকার এক্স্পেরিমেন্ট্ বা পরীক্ষা করিবার উপাদান দিয়াছিল।

চীনের রাজধানী পেকিঙের সাম্রাজিক গ্রন্থাগারে এখনও ভারতীয় গ্রন্থের অনুবাদ ও মূল উভয় মিলাইয়া ৭০০০০ সত্তর হাজার পুঁথি আছে, শুনিয়াছি। অনেক-গুলির মূল ভারতবর্ষে লোপ পাইয়াছে।

তিব্বতের সভ্যতাও ভারতবর্ষের নিকট ঋণী। এরূপ অনেক সংস্কৃত বা পালিগ্রন্থের তিব্বতী অনুবাদ আছে যাহার মূল ভারতবর্ষে লোপ পাইয়াছে। এইরূপ একটি তিব্বতী পুঁথি হইতে পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী সংস্কৃত পাঠ উদ্ধার করিয়াছেন। কোরিয়াতেও ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব পড়িয়াছিল।

জাপানে ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব কতক কোরিয়ার মধ্য দিয়া, কতক চীনের মধ্য দিয়া, কতক সাক্ষাৎভাবে অনুভূত হইয়াছিল। জাপানে রক্ষিত ও ভারতে লুপ্ত প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথি প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাচীন জাপানী কোন-কোন মূর্ত্তির পাদদেশে এবং প্রাচীন কোন-কোন মন্দির-গাত্রে ভারতীয় ভাষায় ও লিপিতে লিখিত কথা এখনও দেখা যায়।

ফিলিপাইন্ দ্বীপপুঞ্জের প্রাচীন লিপি ভারতবর্ষ হইতে প্রাপ্ত।

মধ্য-এশিয়ার যে বহু-বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড এখন প্রধানতঃ বালুকাচ্ছন্ন মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে, তাহার নানা স্থানে বালুকা সরাইয়া অনেক প্রাচীন বিহার, মন্দির, প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে; তাহা হইতে অনেক মূর্ত্তি, পুঁথি, চিত্র পাওয়া গিয়াছে। কোন-কোন পুঁথি অধুনা-লুপ্ত কোন-কোন প্রাচীন ভাষায় লিখিত, যাহার সহিত সংস্কৃতের সম্পর্ক আছে, আবার কোন-কোন পুঁথি সংস্কৃত ভাষাতেই লিখিত। এইসকল বহুবিস্তীর্ণ বালুকাচ্ছন্ন দেশ ভারতবর্ষীয় ধর্ম্ম, সাহিত্য ও শিল্প প্রভৃতির প্রভাব বিশেষ-ভাবে অনুভব করিয়াছিল।

* বজ্রকূট মন্দিরের ছবি এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্ব, দক্ষিণ, ও মধ্য এশিয়াই যে কেবল প্রাচীন ভারতের নিকট ঋণী তাহা নহে। ইহুদীদের দেশে ও সীরিয়াতেও, এবং মিশরেও যে ভারতবর্ষীয় সভ্যতা ও ধর্ম্মের প্রভাব অনুভূত হইয়াছিল, অনেক-পণ্ডিত এইরূপ বলেন, অনেকে আবার তাহা অস্বীকারও করেন। তেম্নি গ্রীস্ ভারতের নিকট কোন বিষয়ে ঋণী, ইহা সাধারণতঃ ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অস্বীকার করিয়া, ভারতবর্ষকে প্রায় সকল বিষয়েই গ্রীস্ ও অন্য কোন-কোন দেশের নিকট ইহাঁরা ঋণী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চান। ভারতবর্ষ কাহারও নিকট ঋণী নহে, এই অসত্য কথা আমরা বলিতেছি না; কিন্তু ভারতবর্ষের নিকটে কাহারা ঋণী তাহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের অন্যতম লিখিতব্য বিষয়।

পশ্চিম এশিয়ার, ইউরোপের ও আফ্রিকার কোন্ কোন্ দেশ ভারতবর্ষের নিকট ঋণী তদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকিলেও, আরব জাতি যে প্রাচীন ভারতের নিকট কোন-কোন বিদ্যা শিখিয়াছিল, তাহা নিশ্চিত। গণিতের কোন কোন বিষয়, রসায়নী বিদ্যার কোন-কোন বিষয়, চিকিৎসার কোন-কোন বিষয়, এবং আরও কোন-কোন বিষয়ে প্রাচীন আরবেরা প্রাচীন ভারতীয়দিগের নিকট শিখিয়াছিল, আরবী নানা গ্রন্থ হইতেই তাহা জানা যায়।

ভারতীয় ধর্ম্ম, বিদ্যা, শিল্প, সভ্যতা যে-যে দেশে নীত হইয়াছিল, সেই-সেই দেশের লোকেরা নিজ-নিজ প্রতিভার দ্বারা তাহাকে কোন-কোন স্থলে নূতন রূপ দিয়াছেন, তাঁহার উন্নতি সাধনও কোথাও-কোথাও করিয়াছেন। এই-প্রকারে সেইসব দেশের লোকদের ব্যক্তিত্ব প্রকটিত ও রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু ভারতীয় বীজের গুণ এবং স্বরূপ একেবারে চাপা পড়িয়া যায় নাই।

স্থূল অর্থে ভারতবর্ষ মানে ভূগোলে বর্ণিত একটি সীমাবদ্ধ দেশ। কিন্তু সূক্ষ্ম অর্থে ইহার মধ্যে কোন-কোন জায়গা ভারতবর্ষ নহে, আবার ইহার বাহিরেও কোন-কোন জায়গা আছে, যাহাকে ভারতবর্ষ বলা যাইতে পারে। মাটির কোন জায়গাকে আমরা ততটা ভারতবর্ষ মনে করি না, ভারতীয় হৃদয় মন আত্মা যে-যে রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহাকে যতটা ভারতবর্ষ বলিতেছি।

এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা বংশতঃ ভারতীয়, বাসও করেন ভারতবর্ষনামধেয় ভূখণ্ডে, কিন্তু যাঁহাদের জীবনে, হৃদয় মন আত্মার প্রকাশে ভারতীয়ত্ব অপেক্ষা বৈদেশিকত্ব অধিক ব্যক্ত হইয়া পড়ে। তাঁহাদিগকে প্রকৃত ভারতীয় মনে করা যায় না, তাঁহাদের অধ্যুষিত ভূমি ভারতবর্ষের অংশ হইলেও তাহার বাহিরে।

আবার ভূগোলের ভারতবর্ষের বাহিরে এমন জায়গা আছে ও তাহাতে এমন লোক আছে, যাহাদের হৃদয় মন আত্মার প্রকাশ প্রকৃত ভারতীয় হৃদয় মন আত্মার রূপ দেখিতে আমাদিগকে সমর্থ করে। ইহাঁরা যদি বংশতঃ ভারতীয় নাও হন, তাহা হইলেও ইহাঁরা আমাদের আত্মীয়।

প্রাচীন কালে নানা দেশে ভারতীয় প্রভাব ব্যাপ্ত হওয়ায় আমাদের এইপ্রকার আত্মীয়দিগের দ্বারা অধ্যুষিত অনেক স্থানকে আমরা ভারতীয় হৃদয় মন আত্মার স্বদেশ বলিতে পারিতাম। প্রাচীনকালের ভারতবর্ষ এবং তাহার বাহিরের আমাদের এইসব স্বদেশ—সবগুলির সমষ্টিকে আমরা বৃহত্তর ও মহত্তর ভারতবর্ষ বলিতেছি। বৃহত্তর বলিতেছি কেন তাহা সহজেই বুঝা যায়;—ভারতবর্ষ যত বড় দেশ, তাহার বাহিরের এই দেশগুলি তাহাতে যোগ করিলে, সমুদয়ের আয়তন তাহা অপেক্ষা বৃহৎ হয়। মহত্তর ভারতবর্ষ বলিবার কারণ এই, যে, শুধু ভারতবর্ষে প্রধান ভারতীয় হৃদয় মন আত্মার যে রূপ ও প্রকাশ আমরা এখনও দেখিতে পাই, তাহা হইতে উহার মহত্ত্বের ও শ্রেষ্ঠতার যে-ধারণা আমাদের হয়, প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা দ্বারা অনুপ্রাণিত দেশসকলে ঐ সভ্যতার নিদর্শনসমূহ পর্য্যালোচনা করিলে তাহার ধারণা তাহা অপেক্ষা উচ্চতর হয়।

পূর্ব্ব-পুরুষের গৌরব বর্ণনা করিয়া অলস ও অকৃতীর যে-অহঙ্কার জন্মে, তাহার উদ্রেক করিবার জন্য এই প্রবন্ধ লিখিতেছি না। বড়াই করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমরা বরং লজ্জা ও দীনতা অনুভব করিয়া ইহাই জিজ্ঞাসা করিতে চাই, যে, প্রাচীন ভারতীয়েরা কি কারণে মহত্তর ভারত সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিলেন, এবং আমরাই বা কেন তাহা সৃষ্টি করিতে পারিতেছি না। আমাদের মহত্তর ভারত সৃষ্টি করিতে পারা দূরে থাক্, ইংরেজরা আসিয়া ভারতবর্ষকেই বরং বৃহত্তর ব্রিটেনের সামিল

করিয়া ফেলিবার চেষ্টায় আছে। যদি ভারতের মহত্তর ব্রিটেনের সামিল হইবার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলেও তাহা মন্দের ভাল মনে করিতাম।* কিন্তু তাহা হইবার নয়।

প্রাচীন কালে ভারতবর্ষ অন্য অধিকাংশ দেশ অপেক্ষা জ্ঞানে ধর্ম্মে সভ্যতায় উন্নত ছিল বলিয়া এবং ভারতীয় আদর্শ উন্নত ছিল বলিয়া, ভারতীয়েরা অন্য অনেক জাতির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ও শিক্ষকের কাজ করিতে পারিয়াছিল। এখন বিস্তর দেশ ভারতবর্ষকে পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর হইয়াছে। এখন বিদেশে ভারতবর্ষের আদর প্রধানতঃ ইহার প্রাচীন জ্ঞানগৌরব, আধ্যাত্মিকতার গৌরব ও সভ্যতার জন্য। আধুনিক কয়েকজন লোকমাত্র তাঁহাদের নিজ নিজ শ্রেষ্ঠতার জন্যও সম্বর্দ্ধিত হইয়া থাকেন। প্রাচীন ভারত জগৎকে যাহা দিয়াছিল, নূতন ভারতকেও তাহার অনুরূপ কিছু দিতে হইবে, নতুবা নূতন করিয়া মহত্তর ভারতের সৃষ্টি হইতে পারিবে না। তাহা দিবার ক্ষমতা যে এখনও ভারতের আছে, তাহা কয়েকজন আধুনিক ভারতীয় মনীষীর কৃতিত্ব দ্বারা বুঝা যায়।

পুরাকালে ভারতবর্ষের লোকেরা অনেকে শিক্ষক হইয়া বিদেশ যাত্রা করিতেন। তাহার মধ্যে কেহ-কেহ নিহতও হইতেন। তথাপি ভারতীয় লোকহিতসাধকদের বিদেশ যাত্রা সেকালে বন্ধ হয় নাই। বন্ধ হয় নাই বলিয়াই প্রাচীনকালে মহত্তর ভারতের উদ্ভব হইয়াছিল।

বর্ত্তমান সময়ে যে-সব ভারতীয় বিদেশে গিয়া থাকে, তাহাদের অধিকাংশ কুলী নামে অভিহিত হয়। স্বাধীন দৈহিক শ্রমের গৌরব আছে। কিন্তু ভারবাহী পশুর মত কিম্বা কলের অঙ্গের মত অপরের হুকুমে এবং অপরের অর্থলোলুপতা চরিতার্থ করিবার জন্য বিদেশে মালের রপ্তানি হওয়ায় গৌরব ত নাই-ই, অধিকন্তু জাতীয় অপমান ও লাঞ্ছনা আছে। বিদেশে, অধিকাংশ ভারতীয়ের নমুনা-অনুসারে, কুলীর জাতি বলিয়া পরিজ্ঞাত হওয়ার অসম্মান হইতে আমাদিগকে স্বচেষ্টায় উদ্ধারলাভ করিতে হইবে। ইহা প্রাথমিক কাজ। মহত্তর ভারত সৃষ্টি পরের কথা।

আধুনিক ভারতবর্ষ জ্ঞানে বিজ্ঞানে লোকহিত-চেষ্টায়, এমন-কি আধ্যাত্মিকতাতেও, জগতে প্রথম শ্রেণীর বলিয়া দাবি করিতে পারে না বটে; কিন্তু জগতে এখনও অনেক অনুন্নত জাতি আছে যাহারা আধুনিক ভারতীয়দিগের নিকট হইতেও শিক্ষালাভ করিতে পারে; প্রাচীন শাশ্বত ভারতীয় আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত আধুনিক কোন ভারতীয় ত নিশ্চয়ই তাহাদিগের হিতসাধন করিতে পারেন। ভারতবর্ষের নিকটেই তিব্বত। তিব্বতীদিগকে ভারতীয়েরা শিক্ষা দিতে পারেন; কিন্তু কোন ভারতীয় সে-উদ্দেশ্যে সেখানে যান না। আফ্রিকার যে-সকল দেশে ভারতের লোকেরা বাণিজ্য বা চাকরি করিতে যান, তথাকার আদিমনিবাসীরা অসভ্য। তাহাদের সেবার জন্য কোন ভারতীয় যান না। ঐসকল দেশে ইউরোপীয়দের দ্বারা অনেক অত্যাচার হয়, অনেক অন্যবিধ অন্যায় কাজও হয়; কিন্তু ইহাও বলা দরকার, যে, সংখ্যায় নিতান্ত কম হইলেও, ঐসব দেশে কৃষ্ণকায়দিগের হিতসাধক ও সেবক ইউরোপীয়ের সম্পূর্ণ অভাব দৃষ্ট হয় না। ভারতবর্ষের অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ-সকলে এবং মালয় উপদ্বীপে ভারতীয় জনসেবকের প্রয়োজন আছে। ফিজি দ্বীপে ভারতীয় জনসেবকের প্রয়োজন আছে। আরো দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। এইসকল কার্য্যে মন না দিলে মহত্তর ভারত প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

অথবা দূরে যাইবার প্রয়োজন কি? মাতৃভূমি ভারতেই প্রত্যেক প্রদেশে আদিমনিবাসী কোল ভীল সাঁওতাল প্রভৃতি রহিয়াছে, হিন্দুসমাজভুক্ত বা তাহার বহির্ভূত অনুন্নত অবজ্ঞাত লক্ষ-লক্ষ লোক রহিয়াছে; তাহাদের সেবায় প্রবৃত্ত হইলে মহত্তর ভারতের উদ্ভব নিকটতর হইবে, তাহাদের সেবা না করিলে তাহা সম্ভব হইবে না।

যে-সকল দেশের সমষ্টিকে বর্ত্তমান কালে সভ্য জগৎ বলা হয়, আমরা চেষ্টা করিয়া যোগ্যতা অর্জ্জন করিলে তাহাদিগকেও আমাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্যের অংশী করিতে পারি—যেমন পুরাকালে প্রাচীন ভারতীয়েরা ভারতের বাহিরের নানা জাতিকে করিয়াছিলেন।

বামুন-বাগ্দী

শ্রী অরবিন্দ দত্ত

(২য় খণ্ড)

প্রথম পরিচ্ছেদ

মহেশ্বরীর ক্রোড়ে কানাইলাল দিন-দিন বর্দ্ধিত হইয়া ক্রমে ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে সাহিত্য, ব্যাকরণ, ইতিহাস ইত্যাদির বহু সারবান্ গ্রন্থ ও ধর্ম্মশাস্ত্রের গীতা, উপনিষদ্ প্রভৃতি অনেকগুলি পুস্তকই সে পড়িয়া ফেলিল। মহেশ্বরীর সৎশিক্ষার প্রভাবে তাহার চরিত্র দিন-দিন নানা গুণে পল্লবিত পুষ্পিত ও ফলবান্ হইয়া উঠিতে লাগিল। কানাইলালকে সকল দিক্ দিয়া মানুষের মতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার চেষ্টার তাঁর অন্ত ছিল না। পূজার ঘরে যাওয়া, রান্না-ঘরে যাওয়া ইত্যাদি যে-সকল প্রশ্ন লইয়া কানাই মহেশ্বরীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত, সংসারের অবিরাম ঘাত-প্রতিঘাতে ও বহু গভীর বেদনার চাপে সে-সকল ক্রমে-ক্রমে তাহার হৃদয়ের তল-দেশে যাইয়া ঢাকা পড়িতেছিল। তাহার উপর সে দেখিত, তাহার একখানি বই শেষ হইলেই মহেশ্বরী আর-একখানি আনিয়া জোগাইতেছেন। সুতরাং তাহার পড়াশুনা শেষ না হইলে যে সে-সব অধিকার সে পাইবে না, এইরূপই সে বুঝিত। মহেশ্বরী অনেককাল আগে এমন কথাই তাহাকে বলিয়াছিলেন।

মহেশ্বরী অনেক দিন হইতে সেতুবন্ধ রামেশ্বর যাইবার ইচ্ছা করিতেছিলেন। শেষ বয়সে এই তীর্থদর্শনের একটা প্রবল বাসনা তাঁহার মনে ছিল। কিন্তু সুখেন্দুর সময় হইয়া উঠে না বলিয়া যাওয়া হয় না। এবার তিনি পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমার ত জমিদারির কাজকর্ম্ম কোনো দিনই মিটবে না। তোমার আশায় বুড়ো বয়সে আর কতকাল ব'সে থাকব? বরং তারিণী-মামাকে খবর দিই, তিনি আমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবেন।"

সুখেন্দু কহিলেন, "বেশ—তিনি নিয়ে যেতে পারেন ত আমার কোনো আপত্তি নেই।"

এই তারিণী চক্রবর্ত্তী দূর সম্পর্কে মহেশ্বরীর মাতুল। তিনি সংবাদ পাইবামাত্র তাড়াতাড়ি আসিয়া হাজির হইলেন। তারিণীর আকার বেঁটে, বর্ণ কাল, চক্ষু দুটি কোটর-প্রবিষ্ট, বক্ষঃস্থল সঙ্কীর্ণ কিন্তু ভুঁড়িটা অপরিমিত। বয়সে ইনি মহেশ্বরীর অপেক্ষা বোধ হয় দুই-এক বৎসরের বড় হইবেন।

তারিণী উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, গরীবকে অসময়ে স্মরণ করেছ কেন? জয় রাধে, গোবিন্দ।"

মহেশ্বরী কহিলেন, "মামা, অনেক দিনের ইচ্ছা সেতু-বন্ধ রামেশ্বর দর্শন করা। তেমন কোনো লোকও পাইনে —সুযোগও হয়ে ওঠে না। এবার মনে হ'ল, মামা থাকতে এত ভেবে মরছি কেন? তাই তোমাকে সংবাদ দেওয়া।"

তারিণী দন্ত-বিকাশ করিয়া কহিলেন, "বেশ ত! বেশ ত! আমরাও আশা করি যে, মায়ের দ্বারা আমাদের পুণ্য সঞ্চয় হবে। কবে যাচ্ছ? জয় রা—।"

মহেশ্বরী কহিলেন, "বয়স হয়েছে, হাতে ত অনেক সময় নেই, আর দেরি ক'রে কাজ কি? একটা দিন দে'খে চলো বেরিয়ে পড়া যাক্।"

মহেশ্বরী ঠিক করিয়াছিলেন কানাইলালকে ফেলিয়া যাইবেন না। সেই দেখাদেখি বলাইও নাছোড়বান্দা হইল। সেও যাইবার জন্য ধরিয়া বসিল। বালক-দুটি তখন সবে ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছিল। তারিণী ইহাদের যাওয়ার কথা শুনিয়া মনে-মনে বিরক্ত হইলেন।

এইসব বাবু-ভায়াদের ফাইফর্মাইস জোগাইতেই যে আর পাঁচজনা লোকের দর্কার। কে এত করিবে? তারিণী একসময় ঘুরে কানাইলালকে দেখাইয়া একজন কর্ম্মচারীর নিকট তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

কর্ম্মচারীটি কহিল, "ও ছেলেটি বড়-মার পালিত পুত্র।"

তারিণী দাঁত সিঁট্কাইয়া কহিলেন, "পালিত পুত্র! খুব পরিচয় দিলে যা হোক্। বলি, রত্নটি কোথায় ছিল—কেন এল—কোন্ বংশ ধরে—সে-সব খবর কিছু রাখো?"

"হাঁ, তা কিছু-কিছু রাখি বই কি! ও একটি বাগ্দীর ছেলে। মা বাপ আত্মীয়স্বজন—কেউ নেই, তাই বড়-মা এনে পালন কর্ছেন।"

তারিণী জাহুতে এক চাপড় মারিয়া কহিলেন, "এই দেখ ত বাপধন! কেমন সোজা হ'য়ে এল। তা' যাচ্ছেন তীর্থ কর্তে—ঐ অজাতটাকে সঙ্গে নিয়ে? ছুঁয়ে লেপে একাকার ক'রে দেবে যে! জয় রা—রাধে গোবিন্।"

কর্ম্মচারী জিভ কাটিয়া কহিল, "আপনি অমন বল্বেন না। বড়-মা ওকে ছেলের চেয়েও বেশী দেখেন—শুন্লে চ'টে যাবেন। রক্ষা রাখ্বেন না।"

তারিণী ঝাঁকুনি দিয়া কহিলেন, "তবেই গেছি আর-কি? আমাকে যে আড়ষ্ট ক'রে তুল্লে দেখ্তে পাচ্ছি। চ'টে যান্, ঘরের ভাত বেশী ক'রে খাবেন। আমি কি কারও প্রত্যাশী নাকি? ছোঁড়া বলে কি! জয় রাধে—গো—।"

কর্ম্মচারী ভীতভাবে কহিল, "আপনি যেরূপ বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছেন, তা'তে আপনার যে ওঁদের সঙ্গে যাওয়া হবে—বোধ হয় না।"

তারিণী চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"চোপ্রহ অপবৃদ্ধি কোথাকার! তারিণী চক্কোত্তির টাকা নেই—কেমন? তাই কাঙাল সেজে তীর্থ ভিক্ষে কর্তে তোমার মা-ঠাক্রুণের দোরে এসে পড়েছে—নয়?"

কর্ম্মচারীটি এই বদ্রাগী লোকটিকে দেখিয়া বেশ একটু আমোদ পাইল। বলিল, "তবে আর ভাবনা কি? সেতুবন্ধ যে এযাত্রা দেখা হবে, সে আর মিথ্যে বলা যাচ্ছে না।"

তারিণী হাত নাচাইয়া কহিল, "আহা! কি আপ্যায়িতই কর্লেন! গঙ্গার সঙ্গে ব্রহ্মপুত্রটা মিশ্ছে, ব'লে তা'র খ্যাতিটাও চ'লে গেছে—কেমন? তারিণী চক্কোত্তি তীর্থধর্ম্ম করে না, গরু-বাছুর ঠেঙিয়ে বেড়ায়, মহাপ্রভুর বুঝি তাই ধারণা? জয় রা—। তুমি এখানে কোন্ পদে কাজ কর্ছ হে?"

"আমি এ সর্কারের মুন্সী।"

"তাই বলো—নইলে এমন মুন্সীয়ানা বুদ্ধি পাবে কোথায়? জয় রাধে—গোবি—।"

এই সময় মহেশ্বরী তারিণীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তারিণী উপস্থিত হইলে মহেশ্বরী বলিলেন, "মামা, পাঁজি দেখ্লাম—কাল দিনটা ভালো আছে। তোমাকে কি আবার বাড়ী-ঘর হ'য়ে আস্তে হবে?"

"না মা, বাড়ী-ঘরে আর যা'ব কি কর্তে। কাপড়-চোপড় দু'একখানা সঙ্গে নেওয়া, সে তোমার এখান থেকেও হ'তে পারে। এইটুকুর জন্যে অতখানি আবার কেন যাওয়া?"

মহেশ্বরী কহিলেন, "সে হবে, সেজন্যে ভাবনা নেই। তা হ'লে কাল যাওয়াই স্থির?"

"স্থির বই কি; শুভ কার্য্যে বিলম্ব কর্তে আছে? জয় রা—শুন্লাম, একটা বাগ্দীর ছেলেকে নাকি সঙ্গে নিচ্ছ?"

মহেশ্বরীর মাতৃ-হৃদয় এই আকস্মিক নিষ্ঠুর আঘাতে পীড়িত হইয়া উঠিল। এই যে জাতির গন্ধটা কানাইলালকে জড়াইয়া দুঃসাধ্য কৌশলে নিরর্থক একটা দুঃখের আবর্ত্ত সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে, ইহাকে কি কোনো মতেই সম্বৃত করিতে পারা যায় না? এক মুহূর্ত্তও কি মানুষ ইহা ভুলিয়া যাইবে না? মহেশ্বরী কহিলেন, "হাঁ মামা, সে ও যাবে।"

তারিণী কহিল, "কেন, ও ছোঁড়াকে রেখে যাওয়া চলে না?"

মহেশ্বরী কহিলেন, "যে পাপগুলো দেহের মধ্যে ক'রে নিয়ে যাচ্ছি, তা'র চেয়ে ও আর এমন-কি জঞ্জাল?"

তারিণী বলিল, "পাপগুলো ত সেতুবন্ধে রেখে

আস্‌বার জন্যই যাওয়া হচ্ছে। কিন্তু ছোঁড়া কি শুদ্ধভাবে আমাদের কাজকর্ম্ম কর্‌তে দেবে? জয় রাধে গোবি—।"

মহেশ্বরী কহিলেন, "অশুদ্ধও কর্‌তে পার্‌বে না। মামা, গঙ্গায় ডুব দেওয়ার পূর্ব্বে রামসীতা দর্শন কর্‌বার আগে অন্তরটা দয়া-ধর্ম্মে মেজে-ঘ'ষে নিতে হয়, নইলে শুধু ডুব দিলে বা দর্শন কর্‌লে মিথ্যা আচারের নামে মুক্তি হয় না। তাই যদি পারো, ওর ছোঁয়া-নেপাতে কিছু এসে যাবে না।"

তারিণী ভ্রূকুটি করিয়া কহিল, "বলো কি? জাতিতে বাগ্দী যে!"

মহেশ্বরী একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "মামা বোধ হয় জানো না যে, শঙ্করাচার্য্যও একজন চণ্ডালের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন।" তার পর কিছুকাল তারিণীকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মামা, শ্রীক্ষেত্রে কখনো গিয়েছ?"

তারিণী মুখে একটা বিকট ভঙ্গী আনিয়া কহিল, "তা যাবো কেন? তারিণী খেতে পায় না, ঘরের বা'র হবে কি ক'রে?"

মহেশ্বরী কহিলেন, "চটো কেন মামা! আমি কি তাই বল্‌ছি? গিয়েছ কি না, তাই জিজ্ঞেস কচ্ছি।"

তারিণী দাঁত মেলিয়া কহিল, "ক ত বা র। মা থাক্‌তে প্রথমে পেটে পূ'রে নিয়ে গিয়েছিলেন, সেই আরম্ভ আর ডুঁয়ে প'ড়ে পা দু'খানা ত তীর্থ ছাড়া থাক্‌তে চায় না।"

মহেশ্বরী কহিলেন, "সেখানে হাড়ি-মুচি শতেক জাত্‌ একত্র হ'য়ে বাবার প্রসাদ নেয়, বোধ হয় দেখেছ?"

"কি জানি মা, ও বিট্‌কেলী ভাবটা আমি বুঝ্‌তে পারিনে। যেমন বিট্‌কেল ঠাকুর, তেম্‌নি বিট্‌কেল চেহারা, রীতিনীতিও সেইরূপ বিট্‌কেলী।"

মহেশ্বরী ব্যথিতা হইয়া কহিলেন, "মামা, বুড়ো, হয়েছ, ওসকল কথা মুখে এন না। সেখানে যখন ভায়ে-ভায়ে গা ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে প্রসাদ গ্রহণ করে, তখন ভেদ জ্ঞান থাকে না। আমরা একই পিতার ভিন্নভিন্ন সন্তান, একথা উপলব্ধি কর্‌বার অমন বিরাট ক্ষেত্র আর কোথাও নেই।"

তারিণী কহিল, "ঠিক বলেছ মা, সে-সময় মনের গতিটাই কেমন উল্‌টে-পাল্‌টে যায়।"

মহেশ্বরী কহিলেন, "ওটিই একমাত্র দেবভাব। ঐ ভাব স্থায়ী ক'রে রাখ্‌তে পারে না ব'লেই ত মনের মধ্যে আবার ছোটোবড় উচ্চ-নীচ, কত কি ভ্রান্ত জ্ঞান আসে যায়। তুমি আমি যাকে ঠেলে ফে'লে রেখে যেতে চাচ্ছি, মামা, যেখানে যাবো সেখানে সেই তিনি কি তা'কে ঠেলে রাখ্‌তে পারেন?"

মহেশ্বরীর কথা বুঝিয়া দেখিবার জন্য তারিণী ততটা মনোযোগী হইল না। সে কহিল, "তা নেও—তা নেও—তোমার যেমন ইচ্ছা। একটা চাকর-বাকরেরও ত দর্‌কার। ছোঁড়া থাক্‌লে পথে-ঘাটে কাজে লাগ্‌বে। হ'লই বা অজাত।"

তারিণী চলিয়া গেল। মহেশ্বরীর অন্তরে কেমন মেঘের সঞ্চার হইয়া রহিল। যাত্রার সূচনাতেই তাঁহার বুকের ধনকে নিষ্ঠুর সমাজ এমন আঘাত করিতেছে, পথে ও পথশেষে না জানি তাহার অদৃষ্টে আরো কত দুঃখ-ভোগ আছে!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সুখেন্দুর নিবাস খুলনা জেলার কোন এক পল্লীগ্রামে। মহেশ্বরীদের ষ্টীমারে চাপিয়া খুলনায় যাইয়া রেল ধরিতে হইবে। শৈল সকাল-সকাল স্নান করিয়া রান্না করিতে গেল, সকলকে খাইতে দিতে হইবে, ছেলেদের সঙ্গে কিছু জলখাবার দিতে হইবে। মহেশ্বরী ছেলেদের পোষাক-পরিচ্ছদ বাছিয়া লইয়া বাক্স সাজাইতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে তারিণী কানাইলালকে একা সম্মুখে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এস বাবাজী, তুমি ত আমার সঙ্গী হ'তে চলেছ, আগে থাক্‌তে পরিচয়টা ক'রে নেওয়া যাক্‌। জয় রা—তোমার নাম কি?"

"কানাইলাল মজুমদার।"

তারিণী কপাল কুঁচ্‌কাইয়া কহিল, "মজুমদার নাকি? ঠিক ত?—ভট্‌চায্যি নয় ত?"

কানাই মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইল।

তারিণী কহিল, "তুমি ঘরের ছেলে ঘরে থাক্‌লেই পার্‌তে। নদীতে হাঙর-কুমীর—রেল-ষ্টীমারে চোর-ডাকাত, পথে-ঘাটে বিপদের ছড়াছড়ি, শেষটা মাকে কাঁদিয়ে না বসো।"

কানাই আর সেখানে দাঁড়াইল না। বাড়ীর মধ্যে মহেশ্বরীর নিকটে চলিয়া গেল। মহেশ্বরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলাই গেল কোথায়? দ্যাখ, তোদের আর কি নিতে হবে না হবে।"

কানাই বলিল, "অত কি নিচ্ছ?"

মহেশ্বরী কহিলেন, "পথে-ঘাটে বেশী-বেশী নিতে হয়। সব জায়গায় কাচিয়ে নেওয়ার সুবিধা কপালে জোটে না।"

কানাইলাল বসিয়া-বসিয়া দেখিতে লাগিল। এক-সময় সে জিজ্ঞাসা করিল, "বড় মা, তীর্থ কর্‌তে কি মেলাই লোক জমা হয়?"

মহেশ্বরী বলিলেন, "হয় বই কি!"

তারিণী ইতিপূর্ব্বে তাহার প্রাণে আতঙ্কের সঞ্চার করিয়া দিয়াছিল, হয়ত তাহারই ফলে তাহার মুখ দিয়া প্রশ্ন বাহির হইল যে—"যদি আমি অত লোকের মধ্যে হারিয়ে যাই?"

মহেশ্বরী কহিলেন, "বালাই! হারাবি কেন? তুই এক-একটা আজগুবী কথা পাস্ কোথায়?"

সে আর কিছু বলিল না। মনের কথা মনে চাপিয়া রাখিল।

অনন্তর যথা-সময়ে তাঁহারা যাত্রা করিয়া বাহির হইলেন। কোলের ছেলে যতই বড় হউক কোলের ছেলে; তাহাকে ছাড়িতে কষ্ট কাহার না হয়? শৈল অতি কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিল। সে কহিল, "মা, কাকা ক'রে দিয়ে যাচ্ছ, দেখো যেন দেরি কোরো না।"

মহেশ্বরী তাহার মাথায় হাত রাখিয়া বলিলেন, "ভয় কি মা, আমরা সত্বরই চ'লে আস্‌ব।"

সুখেন্দু নিজে থাকিয়া মহেশ্বরীদের ষ্টীমারে তুলিয়া দিলেন। মহেশ্বরী ক্যাবিনে রহিলেন। তারিণীচরণ পাটাতনের উপর শয্যা বিছাইয়া লইয়া তাঁহার বিপুলকায় ভুঁড়িটা তাহার উপর গড়াইয়া দিলেন। এতটুকু পথশ্রমেই তিনি কাতর হইয়াছিলেন। বলাই ও কানাই আসিয়া রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইল। বালকদের দেহে-মনে সহজে শ্রান্তি আসে না। তাহারা দেখিতে লাগিল, সম্মুখভাগের বহুবিস্তৃত নদীটি তপোবনবাসিনী ঋষিকন্যার মতো নীরবে আপনার মনে স্বভাবের একাগ্র-প্রেরণায় কোন্ সুদূর লক্ষ্য-পথে ছুটিয়া চলিয়াছে। কত-কত জলযান তাহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া মথিত করিয়া চলিতেছে; সেদিকে তাহার ভ্রূক্ষেপও নাই। তীরে কৃষিক্ষেত্র। ধান্যের শীষগুলির মাথায় দোলা দিয়া খোলা হাওয়া যেন মাঠের বুকে আর-একটি নীল সমুদ্রের ঢেউ তুলিয়াছে। তা'র পশ্চাতে আম জাম কাঁঠাল নারিকেল প্রভৃতি নানা-জাতীয় বৃক্ষ। স্থানে-স্থানে কৃষকগণের আনন্দ-গীতি, বালক-বালিকাগণের সকৌতুক দৃষ্টি—পক্ষীদিগের পক্ষ চালনা। উল্লসিত হইয়া এইসকল দেখিতে-দেখিতে যখন তাহারা ক্লান্ত হইয়া পড়িল, চোখ যেন ঘুমে জুড়িয়া আসিতে লাগিল, তখন তাহারা শয্যার উপর আসিয়া উপবেশন করিল।

যথাকালে ষ্টীমার-খানি খুলনার ঘাটে আসিয়া পৌঁছিল। কানাই ও বলাই তারিণীচরণকে ডাকিয়া কহিল, "আজ্ঞা মশাই, উঠুন, খুল্‌নায় এসেছি।"

তারিণী অঙ্গমোড়া দিয়া উঠিয়া বসিল। চক্ষু রগ্‌ড়াইতে-রগ্‌ড়াইতে বলিল, "খুলনায় এল? তা তোরা হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে আছিস্ যে? যত ছেলে-ছোক্‌রা নিয়ে কাজ কর্‌বার। একটা কুলী ডাক্ না? না—তাও এই ভুঁড়িটা নিয়ে সংগ্রহ কর্‌তে হবে?"

কুলী ডাকিতে হইল না। "কুলী চাই—কুলী চাই", মুখে এই কোলাহল লইয়া জলস্রোতের ন্যায় একটা দল আসিয়া তারিণীচরণকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তারিণী বিকটস্বরে কহিল, "চাই বই কি? মোটগুলো কি তারিণীচরণ ঘাড়ে ক'রে নেবেন? তোরা হাঁ ক'রে যে বড় দাঁড়িয়ে আছিস্? মহেশ্বরীকে নিয়ে আয়।"

কানাই ও বলাই যাইয়া মহেশ্বরীকে লইয়া আসিল।

তারিণী বলিল, "কত নিবি বল্—গাড়ীতে তু'লে দিবি।"

কুলীরা মোটগুলো পরীক্ষা করিয়া কহিল, "একটা টাকা বকশিষ দিতে হবে বাবু!"

তারিণী ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, "একটা—টা—কা? চৌষট্টি পয়সা? তারিণীচরণকে গণ্ডমূর্খ পেলি নাকি? এ বাবা তর্কসিদ্ধান্তের ছেলে, ছোঁ দিয়ে চুনো পুঁটিটে নেবে, তারিণী তেমন জলের মাছ নয়।"

কানাই কহিল, "আজ্ঞা মশাই, আপনার রাধা-গোবিন্দ নাম ভু'লে গেলেন যে?"

তারিণী জলন্ত চক্ষু-দুটি তাহার দিকে ফিরাইয়া কহিল, "আস্পর্দ্ধার আর কম্‌তি নেই। বামুনের স্কন্ধে ভর ক'রে বড় বাড় বেড়ে উঠেছিস যে?"

মহেশ্বরী কানাইলালকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইলেন। তারিণীচরণের এই অভদ্র বাক্য সহিষ্ণুতার সহিত শ্রবণ করিয়া তিনি অতিকষ্টে আপনাকে দমন করিয়া রাখিলেন।

তারিণী কহিল, "দু'গণ্ডা পয়সা—বুঝ্‌লি রে! আট্‌টা পয়সা পাবি, নে, তু'লে নে।"

তারিণীচরণের উদারতার পরিচয় পাইয়া কুলীরা একে একে সকলেই প্রস্থান করিল।

তারিণী গজ্‌গজ্‌ করিতে-করিতে কহিল, "ভাগ্যে বিধি মাপাননি, তুমি-আমি চেষ্টা করলে কি পেতে পারে মা! যাক্‌গে বেটারা, নে ত বাবা কানাই! এই বাক্সটা মাথায় তু'লে! তুমি ভেবো না মা! আমি ওকে দিয়ে একে একে সবই রেখে আস্‌ছি।"

তারিণীর এই স্নেহ-বাক্যের মূলে স্বার্থসাধনের এমন জঘন্য লোলুপতা দেখিয়া মহেশ্বরী বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, "এই মোট্‌ঘাট—ও কচি ছেলে নিতে পারে? ডাক না কুলীদের? যা চায় নেবে।"

তারিণী গদ্‌গদ্‌কণ্ঠে কহিল, "একবারে না পারে পাঁচ-বারে পার্‌বে না? বলো কি, মা! যে রক্তটায় ওর ঘাড় শক্ত ক'রে পাঠিয়েছে, তোমার দুধ ঘিয়ে কি তা, কোমল হ'তে পারে? কি বলিস্‌ কানাই—পার্‌বিনে?"

তারিণীচরণের নিষ্ঠুর আঘাতে মহেশ্বরীর অশ্রু-উৎস চক্ষু পর্য্যন্ত আসিল, কিন্তু কে যেন পাথর চাপা দিয়া রাখিল। তিনি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কানাইলাল দুই হস্তে বাক্সটির ওজন পরীক্ষা করিয়া কহিল, "কেন মা! তুমি অমন করছ? এত বেশী ভারি নয়, বেশ নিয়ে যেতে পারা যাবে। আজ্ঞা মশাই ত ঠিক বলেছেন; বেটারা যা হেঁকে বস্‌বে তাই দিতে হবে?"

তারিণী কানাইলালের পৃষ্ঠে সশব্দে এক চপেটাঘাত করিয়া কহিল, "এবেই বলে ত বাপের বেটা। নীচকুলে জন্মালে কি হয়—সুজন্মা হ'তে ত বাধা নেই। জয় রা—রাধে।"

মহেশ্বরী কহিলেন, "আমি পয়সা বাঁচানোর জন্যে কচি-ছেলে নিয়ে তীর্থ কর্‌তে আসিনি। আর ওরাও ত মজুরি খেটে খায়—দু'পয়সা পাবে ব'লেই আশা করে।"

তারিণী কহিল, "দু'পয়সা কি মা! ষোলো আনা—একটা ধলো চাকি চায় যে!"

মহেশ্বরী আঁচলের খুঁট হইতে একটা টাকা বলাইয়ের হাতে দিয়া কহিলেন, "ডেকে আন্‌ ত, দাদা! সব লোক-জন চ'লে গেল, শেষে কুলী মিল্‌বে না।"

তারিণী বলাইয়ের হাত হইতে ছোঁ মারিয়া টাকাটা তুলিয়া লইল। এবং কুলীদের নিকট যাইয়া আট আনা সাব্যস্ত করিয়া বক্রী আট আনা নিজের পকেটজাত করিল।

তাঁহারা সকলেই দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি কাম্‌রায় উঠিলেন। গাড়ী ফুলতলা ষ্টেশন অতিক্রম করিলে তারিণী কহিল, "মা! খাবারের হাঁড়িটা কি সরা-চাপা দেওয়াই থাক্‌বে?"

মহেশ্বরী বলিলেন, "বকাবকিতে সে-কথা ভু'লেই গেছি। দাও না মামা! ছেলেদের কিছু দাও, নিজেও কিছু খাও।"

তারিণী রসগোল্লার হাঁড়িটি কাছে টানিয়া আনিয়া তিনখানি থালা বাহির করিল। একটি রসগোল্লা তুলিয়া ধরিতে আয়তনের প্রাচুর্য্য দেখিয়া তাহার চক্ষু-দুটি উল্লাসে জল্‌জল্‌ করিয়া উঠিল। রসনায় যে-লালারস প্রচুর-পরিমাণে আসিয়া জমিতে লাগিল, আপনার লোভহীনতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য সে তাহার কতক-কতক কণ্ঠনালী-পথে বিদায় করিতে লাগিল।

তারিণী বলাইয়ের থালায় আট্‌টি, কানাইয়ের থালায় চারিটি এবং নিজে গণ্ডা সাতেক লইল। মহেশ্বরী অদূরে বসিয়া এই সূক্ষ্ম বণ্টন ক্রিয়া দেখিতেছিলেন। তারিণীর যে উদর তাহাতে সে গণ্ডা-সাতেক ত লইবেই। কিন্তু

কানাই ও বলাইএর মধ্যে ইতর-বিশেষ হইল দেখিয়া তাঁহার নেত্র-দুটি আর্দ্র হইয়া উঠিল। তারিণী কার্য্যতঃ যাহা করিল, তাহা মুখে প্রকাশ করিয়া বলিতেও মহেশ্বরীর লজ্জা হইতে লাগিল। তাঁহার ব্যথিত চক্ষু-দুটি ওই পাষাণ-ভিত্তিকে অবলম্বন করিয়া কেবল ইহাই ভিক্ষা করিতে লাগিল যে, "তুমি আমার কানাই ও বলাইয়ের মধ্যে অমন ইতর-বিশেষ জানিতে দিও না।"

বলাইও কেমন কুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিল। সে কহিল, "হাঁড়িতে এত রসগোল্লা রয়েছে,—আজ্ঞা মশাই, কানাই-দাকে আর কিছু দাও না?"

মহেশ্বরী কহিলেন, "সারারাত থাকবে ত? ওরা যে যা খেতে পারে দাও, মামা! ঝিঁকড়গাছায় না হয় বনগাঁয় আবার কিন্‌লেই হবে।"

তারিণী কহিল, "ওর ধাতে সইবে কি না, তাই দিইনি। চিঁড়ে-চাপাটি হ'লে বেশী বেশী খেতে পারত—দিতুমও।"

অম্লান কুসুমের উপর তারিণীর এই নিয়ত নিষ্ঠুর পদ-ক্ষেপে মহেশ্বরী শঙ্কিতা হইয়া উঠিতেছিলেন। কানাই-লালের দৈন্য ফুটাইয়া দেখাইবার জন্য এমন সংশ্রব লইয়া তাঁহাকে তীর্থভ্রমণে বাহির হইতে হইবে জানিতে পারিলে তিনি আসিতেন না। হায়! হায়! যিনি মায়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি নিষ্ঠুরতাকে দুষ্প্রাপ্য করেন নাই কেন? দীনের নয়নাশ্রু মুছাইতে মানুষের প্রাণের শুভজাগরণ কেন এমন নিদ্রিত হইয়া থাকে?

কানাইলালের ভাগ্যে সেই চারিটা রসগোল্লাই বরাদ্দ স্থির রাখিয়া তারিণীচরণ যখন আপনার ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবার জন্য মনোনিবেশ করিল, তখন মহেশ্বরী স্বয়ং উঠিয়া যাইয়া হাঁড়ি হইতে রসগোল্লা বাহির করিয়া কানাই ও বলাইকে আরও কিছু-কিছু দিলেন।

তারিণী কটমট দৃষ্টিতে কানাইলালকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। মহেশ্বরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "মামা! আর চাই?"

তারিণী কহিল, "তা দাও। বনগাঁয়ে যখন কেনা হবে, তখন ভাবনা কি? হাঁড়িতে গোটা-চারেক রাখ্‌লেই হবে। পথে-ঘাটে ছেলে-পিলে নিয়ে চলা—ভাঁড়ারটা সঞ্চিত রাখাই যুক্তি।"

মহেশ্বরী আরও গণ্ডা-সাতেক তারিণীচরণের থালায় দিলেন। খাওয়া শেষ হইলে তারিণীচরণ নিদ্রার আয়োজন করিল। মহেশ্বরী ছেলেদেরও শুইতে বলিলেন। তাহারা বসিয়া-বসিয়া গল্প করিতে লাগিল এবং গাড়ীর দ্বারপথে চারিদিকে চাহিয়া-চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

বনগ্রাম পার না হওয়া পর্য্যন্ত তারিণীর নিদ্রা হইল না। এক-একটা ষ্টেশনে গাড়ী ধরে, আর সে চম্‌কিয়া-চম্‌কিয়া উঠে। বলে, "বনগাঁয় এল নাকি?" বলাই একবার বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "আজ্ঞা মশাই, আপনি স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যান্। বন্‌গাঁ পেরিয়ে গেলেও ক্ষতি হবে না। খাবারের জায়গাতেই ত যাচ্ছেন। ভীমনাগের সন্দেশ—নবীন ময়রার রসগোল্লা—এসব শোনেনি? বনগাঁর চেয়ে কল্‌কাতায় ভালো ভালো খাবার পাবেন।"

তারিণী কহিল, "আর লোভ দেখাস্‌নে! মা কি ততটা সময় কল্‌কাতায় দাঁড়াবেন? আমার জন্যে কি ভাবি? তোদের যে ক্ষিধে পেলেই দিতে হবে। তা পাওয়া যাক্—আর নাই যাক্।"

বলাই কানাইলালের গা টিপিয়া হাসিল।

যাহা হউক বনগ্রামের কিছু কাঁচা-গোল্লা ভাণ্ডার-জাত হইলে তারিণীচরণ নিশ্চিন্তমনে নিদ্রাদেবীর সেবায় নিযুক্ত হইল। ছেলেরাও গল্প করিতে-করিতে ঘুমাইয়া পড়িল। কেবল মহেশ্বরীর ঘুম হইল না। তাঁহার এই প্রবাস-যাত্রার পথে কানাইলালের প্রতি তারিণীচরণের হিংস্র চক্ষুদুটি যে কি উপায়ে শোধন করিয়া লইবেন তিনি তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

(ক্রমশঃ)

সুর-রসিক রম‍্যাঁ রলাঁ

(বাল্য-স্মৃতি)

জেনেভা হ্রদের বুকে সূর্য্য অস্ত যায়; সন্ধ্যার স্নিগ্ধ অন্ধকার পূরবী রাগিণীর আলাপের মত দিগ্বিদিকে ছাইয়া পড়িতেছে; নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া ঝিল্লির তম্বুরা যেন ঐকতানে বাজিয়া উঠিল।

ভিলা অল্গার (Villa Olga) ছোট্ট বাগানটির মধ্যে মহানুভব রলাঁর সঙ্গে বেড়াইতেছি; মানুষের সঙ্গে নিছক মানুষ হইয়া মিশিবার কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা! সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা মন্ত্রের সাধক রলাঁ পৃথিবীর তুচ্ছতম জীবকে প্রাণের মর্য্যাদায় অভিনন্দিত করেন, পদবীর প্রতিবন্ধকতা মনীষার ব্যবধান মানুষকে দূরে রাখিবে, এ তাঁর সহ্য হয় না. এটি অনুভব করে বলিয়াই সামান্য মানুষও বন্ধু বলিয়া তাঁর দু হাত ধরিতে সঙ্কোচ করে না; তাঁর বিরাট প্রাণবীণায় ক্ষুদ্রতম প্রাণের সুরও তা'র নিজস্ব স্থানটি লাভ করিয়া ধন্য হয়। কেবল সুর নয়, বেসুরকেও তা'র ন্যায্য স্থান দিয়া তাঁর উদার সুরসঙ্গতিকে পূর্ণ করিয়া সার্থক করিয়া তুলিবার সাহস রলাঁর আছে।

তাঁর নিজের দেশের লোক ফরাসীরা তখন রুর (Ruhr) উপত্যকা অধিকার করিয়া পরাজিত মুমূর্ষু জার্ম্মানীর রক্ত-শোষণে ব্যস্ত, ক্ষোভে সমবেদনায় অধীর হইয়া রলাঁ বলিয়া যাইতেছেন, "মানুষকে মানুষ পর ভাব্‌বা-মাত্র কত বড় জিনিষ থেকে বঞ্চিত হয়! যে ফরাসীর ঘরের সুখ, বাইরের উৎসবের আনন্দ প্রতিদিন জার্ম্মান সঙ্গীত থেকে আস্‌ছে, তা'রা আজ জার্ম্মানীর কাছে থেকে কি নিতে উন্মত্ত হয়েছে! কোথায় থাক্‌বে এই লুণ্ঠিত ধনের স্তূপ কিন্তু Mozart (মোজার্ট) এর 'Magic Flute', Beethoven, (বেটোফেন) এর Ninth Symphony ?......

বুঝিলাম ভিতরে ঝড় বহিতেছে। মনে পড়িয়া গেল, যে-যুগে জার্ম্মানীর কাছে ফ্রান্স লাঞ্ছিত-পদদলিত, সেই বিষম অবসাদ-অপমানের যুগে জন্মিয়াও রলাঁ জার্ম্মানীর অমর সৃষ্টি তা'র সঙ্গীত-কলাকে কি একাগ্র একান্ত সাধনায় পূজা করিয়া আসিয়াছেন। অত বড় বেসুরের নিষ্ঠুর আঘাত কই প্রাণের সুর-সঙ্গতিকে ত প্রতিহত করিতে পারে নাই! সেই নির্ভীক অটল মানবপ্রেমই ত জাঁ ক্রিস্তফ্ মহা-কাব্যে পর্ব্বে-পর্ব্বে বিচিত্র ছন্দে-লয়ে রূপ ধরিয়াছে, রলাঁকে অমর করিয়াছে!

ধীর পাদবিক্ষেপে রলাঁ ঘরের মধ্যে আসিলেন; সাম্‌নেই প্রিয় পিয়ানোটি যেন প্রতীক্ষা করিতেছিল; আমার মৌন অনুরোধ যেন অনুভব করিয়া তিনি হঠাৎ আলাপ আরম্ভ করিলেন; গুণীর স্পর্শে যন্ত্র যেন জীবন্ত হইয়া উঠিল— তন্ময় হইয়া শুনিয়া গেলাম; ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি না, কি শুনিলাম।

একটু থামিয়া রলাঁ বলিয়া উঠিলেন: "জানো, আমার মা ছিলেন আমার সুরের গুরু; তাঁর কাছেই আমার সঙ্গীতের বর্ণপরিচয়; আমার জীবনের সবচেয়ে বড় দান মা'র হাত থেকেই পেয়েছি; এই সঙ্গীত আমায় সকল বাধা সকল বিরুদ্ধতা ভেদ ক'রে মহা মানবের অভিসারে এগিয়ে নিয়ে চলেছে; মানুষ ও মানুষের মধ্যে ব্যবধান যত নিষ্ঠুর যত একান্তই হোক না কেন, তাদের মিলনের যে একটি চিরন্তন অনির্ব্বচনীয় ক্ষেত্র আছে সেটি সঙ্গীতের সাহায্যেই আমি আবিষ্কার করেছি; তাই আমাদের তথাকথিত শত্রু জার্ম্মানদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা কিভাবে প্রকাশ করেছি তোমায় শোনাই, Gustav Mahlerএর স্মারক গ্রন্থে এটি আমার উৎসর্গ......"

রম‍্যাঁ রলাঁর এই অপ্রকাশিত রচনাটি আমার দেশ-

বাসীকে উপহার দিবার সময় সকৃতজ্ঞ-হৃদয়ে আমার দেশের এ যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুররসিক রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করি। তাঁহার আশীর্ব্বাদেই সঙ্গীত কি তাহা একটু বুঝিতে শিখি এবং রলাঁর মত মনীষীর কাছে যাই ; তাঁরই শুভ জন্মদিন স্মরণ করিয়া এই রচনাটি উৎসর্গ করিলাম।

শ্রী কালিদাস নাগ

Harmonie,
couple auguste de l'amour et de la haine!
Nous chanterons le Dieu aux deux puissantes
ailes.
Hosanna à la vie!
Hosanna à la mort!

"ফরাসী দেশের অন্তর্বর্ত্তী ছোটো একটি সহর। খালের ধারে ছোটো একটি বাড়ী, মন্দগতি শূন্যদিনের নিস্তব্ধতায় আচ্ছন্ন। ছাদের আলিসার সাম্‌নে দিয়া একটা ভারী নৌকা গুণের টানে ভাসিয়া চলিয়াছে। ভিনিসীয় উপ-হ্রদের জলের গন্ধের সহিত বাগানের হিয়াসিন্থ ও কার্‌নেশন ফুলের সুবাস মিশিয়া আসিতেছে। একটি শীর্ণ দুর্ব্বল সঙ্গীহীন শিশু সেইখানে একলা বসিয়া স্বপ্ন দেখে ও ভবিষ্যৎ জীবনের দিকে তাহার দৃষ্টি মেলিয়া ধরে। তাহার অন্তরে ও বাহিরে চারিদিকেই জীবন যেন ঘুমাইয়া আছে। ছোটো সহরটিতে পুরুষেরা কেবল রাজনীতির অথবা ব্যবসায়-বাণিজ্যের আলোচনা করে, আর মেয়েরা করে সাংসারিক তুচ্ছতার, কি জড় ধার্ম্মিকতার চর্চ্চা। ঊর্দ্ধে অসীম আকাশ উঠানের চারিটি দেয়ালের উপর চন্দ্রাতপের মতো ঝুঁকিয়া পড়িয়া জল্‌জল্‌ ঝল্‌মল্‌ করিতেছে, অন্ধকারে অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছে আবার আপনি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতেছে, যেন বিরাট একটি নেত্রের পলক প্রশান্ত ও মোহন-ছন্দে উঠিতেছে আর পড়িতেছে।

সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে আকাশের ও হৃদয়ের স্থিরপ্রভার ভিতর দিয়া অকস্মাৎ যেন একঝাঁক মৌমাছি উড়িয়া চলিয়া গেল। মা হেডন্‌এর একটি ছোটো রাগিণীর আলাপ করিতেছেন। আর আমি নিঃসঙ্গ নই। আবেগের তরঙ্গে আমার মন কাঁপিয়া উঠিতেছে……হে মধুর ক্ষুদ্র বন্ধু। তোমার কি চোখ আছে, ঠোঁট আছে? আমি ত জানি না, কিন্তু একথা জানি যে তোমায় আমি ভালোবাসি আর তুমি আমায় ভালোবাসো……

আমাদের বাড়ীতে পুরাতন জার্ম্মান-সঙ্গীতলিপি ছিল। জার্ম্মান? এ শব্দটি বলিতে কি বুঝায়, আমি কি তা জানিতাম? আমাদের দেশের ওই দিক্‌টায় বোধ হয়

সুর-রসিক রমঁ্যা রলঁ্যা .
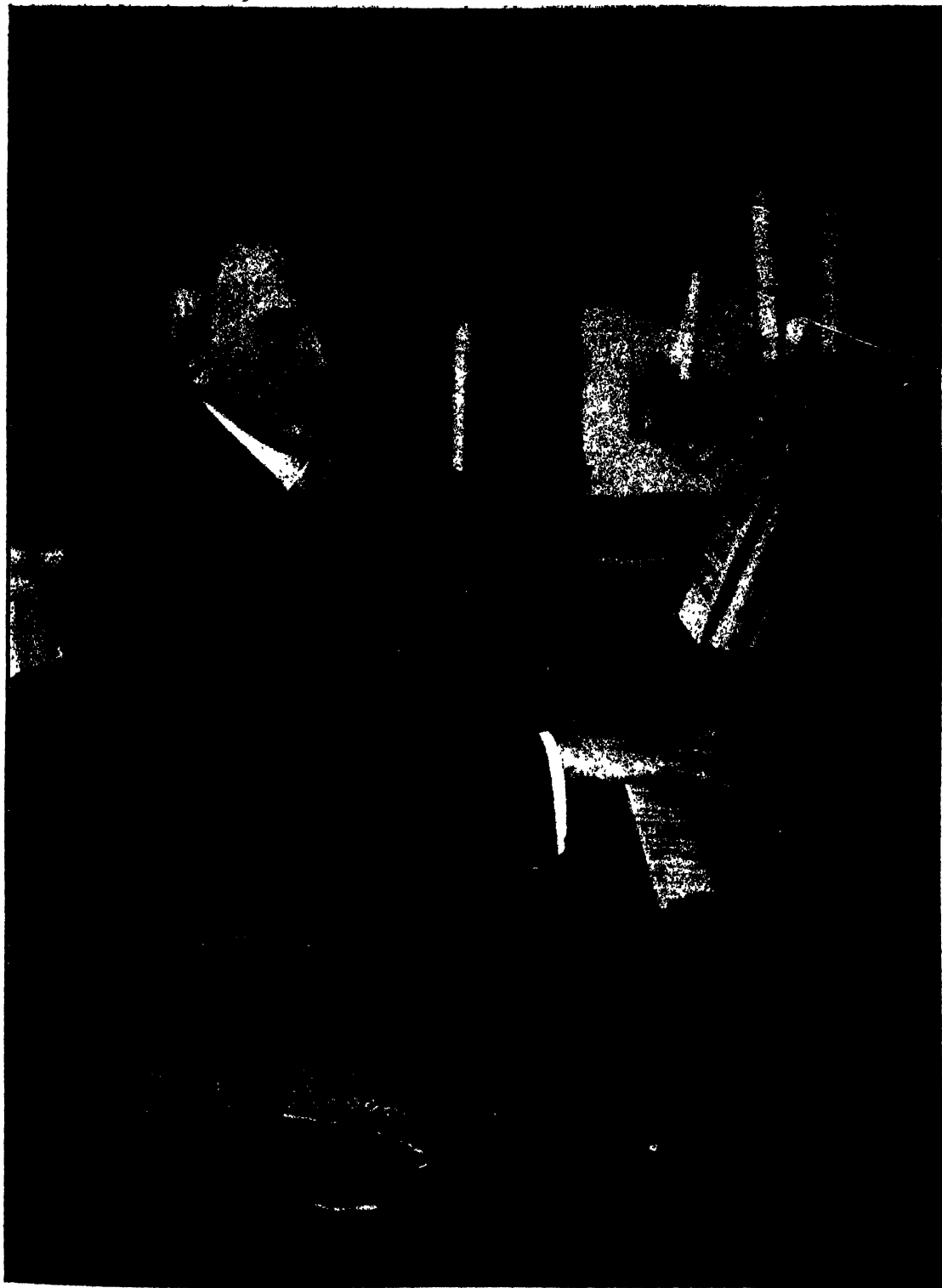
কেহ কখনও সে-দেশের মানুষই দেখে নাই। কাহাকেও "জার্ম্মান"দের বিষয় কোনো কথা বলিতে কদাচিৎ শুনিতাম; কেবল প্রুশিয়ানদের কথাই লোকে বলিত; তাহাদের নাম যে লোকে স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিত না, সে-কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু ওই সঙ্গীত যাহারা সৃষ্টি করিয়াছে, আমি যে সেই প্রাণগুলিকে খুঁজিয়া বেড়াইতাম। আমার কাছে যে তাহারা কেবল সঙ্গীত, কেবল শিল্পের স্রষ্টা। আমি সেই সঙ্গীতের পুঁথিগুলি খুলিয়া বসিতাম, ঠেকিয়া-ঠেকিয়া সেগুলি পিয়ানোর পর্দ্দায় ঝঙ্কারমুখর করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতাম; তাহার ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিত যেন অশরীরী আত্মা; প্রাণপুষ্পের পাপ্‌ড়িগুলি, ব্যথা-গলা হৃদয়ের স্মিতহাস্য, পুলকস্পন্দন, প্রেম ও বিশ্বাসের আনন্দ-উচ্ছ্বাস; স্মৃতি, কামনা, স্নিগ্ধ ও সমুজ্জ্বল অহেতুক সুখ ও নিমিত্তহীন গভীর বিষাদ-রূপে ফুটিয়া উঠিত। আমি তখন সবেমাত্র এই সঙ্গীতরসমূর্ত্তিগুলির সহিত পরিচিত হইয়া উঠিতেছি, তখনই তাহারা আমার অন্তরতম বন্ধু। সেই প্রাণপ্রবাহ, সেই গীতরসধারা, যাহা আমার সমস্ত সত্তাকে স্নান করাইয়াছে, তাহার শিরায়-শিরায় অনুপ্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহা যেন সুন্দরী ধরণীর শোষিত বৃষ্টিধারার মতো অদৃশ্য হইয়া মিলাইয়া যাইত; কিন্তু তাহা যে মাটির বুকে প্রবেশ করে, তাহাই ত মাটির তলায় শান্তগম্ভীর জলরাশিকে গড়িয়া তোলে, প্রেম ও জীবনের ভাণ্ডার পুষ্ট করে।

তখন হইতে জীবনটা হয়ত সাদামাটা ছন্দে ছুটিয়াছে, সমৃদ্ধ ঘটনার আড়ম্বর হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, সুখ ও সহানুভূতির অভাবে ব্যথিত হইয়াছে; কিন্তু আত্মা কখনও অনাবৃষ্টিতে শুকাইয়া মরে নাই, আত্মার অন্তরে ফুটিয়াছে যে রসের অসীম উৎস ... ...

মোজার্ট ও বেটোফেনের প্রেমবেদনা, কামনা ও চপল কল্পলীলা, তোমরা যে আমার দেহের অণুপরমাণু হইয়া উঠিয়াছ; আমি তোমাদের সর্ব্বাঙ্গে পরিব্যাপ্ত করিয়া লইয়াছি, তোমরা আমার, তোমরা আমারই অংশ—ধর্ম্মের রহস্য হইতে এমন ভিন্নভাবে, নিবিড়ভাবে রহস্যময়! নিঃসঙ্গ একটি প্রাণ কত শতাব্দী পূর্ব্বে ভালোবাসিয়াছিল, স্বপ্ন দেখিয়াছিল, বেদনা পাইয়াছিল। সে প্রাণের সত্যরূপ যে কেমন ছিল, তাহা আর কেহ জানিবে না, কিন্তু তবু সেই প্রাণই আজ আর-এক শতাব্দীর আর-একটি নিঃসঙ্গজীবনে, একটি অর্দ্ধ সচেতন বিস্ময়বিহ্বল শিশুর দেহে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিয়াছে; এইসকলের অর্থ যে কি, তাহা সে শিশু এখনও জানে না ....।

হে আমার জার্ম্মান বন্ধুবর্গ, তোমাদের প্রাচীন সঙ্গীত রসিকদের বক্ষে যেমন এইসকল অনুভূতির স্পন্দন জাগিয়া উঠিত, তেমনি ভাবে আমারও বক্ষ স্পন্দিত হইয়াছে। ইহারা যদি শুভ না হইত, তাহা হইলে আমার আত্মাকে ধ্বংস করিয়া ফেলিতে পারিত। তাহারাই যে ছিল আমার আত্মার নিয়ন্তা......কিন্তু কি অশেষ কল্যাণই আমার তাহারা করিয়াছে! যখন শিশু বয়সে পীড়িত হইয়া ভীতচিত্তে ভাবিতাম, বুঝি বা মরিয়া যাইব, (কতকটা ইহাদের সাহায্যেই আমার এই পুরাতন ভীতিটা আমি ভুলিয়া গিয়াছি) মোজার্টের অমুক-অমুক পদ আমার শিয়রে বন্ধুর মতো জাগিয়া থাকিত; মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁহার হাতখানা ধরিয়া থাকিতে প্রাণ চাহিত, এমন-কি সমাধির ভিতরেও তাঁহার সঙ্গ পাইতে ইচ্ছা করিত। পরে কৈশোরের সংশয়বাদের সেই সঙ্কটকালে বেটোফেনের কয়েকটি সুপরিচিত সঙ্গীতই অনন্ত জীবনের অগ্নিকণা আমার জীবনে পুনঃপুনঃ প্রজ্বলিত করিয়াছে। আরো কিছুকাল পরে, যখন জীবিকা-অর্জ্জনের জন্য মরীয়া হইয়া সংগ্রাম করিতেছিলাম, কত রবিবারে যখন আপনাকে একান্ত দুর্ব্বল, বিষণ্ণ, নিপীড়িত মনে করিতাম, যখন জগতের বিদ্বেষী ঔদাসীন্যের ভারে নিষ্পেষিত হইয়া পড়িতাম, তখন আমি ভাগ্‌নেয়ারের রচনা হইতে কি বিরাট্‌ ও আনন্দময় শক্তি সংগ্রহ করিয়াছি। তাহাই আমাকে বিশ্বের পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করিয়াছে। তাহা ছাড়া, যে-কোনো মুহূর্ত্তে যখনই হৃদয় অবসন্ন হইয়াছে, প্রাণরস শুকাইয়া গিয়াছে, তখনই সঙ্গীত-রসে স্নান করিয়া লইয়াছি,—আমার পিয়ানো যে বন্ধুর মতো আমার পাশেই থাকে;—সর্ব্বদাই মায়া ও আশায় উজ্জ্বল মধুর তাজা বিশুদ্ধ প্রাণ পাইয়া আবার তরুণ রূপে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি।

হৃদয় যখন তোমাদের জার্ম্মান সঙ্গীত-রসে পরিপূর্ণ ছিল, মন তখন আর একটি ভিন্ন ও সমান্তরাল সম্পূর্ণ ফরাসী-পথে চলিতেছিল। আমি তখন জার্ম্মান পড়ি না; আমার চিন্তা ফরাসী চিন্তার ভিতর দিয়াই পরিপুষ্ট হইত। আমার দৃষ্টি ও আমার ধীশক্তি প্রেমমুগ্ধ হইত ল্যাটিন সৌন্দর্য্যে, রূপরেখার সুসঙ্গত বিন্যাসে, স্বচ্ছ আদর্শে, স্বপ্নের ন্যায়ে, যুক্তির সাম্রাজ্যে ও আলোকে।

এম্‌নি করিয়া দুইটি জগৎ পরস্পরের উপর আরোপিত হইয়াছিল; এক সেই আত্মা, যাহার সাহায্যে আমি আমার জন্মভূমির সহিত বিশ্রম্ভালাপ করিতাম, এবং সেই মাটিরই তলে-তলে ছিল আর এক অন্তঃসলিলা সঙ্গীত-ধারা, দুরবগাহ প্রচ্ছন্ন আত্মা, যাহার সাহায্যে আমি যে কেবল তোমাদের বর্ত্তমান যুগের প্রাণের সহিত পুনর্মিলিত হইয়াছি তাহা নয়, প্রাচীন যুগের সহিতও মিলিয়াছি। আমি তোমাদের পিতামহদের সহিত এত দিন কাটাইয়াছি যে কখনও কখনও আমার মনে হয় যেন আধুনিক তোমাদের অনেকের অপেক্ষা তাঁহাদের বংশধরের পদবী দাবী করিবার অধিকার আমারই অধিক।

একদিন সেই বিদেহী আত্মা-সমূহের চলন্ত আব্‌ছায়া অনুভূতির ও আমার ফরাসী ধীশক্তির মাঝখানে স্বতঃস্ফূর্ত্ত একটি পথ সহসা খুলিয়া গেল, অমনি দুইটি-জগতের মিলন ঘটিল। আমার অন্তরতম লোকে যে-সত্তা স্বপ্ন দেখিতেছিল, তাহাকে চিনিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া ছাড়া তখন আর আমার কিছু করিবার রহিল না; দেখিলাম, আপনার অজ্ঞাতসারেই প্রাণের স্রষ্টা * হইয়া উঠিয়াছি। যে প্রাণ আমি সৃষ্টি করিয়াছি, তাহা তোমাদেরই অংশ এবং তাহা তোমাদের নিকটই আজ ফিরাইয়া দিতে আসিয়াছি।

শ্রী রম্যাঁ রলাঁ

* "স্রষ্টা" একটি শব্দ-মাত্র। আমরা কেহই প্রকৃত স্রষ্টা নহি। চিরন্তনী শক্তিই একমাত্র সৃষ্টিরূপিণী। র-র

সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রী অমরেশচন্দ্র সিংহ

যেদিন বিশ্ববীণার তারে প্রথম সুর ঝঙ্কৃত হইয়াছিল, সেইদিনই মানবের অন্তররাজ্য প্রতিস্বরের কলরোলে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। সেই মাহেন্দ্রক্ষণে বিশ্বের সুর মানবের কণ্ঠে ধরা দিয়াছিল। সেই আদিম সুরকে প্রস্ফুটিত করিয়া একটি অপূর্ব্ব রঙে রঞ্জিত করিয়া মোহন-রূপে প্রকাশ করা শিল্পীর শ্রেষ্ঠ সাধনা। তাহা সঙ্গীতে হউক বা চিত্রে হউক বা কাব্যে হউক, সেই সাধনার চরিতার্থতা অনন্তে বিহার। সর্ব্ববিধ চারুকলা হইতে আমরা এমন কিছু-একটা জিনিষ আহরণ করিয়া উপভোগ করিয়া থাকি যেটা অনন্তের অসীমের অভিব্যঞ্জনা; প্রাণ সেখানে সমগ্র বিশ্বকে সত্য সুন্দরকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিবার জন্য খুলিয়া গিয়াছে। শ্রেষ্ঠ শিল্পী তিনি, যিনি শব্দের দ্বারা, ভাষার দ্বারা, সুরের দ্বারা, রেখার দ্বারা ভূমার অচিন্ত্য মূর্ত্তিকে মানবের অন্তশ্চক্ষুর সম্মুখে ফুটাইয়া ধরেন। বাঙ্গালার এইপ্রকার সার্ব্বভৌমিক শিল্পীদের মধ্যে সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যতম।

বিষ্ণুপুর-নিবাসী প্রসিদ্ধ গায়ক স্বর্গীয় অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ১২৮৬ সালের ২৫শে পৌষ জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীযুক্তা কৃপাময়ী দেবী ইঁহার জননী। শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর জনকের আশ্চর্য্য সঙ্গীত-অনুরাগ এবং জননীর অপূর্ব্ব কোমল হৃদয় উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছেন।

প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের জীবনলীলা অতি বৈচিত্র্য-পূর্ণ। যখন শিশু ছিলেন, তখনই শ্রীযুক্ত গোপেশ্বরের

শ্রী গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

আশ্চর্য্য প্রতিভা, অলৌকিক মেধা ও অদ্বিতীয় বোধশক্তি দেখিয়া সকলেই বুঝিয়াছিলেন যে, ভারতী তাঁহার প্রশস্ত ললাটে গৌরবের চন্দনটীকা পরাইয়া দিয়া পৃথিবীতে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। শৈশব-কালেই তাঁহার মধুর কণ্ঠে সুরের অপূর্ব্ব খেলা দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইয়াছিলেন। যখন তাঁহার বয়স পাঁচ বৎসর মাত্র তখনই তিনি ললিতকণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে গান গাহিতেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞও এই বালকের বেসুর কিংবা বেতাল লক্ষ্য করিতে পারেন নাই।

বিষ্ণুপুরাধিপতি মহারাজ গোপাল সিংহের পুত্র সঙ্গীতানুরাগী মহারাজ রামকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুর বিষ্ণুপুরে একটি সঙ্গীতবিদ্যালয় স্থাপন করেন। শ্রীযুক্ত অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সঙ্গীতাচার্য্যরূপে মনোনীত হইয়া বহুসংখ্যক ছাত্রের মনোরঞ্জন করিয়া সঙ্গীতশাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব বিশেষ যত্নে শিক্ষা দিতেন। শ্রীযুক্ত গোপেশ্বরও পাঁচ

বৎসর বয়সে হাতেখড়ির পর বিদ্যারম্ভ করেন; এবং সেই সঙ্গে-সঙ্গেই পিতার নিকটে তাঁহার সঙ্গীতশাস্ত্রের সহিত একান্ত পরিচয় আরম্ভ হইল। সঙ্গীতশিক্ষায় তাঁহার প্রগাঢ় ঔৎসুক্য ও অশেষ যত্ন বাল্য হইতেই প্রকাশ পাইয়াছিল। বিদ্যালয়ের অল্পক্ষণ চর্চ্চা তাঁহার মনঃপূত হইত না; তিনি গৃহে আসিয়াও পিতার নিকট একাদিক্রমে তিন-চার ঘণ্টা ৺মদনমোহন জীউর মন্দিরের নির্জ্জন স্থানে একনিষ্ঠ তপস্বীর ন্যায় সঙ্গীতসাধনায় বিভোর থাকিতেন। প্রাচীন গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, তানসেনের সঙ্গীত সেই সময় সর্ব্বাপেক্ষা শ্রুতিমধুর হইত যখন তিনি তাঁহার গুরুদেবের সম্মুখে সঙ্গীতালাপ করিতেন।

শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর এইপ্রকারে অনন্তসাধনায় তন্ময় থাকিয়া পিতার নিকটে ১৩ বৎসর সঙ্গীত শিক্ষা করেন। এই অল্প-সময়ে প্রায় পঞ্চ সহস্র রাগরাগিণীপূর্ণ সঙ্গীত তিনি আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

যখন ৯ বৎসর মাত্র বয়স তখন শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর একবার কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। বালকের কণ্ঠে মধুর সঙ্গীত শ্রবণে শত-শত ব্যক্তি মুগ্ধ হইয়াছিল, ব্রহ্মদেশীয় জনৈক বিশিষ্ট ধনী তাঁহার সঙ্গীতে এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন, যে, তিনি অন্যান্য সকলকে বালকের অদ্ভুত শক্তি দেখাইবার জন্য অতীব ব্যগ্র হইয়া উঠেন। তিনি কয়েক দিনের জন্য মিনার্ভা থিয়েটার-হলে এই বালকের মধুর সঙ্গীতে অসংখ্য জনতার মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন এবং ক্রমে শ্রীযুক্ত গোপেশ্বরের নাম চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। সেই সময়ে বিখ্যাত মৃদঙ্গী ৺মুরারীমোহন গুপ্ত মহাশয়ের প্রিয় শিষ্য শ্রীযুক্ত সত্য গুপ্ত মহাশয় প্রত্যেক স্থানেই শ্রীযুক্ত গোপেশ্বরের সাথী হইতেন এবং তাঁহার সহিত মৃদঙ্গ বাজাইয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন। খ্যাতনামা মৃদঙ্গী শ্রীযুক্ত গোপাল মল্লিক ইঁহার সঙ্গ করিয়া উচ্চকণ্ঠে ইঁহার প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং, ভবিষ্যতে শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর যে অসাধারণ গায়ক হইবেন তাহা প্রকাশ করেন। হিন্দী সঙ্গীতে অভিজ্ঞতা লাভের জন্য গোপেশ্বর হিন্দী শিক্ষা করেন। তাঁহার রচিত অনেক ধ্রুপদ এবং খেয়ালী হিন্দী-সঙ্গীতে তাঁহার হিন্দী ভাষায় প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য প্রকাশ পায়।

বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহ্‌তাব বাহাদুর শ্রীযুক্ত গোপেশ্বরের সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া রাজদরবারের গায়ক-পদে তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তখন শ্রীযুক্ত গোপেশ্বরের বয়স ২৮ বৎসর মাত্র।

স্বর্গীয় স্যার আশুতোষ চৌধুরী এবং তাঁহার পত্নী স্বর্গীয়া প্রতিভা দেবীর যত্নে এবং অক্লান্ত পরিশ্রমে বাংলায় সঙ্গীতবিদ্যার উন্নতি ও প্রচারের জন্য 'সঙ্গীত-সঙ্ঘ' স্থাপিত হয়। প্রথমে স্বর্গীয় বিশ্বনাথ রাও মহাশয় ইহার আচার্য্যপদ ভূষিত করিয়াছিলেন। পরে তিনি অসুস্থতাবশতঃ কর্ম্মত্যাগ করিলে শ্রীযুক্তা প্রতিভা দেবী শ্রীযুক্ত গোপেশ্বরকে এই গৌরবের পদ অলঙ্কৃত করিবার জন্য অনুরোধ করেন। দেশের সঙ্গীত-বিজ্ঞানের লুপ্ত-গৌরব উদ্ধার করিয়া প্রচার করা শ্রীযুক্ত গোপেশ্বরের চির-জীবনের স্বপ্ন। শ্রীযুক্তা প্রতিভা দেবীর প্রস্তাবে এই সুবর্ণসুযোগ উপস্থিত হইল, এই মনে করিয়া তাহা প্রত্যাখান করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। তিনি মহারাজাধিরাজের অনুমতি লইয়া বহু কষ্ট স্বীকার করিয়াও সানন্দে সপ্তাহে তিন দিন 'সঙ্গীত-সঙ্ঘে' উচ্চাঙ্গের হিন্দী সঙ্গীত শিক্ষা দিতে পারিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন।

অনেকেই ধ্রুপদ গাহিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা অকারণে এত মুখভঙ্গী করেন যে, সাধারণের পক্ষে তাহা রুচিকর হইয়া উঠে না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় শ্রীযুক্ত গোপেশ্বরের এইপ্রকার কোনও মুদ্রাদোষ পরিলক্ষিত হয় না। ধ্রুপদ, খেয়াল ও টপ্পা, এই তিনপ্রকার রীতির সঙ্গীতেই তিনি অদ্বিতীয়। রাগরাগিণীর আলাপ অতি সুমিষ্ট ও প্রাঞ্জলরূপে তিনি প্রকাশ করিতে পারেন। ভৈরব রাগ ও ছায়ানট তিনি এমন মধুর গাহিতে পারেন যে, তাহা একবার শুনিলে আর ভুলিতে পারা যায় না। সঙ্গীত থামিয়া গেলেও সঙ্গীতের রেশ মন-প্রাণকে আন্দোলিত ও বিভোর করিয়া রাখে। সাধারণের হিতকল্পে এবং সঙ্গীতানুরাগী জনগণের বিশেষ সহায়তার জন্য তিনি 'সঙ্গীত চন্দ্রিকা' নামক একখানি উৎকৃষ্ট সঙ্গীত-বিষয়ক পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন।

ভারতীয় দর্শনের মূল ধারা-প্রবাহ

শ্রী বিধুশেখর শাস্ত্রী

শ্রদ্ধেয় সভ্যমহাশয়গণ,

এবার এই দর্শনশাখার সভার কার্য্য পরিচালনার জন্য আপনারা আমাকে আহ্বান করিয়া যে-সম্মান প্রদান করিয়াছেন তাহা আমি দর্শনবিদ্যার চরণে সমর্পণ করিয়া আপনাদের আদেশে বা ইচ্ছায় আমার কর্ত্তব্য করিতে চেষ্টা করিব। যদি আপনাদের কোনো কার্য্যে লাগিতে পারি ভাল, না পারি তাহাতেও আপনাদের ও আমার উভয়েরই অনেক উপকার হইবে, এই ভাবিয়া আমি আপাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আপনারা আমার নমস্কার গ্রহণ করুন।

এই জগতে অণু-পরমাণু হইতে আরম্ভ করিয়া কত-প্রকারের কত পদার্থ রহিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সেই-সমস্ত পদার্থ একদিকে, আর মানুষ নিজে অপর দিকে। সে সে-সমস্ত ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু নিজেকে ত্যাগ করার কথা মনে হইলেও তাহার ভয় হয়। সে-সমস্তকে না জানিলেও হয়তো চলিতে পারে, কিন্তু নিজেকে না জানিয়া পারে না। অন্যকে জানিতে হইলে প্রথমে তাহাকে নিজেকেই জানিতে হয়; নিজেকে জানিয়া সে অন্যকে জানে, জানিয়া যাহা কিছু করিবার করে। যেমন কোনো স্থানকে দূর বা নিকট বলিলে বক্তা যে-স্থানে থাকেন সেই স্থানকেই ধরিয়া ঐরূপ বলা হইয়া থাকে, কেননা বস্তুত কোনো স্থানই নিজের স্বভাবে দূর বা নিকট নহে, সেইরূপ মানুষ নিজেকে ধরিয়াই সংসারের সমস্ত ব্যবহার করে। নিজেকে বাদ দিলে তাহার পক্ষে কিছুই নাই, সবই শূন্য হইয়া পড়ে। তাই যেমন বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা, পত্র-পল্লব ও পুষ্প-ফলের একমাত্র আশ্রয় তাহার মূল, সেইরূপ মানুষেরও যাহা-কিছু জানিবার-শুনিবার বুঝিবার-করিবার আছে সেই সমস্তেরই মূল সে নিজে। সে নিজে থাকিলে সবই থাকে, আর তাহাকে বাদ দিলে কিছুই থাকে না। সে নিজেই সকলের মূল, নিজেকে পাইলে যে, সমস্তই পাওয়া যায়।

তাই দেখিতে পাই আমাদের দেশের আধ্যাত্মিক চিন্তা যখন একটু ঘনাইয়া উঠিতেছে তখন গোড়াতেই নিজের কথা—আত্মার কথা। প্রথম দ্রষ্টা বা দার্শনিকদের প্রথম দ র্শ ন বা দৃষ্টি বা দেখার স্ফুরণ হইল আত্মাকে লইয়া,—আত্মা আছে।

আমাদের দেশের একদল দার্শনিক (জৈন) বলিয়াছেন —'যে এক জানে সে সব জানে; যে সব জানে সে এক জানে।' একেকে জানিয়া অনেককে জানা, আর অনেককে জানিয়া একেকে জানা, দুই রকমেই জানিতে পারা যায়। কিছু সন্দেহ নাই, একেকে জানিয়াই অনেককে জানা সুবিধা। অনেকের কি সীমা-সংখ্যা আছে? মানুষ জীবনে কয়টা জিনিসই বা দেখিতে পারে? তাই এক অনুসন্ধিৎসুর প্রশ্ন হইয়াছিল—'কাহাকে জানিলে সমস্তকে জানা হয়।' উত্তর হইয়াছিল—'নিজেকে—আত্মাকে।'

ভাল, কিন্তু এই নিজেকে—আত্মাকে জানার কথা কেন? কেননা, ইহাই তো মানুষের স্বভাব। বলিয়াছি, সে অন্য কিছু না জানিয়া চলিতে পারে, কিন্তু নিজেকে না জানিয়া পারে না। আবার মানুষ কি চায়?—যাহা তাহার ভাল লাগে, যাহা তাহার প্রিয়, যাহাতে তাহার আনন্দ হয়। যাহা যত প্রিয়, যাহাতে যত আনন্দ, তাহা সে ততই চায়। দেখা যায়, তাহার নিজের মত অন্য কিছু প্রিয় নাই। অন্যান্য যতই না কেন তাহার প্রিয় বস্তু থাকুক না, সে সমস্ত হারাইয়া চলিতে পারে, কিন্তু নিজেকে হারাইবার কথাটাও তাহার ভাল লাগে না। নিজে সে নিজের কাছে প্রিয় বলিয়া সেই সম্বন্ধে অন্য জিনিসও তাহার প্রিয় হয়। আদিম দ্রষ্টাদের মধ্যে একজন নিজের স্ত্রীকে বুঝাইতেছিলেন দেখ, পতির জন্য পতি প্রিয় নহে, নিজেরই জন্য পতি প্রিয় হয়; স্ত্রীর জন্য স্ত্রী প্রিয় নহে, নিজেরই জন্য স্ত্রী প্রিয় হয়; পুত্রের জন্য পুত্র প্রিয় নহে, নিজেরই জন্য পুত্র প্রিয়; সকলের জন্য সকলে প্রিয় নহে, নিজেরই জন্য সকলে প্রিয় হইয়া থাকে।' তাই পরম প্রিয় বলিয়া, পরম আনন্দের কারণ বলিয়া মানুষ স্বভাবতই নিজেকে—আত্মাকে চায়। সে কেবল আত্মাকে চায় না, আনন্দকেও চায়, আত্মার সহিত আনন্দের যোগকে চায়।

* ঢাকা মুন্সীগঞ্জে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের দর্শনশাখার সভাপতির অভিভাষণ।

আবার, আত্মা আছে, আনন্দ আছে, কিন্তু কেবল তাহাতে কি হয় যদি তাহা স্থায়িভাবে না থাকে? ক্ষণিক আনন্দে তৃপ্তি নাই। তাই মানুষ আত্মাকে ও আনন্দকে অথবা আত্মার সহিত আনন্দের যোগকে সর্ব্বদা রক্ষা করিতে চাহে। প্রিয়ের বিয়োগে যে-দুঃখ, তাহা অসহ্য। পরম প্রিয় নিজেরই যদি উচ্ছেদ হইয়া যায় তবে তাহার থাকিল কি? যদি কাহাকেও সমগ্র পৃথিবীরাজ্য দান করিয়া বলা হয়—'তুমি ইহা গ্রহণ কর, কিন্তু তোমাকে এখনি মরিতে হইবে, তোমাকে বধ করা হইবে', তবে সে কম্পিত হইয়া উঠিবে। কাজ নাই তাহার পৃথিবী-রাজ্যে, সে নিজেকে রক্ষা করিতে পারিলেই বাঁচে। তাই মানুষ যেমন নিজেকে—আত্মাকে চাহিল, আত্মার আনন্দকে চাহিল, সেইরূপ ইহাও চাহিল যে, সে যেন বর্ত্তিয়া থাকে, অপর কথায়, সে চাহিল যেন সে নিত্য হইয়া থাকে।

এইরূপে আমাদের প্রথম দ্রষ্টাদের কথায় আমাদের পরবর্ত্তী দর্শনচিন্তার তিনটি মূল সূত্রের উদ্ভব হইল আত্মা, আনন্দ, নিত্য। ইহার ক্রম ও শব্দ একটু পরিবর্ত্তন করিয়া লইলে বলিতে পারা যায় নি ত্য, সু খ, আ ত্মা। এই স্থানে পরবর্ত্তী এক শ্রেণীর (বৌদ্ধ) দ্রষ্টাদের তিনটি মূল কথা মনে করিয়া লইতে পারি—অ নি ত্য, দুঃ খ, অ নাত্মা। ইহা একবারে বিপরীত; কিন্তু, পরে আমরা দেখিতে পাইব উভয়েরই সাক্ষাৎ হইয়াছে একই স্থানে।

মানুষ চায় যুক্তি। বিনা যুক্তিতে সে সন্তুষ্ট হয় না, হইতে পারেও না। আর যতক্ষণ সন্তুষ্ট না হয়, ততক্ষণ কোনো কর্ত্তব্যই সে যথাযথভাবে অনুষ্ঠান করিতে পারে না। এই যে নিত্য, সুখ, আত্মা, ইহার প্রত্যেকটির পরীক্ষা হইতে আরম্ভ হইল। পুঙ্খানুপুঙ্খ, তন্ন তন্ন করিয়া বিচার —ইহা কি-কেমন, ইহার কি কেমন প্রমাণ, কি যুক্তি, কি প্রয়োজন, ইত্যাদি যত রকম প্রশ্ন উঠিতে পারে সকলেরই উত্তর দিবার আবশ্যকতা হইল। যত-রকম সন্দেহ হইতে পারে সকলকেই ভঞ্জন করিবার প্রয়োজন হইল। আবার এই প্রসঙ্গে যাহা কিছু আসিয়া পড়িল তাহারও খণ্ডন বা সমর্থনের জন্ত নূতন-নূতন কথা আসিয়া পড়িল। এইরূপে ক্রমে-ক্রমে নূতন-নূতন দর্শনের উদ্ভব হইতে লাগিল।

মানুষের একদিকে সংস্কার ও বিশ্বাস—নানা কারণে ও নানা প্রকারের। সংস্কার-বিশ্বাস ও যুক্তিতে যদি মিলিয়া যায়, ভাল; কিন্তু যখন মিলে না, বিরোধ উপস্থিত হয়, তখন সংস্কার বিশ্বাস লইয়া যাইতে চাহে একদিকে, আর যুক্তি লইয়া যাইতে চাহে অপরদিকে। তখন হয় তাহাদের মধ্যে কিছু ছাড়িয়া ও কিছু লইয়া একটা রফা করিতে হয়, অথবা উভয়ের বলাবল আপনা-আপনিই নির্ণয় হইয়া যায়, প্রবল জিতে, দুর্ব্বল হারে।

নিত্য, সুখ, আত্মাকে চাই, কিন্তু পাইবার বাধা অনেক। শারীরিক ও মানসিক বিবিধ দুঃখের, বিশেষত মৃত্যুর তাড়না প্রত্যক্ষ। সমস্ত দুঃখেরই প্রতীকার মানুষের শক্তির অতীত। অথচ যতক্ষণ ইহা না হইতেছে ততক্ষণ ঐ ইচ্ছা পূর্ণ হইতে পারে না। কি করিয়া ইহা সম্ভব হইবে, ভাবনা হইল। দেখা গেল, কোনো লৌকিক উপায়ে কখনো ইহা সম্ভব হইবে না। চিত্তে অলৌকিক উপায়ের কথা উদিত হইল।

অতিপূর্ব্বকাল হইতে যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান চলিয়া আসিতেছিল। কিরূপে ইহাদের উৎপত্তি হইল তাহা আলোচনা করিবার ইহা স্থান নহে। তবে ইহা ঠিক যে, যে-সময়ের কথা বলিতেছি তখন যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ণমাত্রায় চলিতেছে। যাজ্ঞিকেরা জ্যোতিষ্টোম, বা বি শ্বজিৎ যাগ করিয়া এমন একটি স্থান বা অবস্থাকে লাভ করিবার ইচ্ছা করিতেছেন যেখানে এরূপ এক সুখ বা আনন্দ আছে যাহার মধ্যে দুঃখের লেশও নাই, এবং যাহা নষ্ট হইয়া যায় না, আর ইচ্ছা করিলেই সঙ্গে-সঙ্গে যাহাকে পাওয়া যায়,—অপর কথায়, যাহাকে স্বর্গ বলিয়া উল্লেখ করা হয়। তাঁহারা সোম পান করিতেছেন, আর তাহার পরম্পরা শ্রুত অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস করিয়া ভাবিতেছেন আমরা অমৃত হইয়াছি।

একদিকে বংশপরম্পরাক্রমে সমাগত নানাবিধ ক্রিয়া-কর্ম্মের অতি-অদ্ভুত ফলের বর্ণনা—যাহা শুনিলে সুখ-স্বচ্ছন্দতার অভিলাষী মানুষের চিত্ত সহজেই আকৃষ্ট হইয়া পড়ে, আর অপরদিকে সমাজে বা নিজ-নিজ গৃহে প্রতিদিন নিয়মিতভাবে সেইসমস্ত ক্রিয়া-কর্ম্মের অনুষ্ঠান, সাধারণের চিত্তকে একেবারে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। উহা

ছাড়িয়া অমৃতত্বলাভের অপর কোনো উপায় থাকিতে পারে ইহা মনেই হয় নাই।

যাহা পূর্ব্বে সহজ-সরল বিশ্বাসে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছিল, পরে সেখানে স্বভাবতই যুক্তির উদ্রেক হইল। যতই কেন বিশ্বাস থাকুক না, যুক্তি হইলে কথাটি অনুভবের কাছে আসে।

ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কর্ম্মকেও যুক্তি দ্বারা ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা হইল (ব্রাহ্মণে)। যজ্ঞ করিবার সময়ে কেন পূর্ব্ব-মুখে দাঁড়াইতে হইবে, কেন জল আচমন করিতে হইবে, কেন কুশ পাতিতে হইবে, এইরূপ ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র বিষয়ে যুক্তির অবতারণা হইতে লাগিল। কিন্তু এইসব যুক্তি অতিসরল বুদ্ধির যুক্তি, অতি দুর্ব্বল, প্রায়ই বালকোচিত। সে-যুক্তি যুক্তিই নহে। তখন প্রধানকর্ম্ম সম্বন্ধে কোনো যুক্তির জিজ্ঞাসা জাগে নাই, ঐসমস্ত কর্ম্মের দ্বারা অমৃত হওয়া যায়, কি যায় না, বা তাহার প্রমাণই বা কি, এসব প্রশ্ন উঠে নাই। ক্রমে তাহা উঠিল। যুক্তির জিজ্ঞাসাকে এড়াইয়া থাকিবার উপায় নাই। যুক্তি দেখাইতে ইঁহারা বাধ্য হইলেন, কিন্তু সেই যুক্তিকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রতা দিতে পারিলেন না। যাহা পূর্ব্ব হইতে চলিয়া আসিতেছিল তাহারই সমর্থনের জন্য যুক্তির দ্বারা যতটুকু করা যাইতে পারে, তাহা তাঁহারা করিতে আরম্ভ করিলেন। অপর কথায়, যাহা তাঁহারা পূর্ব্ব হইতে শুনিয়া (শ্রুতি) বা করিয়া আসিতেছিলেন, যে-যুক্তি তাহার অনুকূল তাহাই তাঁহারা দেখাইতে লাগিলেন, উহার প্রতিকূলে যুক্তির স্থান ছিল না, আর থাকিতেও পারিত না। কেননা তাহা হইলে যে মূলেরই উচ্ছেদ হইয়া পড়ে।

তাঁহারা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এইসমস্ত যাগযজ্ঞ ক্রিয়া-কর্ম্মের দ্বারা, যে সেই-সেই অভীপ্সিত ফল পাওয়া যাইবে তাহার প্রমাণ কি, কে বলিল যে তাহাতে ঐরূপ হয়। বলা হইল, শ্রুতি পরম্পরায় এইরূপ জানা যায়। প্রশ্ন হইল, ভাল, এই শ্রুতি বা বেদেরই বা প্রামাণ্য কি? তাঁহারা বলিলেন, লোকের কথায় ভুল-ভ্রান্তি, প্রমাদ বা বঞ্চনার ইচ্ছা থাকিতে পারে, তাই সব সময়ে তাহাকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় না। কিন্তু বেদের কথা তো সেমন নহে। বেদ কোনো মানুষের বা কোনো পুরুষের কথা নহে। ইহা অপৌরুষেয়। ইহার রচনায় মানুষের বা কোনো পুরুষবিশেষের কোনো হাত নাই। ইহা নিত্য। (কিরূপে নিত্য তাহা তাঁহাদিগকে বলিতে হইয়াছে।) তাই ইহার কথায় কোনো সন্দেহ থাকিতে পারে না। তাঁহাদিগকে বুঝাইতে হইয়াছিল, আজ যাগ-যজ্ঞ করিলে দীর্ঘকাল পরে, এমন-কি জন্মান্তরেও কেমন করিয়া তাহার ফল হইতে পারে। যদি কেহ কখনো কাহারো পা টিপিয়া দেয়, সেই পা টিপার সুখ তখনই অনুভব করা যায়; পা টিপিল আজ, আর সুখ হইল কাল, ইহা হয় না। ক্রিয়া আর ফলের মধ্যে একটা যোগ না থাকিলে চলে না; তাঁহাদিগকে তর্কের দ্বারা এই যোগ (অপূর্ব্ব) দেখাইতে হইয়াছিল। এইরূপে বৈদিক কর্ম্ম ও তৎসংসৃষ্ট অন্যান্য সর্ব্ববিধ প্রশ্নের মীমাংসার জন্য ধীরে-ধীরে এক প্রবল সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল।

কর্ম্মীদের চিত্ত যখন কর্ম্ম লইয়াই নিতান্ত আবদ্ধ, তখন আর-একদল একটি কথা ভাবিতে আরম্ভ করিলেন। কর্ম্ম তো করা হইতেছে, কিন্তু ইহার ফল পায় কে? যে করে সেই ফল পায়, ইহা সাধারণ কথা। পূর্ব্ব হইতেই কর্ম্মীদের ধারণা ছিল, কর্ম্মের কর্ত্তা এই দেহ নয়, দেহ তো দেখিতে-দেখিতেই নষ্ট হইয়া যায়। আর সমস্ত কর্ম্মের ফলও এই দেহেই অনুভব করা যায় না। জন্ম-জন্মান্তরেও কর্ম্মের ফল হইয়া থাকে। তাই এই দেহের অতিরিক্ত অথচ এই দেহেই অবস্থিত এমন কিছু আছে, যাহা দেহের নাশে নষ্ট হয় না, এবং যাহা কৃত কর্ম্মের ফল অনুভব করে, ইহার নাম আত্মা। তাঁহাদের এইরূপ একটা দৃঢ় ধারণা ছিল। আর এই ধারণাতেই তাঁহাদের বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড চলিতে লাগিল। কিন্তু এই নবীন ভাবুকেরা উহাতেই তৃপ্ত হইতে পারিলেন না। তাঁহারা বিশেষ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, সেই আত্মা কে, তাহার স্বরূপ কি, তাহার স্বভাব কি। প্রথমত বাহ্য দেহের দিকে দৃষ্টি গেল, দেখিলেন তাহা আত্মা নয়। ক্রমশ অন্তর হইতে অন্তরতরের দিকে চলিতে আরম্ভ করিয়া ভাবিলেন, এই যে প্রাণবায়ু তাহাই আত্মা। অতৃপ্ত হইয়া আরো অন্তরে গিয়া ভাবিলেন, মনই আত্মা। তাহাতেও অতৃপ্ত হইয়া আরো ভিতরে ঢুকিয়া ভাবিলেন, বিজ্ঞান আত্মা। তৃপ্তি
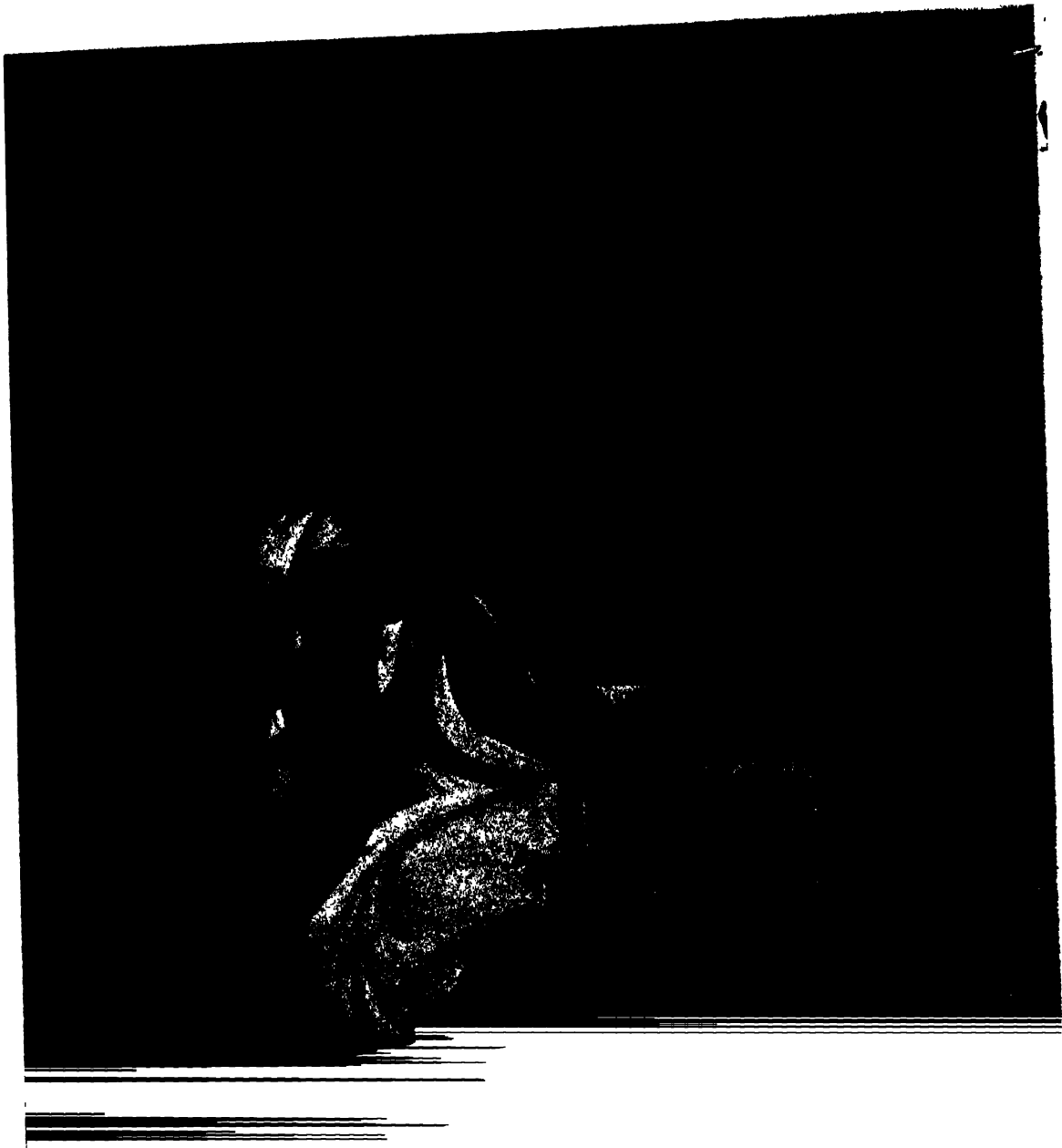
সুরের নেশা
শিল্পী—শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী
শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সৌজন্যে

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

হইল না; তাঁহারো ভিতরে ঢুকিয়া যাহা দেখিলেন, যাহা আনন্দময়, স্থির করিলেন তাহাই হইতেছে আত্মা। এই-রূপে ইহার সম্বন্ধে এক-একটি করিয়া প্রশ্নের উদয় হয়, আর তাঁহারা তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন। যতই চিন্তা করিতে লাগিলেন ততই তাহা বাড়িয়া উঠিতে লাগিল।

তাঁহাদের দৃষ্টি আর-এক দিকে গেল। বিচিত্র বিশ্ব রচনার সৌন্দর্য্য তাঁহাদের নয়ন-মনকে আকর্ষণ করিয়াছিল। মনে হইল, কোথা হইতে ইহা আসিল? কে ইহা করিল? "কোন্ বনের কোন্ সেই বৃক্ষ যাহা হইতে এই ভূলোক দ্যুলোককে কুঁদিয়া বাহির করা হইয়াছে?"

প্রশ্ন বাড়িয়াই যাইতে লাগিল। তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন, "কে ঠিক জানে, আর কেই বা বলিবে, কোথা হইতে ইহা আসিল, কোথা হইতে ইহা জন্মিল? দেবতারাও তো এই সৃষ্টির পরে। কে জানে ইহা কোথা হইতে আসিল। যিনি ইহার অধ্যক্ষ—যিনি পর ব্যোমে, কোথা হইতে এই সৃষ্টি আর তিনি ইহা করিয়াছেন কি করেন নাই, তিনিই তাহা জানেন অথবা জানেন না।" সমগ্র না স দা সীয় সূক্তে (ঋগ্বেদ ১০,১২৯) তাঁহাদের এই সৃষ্টিরহস্যেরই চিন্তা পাওয়া যায়।

এইরূপে সৃষ্টির চিন্তার সঙ্গে সৃষ্টিকর্ত্তার চিন্তা উদিত হইল। তাঁহারা দেখিলেন, দ্যুলোক ভূলোকের সৃষ্টি পর্য্যন্তই নয়, তাহার পরে আরো আছে যিনি ইহাদিগকে সৃষ্টি করিয়া ধারণ করিতেছেন (ঋগ্বেদ ১০, ৩,৮)। তাঁহার মহিমাকে তাঁহারা উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিলেন। হিরণ্যগর্ভীয় সূক্তে (ঋগ্বেদ ১০, ১২১) তাহাই অতি সুন্দররূপে প্রকাশ পাইয়াছে।

এইরূপে তাঁহাদের নিকটে তিনটি বিষয় বিশেষরূপে উপস্থিত হইল, আত্মা, জগতের সৃষ্টি ও ঈশ্বর। জগতের সৃষ্টির সহিত তাহার স্থিতি ও প্রলয়েরও কথা আসিয়া পড়িল। আর স্বভাবতই এই চিন্তা হইল যে, যিনি এই জগৎকে রচনা করিয়াছেন, তাহার স্থিতি ও সংহারও তিনিই করিতে পারেন, অন্যের দ্বারা ইহা সম্ভব হয় না। তাই ক্রমশ ঠিক ধারণা হইয়া গেল, যিনি এই জগতের জন্ম, স্থিতি ও প্রলয়ের কর্ত্তা তিনি ঈশ্বর। তিনি সকলের অপেক্ষা বৃহৎ, অতএব ব্রহ্ম।

যখন এইরূপে ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের ধারণা দৃঢ় হইল, তখন ঈশ্বরের মহত্ত্বের উপলব্ধির সঙ্গে-সঙ্গে মানবের নিজের ক্ষুদ্রত্বের বোধও হইতে লাগিল। সে যে নিজেকে, বা অপর কথায় নিজের আত্মাকে নিত্য আনন্দময় দেখিতে স্বভাবতই ইচ্ছা করিয়াছিল, ঈশ্বরের মহিমা ভাবিয়া দেখিল, তাহা তাঁহারই আশ্রয় ভিন্ন হইবার উপায় নাই। তাঁহারই চিন্তায় মৃত্যুমুখ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া অমৃত হওয়া যায়। যখন এই ধারণা হইল তখন কর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা শিথিল হইতে আরম্ভ করিল। কর্ম্মের দ্বারা অমৃত হওয়া যায়, এই বুদ্ধি বিচলিত হইল।

কেহ-কেহ স্পষ্টই বলিতে আরম্ভ করিলেন, "কর্ম্মের দ্বারা যাহা পাওয়া যায়, সকলেই জানে তাহার ক্ষয় আছে। তাই যাগযজ্ঞ কর্ম্মের দ্বারা যাহা পাওয়া যাইবে, তাহারও সেইরূপ ক্ষয় অবশ্যই থাকিবে।" "কৃত্রিমের দ্বারা অকৃত্রিমকে পাওয়া যায় না।" "যজ্ঞ তো নরম ভেলা" (ইহার দ্বারা পার হওয়া যায় না)। "যাহারা ইহাকেই শ্রেয় বলিয়া মনে করে, তাহারা মূঢ়, তাহারা বারংবার জন্মমৃত্যুর মধ্যে পতিত হয়। স্বয়ং তাহারা অজ্ঞানের মধ্যে থাকিয়াও নিজেকে পণ্ডিত বলিয়া, কৃতার্থ বলিয়া অভিমান করে, আর অন্ধের অনুসরণকারী অন্ধের ন্যায় দুঃখ পাইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়।"

আবার কেহ-কেহ বলিলেন, কর্ম্মের দ্বারা যে-ফল পাইবার কথা, তাহা যেমন কর্ম্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা পাওয়া যায়, সেইরূপ কর্ম্মের জ্ঞানেরও দ্বারা পাওয়া যায়। অশ্বমেধের সম্বন্ধে বলা হইল (তৈত্তিরীয়সংহিতা, ৫-৩-১২-১-২)—"যে অশ্বমেধের দ্বারা যাগ করে, আর যে ইহাকে এইরূপে জানে তাহারা পাপ তরিয়া যায়, ব্রহ্মহত্যা তরিয়া যায়।" যজ্ঞসমূহ বিভিন্নরূপে ব্যাখ্যাত হইতে আরম্ভ হইল। অশ্বমেধের অশ্ব কখন সাধারণ প্রত্যক্ষ অশ্ব নহে। উষা হইল তাহার মস্তক, সূর্য্য হইল চক্ষু, বায়ু হইল প্রাণ, দ্যুলোক তাহার পৃষ্ঠ, অন্তরীক্ষ তাহার উদর, পৃথিবী তাহার চরণ, আর অশ্বমেধটি বস্তুত কি? অগ্নি, সূর্য্য। তাঁহারা বলিলেন, যে এইরূপ জানে সে-ই অশ্বমেধকে ঠিক জানে। যজ্ঞের অনুষ্ঠান বাহ্য হইলেও ইহাকে আধ্যাত্মিক-ভাবে দেখিবার ভাব জ্ঞানীদের মধ্যে আরো পরিস্ফুট

হইতে লাগিল। তাঁহারা বলিলেন, যজ্ঞের আত্মা হইতেছে স্বয়ং যজমান, তাঁহার শ্রদ্ধাই হইতেছে যজমান-পত্নী, তাঁহার শরীর তাহার সমিৎ, বক্ষঃস্থল বেদি, লোমসমূহ কুশ, হৃদয় যূপ, কাম আজ্য, মন্যু পশু, এবং তপস্তাই অগ্নি, ইত্যাদি।

এই স্থানে একটা চিন্তা উঠিল। কর্ম্মের কথা, জ্ঞানের কথা দুই-ই শ্রুতি হইতে পাওয়া যাইতেছে। উভয়েরই প্রামাণ্য এক। অতএব একটাকে ছাড়িলে অপরটিকেও ছাড়িতে হয়, এবং একটিকে ধরিলে অপরটিকেও ধরিতে হয়। তাই একটা রফা করিবার চেষ্টা হইল। জ্ঞানীদের মধ্যে দুইটি প্রধান দল হইলেন। একদল বলিলেন, মুক্তির কারণ জ্ঞান, কিন্তু এই জ্ঞানের লাভের জন্য কর্ম্ম চাই। কর্ম্মের দ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে সেই চিত্তে জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হইবে। তাই ইহারা কর্ম্মকে একটা অপ্রধান স্থান দিয়া রাখিলেন।

অপর দল বলিলেন, না; তাহা নহে, কর্ম্ম ও জ্ঞান উভয়ই একসঙ্গে মুক্তির জন্য আবশ্যক।

ক্রমে তৃতীয় আর-একটি দল দেখা গেল। ইহারা জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ের মধ্যে ঈশ্বরকেও স্থান দিলেন। এ সম্বন্ধে শেষ কথা, বোধ হয়, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় স্থান পাইয়াছে।

আমরা একটু দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। যেখান হইতে আসিয়াছি সেইখানেই যাওয়া যাউক।

আত্মার কথা, ঈশ্বরের কথা, আর বিশ্বরচনার কথা জ্ঞানীদের হৃদয়ে উদিত হইবার পর তাঁহাদের নানারূপ জিজ্ঞাসা উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। ঈশ্বর যদি জগৎ রচনা করিলেন, তবে তিনি তাহা কিরূপে করিলেন? কোথা হইতে করিলেন? কি দিয়া করিলেন? কি জন্য করিলেন? তিনি কোথায়? তিনি কেমন? আবার এই যে আমাদের আত্মা ইহাই বা কি? কোথা হইতে ইহা আসিল? দেহের সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ কি? জন্ম মৃত্যুই বা ইহার কি? মৃত্যু হইলে কোথায় কিরূপে ইহা থাকে, অথবা মোটেই থাকে না? ঈশ্বর বা ব্রহ্মের সঙ্গে ইহার সম্বন্ধই বা কি? এইরূপ শত-শত প্রশ্ন মনের মধ্যে উঠিতে লাগিল, আর তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন। কতক উত্তর পাওয়া গেল, কতক বা গেল না, চিররহস্যের মধ্যে থাকিয়া গেল। একই প্রশ্নের উত্তর নানা ব্যক্তির নিকট নানারূপ হইতে লাগিল। কেহ ভাবিলেন ব্রহ্ম সগুণ, কেহ ভাবিলেন নির্গুণ। কেহ ভাবিলেন ব্রহ্মই সব, কেহ বলিলেন আত্মাই সব। কেহ ভাবিলেন ব্রহ্ম অন্য, আত্মা অন্য; কেহ ভাবিলেন ব্রহ্মও যা, আত্মাও তাই, এই আত্মাই ব্রহ্ম। কেহ বলিলেন আগে সৎ ছিল, কেহ বলিলেন অসৎ ছিল, কেহ বলিলেন সৎও ছিল না, অসৎও ছিল না, একটি সর্ব্বব্যাপী গভীর অন্ধকার ছিল। হয়তো আবার একই জনের নিকট বিভিন্ন ভাবের কথা শুনিতে পাওয়া গেল।

পরে এইসব কথা একটু অস্পষ্ট হইয়া উঠিল। শব্দ অসম্পূর্ণ, সে নিজে সমস্ত অভিপ্রায়কে প্রকাশ করিতে পারে না। আক্ষরিক অর্থের পিছনে আরো কত অর্থ থাকিয়া যায় তাহা সব সময় তাহাতে ধরা পড়ে না। বক্তা বলিবার সময় বক্তব্য বিষয়ের খানিকটা মাত্র শব্দের দ্বারা প্রকাশ করেন, অবশিষ্ট অনেক অংশ দেশ-কাল-পাত্র ও ভাব-ভঙ্গীর দ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে। তাই যখন কেবল শব্দমাত্র লইয়া বিচার করা যায়, তখন এই অসম্পূর্ণতার আশঙ্কা খুবই থাকে।

পূর্ব্ব জ্ঞানীদের ঐ জ্ঞান-চিন্তার পরবর্ত্তী আলোচনাতেও এইরূপ হইল। তাঁহাদের ঐসমস্ত কথার ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা আরম্ভ হইল। কেহ নিজের সংস্কার বা রুচি অনুসারে একটি কথার উপর ঝোঁক দিয়া, তাহার প্রতিকূল কথাটার গৌণ অর্থ ধরিতে আরম্ভ করিলেন। আবার আর-একজন অন্যের গৌণ কথাটাকেই মুখ্যরূপে ধরিয়া তাহার মুখ্য কথাটাকে গৌণ বলিয়া মনে করিয়া লইলেন। কিন্তু কেহই কোনো কথাটাকে একেবারে ত্যাগ করিতে পারিলেন না। পারিলে নিশ্চয়ই ত্যাগ করিতেন, কিন্তু পারিবার উপায় ছিল না। কারণ সকলেরই প্রমাণ শাস্ত্র, আর ঐসমস্ত কথা প্রতিকূলই হউক বা অনুকূলই হউক, শাস্ত্র।

শাস্ত্রের সমন্বয় করিতে তাঁহারা বাধ্য হইলেন। সমন্বয়ের মানে হইতেছে একটা রফা করা, কিছু ছাড়িয়া দেওয়া আর কিছু গ্রহণ করা। যেখানে বস্তুতই ভেদ, দুই জনে অতি স্পষ্টভাবেই দুই কথা বলিয়াছে, সেখানে

সমন্বয় দেখাইতে গেলে সমন্বয়কারীর নিজের একটা নূতন মত পাওয়া যাইতে পারে—তিনি ব্যাখ্যার কৌশলে বলিতে পারেন যে, যিনি 'হাঁ' বলিয়াছেন তাঁহার অভিপ্রায় এই, আর যিনি 'না' বলিয়াছেন তাঁহার অভিপ্রায় এই, তাই ইঁহাদের উভয়ের মত একই; কিন্তু তাহার প্রমাণ কৈই? হইতে পারে উভয় বক্তার অভিপ্রায় ঐরূপ ছিল; আবার ইহাও হইতে পারে তাঁহাদের ঐরূপ অভিপ্রায় ছিল না, বস্তুতই তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন কথা বলিয়াছেন। অন্তত এইরূপ হইবার সম্ভাবনাও থাকে। তাই বলা যায় না কোনরূপে সমন্বয় করিয়া দিলেই যাঁহাদের কথার সমন্বয় করা হইতেছে তাঁহাদের আসল মতটা পাওয়া গেল। সেখানে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, তাহা সমন্বয়কারীর নিজের মত।

যাঁহারা দেখিলেন জীব অন্য ঈশ্বর অন্য, তাঁহাদের মধ্যে ভক্তিবাদ আরম্ভ হইল। যাঁহারা উভয়ের অভেদ দেখিলেন তাঁহাদের মধ্যে একদিকে জ্ঞান ও অপর দিকে অবিদ্যা বা অজ্ঞানের দ্বারা সমস্ত প্রশ্নের সমাধানের চেষ্টা হইতে লাগিল।

জীবের একটা অবিদ্যা বা অজ্ঞান আছে, যাহাতে সে নিজেই নিজেকে ঠিক বুঝিতে পারে না, ঈশ্বরকেও ঠিক বুঝিতে পারে না। অবিদ্যাই তাহার দুঃখের মূল, বন্ধের কারণ। বিদ্যা বা জ্ঞানেই সেই অবিদ্যার নাশ হয়, তাঁহার সমস্ত দুঃখের অবসান হয়। যে-কোনো-প্রকারেই হউক, জীবের এই একটা অবিদ্যার কথা প্রায় সমস্তই প্রধান-প্রধান চিন্তার মধ্যে স্থান লাভ করিল। ইহা আমরা ক্রমেই দেখিতে পাইব।

জীব-ব্রহ্মের ভেদ-অভেদের কথা বলিতেছিলাম। ভেদ ও অভেদ এই দুই দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়িয়া ভক্তিমার্গের ভাবুকেরা প্রধানত ভেদেরই দিকে ঝোঁক রাখিয়া কেহ স্পষ্টতই ভেদ, কেহ বা ভেদ-অভেদ উভয়ই, কেহ বা বিশুদ্ধ (অর্থাৎ মায়া বা অবিদ্যার সম্বন্ধ-রহিত) অভেদ, আবার কেহ বা বিশিষ্টের (অর্থাৎ জীববিশিষ্ট ব্রহ্মের) অভেদ (অর্থাৎ ঐক্য, অর্থাৎ জীববিশিষ্ট ব্রহ্ম এক, ইহাই) চিন্তা করিলেন।

বলিয়াছি তাঁহারা ঐরূপ চিন্তা করিলেন 'ভেদের দিকে ঝোঁক রাখিয়া।' তর্কের বা কৃত্রিম দার্শনিকতার দৃষ্টিতে ইঁহারা যাহাই বলুন, মূলে ইঁহাদের ঐসব চিন্তাতেই ভেদই থাকিল। কৃত্রিম দার্শনিকতা যখন আসে নাই, তখন ভেদ-দৃষ্টিতেই ঈশ্বরের উপলব্ধি হইয়াছিল। যাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাঁহারা বলিলেন, তিনি "আমাদের পিতা," "তিনি আমাদের বন্ধু, তিনি আমাদের জনিতা, তিনি আমাদের বিধাতা।" এই সম্বন্ধই ক্রমে-ক্রমে আরো নানা রকমে বিকাশ পাইতে লাগিল। কাহারো নিকটে তিনি হইলেন মাতা, আবার কাহারো নিকটে তিনিই হইলেন মাতার পুত্র। কাহারো তিনি দাসের প্রভু, সখার সখা, এবং পত্নীর পতি। তাঁহার সঙ্গে কত বিচিত্র ও কত মধুর প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া উঠিল!

জ্ঞানীদের একদল যখন কর্ম্মীদের সঙ্গে একটা রফা করিয়া ঈশ্বরাভিমুখে যাত্রা আরম্ভ করিলেন, তখন আর-এক দল এক বিভিন্ন পথ ধরিয়া চলিলেন। প্রথম দল যাহা হউক একরকম একটা রফা করিয়া বৈদিক কর্ম্মকে একটু স্থান দিয়াছিলেন, কিন্তু দ্বিতীয় দল ইহাকে একেবারে উড়াইয়া দিলেন।

বৈদিক কর্ম্মে পশুহিংসা ছিল। ইহা যে একটা অতি নিষ্ঠুর ব্যাপার, কর্ম্মীরাও যে কেহ-কেহ ইহা না বুঝিতেছিলেন তাহা নহে। তাই তাঁহারা কোনো-কোনো স্থানে বলিতেন যজ্ঞে পশু দেওয়া আর পুরোডাশ দেওয়া একই। একটা গল্পও করিতেন। যজ্ঞের সারভাগ আগে মানুষের মধ্যে ছিল; মানুষকে বধ করায় তাহা ঘোড়ার মধ্যে গেল, ঘোড়াকে বধ করায় গরুতে গেল, গরুকে বধ করায় ভেঁড়ায় গেল, ভেঁড়াকে বধ করায় ছাগলে গেল, ছাগলকেও বধ করায় মাটির মধ্যে গেল, সেখানে তাহাকে ধান্য আর যবের আকারে পাওয়া গেল। ইহা হইতে হইল পুরোডাশ।

কর্ম্মীদের মধ্যে এ ভাবটা ক্রমেই পুষ্টিলাভ করে, এবং তাহার ফলে সাক্ষাৎ পশুর পরিবর্ত্তে ঘৃতপশু ও পিষ্টপশুর ব্যবস্থা দেখা গেল। আরো পরে কুমাণ্ড ও ইক্ষুদণ্ডের বলি চলিতে আরম্ভ করিল।

কর্ম্মীরা যাহাই বলুন, নূতন জ্ঞানীর দল (সাংখ্য, বৌদ্ধ

জৈন) পশুহিংসা সহ্য করিতে পারিলেন না! তাঁহারা দেখিলেন, যে কর্ম্মে পশুহিংসা তাহা অপবিত্র, তাহা দ্বারা পরম মঙ্গল পাওয়া যাইতে পারে না।

আমরা দেখিয়া আসিয়াছি, ইঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞানীরাও বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, বৈদিক কর্ম্মের ফল স্থায়ী হয় না। ইঁহারাও উহা অনুসরণ করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, যাহার ফল স্থায়ী হয় না, তাহার প্রয়োজন কি?

তাঁহারা আরো বলিলেন, কর্ম্মীদের মতে নানারকমের কর্ম্ম আছে, অথচ ইহাদের সকলের ফল সমান নহে। কাহারো ফল বেশী, কাহারো কম। একজন একটি কর্ম্ম করিয়া যে ফল পাইল, অন্যে আর-একটা করিয়া হয় তাহা হইতে বেশী বা কম ফল পাইল। ইহাতে যে কম পাইল তাহার মনে কষ্ট হয়, তাহার তাহাতে দ্বেষ-হিংসা হয়। অতএব বৈদিক কর্ম্মে সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা নাই।

এইরূপে বৈদিক কর্ম্ম ইঁহাদের নিকট তুচ্ছ হইল। বৈদিক কর্ম্মের প্রামাণ্য যাইবার সঙ্গে-সঙ্গে তাহার প্রতিপাদক বেদেরও প্রতি শ্রদ্ধা নষ্ট হইল। তাঁহারা ইহা অতিক্রম করিয়া নূতন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

বেদকে ইঁহারা ছাড়িলেন। কর্ম্মীদের কথা তো একেবারেই ছাড়িলেন, তবে জ্ঞানীদের যেসব কথা যুক্তি-যুক্ত মনে হইয়াছিল সেইগুলিতে তাঁহাদের আপত্তি হয় নাই, হইবার কথাও নহে। যুক্তিকে সঙ্কোচ করিতে পারে, বেদের এমন কোনো শক্তি তাঁহাদের নিকট রহিল না।

যদিও বৈদিক কর্ম্মটা তাঁহারা ছাড়িয়া ছিলেন, তথাপি কোনো কর্ম্ম করিলে যে, তাহার ফলভোগ করিতেই হইবে, তা তাহা এই জন্মেই হউক আর পর জন্মেই হউক, এবং শুভ ও অশুভ যথাক্রমে পুণ্য ও পাপ কর্ম্মের উপর নির্ভর করে, এই কথাটা তাঁহাদের কেহ পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না।

বৈদিক কর্ম্ম ও বেদের প্রভাবকে অতিক্রম করিয়া ইঁহারা নূতন করিয়া ভাবিতে আরম্ভ করিলেন। আমরা দেখিয়াছি, কর্ম্মী ও প্রাচীন জ্ঞানীদের চিন্তার মূলে নিত্য আনন্দ, বা অমৃতত্ব-লাভের একটা আকাঙ্ক্ষা ছিল। কিন্তু এই নবীন জ্ঞানীদের অনেকেরই (সাংখ্য, বৌদ্ধ, নৈয়ায়িক বৈশেষিক,) প্রথম দৃষ্টি পড়িল দুঃখের দিকে—যাহা নানারূপে সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছে। পরে কি হইবে না হইবে তাহা পরের কথা, কিন্তু যে দুঃখের তাড়নাকে নানাভাবে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে হইতেছে তাহারই প্রতিকার আবশ্যক। হাত পুড়িয়া গেলে তাহার জ্বালাটা নিবারণ করিতে পারিলেই শান্তি পাওয়া যায়। তাই তাঁহারা দুঃখটাকেই দূর করিবার কথা লইয়া সমস্ত ভাবিতে লাগিলেন।

প্রাচীন জ্ঞানীদের অলৌকিক বিষয় দেখিবার প্রধান উপায় ছিল শাস্ত্র। যদি অনুমানের প্রয়োজন হইত, তবে সেই অনুমানকে শাস্ত্রের অনুকূলভাবে চলিতে হইত, প্রতিকূলভাবে যাইবার কোনো শক্তি তাহার ছিল না। শাস্ত্রের শাসন না থাকায় অনুমানটাই ইঁহাদের প্রবল হইয়া উঠিল। তাই এই অনুমানেরই সাহায্যে ইঁহাদের একদল(সাংখ্য)যাত্রা আরম্ভ করিলেন ব্যক্ত হইতে অব্যক্তে, স্থূল হইতে সূক্ষ্মে। তিনি এই ব্যক্ত স্থূল জগৎ দেখিয়া তাহারই কারণ অনুসন্ধান করিতে-করিতে সকলের মূল-ভূত কারণ এক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অব্যক্ত পদার্থের অনুসন্ধান পাইলেন। তিনি প্রথমে স্থূল ব্যক্ত জগতের মধ্যে তিনটি জিনিস দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন, এমন একটি জিনিস আছে যাহাতে বস্তুর প্রকাশ হয় ও তাহার লঘুতার উপলব্ধি হয়। আর-একটি জিনিস আছে যাহাতে বস্তুর প্রকাশ না হইয়া আবরণই হইয়া যায়, আর তাহার গুরুত্বের উপলব্ধি হয়। তাহা ছাড়া আরো একটি জিনিস আছে যাহা দ্বারা বস্তুর মধ্যে চেষ্টা-চলন, বা গতি দেখা যায়। কার্য্যের গুণ তাহার কারণে থাকিবেই। তাই প্রত্যক্ষ ব্যক্ত স্থূল জগতে যখন ঐ তিনটি গুণ আছে, তখন তাহার মূল কারণেও সেই তিনটি গুণ থাকিবে সেই মূল কারণটিকে তাঁহারা বলিলেন প্র কৃ তি। যেমন দুধ হইতে শর, শর হইতে মাখন, মাখন হইতে ঘি; এখানে ইহাদের সকলেই মূল প্রকৃতি দুধ, আর সবই তাহার বিকৃতি বা বিকার। আবার শর দুধের বিকার হইলেও মাখনের প্রকৃতি, এবং মাখনও শরের বিকার হইলেও ঘি-এর প্রকৃতি, এবং এইরূপেই এইসমস্ত উৎপন্ন হইয়াছে।

সেইরূপ মূল প্রকৃতি হইতে এই দৃশ্যমান সমস্ত জড় জগতের উৎপত্তি হইয়াছে।

এইরূপে জগৎ-উৎপত্তির সমাধান হইয়া গেলে ঈশ্বরের স্থান ইহাদের নিকট হইতে আপনা-আপনিই সরিয়া পড়িল; তাই দুঃখ দূর করিবার জন্য তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিবার কোনো আবশ্যকতা থাকিল না।

পুরুষ অসঙ্গ, একথা পূর্ব্বজ্ঞানীরা বলিয়াছিলেন। ইহারা তাহা মানিয়া লইলেন। একদিকে পুরুষ অসঙ্গ, অপরদিকে সে প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। এঅবস্থায় কিরূপে তাহার ভোগ বা দুঃখ হয়? অবিদ্যা বা অজ্ঞানে। এমন একটা তাহার অজ্ঞান আছে, যাহাতে সে সম্পূর্ণ ভিন্ন হইলেও প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে এক বলিয়া মনে করে। তাহাতেই তাহার ভোগ, তাহাতেই তাহার দুঃখ। যদি সে যথার্থরূপে জানিতে পারে যে, 'ইহা আমি নহি, ইহা আমার নহি, আমি ইহার নই',—যদি তাহার এইরূপ কে ব ল অর্থাৎ অবিমিশ্র জ্ঞানের উদয় হয়, তবে তাহার সমস্ত দুঃখের অবসান হয়।

যাগ-যজ্ঞাদি বাহ্য উপায়ে পরম সিদ্ধির সম্ভাবনা না দেখিয়া যখন ইহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞানীদের ন্যায় ইহারাও এইরূপ আভ্যন্তরিক উপায়ের কথা চিন্তা করিলেন, তখন আর-একদল এই আভ্যন্তরিক উপায়টি কি তাহা বিশেষ-রূপে ভাবিতে আরম্ভ করিলেন। ইহা হইতে যোগ ও যোগদর্শনের উদ্ভব হইল। যে-কোনোরূপে হউক, পরবর্ত্তী সমস্ত চিন্তার মধ্যে ইহার প্রভাব অব্যাহত হইয়া থাকিল। ঈশ্বর ইহাতে অপ্রধানভাবে স্থান পাইলেন, কারণ তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেও সিদ্ধির কোনো ব্যাঘাত হয় না।

একদিকে বৈদিক কর্ম্মমার্গ ও বেদের প্রামাণ্যের লোপ, এবং অপরদিকে প্রাচীন কর্ম্মীদের ন্যায় ঐ জ্ঞানীদের ঈশ্বর-অস্বীকারেও দুঃখধ্বংসের সমাধান অপর দুই শ্রেণীর (বৌদ্ধ ও জৈন) ভাবুকদের চিন্তার পথ সুগম করিয়া দিল। ইহাদের কথা পরে বলিতেছি।

এদিকে যখন ঈশ্বরমূলক সৃষ্টিতে সন্তোষ না হওয়ায় যেরূপ একদিকে প্রকৃতিমূলক সৃষ্টির চিন্তা হইল, সেইরূপ অপরদিকে কেহ-কেহ আবার ঐ ঈশ্বরমূলক সৃষ্টিকেই সমর্থন করিতে চেষ্টা করিলেন। ঈশ্বরমূলক সৃষ্টির কথায় পূর্ব্বজ্ঞানীরা বলিতেন, এক ঈশ্বরই সৃষ্টির উপাদানকারণ ও নিমিত্তকারণ উভয়ই। ইহাদের কাছে ইহা ঠিক মনে হইল না। যাহা দিয়া কোনো জিনিস করা যায়, এবং যে তাহা করে, এই দুইটি এক হইতে পারে না। ইহারা বলিলেন, ঈশ্বর সৃষ্টির নিমিত্তকারণ কিন্তু তাহার উপাদান-কারণ হইতেছে প র মা ণু। ইহাদের এক দল (বৈশেষিক) ইহারই প্রসঙ্গে প্রধানত স্থূল জগতের দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম প্রভৃতি পদার্থ-তত্ত্ব, আর অপর দল (নৈয়ায়িক) প্রধানত প্রমাণ-মূলক তর্কবিদ্যার চিন্তা করিতে লাগিলেন—যদিও ইহাদেরও মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল নিঃ শ্রে য় স বা দুঃখের একে-বারে নিবৃত্তি। তর্কবিদ্যা বৌদ্ধ ও জৈন-গণেরও প্রতিভায় নানাপ্রকারে পুষ্টিলাভ করিল।

একটু আগেই ইহাদের কথা উঠিয়াছিল, বলিয়াছিলাম ইহাদের কথা পরে বলিতেছি। তাহাই বলি। ইহাদের মধ্যে একদল (জৈন) আত্মার কথা ভাবিতে গিয়া দেখিলেন যে, পূর্ব্বে যাঁহারা আত্মার কথা বলিতেন তাঁহারা সকলেই মনে করিতেন যে, তাহা নিত্য। কিন্তু বস্তুতই কি তাহাই? সত্যই কি তাহা একেবারে নিত্য? নিত্য তো তাহাকেই বলা যায় যাহার স্ব-রূপ কখনো নষ্ট হয় না; অপর কথায়, যাহা বরাবর একইরূপে থাকে, একটুও তাহার ব্যত্যয় হয় না। তাহাই যদি হয়, তবে তো আত্মার সুখ-দুঃখ বন্ধ-মোক্ষ কিছুই হইতে পারে না। কারণ আত্মা যখন সুখ ভোগ করিয়া দুঃখ ভোগ করে, বা দুঃখ ভোগ করিয়া সুখ ভোগ করে, তখন তো তাহার একইরূপে থাকা হয় না। সুখভোগের সময় সে একরূপ, আর দুঃখ ভোগের সময় আর-একরূপ। তাই এইপ্রকারে তাহার স্বরূপ যখন পরিবর্ত্তন হইল তখন তাহা কিরূপে নিত্য হইতে পারে? আবার ইহাকে একবারে অনিত্যও বলা চলে না। কেননা, দুঃখ ও সুখ উভয়ই ভোগ করে একা সে-ই। সে সুখভোগেও আছে, দুঃখভোগেও আছে, সুখের বা দুঃখের নাশের সঙ্গে তাহার নাশ হয় নাই। তেমনি বন্ধের সময় আত্মা একরূপ, মোক্ষের সময় আর একরূপ। তাই যদি তাহাকে একবারেই একই-রূপ বলিয়া স্বীকার করা হয়, তবে হয় তাহার কেবল বন্ধই থাকিবে, অথবা কেবল মোক্ষই থাকিবে, দুই-ই তাহার হইতে পারে

না। তাই বলিতে হয়, আত্মা অনেক-রূপ। যে-কোনো দ্রব্য আছে তাহার একদিকে যেমন উৎপত্তি ও বিনাশ, অপরদিকে সেইরূপ ধ্রুবত্ব বা নিত্যত্ব। একটা সোনার টুকরা হইতে বালা হইল, বালা ভাঙিয়া আবার মালা করা হইল। এখানে যখন বালা হইল তখন টুকরাটা নষ্ট হইয়াছে, আবার যখন মালা হইল তখন বালাও নষ্ট হইয়াছে, অথচ ঐ সোনা জিনিসটা যে-কোনো-রূপেই হউক বরাবর তাহাদের ভিতর দিয়া চলিয়া আসিয়াছে,—স্থিরভাবে আছে; বিভিন্ন আকারের মধ্যে তাহার বর্ণ বা উজ্জ্বলতা প্রভৃতি নষ্ট হইতে পারে, কিন্তু তাহা যে একটা জিনিস এই ভাবটা যায় না। তাই সব জিনিসেরই একদিকে বিনাশ ও উৎপত্তি এবং অপরদিকে তাহা স্থির। অতএব আত্মারও উৎপত্তি-বিনাশ আছে, এবং তাহা নিত্যও বটে। তাই তাহাকে একেবারে নিত্যও বলা যাইতে পারে না, অনিত্যও বলা চলে না, তাহা নিত্য ও অনিত্য উভয়ই। আত্মার সম্বন্ধে তাঁহারা আর-একটা কথা বলিলেন। কোনো বাহ্য পদার্থের শারীরিক সংসর্গে আত্মার বন্ধন হয়, পূর্ব্বে কেহ ভাবেন নাই, ইঁহারা তাহাই করিলেন, এবং ইহা করিতে গিয়া কাপড় প্রভৃতি জিনিসের যেমন ভিন্ন-ভিন্ন প্রদেশ বা অংশ থাকে, ইঁহারা বলিলেন, আত্মারও সেইরূপ প্রদেশ আছে। তেল মাখিলে যেমন গায়ে চারিদিক্ হইতে ধূলা আসিয়া তাহা মলিন করিয়া তোলে, সেইরূপ রাগ-দ্বেষাদির উদ্রেকে শরীর, মন, ও বাক্যের ক্রিয়ায় আত্মার ঐসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম অংশে কর্ম্মযোগ্য পরমাণুপুঞ্জ লাগিয়া ঠিক জল ও দুধের মত, বা আগুন ও গরম লোহার মত একবারে মিশিয়া যায়। ইহাই আত্মার বন্ধ আর ইহার ক্ষয়ই হইতেছে মুক্তি।

দার্শনিক চিন্তার মূল ধারায় বিষম পরিবর্ত্তন হইল অপর দলের (অর্থাৎ বুদ্ধদেব ও তাঁহার অনুগামিগণের) হস্তে। ইঁহারা একবারে বিপরীত দিক্ হইতে ভাবিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু, বলিয়াছি, দেখা যাইবে, আবার সেই পূর্ব্ব জ্ঞানীদেরই সহিত ইঁহারা একই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন।

আমরা দেখিয়াছি, আমাদের দার্শনিক চিন্তার প্রথম ভূমি বা সূত্র ছিল আত্মা। ইঁহারা ভাবিলেন, আত্মা বলিয়া বস্তুত কিছুই নাই। চাকা-প্রভৃতি ভিন্ন-ভিন্ন অঙ্গের যোগে বলা হয় যে, ইহা একখানি গাড়ী, কিন্তু সেখানে গাড়ী বলিয়া পৃথক্ কোনো বস্তুই নাই, যাহা আছে তাহা কেবল চাকা-প্রভৃতি ভিন্ন-ভিন্ন অঙ্গ। ঐ অঙ্গগুলিকেই ধরিয়া কেবল ব্যবহারের জন্য 'গাড়ী' এই শব্দটা বলা হইয়া থাকে। কিন্তু বস্তুত ঐ অঙ্গগুলি ছাড়া সেখানে অন্য কিছুই নাই। সেখানে 'গাড়ী' ইহা একটা সঙ্কেত, বা নাম ছাড়া আর কিছুই নহে। শরীরেরও মধ্যে তেম্নি ভিন্ন-ভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি ছাড়া এমন কিছুই নাই, যাহাকে আত্মা বলিতে পারা যায়। 'গাড়ীর' মত 'আত্মা' ইহাও একটা শব্দমাত্র, নামমাত্র, সঙ্কেতমাত্র, ইহা কেবল ব্যবহারমাত্র।

আমাদের এই শরীরটা তন্ন-তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে প্রধানত দুই শ্রেণীর বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়। কতকগুলি পদার্থ এমন আছে যাহা শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতিতে বিকার প্রাপ্ত হয় (রূপ), যেমন, মাংস, চর্ম্ম ইত্যাদি। সুবিধার জন্য আমরা ইহাকে 'শারীরিক' বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। আর কতকগুলি পদার্থ আছে যাহাকে আমরা 'মন', ও 'মানসিক' (নাম) বলিয়া সহজ ভাষায় ধরিতে পারি।

এই স্থানে প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা বলিয়া লই। এই মন ও মানসিক পদার্থকে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম-ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে গিয়াই ইঁহাদের অপূর্ব্ব মনস্তত্ত্বশাস্ত্রের উৎপত্তি হইল।

ঐ যে দুই-রকম পদার্থ, শারীরিক এবং মন ও মানসিক, তাহা ছাড়া আর কিছুই নাই, যাহাকে আত্মা বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

আবার যাঁহারা আত্মার কথা কহিয়া থাকেন তাঁহাদের মতে আত্মা নিত্য। তাহাই যদি হয়, তবে স্পষ্টই দেখা যায়, ঐ উভয়-শ্রেণীর পদার্থের মধ্যে এমন একটিও নাই যাহার ধ্বংস নাই, যাহা নিত্য। অতএব যাহা অনিত্য, কিরূপে তাহা আত্মা হইবে?

আবার, যাহা অনিত্য তাহা সুখ না দুঃখ, এই প্রশ্ন করিলে সকলেই বলিবেন, তাহা দুঃখ। অতএব যাহা দুঃখ,

কে তাহাকে বলিবে যে, 'ইহা আমি' বা 'ইহা আমার'? কিরূপে ইহা আত্মা বা আত্মার হইতে পারে?

তাই সবই অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মা।

বুদ্ধদেবের এই অনাত্মদর্শনের মূ: কথা ছিল। তিনি দেখিয়াছিলেন, এই যে দুঃখ ইহার মূল কারণ হইতেছে তৃষ্ণা বা আসক্তি। আসক্তির কারণ হইতেছে 'আমি' ও 'আমার', 'অহং' ও 'মম', 'আত্মা' ও 'আত্মীয়' এই বুদ্ধি। তাই যতক্ষণ এই 'আত্মা' ও 'আত্মীয়' বুদ্ধি না যাইতেছে, ততক্ষণ তৃষ্ণা যাইবে না, তৃষ্ণা না গেলে দুঃখও যাইবে না। তাই তাঁহাকে এইরূপে আত্মাকে অস্বীকার করিতে হইল। তাঁহার এই অনাত্মদর্শনকে প্রাচীন জ্ঞানবাদীদের আত্মদর্শনের প্রতিক্রিয়া বলিতে পারা যায়।

এই পর্য্যন্তই নহে। এই অনাত্মবাদ অনাত্মবাদিগণকে আরো অনেক দূরে লইয়া গেল। তাঁহারা একবারে শূন্যবাদে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন, যতক্ষণ পর্য্যন্ত মানুষের 'ইহা একটি ফুল', 'ইহা একখানি মালা,' 'ইহা শরীর,' 'ইহা ইন্দ্রিয়,' এইরূপ এক-একটি বস্তু বলিয়া বুদ্ধি থাকিবে, ততক্ষণ 'আমি' ও 'আমার' এজ্ঞান যাইবে না। যখন 'ফুল' বলিয়া, 'মালা' বলিয়া, 'শরীর' বলিয়া, 'ইন্দ্রিয়' বলিয়া, 'পুত্র' বলিয়া, 'বিত্ত' বলিয়া, কোনো বুদ্ধি হইবে না তখন 'আমি' ও 'আমার' বুদ্ধিও সুতরাং হইবে না। যখন সবই শূন্য, তখন সেই বুদ্ধির অবলম্বন হইবে কি?

ভাল, কিন্তু এই শূন্য শব্দের অর্থ কি? ইহা দ্বারা কি বুঝিতে হইবে? ইহা দ্বারা কি ইহাই বুঝিতে হইবে যে, আকাশের মত সমস্তই ফাঁক, শূন্য কিছুই না? না; কখনই তাহা নহে। শূন্যতা শব্দের অর্থ বস্তুর আসল রূপ (দার্শনিক ভাষায় স্ব স্ব রূ প তা, পারিভাষিক ভাষায় ত থ তা, ধ র্ম্ম ধা তু)। আর ঐ আসল রূপটি ইহাই যে, তাহার স্ব ভা ব বলিয়া কিছু নাই। স্বভাবত কোনো বস্তুরই উৎপত্তি নাই। স্বভাবতই যদি কোনো-কোনো বস্তু থাকে, তবে তাহার উৎপত্তির কোনো কারণই থাকিতে পারে না। অঙ্কুর যদি স্বভাবতই থাকে, তবে অঙ্কুরের হেতু অর্থাৎ মূল কারণ (বীজ) ও প্রত্যয় অর্থাৎ সহকারী কারণ (অনুকূল ঋতু প্রভৃতি), এই উভয়ের কোনোটির প্রয়োজনই থাকে না। বস্তুর এই যে নিঃস্বভাবতা, এই যে স্বভাবত অনুৎপত্তি, অথচ এই যে, হেতু ও প্রত্যয়ের যোগে প্রাদুর্ভাব, ইহারই নাম শূন্যতা। তাই যাহা স্বভাবত উৎপন্ন হয় না, তাহার অস্তিত্ব নাই, আর যাহার অস্তিত্বই নাই তাহার ধ্বংসও নাই, তাহা ভাবেরও মধ্যে নহে, অভাবেরও মধ্যে নহে, তাহা শূন্য।

যখন সবই শূন্য, তখন কোনো বস্তুর যোগে রাগ, দ্বেষ ও মোহের সম্ভাবনা থাকে না। রাগ, দ্বেষ, মোহ না থাকিলে চিত্ত নির্মল হয়। নির্মল চিত্ত নিরুদ্ধ হয়। চিত্তের নিরোধে নির্ব্বাণের সাক্ষাৎকার পাওয়া যায়। নির্ব্বাণের সাক্ষাতে সমস্ত দুঃখের অবসান হয়, এবং তাহা হইলে সমস্ত কর্ত্তব্যের পরিসমাপ্তি হয়।

ইহারা যখন এইরূপে এই স্থানে উপস্থিত হইলেন তখন অন্যান্য ভাবুকদের চিত্ত সেইদিকে আকৃষ্ট হইল। প্রাচীন জ্ঞান-পন্থীরা নিজেদের তত্ত্বের বেদান্তের নূতন ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন। গৌড়াচার্য্য বা গৌড়পাদের কথায় তাহা প্রথম প্রকাশ পাইল। তাঁহারই মত লইয়া শঙ্করের অদ্বৈতবাদ প্রণালী বদ্ধ হইল। ইহা তাঁহাদিগকে কোথায় লইয়া গেল? কোথায় ইহারা ব্রহ্মের অনুভূতি দেখিতে পাইলেন? চিত্তের ঐ সর্ব্বতোভাবে নিরোধে। গৌড়পাদ, ভাঙিয়া-চুরিয়া স্পষ্ট কথায় বলিলেন, চিত্ত যখন সর্ব্বতোভাবে নিরুদ্ধ হয়, যখন তাহা সম্পূর্ণরূপে স্থির, নিষ্কম্প, এবং এইরূপে তাহাতে কোনো বস্তুর কোনো আভাস বা ছায়া থাকে না, তখন তাহাই ব্রহ্ম। যোগ-দর্শন কৈ ব ল্যে র কথা ভাবিয়া এইখানেই আসিয়া পৌঁছিয়াছিল—সাঙ্খ্যদর্শন কে ব ল জ্ঞানের কথা ভাবিয়া ইহাই লক্ষ্য করিয়াছিল। (তবে হয়তো এক-পা-মাত্র ইহার পেছনে ছিল।) ভক্তিপন্থীদেরও কেহ কেহ ইহারই মধ্যে বিষ্ণুর পরম পদকে দেখিতে পাইয়াছিলেন—যদিও বিভিন্ন পথ দিয়া আসিতে হইয়াছিল। তাহার পর, পরবর্ত্তী চিন্তায় এই ভাবের সামান্য প্রভাব লক্ষিত হয় নাই।

এপর্য্যন্ত আমি আপনাদের নিকটে আমাদের দেশের দার্শনিক চিন্তার কয়েকটি মাত্র মূল ধারাকে কেবল স্পর্শ

করিবার দুর্ব্বল চেষ্টা করিয়াছি। সবগুলির নামোল্লেখও সহজ নহে, এবং করিয়াও বিশেষ-কিছু লাভ নাই। কিন্তু এই দর্শনচিন্তার ধারা কত দিকে কত রকমে কত শাখা-প্রশাখায় ধাবিত হইয়াছে তাহা অনুসরণ করিতে পারিলে ভারতবর্ষের মনের গতি একটা দিক্‌কে বুঝিবার বিশেষ সুবিধা হয়।

দেশের দার্শনিক চিন্তাগুলিকে একত্র সংগ্রহ করিয়া দেখিবার চেষ্টা, বা সাধারণ পাঠকগণের সম্মুখে তাহা উপস্থিত করিবার চেষ্টা পূর্ব্বে মধ্যে-মধ্যে হইয়াছে। কিন্তু ঐসব সংগ্রহ-গ্রন্থে যাহা সংগ্রহীত হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা যাহা সংগৃহীত হয় নাই তাহারই সংখ্যা বেশী। তাই এখন নূতন করিয়া একখানি সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ লিখিবার প্রয়োজন আছে। ইহার উপকরণের অভাব নাই, চারিদিকে প্রচুর-পরিমাণে ছড়াইয়া পড়িয়া আছে, একটু সংগ্রহ করিয়া সাজাইয়া-গুছাইয়া লইলেই হয়।

সমস্ত দর্শনই যে আগা-গোড়া প্রণালীবদ্ধ হইয়াছিল তাহা নহে, কিন্তু তাহা যে-কোনো অবস্থাতেই থাকুক না কেন, সংগৃহীত হইলে দার্শনিকের দৃষ্টিতে তাহার মূল্য আছে।

ইহার জন্য কেবল সংস্কৃত, পালি বা প্রাকৃতেই লিখিত ধর্ম্ম বা দর্শন-শাস্ত্রগুলি অনুসন্ধান করিলে চলিবে না। বর্ত্তমান ধর্ম্মমতগুলিকেও দেখিতে হইবে, মধ্যযুগীয় প্রাদেশিক ভাষায় লিখিত ধর্ম্মমতের গ্রন্থগুলিকেও আলোচনা করিতে হইবে। কারণ, আমাদের দেশের দর্শনচিন্তা কেবল একটা জ্ঞানচর্চ্চার আনন্দের জন্য উৎপন্ন হয় নাই, ইহার সহিত সমস্ত ধর্ম্মজীবনের সম্বন্ধ ছিল—যাহা প্রত্যেকেরই আজীবন সাধনার বিষয় ছিল, দর্শন ও ধর্ম্মের এইরূপ একটি অচ্ছেদ্য বা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকাতেই আমাদের দেশে দর্শন একটি জীবন্ত বস্তুর ন্যায় ছিল। ইহা প্রত্যেকেরই অবশ্যজ্ঞাতব্য ছিল। সেইজন্যই যখন ধর্ম্মপিপাসা জাগিল বা জাগান হইল তখন ধর্ম্মেরই সঙ্গে দেশের দর্শনও উত্তরে, পূর্ব্বে ও দক্ষিণে দুর্গম মরু-পর্ব্বত, নদ-নদী সমুদ্র অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিয়াছিল।

বর্ত্তমানে ঐ অবস্থার পরিবর্ত্তন হইলেও, আনন্দের বিষয়, যে-কোনো-রূপে হউক, ভারতীয় দর্শনের প্রসার রুদ্ধ হয় নাই। এবার ইহার ডাক পড়িয়াছে পশ্চিমে। ধর্ম্মের সহিত সেখানে ইহার যোগ না থাকিলেও জ্ঞান হিসাবে ইহার আদর ক্রমশই বাড়িতেছে, এবং আশা করা যায় উত্তরোত্তর বাড়িবে।

পশ্চিম আমাদের দর্শন আলোচনা করিতেছে, আমরাও যে পশ্চিমের দর্শনের আলোচনা করিতেছি না তাহা নহে, কিন্তু ঐ চীন-তিব্বত-খোটান প্রভৃতির অধিবাসীরা আমাদের দেশের দর্শনকে যেমন করিয়া লইতে পারিয়াছিলেন, অথবা পশ্চিমেরই অধিবাসীরা সম্প্রতি যেমন করিয়া লইতেছেন, আমরা সেইরকম করিয়া লইতে পারিতেছি কি? প্রশ্নটা একটু ভাবিয়া দেখা ভাল।

অন্যের কথা ছাড়িয়াই দেওয়া যাউক। যাঁহারা আমাদের প্রতিবাসী যাঁহাদের সঙ্গে আমরা একত্র বহুকাল হইতে বসবাস করিয়া আসিয়াছি, করিতেছি, ও করিব, সেই মুসলমানদের ধর্ম্ম, দর্শন, নীতি-বিজ্ঞান জানিবার জন্য, আমরা কতটুকু করিয়াছি ও করিতেছি? আমার তো মনে হয়, এবিষয়ে ঔদাসীন্য কখনো ভাল নহে। হিন্দুদের দিক্ হইতে বলিতে পারা যায়, তাঁহারা এই ঔদাসীন্যে মুসলমানদের ভিতরের দিক্‌টা দেখিতে না পাইয়া অজ্ঞতার যাহা পরিণাম তাহা পাইয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে আমাদের আপর প্রতিবেশী পারসীদের কথা কি মনে করিবার নাই?

আমাদের দর্শন-সম্বন্ধে আর-একটি কথা না বলিয়া আমি শেষ করিতে পারিতেছি না। নূতন যেমন আমাদিগকে সঞ্চয় করিতে হইবে, সেইরূপ, যাহা আমরা হারাইয়াছি, তাহারও উদ্ধার করিতে হইবে—যদি উদ্ধারের উপায় থাকে। আমরা কত কি হারাইয়াছি, তাহা যে-কেহ তিব্বতী ও চীনা ভাষায় অনূদিত বৌদ্ধ ও অন্যান্য ভারতীয় গ্রন্থের তালিকার দিকে একটু দৃষ্টিপাত করিলে বুঝিতে পারিবেন। কি সর্ব্বনাশই হইয়া গিয়াছে। ঐ দুই দেশে যখন বৌদ্ধধর্ম্মের পিপাসা প্রবলভাবে জাগিয়া উঠিয়াছিল, আর সেই সূত্রে ভারতের সঙ্গে তাহাদের ঘনিষ্ঠভাবে যোগ হইয়াছিল, চীন-তিব্বতের পণ্ডিতেরা ভারতে, এবং ভারতের পণ্ডিতেরা চীন-তিব্বতে গমনাগমন করিতেছিলেন, পরস্পরের ভাষাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতেছিলেন, তখন দুই সহস্রের

অধিক সংস্কৃত পুস্তক চীনা ভাষায় অনুবাদ করা হয়। এইসমস্ত পুস্তকের অধিকাংশই বৌদ্ধ দর্শন ও ধর্ম্ম-বিষয়ের এবং কিছু-কিছু অন্য বিষয়েও ছিল। তিব্বতী ভাষাতেও এইরূপ সহস্রাধিক অনুবাদ বর্ত্তমান আছে। কোনো-কোনো পুস্তক আবার উভয় ভাষাতেই অনুবাদ করা হইয়াছে। এইসমস্ত অনুবাদ দেখিলে বুঝা যায় ঐসময়ের ভারতীয় পণ্ডিতেরা ঐ দুই ভাষায় কেমন অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। যাহাই হউক, ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য, এইসমস্ত তিব্বতী ও চীনা অনুবাদের অধিকাংশেরই মূল সংস্কৃত পাওয়া যায় না। হয়তো কোনো দিনেও পাওয়া যাইবে না। অথচ তাহার মধ্যে কি আছে না জানিলে আমাদের কি ক্ষতি তাহা আপনারা সহজেই অনুমান করিতে পারিবেন। আমাদিগকে ইহার পুনরুদ্ধার করিতেই হইবে, এবং তাহা গুরুশ্রমসাধ্য হইলেও অসাধ্য নহে। এইসমস্ত অনুবাদ এমন সুন্দর প্রণালীতে ও এমন যথাযথরূপে আক্ষরিক ভাবে করা হইয়াছে যে, যাঁহার একদিকে সংস্কৃত ও তিব্বতী বা চীনা ভাষায় উত্তম অধিকার, ও অপর দিকে আলোচ্য বিষয়টি সম্বন্ধে বিশেষ ব্যুৎপত্তি আছে, তাঁহার পক্ষে ঐ লুপ্ত সংস্কৃত উদ্ধার করা অসাধ্য নহে। মনে হয়, ভাষান্তর অপেক্ষা প্রথমে সংস্কৃতে অনুবাদ করাই সহজ এবং সেইজন্য, আর এই কারণে তাহা বাঞ্ছনীয় যে, সেই সংস্কৃতকে ভাষান্তর করিবার লোকের অভাব হইবে না, আর তাহাতে মূলেরই ভাবটা অধিক-পরিমাণে রক্ষিত হইবার সম্ভাবনা আছে। চীনা-তিব্বতীর রুশীয়, জার্ম্মানী, ফরাস ও ইংরেজী অনুবাদের অনুবাদ করিতে গেলে তাহা কেমন দাঁড়াইবে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। সুবিধা দিলে এবিষয়ে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের নিকটে আমরা অনেক কাজের আশা করিতে পারি। ইহাদেরই পূর্ব্ববর্ত্তীগণ ঐসমস্ত অনুবাদের অগ্রণী ছিলেন।

আমরা চীন-তিব্বতের এত কাছে থাকিলেও এবং এত স্বার্থের যোগ থাকিলেও বসিয়া আছি, কিন্তু সাত সমুদ্র তের নদীর পারে থাকিলেও ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এবিষয়েও অনেক—অনেক দূরে অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন। আমরা যেন ভুলিয়া না যাই, তাঁহারা যাহা দিতেছেন তাহা লইবার ক্ষমতাও আমাদের অতি অল্পই আছে। তাঁহাদের ভাষা আমাদের কয় জন জানেন? ইংরেজীতে কতটুকুই বা পাওয়া যায়?

আমাদের দেশে স্বর্গীয় শরচ্চন্দ্র দাস ও সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় তিব্বতী হইতে বস্তুত কিছু উদ্ধার করিয়া আমাদিগকে দিয়াছেন। সে দিন বোম্বাই-সাংগলী কলেজের সংস্কৃত ও পালির অধ্যাপক পি, এল, বৈদ্য মহাশয় তিব্বতী হইতে লুপ্ত সংস্কৃতের উদ্ধার-সম্বন্ধে কিছু নিদর্শন দিয়াছেন, ভবিষ্যতে তাঁহার নিকট আমাদের বিশেষ আশা আছে। কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় তিব্বতী ও চীনা আলোচনার ব্যবস্থা করিয়াছেন, ইহার ফল এখনো প্রকাশ হয় নাই। আর বিশ্বভারতীও নিজের ক্ষুদ্রশক্তির অনুসারে ঐ উভয়ের আলোচনার কিঞ্চিৎ ব্যবস্থা করিয়াছেন, এখনো বলা যায় না তাহাতে কতটা কি ফল পাওয়া যাইবে। এই তো আমাদের চীনা-তিব্বতী আলোচনার কথা, অতি সামান্য, কিন্তু কর্ত্তব্য আমাদের গুরুতর। যদি ভাল মনে করেন, আপনারা ইহা ভাবিয়া দেখিবেন। ইহাই আমার আপনাদের নিকট সবিনয় নিবেদন।

পুস্তক-পরিচয়

গড্ডলিকা—পরশুরাম রচিত এবং শ্রী যতীন্দ্রকুমার সেন দ্বারা ২৯ খানি চিত্রে বিচিত্রিত। মূল্য পাঁচ সিকা।

বাংলাদেশে নির্দ্দোষ হাসির বই নাই—সে কয়খানি বই আছে তাহা ভাঁড়ামোর। আলোচ্য বইখানি নির্ম্মল ব্যঙ্গ কৌতুকে পরিপূর্ণ। ইহার প্রত্যেকটি গল্পই অতি চমৎকার হইয়াছে। ছবিগুলিরও ভঙ্গি দেখিলে অতিরিক্ত গম্ভীর-প্রকৃতির লোকেরও মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিবে। বইখানির ছাপা, কাগজ, বাঁধাই এবং প্রচ্ছদ-পটের ছবি, সকলই নয়নরঞ্জন হইয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে এইরূপ পুস্তকের আবির্ভাব বিশেষ আশাপ্রদ।

এই বইখানি বাংলা সাহিত্য রসিকদের অতি আদরের বস্তু হইবে, ইহা নিঃসন্দেহ।

গান

আজ কি তাহার বারতা পেলরে
কিশলয় ?
ওরা কার কথা কয়
বনময় ?
আকাশে-আকাশে দূরে-দূরে
সুরে-সুরে
কোন্ পথিকের গাহে জয় ?
যেথা চাঁপা-কোরকের শিখা জ্বলে
ঝিল্লি-মুখর ঘন বন-তলে,
এস কবি, এস, মালা পর,
বাঁশি ধর,
হোক্ গানে-গানে বিনিময় ॥

স্বরলিপি

কথা ও সুর—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বরলিপি—শ্রী অরুন্ধতী দেবী

II র্সা র্গা র্গা র্রা । র্রা া র্সা না I ধনা -া ধা পজ্ঞা । গা -া -া -া I -া -া সা রা ।
আ জ কি তা হা র্ বা র তা • পে ল রে • • • • • কি শ

রগা -া -া -া I -া -া সা রা । সা -পা পা জ্ঞা I গা -া -া -া । -া -া সা রা I
ল য় • • • • ও • রে • কি শ ল • • • • য় ও রা

{সা পা পা জ্ঞা । পা পা গা মা I (গা -া -া ধা । পা পা গা রা) } গা -া -া -া ।
কা র ক • থা • ক য় রে • • • • • • • রে • • •

-া -া সা রা I রগা -া -া -া । -া -া র্সা র্রা র্গা -া -া -া । -া -া র্রা র্সা II
• • ব ন ম • • • • য় ব ন ম • • • • • • য়

পা গা II প -া পা -া । জ্ঞা ধা ধা -া I -া -া পা ধা । ধা র্সা র্সা -া I -া -া পা ধা ।
আ কা শে • আ • কা • শে • • • দূ রে দূ • রে • • • সু রে

ধা -র্সা র্সা -া I -া -া -া -া । র্গা -া র্গা র্গা I র্রা র্রা র্রা র্রা । র্সা র্সা র্সা র্সা I
সু • রে • • • • • কো ন্ প থি কে র্ গা হে জ য় গা হে

না -া না না । ধা -া পা পা "কার কথা কয়" ইত্যাদি
জ য়্ গা হে জ য়্ "ও রা"

পা ধা II ধর্সা র্সা র্সা র্সা । র্সা র্সা র্সা র্সা I না -র্রা র্সা -া । -া -া -া -পা I
যে থা চাঁ পা কো র কে র শি খা জ্ব • • লে • • • •

পা ধা না না । না না না র্সা ধা না-নর্সা না । ধপা -া পা গা I
ঝি • ল্লি মু খ র ঘ ন ব ন ত • লে • এ স

পা -া পা -া । জ্ঞা ধা ধা -া -া -া পা ধা । পা র্সা র্সা -া I
ক • বি • এ • স • • • মা লা প • র •

-া -া পা ধা । ধা র্সা র্সা -া -া -া -া -া । সা র্গা র্গা র্গা I
• • বাঁ শি ধ • র • • • • • হো ক্ গা নে

র্রা র্রা র্রা র্রা । র্সা -া র্সা র্সা I র্সা র্সা না না । ধা -া পা পা I
গা নে বি নি ম য়্ গা নে গা নে বি নি ম য়্ "ও রা" "কার কথা কয়
ইত্যাদি II II

নারীরক্ষা-সমিতির নিবেদন

বৎসরাধিক কাল পর্য্যন্ত দেশবাসী শুনিয়া আসিতেছেন, যে, দুর্বৃত্তগণ হিন্দু-মুসলমান নারীগণকে অপহরণ করিয়া তাহাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিতেছে। সেইসকল অসহায়া ও লাঞ্ছিতা নারীগণের করুণ মর্ম্মান্তিক কাহিনী সকলেই অবগত হইতেছেন। বঙ্গদেশের রংপুর জেলাতেই এই অত্যাচার বিশেষভাবে হইতেছে। গাইবান্ধা সবডিভিসানের অন্তর্গত পলাশবাড়ীর কেশবচন্দ্র মহান্তের স্ত্রী "বরদাসুন্দরীর মামলা" এই-সকল নারীনিগ্রহের মধ্যে একটি প্রধান ঘটনা। এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত দুর্বৃত্তগণ বরদাসুন্দরীকে নানাস্থানে লুকাইয়া রাখে। তাহারা সংখ্যায় ছিল প্রায় ২০ জন। জনসাধারণের চেষ্টায় তাহার উদ্ধার সাধন হয়। রংপুরের জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয়গণ যদি যথাসময়ে অনুগ্রহপূর্ব্বক এই ঘটনায় হস্তক্ষেপ না করিতেন তবে এই দুষ্ট দলকে বিচারার্থ আদালতে উপস্থিত করাই সম্ভব হইত না।

আসামীদের মধ্যে ৯ জন গ্রেপ্তার হইয়া রংপুরের সেশন জজের আদালতে ৩৫-দিনব্যাপী বিচারের পর জুরীগণের সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে দীর্ঘকালের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। কিন্তু আসামীগণ হাইকোর্টে আপীল করিলে পর বিচারপতিগণ, জুরীগণকে ভালরূপে মোকদ্দমা বুঝানো হয় নাই, এই দোষের জন্য মোকদ্দমা পুনর্ব্বিচারে আদেশ দিয়াছেন।

এই মোকদ্দমার প্রথম বিচারের সময় হিন্দুমুসলমান জনসাধারণের অর্থ-সাহায্যেই মোকদ্দমা চালানো হইয়াছিল। কারণ স্ত্রীলোকটি ও তাহার স্বামী নিঃসহায় ও দরিদ্র। প্রথমবারে ৫০০০৲ টাকা সংগৃহীত ও ব্যয়িত হইয়াছিল। এক্ষণে পুনর্ব্বার বিচারের আদেশ হইয়াছে, তখন মোকদ্দমা চালাইবার জন্য আবার অর্থ-সাহায্যের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

এইসকল নারীনির্য্যাতন ব্যাপার বঙ্গদেশে নিত্য সংঘটিত হইতেছে। লাঞ্ছিত ব্যক্তিগণের উপরে ও সমাজের উপরে ইহার ফল অত্যন্ত নিদারুণ ও বিষময়। আমরা আশা করি, দেশহিতৈষী মহানুভব ব্যক্তিগণ এই অবস্থা বিশেষরূপে প্রণিধান করিয়া দেখিবেন। আমরা পুনর্ব্বার সর্ব্বসাধারণের নিকট অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। যাহাতে এই মামলাটি সুচারুরূপে চালানো যাইতে পারে, সেইজন্য, আশা করি, দয়াবান্ দেশবাসী সকলেই যথাসাধ্য অর্থ দান করিয়া দুর্বৃত্তগণের শাস্তিবিধানের ব্যবস্থা ও নিঃসহায় নারীজাতির অশ্রুজল মোচনের চেষ্টা করিবেন।

যিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক যাহা কিছু সাহায্য করিবেন, তাহা কোষাধ্যক্ষের নিকট অথবা নিম্নস্বাক্ষরকারিগণের মধ্যে অপর কাহারও নিকট পাঠাইবেন। ইতি

নিবেদকগণ—

শ্রী সতীশরঞ্জন দাস—সভাপতি, ৭নং হাঙ্গারফোর্ড্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—সহঃ সভাপতি, ১৩৯নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রী যতীন্দ্রনাথ বসু—কোষাধ্যক্ষ, ১৪নং বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রী কৃষ্ণকুমার মিত্র—সম্পাদক, ৬নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

—

ছাত্রগণের সামরিক শিক্ষা

কোন-কোন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কলেজের ছাত্রগণকে যুদ্ধবিদ্যা শিখাইবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই যাহাতে এইরূপ শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হয়, অনুকূল লোকমত উৎপাদন করিবার নিমিত্ত শ্রীযুক্ত রঘুনাথ পুরুষোত্তম পরাঞ্জপ্যে এই বিষয়ে ভিন্ন-ভিন্ন প্রদেশে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেছেন।

দেশের অধিবাসী সুস্থ সবল-দেহ যে-কোন যুবক সেনাদলে ভর্ত্তি হইতে চায়, পদ খালি থাকিলে তাহাকে ভর্ত্তি করা উচিত। ভারতবর্ষে সাধারণতঃ কতকগুলি জাতির লোককে এই ওজুহাতে সেনাদলে ভর্ত্তি করা হয় না, যে, তাহারা "অসামরিক" জাতি, অর্থাৎ তাহারা যুদ্ধপ্রিয়, যুদ্ধ-নিপুণ, বা যুদ্ধ-ব্যবসায়ী জাতি নহে। গত মহাযুদ্ধের সময় কিন্তু বাঙালী প্রভৃতি "অসামরিক" জাতিকেও সিপাহী হইতে দেওয়া হইয়াছিল, যদিও বাঙালীদিগকে যুদ্ধ করিতে দেওয়া হয় নাই।

ডাঃ পরাঞ্জপ্যের মত-অনুসারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও সামরিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের অনুকূল প্রস্তাব যদি গৃহীত হয়, এবং যদি গবর্ণ্মেণ্ট্ ঐরূপ শিক্ষার বন্দোবস্ত করেন, তাহা হইলে "অসামরিক" বাঙালী যুবকেরাও যুদ্ধবিদ্যার অ আ ক খ শিখিতে পারিবে। সর্ব্বাপেক্ষা সাংঘাতিক আসল যুদ্ধ শিখিতে তাহারা পাইবে না। কেননা পেশাদার ভারতীয় যোদ্ধারাও যুদ্ধের কয়েকটি প্রধান বিভাগে ঢুকিতে পারে না;—আকাশে বা আকাশ হইতে যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত অভিপ্রেত এয়ারফোর্স্ বা বাতাসী-ফৌজে ভারতীয়ের স্থান নাই। জলযুদ্ধের জন্য অভিপ্রেত রণতরী ভারতবর্ষের নাই, কোন রণতরীতে ভারতীয়ের স্থান নাই। পার্ব্বত্য যুদ্ধের জন্য নিযুক্ত

কয়েকটি গোলন্দাজী দল ভিন্ন আর্টিলারী বা গোলন্দাজী বিভাগেও ভারতীয়দের স্থান নাই।

কোন-কোন দেশে নির্দ্দিষ্ট বয়স-সীমার মধ্যস্থিত সমর্থ পুরুষ-মাত্রেই যুদ্ধ শিখিতে বাধ্য, এবং অন্তঃশত্রু বা বহিঃশত্রুর সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তাহারা যুদ্ধ করিতেও বাধ্য। কোথাও-কোথাও কোয়েকার্ প্রভৃতি যুদ্ধ-বিরোধী ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকদিগকে কিম্বা যুদ্ধ যাহার বিবেকবিরুদ্ধ এরূপ ব্যক্তিবিশেষকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়-সকলে যুদ্ধ শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইলে এইরকমের লোকদিগকে অব্যাহতি দিতে হইবে। তা-ছাড়া, চিকিৎসকদের মতে যাহাদের দেহ যুদ্ধশিক্ষার অনুপযুক্ত, তাহাদিগকেও বাদ দিতে হইবে।

নিম্নতম শ্রেণী হইতে উচ্চতম শ্রেণীর সকল বিদ্যালয়ে বালক ও বালিকাদের এরূপ দৈহিক শিক্ষা আমরা চাই, যাহাতে তাহাদের শরীর সুস্থ ও সবল থাকে। যাহার শক্তি ও স্বাস্থ্য যেরূপ, তাহার জন্য সেইরূপ ব্যায়ামের ব্যবস্থা সহজেই হইতে পারে। তজ্জন্য এই দৈহিক শিক্ষা হইতে কাহাকেও অব্যাহতি দিবার প্রয়োজন নাই, দেওয়া উচিত নয়। অবশ্য পীড়ার সময়ের কথা হইতেছে না।

সেনাদল থাকিলে তাহাতে ভর্ত্তি হইবার অধিকার যখন সকল সমর্থ পুরুষেরই থাকা উচিত মনে করি, তখন যুদ্ধশিক্ষার্থী যুবকদের সামরিক শিক্ষায় আপত্তি করিতে পারি না। কিন্তু আমরা স্বয়ং যুদ্ধের বিরোধী; কারণ যুদ্ধ করিতে গেলেই জয়লাভের জন্য ও অন্যান্য কারণে ধর্ম্ম ও নীতির কোন নিয়মই মানা চলে না; জয়লাভ হয় প্রধান লক্ষ্য, আর-সব-কিছুকে উহার জন্য বলি দিতে হয়। ইহা অনিবার্য্য। যুদ্ধের সঙ্গে বীরত্বের ও স্বাজাতিকতার যোগ থাকায় উহার মহিমা সব দেশেই কাব্যে, উপন্যাসে, ইতিহাসে কীর্ত্তিত হইয়াছে। সত্য কথা বলিতে গেলে কিন্তু যুদ্ধকে নরক না বলিয়া উপায় নাই;—এমন কোন অধর্ম্ম নাই যাহা এপর্য্যন্ত যুদ্ধের জন্য অনুষ্ঠিত হয় নাই। কাব্যে ও পুরাণে যে ধর্ম্মযুদ্ধের চিত্র আছে, তাহার কথা বলিতেছি না; বাস্তব যুদ্ধের কথা বলিতেছি। দেশের স্বাধীনতা লাভ বা রক্ষার জন্য যুদ্ধ, বা কোন কারণে গায়ে পড়িয়া অন্যের সহিত যুদ্ধ, উভয়বিধ যুদ্ধেই জয়লাভের জন্য ধর্ম্ম ও নীতির নিয়ম লঙ্ঘন না করিলে জয়লাভ হয় না।

এইসকল কারণে আমরা যুদ্ধ মাত্রেরই বিরোধী। এইরূপ মত প্রকাশ করিলে ভীরু ও স্বদেশদ্রোহী বিবেচিত হইবার খুব সম্ভাবনা আছে জানিয়াও আমাদের বিশ্বাসানুযায়ী কথা আমাদিগকে বলিতে হইতেছে।

আমরা দেখিতেছি, যে, মহাত্মা গান্ধীর দলভুক্ত "নো-চেঞ্জার" বা পরিবর্ত্তন-বিরোধী এবং অহিংসাবাদী অনেকেও কলেজের সামরিক শিক্ষার সমর্থন উৎসাহের সহিত করিতেছেন। যুদ্ধ যে-কারণেই করা হউক, তাহাতে মানুষ মারিতেই হইবে। সুতরাং অহিংসাধর্ম্ম বজায় রাখিয়া যুদ্ধ করা চলে না। যাঁহারা অহিংসাবাদী ও অহিংসাধর্ম্ম সর্ব্ব-প্রযত্নে রক্ষা করিতে চান, মানুষ মারিবার শিক্ষা লাভ তাঁহারা করিতে পারেন না। আমরা নিজে পুরা অহিংসাবাদী না হইলেও যুদ্ধের বিরোধী। এইজন্য অহিংসাবাদী কাহারও যুদ্ধশিক্ষার সমর্থন আমাদের বিসদৃশ বোধ হয়।

আমরা পুরা অহিংসাবাদী নহি, এই কারণে বলিলাম, যে, কোন-কোন স্থলে অগত্যা দুর্বৃত্ত লোককে মারিয়া ফেলাই উচিত মনে করি। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। কোন দুর্বৃত্ত লোকের পাশব অত্যাচার হইতে কোন নারীকে রক্ষা করিবার অন্য কোন উপায় না থাকিলে লোকটাকে মারিয়া ফেলা ধর্ম্মসঙ্গত মনে করি।

—

ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতীয়ের বহিষ্কার আইন

ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ একই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। বস্তুতঃ উভয়ের রাজনৈতিক যোগ আরো ঘনিষ্ঠতর। ব্রহ্মদেশ ব্রিটিশশাসিত ভারতবর্ষের প্রদেশগুলির একটি প্রদেশ। একই বড়লাট ও তাঁহার শাসন-পরিষদ্ ব্রহ্ম ও ভারতবর্ষের উপর কর্ত্তৃত্ব করেন। গোপালকৃষ্ণ গোখলে মহাশয় তাঁহার একটি বক্তৃতায় দেখাইয়াছিলেন, যে, ব্রহ্মের সরকারী কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য ভারতবর্ষকে বিস্তর টাকা খরচ করিতে হইয়াছে। তাহাতে

ইংরেজের কোন আপত্তি হয় নাই; যে-সকল বর্মী ভারতীয়দিগকে দেখিতে পারেন না, তাঁহাদেরও তাহাতে আপত্তি হয় নাই। কিন্তু এইসব বর্মী ও অধিকাংশ ব্রহ্মপ্রবাসী ইংরেজ ভারতীয়দের, বিশেষতঃ শিক্ষিত ভারতীয়দের, ব্রহ্মদেশে গমনের এবং তথায় তাহাদের বসবাস ও উপার্জ্জনের বিরোধী। ভারতীয়দিগকে ব্রহ্মে অতিষ্ঠ করিবার এবং নূতন ভারতীয়ের আমদানি বন্ধ বা হ্রাস করিবার ইচ্ছা ইঁহাদের বরাবরই ছিল। সম্প্রতি এরূপ দুটি আইন ব্রহ্মে প্রণীত হইয়াছে, যাহাতে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। তাহার কথা বলিবার আগে অন্য দু-একটা কথা বলি।

ভারতীয় সাম্রাজ্যের মধ্যে ব্রহ্ম সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রদেশ। কিন্তু ইহার লোকসংখ্যা বড় কম। ১৯২১ সালের সেন্সস্ হইতে গৃহীত নীচের অঙ্কগুলি হইতে তাহা বুঝা যাইবে

প্রদেশ	আয়তন, বর্গ মাইলে	লোকসংখ্যা	প্রতিবর্গ মাইলে লোকসংখ্যা
আসাম	৬১,৪৭১	৭৯,৯০,২৪৬	১৩০
বালুচীস্থান	১,৩৪,৬৩৮	৭,৯৯,৬২৫	৬
বঙ্গ	৮২,২৭৭	৪,৭৫,৯২,৪৬২	৫৭৮
বিহার-উৎকল	১,১১,৮০৯	৩,৭৯,৬১,৮৫৮	৩৪০
বোম্বাই	১,৮৭,০৭৪	২,৬৭,৫৭,৬৪৮	১৪৩
ব্রহ্ম	২,৩৩,৭০৭	১,৩২,১২,১৯২	৫৭
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	১,৩১,০৫২	১,৫৯,৭৯,৬৬০	১২২
মান্দ্রাজ	১,৪৩,৮৫২	৪,২৭,৯৪,১৫৫	২৯৭
উ-প সীমান্ত প্রদেশ	৩৮,৯১৯	৫০,৭৬,৪৭৬	১৩০
পঞ্জাব	১,৩৬,৯০৫	২,৫১,০১,০৬০	১৮৩
আগ্রা-অযোধ্যা	১,১২,২৪৪	৪,৬৫,১০,৬৬৮	৪১৪

বড় প্রদেশগুলির মধ্যে ব্রহ্মের লোকসংখ্যা সকলের চেয়ে কম। বালুচীস্থান ছাড়া আর সকল প্রদেশের বসতি ব্রহ্ম অপেক্ষা ঘন। বালুচীস্থান পার্ব্বত্য ও মরুময় প্রদেশ বলিয়া উহা বিরলবসতি ব্রহ্মদেশেও পার্ব্বত্য ও আরণ্য অঞ্চল অনেক আছে, কিন্তু মরুভূমি নাই।

ব্রহ্মের ঠিক্ পাশেই বঙ্গ ও আসাম; এবং উভয়েরই, বিশেষতঃ বঙ্গের, বসতি ব্রহ্ম অপেক্ষা খুব ঘন। সুতরাং এই উভয় প্রদেশ হইতে ব্রহ্মদেশে স্বভাবতই অনেক লোক জীবিকার জন্ম গিয়া থাকে। স্থলপথে ব্রহ্মদেশ যাওয়া কঠিন। জলপথে যাইতে হইলে কলিকাতা হইতে রেঙ্গুন যত দূর, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অনেক স্থান হইতেও রেঙ্গুন প্রায় ততদূর। ১৯২১এর সেন্সস্ অনুসারে মান্দ্রাজ হইতে ২,৭৩,০০০, বাংলা হইতে ১,৪৬,০০০ এবং আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশ হইতে ৭১,০০০ লোক ব্রহ্মদেশে গিয়াছে।

১৯২১ সালের সেন্সসে দৃষ্ট হয়, ঐ সালে ব্রহ্মদেশে বাহির হইতে আগত ৭,০৭,০০০ লোক ছিল। তাহার মধ্যে ৫,৭৩,০০০ (অর্থাৎ শতকরা ৮০ জন) ভারতীয় এবং ১,০২,০০০ (অর্থাৎ শতকরা ১৫ জন) চীনদেশীয়। ১৯১১ সালে ব্রহ্মে বাহিরের লোক যত ছিল, ১৯২১ সালে তাহা অপেক্ষা বাড়িয়াছে। ভারতীয়েরা শতকরা ১৬ বাড়িয়াছে, কিন্তু চীনারা বাড়িয়াছে শতকরা ৩৬। ভারতবর্ষের প্রধান-প্রধান কয়েকটি ভাষা যাহাদের মাতৃভাষা, ব্রহ্মদেশে এরূপ লোকদের সংখ্যা নীচে দেওয়া হইল।

মাতৃভাষা	লোকসংখ্যা
অসমিয়া (আসামীয়)	৩৩৮
বাংলা	৩,০১,০৩৯
গুজরাতী	১৩,১৪০
কানাড়ী	৮১৫
মালয়ালম	৫,৯২৬
মরাঠী	১,৫৭৩
ওড়িয়া	৪৭,৫৪৫
পঞ্জাবী	১৭,৮৪৫
রাজস্থানী	১,১৬৭
সিন্ধী	১৬৭
তামিল	১,৫২,২৫৮
তেলুগু	১,৫৫,৫১৯
হিন্দী	১,৫৮,৩৯৯

এপর্য্যন্ত যাহা লেখা হইয়াছে, তাহা হইতে দেখা যাইবে, যে, ব্রহ্মদেশে এখন যত লোক আছে, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী লোক তথায় স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারে। সুতরাং সেখানে বাহির হইতে লোক যাওয়া যাহাতে বন্ধ হয় বা কমে, এরূপ উপায় অবলম্বন করিবার সময় এখনও আসে নাই। বরং বাংলা দেশ ও আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে বসতি যেরূপ ঘন, তাহাতে ঐ দুই প্রদেশে বাহির হইতে আর লোক না-আসা ভাল। কিন্তু তাহার জন্য আইন করা উচিত নয়। যাহা হউক, সে-বিষয়ের আলোচনা এখন করিতেছি না।

ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষের মত ইংরেজদের অধীন। ইংরেজরা সেখানে টাকা রোজগার করিয়া ধনী হইতে চাহিবে, ইহা বিচিত্র নয়। কিন্তু তাহারা বা অন্য ইউরোপীয়েরা মাঠে কিম্বা কলকারখানায় বন্দরে কুলী-মজুরের কাজ করে না, অথচ শ্রমিক ভিন্ন তাহাদের বড়মানুষ হইবারও উপায় নাই। আবার ব্রহ্মদেশের স্বাভাবিক বাসিন্দাদের মধ্যে যথেষ্ট-সংখ্যক ও ভাল শ্রমিকও পাওয়া যায় না। সুতরাং এশিয়াবাসী অন্য শ্রমিক চাই। তাহারা সাধারণতঃ চীনদেশীয় ও ভারতীয় হইয়া থাকে। অতএব চীন ও ভারত হইতে ব্রহ্মে লোকদের আগমনে বাধা জন্মানো উচিত নয়। কিন্তু ব্রহ্মের প্রাদেশিক গবর্মেণ্ট সেই বাধা জন্মাইতেছেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে "বর্ম্মা সী প্যাসেঞ্জার্স বিল্" অর্থাৎ সমুদ্রপথে ব্রহ্মযাত্রী-সম্বন্ধীয় বিল ঐ প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত হইয়াছিল। সভা তাহা পাস্ করিয়াছেন। ব্রহ্মদেশীয় ছাড়া অন্য যে-কেহ সমুদ্রপথে ব্রহ্মদেশে আসিবে তাহাদিগকে জন-পিছু পাঁচ টাকা করিয়া ট্যাক্স দিতে হইবে। তা-ছাড়া ব্রহ্মদেশীয়দিগকে মাথা-পিছু যে ট্যাক্স দিতে হয়, তাহাও দিতে হইবে।

দক্ষিণ আফ্রিকা, কানাডা, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ ভারতবর্ষের লোকদিগকে উপার্জ্জন ও বসবাসের জন্য ঢুকিতে দেয় না। ইহা ভারতীয়দের পক্ষে অসুবিধাজনক ও অপমানকর। এপর্য্যন্ত ভারতসাম্রাজ্যের অন্তর্গত প্রদেশগুলি পরস্পরের যাতায়াত সম্বন্ধে কোন আইন করে নাই, যদিও "বিহারীদের জন্য বিহার," প্রভৃতি রব বহুকাল হইতে শুনা যাইতেছে। ব্রহ্মদেশেও অনেক বর্ম্মী এইরূপ রব তুলিয়াছেন। প্রদেশে-প্রদেশে রেষারেষি বা বিদ্বেষ থাকিলে ভেদনীতিপ্রয়োগ দ্বারা একতার উদ্ভবে বাধা দিয়া ভারতসাম্রাজ্যে প্রভুত্ব বজায় রাখা সহজ হয় বলিয়া ইংরেজরা ইহাতে খুসী। তা-ছাড়া তাহাদের ভারত-সাম্রাজ্যের কোথাও যাতায়াত ত কেহ বন্ধ করিতে পারিবে না; কিন্তু ব্রহ্মদেশে ভারতীয়েরা না গেলে রাজনৈতিক আন্দোলনে এবং অর্থোপার্জ্জনে ইংরেজের সহিত প্রতিযোগিতা কিছু কমিবে বলিয়া তাহারা আশা করে। এখন কিন্তু ব্রহ্মদেশীয়রাই ত অপরের সাহায্য পরিচালনা বা প্ররোচনা ব্যতিরেকেও রাজনৈতিক আন্দোলনে খুব সমর্থ হইয়াছে;—শুধু পুরুষেরা নহে, স্ত্রীলোকেরাও। অর্থোপার্জ্জনে প্রতিযোগিতা-সম্বন্ধে বক্তব্য এই, যে, অধিকাংশ ভারতীয় ব্রহ্মে যায় দৈহিক শ্রম বা ছোটখাট ব্যবসা করিতে। তাহাদের সহিত ইংরেজদের কোন প্রতিযোগিতা নাই; বরং শ্রমিক না পাইলে ইংরেজদের রোজগার বন্ধ হইতে পারে। সম্ভবতঃ এই কারণে, ব্রহ্মের ব্যবস্থাপক সভায় ইংরেজদের ব্রহ্মদেশীয় বণিক্-সমিতির দু'জন প্রতিনিধি ইংরেজ সমুদ্রপথে আগন্তুকদের উপর এই ট্যাক্স্ বসাইবার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। অন্য কোন-কোন ইংরেজও ইহার বিরোধী।

এই ট্যাক্সের জন্য ভারতবর্ষ হইতে ব্রহ্মে লোক কম যাইবে মনে হয় না। ভারতবর্ষ হইতে ব্রহ্মে যাইবার জাহাজ-ভাড়া যদি পাঁচ টাকা করিয়া বাড়িত, তাহা হইলেও ব্রহ্মে রোজগারের সম্ভাবনা থাকায়, যাত্রী কমিত না। ভারতবর্ষে রেলভাড়া খুব বাড়িয়াছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী বাড়িয়াছে। এইজন্য আমাদের মনে হয়, ব্রহ্মের নূতন ট্যাক্স্‌টির মন্দ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। লাভের মধ্যে মানুষের মনে রাগ-দ্বেষ রেষারেষি বাড়িবে। অবশ্য, ব্রহ্ম-গবর্মেণ্টের আয় বার্ষিক ১৫ লক্ষ টাকা বাড়িবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। কিন্তু অলাভের তুলনায় এই লাভটা কি এতই বেশী?

ব্রহ্মদেশীয় ব্যবস্থাপক সভায় আর-একটি আইন পাস্ হইয়াছে, তাহার নাম অপরাধী বহিষ্করণের আইন। পীন্যাল কোডে যে-সব অপরাধের জন্য দুই বৎসর বা ততোধিক সময়ের জন্য দণ্ড হয়, সেইরূপ অধিকাংশ অপরাধের মধ্যে কোন একটা অপরাধ ব্রহ্মদেশীয় ভিন্ন অন্য কেহ করিয়া দণ্ডিত হইলে কিম্বা সদাচরণ করিবার জন্য জামিন দিতে বাধ্য হইলে সে ব্রহ্মদেশ হইতে বহিষ্কার-যোগ্য হইবে। ভারতবর্ষের কোন শ্বেত বা অশ্বেত বিদেশী ঐরূপ কোন অপরাধে দণ্ডিত হইলে তাহাকে ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইয়া দিবার আইন নাই।

"রেঙ্গুন মেল" এই আইনটিতে রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি আছে বলিয়া সন্দেহ করেন। উহাতে লিখিত হইয়াছে :—

"You are no habitual offender, no moral obliquity may be charged against you; you may not be a

murderer or a ravisher or a smuggler or a pimp or procurer or forger or thief or dacoit, you may be a patriot, speaking and writing and generally fighting for the community's cause: you may be a social service worker: you may be a journalist and educator: you may be building up a pioneer industry: you may be stimulating cultural interest in non-Burman things of intellect: you make yourself undesirable to the Administration, a case is vamped up against you; you are kicked out of a province which is part and parcel of the British Indian Empire."

তাৎপর্য্য।—তুমি দাগী আসামী বা 'পুরাতন পাপী' নও; তোমার বিরুদ্ধে নরহত্যা, বলাৎকার, জাল ডাকাতি ইত্যাদি দুর্নীতিমূলক কাজের অভিযোগ না থাকিতে পারে; তুমি হয়ত লোকহিতার্থ বক্তৃতা কর বা লেখ; তুমি সমাজসেবক হইতে পার; তুমি সাংবাদিক ও শিক্ষক হইতে পার; তুমি হয়ত একটা নূতন পণ্যশিল্পের কারখানা গড়িয়া তুলিতেছ; তুমি হয়ত ব্রহ্মদেশের বাহিরের জ্ঞান ও সভ্যতা-সম্বন্ধীয় কোন বিষয়ে তথাকার লোকদের কৌতূহল ও আগ্রহ জন্মাইতে চেষ্টা করিতেছ;—এহেন তুমি ব্রহ্মের শাসকদের কুনজরে পড়িলে এবং তাঁহারা তোমাকে একজন অবাঞ্ছনীয় মানুষ মনে করিলেন; তোমার নামে একটা মোকদ্দমা গড়িয়া তোলা হইল; ফলে ব্রিটিশভারতীয় সাম্রাজ্যেরই একটি অংশ হইতে তুমি তাড়িত হইলে।"

"রেঙ্গুন মেল" যেরূপ সন্দেহ করিয়াছেন, তাহা আমাদের অমূলক মনে হয় না।

—

যুদ্ধ ও সভ্যতা

যুদ্ধের কোন গুণ নাই, কোন উপকারিতা নাই, ইহা কেহ বলিতে পারে না। যুদ্ধ করিতে হইলে নির্ভীকতা ও বীরত্বের দরকার হয়। একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ লোককে দল বাঁধিয়া একাগ্রভাবে নেতার আদেশ মানিয়া সুশৃঙ্খলার সহিত কাজ করিতে হয়। যে-কোন মুহূর্ত্তে দ্বিধা না করিয়া সকল-প্রকার কষ্ট সহ্য করিবার নিমিত্ত, সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিবার নিমিত্ত, প্রিয়তম আত্মীয়-বন্ধুর মায়া কাটাইয়া প্রাণ দিবার নিমিত্ত প্রস্তুত থাকিতে হয়।

কিন্তু এমন অনেক লোকহিতকর কাজ আছে, তাহাতে এইপ্রকার নির্ভীকতা, বীরত্ব ও আত্মোৎসর্গের প্রয়োজন হয়। লোকহিতকর কাজ করিতে গিয়া এরূপ নির্ভীকতা, বীরত্ব ও আত্মোৎসর্গের সহিত অনেকে প্রাণ দিয়াছেন, যাহা যুদ্ধে প্রদর্শিত ঐসকল গুণ অপেক্ষা কোন অংশেই নিকৃষ্ট নহে, বরং শ্রেষ্ঠ। কেননা, যুদ্ধের উত্তেজনায় প্রাণ দেওয়া অপেক্ষা (দৃষ্টান্ত-স্বরূপ) বা কুষ্ঠরোগীর বা প্লেগরোগীর উত্তেজনাবিহীন সেবা করিতে গিয়া নিজে ঐ ঐ রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণ দেওয়া অধিক বীরত্ব, নির্ভীকতা ও আত্মোৎসর্গের কাজ।

যুদ্ধে নৃশংসতা, মিথ্যাচরণ, পরস্বাপহরণ, নারী-চরিত্রের অবমাননা, নারীর উপর পাশব অত্যাচার, নির্দ্দোষ লোকদেরও প্রাণনাশ, সর্ব্বস্বনাশ, গ্রামনগর জ্বালাইয়া দেওয়া, প্রভৃতি বর্ব্বরোচিত কাজ কত যে হইয়া থাকে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

এইজন্য দার্শনিক উইলিয়ম্ জেম্স্, যুদ্ধের অনিষ্টকর অঙ্গগুলি থাকিবে না অথচ যুদ্ধে যে সকল সদ্‌গুণ বিকশিত হয় তাহা বিকশিত হইবে, যুদ্ধের সমতুল্য সুনীতি সঙ্গত এরূপ কোন অনুষ্ঠান বা কর্ম্মের উদ্ভাবন আবশ্যক, বলিয়া গিয়াছেন।

সভ্যদেশে দু'জন সভ্য মানুষের মধ্যে সম্পত্তি-ঘটিত কোন বিবাদ হইলে তাহারা সাধারণতঃ আদালতের বা সালিসীর আশ্রয় লইয়া থাকে, পরস্পরের মধ্যে মারামারি করিয়া বিবাদ-নিষ্পত্তির চেষ্টা করে না; একজন মানুষ আর-একজনকে জখম বা খুন করিলে হত বা আহত ব্যক্তির আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবেরা সাধারণতঃ স্বয়ং হন্তা বা আততায়ীকে শাস্তি দেয় না, আদালতে নালিশ করিয়া বা সালিসী দ্বারা তাহাকে দণ্ডিত করিতে চেষ্টা করে। বিবাদ-নিষ্পত্তি ও অপরাধীকে শাস্তি দিবার ভার নিজেরা না লইয়া রাজশক্তির উপর বা সালিসের উপর সেই ভার অর্পণ, সভ্য সমাজের একটি লক্ষণ।

কিন্তু সভ্যদেশে-সভ্যদেশে, সভ্যজাতিতে-সভ্যজাতিতে, উক্ত-প্রকার কোন বিরোধ ঘটিলে তাহারা নিজেই যুদ্ধ করিয়া মারামারি কাটাকাটি করিয়া থাকে। অথচ আমরা "সভ্য জগৎ" কথাটি ব্যবহার করিয়া থাকি। কিন্তু বস্তুতঃ মানুষে-মানুষে মারামারি যেমন অসভ্যতার চিহ্ন, দেশে-দেশে জাতিতে-জাতিতে যুদ্ধও তেম্‌নি বর্ব্বরতার লক্ষণ।

এই কারণে বহুবৎসর পূর্ব্ব হইতে দেশে-দেশে বিবাদ ঘটিলে আন্তর্জাতিক সালিসী দ্বারা তাহার নিষ্পত্তির চেষ্টা হইতেছে। এমন অনেকগুলি ঝগড়া এইপ্রকারে রক্তপাত

না করিয়াই মিটাইয়া দেওয়া হইয়াছে, যাহার জন্ত আগেকার কালে নিশ্চয়ই যুদ্ধ হইত। আন্তর্জাতিক আদালত দ্বারা জাতিতে-জাতিতে সব বিবাদের নিষ্পত্তি হওয়া উচিত, মানবহিতৈষীদিগের অনেক অগ্রণী বহুকাল হইতে ইহা বলিয়া আসিতেছেন। এই আদর্শ শীঘ্র বাস্তবে পরিণত না হইলেও ভবিষ্যতে কোন সময়ে যে হইবে, এরূপ আশা করা যাইতে পারে। তখনই "সভ্য জগৎ" কথাটি অন্বর্থ হইবে, এখনকার পৃথিবীর কোন অংশকে ঠিক্ সভ্য বলা যায় না।

যুদ্ধের একটা দোষ এই,—যে, শান্তির সময়ে সাধারণ সব কাজে মানুষ নিজের হিতাহিত জ্ঞান ও বুদ্ধি অনুসারে চলিতে পারে; কিন্তু যুদ্ধের সময় সৈনিকরা তাহা করিতে পারে না। মনে করুন, যদি ইটালীর লোকেরা অন্যায় করিয়া গ্রীস্ আক্রমণ করে, তাহা হইলে ইটালীর যে-সব সৈনিক গ্রীস্ আক্রমণ অনুচিত মনে করিবে, তাহারাও যুদ্ধ হইতে বিরত থাকিতে পারিবে না, তাহাদের ধর্ম্মবুদ্ধির নিষেধ সত্ত্বেও তাহারা গ্রীসের সহিত লড়িতে বাধ্য হইবে, নরহত্যা লুণ্ঠন গৃহদাহাদি নানা অপকর্ম্ম করিতে বাধ্য হইবে। মানুষের স্বাধীন বিচারশক্তি, হিতাহিত-জ্ঞান, ধর্ম্মবুদ্ধি তাহাকে ইতর প্রাণী হইতে শ্রেষ্ঠ পদবী দিয়াছে। কিন্তু যুদ্ধের সময় হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ লোককে মানুষের এইসব বিশেষত্বে জলাঞ্জলি দিয়া রাজার, সম্রাটের বা সেনাপতির হাতের অস্ত্রের মত নির্ব্বিচারে কাজ করিতে হয়। যুদ্ধ এইপ্রকারে মানুষকে অনেকটা অ-মানুষে পরিণত করে বলিয়াও আমরা যুদ্ধের বিরোধী।

সান্ য়ৎ সেন্

চীন দেশের প্রসিদ্ধতম নেতা সান্ য়ৎ সেনের মৃত্যু-সংবাদ ইতিপূর্ব্বে কয়েকবার রটিয়াছিল। এবার কিন্তু সকলেই মনে করিতেছেন, যে, তাঁহার মৃত্যু সত্য সত্যই হইয়াছে।

চীনে সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে উহার সম্রাট্ ছিলেন মাঞ্চু বংশীয়। মাঞ্চুরা চৈনিক নহে, বিদেশী, মাঞ্চুরিয়ার লোক। তাহারা চীন জয় করিয়া দীর্ঘকাল চীনের উপর প্রভুত্ব করিয়াছিল।

যে-সকল দেশহিতৈষী ব্যক্তির চেষ্টায় চীনে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, ডাক্তার সান্ য়ৎ সেন্ তাঁহাদের মধ্যে প্রধান। বলিতে গেলে তিনিই নূতন চীনকে গড়িয়া তুলিয়াছেন। কতবার যে তিনি ঘাতকদের হাত হইতে পলাইয়া রক্ষা পাইয়াছেন, তাহা হয়ত এখনও জানা নিজের পড়ে নাই। কখন-কখন তিনি ঘাতকদিগকে বুঝাইয়া মতাবলম্বী করিতেও সমর্থ হইয়াছিলেন।

সান্ য়ৎ সেন্ ও তাঁহার পত্নী

একবার চীনের মাঞ্চু গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছিল, যে, যে-কেহ সান্ য়ৎ সেনের মাথা আনিয়া দিতে পারিবে, তাহাকে অনেক টাকা দেওয়া হইবে; অর্থের পরিমাণও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। টাকার লোভে দু'জন রাজকর্ম্মচারী ও বারজন সৈন্ত সান্ য়ৎ সেনের অজ্ঞাতসারে ক্যাণ্টনে তিনি যে-ঘরে গোপনে বাস করিতে-ছিলেন, তথায় গিয়া উপস্থিত হয়। মৃত বা জীবিত যে-অবস্থাতেই হউক সান্‌কে হাজির করিতে পারিলেই

তাহারা পুরস্কার পাইত, যদিও চীন-গবর্ণমেণ্টের হুকুম ছিল, যে, জীবিত অবস্থায় আনিতে পারিলেই ভাল হয়। সান্ য়্‌ৎ সেন্ লোকগুলাকে দেখিয়াই রাষ্ট্রীয় ধর্ম্মনীতি-সম্বন্ধে চীনদেশের একটি প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থ তুলিয়া লইয়া তাহাদিগকে পড়িয়া শুনাইতে লাগিলেন। তাহারা শুনিতে ও পরে প্রশ্ন করিতে লাগিল। আলোচনা আরম্ভ হইল, এবং সান্ তাহাদিগকে বুঝাইতে লাগিলেন। দুই ঘণ্টা পরে রাজকর্ম্মচারী দু'জন ও বার জন সৈন্য চলিয়া গেল। তাহারা সান্ য়্‌ৎ সেনের মতে বিশ্বাসবান্ হইয়াছিল; তাহাদের মত-পরিবর্ত্তন না ঘটিলে চীনে হয়ত কখনও সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হইত না; কারণ, তাহাদের উপর সেদিন সেই ব্যক্তির মরাবাঁচা নির্ভর করিতেছিল যিনি ভবিষ্যতে নব্য চীনের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান যুগে সান্ য়্‌ৎ সেন্ চীনের শ্রেষ্ঠ পুরুষ। তাঁহার সমসাময়িকদিগের মধ্যে তাঁহার সমকক্ষ কেহই ছিল না। চীনে সাধারণতন্ত্র স্থাপনের প্রশংসা সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহারই পাওনা। এশিয়ার রাজনীতি-ক্ষেত্রে, পাশ্চাত্য লেখকদের মতে, আধুনিক তিনজন প্রাচ্য নেতার নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখের যোগ্য,—চীনে সান্ য়্‌ৎ সেন্, ভারতবর্ষে মোহনদাস কর্মচাঁদ গান্ধী, তুরস্কে মুস্তাফা কমাল পাশা। সান্ এবং কমাল পাশা উভয়েই যুদ্ধ ও বিপ্লব দ্বারা নিজনিজ দেশকে স্বাধীন করিয়াছেন; মহাত্মা গান্ধী যুদ্ধ করিতে চান না, কিন্তু তিনিও দেশের স্বাধীনতা চান। এই তিনজন প্রাচ্য নেতাই বিদেশীর প্রভুত্বের বিরোধী। সান্ চীনে পাশ্চাত্য সভ্যতা আনয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই সভ্যতার বিদেশী কর্ম্মী ও পাণ্ডাদের প্রভুত্বের বিরোধিতা তিনি করিয়াছিলেন; এইজন্য এই বিদেশীদের প্রভাব তাঁহাকে ক্ষমতাহীন করিতে সাহায্য করিয়াছিল।

ডাক্তার সান্ য়্‌ৎ সেন্ হংকঙে এক ব্রিটিশ মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করেন, অস্ত্রচিকিৎসায় তাঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। তিনি যেমন হাসপাতালে অনেক রোগীর উপর অস্ত্রপ্রয়োগ করিয়া তাহাদিগকে সুস্থ করিয়াছিলেন, তেমনি নিজের দেশ ও জাতির চিকিৎসাও তিনি করিয়াছিলেন। চীন-জাতির জরাগ্রস্ত দেহে তিনি নূতন প্রাণের সঞ্চার করিয়াছিলেন। যে তিনজন প্রাচ্য নেতার নাম করা হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে সানের কাজই আগে আরব্ধ হইয়াছিল, এবং তিনিই প্রথমে স্বদেশকে স্বাধীন করিতে পারিয়াছিলেন। অবশ্য চীনের অন্তর্যুদ্ধ এখনও থামিয়া থামিয়া হইতেছে; কিন্তু যাঁহারা পাশ্চাত্য নানা দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস জানেন, তাঁহারা মনে করিবেন না, যে, চীনে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও শান্তি বদ্ধমূল হইতে বড় বেশী সময় লাগিতেছে; সুতরাং তাঁহারা চীনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও নিরাশ হইবেন না।

মাঞ্চু রাজত্ব ধ্বংস করিয়া চীনকে স্বাধীন করিবার চিন্তা প্রথম হইতেই সানের ছিল না; তাঁহার ও তাঁহার গঠিত দলের ইচ্ছা ছিল শাসন-সংস্কার করা, বিপ্লব-সংঘটন তাঁহাদের অভিপ্রায় ছিল না। কিন্তু কার্য্যতঃ শেষে বিপ্লব না ঘটাইয়া সংস্কার-সাধন অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল।

প্রথমে আঠার জন যুবক চীনের রাষ্ট্রীয় উন্নতিতে ব্রতী হইয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই এরূপ আগ্রহের সহিত নিজের কাজ করিয়াছিলেন, যে, মাঞ্চু গবর্ণমেণ্টের শক্তি তাঁহাদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইয়াছিল, এবং কয়েক বৎসরের মধ্যেই কেবল সান্ ছাড়া আর সকলেই আবিষ্কৃত, ধৃত ও নিহত হইয়াছিলেন। তৎকালে চীনে প্রগতিকামীদের ভাগ্যে এইরূপ শাস্তিই ঘটিত। গবর্ণ্মেণ্ট ও তাঁহাদের মধ্যে কোন রফার সম্ভাবনা ছিল না। যাঁহারা আবেদন-নিবেদন করিয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং তাহার সাহায্যে শাসনসংস্কার সাধিত হইবে আশা করিয়াছিলেন, পরে তাঁহাদিগকেই সাক্ষাৎভাবে কাজে নামিতে, অর্থাৎ ইংরেজীতে বলিতে গেলে ডিরেক্ট্ অ্যাক্শনের পন্থা অবলম্বন করিতে এবং বিপ্লবরূপ লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল।

১৮৯৪-৯৫ সালে যখন জাপান চীনকে পরাস্ত করে, তখন বিপ্লবীরা সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে মনে করিয়া দক্ষিণ চীনের প্রাদেশিক রাজধানী কাণ্টন অধিকারপূর্ব্বক উহার স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে মনস্থ করে। অস্ত্রশস্ত্র সংগৃহীত হইল, স্বাধীনতামন্ত্রে দীক্ষিত বিশ্বস্ত লোকেরা দলবদ্ধ হইল, আক্রমণের সময় পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট হইল; শেষ মুহূর্ত্তে, যখন বিদ্রোহী সৈন্যদল অভিযান করিয়াছে, একজন বিশ্বাসঘাতক লোক প্রাদেশিক রাজকর্ম্মচারীদের নিকট সব কথা প্রকাশ করিয়া দিল। নেতাদের মধ্যে যাহারা পলাইতে পারিল না, তাহারা ধৃত, উৎপীড়িত ও নিহত হইল। সান্ ও আর অল্প কয়েক জন ধরা পড়েন নাই। তিনি ছদ্মবেশে রাত্রে যে-সব সরকারী সৈন্য তাঁহার খোঁজে ছিল তাহাদের চোখের সাম্‌নে, নগর-প্রাচীর অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেলেন। তার পর গরীবের কুঁড়ে ঘর, খালের নৌকা, মাঠ, নানা জায়গায় লুকাইয়া মাকাও সহরের পথ ধরিলেন। পনর বৎসর তাঁহাকে এইভাবে, উপন্যাস-বর্ণিত নানা বিপদ্-আপদের মধ্য দিয়া কাটাইতে হয়।

তাঁহার মাথার দাম অনেক-বার লক্ষ-লক্ষ টাকা ঘোষিত হয়; গুপ্তচর, গোয়েন্দা ও পুলিশের লোক তাঁহার অনুসরণ করিতে থাকে; কিন্তু তাহা-সত্ত্বেও তিনি কখন ধুলো,

কখন রেলিয়া, কখন ফেরিওয়ালার বেশে হঠাৎ একটা সহরে উপস্থিত হইতেন, এবং বিপ্লবপ্রচার, দলগঠন, ও অর্থসংগ্রহ করিতে-করিতে সারা চীন দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। গভীর নিশীথে কোনও ভগ্ন-পরিত্যক্ত মন্দিরে একজন-একজন করিয়া লোক জমা হইত; কে কি প্রকারে সেখানে গুপ্ত সভার অধিবেশনের সংবাদ প্রচার করিত, কেহ বলিতে পারে না। তাহার পর আধ আলো আধ-আঁধারে ডাক্তার সান্ আবির্ভূত হইয়া তিনচারি ঘণ্টা ব্যাপী বক্তৃতার পর সরিয়া পড়িতেন এবং শ্রোতারাও উদ্দীপ্ত-হৃদয়ে নিস্তব্ধে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িত। কেহ ধরা পড়িলে নিদারুণ যন্ত্রণার সহিত তাহার প্রাণদণ্ড হইবার কথা।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে, কাণ্টন হইতে তাঁহার প্রথম পলায়নের পর, তাঁহাকে একবার লণ্ডনে চীনমন্ত্রীনিবাসে একটা ঘরে বন্ধ করিয়া রাখা হয়। তিনি আমেরিকা হইতে লণ্ডন আসিয়াছেন, গোয়েন্দারা লণ্ডনস্থ চীনমন্ত্রীকে এই খবর দেওয়ায় তাঁহাকে ভুলাইয়া মন্ত্রীনিবাসে আনা হয়, এবং সেখানে একটা ঘরে বন্ধ করিয়া তালাচাবী লাগাইয়া রাখা হয়। তাঁহার গ্রেপ্তার গোপন রাখা হয়, তাঁহার সহিত কাহাকেও সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হয় নাই। গোপনে চীনগামী একটা জাহাজে করিয়া তাহাকে চীনে লইয়া গিয়া গবর্নেণ্টের হাতে শাস্তির জন্য তাঁহাকে অর্পণ করা চীন-মন্ত্রীর উদ্দেশ্য ছিল। সান্ ইহা জানিতে পারিয়া "মরিয়া" হইয়া তাঁহার বন্ধুদিগকে সব কথা জানাইতে চেষ্টা করেন। ভৃত্যদের হাতে চিঠি দেওয়ায় তাহারা তৎক্ষণাৎ মন্ত্রী-নিবাসের সরকারী লোকদিগকে তাহা অর্পণ করে। তিনি তাঁহার কামরার গরাদের ভিতর দিয়া একাধিকবার দুই শিলিং মুদ্রার সহিত বাঁধিয়া ভারী করিয়া চিঠি বাহিরে ছুড়িয়া ফেলেন। তাহা উঠানের মধ্যে পড়ে। পরিশেষে তিনি তাঁহার ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক ও অন্তরঙ্গ বন্ধু ডাক্তার জেম্‌স্ কাণ্ট্‌লির (Dr. James Cantlie) কাছে চিঠি লইয়া যাইতে একজন চাকরকে রাজি করেন। ডাঃ কাণ্টলি সাতিশয় ব্যস্ততার সহিত স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড নামক পুলিশ থানায় নানা খবরের কাগজের আফিসে, ব্রিটিশ পররাষ্ট্র-বিভাগের আফিসে খবর দেন। প্রথমে কেহ খবরটায় বিশ্বাসই করিতে চায় নাই, কিন্তু তথাপি তদন্ত করা হয়। চীনমন্ত্রীনিবাসের লোকেরা সানের সম্বন্ধে কিছুই জানে না বলে; কিন্তু যখন তাঁহার সেখানে থাকার কথা অস্বীকার করিবার আর পথ রহিল না, তখন তাহারা বলে সান্ সেখানে স্বেচ্ছায় আসিয়াছে, চীনমন্ত্রীনিবাস চীন-দেশেরই অংশের মত, সান্ চীন হইতে পলাতক অপরাধী সুতরাং তাঁহাকে সেখানে বন্দী করিবার অধিকার মন্ত্রী-নিবাসের কর্ত্তৃপক্ষের আছে। কিন্তু ব্রিটিশ পররাষ্ট্র আফিস খুব কড়া দাবি করায় এবং লণ্ডনের খবরের কাগজ-ওয়ালারা সানের পক্ষ অবলম্বন করায়, সান্‌কে ছাড়িয়া দিতে হইল। তিনি বার-দিন বন্দী থাকিয়া খালাস পাইলেন।

সান্ য়ৎ সেন্‌কে বহুবৎসর ধরিয়া যখন চীনের মাঞ্চু গবর্ণমেণ্ট শিকার করিবার চেষ্টা করিতে থাকে, তখন তাহার মধ্যে তিনি বহুবার এই-প্রকারে বাঁচিয়া যান বা পলায়ন করেন। একবার একটি ছোট নৌকায় যখন সান্ লুকাইয়াছিলেন, তখন একজন লোক আসিয়া তাঁহাকে বলিল, "আপনাকে ধরাইয়া দিলে গবর্মেণ্ট আমাকে ১৫০০০ টাকা বক্‌শিস্ দিবে বলিয়াছে।" সান্ তাহার সহিত আলোচনা আরম্ভ করিয়া দিয়া তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কতকক্ষণ পরে লোকটা নিজের দোষ বুঝিতে পারিয়া মাটিতে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িল এবং তাঁহার নিকট সাশ্রনয়নে ক্ষমা প্রার্থনা করিল। এইরূপ বিস্তর সত্য ঘটনার কাহিনী সান্ য়ৎ সেনের জীবনচরিতে আছে।

এই মহা স্বদেশপ্রেমিকের মৃত্যুতে চীন, সমস্ত এশিয়া, সমগ্র জগৎ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। কিন্তু যে-বিশ্ববিধাতার বিধানে চীনে তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল, তিনি চীনকে, এশিয়াকে, জগৎকে পরিত্যাগ করেন নাই;—আমরা যেন তাঁহাকে বিস্মৃত না হই, তাঁহাকে পরিত্যাগ না করি।

"ত্র্যহস্পর্শে"রও অধিক

কোনও একটা দিনে তিনটা তিথি একত্র সমাবেশ হইলে তাহাকে ত্র্যহস্পর্শ বলে। তাহা হইতে অহিতকর কোন তিনটা কারণ কিম্বা অনিষ্টকারী কোন তিনজন মানুষের একত্র সমাবেশকেও ব্যঙ্গ করিয়া ত্র্যহস্পর্শ বলা হইয়া থাকে।

এবার লণ্ডনে ভারতের ভাগ্যে ত্র্যহস্পর্শ অপেক্ষাও আশঙ্কাজনক একটা সম্মিলন ঘটিতে যাইতেছে।

পার্লেমেণ্টে ব্রিটিশ শ্রমিকদলের প্রতিনিধিরা ভারত-বর্ষের কোন হিতসাধন করিতে পারেন নাই, বরং তাঁহাদেরই প্রভুত্বকাল শেষ হইবার ঠিক পূর্ব্বে বাংলাদেশে বিনা বিচারে বিস্তর লোককে গ্রেপ্তার করিয়া আটক করিয়া রাখা হইয়াছে; এখনও তাঁহাদের কাহারও বিচার হয় নাই, কাহাকেও ছাড়িয়া দেওয়াও হয় নাই। তথাপি শ্রমিকদলের লোকদের মধ্যে ভারতবর্ষের পক্ষে দু-চারটা মুখের কথা বলিবার এবং কাগজের পিঠে কলমের আঁচড় দিবার লোক ছিল। এবং শ্রমিকদলের পক্ষ হইতে ভারতকে স্বায়ত্তশাসন দিবার একটা অঙ্গীকারের মতও আছে। তাহাদের পরে রক্ষণশীল দলের লোকেরা কর্ত্তা হইয়াছে।

তাহাদের কেহ কখন ভারতবর্ষকে স্বরাজ দিবে বলিয়াছে বলিয়া শুনি নাই এবং তাহারা ভারতবর্ষকে চিরকালের জন্ম ইংরেজের পদানত রাখিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাহাদের আমলে, বাংলাদেশে বড় লাটের যে-অডিন্যান্সের বলে এত লোক বিনা বিচারে বন্দী হইয়াছেন, তাহা আইনে পরিণত হইয়াছে।

এই রক্ষণশীল দলভুক্ত ভারত-সচিব লর্ড বার্কেন্‌হেড ভারতবর্ষের বর্ত্তমান প্রধান-প্রধান সমস্যাগুলির সম্বন্ধে ভারতের বড়লাট লর্ড রেডিং কয়েকজন প্রাদেশিক গবর্ণর ও অন্যান্য কতিপয় উচ্চপদস্থ ইংরেজ রাজ-কর্ম্মচারীর সহিত মন্ত্রণা করিবেন। পরলোকগত ভারতসচিব মণ্টেগু-সাহেব ভারত-শাসন-সংস্কার আইন প্রণীত হইবার পূর্ব্বে যখন ভারতীয় উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের সঙ্গে পরামর্শ করিতে চাহিয়াছিলেন, তখন তিনি স্বয়ং ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। ভারতের সমস্যা-সম্বন্ধে আলোচনা ও মন্ত্রণা ভারতবর্ষে হওয়ার একটা স্বাভাবিক সঙ্গতি ও যুক্তিযুক্ততা আছেই, অধিকন্তু এরূপ প্রণালীর অন্য উপকারিতাও আছে। কোন দেশের বর্ত্তমান অবস্থা-সম্বন্ধে কোনও বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে, সেই দেশকে ও দেশের লোককে নিজের চোখে দেখা ও তাহাদের কথা নিজের কানে শোনা একান্ত দর্‌কার। কেবল সেই উপায়ে কেহ যদি সত্য নিরূপণ করিতে নাও চান, তাহা হইলেও, অপরের মুখে যাহা তিনি শুনিয়াছেন, অন্ততঃ তাহার সত্যতা যাচাই করাও দেশটিতে থাকিয়া যেমন হইতে পারে, দূর হইতে তেমন হইতে পারে না।

যাহা হউক, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আলোচনা, মন্ত্রণা ও জ্ঞানলাভের জন্ম মণ্টেগু স্বয়ং ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন; বার্কেন্‌হেড্ ভারতে আসিবেন না, ভারতের বড়লাট প্রভৃতিই লণ্ডন যাইবেন। মণ্টেগুর আমলে সর্‌কারী বেসর্‌কারী ইংরেজ ভারতীয় নানা-রকম লোকের মত শোনা হইয়াছিল। এবার কেবল সর্‌কারী কয়েকজন মাত্র ইংরেজ কর্ম্মচারীর সহিত পরামর্শ হইবে। তাহাতে ফল যে কিরূপ হইবে, অনুমান করা কঠিন নয়।

লণ্ডনে কে-কে হাজির হইবেন দেখা যাক্। বড়লাট রেডিং যাইতেছেন। তিনি ভারতে বড়লাট হইবার আগে ইংলণ্ডের প্রধান বিচারপতি ছিলেন এবং এদেশে আসিয়া শাদা-কালা-নির্ব্বিশেষে সুবিচার প্রতিষ্ঠিত করিবার আশা দিয়াছিলেন। তাহা তিনি করেন নাই বা করিতে পারেন নাই, একটির পর একটি করিয়া নানা বিষয়ে ব্যবস্থাপক সভার মতের বিরুদ্ধে নিজের মত বহাল রাখিয়াছেন, বিনা বিচারে মানুষকে বন্দী করিয়া অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্ম আটক করিয়া রাখিবার নিমিত্ত ব্যবস্থাপক সভার মতের বিরুদ্ধে আইন করাইয়াছেন, এবং ভারতীয়দের ন্যায্য রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার সহিত কোন মৌখিক সহানুভূতিও প্রদর্শন করেন নাই। তাঁহার রাজস্ব-মন্ত্রী স্যার্ বেসিল ব্লাকেট্ তখন লণ্ডনে থাকিবেন। তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী স্যার্ জেফ্রী মণ্ট্‌মরেন্সী আগে হইতেই ছুটি লইয়া বিলাতে আছেন। বিহারের গবর্ণর স্যার্ হেন্‌রী হুইলারও ছুটিতে তথায় থাকিবেন। তিনি আগে বঙ্গের শাসন-পরিষদের সভ্য থাকায় বাংলা-দেশ-সম্বন্ধেও তাঁহার মত শিরোধার্য্য বলিয়া গৃহীত হইবে। ব্রহ্মদেশের গবর্ণর স্যার্ হারকোর্ট্ বাট্‌লারও যাইতেছেন। তিনি আগে আগ্রা-অযোধ্যার গবর্ণর থাকায় ঐ যুক্তপ্রদেশদ্বয়-সম্বন্ধেও তাঁহার মত বেদবাক্য বলিয়া গৃহীত হইবে। তা ছাড়া আগ্রা-অযোধ্যার রাজস্ব-পারিষদ ও'ডোনেল্ সাহেবও যাইতেছেন। মান্দ্রাজ হইতে যাইতেছেন স্যার্ আর্থার্ ন্যাপ, যাঁহার মালাবারে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী থাকা কালে অনেক মোপ্‌লা বিদ্রোহীর চলন্ত অন্ধকূপ রেলগাড়ীতে জীবন্ত সমাধি ঘটিয়াছিল। পঞ্জাবের পারিষদ স্যার্ জন্ মেনার্ড যাইতেছেন, এবং ভারত-সাম্রাজ্যের রক্ষাকর্ত্তা পঞ্জাবের ভূতপূর্ব্ব লাট স্যার্ মাইকেল ও'ডোয়াইয়ার ত আগে হইতেই বিলাতে আছেন। বোম্বাইয়ের ভূতপূর্ব্ব লাট স্যার্ জর্জ লইড ও আগে হইতে আছেন। তা-ছাড়া আগেকার লাট সিডেন্‌হাম্, মেষ্টন্ প্রভৃতি ত আছেনই।

ইঁহাদের কাহাকেও ভারতের ভাগ্যাকাশের শুভগ্রহ মনে করিবার কোন কারণ নাই। এতগুলি কুগ্রহের সমাবেশে কি ফল ফলিবে, জানিতে কৌতূহল অবশ্যই হয়।

অবশ্য খুব সদাশয় ইংরেজও যে, আমাদিগকে স্বাধীন করিয়া দিতে ও মানুষ করিয়া দিতে পারে, ইহা আমরা বিশ্বাস করি না। অন্যে আমাদের সুযোগ করিয়া দিতে এবং সাহায্য করিতে পারে বটে, কিন্তু প্রধান চেষ্টা, মূল-চেষ্টা, আসল চেষ্টা আমাদিগকেই করিতে হইবে। ভারতের ভাগ্যাকাশের কুগ্রহ আমরাই, শুভগ্রহও আমরাই হইতে পারি; অন্য লোককে কুগ্রহ বা শুভগ্রহ মনে করা ও বলা কেবল ব্যঙ্গচ্ছলেই চলে।

"উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ।
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি॥"

"লক্ষ্মী উদ্যোগী পুরুষসিংহকে আশ্রয় করেন; দৈব কিছু শুভফল দিবে, ইহা কাপুরুষেরাই বলিয়া থাকে।"

অতএব,

"দৈবম্ নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা।
যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ॥

"দৈবকে নষ্ট করিয়া আত্মশক্তির দ্বারা পৌরুষ অবলম্বন কর। যত্ন করিয়াও যদি সিদ্ধিলাভ না হয়, তাহাতে দোষ কি?"

প্রভুত্ব করিবার ইংরেজের অভাব

মানুষের যেমন ধনের লোভ, মোহ ও আকর্ষণ আছে, তেমনি প্রভুত্বের ও ক্ষমতার লোভ, মোহ ও আকর্ষণও আছে। দীর্ঘকাল ধরিয়া ইংরেজ রাজকর্ম্মচারীরা ভারতবর্ষে খুব মোটা বেতনের চাকরী করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে; তদুপরি তাহাদের প্রভুত্ব ও ক্ষমতাও ছিল কার্য্যতঃ অসীম। এবং এই প্রভুদের সহায়তায় ইংরেজ বণিক্ ও ধনিকগণও ভারত হইতে অর্থ শোষণ খুব করিয়া আসিতেছে।

তাহার পর আসিল ভারত-শাসনসংস্কার আইন। ইহাতে বাস্তবিক যে ভারতীয়দের প্রকৃত ক্ষমতা বিশেষ কিছু বাড়িয়াছে, তাহা নহে; প্রাদেশিক ও ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা-সমূহে আমাদের প্রতিনিধিরা গবর্মেণ্টের মতের বিরুদ্ধে যে-প্রস্তাব ধার্য্য করিয়াছেন, তাহার কতগুলি কার্য্যে পরিণত হইয়াছে, সন্ধান লইলেই আমরা কিরূপ স্বায়ত্তশাসন পাইয়াছি বুঝা যাইবে। যাহা হউক, সিবিলিয়ান্‌রা ও তাঁহাদের বন্ধুরা রব তুলিলেন, ভারতীয়-দিগকে এত ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, যে, ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেট্ প্রভৃতি তাহাদের চক্ষে নগণ্য ও হেয় হইয়া পড়িয়াছেন, এবং তাঁহাদের জীবন কণ্টকময় হইয়া পড়িয়াছে। ভারত-বর্ষে ইংরেজ পুরুষ ও নারীর কিরূপ অপমান হইতেছে, তাহাদের কিরূপ প্রাণ সংশয় হইয়াছে, ইংরেজ স্ত্রীলোকদের নারীধর্ম্ম বজায় থাকাও কিরূপ কঠিন হইয়া পড়িয়াছে, তাহার নানা অতিরঞ্জিত ও কাল্পনিক বর্ণনা বিলাতে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, প্রকাশিত হইতে লাগিল। তাহার পর ইংরেজদের এদেশে থাকিবার ব্যয় কিরূপ বাড়িয়াছে, তাহাও অবশ্য বর্ণিত হইতে লাগিল। সিদ্ধান্তটা এই দাঁড়াইল, যে, ইংরেজদের এমন যে অপমান, অসুবিধা, প্রাণসংশয় ও সতীত্বসংশয়ের দেশ ভারতবর্ষ, সেই ভারতবর্ষে ইংরেজ সিবিলিয়ান্‌রা এবং তাঁহাদের স্ত্রীরা ভারতীয়দের উদ্ধার সাধনের জন্য থাকিতে ও যাইতে আর রাজি নহেন;—কিন্তু, কিন্তু, তবে কিনা, অবশ্য, যদি সিবিলিয়ান্‌দের বেতন ও অন্যান্য পাওনা বাড়াইয়া দেওয়া হয় এবং তাহাদিগকে সপরিবারে বিলাত হইতে ভারতে যাতায়াতের ভাড়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহারা ভারতীয়দের মোক্ষলাভের সহায়তা করিতে রাজি হইতেও পারে। এইরূপ ওজুহাতে পুনঃ পুনঃ তাহাদের বেতনাদি বাড়ানো হইল। শেষে লী-কমিশন বসিয়া তাহাদের সুপারিস্-অনুসারে এবং ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বেতনাদি বৃদ্ধি পুনরায় হইয়াছে। কিন্তু ইহাতেও নাকি ইংরেজ যুবকদের ভারতীয় সিবিলিয়ান্ হইবার ইচ্ছা হইতেছে না। ভারত-বর্ষে যাঁহারা আগে প্রাদেশিক লাটগিরি করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহ-কেহ এবং অন্যেরাও বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিতে গিয়া ভারতবর্ষে চাকরীর নানা সুবিধা-সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেছেন। স্বয়ং ভারতসচিব বার্কেন্‌হেড্ কলম ধরিবেন, ও ইংরেজ যুবকদিগকে ভারতবর্ষের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা হইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিবেন। বাস্ত-বিক ভারতবর্ষের হর্ত্তা-হওয়া ত ভালই। কর্ত্তা ও বিধাতা হইতেই বা আপত্তি কেন হয়?

কিন্তু আগে আগে বেতন বাড়াইবার জন্য ও অন্য উদ্দেশ্যে, ভারতবর্ষ-সম্বন্ধে এত মিথ্যা কথা বিলাতে বলা হইয়াছে এবং এত বিভীষিকা প্রদর্শিত হইয়াছে, যে, এখন তাহার বিপরীত কথায় বোধ হয় বিলাতের যুবকেরা আর অবস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছে না। ফলে সিবিল্‌সার্ভিসের পরীক্ষায় যথেষ্ট ইংরেজ পরীক্ষার্থী জুটিতেছে না। লী-কমিশানের রিপোর্ট-অনুসারে দীর্ঘ-কাল-পরে ভারতে সিবিলিয়ান্‌দের মধ্যে শতকরা ৫০ জন ভারতীয় ও ৫০ জন ইংরেজ হইবার কথা। কিন্তু লর্ড বার্কেন্‌হেড্ আশঙ্কা করিতেছেন, যে, এই শত-করা ৫০জন ইংরেজ সিবিলয়ান্‌ও না জুটিতে পারে।

বিলাতে ভারতবর্ষের মুক্তিদাতা এতগুলি লোক সমবেত হইয়া যে-যে বিষয়ে পরামর্শ করিবেন, ইংরেজ যুবকদিগকে ভারতে সিবিলিয়ান্ হইবার নিমিত্ত প্রলুব্ধ করিবার জন্য আর কি করা যাইতে পারে, তাহার মধ্যে সম্ভবত তাহা একটি। হয়ত সিবিলিয়ান্‌দের বেতনাদি আরও বাড়াইবার ব্যবস্থা হইতে পারে। সে যুক্তিটি মন্দ নয়। টাকাটা যখন ভারতবর্ষ দিবে, তখন কেবল-মাত্র গ্রহণ করিবার কষ্ট স্বীকার করা জগদ্ধিতৈষী ইংরেজদের অবশ্যকর্ত্তব্য। বিশেষতঃ, ভারতীয়দের ঐহিক ধনসম্পত্তির ভার ও বন্ধন এইপ্রকারে যতই কমানো যাইবে, তাহারা সেই-পরিমাণে পারত্রিক মোক্ষ-লাভের উপযুক্ত হইয়া উঠিবে। অতএব মুক্তিদাতা ইংরেজদের এবিষয়ে ভারতবর্ষের সাহায্য করা একান্ত-কর্ত্তব্য।

অবশ্য, মন্দলোকে কি না বলে? তাহারা বলিতে পারে, সিবিলিয়ান্‌দের বেতনাদির এই অনুমিত শেষবৃদ্ধি অতিবৃদ্ধি হইয়া যাইতে পারে, এবং "অতি" কথাটা যে "অলক্ষ্যে" তাহা রামায়ণে লেখা আছে, যথা, "অতিদর্পে হতা লঙ্কা," ইত্যাদি। কিন্তু গোরুর-গাড়ীর ও লাঠি-ধনুর্ব্বাণের যুগে যাহা সত্য ছিল, ট্যাঙ্কের, এরোপ্লেনের, বোমার, সব্‌মেরীনের ও "শেল্"এর যুগে তাহা নিশ্চয়ই মিথ্যা।

ভারত-শাসনসংস্কার আইনের আরও কি-সংস্কার হইতে পারে বা পারে না, তাহা আলোচনা করিয়া রিপোর্ট্

লিখিবার জন্ম যে-কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল,তাহার রিপোর্ট্ বাহির হইয়াছে। এই ম্যাডিম্যান্ কমিটির অধিকাংশ সভ্য সামান্য জোড়াতালি দিবার পক্ষে রিপোর্ট্ দিয়াছেন; বাকী সভ্যেরা, বর্ত্তমান ভারত-শাসন আইনে ভারতীয়দিগকে যত ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা আরও বেশী ক্ষমতা দিবার পক্ষে, যথা সম্পূর্ণ প্রাদেশিক আত্মকর্ত্তৃত্ব প্রভৃতির পক্ষে রিপোর্ট করিয়াছেন। এই বিষয়-সম্বন্ধেও নিশ্চয়ই বিলাতে মন্ত্রণা হইবে। রক্ষণশীলদলের অন্যতম সাপ্তাহিক কাগজ স্যাটার্ডে রিভিয়ু ইতিমধ্যেই যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই—"১৯২৯ সাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া কি লাভ? শাসনসংস্কার ত ব্যর্থ হইয়াছে; অতএব বর্ত্তমান শাসন-প্রণালী উঠাইয়া দিয়া আগেকার প্রণালীতে ফিরিয়া যাওয়াই ভাল।" লর্ড্ সিডেনহামও আমেরিকার কারেণ্ট হিষ্ট্রী ম্যাগাজিনে লিখিয়াছেন, মর্লী-মিণ্টো সংস্কারের সময়েই অনেক ভারতীয় নেতা বলিয়াছিলেন, যে, ভারতীয়দিগকে অত্যন্ত বেশী ও তাহাদের আশার অতীত ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ মতাবলম্বী লোক রক্ষণশীলদলে অনেক আছে। অতএব তাহাদের প্রভুত্বকালে ম্যাডিম্যান্ কমিটির রিপোর্ট্-সম্বন্ধে মন্ত্রণার ফল যে ভারতবর্ষের অনুকূল হইবে না, তাহা বলাই বাহুল্য।

আরও অনেক বিষয়ে মন্ত্রণা হইতে পারে। কিন্তু তাহার ফলাফল-সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা করিয়া লাভ নাই।

—

উদ্ধারকর্ত্তা-সংগ্রহের ব্যয়

পূর্ব্বে লিখিয়াছি, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত ইংরেজ যুবকেরা আর আগেকার মত দলে-দলে ভারতীয়দের উদ্ধার-সাধনার্থ এদেশে সিবিলিয়ানী চাকরি করিতে আসিতে ব্যগ্র নহে। অধম-পতিত ভারতীয়দের দশা তবে কি হইবে, ভাবিয়া-ভাবিয়া অনেক ভারত-ভাগ্যবিধাতা ইংরেজের ঘুম হইতেছে না, তাঁহারা অস্থিচর্ম্মসার হইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ-কেহ পূর্ব্বে আমাদের মুক্তির জন্ম এদেশে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা ছিলেন। এখন ইঁহারা বিলাতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বক্তৃতাদি করিয়া, ভারতবর্ষের উদ্ধার-কর্ত্তা ইংরেজ সিবিলিয়ানদের দল যাহাতে পূর্ব্ববৎ পুষ্ট থাকে, সেই চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা এই যে কষ্টস্বীকার করিতেছেন, তাহা তাঁহারা আমাদের প্রতি দয়াবশতঃ বিনা মূল্যেই করিতেছেন। কিন্তু যাতায়তের ব্যয়, সভার জন্ম হল ভাড়া, বিজ্ঞাপন বিলি, প্রভৃতি খরচ ত আছে। সেগুলা তাঁহাদিগের নিজেদের পকেট হইতে দিতে বলা যুক্তিসঙ্গত কিম্বা শিষ্টাচারসম্মত নহে। এবং যেহেতু ভারতবর্ষের মুক্তিদাতা-সংগ্রহের চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ভারতেরই হিত ও লাভের জন্ম, ইহাতে ইংলণ্ডের এবং কোনও ইংরেজের একটা কানাকড়িও লাভ হইবে না, সেই হেতু ব্রিটিশ-গবর্ণ্মেণ্ট্ পূর্ব্বোক্ত ব্যয়ভার বহনের উচ্চ অধিকার ভারতবর্ষকে সম্ভোগ করিতে দিয়াছেন।

—

সত্যবাদী ইংরেজ

স্যার্ রবার্ট্ হর্ন্ নামক একব্যক্তি গ্লাসগোতে একটা বক্তৃতায় বলিয়াছে, ভারতবর্ষের একজন প্রাদেশিক গবর্ণর্ তাঁহাকে বলিয়াছে, যে, এখন ১০ জন সিবিলিয়ানের মধ্যে ৯ জন ভারতীয়। সমগ্র ভারতবর্ষে যত সিবিলিয়ান্ আছে, তাহার মধ্যে শতকরা ২০জন ত ভারতীয় নহেই, কোন প্রদেশেরই সিবিলিয়ানদের মধ্যে শতকরা ৯০ জন ভারতীয় নহে। এইজন্য মনে হইতেছে, হয় প্রাদেশিক গবর্ণরটা মিথ্যা কথা বলিয়াছে, কিম্বা স্যার্ রবার্ট্ মিথ্যা কথা বলিয়াছে। বিলাতে ভারতবর্ষ-সম্বন্ধে এইরকম খাঁটি খবর বিস্তর বাহির হয়।

—

ভারতবর্ষ ও জাতিসংঘ

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় জিজ্ঞাসিত একটি প্রশ্নের সরকারী উত্তর হইতে জানা যায়, যে, লীগ্ অব্ নেশ্যান্স্ অর্থাৎ জাতিসংঘের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ ১৯২২ সালে গ্রেট্ ব্রিটেন, ফ্রান্স ইটালী, পোল্যাণ্ড, ও ভারতবর্ষ সমান টাকা দিয়াছিল। হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ম তা'র চেয়ে অনেক কম দিয়াছিল। জাতিসংঘে কি ভারতবর্ষের মর্য্যাদা, ক্ষমতা, অধিকার, এবং তাহার সভ্যত্ব হইতে সুবিধা ও লাভ, অন্য চারিটি জাতির সমান, এবং বেল্জিয়ম ও হল্যাণ্ডের চেয়ে বেশী? তাহাদের সহিত ভারতবর্ষের তুলনা হইতে পারে কি? ভারতবর্ষ ত সংঘে নিজের প্রতিনিধিও নিযুক্ত করিতে পারে না। ব্রিটিশ গবর্ণ্মেণ্ট্ নিজের পছন্দমত ইংরেজ নিযুক্ত করে, এবং তাহার দ্বারা বিনি পয়সায় নিজের ভোট বাড়ায়। মিষ্টার্ কাম্বেল নামক একজন প্রতিনিধি আবার নিজেকে, শুধু গবর্ণ্মেণ্টের নয়, ভারতবর্ষের লোকদেরও প্রতিনিধি বলিয়া মিথ্যা দাবি জেনিভায় জাতিসংঘের আফিস বৈঠকে করিয়াছিল।

১৯২৩ ও ১৯২৪ সালে ভারতবর্ষ জাতিসংঘে ইটালী, পোল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, ও বেলজিয়ম্ অপেক্ষা বেশী টাকা দিয়াছিল, অর্থাৎ দিতে বাধ্য হইয়াছিল;—কেননা, ব্রিটিশ-সিংহের ল্যাজে বাঁধা ভারতবর্ষকে অগত্যা ব্রিটেনের লাভের জন্ম তাহার হুকুম তামিল করিতে হয়। স্বাধীন দেশ-সকলের চেয়ে বেশী টাকা দিয়া ভারতবর্ষকে এই যে ব্রিটেনের দাসত্বের প্রমাণ জগতে ঘোষণা করিতে হয়, ইহা কম লজ্জা ও লাঞ্ছনা নহে।

—

আফিং ও চিকিৎসকের অভাব

ভারত গবর্ণমেণ্ট্ কেবল চিকিৎসকদের ব্যবস্থা অনুযায়ী ঔষধার্থ ও বৈজ্ঞানিক ব্যবহারের জন্য যতটুকু আফিং দরকার, তাহাই উৎপন্ন করিতে রাজি নহেন। তাহার একটা কারণ এই প্রদর্শিত হয়, যে ভারতবর্ষে যোগ্যতা-বিশিষ্ট চিকিৎসক যথেষ্ট নাই; সেইজন্য সর্ব্বত্র ভারতবাসীরা নানা পীড়ার জন্য স্বয়ং টোট্কা ঔষধরূপে আফিং ব্যবহার করে ও তাহাতে উপকার পায়। কেবল ঔষধের দোকানে ডাক্তারদের ব্যবস্থা অনুসারে আফিং বিক্রী হইলে, ডাক্তার-বিহীন অগণিত স্থানে লোকে আফিং ব্যতিরেকে একেবারে ঔষধবিহীন হইয়া পড়িবে, এবং তাহাদের রোগ সারিবে না। অতএব, আফিং এখন যে-পরিমাণে উৎপন্ন এবং অনুমতিপ্রাপ্ত দোকানে বিক্রী হয়, তাহা হওয়াই উচিত।

গবর্ম্মেণ্টের যুক্তির উত্তরে অবশ্য বলা যাইতে পারে, "তোমরা যুদ্ধের জন্য শতশত কোটি টাকা খরচ করিয়াছ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে সামান্য একটা লড়াই হইলেই তাহাতে ২০।২৫ কোটি টাকা খরচ হয়, পুলিশের ব্যয় বাড়িয়াই চলিতেছে, অথচ যথেষ্টসংখ্যক চিকিৎসক প্রস্তুত করিবার জন্য তোমরা যথেষ্ট শিক্ষালয় স্থাপন ত করই নাই, অধিকন্তু দেশের লোকেরা (যেমন বাঁকুড়ায়) মেডিক্যাল স্কুল স্থাপন করিলে তাহার সাহায্য না করিয়া বাধাই দাও; ইহার জন্য কি ভারতবর্ষের লোক দায়ী, না তোমরা?" কিন্তু এখন গবর্ম্মেণ্টের দোষ না দেখাইয়া আমরা সর্কারী যুক্তির অসারতা একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইতেছি।

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় ডাঃ এস্ কে দত্ত আফিঙের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিতে উঠিয়া বলেন, সমগ্র বাংলাদেশে যত আফিং বিক্রী হয় তাহার একতৃতীয়াংশ শুধু কলিকাতায় হয়। বাংলা দেশের লোক-সংখ্যা ৪৭ নিযুত, সহর কলিকাতার মোটামুটি এক নিযুত। সারা বাংলার ৪৭ নিযুত লোক যত আফিং খায়, কলিকাতার এক নিযুত লোকেই তাহার একতৃতীয়াংশ খায়। গবর্ম্মেণ্টের যুক্তি সত্য হইলে ইহার মানে এই দাঁড়ায়, যে, কলিকাতায় একজনও ডাক্তার নাই বলিয়া কলিকাতার লোকেরা সকলরকম ব্যারামের জন্য নিজেরাই বেশী-বেশী করিয়া আফিং ব্যবহার করে, এবং গ্রামপ্রধান বাংলাদেশের বাকী অংশে—সহরে ও গ্রামে ঝুড়ি-ঝুড়ি ডাক্তার থাকায় লোকেরা তাঁহাদের ব্যবস্থা-অনুসারে সকল ব্যাধির জন্য অন্যান্য ঔষধ ব্যবহার করায় তথায় আফিঙের কাট্তি কম হয়। কলিকাতা যে ডাক্তারশূন্য এবং বাংলার গ্রামে-গ্রামে যে ডাক্তার গিজ্‌গিজ্ করিতেছে, ইহা কে না জানে?

চিত্তরঞ্জন দাশ ও অহিংসা

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ সম্প্রতি একটি ইস্তাহার জারি করিয়া বলিয়াছেন, যে, তিনি এবং স্বরাজ্যদল রাজনৈতিক গুপ্তহত্যা ও ভীতি-উৎপাদন-নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী, ঐরূপ উপায়ে কখন স্বরাজ্য-লাভ হইতে পারে না, ইত্যাদি। ইহা উত্তম কথা।

স্বরাজ্যদল ঐপ্রকার নীতির সমর্থক, ইউরোপীয় সমাজে এইরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছে বলিয়া, তিনি বলেন, তিনি তাহা দূর করিবার নিমিত্ত এই ইস্তাহার জারি করা আবশ্যক মনে করিয়াছেন। তিনি বলেন, স্বরাজ্যদলের নীতি ও কার্য্য-প্রণালী-সম্বন্ধে ইউরোপীয়দিগের ঐরূপ ধারণার উদ্ভবে তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন। তাঁহার মত বুদ্ধিমান্ লোক কেন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন, বুঝিতে পারিলাম না। সিরাজগঞ্জে গোপীনাথ সাহা বিষয়ক প্রস্তাব ধার্য্য হওয়া, তাহার পর তাহা যে ঠিক্ হইয়াছিল, তাহা কাগজে-পত্রে ও সভাসমিতিতে প্রমাণ করিবার চেষ্টা, কংগ্রেস্‌কমিটিতে পর্য্যন্ত চিত্তরঞ্জন বাবুর জিদ বজায় রাখিবার চেষ্টা, ফর্‌ওয়ার্ড কাগজে সকলের ভাল করিয়া নজরে পড়ে, এরূপ ভাল জায়গায় ও বড় অক্ষরে ব্লাণ্ট্ সাহেবের বহি হইতে মদনলাল ধিংড়ার প্রশংসাত্মক বাক্য উদ্ধার, ইত্যাদি কার্য্য হইতে ইউরোপীয়েরা যদি একটা বিশ্বাসে উপনীত হইয়া থাকে, তাহা বাক্যের দ্বারা এবং কার্য্যেরও দ্বারা অপনোদনের চেষ্টা নিশ্চয়ই সমর্থনযোগ্য। কিন্তু ঐরূপ বিশ্বাসের উদ্ভবে আশ্চর্য্যান্বিত হওয়া স্বাভাবিক মনে হইতেছে না।

চিত্তরঞ্জন-বাবুর ইস্তাহার বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স্ আইনে পরিণত হইবার এবং আইনটার প্রপূরক আর-একটা আইন বিধিবদ্ধ হইবার পর তিনি জারি না করিয়া বহু-পূর্ব্বে করিলে ভাল হইত, এবং তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধিও অধিক সহজে হইত।

গবর্ম্মেণ্টের সহিত সহযোগিতা

স্বরাজ্যদল কোন্-কোন্ "সম্মানজনক" সর্ত্তে গবর্ম্মেণ্টের সহিত সহযোগিতা করিতে পারেন, সে-বিষয়ে একটা লেখা ফজলল হক্ প্রভৃতি কয়েকজন ব্যবস্থাপক কাগজে ছাপেন, তাহার পর চিত্তরঞ্জন দাশ তাহার সংশোধক আর কি-একটা ছাপান; চিত্তরঞ্জনের অহিংসাবাদ পাঠ করিয়া ভারতসচিব বার্কেন্‌হেড্ ও তাঁহাকে বিপ্লববাদ রাজনৈতিক হত্যা আদি দমনে গবর্ম্মেণ্টের সহায়তা করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিয়াছেন; চিত্তরঞ্জন বর্ত্তমান অবস্থায় গবর্ম্মেণ্টের সহযোগিতা করিতে নারাজ;—ইত্যাকার নানা জাহাজী সংবাদ খবরের কাগজে বাহির হইয়াছে ও হইতেছে। দেশের কাণ্ডারী ও কর্ণধারগণের তাহা প্রণিধানযোগ্য;

আদায়-ব্যাপারীদের তৎসমুদয়ের আলোচনা অনধিকার-চর্চ্চা।

তথাপি, ইংরেজীতে যেমন বলে, যে, বিড়ালেরও রাজাকে দেখিবার অধিকার আছে, তেমনি আদায় ব্যাপারীদেরও গবর্মেণ্টের সহিত সহযোগিতা-সম্বন্ধে নিজেদের খাস্ ব্যবহারের জন্য একটা সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিবার অধিকার আছে। তদ্রূপ একটা সিদ্ধান্ত এই যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত পরাধীন দেশের অধিবাসী কোন ব্যক্তি বা দল সমানে-সমানে গবর্মেণ্টের সহিত সহযোগিতা করিতে পারে, এই কল্পনা আকাশকুসুম। ইস্পাতের শিকলে সোনার গিল্টি থাকিলেও উহা শিকল, গলার হার নহে। গবর্মেণ্ট্ কাহাকেও সহযোগিতা করিতে ডাকিলে, এই সহযোগিতার প্রকৃত অর্থ অনুবর্ত্তিতা,—যদিও তাহার উপর সহযোগিতার রং মাখানো থাকিতে পারে। সহযোগিতা অর্থে ভারতের শ্বেত আমলারা চিরকাল ইহাই বুঝিয়াছে, এবং এখনও বুঝে "আমরা কর্ম্মনীতি ও কার্য্যপদ্ধতি ঠিক করিয়া দিব, তোমরা সেই-অনুসারে কাজ করিবে;—অবান্তর ছোটখাট বিষয়ে অবশ্য আমরা তোমাদের কথা শুনিব এই উদ্দেশ্যে, যে, তাহার দ্বারা, তোমরা বস্তুতঃ অনুবর্ত্তিতা করিলেও এই ভ্রমেই পড়িয়া থাকিবে যে, তোমরা আমাদের সমকক্ষভাবে সহযোগিতা করিতেছ।"

অনুবর্ত্তিতাকে গিল্টি করিয়া বা রং ফলাইয়া সহযোগিতার চেহারা দিলেও তাহা কখনও "সম্মানজনক" হইতে পারে না।

—

তারকেশ্বরের শুদ্ধির জন্য চিত্তরঞ্জনের আত্মবলিদান

তারকেশ্বর তীর্থকে সর্ব্বপ্রকার অত্যাচার ও অনাচার হইতে মুক্ত করিবার জন্য চিত্তরঞ্জন প্রাণ দিতেও প্রস্তুত এইরূপ বলিয়াছিলেন। তাঁহার এই আত্মবলিদান প্রতিশ্রুতির হোমশিখায় বঙ্গের নানা স্থান হইতে শত শত ব্যক্তি আপনাদিগকে আহুতি দিতে আসিয়াছিল। ফলে সতীশ গিরি মহান্তের দক্ষিণ হস্ত প্রভাত গিরিকে মহান্ত করিয়া তাহার সহিত একটা রফা করা হয়. যদিও চিত্তরঞ্জন প্রাণ দেন নাই, এবং তারকেশ্বরের কালিমাও দূর হয় নাই। সম্প্রতি আদালতে এই রফা বেআইনী বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সুতরাং চিত্তরঞ্জনের আত্মবলিদান ও এত লোকের আহুতি বাজে খরচ হইয়া দাঁড়াইল। এরূপ অপব্যয় সাতিশয় শোচনীয়।

—

কলিকাতায় মাদক-বিক্রয়-নিবারণ চেষ্টা

মদ, আফিং, গাঁজা, প্রভৃতি সকল রকম মাদক দ্রব্যের দোকান কলিকাতা হইতে উঠাইয়া দেওয়া হউক, এই মর্ম্মের একটি প্রস্তাব ধার্য্য করিয়া কলিকাতা মিউনিসিপালিটী তাহা বাংলা গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা শুধু কলিকাতা হইতে নয়, দেশের সমস্ত সহর ও গ্রাম হইতে মাদক দ্রব্যের বিক্রয় ও ব্যবহার বন্ধ করিবার পক্ষে। কলিকাতা এই প্রস্তাব ধার্য্য করিয়া ভালই করিয়াছেন।

কলিকাতায় মাদকের ব্যবহার বন্ধ করিতে হইলে তাহার বাহির হইতে লোকে গোপনে মাদক আনিয়া নিজে ব্যবহার করিতে এবং অন্যকে বিক্রী করিতে যাহাতে না পারে, তাহার বন্দোবস্তও করিতে হইবে। এবিষয়ে কলিকাতা মিউনিসিপালিটী মনোনিবেশ করিলে ভাল হয়।

—

জাপানে ও ভারতবর্ষে ডাকমাশুল

জাপানের লোক-সংখ্যা ৫৭,২৩৩,৯০৬, ব্রিটেন্‌শাসিত ভারতবর্ষের লোক সংখ্যা ২৪৭,০০৩,২৯৩; অর্থাৎ ব্রিটিশ-শাসিত ভারতের লোক-সংখ্যা জাপানের চারিগুণেরও অধিক। অথচ জাপান গবর্মেণ্টের বার্ষিক আয় ২১১ কোটি ৩৫লক্ষ ৮১ হাজার টাকা, ব্রিটিশভারতীয় গবর্ণ্‌মেণ্টের বার্ষিক আয় মোটামুটি ১৩০ কোটি টাকা। ভারতবর্ষের প্রাদেশিক গবর্মেণ্ট্‌গুলি যে-যে রকমের রাজস্ব পাইয়া থাকেন, তাহা ধরিলেও ১৯২০ ২১ সালে ভারতে ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের আয় মোটামুটি ২১৫ কোটি টাকা হইয়াছিল। ইহা হইতে বুঝা যাইবে, যে, গড়ে জাপানের লোকেরা ভারতের লোকদের চেয়ে বেশী ধনী ও বেশী ট্যাক্স্ দিতে সমর্থ।

যাহারা আমাদের চেয়ে বেশী ধনী, তাহাদিগকে যদি আমাদের চেয়ে বেশী হারে ডাকমাশুল দিতে হয়, তাহা হইলে তাহা তাহাদের গায়ে লাগিবার কথা নয়। অতএব দেখা যাক্, জাপানের ডাকমাশুলের হার কিরূপ। আমরা এক-একখানা পোষ্ট্‌কার্ডের জন্য দু'পয়সা ডাকমাশুল দিই; জাপানের লোকেরা দেয় দেড় সেন্ অর্থাৎ দেড় পয়সা। আমরা এক-একখানা চিঠির জন্য দিই চারি পয়সা, জাপানের লোকেরা দেয় তিন সেন্ অর্থাৎ তিন পয়সা। আমরা খবরের কাগজ ডাকে পাঠাইবার জন্য সর্ব্বনিম্ন মাশুল দিই এক-একখানা হাল্কা কাগজের জন্য এক পয়সা, জাপানের লোকেরা দেয় আধ সেন্ অর্থাৎ আধ পয়সা।

জাপানীরা প্রত্যেকে গড়ে ভারতীয়দের চেয়ে ধনী হওয়া সত্ত্বেও, তাহাদের দেশে ডাকমাশুলের হার এখান-

কার চেয়ে কম। তাহার ফল কিরূপ হইয়াছে দেখুন। ১৯২০ ২১ সালে জাপানে ও ভারতবর্ষে উভয় দেশের ডাক-বিভাগ চিঠি ও পোষ্ট্‌কার্ড্‌ এবং খবরের কাগজ কত চালান ও বিলি করিয়াছিল, তাহারই তালিকা দিতেছি।

দেশ	চিঠি ও পোষ্টকার্ড	খবরের কাগজ
ভারতবর্ষ	১২৪,২৬,১৫,৬১৯	৭,০৩,০৬,৭৭২
জাপান	৬৩০,০৮,৩৯,০০০	২৫,৮৪,২৩,০০০

জাপানের লোকসংখ্যা ব্রিটিশশাসিত ভারতের সিকিরও কম হওয়া সত্ত্বেও তাহারা আমাদের প্রায় তিন গুণ চিঠি ও পোষ্ট্‌কার্ড্‌ ডাকে পাঠায়, এবং আমাদের চেয়ে তিনগুণেরও অধিক খবরের কাগজ ডাকে পায়। মনে রাখিতে হইবে, ভারতের দেশী রাজ্যের লোকেরাও আমাদিগকে চিঠি লেখে ও আমাদের চিঠি পায়। তাহাদের সংখ্যা ধরিলে সমগ্র ভারতের লোক-সংখ্যা জাপানের ৫গুণেরও বেশী হয়। অবশ্য সস্তা ডাকমাশুলই ইহার প্রধান ও একমাত্র কারণ নহে। জাপানে ভারতবর্ষ অপেক্ষা অনেক বেশী শিক্ষার বিস্তার ইহার প্রধান কারণ। ভারতে শতকরা ছয় জন মানুষ লিখিতে-পড়িতে পারে। জাপানে ৫।৬ বৎসরের শিশুরা ছাড়া প্রায় আর সকলেই লিখিতে-পড়িতে পারে। কিন্তু জাপানে শিক্ষার অধিকতর বিস্তার তথায় চিঠি ও কার্ডের এবং খবরের কাগজের ডাকে খুব বেশী চলান হইবার প্রধান কারণ হইলেও, সস্তা ডাকমাশুলও যে একটা গণনীয় কারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

—

বঙ্গে বিধবাবিবাহ

বঙ্গে বিধবাবিবাহ উৎসাহের সহিত চালাইবার নিমিত্ত সম্প্রতি কলিকাতায় আলবার্ট্‌ হলে সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ পণ্ডিত মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি সভা হইয়াছিল। তাহাতে পণ্ডিত মহাশয় একটি অতি সারবান্‌ সুচিন্তিত বক্তৃতা করিয়া বিধবা-বিবাহের আবশ্যকতা ও উহা প্রচলিত না থাকার অনিষ্ট ফল বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন।

নারীরাও মানুষ, পুরুষেরাও মানুষ। সুতরাং যাঁহার নিরপেক্ষ ন্যায়বুদ্ধি আছে, তিনিই বলিবেন, পুত্র পৌত্রাদিবিশিষ্ট পুরুষেরাও যখন বিপত্নীক হইলে অবাধে বিবাহ করে, তখন নিঃসন্তানা অল্পবয়স্কা বিধবাদের বিবাহ অবশ্যই হওয়া উচিত। এরূপ বিধবারা চিরবৈধব্য-হেতু আজীবন যেরূপ কষ্ট পান, তাহাতে তাঁহাদের প্রতি দয়া যাঁহাদের আছে, তাঁহারাই তাঁহাদের বিবাহে মত দিবেন এবং উৎসাহী হইবেন।

অল্পবয়স্কা বিধবাদের বিবাহ প্রচলিত না থাকায় সমাজে কিরূপ দুর্নীতি ও অপবিত্রতা বৃদ্ধি পায়, তাহার একটি মাত্র প্রমাণ দিতেছি। গ্রাম্যভাষায় বিধবার সমার্থক যে-শব্দ ব্যবহৃত হয়, উপপত্নী ও পতিতা নারী বুঝাইতেও সেই শব্দ ব্যবহৃত হয়।

তদ্ভিন্ন ভ্রূণহত্যা, শিশুহত্যা, প্রভৃতি মহা পাপও চিরবৈধব্যের ফল।

বাঙালী হিন্দুদের সংখ্যাহ্রাসেরও একটি কারণ অল্পবয়স্কা বিধবাদের চিরবৈধব্য। এই চিরবৈধব্য হেতু যাঁহারা সন্তানের জননী হইতে পারিতেন, এমন লক্ষ লক্ষ নারী নিঃসন্তানা থাকায় লোকসংখ্যা বাড়িতে পায় না; আবার বঙ্গে পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যার ন্যূনতা, কন্যাশুল্ক প্রভৃতি কারণে অনেক পুরুষ অবিবাহিত থাকিয়া যায় কিম্বা এত অধিক বয়সে বিবাহ করে, যে, তাহাদের যত সন্তান হইতে পারিত তত হয় না। বিধবাদের বিবাহ চলিত হইলে নারীর সংখ্যার ন্যূনতার কুফল অনেকটা নিবারিত হইবে, এবং এখন যে-সব পুরুষ বিবাহ করিতে পারে না, তাহারা পত্নী পাইবে। বিধবাবিবাহ চলিলে আর-একটা ভাল ফল এই হইবে, যে, সাধারণতঃ যে বয়সে কুমারীদের বিবাহ হয় তাহা অপেক্ষা বেশী বয়সে বিবাহিতা হইবেন, সুতরাং সন্তানের জননীও হইবেন অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে; সেই কারণে তাঁহাদের সন্তানেরা সাধারণতঃ বাল্যবিবাহের সন্তানদের চেয়ে সুস্থ ও সবল হইবে।

বাংলাদেশে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা অধিক। তাহা সত্ত্বেও দেখা যায়, মুসলমান-সমাজে যত বিধবা আছেন, হিন্দু-সমাজে তাহা অপেক্ষা বিধবাদের সংখ্যা অনেক বেশী। সকল বয়সের বিধবাদের সংখ্যা না দেখাইয়া কেবলমাত্র ত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কোন্‌ সমাজে কত বিধবা আছেন, ১৯২১ সালের সেন্সস্‌-অনুসারে তাহা দেখাইতেছি।—

বয়স	হিন্দু বিধবা	মুসলমান বিধবা
০-১	৪৫	১৮
১-২	২৫	২৪
২-৩	১২৪	৮৩
৩-৪	৩২১	২৪০
৪ ৫	৯২০	১০৪১
৫-১০	৮৭৫১	৭৫৫৮
১০-১৫	৩৬৩২৩	২৩৪৮০
১৫-২০	৯৬৪৭০	৫২১৭৯
২০-২৫	১৫১০৮৬	৭২৫৯৮
২৫-৩০	২৩০৭৯৩	১২৪৪৬৯

—

বালিকাদের সম্মতির বয়স

বালিকাদের বর্ত্তমান সম্মতির বয়স বার বৎসর,

তাহা বাড়াইবার জন্য স্যার্ হরিসিং গৌড় ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় যে-বিল্ উপস্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহা নামঞ্জুর হইয়াছে।

যাঁহারা সম্মতির বয়স বাড়াইয়া স্বামীর পক্ষে ১৪ ও অন্য পুরুষের পক্ষে ১৬ করিবার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাঁহারা একথা কেহই বলেন নাই—বলিবার সাহস হয়ত কাহারও-কাহারও হয় নাই—যে, ১৪ বৎসরেরও কম বয়সে বালিকা মাতা হইবার যোগ্যতা লাভ করে; বরং তাঁহাদের মধ্যে কেহ-কেহ ইহা স্পষ্ট করিয়াই বলেন, যে, বালিকাদের বিবাহ এখনকার চেয়ে বেশী বয়সে হইলেই, যে অনিষ্টফল নিবারণের জন্য বিলটি পেশ করা হইয়াছে, তাহা নিবারিত হইবে, অতএব হিন্দু সমাজের নেতাদের বালিকাদের বিবাহের বয়স বাড়াইয়া দেওয়া সর্ব্বপ্রযত্নে কর্ত্তব্য। তাহাদের বিবাহ খুব কচি বয়সে দিব, অথচ সম্মতির বয়সও বাড়াইব না, এরূপ নৃশংস ও অসঙ্গত ব্যবহার অমার্জ্জনীয়।

বিরোধীরা স্বামীদের অধিকারের উপর, এবং তাহারা কিরূপে নিরাপদ্ হইতে পারে, তাহার উপরই বেশী জোর দিয়াছিলেন। কিন্তু বালিকা বধূদেরও যে অধিকার আছে, বাল্যমাতৃত্বের জন্য যে হাজার-হাজার বালিকা অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে কিম্বা জীবন্মৃত হইয়া থাকিতেছে ও তাহাদের সন্তানেরা মৃত অবস্থায় বা দুর্ব্বল ও ক্ষীণজীবী হইয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে এবং তাহাতে সমস্ত জাতি দুর্ব্বল, হীনবীর্য্য ও কাপুরুষ হইতেছে, সে-কথাটা বিপক্ষ মহাশয়েরা ভুলিয়া যাইতেছেন। আর, স্বামীদের তথাকথিত অধিকারটাই বা কি রকম? অধিকার আর কিছু নয়—বালিকা পত্নী দ্বাদশ-বর্ষবয়স্কা হইলেই (এবং কখন-কখন তাহার পূর্ব্বেই) তাহার সহিত দাম্পত্য-জীবনযাপনের অধিকার। এই অধিকারের কথা যাহারা বলিতে লজ্জা বোধ করে না, তাহাদের মত বেহায়া খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন।

এই প্রসঙ্গে গোখলে প্রতিষ্ঠিত ভারত-সেবক-সমিতির মুখপত্র সার্ভেণ্ট্ অব্ ইণ্ডিয়া দিল্লীর একটি খবরের কাগজ হইতে এই সংবাদটি সংগ্রহ করিয়াছেন, যে, তথাকার লেডী হার্ডিং হাঁসপাতালে একটি তের বৎসরের বালিকা তৃতীয় বার সন্তান প্রসব করিবার নিমিত্ত ভর্ত্তি হইয়াছে। সংবাদটির উপর সার্ভেণ্ট্ অব্ ইণ্ডিয়া মন্তব্য করিতেছেন—"Let the Government and others who killed the Gour Bill ponder over their crime;" "গবর্ণ্মেণ্ট্ ও অন্য যাহারা গৌড়-বিলের প্রাণবধ করিয়াছেন, তাঁহারা নিজেদের অপরাধ-সম্বন্ধে চিন্তা করুন।"

—

কোহাটের হিন্দুমুসলমান বিরোধ

কোহাটের হিন্দুমুসলমান-বিরোধ-সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া মহাত্মা গান্ধী ও মৌলানা শৌকৎআলী এই একটা বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত হইয়াছেন, যে, গবর্ণ্মেণ্ট্ কর্ম্মচারীরা ও গবর্ণ্মেণ্ট্ এবিষয়ে তাহাদের কর্ত্তব্য করেন নাই, গুরুতর ক্রটি ও অপরাধ তাঁহাদের হইয়াছে; তাঁহারা নিজেদের কর্ত্তব্য করিলে ব্যাপারটি এরূপ গুরুতর আকার ধারণ করিত না। অন্য অনেক বিষয়ে উভয় নেতার মধ্যে মতভেদ হইয়াছে। তাঁহাদের মত দুই বন্ধু যে একমত হইতে পারেন নাই, তাহা হইতেই বুঝা যাইতেছে, উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে পরস্পরের বিরুদ্ধে কিরূপ প্রতিকূল ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছেন।

উভয় সম্প্রদায়ের মনের মিল যাহাতে হয়, সর্ব্বপ্রযত্নে তাহা করিতে হইবে। কিন্তু কোন প্রকার চুক্তি দ্বারা তাহা হইবে না। যখন মানুষদের হৃদয় মন আত্মার দেশ এক হয়, তাহাদের সর্ব্বোচ্চ আধ্যাত্মিক ও সামাজিক আদর্শ এক হয়, তখনই তাহাদের প্রকৃত ও স্থায়ী সদ্ভাব সম্ভবপর হয়। মুসলমানেরা বাস করিবেন সপ্তম শতাব্দীর আরবদেশে কিম্বা মামুদ গজনবী, আলাউদ্দীন খিলজী, মুহম্মদ তোগলক বা আওরংজীবের আমলে, এবং হিন্দুরা বাস করিবেন মনুস্মৃতির দেশে কিম্বা স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের আমলে;—এঅবস্থায় সদ্ভাব ও মিলন সম্ভবপর নহে। সাধনা দ্বারা ভারতীয় সকল সম্প্রদায়কে ভারতবর্ষের সর্ব্বোচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শ উপলব্ধি করিতে হইবে, এবং সেই আদর্শের দেশে সকলের আত্মাকে বাস করিতে হইবে। তবে আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে।

—

বঙ্গে লোকহিতসাধন

সম্প্রতি বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলীর, সেণ্ট্রাল্ অ্যাণ্টি-ম্যালেরিয়া সোসাইটীর, এবং বেঙ্গল হেল্থ অ্যাসোসিয়েশ্যানের কর্ম্মিষ্ঠতার পরিচয় প্রকাশ্য সভায় সর্ব্বসাধারণে পাইয়াছেন। আমরা ইহাদের হিতচেষ্টাসমূহের প্রসার ও সম্পূর্ণ সাফল্য কামনা করিতেছি, এবং বঙ্গের অধিবাসীগণকে সহযোগিতা দ্বারা ও অর্থ দ্বারা ইঁহাদের সাহায্য করিতে অনুরোধ করিতেছি।

—

বঙ্গে জলকষ্ট

জলকষ্টের জন্য বার্ষিক আর্ত্তনাদ শ্রুত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। অনেক গ্রামে ও নগরে অগ্নিকাণ্ডও হইতেছে। গবর্ন্মেণ্ট্ ডিষ্ট্রিক্ট্ বোর্ড্ প্রভৃতির মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলে চলিবে না; দলবদ্ধভাবে স্বাবলম্বন চাই। ইহা পুরাতন কথা। কিন্তু নূতন করিয়া স্মরণ করিতে দোষ নাই।

কৃষি ও স্বাস্থ্যবিষয়ক উন্নতির জন্য সমিতি গঠন করিবার যে আইন আছে (বোধ হয় ১৯২০ সালের ৬ আইন), তদনুসারে সমিতি গঠন করিয়া সভ্যের চাঁদা দিয়া কিছু টাকা সংগ্রহ করিলে পুরাতন পুষ্করিণী আদির পঙ্কোদ্ধারের জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ঋণ পাইতে পারেন।

—

হোষঙ্গাবাদে 'অস্পৃশ্যতা'

মধ্য প্রদেশের হোষঙ্গাবাদ সহরের কতকগুলি তথাকথিত অস্পৃশ্য লোক সাধারণের কূপ হইতে জল তুলিবার অনুমতি কর্তৃকপক্ষের নিকট চাহিয়াছিল, নতুবা তাহাদিগকে দারুণ গ্রীষ্মে ও রৌদ্রে বহুদূরবর্ত্তী নর্ম্মদানদী হইতে জল আনিতে যাইতে হয়। অনুমতি তাহারা পাইয়াছিল, কিন্তু তাহাদের প্রতিবেশী মুসলমান ও হিন্দুদের প্রতিকূলতায় তাহারা কূপ হইতে জল তুলিতে পারিতেছে না। এ-বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সহিত গোঁড়া হিন্দু সম্প্রদায়ের শিরোমণি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের যে সব কথাবার্ত্তা হইয়াছে, খবরের কাগজে তাহার বৃত্তান্ত পড়িয়া আমরা ভারতীয় বা হিন্দু বলিয়া গৌরব বোধ করিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, গোঁড়ারা বলিয়াছেন, হিন্দু মহাসভা-কর্তৃক মনোনীত সমগ্র ভারতীয় বিদ্বজ্জনসভা যদি সাধারণের কূপ হইতে "অস্পৃশ্যদিগকে" জল তুলিবার অধিকার দেন, তাহা হইলে তাঁহারা তাহাতে সম্মত হইবেন। হোষঙ্গাবাদের মিউনিসিপ্যাল্ সভাপতি এখন পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়কে এই বিদ্বজ্জনসভার নিকট বিষয়টি উপস্থিত করিয়া শীঘ্র ব্যবস্থা লইতে অনুরোধ করিয়াছেন। দেখা যাক্, হিন্দু মহাসভার কলিকাতার অধিবেশনে কি হয়। কিন্তু হিন্দু-সমাজে সামাজিক সংকীর্ণতা ও ভীরুতা এত বাড়িয়াছে, যে, হিন্দু মহাসভা বা বিদ্বজ্জনসভা অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা দিলেই যে তাহা দেশের সর্ব্বত্র গৃহীত ও অনুসৃত হইবে, এমন আশা হয় না।

—

কলিকাতায় হিন্দুমহাসভার কাজ

এবার বাংলা দেশে হিন্দু মহাসভার অধিবেশন হইতেছে। বঙ্গে হিন্দুর ক্রমশঃ হ্রাস ও অধোগতি হইতেছে। ইহা নিবারণের জন্য নানা উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। তন্মধ্যে সামাজিক প্রধান চারিটি উপায়—(১) বাল্যবিবাহ ও বাল্যমাতৃত্বের উচ্ছেদসাধন, (২) নিঃসন্তানা অল্পবয়স্কা বিধবাদের বিবাহ পুনঃ প্রচলন, (৩) স্ত্রীশিক্ষার সম্যক্ বিস্তার, এবং (৪) যে-সকল জাতিকে লোকে ভ্রান্ত-সংস্কার-বশতঃ অস্পৃশ্য বা অনাচরণীয় মনে করে, তাহাদিগকে যথোপযুক্ত সামাজিক অধিকার ও সম্মান প্রদান, এবং তাহাদের প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন। এই চারিদিকে উন্নতির ব্যবস্থা করিতে না পারিলে হিন্দুমহাসভার অধিবেশন মূল্যহীন হইবে।

আমরা কাহাকেও অস্পৃশ্য বা অনাচরণীয় মনে করি না। সুতরাং কোন-কোন জাতির নামের উল্লেখ এখানে করিলে কেহ-যেন মনে না করেন, যে, আমরা তাঁহাদিগকে ঐ পর্য্যায়ভুক্ত মনে করি। ১৯২১ সালের সেন্সস্ রিপোর্টে দেখিলাম, বঙ্গে ব্রাহ্মণদের সংখ্যা ১৩ লক্ষ ৯ হাজার ৫৩৯ মাত্র। বৈদ্যদের সংখ্যা মাত্র এক লক্ষের উপর। কায়স্থদের সংখ্যা ১২ লক্ষ ৯৭ হাজার ৭৩৬। সেন্সস্ রিপোর্টের মতে চাষী কৈবর্ত্ত বা মাহিষ্যদের সংখ্যা ২২ লক্ষ ১০ হাজার ৬৮৪। নমঃশূদ্রের সংখ্যা ২০ লক্ষ ৬ হাজার ২৫৯। রাজবংশীদের সংখ্যা ১৭ লক্ষ ২৭ হাজার ১১১,:ইত্যাদি। অতএব ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থেরাই যেন সর্ব্বেসর্ব্বা তাঁহারা এরূপ ভাণ করিলে চলিবে না।

নমঃশূদ্রেরা ইতিমধ্যেই বিদ্রোহী হইয়াছেন। বর্ত্তমান সামাজিক ব্যবস্থা ও অবস্থার পরিবর্ত্তন না হইলে তাঁহাদের অনেকে মুসলমান ও অনেকে খৃষ্টীয়ান হইয়া যাইবেন। ধর্ম্মবিশ্বাসের জন্য ধর্ম্মান্তর গ্রহণ নিন্দনীয় নহে; অন্য কোন কারণে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ নমঃশূদ্রদের পক্ষে এবং সাধারণতঃ হিন্দু-সমাজের পক্ষে সুফলপ্রদ হইবে না।

—

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন

কলিকাতায় যখন হিন্দুমহাসভার অধিবেশন হইবে, মুন্সীগঞ্জে তখন বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন হইবে। কোন্ অনুষ্ঠানটি ছাড়িয়া কোন্‌টিতে কে যোগ দিবেন, তাহা স্থির করা সহজ হইবে না।

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের বৎসর-বৎসর অধিবেশন হওয়ার এপর্য্যন্ত কি স্থায়ী শুভ ফল ফলিয়াছে, তাহার একটি রিপোর্ট বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশ করিলে ভাল হয়। আমরা উহা পাইলে উহার সংক্ষিপ্তসার প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক।

—

বঙ্গের কতিপয় ব্যবস্থাপকের চাঞ্চল্য

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার একটি অধিবেশনে অধিকাংশের মতে স্থির হয়, যে মন্ত্রী নিয়োগ করা গবর্ণমেণ্টের উচিত। তাহার পর গবর্ণর জানান, যে যদি তাঁহার দ্বারা মনোনীত মন্ত্রীরা সভার বিশ্বাসভাজন না হন, তাহা হইলে তাঁহাদের বেতনের বরাদ্দ মঞ্জুরীর জন্য সভায় উপস্থিত করা হইলেও তাঁহাদের বেতন কিছু কমানো হউক এইরূপ প্রস্তাব ধার্য্য হইলে, মন্ত্রীরা পদত্যাগ করিবেন, এবং অন্য মন্ত্রী নিযুক্ত হইবেন; কিন্তু যদি মন্ত্রীদের বেতনের বরাদ্দটাই না-মঞ্জুর হয়, তাহা হইলে আর মন্ত্রীনিয়োগ হইবে না, গবর্ণর্ স্বয়ং হস্তান্তরিত বিষয়গুলির ভার

স্বহস্তে লইবেন। যথাকালে মন্ত্রীদের বেতনের বরাদ্দ সভায় উপস্থিত করা হইলে, উহা না-মঞ্জুর হইয়া গিয়াছে।

ডায়ার্কি বা দ্বৈরাজ্যের উচ্ছেদসাধন, আমরা বাঞ্ছনীয় মনে করি। সুতরাং ব্যবস্থাপক সভা মন্ত্রীনিয়োগের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করায় সেজন্য আমরা সভ্যদের নিন্দা করিতেছি না। যে দু'জন লোক মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে আমরাও উপযুক্ত মনে করি নাই। তাঁহাদের মন্ত্রীত্ব ত্যাগেও আমরা দুঃখিত নহি।

আমরা কেবল ভাবিতেছি, একবার অধিকাংশের মতে মন্ত্রীনিয়োগ গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য বলিয়া ধার্য্য হইল,তার পর আবার অধিকাংশের মতে স্থির হইল মন্ত্রী থাকা উচিত নয়, সুতরাং দুইবারের অধিকাংশের মধ্যে এমন কতকগুলি লোক আছেন, যাঁহারা একবার যাহাতে সম্মতি দিয়াছিলেন, দ্বিতীয়বার তাহাতেই অসম্মতি জানাইলেন। এইরূপ চঞ্চলমতি লোকরা শ্রদ্ধেয় ও ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইবার যোগ্য বিবেচিত হইতে পারেন না।

—

"রাজা" বদ্‌মায়েস্ ও "প্রজা" কয়েদী

কয়েকটি শিশু চোর-চোর খেলিত। চোর ছিল দু-রকম, লক্ষ্মী চোর ও দুষ্টু চোর। ইহা সত্য ঘটনা। চোরও আবার দু' রকম হয়, শুনিয়া বয়োবৃদ্ধেরা হাসিবেন। কিন্তু আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে ইহার সদৃশ একটা ব্যাপার গবর্মেণ্টের জ্ঞাতসারে ও অনুমোদনে চলিয়া আসিতেছে, যাহা হাস্যকর নহে, সাতিশয় লজ্জাকর। তথাকার একটা জেলে শ্বেত-কয়েদীদের জন্য গ্রীষ্মে পাখার ব্যবস্থা আছে, এবং সেই পাখা টানে ভারতীয় কয়েদীরা। অর্থাৎ, যে রাজার জা'ত, "বাদশাহ কা দোস্ত", সে যদি চোর ডাকাত বদ্‌মায়েস্ হয়, তথাপি তাহার রাজসম্মানটা বজায় থাকা চাই, এবং ভারতীয় কয়েদীরা প্রজার জা'ত বলিয়া বন্দীকৃত বদ্‌মায়েস্ ইংরেজদের পাখা টানিতে বাধ্য।

ঐ আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে দুটা হ্যাট্‌কোট্-পরা ফিরিঙ্গী —একটা কুৎসিৎ অপরাধ করায়, তাহাদের বেত্রাঘাত দণ্ড হয়। তখন ফিরিঙ্গীদের নেতা কর্ণেল্ গিড্‌নী বলিলেন, অপরাধীদিগকে বেত মারিবার জন্য যে দেশী লোক নিযুক্ত আছে, তাহার দ্বারা ঐ ফিরিঙ্গীদিগকে বেত মারাইলে বড় অপমান ও অন্যায় হইবে, তাহাদের কোন জা'ত-ভাই ফিরিঙ্গীর দ্বারা বেত্রাঘাতের ব্যবস্থা হউক। তাহাই হইল।

এমন খৃষ্টীয় ধর্ম্মসঙ্গত ব্যবস্থা যে-সাম্রাজ্যে আছে, তাহার সচিব লর্ড বার্কেন্‌হেড ভারতীয়দিগকে সহযোগিতার জন্য আহ্বান করেন, এবং তাহা "সম্মানজনক"সহযোগিতা হইতে পারে কি না, তাহার আলোচনা ভারতীয় নেতৃবর্গকে করিতে হয়। উভয় পক্ষই রাজ্যের যোগ্য।

—

দীর্ঘ জীবন লাভের উপায়

দীর্ঘ-জীবন লাভের উপায়-সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন। বিখ্যাত আরো দু-এক জনের কথা শুনিতে ক্ষতি কি?

মোটরগাড়ী-নির্মাতা হেন্‌রী ফোর্ড্ পৃথিবীর একজন সর্ব্বাপেক্ষা ধনী লোক। কর্ম্মিষ্ঠও খুব। সাধারণতঃ ধর্ম্মোপদেষ্টারাই বিলাস-ব্যসন ত্যাগ করিতে বলেন। ইনি সে-শ্রেণীর লোক নহেন। পাকা ব্যবসাদার, কাজ কিসে বেশী হয় ও ভাল হয়, তাই চান। এই হেন্‌রী ফোর্ড্ বলেন,"মানুষ একশত পঁচিশ বৎসর বাঁচিতে পারে কিন্তু তাঁহাকে চা, কফি, তামাক, ও মদ্য ছাড়িতে হইবে।' অবশ্য এই জিনিষগুলির প্রত্যেকটি অন্যগুলির সমান অনিষ্টকর নহে; কিন্তু তামাক মদের সমান অনিষ্টকর নহে বলিয়া, যে, তাহা নির্দ্দোষ বা হিতকর, তাহাও নহে।

স্বভাবজাত নানাবিধ গাছের ফুলের মিশ্রণ দ্বারা যিনি নূতন-নূতন উৎকৃষ্ট ফল ও ফুলের সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই আশ্চর্য্যকর্ম্মা বৈজ্ঞানিক লুথার বার্‌ব্যাঙ্ক ও তামাক, চা ও কফির দারুণ বিরোধী। —

শিশুদের আধ-আধ কথা

শিশুদের আধ-আধ কথা শুনিতে বেশ ভাল লাগে; কিন্তু তাহাদিগকে ইচ্ছা করিয়া সেরূপ কথা বলানো উচিত নয়, এবং যাহাতে তাহারা শীঘ্র পরিষ্কার সুস্পষ্ট উচ্চারণ করিতে পারে সেই চেষ্টাই করা উচিত। এইজন্য তাহাদের সহিত তাহাদের মত আধ-আধ কথা বলা উচিত নয়।

—

ভারতে খৃষ্টীয়ান শক্তির অভ্যুদয়

মেজর বামনদাস বসু মহাশয় "রাইজ অব্ দি ক্রিশ্চিয়ান্ পাউআর ইন্ ইণ্ডিয়া" ("ভারতে খৃষ্টীয়ান শক্তির অভ্যুদয়") নামক যে পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহা এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক উহার আধুনিক ইতিহাসে এম্-এ উপাধিলিপ্সুদিগের পাঠযোগ্য বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্ব স্থাপনের ইতিহাস-সম্বন্ধে এমন অনেক জ্ঞাতব্য সত্য কথা আছে, যাহা প্রচলিত অন্যান্য ভারতীয় ইতিহাসে নাই। সেইজন্য ইহা পাঠযোগ্য।

—

রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী গ্রন্থাবলী

রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী কোন-কোন বহি কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত হইয়া থাকে। সম্প্রতি লক্ষ্ণৌয়ের ইসাবেলা থোবার্ন্ কলেজ নামক নারীদের উচ্চশিক্ষার কলেজের অন্যতম অধ্যাপক মিস্ ডিক্সিট্ রবীন্দ্রনাথের "দি কিং অব্ দি ডার্ক্ চেম্বার্" ("রাজা") নাটক সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনা করিবার নিমিত্ত হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ে আসিয়া-

ছেন; আমেরিকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য তিনি গবেষিকারূপে এই প্রবন্ধ লিখিতেছেন।

তিনি যদি মূল বাংলা নাটকটি পড়েন, তাহা হইলে আরও ভাল হয়।

—

টোকিওতে প্রাচ্য মেডিক্যাল্ কন্ফারেন্স্

শুনা যাইতেছে যে, জাপানের রাজধানী টোকিওতে আগামী ১৮ই অক্টোবর হইতে প্রাচ্য চিকিৎসকগণের একটি কনফারেন্স্ বাসিবার আয়োজন হইয়াছে। নিমন্ত্রণ-পত্র প্রেরিত হইয়াছে। পারস্য ও তুরস্ক ছাড়া সব প্রাচ্য দেশের প্রতিনিধি ইহাতে উপস্থিত হইবেন, কিন্তু ইউরোপ, আমেরিকার ডাক্তারদিগকেও বাদ দেওয়া হইবে না। কন্ফারেন্স প্রধানতঃ সর্ব্বসাধারণের স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন। জাপানের গবর্মেণ্ট্ এই কন্ফারেন্সের জন্য তিন লক্ষ টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন।

আমরা আশা করি ভারতবর্ষ হইতেও বড়-বড় ডাক্তারেরা যাইবেন, যাঁহারা কোন-প্রকার গবেষণা করিয়াছেন, তাঁহাদের ত যাওয়াই উচিত। যাঁহারা যাইবেন, তাঁহারা যেন জাপানের শিক্ষাপ্রণালী, গ্রাম ও নগরের স্বাস্থ্যরক্ষার বন্দোবস্ত, শাসনপ্রণালী, কৃষিশিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির ব্যবস্থা, প্রভৃতি বিষয়ে সম্যক জ্ঞানলাভ করিবার চেষ্টা করেন।

—

কৌশল নয় ত?

২৫শে মার্চ্চ্ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে পুলিশের একটি বিভাগের বরাদ্দ-সম্বন্ধে আলোচনার সময় মিঃ এ সি ব্যানার্জ্জি বলেন, যে, উহার উদ্দেশ্য অপরাধী ধরা বলিয়া উক্ত হয় বটে, কিন্তু কোন-কোন মোকদ্দমায় ইহার কর্ম্মিষ্ঠতার পরিচয় অপরাধী ধরা অপেক্ষা সাক্ষ্য সৃষ্টি করায় অধিক পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে স্যার্ হিউ স্টিফেন্সন্ আপত্তি করায়, সভাপতি কটন্সাহেব ব্যানার্জ্জি মহাশয়কে তিনি কি বলিয়াছেন, জিজ্ঞাসা না করিয়াই স্যার্ হিউএর উক্তি ঠিক বলিয়া ধরিয়া লন, এবং তা'র পর ব্যানার্জ্জি মহাশয়কে ক্ষমা চাহিতে বলেন। অতঃপর অনেক কথাকাটাকাটি হয়। কটন্ সাহেব ধমক দিতে ও রূঢ় ব্যবহার করিতে থাকেন। ভারতীয় নির্ব্বাচিত সভ্যেরা তাহাতে সভাগৃহ হইতে চলিয়া যান। কিছুক্ষণ পরে তাঁহারা আবার ফিরিয়া আসিয়া আবার কটন্ সাহেবের পূর্ব্ববৎ ব্যবহার-বশতঃ বাহির হইয়া যান।

এই সুযোগে খুব অল্প সময়ের মধ্যে বজেটের অনেক বরাদ্দ বিনা-আপত্তিতে মঞ্জুর করাইয়া লওয়া হয়।

পরদিনও নির্ব্বাচিত সভ্যেরা না থাকায় আরও অনেক বরাদ্দ খুব অল্প সময়ের মধ্যে মঞ্জুর হইয়া যায়।

এ বুদ্ধিটা মন্দ নয়। আজকালকার দিনে বজেটের অনেক বরাদ্দ-সম্বন্ধে কোন-না-কোন ভারতীয় সভ্য ত কড়া কথা বলিবেনই; সেই সুযোগে যদি সভাপতির চটিবার ও ধমক দিবার বন্দোবস্ত থাকে, তাহা হইলে স্বাধীন-চিত্ততাভিমানী সভ্যদের সভাগৃহ ছাড়িয়া যাইবার খুবই সম্ভাবনা। অতএব, এই কৌশলটা অন্যান্য প্রদেশের আমলাতন্ত্রের শিখিয়া লওয়া ও কাজে লাগানো সুবুদ্ধির পরিচায়ক হইবে।

আমাদের বিবেচনায় মিঃ এ সি ব্যানার্জ্জি কোন অন্যায় কথা বলেন নাই, এবং অন্য ভারতীয় সভ্যেরাও কোন-প্রকার অশিষ্ট ব্যবহার করেন নাই।

—

"সুন্দর-দূত"

জাপানে ভূমিকম্পের নিষ্ঠুর ধ্বংস-লীলার পর রবীন্দ্রনাথ সে দেশে যান। মৃত্যু-বাধা-পীড়িত দেশে তাঁহার নব-জীবনের বার্ত্তা আনন্দ জাগাইয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার বিদায়-কালে সে-দেশের মেয়েরা সমস্ত দেশের বিদায়-অভিবাদন জানাইতে জাহাজ-ঘাটে আসিয়াছিল। যে-বন্ধুকে মানুষ ছাড়িয়া দিতে চাহে না, অথচ যাহাকে ছাড়িয়া না দিয়া উপায় নাই, তাহার প্রতি হৃদয়ের প্রীতি ও আপনাদের বিচ্ছেদ-দুঃখ জাপানী মেয়েরা জানায় তাহাদের চিরাচরিত প্রথার সাহায্যে। মেয়েরা সকলে হাতের মুঠায় সুদীর্ঘ কাগজের রঙীন ফিতা লুকাইয়া ঘাটে আসে। বন্ধু জাহাজে উঠিলে মেয়েরা ফিতার একটা মুখ হাতে রাখিয়া আর-একটা মুখ তীর হইতেই জাহাজের দিকে ছুঁড়িয়া দেয়। বন্ধুরা জাহাজ হইতে এই বন্ধনের ফাঁশ চাপিয়া ধরেন। এমনি শত-শত রঙের ক্ষীণ বাঁধনে তাহারা যেন বন্ধুকে বাঁধিয়া রাখিতে চায়। জাহাজ চলিতে-চলিতে ফিতার জাল টানিয়া ছিঁড়িয়া লইয়া যায়। তীরের সহিত শেষ বন্ধন এমনি করিয়া ছুটিয়া যায়। "সুন্দর দূতে" রবীন্দ্রনাথের এই বিদায়-অভিবাদনের ছবি দেখিতে পাই।

অ চ

ভ্রম সংশোধন

১৩৩১ সালের চৈত্র মাসের প্রবাসীর ৮৪৬ পৃষ্ঠার প্রথম পংক্তিতে "সভ্যদের" শব্দটির পূর্ব্বে "মুসলমান" শব্দটি বসিবে।

১৩৩২ বৈশাখের প্রবাসীর	পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
	৩৩	১	৫	পাশরিলে	পসারিলে
	১৮	১	২৪	good feeling	যাকে good feeling
	২৪	২	২৯	মাদকতা	মাদকতা।

১৩৩১ ফাল্গুনের প্রবাসীর ৬৯২ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় কলমের শেষে "ওমার খৈয়াম" পুস্তকের সমালোচনা আছে। বইটির নাম "রুবাইয়াৎ" হইবে, "ওমর খৈয়াম" নহে।

৯১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেসে শ্রী অবিনাশচন্দ্র সরকার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
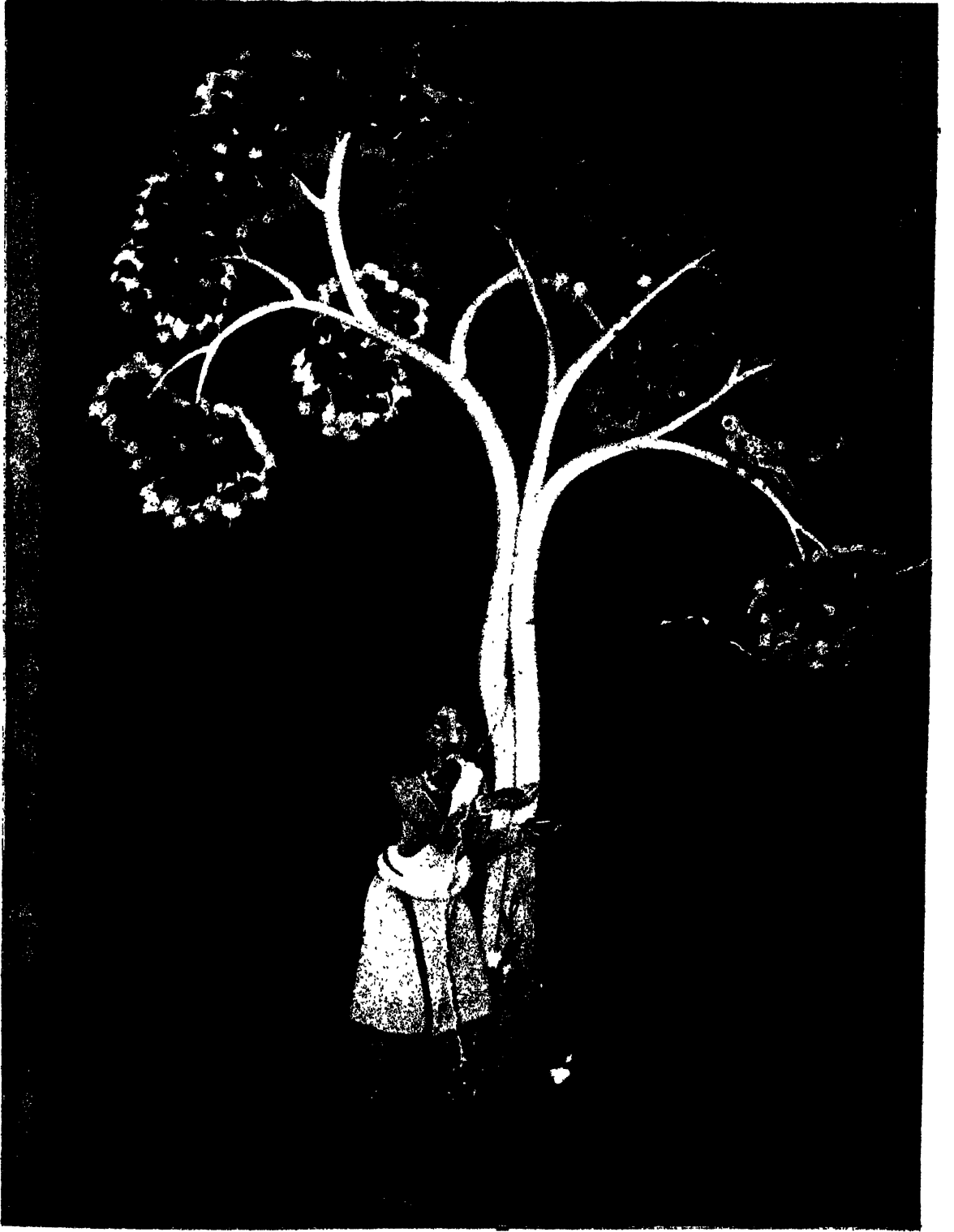
বনের পাখী

চিত্রশিল্পী শ্রীমতী গৌরী বসু

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

২৫শ ভাগ
১ম খণ্ড

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩২

২য় সংখ্যা

পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯২৫
ক্রাকোভিয়া স্টীমার

পূর্ব্বেই বলেছি, নন্দিনী তার নাম, তিন বছর তার বয়স, সে তৃতীয়ার চাঁদটুকুর মতো। আধুনিক নবেল পড়্‌বার সময় তার এখনো হয়নি। ঘুম পাড়াবার আগে তাকে গল্প শোনাবার লোক চাই। তাই যে-আমি এতকাল জনসাধারণকে ঘুম পাড়াবার বায়না নিয়েছিলুম, দায়ে প'ড়ে সেই-আমার পদবৃদ্ধি হ'ল। আজকাল এই ক্ষুদ্র মহারাণীর শয্যাপার্শ্বে আমার তলব হচ্চে।

কাল রাত্রে আহার সেরে জাহাজের কামরায় এসে বসেছি। হুকুম হ'ল, "দাদামশায়, বাঘের গল্প বলো।" আমি কবি ভবভূতির মতো বিনয় ক'রে বল্লুম, "আমার সমযোগ্য লোক হয়ত জাহাজে এক-আধজন মিল্‌তেও পারে, কারণ যাত্রী অনেক এবং বিপুলা চ তরণী।" কিন্তু নিষ্কৃতি পেলুম না।

তখন সুরু ক'রে দিলুম;

> এক যে ছিল বাঘ,
> তার সর্ব্ব অঙ্গে দাগ।
> আয়নাতে তাই হঠাৎ দেখে
> হ'ল বিষম রাগ।
> ঝগ্‌ড়ুকে সেই বল্লে ডেকে
> এখ্‌খনি তুই ভাগ,
> যা চ'লে তুই Prague,
> সাবান যদি না মেলে তো যাস্ হাজারিবাগ।

বীণাপাণির কৃপা এইখানে এসে থেমে গেল, ছড়া আর এগোল না। তখন ছন্দের বেড়া ডিঙিয়ে গদ্যের মধ্যে নেমে পড়্‌লুম। পাঠক নিশ্চয় বুঝ্‌তে পার্‌চেন গল্পের মূল ধারাটা [illegible] [illegible] সর্ব্বাঙ্গীণ কলঙ্ক-মোচনের জন্যে

সাবান অন্বেষণের দুঃসাধ্য অধ্যবসায়ে ঝগ্‌ড়ু-নামধারী বেহারার যাত্রা।

কথা উঠ্‌বে, ঝগ্‌ড়ুর তাগিদটা কিসের। দয়ারও নয়, মৈত্রীরও নয়, ভয়ের তাগিদ। বাঘ শাসিয়েছিল, সাবান না আন্‌তে পার্‌লে তার কান ছিঁড়ে নেবে। এতে বাস্তব-বিলাসীরা আশ্বস্ত হবেন, বুঝ্‌বেন, তা হ'লে গল্পটা নেহাৎ আজ্‌গুবি নয়।

প্রথমে দেখাতে হ'ল পাথেয় এবং সাবানের মূল্যের জন্যে কি অসম্ভব উপায়ে ঝগ্‌ড়ু একেবারে পাঁচ তিন নয়, সাত দশ পয়সা সংগ্রহ কর্‌লে। টেঁকে গুঁজে গোরুর-গাড়ী ক'রে সে বৃহস্পতিবারের বারবেলায় চেকোস্লোভাকিয়ায় রওনা হ'ল। বোলপুরের কাছে ধোবাপাড়ার রাস্তায় আস্‌তেই থামকা একটা ব্রাউন রঙের গাধা সাদারঙের গোরুটার গা চেটে দিলে। বর্ণভেদে শ্রদ্ধাবান্ গোরুটা জাতিচ্যুতির ক্ষোভে গাড়ীটা উল্‌টিয়ে দিয়ে বন্ধন-মুক্তভাবে চারপা তুলে সংসার ত্যাগ ক'রে যাওয়াতে সেই অপঘাতে ঝগ্‌ড়ুর পা ভেঙে তাকে রাস্তায় প'ড়ে থাকৃতে হ'ল। বেলা ব'য়ে যায়, দূর থেকে ক্ষণে-ক্ষণে বাঘের ডাকও শোনা যাচ্চে। এখন হতভাগার কান বাঁচে কি ক'রে? এমন সময় ঝুড়ি-কাঁখে জোড়াসাঁকোর মোক্ষদা চলেছে হাটে লাউশাক কিন্‌তে। ঝগ্‌ড়ু বল্‌লে, "মোক্ষদা, ও মোক্ষদা, তোমার ঝুড়িতে ক'রে আমাকে ইষ্টিশনে পৌঁছিয়ে দাও।" মোক্ষদা যদি তখনি দয়া ক'রে সহজে রাজি হ'ত, তা হ'লে বাস্তবওয়ালার মতে সেটা বিশ্বাস-যোগ্য হ'ত না। তাই দেখাতে হ'ল ঝগড়ু যখন টেঁকের থেকে দু-পয়সা নগদ দেবে কবুল কর্‌লে, তখনই মোক্ষদা তাকে ঝুড়িতে তুলে নিলে। আশা করেছিলুম, গল্পের এই সন্ধিস্থলে এসে পৌঁছবার পূর্ব্বেই শ্রোত্রীর ঘুম আস্‌বে। তার পরে কাল আবার যদি আমাকে ধরে, তা হ'লে উপসংহারে দেখাতে হবে, ভালোমানুষ ঝগ্‌ড়ুর কানের তো কোনো অপচয় হ'লই না, বরঞ্চ পূর্ব্বের চেয়ে এই প্রত্যঙ্গটা দীর্ঘতর হ'য়ে উঠে কানের বানানে দন্ত্য "ন"কে মাত্রা-ছাড়া মূর্দ্ধন্য "ণ"য়ে খাড়া ক'রে তোল্‌বার পক্ষে সাক্ষ্য দিলে। কেবল কাটা গেল ঐ দুষ্ট বাঘের লেজটা। সংসারে ধর্ম্মের পুরস্কার ও অধর্ম্মের তিরস্কার-মূলক উপদেশের সাহায্যে কর্দ্দমিত বঙ্গ-সাহিত্যে স্বাস্থ্যকর হাওয়া বইয়ে দেবার ইচ্ছাটাও আমার মনে ছিল।

কিন্তু গল্পের গোড়ায় নন্দিনীর চোখে যে-একটু ঘুমের আবেশ ছিল, সেটা কেটে গিয়ে তার দৃষ্টি শরৎকালের আকাশের মতো জল্‌জল্ কর্‌তে লাগ্‌ল। ভয়ে হোক্, ভক্তিতে হোক্, বাঘ যদি-বা ঝগ্‌ড়ুর কানটা ছেড়ে দিতে রাজি হয়, নন্দিনী গল্পটাকে ছাড়্‌তে কিছুতেই রাজি হ'ল না। অবশেষে দুইচার-জন আত্মীয়-স্বজনের মধ্যস্থতায় কাল রাত্রির মতো ছুটি পেয়েছি।

আর্টিস্ট্ বল্‌লেন, গল্পের প্রবাহে নানা-রকম ভেসে-আসা ছবি ওর মনকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে রাখ্‌ছিল। তা হ'লেই তর্ক ওঠে, ছবির এমন কী গুণ আছে যাতে ঔৎসুক্য জাগিয়ে রাখে। কোনো দৃশ্য যখন বিশেষ ক'রে আমাদের চোখ ভোলায়, তখন কেন আমরা বলি, যেন ছবিটি?

মুখ্যত ছবির গুণ হচ্চে দৃশ্যতা। তাকে আহার করা নয়, ব্যবহার করা নয়, তাকে দেখা ছাড়া আর কোনো লক্ষ্যই নেই। তা হ'লেই বল্‌তে হবে, যাকে আমরা পুরোপুরি দেখ্‌তে পাই তাকে আমাদের ভালো লাগে। যাকে উদাসীন-ভাবে দেখি, তাকে পুরো দেখিনে; যাকে প্রয়োজনের প্রসঙ্গে দেখি, তাকেও না; যাকে দেখার জন্যেই দেখি, তাকেই দেখ্‌তে পাই। বোলপুরের রাস্তায় গোরু, গাধা, গাড়ী উল্টে ঝগ্‌ড়ুর পা-ভাঙা, প্রভৃতি দৃশ্যের দাম কিসেরই বা? চল্‌তি ভাষায় যাকে মনোহর বলে, এ ত তা নয়। কিন্তু গল্পের বেগে তারা মনের সাম্‌নে এসে হাজির হচ্ছিল, শিশুর মন তাদের প্রত্যেককেই স্বীকার ক'রে নিয়ে বল্‌লে, "হাঁ এরা আছে।" এই ব'লে স্বহস্তে এদের কপালে অস্তিত্ব-গৌরবের টীকা পরিয়ে দিলে। এই দৃশ্যগুলি গল্প বলার বেষ্টনীর মধ্যে একটি বিশেষ ঐক্য লাভ করেছিল। বিশ্বের ছাড়া-ছাড়া সমস্ত ছড়ানো তথ্যের অস্পষ্টতা থেকে স্বতন্ত্র হ'য়ে তারা সুনির্দ্দিষ্ট হ'য়ে উঠেছিল। এই জোরে তারা কেবলি দাবী কর্‌তে লাগ্‌ল, আমাকে দেখ। সুতরাং নন্দিনীর চোখে ঘুম আর টিঁক্‌ল না।

কবি বলো, চিত্রী বলো, আপনার রচনার মধ্যে সে কি

চায় ? সে বিশেষকে চায়। বাতাসে যে-অঙ্গারবাষ্প সাধারণভাবে আছে, গাছ তাকে আত্মসাৎ ক'রে আপন ডালেপালায় ফলে-ফুলে আপন ছন্দে রঙে অত্যন্ত বিশেষ ক'রে যখন তোলে, তখনই তাতে সৃষ্টির লীলা প্রকাশ পায়। নীহারিকায় জ্যোতির্বাষ্প একটা একাকার ব্যাপার, নক্ষত্র-আকারে বিশেষত্ব লাভ করায় তার সার্থকতা। মানুষের সৃষ্টিচেষ্টাও সেইরকম অনির্দ্দিষ্ট সাধারণ থেকে সুনির্দ্দিষ্ট বিশেষকে জাগাবার চেষ্টা। আমাদের মনের মধ্যে নানা হৃদয়াবেগ ঘুরে বেড়ায়। ছন্দে সুরে কথায় যখন সে বিশেষ হ'য়ে ওঠে, তখন সে হয় কাব্য, সে হয় গান। হৃদয়াবেগকে প্রকাশ করা হ'ল ব'লেই যে আনন্দ তা নয়। তাকে বিশিষ্টতা দেওয়া হ'ল ব'লেই আনন্দ। সেই বিশিষ্টতার উৎকর্ষেই তার উৎকর্ষ। মানুষের যে-কোনো রচনা সেই উৎকর্ষ পেয়েছে, তাকেই আর্ট্-সৃষ্টিরূপে দেখি ; সেই একান্ত দেখাতেই আনন্দ।

ইংরেজি ভাষায় character শব্দের একটা অর্থ স্বভাব, নৈতিক চরিত্র ; আরেকটা অর্থ চরিত্ররূপ। অর্থাৎ এমন কতকগুলি গুণের এমন সমাবেশ যাতে এই সমাবেশটি বিশেষভাবে লক্ষ্যগোচর হয়। পূর্ব্বেই বলেছি, এই-রকম বিশেষ গোচরতাই আর্টের ধর্ম্ম। নাট্যে কাব্যে চিত্রে নৈতিক সদ্‌গুণের চেয়ে এই characterএর মূল্য বেশি।

সৃষ্টির দিকে বিশেষত্ব এই ত আছে character, সৃষ্টিকর্ত্তার দিকে বিশেষত্ব প্রতিভায়। সেটা হচ্চে দৃষ্টির বিশেষত্ব, অনুভূতির বিশেষত্ব, রচনার বিশেষত্ব নিয়ে। ভক্ত সমুদ্র পর্ব্বত অরণ্যে সৃষ্টিকর্ত্তার একটি স্বরূপ দেখ্‌তে পান, তাতেই সেই দৃশ্যগুলি বিশেষভাবে তাঁর অন্তরঙ্গ হ'য়ে ওঠে। রূপকারের রচনাতেও তেম্‌নি ক'রেই স্রষ্টা-ব্যক্তিটি আপন প্রতিভার স্বরূপ দিয়ে আপন সৃষ্টির রূপটিকে দ্রষ্টা ব্যক্তিটির কাছে সুনির্দ্দিষ্ট ক'রে দেয়। তাতে যে আনন্দ পাই, সে সৌন্দর্য্যের বা স্বার্থবুদ্ধির বা শুভবুদ্ধির আনন্দ নয়, বিশেষকে ব্যক্ত দেখার আনন্দ। আমার ভিতরকার ব্যক্তি সেই পরিব্যক্তিতে নিজেরই বিস্তার দেখে। বস্তুতত্ত্ব (physics) সমস্ত বস্তুর মধ্যে সাধারণ, সেটা হ'ল বিজ্ঞানের ; আর চেহারা পদার্থটা বিশেষের, সেটা হ'ল আর্টের। বিশেষের বেড়া ভাঙ্‌তে ভাঙ্‌তে বিজ্ঞান যখন ব্যাপককে পায়, তখন তার সার্থকতা ; আর ব্যাপকের পর্দ্দাটা তুলে ধ'রে আর্ট্ যখন বিশেষকে পায়, তখন সে হয় খুসি।

সুন্দর সেই বিশেষের কোঠায় এসে পড়ে তো ভালো, নইলে সুন্দর ব'লেই তার গুমোর নেই। আর্টের এলেকায় সাহেব-পাড়ার সরকারী বাগানের স্থান নেই, আছে চিৎপুর রোডের। সরকারী বাগানের অনেক সদ্‌গুণ আছে, তাকে সুন্দর বল্‌লে লক্ষণে মেলে ; সে-বাগানে সাধারণ উপকার আছে, কিন্তু বিশেষ স্বাদ নেই। চিৎপুরের রোডের স্বাদ আছে, উপকার নেই বল্‌লেই হয়। কল্‌কাতার ইডেন-গার্ডেন ফোটোগ্রাফের অন্ত্যজ পংক্তিতে স্থান পেতে পারে, কিন্তু চিৎপুর রোডের পংক্তি আর্টের অভিজাতবর্গের কোঠায়। কুলীনের মেয়ের মতোই চিৎপুর রোড আর্টিস্‌টের তুলিতে আপন পর্য্যায় পাবার জন্যে আজ পর্য্যন্ত অপেক্ষা ক'রে আছে। কোনো কালে নাও যদি পায়, তবু তার কৌলীন্য ঘুচ্‌বে না।

হেড্‌মাষ্টার তাঁর ইস্কুলের সবচেয়ে শিষ্টশান্ত অধ্যয়ন-রত ভালো ছেলেটির প্রতি তর্জ্জনী নির্দ্দেশ ক'রে তাকে আমাদের দৃষ্টান্তগোচর ক'রে রাখবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তর্জ্জনীর জোরেও আমরা তাকে স্পষ্ট দেখ্‌তে পাইনে। যাকে খুবই দেখ্‌তে পাওয়া যায়, সে হেড্-মাষ্টারের আদর্শ ছেলে নয়, ছাত্রবৃত্তি তার কপালে প্রায়ই জোটে না। সেটা ডানপিটে ইস্কুল-পালানো ছেলে, আপন প্রাণপূর্ণ বিশেষত্ব দ্বারা সে খুবই স্ব-প্রকাশ। ব্যবহারের দিক্ থেকে তাকে অবজ্ঞা করা চলে, কিন্তু প্রয়োজন-নিরপেক্ষ প্রকাশের দিক্ থেকে সে-ছেলে সেরা ছেলে। সে হেড্‌মাষ্টারের বর্জ্জনীয়, কিন্তু আর্টিস্‌ট্‌ বিধাতার বরণীয়। চরিত্রনীতি-বিলাসী ঐতিহাসিক তাঁর মহাভারতে যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম্মরাজ নাম দিয়ে সদ্‌গুণের উচ্চ পীঠের উপর দাঁড় করিয়ে সর্ব্বদা আমাদের চোখের উপর ধ'রে রেখেছেন, কিন্তু তবু যুধিষ্ঠির স্পষ্ট ক'রে চোখে পড়েন না ; আর চরিত্র-চিত্র-বিলাসী কবি তাঁর ভীমসেনকে নানা অবিবেচনা ও অসংযমের অপবাদে লাঞ্ছিত ক'রেও

আমাদের কাছে সুস্পষ্ট ক'রে তুলেচেন। যারা সত্য কথা বল্‌তে ভয় করে না, তারা স্বীকার করবেই যে সর্ব্বগুণের যুধিষ্ঠিরকে ফেলে দোষগুণে জড়িত ভীমসেনকেই তারা ভালোবাসে। তার একমাত্র কারণ, ভীমসেন সুস্পষ্ট। শেক্‌স্‌পিয়রের ফল্‌স্টাফও স্বাস্থ্যকর দৃষ্টান্ত ব'লে সমাজে আদরণীয় নয়, স্পষ্ট প্রত্যক্ষ ব'লেই সাহিত্যে আদরণীয়। রামচন্দ্রের ভক্তদের আমি ভয় করি; তাই খুব চুপিচুপি বল্‌চি, সাহিত্যে রামের চেয়ে লক্ষ্মণ বড়। বাল্মীকিকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি নিশ্চয়ই মান্‌বেন যে, রামকে তিনি ভালো বলেন, কিন্তু লক্ষ্মণকে তিনি ভালোবাসেন।

আমরা হাজার প্রমাণ দেখাতে পারি যে, আর্টে আমরা গুণবান্‌কে চাইনে, রূপবান্‌কে চাই। এখানে রূপবান্ বল্‌তে সুন্দরকে বল্‌চিনে। রূপের স্পষ্টতায় যে সুপ্রত্যক্ষ, সেই রূপবান্। শ্রীমন্ত সদাগরের চেয়ে রূপবান্ ভাঁড়ুদত্ত। বিষবৃক্ষে অনেক নামজাদা নায়ক-নায়িকা আছেন, অনেক সাধু লেখক তাদের চরিত্র বিচার করেচেন, তার উপরে আমি আর কিছু বল্‌তে চাইনে; কেবল এইটুকু ব'লে রাখি, বিষবৃক্ষে হীরা রূপবান্। হীরা আমাদের ঘুমতে দেয় না, সে সুন্দর ব'লে নয়, গুণবান্ ব'লে নয়, রূপবান্ ব'লে; সাধারণ অস্পষ্টতার মাঝখানে সে বিশেষ ব'লে, সুপ্রত্যক্ষ ব'লে।

এ কথা মান্‌তে হবে, চল্‌তি ভাষায় যাকে সুন্দর বলে, তাকে নিয়ে কবি কিম্বা রূপকার আপনাদের রচনায় খুব ব্যবহার ক'রে থাকেন। তার প্রধান কারণ, সৌন্দর্য্য হচ্চে একটা বিশিষ্টতা। জীবনের পথে চল্‌তে চল্‌তে অগণ্য বস্তুর ভিড়কে আমরা পাশ কাটিয়েই যাই। সুন্দর হঠাৎ ব'লে ওঠে, "চেয়ে দেখ।" প্রতিদিন হাজার হাজার জিনিষকে যা না বলি, তাকে তাই বলি; বলি, "তুমি আছ।" ঐটেই হ'ল আসল কথা। সে যে নিশ্চিত আছে, এই বার্ত্তাটাই তার সৌন্দর্য্য আমার কাছে উপস্থিত করলে। সে যে সৎ, এইটে একান্ত উপলব্ধি করতে পারলুম ব'লেই সে এত আনন্দ দিলে। শিশুর কাছে তার খেলার জিনিষ মহার্ঘ ব'লেই দামী নয়, সুন্দর ব'লেই প্রিয় নয়। আপন কল্পনা-শক্তি দিয়ে তাকে স্পষ্ট উপলব্ধি করে ব'লেই, ছেঁড়া নেকড়ায় তৈরী হ'লেও সে তার কাছে সত্য, এবং সত্য ব'লেই আনন্দময়; কারণ সত্যের রূপই হচ্চে আনন্দ।

এক-রকমের গায়ে-পড়া সৌন্দর্য্য আছে, যা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির সঙ্গে যোগ দিয়ে অতিলালিত্যগুণে সহজে আমাদের মন ভোলায়। চোর যেন দ্বারীকে ঘুষ দিয়ে চুরি করতে ঘরে ঢোকে। সেইজন্যে যে-আর্ট্ আভিজাত্যের গৌরব করে, সে-আর্ট্ এই সৌন্দর্য্যকে আমল দিতেই চায় না। এক-জা'তের বাইজি-মহলে চলিত খেলো সঙ্গীত তার হাল্‌কা চালের সুর-তালের উত্তেজনায় সাধারণ লোকের মনে নেশা ধরিয়ে দেয়। বড় ওস্তাদেরা এই নেশা ধরানো কান-ভোলানো ফাঁকিকে অত্যন্ত অবজ্ঞা করেন। তাতে তাঁরা সাধারণ লোকের সস্তা বক্‌শিষ থেকে বঞ্চিত হওয়াকেই পুরস্কার ব'লে মেনে নেন। তাঁরা যে-বিশিষ্টতাকে আর্টের সম্পদ্ ব'লে জানেন, সে-বিশিষ্টতা প্রলোভন-নিরপেক্ষ উৎকর্ষ। তাকে দেখাতে গেলে যেমন সাধনা, তাকে পেতে গেলেও তেম্‌নি সাধনা চাই। এইজন্যেই তার মূল্য। নিরলঙ্কার হ'তে তার ভয় নেই। সরলতার অভাবকে আড়ম্বরকে সে ইতর ব'লে ঘৃণা করে। সুললিত ব'লে নিজের পরিচয় দিতে সে লজ্জা বোধ করে, সুসঙ্গত ব'লেই তার গৌরব।

গীতায় আছে, কর্ম্মের বিশুদ্ধ মুক্তরূপ হচ্চে তার নিষ্কামরূপ। অর্থাৎ ত্যাগের দ্বারা নয়, বৈরাগ্যের দ্বারাই কর্ম্মের বন্ধন চ'লে যায়। তেম্‌নি ভোগেরও বিশুদ্ধরূপ আছে, সেই রূপটি পেতে গেলে বৈরাগ্য চাই। বল্‌তে ভয়, "মা গৃধঃ," লোভ কোরো না। সৌন্দর্য্যভোগ মনকে জাগাবে, এইটেই তার স্বধর্ম্ম; তা না ক'রে মনকে যখন সে ভোলাতে বসে, তখন সে আপনার জা'ত খোয়ায়, তখন সে হ'য়ে যায় নীচ। উচ্চ-অঙ্গের আর্ট্ এই নীচতা থেকে বহু যত্নে আপনাকে বাঁচাতে চায়। লোভীর ভিড় তাড়াবার জন্যে সে অনেক সময়ে কঠোরকে দ্বারের কাছে বসিয়ে রাখে, এমন-কি, অনেক সময় কিছু বিশ্রী, কিছু বেসুর তার রচনার সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। কেননা, তার সাহস আছে। সে জানে, যে বিশিষ্টতা আর্টের প্রাণ, তার সঙ্গে গায়ে প'ড়ে মিষ্টি মিশোল করবার কোনো দরকার

নেই। উমার হৃদয় পাবার জন্তে শিবকে কন্দর্প সাজ্‌তে হয়নি।

বিশেষকে দেখবার আর একটা কৌশল আছে, সে হচ্চে নূতনত্ব। অতিপরিচয়ের আবরণে বিশেষ ঢাকা পড়ে, এইজন্তে অনভ্যস্তকেই বিশেষ ব'লে খাড়া করবার দিকে দুর্ব্বল আর্টিস্‌ট্‌-এর প্রলোভন আস্‌তে পারে। এই প্রলোভন আর্টিস্‌ট্‌-এর তপোভঙ্গের কারণ। অতিপরিচয়ের ম্লানতার মধ্যেই চির-বিশেষের উজ্জ্বলরূপ দেখাতে পারে যে-গুণী, সেই ত গুণী। যেখানটা সর্ব্বদা আমাদের চোখে পড়ে অথচ দেখ্‌তে পাইনে, সেইখানেই দেখবার জিনিষকে দেখানো হচ্চে আর্টিস্‌ট্‌-এর কাজ। সেইজন্তেই ত বড় বড় আর্টিস্‌ট্‌-এর রচনার বিষয় চিরকালের জিনিষ। আর্ট পুরাতনকে বারে বারে নূতন করে। বিশেষকে সে দেখ্‌তে পায় হাতের কাছে, ঘরের কাছে। সৃষ্টি তো খনির জিনিষ নয়, যে, খুঁড়্‌তে খুঁড়্‌তে তার পুঁজি ফুরিয়ে যাবে। সে যে ঝর্‌না; তার প্রাচীন ধারা-যে চিরদিনই নবীন হ'য়ে বইচে, এইটে প্রমাণ করবার জন্তে তাকে কোনো অদ্ভুত ভঙ্গী কর্‌তে হয় না। অশোকের মঞ্জরী কালিদাসের আমলেও যে-রঙে বসন্তের শ্যামল বক্ষ রাঙিয়ে দিয়েচে, আজও নূতনত্বের ভাণ ক'রে সেই রঙ্‌ বদল করবার তার দরকার হয়নি। নির্ভয়ে সে বর্ষে বর্ষে পুরাতনের বাসর-ঘরেই নবীনের ঘোমটা খুলে দিচ্চে। বারে বারেই চোখের উপর থেকে জড়তার মোহ কেটে যাচ্চে, আর চির-বিশেষকে দেখ্‌তে পাচ্চি। কিন্তু ইটের ঢেলার চেয়ে অশোকমঞ্জরীকেই বিশেষ ক'রে দেখি কেন, এইটেই দাঁড়ায় প্রশ্ন। এর উত্তর এই যে, আপন অংশ-প্রত্যংশের সমাবেশ নিয়ে অশোক আপনার মধ্যে একটি সুসঙ্গত বিশেষ ঐক্যকে প্রকাশ ক'রে ব'লেই, তার মধ্যে আমাদের মন একটি পুরো দেখাকে দেখে। ইটের ঢেলায় আমাদের কাছে সত্তার সেই চরমতা নেই। একটা স্টীম্‌ ইঞ্জিনের মধ্যে প্রয়োজন-ঘটিত সুষমার ঐক্য আছে। কিন্তু সেই ঐক্য প্রয়োজনেরই অনুগত। সে নিজেকেই চরম ব'লে প্রকাশ করে না। আর-কিছুকে প্রকাশ করে। সেই ইঞ্জিনের মধ্যে ব্যবহারের আনন্দ, তার মধ্যে কৌতূহলের বিষয় থাকৃতে পারে। কিন্তু তাতে বিশুদ্ধ দেখার অহৈতুক বিষয় নেই।

সত্তাকে সকলের চেয়ে অব্যবহিত ক'রে অনুভব করি নিজের মধ্যে। আমার মধ্যে একটি এক নিয়ত বল্‌চে, "আছি"। গানের মধ্যে, ছবির মধ্যে এক যদি তেম্‌নি জোরে ব'লে উঠ্‌তে পারে, "এই যে আমি," তা হ'লেই তাতে-আমাতে মিলনের সুর পূর্ণ হ'য়ে বাজ্‌ল। এ'কেই বলে শুভদৃষ্টি; ঐক্যের উপলব্ধিতে দেখবার বিষয় চোখে-পড়া।

আর্টিস্‌ট্‌ প্রশ্ন কর্‌চে, আর্টের সাধনা কি। আমি বলি, "দেখ", তবেই দেখাতে পার্‌বে। সত্তার প্রবাহিনী ঝ'রে পড়্‌চে; তারই স্রোতের জলে মনের অভিষেক হোক; ছোট বড় সুন্দর অসুন্দর সব নিয়ে তার নৃত্য। সেই প্রকাশধারার বেগ চিত্তকে স্পর্শ কর্‌লে চিত্তের মধ্যেও প্রকাশের বেগ প্রবল হ'য়ে ওঠে। সৃষ্টির লীলা চারদিকেই আছে, এই সহজ সত্যটি যদি আর্টিস্‌ট্‌ আজও আবিষ্কার কর্‌তে না পেরে থাকে, পুরাণ-কাহিনীর পুঁথির মধ্যে প্রাচীন রাজপুতানার পটের মধ্যে যদি সে দেখার জিনিষ খুঁজে বেড়ায়, তা হ'লে বুঝ্‌ব, কলা-সরস্বতীর পদ্মাসন তার মনের মধ্যে বিকশিত হয়নি। তাই সে সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড্‌ আসবাবের দোকানে নির্জ্জীব কাঠের চৌকী খুঁজ্‌তে বেরিয়েছে।

প্রবাহিনী

দুর্গম দূর শৈল-শিরের
স্তব্ধ তুষার নইতো আমি ;
আপ্না-হারা ঝর্না-ধারা
ধূলির ধরায় যাই যে নামি'।
সরোবরের গম্ভীরতায়
ফেনিল নাচের মাতন ঢালি ;
অচল শিলার ভ্রূভঙ্গিমায়
বাজাই চপল করতালি।
মন্দ্র-সুরের মন্ত্র শুনাই
গভীর গুহার আঁধার তলে,
গহন বনের ভাঙাই ধেয়ান
উচ্চ হাসির কোলাহলে।
শুভ্র ফেনের কুন্দমালায়
বিন্ধ্যগিরির বক্ষ সাজাই,
যোগীশ্বরের জটার মধ্যে
তরঙ্গিণীর নূপুর বাজাই।
বৃদ্ধ বটের লুব্ধ শিকড়
আমার বেণী ধরিতে চায় ;
সূর্য্য-কিরণ শিশুর মতন
অঙ্ক আমার ভরিতে চায়।
নাই কোনো মোর ভয়-ভাবনা,
নাই কোনো মোর অচল রীতি।
গতি আমার সকল দিকেই,
শুভ আমার সকল তিথি।
বক্ষে আমার কালোর ধারা,
আলোর ধারা আমার চোখে ;
স্বর্গে আমার সুর চ'লে যায়,
নৃত্য আমার মর্ত্ত্যলোকে।

অশ্রু-হাসির যুগল ধারা
ছোটে আমার ডাইনে বামে।
অচল গানের সাগর-মাঝে
চপল গানের যাওয়া-আসা থামে।

১১ই ডিসেম্বর
বুএনেস্ আইরেস্

প্রাণ-গঙ্গা

প্রতিদিন নদীস্রোতে পুষ্প পত্র কার' অর্ঘ্য দান
পূজারীর পূজা অবসান।
আমিও তেমনি যত্নে মোর ডালি ভরি'
গানের অঞ্জলি দান করি
প্রাণের জাহ্নবী-জলধারে,
পূজি আমি তারে॥

বিগলিত প্রেমের আনন্দ বারি সে যে,
এসেছে বৈকুণ্ঠধাম ত্যেজে।
মৃত্যুঞ্জয় শিবের অসীম জটাজালে
ঘুরে ঘুরে কালে কালে
তপস্যার তাপ লেগে প্রবাহ পবিত্র হ'ল তার।
কত না যুগের পাপভার
নিঃশেষে ভাসায়ে দিল অতলের মাঝে।
তরঙ্গে তরঙ্গে তার বাজে
ভবিষ্যের মঙ্গল সঙ্গীত।
তটে তটে বাঁকে বাঁকে অনন্তের চলেছে ইঙ্গিত॥

দৈবস্পর্শে তার
আমারে সে ধূলি হ'তে করিল উদ্ধার;
অঙ্গে অঙ্গে দিল তার তরঙ্গের দোল;
কণ্ঠে দিল আপন কল্লোল।

আলোকের নৃত্যে মোর চক্ষু দিল ভরি'
বর্ণের লহরী।
খুলে গেল অনন্তের কালো উত্তরীয়,
কত রূপে দেখা দিল প্রিয়,
অনির্ব্বচনীয়॥

তাই মোর গান
কুসুম-অঞ্জলি-অর্ঘ্যদান
প্রাণ-জাহ্নবীরে।
তাহারি আবর্ত্তে ফিরে ফিরে
এ পূজার কোনো ফুল নাও যদি ভাসে চিরদিন,
বিস্মৃতির তলে হয় লীন,
তবে তার লাগি', কহ,
কার সাথে আমার কলহ?
এই নীলাম্বরতলে তৃণ-রোমাঞ্চিত ধরণীতে,
বসন্তে বর্ষায় গ্রীষ্মে শীতে
প্রতিদিবসের পূজা প্রতিদিন করি' অবসান
ধন্য হ'য়ে ভেসে যাক্ গান॥

১৬ জানুয়ারি ১৯২৫
জুলিয়ো চেজারে।

সৃষ্টিকর্ত্তা

জানি আমি মোর কাব্য ভালোবেসেছেন মোর বিধি,
ফিরে যে পেলেন তিনি দ্বিগুণ আপন-দেওয়া নিধি।
তাঁর বসন্তের ফুল বাতাসে কেমন বলে বাণী
সে যে তিনি মোর গানে বারম্বার নিয়েছেন জানি।
আমি শুনায়েছি তাঁরে, শ্রাবণ রাত্রির বৃষ্টিধারা
কি অনাদি বিচ্ছেদের জাগায় বেদন সঙ্গীহারা।
যেদিন পূর্ণিমা রাতে পুষ্পিত শালের বনে বনে
শরীরী ছায়ার মতো একা ফিরি আপনার মনে

গুঞ্জরিয়া অসমাপ্ত সুর, শালের মঞ্জরী যত
কি যেন শুনিতে চাহে ব্যগ্রতায় করি' শির নত,
ছায়াতে তিনিও সাথে ফেরেন নিঃশব্দ পদচারে,
বাঁশির উত্তর তাঁর আমার বাঁশিতে শুনিবারে।
যেদিন প্রিয়ার কালো চক্ষুর সজল করুণায়
রাত্রির প্রহরমাঝে অন্ধকারে নিবিড় ঘনায়
নিঃশব্দ বেদনা, তার দু'টি হাতে মোর হাত রাখি
স্তিমিত প্রদীপালোকে মুখে তার স্তব্ধ চেয়ে থাকি,
তখন আঁধারে বসি' আকাশের তারকার মাঝে
অপেক্ষা করেন তিনি, শুনিতে কখন্ বীণা বাজে
যে সুরে আপনি তিনি উন্মাদিনী অভিসারিণীরে
ডাকিছেন সর্ব্বহারা মিলনের প্রলয়-তিমিরে॥

২৫ ডিসেম্বর ১৯২৪
বুয়েনোস আইরেস্।

ক্রাকোভিয়া
১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৫।

ফুলেরমধ্যে যে-আনন্দ সে প্রধানত ফলের প্রত্যাশার আনন্দ, এটা অত্যন্ত মোটা কথা। বিশ্বসৃষ্টিতে দেখ্‌তে পাই সৃষ্টিতেই আনন্দ, হওয়াটাই চরম কথা। তার ফুলেও আছে হওয়া, ফলেও আছে হওয়া। ফুলটা হ'ল উপায় আর ফলটা হ'ল উদ্দেশ্য, তাই ব'লে উভয়ের মধ্যে মূল্যের কোনো ভেদ দেখ্‌তে পাইনে।

আমার তিনবছরের প্রিয়সখী, যাকে নাম দিয়েছি নন্দিনী, তার হওয়ার উদ্দেশ্য কি, এ প্রশ্নের কোনো জবাব-তলবের কথা মনে আসে না। সে যে কুলরক্ষার সেতু, সে যে পিণ্ড-জোগানের হেতু, সে যে কোনো এক ভাবী-কালে প্রজনার্থং মহাভাগী, এসব হ'ল শাস্ত্রসঙ্গত বিজ্ঞান-সম্মত মূল্যের কথা। ফলের দরে ফুলের বিচার ব্যবসা-দারের। কিন্তু ভগবান্ তো সৃষ্টির ব্যবসা ফাঁদেননি। তাঁর সৃষ্টি একেবারেই বাজে খরচ;—অর্থাৎ আয় করবার জন্যে খরচ করা নয়, এইজন্যই আয়োজনে প্রয়োজনে সমান হ'য়ে মিশে গেছে। এইজন্য যে-শিশু জীবলোকের প্রয়োজনসাধনের পক্ষে অপূর্ণ, সেই তিনবছরের শিশুর অপূর্ণতাই সৃষ্টির আনন্দ-গৌরবে পূর্ণ। আমি তো দেখি বিশ্ব-রচনায় মুখ্যের চেয়ে গৌণটাই বড়। ফুলের রঙের মুখ্য কথাটা হ'তে পারে পতঙ্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করা;—গৌণ কথাটা হচ্চে সৌন্দর্য্য। মানুষ যখন ফুলের বাগান করে, তখন সেই গৌণের সম্পদ্‌ই সে খোঁজে। বস্তুত গৌণ নিয়েই মানুষের সভ্যতা। মানুষ কবি যখন প্রেয়সীর মুখের একটি তিলের জন্য সমরখন্দ, বোখারা পণ কর্‌তে বসে, তখন সে "প্রজনার্থং মহাভাগা"র কথা মনেই রাখে না। এই বে-হিসাবী সৃষ্টিতে বে-হিসাবী আনন্দ-রূপকেই সে সৃষ্টির ঐশ্বর্য্য ব'লে জানে।

প্রাণীসংসারে জৈব-প্রকৃতিই সকলের গোড়ায় আপন ভিৎ ফেঁদে, জাজিম পেতে, আলো জেলে, পৃথিবীর ভাণ্ডার থেকে সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র, মাল্-মস্‌লা নিজের ব্যবহারের জন্যে সংগ্রহ ক'রে নিয়ে সংসার পেতে বসেছিল। ভোরের বেলায় সে মুখ্য জায়গাটা দখল ক'রে বস্‌ল। তারি বচন হচ্চে, সা ভার্য্যা যা প্রজাবতী। অর্থাৎ যদি কাজে লাগ্‌ল তবেই তার দাম।

চিৎ-প্রকৃতি এসে জুট্‌লেন কিছু দেরীতে। তাই জৈব-প্রকৃতির আশ্রয়ে তাঁকে পরভৃত হ'তে হ'ল। পুরানো

পথে পুরানো ঘাটে পুরানো কালের মাল-মসলা নিয়েই সে ফাঁদলে তার নিজের ব্যবসা। তখন সে সাবেক আমলের মুখ্য থেকে হাল আমলের গৌণ ফলিয়ে তুলতে বসল। আহারকে ক'রে তুল্‌লে ভোজ, শব্দকে ক'রে তুল্‌লে বাণী, কান্নাকে ক'রে তুল্‌লে কাব্য। মুখ্যভাবে যেটা ছিল আঘাত, গৌণভাবে সেটা হ'ল আবেদন; যেটা ছিল বন্দিনীর শৃঙ্খল, সেটা হ'ল বধূর কঙ্কণ; যেটা ছিল ভয়, সেটা হ'ল ভক্তি; যেটা ছিল দাসত্ব, সেটা হ'ল আত্ম-নিবেদন। যারা উপরের স্তরের চেয়ে নীচের স্তরকে বিশ্বাস করে বেশি, তারা মাটি খোঁড়াখুড়ি করতে গেলেই পুরাতন তাম্রশাসন বেরিয়ে পড়ে। বৈজ্ঞানিকের চশ্‌মায় ধরা পড়ে যে, ক্ষেতের মালিক জৈব-প্রকৃতি, অতএব ফসলের অধিকার নির্ণয় করতে গেলে বৈজ্ঞানিকের কাছে চিৎপ্রকৃতির দাবী অগ্রাহ্য হ'য়ে আসে। আপিলে সে যতই বলে প্রণালী আমার, প্ল্যান আমার, হাল-লাঙল আমার, চাষ আমার, কিছুতেই অপ্রমাণ করতে পারে না যে, মাটির তলাকার তাম্রশাসনে মোটা অক্ষরে খোদা আছে, জৈবপ্রকৃতি। মোটা অক্ষরের উপরে বিচারকের নজরও পড়ে বেশি। কাজেই রায় যখন বেরোয়, তখন পাকা প্রমাণসহ প্রকাশ হ'য়ে পড়ে যে, সাবেক আমলের ভূতই বর্ত্তমান আমলে ভগবান্ সেজে এসেছে।

জৈব প্রকৃতিতে শিশুর একটা অর্থ আছে। সেই অর্থটাকেই যদি সম্পূর্ণ ব'লে স্বীকার ক'রে নিই, তা হ'লে বল্‌তে হয় মাছের ছানার সঙ্গে মানুষের শিশুর কোনো প্রভেদ নেই। অর্থাৎ তার একমাত্র অর্থ বংশবৃদ্ধি।

কিন্তু চিৎপ্রকৃতি সেই অর্থটাকে নিয়ে যখন আপনার চিন্ময় জিনিষ ক'রে তুল্‌লে, তখন তাকে চোর বদনাম দিয়ে মূলকেই মালেক স্বীকার করি যদি, তা হ'লে সেক্‌স্‌পিয়ারেরও মাল থানায় আটক করতে হয়। মসলা আর মাল ত একই জিনিষ নয়; মাটির মালেক যদি হয় ভূপতি, ভাঁড়ের মালেক ত কুমোর।

আমাদের চিত্ত শিশুর মধ্যে সৃষ্টির অহৈতুক আনন্দটি দেখ্‌তে পায়। বয়স্ক মানুষের মধ্যে উদ্দেশ্য-উপায়-ঘটিত নানা তর্ক আছে; কেউবা কাজের কেউবা অকাজের; কারো বা অর্থ আছে, কারো বা নেই। কিন্তু শিশুকে যখন দেখি, তখন কোনো প্রত্যাশার দ্বারা আচ্ছন্ন ক'রে দেখিনে। সে যে আছে এই সত্যটাই বিশুদ্ধভাবে আমাদের মনকে টানে। সেই অপরিণত মানুষটির মধ্যে একটি পূর্ণতার ছবি দেখা দেয়। শিশুর মধ্যে মানুষের প্রাণময় রূপটি স্বচ্ছ অনাবিল আকাশে সুপ্রত্যক্ষ। নানা কৃত্রিম সংস্কারের ষড়যন্ত্রে তার সহজ আত্ম-প্রকাশে একটুও দ্বিধা ঘটিয়ে দেয় না। প্রাণের বেগে নন্দিনী যে-রকম সহজে নেচেকুঁদে গোলমাল ক'রে বেড়ায়, আমি যদি তা করতে যাই তা হ'লে যে-প্রভূত সংস্কারের পরিমণ্ডল আমাকে নিবিড় ক'রে ঘিরে আছে সে-সুদ্ধ নড়চড় করতে থাকে, সেটা একটা অসঙ্গত ব্যাপার হ'য়ে ওঠে। শিশু যা-তা নিয়ে যেমন-তেমন ক'রে খেলে, তাতেই খেলার বিশুদ্ধ রূপটি দেখি। খেলার উপকরণের কৃত্রিম মূল্য, খেলার লক্ষ্যের কৃত্রিম উত্তেজনা তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে না। নন্দিনী যখন লুব্ধভাবে কমলালেবু খায়, তখন সেই অসঙ্কোচ লোভটিকে সুন্দর ঠেকে। সহজ প্রাণের রসবোধের সঙ্গে কমলা-লেবুর যে মধুর সম্বন্ধ, ভদ্রতার কোনো বিধানের দ্বারা সেটা ক্ষুণ্ণ হয়নি। ঝগড়ু-বেহারাটার প্রতি নন্দিনার যে বন্ধুত্বের টান সেটা দেখ্‌তে ভালো লাগে, কেননা, যে-কোনো দুই মানুষের মধ্যে এই সম্বন্ধটি সত্য হওয়ার কোনো বাধা থাকা উচিত না; কিন্তু সামাজিক ভেদ-বুদ্ধির নানা অভ্যস্ত সংস্কারকে যেম্‌নি আমি স্বীকার করেছি অম্‌নি ঝগড়ু-বেহারার সঙ্গে বন্ধুত্ব করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হয়েছে, অথচ এমন ভদ্রবেশধারীকে আমি সমকক্ষভাবে অনায়াসে গ্রহণ করতে পারি যার মনুষ্যত্বের আন্তরিক মূল্য ঝগড়ুর চেয়ে অনেক কম। জাহাজে তার সমবয়স্ক য়ুরোপীয় বালিকার সঙ্গে নন্দিনীর ঝগড়াও হয়, ভাবও হয়, পরস্পরের মধ্যে সম্পত্তির বিনিময়ও চল্‌চে। য়ুরোপীয় পুরুষযাত্রীর সঙ্গে মাঝে মাঝে আমার মাথা নাড়ানাড়ি হ'য়ে থাকে, শরীরের স্বাস্থ্য ও আব্‌হাওয়া নিয়ে বাজে কথা বলাবলিও হয়; সংস্কারের বেড়া ডিঙিয়ে তার বেশি আর সহজে এগোতে পারিনে। সহজ মানুষের সত্যটি সামাজিক মানুষের কুয়াশায় ঢেকে রেখে দেয়। অর্থাৎ আমরা নানা অবান্তর তথ্যের অস্বচ্ছতার

মধ্যে বাস করি। শিশুর জীবনের যে সত্য, তার সঙ্গে অবান্তরের মিশোল নেই। তাই তার দিকে যখন চেয়ে দেখবার অবকাশ পাই, তখন প্রাণলীলার প্রত্যক্ষ স্বরূপটি দেখি, তাতে সংস্কারভারে পীড়িত চিন্তাক্লিষ্ট মন গভীর তৃপ্তি পায়।

শিশুর মধ্যে আমরা মুক্তির সহজ ছবি দেখ্‌তে পাই। মুক্তি বল্‌তে কি বোঝায়? প্রকাশের পূর্ণতা। ভগবান্-সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর-ছলে ঋষি একটি চরম কথা বলেছেন: স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি? স্বে মহিম্নি। সেই ভগবান্ কিসের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত? তার উত্তর, নিজের মহিমাতেই। অর্থাৎ তিনি স্বপ্রকাশ। শিশুরও সেই কথা। সে আপনাতে আপনি পরিব্যক্ত। তাকে দেখে আমাদের যে আনন্দ সে তার বাধামুক্ত সহজ প্রকাশে। য়ুরোপে আজ-কাল চিত্রকলার ইতিহাসে একটা বিপ্লব এসেছে দেখ্‌তে পাই। এতকাল ধ'রে এই ছবি আঁকার চারদিকে হিন্দুস্থানী গানের তানকর্তবের মতো—যে-সমস্ত প্রভূত ওস্তাদী জ'মে উঠ্‌ছিল, আজ সকলে বুঝেছে তার বারো আনাই অবান্তর। তা সুঠাম হ'তে পারে, কোনো না কোনো কারণে মনোহর হ'তেও পারে, তার আড়ম্বর-বাহুল্যে বিশেষ-একটা শক্তি-সম্পদ্‌ও প্রকাশ কর্‌তে পারে; অর্থাৎ ঝড়ের মেঘের মতো তার আশ্চর্য্য রঙের ঘটা থাক্‌তে পারে, কিন্তু আসল যে-জিনিষটি পড়েছে ঢাকা, সে হচ্চে সরল সত্যের সূর্য্য, যাকে স্বচ্ছ আকাশে তার আপন নির্ম্মল মহিমায় দেখে বিশ্ব আনন্দিত হয়।

গান বলো চিত্র বলো কাব্য বলো ওস্তাদী প্রথমে নম্রশিরে—মোগল দর্‌বারে ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কম্পানির মতো—তাদের পিছনে থাকে। কিন্তু যেহেতু প্রভুর চেয়ে সেবকের পাগ্‌ড়ির রং কড়া, তার তকমার চোখ-ধাঁধানি বেশি, এই কারণে তারা ভিড়ের উৎসাহ যতই পায়, ততই পিছন ছেড়ে সাম্‌নে এসে জ'মে যায়। যথার্থ আর্ট্ তখন হার মানে, তার স্বাধীনতা চ'লে যায়। যথার্থ আর্টের মধ্যে সহজ প্রাণ আছে ব'লেই তার বৃদ্ধি আছে, গতি আছে; কিন্তু যে-হেতু কারুনৈপুণ্যটা অলঙ্কার, যেহেতু তাতে প্রাণের ধর্ম্ম নেই, তাই তাকে প্রবল হ'তে দিলেই আভরণ হ'য়ে ওঠে শৃঙ্খল. তখন সে আর্টের স্বাভাবিক বৃদ্ধিকে বন্ধ ক'রে দেয়, তার গতি রোধ করে. তখন যেটা বাহাদুরি কর্‌তে থাকে সেটা আত্মিক নয়, সেটা বৈষয়িক; অর্থাৎ তার মধ্যে প্রাণগত বৃদ্ধি নেই, বস্তুগত সঞ্চয় আছে। তাই আমাদের হিন্দুস্থানী গানে বৃদ্ধি দেখ্‌তে পাইনে। তানসেন প্রভৃতির অক্ষয় কমণ্ডলু থেকে যে-ধারা প্রবাহিত হয়েছিল, ওস্তাদ প্রভৃতি জহ্নু-মুনি কারদানি দিয়ে সেটি গিলে খেয়ে ব'সে আছে। মোট কথা, সত্যের রসরূপটি সুন্দর ও সরল ক'রে প্রকাশ করা যে কলাবিদ্যার কাজ অবান্তরের জঞ্জাল তার সবচেয়ে শত্রু। মহারণ্যের শ্বাস-রুদ্ধ ক'রে দেয় মহাজঙ্গল।

আধুনিক কলারসজ্ঞ বল্‌চেন, আদিকালের মানুষ তার অশিক্ষিত-পটুত্বে বিরলরেখায় যেরকম সাদাসিধে ছবি আঁকৃত, ছবির সেই গোড়াকার ছাঁদের মধ্যে ফিরে না গেলে এই অবান্তরভার-পীড়িত আর্টের উদ্ধার নেই। মানুষ বারবার শিশু হ'য়ে জন্মায় ব'লেই সত্যের সংস্কার-বর্জ্জিত সরলরূপের আদর্শ চিরন্তন হ'য়ে আছে, আর্ট্‌কেও তেম্‌নি শিশু-জন্ম নিয়ে অতি-অলঙ্কারের বন্ধনপাশ থেকে বারে বারে মুক্তি পেতে হবে।

এই অবান্তর-বর্জ্জন কি শুধু আর্টেরই পরিত্রাণ? আজকের দিনের ভারজর্জ্জর সভ্যতারও এই পথে মুক্তি। মুক্তি-যে সংগ্রহের বাহুল্যে নয়, ভোগের প্রাচুর্য্যে নয়, মুক্তি-যে আত্ম-প্রকাশের সত্যতায়, আজকের দিনে এই কথাই মানুষকে বারবার স্মরণ করাতে হবে। কেননা আজ মানুষ যেরকম বন্ধনজালে জড়িত, এমন কোনো দিনই ছিল না।

লোভ-মোহের বন্ধন থেকে মানুষ কবেই বা মুক্ত ছিল? কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে মুক্তির সাধনা ছিল সজাগ। বৈষয়িকতার বেড়ায় তখন ফাঁক ছিল, সেই ফাঁকের ভিতর দিয়ে সত্যের আলো আস্‌ত ব'লে সেই আলোর প্রতি কোনো দিন বিশ্বাস যায়নি। আজ জটিল অবান্তরকে অতিক্রম ক'রে সরল চিরন্তনকে অন্তরের সঙ্গে স্বীকার করবার সাহস মানুষের চ'লে গেছে।

আজ কত পণ্ডিত তথ্যের গভীর অন্ধকূপে ঢুকে টুক্‌রো-টুক্‌রো সংবাদের কণা খুঁটে খুঁটে জমাচ্চেন। য়ুরোপে

যখন বিদ্বেষের কলুষে আকাশ আবিল, তখন এইসকল পণ্ডিতদেরও মন দেখি বিষাক্ত। সত্য-সাধনার যে উদার বৈরাগ্য ক্ষুদ্রতা থেকে ভেদবুদ্ধি থেকে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে, তাঁরা তার আহ্বান শুনতে পাননি। তার প্রধান কারণ, জ্ঞানসাধনায় উপরের দিকে খাড়া হ'য়ে মানুষের যে-মাথা একদিন বিশ্ব-দেখা দেখ্‌ত আজ সেই মাথা নীচে ঝুঁকে প'ড়ে দিনরাত টুক্‌রো-দেখা দেখ্‌চে।

ভারতের মধ্যযুগে যখন কবীর দাদু প্রভৃতি সাধুদের আবির্ভাব হয়েছিল, তখন ভারতে সুখের দিন না। তখন রাষ্ট্রনৈতিক ভাঙাগড়ায় দেশের অবস্থার কেবলি উলট্‌-পালট্‌ চল্‌ছিল। তখন শুধু অর্থবিরোধ নয়, ধর্ম্ম-বিরোধের তীব্রতাও খুব প্রবল। যখন অন্তরে বাহিরে নানা বেদনা, সেই অস্থিরতার কালে স্বভাবতঃ মানুষের মন ছোট হয়, তখন রিপুর সংঘাতে রিপু জেগে ওঠে। তখন বর্ত্তমানের ছায়াটাই কালো হ'য়ে নিত্যকালের আলো আচ্ছন্ন করে, কাছের কান্নাই বিশ্বের সকল বাণী ছাপিয়ে কানে বাজে। কিন্তু সেই বড় কৃপণ সময়েই তাঁরা মানুষের ভেদের চেয়ে ঐক্যকে সত্য ক'রে দেখেছিলেন। কেননা, তাঁরা সকলেই ছিলেন কবি, কেউ পণ্ডিত ছিলেন না। শব্দের জালে তাঁদের মন জড়িয়ে যায়নি, তথ্যের খুঁটি-নাটির মধ্যে উঞ্ছবৃত্তি কর্‌তে তাঁরা বিরত ছিলেন। তাই হিন্দু-মুসলমানের অতি প্রত্যক্ষ বিরোধ ও বিদ্বেষ বুদ্ধির মধ্যে থেকেও তাদের মনুষ্যত্বের অন্তরে একের আবির্ভাব তাঁরা বিনাবাধায় স্পষ্ট ক'রে দেখেছিলেন। সেই দেখাতেই দেখার মুক্তি।

এর থেকেই বুঝ্‌তে পারি, তখনো মানুষ শিশুর নব-জন্ম নিয়ে সত্যের মুক্তিরাজ্যে সহজে সঞ্চরণ কর্‌বার অবকাশ ও অধিকার হারায়নি। এইজন্তেই আকবরের মতো সম্রাটের আবির্ভাব তখন সম্ভবপর হয়েছিল; এই-জন্তেই যখন ভ্রাতৃরক্ত-পঙ্কিল পথে অওরংজেব গোঁড়ামির কঠোর শাসন বিস্তার করেছিলেন, তখন তাঁরই ভাই দারাশিকো সংস্কার-বর্জ্জিত অসাম্প্রদায়িক সত্য সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তখন বড় দুঃখের দিনেও মানুষের পথ ছিল সহজ। আজ সে-পথ বড় দুর্গম। এখনকার দিনে প্রবীণেরা পথের প্রত্যেক কাঁকর গুণে বাধারই হিসাবকে প্রকাণ্ড ক'রে তোলে;—মৃত্যুঞ্জয় মানবাত্মার অপরাহত শক্তিকে তারা উপস্থিতের ছোট ছোট বিরুদ্ধ সাক্ষ্যের জোরে অবজ্ঞা করে। তাই তারা এত কৃপণ, এত সন্দিগ্ধ, এত নিষ্ঠুর, এত আত্মম্ভরি। বিশ্বাস যার নেই, সে কখনো সৃষ্টি কর্‌তে পারে না, সে কেবল সংগ্রহ কর্‌তে পারে, অবশেষে এই সংগ্রহ নিয়েই যত মারামারি কাটাকাটি।

আজকের এই বিশ্বাসহীন আনন্দহীন অন্ধযুগ কবির বাণীকে প্রার্থনা কর্‌চে, এই কথা শোনাবার জন্তে যে, আত্মম্ভরিতায় বন্ধন, আত্মপ্রকাশেই মুক্তি; আত্মম্ভরিতায় জড় বস্তুরাশির জটিলতা, আত্মপ্রকাশে বিরলভূষণ সত্যের সরলরূপ।

মুক্তি

মুক্তি নানা মূর্ত্তি ধরি' দেখা দিতে আসে জনে জনে,
এক পন্থা নহে।
পরিপূর্ণতার স্বাদ নানা পাত্রে ভুবনে ভুবনে
নানা স্রোতে বহে।

সৃষ্টি মোর সৃষ্টি সাথে মেলে যেথা, সেথা পাই ছাড়া,
মুক্তি যে আমারে তাই সঙ্গীতের মাঝে দেয় সাড়া,
সেথা আমি খেলা-ক্ষ্যাপা বালকের মতো লক্ষ্মীছাড়া
নিত্য-নিঃস্ব নগ্ন নিরুদ্দেশ।
সেথা বারে বারে মোর প্রথম জন্মের নাহি শেষ॥

যে-সুর পেয়েছি গানে মাঝে মাঝে, সে সুরে, হে গুণী
তোমারে চিনায়।
বেঁধে দিয়ো নিজ হাতে সেই নিত্য সুরের ফাল্গুনী
আমার বীণায়।
তা হ'লে বুঝিব আমি ধূলি কোন্ ছন্দে হয় ফুল
বসন্তের ইন্দ্রজালে অরণ্যেরে করিয়া ব্যাকুল;
নব নব মায়াচ্ছায়া কোন্ নৃত্যে নিয়ত দোদুল
বর্ণ বর্ণ ঋতুর দোলায়।
তোমারি আপন সুর কোন্ তালে তোমারে ভোলায়॥

যেদিন আমার গান মিলে যাবে তোমার গানের
সুরের ভঙ্গীতে
মুক্তির সঙ্গম-তীর্থ পাব আমি আমারি প্রাণের
আপন সঙ্গীতে।
সেদিন বুঝিব মনে নাই নাই বস্তুর বন্ধন,
শূন্যে শূন্যে রূপ ধরে তোমারি এ বীণার স্পন্দন;
নেমে যাবে সব বোঝা, থেমে যাবে সকল ক্রন্দন,
ছন্দে তালে ভুলিব আপনা—
বিশ্বগীত-পদ্মদলে স্তব্ধ হবে সকল ভাবনা॥

সঁপি' দিব সুখ দুঃখ আশা ও নৈরাশ্য যত কিছু
তব বীণা-তারে,—
ধরিবে গানের মূর্তি, একান্তে করিয়া মাথা নীচু
শুনিব তাহারে।

দেখিব তাদের, যেথা ইন্দ্রধনু অকস্মাৎ ফুটে,
দিগন্তে বনের প্রান্তে উষার উত্তরী যেথা লুটে,
বিবাগী ফুলের গন্ধ মধ্যাহ্নে যেথায় যায় ছুটে ;—
নীড়ে-ধাওয়া পাখীর ডানায়
সায়াহ্ন-গগন যেথা দিবসেরে বিদায় জানায় ॥

সেদিন আমার রক্তে শুনা যাবে দিবস রাত্রির
নৃত্যের নূপুর ;
নক্ষত্র বাজাবে বক্ষে বংশীধ্বনি আকাশযাত্রীর
আলোক-বেণুর ।
সেদিন বিশ্বের তৃণ মোর অঙ্গে হবে রোমাঞ্চিত,
আমার পরাণ হবে কিংশুকের রক্তিমা-লাঞ্ছিত :
সেদিন আমার মুক্তি, যেই দিন হে চির-বাঞ্ছিত,
তোমার লীলায় মোর লীলা,
যেদিন তোমার স:ঙ্গ গীতরঙ্গে তালে তালে মিলা ॥

২২ অক্টোবর,
১৯২৪
ষ্টিমার এণ্ডিস ।

তৃতীয়া

কাছের থেকে দেয় না ধরা, দূরের থেকে ডাকে
তিন বছরের প্রিয়া আমার, দুঃখ জানাই কাকে।
কণ্ঠেতে ওর দিয়ে গেছে দখিন হাওয়ার দান
তিন বসন্তে দোয়েল শ্যামার তিন বছরের গান ।
তবু কেন আমারে ওর এতই কৃপণতা,
বারেক ডেকে দৌড়ে পালায়, কইতে না চায় কথা ।
তবু ভাবি, যাই কেন হোক্ অদৃষ্ট মোর ভালো,
অমন সুরে ডাকে আমার মাণিক আমার আলো ।
কপাল মন্দ হ'লে টানে আরো নীচের তলায়,
হৃদয়টি ওর হোক্ না কঠোর মিষ্টি তো ওর গলায় ॥

আলো যেমন চমকে বেড়ায় আম্‌লকির ঐ গাছে
তিন বছরের প্রিয়া আমার দূরের থেকে নাচে।
লুকিয়ে কখন বিলিয়ে গেছে বনের হিল্লোল
অঙ্গে উহার বেণুশাখার তিন ফাগুনের দোল।
তবু ক্ষণিক হেলাভরে হৃদয় করি' লুট
শেষ না হ'তেই নাচের পালা কোন্‌খানে দেয় ছুট।
আমি ভাবি এই বা কি কম,প্রাণে তো ঢেউ তোলে,
ওর মনেতে যা হয় তা হোক্‌ আমার তো মন দোলে।
হৃদয় না হয় নাই বা পেলাম মাধুরী পাই নাচে,
ভাবের অভাব রইল না হয়, ছন্দটা তো আছে॥

বন্দী হ'তে চাই যে কোমল ঐ বাহু-বন্ধনে;
তিন বছরের প্রিয়ার আমার নাই সে খেয়াল মনে।
সোনার প্রভাত দিয়েছে ওর সর্ব্বদেহ ছুঁয়ে
শিউলি ফুলের তিন শরতের পরশ দিয়ে ধুয়ে॥
বুঝ্‌তে নারি আমার বেলায় কেন টানাটানি।
ক্ষয় নাহি যার সেই সুধা নয় দিত একটুখানি।
তবু ভাবি বিধি আমায় নিতান্ত নয় বাম,
মাঝে মাঝে দেয় সে দেখা তারি কি কম দাম?
পরশ না পাই, হরষ পাব চোখের চাওয়া চেয়ে,
রূপের ঝোরা বইবে আমার বুকের পাহাড় বেয়ে॥

কবি ব'লে লোক-সমাজে আছে তো মোর ঠাঁই,
তিন বছরের প্রিয়ার কাছে কবির আদর নাই।
জানে না যে ছন্দে আমার পাতি নাচের ফাঁদ,
দোলার টানে বাঁধন মানে দূর আকাশের চাঁদ।
পলাতকার দল যত সব দখিন হাওয়ার চেলা
আপনি তারা বশ মেনে যায় আমার গানের বেলা।

ছোট্ট ওরি হৃদয়খানি দেয় না শুধু ধরা,
ঝগ্‌ড়ু বোকার বরণ-মালা গাঁথে স্বয়ম্বরা।
যখন দেখি এমন বুদ্ধি, এমন তাহার রুচি,
আমারে ওর পছন্দ নয়, যায় সে লজ্জা ঘুচি'॥

এমন দিনও আস্‌বে আমার, আছি সে-পথ চেয়ে,
তিন বছরের প্রিয়া হবেন বিশ বছরের মেয়ে।
স্বর্গভোলা পারিজাতের গন্ধখানি এসে
ক্ষ্যাপা হাওয়ায় বুকের ভিতর ফির্‌বে ভেসে ভেসে।
কথায় যারে যায় না ধরা এমন আভাস যত
মর্ম্মরিবে বাদল-রাতের রিমিঝিমির মতো।
সৃষ্টিছাড়া ব্যথা যত, নাই যাহাদের বাসা,
ঘুরে ঘুরে গানের সুরে খুঁজ্‌বে আপন ভাষা।
দেখ্‌বে তখন ঝগ্‌ড়ু বোকা কি কর্‌তে বা পারে,
শেষকালে সেই আস্‌তে হবেই এই কবিটির দ্বারে॥

৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯২৪
বুয়েনোস্ আইরেস।

ফোটোগ্রাফের উত্তরে

তিন বছরের বিরহিণী জান্‌লাখানি ধ'রে
কোন্ অলক্ষ্য তারার পানে তাকাও অমন ক'রে?
অতীত কালের বোঝার তলায় আমরা চাপা থাকি,
ভাবী কালের প্রদোষ আলোয় মগ্ন তোমার আঁখি।
তাই তোমার ঐ কাঁদন-হাসির সবটা বুঝি না যে,
স্বপন দেখে অনাগত তোমার প্রাণের মাঝে।
কোন্ সাগরের তীর দেখেছ জানে না তো কেউ,
হাসির আভায় নাচে সে কোন্ সুদূর অশ্রু ঢেউ।
সেখানে কোন্ রাজপুত্তুর চিরদিনের দেশে
তোমার লাগি সাজ্‌তে গেছে প্রতিদিনের বেশে।

সেখানে সে বাজায় বাঁশি রূপকথারি ছায়ে,
সেই রাগিণীর তালে তোমার নাচন লাগে গায়ে
আপনি তুমি জানো না তো আছ কাহার আশায়,
অনামারে ডাক দিয়েছ চোখের নীরব ভাষায়।
হয়ত সে কোন্ সকাল-বেলা শিশির-ঝলা পথে
জাগরণের কেতন তুলে আস্‌বে সোনার রথে,
কিম্বা পূর্ণ চাঁদের লগ্নে, বৃহস্পতির দশায়;—
দুঃখ আমার, আর সে যে হোক্, নয় সে দাদামশায়।

২০ ডিসেম্বর, ১৯২৪
বুয়েনোস্ আইরেস্।

হারুনা মারু জাহাজ থেকে নেমে প্যারিসে কয়েক দিন মাত্র ভূমিমাতার শুশ্রূষা ভোগ করতে পেরেছিলাম্। হঠাৎ খবর এল, যথাসময়ে পেরুতে পৌছতে হ'লে অবিলম্বে জাহাজ ধরা চাই। তাড়াতাড়ি শেরবুর্গ-বন্দর থেকে আণ্ডেস্ জাহাজে উঠে পড়লুম। লম্বায়-চওড়ায় জাহাজটা খুব মস্ত, কিন্তু আমার শরীরের বর্ত্তমান অবস্থায় আরামের পক্ষে যে-সব সুবিধার প্রয়োজন ছিল, তা পাওয়া গেল না। জাপানী জাহাজে আতিথ্যের প্রচুর দাক্ষিণ্যে আমার অভ্যাসটাও কিছু খারাপ ক'রে দিয়েছিল। সেইজন্যে এখানে ক্যাবিনে প্রবেশ ক'রেই মনটা অপ্রসন্ন হ'ল। কিন্তু যেটা অনিবার্য্য, নিজের গরজেই মন তার সঙ্গে যত শীঘ্র পারে রফা ক'রে নিতে চায়। অত্যন্ত দুষ্পাচ্য জিনিষও পেটে পড়লে পাকযন্ত্র হাল ছেড়ে দিয়ে জারক-রস প্রয়োগ বন্ধ করে না। মনেরও জারক-রস আছে, অনভ্যস্ত কোনো দুঃখকে হজম ক'রে নিয়ে তাকে সে আপনার অভ্যস্ত বিশ্বের সামিল ক'রে নিশ্চিন্ত হ'তে চায়। অসুবিধাগুলো এক-রকম সহ্য হ'য়ে এল, আর দিনের পর দিন চরকার একঘেয়ে সুতো কাটার মতো একটানে চলতে লাগল।

বিষুবরেখা পার হ'য়ে চলেছি, এমন সময় হঠাৎ কখন শরীর গেল বিগ্‌ড়ে, বিছানা ছাড়া গতি রইল না। ক্যাবিন জিনিষটাই একটা স্থায়ী ব্যাধি, ইন্দ্রিয়গুলো যদি তার সঙ্গে যোগ দিয়ে জুলুম সুরু করে, তা হ'লে পুলিশের আকস্মিক বন্ধনের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে পর্য্যন্ত আপিল বন্ধ হয়, কোথাও কিছুই সান্ত্বনা থাকে না। শান্তিহীন দিন আর নিদ্রাহীন রাত আমাকে পিঠমোড়া ক'রে শিকল কষ্‌তে লাগল। বিদ্রোহের চেষ্টা করতে গেলে শাসনের পরিমাণ বাড়তেই থাকে। রোগ-গারদের দারোগা আমার বুকের উপর দুর্ব্বলতার বিষম একটা বোঝা চাপিয়ে রেখে দিলে—মাঝে মাঝে মনে হ'ত, এটা স্বয়ং যমরাজের পায়ের চাপ। দুঃখের অত্যাচার যখন অতিমাত্রায় চ'ড়ে ওঠে, তখন তাকে পরাভূত করতে পারিনে; কিন্তু তাকে অবজ্ঞা করবার অধিকার ত কেউ কাড়তে পারে না—আমার হাতে তার একটা উপায় আছে, সে হচ্চে কবিতা-লেখা। তার বিষয়টা যাই হোক না কেন, লেখাটাই দুঃখের বিরুদ্ধে সিডিশন-বিশেষ। সিডিশনের দ্বারা প্রতাপশালীর বিশেষ অনিষ্ট হয় না, তাতে পীড়িত চিত্তের আত্মসম্ভ্রম রক্ষা হয়।

আমি সেই কাজে লাগ্‌লুম, বিছানায় প'ড়ে প'ড়ে কবিতা লেখা চল্‌ল। ব্যাধিটা যে ঠিক্ কি, তা নিশ্চিত বল্‌তে পারিনে, কেবল এই জানি, সে একটা অনির্ব্বচনীয় পীড়া। সে-পীড়া শুধু আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে নয়, ক্যাবিনের সমস্ত আসবাব পত্রের মধ্যে সর্ব্বত্র সঞ্চারিত—আমি আর আমার ক্যাবিন সমস্তটা মিলে যেন একটা অখণ্ড-রুগ্নতা।

এমনতর অসুখের সময় স্বভাবতই দেশের জন্যে ব্যাকুলতা জন্মে। ক্যাবিনের জঠরের মধ্যে দিবারাত্রি জীর্ণ হ'তে হ'তে আমারও মন ভারতবর্ষের আকাশের

উদ্বেগে উৎসুক হ'য়ে উঠ্‌ল। কিন্তু এই উত্তাপের পরিমাণ বেড়ে বেড়ে ক্রমে যেমন তা আলোকিত হয়, দুঃখেরও তেম্‌নি পরিমাণভেদে প্রকাশভেদ হ'য়ে থাকে। যে-দুঃখ প্রথমে কারাগারের মতো বিশ্ব থেকে পৃথক্ ক'রে মনকে কেবলমাত্র নিজের ব্যথার মধ্যেই বদ্ধ করে, সেই দুঃখেরই বেগ বাড়্‌তে বাড়্‌তে অবশেষে অবরোধ ভেঙে পড়ে এবং বিশ্বের দুঃখ-সমুদ্রের জোটালের বানকে অন্তরে প্রবেশ করবার পথ ছেড়ে দেয়। তখন নিজের ক্ষণিক ছোট দুঃখটা মানুষের চিরকালীন বড় দুঃখের সাম্‌নে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়ায়, তার ছটফটানি চ'লে যায়। তখন দুঃখের দণ্ডটা একটা দীপ্ত আনন্দের মশাল হ'য়ে জ্ব'লে ওঠে। প্রলয়কে ভয় যেই না করা যায়, অম্‌নি দুঃখ-বীণার সুর বাঁধা সারা হয়। গোড়ায় ঐ সুর বাঁধ্‌বার সময়টাই হচ্চে বড় কর্কশ, কেননা তখনো যে দ্বন্দ্ব ঘোচেনি। এই অভিজ্ঞতার সাহায্যে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকের অবস্থা কল্পনা করতে পারি। বোধ হয়, প্রথম অবস্থায় ভয়ে ভরসায় যতক্ষণ টানাটানি চল্‌তে থাকে, ততক্ষণ ভারি কষ্ট। যতক্ষণ জীবনকেই একমাত্র ক'রে দেখিনে, যতক্ষণ তাকে অতিক্রম ক'রেও জীবনের চিরপরিচিত ক্ষেত্রটা দেখা যায়, ততক্ষণ সেই দ্বন্দ্বের টানে ভয় কিছুতেই ছাড়্‌তে চায় না। অবশেষে তাপের তীব্রতা বাড়তে বাড়্‌তে রুদ্র যখন অদ্বিতীয় হ'য়ে দেখা দেন, প্রলয়ের গর্জ্জন তখন সঙ্গীত হ'য়ে ওঠে—তখন তার সঙ্গে নির্ব্বিচারে সম্পূর্ণভাবে যোগ দেবার নিরতিশয় আগ্রহে মরীয়া ক'রে তোলে। মৃত্যুকে তখন সত্য ব'লে জেনে গ্রহণ করি, তা'র একটা পূর্ণাত্মক রূপ দেখ্‌তে পাই ব'লে তার শূন্যাত্মকতার ভয় চ'লে যায়।

কয়দিন রুদ্ধকক্ষে সঙ্কীর্ণ শয্যায় প'ড়ে প'ড়ে মৃত্যুকে খুব কাছে দেখ্‌তে পেয়েছিলাম, মনে হয়েছিল প্রাণকে বহন করবার যোগ্য শক্তি আমার শেষ হ'য়ে গেছে। এই অবস্থায় প্রথম ইচ্ছার ধাকাটা ছিল দেশের আকাশে প্রাণটাকে মুক্ত ক'রে দেওয়া। ক্রমে সেই ইচ্ছার বন্ধন শিথিল হ'য়ে এল। তখন মৃত্যুর পূর্ব্বেই ঘরের বাইরে নিয়ে যাবার যে প্রথা আমাদের দেশে আছে, তার অর্থটা মনে জেগে উঠ্‌ল। ঘরের ভিতরকার সমস্ত অভ্যস্ত জিনিষ হচ্চে প্রাণের বন্ধনজাল। তারা সকলে মিলে মৃত্যুকে তীব্রভাবে প্রতিবাদ করতে থাকে। জীবনের শেষ ক্ষণে মনের মধ্যে এই দ্বন্দ্বের কোলাহল যদি জেগে ওঠে, তবে তাতেই বেসুর কর্কশ হয়; মৃত্যুর সম্পূর্ণ সঙ্গীত শুন্‌তে পাইনে,—মৃত্যুকে সত্য ব'লে স্বীকার ক'রে নেবার আনন্দ চ'লে যায়।

বহুকাল হ'ল আমি যখন প্রথম কাশীতে গিয়েছিলাম তখন মৃত্যুকালের যে একটি মনোহর দৃশ্য চোখে পড়েছিল, তা আমি কোনো দিন ভুল্‌তে পার্‌ব না। ঠিক মনে নেই, বোধ করি তখন শরৎকাল; নির্ম্মল আকাশ থেকে প্রভাত সূর্য্য জীবধাত্রী বসুন্ধরাকে আলোকে অভিষিক্ত ক'রে দিয়েচে। এপারের লোকালয়ের বিচিত্র চাঞ্চল্য, ওপারের প্রান্তরের সুদূরবিস্তীর্ণ নিস্তব্ধতা, মাঝখানে জলধারা, সমস্তকে দেবতার পরশমণি ছোঁয়ানো হ'ল। নদীর ঠিক মাঝখানে চেয়ে দেখি একটি ডিঙি নৌকা খরস্রোতে ছুটে চলেছে। আকাশের দিকে মুখ ক'রে মুমূর্ষু স্তব্ধ হ'য়ে শুয়ে আছে, তারি মাথার কাছে করতাল বাজিয়ে উচ্চস্বরে কীর্ত্তন চল্‌চে। নিখিল বিশ্বের বক্ষের মাঝে মৃত্যুর যে পরম আহ্বান, আমার কাছে তারি সুগম্ভীর সুরে আকাশ পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌ল। যেখানে তার আসন সেখানে তার শান্তরূপ দেখ্‌তে গেলে মৃত্যু যে কত সুন্দর তা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয়। ঘরের মধ্যে সমস্তই তাকে উচ্চৈঃস্বরে অস্বীকার করে; সেইজন্য সেখানকার খাটপালঙ, সিন্দুক চৌকি দেওয়াল কড়ি বরগা, সেখানকার প্রাত্যহিক ক্ষুধাতৃষ্ণা কর্ম্ম ও বিশ্রামের ছোটো-খাটো সমস্ত দাবীতে মুখর চঞ্চল ঘরকন্নার ব্যস্ততার মাঝখানে সমস্ত ভিড় ঠেলে সমস্ত আপত্তি অতিক্রম ক'রে মৃত্যু যখন চিরন্তনের লিপি হাতে নিয়ে প্রবেশ করে, তখন তাকে দস্যু ব'লে ভ্রম হয়, তখন তার হাতে মানুষ আত্মসমর্পণ করবার আনন্দ পায় না। মৃত্যু বাঁধন ছিন্ন ক'রে দেবে, এইটেই কুৎসিত, আপনি বাঁধন আল্‌গা ক'রে দিয়ে সম্পূর্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে তার হাত ধর্‌ব, এইটেই সুন্দর।

হিন্দু কাশীকে পৃথিবীর বাহিরের স্থান ব'লেই বিশ্বাস করে। তার কাছে কাশীর ভৌগোলিক সীমানা একটা মায়া, পরমার্থত সেখানে নিখিল বিশ্বের পরিচয়, সেখানে

বিশ্বেশ্বরের আসন। অতএব বিশেষ দেশবাসীর কাছে বিশেষ দেশের যে আকর্ষণ-বেগ তার প্রাণকে সেখানকার মাটি জল আকাশের সঙ্গে নানা বিশেষ সূত্রে বাঁধে, কাশীর মধ্যে যেন পৃথিবীর সেই বিশেষ দেশগত বন্ধনও নেই। অতএব যথার্থ হিন্দুর কানে মৃত্যুর মুক্তিবাণী কাশীতে বিশুদ্ধ সুরে প্রবেশ করে।

বর্ত্তমান যুগে ন্যাশনাল বৈষয়িকতা বিশ্বব্যাপী হ'য়ে স্বদেশগত অহমিকাকে সুতীব্রভাবে প্রবল ক'রে তুলেচে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই সংঘ-আশ্রিত অতি প্রকাণ্ডকায় রিপুই বর্ত্তমান যুগের সমস্ত দুঃখ ও বন্ধনের কারণ। তাই সেদিন বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমার মনে হ'ল, আমিও যেন মুক্তির তীর্থক্ষেত্রে মরতে পারি,—শেষ মুহূর্ত্তে যেন বল্‌তে পারি সকল দেশই আমার এক দেশ, সর্ব্বত্রই এক বিশ্বেশ্বরের মন্দির; সকল দেশের মধ্য দিয়েই এক মানব-প্রাণের পবিত্র জাহ্নবীধারা এক মহাসমুদ্রের অভিমুখে নিত্য-কাল প্রবাহিত।

১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৫;
ক্রাকোভিয়া।

বিশ্বদুঃখ

অন্ধ ক্যাবিন আলোয় আঁধার গোলা,
বন্ধ বাতাস কিসের গন্ধে ঘোলা।
মুখ ধোবার ঐ ব্যাপারখানা দাঁড়িয়ে আছে সোজা,
ক্লান্ত চোখের বোঝা।
ঝুল্‌চে কাপড় pegএ,
বিজ্‌লি-পাখার হাওয়ার ঝাপট্ লেগে।
গায়ে গায়ে ঘেঁষে
জিনিষপত্র আছে কায়ক্লেশে
বিছানাটা কৃপণ-গতিকের,
অনিচ্ছাতে ক্ষণকালের সহায় পথিকের
ঘরে আছে যে-কটা আসবাব,
নিত্য যতই দেখি, ভাবি ওদের মুখের ভাব
নারাজ ভৃত্য-সম
পাশেই থাকে মম,
কোনো মতে করে কেবল কাজ-চালাগোছ সেবা।
এমন ঘরে আঠারো দিন থাক্‌তে পারে কেবা?
কষ্ট ব'লে একটা দানব ছোট্ট খাঁচায় পুরে
নিয়ে চলে আমায় কত দূরে।

নীল আকাশে নীল সাগরে অসীম আছে ব'সে
কি জানি কোন্ দোষে
ঠেলে ঠুলে চেপে চুপে মোরে
সেখান হ'তে করেছে একঘ'রে।

হেন কালে ক্ষুদ্র দুখের গবাক্ষপথ বেয়ে
কেমন ক'রে এল হঠাৎ ধেয়ে
বিশ্বধরার বক্ষ হ'তে বিপুল দুখের প্রবল বন্যাধারা ;
এক নিমিষে আমারে সে করলে আত্মহারা।
আন্‌লে আপন বৃহৎ সান্ত্বনারে,
আন্‌লে আপন গর্জ্জনেতে ইন্দ্রলোকের অভয়
ঘোষণারে ;
মহাদেবের তপের জটা হ'তে
মুক্তিমন্দাকিনী এল কুল-ডোবানো স্রোতে ;
বল্‌লে আমার চিত্ত ঘিরে ঘিরে—
ভস্ম আবার ফিরে পাবে জীবন-অগ্নিরে।
বল্‌লে, আমি সুরলোকের অশ্রুজলের দান,
মরুর পাথর গলিয়ে ফে'লে ফলাই অমর প্রাণ।
মৃত্যুঞ্জয়ের ডমরুরব শোনাই কলস্বরে,
মহাকালের তাণ্ডবতাল সদাই বহি উদ্দাম নির্ঝরে।
স্বপ্নসম টুটে
এই ক্যাবিনের দেয়াল গেল ছুটে।
রোগশয্যা মম
হ'ল উদার কৈলাসেরি শৈলশিখর-সম।
আমার মনপ্রাণ
উঠ্‌ল গেয়ে রুদ্রেরি জয়গান॥

মৃত্যুর আহ্বান

জন্ম হয়েছিল তোর সকলের কোলে
আনন্দ-কল্লোলে।
নীলাকাশ, আলো, ফুল, পাখী,
জননীর আঁখি,

শ্রাবণের বৃষ্টিধারা, শরতের শিশিরের কণা,
প্রাণের প্রথম অভ্যর্থনা।
জন্ম সেই
এক নিমিষেই
অন্তহীন দান,
জন্ম সে যে গৃহমাঝে গৃহীরে আহ্বান ॥

মৃত্যু তোর হোক দূরে নিশীথে নির্জ্জনে,
হোক্ সেই পথে যেথা সমুদ্রের তরঙ্গ গর্জ্জনে
গৃহহীন পথিকেরি
নৃত্যচ্ছন্দে নিত্যকাল বাজিতেছে ভেরী।
অজানা অরণ্যে যেথা উঠিতেছে উদাস মর্ম্মর,
বিদেশের বিবাগী নির্ঝর
বিদায় গানের তালে হাসিয়া বাজায় করতালি।
যেথায় অপরিচিত নক্ষত্রের আরতির থালি
চলিয়াছে অনন্তের মন্দির সন্ধানে,
পিছু ফিরে চাহিবার কিছু যেথা নাই কোনোখানে।
দুয়ার রহিবে খোলা ; ধরিত্রীর সমুদ্রপর্ব্বত
কেহ ডাকিবে না কাছে, সকলেই দেখাইবে পথ।
শিয়রে নিশীথরাত্রি রহিবে নির্ব্বাক্,
মৃত্যু সে যে পথিকেরে ডাক ॥

দুঃখসম্পদ্

দুঃখ, তব যন্ত্রণায় যে-দুর্দ্দিনে চিত্ত উঠে ভরি'
দেহে মনে চতুর্দ্দিকে তোমার প্রহরী
রোধ করে বাহিরের সান্ত্বনার দ্বার,
সেইক্ষণে প্রাণ আপনার
নিগূঢ় ভাণ্ডার হ'তে গভীর সান্ত্বনা
বাহির করিয়া আনে ; অমৃতের কণা

গ'লে আসে অশ্রুজলে,
সে আনন্দ দেখা দেয় অন্তরের তলে
যে আপন পরিপূর্ণতায়
আপন করিয়া লয় দুঃখ-বেদনায়।
তখন সে মহা অন্ধকারে
অনির্ব্বাণ আলোকের পাই দেখা অন্তর-মাঝারে।
তখন বুঝিতে পারি আপনার মাঝে
আপন অমরাবতী চিরদিন গোপনে বিরাজে॥

বেদনার লীলা

গানগুলি বেদনার খেলা যে আমার,
কিছুতে ফুরায় না সে আর।
যেখানে স্রোতের জল পীড়নের পাকে
আবর্ত্তে ঘুরিতে থাকে,—
সূর্য্যের কিরণ সেথা নৃত্য করে;—
ফেনপুঞ্জ স্তরে স্তরে
দিবারাতি
রঙের খেলায় ওঠে মাতি।
শিশু রুদ্র হাসে খল খল,
দোলে টল মল
লীলাভরে।
প্রচণ্ডের সৃষ্টিগুলি প্রহরে প্রহরে
ওঠে পড়ে আসে যায় একান্ত হেলায়,
নিরর্থ খেলায়।
গানগুলি সেইমতো বেদনার খেলা যে আমার,
কিছুতে ফুরায় না সে আর॥

বিদ্যালয়ে গণতন্ত্র

শ্রী বিজয়কুমার ভৌমিক

বর্ত্তমান যুগ গণতন্ত্রের যুগ। সভ্যজগতের অধিকাংশ স্থলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং বাকী প্রায় সকল স্থলেই উহার জন্ম আন্দোলন চলিতেছে; সকলেই নিজেদের সুবিধামত শাসন-ব্যবস্থা নিজেরা করিয়া লইতে চাহিতেছে। সকল মানুষের মধ্যে যে একটি স্বাধীনতার প্রবৃত্তি চিরকাল আছে, তাহা হইতেই ইহার জন্ম। কিন্তু কেবলমাত্র গণতন্ত্র লাভ হইলেই যে তাহা সুখকর হইবে ইহার কোনো অর্থ নাই। স্থান্ ডোমিনুগো, হাইতি, মেক্সিকো প্রভৃতি অনেক গণতন্ত্রেই দেখা গিয়াছে—জনসাধারণ নিজেদের শাসন-ব্যবস্থা করিতে তেমন দক্ষ নহে। ইহার প্রধান কারণ তাহাদের এ-বিষয়ে শিক্ষার অভাব। কিন্তু শিক্ষার অভাবে গণতন্ত্র তুলিয়া দেওয়া যাইতে পারে না। শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা দ্বারাই ঐ বিষয়ে শিক্ষা লাভ হইবে;—জলে না নামিয়া সন্তরণ শিক্ষা করা যায় না।

গণতন্ত্র লাভ করিতে আমরাও চাই। এই চাওয়ার অধিকার আমাদের আছে। কিন্তু গণতন্ত্রে প্রত্যেক দেশবাসীরই দেশের শাসন-ব্যাপারে কিছু-না-কিছু কর্ত্তব্য থাকে। এই কর্ত্তব্য যথোপযুক্তভাবে সম্পাদন করিতে হইলে, বাল্যকাল হইতে এবিষয়ে শিক্ষালাভ হইলে ভালো হয়। বিদ্যালয়ে এই শিক্ষা অতি সুন্দররূপে হইতে পারে। বিদ্যালয়ের এই গণতান্ত্রিক শিক্ষা শুধু পুস্তকগত হইলে চলিবে না;—হাতে-কলমে শিখাইতে হইবে। সন্তরণ-সম্বন্ধে দশখানা বড়-বড় বই পড়িলে সন্তরণ শিক্ষা হয় না। তুলি না ধরিয়া আঁকিতে শেখা যায় না। সঙ্গীত শুনিয়াই গায়ক হওয়া যায় না। গণতন্ত্র-সম্বন্ধে ছাত্রেরা বই পড়িলে ভালো, কিন্তু না-পড়িয়াও নিজেদের বিদ্যালয়কে যদি একটি গণতান্ত্রিক নগর বা রাজ্যরূপে পরিচালনা করিতে পারে, তাহা হইলে তাহা দ্বারা তাহারা যে মানসিক সংযম শিক্ষা ও শক্তি অর্জ্জন করিবে, তাহা ভবিষ্যৎ দেশশাসন-ব্যাপারে তাহাদিগকে অনেক-পরিমাণে দক্ষ করিবে।

বর্ত্তমানে আমাদের বিদ্যালয়গুলিকে শিক্ষকের স্বেচ্ছাতন্ত্র বলা যাইতে পারে। এখানে কোনো ব্যাপারে ছাত্রদের মতামতের কোনো মূল্য নাই। অনেক স্থলে মত-প্রকাশের ফলে ভাগ্যে উপরি শাস্তি লাভ হয়। ছাত্রদের রীতি-নীতি এবং শৃঙ্খলাবিধান-বিষয়ে এই শিক্ষক-তন্ত্রের মাত্রা অনেক কমাইয়া বা বয়স্ক ছাত্রদের বেলা একেবারে তুলিয়া দিয়া ছাত্রতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করা যাইতে পারে।

ছোট স্কুল বা পাঠশালা হইলে সকল ছাত্র মিলিয়া সভা করিয়া অধিকাংশের ভোট দ্বারা (by majority vote) আইন বা নিয়ম করিবে; কি-ভাবে তাহারা চলিবে কি-ভাবে চলিবে না তাহা সভাতেই নির্দ্ধারণ করিবে এবং সভায় নির্দ্ধারিত ঐসমস্ত আইন যাহাতে প্রতিপালিত হয়, তাহা দেখিবার জন্ম নিজেদের মধ্য হইতে কতকগুলি কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিবে,—যথা অধ্যক্ষ (Mayor বা President), পুলিশ সুপারিন্টেডেণ্ট্ এবং বিচারক। বিদ্যালয় যদি বড় হয়, তাহা হইলে উহার প্রত্যেক শ্রেণীকে একটি পাড়া (ward) ধরিয়া লওয়া চলে। এইরূপ প্রত্যেক পাড়া হইতে একজন, দুইজন বা তিনজন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইবে এবং এই প্রতিনিধিদের সভা হইবে ঐ বিদ্যালয়-গণতন্ত্রের পার্লিয়ামেণ্ট্। এই পার্লিয়ামেণ্ট্ সমস্ত আইন করিবে এবং অধ্যক্ষ প্রভৃতি প্রধান কয়েকটি কর্ম্মচারী নিয়োগ করিবে। কর্ম্মচারীরা প্রয়োজন বোধ করিলে নিজেরা বা তাহাদের পার্লিয়ামেণ্টের দ্বারা পুলিশের পরিদর্শক, কনেষ্টবল্ প্রভৃতি আরো কয়েকজন নিম্নতন কর্ম্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

এই ছোট পাঠশালার পূর্ণ-গণতন্ত্র বা বড় স্কুলের প্রতিনিধি-গণতন্ত্র বিদ্যালয়ের স্বার্থ, নিজেদের স্বাস্থ্য, নিজেদের সুবিধা-অসুবিধা, পরস্পরের সহিত ব্যবহার, শিক্ষকদের প্রতি ব্যবহার, ক্রীড়া প্রভৃতি বিষয়ে নিয়ম করিবে। এইসমস্ত নিয়ম বা আইন সকল সময়েই অধিকাংশের ভোটে নির্দ্ধারিত হইবে এবং একবার বিধিবদ্ধ হইলে সকলের উপরেই উহা প্রযোজ্য হইবে। কোনো ছাত্র কোনো আইন লঙ্ঘন করিলে পুলিশ-ছাত্র তাহাকে নিবারণ করিবে এবং না-শুনিলে ধরিয়া বিচারক-ছাত্রের নিকট লইয়া যাইবে। বিচারক সাক্ষী ডাকিয়া সকল পক্ষের কথা শুনিয়া তাহার বিচার ও দণ্ড করিবে। মনে করুন, একটা আইন হইল "কেহ বিদ্যালয়ের বেঞ্চে ছুরি দিয়া কোনোরকম দাগ দিতে পারিবে না।" একটি দুষ্ট

ছেলে কাহারো কথা না শুনিয়া ঐ আইন লঙ্ঘন করিল। পুলিশের লোকে তাহাকে ধরিয়া বিচারকের নিকট লইয়া গেল। বিচারক বিচার করিয়া আদেশ করিল—উহার দুই দিন খেলা বন্ধ। এইরূপে কখনো খেলা বন্ধ, কখনো আলাপ বন্ধ, কখনও সর্ব্বসমক্ষে ক্ষমা প্রার্থনা প্রভৃতি দণ্ড এই গণতন্ত্রের নাগরিকদের উপর প্রযোজ্য হইবে। এইরূপ দণ্ড যে শিক্ষকের বেত্রাঘাত অপেক্ষাও কার্য্যকর হয় ইহা পরীক্ষিত সত্য। কারণ, ইহাতে ছাত্রদের দায়িত্বজ্ঞান ও আত্মসম্মান-বোধ জাগে।

বিদ্যালয়ে এইরূপ ছাত্রতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে, শিক্ষকগণের ক্ষমতার লাঘব হইবার ভয় হইতে পারে। কিন্তু তাহা অমূলক। শিক্ষকগণের অধিকার ও ক্ষমতা সমানই রহিবে; তাঁহারা কেবল তাঁহাদের কার্য্যের কিয়দংশ ছাত্রগণের উপর ন্যস্ত করিবেন। এই ভার দেওয়ার জন্য অবশ্য শিক্ষকদের স্বেচ্ছায় নিজ সঙ্ঘের ক্ষমতা কিছু খর্ব্ব করিয়া রাখিতে হইবে। যে-বিধির (Constitution) উপর এই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহা সর্ব্বপ্রথমে প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষক-সঙ্ঘের দ্বারা অনুমোদিত হইবে এবং ইচ্ছা করিলে প্রধান শিক্ষক কোনো আইন বা নিয়ম নাকচ্ বা প্রতিষেধ (Veto) করিবার অধিকারও রাখিতে পারেন। প্রয়োজন বোধ করিলে এরূপ নিয়মও হইতে পারে যে, প্রত্যেক আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে উহা প্রধান শিক্ষকের দ্বারা স্বাক্ষরিত হইবে এবং তাঁহার স্বাক্ষর না হইলে উহা গ্রহণ-যোগ্য হইবে না। তবে ইহা নিশ্চিত যে, ছাত্রগণের কার্য্যের উপর যত কম হস্তক্ষেপ করা হয় ততই ভালো। সকল আইনই শিক্ষক-সঙ্ঘ ইচ্ছা করিলে নাকচ করিতে পারেন, ইহা মনে করিতে ছাত্রদের আত্মমর্য্যাদা যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হয়। সুতরাং কিছু তাহাদের হাতে পুরাপুরি ছাড়িয়া দেওয়া ভালো।

আমার এই প্রস্তাব শুনিয়া গতানুগতিক লোকেরা হয়ত ইহাকে পাগলের প্রলাপ মনে করিয়া হাসিতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদের অবগতির জন্য লিখিতেছি, ইহা আমার কল্পনাপ্রসূত নহে। উইলসন্ গিল্ নামক একজন আমেরিকান্ ভদ্রলোক ইহার উদ্ভাবক। একসময়ে তাঁহার নেতৃত্বে কিউবা দ্বীপের ৩৭০০ বিদ্যালয়ে এই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়া অতি সুন্দরভাবে চলিয়াছিল। আমেরিকার যুক্তরাজ্য, হাওয়াই দ্বীপ, জাপান, আলাস্কা, দক্ষিণ আমেরিকা ও দক্ষিণ আফ্রিকার কয়েকটি স্থান এবং ইউরোপের কয়েকটি রাজ্যে এই ছাত্র-গণতন্ত্রের সুন্দর কার্য্য চলিতেছে। এবং সর্ব্বত্রই ইহার প্রসার দিন-দিন বাড়িতেছে। অনেক স্থলে আবার দুই বা ততোধিক বিদ্যালয় লইয়া রীতিমত যুক্তরাজ্যের গণতন্ত্র চলিতেছে ও তাহার নানাপ্রকার জটিল বিধিব্যবস্থায় ছাত্রগণ দক্ষ হইয়া উঠিতেছে। শুনিয়াছি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনেও কতকটা এইভাবের কার্য্য হইয়া থাকে। ইহাতে সুফলও অনেক ফলিয়াছে।

জিজ্ঞাসা হইতে পারে—ইহার উপকারিতা কি? যথার্থ দেশশাসনরূপ বিরাট্ ব্যাপারের সহিত এই ছেলে-খেলার কি সম্বন্ধ আছে? ইহার উত্তরে বলি, ইহা নিতান্ত ছেলে-খেলা নহে। প্রথমত ইহাতে শিশু ও বালকগণ নিজেদের বয়স্ক মনে করিয়া আনন্দ ও তুষ্টিলাভ করিবে—তাহাই একটা বড় লাভ। ইহার উপরে তাহারা অধিকাংশের মতে কার্য্য করার এবং নিয়মানুবর্ত্তিতার যে-শিক্ষা পাইবে তাহা ভবিষ্যৎ জীবনে তাহাদের যথেষ্ট উপকার সাধন করিবে। ইহাতে স্বাধীনতার সুব্যবহার করিতেও তাহারা শিক্ষালাভ করিবে। দেখা গিয়াছে, ছেলেরা নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছায় যে-নিয়ম গড়িয়া তোলে, তাহা ভঙ্গ করিবার প্রবৃত্তি তাহাদের হয় না। ইহা ভবিষ্যৎ নাগরিক জীবন পরিচালনে তাহাদের প্রধান সহায় হইবে। ইহা ছাড়া এই ছাত্রতন্ত্রে যাহারা কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইবে তাহারা এবং তৎসহ সমস্ত ছাত্রই দায়িত্বজ্ঞান-সম্বন্ধে যে-শিক্ষালাভ করিবে, তাহাতে আমাদের সমগ্র জাতীয় জীবনকে উন্নত করিবে। যে-দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত আছে, সে-দেশের বালকগণ বয়স্ক লোকদের দেখিয়াও অনেক-কিছু শিক্ষালাভ করিতে পারে। তাহাদের অপেক্ষা স্বরাজকামী এই পরাধীন জাতির পক্ষে বিদ্যালয়ের এই গণতন্ত্র যে অধিকতর আবশ্যক তাহা প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই বুঝিবেন।

আশা করি শান্তিনিকেতন ছাড়া অন্তত আরো দু'-একটি বিদ্যালয়ের উন্নততর ভাবসম্পন্ন শিক্ষকগণের দ্বারা ইহা এদেশে পরীক্ষিত হইবে। পরীক্ষা করিলেই বালকেরা যে নিছক মন্দ ও স্বাধীনতার সুব্যবহারে অপারগ, এ ভুল ও ভয় তাঁহাদের ভাঙিয়া যাইবে এবং ইহার ফলে ছাত্রগণকে অধিকতর সৎ ও নিয়মানুগ দেখিয়া তাঁহারা চমৎকৃত হইবেন।

"বিয়ের ফুল"

শ্রী বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

১

রামতনু সাত-সাতজায়গায় মেয়ে দেখিয়া ফিরিল; কিন্তু পছন্দ আর হইল না। সবগুলিই জবুথবু হইয়া সাম্‌নে আসিয়া বসে; হাজার চেষ্টা করিলেও ভালো করিয়া দেখা হয় না,—সেইজন্য হাজার সুন্দর হইলেও মনে কেমন একটু খুঁৎ থাকিয়া যায়। সন্দেহ হয়—আচ্ছা, এ যে চোখটা কোনোমতেই বড় করিয়া চাহিল না—নিশ্চয়ই কোনো দোষ আছে; ওর যে খোঁপার এত ধুম—ঐ-খানেই গলদ্ নাই ত?—ইত্যাদি।

নাহক্ এই সাত ঘাটের জল খাইয়া রামতনু স্থির করিল, কন্যামননের এ প্রশস্ত উপায় নহে। একটা প্রশস্ত উপায় মনে-মনে ঠাওরাইবার চেষ্টা করিতেছিল, এমন সময় বৌদিদির মুখে একদিন শুনিল, তাঁহার সম্পর্কে এক পিসির কন্যা সম্প্রতি প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত পাশ দিয়া জলপানি পাইয়াছে। রামতনু বেচারা এতদিন বেশীর ভাগ পাড়াগেঁয়ে 'পুঁটী খেঁদী'দেরই সন্ধান লাগাইয়া ফিরিতেছিল, সুতরাং এমন খবর পাইয়া এই সুশিক্ষিতা যুবতী রত্নটির জন্য তাহার হৃদয় একেবারে পিপাসিত হইয়া উঠিল।

'দেখা নাই, বুঝা নাই, এইরূপ হইল কি করিয়া'—ইত্যাকার সন্দেহ যদি কাহারও মনে উদয় হয় ত কৈফিয়ৎ এই মাত্র দেওয়া যায় যে প্রেম সব সময় চোখে দেখার তোয়াক্কা রাখে না—'হৃদয়মরুভূমে' আপনার খেয়াল মতোই গজাইয়া উঠে। তাই, বৌদিদি সংবাদটি দিতে, একটু অশোভন হইলেও রামতনু প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিল, "কত বয়স তাঁর, দেখ্‌তে কেমন?"

বৌদিদি ইহাতে তাচ্ছিল্যের সহিত মুখটা ঘুরাইয়া বলিলেন "পোড়া কপাল, তোমার বুঝি অম্‌নি নোলায় জল এল? পুরুষের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে পাশ করে, সে-মেয়ের আবার বিয়ে! গলায় দড়ি জোটে না? কোন্ দিন ব কাছা-কোঁচা এঁটে পুরুষের সঙ্গে আফিসে বেরুবে।"

রামতনু বেজায় অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। বুঝিল কথাগুলা বড় অসাময়িক হইয়া পড়িয়াছে। বয়স এবং চেহারার সহিত পাশ দিবার বিশেষ সম্বন্ধ সে নিজেই তেমন খুঁজিয়া পাইল না। কথাগুলা তাহার মনের আকস্মিক উন্মাদনার খবরই বাহিরে প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। সাম্‌লাইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "না গে না, সে-কথা নয়; কত বয়সে পাশ দিয়েছে—তোমার গিয়ে, ষোল বছরের কমে—অর্থাৎ কিনা—"

বৌদিদি হাসিয়া ফেলিলেন।

রামতনু মুখ-চোখ রাঙা করিয়া আরও দুইতিনবার "অর্থাৎ কিনা অর্থাৎ কিনা" করিয়া, তখনও বৌদিদিকে হাসিতে দেখিয়া হঠাৎ চটিয়া উঠিল। বলিল "না বৌদিদি সবসময় ইয়ারকি ভালো লাগে না—"

পূর্ব্বের মতোই সুতীক্ষ্ণ হাস্যসহকারে বৌদিদি উত্তর করিলেন,—"বিশেষ ক'রে মনের অবস্থা যে-সময় খারাপ, না?—আহা শুধু পাশ করা শু'নেই বেচারীর এই দশা! যখন শুনবে চোদ্দবছর বয়স, দেখ্‌তে পটের ছবিটির মতন, তা'র উপর আবার পদ্য লিখ্‌তে পারে তখন বোধ হয় মূর্চ্ছো যাবে।"

মূর্চ্ছা যাবার লক্ষণ রামতনুর তখনই প্রকাশ পাইতেছিল—রাগের চোটে; কিন্তু নেহাৎ নাকি সে-ই, তাই কোনোরকমে আত্মসংবরণ করিয়া ঘর হইতে সক্রোধে বাহির হইয়া গেল।

এই ঘটনাটির পর ছোক্‌রা হঠাৎ বড় নির্জ্জনতাপ্রিয় হইয়া উঠিল। বৈকালে দেখা গেল, সে মাঠে একলা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং সন্ধ্যার সময় তাহাকে বড় একটা দেখাই গেল না। রাত্রে ডা'লের সহিত দুধ মাখিয়া, এবং মাঝে-মাঝে আলুর শাঁস বাদ দিয়া খোসা খাইয়া

সে আহার শেষ করিল এবং তাহার পর বিছানার আশ্রয় লইল। রাত একটার সময়ও সে জাগিয়া—মশারির চালে কল্পনার রঙীন ছবি আঁকিতেছে। হায়রে প্রেম!—লোকটাকে কি শেষকালে কবি করিয়া ছাড়িল?

* * *

তাহার পরদিন কিন্তু মেঘ কাটিয়া গেল এবং রামতনুকে বেশ প্রফুল্ল দেখা গেল। স্পষ্টই বুঝিতে পারা গেল যে, সে রাতারাতি একটা মৎলব আঁটিয়া ফেলিয়াছে। সে স্থির করিল প্রজাপতির সহিত এপর্য্যন্ত সাত সাতটা বাজি হারিলেও আর একহাত খেলিয়া দেখিবে। এবার আর পরের কথায় নাচিয়া চট করিয়া কন্যা দেখিতে ছুটিয়া তিক্তমুখে ফিরিয়া আসা নয়। পূর্ব্বরাগের পালাটা দস্তুর-মত শেষ করিয়া অন্য কথা। তবে দেরি আর কোনোমতেই করা চলে না। সে মনশ্চক্ষে দেখিতে পাইল এই বিদুষী তরুণীটির জন্য যুবক-মহলে একটা চাঞ্চল্য পড়িয়া গিয়াছে এবং স্বয়ংবর সভার প্রত্যেক প্রার্থীর মতন যদিও সে নিজেকেই সর্ব্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয় মনে করিল, তথাপি ভাবিল—না; দেরি করাটা নিরাপদ্ নয়।

সকাল বেলা একটু এদিক্-ওদিক্ করিয়া কাটাইল; তাহার পর হঠাৎ বৌদিদির নিকট একটা পুরানো টেলিগ্রাম লইয়া গিয়া বিরক্তভাবে বলিল, "এই নাও যা মনে করেছিলুম তাই; আমায় আর থাক্‌তে দিলে না।

টেলিগ্রাম দেখিয়া বৌদিদির মুখটা শুখাইয়া গিয়াছিল। তিনি জিজ্ঞাসু-নেত্রে চাহিয়া রহিলেন।

রামতনু বলিল, "ভয় পাবার কিছুই নেই; তবে আমায় কালই যেতে হবে!" "কাল! এই বল্‌লে ১২ দিন দেরি আছে?"

"আমি বল্‌লেই ত আর হচ্ছে না, বিশ্বাস না হয় টেলিগ্রামটা পড়িয়ে নাও কাউকে দিয়ে"—বলিয়া, পাছে সত্যই কাহাকেও দিয়া পড়াইয়া লওয়া হয়, এই ভয়ে সেটা সঙ্গে-সঙ্গে পকেটে পুরিল এবং হঠাৎ অধিকতর বিরক্তভাবে সেটাকে বাহির করিয়া টুক্‌রা-টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া বলিল, "আরে রামঃ, এমন কলেজেও মানুষে পড়ে!"

এসব ব্যাপারে অনভিজ্ঞা বৌদিদি সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন "তা ভাই, কি কর্‌বে বলো; কামাই করাটা কি ভালো হবে? তোমার দাদা শু'নে আবার চট্‌বেন। কিন্তু এমন কেন হ'ল বলো ত?

রামতনু পূর্ব্বের মতনই রাগতভাবে বলিল, "কে জানে? শুনেছিলাম লাটসাহেব নাকি কলেজ দেখ্‌তে আস্‌বে তাই হবে বা।"

বৌদিদি রাগিয়া বলিলেন, "মুয়ে আগুন লাটসাহেবের, সে আর মর্‌বার সময় পেলে না? ঘরের ছেলে দু'দিন ঘরে এসে বস্‌বে তা'তেও সোয়াস্তি নেই।"

যেন অকস্মাৎ মনে পড়িয়া গেল এইভাবে রামতনু বলিল "চুলোয় যাক্; হ্যাঁ, তোমার কোনো কাজটাজ আছে নাকি?—তা হ'লে বলো। তাই ব'লে আমি কিন্তু তোমার সেই পিসের বাড়ীতে যেতে পার্‌ব না, সে আগে থাক্‌তেই ব'লে রাখ্‌ছি।"

এই সরলহৃদয়া রমণী ভাবিলেন কালকের ঠাট্টায় দেবর তাঁহার রাগ করিয়াছে। সেইজন্য সেইখানেই যাওয়াইবার জন্য বেশী জিদ্ করিয়া বসিলেন। ঠিকানা দিলেন, মাথার দিব্য দিলেন, এবং যাহাতে হাঁটিয়া যাইতে না হয় তাহার জন্য ভাড়াও কবুল করিলেন। রামতনুর ঠিকানাটা লওয়াই উদ্দেশ্য ছিল;—সেটি মনে-মনে মুখস্থ করিয়া লইল। বাহিরে কিন্তু খুব মাথা নাড়িয়া বৌদিদিকে বলিল "সে হ'তেই পারে না, আমি সেখানে যেতে পার্‌ব না; তুমি আমায় তা হ'লে চেননি।"

পরদিবসই যাওয়া স্থির হইল। দাদা তাহার বাড়ীতে ছিলেন না। রামতনু ভাবিল, স্ত্রীর মুখে তিনি যখন এই উদ্ভট কথাটা শুনিবেন তখন নিশ্চয় ভাবিবেন রামতনু ভ্রাতৃজায়ার সহিত খুব একচোট ঠাট্টা করিয়া গিয়াছে; ততদিন সে একটা সুসঙ্গত কারণ খুঁজিয়া বাহির করিয়া ফেলিবে।

মা বধূমাতার মুখে শুনিলেন। অঞ্চলে চোখ মুছিয়া বলিলেন, "রামুর আমার পড়াশুনার ঝোঁকটা চিরকালই এইরকম। আহা ওকি বাঁচ্‌বে, আমাদের পোড়া অদৃষ্টে! —সবই ভালো বাছার, তবে ঐ কেমন বিয়ের ফুল আর ফুট্‌চে না"—ইত্যাদি ইত্যাদি।

২

যাহা হউক কোর্ট্‌শিপ করিবার উদ্দেশ্যে বই বিছানা ও স্টীলট্রাঙ্ক-সমেত রামতনু কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিল। হাওড়ায় পঁহুছিল সন্ধ্যার ঘণ্টাদেড়েক পূর্ব্বে। মনটা তাহার উৎসাহে পূর্ণ হইয়া উঠিল। এইবার তবে সে সেই বাগ্‌দত্তার নিকট পহুঁছিল, যাহাকে আজ তিন দিন ধরিয়া কল্পনা ও স্বপ্নের মাঝে পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। পুলটি পার হইলেই তাহার ঐ তীর্থ-স্বরূপ নগরী! ওঃ, কাল এতক্ষণ!—ভাবিতেও অসহ্য সুখ!

অন্যমনস্কভাবে মালকোঁচা আঁটিয়া ভারনিপীড়িত কুলীটাকে একটা ধমক দিল; এবং নিজেই বিছানার পুঁটুলিটা হাতে ঝুলাইয়া লইল। নিকটে একটা ছোঁড়া একটা ফিটনের দ্বার খুলিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ভারটা নেহাৎ অসহ্য বোধ হওয়ায় রামতনু কিছু না বলিয়া সেটা দ্বারপথে সেই ফিটনের মধ্যে চালাইয়া দিয়া অগ্রগামী দূরবর্ত্তী কুলীটাকে ডাক দিল, "ওরে ব্যাটা, এদিকে, এখানে!"

সাহেব-লোভী ছোঁড়াটা ব্যাপার দেখিয়া হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল। এক্ষণে আবার কুলীটাকে গাড়ীর দিকে আসিতে দেখিয়া অগ্নিশর্ম্মা হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "এটা মালগাড়ী আছে নাকি বাবু;—যেতো পার্‌ছো চাপাচ্ছো? আমার আয়েসী বিলিতি ঘোঁড়া; বাজে মাল টান্‌তে পার্‌বে না।" তাহার পর রামতনুর সহিত অন্য লোক নাই দেখিয়া বলিল, "আলবৎ, আদ্‌মি যেতো পার্‌বে এসো, তা'তে না বোল্‌বার ছেলে নয়"—বলিয়া ঘোড়াটার চর্ম্মসার জঙ্ঘায় একটা চাপড় দিয়া বলিল "কিরে বেটা, না?"

রামতনু কথাটার প্রমাণের জন্য একবার 'আয়েসী বিলিতি' ঘোড়াটার পানে চাহিল, দেখিল সে বেচারীও দীন-নয়নে মোটগুলার পানে চাহিয়া আছে। তাহার সুস্পষ্ট মোটা-মোটা পঞ্জরের বেড়ার মধ্যে শিরাবহুল স্থূল পেটটি দেখিলেই বোধ হয়, সে তাহারই ভারে এত কাহিল যে অন্যভার বহিবার আর তাহার সামর্থ্য নাই। 'তবে বেঁধে মারো, সয় ভালো',—ভাবটা যেন অনেকটা এই-রকম-গোছের।

কিন্তু অনুকম্পার এ অবসর নহে; বরং দু-পয়সা ভাড়া বেশী দেওয়া যাইতে পারে, তাই সেই বালকের কথায় অনাদর দর্শাইয়া রামতনু বোঝাগুলি কুলীর মাথা হইতে নামাইতেছিল, এমন সময় এক সাহেব-আরোহীর সহিত গাড়োয়ান স্বয়ং আসিয়া দেখা দিল। সুখের বিষয় কোনো বচসা হইল না; কারণ এই নবৈশ্বর্য্যগর্ব্বিত গাড়োয়ানটার সহিত আর বাক্যবৃদ্ধি নিরাপদ্‌ নহে জানিয়া রামতনু স্বহস্তেই বোঝাটি গাড়ী হইতে নামাইয়া লইল।

ফিটন চলিয়া গেল। চালকের পাশে বসিয়া সেই উদ্ধত ছোঁড়াটা একবার রামতনুর পানে চাহিয়া হাসিতে-হাসিতে গাড়োয়ানটাকে কি একটা বলিল। কথাটা শুনিতে না পাইলেও রামতনু অপমানের আঘাতে বড় নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল। তাহার বাগ্‌দত্তার ছবিটি মনে এতই সজীব হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহার মনে হইল যেন তাহার সম্মুখেই তাহাকে এই লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইতেছে।

কিন্তু নিরুৎসাহ হইলে কাজ চলে না। এদিকে সব গাড়ীই প্রায় ভর্ত্তি হইয়া আসিতেছে। রামতনু কুলিটাকে বলিল "নে, ওঠা—ও-বেটা আজ বড় বেঁচে গেল আমার হাত থেকে।"

কুলীটা খপ্‌ করিয়া একটু নীচু হইয়া হাত জোড় করিয়া বলিল "না বাবু, আমায় চুকিয়ে দিন; আপনি বোড়ো ফ্যাসাদে লোক আছেন।"

গাড়োয়ানটার মতন কুলীটারও অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন ছিল বলিতে হইবে। তাই অদূরে কয়েকজন ব্যর্থমনোরথ গাড়োয়ানকে সেই অভিমুখে হুড়াহুড়ি করিয়া আসিতে দেখা গেল এবং তাহাদের মধ্যে একজন বিশেষ ক্ষিপ্রতার সহিত আগুয়ান হইয়া মালগুলিতে হাত রাখিয়া সঙ্গীগণকে শাসাইয়া দিল, "ব্যস্‌ করো, মেরা সওয়ারি হ্যায়!—"এবং সঙ্গে-সঙ্গে তাহার সহকারী বালককে ডাক দিল, "এ ইসমাইল, আরে চল্‌ শা—।"

তাহাকে লইয়াই এত কাড়াকাড়ি পড়িয়া গিয়াছে দেখিয়া রামতনু আবার বেশ সপ্রতিভ হইয়া উঠিল এবং গাড়ী আসিলে গদিতে একটা চাপ দিয়া বসিয়া বলিল, "হাঁকো।"

ঘোড়ার পিঠে চাবুক কষিয়া গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যেতে হোবে, বাবু?" রামতনু একেবারে আকাশ হইতে পড়িল। তাই ত, কোথায় যাইতে হইবে? সর্ব্বনাশ! এ-কথাটা যে রামতনু নিজেই জানে না। কলেজের হোষ্টেলে যে তালা আঁটা, এ-কথাটা যে সে একবারও ভাবে নাই! কি বিভ্রাট! এখন উপায়? এদিকে সন্ধ্যা আগতপ্রায়, আর সঙ্গে এই তিন-তিনটা অতিকায় মোট। এই তিন দিন পড়াশুনা ছাড়িয়া এত যে ছাইভস্ম চিন্তা করিল তাহার মধ্যে এই এত বড় চিন্তাটা কি মনে একবারও স্থান দিতে নাই।

কবিরা বলেন প্রেম অন্ধ;—তা যখন হইয়াছিল তখন ত অন্ধ করিয়াইছিল, কিন্তু এখন সে-নেশা কাটিয়া গেলেও রামতনু চক্ষে কিছু দেখিতে পাইল না। শরীর তাহার এলাইয়া পড়িল। গদিতে ঠেস্ দিয়া সে আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল; কিন্তু আকাশ-পাতালের মাঝখানে সে আপাততঃ কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে তাহার কোনো সন্ধানই স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না।

১৪ নং বিপ্রদাস লেনের কথা একবার মনে হইল। কিন্তু সেখানে ত এ-অবস্থায় গিয়া খোঁটা-গাড়া চলে না। চলে না ত,—কিন্তু উপায়? কলেজ খুলিবার ত এখনও পুরো দশ দিন বাকি; এই দশ দিন কি গাড়ীতে ঘুরিয়া বেড়াইবে?—তাহা সম্ভব হইলেও না হয় চলিত!

গাড়ীটা ষ্টেশন ছাড়াইয়া বাহিরে আসিল। ইহার মধ্যে গাড়োয়ান আরও দুইতিন-বার মাথা ঝুঁকাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "কোথায় যেতে হোবে?" কিন্তু কোনো উত্তর না পাওয়ায় গাড়ী থামাইয়া নামিয়া আসিয়া রুক্ষভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "এ বাবু, আপনিও একটা মাল আছেন নাকি? কোথায় বোলেন না যে?—না আমরা জ্যোৎষী আছি নাকি যে বাড়ী চিনে লোবো?"

ঘর্ম্মাক্ত কলেবর রামতনু সোজা হইয়া বসিয়া ধীরভাবে বলিল, "দাঁড়া না বাবা; ততক্ষণ তুই চলনা সামনে, বল্‌ছি কিনা।"

একটা অজানা বিপদের আশঙ্কায় ভীত হইয়া গাড়োয়ান বলিল, "কি মজার কোথা আছে! আপনি নামুন, আমি এ মোকোম সওয়ারি ছাহে না।" পরে ইস্মাইলকে বলিল, "উতার রে,—লা বক্সা।"

বিপদ্ যখন এতই আসন্ন হইয়া পড়িল রামতনুর চট্ করিয়া একটা হোটেলের কথা মনে পড়িয়া গেল। সে বলিল, "আঃ চল্ না-রে ২৫।৭ নং মেছো বাজারে; আমার এই নম্বরটাই মনে পড়্‌ছিল না।"

৩

অপরাহ্ন কাল। 'নবদ্বীপ আশ্রম''-এর একটি ক্ষুদ্র কক্ষে আশ্রিত রামতনু গালে হাত দিয়া গাঢ় চিন্তায় আচ্ছন্ন।

আকাশে মেঘ থম্ থম্ করিতেছে। অপরাহ্নের তাবৎ চিহ্নগুলাই লোপ পাইয়াছে। রামতনুর মনটা বড় বিষন্ন। আজ সকালে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল বলিয়া, প্রিয়ার উদ্দেশে যাওয়া হয় নাই; আর এখনও এই দশা। কাজটাও এমন-ধরণের নয় যে একটা গাড়ী ভাড়া করিয়া যাওয়া চলে। যাক্, যখন উপায় নাই, তখন আর কি হইবে?

পশ্চিমে হাওয়ায় মেঘগুলা পূর্ব্বপ্রান্তে জড় হইতেছিল। রামতনু শখ্ করিয়া ভাবিতেছিল তাহার মানসপ্রতিমাও ওই দিক্‌টাই আলো করিয়া আছে। পুরাকালের এই মেঘ বিরহী যক্ষের সংবাদ যেমন তাহার প্রেয়সীর নিকট বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল, আজও যেন সেইরূপ রামতনুর মনোব্যথা বহন করিয়াই পূর্ব্বদিকে ১৪ নং বিপ্রদাস লেনে, তাহার প্রিয়ার পদতলে ঢলিয়া পড়িতেছে। আহা, তাহার বিরহের এত সুখ!

রামতনুর কিন্তু মনে পড়িল, তাহার সহিত যখন একবারও দেখা হয় নাই, তখন এই মন-গড়া বিরহ নিষ্ফল। প্রথমে কিরূপে দেখা সাক্ষাৎ করা উচিত, সেইটিই ভাবিবার কথা। বাস্তবিক, "আমি বৌদির দেওর" বলিয়া উঠিলে ত চলিবে না?—কারণ জগতে বৌদিদি যেমন অনেক, দেবরও তেম্‌নি সংখ্যাতীত। না হয় ৫ মিনিট ধরিয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া পরিচয়ই দিল। তাহার পর যদি জিজ্ঞাসা করে, "কি কাজ?"—

সাত-পাঁচ ভাবিয়া রামতনু স্থির করিল, পরিচয়টা যেন হঠাৎ হইয়া গেল এইরূপ হইলেই ঠিক হয়।

মিনিট-কয়েক চিন্তার পর রামতনুর মাথায় একটা জমকালো মৎলব উদয় হইল। সেটা সংক্ষেপত এই—

সে এখনই বাহির হইয়া বিপ্রদাস লেন্‌টা চিনিয়া লইবে। তাহার পর যতক্ষণ না বৃষ্টি থামে এদিক্‌-ওদিক্‌ একটু পায়চারি করিবে এবং বৃষ্টি নামিবামাত্রই গলিতে ঢুকিয়া পড়িবে ও চৌদ্দ নম্বর বাড়ীর নিকট গিয়া আর যেন পারিল না, এইভাবে তাহার বারান্দায় উঠিয়া পড়িবে। ইহাতে চাই কি শ্রীমুখের একটু "আহা" এবং শ্রীহস্তপ্রদত্ত একটি শুষ্ক বস্ত্রেরও আশা করা যাইতে পারে। তা-ভিন্ন পরিচয়াদির সময়ও পাইবে অনেক।

তাহা হইলে আর দেরি করা চলে না। রামতনু তাড়াতাড়ি জুতাজামা পরিয়া বাহির হইয়া পড়িল। চারিদিকে মেঘের আড়ম্বর দেখিয়া একবার মনে হইল, ছাতাটা লইয়া যায়, কিন্তু ভাবিল তাহা হইলে ভালো জমিবে না।

ছোটো-বড় কতকগুলা গলি অতিক্রম করিয়া রামতনু কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে আসিয়া পড়িল। রাস্তার দুই দিকে বিপ্রদাস লেন্ খুঁজিতে-খুঁজিতে সে উত্তর দিকে চলিল। মাঝে-মাঝে আকাশের পানে চাহিয়া তাহার মনটা বড় দমিয়া যাইতেছিল। বৃষ্টি আরম্ভ হইল বলিয়া—আর দেরি নাই। তাহা হইলেই ত সর্ব্বনাশ! আশঙ্কা-দুর্ব্বল-মনে রামতনুর একটা সংশয় উদয় হইল—বৌদিদি যদি ভুল বলিয়া থাকেন!

বিপন্নভাবে রামতনু এক বৃদ্ধ দোকানীকে বলিল, "ওগো কর্ত্তা, আমি বিপ্রদাস লেনে যাবো—

বৃদ্ধ কি-একটা নেশার ঝোঁকে ঝিমাইতেছিল। মাথা না তুলিয়াই ঘাড়টা একটু হেলাইয়া বলিল, "স্বচ্ছন্দে।"

বৃষ্টি নামিল। এখানে আর বৃথা কালক্ষেপ করা যায় না। দোকানীকে বিড়্‌-বিড়্ করিয়া কি-একটা গালি দিয়া রামতনু একরকম ছুটিতেই আরম্ভ করিল। বৃষ্টির জলে তাহার উৎসাহ স্যাঁৎস্যাঁতে হইয়া আসিতেছিল। স্থির করিল, আর-একজনকে জিজ্ঞাসা করিবে; যদি সন্ধান না পায় ত আজ এই পর্য্যন্ত!

এইরূপ মনস্থ করিয়া রামতনু একজন পথিককে প্রশ্ন করিল। সামনেই একটা গলি ছিল, তিনি দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, "এই গলি দিয়ে একটু বেরিয়ে যান, সামনেই বিপ্রদাস লেন্।"

রামতনু হাতে স্বর্গ পাইল, কিন্তু মাথার স্বর্গ তাহাকে তীক্ষ্ণ বারিধারায় বিব্রত করিয়া তুলিতেছিল, আর সেই তীক্ষ্ণতা যখন অতিশয় অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন রামতনু বিপ্রদাস লেনে প্রবেশ করিয়া দেখিল, ডাহিনে বাড়ীর নম্বর ১১১ এবং বামে ১১২!

তাহার মানে, এটা গলির শেষ দিক্ এবং গলিটাও মস্ত বড়। দুঃখ করিয়া আর কি হইবে। দক্ষিণ দিকের বাড়ীগুলার উপর মাঝে-মাঝে নজর ফেলিয়া মাথা নীচু করিয়া সে দৌড়াইতে লাগিল। তাই কি ছাই বাড়ীগুলাই ছোটো? যা হোক এই বড়-বড় বাড়ীগুলার নম্বর ক্রমে-ক্রমে কমিয়া আসিতে লাগিল এবং রামতনুরও নষ্ট উৎসাহ ফিরিয়া আসিতে লাগিল। অবশেষে একবার মাথা উঁচাইয়া রামতনু দেখিল—২১।

তাহার পর মুখে হাসি দেখা দিল এবং সে আর মাথাও নীচু করিল না। চোখে জলের ঝাপ্‌টা লাগিতেছিল। আসন্ন সুখের কথা ভাবিয়া এ সামান্য অসুবিধাকে উপেক্ষা করিয়া বাড়ীর নম্বরগুলিতে দৃষ্টি-নিবদ্ধ রাখিয়া রামতনু লম্বা-লম্বা পা ফেলিয়া সৌখীন চালে দৌড়াইতে লাগিল। মুখে একটু হাসিও টানিয়া আনিল—যেন ব্যাপারটা সে বড়ই উপভোগ করিতেছে।

ক্রমে ১৮, ১৭, ১৬ নম্বর বাড়ী পার হইয়া গেল। এইবার ১৫, তাহার পর এই ১৪!—রামতনু টপ্ করিয়া উঠিয়া পড়িল। দিব্য বারান্দাওয়ালা বাড়ী।

গলা থেকে চাদরটা নামাইয়া নিংড়াইতে নিংড়াইতে রামতনু বলিল, "কী বৃষ্টি!"—এবং একবার চারিদিক্‌টা চাহিয়া দেখিল।

বারান্দার এককোণে একটা খোট্টা চাকর গুন্‌গুন্ করিয়া গান করিতেছিল—

"কলকতিয়াকে লোগনিকে নহি পতিয়ইহ
সমবুহ সমবুহ সখি বাট ঘাট সেইহ—"

অর্থাৎ হে সখি কলিকাতার লোককে প্রত্যয় নাই; অতএব পথঘাট চলিবে খুব সাম্‌লাইয়া;—সুতরাং এবংবিধ অবিশ্বাস্য একজন কলিকাতাবাসীকে পথঘাট ছাড়িয়া

একেবারে তাহার প্রভুর গৃহে আশ্রয় লইতে দেখিয়া রুক্ষভাবে সে বলিল, "এ মাসা, কিনারে চলিয়ে দাঁড়ান; দালানকে মাঝখানে জল পরুসে।"

রামতনুর এতক্ষণ অন্তরকম অভ্যর্থনা পাইবার কথা। কিন্তু তাহার কোনো চিহ্ন না পাইয়া সে দালানের মাঝখানেই দাঁড়াইয়া রহিল। এক্ষণেই পরিচয়-মাত্রে তাহার কদর দেখিয়া এ-ব্যাটা মেড়োর কিরূপ ভ্যাবাচাকা লাগিয়া যাইবে তাহা ভাবিয়া রামতনু বেশ-একটু কৌতুক অনুভব করিতেছিল। আর-একটু দাঁড়াইয়া চঞ্চলভাবে ইতস্তত দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া রামতনু দেখিল দোরে শিকল আঁটা। এতক্ষণ সে শুধু কাঁপিতেছিল এইবার দাঁতে দাঁত লাগিতে সুরু হইল। কী কুগ্রহ, মিছামিছি সন্ধ্যার সময় এই বৃষ্টিস্নান! আরে মারো ঝাড়ু এ কোর্ট্‌শিপের মাথায়! ইহার চেয়ে চারক্রোশ গরুর গাড়ী চড়িয়া মেয়ে দেখিতে যাওয়া শতগুণে শ্রেয়।

হঠাৎ-পরিচয়ের আশা ছাড়িয়া, কাপড় নিংড়াইয়া মাথা মুছিতে-মুছিতে রামতনু চাকরটাকে প্রশ্ন করিল, "তোর মনিবরা কোথায়?"

চাকরটা লোকটার চালচলন দেখিয়া সন্দিগ্ধমনে ইতস্তত করিয়া বলিল, "তা'তে তোমার কি জরুরি আছে? এই পাঁচমিনিটমে এসে পড়্‌বে"—বলিয়া একবার আড়্‌চোখে নির্জ্জন রাস্তা ও রুদ্ধগৃহগুলার উপর নজর ফিরাইয়া লইল।

বেচারা, মনিবের সত্বর প্রত্যাবর্ত্তনের সম্ভাবনা জানাইয়া, এই অজ্ঞাতকুলশীল কলিকাতাবাসীটিকে তাড়াইবে ভাবিয়াছিল, কিন্তু ইহাতে তাহাকে বরং প্রফুল্ল হইতে দেখিয়া বেজায় অস্বস্তি অনুভব করিল এবং রামতনুর উপর হইতে চোখ না সরাইয়া একটু রাস্তার দিকে সরিয়া বসিল।

রামতনু সেটা বিশেষ লক্ষ্য করিল না। নেহাৎ চুপ করিয়া না থাকিয়া একটু কথাবার্ত্তা কহিবার জন্ত বলিল, "তুই বুঝি বাবুর চাকর?"

উত্তর হইল, "হুঁ;—লেকিন্ হামার বড়া ভাই পুলিসে কাম করে!" রামতনু 'বড়াভাইয়ের' পরিচয়ের প্রয়োজন তেমন বুঝিতে পারিল না, ভাবিল—মেড়োর বুদ্ধি।'

অনেকক্ষণ নীরবে কাটিল। রামতনু মুঠায় চাপিয়া-চাপিয়া জল বাহির করিয়া রকের মাঝেই ফেলিতে লাগিল। চাকরটা অসহিষ্ণুভাবে বলিয়া উঠিল "এ মাসা, কিনারে দাঁড়ান না, কিস্ মাফিক্ লোক আপনি?"

রামতনু একটু চটিল; ভাবিল আচ্ছা বেয়াদব ত। কিন্তু মনে হইল—'আহা চেনে না; ওবেচারার আর দোষ কি?'—তাই এই অজ্ঞানজনিত ঔদ্ধত্যকে ক্ষমা করিয়া বলিল "কৈ, মনিব যে তোর আসে না?"

চাকরটা তাহার দিকে ফিরিলও না; তাচ্ছিল্যের সহিত চুপ করিয়া রহিল। রামতনু ভিতরে-ভিতরে জলিয়া যাইতেছিল; কিন্তু ভাবিয়া দেখিল চটিয়া ফল নাই। তাই কঠোর সংযমের সহিত বলিল, "তা যদি দেরিই থাকে ত একটা শুক্‌নো কাপড় নিয়ে আয় দিকিন্—"

চাকরটা বিজ্ঞভাবে মাথা নাড়িয়া ব্যঙ্গস্বরে বলিল, "আর এক পিয়ালা চা ভি আনিয়ে দি;—বোড়া ভিজিয়ে গেলেন—"

রামতনু তখন আরও চটিয়া গেল, কিন্তু আরও নরম সুরে চিবাইয়া-চিবাইয়া বলিল, "দেখ, ঢের বাঙ্গলা বুলি হয়েচে, চালাকি হচ্চে? আমার চাকর হ'লে এতক্ষণ আস্ত থাক্‌তিস্‌নে। তোর মনিব এলে টের পাবি আমি কে। তবে নেহাৎ দেরি হ'লে আমি যদি চ'লেই যাই, ত এই কার্ড্‌ রইল। নে, একখানা কাপড় নিয়ে আয় দিকিন লক্ষ্মী ছেলের মতন।"

রামতনু পূর্ব্ব হইতেই কার্ড্‌ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল। ভিজা একখানা কার্ড্‌ বাহির করিয়া তাহার নাম ও ঠিকানা লিখিয়া চাকরটার হাতে দিয়া বলিল "নে রাখ্‌; আর এই ঠিকানায় আমার ভিজে কাপড়গুলোও কাল দিয়ে আস্‌বি।" চাকরটা গম্ভীরভাবে কার্ড্‌টা দুখণ্ড করিয়া ফেলিয়া দিল এবং দাঁড়াইয়া উঠিয়া হুঁসিয়ারির সহিত গলা উঁচাইয়া বলিল, "হামার নাম রামটহল্‌বা আসে, হামায় ঠকিয়ে কাপড় লিতে আসে তুম্?"

রামতনু আর নিজেকে সাম্‌লাইতে পারিল না, কারণ মানবের ধৈর্য্য, এবং শীত সহ্য করিবার ক্ষমতা—উভয়েরই একটা সীমা আছে। একে ত শুষ্ক কাপড় পাইল না,

তাহার উপর চক্ষের সম্মুখে তাহার কার্ডের এই লাঞ্ছনা হওয়াতে সে একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। ঘুসি বাগাইয়া সাম্‌নে আগাইয়া গেল এবং দাঁতে দাঁত পিষিয়া বলিল "আমি ঠগ জোচ্চোর?—বেটা মেড়ো, যতবড় মুখ নয় ততবড় কথা?—"

হুঁসিয়ার হইলেই যে সাহসী হইতে হইবে এমন কোনো কথা শাস্ত্রে লেখে না। আবার সম্প্রতি সহরে কয়েকটা ডাকাতি হইয়া গিয়াছিল। রামতনুর উদ্যত ঘুসির নিম্ন হইতে তড়িতের ন্যায় সরিয়া গিয়া মাঝরাস্তায় বৃষ্টি মাথায় করিয়া রামটহলবা আর্ত্তস্বরে ডাকিয়া উঠিল "খুন ভইল, দৌড় হো—ডাকু পড়ল বা—"

রামতনু প্রমাদ গণিল। প্রেম করিতে আসিয়া শেষকালে ডাকাতিতে অভিযুক্ত হইতে হইবে নাকি?—লোকে এমন ফ্যাসাদেও পড়ে!

মুহূর্ত্তের মধ্যে নামিয়া পড়িয়া রামতনু প্রেম ভুলিয়া প্রাণপণে ছুটিল। সাম্‌নেই একটা গলি দেখিতে পাইয়া তাহার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল এবং এগলি-সেগলি করিয়া একেবারে হেদোর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। হাঁপাইতে লাগিল যেন বুকের পাঁজরা-কটা ছিট্‌কাইয়া বাহির হইয়া যাইবে।

কিন্তু তখনও তাহার স্বস্তি নাই। সাম্‌নে দিয়া মন্থর গতিতে একটা ঘোড়ার গাড়ী যাইতেছিল। একবার চারিদিক্ চাহিয়া গাড়োয়ানকে সে জিজ্ঞাসা করিল, "মেছো-বাজার যাবি?"

রামতনুর বস্ত্রের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গাড়োয়ান বলিল, "না বাবু, গদি ভিজে যাবে।"

"আমি দাঁড়িয়ে যাবো বাবা, গদি ভিজ্‌লে তুই দাম পাবি।"

"ডবল ভাড়া লিব বাবু, দেখ্‌ছেন না কি-রকম বাদল আছে?

"বাদল না হ'লে আর এইটুকুর জন্যে গাড়ী করি? তা ডবল ডবলই সই, কত হবে?

"দেড় টাকা দিবেন বাবু; আপনি ভদ্রলোক কষ্টে পড়েছেন, কি আর বল্‌ব?"

ভদ্রলোকের জন্য ত্যাগ-ব্যবসায়ী এই উদারচেতা গাড়োয়ানের গাড়ীতে চড়িতে-চড়িতে রামতনু বলিল, "চার আনার ডবল কি দেড় টাকা হয় বাপু? তা চল্ তোর ধর্ম্ম তোতেই আছে; একটু জোরে হাঁকাস।'

গাড়ী চড়িবার মিনিট খানেকের মধ্যে বৃষ্টিটা হঠাৎ ধরিয়া গেল। বিধির এই কঠোর বিদ্রূপ দেখিয়া রামতনুর মনে হইল গাড়ীর দেওয়ালে মাথা ঠুকিয়া মরে।

নামিয়া একটা দোকান হইতে ৫ গ্রেন্ কুইনাইন্ কিনিয়া লইয়া হোটেলে ঢুকিল। তাহার পর ট্রাঙ্ক্ খুলিয়া গাড়োয়ানের-জন্য দেড় টাকা বাহির করিয়া লইল। তাহার পর একটি একটাকার নোট ও বিকশিত-দন্ত বিদ্রূপের মতন একটি টাকা ট্রাঙ্কের মাঝখানে পড়িয়া রহিল।

৪

পরদিবস বেলা আন্দাজ চারিটার সময় রামতনু বিছানার উপর অলসভাবে শুইয়া জানালার মধ্য দিয়া আকাশ পানে চাহিয়া ছিল। মেঘ ছিল না বলিলেও মিথ্যা বলা হয় না, তবুও ঘর-পোড়া গরু যেমন সিঁদুরে মেঘে ডরায়, সেইরূপ যা দুই-একখণ্ড মেঘ এদিক্-ওদিক্ করিয়া বেড়াইতেছিল তাহা দেখিয়াই রামতনুর যথেষ্ট আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল এবং আশু-বিবাহের আশা দিয়াও তাহাকে শ্যামবাজারে পাঠাইতে পারা যাইত না। সে ভাবিতেছিল মেঘের নামগন্ধ না মুছিয়া গেলে সে আর পাদমপি নড়িতেছে না। এমন পয়সাও নাই যে গাড়ী করিয়া যাইবে। আর যাইলেও যে তাহাকে কেন্দ্র করিয়া মস্তবড় একটা ভীড় দাঁড়াইয়া যাইবে না তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? ব্যাটা উজ্‌বুক চাকরটা সব কাঁচাইয়া দিল।

মেসে একটা লোক খবরের কাগজ দিত, সে দেখা দিল। তাহাকে নিজের ঘরে ডাকিয়া রামতনু কাগজটা লইল। হাতে কোনো কাজ নাই, একটা কাগজের দামও বেশী নয়, রামতনু জিজ্ঞাসা করিল, "কোনো বাঙ্গালা কাগজ রাখিস্?" লোকটা সোৎসাহে একখানা 'নায়ক' বাহির করিয়া বলিল, "এই লিন্ বাবু, এরকম গালাগাল পাঁচকড়ি-বাবু অনেক দিন দেননি; প্রাণ খুলে লাটসাহেবকে নিয়েচেন একচোট।" রামতনু হাসিয়া কাগজখানা লইল, তাহাকে দাম চুকাইয়া দিল এবং বুকে বালিশটা চাপিয়া কাগজটা বিছানায় মেলিয়া পড়িতে লাগিল।

পড়িবে আর কি !—প্রথমেই বড়-বড় অক্ষরে ছাপা হেডিং গুলায় নজর পড়ায় তাহার আক্কেল গুম্ হইয়া গেল—"দিনে ডাকাতি ! মাঝ-সহরে ভীষণ কাণ্ড !! নিম্নবর্ত্তী দুইটি অনতিক্ষুদ্র প্যারাগ্রাফে লেখা আছে "গতকল্য বেলা আন্দাজ ৪।০ ঘটিকার সময় ১৪নং বিপ্রদাস লেনে শ্রীযুক্ত বাবু সারদাপ্রসাদ দত্তের ভবনে একটি লোমহর্ষণ ডাকাতির উপক্রম হইয়া গিয়াছে।' অশ্রান্ত বৃষ্টি হইতেছিল বলিয়া গলিতে লোক চলাচল বন্ধ ছিল এবং আশপাশের বাড়ীগুলিরও দুয়ার-জানালা প্রায় সব রুদ্ধ ছিল। সারদাবাবু সপরিবারে ৺ কালীঘাটে দেবী-দর্শনে গিয়াছিলেন। বাড়ীতে ছিল মাত্র একটি পশ্চিমা চাকর। এইসময় সুযোগ বুঝিয়া একটি ভদ্রবেশধারী যুবা ভিজিতে-ভিজিতে আসিয়া বারান্দায় উঠে এবং প্রথমে সোজা কথায় একখানি শুষ্ক বস্ত্র চাহিয়া আলাপ জমাইবার চেষ্টা করে এবং তাহাতেও কৃতকার্য্য না হইয়া একখানি কার্ড হাতে দিয়া বলে যে সে তাহার প্রভুর আত্মীয়। চাকরটা ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া কার্ড্‌টা ছিঁড়িয়া দেয় এবং তাহাকে অর্দ্ধচন্দ্রদানে নিষ্ক্রান্ত করিবার প্রয়াস করে। ইহাতে দুর্বৃত্ত জামার মধ্য হইতে একখানা ভোজালি বাহির করিয়া তাহাকে আক্রমণ করে। তখন ভৃত্যটা রাস্তায় পড়িয়া চীৎকার করিয়া লোক জড় করে। ইত্যবসরে ভদ্রবেশধারী গুণ্ডাটি চম্পট দেয়। এবং ঠিক এই সময় গলির বাহিরে সদর রাস্তা দিয়া একটি মোটরকে উর্দ্ধশ্বাসে বৃষ্টির মধ্য দিয়া ছুটিয়া যাইতে দেখা যায়। পুলিসের তদন্ত চলিতেছে।

দ্বিখণ্ডিত কার্ডের অর্দ্ধেকটা-মাত্র পাওয়া গিয়াছে ; সেটার লেখাটুকুও নাকি জল পড়িয়া এম্‌নি অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, কিছুই নিরূপিত হয় না। আমাদের লালটুপি ভায়ারা বোধ করি ভাবিতেছেন লেখাটা পড়া গেলে ব্যাপারটার একটা কিনারা হয়। এমন না হইলে আর বুদ্ধি! আমরা বলি অত মাথা না ঘামাইয়া বিজ্ঞাপন দিয়া ঠিকানাটা ডাকাতের নিকট হইতে আনাইয়াই লওয়া হোক্ না।"

রামতনুর সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল। কি সর্ব্বনাশ! সে একজন ফেরারী আসামী ! তাহাকে লইয়া সহরময় হৈ-চৈ পড়িয়া গিয়াছে। ঘামে তাহার বুকের বালিশ ভিজিয়া গেল এবং তাহার মনে হইতে লাগিল যেন মাথার মধ্যে একটা গুব্‌রে পোকা ঢুকিয়া ভোঁ-ভোঁ করিয়া চক্কর দিতেছে। ক্রমে পারিপার্শ্বিক জিনিষগুলার ধারণা যেন তাহার এলোমেলো হইয়া আসিতে লাগিল।

মিনিট ৫-এক পরে সে অতিকষ্টে নিজেকে একটু সাম্‌লাইয়া লইল ; বাহিরে গিয়া বেশ করিয়া মাথাটা ধুইয়া ফেলিল। লোকটা সাধারণত দেবদেবী মানিত না, কিন্তু হঠাৎ তাহার তেত্রিশ কোটির উপরই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়া গেল এবং তাঁহাদের মধ্যে যিনি যাহা পছন্দ করেন তাঁহার জন্য সেই দ্রব্য প্রচুর-পরিমাণে মানৎ করিয়া বসিল। আবার ভিতরে আসিয়া কাগজটা আর-একবার পড়িয়া তাড়াতাড়ি ভাঁজ করিয়া ফেলিল। তাহাতেও তাহার মন যেন মানিল না। খবরটা সহরের অনেকে পড়িয়াছে এবং পড়িতেছে, কিন্তু তাহার ভীতি এই কাগজখানিতে এমন সংবদ্ধ হইয়া পড়িল যে, সে যেন ইহা লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখিলেই বাঁচে। তাহার ঘরে এই খবরটা তাহার কেনা এই কাগজে কেহ পড়িলে যেন তাহার গ্রেপ্তার না হইয়াই যায় না।

রামতনু এদিক্‌-ওদিক্ দেখিয়া ভাঁজকরা কাগজখানা বিছানার নীচে একেবারে মাঝখানে গুঁজিয়া দিল। জানালা দিয়া কাগজখানা রাস্তায় ফেলিয়া দেওয়াও তাহার যেন নিরাপদ্ বোধ হইল না।

তাহার পর মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে লাগিল, এখন পুলিশের হাত হইতে বাঁচিবার উপায় কি ? মাতৃবাক্য ঠেলিয়া একেবারে অশ্লেষা-মঘা মাথায় করিয়া আসিয়া কি অঘটনটাই না ঘটিল ! যাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া আসা তাহার মুখ ত এখন দেখাও গেল না ; যদি ভবিষ্যতে দেখা হয় ত পুলিশ পরিবৃত হইয়া—কল্পনাতে প্রেমের নেশা ছুটিয়া গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠে ! সে-মুখ দেখাইবার বদলে এখন ভগবান্ যদি তাহার নিজের মুখ লুকাইবার একটু সুযোগ করিয়া দেন ত সে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে। ধরো শেষ-পর্য্যন্ত জেলে না হয় নাই যাইতে হইল ; কিন্তু এই কুটুম্ব-সাক্ষাৎ লইয়া কি কেলেঙ্কারিই না হইবে। শেষে বাড়ী-পর্য্যন্ত টান

ধরিবে, তাহার প্রবঞ্চনা করিয়া চলিয়া আসার কথাও জাহির হইয়া পড়িবে এবং সে-আসার উদ্দেশ্যও কাহারও অবিদিত থাকিবে না। হা ঈশ্বর, স্বপ্নে দেখাইয়াছিলে মধুর মিলন, আর বাস্তবে দাঁড় করাইলে কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া ডাকাতির দায়ের এজাহার।

নীচে ঠাকুরের সঙ্গে যেন একটি ভদ্রলোকের কথা-বার্ত্তার আওয়াজ শুনা গেল; তাহার পর সিঁড়িতে পায়ের শব্দ,—রামতনু উৎকর্ণ হইয়া রহিল। শব্দটা যেন তাহারই ঘরের পানে আসিতেছে; বিবশাঙ্গ রামতনু দরজার দিকে অপলক-নেত্রে চাহিয়া রহিল।

ভদ্রলোকটি দরজার সামনে আসিয়া রামতনুকে নমস্কার করিলেন, তাহার পর ভিতরে প্রবেশ করিয়া বিনা-বাক্য-ব্যয়ে চেয়ারখানায় বসিয়া বলিলেন, "মশায়—"

রামতনুও ঠিক এতক্ষণে সাহস-সঞ্চার করিয়া বলিল, "মশায়—"

দুজনের কথা একসঙ্গে বাহির হওয়ায় দুজনেই একটু থতমত খাইয়া গেল। সাম্‌লাইয়া রামতনু কি বলিতে যাইতেছিল, তাহার আগেই ভদ্রলোকটি বলিলেন, "এখানে রাম—এই রাম—অর্থাৎ রামতারণ ব'লে কেউ থাকেন?"

রামতনু বুঝিল এ সাক্ষাৎ ডিটেক্‌টিভ, আর রক্ষা নাই। তাহার ক্ষীণ তনুটি ভিতরে-ভিতরে কাঁপিয়া উঠিল। ঢোক গিলিয়া জড়িত-স্বরে বলিল, "আজ্ঞে কই না?"

"থাকেন না?—তাই ত...আচ্ছা ধরুন রামের সঙ্গে কিছু যোগ ক'রে...যেমন ধরুন...রাম...রামু..."

রামতনুর বক্ষে সজোরে ঢিপ-ঢিপ্ করিয়া আওয়াজ হইতেছিল। সে ব্যস্তভাবে বলিল, "না, না মশায় ওরকম-ধরণের নাম...রামায়ণ থেকে কোনো নামই এ-বাড়ীতে নেই...আপনি বোধ হয় ভুল ঠিকানায় এসেছেন।"

লোকটি রামতনুর পানে একটু অপ্রতিভভাবে চাহিলেন ও বলিলেন, "মশায় মাফ করবেন, আপনাকে বোধ হয় বিরক্ত করছি; আপনি অসুস্থও বোধ হচ্চেন, কিন্তু একটু হাঙ্গামে পড়া গেছে"...বলিয়া পকেটে হাত দিলেন এবং কোণাকোণি ছিন্ন একটা কার্ড্ বাহির করিয়া পড়িয়া বলিলেন, "আজ্ঞে না, ঠিকানা ঠিক এই; এই দেখুন না।"

রামতনু কার্ড্ দেখিবে কি, সব আঁধার দেখিতেছিল। এ সেই তাহারই কার্ড...রামটহলের হাতে ছেঁড়া। সে মন্ত্রমুগ্ধের মতন কার্ড্‌টার দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

হঠাৎ লোকটি বলিলেন, "আচ্ছা আপনি এখানে আছেন ক'দিন? সবাইকে চেনেন?"

রামতনুর নেশার মতো ভাবটা ছাৎ করিয়া কাটিয়া গেল; সে মুখ তুলিয়া পাগলের মতো ফ্যাল্-ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল।

লোকটিও ব্যাপারটা আন্দাজ করিতে পারিলেন না। নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিলেন, "না, আপনি রেস্ট্ নিন্, আপনাকে জ্বালাতন ক'রে বড় অন্যায় করছি। আমি বোধ হয় ভুল ঘরেই ঢুকেছি; কিন্তু অন্য ঘরগুলাও বন্ধ। তা আমি এই বইটা নিয়ে বসি। অন্যান্য ভদ্রলোকেরা এলে খোঁজ নেবো।" তাহার পর তিনি চিন্তিতভাবে নিজের মনে-মনেই বলিলেন, "কিম্বা হ'তেও পারে...নিজেই বোধ হয় ভুল বুঝেছি"...বলিয়া বইখানার পাতা উল্টাইতে লাগিলেন।

বলে কি?...বসিয়া থাকিবে! রামতনুর মাথায় বাজ পড়িল। বিপদে বুদ্ধিবৃত্তিকে একটু গুছাইয়া লইয়া বলিল, "আজ্ঞে ব'সে থেকে ত কোনো ফল নেই; আমি এ মেসের সব্বাইকেই জানি,...আজ ৪ বছর একটানা এখানে রয়েছি। আপনি মিছিমিছি সময় নষ্ট করছেন—" ভদ্র-লোক উত্তর দিলেন না, শুধু চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া বইয়ের এক জায়গায় কি যেন পড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহার পর সন্দিগ্ধভাবে রামতনুর মুখের পানে খানিক-ক্ষণ চাহিয়া 'হো হো' করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন "তা থাকুন মশায় ৪ বছর, কিন্তু ২ মিনিটে আমি যা টের পেয়েছি আপনি ৪ বছরে কেন টের পাননি তা জানিনে। অর্থাৎ রামতনু ব'লে এখানে কেউ আছেন, সম্ভবতঃ এই মেসেই থাকেন, আর সম্ভবতঃ আমার সামনেই ব'সে আছেন। দেখুন ত এই বইখানা

বোধ হয় আপনার”—বলিয়া লোকটি, রামতনুর যেখানে নামটা লেখা ছিল, সেইখানটা টিপিয়া ধরিয়া তাহার সম্মুখে বইটা বাড়াইয়া ধরিলেন।

রামতনুর মুখটা ছাইয়ের মতো ফ্যাকাসে হইয়া গেল। লোকটির হাতটা চাপিয়া ধরিয়া নিতান্ত মিনতির স্বরে কহিল “মশায় বাঁচান, কিছু দোষ নেই আমার, জেল থেকে—”

“—কিছু দোষ নেই নিতান্ত বলা যায় না; কারণ মিছেমিছি আত্ম-গোপন কর্‌তে গিয়ে আমায় যে ভাবিয়েছেন তা'তে একটু দোষ হয়েছে বই কি; তবে তা'র জন্যে জেলে যেতে হবে না, এ-গ্যারাণ্টি আমি দিতে পারি। তা'র পরে ব্যাপারটা একটু খু'লে বলুন ত।”

রামতনু ব্যাপারটা খুলিয়া বলিল না বটে, তবে কিছু-কিছু বলিল;—অর্থাৎ সারদা-বাবুর সহিত তাহাদের কুটুম্বিতা কি-প্রকারের আর সেই-কুটুম্বিতাসূত্রে আলাপ করিবার প্রয়াসে ব্যাপারটা কিরূপ অহেতুকভাবে ঘোরালো হইয়া দাঁড়াইয়াছে—ইত্যাদি, ইত্যাদি। বেশীর ভাগ গোপনই করিল—যেমন আসিবার মুখ্য উদ্দেশ্য কি, আসিল কত বাধা-বিপত্তির মাঝে, আরো অনেক কথা।

ভদ্রলোকটির নাম অমিয়-বাবু। তিনি বলিলেন, “হ্যাঁ, আমিও অনেকটা এইধরণের কিছু-একটা হবে তা আন্দাজ করেছিলুম। চাকরটা যখন একটা কার্ডের টুক্‌রা দেখিয়ে বল্‌লে, আবার আমায় কার্ড দিয়ে ভোলাতে এসেছিল তখনই আমার মনে একটু খট্‌কা লাগে, ভাব্‌লুম বাঙ্গালাদেশে ডাকাতির যুগটা এখনও সম্পূর্ণ যায়নি বটে, তবে চিঠিপত্র দিয়ে ডাকাতির যুগটা আর নেই। লুট কর্‌তে এসে ঠিকানা রেখে যাবে, এমন ডাকাতকে অতি-সাহসী অথবা অতি-বোকা বল্‌তে হবে, তা এই সভ্যযুগে এই দুই-রকমের কোনোটাই থাকা সম্ভব নয়।

“পুলিশরা কার্ডের খানিকটা পেয়ে বাকিটা খুঁজ্‌তে লাগ্‌ল। দৈবক্রমে সেটা জলকাদা মাখা হ'য়ে আমার জুতোর পাশেই প'ড়ে ছিল; আমি জুতোর তলায় সেটা চেপে ধর্‌লাম, এবং সুবিধামতো উঠিয়ে পকেটে পুর্‌লাম। চিঠিখানি নিয়ে আমি দুটো সিদ্ধান্ত খাড়া কর্‌লাম,—প্রথমতঃ যদি খারাপ মৎলবে কেউ এসে থাকে ত চিঠিটার কোনো মূল্যই নেই—সে প্রকৃতপক্ষেই চাকরটার কাছে নিজের আত্মীয়তা প্রমাণ কর্‌তে গিয়েছিল,—একটা যা-তা ঠিকানা দিয়ে। আর যদি কোনো জানিত লোক দেখা কর্‌তে এসে থাকে, তবে চিঠিটার যথেষ্টই দাম আছে। আমার নিজের আন্দাজ কাউকেও আর জানালাম না, ভাব্‌লাম একবার চুপি-চুপি দেখা যাবে।

“ঠিকানাটা বুঝ্‌তে তত্তটা বেগ পেতে হয়নি; তবে নামটা সমস্ত পাওয়া গেল না। এই দেখুন না আন্দাজে 'রাম' গোছের একটা কথা দাঁড় করানো যায়, বাস্, তা'র পরে ছেঁড়া। পুলিসের হাতে যেটুকু ছিল, তা'তে নামের যেটুকু ছিল একেবারে জলকাদায় মু'ছে গেছে, নীচে খালি 'Lane' আর তা'র নীচে 'Calcutta' পড়া যায়।

“কিন্তু পূরো নামের অভাবটুকুই ব্যাপারটাকে খানিকটা রহস্য দিয়ে একটু জমাট ক'রে তোলে, আর আমার একটু ডিটেক্‌টিভি করার লোভটা বাড়িয়ে দেয়। এটুকু না থাক্‌লে ত ব্যাপারটা একরকম বৈচিত্র্যহীনই বল্‌তে হয়।

“যা হোক শেষে কিন্তু আপনি বড় দমিয়ে দিয়েছিলেন। আর আপনার এই বইখানি আমায় সাহায্য না কর্‌লে আমায় বড় অপ্রস্তুত হ'য়ে বাসায় ফির্‌তে হ'ত। আচ্ছা, আপনি কিন্তু এতটা বেগ দিলেন কেন? সত্যিই ডাকাতি কর্‌তে গিয়েছিলেন নাকি?—তা হ'লে গেরস্তর কাছে ঠিকানা দিয়ে আস্‌তে পার্‌লেন, আর আমার কাছে আত্মপরিচয় দেবার সময় সব সাহস লোপ পেলে?”

ভদ্রলোকটি চেয়ারে হেলান দিয়া খুব হাসিতে লাগিলেন; রামতনু ক্ষীণ-ভাবে তাহাতে একটু যোগ দিল, তাহার পর বিছানার ভিতর হইতে 'নায়ক' খানা বাহির করিয়া বলিল, “পড়ুন এইখানটা, তা হ'লেই শ্রাদ্ধ কতদূর গড়িয়েছে বুঝ্‌তে পার্‌বেন। মহাশয়, মানুষ সাধু কি অসাধু তা আর আজকাল তা'র নিজের কাজের ওপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে এইসব খবরের কাগজগুলার মতামতের ওপর।”

অমিয়-বাবু উচ্চহাস্যে মধ্যে-মধ্যে বিবরণটুকু পড়িয়া কাগজটা রাখিয়া দিলেন, বলিলেন, “বাহাদুরি তবে আমারই বেশী, একটা মস্ত-বড় ব্যাপারের কিনারা ক'রে

ফেলেছি। কিন্তু আসল কথাটা যে চাপা প'ড়ে যাচ্ছে। নিন্ জামাটামা প'রে ব্যাপারটা না জুড়ুতে পরিচয় হ'লেই ভালো, তাঁদের একেবারে অভিভূত ক'রে ফেলা যাবে। নিন্, আমি ততক্ষণ একটা সিগারেট ধরাই।"

ভয়টা যখন সম্পূর্ণ তিরোহিত হইল, রামতনুর মনে আবার পূর্ব্বের ভাবটা আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া লইল। অমিয়-বাবু তাহাকে বিপন্মুক্ত করিয়াছেন বটে, কিন্তু বিশেষ করিয়া তিনি তাহার বাঞ্ছিতার আত্মীয় বলিয়া, সে সহজেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িল এবং তাঁহার আতিথ্যের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। অমিয়-বাবু যখন সিগারেট ধরাইতেছিলেন রামতনু প্রচ্ছন্নভাবে একটা টাকা বাহির করিয়া নীচে নামিয়া গেল এবং ঠাকুরকে বাছা-বাছা খাবার, একবাক্স কাঁচিমার্কা সিগারেট্ ও পানের ফরমাস দিয়া উপরে উঠিয়া আসিল। তাহার মনে হইতেছিল, 'হ্যাঁ শেষপর্য্যন্ত বিয়ের ফুলটা ফুট্ল তা হ'লে, ভগবান্ মুখ তু'লে চাইলেন,—ও চাইতেই হবে—অধ্যবসায় ব'লে একটা জিনিষ আছে ত? আর তিনিই শুধু আছেন, ওসব দেবতা-টেবতা কিছু নয়, হ্যাঃ—'

ঘরে আসিয়া প্রফুল্লভাবে অমিয়-বাবুকে বলিল, "তা নয় টাট্কা-টাট্কিই দেখা-শুনা করা গেল; কিন্তু আগে থাকতে বাড়ীতে কে-কে আছেন জানা থাক্লে পরিচয়ের বিশেষ সুবিধা হয়। অর্থাৎ নূতন পরিচয়ের আড়ষ্টভাবটা অনেকটা কেটে যায়। বিশেষ ক'রে আপনাকে ভাগ্যক্রমে পেয়ে আমি এ-সুযোগটুকু ছাড়্তে রাজি নয়।'

রামতনু পূর্ব্বে অবশ্য অনেকটা শুনিয়াছিল, কিন্তু যাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া আসা তাহার সম্বন্ধে আলোচনার জন্য তাহার তৃষিত মনটা বড়ই ব্যগ্র হইয়া উঠিল,—বিশেষ করিয়া তাহারই এই আত্মীয়ের সহিত।

অমিয়-বাবু বলিলেন "হ্যাঁ, সে-কথা মন্দ কি; তবে মেলা লোকের মধ্যে গিয়ে আপনাকে হাঁপিয়ে পড়্তে হবে না—বাড়ীতে ওঁদের আছেন মাত্র কর্ত্তা স্বয়ং আর এই গিয়ে একটি মেয়ে, মা আর-একটি ছেলে, সে নেহাৎ ছেলেমানুষ—ইস্কুলের নীচু ক্লাশে পড়ে।"

নিজের অন্তর্নির্দ্দিষ্ট পথে আলোচনাটিকে লইয়া যাইবার জন্য রামতনু বলিল, "হ্যাঁ, লেখাপড়ার কথায় মনে প'ড়ে গেল—সারদা-বাবুর মেয়েটি ত খুব উচ্চ-শিক্ষিতা—"

"উচ্চ-শিক্ষিতা এখনও ব'লে ফেলা যায় না; ম্যাট্রিকটা পাশ করেছেন মাত্র; তবে হ্যাঁ, আরও পড়েন সবারই এইরকম ইচ্ছে"...কথাগুলা অমিয়-বাবু ঘাড়টা একটু নামাইয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন।

রামতনু বলিল, "যাই হোক, আমাদের মধ্যে এটুকুও বড়-একটা পাওয়া যায় না, আলাপ ক'রে তৃপ্তি পাওয়া যাবে। তা'র ওপর আপনার সঙ্গে পরিচয়টা আগে থাক্তেই হ'য়ে রইল। আপনাদের সঙ্গে ওদের খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ব'লে বোধ হচ্ছে যেন—"

অমিয়-বাবু পূর্ব্ববৎ হাসিয়া বলিলেন "—সম্বন্ধ কিছুই ছিল না,তবে কয়েক-দিন থেকে হ'য়ে দাঁড়িয়েছে বটে—আর সেটা একটু ঘনিষ্ঠও বল্তে হবে বই কি—"

রামতনু বাক্যের কৌশলটুকু লক্ষ্য করিয়া হাসিয়া বলিল—"কি-রকম?"

"—অর্থাৎ ওর নাম কি ওঁর সেই মেয়ের সঙ্গে সম্প্রতি আমার বিবাহ হয়েছে।" বলিয়া পূর্ব্বের মতন লজ্জিতভাবে হাসিতে-হাসিতে অমিয়-বাবু নির্ব্বাপিত সিগারেটটা আবার ধরাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এবং ঠিক এইসময়ে দরজার আড়াল হইতে উড়ে-ঠাকুরটা ইসারা করিয়া জানাইল আতিথ্যের আয়োজন সব হাজির।

ময়ূরভঞ্জের আল্‌পনা

অধ্যাপক শ্রী ফণীন্দ্রনাথ বসু

আমদের দেশে যে আল্‌পনা দেওয়ার প্রথা এখনও প্রচলিত আছে তা'র মধ্যে আম জনসাধারণের শিল্পের পরিচয় পাই। প্রাচীন কাল থেকে ভারতে যে শিল্পের ধারা চ'লে আস্‌ছে, সেই ধ ,ই জনসাধারণের মধ্যে প্রবেশ ক'রে তাদের অনুপ্রাণিত করেছে। এখন এই আল্‌পনার মধ্যেই আমরা সেই প্রাচীন শিল্পের শেষ অংশ দেখ্‌তে পাচ্ছি। আবার এরই মধ্যে আমরা জনসাধারণের প্রকৃতির, তাদের জীবনের ও তাদের শিল্পের প্রকৃত পরিচয় পাচ্ছি। যাঁরা এখনও এই আল্‌পনা দেওয়ার প্রথাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, তাঁরা কারো কাছ থেকে কোনো শিক্ষা বা দীক্ষা লাভ করেননি, শুধু প্রাচীন শিল্পের ধারা যেটুকু তাঁদের কাছে এসে পড়েছে, সেইটুকুকে তাঁরা ধ'রে রেখেছেন। সেই প্রাচীন ধারার মধ্যে জন-সাধারণের যা-কিছু অনুষ্ঠান, যা-কিছু আচার-ব্যবহার ল তা অনেকটা মি'শে গেছে। তাই এই আল্‌পনার মধ্যে আমরা যে শুধু জনসাধারণের শিল্পের পরিচয় পাই তা নয়, তাদের জীবন-যাত্রার অনেক কথা জান্‌তে পারি।
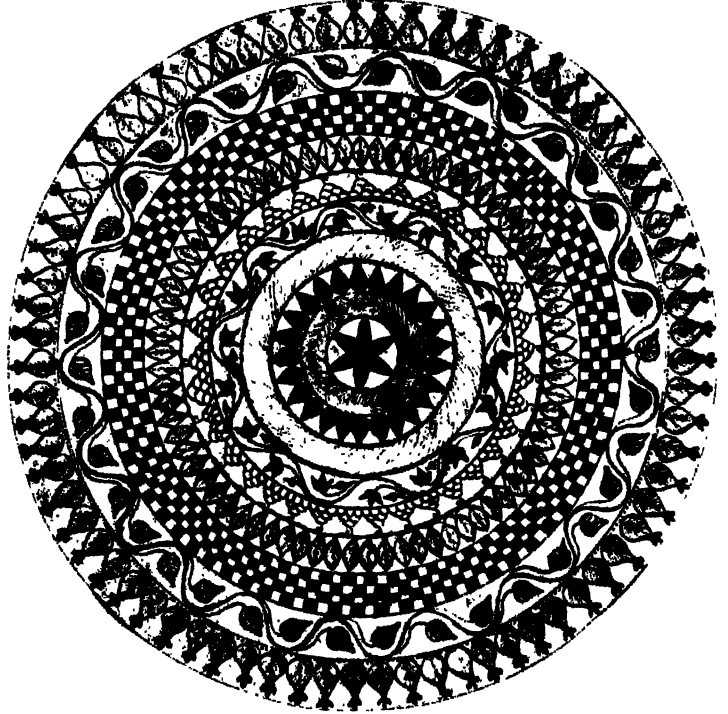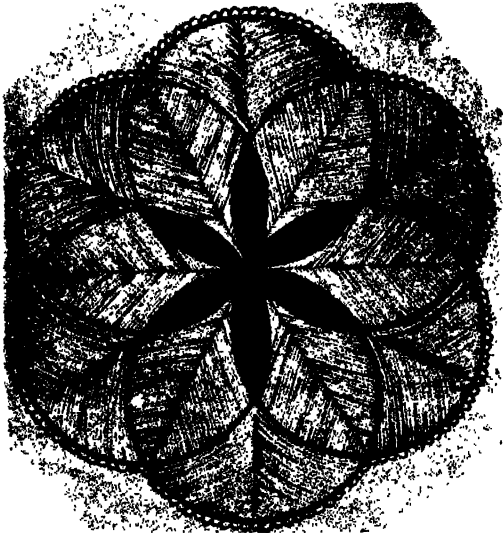
১নং চিত্র—ময়ূরভঞ্জের আল্‌পনা

২নং চিত্র—ময়ূরভঞ্জের আল্‌পনা

সুখের বিষয় যে, এই আল্‌পনার নমুনা সংগ্রহ কর্‌বার চেষ্টা আমাদের দেশে হচ্ছে। এবিষয়ে অগ্রণী হচ্ছেন শ্রদ্ধেয় শিল্পাচার্য্য শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি তাঁর "বাংলার ব্রত" বইতে বাংলা দেশে প্রচলিত অনেক আল্‌পনার নমুনা সংগ্রহ করেছেন। এই যে শিল্পের নমুনা পাচ্ছি, এটি হচ্ছে জনসাধারণের সম্পত্তি। যখনই

কারো বাড়ীতে যে-কোন ব্রত হোক্ না কেন, বিবাহাদি কোনো উৎসব হোক্ না কেন, অম্‌নি মেয়েরা সেই চির-প্রথাগত আল্‌পনা দিতে ব'সে যাবেন। মানুষের জীবনে

৩ নং চিত্র

৫নং চিত্র—ময়ূরভঞ্জের আল্‌পনা

যে-সব কাজ-কর্ম্ম, যে-সব অনুষ্ঠান আছে সেগুলোকে সুন্দর কর্‌বার এই একটি উপায়।

এই আল্‌পনা দেওয়ার প্রথা শুধু যে বাংলা দেশে আছে তা নয়, উড়িষ্যায়, মান্দ্রাজে, বোম্বাই, গুজরাট ও উত্তর ভারতের অনেক স্থানে আছে। তবে দুঃখের বিষয়,
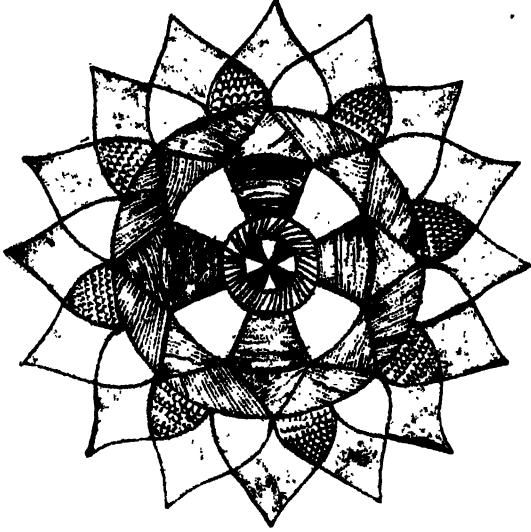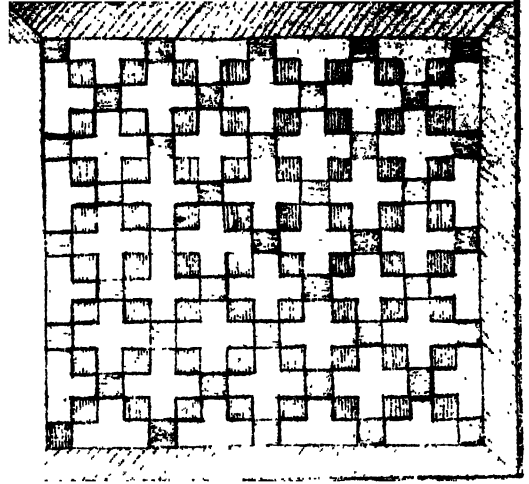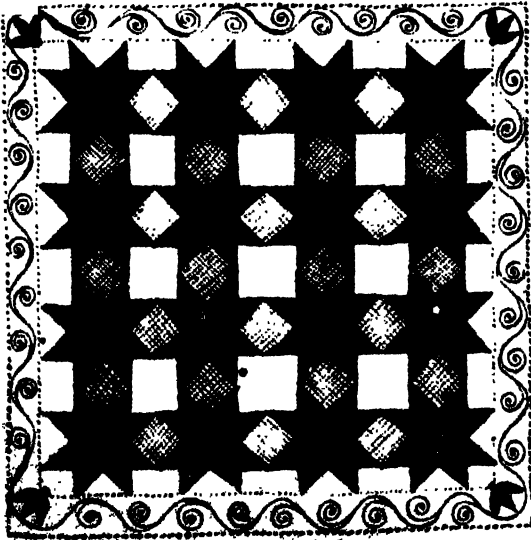
৪নং চিত্র—ময়ূরভঞ্জের আল্‌পনা
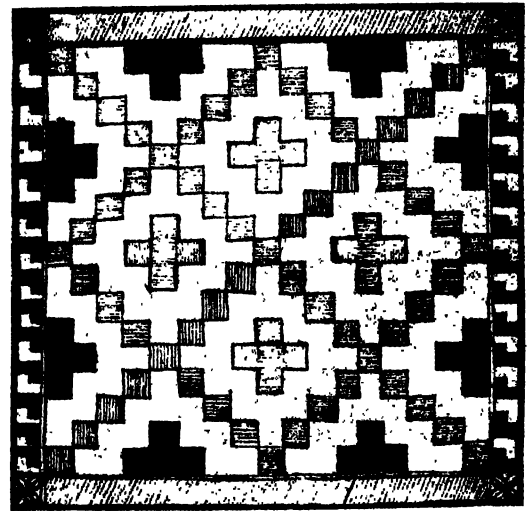
৬নং চিত্র—ময়ূরভঞ্জের আল্‌পনা

সব জায়গাকার নমুনা সংগৃহীত হয়নি। বাংলা ছাড়া তামিল ও মহারাষ্ট্রীয় আল্‌পনার নমুনা কিছু সংগৃহীত
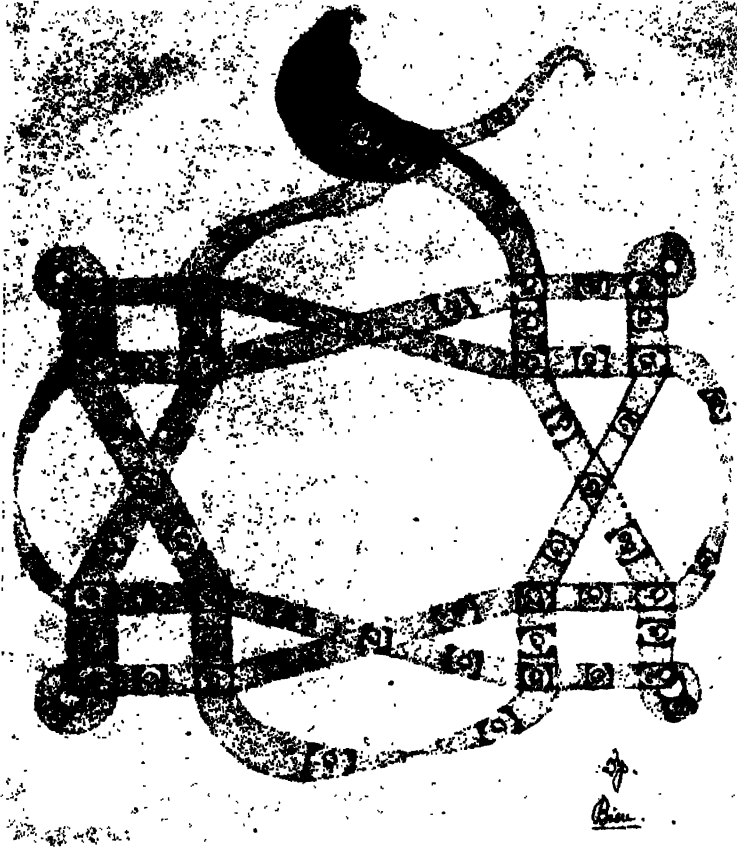
৭নং চিত্র—ময়ূরভঞ্জের আল্‌পনা

হয়েছে। গুজরাটে যে-সব আল্‌পনা প্রচলিত আছে, সেগুলো অনেকটা তন্ত্রের যন্ত্রের আকারের। উড়িষ্যায় একখানি বই আছে "প্রবন্ধচিন্ত্রোদয়" ; তা'তে নানা-রকম ছবির নমুনা আছে।

এবারে আমি ময়ূরভঞ্জে কিছু আল্‌পনার নমুনা সংগ্রহ করি। সেখানে গ্রামের প্রত্যেক বাড়ীর দেয়ালে আল্‌পনা দেওয়া হয়। প্রায়ই গ্রামের মাঝখান দিয়ে রাস্তা চ'লে গেছে, আর তা'রই দু'পাশে লোকদের বাড়ী। সেইসব বাড়ী কালো, লাল বা গেরুয়া রং দিয়ে সুন্দরভাবে লেপা হয়, আর তা'রই উপরে নানা-রকম আল্‌পনা আঁকা হয়। এইসব আল্‌পনাকে ময়ূরভঞ্জে "ঝুঁটী" বলা হয়। ঝুঁটীকে আমরা দু'ভাগে ভাগ কর্‌তে পারি। প্রথম যে-সব ঝুঁটী শুধু বাড়ী সাজাবার জন্যে ব্যবহৃত হয়, যেমন ১-৭ নং ছবি। এগুলি বিশেষ কোনো ব্রত বা পূজার জন্য ব্যবহৃত হয় না, শুধু ঘরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে। তবেই দেখা যাচ্ছে যে, যদিও এইসব লোকদের আমরা অশিক্ষিত ব'লে ঘৃণা করি, তবুও এদের মধ্যে সৌন্দর্য্য-জ্ঞান যথেষ্ট আছে। এরা এদের মাটির ঘরকেও সুন্দর ক'রে তোল্‌বার চেষ্টা করে। ১নং ছবির মতন নমুনা আমরা প্রাচীন শিল্পে পাথরের স্তম্ভের উপর দেখ্‌তে পাই। স্তম্ভটি সাজাবার জন্যে আগেকার শিল্পীরা এইরকম পদ্ম ও লতাপাতার ব্যবহার কর্‌ত। এখানকার লতাপাতা দিয়ে সাজানোর পদ্ধতি আমাদের সাঁচি বা ভারুতের স্ক্রোলের কথা মনে করিয়ে দেয়। সেই স্ক্রোল্ করার প্রথাই আজকালকার আল্‌পনায় পরিণত হয়েছে।

দ্বিতীয়—যে-সব আল্‌পনা শুধু ব্রত বা বিবাহাদি

৮নং চিত্র—ময়ূরভঞ্জের কয়েক-প্রকার আল্‌পনার নমুনা
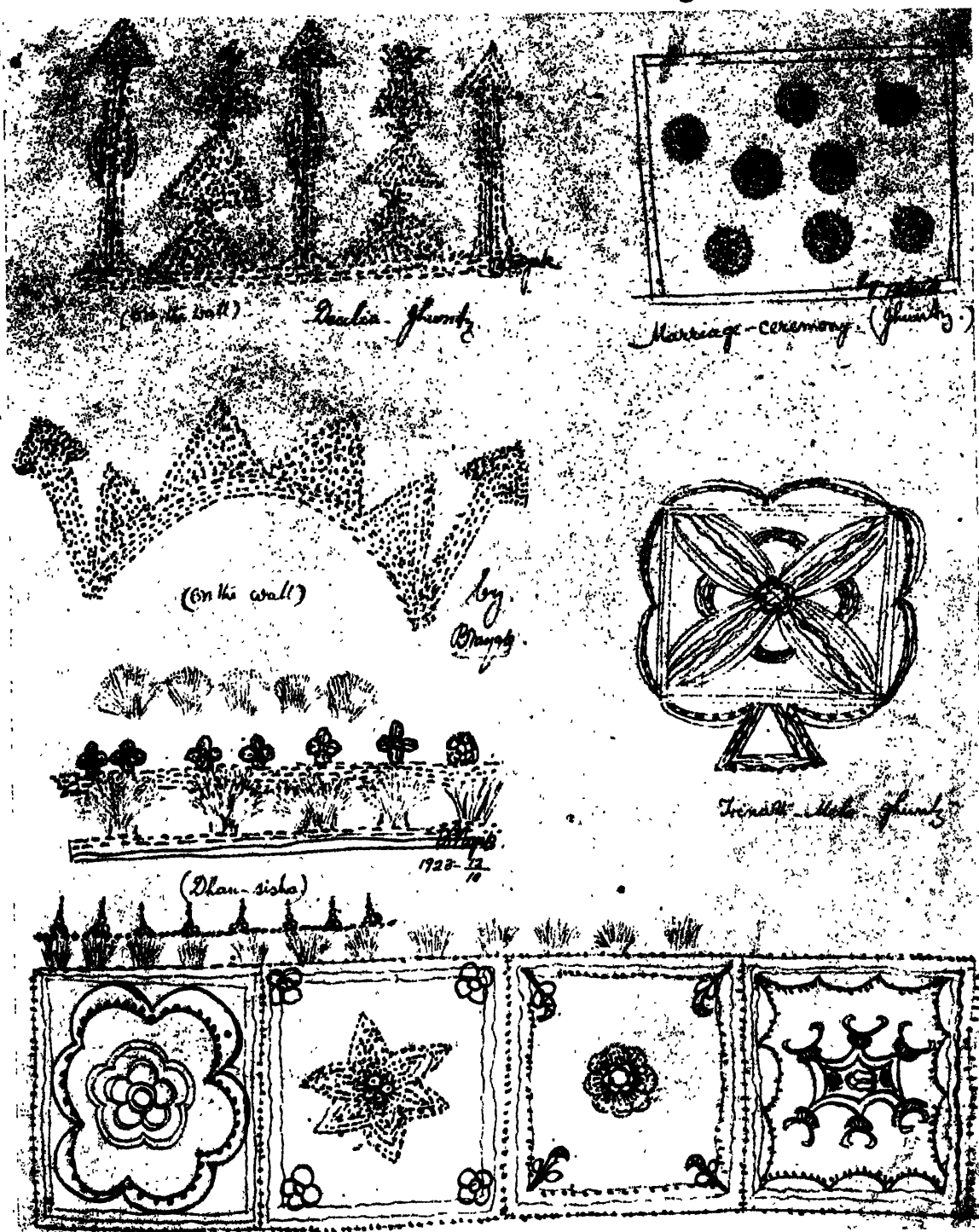
উৎসবে ব্যবহৃত হয়, যেমন ৮-১১ নং ছবি। সাধারণতঃ অগ্রহায়ণ মাসই (উড়িষ্যায় বলে মার্গশীর্ষ মাস) ঝুঁটীর মাস। এই মাসে প্রতি বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষে প্রত্যেক বাড়ীতে নতুন-নতুন ঝুঁটী বা আল্‌পনা দেওয়া হয়। এই উপলক্ষে "ধানের শীষ"ই প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতে দেখা যায়। ধানের শীষ লক্ষ্মীর প্রিয় বলে
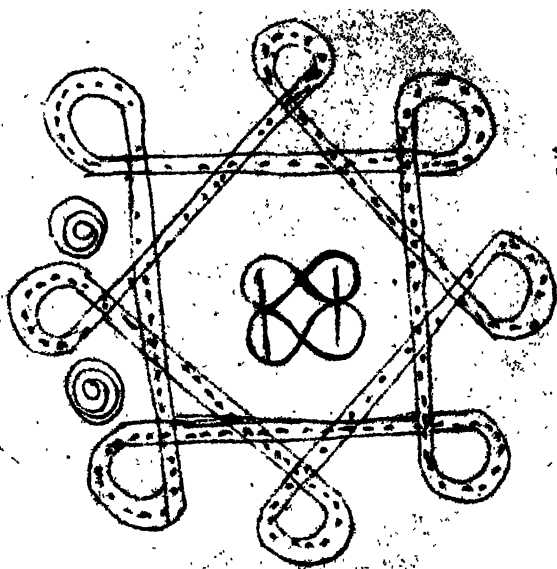
৯নং চিত্র—বিবাহের ডালায় উপরকার আল্‌পনা
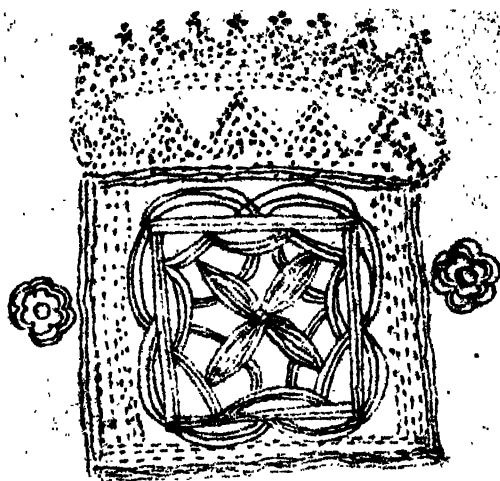
১১নং চিত্র—অধিবাসের আল্‌পনা

১০নং চিত্র- রাস-মণ্ডল (ঝুঁটী) আলপনা
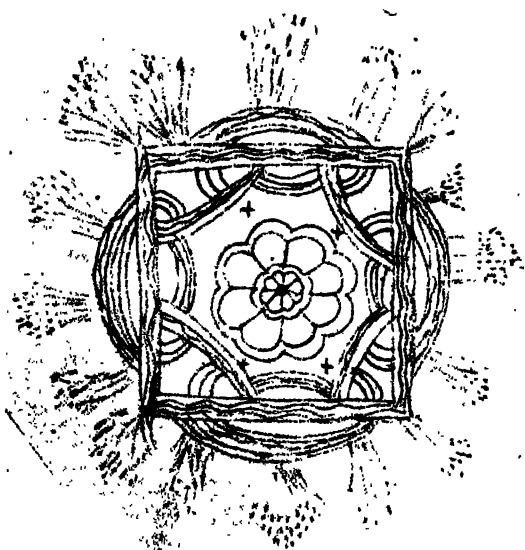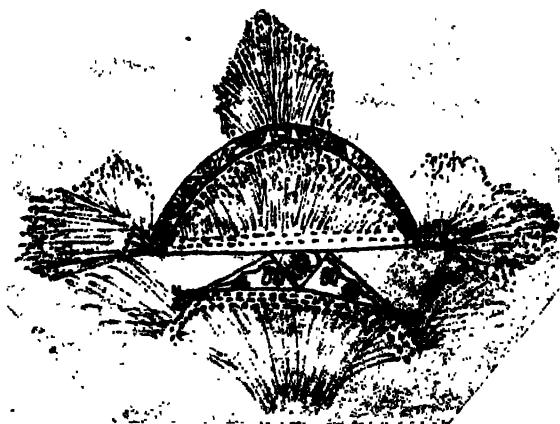
১২নং চিত্র— লক্ষ্মী-পূজার (ঝুঁটী) আল্‌পনা

এটার খুব বেশী প্রচলন। আমাদের দেশে যেমন বিবাহের সময় নানারকম আল্‌পনা দেওয়া হয়, সেইরকম ময়ূরভঞ্জেও বিবাহে নানারকম "ঝুঁটী" করে। সে-সময় বিবাহের ডালা, ফুলের মুকুটের, কলাগাছের ও আম-
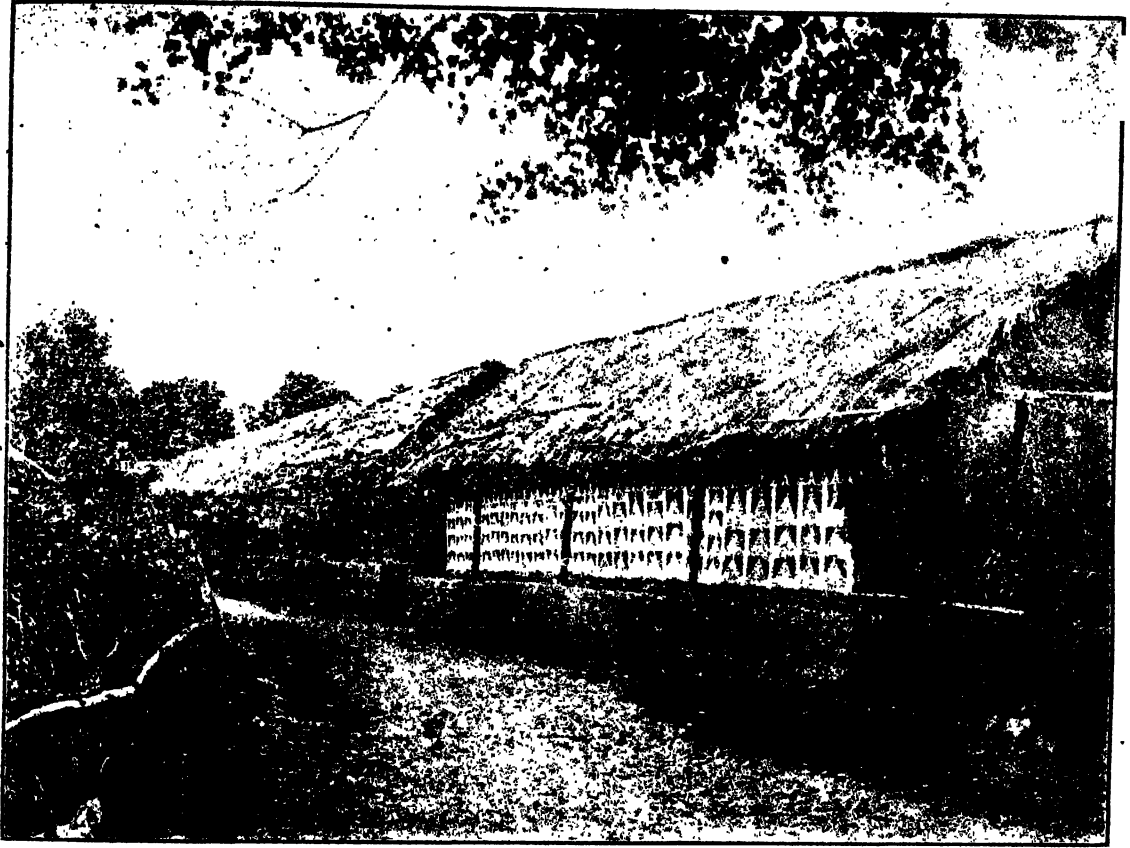
১৩নং চিত্র—ময়ূরভঞ্জে দেওয়ালে আল্‌পনা দেওয়ার নমুনা

গাছের আল্‌পনা দেয়। লক্ষ্মীপূজা ছাড়া ত্রিনাথদেবের পূজায়, করম্‌পূজায়, মাঘপরবে, বাধ্‌না-পরবে, দশরার সময় নানান্ রকমের আল্‌পনা দেওয়া হয়। তা হ'লে দেখা যাচ্ছে যে, এই আল্‌পনা অনেক-পরিমাণে ধর্ম্মের সঙ্গে জড়িত।

আমাদের দেশের মতন এখানেও মেয়েরাই এইসব আল্‌পনা দেয়। মেয়েরা চালের গুঁড়ো দিয়ে এই আল্‌পনা দিয়ে থাকে। তা'রা এবিষয়ে কোনো রকম শিক্ষা না পেলেও, তাদের আল্‌পনা খুব সুন্দর ও স্বাভাবিক হয়। দ্যুতিবাহন (বা জীমূতবাহন) পূজার ব্রতকথায় আমরা এইরকম আল্‌পনা বা ঝুঁটীর উল্লেখ পাই :—

"রবিবার দিন ঘরদ্বার লিপিলা।
স্নান করি' শুক্ল বস্ত্র পিন্ধিলা।
ঘর-দ্বার ঝুঁটী দেই পঞ্চবর্ণ ফুল আনিলা।"

নষ্টচন্দ্র

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

অনিল মেসোপোটেমিয়ায় গিয়ে অনলকে খবর দিয়েছে, সে কোনো সুযোগে ফ্রান্সে যাচ্ছে এবং সেখান থেকে শীঘ্রই ইংলণ্ডে যাবে; সে যদি ইংলণ্ডে যেতে পারে তা হ'লে সেখানে সে লেখা-পড়া করবে; তখন তার হয়ত মাসে-মাসে কিছু টাকার দরকার হ'তে পারে; আবশ্যক হ'লে তাদের সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করে' বা বন্ধক রেখে টাকা পাঠাতে হবে, একথাও সে অনলকে আগে থাকতে জানিয়ে রেখেছে।

অনিল যে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে চলে' যেতে পেরেছে, এই সংবাদে অনল যেমন আনন্দিত হয়েছিল, অনিলকে মাসে-মাসে দু-তিন শত টাকা পাঠাতে হবে ভেবে তেমনি উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠেছিল। অনিলকে কলকাতায় পড়তে পাঠিয়ে অবধি সে ত এক-রকম বৈরাগ্য অবলম্বন করেছিল; এখন একেবারে কৃচ্ছ্রসাধন আরম্ভ করলে; প্রত্যেকটি পয়সা সে সন্তর্পণে জমিয়ে রাখছিল, কি-জানি কখন অনিলের তলব আসে।

অনলের পরামর্শে ও চেষ্টায় বাসুন্দিয়া এষ্টেট থেকে ম্যাজিষ্ট্রেটের ওয়ার-ফাণ্ডে ও অন্যান্য দুই-একটা অনুষ্ঠানে বিশেষ মোটা-মোটা দান করাতে এবং নিজের জমিদারীর ভিতর স্থানে-স্থানে স্কুল হাঁসপাতাল পথ ও জলাশয় প্রতিষ্ঠা করে' দেওয়াতে ষ্টেট্ কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা ম্যাজিষ্ট্রেট্ ত্যাগ করেছেন; জমিদারীর কর্ত্রী শ্রীমতী ধনিষ্ঠা দাসী যে নিজের জমিদারী পরিচালনায় যথেষ্ট নিপুণা ও মনোযোগিনী এ-সম্বন্ধে ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁর মন্তব্য রেভেনিউ বোর্ডে জানিয়েছেন। ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছ থেকে এই খবর শ্রীমতী ধনিষ্ঠা দাসীর নামে এসে পৌঁছল এবং জমিদার প্রফুল্ল মুস্তফীর বাপের আমলের দেওয়ান রাজকুমার-বাবু যখন এই শুভ সংবাদ কর্ত্রী বউ-রাণীকে গিয়ে শোনালেন, তখন বিকাল বেলা।

ধনিষ্ঠা হাসিভরা মুখে দেওয়ানকে বললে—আপনি এখনি বাজার থেকে যত টাকার সন্দেশ আর বাতাসা পাওয়া যায় আনিয়ে গোবিন্দদেবের ভোগ দিইয়ে হরির লুট দেবার ব্যবস্থা করে' দিন গে। আর কাল ঠাকুরের পূজা আর ভোগের বিশেষ আয়োজন করে' দেবেন। আর দুধ দই ক্ষীর সন্দেশের বায়না আজকেই দিয়ে দিন, যত শিগ্‌গীর হয়, ব্রাহ্মণ-ভোজন, কাঙালী-ভোজন করাতে হবে।

বাসুন্দিয়াতে রীতিমত উৎসব লেগে গেল। জমিদারের অকস্মাৎ মৃত্যুর শোক ভুলে' সমস্ত জমিদারী স্বাধীনতা লাভের আনন্দে উৎসবময় হ'য়ে উঠল। দেউড়িতে নহবৎ বাজতে লাগল; প্রতি তোরণে-তোরণে দেবদারু-পাতার তোরণ, আম্র-পল্লবের মালা, কদলী-বৃক্ষ ও পূর্ণ ঘট স্থাপিত হ'ল; ক্রমাগত বোমের আওয়াজে লোকের কান ঝালা-পালা হ'য়ে উঠল; সন্ধ্যার পর কাছারী-বাড়ীর সামনের মাঠে অনেক টাকার আতস বাজি পুড়ল। গয়লা ময়রা জেলে প্রভৃতির আনা-গোনায় কাছারী-বাড়ী সরগরম; অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত কাছারীতে কাজের বিরাম নেই।

অনেক চেষ্টা করে'ও ঠিক তার পরদিনই ব্রাহ্মণ-ভোজন করাবার মতন উপকরণ-সামগ্রী সংগ্রহ হ'য়ে উঠল না; ব্রাহ্মণ ভোজন ও কাঙালী-ভোজন হবে একদিন পরে। ইতিমধ্যে উৎসবটা জুড়িয়ে না যায় বলে'ও বটে এবং বৃহৎ ভোজের দিন কাছারীর ও বাড়ীর সমস্ত আমলা কর্ম্মচারী পেয়াদা পাইক ও চাকর-দাসীরা কর্ম্মেই ব্যস্ত থাকবে, তারা নিজেরা আনন্দ করবার অবসর পাবে না বলে'ও বটে, মাঝের ফাঁকের দিনে তাদের সকলকে মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ করা হয়েছে।

মধ্যাহ্ন অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে। বেলা প্রায় দু'টা। সবে ব্রাহ্মণেরা বৈঠকখানা-বাড়ীর দরদালানে খেতে বসেছে; সেই দালানের সামনের রকে অন্যান্য জাতির ভদ্রলোকদের পাতা পাড়া হয়েছে, ব্রাহ্মণেরা

ভোজনে প্রবৃত্ত হ'লেই তাদেরও ডাক পড়্বে। উপরের ঘরের একটি বন্ধ জান্‌লার খড়খড়ির পাখী তুলে' প্রফুল্লমুখী ধনিষ্ঠা কৌতূহলী দৃষ্টি প্রেরণ করে' অভ্যাগতদের ভোজন পর্য্যবেক্ষণ কর্‌ছিল। সে দেখ্‌লে মার্ব্বেল-পাথর-পাতা দালানের উপর কার্পেটের আসন পেতে ব্রাহ্মণেরা সার দিয়ে খেতে বসেছে, রাজকুমার-বাবু তাদের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে সকলের আহারের তত্ত্বাবধান কর্‌ছেন। একজন পাচক এক-হাতে একটা পিতলের বাল্‌তি ও অপর-হাতে একটা পিতলের বড় চাম্‌চে নিয়ে নূতন একটা পদ পরিবেষণ কর্‌তে উপস্থিত হ'তেই রাজকুমার-বাবু যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন সেখান থেকে খানিক দূরে সরে' গেলেন; তিনি সরে' যেতেই এতক্ষণ তিনি যে লোকটিকে আড়াল করে' দাড়িয়েছিলেন সেই লোকটির উপর ধনিষ্ঠার দৃষ্টি গিয়ে পড়্‌ল—ধনিষ্ঠা একেবারে চম্‌কে উঠ্‌ল! রাজকুমার-বাবু সরে' যেতেই মেঘাবরণমুক্ত সূর্য্যের ন্যায়, ভস্মাপসৃত অগ্নির ন্যায় যে তেজঃপুঞ্জমূর্ত্তি ধনিষ্ঠার দৃষ্টির সম্মুখে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠ্‌ল তার দিকেই তার মুগ্ধ নির্নিমেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ হ'য়ে গেল। আজ জমিদারের বাড়ীতে উৎসবের নিমন্ত্রণ; তাই সকলে যে যার উৎকৃষ্টতম পরিচ্ছদে সজ্জিত হ'য়ে এসেছে; কেবল ঐ ব্যক্তিরই সজ্জার নিতান্ত অভাব—তার পরণে একখানা মোটা খদ্দরের খাটো সাদা থান আর গায়েও একখানা মোটা খদ্দরের সাদা চাদর; এই তপস্বীর স্বল্প বেশেও তার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ও দীপ্তি আর সকলের চেষ্টাকৃত প্রসাধনের উপর নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেছে। তার আশে-পাশে সাম্‌নে কত লোক হাসি-মস্করা রঙ্গ-তামাসা কর্‌ছে; সকলের চঞ্চলতা ও বাচালতার মধ্যে গম্ভীর স্বপ্রতিষ্ঠ হ'য়ে বসে' আছে সে একা। তার দেহ দীর্ঘ ও পরিপুষ্ট, মুখ পূরন্ত গোল, তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, মুখশ্রী বুদ্ধির প্রভায় উদ্ভাসিত, তার উপর উদ্বেগের ছায়াপাত হওয়াতে সৌন্দর্য্যের সমস্ত উগ্রতা প্রশান্ত গাম্ভীর্য্যে পরিণত হ'য়ে উঠেছে। যতক্ষণ ব্রাহ্মণভোজন হ'ল ততক্ষণ ধনিষ্ঠা এক-দৃষ্টে কেবল সেই লোকটিকেই দেখ্‌ছিল, তার সমস্ত মনোযোগ সেই লোকটির নিকটে আবদ্ধ হ'য়ে পড়েছিল। একজন পাচক পরিবেশকের পা লেগে একটা জলের গেলাস উল্‌টে গিয়ে দুজন ব্রাহ্মণের যে খাওয়া নষ্ট হ'য়ে গেল এবং সেই জল গড়িয়ে এসে নীচের রকে উপবিষ্ট একজন কায়স্থ ভদ্রলোকের গায়ের শালখানা তর কারি-ধোয়া হলুদের ছোপ লেগে নোঙ্‌রা করে' দিলে এব তার ফলে ভোজনকারীদের ও তদারককারীদের মধ্যে যে বিষম চাঞ্চল্য উপস্থিত হ'ল, ধনিষ্ঠা তা লক্ষ্য কর্‌তে পার্‌লে না। তার মনে কেবলই প্রশ্নের পর প্রশ্ন উদয় হচ্ছিল—এই লোকটি কে? এর নাম কি? এর বাড়ী কোথায়? এর পরিচয় কি? এর বাড়ীতে আর কে-কে আছে? এর স্ত্রী—সে কি রূপেগুণে এর উপযুক্ত? সে কী সৌভাগ্যবতী!

ব্রাহ্মণ-ভোজন সমাপ্ত হ'য়ে গেল। ব্রাহ্মণেরা আসন ছেড়ে উঠে একে-একে দালান থেকে বেরিয়ে যেতে লাগ্‌ল। ধনিষ্ঠা যে-লোকটিকে এতক্ষণ দেখ্‌ছিল, সে তার দৃষ্টির বহির্ভূত হ'য়ে যেতেই ধনিষ্ঠার চমক ভাঙ্‌ল এবং সে চীৎকার করে' ডাক্‌তে লাগ্‌ল—মাধী, মাধী, ও মাধী……

আহ্বানের মধ্যে ব্যগ্রতার আভাস পেয়ে মাধবী দাসী পান-সাজা ফেলে' রেখে খয়ের-চূণ-মাখা-হাতেই সেখানে ছুটে' এল।

তাকে দূরে আস্‌তে দেখে'ই ধনিষ্ঠা ব্যগ্রভাবে বলে' উঠ্‌ল—তুই ছুটে' দেওয়ানজী মশায়ের কাছে যা, তাঁকে আমার কাছে চট্ করে' ডেকে নিয়ে আয়………

মাধবী এই কথা শুনে'ই ফিরে' ছুট্‌ল………

ধনিষ্ঠা তার পিছন দিক্ থেকে ডেকে আবার বল্‌লে—দেখ, দেওয়ানজি মশায়কে বল্‌বি—ব্রাহ্মণদেরকে যেন একটু অপেক্ষা কর্‌তে বলেন, তাঁদের একজনও যেন চলে' না যান।

ক্ষণকাল পরেই বৃদ্ধ রাজকুমার-বাবু ধনিষ্ঠার কাছে এসে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—কি মা, আমাকে স্মরণ করেছ কেন?

ধনিষ্ঠার মুখ অকস্মাৎ অকারণে লাল হ'য়ে উঠ্‌ল, সে তৎক্ষণাৎ রাজকুমার-বাবুর প্রশ্নের উত্তর দিতে পার্‌লে না; সে মাথার কাপড় একটু সাম্‌নে টেনে দিয়ে একবার ঢোক গিলে মৃদুস্বরে বল্‌লে—ব্রাহ্মণ-ক'জনকে কিছু ভোজন-দক্ষিণা দিলে হয় না?

রাজকুমার বাবু বল্‌লেন—এ ত অতি উত্তম সঙ্কল্প! কত করে' দিতে হবে, হুকুম করে' দাও, আমি দিয়ে দিচ্ছি।

ধনিষ্ঠা আবার লাল হ'য়ে উঠ্‌ল, আবার মুহূর্ত্ত-কাল ইতস্তত করে' সে অতি মৃদুস্বরে বল্‌লে—আমি নিজে হাতে করে' দিতে চাই।

রাজকুমার-বাবু বল্‌লেন—বেশ। আমি সবাইকে উপরের দালানে ডেকে আন্‌ছি, তুমি নিজে হাতে করে' সকলকে দক্ষিণা দেবে এস।

ধনিষ্ঠার মুখের উপর দিয়ে লালের ছোপ আর-একবার বুলিয়ে গেল।

ধনিষ্ঠার মুখে বারম্বার বর্ণবিপর্য্যয় লক্ষ্য করে' রাজকুমার-বাবু বল্‌লেন—তা এতে আর লজ্জা কি মা, এরা সবাই তোমার চাকর, তোমার সন্তানতুল্য… …

ধনিষ্ঠার মুখ এবার এমন বেশী লাল হ'য়ে উঠ্‌ল যে, রাজকুমার-বাবু যে-কথা বল্‌তে আরম্ভ করেছিলেন সে-কথা সমাপ্ত না করে'ই চলে' যেতে-যেতে বল্‌লেন—ব্রাহ্মণদের আঁচানো এতক্ষণ হ'য়ে গেছে, আমি তাদের ডেকে আনি গিয়ে……

রাজকুমার-বাবু কিছু-দূর অগ্রসর হ'য়ে গেলে ধনিষ্ঠা ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—সবসুদ্ধ কতজন ব্রাহ্মণ হবেন? মাধী আপনার সঙ্গে যাচ্ছে আমাকে আগেই একটু বলে' পাঠাবেন……

রাজকুমার-বাবু যেতে-যেতে ফিরে' দাঁড়িয়ে বলে' গেলেন—আমার গোণা আছে, ব্রাহ্মণ বাইশ জন।

রাজকুমার-বাবু ব্রাহ্মণদের ডেকে আন্‌তে গেলেন। ধনিষ্ঠা দক্ষিণার আয়োজন করতে মালখানা-ঘরে গিয়ে ঢুক্‌ল।

উপরের দালানে ব্রাহ্মণেরা এসে সমবেত হয়েছে। ধনিষ্ঠা একখানি উজ্জ্বল গরদের থান-কাপড় পরে' মাথায় ঈষৎ অবগুণ্ঠন টেনে আঁচলটি গলার পিছনে দিয়ে সাম্‌নের দিকে ফিরিয়ে এনে গললগ্নীকৃতবাসে ব্রাহ্মণদের সম্মুখে মন্থর-গমনে এসে উপস্থিত হ'ল; তার পিছনে-পিছনে দাসী মাধবী একখানি বড় রূপার থালার উপর বাইশ ভাগে সাজানো একটি করে' টাকা, পৈতা ও সুপারি বহন করে' নিয়ে এল। ধনিষ্ঠা এসেই গলায়-ঘেরা আঁচলটিকে দুদিক্ থেকে দুহাতে ধরে' বুকের সাম্‌নে হাত জোড় করে' মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে' মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে সকলকে প্রণাম কর্‌লে। উঠে দাঁড়িয়ে তার পর মাধবীর হাতের থালা থেকে টাকা পৈতা ও সুপারি এক-এক ভাগ তুলে' দুহাতের অঞ্জলিতে নিতে লাগ্‌ল এবং এক-এক জন ব্রাহ্মণ অগ্রসর হ'য়ে এসে তার সাম্‌নে অঞ্জলি পাত্‌লে সেই অঞ্জলিতে দক্ষিণা দিয়ে দিতে লাগ্‌ল এবং দক্ষিণা দেওয়ার পর আবার করজোড় করে' তার উপর নত মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করতে লাগ্‌ল। পাঁচ-সাত জনের পরেই সেই প্রদীপ্ত-পাবকতুল্য লোকটি অগ্রসর হ'য়ে এসে তার সাম্‌নে হাত পাত্‌লে। চকিত-দৃষ্টিতে একবার তাকে দেখে' নিয়ে থালা থেকে দক্ষিণা তুলে' তার হাতে দিতে গিয়েই ধনিষ্ঠার মনে হ'ল ভিখারী শিবকে অন্নপূর্ণার ভিক্ষা দেওয়ার কথা; অম্‌নি তার হাত এমন কেঁপে উঠ্‌ল যে দক্ষিণার টাকাটি ব্রাহ্মণের অঞ্জলির খোলের মধ্যে না পড়ে' এক পাশে পড়্‌ল এবং সেখান থেকে ছিট্‌কে মাটিতে পড়ে' সশব্দে মার্ব্বেল পাথরের মেঝের উপর দিয়ে গড়িয়ে অনেক দূরে চলে' গেল। ধনিষ্ঠা লজ্জায় একেবারে লাল হ'য়ে উঠ্‌ল। এক-জন ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি সেই টাকাটি কুড়িয়ে রাজকুমার-বাবুর হাতে দিলে এবং রাজকুমার-বাবু ধনিষ্ঠাকে এনে দিলেন; ধনিষ্ঠা সেই টাকাটি আবার ব্রাহ্মণের অঞ্জলিতে সন্তর্পণে অর্পণ কর্‌লে।

সকলকে দক্ষিণা দেওয়া হ'য়ে গেল। সকলে চলে' গেল। তখন রাজকুমার-বাবু জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—কালকে যে ব্রাহ্মণ-ভোজন হবে, তাঁদেরও কি দক্ষিণা দেওয়া হবে? তাঁদেরও কি তুমি নিজে হাতে করে' দক্ষিণা দেবে?

ধনিষ্ঠা মুখ নত করে' মৃদুস্বরে বল্‌লে—না, তাঁদেরকে আপনিই দেবেন। এঁরা সব আমার কর্ম্মচারী, এঁদের অনেকের সাম্‌নেই আমার এখন বেরুতে হবে, সকলকে অল্পে-অল্পে চিনে' রাখাও আমার দরকার……

রাজকুমার-বাবু বল্‌লেন—এ অতি ঠিক কথা বলেছ মা। আগে যদি মনে করে' দিতে তা হ'লে প্রত্যেকের

দক্ষিণা নেবার সময় আমি একে-একে সকলের পরিচয় দিয়ে দিতাম।

ধনিষ্ঠা মৃদু হেসে বল্লে—কয়েকজনের চেহারা আমার এখনও মনে আছে, তাঁরা কে কি করেন?... ...

রাজকুমার-বাবু বল্লেন—কি-রকম চেহারা বলো দেখি?

ধনিষ্ঠার বর্ণনা শু'নে-শু'নে রাজকুমার-বাবু প্রত্যেক বর্ণিত ব্যক্তির পরিচয় দিতে লাগ্‌লেন।

—ঐ যে খুব মোটা বেঁটে মাথায় টাক......

...হ্যাঁ হ্যাঁ, উনি গঙ্গাধর মুখুয্যে, আমাদের জমানবিশ।

—খুব কালো রোগা, দাঁত নেই, গায়ে সবুজ শাল ছিল......

—হ্যাঁ, উনি ঈশান চাটুয্যে, আমাদের মহাফেজ।

—আর একজনের চেহারা ঠিক মনে নেই, দক্ষিণা দেবার সময় দেখ্‌লাম হাতে একটা বেশী আঙুল আছে...

—হ্যাঁ, উনি জমা সেরেস্তার মোহরের, নাম প্যারীলাল বাঁড়ুয্যে।

ধনিষ্ঠা রাজকুমার-বাবুর দিকে মুখ ঈষৎ তুলে' বল্লে—আর চেহারা ত বিশেষ কারো মনে পড়্‌ছে না......এক-জন কেবল একখানা চাদর গায়ে দিয়ে খালিপায়ে এসে-ছিলেন......

—হ্যাঁ হ্যাঁ, উনি অনল ঘোষাল .....

—উনিই? আপনি বল্‌ছিলেন না, যে ওঁরই বুদ্ধি-পরামর্শে আমাদের জমিদারী কোর্ট্ অব্ ওয়ার্ড্‌সের কবল থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে?

—হাঁ। ভারি বুদ্ধিমান্ বিচক্ষণ লোক। বয়স অল্প, কিন্তু খুব ভারিক্কি। বাহ্যিক চেহারা যেমন সুন্দর, স্বভাব-চরিত্রও তেম্‌নি......

—উনি অমন সন্ন্যাসীর মতন কেন থাকেন?

—ওঁর ভাই—আমাদের বাবু-মহাশয়ের থিয়েটারের সেই অনিল, যে প্রধান নায়িকার ভূমিকা অভিনয় করত...

—ও! ইনি সেই অনিলের দাদা বুঝি?

—হ্যাঁ, নিজের দাদা নয়, বৈমাত্রেয় ভাই......

—অনিল এখন কোথায়? কি করছে?

—অনিল বাঙ্গালী-পল্টনে ভর্ত্তি হ'য়ে যুদ্ধে গিয়েছিল; সেখান থেকে খবর দিয়েছে, সে কি পড়্‌তে বিলেত যাচ্ছে; দাদাকে লিখেছে পড়ার খরচ জোগাতে; তাই অনল-বাবু নিজের সমস্ত খরচ যথাসম্ভব সংক্ষেপ করে' ভাইয়ের জন্যে টাকা জমাচ্ছেন—শীত-গ্রীষ্মের ঐ এক পোষাক, এক খাটো কাপড় আর চাদর; আহার দিনান্তে এক-পাকে দুটি ভাতে ভাত, কোনোদিন বা একটু খিচুড়ি।

বৈমাত্রেয় ভাইয়ের জন্যে এই নিদারুণ কষ্ট স্বীকারের পরিচয় পেয়ে ধনিষ্ঠার অনলের প্রতি মন সম্ভ্রমে ও শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌ল; প্রথম দর্শনেই যাকে ভালো লেগেছিল, যার কাছে এষ্টেট রক্ষার জন্য কৃতজ্ঞতা অন্তরে সঞ্চিত হ'য়ে ছিল বলে' প্রথম-দর্শনের ভালোলাগা সম্ভ্রম উদ্রেক করেছিল, এখন সেই ভালো লাগা শ্রদ্ধায় অভিষিক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। ধনিষ্ঠা রাজকুমার-বাবুকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—ওঁর বাড়ীর লোকেদের খরচ চলে' কেমন করে'?

—ওঁর বাড়ীতে আর কেউ নেই; বিয়ে কর্‌লে নিজের খরচ বেড়ে যাবে এবং এই ভাইয়ের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘট্‌তে পারে ভেবে উনি কখনো বিয়ে কর্‌বেন না ঠিক করেছেন।

এই সংবাদে ধনিষ্ঠার মন অকস্মাৎ কেন নিরতিশয় প্রফুল্ল হ'য়ে উঠ্‌ল। সে রাজকুমার-বাবুকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—উনি আমাদের এখান থেকে কত পান?

—পঞ্চাশ টাকা।

—মোটে পঞ্চাশ টাকা? যাঁর কাছ থেকে এষ্টেট্ এত উপকার পেয়েছে তাঁকে এত কম দেওয়া ভালো হচ্ছে না। ওঁকে এই মাস থেকে অন্ততঃ একশ টাকা করে' দেওয়া উচিত।

—বেতন একেবারে দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিলে পুরাতন কর্ম্মচারীরা অসন্তুষ্ট হবে।

—কেউ যদি অসন্তোষ প্রকাশ করে তাকে জানিয়ে দেবেন, পুরাতন হোক নূতন হোক এষ্টেট্ যাঁর কাছ থেকে বেশী কাজ পাবে তাঁকেই বেশী পুরস্কার দেবে।

রাজকুমার-বাবু কর্ত্রীর আদেশের দৃঢ়তা দেখে' আর প্রতিবাদ কর্‌তে সাহস কর্‌লেন না। তিনি "আচ্ছা" বলে' বিদায় নেবার উদ্যোগ কর্‌ছেন দেখে' ধনিষ্ঠা বল্লে—আর এক কথা। অনিলকে উনি যে কি-রকম ভালোবাস্‌তেন তা ত আপনারা জানেন; অনিল যখন বিলেত গিয়ে

লেখাপড়া শিখে' মানুষ হ'তে চেষ্টা কর্‌ছে তখন তাকেও এষ্টেট্ থেকে কিছু সাহায্য করা উচিত; তার যে এখানে লেখাপড়া হয়নি তার জন্যে ত এই এষ্টেটের মালিকই দায়ী।

রাজকুমার-বাবুর মনে পড়্‌ল এই বউরাণী স্বামীকে সর্ব্বদা অনিলের সঙ্গে থাকতে দেখে' ঈর্ষ্যান্বিত হ'য়ে অনিলের নাম কখনো মুখে আন্‌তেন না, তার কথা উল্লেখ করতে হ'লে ঘৃণা ও হিংসা-ভরা স্বরে বল্‌তেন আমার সতীন! যাকে অবলম্বন করে' এই হিংসা উদগত হয়েছিল তার অন্তর্দ্ধানে তার প্রিয়পাত্র হিংসার পাত্র থেকে এখন অনুকম্পার পাত্র হ'য়ে উঠেছে; এই অনুকম্পা পরলোকগত প্রিয়তম পতির প্রতি প্রীতির স্মৃতির ফল। এইকথা মনে করে' রাজকুমার-বাবু বল্‌লেন—তা তাকেও মাসে-মাসে কিছু-কিছু দিলেই হবে।

ধনিষ্ঠা মাথা নীচু করে' দৃঢ়স্বরে বল্‌লে—অনিলের দাদাকে বলে' দেবেন—অনিলের বিলেতে পড়ার সমস্ত খরচ এষ্টেট্ থেকে দেওয়া হবে।

রাজকুমার-বাবু আশ্চর্য্য অবাক্ হ'য়ে ধনিষ্ঠার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ধনিষ্ঠা ধীরমন্থরপদে দালান থেকে ঘরের মধ্যে চলে' গেল।

ধনিষ্ঠা যুবতী, সুন্দরী, জমিদারের বিধবা পত্নী। ধনিষ্ঠার স্বামী প্রফুল্ল-বাবু সুশিক্ষিত না হ'লেও তার চাল-চলন ছিল ইংরেজি-ধরণের; সে স্ত্রীকে নিয়ে খোলা গাড়ীতে বেড়াতে যেত; স্ত্রীর সঙ্গে যে-ঘরে বসে' থাকত, কোনো কর্ম্মচারী বা প্রজা কোনো বিষয়-কর্ম্মের উপলক্ষে তার দর্শন-প্রার্থী হ'লে সেই ঘরেই স্ত্রীর সামনেই তাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করত; বাইরের ঘরে কোনো অভ্যাগত উপস্থিত থাকার সময় যদি হঠাৎ ধনিষ্ঠা সেই ঘরে এসে পড়্‌ত, তা হ'লে সেই অভ্যাগত যে-পরিমাণ ব্যস্ত ও সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়্‌ত তার সিকিও ধনিষ্ঠা বা প্রফুল্ল-বাবু হ'ত না; সেই অভ্যাগত পূর্ব্ব-পরিচিত বা পূর্ব্ব-দৃষ্ট হ'লে ধনিষ্ঠা বেশ সহজ অপ্রতিভভাবে স্বামীর পাশে এসে বস্‌ত, এবং সে-ব্যক্তি অপরিচিত অদৃষ্টপূর্ব্ব হ'লে ধীরে-ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে যেত; কখনো-কখনো বা প্রফুল্ল-বাবু স্ত্রীকে ডেকে আগন্তুকের সঙ্গে স্ত্রীর পরিচয় করিয়ে দিত। প্রফুল্ল ও ধনিষ্ঠার এইরূপ আচরণ অনেকের কাছেই উৎকট ও বিসদৃশ ফিরিঙ্গিয়ানা বলে' মনে হ'ত, কিন্তু কেউ মুখ ফুটে' জমিদার-দম্পতির আচরণের স্পষ্ট প্রতিবাদ বা নিন্দা করতে সাহস করত না।

গ্রামের যদু বাঁড়ুয্যে ধনিষ্ঠা-সম্বন্ধে অযথা নিন্দা প্রচার করেছিল শুনে' প্রফুল্ল নিজে তার বাড়ীতে গিয়ে যদু বাঁড়ুয্যেকে আচ্ছা করে' বেতিয়ে দিয়ে এসেছিল এবং বেত মার্‌বার সময় বলেছিল—"তুমি ব্রাহ্মণ বলে' আমি নিজে তোমার বাড়ীতে এসে তোমাকে বেতিয়ে গেলাম; তুমি ব্রাহ্মণ না হ'লে আমার হাড়ী পাইক দিয়ে কান ধরে' দেউড়িতে নিয়ে গিয়ে যে মুখে মিথ্যা কুৎসা রটনা করেছ সেই মুখ জুতো মেরে ভাঙিয়ে দেওয়াতাম!" এইকথা শোনার পর গ্রামের ব্রাহ্মণেরা প্রফুল্লর এমন ব্রাহ্মণ-ভক্তির পরিচয় পাওয়া সত্ত্বেও ধনিষ্ঠা-সম্বন্ধে আর কোনো অভিমত ব্যক্ত করতে সাহস করেনি; অপর জাতির লোকেরা ত ব্রাহ্মণেরই দাস!

স্বামীর কাছে এইরূপ প্রশ্রয়প্রাপ্তা যুবতী সুন্দরী নিঃসন্তানা ধনিষ্ঠা যখন বিধবা হ'য়ে সমস্ত সম্পত্তির মালিক ও সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হ'ল তখন গ্রামের পরার্থপ্রাণ প্রবীণ লোকগুলি আর-একবার চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ল। একটা কানাঘুষা জনরব ধনিষ্ঠার কানে এসেও পৌঁছল। ধনিষ্ঠা কিছুমাত্র বিচলিত না হ'য়ে দেওয়ান রাজকুমার বাবুকে ডেকে অতি ধীর প্রশান্তভাবে বল্‌লে—হরিশ চাটুয্যেকে বলে' দেবেন যদু বাঁড়ুয্যের কথাটা যেন মনে রাখে; তাঁর মতন আমি ত আর ব্রাহ্মণ-ভক্তি দেখাতে পার্‌ব না, আমাকে নগদি পাইক দিয়ে কাজ সার্‌তে হবে।

যে মেয়ে নিজের কুৎসা শুনে' কিছুমাত্র সঙ্কুচিত না হ'য়ে এমন সুস্পষ্টভাবে ভবিষ্যৎ ব্যবস্থার আভাস দিতে পারে তাকে নিয়ে নিন্দাচর্চ্চার বিলাসিতা করা যে বিশেষ নিরাপদ্ নয় তা বুঝ্‌তে গ্রামের কারো বাকী থাকেনি। কিন্তু সমস্ত গ্রামটা একটা প্রকাণ্ড ভীমরুলের

চাকের মতন হ'য়ে উঠ্‌ল—বাহিরে দিব্য নিরীহ, কিন্তু ভিতরে বিষ-মক্ষিকার প্রচ্ছন্ন গুঞ্জরণ।

কোর্ট অব্‌ ওয়ার্ডসের কবল থেকে জমিদারী নিষ্কৃতি পাওয়ার আনন্দ-উৎসবে ভূরিভোজন ও নগদ দক্ষিণা লাভ করে' পরম সন্তুষ্ট হ'য়ে গ্রামবাসীদের নিন্দা-রটনার উগ্র স্পৃহাটা আর একবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠ্‌তে চাচ্ছিল, কিন্তু পরের দ্বাদশীতেই বিধবা ধনিষ্ঠার পারণ-উপলক্ষে গ্রামের দ্বাদশটি ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণ হওয়াতে ব্রাহ্মণদের অন্তত মনের বাসনা মনের মধ্যেই চেপে রাখ্‌তে হ'ল, কারণ দ্বাদশীর সংখ্যা মাসে দুটা এবং গ্রামে ব্রাহ্মণের সংখ্যাও খুব অধিক নয়,—প্রত্যেকেই পালার প্রত্যাশা রাখে; জমিদার-বাড়ীর ভোজে মুখ খুল্‌বার লোভে ব্রাহ্মণরা এখন মুখ বুজ্‌তে বাধ্য হ'ল।

যে দ্বাদশ জন ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হ'ল তাদের কয়েক জন ধনিষ্ঠারই কর্ম্মচারী এবং তাদের অন্যতম অনল। ধনিষ্ঠা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ব্রাহ্মণভোজন করিয়ে দক্ষিণান্ত করলে। ব্রাহ্মণেরা ধনবতী যুবতী বিধবার এই ধর্ম্মনিষ্ঠা দেখে' ধন্য-ধন্য কর্‌তে-কর্‌তে বিদায় হ'ল। কেবল কোনো কথা বল্‌লে না গম্ভীর অনল; তবু তার প্রসন্ন মন চুপি চুপি বল্‌ছিল—কর্ত্রীঠাকুরাণীর ব্রাহ্মণে ভক্তি অক্ষয় হোক, আমি এক-ঘেয়ে ভাতে-ভাত-খাওয়া মুখটা মাঝে-মাঝে বদ্‌লে নিই।

অনল কলির ব্রাহ্মণ হ'লেও তার মানসিক আশীর্ব্বাদ যে অমোঘ তার পরিচয় আবার পনেরো দিন পরেই ফিরে' দ্বাদশীতে পাওয়া গেল। এবার পূর্ব্ব দ্বাদশীর নিমন্ত্রিত একাদশ ব্রাহ্মণকে বাদ দিয়ে অপর একাদশকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে, কিন্তু দ্বাদশ সংখ্যা পূরণ করছে অনল।

ব্রাহ্মণরা যখন ভোজন শেষ করে' এনেছে এবং তাদের পাতে দই-সন্দেশ দেওয়া হচ্ছে তখন মাধবী দাসী ব্রাহ্মণদের উদ্দেশ করে' বলে' উঠ্‌ল—এই চন্দ্রপুলি আর মনোহরা রাণীমা নিজের হাতে তৈরী করেছেন।

অম্‌নি ব্রাহ্মণেরা সেই দুই মিষ্টান্নের তারিফ্‌ কর্‌তে মুখর হ'য়ে উঠ্‌ল, যারা তখনও ভেঙে মুখে দেয়নি এবং এমন-কি যাদের পাতে তখনও সন্দেশ পড়েনি তারা পর্য্যন্ত মিষ্টান্নের মহিমা কীর্ত্তনে যোগ দিলে; কেবল একটিও কথা বল্‌লে না অনল, কিন্তু সে খেলে সকলের চেয়ে বেশী।

একজন ব্রাহ্মণ হেসে অনলকে বল্‌লে—অনল-বাবু, রাণীমার নিজের হাতের তৈরী সন্দেশ কেমন হয়েছে আপনি ত কিছু বল্‌লেন না?

অনল ঈষৎ হেসে বল্‌লে—একে ত কথা বল্‌বার অবসর নেই, বাগ্‌যন্ত্র এখন রসনা হ'য়ে অন্য কর্ম্মে ব্যাপৃত, তার উপর আবার বাক্যের চেয়ে ব্যবহারের প্রমাণটাকেই আমি প্রধান মনে করি।

অনলের কথা শুনে' অপর ব্রাহ্মণেরা উচ্চরবে হেসে উঠ্‌ল, এবং ধনিষ্ঠা লজ্জা পেয়ে রাঙা মুখ নত করে' চোখের কোণ দিয়ে একবার অনলকে দেখে' নিলে।

দুদিন পরেই আবার শিবরাত্রির পারণ। আবার দ্বাদশ ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণ। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের ব্রাহ্মণেরা বাদ পড়ে' একাদশ নূতনের নিমন্ত্রণ হ'ল; কিন্তু এবারও দ্বাদশ হ'ল অনল।

মাসে দুবার কি তিনবার ব্রাহ্মণদেরকে শুধু খাইয়ে ও কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিয়ে ধনিষ্ঠার মন তৃপ্ত হ'তে পার্‌ছিল না। ধনিষ্ঠা কুল-পুরোহিতকে ডাকিয়ে গলায় কাপড় দিয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করে' নিবেদন করলে—আমার এ জন্মের মতন ত কপাল পুড়ে' গেল; আস্‌ছে জন্মটা যাতে এমন দুঃখ না পাই, তার ব্যবস্থা আপনাকে করে' দিতে হবে। আমি ব্রত-নিয়ম দান-ধ্যান করতে চাই। আমি বিধবা মানুষ, এক মুঠি আলো চাল হ'লেই আমার যথেষ্ট, এত টাকা নিয়ে আমি করব কি? যা আমি হাতে তুলে' দিতে পারব, তাই আমার পর-জন্মের জন্যে তোলা থাক্‌বে।

পুরোহিত ঠাকুর তার ধনী যজমানের শুভমতির পরিচয় পেয়ে সুপ্রসন্ন-মুখে পুষ্পিতাগ্র টিকি দুলিয়ে বল্‌লে—এ মা তোমারই উপযুক্ত কথা! হবে না কেন?—যেমন শ্বশুর-কুল তেম্‌নি পিতৃকুল! তোমার ধর্ম্মনিষ্ঠাতে দুই কুলই উজ্জ্বল হবে!.........

ধনিষ্ঠা নিজের প্রশংসাবাদ শুনে' লজ্জিত হ'য়ে বল্‌লে—যে-ব্রততে আমি খুব দান করতে পারি, এমন একটা ব্রত বেছে আমাকে শিগ্‌গীর বল্‌বেন।

পুরোহিত-ঠাকুর বল্‌লে—বৈশাখ মাস পুণ্য মাস, মহাবিষুব সংক্রান্তির দিন দান সংক্রান্তির ব্রত নিলেই হবে; এই ব্রত প্রতিমাসের সংক্রান্তিতে ব্রাহ্মণকে বিবিধ দ্রব্য দান করে' সম্বৎসরে উদ্‌যাপন করতে হয়......

ধনিষ্ঠা ব্যস্ত হ'য়ে বলে' উঠ্‌ল—বৈশাখ মাসের ত এখনও দেড়মাস দেরী! এখনই কিছু আরম্ভ করা যায় না?

পুরোহিত ভেবে-চিন্তে বল্‌লে—ফাল্গুন চৈত্র মাসে কোনো ব্রতারম্ভের কথা ত মনে পড়ছে না। পাঁজি-পুঁথি দেখে' আপনাকে জানাবো।

ধনিষ্ঠা বল্‌লে—কথায় বলে হিন্দুর বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ আমাকে যা হয় একটা কিছু খুঁজে' দিতেই হবে।

যজমানের আগ্রহে যত না হোক, নিজের প্রাপ্তির সম্ভাবনার তাগাদায় পুরোহিত পাঁজি-পুঁথি ঘাঁট্‌কে এসে ধনিষ্ঠাকে খবর দিলে—চৈত্রমাস মধুমাস, মাধব-প্রিয়মাস; এই মাসে নারায়ণাত্মক নক্ষত্রপুরুষ নামে এক ব্রত করা যায়, মৎস্য পুরাণে এর ব্যবস্থা আছে; বিধবা নারীরও করণীয় এই ব্রত; বিষ্ণুপূজা করে' লক্ষ্মীকান্ত বিষ্ণুর উদ্দেশে নিবেদিত মনোজ্ঞ শয্যা বস্ত্র গাভী এবং বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর স্বর্ণপ্রতিমা 'পূর্ণে ব্রতে সর্ব্বগুণান্বিতায় বাগ্-রূপশীলায় চ সামগায়' সর্ব্বগুণান্বিত রূপবান্ ব্রাহ্মণকে দান কর্‌তে হয়। তাতে জন্ম-জন্মান্তরেও কখনো বিধবা হ'তে হ না—এই ব্রতের প্রার্থনাই হচ্ছে—

যথা ন লক্ষ্ম্যাঃশয়নং তব শূন্যং জনার্দ্দন।
শয্যা মমাপ্যশূন্যাস্তু কৃষ্ণ জন্মনি জন্মনি॥—

হে জনার্দ্দন, তোমার শয্যা যেমন কখনও লক্ষ্মী-শূন্য হয় না, আমার শয্যাও যেন জন্মে-জন্মে তেম্‌নি অশূন্য হয়।..........

পুরোহিতের কথা সমাপ্ত হ'তে-না হ'তেই ধনিষ্ঠা পরম উৎসাহিতা হ'য়ে বলে' উঠ্‌ল—আমি এই ব্রতই করব।

যথাকালে যথানিয়মে ঐ ব্রত অনুষ্ঠিত হ'ল, এবং ব্রতে উৎসৃষ্ট বহুমূল্য দ্রব্যসম্ভার রূপগুণান্বিত সদ্‌ব্রাহ্মণ বলে' অনলকে দান করা হ'ল।

এর পরে প্রত্যেকমাসের সংক্রান্তিতে বা কোনো বিশেষ তিথিতে যে-কোনো ব্রত সন্ধান করে' পাওয়া যেতে লাগ্‌ল, ধনিষ্ঠা তারই অনুষ্ঠানে ব্রতী হ'তে লাগ্‌ল এবং পাদুকা ছত্র শয্যা তৈজসপত্র বস্ত্র উত্তরীয় প্রভৃতি বিবিধ উপহারে অনলের গৃহ পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। সঙ্গে-সঙ্গে অনলের বেশ-ভূষারও বিলক্ষণ পরিবর্ত্তন সকলেই লক্ষ্য করছিল।

একজন একদিন হাসি চেপে অনলকে জিজ্ঞাসা করলে—আপনার বৈরাগীর ভেক্ যে একেবারে বদ্‌লে গেল!

অনল হেসে উত্তর দিলে—জুটত না বলে' দায়ে পড়ে' বৈরাগী সাজ্‌তে হয়েছিল; এখন কর্ত্রী ঠাকুরাণীর পুণ্যে যে সব জিনিস জুটে' যাচ্ছে সে-সব ব্যবহার না করে' বাজারে নিয়ে গিয়ে ত আর বেচ্‌তে পারি না। আমি বৈরাগী সেজেছিলাম ভাইয়ের অভাব-মোচনের জন্যে। তার অভাবও যিনি মিটিয়েছেন, আমার অভাবও তাঁরই দৌলতে মিট্‌ছে—শুধু আমার নয়, গ্রামের কোন্ ব্রাহ্মণের অভাব না মিটেছে?

সেই লোকটি আবার হাসি চেপে মনে-মনে বল্‌লে—তোমার একটু বিশেষ।

এই কথাটা অনলের মনের মধ্যেও অস্পষ্টভাবে উদয় হয়েছিল, তাই সে অতখানি কৈফিয়ৎ দিয়ে নিজের অকারণ সঙ্কোচ চাপা দিতে চেষ্টা করলে।

(ক্রমশঃ)

মৌমাছির ভাষা

শ্রী সুধাময়ী দেবী

বহুকাল হইতে বহু বৈজ্ঞানিক, কবি ও পণ্ডিত ব্যক্তি মৌমাছিদের জীবনযাত্রা-সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছেন; নানা গ্রন্থ এবিষয়ে লেখা হইয়াছে; কিন্তু এযাবৎ মৌমাছিরা কি উপায়ে পরস্পরের সঙ্গে কথা-বার্ত্তা চালায়, এই তথ্যটি কেহই বাহির করিতে পারেন নাই।

পরীক্ষার জন্য ছাদ-দেওয়া ও কাঁচ-ঘেরা মৌচাক
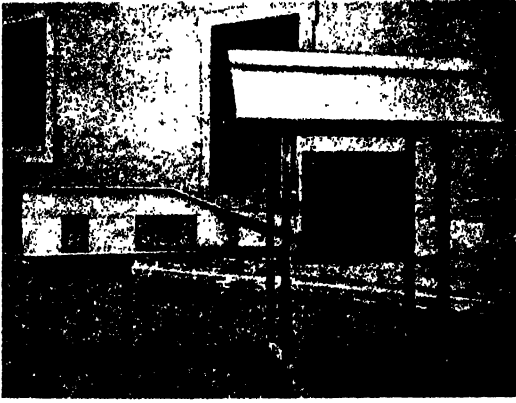
'হের্ কার্ল্ ফন্ ফ্রিশ্ (Herr Karl von Frisch) নামে একজন জার্মান পণ্ডিত সম্প্রতি এবিষয়ে তাঁহার গবেষণার ফল এক পত্রিকায় ব্যক্ত করিয়াছেন। আশা করা যায়, এই গবেষণা সকলের নিকটেই খুব কৌতুহল-জনক হইবে।

এই পণ্ডিতের মতে একধরণের মৌমাছি কেবল একটি জাতের ফুলের মধু সংগ্রহ করে, নানা ফুলে ঘুরিয়া বেড়ায় না। এই একনিষ্ঠতা কি করিয়া তাহারা পাইল? তাহাদের চোখ আছে সত্য, কিন্তু বর্ণ-জ্ঞান এত বেশী নাই যে, কেবল রঙের ভেদ বিচার করিয়া তাহারা নির্দ্দিষ্ট ফুলের সন্ধান পায়, তবে তাদের ঘ্রাণশক্তি খুব প্রবল, এবং গন্ধের স্মৃতি তাহাদের খুব তীক্ষ্ণ। ফুলের গন্ধ দ্বারাই তাহারা একজাতীয় ফুলের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ায়। হের্ ফন্ ফ্রিশ্ দেখাইয়াছেন, যে, মৌমাছিদের ঘ্রাণযন্ত্র তাহাদের দাড়ার মধ্যে থাকে। দাড়া কাটিয়া ফেলিলে তাহারা রং দেখিয়া কোনো রকমে তাহাদের বাঞ্ছিত ফুল বাহির করে, কিন্তু তাহাদের আঘ্রাণ-শক্তি একেবারে চলিয়া যায়।

বিভিন্ন ফুলের গন্ধ-ভেদের দ্বারা কেবল যে বিভিন্ন-প্রকার মৌমাছিকে আকর্ষণ করা যায় তাহা নয়, মৌমাছিদের গতিবিধি লক্ষ্য করিলে ফুলের জাতিতত্ত্বও অনেকাংশে জানা যায়। কিন্তু যেটি আমাদের প্রধান জ্ঞাতব্য তাহা এই যে, এই ঘ্রাণশক্তি দ্বারা মৌমাছিরা পরস্পরের মধ্যে কিরূপে খবরের আদান-প্রদান করে। হের্ ফন্ ফ্রিশ্ প্রথমে তাঁহার বাগানে স্থানে-স্থানে কাগজে মধু মাখাইয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিলেন। কয়েক ঘণ্টা পরে একটি মৌমাছি তাহার সন্ধান পায়। তাহার পর দেখা গেল মিনিট কতকের মধ্যেই একই চাকের শত-শত মৌমাছি সেই মধুর লোভে আসিয়া উপস্থিত।

ইহার পর সেই পণ্ডিত একটি মৌচাক নিজের হাতে নির্ম্মাণ করিলেন। মধুভাণ্ডগুলি একটির পর আর-একটি
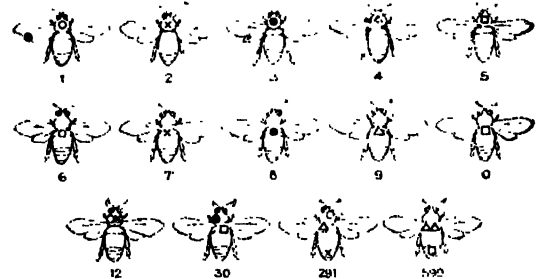
মৌমাছি লক্ষ্য করিবার প্রথা—৫৯৯টি মৌমাছিকে হাজার-হাজার মৌমাছির মধ্য হইতে বাছিয়া বাহির করা

করিয়া স্তরে-স্তরে সাজাইয়া দিলেন। তার পর কাঁচ দিয়া সেগুলি ঘিরিয়া লইলেন। কাঁচ থাকাতে মৌমাছিরা বিশেষ অসুবিধা বোধ করিল বলিয়া মনে হইল না। সেই চাকে

৩০ হাজার হইতে ৫০ হাজারের মধ্যে মৌমাছি থাকিত। হের্ ফন্ ফ্রিশ্ সেগুলির মধ্যে ৫৯৯টি মৌমাছিকে পাঁচ রকম বিভিন্ন রঙে চিহ্নিত করিয়াছিলেন। তিনি এত বেশী এদের চিনিয়াছিলেন যে, নির্দ্দিষ্ট মৌমাছিগুলি যখন উড়িয়া চলিয়া যাইত তখনও তাদের চিনিতে পারিতেন।

মধু খাইয়া মৌমাছির নাচ

এখানে বলিয়া রাখা দরকার, যে, এই পণ্ডিত বহু বৎসর ধরিয়া বহুবার পরীক্ষা করিয়া তাঁহার সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, সুতরাং অস্পষ্টতা বা ভ্রম ইহার মধ্যে থাকা সম্ভব নয়।

তিনি ক্রমশঃ লক্ষ্য করিয়াছেন যে, একটি মৌমাছি একস্থানের মধু সংগ্রহ করিয়া নিজে খানিকটা খাইয়া অবশিষ্ট মধু চাকের দিকে লইয়া যায়, সেখানে কতকগুলির মধ্যে তাহা বিলাইয়া দেয়, তাহারা কতকটা নিজেরা খাইয়া
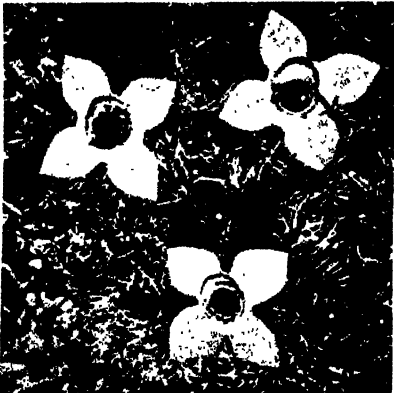
পালিত মৌমাছিদিগকে খাওয়ানো—কৃত্রিম নীল ফুলের সাহায্যে

বাকীটা জমাইয়া রাখে। এইরূপে ভাগাভাগি করিয়া মধু সংগ্রহের কাজ চলে।

মধু সঙ্গীদের মধ্যে বিলাইয়াই মৌমাছিটি ক্ষান্ত হয় না; সে এক অদ্ভুত-রকমের নাচ আরম্ভ করে। দ্রুতলঘু গতিতে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া খানিকক্ষণ উত্তেজিত-ভাবে সে নাচে, তার পর হঠাৎ উল্টাদিকে ফিরিয়া গিয়া আবার সেই-রকম নাচ আরম্ভ করে। তিন বার হইতে কুড়ি বার পর্য্যন্ত এরূপ-ভাবে নাচিয়া হঠাৎ চাক হইতে বাহির হইয়া
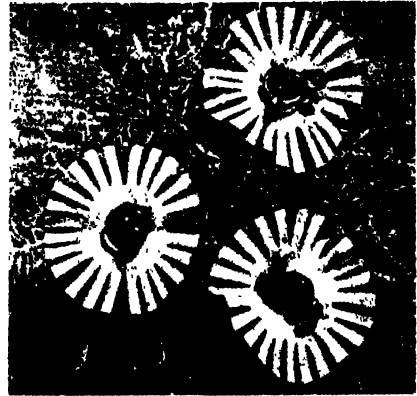
বিভিন্ন রং ও আকারের কৃত্রিম ফুল

সে তার নব-আবিষ্কৃত ফুলের সন্ধানে সেইদিকে ছোটে। নাচিবার সময় থাকিয়া-থাকিয়া মৌমাছিটি তার সঙ্গীদের ঠেলা দেয়। ঠেলা খাইয়া তাহারা কি ব্যাপার দেখিবার জন্য ফেরে। সঙ্গে-সঙ্গে তাহারা উন্মত্তভাবে নাচিতে আরম্ভ করে। নাচের সময় পরস্পরকে পরস্পরের দাড়া দিয়া বেষ্টন করিয়া লয়, এইরূপে প্রথম মৌমাছিটির পিছনে মস্ত একটি দল জুটিয়া যায়। থাকিয়া-থাকিয়া একটি করিয়া মৌমাছি দল ছাড়িয়া উড়িয়া পলায়; যথাসময়ে আবার ফিরিয়া আসিয়া নাচে যোগ দেয়।

এই নাচের মধ্য দিয়া নূতন ফুলের খবর মৌমাছিদের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। প্রথম মৌমাছিটির সঙ্গে যাইয়া অন্য মৌমাছিরা সেই স্থানটি দেখিয়া লয়, এমন নহে; তাহার ফিরিয়া আসার অপেক্ষাও করে না, সে ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বেই নাচিতে-নাচিতে অপর মৌমাছিরা একে-একে মধুর উদ্দেশে উড়িয়া যায়। হের্ ফন্ এই তথ্যটি ভালো করিয়া নিরূপণ করিবার জন্য তাঁহার বাগানের

চাকের পশ্চিমে পনের গজ দূরে একটি বাটিতে মধু রাখিয়া তাঁহার চিহ্নিত মৌমাছিদের আনিয়া খাওয়ান। পরে এইরকম মধুর বাটি কিছু দূরে-দূরে তিনি রাখিয়া দেন। চিহ্নিত মৌমাছিরা মধু খাইয়া নাচিবার পর অতি অল্প-সময়ের মধ্যে নিকট ও দূরের প্রত্যেকটি মধুর বাটির সন্ধান সেই চাকের অপর মৌমাছিরা পায় ও তাহা হইতে মধু সংগ্রহ করে। চিহ্নিত মৌমাছিগুলিকে মধু খাওয়ানো না হইলে আর নাচের ভিতর দিয়া সেই খবর মৌচাকের সকল মৌমাছির মধ্যে ছড়াইয়া না পড়িলে এত শীঘ্র সেই মধুর সন্ধান হইত না, ইহা নিশ্চয়। খাদ্যদ্রব্য খুব দূরে

মৌমাছিদিগকে খাওয়ানো। মৌমাছির যে-অঙ্গ হইতে সুগন্ধ বাহির হয় তীর দিয়া তাহা দেখানো হইতেছে

থাকিলেও এই উপায়ে তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে মৌমাছিদের দেরি লাগে না। একবার সেই মৌচাক হইতে এক কিলোমিটার (৩২৮০ ফুট) দূরে ঐরূপ একটি মধুভাণ্ড রাখা হইয়াছিল। অনেক পাহাড়, অনেক মাঠ পার হইয়া তবে সেখানে পৌছানো যায়। চার ঘণ্টা পরে মৌমাছিরা সেটিকেও বাহির করে। তাহা হইতে মধু খাইতে যখন তাহারা ব্যস্ত তখন সেগুলিকে চিহ্নিত করিয়া লওয়া হয় এবং মধু লইয়া যখন তাহারা চাকে ফেরে তখন একদল পর্যাবেক্ষক তাহাদের সঙ্গে-সঙ্গে আসে।

নাচের পর মৌমাছিগুলি মধুর সন্ধানে বাহির হয়। প্রথমে কাছাকাছি সকল স্থানে খুঁজিয়া ক্রমশঃ দূরে আগাইয়া অবশেষে মাঠের পারে এই স্থানটি তাহারা আবিষ্কার করে, তাহাদের পরিশ্রমের যথোচিত পুরস্কার তাহারা পায়।

হের্ ফন্ ফ্রিশ্ আর-একটি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। মধুশূন্য করিয়া সত্যিকারের ফুলের মধ্যে চিনি ও জল তিনি ভরিয়া রাখিয়া দিয়াছেন। ফুলের গন্ধে পূর্ব্বের মতোই মৌমাছিরা আকৃষ্ট হইয়া আসে। ফুলগুলির ঠিক পাশে কতকগুলি গুল্ম রাখিয়া হের্ ফন্ দেখিয়াছেন গুল্মগুলির দিকে না তাকাইয়া ফুলগুলির কাছেই তাহারা ক্রমাগত আসে ও বারবার ধৈর্য্যের সঙ্গে সেগুলির মধ্যে মধু অন্বেষণ করে। যদি গুল্মগুলির মধ্যে মধুভরা ফুল রাখিয়া মধুশূন্য ফুলের মধ্যে গুল্ম রাখা হয়, তাহা হইলে ফুলগুলিকে অগ্রাহ্য করিয়া তাহারা গুল্মের নিকটই যায়। ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, মৌমাছিরা ফুলের বিভিন্ন গন্ধের নির্দ্দেশ করিতে কিরূপ নিপুণ এবং নাচের মধ্য দিয়া কিরূপে তাহারা পরস্পরকে জানাইয়া দেয় যে, কোন্-প্রকার ফুলের অন্বেষণ করিতে হইবে। যদি একটি ফুলের মধ্যে মধু থাকে, তবে সকলগুলির মধ্যে মধু থাক্ বা না থাক্, সেই-জাতীয় প্রত্যেকটি ফুল তাহারা তন্ন-তন্ন করিয়া খুঁজিয়া মধুভরা ফুলটির সন্ধান করিয়া ছাড়িবে; মধুর লোভে কিন্তু অন্যজাতীয় ফুলের নিকট যাইবে না।

কৃত্রিম ফুলের মধ্যে 'পেপারমিণ্টে'র মতো যদি সুস্বাদু ও সুগন্ধি পদার্থ রাখিয়া দেওয়া হয়, তাহাতেও মৌমাছিরা আকৃষ্ট হয় এবং ঐরূপ গন্ধ যেখান হইতে পায় সেইদিকেই তাহারা ধাবিত হয়।
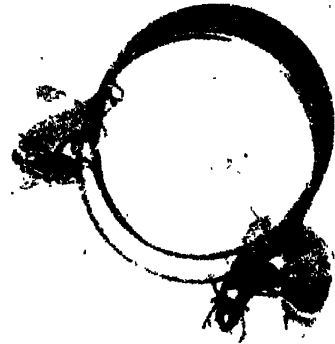
মৌমাছি—কৃত্রিম ভোজন-স্থানে

মৌমাছিদের এই গন্ধের ভেদাভেদ-জ্ঞান থাকাতে বিভিন্ন ফুলের বিকাশেরও সহায়তা হয়। কারণ, যদি একটি নূতন-জাতীয় ফুলের সন্ধান একটি মৌমাছি পায় তবে সেইজাতীয় ফুল যেখানে যত থাক্ তাহার সন্ধান হইবেই এবং মৌমাছির সাহায্যে তাহাদের বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী

আর-একটি বিষয় এই পণ্ডিত লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছেন যে, আহার্য্য সামগ্রীর প্রাচুর্য্য-অপ্রাচুর্য্য-অনুসারে অল্প বা বহুসংখ্যক মৌমাছি আকৃষ্ট হয়। এক্ষেত্রেও মনে হয়, তাহাদের মধ্যে যেন খবরটি কোনো উপায়ে পরস্পরের মধ্যে জানাজানি হয়। ভালো করিয়া এই তথ্যটি নিরূপণ করিবার জন্য হের্ ফন্ ফ্রিশ্ মধুভরা বাটির বদলে ব্লটিং কাগজে চিনি ও জল মাখাইয়া স্থানে-স্থানে রাখিয়া দিয়াছেন। দু'একটি মৌমাছি আসিয়া তাহা হইতেও আহার্য্য লইয়াছে ; কিন্তু চাকে ফিরিয়া গিয়া তাহারা আর নাচে নাই ; ফলে নূতন মৌমাছি আর সে-স্থানে আসে নাই। ব্লটিং কাগজের ন্যায় কৃত্রিম ফুলে সামান্য মিষ্ট পদার্থ রাখিয়াও তিনি দেখিয়াছেন একই ফল ফলিয়াছে।

এই অঙ্গ হইতে একটি সুগন্ধ বাহির হইতে থাকে, মানুষের নাকেও এই গন্ধ আসিয়া লাগে। অপর মৌমাছির নিকট এই গন্ধের একটি আকর্ষণ-শক্তি আছে এবং অনেক দূর হইতেই এই গন্ধ নূতন মৌমাছিকে আহার্য্য-দ্রব্যের নিকট আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়।

মৌমাছিদের মধ্যেও আবার দুইটি ভাগ আছে।— ফুলের রেণুসংগ্রহকারী মৌমাছি ও মধুসংগ্রহকারী মৌমাছি। যাহারা রেণু সংগ্রহ করে তাহাদের নাচও বিভিন্ন। ইহার বিশেষত্ব এই যে, নাচিবার সময় ইহারা পুচ্ছ নাচাইয়া-নাচাইয়া সঙ্গীদের মুখে ও বিশেষভাবে তাহাদের দাড়ায় রেণু মাখাইয়া দেয়। প্রত্যেক ফুলের রেণুর গন্ধ বিভিন্ন ; এমন কি সেই ফুলের পাপ্ড়ির

মৌমাছি বসাইবার জন্ত কয়েকটি উদ্ভিন্ন ফুল

মৌচাক হইতে সমান দূরে দুই দিকে দুইটি আহার্য্য-ভাণ্ড রাখিয়া দিয়া হের্ ফন্ ফ্রিশ্ নূতন আর-একটি পরীক্ষা করিয়াছেন। একটিতে প্রচুর মিষ্ট পদার্থ, অপরটিতে অতি সামান্য রাখিয়া দিয়াছেন, কৃত্রিম অন্য কোনো গন্ধ কোনোটিতেই দেন নাই। কিন্তু দেখা গিয়াছে যে মৌমাছিগুলি প্রচুর আহার্য্যের সন্ধান পাইয়াছে। চাকে ফিরিয়া তাহারা যথারীতি নাচিয়া সঙ্গীদের মধ্যে সেই খবর দিয়াছে। অপর দিকে স্বল্পাহারী মৌমাছিরা আদৌ নাচে নাই। ফলে বাহ্য গন্ধ না থাকাতেও অধিক-পরিমাণ আহার্য্যের নিকট মৌমাছিরা দশগুণ অধিক আসিয়াছে। প্রচুর আহার্য্যে তৃপ্ত, মৌমাছিরা খাইবার সময় ও উড়িয়া চলিবার সময় তাহাদের শরীরের নিম্নভাগ হইতে একটি বিশেষ অঙ্গ বাহির করে ; অন্য সময়ে ইহা তাহাদের চামড়ার তলায় লুক্কায়িত থাকে।

গন্ধ হইতেও রেণুর গন্ধ বিভিন্ন। নাচের ভিতর দিয়া এই খবর মৌমাছিরা সঙ্গীদের নিকট জ্ঞাপন করে। রেণুসংগ্রহকারী দুইপ্রকার মৌমাছির দুইটিকে চিহ্নিত করা হয়, একটি গোলাপরেণু সংগ্রহকারী, অপরটি ক্যান্টারবেরী বেলের (Cantertury bells)। এই দুইপ্রকার ফুলের রেণু সরাইয়া লওয়া হয়। ফলে দেখা গেল ফুলগুলির নিকট মৌমাছিদের আগমন কমিয়া আসিল। গোলাপ-ফুলের রেণুকোষটি তুলিয়া লইয়া Canterbury bell ফুলের মধ্যে গাঁথিয়া দেওয়া হয় এবং Canterbury bell ফুলের রেণুকোষ গোলাপের মধ্যে রাখা হয়। যথাসময়ে একটি মৌমাছি আসিয়া Canter-ury bell হইতে গোলাপ-রেণু পর্য্যাপ্ত-পরিমাণে সংগ্রহ করিয়া চাকে ফিরিয়া নাচিতে আরম্ভ করে ; কিন্তু Canterbury bellএর রেণু সংগ্রহকারী সঙ্গীদের মনো-

স্তূা কাটা
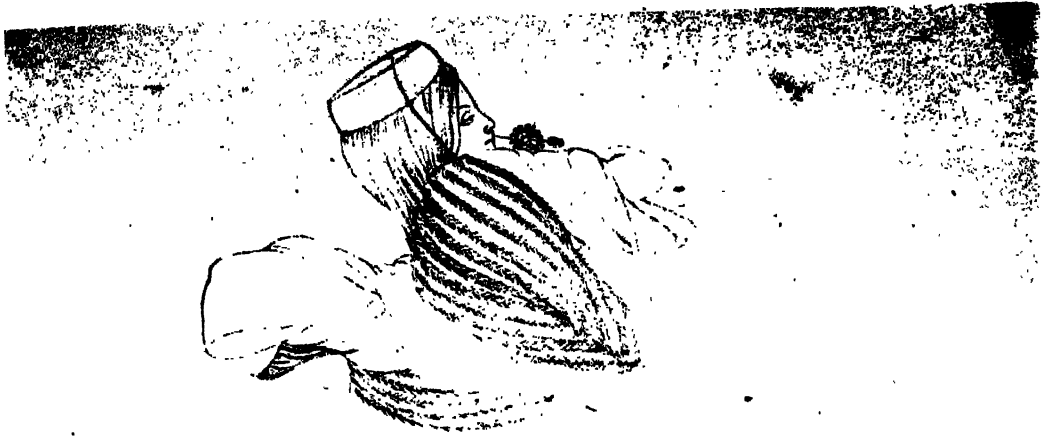
গুণ টানা
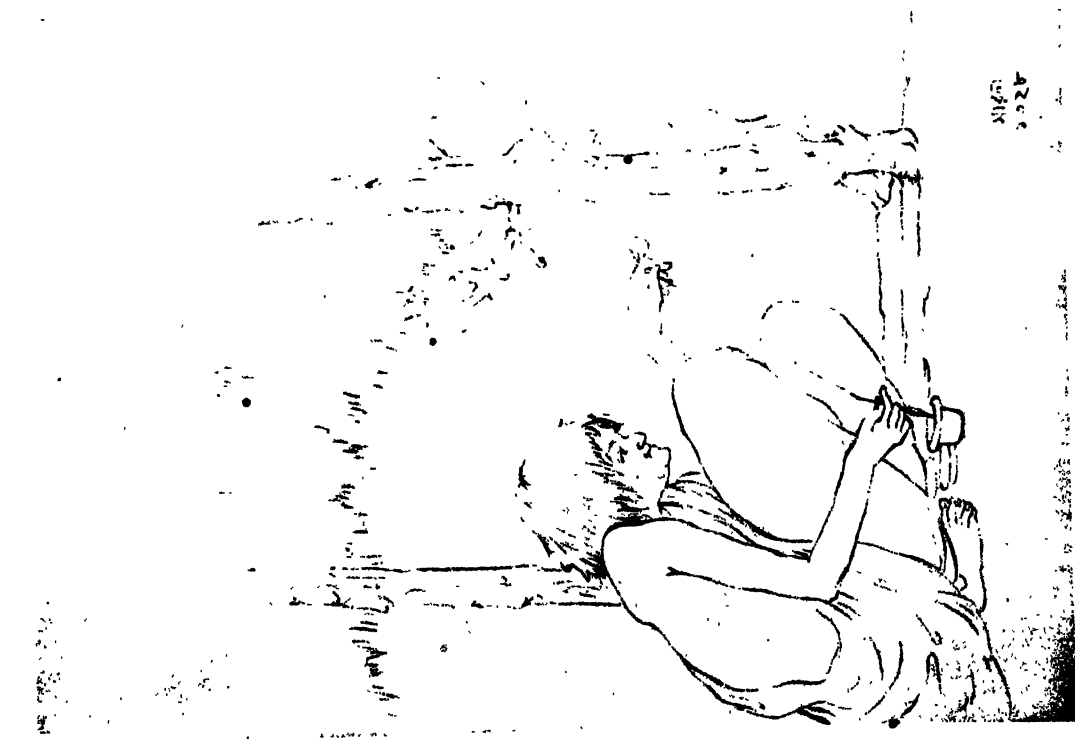
চিত্রকর—শ্রী সারদাচরণ উকিল

যোগ সে কিছুতেই আকর্ষণ করিতে পারিল না, দল ছাড়ার মতো সে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। অপর দিকে গোলাপরেণুসংগ্রহকারী মৌমাছিদের নিকট সে খুব আদর পাইল। কিন্তু এইবার সেই মৌমাছিগুলির ঠকিবার পালা আসিল। স্বভাবতই তাহারা গোলাপ-ফুলের নিকট গেল, কিন্তু তাহার মধ্যে গোলাপ-রেণুর কোনো সন্ধান না পাইয়া বহুক্ষণ ধরিয়া বৃথাই তাহার সন্ধানে ফিরিতে লাগিল।

ডেরর্ ফন্ ক্রিশের বহু বৎসরের গবেষণার ফল সংক্ষেপে বিবৃত করা হইল। স্বাভাবিক কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া ও কতকটা এই অদ্ভুত ক্ষুদ্র প্রাণীদের প্রতি মমতার জন্যও বটে, তিনি অসীম ধৈর্য্যের সঙ্গে ইহাদের সম্বন্ধে নানা-প্রকার পরীক্ষা করিয়াছেন। এগুলি এতই সহজ ও সুন্দর ভাবে দেখানো হইয়াছে যে, যে-কোনো ব্যক্তি ইহা হইতে কল্পনার ও কৌতূহলের চরিতার্থতা লাভ করিতে পারিবেন।*

* Discovery, March 1924 হইতে সঙ্কলিত।

বজ্রকূট মন্দির বা শ্বেতনাগ মন্দির

অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী, এম্-এ

হাং চাউ (Hang Chow) নগর সাংঘাই হইতে ১১০ মাইল দূরে, দক্ষিণ পশ্চিমে। সাংঘাই হইতে হাংচাউ পর্য্যন্ত রেল আছে। হাংচাউর নীচেই প্রসিদ্ধ West Lake বা পশ্চিম হ্রদ।

সমস্ত চীনের মধ্যে এই হ্রদটির খুব নাম। কত কবিতা যে এই হ্রদটির বিষয়ে আছে, তাহা বলা যায় না। সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী ও গুণী এই হ্রদটির কাছাকাছি-দেশেই জন্মিয়াছেন।

নগরটিও অতি প্রাচীন। চীনসম্রাট্ "য়ি"(Yi)২১৯৮ খ্রীঃ পূঃ সালে দেশে কৃষির উপযোগী জল সরবরাহের (irrigation) সুব্যবস্থা করিয়া যান। এই নগরে পূর্ব্বে সমুদ্রের ভয়ঙ্কর বান আসিত। তিনিই ভালো ইঞ্জিনীয়ার দিয়া তাহা বন্ধ করেন ও জল-স্রোত যথাযোগ্য দিকে পরি-চালিত করেন। মার্কো পোলো এই হ্রদ ও এই নগরের যে প্রশংসা করিয়াছেন, তাহা পড়িয়া দেখিলে সকলেই আনন্দ পাইবেন।

তাই' পিং বিপ্লবের পর এই নগরের বহু যুগের বহু মন্দির এক সঙ্গে প্রায় নষ্ট হইয়া যায়।

হ্রদের দুইদিকে দুইটি প্রধান দ্রষ্টব্য। হ্রদের দিকে দাঁড়াইয়া দেখিলাম—ডানদিকে ক্ষীণ দীর্ঘ Needle Pagoda অথবা রাজা "সু"-এর সূচী-মন্দির। আর বামে এই বজ্রকূট মন্দির বা শ্বেতনাগ মন্দির (White Snake Pagoda)। এই নামটির একটি গল্প আছে। এক পরমা-সুন্দরী নাগকন্যা মনুষ্যলোকে আসিয়া বহু লোককে পথভ্রষ্ট ও বিপন্ন করিতেন। তাঁর ছিল কামরূপ, অর্থাৎ তিনি যে-কোনো রূপ ধারণ করিতে পারিতেন। সে-সম্বন্ধে বহু গল্প ও উপাখ্যান আছে। পরিশেষে দয়াদেবী মঞ্জুশ্রী তাঁকে অনুতপ্ত করাইয়া তপস্যাদ্বারা শুদ্ধ করাইয়া দেবজন্ম দান করেন। যে-স্থলে এই ঘটনা ঘটে, সেখানে এই মন্দির।

আমরা গিয়াই হঠাৎ ভারতের মন্দিরের মতো এই মন্দিরটির চেহারা দেখিয়া চমকিয়া উঠিলাম। হ্রদটির মধ্যে একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ে দ্বীপে এই মন্দির। ঠিক যেন ভুবনেশ্বরের বা বিক্রমপুর রাজাবাড়ীর বা বীরভূমের ইছাই ঘোষের মন্দিরের নমুনায় তৈয়ারি। তাহার হেতু জিজ্ঞাসা করায় স্থানীয় বৃদ্ধ ও পণ্ডিতরা কেহ বলিলেন, "লঙ্কা দ্বীপ হইতে লোক আসিয়া এটি নির্ম্মাণ করান।" কেহ বলিলেন, "ভারত হইতে লোক আসিয়া এটি তৈয়ার করান।"

হাংচাউর কাছাকাছি লাল ইটের প্রাচীন মন্দির বা প্রাচীন ইমারত্ এই মন্দিরটি ছাড়া আর নাই। আর চীনদেশে লাল ইটের চলন হইবার বহু পূর্ব্বে এই মন্দির তৈয়ারী। প্রায় পৌনে চারিশত বৎসর পূর্ব্বে জাপানী জলদস্যুরা এই প্রদেশটায় উপদ্রব করিত। তাদের মনে হইল, এই মন্দিরটি হইতে তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করা হয়। তাই তাহারা তিন দিন তিন রাত্রি চারিদিকে আগুন জ্বালিয়া মন্দিরটি পোড়ায়। তাহাতে বাহিরের যা-কিছু কাজ সব পুড়িয়া যায়, আর সারা মন্দিরটাই দগ্ধ রক্তবর্ণ হইয়া যায়।

চীনের বজ্রকূট মন্দির (নিকট হইতে)

এই হ্রদেরই তীরে ভারতীয় সাধুদের প্রতিষ্ঠিত গৃধ্র-কূট ও প্রাচীন সঙ্ঘারাম। সেখানেবহু ভারতীয় সাধুর মূর্ত্তি ও সমাধি আছে। সেটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। এই মন্দিরটি গত সেপ্টেম্বর মাসে ধসিয়া পড়িয়াছে। আমরা চলিয়া আসিবার এত অল্প পরেই যে এমন একটি প্রাচীন কীর্ত্তি পড়িয়া যাইবে, বুঝিতেও পারি নাই।

বজ্রকূট মন্দিরের অপর-একটি দৃশ্য (দূর হইতে)

চীনযাত্রী ভারতবাসী মাত্রেরই (Hang Chow) হাং-চাউর পশ্চিম হ্রদ দর্শন করা উচিত। তাহার তীরের তীর্থ-বিষয়ে অন্য সময়ে বলা যাইবে। কিন্তু সেই হ্রদের তীরে ভারতবাসীর পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দের দৃশ্যটা যে গেল, ইহাই দুঃখের বিষয়। এইটির দিকে তাকাইলে আমাদের মনে হইত, যেন দেশেই আছি।

৺ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রী স্বর্ণকুমারী দেবী

আমার পূজ্যপাদ দাদামহাশয় ৺ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিসভায় সভাপতি হইয়া আজ কিছু বলিতে আমাকে অনুরোধ করা হইয়াছিল। এজন্য আমি আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। কোনো প্রিয়জনকে হারাইবার পর কত কথাই বলিতে ইচ্ছা হয়! যে-সকল সুখময় স্মৃতি এখন মনের মধ্যে সারাদিন উথলিত আবেগে বহিতেছে, সেইসকল স্মৃতি বাহিরে প্রকাশ করিতে কত না আকুলতা জন্মায়! আমার দাদা-মহাশয়ের গুণগান করিবার কথা অনেকই আছে, কিন্তু আমার শরীর অসুস্থ, এবং অবসাদগ্রস্ত বলিয়া আমি আমার বাসনাকে সংযত করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে কেবল দু'একটা মাত্র কথা বলিয়া শেষ করিব।

সাহিত্য-জগৎ তাঁহার নিকট কিরূপ ঋণী এপ্রবন্ধে তাহা বলা বাহুল্য-মাত্র। তিনি নিজে বেশ বড়-একজন লেখক ছিলেন। তাঁহার রচিত 'পুরুবিক্রম', 'অশ্রুমতী' প্রভৃতি নাটক ন্যাশানাল থিয়েটার প্রভৃতি পূর্ব্বকালীন নাট্যালয়ে বহুবার অভিনীত হইয়াছে। তাহার পর গিরীশ ঘোষ নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন। নূতনদাদা এরূপ গুণগ্রাহী ও অমায়িক-চিত্ত ছিলেন যে, গিরীশ ঘোষের খ্যাতিতে তিনি কিছুমাত্র ক্ষুণ্ন হন নাই। প্রহসন-রচনাতেও তিনি সিদ্ধ-হস্ত ছিলেন। তাঁহার "যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ", "দায়ে প'ড়ে দারপরিগ্রহ" প্রভৃতি প্রহসন-রচনাগুলি নবীন পাঠকদের পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি। ঐসকল গ্রন্থে হাস্যকৌতুক প্রচুর আছে, কিন্তু এরূপ সুরুচি-সঙ্গত লেখা আধুনিক কোনো প্রহসন-রচনাতে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না;—অন্ততঃ আমি দেখি নাই। এতদ্ব্যতীত ফরাসী, সংস্কৃত প্রভৃতি নানা ভাষার গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া তিনি বঙ্গসাহিত্যের যেরূপ পুষ্টিসাধন করিয়াছেন, এমন আর কেহই করেন নাই। কিন্তু তিনি কেবল সাহিত্যিকই ছিলেন না; চিত্রবিদ্যা এবং সঙ্গীতবিদ্যাতেও তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা ছিল। এই উভয় বিদ্যা তিনি বিনা-শিক্ষাতেই লাভ করিয়াছিলেন। যাহারই সহিত তাঁহার আলাপ হইত, তাঁহারই প্রতিকৃতি তিনি অতি অনায়াসে আঁকিয়া রাখিতেন এবং যে-কোনো গায়ক গোলকধাঁধাযুক্ত ঘূর্ণ্যমান তানলয়ে গাহিয়া গেলেও, তিনি সঙ্গে-সঙ্গে যন্ত্রে তাহা বাজাইয়া লইতে পারিতেন। প্রথম যখন কলিকাতায় হার্‌মোনিয়াম আম্‌দানি হয়, তখন আমাদের বাড়ী একটি বড় হার্‌মোনি-য়াম্ আনা হইয়াছিল। নূতনদাদা সেই যন্ত্রটি প্রতিদিন প্রত্যূষে বাজাইতেন। আমি তখন অতি ছোটো ছিলাম,—মনে পড়ে, আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতন তাঁহার বাজনা শুনিবার জন্য ছুটিয়া যাইতাম। আমাদের জোড়া-সাঁকোর বাড়ীতে তখন সঙ্গীতচর্চ্চা যথেষ্ট-পরিমাণে হইত। তখনকার সুপ্রসিদ্ধ গায়ক বিষ্ণু আমাদের বাড়ীতে গায়কতা করিতেন এবং দেশ বা বিদেশ হইতে যে-কোনো বড় গায়ক আসিলেই এখানে অতিথিরূপে অভ্যর্থিত হইতেন। সেই আবহাওয়ার মধ্যে থাকিয়া নূতনদাদার স্বাভাবিক সঙ্গীতক্ষমতা আরো বিকাশপ্রাপ্ত হয়। এই আবহাওয়ার মধ্যে লালিত-পালিত হইয়া স্নেহাস্পদ রবীন্দ্রনাথও এতবড় সঙ্গীতজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি বাল্যকালে কিছু দিন বিষ্ণুর নিকট গান শিক্ষা করিয়াছিলেন। নূতনদাদা কিন্তু সেরূপভাবে কাহারও নিকট শিক্ষালাভ না করিয়াও বিচক্ষণ গায়কের মতনই সুরজ্ঞ হইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের এবং আমার বহু গানে তিনি সুর বসাইয়া দিয়াছেন।

তিনি কিরূপ গুণের আদর করিতে জানিতেন, এ-প্রসঙ্গে তাহার একটি গল্প বলি। তাঁহার এক সামান্য বাজার সরকারের বালিকা-স্ত্রী গান গাহিতে পারিত। কেমন করিয়া একথা তাঁহার কানে গিয়াছিল জানি না, কিন্তু ইহা শুনিবামাত্র তিনি সেই মেয়েটিকে কাছে

ডাকিয়া বাড়ীর অন্য মেয়েদের সহিত সমান আদরে তাহাকে সঙ্গীত শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

তাঁহার মতন উদার-প্রকৃতির লোক অতি দুর্লভ। তাঁহার রাঁচি-প্রবাসকালে লাট-সাহেব দু'একবার তাঁহার মন্দির-প্রাসাদ দেখিতে যান। নূতনদাদা তাঁহাকে যেরূপ আদর-অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, কোনো দীন দুঃখী তাঁহার মন্দির দেখিতে গেলেও তাহাকে সেইরূপ আদর-অভ্যর্থনা করিয়া লইতেন। যিনি তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তিনিই তাঁহার স্বভাব-মাহাত্ম্যের পরিচয় পাইয়াছেন।

পারিবারিক স্নেহ-প্রীতিও তাঁহাতে কম ছিল না। আমাদের বাল্যকালে যখন প্রথম বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' বাহির হয়, তখন তিনি সেখানি হাতে করিয়া ভিতরে যাইয়া স্ত্রীলোকদিগকে পড়িয়া শোনাইতে লাগিলেন। ইংরেজী পুস্তকেরও তর্জ্জমা করিয়া তিনি অবসরকালে আমাদের শোনাইতেন। পরে যখন তিনি নিজে রচনা করিতে আরম্ভ করেন, তখন এক-একখানি বই শেষ হইলেই আমাদিগকে লইয়া বেশ-একটা মজ্‌লিশ জমাইয়া বসিতেন। আমরা মুগ্ধভাবে তাঁহার পাঠ শুনিতে-শুনিতে যে-সকল টীকা-টিপ্পনী করিতাম, তাহা তিনি বেশ খুসী হইয়াই শুনিতেন; এবং তদনুসারে স্থল-বিশেষে তাঁহার লেখার মধ্যে কিছু-কিছু বাড়াইতে-কমাইতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। এইরূপে তিনি আমাদের অন্তঃপুরেও সাহিত্যের আব্‌হাওয়ার সৃষ্টি করেন।

আমি যখন লিখিতে আরম্ভ করি, তিনি তখন আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ দান করিয়াছিলেন। আমার লেখা 'দীপ-নির্ব্বাণ' পড়িয়া তাঁহার এতদূর ভালো লাগিল যে, তাঁহার পরম বন্ধু সাহিত্য-বিশারদ ও কবি ৺অক্ষয় চৌধুরীকে ইহা না পড়াইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না। অন্য ঘরে আমার স্বামী ও তিনি এই লেখা পড়িয়া ইহার গুণাগুণ আলোচনা করিতেন। আমি ও নূতন-দাদার স্ত্রী, আমার প্রিয়সখী বৌ-ঠাকুরাণী পাশের ঘরে থাকিয়া অন্তরাল হইতে শুনিতাম। কিছুদিন পরে চৌধুরী মহাশয়ের স্ত্রী যখন সুদূর পিত্রালয় হইতে কলিকাতায় আসিলেন, তখন এই সূত্র অবলম্বনেই আমাদের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ উপাদেয় আত্মীয়তা-সম্পর্ক সৃষ্ট হয়; এবং আমাদের পর্দ্দা-প্রথা উঠিয়া যায়।

তাঁহার কিরূপ অপরিসীম দেশ প্রীতি ছিল, তাহারও পরিচয় তিনি নানা কাজে দেখাইয়া গিয়াছিলেন। এক সময়ে তাঁহার মনে হইয়াছিল ব্যবসা-বাণিজ্যে বড় না হইলে দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধন হইবে না, তাই তিনি প্রথম নীলের চাষ আরম্ভ করেন। পরে, এই চাষে তাঁহার যাহা কিছু লাভ হইয়াছিল সমস্ত খরচ করিয়া তদানীন্তন প্রধান ইংরেজ কোম্পানীর প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া বরিশালে ফেরি ষ্টিমার খুলিলেন। কিন্তু দেশের লোকের সাহায্য-সহানুভূতি-সত্ত্বেও এই ব্যবসা অধিক কাল স্থায়ী রাখিতে পারেন নাই। প্রভূত ক্ষতিস্বীকার করিয়া পরে সেই ষ্টিমার ইংরেজ কোম্পানীকে বিক্রয় করিয়া ফেলিতে বাধ্য হন। এই ঘটনায় তাঁহার দেশ-প্রীতি ও সৎসাহসের চূড়ান্ত পরিচয় পাওয়া যায়।

তাঁহার জীবনের অনেক কথাই বসন্ত-বাবুর প্রণীত তাঁহার "জীবনস্মৃতি"তে গাঁথা রহিয়াছে। আপনারা এখন সেইসকল স্মৃতির আলোচনা করিয়া তাঁহার গুণ-গৌরব রক্ষা করুন, ইহাই প্রার্থনীয়। এরূপ প্রতিভাশালী ব্যক্তির যেরূপ অভ্যর্থনা পাওয়া উচিত ছিল, তাহা তিনি পান নাই। ইহাতে আমাদেরই জাতীয় দৈন্য প্রকাশ পাইতেছে। আশা করি সাহিত্য-সমাজ এইবার তাঁহাকে যথাপ্রাপ্য গৌরবাসন প্রদান করিয়া তাঁহার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিবেন। *

* আশুতোষ-কলেজের বাংলা-সাহিত্য-সাম্মলনীর উদ্যোগে ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে ৺জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্মৃতি-সভায় পঠিত।

বঙ্গদেশে দর্শনশাস্ত্র আলোচনার ইতিহাস

শ্রী বিমানবিহারী মজুমদার*

বঙ্গদেশ গীতিকবিতার দেশ ও বাঙ্গালী ভাবপ্রবণ জাতি বলিয়া দেশ-বিদেশে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। এ-স্থলে আমরা যদি বলি যে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই দেড় হাজার বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালী জাতির শ্রেষ্ঠ মনীষীগণ গভীরভাবে দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করিয়া নব-নব মতবাদ উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইলে অনেকেই এ কথাকে নিছক উপন্যাস বলিয়া মনে করিবেন। আমাদের দেশের ইতিহাস জাতির প্রাণের পরিচয় লইয়া রচিত হয় নাই; শুধু প্রস্তরের সাক্ষ্য লইয়া লিখিত হইয়াছে। তাই আমাদের শিক্ষা ও সভ্যতার ধারা আমরা অবগত নহি। এইদিকে কাজ করিবার বিস্তৃত-ক্ষেত্র পড়িয়া আছে। আমরা এ-সম্বন্ধে কেবলমাত্র দিক্ নির্দ্দেশ করিয়া লোগ্যতা। ব্যক্তিকে আলোচনার জন্য আহ্বান করিতেছি।

সম্প্রতি দামোদরপুরে যে পাঁচখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে বঙ্গদেশে যে দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা হইত তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির কোটীবর্ষ বিষয়ের একজন ব্রাহ্মণ "পঞ্চমহাযজ্ঞ প্রবর্ত্তনায়" ভূমি ক্রয় করিতে চাহিতেছেন ইহা দামোদরপুরের দ্বিতীয় লিপি হইতে জানা যায় (Ep. Indica, Vol. XV No. 7)। মনুসংহিতায় এই পঞ্চযজ্ঞ সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন—

অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমোদৈবো বলিভৌতো নৃ-যজ্ঞোঽতিথিপূজনম্॥

আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে, প্রাচীনকালে অন্ততঃ একখানি বেদ পাঠ না করিলে কাহারও বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত হইত না। বঙ্গদেশে বৈদিক দর্শনের আলোচনা-সম্বন্ধে আমাদের যুক্তি দামোদরপুর লিপির প্রথমখানি দ্বারা দৃঢ়ীকৃত হইতেছে। তাহাতে কর্পটিক নামক ব্রাহ্মণ 'অগ্নিহোত্রোপযোগায়' ভূমি চাহিতেছেন। অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ বেদের কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্গত এবং মীমাংসা-দর্শনে তৎসম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা আছে। সুতরাং অনুমান হয় যে, খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে বঙ্গদেশে মীমাংসাদর্শনের আলোচনা হইত। এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, রাঢ়ী ও বারেন্দ্র কুলশাস্ত্রে যে লিখিত আছে—আদিশূর কর্ত্তৃক বঙ্গে প্রথম বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনীত হয়, সে-উক্তি দামোদরপুর লিপির আবিষ্কারের পর আর বিশ্বাস করা যায় না। বঙ্গদেশে আর্য্য সভ্যতা যে অতি প্রাচীন-কালেই ব্যাপ্ত হইয়াছিল, উক্ত লিপি তাহারও সাক্ষ্য দিতেছে।

তাহার পর খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতেও যে সেই আলোচনার স্রোত রুদ্ধ হয় নাই, তাহার পরিচয় আমরা চীনদেশীয় পরিব্রাজক হুয়েন সাংএর বিবরণী ও তাঁহার জীবনী হইতে জানিতে পারি। হুয়েন সাং নালন্দা মহাবিহারের অধ্যক্ষ শীলভদ্রের নিকট পাঁচ বৎসরকাল ধরিয়া বেদ ও বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। আর বৌদ্ধ দর্শন-সম্বন্ধে যে-সকল সমস্যা তাঁহাকে কেহ সমাধান করিয়া দিতে পারে নাই, তাহা শীলভদ্র তাঁহাকে সরলভাবে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। এই শীলভদ্র আমাদেরই দেশের সমতট-প্রদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া বঙ্গমাতার মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। তিনি সন্ন্যাসী হইয়া বাহির হইবার পুর্ব্বে অতি অল্প আয়াসেই সমতটে হেতুবিদ্যা, শব্দবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, অথর্ব্ব, সাংখ্যদর্শন ও অন্যান্য শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। উল্লিখিত বিবরণ হইতে অনুমান হয় যে বঙ্গদেশে তখন দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে ন্যায় ও সাংখ্যেরই পঠন-পাঠন অধিকতর প্রচলিত ছিল। হুয়েন সাং তাঁহার গ্রন্থের মধ্যে কোথাও বেদান্তের মতের মুখ্য বা গৌণভাবে উল্লেখ করেন নাই।

অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগ হইতে বঙ্গদেশে পাল নরপতিগণের রাজত্ব আরম্ভ হয়। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। আর সেইসময়ে বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের স্রোত খুব প্রবলভাবে বহিয়াছিল। কিন্তু বৌদ্ধপ্লাবনে হিন্দুর জাতি রক্ষায় বা হিন্দুর দর্শন আলোচনার যে ব্যাঘাত হয় নাই, তাহা আমরা পালরাজগণের লিপি পাঠে অবগত হই। মহা-রাজ ধর্ম্মপাল স্বয়ং "বর্ণদিগকে স্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠান" করিয়াছিলেন। আর দার্শনিক ব্রাহ্মণদিগকে পালরাজগণ গুপ্ত সম্রাট্‌দিগের ন্যায় ভূমিদান করিয়া উৎসাহ দিতেন। কমৌলি লিপিতে দেখা যায় যে, মহারাজ বৈদ্যদেব বরেন্দ্রভূমির ভাবগ্রাম-নিবাসী শ্রীধর নামক ব্রাহ্মণকে গ্রামদান করিয়াছেন। উক্ত শ্রীধর ছিলেন

"কর্ম্মব্রহ্মবিদাং মুখ্যঃ সর্ব্বাকারতপোনিধিঃ।
শ্রৌতস্মার্ত্তরহস্যেষু বাগীশ ইব বিশ্রুতঃ॥"

ব্রাহ্মণ দর্ভপাণির বংশ পুরুষানুক্রমে পাল সম্রাট্‌গণের মন্ত্রিত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াও, তাঁহারা দর্শনশাস্ত্রের আলোচনায় অমনোযোগী ছিলেন না। দর্ভপাণির পৌত্র কেদার-মিশ্র বাল্যকালেই তাঁহার অসাধারণ মেধাশক্তি-বলে চতুর্ব্বেদে সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন।

আবার তাঁহারই অধস্তন পুরুষ গুরব মিশ্র বেদ, আগম ও জ্যোতিষ-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন।

হিন্দু দর্শনের এতাদৃশ আলোচনা থাকিলেও বঙ্গদেশ বৌদ্ধ পণ্ডিত-গণের জন্যই সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে, এমন কি বহির্ভারতেও, খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। তিব্বতীয় ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্রদাস তাঁহার Indian Pandits in the Land of Snow নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, খৃষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে বঙ্গদেশ হইতে বহু পণ্ডিত তিব্বতে ধর্ম্মসংস্কার করিবার জন্য আহূত হইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে একজনের নাম শান্তরক্ষিত। তিনিও শীলভদ্রের ন্যায় নালন্দা বিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন। পরে তিব্বতে যাইয়া সেখানে ধর্ম্ম ও দর্শন-শাস্ত্র শিক্ষা দেন।

খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বিক্রমণীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তথায় তিনি এক পণ্ডিতের নিকট হিন্দু-দর্শন ও বৌদ্ধ-ধর্ম্মের স্থূল-স্থূল বিষয়গুলি শিক্ষা করিয়াছিলেন। পরে তিনি নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন ও বিক্রম-শিলা বিহারের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। তিনি তিব্বতে যাইয়া বজ্রযান ও কালচক্রযান মতবাদ প্রচার করেন। বজ্রযানের মধ্যে দর্শন, রহস্যানুভূতি

* এই প্রবন্ধটি প্রেসিডেন্সী কলেজের দর্শনশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম্-এ, মহাশয়ের পরিচালনাধীনে রচিত ও তাঁহার সভাপতিত্বে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনীর পঞ্চদশ অধিবেশনে পঠিত।

ও কামুকতার অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ হইয়াছিল, কালচক্রযানের অর্থ যে-যান অবলম্বন করিলে মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের যত্নে আমরা খৃষ্টীয় অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাঙ্গালী বৌদ্ধগণের মধ্যে কিরূপ দার্শনিক মতবাদ প্রচলিত ছিল, তাহা জানিতে পারিয়াছি। সে-সময় তাঁহারা ষড়্‌দর্শন বলিতে, ব্রহ্ম, ঈশ্বর, অর্হৎ, বৌদ্ধ, লোকায়ত ও সাংখ্যদর্শন বুঝিতেন। বঙ্গদেশে তখন সহজ মতের প্রবর্ত্তন হইয়াছিল। সহজবাদীরা বলেন যে, ভাবও নাই, অভাবও নাই, সকলই শূন্যরূপ। এ হিসাবে তাঁহাদিগকে অদ্বয়বাদী বলা যাইতে পারে। লুই সিদ্ধাচার্য্য রাঢ়দেশের লোক ছিলেন বলিয়া শাস্ত্রী-মহাশয় স্থির করিয়াছেন। তাঁহার লিখিত চর্য্যাচর্য্য-বিনিশ্চয়ের একটি পদ হইতে সহজিয়াগণের দর্শনের ভিত্তি কি ছিল তাহা বুঝা যাইবে।—

কা আ তরুবর পঞ্চবি ডাল।
চঞ্চল চীএ পাইঠো কাল॥
দিট করিঅ মহাসুহ পরিমাণ।
লুই ভাই গুরু পুছিঅ জান॥
সঅল সমাহিঅেন কাহি করি অই।
সুখ দুখেতে নিচিত মরি আই॥
এড়ি এউ ছান্দক বান্ধ করণক পাটের আস।
সুনু পাখ ভিতি লাহরে পাস॥
ভাই লুই আমহে পানে দিঠা।
ধমণ চমণ বেণি পণ্ডি বইঠা॥

অর্থাৎ "দেহতরুবরে পাঁচটি ডাল আছে। চঞ্চল চিত্তে কাল প্রবেশ করিলে, লুই বলেন মহাসুখের পরিমাণ দেখিয়া, উহা কি গুরুকে জিজ্ঞাসা করিয়া লও। যত-রকম সমাধি আছে, তাহা দ্বারা কি হইবে? সে-সকল সমাধি করিলে সুখ ও দুঃখে নিশ্চয় মারা যাইবে। ছন্দের বন্ধন ও করণের পরিপাটী পরিত্যাগ করিয়া শূন্য পক্ষরূপ ভিত্তিকে লইয়া আইস। লুই বলিতেছেন—আমি পণ্ডিতের বচনানুসারে দেখিয়াছি, ধমণ ও চমণ অর্থাৎ আলি ও কালি এই উভয় আসন করিয়া আমার দেবতা বসিয়া আছেন।"

লুই সিদ্ধাচার্য্য প্রভৃতি পণ্ডিতগণের শূন্যবাদ-সম্বন্ধে মত দার্শনিক প্রণালীতে পরিস্ফুট হইয়াছিল। কিন্তু কোনো দেশেরই সাধারণ লোকেরা দর্শনের ধার ধারে না। আমাদের দেশের সাধারণ বৌদ্ধ উপাসকেরা কেবল শিখিয়া রাখিয়াছিলেন যে সবই শূন্য—কিন্তু সেই শূন্যকেও আবার মূর্ত্তি দিয়া নিরঞ্জন ধর্ম্মঠাকুরে পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছিল। এই ধর্ম্মঠাকুরের মহিমা ও তাঁহা হইতে সৃষ্টি বর্ণনা করিয়া বঙ্গভাষায় শূন্যপুরাণ লিখিত হইয়াছিল। ঠিক কোন্ তারিখে এই গ্রন্থ রচিত হয়, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা না গেলেও, ইহা নিশ্চিত যে, দ্বাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালার সাধারণ বৌদ্ধেরা বৌদ্ধবাদ বলিতে যাহা বুঝিত তাহা ইহাতে আছে।

নহি রেক, নহি রূপ, নহি ছিল বন্ন চিন।
রবি শশী নহি ছিল নহি রাতি দিন॥

ইত্যাদি বর্ণনা "ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ॥

প্রভৃতি উপনিষদীয় ভাব মনে জাগাইয়া দেয়। এইরূপে সৃষ্টির পূর্ব্ব অবস্থা বর্ণনা করিয়াই কিন্তু ইহার পর যখন বলা হইল—

চৌদ্দ যুগ বই পরভু ভুলিলেন হাই
উর্দ্ধ নিশ্বাসে জনিমিলেন পক্ষ উলুকাই।

তখন নিরঞ্জন ঠাকুরের গোঁড়া চেলা ভিন্ন আর সকলেরই পক্ষে হাস্য সম্বরণ করা কঠিন হইয়া উঠে।

বঙ্গদেশে দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বৌদ্ধ-দর্শনের এতাদৃশ অবস্থা হইলেও, হিন্দুগণের মধ্যে তখন নূতন করিয়া দর্শনশাস্ত্র আলোচিত হইতেছিল। বৌদ্ধ-প্লাবনের পর হিন্দু ধর্ম্মকে জাগাইবার জন্য নূতন করিয়া তখন কর্ম্মকাণ্ডের তথা মীমাংসা-দর্শনের আলোচনা হইতেছে। তাই আমরা শূলপাণি, ভবদেব ভট্ট, গুণবিষ্ণু, পশুপতি ও হলায়ুধের ন্যায় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণের স্মৃতিশাস্ত্র দেখিতে পাই।

ঈশাননাগরের "অদ্বৈত-প্রকাশ" মতে অদ্বৈতের জন্ম ১৪৩৩ খৃষ্টাব্দে। তিনি

"দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমে শান্তিপুরে গেলা,
ষড়্‌দর্শনশাস্ত্র ক্রমে পড়িতে লাগিলা"।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে ১৪৪৫ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার সমসাময়িক রঘুনাথ শিরোমণি ও কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের আবির্ভাবের প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেও বঙ্গদেশে ষড়্‌দর্শনের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা হইত। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বের নবদ্বীপের যে অবস্থা শ্রী বৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয় শ্রীচৈতন্যভাগবতে করিয়াছেন, তাহাতেও আমরা জানিতে পারি যে, নবদ্বীপে নব্য ন্যায়ের আবির্ভাবের পূর্ব্বেও অন্যান্য দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা হইত।

কিন্তু খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই বাঙ্গালীর মনীষা দর্শন-শাস্ত্রের মধ্যে যথার্থ গবেষণা ও উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়াছে। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে বঙ্গদেশে এক নব-জাগরণের সূত্রপাত হয়। ঐসময় এক নবদ্বীপেই রঘুনন্দনের স্মৃতি, রঘুনাথের নব্য ন্যায়, শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম্ম ও কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের তন্ত্র-সংস্কার প্রচারিত হইয়াছিল।

নব্য ন্যায় মিথিলার নিজস্ব সম্পত্তি ছিল। গঙ্গেশ উপাধ্যায় তাঁহার তত্ত্ব-চিন্তামণি গ্রন্থে প্রত্যক্ষাদি চারি-প্রকার প্রমাণের বিস্তৃত আলোচনা করিতে যাইয়া প্রাচীন ন্যায় হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়েন। অবচ্ছেদ্যাবচ্ছেদকভাব, প্রতিযোগ্যানুযোগিভাব, নিরূপ্যনিরূপকভাব, ও প্রকার-প্রকারিভাব-সম্বন্ধে প্রাচীন ন্যায়ে বিশেষ আলোচনা ছিল না; তিনিই এ-সম্বন্ধে পথ-প্রদর্শক। মিথিলার দার্শনিক গৌরব রাজর্ষি জনকের সময় হইতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। নবদ্বীপের নৈয়ায়িকগণ তাঁহাদের অসামান্য প্রতিভার বলে মিথিলার সেই গৌরব হরণ করিয়া লন।

নবদ্বীপে নব্য ন্যায়ের স্থাপয়িতা কে তাহা লইয়া কিছু মতভেদ আছে। স্বর্গীয় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় লিখিয়াছিলেন যে, কুসুমাঞ্জলির অন্যতম ব্যাখ্যাকার রামভদ্র সিদ্ধান্তবাগীশই নবদ্বীপের আদি নৈয়ায়িক, তৎপরে বাসুদেব সার্ব্বভৌম। কিন্তু আমরা জগদীশ তর্কালঙ্কারের পৌত্র বলিয়া রামভদ্র সিদ্ধান্তবাগীশের পরিচয় জানি। তিনি জগদীশের শব্দশক্তিপ্রকাশিকার সুবোধিনী নাম্নী টীকাও রচনা করিয়া গিয়াছেন। এরূপ স্থলে বাসুদেব সার্ব্বভৌমই বঙ্গদেশের প্রথম নব্য নৈয়ায়িক বলিয়া গৌরব লাভ করিতে পারেন। তাঁহার সুযোগ্য ছাত্র রঘুনাথ শিরোমণি তাঁহার অলোকসামান্য প্রতিভার আলোক-সম্পাত করিয়া নব্য ন্যায়কে ভাস্বর করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি গঙ্গেশের উল্লিখিত আর তিন প্রমাণ সবিশেষ আলোচনা করিয়া অনুমানখণ্ডেই তাঁহার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেন। রঘুনাথ "তত্ত্বচিন্তামণির" যে দীধিতি নামক ভাষ্য রচনা করেন, তাহার উপর যত পণ্ডিত যত টীকা-টিপ্পনী করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় পৃথিবীর খুব কম গ্রন্থেরই ভাগ্যে ঐরূপ সম্মান জুটিয়াছে। দীধিতির ভাষ্যকার-গণের মধ্যে জগদীশ তর্কালঙ্কার, মথুরানাথ তর্কবাগীশ, গদাধর ন্যায়-সিদ্ধান্তবাগীশ, জয়রাম ন্যায়পঞ্চানন, ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ, রামচন্দ্র

ন্যায়বাচস্পতি, রঘুদেব ন্যায়ালঙ্কার ও নীলকণ্ঠ শাস্ত্রীর রচিত ভাষ্য নৈয়ায়িক-সমাজে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। উক্ত ভাষ্যকারগণ যে আধুনিক কলেজপাঠ্য গ্রন্থের Note-makerদের মতন ছিলেন তাহা নহে; ভাষ্যের মধ্যেও তাঁহারা যথেষ্ট মৌলিকতা ও স্বাধীন চিন্তার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। এইস্থলে একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। আমাদের দেশের বর্ত্তমানযুগের কোনো মনীষী রঘুনাথ প্রভৃতির গ্রন্থাদি-রচনাকে বাঙ্গালী মস্তিষ্কের অপব্যবহার আখ্যা দিয়াছেন। তিনি যদি রঘুনাথের গ্রন্থের প্রথম পত্রটিও দেখিতেন তাহা হইলে ঐরূপ মত প্রচার করিবার পূর্ব্বে একটু বিবেচনা করিতেন। যে যুগে গণেশ সরস্বতী হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রেত্রিশ কোটি দেবতা ও ছচারি কোটি উপদেবতাকে প্রণাম করিয়া গ্রন্থারম্ভ করা রীতি ছিল—সেইযুগে সেই নির্ভীক সত্যানুসন্ধী পুরুষ মঙ্গলাচরণে বলিতেছেন—"নমঃ প্রামাণ্যবাদায় মৎকবিত্বাপহারিণে।" ভাবপ্রবণতা বা কবিত্ব সত্যানুসন্ধিৎসার বিঘ্ন উৎপাদন করে, তাই শিরোমণি মহাশয় অন্তর হইতে সমস্ত কল্পনাকে নির্ব্বাসিত করিয়া প্রমাণের আলোক হাতে করিয়া সত্যের অনুসন্ধানে যাত্রা করিয়াছেন। অন্তরের মধ্যে "সত্য শিব সুন্দর"কে উপলব্ধি করাই যদি জীবনের সার্থকতা হয়, তাহা হইলে আর রঘুনাথ ও তদনুবর্ত্তী নৈয়ায়িকগণের অশেষ শ্রমকে ব্যর্থ বলিয়া দূরে ফেলা যায় না।

খৃষ্টীয় ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর বহু নৈয়ায়িকের নাম ও গ্রন্থ-তালিকা পরলোকগত ডক্টর মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার History of Indian Logic (1922) নামক সুবৃহৎ গ্রন্থে লিখিয়াছেন। ঐ নাম-তালিকা পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, বঙ্গদেশে দার্শনিক আলোচনা কিরূপভাবে দ্রুত চলিয়াছিল। তবে নৈয়ায়িকগণের কাল-নির্ণয়-ব্যাপারে বিদ্যাভূষণ মহাশয় অনেক স্থলেই প্রবাদ ও অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াছেন; কিন্তু সেই অনুমানগুলি একত্র করিয়া দেখিলে তাহা পরস্পর-বিরোধী বলিয়া ধারণা জন্মে। আর তিনি কেবলমাত্র তালিকা করিয়া নিরস্ত না হইয়া যদি নব্যন্যায়ের গ্রন্থাদি হইতে উহার ক্রমবিকাশ দেখাইতেন তবেই গ্রন্থ যথার্থ History of Philosophy হইত।

সপ্তদশ শতাব্দীতে মথুরানাথ তর্কবাগীশ মাথুরী ও জগদীশ তর্কালঙ্কার জাগদীশী নামক ভাষ্য রচনা করিয়া বাঙ্গালীর দার্শনিক গৌরব বর্দ্ধিত করেন। জগদীশ শব্দের প্রামাণ্য-সম্বন্ধে পরমতনিরাকরণপূর্ব্বক শব্দ যে স্বতন্ত্র প্রমাণ ইহা সংস্থাপন করিয়াছেন ও প্রকৃতি, প্রত্যয় ও নিপাত এই তিন-প্রকার সার্থক শব্দের বিভাগ করিয়াছেন। জগদীশ আবার শ্রীচৈতন্যদেবের শ্বশুর সনাতন মিশ্রের চতুর্থ অধস্তন পুরুষ হওয়ায় বাঙ্গালীর অধিকতর পূজার পাত্র হইতেছেন।

খানাকুল কৃষ্ণনগরে কণাদ তর্কবাগীশ মহাশয় আবির্ভূত হইয়া ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। প্রবাদ যে তিনি রঘুনাথের সহপাঠী ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ছাত্র ছিলেন। কিন্তু ইহার মূলে কোনো সত্য আছে বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার নিজকৃত ভাষ্যগ্রন্থের মঙ্গলাচরণ দেখা যায়।

তিনি চূড়ামণি উপাধিধারী কোনো পণ্ডিতের ছাত্র ছিলেন। অনুমান হয় যে ঐ চূড়ামণি ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী নামক গ্রন্থ-লেখক জানকীনাথ চূড়ামণি হইবেন। তাহা হইলে কণাদ তর্কবাগীশ খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর লোক বলিয়াই বোধ হয়। তিনি মণিব্যাখ্যা নামে চিন্তামণির টীকা বৈশেষিক দর্শন-সম্বন্ধীয় ভাষারত্ন ও অপর একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

সপ্তদশ শতাব্দীর আর-একটি নব্য নৈয়ায়িক আজও নব্যন্যায়ের ছাত্রগণের প্রিয়সঙ্গী হইয়া আছে। তাঁহার নাম গদাধর ভট্টাচার্য্য, তাঁহার টীকা গদাধরী বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তাঁহার ব্যুৎপত্তিবাদ নামক গ্রন্থ ১৬২৫ খৃষ্টাব্দে একজন নকল করিয়াছিল দেখা যায়। আবার ইতিহাস-প্রণেতা শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন বলেন যে, তাঁহার সপ্তম অধস্তন পুরুষ এখনও তাঁহার বাসগ্রাম বগুড়া জেলার অন্তর্গত লক্ষ্মীচাপড় গ্রামে বাস করিতেছেন। ইনি হরিরাম তর্কসিদ্ধান্তের ছাত্র ছিলেন ও তাঁহার পরেই স্বীয় প্রতিভাবলে নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হন।

তাঁহার পূর্ব্বে ও পরে বহুতর নৈয়ায়িক গ্রন্থরচনা করিয়া বঙ্গদেশের দার্শনিক আলোচনার স্রোত অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। মনীষীগণের বিশেষতঃ স্বদেশীয় কৃতবিদ্যগণের নাম-গ্রহণেও পুণ্য আছে।

নবদ্বীপ যে ভারতবর্ষের অক্সফোর্ড-স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল তাহা সকলেই অবগত আছেন। নব্যন্যায়ের আলোচনার প্রধান ক্ষেত্র নবদ্বীপে হইবার দুইটি কারণ আমরা দেখিতে পাই। প্রথম হইতেছে যে, বঙ্গদেশের নবজাগরণের সূত্রপাত এইখান হইতেই হয়; তাই ইউরোপের মধ্যযুগে যেমন ইতালির ফ্লোরেন্স নগরে বিদ্বজ্জনের সমাবেশ হইয়াছিল, সেইরূপ নবদ্বীপে সকল শ্রেণীর পণ্ডিতের শুভাগমন হইয়াছিল। অপর-একটি কারণ পরবর্ত্তী কালের কৃষ্ণনগরাধিপতিগণের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা। কিন্তু নবদ্বীপই জ্ঞানালোচনার একমাত্র স্থান হয় নাই—বঙ্গদেশের মধ্যে অন্যান্য স্থানেও দার্শনিকগণ জন্মগ্রহণ করিয়া গ্রন্থরচনা ও অধ্যাপনা করিয়া গিয়াছেন।

এইসকল স্থানের মধ্যে বিক্রমপুর, বাকলা চন্দ্রদ্বীপ, গুপ্তপল্লী, ভট্টপল্লী, পূর্ব্বস্থলী, দিগুতুই, বালি, খানাকুল কৃষ্ণনগর ও ফরিদপুরের কোটালীপাড়ার নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য বঙ্গদেশের জ্ঞানচর্চ্চার ইতিহাস রচনা করিতে হইলে ঐস্থানগুলির প্রত্যেকটিতে কতজন পণ্ডিত কোন্ সময়ে আবির্ভূত হইয়া জ্ঞানপ্রচারের জন্য কি কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তাহা লেখা প্রয়োজন। যতদিন পর্য্যন্ত না সেরূপ অনুসন্ধান হইতেছে, ততদিন বাঙ্গলার ইতিহাস সর্ব্বাঙ্গীণ হইতে পারিবে না।

এইসকল স্থানের মধ্যে এক কোটালীপাড়ায় যত অধিক-সংখ্যক পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তত আর অন্য কোনো স্থানে করিয়াছেন বলিয়া আমার মনে হয় না। দার্শনিকগণের মধ্যে এখানে রামচন্দ্র ন্যায়বাগীশ একজন অসাধারণ নৈয়ায়িক ছিলেন। কৃষ্ণনাথ সার্ব্বভৌম জগদানন্দ তর্কবাগীশ প্রভৃতি প্রাচীনকালের পণ্ডিতগণ ও বর্ত্তমানযুগের মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, কুলচন্দ্র শিরোমণি, আশুতোষ তর্করত্ন, জয়নারায়ণ তর্করত্ন, নবযুগের হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যাতা শশধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি কোটালীপাড়ার মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। কোটালীপাড়ার পণ্ডিতগণের বিচার ও সিদ্ধান্ত এককালে সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গ মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিত। এই সুপ্রসিদ্ধ গ্রামে আমরা দুইজন দার্শনিক মহিলার পরিচয় পাই। উপনিষদ্-যুগের গার্গী, মৈত্রেয়ীর জীবনের আদর্শ যে এদেশে একেবারে ব্যর্থ হইয়া যায় নাই, তাহা তাঁহাদের জীবনী পর্য্যালোচনা করিলেই বুঝা যায়। ইঁহাদের মধ্যে একজনের নাম বৈজয়ন্তী দেবী ও অপরের নাম প্রিয়ম্বদা দেবী। ইঁহারা উভয়েই অষ্টাদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। উভয়েরই জ্ঞাতি বংশধর আজও বিদ্যমান রহিয়াছেন। "আনন্দলতিকা" নামক কাব্যে বৈজয়ন্তী দেবীর স্বামী বলিয়াছেন—"যেনাকারি প্রিয়া সহ" স্বামীস্ত্রী উভয়েই একত্র হইয়া এই কাব্যলেখার দৃষ্টান্ত বাঙ্গলাদেশে আর আছে কি না সন্দেহ। বৈজয়ন্তী দেবী পিতার নিকট টোলে তর্কশাস্ত্র-অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; স্বামীগৃহে আসিয়া তাঁহার নিকটও গভীরভাবে দর্শনশাস্ত্র আলোচনা করেন। প্রিয়ম্বদা দেবী পণ্ডিতপ্রবর শিবরাম সার্ব্বভৌম মহাশয়ের কন্যা; শিবরাম তাঁহাকে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন ও বিবাহের পূর্ব্বে প্রিয়ম্বদাকে মীমাংসাদর্শনে ব্যুৎপন্না করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার স্বামী রঘুনাথ মিশ্রের গৃহে আসিয়াও দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করিতেন। কথিত আছে যে, তিনি মদালসা উপাখ্যানের দার্শনিক টীকা ও ভারতীয় শাস্তি-

পর্ব্বের মোক্ষধর্ম্মের একখানি বিস্তৃত টীকা প্রণয়ন করেন। কোটালীপাড়ার এই দুই বিদুষীর নাম করিতে যাইয়া পূর্ব্ববঙ্গের মহিলা কবি আনন্দময়ীর কথাও মনে পড়িয়া যায়। কথিত আছে রাজা রাজবল্লভ একদা অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের প্রমাণ ও যজ্ঞকুণ্ডের প্রতিকৃতি চাহিলে আনন্দময়ী তাহা প্রেরণ করেন। ইহাও বঙ্গমহিলার মীমাংসাদর্শনের সহিত পরিচয়ের প্রমাণ-স্বরূপ।

এই স্থলে বলা প্রয়োজন যে, বঙ্গদেশে ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনা প্রবলভাবে চলিলেও অপরাপর দর্শনের আলোচনাতেও বাঙ্গালী পণ্ডিতেরা অমনোযোগী ছিলেন না। মীমাংসা-দর্শনের আলোচনা-প্রসঙ্গে ইহা বলা প্রয়োজন যে, নৈয়ায়িকগণ খুব ঘনিষ্ঠভাবেই উক্ত দর্শনের সহিত পরিচিত ছিলেন। কেননা তাঁহাদিগকে প্রভাকর মত, জরন্নৈয়ায়িক মত প্রভৃতি খণ্ডন করিবার জন্য মীমাংসা দর্শন খুব ভালো করিয়া পড়িতে হইত। বৈশেষিক দর্শনের সহিত নব্যন্যায়ের যথেষ্ট সম্বন্ধ লক্ষিত হয়। নব্যন্যায়ের অধ্যাপকগণের মধ্যে অনেকেই বৈশেষিক দর্শনের উপর গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপে ভাষা-পরিচ্ছেদকার বিশ্বনাথ সিদ্ধান্তপঞ্চাননের বৈশেষিক দর্শন-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ, জগদীশের তর্কামৃত নামক বৈশেষিক দর্শনের ক্ষুদ্রগ্রন্থ, হরিরাম তর্কবাগীশের সপ্তপদার্থনিরূপণ নামক বৈশেষিক শাস্ত্রের ব্যাখ্যার উল্লেখ করা যাইতে পারে।

সাংখ্যদর্শন-সম্বন্ধেও নৈয়ায়িকগণ গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। আমরা রঘুনাথ তর্কবাগীশের সাংখ্যতত্ত্ববিলাস, বংশধর শর্ম্মার সাংখ্যতত্ত্ববিভাকর প্রভৃতি গ্রন্থ দেখিতে পাই।

অদ্বৈতবাদের বৈদান্তিকেরও বঙ্গদেশে অভাব ছিল না। সুপ্রসিদ্ধ বৈদান্তিক মধুসূদন সরস্বতীপাদ ফরিদপুরের কোটালীপাড়ায় জন্মগ্রহণ করিয়া বঙ্গদেশকে গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কৃত ভাষ্যাদি পাঠ করিলে শঙ্করাচার্য্যের বাক্যের যথার্থ তাৎপর্য্য উপলব্ধি করা যায়। তাঁহার জ্ঞাতিবংশের অধস্তন দশম পুরুষ আজও কোটালীপাড়ায় বাস করিতেছেন। তিনি বিশ্বেশ্বর সরস্বতী নামক এক দণ্ডীর নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তাঁহার লিখিত ২২খানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি ও গীতার শাঙ্কর ভাষ্যের ব্যাখ্যা সবিশেষ প্রসিদ্ধ।

সকল দর্শনেরই যে আলোচনা বঙ্গদেশে হইত তাহা পর্তুগীজগণ জানিতেন না। Abbe Journdain's ournal হইতে জানিতে পারি যে, ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের রাজার লাইব্রেরীর জন্য রঘুনাথ, মথুরানাথ, গদাধর ও জগদীশের গ্রন্থরাজি প্রেরণ করা হইয়াছিল। পর্তুগীজগণ বাঙ্গালার নব্যন্যায়ের আলোচনায় সবিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। Anquetil Du Perron বলিয়াছেন যে, Father Mosac নবদ্বীপে সংস্কৃত-শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন। Father Mosac-এর সহিত Perron-এর ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে চন্দননগরে আলাপ হইয়াছিল।

বঙ্গদেশে যখন ন্যায়শাস্ত্রের এরূপ প্রবল প্রভাব সেই সময়েই বাঙ্গলার একটি সাধক-সম্প্রদায় যে বৃন্দাবনের নিকুঞ্জে বসিয়া এক বেদান্তবাদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সে-কথা তখন জনসাধারণে বিশেষ অবগত হন নাই। আজও তাহাদের কথা আমাদের দেশে যে খুব আলোচিত হইয়াছে তাহা নহে। বৈষ্ণব-চরিত ও লীলাগ্রন্থগুলিই আমাদের বাবাজী মহাশয়েরা ও আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিগণ আলোচনা করিয়া থাকেন। বাংলার বৈষ্ণব দর্শনের সহিত খুব অল্প লোকই পরিচিত। অথচ ইহা বাঙ্গালী প্রতিভার কিছু কম নিদর্শন নহে যে, খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে যখন বেদান্তের উপর প্রায় শতাধিক বাদ ঘোষিত হইয়াছে, তখন সেইগুলি নিরস্ত করিয়া একটি নূতন মতবাদ বঙ্গদেশে ঘোষিত হইল।

বাংলার বৈষ্ণবগণের দার্শনিক মতবাদের নাম অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ। খৃষ্ট বা বুদ্ধ যেমন কোনো গ্রন্থ লিখিয়া যান নাই, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও তেমনি কোনো গ্রন্থ রচনা করেন নাই। তবে তাহার উপদেশ ও জীবনী অবলম্বন করিয়া পরে বৈষ্ণব সাধকগণ অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদের সৃষ্টি করেন। শ্রীরূপ ও সনাতন লীলাবিষয়ে ব্যাখ্যা ও গ্রন্থই রচনা করেন। তবে সেই লীলাবর্ণনার মধ্যেই সূক্ষ্মভাবে উক্ত বাদের মূলতত্ত্ব নিহিত ছিল। পরে তাঁহাদের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীব গোস্বামীপাদ এই নূতন দর্শনবাদ সৃজন করিলেন। শ্রীজীবের ন্যায় পাণ্ডিত্য-প্রতিভা বঙ্গদেশের কেন ভারতবর্ষেরও খুব কম পণ্ডিতের ছিল। তিনি শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করিয়া যে অপূর্ব্ব রত্ন আহরণ করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালীর কণ্ঠদেশে সুশোভিত থাকা উচিত। অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদের উৎপত্তির পূর্ব্বে ভাস্করাচার্য্য উপচারের ভেদাভেদ প্রচার করেন। তাঁহার মতে একই বস্তুর অবস্থাভেদে কারণত্ব ও কার্য্যত্ব পরিলক্ষিত হয়। সর্ব্বত্রই কারণাত্মকতা ও জাত্যেকত্ব দ্বারা অভেদ এবং কার্য্যাত্মকতা ও প্রকাশাত্মকতা দ্বারা ভেদ দেখা যায়। যেমন ঘটের কারণ মাটি সুতরাং মাটি ও ঘট একই। এস্থলে কারণাত্মকতার দ্বারা অভেদ। কিন্তু কার্য্যরূপে ও ঘটাকারজনিত প্রকাশরূপে মৃত্তিকা হইতে ঘট ভিন্ন বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু এই ভেদাভেদ ঔপচারিক— নিম্বার্ক ভাষ্যের ন্যায় ইহাতে বাস্তব ভেদাভেদ স্বীকৃত হয় নাই।

শ্রীজীব তাঁহার নিজের মত সর্ব্বসম্বাদিনীতে অতি অল্পের মধ্যে বলিয়াছেন। আমরা তাহার বাদানুবাদ দিলাম। শ্রীজীব বলেন, "অপর এক সম্প্রদায়ী বেদান্তীরা বলেন, তর্কের অপ্রতিষ্ঠা হেতু ভেদেও এবং অভেদেও নিখিল দোষসমূহ দর্শনে ভিন্নতারূপ চিন্তা করা অসম্ভব। এইজন্য যেমন ভেদসাধন করা দুষ্কর, তেমনি অভিন্নভাবে চিন্তা করিয়া অভেদ-সাধন করাও দুষ্কর। এইরূপে ভেদাভেদ সাধনে চিন্তার অসমর্থতা উপলব্ধিতে অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ স্বীকার করেন। বাদরায়ণ পৌরাণিক ও শৈবগণের মতে ভেদাভেদবাদ। মায়াবাদিগণের মতে ভেদাংশ ব্যবহারিক বা প্রাতীতিক মাত্র। গোতম, কণাদ, জৈমিনি, কপিল ও পতঞ্জলির মতে ভেদবাদ; রামানুজ মতে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও শ্রীমাধবাচার্য্য মতে ভেদবাদ স্বীকৃত হইয়াছে। পরমতত্ত্ব অচিন্ত্য শক্তিময় বলিয়া স্বীয় মতে অচিন্ত্য ভেদবাদই সিদ্ধান্তিত হইল।"

শ্রীজীবের পর অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ ভাগবতের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া ঐ বেদান্ত-মত সমর্থন করিয়াছেন। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কথা এই যে তিনি বাঙ্গলা গ্রন্থ 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা' ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সংস্কৃত দার্শনিক টীকা রচনা করেন। তাঁহার পরে বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় গোবিন্দভাষ্য নামে বেদান্তদর্শনের ভাষ্য রচনা করেন। বলদেব শ্রীজীবেরই অনুবর্ত্তন করিয়া এই ভাষ্য লিখিলেও, তিনি মাধ্বমতের দিকে যেন একটু বেশী ঝুঁকিয়াছেন। বলদেব গোবিন্দভাষ্য, তাহার স্বকৃত টীকা, সিদ্ধান্তরত্ন, গীতাভাষ্য প্রভৃতি রচনা করেন।

শ্রীজীবের সহিত বিশ্বনাথের বৈষ্ণবলীলাবাদের একটি প্রধান বিষয় লইয়া মতভেদ দেখা যায়। শ্রীজীব উজ্জ্বলনীলমণির টীকাতে ১২টি যুক্তি-দ্বারা স্বকীয়াবাদ স্থাপন করেন। আজকাল পদাবলী অনেকেই আলোচনা করিতেছেন; কিন্তু উজ্জ্বলনীলমণি না পড়িলে উহার সম্যক্ উপলব্ধি হয় না। বিশ্বনাথ আবার ২০টি যুক্তিদ্বারা ঐ মত খণ্ডন করেন। বিশ্বনাথের সময় পদকল্পতরুর সংগ্রহ-কর্ত্তা সুপ্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা রাধামোহন ঠাকুর মহাশয়ও পরকীয়াবাদী ছিলেন। নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ নিজ মোহর দ্বারা পরকীয়াবাদীদের জয় স্থির করিয়া দেন (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০৮)। কিন্তু ইহার ফলে বঙ্গদেশে বৈষ্ণব সমাজ যৎপরোনাস্তি দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া উঠেন। সাধারণ বৈষ্ণবগণ দাস্য নিকভাবে

পরকীয়াবাদ গ্রহণ না করিয়া স্বঅ জীবনে উহার অভিনয় করিতে গিয়াছিলেন। তাই বিশ্বনাথের পরকীয়াবাদ স্থাপনের পর বৈষ্ণব-সমাজের দুর্গতি আরম্ভ হইল এবং আর বৈষ্ণবদর্শনের এত ক্রমবিকাশ হইল না।

বৈষ্ণবদর্শনের বিকাশপথ রুদ্ধ হইয়া গেলেও ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনা আমাদের দেশে সমভাবেই চলিতে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের পুত্র রুদ্ররাম ৫ খানি ও কৃষ্ণকান্ত বিদ্যাবাগীশ ৭ খানি গ্রন্থ রচনা করেন। এই সময়ের আরও অনেক নৈয়ায়িক পণ্ডিতের যশকাহিনী আজ পর্য্যন্ত লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায়। ইঁহাদের মধ্যে বুনো রামনাথের নাম সবিশেষ প্রসিদ্ধ। কৃষ্ণনগরের মহারাজা শিবচন্দ্র তাঁহার গৃহে যাইয়া জিজ্ঞাসা করেন যে, পণ্ডিতের কোনো অভাব আছে কি না। রামনাথ নৈয়ায়িক চিন্তায় নিমগ্ন—তিনি অভাব বলিতে সমস্যা অসমাধিত আছে কি না তাহাই বুঝিয়া বলিলেন—"না মহারাজ, আমি সমস্ত অভাব পূরণ করিতে সমর্থ হইয়াছি।" মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাতে নবদ্বীপের হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত ও কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি প্রভৃতি পণ্ডিত ছিলেন।

কোম্পানীর আমলেও বাঙ্গলাদেশে দার্শনিক পণ্ডিতের অভাব হয় নাই। সাধারণের ধারণা আছে যে, বেদান্তশাস্ত্রের আলোচনা আমাদের দেশে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, রাজা রামমোহন রায়ই উহার পুনরায় প্রবর্ত্তন করেন। কিন্তু ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের কলিকাতা রিভিউএর What is Vedanta নামক প্রবন্ধে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার কৃত বেদান্তচন্দ্রিকার নাম উল্লেখ দেখা যায়। ঐ গ্রন্থ ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছিল। তখনও রাজার দার্শনিক গ্রন্থরাজি বাহির হয় নাই। কথিত আছে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ষড়্দর্শনে সমান পণ্ডিত ছিলেন।

তাঁহার পর আমরা সংস্কৃতকলেজের পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননকে লাভ করিয়াছিলাম। তিনি কণাদসূত্রবিবৃতি নামক বৈশেষিক দর্শনের টীকা ও পদার্থসার নামক ন্যায়গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি "সর্ব্বদর্শন সংগ্রহের"ও মর্ম্মানুবাদ করিয়া বঙ্গ ভাষার শ্রীবৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কলেজে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, তারাশঙ্কর তর্করত্ন, দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন, রামকমল ভট্টাচার্য্য, ও চতুষ্পাঠীতে মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, শ্রীনন্দন তর্কবাগীশ, হরচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, রাখালদাস ন্যায়রত্ন, তারাচাঁদ তর্করত্ন প্রভৃতি বঙ্গদেশীয় প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিতগণ শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন।

চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় ফেলোশিপের বক্তৃতায় যেরূপ সরলভাবে বেদান্ত-দর্শন বুঝাইয়াছেন, সেরূপ করিয়া আর এপর্য্যন্ত কেহ বুঝাইতে পারেন নাই। কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়ও বহু দার্শনিক গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় প্রচার করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয় ন্যায়ের এক অভিনব ব্যাখ্যা করেন। তিনি অতিরিক্ত জীবাত্মা স্বীকার না করিয়া মনকেই জীবসংজ্ঞা দান করিয়াছেন। জীবাত্মা ও মনে ঐক্যসংস্থাপন নৈয়ায়িকের এই সর্ব্বপ্রথম উদ্যম।

বামুন-বাগ্দী

শ্রী অরবিন্দ দত্ত

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মহেশ্বরীর জন্য কলিকাতায় একটি বাড়ী ভাড়া করা হইয়াছিল। তাঁহারা সকলে সেই বাসায় আসিয়া উঠিলেন। ছেলেদের কষ্ট হইবে বলিয়া দুইদিন কলিকাতায় যাপন করিয়া তাঁহারা সেতুবন্ধ যাইবার জন্য তৃতীয় দিবসে হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। টিকিট খরিদ করা হইলে তারিণীচরণ মহেশ্বরীকে লইয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। তখনও গাড়ী ছাড়িতে প্রায় কুড়ি মিনিট বিলম্ব ছিল। ছেলেরা বলিল, "আমরা ঠিক সময়ে এসে উঠ্‌ব, একটু এদিক্-ওদিক্ বেড়িয়ে আসি।"

তাহারা ইতস্তত বেড়াইতে-বেড়াইতে একস্থানে দেখিল একটি ভদ্রলোক একটি পীড়িতা স্ত্রীলোকের পার্শ্বে বসিয়া অশ্রুপাত করিতেছেন। আর দশ-বারো বৎসরের একটি বালিকা কখনও অঞ্চল দ্বারা তাহার জননীকে বাতাস করিতেছে, কখনও বা হস্ত ও পদের অঙ্গুলিগুলি টানিয়া-টানিয়া দিতেছে।

কানাইলাল জিজ্ঞাসা করিল, "এঁর কি হয়েছে? আপনি কাঁদ্‌ছেন কেন?"

ভদ্রলোকটি বলিলেন, "আমি বড়ই বিপদ্‌গ্রস্ত। ঘাটালে আমি চাকুরি করি। এদের নিয়ে ব্রহ্মপুত্র-স্নানে গিয়েছিলাম। গতরাত্রে এই ষ্টেশনেই এঁর কলেরা হয়েছে। এখনও পর্য্যন্ত একটুও ঔষধ পড়েনি। ষ্টেশনে এত ভদ্রলোক ভিড় ক'রে আছেন, কিন্তু এমন-একটি লোকেরও সাহায্য পেলাম না যে, দুটো হোমিওপ্যাথিক ওষুধ আনাই। এদের ফে'লেও যেতে পারিনে।"

কানাই কহিল, "কি ওষুধ আন্‌তে হবে বলুন, আমি এনে দিচ্ছি।"

কানাইলালের উপর সজল চক্ষুদু'টি স্থাপিত করিয়া ভদ্রলোকটি তাঁহার কৃতজ্ঞতা জানাইলেন। মুখে কিছুই বলিতে পারিলেন না। তিনি একখানি কাগজে ঔষধ-দু'টির নাম লিখিয়া দিলেন।

বলাইকে সঙ্গে লইয়া কয়েক পদ আসিবার পর কানাই তাহাকে কহিল, "ভাই! তুমি যাও, বড়-মা আবার ব্যস্ত হ'য়ে পড়্বেন। আচ্ছা! চলো, বড়-মাকে একবার ব'লেই যাই।"

তাহারা তখন তাড়াতাড়ি করিয়া মহেশ্বরীর নিকটে আসিল। কানাই কহিল, "একটি ভদ্রলোকের স্ত্রীর বড় ব্যারাম। আমি এই ওষুধ-দুটো কি'নে তাঁকে দিয়ে আস্ছি। বলাই, তুই গাড়ীতে যা, বস্বি। আর বড়-মা! যদি একটু দেরি হ'য়ে পড়ে—আর গাড়ী ছাড়্বার সময় হয়, তবে নেমে পোড়ো—পরের গাড়ীতে যাবো। ফে'লে যেও না যেন।"

মহেশ্বরী কহিলেন, "আচ্ছা! তাড়াতাড়ি ক'রে আসিস্—সময় বড় নেই। বলাই তোর সঙ্গে গেলে পার্‌ত।"

কানাই বলিল, "চট্‌পট্ ছু'টে চ'লে আস্তে হবে; দু'জনে গেলে আবার নজর রেখে চল্‌তে হবে—সে আরও দেরি হ'য়ে যাবে।"

এই বলিয়া কানাই ছুটিয়া চলিয়া গেল।

তারিণীচরণ মনে-মনে বলিল, দেরি হ'লেই মঙ্গল, উপসর্গটা এখানে ঝেড়ে ফে'লে যেতে পার্‌লে পুণ্যসঞ্চয়ে আর বাধা হবে না।"

এদিকে যখন গাড়ীর দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়িল তখন মহেশ্বরী কহিলেন, "মামা তা'র ত দেরি হচ্ছে। জিনিষপত্তরগুলো নামিয়ে রাখ্‌লে হ'ত? শেষে তাড়াতাড়ি ক'রে নামানো যাবে না।"

তারিণী কহিল, "যদি গাড়ী ছাড়্‌তে-ছাড়্‌তে এসে পড়ে, তবে তুল্‌তেও ত পারা যাবে না। মি ভেব না, মা! দরকার হ'লে তারিণীচরণ এ মিনিটেই গাড়ী খালি ক'রে নেবে। জয় রাধে-গোবিন্দ।"

মহেশ্বরী কহিলেন, "না হয় পরের গাড়ীতেই যাবো?"

তারিণী কহিল, "তুমি ক্ষেপেছ, মা! ছোঁড়াটাকে ফে'লে যাবো? আসে ভালোই—না আসে একটা কিছু কর্‌বই। জয়—রা—রাধে।"

তৃতীয় ঘণ্টা বাজিল। মহেশ্বরী দ্বার খুলিয়া বাহির হইতে যাইবেন এমন সময় তারিণী সজোরে হাত চাপিয়া ধরিল। বলিল, "ওই দেখ না—ওই যে দৌড়ে আস্ছে।"

জনস্রোতের মধ্যে মহেশ্বরী তাঁহার কানাইলালকে নির্ণয় করিতে পারিলেন না। ইতিমধ্যে গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

মহেশ্বরী বেঞ্চের উপর এলাইয়া পড়িলেন। তারিণী বুঝাইতে লাগিল—"সে নিশ্চয়ই পিছনের কোনো গাড়ীতে উ'ঠে পড়েছে। পরের ষ্টেশনে গাড়ী থাম্‌লে খুঁজে নেবো।"

তারিণীর সান্ত্বনা-বাক্যে মহেশ্বরী আশ্বস্ত হইতে পারিলেন না। মাতৃ-হৃদয়ের ফাঁকা স্থানটি, যে ফাঁক্ করিয়াছে, সে ভিন্ন আর কেহ পূরণ করিতে পারে না। এই স্নেহময়ী শান্ত-স্বভাবা সৎ-জননী বলাইকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন, কিন্তু যে-স্থানটা ফাঁকা হইয়াছে, সে-স্থান যে পূরণ হয় না! তিনি কাঁদিতে-কাঁদিতে কহিলেন, "মামা! গাড়ী যদি না থামে?"

তারিণী ধম্‌কাইয়া কহিল, "থাম্‌বে না—রাতদিনই চল্‌তে থাক্‌বে?"

"এই ত ষ্টেশনের পর ষ্টেশন ফে'লে চলেছে—থামে কই?"

"ডাক-গাড়ী যে—সকল ষ্টেশনে ধরে না। জয়—রা—।"

বলাইএর চক্ষে ধারা বহিতেছিল। মহেশ্বরী বলাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যাদের ওষুধ আন্‌তে গেছে—তাদের কি অসুখ?"

বলাই কহিল, "কলেরা।"

মহেশ্বরী সভয়ে উচ্চারণ করিলেন, "কলেরা!" তাঁহার মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া গেল। শুধু বুকের স্পন্দনটা দ্রুত করিয়া দিয়া তাঁহার দেহের অন্যান্য ক্রিয়াসকল কে যেন হঠাৎ থামাইয়া দিল। তিনি বেঞ্চের উপর আবার ঢলিয়া পড়িলেন। যে-কালব্যাধি কানাইলালের গৃহখানি শ্মশান করিয়া দিয়া কেবল তাহাকেই অবশিষ্ট

রাখিয়াছে, সে আজ তাহাকে সম্মুখে পাইয়া কি আত্ম-সম্বরণ করিতে পারিবে? মহেশ্বরী যাহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া এতদিন কত অপমান, বিদ্রূপ, নির্যাতন, সমস্তই অম্লান-বদনে বুক পাতিয়া সহ্য করিয়া আসিতে-ছেন, প্রাণের সে স্নেহ-সম্পদ হারাইয়া আজ কিরূপে তিনি প্রকৃতিস্থা থাকিবেন? যিনি বিপদে-বিষাদে কত শান্ত, তিনি আজ এমন অশান্ত হইয়া উঠিলেন যে, এক-সময় তিনি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"মামা!—তুমিই মাতৃ-হৃদয়ের এ দুর্দ্দশা করেছ! মাতৃ-স্নেহ যে কি জিনিষ তা জানো না।"

তারিণী বিদ্রূপের স্বরে কহিল, "হাঁ মা! মাতৃস্নেহ যে কুস্থানে গিয়ে তা'র নামের কলঙ্ক করে, সেটা জান্‌তাম না বটে! জয়—রাধে গোবিন্দ।"

মহেশ্বরী বুকের উপর হাত রাখিয়া কহিলেন, "পাগল! এখানে বিভাগ নেই—বিচার নেই——ভাগ-বাঁট্‌রা নেই—সব একাকার।" মহেশ্বরীর স্বর জড়াইয়া আসিল।

তারিণী বার-দুই রাধা-গোবিন্দের নাম উচ্চারণ করিয়া বলিল, "একাকার না হ'লে আর এমন একাকার কর্‌তে পারো?"

মহেশ্বরী কহিলেন, "সম্পর্কে তুমি মামা, কিন্তু আমার ইচ্ছে হচ্ছে যে, বালকের মতন তোমাকে বোঝাই। বর্ষা যখন নামে তখন শুধু বড় গাছের উপর তা বর্ষিত হয় না—আগাছা-কুগাছা সমানভাবেই তা ভোগ কর্‌তে পায়। নারীর এ বিরাট্ রূপ তুমি কখনো চোখে দেখনি। কি পিতা, কি স্বামী, কি সন্তান কেহই এ রূপকে বিভেদ ক'রে দেখেন না। সকলে সমানভাবে স্নেহ পেয়ে থাকেন। সে যাক্—যা করেছ তা'র আর হাত নেই। আমি জান্‌তাম, তোমার বয়স হয়েছে, তাই তোমাকে সঙ্গে আন্‌তে ইতস্তত করিনি।"

তারিণী তাহার জলন্ত চক্ষু-দুটি মহেশ্বরীর দিকে ফিরাইয়া কহিল, "তুমি ডেকে এনে অপমান কর্‌বে না বিশ্বাস ছিল ব'লেই আমি আস্‌তে দ্বিধা করিনি।"

মহেশ্বরী কহিলেন, "মামা! তুমি ভুল বুঝেছ। আমরা কারো অপমান কর্‌তে পারিনে। কিন্তু সকলকে শাসন কর্‌বার অধিকার আমাদের আছে। সে অধিকার-টুকু বোঝো না ব'লেই মনে ব্যথা পাও।"

তারিণী আর-কিছু বলিল না। মহেশ্বরীও নীরব হইলেন। বড়-মার চিত্ত-চাঞ্চল্য দেখিয়া বলাই এতক্ষণ কিছু বলিতে সাহস করে নাই। সঙ্গীহীন হইয়া তাহার এমন অসহ্য যাতনা বোধ হইতেছিল যে, গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িতে পারিলে সে যেন বাঁচিত। তারিণী-চরণের সহিত মহেশ্বরী যখন মিষ্টভাবে আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন তখন তাহার কিছু সাহস হইল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "বড়-মা! কানাইদা'কে পাওয়া যাবে ত?"

মহেশ্বরী তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইলেন। বলিলেন, "পাওয়া যাইবে বই কি! প্রাণে ছাড়্‌তে না চাইলে কি ছাড়াছাড়ি হয়। যে-কালব্যাধির কথা শুনিয়েছিস্, এখন বিধাতা তা'কে প্রাণে রাখ্‌লে হয়।"

মহেশ্বরীর বেদনার উচ্ছ্বাসটা যখন তাঁহার নিজের মর্ম্মস্থলকে আহত করিয়া প্রকাশ পাইল, তখন অল্পবুদ্ধি তারিণী মনে করিল, সে বুঝি তিরস্কৃত হইল, এবং গ্লানিটা অবাধে পরিপাক করিবার জন্য চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া রহিল।

মহেশ্বরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "মামা কি ঘুমোলে নাকি?"

তারিণীচরণ অন্যদিকে মুখ করিয়া কহিল, "যে-বিষ ঢেলে দিয়েছ, সেটাকে আগে হজম কর্‌ব—তার পরে ত ঘুম?"

মহেশ্বরী কহিলেন, "বিষ হজম কর্‌তে পার্‌লে অমৃত হ'য়ে যাবে। কিন্তু যদি পরিপাক কর্‌বার ক্ষমতা না থাকে—পেটেই থেকে যায়—তবেই গোল। মামা! কোন্ ষ্টেশনে গাড়ী থাম্‌বে?"

তারিণী উগ্রস্বরেই কহিল, "আমি তা'র কি জানি? রেলের কর্ত্তারাই জানে।"

মহেশ্বরী কহিলেন, "রাগ করো কেন, মামা। সেই ষ্টেশনে যে আমাদের নাম্‌তে হবে।"

তারিণী কিছু বিস্মিত হইয়া কহিল, "কেন? সেতুবন্ধ হ'য়ে গেল নাকি?"

মহেশ্বরী কহিলেন, "কল্‌কাতায় আগে যাই। ছেলে-টাকে পাই ত ফি'রে এলে হবে।"

তারিণী ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আর যদি না পাও?"

মহেশ্বরীর প্রাণ আলোড়িত হইয়া উঠিল। তিনি কিছুক্ষণ জবাব দিতে পারিলেন না। পরে মৃদুস্বরে কহিলেন, "না পাওয়া গেলে কোন্ দিকে যে যাবো এখনও স্থির নেই।"

তারিণী বেঞ্চ্ হইতে লাফাইয়া উঠিল। ভুঁড়িটা নাচাইয়া কহিল,"শোনো মহেশ্বরী! এই নিষ্পাপ দেহখানা তোমার সংস্পর্শে এসে আঠারো আনা পাপ ভর ক'রে দাঁড়িয়েছে। তীর্থের নামে বের হ'লে—পা মচ্‌কালে বাগ্‌দির ছেলে। দেশে গেলে লোকে মুখে নুড়ো জ্বেলে দেবে না?"

মহেশ্বরী অতি দুঃখে হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, "কলকাতায় গিয়ে সুখেনকে খবর দেবো। সে এলে তুমি খরচপত্তর নিয়ে রামেশ্বর যেও।"

তারিণী কহিল,"ছোঁড়াটা—এমন অষ্ট বন্ধনে বেঁধেছে জানতে পারলে তারিণীচরণের আজ পথ থেকে ফিরতে হয়? তারিণী চক্রোবর্ত্তির বুদ্ধির ওপর হাত দেয় এমন লোক আজও জন্মায়নি। নিতান্ত আহম্মক সেজেই ঘর থেকে পা বাড়িয়েছিলুম, নইলে একটা মেয়েলোকের হাতে বুদ্ধিটা জখম হ'য়ে যায়?"

মহেশ্বরী কহিলেন, "সে, মামা যা হবার হয়েছে। সে-কথা যেতে দাও। এখন যে-ষ্টেশনে গাড়ী ধরবে, সেই-খানে নামতে হবে, মনে থাকে যেন। একটা কুলী ডেকে তাড়াতাড়ি জিনিসপত্তরগুলো নামিয়ে নিও।"

তারিণীচরণ সমস্ত দেহ বস্ত্রাবৃত করিয়া শুইয়া পড়িল।

মহেশ্বরী চুপিচুপি বলাইকে কহিলেন, "মামা যদি মন না দেন, তুই একটা কুলী ডেকে জিনিসপত্তরগুলো নামিয়ে নিতে পারবিনে?"

বলাই কহিল, "কেন পারব না? তুমি ভেব না, বড়-মা! আমি সবই ঠিক ক'রে নেবো।"

মহেশ্বরী গাড়ীর গবাক্ষপথে চক্ষু রাখিয়া ষ্টেশনের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তারিণীচরণের নিকট মহেশ্বরীর সমস্ত তাড়না এবং উপদেশ ব্যর্থ হইল। প্রবাস-পথে তারিণীকে মহেশ্বরীর খুবই দরকার। তিনি তাঁহার মনের অসহ্য সন্তাপ তাহাকে একটু-একটু করিয়া বুঝাইতেছিলেন। কিন্তু যে অহঙ্কারে আত্মবিস্মৃত হইয়া শুধু আপনার কৃতিত্বের উপর বিশ্বাস রাখে, তাহাকে বুঝানো ত যায়ই না বরং শত্রুতাসাধনে সে তৎপর হয়। মহেশ্বরী যদি তারিণীর বুদ্ধির প্রতি সম্মান দেখাইয়া কথা বলিতেন, তাহা হইলে হয়ত কিছু ফল পাইতেন। তারিণী মনে মনে ভাবিতেছিল, একটি স্ত্রীলোকের দুর্ব্বুদ্ধির পিছনে যদি গতানুগতিক-ভাবে আপনার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিটা সে ছাড়িয়া দেয়, তাহা হইলে লোকের নিকট তাহার অসারত্ব প্রতিপন্ন হইতে অধিক সময় লাগিবে না। সুতরাং সে মহেশ্বরীকে সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত লইয়া যাইবার জন্য মনের মধ্যে এক নূতন সঙ্কল্প গড়িয়া তুলিল।

তারিণীচরণ সেই যে চক্ষু বুজিয়া পড়িয়াছিল, সে আর উঠিল না—কথা বলিল না—চক্ষুও মেলিল না। সে ভরসা করিয়াছিল যে, একটি বালককে মাত্র আশ্রয় করিয়া এই দূরদেশের একটা ষ্টেশনে নামিয়া পড়িতে মহেশ্বরী কখনই সাহসী হইবেন না। কিন্তু এই স্বার্থান্ধ লোকটির সহিত সামান্য সময়ের সংস্রবে মহেশ্বরী যে-অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, উহার দ্বারা তাঁহারা আর বিশেষ-কিছুই সাহায্য পাইবেন না।

ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে মহেশ্বরী 'মামা'! 'মামা'! বলিয়া কয়েকবার ডাকাডাকি করিলেন। তারিণীর নিদ্রা ভাঙ্গিতে চায় না। বলাই ইতিমধ্যে একটি কুলী সংগ্রহ করিয়া আনিয়া জিনিষপত্র সমস্ত নামাইয়া লইল। এবং মহেশ্বরীকে নামিতে বলিয়া নিজে নামিয়া পড়িল। মহেশ্বরী দ্বারের নিকটে আসিয়া বলিলেন, "মামা! তোমার ত ঘুম ভাঙ্‌ছে না। যদি সেতুবন্ধ যেতে চাও, তোমার নিকট টিকিট আছে, ঐ টিকিটে

যেতে পারো। আর তোমার কি খরচপত্তর লাগ্‌বে একবার বাইরে এসে হিসেব ক'রে নাও।"

এই বলিয়া মহেশ্বরী অবতরণ করিলেন। তারিণী গাত্রবস্ত্র অপসারিত করিয়া দেখিল যে, তাহার ন্যায় কার্য্যক্ষম ও সুচতুর চালকটির পক্ষুত্ব প্রমাণিত করিয়া দিয়া সকলে নামিয়া পড়িয়াছেন। সে আর কি করিবে, অগত্যা সেও নামিয়া পড়িল।

মহেশ্বরী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মামা! তুমি কি সেতুবন্ধ যেতে চাও?"

তারিণীর মনে এমন ভরসা ছিল না যে, সে একাকী দূরদেশে অপরিচিত স্থানে যাইয়া আপনার দেহটাকে বাঁচাইয়া আনিতে পারিবে। সে দন্তবিকাশ করিয়া কহিল, "বলো কি মা। তোমাকে এই জন-সমুদ্রের মাঝে একলাটি ফে'লে দিয়ে যাবো তীর্থ কর্‌তে?" একটু পরে আবার কহিল, "গাড়ীতে উ'ঠে পড়্‌লে হ'ত—বুঝ্‌লে মা। কল্‌কাতা ভারি একটা সহর কিনা। ফি'রে এসে তোমার ছেলেকে তারিণীচরণ একদিনেই টেনে বের্‌ ক'রবে—দেখো। বোম্বে, মাদ্রাজ, দিল্লী, লাহোর সবই তোমার এই মামাটির পায়ের তলায়। বিলেত কিনা যাইনি, তা'র আইডিয়াটা মনের মধ্যে যা গড়া-পেটা রয়েছে সেখানে গেলেও তারিণীচরণ ঘাবড়ে যাবেন না।"

মহেশ্বরী এসকল কথায় কর্ণপাত করিলেন না। গাড়ীর আরোহীগণ, যাহারা কাজে-অকাজে নামিয়া পড়িয়াছিল, গাড়ী ছাড়িবার উপক্রম হইলে তাহারা যখন আবার হুড়্‌-পাড়্‌ করিয়া গাড়ীতে উঠিতে লাগিল তখন তারিণী অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া ষ্টেশনের খানিকটা স্থান লইয়া ছুটাছুটি করিয়া ঘর্ম্মাক্ত-কলেবরে পাগলের মতন মহেশ্বরীর নিকটে আসিয়া বলিল, "মহেশ্বরী! ওই ইঞ্জিনে ধোঁয়া উড়্‌ছে—ওই বাঁশী বাজালে—এখনি হুস্‌ হুস্‌ শব্দ কর্‌বে—এস মা! উ'ঠে পড়ি।" এই বলিয়া একটা বাক্সের একদিকে বলাই, একদিকে তারিণী, দুইজনে দুইদিকে ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। রেলের একজন গার্ড্‌ সেইখান দিয়া যাইতেছিল। তাহাকে দেখিয়া তারিণী বলিল, "বাবা! দোহাই তোমার, গাড়ীটা আর এক মিনিট ঠেকিয়ে রাখো।" তার পর বাক্সছাড়িয়া দিয়া সে দ্রুতপদে যাইয়া মহেশ্বরীর হাত ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। বলিল, "মহেশ্বরী! এ কি কর্‌লি? গাড়ী যে ছেড়ে দিলে—আয়! আয়! এখনও উঠ্‌তে পারা যাবে।"

গাড়ী তখন চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তারিণী মহেশ্বরীর হাত ছাড়িয়া দিয়া রেলের সঙ্গে-সঙ্গে ছুটিতে লাগিল। আর এক-একবার পিছু ফিরিয়া মহেশ্বরীকে ডাকিতে লাগিল। গাড়ীখানা যখন ষ্টেশন ত্যাগ করিয়া গেল, তখন সে হাত পা ছাড়িয়া দিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িল এবং এক-একবার বলাই ও মহেশ্বরীর উপর তাহার সর্ব্বগ্রাসী দৃষ্টি এমন তীক্ষ্ণ করিয়া হানিতে লাগিল যে, তারিণীর চক্ষু বলিয়াই তাঁহারা রক্ষা পাইলেন,—ভস্মীভূত হইলেন না।

এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইবার পর কলিকাতা-গামী ট্রেন্‌খানি আসিয়া প্লাটফর্ম্মে দাঁড়াইল। বলাই টিকিট করিয়া আসিয়া একটি কুলীর সাহায্যে জিনিসপত্র-সকল গাড়ীতে তুলিয়া লইল। মহেশ্বরী কহিলেন, "মামা! আর ব'সে থেকে কি হবে? এস! গাড়ী এখনই ছেড়ে দেবে।" এই বলিয়া মহেশ্বরী গাড়ীতে উঠিলেন। তারিণী আর উপায়ান্তর না দেখিয়া অবরুদ্ধ সর্পের ন্যায় গর্জ্জিতে-গর্জ্জিতে ট্রেনে গিয়া উঠিল।

কলিকাতায় পৌঁছিলে মহেশ্বরী নিজেই সমস্ত ষ্টেশনটি ঘুরিয়া-ফিরিয়া কানাইলালকে তন্ন-তন্ন করিয়া খুঁজিলেন। অবশেষে নিরুৎসাহ হইয়া যেখানে সেই ভদ্রলোকেরা আস্তানা ফেলিয়াছিলেন, সেইখানে আসিয়া বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার সর্ব্বপ্রধান চিন্তা—সেই কাল-ব্যাধি। সেই চিন্তায় তাঁহার দেহ একেবারে অবশ করিয়া ফেলিতে লাগিল। যে খল ব্যাধি তাহার পিতামাতা ভ্রাতা ভগিনী গৃহের সকলকেই একে-একে গ্রহণ করিয়াছে, সে কি আজ তাঁহার জীবনসর্ব্বস্বকে হাতে পাইয়া ছাড়িয়া দিয়াছে? যে-সকল চিন্তা চিত্তের একান্ত অবসাদজনক, সে-সকল এখন অন্তরের অন্তর্ব্বর্ত্তী স্তর হইতে জীবন্ত হইয়া মহেশ্বরীর নিকটে আসিয়া প্রকাশ পাইতে লাগিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "হয়ত বাছা মুখে একটু ওষুধ পায় নাই—জল-জল করিয়া প্রাণটা বাহির হইয়া গিয়াছে! মা-অন্ত প্রাণ

যায়—মায়ের অভাব তাহার জীবনী-শক্তিকে হয়ত অতি মাত্রায় কমাইয়া দিয়াছে। সে যে তাহাকে ফেলিয়া যাইতে নিষেধ করিয়াছিল। একটা গাড়ী অপেক্ষা করিতে বলিয়াছিল। এই উপেক্ষা হয়ত তাহার অভিমানকে জাগাইয়া দিয়া তাহার আত্মনাশের পথ সহজ করিয়া দিয়াছে। তাহার মুক্ত-আত্মা মহেশ্বরীর এ অপরাধ কি ক্ষমা করিতে পারিবে? মহেশ্বরী আর ভাবিতে পারিলেন না। তিনি যেন সেইখানে মাটির সঙ্গে পাথর হইয়া বসিয়া গেলেন।

তারিণী কহিল, "এখানে ব'সে ব'সে ভাব্‌লে ষ্টেশনের পেট খুঁড়ে সে কিছু বের হচ্ছে না, বুঝ্‌লে মহেশ্বরী! এখন যে-পথে হয় এক পথে হাঁটতে হবে ত? পেট্‌টি আর কতক্ষণ শান্ত রাখা যায়?"

মহেশ্বরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলাই! টেলিগ্রাম কোথায় করতে হয় জানিস্‌?"

বলাই কহিল, "জানি—ডাকঘরে। এখানে কাছে ডাকঘর আছে কি না জানিনে। তা সে লোকের কাছে জেনে নিতে পারব। কা'কে টেলিগ্রাম করতে হবে বড়-মা?"

মহেশ্বরী কহিলেন, "সুখেন্‌কে। মামা কি একটু সঙ্গে যেতে পারবে?"

তারিণী মুখ বিকট করিয়া কহিল, "মামার ঠ্যাং দু'খানা পঙ্গু হয়নি—তা সে পারে। তবে তোমার সঙ্গে তীর্থ করতে আস্‌তে হবে জান্‌লে বিশ্বকর্ম্মার নিকট থেকে ঠ্যাং দু'খানার শক্তি চিরস্থায়ী ক'রে নিয়ে আস্‌তাম। তা করা হয়নি, এখন খেয়ে-দেয়েই শক্তি জোগান দিতে হবে।"

তারিণীর হাতে একটি টাকা দিয়া মহেশ্বরী কহিলেন, "এই দিয়ে কিছু জল্‌-টল্‌ খেয়ে যাও।"

তারিণী কহিল, "ছোঁড়াটা কি তোমার এই মামাটির মুখের দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে থাকবে—আর পেটের জালা মেটাবে?"

মহেশ্বরী বলাইএর হাতেও একটি টাকা দিলেন। পথে তারিণী তাহার নিকট হইতে সে টাকাটিও চাহিয়া লইল এবং পাঁচসিকার খাবার খরিদ করিয়া বক্রী বারো আনা সে পকেটে পূরিল। খাবারের চৌদ্দআনা-রকম সে উদরস্থ করিল; বলাই দু'আনা-রকম খাইতে পাইল। তার পর সে মহেশ্বরীর নিকটে আসিয়া বেশ করিয়া চাপিয়া বসিল। মহেশ্বরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "মামা! তোমরা গেলে না?"

তারিণী যখন দেখিল, এই অবোধ নারীর অসঙ্গত অশান্তিটা মুখমণ্ডলের স্নায়ুগুলা পর্য্যন্ত ফুটাইয়া তুলিয়াছে, তখন সে তীর্থদর্শনের অভিপ্রায়টা জীর্ণ করিয়া লইয়া ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইল। সুখেনকে খবর দিয়া বৃথা কালক্ষেপ করা সে সঙ্গত মনে করিল না। সে কহিল, "সুখেনকে খবর দিয়ে কি হবে? সে কি এই লক্ষ-লক্ষ লোকের মাঝ্‌খান থেকে ছোঁড়াকে টেনে বের করতে পারবে?"

মহেশ্বরী কহিলেন, "মৃতদেহ আত্মাটাকে জোর ক'রে পু'রে রাখ্‌বার চেষ্টা যে কি পাগ্‌লামি, সে তুমি বুঝ্‌বে না। প্রাণের উৎসব যে, সে চ'লে গেল! প্রাণ কি ক'রে থাকবে?"

তারিণী নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া কহিল, "এসকল অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি—তারিণী যা দেখ্‌তে পারে না—তাই। আপনার রক্ত মাংস, সুখেনের ছেলে, এই বলাই গেল তল্‌—আর সেই বাগ্দী ছোঁড়াটাই হ'ল কিনা প্রাণের উৎসব!"

মহেশ্বরী কহিলেন, "ভেবে দেখ্‌লে আপনার রক্ত সবাই। ধারায়-ধারায় এখন সহস্র ধারায় এসে পড়েছে। আর সংসারে যার দাঁড়াবার স্থল আছে, তা'র স্নেহ পেতে অভাব হয় না। যার সে-স্থান নেই, সে যে স্নেহের একান্ত কাঙাল! আমাদের নারী-হৃদয় তাকেই বেশী ক'রে জড়িয়ে ধরে।"

তারিণী কহিল, "সে কি কচি খোকা! চলো ঘরে ফি'রে যাই, দেখ্‌বে আমাদের আগেই সেখের বাড়ীতে সে সশরীরে উদয় হয়েছে।"

মহেশ্বরী কহিলেন, "তা সে যায়নি। সে যে কি অভিমানী ছেলে—তুমি জানো না, মামা! একটা গাড়ী অপেক্ষা ক'রে যেতে বলেছিল—সে-কথা সে ভুলবে না। তার পর হাতে পয়সাকড়িও নেই। সে কেবল স্নেহ-রসে

বেড়েই উঠেছে—আপনার নিজত্বটুকু বু'ঝে নিতে পারেনি—তা আমার কাছেই ফে'লে গেছে।"

বলাই জিজ্ঞাসা করিল, "বড়-মা! টেলিগ্রাফ্ কর্‌তে যাই তবে—কি ব'লে কর্‌তে হবে?"

মহেশ্বরী কহিলেন, "হাঁ দাদা! যাও! লেখো,—বড় বিপদ্—শীঘ্র এস। বাসার ঠিকানা দিও।"

"তুমি এক্‌লাটি এখানে থাক্‌তে পার্‌বে?"

"তা পার্‌ব। দিনের বেলা ভয় নেই, তোমরা এস গিয়ে।"

বলাই গমনোদ্যত হইলে তারিণীও অগত্যা তাহার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ চলিল।

সংসারে নারীর কর্ত্তব্য ও সম্পর্ক যে কত দিকে তাহা তারিণীর মতন স্বার্থপর লোকে বুঝিতে পারিবে কেন? যে-হৃদয় আড়ম্বরশূন্য—সে অন্তঃসলিলা ফল্গু-নদীর ন্যায় অতি গোপনে—লোক-চক্ষুর অন্তরালে এই দাব-দগ্ধা ধরিত্রীর শুষ্ক বুকখানি মমতার প্রলেপে যে কতখানি শীতল করিয়া রাখে, সে খবর সে দিতেও চায় না—অপরেও পায় না।

তারিণী ও বলাই চলিয়া গেলে মহেশ্বরী ষ্টেশনের দিকে তাঁহার কাতর চক্ষু-দুটি নিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। গাড়ীগুলি বেদনার সুরে বাঁশী বাজাইয়া অনুক্ষণ অসংখ্য যাত্রী আনিয়া ঢালিতেছে ও তুলিতেছে; তাঁহার নিস্তব্ধ হৃদয়ে চেতনা জাগাইয়া দিতে, কই কানাইলালকে ত আনিয়া দেয় না! মহেশ্বরীর প্রাণের মাঝে এমন করিয়া ধরা দিয়া এই জনস্রোতের মধ্যে কোথায় সে লুকাইয়া পড়িল! যদি সে প্রাণে বাঁচিয়া থাকে, তাঁহার জন্যও তা'র কত না কষ্ট হইতেছে! বিপৎসঙ্কুল সংসারে তিনি যে তাহাকে এক্‌লাটি করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন! মহেশ্বরীর চক্ষু দিয়া অজস্রধারে জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

নবীন সেই প্রথম যে-দিন এই নিরাশ্রয় আড়াই-বৎসরের উলঙ্গ শিশুটিকে হাঁটাইতে-হাঁটাইতে আনিয়া তাঁহার হাতে সমর্পণ করিয়া গেল, সেই দিন হইতে আজ এই ষোড়শবর্ষ কত অপমান-বিদ্রূপ হেলায় সহ্য করিয়া, তিনি যে আপনার বুকের উপর তাহাকে বাড়াইয়া তুলিয়াছেন। এই সুদীর্ঘ সময়ের কত-কত ঘটনা, আজ উজ্জ্বল হইয়া তাঁহার চক্ষে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। সুখেন্দুর সেই নিষ্ঠুর বেত্রাঘাত, সে যে এখনও তাহার অঙ্গের ভূষণ হইয়া আছে। বলাইকে সুস্থ করিবার জন্য বালকের সেই মন্ত্র-শিক্ষা—শিশু-হৃদয়ের এ অপরূপ রূপ বাগ্দীর ছেলের অপবাদের আড়ালে ত লুকাইয়া ফেলা যায় না? শান্তির বিবাহের সেই কতরকমের নির্য্যাতন? একে-একে সমস্তই মনে উঠিয়া মহেশ্বরীর মন ও প্রাণ অত্যন্ত শোচনীয় করিয়া তুলিল।

বলাই ও তারিণী টেলিগ্রাম করিয়া ফিরিয়া আসিলে তাঁহারা সকলে বাসায় গেলেন। টেলিগ্রাম পাইয়া এক-দিন পরে সুখেন্দু আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সুখেন্দু সমস্ত শুনিলেন। কানাইলালের জন্য তাঁহারও মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। যে-বালক এই সুদীর্ঘকাল পুত্রাধিক স্নেহে তাঁহার গৃহে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে, তাহার বিচ্ছেদে কাতর হইবেন না, সংসারে এমন নিষ্ঠুর কে আছেন? বিশেষত শেষ দিক্‌টায় কানাইলালের চরিত্র এমন পরিবর্ত্তিত ও লোভনীয় হইয়া উঠিয়াছিল যে, সুখেন্দুও তাহার শিষ্ট শান্ত ও সভ্য ব্যবহারে একান্ত মুগ্ধ ও পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিলেন।

সুখেন্দুর হৃদয়ও স্নেহ-প্রবণ। বৈষয়িক লোকের হৃদয়ে ঘটনা-পরম্পরায় যে রূঢ়তাটুকু প্রকাশ পায়, তাঁহার চরিত্রেও মাঝে-মাঝে তাহারই একটা আভাস দেখা যাইত। যাহা হউক কানাইলালের জন্য তাঁহার চক্ষুদু'টিও অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল।

সুখেন্দুর যাহা সাধ্য সমস্তই করিলেন। তিনি হাঁসপাতালগুলির রেজেষ্টারী বহি দেখিয়া আসিলেন। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিলেন এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বে যে-সকল উদ্যান বা পুষ্করিণীর তীরে বহু লোকজনের সম্মিলন হয়, সে-সকল স্থানে দিন-কতক ঘুরিয়া-ফিরিয়া অনুসন্ধান করিলেন। কিন্তু সমস্ত চেষ্টাই যখন নিষ্ফল হইল, তখন মহেশ্বরীকে দেশে লইয়া যাইবার জন্য তিনি অনেক সাধ্য-সাধনা করিলেন। মহেশ্বরী কহিলেন, "আমি দেশে গিয়ে শূন্য ঘর দেখ্‌তে পার্‌ব না। তুই গিয়ে শৈলকে পাঠিয়ে দে—আর বলাইও দিনকতক আমার সঙ্গে থাক্।"

অনন্তর সুখেন্দু শৈলবালাকে না পাঠানো পর্য্যন্ত তারিণীচরণ সেখানে থাকিবেন, এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিয়া তিনি দেশে রওনা হইলেন। (ক্রমশঃ)

কাঁটা-গোলাপ

শ্রী সুধীরকুমার চৌধুরী

এই চন্দ্রমল্লিকার গুচ্ছি,
শুভ্র শুচি,
জ্যোৎস্নার চুম্বন-স্বপ্ন সবুজের কম্প্র স্নিগ্ধ বুকে,
আমি জানি কত দুঃখে সুখে
বিনিদ্র রজনী আর ক্লান্তিহীন দিবসের কাজে
এরে আমি ফুটায়েছি আমার জীবন-বন-মাঝে
বহু সাধনায়। জানি আমি,
এর স্নিগ্ধ হাসিটিতে আছে তব চির-শুভকামী
অন্তরের মৌন আশীর্ব্বাদ। অনন্তের যাত্রাপথ'পরে
যদি এর দলগুলি কখনো শুকায়ে ঝ'রে পড়ে
হতাশ্বাসে,—সহসা নিঃশ্বাস আসে রুধি'
পুষ্পহীন মালার গ্রন্থিতে,—তুমি এসে দেবে শুধি'
মরণের কাছে তা'র যত জনমের যত ঋণ,
তোমার পরশ দিয়া জীবনেরে করিবে নবীন,
আমার কণ্ঠের 'পরে তোমার প্রেম সে জন্ম লবে
নব-নব পুষ্পদলে, নব-নব পেলব পল্লবে
বারম্বার।

আর,
শোণিতের রঙে রাঙা এই যে গোলাপ,
এ মোর মধুর অনুতাপ,
বাসনা-কণ্টক-বন আলো-করা ফুল,
সকল-ভোলানো ক'টি ভুল,—
কোথা এরে ফে'লে যাবো? জানি বন্ধু কোনো মধুরাতে
হাসিয়া লবে না এরে প্রসন্ন করুণ নেত্রপাতে,
প্রসারিত দক্ষিণ ও হাতে।
যদি কভু ব'হে আসে হাওয়া,
পড়ে এর বক্ষ'পরে নিদাঘ-সূর্য্যের রুদ্র নিষ্করুণ চাওয়া,
আমার বক্ষের চাপে অসতর্কে পিষি' যায় দল,
আষাঢ় প্রলয় হানে ঝিমিঝিমি বাজায়ে মাদল

শঙ্কিত চঞ্চল এরে ঘিরি',—যদি কোনো শুক্ররাতে
লুকায়ে মরিয়া থাকে আপনাতে আপন-লজ্জাতে,—
কারো তাহে ঝরিবে না একফোঁটা নয়নের বারি।—
তাই কি নয়নজলে আপনি রুধিতে নাহি পারি
এর মুখ চাহি'?
যার লাগি' কোথা' স্থান নাহি,
বহি' তা'রে অন্তরের সুগোপন অন্তরালে ঢাকি',
দিবানিশি জ্বালাইয়া রাখি
সুগভীর হৃদি-ক্ষতে শোণিতের দীপ্ত দীপ-শিখা
তা'র তরে, দিনে-দিনে ক্ষতির ভাষায় হয় লিখা
তাহারই পূজার মন্ত্র জীবনের পর্ণপত্র ভরি',
দিবা-বিভাবরী
এ বিশ্ব উদ্গারে বিষ যার তরে নিঃশ্বাসে-নিঃশ্বাসে,
আমি তা'রে অটল বিশ্বাসে
পথ হ'তে পথে লই, দিন হ'তে লই দিনান্তরে;—
জানি কোথা আছে শেষ, জানি কোথা আছে তা'রও তরে
সকরুণ স্নিগ্ধ পথছায়া; কোথা খু'লে যাবে খিল,
তোমা-সনে কোনোখানে খু'জে পাবে আপনার মিল
ওগো দণ্ডধর, তব প্রচণ্ড নির্ম্মম অভিশাপে
অসতর্ক যেই ভুল, মুহূর্ত্ত-মোহের যেই পাপে
বিদূরিত করেছিলে, সেদিন আপনি তব সনে
নির্লাজ সহাস মুখে বসিবে সে বিচার-আসনে
নিজ অধিকারে!...

হে সন্ন্যাসী!
হে নির্ম্মম মহা-মৌনী, হে গোপন গুহাতল-বাসী,
ওগো রুদ্র, ওগো শান্ত, হে ভৈরব, বিরাট্ ভীষণ,
সীমাহীন মহাশূন্যে পাতা তব তপের আসন
অবিটুট অচলতা ভরি'।—তবু ধাই
ঐ রুদ্ধতার পানে, প্রাণপণে নিজেরে শুধাই,—

কোথা' অবকাশ নাহি, কোথা তব নাহি কোনো ভুল,
স্খলন-কম্পন একচুল,
কোনো মোহ, কোনো স্বপ্ন, অর্থহীন আলস্যের মায়া,
তোমার আলোতে কোনো ক্ষণিকের রঙে রাঙা ছায়া
আড়াল করে না তব যুগান্ত-সাধন-ধনটিরে ?
হে তপস্বী, জিতেন্দ্রিয় ! হে নিষ্কাম ! তব চিত্ততীরে
লাগে না কি কোনো দূর-দুরান্তের আবেশ-বিহ্বল
ঘন দোলা, যবে বাষ্প-ছলছল
বেদনায় কাঁদে দূর সায়াহ্নের মেঘভারাতুর অন্ধকার,
ধরায় মূরছি' পড়ে তুলি' আর্ত্ত উচ্চ হাহাকার
চকিত বিদ্যুৎদীপে আপন বিধুর মূর্ত্তি হেরি',
তার পর প্রাণপণে তোমার চরণতল ঘেরি'
পড়ি' থাকে। যবে কোনো বর্ণহীন নিদাঘ দুপুরে
চরাচর ঢেকে যায় রুদ্র রিক্ত ক্লিষ্টতার সুরে,
তোমার চলার পথে যতি-ছন্দে কাটে না কি তাল ?
বসন্তের সৌন্দর্য্যে মাতাল
পরিমল-গন্ধবাহী সমীরণ তব হৃদিতলে
বহে না কি গোপন বারতা, যবে প্রীতিতে উথলে
গগনের বক্ষ জুড়ি' আলোকের গদগদ ভাষা,
কিসলয়ে-কিসলয়ে কানাকানি চুম্বনের আশা
সলাজ কম্পনে ফু'টে ওঠে, নদীতীরে
দুইটি শ্যামল হাসি একখানি উন্মুখ প্রীতিরে
খেয়া-পারাপার করে ? যবে রাত্রি আসে,
সীমাহীন তমোরাশি অসীমেরে তিলে-তিলে গ্রাসে,
কভু মনে নাহি জাগে, যারা যায় তা'রা যদি যায়
সুচির রাত্রির সীমানায়,
যদি আর ফি'রে নাহি আসে ; ত্বরা করি'
একটি নিমেষ-মাঝে চাহ না অসীম তৃষা ভরি'
এ বিশ্বের সব রস, একটি নিঃশ্বাসে সব মধু
চুমুকে চুমিয়া নিতে ? বর, ওগো বঁধু .
দুরু-দুরু কাঁপে না কি বক্ষ তব, যবে কোনো গোধূলি লগনে
আলোর মেখলা কার টু'টে যায় বিস্রস্ত গগনে
স্তব্ধ ছায়াতলে, তা'র শিঞ্জিনীর ঝিনিঝিনি বাজে
ঝঙ্কৃত ঝিল্লীরবে, আনত আননে সুখে লাজে
ফুটে ওঠে সায়াহ্নের সুমধুর রক্তিম আভাস,
ধরায় লুটায়ে রহে জোনাকি-খচিত পীতবাস,
গোপন বেপথু-বক্ষ থরথরি' শিহরিয়া কাঁপে
কি পুলক-শঙ্কা-ভরে, দুনয়ন ঝাঁপে
তিমির আঁচলে। যবে জ্যোৎস্নাময়ী নিস্তব্ধ নিশির
নিবাত আলোকে তব যৌবন-পুষ্পিত প্রেয়সীর
অনাবৃত রূপখানি আঁকো তুমি ধ্যান-তূলিকায়,
সুকোমল কিসলয়ে, অশোকের রঙীন শিখায়,
শিশির-আর্দ্রতা আর ধরণীর অঙ্গের সৌরভে,
সাগরের বক্ষ-দোলা, বিহগ কাকলি-কলরবে
সুগঠিত সুঠাম সুন্দর মনোলোভা—
তা'র কোনো সচকিত শোভা,
রহস্য-গভীর হাস্য, অঙ্গলাস্য অলস ইঙ্গিতে
ক্ষণিকের চঞ্চলতা জাগায় না ধ্যান-স্তব্ধ চিতে,
কাঁপে না তূলিকা তব ক্ষণিকের অতর্কিত মোহে
হৃদয়-কম্পন-সনে অবাধ্য বিদ্রোহে,
হে বিশ্ব চিত্রক ! তব বিস্ময়ের অবকাশ দিয়া
পশে না অঙ্গনে তব দুরাশায় দুরু-দুরু হিয়া
চপল মুখর যত এ-বিশ্বের নিঃস্ব ভিক্ষুদল,
স্খলন বিচ্যুতি ভুল পাপ তাপ নয়নের জল,
তোমার চরণ ঢাকি' মরে না কি বরণ-বিভায়
একটি পরম অবসানে ?·········

কোনো জ্যোতির্দীপ্ত প্রখর দিবায়,
এই চন্দ্রমল্লিকার গুছি,
শুভ্র শুচি,
তোমার নয়ন-কোণে গোধূলির করুণ আভাস
চকিতে রচিয়া দেয় যদি,—তবে তা'র শুভ্র বক্ষোবাস
পলকে রঙিয়া হয় গোলাপের স্নিগ্ধ অরুণিমা ;
তনুর তনিমা
পুলকে কণ্টকি' ওঠে ; সেইদিন সে সুযোগ-ক্ষণে,
মিশায়ে সে-সনে,
এ কাঁটা-গোলাপগুলি রেখে যাবো তোমার চরণে,
এই আশা আছে মোর মনে।

শিক্ষকের আক্ষেপ

জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

এ জেমশেদপুর। অর্থের অনুসন্ধান এখানকার সকলের কার্য্য। লৌহ লইয়া সকলের কারবার ; কঠিন এখানকার মাঠঘাট, কঙ্কর-প্রস্তর চারিদিকে। পার্শ্বেই ধূমায়মান কারখানা, জলধিনিন্দিত শব্দ তাহার। এই মরুর মধ্যে উদ্যান-রচনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন যাঁহারা তাঁহাদিগের উদ্যমকে শ্রদ্ধা করি। সাহিত্যসভার কর্ম্মী-দিগকে আমার নমস্কার। তাঁহারা যে হরিৎক্ষেত্রটি রচনা করিয়াছেন তাহা প্রকৃত মানবত্বের তেমনই প্রকাশক, যেমন এই কঙ্করময় প্রদেশেও প্রকৃতির আত্মপ্রকাশ ঐ নদীর ছায়া-সুনিবিড় তীরে-তীরে, পাথর-খোঁড়া শ্যামলতায় ; আর যেমন এই অতিব্যস্ত মানুষের হাটে ঐ শিশুদের ক্রীড়া-কোলাহল।

আমার বৃত্তি শিক্ষাদান। দান-শব্দটির ব্যবহার অন্যায় হইল ; তাহা পুরাকালে আমার কোনো পূর্ব্বপুরুষ-সম্বন্ধে প্রয়োগ করা চলিত। আমি শিক্ষাব্যবসায়ী। পয়সার জন্য শিক্ষাকর্ম্ম করি, লোকে হিসাব বুঝিয়া লয়, হিসাব না মিলিলে ছাড়িয়া কথা কহে না। এমন শিক্ষা দিই, যাহার হিসাব-নিকাশ চলে, তাহার খাতাপত্রও আছে ; পরিদর্শক তাঁহার মাপকাঠি লইয়া আসিয়া রক্ত-চক্ষু দেখান, বিশ্ববিদ্যালয় তাহার তৌলদণ্ড ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন, ওজন দেখিবার জন্য। সুতরাং সংসারবুদ্ধি-প্রণোদিত যে-শিক্ষা তাহারই আলোচনায় কয়েকটা কথা বলিতেছি।

এই যে শিশু ও বালক লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছি, সুকুমারমতি তাহারা, যেমন ছাপ তাহাদের উপর দিতে চাহি তাহাই দিবার অনেক সুযোগ আমাদের হাতে রহিয়াছে।

ভারতের পুরাকালের শিক্ষাব্যবস্থা-সম্বন্ধে অল্পবিস্তর অনেকেরই জানা আছে। শিক্ষার সেই এক দিন ছিল, কেবল আমাদের দেশে নয়, অনেক দেশেই, যখন ইহাতেও পয়সাকড়ির কোনো গন্ধ ছিল না। তখন মানুষের অন্তরকে বিকশিত করিয়া তুলিবার দিন ছিল। তখনকার বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যই ছিল এই এবং ইহার জন্য অনেক মহাত্মা সর্ব্বত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। এখন যে-দিন চলিতেছে তাহা মানুষের বাহিরটাকে গড়িয়া তুলিবার দিন মাত্র।

এখন আমাদের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে এই বিকশিত করিয়া তোলা ও গড়িয়া তোলা লইয়া।

কথায় আমরা বলি, মানুষ করা। সহজ কথায় শিক্ষার এমন-একটি সংজ্ঞা আর মিলিবে না। মানুষ করা। ইহার অর্থ কি ? মানুষের সন্তান হইয়া যে জন্মিয়াছে, ঈশ্বরেচ্ছায় ও চিকিৎসকদের অনুগ্রহে যদি সে বাঁচিয়া থাকে, মানুষ না হইয়া যায় কোথায় ? কিন্তু মানুষ ও মানুষের আকারে পশু, এই দুইটিই আমাদের এত পরিচিত যে অনেককেই বলিয়া দিতে হয় না, মানুষ কাহাকে বলে। তুমি অর্থ উপার্জ্জন করিতেছ, এ অতি উত্তম কথা ; ইহা আবশ্যক, ইহা তোমার কর্ত্তব্যও। তুমি আনন্দ পাইতে চাও, ইহাও উত্তম, রস ব্যতীত বাঁচিবে কি করিয়া ? শুষ্কতাই মৃত্যু, আনন্দও আবশ্যক। কিন্তু অর্থটা কিরূপে উপার্জ্জন করিতেছ, অথবা আনন্দটা কিরূপে মিলিতেছে তাহার বিচার যে করে সে আমাদের মধ্যেকার মানুষটি ;—যে-মানুষ দেখিতে চাহে আমাদের স্ফূর্ত্তি কুৎসিত কি সুন্দর, সে-মানুষ করা যায় না, মানুষের সন্তান সে-মনুষ্যত্বে ফুটিয়া উঠে। সমস্ত বাধা বা বিপত্তি সত্ত্বেও যাহা মানবশিশুকে এই মনুষ্যত্বে ফুটাইয়া তুলিতে পারে, তাহাকেই বলি শিক্ষা।

এখনও সকল কথা বলা হইল না। আমরা আজকাল ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত প্রকারের বিদ্যালয়ে যে-শিক্ষা দিতেছি তাহার উদ্দেশ্য এই যে শিক্ষিত মানবশিশুগুলি বড় হইয়া,

* জেমশেদপুর সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত।

কালে, আমরা বাহিরে যে-জগৎ দেখিতেছি তাহার কাজে আসিবে। এ অতি ঘোরতর সংগ্রামের স্থান, সকলেই এ-কথা জানেন। ইহারই সংগ্রামে শিক্ষিত মানব যাহাতে আঁটিয়া উঠিতে পারে, বিদ্যালয়গুলি চায় যে এমন শিক্ষাই মানব-শিশুকে দিবে। এই যে ব্যবসায়ক্ষেত্র, ইহার সমস্ত অধ্যবসায়ের মূলের কথা সংগ্রাম, শেষের কথাটিও সংগ্রাম। ইহাতে অনবরত নানা-প্রকারের সংগ্রাম চলিতেছে এবং ইহারই ভিতর দিয়া মানুষের গ্রাসাচ্ছাদন ঘটিতেছে, কখনও বা ঘটিতেছে না। বিদ্যালয় শিক্ষা দিতে চায় সেই উপায় যে-উপায়ে এই সংগ্রামে জয়ী হওয়া যায়; নিতান্তই যদি জয়মাল্য না মিলে, তবু অন্তত কিরূপে আর কয়েকজনের উপর দাঁড়াইয়া মাথাটা খানিক উঁচা করিয়া রাখা যাইতে পারে। এইটুকু শিক্ষা পাওয়াও আবশ্যক, আর ইহা অপেক্ষা যাহা বড় কথা তাহা সকলের জন্য নহে, এইরূপই আমরা ঠিক দিয়া বসিয়া আছি। যাহারা নিতান্তই নাছোড়-বন্দা, তাহারা এ-সমস্ত বড় কথা লইয়া মাথা ঘামাইয়া মরিতেছে, আর সাধারণ সকলে সংগ্রামের শিক্ষা পাইয়া পরস্পর মাথা ভাঙিতেছে। অথচ যাহাকে বড় বলিয়া অসাধারণ আখ্যা দিয়া বাতিল করিয়াছি এবং যাহার উপাসকগণ সাধারণের মতে লক্ষ্মীছাড়ার দলভুক্ত, তাহাই স্বাভাবিক; আর, যাহা লইয়া আছি, তাহা আমাদের মধ্যে মানুষকে বিকশিত হইয়া উঠিতে না দিয়া তাহাকে খাটো করিয়া রাখিয়াছে।

সকলেই বলেন শুনি, এবং অন্তরে-অন্তরে অনুভবও করি, যে জাতির কল্যাণ নির্ভর করে তাহার বিদ্যালয়-গুলির উপর। এ আর এমন-কিছু কঠিন কথা নয় যে বুঝিতে পারিব না! কিন্তু একটা পাকাপোক্ত-রকম বিশ্ববিদ্যালয়, যাহাতে খুব বড়-বড় আলোচনা-সকল চলিতেছে, ন্যায়ের কথা কাটাকাটি, বিচারের টানাপড়েনের যেখানে অন্ত নাই, বিজ্ঞানের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মকে যেখানে ধরা পড়িতে হইতেছে, জাতির কল্যাণ কি গঠিত হইতেছে সেইখানেই? একদিন বড়-বড় কথার মোহে পড়িয়া ভাবিতাম, সেইখানেই আমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তি। ঐসমস্তের প্রয়োজন অত্যধিক হইলেও আজ একথা বুঝিতে পারিয়াছি, জাতির জীবন নির্ভর করিতেছে ঐ বালকগুলির বিদ্যালয়গুলিতে কি হইতেছে তাহার উপর। এমন-কি, ঐ মোটামোটা বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও ঐ বিদ্যালয়গুলির কক্ষে-কক্ষে প্রাণ লাভ করিতেছে। এক-একজন এ-কথা শুনিয়া বিদ্রূপের উচ্চহাস্যে চতুর্দ্দিক্ কম্পিত করিবেন। জাতির কল্যাণের পথ খোলা হইবে কিনা ঐসমস্ত পাঠশালাগুলির গুরুমহাশয়দের নিকট! ইহা অপেক্ষা হাসির কথা আর কি হইতে পারে? তাঁহারা বলিবেন, তুমি বলিতে চাও, বিদ্যালয়গুলিতে মানুষ-করা চলিতেছে না, অথচ চিন্তাশীল লোক এখনও সমাজবক্ষ হইতে লুপ্ত হয় নাই। এ-কথাটিও ভাবিয়া দেখা হয় নাই তাহা নহে। এক-একজন এমন মানুষ জন্মগ্রহণ করেন তাঁহাদের প্রাণের শক্তি এত যে সে-বহ্নিকে ভস্মাচ্ছাদিত করিলেও তাহা নির্ব্বাপিত হইতে চাহে না। বিদ্যালয়ের শিক্ষার তাড়না-সত্ত্বেও তাঁহারা নিজের গুণে মাথা তুলিয়া উঠিতেছেন। যদি বিদ্যালয়ে মানুষকে সমগ্রভাবে বিকশিত করিয়া তোলা চলিতে থাকিত, তাঁহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইত, এবং যে-বাধা তাঁহারা পাইয়াছেন তাহা না থাকিলে তাঁহাদের প্রতিভার বিকাশও অধিক হইত।

বিদ্যালয়গুলি সত্যভাবে শিক্ষার কেন্দ্র না হইলে এই-প্রকারে সমাজের বহুল ক্ষতি হইতে থাকে। কেবল্ কোনো-একটি দেশের নহে, জগতের এই ক্ষতি চলিতেছে। শিক্ষার যাঁহারা কর্ত্তা, তাঁহারা আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন, মানুষটানুষ অত কথা তোমাদের ভাবিবার দরকার নাই, ফুটাইয়া তোলা ও গড়িয়া তোলা লইয়া মাথা ঘামাইবারও তোমাদের কোনো প্রয়োজন দেখিতেছি না; এই যে মনোহর ছাঁচটি যত্নে গড়িয়া তোমাদের হাতে দিয়াছি, এক-একটি মানব-শিশুকে লও ও ইহাতে ঢালো, দেখিবে সে কেমন কাজের জিনিষ হইয়া বাহিরে আসিবে, আর কিরূপে এই ছাঁচ ব্যবহার করিতে হইবে, আমাদের এই পুঁথিতে সমস্তই লেখা আছে, দেখিয়া লইও।

এ কেমন ছাঁচ? জগৎটাকে ত দেখাই যাইতেছে। তাহার যাহা প্রয়োজন বলিয়া মনে হইতেছে তাহাকেই

আমরা চিন্তার বিষয় করিয়াছি, এবং তাহার সমাধানের জন্ত যে-প্রকারের জীব আবশ্যক, বিদ্যালয়গুলির উপর হুকুম জারি করা হইয়াছে, তাহাই প্রস্তুত করিবার জন্ত। কিন্তু প্রশ্নের সমাধান ঠিক হইল কি না, তাহাও ত বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। ব্যাধি হইয়াছে, অঙ্গের উত্তাপ ধরা পড়িয়াছে, শীতল জলে রোগীকে ডুবাইয়া ধরিয়া সে-উত্তাপ দূর করিবার চেষ্টায় যদি রোগীর বিকার উপস্থিত হয়, তাহাতে চিকিৎসক যিনি, তিনি আশ্চর্য্য হইবেন না, কিন্তু উত্তাপের নিরাকরণে শৈত্যের ব্যবস্থা করিয়া আমাদের এই ব্যবস্থাদাতা কি ভুল করিয়াছেন, তাহা বুঝাইতে হইলে উক্ত মহাশয়টির বুদ্ধির আশপাশ একটুকু পরিচ্ছন্ন করিয়া লওয়া আবশ্যক। তিনি যে বাহিরটিকে বেশ দেখিতে পাইতেছেন, তাহা বুঝিতে কোনো ক্লেশ হয় না, কিন্তু ভিতরের খবর লইবার তাঁহার শক্তি নাই। সমাজের কি প্রয়োজন তাহা বুঝিতে হইলে আমাদের মনকেও বেশ অনেকখানি স্বার্থের পাশ হইতে মুক্ত করিয়া লইতে হইবে। কেবল প্রয়োজন-প্রয়োজন রব তুলিয়া মানুষের মনকে বাহিরের প্রয়োজনের অতিরিক্ত আর-কিছুকেই ধরিবার অবকাশ না দিলে সকলেই যে ঐগুলিকেই দেখিবে তাহাতে আশ্চর্য্য নাই। সকলে ঐগুলির উচ্ছেদের ব্যবস্থায় তৎপর; একটি আমাদের দৃষ্টিকে মুক্তি দিতে না দিতেই আর-একটি তাহাকে আকর্ষণ করিতেছে, তখন সেইটিকে লইয়াই চেষ্টা চলিতেছে, আর বিদ্যালয়গুলি এই চেষ্টার আক্রমণে মুহ্যমান হইয়া পড়িতেছে। যে-ব্যবস্থা মানবের সমগ্র প্রয়োজনের নিরাকরণ করিতে পারে, তাহার সন্ধান আর হইতেছে না।

একটি উদাহরণ লইতেছি। সৈন্য আবশ্যক। শত্রুর অভাব নাই, সকলেই অপরকে গ্রাস করিয়া স্ফীত হইতে চাহিতেছে, সৈন্যের সাহায্যে আততায়ীকে বাধা দিতে হইবে। কিন্তু ভালোরূপ সৈন্য প্রস্তুত করিতে হইলে তাহাকে যুদ্ধ ব্যতীত আর সকল বিষয়ে অন্ধ করিতে হইবে। যে-সমস্ত কথায়, যে-সমস্ত ব্যবস্থায়, যে-সমস্ত কর্ম্মে লিপ্ত থাকিলে তাহার কাটাকাটির প্রবৃত্তিটা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রবল হইয়া উঠে, তাহাকে তাহারই সুযোগ দাও। অন্তরের নরম ভাবগুলি, যাহা না হইলে মানুষ মানুষনামের যোগ্য হয় না, তাহা যেন ঐ ব্যক্তির মনে স্থান না পায়। তাহার ঐ একটামাত্র দিক্ গড়িয়া তোলা হউক। যদি সে তাহাতে একটা যুদ্ধ করিবার যন্ত্রবিশেষ মাত্র হইয়া উঠে, কোনো চিন্তা নাই, তাহাকে ঐ-প্রকারের যন্ত্র করাই আবশ্যক। কিন্তু, ওহে প্রয়োজনের উপাসক, তাহার মধ্যেকার মানুষটিকে যে খুন করিলে, কি ভীষণ ক্ষতির বোঝা তাহার স্কন্ধে তুমি চাপাইয়া দিলে, একটু ভাবিয়া দেখিবে না? তোমার স্বার্থের সিদ্ধি ঘটিয়াছে সে-কথা আমি স্বীকার করিতেছি; সে তোমার উর্দ্দি পরিয়া খুব বুক ফুলাইয়া চলিয়াছে, কিন্তু ঐ ব্যক্তিটির সত্য স্বার্থের মূলে তুমি কুঠারাঘাত করিয়াছ। মানুষের সন্তান হইয়া জন্মিয়াও সে মানুষ হইবার অবকাশ পাইল না! তুমি বলিবে, দেখিতেছ না, কি চমৎকার বস্তু প্রস্তুত করিয়াছি; ও দেশের নামে মরিতে ভয় পাইবে না। সে-কথা সত্য, দেশের নামে মরিতে ও মারিতে ও পিছপাও নয় সে-কথা মানি, কিন্তু সমাজের যে-শত্রুতা তোমার ঐ যন্ত্রগুলি করে, তাহার যে ইয়ত্তা নাই। উহাদের জ্বালায় পথঘাট অরণ্য হয়, পাপ যে পাপ নয় উহাদের কাছে!

সমালোচক-মহাশয় বলিতে পারেন, গুরুমহাশয়, বড়-একটি কথা বলিয়াছ; বিদ্যালয়ের ব্যবস্থার কথা বলিতে গিয়া আসিয়া পড়িয়াছ একেবারে যুদ্ধক্ষেত্রে, যেখানে বিধি-নিয়মের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ঘটিয়াছে সেইখানে। আচ্ছা, লউন, আপনার কর্ম্মের ওস্তাদটিকে। তিনি একজন দক্ষ কর্ম্মী, কিন্তু তাঁহার দক্ষতা কোথায়? তিনি কাজ করাইতেছেন, খাটিবার লোক খাটিতেছে, তাহারা ডুবিতেছে কি ভাসিতেছে, সেদিকে দৃষ্টি দিলেই তিনি মুস্কিলে পড়িবেন। খরচ যত অল্প হয়, কাজ যত অধিক হয়, নিজের বেতন যত বাড়াইয়া লইতে পারেন এবং কাজের লভ্যাংশ যত মোটা হইতে পারে, তাহাই তাঁহার দ্রষ্টব্য। ব্যাধি, শীতাতপ, বিপদাপদ, অতিরিক্ত পরিশ্রম প্রভৃতি যাহা-কিছু তাঁহার লোকগুলিকে অনবরত ভ্রূকুটি করিতেছে তাহার হিসাব তাঁহার খাতায় থাকে না; এসমস্ত চিন্তা তাঁহার পক্ষে কুচিন্তা। এগুলি হইতে যে-পরিমাণে মুক্ত থাকিয়া তিনি কাজ আদায় করিতে পটু, সেই-পরিমাণে তিনি কাজের মানুষ। এ উচ্চ লক্ষণ নহে,

যে-শিক্ষায় এরূপ কর্ম্মী সৃষ্টি করে, তাহাকে আদৌ শিক্ষা নাম দেওয়া চলে না।

কারণ মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য এত সঙ্কীর্ণ নহে। আরো বৃহত্তর ক্ষেত্রে তাহার স্থান। বামনের হস্তপদ স্থূল হইতে পারে, কিন্তু ঐ স্থূলতা দেখিয়া মনে করা ভুল যে, সে একটা বড় কর্ম্মী। দৈর্ঘ্যে তাহার যে ক্ষতি স্থূলতায় তাহার পরিপূরণ হয় না, সে তথাপি অকর্ম্মণ্য। এক-দিকের কুশলতায় মানুষ হওয়া যায় না। মানুষকে সমাজে, রাষ্ট্রে, সর্ব্বত্র কাজ করিতে হইবে। জীবনের প্রতিমুহূর্ত্তে তাহাকে মানুষ হইতে হইবে, প্রতি-পদক্ষেপেও। শিক্ষা যদি তাহাকে এইসকল দিকেই খাটি করিয়া তুলিতে না পারে, তবে তাহা শিক্ষাপদবাচ্য কিরূপে হইবে?

মানুষের শরীর যেমন বাড়িয়া উঠে, মানুষের অন্তরও তেমনি বাড়িয়া উঠিবার শক্তি রাখে। শরীরের বাড়িয়া উঠিবার জন্য যাহা-কিছু আয়োজনের প্রয়োজন, তাহাদের সংখ্যা অধিক নহে। কিন্তু যেখানে মন লইয়া কারবার করিতে হয়, মুস্কিল সেখানে অনেক, কারণ অনেক সময় ভাঙিলাম, কি গড়িলাম তাহাই বুঝিয়া উঠা কঠিন।

এখানকার কারখানায় লেদ্ অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। সুচতুর মিস্ত্রীরা তাহার সাহায্যে, মোটা-মোটা লৌহপিণ্ডকে কেমন নানা-প্রকার আকারে গড়িয়া তুলিতেছে। যেমনটি আবশ্যক, এখানে একটু উঁচু, এখানে একটু নীচু, এখানে একটু বাঁকা, এখানে একটু ঢেউখেলানো, যেমনটি চাওয়া যাইবে, মিলিবে। আমাদের বিদ্যালয়ের লেদেও আমরা হুকুম তামিল করিতেছি, আমরা কেবল মানব-শিশুকে একটা বিশেষ আকার দিতে চেষ্টা করিতেছি।

সকলেই দেখি চান, তাঁহাদের সন্তান উপার্জ্জনক্ষম হোক। যদি জিজ্ঞাসা করি, ইহা চান কি না যে সে মানুষ হয়? উত্তর মিলিবে তৎক্ষণাৎ, যে নিশ্চয়ই চাই, সে যেন মানুষ হয়। কিন্তু দেখা যায়, সে যখন মানুষ হয় না, কিন্তু টাকা আনিতে থাকে, আমাদের উপর কেহই তেমন গালিবর্ষণ করেন না; আর যখন সে মানুষ হয় কিন্তু অর্থশালী হইবার পথ ধরে না, তখন আমাদের চাকুরি লইয়া টানাটানি পড়িয়া যায়।

শিক্ষককে সেইজন্য এমন স্থান পাইতে হইবে যে, সে নির্ভীক হইয়া কাজ করিতে পারে। কিন্তু নির্ভীক হও বলিলেই তাহা হওয়া যায় না। সে যখন দেখিতেছে সকলেই তাহার উপর মুরুব্বিয়ানা করিতেছে, তখন আত্ম-রক্ষাতেই অধিকতর মনোযোগ দেওয়া ভিন্ন তাহার উপায় কি? অর্থ যাহার হাতে, পরামর্শ দিবার অধিকার সে ছাড়িতে চাহে না; আর তাহার পরামর্শ গৃহীত না হইলে সে যদি টাকার থলের মুখটা কষিয়া বাঁধিয়া রাখে, তাহাতে যে কি দোষ তাহা সে বুঝিবে না। এ মানুষের একটি দুর্ব্বলতা। চিকিৎসকের হস্তে প্রাণ নির্ভর করে, কিন্তু তিনিও পরামর্শ-দাতার হাত এড়াইতে পারেন না, আর উকিলেরা জানেন, পরামর্শদাতার হাত হইতে তাহারই সম্পত্তিকে রক্ষা করা অনেক সময় দায় হইয়া উঠে। কিন্তু শিক্ষা-ব্যাপারেই এই বিপদ্ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ডাক্তার-উকিল, ইহার কুফল চোখে আঙুল দিয়া দেখাইতে পারেন, কিন্তু শিক্ষকের কাজ এমন যে সে তাহা পারে না। সুতরাং যাহাকে সত্য বলিয়া সে জানে, তাহাও অপরের নিকট জোর করিয়া ধরিবার সুযোগ সে পায় না।

সর্ব্বাপেক্ষা বড় সত্য এই যে, আমরা মানুষ এ কথা শিক্ষক বুঝে, কিন্তু সে বেচারা বুঝিয়া কি করিবে? এই সত্য সকলের নিকট পরিস্ফুট হওয়া আবশ্যক।

প্রত্যেক মানুষটি এক-প্রকারের হইবে, ঈশ্বরের এ বিধান নহে। সেইজন্য প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে চিনিয়া লইয়া তাহার জীবনের রসদ জোগাইবার যে ব্যবস্থা তাহাই সৎ-ব্যবস্থা। বর্ত্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা তাহার অনুকূল নহে।

মহাকর্ষণ নামে একটি শক্তি আছে, তাহাই সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্র, সমস্ত জাগতিক বস্তুকে বিধি-নিয়মের বশবর্ত্তী করিয়া চালাইতেছে। তেমনি আমাদের মধ্যেকার মানুষটি। সেটি যদি সত্যভাবে জাগ্রৎ হয়, তবেই আমাদের পক্ষে সকল বিষয়ে সত্য হওয়ার সম্ভাবনা, নচেৎ নহে। সত্য নির্ভীক, কিছুই তাহাকে দমাইতে পারে না, তাহাকে বন্ধন করিতে পারে এমন রজ্জু নাই, তাহার বিকার

আনিতে পারে এমন ব্যাধি নাই। ব্যাধি ও বিকার অসত্যের পরিচায়ক। আমাদের সন্তানগণ যদি দুর্ব্বলতা-দুষ্ট হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে সত্যের উপর তাহাদের জীবন ভিত্তিলাভ করে নাই।

এই সত্য-মানুষটিকে জাগাইয়া তোলা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্দেশ্য লইয়া চেষ্টা করিলে ঘটে না, ঐ মানুষটিকে জাগাইয়া তোলাই যেখানে উদ্দেশ্য সেইখানেই তাহা সম্ভব। আর যেখানে তাহা সম্ভব নয়, সেখানে যে ক্ষতি, তাহার ইয়ত্তা নাই।

এই ক্ষতি হইতে যে সমাজ ও দেশ মুক্ত নহে, তাহার কল্যাণের পথও খোলা নাই। সে দেশ ও সমাজ কতকগুলি কৃত্রিম মানুষ লইয়া কারবার করিতেছে; তাহার অঙ্গে সহজ স্ফূর্ত্তি নাই, তাহার চেষ্টায় প্রাণ নাই। এই অভাব তাহার দূর হইবার নহে, যতদিন তাহার বিদ্যালয় মানুষ করার কার্য্য সুরু না করিবে।

জোর করিয়া কাহারো স্কন্ধে একটা কোনো দক্ষতার বোঝা চাপাইয়া দেওয়া অকিঞ্চিৎকর। আমাদের হাতে একটা ছাঁচ আছে তাহাতেই সকলকে ঢালিয়া গড়িব, এই যখন এখনকার ব্যবস্থা তখন ফল এই হইবে যে, যে-সকল শিশু সেই ছাঁচের সহিত ঠিক মিলিবে না, তাহাদিগকে কোনো-না-কোনো স্থানে জড়সড় হইয়া ছাঁচে ঢুকিতে হইবে, আর যখন বাহির হইবে, সেই-সেই স্থানে পঙ্গু হইয়া বাহিরে আসিবে। হইতেছেও তাহাই। দেখিতেছি বিদ্যালয়সকল হইতে যাহারা বাহির হয়, তাহাদের সকলেরই প্রায় এক রূপ। একই-প্রকারের তাহাদের চিন্তা-স্রোত, একই-প্রকারের চলা-ফেরা, আর তাহাদের অল্প-স্বল্প যাহা-কিছু দক্ষতা তাহাও একই ছাঁচে ঢালা। যাহাদের ভাগ্যক্রমে ছাঁচের সহিত অনেকখানি মিল ঘটিয়াছিল, তাহারা বুঝি অনেকটা ভালো, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা সামান্য, বাকীগুলি পঙ্গু কোথাও না কোথাও। বিদ্যালয়গুলিতে যদি দেশের কল্যাণের ভিত্তি পত্তন করিতে হয়, তাহা হইলে সেগুলি এইরূপ পঙ্গুতার কারখানা হইয়া থাকিলে ঘটিবে না। স্বাধীনতার ভিতর দিয়া মানুষকে ফুটিয়া উঠিবার সুযোগ দেওয়াই বিদ্যালয়ের কার্য্য।

হইতে পারে চিড়িয়াখানার জন্তু দেখিয়া আমরা খুসি হই, কিন্তু ঐ জন্তুগুলি যে আনন্দে নাই, তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। খাঁচার ভিতরের পাখীটার পালকগুলি যতই রঙীন হোক না কেন সে সুন্দর নয়, কিন্তু ঐ চড়াই পাখীটি যে এধার-ওধার উড়িয়া বেড়াইতেছে, উহার আনন্দ দেখে কে?

খেলার মাঠে যখন শিশুদের প্রসারধর্ম্মী জীবনের প্রকাশ দেখি, দেখিয়া আনন্দ হয়; ঐগুলিকে যখন বিদ্যালয়ের খাঁচায় পুরি, তাহারা তেমন সুন্দর দেখায় না। একদল লোক বলেন, আনন্দের সহিত শিক্ষাকে যুক্ত করা যায় না। ইঁহারাই আমাদের বিদ্যালয়গুলির কর্ত্তা। বিদ্যালয়ে যে খেলার মাঠ আবশ্যক, একথা অনেককেই বুঝানো অত্যন্ত কঠিন হইয়াছে। নাই বা থাকিল খেলার মাঠ, অঙ্ক কষা, ইতিহাস মুখস্থ করা প্রভৃতি অতীব গুরুতর ও নিতান্ত আবশ্যক বিষয়সকল যখন চলিয়া যাইতেছে, খেলা-সম্বন্ধে মাথা ঘামাইবার কোনোই প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না। কিন্তু ছাত্রদের জীবনী-শক্তি কমিয়া আসিয়াছে, হজমের শক্তি নাই-ই। আর কয়েকটা বৎসর পরেই বিদ্যালয় হইতে ছাত্রেরা বাহিরে আসিলে তাহাদিগকে তুলাভরা জামায় ঢাকিয়া রাখিতে হইবে, বাহিরের আলোক-বাতাস তাহারা আর সহ্য করিতে পারিবে না।

পারিবার কথাও নহে। চীনদেশের মেয়েদের সৌন্দর্য্য পায়ে। শৈশব হইতে পা বাঁধিয়া রাখিয়া এই সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করার জ্বালায় তাহারা আর চলিতেই পারে না। আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষার তাড়নায় ছেলেদের প্রাণ টেঁকে না।

শিক্ষার সহিত আনন্দের, স্বাধীনতার কোনো বিরোধ নাই; বস্তুত স্বভাবত ইহাদের সম্বন্ধ অতি নিকট। কিন্তু ফরমাইসি ব্যাপারে স্বভাবের আনন্দ আসিবে কোথা হইতে? সেইজন্য আমাদের বিদ্যালয়ের ফরমাইসি শিক্ষায় ছাত্রদের আনন্দ মিলে না। আর, এই ফরমাইস্ যে তামিল করিতেছে, সেই শিক্ষকই বা কি করিবে? কোথায় সে আনন্দ পাইবে যে, ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ করিবে?

শিক্ষা-গ্রহণ করাকে মানুষ এত কঠিন মনে করিতেছে কেন? শিক্ষা-গ্রহণ-ব্যাপারটা মানুষের, কেবল মানুষের কেন, সকল জীবেরই পক্ষে এমন স্বাভাবিক ব্যাপার

যে, সেটা শিশুর আহারের জন্য চীৎকার করার মতনই মনে হয়। কিন্তু বিদ্যালয়ের মধ্যে তাহাকে অস্বাভাবিক আকার দেওয়া হইয়াছে বলিয়াই তাহা এমন ভীতিপ্রদ হইয়া উঠিয়াছে।

আপনারা বলিতে পারেন, তুমি ত শিক্ষক। তুমি আমাদের নিকট এমন কাঁদুনি গাহিতেছ কেন? অভাব-অভিযোগের পালা তোমার ফুরাইতেছে না দেখিতেছি; থামাও তোমার কচকচানি, কি চাও তাহাই বলো।

চাই না আর কিছুই বন্ধু, চাই কেবল এই যে, আমাদের হাতের বন্ধনটি মোচন করিয়া দাও। সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বরও আমাদিগকে করিয়া দিবে না; আর দিলেও তাহাতে আমাদের কর্ম্মের বিশেষ সুবিধা হইবে না, বরঞ্চ এই কর্ম্মের পক্ষে আমাদের এই বর্ত্তমান সদা-বেষ্টিতের অবস্থাটাই আছে ভালো, কারণ প্রাণকে সেই-ই জাগাইতে পারে, প্রাণ লইয়াই যাহার টানাটানি। কিন্তু যে ভারটা আমাদের উপর তাহাকেও যথার্থভাবে বহন করিতে হইবে। ভগবানের এমন সৃষ্টি যে মানুষ, তাহাকে আমরা একঘেয়ে অসম্পূর্ণ আকার দিয়া চলিয়াছি। যেখানে আমরা খুব ভালো কাজ করিয়াছি সেখানে ঐ হাতুড়ি-পেটার কার্য্যে কোনো খোঁচ্‌খাঁচ্ রাখি নাই এইমাত্র। কিন্তু সৃষ্টিকর্ত্তাই জানেন, আমাদের এই ব্যবস্থায় তাঁহার মানুষ গড়িতেছে না, গড়িতেছে এই জগতের আপাতকার্য্যসিদ্ধির জন্য যাহা আবশ্যক তাহাই। ইহাতে ভবিষ্যৎ জগৎ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে।

কেহ-কেহ হয়ত আমাকে বলিতে পারেন, তুমিই অধিকতর ক্ষতির উপদেশ দিতেছ; তুমিই তোমার ছাত্র-গুলিকে একটি বিষম স্থানে দুর্ব্বল করিবার আয়োজন করিতে চাহিতেছ; তাহাদিগকে যে উপার্জ্জন করিতে হইবে, তাহা ভাবিয়া দেখিতেছ না। কিন্তু এ-কথায় কোনো ভুল নাই যে, বেশীর ভাগ মানুষের উপার্জ্জন-পরায়ণতা স্বাভাবিক। দায়িত্বজ্ঞান ও কর্ত্তব্যবুদ্ধি মানুষের লক্ষণ। যে মানুষ, সে উপার্জ্জনের প্রয়োজন বুঝিবে এবং উপার্জ্জন করিবেও, কেবল তাহাতে এই একটা বিশেষত্ব থাকিবে যে, এই যে কেবল টাকা-টাকা করিয়া সকলে চীৎকার করিতেছে তাহা সে করিবে না। আরও একটা বিশেষত্ব দেখা যাইবে এই যে, নিজের অথবা আপন জনের উদর-পূরণেই তাহার উপার্জ্জনের উদ্দেশ্য সীমাবদ্ধ হইয়া থাকিবে না। একথা মনে করা ভুল যে, কাহাকেও কেবলমাত্র উপার্জ্জন করিতে শিখাইলেই তাহার সমস্ত শক্তি টাকা আনার কার্য্যে লাগিবে। তাহার এমন শক্তি অনেক আছে যাহা টাকা আনার কার্য্যে ব্যবহৃত হইতে পারে না, কিন্তু মহত্তর কার্য্য করিতে পারে, তাহার এমন শক্তিও আছে যাহা প্রস্ফুটিত হইতে না পাইয়া পচিয়া উঠিয়া তাহারই জীবনকে বিষাক্ত করিয়া তুলিতে পারে। তাহাকে সর্ব্বাঙ্গীণ মানুষে বিকশিত করিয়া তুলিতে পারিলে তবেই এরূপ ক্ষতি এবং বিপদের সম্ভাবনা থাকে না।

জীবন-সংগ্রাম যেরূপ তীব্র হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে কোথাও কোনো দুর্ব্বলতা সহ্য হইবার আর অবকাশ নাই। ভগবান্ মানুষ দিয়াছেন, তাহাকে অপচয় যে-দেশ করিবে তাহার রক্ষা নাই, প্রকৃতির নিয়মেই তাহাকে নীচে নামিতে হইবে। প্রত্যেককেই তাহার সমস্ত শক্তিতে দৃঢ় হইয়া জগতের সমক্ষে দাঁড়াইতে হইবে। তাহা না হইলে, আর-একজন, যে শক্তিমান্, সে ছাড়িয়া দিবে না, সমস্ত কাড়িয়া লইবে। অল্পে স্বল্পে সহজভাবে দিন চলিয়া যাইবার যুগ ফুরাইয়া গিয়াছে; ঐ অল্পে-স্বল্পে চলিয়া যাওয়া আর সহজভাবে ঘটিতেছে না।

ইহা হইতে নিষ্কৃতির উপায়, ক্ষুদ্র হইতে বৃহত্তরের দৃষ্টি ফিরাইয়া সেই বৃহত্তরের উপযুক্ত শক্তি সংগ্রহ করা। মানুষকে কাটিয়া-ছাঁটিয়া বিশেষ-বিশেষ প্রয়োজনের জন্য তাহাকে প্রস্তুত করা, মহৎকে ক্ষুদ্রের কোঠায় নামাইয়া আনা মাত্র। সে মানুষ বলিয়াই বৃহত্তরে তাহার স্থান, তাহার সেই অধিকারকে পাকা করিবার অবকাশ তাহাকে দিতেই হইবে। এ তখনই সম্ভব যখন সে সম্পূর্ণ মানবে স্ফূর্ত্তিলাভ করিবে, আনন্দের আব্‌হাওয়ায় শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ স্বাস্থ্যের নির্ম্মলতায় যখন তাহার ভিতর ও বাহির উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।

বক্তৃতা-বাগীশ শিক্ষা ব্যবসায়ীর বাক্যবৃষ্টি ক্ষমা করুন। বলিতে চাহি মাত্র এই যে, মুক্তির মধ্যে জীবনের অবধি ও পরিপূর্ণ বিকাশ ব্যতীত দুর্গতি হইতে মুক্ত থাকিবার অন্য পন্থা নাই।

শ্রী হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

বায়স্কোপের বিজ্ঞাপন—

বায়স্কোপ দেখিবার জন্ত চলন্ত চিত্রালয়ে প্রবেশ করিলে পর একজন লোক আগমনকারীকে নির্দ্দিষ্ট বসিবার স্থানে পৌঁছাইয়া দেয়। এই পথপ্রদর্শনকারীদের পিঠ এতদিন পর্য্যন্ত খালি ছিল অর্থাৎ তাহাতে কোন বিজ্ঞাপন পড়ে নাই। সম্প্রতি কালিফোর্নিয়াতে এই চলন্ত চিত্রালয়ের পথপ্রদর্শনকারীদের পিঠেও বিজ্ঞাপন দিতে আরম্ভ করিয়াছে। অভ্যাগত যখন তাহার পিছন-পিছন যাইবে, তখন সে পরদিনের বা আগামী সপ্তাহের

পথপ্রদর্শন-কারীর পিঠে আগামী সপ্তাহের জন্ত বিজ্ঞাপন লেখা আছে

চিত্রের বিবরণ জানিতে পারিবে। অন্ধকার হলে প্রবেশ করিয়া প্রদর্শক একটি সুইচ্ টিপিয়া দিবামাত্র ঘাড়ের কাছে লাগানো একটি বাতি হইতে পিঠের বিজ্ঞাপনের উপর আলোকপাত হইয়া তাহা অন্ধকারেও দৃশ্যমান হইবে।

—

গৌরীশঙ্কর-বিজয়-অভিযান—

যে বীরের দল গৌরীশঙ্কর জয় করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের কথা সকলেই খবরের কাগজে পড়িয়া থাকিবেন। তাঁহারা এত উঁচুতে উঠিয়াছিলেন, যেখানে হাওয়া প্রায় পাওয়া যায় না বলিয়া মনে হয়। নিশ্বাস-প্রশ্বাসের জন্ত যে-প্রকার ঘন বাতাসের দরকার সে-প্রকার ঘন বাতাস পাহাড়ের অতি উচ্চ স্থানগুলিতে নাই। সেইজন্ত অভিজেতার দলের প্রত্যেকের অক্সিজেন্ বাষ্পের একটি করিয়া ট্যাঙ্ক বা আধার পিঠে বহন করিতে হইয়াছিল। এই ট্যাঙ্কের ওজন ৪৫ পাউণ্ড। ট্যাঙ্ক্ হইতে একটি নল মুখের সঙ্গে লাগানো থাকিত এবং এই

গৌরীশঙ্কর অভিযানকারীর পিঠে অক্সিজেন-আধার

নলের দ্বারা তাঁহারা নিশ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চালাইতেন। এত করিয়া, ও তাঁহারা তাঁহাদের দুই জন নেতাকে বিসর্জ্জন দিয়াও, গৌরীশৃঙ্গের চূড়ার উপর তাঁহারা উঠিতে সক্ষম হন নাই। গৌরীশৃঙ্গের চূড়ার প্রায় ২০০০ ফুট নীচ হইতেই তাঁহাদের প্রত্যাগমন করিতে হইয়াছিল।

—

পায়রা-দূত—

বিজ্ঞানের এত উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও এখন পর্য্যন্ত সংবাদ আদান-প্রদানের জন্ত কপোত ব্যবহার হয়। যখন সংবাদ-প্রেরণের সকল-প্রকার উপায় নষ্ট হইয়া যায়, তখন বিপক্ষ-শিবির বা সেনাদল পার হইয়া সংবাদ বহন করে—কপোত। পুরাকালে ভারতবর্ষে এবং মিশরে যুদ্ধকালে কপোত দূতের কাজ করিত। অতি দূর দেশে লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দিলেও পায়রা যে কেমন করিয়া, কোন্ শক্তির সাহায্যে নিজের বাসায় প্রত্যাগমন করে, তাহা এখনও কেহ বলিতে পারে না। দূত-পায়রার এক-একটির ইতিহাস অতি চমৎকার। পানামা খালে একবার একটি মাছ-ধরা জাহাজ ঝড়ে কোথায় উধাও হইয়া যায়। কোনো রকমেই আর তাহার খোঁজ পাওয়া যায় না। তাহার উদ্ধারের জন্ত নানা-প্রকার আয়োজন
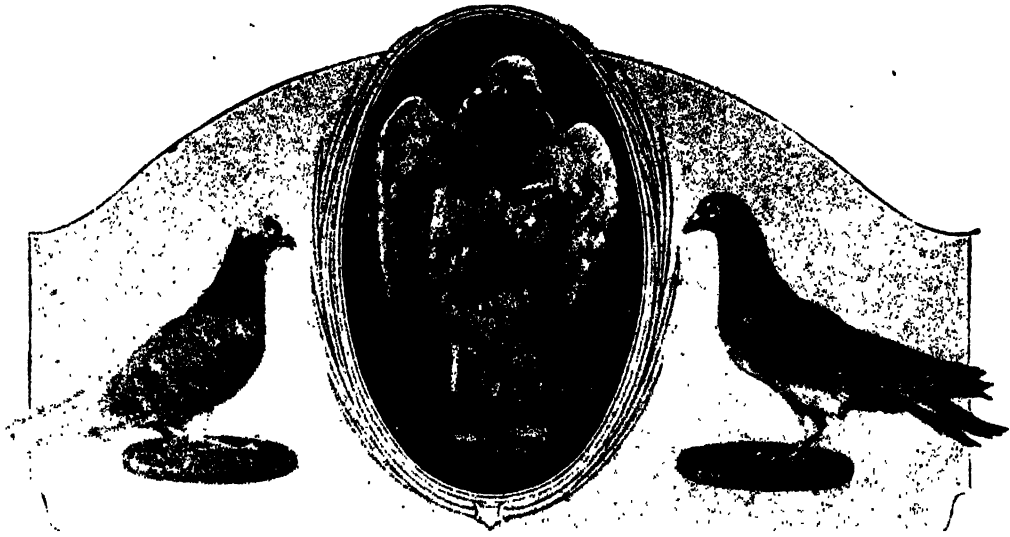
বিগত মহাযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র কর্ত্তৃক নিয়োজিত কয়েকটি পায়রা-দূত—
বামে মকার নামক পায়রা-দূত, দক্ষিণে প্রেসিডেন্ট্‌ উইলসন্‌ নামক পায়রা-দূত মধ্যে একটি আদর্শ দৌড়বাজ পায়রার ছবি

হইতেছে—এমন সময় দেখা গেল যে, একটি মৃতপ্রায় ক্লান্ত পায়রা সেই হারানো জাহাজের সংবাদ লইয়া হাজির হইয়াছে। এই পায়রা যদি যথা-সময়ে খবর বহন করিয়া না আনিত, তাহা হইলে হারানো জাহাজখানির উদ্ধার হইত কি না বলা শক্ত।

এইসকল পায়রা ২০০।৩০০ মাইল পথ অতি সহজেই চলিয়া যায়। হাজার মাইল উড়িয়া গিয়াছে এমন পায়রাও আছে বলিয়া শুনা যায়। হাজার মাইল অবশ্য একটানা যায় না। রাত্রিকালে কপোতেরা কোথাও বিশ্রাম করে এবং ভোর হইবামাত্র নিজের পথে চলিতে আরম্ভ করে। ঝড়-বৃষ্টিতে ইহাদের বিশেষ কোনো-প্রকার ক্ষতি করিয়াছে বলিয়া শোনা যায় না। ইহাদের দিগ্‌ভ্রম হওয়া অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। কপোত-দের গায়ে বৃষ্টি লাগিতে পায় না—ইহাদের পালকের উপরে একপ্রকার গুঁড়া-গুঁড়া দ্রব্য থাকে—যাহাতে গায়ে জল পড়িবামাত্র তাহা ঝরিয়া যায়।
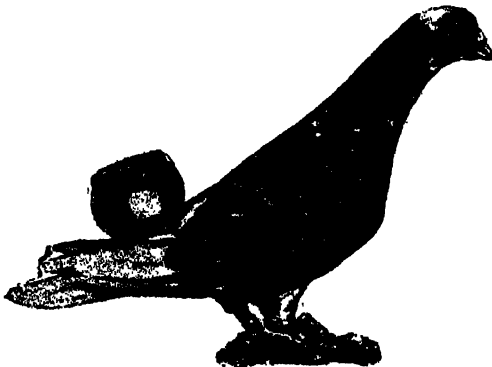
মকার পায়রা দূত—বিগত মহাযুদ্ধে ইহা একটি বিপন্ন আমেরিকান্‌ সৈন্যদলের সংবাদ বহন করিয়াছিল

এইপ্রকার দূত তৈরি করিতে পায়রাকে অনেক শিক্ষা দিতে হয়। প্রথম ইহাদের নিজের বাসা ভালো করিয়া চিনাইতে হয়। বাচ্চা-অবস্থা হইতেই ইহাদের শিক্ষারম্ভ করিতে হয়। তার পর এক মাইল দুই মাইল দূর হইতে বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। এইপ্রকারে ক্রমশঃ সে অতি দূর হইতেও নিজের বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে শিক্ষালাভ করে। প্রথম-প্রথম না খাইতে দিয়া পায়রাদিগকে বাসায় ফিরিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। বাসায় খাবার আছে এই আশায় ক্ষুধার্ত্ত পায়রাগুলি অতি-তৎপর নিজ বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করে। ভালো রকম শিক্ষা পাইলে পায়রা অতি শীঘ্র ৬০০।৭০০ মাইল পথ অতিক্রম করিতে পারে। মিনিটে মাইল উড়িয়া যায় এমন পায়রাও আছে।

গত মহাযুদ্ধের সময় পায়রা-দূতের বহুল ব্যবহার হইয়াছিল। মিত্রশক্তির প্রায় ১০৫,০০০ পায়রা-দূতের কাজ করিয়াছিল। যখন টেলিফোন্‌ টেলিগ্রাফ, এমন-কি বেতারেও সংবাদ পাঠানো অসম্ভব হইয়াছে, তখন পায়রা শত্রু শিবির পার হইয়া সংবাদের আদান-প্রদান চালাইয়াছে। ১২ সেপ্টেম্বর ১৯১৮ সালে "মকার" নামক কপোত যোম প্রান্তর হইতে মিত্র-শিবিরে বিপন্ন এবং অবরুদ্ধ আমেরিকান্‌ সৈন্যদলের সংবাদ বহন করিয়া আনে। সে যখন আসিয়া পৌঁছিল, তখন তাহার একটি চোখ বন্দুকের গুলিতে উড়িয়া গিয়াছে, এবং তাহার মাথা রক্তে লাল হইয়া গিয়াছে। এই পায়রা সংবাদ লইয়া আসিয়া পড়াতে প্রকাণ্ড সৈন্যদল রক্ষা করা সম্ভবপর হইয়াছিল।

পদাতিক সৈন্যদলের অনেকের পিঠে রেশমের থলিতে (অক্সিজেন্‌-পূর্ণ) পায়রা আবদ্ধ থাকিত। অক্সিজেন্‌পূর্ণ থলিতে রাখিবার উদ্দেশ্য-পায়রাদের শত্রুদের বিষাক্ত গ্যাসের আক্রমণ হইতে রক্ষা করা। অনেক সময় দিনের পর দিনের অনাহারে এবং জল-কাদার মধ্যে গর্ত্তে বাস করিয়াও এই-সকল পায়রা দূতের কাজ অতি তৎপরতার সহিত করিয়াছে। স্পাইক্‌ নামক আর-একটি কপোত গত মহাযুদ্ধের সময় ৫৬ বার গোলা-বৃষ্টির মাঝখান দিয়া ক্রমাগত সংবাদ বহন করিয়া আসা-যাওয়া করিয়াছে। একবারও সে কোনো প্রকার আঘাত প্রাপ্ত হয় নাই।

পায়রা সংবাদ লইয়া প্রায় ৩০০ ফুট উচ্চে আকাশ পথে উড়িয়া যায়। এত উঁচুতে গুলি করিয়া সংবাদবাহী কপোত হত্যা করা অসম্ভব। গোলা বা গ্যাসও এত উঁচুতে কিছুই করিতে পারে না। বাজ-পাখীর দ্বারা কপোত হত্যা করাই একমাত্র সম্ভবপর উপায়। কিন্তু ফরাসীরা সংবাদ-বাহী কপোতের পুচ্ছে একপ্রকার বাঁশী বাঁধিয়া দেয়। আকাশে উড়িবার সময় এই বাঁশীতে হাওয়া লাগিয়া ভয়ানক বিকট শব্দ হয়, তাহাতে বাজ-পাখী ভয় পায়—এবং পায়রাকে আক্রমণ করিতে সাহস করে না।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ফরাসীরা একপ্রকার অদ্ভুত আকাশ-ক্যামেরার আবিষ্কার করে। এই ক্যামেরা পায়রার পেটের কাছে বাঁধা থাকে। ক্যামেরাটি অ্যালুমিনিয়মের তৈয়ারী। ইহার দুইটি লেন্স—একটি সামনের দিকে আর-একটি তলার দিকে। ক্যামেরার ভিতরে একটি ছিদ্রওয়ালা রবার-বল থাকে। এই বলটির সমস্ত হাওয়া বাহির হইয়া যাইবামাত্র ক্যামেরার লেন্সের আড়াল খুলিয়া যায় এবং নীচের শত্রু-শিবিরের একটি ছবি ফিল্মে উঠিয়া যায়। এই ফিল্ম্ ডেভালপ্ করিলে ছবিখানি অতি স্পষ্ট হইয়া উঠে।
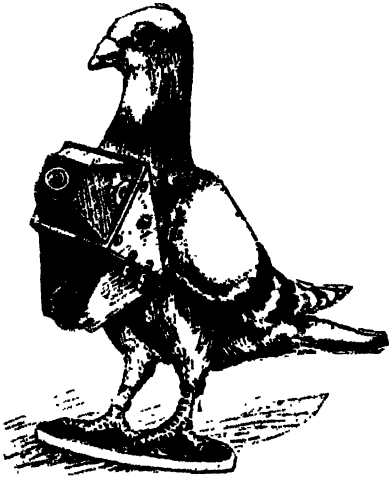
ফরাসীদের আবিষ্কৃত আকাশ-ক্যামেরায় পায়রা-দূতের সাহায্যে বিপক্ষ সৈন্যদলের ফোটো গ্রহণ

পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক দেশেই পায়রা পোষা হয়। ইহাদের দ্রুত গতি একটি দেখিবার জিনিষ। ম্যাসাচুসেট্‌স্ স্থানের একটি পায়রা সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় ১৮০০ মাইল আকাশ-পথ অতি অল্প সময়ের মধ্যে অতিক্রম করিয়াছিল। যুদ্ধের সময়ই যে কেবল পায়রার দরকার হয়, তাহা নয়—ক্রীড়া এবং বেসরকারী সংবাদ আদান-প্রদানের কাজে পায়রার প্রচুর ব্যবহার আছে। সংবাদবাহী কপোতের দাম অতি ভয়ানক হয়। বিলাতে একটি সংবাদবাহী কপোত বিক্রয় হয়, তাহার দাম হয় ৫৪,০০০্ টাকা।

সংবাদবাহী কপোত অতি বিলাসী। তাহার থাকিবার কাঠের ঘরটি ফিটফাট না হইলে সে কোনো মতেই সেখানে প্রবেশ করিবে না। খাদ্য সম্বন্ধেও তাহার যথেষ্ট বিলাস আছে।

অঙ্গুরী-আলোক—

একপ্রকার নতুন-ধরণের বৈদ্যুতিক আলোর আবিষ্কার হইয়াছে। আঙুলে আংটির মতন এই আলোটি লাগানো চলিবে। ইহার আলো ঠিক দরকার-মতো স্থানে প'ড়বে। অন্য কোনো স্থানে পড়িবে না। ঘড়ি

অসুস্থ ব্যক্তির অঙ্গুরীর আলোক-সাহায্যে লিখন পঠন

মেরামতির কাজে, চিত্রকর এবং রোগীদের পক্ষে ইহা অতি সুবিধার হইবে। চোখে একেবারেই আলো লাগিবে না। রোগী শুইয়া-শুইয়া লেখা বা বই পড়ার কাজ করিতে পারিবে। দেওয়ালের তার হইতে বিদ্যুত লইয়া ইহার কাজ চলিবে এবং অতি সামান্য প্রবাহেই এই বাতি জ্বলিবে।

গাছের তৈরী হাতী—

ছবিতে দেখুন একটি হাতী দেখা যাইতেছে, তাহার সামনে দুইজন ভদ্রমহিলা রহিয়াছেন। ঐ হাতীটি সত্যিকার হাতী নয়—গাছকে

গাছের তৈরী হাতী

কেয়ারী করিয়া হাতীর আকার দেওয়া হইয়াছে। যে-বাগানে এই গাছের হাতীটি আছে, সেই বাগানে এইপ্রকার গাছের তৈরী আরো নানা-প্রকার জীবজন্তুর প্রতিকৃতি আছে। জন্তুর আকার এবং ধরণ ধারণ ঠিক রাখিবার জন্য বাজে ডাল এবং পাতা কাঁচি দিয়া সময়মত সযত্নে ছাঁটিয়া ফেলা হয়।

পৃথিবীর নীচের গুহা—

আমেরিকার এক সহরের কাছে মাটির ৮০ ফুট নীচে এক আশ্চর্য্য গুহার আবিষ্কার হইয়াছে। একটি গর্ত্ত দিয়া দড়ির সিঁড়ির সাহায্যে এই গুহার মধ্যে প্রথম অবতরণ করা হয়। এই গুহাটি অতি প্রশস্ত এবং

মাটির নীচের অতুলনীয় শোভাসম্পন্ন গুহা—অবতরণকারীরা হামাগুড়ি দিয়া অগ্রসর হইতেছেন

দড়ির সাহায্যে গুহার উচ্চতর অংশে আরোহণ

তাহার ভিতরের শোভা নাকি অতুলনীয়। চারিদিকে নানা-প্রকার সুশৃঙ্খলে পাথরের স্তূপ আছে, দূর হইতে এই পাথরগুলিকে বরফ বলিয়া মনে হয়। ভূতত্ত্ববিদ্‌দের মতে এই গুহা বহু হাজার বছরের পূর্ব্বের কোনো এক বর্ত্তমানে শুষ্ক নদীর পথে ছিল। নদী অবশ্য মাটির উপরে ছিল না, মাটির তলা দিয়াই তাহার গতি ছিল।

কুকুরকে শিক্ষা দেওয়া—

প্রত্যেক জন্তুই শিক্ষা পাইতে এবং শিক্ষা করিতে ভালোবাসে। ইহাতে তাহারা প্রচুর আনন্দ পায়। কিন্তু ইহাদের শিক্ষা দিবার ঠিক উপায় জানা চাই, এবং শিক্ষা দেওয়ার কার্য্যটি অতি ধৈর্য্যের সহিত করিতে হইবে। ছোটো-ছোটো ছেলে-মেয়েদের ধমক এবং লাঠির ভয় দেখাইয়া অল্প সময়ে অধিক শিক্ষা দেওয়া যায় না—এমন-কি, লাঠি এবং ধমকের ফলে ফল অনেক সময় উল্টা হয়। কুকুর ইত্যাদি জন্তু-সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। আদর এবং স্নেহ দিয়া তাহাদের যেমন অধিক শিক্ষা অল্প সময়ে

একটি পোষা-কুকুরের নির্দ্দেশক্রমে দাঁড়াইবার ভঙ্গি

দেওয়া যায়—লাঠির গুঁতার চোটে তাহা হয় না। নিজের বিরক্তি এবং রাগ যে দমন করিতে পারে না, সে কখনও জন্তুর শিক্ষার কার্য্যে সাফল্য লাভ করিতে পারে না।

কুকুরকে শিক্ষা দিবার ইচ্ছা থাকিলে, শিক্ষার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে কুকুরকে কি-কি শিক্ষা দিব, তাহা স্থির করিয়া লইতে হইবে।

শান্তিরক্ষক পোষা-কুকুর বিপৎকালে কাজ করিবার জন্য প্রস্তুত

খুব বেশী বিষয় শিখাইবার চেষ্টা করা ভুল। মাত্র কয়েকটি বিষয় খুব ভালো করিয়া শিখানোই ভালো। তাহাতে কুকুর এবং শিক্ষক উভয়ের পক্ষেই ভালো। পুরানো শিক্ষা তাহার একেবারে না-ভুলিবার-মতো

করিয়া শেখা না হইলে অন্য বিষয় শিখাইবার চেষ্টা করা উচিত নয়। তাহাতে দুইটি শিক্ষাই অনেক সময় ব্যর্থ হইয়া যায়।

বাচ্চা-অবস্থা হইতেই শিক্ষা দেওয়া ভালো। প্রথমেই তাহাকে বাধ্যতা শিক্ষা দিতে হইবে। প্রভুকে প্রভু বলিয়া বেশ ভালো করিয়া চিনাইয়া দিতে হইবে। কুকুর যে-মুহূর্ত্তে তাহার প্রভুকে চিনিতে পারিবে, সেই মুহূর্ত্তেই সে তাঁহার কথামতো এবং শিক্ষামতো কাজ করিবার জন্য সকল সময় প্রস্তুত থাকিবে। শিক্ষার সময় কুকুরের সহিত অন্য কাহাকেও বিশেষ বন্ধুত্ব করিতে দিতে নাই।

কুকুরকে প্রথমেই কোনো বিশেষ স্থানে কথামতো শুইয়া থাকিতে বাধ্য করিতে হইবে। শেষে এমন হইবে যে, বলিবামাত্র সে নির্দ্দিষ্ট

প্রাতরাশের অপেক্ষায় একটি পোষা-কুকুর

স্থানে গিয়া নির্দ্দিষ্ট ভঙ্গিতে শুইয়া পড়িবে। শুইয়া থাকিবার শিক্ষা দিবার সময় তাহাকে ক্রমাগত পিঠে চাপ দিতে হইবে এবং "শু'য়ে থাক্" "শু'য়ে থাক্" বলিয়া হুকুম করিতে হইবে। এই শব্দ ক্রমাগত শুনিতে-শুনিতে ইহা তাহার মনে বসিয়া যাইবে এবং অবশেষে এমন হইবে যে, এই কথা শুনিবামাত্র সে শুইয়া পড়িবে। কুকুর শুইয়া পড়িবামাত্র তাহার পিঠে আদর করিয়া চাপ্‌ড়াইতে হইবে, এবং সে যেন একটা ভয়ানক বাহাদুরির কাণ্ড করিয়াছে এইপ্রকার প্রশংসার ভাব দেখাইতে হইবে। প্রত্যেকটি শিক্ষার পরই কুকুরকে কোনো-না-কোনো প্রকারে পুরস্কৃত করা দরকার। এইপ্রকারে তাহাকে ছাতা-লাঠি বহা, বল মুখে করিয়া আনা, জলে লাফাইয়া পড়া, ইত্যাদি অনেক-কিছুই শিক্ষা দেওয়া যায়। সকল সময়ই বিশেষ ধৈর্য্যের প্রয়োজন। ধৈর্য্যচ্যুত হইলে কুকুর বা অন্য কোনো জন্তুকে বিশেষ-কিছুই শিখানো যাইবে না।

জিনিষ পাহারা দেওয়া, মোটরে বসা, রাস্তা দিয়া চলিবার সময় ঠিক পিছনে-পিছনে হাঁটা, সবই হুকুম করিয়া আস্তে আস্তে শিখান যায়।

—

আকাশ-লিপি—

গত মহাযুদ্ধের পর এরোপ্লেন্ লইয়া নানা-প্রকার পরীক্ষা এবং খেলা চলিয়াছে। তাহার মধ্যে এরোপ্লেন্ হইতে ধূম্রের সাহায্যে আকাশ-বিজ্ঞাপন-লেখা ব্যবসায়ের দিকে অনেক সাহায্য করিয়াছে। মাটি হইতে দুই মাইল উচ্চে যদি কিছু লেখা যায়, তাহা ১০০ বর্গ মাইলের সকল লোকে দেখিতে এবং পড়িতে পারে। মেজর্ জন্ সি স্যাভেজ নামক

এরোপ্লেন সাহায্যে আকাশে লেখা

একজন সেনানী এই কল্পনাকে প্রথম কার্য্যে পরিণত করেন। কাপ্তেন সিরিল টার্নার ২৪শে নভেম্বর সর্ব্বপ্রথম এরোপ্লেন্ হইতে ধোঁয়া ছাড়িয়া "Hello U. S. A" এই কথা-কয়টি আকাশে লেখেন।

আকাশে-লেখার কাজে ব্যবহার হইবার জন্য স্বতন্ত্র এরোপ্লেন্ তৈয়ারী হয়। ইহাদের গতি মিনিটে দুই মাইলের কিছু বেশী। এইসমস্ত কাজে যে-এরোপ্লেন্ ব্যবহার হইবে, তাহাদের গতি অতি ক্ষিপ্র হওয়া দরকার এবং তাহাদের কলকব্জাও এমন হইবে যে, যাহাতে ১০০০০ ফুট উচ্চেও এরোপ্লেন্‌কে সহজে ইচ্ছামত ঘোরানো-ফেরানো যাইতে পারে। এইসকল এরোপ্লেন্‌কে সাধারণ এরোপ্লেন্ হইতে আটগুণ বেশী শক্ত করিয়া তৈয়ার করা হয়, কারণ ইহাতে বিপদের সম্ভাবনা বেশী আছে। মাটি হইতে ১০,০০০ ফুট না উঠিয়া কখনও কিছু লিখিবার চেষ্টা করা হয় না। যত বেশী উঁচুতে উঠা যাইবে, হাওয়ায় স্থিরতা ততই বেশী-পরিমাণে পাওয়া যাইবে। হাওয়া স্থির থাকিলে লেখা অধিকক্ষণ স্থায়ী হইবে এবং তাহা অধিক লোকে পাঠ করিতে পারিবে।

লেখা একবার আরম্ভ করিলে তাহা নির্ভুল করিতে হইবে। লেখা উল্টাদিকে লিখিতে হইবে। তাহা না হইলে মাটির লোকে তাহা ঠিকমত পড়িতে পারিবে না। লেখায় যদি কোনো প্রকার ভুল চুক হইয়া যায়, তবে তাহা আর শুধরাইবার কোনো উপায় নাই। মিনিটে দুই-মাইল বেগে যখন এরোপ্লেন ধূম্র ত্যাগ করিতে-করিতে আগাইয়া যায়, তখন সে প্রতি সেকেণ্ডে ২০০,০০০ বর্গ ফুট ধোঁয়া ছাড়ে। এক মিনিটে একটি এরোপ্লেন্ ২ মাইলের মধ্যে ১,২০,০০,০০০ বর্গ ফুট ধোঁয়ার লেখা ত্যাগ করিয়া যায়। শীঘ্রই তিনচারখানি এরোপ্লেনের সাহায্যে রঙীন বিজ্ঞাপন দিবার চেষ্টা হইবে।

এই কাজে যে-সকল লোক নিযুক্ত হয়, তাহারা অতিশয় দক্ষ এবং পাকা লোক। গত মহাযুদ্ধে তাহারা সকলেই এরোপ্লেনে অসীম সাহসের সহিত নানা দুঃসাধ্য কার্য্য করিয়াছিল।

—

বায়ু-চালিত বিদ্যুৎ উৎপাদন করিবার কল—

একজন জার্ম্মান্ অফিসার্ একটি হাওয়া-কল তৈয়ারী করিয়াছেন। এই হাওয়া-কলের সাহায্যে সহর হইতে বহুদূরে অতি অল্প খরচে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা চলিতে পারে। সামান্য একটু বাতাস লাগিলেই এই হাওয়া-কলের পাখনাগুলি ঘোরে এবং যে-দিকে হাওয়া সেই দিকেই
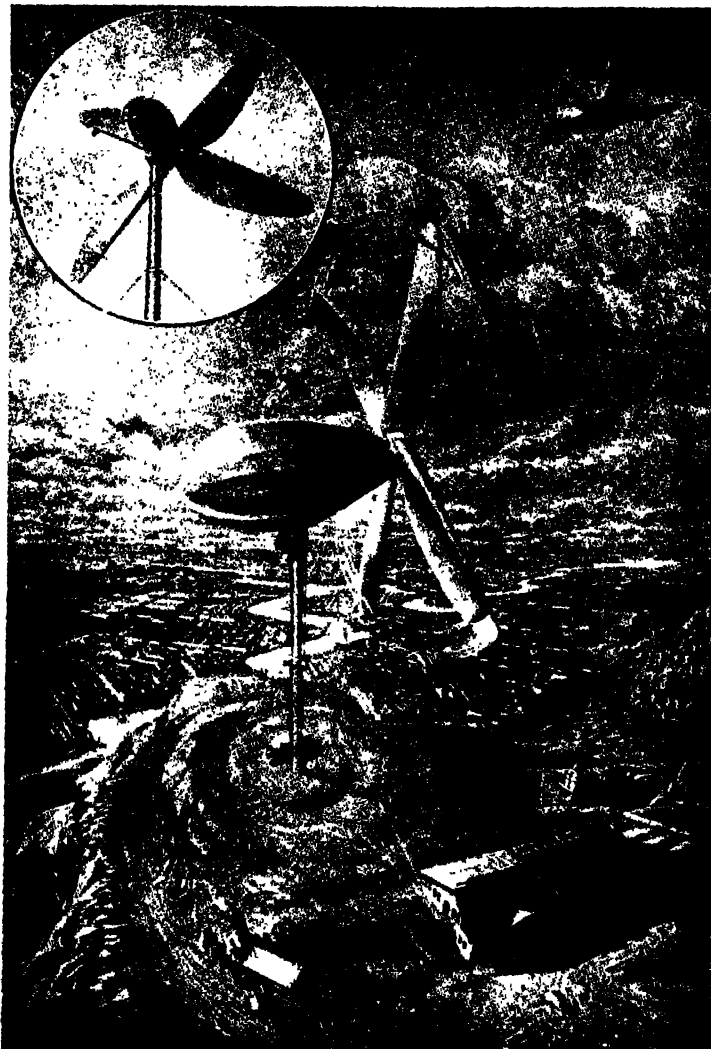
বায়ু-চালিত-বিদ্যুৎ-উৎপাদনকারী কল

পাখনাগুলি আপনা হইতেই ঘুরিয়া যায়। ডায়নামোটি পাখনার পিছনেই গোল আবরণের মধ্যে আছে। এই হাওয়া-কলটি কোনো স্থানে বসাইতে মাত্র ছয় ঘণ্টা সময় লাগে। একবার বসাইয়া ফেলিলে ইহার পিছনে আর বিশেষ কোনো-প্রকার খরচ হয় না।

রূপ ও আলাপ

সঙ্গীতাচার্য্য শ্রী গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

ভৈরব

রাগরাগিণীর মতামত-সম্বন্ধে বহু সংস্কৃত গ্রন্থ আছে, যথা :—
সঙ্গীত রত্নাকর, সঙ্গীত-দর্পণ, সঙ্গীত-পারিজাত, সঙ্গীত-রত্নাবলী, সঙ্গীত-সময়সার, ইত্যাদি ইত্যাদি। এইসকল গ্রন্থে রাগরাগিণী-সম্বন্ধে বহু মত-ভেদ দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ কোনো মতে ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী এবং কোনো মতে ছয় রাগ ত্রিশ রাগিণী, আবার এক মতে যাহা রাগ, অপর মতে তাহা রাগিণী এই মতভেদ সত্ত্বেও যে-মত সর্ব্ববাদী-সম্মত তাহাই নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে। ভৈরব, মালকোশ, হিন্দোল, দীপক, শ্রীওমেঘ। এই মত হিন্দুস্থানে সকলেই মানিয়া থাকেন। ইহাই অবলম্বন-পূর্ব্বক লেখা হইল যে,

ধ্বনি দ্বারা লোকের চিত্ত রঞ্জন করে, সাধারণতঃ তাহাকে রাগ ও রাগিণী বলে। রাগ অর্থে পুরুষ ও রাগিণী অর্থে স্ত্রী। এই ছয়টি রাগ গাইবার ছয়টি ঋতু নির্দ্দেশ আছে, যথা :—

শরতে—ভৈরব। হেমন্তে—মালকোশ। বসন্তে—হিন্দোল। গ্রীষ্মে—দীপক। শিশিরে—শ্রীরাগ। বর্ষায়—মেঘ। পরন্তু উক্ত ঋতুতেই যে উক্ত রাগ গাইতে হইবে এমন নহে, অর্থাৎ দেশাচার মতে সকল ঋতুতেই গাওয়া যাইতে পারে। প্রথমে রাগ ছয়টির বিষয়, রূপবর্ণন, প্রতিমূর্ত্তি, আলাপ, এবং গান পর পর দেওয়া হইবে। এবং পরে রাগিণী ছয়টি দেওয়া হইবে। একটি রাগ ও তাহার ছয়টি রাগিণী নিয়মিত-ভাবে দেওয়া হইবে। এই সংখ্যায় ভৈরব রাগের বিষয় লেখা হইল; তৎপরে ছয়টি রাগিণী থাকিবে এবং আবার অন্য সংখ্যায় মালকোশ ও তাহার ভার্য্যা ছয়টি থাকিবে। এইরূপ ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণীর রূপ, আলাপ, গান সমস্তই থাকিবে। বাদী, বিবাদী ও জাতি প্রভৃতি সমস্তই দেওয়া হইবে। আলাপ অর্থে পরিচয়। ধ্রুপদ-গানের ছন্দ ত্যাগ-পূর্ব্বক স্বরবিন্যাস দ্বারা তে, রে, নে, রি, রে, না ইত্যাদি শব্দ যোগে স্বরের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচয় করার নাম 'আলাপ'। অনেকের ধারণা যে, অগ্রে আলাপের সৃষ্টি, তৎপরে গান। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভুল। যেমন আগে ভাষার সৃষ্টি তৎপরে 'ব্যাকরণ' ইহাও তদ্রূপ। গান, তালের নিয়মানুসারে গাহিতে হয়, সুতরাং বাঁধাবাঁধি যথেষ্ট আছে; তজ্জন্য আগে সেই-সেই স্বর ইচ্ছানুযায়ী বিস্তারিত ভাবে দেখাইয়া তৎপরে গান গাওয়া প্রচলিত। আলাপ করা কাঁচা অল্প শিক্ষিত গায়কের কার্য্য নহে, ইহা বহুদর্শন ও সাধনা-সাপেক্ষ।

ভৈরবো মালকোশশ্চ হিন্দোলো দীপকস্তথা।
শ্রীরাগো মেঘরাগশ্চ ষড়েতে পুরুষাঃ স্মৃতাঃ॥

ভৈরব, মালকোশ, হিন্দোল, দীপক, শ্রীরাগ ও মেঘ এই ছয়টি পুরুষ অর্থাৎ রাগ-পদবাচ্য।

ভৈরব রাগের ধ্যান

গঙ্গাধরঃ শশিকলা তিলকস্ত্রিনেত্রঃ
সর্পৈর্বিভূষিততনুর্গজকৃত্তিবাসাঃ।
ভাস্বৎ ত্রিশূলকর এষ নৃমুণ্ডধারী
শুভ্রাম্বরো জয়তি ভৈরব আদিরাগঃ॥

ভাবার্থ—যাঁহার মস্তকে গঙ্গাদেবী সর্ব্বদা কুলুকুলুধ্বনি করিতেছেন, ললাটে চন্দ্রখণ্ড তিলকের ন্যায় শোভিত, তিনটি নয়ন, সর্প ভূষণে ভূষিতাঙ্গ, পরিধানে শুক্লবর্ণ গজচর্ম্ম এবং এক হস্তে ভাস্বর ত্রিশূল ও অপর হস্তে একটি নৃমুণ্ড, তিনিই ভৈরব অর্থাৎ আদি রাগ।

ভৈরব—আলাপ

সম্পূর্ণ জাতি।
ঋও্ধ কোমল।
দুই—নি।
ম—বাদী।
প—সংবাদী।

আস্থায়ী

গ্রহ-স্বর

সন্‌া সা মা-া মগা মগা মা পা -া পা মা‿ণা দা -া দা
তে॰ • না॰ তো॰ •ম্‌ না • • নে তা • • • •

দা -া পা পদা পদা মপা মা-া গা ঋা মগা পা 'মা -া -া
না • • তে॰ •• •• না॰ • তে •• • রি • •

মগা মা ঋ -া সাসা -া সন্‌া সা ন্‌সা দ্‌া -া প্‌া
রে॰ না • • •• • তা॰ • না • • •

প্‌দ্‌া প্‌দ্‌া মুপ্‌া ম্‌া -া গ্‌া ম্‌া ণ্‌া দ্‌া -া‿সা -া -া সা
তো॰ •• •ম্‌ না • • তে • • • • • • না

ঋা মগা পা মা গা ঋ গা ঋ -া সা সা সা সা
তা •• • না • • তো • ম্‌ না তে রে না

ন্যাস-স্বর

সন্‌া সন্‌া ঋ সা -া ॥
তে না ০ তো ম্

অন্তরা

মা ণদা -া দা র্সা -া র্সা সা র্সা র্সা র্ঋা র্মা র্গা র্পা র্মা
তো ০ ০ ম্ না ০ নে তে রে তে ০ ০ ০ ০ ০
-া র্গা র্ঋা র্মর্গ র্ঋা -া র্সা র্সনা র্সা র্সা দা -া পা
০ না তা ০০ ০ ০ না তে০ ০ ০ ০ ০ না
পা দপা মা পা মা -া গা মা ণা দা -া পা
তো ০০ ০ ম্ না ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০
মা -া গা ঋমা গপা মা -া গা গমা গমা
তে ০ ০ রি০ ০০ রে ০ ০ না০ ০০
ঋা-া সা সা সা সা সন্‌া সন্‌া ঋা সা-া ॥
০০ ০ তে রে না তে না ০ তোম্

সঞ্চারী

সা সা দা দা ণদা ণদা -া পা পমা পা মা-া গা
তে রে নে রি রে না ০ ০ তো০ ম্ না০ ০
ঋা মগা পা মা গা ঋা -া সসা -া সা -া
তে না ০ ০ না ০ ০ ০০ ০ তো ম্
দ্‌া দ্‌া সন্‌া ঋা সা-া ঋা মগা মা ঋা-া সা-া।
না তে ০০ ০ রে০ না ০০ ০ ০০ ০০

আভোগ

র্সা ণদা -া -া র্সা -া র্সা সা র্সনা র্ঋা র্স -া
তে রে ০ ০ ০ ০ ০ না তো০ মা না ০
র্ঋর্মা র্গর্মা র্ঋা -া র্সা র্সা ণদা -া পা মা গা ণ্ম
তে০ ০০ ০ ০ না তে রে ০ ০ না ০ ০
দা পা -া মগা মগা মা ঋা -া সা সা সা সা
নে তে ০ না০ ০০ ০ ০ ০ নে তে রে না
সন্‌া সন্‌া ঋ সা -া ॥
তে না ০ তো ম্

দুন ছন্দে অস্থায়ী

সন্‌সা মা মগমগা মপা -া পা মণা দা
তে০০ না তো০০০ না০ ০ নে তা০ ০
দঃ দাপঃ পদপদা মপা মা গঋ মগপা মাঃ মগঃ
ন না০ তে০০০ ০০ না ০তে ০০০ রি রেঃ
মঋ -ঃ সসঃ -া সন্‌া সা নসদ্‌াঃ প্‌ঃ প্‌দ্‌প্‌দ্‌া ম্‌পা ম্‌া
না০ ০ ০০ ০ তা০ ০ না০ ০ তো০০০ ০ম্ না
গ্‌ম্‌া ণ্‌দ্‌াঃ সঃ -া সা ঋমগা পমা গঋা গঋঃ সঃ
০নে ০০ ০ ০ না তা০০ ০না ০০ তো০ না
সসা সঃ সন্‌ঃ সন্‌ঃ ঋঃ সা ।
তেরে না তে না ০ তোম্

রাগ—ভৈরব—তাল চৌতাল

ভৈরব-স্বরূপ বর্ণন

শীষ জটা নিমে গঙ্গ-তরঙ্গ
ত্রিলোচন চন্দ-ললাট উপর।
লাল বিশাল ফণী-শিখরী-মণি
জ্যোত লসৈ কছু কুণ্ডল তুপর।
বাঘাম্বর পহন শুভ্রবরণ
নীলকণ্ঠ নরমুণ্ড শোহে কণ্ঠপর।
হররূপ কীরে ত্রিশূল লিয়ে
হরবল্লভ রীঝ বড়ো ডমরুপর॥

হরবল্লভ*।

আস্থায়ী

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
ণ
দা -া । দা দা । পা -া । দা মা । পা গা । মা মা ।
শী ০ ষ জ টা ০ নি ০ ০ ০ ০ মে

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
ঋা -া । গা মা । পা মা । গমা গমা । ঋ -া । সা সা ।
গ ০ ঙ্গ ০ ০ ত র০ ০০ ০ ০ ০ ঙ্গ

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
সা -া । ণদা -া । সা সা । সা ঋা । গা মা । -া মা ।
ত্রি ০ লো ০ চ ন চ ০ ০ ০ ০ ন্দ

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
গা মা । ণদা -া । দা পা । মা গা । মা মা । ঋা সা ॥
ল লা ০ ০ ট ০ উ ০ ০ প ০ র

অন্তরা

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
{ মা -া । ণদা -া । -া দা । র্সা -া । -া না । র্ঋা র্সা ।
লা ০ ল ০ ০ বি শা ০ ০ ০ ০ ল

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
র্সা র্ঋা । র্গা র্মা । র্পা র্মা । র্মা র্গা । র্মা র্ঋা । র্সা র্সা } ।
ফ ণী ০ ০ ০ শি খ ০ ০ রী ম ণি

* হরবল্লভ অতি প্রাচীন গায়ক ছিলেন ; শুনা যায় সম্রাট্ আলাউদ্দিনের সময়ের লোক।

সাঁঝের

চিত্রকর শ্রী বঙ্কুবি কালে

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
র্সা -া । র্সা ণ্দা । -া দা । ণ্দা -া । দা -া । পা পা ।
জ্যো ০ ০ ত ০ ল সৈ ০ ০ ০ ক ছু

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
গা মা । ণা -া । দা পা । মা গা । মা মা । ঋ সা ॥
কু ০ ০ ০ গু ল ভ ০ ০ প র

সঞ্চারী

১´ ০ ২ ০ ৩ ৩
সা দা । -া দা । -া দা । ণ্দা -া । -া দা । পা পা ।
বা ০ ০ ঘা ০ ম্ব র ০ ০ প হ ন

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
মা গা । ঋ মগা । পা মা । গা মা । ঋ া । সা সা ।
শু ০ ০ ভ্র০ ০ ব র ০ ০ ০ ০ ণ

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
সা ন্া । দা ন্া । সা সা । সা ঋ । গা মা । -া মা ।
নী ০ ল ক ০ ণ্ঠ ন র ০ মু ০ গু

১ ০ ২ ০ ৩ ৪
গা মা । ণ্দা -া । পা পা । মা গা । গা ঋ । সা সা ॥
শো ০ ০ ০ হে ক ০ ণ্ঠ ০ প র

আভোগ

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
মা মা । ণদা -া । র্সা -া । র্সা না । ঋ্া র্সা । র্সা র্সা ।
হ র ০ ০ রু ০ প ০ ০ কি ০ য়ে

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
র্সা ঋ্া । র্গা র্মা । র্পা র্মা । র্গর্মা র্গর্মা । ঋ্া -া । র্সা র্সা ।
ত্রি ০ শূ ০ ০ ০ ল০ ০০ ০ ০ নি য়ে

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
র্সা র্সা । ণদা -া । দা পা । পদা পদা । মা পা । মা গা ।
হ র ব ০ ল্ল ভ রী০ ০০ ০ ০ ঝ ০

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
গা মা । ণদা -া । দা পা । মা গা । মা মা । ঋা গা ।
ব ড়ো ০ ০ ড ম রু ০ ০ প ০ র

ক্রমশ।

চর্‌কার গান

শ্রী হেমেন্দ্রলাল রায়

চরকা কাটো—চর্‌কা কাটো, একটা জাতি উঠ্‌ছে জেগে,
নূতন দিনের হচ্ছে সুরু তরুণ উষার আভাস লেগে।
চেয়ে আছে গোটা ভারত, বোনো তোমার বসন বোনো,
নূতন দিনের বরণ লাগি' পোষাক চাহি,—সবাই শোনো!

তাদের লাগি' চর্‌কা কাটো বেঁচে আছে আজও যারা,
চর্‌কা কাটো—দেশের জীবন সূতার মাঝে দিচ্ছে সাড়া।
ভবিষ্যতের সম্ভাবনা বোনো তোমার নিজের হাতে;
দুনিয়াতে শক্ত যারা ভাগ্য ফেরে তাদের সাথে!

নগ্ন জনে বস্ত্র দেহ, বোনো—বোনো—বসন বোনো,
চর্‌কা দিয়ে ক্ষুধার্ত্তেরি অনশনের অন্ন গোণো।
চর্‌কা কাটো, আলস্যেরে দাও ফেলে দাও আবর্জ্জনায়,
চর্‌কা ধরো বাঁচার মতো বেঁচে থাকার সম্ভাবনায়।

ধর্ম্ম তোমার চর্‌কা কাটা—গলা ছেড়ে গর্ব্বে গাহ,*
চর্‌কা কাটো প্রায়শ্চিত্তে চিত্ত-শুচি যে-জন চাহ।
চর্‌কা কাটো অতীত দিনের পাপের ছাপে মোছার লাগি',
চর্‌কা কাটো অধীনতার বন্ধনেরি মুক্তি মাগি'।

চর্‌কা কাটার ছন্দ বাজুক মন্দিরে ও মস্‌জিদেতে;
চর্‌কা গানের মন্ত্র গাহুক 'পারিয়া' আর ব্রাহ্মণেতে;
ইস্কুলেতে চর্‌কা চলুক,—বেসাদ যে এ মুক্তি পণের,
চর্‌কাতে আজ ভিড়্‌তে হবে পতিত জাতের পুত্রগণের।

মৌমাছিরা ফুলের মধু ফিরছে খুঁজে গুনগুনিয়ে,
তুলার পাঁজে চর্‌কা চালাও ছন্দ-সুরের জাল বুনিয়ে।
উজাড় করো সূতার ভাঁড়ার, বস্ত্র পরে' জমাও সূতা,
বস্ত্রেরি এই বাণিজ্যেতে লক্ষ্মী নিজে আবির্ভূতা।

কাটো—কাটো, চর্‌কা কাটো, মরা জাতি জাগছে যে গো,
চর্‌কা কেটে মুক্তি নিতে, মানুষ হ'তে চাইছে সে গো।
চর্‌কা কাটো—চর্‌কা কাটো; গাইছে শোনো
দেশের মেয়ে,—
"চর্‌কা তোমার ঢের ধারালো অসি এবং মসীর চেয়ে।"

স্বাধীনতার দেবতা যিনি চর্‌কা-চাকায় বসত করেন,
গোলাগুলি বদ্‌লে' আজি অস্ত্র তাঁহার 'টানা-পোড়েন'।
বসন বোনো,—বুনুনীতে হাসি তাঁহার পড়্‌ছে বোনা,
ঘরের ছেলে-মেয়ের মুখে ফুট্‌ছে খুশীর নিরেট সোনা।

কাটো—কাটো—চর্‌কা কাটো, যুগের নূতন নিশান দোলে,
নরের এবং নারীর মিলন চর্‌কা-তাঁতের অঙ্গে চলে।
গোটা জগৎ চর্‌কা-সূতার একটি তারে বাঁধার লাগি'
চর্‌কা হ'তে সূতার শিকল পাকে পাকে মেল্‌ছে আঁখি।

চর্‌কা চালাও—চর্‌কা চালাও—গড়ে' তোলো স্বর্গ নূতন,
সত্য এবং সুন্দরেরি দোলাও বিরাট্ বিজয় কেতন।
চর্‌কা এবং তাঁতের গানে দাও দোলা দাও চিত্ত দোলায়,
বিবাদ-ভরা বিশ্ব এসে মিল্‌বে তোমার মনের তলায়।

চালাও চালাও—চর্‌কা চালাও, পাঁজের সাথে মিলাও পাঁজে
সূতার ফেরে পড়্‌ছে ধরা পরিশ্রমের প্রাপ্যটা যে।
ধৈর্য্য এবং নিষ্ঠা এবং ত্যাগের সাথে চর্‌কা কাটো,
দেশের মাটি ধন্য হবে—চর্‌কা নহে তুচ্ছ, খাটো।

ধরা যাহার চাকার কাঠি বিশ্বেরি সেই চর্‌কাটাতে,
সূর্য্য নিজে ঘুরান চাকা, চর্‌কা কাটেন দীপ্ত হাতে।
মহা ব্যোমে তারায় তারায় ছন্দ তারি বাজ্‌ছে শোনো,
ছন্দে তারি চর্‌কা কাটো—বোনো তোমার বসন বোনো

* Maude Ralstion Sharman-এর 'The Charkha'-র অনুসরণে

বঙ্গে ম্যালেরিয়ার আদিম ইতিহাস

বঙ্গদেশের মোট গ্রাম ও নগরের সংখ্যা ৮৯,৬৬০ এবং লোক-সংখ্যা ৪৭৫৯২৪৬২ জন। যাহাকে সহর অথবা নগর বলা যায় অর্থাৎ যে-স্থানে মিউনিসিপ্যালিটী, জলের কল, স্কুল-কলেজ, আদালত ইত্যাদি আছে, তাহাদের সংখ্যা মাত্র ১৩৫; আর এই সহর অথবা নগরে ৩২,১১,৩০৪ জন লোক বাস করেন। অবশিষ্ট ৮৯,৫২৫ পল্লীগ্রাম এবং তথায় বাঙ্গলার শতকরা ৯৪ জন অর্থাৎ প্রায় ৪।।০ কোটি লোক বসতি করিয়া থাকেন।

বাঙ্গালার জন্মের হার কমিয়া চলিয়াছে। ১৮৯৭ খৃঃ হইতে ১৯০৬ খৃঃ পর্যান্ত জন্মের হার যেরূপ ছিল, বিগত দশ বৎসরে তদপেক্ষা শতকরা দশ জন কম হইয়াছে। ম্যালেরিয়াই ইহার প্রধান কারণ। ভারতে প্রতিবৎসর পাঁচ কোটির অধিক লোক ম্যালেরিয়ায় অস্থির হয়, তন্মধ্যে অন্ততঃ পঞ্চাশ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। বঙ্গদেশে গড়ে ২ কোটি ৮৩ লক্ষ লোক ম্যালেরিয়ায় কষ্ট পায়, তন্মধ্যে বৎসরে প্রায় বারো লক্ষের অধিক লোক মারা যায়।

প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশের জলের ঢালুতা উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে ছিল। উত্তর ও মধ্য বঙ্গের ব্যবস্থা এইরূপ ছিল। কেবল রাঢ়ে বা বর্দ্ধমান বিভাগে নদীর গতি পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব দিকে ছিল। এমন-কি দামোদর নদ গোড়ায় পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে আসিয়া কতকটা দক্ষিণ দিকে বহিয়া শেষে পূর্ব্বগামী হইয়া সরস্বতী নদীতে আসিয়া মিলিত হয়। ১৭৩৭ খৃঃ হইতে ঘন ঘন ভূমিকম্প হইয়া বাঙ্গালার জলধারার স্বাভাবিক ঢালুতার আংশিক পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছিল। বর্দ্ধমান বিভাগের পশ্চিম অংশের ঢালুতা উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে হইল; মধ্য-বাঙ্গালা এবং ভাগীরথী নদীর দুই ধারের জমি উচ্চ হইয়া গেল; গঙ্গা ও পদ্মার স্রোত ছাপঘাটি, মাথাভাঙা, এবং জলাঙ্গীর মোহানা দিয়া দক্ষিণে প্রবাহিত হওয়ায় বন্ধ হইয়া যায়; ফলে পদ্মার আকার অতি ভীষণ হইল, গঙ্গার জল প্রায় পনের আনাই পদ্মা দিয়া পূর্ব্বমুখে প্রবাহিত হইল। ব্রহ্মপুত্র পূর্ব্বে আসামের ও পূর্ব্ববঙ্গের কোণ দিয়া আসিয়া দক্ষিণাভিমুখী ছিল, এই সময় তাহার স্রোত যমুনা দিয়া পশ্চিমাভিমুখী হইয়া পদ্মায় মিলিত হয়। নদনদী-সমূহের এইরূপ প্রবাহ-গতি পরিবর্ত্তিত হওয়ায়, বাঙ্গালার স্বাভাবিক আকারেরও পরিবর্ত্তন ঘটিল। মধ্য বাঙ্গালার ভৈরব, যমুনা, ইচ্ছামতী, বেত্রবতী, কপোতাক্ষ, চূর্ণী, ফড়িয়া প্রভৃতি নদ-নদী মজিয়া হাজিয়া উঠিল। উত্তর বঙ্গের করতোয়া ক্ষীণকায়া হইল। ত্রিস্রোতা বা তিস্তা পদ্মা ছাড়িয়া ব্রহ্মপুত্র বা যমুনায় মিশ্রিত হয়, কুশী বা কৌশিকী নদী পূর্ণিয়া নগরের পশ্চিমে গিয়া পড়িল। ইহার ফলে, দিনাজপুর ও মালদহ জেলার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীসমূহ শুষ্ক হইয়া মজিয়া উঠিল। বগুড়া ও রঙ্গপুর জেলারও প্রায় ঐ দশা ঘটিল।

এই ঢালুতা পরিবর্ত্তনের ফলে, বর্ষার জল জমীতে বসিতে লাগিল ও ক্রমে মধ্য, উত্তর ও পশ্চিম বাঙ্গালা অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিল। এই সময় বঙ্গদেশে ম্যালেরিয়া দেখা দিল। ভূমির এই উত্থান জন্য সুন্দর-বনের অনেক স্থান সামান্য সামান্য উচ্চ হয়। যশোহর জেলা সর্ব্বত্র অস্বাস্থ্যকর হইল। ১৭৪০ খৃঃ হইতে এই প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন ধীরে ধীরে ঘটিতেছিল। প্রায় শত বৎসরে এই পরিবর্ত্তন পূর্ণরূপে সংঘটিত হয়। প্রথমে ম্যালেরিয়া দক্ষিণ জেলাসমূহেই নিবদ্ধ ছিল; তাহার পর রেলের বিস্তার, দামোদর নদের বাঁধ-নির্ম্মাণ প্রভৃতির ফলে বর্দ্ধমান বিভাগে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হয়। রেলের বাঁধে দামোদর নদ জলপ্লাবন হইতে বঞ্চিত হইয়া বর্দ্ধমান, হুগলী ও হাবড়া জেলা ডাঙ্গাভূমি করিয়া দিল। এদিকে "পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের" কল্যাণে পূর্ব্ব ও মধ্যবঙ্গ জালবোনার মত রেলের বাঁধে ও পথে আবদ্ধ হইল। এই অবস্থার ফলেই ম্যালেরিয়া দেখা দিল।

ম্যালেরিয়াকে প্রথম প্রথম লোক "নূতন জ্বর" বলিত। ১৮০৪ খৃঃ বহরমপুরে প্রথম ম্যালেরিয়া দেখা দিয়াছিল। তাহার পর ১৮২৪ খৃঃ যশোহরের অন্তর্গত মহম্মদপুরে আবির্ভাব হইয়া নলডাঙ্গা, চাঁচড়া, কশবা ধ্বংস করে। ১৮৩২ খৃঃ গদখালি, কাঁদচিলা, মুকপুকুরিয়া প্রভৃতি গ্রামে আবির্ভূত হইয়া প্রায় নয় হাজার লোককে মৃত্যুমুখে পাঠাইয়া নদীয়া জেলায় প্রবেশ করে। ১৮৪৫ খৃঃ এই তথাকথিত নৃশংস 'নূতন জ্বর' নিজ যশোহর ও তৎসন্নিহিত অনেকগুলি গ্রামের লোকক্ষয় করিয়াছে। ১৮৫৫ খৃঃ পুনরায় যশোহরে ম্যালেরিয়া দেখা দিয়াছিল। ১৮৫৬ খৃঃ উলাতে প্রবেশ করাতে চার বৎসরের মধ্যে প্রায় বিশ হাজার লোক গতায়ু হয়। ১৮৫৭ খৃঃ রাণাঘাট ও তাহার নিকটস্থ অনেকগুলি গ্রাম নষ্ট করে। ১৮৫৯ খৃঃ উহা কাঁচড়াপাড়া ও নৈহাটীতে উপস্থিত হয়। ১৮৬০ খৃঃ হালিসহর একপ্রকার জনশূন্য করিয়াছিল। পরে ১৮৬১ খৃঃ শান্তিপুরে ম্যালেরিয়া প্রবেশ করে।

১৮৬২ খৃঃ পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথ নির্ম্মিত হয়। ১৮৬৩ খৃঃ শ্যামনগর ও তাহার নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে ম্যালেরিয়া আবির্ভূত হয়। ১৮৬৪ খৃঃ হইতে ১৮৬৭ খৃঃ পর্য্যন্ত কৃষ্ণনগরে থাকিয়া এই রাক্ষসী নগরের প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোক ধ্বংস করিয়াছিল। ১৮৬৮ খৃঃ হুগলী সহর ও তাহার অন্তর্গত শ্রীরামপুর, তারকেশ্বর, হরিপাল, সাহাবাজার, দশঘরা, বসুয়া প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রাম ম্যালেরিয়ায় প্রায় জনশূন্য হইয়া যায়। ১৮৬৯ খৃঃ খুলনার অধিকাংশ, যশোহরের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ, মেহেরপুর, গোবরডাঙ্গা ও এইরূপে ২।৩ বৎসরের মধ্যে ক্রমশঃ সমগ্র বঙ্গদেশে ম্যালেরিয়ার প্রভাব বিস্তৃত হয়। ১৮৬৯ খৃঃ অর্থাৎ ১২৭৬ সালে ম্যালেরিয়া মহামারীরূপে সমগ্র বঙ্গভূমি ছারখার করিয়া তদবধি এদেশে চিরস্থায়ী হইয়া রহিয়াছে। ১৮৯০ খৃঃ পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় ইহার প্রাদুর্ভাব অতিমাত্রায় ছিল। ইহা প্রথমে মহামারীর আকার ধারণ করিয়া দেশকে ধ্বংস করিয়াছিল, পরে উহা জাপ্য রোগে পরিণত হয়।

চরকে নাকি একপ্রকার জ্বরের কথা বর্ণিত আছে, তাহা মশা দ্বারা ছড়াইয়া পড়ে। ১৮৮০ খৃঃ সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ল্যাভারেন্ সর্ব্বপ্রথমে ম্যালেরিয়ার বীজাণু আবিষ্কার করেন। ১৮৮৩ খৃঃ ডাক্তার গরি ঐ জীবাণুর আশ্রয়দাতার রক্তে বাসকালীন অবস্থার বিষয় ও কেমন করিয়া জ্বরের সময় উহার ক্রমবৃদ্ধি হয়, তাহা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ১৮৯৯ খৃঃ অধ্যাপক রোনাল্ড রস্ বিশেষভাবে প্রমাণিত করেন যে, এনোফেলিস্ নামক এক-প্রকার মশার দ্বারাই ম্যালেরিয়া বিস্তার হয়। ১৮৯৯ খৃঃ

স্যার্ রোনাও্ ভারতে ম্যালেরিয়া লইয়া বহু পরীক্ষা ও গবেষণা করিয়া এরূপ প্রমাণসমূহ সংগ্রহ করেন যে, সমগ্র জগতের চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহার মত মানিয়া লন।

(স্বাস্থ্য-সমাচার, চৈত্র ১৩৩১) শ্রী সুরেন্দ্রমোহন বসু

—

স্বদেশী ও বিদেশী রঙ

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের স্বাক্ষরিত যে-সকল সনন্দে রাজা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শর্ম্মণঃ নাম স্বাক্ষর বাংলা ভুষা ও শেহাই দ্বারা প্রস্তুত কালীতে লিপিবদ্ধ দেখিয়াছি, এখনও তাহার চাকচিক্যশীলতা, দৃঢ়তা ও দীর্ঘস্থায়িতা দেখিলে বোধ হয় যে, আরও সহস্র বৎসরেও উহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে না। বর্ত্তমান সময়ে কি কলিকাতা বা এদেশের স্থানান্তরে প্রস্তুত কিম্বা বিলাতী আমদানি যে-সকল কালী আমরা ব্যবহার করিতেছি ইহা বহুদিন শুষ্ক হইয়া গেলেও উহার উপর কোনরূপে বিন্দুমাত্রও জল পড়িলে তাহা তখনই গলিয়া কালী এমন ধ্যাব্ড়াইয়া যাইবে যে, উহা "বহুমূল্যের কালী হইলেও" নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ও ক্ষণমাত্র স্থায়ী বলিয়াই বুঝা যাইবে।

বহু বৎসর পূর্ব্বে অধ্যাপক ও মৌলবীগণ অলক্ত-রাগ-রঞ্জিত যে-সকল কবচ ও দোয়াতাবিজ ভোজপত্রে, তেড়েঠে বা তালপত্রে অথবা কাগজে লিখিয়া মাদুলী, পদক বা অন্যান্য অলঙ্কার বা তাবিচের মধ্যে পুরিয়া দিয়াছিলেন, তাহা কিম্বা অধ্যাপক ও মুন্সীদিগের হস্তলিখিত পুরাতন গ্রন্থাদি দেখিলে, উহা যে অচিরকালের লিখিত নহে, ইহা কখনই বুঝা যাইবে না।

পূর্ব্বে এদেশের কৃষি-উৎপন্ন বৃক্ষের কাষ্ঠ, ত্বক্, ফল, মূল, পুষ্প, বৃন্ত ও শিকড় প্রভৃতি রঞ্জন-শিল্পে ব্যবহার হইত। তাহার রঙ যেমন চিরস্থায়ী ছিল, রঞ্জিত বস্ত্র প্রভৃতির বহুস্থায়িত্ব-পক্ষেও তাহা সেইরূপ সহায়তা করিত।

আমরা নিম্নে কয়েকটি রঞ্জক উদ্ভিদের নাম প্রদান করিলাম। রঞ্জক-বিদ্যা-বিশারদ বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ যদি উহা কার্য্যোপযোগী করিয়া পুনরায় ব্যবহারে আনিতে পারেন, তাহা হইলে দেশের প্রভূত উপকার-সাধন ও কৃষি-কার্য্যের কিছু প্রসার ও বৃদ্ধি হইতে পারে।

বাবলার ছাল, গরান গাছের ছাল, বকম কাষ্ঠ, আছ ফুলের শিকড়, কুসুম ফুল, হরীতকী, বয়ড়া, আমলকী, নীল, লাক্ষা, শেফালিকা ফুলের বৃন্ত, হরিদ্রা, জাফ্‌রান, নটকান ফলের বীজ প্রভৃতি পদার্থে পূর্ব্বকালে বস্ত্রাদি রঞ্জন হইত।

বাবলার ছাল, হরীতকী, বয়ড়া ও আমলকী দ্বারা উত্তম, পাকা কালো আলপাকা অথবা ক্যালিকোর ন্যায় রঙ হয়। উহাতে চর্ম্ম, বস্ত্র উভয়ই রঞ্জিত হইতে পারে।

গরান কাষ্ঠের ছালে চর্ম্ম রঞ্জন হয়; ইহাতে বাদামী রঙ ভালো হয়।

বকম কাষ্ঠ ও আছ ফুলের শিকড়ে বস্ত্র লোহিত হয়, কুসুম ফুলে কুসুমী রঙ্ হয় এবং ইহা বস্ত্র-রঞ্জন-ব্যবহারেই উপযোগী।

নীলে নীল বস্ত্র প্রস্তুত হয়।

লাক্ষা দ্বারা অলক্তক-সদৃশ রঙ্ এবং বস্ত্রাদি রঞ্জিত হইতে পারে।

শেফালিকা পুষ্প-বৃন্তের হরিদ্রাভ রক্তবর্ণ রঙ্ বস্ত্র-রঞ্জনেই ব্যবহার্য্য।

হরিদ্রায় হরিদ্রা বর্ণ এবং জাফরানে তদপেক্ষা একটু ঘোর রক্তাভ হরিদ্রাবর্ণ রঙ দৃষ্ট হয়।

নটকান বীজে গেরী মাটির ন্যায় বর্ণ উৎপন্ন ও প্রতিফলিত হয়। ইহাও বস্ত্র-রঞ্জনের উপযোগী।

আমরা বাল্যকালে হরীতকী, বয়ড়া, আমলকী, টেরী ফল সহ কয়েক খণ্ড পুরাতন লৌহ জলে দুই-এক দিন ভিজাইয়া রাখিয়া শেষে অগ্নিতে পাক করিয়া যে-কালী প্রস্তুত করিয়া তদ্বারা কাগজের উপরে লিখিতাম, সে লিপি-কাগজ নষ্ট হইয়া গেলেও অক্ষর অস্পষ্ট হইত না। ঐ-কালীতে অল্পমাত্র হীরাকসের গুঁড়া মিশ্রিত করিলে আরও গাঢ় কৃষ্ণত্ব প্রাপ্ত হইত। কেবল মাত্র চারি পয়সা ব্যয়ে ৩ পাঁইট কালী প্রস্তুত হইত। অপিচ অধ্যাপক, ভট্টাচার্য্য ও মৌলবীগণ লাক্ষা-রসোৎপন্ন অলক্তক-রাগসহ দ্রব্যান্তর (যাহা আমার অজ্ঞাত) মিশ্রিত করিয়া যে লাল কালী প্রস্তুত করিতেন, তাহাও চিরস্থায়ী হইত।

এবার দেখাইব যে, বিদেশীয়েরা কি-কি উপায়ে কি-কি দ্রব্য দ্বারা পাকা পাড়, নানারঙের ছিট্, এবং কার্পাস পশম, রেশম প্রভৃতি রঞ্জিত করিয়া থাকেন।

চাঁপা ফুলের মতন পাকা রং্ করিতে হইলে সুগার্ অব্ লেড, হীরাকস, গরম জল ও গঁদ দর্কার হয়।

পাকা নীল রঙ্ করিতে হইলে মনছাল (মনঃশিলা—ভয়ানক বিষাক্ত) নীলা বাখারি চূণ ও গঁদ দরকার হইয়া থাকে।

কাপড়ের পাকা পাড়, পাকা ছিট করিতে হইলে সুগার অব্ লেড, এসেটিক্ এসিড, ফটকিরি প্রভৃতি দ্বারা লাল রঙ্ তৈয়ার করিতে হয়।

পাকা কালো রঙ্ তৈয়ার করিতে হইলে পাইরেনিগ্নেট অব্ লাইম বা আয়রন্ লিকর্ অথবা ব্লাক্ লিকর্ দর্কার। হীরাকসের জলে সুগার অব্ লেড্ একত্র করিলে এসিটেট্ অব্ লাইম্ বা সুগার অব লেড্ হীরাকসের সহিত মিশাইয়া ব্লাক লিকার্ বা আয়রন লিকর্ নামক কালো রঙ প্রস্তুত হয়।

আর লাল রং বিদেশীয়েরা এইরূপে তৈয়ার করে যথা,—সুগার অব্ লেড্ ৭॥ সের, সোডা ১ সের ও গরম জল ৫০ সের। প্রথম গরম জলে ফটকিরি দ্রব করিয়া উহাতে সোডা দিতে হয়, পরে উথলিয়া উঠিলে সুগার অব্ লেডের চূর্ণ দিতে হয়। পরে ভালোরূপ নাড়িয়া তাহাতে গঁদ দিলেই উহা ঘন হইবে ও উহা কাপড়ে ছাপ দিবার উপযুক্ত হইয়া থাকে।

ফিকা লাল রঙের জন্য ফটকিরি ৪ সের, সুগার অব্ লেড্ ৩ সের ও জল ৩ সের দর্কার হয়।

অত্যন্ত ফিকা লাল রঙ করার জন্য সুগার্ অব্ লেড্ ৭॥ সের, ফিটকিরি ১৮॥ সের। চা-খড়ি চূর্ণ ১। সের, নরম খড়ি ২॥ সের ও জল ৫০ সের আবশ্যক হয়।

পূর্ব্বে এদেশে খদির, জাঙ্গালে, টিকা প্রভৃতি দ্বারা রঙ তৈয়ার করা হইত। এক্ষণে বিদেশীয়েরা বাই ক্রোমেট্ অব্ পটাশ্ প্রভৃতি উগ্র ও বিষাক্ত দ্রব্য দ্বারা খদিরের পাকা রঙ্ করিয়া থাকে। বিদেশীয়েরা, কাপড় খদিরের জলে ভিজাইয়া ও পরে শুকাইয়া বাই ক্রোমেট্ অব্ পটাশের উষ্ণ জলে ভিজাইয়া পরে শুখাইয়া লইয়া থাকে।

কাপড়ের উপর তুঁতে বা জাঙ্গালের ছাপ দিয়া শুখাইলে পরে চূণ-গোলা দিতে হয়, পরে ঐ বর্ণ নীল হইলে কাপড়টিকে শিমুলক্ষারের (শঙ্খবিষ বা আর্সিনিয়েট্ অব্ পটাশ্) জলে ফুটাইলে হরিৎ রং হইবে।

সুগার্ অব্ লেড বা নাইট্রেট্ অব্ লেডের জলে কাপড় ভিজাইয়া পরে ঐ-কাপড় বাইক্রমেট্ অব্ পটাশের জলে ভিজাইয়া ঘোর হরিদ্রাবর্ণ করে। কিন্তু কমলা রংএর পাকা রং করিতে হইলে ঐ হরিদ্রাবর্ণ কাপড় চুণের জলে ফুটাইলে ক্রোমেট্ অব্ লেডের বর্ণ কমলা হইয়া থাকে। আজকাল বিদেশীয়েরা কমলা রঙের ধুতির সূতা ঐরূপে রঞ্জিত করিয়া থাকেন।

নীল রঙে রঞ্জিত বস্ত্র বা নীল ছিটকে অ্যাসিটেট্ অব্ লেডের জলে

মগ্ন করিয়া পরে বাইক্রোমেট্‌ অব্‌ পটাশের জলে মগ্ন করিলে ঐ স্থান পীতবর্ণ প্রাপ্ত হয়।

বিদেশীয়েরা সূতা, রেশম, পশম, প্রভৃতি প্রণীর রং দিয়া রঞ্জিত করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ হীরাকসের জলে কাপড় ডুবাইয়া পরে চূণের জলে ধৌত করিতে হয়। সির্কা বা অন্যান্য অম্ল মিশ্র দিয়া পরে ফেরোসায়েনাইড্‌ অব্‌ পটাশের (অতি বিষাক্ত পদার্থ) বা টার্টরিক্‌ এসিড্‌ প্রভৃতি পদার্থ দ্বারা এবং চূণ গোলার জলে ভিজাইয়া ঐ কাপড়খানিতে শঙ্খবিষ বা আর্সেনিয়েট্‌ অব্‌ সোডার জলে মগ্ন করিয়া ঘোর হরিদ্বর্ণ রঙ করিয়া থাকে।

বিদেশীয়েরা মনোমুগ্ধকর রং তৈয়ার করিবার জন্য বিষাক্ত দ্রব্য ব্যবহার করিয়া থাকে।

(কৃষক, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৩১) শ্রী রাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

নিরামিষাশী ও আমিষাশীর প্রণয়

ইয়ং সিটিজেন্‌ পত্রিকায় এম্‌ মিউজিয়াস্‌ হিগিন্‌স্‌ মহাশয় একটি সিংহলী উপকথার অনুবাদ করিয়াছেন। সেটি এই :—

ভারতের বাদহ দেশের রাজা বিদেহ একদিন তাঁহার প্রাসাদের বারাণ্ডায় পায়চারি করিতে-করিতে হাসিতেছিলেন। একবার তিনি খুব জোরে হাসিয়া উঠিলেন। রাজা ছিলেন গম্ভীর প্রকৃতির লোক। তাঁহাকে হাসিতে দেখিয়া রাণী উদম্বরা দেবী বিস্মিত হইলেন।

নীচের উঠানে রাজা এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতে পাইয়াছিলেন। উঠানের পাঁচিলের তলায় একটি কুকুর ও একটি ছাগল দাঁড়াইয়াছিল। কুকুরটির মুখে কিছু ঘাস ছিল, আর ছাগলটা মুখ হইতে খানিকটা মাংস মাটিতে নামাইয়া রাখিল। দু-জনেই দুজনের মুখের দিকে আনন্দের সহিত চাহিয়াছিল। কুকুরটা ছাগলের দেওয়া মাংস খাইতে লাগিল; ছাগলটা কুকুরের দেওয়া ঘাস খাইতে লাগিল। তাড়াতাড়ি খাওয়া সারিয়া লইয়া দু-জনে পাশাপাশি খানিকক্ষণ শুইয়া রহিল। তার পর উভয়ে উঠানের দুই দিক্‌ দিয়া চলিয়া গেল। মহারাজা কয়েকদিন ধরিয়া এই একই ব্যাপার ঘটিতে দেখিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, কি করিয়া দুইটি বিপরীত প্রকৃতির জন্তুর এত ভাব হইল; আবার কুকুর আনে ছাগলের জন্য ঘাস, আর ছাগল আনে কুকুরের জন্য মাংস—ইহাই বা কিরূপ?

এই দুইটি জন্তুর বন্ধুত্ব যেরূপে হইয়াছিল তাহা এই। রাজার হাতীশালা হইতে ছাগলটা রোজ ঘাস চুরি করিয়া খাইত। হাতীরক্ষক একদিন তাহা দেখিতে পাইয়া ছাগলটাকে এমন প্রহার দিল যে, সে মৃতপ্রায় হইয়া গেল। বেচারা ছাগল ধুঁকিতে-ধুঁকিতে উঠানের পাঁচিলের ধারে আসিয়া পড়িয়া রহিল। ঠিক সেই সময়ে একটা কুকুর ধুঁকিতে-ধুঁকিতে ঐরকম অবস্থায় সেখানে আসিয়া হাজির হইল।

ছাগল জিজ্ঞাসা করিল—"ভাই কুকুর, তোমার কি হয়েছে?"

কুকুর বলিল—"তোমার কি হয়েছে বলো।"

ছাগল তখন তাহার যাহা হইয়াছিল সমস্ত বলিল। কুকুর বলিল, "ভাই, আমারও দশা তোমারই মতন। আমি রান্নাশালা থেকে রোজ মাংস চুরি ক'রে খেতুম। আজ রাঁধুনিটা দেখতে পেয়ে আমাকে এমন মেরেছে যে, প্রায় প্রাণ বা'র ক'রে দিয়েছে।"

ছাগল জিজ্ঞাসা করিল—"তা হ'লে আর তোমার রান্নাশালায় যাওয়া হচ্ছে না?"

কুকুর দুঃখের সহিত বলিল—"না, ভাই, সে ভারি বাদি। সেখানে যদি আমায় আর-একবার দেখতে পায় তা হ'লে আর প্রাণ থাকবে না।"

ছাগলও বিষণ্ণভাবে বলিল—"আমারও সেই অবস্থা, ভাই। কি করব, ভাই, এখন আমরা? এস আমরা দুজনে বন্ধুত্ব করি; দুজনে দুজনকে সাহায্য করি।"

কুকুর ভাবিল, একটা ছাগল বন্ধু করিয়া আর লাভ কি? তবে এই বিপদে কেহ-না থাকার চেয়ে একজন থাকা ভালো। এই ভাবিয়া সে ছাগলকে বন্ধু করিল। দুইজনে শপথ করিয়া বন্ধু হইল।

ছাগল বলিল—"দেখ, বন্ধু, আমি যদি রান্নাশালায় যাই, রাঁধুনি আমায় সন্দেহ করবে না। আর আমি এক টুকরো ক'রে মাংস তোমার জন্যে নিয়ে আসব।"

কুকুর বলিল—"বন্ধু, তোমার বুদ্ধি চমৎকার। কিন্তু তুমি কি খাবে?"

ছাগল বলিল—"কেন? তুমি রোজ হাতীশালায় গিয়ে আমার জন্যে কিছু ক'রে ঘাস নিয়ে আসবে।"

কুকুর আনন্দে ঘেউ ঘেউ করিয়া বলিল—"বন্ধু, সাবাস তোমার ফন্দী। হাতীওয়ালা আমাকে সন্দেহ করবে না, কেননা আমি ত ঘাস খাইনে। সে একটু আড়ালে গেলেই আমি ঘাস নিয়ে আসব তোমার জন্যে।"

দুই বন্ধুতে এই ঠিক করিয়া সেইদিন হইতেই পরস্পরের জন্য মাংস ও ঘাস আনিতে লাগিল।

ইহাই রাজা দেখিতে পাইয়াছিলেন।

দীর্ঘ-জীবন লাভের উপায়

আমেরিকার বিখ্যাত হেন্‌রি ফোর্ড্‌ বলেন, মানুষ ১২৫ বৎসর অনায়াসে বাঁচিতে পারে, যদি তার শরীর সে কার্‌বন্‌ হইতে মুক্ত রাখিতে পারে,—যদি চা, ক'ক, তামাক বা মদ সে না খায়। খাদ্যদ্রব্য ভালো করিয়া চিবাইয়া খাইলে খুব শীঘ্রই তৃপ্তি পাওয়া যায়; তাহা হইলে খুব বেশী খাদ্যের প্রয়োজন হয় না। কেবলমাত্র ভালো খাদ্য মানুষের খাওয়া চাই। ফোর্ড্‌ বলেন, চা, কফি, তামাক, মদ প্রভৃতি ভবিষ্যতে মানুষ ত্যাগ করিবে।

এডিসনের প্রপিতামহ খুব সরলভাবে জীবন যাপন করিতেন। তিনি ১০২ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন। এডিসনের পিতাও খুব সরলভাবে থাকিতেন বলিয়া ১০৫ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন। ইঁহারা সাত ভাই ছিলেন। ইহারা প্রায় সকলেই ৮০ বৎসরের অধিক বাঁচিয়াছিলেন। তিন জন ১০০ বৎসরের কাছাকাছি বাঁচিয়াছিলেন। এডিসন অত্যন্ত সরল জীবন যাপন করেন।

উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিশারদ লুথার বার্‌ব্যাঙ্ক চা কফি প্রভৃতির অত্যন্ত বিরোধী।

এই তিন জন বড় লোকের জীবন-যাপন-পন্থা অনুসরণ করিলে দীর্ঘ জীবন লাভ করা কঠিন নয়।

ইংলণ্ডের টমাস্‌ পার্‌ ১৫২ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন। মৃত্যুর কিছু পূর্বে তাঁহাকে রাজচিকিৎসক পরীক্ষা করিয়া বলেন যে, আরো ২০ বৎসর তিনি বাঁচিতে পারেন, তখনও তাঁহার ধমনীসমূহ কোমল ও স্থিতিস্থাপক ছিল। তাঁহাকে রাজকার্যে নিয়োগ করা হয়। তিনি সরলভাবে জীবন যাপন করিতেন; মদ বা তামাক খাইতেন না; নিরামিষভোজী ছিলেন। কিন্তু রাজবাড়ীর আহারে তিনি আর এক বৎসরও বাঁচিলেন না।

(ওরিয়েন্টাল্‌ ওয়াচ্‌ম্যান এণ্ড্‌ হেরাল্ড্‌ অভ্‌ হেল্‌থ্‌)

আধুনিক জাপানী নারী

জাপানের সহরে স্কুলের মেয়েরা অধিকাংশ বিদেশী পরিচ্ছদ পরে। মফঃস্বলে কিন্তু মেয়েরা পোষাকে এতটা পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন নয়।

আঠারো বা উনিশ বছরে মেয়েরা গ্র্যাজুয়েট্ হয়। পূর্ব্বে এই বয়সে বিবাহ হইত। এখন বিবাহের বয়স বাইশ বা তেইশ। সহরের বাহিরে কিন্তু গ্র্যাজুয়েট্ হওয়ার পরই বিবাহ হয়।

বিবাহ অধিকাংশ স্থলে তৃতীয় ব্যক্তি দ্বারা স্থির হয়। উভয় পক্ষের পিতা-মাতা ছেলের বা মেয়ের কুল, বয়স, স্বভাব, শিক্ষা, রূপ প্রভৃতির অনুসন্ধান করেন। কন্যা ও পুত্রের বিবাহের ঠিক হইলে পিতা-মাতা ছেলেকে ও মেয়েকে তা জানান। ছেলে ও মেয়ে রাজী হইলে একটা নির্দ্ধারিত জায়গায় উভয়ের সাক্ষাৎ ঘটানো হয়। যদি উভয়ে উভয়ের প্রতি প্রীত হয়, তাহা হইলে বিবাহের ঠিক করা হয়।

ঘটকের দ্বারা বিবাহ হওয়ার যে-সব দোষ তাহা নিবারণ করিবার জন্য আজকাল বিবাহে বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করা হয়। এখন ছেলে-মেয়ের পরস্পরের দেখা হইবার পর পিতা-মাতার তত্ত্বাবধানে তাহাদিগকে প্রায় এক বৎসর পরস্পর মিলিতে-মিশিতে দেওয়া হয়। তার পর উভয়ের পছন্দ হইলে বিবাহ হয়। তবে ঘটকালির প্রথা একেবারে আপত্তিকর নয়, যদি ঘটক বেশ ভদ্র হয়।

জাপানে মধ্যবিত্ত গৃহে ওরূপ র্ণ প্রথা নয়। তবে অনেক পুরুষ ও নারী পারিবারিক বন্ধন না মানিয়া স্বাধীনভাবে নিজেরা মনোনয়ন করিয়া বিবাহ করে।

মধ্যবিত্ত ঘরের পুরুষ মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েকেই বিবাহ করে। জাপানী নারীরা পাতিব্রত্যে অতুলনীয়া। বড়-বড় সহরে নূতন দম্পতীরা আলাদা বাড়ী করিয়া থাকে। কিন্তু সহরের বাহিরে এ প্রথা নাই; সেখানে বিবাহিত নারীকে স্বামীর যেমন পরিচর্য্যা করিতে হয়, স্বামীর পিতা-মাতারও সেইরূপ করিতে হয়।

এরূপ স্ত্রীলোকদের বিবাহের পরই ঘরসংসারের ভার লইতে হয়। বাড়ীতে একটা ঝি থাকে, তাহারি সাহায্যে রান্না-বান্না করিতে হয়। সেলাইয়ের কাজও তাহারা করে এবং বাড়ীর লোকের কাপড়-চোপড় কাচিতে হয়। ঘর-সংসারের এইসব কাজে তাহারা এত ব্যস্ত থাকে যে, বিশ্রামের সময় তাহারা পায় না বলিলেই হয়।

উঁচু ঘরের মেয়েরা খানিকটা অবসর পায়, ঝি-চাকরদের দিয়া তাহারা কাজ করায়। নিম্নশ্রেণীর মেয়েদের সংসারে এত খাটিতে হয় না। সুতরাং মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের কষ্ট বেশী। জার্ম্মানীর মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদেরও এই অবস্থা।

জাপানে আজকালকার শিক্ষিত পুরুষ ও মেয়েরা, সংসারের জন্য মেয়েদের এত খাটা পছন্দ করেন না। এরূপ ঘরের মেয়েরা সামাজিক আলোচনা লইয়া থাকে; তবে ইহাদের সংখ্যা খুব কম।

(জাপান ম্যাগাজিন্)

পর্দ্দা-প্রথার উৎপত্তি

নিউ ওরিয়েন্ট পত্রিকায় অধ্যাপক মহম্মদ হাবিব মহাশয় এই সম্বন্ধে একটি সুন্দর চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আমরা তাহার সার সঙ্কলন করিলাম।—

ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে কতকগুলি সামাজিক ত্রুটি নিবারণ করিবার জন্য পর্দ্দা প্রথা আরম্ভ হয়। এখন ইহা সাধারণ মুসলমানদের ঘরে ধর্ম্মান্তর্গত একটা ব্যাপার বলিয়া স্বীকৃত।

আমি ধরিয়া লইতেছি যে, পর্দ্দা-প্রথা মূলত মুসলমানদের দ্বারা প্রবর্ত্তিত এবং ইহার দোষ বা গুণের জন্য মুসলমানরাই দায়ী। মধ্য যুগের মুসলমানরা অ মুসলমান মেয়েদের হরণ করিয়া লইয়া পলাইত, সুতরাং পর্দ্দার সৃষ্টি হইয়াছে—এই ধারণা আমি মানিব না। হিন্দু সমাজ মুসলমানের হাত হইতে তাহার নারীদের রক্ষা করিতে যদি পর্দ্দার আশ্রয় লইয়া থাকে, তাহা হইলে ভারত হইতে বহু দূরে উত্তর আফগানিস্তান, মধ্য এশিয়া প্রভৃতি স্থানে অধিকাংশ মুসলমানের মধ্যে কড়া পর্দ্দা থাকিবার যে কি কারণ তাহা বলা যায় না। আমাদিগের নিকট হইতে তাহারা এই প্রথা গ্রহণ করে নাই। তাহারা স্বেচ্ছায় ইহার প্রবর্ত্তন করে ও আমাদিগকে ইহা পাঠাইয়া দেয়। ভারতের সমস্ত মুসলমান এবং যে-সব হিন্দু অস্ত্রের প্রভাবে নয় সামাজিকভাবে মুসলমানদের দ্বারা প্রভাবান্বিত তাহারাও এই প্রথা মানে। মুসলমানেরা মান্দ্রাজ ও গুজরাট অধিকার করে; কিন্তু মান্দ্রাজ ও গুজরাট এপ্রথা গ্রহণ করে নাই। তাহার কারণ এ-দুই জায়গায় অধিক উন্নতিশীল মুসলমান বাস করে নাই। এপ্রথার উৎপত্তি হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্বের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়; যদিও মুসলমান প্রতিবাসীর প্রভাবে হিন্দুরা ইহা গ্রহণ করিয়াছে। কেবল বিদেশী নয় ধর্ম্মবিরুদ্ধ অনেক আচার-নিয়ম মুসলমানেরা যেমন হিন্দুদের নিকট হইতে লইয়াছে, হিন্দুরাও তেমনি মুসলমানদের এই নব আবিষ্কৃত প্রথা শিক্ষা করিয়াছে।

মুসলমান জগতের দিকে মোটামুটিভাবে তাকাইয়া দেখিলে একটি জিনিষ দেখিতে পাইব। পর্দ্দা কতকগুলি মুসলমান দেশে আছে; সবগুলিতে নাই। উত্তর আফ্রিকার আরবদিগের মধ্যে ইহা নাই এবং আফ্রিকার অন্তর্ভাগের নিগ্রোদের মধ্যেও ইহা নাই। আরবের অধিবাসীদিগের মধ্যে এ প্রথা নাই এবং পশ্চিম তুরস্কে ইহার শিথিল প্রচলন আছে। অপর পক্ষে কিন্তু (আধুনিক পরিবর্ত্তন না ধরিয়া) পারস্য, মধ্য এশিয়া ও আফগানিস্তান এই প্রথা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করার জন্য প্রসিদ্ধ। ইহার কারণ কি? কারণ এই মনে হয় যে, মুসলমান জগতের পূর্ব্বভাগ, যে-ভাগ পরবর্ত্তী মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী কর্ত্তৃক অধ্যুষিত, ধর্ম্মের দিক্ হইতে এই পর্দ্দা-প্রথার কোনো সম্মতি পায় নাই; এ প্রথা সাম্প্রদায়িক একটা কৃত্রিম অনুষ্ঠান।

অধ্যাপক হাবিব আরো বলিয়াছেন যে, চেঙ্গিস খাঁর আক্রমণের ফলে তাঁহার আক্রান্ত দেশসমূহে পর্দ্দার প্রচলন হয়। চেঙ্গিস খাঁ ও তাঁহার মঙ্গোল সেনাদল মুসলমান ছিলেন না। ঐসব স্থানে মেয়েরা কি ভীষণ নির্য্যাতন লাভ করে, লেখক তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন। এই মঙ্গোল আক্রমণের ফলে মুসলমান সমাজে মেয়েদের সম্মান রক্ষার জন্য পর্দ্দার সৃষ্টি হয়। লেখকের মতে এই পর্দ্দা ও বাল্যবিবাহ আমাদের জাতীয় দুর্ভাগ্যের মূলগত কারণ।

বাংলা

খাদ্য—

সাধারণতঃ বর্ষাকালেই খাদ্যদ্রব্যের দুর্মূল্যতা বাড়ে। কিন্তু এই বৎসর পৌষ মাস হইতেই চাউলের দর উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া এখন ৮৲, ৮।৹ মণ হইয়াছে। বাংলার নানা জেলা হইতেই হাহাকার-রব উঠিয়াছে। ইহার ফলে দেশে চুরি-ডাকাতির সংখ্যাধিক্য হইয়াছে। সহযোগী চারুমিহির সংবাদ দিতেছেন :—

কয়েকমাস যাবৎ এই জেলায় চুরি-ডাকাতি ও অন্যান্য অপরাধের সংখ্যা অসম্ভব বৃদ্ধি হইয়াছে। নানাস্থানে এই অপরাধের বৃদ্ধি গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। অনেকে শাস্তি প্রাপ্ত হইয়া জেলে গিয়াছিল। সম্প্রতি তাহারা জেল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া এইসকল স্থান গুলজার করিয়া তুলিয়াছে। লোকে টাকা কড়ি এমন-কি সামান্য ঘটী বাটী লইয়াও নিরাপদে বাস করিতে পারিতেছে না। ভরসা করি, কর্ত্তৃপক্ষ এই অবস্থার প্রতি সত্বর মনোযোগ প্রদান করিবেন।

স্বাস্থ্য

বঙ্গীয় য়্যান্টি-ম্যালেরিয়্যাল্ সোসাইটি—

সেন্ট্রাল্ কো-অপারেটিভ য়্যান্টি-ম্যালেরিয়াল সোসাইটির ৫ম বার্ষিক কার্য্যবিবরণী বাহির হইয়াছে। সোসাইটি বাংলার ভিন্ন-ভিন্ন স্থানে কিরূপভাবে ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বর নিবারণের চেষ্টা করিয়াছেন ঐ বিবরণীতে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। সোসাইটির কার্য্যের কিরূপ প্রসার হইতেছে তাহা নিম্নলিখিত হিসাব হইতেই বোধগম্য হইবে।

বৎসর	সোসাইটির সংখ্যা
১৯১৬—১৭	৩
১৯১৮	৮
১৯২০	২৬
১৯২২	৩২
১৯২৩	৮২
১৯২৪	৩৬০
১৯২৫	৪৩৩

সোসাইটি দুইটি উপায়ে কার্য্য চালাইয়া থাকেন। প্রথম উপায় হইতেছে যখনই কোনোস্থানে কালাজ্বর ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাব হয় তখন কর্ম্মীদল সেখানে যাইয়া রোগের প্রতিকার ও প্রসার হ্রাসের ব্যবস্থা করেন ও গ্রামবাসীদিগকে এইসকল রোগের সহিত কিরূপভাবে সংগ্রাম করিতে হয় শিক্ষা দেন। দ্বিতীয়তঃ সোসাইটি প্রচারকার্য্য দ্বারা তাহাদের উদ্দেশ্য সাধন করেন। এইজন্য সোসাইটির একখানা মাসিক পত্রিকা আছে। আলোচ্য বর্ষে সোসাইটি বাংলা সরকারের তহবিল হইতে ২৫ হাজার টাকা ও তিনশত টাকার কুইনাইন পাইয়াছেন।

বিশ্ব-ভারতী ব্রতী বালকদল-সম্মিলনী—

এইপ্রসঙ্গে আর এক দল কর্ম্মীর কথা আমাদের মনে পড়ে। ইঁহারা বিশ্বভারতীর পল্লী-সেবা বিভাগের ব্রতী বালক দল (Boy Scout). বিগত ১২ই এপ্রিল এই দলের একটি সম্মিলনী হইয়াছিল। বীরভূম জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে প্রায় ২৫০ জন ব্রতী বালক এই সভায় যোগদান করেন। ইঁহারা বিশ্বভারতীর কর্ম্মীগণের নির্দ্দেশানুযায়ী শিক্ষা লাভ করিয়া নানাভাবে নিজ-নিজ পল্লীর উন্নতি সাধনের নিমিত্ত সেবা-ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। এই সভায় বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা রবীন্দ্রনাথ বলেন যে, কত ধনী কত বিদ্বান্ এই শান্তিনিকেতনে আসেন, কিন্তু আজ তাঁর সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দ হইয়াছে এইজন্য যে, বীরভূমের সুদূর প্রান্তর হইতে যে-সকল পল্লীবালকেরা এখানে মিলিত হইয়াছে তাহারা ধনী বা বিদ্বান্ নয়, কিন্তু তাহারা সেবক। দেশের দুঃখ দূর করিবার জন্য তাহারা প্রস্তুত। তাহাদিগকে নিজেদের দেশ জয় করিতে হইবে। দেশ জয়ের অর্থ, দেশের মধ্যে যাহারা দুঃখ-বিপদে নিমজ্জিত, যাহারা নিপীড়িত, নিষ্পেষিত—তাহাদের হৃদয় জয় করা। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়, যে যাহারা নীচে পড়িয়া রহিয়াছে তাহাদের দুঃখ দূর করিবার জন্য বেশী লোক নাই। যেসকল কর্ম্মী আজ এখানে উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহারা পল্লীর দারিদ্র্য-দুঃখ নিপীড়িত জনসাধারণের প্রাণ সঞ্চার করিতে সমর্থ হইতেছেন দেখিয়া তিনি আনন্দিত।

আজ তাঁহারা জয়চিহ্ন-স্বরূপ যে পতাকা বা ঝাণ্ডা প্রাপ্ত হইয়াছেন, আশ্রমের মেয়েরা তাহাকে চারুশিল্পের দ্বারা সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়া তাহাদিগের হস্তে তুলিয়া দিয়াছে। তাহারা যেন ইহা স্মরণ রাখিয়া এই দেশের নারীর মর্য্যাদা রক্ষার উপযুক্ত হয়। এই ধ্বজা যেন তাহাদিগকে সেবার পথে লইয়া যায়। সেবার মধ্য দিয়া তাহারা যেন দেশের হৃদয় জয় করিতে পারে।

বড়োদা-রাজ্যে সমাজ-সেবা বাধ্যতা-মূলক করা হইয়াছে এবং যে ব্যক্তি উহাতে অবহেলা করিবে তাহাকে আইন-অনুসারে দণ্ডনীয় হইতে হইবে, এইরূপ বিধি প্রণয়ন করা হইয়াছে। কিন্তু বিশ্বভারতীর ব্রতী বালকগণ স্বইচ্ছায় যে পল্লী সংগঠন ও পল্লী সেবার ভার লইয়াছে।

বঙ্গীয় দাতব্য-চিকিৎসালয়সমূহ—

দাতব্য চিকিৎসালয়-সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে-নিয়ম প্রচলিত ছিল সম্প্রতি বাংলা গবর্ণমেন্ট, তাহার পরিবর্ত্তে এক নূতন আইন জারি করিয়া জানাইয়াছেন যে যাহারা ঔষধাদি গ্রহণ করিতে দাতব্য চিকিৎসালয়ে যাইবে তাহারা সাধারণতঃ বিনামূল্যেই ঔষধাদি পাইবে। কিন্তু অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদের ঔষধের জন্য মূল্য দেওয়া কর্ত্তব্য। অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ বিনামূল্যে ঔষধ লইয়া দাতব্য চিকিৎসালয়ের সুবিধার অপব্যবহার করিলে ডাক্তার তাহা ম্যানেজিং কমিটির গোচরীভূত করিবেন। যদি কোনো জেলাবোর্ড বা মিউনিসিপালিটি দাতব্য চিকিৎসালয়ের যাহারা ঔষধ লইবে তাহাদের নিকট হইতে মূল্য গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে ঐসমস্ত জেলাবোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটি নিজেরাই

মূল্যের হার নির্দ্দিষ্ট করিতে পারিবেন। তবে দরিদ্র ও অসমর্থ রোগীদের নিকট হইতে পয়সা আদায় করিতে পারিবেন না।

চিকিৎসালয়ে দান—

বরিশাল জেলার চন্দ্রহার গ্রাম-নিবাসী-ডাক্তার বাবু সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় তাঁহার পিতা কালীপ্রসন্ন দাশ মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষা-কল্পে একটি ওয়ার্ডের জন্য ৫০০০৲ হাজার টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

বাংলায় নারী নির্য্যাতন—

বাংলায় নারী-নির্য্যাতন বাড়িয়াই চলিয়াছে। নির্য্যাতনকারী দুর্ব্বৃত্ত-দল কিরূপ বে-পরোয়াভাবে তাহাদের অত্যাচার চালাইয়াছে তাহা নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তটি হইতেই বুঝা যাইবে। এই সংবাদটি পড়িলে মনে হয় দেশ সম্পূর্ণভাবে অরাজক হইয়াছে—

রংপুর জেলার তিস্তার দরবারু মাঝি তাহার স্ত্রী স্বর্ণদাসী ও একটি নাবালিকা কন্যাসহ দুইটি ভাঙা কুঁড়ে-ঘরে বাস করিত। দুর্ব্বৃত্তগণ স্বর্ণদাসীর উপর অত্যাচার করিবে এই আশঙ্কায় গ্রামস্থ হিন্দু-মুসলমান প্রতিবেশীগণ দরবারু মাঝিকে তাহার স্ত্রী স্বর্ণদাসীকে উপযুক্ত আশ্রয় স্থানে রাখিবার পরামর্শ দেয়। তদনুসারে সে তাহার স্ত্রীকে কাউনিয়ার খেতা মাঝির বাড়ীতে রাখিয়া আসে। দুর্ব্বৃত্তগণ ১৫।২০ জন রাত্রিতে গিয়া উক্ত খেতা মাঝির বাড়ী চড়াও করে। গৃহস্বামী ও অন্যান্যকে আহত করিয়া স্বর্ণদাসীকে স্কন্ধে করিয়া তিস্তানদীর প্রায় অর্দ্ধ মাইল রেলওয়ে পার হইয়া ৩৪ দিন বিভিন্ন স্থানে রাখিয়া তাহার উপর অকথ্য অত্যাচার করে। কাউনিয়ার সরকারী দারোগা অতিকষ্টে স্বর্ণদাসীকে অর্দ্ধমৃতাবস্থায় তিস্তার শুটকি বন্দর হইতে উদ্ধার করেন। রংপুরে ডাক্তারী পরীক্ষার্থ পাঠাইয়া তাহাকে পরীক্ষা করা হইয়াছিল। ইহার, কয়েকদিন পর আশ্রয়দাতা খেতা মাঝির বাড়ীর দরজা বাঁধিয়া দুর্ব্বৃত্তগণ পোড়াইয়া দিয়াছে। স্বর্ণদাসী ও খেতা মাঝি বর্ত্তমানে গৃহহারা ও পথের ভিখারী। দুর্ব্বৃত্তগণ আরও বলিতেছে যে, স্বর্ণদাসী ও তাহার আশ্রয়-দাতা খেতা মাঝিকে যে-কেহ, যে-কোনোপ্রকারে সাহায্য করিবে তাহারও গৃহদাহ ও সর্ব্বনাশ করিবে। কয়েকজন আসামী-গণের নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছে। নির্য্যাতিতা স্বর্ণদাসী ৮।১০ জনের নাম করিয়াছে। দুর্ব্বৃত্তগণের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয়ই আছে।

স্বাঃ—শ্রী •ভূনারায়ণ দেবশর্ম্মা, সম্পাদক কুড়িগ্রাম, ক্ষত্রিয় শাখা-সমিতি ও নারীরক্ষাসমিতি।

যশোহর, ২৪ পরগণা, বরিশাল, মৈমনসিংহ প্রভৃতি নানা জেলা হইতেও এইরূপ অমানুষিক অত্যাচারের কথা দৈনিক সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতেও নারীনির্য্যাতনের ভয়াবহ কাহিনী পাঠ করিলে রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠে। দুর্ব্বৃত্তেরা, কোনো-কোনোস্থলে গ্রামের জমিদারেরাও ইহাদের সহায়ক, নারীহরণ করিয়া গৃহস্থের বাড়ী-বাড়ী ঘুরাইয়া, এক বাড়ী হইতে গ্রামান্তরে অপর বাড়ীতে ফিরিয়া নির্ভীক ও নির্লজ্জভাবে সমাজের বুকের উপর ব্যভিচার করিতেছে!

পরলোকগত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কন্যাগণ—

বাঙালীর পক্ষে অপরিসীম লজ্জার কথা যে, দানবীর দেশগতপ্রাণ ৺পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দুইটি কন্যা আজ উদরান্নের জন্য দেশবাসীর নিকট সাহায্যপ্রার্থিনী। ডাক্তার শ্রীযুক্তা বিধুমুখী বসু নানা সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত করুণ কাহিনীটি প্রকাশ করিয়াছেন :—

বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাতা বিদ্যাসাগর-মহাশয়ের মধ্যমা কন্যা আমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি ও তাঁহার তৃতীয়া ভগ্নী উভয়েই অত্যন্ত কষ্টে কালাতিপাত করিতেছেন। তিনি তাঁহার কয়েকটি বন্ধুর দান মাত্র ১৫৲ টাকায় নিজের, কন্যার ও দুইটি দৌহিত্রের ভরণপোষণ করিয়া থাকেন। তিনি বর্ত্তমানে কাশীতে বাস করিতেছেন, কারণ সেখানে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় অপেক্ষাকৃত অল্প। দ্বিতীয়ত তিনি সেখানে শারীরিক পরিশ্রম করিয়াও কিঞ্চিৎ আয় করিয়া থাকেন।

বিদ্যাসাগর-মহাশয়ের তৃতীয়া কন্যার অবস্থা ততোধিক শোচনীয়, সংসারে তাঁহার একটি পঙ্গু পুত্র ভিন্ন আপনার বলিতে আর কেহ নাই। তিনি বর্ত্তমানে তাঁহাদের পুরাতন মালীর গৃহে একটি বারান্দায় বাস করিতেছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে যখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা জনসাধারণের নিকট ভিক্ষা করিতে অগ্রসর হন, তখন কয়েকজন আত্মীয় তাঁহাকে সাহায্য দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া এই লজ্জাজনক সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত করেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহারা কেহই কিছু সাহায্য করেন নাই। এই কারণেই বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাতা ও তেজস্বী ব্যক্তির কন্যা হইয়াও তাঁহাকে এই সাহায্য ভিক্ষা করিতে হইতেছে। এখনও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অন্নে পরিপুষ্ট ব্যক্তির বংশধর বাঙ্গলাদেশে অনেকেই আছেন।

তাঁহার অন্নে পরিপুষ্ট না হইলেও বঙ্গদেশে এমন লোক খুবই বিরল যিনি বিদ্যাসাগর-মহাশয়ের নিকটে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ঋণী নন; অতএব আশা করা যায়, প্রত্যেকেই সেই মহাপুরুষের স্মৃতি মনে রাখিয়া তাঁহার সন্তানগণকে এই দুরবস্থা হইতে উদ্ধার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইবেন। যাঁহারা উপরোক্ত মহদুদ্দেশ্যে কিছু সাহায্য করিতে চান, তাঁহারা শ্রীমতী বিধুমুখী বসুকে ৯৩।১ হরিঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, জানাইলে তিনি বাধিতা হইবেন।

তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যাসাগর-কলেজের (ভূতপূর্ব্ব মেট্রোপলিটন কলেজ) ছাত্রসংখ্যা ন্যূনাধিক এক সহস্র। ইহাদেরও এই কলঙ্ক মোচন করিবার চেষ্টা করা উচিত। আমরা আশা করি শ্রীযুক্তা বসুর এই আবেদন নিষ্ফল হইবে না।

শিক্ষা—

অবৈতনিক হাইস্কুল। কলিকাতা জোড়া-সাঁকোর সুপ্রসিদ্ধ সেন-বংশের কন্যা কাশীপুর ফুলবাগানের ৺গোপেশ্বর মল্লিক মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী শরৎকুমারী স্বামীর স্মৃতি রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে ইতিপূর্ব্বে কাশীপুরে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছেন। এক্ষণে স্বামীর সুন্দর বাসভবন ও ফুলবাগান নামে উদ্যানে একটি অবৈতনিক উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কাশীপুর, চিৎপুর, পাইকপাড়া, দমদমা, সিঁথি, পাজপাড়া প্রভৃতি স্থানের অধিবাসীগণের বিদ্যাশিক্ষার কোনো উপায় ছিল না। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এইসকল অঞ্চলের অধিবাসীগণের এক মহদুপকার সাধিত হইল।

কলিকাতার ইম্পিরিয়াল্ লাইব্রেরী—

ভারত সরকারের শিক্ষাসচিব স্যার এম্, হবিবুল্লা জনৈক সাংবাদিকের নিকট বলিয়াছেন যে, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী কলিকাতা হইতে তুলিয়া লইয়া যাইবার প্রস্তাব এখনও সরকারের বিবেচনাধীন। তিনি বলিয়াছেন যে, ঐ পাঠাগার কলিকাতায় থাকিলে তাহা প্রধানতঃ বঙ্গদেশের লোকেদেরই কাজে লাগিবে। সুতরাং ভারত সরকার এই পাঠাগারের ব্যয়ভার বহন করিতে নারাজ। যদি লাইব্রেরী কলিকাতায় থাকে, তবে বাংলা সরকারকে উহার ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে—নতুবা উহা দিল্লীতে স্থানান্তরিত হইবে। সরকারী পুরাতন দলিল-দস্তাবেজ ইত্যাদি দিল্লীতে লওয়াই স্থির হইয়া গিয়াছে।

বঙ্গে বিধবা-বিবাহ—

মেদিনীপুর বিধবা-বিবাহ-সহায়ক সভার কাজ ভালোরূপেই চলিতেছে। সম্প্রতি উক্ত সভার প্রচেষ্টায় তিনটি (দুটি সদ্‌গোপ ও একটি মাহিষ্য) বিধবা বিবাহ হইয়াছে। সদ্‌গোপ বালিকা-দুটির যথাক্রমে ৮ বৎসর ও ৫ বৎসর বয়ঃক্রম-কালে বিবাহ হয়। ৮ বৎসরের বালিকাটি বিবাহের ছয় মাস পরেই বিধবা হয়। ৫ বৎসরের বালিকা ৮ বৎসর বয়সে বিধবা হয়। হিন্দুজাতিকে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিতে হইলে বিধবা-বিবাহে প্রসার হওয়া দরকার। কিন্তু অনেক স্থল হইতে এই উদ্যোগে বাধা দেওয়া হইতেছে। সহযোগী টাঙ্গাইল-হিতৈষী লিখিতেছেন :—

সহযোগী কাশীপুর নিবাসী লিখিয়াছেন মহারাণী সুনীতি দেবী রচিত একখানি স্কুলপাঠ্য পুস্তকে "বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহ দিতে প্রস্তুত ছিলেন." এই কথাকয়েকটি থাকায় তিনি বরিশাল ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের তালিকা হইতে ঐ-পুস্তক তুলিয়া দেওয়ার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। বিধবা বিবাহ দেওয়া হিন্দু-সম্প্রদায়ের কতকের মতবিরুদ্ধ হইলেও হিন্দু-শাস্ত্র-বিরুদ্ধ নয়, একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন নাই। এবং আজকাল হিন্দুজাতি যেরূপ দিন দিন ক্ষয়ের দিকে যাইতেছে, তাহাতে চিন্তাশীল মনীষিগণ বিধবা-বিবাহের প্রয়োজনীয়তাই উপলব্ধি করিতেছেন। অনেক স্কুলপাঠ্য পুস্তকেই নানা ধর্মের নানা সম্প্রদায়ের গুণ কীর্তন করিয়া প্রবন্ধাদি লেখা হইয়া থাকে। তাহা পাঠ করিয়া যদি বালক-বালিকারা ধর্ম্ম ও মত পরিবর্তন করে, তবে তাহাদিগকে স্কুলে না পড়াইয়া নিজ-নিজ বাড়ীতে শুধু ধর্মগ্রন্থ পড়ানোই উচিত। এইসমস্ত বিবেচনা করিয়া কোনো পাঠ্য নির্ব্বাচক সহযোগী কাশীপুর-নিবাসীর হিতোপদেশ গ্রহণ করিবেন বলিয়া বোধ হয় না।

বঙ্গে তুলার চাষ-

সমগ্র বঙ্গে এই বৎসর ৭৫,৫৭৫ একর জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে। গত বৎসর ৬৯,৬০১ একর জমিতে তুলার চাষ হইয়াছিল। ইহা হইতে ২৩,৫০৬ গাঁট তুলা পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। গত বৎসর ২১১২৮ গাঁট তুলা হইয়াছিল।

বাঙ্গালায় মহাত্মা গান্ধী—

মহাত্মা গান্ধী বাংলা ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন। তাঁহার এই ভ্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে বাংলায় খদ্দরের ও চরখার কিরূপ প্রসার হইয়াছে, তাহা দেখা ও সকল মতের সকল শ্রেণীর লোকের সহিত সরলভাবে কথাবার্তা বলিয়া সকলের অভাব অভিযোগ শ্রবণ করা। তিনি তাঁহার অভ্যর্থনা-সম্পর্কে নিম্নলিখিত অনুরোধ করিয়াছেন :—

আমাকে সম্মানিত করিবার কোনো প্রয়োজন নাই। যদি সত্যই আপনারা আমাকে সন্তুষ্ট করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমার অনুরোধমত কাজ করুন।

আমি সকল পুরুষ ও মহিলাকে সাধ্যমত খদ্দর ক্রয় করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

কয়েকটি পয়সার মূল্য আপনার নিকট তুচ্ছ হইলেও দরিদ্রগ্রামবাসীর নিকট তাহা তুচ্ছ নহে।

বাংলায় কংগ্রেস সদস্য—

সম্প্রতি বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদক বাংলার কংগ্রেস সদস্য-সংগ্রহ-কার্য্যের একটি বিবরণ দিয়াছেন। বিবরণে প্রকাশ যে হাতে কাটা-সূতার চাঁদাদানকারীর সংখ্যা-হিসাবে ধরিলে বাংলা ভারত-বর্ষের অন্যান্য পাঁচটি প্রদেশের নিম্নস্থান অধিকার করিয়াছে। কিন্তু বাংলায় কংগ্রেস-সদস্যের সংখ্যা অন্যান্য প্রদেশ হইতে অধিক। সম্পাদক-মহাশয় বলিয়াছেন, বাংলায় পল্লীতে তুলার অভাবেই কার্য্যের প্রসার হইতেছে না। তুলা সরবরাহের বন্দোবস্ত করা হইতেছে কি না, সে-সম্বন্ধে কোনো কথা জানা যায় নাই।

মৃজাকালু স্মৃতি—

দুই বৎসর পূর্ব্বে লবণপ্রস্তুত-সম্পর্কিত-ব্যাপারে বরিশাল-জেলার মৃজাকালুর হাটে তিনজন মুসলমান বন্দুকের গুলিতে প্রাণত্যাগ করে। সেইসময় অনেকেই লবণ-আইন অমান্য করিবার কথা তুলিয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমে এ-সম্পর্কীয় আন্দোলন বন্ধ হইয়া যায়। তথাপি গত বৎসরের ন্যায় এবারেও ১লা বৈশাখ তারিখে বরিশাল ও বাংলার অন্যান্য কয়েকটি স্থানে মৃজাকালু স্মৃতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এইদিনে ঐসকল স্থানে মৃজাকালুর সেই মর্ম্মান্তিক কাহিনী বিবৃত করা হয় এবং ব্রত উদ্‌যাপন-কারীগণ এই ভ্রাতৃহত্যার বেদনা স্মরণার্থে এই তারিখে ট্যাক্সের বিনিময়ে প্রাপ্ত লবণ ব্যবহার করেন নাই।

সভা-সমিতি—

গত মাসে বাংলায় অনেকগুলি সভা-সমিতির অধিবেশন হইয়াছে। মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য-কয়টি এই :—

১। নিখিল-ভারত হিন্দু মহাসভা। পঞ্জাবের জননায়ক লালা লাজপত রায় এই সভার সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। সভায় হিন্দুসংগঠনপ্রচেষ্টা, অনুন্নত জাতিদের উদ্ধার প্রভৃতি বিষয়ে অনেক-গুলি প্রস্তাব আলোচিত ও গৃহীত হইয়াছে। হিন্দু সংগঠনের জন্য অনেক টাকা চাঁদাও উঠিয়াছে।

২। বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সভা। ফরিদপুরে এই সভার অধিবেশন হয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ইহার সভাপতিত্ব করেন।

৩। বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সভা। ফরিদপুরে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অধিনায়কত্বে এই সভার অধিবেশন হয়।

৪। বঙ্গীয় প্রাদেশিক যুবক সম্মিলনী। সভাপতি শ্রী যতীন্দ্রমোহন রায়। ইহা ভিন্ন ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলন, আঞ্জুমান ইস্‌লামিয়া সভা, বঙ্গীয় অস্পৃশ্যদের সভা প্রভৃতি কয়েকটি সভারও অধিবেশন হইয়াছে।

তারকেশ্বরের অবস্থা—

তারকেশ্বর সমস্যা সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য ভারতীয় সংবাদ-পত্র-সেবি-সঙ্ঘের প্রতিনিধিগণ তারকেশ্বর গমন করিয়া এবং তারকেশ্বর-সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া যে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন, তাহাতে লিখিয়াছেন যে, তারকেশ্বরের অবস্থা বর্ত্তমানে সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। উহার শীঘ্রই একটা বন্দোবস্ত হওয়া উচিত। তাঁহারা সত্যাগ্রহ-কমিটির কার্য্য-সম্বন্ধে লিখিতেছেন, যে, সত্যাগ্রহ-কমিটি যাত্রিগণের নিকট হইতে পূর্ব্বে যে অতিরিক্ত পয়সা আদায় হইত, তাহা বন্ধ করিয়া ভালোই করিয়াছেন। পূর্ব্বে মন্দিরে ঢুকিবার দ্বারে পয়সা লওয়া হইত, বর্ত্তমানে উহা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। মন্দিরের আয় কমিয়া গিয়াছে। মন্দিরের দেব-সেবার ভার বর্ত্তমানে সত্যাগ্রহ কমিটির উপর ভোগের বরাদ্দ অর্থাভাবে অনেক কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সত্যাগ্রহ কমিটি ও মহাবীরদলের স্বেচ্ছাসেবকগণের ব্যয় মন্দিরের আয় হইতে নির্ব্বাহ করা হয়। সত্যাগ্রহ কমিটির হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ আরও উন্নততর হওয়াই তদন্ত কমিটির অভিপ্রায়, কমিটি সমস্ত অনুসন্ধান করিয়া নিম্নোক্ত ব্যবস্থা অনুমোদন করিয়াছেন।

(১) তারকেশ্বর সমস্যা-সম্বন্ধে আর মামলা-মোকদ্দমা চলা মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে। যাত্রিগণ এবং হিন্দু সমাজের সুবিধার জন্য এইসম্বন্ধে শীঘ্রই একটা মিটমাট হইয়া যাওয়া উচিত। (২) হিন্দুগণের প্রতিনিধি লইয়া তারকেশ্বর-সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয়ের পরিচালনার জন্য একটি কমিটি-

গঠিত হওয়া উচিত। মোহান্ত উক্ত কমিটির একজন সদস্য হইতে পারেন। এবং প্রচলিত রীতি-অনুসারে ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় কার্য্য পরিচালনা করিতে পারেন, তাঁহাকে যাত্রিগণ স্বেচ্ছাক্রমে যে দান করিবে, তিনি কেবল সেইগুলিরই অধিকারী হইবেন। কিন্তু তিনি যাত্রীদের নিকট হইতে অন্ত কোনোরূপ অর্থ আদায় করিতে পারিবেন না। (৩) কমিটি পূজা এবং অন্যান্ত উৎসবাদির জন্ত যাত্রিগণের নিকট হইতে যত কম পারা যায় সেই-পরিমাণ অর্থ আদায় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন। যাত্রীদের প্রদত্ত কেশ, অর্থ, স্বর্ণ, রৌপ্য বা অন্ত কোনোরূপ মূল্যবান্ দ্রব্য মন্দিরের সম্পত্তির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত,এবং উহা দেব-সেবা অথবা যাত্রীদের সুবিধার জন্ত ব্যয়িত হইবে। (৪) কমিটি একজন সুযোগ্য এবং চরিত্রবান্ ম্যানেজার নিযুক্ত করিবেন। উক্ত ম্যানেজারকে সর্ব্বপ্রকার আয় ও ব্যয়ের যথারীতি হিসাব রাখিতে হইবে। তাঁহাকে তাঁহার কার্য্যের জন্ত যথাযোগ্য জামীন দিতে হইবে। (৫) সমস্ত হিসাবাদি সময়-সময় পরীক্ষা করাইয়া প্রকাশিত করিতে হইবে, এবং হিসাবের বিবরণে তত্ত্বাবধানের সমস্ত বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উল্লেখ করিতে হইবে। হিসাবের বিবরণের একখানা নকল কোর্ট-অ্যাণুয়্যালে ফাইল করিতে হইবে। মূল কথায় কমিটি মন্দিরের সম্পত্তির ট্রাষ্টি হিসাবে কার্য্য করিবেন।

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত—

স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ১৬ বৎসর পরে দেশে ফিরিতেছেন। যুগান্তরের মামলায় ১ বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করিয়া ১৯০৯ সালে শ্রীযুক্ত দত্ত আমেরিকায় গমন করিয়াছিলেন। তিনি তথায় ৫ বৎসর বাস করেন ও এম্-এ ডিগ্রী প্রাপ্ত হন। যুদ্ধ বাধিলে তিনি ইউরোপ গমন করেন। তিনি ভারতের জন্ত বিদেশে অনেক-প্রকার কাজ করিতেছিলেন। বার্লিন-বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ করিয়া তিনি নৃতত্ত্ব-বিষয়ে ডাক্তারের ডিগ্রী লাভ করেন।

শ্রীযুক্ত দত্ত দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেশে বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপদ্ধতির প্রচলন করিতে চেষ্টা করিবেন।

তিনি দেশে আসিবার পূর্ব্বে অনেকে তাঁহাকে এই বলিয়া নিরস্ত করিতে চেষ্টা করেন যে ভারতে ফিরিয়া গেলেই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইবে। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ইহা সত্ত্বেও দেশে আসিয়া সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন।

ব্যবস্থাপক সভায় পুনর্নির্ব্বাচন—

অনুপস্থিতির অজুহাতে বাংলা সরকার নোয়াখালি ও বাঁকুড়ার অ-মুসলমান সম্প্রদায়ের সদস্য রাজবন্দী শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র ও শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায়ের স্থলে পুনর্নির্ব্বাচনের আদেশ দেন।

সুখের বিষয় তাঁহারা পুনরায় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। কেহই তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দী ছিল না। ভোটারগণ তাঁহাদিগকে পুনরায় নির্ব্বাচন করিয়া লাঞ্ছিত স্বদেশসেবকদ্বয়ের প্রতি অটুট বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার পরিচয় দিয়াছেন।

বাংলার রাজবন্দিগণ— ✓

বাংলা দেশে ও বাহিরে অনেকগুলি বাঙালী যুবক বিনাবিচারে কারাগৃহের অনেক-প্রকার হীনতা ও লাঞ্ছনার মধ্যে দিন কাটাইতেছে।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর অগ্রজ শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু মহাশয় সম্প্রতি মান্দালয় জেলে রাজবন্দীদের অবস্থা পরিদর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। ঐ-জেলে প্রায় ষোলোজন রাজবন্দী এখন আছেন। মান্দালয়-সহরের হাওয়া এখন অত্যন্ত গরম, তাছাড়া ধুলাও খুব বেশী, এইজন্ত স্বাস্থ্য-সংরক্ষণ অতিশয় সাবধানতার কাজ। জেলকর্তৃপক্ষের ব্যবহার খারাপ নয়। বন্দীদের ইচ্ছানুরূপ পুস্তকাদি পাঠ করিতে দেওয়া দূরের কথা, কোনোপ্রকার পুস্তক পাঠেরই অনুমতি দেওয়া হয় না। সংবাদ-পত্রের মধ্যে ষ্টেটস্‌ম্যান বেঙ্গলী বার্ম্মা-গেজেট মাত্র পড়িতে দেওয়া হয়। এইজন্ত রাজবন্দীদের জ্ঞানচর্চ্চার অভাবে কালযাপন করিতে হইতেছে ; বলা বাহুল্য এই অভাবই তাদের বন্দীজীবনকে ক্রমশঃ অসহ্য করিয়া তুলিতেছে।

ব্রহ্মদেশের মান্দালায় জেল হইতে মাদারীপুরের বিখ্যাত কর্ম্মী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দাস মহাশয়ের ৮ই এপ্রিল তারিখের লিখিত পত্রে প্রকাশ যে, তিনি অর্শরোগে প্রচুর রক্তস্রাব-নিবন্ধন অতিশয় কষ্ট পাইতেছেন। যদিও জেল-ডাক্তার তাঁহার চিকিৎসা করিতেছেন, তথাপি তাঁহার আরোগ্য বা রোগ-উপশমের সংবাদ না পাওয়া পর্য্যন্ত দেশবাসী উৎকণ্ঠিত থাকিবে।

শ্রী প্রভাত সান্যাল

সাঁওতাল-জীবন

শ্রী বিভূতিভূষণ গুপ্ত

আমাদের আশ্রমের পশ্চিম প্রান্তে সীমান্ত-রেখায় বিরল-তরু-ছায় ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কুটীরযুক্ত যে-কয়খানি গ্রাম দেখা যায় তাহাদিগের অধিবাসী দরিদ্র সাঁওতালদিগের জীবন-সম্বন্ধে কিছু লিখিবার চেষ্টা করিব। এই সাঁওতালদিগের অধিকাংশই দরিদ্র। গ্রাসাচ্ছাদনের অতিরিক্ত সঞ্চয় করিবার ক্ষমতা ইহাদিগের নাই। তাহাদের সামান্ত উপার্জ্জন-লব্ধ ধন আহার এবং পোষাকে ব্যয়িত হয়। ইহাদিগের মধ্যে যাহারা একটু অবস্থাপন্ন তাহাদের দুই-তিনটি গৃহ, একটি গোয়াল, একটি শূকরের খোঁয়াড়, গুটি-কতক মুরগী, তিন-চারিটি লাঙল, বিঘা-কতক জমি এবং হয়ত কুড়ি ত্রিশ টাকা সঞ্চিত থাকিলেও থাকিতে পারে। তাহা ব্যতীত প্রত্যেকের ব্যবহারোপযোগী দ্রব্য, যেমন

একটি রঙ্গির থালি, কয়েকটি বাটী, মাটির হাঁড়ি একটি, কুলুল একটি, কাঠের চিরনী, ইত্যাদি আছে।

ইহাদিগের গৃহের চতুষ্পার্শ্ব গোময়-লিপ্ত করা হয়; চমৎকার পরিষ্কার, কোথাও একটুও ময়লা নাই। কাহারো কাহারো ঘরের চালে লাউ-কুমড়ার চারা লতাইয়া উঠিয়াছে। কচিৎ দুই-একটি ফলও দেখা যায়। ইহারা ফুল অত্যন্ত ভালোবাসে। বসন্তকালে ইহাদিগের একটি উৎসব হয়। তখন বসন্ত-দেবতাকে পুষ্পোপহার প্রদান করিয়া ইহারা পুনরায় নূতন পুষ্প কর্ণে অথবা মস্তকে ধারণ করে। এই পূজাকে প্রস্ফুটিত বাহা পূজা বলে। সে-সম্বন্ধে পরে বলিতেছি।

ইহারা গাঁদাফুলের অত্যন্ত ভক্ত। হাদের গৃহের পার্শ্বে শিম অথবা অন্য কোনো তরিতরকারীর চারা লতাইয়া উঠিবার জন্য ইহারা মাচা নির্ম্মাণ করিয়া দেয়। এগুলিকে সজীব রাখিতে ইহাদিগকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হয়। এই মরুভূমির মত অনুর্ব্বর প্রদেশে জলাভাবে কোনো-কিছু উৎপন্ন করা অত্যন্ত কষ্টকর। এই-সমস্ত মাচার নিম্নে অথবা পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধভাবে গাঁদাফুলের ঝাড় দেখা যায়। শীতকালে এইসমস্ত ঝাড় হরিদ্রা-বর্ণে রঞ্জিত হয় এবং প্রচুর পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়। আমরাও প্রয়োজন হইলে ইহাদের নিকট হইতে ফুল আনিয়া থাকি। সকলেরই নিজের গৃহের পার্শ্বে একটু-একটু জমি আছে। ইহাতে শাক-সব্জী উৎপন্ন হয়। বেগুন, শশা, কুমড়া, ইত্যাদি কাহারো কাহারো ক্ষেতে দেখা যায়। তাহা ছাড়া প্রায় প্রত্যেকেরই তিন-চার বিঘা খাজনা-করা ধানের জমি আছে। জমিদারকে খাজানা দিয়াও যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহার এবং শাকসব্জীর সাহায্যে কোনো প্রকারে ইহাদের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ হয় এবং সকলেই তাহাতে সুখী। সভ্য-সমাজ হইতে দূরে পড়ায় ইহাদের কোনো উচ্চ আশা নাই। অর্থে মনের প্রকৃত আনন্দ হয় না। মানুষ দরিদ্র অবস্থাতে থাকিয়াও সুখী হইতে পারে। আমি একবার এক সাঁওতাল রমণীর সহিত আলাপ করিয়াছিলাম। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার কি কিছু অভাব আছে? তোমার পরিবারে লোক-সংখ্যা কত?" সে বলিল, "আমার কোনো অভাব নাই, আমরা সংসারে চারিজন। আমার পুত্র, পুত্রবধূ এবং একটি শিশু পৌত্র। আমার শূকর আছে, মুরগী আছে, ক্ষেতে ধান আছে; আমার আবার কিসের অভাব?" ইহাতেই বুঝা যায় ইহারা কত সুখে জীবন যাপন করে। কিন্তু অর্থাভাবে যে তাহাদিগকে বিপদে পড়িতে হয় না, তাহা বলিতেছি না।

এক-একটি পরিবার তিন-চার জন অথবা পাঁচজনেও গঠিত হয়। পুরুষেরা কাজ করিয়া দৈনিক চারি আনা করিয়া উপার্জ্জন করে এবং স্ত্রীলোকেরা গৃহের কার্য্যসমূহ সম্পন্ন করে। কখনো-কখনো স্ত্রীলোকেরাও শারীরিক কর্ম্ম করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করে এবং বালকেরা গো-মেষাদি লইয়া সমস্ত দিন মাঠে-মাঠে চরাইয়া বেড়ায়।

ইহাদিগের ভোজন-ব্যাপার অত্যন্ত সাধাসিধা-রকমের। প্রাতে কার্য্যে বাহির হইবার পূর্ব্বে পুরুষেরা বাটিতে শীতল জলে ভাত ভিজাইয়া লইয়া বাহির হয় এবং দ্বিপ্রহরে কর্ম্মস্থানে আহার করে। ইহাদিগের প্রধান অস্ত্র তীর-ধনুক। বাদ্য মাদল এবং পানীয় তাড়ী। এই তাড়ীই তাহাদের অত্যন্ত অপকার করিতেছে। যৎসামান্য উপার্জ্জিত অর্থের অধিকাংশই ইহাতে ব্যয়িত হয়, কিন্তু মদ্যপান ইহাদিগের ভিতর এত প্রচলিত হইয়াছে যে, ইহাকে তাহারা দোষের মধ্যেই গণ্য করে না। যে কোনো উৎসবে, পূজায় বিবাহে, ইহাই ইহাদিগের সর্ব্বপ্রধান পেয়। ইহারা অতিশয় কুসংস্কারাপন্ন। অপদেবতার প্রতি ইহাদের বিশ্বাস প্রগাঢ় এবং অটল এবং বিশেষ-বিশেষ সময়ে ইহাদের পূজা করে। বিচ্ছিন্নভাবে বাস করে বলিয়া ইহাদিগের কোনো স্থায়ী সমাজ নাই। তবে তিন-চারিটি গ্রামের প্রধান ব্যক্তিদিগকে লইয়া একটি পঞ্চায়েৎ আছে। কোনো অন্যায় হইলে সকলে নির্দ্দিষ্ট স্থানে একত্র হয় এবং বিচার করে। যে গ্রামের মোড়ল, তাহাকে উচ্চাসন প্রদান করা হয়।

সভায় বাদী-প্রতিবাদী দুই দলের রীতিমত তর্ক আরম্ভ হয়। প্রত্যেকেই মোড়লের আদেশ লইয়া নিজের পক্ষকে সমর্থন করে। এইপ্রকারে যে-পক্ষ জয়লাভ করে, সেই পক্ষের উকিল-ব্যারিষ্টারগণ মক্কেলের

নিকট হইতে দুই-একটাকা পুরস্কার পায়। এইপ্রকারে ইহাদিগের বিচার-কার্য্য সম্পন্ন হয়। সাঁওতালী ভাষায় ইহার নাম হালিসা। এই হালিসায় আমি কয়েকবার উপস্থিত ছিলাম। কি বালক, কি বৃদ্ধ—সকলেই এই বিচারে যোগ দিতে পারে, কিন্তু সাবালক না হইলে কোনো পক্ষে যোগ দিয়া তর্ক করিবার ক্ষমতা হয় না। এইসমস্ত গ্রাম-সম্বন্ধীয় বিচার্য্য বিষয় ইহারা কাহারো নিকট প্রকাশ করে না।

মাংসে ইহাদের বড় রুচি। প্রায় সমস্ত পশুপক্ষীর মাংসই ইহারা ভক্ষণ করে।

ইঁদুর, বাক, শূকর, খরগোস, এবং নানাজাতীয় পক্ষী ইহাদিগের প্রধান খাদ্য। ছয়-সাত বৎসর পূর্ব্বে ইহারা মাংস অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ভক্ষণ করিত।

আজকাল এ-বিষয়ে একটু উন্নতি হইয়াছে। আমি একদিন ইহাদের ভোজন-ক্রিয়ার পূর্ব্বে তথায় উপস্থিত ছিলাম। একদিন দূর হইতে জনতা এবং লোকের কোলাহলে কৌতূহলী হইয়া নিকটে গমন করিয়া দেখিলাম বিরাট্‌-আকার দুই শূকর রক্তাক্ত-কলেবরে পড়িয়া আছে, বক্ষে তীরের ফলার ক্ষত-চিহ্ন। বালক বৃদ্ধ সকলেই প্রফুল্লমুখে শুষ্ক পত্র আহরণে ব্যস্ত। পরে স্তূপাকারে মৃত শূকরের উপর পত্র সজ্জিত করিয়া তাহাতে অগ্নিদান করা হইল। এমন দুর্গন্ধ ধূম উঠিতে লাগিল যে, আমাকে বাধ্য হইয়া সে-স্থান পরিত্যাগ করিতে হইল। এইপ্রকারে তিন-চারবার শূকরটাকে দগ্ধ করিলে পর কাস্তের সাহায্যে ইহাকে খণ্ড-খণ্ড করিয়া বাড়ীতে-বাড়ীতে প্রেরণ করা হইল এবং সকলে পৃথক্‌-পৃথক্‌ ভাবে রন্ধন করিয়া ভোজন করিল।

সন্তান জন্মিলে পাঁচ দিন পর্য্যন্ত সূতিকা-গৃহে থাকিতে হয়। তার পর নবজাত শিশু এবং প্রসূতিকে সকলে স্পর্শ করিতে পারে। নামকরণের সময় গ্রামের সকলে সমবেত হয়, শিশু পিতৃমাতৃহীন হইলে কয়েক জন বিশেষ ব্যক্তি মিলিত হইয়া শিশুর নাম রাখে। কিন্তু যদি শিশুর পিতামাতা বর্ত্তমান থাকে, তবে পুত্র জন্মিলে পিতার নামেই তাহাকে অর্পণ করা হয়; এবং কন্যা জন্মিলে মাতার নামেই তাহার নাম রাখা হয়।

পুরুষ স্ত্রীলোক সকলেরই কান বেঁধা হয়। জন্ম গ্রহণের তিন-চারি মাসের মধ্যে উক্ত অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

ইহাদিগের মধ্যে উচ্চ নীচ জাতি আছে। তন্মধ্যে মণ্ডি, হেমরোম এবং হাঁসদাও এই তিনটি প্রধান। এই তিন জাতির পরস্পরের ভিতর উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারে। কিন্তু কন্যা ও পাত্র একজাতি হইলে বিবাহ হয় না। নিমন্ত্রিত লোকদিগকে ভোজন করাইবার ভার বরকর্ত্তাকে গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু ইচ্ছা করিলে তাঁহারা বিকালে কন্যাকর্ত্তার বাটীতে সদলবলে আহার করিতে পারেন। বিবাহে বরকর্ত্তাকে কন্যার পিতাকে বারো টাকা পণস্বরূপ দিতে হয়। এই প্রাপ্য টাকা দেওয়া চাই, ইহার কমও গ্রহণ করে না এবং বেশীও আশা করে না। ইহা ছাড়া আরো কাপড়, গহনা ইত্যাদি দিতে হয়। বিবাহ কন্যার বাটিতেই সম্পন্ন হয়। আমাদের ন্যায় ইহাদেরও একদল ঘটকসম্প্রদায় আছে। তাহারা পাত্র-পাত্রী নির্ব্বাচন করিয়া থাকে।

ইহাদের পাঁজী নাই। সুতরাং এক নূতন উপায়ে বিবাহের দিন নির্দ্দিষ্ট করা হয়।

যতদিন পরে বিবাহ দিবার ইচ্ছা হয়, একটি হরিদ্রা-বর্ণে রঞ্জিত সূত্রে ততগুলি গ্রন্থি দেওয়া হয়। তৎপরে প্রতিদিন একটি-একটি করিয়া খুলিয়া ফেলিতে হয়। শেষ গ্রন্থির দিন বিবাহ সম্পন্ন হয়।

বিবাহের পূর্ব্বদিন গ্রামের সমুদয় লোক বরকে দেখিতে আসে। তখন কেহ একটাকা, কেহ একখানি কাপড় ইত্যাদি যার যাহা সাধ্য দিয়া যায়। তাহাতে পাত্র প্রায় নয় দশ টাকা পায়। বিবাহের দিন প্রাতে 'গায়েহলুদ' হয়। উভয়ের গৃহে পৃথক্‌-পৃথক্‌-ভাবে বর-কন্যার গায়ে হলুদ দেওয়া হয়। পাত্রী সমবেত এয়োস্ত্রীদিগকে সিঁদুর প্রদান করে।

বিবাহের পূর্ব্বে কন্যা সীমন্তে সিঁদুর ধারণ করিতে পারে না।

যথাসময়ে বর কন্যার গৃহে আগমন করে। এইসময় একটু খেলা হয়। বরযাত্রী এবং কন্যাযাত্রী উভয় দল মুখোমুখি হইয়া দণ্ডায়মান হয়। প্রত্যেকেই একটি যষ্টি

গ্রহণ করে। তার পর পাঁয়তারার মতো কখন বা উভয় দল সম্মুখে, কখনো বা পার্শ্বে, কখনো বা পিছনে সরিয়া যায়। প্রায় ঘণ্টাখানেক উভয় দলের মধ্যে এই ক্রীড়া চলিতে থাকে। তৎপরে বরযাত্রীরা সমুদায় যষ্টি কন্যাযাত্রী-দিগের পদতলে রাখিয়া দেয়। ইহা আত্ম-সমর্পণের চিহ্ন; আমাদের দেশে পূর্ব্বকালে ক্ষত্রিয়েরা যুদ্ধ করিয়া কন্যা জয় করিয়া তবে বিবাহ করিতেন। ইহাদিগের ভিতর সেই প্রথা ক্রীড়াকারে পরিণত হইয়া চলিয়া আসিতেছে। তৎপরে বরযাত্রীরা ক্রমাগত তাহাদের অস্ত্র পুনর্গ্রহণ করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু গ্রহণ করিতে পারিতেছে না, বারবার এইপ্রকার ভাব দেখাইয়া ফিরিয়া আসে, তাহার পর পলায়নোদ্যত হইলেই কন্যাযাত্রীরা তাহাদিগকে হস্তের ইসারায় ডাকিতে থাকে। বলা বাহুল্য, এখনও সেইপ্রকার ক্রীড়া চলিয়া থাকে। তাহাদের আহ্বানে বরযাত্রীগণ নিকটে আসিলে কন্যা-যাত্রীরা হাতের ইসারায় তাহাদের মুখ মুছাইয়া দেয় এবং মুখে খাদ্য প্রদানের ভাব প্রদর্শন করে। অপর পক্ষও হাঁ করিয়া খাদ্য গ্রহণ ও চর্ব্বণের ভাব প্রদর্শন করে। এইপ্রকার অভ্যর্থনা শেষ হইলে তাহাদিগকে বিনোদন করিবার নিমিত্ত নাচ এবং গান আরম্ভ হয়। সাঁওতাল রমণীরা এই নৃত্য ও গীত করিয়া থাকে। সকলে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান হয়, তৎপরে গানের সঙ্গে-সঙ্গে শ্রেণীরক্ষা করিয়া নানাবিধ অঙ্গভঙ্গী-সহকারে নৃত্য করিতে থাকে। নৃত্যগীত সমাপ্ত হইলে কন্যাপক্ষীয়গণ বরযাত্রীদিগকে লইয়া একটি উচ্চ মাচার তলে গমন করে। তার পর যষ্টির দ্বারা উভয় দলই তাহাতে আঘাত করে। তাহার অর্থ, এই গৃহ-সম্পত্তি সবই আমাদের উভয় দলের। এইপ্রকারে দুটি পৃথক্ জাতি পরস্পরের সহিত একতা-সূত্রে আবদ্ধ হয়। তৎপরে দ্বিপ্রহরে বিবাহ-কাল নির্দ্দিষ্ট হয়। বর-কন্যা উভয়ে দুইটি কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট হয়। তখন সকলে মিলিয়া কন্যাকে পিঁড়িতে উঠাইয়া বরকে তিনবার অথবা পাঁচবার প্রদক্ষিণ করে। ইহা সমাপ্ত হইলে উভয়ের গাত্রে মন্ত্রপূত বারি নিক্ষেপ করা হয় এবং কন্যার সীমন্তে সিঁদুর লেপন করা হয়। ইহার পূর্ব্ব-পর্য্যন্ত কন্যার মুখ অবগুণ্ঠনে আবৃত থাকে। তার পর কন্যার অবগুণ্ঠন মোচন করা হয় এবং বরকন্যা উভয়েই উভয়ের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করে। ইহাই শুভদৃষ্টি। এইপ্রকারে বিবাহ সম্পন্ন হইলে সমস্ত দিন নৃত্যগীত ইত্যাদি চলিতে থাকে। কন্যা স্ত্রীলোকদিগের সহিত এবং বর পুরুষদিগের সহিত নৃত্যে যোগদান করে এবং উভয় দল মুখোমুখি হইয়া নৃত্য করিতে থাকে। এইসময় কন্যাকে তাহার সম্পর্কিতদিগের নিকট হইতে যথেষ্ট ঠাট্টা-বিদ্রূপ সহ্য করিতে হয়। পাত্রও বাদ যায় না। ইহার পর কন্যা বরের গৃহে তিনদিন যাপন করে। তাহার পর পিতৃগৃহে একবৎসর যাপন করিয়া শ্বশুর-গৃহে আগমন করে এবং স্বামী-সহবাসে কালযাপন করে।

বৎসরে প্রত্যেক মাসেই ইহাদের পূজা অথবা পার্ব্বণ আছে। ইহারা ফাল্গুন হইতে মাস গণনা করে। এই ফাল্গুন মাসে ইহাদের বাহা পূজা অর্থাৎ বসন্ত পূজা। এই পূজার পূর্ব্বে কোনো সাঁওতাল-রমণী পুষ্পাভরণে সজ্জিত হইতে পারে না, এবং নূতন ফল দেবতাকে না উৎসর্গ করিয়া ভক্ষণ করিতে পারে না। চৈত্র মাসে ইহাদিগের কোনো পূজা নাই। বৈশাখে হোমপূজা। এই পূজার আরাধ্য দেবতা মহাদেব। ইহারা একটি প্রস্তর শিলার নিকট পূজা প্রদান করিয়া সকলের মঙ্গল প্রার্থনা করে। কয়েকটি বিশেষ নিয়ম-অনুসারে প্রত্যেক পূজার কার্য্যই সম্পন্ন হয়। প্রত্যেক গ্রামে একঘর করিয়া পুরোহিত আছে। এই পরিবারের মধ্যে বালক বৃদ্ধ সকলেই পূজা করিবার অধিকারী। একটি পাত্রের উপর আতপ চাউল স্তূপাকারে সাজাইয়া রাখে, তদুপরি একটি সুপারি স্থাপন করে। যদি সেটি নিম্নে পতিত হয় তবে দেবতা প্রসন্ন হইয়াছেন এরূপ মনে করিতে হইবে। নতুবা জানিতে হইবে ঈশ্বর অপ্রসন্ন রহিয়াছেন।

জ্যৈষ্ঠ মাসে 'এরো পূজা'। গ্রামবাসী সকলে মিলিয়া সর্দ্দারকে লইয়া ঈশ্বরের পূজা করে এবং তাহার পর প্রত্যেকে নিজের গৃহেও সেই আরাধ্য দেবতার পূজা করিয়া থাকে।

আষাঢ়ে হরিয়াও পূজা। সেই পূজার ইষ্টদেবতা ইন্দ্রদেব। প্রচুর বারি বর্ষণ করো—এই একমাত্র বর ইহারা তাঁহার নিকট প্রার্থনা করে। শ্রাবণ মাসে কোনো পূজা

নাই। ভাদ্রে ছাতা পূজা। কেবলমাত্র আমোদের জন্য এই পূজা হয়। এই পূজায় নৃত্য গীত এবং জাঁকজমকের সহিত বাদ্য হয়। প্রথমে দুটি খুঁটি একহস্ত ব্যবধানে মৃত্তিকাতে প্রোথিত হয়। তৎপর একটি বংশখণ্ড আড়াআড়ি-ভাবে স্থাপন করা হয়। ইহার মধ্যস্থলে একটি ছিদ্র থাকে এবং একটি দীর্ঘ-সরু বংশ এই ছিদ্রে ঋজুভাবে দাঁড় করানো হয়। তাহার ডগায় কাগজের টোকা নির্ম্মাণ করিয়া ঝুলাইয়া দেওয়া হয় এবং তাহার তলদেশে অনেক ফুল ছড়াইয়া দেওয়া হয়। আশ্বিন মাসে উহারা দিবি অর্থাৎ দুর্গাপূজা করে। এই পূজাতেই সর্ব্বাপেক্ষা ঘটা হয়। নানাবিধ নৈবেদ্য ফলমূল দিয়া ইহার সম্মুখে স্থাপন করা হয় এবং দেবী প্রসন্ন কি না, তাহা চাউলের উপর সুপারি দিয়া ঠিক করে। তৎপর যে পুরোহিত সে এই মন্ত্র দুই তিনবার উচ্চারণ করে "মা তবে এমাম কানাই" অর্থাৎ মা তবে তুমি আমাদের পূজা গ্রহণ করো। ইহা ছাড়া আর দ্বিতীয় মন্ত্র নাই। প্রায় প্রত্যেক পূজায় বলিদান হয়। এই পূজাতে বিশেষ করিয়া হয়। প্রতিমা একরাত্রি এবং পরদিন বিকাল পর্য্যন্ত গৃহে থাকে এবং ভাসানের সময় সকলে মিলিয়া নিকটস্থ জলপূর্ণ স্থানে ফেলিয়া দেয়। বলা বাহুল্য এই পূজায় নেশা, নাচ এবং বাদ্য যথেষ্ট-পরিমাণে হয়। প্রত্যেক শুভ অনুষ্ঠান সকলকে লইয়া সম্পন্ন হয়—কাহারো গৃহে পূজা হইলে সকলকেই নিমন্ত্রণ করা হয়। সুতরাং ভোজনও সামান্য-রকমে সম্পন্ন হয়। ভাত এবং কিছু মাংস। ইহাতেই সকলে খুসী।

কার্ত্তিক মাসে সরস্বতী পূজা। ইহারও মূর্ত্তি ক্রয় করা হয় এবং উপরোক্ত নিয়মানুসারে পূজা সম্পন্ন হয়।

অগ্রহায়ণ মাসে নওবাই অর্থাৎ নবান্ন হয়। ইহা একটি পরব মাত্র। নূতন ধান্য ক্ষেত্র হইতে উৎপন্ন হইলেই সকলে মিলিয়া দুধ, গুড়, কলা এবং নূতন চাউল দিয়া মাখিয়া গৃহদেবতাকে নিবেদন করিয়া ভোজন করে।

পৌষ মাসে সহোরাই পূজা। এই পূজাটি বাঁধা পূজা নামে আমাদের নিকট সুপরিচিত।

এইসময়ে গৃহপালিত উপকারী পশুদিগকে ইহারা পূজা করে। বাস্তবিক এইটি খুব চমৎকার। পশুরা যদিও অত্যন্ত নীচ তথাপি তাহারা আমাদের উপকার করে বলিয়া একদিক্ দিয়া আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র এবং এই পূজা তাহাদিগকে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন ভিন্ন আর কিছুই নয়। উক্ত পশুদিগের কপালে সিঁদুর লেপন করিয়া নবীন তৃণ ভক্ষণ করানো হয়। তা'র পর তাহাদিগকে প্রণাম করিয়া সকলে মিলিয়া উৎসব করে। মাঘ মাসে মাঘ পূজা। এই পূজাটি 'বর্ষ-শেষ' পূজা সুতরাং ধুমধামও যথেষ্ট হয়।

ইহারা বিশিষ্ট দিনে অপদেবতাকে পূজা করে। গ্রামের পশ্চিমে প্রকাণ্ড একটি বট বৃক্ষ আছে। অন্ধকার রাত্রে সেই বৃক্ষের নিম্নে জীবন্ত ছাগশিশু বাঁধিয়া রাখে। যদি সকালে তাহাকে পাওয়া যায় তবে কাটিয়া ভক্ষণ করে। কিন্তু এযাবৎ কোনো অদৃশ্য হস্ত এই বলি অপহরণ করে নাই। প্রাতে জীবন্ত লোকের হস্তেই তাহাদিগকে প্রাণ হারাইতে হয়।

মৃতের ইহারা সৎকার করে। পরিবারের মধ্যে কেহ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে স্বজাতীয়রা সকলে মিলিয়া মৃতদেহ খাটিয়াতে লইয়া শ্মশানে গিয়া পোড়াইয়া ফেলে এবং একটি অস্থি লইয়া সেই দিনই দামোদরে নিক্ষেপ করিয়া আসে এবং স্নান করিয়া গৃহে আগমন করে। সেই দিন গ্রামের লোকেরা তাহাদের গৃহে সমবেত হয়। পরে প্রত্যেকেই চুল এবং দাড়ি-গোঁপ ছাঁটিয়া ফেলে। কেবল সেই পরিবারের সকলে মাথা মুণ্ডন করে। তার পর সকলে মিলিয়া ভোজন করে। মাছ-মাংসও এই খাওয়াতে নিষিদ্ধ নহে।

ইহাদিগের ভাষার একবর্ণও আমাদিগের বোধগম্য হয় না। কিন্তু অল্পকাল শিক্ষা করিলেই সরল হইয়া পড়ে। ইহাদিগের ক্রিয়ার আকৃতিগুলিই বিশেষ শিক্ষণীয়। কিন্তু তা'র মধ্যেও বেশ-একটি বাঁধাবাঁধি নিয়ম আছে। উহাদিগের সাতটি ক্রিয়ার আকৃতি আছে। বাংলায় যেমন তেছি, তেছিলাম, ব, আছি, আছিলাম অভ্যাস এবং আদেশ আছে, ইহাদিগেরও তেম্নি 'লেনাই', 'কানাই', 'আকানাই', কান্তাহৈআই', 'আই', 'হেলেনাই', 'মে' ইত্যাদি আছে। এইগুলিই সাঁওতালী ক্রিয়ার নামের পরে বসাইয়া দিলেই ভিন্ন-ভিন্ন আকার এবং অর্থ ধারণ

করে। 'বসা'কে সাঁওতালিতে দুড়ু বলে। ইহার পর যথাক্রমে উক্ত পদগুলি বসাইয়া দিলেই যথাক্রমে বসে, বসিবে, বসিতেছে ইত্যাদি মানে বোঝায়। নিম্নে একটি তালিকা প্রদত্ত হইল :—

দৌড়ান	দৌড়ায়	দৌড়াইতেছে	দৌড়াইবে	দৌড়াইতেছিল	দৌড়াইয়াছে	দৌড়াইয়াছিল
দৌড়	দৌড়কানাই	দৌড়-আকানাই	দৌড়আই	দৌড়-কান্তাহেঁআই	দৌড়-হেলেনাই	দৌড়লেনাই

প্রাচীন ভারতে ধর্ম্ম

শ্রী অমূল্যচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ধর্ম্ম মানবজাতির একটি প্রধান অবলম্বন। যতদিন মানবের ইতিহাস পাওয়া যাইতেছে ততদিন ইহার ধর্ম্ম বিশ্বাসেরও একটি ইতিহাস পাওয়া যাইতেছে। প্রধানতঃ দুইটি বিশ্বাস হইতে ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়। প্রথম, এই বিশ্ব ও জীবজন্তু কেমন করিয়া সৃষ্ট হইল? দ্বিতীয়, জীবগণ প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যায়? প্রথম বিশ্বাস হইতে দেবতা ও ঈশ্বরের সৃষ্টি হইয়াছে; দ্বিতীয় বিশ্বাস হইতে পিতৃলোকের সৃষ্টি হইয়াছে। নানা দেশে নানা জাতি নানা-প্রকারে এই দুইটি প্রশ্নের উত্তর দিয়াছে। তাহাতেই নানা-প্রকার ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে। কোনো জাতি যখন অসভ্য অবস্থায় থাকে তখন তাহার ধর্ম্মও নানারূপ কুসংস্কারপূর্ণ নিম্ন শ্রেণীর বিশ্বাস মাত্র থাকে, আবার যখন জাতি সভ্য ও উন্নত হইয়া উঠে তখন তাহার ধর্ম্মবিশ্বাসও সেইসঙ্গে মার্জ্জিত ও উন্নত হইয়া উঠে। কোনো কোনো দেশে ধর্ম্মবিশ্বাস অগ্রে উন্নত হয়, পরে জাতি তাহার সঙ্গে সঙ্গে উন্নত হয়। যাহা হউক কোনো জাতি ও তাহার ধর্ম্ম একসূত্রে গ্রথিত। একের উন্নতি হইলে অপরের উন্নতি হইবে, আবার একের অবনতি হইলে অপরের অবনতি হইবে। প্রাচীন ভারতেও এইরূপ হইয়াছিল। প্রাচীন ভারতীয়দিগের ধর্ম্মবিশ্বাস আদিম অবস্থা হইতে ক্রমশঃ উন্নত হইয়া মধ্যযুগে চরম সীমায় উঠে ও তৎসহ জাতিও উন্নতির শিখরে আরোহণ করে। তৎপরে ধর্ম্মের অবনতি হইতে আরম্ভ হয় ও ধর্ম্মের অবনতির সঙ্গে জাতিও অবনত হইয়া পড়ে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা ধর্ম্মের সেই ক্রমবিকাশ দেখাইতে চেষ্টা করিব।

প্রথমতঃ আমরা দেখি যে বহু প্রাচীন কালে ভারতে বৈদিক ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। নানারূপ আড়ম্বরপূর্ণ যাগ-যজ্ঞ ক্রিয়াকলাপ করিলেই মানুষ মৃত্যুর পর স্বর্গে গমন করে, ইহাই প্রাচীন কালের ভারতবাসীদিগের বিশ্বাস ছিল। নানারূপ দেবতার কল্পনা করা হইত, তাহাদের উদ্দেশেই যাগযজ্ঞ করা হইত। বিশ্ব-সৃষ্টি সম্বন্ধেও একটি কল্পনা করা হইত। তেত্রিশটি দেবতা, পিতৃগণ, ঋষিগণ প্রভৃতি সকলে এই বিশ্বের রক্ষক ও পালক। ইহারা সকলে লোকপিতামহ ব্রহ্মার বংশধর। ব্রহ্মার ছয় পুত্র। সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ মারীচের পুত্র কশ্যপ। সমস্ত দেবগণ, ঋষিগণ, মানব, দৈত্য, জীব-জন্তু, বৃক্ষলতা প্রভৃতি সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ কশ্যপের অপত্য। (মহাভারত আদি ৬৫)

আদিম ভারতীয়দিগের বিশ্বাস ছিল যে, যাগযজ্ঞ করিলেই দেবতাগণ সন্তুষ্ট হন ও যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা মৃত্যুর পর স্বর্গে গমন করেন।

নারদ ঋষি যুধিষ্ঠিরকে কহিতেছেন, "যযাতি, নহুষ, পুরু, মান্ধাতা—(প্রভৃতি রাজগণ) ও অনেকানেক ভূরিদক্ষিণ মহৎ অশ্বমেধানুষ্ঠান দ্বারা স্বর্গগত শশবিন্দু বংশীয়

সহস্র সহস্র জন ঐ সভায় (যমরাজের সভায়) গমন করিয়া ভগবান্ যমের উপাসনা করেন।" (সভা ৮)

অন্যত্র তিনি বলিতেছেন, "হে নরাধিপ, যে সকল মহীপালেরা রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা পরমাহ্লাদে ইন্দ্রের সহিত কালযাপন করিতে পারেন।" (সভা ১১)

বৈশম্পায়ন কহিতেছেন, "যযাতি স্বীয় বিক্রম-প্রভাবে সম্রাট্ হইয়া এই সসাগরা পৃথিবী শাসন, বহুবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান ও একান্ত ভক্তির সহিত পিতৃ ও দেবগণকে অর্চনা করিয়া স্বতনির্বিশেষে প্রজাপালন করিতেন।" (আদি ৭৫)

মহীপাল অনাধৃষ্টির মতিনার নামে এক পুত্র জন্মে। পরম ধার্ম্মিক মতিনার রাজসূয় ও অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। (আদি ৯৪)

রাজা সুহোত্র ও সম্বরণ বহুবিধ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। (আদি ৯৪)

রাজা ভরত "পুত্রার্থী হইয়া বহুবিধ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করাতে মহর্ষি ভরদ্বাজের অনুগ্রহে ভূমন্যু নামে এক পুত্র লাভ করিলেন। (আদি ৯৪)

পুরু তিনবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং পরিশেষে বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিয়া অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। (আদি ৯৫)

রাজা মহাভৌমের পুত্র "অযুতসংখ্যক পুরুষমেধ যজ্ঞ করিয়া অযুতনায়ী এই নাম লাভ করিয়াছিলেন।" (আদি ৯৫)

ইক্ষ্বাকুকুলে জাত রাজা মহাভিষ "সহস্র অশ্বমেধ ও শতসংখ্যক রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদনপূর্ব্বক দেবরাজকে প্রসন্ন করিয়া চরমে পরম ফল স্বর্গ ফল লাভ করিয়াছিলেন"। (আদি ৯৬)

নারদ রাজা সৃঞ্জয়কে কহিতেছেন, "ভগবান্ শূলপাণি উঁহাকে (রাজা মরুত্তকে) বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে দেখিয়া হিমাচলের এক প্রত্যন্ত পর্ব্বত প্রদান করিয়াছিলেন। বৃহস্পতি ও ইন্দ্র প্রভৃতি অমরগণ যজ্ঞান্তে উঁহার নিকট উপনীত হইলেন।" (দ্রোণ ৫৫)

রাজা সুহোত্র কুরুজাঙ্গলে বিস্তীর্ণ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে অপরিমিত সুবর্ণ দান করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে প্রভূত দক্ষিণা দান-সহকারে শতসহস্র অশ্বমেধ, রাজসূয়, পবিত্র ক্ষত্রিয় যজ্ঞ ও অন্যান্য নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান করিয়া অভিলষিত গতি লাভ করিলেন"। (দ্রোণ ৫৬)

নিম্নে আমরা আরো কতকগুলি অংশ মহাভারত হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি যে, তৎকালে নানারূপ যাগযজ্ঞই প্রাচীন আর্য্যগণের ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ ছিল।

"সেই যাজ্ঞিক অঙ্গরাজ পৌরব ক্রমে স্বধর্ম্মানুগত সর্ব্বকামপ্রদ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন।" (দ্রোণ ৫৭)

"শিবি রাজা সর্ব্ব-কার্য্য সমন্বিত বহুবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করেন ও তিনি যজ্ঞফলে দেবলোকে গমন করিয়াছেন"। (দ্রোণ ৫৮)

"ঐ সর্ব্বভূতানুকম্পী মহাত্মা (রাজা রামচন্দ্র) বিবিধ রাজ্য লাভ করিয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিয়া মহাযজ্ঞ ও ত্রিগুণ দক্ষিণ শত অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া হবি-দ্বারা পুরন্দরের প্রীতি-সাধন এবং অন্যান্য বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা ক্ষুৎপিপাসা পরাজয়পূর্ব্বক দেহিগণের সমস্ত রোগ নিবারণ করিয়াছিলেন।" (দ্রোণ ৫৯)

"ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি সুরগণ ভগীরথের যজ্ঞ অলঙ্কৃত করিয়া যজ্ঞাংশ গ্রহণ ও যজ্ঞবিঘ্ন নিবারণ করিয়াছেন।" (দ্রোণ ৬০)

"ঐ ভূপাল (দিলীপ) বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে এই বসুপূর্ণ বসুন্ধরা প্রদান করেন।" (দ্রোণ ৬১)

মান্ধাতা বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া পুণ্যার্জ্জিত লোকে গমন করেন। (দ্রোণ ৬২)

"নাভাগ-তনয় মহাত্মা অম্বরীষ—বিধানানুসারে শত-শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া স্বর্গে গমন করেন।" (দ্রোণ ৬৪)

"মহারাজ শশবিন্দু অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া তাহার ফলে স্বর্গে গমন করেন।" (দ্রোণ ৬৫)

নহুষ-তনয় যযাতি শত-শত রাজসূয়, শত অশ্বমেধ, সহস্র পুণ্ডরীক, শত বাজপেয়, সহস্র অতিরাত্র, অসংখ্য চাতুর্ম্মাস্য, বহুবিধ অগ্নিষ্টোম ও অন্যান্য অসংখ্য যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া স্বর্গে গমন করেন। (দ্রোণ ৬৩)

অমূর্ত্তরয়ার পুত্র গয় কেবল দর্শ-পৌর্ণমাস, নবশস্যেষ্টি

চাতুর্ম্মাস্য প্রভৃতি ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া স্বর্গে গমন করেন। (দ্রোণ ৬৬)

রন্তিদেবের যজ্ঞ-সময়ে পশুগণ স্বর্গ-লাভেচ্ছায় স্বয়ং যজ্ঞস্থলে আগমন করিত। (দ্রোণ ৬৭)

অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন, "বেদাধ্যয়নপূর্ব্বক পাণ্ডিত্যলাভ ও বিবিধ যত্নসহকারে ধন আহরণপূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করা অবশ্য কর্ত্তব্য।" "যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল অবিনশ্বর। মহারাজ দশরথ যজ্ঞকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়স্কর বলিয়া নির্দ্দেশ ও সতত উহার অনুষ্ঠান করিতেন। অতএব আপনি মহাজন-সেবিত যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক কুপথে পদার্পণ করিবেন না।" (শান্তি ৮)

পক্ষীরূপী ইন্দ্র বলিতেছেন, "বেদমন্ত্রোক্ত ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠানই ব্রাহ্মণের স্বর্গলাভের উপায়।" (শান্তি ১১)

মহারাজ জনকের মহিষী জনককে কহিতেছেন, "যে-ব্যক্তি গুরুলোকের প্রীতিসম্পাদনার্থ অহরহ বিপুলদক্ষিণ, বহুপশুসমন্বিত বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, এই জগতে তাঁহার তুল্য ধর্ম্মপরায়ণ আর কে হইতে পারে?" (শান্তি ১৮)

বেদব্যাস যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, "রাজন্, আমি তোমাকে অনুজ্ঞা করিতেছি, তুমি অচিরাৎ প্রভূতদক্ষিণ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করো। অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা সমুদয় পাতক বিনষ্ট হইয়া থাকে, অতএব তুমি ঐ যজ্ঞ সমাধান করিলে নিশ্চয়ই নিষ্পাপ হইবে।" (আশ্বমেধিক ৭১)

স্যমরশ্মি কহিতেছেন, "যে-ব্রাহ্মণ বেদশাস্ত্রানুসারে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেন, পাপ কখনই তাঁহাকে হরণ বা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় না। তিনি যজ্ঞ ও যজ্ঞে নিহত পশুদিগের সহিত স্বর্গে গমন করিতে পারেন।" (শান্তি ২৬৯)

পূর্ব্ব কালে ব্রাহ্মণদিগের এইরূপ ধারণা ছিল যে, যজ্ঞে নিহত পশুগণ যজ্ঞকর্ত্তার সহিত স্বর্গে গমন করে। এই ধারণা হইতেই পশু বলির সৃষ্টি হইয়াছিল। উপরোক্ত উদ্ধৃত অংশ হইতে ইহাই বুঝিতে পারা যায়।

যুধিষ্ঠির স্বর্গে গমন করিলে দেবরাজ তাঁহাকে কহিলেন, "আজি অবধি গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ সতত তোমার শুশ্রূষা করিবে। অতঃপর তুমি রাজসূয়জিত-লোকসমুদয় ও তপস্যায় মহাফল উপভোগে প্রবৃত্ত হও।" (স্বর্গারোহণ ৩)

এইসমস্ত স্বর্গের কল্পনা উচ্চশ্রেণীর নহে। স্বর্গটাকে তাঁহারা একটি অফুরন্ত বিলাস ও উপভোগের স্থান বলিয়া মনে করিতেন।

নারদ একস্থানে মাতলিকে বলিতেছেন, "ঐ দেখ, অদিতির জ্যেষ্ঠ পুত্র সুরশ্রেষ্ঠ দেবরাজের কাঞ্চনময় সুরাগৃহ শোভা পাইতেছে।" (উদ্যোগ ৯৭)

সিদ্ধপুরুষগণ স্বর্গে গিয়া বিলাস উপভোগ করিতেন। সভাপর্ব্বে নারদ যুধিষ্ঠিরকে স্বর্গের যাবতীয় সভার বর্ণনা করিতেছেন। তাঁহার বর্ণনা-মতে ইন্দ্র, যম, বরুণ, কুবের ও ব্রহ্মা সকলের সভাতেই অপ্সরাগণ নৃত্যগীতাদির দ্বারা সকলের মন হরণ করে। (সভা ৭।৮।৯।১০।১১ ; শান্তি পর্ব্ব ৯৮ ও ৯৯ অধ্যায়) বীর পুরুষগণ ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে সংগ্রামে নিহত হইলে অপ্সরাসকল তাহাদিগকে পতিত্বে বরণ করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইয়া থাকে।

আরও তাঁহাদিগের ধারণা ছিল যে, স্বর্গে গমন করিলে মৃত আত্মীয়-স্বজনগণের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। যুধিষ্ঠির যখন স্বর্গে যান তখন তিনি তথায় পিতা মাতা ভ্রাতৃগণ সকলেরই সাক্ষাৎ পাইলেন। স্বর্গপ্রাপ্তির উপায় ছিল নানাবিধ যাগযজ্ঞ। ইহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি।

এইসমস্ত হিংসাময় পশু-যজ্ঞ কিন্তু সমাজে ক্রমশঃ নিন্দনীয় হইয়া উঠিল। জ্ঞানী লোকসমূহ এইসমস্ত কর্ম্মকাণ্ডের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়ায় ক্রমশঃ আড়ম্বরপূর্ণ যাগযজ্ঞ ভারত হইতে উঠিয়া গেল।

কোনো ব্যক্তি তাহার পিতাকে বলিতেছে, "উত্তরায়ণ উপস্থিত হইলে আমি শান্তি-যজ্ঞ, ব্রহ্ম-যজ্ঞ, বাক্-যজ্ঞ, মনোযজ্ঞ ও কর্ম্মযজ্ঞে প্রবৃত্ত হইব। মাদৃশ ব্যক্তিদিগের কখনই হিংসামূলক পশু যজ্ঞ বা অনিষ্টফলোপদায়ক ক্ষাত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্তি জন্মে না।" (শান্তি ১৭৫)

যে-সমস্ত ক্ষাত্র যজ্ঞ পূর্ব্বে স্বর্গপ্রাপ্তির উপায় ছিল তাহা এক্ষণে অনিষ্টফলোপদায়ক বলিয়া বিবেচিত হইতেছে।

সনৎসুজাত বলিতেছেন, "অবিদ্বান্ পুরুষ যাগ ও হোমাত্মক কর্ম্ম দ্বারা মোক্ষলাভ করিতে পারেন না।" (উদ্যোগ ৪৪)

অন্যত্র তিনি বলিতেছেন, "কিন্তু বিদ্বান্ ব্যক্তি জ্ঞান-প্রভাবে ব্রহ্মলাভ করিয়া থাকেন।" (উদ্যোগ ৪৩)

শুকদেব কহিতেছেন, "এই নিমিত্ত পারদর্শী যতিরা কদাচ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন না। জীব কর্ম্ম-প্রভাবে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে; কিন্তু জ্ঞান-প্রভাবে তাহার নিত্য অনৃতত্ব লাভ হয়।" (শান্তি ২৪১)

এইসমস্ত উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, সমাজ এইসময় জ্ঞানকাণ্ডের পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছে।

বেদব্যাস কহিতেছেন, "যিনি জীবের প্রতি দয়াবান্, সর্ব্বজ্ঞ ও সমুদয়বেদবেত্তা হইয়া মৃত্যুকে বশীভূত করিতে সমর্থ হয়েন, তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ। যথার্থ বিধি পরিত্যাগ করিয়া কেবল নানা-প্রকার ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেই ব্রাহ্মণ্যলাভ হয় না।" (শান্তি ২৫১)

এই ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞ পূর্ব্বযুগে আদরণীয় ছিল।

জাজলি তুলাধার নামক বণিককে কহিতেছেন, "যাহা হউক এক্ষণে ব্রাহ্মণেরা আপনাদের কর্ত্তব্য অন্তর্যাগ পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্ষত্রিয়গণের কর্ত্তব্য হিংসাময় জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। দেখুন, লুব্ধস্বভাব ধনপরায়ণ আস্তিকেরা বেদবাক্যের যথার্থ মর্ম্ম অবগত না হইয়া, সত্যের ন্যায় লক্ষিত মিথ্যাময় ক্ষত্রিয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও যজমানকে বিবিধ বস্তুদানে উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন।" (শান্তি ২৬৩)

নানারূপ দ্রব্যের সমাবেশ ও বহু আড়ম্বর, নানাবিধ মন্ত্রপাঠ ও পশুবধ এগুলি অপ্রয়োজনীয় বোধে সকলেই ক্রমে ইহার উপর বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল ও সকলে অন্তর্যাগের পক্ষপাতী হইয়াছিল।

তুলাধার জাজলিকে বলিতেছেন, "তাঁহারা (জ্ঞানবান্ লোক) স্বর্গ যশ বা ধন লাভের অভিলাষে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন না। কেবল সজ্জন-সেবিত পথের অনুসরণ করিয়া থাকেন এবং হিংসাধর্ম্মে লিপ্ত না হইয়া যাগ ও যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েন।" (শান্তি ২৬৩)

তিনি আরও বলিতেছেন, "যে-সকল ব্রাহ্মণ যথার্থ জ্ঞানবান্, তাঁহারা আপনাদিগকেই যজ্ঞীয় উপকরণরূপে কল্পনা করিয়া প্রজাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত মানসিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। আর লুব্ধ ঋত্বিকগণ স্বর্গলাভার্থী ব্যক্তিদিগকেই যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করাইয়া পাকেন এবং স্বধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা প্রজাদিগকে স্বর্গলাভের উপায় বিধান করিয়া দেন।" (শান্তি ২৬৩)

অন্যত্র তিনি বলিতেছেন "সকাম মূঢ় ব্যক্তিরা ওষধি পরিত্যাগপূর্ব্বক পশুহিংসা দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়।" (শান্তি ২৬৩)

পুনরায় তিনি বলিতেছেন, "অতএব পশুহিংসা অপেক্ষা পুরোডাশ দ্বারা যজ্ঞ-সম্পাদন করাই শ্রেয়স্কর।" (শান্তি ২৬৩)

এইসমস্ত উক্তিদ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, পশুহিংসা সে-সময় কতদূর ঘৃণিত হইয়া গিয়াছিল।

নরপতি বিচখ্যু গোমেধ যজ্ঞে নিহত গো-সমুদয় দর্শন করিয়া আক্ষেপ করিতেছেন ও কহিতেছেন "ধূর্ত্তেরাই মদ্য, মাংস, মধু, মৎস্য, তালরস ও যবাগূতে আসক্ত হইয়া থাকে।" (শান্তি ২৬৫)

অনেকে বলেন গোমেধ একটি আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান। উহা যে আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান নয়—তাহা উক্ত বাক্য এবং মহাভারতের আরও অন্যান্য অংশ পাঠে সহজেই বোধগম্য হয়।

"একদা মহর্ষি ত্বষ্টা নরপতি নহুষের গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিলে তিনি শাশ্বত বেদ-বিধানানুসারে তাঁহাকে মধুপর্ক-প্রদানার্থ গোবধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময় জ্ঞানবান্ সংযমী মহাত্মা কপিল যদৃচ্ছাক্রমে তথায় সমাগত হইয়া নহুষকে গোবধে উদ্যত দেখিয়া স্বীয় শুভকরী নৈষ্ঠিকী বুদ্ধিপ্রভাবে 'হা বেদ' এই শব্দ উচ্চারণ করিলেন।" (শান্তি ২৬৮)

ঐ সময়ে স্যুমরশ্মি নামক মহর্ষি কপিলের সহিত খুব তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ করিয়া দিলেন।

স্যুমরশ্মি যাহা বলিলেন তাহার সার-মর্ম্ম এই, "বেদে কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড উভয়ই সমান ও উক্তরূপ গোহত্যা নিন্দনীয় নহে।" কপিল বলিলেন, 'পশুহত্যা নিন্দনীয়

ও কর্ম্মকাণ্ড অপেক্ষা জ্ঞানকাণ্ড উৎকৃষ্ট।" উভয়ে বহুক্ষণ বাদানুবাদের পর কপিল স্যুমরশ্মিকে স্বমতে আনয়ন করিলেন।

এক যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসীতে এইরূপ তর্কবিতর্ক হয়; তাহাতে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণই জয়লাভ করে ও যজ্ঞে পশুবধ করে। (আশ্বমেধিক ২৮)

পূর্ব্বে উঞ্ছবৃত্তি সত্যনামা এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি যজ্ঞে পশুবধ করিতেন। একদা একটি মৃগকে বধ করিবার সঙ্কল্প করেন। সেইসময় তিনি দেখিলেন, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ বিচিত্র বিমান লইয়া তাঁহার অপেক্ষা করিতেছে। মৃগবধ করিলেই তিনি উক্ত বিমানে চড়িয়া অপ্সরাগণের সহিত স্বর্গে গমন করিতেন। কিন্তু তাঁহার মৃগবধ করা হইল না। সহসা তাঁহারা জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হইল। তিনি বুঝিলেন হিংসা করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করা শ্রেয়স্কর নহে। মহাভারতে লিখিত আছে মৃগ স্বয়ং তাঁহাকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করেন। ধর্ম্মই মৃগরূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছিলেন। (শান্তি ২৭২)

এই দ্বিতীয় স্তরে আমরা দেখিতেছি পশুযজ্ঞ ক্রমে বর্জ্জিত হইতেছে। বেদের ধর্ম্মকাণ্ড যে অসার ও ভ্রান্তিপূর্ণ তাহাও এইসময়ে সকলে বুঝিতে পারিয়াছিল।

রাজর্ষি জনক পরাশরকে বলিতেছেন, "অতএব আমি শাস্ত্রসমালোচনপূর্ব্বক তোমাকে কহিতেছি যে, হিংসাত্মক কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্মজ্ঞান অবলম্বন করা মনুষ্যের অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম।" (শান্তি ২৯৫)

যাজ্ঞবল্ক্য গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসুকে কহিতেছেন, "কর্ম্ম-কাণ্ডোক্ত নশ্বর ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক অক্ষয় ধর্ম্মে নিরত হইয়া যত্নসহকারে অহরহ জীবাত্মাকে বিশুদ্ধরূপে দর্শন করিতে পারিলেই প্রকৃতিকে অতিক্রম ও পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়।" (শান্তি ৩১৯)

নারদ শুকদেবকে বলিতেছেন,"লোকে একবার দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক নিতান্তই দুঃখিত হইয়া সেই দুঃখ দূরীকৃত করিবার নিমিত্ত নানাপ্রকার জীবহিংসা দ্বারা বিবিধ যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে।" (শান্তি ৩৩০)

দেবরাজ ইন্দ্র কোনো সময়ে এক যজ্ঞ করেন। ঐ যজ্ঞে "পশুবধের সময় উপস্থিত হইলে মহর্ষিগণ পশুদিগকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে ইন্দ্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "দেবরাজ! এরূপ যজ্ঞানুষ্ঠান কখনই মঙ্গলকর নহে।......যজ্ঞে পশুহত্যা করা শাস্ত্রসঙ্গত নহে।" (আশ্বমেধিক ৯১)

ভগবদ্গীতায় ভগবান্ বলিতেছেন "যেমন কূপ, বাপী, তড়াগ প্রভৃতি জলাশয়ে যে-সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, এক-মাত্র মহাহ্রদে সেইসকল প্রয়োজন সম্পন্ন হইয়া থাকে, সেইরূপ সমুদয়-বেদে যে-সকল কর্ম্মফল বর্ণিত আছে,সংশয়-রহিত বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ একমাত্র ব্রহ্মে তৎসমুদয়ই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।" (ভীষ্ম ২৬)

অন্যত্র ভগবান বলিতেছেন, "যাঁহারা বেদ-বিহিত যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, তাঁহারা স্বর্গলাভ করিয়া পুনরায় মর্ত্ত্যে জন্মগ্রহণ করেন, যাঁহারা অনন্যমনে আমাকে চিন্তা ও আরাধনা করেন আমি তাঁহাদিগকে যোগক্ষেম প্রদান করিয়া থাকি।" (ভীষ্ম ৩৩)

এস্থলে যজ্ঞ অপেক্ষা শ্রদ্ধা ও ভক্তির প্রাধান্য স্বীকৃত হইতেছে।

ভগবান অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, "হে অর্জ্জুন! তুমি আমার যে নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য মূর্ত্তি অবলোকন করিলে দেবগণ উহা নেত্রগোচর করিবার নিমিত্ত নিয়ত অভিলাষ করিয়া থাকেন। কিন্তু কেহই বেদাধ্যয়ন, দান, তপ ও যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা আমার ঐ মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয় না।" (ভীষ্ম ৩৫)

বেদব্যাস শুকদেবকে বলিতেছেন, "যিনি লোভপরাঙ্মুখ দুঃখশূন্য, ইন্দ্রিয়নিগ্রহশীল, যজ্ঞাদিকার্য্যবিহীন.........সেই যোগী মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়েন।" (শান্তি ২৩৬)

অন্যত্র তিনি বলিতেছেন, "কর্ম্মকাণ্ড বেদে ব্রহ্ম ইন্দ্রাদি দেবতারূপে নিরূপিত হইয়াছেন বলিয়া, কর্ম্মকাণ্ড বেদবিদ্ ব্যক্তিরা তাঁহাকে পরিজ্ঞাত হইতে পারে না। জ্ঞানকাণ্ড বেদে তিনি ব্যক্তরূপে কথিত হইয়াছেন; এই নিমিত্ত জ্ঞানকাণ্ড বেদবেত্তা তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরাই তাঁহাকে দর্শন করিতে সমর্থ হন।" (শান্তি ২৩৮)

কর্ম্মকাণ্ড বেদে নানা খণ্ড দেবতার কল্পনা করায় তাহা ব্যাসদেবের মতে জ্ঞানকাণ্ড অপেক্ষা নিকৃষ্ট। তবেই দেখা যাইতেছে সমাজ তিনটি কারণে কর্ম্মকাণ্ড বর্জ্জন করিয়া-

ছিল। প্রথমতঃ, যজ্ঞে পশুহিংসা। দ্বিতীয়তঃ, ব্রাহ্মণগণ নিজের উদর পূরণের নিমিত্ত যজমানকে নানারূপ দ্রব্যের আয়োজন করিতে বলিতেন ও নানারূপ মিথ্যা অনুষ্ঠান করিতেন। তৃতীয়তঃ, কর্ম্মকাণ্ডে বহু দেবদেবী বিশ্বাস করিতে হইত। এই তিনটি আবর্জ্জনা থাকায় কর্ম্মকাণ্ডের উপর ঋষিদিগের শ্রদ্ধা একেবারে চলিয়া গেল ও সমাজ ক্রমে-ক্রমে জ্ঞানকাণ্ডের পক্ষপাতী হইয়া উঠিল। এই সময় ভারতে উপনিষদের ধর্ম্ম প্রচারিত হয়।

এই স্তরে ধর্ম্মবিশ্বাস যেরূপ উচ্চ হইল স্বর্গ বা ঈশ্বরের ধারণাও সেইরূপ উচ্চ হইল। ব্যাসদেব শুকদেবকে কহিতেছেন, "কাল সকল ভূতকেই বিনষ্ট করিতেছে, কিন্তু যাঁহার প্রভাবে সেই কাল বিনষ্ট হইয়া থাকে, তাঁহাকে কেহই পরিজ্ঞাত হইতে পারে না। সেই পরম স্বরূপ পরমাত্মা ঊর্দ্ধ, অধঃ, মধ্য বা তির্য্যক্ স্থানে অবলোকিত হয়েন না, এই সমুদয় লোকই তাঁহার অন্তরস্থ; তাঁহার বহির্ভাগে কিছুই নাই।" (শান্তি ২৩৯) সেই দেবদেবী, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, সিদ্ধপুরুষ, আত্মীয়-নৃত্যগীত, পানভোজন, হাস্য-কৌতুকাদি-সমন্বিত নানাবিধ ঐশ্বর্য্যপূর্ণ স্বর্গের কল্পনা এখানে কিরূপ চরম দার্শনিক তত্ত্বে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

ব্যাসদেব পুনরায় কহিতেছেন "জীব কর্ম্ম-প্রভাবে স্বজন, পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু জ্ঞান-প্রভাবে তাহার নিত্য অমৃতত্ব লাভ হয়।" (শান্তি ২৪১)

সমাজ এখন নিত্য অমৃতের সন্ধানে ছুটিয়াছে। স্বর্গের সুখ-ঐশ্বর্য্য এখন অত্যন্ত তুচ্ছ ও বেদকে এখন ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ হইতেছে।

বেদব্যাস কহিতেছেন, 'বেদ অপেক্ষা সত্য, সত্য অপেক্ষা ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ অপেক্ষা দান, দান অপেক্ষা তপস্যা, তপস্যা অপেক্ষা বৈরাগ্য, বৈরাগ্য অপেক্ষা আত্মজ্ঞান, আত্মজ্ঞান অপেক্ষা সমাধি, সমাধি অপেক্ষা ব্রহ্মভাগপ্রাপ্তি উৎকৃষ্ট।" (শান্তি ২৫১) বেদ এযুগে সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন স্তরে পড়িয়া গিয়াছে।

বিদেহরাজ ধর্ম্মধ্বজ সুলভাকে বলিতেছেন, "কেহ-কেহ সমধিক জ্ঞানযুক্ত কর্ম্মকে, কেহ-কেহ সমধিক কর্ম্মযুক্ত জ্ঞানকে মোক্ষের সাধন বলিয়া নিরূপণ করেন, কিন্তু মহাত্মা পঞ্চশিখ ঐ উভয় মত পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল বিশুদ্ধ জ্ঞানকেই মুক্তি-লাভের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।" (শান্তি ৩২১)

কোনো গুরু তাঁহার শিষ্যকে উপদেশ দিতেছেন, "জ্ঞানই পরম ব্রহ্ম এবং সন্ন্যাসই উৎকৃষ্ট তপস্যা, যে-ব্যক্তি নিগূঢ়ভাবে জ্ঞানতত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ হয়, তাহার সমুদয় কামনা পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। (আশ্বমেধিক ৩৫)

ব্রহ্মা দেবগণকে বলিতেছেন, "তত্ত্বদর্শী বৃদ্ধগণ জ্ঞানকে মোক্ষসাধক বলিয়া কীর্ত্তন করেন। এই নিমিত্ত বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভ হইলেই মনুষ্য সমুদয় পাপ হইতে বিমুক্ত হয়।" (অশ্বমেধিক ৫০)

যুধিষ্ঠির কোনো স্থলে কহিতেছেন, "তপস্যা অপেক্ষা ত্যাগ ও ত্যাগ অপেক্ষা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ উৎকৃষ্ট।" (শান্তি ১৯)

একবার যখন নানারূপ বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া নির্ম্মল জ্ঞানের স্রোত সমাজে প্রবাহিত হইতে লাগিল তখন সে চতুর্দ্দিকে সত্যের অনুসন্ধানে ছুটিল। তাহারই ফলে এই যুগে ভারতের অতীত গৌরবের সাক্ষীস্বরূপ অনেকগুলি উচ্চ অঙ্গের দর্শন রচিত হয়। 'ঈশ্বর এক,' ইহা উপনিষৎ ঠিক করিয়া দিল। কিন্তু তাহা পাওয়া যায় কিরূপে? যোগশাস্ত্র বলিলেন, "আমি কতকগুলি প্রক্রিয়া বলিয়া দিতেছি সেই-সকল অনুষ্ঠান করিলে চিত্ত সংযত ও একাগ্র হয়। তখন পরমেশ্বরের ধ্যান করিলে তাঁহার জ্যোতি দর্শন করা যায়। এই যোগশাস্ত্র পরবর্ত্তীকালে কতকগুলি নীরস অনুষ্ঠানে পরিণত হয়।

আর্য্য-সভ্যতার অন্যতম স্তম্ভ, সাংখ্যশাস্ত্র এই সময়ে প্রচারিত হয়। আর্য্যজাতির জ্ঞান কতদূর উচ্চে উঠিয়াছিল তাহা এই শাস্ত্র পাঠে অবগত হওয়া যায়। কেবল বিশুদ্ধ যুক্তি ছাড়া ইহাতে আর কিছুই নাই। ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব যুক্তিতে পাওয়া যায় না, সেজন্য সাংখ্য ইহা অস্বীকার করেন। ঈশ্বরের অস্তিত্বও যুক্তিবলে প্রমাণিত হয় না; সেজন্য সাংখ্য-মতাবলম্বীগণ ঈশ্বরও মানেন না। সমুদয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিশ্লেষণ করিয়া ইঁহারা চতুর্ব্বিংশতি পদার্থ পাইলেন। তখন তাঁহারা কহিলেন, এই চতুর্ব্বিংশতি

তত্ত্ব অবগত হইলেই মোক্ষ লাভ করিতে পারা যায়। ইহাই সাংখ্য শাস্ত্র।

এই সময় আর একটি ধর্ম উদ্ভূত হয়। তাহা সত্যধর্ম। এই ধর্ম-মতে দান, পরোপকার, সত্য, অহিংসা প্রভৃতি কর্মদ্বারা মানব মোক্ষ লাভ করিতে পারে। ইহা জৈন বা বৌদ্ধধর্ম। মহাভারতে ইহা সত্যধর্ম বলিয়া খ্যাত। এই দুইটি ধর্মের যাহা সার-মর্ম তাহা মহাভারতের বহুস্থানে পাওয়া যায়। শান্তি ও অনুশাসন পর্ব্বদুইটি এই ধর্মকথায় পরিপূর্ণ। তথায় ইহা 'সত্য' ধর্ম নামে খ্যাত।

ধর্মবিবর্ত্তনের এই তৃতীয় স্তরে আমরা এই তিনটি ধর্ম দেখিতে পাই। সাংখ্য বলিতেন, "চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব জানিলেই মোক্ষ; যোগশাস্ত্র বলিতেন, যোগ অভ্যাস করিলেই মুক্তি, আর সত্য ধর্ম বলিতেন, মনুষ্যের হৃদয় পবিত্র ও উন্নত এবং চরিত্র বিশুদ্ধ হইলেই জীবের মোক্ষ বা নির্ব্বাণ লাভ হয়। ইহার মধ্যে বিদ্বান্ ও উচ্চ দার্শনিকগণ সাংখ্যমতাবলম্বী, যোগী, সন্ন্যাসীগণ যোগ মতাবলম্বী, উদারহৃদয়-সম্পন্ন উচ্চ জাতি ও শিক্ষিত বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি জাতি সত্যধর্মাবলম্বী ছিলেন। সকলেই আপন-আপন অবলম্বিত পন্থাকেই অন্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিতেন।

ভগবদ্গীতায় ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, "নিষ্পাপ যোগী অধিকতর যত্ন-সহকারে অনেক জন্মে সিদ্ধ হইয়া পরিশেষে পরম গতি প্রাপ্ত হয়েন। হে অর্জ্জুন! যোগী তপস্বী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এবং কর্ম্মী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" (ভীষ্ম ৩০; গীতা ৬)

যুধিষ্ঠির বলিতেছেন, "মোক্ষার্থীরা যে-গতি লাভ করেন তাহা নির্দ্দেশ করা নিতান্ত সুকঠিন; অতএব যোগই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও প্রার্থনীয়।" (শান্তি ১৯)

ব্যাসদেব বলিতেছেন, "স্থূল দেহের সহিত আত্মার অভেদ-বুদ্ধি-বিমুক্ত যোগী সর্ব্বাগ্রে হৃদয়াকাশে আকাশ-সমাশ্রিত সূক্ষ্ম নীহারের ন্যায় পদার্থ দর্শন করিয়া থাকেন। অনন্তর সেই ধূমরূপ তিরোহিত হইলে তাঁহার হৃদয়াকাশে জলরূপ দর্শন হয়; জলাকাশ অন্তর্ধান করিলে বহ্নিরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে, বহ্নিরূপ তিরোহিত হইলে সর্ব্বসংহারক বায়ুরূপ প্রকাশিত হয় এবং সেই বায়ু সূক্ষ্ম হইলে উহার রূপ ঊর্ণাতন্তুর ন্যায় নিরীক্ষিত হইয়া থাকে। তৎপরে উহা শুক্লগতি প্রাপ্ত হইয়া বিরূপ আকারের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। যোগীদিগের এইসমস্ত রূপ অনুভূত হইলে যে-প্রকার ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহাও শ্রবণ করো। যে-যোগী পার্থিব ঐশ্বর্য্যে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তিনি প্রজাপতি ব্রহ্মার ন্যায় অক্ষুব্ধ হইয়া স্বীয় কলেবর হইতে প্রজা সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয়েন।" (শান্তি ২৩৬)

অন্যত্র তিনি বলিতেছেন, "পাঁচ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে এক-মাত্র ইন্দ্রিয় বিষয়ে আসক্ত থাকিলেই মনুষ্যের শাস্ত্রীয় বুদ্ধি সেই ইন্দ্রিয়রূপ একমাত্র দ্বার অবলম্বন করিয়া সছিদ্র চর্ম্ম-ময় জলাধারস্থ সলিলের ন্যায় নিঃসৃত হইয়া যায়; অতএব ধীবর যেমন প্রথমে জালদংশক্ষম মৎস্যদিগকে রুদ্ধ করিয়া অন্যান্য মৎস্য সমুদয়কে আক্রমণ করে, তদ্রূপ যোগ-শীল ব্যক্তি প্রথমে মনকে রুদ্ধ করিয়া পশ্চাৎ অন্যান্য ইন্দ্রিয়-গণকে সংযমিত করিবেন। যোগবিদ্ পুরুষ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও জিহ্বা এই চারি ইন্দ্রিয়কে বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া মনে ও মনকে সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত করিয়া বুদ্ধিতে সন্নিবেশিত করিবেন। মন ইন্দ্রিয়গণের নিকট সমবেত হইয়া বুদ্ধিতে অবস্থানপূর্ব্বক প্রসন্ন হইলেই যোগী ব্যক্তি ধূমবিহীন প্রজ্বলিত অনল-শিখার ন্যায় সেই তেজঃ-স্বরূপ সর্ব্বব্যাপী পরম ব্রহ্মকে দীপ্তিমান্ সূর্য্যের ন্যায় ও ও গগনমণ্ডলস্থ বিদ্যুদগ্নির ন্যায় হৃদয়-মধ্যে দর্শন করিয়া থাকেন। সর্ব্বভূতহিতৈষী ধৃতিমান্ জ্ঞানসম্পন্ন মহাত্মা-গণই যোগবলে তাঁহার দর্শনলাভে সমর্থ হয়েন। যে-ব্যক্তি জনশূন্য প্রদেশে একাকী উপবিষ্ট হইয়া সংযতচিত্তে ছয় মাস পূর্ব্বোক্তরূপে যোগানুষ্ঠান করিতে পারেন তাঁহার ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।" (শান্তি ২৪০)

বেদব্যাস শুকদেবকে কহিতেছেন, "মনুষ্য যত্নবান্ হইয়া শিশু সন্তানদিগের ন্যায় কুমার্গগামী ইন্দ্রিয়দিগকে বুদ্ধিদ্বারা সংযমিত করিয়া একাগ্রচিত্ত হইবে। মন ও ইন্দ্রিয়গণের একাগ্রতাই পরম তপস্যা ও সর্ব্বকর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" (শান্তি ২৫০)

ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে কহিতেছেন, "মহাত্মা হারীত সন্ন্যাস-ধর্ম্মকেই মোক্ষলাভের প্রধান সাধন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া

গিয়াছেন। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরাই এই ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া মোক্ষলাভ করিতে পারেন।" (শান্তি ২৭৮)

অন্যত্র তিনি কহিতেছেন, "বৎস, যে-ব্যক্তি মোক্ষ-ধর্ম্মের অনুশীলনে যত্নবান্, অল্পাহারনিরত এবং জিতেন্দ্রিয় হয়েন, তিনিই নির্ব্বিশেষে ব্রহ্মপদ লাভ করিতে পারেন। অতএব লাভালাভে সমজ্ঞান ও উপস্থিত বিষয়ে নিরপেক্ষ হইয়া গৃহাশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য।"তাঁহারা কর্ম্মানুষ্ঠানপূর্ব্বক পাপপুণ্য উপার্জ্জন করিবেন না। বৈরাগ্য আশ্রয়পূর্ব্বক নিত্য তৃপ্ত, পরম পবিতুষ্ট, প্রসন্নবদন, প্রফুল্লেন্দ্রিয়, ভয়শূন্য, জপপরায়ণ ও মৌনাবলম্বী হইয়া থাকিবেন।" "ধর্ম্ম-বিষয়ে নিস্পৃহ সর্ব্বভূতে সমদর্শী আত্মারাম, প্রশান্তচিত্ত, অল্পাহারনিরত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া অন্নাদি বা ফলমূলাদি দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা তাহাদের অবশ্যকর্ত্তব্য।" (শান্তি ২৭৮) ইহা ত্যাগ-ধর্ম্ম ও এই ধর্ম্মই গীতায় নিষ্কাম ধর্ম্মরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

মহর্ষি সনৎ নারদকে বলিতেছেন, "যোগবিহীন ব্যক্তি-দিগের মোক্ষবিষয়িণী বুদ্ধি নাই। যোগ ব্যতীত কেহই সুখলাভে সমর্থ হয় না।" (শান্তি ২৮৭) এই স্তরে যতগুলি ধর্ম্ম প্রচারিত হয় তাহার মধ্যে যোগশাস্ত্রই ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন। সাংখ্য, সত্যধর্ম্ম, প্রভৃতি ধর্ম্ম ঈশ্বর মানিতেন না বা তাঁহার কোনো খোঁজ-খবর রাখিতেন না। এইজন্য বেদে ইহাদের আদর নাই।

বশিষ্ঠদেব রাজর্ষি জনককে বলিতেছেন, "আমি পূর্ব্বে শাস্ত্রের যথাতত্ত্ব নিরূপণ সময়ে যে সাংখ্য ও যোগ-শাস্ত্রের কথা কহিয়াছি সে উভয়ই একরূপ। তন্মধ্যে সাংখ্য-শাস্ত্রে শিষ্যদিগের অনায়াসে জ্ঞানলাভ হয়, কিন্তু যোগশাস্ত্র অতি বিস্তীর্ণ বলিয়া উহাতে শীঘ্র জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। যোগশাস্ত্র অতি বিস্তীর্ণ ও দুরবগাহ বটে, কিন্তু বেদে উহার সমধিক সমাদর দৃষ্ট হইয়া থাকে। সাংখ্য-মতাবলম্বীরা ষড়্‌বিংশকে পরম তত্ত্ব না বলিয়া পঞ্চ-বিংশকেই পরমতত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; এই কারণেই বেদশাস্ত্রে সাংখ্যের সম্যক্ আদর নাই।" (শান্তি ৩০৮) সাংখ্য-মতাবলম্বীগণ ঈশ্বর মানিতেন না বলিয়া বেদবিদ্ পণ্ডিতগণ ইহার সমাদর করিতেন না।

তিনি অন্যত্র বলিতেছেন, "প্রকৃতিবাদী সাংখ্যবিৎ পণ্ডিতগণ প্রকৃতিকেই প্রধান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাঁহারা কহিয়া থাকেন যে, প্রধানা প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার ও অহঙ্কার হইতে শব্দ স্পর্শাদি পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূত উৎপন্ন হয়। সাংখ্যবাদীরা এই আটটিকেই প্রকৃতি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়, আকাশাদি পঞ্চভূত ও মন এই ষোড়শটি ঐ আটটি প্রকৃতির বিকার। যে-পদার্থ হইতে যে-পদার্থের উৎপত্তি হয় তাহা সেই পদার্থেই লীন হইয়া থাকে।" (শান্তি ৩০৭)

দেবল ঋষি নারদকে বলিতেছেন, "পুণ্য-পাপের ক্ষয়ের নিমিত্ত সাংখ্য-শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ আবশ্যক।" (শান্তি ২৭৫)

ভীষ্ম কহিতেছেন, "ধর্ম্ম-রাজ সাংখ্য মতাবলম্বীরা সাংখ্যের এবং যোগীরা যোগের সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। যোগিগণ ঈশ্বর ব্যতীত মুক্তিলাভের উপায়ান্তর নাই বলিয়া আপনাদিগের মতের শ্রেষ্ঠতা সম্পাদন করেন। কিন্তু সাংখ্য-মতাবলম্বীরা কহেন যে, ঈশ্বরে ভক্তি করিবার কোনো প্রয়োজন নাই। যিনি সমুদয় তত্ত্ব অবগত হইয়া বিষয় হইতে বিমুখ হয়েন তিনি দেহনাশের পর নিশ্চয়ই মুক্তিলাভের অধিকারী হইয়া থাকেন।" (শান্তি ৩০১)

এইযুগে লোকে ঈশ্বর লইয়া কিরূপ তর্ক করিতেন তাহা নিম্নলিখিত বাক্য হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়। বেদব্যাস যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন, "মহারাজ! কর্ম্মের কর্ত্তা কে? ঈশ্বর না পুরুষ?.........যদি ঈশ্বর সমুদয় কার্য্যের কর্ত্তা হয়েন তাহা হইলে পুরুষেরা ঈশ্বরের নিয়োগানুসারেই শুভ বা অশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সুতরাং ঈশ্বরকেই তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে।" (শান্তি ৩২)

ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে কহিতেছেন "ধর্ম্মরাজ! কপিলাদি মহর্ষিগণ এই সূক্ষ্ম সাংখ্যমত যেরূপে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করো। এই সাংখ্যমত অভ্রান্ত ও বহুবিধগুণযুক্ত। ইহাতে দোষের লেশমাত্র নাই।" (শান্তি ৩০২)

অন্যত্র তিনি বলিতেছেন, "মহাত্মা মনীষিগণ এই

সাংখ্য-মতকে অক্ষয়, ধ্রুব, পূর্ণব্রহ্ম, সনাতন, নির্দ্বন্দ্ব, নির্ব্বিকার, নিত্য এবং আদি অন্ত ও মধ্যবিহীন বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। উহা যোগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উহা হইতে সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় উপস্থিত হয়। পরমর্ষিরা শাস্ত্র-মধ্যে সাংখ্য-মতকেই উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকেন। দেবতা, ব্রাহ্মণ, যোগী সাংখ্যমতাবলম্বী ও শান্তিমতাবলম্বী ব্যক্তিরা যে-পরমাত্মার প্রতিনিয়ত স্তব করিয়া থাকেন, সাংখ্য-শাস্ত্রই সেই নিরাকার পরব্রহ্মের মূর্ত্তি-স্বরূপ।" (শান্তি ৩০২)

বৈদিক যুগে বেদকেই ব্রহ্ম-স্বরূপ কল্পনা করা হইত। এযুগে সাংখ্য সেইস্থান অধিকার করিল।

অনেকে এই সাংখ্য-শাস্ত্রের অকাট্য যুক্তি দেখিয়া ইহা গ্রহণ করিয়াও মনকে ভালোরূপ বুঝাইতে পারিতেন না বলিয়া সাংখ্য-প্রোক্ত চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের অতীত এক পরমাত্মা বা ঈশ্বরের কল্পনা করিতেন।

ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে কহিতেছেন, "চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বাতীত সনাতন বিষ্ণুই অক্ষয় পদার্থ। তিনি তত্ত্বমধ্যে পরিগণিত নহেন, যথার্থ বটে, সমুদয় তত্ত্বে অবস্থান করিতেছেন বলিয়া পণ্ডিতেরা তাঁহাকে পঞ্চবিংশ তত্ত্ব বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন।" (শান্তি ৩০৩)

এই যুগের ধর্ম্মগুলির বিশেষত্ব এই যে, এইগুলি নিবৃত্তিমূলক ধর্ম্ম। বৈদিক ক্রিয়াকলাপগুলি প্রবৃত্তি-মার্গ ছিল। প্রত্যেক যজ্ঞের কিছু উদ্দেশ্য থাকিত। হয় স্বর্গ-ভোগ, না হয় এই জগতেই সুখভোগ। কিন্তু এই তৃতীয় স্তরের ধর্ম্মগুলি সমস্ত নিবৃত্তিমূলক ও নিষ্কাম।

অনেকে সাংখ্য, যোগ, ও নিষ্কাম কর্ম্ম এই তিনটিকে সমদৃষ্টিতে দেখিতেন। রাজর্ষি জনক সুলভাকে কহিতেছেন, "পরাশর-গোত্র-সম্ভূত, সন্ন্যাসধর্ম্মাবলম্বী বৃদ্ধ মহাত্মা পঞ্চশিখ আমার গুরু। সেই মহাত্মা হইতেই আমি মোক্ষতত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। তাঁহার তুল্য বক্তা আর কেহই নাই। তিনি মোক্ষের হেতু স্বরূপ। আমি তাঁহার প্রসাদেই সাংখ্যজ্ঞান, যোগ ও নিষ্কাম যাগযজ্ঞাদি এই ত্রিবিধ মোক্ষধর্ম্মের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইয়া সংশয়-বিহীন হইয়াছি।" (শান্তি ৩২১)

নারায়ণ একস্থলে বলিতেছেন, "মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ এই সাত জন মহর্ষি ব্রহ্মার মন হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। ইঁহারা সকলেই বেদবেত্তা ও বেদাচার্য্য। ইঁহারা প্রজা উৎপাদন করিবার নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছেন। যাঁহারা যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান করিয়েন, তাঁহাদিগের জন্য এই পথ নির্দ্দিষ্ট করিলাম। এক্ষণে নিবৃত্তিপথাবলম্বীদিগের বিষয়ও উল্লেখ করিতেছি শ্রবণ করো। সন, সনৎসুজাত, সনক, সনন্দন, সনৎকুমার, কপিল ও সনাতন এই সাত জন মহর্ষি ব্রহ্মার মন হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। ইঁহাদের বিজ্ঞানবল স্বতঃসিদ্ধ। ইঁহারা সকলেই নিবৃত্তিধর্ম্মাবলম্বী। ইঁহারা যোগ ও সাংখ্যজ্ঞানবিশারদ, মোক্ষ-ধর্ম্মের আচার্য্য ও মোক্ষধর্ম্ম প্রবর্ত্তক।" (শান্তি ৩৪১) প্রথমোক্ত ঋষিগণ পুরাতনদলের ও শেষোক্ত ঋষিগণ নূতন দলের। ইঁহারাই নবযুগ প্রবর্ত্তন করেন। আরও আমরা দেখিতেছি মোক্ষধর্ম্ম বেদে ছিল না। নূতন দলের ঋষিগণ ইহার প্রবর্ত্তক। বৈদিক আর্য্যগণ ঐশ্বর্য্য চাহিতেন, পুত্র-কলত্র চাহিতেন, স্বর্গ চাহিতেন এবং এই-সমস্ত লাভ করিবার নিমিত্ত তাঁহারা নানাবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেন। কিন্তু এই নূতন দলের ঋষিগণ এসকল কিছুই চান না। তাঁহারা চান একেবারে মোক্ষ। পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য এমন-কি স্বর্গ পর্য্যন্ত তাঁহাদের নিকট এখন সামান্য বোধ হইতেছে। এখন তাঁহাদের লক্ষ্য আরও উচ্চ। ভারতীয় আর্য্য-সভ্যতার একটি বড় অধ্যায় এই স্থানে সমাপ্ত হইল, ও নূতন দর্শন ও নূতন ধর্ম্ম ভারতে প্রচারিত হইতে লাগিল।

ভোলা

শ্রী সুনীল মিত্র

১

কেলো বাগ্‌দীর ছেলে, দত্তদের হীরু তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু। দুজনায় একসঙ্গেই পড়িত। পাঠশালায় গুরু-মহাশয়ের কঠোর শাসন এবং সতর্ক দৃষ্টি তাহাদের প্রগাঢ় বন্ধুত্বের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড প্রাচীর খাড়া করিয়া রাখিত। ভদ্রলোকের ছেলেরা বসিত বাঁশের বেঞ্চিতে আর কেলোদের বসিতে হইত নীচে মেঝের উপরে। এই নিয়মের সামান্য ব্যতিক্রম হইলেই উভয় পক্ষকেই কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে হইত—একপক্ষের নিয়মভঙ্গের জন্য অপর পক্ষের নিয়ম-লঙ্ঘনকারীদের প্রশ্রয় দেওয়ার অপরাধে। পাঠশালার বাহিরে পা বাড়াইতেই গুরু-মহাশয়ের গড়া প্রাচীরটি কিন্তু একনিমেষের মধ্যেই যেন কোথায় অদৃশ্য হইয়া যাইত। তখন তাহারা পরস্পরের হাত ধরাধরি করিয়া ইতর-ভদ্রের গণ্ডীর বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইত।

কেলো প্রায়ই হীরুকে তাহাদের বাড়ীতে ডাকিয়া লইয়া গিয়া কাঁচা পেয়ারা, ডাঁশা আমড়া, পাকা জলপাই, প্রভৃতি খাইতে দিয়া বন্ধুর সম্বর্দ্ধনা করিত। হীরুর কিন্তু এ-সমস্তের প্রতিদান দিবার মত সুযোগ বড়-একটা ঘটিয়া উঠিত না। বাগ্‌দীর ছেলেকে ত আর ভদ্রলোকের বাড়ীতে ডাকিয়া লইয়া যাওয়া যায় না; তাই সে সুযোগ পাইলেই বাড়ীর-তৈরী খাবার হইতে নিজের ভাগটা গোপনে পাঠশালায় আনিয়া কেলোকে খাইতে দিত; ইহাতে সে পরম সুখ অনুভব করিত।

সে-দিন পাঠশালার ছুটির পর বাহিরে আসিয়া কেলো হীরুকে উদ্দেশ করিয়া কহিল—"আমাদের খেজুর-বাগানের দক্ষিণদিক্‌কার চারা গাছগুলোর প্রথম রস দিয়ে আজ নতুন গুড় তৈরী করা হ'য়েছে; তাই মা তোকে ডেকে নিয়ে যেতে বলেছে; যাবি?"

হীরুর পক্ষে নূতন গুড়ের লোভটা সম্বরণ করা খুবই কঠিন হইল। কেলোদের বাড়ীর দুইতিন বৎসরের পুরাতন গুড়ই তাহাদের বাড়ীতে গিয়া নূতন নাম ধারণ করে। সুতরাং নূতন গুড়ের সত্যিকারের আস্বাদটা হীরুর ভাগ্যে খুব কমই জুটিয়া থাকে। সেইজন্য এই শুভ সুযোগটি ছাড়িয়া দিতে হীরুর আদৌ মন সরিতেছিল না। ক্ষণকাল ভাবিয়া লইয়া, কেলোর কথার উত্তরে হীরু একটু সঙ্কুচিত হইয়া কহিল—"কিন্তু মুখে যে গন্ধ লেগে থাকবে, মা টের পেলে আমার আর—"; হীরুর কথা শেষ না হইতেই কেলো হাসিয়া বলিয়া উঠিল—"দূর্ পাগল, তাই বুঝি টের পায়—ভালো ক'রে মুখ ধুয়ে কচি শশা চিবিয়ে ফে'লে দিবি; তা হ'লে তুই নিজেও টের পাবিনে—বুঝ্‌লি।"

"কিন্তু ভাই, দিদি ঠিক্ ধ'রে ফেল্‌বে; কুকুরের মতন গন্ধ শুঁকে সে সব টের পায়।"

কেলো হীরুকে আশ্বাস দিয়া কহিল—"না হয় দুটো তুলসী-পাতা চিবিয়ে খেয়ে ফেল্‌বি; তা হ'লে ঢেকুর তুল্‌লেও কেউ ঠিক্ পাবে না, আমি একেবারে দিব্যি গেলে বল্‌তে পারি।"

হীরু আশ্বস্ত হইয়া মনে-মনে কেলোর বুদ্ধির খুব তারিফ করিল, তাহার পর দুজনা গল্প জুড়িয়া দিয়া বলিতে আরম্ভ করিল।

বাড়ী ফিরিয়া কেলো তাহার মাতাকে উদ্দেশ করিয়া চেঁচাইয়া কহিল—"হীরু এসেছে মা, কি দেবে ওকে শীগ্‌গির দিয়ে যাও।"

কিছুক্ষণ পরে কেলোর মা একটা বেতের ধামিতে করিয়া গরম মুড়ি, কিছু নারিকেল-কোরা এবং খানিকটা নূতন গুড়ের পাটালি আনিয়া হীরুর হাতে দিলেন। আনন্দে এবং পুলকে হীরুর সমস্ত মনটা নাচিয়া উঠিল; তাহার চোখে-মুখে কৃতজ্ঞতার ভাব ফুটিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তকাল পরেই কেলো একটি হৃষ্টপুষ্ট কুকুর-ছানা

প্রণতি

চিত্রশিল্পী শ্রীসিদ্ধেশ্বর মিত্র

কোলে করিয়া সেখানে উপস্থিত হইয়া হীরুকে উদ্দেশ করিয়া কহিল—"নিবি এটাকে ?"

হীরু তাহার বন্ধুর হাত হইতে কুকুর-ছানাটিকে এক-প্রকার ছিনাইয়া লইয়া ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিল—"হ্যা ভাই, নেবো।"

"নিবি ত কিন্তু রাখ্‌বি কোথায় ?"

হীরু মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া কহিল—"কেন, আমাদের হাঁসের ঘরে, হাঁস ত আর এখন নেই, ঘরটা পরিষ্কার ক'রে নেবো'খন—কি বলিস্‌ ?"

কথাটা বলিয়া হীরু কেলোর দিকে উত্তরের অপেক্ষায় চাহিয়া রহিল কেলো একটু চিন্তিতস্বরে কহিল—"সে ত হ'ল, কিন্তু বাড়ীতে কুকুর পুষ্‌লে তোর মা যদি বকাবকি করে ?"

কেলোর কথা শুনিয়া নিমেষের মধ্যেই হীরুর কুকুর-পোষার সখ কোথায় যেন মিলাইয়া গেল। তাহার প্রফুল্ল মুখখানি হঠাৎ যেন বাসিফুলের মতন বিমর্ষ হইয়া গেল। আনন্দের আতিশয্যে মায়ের কথা এতক্ষণ তাহার মনেই ছিল না। কিছুক্ষণ ভাবিয়া লইয়া চিন্তিত মুখে সে কহিল—"দিদি ভারি দুষ্টু ; চুপি-চুপি হয়ত মাকে ব'লে দেবে ; নইলে মাকে না জানিয়েও পোষা যায় কিন্তু।"

কেলো কহিল—"নিয়ে ত যা, তা'র পর তোর মা না রাখ্‌তে দিলে আমায় আবার ফিরিয়ে দিয়ে যাস্‌—কেমন ?"

কেলোর প্রস্তাবে সম্মত হইয়া হীরু কহিল—"হ্যা ভাই ; তাই বেশ হবে।" ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া আবার কহিল—"ফিরিয়ে বোধ হয় আর দিতে হবে না, মাকে ব'লে-ক'য়ে কোনো রকমে এ'কে রেখে দেবো'খন—আচ্ছা ভাই, এর নাম কি রাখ্‌ব বলো ত।"

"আমরা ত ভোলা ব'লে ডাকি, তুইও তাই ব'লে ডাক্‌বি।"

হীরু কুকুর-ছানাটির মুখের কাছে খানিকটা পাটালি-গুঁড়া করিয়া দিতে-দিতে কহিল—"আচ্ছা, তাই হবে।"

তাহার পর বাড়ী ফিরিয়া হীরু অনেক কাকুতি-মিনতি কান্নাকাটা সাধ্যসাধনা করিয়া তাহার মায়ের নিকট হইতে ভোলার জন্য একটু আশ্রয় ভিক্ষা করিয়া লইল।

২

হীরু আহারে বসিয়াছিল। ডা'লঝোল প্রভৃতি খাওয়া শেষ হইলে চারিদিকে একবার সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দুধের বাটিটা মুখের কাছে ঠেকাইয়াই বাটিটা হাতে করিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেই ঘরের ভিতর হইতে বিভা বলিয়া উঠিল—"সব দেখ্‌তে পাচ্ছি হীরু, নিজে না খেয়ে কুকুরকে দুধ দেওয়া হচ্ছে বুঝি ?"

এত সাবধানতার পরও হীরু ধরা পড়িয়া গিয়া অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া—"তাই বুঝি ?" বলিয়া মুখ হাঁড়ি করিয়া গোঁজ হইয়া বসিয়া রহিল। বিভা তাহার এই ছোট্ট অভিমানী ভাইটিকে ভালো-রকমই চিনিত। তাড়াতাড়ি সস্নেহে বাহিরে আসিয়া হীরুর পিঠে হাত বুলাইয়া দিতে-দিতে কহিল—"লক্ষ্মী দাদাটি, ও দুধটুকু খেয়ে ফেলো, তুমি আঁচিয়ে এলে কুকুরের জন্যে আমি আলাদা ক'রে দুধ দেবো এখন ; মা টেরও পাবেন না—কেমন ?"

"হুঁ, ছাই দুধ দেবে। এই ব'লে আমাকে ভুলিয়ে দুধ খাইয়ে দিয়ে পরে কলা দেখাবে—এই ত ?"

বিভা জোর করিয়া হাসি চাপিয়া কহিল—"আচ্ছা, না যদি দিই তা হ'লে আর কোনো দিন আমার কথা শুনো না, কেমন ?"

হীরু এবার তাহার দিদির কথায় বিশ্বাস করিয়া এক-নিশ্বাসে দুধটুকু শেষ করিয়া পিঁড়ি ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল।

বিভা খাইতে বসিয়াছিল, ক্ষণকাল পরে হীরু একটি নারিকেলের মালা হাতে করিয়া রান্নাঘরে ঢুকিয়া চুপি-চুপি তাহাকে কহিল—"বাঁ-হাতে ক'রে ভোলার দুধটা দিয়ে দাও দিদি, মা পুজোয় বসেছেন, তোমার খাওয়া শেষ হ'তে-হ'তে তিনি আবার উ'ঠে আস্‌বেন।"

বিভা কড়া হইতে হীরুর মালায় এক হাতা দুধ ঢালিয়া দিতেই, হীরু মিনতির স্বরে বলিয়া উঠিল—"চারটি ভাত দাও না, দিদি।"

নিজের পাতা হইতে এক মুঠো ভাত মালাটিতে ঢালিয়া দিয়া বিভা একটু হাসিয়া কহিল—"আচ্ছা হীরু, ভোলা কি তোমার ছেলে যে ওকে এত যত্ন ক'রে দুধ ভাত খাওয়াচ্ছ ?

"দূর্, আমার ছেলে হ'তে যাবে কেন? ছেলে মানুষের বুঝি আবার ছেলে থাকে, ও তোমার ছেলে।"

কথাটা বলিয়া হীরু হাসিতে লাগিল। বিভা লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিয়া কহিল—"তুমি বুঝি তা হ'লে ভোলার মামা?"

হীরু রাগিয়া কহিল—"ও-রকম কর্‌লে ভালো হবে না দিদি, তা ব'লে রাখ্‌ছি। লেস্ বোনায় সুতো যখন খুঁজে পাবে না তখন কিন্তু আমায় দোষ দিতে পার্‌বে না।"

"বেশ ত, তা হ'লে তোমার ভোলারই জামা তৈরী করা হবে না। আমার কি, ভোলা যখন শীতে কোঁ-কোঁ কর্‌বে তখন কিন্তু আমায় দোষ দিতে পার্‌বে না।"

হীরু ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—"না দিদি, তোমার সুতো কক্ষনও লুকোবো না।" মুহূর্ত্তকাল থামিয়া পুনরায় বলিয়া উঠিল—"আজ দুপুরে মা ঘুমুলে জামাটা শেষ ক'রে দিতে হবে কিন্তু।"

বিভা হাসিয়া কহিল—"সে হবে'খন। এখন শীগ্‌গির স'রে পড়ো; এর পর মা এসে পড়্‌বেন।"

হীরু আর কোনো কথা না বলিয়া তাড়াতাড়ি মালাটি হাতে করিয়া নিঃশব্দে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িল।

কয়েকদিন পরের কথা। বিভা সবেমাত্র ডা'লটা নামাইয়া রাখিয়া মাছ ভাজিবার উদ্যোগ করিতেছিল। এমন সময় হঠাৎ হীরু কোথা হইতে ঝড়ের বেগে রান্নাঘরে ঢুকিয়া ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিল,—"শীগ্‌গির ভোলাকে চারটি ভাত দাও দিদি; বড্ড মেরেছি তা'কে, কপাল কেটে একেবারে ঝর্ ঝর্ ক'রে রক্ত পড়্‌ছে।"

হীরু ভোলাকে মারিয়াছে,—কথাটা বিভা বিশ্বাস করিতে পারিল না; তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বিস্মিতস্বরে প্রশ্ন করিল—"কে মেরেছে, তুমি?"

হীরু একটু ঝাঁঝালো গলায় উত্তর করিল—"মার্‌ব না, ওবাড়ীর রাঙা বুড়ীকে ছুঁয়ে দিলে কেন? এক্ষুণি যে বুড়ী এসে মাকে নালিশ ক'রে দেবে।" তাহার পর গলার স্বর অনেকটা নরম করিয়া কহিল,—"দেখ দিদি, ভোলার কোনো দোষ নেই; রাঙা-বুড়ী চান্ ক'রে পুজোর ফুল নিয়ে যাচ্ছিল, ও মনে ক'র্‌লে খাবার বুঝি; তাই আহ্লাদে লাফাতে-লাফাতে দুই ঠ্যাং একেবারে বুড়ীর গায়ের ওপর তু'লে দিলে, অম্‌নি বুড়ী ক্যার্‌-ক্যার্ কর্‌তে-কর্‌তে সব ফুলগুলো ছুঁড়ে জলে ফে'লে দিলে।" ফুল ফেলিয়া দিবার সময় বুড়ীর মুখে ঘৃণা এবং বিরক্তির যে ভাবটি ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহার অনুকরণ করিতে গিয়া হীরু একটা বিকট মুখভঙ্গী করিয়া বসিল। বিভা হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল; হীরু লজ্জিত হইয়া কহিল—"দাও না চারটি ভাত, দেরি কর্‌ছ কেন?"

বিভা কোনো মতে হাসির বেগ সাম্‌লাইয়া একখানা কলার পাতায় দুই-হাতা ভাত এবং খানিকটা ডা'ল ঢালিয়া দিয়া মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়া কহিল—"ভোলা ছুঁয়ে দিলে বুড়ী কেমন ক'রে উঠেছিল, আর-একবার দেখাও না, লক্ষ্মী দাদাটি।"

হীরুকে দিয়া কোনো কাজ আদায় করিয়া লইতে হইলে বিভা তাহাকে দাদা বলিয়া সম্বোধন করিত। বিভার কথায় হীরু বলিয়া উঠিল— "হুঁ, আমি দেখাই আর তুমি গিয়ে বুড়ীকে ব'লে দিয়ে মজা দেখ—কেমন? না, আমি আর দেখাতে পার্‌ব না।" কথাটা বলিয়া হীরু আর অপেক্ষা করিল না। দুই হাতে পাতাখানি তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল। ভোলার দুরবস্থা এবং হীরুর কাণ্ডখানা দেখিবার কৌতূহল বিভা দমন করিতে পারিল না। তাড়াতাড়ি মাছের কড়াখানা নামাইয়া রাখিয়া ভোলার ঘরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিল হীরু তাহার মাথায় প্রকাণ্ড একখানা ভিজা ন্যাকড়ার জলপটি বাঁধিয়া দিয়া তাহাকে কোলের উপর বসাইয়া ভাত খাওয়াইতেছে। একটু হাসিয়া বিভা কহিল—"ওকি হচ্ছে, হীরু?"

বিভার আগমন হীরু টের পায় নাই; হঠাৎ তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাড়াতাড়ি ভোলাকে মাটিতে নামাইয়া দিয়া সে অপরাধীর মতন মাটির দিকে মুখ করিয়া বসিয়া রহিল; হীরুর অবস্থা দেখিয়া বিভা কাছে আসিয়া সস্নেহে কহিল—"কতটা কেটেছে দেখি, ভাই।"

হীরু কতকটা সাহস পাইয়া কহিল, "আগে বলো মাকে বল্‌বে না, আমি ওকে এঁটো মুখে কোলে নিয়েছিলুম।"

বিভা হাসিতে-হাসিতে কহিল—"আমি কি রাঙী-বুড়ী, যে মাকে সব কথা ব'লে দেবো?"

হীরু আশ্বস্ত হইয়া ভিজা ন্যাক্‌ড়াখানা খুলিয়া ফেলিয়া ভোলার ক্ষতস্থানটা বিভাকে দেখাইয়া দিল। বিভা দুঃখ প্রকাশ করিয়া কহিল—"আহা, বড্ড লেগেছে দেখ্‌ছি যে। আমার কাছে মলম আছে এনে লাগিয়ে দাও; এক দিনেই সেরে যাবে।"

হীরু পুলকিত হইয়া বলিয়া উঠিল—"সত্যি দেবে?"

"হাঁ দেবো, এস আমার সঙ্গে, নিয়ে যাও।"

হীরুর চোখেমুখে অপরিসীম আনন্দের একটা আভা ফুটিয়া উঠিল। সে আর কোনো কথা না বলিয়া বিভাকে অনুসরণ করিতে লাগিল। বাড়ীর ভিতর পা দিতেই হীরুর মাতা কর্কশকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—"বলি, ভোলাকে তুই বাড়ী থেকে বের্‌ ক'রে দিবি কি না তাই আমি শুন্‌তে চাই।"

হীরু বুঝিতে পারিল রাঙী-বুড়ী তাহার কর্ত্তব্য পালন করিতে আদৌ ত্রুটি করে নাই। মুখ ভার করিয়া সে বিভার পিছনে দাঁড়াইয়া তাহার আঁচলের একটা খুঁট ধরিয়া নাড়া-চাড়া করিতে লাগিল। হীরুর অসহায় অবস্থা দেখিয়া বিভা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—"তা'র জন্যে ত ও ভোলাকে মেরে একেবারে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে, এতেও বুড়ীর রাগ পড়্‌ল না?"

কথাটা শুনিয়া হীরুর মা বিভাকে উদ্দেশ করিয়া পুনরায় বিরক্তির স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"দেখ্‌ বিভা, তুই ওকে নাই দিয়ে-দিয়ে একেবারে মাথায় উঠিয়ে দিচ্ছিস।"

বিভা আর কোনো কথা না বলিয়া হীরুকে সঙ্গে করিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল। মায়ের কবল হইতে রক্ষা পাইয়া হীরু একটা মুক্তির নিশ্বাস ফেলিয়া কৃতজ্ঞতার স্বরে কহিল—"ভাগ্যিস্‌ তুমি ছিলে দিদি, নইলে—" হীরুর কথাটা শেষ হইতে না হইতেই হাসিতে-হাসিতে বিভা সস্নেহে তাহার চিবুকটা ধরিয়া একটু নাড়িয়া দিয়া কহিল—"থাক্‌ খুব হয়েছে, আর বল্‌তে হবে না।"

৩

সে-দিন বোসেদের বাড়ীর টুনুর অন্নপ্রাশনে হীরুর নিমন্ত্রণ ছিল। নিমন্ত্রণ-বাড়ী ভালো করিয়া খাইতে পারিবে না বলিয়া, সকাল হইতে সে নিজেও কিছু খায় নাই; ভোলাকেও কিছু খাইতে দেয় নাই। তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবে ঠিক করিয়াছিল। অল্প কিছু খাওয়াইবার জন্য বিভা হীরুকে অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়াছিল। কিন্তু সে কিছুতেই রাজি হয় নাই; অগত্যা তাহাকেও না খাইয়া থাকিতে হইল।

তখন বেলা প্রায় বারোটা। হীরু আসিয়া বিভাকে ধরিয়া বসিল,—মাথায় গন্ধ-তেল মাখাইয়া গায়ে সাবান দিয়া তাহাকে স্নান করাইয়া দিতে হইবে। কথাটা শুনিয়া বিভা বিস্মিত-দৃষ্টিতে হীরুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—যাহাকে চোখ রাঙাইয়া খোসামোদ করিয়া কোনো দিন গামছা দিয়া গায়ের ময়লা তুলিতে রাজি করা যায় নাই, সাবান দেখিলে ভয়ে যে দশ হাত পিছাইয়া যায়, সেই আজ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সাবান মাখাইয়া দিবার প্রস্তাব জানাইতে আসিয়াছে। বিভাকে নিরুত্তর দেখিয়া হীরু তাহার আঁচল ধরিয়া একবার টানিয়া দিয়া কহিল—"ওঠো না দিদি, আর দেরী কোরো না, নেমন্তন্নে যাবার আর যে বেশী দেরি নেই।"

বিভা হাসিয়া কহিল—"আজ যে বড় সাবান মাখার সখ হয়েছে?"

অপ্রসন্নমুখে হীরু উত্তর করিল—"ও বাড়ীর অজিত কেষ্টা সবাই ত সাবান মেখে পরিষ্কার হ'য়ে নেমন্তন্ন খেতে যাবে বলেছে, আমি বুঝি শঙ্কর উড়ের মতন অম্‌নি নোংরা হ'য়ে যাবো?"

"কে তোমায় নোংরা হ'য়ে থাক্‌তে বলে? তুমি কথা শোনো না তাই না, নইলে রোজ তোমায় পরিষ্কার ক'রে একেবারে বাবু সাজিয়ে দিতে পারি।"

হীরু হাসিয়া বলিয়া উঠিল—"বা রে! বাড়ীতে রোজ বুঝি আবার কেউ বাবু সেজে থাকে, কোথাও যেতে হ'লে না সাজে।"

বিভা আর-কোনো কথা না বলিয়া গামছা এবং সাবান লইয়া হীরুকে সঙ্গে করিয়া ঘাটের দিকে চলিল।

হীরুকে সাবান মাখানো শেষ করিয়া বিভা সিঁড়ির উপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহার গা মুছাইয়া দিতে-দিতে দেখিতে পাইল দূরে একটা অপরিচ্ছন্ন জায়গায় ঢুকিয়া ভোলা পরম তৃপ্তি-সহকারে একটি ঘৃণ্য দুর্গন্ধময় অখাদ্য চিবাইতেছে। ঘৃণায় বিভা তাহার সমস্ত দেহের ভিতর একটা অস্বস্তিকর শিহরণ অনুভব করিল। সে আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। ভোলার দিকে আঙুল নির্দেশ করিয়া হীরুকে বলিয়া উঠিল—"তোমার ভোলার কীর্ত্তিটা একবার দেখ। তুমি ওকে খেতে দাওনি ব'লে ও নিজেই নিজের খাবার জোগাড় ক'রে নিয়েছে।"

হীরু ক্রোধে আত্মহারা হইয়া ছুটিতে-ছুটিতে ভোলার নিকট উপস্থিত হইয়া একখানা কঞ্চি দিয়া সজোরে তাহার পিঠের উপর বেশ কয়েক ঘা বসাইয়া দিল। ভোলা মার খাইয়া চীৎকার করিতে-করিতে সরিয়া আসিতেই হীরু তাহার কান ধরিয়া হিড়-হিড় করিয়া টানিতে-টানিতে ঘরে আনিয়া আটকাইয়া রাখিল। বিভা গামছা হাতে করিয়া এতক্ষণ অবাক্ হইয়া সমস্ত দেখিতেছিল। হীরু ফিরিয়া আসিয়া কহিল—"ঠিক শাস্তি হয়েছে, আজ আর সমস্ত দিনের মধ্যে ওকে কিছু খেতে দিচ্ছি-নে।"

হীরুর ভিজা চুলগুলি আঁচড়াইয়া ঠিক করিয়া দিবার জন্ম বিভা চিরুনী হাতে করিয়া তাহার ঘরে ঢুকিতেই দেখিতে পাইল সে বালিশে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতেছে। কাছে আসিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে উঠাইবার চেষ্টা করিয়া কহিল—"কাঁদছ কেন, ভাই? উ'ঠে এস, চুলগুলো ঠিক ক'রে দিই।"

হীরু অভিমান-ক্ষুণ্ণ-স্বরে বলিয়া উঠিল—"আমার কোনো কাজ তোমার আর করতে হবে না, আমি নেমন্তন্ন খেতে যাবো না।"

বিভা আশ্চর্য্য হইয়া কহিল—"বাঃ, আমি কি দোষ করলুম?"

হীরু বালিশ হইতে মুখ না তুলিয়াই কহিল—"তুমি কেন ভোলাকে মারতে বারণ করলে না?"

হীরুর রাগের এবং অভিমানের কারণটা বুঝিতে পারিয়া বিভা হাসিয়া কহিল—"তোমার ভোলা কথা শোনে না, তাই তুমি তা'কে শাসন করছিলে, আমি কেন বারণ করতে যাবো?"

বিভা ভোলার অবাধ্যতার কথাটা স্মরণ করাইয়া দিতে অনুশোচনার পরিবর্ত্তে হীরুর মন পুনরায় ক্রোধে ভরিয়া উঠিল। সে ক্রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল,—"মেরেছি, বেশ করেছি; যাও আমায় বিরক্ত কোরো না, আমার পেট কামড়াচ্ছে, আমি খেতে যাবো না।"

"লক্ষ্মী ভাইটি—"

হীরু বিছানা হইতে উঠিয়া হন্‌হন্ করিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

গোলযোগ শুনিয়া পাশের ঘর হইতে গৃহিণী নিদ্রা-জড়িত-কণ্ঠে কহিলেন—"কি হ'ল তোদের, হীরু নেমন্তন্নে গেছে?"

মাতার গালিগালাজ এবং বকাবকি হইতে হীরুকে নিষ্কৃতি দিবার জন্ম বিভা একটু ভাবিয়া কহিল—"হীরুর পেট কামড়াচ্ছে, সে খেতে যাবে না।"

"সময়-কাল ভালো না, তা হ'লে আর গিয়ে কাজ নেই।" কথাটা বলিয়া গৃহিণী পুনরায় পাশ ফিরিয়া শুইলেন।

বিভা অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়াও যখন হীরুকে নিমন্ত্রণে পাঠাইতে পারিল না তখন তাহাকে বাড়ীতে খাওয়াইবার জন্ম পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতেও হীরু রাজি হইল না দেখিয়া বিভা তাহার শেষ কৌশলটি প্রয়োগ করিয়া কহিল—"তা হ'লে আমাকেও না খেয়ে থাকতে বলো ত?"

হীরু ক্ষণকাল গোঁজ হইয়া বসিয়া থাকিয়া কহিল—"ভাত দেবে চলো।" হীরুর পরিবর্ত্তন দেখিয়া বিভা মনে-মনে হাসিতে-হাসিতে তাহাকে সঙ্গে করিয়া রান্নাঘরে চলিল।

খাওয়া শেষ হইলে হীরু একটি বাটিতে করিয়া ভুক্তাবশিষ্ট ভাতগুলি কুড়াইয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াতেই বিভা হাসিয়া বলিয়া উঠিল—"কই, ভোলাকে সমস্ত দিন খেতে দেবে না বলেছিলে যে!"

হীরু নিজের প্রতিজ্ঞাভঙ্গের জন্ম লাজ্জিত হইয়া কহিল—"তা হ'লে একেবারে ম'রে যাবে দিদি;—এত মেরেছি তা'র ওপর খেতে না দিলে বড্ড কষ্ট পাবে যে।"

ভোলার ঘর খুলিতেই সে ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া হীরুর মুখের দিকে চাহিয়া লেজ নাড়িতে লাগিল। হীরু মজা দেখিবার জন্য একটা কপট ধমক দিতেই ভোলা ভয়ে লেজ গুটাইতে-গুটাইতে দূরে সরিয়া গেল। হীরু নিজের মনেই হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল—"এখনও ভয় ভাঙেনি।" পরে তাহাকে কোলে টানিয়া আনিয়া সযত্নে গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে-দিতে বাটিটা তাহার মুখের কাছে ধরিল।

পরদিন হীরু পাঠশালা হইতে ছুটিতে-ছুটিতে বাড়ী ফিরিয়া বৈঠকখানায় বই-শ্লেট ফেলিয়া ব্যস্তভাবে বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া বিভাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া হাঁপাইতে-হাঁপাইতে কহিল—"দেখ দিদি, ভোলা এত ছোট ত, কিন্তু ওর গায়ে জোর কত জানো? বড়-বড় দুটো কুকুরকে ও হারিয়ে দিতে পারে। রাস্তায় আস্‌তে-আস্‌তে, এম্‌নি বড়-বড় দুটো কুকুরের সঙ্গে ওর ঝগ্‌ড়া বেধে গেল—ভোলা তাদের এম্‌নি তাড়া কর্‌লে যে ভয়ে লেজ গুটোতে-গুটোতে তা'রা একেবারে ডোবার ভেতর নেমে পড়্‌ল, দে'খে ত আমি হেসেই বাঁচিনে।"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া হীরু আবার বলিয়া উঠিল—"আমাদের বাড়ী আর চোর আস্‌তে পাবে না; তাই না দিদি?"

বিভা মুচ্‌কি হাসিয়া কহিল—"চোর কেন চোরের বাবাও আস্‌তে পার্‌বে না।"

হীরু পুলকিত হইয়া উৎসাহের সহিত আরও বলিয়া যাইতে লাগিল—"আর দেখ দিদি, ভোলা এর মধ্যেই আমায় এত চি'নে ফেলেছে সে আর কি বল্‌ব। এত মারি ত তবুও সব সময় আমার সঙ্গে-সঙ্গে ঘুর্‌বে। কাল রাঙী-বুড়ীর বাতের ওষুধ আন্‌তে ডাক্তারখানায় গেলুম ত, ভোলাও আমার সঙ্গে-সঙ্গে গেল। ফেরার সময় আমি ওকে ভুলিয়ে অন্য রাস্তা দিয়ে এলুম। ও মা! কালীবাড়ীর সাম্‌নে এসে দেখি ভোলা আমার জন্যে পথ আগ্‌লে ব'সে আছে। আমাকে খুঁজে পেয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে আহ্লাদে লেজ নাড়্‌তে লাগ্‌ল।"

বিভা কহিল—"তুমি ওকে খেতে দাও কিনা, তাই ও তোমাকে এত ভালোবাসে।"

হীরু আরও কি-একটা বলিবার উপক্রম করিতেই বিভা বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "স্কুল্ থেকে এসেছ এখন খাবার খেয়ে নাও, তা'র পর সব শুন্‌ব'খন।" কথাটা বলিয়া বিভা জান্‌লার মাথা হইতে খাবারের বাটিটা পাড়িয়া হীরুর হাতে দিল।

একটা নারিকেলের লাড়ু মুখের ভিতর পুরিয়া দিয়া হীরু বিভাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল—"ভোলার জন্যে একটা বক্‌লেস্ কি'নে দাও না, দিদি।" বিভা বিস্মিত হইয়া কহিল—"এখানে কোথায় বক্‌লেস্ পাবো? তোমার দাদাবাবুকে লিখে দেবো এবার আস্‌বার সময় নিয়ে আস্‌বে।"

হীরু অগ্রসর হইয়া নাকিস্বরে কহিল—"অনেক দেরি হ'য়ে যাবে যে—ওবাড়ীর অজিতের কাছে একটা বক্‌লেস আছে, সেইটে কি'নে দাও না। মোটে চার আনা দাম, দিদি।"

"মা যে বক্‌বেন তা হ'লে।"

"না দিদি, তুমি কি'নে দিয়েছ শুন্‌লে কিছু বল্‌বেন না।"

বিভা হাসিয়া কহিল—"আচ্ছা, আমি পয়সা দেবো'খন তুমি কি'নে এনো, কেমন?"

এত শীঘ্র দিদিকে রাজি করিতে পারিবে বলিয়া হীরু আশা করে নাই। আনন্দে পুলকিত হইয়া সে খাবার ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—"অজিতকে শীগ্‌গির ব'লে আসি তা হ'লে।"

বিভা চট করিয়া হীরুর একখানা হাত ধরিয়া ফেলিয়া কৃত্রিম রোষভরে কহিল—"আগে খেয়ে নাও, তা'র পর যেও, খাওয়া নেই দাওয়া নেই রাতদিন কেবল ভোলা আর ভোলা।"

হীরু তাড়াতাড়ি বসিয়া পড়িয়া খাবারগুলি পকেটে ভরিয়া বিভার মুখের দিকে চাহিয়া মিনতিভরা-স্বরে কহিল—"খেতে-খেতে যাই, দিদি?"

বিভা হাসিয়া ফেলিল। হীরু আর কোনো কথা না বলিয়া ছুটিয়া পলাইল।

৪

সকাল বেলায় বিছানায় শুইয়া-শুইয়াই হীরু তাহার

বাতার কর্কশ কণ্ঠ শুনিতে পাইল—"আজ যদি না আমি ছুটোকেই বাড়ী থেকে বের করি তা হ'লে আমার—দেখ্ বিভা তুইই যত নষ্টের মূল, তোর আস্কারা পেয়ে-পেয়েই—" আরও কিছুক্ষণ কান খাড়া করিয়া শুনিয়া হীরু বুঝিতে পারিল ভোলা রাত্রে রান্নাঘরে ঢুকিয়া একটা অনর্থ ঘটাইয়াছে। চট্ করিয়া বিছানা ছাড়িয়া হীরু উঠিয়া পড়িল। গোপনে বাহিরে আসিয়া ভোলাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহার বক্লেস্ খুলিয়া রাখিয়া গলায় একগাছা মোটা দড়ি বাঁধিয়া তাহাকে টানিতে-টানিতে কেলোদের বাড়ীর উদ্দেশে চলিতে আরম্ভ করিল। কিছুক্ষণ পরে তাহাদের বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ডাকিল—"কেলো, ও কেলো।" কেলো বাহিরে আসিলে হীরু ভোলার দড়িটা কেলোর দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া গম্ভীর-স্বরে কহিল—"এই নাও তোমার কুকুর। ফের যদি আমাদের বাড়ী-মুখো হয় তা হ'লে কিন্তু ওকে খুন ক'রে ফেল্‌ব তা যেন মনে থাকে।"

কথাকয়টা বলিয়াই হীরু হন্-হন্ করিয়া বাড়ীর দিকে চলিতে আরম্ভ করিল। ভোলাও হীরুর পিছন-পিছন ছুটিবার উপক্রম করিতেই কেলো তাহার গলার দড়িটা ধরিয়া জোর করিয়া টানিতে-টানিতে তাহাকে গোয়ালের দিকে লইয়া চলিল। ভোলার আর্ত্তনাদ শুনিয়া হীরু একবার পিছন ফিরিয়া তাকাইয়াই পুনরায় দ্রুতপদে চলিতে লাগিল। হীরু ফিরিয়া আসিয়া বাড়ীর ভিতর পা বাড়াইতেই বিভা তাহাকে দেখিতে পাইয়া ব্যস্তভাবে প্রশ্ন করিল—"এই শীতে খালিগায়ে সকাল বেলায় উ'ঠে কোথায় গিয়েছিলে? বাড়ীশুদ্ধ লোক তোমায় খুঁজে-খুঁজে যে একেবারে হয়রান হ'য়ে গেল!"

কাঁদো-কাঁদো গলায় হীরু কহিল—"ভোলাকে ফিরিয়ে দিয়ে এলাম।"

হীরুর ছল্-ছল্ চোখ আর কান্নাভেজা গলার স্বর বিভার মনটাকে খুব নরম করিয়া দিল। হীরুকে কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া কোমলস্বরে সে কহিল,—"ছি ভাই, মার কথায় কি রাগ করতে আছে?"

হীরু আর নিজেকে সাম্‌লাইতে পারিল না; বিভার কোলের ভিতর মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। বিভার চোখদুটিও সজল হইয়া উঠিল। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া হীরুকে উদ্দেশ করিয়া কহিল—"লক্ষ্মী দাদাটি, কথা শোনো আর কেঁদো না। আমি মাকে বুঝিয়ে বল্‌ব'খন; তুমি আবার ভোলাকে নিয়ে এস গিয়ে—কেমন?"

হীরু চোখ মুছিয়া উঠিয়া বসিয়া কহিল,—"আন্‌তে হবে না দিদি, সে নিজেই চ'লে আস্‌বে'খন, আমায় ছেড়ে কক্‌খনো থাক্‌তে পার্‌বে না।"

অন্যান্য দিনের মতন হীরু ভাত খাইয়া আঁচাইতে যাইবার সময় ভোলার জন্য বাটিতে করিয়া ভাত লইয়া অন্যমনস্কভাবে ঘাটের দিকে গেল। ভোলার ঘরের সম্মুখে আসিতেই হঠাৎ তাহার মনে হইয়া গেল—"আজ ত ভোলা নেই।" মুহূর্ত্তের মধ্যে দুঃখে ক্ষোভে অভিমানে তাহার সমস্ত মনটা ভরিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া থাকার পর ভাতগুলি ছুঁড়িয়া পুকুরের জলে ফেলিয়া দিয়া হীরু আঁচাইয়া বাড়ী ফিরিল।

হীরুর মন খারাপ দেখিয়া বিভা তাহাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল—"আজ আর পাঠশালে গিয়ে কাজ নেই।"

সে-কথায় কান না দিয়া হীরু গম্ভীরমনে জামা গায়ে দিয়া বই-শ্লেট হাতে লইয়া পাঠশালার দিকে চলিতে আরম্ভ করিল।

বড় রাস্তায় পা দিতেই হীরু দেখিতে পাইল, ভোলা ছুটিয়া বাড়ীর দিকে আসিতেছে। আনন্দে হীরুর সমস্ত মনটা নাচিয়া উঠিল। সে আর চলিতে পারিল না—রাস্তার মাঝখানেই থম্‌কাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। একটু পরেই ভোলা হীরুর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আনন্দে লেজ নাড়িতে-নাড়িতে তাহার পায়ের গোড়ায় লুটো-পুটি খাইতে লাগিল। হীরুর আর পাঠশালা যাওয়া হইল না; ভোলাকে সঙ্গে করিয়া সে বাড়ী ফিরিয়া আসিল। বাহিরের ঘরে বই-শ্লেট রাখিয়া তাড়াতাড়ি ভিতরে আসিয়া আগ্রহভরে বিভাকে কহিল—"যা বলেছিলুম ঠিক্ তাই হ'য়ে গেল, দেখ্‌লে দিদি?"

বিভা জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে হীরুর মুখের দিকে চাহিল। হীরু মুহূর্ত্তকাল মৌন থাকিয়া পুনরায় কহিল—"ভোলা দাঁত দিয়ে দড়ি কে—টে পালিয়ে এসেছে; দেখ দিদি আমায় রাস্তায় দেখ্‌তে পেয়ে সে কি আহ্লাদ ভোলার!

যদি একবার দেখ্‌তে।" ক্ষণকাল থামিয়া হীরু আবার বলিয়া উঠিল—"তোমার কথাও ঠিক খেটে গেল, দিদি। পাঠশালে যেতে বারণ করেছিলে, সত্যি-সত্যিই তাই হ'য়ে গেল।" বিভা একটু হাসিয়া কহিল—"বেশ, এখন ওকে খেতে দাও গিয়ে, চলো ভাত বের ক'রে দিয়ে আসি।"

কৃতজ্ঞতার আতিশয্যে হীরু বিভাকে উদ্দেশ করিয়া প্রশ্ন করিল, "তুমিও ভোলাকে খুব ভালোবাসো দিদি, তাই না?"

"তুমি যাকে ভালোবাসো তা'কে কি আমার না ভালোবেসে উপায় আছে?" কথাটা বলিয়া বিভা হাসিতে লাগিল। ইঙ্গিতটি বুঝিতে না পারিয়া হীরু আর কোনো প্রশ্ন করিল না; মৌন হইয়া রান্নাঘরের দিকে বিভাকে অনুসরণ করিতে লাগিল।

কয়েক দিন পরে ভোলা আর-একটি নূতন কাণ্ড করিয়া বসিল। গৃহিণী বরাবরই অতি-প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠান ঝাঁট দিয়া সমস্ত বাড়ীময় গোবর-জলের ছড়া দেন। পরে আবার ঘরে ফিরিয়া আসিয়া সকলের ঘুম ভাঙাইয়া নিজের বিছানা-পত্র তুলিয়া রাখেন। সেদিনও অভ্যাস-মতন বাহিরের কাজ শেষ করিয়া ঘরে ফিরিয়া বিভাকে ডাকিয়া গিয়া বিছানা তুলিবার উদ্দেশ্যে নিজের লেপটি উঁচু করিতেই যাহা চোখে পড়িল তাহাতে মুহূর্তের মধ্যে তাঁহার সমস্ত শরীরটা জ্বলিয়া উঠিল। দেখিলেন ভোলা তাঁহার লেপের তলায় পরম আরামে দেহটিকে এলাইয়া দিয়া চোখ বুজিয়া পড়িয়া আছে। তিনি চেঁচাইয়া সমস্ত বাড়ীটিকে একেবারে মাথায় করিয়া তুলিলেন। চীৎকার শুনিয়া চোখ মুছিতে-মুছিতে বিভা তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিল। ভোলা তখনও মিটির-মিটির করিয়া গৃহিণীর মুখের দিকে চাহিতেছিল। তাহার কাণ্ড দেখিয়া বিভা ত হাসিয়াই খুন। বিভার হাসি দেখিয়া গৃহিণীর মুখেও এত দুঃখে বিরক্তির হাসি ফুটিয়া উঠিল। নিজেকে কতকটা সাম্‌লাইয়া বিভা ভোলাকে তাড়াইয়া দিল। পরে মায়ের লেপ কাঁথা তোষক বালিশ প্রভৃতি সমস্তই বাহিরের রোয়াকে জমা করিয়া রাখিল।

এই ঘটনার জন্ত সেদিন আর হীরুকে মায়ের নিকট হইতে একটুও গালিমন্দ শুনিতে হইল না। কারণ বিভা এই দুরন্ত শীতে কাঁথা চাদর ওয়াড়গুলি জলকাচা করিয়া তোষক-বালিশে গঙ্গাজল ছিটাইয়া গৃহিণীর মন অনেকটা নরম করিয়া আনিয়াছিল। তাহার উপর ভোলার স্বভাবটা জানিয়া-শুনিয়াও তিনি যখন ঘর খুলিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন তখন দোষটা যে সম্পূর্ণ তাঁহারই একথাটাও সে তাঁহাকে বেশ ভালো করিয়াই বুঝাইয়া দিয়াছিল। ঘুম ভাঙিলে হীরু বিভার নিকট হইতে সমস্ত শুনিয়া শাস্তিস্বরূপ সেদিন ভোলার সকালবেলাকার আহার বন্ধ করিয়া গলায় একখানা ভারী ইট বাঁধিয়া দিয়া তাহাকে রৌদ্রে বসাইয়া রাখিল।

৫

কয়েক মাস পরের কথা। কি-একটা ছুটিতে হীরুর ছোটো-মামা তাহাদের বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়া ভগ্নীকে বুঝাইয়া বলিলেন, হীরুকে পাঠশালায় পড়াইয়া অনর্থক সময় নষ্ট করা হইতেছে। তিনি তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া নিজের বাড়ীতে রাখিয়া ভালো স্কুলে পড়াইবেন এরূপ অভিমতও প্রকাশ করিলেন। ভ্রাতার এই প্রস্তাবে গৃহিণীর আপত্তির কোনো কারণ ছিল না, বরং ইহাতে তিনি বিশেষ আনন্দই প্রকাশ করিলেন। আপনার জনের কাছে থাকিয়া ভালো স্কুলে পড়িবে ইহা অপেক্ষা সুখের কথা আর কি হইতে পারে? সহোদর ভাইএর নিকট ছেলেকে রাখিয়া তিনি যতটা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন অন্য কোথাও রাখিয়া ততটা পারিবেন না।

হীরু সমস্ত শুনিয়া বিভাকে ধরিয়া বসিল,—"আমি তা হ'লে ভোলাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবো।"

বিভা বুঝাইয়া বলিল—"সে কি হয় ভাই? পরের বাড়ী গিয়ে ও উৎপাত কর্‌লে তা'রা সহ্য কর্‌বে কেন?"

হীরু অভিমানে কহিল—"তা হ'লে আমি যাবো না মামার সঙ্গে।"

বিভা রাগ করিয়া কহিল—"বেশ ত ভোলাকে নিয়ে চিরকালটা বাড়ী ব'সে থাক, লেখাপড়া শিখে আর কাজ কি? মুখ্যু হ'য়ে থাক্‌লেই চল্‌বে—কেমন?" হীরু আর কোনো কথা না বলিয়া গুম হইয়া বসিয়া রহিল।

কথাটা হীরুর মামার কানে উঠিল। তিনি তাহাকে

বুঝাইয়া বলিলেন—"বিলাতী কুকুর কিনে দেবো; সে দেখ্‌তে ভোলার চেয়ে অনেক ভালো, গায়ে ভোলার চেয়ে তার গুণ জোর বেশী।"

হীরু তাচ্ছিল্যের স্বরে কহিল—"ছাই বিলিতী কুকুর! লড়ুক ত একবার ভোলার সঙ্গে; সে আর লড়তে হয় না; ভোলাকে দেখ্‌লেই ভয়ে লেজ গুটোতে-গুটোতে পালাতে হবে।"

হীরুর কোনো কথাই টিঁকিল না; তাহাকে যাইতেই হইবে। নিরুপায় হইয়া হীরু ক্ষুণ্ণমনে তাহার দিদির উপর ভোলার সমস্ত ভার চাপাইয়া দিল।

হীরুদের বাড়ী হইতে রেল-ষ্টেশন প্রায় আট ক্রোশ দূরে। প্রথম তিন ক্রোশ গোরুর-গাড়ীতে যাইতে হয়; পরে পাকা রাস্তা হইতে ঘোড়ার-গাড়ীর ব্যবস্থা আছে।

যাইবার দিন ঠিক হইয়া গেল। দুপুরে আহারাদি করিয়া গাড়ীতে চড়িতে হইবে। সে-দিন সমস্ত সকালটা হীরু ভোলাকে আদর করিল, নিজে খাইবার পূর্ব্বে ভোলাকে খাওয়াইয়া কেলোদের বাড়ীতে লইয়া গিয়া তাহাকে মিনতি করিয়া কহিল—"আমি রওনা হ'য়ে গেলে ওকে ছেড়ে দিস্, নইলে আমাকে কিছুতেই যেতে দেবে না, ও সমস্ত বুঝ্‌তে পার্‌বে।"

কথাটা বলিতে-বলিতে হীরুর গলার স্বর ভারী হইয়া আসিল। কেলো তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিল—"তুই ভোলার জন্যে ভাবিস্‌নি, আমি মাঝে-মাঝে ও-বাড়ীর হারান-দাকে দিয়ে চিঠি লি'খে তোকে জানাবো ভোলা কেমন থাকে, বুঝ্‌লি? তুই ত চিঠি পড়্‌তে পারিস, তখন আর ভাব্‌না কি?"

হীরু সে-কথায় কোনো কান না দিয়া কেলোকে অনুরোধ করিয়া কহিল—"মাঝে-মাঝে ভোলাকে দেখিস্ কেলো, ভুলিস্‌নি যেন।"

কেলো ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

* * *

হীরু গাড়ীর ছইএর ভিতর বসিতে পারিল না। তাহার যেন কেমন অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। ছইএর বাহিরে আসিয়া উদাস-দৃষ্টিতে রাস্তার দিকে চাহিয়া সে নীরবে বসিয়া রহিল।

গাড়ীখানি ধীরে বট্‌তলা ছাড়াইয়া বাঁ দিকে মোড় ফিরিতেই হীরু দেখিতে পাইল সামনের বড় অশথ-গাছটার তলায় দাঁড়াইয়া ভোলা হাঁফাইতেছে; হীরুকে দেখিতে পাইয়া সে তীর-বেগে ছুটিয়া আসিয়া লাফাইয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। হীরু আনন্দে অধীর হইয়া তাড়াতাড়ি দু'হাতে ভোলার মাথাটা টানিয়া আনিয়া নিজের বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল। সমস্ত দেখিয়া-শুনিয়া হীরুর মামা নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বিকৃতস্বরে বলিয়া উঠিলেন, —"দূর্—দূর্ শীগ্‌গির নামিয়ে দে—!" হীরু ভোলাকে নিষ্কৃতি দিয়া কহিল—"নেমে যা ভোলা!" ভোলা এক লাফে রাস্তায় নামিয়া পড়িয়া গাড়ীর সঙ্গে-সঙ্গে চলিতে আরম্ভ করিল। হীরু একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ভোলার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

হীরু মনে করিয়াছিল তাহারা ঘোড়ার-গাড়ীতে চড়িলে ভোলা গোরুর-গাড়ীর সঙ্গে পুনরায় বাড়ী ফিরিয়া যাইবে। কিন্তু ভোলা যখন হাঁফাইতে-হাঁফাইতে ঘোড়ার-গাড়ীর সঙ্গেও ছুটিতে আরম্ভ করিল তখন হীরু সত্যসত্যই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল। খোসামোদ করিয়া, ধমক দিয়া, এমন-কি প্রহার পর্য্যন্ত করিয়াও যখন হীরু তাহাকে ফিরাইতে পারিল না তখন সে হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িয়া মামাকে প্রশ্ন করিল—"ষ্টেশন থেকে ভোলা পথ চি'নে বাড়ী যেতে পার্‌বে ত?"

তাচ্ছিল্যের স্বরে তাহার মামা উত্তর করিলেন—"নাই বা পার্‌লে?"

মামার উত্তর শুনিয়া হীরুর সমস্ত অন্তরটা তাঁহার প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিল। আর কোনো প্রশ্ন করিবার তাহার প্রবৃত্তি হইল না। গাড়ীর জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া ভোলার দিকে স্নেহকরুণ-দৃষ্টিতে চাহিয়া সে মৌন হইয়া বসিয়া রহিল।

ভোলা সমস্ত রাস্তা অপরিচিত কুকুরদের সঙ্গে ঝগড়া করিতে-করিতে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া দ্রুতগামী ঘোড়ার-গাড়ীর সঙ্গে সমানে ছুটিতে-ছুটিতে যখন ষ্টেশনে পৌঁছিল, তখন রাত্রির অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিয়াছে। ট্রেনের আর বেশী দেরি ছিল না। হীরুর মামা হীরুকে জিনিষ-পত্রের পাহারায় বসাইয়া টিকিট কিনিতে গেলেন। হীরু

সেই সুযোগে সম্মুখের খাবারের দোকান হইতে গোটা কয়েক সন্দেশ কিনিয়া-আনিয়া ভোলাকে খাইতে দিয়া সস্নেহে তাহার গায়ে-মাথায় হাত বুলাইতে-বুলাইতে কহিল—"লক্ষ্মী ভোলা, এখন বাড়ী যা—দিদি তোকে এখন থেকে দেখ্‌বে-শুন্‌বে, খেতে দেবে।…" কথাটা বলিতে-বলিতে হীরুর গলার স্বর ভারী হইয়া আসিল; চোখদুটি সজল হইয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ পরে ভোলা হীরুর সহিত প্লাট্‌ফরমে আসিল। ট্রেন আসিলে হীরু তাহার মামার সহিত গাড়ীতে উঠিয়া জানালা দিয়া গলা বাড়াইয়া ছল্‌-ছল্‌-চোখে ভোলার দিকে চাহিয়া রহিল। ভোলা প্লাট্‌ফরমেই দাঁড়াইয়া রহিল।

গাড়ী ছাড়িয়া দিলে হীরু দেখিতে পাইল ভোলা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ট্রেনের সঙ্গে ছুটিতেছে। গাড়ী জোরে চলিতে আরম্ভ করিলে ভোলা তাহার প্রাণপণ-শক্তিতে গাড়ীর সঙ্গে সমানে ছুটিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুদূর চলিয়া ভোলা ক্রমেই পিছাইয়া পড়িতে লাগিল। হীরু উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে দেখিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে ভোলাকে আর দেখা গেল না। একটা অব্যক্ত বেদনায় হীরুর সমস্ত দেহ মন অবসন্ন করিয়া আনিল। হতাশ ভাবে বেঞ্চির উপর বসিয়া পড়িতেই তাহার দুই গণ্ড বহিয়া ঝরঝর ঝরিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

মামার বাড়ী আসিয়া হীরু একেবারে মুষ্‌ড়িয়া পড়িল। কয়েক-দিন ধরিয়া অতি-প্রয়োজনীয় কথা ভিন্ন সে কাহারও সহিত কথা কহিল না।

পাঁচছয়-দিন পরে হীরু একখানা চিঠি পাইল—কেলো লিখিয়াছে—"তুমি চলিয়া যাওয়ার পর, ভোলা বাড়ী ফিরিয়া এ-কয়দিনের মধ্যে কিছুই খায় নাই, অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহাকে কেহ কিছু খাওয়াইতে পারে নাই। "তাহার পর পরশু দিন ভোলা হঠাৎ পাগল হইয়া ঘোসেদের অজিতকে কামড়াইয়া দিয়াছে; অজিত মারিয়া তাহার মাজা ভাঙিয়া দিয়াছে; এখন আর সে উঠিতে পারে না। চুপ করিয়া নিজের ঘরে শুইয়া থাকে। কিছু না খাওয়াইতে পারিলে শীঘ্রই মরিয়া যাইবে।"

চিঠি পাইয়া হীরু কাঁদিয়া-কাটিয়া সকলকে অস্থির করিয়া তুলিল। দুঃখে-শোকে সে আহার নিদ্রা পর্য্যন্ত ত্যাগ করিল। হীরুর মামা বে-গতিক দেখিয়া সেইদিনই তাহাকে সঙ্গে করিয়া পুনরায় তাহাদের বাড়ীর উদ্দেশে রওনা হইলেন।

* * * *

গোরুর-গাড়ীখানি হীরুদের বাড়ীর কাছাকাছি আসিবা-মাত্র হীরু গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িয়া উদ্বেগ ও আশঙ্কা লইয়া ছুটিতে ছুটিতে একেবারে ভোলার ঘরের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঘরের মধ্যে মুখ বাড়াইয়া দেখিল ভোলা নাই। পাথরের মূর্ত্তির মতন সে নির্ব্বাক্ নিশ্চল হইয়া সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল। একটি বিলাপের বাণীও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না, এক ফোঁটা অশ্রুও তাহার চোখের কোণে দেখা দিল না।

ক্ষণকাল পরেই হীরুর মামা বাড়ীর ভিতর আসিয়া তাঁহাদের আগমন সংবাদ জানাইলেন।

বিভা ছুটিয়া ভোলার ঘরের সম্মুখে আসিতেই হীরু মর্ম্মভেদী স্বরে—"ভোলা আর তোমাদের উৎপাত করবে না, দিদি।" বলিয়া কাঁদিয়া তাহার দেহের উপর লুটাইয়া পড়িল। হীরুকে দুই হাতে কোলের ভিতর চাপিয়া ধরিতেই বিভার চোখ দিয়া কয়েক-ফোঁটা উত্তপ্ত অশ্রু হীরুর মাথার উপর গড়াইয়া পড়িল। একটা সান্ত্বনার কথাও তখন বিভা খুঁজিয়া পাইল না।
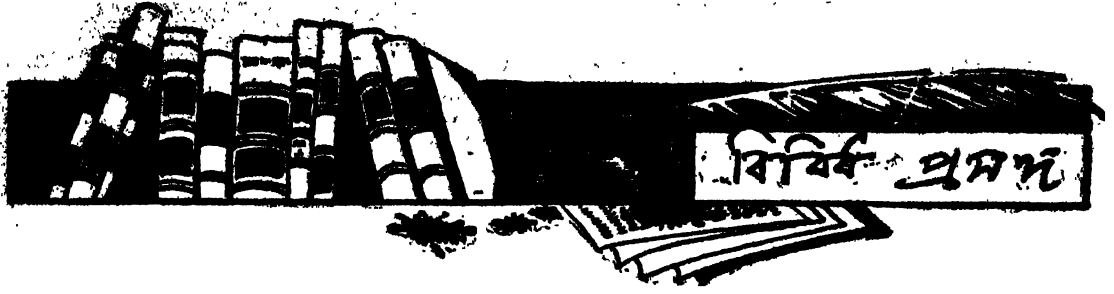
আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের অভিভাষণ

ফরিদপুরে প্রাদেশিক হিন্দুসভার অধিবেশনে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় যে অভিভাষণ পাঠ করেন, তাহা সকল বাঙ্গালী হিন্দুর প্রণিধানযোগ্য। তিনি আরম্ভে বলিতেছেন :—

প্রায় ২০ বৎসর গত হইল আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু ডাঃ উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যে-বিপদ্‌বার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন তাহা আজ অক্ষরে-অক্ষরে ফলিয়াছে। নিম্নে যে-তালিকা প্রদত্ত হইল তাহা দেখিলেই বোধগম্য হইবে হিন্দু জাতি আজ কি-প্রকারে ধ্বংসের পথে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে।

প্রতি দশ বৎসরে হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি

(প্রতি ১০ হাজারে)।

	১৮৮১	১৮৯১	১৯০১	১৯১১	১৯২১
হিন্দু—	৪৮৮২	৪৭৬৭	৪৭০০	৪৫২৩	৪৩৭২
মুসলমান—	৪৯৬৯	৫০৬৮	৫১১৯	৫২৩৪	৫৩৫৫

এই হতভাগ্য দেশে ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, কলেরা প্রভৃতি কালান্তক ব্যাধি মৌরশী পাট্টা করিয়া রহিয়াছে; হিন্দু ও মুসলমান এইসমস্ত ব্যাধির সমভাগী কিন্তু ইহা সত্ত্বেও হিন্দুর সংখ্যা কেন দিন-দিন হ্রাস হইতেছে? ইউরোপীয় জগতে কি-প্রকারে সন্তান-উৎপাদন (birth control) বন্ধ করা যায় তাহার উপায় উদ্ভাবন হইতেছে; কিন্তু বাংলা-দেশে হিন্দুসমাজে আমাদের আত্মকৃত দূষণীয় প্রথাই ইহা সংসিদ্ধ করিতেছে। ইহার প্রধান কারণগুলি, যথা—

(১) বিবাহযোগ্যা পাত্রীর অভাব।

(২) বিধবার বিশেষতঃ বালবিধবার, বাধ্যতামূলক পুনর্বিবাহ নিষেধ।

দেখা যায় যে, প্রায় সমস্ত হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা বেশী; কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর বিবাহ-প্রথা রহিত হওয়ায় অনেক সময় কন্যা পাত্রস্থ করা দায়; আবার অপর পক্ষে পাত্রের উপযুক্ত কন্যা পাওয়াও দুষ্কর—বারেন্দ্র রাঢ়ীর সহিত, আবার উত্তর রাঢ়ী দক্ষিণ রাঢ়ীর সহিত ক্রিয়াকর্ম্ম করিতে নারাজ। হিন্দু-সমাজে তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মধ্যে পণ বিনা পাত্রী পাওয়া দায়। এই কারণে অনেকে ৪০ বৎসর গত হইলে পৈতৃক ভদ্রাসন বন্ধক দিয়া একটি অপরিণত-বয়স্কা বালিকা বিবাহ করেন। অনেকের ভাগ্যে বিবাহ ঘটিয়া উঠে না। ফলে এই দাঁড়ায় যে বালিকাবধূ ১৫-২০ বৎসর বয়সেই বিধবা হইয়া যায়। এই কারণেই বাংলা দেশে কামার, কুমোর, ধোপা, নাপিত প্রভৃতি শ্রেণী এক-প্রকার বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে এবং পশ্চিম দেশীয় খোট্টারা আসিয়া ইহাদের স্থান অধিকার করিতেছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে এই যে অনেক শ্রেণী ও উপশ্রেণীর মধ্যে পুরুষেরা পাত্রীর অভাবে অবিবাহিত থাকিতে বাধ্য হয়, পরন্তু সহস্র সহস্র বালবিধবাগণ সামাজিক রীতি-অনুসারে পুনর্বিবাহ করিতে পারে না। কিন্তু নৈসর্গিক গতি অবরোধ করে কে? উপপত্নী ও রক্ষিতা-নারী সমাজের ভিতর ছড়াইয়া পড়িতেছে—পাপস্রোত ও ভ্রূণহত্যা-পাতকে দেশ প্লাবিত। প্রায় ৭০ বৎসর হইল প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার "বিধবাবিবাহ" বিষয়ক গ্রন্থের উপসংহারে জ্বালাময়ী বাণীতে যে হৃদয়বিদারক আর্ত্তনাদ করিয়াছিলেন তাহা যেন এখনও আমার কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইতেছে। আমি জানি অনেক হিন্দু বিধবা এইপ্রকার কলঙ্কময় জীবন যাপন করা অপেক্ষা ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া উদ্বাহসূত্রে আবদ্ধ হওয়া শ্রেয়ঃ জ্ঞান করেন।

সামাজিক দুর্নীতি ও কুসংস্কারের দাস হইয়া হিন্দুগণ মুসলমানের সহিত জীবন-সংগ্রামে প্রতিনিয়ত পরাজিত হইতেছে এবং জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের অনেক ক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত হইতেছে। বাংলাদেশের বড়-বড় নদীতে অবিরত ষ্টীমার যাতায়াত করে এবং ইংলণ্ড, আমেরিকার বড়-বড় জাহাজ প্রতিনিয়ত সমুদ্রবক্ষে চলিতেছে। ইহাদের সারঙ্, খালাসী প্রভৃতি পূর্ব্ব-বাংলার চাষী মুসলমান শ্রেণী হইতে সংগৃহীত। মুসলমান রেঙ্গুন, আকায়াব, মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি দূরদেশে শ্রমিকভাবে যাইয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করে এবং দেশে পাঠায়। আমি জানি চাটগাঁয়ের অনেক গ্রামে এইপ্রকারে প্রতিমাসে ৪০।৫০ হাজার টাকা মনিঅর্ডার হইয়া আসে। তা-ছাড়া পদ্মায় চর পড়িলেই দুঃসাহসিক মুসলমান ভাসিয়া আবাদ করিতে আরম্ভ করে। প্রতিবৎসর সহস্র-সহস্র মুসলমান চাষী আসামের উর্ব্বরা উপত্যকায় যাইয়া উপনিবেশ সংস্থাপন করিতেছে। কিন্তু হিন্দু অলস ও কুসংস্কার-জালে জড়িত; দুর্গমার্গ ও জাতিচ্যুতির ভয় তাহাকে আড়ষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। সে পৈতৃক ভদ্রাসন ছাড়িয়া যাইতে রাজি নয়। এই কারণে সে দরিদ্র ও নিরন্ন হইয়া পড়িতেছে।

জাতিভেদরূপ-ব্যাধিজর্জ্জরিত হিন্দু প্রতিপদে শৃঙ্খল গড়িয়া নিজকে আবদ্ধ করিয়াছে। ধোপা কুমোরের কাজ করিবে না—কুমোর কামারের কাজ করিবে না। কিন্তু মুসলমানদিগের কোনো-প্রকার বাধাবিপত্তি নাই; সে নিজের রুচি ও ইচ্ছানুযায়ী যে-কোনো ব্যবসা অবলম্বন করিতে পারে; এই কারণে চামড়া ও দপ্তরীর ব্যবসায় মুসলমানদিগের একচেটিয়া।

বাংলাদেশে প্রায় ১৮ লক্ষ উড়িয়া ও হিন্দুস্থানী আসিয়া অনেক বিভাগে জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে এবং অজস্র টাকা রোজগার করিয়া স্ব-স্ব প্রদেশে পাঠাইতেছে। কিন্তু আমরা "হা অন্ন হা অন্ন" করিয়া চীৎকার করিতেছি ও হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া আছি। নিম্ন শ্রেণীর অনেক হিন্দু শ্রমবিমুখ হইয়া অনায়াসলভ্য জীবিকা অর্জ্জনে ব্যস্ত, এই কারণে বৈরাগী ও বৈরাগিণীর সংখ্যা দিন-দিন বাড়িতেছে এবং গেরুয়াধারীরও অভাব দেখা যাইতেছে না। বাবাজী ও মাজিরা পাতাল-কোঁড়ের ন্যায় গজাইয়া উঠিতেছে।

এইপ্রকারে "কতকগুলি প্রকৃত ঘটনা বিবৃত" করিয়া এবং হিন্দু-সমাজ আজ যে কি-প্রকার ব্যাধিগ্রস্ত তাহাও

কিছু-কিছু জানাইয়া রায়-মহাশয় "উপযুক্ত ঔষধ ও পথ্য প্রয়োগ" কল্পে বলেন :—

১ম। বিধবাবিবাহ প্রচলন।

২য়। যে-সমস্ত কুলবধূ প্রতিনিয়ত আমাদের গৃহ হইতে অপহৃত হইতেছে এবং দুর্ব্বলতা ও কাপুরুষতা-প্রযুক্ত যাহাদিগকে আমরা দুর্ব্বৃত্তের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারি না তাহাদিগকে উদ্ধার করা ও সমাজের বক্ষে স্থান দেওয়া।

৩য়। অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন। যদি আমাকে কোনো বিদেশী জিজ্ঞাসা করেন,—৩০ কোটি ভারতবাসী কেন আজ মুষ্টিমেয় পরদেশীর পদানত ও ক্রীড়ার পুত্তলি? আমি এক-কথায় তাহার উত্তর দিই—অস্পৃশ্যতারূপ অভিশাপ। যদি আমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করেন, স্বরাজ-লাভের প্রধান পরিপন্থী কি? আমি এককথায় উত্তর দিব—অস্পৃশ্যতারূপ অভিশাপ। সভা-সমিতিতে বড়-বড় শাস্ত্রের বচন আবৃত্তি করি, যথা :—"সর্ব্বভূতেষু নারায়ণ" কিন্তু তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর কেহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইলেও যদি এক গেলাস জল কোনো সামাজিক নিমন্ত্রণে দেয় তখনই জাতিচ্যুত হইলাম বলিয়া পংক্তিসমেত উঠিয়া পলাই। সোডা, লিমনেড্ পান করিব, বরফজল খাইব—যেন সেগুলি নৈকষ্য-কুলীন শুদ্ধস্নাত পূত হইয়া গায়ত্রী জপ করিতে-করিতে গঙ্গাজল দিয়া প্রস্তুত করে। ষ্টীমারে উঠিয়া সর্ব্বাগ্রে বাবুর্চ্চির নিকট যাইয়া এক প্লেট মুরগীর কারি ও ভাত লইয়া অক্লেশে উদরস্থ করিব। এইসমস্ত ব্যাপারে হিন্দুত্বের কিছুমাত্র বিচ্যুতি হয় না। কলিকাতার এবং অন্যান্য সহরে এখনকার দিনের যত রাঁধুনী ব্রাহ্মণ প্রায়ই খোট্টা না হয় উড়িয়া, তাহাদের জাতি গোত্রের কোনো খবর রাখি না—চেহারা দেখিলে অনেক সময় ডোম কি চামার বলিয়া মনে হয়, কিন্তু একগুচ্ছ সূত্র গলদেশে প্রলম্বিত হইলেই হিন্দুত্ব বজায় থাকে। অনেক সুবিজ্ঞ চিকিৎসক-বন্ধু আমাকে বলিয়াছেন যে, এইসকল বামুন যাহারা পরিবার সঙ্গে আনে না তাহাদের অনেকেরই স্বভাব-চরিত্র কলুষিত, এবং শতকরা ৯৫ জন কদর্য্য ব্যাধিগ্রস্ত। সনাতন হিন্দুধর্ম্ম ইহাদের হস্তে প্রস্তুত অন্ন-ব্যঞ্জনাদি গ্রহণ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন না। অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। ভণ্ডামি ও কপটাচরণ ধর্ম্মের প্রধান আবরণ হইয়াছে—দেশাচার ও লোকাচার ধর্ম্মের সিংহাসন অধিকার করিয়াছে।

বিশুদ্ধ রক্তের অহঙ্কার করিবার লোক শুধু বঙ্গে বা ভারতে নহে, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। অথচ নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞান এই সত্য কথা বহুদি হইতেই বলিয়া আসিতেছেন, যে, বিশুদ্ধ জাতি, অর্থাৎ যে-জাতির সহিত অন্য কোনো জাতির রক্তের মিশ্রণ কখনও হয় নাই, কোথাও নাই—উহা একটা কাল্পনিক পদার্থ। এইজন্য আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের নিম্নলিখিত কথাগুলি খাঁটি বৈজ্ঞানিক সত্য।

যাঁহারা লোকতত্ত্বের (Ethnology) বিষয় কিছুমাত্র আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে, আজকালকার তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর রক্তে অনার্য্য ও দ্রাবিড়ীয় শোণিতের যথেষ্ট সংমিশ্রণ আছে। ক্ষত্রবংশাবতংস রাজপুতগণ শক- ও হূণ-বংশোদ্ভব—হিন্দুসমাজ তাহাদিগকে অবাধে গলাধঃকরণ করিয়া হজম করিয়াছে। আসামের অহোম, কুচবিহার ও ত্রিপুরার নৃপতিগণও এইপ্রকারে ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়াছেন। এক-সময়ে প্রায় সমস্ত বরেন্দ্র-ভূমি কুচবিহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বারেন্দ্র-শ্রেণীর রক্তে যথেষ্ট পরিমাণে মঙ্গোলীয় রক্তের সংমিশ্রণ আছে। বাংলাদেশ হাজার বৎসরের অধিককাল বৌদ্ধধর্ম্মের আধিপত্য স্বীকার করিয়াছিল;—তখন প্রকৃতপক্ষে একাকার হইয়া গিয়াছিল। যখন আদিশূর ও বল্লালসেনের সময় পুনরায় ব্রাহ্মণাধিপত্য বিস্তার লাভ করে, তখন কত-রকম গলদ যে সমাজ মানিয়া লইলেন তাহার আলোচনার সময় নাই। যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, আদিশূর কর্ত্তৃক কান্যকুব্জ হইতে নিমন্ত্রিত পঞ্চ ব্রাহ্মণ হইতে বাংলায় ১২ লক্ষ ব্রাহ্মণের উৎপত্তি, তাঁহাদিগের সহিত তর্ক করিতে চাহি না। ইতিহাসে আছে কি না জানি না যে, তাঁহারা স্বীয়-স্বীয় পত্নী সমভিব্যাহারে আসিয়াছিলেন। আবার সপ্তশতী ব্রাহ্মণেরাই বা কোথায় গেলেন? লোকতত্ত্বের অকাট্য প্রমাণের নিকট সকল যুক্তি পরাস্ত। নাসিকার ছিদ্র (nasal slit) ও মুখের সৌষ্ঠব ও আকৃতি (facial contour) প্রভৃতি দ্বারা বিচার করিলে বাংলাদেশে তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর ও নমঃশূদ্র, ব্রাত্যক্ষত্রিয়, মাহিষ্য প্রভৃতির মধ্যে কিছুমাত্র পার্থক্য দৃষ্ট হইবে না। যদি সুবর্ণবণিকগণের পূর্ব্বপুরুষগণ বল্লালসেনকে ক্রমান্বয়ে মুদ্রা ধার দিয়া এবং তাহা ফিরিয়া পাইবার আশা জলাঞ্জলি দিয়া পুনরায় ঋণ দিতে অস্বীকৃত না হইতেন তাহা হইলে তাঁহারাও আজ কৌলীন্য-মর্য্যাদা হইতে বঞ্চিত হইতেন না। হায় রে বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজ—ধন্য তোর মহিমা! বেদ-সঙ্কলয়িতা ও মহাভারত-রচয়িতা মহামুনি ব্যাস মৎস্যগন্ধার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন—মহর্ষি বশিষ্ঠ ও দেবর্ষি নারদ কেহ বা দাসী পুত্র কেহ বা বেশ্যাপুত্র। সনাতন হিন্দু-ধর্ম্ম কি তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করেন?

ব্যাস বশিষ্ঠ নারদকে কেহ এখন প্রত্যাখ্যান করেন না বটে; কারণ তাঁহারা এখন অশরীরী। কিন্তু তাঁহারা এখন জীবিত থাকিলে তাঁহাদের সঙ্গে আজকালকার বামুনরা পংক্তিভোজন করিতেন না; অধিকন্তু, কেহ তাহা করিলে, বর্দ্ধমানের ব্রাহ্মণ-সভা তাঁহাকে জাতিচ্যুত করিবার ফতোয়া দিতেন।

পুরাকালে কোনো কারণে কোনো হিন্দু-নারীর পদস্খলন হইলে তাঁহার আবার ধর্ম্মপথে আসিবার ও থাকিবার উপায় ছিল এবং তিনি ধর্ম্মশীলা হইলে ভক্তির পাত্রীও হইতেন। ইহা দেখাইবার জন্য হিন্দুসভার সভাপতি প্রফুল্লচন্দ্র বলেন :—

"অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা
পঞ্চনারী স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনং"।

কই, সীতা সাবিত্রীর নাম করা হয় না কেন? ইহার তাৎপর্য্য এই যে, এক-সময়ে হিন্দুধর্ম্ম কি-প্রকার উদার ছিল। যে-সকল বিধবা পুনর্বিবাহ করিয়া আদর্শ সতী হইয়াছেন তাঁহাদিগকেই স্মরণ করিতে হইবে। সে একদিন আর আজ একদিন!

বৌদ্ধ শাস্ত্রেও দেখা যায়, কোনো-কোনো নারী চরিত্র-ভ্রংশ হইবার পরেও ধর্ম্মশীলা হইয়া বৌদ্ধভিক্ষুণী শ্রেণীতে স্থান পাইয়াছিলেন এবং থেরীরূপে সম্মানিতা হইয়াছিলেন।

ভারতবর্ষের মধ্যে সিন্ধুদেশই প্রথমে বিদেশী মুসলমানদিগের দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই আক্রমণের ফলে অনেক হিন্দু পুরুষ ও স্ত্রীলোক মুসলমান-সম্প্রদায়ভুক্ত হয়। তাহাদের পুনর্ব্বার হিন্দু হইবার ব্যবস্থা "দেবল-স্মৃতি"তে আছে। মুসলমান পুরুষের ঔরসে যে-সকল হিন্দু স্ত্রীলোকের সন্তান হইত, তাহাদিগকে পর্য্যন্ত প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া হিন্দুসমাজে পুনর্গ্রহণের ব্যবস্থা ঐ "দেবল-স্মৃতি"তে দৃষ্ট হয়।

বাঙালী হিন্দু সমাজের দুর্ব্বলতার অন্যতম কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া রায়-মহাশয় বলেন :—

মুসলমানগণকে বাদ দিলেও বাংলায় মোটামুটি ২০০ লক্ষ হিন্দু,—তাহার মধ্যে কায়স্থ, ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য মাত্র ২৫।২৬ লক্ষ—অষ্টমাংশ মাত্র। আমি জিজ্ঞাসা করি, ইঁহারাই কি চিরকাল সমাজে আধিপত্য করিয়া আসিবেন? দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে ঈসপ্ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে উদর ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সহিত ঝগড়া বাধিলে অনশনে প্রাণ-ত্যাগ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। এই অবজ্ঞাত, নির্য্যাতিত, অশিক্ষিত তথাকথিত নিম্নশ্রেণী আমাদেরই রক্তমাংস। দৈহিক শক্তি ও বল হিন্দু-সমাজে যাহা-কিছু তাহা ইঁহাদেরই মধ্যে বিদ্যমান, ইঁহাদিগকে বাদ দিয়া হিন্দুসমাজ কোথায় দাঁড়াইবে? ঘরশত্রুতে রাবণ নষ্ট। একদিকে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ—অপর দিকে আমাদের মধ্যে আত্ম-কলহ। এই ঘরোয়া বিবাদ-বিসম্বাদ লইয়া ব্যতিব্যস্ত থাকিব, না এইসমস্ত মিটমাট করিয়া সকল শ্রেণীকে কোলে টানিয়া লইয়া স্বরাজ-লাভের সোপান নির্ম্মাণ করিব?

হিন্দুদের সংখ্যা কেন যথেষ্ট বাড়িতেছে না, বরং কোথাও-কোথাও কমিতেছে, তাহা বলিতে গিয়া বক্তা কয়েকটি কারণ নির্দ্দেশ করেন।

হিন্দু-সমাজের লোক-সংখ্যা হ্রাসের আর-একটি প্রধান কারণ এই—ইদানীং আবার সমাজের নিম্নস্তরের হিন্দুগণ আভিজাত্যগর্ব্বে স্ফীত হইয়া বৈশ্যত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদনে চেষ্টা করিতেছেন। ইহার প্রধান ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, উচ্চবর্ণের লোকেরা যে-প্রকার সামাজিক রীতিনীতি ও চালচলন অনুসরণ করে, ইহারাও সেই পথাবলম্বী হইতেছে। কতকগুলি তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত ছিল কিন্তু এখন তাহারা ইহা বর্জ্জন করিয়াছে। এই কারণে হিন্দু-সমাজের প্রত্যেক স্তরে যে কেবল উৎপাদিকা শক্তি কমিতেছে তাহা নহে, ভ্রূণ ও শিশুহত্যা সেই অনুপাতে বাড়িতেছে। ১৯২১ সালের আদমসুমারীতে দেখা যায় সমগ্র বাংলার লোক-সংখ্যার মধ্যে মোটামুটি ২ কোটি হিন্দু এবং ২।০ কোটি মুসলমান, বাকি শতকরা ৪ ভাগের কম খৃষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতি অন্য ধর্ম্মাবলম্বী। অথচ ৫০ বৎসর পূর্ব্বে (১৮৭২ খৃঃ অব্দে) হিন্দুর সংখ্যা মুসলমান অপেক্ষা ৪ লক্ষ অধিক ছিল।

আর-একটি কারণ অভিভাষণের নিম্নোদ্ধৃত অংশে দৃষ্ট হইবে।

নিম্নে বঙ্গদেশের হিন্দু ও মুসলমান বিধবার যে-তালিকা প্রদত্ত হইল তাহা দৃষ্টে স্পষ্ট প্রতী............যে, কেন আমাদের ইসলাম-ধর্ম্মাবলম্বী ভ্রাতৃগণ সংখ্যায় আমাদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া যাইতেছে।

বয়স	হিন্দু-বিধবা	মুসলমান-বিধবা
১—৫	১৪৩৯	১৪০৬
৫—১০	৮৭৫১	৭৫৫৮
১০—১৫	৩৬৩২৩	২৩৪৮০
১৫—২০	৯৬৪৭০	৫২১৭৯
২০—২৫	১৫১০৮৬	৭২৫৯৮
২৫—৩০	২৩০৭৯০	১২৪৪৬৯

উপরের তালিকাটি-সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার আছে। বাংলা দেশে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা বেশী; হিন্দুনারী অপেক্ষা মুসলমান নারীর সংখ্যা বেশী।

হিন্দুনারী—৯৯,৫০,৮২৫।

মুসলমান নারী—১,২৩,৮১,৮১৭।

ইহা-সত্ত্বেও বিধবাদের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা বেশী, মুসলমানের সংখ্যা কম। ইহার কারণ, হিন্দুবিধবাদের—এমন-কি বালিকা ও শিশু বিধবাদেরও বিবাহ হয় না, কিন্তু মুসলমান-বিধবাদের বিবাহ নিষিদ্ধ নহে বলিয়া তাহারা অনেকে বিবাহ করিয়া সধবাদের শ্রেণীভুক্ত হয়, বিধবা-পর্য্যায়ভুক্ত থাকে না। হিন্দুসমাজের সংস্রবে থাকায় মুসলমানদের মধ্যেও বিধবা-বিবাহে বিরাগ কতকটা প্রবেশ করিয়াছে; নতুবা তাহাদের মধ্যে বিধবার সংখ্যা আরও কম দেখা যাইত।

মুসলমানদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত থাকায় তাহাদের মধ্যে অধিক-সংখ্যক নারী জননী হন; হিন্দুদের মধ্যে উহার প্রচলন না থাকায় অল্পবয়স্কা বিধবাদেরও মাতৃত্ব ঘটে না। মুসলমানদের অধিকতর বংশবৃদ্ধির ইহা একটি কারণ। ইহাও মনে রাখিতে হইবে, যে, হিন্দু বিধবাদের মধ্যেও কেহ-কেহ মুসলমানের পত্নী বা উপপত্নী হওয়ায়, তাহাও মুসলমানের সংখ্যা-বৃদ্ধির কারণ হয়। বাংলাদেশে, বিশেষ করিয়া হিন্দুসমাজে, নিতান্ত কচি বয়সে অনেক কন্যার বিবাহ হয় এবং অল্প বয়সেই তাহাদের সন্তান হয়। এই শিশুদের অনেকের শৈশবেই মৃত্যু হয়; যাহারা বাঁচিয়া থাকে, তাহারাও বেশ সুস্থ সবল ও দীর্ঘজীবী হয় না। অন্যদিকে, বিধবাদের বিবাহ যখন হয়, তখন সাধারণত যৌবন-প্রাপ্তির পরই হইয়া

থাকে, তাহাদের সন্তানও জন্মে যৌবন-প্রাপ্তির পর। এইসব সন্তানের জীবনী-শক্তি, স্বাস্থ্য ও আয়ু শিশু-বিবাহের সন্তানদের চেয়ে বেশী হইবারই কথা। সুতরাং বিধবা বিবাহ-নিষেধক হিন্দু-সমাজ অপেক্ষা উহার অনুমোদক মুসলমান সমাজের অধিকতর সজীবতা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

অবনত শ্রেণীর অনেক হিন্দু কেন খৃষ্টিয়ান্‌ বা মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করেন, তাহার প্রধান কারণ অভিভাষণের নিম্নোদ্ধৃত অংশে বিবৃত হইয়াছে।

ছুঁৎমার্গগ্রস্ত উচ্চবর্ণের হিন্দুদিগের অবজ্ঞা ও উদাসীনতার ফলে অবনত শ্রেণীর লোকেরা দলে-দলে মুসলমান ও খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে। কেনই বা করিবে না? ইস্‌লাম ধর্ম্মে সাম্যবাদের পরাকাষ্ঠা বিদ্যমান। ডোম হউক, বাগ্দী হউক সে যে-দিন ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে সেই দিন হইতে সে সমস্ত সামাজিক অধিকার অন্যের সহিত সমভাবে ভোগ করে। একসঙ্গে, এমন-কি একপাত্র হইতে ভোজন, এক মসজিদে ভগবানের উপাসনা হইতে সে বঞ্চিত হয় না। ইহা ছাড়া খৃষ্টান মিশনারীরা তাহাদের শিক্ষা, চিকিৎসা ও ভাবী জীবিকা অর্জ্জনের যথেষ্ট সহায়তা করেন। এককথায় বলিতে গেলে হিন্দুসমাজ কেবল পায়ে ঠেলিতে পারে, কোলে টানিয়া আনিবার শক্তি তাহার নাই। সম্প্রতি নিমন্ত্রিত হইয়া আমি সপ্তাহকাল "অভয়-আশ্রমের" আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম। সেখানে যে দিব্য দৃশ্য দেখিলাম তাহাতে আমার বড়ই তৃপ্তিলাভ হইল। সেখানে হিন্দু মুসলমানের বাদ-বিচার (?) নাই—সেবক হইলেই হইল এবং অনেক সময় চামার-মেথর ভদ্রলোকের সন্তানগণের সহিত পাশাপাশি বসিয়া আহার-বিহার করেন। কুমিল্লা সহরের মেথরগণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও ধৌত বস্ত্র পরিধান করিয়া যখন আহার করিতে লাগিল তখন মনে অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইল। শুধু তাহাই নহে, এইসমস্ত অবজ্ঞাত ও পদদলিত লোকের বাবুদের সঙ্গে একাসনে বসিয়া আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান বাড়িল। হিন্দু-সমাজ ইহাদিগকে ইতর জীবজন্তু অপেক্ষা ঘৃণা করে এবং কোণঠেসা করিয়া রাখিয়াছে। একটা বিড়াল আঁস্তাকুড় বেড়াইয়া পচা ইন্দুরের মাংস ভক্ষণের পর রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়া কড়ায় মুখ দিয়া চক্‌চক্‌ করিয়া দুধ খাইতেছে, কখনও-কখনও-বা থাবা দিয়া পাত হইতে মাছের মুড়া লইয়া খাইতেছে—ছুঁৎমার্গীদের ইহাতে কোনো আপত্তি হয় না—অম্লানবদনে সেই দুধ পান করে ও সেই পাতে বসিয়া ভোজন করে। কিন্তু তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতির কেহ রান্নাঘরের চৌকাঠ উত্তীর্ণ হইলে একরশি তফাতে ভাতের হাঁড়ি অন্নব্যঞ্জনাদি তৎক্ষণাৎ অপবিত্র হইল বলিয়া পরিত্যক্ত হয়। স্বামী বিবেকানন্দ যথার্থই বলিয়াছেন, যে এখন রান্নাঘরে ও ভাতের হাঁড়ির ভিতর হিন্দুধর্ম্ম আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, অর্থাৎ দেশাচার, লোকাচার ও কপটাচার ধর্ম্মের দোহাই দিয়া বিরাজ করিতেছে।

বাংলাদেশে অজ্ঞতার পরিমাণ নির্দ্দেশার্থ রায় মহাশয় বলিতেছেন :—

বাংলাদেশ অজ্ঞতা-তমসাচ্ছন্ন—শতকরা ৫।৭ জন মাত্র বর্ণজ্ঞান-বিশিষ্ট। এইসমস্ত কুসংস্কার তিরোহিত করিতে হইলে লোকশিক্ষা বিস্তার সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। যাহাতে প্রত্যেক গ্রাম অন্তত প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। বিশেষতঃ বালিকাগণের মধ্যেও শিক্ষার আলোক প্রবেশ করাইতে হইবে। গবর্ণমেণ্টের দিকে চাহিয়া থাকিলে আর চলিবে না।

শতকরা পাঁচ সাত জনে ও দশজনে বিশেষ কোনো প্রভেদ নাই। তথাপি বঙ্গে নিরক্ষরদের সংখ্যার নির্ভুলতার জন্য বলা আবশ্যক, যে, বঙ্গে ৫ বৎসরের অধিকবয়স্ক পুরুষদের মধ্যে হাজার-করা ১৮১ জন, এবং ঐ বয়সের নারীদের মধ্যে হাজারে ২১ জন লিখিতে-পড়িতে পারে; স্ত্রীলোক ও পুরুষ একত্র ধরিলে হাজারে ১০৪ জন অর্থাৎ শতকরা দশের কিছু বেশী লিখন-পঠনক্ষম।

উপসংহারে বক্তা-মহাশয় বলেন :—

বাংলায়—বিশেষতঃ পূর্ব্ব ও উত্তর বাংলায়—হিন্দুজাতি ধ্বংসের পথে চলিয়াছে—স্বেচ্ছাকৃত আত্মহত্যা করিতেছে। এখনও যদি আমাদের মোহ-নিদ্রা না ভাঙ্গে তাহা হইলে ২০০।২৫০ শত বৎসরের মধ্যে হিন্দুজাতি ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইবে। এখন আর কথায় চিঁড়া ভিজাইবার চেষ্টা করিলে হইবে না, কাজ করিতে হইবে ও কাজে দেখাইতে হইবে যে, আমরা প্রকৃতই এই ধ্বংসোন্মুখ জাতি সংরক্ষণে প্রস্তুত। এই হিন্দুসভার তথা-কথিত নিম্ন শ্রেণীদিগকে অনাচরণীয়রূপ অবজ্ঞা হইতে মুক্ত করিতে হইবে। তাহাদিগকে "জলচল" করিতে হইবে। যদি সাহসে না কুলায়, জানিলাম, যে, আমাদের বক্তৃতা ও আস্ফালন ফাঁকা আওয়াজ মাত্র।

—

হিন্দুর ধর্ম্মান্তরগ্রহণের একটি কারণ

"উচ্চ"বর্ণের হিন্দুদের অবজ্ঞা, উদাসীনতা, অপমানকর ব্যবহার ও কোথাও-কোথাও নিষ্ঠুরতা "অবনত" শ্রেণীর লোকদের ধর্ম্মান্তর গ্রহণের একটি প্রধান কারণ, ইহা অনেকে বলিয়াছেন। ইহা সত্য কথা। কিন্তু আমরা মনে করি, এই কারণসত্ত্বেও "অবনত" হিন্দুদের হিন্দুই থাকা উচিত, এবং তাঁহারা হিন্দু থাকিতেও পারেন, এবং ক্রমশঃ সামাজিক লাঞ্ছনা হইতেও আপনাদিগকে মুক্ত করিতে পারেন।

যাঁহারা ধর্ম্মপিপাসু হইয়া আধ্যাত্মিক কারণে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিতেছি না। আর্থিক ও সামাজিক কারণে হিন্দুর ধর্ম্মান্তর-গ্রহণই এস্থলে আমাদের আলোচ্য।

হিন্দু মহাসভা যেরূপ ব্যাপকভাবে হিন্দুর সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং যাহার ফলে উহার গত অধিবেশনে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় উহার অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি

এবং রাজা রাজপৎ রায় উঁহার সভাপতি-পদে বৃত হইয়াছিলেন, আমরা হিন্দু শব্দের সেই ব্যাপক সংজ্ঞা গ্রহণ করিয়া আমাদের বক্তব্য বলিব।

খৃষ্টীয় কোনো-কোনো দেশের ইতিহাসে দেখিতে পাই, যে, তথায় পূর্ব্বে রোমান্ কাথলিক্ ভিন্ন অন্য সম্প্রদায়ের খৃষ্টিয়ানগণ উৎপীড়িত হইত। তাহারা রোমান্ কাথলিক-দিগের গির্জ্জায় উপাসনা করিতে পাইত না, মৃত্যুর পর তাহাদের দেহ রোমান্ কাথলিক্‌দের গোরস্থানে স্থান পাইত না; কখন-কখন তাহাদিগকে জীবিত অবস্থাতে পুড়াইয়া মারিয়া ফেলা হইত। কিন্তু এক সম্প্রদায়ের খৃষ্টিয়ানেরা অন্য-এক সম্প্রদায়ের খৃষ্টিয়ানদের প্রতি অত্যাচার করিত বলিয়া উৎপীড়িত সম্প্রদায় খৃষ্টীয় ধর্ম্ম ত্যাগ করে নাই; বরং উৎপীড়িতেরা নিজেদের মত ও বিশ্বাস-কেই বিশুদ্ধ খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রতিপাদনপূর্ব্বক নিজেদের দল পুষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে দেখিতে পাই মুসলমানদিগের মধ্যে এক দল লোক আফ্‌গানিস্থানে উৎপীড়িত হইতেছে, তাহাদের মধ্যে কয়েকজন কারারুদ্ধ এবং দুজন প্রস্তর-নিক্ষেপ দ্বারা নিহত হইয়াছে। কিন্তু এই অত্যাচারের জন্য উৎপীড়িত আহ্‌মদিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা ইস্‌লাম ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই; বরং তাহারা এশিয়া ও ইউরোপে নিজেদের মতকেই প্রকৃত ইস্‌লাম বলিয়া প্রমাণ ও প্রচার করিবার চেষ্টা করিতেছে।

ইংলণ্ডে দীর্ঘ কাল ধরিয়া রোমান্ কাথলিকেরা রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইত না; প্রটেস্‌টাণ্ট্‌দিগের মধ্যে আংলিকান্ ভিন্ন অন্য খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের লোকেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পড়িতে পাইত না। কিন্তু এরূপ কারণেও এইসকল উৎপীড়িত খৃষ্টীয়ানেরা খৃষ্টীয় ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে নাই।

আমেরিকার ইউনাইটেড্‌ষ্টেট্‌সের নিগ্রোগণ খৃষ্টীয়-ধর্ম্মাবলম্বী। কিন্তু সাধারণতঃ তাহারা শ্বেতকায় খৃষ্টীয়ান্‌-দের গির্জ্জায় উপাসনা করিতে পায় না, শ্বেতকায়দের গোরস্থানে তাহাদের মৃতদেহ প্রোথিত হয় না, শ্বেতকায়-দের স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহারা পড়িতে পায় না, শ্বেতকায়দের হোটেলে তাহারা থাকিতে বা খাইতে পায় না, শ্বেতকায়দের সঙ্গে এক রেলগাড়ীর কাম্‌রায় বা এক ট্রামে তাহারা ভ্রমণ করিতে পারে না, ভোজে শ্বেতকায়দের সহিত তাহাদের নিমন্ত্রণ ও পংক্তিভোজন হয় না, শ্বেতকায়দের সহিত তাহাদের বিবাহ অনেক রাষ্ট্রে বে-আইনী কাজ বলিয়া দণ্ডিত হয়, শ্বেতকায়েরা কখন-কখন বিচারের পূর্ব্বেই নিগ্রোদিগকে ফাঁসী দিয়া বা পুড়াইয়া মারিয়া ফেলে। কিন্তু তথাপি আমেরিকার নিগ্রোরা খৃষ্টীয় ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে না; তাহারা সর্ব্বপ্রকারে নিজেদের উন্নতি করিবার চেষ্টা করিতেছে; নিজেদের স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতেছে, এবং নিজেদের গির্জ্জায় নিজেদের ধর্ম্মোপদেষ্টা ও পুরোহিতের দ্বারা উপাসনা ও ধর্ম্মসঙ্গত সমুদয় ক্রিয়া-কলাপ ও অনুষ্ঠান সম্পাদন করিতেছে।

আমাদের দেশে যে সব জাতিকে অস্পৃশ্য বা অনাচরণীয় মনে করা হয়, তাঁহাদিগকেও "উচ্চ" বর্ণের লোকদের সঙ্গে এক স্কুলে অনেক জায়গায় পড়িতে দেওয়া হয় না, দেবমন্দিরে ঢুকিতে দেওয়া হয় না, তাঁহাদের সহিত পংক্তি-ভোজন ও বৈবাহিক আদান-প্রদান হয় না, ইত্যাদি। এইসব কারণে তাঁহাদের মধ্যে অনেকে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহারা তাহা না করিয়া উৎপীড়িত নানা খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের ও খৃষ্টিয়ান্ নিগ্রোদের মতন নিজেদের ধর্ম্মেই থাকিয়া ক্রমে-ক্রমে নিজেদের উন্নতি করিতে পারেন। "উচ্চ" বর্ণের দেবমন্দিরে ঢুকিতে না পাইলে তাঁহারা নিজেদের মন্দির নির্ম্মাণ করিতে পারেন, "উচ্চ" বর্ণের পুরোহিতেরা তাঁহাদের বিবাহ না দিলে নিজেদের পুরোহিত তাঁহারা নিযুক্ত করিতে পারেন (বস্তুতঃ অনেক "নিম্ন" শ্রেণীর হিন্দুর নিজেদের পুরোহিত আছে), ইত্যাদি। অবশ্য এইরূপ স্বাবলম্বী হইতে হইলে কতকটা শিক্ষার ও চিন্তাশক্তির এবং দল বাঁধিবার ক্ষমতার প্রয়োজন। দাসত্বমুক্ত নিগ্রোদের মধ্যে প্রথম-প্রথম যত শিক্ষিত লোক ছিল, ভারতবর্ষের "অবনত" জাতিদের মধ্যে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বা অনুপাত তাহা অপেক্ষা কম নহে। নিগ্রোরা যখন খুব সামান্য অবস্থা হইতে ক্রমশঃ উন্নত ও শক্তিশালী হইতে পারিতেছে, তখন আমাদের দেশের "নিম্ন" শ্রেণীর হিন্দুরা কেন না

পারিবে ? নিগ্রোরা একেবারে বর্ব্বর অবস্থা হইতে উন্নতি করিয়াছে। আমাদের দেশের নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা সাধারণতঃ আফ্রিকার নিগ্রোদের মতন অসভ্য অবস্থার লোক নহে। তদ্ভিন্ন, শ্বেতকায় ও নিগ্রোতে জাতিগত (racial) যে-প্রভেদ আছে, অস্মদ্দেশে (দৃষ্টান্ত-স্বরূপ) ব্রাহ্মণে ও নমঃশূদ্রে সে প্রভেদ নাই।

কেহ-কেহ মনে করিতে পারেন, ব্রাহ্মণে পৌরোহিত্য না করিলে যখন হিন্দুবিবাহ সিদ্ধ হয় না, তখন অন্য জা'তের লোকেরা কেমন করিয়া সকল বিষয়ে স্বাবলম্বী হইতে পারেন ? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অনেক হিন্দু জা'তের নিজেদের পুরোহিত আছে, যাহারা ব্রাহ্মণ নহে। তা-ছাড়া, আজকাল, স্যার্ হরিসিং গৌড় যে-বিবাহ-আইন বিধিবদ্ধ করাইয়াছেন, তদনুসারে কোনো হিন্দুর বিবাহ রেজিষ্টারী করা হইলেই তাহা নিশ্চিত আইনসঙ্গত বিবেচিত হইবে, তাহাতে ব্রাহ্মণ পুরোহিত থাকুন বা না থাকুন। সুতরাং বিবাহের জন্য আর কোনো উদ্বেগের কারণ নাই।

অতএব আমরা বলি, ব্রাহ্মণদের বা অন্য "উচ্চ" বর্ণের লোকদের মুখাপেক্ষী না হইয়া এবং তাঁহাদের সহিত বিরোধও না করিয়া যে-কোনো হিন্দু-জা'তের লোকেরা হিন্দু থাকিয়াই উন্নত ও স্বাবলম্বী হইতে পারেন।

বস্তুতঃ হিন্দুদিগের মধ্যে যাঁহারা আপনাদিগকে "ভদ্র-লোক" বলিয়া থাকেন ও অন্য সকলকে ঐ আখ্যা হইতে বঞ্চিত করিতে চান, তাঁহারাই সংখ্যায় অল্প, ও অপরেরাই সংখ্যায় বেশী (তাহা পরে দেখাইতেছি)। অতএব, যাঁহারা সংখ্যায় কম, তাঁহারা হিন্দুয়ানীর সমুদয় অধিকার ও মানসম্ভ্রম একচেটিয়া করিবেন, এবং অপরেরা তাহাতে বঞ্চিত থাকিয়াও নীরব ও নিশ্চেষ্ট থাকিবেন, ইহা স্বাভাবিক অবস্থা নহে। ন্যায্য ব্যবস্থা এই, যে, হিন্দুনামধারী সকল হিন্দুই হিন্দুত্বের গৌরব, মানসম্ভ্রম, অধিকার প্রভৃতি পাইবেন। যদি তাহা না হইয়া অধিকাংশ হিন্দুনামধারী ব্যক্তি ঐ গৌরবাদির অধিকারী হইতেন, তাহা হইলে তাহাও বর্ত্তমানে সংখ্যায় ন্যূন লোকদিগের উহাতে এক-চেটিয়া অধিকার স্থাপন অপেক্ষা ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা বলা যাইতে পারিত।

হিন্দু-সমাজে কাহাদের সংখ্যা বেশী তাহা দেখাইবার জন্য বাংলা দেশের কয়েকটি জা'তের লোক-সংখ্যা ১৯২১ সালের সেন্সাস্ রিপোর্ট্ হইতে নীচে উদ্ধৃত করিতেছি। জা'তের নাম সেন্সাস্ রিপোর্টে যেরূপ লেখা আছে, সেইরূপ দিলাম। এবিষয়ে আমাদের নিজের কোনো দায়িত্ব নাই।

জা'ত	লোকসংখ্যা
চাষী কৈবর্ত্ত (মাহিষ্য)	২২,১০,৬৮৪
নমশূদ্র	২০,০৬,২৫৯
রাজবংশী	১৭,২৭,১১১
বাগ্দী	৮,৯৫,৩৯৭
বৈদ্য	১,০২,৯৩১
বাউরী	৩,০৩,০৫৪
ব্রাহ্মণ	১৩,০৯,৫৩৯
চামার ও মুচী	৫,৬৯,৯৬৬
ধোবা	২,২৭,৪৬৯
ডোম	১,৫০,২৬৩
গন্ধবণিক্	১,৪১,৮৮৬
গোয়ালা	৫,৮৩,৯৭০
হাড়ি	১,৪৮,৮৪৭
যোগী বা যুগী	৩,৬৫,৯১০
জালিয়া কৈবর্ত্ত (আদি কৈবর্ত্ত)	৩,৮৪,০৪৯
কামার (কর্ম্মকার)	২,৫৬,৮৮৭
কায়স্থ	১২,৯৭,৭৩৬
কুমার	২,৮৪,৬৫৩
মালো	২,২১,১৯৮
নাপিত	৪,৪৪,১৮৮
পোদ (পৌণ্ড্র)	৫,৮৮,৩৯৪
সদ্গোপ	৫,৩৩,২৩৬
সাহা	৫,৫৯,৭৩১
শুঁড়ি	৯২,৪৯২
সুবর্ণবণিক্	১,১৭,১২৩
সূত্রধর	১,৬৮,৫৭৭
তাঁতি ও তাতোয়া	৩,১৯,৬১৩
তেলী ও তিলি	৩,৯৫,৯২৬

ইহা হইতে দেখা যাইবে, ভদ্রলোক-নামধেয় জা'তের লোকেরা সংখ্যায় অন্যান্য জা'তের লোকদের চেয়ে অনেক কম। উপরে সকল জা'তের উল্লেখ করা ও লোকসংখ্যা দেওয়া হয় নাই। নতুবা "ভদ্রলোক" শ্রেণীর লোকদের সংখ্যা তুলনায় আরো কম দেখা যাইত।

কোনো সমাজের মধ্যে যাহারা সংখ্যায় বেশী, তাহারাই যদি জ্ঞানগৌরবে, সর্ব্ববিধ মানসিক ও আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্যে এবং সামাজিক মানসম্ভ্রম ও অধিকারে হীন হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে-সমাজ কখন উন্নত ও শক্তিশালী হইতে পারে না; এই-হেতু হিন্দুসমাজের সকল শ্রেণীর লোকদেরই সর্ব্ববিধ অধিকার পাওয়া উচিত।

দেশাচার ও লোকাচার-অনুসারে ভিন্ন-ভিন্ন জা'তের লোকদের সমাজে যে-স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে, শিক্ষা ও আর্থিক অবস্থার উন্নতির দ্বারা কার্য্যতঃ ও ব্যবহারতঃ তাহার পরিবর্ত্তন হইতে পারে। জা'তদের মধ্যে ব্রাহ্মণদের স্থান লোকাচার, দেশাচার ও শাস্ত্র-অনুসারে সকলের উপর; কিন্তু তা বলিয়া নিরক্ষর রাঁধুনী-বামুন, ছাগ মাংস-বিক্রেতা বামুন, কলিকাতা-শহরে উৎকলীয় ও পশ্চিমা ব্রাহ্মণ মজুর গাড়োয়ান ও কারিকর কার্য্যতঃ ব্রাহ্মণের সম্মান পায় না। অন্য দিকে একটি দৃষ্টান্তও লউন। কারণ যাহাই হউক, লোকাচার ও দেশাচার-অনুসারে গোঁড়া লোকদের দ্বারা সুবর্ণবণিকেরা জলাচরণীয় জা'ত বলিয়া বিবেচিত হয় না। কিন্তু তাহারা শিক্ষায় অনেকটা অগ্রসর এবং সচ্ছল অবস্থার লোক বলিয়া "অবনত" শ্রেণীভুক্ত নহে। বঙ্গে শিক্ষায় সুবর্ণবণিক্‌দের স্থান কিরূপ, তাহা নীচের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে।

জা'ত	হাজারে কয় জন লিখনপঠনক্ষম
বৈদ্য	৬৬২
ব্রাহ্মণ	৪৮৬
কায়স্থ	৪১৩
সুবর্ণবণিক্	৩৮০
গন্ধবণিক্	৩৪৪
সাহা	৩২১
বারুই	২২৯
তেলী ও তিলী	২২৫
কামার	২০২
সদ্‌গোপ	২০০
নাপিত	১৫২
কৈবর্ত্ত চাষী	১৩৯
নমশূদ্র	৮৫

যে-কোন হিন্দু জা'ত শিক্ষায় অগ্রসর ও ধনশালী হইলে, ব্রাহ্মণসভার প্রতিকূলতাসত্ত্বেও তাহাদের সামাজিক মর্য্যাদা বৃদ্ধি অনিবার্য্য।

আমরা আগে দেখিয়াছি, যে, কোন-কোন খৃষ্টীয় ও মহম্মদীয় সম্প্রদায় ও জাতি অপমান ও উৎপীড়নসত্ত্বেও খৃষ্টীয় বা মহম্মদীয় ধর্ম্ম ত্যাগ করে নাই, বরং তাহারা স্বধর্ম্মে থাকিয়াই নিজের-নিজের চেষ্টায় অবস্থার উন্নতি ও দলবৃদ্ধি করিতেছে। আমাদের বিশ্বাস "নিম্ন" শ্রেণীর হিন্দুরাও হিন্দু থাকিয়াই ক্রমে-ক্রমে সামাজিক মর্য্যাদা লাভ করিতে পারিবে। তাহার জন্য তাহাদের মধ্যে শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তৃতি এবং তাহাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি আবশ্যক।

এক্ষণে দুই-একটি আপত্তি উঠিতে পারে। অনেকে বলিবেন, হিন্দুধর্ম্মে অনেক কুসংস্কার আছে এবং অনেক অযৌক্তিক মত আছে; সুতরাং তাহা ত্যাগ করাই ভালো। আমরা স্বীকার করি, যে, হিন্দুধর্ম্মে কুসংস্কার ও ভ্রান্ত মত অনেক আছে, এবং সেগুলি বর্জ্জন করা একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু সেইগুলি বর্জ্জন করিলেই ত হইল; তাহার উপর আবার খৃষ্টীয়ান্ বা মুসলমান হইবার কি প্রয়োজন আছে? শেষোক্ত ঐ দুই ধর্ম্মে এবং প্রত্যেক ঐতিহাসিক ধর্ম্মে কুসংস্কার ও ভ্রান্ত মত আছে, এবং তাহা সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মে কুসংস্কার ও ভ্রম আছে বলিয়া উহা পরিত্যাগ করিয়া কুসংস্কার ও ভ্রম-পূর্ণ খৃষ্টীয় বা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ কেমন করিয়া যুক্তিযুক্ত হইতে পারে, তাহা বুঝিতে পারি না।

পাশ্চাত্য নানা দেশে বিস্তর শিক্ষিত লোক আছে, যাহারা খৃষ্টীয় ধর্ম্মের কুসংস্কার ও ভ্রম ত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু খৃষ্টীয় নাম ত্যাগ করে নাই। তাহারা খৃষ্টীয়ান্ বলিয়াই পরিচিত। তেমনি হিন্দুধর্ম্মের কুসংস্কার ও ভ্রম ত্যাগ

করিয়াও হিন্দু থাকা যায়। বস্তুতঃ এখনই ত হিন্দুসমাজে হাজার-হাজার শিক্ষিত লোক আছে যাহারা অজ্ঞ লোকদের কুসংস্কার ও ভ্রম বর্জ্জন করিয়াছে। তাহা না হইলে লালা লাজপত রায় ও আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ভারতবর্ষীয় হিন্দুমহাসভা এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দুসভায় উচ্চ স্থান লাভ করিতে পারিতেন না।

আর-একটা আপত্তি এই হইতে পারে, যে, খৃষ্টীয় ধর্ম্মের বা ইস্লামের কুসংস্কার ও ভ্রমগুলি উহার অস্থিমজ্জাগত নহে, এইজন্য তৎসমুদয় বর্জ্জন করিলেও উক্ত দুই ধর্ম্মের সার শ্রেষ্ঠ অংশ অনেক থাকে; কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের ভ্রম ও কুসংস্কারগুলি উহার অস্থিমজ্জাগত, সুতরাং সেগুলি ত্যাগ করিলে হিন্দুধর্ম্মই ত্যাগ করিতে হইবে। ইহা সত্য নহে। এই আপত্তির কোনো মূল্য নাই। তাহা দেখাইতেছি।

আমেরিকায় নিগ্রোদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা হয়, তাহা আগে বলিয়াছি। তাহাদের প্রতি এরূপ ব্যবহার হইবার একটা কারণ এই যে, তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা পূর্ব্বে তাহাদের জন্মভূমি আফ্রিকা হইতে ক্রীত বা হৃত দাসরূপে আমেরিকায় আনীত হইয়াছিল, এবং পশুর মত ব্যবহৃত হইত। যখন বর্ব্বর ও নিষ্ঠুর দাসত্বপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত হইল, তখন খৃষ্টীয়ান্ পাদ্রীরা বলিতে লাগিলেন, যে, দাসত্বপ্রথা খৃষ্টীয় ধর্ম্মসম্মত; তাঁহারা বাইবেল্ হইতে উহার সমর্থক বচনসকল উদ্ধৃত করিয়া দাসব্যবসায়ীদের ও দাসপ্রভুদের কার্য্যের সমর্থন করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ ইহা সত্যও বটে, যে, বাইবেলে দাসত্ব-প্রথার বিরুদ্ধে পরিষ্কার কোনো উক্তি নাই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইউরোপ ও আমেরিকার দাসত্বপ্রথার উচ্ছেদ সাধিত হইয়াছে। তাহাতে কেহই বলে না, যে, খৃষ্টীয় ধর্ম্মটাই মাটি হইয়াছে। বরং আগে যে-সকল পাদ্রী ও মিশনরী দাসত্বপ্রথার সমর্থন করিতেন, তাঁহাদেরই স্থানভুক্ত অন্য পাদ্রী ও মিশনরীরা এখন দাসত্বপ্রথার উচ্ছেদকে খৃষ্টধর্ম্মের অন্যতম কীর্ত্তি বলিয়া দাবী করেন।

আর-একটা দৃষ্টান্ত লউন।

আগে খৃষ্টীয় দেশসকলে ডাইনী বলিয়া সন্দেহভাজন স্ত্রীলোকদিগকে জলে ডুবাইয়া বা পুড়াইয়া মারিয়া ফেলা হইত। বাইবেলে তাহাদের প্রাণবধের সমর্থক যে-উক্তি আছে, তাহা এইপ্রকার নিষ্ঠুর ব্যবহারের সমর্থনার্থ উদ্ধৃত হইত। কিন্তু এখন ডাইনীদের অস্তিত্বে বিশ্বাস খৃষ্টীয় দেশসমূহ হইতে প্রায় লোপ পাইয়াছে এবং ডাইনীদিগকে তথায় পুড়াইয়া বা জলে ডুবাইয়া বা অন্য কোনো-প্রকারে মারিয়া ফেলা হয় না। তাহা হইলেও খৃষ্টীয় ধর্ম্মটা টিঁকিয়া আছে।

সেইরূপ "অস্পৃশ্যতা," কাহারও-কাহারও প্রদত্ত জলের বা অন্নের অগ্রহণীয়তা, অসবর্ণ বিবাহের ও বিধবাবিবাহের নিষিদ্ধতা, প্রভৃতি এখন হিন্দু-ধর্ম্মের সার অংশ বলিয়া গৃহীত হইতেছে বটে; কিন্তু যখন ক্রমে ক্রমে লোকে এগুলি পরিত্যাগ করিবে, তখনও হিন্দুধর্ম্ম থাকিবে, এবং নির্ম্মলতম প্রবলতম ও সজীবতমভাবে থাকিবে, হিন্দুর শাস্ত্র, হিন্দুর সাহিত্য, এবং হিন্দুর অতীত ও আধুনিক ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলেও আমাদের সিদ্ধান্ত ঠিক্ বলিয়া মনে হয়।

শ্রুতি হিন্দুর শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র। শ্রুতিতে কোটি কোটি লোকের বংশগত অস্পৃশ্যতা ও অনাচরণীয়তার ব্যবস্থা আছে বলিয়া আমরা অবগত নহি। বরং অতি "নীচ" কুলের লোকদিগকে হিন্দুর শিরোমণিরা স্পর্শ করিয়াছিলেন ও তাহাদের অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন, পুরাণে কাব্যে ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্ত দৃষ্ট হয়। অসবর্ণ বিবাহের ও বিধবাবিবাহের ব্যবস্থা ও দৃষ্টান্ত প্রাচীন শাস্ত্রে ও ইতিহাসে দৃষ্ট হয়। "নীচ" কুলজাত লোক ব্রাহ্মণ হইয়াছে, তাহারও দৃষ্টান্ত আছে।

আধুনিক কালে দেখিতে পাই, যাঁহারা অস্পৃশ্যতা ও অনাচরণীয়তা মানেন না, তাঁহারাও হিন্দু বলিয়া পরিচিত ও গৃহীত। বিস্তর হিন্দুর এখন বিধবাবিবাহ হইতেছে। তাহারা হিন্দুই থাকিতেছে। হায়দরাবাদের কায়স্থ মহারাজা কিষণপ্রসাদের কৌলিক রীতিই হইতেছে একটি মুসলমান পত্নী গ্রহণ। তাহাতে উক্ত বংশের হিন্দুত্ব লোপ পায় নাই। মোগল রাজত্বকালে যে-সব রাজপুত রাজা মোগলকে কন্যা দিয়াছিল, তাহাদের বংশধর রাজারা হিন্দু বলিয়াই এখনও পরিগণিত; তাহাদের পাতিত্য ঘটে নাই। নাম করিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু

আধুনিক সময়ের দেশ-বিদেশে বিখ্যাত মৃত ও জীবিত অনেক লোক ব্রাহ্মণসভার ও দেশাচার ও লোকাচারের অনুচর না হইয়াও সর্ব্বত্র হিন্দু বলিয়াই গৃহীত হইয়া থাকেন। অপ্রসিদ্ধ এইরূপ লোকের সংখ্যা ত আরও অনেক বেশী—শতগুণ বা সহস্র গুণ বলিলেও চলে।

হিন্দু-ধর্ম্মের ও হিন্দুর লোকাচার ও দেশাচারের ভ্রান্ত ও নিকৃষ্ট অংশ পরিত্যক্ত হওয়া সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়, এবং তাহাই যথেষ্ট; তাহার উপর ভারতবর্ষজাত সব ধর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া মুসলমান বা খৃষ্টীয়ান্ হইবার কোনই প্রয়োজন নাই। ভারতীয় শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রসকলে এবং ভারতীয় সাধুসন্তদিগের বাণীতে যে আধ্যাত্মিক সম্পদ্ নিহিত আছে, তাহা অতুলনীয় হইলেও তাহা ব্যতীত অন্য কোন দেশের মহাপুরুষদের উপদেশ গ্রহণ করিবার কোন প্রয়োজন নাই, এমন কথা বলিতেছি না। কিন্তু সেই-সব উপদেশ গ্রহণের জন্য খৃষ্টীয়ান্ বা মুসলমান হইবার আবশ্যক নাই, ইহাই আমাদের বক্তব্য।

জা'তে জা'তে ঝগড়া-বিবাদ ও রেষারেষির আমরা বিরোধী। কিন্তু যদি ঘটনাচক্রে উহা অপরিহার্য্য হয়, তাহা হইলে তের লক্ষ ব্রাহ্মণ, অন্যান্য জা'তের কথা ছাড়িয়া দিলেও, কালক্রমে যে শুধু কুড়ি লক্ষ নমশূদ্রদিগের দ্বারাই কোণঠেসা হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব সময় থাকিতে ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করাই বুদ্ধিমানের কাজ। কারণ, অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক উচ্চবর্ণসকলের সুবিধাজনক যে-ধর্ম্ম, ভবিষ্যতে তাহা হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত না হইয়া অধিকসংখ্যক অন্যান্য বর্ণের লোক-দিগের সুবিধাজনক যে-ধর্ম্মমত, তাহাই নিশ্চয় হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইবে।

যাঁহারা এতকাল শূদ্র বা শূদ্রাধম বলিয়া পরিচিত ছিলেন, তাঁহারা যে সবাই আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বা, ন্যূনকল্পে, বৈশ্য বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন, ইহা কতকটা সুলক্ষণ; কিন্তু নিজেরা "উন্নত" হইতে চাহিলেও তাঁহারা অন্য সকলের ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব, বা বৈশ্যত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহাদিগকে নিজেদের সমকক্ষ মনে করিতে চাহেন না, ইহা দুর্লক্ষণ। সকলে জানিয়া রাখুন, সমগ্র হিন্দুসমাজ উন্নত না হইলে কোন জা'তই সম্যক উন্নত ও শক্তিশালী হইতে পারিবেন না, এবং সমগ্র হিন্দু-সমাজের উন্নতি ও শক্তিমত্তার মানে হীনতম, অজ্ঞতম, দরিদ্রতম, অবনততমের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি।

—

হিন্দু মহাসভা

হিন্দু মহাসভা যে-প্রচেষ্টার ফল, আমরা তাহার সমর্থন করি। ইহাও আমরা স্বীকার করি, যে, হিন্দু মহাসভার অগ্রসর সভ্যেরা যাহা করিতে চান, গোঁড়া সভ্যদের সংখ্যাধিক্য-ও প্রভাব-বশতঃ তাহা তাঁহারা পূর্ণ মাত্রায় করিতে পারেন না। তথাপি এই মহাসভা দ্বারা অনুমোদিত প্রস্তাবসকলে সমালোচনার যোগ্য কিছু থাকিলে তাহার সমালোচনা করা আমাদের কর্ত্তব্য মনে করি।

সাধারণ পুষ্করিণী, কূপ, প্রভৃতি ব্যবহার করিবার ও তাহা হইতে জল লইবার অধিকার জাতিনির্ব্বিশেষে সকলেরই আছে, ইহা মহাসভা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু মহাসভার প্রস্তাব-অনুযায়ী কাজ করিতে মহাসভা কাহাকেও বাধ্য করিতে পারেন না। এইজন্য যেখানে-যেখানে প্রয়োজন হইবে, তথায় "অস্পৃশ্য" ও "অনাচরণীয়" জাতিদের জন্য স্বতন্ত্র জলাশয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে বলিয়া মহাসভা অন্যায় করেন নাই, ইহা স্বীকার করিতে পারি। কিন্তু ইহাও স্পষ্ট করিয়া বলা মহাসভার উচিত ছিল, যে, অদ্যাবধি যে-সকল স্থানে সকল জাতির লোক একই জলাশয় ব্যবহার করিতেছেন, সেখানে নূতন করিয়া কেহ গোঁড়ামিবশতঃ "নিম্ন" শ্রেণীর লোকদিগকে তাহা ব্যবহারে বাধা দিতে পারিবেন না, এবং কোনস্থানেই "নিম্ন" শ্রেণীর লোকদের জন্য স্বতন্ত্র জলাশয় খনন করিয়া না দিয়া কেহ তাহাদের সাধারণ জলাশয় ব্যবহারে বাধা দিতে পারিবে না। অবশ্য আমরা ইহা জানি, যে, মহাসভা একটা মত প্রকাশ করিলেই যে হিন্দুসর্ব্বসাধারণ তাহা মানিয়া চলিবেন, এরূপ সম্ভাবনা কম। তথাপি যাহা সত্য ও ন্যায়সঙ্গত, মহাসভার তাহাই বলা উচিত।

মহাসভা কলিকাতার অধিবেশনে "নিম্ন" শ্রেণীর লোক-দিগকে বেদপাঠে অনধিকারী বলিয়াছেন। এরূপ একটা প্রস্তাব ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ধার্য্য করিবার সার্থকতা বুঝিলাম

না। বেদ বহুকাল হইল ছাপা হইয়া গিয়াছে, এবং ছাপা হইয়াছেও "ম্লেচ্ছ" লোকদিগের দ্বারা ম্লেচ্ছ-অধ্যুষিত দেশে। এখন এদেশেও বেদ ছাপা হইয়াছে। উহা হিন্দুদের সকল জা'ত এবং অহিন্দু সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকেরা ইচ্ছা করিলেই পড়িতে পারে; এবং অনেকে পড়িতেছেও। সুতরাং "কেজো" পরামর্শ বা অনুরোধ-হিসাবে মহাসভার প্রস্তাবটির কোনোই সার্থকতা ও মূল্য নাই। তাহা ছাড়া, বেদের সংহিতা ও উপনিষদে যদি মূল্যবান্ প্রাণপ্রদ জিনিষ থাকে, তাহা হইলে হিন্দু-সমাজের অধিকাংশ লোককে তাহা হইতে বঞ্চিত রাখাটা যে কিরূপ সুবুদ্ধি ও ন্যায়পরায়ণতার পরিচায়ক, তাহা বলিতে হইবে না। হিন্দু-মহাসভা খৃষ্টীয়ান্ মুসলমান প্রভৃতি কাহাকেও বেদপাঠ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারেন না; কিন্তু নিজেদের ঘরের লোক যাঁহারা, সেই অগণিত হিন্দুকে তাঁহারা বেদপাঠের অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিতে চান।

—

ফরিদপুরে হিন্দুত্ব

আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, যে, ফরিদপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সভার (বেঙ্গল প্রভিন্সিয়্যাল কন্‌ফারেন্সের) এবং প্রাদেশিক হিন্দুসভার অধিবেশনে অস্পৃশ্যতার ও জল-অনাচরণীয়তার প্রতিবাদ হইয়াছে, এবং সকল জা'তের বেদপাঠ করিবার অধিকার ঘোষিত হইয়াছে। অধিকন্তু প্রাদেশিক হিন্দুসভার অধিবেশনে সকল হিন্দু জাতির পুরুষ ও নারীদিগকে বেদ অধ্যয়ন করিয়া স্বহস্তে বৈদিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে।

ফরিদপুরের অধিবেশনে হিন্দুসভা সকল শ্রেণীর ও জাতির হিন্দুর এবং জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে অপর সকলের বেদ অধ্যয়ন করিবার অধিকার স্বীকার করিয়াছেন, সকল হিন্দুর সাধারণ দেবমন্দিরে ও বিদ্যামন্দিরে প্রবেশ ও তাহা ব্যবহার করিবার এবং সাধারণ জলাশয় ব্যবহার করিবার সমান অধিকার স্বীকার করিয়াছেন, প্রত্যেক হিন্দু অন্য যে-কোন হিন্দুর ছোঁয়া জল পান করিতে পারেন বলিয়াছেন, এবং পুরোহিত, ধোবা ও নাপিতের জাতিনির্ব্বিশেষে সকল হিন্দুর কাজ করিতে অধিকারী বলিয়াছেন—বলিয়াছেন, যে, কোন হিন্দুর ইহাতে আপত্তি করা উচিত নহে।

বিধবাবিবাহ-সম্বন্ধে এই অধিবেশনে বলা হইয়াছে, যে, ব্রহ্মচর্য্য হিন্দু বিধবাদের আদর্শ হইলেও, কোন হিন্দু বিধবা-বিবাহ করিলে তাঁহাকে বা তাঁহার স্বামীকে জাতিচ্যুত বা হিন্দুর কোন অধিকার বা সুবিধা হইতে বঞ্চিত করা উচিত নহে।

"অনেক হিন্দু নারী উৎপীড়িত ও গুণ্ডাদের দ্বারা ধর্ষিত হইতেছেন, এবং তজ্জন্য অনেক স্থলে তাঁহাদিগকে দুঃখপূর্ণ হীন জীবন যাপন করিতে হইতেছে ও কখন-কখন ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে হইতেছে; এইজন্য প্রাদেশিক হিন্দুসভা সকল হিন্দুকে এইরূপ অত্যাচার নিবারণ করিতে এবং অত্যাচারিতাদিগকে হিন্দু সমাজে রাখিতে ও সকল-প্রকার সাহায্য দিতে অনুরোধ করিতেছেন।"

তদ্ভিন্ন হিন্দুসভা প্রত্যেক জেলায়, মহকুমায়, থানায় ও গ্রামে হিন্দুস্বেচ্ছাসেবক সমিতি গঠন করিতে ও তাহাদের দ্বারা জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকল অত্যাচারিত ও দুঃস্থ লোকের সাহায্য করিতে মনঃস্থ করিয়াছেন। ব্যায়ামাদি দ্বারা দৈহিক স্বাস্থ্য- ও বল-বৃদ্ধির দিকেও হিন্দুসভা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন। সকল হিন্দু পুরুষ ও নারীর গীতা-পাঠের ঔচিত্য হিন্দুসভা উপলব্ধি করিয়াছেন। বঙ্গে হিন্দুর সংখ্যা কমিতেছে এবং অনেক হিন্দু ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতেছে বলিয়া হিন্দুসভা, যে-সব হিন্দু অন্য ধর্ম্ম-গ্রহণের পর আবার হিন্দু হইতে চান, তাঁহাদিগকে প্রয়োজনীয় ক্রিয়াকলাপের পর আবার সমাজে গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন।

—

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম

অনেকে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রশংসা করেন ও বলেন যে, বর্ত্তমান জাতিভেদ প্রথার তাঁহারা সমর্থন করেন না, কিন্তু মূল চারিটি জাতি—শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ—তাঁহারা রাখিতে চান, এবং এই চারিটি জাতিতে সকল হিন্দুকে গুণ ও কর্ম্ম-অনুসারে বিভক্ত করা যায়। কিন্তু এই জা'ট

-কে করিবে? প্রত্যেক হিন্দুর হৃদয় মন আত্মায় কি গুণ আছে এবং সে কোন্ কর্ম্মের উপযুক্ত, তাহা স্থির করিবার মতন সর্ব্বজ্ঞতা ও ক্ষমতা কাহারও আছে কি? শ্রেণীচতুষ্টয়ে ভাগ করিবার মতন জ্ঞান ও শক্তি কাহারও থাকিলেও ঐ ভাগ মানিয়া কয়জন চলিবে? সকলকে উহা মানিয়া চালাইবার মতন ক্ষমতা কাহারও ত নাই। কাহারও গুণ ও কর্ম্ম বদ্‌লাইয়া গেলে—তাহা বদ্‌লাইয়া যায়ও—আবার তাহাকে নূতন জাতিতে ভুক্ত কে করিবে?

বর্ত্তমান সময়ে দেখিতে পাই, অনেক ব্রাহ্মণ সৈন্যদলে কাজ করে, নানা ব্যবসা করে, চাকুরি করে, ভৃত্যের কাজ করে, তাহাদিগকে ও তাহাদের বংশধরদিগকে যথাক্রমে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র শ্রেণীতে নামাইয়া দিবার ক্ষমতা কাহারও আছে কি? কায়স্থদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও দেখা যায়, অনেক কায়স্থ (যেমন স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ) ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছিলেন ও দেন; তাঁহাদিগকে ও তাঁহাদের পরিবারস্থ লোকদিগকে ব্রাহ্মণত্ব কেহ দিয়াছে বা দিতে পারে কি? বৈশ্যজাতীয় মহাত্মা গান্ধী ভারতবর্ষের অন্যতম ধর্ম্মোপদেষ্টা হইয়াছেন। তাঁহাকে ও তাঁহার পরিবারস্থ ব্যক্তিদিগকে কেহ ব্রাহ্মণত্ব দিয়াছে কি?

কতকগুলি কথা আছে, যেগুলি ব্যবহার করিলে, এবং অতীতকালের ব্যবস্থাসমূহের প্রশংসা করিলে লোকপ্রিয় হওয়া যায় সন্দেহ নাই। ইহাও স্বীকার্য্য, যে, কেহ-কেহ আন্তরিক বিশ্বাস-বশতঃ—লোকপ্রিয় হইবার জন্য নহে—ঐসব কথা ব্যবহার ও অতীতের প্রশংসা করেন। কিন্তু যাহা বাস্তবে পরিণত করা অসাধ্য এবং যাহা সম্ভবতঃ কোন যুগে বা কালে বিদ্যমান ছিল না, সেরূপ ব্যবস্থার উল্লেখ বা প্রশংসা করিয়া লাভ কি? প্রাচীনকালেও বিদূষকেরা ব্রাহ্মণজাতীয় হইত, এবং ক্ষত্রিয়েরা ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন।

বস্তুতঃ একই মানুষের মধ্যে শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের গুণ ও কর্ম্মের সমাবেশ দেখা যায়। জীবনের ভিন্ন-ভিন্ন সময়ে, এমন কি একই দিনের ভিন্ন-ভিন্ন অংশে, একই মানুষ শূদ্রাচারী, বৈশ্যাচারী, ক্ষত্রিয়াচারী ও ব্রাহ্মণাচারী হইতে পারেন ও হন। খুব বড় একটা দৃষ্টান্ত লওয়া যাক্। মহাত্মা গান্ধী নিজেকে তাঁতি, চাষা ও মেথর বলিয়া পরিচয় দেন; কেননা তিনি সূতা কাটা ও কাপড় বোনা, চাষ এবং নর্দ্দামা ও পায়খানা পরিষ্কার করিবার কাজ করিয়া থাকেন। নিজমুখে তাঁহার পেশা এইভাবে বর্ণিত হওয়ায় তিনি বৈশ্য ও শূদ্র শ্রেণীভুক্ত। কিন্তু তিনি অনতিক্রম্য সাহসের সহিত আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে নিরস্ত্র সংগ্রাম করিতেছেন এবং অস্পৃশ্যতা পানদোষাদি নানা কুপ্রথার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছেন বলিয়া তিনি ক্ষত্রিয়ও বটেন। আবার তিনি অহিংসামন্ত্রে সকলকে দীক্ষিত করিতেছেন বলিয়া, ব্রহ্মচর্য্যপালনে বিদ্যার্থী ও অপর যুবকদিগকে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন বলিয়া, নানা আধ্যাত্মিক উপদেশ দিতেছেন বলিয়া, তিনি ব্রাহ্মণপদবাচ্য।

অপ্রসিদ্ধ লোকদের জীবনেও দেখা যায়, যে, তাহারা অনেকে প্রত্যেকেই কখন না কখন দৈহিক শ্রমসাধ্য সেবার কাজ করে, কোন-না-কোন ব্যবসা বা চাষাদি দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করে, যাহা অনিষ্টকর বলিয়া জানে তাহার বিনাশসাধনের চেষ্টা করে, এবং জ্ঞান ও ধর্ম্মের অনুশীলন করে, পরমার্থ চিন্তা করে, ভগবানের নাম করে। অতএব ইহারা প্রত্যেকেই শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ। আমাদের ধারণা প্রত্যেক মানুষেরই দৈহিক শ্রমসাধ্য কোন-না-কোন কাজ করা উচিত, অর্থ উপার্জ্জনের জন্য কোন-না-কোন বৃত্তি অবলম্বন করা উচিত, অমঙ্গলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা উচিত, এবং জ্ঞানলাভ ও পরমার্থ চিন্তা করা উচিত। এই-প্রকারে সবাই জন্মতঃ শূদ্র, কিন্তু কর্ম্ম-সাধনা দ্বারা বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ। কেবল এই অর্থ ও এইরকমে বর্ণাশ্রম সত্য ও শুভফলপ্রদ হইতে পারে, অন্য কোন-প্রকারে নহে।

—

রবীন্দ্রনাথের জন্মতিথি উৎসব

গত ২৫শে বৈশাখ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের চৌষট্টি বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হইয়াছে; ঐ দিন তিনি পঁয়ষট্টি বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন। ঐ দিবস নিম্নলিখিত পদ্ধতি-অনুসারে শান্তিনিকেতনে উৎসব হইয়াছিল।

আচার্য্য

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের

পঞ্চষষ্টিতম জন্মতিথি-উৎসব

কার্য্যাবলী

২৫শে বৈশাখ, ১৩৩২।

প্রাতে ৬ষ্ঠ ঘটিকা

১। শঙ্খ ও ঘণ্টা বাজিলে আচার্য্যের গৃহ "উত্তরায়ণে" সকলের উপবেশন।

২। গান।

৩। আচার্য্যের আগমন।

৪। সকলের দণ্ডায়মান হইয়া বেদগান ও মন্ত্রপাঠ।

৫। আশ্রমবাসীর পক্ষ হইতে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের স্বস্তিবচন-পাঠ :—

আচার্য্য, গুরো, তাত, কল্যাণমিত্র শ্রেষ্ঠ,
আশঙ্কাং শময়ংস্তমো বিদলয়ন্নাশাঃ সমুদ্বোধয়-
ন্নানন্দং জনয়ন্নগঞ্জনমনঃপ্রেমাঙ্কুরং রোপয়ন্।
শান্তিং সংঘটয়ন্ সমস্তবসুধাশ্রেয়শ্চ সংসাধয়-
ন্নয়ং তব বর্ষবৃদ্ধিদিবসঃ প্রাপ্তঃ পুনঃ পুণ্যতঃ ॥

তদদ্য ইদং বয়মাশাস্মহে—
এষ ত্বাং সবিতা ধিনোতু ভগবান্ যজ্জ্যোতিরাদীপ্যতে,
ত্বাং পাত্বাশ্রমদেবতা ভগবতী নিত্যং প্রসন্নান্তরা।
জীব ত্বং শরদাং শতং স্ফুটতরং বিশ্বস্য পশ্যঞ্ শিবং,
ত্বৎপাদেষু অদনাবতং চ ভুবনং শান্তিঃ পরামাগতম্ ॥

৬। আচার্য্যকে মাল্যচন্দনাদি দান।

৭। শঙ্খঘণ্টাধ্বনি ও আনন্দবাদ্য।

৮। বীণাবাদন।

৯। আশ্রম-কন্যকা ও পুরস্ত্রী-গণের প্রশস্তিপাত্র লইয়া আগমন ও আচার্য্যকে অর্ঘ্যপ্রদান।

১০। কবিতা-আবৃত্তি।

১১। গান।

প্রাতে ৭ম ঘটিকা

উত্তরায়ণে জলযোগ।

প্রাতে ৭॥০ম ঘটিকা

১। পঞ্চবটী রোপণ ও উৎসর্গ

কর্ত্তা।

ওঁ অস্মিন্ কর্ম্মণি 'ওঁ পুণ্যাহং' ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু।

সদস্যগণ।

ওঁ পুণ্যাহং, পুণ্যাহং, পুণ্যাহম্।

কর্ত্তা।

ওঁ অস্মিন্ কর্ম্মণি 'ওঁ স্বস্তি' ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু।

সদস্যগণ।

ওঁ স্বস্তি, স্বস্তি, স্বস্তি।

কর্ত্তা।

ওঁ অস্মিন্ কর্ম্মণি 'ওঁ ঋদ্ধিঃ' ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু

সদস্যগণ।

ওঁ ঋধ্যতাম্ ঋধ্যতাম্ ঋধ্যতাম্।

কর্ত্তা।

ওঁ তৎসদদ্য বৈশাখে মাসি মেষরাশিস্থে ভাস্করে শুক্লে পক্ষে পূর্ণিমায়াং তিথৌ স্ববর্ষবৃদ্ধিদিবসে শাণ্ডিল্যগোত্রঃ শ্রীরবীন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা পান্থপশুপক্ষিণাম্ অন্যেষাং চ প্রাণভৃতাং হিতায় চ সুখায় চ এতাং পঞ্চবটীং রোপয়ামি, রোপয়িত্বা চ তেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ সমুৎসৃজামি।

সদস্যগণ।

ইদং সিধ্যতু, ইদং সিধ্যতু, ইদং সিধ্যতু। সাধু, সাধু, সাধু।

আশ্রম-কন্যকা- ও পুরস্ত্রীগণ-কর্ত্তৃক শঙ্খঘণ্টাধ্বনি,

আনন্দবাদ্য।

২। কন্যকা ও পুরস্ত্রী-গণের প্রশস্তিপাত্র-হস্তে তিনবার পঞ্চবটীর প্রদক্ষিণ করা হইলে শঙ্খ, ঘণ্টা ও অন্যান্য আনন্দ-বাদ্যের সহিত তাহার রোপণ।

৩। স্মৃতিগাথাপ্রতিষ্ঠা—

পান্থানাং চ পশূনাং চ পক্ষিণাং চ হিতেচ্ছয়া।
এষা পঞ্চবটী যত্নাদ্ রবীন্দ্রেণেহ রোপিতা ॥

৪। গান—

মরুবিজয়ের কেতন উড়াও শূন্যে,
হে প্রবল প্রাণ।
ধূলিরে ধন্য করো করুণার পুণ্যে,
হে কোমল প্রাণ।
মৌনী মাটির মর্ম্মের গান কবে
উঠিবে ধ্বনিয়া মর্ম্মর তব রবে?
মাধুরী ভরিবে ফুলে ফলে পল্লবে,
হে মোহন প্রাণ।

পথিক-বন্ধু, ছায়ার আসন পাতি,
এস শ্যামসুন্দর।
এস বাতাসের অধীর খেলার সাথী,
মাতাও নীলাম্বর।
উষায় জাগাও শাখায় গানের আশা,
সন্ধ্যায় আনো বিরামগভীর ভাষা,
রচি' দাও রাতে সুপ্ত গীতের বাসা,
হে উদার প্রাণ ॥

মধ্যাহ্ন ১১শ ঘটিকা

আহার।

অপরাহ্ণ ৫ম ঘটিকা

জলযোগ।

রাত্রি ৭ম ঘটিকা

১। অভিনয়—"লক্ষ্মীর পরীক্ষা।"

২। গান।

রাত্রি ৮॥০ম ঘটিকা

আহার।

অশ্বত্থ, বট, বিল্ব, অশোক ও আমলকী, এই পাঁচটি বৃক্ষ রোপণ করা হইয়াছে। নিকটে একটি কূপও খনিত হইবে।

"লক্ষ্মীর পরীক্ষা"র অভিনয় আশ্রম কন্যকাগণ করিয়াছিলেন; কেবল লক্ষ্মী-দেবীর ভূমিকা কলিকাতার কোন মহিলা গ্রহণ করিয়াছিলেন। অভিনয় খুব ভালো হইয়াছিল।

সমুদয় অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইয়াছিল।

উপরে যে নূতন গানটি মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা ব্যতীত আরো অনেকগুলি গান গাওয়া হইয়াছিল।

—

বিশ্বভারতী পঞ্চবিংশ জয়ন্তী

আগামী পৌষ মাসে বিশ্বভারতীর পঞ্চবিংশ জয়ন্তী হইবে। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহা ক্রমশঃ বিকশিত হইয়া বিশ্বভারতীতে পরিণত হইয়াছে।

সাধারণতঃ প্রতিবৎসর ৭ই ও ৮ই পৌষ শান্তিনিকেতনে যে-উৎসব হইয়া থাকে, আগামী পৌষ মাসে তাহা হইবে; অধিকন্তু আরও নানা অনুষ্ঠান হইবে। বিস্তারিত বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে।

—

কাবুলে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি

আফগানিস্থানের রাজধানী কাবুলে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি বাস করেন। তাঁহার খরচটা দিতে হয় ভারতবর্ষকে। আফগানিস্থানকে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণ স্বাধীন বলিয়া স্বীকার করিবার পূর্ব্বে আমীরকে বার্ষিক ১৮ লক্ষ টাকা ভারতবর্ষের রাজকোষ হইতে দেওয়া হইত। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ভারতবর্ষকে যে এপর্য্যন্ত কত কোটি টাকা খরচ করিতে হইয়াছে, তাহার ঠিক হিসাব কখনও প্রকাশিত হইবে বলিয়া মনে হয় না।

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁহার ফরিদপুরের অভিভাষণে ভারতবর্ষের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত থাকিবার যেসব সুবিধার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, এই কোটি-কোটি টাকা ব্যয় তাহার মধ্যে অন্যতম নয় কি?

—

বর্দ্ধমানে ব্রাহ্মণসভার অধিবেশন

কলিকাতায় হিন্দু-মহাসভার অধিবেশনে খুব অল্প-সংখ্যক বাঙালী যোগ দিয়াছিল। বর্দ্ধমানে ব্রাহ্মণসভার অধিবেশনে কত লোক যোগ দিয়াছিল, জানি না; তবে, উহা, যে, হিন্দু মহাসভার প্রভাব কমাইবার জন্য কল্পিত হইয়াছিল, এরূপ মনে করিবার কারণ আছে।

ব্রাহ্মণসভার এই অধিবেশন-সম্বন্ধে হিন্দুসমাজের অন্যতম মুখপত্র "আনন্দবাজার পত্রিকা" বলেন:—

"বর্দ্ধমানে এক জমিদার ব্রাহ্মণকে সভাপতি করিয়া এক উকীলব্রাহ্মণের উদ্যোগে, কতিপয় ব্রাহ্মণ-জাতীয় ব্যক্তি এক বৈঠক বসাইয়াছিলেন। আমরা যতদূর জানি, তাহাতে ইহাকে বঙ্গীয় সর্ব্বশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের প্রতিনিধি-সভা বলা সঙ্গত হইবে না। তবু যাঁহারা সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহারা বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের সমস্যাগুলি নাড়া দিবার সাহস পান নাই। এমন-কি, বাঙ্গালার বিভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ-জাতির যে-সমস্যা—তাহাও বিবেচনা করিবার সাহস এই বৈঠকের হয় নাই।"

উক্ত পত্রিকার দ্বিতীয় মন্তব্যও উদ্ধৃত করিতেছি।

"এই সভায় কয়েকজন বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতও উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের উপস্থিতি-সত্ত্বেও কয়েকটি হাস্যকর প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেবদেবীর প্রতিকৃতিসহ "বর্ণ-পরিচয়" ইত্যাদি শিশুপাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন ও প্রচার করার প্রস্তাবটি উল্লেখ করিতেছি। সেই সঙ্গে সর্ব্বসাধারণ হিন্দুকে কালীমার্কা সিগারেট ও দেশলাই ব্যবহার করিবার পরামর্শ দিলে বর্দ্ধমানী বৈঠক আরও দূরদর্শিতার পরিচয় দিতেন।"

"আনন্দবাজার পত্রিকার" সম্পাদক হিন্দুসমাজভুক্ত। আমরা প্রচলিত অর্থে তাহা নহি। এই কারণে তাঁহার মতন মন্তব্য প্রকাশ করিতে আমাদের সাহস হইত না। যাহা হউক, যে-প্রস্তাবটির উল্লেখ সহযোগী করিয়াছেন,

আমাদিগকে খোঁচা দিবার জন্ত তাহা ও তাহার সমর্থক একটি মুদ্রিত বক্তৃতা বা প্রবন্ধ আমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। তাহাতে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয় ও প্রবাসী-সম্পাদকের বর্ণপরিচয়ে অক্ষর পরিচয় করাইবার জন্ত জীবজন্তুর ছবি আছে বলিয়া উভয় পুস্তককে আক্রমণ করা হইয়াছে। প্রবাসী-সম্পাদকের উপরই প্রস্তাবকের রাগ বেশী দেখিলাম। প্রস্তাবক মহাশয় বালক-বালিকাদের কুকুর খরগোস ছাগল প্রভৃতির ছবি দেখার বড় বিরোধী। কিন্তু তাঁহার নিকট আমাদের সাহুনয় নিবেদন এই, যে, পঞ্চাশ ষাট বৎসরের অধিক পূর্ব্বে বটতলা হইতে "শিশু-বোধক" নামক যে বিশ্বকোষ প্রকাশিত হইত (এখনও হয়), তাহাতেও বর্ণমালার সঙ্গে জীবজন্তুর ছবি থাকিত। ঐ অপূর্ব্ব গ্রন্থের রচয়িতা ও সংকলন কর্ত্তা কে ছিলেন জানি না; কিন্তু তিনি যে "সমাজ-সংস্কারক" বা "পাষণ্ড" ছিলেন না, তাহার প্রমাণ এই, যে, "শিশুবোধকে" গঙ্গার বন্দনা, গুরুদক্ষিণা, দাতাকর্ণ, শ্রীরাধার কলঙ্কভঞ্জন, প্রহ্লাদচরিত্র, প্রভৃতি নিষ্ঠাবান্ হিন্দুদিগের অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়গুলি আছে। এ-হেন নিষ্ঠাবান্ গ্রন্থকারও যে জীবজন্তুর ছবি নিজের বহিতে দিয়াছিলেন, তাহার কারণ সম্ভবতঃ এই, যে, তিনি কখনও আশঙ্কা করেন নাই, যে, ঐসকল ছবি দেখিয়া কোন বালক জাতিস্মর হইয়া উঠিবে। আমাদেরও ওরূপ কোন আশঙ্কা হয় নাই।

"শিশুবোধকের" গ্রন্থস্বত্ব কোনও ব্যক্তিবিশেষের নাই; উহা বটতলার অনেকেই প্রকাশ করেন। আমাদের নিকটে সম্প্রতি যে ১৩৩১ সালের ছাপা একখানি ঐ বহি রহিয়াছে, তাহার মলাটে একটি ফ্রকপরা বালিকার একপাশে একটি কুকুর ও আর একপাশে একটি বিড়াল রহিয়াছে। আশা করি, আগামী অধিবেশনে ব্রাহ্মণসভা এই পুস্তকের প্রকাশক শ্রীযুক্ত তারাচাঁদ দাসকে জাতিচ্যুত করিবেন।

হিন্দুসভা দেবদেবীর প্রতিকৃতিসহ বর্ণপরিচয় প্রভৃতি শিশুপাঠ্য পুস্তক রচনা ও প্রচার করিবার যে প্রস্তাব করিয়াছেন, "অহিন্দু" আমরা তৎসম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিলে আশা করি তাহা অনধিকারচর্চ্চা বিবেচিত হইবে না।

দেবদেবীর যে-সকল মৃন্ময়, দারুময়, প্রস্তরময় বা ধাতুনির্ম্মিত মূর্ত্তি দেবমন্দিরে বা হিন্দুদিগের গৃহে পূজার্চ্চনার জন্ত রক্ষিত হয়, ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে সাধারণতঃ তাহা অন্তে স্পর্শ করে না, এবং ব্রাহ্মণেরাও স্নানাদির পর শুচি হইয়া তবে তাহা স্পর্শ করে। কাগজের উপর অঙ্কিত রঙীন জগন্নাথ দেব ও অন্তান্ত দেবতার ছবিও কোথাও-কোথাও এইরূপে পূজিত হইয়া থাকে। কিন্তু বর্ণপরিচয় বহিতে দেবদেবীর ছবি থাকিলে তাহাতে সকল জাতির লোকে স্নাত, অস্নাত, শুচি, অশুচি, সকল অবস্থায় হাত দিবে, কখন-কখন সহজে পাতা উল্টাইবার জন্ত জিহ্বায় আঙুল দিয়া তাহা বহির পাতায় লাগাইবে। ঐ নিষ্ঠীবন দেবমূর্ত্তির গায়ে লাগিবে। তাহা হিন্দু-শাস্ত্রের অনুমোদিত কি না, ব্রাহ্মণসভা স্থির করুন।

ছাপাখানায় ছাপিবার লোকেরা এবং দপ্তরীরা সাধারণতঃ মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী। তাহাদের স্পর্শে দেব-দেবীর চিত্র অপবিত্র হইবে কি না, তাহাও ব্রাহ্মণ-সভার বিচার্য্য।

"আনন্দবাজার পত্রিকা"র শেষ মন্তব্যটিও উদ্ধৃত করিতেছি।

"যে বর্ণ ও আশ্রম—বাঙ্গালী হিন্দুসমাজে সহস্র বৎসর লুপ্ত হইয়া গিয়াছে—সেই 'বর্ণাশ্রমী' বলিয়া নিজেকে পরিচয় দেওয়া এবং যাহা নাই, তাহাই রক্ষার জন্ত চেষ্টা করা—রামধনুতে জ্যা-রোপণের চেষ্টার ন্তায় করুণ প্রহসন। অথচ 'ব্রাহ্মণ-সম্মিলনীর' নামে এই প্রহসনের অভিনয় করিতে কাহারও বিন্দুমাত্র লজ্জা হয় না। বর্ণাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিতে পারো তোমরা? এই বহু জাতিতে বিভক্ত হিন্দুসমাজকে চারিটি মূলবর্ণে চালিয়া সাজিতে পারো? না সে শক্তি, সে মেধা তোমাদের নাই,—সে-সমাজবিন্তাস-কৌশল তোমরা জানো না,—স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক কহিব, তোমরা তাহা জানো না—তবুও বর্ণাশ্রমের কথা মুখে আনিতে তোমাদের লজ্জা হয় না—এই আশ্চর্য্য। বাঙ্গলায় যাঁহারা ব্রাহ্মণ বর্ণ বলিয়া কথিত—তাঁহাদের মধ্যে শ্রেণীভেদ কেন? ইহা কোন্ শাস্ত্রের বিধান? ইঁহাদের মধ্যে বৈবাহিক আদান-প্রদান বা সামাজিক সম্বন্ধ নাই কেন? অবশ্য এসব প্রশ্ন নিরর্থক—কেননা সমগ্র হিন্দুসমাজের সহিত যোগসূত্র অস্বীকার করিতে যাহারা লজ্জাবোধ করে না—তাহাদের মৃত্যু সন্নিকট। মরণাহতকে কটু কহিয়া লাভ নাই।"

—

শান্তিনিকেতনে বালিকাদের শিক্ষার ব্যবস্থা

কলিকাতা শহরে ও বাংলা দেশের অন্ত অনেক স্থানে বালিকারা শিক্ষা লাভ করিবার চেষ্টায় অনেক সময়

স্বাস্থ্য হারাইয়া বসে। অবরোধ-প্রথা আছে বলিয়া তাহাদিগকে গাড়ী করিয়া স্কুল-কলেজে যাইতে ও সেখান হইতে আসিতে হয়। সেইজন্ত সচরাচর সকাল-সকাল তাড়াতাড়ি কিছু খাইয়া গাড়ীর জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়, আবার আসিবার বেলা হয়ত স্কুল-কলেজের ছুটির অনেক পরে বাড়ী ফিরিতে হয়। তাহার উপর কলিকাতায় ও অন্যান্য অনেক সহরে মেয়েদের অঙ্গচালনা ও মুক্তবায়ু সেবনের কোন সুযোগ সচরাচর হয় না; অথচ স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে, যে-কেহ মস্তিষ্ক-চালনা করে, তাহার স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অঙ্গচালনা ও মুক্ত-বায়ুসেবন বিশেষ আবশ্যক।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশে মধ্যাহ্নে শারীরিক অবসাদ হয়। এইজন্ত আমাদের প্রাচীন পন্থানুযায়ী পাঠশালা ও টোলে সকাল-বিকাল অধ্যাপনা হয়, দুপুরে কিছু হয় না। কিন্তু ইংরেজেরা শীতের দেশের লোক বলিয়া নিজেদের দেশের রীতি-অনুসারে এদেশেও আফিস আদালত স্কুল কলেজের কাজ ১০টা-১১টার পর হইতে ৪টা-৫টা পর্য্যন্ত করেন ও করান। এরূপ ব্যবস্থা আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের, বিশেষতঃ ছাত্রীদের, স্বাস্থ্যের অনুকূল নহে।

শান্তিনিকেতনে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাত্র ও ছাত্রীদের শিক্ষার যে-ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে অধ্যাপনা হয় সকাল-বিকাল। ফাঁকা জায়গায়, অনেক সময় গাছতলায় ক্লাস বসে; সুতরাং নির্ম্মল বাতাস ও যথেষ্ট আলোকের অভাব কখন হয় না। ছাত্রীনিবাস ও ক্লাস একই জায়গায়; সুতরাং তাড়াতাড়ি নাকে-মুখে কিছু গুঁজিয়া ছাত্রীদিগকে গাড়ী চড়িয়া স্কুলে যাইতে হয় না। মুক্তবাতাসে খেলিবার ও বেড়াইবার সুবিস্তৃত জায়গা আছে। বোলপুর শহর এখান হইতে দূরে বলিয়া মেয়েরা অসঙ্কোচে খোলা জায়গায় বেড়াইতে পারেন। এইসকল কারণে এইস্থানে বাস ও শিক্ষালাভ স্বাস্থ্য-রক্ষার পক্ষে অনুকূল।

ছাত্রীদিগকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও পরীক্ষা দিবার জন্য শিক্ষালয়ে পড়িতে হয় না; তাঁহারা সব পরীক্ষাই (অবশ্য বিজ্ঞানের পরীক্ষা ছাড়া) বাড়ীতে পড়িয়া "প্রাইভেট্" পরীক্ষার্থিনীরূপে দিতে পারেন। সুতরাং শান্তিনিকেতন হইতে ছাত্রীদের পরীক্ষা দিবার কোনো বাধা নাই।

এখানকার ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ বা প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া থাকে। ইংরেজী, গণিত, ইতিহাস, সংস্কৃত, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, পালি, ফ্রেঞ্চ, জার্ম্মান্, তর্কশাস্ত্র, প্রভৃতি বিষয়ে ইণ্টারমীডিয়েট্ পরীক্ষার জন্য অধ্যাপনা এখানে হইতে পারে। ইংরেজী, সংস্কৃত, পালি, ইতিহাস, দর্শন-শাস্ত্র এবং অর্থনীতিতে বি-এ ও এম্-এ পরীক্ষার জন্ত অধ্যাপনা করিবার লোক এখানে আছেন। অবশ্য, কেহ কোন পরীক্ষা দিবেন বা না-দিবেন, তাহা তাঁহার ইচ্ছাসাপেক্ষ।

উৎকৃষ্ট গ্রন্থাগার শিক্ষালাভের জন্ত একান্ত আবশ্যক। শান্তিনিকেতনের গ্রন্থাগারে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় নানা পুস্তক প্রচুর-পরিমাণে আছে। বোধ হয় প্রেসিডেন্সী কলেজ ছাড়া আর-কোন বঙ্গীয় কলেজে এত বহি নাই। কোন-কোন বিষয়ে শান্তিনিকেতনের গ্রন্থাগার প্রেসিডেন্সী কলেজের গ্রন্থাগার অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট।

সাধারণতঃ স্কুল-কলেজে যে-সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়, তৎসম্বন্ধে যাহা বলিবার বলিলাম, এখন অন্য কথা বলি।

শিক্ষা-বিষয়ে যাঁহারা চিন্তা করেন, তাঁহারা সকলেই স্বীকার করেন, যে, বর্ত্তমান প্রচলিত শিক্ষা-প্রণালী সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন নহে। অথচ তাহার প্রতিকার করিবার চেষ্টা করা সহজ নহে। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাকে স্বাভাবিক ও সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

এখন শিক্ষা বলিতে সাধারণতঃ পুস্তক হইতে জ্ঞান-লাভ বুঝায়। কিন্তু যাঁহারা নিজে জ্ঞান লাভ করিয়া পুস্তক রচনা প্রথমে করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রকৃতির সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তাহা করিয়াছিলেন। এই-জন্ত রবীন্দ্রনাথ এরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, যাহাতে বালক-বালিকারা প্রকৃতির ক্রোড়ে লালিত-পালিত ও বর্দ্ধিত হয়। ভিন্ন-ভিন্ন ঋতুতে ভিন্ন-ভিন্ন উৎসব করিয়া তিনি আশ্রমস্থ সকলের হৃদয়মনচক্ষুকর্ণাদিকে প্রকৃতির সম্বন্ধে সচেতন করিতে ও রাখিতে চেষ্টা করেন। ছাত্র ও ছাত্রীদিগের সাহিত্য-সভা প্রভৃতির সাহায্যে তাহারা

কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প প্রভৃতি রচনা, আবৃত্তি ও পাঠ করিতে শিখে; তাহাদের উপযোগী অভিনয় ও সঙ্গীতাদিও তাহারা করে। তাহাদের কয়েকটি হস্তলিখিত সচিত্র মাসিক পত্র আছে।

কণ্ঠ-সংগীত ও যন্ত্র-সংগীত শিখাইবার উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা এখানে আছে।

চিত্রাঙ্কণ এবং নানাবিধ কারুকার্য্য শিখাইবার ব্যবস্থা এখানে আছে। প্রসিদ্ধ চিত্রকর শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু এখানকার কলাভবনের অধ্যক্ষ।

ছাত্রীরা এখানে গৃহকর্ম্ম শুশ্রূষা প্রভৃতি শিক্ষা করিতে পারেন।

আমরা যতদূর অবগত আছি, ছাত্রীদের এখানকার মতন সর্ব্বাঙ্গীণ শিক্ষার ব্যবস্থা বঙ্গের অন্যত্র কোথাও নাই। পাঁচটি ছাত্রীকে বিনাবেতনে শিক্ষা দিতে বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ মনস্থ করিয়াছেন। এই ৫ জনকে কেবল আহারাদির ব্যয় দিতে হইবে। "আশ্রমসচিব, শান্তি-নিকেতন," এই ঠিকানায় চিঠি লিখিলে অন্যান্য সংবাদ জানা যায়।

—

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশের অভিভাষণ

ফরিদপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিকসম্মিলনের সভাপতিরূপে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ যে-অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, দৈনিক বসুমতীতে আমরা তাহা পড়িয়াছি। উহাতে এমন অনেক কথা আছে, যাহাতে আমরা দাশ মহাশয়ের সহিত একমত; কিন্তু তাঁহার প্রধান-বক্তব্য সম্বন্ধে আমরা তাঁহার সহিত একমত নহি। তাহার আলোচনা করিবার পূর্ব্বে অন্য দু-একটা কথা আমরা বলিতে চাই।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে বা তাহার বাহিরে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় অবস্থা ও ব্যবস্থা কিরূপ হওয়া উচিত, তাহার আলোচনার প্রকৃত স্থান কংগ্রেস্, অবশ্য তাহার উপর প্রাদেশিক মঙ্গলামঙ্গলও নির্ভর করে বটে; কিন্তু তাহার উপর প্রত্যেক জেলার এবং গ্রামেরও মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে। কিন্তু তা বলিয়া, একটা গ্রাম্য সম্মিলনে বা জেলা-সম্মিলনে প্রধানতঃ ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের সহিত ভারতবর্ষের সম্বন্ধ আলোচনা করা সঙ্গত নহে। তেমনি প্রাদেশিক সম্মিলনেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সহিত ভারতবর্ষের সম্বন্ধ প্রধান বা একমাত্র আলোচনার বিষয় হইতে পারে না। কিন্তু দাশ-মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে প্রধানতঃ বাংলা-দেশের সমস্যা, ব্যাধি ও অভাবের আলোচনা না করিয়া নানা বৃহত্তর ব্যাপারের আলোচনা করিয়াছেন। ইহা সঙ্গত হয় নাই। অবশ্য, ইহা হইতে পারে, যে, তিনি নিজের বা নিজের দলের কোন প্রয়োজনের অনুরোধে এইরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

ইংরেজী অনেক কাগজে এইরূপ পড়িয়াছি, যে, দাশ-মহাশয় তাঁহার বাংলা অভিভাষণের ইংরেজী অনুবাদ তাঁহাদিগকে, ছাপিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার বাংলা অভিভাষণ পড়িতে-পড়িতে আমাদের অনেক জায়গায় মনে হইয়াছে, যেন তিনি ইংরেজীটাই আগে লিখিয়াছেন ও পরে তাহার বাংলা তর্জ্জমা করিয়াছেন; কিম্বা চিন্তা করিয়াছেন ইংরেজীতে ও লিখিয়াছেন বাংলায়। সেইজন্য কোথাও-কোথাও আমরা তাঁহার বক্তব্য ঠিক্ বুঝিতে পারি নাই। অবশ্য, আমাদের বাংলা-জ্ঞান যথেষ্ট না-হওয়াও তাহার একটা কারণ হইতে পারে। চিত্তরঞ্জন যে প্রথমে ইংরেজীতে লিখিয়াছেন বা ভাবিয়াছেন, দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁহার অভিভাষণের নিম্নোদ্ধৃত অংশটি হইতে তাহা মনে হয়।

"মুক্তির আদর্শ লইয়া আলোচনা প্রসঙ্গে আমার মনে হয়, স্বরাজের আদর্শ অপেক্ষা, Independenceএর আদর্শ অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ। ইহা সত্য যে Independence অর্থ Dependence বা অধীনতার অভাব। সুতরাং এই আদর্শ মূলতঃ অভাবাত্মক কিন্তু অধীনতার অভাব হইলেই ভাবাত্মক (Positive) কিছু স্বতঃই আমরা নাও পাইতে পারি। আমি অবশ্য ইহা বলি না যে, Independence ও স্বরাজ পরস্পর বিরোধী অথবা ইহার একের সঙ্গে অপরের সামঞ্জস্য-বিধান হইতে পারে না। এমন কথা আমি বলি না। কিন্তু আমাদের প্রয়োজন শুধু অধীনতার অভাব নয়—ভাবাত্মক বা বস্তুগত এক অখণ্ড স্বরাজের প্রতিষ্ঠা। কল্য প্রভাতেই ভারতবর্ষ Independence অর্থাৎ অধীনতা পাশ হইতে মুক্ত হইতে পারে, যদি যে-কোন উপায়েই হউক—ইংরাজরাজ এদেশ হইতে চলিয়া যায়। কিন্তু ইংরাজ চলিয়া গেলে আমরা অধীনতাপাশ মুক্ত হইতেও বা পারি, তথাপি কেবল তাহাতেই আমি স্বরাজ অর্থে যাহা বুঝি, তাহার প্রতিষ্ঠা হয় না। ইংরাজ চলিয়া যাওয়া একটা অভাবাত্মক ব্যাপার; স্বরাজ অভাবাত্মক কিছু নয়, সুতরাং ইংরাজ চলিয়া যাওয়া আর স্বরাজলাভ এক বস্তু নহে। স্বরাজলাভ একটা বিশেষ-রকমের ভাবাত্মক বস্তুর উদ্ভব বা প্রতিষ্ঠা। কি বস্তুর এই উদ্ভব? কি উপায়ে ইহার প্রতিষ্ঠা? ইহাই প্রশ্ন এবং সত্যই ইহা স্পষ্ট উত্তরের দাবী আমাদের নিকট করিতে পারে।"

আমরা বাঙালী; আমরা নিজেদের ভাষায় যখন পরস্পরের মধ্যে কথা বলি, তখন "ইণ্ডিপেণ্ডেন্স্" কথাটা ব্যবহার করি না; বলি স্বাধীনতা। কিন্তু স্বাধীনতার চেয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিয়া স্বরাজলাভ যে বড় জিনিষ, তাহাই প্রমাণ করা দাশ-মহাশয়ের আবশ্যক ছিল, সুতরাং তিনি ইণ্ডিপেণ্ডেন্স্ কথাটা ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও তাঁহার সিদ্ধান্ত সপ্রমাণ হয় না। ইণ্ডিপেণ্ডেন্সের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অবশ্য ডিপেণ্ডেন্সের বা অধীনতার অভাব বটে। কিন্তু শব্দসকলের অর্থ কি ব্যুৎপত্তিগত অর্থেই সীমাবদ্ধ থাকে? তাহা থাকে না, অর্থ আরও ব্যাপক হইয়া যায়। আমেরিকার লোকেরা স্বাধীন হইবার জন্য অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহার নাম "দি আমেরিকান্ ওয়ার্ অব ইণ্ডিপেণ্ডেন্স।" এই যে স্বাধীনতা-সমর, ইহা কি একটা অভাবাত্মক জিনিষের জন্য তাহারা করিয়াছিল? যুদ্ধ-অন্তে তাহারা যাহা পাইয়াছিল তাহা কি অভাবাত্মক? সেই অভাবাত্মক জিনিষটার জোরেই কি আমেরিকা আজ জগতে বৈষয়িক ব্যাপারে প্রধান স্থান এবং রাষ্ট্রীয় শক্তিতে অন্যতম প্রধান স্থান অধিকার করিতে পারিয়াছে? না, তা নয়; ইণ্ডিপেণ্ডেন্সের মানে শুধু "অনধীনতা" নহে, উহার মানে স্বাধীনতা এবং আত্মকর্তৃত্বও বটে। জাপান একটি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট দেশ। ইণ্ডিপেণ্ডেন্সের মানে যদি কেবল অভাবাত্মক অনধীনতাই হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে, এই অভাবাত্মক জিনিষটা জাপানকে চীনের ও রুশিয়ার গালে চড় মারিতে এবং পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম শক্তিশালী জাতি হইতে সমর্থ করিয়াছে। যদি ইংরেজীতে বলা হয়, অমুকের খুব স্পিরিট অব্ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স্ আছে, কিম্বা অমুক কবি স্বদেশবাসীদের মধ্যে স্পিরিট অব্ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স জাগাইতেছেন, তাহা হইলে সে-ভাবটার মানে কি একটা অভাবাত্মক জিনিষ? না একটা অতিপ্রবল অন্তপ্রাণনা?

আমরা দেখাইলাম, ইণ্ডিপেণ্ডেন্সের ব্যুৎপত্তি যাই হোক্, উহার অর্থ অভাবাত্মককে ছাড়াইয়া প্রবল ভাবাত্মক জিনিষে পৌঁছিয়াছে। কিন্তু আমাদের তাহা দেখাইবার প্রয়োজন ছিল না। কারণ, আমরা বাঙালীরা বলি স্বাধীনতা, চাই স্বাধীনতা, ইণ্ডিপেণ্ডেন্সের কি মানে, তাহাতে আমাদের দরকার কি? যদি উহার মানে শুধু অভাবাত্মক অনধীনতাই হয়, তাহা হউক না? আমরা সে অভাবাত্মক জিনিষ ত চাহিতেছি না, আমরা চাহিতেছি স্বাধীনতা,—সেই জিনিষ চাহিতেছি যাহা জাতিকে আত্মকর্তৃত্ব দেয়। চিত্তরঞ্জন দাশ এবং তাঁহার মতাবলম্বী লোকেরা দেখাইতে পারিবেন না, যে, স্বাধীনতা জিনিষটা, আত্মকর্তৃত্ব জিনিষটা, অভাবাত্মক এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিয়া স্বরাজ তাহা অপেক্ষা বড় জিনিষ, লোভনীয় জিনিষ।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিয়া স্বরাজ যদি স্বাধীনতা অপেক্ষা ভালো ও বড় ও বাঞ্ছনীয় হয়, তাহা হইলে, জিজ্ঞাসা করি, স্বাধীন ফ্রান্স, স্বাধীন জাপান, স্বাধীন ডেন্মার্ক, স্বাধীন হল্যাণ্ড, স্বাধীন ইটালী, স্বাধীন আফগানিস্থান, এমন কি স্বাধীন নেপালও, কেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে লাফাইয়া আসিয়া পড়িতেছে না? যে ঈজিপ্ট (মিশর) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে ছিল এবং কার্য্যতঃ এখনও আছে, তাহা কেন সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র হইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে? আয়ার্ল্যাণ্ড কেন স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের জন্য বহুশতাব্দীব্যাপী চেষ্টা করিয়াছে? আমাদের বহু রাজনৈতিক নেতা যে ঔপনিবেশিক স্বরাজ চাহিতেছেন, কানাডা তাহা পাইয়াও কেন কার্য্যতঃ স্বাধীনতা-লাভেরই উদ্দেশ্যে আমেরিকায় নিজের আলাদা রাষ্ট্রদূত রাখিয়াছে এবং ইংলণ্ড নিরপেক্ষ হইয়া স্বাধীনভাবে কোন কোন বিষয়ে আমেরিকার সহিত সন্ধি করিয়াছে?

বলুন, যে, স্বাধীন হইবার ক্ষমতা আমাদের এখন নাই বা কখন হইবে না, তাহা অন্ততঃ শুনিতে রাজি আছি। কিন্তু স্বাধীনতা অপেক্ষা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে থাকিয়া স্বরাজ ভালো বা বড়, এরূপ বাজে কথা, হাস্যকর কথা, শুনিবার মর্ম্মবেদনা ও লজ্জা সহ্য করিতে ইচ্ছুক নহি।

চিত্তরঞ্জন বলিতেছেন:—

Independenceএর আদর্শ হইতে স্বরাজের আদর্শে পার্থক্য কি? স্বরাজের আদর্শে কি আছে—যাহা Independenceএর আদর্শে নাই? আমি বলি, আমাদের জাতির সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতার যে-আদর্শ, তাহাই স্বরাজ।

বাঙালীর ভাষায় ও মনে যে-পার্থক্য নাই, এখানেও

চিত্তবাবু সেই ভূতকে খাড়া করিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। আমরা যে বলিই না, যে, ইণ্ডিপেণ্ডেন্‌স্‌ চাই, আমরা বলি, সর্ব্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা চাই। তাহার উত্তরে তিনি কি বলিতে চান?

চিত্তরঞ্জন আবার বলিতেছেন :—

আমি যে শিক্ষা পাইয়াছি তাহাতে Rule অর্থাৎ শাসন একথাটির মধ্যে যে ভাব ফুটিয়া উঠে—তাহার বিরুদ্ধে আমার মন বিরূপ হইয়া উঠে—তা সে শাসন ঘরেরই (Home) হউক অথবা পরেরই (Foreign) হউক। Self-Government এর বিরুদ্ধেও আমার এরূপ আপত্তি। কিন্তু কেবল নিজেদের দ্বারা এবং নিজেদের জন্যই যদি Self-Government হয় তবে আমার আপত্তি বড় টিকে না সত্য কিন্তু সে ক্ষেত্রে আমি বলিতে পারি যে, স্বরাজের আদর্শ তাহার সমস্ত বিদ্যমান আছে।

এখানে তিনি কি যে বলিতে চান, তাহা ভালো করিয়া বুঝিতে পারিলাম না। প্রকৃত সেল্‌ফ গবর্ণমেণ্ট ত নিজেদের দ্বারা নিজেদের জন্যই হয়, অন্য কি রকম প্রকৃত সেল্‌ফ-গবর্ণমেণ্ট হইতে পারে, বুঝি না। প্রথমে চিত্ত বাবু এরূপ কথা বলিয়াছেন, যাহাতে মনে হয়, তিনি ফিলসফিক্যাল অ্যানার্কিষ্ট, অর্থাৎ সেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানবিদ্‌দিগের দলভুক্ত যাহারা গবর্ণমেণ্ট মাত্রকেই অমঙ্গল মনে করেন ও না-পছন্দ করেন, যেমন, বাকুনিন্‌। তাহার পরেই কিন্তু বোধ হয় তাঁহার আব্রাহাম্‌ লিঙ্কনের "জনসাধারণের জন্য ও জনসাধারণের দ্বারা জনসাধারণের শাসন" (government of the people by the people and for the people) এই কথাগুলি মনে পড়িয়া গিয়া থাকিবে।

অতঃপর চিত্ত বাবু একটা বিশাল "দর্দি" খাড়া করিয়াছেন। যথা—

আমাদের জাতীয় স্বাধীনতার যে-সমস্ত অধিকার, তাহা যদি বৃটিশ সাম্রাজ্য স্বীকার করে, তবে আমাদের এই সাম্রাজ্যের বাহিরে যাইবার প্রয়োজন নাই। আর যদি স্বীকার না করে—তবে বাধ্য হইয়া সাম্রাজ্যের বাহিরে আমাদের যাইতে হইবে।

জাতীয় স্বাধীনতার সমস্ত অধিকার ইংলণ্ড্‌ আয়র্ল্যাণ্ড্‌কে দেয় নাই, মিশরকে দেয় নাই, আমাদিগকে দিবার বিন্দুমাত্রও সম্ভাবনা আছে, ইহা দাশ-মহাশয় কেন কল্পনা করিয়াছেন, তাহা তিনিই বলিতে পারেন।

তিনি আর-একটা আজ্‌গুবি কথা বলিয়াছেন।

ইহা সত্য যে, আমরা যদি এই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকি, তবে অনেক-রকমের সুবিধা ও সুযোগ আমরা লাভ করিতে পারি। সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির সহিত এখন আর প্রভু ও ক্রীতদাসের সম্বন্ধ নাই। খণ্ড দেশ বা রাজ্যগুলি এখন স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র-ভাবে নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছায় সাম্রাজ্যের সহিত একসঙ্গে গ্রথিত থাকিবার জন্য চুক্তিতে আবদ্ধ।

এই "এখন"টা কখন্‌? তা'র সন তারিখ কি?

চিত্ত বাবু বলিতেছেন :—

এখন ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, পৃথিবীর জাতি সকলের বর্ত্তমান অবস্থায় কোন এক দেশ বা জাতিই অন্যের নিরপেক্ষ হইয়া, পৃথক্‌ভাবে থাকিতে পারে না—বাঁচিতে পারে না এবং এই আদর্শের অনুপাতে বৃটিশ-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত খণ্ডরাজ্যগুলি নিশ্চয়ই তাহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য স্বাধীনভাবে রক্ষা করিয়া ও তাহার উন্নতিকল্পে কোনরূপ বাধা না পাইয়া যদি অগ্রসর হইতে পারে, তবে সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিয়াও স্বরাজ অর্থে আমি যাহা বুঝি, তাহা অবশ্যই লাভ করিতে পারে।

কোন এক দেশ বা জাতি অন্যের নিরপেক্ষ হইয়া যে টিকিয়া থাকিতে পারে না, তাহা সত্য কথা। কিন্তু ইহার সঙ্গে আর-একটা সত্য কথা জুড়িয়া না দিলে, সম্পূর্ণ সত্য ত বলা হয়ই না, প্রকারান্তরে মিথ্যাই বলা হয়। বাঁচিয়া থাকিবার জন্য, টিকিয়া থাকিবার জন্য, স্বাধীন জাতিরা নিজেদের সাময়িক ও পরিবর্ত্তনশীল প্রয়োজন-অনুসারে নানা জাতি ও দেশের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়। দৃষ্টান্ত দিতেছি। গত মহাযুদ্ধের সময়ে ও আগে জাপানে ও ইংলণ্ডে মিত্রতা ছিল। যুদ্ধের শেষ-দিকে ইংলণ্ড ও রুশিয়া পরস্পরের শত্রু ছিল, জাপানে ও রুশিয়াতেও বন্ধুত্ব ছিল না, এখনও ইংলণ্ডের সহিত রুশিয়ার সন্ধি হয় নাই। কিন্তু এখন দেখিতেছি, যে-রুশিয়ার সঙ্গে একদা জাপান প্রচণ্ড যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহারই সহিত সেদিন সে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে। অন্যদিকে ইংলণ্ড ও আমেরিকা একজোট হইয়া জাপানকে হীনবল এবং চীনকে আয়ত্তাধীন করিতে চেষ্টা করিতেছে। এইরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়, যাহা হইতে বুঝা যায়, যে, আন্তর্জাতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন-অনুসারে স্বাধীন জাতিরা আত্মরক্ষা ও স্বার্থরক্ষার জন্য কখন এ-জাতি কখন সে-জাতির সহিত মিত্রতা স্থাপন করে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত ভারতবর্ষের এরূপ স্বাধীনভাবে কখন ইংলণ্ডের মিত্র কখন বা ইংলণ্ডের শত্রুর সহিত সন্ধি করিবার অধিকার লাভের কখনও বিন্দুমাত্রও সম্ভাবনা নাই। ভৌগোলিক কারণে, এবং আমাদের ভাষা সভ্যতা

সামাজিক ব্যবস্থা, ইতিহাস, ও জাতি আলাদা বলিয়া আমাদের প্রয়োজন ও স্বার্থ কোন কালেই ইংলণ্ডের প্রয়োজন ও স্বার্থের সহিত এক হইবে না। এইহেতু আমাদের জাতীয় পূর্ণ বিকাশের জন্য সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভিন্ন অন্য আদর্শ হইতে পারে না। তাহা আমরা অর্জন করিতে পারিব কি না, সে-কথা আলাদা। দাশ-মহাশয় অন্যের নিরপেক্ষ হইয়া যে বাঁচিয়া থাকা যায় না, বলিয়াছেন, তাহা সত্য হইলেও, ভারতবর্ষের সম্বন্ধে একথাটা তোলাই উচিত হয় নাই। কারণ, ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের সহিত যুক্ত থাকিয়াও ত টিকিয়া বা বাঁচিয়া নাই,—রাষ্ট্রীয় হিসাবে ভারতবর্ষ মৃত, উহা ব্রিটিশ সিংহের ল্যাজে-বাঁধা শবের মতন। ইংলণ্ডের সঙ্গে ফ্রান্স যুক্ত হইয়া ও ফ্রান্সের সঙ্গে ইংলণ্ড যুক্ত হইয়া উভয়ে বাঁচিয়া আছে এইজন্য, যে, উভয়ে স্বাধীন। স্বাধীনভাবে পরস্পরের সহিত যুক্ত হওয়াটা বড় আদর্শ; কিন্তু পরাধীনভাবে অন্যের লাঙ্গুলে বদ্ধ থাকাটা আদর্শই নয়।

চিত্তরঞ্জন-বাবুর সব কথার আলোচনা করিবার আমাদের সময় ও স্থান নাই। আরও দু'একটা কথা বলিব।

হিংসা কোন যুগেই আমাদের জাতীয়-জীবনের আদর্শ ছিল না বা এখনও নাই—সুতরাং হিংসামূলক কোন উপায় আমরা অবলম্বন করিতে পারি না। কেননা, তাহা আমাদের জাতীয় সভ্যতার আদর্শে নাই। আমি বলি না যে, ভারতের ইতিহাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ নাই অথবা কোন-কোন ক্ষেত্রে হিংসামূলক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় নাই। আমাদের কোন বালকে পাঠ করিলেও আপনাদিগকে বলিয়া দিবে যে, ইহা মিথ্যা। কিন্তু অনেক জিনিস জোর করিয়া আমাদের মধ্যে প্রবেশ করানো হইয়াছে। ইতিহাস-পাঠকদের মধ্যে বিশেষজ্ঞগণ অবশ্যই আমাদের জাতীয় সভ্যতার যে যথার্থ স্বরূপ—তাহা হইতে তাহার উপর আরোপিত যে মিথ্যা আবরণ—তাহা অবশ্যই পৃথক্ করিয়া দেখিতে পারিবেন। হিংসা আমাদের প্রকৃতির মধ্যে তেমনভাবে নাই—যেমন য়ুরোপে আছে।

য়ুরোপের লোকদের মধ্যে যেমন হিংসা আছে, আমাদের মধ্যে তেমন নাই, ইহা সত্য হইতে পারে; আমাদের পরাধীনতা তাহার একটা কারণও হইতে পারে। কিন্তু, আমরা অহিংসার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিলেও, ইহা সত্য বলিয়া মানিতে পারি না, যে, অহিংসা কোন কালে আমাদের জাতীয় আদর্শ, সংঘবদ্ধজীবনের আদর্শ ছিল। আমরা জানিতে চাই, ভারতবর্ষের কোন্ শাস্ত্রে, কাব্যে, পুরাণে, ইতিহাসে, বলিয়াছে, যে, জাতির ও দলের আত্মরক্ষার বা মুক্তির জন্যও যুদ্ধ করিও না? এসব ছাড়া আর কোথায় আমাদের জাতীয় আদর্শ বা প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যাইবে? গীতা ত একটি সকল হিন্দুর সম্মানিত শাস্ত্র; তাহা ত প্রয়োজন হইলে যুদ্ধ করিতেই আদেশ করিতেছে। আমরা নিজে যুদ্ধের বিরোধী, এমন-কি কলেজে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষাদানের বিরুদ্ধেও আমরা লিখিয়াছি। কিন্তু ভারতবর্ষের আদর্শ বা জাতীয় প্রকৃতি-সম্বন্ধে এমন কথা বলা আমরা উচিত মনে করি না, যাহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। ব্যক্তিগতভাবে অহিংসা-মন্ত্র সাধনা ও প্রচার ভারতবর্ষে হইয়াছে, ইহা অবশ্য আমরা স্বীকার করি।

সশস্ত্র বিদ্রোহ করিয়া ভারতবর্ষ স্বাধীন হইতে পারে কি না, তৎসম্বন্ধে চিত্তরঞ্জন বলেন :—

আমি বলিতে দ্বিধা বোধ করি না যে, হিংসামূলক বিদ্রোহ দ্বারা আমরা কখনই জাতীয় মুক্তি লাভ করিতে পারিব না। তার পর ভারতীয় প্রকৃতির অহিংসামূলক বৈশিষ্ট্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও ইহা কিরূপে সম্ভব যে, নিরস্ত্র একটা পরাধীন জাতি হিংসামূলক বিদ্রোহ দ্বারা অত্যন্ত সুনিয়ন্ত্রিত গভর্ণমেণ্টের আজিকার দিনের প্রচণ্ড হিংসামূলক—প্রচুর আয়োজন ও বাধার বিরুদ্ধে জয়ী হইবে? ফরাসী বা অন্যান্য দেশের বিদ্রোহের কথা তুলিয়া কাজ নাই। সে-সমস্ত বিদ্রোহের যুগে মানুষের তীর ধনুক ও বর্শা হাতে যুদ্ধ করিত, কখন বা জয়লাভও করিত। ইহা কি কল্পনায় সম্ভব যে, ঐ উপায়ে আমরা এই বিজ্ঞানের যুগে সামরিক ভিত্তির উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত একটা রাজশাসনকে বিধ্বস্ত করিতে পারি? আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, ইংলণ্ডেও এই শ্রেণীর বিদ্রোহ আর আজিকার দিনে সম্ভবপর নয়।

যুদ্ধবিদ্যার, এবং ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলের সামরিক উপযোগিতার সম্বন্ধে আমাদের কোন জ্ঞান নাই; সুতরাং আমরা চিত্ত-বাবুর কথার খণ্ডন বা সমর্থন কিছুই করিতে পারিলাম না। কিন্তু কোন বিষয়েই "অসম্ভব" কথাটা উচ্চারণ করিতে আমরা দ্বিধা বোধ করি।

ভারতবর্ষে জাতীয় একতাস্থাপনের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যে শৃঙ্খলা, যে সামঞ্জস্য ও সমন্বয়সাধনের কথা আমি বলিয়াছি এবং যাহা ব্যতীত স্বরাজ-প্রতিষ্ঠা অসম্ভব বলিয়া আমার ধারণা, হিংসামূলক কোন উপায় অবলম্বন করিতে গেলে তাহা একেবারে অসম্ভব হইবে।

ইহা সত্য বলিয়া আমাদেরও মনে হয়।

আমরা যদি হিংস্র হইয়া উঠি, তাহার ফলে গভর্ণমেণ্ট আরও অধিক হিংস্র হইয়া উঠিবে এবং এমন এক প্রচণ্ড দমন নীতি আমাদের উপর চালনা করিবে, যাহার ফলে স্বরাজলাভ করিবার যে-আকাঙ্ক্ষা আমাদের মনের মধ্যে আছে, তাহা একেবারে নির্ব্বাপিত হইয়াও যাইতে পারে। হিংসামূলক বিদ্রোহের পক্ষপাতী যে-সমস্ত যুবকগণ আছেন, তাঁহাদিগকে

আমি জিজ্ঞাসা করি যে, আপনার সাধারণ দেশবাসী কি তাহাদের পক্ষ লইবে? যখন জীবন ও সম্পত্তি বিপন্ন হইবে তখন যাহাদের বিপন্ন হইবে অথবা যাহাদের বিপন্ন হইবার আশঙ্কা জন্মিবে, তাহারা সকলেই এই বিদ্রোহের ছায়ার ত্রিসীমানার মধ্যেও থাকিবে না। সুতরাং এইরূপ বিদ্রোহ কার্য্যকারী হইবে না।

ইহা হইল ভয়ের কথা। কাহারও প্রাণে ত্রাসের উদ্রেক করার উপর যে যুক্তির প্রবলতা নির্ভর করে, আমরা সেরূপ কোন যুক্তিতে বিশ্বাস করি না। হিংসা ভালো নয়, বলুন তাহা আমরা শুনিব। কারণ আমরা স্বয়ং অহিংসাবাদী। কিন্তু হিংস্র হইলে অন্য কেহ আরও বেশী হিংস্র হইতে পারে, এসম্ভাবনা জগতে চিরকালই ছিল ও এখনও আছে; তথাপি যুগে-যুগে দেশে-দেশে স্বাধীনতার যুদ্ধ হইয়াছে এবং এখনও কোন-কোন দেশে হইতেছে। এই কারণে, যে-ভয়ের যুক্তি চিত্তরঞ্জন বিশেষ করিয়া যুবকদের জন্য উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহাতে তাহারা সায় দিয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না।

আর-একটা কথা দাশ-মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিতে চাই। তিনি বলিতেছেন –

সমগ্র ভারতে প্রজাশক্তির মধ্যে একযোগে একটা বিরাট্ অহিংসা-মূলক গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অবাধ্যতার আব্‌হাওয়া সৃষ্টি করা স্বাধীনতা-প্রয়াসী পর্য্যন্ত আমরা আমাদের হস্তে স্বাধীনতার যুদ্ধে ইহাই শেষ অস্ত্র। আমি বলি ব্রহ্মাস্ত্র।

দরকার হইলে তিনি এই ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিবেন বলিতেছেন। কিন্তু তাহা প্রয়োগ করিলে, তাহার ফলে গবর্ণ্‌মেণ্ট্ হিংস্র হইয়া উঠিয়া এমন-এক প্রচণ্ড নীতি আমাদের উপর কি চালনা করিবে না, "যাহার ফলে স্বরাজলাভ করিবার যে-আকাঙ্ক্ষা আমাদের মনের মধ্যে আছে, তাহা একেবারে নির্ব্বাপিত হইয়াও যাইতে পারে"? সংকীর্ণ সীমার মধ্যে অহিংসামূলক অবাধ্যতা যেখানে-যেখানে হইয়াছে, সেইখানেই সরকারী কর্ম্মচারীরা হিংস্র হইয়াছে। সুতরাং ব্যাপকভাবে সমগ্র দেশে ঐরূপ অবাধ্যতা চালাইলে যে গবর্ণ্‌মেণ্টের সমুদয় নিগ্রহবল ও হননবল আমাদের উপর প্রযুক্ত হইতে পারে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

অতএব গবর্ণ্‌মেণ্টের হিংস্রতাকে যদি ভয় করিতে হয়, তাহা হইলে সশস্ত্র বিদ্রোহের কল্পনাতেও তাহা করিতে হইবে, অহিংস অবাধ্যতার কল্পনাতেও তাহা করিতে হইবে।

দাশ-মহাশয় বাংলার আধুনিক ইতিহাস হইতে ইহা দেখাইয়াছেন, যে,

সুতরাং ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, রাজ-অত্যাচারের পরেই একটা রাজদ্রোহিতার সূত্রপাত হয়। আবার এই রাজদ্রোহিতার পরে পুনরায় একটা রাজ-অত্যাচার আত্মপ্রকাশ করে। খালি তাই নয়,—যখনি গভর্ণমেণ্ট্ আপাতদৃষ্টিতে প্রজার হিতের জন্য কোন আইন পাশ করেন —আবার ঠিক তাহার সঙ্গে-সঙ্গেই দমন-নীতি সমর্থন করিয়া আর-একটা আইনও পাশ হয়।

আমাদের বিবেচনায় চিত্ত-বাবুর এই সিদ্ধান্ত সত্য।

গবর্ণ্‌মেণ্টের সহিত সহযোগিতা করিবার যে-সব সর্ত্ত চিত্তবাবু নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ এরূপ অস্পষ্ট (ইংরেজীতে যাহাকে বলে ভেগ), যে, তৎসম্বন্ধে আমরা কিছু বলিতে চাই না। সাধারণভাবে ইহাই বলিতে চাই, যে, দাশ-মহাশয় কর্ত্তৃপক্ষকে খুসী করিবার জন্য এতটা নীচে নামিয়াছেন, যে, তাঁহার ও তাঁহার দলের নিন্দাভাজন মডারেট্‌রাও এত নীচে নামেন নাই।

চিত্তরঞ্জন-বাবু বলিতেছেন :—

আমি একথা আপনাদিগকে বিশেষরূপে চিন্তা করিতে বলিতেছি যে, আমরাও গভর্ণ্‌মেণ্টের সহিত এমন একটা সর্ত্তে আবদ্ধ হইব যে, কি কথায়, কি কার্য্যে, কি হাব-ভাবে আমরা রাজদ্রোহমূলক কোন আন্দোলনে উৎসাহ দিব না—অবশ্য এখনো দিই না এবং আমরা সর্ব্বতোভাবে এইরূপ আত্মঘাতী আন্দোলন দেশ হইতে দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিব। এইরূপ একটা চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার যে বিশেষ-কোন প্রয়োজন আছে, তাহা নয়—কেননা, বাঙ্গালার প্রাদেশিক সম্মিলন,—কোন দিন রাজদ্রোহমূলক কোন-প্রকার আন্দোলনকে উৎসাহ দেয় নাই।

গবর্ণ্‌মেণ্ট অনেক আন্দোলনকে রাজদ্রোহমূলক মনে করেন, যাহা ভারতীয় বহু দেশভক্ত ন্যায্য মনে করেন। অসহযোগ আন্দোলনকেই ত গবর্ণ্‌মেণ্ট্ রাজদ্রোহমূলক মনে করেন। নতুবা এত অসহযোগীর জেল হইত না। স্বেচ্ছাসেবক দলগঠনও এক-সময় রাজদ্রোহমূলক বিবেচিত হওয়ায় শত-শত স্বেচ্ছাসেবকের জেল হইয়াছিল। সুতরাং রাজদ্রোহমূলক আন্দোলন-সম্বন্ধে এত বড় একটা ব্যাপক অঙ্গীকারে বদ্ধ হইবার কথা চিত্তরঞ্জন-বাবু কেমন করিয়া তুলিয়া সমগ্র জাতির মাথা হেঁট করিলেন, তাহা আমরা বুঝিতে অসমর্থ। অবশ্য, বোমা দ্বারা বা বন্দুক দ্বারা বা অন্য উপায়ে রাজনৈতিক হত্যা, প্রভৃতি হিংস্র প্রচেষ্টার পক্ষপাতী আমরা নহি। কিন্তু "রাজদ্রোহমূলক আন্দোলন" বলিতে শুধু ত এইগুলি বুঝায় না, আরও

অনেক জিনিষ বুঝায় যাহা আমাদের বিবেচনায় নির্দ্দোষ। ইহা আমরা সত্য বলিয়া মনে করি না, যে, "বাঙ্গালার প্রাদেশিক সম্মিলন কোন দিন রাজদ্রোহমূলক কোন-প্রকার আন্দোলনকে উৎসাহ দেয় নাই।"

এখন আমাদের নিজের কথা কিছু বলি। সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আমাদের আদর্শ। তাহা কালে বাস্তবে পরিণত হইবে বলিয়া আমরা আশা ও বিশ্বাস করি; কিন্তু কি উপায়ে কখন্ হইবে, জানি না। সশস্ত্র বিদ্রোহের পক্ষপাতী আমরা নহি। সম্পূর্ণ স্বাধীনতা যদিও আমরা চাই, তথাপি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিয়া যতটা রাষ্ট্রীয় শক্তি আমাদের হইতে পারে, তাহা অর্জ্জনের বিরোধীও আমরা নহিই, বরং তাহা পাইলেই লইব; এবং লইব এইজন্য, যে, তাহা আমাদিগকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতার দিকে আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা অপেক্ষা অনেক অধিক অগ্রসর করিয়া দিবে।

আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পাইলেই ইংলণ্ডের বিরুদ্ধাচরণ করিব, এরূপ কোনো কল্পনা আমাদের নাই; বরং ইংলণ্ডের ও অন্য সব জাতির বন্ধুই আমরা থাকিতে চাই। কিন্তু অগত্যা, বাধ্য হইয়া, কোনো জাতির সহিত আমরা যুক্ত থাকিতে চাই না।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য একটা বৃহৎ জিনিষ বটে, কিন্তু উহা সজীব নহে, উহার জৈব অখণ্ডতা (organic unity) নাই; উহার এক অংশের শ্রীবৃদ্ধিতে অপর সব অংশের শ্রীবৃদ্ধি হয় না, এক অংশের হানি ও দুঃখে অপরের হানি ও দুঃখ হয় না। ইংলণ্ডের কত যে শক্তিবৃদ্ধি, শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি হইয়াছে, সঙ্গে-সঙ্গেই ভারতবর্ষের সেরূপ কিছু শক্তিবৃদ্ধি শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি হয় নাই। পক্ষান্তরে ভারতের দারিদ্র্য-বৃদ্ধি, রোগবৃদ্ধি, জীবনীশক্তির হ্রাস, এবং দুর্ব্বলতা-বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে ইংলণ্ডের দারিদ্র্যবৃদ্ধি, রোগবৃদ্ধি, জীবনীশক্তির হ্রাস ও দুর্ব্বলতা বৃদ্ধি হয় নাই। জীবদেহে, মানবদেহে এক অঙ্গের বেদনা, পীড়া, অসাড়তা বা মৃত্যুতে অন্য সব অঙ্গেরও বেদনা, ক্ষতি, বা মৃত্যু হয়। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সেরূপ একটা জিনিষ নহে, কোন কালে হইতেও পারে না। এইহেতু ইহা শুভফলপ্রদ নহে, স্বাভাবিক নহে, এবং টিকিতে পারে না।

নূতন জার্ম্মান রাষ্ট্রপতি

জার্ম্মানি আজকাল সাধারণতন্ত্রের অনুসরণ করিতেছে। তাহার সম্রাট্ এখন নির্ব্বাসনে। কিন্তু জার্ম্মানিতে অসংখ্য লোকের মনে এখনো সম্রাটের প্রতি ভক্তি অচলা রহিয়াছে। সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে সম্রাট্ জার্ম্মানিতে দেবতার মতন পূজিত হইতেন। যুদ্ধের পরে কাইসার ভিলহেল্ম্ নির্ব্বাসিত হন ও জার্ম্মানিতে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু সম্রাট্-পূজার ভাব জার্ম্মানির জনসাধারণের মন হইতে চলিয়া যায় নাই। পুনর্ব্বার সম্রাট্‌কে অথবা তাঁহার কোনো বংশধরকে জার্ম্মানির সিংহাসনে বসাইবার জন্য একদল জার্ম্মান্ সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছে। এইসকল সম্রাট-ভক্তদিগের মধ্যে প্রুশিয়ার জমিদার-(ইউঙ্কের) মণ্ডলীর লোকই অধিক। প্রুশিয়ার জমিদার ও তাহার যোদ্ধ্‌সম্প্রদায় বলিতে একই শ্রেণীকে বুঝায়। এই সম্প্রদায়ের লোকেরাই পূর্ব্বকালীন প্রুশিয়ার সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন।

কিছুকাল হইল জার্ম্মানিতে ন্যাশ্‌নালিষ্ট পার্টি খুব প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। এই পার্টির সভ্যগণ সম্প্রতি সেনাপতি ফন্ হিণ্ডেনবুর্গ্‌কে তাহাদের সভাপতিরূপে জার্ম্মান্-সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রপতি-নির্ব্বাচন-ক্ষেত্রে উপস্থিত করে। হিণ্ডেন্‌বুর্গ্ মনোনীত হইয়াছেন। ইংলণ্ড্, ফ্রান্স্ ও অন্যান্য দেশে এই মনোনয়ন লইয়া হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। ফন্ হিণ্ডেনবুর্গ্ বিগত যুদ্ধের প্রসিদ্ধ সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার কৌশলে পূর্ব্ব যুদ্ধক্ষেত্রে রুশিয়ার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছিল। তাঁহার কৌশলে পশ্চিম যুদ্ধক্ষেত্রেও ইংরেজ ও ফরাসীর বিশেষ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল। তিনি প্রায় জার্ম্মানির যুদ্ধ-দেবতার স্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন বলিলেও ভুল হয় না। এ-হেন হিণ্ডেন্‌বুর্গ্‌কে যদি জার্ম্মান্ জাতি রাষ্ট্রনেতার পদে অধিষ্ঠিত করে, তাহা হইলে ফ্রান্স্ ও ইংলণ্ডের মনে ভীতির সঞ্চার হইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি? হিণ্ডেন্‌বুর্গ্ বলিয়াছেন, তিনি শান্তির পথেই চলিবেন। তাঁহার এই আশ্বাস-বাক্যে অবশ্য ভীতিবাদীরা আশ্বস্ত হইতে পারিতেছেন না। ইংলণ্ড্ ও ফ্রান্স্ এই মনোনয়নকে যুদ্ধের আহ্বানরূপেই গ্রহণ করিয়াছে।

আমাদের মনে হয় না ইহার মধ্যে ঐরূপ কোনো অর্থ আবিষ্কার করার সম্বন্ধে বিশেষ-কিছু আছে।

স্বর্গীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রদ্ধেয় জ্যোতি-বাবু আজ ধরাধামে নাই, চৈত্র মাসের প্রবাসীতে এই সংবাদ পাঠ করিয়া নিতান্ত সময়াভাব-সত্বেও কয়েকটি কথা না লিখিয়া পারিতেছি না।

রবি-বাবুর বন্ধু ৺ অক্ষয়কুমার চৌধুরী [যাঁহার কথা "জীবনস্মৃতি"তে বিশদভাবে উল্লিখিত হইয়াছে] মহাশয়ের পত্নী "শুভ-বিবাহ"-প্রণেত্রী পরলোকগতা শরৎকুমারী চৌধুরাণী মহাশয়াকে আমি মাতার ন্যায় ভক্তি করিতাম। বাইশ বৎসর পূর্ব্বে যখন তাঁহার সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়, তিনি জ্যোতি-বাবুর গভীর পাণ্ডিত্য, নানাবিষয়িণী প্রতিভা ও বালকোচিত শুভ্র সরলতার পুনঃপুনঃ প্রশংসা করেন। বাল্যকালে 'ভারতী' ও 'বালক' পত্রিকায় খুলনা-বরিশালে স্বদেশী জাহাজ-চালানো-সম্বন্ধে কতকগুলি উদ্দীপনাপূর্ণ পত্রে, ও অশ্রুমতী প্রভৃতি নাটকে জ্যোতি-বাবুর কিঞ্চিৎ পরিচয় লাভ করিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহার সহিত দেখা-সাক্ষাতের সৌভাগ্য ঘটে নাই। একবার "প্রবাসী" পত্রিকায় আমি "কুকী-পুঞ্জী" নামে একটি প্রবন্ধ লিখি। ত্রিপুরা-রাজ্যের পার্ব্বত্য প্রদেশে জনৈক সামন্ত কুকীরাজার বাড়ীতে ভ্রমণের কাহিনী বিবৃত করিয়া ঐ-প্রবন্ধ রচিত হইয়াছিল। উহা পড়িয়া জ্যোতি-বাবু চৌধুরাণী মহাশয়ার নিকট আমার প্রশংসা করেন এবং তাঁহার অনুরোধে বালিগঞ্জে ৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাড়ীতে জ্যোতি-বাবুর সহিত দেখা করিতে গিয়া দেখিলাম, তিনি আমাকে ম্যাঙ্গোপার্ক, লিভিংষ্টোন্, শরচ্চন্দ্র দাস প্রভৃতির ন্যায় এক-জন বীর ভ্রমণকারী বলিয়া ঠাওরাইয়া লইয়াছেন। তাঁহার বিনয়, সৌজন্য ও সরলতা দেখিয়া বস্তুতঃ আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম। ইহার বহুকাল পরে, ১৯১৫ কি ১৯১৬ সালে, ফরাসী পণ্ডিত সেনা (Senart) প্রণীত ভারতবর্ষীয় জাতিভেদ-প্রথা-সম্বন্ধীয় পুস্তকের বাংলা অনুবাদ করিবার জন্য ঐ-পুস্তকের একখণ্ড জ্যোতি-বাবুকে পাঠাইয়া দিই। তিনি তৎক্ষণাৎ অনুবাদ করিতে স্বীকৃত হন এবং তাঁহার কৃত অনুবাদ "প্রবাসী"তে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হয়। ঐ-পুস্তকের বিনিময়ে তিনি তাঁহার আত্মজীবনী ও প্রবন্ধাবলী আমাকে উপহার দেন। ঐ সময় হইতে মধ্যে-মধ্যে উঁহার সঙ্গে আমার পত্র-ব্যবহার চলে। পত্র লেখার একটি বিশেষত্ব এই দেখিতাম যে,খামের উপরের ঠিকানাও তিনি কখন ইংরেজীতে লিখিতেন না। একবার আমাকে লিখিয়াছিলেন, "আমার দুঃখ হয়,.........আমাদের বঙ্গ-সাহিত্য আপনার লেখা হইতে বঞ্চিত।" ১৯১৮ কি ১৯১৯ সালে পূজার ছুটিতে আমি একবার রাঁচি বেড়াইতে যাই এবং তাঁহার সঙ্গে দেখা করি। তিনি তাঁহার ছবির খাতায় আমার মুখের প্রতিকৃতি আঁকিয়া রাখেন এবং এই বৃদ্ধবয়সেও আমার সহিত দেখা করিতে আমার বাসায় আসেন। আমি যে-বন্ধুর আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম, তিনি একসময় জ্যোতি-বাবুর বাড়ী "শান্তিধামে"র নিকটেই থাকিতেন। তিনি আমাকে বলিয়াছেন, যে, গভীর সন্ধ্যায়, যখন সূর্য্য ডুবিয়া গিয়াছে, এবং অতি প্রত্যূষে তিনি জ্যোতি-বাবুকে লেখা-পড়ায় নিমগ্ন দেখিয়াছেন। তাঁহার চেহারায়, পোষাকে কিংবা কথা-বার্ত্তায়, তিনি যে কত বড় গুণী লোক ছিলেন, তাহার কিছুই প্রকাশ পাইত না।

জ্যোতি-বাবুর কয়েকখানি চিঠি আমার নিকট আছে, তাহা হইতে নমুনাস্বরূপ কিছু-কিছু উদ্ধৃত করিতেছি।

"আমাদের সভ্যতার যাহা ভালো তাহা বজায় রাখিতে হইবে এবং য়ুরোপীয় সভ্যতার যাহা ভালো তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। এই মধ্যপন্থাই সমাজ-সংস্কারের প্রকৃষ্ট পন্থা।"

"এখনকার লোকের ধর্ম্মভয় অপেক্ষা ধর্ম্মবুদ্ধি বেশী জাগ্রত হইয়াছে। এই-হিসাবে আমরা বেশী moral man."

"অন্ধ সংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস, অদৃষ্টবাদ প্রভৃতি আমাদের হাড়ে-হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে। সুশিক্ষিত বি-এ, এম্-এ-রাও তাহা অতিক্রম করিতে পারেন না। একবার এখান [রাঁচি] হইতে কলিকাতায় যাত্রা করিবার সময় এখানকার একজন দিগ্‌গজ সাহিত্যিক ও এম্-এ আমাদের

বলিলেন—'আজ যাত্রা করিবেন না—আজ অশ্লেষা, মঘা, ত্রিস্পর্শ—ভয়ানক অযাত্রা'—তথাপি আমরা গেলাম—এমন সুযাত্রা আর কখন হয় নাই। আমরা যে-আধ্যাত্মিকতার অভিমান করি সেটাও আমাদের বৃথা অভিমান-মাত্র। আমরা কতকগুলি অভ্যস্ত অর্থহীন অনুষ্ঠানকে আধ্যাত্মিকতা মনে করি। অবশ্য আমাদের দেশে অনেক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাঁদের প্রকৃত রূপে আধ্যাত্মিক বলা যাইতে পারে। কিন্তু সাধারণ লোক পুরাকালেও যেমন, এখন তেমনি বৈষয়িক।"

"আমাদের মধ্যে এখনও democratic spirit সাম্য-বুদ্ধি প্রবেশ লাভ করে নাই। তা যদি করিত, তা হইলে আমাদের সমাজের মধ্যেও তার পরিচয় পাইতাম। অধিকার কেহ ছাড়িতে চাহে না—কেবলই অধিকার অর্জ্জন করিতে চায়। ইংরাজেরা প্রভুত্ব ছাড়িবে, আমরা প্রভুত্ব করিব। কিন্তু সমাজে আমরা নীচের লোকদের আমাদের পায়ের তলায় রাখিব, আমরা চিরকাল তাহাদের প্রভু হইয়া থাকিব। ইহাই আমাদের মনোভাব। এই মনোভাব লইয়া যদি আমরা রাজনৈতিক প্রভুত্ব পাই, আমরা ইংরাজের চেয়েও bureaucrat ও autocrat হইয়া দাঁড়াইব।"

"এখন হিন্দুধর্ম্ম ছোঁয়াছুঁয়ির ধর্ম্ম—casteএর ধর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু caste ত্যাগ করিলেই যে অহিন্দু হইবে এমন কোন কথা নাই—তার সাক্ষী, চৈতন্যদেব ত মুসলমানকে দীক্ষিত করিয়া আপনার দলের মধ্যে লইয়াছিলেন। আজও ত জগন্নাথ-ক্ষেত্রে আহারাদিতে জা'তের কোন বাধা নাই। আসল কথা, হিন্দু ভাব ও হিন্দু tradition রক্ষা করিয়া যদি কেহ জা'তের উচ্ছেদ করে তা'তে লোকের চক্ষে তেমন খারাপ লাগে না। কেশব-বাবুর "সমাজ" ও "সাধারণ সমাজ" হিন্দু tradition ও শাস্ত্রের উপর নির্ভর না করিয়া বিদেশী tradition ও শাস্ত্রের দিকে বেশী ঝোঁক দেওয়ায় হিন্দু ব্রাহ্মদিগকে আপনার বলিয়া আর গ্রহণ করিতে পারিল না। রামমোহন রায় যদিও সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্য দিয়াই একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ব্রাহ্মসমাজকে একমাত্র উপনিষদ্ শাস্ত্রের উপরেই সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। আদি ব্রাহ্মসমাজ সেই পন্থাই অনুসরণ করিতেছেন। অবশ্য আদি ব্রাহ্মসমাজ জাতিভেদ কার্য্যতঃ এখনো ত্যাগ করে নাই। তবে, সাধারণতঃ জাতিভেদের বন্ধন হিন্দুসমাজেও অনেকটা শিথিল হইয়া আসিয়াছে—এখন অনেকটা বিবাহের আদান-প্রদানের মধ্যেই বদ্ধ রহিয়াছে। Patelএর মতো বিল যদি কখন pass হয়, তা হইলে আরও একটু শিথিল হইয়া পড়িবে। এরূপে হিন্দুসমাজেও ক্রমে অসবর্ণ বিবাহ সহিয়া যাইবে। এখন কেবল কালের অপেক্ষা। চৈতন্য-দেবের মতো কোনও মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া যদি জাতিভেদ উঠাইবার চেষ্টা করেন, তা হইলে জাতিভেদ হিন্দুসমাজ হইতেও ক্রমে উঠিয়া যাইতে পারে। কিন্তু একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব আবশ্যক। যে-সে লোকের কর্ম্ম নয়।"

"তখন [মহাভারতের যুগে] আচার-ব্যবহার ও মতামতে কতটা উদারতা ছিল! আমরা কোথায় আরও অগ্রসর হইব—না আরও পিছাইয়া পড়িয়াছি!"

"আমাদের দেশ পূর্ব্বে ধ্যানের জন্যই বিখ্যাত ছিল। আজকাল ধ্যানের বদলে কর্ম্মই প্রবল হয়েছে। একদল ধ্যানী ও একদল কর্ম্মী চিরকালই আছে ও চিরকালই থাকবে। কর্ম্মের গোড়ায় ধ্যান থাকা আবশ্যক—ধ্যানের অভাবে কর্ম্ম সুপথে চালিত হয় না—পথভ্রষ্ট হয়। আবার কর্ম্মের অভাবে শুধু ধ্যান নিরর্থক হয়। দুয়ের সমন্বয় আবশ্যক।"

এই শেষ চিঠিখানি ১৯২৩ সালের ৭ই জুলাই তারিখে লিখিত। যখন আমি এই অকপট, সৌম্যদর্শন, ঋষিকল্প, ওজস্বী, মহামনা, স্বদেশপ্রাণ, বহুগুণান্বিত মনীষী ও মেধাবী বিপত্নীক বাঙ্গালীসন্তানের কথা স্মরণ করি, তখন মনে হয় যে-জাতির উচ্চস্তরে ঈদৃশ মনুষ্যত্বের বিকাশ হইয়াছে তাহার ভবিষ্যৎ কখনও অনুজ্জ্বল হইতে পারে না—ইহাদের মহৎ দৃষ্টান্ত সমগ্র জাতিকে উচ্চ হইতে উচ্চতর গ্রামে লইয়া যাইবে, এবিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন হেতু নাই।

শ্রী:—

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ও জাতীয় অবনতি

পাশ্চাত্যে একটা কথা আছে যে, প্রেমের দেবতা অন্ধ। অর্থাৎ কিনা ভালোবাসার চক্ষে যাহা দেখা যায় তাহা সচরাচর সত্যের বিপরীত। কালো-ছেলে ভালোবাসার দৃষ্টিতে গৌরবর্ণ হইয়া উঠে, বৃদ্ধযুবার ও ক্ষীণকায় কাপুরুষ মহাভুজ ভীমসেনের রূপ ধারণ করে। ফরিদপুরে বঙ্গীয় হিন্দুসম্মিলনে মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন, **বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও নীতিশাস্ত্র-সঙ্গত**। তিনি আরো বলিয়াছেন, "**কেহ যেন মনে না করেন আমি বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ সমর্থন করি**" এই দুইটি কথা মহাত্মা অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন-উপলক্ষে বলিয়াছেন। তাঁহার মতে, অস্পৃশ্যতা দোষেই হিন্দুজাতি উন্নতি লাভ করিতে পারিতেছে না। এই মত তাঁহার একলার নহে। তবে তিনি শুধু অস্পৃশ্যতার উপরেই যতটা দোষ দিতেছেন অপরে তাহা না-দিতে পারে।

অপরের মতে হয়ত জাতিভেদ ও বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ থাকাতেই হিন্দুজাতি এত দ্রুত অধোগমন করিতেছে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাত্মার বিশেষ ভক্ত ও ভালোবাসার পাত্র। তিনি মহাত্মা-সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "যিনি নব্য ভারতের উদ্ধার-কল্পে যুগাবতার-রূপে অবতীর্ণ—জগতের সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব মহাত্মা গান্ধী।" পূর্ব্বে বলিয়াছি ভালোবাসা ও ভক্তির চক্ষু সাধারণ চক্ষু হইতে বিভিন্ন। তাহা না হইলে আচার্য্য রায়ের মতামত তাঁহার আদর্শ মানবের মতামতের সহিত মিলিতেছে না কেন? আচার্য্য রায় বলিতেছেন,—

"এই হতভাগ্য দেশে ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, কলেরা প্রভৃতি কালান্তক ব্যাধি মৌরসী পাট্টা করিয়া রহিয়াছে, হিন্দু মুসলমান এইসমস্ত ব্যাধির সমভাগী, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও হিন্দুর সংখ্যা কেন দিন-দিন হ্রাস হইতেছে? ইউরোপীয় জগতে কি-প্রকারে সন্তান-উৎপাদন (birth control) বন্ধ করা যায়, তাহার উপায় উদ্ভাবন হইতেছে, কিন্তু বাংলা দেশে হিন্দু-সমাজে আমাদের আত্মকৃত দুর্নীতির প্রথাই ইহা সংসিদ্ধ করিতেছে। ইহার প্রধান কারণগুলি যথা :—

(১) বিবাহযোগ্যা পাত্রীর অভাব।

(২) বিধবার,—বিশেষতঃ বালবিধবার, বাধ্যতামূলক পুনর্বিবাহ নিষেধ।

দেখা যায় যে, প্রায় সমস্ত হিন্দু-সম্প্রদায়ের মধ্যে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা বেশী, কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর বিবাহ-প্রথা রহিত হওয়ায় অনেক সময় কন্যা পাত্রস্থ করা দায়, আবার অপর পক্ষে পাত্রের উপযুক্ত কন্যা পাওয়াও দুষ্কর—বারেন্দ্র রাঢ়ীর সহিত, উত্তর রাঢ়ী দক্ষিণ রাঢ়ীর সহিত ক্রিয়াকর্ম্ম করিতে নারাজ। হিন্দুসমাজে তথাকথিত নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে পণ বিনা পাত্রী পাওয়া দায়। এই কারণে অনেকে ৪০ বৎসর গত হইলে পৈতৃক ভদ্রাসন বন্ধক দিয়া একটা অপরিণত-বয়স্কা বালিকা বিবাহ করেন। অনেকের ভাগ্যে বিবাহ ঘটিয়া উঠে না। ফলে এই দাঁড়ায় যে, বালিকাবধূ ১৫।২০ বৎসর বয়সেই বিধবা হইয়া যায়। এই কারণেই বাংলা দেশে কামার, কুমোর, ধোপা, নাপিত প্রভৃতি শ্রেণী একপ্রকার বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে এবং পশ্চিম-দেশীয় লোকেরা আসিয়া ইহাদের স্থান অধিকার করিতেছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে এই যে অনেক শ্রেণী ও উপশ্রেণীর মধ্যে পুরুষেরা পাত্রীর অভাবে অবিবাহিত থাকিতে বাধ্য হয়, পরন্তু সহস্র-সহস্র বালবিধবাগণ সামাজিক রীতি অনুসারে পুনর্বিবাহ করিতে পারে না। কিন্তু নৈসর্গিক গতি অবরোধ করে কে? উপপত্নী ও রক্ষিতা-নারী সমাজের ভিতর ছড়াইয়া পড়িতেছে—পাপস্রোতে ও ভ্রূণহত্যাপাতকে দেশ প্লাবিত। প্রায় ৭০ বৎসর হইল, প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর-মহাশয় তাঁহার "বিধবাবিবাহ"-বিষয়ক গ্রন্থের উপসংহারে জ্বালাময়ী বাণীতে যে হৃদয়বিদারক আর্ত্তনাদ করিয়াছিলেন, তাহা যেন এখনও আমার কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইতেছে। আমি জানি, অনেক হিন্দু বিধবা এইপ্রকার কলঙ্কময় জীবন যাপন করা অপেক্ষা ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া উদ্বাহসূত্রে আবদ্ধ হওয়া শ্রেয়ঃ জ্ঞান করেন।"

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, আচার্য্য রায়ের মতে বিভিন্ন জাতির মধ্যে অন্তর্বিবাহ ও বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ হওয়াতেই হিন্দু সমাজে জনসংখ্যা হ্রাস ও দুর্নীতি বৃদ্ধি পাইতেছে। অথচ তাঁহার গুরু মহাত্মা গান্ধী বলিতেছেন যে, জাতিভেদ "নীতিশাস্ত্রসঙ্গত" ও অন্তর্বিবাহ উচিত নহে। মহাত্মা গান্ধীর সহিত আমাদের মতের মিল নাই। আচার্য্য রায়ের কথা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আচার্য্য রায় মহাত্মা গান্ধীর এইসকল ধারণার বিরুদ্ধবাদ করিলেও সে-কথা পরিষ্কার করিয়া বলিতেছেন না। তিনি যদি "**জাতিভেদ ভালো নহে**" ও "**বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ প্রয়োজন**" এই কথা পরিষ্কার করিয়া বলিতেন তাহা হইলেই উত্তম হইত—তাহা হইলে অবশ্য তাঁহাকে জোরের সহিত মহাত্মার কথার প্রতিবাদ করিতে হয়।

মহাত্মা গান্ধী যে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের সমর্থন করেন তাহার কারণ তিনি বর্ণাশ্রমধর্ম্মকে আমরা যে-ভাবে দেখি সেভাবে দেখেন না। তিনি বলেন, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অর্থে সামাজিক কর্ত্তব্যবিভাগ। অর্থাৎ কিনা বর্ণাশ্রমধর্ম্মবাসীকে সমাজে তাহার কর্ত্তব্যটুকু অবলম্বন করিয়া একাগ্রতার সহিত জীবন যাপন করিতে হইবে। সে দেখিবে না তাহার

অধিকার কি কি, সে দেখিবে শুধু তাহার কর্ত্তব্য কি। এইরূপ কায়মনোবাক্যে কর্ত্তব্য পালনের আদর্শ অতি উত্তম জিনিষ। সমাজে সকল ব্যক্তি যদি নিজ কর্ত্তব্য এইরূপে পালন করে, তাহা হইলে সামাজিক উন্নতি দ্রুতগতিতেই হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু কর্ত্তব্য পালন ও কর্ত্তব্যপালনের ক্ষমতা এই দুইটিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা সম্ভব নহে। যাহার যে-কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই, তাহাকে সেই কার্য্য কর্ত্তব্য বলিয়া স্কন্ধে আরোপিত করিয়া দিলেই কি সে-কার্য্য সে করিতে পারিবে? নিশ্চয়ই না। কর্ত্তব্য-বিভাগ করিতে হইলে যাহাতে প্রত্যেকটি কর্ত্তব্য উপযুক্ত পাত্রে ন্যস্ত হয় তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। মহাত্মা গান্ধীর সমর্থিত বর্ণাশ্রমধর্ম্মে কর্ত্তব্য-বিভাগ জন্মগত-ভাবে হইয়া থাকে। মানুষ কর্ত্তব্য স্কন্ধে লইয়াই জন্মগ্রহণ করিবে। প্রাণ-বিজ্ঞানের দিক্ দিয়া দেখিলে ব্যাপারটা অতিশয় হাস্যকর। ধরা যাউক যে একব্যক্তি ভারী বোঝা উত্তোলন-কার্য্য কর্ত্তব্য-রূপে পাইয়া জন্মগ্রহণ করিল। তাহার শিশু-কালেই কোনো কারণে শরীরটি ক্ষীণাস্থি ও দুর্ব্বল-পেশী-যুক্ত হইয়া গেল। এক্ষেত্রে তাহার পক্ষে কর্ত্তব্য পালন অসম্ভব। অপর দিকে হয়ত আর-এক ব্যক্তি নিজের বিশাল দেহ লইয়া শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতে লাগিল। **মানুষ কি কার্য্যের উপযুক্ত হইবে তাহা বংশানুক্রমিক-ভাবে নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া যায় না।** বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের মূল ত্রুটি এইখানে। তার পর বিবাহের কথা। ভালোবাসা, স্বামী-স্ত্রীর স্বভাবের সাম্য ইত্যাদি যে-সকল অবস্থা বর্ত্তমান থাকিলে বিবাহিত জীবন সুখী হয়, সেগুলি না হয় আমরা সমাজ-দেবতার সম্মুখে বলিদানই করিলাম। ধরা যাউক বিবাহের উদ্দেশ্য বিবাহিত জীবনে সুখ নহে; তাহার উদ্দেশ্য সামাজিক কর্ত্তব্যপালনের উপযুক্ত সন্তান-সন্ততি সৃজন ও পরিপালন করা। তাহা হইলেও জাতি মিলাইয়া বিবাহ দেওয়া শ্রেষ্ঠ উপায় নহে। কেননা কোনো ব্যক্তির যে-প্রকার স্বামী অথবা স্ত্রী হইলে সে নিজের জাতিগত কর্ত্তব্য পালনের উপযুক্ত সন্তান লাভ করিতে পারে, সেইরূপ স্বামী বা স্ত্রী সে নিজ জাতির মধ্যে না পাইয়া অন্য জাতির মধ্যেই হয়ত সহজে পাইতে পারে। এক্ষেত্রে সুপ্রজনন-বিজ্ঞানের খাতিরে তাহার জাতি বিসর্জ্জন দেওয়াই উচিত। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, উপযুক্তরূপে কর্ত্তব্য-বিভাগ অথবা সামাজিক কর্ত্তব্যপালনের দিক্ দিয়া সুপ্রজনন, এই দুইটির কোনোটিরই অনুকূল নহে। তবে মহাত্মা গান্ধী এই নিষ্প্রয়োজন ও অনিষ্টকর প্রথার সমর্থন করেন কেন? সামাজিক কর্ত্তব্য ভুলিয়া ব্যক্তিগত সুখান্বেষণে আত্ম-নিয়োগ করিতে আমরা কাহাকেও বলিতেছি না। আমরাও বলি যে সামাজিক কর্ত্তব্যের স্থান ব্যক্তিগত সুখের উপরে এবং সেই দিক্ দিয়াই বর্ণাশ্রমধর্ম্মের উচ্ছেদ প্রয়োজন। তাহাতে হিন্দুধর্ম্ম যদি অভিনব রূপ ধারণ করে তাহাতেও আসে যায় না।

অ

—

জাতিধর্ম্ম ও দারিদ্র্য

বাংলার হিন্দু-জাতি অতিশয় দরিদ্র। মুসলমান অপেক্ষা তাহারা দরিদ্র কি না, তাহার বিচার এখানে নিষ্প্রয়োজন। হিন্দুরা বাংলার জমিদার, সুতরাং হয় ত তাহাদেরই মোট ধনসম্পত্তি মুসলমান অপেক্ষা অধিক; কিন্তু যেখানেই নিজে খাটিয়া অর্থোপার্জ্জনের কথা উঠে, সেখানেই মুসলমান তাহার জাতি-ভেদ-বিচ্ছিন্নতা ও কর্ম্মক্ষমতাপ্রযুক্ত হিন্দু-অপেক্ষা অধিক ধনশালী। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রাদেশিক হিন্দু সম্মিলনে বলিয়াছেন—

> সামাজিক দুর্নীতি ও কুসংস্কারের দাস হইয়া হিন্দুগণ মুসলমানের সহিত জীবনসংগ্রামে প্রতিনিয়ত পরাজিত হইতেছে এবং জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের অনেক ক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত হইতেছে। বাংলা দেশের বড়-বড় নদীতে অবিরত স্টীমার যাতায়াত করে এবং ইংলণ্ড ও আমেরিকার বড়-বড় জাহাজ প্রতিনিয়ত সমুদ্রবক্ষে চলিতেছে, ইহাদের সারেঙ, খালাসী প্রভৃতি পূর্ব্ববাংলার চাষী মুসলমান শ্রেণী হইতে সংগৃহীত। মুসলমান রেঙ্গুন, আকিয়াব, মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি দূরদেশে অধিককাল যাইয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করে এবং দেশে পাঠায়। আমি জানি, চাটগাঁয়ের অনেক গ্রামে এইপ্রকারে প্রতিমাসে ৪০।৫০ হাজার টাকা মণিঅর্ডার হইয়া আসে। তা-ছাড়া পদ্মায় চর পড়িলেই দুঃসাহসিক মুসলমান আসিয়া আবাদ করিতে আরম্ভ করে। প্রতিবৎসর সহস্র সহস্র মুসলমান চাষী আসামের উর্ব্বরা উপত্যকায় যাইয়া উপনিবেশ সংস্থাপন করিতেছে, কিন্তু হিন্দু অলস ও কুসংস্কারজালে জড়িত, দুঃখমার্গ ও জাতিচ্যুতির ভয় তাহাকে আড়ষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। সে পৈতৃক ভদ্রাসন ছাড়িয়া যাইতে রাজি নয়, এই কারণে সে দরিদ্র ও নিরন্ন হইয়া পড়িতেছে।

জাতিভেদরূপ ব্যাধিজর্জ্জরিত হিন্দু প্রতিপদে শৃঙ্খল পড়িয়া নিজেকে আবদ্ধ করিয়াছে। যোগী কুমারের কাজ করিবে না। কিন্তু মুসলমানদিগের কোনো-প্রকার বাধাবিপত্তি নাই; সে নিজের রুচি ও ইচ্ছানুযায়ী যে কোনো ব্যবসা অবলম্বন করিতে পারে, এই কারণে চামড়া ও দপ্তরীর ব্যবসায় মুসলমানদিগের একচেটিয়া।

যাহার যে-কর্ম্মে পটুতা, সে যদি সেই কর্ম্মের মধ্যে অবাধে প্রবেশ করিতে না পারে তাহা হইলে তাহার ও সামাজিক সম্পদ্ বৃদ্ধির অন্তরায় হয়। জাতিভেদের ফলে হিন্দুকে ক্রমাগত বাধা পাইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হয়, কাজেই তাহার এই দারিদ্র্য। এই প্রতিযোগিতার যুগে অযথা ইতস্ততঃ করিয়া হিন্দু তাহার অর্থনীতিক সুবিধা হারাইয়া অনাহারে ভদ্রাসন আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকে। মুসলমানের ভদ্রাসন সঙ্কীর্ণ নহে, তাহা পৃথিবীব্যাপী, তাহার কর্ত্তব্য সর্ব্বক্ষেত্রে, কাজেই সে অগ্রগামী। যেমন জাতির জন্য হিন্দুর দেশ ক্রমশঃ জনশূন্য হইয়া আসিতেছে, তেম্‌নি জাতির জন্যই তাহার আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে।

অ

—

মরোক্কো বিবাদে ফরাসীর হস্তক্ষেপ

কিছুকাল পূর্ব্বে যখন আব্‌দুল করিমের সেনাদল স্পেনের বাহিনীর সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছিল, তখন ফরাসী খবরের কাগজে অন্তত পাশ্চাত্য জাতির গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার খাতিরেও মরোক্কোতে কিছু-একটা করা দরকার এইরূপ একটা কথা উঠিয়াছিল। কেহ অবশ্য বলে নাই যে, ফরাসীর উচিত আবদুল করিমকে আক্রমণ করা, তবু একথা শুনা গিয়াছিল যে যথা-সময়ে কার্য্যক্ষেত্রে না নামিলে পরে ফরাসী-মরোক্কোর অবস্থাও স্পেনীয়-মরোক্কোর মতন হইতে পারে। আব্‌দুল করিম দেশ-ভক্ত লোক। তাঁহার অনুচরবৃন্দও দেশের জন্য সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত। তাঁহাদের উদ্দেশ্য স্পেন বা ফ্রান্‌স্‌কে বিপন্ন করা নহে, দেশকে স্বাধীন করিয়া উন্নতির পথে লইয়া যাওয়া। কাজেই ফরাসীর করিম-ভীতির কারণ যে নাই তাহা নহে। আজ একদল দেশশত্রুকে বিতাড়িত করিলেই যে, কালে আর-এক দলের প্রতি আব্‌দুল করিম নজর দিবেন একথা ভাবিলে ভুল করা হইবে না। যাহা হউক, আব্‌দুল করিম স্পেনের বিরুদ্ধে সফলকাম হইবার ফলে তাঁহার ইয়োরোপীয় শত্রুর সংখ্যা বাড়িয়াছে। ইহার কারণ তিনি ইয়োরোপীয় নহেন এবং ইয়োরোপের সামরিক জাতিবৃন্দ দরজায় গোড়ায় আর-একটা জাপানের জন্ম দেখিতে চায় না।

ধীরে-ধীরে কেমন করিয়া যে ফরাসীর সহিত আব্‌দুল করিমের যুদ্ধ বাধিয়া গেল তাহা ঠিক বুঝা গেল না। শুনিলাম, তাঁহার সেনাদল ফরাসী-অধিকৃত স্থানে প্রবেশ করার ফলে ফরাসীরা **বাধ্য হইয়া** যুদ্ধে নামিয়াছে। অবশ্য ইউরোপীয় জাতিরা বাধ্য না হইলে পরের দেহে হস্তক্ষেপ করে না একথা সর্ব্বজনবিদিত। তবে, ফরাসীদের বাধ্য হওয়াটা কি-ভাবে হইল তা এখন পরিষ্কার বুঝা যায় নাই। আব্‌দুল করিম এখনও স্পেনের সহিত যুদ্ধে ব্যস্ত। এমন সময় তাঁহাকে আক্রমণ করিলে সুবিধা অনেক। শুভস্য শীঘ্রম্। ফরাসীরা বাধ্য হউক বা না হউক শাস্ত্র-সম্মতভাবেই কার্য্য করিতেছে।

অ

—

বাঁদরের বুদ্ধি

মানুষের অহঙ্কারের সীমা নাই বলিয়াই সম্ভবত তাহার জ্ঞান এত সীমাবদ্ধ। বহুক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, মানুষ নিজের অসাধারণত্ব প্রমাণ করিবার আবেগে প্রকৃতির কার্য্যে মানব-প্রধানত্ব চির-বর্ত্তমান দেখে। জীব-জগতের বিষয়ে মানুষের জ্ঞান অত্যন্তই কম। জীবজন্তুদের দেহ-সম্বন্ধে জ্ঞান আমাদের অনেকটা আছে, কিন্তু তাহাদের মনের কথা আমরা জানি না বলিলেই চলে। কীট-পতঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া গর্দ্দভ বা উষ্ট্র সকল প্রাণীরই দেহ লইয়া মানুষ যথেষ্ট নাড়া-চাড়া করিয়াছে, কিন্তু মনের ক্ষেত্রে এ নাড়া-চাড়া যেন ইচ্ছা করিয়াই সে করে নাই। কেননা যদি প্রমাণ হইয়া যায় যে, সে গর্দ্দভ অথবা বাঁদর অপেক্ষা মানসিক ভাবে শ্রেষ্ঠ হইলেও সে শ্রেষ্ঠত্ব শুধু কম-বেশীর শ্রেষ্ঠত্ব, বিশেষত্বের নহে, তাহা হইলে সৃষ্টির চরম আদর্শ মানুষের মান থাকে না। এইজন্যই দেখিতেছি যে, মনো-

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জীব-জন্তুদের আমরা সম্পূর্ণরূপে তাচ্ছিল্য করিয়াই চলি। মানুষ ব্যতীতও যে সকল প্রাণী পৃথিবীতে আছে তাহাদের উপযুক্তরূপে না বুঝিতে পারিলে সৃষ্টির বিষয়ে আমাদের জ্ঞান কখনো সম্পূর্ণ হইবে না। মনো-বিজ্ঞানের এই ক্ষেত্রে কার্য্য খুবই কম হইয়াছে। এমন-কি, শিশুর চরিত্র-সম্বন্ধেও আমরা জানি খুব কম। সম্প্রতি ইংরেজীতে একখানি পুস্তক বাহির হইয়াছে। তাহাতে এই বিষয়ে অনেক নূতন খবর আছে।

প্রুশিয়ান্ আকাডেমি অফ্ সায়েন্সেজ্ যুদ্ধের পূর্ব্বেই টেনেরিফে কয়েকজন বৈজ্ঞানিককে বাঁদরদের বিষয় অনুসন্ধান করিবার জন্ম পাঠাইয়াছিলেন। ১৯১৭ খৃঃ অব্দে এইসকল বৈজ্ঞানিকদের দলপতি W Kohler তাঁহাদের অনুসন্ধানের ফলাফল Intelligenzpruefung an Anthropoiden নাম দিয়া পুস্তক-আকারে প্রকাশ করেন। এই পুস্তকের সম্প্রতি ইংরেজী তর্জ্জমা হইয়াছে। (The Mentality of Apes, Kegan Paul, 16s) যে সকল বাঁদর লইয়া ইঁহারা চর্চ্চা করিয়াছিলেন, সেগুলি শিম্পাঞ্জি। নয়টি শিম্পাঞ্জি ছিল। মনোবিজ্ঞানবিদ্‌দিগের মধ্যে অধিকাংশের মতেই বাঁদর অথবা অন্য-কোনো জানোয়ারের জাগ্রত-বুদ্ধি বলিয়া কিছু নাই। তাহারা যাহা-কিছু করে সবই প্রকৃতিগত অভ্যাস অথবা স্বভাবের তাড়নায়। ঠেকিয়া-শিখিয়া, বিফল হইয়া অন্ধকারে হাতড়াইয়া নিজেদের অজ্ঞানেই জানোয়ারেরা অভ্যাস গঠন করে। মানুষের বুদ্ধি বলিতে যে সজাগ ইচ্ছাশক্তি-সংক্রান্ত জিনিস বুঝায়, জীবজন্তুর বুদ্ধি সে-প্রকার কিছু নাই। এখানে আমরা মানুষের অহঙ্কারের ছাপ পুরাপুরি দেখিতেছি। Kohlerএর অনুসন্ধানের ফলে তিনি বলিতেছেন যে, বাঁদরের মানুষ অপেক্ষা কম বুদ্ধি থাকিলেও সে-বুদ্ধি মানুষের বুদ্ধির মতোই সজাগ ও ইচ্ছাশক্তি সম্পর্কিত। তিনি ইহা প্রমাণ করিবার জন্ম কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছেন। বাঁদরের খাঁচা হইতে দূরে একটি কলা রাখা হইয়াছিল। তাহার সহিত একটি সুতা বাঁধা ছিল। বাঁদরটি একবার কলাটির দিকে দেখিল এবং সুতাটিও দেখিল। তার পর কোনো-প্রকার ইতস্তত না করিয়া সুতাটি ধরিয়া টানিয়া কলাটি গ্রহণ করিল। এই-প্রকার কার্য্য একটি কুকুরকে দেওয়াতে সে এভাবে করিতে পারে নাই। একটি কলা খাঁচার বাহিরে বাঁদরের হাতের এলাকা হইতে দূরে রাখা হইল। খাঁচার ভিতর একটি লাঠি ছিল। বাঁদরটি অল্পবিস্তর চুপ করিয়া হঠাৎ লাঠিখানা গ্রহণ করিয়া তাহার সাহায্যে কলাটি টানিয়া লইল।

এইপ্রকার আরও অনেক ঘটনা হইতে শ্রীযুক্ত Kohler এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন যে, বাঁদরদের বুদ্ধি পরিমাণে মানুষ অপেক্ষা কম হইলেও মানুষ ও বাঁদরের বুদ্ধির মধ্যে জাতিগত বৈষম্য কিছুই নাই। সহজ কার্য্য বুদ্ধিমত্তার সহিত নিষ্পন্ন করিতে বাঁদরেরা খুবই পারে। অপেক্ষাকৃত কঠিন কার্য্যও কোনো কোনো বিশিষ্ট-রূপে বুদ্ধিমান্ বাঁদর করিতে সক্ষম হইয়াছে। এই পুস্তক মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মূল্যবান্ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। আমাদের দেশেও ইহার আদর হইবে আশা করা যায়।

অ

৯১, আপার সার্কুলার রোড, প্রবাসী প্রেসে শ্রী অবিনাশচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
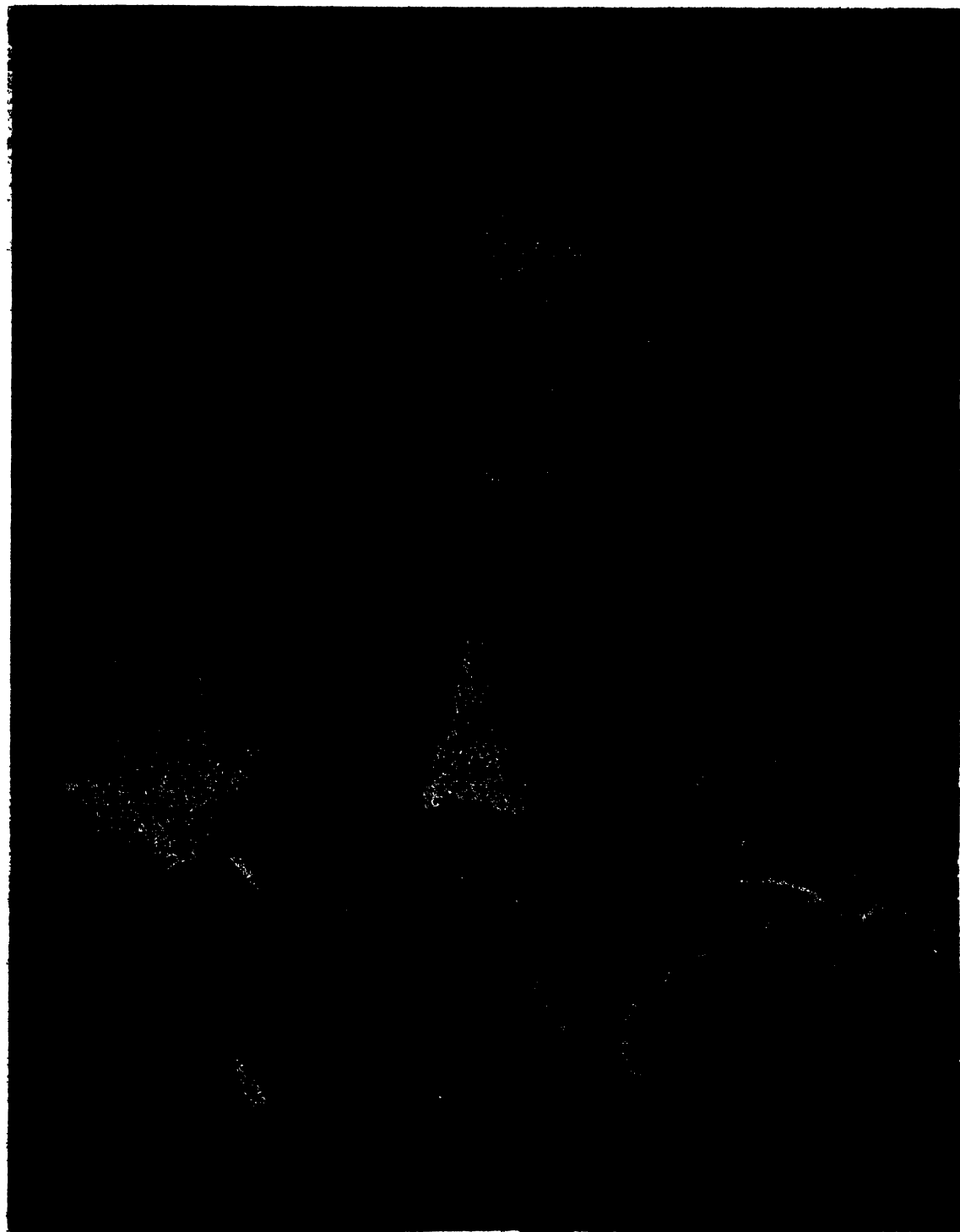
বুদ্ধদেব ও সুজাতা

শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ বিশী

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

২৫শ ভাগ
১ম খণ্ড

আষাঢ়, ১৩৩২

৩য় সংখ্যা

মেঘদূত

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবিবর, কবে কোন্ বিস্মৃত বরষে
কোন্ পুণ্য আষাঢ়ের প্রথম দিবসে
লিখেছিলে মেঘদূত ! মেঘমন্দ্র শ্লোক
বিশ্বের বিরহী যত সকলের শোক
রাখিয়াছে আপন আঁধার স্তরে-স্তরে
সঘন সঙ্গীত-মাঝে পুঞ্জীভূত ক'রে।

সেদিন সে উজ্জয়িনী-প্রাসাদ-শিখরে
কি না জানি ঘন-ঘটা, বিদ্যুৎ-উৎসব,
উদ্দাম পবন-বেগ, গুরু-গুরু রব।
গম্ভীর নির্ঘোষ সেই মেঘ-সংঘর্ষের
জাগায়ে তুলিয়াছিল সহস্র বর্ষের
অন্তর্গূঢ় বাষ্পাকুল বিচ্ছেদ-ক্রন্দন
এক দিনে। ছিন্ন করি' কালের বন্ধন
সেই দিন ঝ'রে পড়েছিল অবিরল
চিরদিবসের যেন রুদ্ধ অশ্রুজল
আর্দ্র করি' তোমার উদার শ্লোকরাশি।

সেদিন কি জগতের যতেক প্রবাসী
জোড়হস্তে মেঘপানে শূন্যে তুলি' মাথা
গেয়েছিল সমস্বরে বিরহের গাথা
ফিরি' প্রিয়-গৃহপানে? বন্ধন-বিহীন
নবমেঘ-পক্ষ-'পরে করিয়া আসীন
পাঠাতে চাহিয়াছিল প্রেমের বারতা
অশ্রুবাষ্পভরা,—দূর বাতায়নে যথা
বিরহিণী ছিল শুয়ে ভূতল-শয়নে
মুক্তকেশে, ম্লান-বেশে সজল-নয়নে?

তাদের সবার গান তোমার সঙ্গীতে
পাঠায়ে কি দিলে, কবি, দিবসে নিশীথে
দেশে দেশান্তরে, খুঁজি' বিরহিণী প্রিয়া?
শ্রাবণে জাহ্নবী যথা যায় প্রবাহিয়া
টানি' ল'য়ে দিশ-দিশান্তরে বারিধারা
মহাসমুদ্রের মাঝে হ'তে দিশাহারা।

পাষাণ-শৃঙ্খলে যথা বন্দী হিমাচল
আষাঢ়ে অনন্ত শূন্যে হেরি' মেঘদল
স্বাধীন-গগন-চারী, কাতরে নিশ্বাসি'
সহস্র কন্দর হ'তে বাষ্প রাশি-রাশি
পাঠায় গগন-পানে, ধায় তা'রা ছুটি'
উধাও কামনা-সম ; শিখরেতে উঠি'
সকলে মিলিয়া শেষে হয় একাকার,
সমস্ত গগনতল করে অধিকার।
সেদিনের পরে গেছে কত শতবার
প্রথম দিবস, স্নিগ্ধ নব-বরষার।
প্রতি বর্ষা দিয়ে গেছে নবীন জীবন
তোমার কাব্যের পরে, করি' বরিষণ
নববৃষ্টিবারিধারা ; করিয়া বিস্তার
নবঘনস্নিগ্ধচ্ছায়া ; করিয়া সঞ্চার
নব-নব প্রতিধ্বনি জলদমন্দ্রের ;
স্ফীত করি' স্রোতোবেগ তোমার ছন্দের
বর্ষা-তরঙ্গিণী-সম।

কত কাল ধ'রে
কত সঙ্গিহীন জন, প্রিয়াহীন ঘরে
বৃষ্টিক্লান্ত বহুদীর্ঘ লুপ্ত-তারাশশী
আষাঢ় সন্ধ্যায়, ক্ষীণ দীপালোকে বসি'
ওই ছন্দ মন্দ-মন্দ করি' উচ্চারণ
নিমগ্ন করেছে নিজ বিজন-বেদন !
সে-সবার কণ্ঠস্বর কর্ণে আসে মম
সমুদ্রের তরঙ্গের কলধ্বনি-সম
তব কাব্য হ'তে।

ভারতের পূর্ব্বশেষে
আমি ব'সে আজি ; যে শ্যামল বঙ্গদেশে
জয়দেব কবি, আর এক বর্ষাদিনে
দেখেছিলা দিগন্তের তমাল-বিপিনে
শ্যামচ্ছায়া-পূর্ণ মেঘে মেদুর অম্বর।

আজি অন্ধকার দিবা, বৃষ্টি ঝরঝর,
দুরন্ত পবন অতি, আক্রমণে তা'র
অরণ্য উদ্যতবাহু করে হাহাকার।
বিদ্যুৎ দিতেছে উঁকি ছিঁড়ি' মেঘভার
খরতর বক্র হাসি শূন্যে বরষিয়া।

অন্ধকার রুদ্ধগৃহে একেলা বসিয়া
পড়িতেছি মেঘদূত, গৃহত্যাগী মন
মুক্তগতি মেঘপৃষ্ঠে লয়েছে আসন,
উড়িয়াছে দেশ-দেশান্তরে। কোথা আছে
সানুমান্ আম্রকূট ; কোথা বহিয়াছে
বিমল বিশীর্ণ রেবা বিন্ধ্য-পদমূলে
উপল-ব্যথিত-গতি ; বেত্রবতীকূলে
পরিণত-ফলশ্যাম জম্বুবনচ্ছায়ে
কোথায় দশার্ণ গ্রাম রয়েছে লুকায়ে
প্রস্ফুটিত কেতকীর বেড়া দিয়ে ঘেরা ;
পথ-তরু-শাখে কোথা গ্রাম-বিহঙ্গেরা
বর্ষায় বাঁধিছে নীড়, কলরবে ঘি'রে
বনস্পতি ; না জানি সে কোন্ নদীতীরে
যূথীবন বিহারিণী বনাঙ্গনা ফিরে,
তপ্ত কপোলের তাপে ক্লান্ত কর্ণোৎপল
মেঘের ছায়ার লাগি' হ'তেছে বিকল ;
ভ্রূবিলাস শেখে নাই কা'রা সেই নারী
জনপদ-বধূজন, গগনে নেহারি'
ঘনঘটা, ঊর্দ্ধনেত্রে চাহে মেঘপানে,
ঘন নীল ছায়া পড়ে সুনীল নয়ানে ;
কোন্ মেঘশ্যামশৈলে মুগ্ধ সিদ্ধাঙ্গনা
স্নিগ্ধ নব ঘন হেরি' আছিল উন্মনা
শিলাতলে, সহসা আসিতে মহা ঝড়
চকিত-চকিত হ'য়ে ভয়ে জড়সড়
সম্বরি' বসন, ফিরে গুহাশ্রয় খুঁজি',
বলে, "মাগো, গিরিশৃঙ্গ উড়াইল বুঝি !"
কোথায় অবন্তিপুরী ; নির্ব্বিন্ধ্যা তটিনী ;
কোথা শিপ্রা নদীনীরে হেরে উজ্জয়িনী
স্বমহিমচ্ছায়া ; সেথা নিশি দ্বিপ্রহরে
প্রণয়-চাঞ্চল্য ভুলি' ভবন-শিখরে
সুপ্ত পারাবত ; শুধু বিরহ-বিকারে
রমণী বাহির হয় প্রেম-অভিসারে

সূচিভিন্ন অন্ধকারে রাজপথ-মাঝে
ক্বচিৎ-বিদ্যুতালোকে ; কোথা সে বিরাজে
ব্রহ্মাবর্ত্তে কুরুক্ষেত্র ; কোথা কনখল,
যেথা সেই জহ্নু-কন্যা যৌবন-চঞ্চল,
গৌরীর ভ্রুকুটি-ভঙ্গি করি' অবহেলা
ফেনপরিহাসচ্ছলে, করিতেছে খেলা
ল'য়ে ধূর্জ্জটীর জটা চন্দ্রকরোজ্জ্বল !

এইমত মেঘরূপে ফিরি' দেশে দেশে
হৃদয় ভাসিয়া চলে, উত্তরিতে শেষে
কামনার মোক্ষধাম অলকার মাঝে,
বিরহিণী প্রিয়তমা যেথায় বিরাজে
সৌন্দর্য্যের আদিসৃষ্টি ; সেথা কে পারিত
ল'য়ে যেতে, তুমি ছাড়া, করি' অবারিত
লক্ষ্মীর বিলাসপুরী—অমর ভুবনে !
অনন্ত বসন্তে যেথা নিত্য পুষ্পবনে
নিত্য চন্দ্রালোকে, ইন্দ্রনীল শৈলমূলে
সুবর্ণসরোজফুল্ল সরোবরকূলে
মণিহর্ম্ম্যে অসীম সম্পদে নিমগনা
কাঁদিতেছে একাকিনী বিরহ-বেদনা
মুক্ত বাতায়ন হ'তে যায় তা'রে দেখা
শয্যাপ্রান্তে লীন তনু ক্ষীণ শশি-রেখা
পূর্ব্ব গগনের মূলে যেন অস্তপ্রায়।

কবি, তব মন্ত্রে আজি মুক্ত হ'য়ে যায়
রুদ্ধ এই হৃদয়ের বন্ধনের ব্যথা ;
গড়িয়াছি বিরহের স্বর্গলোক, যেথা
চিরনিশি যাপিতেছে বিরহিণী প্রিয়া
অনন্ত সৌন্দর্য্য-মাঝে একাকী জাগিয়া।

আবার হারায়ে যায় ;—হেরি চারিধার
বৃষ্টি পড়ে অবিশ্রাম, ঘনায়ে আঁধার
আসিছে নির্জ্জন নিশা ; প্রান্তরের শেষে
কেঁদে চলিয়াছে বায়ু অকূল উদ্দেশে।
ভাবিতেছি অর্দ্ধরাত্রি অনিদ্রনয়ান,
কে দিয়েছে হেন শাপ, কেন ব্যবধান ?
কেন ঊর্দ্ধে চেয়ে কাঁদে রুদ্ধ মনোরথ ?
কেন প্রেম আপনার নাহি পায় পথ
সশরীরে কোন্ নর গেছে সেইখানে,
মানস-সরসী তীরে বিরহ-শয়ানে,
রবিহীন মণিদীপ্ত প্রদোষের দেশে
জগতের নদীগিরি সকলের শেষে।

[কবি এই কবিতাটি ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে লিখিয়াছিলেন। উহা তাঁহার "মানসী" নামক পুস্তকে মুদ্রিত হইয়া থাকে। সময়োপযোগী বলিয়া আমরা উহা পুনর্মুদ্রিত করিলাম। —প্রবাসীর সম্পাদক]

একখানি চিঠি

[সম্প্রতি কোনো প্রসিদ্ধ ইংরেজ বৈজ্ঞানিক-সাহিত্যিকের একখানি চিঠিতে আধুনিক সভ্যতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও অন্যান্য রচনাবলীর সম্বন্ধ নিয়ে আলোচনা ছিল। তিনি বল্ছেন, বর্ত্তমানকালে মানুষের "নূতন বৈজ্ঞানিক সভ্যতা" পাশ্চাত্য জগতে শক্তিমদমত্ততা-বশত যে-বিভীষিকার সৃষ্টি করছে, তা'র বিরুদ্ধে কবি তাঁর "ন্যাশনালিজম্" প্রভৃতি বইএ সুতীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে স্বাধীন মহৎভাব এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন, এবং তাঁর কথার সত্যতা ইউরোপকে ক্রমেই মর্ম্মে-মর্ম্মে নিবিড় ক'রে উপলব্ধি করতে হচ্ছে। কিন্তু চিঠিখানিতে একটা অভিযোগ আছে—লেখকের বক্তব্য এই যে, বিশুদ্ধ যুক্তির দিক্ থেকে ভাবুক যিনি তিনি যেমন "আধুনিকতাকে" বিশ্লেষণ ক'রে দেখাবার অধিকারী, তেম্নি "নবাবিষ্কৃত" সাম্যাজের সৌন্দর্য্য-শক্তি বিপুল অদ্ভুত যন্ত্ররচনায়, বড়-বড় জাহাজে, রেলগাড়ীতে, এরোপ্লেনে, যন্ত্রধ্বনিত কারখানাঘর প্রভৃতিতে যে-বিচিত্ররূপ ধ'রে প্রকাশিত হচ্ছে, কবি-হিসাবে তা'র অপরূপ রোমান্সকে তাঁর কাব্যের সামগ্রী ক'রে তোলা চাই। তিনি আরো বল্ছেন, এখন থেকে যথার্থ বড় কবি এইভাবে বিজ্ঞানকে, "আধুনিকতাকে" মেনে নিয়ে তবেই কবিতা লিখ্বেন, এবং তবেই তাঁর রচনা "জীবনধর্ম্মী" হ'য়ে উঠ্বে। কিপ্লিং-এর শক্তি অত্যন্ত কম এবং মন বাঁকা ব'লে তিনি পারেননি, কিন্তু যুদ্ধজাহাজ, সৈন্যাবাস, রেলওয়ে-ষ্টেশন প্রভৃতি আধুনিক জগতের অত্যাবশ্যক নিত্যব্যবহার্য্য উপকরণ-অনুষ্ঠানগুলিকে কবিতায় অন্তর্গত করবার চেষ্টা ক'রে তিনি

যে কালধর্মের পরিচয় দিয়েছেন, তা প্রশংসনীয়। পত্র-লেখকের মতে আধুনিক জগতের সর্ব্বপ্রধান কবি হ'লেও রবীন্দ্রনাথের কাব্যে কোথাও এই চেষ্টা নেই, এটা বিস্ময়কর, এবং এর কারণ তিনি জান্তে চেয়েছেন।

এতে আমাদের মনে প্রথমেই প্রশ্ন জাগে, "আধুনিকতা" বল্‌তে কি বোঝায়, এবং চিরন্তন সত্য ও সৌন্দর্য্যের লীলাক্ষেত্র যে সাহিত্য এবং শিল্পসৃষ্টির জগৎ, তা'র সঙ্গে ঐ বস্তুটির সম্বন্ধ কি-প্রকারের। দ্বিতীয় কথা এই, যে, কাব্যে কতকগুলি যন্ত্রপাতি বা নিত্যব্যবহার্য্য উপকরণের উল্লেখ করলেই তা'কে "জীবনধর্ম্মী" ক'রে তোলা যায় কি না এবং কাব্য-সমালোচনার সময় তা'কে ঐহিক্ থেকে দেখ্‌ব, না যেখানে বিশুদ্ধ সত্যের তপস্যায় অনুপ্রাণিত, তা'র প্রেরণা কাব্যে এসে পৌঁছেছে কি না, তাই নিয়ে ভাব্‌ব। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ "বলাকার" অনেকগুলি কবিতা, "সবুজ" পুস্তকে প্রকাশিত "আমার জগৎ" প্রবন্ধ, কবির নূতন কবিতা "হে ধরণী কেন প্রতিদিন" প্রভৃতি রচনার উল্লেখ করা যেতে পারে।

ইউরোপের সাহিত্যে দেখি প্রাণের সরস সৌন্দর্য্যরূপকে অবিশ্বাস ক'রে ভিতরকার কঙ্কালগুলিকে নগ্নরূপে চোখের সামনে খাড়া করিয়ে "রিয়ালিটির" রহস্য ভেদ করবার চেষ্টা এবং তা'র উপাসনা চল্‌ছে। সেখানকার অনেক কবি-শিল্পীও এই আদর্শ নিয়ে আপন-আপন রচনাকে "জীবনধর্ম্মী", "যুগধর্ম্মী" এবং "আধুনিক বৈজ্ঞানিক সভ্যতার" নব-নব উপকরণের দ্বারা অনুপ্রাণিত ক'রে তোল্‌বার সাধনা করছেন। "বাস্তব" হবার এই চেষ্টার ঢেউ যে সাগরপার থেকে এদেশের সাহিত্যের শিল্পে এবং সঙ্গীতে এসে পৌঁছয়নি তা নয়। কাব্যে "আধুনিকতা" (অবশ্য পাশ্চাত্য-দেশজাত) এবং নবাবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক উপকরণের আমদানি ক'রে কবিত্বশক্তি বাড়াবার চেষ্টা আমাদের দেশেও বিরল নয়। তাই এবিষয়ে আমাদের ভালো ক'রে ভেবে দেখ্‌বার দরকার আছে। এই প্রসঙ্গ উত্থাপন ক'রে রবীন্দ্রনাথকে পত্র লেখায় তিনি দু-চার কথায় যা উত্তর দিয়েছেন, তা ভেবে পড়্‌লে এ-বিষয়ে আমাদের চিন্তার বিশেষ সহায়তা হবে মনে ক'রে তা নিয়ে উদ্ধৃত করা গেল।]

"এখন আমরা যাকে সায়ান্স্ বলি, মানুষের মধ্যে চিরকালই তা আছে। এখন তা'কে জীবনের অন্য অঙ্গ থেকে আমরা পৃথক্ ক'রে বিশেষ নাম দিয়ে বিশেষভাবে তা'র সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে উঠেছি। তার কারণ, বর্ত্তমানকালে প্রাকৃতিক শক্তিকে মানুষ নিজের কাজে খাটাবার জন্যে উ'ঠে প'ড়ে লেগেছে; এতে ক'রে তা'র খুবই সুবিধা হচ্চে। তাই আজকাল এই **সুবিধার**-চর্চ্চাটা মানুষের অন্য সমস্ত প্রয়াসের তুলনায় বড় হ'য়ে উঠ্‌ল। কিন্তু মানুষ যখনি হাতুড়ি দিয়ে পাথর ভেঙেছে, লোহার শলা দিয়ে মাটি খুঁড়েচে, তাঁত বসিয়ে কাপড় বুনেছে, তখনি সে সুবিধা ঘটাবার বুদ্ধিকে জাগিয়েছে। তা'তে সে জয়ী হয়েছে। কিন্তু কখনো সে আপন হাতিয়ারকে নিয়ে গান গায়নি। তলোয়ার নিয়ে গেয়েছে, হাতিয়ার ব'লে নয়, তা'তে বধ করবার সুবিধা হয় ব'লে নয়—তা'র সঙ্গে বীরত্ব-প্রকাশের প্রসঙ্গ আছে ব'লে। এই বীরত্ব-প্রকাশটার একটা চরম মূল্য আছে, কোনো-একটা উদ্দেশ্য সাধনের উপায় ব'লে নয়। এর থেকে বুঝ্‌তে হবে, মানুষের চেষ্টা যেখানে চরমকে, Ultimateকে স্পর্শ করেছে, সেইখানেই তা'র গান জেগেছে। একটা সুন্দর ঘট ব্যবহার-যোগ্যতার মূল্যে মূল্যবান্ নয়, সে অমূল্য ব'লেই মূল্যবান্, সে-সুষমার গৌরবে প্রয়োজনের দরদস্তুরকে পেরিয়ে গেছে। এই জন্যে Grecian Urnএর উপর কবিতা লেখা চলেছে, কিন্তু Grecian হাতুড়ির উপর চলেনি। Efficiency যতই বিস্ময়জনক হোক্, কোনোদিন মানুষের মনে সুর জাগায়নি; implements মানুষকে সম্পদ্‌শালী করেছে, কিন্তু inspire করেনি। যেখানে কোনো উৎকর্ষ, perfection, আপনাতে আপনি পর্য্যাপ্ত, অর্থাৎ যেখানে সে অসীমে পৌঁছিয়েছে, সেখানেই সে মানুষকে কবি করেছে, রূপকার করেছে। প্রেয়সীর হাতের কাছে মানুষ সম্পূর্ণ হার মান্‌তে রাজি, কিন্তু কারিগরের হাতিয়ারের কাছে নয়। আজকালকার দিনে সুবিধার বিশ্বজোড়া হাটে মানুষ বড়-বড় হাতিয়ার সব তৈরি করছে, প্লেটোর আমলে, এস্কিলসের আমলে তা ছিল না; সেই অভাববশত মনুষ্যত্ব কিছুমাত্র খাটো ছিল না। বৈজ্ঞানিক হাতিয়ারের যোগে মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বড় ও সংখ্যায় বহুল হয়েছে, অর্থাৎ মানুষ হয়েচে giant, কিন্তু স্বয়ং মানুষ তা'তে বড় হয়নি। মানুষের personalityর মহত্ত্বর চেয়ে তা'র সাংসারিক সুবিধা-সাধনের সুযোগ বড় নয়। এইজন্যেই কলকারখানা নিয়ে কোনো আধুনিক দান্তে Vita Nuova লিখ্‌ছে না—কারণ ওতে নূতন থাক্‌তে পারে কিন্তু Vita নেই। মানুষ যেদিন প্রথম আগুন জ্বালিয়েছিল, সেদিন স্তবগান করেছিল; আগুনে তা'র রান্নার সুবিধা হয়েছিল ব'লে নয়, আগুনের নিজের মধ্যেই একটা চরম রহস্য আছে ব'লে। মানুষের কুড়ালের মধ্যে কোদালের মধ্যে সেই চরম রহস্য নেই। বিজ্ঞান যেখানে পরমাণুর পরমতত্ত্বের সামনে আমাদের বিস্মিত মনকে দাঁড় করায়, সেখানে চরমকে দেখি—আমি সেই চরমের বন্দনা করেছি। কিন্তু বাষ্পের যোগে যেখানে রেলগাড়ি চলে, সেখানে cleverকে দেখি, perfectকে দেখিনে, সেখানে Vulcanকে দেখি Apolloকে দেখিনে।

সেখানে কারখানা-ঘরে প্রবেশ করি, সৃষ্টির রহস্ত-মন্দিরে নয়। সেখানে কুশ্রীতার লজ্জা নেই, সেখানে অসম্পূর্ণতা নয়। সেখানে মাংসপেশী ফুলে' উঠেছে, কিন্তু লাবণ্য কোথায়? সেখানে স্থূলকে দেখি, অনির্ব্বচনীয়কে দেখিনে ত। তাই বাহবা দিই, কিন্তু সে-বাহবায় ছন্দ আসে না। আজকের কালের বিরাট্ কারখানা-ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে জগৎসুদ্ধ লোক ভয়ে-বিস্ময়ে লোভে সমস্বরে বাহবা দিলে, কিন্তু জানু নত হ'ল না, প্রণাম করলে না, কেননা এ তো মন্দির নয়। পুরাতন দেবমন্দির মানুষ ভেঙে দিচ্চে, কিন্তু নূতন দেবমন্দির এখনো তো গড়া হ'ল না, তাই ব'লেই কি পূজার অর্ঘ্য নিয়ে যেতে হবে তা'র হাটের আড়ৎ-ঘরে?"

[এই বছরের বৈশাখ মাসে "ভারতী"তে রবীন্দ্রনাথের যে পত্রখানি ছাপা হয়েছিল, এইপ্রসঙ্গে আমরা সেটা সকলকে পড়তে অনুরোধ করি।]

অ

মেটারলিঙ্কের প্রভাত-সঙ্গীত

মেটারলিঙ্ক তাঁহার জীবনের প্রথম যুগেই প্লোটিনাস্ রুইসব্রোক্, নোভালিস্, এমার্স ন্, কার্লাইল প্রভৃতির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার নাটক আবার আমাদের নিকট এই কথাটিই প্রমাণ করিয়াছে যে, মিষ্টিকৃগণের (mystic) অনুভব-জগৎ মেটারলিঙ্কের চিত্তকে লুব্ধ এবং আকৃষ্ট করিলেও তিনি সে-জগতে প্রবেশ করিতে পারিতেছিলেন না। মিষ্টিক্ সাধকগণের নিকট যাহা স্বতঃসিদ্ধের মতনই ছিল, ইনি তাহার জন্য শুধু হাৎড়াইতেছিলেন। তাঁহার অন্তরাত্মা অচলায়তনের পঞ্চকের মতন কেবলই যেন কাঁদিয়া গাহিতেছিল—

"আমার বাঁধন দাও গো টুটে'।
আমি হাত বাড়িয়ে আছি, আমায় লও কেড়ে লও লুটে।"

রুইস্ব্রোকের ভূমিকাতেই তিনি 'মিষ্টিক'দের লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন যে, নিশ্চিত সত্যের সন্ধান ইঁহাদের নিকটই শুধু পাওয়া যায়। ইহা হইতেই মিষ্টিকদের প্রতি ইঁহার অগাধ বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। 'মিষ্টিক' শব্দটি বাংলা নহে, অথচ ইহার ঠিক বাংলা প্রতিশব্দও নাই। এখানে 'মিষ্টিক' বলিতে আমরা সাধারণত কি কি বুঝি, অন্তত শ্রীযুক্ত জেম্‌সন্ তাঁহার 'ইউরোপের আধুনিক নাটক'-পুস্তকে মেটারলিঙ্ক্‌কে 'মিষ্টিক' বলিতে আপত্তি করিতে গিয়া 'মিষ্টিক' শব্দটির যে-অর্থ মনে-মনে গ্রহণ করিয়াছেন তাহাই এখানে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিব। ইংরেজি-ভাষায় এই শব্দটি এত বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত যে, তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় দিতে গিয়া কেহ-কেহ বিরাট্ পুস্তক লিখিয়া বসিয়াছেন। মিষ্টিকের সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ হইতেছে একটি গোপন, অতীন্দ্রিয়, বিশ্বব্যাপ্ত চেতন-শক্তির প্রতি হৃদয়ানুভব হইতে উদ্ভূত একান্ত এবং অপরিসীম বিশ্বাস। এ-বিশ্বাস শুধু সেই অস্তিত্বের উপর নহে; সেই অনন্ত শক্তি যে পরম মঙ্গলময়, পরম সুন্দর এবং তাহার সহিত মানবাত্মা যে মূলত অভিন্ন এবং তাহার সহিত একাত্মতা-লাভই যে মানবাত্মার চরম ও পরম সার্থকতা, ইহাও মিষ্টিকের একান্ত অবিচলিত বিশ্বাস। মেটারলিঙ্ক্ অন্তরে এই বিশ্বাসটিকে কিছুতেই যেন পাইতেছিলেন না। অবশেষে যেন তিনি অকস্মাৎ আলোক প্রাপ্ত হইলেন। তাহারই 'ফলে দীনের সম্পদ্' (Treasure of the Humble) পুস্তকখানা লিখিত হইল। ইহাতে মানব-অন্তরের সুন্দর গভীর অনুভব-রাশির বিকাশ ও তজ্জনিত আনন্দময় আশার আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

১৮৯৬ সালে মেটারলিঙ্ক প্রবন্ধাকারে তাঁহার নবজীবন-লব্ধ সত্যটিকে ব্যক্ত করিবার প্রয়াস পান। মাত্র এই বইখানি পড়িলেই মেটারলিঙ্কীয় অনুভূতির সম্যক্ পরিচয়

পাওয়া যাইতে পারে। এই বইখানি পড়িলেই মনে হয় যেন মেটারলিঙ্ক্ স্বীয় জীবনে একটি কোনো পরম মুহূর্ত্তের সাক্ষাৎ পাইয়াছেন। সেই মুহূর্ত্তের অপরিসীম আনন্দের বিপুল উচ্ছ্বাসে যেন তাঁহার অন্তরের সকল সংশয় ঝোড়ো হাওয়ার মুখে মেঘের মত কোথায় উড়িয়া গিয়াছে। তাই এই বইখানির প্রতিছত্রে ব্যক্তি-গত অনুভূতির প্রবলতা পাঠকের মনের অবিশ্বাসকেও অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্য স্তম্ভিত করিয়া রাখিতে পারে। 'মিষ্টিক' ভাবের প্রতি অনুরাগ তাঁহার প্রকৃতিগত ছিল এবং যৌবনের শিক্ষা তাঁহার সেই অনুরাগটিকে আরো প্রবল করিয়া তুলিয়াছিল। এবার আপনার জীবনে উপলব্ধ কতকগুলি অনুভূতি যেন হঠাৎ সেই মিষ্টিক তত্ত্বগুলিকে একেবারে আনন্দ-জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল। এইজন্য যতটুকু তাঁহার অনুভবে স্পষ্ট হইয়া সত্যই ধরা দিয়াছিল, মনে হয়, যেন আনন্দের বেগে, সৌন্দর্য্যের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণের প্রাবল্যে, নবাগত বিশ্বাসের প্রাচুর্য্যে তিনি তা'র চেয়ে আরও বেশী অতি প্রবলভাবে প্রচার করিয়া ফেলিয়াছেন। বোধ করি সেইজন্যই পরবর্ত্তী জীবনে তাঁহাকে তাঁহার সত্যপ্রিয়তার টানে কাল্পনিক সৌন্দর্য্য-লোক হইতে নামিয়া আসিতে হইয়াছে; এইজন্যই পরবর্ত্তী লেখায় তাঁহাকে আমরা এই পুস্তকে প্রচারিত অনেক বিশ্বাস বর্জ্জন করিয়া কতকটা মধ্যপন্থীর বেশে দাঁড়াইতে দেখি।

সে যাহাই হোক, এই বইখানির মধ্য দিয়া এমন একটি প্রবল আশাবাদ মেটারলিঙ্ক প্রচার করিয়াছেন যে, সেইজন্যই এই বইখানির পাঠক-সংখ্যা খুব বেশী; তাঁহার নাটক হইতেও এই বইখানির সমাদর ও প্রচার অনেক বেশী: মেটারলিঙ্ক তাঁহার নাটকে অদৃষ্টের রুষ্ট প্রভাবটিকে কি জানি কেন বহু পরেও অস্বীকার করিতে পারেন নাই। জয়জেল নাটকের পরমানন্দের পশ্চাতেও মার্লিনের নিদারুণ নিয়তির কৃষ্ণ যবনিকা দেখিতে পাই। কিন্তু 'দীনের সম্পদে' আমরা মেটারলিঙ্ক্‌কে অপূর্ব্ব আশাবাদী-রূপে দেখিতে পাই। রহস্য-লোকের সম্মুখে আর তিনি অবসাদ-ভার লইয়া ভীতচিত্তে দাঁড়াইয়া নাই, তিনি বিস্ময়ে-আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া রহস্য-সমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া আছেন, অতল রহস্য-সাগর হইতে ভাবুক ডুবুরী যে-কয়টি অপরূপ মুক্তা তুলিয়াছেন, তাঁহার দিকে শিশুর মতন বিস্মিত আনন্দে তিনি চাহিয়া আছেন এবং বিশ্ববাসীকে ডাকিয়া দেখাইতেছেন।

মেটারলিঙ্কীয় ভাবের বীজ এই পুস্তকে অঙ্কুরিত হইয়া পরে তাহা নানা লেখায় বিশেষভাবে বিকসিত হইয়াছে বলিলে বেশী ভুল হইবে না। এইজন্য এই বইখানির বিস্তৃত আলোচনা করিয়া মেটারলিঙ্কীয় ভাবলোকের ঈষৎ পরিচয় পাইবার চেষ্টা করিব।

'দীনের সম্পদ্ প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব্ব-পর্য্যন্ত মেটার্লিঙ্ক নাটকে যে-জীবনকে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতে মানব-নিয়তির বিভীষিকাকেই মূর্ত্ত করিয়া তোলা হইয়াছে। তাহার মধ্যে আনন্দের কোনোই বস্তু নাই; যদিও প্রেম আসিয়া মাঝে-মাঝে মানবাত্মাকে বলীয়ান্ করিয়া তুলিয়াছে, তবু মৃত্যুর ভীম-ছায়া জীবনকে ঘিরিয়াই আছে। কিন্তু এতকাল পরে আলোক আসিয়া এই অন্ধকারকে অপসারিত করিল। কোনো-কোনো লেখায় যদিও তাঁর পূর্ব্বভাবের প্রকাশ পাই, তবুও এই বইখানির সর্ব্বত্রই সেই ভাবটিকে জয় করিবার চেষ্টাও দেখিতে পাই। একটা নবীন আশা ও নূতন আনন্দের বেগে যেন মৃত্যুর বিভীষিকাটা সরিয়া যাইতেছে, দুঃখ আসিয়া একদিন অন্তরাত্মাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল; অসহায়ের মতন মানবাত্মা সেদিন মৃত্যুর দিকে চলিয়াছিল। কিন্তু এখনও যেন এই দুঃখের বাহিরে দাঁড়াইয়া তিনি দুঃখলোকের অন্তর্নিহিত বাণীটিকে প্রত্যক্ষ করিতেছেন। যদিও তিনি বলিতেছেন যে, অদৃষ্ট মানুষের জন্য সুখ কখনও আনে না সে, দুঃখ লইয়া আসে * যদিও তিনি বলিতেছেন যে, মৃত্যুই একমাত্র পরিণাম †, তবু এই বলার মধ্যে অসহায় আর্ত্তনাদের সুর নাই। কারণ তিনি দুঃখের একটা মহান্ মূল্য নির্দ্দেশ করিতে পারিয়াছেন। আমাদের বেদনার মধ্যেই যে আমাদের সত্যকার পরিচয় সমধিক পরিস্ফুট ইহা বুঝিতে পারিয়া তিনি দুঃখকে তাই আহ্বান করিতেছেন। এটি সম্ভব হইত না, যদি তিনি জীবনে দুঃখের অতীত কোনো মহান্

* Treasure of the Humble

† Treasure of the Humble (Predestined).

সত্যের আভাস না পাইতেন। তিনি আভাস যে পাইতেছেন, তাহা বেশ বোঝা যায়। তিনি বলিতেছেন ;—'প্রত্যেক দুর্ঘটনার মাঝে নিমিষের জন্ম হইলেও আমাদের অন্তরের সহজবোধ বলে, যে অদৃষ্ট আমাদের প্রভু নয়, আমরাই অদৃষ্টের প্রভু। *

প্রথমকার লেখায় কোথাও-কোথাও যেটুকু দ্বিধা দেখা যায়, পরের লেখায় তাহাও অন্তর্হিত হইয়াছে। যদিও কোথাও স্পষ্টাক্ষরে তিনি মৃত্যুকে অস্বীকার করিয়া আত্মার জয় ঘোষণা করেন নাই, তবু তাঁর কথার সুরে এই ভাবটি বেশ জোরালো হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি দার্শনিক যুক্তি প্রয়োগ করিয়া নিজের মতবাদটিকে কোনো নির্দ্দিষ্ট ভিত্তির উপর স্থাপন করার চেষ্টা করেন নাই। জীবন-সম্বন্ধে আমাদের অন্তরের কতকগুলি নিগূঢ় অনুভূতির মধ্যে তিনি মানবাত্মার অসীম সৌন্দর্য্যের সন্ধান পাইয়া তাহারই প্রেরণায় আপনার কথাগুলি বলিয়া গিয়াছেন ; এইজন্য কোথাও বিশ্বাস এবং অনুভূতির প্রবলতা যেমন প্রকাশ পাইয়াছে, কোথাও তেমনি পূর্ব্ব জীবনের বিষণ্ণ ধারণাও আত্মগোপন করিবার চেষ্টা করে নাই। কিন্তু সমগ্রভাবে বিচার করিয়া মেটারলিঙ্কের এই রচনার মধ্যে আমরা এক অত্যাশ্চর্য্য আনন্দকে প্রত্যক্ষ করিতেছি। তিনি মানবাত্মাকে এক অসম্ভব মহিমা ও গৌরবের মধ্যে, পবিত্রতা ও সৌন্দর্য্যের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এইখানেই মেটারলিঙ্কের vision ; এখানেই মেটারলিঙ্ক্ আপনার বিশেষত্ব লইয়া বিশ্ব-সভায় দাঁড়াইয়াছেন। মানব-জীবনে স্বর্গীয় স্বপ্নকে প্রত্যক্ষ করিয়া দেখার মধ্যেই মেটারলিঙ্ক্ সার্থক।

মেটারলিঙ্ক্ যে আসন্ন নবযুগের বাণী প্রচার করিয়াছেন, তাহা আসন্ন নাও হইতে পারে ; কিন্তু তাঁহার এই বাণী প্রচারের মূলে একটি নূতন সত্যের আবিষ্কার রহিয়াছে। তাঁহার বিশ্বাস যে, একটা অধ্যাত্মযুগ আসন্ন হইয়া আসিয়াছে। * এডোয়ার্ড্ কার্পেণ্টার, অরবিন্দ, ডাক্তার বাক্ † এক অভিনব অধ্যাত্মযুগের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। মানুষের সঙ্গে মানুষের অন্তরতম পরিচয়টি নানা আবরণে আচ্ছন্ন হইয়া আছে ; আসন্ন নবযুগের হাওয়া লাগিয়া সেই আবরণগুলি আজ সরিয়া যাইতেছে বলিয়া মেটারলিঙ্কের বিশ্বাস। মানবাত্মা যে পরস্পরের নিকটতর হইয়া আসিতেছে, তাহার অনেকগুলি নিদর্শন রহিয়াছে। শুধু পরস্পরের নিকট নয়, মানুষ আজ আপনার অন্তরাত্মাকেও নিকটতর করিয়া জানিতে পারিতেছে।

মানব-জীবনের যেটুকু অভিব্যক্ত, তাহা হইতে তাহার সত্যকার গভীর জীবনটি যে একেবারে স্বতন্ত্র ইহা মেটারলিঙ্ক্ বার-বার করিয়া বলিয়াছেন। তিনি বলেন, এই যে আমাদের জীবন ইহা আমাদের সত্য জীবন নহে ; আমাদের চিন্তা ও স্বপ্নরাশি হইতে আমরা স্বতন্ত্র। ‡ জীবনের একটা দিক্ আছে, সে-দিক্টা চাঁদের অপরার্দ্ধের মতন বাস্তবজীবনের সূর্য্যালোকে কখনও প্রকাশ পায় না—আর সে-ই আমাদের শ্রেষ্ঠতম, পবিত্রতম এবং মহত্তম দিক। তাহাকে মানুষের কর্ম্মে ও চিন্তায় এবং বাহ্য প্রকাশের মধ্যে কিছুতেই ধরিতে পারা যায় না।

মানুষের সেই দিক্‌টি তা'র গভীরতর জীবন। সেই জীবন ও এই বহির্জীবনের মধ্যে একটি রহস্যময় আবরণ রহিয়াছে ; ইহাকে অপসারিত করা অসম্ভব বলিয়াই বাহিরে তাহার সত্য পরিচয়ের সন্ধান করিতে যাওয়া বৃথা। $ মানবাত্মার অন্তর্লোকে প্রবেশ করিতে হইবে, তাহা হইলেই মানবের সত্য পরিচয়—অর্থাৎ মানবাত্মা যে চিরপবিত্র, চিরসুন্দর ও মঙ্গলময় ইহা বুঝিতে পারা যাইবে।

মেটারলিঙ্ক্ জানেন যে,এ তত্ত্ব লইয়া তর্ক করা চলে না। শুধু অনুভূতির মাঝেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। মানুষকে

* Treasure of the Humble. p. 139. পরবর্ত্তী রচনা Wisdom and Destiny অন্তর্দৃষ্টি ও অদৃষ্ট-পুস্তকে তিনি অদৃষ্ট-জয়ের তত্ত্বটিকে দার্শনিক ভাবায় সুপরিস্ফুট করিয়া দেখাইয়াছেন।

* Treasure of the Humble (Awakening of the Soul).

† Dr. Bucke's Cosmic Consciousness.

‡ Treasure of the Humble (Predestined) p. 55.

$ Treasure of the Humble (Mystic Morality).

যে আমরা বাহির দিয়া বিচার করি না, বরং আমরা যে তাহার অন্তরের দিক্ দিয়াই বিচার করিতে শিখিতেছি, তাহার প্রমাণ কোথায় ? তিনি বলেন, এমন হইয়া থাকে যে, যাহাকে আমরা সাধু না বলিয়া আর-কিছুই যুক্তির দিক্ দিয়া বলিতে পারি না, তাহার নিকট গেলেও আমাদের অন্তর উন্মুক্ত না হইয়া সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতে পারে ; আবার যাহার কর্ম্ম নিতান্ত হীন তাহার নিকট গেলেও আমাদের অন্তর শুদ্ধ শুচিতায় ভরিয়া উঠিতে পারে। এই বিচার-প্রণালী যুক্তি দিতে পারে না, ইহা মানবের অন্তরতম সত্যবোধ হইতে উদ্ভূত। হয়ত চিন্তায় ও কর্ম্মে একজন সাধু, কিন্তু তাহার নিকট তাহার অন্তরতম আত্মার শুদ্ধতা সহজ হয় নাই। মানুষ আপনার অজ্ঞাতে তাহার অন্তর দিয়া মানুষকে দেখিতে পায়। * এশক্তি এ-যুগের সৃষ্টি নহে ; বর্ত্তমান যুগে শুধু মানবজাতি সাধারণ-ভাবে এই শক্তির অধিকার পাইতে চলিয়াছে, ইহাই মেটারলিঙ্কের বক্তব্য।

এই গভীর সত্য-জীবনের পরিচয়কে পাইতে হইলে মানুষকে নীরব হইয়া, উন্মুখ হইয়া থাকিতে হইবে। এই গভীরতর জীবন নিত্যকাল হইতেই রহিয়াছে। যে-কোনো ঘটনায় আমাদের অন্তরতম জীবন আমাদের মধ্যে জাগিয়া উঠিতে পারে। এই জগতের প্রত্যেকটি তুচ্ছতম ঘটনা অতি মহান্, প্রত্যেকটি দিন একটি পরম দিন। † আমাদের অন্তরকে সজাগ রাখিতে পারিলেই শুধু এই গভীরতর জীবনকে পাইতে পারি। নীরবতার মধ্যেই আমাদের গভীরতর জীবনের পরিচয় সম্ভব।

মেটারলিঙ্ক্‌কে বুঝিতে হইলে তাঁহার নীরবতাটিকে ভালো করিয়া বুঝিতে হইবে। মেটারলিঙ্ক্ তাঁহার নাটকে এই নীরবতাকে অতি উচ্চে স্থান দান করিয়াছেন। কারণ তিনি বলেন যে, মানুষের সহিত মানুষের সত্য পরিচয় ও প্রেম একমাত্র নীরবতার মধ্যেই সম্ভব। যতক্ষণ পর্য্যন্ত দুটি ব্যক্তি পরস্পরের নিকট নীরব হইয়া থাকিতে পারে নাই, ততক্ষণ তাহাদের পরিচয়ই হয় নাই। নীরবতার মধ্যেই আমাদের অন্তরাত্মা পরস্পরকে দেখিবার সুযোগ পায় এবং নিজেদের গভীরতর স্বরূপটিকে দেখিতে পায়। কথাবার্ত্তা দিয়া আমরা শুধু একটা আড়াল সৃষ্টি করিয়া পরস্পর হইতে দূরে থাকি ; যখন আমাদের অন্তরতম পরিচয় ঘটে, তখন বাক্য বহু পশ্চাতে পড়িয়া থাকে। সেই রহস্যময় পরিচয়ের সন্ধান আমাদের বুদ্ধির অগোচর। নীরবতার মধ্যে যে-পরিচয় ঘটে তাহা বাহিরের পরিচয়ের সম্পূর্ণ বিপরীত হইতে পারে। এই পরিচয়ের মূল্য নীরবতার গুণগত ভেদের দ্বারাই স্থির হইয়া যায়। নীরবতা দুই ক্ষেত্রে কখনও এক হইতে পারে না। নীরবতার মধ্যে আমরা পরস্পরের জীবনগত গভীরতা বুঝিতে পারি এবং সেই-পরিমাণে আমাদের সম্বন্ধের গভীরতাও স্থির হইয়া যায়। মেটারলিঙ্ক বলেন, এই নীরবতা উচ্চতম্ সত্যের দূত, তাহার নিকটই হৃদয় আমাদের রহস্যময় বার্ত্তা পায়। যাহারা নীরব হইতে পারে নাই, অন্তরের বাক্যাতীত নির্জ্জনতায় যারা প্রবেশ করিতে পারে নাই, তাহাদের নিকট সত্যের নিশ্চয়তা আসিতে পারে না। নীরব পরিচয় অতি মধুরও হইতে পারে, আবার মর্ম্মান্তিক বিচ্ছেদেরও কারণ হইতে পারে। কারণ নীরবতার মধ্যে অন্তর যাহার সহিত যুক্ত হইতে পারে না, তাহার সহিত মিলন একেবারে অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। নীরবতার বিচার অলঙ্ঘ্য, সে আমাদের অদৃষ্ট-বিধান জানাইয়া দেয়।

সুতরাং গভীরতর জীবনের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে এই নীরবতাকে জীবনে আবাহন করিতে হইবে। মৃত্যু, শোক কিম্বা অদৃষ্টের অজ্ঞাত নিয়ম আমাদিগকে কখনো কখনও এই নীরবতার মাঝে টানিয়া লয়। আমরা কথায় প্রকাশ না করিতে পারিলেও মৃত্যুর সম্মুখে আমাদের নীরবতা যে একটা শূন্য নয়, তখন আমাদের জীবনের মধ্যে যে এক অসীম রহস্যের জাগরণ হয়, তাহা

* 'জীবন ও পুষ্প'-পুস্তকে Forgiveness of Injuries (অপরাধের ক্ষমা)নামক ১৯০৭ সালে প্রকাশিত প্রবন্ধে মেটারলিঙ্ক্ তাঁহার এই মতটিকে ব্যক্ত করিতে গিয়া সত্যপরিচয়-বস্তুটা যে তেমন সাধারণ নয় তাহা বলিয়াছেন। প্রথম জীবনের অনুভবে মগ্ন হইয়া তিনি যাহাকে সর্ব্বসাধারণের সম্পদ্ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন তাহা যে বাস্তবিক তাহা নহে, জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে তিনি তাহা বুঝিয়া বলিয়াছেন যে, খুব কম লোকেই সত্য পরিচয়কে গ্রহণ করার শক্তি রাখিতে পারে ; নানা আবরণে এই শক্তি আচ্ছন্ন হইয়া যায়। Cf. Life & Flowers (Forgiveness of Injuries, § 1, pp. 176.)

† Treasure of the Humble (The Deeper Life).

অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু প্রেমের নীরবতাই আমরা কতকটা স্বেচ্ছায় পাইতে পারি, ইহাই মেটারলিঙ্কের মত। যদিও নীরবতা মাত্রই আমাদের জীবনের গোপন গভীর রহস্যকে জাগাইয়া তোলে,তবু প্রেমের নীরবতাকেই তিনি শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন। শোকের আঘাতে জাগরণের চেয়ে প্রেমের গভীর তন্ময়তার মাঝ দিয়া জাগরণই কি শ্রেয় নয়?

অন্তরের গভীর গম্ভীর নীরবতাকে প্রকৃত জীবনে এত বড় স্থান দিয়াছেন বলিয়াই নাটকীয় রীতি সম্বন্ধে মেটারলিঙ্ক্ এক অভিনব সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। প্রেমকেই যখন মেটারলিঙ্ক্ গভীরতর জীবনে উপনীত হইবার শ্রেষ্ঠ উপায় স্থির করিয়াছেন, তখন এখানে তাঁহার প্রেম সম্বন্ধে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আমরা তাঁহার পূর্ব্বলিখিত নাটকে এই কথাটির আভাস পাইয়াছি যে, মৃত্যুর সম্মুখেও যদি জগতের কোনো শক্তি অবিচলিত হইয়া দাঁড়াইতে পারে, তবে সে-শক্তি একমাত্র প্রেমেরই আছে। 'দীনের সম্পদে' মেটারলিঙ্ক যেন প্রেমও আরো স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাইতেছেন। আমাদের অন্তর এবং বিশ্বসৃষ্টির পশ্চাতে যে রহস্যময় শক্তি রহিয়াছে, তাহাকে রহস্যময় বলিয়া স্বীকার করিলেও এখন তিনি তাহার অজ্ঞেয়তাকে ভীষণ বলিয়া স্বীকার করিতেছেন না। ঈশ্বর বলিতে তিনি যাহা-কিছু পরমসুন্দর, মহীয়ান্ ও পরম-মঙ্গল তাহাকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মানব-জীবনের গভীরতর সত্তা যে এই পরমরহস্যময়, পরম সৌন্দর্য্যময় তাহাও তিনি বহুস্থলেই স্বীকার করিয়াছেন। প্রেম ভালোবাসাকে এইজন্য মেটারলিঙ্ক সেই অনন্ত রহস্য শক্তির সহিত 'পরম ঐক্যের স্মৃতি (a recollection of of great primitive unity) * বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কোথায় "যেন" এই মানবাত্মা পরস্পরের সহিত একান্তই এক, যেন সকলেই একই শক্তির সন্তান, এই বোধটি প্রেম আমাদের মধ্যে জাগাইয়া দেয়।

প্রতিমানবের মধ্যে আমাদের একটি নিত্যকালের পরিচয় নিহিত রহিয়াছে; শুধু এই পরিচয়টিকে আমাদের আবিষ্কার করিতে হইবে। মেটারলিঙ্ক বলেন, চির-পরিচয়ের রহস্যলোকে প্রতিমানবের অন্তরাত্মা নিয়তই

* Treasure of the Humble (Invisible Goodness)

যাতায়াত করিয়া থাকে বলিয়াই মনে হয়। এমন একটি জগৎ আমাদের জ্ঞানের অতীত হইয়া আছে, যেখানে আমরা পরস্পরকে জানিয়া বসিয়া আছি। * মেটার্-লিঙ্কের মতে পুরুষ এই রহস্যলোক হইতে একান্ত বিচ্ছিন্ন হইয়া আছে, কিন্তু নারীই শুধু এখনো এই চিরমিলন-লোকের অধিকার হারাইয়া বসে নাই। ইঙ্গিতমাত্রেই সে এই বহির্লোকের সহস্র তুচ্ছতাকে অতিক্রম করিয়া একনিমিষে সেই অন্তর্লোকে উপনীত হইতে পারে ও অন্তরতম আহ্বানে সাড়া দিতে পারে। শিশুও যে অনায়াসে মানবাত্মার অন্তরতম রূপটিকে দেখিতে পায়, তাহার স্বচ্ছ দৃষ্টির সম্মুখে যে অদৃষ্টলোকের ক্রিয়া গোপন থাকিতে পারে না, ইহা মেটারলিঙ্ক যে এই পুস্তকেই প্রথম প্রচার করিয়াছেন † তাহা নয়, পীলিয়াস ও মেলিসান্ডা নাটকেও (অঙ্ক ৫, দৃশ্য ১) এই তত্ত্বের প্রয়োগ আমরা দেখিতে পাই। পরবর্ত্তী নাটকেও এই বিশ্বাসটিকে তিনি প্রচার করিয়াছেন।

মেটারলিঙ্ক মানব-অন্তরের পরম সৌন্দর্য্য ও পবিত্রতাকে অপূর্ব্ব শক্তিময় বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। যাহার অন্তর আপনার মধ্যে এই গভীরতার জীবনকে জাগ্রত করিয়া পাইয়াছে সে তাহার সম্বন্ধে সচেতন নাও হইতে পারে, এমন-কি না হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ চেতনা আমাদের জীবনের বাহিরের স্তরের কথা, কিন্তু যাহার মধ্যে এই গভীরতার জীবন ক্রিয়াশীল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার চারি পাশের মানুষও এই জীবনের প্রভাব অনুভব করিয়া সুন্দর হইয়া উঠিবে। সচেতন সৌন্দর্য্য ও মঙ্গলের উপর মেটারলিঙ্কের শ্রদ্ধা নাই। তাঁহার মতে চেতনার মধ্যে যে সৌন্দর্য্য ও কল্যাণ-বোধ আত্মপ্রকাশ করে, তাহা প্রাণহীন। কিন্তু অন্তরের গভীরতর সত্তার সহিত একীভূত যে সৌন্দর্য্য ও কল্যাণ তাহা অদৃষ্টের কঠোরতাকেও কোমল করিয়া তুলিবার শক্তি রাখে। ‡

'দীনের সম্পদে' মেটারলিঙ্ক্ মানব জীবন যে পরম

* Treasure of the Humble (On Women)

† Treasure of the Humble (Awakening of the Soul), p 39

‡ Treasure of the Humble (Invisible Goodness), p. 161.

গৌরবময় ও পরম সুন্দর বলিয়া সানন্দে প্রচার করিতে দ্বিধা করেন নাই। এইজন্য তিনি মানব-জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনা এবং কর্ম্মকে পরম মহান্ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। প্রত্যেক মানবের অন্তরতম স্বরূপটি যে মঙ্গল ও সৌন্দর্য্যেরই প্রতিরূপ তাহা বলিতে গিয়া তাঁহার কোথাও সংশয় দেখিতে পাই না। কিন্তু তাহা হইলে মানুষের বিচার করি আমরা কি দিয়া? সবই যদি ব্রহ্মময়, শুদ্ধ, বুদ্ধ, তাহা হইলে এই জগতের ভালো-মন্দের সহস্র বিচার, এ কি একটা পাগলের নীতি-শাস্ত্র? ইহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, যদিও প্রতিমানবের অন্তরতম সত্য একই, তথাপি এই সত্যকে প্রতিমানব আপনার মধ্যে সত্য করিয়া প্রাপ্ত হয় নাই। আমরা 'ভগবান্' হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গভীরতর জীবনের ভিত্তি হইতে বহুদূরে ছায়ার রাজ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। কখনো কখনো জীবনের গভীর মুহূর্ত্তে আমরা সেই পরম ভিত্তির উপর গিয়া দাঁড়াই সত্য, কিন্তু সেখানে আমাদের সত্য প্রতিষ্ঠা হয় নাই বলিয়া আমাদের এই পরিচয়টি নির্ব্বাসিতের পরিচয়। সেই পরম সত্য রূপ হইতে আমাদের দূরত্ব বা নৈকট্য দিয়াই সেইজন্য আমাদের ইহজগতের বিচার। এইজন্যই প্রতি-মানবাত্মাকে পরমসুন্দর বলিয়া স্বীকার করিলেও এই জীবনের পথে আত্মায় আত্মায় অমিলের সম্ভাবনাও মেটারলিঙ্ক্ জ্ঞাপন করিয়াছেন। এইজন্যই এই দূরত্বটুকু আছে বলিয়াই এই নির্ব্বাসিত মানব পরস্পরকে পায় না। পরিপূর্ণ সত্যের মধ্যেই পরিপূর্ণ মিলন সম্ভব, পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যেই আত্মার পরিপূর্ণ পরিচয়। কেবল কয়েকটি গভীর মুহূর্ত্তে সেই রহস্য-সুন্দরের সাক্ষাৎ পাইলেই জীবন সার্থক হইতে পারে না। সৌন্দর্য্য এবং নিষ্ঠার মধ্যে আমাদের জীবনকে এমন করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে যাহাতে উহা আমাদের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে একেবারে মিশিয়া যায়। পরম প্রতীক্ষা ও ধ্যানই জীবনকে এই রহস্য-লোকের সহিত অন্তরাত্মার যোগ আবিষ্কার করিবার শক্তি দেয়।

আমরা দেখিলাম যে, মেটারলিঙ্ক মানব-জীবনের দৈনন্দিন ঘটনাকে অপরিসীম রহস্যের পরমাশ্চর্য্য আলোকে দেখিয়াছেন ও দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। মানব-জীবনকে তিনি এক অপূর্ব্ব গৌরব দান করিয়াছেন। 'দীনের সম্পদ্' পুস্তকখানি, এককথায় বলিতে গেলে, নৈরাশ্য, ভীতি ও বিষাদ হইতে মুক্ত জীবনের একটি অপূর্ব্ব আনন্দোচ্ছ্বসিত প্রভাত-সঙ্গীত।

ঝরা পাতা

শ্রী কালিদাস নাগ

ঢেকে দিয়ে নিদাঘের রুক্ষ দৈন্যরাশি
নেমে এল অশান্ত আষাঢ়; গেল ভাসি'
যত ধূলা মলা তৃষা; উন্মত্ত উৎসবে
আহ্বানিল বিশ্বজনে সুগম্ভীর রবে
নিমেষের পরিচয়ে! নব কিশলয়,
আশা আলো প্রাণে মাতি' দেয় পরিচয়,
বলে ব্যগ্রভাবে "ওগো এস এস এস,
অজস্র-বর্ষণে তুমি মোরে ভালোবেসো
অসীম সোহাগে; আমি সে প্রেমের টানে,
ধীরে-ধীরে প্রকাশিব শব্দহীন গানে
আমার যতেক শোভা স্নিগ্ধ সফলতা
অন্তর সঞ্চিত—"

অন্য দিকে ঝরা পাতা,
রূপহীন আশাহীন ভাষাহীন চোখে
শুধু চেয়ে থাকে! যবে বর্ষা লোকে-লোকে
আনে সমারোহ, ঝরা পাতা তা'র মাঝে
সঙ্কোচে মূর্চ্ছিতপ্রায়, মৃত্যুপীত লাজে
যেন চায় মাটি সাথে মাটি হইবারে;
যেন বলে মর্ম্মভেদী মূক অশ্রুধারে

পড়ি' এক কোণে "ওগো বরষা-সুন্দরী
তরুর আশ্রয়-বাহু আজ পরিহরি'
মোর কিছু না আছে দিবার ; রূপ নাই
আশা নাই প্রাণ নাই—তবু তবু চাই—
এস মোর শুষ্কবুকে ল'য়ে সরসতা
যাহা কোনো দিন হ'য়ে মোর সফলতা
পারিবে না শুধিবারে তোমার সে ঋণ
কোনো ক্রমে ; সেই ঋণ হ'য়ে অন্তহীন
যদি থাকে, বিশুষ্কতা নাহি যদি ছুটে,
তবু রস হ'য়ে এসো, যদি বৃথা লুটে
তোমার প্রাণের ধারা মৃত্যুপরে মোর,
তবু এসো—"
হায়, 'তবু'র রহস্য ঘোর
কে দেছে ঘনায়ে মর্ত্ত্যলোকে ! তাই এই
ধরণীর রন্ধ্রে-রন্ধ্রে প্রতি মুহূর্ত্তেই
বাজে 'তবু তবু' অন্তহীন ! আমি তব
যোগ্য নই, তবু ভালোবাসি ; চির নব
তব রূপ এ কুরূপে করে দিশাহারা,
নাহি পাই, তবু চাই পাগলের পারা
তোমার পরশ-সুধা। তুমি ত গো দাতা,
আমি দরিদ্র ভিখারী, সদা হাত পাতা
তোমার দুয়ারে, তবু বলি গর্ব্বভরে,
ভিখারীর দাতারূপ হেরি', মোর পরে
চাবে কাঙালের মতো ; অপরাধ মম
পুঞ্জীভূত হ'য়ে ওঠে পর্ব্বতের সম
নিশিদিন, তবু বলি বিশ্বাসের ভরে,
ক্ষমা প্রেম সব ঢেকে দেবে।
চির তরে
মিশে গেছে এ ধরায় ধূলাতে ধূলাতে
'তবু'র স্বপন সুধা ! পারেনি কুলাতে
তাই শুধু তৃপ্তি, শুধু সুখ, অনুগ্রহ,
কৃপার সম্ভার ; এই ধরণীর দেহ
খালি আছে, অতৃপ্তি বেদনা অলঙ্কারে
মণ্ডিত হইতে ! হায় তাইত ঝঙ্কারে
জীবন-বীণার মন্দ্র সপ্তকের বুকে
ভাষাহীন শব্দহীন আলাপের মুখে
অতৃপ্তির নিবিড় মূর্চ্ছনা ত'ার মাঝে,
অযোগ্যের ভালোবাসা থেকে-থেকে বাজে,
কুরূপের রূপস্পৃহা, ভিক্ষুকের সাধ
হ'তে দাতা, নৈতিকের লক্ষ প্রতিবাদ
তুচ্ছ করি', কলঙ্কীর পূত প্রেম-শিখা
পাপীর মুক্তির আশা, হ'য়ে যায় লিখা
জীবন-সুরের ঠাটে ! তাইত চমকে
অন্তহীন 'তবু—তবু—তবু'র গমকে
ধরণীর বিচিত্র রাগিণী ! সেই সুর,
সহসা উঠিল বাজি' ভীষণ-মধুর,
শব্দহারা রাগিণীর স্তম্ভিত নিঃস্বনে,
আজি আষাঢ়ের এই প্রথম বর্ষণে
প্রথম সন্ধ্যায়, ঐ ঝরা পাতাটির
'তবু—তবু' সুরে।
মৃত্যুভরা এ মাটির
মর্ম্ম-মাঝে এ অদম্য দুঃসাহস রাশি
কেন আছে নাহি জানি ! শুধু ওঠে ভাসি'
দেখি ঐ ঝরা পাতাটির দীর্ঘশ্বাসে
মর্ত্ত্যের অন্তরতম ব্যথা ; তাই আসে
নেমে বুঝি আকাশের রুদ্ধ অশ্রুধারা
বরষার রূপে ; তাই উন্মাদিনী-পারা,
প্রিয়হারা প্রেয়সীর দুর্দ্দম আবেগে
কেঁদে ওঠে জলদ-গর্জ্জনে, উঠে জেগে
বিনিদ্র বেদনা, দীর্ঘশ্বাসে ঝড়ে-ঝড়ে
ত্রিভুবন কাঁপাইয়া হুঙ্কারিয়া পড়ে
জীর্ণ পাতাটির বুকে ; অশ্রুর চুম্বনে
তা'র মৃত মুখটিতে ফুটায় উন্মনে
অনুপম মৃত্যুর মাধুরী ! অবশেষে,
অশ্রুস্রোতে ভাসাইয়া, উন্মত্ত আবেশে
প্রাণ ভরি' আলিঙ্গিয়া ঝরা পাতাটির
সমাধি রচিয়া দেয় নিস্তব্ধ গম্ভীর
ধরণীর বুকে ! তাই মাটির সন্তান,
মাটির বুকেতে লভে চরম নির্ব্বাণ॥

খণ্ডগিরি
১৯১৭

নষ্টচন্দ্র

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

একদিন বিকাল-বেলা রাজকুমার-বাবু জমিদারীর কাগজ-পত্র নিয়ে ধনিষ্ঠাকে জরুরী বিষয়ে সংবাদ দিয়ে তার আদেশ নিতে এসেছেন। ধনিষ্ঠা লেখা-পড়া জানে না। গভর্ণমেন্টের তরফ্ থেকে যখন জমিদারী কোর্ট-অব্-ওয়ার্ডসের অধীনে নিয়ে যাবার চেষ্টা হচ্ছিল, সেই সময় রাজকুমার-বাবু ধনিষ্ঠাকে কোনো-মতে নাম দস্তখত কর্‌তে শিখিয়েছিলেন; ধনিষ্ঠা আল্‌পনা দেওয়ার মতন নাম দস্তখত করা অভ্যাস করেছিল এবং তার দ্বারা গভর্ণমেন্টের কাছে প্রমাণ করেছিল যে, সে লেখা-পড়া জানে। ধনিষ্ঠা বাস্তবিক লেখাপড়া না জান্‌লেও তার স্বাভাবিক বুদ্ধি ছিল প্রখর। সে জমিদারীর অত্যন্ত কূট-কচালে ব্যাপারও সহজে বুঝে' তার একটা সন্তোষজনক মীমাংসা কর্‌তে পার্‌ত। প্রত্যেক বিষয়ের খুঁটিনাটি নিজে শুনে' এবং বিজ্ঞ রাজকুমার-বাবুর অভিমত ও পরামর্শ জিজ্ঞাসা করে'-করে' তার বুদ্ধি ক্রমশই অধিকতর শাণিত হ'য়ে উঠ্‌ছিল। এইজন্য রাজকুমার-বাবুকে প্রত্যহ ধনিষ্ঠার নিকটে এসে জমিদারীর সমস্ত অবস্থার ও কার্য্যের বিবরণ শোনাতে হ'ত এবং তার অনুমোদিত কর্ম্মের কাগজপত্রে তার সম্মতিসূচক দস্তখত করিয়ে নিতে হ'ত। সেদিনের কাজ শেষ করে' রাজকুমার-বাবু যখন যাবার জন্য উঠে' দাঁড়ালেন তখন ধনিষ্ঠা হঠাৎ বলে' উঠ্‌ল—আপনি ত আমার শ্বশুর-মশায়ের আমল থেকে কাজ কর্‌ছেন। আমি কদিন থেকেই ভাব্‌ছি আপনাকে বল্‌ব............

ধনিষ্ঠা যে কি বল্‌তে চাচ্ছে তা ঠিক আন্দাজ কর্‌তে না পেরে রাজকুমার-বাবু তার মুখের দিকে উৎসুক-দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

ধনিষ্ঠা বল্‌তে লাগ্‌ল—আপনি এই এষ্টেট্ থেকে আপনার বেতনের অর্দ্ধেক যাবজ্জীবন পেন্‌সন্ পাবেন।

রাজকুমার-বাবুর মুখ প্রফুল্ল হ'য়ে উঠ্‌ল।

ধনিষ্ঠা বল্‌তে লাগ্‌ল—আপনার যেদিন ইচ্ছা হবে সেই দিন থেকে কর্ম্মে অবসর নিয়ে বিশ্রাম কর্‌বেন।

রাজকুমার-বাবু প্রফুল্লমুখে বল্‌লেন—আমি অনেক দিন থেকেই বিদায় চাইব ভাব্‌ছিলাম, কিন্তু বাবাজীর হঠাৎ কাল হ'ল, আর তোমার হাতে এত বড় জমিদারী এসে পড়্‌ল, তাই আমি এই অসময়ে বিদায় নেবার কথা উত্থাপন কর্‌তে পারিনি। আমি কাশীতে গঙ্গার ধারে ছোট্ট একখানা বাড়ী কিনেছি। আমি তোমার কাছ থেকে ছুটি পেলে বাবা বিশ্বেশ্বরের শ্রীচরণে মাথা রেখে মর্‌তে পারি। অর্থলোভ যা ছিল তাও ত তুমি অর্দ্ধেক মোচন করে' দিলে; তাই এখন ছুটি পাবার জন্যে আগ্রহ দ্বিগুণ হ'য়ে উঠ্‌ছে।

ধনিষ্ঠা জিজ্ঞাসা কর্‌লে—আপনার অবর্ত্তমানে আপনার কাজ কর্‌তে পারেন এরকম দক্ষ কর্ম্মচারী আমাদের কেউ আছেন কি?

—আমাদের জমানবিশ গঙ্গাধর-বাবুও কর্ত্তার আমলের পাকা লোক............

—তিনি কি ইংরেজি জানেন, আইন জানেন?

—না। কিন্তু তিনি করিত-কর্ম্মা লোক......

—কিন্তু আজকালকার কালে ইংরেজি না জান্‌লে কি ম্যানেজারের কাজ ভালো করে' করা চল্‌তে পারে?

—হ্যাঁ, সে-কথা ঠিক বটে; তবে অনল-বাবু আছেন, তাঁকে অ্যাসিস্‌ট্যান্ট্ ম্যানেজার করে' দিলে.........

—আচ্ছা, এখন তবে ঐ ব্যবস্থাই করে' দেবেন। গঙ্গাধর-বাবুর বয়স কত হবে?

—ষাট-পঁয়ষট্টি হবে।

ধনিষ্ঠা আর কোনো কথা বল্‌লে না। রাজকুমার-বাবু প্রস্থান কর্‌লেন।

আষাঢ় মাসে জমিদারীর পুণ্যাহ উৎসব সমাপ্ত করে'

রাজকুমার-বাবু বিদায় গ্রহণ করলেন। এখন গঙ্গাধর-বাবু ম্যানেজার, আর তাঁর সহকারী অনল।

কার্ত্তিক মাস। একটু-একটু শীত পড়েছে। কার্ত্তিকের হিম লেগে বৃদ্ধ গঙ্গাধর-বাবুর সর্দ্দি-কাশি হয়েছে, হাঁপানি চেগেছে। তিনি কাজে আস্তে পারেননি। ধনিষ্ঠাকে দিয়ে কাগজ-পত্র সই করাতে হবে। অনল কাছারী-বাড়ী থেকে জমিদারের বৈঠকখানা বাড়ীর আপিস-ঘরে গিয়ে অন্দরে কর্ত্রীর কাছে এত্তেলা পাঠিয়ে দিলে।

ধনিষ্ঠার খাস আপিসের খান্‌সামা নিত্যকার অভ্যাস-অনুসারে ধনিষ্ঠাকে গিয়ে খবর দিলে—ম্যানেজার-বাবু এসেছেন।

ধনিষ্ঠা এই নির্দ্দিষ্ট সময়ে এই সংবাদটি পাবার জন্যে অপেক্ষা কর্‌ছিল। সে খবর পেয়েই উঠে' বাইরের ঘরে এল। ঘরের চৌকাঠের এপারে পদক্ষেপ করে'ই সে থমকে দাঁড়াল,—সে দেখ্‌বে মনে করে' এসেছিল, বেঁটে মোটা টেকো কালো গঙ্গাধর-বাবু এক-বোঝা কাগজ-বই নিয়ে এসে হাঁপানিতে হাঁপাচ্ছেন, কিন্তু সে দেখ্‌লে গঙ্গাধরের বদলে মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে দীর্ঘোন্নত-দেহ প্রদীপ্ত-অনলশিখার মতন প্রভাস্বর অনল। অনলকে দেখ্‌বা মাত্র ধনিষ্ঠার কর্ণমূল পর্য্যন্ত অকস্মাৎ আরক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। সে ক্ষণকাল ইতস্তত করে' নিজেকে সম্বৃত করে' নিয়ে ঘরের মাঝখানে এগিয়ে গেল।

ধনিষ্ঠা নিকটে আস্‌তেই অনল দুই হাত জুড়ে' কপালে ঠেকিয়ে মাথা নত করে' নমস্কার করলে।

ম্যানেজারের কাছ থেকে এরূপ অভিবাদন লাভ করা ধনিষ্ঠার পক্ষে এই নূতন; রাজকুমার-বাবু ও গঙ্গাধর-বাবু সেকেলে লোক, ধনিষ্ঠার শ্বশুরের আমলের কর্ম্মচারী, নিজেদের কন্যার চেয়েও বয়ঃকনিষ্ঠা ধনিষ্ঠাকে তাঁরা বউ-মা বলে' সম্বোধন করেন, কর্ত্রী বলে' অভিবাদনের কথা তাঁদের মনে কখনো উদয়ও হয়নি। অনলের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত অভিবাদন লাভ করে' ধনিষ্ঠা লজ্জিত ও বিব্রত হ'য়ে মৃদু-স্বরে বল্‌লে—আপনি ব্রাহ্মণ, আপনি আমাকে নমস্কার করলে আমার পাপ হবে, আপনি আমাকে নমস্কার করবেন না।

এই বলে' ধনিষ্ঠা গলায় কাপড় দিয়ে দূর থেকে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে অনলকে প্রণাম করলে।

অনল অপ্রস্তুত হ'য়ে অন্য বিষয় দ্বারা এই ব্যাপারকে চাপা দিবার জন্য সাম্‌নের টেবিল থেকে কতকগুলা কাগজ হাতে তুলে' নিলে।

অনলের হাতে কাগজ দেখে' ধনিষ্ঠা জিজ্ঞাসা করলে—গঙ্গাধর-বাবু এলেন না কেন?

—গঙ্গাধর-বাবুর অসুখ হয়েছে।

ধনিষ্ঠা মাথা নীচু করে' মৃদুস্বরে বল্‌লে তিনি ভালো হ'য়ে এলে তাঁকেই কাগজপত্র নিয়ে আস্‌তে বল্‌বেন। ধনিষ্ঠার এই কথায় অনল অপমান বোধ করে' রাগে বিরক্তিতে ও লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠ্‌ল। সে আত্মসংবরণ করে' বল্‌লে,—গঙ্গাধর-বাবু কতদিনে ভালো হবেন, তার ঠিক নেই; অথচ এমন কাজ আছে যা তাঁর জন্যে মুল্‌তবি করে' রাখ্‌লে এষ্টেটের ক্ষতি হবে। চরপাড়ার নূতন চরটা এখনি বিলি না করলে এর পর আর একবছরই বিলি হবে না—চর জমি চাষ কর্‌বার সময় এসে পড়েছে। কাজি-নগরের…

ধনিষ্ঠা মাথা নীচু করে' হাতের নখ খুঁটতে-খুঁটতে মৃদুস্বরে বল্‌লে যা করতে হয় আপনিই করে' দেবেন। আমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌বার কিছু দর্‌কার নেই।

ধনিষ্ঠার এই কথায় অনলের মনের ক্ষোভ দূর হ'য়ে গেল। সে বল্‌লে—কিন্তু হুকুম-নামায় আপনার সই……

ধনিষ্ঠা মাথা আরো ঝুঁকিয়ে মুখ আরো লাল করে' বল্‌লে—আমি লিখ্‌তে জানি না।

ধনিষ্ঠা এতদিন বৃদ্ধদের কাছে অকুণ্ঠিতভাবে নিজের নাম তেড়া-বাঁকা অক্ষরে দস্তখত করে' এসেছে; কিন্তু আজ অনলের সাম্‌নে তার সেই অপটুতার কুশ্রীতা প্রকাশ করতে অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ হচ্ছিল; তাই সে বল্‌লে—আমি লিখ্‌তে জানি না।

অনল আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লে—কিন্তু সমস্ত হুকুমনামাতেই ত আপনার সই থাকে।

ধনিষ্ঠা বল্‌লে—টিপ-সই ঢেঁড়া-সই যেমন, আমার ঐ সইও তেম্‌নি; রাজকুমার-বাবু একটা কাগজে আমার নাম লিখে' দিয়েছিলেন, আমি তাই দেখে'-দেখে' ঠিক সেই-

রকম লিখ্‌তে চেষ্টা করে'-করে' নাম লেখাটা অভ্যাস করেছি, আমি জানি না যে তা'তে কি-কি অক্ষর আছে।

অনলের মুখে বিস্ময় ও সম্ভ্রম ফুটে' উঠ্‌ল, সে বল্‌লে—যাঁর এমন অসাধারণ অধ্যবসায় ও বুদ্ধি তিনি ইচ্ছা কর্‌লে ত ছয় মাসের মধ্যে লেখা-পড়া শিখে' ফেল্‌তে পারেন।

ধনিষ্ঠা অনলের দিকে মুখ তুলে' দৃঢ়স্বরে বল্‌লে—আমি লেখা-পড়া শিখ্‌ব।

অনল বল্‌লে—একজন শিক্ষয়িত্রীর জন্যে খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে দিলেই হবে।

—একজন ভালো শিক্ষক কত হ'লে পাওয়া যেতে পারে?

শতখানেক টাকায় পাওয়া যেতে পারে।

ধনিষ্ঠা ইতস্তত কর্‌তে-কর্‌তে বল্‌লে—আপনি একটু সময় করে' পড়াতে পারেন না?

অনল মনে কর্‌লে, মাসে একশ টাকার খরচ বাঁচাবার জন্যে ধনিষ্ঠার এই প্রস্তাব। অনল কৌতুক অনুভব করে' মনের মধ্যে হাসি চেপে বল্‌লে, সকাল-বিকাল ত আমার কোনো কাজ নেই। আপনি যখন হুকুম কর্‌বেন তখনই আমি এসে পড়াতে পারি।

—আপনি তা হ'লে দুবেলাই আস্‌বেন।

—আপনার যবে থেকে ইচ্ছা হবে আমাকে খবর দেবেন।

—আমি আজ থেকেই আরম্ভ করব। আপনি রোজ আপিসের ছুটির পর আমাকে পড়িয়ে তার পর বাড়ী যাবেন। সকাল বেলা আমার স্নান আহ্নিক করে' পড়্‌তে বস্‌তে নটা বাজ্‌বে। আপনিও স্নান-আহ্নিক সেরে আস্‌বেন, নইলে এখান থেকে ফিরে' গিয়ে স্নান-আহ্নিক করে' খেয়ে আপিসে আস্‌তে আপনার দেরী হ'য়ে যেতে পারে।

ধনিষ্ঠার কথা শুনে' অনলের মন আবার হাসিতে ভরে' উঠ্‌ল, সে মনে-মনে বল্‌লে—কী সেয়ানা! কায়েত-কন্যা কিনা! কাছারীর কাজও পুরা-মাত্রায় করিয়ে নেওয়া চাই, আবার কাউ-স্বরূপ রোজ দুটি বেলা পড়া বলে' দিয়ে যেতেও হবে!

অনল প্রকাশ্যে বল্‌লে—আপনি যে-রকম আদেশ কর্‌বেন, আমি ঠিক সেই-রকম কর্‌ব।

ধনিষ্ঠা অনলের কাছে অকপটে নিজের অজ্ঞতা স্বীকার করে' এবং মূর্খতা দূর করবার উপায় স্থির করে' মনের লজ্জার ভার অনেকটা লঘু বোধ কর্‌তে লাগ্‌ল। তার পর সে অনলের সাম্‌নে বসে' কাগজ-পত্রে সই কর্‌তে প্রবৃত্ত হ'ল, কিন্তু প্রত্যেকবার সই কর্‌বার আগে তার মুখ লাল হ'য়ে উঠ্‌ছিল।

কাছারীর ছুটির পর অনল আবার জমিদার-বাড়ীতে এসে অন্দরে খবর পাঠালে। সঙ্গে-সঙ্গে মাধী দাসী এসে অনলকে বাড়ীর ভিতর নিয়ে গেল। অনল ভিতরে গিয়ে দেখ্‌লে, খোলা দালানের একপাশে একখানা পুরু কার্পেট পাতা আছে এবং তার উপরে আছে একখানা নূতন স্লেট্, একখানা নূতন বর্ণপরিচয় ও একটা গোটা স্লেট্ পেন্‌সিল, দালানের আর-একদিকে একখানা পুরু গালিচার আসন পাতা আছে, আর তার সাম্‌নে সাদা পাথরের বড় থালায় সাজানো আছে প্রচুর-পরিমাণে বিবিধ-প্রকার ফল ও মেওয়া এবং মিষ্টান্ন। দালানের একধারে নর্দ্দমার কাছে রাখা আছে একটা রূপার গাড়ু আর তার মুখের উপর একখানা ধোয়া নূতন তোয়ালে।

অনল সেখানে এসেই অবাক্ হ'য়ে সেইসমস্ত আয়োজন দেখ্‌ছে দেখে' ধনিষ্ঠা মৃদুস্বরে বল্‌লে—এই আপিস থেকে এলেন, আগে একটু জল খেয়ে নিন। হাত-মুখ ধোবেন কি? এই পাশেই ওটা জলের ঘর।

অনল হেসে বল্‌লে—আমাদের শাস্ত্রকারেরা বলেছেন, যে ভোজনের আয়োজন দেখ্‌লে ব্রাহ্মণেরা নৃত্য করে, আমি সেই ব্রাহ্মণকুলের অমর্য্যাদা কেমন করে' করি? কাজেই হাত-মুখও একটু ধুতে হবে।

ধনিষ্ঠা ব্যস্ত হ'য়ে বল্‌লে—মাধী মাধী, গাড়-গামছা জলের ঘরে দিয়ে আয়।

তার পর অনলকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কাপড় ছাড়্‌বেন কি?

অনল হেসে বল্‌লে—কল্‌কাতায় মেসে থেকে লেখা-পড়া শিখ্‌তে হয়েছে, অত শুচিতা রাখ্‌তে পারিনি।

অনল হাত-পা ধুয়ে এসে আসনের কাছে জুতো

খুলে' রেখে খেতে বস্‌ল। অনল ভিজা-পায়ে জুতো পরেছিল, পুরাতন জুতোর আল্‌গা সুখতলা পায়ের সঙ্গে লেগে বাইরে বেরিয়ে পড়্‌ল। ধনিষ্ঠার সাম্‌নে এই অশোভন ব্যাপার ঘটাতে অনল একটু অপ্রতিভ হ'য়ে পড়্‌ল।

পর দিন প্রভাতে নটার সময় অনল আবার পড়াতে এল। যে-দালানে বসে' পড়াচ্ছিল সেই-দালানের দেওয়ালে একটা মার্ব্বেল-পাথরের ব্র্যাকেটের উপর বসানো একটা মার্ব্বেল পাথরের ঘড়ি থেকে বিচিত্র স্বর-লহরীতে যেই দশটা বাজ্‌ল, অম্‌নি মাধী দাসী এসে দালানে খাবারের ঠাঁই করে' দিলে এবং চেঁচিয়ে ডাক্‌লে— ঠাকুর-মশায়, ম্যানেজার-বাবুর ভাত নিয়ে এস।

অনল ব্যস্ত হ'য়ে বল্‌লে—আবার ভাত খাবার লেঠা করেছেন কেন?

ধনিষ্ঠা ঈষৎ লজ্জিতভাবে মৃদুস্বরে বল্‌লে—আপনি ত নিজে রেঁধে খান; এখান থেকে বাসায় যাবেন, রাঁধ্‌বেন, খাবেন, তার পর আবার এত দূর আস্‌বেন…

অনল হেসে বল্‌লে—আমি কুকারে রান্না চড়িয়ে এসেছি……

ধনিষ্ঠা বল্‌লে—তা হোক্‌, কাল থেকে আর রান্না চড়িয়ে আস্‌বেন না।

ভূরি-ভোজন করে' অনল আপিসে গেল।

সেই দিন বিকাল-বেলা অনল পা ধোবার জন্যে জলের ঘরে গিয়ে দেখ্‌লে একজোড়া নূতন খড়ম কিনে' এনে রাখা হয়েছে, ভিজে-পায়ের সঙ্গে আল্‌গা সুখতলা বেরিয়ে এসে তাকে আর যাতে লজ্জা না দেয়। তার পরেই লুচি তরকারি মিষ্টান্ন আকণ্ঠ আহার।

এইরূপে ধনিষ্ঠার বাড়ীতে অনলের দুবেলার আহারের ব্যবস্থা কায়েমি হ'য়ে গেল।

অনলের যে-পরিমাণে সুবিধা হ'তে লাগ্‌ল ধনিষ্ঠার সেই-পরিমাণে শ্রম ও ক্লেশ বেড়ে চল্‌ল; সে নিজ-হাতে নানা-রকম খাদ্য-সামগ্রী প্রস্তুত করে' এবং বহু ব্রতের কঠোর ত্যাগ নিজে স্বীকার করে' অনলের অভাব মোচন করে।

মাস-কাবারে ধনিষ্ঠা সাটিনের একটা সুন্দর ছোট থলিতে করে' একশ টাকা এনে অনলের হাতে দিলে। থলিটি ধনিষ্ঠার নিজের হাতের তৈরী।

হাতে টাকা পেয়ে অনল আশ্চর্য্য হ'য়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, এ কিসের টাকা?

ধনিষ্ঠা ঈষৎ হেসে বল্‌লে—ও আমার গুরু-দক্ষিণা।

অনল যে ভেবেছিল যে এ কাজ তার ফাউ, তার জন্য এখন সে মনে-মনে অত্যন্ত লজ্জা অনুভব কর্‌তে লাগ্‌ল।

কিছুদিন থেকে ধনিষ্ঠা লক্ষ্য কর্‌ছে, গম্ভীর অনল আরো গম্ভীর হ'য়ে উঠেছে, তার মুখের উপর বিষাদের কালিমা দিন-দিন ঘনীভূত হ'য়ে উঠ্‌ছে। ধনিষ্ঠা জানে, অনলের এক ভাই ছাড়া বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে আপনার বল্‌তে আর কেউ নেই, সেই ভাইও সাত সমুদ্র তের নদীর পারে। মানুষের মন বিষণ্ণ হয় প্রিয়জনের বিচ্ছেদে ও অশুভ-আশঙ্কায়, অর্থকষ্টে বা বৈষয়িক চিন্তায় কিম্বা নিজের স্বাস্থ্যহানিতে। এক ভাইয়ের সঙ্গে বিচ্ছেদ ছাড়া অন্য কোনো উৎপাতই ত অনলের নেই; এবং সেই ভ্রাতৃবিচ্ছেদও ত পুরাতন ব্যাপার। সুতরাং অনলের বিষণ্ণ গাম্ভীর্য্যের কারণ জান্‌বার জন্যে ধনিষ্ঠা অত্যন্ত ব্যগ্র ও উৎকণ্ঠিতা হ'য়ে উঠেছে।

শ্রাবণ মাস। বৃহস্পতিবার। বিকাল-বেলা। অবিরল-ধারে বৃষ্টি হচ্ছে। আজ হাট-বার। কাছারী বন্ধ। ধনিষ্ঠার কোনো কাজ নেই। সে বৈঠকখানার বাইরের ঘরের একটা জান্‌লার খড়খড়ির পাখী তুলে' রাস্তার দিকে তাকিয়ে বসেছিল। কত লোক কত জিনিস নিয়ে হাটে যাচ্ছে, হাট থেকে ফিরে' আস্‌ছে। ধনিষ্ঠা উদাস-মনে সেই-সব লোকের জলে ভিজে-ভিজে যাওয়া-আসা দেখ্‌ছে।

হঠাৎ মাধবী দাসী সেইখানে এসে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—মাগো মা, ছোট ম্যানেজার-বাবুর বাড়ীতে সব জিনিষ-পত্তর নিলাম হচ্ছে, সব হাটের লোক একেবারে ভেঙে পড়েছে।

ধনিষ্ঠা চকিত হ'য়ে বিস্মিত জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে মাধীর মুখের দিকে তাকিয়ে কেবল-মাত্র বল্‌লে—অ্যাঁ?

ধনিষ্ঠা মাধীর সব কথা শুনতে পায়নি, যা শুনতে পেয়েছে তারও যেন অর্থ ভালো করে' উপলব্ধি করতে পারেনি।

মাধী তার সংবাদ আবার বললে।

ধনিষ্ঠা মনের উদ্বেগ চেপে রেখে শান্ত-স্বরে জিজ্ঞাসা করলে—কেন নিলাম হচ্ছে জানিস্?

—তা ত জানি না, ভিড়ে কি ভিতরে যাবার জো আছে।

—সন্ধ্যাবেলা একবার পারিস ত ম্যানেজার-বাবুর বাসায় যাস্, দেখে' আসিস্ কি-কি জিনিষ বিক্রী হয়েছে। আর পারিস ত শ্রেনেও আসিস্, এমন কি ঠেকায় প'ড়ে' তাঁকে বাড়ীর জিনিষ বিক্রী করতে হ'ল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে। ধনিষ্ঠা পূজার ঘরে বসে' নিবিষ্ট-মনে সন্ধ্যা-আহ্নিক করছে।

মাধী-দাসী দরজার কাছে এসে ধনিষ্ঠাকে তখনও পূজারতা দেখে' আস্তে-আস্তে ফিরে' যাচ্ছিল।

ধনিষ্ঠা কৌতূহল দমন করতে না পেরে জপ ভুলে' জিজ্ঞাসা করলে—মাধী, কি রে?

মাধী কণ্ঠস্বরে বিস্ময় ও বেদনা ঢেলে দিয়ে বলে' উঠ্‌ল—ওগো মাগো, ম্যানেজার-বাবুর বাড়ীতে একটা জিনিষও নেই! গিয়ে দেখি পাতা পেড়ে ভাত বাড়্‌ছেন, একটা বাটি নেই যে ডাল নেন, ভাতের মাঝখানে গর্ত্ত করে' তাতেই ডাল ঢেলে নিলেন। খাট-পালঙ্ক্ বিছানা-বালিশ বাক্স-প্যাঁটরা জামা-কাপড় একটা কিছু নেই গা!

ধনিষ্ঠা মালা জপে মনোনিবেশ করলে, তার দুই চক্ষু মুদ্রিত। এই দেখে' মাধী বিস্ময় প্রকাশ বন্ধ করে' সেখান থেকে চলে' গেল।

পূজার ঘর থেকে ধনিষ্ঠার বাহির হ'তে সেদিন অনেক বেশী রাত হ'য়ে গেল।

ধনিষ্ঠা মেঝেতে আঁচল পেতে শুল।

তা দেখে' মাধী ব্যস্ত হ'য়ে বলে' উঠ্‌ল—ও কি মা! ওখানে শুচ্ছ যে?

ধনিষ্ঠা গম্ভীরভাবে বললে—বড় গরম। বিছানায় শুতে পারব না।

মাধী ব্যস্ত হ'য়ে বললে—মাথায় একটা বালিশ দিই।

ধনিষ্ঠা বললে—না থাক, দরকার হ'লে বিছানায় উঠে' শোবো।

ধনিষ্ঠা ভূমি-শয্যাতেই রাত কাটিয়ে প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করে' স্নানের ঘরে যেতে-যেতে মাধীকে বলে' গেল—তুলসীকে একবার ভট্‌চাযি্য-মশায়ের বাড়ীতে পাঠিয়ে দে, তাঁকে শিগ্‌গীর ডেকে নিয়ে আস্‌বে, এই মাসে শিগ্‌গীর কি ব্রত নেওয়া যেতে পারে, তা যেন পাঁজি-পুঁথি দেখে' ঠিক করে' আসেন।

ধনিষ্ঠা স্নান করে' এসে পূজার ঘরে গিয়েই দেখ্‌লে পুরোহিত-ঠাকুর এসে বসে' রয়েছেন। ধনিষ্ঠা গলায় কাপড় দিয়ে প্রণাম করে' উঠে দাঁড়াতেই পুরোহিত জিজ্ঞাসা করলে—আবার নূতন ব্রত নিতে হবে মা? এত কষ্ট করলে যে শরীর একেবারে ভেঙে পড়বে!

ধনিষ্ঠা মাথা নীচু করে' বললে—তা পড়ুক গে, এ-শরীর নিয়ে আর কি হবে?

পুরোহিত দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে' বললে—এই শ্রাবণ মাসের শুক্লা দ্বিতীয়াতে অশূন্য-শয়ন ব্রত তুমি নিতে পারো। অশূন্যে শয়ন করে' এই ব্রত উদ্‌যাপন করতে হয় এবং সদ্‌ব্রাহ্মণকে খাট বিছানা কাপড় ছাতা পাদুকা ভোজ্য ইত্যাদি দান করলে ব্রতচারিণীর শয্যা কখনো শূন্য হয় না, সে কখনো বিধবা হয় না। এই ব্রত সধবা-বিধবা উভয়েই করতে পারে।

পুরোহিতের কথা শুনতে-শুনতে ধনিষ্ঠা একবার লাল হয়ে উঠ্‌ল, তার পর দৃঢ়স্বরে বললে—এই ব্রতই আমি করব, আপনি ফর্দ্দ করে' আজকেই আমাকে পাঠিয়ে দেবেন।

আজ ধনিষ্ঠার পূজা করতে অনেক দেরী হ'য়ে গেল। সে পূজার ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই দেখ্‌লে, অনল এসে তার জন্যে অপেক্ষা করছে।

ধনিষ্ঠা নীরবে এসে পড়্‌তে বসল। কিছুক্ষণ পড়্‌তে-পড়্‌তে হঠাৎ মুখ তুলে' জিজ্ঞাসা করলে—কাল আপনার বাড়ীতে নিলাম হচ্ছিল?

অনলের মুখ লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠ্‌ল, সে ঢোক গিলে' কুণ্ঠিত-স্বরে বললে—হ্যাঁ।

—কি-কি নিলাম হল?

—আপনার নিরন্তর ব্রতের দক্ষিণা যা-কিছু দান পেয়েছিলাম সমস্তই।

—কত টাকা হ'ল?

—সাতশ ছাপ্পান্ন টাকা।

ধনিষ্ঠা ক্ষণকাল চুপ করে' থেকে সঙ্কুচিতভাবে ধীরে প্রশ্ন কর্‌লে—হঠাৎ এত টাকার কি দরকার হ'ল, তা জান্‌তে পারি কি?

অনলের মুখ একবার লাল হ'য়ে উঠে'ই পরক্ষণেই ম্লান বিষণ্ণ হ'য়ে উঠ্‌ল, সে বল্‌লে—অনিল—অনিল—চিঠি লিখেছে—সে বিলেতে একটি মেমকে বিয়ে করেছে, তাদের একটি মেয়ে হয়েছে, সেইজন্যে তার কিছু টাকা শিগ্‌গীর চাই।

ধনিষ্ঠা শুধু বল্‌লে—"ও!" পরক্ষণেই সে একখানা খাতা খুলে' অনলের সাম্‌নে ধরে' বল্‌লে—দেখুন ত এই অঙ্কগুলো ঠিক হয়েছে?

ধনিষ্ঠার লেখা-পড়া নিত্য-নিয়মিত চল্‌তে লাগ্‌ল। কেবল বৃহস্পতিবার ছুটির দিন ছাড়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও বিকালে অনলের আহার ধনিষ্ঠার বাড়ীতেই এমন প্রচুর হয় যে তাকে বাড়ীতে আর আহারের কোনো আয়োজনই কর্‌তে হয় না; বৃহস্পতিবারের আহারও ধনিষ্ঠার বিবিধ ব্রতের দক্ষিণা-স্বরূপে প্রাপ্ত ভোজ্য থেকেই সম্পন্ন হ'য়ে যায়। সে যে দুই শত টাকা বেতন পায়, তার এক পয়সাও তাকে নিজের জন্য খরচ কর্‌তে হয় না, সে সমস্ত টাকাটাই অনিলকে পাঠিয়ে দেয়, ছেলে-মানুষ বিদেশে স্ত্রী কন্যা নিয়ে অর্থাভাবে যেন কষ্ট না পায়,—একে বিলাতে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের খরচই বেশী, তাতে আবার সে-দেশের মেয়েদের অভাবও বিবিধ। অনিলের মেয়ে হয়েছে, তার যেন কিছুতেই একটুও কষ্ট না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা ত অনলেরই কর্ত্তব্য—সে যে অনিলের মেয়ের জ্যাঠা-মশায়।

*

* *

অনিলের কাছে মাসে-মাসে ধনিষ্ঠার এষ্টেট্ থেকে দুই শত টাকা এবং অনলের কাছ থেকে দুই শত টাকা নিয়মিত গিয়ে থাকে। অনিলের দেশে ফের্‌বার নামও নেই। আজকাল তার সংবাদও বেশী পাওয়া যায় না, কেবল বরাদ্দ টাকার চেয়ে বেশী টাকা দরকার হ'লে সে দাদাকে চিঠি লেখে। এবং অনল আবার জিনিষ-পত্র বেচে টাকা পাঠায়। অনল ঠিক স্পষ্ট না ভাব্‌লেও তার মগ্নচৈতন্যের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল হ'য়ে গিয়েছিল যে ধনিষ্ঠার ধর্ম্মনিষ্ঠা যে-রকম দিন-দিন উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছিল তাতে দক্ষিণা ও দান পেয়ে তার অভাব ও রিক্ততা পূর্ণ হতে বেশী দেরী লাগ্‌বে না।

এষ্টেটের ম্যানেজার গঙ্গাধর-বাবুর মৃত্যু হয়েছে। এখন অনল এষ্টেটের প্রধান ম্যানেজার। আগেকার ম্যানেজারেরা দুই শত টাকা করে' বেতন পেতেন। অনল ইংরেজি জানা লোক বলে' তার বেতন হয়েছে তিন শত টাকা।

পূর্ব্বেকার দারিদ্র্য-ভূষণ সাদাসিধা অনল বিলাসিতার প্রচুর উপকরণ অনায়াসে লাভ করে'-করে' এবং প্রভুত্বের উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে ক্রমশঃ এখন রীতিমতো বিলাস-পরায়ণ বাবুতে পরিণত হয়েছে; সে এষ্টেট্ থেকে ও ধনিষ্ঠার কাছ থেকে অজস্র যে অর্থ ও দ্রব্যসামগ্রী পাচ্ছে তা যে কারো বিশেষ অনুগ্রহের দান তা সে স্পষ্ট করে' বুঝ্‌তে পার্‌ত না, কারো যে তার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ ও পক্ষপাত কর্‌বার কিছুমাত্র কারণ ঘটেছে, তাও সে বুঝ্‌তে পারেনি; কাজেই সে তার সমস্ত লভ্যকে নিজের ব্রাহ্মণত্বের এবং যোগ্যতার যথাযোগ্য উপার্জ্জন বলে'ই মনে করে। বিশেষতঃ সে যে অনিলকে যথেষ্ট সাহায্য কর্‌তে পার্‌ছে, এই সন্তোষেই সে এমন তন্ময় হ'য়ে ছিল যে সেই সাহায্য কি উপায়ে উপার্জ্জিত হচ্ছে, সেদিকে তার খেয়ালই ছিল না। এষ্টেট্ থেকেও যে অনিলকে এতদিন ধরে' বিলাত-প্রবাসের খরচ জোগানো হচ্ছে তাতেও তার মনে কোনো কুণ্ঠা স্থান পাচ্ছিল না, কারণ অনিলের এখানকার বিফলতার জন্যে সে মনে-মনে এই এষ্টেটের পরলোকগত মালিককেই দায়ী ও দোষী সাব্যস্ত করে' রেখেছিল। অনিলের প্রত্যাবর্ত্তনে অসঙ্গত-রকম বিলম্ব মাঝে-মাঝে অনলকে সন্দিগ্ধ ও কুণ্ঠিত করে' তোল্‌বার জোগাড় করে, কিন্তু অনিল মাঝে-মাঝে দাদাকে বিলম্বের নানান্-রকম কৈফিয়ৎ ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আভাস দিয়ে শান্ত করে'

রাখে। অনিল সংবাদ দিয়েছে, সে-দেশের সকল সক্ষম লোক এখন যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকাতে তার নানাবিধ কারখানায় হাতে-কলমে কাজ শিখ্‌বার বিলক্ষণ সুযোগ উপস্থিত হয়েছে, সে এক সঙ্গে ইন্‌জিনিয়ারিং রঙ্‌ আর কাঁচের কার্‌খানায় কাজ শিখ্‌ছে, সে কৃতবিদ্য হ'য়ে যুদ্ধান্তে দেশে ফিরে' এলে কর্ম্মাভাবে তাকে এক দিনও বসে' থাকতে হবে না, ঐ তিনরকমের কার্‌খানার মালিকেরা তাকে লুফে' নেবার জন্যে কাড়াকাড়ি করবে এবং তাতে করে' তার বাজার-দর বিলক্ষণ চড়ে' যাবে।

ছয় বৎসর কেটে গেল। অনেক দিন অনিলের কোনো খবর পাওয়া যায়নি। হঠাৎ অনল অচেনা হাতের লেখা একখানা চিঠি পেলে, চিঠিখানা বিলাত থেকে আস্‌ছে। চিঠির খামে কালো-আঁজি-কাটা শোকচিহ্ন। অনল চিঠি খুলে'ই স্বাক্ষর দেখ্‌লে—চিঠি লিখ্‌ছে—

Yours very affectionately,
(Mrs.) Norah Ghoshal.

অনল হঠাৎ বুঝ্‌তে পারলে না, সুদূর বিলাতে তার স্নেহপাত্রী কে আছে। পরক্ষণেই তার ঘোষাল উপাধি দেখে'ই মনে হ'ল এই নোরা ঘোষাল নিশ্চয়ই তার ভ্রাতৃবধূ; অনল তার ভ্রাতৃবধূর নাম জানত না, অনিল তাকে জানায়নি, তারও জান্‌বার আগ্রহ হয়নি। চিঠির উপরে ভ্রাতৃ সম্বোধন দেখে' অনলের মনের ধারণা বদ্ধমূল হ'ল এবং চিঠির প্রথম পঙ্‌ক্তি পড়ে'ই সেই ধারণা সুদৃঢ় হ'য়ে গেল এবং সঙ্গে-সঙ্গে অশুভ-আশঙ্কায় তার বুক কেঁপে উঠ্‌ল—পত্র-লেখিকা প্রারম্ভেই নিজের পরিচয় দিয়ে লিখেছে—"আমি তোমার ভাই ও'নীলের স্ত্রী। তোমার ভাইয়ের মৃত্যু হয়েছে। আমি ও'নীলের কন্যাকে নিয়ে নিরাশ্রয় ও বিপন্ন হ'য়ে পড়েছি। তোমার ভাই অত্যন্ত বেয়াড়া মাতাল ছিল, সে কোনো কাজ করত না, কেবল পড়ে'-পড়ে' মদ খেত। তার মদের দেনায় পাওনাদারেরা আমার আদরের কন্যা প্রিসিলার গায়ের জামা পর্য্যন্ত বেচে নিয়েছে, তবু ধার শোধ হয়নি। তুমি শীঘ্র কিছু টাকা না পাঠিয়ে দিলে আমাকে প্রিসিলার হাত ধরে' কার্‌খানায় মজুরি করতে যেতে হবে। তুমি আমাদের পাথেয় পাঠিয়ে দিলে আমি তোমার কাছে গিয়ে তোমার ভাইয়ের মেয়েকে তোমার হাতে সঁপে' দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে মরতে পারি—আমারও মৃত্যুর বেশী বিলম্ব নেই, ও'নীলের অত্যাচারে, অনাহারে অনাচ্ছাদনে ও দুশ্চিন্তায় আমার যক্ষ্মা হয়েছে। আমি হঠাৎ মরে' গেলে তোমার ভাইয়ের কন্যা একেবারে অনাথ হবে, পথে দাঁড়াবে। তুমি দয়া করে' কেবল তার জন্যে আমাদের সে-দেশে যাবার পাথেয় পাঠিয়ে দিতে অবহেলা করবে না আশা করি।"

অনল ভ্রাতৃশোকে অভিভূত হ'য়ে পড়্‌ল। তার ইচ্ছা করছিল, ছুটে' গিয়ে অনিলের পিতৃহীন কন্যাকে বুকে তুলে' নেয়। এই দারুণ শীতে সেই কচি মেয়ের গায়ে হয়ত যথেষ্ট গরম কাপড় নেই, হয় ত সে মায়ের বিষাক্ত-ব্যাধির ছোঁয়াচে কোরকেই বিনষ্ট হ'য়ে যাবে।

অনল সেই দিনই কাঁদতে-কাঁদতে কল্‌কাতায় গিয়ে নোরা ঘোষালের নামে হাজার টাকা কেব্‌ল্‌ মনি-অর্ডার করে' এল। এই টাকা সংগ্রহ করবার জন্যে এবার তাকে আর জিনিষ-পত্র বিক্রী করতে হ'ল না, এখন সে পদস্থ-লোক, তেজারতি-ব্যবসাদার মহাজনের কাছে হাজার টাকা ঋণের কথা উত্থাপন করবা-মাত্রই ঐ টাকা সে কেবল মাত্র হ্যাণ্ড্‌-নোট্‌ লিখে' দিয়েই সংগ্রহ করতে পেরেছে।

এর মাসখানেক পরে অনল নোরার আর একখানা চিঠি পেলে, তাতে সে খবর দিয়েছে যে সে তার কন্যাকে নিয়ে ভারতবর্ষে রওনা হয়েছে, বরাবর জাহাজে এসে কল্‌কাতায় নাম্‌বে।

গোলকোণ্ডা জাহাজ কল্‌কাতায় পৌছবার নির্দ্দিষ্ট দিন ও ঘাট খবরের-কাগজে দেখে' অনল কল্‌কাতায় গিয়ে ঘাটের জেটিতে দাঁড়িয়ে জাহাজের আগমন প্রতীক্ষা করছে। সে তার ভ্রাতৃবধূ ও ভ্রাতুষ্পুত্রীকে অভ্যর্থনা করে' নিজের বাড়ীতে নিয়ে যেতে এসেছে। অপেক্ষা করতে-করতে অনলের এই দুর্ভাবনা প্রবল হ'য়ে উঠ্‌ছিল যে তার অদেখা পরম-আত্মীয়া-দুটিকে আগন্তুক যাত্রীদের ভিড়ের ভিতর থেকে সে চিনে' বার করবে কি করে'।

অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর দূরে ষ্টীমার দেখা গেল। প্রতীক্ষমাণ লোকদের ধৈর্য্যশক্তির কঠোর পরীক্ষা নিতে-নিতে অতি ধীরে-ধীরে অগ্রসর হ'য়ে এসে ষ্টীমার জেটির পাশে ভিড়্‌ল। ষ্টীমারের রেলিং ধরে' কত নর-নারী

বালক-বালিকা দাঁড়িয়ে আছে। কোনো যুবতী রমণীর কাছে ছোট একটি মেয়েকে দাঁড়িয়ে থাকৃতে দেখ্‌লেই অনলের মনের মধ্যে ব্যাকুল প্রশ্ন উঠ্‌ছিল—এই কি? এই?

ষ্টীমার যদি-বা লাগ্‌ল ত লোক আর নামে না। অনেক ক্ষণ পরে লোক যদি-বা নামৃতে আরম্ভ করূলে ত সে একেবারে জনস্রোত। অনল নির্গমনের পথের যথাসম্ভব কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে উৎসুক-নেত্রে জনপ্রবাহের মধ্যে থেকে দুটি ক্ষুদ্র বুদ্‌বুদের মতন দুটি নগণ্য প্রাণীকে খুঁজে' বার করূবার চেষ্টা করূছিল। অনল দেখ্‌লে সিঁড়ি দিয়ে নামৃছে একটি ছোট মেয়ের হাত ধরে' একটি স্ত্রীলোক। তার দেহ অত্যন্ত দীর্ঘ এবং একগাছা যষ্টির মতন কৃশ; তার বয়স ছত্রিশ কি ছিয়াত্তর ঠাহর করা দুষ্কর; রমণীর রমণীয়ত্ব তার কোনো অঙ্গে নেই, একটা কাঠিতে যেন কাপড় জড়িয়ে পুতুল-নাচ করানো হচ্ছে; কিন্তু তার সঙ্গের মেয়েটি পুষ্প-কোরকের মতন সুন্দর ও কমনীয়, তার মুখে অনিলের মুখের আদল সুস্পষ্ট হয়ে অনলের চোখে পড়্‌ল। কিন্তু যে-ব্যক্তির সঙ্গে সেই মেয়েটি ষ্টীমারের সিঁড়ি দিয়ে নামৃছিল সেই না-পুরুষ না-মেয়ে অদ্ভুত জীবটি যে অনিলের স্ত্রী হ'তে পারে না, এ-সম্বন্ধে একেবারে স্থিরনিশ্চয় হয়ে অনল মনে করূলে, অনিলের স্ত্রী-কন্যাকে খুঁজে' বার করূবার অতি আগ্রহেই ঐ মেয়েটির মুখে সে অনিলের আদল কল্পনায় আরোপ করেছে। অনল তাদের দিক্ থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে সন্ধান করূতে যাবে, হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়্‌ল সেই জ্যামিতিক-সরলরেখাকৃতি সঞ্চরমাণা মানুষ-কাঠিটার হাতের একটা ব্যাগের উপর। তাতে একটা লেবেলের গায়ে লেখা আছে—মিসেস্ ঘোষাল!

অনলের বুক আতঙ্কে শিউরে উঠ্‌ল! তার মনে হ'ল এই বিভীষিকা মূর্ত্তি নিরন্তর চোখের সাম্‌নে থাকাতেই অনিলের মাতাল হওয়া ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর ছিল না, এবং এই দুর্দ্দর্শন কদাকৃতির আতঙ্কেই অনিলের অকালে মৃত্যু হ'য়ে সে বেঁচেছে। অনলের একেবারে বাক্‌রোধ হ'য়ে গেল, সে অভ্যাগতকে অভ্যর্থনা করূতে ভুলে' একদৃষ্টে তার দিকে মোহগ্রস্তের মতন তাকিয়ে রইল।

অনলকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকৃতে দেখে' সেই অদ্ভুতাকৃতি লোকটি অনলকে জিজ্ঞাসা করূলে—আপনি কি মিষ্টার ঘোষাল?

স্বপ্নে কথা বল্‌বার চেষ্টা করার মতন্ অনলের মুখ দিয়ে একটা অব্যক্ত অস্ফুট শব্দ নির্গত হ'ল।

সেই ব্যক্তি তখন বল্‌লে—আমি আপনাকে জানাতে দুঃখিত হচ্ছি যে আপনার ভ্রাতৃবধূ মিসেস্ ঘোষাল ষ্টীমারে মারা গেছেন.........

এই শোক-সংবাদে অনল যেরূপ আরাম অনুভব করূলে সে-রকম আরাম অনেক আনন্দ-সংবাদে লোকে অনুভব করে না। সে স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে জিজ্ঞাসা করূলে—এই কি মিস্ ঘোষাল? এই মাতৃহীন বালিকাকে যিনি দয়া করে' আমার কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন তাঁকে কি বলে' আমার কৃতজ্ঞতা জানাবো, তার ভাষা খুঁজে' পাচ্ছি না।

সেই স্ত্রীলোকটি বল্‌লে...আমি কল্‌কাতার জেনানা মিশনে কাজ করি; প্রভু যিশু খৃষ্টের আমরা সেবিকা, আর্ত্ত-সেবা আমাদের ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য।

অনল মিশনারির বক্তৃতা শুন্‌ছিল না, সে অনিলের মেয়েকে কোলে করূবার জন্যে নত হ'য়ে তার দিকে হাত বাড়িয়ে স্নেহভরা হাসিমুখে মিষ্টস্বরে তার সঙ্গে পরিচয় করূবার চেষ্টা করূছিল।

মেয়েটি এই অদৃষ্ট-পূর্ব্ব-পরিচ্ছদ-পরিহিত অপরিচিত ব্যক্তির আহ্বানে ভয় পেয়ে তার সঙ্গিনী ও পথের আশ্রয়-দাত্রীর গাউন চেপে ধরে' তার পায়ের কাছে ঘেঁষে নিজেকে লুকোবার চেষ্টা করূছিল।

প্রিসিলাকে সঙ্কুচিত হ'তে দেখে সেই স্ত্রীলোকটি তাকে বল্‌লে...প্রিসি ডার্‌লিং, উনি তোমার জ্যাঠা হন, তোমার মা তোমাকে ওঁর কাছেই নিয়ে আস্‌ছিলেন; লক্ষ্মী মেয়ে তুমি ওঁর সঙ্গে যাও।

প্রিসিলা কাঁদো-কাঁদো করুণ সুরে বল্‌লে...ও মিস্ ডয়েল, আমি ওঁর সঙ্গে যাবো না, তোমার সঙ্গে যাবো...

প্রিসিলার কাছে অপরিচিত বিদেশী আত্মীয় অপেক্ষা পরিচিত ও স্বজাতীয়া কিন্তূতকিমাকার লোকটাকেও প্রিয়তর আশ্রয় বলে' মনে হচ্ছিল।

অনল অনিচ্ছুক ও রোরুদ্যমানা প্রিসিলাকে মিস্ ডয়েলের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে চল্‌ল; প্রিসিলার চোখের জল দেখে তার চোখেও অশ্রুর বন্যা বইছিল। কিন্তু সে অতি শীঘ্রই নানাবিধ সুদৃশ্য ও মনোহর খাদ্য খেল্‌না ও পোষাক কিনে' দিয়ে এবং প্রাণঢালা আদর করে' প্রিসিলাকে বশ করে' ফেল্‌লে।

বাড়ী যেতে-যেতে অনল প্রিসিলাকে বল্‌লে—আজ থেকে তোমাকে আমরা মহাশ্বেতা বলে' ডাকব।

প্রিসিলা বড় শান্ত মেয়ে, সে চুপ করে' রইল, এবং মনে-মনে এই দুরুচ্চার্য্য নামটা মুখস্থ কর্‌বার চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌ল।

অনল বাসুন্দিয়ায় পৌঁছেই মহাশ্বেতাকে ধনিষ্ঠার কাছে দেখাতে নিয়ে গেল।

সুন্দর মেয়েটিকে দেখে'ই ধনিষ্ঠা কোলে তুলে' নিয়ে গাল টিপে' আদর করে' জিজ্ঞাসা কর্‌লে—তোমার নাম কি খুকী?

মহাশ্বেতা কিছুই বুঝ্‌তে না পেরে একবার ধনিষ্ঠার মুখের দিকে ও একবার অনলের মুখের দিকে তাকাতে লাগ্‌ল।

অনল ঈষৎ হেসে বল্‌লে—ও বাংলা বুঝ্‌তে পারে না। ওর ইংরেজী নাম বিশ্রী ছিল, তাই বদ্‌লে আমি ওর নাম রেখেছি মহাশ্বেতা।

ধনিষ্ঠা একটু হেসে বল্‌লে—এই বা কোন্ সুশ্রী নাম রেখেছেন? অত বড় নাম ধরে' কেমন করে' ডাকা যাবে? ওর নাম আমি ঠিক করে' রেখেছি গৌরী।

অনল হেসে বল্‌লে—বেশ, ঐ নামই তবে ওর থাকুক।

ধনিষ্ঠা বল্‌লে—কিন্তু ও যে বাংলা জানে না, ওর সঙ্গে আমি কথা বলব কি করে'?

অনল হেসে বল্‌লে—মেয়ের কাছ থেকে মা ইংরেজি শিখ্‌বেন, আর মায়ের কাছ থেকে মেয়ে বাংলা শিখ্‌বে।

ধনিষ্ঠা বলে' উঠ্‌ল—ওর মাকে নিয়ে এলেন না, আমি একবার দেখ্‌তাম; আমি পাল্‌কী আর মাধীকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, আপনি তাকে একবার পাঠিয়ে দেবেন।

অনল বিষণ্ণ হয়ে' দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে' বল্‌লে—ওর মা পথে জাহাজে মারা গেছে।

ধনিষ্ঠা স্নেহভরে গৌরীকে বুকে চেপে ধরে' বল্‌লে—আহা বাছা রে! তবে আমিই ওর মা হবো। আপনি ওকে শিখিয়ে দেবেন, আমাকে যেন মা বলে' ডাকে।

*

* *

গৌরীকে নিয়ে অনল মহামুস্কিলে পড়্‌ল। গৌরী অনিলের মেয়ে, বিশ্বসংসারে তার এই একটি মাত্র স্নেহের পাত্রী; কিন্তু গৌরী আবার ম্লেচ্ছ খৃষ্টানীরও মেয়ে। স্নেহের আবেগে অনিলের কন্যাকে বুকে চেপে ধর্‌তে ইচ্ছা করে, কিন্তু তাকে স্পর্শ কর্‌লে নাইতে হবে, অন্ততপক্ষে কাপড় ছাড়্‌তে হবে। তার ছোঁয়া-কাপড়ে পূজা আহ্নিক করা চলে না, রান্না-খাওয়া চলে না। গৌরী নিতান্ত ছেলে মানুষ, নিজের হাতে ভালো করে' খেতে পারে না; পিঁড়িতে চ্যাপটালি খেয়ে বসে' হাত দিয়ে ডাল-ভাত মেখে খাওয়া তার অভ্যাস নেই, এমনতর ব্যাপার সে কখনো চোখেও দেখেনি। প্রথম দিন অনল পিঁড়ি পেতে ভাত দিয়ে তার সাম্‌নে নিজে আসনপিঁড়ি হ'য়ে বসে' গৌরীকে দেখিয়ে দিলে, মাটিতে কেমন করে' বস্‌তে হয়; তার পর কেমন করে' ভাত ভেঙে ডাল-ঝোল মেখে হাতে করে' গ্রাস তুল্‌তে হবে, অনল তাকে অনেক করে' বুঝিয়ে দিয়ে বলে' দিতে লাগ্‌ল; কিন্তু যে-ব্যাপার গৌরী জীবনে কখনো আর কাউকে সম্পন্ন কর্‌তে দেখেনি, সেই অনভিজ্ঞকর্ম্ম সে কিছুতেই সুসম্পন্ন কর্‌তে পার্‌ছিল না; মাছ বেছেও সে খেতে পার্‌ছিল না, কাঁটা-সুদ্ধই মাছ মুখে দিতে যাচ্ছে দেখে' অনল আর তটস্থভাবে থাক্‌তে পার্‌লে না, সে গৌরীর উচ্ছিষ্ট থালা ছুঁয়ে মাছ বেছে ভাত মেখে তাকে খাইয়ে দিলে।

ম্লেচ্ছের উচ্ছিষ্ট-স্পর্শ। অনল গৌরীকে আঁচিয়ে মুছিয়ে দিয়ে স্নান করে' রান্না-ঘরের মধ্যে গিয়ে লুকিয়ে খেতে বস্‌ল।

গৌরী জ্যাঠামশায়কে খুঁজ্‌তে-খুঁজ্‌তে সেই রান্না-ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুক্‌ল। অনলের খাওয়া নষ্ট হ'ল, সে ভাত ফেলে উঠে পড়্‌ল; রান্নার হাঁড়িও মারা গেল।

অনলকে সমস্ত খাদ্যসামগ্রী ফেলে' রেখে উঠে' পড়্‌তে

দেখে' গৌরী আশ্চর্য্য হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলে—তুমি আর খাবে না বাবা ?

অনল ছোট ভাইয়ের খরচ জোগাতেই এতদিন এত ব্যস্ত ছিল যে নিজে বিবাহ করবার কথা সে মনের কোণেও স্থান দিতে পারেনি ; তার পরে পিতৃ মাতৃহীনা নিরাশ্রয়া গৌরী এসে তাহার জীবন জুড়ে' বসাতে বিবাহের সঙ্কল্প সে একেবারেই ত্যাগ করেছে ; এই ম্লেচ্ছ-সংস্পর্শের মধ্যে কোন্ সদ্‌ব্রাহ্মণ তাকে কন্যা সম্প্রদান করবে ? যদিই বা কেউ করে, তবে সেই নবাগতা তার নিঃসম্পর্কীয়া এই বালিকাকে কিরূপ চক্ষে দেখ্‌বে তা কে জানে ? তাই অনল স্থির করেছে সে গৌরীর পিতা ও মাতা হ'য়ে গৌরীকে প্রতিপালন করবে এবং গৌরীকে দিয়েই তার বাৎসল্য-ক্ষুধা মেটাবে। এইজন্যে অনল গৌরীকে শিখিয়েছে, সে তাকে বাবা বলে' ডাকবে।

অনল সমস্ত অভুক্ত ভাত থালায় করে' এনে বাড়ীর বাঘা কুকুরটার সাম্‌নে ঢেলে দিতে-দিতে গৌরীর প্রশ্নের উত্তরে হাসিমুখে বল্‌লে—আর আমি খেতে পারব না মা। তুমি আর কখনো ঐ ঘরে ঢুকো না, বুঝ্‌লে ?

গৌরী অবাক্ হ'য়ে অনলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তার কেমন সন্দেহ ও আশঙ্কা হচ্ছিল যে তার ঐ ঘরে ঢোকার সঙ্গে অনলের না-খাওয়ার একটা-কিছু কার্য্য-কারণ সম্পর্কের সংযোগ আছে।

রাত্রেও গৌরীকে খাইয়ে দিয়ে অনল স্নান করলে। মাঘমাসের কন্‌কনে-শীতের রাত্রি।

গৌরী অনলকে জিজ্ঞাসা করলে—বাবা, তুমি কতবার স্নান করো ? তোমার শীত করে না ?

অনল কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে বল্‌লে—শীত করলেই বা কি করব মা ? আমাদের যে এতবারই নাইতে হয়।

গৌরী আশ্চর্য্য হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলে—কেন ?

এই 'কেন'র কি উত্তর দেবে ভেবে না পেয়ে বিব্রত হ'য়ে অনল বল্‌লে—তোমার ঘুম পায়নি মা ? শোবে না ?

গৌরীর একলা শুতে ভয়-ভয় করছিল। সে মৃদুস্বরে বল্‌লে—তোমার খাওয়া হ'য়ে গেলে শোবো। আমি তোমার খাবার-ঘরে ঢুকব না, দরজার বাইরে বসে' থাক্‌লে কি দোষ হবে ?

অনলের চোখ ফেটে জল বেরিয়ে গেল, সে ছুটে' এসে গৌরীকে কোলে তুলে' বুকে চেপে ধরলে ; তার ইচ্ছা করছিল, যে গৌরীর ফুলের মতন টুল্‌টুলে মুখখানিতে চুম্বনের পর চুম্বন করে, কিন্তু সে-ইচ্ছা তাকে দমন করতে হ'ল, গৌরী যে ম্লেচ্ছ।

অনল গৌরীর জন্যে একটি স্বতন্ত্র বিছানা নিজের বিছানার কাছে সন্ধ্যা-বেলাই পেতে রেখেছিল ; ঘরে ঢুকে'ই অনলের মনে এই প্রশ্ন উদয় হ'ল যে গৌরীকে আলাদা বিছানায় শুইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে আবার সে কাপড় বদ্‌লে এসে নিজের বিছানায় শোবে, না গৌরীকে নিজের কাছে নিয়েই শোবে। অনিলের মনে হ'ল গৌরীকে তার নিজের কাছে রাখ্‌তে হ'লে সকল বিষয়ে ও সকল সময়ে গৌরীর ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলা তার পক্ষে অসম্ভব হবে। কেবল পূজার স্থান ও সামগ্রী এবং আহারের স্থান ও সামগ্রী গৌরীর ছোঁয়া থেকে রক্ষা করে' চল্‌তে পারলেই যথেষ্ট হবে। এই ভেবে অনল গৌরীকে নিজের বিছানারই একপাশে শুইয়ে দিয়ে তার পাশে শুলো এবং অনিলের সুন্দর মেয়েটুকুকে কোলের কাছে শুয়ে থাক্‌তে দেখে'ই অনল আবার স্নেহাবেগে আত্ম-বিস্মৃত হ'য়ে গৌরীকে বুকে টেনে নিলে এবং গৌরীর মাথাটি তার মুখের কাছে এসে পড়্‌তেই অনল গৌরীর শুভ্র ললাটে স্নেহভরে একটি চুম্বন করলে।

গৌরী তার জ্যাঠা-মশায়ের এই স্নেহের পরিচয় পেয়ে নূতন পরিচয়ের সঙ্কোচ কাটিয়ে জ্যাঠা-মহাশয়ের বুকের মধ্যে গাঢ়ভাবে লগ্ন হ'য়ে ঘুমোবার উপক্রম করছিল, হঠাৎ সে ধড়্‌মড়িয়ে উঠে' বসে' অনলকে বল্‌লে—বাবা, আমাকে উপাসনা করালে না ?

অনল ঈষৎ লজ্জিত হ'য়ে উঠে' বস্‌ল ; তার মনে দ্বিধা উপস্থিত হ'ল, এই ম্লেচ্ছ-স্পর্শের অশুচিতা নিয়ে সে ভগবান্‌কে ডাকতে পারে কি না। সে ইতস্তত করতে-করতে বল্‌লে—আমি ত সন্ধ্যাবেলায় উপাসনা করেছি।

গৌরী কণ্ঠস্বরে ঈষৎ জোর দিয়ে অনলের কথার প্রতিবাদ করে' বল্‌লে—তুমি ত করেছ, কিন্তু আমি ত করিনি।

অনল অপ্রতিভ হ'য়ে বল্‌লে—তুমি ছেলে-মানুষ,

তোমার উপাসনা করতে হবে না, ভগবান্ ছেলেদেরকে এম্‌নিই ভালোবাসেন।

গৌরী জ্যাঠা-মহাশয়ের কথায় প্রতিবাদ করে' আবার বলে' উঠ্‌ল—ভগবান্ ত সবাইকে ভালোবাসেন, সেই জন্যেই ত আমাদের পাদ্রি বল্‌তেন যে আমাদের সকলেরই ভগবান্‌কে ভালোবেসে উপাসনা করা উচিত। আমার মা ত রোজ রাত্রে আমাকে উপাসনা করাতেন।

অনল গৌরীর কথা শুনে' মহা বিপদে পড়ে' গেল, সে এই শিশুর সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হ'তে পারে না এবং তাকে বল্‌তেও পারে না যে সে ম্লেচ্ছ, ম্লেচ্ছের ভগবানের সঙ্গে তার মতন নিষ্ঠাবান্ সদ্‌ব্রাহ্মণের কোনো সম্পর্কই নেই, এবং তাদের ব্রাহ্মণের ভগবান্ ব্রাহ্মণেতর হিন্দু জাতির ছোঁয়ার ভয়েই সতত সন্ত্রস্ত হ'য়ে কাল যাপন করেন, ম্লেচ্ছের সংস্পর্শ ঘট্‌লে সেই শুচিবায়ুগ্রস্ত ভগবান্-বেচারার জা'ত ত যাবেই, চাই কি দুর্ভাবনায় প্রাণও যেতে পারে—ম্লেচ্ছের ছোঁয়াচ লেগে কত মন্দিরের কত ঠাকুরেরই না প্রাণ বিয়োগ ঘটেছে এবং তাঁদের সঙ্গে কত ভক্ত ও অভক্তেরও প্রাণ গেছে; মাদ্রাজে মালাবারে ঠাকুরের মন্দিরের পথ দিয়ে অন্ত্যজ হাঁট্‌লে ঠাকুরের জা'ত যায়; যে গান্ধী ইংরেজের বিরুদ্ধতা করেছিলেন বলে' দেশের লোকে তাকে মহাত্মা বল্‌বার জন্যে ক্ষেপে উঠেছিল এবং যে লোকে তাঁকে মহাত্মা না বল্‌ত তার উপর মারমুখো হ'ত, সেই গান্ধী এখন জাতিভেদ তুলে' ঠাকুরের মন্দিরে সকলকে প্রবেশাধিকার দিতে বল্‌ছেন বলে' মহাত্মাই এখন ম্লেচ্ছ বলে' নিন্দিত হচ্ছেন!

অনলকে নিরুত্তর হ'য়ে ইতস্তত করতে দেখে' গৌরী বল্‌লে—বাবা, উপাসনা করে' নাও, আমার যে ঘুম পাচ্ছে।

অনল বল্‌লে—আজ তবে ঘুমোও মা, কাল সকালে স্নান-টান করে' শুদ্ধ হ'য়ে ভগবানের পূজা করলেই হবে।

গৌরী বলে' উঠ্‌ল—তুমি ত এই নেয়ে এলে! তবে আবার অশুদ্ধ হ'লে কেমন করে'?

অনল গৌরীকে রূঢ়ভাবে বল্‌তে পার্‌লে না যে আমি অশুচি হয়েছি তোমাকে ছুঁয়ে। সে বল্‌লে—তোমার মা তোমাকে কি কথা বলিয়ে উপাসনা করাতেন তা ত আমি জানি না; তোমার যদি কিছু মনে থাকে তবে তুমি নিজে নিজে বলো।

গৌরী নিদ্রাজড়িত অস্পষ্টস্বরে বল্‌লে—আমার ত এখনো মুখস্থ হয়নি।

তখন অনল উপায়ান্তর না দেখে' বল্‌লে—আচ্ছা, তুমি একটু বসো, আমি একটু বাইরে থেকে আসি।

অনল বাইরে গিয়ে কাপড় ছেড়ে গঙ্গাজল স্পর্শ করে' যখন ঘরে ফিরে' এল তখন দেখ্‌লে গৌরী শীতে কুঁকুড়ি-শুঁকুড়ি হ'য়ে ঘুমিয়ে বিছানায় ঢলে' পড়েছে। অনল স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে' গৌরীকে ভালো করে' শুইয়ে দিয়ে লেপ ঢাকা দিয়ে তার পাশে শুয়ে পড়্‌ল। সে রাত্রে তার আর খাওয়া হ'ল না। (ক্রমশঃ)

পল্লীপার্ব্বণ *

আশ্বিনে—অম্বিকা-পূজা, পড়ে মোষ-পাঁঠা।
কার্ত্তিকে—কালিকা-পূজা, ভাই-দ্বিতীয়া ফোঁটা॥
অঘ্রাণে—নবান্ন, নূতন ধান কেটে।
পৌষ মাসে—পৌষ পার্ব্বণ, ঘরে ঘরে পিঠে॥
মাঘ মাসে—শ্রীপঞ্চমী, বালকের হাতে-খড়ি।
ফাগুন মাসে—দোল-যাত্রা, ফাগ ছড়াছড়ি॥
চৈত্র মাসে—চড়ক-সন্ন্যাস, গাজনেতে ভরা।
বৈশাখ মাসে—তুলসী-গাছে দেয় বসুন্ধারা॥
জ্যৈষ্ঠ মাসে—ষষ্ঠীবাটা, জামাই যত জড়।
আষাঢ় মাসে—রথযাত্রা, লোকের ভিড় বড়॥
শ্রাবণ মাসে—ঢেলা-ফেলা, খই আর মুড়ি।
ভাদ্র মাসে—টক্-পান্তা খান মনসা-বুড়ী॥

সংগ্রাহক—শ্রী উমাপদ মুখোপাধ্যায়

* বুড়ী দিদিমার মুখে এই ছড়া শুনেছি। বাংলার পল্লীর বারো মাসের তেরো পার্ব্বণের সংবাদ এই ছোটো কবিতার মধ্যে কেমন সুন্দর-ভাবে ফুটে' উঠেছে? সহজ সরল গ্রাম্য চলিত ভাষার সংযোগে কবি তাঁর এই কবিতাটি মধুর করে' তুলেছেন। কবিতাটি গ্রাম্য ভাষায় লিখিত হ'লেও কোথাও কষ্ট করে' মেলাতে হয়নি। এই কবিতার রচয়িতা কে তাহা আমার জানা নেই।

প্রকৃতির প্রতীক্ষা

শ্রী মণি মজুমদার

কত যুগ যুগান্তর ধরি'
তোমার এদেহখানি সযতনে সাজাইয়া
বসে' আছ নিসর্গ-সুন্দরি!
প্রিয়-সমাগম-আশে প্রেয়সীর প্রায়,—
আমারি,—আমারি প্রতীক্ষায়!

প্রাণের আলোকে মম পাবে তুমি নবীন জীবন—
চিরদিন মনে-মনে এ যে তব ছিল আকিঞ্চন;
কত রবি কত শশী আলোকিত করেছে তোমায়
তবুও বলেছ, "হায়,—হায়,
বিফলে—বিফলে দিন যায়!"

সীমাহারা সিন্ধুরূপে দিকে-দিকে বাহু প্রসারিয়া
উন্মত্ত আবেগে মোরে ফিরিয়াছ সন্ধান করিয়া।
শুভ্র-ফেন-পুষ্প-মালা যতনে করেছ আহরণ
আমারে যে করিতে বরণ।
বিরহ-ব্যথায় নীল তরঙ্গ-আকুল জলরাশি
দেশ হ'তে দেশান্তরে কূলে-কূলে লুটায়েছে আসি'।
তটের কঠিন বুকে আছড়িয়া পড়ি' বারবার,
কত যে করেছ হাহাকার;
বলেছ অধীর বেদনায়,
"কোথায় সে,—কোথায়—কোথায়?"

আপনারে করিয়া সংযত,—
কোথাও বসেছ তুমি ধ্যানমগ্না তাপসীর মতো।
আকাশে উন্নত করি' শির আপনার
পথ চেয়ে রয়েছ আমার।
সব চঞ্চলতা তব নিঃশেষে করিতে অবসান
বুকে তুমি চাপিয়াছ রাশি-রাশি কঠিন পাষাণ।
মৌন স্তব্ধ শক্তি-দৃপ্ত অপূর্ব্ব সে মূরতি তোমার—
সহস্র ঝঞ্ঝায় সে যে নিঃস্পন্দ অটল নির্ব্বিকার—
সাধনায় সিদ্ধি-তরে আপনি যে আপনারি 'পর
করিয়াছ একান্ত নির্ভর।
সে তব পার্ব্বতী মূর্ত্তি, দীপ্ত মহিমায়
কঠোর গর্ব্বিত দৃঢ়, মগ্ন তপস্যায়
লভিতে আমায়।

নিবিড় বনের মাঝে ফুলে-ফুলে নিভৃত গোপন
শয়নীয় করিয়া রচন,
মোর তরে উৎসুক অন্তরে
সবুজ আঁচলখানি বিছাইয়া বিশাল প্রান্তরে
দিকে-দিকে মৃদুল সমীরণ
করেছ বীজন!
তরুণী বধূর মতো সাজি' তুমি উৎসবের বেশে
দাঁড়ায়েছ এসে,—
চকিত-নয়নে চাহি' দুরুদুরু কম্পিত হিয়ায়
বলেছ, "চরণ-ধ্বনি ওই তা'র বুঝি শোনা যায়।"

কভু তুমি অন্তহীন নীলিমা-রূপিণী,
অয়ি মায়াবিনি!
শত বাহু পাশে মোরে যেন তুমি করিতে বেষ্টন,
জগৎ করেছ আলিঙ্গন।
নিজ শূন্যতায় কভু পীড়িত-ব্যথিত,
দিগন্তে যে হয়েছ নমিত।
না লভি' আমায় যেন নিরাশায় অবশ অন্তরে
ক্লান্ত-দেহে লুটাইয়া পড়িয়াছ ধরণীর 'পরে।
জাগিয়াছ তামসী নিশায়
সহস্র তারকা-আঁখি মেলি' তুমি হেরিতে আমায়।
কভু কালো মেঘমালা চারিদিক্ ঘিরিয়াছে আসি',
যেন সে হিয়ার তব পুঞ্জীভূত বেদনার রাশি।

বিদ্যুতের খড়্গ করে ঘোর-রবে করি' গরজন
বহাইয়া উন্মত্ত পবন
আসি' মোর নিভৃত আগারে
আঘাত করেছ বারে-বারে।
না হেরি' আমারে যেন উন্মাদিনী-প্রায়
প্রলয়ের অভিনয় করিয়াছ মত্ত ঝটিকায়।
আজি হের আসিয়াছে সকল বাঁধন টুটি' তার
অয়ি মুগ্ধে! প্রণয়ী তোমার।
চারিপাশে এতদিন ক্ষুদ্র গণ্ডী করিয়া রচন
কত না দেখেছি দুঃস্বপন।
আজি যে এসেছি আমি তোমার রূপের পারাবারে
ডুবিতে, মিশিতে একেবারে।
হের চির-পথিকের বেশে
পথ-প্রান্তে দাঁড়ায়েছি এসে।
দিগন্ত-বিস্তৃত তব অন্তহীন সাম্রাজ্য-ভিতর
এস মোরে করো অধীশ্বর।
সব-বাধা-বন্ধ-হীন মুক্ত মম প্রাণের ধারায়
ধরণীর ধূলি হ'তে আকাশের তারায়-তারায়;
বহাইয়া জীবনের প্রবাহ মধুর
তোমারে শুনাবো আমি অফুরন্ত আনন্দের সুর।
তব বাহু-পাশে মোরে চির-বন্দী লইতে করিয়া
এস আজি প্রিয়া।
তোমার বাঞ্ছিত হের সেও আজি আকুল-হিয়ায়
তোমারেই চায়।
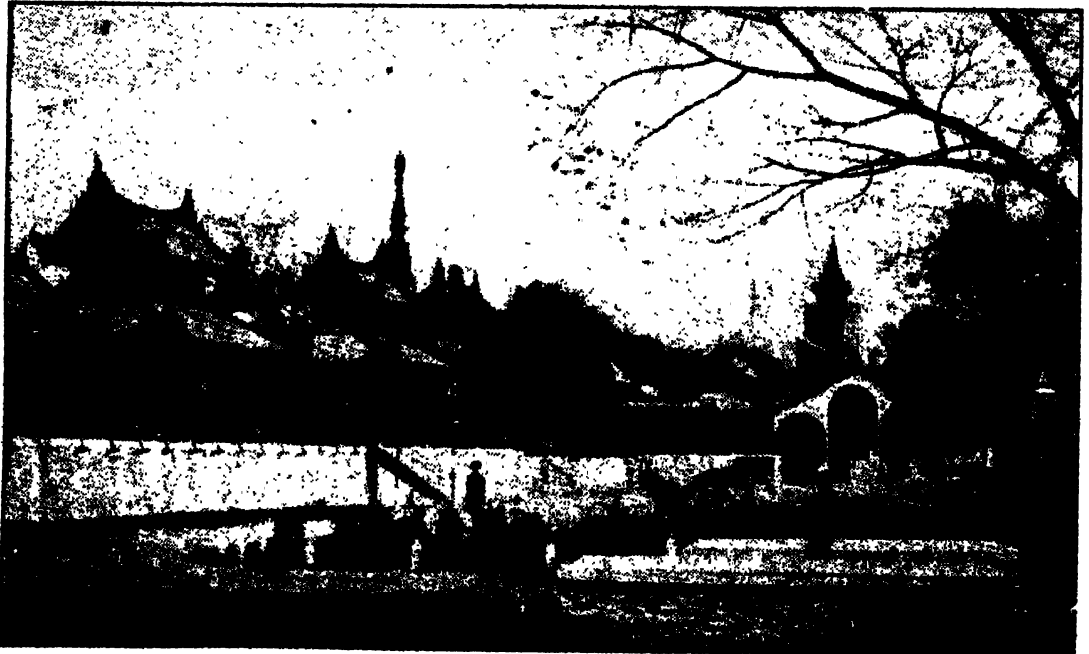
বামুন-বাগ্দী

শ্রী অরবিন্দ দত্ত

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কানাইলাল যে ভদ্রলোকটির ঔষধ আনিতে গিয়াছিল, তাঁহার নাম গণপতি মিত্র। পূর্ব্বে হুগ্‌লি জেলায় তাঁহার বসতি ছিল। এখন ঘাঁটালে একটুক্‌রা জমি লইয়া—সেইখানেই সামান্ত-রকমের একটি বাড়ী প্রস্তুত করাইয়াছিলেন এবং তথাকার বাসিন্দা হইয়া পড়িয়াছিলেন। স্ত্রী ও দুইটি কন্যা সন্তান ব্যতীত সংসারে তাঁহার আর কোনো বন্ধনই ছিল না। বড় মেয়েটির বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। ছোটোটির নাম নলিনী; সে একাদশ বৎসরে পড়িয়াছিল।

কানাইলাল হাঁপাইতে-হাঁপাইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। গণপতির হস্তে ঔষধ-দুটি দিয়া কহিল, "অনেক দূর যেতে হয়েছিল, বড় দেরি হ'য়ে গেছে। আমার মা বোধ হয় এ-গাড়ীতে যেতে পারেননি। আমি একবার দেখা ক'রে আসি। এসে আপনাদের শুশ্রূষা কর্‌ব।"

গণপতি কহিলেন, "আপনাকে আর কি ব'লে ধন্যবাদ দেবো? যদি পারেন ত একবার এসে দে'খে যাবেন।"

কানাই দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। আসিয়া দেখিল, গাড়ীখানা চলিয়া গিয়াছে। তাহার হৃদয়ের স্পন্দন অত্যন্ত দ্রুত হইয়া উঠিল, কিন্তু তখনও তাহার মনে ভরসা ছিল যে, মাতৃস্নেহের অচ্ছেদ্য সম্পর্কটা এমন সহজে যায় না। মহেশ্বরী কোথাও-না-কোথাও আশ্রয় লইয়া তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। সে প্লাটফর্ম্মের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই ঘুরিয়া-ঘুরিয়া আসন্নমৃত্যু-লোকের মায়াজড়িত চক্ষু-দুটির মতো তাহার চক্ষু দুটি সকলের দিকে ঘুরাইতে-ফিরাইতে লাগিল। যখন কোথাও তাঁহাদের দেখিতে পাইল না, তখন সে বিশ্রাম-গৃহগুলি তন্ন-তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া আসিল; এবং তৃষিত চাতকের মতো নবাগত যাত্রীদের প্রতিও কিছুকাল 'হাঁ' করিয়া চাহিয়া রহিল। অবশেষে সজোরে একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া সে গঙ্গার ঘাটে আসিয়া বসিল; এবং হঠাৎ একটা পরিবর্ত্তনের পথে আসিয়া সে একেবারে দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িল। খাইতে, শুইতে, উঠিতে, বসিতে যে মহেশ্বরীকে তাহার একান্তই প্রয়োজন। এক-মাত্র মহেশ্বরীই তাহাকে জগতের সম্মুখে পরিচিত করিয়া রাখিয়াছেন। মহেশ্বরীর অভাবে জগতের সহিত তাহার কোনো সম্বন্ধই নাই। আনন্দের সহিত বেদনা যে এমন জট পাকাইয়া জড়াইয়া থাকিতে পারে, যাহাদের জীবন-গীতি অন্য যন্ত্রের সাহায্যে বাজিতে থাকে, তাহারা তাহা বুঝিতে পারে না। বাতাসের ঘেরটার বাহিরে যে দম্-আট্‌কা পড়িবার একটা সঙ্কট-স্থান আছে, তাহা তাহাদের চক্ষে সত্য এবং পাকাপাকি হইয়া পড়ে তখনই—যখন তাহারা অবস্থার গতিকে আপনার সমস্ত পুঁজিপাটা লইয়া সেখানে যাইয়া উপস্থিত হয়। হঠাৎ এই পরিবর্ত্তনের মধ্যে পড়িয়া কানাইলালের বিচার-বুদ্ধি ও হিতাহিত জ্ঞান একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল। সে কেবল অপরের স্কন্ধে ভর করিয়া বাড়িয়া উঠিতেছিল। সে কোনোদিন এমন সন্ধান পায় নাই যে, কিরূপে আপনার বিধি-ব্যবস্থাকে নিজের নিয়মে মিলাইয়া লইতে হয়।

গঙ্গাবক্ষের ঢেউগুলি নাচিয়া-নাচিয়া তাহাকে যেন পুরস্কারের ইঙ্গিত জানাইয়া আপনাদের গন্তব্যপথে ছুটিয়া চলিতে লাগিল। গঙ্গার পুলের উপর দিয়া পিপীলিকার শ্রেণীর ন্যায় অবিরাম জনস্রোত আপন-আপন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য চলিয়াছে। তাহারাও যেন কটাক্ষ করিয়া যাইতেছে যে, "আপনার ব্যক্তিত্বকে অন্যের হাতে বিলাইয়া দিয়া এই কর্ম্মক্ষেত্রের সমরলীলায় পঙ্গুর মতো বসিয়া থাকিলে চলিবে না। মায়ার বোঝা মস্তকে লইয়া শক্তি অপচয় করিলে নিজেকেই নির্জীব করিয়া ফেলিবে।" সে মনে-মনে বলিতে লাগিল "ইহারা এমন অন্যায় ইঙ্গিত করিতেছে কেন? বোধ হয়, ইহারা মাতৃস্নেহ পায় নাই। তাই কল্যাণময়ী জননীর পদতলে শক্তির অপচয় করিবার যোগ্যতা পাওয়া যে কত বড় শক্তিলাভ তাহা ইহারা জানে না।"

কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে তাহার মনে একটা অভিমানও জাগিয়া উঠিল। তাহার দৃষ্টির বাহিরে, সম্পূর্ণ ইচ্ছার প্রতিকূলে যাহা সংঘটিত হইল, তাহার কারণ যাহাই হউক না কেন—মহেশ্বরীর অপরাধের সন্ধানে তাহার চক্ষু-দুটি

সর্ব্বপ্রথমে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। সে ভাবিল, "বড়-মা কি একটা-গাড়ীও অপেক্ষা করিয়া যাইতে পারিলেন না? ভাবিয়াও দেখিলেন না যে, এই নির্ব্বান্ধব পুরীতে আমি কোথায় যাইয়া দাঁড়াইব?" একবার তাহার মনে হইল,—হয়ত তারিণীচরণই কৌশল করিয়া এই বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছে। কিন্তু তাহার বড়-মায়ের উপর যে কেহ শক্তি পরিচালনা করিতে পারে, এ-বিশ্বাসও তাহার মনে অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। তখন মহেশ্বরীর উপর অভিমানটা আবার প্রবল হইয়া উঠিল।

চিত্তের প্রকৃতি ও বিশেষত্ব শিক্ষার দ্বারা বিকশিত হয়। কিন্তু যতক্ষণ তাহাতে সংযম স্পর্শ না করে, ততক্ষণ তাহা পরিপূর্ণতা লাভ করে না। মহেশ্বরীর সুশিক্ষায় কানাইলাল চলিবার একটা পদ্ধতি—একটা ইসারা পাইয়াছিল মাত্র। কিন্তু নিজের কর্ম্মক্ষেত্রে ক্রমাগত চলিতে-চলিতে যতক্ষণ সে সংযম না শিক্ষা করিতেছে ততক্ষণ তাহার চিত্ত নাচিয়া-দুলিয়া যে তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? তাই সকল সুচিন্তা ও সুযুক্তি দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া মহেশ্বরীর উপর অভিমানটাকেই সে সকলের অপেক্ষা বড় করিয়া তুলিল।

কানাইলাল ভাবিল, "বড়-মা যখন আমাকে এই বিপুল বিশ্বের মাঝখানে অসহায় করিয়া ফেলিয়া যাইতে পারিলেন, স্নেহময়ী জননীর চিত্তের সেই অবারিত দ্বারটিতে যদি কবাটই পড়িল, তবে আমি বলপূর্ব্বক সে দ্বার ঠেলিয়া সেখানে ঢুকিয়া আর আমার স্নেহের পুঁজি বাড়াইতে যাইব না।" তাহার নেত্র হইতে অবিরল-ধারে অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

অভিমানের বস্তু সম্মুখে থাকিলে উভয়ের মন কথা-কথির মধ্যেও আনুগত্য বা ত্যাগস্বীকারের একটা দম্‌কা হাওয়ায় আবার দুটিকে মিলাইয়া-মিশাইয়া দিতে পারিবে এইরূপ একটা সন্ধির কল্পনায় মনকে যেন একটু আশ্বস্ত রাখে, কিন্তু অভিমান নগ্নমূর্ত্তি ধরিলেই প্রাণটা হাহাকারে পূর্ণ হইয়া যায়। মহেশ্বরীর অবিদ্যমানে তাঁহারই সম্বন্ধে কুটিল কল্পনায় কানাইলাল আপনার মনের মধ্যে যে আবর্ত্ত রচনা করিয়া তুলিতেছিল, সেই আবর্ত্তে পড়িয়া সে নিজেই হাবুডুবু খাইতে লাগিল। এবং যে তাহার অন্তরের দুর্দ্দশা ঘটাইয়াছে, তাহার সেই নিষ্ঠুরতাকে চক্ষের সম্মুখে প্রতিফলিত করিয়া দিয়া সমস্ত গুণ-গরিমাকে হাল্‌কা করিয়া দিতে না পারায় তাহার অন্তরের অস্বস্তিটা দ্বিগুণ করিয়া তুলিল।

যখন সন্ধ্যা হইল তখন সে বুঝিল, এ-ভাবে বসিয়া কাটাইলে আর চলিবে না। তাহাকে আহার্য্যের চেষ্টা করিতে হইবে—আশ্রয়ও দেখিতে হইবে। কিন্তু এত লোক যাইতেছে আসিতেছে, কেহ ডাকিয়াও ত জিজ্ঞাসা করে না! সে কাহার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিবে? এই সংসার-পথের নূতন পথিকের মনে আতঙ্কের সঞ্চার করিয়া দিয়া যখন রাত্রির অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল, তখন সে ধীরে-ধীরে ষ্টেশন-অভিমুখে চলিল; এবং গণপতির নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল, পীড়িতা স্ত্রীকে লইয়া তখনও পর্য্যন্ত তিনি সেইখানে অবস্থিতি করিতেছেন।

সে জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কেমন আছেন?"

গণপতি কহিলেন, "একটু ভালো দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এখানে ত আর এভাবে রাখ্‌তে পারা যাচ্ছে না। রেল-ষ্টীমারে নিয়ে গেলেও কষ্ট পাবে। নৌকো হ'লে ভালো হ'ত। আমি নড়্‌তে পারছিনে। কে-বা এসব ক'রে দেয়—"

কানাই জিজ্ঞাসা করিল, "ঘাঁটাল পর্য্যন্ত যেতে কত ভাড়া নেবে?" আমি দে'খে আসি যদি ভাড়া কর্‌তে পারি।"

গণপতি কহিলেন, "ভগবান্ আপনাকে সুখে রাখুন। ভাড়া বোধ হয় পাঁচ-সাত টাকা নিতে পারে। ঘাঁটাল পর্য্যন্ত যদি না যেতে চায়, রাণীচক পর্য্যন্ত গেলেও সেখানে নৌকো পাবো।"

কানাইলাল চলিয়া গেল; এবং অনতিবিলম্বে আট টাকা ভাড়া সাব্যস্ত করিয়া একজন মাঝিকে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইল।

কানাই জিজ্ঞাসা করিল, "ঘাঁটাল পর্য্যন্ত আপনাদের সঙ্গে আমাকে কি আবশ্যক হবে ব'লে মনে করেন?"

গণপতি পরম আপ্যায়িত হইয়া কহিলেন, "তা হ'লে

খুবই ভালো হয়। জলপথে রোগী নিয়ে একাকী যাওয়া! আমি বল্‌তে সাহস পাইনি। কিন্তু আপনার অসুবিধা হবে না ত? আপনার মা কি সম্মতি দেবেন? আপনারা না কোথায় যাচ্ছিলেন "

কানাই একটি দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়া লইয়া কহিল, "আমার মা তেমন নন্। তাঁর কাছে আপন-পর ভেদ নেই; বরং আপনাদের এই অসময়ে সাহায্য কর্‌তে না পার্‌লে তিনি দুঃখিত হবেন।

গণপতি কহিলেন, "সে আপনার ব্যবহারেই বুঝ্‌তে পেরেছি। সন্তান দেখ্‌লেই বোঝা যায় জননী কেমন!"

কানাইলাল তখন একখানি ঘোড়ার গাড়ী করিয়া সকলকে লইয়া নৌকায় যাইয়া উঠিল। এই বয়সেও যে মহেশ্বরীর স্নেহাঞ্চলের নিম্নে সেই আড়াই বৎসরের বালকটির মতো পরম সুখে বাস করিতেছিল, সে আজ সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে অপরিচিত লোকের সঙ্গে কোন্ সুদূর দেশে ভাসিয়া চলিল!

কানাইলাল নিঃসম্বল। টাকা-কড়ি সমস্তই মহেশ্বরীর নিকটে ছিল। টাকা পয়সা হাতে থাকিলেও সে হয়ত দেশের বাড়ীতে ফিরিয়া যাইত না। মহেশ্বরী একদিন বলিয়াছিলেন যে,—সে বাগ্‌দীর ছেলে, তাহার বাড়ী উত্তরপাড়ায়। সে-কথাটা তখন তাহার নিকট যত ছোটো বলিয়া ঠেকিয়াছিল, এখন তাহা তত বৃহৎ হইয়া দাঁড়াইল। স্নেহের বন্ধনে এমন-একটু ফাঁক না থাকিলে, কে কবে সন্তানকে ফেলিয়া চলিয়া যাইতে পারে? কানাইলাল তাই কোনো ইতস্তত না করিয়াই নৌকায় উঠিল।

তখন রাত্রি হইয়াছে। কানাইলাল নৌকার ছাদের উপর বসিয়াছিল। এই মাতৃহারা বালকের দুঃখে আকাশের তারাগুলি যেন সেদিন অত্যন্ত নিষ্প্রভ হইয়াই দেখা দিয়াছিল। তাহার বেদনাময় প্রাণের সুরে ও রঙে যেন সমস্ত জগতখানি অনুরঞ্জিত হইয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। কানাইলাল যতই মহেশ্বরীকে দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতে চাহিতেছিল, ততই তাঁহার নির্ম্মল স্নেহের একটা নিগূঢ় প্রতিধ্বনি তাহার অন্তরে ধ্বনিত হইয়া দুঃখটাকে অতি তীব্র করিয়া তুলিতেছিল; এবং তাহার চঞ্চল মনকে সংযমের দ্বারা বাঁধিয়া সু-ধার অস্ত্রে চক্ষের ছানিটা তুলিয়া ফেলিয়া দিতে পারিলে, মহেশ্বরীর প্রকৃত রূপ দৃষ্ট হইবে, এইরূপই যেন কে ইঙ্গিত করিতেছিল। বলাই শৈলবালার পেটের সন্তান; যে-স্নেহ সে-মাতৃস্নেহকেও পরাভূত করিয়াছে, তাহাকে ভুলিব বলিলে কি ভুলিতে পারা যায়? সে ছাদের উপর শুইয়া পড়িল— ভাবিতে লাগিল,—ঘুমাইয়া পড়িলে কোমল হস্তের বেষ্টনে বক্ষের মধ্যে আর বুঝি কেহ তাহাকে নিরাপদে রাখিবে না সে কোথায় চলিয়াছে—কেন চলিয়াছে—আর বুঝি কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে না। যে-সময়টা ভাবনারও অন্ত থাকে না, কোনো পথও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, সে-সময় বিবেক ও বুদ্ধি অতি দূরে গিয়া সরিয়া দাঁড়ায় এবং নিজেদের ঘরের দুর্দ্দশা দেখিয়া নিজেরাই হাসিতে থাকে। কানাইলাল বিবেক-বুদ্ধি হারাইয়া, স্রোতের তৃণ যেমন ভাসিয়া যায়, কোথায় যায়, কেন যায়, জানে না, সেইরূপই সে ভাসিয়া চলিয়াছে। তাহার অন্তরের মধ্যে অভিমান, দুঃখ ও ক্ষোভ এমন ভরপূর হইয়া উঠিয়াছিল যে, তথায় তিল রাখিবারও স্থান ছিল না, অথচ সে যে-দিকে চক্ষু ফিরায়, দেখিতে পায়, সমস্ত অন্তরটা জুড়িয়াই তাহার সেই মহেশ্বরী মা! সে অচৈতন্য হইয়া ছাদের উপর পড়িয়া রহিল।

নৌকার মধ্যে নলিনী জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা! বাবুটি কিছু খেলেন না? খাবার রয়েছে—আপনাদের দেবো?"

গণপতি ব্যস্তভাবে কহিলেন, "তাইত, সেকথা দেখি ভুলেই গেছি! কানাইবাবু "

দুই-চারিবার ডাকিতে কানাইলাল উত্তর করিল।

গণপতি কহিল, "সঙ্গে কিছু জলখাবার রয়েছে, একবার নীচে আসুন না?"

কানাই বলিল, আমার শরীরটা তত ভালো নেই, রাত্রে আর কিছু খাবো না।"

গণপতি বাহিরে আসিলেন; এবং কানাইলালকে কিছু খাওয়াইবার জন্য বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কানাই বলিল, "আপনারা ব্যস্ত হবেন না, আজ আর আমার জলবিন্দুও খেতে ইচ্ছা নেই।"

গণপতি কহিলেন, "তা আপনি ভিতরে আসুন, বাইরে একলাটি ব'সে রইলেন!"

কানাই কহিল, "আপনি কেন কুণ্ঠিত হচ্ছেন? আমি এখানে বেশ আছি।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বাড়ীতে যাইয়া শৈলবালাকে ভিন্ন সুখেন্দু আর কাহাকেও কিছু বলিলেন না। কানাইলাল কোথায় গেল—কি হইল ইত্যাদি নানারূপ দুর্ভাবনায় তিনি অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। যাহা হউক তিনি আর কাল-বিলম্ব না করিয়া তাঁহার পিসতুতো ভাই গোকুলকে সঙ্গে দিয়া শৈলবালাকে কলিকাতায় মহেশ্বরীর নিকটে পাঠাইয়া দিলেন।

শৈলবালা আসিয়া দেখিল, মহেশ্বরীর আহার নাই, নিদ্রা নাই, শরীরও নিতান্ত শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। তিনি তাঁহার সজল চক্ষু-দুটি রাস্তার জনস্রোতের উপর নিবদ্ধ করিয়া দিবারাত্রি বসিয়া থাকেন। শৈল কহিল, "মা! অমন ভেবে-ভেবে শরীর কাহিল করছ, সে নিশ্চয়ই আসবে, তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারবে না। সেয়ানা হয়েছে, নিশ্চয়ই দেশের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হ।"

মহেশ্বরী কহিলেন, "সে আসুক বা না আসুক সে ভাবিনে। যে কালব্যাধির সম্মুখে পড়েছিল—তাই ভাবি। আর যদি শুনতে পেতাম যে সে একজনা মা পেয়েছে, তা হ'লে আর ভাবনার কিছু ছিল না। তা'র যে সংসার-বুদ্ধি কিছুই হয়নি! যদি প্রাণে বেঁচে থাকে—না খেতে পেয়ে হয়ত দ্বারে-দ্বারে ঘু'রে বেড়াচ্ছে। এমন রাতারাতি সে যে অকূল সমুদ্রে পড়বে, তা ত মা! কোনো দিন ভাবিনি।"

শৈল কহিল, "অগতির গতি দীনবন্ধুই তা'কে দেখছেন। দুঃখীদের থেকে আপনাকে আলগা ক'রে নেবার ঝোঁক যদি বিধাতার থাকত, তা হ'লে দুঃখী লোক কি বাঁচতে পেত?"

মহেশ্বরী কহিলেন, "সে ঠিক কথা। কিন্তু দুঃখী-লোকের শক্তিটা ভগবান্ বেশী ক'রেই পরীক্ষা করেন। মানুষ কত বড় বলিষ্ঠ হ'লে তবে সেই শক্তি-পরীক্ষায় জয়ী হ'তে পারে! সে যে মা, মাথার বোঝা বইতে পারে না—মনের বোঝা কি বইতে পারবে?"

শৈল কহিল, "কিন্তু মা! ভগবান্ ত কা'কেও প্রাণে মেরে শক্তি পরীক্ষা করেন না! সে তোমার কাছে যেরূপ শিক্ষা-দীক্ষা পেয়েছে, তা'তে নিশ্চয়ই সে জয়ী হ'তে পারবে।"

মহেশ্বরী কহিলেন, "মানুষ তা'র সত্যকার অধিকার যতদিন বুঝতে না পারে, ততদিন একটা ভয়ও আছে। তখন একটা বিপক্ষ শক্তি তা'কে এমন স্থানেও নিয়ে যেতে পারে যেখানে আত্মনাশই প্রাণ জুড়াবার সহজ শক্তি ব'লে প্রলোভন দেখায়।"

মহেশ্বরীর প্রাণে যে কত আশঙ্কা, শৈল একে-একে সমস্তই বুঝিতে পারিল। সে কহিল, "কিন্তু এই সুবৃহৎ সহরের এক-কোণে প'ড়ে থাকলে, সেও বা কি ক'রে আমাদের খোঁজ পাবে, আমরাও বা কি ক'রে পাবো?"

মহেশ্বরী কহিলেন, "তা বুঝি মা! কিন্তু আমার প্রাণের নিধি যে এইখানেই হারিয়েছে। তাই দেশে যেতে মন চায় না। এইখানেই জনসমুদ্রের মাঝে চোখ-দুটো পাতিয়ে রাখতে ইচ্ছে হয়।" কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "আমার উপর যে তা'র কত বড় জোর—সে তোমরা জানো না। যে-ধাক্কাটা লেগেছে তা আমি সামলাতে পারছি—কিন্তু তা'র যে সে-শক্তি নেই!"

শৈল কহিল, "তুমি মিছে-মিছে কেবল খারাপটাই ভাবছ। সে-হয়ত সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে গেছে। তাঁরা সুস্থ হ'লে চলে আসবে।"

মহেশ্বরী কহিলেন, "মনে এইরূপ একটা সামঞ্জস্য আনতে না পারলে মানুষের প্রাণটা ফেটে চ'টে খান্-খান্ হ'য়ে পড়ত। আমিও তাই ভাবছি। কিন্তু সে-ভাবনাটা বড় ক'রে ভাবতে পারিনে।"

শৈলবালা আর কিছু বলিল না।

কানাইলালের বিচ্ছেদ বলাইএর অন্তরেও অত্যধিক বাজিয়াছিল। সে একাকী প্রতিদিন দুবেলা যতটা পারিত খোঁজ করিয়া আসিত; তারিণীচরণের বড় সাহায্য পাইত না। গোকুল আসিলে তাহার অনেকটা

সুবিধা হইল। গোকুলকে সঙ্গে লইয়া সে প্রত্যহ নানা স্থানে ঘুরিয়া আসিত। কিন্তু যাহাকে সে চায়, তাহাকে কে যেন অত্যন্ত গোপন-দেশে লুকাইয়া রাখিয়াছে! বালকের হৃদয়-ভরা আগ্রহের প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার কোনো আবশ্যকতাই সে বোধ করিতেছে না। সে প্রত্যহ কত আশা লইয়া বাহির হইত? আজ বুঝি তাহার কানাই-দাকে আনিয়া তা'র বড়-মার হাতে দিতে পারিবে।" তাহার সে আশা পূর্ণ হইত না। শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস বুকে বহন করিয়া লইয়া সে ঘরে ফিরিত।

কানাইলালের সহিত বিচ্ছিন্ন হইবার পর হইতে গঙ্গাস্নানের লালসাটা মহেশ্বরীর অন্তরে অত্যন্ত বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল। একটি দিনও ফাঁক যাইত না। তিনি প্রত্যহ বলাইকে সঙ্গে লইয়া স্নানে যাইতেন। কিন্তু ঘাটে উপস্থিত হইলে স্নান-আহ্নিক ভুলিয়া যাইতেন। শুধু পুলের উপর দিয়া যে-সকল লোক যাতায়াত করিত, তাহাদের উপর তাঁহার উদ্ভ্রান্ত চক্ষু-দুটি স্থাপিত করিয়া তিনি সোপানের উপর নীরবে বসিয়া থাকিতেন। বেলা বাড়িয়া যাইত, হুঁস থাকিত না। কত লোকে তাঁহাকে পাগল ভাবিয়া হাসিত—জ্ঞান নাই,—প্রাণ-পুত্তলির অপেক্ষায় তাঁহার মন ও প্রাণ তন্ময় হইয়া থাকিত। এইরূপে সূর্য্যদেব যখন মাথার উপর উঠিতেন, তখন তিনি শূন্য বক্ষ লইয়া গৃহে ফিরিতেন।

এদিকে গোকুল আসিয়া উপস্থিত হইলে তারিণীচরণও দিন কতক কানাইলালের খুব অনুসন্ধান করিল। কেননা সেই বাগ্দী ছোঁড়াটা তখনও যদি আত্মগোপনের ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া প্রকাশিত হইয়া পড়ে, তবে তাহার সেতুবন্ধ যাওয়ার আর কোনো বাধা হয় না। কিন্তু যখন তেমন কোনো সুলক্ষণ সে দেখিতে পাইল না, অথবা মহেশ্বরীর হঠাৎ ঘরে ফিরিবারও সম্ভাবনা বুঝিল না, তখন সে ক্ষুণ্ণমনে দেশে প্রত্যাগমন করিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কানাইলালের এখন নানা প্রয়োজনের সহিত সম্পর্ক পাতাইতে হইতেছে। সুখ-সুপ্তির কক্ষ ছাড়িয়া সে সহসা এমন-এক শূন্য স্থানে আসিয়া ছিট্‌কাইয়া পড়িয়াছে যে, সেখানে আহার্য্য নাই—আশ্রয় নাই—বল-ভরসা নাই! আছে শুধু সুখ, শান্তি, আরাম ও বিরামের অন্ত্যেষ্টির বিপুল আয়োজন—মান-অভিমানের তাড়না, আর মর্ম্মভেদী বেদনা ও হাহাকার।

গণপতিরা যাঁটালের গৃহে উপস্থিত হইলে নলিনী-সকাল-সকাল রান্না বান্না সারিয়া গণপতি ও কানাইলালের জন্য ভাত বাড়িয়া কানাইলালকে ডাকিতে আসিল। কানাই বাহিরের ঘরে একখানি জীর্ণ তক্তপোষের উপর শুইয়া পড়িয়া তাহার বিপ্লব-শ্রান্ত হৃদয়টি শান্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিল। নলিনী আসিয়া তাহাকে ভাত খাইবার জন্য ডাকিয়া যখন তাহার নির্জ্জন চিন্তার মধ্যে একটা গোলমাল তুলিয়া বসিল, তখন সে সহসা মুখ ফিরাইয়া একবার জিজ্ঞাসা করিল।

"এরই মধ্যে রান্না হ'য়ে গেল?"

নলিনী কহিল "হুঁ!"

"দিয়েছ নাকি?"

"হুঁ।"

"কোথায়?"

"রান্নাঘরে। বাবাকে আর আপনাকে।"

কানাইলাল তাহার মুখ অন্যদিকে ফিরাইয়া লইল; এবং কতদিনের একটা ক্ষীণ স্মৃতি মনের মধ্যে সহসা ফুটাইয়া তুলিয়া তাহারই অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল। নলিনীর ডাকে সে যেন ঝট্‌পট্ উঠিয়া যাইয়া খাইতে বসিতে পারে না। তাহার এই ঝকমারির জীবনে যেন অনেক কথাই ভাবিয়া লইবার আছে। মহেশ্বরী তাহাকে নিজের হাতে মাখিয়া-জুখিয়া খাওয়াইয়া দিলেও সে তখন তাঁহাদের রান্নাঘরে ঢুকিবার অধিকার পায় নাই। তার পর সে-বার শান্তির শ্বশুরালয়ে তাহার উচ্ছিষ্ট লইয়া একটা লড়াই উঠিয়া, সে-সংসারে তাহার অধিকারের যে মাত্রা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিল, কানাইলালের হঠাৎ মনে উঠিল, সে-মাত্রাটা বুঝি বিশ্ব-সংসারের সহিত একই সম্বন্ধে জড়িত। গণপতিরা না জানিলে না শুনিলে কি হয়, সে লুকোচুরি খেলিয়া শয়তানের রঙে আপনাকে চিত্রিত করিতে পারিবে না। তাহাকে যখন বুঝাইয়া দিবার কেহ নাই,—সে কোন্‌খানে পা ফেলিবে—কোন্‌খানে ফেলিবে

না, তখন তাহাকে দূরে-দূরেই থাকিতে হইবে। সে নলিনীর দিকে ফিরিয়া কহিল, "আমার শরীরের গ্লানি এখনও যায়নি, কিছু খাবো না।"

নলিনী কহিল, "কাল কিছু খেলেন না, আজও খাবেন না? রুটি ক'রে দেবো?"

"না দিদি, দেখ্ছ না বিছানায় প'ড়ে রয়েছি—আমার ভারি অসুখ বোধ হচ্ছে।"

নলিনী কহিল, "কিছু না খেয়ে কি লোকে থাকৃতে পারে! একটু সুজি ক'রে দিই?"

কানাই বলিল, "না, সত্যিই বল্‌ছি, আমি এখন কিছু খেতে পারব না। ভালো বোধ করি ত তখন তোমায় ডেকে বল্‌ব।"

নলিনী যাইয়া গণপতিকে কহিল। গণপতি অন্নের থালা সম্মুখে লইয়া কানাইলালের অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "কি কানাই-বাবু, কিছুই খাবেন না নাকি? জ্বর-জারি হয়নি ত, বরং দু-চারখানা রুটি ক'রে দিক।"

কানাই বলিল, "আপনারা সবাই ব্যস্ত ক'রে তুল্‌ছেন! আমার যখন দরকার হবে চেয়ে নিয়ে খাবো। এখন একটু ঘুমিয়ে দেখি যদি শরীরটা ভালো হয়।"

গণপতি কহিলেন, "আমি ত খেয়েই বের হ'য়ে যাচ্ছি। লজ্জা করবেন না যেন। নলিনীকে ডেকে বল্‌বেন। যা হয় কিছু খাবেন। সারাদিন উপোষ ক'রে থাকবেন না।"

তা'র পর গণপতি আহার করিয়া কার্য্যস্থলে চলিয়া গেলেন।

কানাইলাল দেখিল, তাহার চলিবার পথে কোনো পথটাই পরিষ্কার নাই। সকলগুলিই নির্দ্দয়ভাবে আট্‌কাইয়া দিয়া কে যেন অলক্ষ্যে থাকিয়া শুনাইয়া দিতেছে,—পথ নাই! পথ নাই!!

নানারূপ দুশ্চিন্তা করিতে-করিতে কানাইলাল যখন ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িল, তখন সে নলিনীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এখানে একটা উহুন পেতে রান্নার ব্যবস্থা করা যায়?"

নলিনী জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

"রাঁধ্‌তাম।"

নলিনী একটু হাসিয়া কহিল, "কেন—আমাদের হাতে খাবেন না বুঝি?"

কানাই সঙ্কোচের সহিত বলিল, "আমি নিজে রেঁধে-বেড়ে খেলেই ভালো থাকৃব।"

"তাই বুঝি ও-বেলা খেলেন না? বরাবরই কি নিজে রেঁধে-বেড়ে খান্?"

"তা খাইনে, এখন থেকে খাবো।"

"আপনার গলায় কি পৈতে আছে?"

"তা নেই। আমি ত বামুন নই!"

"তবে কি?"

"মজুমদার।"

"তবে আমাদের হাতে খাবেন না কেন?"

"হাতে খেতে বাধা নেই। আমাকে কিছুকাল এই-ভাবে চল্‌তে হবে।" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "যা বল্‌লাম তা'র কোনো উপায় হবে?"

"দেখি মা'র কাছে জিজ্ঞাসা ক'রে আসি।"

এই বলিয়া নলিনী চলিয়া গেল; এবং মহামায়াকে সকল কথা বলিল। মহামায়া কহিলেন, "কাল থেকে না হয় তাই করবেন। আজ দু'দিন খাননি—আজ ঘরে খেলে পারতেন।"

নলিনী তাড়াতাড়ি আসিয়া কহিল, "আজকের দিনটা ঘরে খান—দু'দিন খাননি, কাল থেকে রেঁধে-বেড়ে, খাবেন।"

কানাই দেখিল, যে-সংশয়টা তাহার মনে জমাট বাঁধিয়া উঠিতেছে, তাহাকে এইরূপে থামাইয়া দিলে, এই নলিনী মেয়েটিই হয়ত একদিন-না-একদিন ছোঁয়াছুঁয়ি বিচার করিয়া যে-কারণে শান্তির ননদিনী তাহাকে দিয়া সমস্ত ঢেঁকিশালাটা গোময়লিপ্ত করাইয়া লইয়াছিলেন, ঠিক সেই কারণেই নিজেদের মধ্যে একটা অনিষ্ট ঘটনা করিয়া তুলিবে। প্রথম হইতেই ছাড়া-ছাড়া থাকিলে সকলের পক্ষেই মঙ্গল হইতে পারিবে।

সে কহিল, "না দিদি, আমি অকারণ কিছুই বলিনি। বোধ হয় সকল কথা জান্‌তে-শুন্‌তে পারলে তোমরা সন্তুষ্ট হ'তে পার্‌তে। কিন্তু সে উপায় নেই।"

নলিনী কহিল, "তবে আমি উনুন তৈরি ক'রে দিই, আপনি সকাল-সকাল রাঁধুন—তুদিন খাননি!"

এই বলিয়া সে বাড়ীর ভিতর হইতে একখানি খন্তা লইয়া আসিল; এবং মাটি খুঁড়িয়া উপরে তিনদিকে তিনখানি ইঁট বসাইয়া অবিলম্বে একটি উনুন তৈরি করিয়া দিল। তা'র পর একখানি থালায় করিয়া চা'ল, ডা'ল, নুন, তেল, দুটি লঙ্কা, চারিটি আলু, একটু হলুদের গুঁড়া ও এক-ঘড়া জল আনিয়া দিল। রাঁধিবার জন্য একটি পিত্তলের ডেক্ আনিয়া দিলে কানাইলাল বলিল, "একটা মেটে হাঁড়ি পেলে ভালো হয়। এসব আবার মাজা-ঘষা করতে হবে—হাঙ্গামা আছে।"

নলিনী বলিল, "সে আমি ক'রে দেবো।"

কানাই কহিল, "না। এম্‌নি কত-কি করতে হবে। তুমি দেখ যদি একটা হাঁড়ি পাও।"

নলিনী তখন বাড়ীর মধ্যে যাইয়া সিকার উপর টাঙানো যেসব হাঁড়ি নানাবিধ দ্রব্য উদরে লইয়া বিরাজ করিতেছিল, তাহার মধ্য হইতে একটি বাছিয়া বাজাইয়া লইয়া চলিয়া আসিল; এবং চুল্লীতে আগুন ধরাইয়া দিল। বলিল, ভাতটা চাপিয়ে দিন আমি মশলা বেটে আনি।"

কানাই কহিল, "ডা'ল আর রাঁধব না—আলু ভাতে দিলেই হবে।"

নলিনী বলিল, "শুধু আলু-ভাতে দিয়ে কি খাওয়া যায়? ডা'লটা রাঁধুন—কতক্ষণ লাগ্‌বে!"

কানাই কহিল, "কিচ্ছু দরকার নেই। আলুভাতে দিয়েই বেশ খাওয়া হবে।"

নলিনী কিছু না বলিয়া বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল; এবং একখানি নেকড়া আনিয়া ডালগুলি লইয়া একটি পুঁটুলি বাঁধিল। বলিল, "ভাতের মধ্যে ছেড়ে দেবেন। আলুভাতে আর ডা'লভাতে হবে, আর একটু দুধ এনে দেবো।"

কানাই তখন ভাতের হাঁড়িতে নলিনীর নির্দ্দেশমতো জল দিয়া চা'ল আলু এবং ডা'লের পুঁটুলিটি তাহাতে ছাড়িয়া দিল। নলিনী বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ বাদে সে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, উনুনে জাল হু-হু করিয়া জ্বলিতেছে! ভাতের হাঁড়িটার দিকে নিরীক্ষণ করিয়া সে কহিল, "করেছেন কি? সব যে জ্বলছে!—কাঠ-ক'খানা তু'লে ফেলুন। কাঠিতে দুটো ভাত তু'লে টিপে দেখুন ত—ভাত বোধ হয় হ'য়ে গেছে—গ'লে গেল যে!"

কানাইলাল ভাত লইয়া টিপিয়া দেখিল। বলিল, "হ'য়ে গেছে।" সে তাড়াতাড়ি বেড়ি দিয়া হাঁড়িটা নামাইল। নলিনী কহিল, "নামিয়ে ফেল্‌লেন? ফেন রইল যে, ফেনসুদ্ধ ভাত খাবেন কি ক'রে? হাঁড়িটা চুল্লীর উপর তু'লে দিন। মুখে সরা চাপা দিয়ে মালসাটায় ফেন গেলে ফেলুন। বেড়িটা শক্ত ক'রে ধর্‌বেন। দেখ্‌বেন যেন স'রে এসে ভাত-সুদ্ধ গায়ে-পায়ে না পড়ে।"

ভাতের ফেন গালা হইলে নলিনী উঠিয়া যাইয়া বাগান হইতে দুটা কাঁচা-লঙ্কা তুলিয়া আনিল। বলিল, "কাঁচা-লঙ্কা না হ'লে ভাতে-পোড়া খেয়ে সুখ হয় না। থালাটায় ভাতগুলো ঢেলে ফেলুন। সরাতে আলু আর ডা'লভাতে মেখে নেবেন।"

কানাই বলিল, "থালাটা আর এঁটো করব না। সাম্‌নেই ত কলার পাতা রয়েছে, একখানা কেটে নিলেই হবে।

নলিনী হাসিয়া কহিল, "ওঃ! আপনি মোটেও গায়ে সেক-তাপ লাগাবেন না—অথচ রেঁধে খেতে চান!"

কানাই বলিল, "সেই ত ভালো। পাতাটা ফে'লে দিলেই চু'কে যাবে।"

নলিনী তখন নিজেই একখানা পাতা কাটিয়া আনিয়া দিল। তা'র পর সে যেমন-যেমন দেখাইয়া দিল, কানাই সেইরূপ করিয়া রাঁধিবার পাত্রগুলি ধুইয়া-মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিয়া দিল। তা'র পর খাইতে বসিল। নলিনী কিছু দুধ ও একটু গুড় আনিয়া দিল। বলিল, "দুধ বড় কম হ'ল। একটা গরু মোটে,—বাবার আবার দুবেলা একটু-একটু দুধ নইলে খাওয়া হয় না।"

কানাই কহিল, "দুধ না হ'লেও চল্‌ত। গরম-গরম ভাতে একটা ভাতে-পোড়া হ'লেই যথেষ্ট,—তাই দু-দুটো হ'ল। আর চাই কি?"

"সে সন্ন্যাসী মানুষের চলে। দুইতিন তরকারী না হ'লে বাবা দেখি মুখ শিঁটকতে লাগেন।"

নলিনীর এই ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ ভাব সন্ধানে-সন্ধানে যেন কানাইলালের কোন্ জমাট-বাঁধা স্মৃতির দুয়ার অল্পে-অল্পে খুলিয়া দিতে লাগিল। একটা রুদ্ধ ক্রন্দনের উচ্ছ্বাস চাপিয়া লইয়া কানাইলাল চক্ষু-দুটি একবার মুছিয়া লইল।

ইতিমধ্যে গণপতি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি এইসমস্ত দেখিয়া কিছুকাল বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কানাই-বাবু, এসব হয়েছে কি ?"

কানাই হাসিয়া কহিল, "স্বপাকে খেলাম—এই-ই ভালো।"

গণপতি মেয়েকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন "ভাত ছিল না বুঝি ?" তা তোরা সকাল-সকাল দুটো রেঁধে দিতে পারিসনি ?"

নলিনী মুখ কঁচুমাচু করিয়া কহিল, "উনি শুন্‌লেন না যে! যতদিন থাক্‌বেন নিজেই নাকি রেঁধে-বেড়ে খাবেন।"

গণপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাই নাকি কানাই-বাবু? কেন এমন স্থির করেছেন ?"

"কেন—সে-কথা বুঝিয়ে বল্‌বার অধিকার আমি এখনও পাইনি। এ বেশ হবে, আপনারা কিছু মনে কর্‌বেন না।"

"আপনি এ-বড় লজ্জার মধ্যে ফে'লে দিলেন। সত্যি-সত্যি আপনি কারুর হাতে খান না নাকি ?

"তা খাই। কিন্তু এখন থেকে কেন খাবো না সে-কথা বুঝিয়ে বল্‌বার মতো আমার কিছু জানা নে আপনি কাপড়-চোপড় ছাড়ুন গিয়ে। এইত রান্না-বান্না ক'রে খেলাম, কোনো কষ্টই হয়নি।"

গণপতি চলিয়া গেলেন।

(ক্রমশঃ)

বিহারে বাঙ্গালী উপনিবেশ

শ্রী জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস

পাটনার সহরের পশ্চিম ভাগের নাম বাঁকীপুর। বৌদ্ধ যুগে এখানে দুইটি গ্রাম ছিল। সম্রাট্ অশোকের দ্বিতীয়া মহিষী "কারুবাকী"র নাম হইতে একটির নাম ছিল "কারুবাকীপুর" এবং তাঁহার গর্ভজ পুত্র জয়বরের নামে দক্ষিণ পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের নাম ছিল "জয়বরপুর"। মুসলমান যুগে উভয় নাম একত্র করিয়া গ্রাম দুটি "বাঁকীপুর-জয়বর" এই নামে প্রসিদ্ধ হয়। * পরে য়ুরোপীয় অধিকারে আসিয়া ইহা "বাঁকীপুর" নামে অভিহিত হয় এবং আয়তনে বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়। পাটনার প্রধান-প্রধান এবং আধুনিক অধিকাংশ বাঙ্গালী এই স্থানেই বাস করেন।

পূর্ব্বে সোরার কারবার-সূত্রে এখানে ওলন্দাজ ও ইংরেজের আবির্ভাব হয়। ১৬৫০-৫৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে গঙ্গার অপর পারস্থ সিংনা গ্রামে সর্ব্বপ্রথম ইংরেজ বণিকের কুঠী স্থাপিত হয়। আফিং, গালা ও সোরা তাঁহাদের বাণিজ্যের প্রধান পণ্য ছিল। ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর লবণ ও সোরার ব্যবসায় সূত্রে বহু বাঙ্গালী এখানে স্থায়ী বাস স্থাপন করেন। তখন আফিমের কুঠীতেও অনেক বাঙ্গালী কর্ম্ম করিতেন। কিন্তু কোম্পানীর আমলের বহু পূর্ব্ব হইতেই অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে বঙ্গের সম্ভ্রান্ত ঘরের সন্তানগণ তখনকার রাজভাষা ফারসী শিক্ষার জন্য প্রায়ই পাটনা-প্রবাসী হইতেন। সার্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় তাঁহার জনৈক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী নদীয়া 'মাঝের গ্রাম'-

* "Pataliputra" by Manoranjan Ghosh, M. A., Curator, Patna Museum, p. 29, Appendix D.

নিবাসী ৺গোপীনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র মহেশ-চন্দ্রকে পাটনা প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি কিছুকাল এখানে পারস্য-ভাষা শিক্ষা করিবার পর বাবু প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেষ্টায় আফিমের কুঠীতে কর্ম্ম প্রাপ্ত হন এবং বাঁকীপুরে স্থায়ী বাস স্থাপন করেন। তাঁহারই দুই পুত্র সব্‌জীবাগের বাটীতে জন্মগ্রহণ করেন। কনিষ্ঠ বাবু হরিদাস চট্টোপাধ্যায় গয়াকেই নিজ কর্ম্মক্ষেত্র করিয়া লন। জ্যেষ্ঠ কালিদাস-বাবু উক্ত আফিসের কুঠীতে কর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া দক্ষতার গুণে সর্ব্বোচ্চ পদ লাভ করেন। পাটনা-প্রবাসী রাজা শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী অম্বিকাসুন্দরী দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। কালিদাস-বাবুর আন্তরিক কালীভক্তি তাঁহার নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিল। তিনি শেষ-পর্য্যন্ত ভক্তিভরে কালীপূজা করিয়া ১৯০২ খৃষ্টাব্দে প্রতিমা-বিসর্জ্জনের দিন মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার সন্তানাদি হয় নাই। কাশীর কাপাশী ব্রহ্মপুরীতে তিনি একটি শিবমন্দির স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পিতা মহেশ-বাবু যখন ফারসী শিক্ষার জন্য পাটনা যাত্রা করেন, তখন তাঁহার স্বগ্রামনিবাসী পাটনার বিখ্যাত উকীল এবং "Travels in India" নামক পুস্তকের লেখক ৺শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা ৺গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সহযাত্রী হইয়াছিলেন। গোপাল-বাবুও আফিম-বিভাগে কর্ম্ম লইয়া বাঁকীপুরে স্থায়ী হইয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় ১৭৮৬ অব্দে দ্বাদশ-বর্ষ-মাত্র বয়সে স্বনামধন্য মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় পারস্য ও আরবী ভাষা শিক্ষার জন্য পাটনা-প্রবাসী হইয়াছিলেন। গঙ্গার উপকূলে যথায় জগৎশেঠের প্রাসাদ ছিল, তাহার নিকটে অর্থাৎ বর্ত্তমান বিলুপ্ত প্রাসাদ ও দুর্গের মধ্যবর্ত্তী মাদ্রাসার সন্নিহিত পল্লীর কোনো বাটীতে তিনি বাস করিতেন এবং উক্ত মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করিতেন। সে বাটীর সন্ধান আমরা পাই নাই। তিন বৎসরে এখানে জনৈক মৌলবীর নিকট শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি সংস্কৃত শিক্ষার জন্য বারাণসী গমন করেন। এই শিক্ষার ফলে তিনি উত্তরকালে মুসলমান-সুধী-সমাজে "জবরদস্ত্‌ মৌলবী" নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। বাঁকী-পুরের প্রবীণ উকীল শ্রীযুক্ত রামলাল সিংহ মহাশয় তাঁহার গৃহ সযত্ন-রক্ষিত রাজার লিখিত একখানি পুস্তিকা আমাদের দেখান।* উহা পাটনার অ্যালেনব্যাক্ সাহেবকে রাজা উপহার দিয়াছিলেন। উক্ত সাহেব তখন গুলজার-বাগে থাকিতেন। উপহৃত পুস্তকের নাম পত্রের উপর রাজা স্বহস্তে লিখিয়াছেন—William Allenback from the Author.

শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে বাঁকীপুর সহরের মারুফগঞ্জ-পল্লীতে ব্যবসায়-উপলক্ষে কয়েকজন বাঙ্গালী আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। লবণ, চাউল, গম, তিসি, তৈল, তুলা প্রভৃতির অনেকগুলি গদি তাঁহারা এখানে স্থাপিত করিয়াছিলেন। আজিও তৈলাদির আড়ত এখানে বিদ্যমান আছে। ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল হইতে ইংরেজের সোরা ও নিমকমহালের যে-সকল বাঙ্গালী এদেশবাসী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী কালের বাঙ্গালী ব্যবসায়ীরা এখানে ৫২টি গদি স্থাপিত করেন। তন্মধ্যে মানকুণ্ডের খাঁ-বাবুদের গদি ছিল প্রধান। মারুফগঞ্জে তাঁহারা প্রতিষ্ঠিত হইয়া পাটনায় সর্ব্বপ্রথম জাতীয় অনুষ্ঠান দুর্গাপূজার প্রবর্ত্তন করেন। মুর্শিদাবাদের সাহাদের বাড়ী মারুফগঞ্জে এখনও বিদ্যমান আছে। ৫২ গদির অন্যতম গদিয়ান দেবীপুরের ভূস্বামী সিংহ-বাবুরা মহাজন হইতেই জমিদার হন। কলিকাতা ও কাল্‌নায় তাঁহাদের সদর গদি ছিল। কালনার অংশবিশেষ এখনও তাঁহাদের জমিদারি-ভুক্ত। বাঁকীপুরে তাঁহাদের এক প্রকাণ্ড অট্টালিকা আজও বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের বংশধরগণ এখানে বাস না করায় তাহা শূন্য পড়িয়া আছে এবং অযত্নে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। এই পল্লীতে একসময় বাঙ্গালী-প্রাধান্য থাকায় ইহা "বাবুয়াগঞ্জ" নামে আজিও প্রসিদ্ধ। শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ মহাশয় ইঁহাদের সম্বন্ধে এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—"৬৫ বৎসর বয়ঃক্রম-কালে নীলাম্বর কাশীদর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন এবং দেবীপুরের অন্যতম জমিদার শ্রীযুক্ত নন্দগোপাল সিংহ ও শ্রীযুক্ত আনন্দগোপাল সিংহ মহাশয়দিগের পিতৃদেব স্বর্গীয়

* Translation of Ishopanishad one of the chapters, of the Zajurveda". By Ram Mohon Ray, Calcutta. Printed by Phillip Pereira, at the Hindustanee Press, 1816.

বঙ্কুবিহারী সিংহ মহাশয়ের নিকট নিজ অভিলাষ জ্ঞাপন করেন। তিনি পাটনার ফেরত নৌকায় পাটনার গদিয়ান বর্দ্ধমান কোণ্ডারপাড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত রামলাল রায় মহাশয়ের উপর কাশী পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিবার হুকুমনামাসহ প্রেরণ করেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় কাশী দর্শন তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই। পাটনা যাইবার কালে পথিমধ্যে নৌকাতেই তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন। তিনি আশ্বিন মাসে পাটনাতে দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি যে সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতেই আমরা একথা জানিতে পারি। সে গানে আছে "পাটনাতে সিজিদের গদী, এখানে হলো সমাধি।" *

ভিখ্‌না পাহাড়ী † বাঁকীপুরের একটি পল্লী। এখানে এক শতাব্দীর উপর হইল, বল্লভীকান্ত ঘোষ মহাশয় পাটনায় আসিয়া বিস্তৃত ভূসম্পত্তি করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশধর হরগোবিন্দ ও জয়গোবিন্দ ঘোষ ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত ইমাম-বাদী বেগমের দিয়ারা জমি অর্থাৎ করভূমি লইয়া ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে যে মোকদ্দমা হয়, তাহাতে তাঁহাদের অনেক বিষয় নষ্ট হইয়া যায়। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে সেই মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হয়।§ পাটনার সুযোগ্য উকীল শ্রীযুক্ত রামলাল সিংহ মহাশয়ের গৃহে রক্ষিত একখানি 'মুগ্ধবোধ' ব্যাকরণের পত্র-পৃষ্ঠে আমরা দেখিলাম হরগোবিন্দ বাবু স্মারকস্বরূপ স্বহস্তে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন—"শ্রীহরগোবিন্দ ঘোষস্য পুস্তকমিদং ১৫ বৈশাখস্য সন ১২৩৫ সাল বরাহনগর।" ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, কলিকাতার উপরস্থ বরাহনগরে তাঁহাদের পূর্ব্ববাসস্থলী ছিল। ইহারাই এখানে বাসন্তী পূজার প্রবর্ত্তন করেন। এ-পূজা প্রতিবৎসর এখনও চলিয়া আসিতেছে। এই ঘোষ-বংশের তৃতীয় পুরুষ বাবু গঙ্গাধর ঘোষ পাটনা জজের সেরেস্তাদার ছিলেন। তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্র স্বনামখ্যাত স্বর্গীয় রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাদুরের শ্বশুর ৺কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ রায় বাহাদুর আফিম মহলের সেরেস্তাদার এবং স্থানীয় মিউনিসিপালিটির কমিশনর ছিলেন। এখানে তাঁহার সামান্য জমিদারিও আছে। কৃষ্ণ-বাবুর ভাগিনেয় ৺অম্বিকাচরণ ঘোষ মহাশয় হিন্দী তুলসীদাসী রামায়ণের বঙ্গানুবাদ ও "ভিক্টোরিয়া চরিত" নামে দুইখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। উক্ত ঘোষ-বাবুদের পর বাবু শ্যামলাল মিত্রের পিতা দেওয়ান রামসুন্দর মিত্র মহাশয় নিমকের দেওয়ান হইয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে আসিয়া পাটনা-প্রবাসী হন। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। তিনি কলিকাতার শ্যামবাজার নিবাসী প্রসিদ্ধ জমিদার ৺মোহনলাল মিত্র মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষ। দেওয়ান রামসুন্দর মিত্র গয়া-জেলায় বিস্তৃত জমিদারি করেন এবং পাটনায় সর্ব্বপ্রথম পাকাবাড়ী নির্ম্মাণ করান। এজন্য সব্‌জীবাগের এই বাড়ী এখানে "পাকাবাড়ী" নামে আজিও বিখ্যাত। শোণপুরের হরিহর ছত্রের মেলার হরিহর নাথ শিবলিঙ্গের মন্দিরের নিকট যে কালীমন্দির আছে, তাহা রামসুন্দর-বাবুর স্থাপনা। গঙ্গার মোরাদপুর ঘাটের উপর বিরাজিত সতীমন্দির রামসুন্দর বাবুর দুই স্ত্রীর মধ্যে এক স্ত্রীর পুণ্যস্মৃতি বহন করিতেছে। বঙ্গদেশ হইতে পূর্ব্বে নৌকাযোগে যাঁহারা গয়া প্রভৃতি তীর্থে যাইতেন, তাঁহাদের তখন মিত্র মহাশয়দের বাড়ী আসিতে হইত। স্বর্গীয় যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় গয়াতীর্থ ভ্রমণ-কালে ইহাঁদেরই বাড়ী আসিয়াছিলেন। বিহারে ইহাঁদের বিস্তীর্ণ জমিদারি, বাড়ীঘর প্রভৃতি কর্ম্মচারী দ্বারা সুরক্ষিত। ডাক্তার মার্টিন সাহেব তাঁহার "প্রাচ্য ভারত" নামক গ্রন্থে * শাহাবাদ জেলার "সাসারাম" বা "রোহটাস"-এর বিবরণ প্রসঙ্গে রামসুন্দর-বাবুকে "This smart young man" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। "Sudder Dewayn Select Report"এও তাঁহার উল্লেখ আছে।

বাঁকীপুরের পূর্ব্বাংশে গায়ঘাট নামক পল্লীতে আমরা বাঙ্গালীর একটি কীর্ত্তি-নিদর্শন বিরাজিত দেখিলাম।

---

* বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন, ৮ম অধিবেশনের বিবরণ (বর্দ্ধমান ১৩২১)

† "*** the hill of Bhikshus (Buddhist mendicants). It is the westernmost Buddhist stupa of Ancient Pataliputra. At its foot was a Buddhist monastery for female mendicants."—*Pataliputra* by M. Ghosh, M. A., Curator, Patna Museum.

§ *Vide* Mustt. Imambadi Begam *versus* Hargobind Ghosh, Moor's Indian Appeals, Vol. IV., p. 403.

* Dr. Montgomery Martin's Eastern India.

এখানে বৈষ্ণব গোস্বামীদের একটি মঠ ও মন্দির আছে। কথিত আছে যে, এই মঠ তিন চারিশত বৎসরের পুরাতন। এক্ষণে মঠটি হিন্দুস্থানী বৈষ্ণবদের অধিকারগত। ইহা "চৈতন্ত মঠ" নামে অভিহিত। মঠের বহির্দ্বারের শীর্ষ-দেশে "শ্রী ৵ শ্রী" এই চিহ্ন + সহ "শ্রীশ্রীরাধারমণ ভট্ট গোপাল শ্রীবৃন্দাবন নিত্যবিহার" এইরূপ লিখিত আছে। 'চৈতন্তমঠ' প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে গোপাল ভট্ট গোস্বামীর বংশধর গোস্বামী শ্রী সিতাবলালজীর হস্তগত হয়। তাঁহার পর ক্রমান্বয়ে "শ্রী গৌরকিশোর শ্রী বৃজকিশোর গোস্বামী ও শ্রী রাধালাল গোস্বামীর অধিকারে থাকে।" এক্ষণে ইহা রাধালাল গোস্বামীর ভ্রাতা বর্ত্তমান মঠাধিকারী শ্রী কৃষ্ণচৈতন্য গোস্বামীর তত্ত্বাবধানে আছে। এই মঠ পূর্ব্বে প্রাচীন ঔপনিবেশিক বাঙ্গালী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহা যাঁহাদের দ্বারা অধিকৃত ও পরিচালিত ছিল, তাঁহাদের গোমস্তা বা উকীল ৵শম্ভুচন্দ্র সান্ন্যাল কর্ত্তৃক "১২১০ হিজরী, ১২০৩ ফসলী, ইংরেজী ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে" লিখিত দানপত্র দ্বারা হস্তান্তরিত হইয়াছিল। মূল দানপত্র বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত, উহার হিন্দী ও উর্দ্দু অনুবাদও আমরা মূলের সহিত রক্ষিত দেখিলাম। হিন্দী দানপত্র-খানিতে "শ্রী লালবিহারী শর্ম্মণঃ, শ্রী কুঞ্জবিহারী শর্ম্মণঃ, শ্রী ব্রজকিশোর শর্ম্মণঃ" এইরূপ বঙ্গাক্ষরে তিনটি দস্তখত দেখা গেল। দানপত্রে "শ্রীশ্রী ঈশ্বর-সেবা করকে পরম সুখ ভোগ কর" এইরূপ গ্রহীতার প্রতি উক্ত হইয়াছে। মঠের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ মৌজা জালালপুর ও ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র ভূখণ্ড দান করা হইয়াছে। উকীল শম্ভুচন্দ্রের পিতার নাম "রাম-নারায়ণ" এবং পিতামহের নাম "রামচন্দ্র সান্ন্যাল" বলিয়া লিখিত আছে। দাতৃগণ যে "বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ" এ-কথাও স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হইয়াছে। এখানে চৈতন্যদেব প্রবর্ত্তিত মৃন্ময়-খোল-বাদ্যসহ কীর্ত্তন হইয়া থাকে। মন্দির মধ্যে শ্রী চৈতন্যদেব এবং শ্রী মন্নিত্যানন্দ দেবের দণ্ডায়মান মূর্ত্তি বিরাজিত। পরিচ্ছদ হিন্দুস্থানী; চুড়ীদার পাজামার উপর অঙ্গরাখা এবং মাথায় বাঁকা টুপী! মঠ হইতে "চৈতন্য চন্দ্রিকা' নামে একখানি হিন্দী মাসিক পত্র ১৯১৯-২০ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রকাশিত হইতেছে। বর্ত্তমান মঠধারী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচৈতন্য গোস্বামী মহাশয় * এই পত্রিকার সম্পাদক। মঠে একটি গ্রন্থাগার আছে, তাহাতে চারি পাঁচশত বৈষ্ণবধর্ম্ম-ও বিবিধ-বিষয়ক বাঙ্গালা গ্রন্থ রক্ষিত হইয়াছে। মঠে প্রবেশ করিতেই একটি ফলবান্ নারি-কেল বৃক্ষ প্রথমেই বঙ্গের পল্লীগৃহ স্মরণ করাইয়া দেয়। নারিকেলের বরফির ন্যায় মিষ্টান্ন মন্দিরে প্রস্তুত করিয়া ভোগ দিবার প্রথাও এখানে পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছে। বিহারের স্থানে-স্থানে দেখা গিয়াছে যে, পুরাতন নারিকেল বৃক্ষ যথায় আজিও বিদ্যমান আছে, অথচ তাহা কবে কাহার দ্বারা রোপিত হইয়াছিল তাহার নিদর্শন নাই, তথায় যে একসময় বাঙ্গালীর বাস ছিল, অনুসন্ধানে তাহা জানা গিয়াছে। এইরূপ গায়ঘাট-পল্লীতে নারিকেল বৃক্ষ-বিশিষ্ট আর একটি বাড়ী আছে। এই অট্টালিকা প্রকাণ্ড ও পুরাতন। পূর্ব্বে ইহা কোনো মুসলমান নবাবের ছিল। পরে ইহা কাহ্নপাড় নামক নাজারতের এক চাপ্রাসীর অধিকারে আসে; অতঃপর নাজীর তাহা ক্রয় করিয়া লন এবং স্বীয় কন্যা তুলসা-বিবিকে দান করেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে স্বনামখ্যাত স্বর্গীয় কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের মেসো মহাশয় ৵হেমচন্দ্র বরাট তুলসা-বিবির নিকট হইতে উক্ত ভদ্রাসন ক্রয় করেন। হেমবাবুর পুত্র শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন বরাট এক্ষণে সেই বাড়ীতে বাস করিতেছেন। তাঁহার বয়স এক্ষণে প্রায় ৭০ বৎসর হইবে। তিনি উত্তর-ভারতে বহুস্থানে প্রবাস-বাস করিয়াছিলেন এবং আলমোড়া-বাসকালে "The Swami of Almora" নামে খ্যাত বাঙ্গালী সন্ন্যাসীর শেষ জীবনে সেবা ও সমাধিদান-বিষয়ে অন্যতম সহায় হইয়াছিলেন। কবিবর দেবেন্দ্রনাথ সেন গায়ঘাটস্থ এই বাড়ীতে থাকিয়া পাটনা-কলেজে অধ্যয়ন করিয়া এখান হইতে এফ্-এ পরীক্ষা দিয়া গাজীপুর গমন করেন। এতদঞ্চলে "নাদন" নামে একটি গ্রাম আছে। এখানেও একস্থানে দুই একটি পুরাতন নারিকেল বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তথায় বাঙ্গালী বাসের চিহ্নমাত্র নাই। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, ঐ স্থান একসময়ে বাঙ্গালী জমিদারের অধিকারভুক্ত ছিল। কোম্পানীর আমলের প্রারম্ভে সেট্‌লমেন্টের কর্ম্মসূত্রে বাবু রাধামোহন নিয়োগী

+ শ্রীমতীর চরণের নূপুর-চিহ্ন।

* ইঁহারই সৌজন্যে আমরা মূল দানপত্রখানি দেখিতে পাইয়াছিলাম।

বঙ্গদেশ হইতে আসিয়া নাদন গ্রামকে স্বীয় কর্ম্মকেন্দ্র করিয়া তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী ভূসম্পত্তি অধিকার করিতে-করিতে ক্রমে বিস্তৃত জমিদারি করিয়া ফেলেন। রামমোহন বাবুর আদিবাস ছিল চন্দ্রনগর। তাঁহার পোষ্যপুত্র রামরতন, (সাধারণতঃ রতন নিয়োগী নামে পরিচিত) অতিশয় দুর্দ্দান্ত এবং প্রতাপশালী ছিলেন। কিন্তু তিনিই সেই সমস্ত ভূসম্পত্তি নষ্ট করেন। এক্ষণে কয়েকটি নারিকেল বৃক্ষ ব্যতীত তাঁহার ভিটার কোনো চিহ্নই নাই।

প্রায় ৮৪।৮৫ বৎসর পূর্ব্বে স্থানীয় জজ আদালতের প্রবীণ উকীল প্রত্নতত্ত্বানুরাগী শ্রীযুক্ত রামলাল সিংহের পিতামহ ৺হরচন্দ্র সিংহ মহাশয় বারাসত হইতে আসিয়া পাটনা কমিশনর অফিসের একাউণ্টাণ্ট্ হন এবং মোরাদ-পুরে ভদ্রাসন নির্ম্মাণ করিয়া স্থায়ী বাস স্থাপন করেন। মোরাদপুর পল্লী বাঁকীপুরের বাঙ্গালীদের একটি প্রধান উপনি-বেশ স্থল। ৺হরচন্দ্র বাবুর পুত্র স্বর্গীয় বাবু ঈশানচন্দ্র সিংহ পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি ছোটো আদালতের দপ্তরে হেড ক্লার্কের কর্ম্ম করিতেন। তাঁহাকে পারস্য ভাষার কাগজপত্র ইংরেজীতে এবং ইংরেজী হইতে পারস্য ভাষায় অনুবাদ করিতে হইত। রামলাল-বাবু পিতার অধ্যয়ন-স্পৃহা এবং সাহিত্যানুরাগ উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছেন। তাঁহার অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি, ইতিহাস-জ্ঞান, পুরাতত্ত্বানুসন্ধান, সাহিত্যানুরাগ এবং প্রৌঢ় বয়সে যৌবনের উদ্যম অতিশয় প্রশংসনীয় এবং স্পৃহণীয়। সিংহ-মহাশয় বিহারের নানা স্থান হইতে প্রাপ্ত বিভিন্ন যুগের পুরা-দ্রব্য ও পুরাতত্ত্ব সংসৃষ্ট ইষ্টক ও মূল্যবান্ পাষাণখণ্ড সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার গৃহ বহুদিন হইতে সাহিত্যিকগণের সমাগমস্থান এবং সাহিত্যালোচনার একটি কেন্দ্র হইয়া আছে। স্বনামখ্যাত নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় তাঁহার বাড়ীতে অবস্থান করিয়া "কমলে কামিনী" নাটকের অনেকাংশ লিখিয়াছিলেন। মিত্র-মহাশয়ের ব্যবহৃত টেবিল-চেয়ার, মস্যাধার প্রভৃতি এখানে অতিযত্নে রক্ষিত হইতেছে। সময়-সময় নবীন পণ্ডিত মহাশয়, কবিবর ডি, এল্, রায়-প্রমুখ প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকগণ সিংহ মহাশয়ের বৈঠকখানা-বাড়ীতে আসিয়া বাস করিতেন এবং সাহিত্যালোচনায় অতিবাহিত করিতেন। রামলাল-বাবু আদালতের কর্ম্ম ব্যতীত যাবতীয় কল্যাণকর অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া থাকেন এবং ইতিহাস-চর্চ্চায় ও সাহিত্য-সেবায় আনন্দানুভব করেন। তাঁহার লিখিত "জগৎ শেঠ" এবং "রাজগৃহ" ভারতবর্ষ এবং নব্যভারতের পাঠকের নিকট অবিদিত নাই। পাটনার ঔপনিবেশিক ও প্রবাসী বাঙ্গালীদের তথ্য-সংগ্রহ-কার্য্যে সাহায্য করিয়া এবং এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থানের নানা দর্শনীয় স্থান ও বস্তু প্রদর্শন করিবার কষ্ট স্বীকার করিয়া তিনি লেখককে চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ করিয়াছেন। পাটনা মিউজিয়ামের কিউরেটর শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ঘোষ, এম্‌-এ, মহাশয় ইংরেজী ভাষায় "পাটলিপুত্র"-নামে পাটনার যে প্রাচীন ও আধুনিক ইতিবৃত্ত লিখিয়াছেন, তাহার পরিশিষ্টস্বরূপ রামলাল-বাবুর লিখিত পাটলিপুত্রের প্রাচীন ও আধুনিক কীর্ত্তি-নিদর্শন-সমূহের ইতিহাসাংশ * সংযুক্ত করিয়া তিনি তাঁহার উপাদেয় পুস্তিকার উপাদেয়ত্ব বৃদ্ধি করিয়াছেন। মনোরঞ্জন বাবু পাষাণতত্ত্বানুসন্ধানে (paleolithic researches) পারদর্শিতার জন্য খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। তাঁহার পিতা ২৪ পরগণা বড়জ-গদিয়া-গ্রাম-নিবাসী বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে আসিয়া বাঁকীপুর-প্রবাসী হইয়াছিলেন।

---

* "Monuments of Pataliputra, Past and Present." By Babu Ram Lal Sinha, B. L.—being Appendix D, to *Pataliputra* By M. Ghosh, M. A., Curator, Patna Museum, pp. 28-49.

প্রাচীন-ভারতীয় আকাশপোতে পারদ-ব্যবহার*

শ্রী জগদ্বন্ধু মুখোপাধ্যায়

প্রাচীন ভারতে আকাশযান ছিল তাহা প্রমাণ করিয়া পরে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে কোনো কোনো আকাশপোত পারদ-সাহায্যে চালিত হইত।

প্রাচীন ভারতে আকাশযানের বহুল প্রচলন ছিল বুঝিতে পারা যায়। এ-সম্বন্ধে রামায়ণ, মহাভারত, কাব্য, পুরাণ ও তন্ত্র হইতে প্রচুর উপাদান সংগ্রহ করা যাইতে পারে। মহাভারত আদিপর্ব্ব পাঠে জানা যায় দেবগুরু বৃহস্পতির ভাগিনেয় দেবশিল্পী (Engineer ?) বিশ্বকর্ম্মা সহস্র-সহস্র শিল্পসৃষ্টির মধ্যে দিব্য বিমানসমূহের নির্ম্মাণকর্ত্তা ছিলেন। বায়ুপুরাণে দেখিতে পাই, মেরু পর্ব্বতের বিভিন্ন স্তরে চাকচিক্যশালী অসংখ্য আকাশপোত চতুর্দ্দিক্ সমুদ্ভাসিত করিয়া রহিয়াছে। তন্মধ্যে ব্রহ্মার বিমান অতীব বৃহৎ ও মহাগুণসম্পন্ন। মহাভারতের আদিপর্ব্বে অন্যত্র দৃষ্ট হয়, ব্যাসদেব ঋষিগণের ব্রহ্মার সভায় গমন-পথের বর্ণনাস্থলে বলিতেছেন, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা ও দেবগণের ক্রীড়াভূমি শত-শত বিমানে পূর্ণ রহিয়াছে। রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে বর্ণিত আছে, শিব পার্ব্বতীর সহিত বৃষে আরোহণপূর্ব্বক (বায়ু মার্গেণ গচ্ছন্) বায়ুমার্গে যাইতে যাইতে রোদন-ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। বৃষে আরোহণ করিয়া বায়ুমার্গে যায় কি করিয়া? আমার মনে হয়, শিবের আকাশযান বৃষের আকার-বিশিষ্ট অথবা বৃষ-চিহ্নিত ছিল। মার্কণ্ডের দেবী-যুদ্ধ বর্ণনাস্থলে বলিতেছেন—ব্রাহ্মণী (হংসযুক্ত-বিমানাগ্রে) হংসমূর্ত্তি-সমলঙ্কৃত বিমানে, মহেশ্বরী (বৃষারূঢ়া) বৃষচিহ্নিত বিমানে, কৌমারী (ময়ূর-বাহনা) ময়ূরমূর্ত্তি সমলঙ্কৃত বিমানে আরোহণপূর্ব্বক দেবতাগণের সহিত যুদ্ধ করিতে যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। বায়ু-পুরাণে দেখিতে পাই কার্ত্তিকেয়ের শরবনে জন্মের পর দেবগণ যখন তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন, তখন আকাশে এত বিমান সমবেত হইয়াছিল যে (বিমানযানৈরাকাশম্ পতত্রিভিরিবাবৃতং) মনে হইতেছিল আকাশ যেন পক্ষিগণ দ্বারা সমাবৃত হইয়াছে। রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ড পাঠে জানিতে পারি বিভীষণ রামচন্দ্রকে বলিতেছেন—এই যে সম্মুখে সূর্য্যসন্নিভ সুগঠিত অত্যুত্তম দিব্য বিমান দেখিতেছেন ইহার নাম পুষ্পক। ইহা (কামগং) চালকের ইচ্ছা-অনুসারে চালিত হইয়া থাকে এবং ইহা রাবণ কুবেরকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া হরণ করিয়াছিলেন। রঘুবংশ পাঠে জানা যায়, বিমান কখনও অত্যুচ্চ আকাশ-পথে বিচরণ করিতেছে, কখনও মেঘ সঞ্চার-পথে এবং কখনও পক্ষিদিগের সঞ্চার-মার্গে নামিয়া আসিতেছে। কুমার সম্ভবে বর্ণিত আছে,— তারকাসুরের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য দেবগণ নিজ-নিজ বিমানে আরোহণ করিয়া আকাশ-পথে অপেক্ষা করিতেছিলেন এবং আকাশ বিমানে-বিমানে সমাকীর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

কাব্যে যে বিমানগুলির উল্লেখ আছে সেগুলি না হয় তর্কের খাতিরে কবি-কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে, কিন্তু রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও তন্ত্রে যে আকাশ-যানের উল্লেখ আছে, সেগুলিকে কখনও বন-জাত গুল্ম-বিশেষের ধূম-সেবন-জনিত বিকৃত মস্তিষ্কের প্রলাপ-উক্তি বলা চলে না; বিশেষতঃ গত ইয়ুরোপীয় মহাযুদ্ধে ঐরূপ আকাশ-পোত থাকা যে সম্ভব তাহা প্রমাণিত হইয়াছে।

রামায়ণ ও বায়ুপুরাণ পাঠে জানা যায় যে, এই বিমানগুলির গবাক্ষ-সকল স্বর্ণখচিত হইয়া লোকের মনস্তুষ্টি বিধান করিত এবং কোনো কোনো বিমান স্ফটিক দ্বারাও নির্ম্মিত হইত। রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ড পাঠে জানা যায় ইন্দ্রজিতের বিমান আকাশগমন-সময়ে দৃষ্ট হইতই না, এমন-কি, তাহার শব্দ পর্য্যন্ত শ্রুত হইত না। পাশ্চাত্য আকাশপোতে এই ত্রুটিদ্বয় সমানভাবে বর্ত্তমান। প্রাচীন ভারতীয়গণ এবিষয়ে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। ভারতীয় বিমানগুলির বর্ণনা-পাঠে জানা যায়, এগুলি নানা শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। কতকগুলি কেবলমাত্র যুদ্ধকার্য্যে ব্যবহৃত হইত অপর কতকগুলি সাধারণ আকাশযান ছিল। অপর কতকগুলি উভয় কার্য্যেই ব্যবহৃত হইত। রামায়ণে বর্ণিত পুষ্পক রথ উভয় কার্য্যে ব্যবহৃত হইত। রাবণের দিগ্বিজয়-সময়ে রাবণকে পুষ্পকে আরোহণ করিয়া যাইতে দেখা যায় এবং যমপুরে যুদ্ধে যমসেনার দ্বারা উহা ভগ্ন হয় এবং তখনই উহা বরপ্রভাবে মেরামত হইয়া যুদ্ধোপযোগী হয়। রাবণ যখন কার্ত্তিকেয়ের জন্ম-ভূমি শরবনে যুদ্ধাভিলাষী হইয়া ধাবিত হন তখন কৈলাস-পর্ব্বত অতিক্রম করিতে হয়; কিন্তু কৈলাস-পর্ব্বত অতিক্রম করিতে গিয়া রাবণের পুষ্পক রথ সহসা গতিহীন হয়; তখন রাবণ বুঝিতে পারেন নাই কেন উহার গতিরোধ হইল। পরে জানিতে পারিলেন যে শিবশক্তিতে উহার গতিরোধ হইয়াছে, ইহার দ্বারা মনে হয় কৈলাসে শঙ্কর স্থাপিত এমন কোনো বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সমাবেশ ছিল যাহা দ্বারা আকাশপোতের গতিরোধ করা চলিত। সম্প্রতি জার্ম্মানগণ কোনো অদৃশ্য বৈদ্যুতিক (আলোক ?) প্রবাহ দ্বারা বহুদূরে থাকিয়া এই শ্রেণীর আকাশপোত ও মোটর-গাড়ীর গতিরোধ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, এই শ্রেণীর যন্ত্র সংস্থাপন দ্বারা বলশেভিক রুশিয়া আকাশপোতের আক্রমণ হইতে স্বদেশকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

এই পুষ্পকে করিয়া রাবণের দাসীগণ সীতাকে লইয়া রামলক্ষ্মণের নাগপাশ বন্ধন দেখাইতে গিয়াছিল। রাবণের যে কেবলমাত্র পুষ্পক রথ ভিন্ন অন্য কোনো আকাশযান ছিল না তাহা নহে। রাবণ যখন সীতাকে হরণ করেন তখন যে-রথে করিয়া সীতাকে লইয়া পলায়ন করেন, সেই রথ পুষ্পক নয়, অন্য একখানি বিমান, সেখানি উন্নত শ্রেণীর নয়। রামায়ণের বর্ণনা পাঠে বুঝা যায় ঐ বিমানে অত্যন্ত শব্দ হইত বা ইচ্ছাক্রমে করা যাইত এবং উহা দ্রুত চলিতে পারিত, কিন্তু আত্মরক্ষা বিষয়ে পুষ্পক অপেক্ষা অনেক হীন ছিল। ঐ বিমান পুষ্পকের ন্যায় শীঘ্র মেরামত করা চলিত না। তবে বিশেষ প্রয়োজন হইলে আগ্নেয় অস্ত্রদ্বারা তথা হইতে আত্মরক্ষা করা চলিত মাত্র। প্রতিযোদ্ধা বলবান্ হইলে তাহাও চলিত না, কারণ জটায়ু উক্ত বিমানখানি ভাঙ্গিয়া দেওয়ায় রাবণকে ভূমিতে নামিয়া যুদ্ধ করিতে হয়। কিন্তু এই বিমানখানি পুষ্পকের ন্যায় বর-প্রভাবে তখনই মেরামৎ হয় না। এই কারণে বুঝা যায় এখানি পুষ্পক নয়, বিশেষতঃ মহর্ষি বাল্মীকি এখানে পুষ্পকের উল্লেখ করেন নাই, মাত্র বিমানের উল্লেখ করিয়াছেন। ইন্দ্রজিতের আকাশ-

---

* "লোহাগড়া রামানারায়ণ পাবলিক লাইব্রেরীতে পঠিত"। প্রাচীন ভারতীয়গণ ব্যবহারিক জগতে এতখানি অগ্রসর যদি না হইয়াও থাকেন, তবু অন্তত কল্পনার চক্ষেও যে বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক নানা আবিষ্ক্রিয়া এত দিন পূর্ব্বে দেখিয়া রাখিয়াছিলেন, ইহাও কম প্রশংসার এবং বিস্ময়ের কথা নয়। প্রঃ সঃ

পোত খুবই উন্নত প্রণালীর। দেবগণেরও বিমান ছিল বটে কিন্তু তাঁহারা যুদ্ধকালে ইন্দ্রজিতের স্থায় তাহা অদৃশ্য রাখিতে পারিতেন না। নিকুম্ভিলায় ইন্দ্রজিতের যে বর্ণনা আছে, তাহা পাঠে দেখা যায় বিভী তকী কাষ্ঠ, অগ্নি, ঘৃত, রক্ত বস্ত্র, জীবিত কৃষ্ণবর্ণ ছাগ ও কৃষ্ণ লৌহ নির্ম্মিত স্রুব ও নীল মেঘ তুল্য ভীষণ এক বটবৃক্ষ দেখিতে পাই। তথায় ধূমহীন অগ্নির উল্লেখ আছে। বিশেষতঃ নিকুম্ভিলা নিবিড় বনমধ্যে অবস্থিত। রক্তউষ্ণীষধারিণী হোমপরিচারিকাগণেরও তথায় উপস্থিতির উল্লেখ আছে। ইহা দ্বারা মনে হয় নিকুম্ভিলা ইন্দ্রজিতের আকাশ-যানের জন্য গ্যাস লইবার একটি গুপ্ত কারখানা মাত্র। গুপ্তরহস্য-প্রকাশ ভয়ে স্ত্রী-মজুরের দ্বারা (হোমপরিচারিকা?) কারখানার কার্য্য চলিত। নীল মেঘের স্থায় ভীষণ বটবৃক্ষটি বোধ হয় আকাশ-যানের ষ্টেশনের কার্য্য করিত। পুরাণাদিতে মায়ারথের বর্ণনা পাঠে বুঝা যায়, সেগুলি গুপ্ত আকাশপোত ভিন্ন আর কিছুই নহে; সেগুলি দরকার-মতন জমির উপরেও চলিতে পারিত। গত ইয়ুরোপীয় মহা-যুদ্ধের সময় জার্ম্মান-সাম্রাজ্যের পূর্ব্বপ্রান্তস্থিত স্থানগুলি শত্রুপক্ষের হস্তগত হইবার উপক্রম হইলে, সৈনিকগণ সাধারণ জার্ম্মান বেশে লাঠি লইয়া ভ্রমণে বহির্গত হইতেন, বিপক্ষীয়দিগকে দুর্ব্বল মনে করিলে সেই লাঠি মুহূর্ত্ত-মধ্যে ভীষণ বন্দুকে পরিণত হইয়া শত্রুর প্রাণ বিনাশ করিত। পুরাণোক্ত মায়ারথও ঐরূপ কোনো গুপ্ত অবস্থায় রাখা চলিত এবং প্রয়োজনমতে ক্ষুদ্র আকাশযানে পরিণত করা হইত। বর্ণনা পাঠে ইহাই মনে হয়।

ভারতীয় বিমানগুলি নানা প্রণালীতে প্রস্তুত হইত, তন্মধ্যে এক-প্রকার বিমান ছিল, যাহা পারদ-সাহায্যে আকাশগামী হইত। এ-সম্বন্ধে তন্ত্রে ও তন্ত্রোক্ত চিকিৎসাশাস্ত্রে পারদের গুণ-বর্ণনাস্থলে বহু উল্লেখ আছে। তন্ত্রোক্ত কবিরাজী সংগ্রহ-পুস্তক রসেন্দ্রসারসংগ্রহে দেখিতে পাই :—

> হতো হন্তি জরাব্যাধিং মূর্চ্ছিতো ব্যাধিঘাতকঃ।
> বদ্ধঃ খেচরতাং ধত্তে ......

উক্ত শ্লোকের টীকাকার ব্যাখ্যা করিতেছেন "বদ্ধ ইতি বদ্ধঃ পারদঃ খেচরতাং দদাতীতি" অর্থাৎ বদ্ধ পারদ মানবকে আকাশ গমনের শক্তি প্রদান করে। রসরত্নসমুচ্চয় ধৃত বচনটিও উপরোক্ত শ্লোকের অনুরূপ।

> হতো হন্তি জরা-মৃত্যুং মূর্চ্ছিতো ব্যাধিঘাতকঃ।
> ধত্তে চ খেগতিং বদ্ধঃ......

অন্যত্র রাজনির্ঘণ্টে দেখিতে পাই—

> মূর্চ্ছিতো হরতে ব্যাধীন্ বদ্ধঃ খেচরসিদ্ধিদঃ।
> সর্ব্বসিদ্ধিকরোলীনো নিরুদ্ধো দেহসিদ্ধিদঃ॥

এখানেও দেখিতেছি পারদ বদ্ধ হইলে খেচর-সিদ্ধি (আকাশগমনের সামর্থ্য) দান করে।

রসামৃতে দেখিতে পাই—

> বদ্ধো রসোভবেদ্ ব্রহ্মা বদ্ধো জ্ঞেয়ো জনার্দ্দনঃ।
> রঞ্জিতঃ ক্রমিতশ্চাপি সাক্ষাদ্ দেবো মহেশ্বরঃ।
> মূর্চ্ছিত্বা হরতি রুজং বন্ধনমনুভূয় খেগতিং কুরুতে।
> অজরী করোতি হি মৃতঃ......

এখানে দেখিতেছি বদ্ধ পারদকে জনার্দ্দনস্বরূপ জ্ঞান করিবে এবং পারদকে (যথানিয়মে?) বন্ধন করিলে সে আকাশগমনের শক্তি প্রদান করে॥

অন্যত্র দেখিতে পাই :—

> স্মৃতোঽজো-রূপদো বৃষ্যো বৃদ্ধিকৃদ্ধাতুবর্দ্ধনঃ।
> সগুত্বনাশনঃ শূরঃ খেচরসিদ্ধিদঃ পরঃ॥

এখানেও দেখিতেছি পারদের খেচর-সিদ্ধি প্রদানের ক্ষমতা আছে। পারদের উৎপত্তি-সম্বন্ধে তন্ত্রে দেখিতে পাই :—

> তত্র ভেদেন বিজ্ঞেয়ং......চতুর্ব্বিধং।
> শ্বেতং রক্তং তথা পীতং কৃষ্ণং তৎতু ভবেৎ ক্রমাৎ;
> ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চ খলু জাতিতঃ॥
> শ্বেতং শস্তং রুজানাশে রক্তংকিল রসায়নে।
> ধাতুবাদে তু তৎপীতং খেগতৌ কৃষ্ণমেবচ।

উপরোক্ত শ্লোকগুলির মোটামুটি অর্থ—। পারদ চারি-প্রকার যথা শ্বেত, রক্ত, পীত, কৃষ্ণ,—যথাক্রমে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। শ্বেতবর্ণের পারদ ব্যাধিনাশক, শরীরের রসায়ন-জন্য অর্থাৎ জরা-ব্যাধিনাশের জন্য রক্তবর্ণ পারদ, পীতবর্ণ পারদ ধাতুবাদে অর্থাৎ ধাতুবেধন কার্য্যে (হীনধাতুকে মূল্যবান্ ধাতুতে পরিণত, করিতে) এবং আকাশ-গমনে কৃষ্ণবর্ণ পারদ প্রশস্ত।

পারদ শ্বেতবর্ণের, কিন্তু তন্ত্রে দেখিতেছি শ্বেত ভিন্ন রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ বর্ণেরও পারদ আছে। এই রক্ত, পীত, ও কৃষ্ণ বর্ণের পারদ (amalgam) অ্যামালগাম বা পারদ-প্রধান কোনো মিশ্রধাতু বলিয়া মনে হয়।

ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রমাণ আর কি হইতে পারে যে প্রাচীন ভারতীয়গণ পারদ-সাহায্যে আকাশযান পরিচালন করিতে পারিতেন। অন্য বহু পদার্থের সাহায্যে আকাশযান পরিচালিত হইত, তন্মধ্যে যে পারদ একটি, ইহা উপরে লিখিত শ্লোকগুলি হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়। পারদ কোনো উপায়ে প্রণালী-মতে বদ্ধ করা হইত এবং এই পারদ কৃষ্ণ বর্ণের ছিল ও ইহার দ্বারাই আকাশযান পরিচালন প্রশস্ত, ইহাই দেখা যাইতেছে।

গত ইয়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় ও তাহার কিছু পূর্ব্বে ভারতীয় আকাশযান-সম্বন্ধে সাময়িক পত্রিকাদিতে আলোচনা হইয়াছিল, কিন্তু বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয় কিসের সাহায্যে এবং কি-প্রণালীতে ভারতীয় আকাশযানগুলি চালিত হইত, সে-সম্বন্ধে কোনো আলোচনা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। আশা করি, যুবক ভারতের বৈজ্ঞানিকদিগের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইবে এবং তাহার ফলে সাময়িক পত্রিকাদিতে এ-সম্বন্ধে আলোচনা দেখিতে পাইব।

ইতালির পথঘাট

শ্রী বিনয়কুমার সরকার

১

কিয়াসোর পথে মিলানোয় পৌঁছিতে ইতালির এক বড় শহর পাওয়া গেল। নাম কোমো। হ্রদের উপর এই নগর অবস্থিত। পাহাড়ের গায়ে ঘরবাড়ীগুলা ইতালির স্বইস-দৃশ্যই বহন করিতেছে। লুগানো হ্রদের মতন কোমো হ্রদও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের আব্‌হাওয়ায় ভরপুর। হ্রদটা আগাগোড়া ইতালির অধীন।

ইতালিতে আছে সবই উত্তর ইতালির সম্পদ্। ফ্রান্সের লাগাও পিয়েমোন্তে জেলা আর লম্বার্দি জেলা এই দুই জেলার বাহিরে ইতালি "একপ্রকার আগাগোড়া কৃষিপ্রধান।"

কিয়াসোর কোমোয় চিম্‌নির ধোঁয়া কিছু-কিছু লক্ষ্য করিয়াছি। অবশ্য কথায়-কথায় রাইন্‌ল্যাণ্ড্ অথবা বেলজিয়াম্ ইত্যাদি অঞ্চলের নাম মুখে না আনাই উচিত। শুনিলাম কোমো ইতালিয়ান্ রেশম-শিল্পের সর্ব্বপ্রধান আড্ডা। তুঁতের গাছ রেলপথের দুই ধারেই দেখিতেছি।

মিলানো শহর

কোমোয় একজন সপত্নীক ইতালিয়ান্ এঞ্জিনিয়ার উঠিলেন। ইনি বহুকাল ছিলেন দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনা দেশে। একাধিক ভাষায় দখল আছে। কখনো জার্ম্মানে কখনো ফরাসীতে কথাবার্ত্তা বলিতে থাকিলেন। ইঁহার স্ত্রী কিছু-কিছু ফরাসী জানেন।

এঞ্জিনিয়ার বলিতেছেন :—"বড়গোছের ফ্যাক্টরি, কারখানা, যন্ত্রপাতির প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি যাহা-কিছু

২

মিলানো লম্বার্দির বড় শহর। ষ্টেশন দেখিয়া ভক্তি চটিয়া গেল। শহরের যে পাড়া দিয়া রেল গাড়ী চলিতেছে

সেটা অতি ওঁছা। অথচ শুনিতেছি মিলানো ইতালিয়ান্ লক্ষপতিদের বাথান।

পুলিশের মাথায় শোভিতেছে "গারিবাল্দি টুপি"। প্যারিসে এই গড়নওয়ালা টুপিকে বলে "নেপোলিয়ানী টুপি।" পাহারাওয়ালা এবং ফৌজের গায়ে একপ্রকার ওভারকোট দেখিতেছি। ইহাকে আমাদের সুপরিচিত আলোয়ান হইতে তফাৎ করা কঠিন। গলার বোতাম আঁটা যায় বটে, কিন্তু হাতা নাই। আর, দুইদিক্‌কার বেড় এত চওড়া যে রীতিমতন "আলোয়ান মুড়ি" দিয়া লোকেরা চলা-ফেরা করিতেছে।

গারিবল্‌দি মনুমেণ্ট্ (মিলানো)

জার্ম্মানি, ফ্রান্স, আমেরিকা ইত্যাদি দেশে মেয়েরা শীতকালে যে-ধরণের "কেপ্" জাতীয় ওভারকোট ব্যবহার করে তাহা হইতে ইতালিয়ান্ পুরুষদের আলোয়ান্ প্রায় জামা স্বতন্ত্র। ইতালিয়ান্ নারীরা ভারতের সুপরিচিত "কম্ফার্টার" বা গলাবন্ধ ব্যবহার করে। তবে এই গলাবন্ধও আকারে-প্রকারে প্রায় আলোয়ানেরই সমান। কোনো বোতাম নাই। সমস্ত ঘাড়পিঠ ঢাকিয়া সম্মুখে দুইধারে ঝুলিবার মতন লম্বা।

ভারতে মেয়েরা আলোয়ান ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত। ওভারকোটের রেওয়াজ বোধ হয় সুরু হয় নাই। যদি কখনো এই-ধরণের জামাজাতীয় কিছু চিজ ভারতে কায়েম হইতে থাকে তাহা হইলে "কেপ্"-শ্রেণীর পোষাক বোধ হয় ভারতবাসীর বেশী পছন্দসই হইবে। বিদেশে কোনো-কোনো ভারতীয় মহিলার গায়ে "কেপ্" দেখিয়া এইরূপই মনে হইয়াছে।

৩

মিলানোয় নামা হইল না। গাড়ী বদলানো গেল। এতক্ষণ দক্ষিণে চলিতেছিলাম। এইবার গাড়ী ছুটিতেছে সোজা পূবে। বহুসংখ্যক "ডেলি প্যাসেঞ্জার" এখন সহযাত্রী। কেহ উকীল, কেহ ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর, কেহ ব্যবসাদার ইত্যাদি।

আমার হাতে "কোরিয়েরে দেল্লা সেরা" দেখিয়া উকীল-বাবুটি ইতালিয়ান্ ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলেন :—"ইতালিয়ান্ আসে কি ?" জবাব :—"এইমাত্র ষ্টেশনে ইতালিয়ান্ ভাষার সঙ্গে প্রথম চাক্ষুষ পরিচয় ! দেখিতেছি, ফরাসী বা জার্ম্মান শব্দের আত্মীয় কতগুলা জুটে।" উকীল-মহাশয় অন্য কোনো ভাষায় পটু নয় বুঝা গেল।

ব্যবসায়ী বলিতেছেন :—"মিলানো ভারী শহর। এখানকার 'ব্রেদা কোম্পানী'র কার্‌খানায় খাটে ছয় হাজার মজুর। চাষ-আবাদের যন্ত্রপাতি, রেলগাড়ী, উড়োগাড়ী, ইত্যাদি হরেক চিজই ব্রেদা ফ্যাক্টরিতে তৈয়ারি হয়। কার্‌খানাগুলাকে একটা ছোটখাটো শহরের ঘরবাড়ী বলিলেই চলে। কার্‌খানা হইতে কারখানার মাল চালান করিবার জন্য রেলপথই আছে প্রায় পঁচিশ মাইল।"

মিলানোয় অটোমোবিলও তৈয়ারি হয়। "রোমেও" কোম্পানীর গাড়ী ইতালিয়ান্-সমাজে সুবিদিত। ব্যবসায়ী বলিলেন :—"ইতালির বাহিরে ফিয়াৎ কোম্পানীরই নাম আছে। তাহাদের ফ্যাক্টরিগুলা পিয়েমোন্তে জেলার তোরিনো নগরে অবস্থিত।"

মুসোলিনি-সম্বন্ধে কথা উঠিল। ফেব্রুয়ারি মাসের শেষাশেষি। শীঘ্রই ইতালিয়ান্ পার্ল্যামেণ্টের সভ্য-বাছাই হইবে। মুসোলিনির দল জয়ী হইতে পারিবে কি?

উকীল বলিতেছেন:—"ফ্রান্সের পোঁআকারে যা, আমাদের মুসোলিনি তা। উভয়েই "ডিক্টেটর", একচ্ছত্রী বাদশা-বিশেষ। তবে মুসোলিনির মতন স্বদেশ-সেবক জগতে খুব কমই আছে। লোকটা চৌপর দিন-রাত দৈত্যদানবের মতন খাটিতে পারে। আর ইতিমধ্যে ইতালির শাসন-বিভাগে মুসোলিনির প্রভাবে বহুবিধ সংস্কার সাধিত হইয়াছেও।"

ব্যবসায়ী বলিলেন:—"ঠিক কথা। কিন্তু উত্তর ইতালির মজুর-মহলে মুসোলিনি কল্‌কে পান না। আগামী বাছাই-কাণ্ডে পিয়েমোন্তে আর লম্বার্দি জেলায় ফাসিষ্ট্‌রা ঢিট্ হইয়া যাইবে। উত্তর অঞ্চলগুলায় সোশ্যালিষ্টদের সঙ্গে টক্কর দিবার মতন ক্ষমতা অন্য কোনো দলের নাই।

"আহ্বান্তি" (আগুয়ান) কাগজ সোশ্যালিষ্ট দলের মুখপত্র। জার্ম্মান্ "ফোর্‌হ্ব্যার্টস্" আর ইতালিয়ান্ "আহ্বান্তি" এক-গোত্রের দৈনিক। "ফাসি" (সমিতি) পন্থী ন্যাশন্যালিষ্ট্‌রা "পোপোলো দিতালিয়া" (ইতালির জনসাধারণ) কাগজ চালাইয়া থাকে। "পোপোলোর" সঙ্গে "আহ্বান্তি"র "ম্যাড়ার লড়াই" চলিতেছে অহরহ।

"কোরিয়েরে দেল্লা সেরা" (সান্ধ্য সংবাদ) একটা "বৈকালী"। নামেই প্রকাশ। ব্যাঙ্কের বাবুটি বলিতেছেন:—"কোরিয়েরে আহ্বান্তির দলেরও নয় পোপোলোর দলেরও নয়। ইতালির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি-সাধন ইহার উদ্দেশ্য। এই কাগজের কর্ত্তারা দেশকে সোশ্যালিষ্ট্ এবং ন্যাশন্যালিষ্ট্ দুই দলের অত্যাচার হইতে বাঁচাইতে চেষ্টিত। ইহাদিগকে উন্নতিনিষ্ঠ উদারপন্থী বলা চলে।"

জার্ম্মানিতে এবং সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডে থাকিতে জার্ম্মান এবং ফরাসী কাগজে "কোরিয়েরের" মত এবং টিপ্পনীই বেশী পড়িয়াছি। ব্যাঙ্কারের নিকট শুনা গেল:—"জগতের সকল বড়-বড় দেশে 'কোরিয়েরে'র লোক মোতায়েন

বেনিতো মুসোলিনি

আছে। বিদেশী ঘটনা-সম্বন্ধে খাঁটি তথ্য প্রচার করা এই কাগজের এক প্রধান কাজ। ব্যবসাবাণিজ্য শিল্পকৃষি ইত্যাদি বিষয়েও কোরিয়েরেই ইতালির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দৈনিক। সকলক্ষেত্রে ওস্তাদ বাহাল করিয়া খবর সংগ্রহ করা হইয়া থাকে, এইজন্য কর্ত্তারা টাকাও ঢালে প্রচুর।"

৬

শীত প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছে। কিন্তু উত্তর ইতালিতে ঠাণ্ডা এখনো কমে নাই। গাড়ীর কামরাগুলা গরম করা ইতালিতেও দস্তুর দেখিতেছি। শুনিলাম এবার নাকি মায় রোম এবং নাপোলি (নেপ্‌ল্‌স্) পর্য্যন্ত অর্থাৎ দক্ষিণ ইতালিতেও বরফ পড়িয়াছে। এইসকল অঞ্চলে বরফপড়া একটা অঘটন-ঘটার সামিল। অর্থাৎ রোম নেপ্‌ল্‌স্ ইত্যাদি শহরে ইয়োরোপের সুপরিচিত শীত আসে না।

দুইধারের ক্ষেতগুলা আগাগোড়া সমতল। বুনো গাছগুলা ন্যাড়া-ও ঠুঁটা-ভাবে বিচিত্র দেখাইতেছে। কদাকার বলিলেও দোষ হইবে না। তবে বহুদূর পর্য্যন্ত সারি-সারি দেখা যাইতেছে বলিয়া চোখের আরাম জুটিতেছে মন্দ নয়।

কাস্তেল্লো দুর্গের সম্মুখভাগ (মিলানো)

আঙুরের মাচাগুলাও অবশ্য পত্রহীন। সর্ব্বত্রই "শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে।" দেখিতে-দেখিতে ব্রেসিয়া সহরে উপস্থিত হইলাম। পাহাড়ের পায়ে ও গায়ে ইট-পাথরের বাড়ীগুলা সুন্দর দেখাইতেছে। পাহাড়গুলা অবশ্য আল্পসের দক্ষিণ সীমানা।

১৯১৪ সালের অষ্ট্রিয়া হাঙ্গারির টিরোল জেলা প্রায় এইখানেই আসিয়া ঠেকিত। ১৯১৮-১৯ সালের ভার্সাই সন্ধি ইতালির উত্তর সীমানা বহু উত্তরে,—প্রায় ইন্‌স্‌ব্রুকের নিকট গিয়া ঠেকাইয়াছে। আগে ছিল বহু ইতালিয়ান্ নরনারী অষ্ট্রিয়া হাঙ্গারির গোলাম। আজ কাল বহু জার্ম্মান্ (অষ্ট্রিয়ান্) নরনারী ইতালির অধীনে জীবনযাপন করিতেছে। দক্ষিণ টিরোল সীমান্ত-প্রদেশ। কাজেই এই অঞ্চলে হয় ইতালিয়ানের উপর জার্ম্মানের জুলুম না হয় জার্ম্মানের উপর ইতালিয়ানের জুলুম সনাতন কথা।

৭

গাড়ীর ভিতর এক ইতালিয়ান্ মহিলার বোঁচকায় কতকগুলা এক-নামের মাসিক কাগজ দেখিতেছি। ইনি ভাঙা-ফরাসীতে বলিলেন :—"আমি এই মাসিকের 'প্রপাগাঁদ' করি।" অর্থাৎ ইনি কাগজটার আড়কাঠি।

কাগজটার নাম "লে ভিয়ে দি'তালিয়া" (ইতালির পথ-ঘাট)। বহু-সংখ্যক ফোটো-চিত্রে ভরা, অতি সুন্দর কাগজে ছাপা। উল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া দেখিতেছি কম-সে-কম শতকরা প্রায় ত্রিশটা শব্দ পাক্‌ড়াও করা সম্ভব। প্রবন্ধগুলা ঠারে-ঠোরে বুঝাও যাইতেছে মন্দ নয়। রগড় বটে। ইতালিয়ান্ ভাষার কোনো ব্যাকরণ, "প্রথম পাঠ" বা অভিধান আজ পর্য্যন্ত হাতে নাড়াচাড়া করি নাই। একমাত্র ফরাসীর জোরে ইতালিয়ান্ লেখাগুলা বিনা-কষ্টে সমজিয়া লইতেছি।

ইতালির প্রত্যেক পল্লী ও সহরের যেখানে যা-কিছু সৌন্দর্য্যের খনি আছে সবই এই কাগজের আলোচ্য বিষয়। প্রাকৃতিক দৃশ্য হিসাবে, ঐতিহাসিক ঘটনার তরফ হইতে, বাস্তু গৌরব স্থাপত্য এবং চিত্রশিল্পের লাইনে ও ইতালি-দেশ যে দেশীবিদেশী সকল নরনারীরই একটা "দেখিতব্য" মুল্লুক,—ইহাই হইতেছে পত্রিকার ভাবার্থ।

টুরিষ্ট্, পর্য্যটক, প্রত্নতত্ত্বের গবেষক, সুকুমার শিল্পের সমজদার, স্বাস্থ্যান্বেষী, প্রকৃতিপূজক, কবি, ঔপন্যাসিক, চিত্রকর ইত্যাদি সকল শ্রেণীর "লিখিয়ে-পড়িয়ে"

এবং পয়সাওয়ালা লোককে আকৃষ্ট করিবার জন্য ইতালিতে একটা বড় আড্ডা আছে। সেই আড্ডারই এই মাসিকটা মুখপত্র "লে ভ্রিয়ে দিতালিয়া" বা ইতালি প্রদর্শিকা। ইহা পাণ্ডার কাজ করিতেছে! বলা বাহুল্য, ছবিগুলা দেখিলেই, ইতালি-দেখার নেশা পাইয়া বসে।

৮

স্বদেশের প্রাকৃতিক, ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক সৌন্দর্য্য বা সম্পদ্‌গুলা দেশীবিদেশী নরনারীর নিকট প্রিয় করিয়া তোলা একটা ব্যবসা সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান যুগে গান গাওয়া, ছবি আঁকা, ধর্ম্ম প্রচার করা সবই ব্যবসা। কিন্তু স্বদেশী সৌন্দর্য্যসমূহের প্রচার, আলোচনা, অনুসন্ধান, আবিষ্কার, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা ইত্যাদিকে স্বদেশ সেবার, স্বদেশপ্রীতির, স্বদেশ-পূজার অঙ্গ বিবেচনা করিলেও অত্যুক্তি করা হইবে না।

এই হিসাবে জাপানীরা ফরাসীদের মতন, ইতালিয়ানদের মতন, জার্ম্মানদের মতন স্বদেশ-পূজক, স্বদেশসেবক, স্বদেশভক্ত। ভারতের নরনারী এই বিভাগে ইতালিয়ান, ফরাসী, জার্ম্মান, জাপানী ইত্যাদি জাতির সঙ্গে টক্কর দিতে পারিবে না। স্বদেশের সৌন্দর্য্য আবিষ্কার, প্রচার ও উপভোগ করিবার দিকে ভারতের যৌবনশক্তি কর্ম্ম-ক্ষেত্র ঢুঁড়িয়া বাহির করুক। স্বদেশপূজায় আমরা যেন বেশীদিন অন্য কোনো জাতির পিছনে পড়িয়া না থাকি।

৯

লম্বার্দির পল্লী কুটীরগুলায় টেসিন-(ইতালির সুইট্‌সার্ল্যাণ্ড্‌) বাসীদের ধরণ-ধারণ অনেকটা দেখিতেছি। ঘরবাড়ী নোংরা। গো ছাগল আর নরনারী যেন সকলে মিলিয়া একই ছাদের তলায় বসবাস করে। জার্ম্মান কিষাণদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং সম্পদ্‌ ও পারিপাট্য লক্ষ্য করা যাইতেছে না।

কিষাণদের গোলাঘরের বারান্দা দেখিলে ভারতীয় পল্লীদৃশ্যই চোখে পড়িবে। আমেরিকার কৃষকেরা কিরূপ সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবনধারণ করে, ইতালির পল্লীগুলা দেখিবামাত্র সেকথা মনে পড়িল। মার্কিন কিষাণে আর ইতালিয়ান্‌ কিষাণে আকাশপাতাল প্রভেদ।

চাষ-আবাদের ঋতু এ নয়। তবুও কোনো-কোনো মাঠে মেয়েপুরুষের অল্পবিস্তর কাজ-কর্ম্ম চলিতেছে। বলদে হাল টানে, ঘোড়ায় নয়। আবার ভারতীয় দৃশ্য। ভেঁড়ার পালও মাঝে-মাঝে দৃশ্যাবলীর বৈচিত্র্য সাধন করিতেছে

কবিবর দান্নুন্‌সিও

১০
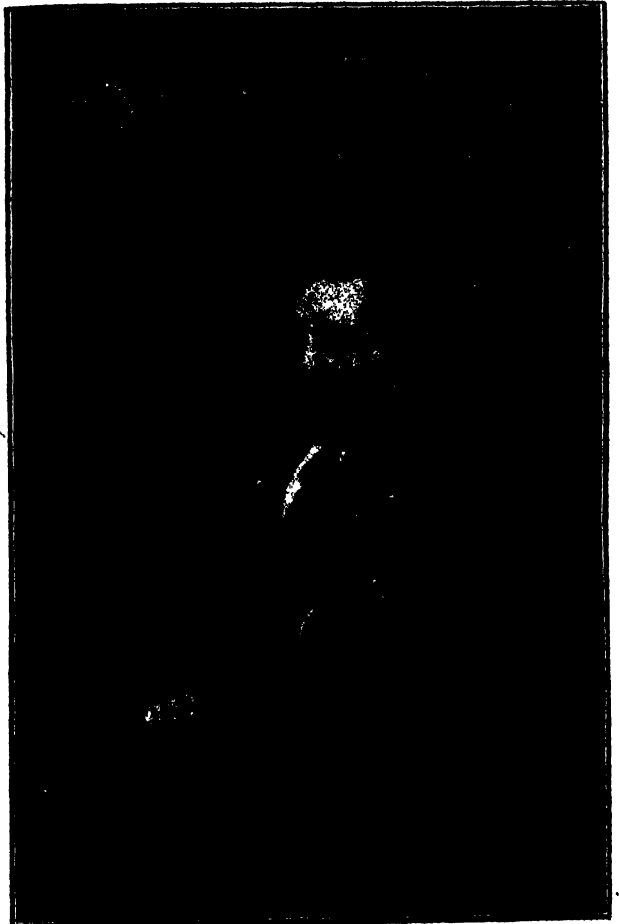
এক অপূর্ব্ব হ্রদের সুনীল জলরাশি হঠাৎ চোখ টানিয়া লইয়া গেল। এধারে-ওধারে পাহাড়ের ওঠানামা। সুবিস্তৃত সাগর। লুগানো হ্রদের চেয়ে বড়। "লাগো

ভেকিও দুর্গ (ভেরোনা)

যন্ত্র-বিশেষ। আজকাল আর এ-সব দুর্গের সামরিক কিম্মৎ নাই। কেননা ইতালির উত্তর সীমানা এখান হইতে সাত আট ঘণ্টার পথ।

গার্দা হ্রদের আবেষ্টনে স্বাস্থ্য-নিবাস, সানাটোরিয়ুম, হাঁসপাতাল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। শীতকালেও নাকি মাজ্জিয়োরে, লুগানো, ও কোমোর মতন গার্দার জলবায়ু, বেশ মোলায়েম ও আরাম-দায়ক। চিত্রশিল্পী ডিরের আর কবিবর গ্যেটে দুইজনেই গার্দার প্রশংসা করিয়াছেন শতমুখে।
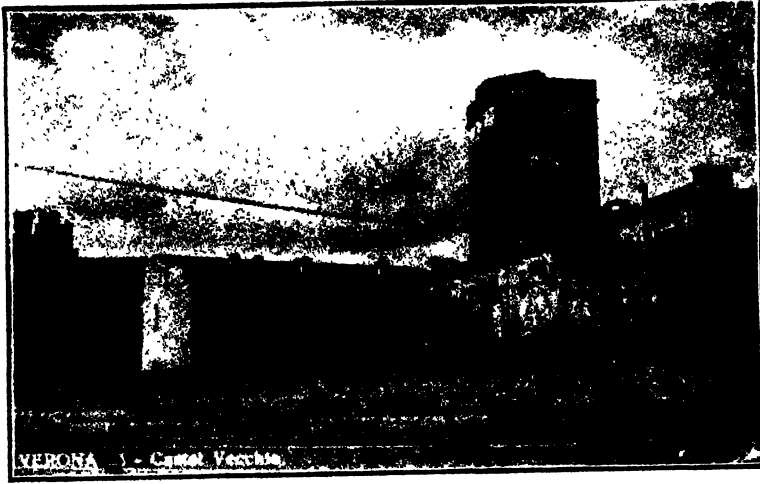
দি গার্দা" নামে এই পাহাড়ী সাগর অষ্ট্রিয়ান-ইতালিয়ান সীমানায় বহু প্রকৃতিপূজককে আকৃষ্ট করিয়াছে। এক্ষণে অবশ্য গার্দা পুরাপুরি ইতালির দখলে। সহযাত্রীর মুখে শুনিলাম :—"দান্নুৎসিয়ো কবি এই সাগরেরই উপকূলে বসিয়া গীতিকাব্য লিখিয়া থাকেন। পল্লীর নাম গার্দোনে।"

পিয়েত্রো দুর্গ (ভেরোনা)

রেলে বসিয়াই দুর্গ দুএকটা দেখা গেল। সেকালে,—অর্থাৎ ১৯১৪ সালের যুগে এই সব দুর্গই ছিল অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ইতালির আত্মরক্ষার

ভিক্তর এমান্যুয়েল গ্যালারি (মিলানো)

আরেনার বহির্ভাগ (ভেরোনা)

ইতালির পল্লীশহর ইংরেজি-সাহিত্যে অমর। সেকালের বায়রন্ আর একালের ব্রাউনিঙ্ ইতালির "পথঘাট"গুলিকে ইংরেজি কাব্যে চিরকালের জন্য গাঁথিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। বায়রণ-ব্রাউনিঙের কবিতাবলী দস্তুর-মতন বুঝিতে হইলে ইতালির ভূগোল-ইতিহাস "নখদর্পণে" রাখা আবশ্যক।

আরেনার ভিতরকার দৃশ্য (ভ্বেরোনা)

এইধরণের সাহিত্যে-গাঁথা ইতালির বিবরণ পাই আর-এক ইংরেজ-বীরের রচনায়। সে যে-সে কবি নয় স্বয়ং শেক্‌স্‌পীয়ার। কবিবরের নাট্য-সাহিত্যে ইতালির নবীন-প্রবীণ সবই প্রচুর-পরিমাণে বিরাজ করিতেছে।

দান্তে (ভ্বেরোনা)
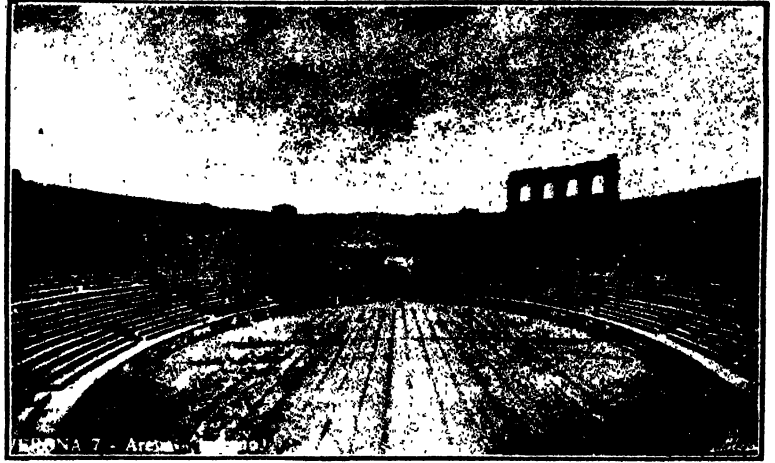
গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল ভ্বেরোনায়। বাঙালী-পর্য্যটক শেক্‌স্‌পীয়ার-রচিত "ভ্বেরোনার দুই বাবু" মনে না আনিয়া পারে কি ?

১২

বাদশাহী আমলের নিদর্শন ভ্বেরোনায় কিঞ্চিৎ-কিছু আছে। "আরেনা"টা দেখিলে প্রাচীন ইয়োরোপের এক বাস্তুগৌরব চোখে ভাসিবে। মিলানোর "আরেনা" নেপোলিয়নের হুকুমে গড়া। "আরেনা"-জাতীয় "আম্ফি-থিয়েটার" ভারতে বা এশিয়ার কুত্রাপি কখনো গড়া হইয়াছিল কি ? ভ্বেরোনার আরেনা "রোমান আমলে"র চিহ্ন।

মহাকবি দান্তের মনুমেণ্ট ভ্বেরোনার এক কীর্ত্তি! পিয়েত্রোদুর্গ এবং জেনো মন্দিরও প্রাচীন জীবনের সাক্ষী।

ভ্বেরোনা আজকাল এমন-কিছু বড় শহর নয়। "সড়কের ধূলা খাইতে সাধ থাকিলে এখানে এক-বেলা কাটানো চলিতে পারে।"—এইকথা বলিতে-বলিতে এক গ্রীক ব্যবসায়ী স্ত্রীপুত্র লইয়া গাড়ীতে সওয়ারী হইলেন। নামিব কি না ইতস্তত করিতেছি। এমন সময়ে ইঁহারা আবার বলিলেন :—"আরে মশায় ঝক্‌মারি।" যাহা হউক খানিকক্ষণ ষ্টেশনে পায়চারি করা গেল। বিকাল হইয়া আসিয়াছে। চা ইচ্ছা করিতেই বা আপত্তি কি!

সেণ্ট্ জেনোর গির্জ্জা (হ্বেরোনা)
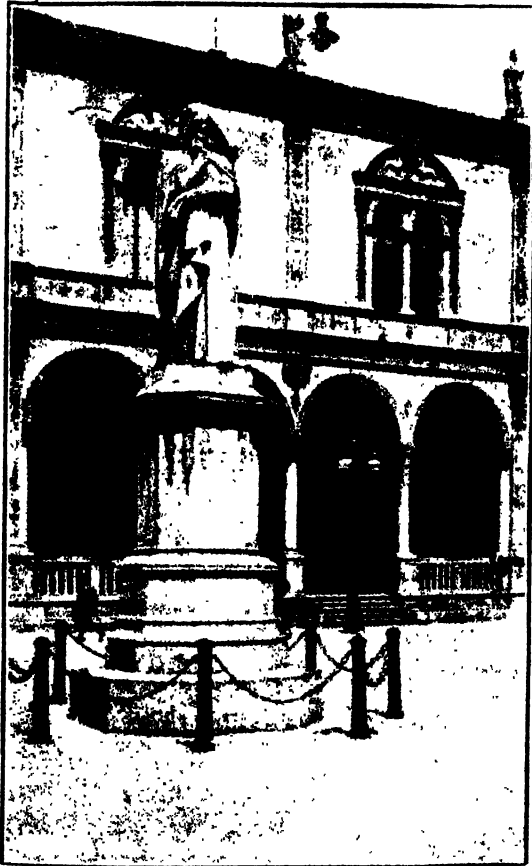
রোম হইতে বার্লিন যাইতে হইলে হ্বোরোনার পথই সোজা। ত্রেন্তো, ইন্স্‌ব্রুক, মিউনিক্ হইয়া খাড়া উত্তরে যাত্রা করা হয়। হ্বেরোনায় লম্বার্দি জেলার শেষ আর হ্বেনেৎসিয়া জেলার সুরু। জার্ম্মান-ইতালিয়ান ব্যবসা-বাণিজ্যের স্রোত হ্বেরোনার আড়তে-আড়তে কিছু-কিছু আসিয়া ঠেকে। সহযাত্রীর নিকট শুনা গেল :—"রেশম, চামড়া, ইত্যাদির কারবার এই অঞ্চলে প্রসিদ্ধ। হ্বেরোনার মর্ম্মর ইতালির বাহিরেও নামজাদা।"

টল্‌স্‌টয়ের আত্মকথা

শ্রী কানাইলাল সামন্ত

টল্‌স্‌টয় (Count Leo Tolstoy) তাঁহার আত্মকথায় (My Confession) আপনার কৈশোর হইতে বিমুখ মন পরে কেন আবার ধর্ম্মের অভিমুখে ফিরিয়াছিল—তাহারই আলোচনা করিয়াছেন। আর্টিস্‌ট্ এর লেখায় যে-গুণ অবশ্যম্ভাবী সেই গুণে বিষয়টি ব্যক্তিগত হইয়াও ব্যক্তিগত হয় নাই। অনেকেরই জীবনে টল্‌স্‌টয়েরই মতন প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি নানাভাবে খেলিয়াছে, অনেকেই জীবনের পরম পরিণাম কি তাহা জানিবার জন্য উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছেন ; কিন্তু বহু সন্ধানেও যেন জীবন-সম্বন্ধে পরম সত্যটিকে জানা যায় নাই।

টল্‌স্‌টয় খৃষ্টীয় ধর্ম্মেরই আব্‌হাওয়ায় শৈশবে লালিত হইয়াছিলেন। যেমন শিখিয়াছিলেন তেম্‌নি শৈশবে প্রার্থনা করিতেন, খৃষ্টে বিশ্বাস করিতেন এবং সেই বিশ্বাসেই যে আত্মার গতি হইবে, তাহাও শুনিয়াছিলেন। কিন্তু শৈশবের এই বিশ্বাস পরবর্ত্তী সময়ের শিক্ষা-দীক্ষায় কোন্ সময়ে যে লুপ্ত হইয়াছিল, তাহা

টল্‌স্টয় নিজেই জানিতেন না। তিনি যখন বালক, তখন তাঁহাদের এক কলেজপাঠী বন্ধু আসিয়া বলিল, "সে সম্প্রতি একটি নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছে যে ঈশ্বর বলিয়া কিছু নাই।" টল্‌স্টয় ভাবিয়াছিলেন, খুব সম্ভব একথা সত্যই হইবে। ইহা ছাড়া যোলো বৎসর বয়সেই তিনি দর্শন-শাস্ত্র পড়িতে আরম্ভ করেন এবং উহার সূক্ষ্ম (abstract) আলোচনায় যথেষ্ট আসক্ত হইয়া পড়েন। দর্শন-শাস্ত্র-পাঠে ঈশ্বর-বিশ্বাস দৃঢ় হয় না, বরং পূর্ব্বে সে-বিশ্বাস দৃঢ় থাকিলেও পরে তাহাই টিকিয়া থাকা অনেক সময় দুঃসহ হয়। কারণ যদিও কিছু-একটা প্রতিপাদন করাই দর্শন-শাস্ত্রসমূহের কাজ, তথাপি ইহার আলোচনার ফলে সে-বিষয় অনেক সময়ই অপ্রতিপাদ্য হইয়া উঠে।

যাহা হউক টল্‌স্টয় ক্রমে যৌবন সীমায় অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যে-সমাজে তিনি বাড়িতে লাগিলেন, সেখানে রাজসিক অহঙ্কার, কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি ছয়টা রিপুই প্রবল ছিল এবং সেগুলি আপনা হইতেই তাঁহারও মন অধিকার করিয়া বসিল। টল্‌স্টয়ের কোনো নিকট আত্মীয়া প্রায়ই তাঁহাকে বলিতেন যে, পুরুষত্বের পরিচয় দুইটি বিষয়ে পাওয়া যায় এবং টল্‌স্টয় পুরুষত্বের ঐ দ্বিবিধ পরিচয় দিলেই তিনি যারপরনাই সুখী হইবেন। পুরুষত্বের একটি পরিচয় কোনো সম্ভ্রান্তবংশীয়া সুন্দরী রমণীর সঙ্গে অবৈধ প্রণয় থাকা এবং আরেকটি নাকি মহামান্য জারের শরীর-রক্ষী হওয়া বা সৈন্যাধ্যক্ষ হওয়া। টল্‌স্টয় সেনাদলে যোগ দিয়াছিলেন এবং সেই সময়ে লিখিতে আরম্ভ করেন। সেনাদল ছাড়িয়া যখন তিনি রাজধানীতে আসিলেন—দেখিলেন যে গ্রন্থকার-হিসাবে বেশ একটু সম্মান তাঁহার ভাগ্যে জুটিয়া গিয়াছে। সেণ্ট্‌ পিটার্স্‌বার্গের লেখক-সমাজের সহিত তাঁহার পরিচয় হইল, তিনি তাঁহাদেরই একজন হইয়া উঠিলেন। সাময়িক পত্রের অভাব ছিল না, লেখকেরও অভাব ছিল না, লেখারও অভাব ছিল না। অভাব ছিল লেখার বিষয় ও লেখার সার্থকতার, কিন্তু সে-কথা কেহ স্বীকার করিত না। লেখকেরা সকলেই বিশেষ প্রতিভা লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে লেখাই যথেষ্ট, ভাবিয়া বুঝিয়া বা শিখিয়া লেখার কোনো আবশ্যকতা নাই, কারণ অপরকে ভাবাইয়া তোলা, অপরকে বুঝানো এবং অপরকে শিক্ষা দেওয়াই লেখকদের কাজ—এইরকম ছিল তখনকার মত। এমন মতবাদের কল্যাণে আপনার অহঙ্কার পোষণ করিতে পাইলে ও কিছু শিক্ষা না-করার জন্য মনকে প্রবোধ দিতে পাইলে কে না সে-অহঙ্কার পোষণ করে, কেই বা মনকে প্রবোধ না দেয়? টল্‌স্টয়ও তাই অহঙ্কার পুষিয়া মনকে প্রবোধ দিয়াছিলেন।

জন-সমাজে শিক্ষা প্রচারই যখন লেখকের কাজ তখন টল্‌স্টয় আপনার জমিদারিতে বর্ণজ্ঞানহীন প্রজাগণের মধ্যে শিক্ষাপ্রচার করিতে গেলেন এবং তাহার ফলে তাঁহাকে ঠেকিয়া মনে-মনে স্বীকার করিতে হইল, শিক্ষকেরও হয়ত কিছু শেখার প্রয়োজন আছে। সেইজন্য তিনি ইউরোপ মহাদেশে ভ্রমণ করিতে যান; এবং কিছু যে শিখিয়াছিলেন তাহাও নিশ্চয় সেখানকার সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রের সকল প্রতিভাবান্‌ বড় লোকদের সঙ্গে তাঁহার পরিচয়ে। সকল স্থানেই এই একটি কথা শিখিলেন যে, জগতে মানব-জীবনে সভ্যতায়, শিক্ষায়, দীক্ষায়, জ্ঞানে ক্রমশই উন্নতি হইতেছে।

ইউরোপ হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি বিবাহ করেন এবং বিবাহের পর কিছুদিন প্রণয়-সুখে কাল কাটান। এই সময়টি তাঁহার সুখের সময়। এই সময়ই তাঁহার প্রতিভা-বিকাশের সময়। তিনি অনায়াসেই বিশ্রাম না করিয়া অনবরত আট ঘণ্টা শ্রমসাধ্য বিষয়ে মস্তিষ্ক চালনা করিতেন। তাঁহার শরীরও এমন সুস্থ-সবল ছিল যে, ইহা ছাড়া মাঠে কৃষকদের সঙ্গেও সমানভাবে তিনি কাজ করিতে পারিতেন। একে-একে তাঁহার বইগুলি লেখা হইতে লাগিল, নামও হইতে লাগিল। তিনি ভাবিলেন কালে তিনি পুশ্‌কিন্‌, গোগল্‌, মোলিয়ের, সেক্‌স্‌পিয়র প্রভৃতি জগতের সকল বড় লেখকদের সমকক্ষ হইয়া উঠিবেন; এমন-কি, হয়ত যশে ও প্রতিভায় তাঁহা[illegible]র ছাড়াইয়াও যাইতে পারেন।

কিন্তু মানুষের সুখের আলোয় কোথা হইতে কখন্‌ কেমন করিয়া কি ছায়া যে পড়ে, তাহা কে জানে? টল্‌স্টয়ের পরিপূর্ণ সুখের আলোয় সেই ছায়া মাঝে-মাঝে আসিয়া পড়িল। সে শুধু কয়েকটি প্রশ্ন, আর-

কিছু নয়। প্রথম-প্রথম ভাবিতেন, এইসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কিছুই শক্ত নয়; বিশেষতঃ ভাবিলে তিনি নিশ্চয়ই নিজের মনকে উত্তর দিতে পারিবেন। সে-কথায় প্রশ্ন ফিরিয়া গেল, কিন্তু আবার তাহারা মনে ফিরিয়া-ফিরিয়া উদিত হইতে লাগিল। প্রশ্নগুলিকে দীর্ঘকাল আর উপেক্ষা করা চলে না, টল্‌স্‌টয় উত্তর খুঁজিতে প্রবৃত্ত হইলেন। টল্‌স্‌টয় ভাবেন, তাঁহার নূতন গ্রন্থ হইতে তাঁহার নাম জগতে আরও ছড়াইয়া পড়িবে, এমন সময় মনের মধ্যে কে যেন বলে, "তাহা যেন হইল, তুমি না হয় পুশ্‌কিন্‌, গোগল্‌, শেক্‌স্‌পিয়র সকলের অপেক্ষাই অধিক প্রতিভাবান্‌, অধিক যশস্বী হইলে, কিন্তু তাহাতে কি ফল?" টল্‌স্‌টয় ভাবেন, তাঁহার হাতে পড়িয়া পৈতৃক জমিদারির আরও আয়তন কেমন অনায়াসেই বাড়িয়া চলিল। মনের ভিতর কে বলে, "তাহাতে কি হইল?" তিনি আপনার পুত্রকে শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হন, তখন হয়ত সেই অদ্ভুত প্রশ্নকর্তাই আবার প্রশ্ন করিয়া বসিল, "কিন্তু কেন তোমার পুত্রকে শিক্ষা দিতে বসিলে? কি হইবে?" এরূপ হইলে মানুষ তিষ্ঠিতে পারে না, টল্‌স্‌টয়েরও জীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। তিনি দেখিতে লাগিলেন, মৃত্যুই মনুষ্য-জীবনের নিয়তি, তাঁহাকেও সকলের মতন মরিতেই হইবে—অন্য পথ নাই এবং সেই মৃত্যুর পূর্ব্বে জীবনের অর্থ কিছু দেখা গেল না, মৃত্যুতে বা মৃত্যুর পরেও কোনো অর্থ দেখা যায় না। এই অর্থ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, নহিলে দুদিন বেশী বাঁচিয়াই বা ফল কি? আজই আত্মহত্যা করিয়া জীবন শেষ করিয়া দেওয়া শ্রেয়। যাহাতে আত্মহত্যা না করিয়া বসেন, তাহার জন্য টল্‌স্‌টয়কে বিশেষ সাবধান হইয়া চলিতে হইল, কাছে পিস্তল রাখেন না, বন্দুক লইয়া একা শিকারে যান না, এমন-কি নিজের কাছে একগাছা দড়িও রাখেন না. পাছে রাত্রে আপনার নির্জ্জন কক্ষে আপনাকে লট্‌কাইয়া বসেন। অথচ মনে রাখিতে হইবে—টল্‌স্‌টয়ের প্রকৃত মানসিক অবস্থাটা যখন এই, তখনও তিনি বই লিখিতেছেন, বই ছাপাইতেছেন; শুধু যে জমিদারির আয় বাড়িতেছে, স্ত্রীপুত্র লইয়া সংসার করিতেছেন, স্নানাহার বেশবাস নিয়মিত হইতেছে—তাহা নয়। মানুষের বাহিরের রূপের আবরণ দেখিয়া এমন-কি তাহার ব্যবহার ও আচরণের পরিচয় পাইয়াও মানুষের প্রকৃত স্বরূপটি যে কি তাহা কে সব সময়ে নির্ভুলভাবে বলিয়া দিবে? টল্‌স্‌টয় মানুষের সমস্ত জ্ঞান-সাগর মন্থন করিতে লাগিলেন, সে-বিদ্যা তাঁহার যথেষ্টই ছিল। যুগে-যুগে মানুষ যাহা ভাবিয়াছে, যাহা বুঝিয়াছে, তাহাই আলোচনা করিয়া দেখিতে লাগিলেন; এবং এযুগে বিজ্ঞান বিবিধ শাখায় যাহা জানিয়াছে ও জানিতেছে—তাহাও তাঁহার জ্ঞানের বাহিরে রহিল না। বিজ্ঞান নানা বিদ্যার নানা বিষয়ের আলোচনা করিয়াছে,—তাহার জ্যোতিষ, রসায়ন, বস্তুতত্ত্ব, উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব, জীবতত্ত্ব—প্রভৃতি বহু শাখা। তাহার সকল কথা স্পষ্ট, প্রমাণিত, সত্য। কিন্তু জীবনের প্রশ্ন সে এড়াইয়া গিয়াছে। সে বলে, "ওসব কথা থাক্‌। আকাশের কোন্‌ তারকা কোথায় আছে, কত বেগে কোথায় যাইতেছে, জানিতে চাহিলে বলিতে পারি। আমিবা নামক জীবকোষ হইতে কেমন করিয়া জীব-জগতের সৃষ্টি-স্থিতি ও ক্রমোন্নতি, তাহাও আমি জানি এবং জটিল মানব-দেহ-কোষের রহস্যও উদ্ভেদ করিয়াছি। ভাবিয়া দেখ, জীবনের তত্ত্বমূলক ভাবনা বৃথা, কিন্তু মানব যাহাতে আরও সুসভ্য আরও সুখী হয় তাহার জন্য বিজ্ঞানের অতুলনীয় অক্লান্ত যত্ন কি প্রশংসার নহে?"—দর্শনশাস্ত্র জীবনের প্রশ্নকে এড়াইয়া যায় না, বরং ঐ প্রশ্ন লইয়াই তাহার আরম্ভ। কিন্তু যদি ইহা দুঃখের বিষয় না হইত, তবে নিঃসন্দেহ কৌতুকের বিষয় হইত যে, ঐ প্রশ্ন লইয়াই দর্শন-শাস্ত্রের শেষ। বুদ্ধদেব বলিতেছেন, "জীবন দুঃখময়, মৃত্যু হইতে মৃত্যুতেই তাহার গতি। অতএব এই জীবনের সমূলে উচ্ছেদ-সাধনই জীবনের পক্ষে একমাত্র শ্রেয় পথ। নির্ব্বাণই পরম প্রার্থনার বিষয়।" সলোমন বলিতেছেন, "জীবন দুঃখময়; মৃত্যুই জীবনের নিয়তি। আমার পূর্ব্বে যাহারা ছিল ও যাহা-কিছু ছিল, কিছুই নাই এবং আমিও থাকিব না। আমার সাম্রাজ্য, আমার ঐশ্বর্য্য, আমার সুখ-সম্ভোগ সমস্তই বৃথা। যাহারা অজ্ঞান, যাহারা অবোধ, যাহারা মূঢ় তাহারাই ধন্য; যে অবধি না চোখ ফুটিতেছে, সুখ-স্বপ্ন না ভাঙিতেছে, মৃত্যু না আসিতেছে, সে অবধি তাহারা পিতামাতার স্নেহ, রমণীর প্রেম, পানাহারের সুখ প্রাণ

ভরিয়া ভোগ করুক। আমার পক্ষে কোনো-প্রকার সুখ-ভোগের অস্তিত্ব নাই, শান্তিও নাই।" "জীবন দুঃখময়, মৃত্যুই জীবনের নিয়তি।"—শোপেন্‌হাউর্‌ও এই কথাই বলিয়াছেন।

ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি,এগুলি দর্শন-বিজ্ঞানের মাঝে পড়ে এবং এগুলি সত্য-মিথ্যায় পূর্ণ। দর্শনে-বিজ্ঞানে জীবনের যে-প্রশ্নের উত্তর মিলিল না, ঐগুলিতে সে-উত্তর মিলিবার নয়।

টল্‌স্‌টয় অবশেষে নিঃসন্দেহ বুঝিলেন,যে-প্রশ্ন সর্ব্বাপেক্ষা সরল মনে হইয়াছিল, বস্তুতঃ তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা জটিল, তাহারই উত্তর কখনও মিলে নাই, হয়ত মিলিবে না। উত্তর না পাইলে বাঁচিয়া থাকা দুরূহ, কিন্তু তবুও বাঁচিয়াই থাকিতে হইবে, কারণ আত্মহত্যাই শ্রেয় বলিয়া জানিয়াও সে-কার্য্যে অগ্রসর হইতে সাহস হয় না। চারি জাতির লোক আছে। প্রথম যাহারা জীবনের সম্বন্ধে ভাবে নাই, যাহাদের জীবনে জীবন-সম্বন্ধীয় পরম প্রশ্নটি উত্থাপিত হয় নাই তাহারা অজ্ঞ, তাহারা অবোধ, তাহারা মূঢ় এবং জীবনে সুখ-দুঃখ উভয়ের অস্তিত্ব থাকা সত্বেও তাহারা সুখীই বলিতে হইবে। তাহারা মৃত্যুকে প্রতি-নিয়ত দেখিতেছে, কিন্তু মৃত্যুর সম্বন্ধে ভাবে না, মৃত্যুকেই আপনার পরিণাম বলিয়া বুঝিয়া দেখে না। দ্বিতীয় জাতির লোক জীবনের পরিণাম বুঝিয়াছে, জীবনের কথা ভাবিয়াছে, কিন্তু কোনো মীমাংসায় না পৌছিয়া অবশেষে বলিয়াছে, "Eat, drink and be merry—while you live." "যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ। ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ?" তৃতীয় জাতির লোকেরা জীবনের কথা ভাবিয়াছে, বুঝিয়াছে এবং প্রকৃত বুদ্ধিমানের মতন পথটি লইয়াছে। তাহারাই সাহসী, তাহারা আসল ব্যাপারটি বুঝিয়া ভরা যৌবনেই আপনার হাতে আপনার জীবনটি শেষ করিয়া দিতে কুণ্ঠিত হয় না, তাহারা স্বচ্ছন্দে আত্মহত্যা করে; বর্ত্তমান যুগে তাহাদের সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে। টল্‌স্‌টয়ের মতে তাঁহার তৃতীয় পন্থা লওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু সাহসের অভাবে তিনি শেষ পথেরই পথিক হইয়াছেন। সলোমন, শোপেনহাউর্‌ এবং কেন জানি না বুদ্ধদেবকে পর্য্যন্ত তিনি সেইদিকেই টানিয়াছেন। মরিতে সাহস হয় না, তাই সকলের অপেক্ষা অধিক জানিয়া-শুনিয়া, অধিকতর ভাবিয়া-বুঝিয়া, তবুও বাঁচিয়া থাকা, ইহাই তাঁহাদের জীবন। হিংস্র জন্তুতে তাড়া করিয়াছে, অতল কূপে পড়িলাম, কূপের তলে একটা রাক্ষস মুখ হাঁ করিয়া আছে। পড়িতে-পড়িতে অসহায়ের অবলম্বন বলিতে মিলিল একটি কাঁটা-গুল্ম, পরে দেখি তাহার একদিকে একটি শ্বেত মূষিক, অপরদিকে এক কৃষ্ণ মূষিক শিকড় কাটিয়া ফেলিতেছে, জীবনের পরম দুঃখের যেটুকু আয়ু তাহাও দিন ও রাত্রি প্রতিনিয়তই হরণ করিতেছে। ইতিমধ্যে দেখিলাম, ঐ গুল্মের একটি পাতায় দুইবিন্দু মধু, তখন তাহাই লেহন করিয়া লইতেছি, তৃষ্ণা মিটে কি না, রস মিলে কি না কে জানে? কিন্তু জীবনের দুটি বিন্দু মধুর লোভ পরম সঙ্কটেও ত্যাগ করিতে পারি না।

এইরূপে টল্‌স্‌টয়ের অস্বস্তির জীবন কাটিতে লাগিল; দিনরাত্রি আসিতে-যাইতে লাগিল। তখন তিনি ভাবিলেন, "কিন্তু তাহা হইলে আদৌ এজগৎ টিঁকিয়া আছে কিরূপে? কেবল আমি বুঝিয়াছি আর শোপেন্‌হাউর ও সলোমন বুঝিয়াছেন, এমন নাও হইতে পারে। জগতের অনেক লোকেই জীবনের তত্ত্ব বুঝিয়াছে, কারণ জীবন যে তাহাদেরও, কিন্তু তবুও ত জগৎ টিকিয়া আছে এবং আরো বহু-বহু কাল টিঁকিয়া থাকিবার লক্ষণ দেখাইতেছে।...তবে বিজ্ঞান বা দর্শন পুস্তকের পাতায় নয়, কিন্তু নিখিল মানব-জীবনের পাতাতেই জীবনের তত্ত্ব অধ্যয়ন করিতে হইবে। তাহা হইলে হয়ত মীমাংসা পাওয়া যাইবে।" এইরূপে নূতনভাবে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া টল্‌স্‌টয় অবাক্ হইয়া দেখিলেন, সত্যই নিখিল জনসাধারণ জীবনের তত্ত্ব বোঝে এবং তাহারা জীবন লইয়া তবুও টিঁকিয়া আছে। কিসে তাহারা টিকিয়া আছে, সেও এক পরম আশ্চর্য্য ব্যাপার। তাহারা ধর্ম্ম-বিশ্বাসের (faith) দ্বারাই টিঁকিয়া আছে, সেই বিশ্বাসই তাহাদিগকে জীবনের অর্থ বুঝাইয়া দিয়াছে, যাহা টল্‌স্‌টয় নিখিল দর্শনশাস্ত্র খুঁজিয়াও বাহির করিতে পারিলেন না। এই ধর্ম্মবিশ্বাসকে (faith) তিনি আপনার সমশ্রেণীর সমাজে দেখিয়াও দেখেন নাই। সে-সমাজে বিশ্বাস—বিশ্বাসই

নয়, জীবনের সহিত তাহার কোনো সম্পর্কই নাই, পরম অদ্ভুত সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের তত্ত্ব, ভাবী মহাবিচারের চিত্র ও বিশেষ-বিশেষ উপায়ে উদ্ধার পাওয়ার আশা সমস্তই জীবনের একপাশে পড়িয়া আছে; আর সুখের, সম্ভোগের, বিলাসিতার জীবনই আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ হইয়া আসল জীবন হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু জন-সাধারণের মধ্যে যে-ধর্ম্মবিশ্বাস তাহা জীবন্ত, তাহা সমস্ত জীবনব্যাপী; তাহাদের বিশ্বাস, তাহাদের ব্রত আচার আচরণ যতই অদ্ভুত বা কুসংস্কারপূর্ণ মনে হউক না—জীবনের সহিত উহাদের সম্বন্ধ আছে, উহারা খাপ খাইয়াছে। তাই, অজ্ঞ, দরিদ্র অথচ শ্রমপরায়ণ বিপুল জনসমাজ জীবনের দারিদ্র্য, দুঃখ, শোক, অপমান, অত্যাচার, অন্যায়, রোগ-যন্ত্রণা, মৃত্যু—সমস্তই সহ্য করিতেছে, বাঁচিয়া আছে,—এমন-কি জীবনে সন্তোষ, আশা, উৎসাহ, প্রেম—ইহাদেরও কোনো অভাব নাই। এই আশ্চর্য্য দৃশ্য, এই মহান্ দৃশ্য টল্‌স্টয়ের অন্তঃকরণকে সবলে আকর্ষণ করিল; তিনি প্রতিভাবান্ বা প্রতাপশালীগণের বংশধর যাহাই হউন—তিনি অন্তরে-অন্তরে জনসাধারণের একজন ছিলেন, একথা আর তাঁহার নিজের কাছে লুকানো রহিল না। জন-সাধারণের হৃদয়ের দিকে হৃদয়ের এই প্রবল আকর্ষণে দেখিতে পাই, তিনি মানবের জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইতিহাস, শিক্ষা, দীক্ষা, সভ্যতা সমস্তকেই বহুলাংশে নিরর্থক বলিয়া মানিয়াছেন এবং সে-কথা বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। হয়ত তিনি একদিকের ঝোঁক ছাড়িয়া আর একদিকে অধিক ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন। যাহা হউক, স্বীয় আত্মকথায় তিনি বলিতেছেন, "জীবনকে যদি বুঝিতে হয়, সর্ব্বাগ্রে প্রকৃত জীবন যাপন করিতে হইবে, তাহার সমস্ত দুঃখদৈন্য, শ্রম বরণ করিয়া লইতে হইবে। সমাজের পরস্বাপহারী শোভাবিশেষ, পরগাছা-বিশেষ হইয়া থাকিলে চলিবে না। কিন্তু আমরা জমিদার, সম্ভ্রান্তবংশীয় প্রভৃতি সকলে সেই পরগাছা হইয়াই আছি। আর প্রকৃত জীবন লইয়া বাঁচিয়া আছে অজ্ঞ দরিদ্র পদদলিত অত্যাচারিত জন-সাধারণ।"—টল্‌স্টয় আর-একটি সুন্দর কথা বলিয়াছেন, এই কথাটি তিনি বহু জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যর্থ আলোচনার পর বুঝিয়াছেন যে, সসীমকে সসীম বলিয়া জানিলে কিছুই জানা হয় না, এবং অসীমকে অসীম বলিয়া জানিলেও কিছুই জানা হয় না, তাই সসীমকে অসীমের সম্পর্কে এবং অসীমকে সসীমের সম্পর্কে জানিতে হইবে। কিন্তু এরূপভাবে জানিতে হইলে যুক্তিতর্ক পরাজয় মানে। বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ব্যতীত এখানে উপায় নাই, তাই ধর্ম্ম-বিশ্বাস,—তাই faith. এই ধর্ম্মবিশ্বাস বা faith সসীমকে অসীমের সম্পর্কে এবং অসীমকে সসীমের সম্পর্কে জানিয়াই জীবনকে সম্যক্ জানিয়াছে; যাহারা আস্তিক, যাহারা আস্থাবান্, তাহারাও জীবনের একটি অর্থ পাইয়াছে।

যৌবনের প্রারম্ভে যে-বিশ্বাস তিনি কখন্ হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন, দীর্ঘকাল পরে বহু দুশ্চিন্তা ও বহু সন্ধানের পরে সেই বিশ্বাসকেই ফিরিয়া পাইলেন, ইহাই টল্‌স্টয়ের আত্মকথা। এই হারাইয়া ফেলিবার এবং ফিরিয়া পাইবার যে বিশেষ প্রয়োজন ছিল, তাহাও পরে বুঝা যাইতেছে। যে বিশ্বাস হয়ত শিথিলভাবে চিরকালই বর্ত্তমান থাকিত, সেই বিশ্বাস হারানিধি হইয়া পরে জীবনে জীবন্ত হইয়া উঠিল। তাহা-ছাড়া টল্‌স্টয় বিশ্বাস ও তত্ত্বানুসন্ধান করিয়াছিলেন এবং ফলে চার্চ্চকেও ছাড়াইয়া খৃষ্টেরই নিকটস্থ হইয়াছিলেন; শান্তি পাইয়াছিলেন—ইহাও হইতে পারে।

টল্‌স্টয় জনসাধারণেরই একজন হইবার সাধনা আরম্ভ করিলেন। খৃষ্ট-ধর্ম্মে জীবনের সম্বন্ধে কি বলে, তাহাই শুনিতে, বুঝিতে ও বিশ্বাস করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মের সমস্ত বাহ্য আচার-আচরণও মানিয়া চলিতে লাগিলেন। অনেক জিনিষ অদ্ভুত নিরর্থক বলিয়া প্রতিভাত হইতে লাগিল, কিন্তু দীর্ঘকাল মনকে শাসন করিয়া সে-সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করিতে দিলেন না, কারণ একবার সে ত আপনার বুদ্ধিতে মরণের পথেই চলিয়াছিল; দ্বিতীয় বারে সাবধান হওয়া উচিত। কিন্তু সত্যই যাহা নিরর্থক, অদ্ভুত বলিয়া মনে হয়, সে-সম্বন্ধে প্রবল মন ও সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিকে দীর্ঘকাল নীরব রাখা যায় না, শাসন করা যায় না, আঁখি ঠারিয়া রাখা চলে না। ধর্ম্মের তত্ত্বকে ভালো করিয়া বুঝিবার জন্যও অন্তত ধর্ম্মের তত্ত্বালোচনা করা আবশ্যক, অস্বীকার করিবার উদ্দেশ্য লইয়া আলোচনা না হওয়াই

হয়। প্রত্যেক ধর্ম্ম অপর ধর্ম্মকে মিথ্যা বলিতেছে, অন্ততঃ ধর্ম্মরক্ষকদিগের কথায় সেইরূপই মনে হয়। একই খ্রীষ্ট ধর্ম্মের একশাখা অপর শাখাকে শুধু ভ্রান্ত বলিয়াই ক্ষান্ত হইতেছে না, কিন্তু সামান্য দুয়েকটি অনুষ্ঠানের কয়েকটি অঙ্গে উভয়ের মতভেদ থাকায় বলিতেছে—যাহারা ঐ শাখা ধরিয়া আছে তাহাদের কোনো রূপেই আশা নাই, উদ্ধার নাই। কাজেই টল্‌স্টয় ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। বিরুদ্ধ মতামতের সে এক গহন কণ্টকবন, বুদ্ধি-বিভ্রান্তকারী ব্যাখ্যার দুস্তরণীয় সাগর; প্রথমে কিছুই বুঝা যায় না। যে ঈশ্বরকে মঙ্গলময় প্রেমময় বলা যাইতেছে—তাঁহার বিচারে একজনেরও অনন্ত নরক কেন হইবে, বা যাহাতে সেই নরক লাভ হইবে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ তাহার বীজ কেন রাখিবেন, সীমাবদ্ধ পাপের জন্য অসীম শাস্তিই বা কিরূপ ন্যায়সঙ্গত বিচার, এসমস্তই পরম রহস্য এবং এসমস্ত বিশ্বাস করাও যায় না। ক্রমে টল্‌ষ্টয় বুঝিলেন, প্রচলিত খৃষ্ট ধর্ম্মের পনেরো আনা পুরোহিত সম্প্রদায়ের দ্বারা স্বার্থ-সাধনোদ্দেশ্যে বিরচিত হইয়াছে। সেই ভেজাল ও সেই মিথ্যাকে ত্যাগ করিয়া খৃষ্টের ধর্ম্ম খুঁজিয়া বাহির করা সহজ নহে। খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচারকদের উচ্চ কলরবকে ছাপাইয়া খৃষ্টের বাণী শুনিতে পাওয়া যায় না। যে চার্চ্চের কথা খৃষ্ট স্বপ্নেও ভাবেন নাই, খৃষ্ট ধর্ম্মের সেই স্বার্থসম্ভূত সৃষ্টি খৃষ্টকে নির্ব্বাসিত করিয়াছে; টল্‌স্টয় জীবনতত্ত্বের নিকটস্থ হইয়াছিলেন, খৃষ্টেরও নিকটস্থ হইয়াছিলেন। তখন তিনি প্রচলিত খৃষ্ট ধর্ম্মের সম্বন্ধে যাহা বলিতেছেন, তাহাই তাঁহার "খৃষ্টীয় ধর্ম্মতত্ত্বের সমালোচনা" নামক পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব।

তাহা এই—

"আমার মনে আছে, যখন আমি চার্চ্চের শিক্ষায় সন্দিহান হইতে সুরু করি নাই, তখন আমি বাইবেলের এই কথাগুলি পাঠ করিয়াছিলাম। মানব-সন্তান খৃষ্টের সম্বন্ধে ভক্তিহীনভাবে কথা বলিলে ক্ষমা পাইবে, কিন্তু পবিত্র আত্মার বিষয়ে ভক্তিহীনভাবে কথা বলিলে এ-লোকে কি পরলোকে কোথাও ক্ষমা পাইবে না। এই কথাগুলি তখন আমি বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু আজ ইহারা আমার কাছে ভয়ঙ্কর রকম স্পষ্টই হইয়া উঠিয়াছে। এই ত সেই ভক্তিহীন বাণী—যাহার ক্ষমা ইহলোকেও নাই, পরলোকেও নাই। চার্চ্চ-বিষয়ক শিক্ষাকে ভিত্তি করিয়া চার্চ্চ যে ভয়ঙ্কর শিক্ষা দিতেছেন, তাহাই সেই ভক্তিহীন বাণী।" *

* এই প্রবন্ধ টল্‌ষ্টয়ের "My Confession" (ইংরেজী অনুবাদ) পাঠ করিয়া লিখিত।

চীনে প্রকৃতি-পূজা

শ্রী হরিপদ ঘোষাল, এম্-এ, বিদ্যাবিনোদ

কন্‌ফিউসিয়াসের প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ষষ্ঠ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে তাও-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা লেও-জু চীনদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। খৃষ্টের জন্মের কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে ইয়োরোপীয় সভ্যতার জন্মভূমি গ্রীস্-দেশে জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্রোত প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। সক্রেতিস্, প্লেটো ও আরিস্ততল্ এই যজ্ঞে প্রধান পুরোহিত ছিলেন। ঠিক্ সেই সময় সুদূর চীনদেশেও মানব-মনের জাগরণ ও মানব চিন্তা-শক্তির স্ফুরণ হইয়াছিল। যখন কন্‌ফিউসিয়াস্ চীনের পারিবারিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে নূতন ভাব আনয়ন করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন তাও-ধর্ম্মাবলম্বী জ্ঞানী ব্যক্তিগণ তাঁহাদের আবিষ্কৃত নূতন পথে চীনবাসীদিগকে পরিচালিত করিতেছিলেন এবং তাঁহাদের উচ্চ আদর্শে তাহাদিগকে অনুপ্রাণিত করিতেছিলেন।

তাও শব্দের অর্থ ধর্ম্ম-পথ। তাও-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা লেও জু। এই ধর্ম্মের স্বরূপ কি, ইহার অধিষ্ঠান কোথায়, ইহা কিরূপে জন্মিয়াছিল, কিরূপে বর্ত্তমান আছে এবং ইহার কার্য্য কি,—এই সমস্ত বিষয়ে এক্ষণে আমরা আলোচনা করিব।

তাও-ধর্ম্মের প্রধান লেখক চোয়াং-জু বলেন যে, ইহা অনন্ত কাল হইতে বর্ত্তমান আছে, ইহা কখনও ছিল না বলিতে পারা যায় না। লেও জু বলেন, এমন-কি ভগবানের পূর্ব্বেও তাও বর্ত্তমান ছিলেন।

তাও সমস্ত বিশ্বে অনুস্যূত রহিয়াছেন; সমস্ত বিশ্ব ইঁহার ঐশ্বর্য্য ও মহিমায় উদ্ভাসিত, অথচ ইঁহা হইতে সুন্দরতর কিছুই নাই। ইনি চন্দ্রসূর্য্যকে তাহাদের নির্দ্দিষ্ট পথে ভ্রমণ করিতে নিয়মিত করিয়াছেন। ইঁহার দেহ নাই, অথচ ইনি সমস্ত দেহবান্ বস্তুর জনক; ইঁহাকে শোনা যায় না, অথচ ইঁহার সাহায্যে সকল শব্দ শোনা যায়; ইঁহাকে দেখা যায় না, অথচ ইনি সমস্ত পদার্থের পশ্চাতে অবস্থিত। ইনি অপাণি-পাদ; ইনি কোথাও গমন করেন না, কিছুই করেন না। ইনি সমস্ত প্রাণীর জন্মদাতা, পালনকর্ত্তা ও আলোকদাতা। ইনি সমদর্শী ও ইচ্ছাশূন্য। ইনি সর্ব্বদা কার্য্য করিতেছেন—ইনি ভাগ্য-দেবতার ন্যায় নির্ম্মম, অথচ করুণাময়।

ইউ-নান-জু-নামক আর-একজন দার্শনিক বলিয়াছেন, তাও দ্বারা অনন্ত ব্যোম বিধৃত ও সমস্ত পৃথিবী ওতপ্রোত। ইঁহার সীমা নাই, ইঁহার উচ্চতা ও গভীরতা অপরিমেয়। ইনি আকৃতিহীন পদার্থকে আকৃতি-বিশিষ্ট করিয়া আমাদের সম্মুখে আনয়ন করেন। ইঁহার শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া পশুগণ ভ্রমণ করে—বিহঙ্গগণ আকাশে বিচরণ করে—চন্দ্রসূর্য্য ঔজ্জ্বল্য লাভ করে এবং গ্রহ-তারকা তাহাদের নির্দ্দিষ্ট পথে ঘুরিয়া বেড়ায়। ইঁহার কৃপায় বসন্ত-সমাগমে মৃদুমন্দ সমীরণ প্রবাহিত হয়, প্রাবৃটের প্রীতিদায়ক বারিধারা বর্ষিত হয় এবং জীবগণ প্রাণধারণ করে ও বর্দ্ধিত হয়: ইঁহার দয়ায় পক্ষীগণ ডিম্ব প্রসব করে ও তা দিয়া ছানা ফুটায়। যখন লোমযুক্ত পশুগণ শাবক প্রসব করে—যখন বৃক্ষলতা নবীন স্বর্ণাভ পত্ররাশি দ্বারা সুসজ্জিত হয়, তখন ইনি লোক-চক্ষুর অন্তরালে সমস্ত কর্ম্ম সম্পাদন করেন। ইনি আকারহীন, ছায়ার ন্যায় অস্পষ্ট, অথচ ইঁহার ক্ষমতা অফুরন্ত। সেই নামরূপরহিত শক্তির অসংখ্য গুণের মধ্যে কয়েকটি মাত্র গুণের কথা বলা হইল। একটি মাত্র কথায় ইঁহাকে প্রকাশ করা অসাধ্য। এইজন্য লেও-জু স্বয়ং বলিয়াছেন যে, সেই অজ্ঞেয় পদার্থকে কেবলমাত্র তাও-নামে অভিহিত করাই যুক্তিযুক্ত। যে-শক্তির অলক্ষ্য প্রভাবে উদ্যানে কুসুম বিকশিত হয় এবং জল নিম্নাভিগামী হয়—যাঁহার জন্য বৃষ্টিধারা পতিত হয় এবং সূর্য্য উজ্জ্বল কিরণ বিতরণ করে ও ঋতুগণ যথাসময়ে আবির্ভূত হয়—যাঁহা দ্বারা প্রজাপতির পক্ষ বিবিধবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে—যাঁহা হইতে উত্তাপ প্রসারণ ও শীতলতা আকুঞ্চন করিবার ক্ষমতা লাভ করিয়াছে—যিনি কাহাকেও বা ঘনকৃষ্ণ কেশরাজিতে সুসজ্জিত করিয়াছেন—এক কথায় বলিতে গেলে, যিনি সমস্ত দৃশ্য পদার্থের কারণ, যিনি এই বিশ্বরূপ বিরাট্ যন্ত্রের পরিচালক, তাঁহাকে আমরা অন্য কোনো নামে অভিহিত করিতে না পারিয়া কেবলমাত্র প্রকৃতি বলি। তাও-কে প্রকৃতি বা প্রধান কারণ বলিতে পারা যায়। অতএব আমরা তাও অর্থে প্রকৃতি এবং তাও-ধর্ম্ম অর্থে প্রাকৃতিক দর্শন বুঝি।

চোয়াং-জু বলিয়াছেন, এমন এক সময় ছিল যখন সমস্ত বস্তুর আরম্ভ বা জন্ম হইয়াছিল। তাহার পূর্ব্বেও কাল বর্ত্তমান ছিল। হিন্দু-শাস্ত্র-মতে কাল অনাদি—কালের আদি-মধ্য-অন্ত নাই। কাল অনন্ত হইতে জন্মলাভ করিয়া অনন্তকাল পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকিবে। লেও-জু বলিয়াছেন, যাঁহার বিকার নাই, তিনিই সমস্ত বিকারের কর্ত্তা; যিনি অজ বা জন্মরহিত, তিনিই সকলের জন্মদাতা; যাঁহার পরিবর্ত্তন নাই তিনিই সমস্ত প্রাণীর প্রাণস্বরূপ। একবার কোনো সম্রাট্ তাঁহার মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, বস্তুসমূহ জন্মিবার পূর্ব্বে কোনো পদার্থ ছিল কি না? মন্ত্রী উত্তর করিলেন, যদি না থাকে তাহা হইলে ইহা বর্ত্তমানে কিরূপে এবং কোথা হইতে আসিল? সম্রাট্ বলিয়াছিলেন, পদার্থ (matter) অনন্তকাল হইতে বর্ত্তমান আছে। মন্ত্রী উত্তর দিলেন, পদার্থ ছিল কি না তাহার কোনো প্রমাণ নাই এবং ইহা মানুষের জ্ঞানের বহির্ভূত। সম্রাট্ জিজ্ঞাসা করিলেন, বিশ্বের অন্ত আছে কি? মন্ত্রী বলিলেন যে, তিনি এই বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। সম্রাট্ বলিলেন, যেখানে কিছুই নাই, তাহাই অনন্ত এবং যেখানে কিছু আছে, তাহা সান্ত। মন্ত্রী উত্তর দিলেন, অনন্ত-সম্বন্ধে কেহ কিছু জানে না; তবে আমরা এইমাত্র জানি যে, পৃথিবী ও আকাশ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত। ইন্দ্রিয়জ্ঞানলভ্য এই অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র জগৎ ব্যতীত অন্য কোনো জগৎ আছে কি না তাহা আমরা কিরূপে জানিব?

তাও-মত উচ্চ বৈদান্তিক মত অপেক্ষা নিকৃষ্ট। তাও-দার্শনিকগণ প্রকৃতিকেই বিশ্বের আদি জননী বলিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃতি জড়-প্রকৃতির কারণ, অর্থাৎ কারণের কারণ ব্রহ্ম। তাও-মত আমাদের সাংখ্য-মতের ন্যায়। তাও বলেন, প্রকৃতি সমস্ত সৃষ্টির কারণ—দেবতাগণের প্রভুত্বের অপেক্ষা না করিয়া প্রকৃতি-দেবী স্বতই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। তাও-ধর্ম্মের পুরাতন গ্রন্থে ঈশ্বরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাকে শক্তি কিম্বা সৃষ্টিকর্ত্তা বলা হইয়াছে। কোথাও-কোথাও ঈশ্বরের বিদ্যমানতা প্রকাশ করিবার জন্য তাই=ঈশ্বর শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এইরূপ উল্লেখ অস্পষ্ট ও অনিশ্চিত। সৃষ্টি অর্থে পরিণাম বা পরিবর্ত্তন কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে। তাও-ধর্ম্ম সাংখ্যের ন্যায় পরিণামবাদ স্বীকার করেন।

তাও-ধর্ম্মানুসারে মানুষ এই ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্রাংশ মাত্র। সমস্ত বস্তুর ন্যায় মানুষও সেই বিশ্বব্যাপিনী শক্তির বিকাশ। ইহা কেবলমাত্র একটা দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক মত নহে। তাও-ধর্ম্মাবলম্বীর নিকট মৃত্যু কেবলমাত্র একটা অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তন। ইহা চক্রের আবর্ত্তন ব্যতীত আর কিছুই নহে। কালধর্ম্মে বৃক্ষের পত্র যেরূপ শুষ্ক হইয়া ঝরিয়া পড়ে কিম্বা ঋতুগণ যেমন একটার পর একটা আপনা হইতেই আসে, মৃত্যু ঠিক্ সেইরূপ। সময় আসিলে মানুষও নষ্ট হইয়া যায়, মরিয়া যাওয়া কেবল একটা প্রাকৃতিক নিয়ম। লেও-জু বলিয়াছেন, দারিদ্র্য যেরূপ পণ্ডিতগণের সহচর, সেইরূপ মৃত্যু সকলের চরম পরিণতি। মৃত্যুর জন্য শোক নিষ্প্রয়োজন। জীবনের সুখভোগের তীব্র বাসনা ভ্রম ব্যতীত কিছুই নহে। মানুষ মৃত্যুকে ভয় করে, কিন্তু ইহার শান্তির কথা জানে না। সৎ লোকের পক্ষে মৃত্যু শান্তির আগার, মন্দ লোকের পক্ষে মৃত্যু লুকাইবার স্থান। যাহাদের মৃত্যু হইয়াছে, তাহারা নিজের গৃহে ফিরিয়া গিয়াছে, কিন্তু যাহারা জীবিত আছে তাহারা এখনও ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

মানুষ প্রকৃতির দান-অংশ বিশেষ। অতএব তাহার জন্মগত পবিত্রতা রক্ষা করা উচিত। মানব-প্রকৃতির পবিত্রতা রক্ষা করা তাও-ধর্ম্মা-বলম্বীর মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু এই পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারা যাইবে কিরূপে? যিনি যথার্থ জ্ঞানী, তিনি সর্ব্ব বিষয়ে প্রকৃতি-জননীর অনুকরণ করিবেন—পূর্ব্ব হইতে কোনো উদ্দেশ্য স্থির না করিয়া যে বৃত্তি স্বতই মনে উদিত হয় তাহা পালন করিবেন। প্রকৃতি নিশ্চেষ্ট। অতএব জ্ঞানী কোনো চেষ্টা করিবেন না। প্রকৃতি নিস্তব্ধ, অতএব জ্ঞানী নিস্তব্ধভাবে সমস্ত ঘটনা দর্শন করিবেন। বাহিরের কোনো পদার্থের দিকে লক্ষ্য করিলে, ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি দ্বারা পরিচালিত হইলে, মানব-প্রকৃতির স্বাভাবিক পবিত্রতা কলুষিত বা নষ্ট হইয়া যায়। এমন-কি দয়া, ধর্ম্মভাব, সদ্ব্যবহার প্রভৃতি বৃত্তির অনুশীলনের আবশ্যকতা নাই; কোনো বস্তুর উপর হস্তক্ষেপ করিলে প্রকৃতির উপর অত্যাচার করা হয়। ইহা দূষণীয়। প্রকৃতি তোমাকে কৃষ্ণ কেশ দিয়াছেন, তুমি ইহাকে অন্য রংএ রঞ্জিত করিবে না; তোমার বর্ণ শুভ্র, তুমি ইহাকে গোলাপী রংএ পরিবর্ত্তিত করিবে না; ষণ্ডের দুইটি শৃঙ্গ ও খুর বিভক্ত, অশ্বের ঘাড়ে লম্বা-লম্বা চুল, কিন্তু যদি তুমি ষণ্ডের শৃঙ্গ ভাঙ্গিয়া দাও ও খুর কাটিয়া দাও, অশ্বের চুল ছাঁটিয়া ছোটো করিয়া দাও ও তাহার খুর কাটিয়া বিভক্ত করিয়া দাও তাহা হইলে তুমি প্রকৃতির বিরুদ্ধে কার্য্য

করিবে। ইহাই প্রকৃতির উপর হস্তক্ষেপ। এই অবিবেচনার কার্য্যের জন্য তোমাকে উপযুক্ত শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

অতএব মানুষকে প্রকৃতির সহিত খাপ্ খাওয়াইতে হইলে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে নৈষ্কর্ম্য অবলম্বন করিতে হইবে, হৃদয়ের সমস্ত বাসনা ও প্রচেষ্টা নির্ব্বাসিত করিতে হইবে। দেশের শাসনকার্য্যেও এই নীতি অবলম্বন করিতে হইবে। সকল বিষয়ে আইন করিলে রাজনৈতিক ব্যাপারে বৃথা হস্তক্ষেপ করিলে দেশে অশান্তি ও অরাজকতার সৃষ্টি হয়। জনসাধারণকে তাহাদের নিজের কার্য্য করিতে সুযোগ ও সুবিধা দাও—তাহাদের কার্য্যে তাহাদের প্রকৃতি-দত্ত ক্ষমতার স্ফুরণে বাধা দিও না—অনাবশ্যক কোনো কার্য্য করিও না। সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে, প্রাকৃতিক ও নৈতিক বিজ্ঞানের ব্যাপারে প্রকৃতি তাহার নিজ পন্থা খুঁজিয়া লউক। তাহা হইলে প্রজাগণ তাহাদের অবস্থায় সন্তুষ্ট হইবে, ষড়যন্ত্র, বিবাদ ও অনিষ্টপাত হইতে দেশ অব্যাহতি পাইবে। শ্রমজীবীর সাধারণ স্থূল হাতিয়ারের পরিবর্ত্তে জটিল কলের আমদানি করিলে বিলাসিতা, ষড়যন্ত্র, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও অসন্তোষ আসিয়া পড়িবে। কৃত্রিম সূক্ষ্ম যন্ত্র উদ্ভাবন করিবার বুদ্ধি-বৃত্তির পরিচালনে দুষ্ট বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। নৈষ্কর্ম্য, সরলতা ও সন্তোষ সুখের একমাত্র উপায় এবং দেহ-বুদ্ধি প্রবৃত্তি ইচ্ছার সহিত প্রকৃতির সামঞ্জস্য বিধান হইলে এই সুখ লাভ হয়।

তাও-ধর্ম্মের এই আদর্শ অনুসারে বহু ব্যক্তি সংসার ত্যাগ করিয়া নির্জ্জন স্থানে বাস করিয়াছিলেন। লোকালয় হইতে বহুদূরে পর্ব্বত-গুহায় কিম্বা ঘনপত্রসমন্বিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যপূর্ণ ছায়াযুক্ত স্থানে গমন করিয়া তাঁহারা চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। ভালোবাসা ও ঘৃণার প্রতি উপেক্ষা করিয়া, পার্থিব বস্তুসমূহের প্রতি বাসনা ও প্রবৃত্তি পরিহার করিয়া এবং জীবনী-শক্তি-ক্ষয়কারী সুখ, দুঃখ, চিন্তায় জলাঞ্জলি দিয়া অবিচলিতচিত্তে তাঁহারা গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। পার্ব্বত্য দেশের সরল-বিশ্বাসী অধিবাসীগণ মনে করে যে, প্রাচীন কালের সাধুগণ এখনও জীবিত আছেন। চি লি এবং শ্যানটুং প্রদেশের উপর দিয়া যে শৈলশ্রেণী পিকিং হইতে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে, তাহার মধ্যে "শত পুষ্পের পর্ব্বত-শৃঙ্গ"-নামে এক পবিত্র শৃঙ্গ আছে। তথায় অগণিত বন্য পুষ্প প্রস্ফুটিত হয় এবং পর্ব্বত গহ্বরে বহু ব্যাঘ্র ও হিংস্র জন্তু বাস করে। এই ভয়াবহ স্থানে অর্দ্ধপ্রোথিত অবস্থায় সাধুগণ বাস করেন। কথিত আছে, বহুকাল যাবৎ প্রকৃতির সহবাসে তাঁহারা অমৃতত্ব লাভ করিয়া অপার্থিব আনন্দের অধিকারী হইয়াছেন। স্বর্গের বৃষ্টিধারা তাঁহাদের মুখমণ্ডল ধৌত করে, সমীরণ তাঁহাদের মস্তকের কেশ-রাশির প্রসাধন করে। তাঁহাদের হস্তদ্বয় বক্ষে সন্নিবেশিত এবং তাঁহাদের নখ বর্দ্ধিত হইয়া গলদেশ পরিবেষ্টন করিয়াছে। তাঁহাদের দেহে তৃণ ও পুষ্প জন্মিয়াছে। কোনো ব্যক্তি তাঁহাদের নিকট গমন করিলে তাঁহারা কেবলমাত্র দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন, কিন্তু মৌনাবলম্বন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকের বয়স তিন শত বৎসরের অধিক; আবার কাহারও বয়স এক শত বৎসরের বেশী নহে। কিন্তু তাঁহারা সকলেই অমরতা লাভ করিয়াছেন। এমন এক দিন আসিবে, যখন তাঁহাদের জীর্ণ পুরাতন দেহ ক্ষয় হইয়া যাইবে, প্রাণবায়ু বহির্গত হইবে এবং তাঁহাদের আত্মা মুক্তিলাভ করিবে।

তাও-ধর্ম্মের কতকগুলি সুন্দর নীতি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। দয়ার কার্য্য দ্বারা অন্যায়ের প্রতিকার করিবে।

২। যিনি অপরকে জানেন তিনি বুদ্ধিমান্, কিন্তু যিনি নিজেকে জানেন তিনি যথার্থ জ্ঞানী।

৩। যিনি অপরকে পরাজয় করেন তিনি বলবান্, কিন্তু যিনি আত্মজয় করেন তিনি শক্তিশালী।

৪। কামনার বন্যা শ্লথ করা অপেক্ষা অধিকতর পাপ কার্য্য নাই; অসন্তোষ অপেক্ষা অধিকতর দুঃখ নাই; ধনলোভ অপেক্ষা অধিকতর বিপদ্ নাই।

৫। করুণা, সংযম ও নম্রতা, এই তিনটি মূল্যবান্ বস্তু।

৬। জল অপেক্ষা অধিকতর দুর্ব্বল বা নরম পদার্থ নাই, কিন্তু শক্ত ও কঠিন পদার্থকেও ইহা ভেদ করে।

কন্‌ফিউসিয়াস্ ও তাঁহার শিষ্যগণ গ্রন্থ, প্রথা ও গুরুকে অতি ভক্তি করিতেন। ইহার জন্য দার্শনিক চোয়াং-জু উপহাস করিতেন এবং বলিতেন যে, মানুষের চিন্তা ও বিচারের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। তাঁহার মৃত্যু-শয্যায় উপবিষ্ট আত্মীয়গণকে তিনি অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃতদেহ যেন সমাহিত না হয়। "আকাশ ও পৃথিবী আমার সমাধি হইবে; সূর্য্য ও চন্দ্র আমার ক্ষমতার পরিচয় দিবে; এবং সমস্ত সৃষ্ট জগৎ আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার শোক প্রকাশ করিবে।" পক্ষীগণ তাঁহার মৃতদেহ খণ্ড-খণ্ড করিবে বলিয়া তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহার অনুরোধ প্রত্যাহার করিতে বলিলে তিনি কহিলেন—ইহাতে ক্ষতি কি? উপরে আকাশের পক্ষী, নিম্নে কীট ও পিপীলিকার যদি একজনকে বঞ্চিত করিয়া অন্যের খাদ্য জোগাও, তাহা হইলে বিশেষ-কিছু অন্যায় হইবে কি?

তাও-ধর্ম্মের কয়েকখানি উপাদেয় গ্রন্থ আছে। তাহার মধ্যে সু-শু ও কাণ-ইং-পিএন প্রধান। সু-শু গ্রন্থে শাসনকর্ত্তাদিগের কর্ত্তব্যের কথা লিখিত হইয়াছে। কান-ইং-পিএন-নামক পুস্তক সাধারণের শিক্ষার জন্য লিখিত হইয়াছিল। চীনের আপামর জনসাধারণ এই গ্রন্থ পাঠ করে এবং ইহার উচ্চ শিক্ষা লক্ষ-লক্ষ ব্যক্তির জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। সুন্দর-সুন্দর বহু নীতিশিক্ষা এই সকল পুস্তক-পাঠে অবগত হওয়া যায়। ধর্ম্ম-পথে জীবন পরিচালিত করিতে হইলে যে-সমস্ত উচ্চ নীতি দ্বারা মানব-মন পরিমার্জ্জিত ও সংশোধিত হইতে পারে—চরিত্র সুসংস্কৃত হইয়া হৃদয়ে সদ্‌গুণরাশি বিকশিত হইতে পারে এবং মানব-প্রকৃতির দেবত্ব উজ্জ্বলভাবে দৈনন্দিন কার্য্যাবলীর মধ্যে প্রতিফলিত হয়, তাও-ধর্ম্মে তাহার অসদ্ভাব হয় নাই। যে-সমস্ত উচ্চ নীতি ও শিক্ষা বৌদ্ধ ধর্ম্ম, হিন্দুধর্ম্ম ও খৃষ্টান ধর্ম্মের গৌরব—যাহার জন্য এইসমস্ত ধর্ম্মের প্রচারক ও উপদেষ্টাগণ গর্ব্ব অনুভব করিয়া থাকেন; প্রাচীনকালে চীনদেশে তাহার অভাব হয় নাই।

কালে এই পবিত্র তাও-ধর্ম্মের অবনতি ঘটিয়াছিল। লেও-জু প্রবর্ত্তিত উচ্চ সন্ন্যাস-ভাব মৃতদেহ রক্ষায় বহুবিধ প্রক্রিয়ার উদ্ভাবনে পর্য্যবসিত হইল। যে উচ্চ দার্শনিক চিন্তা প্রকৃতির গূঢ় গুপ্ত রহস্য উদ্‌ঘাটনের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হইয়াছিল, তাহাই আবার অপকৃষ্ট ধাতব পদার্থকে কি-রূপে স্বর্ণে পরিণত করিতে পারা যায় তাহার চেষ্টায় পরিণত হইল—মৃত্যুর পর অনন্ত জীবন লাভ করিবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা, পার্থিব জীবন দীর্ঘকাল স্থায়ী করিবার উপায় উদ্ভাবনে রত হইল এবং প্রকৃতির পবিত্র সাহচর্য্যে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিবার প্রচেষ্টা তাও-ধর্ম্মাবলম্বী পুরোহিত-সম্প্রদায়ের ভূতপ্রেতদিগকে মন্ত্রে বশীভূত করণের জাদুবিদ্যায় পরিণত হইল। এক্ষণে তাও ধর্ম্মের প্রধান জাদুকর অমরত্ব-লাভের গুপ্ত মন্ত্র জানেন বলিয়া সকলে বিশ্বাস করে এবং চীনের অশিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁহাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকে। অশিক্ষিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন পুরোহিত-সম্প্রদায়ের হাতে পড়িয়া উচ্চ ধর্ম্মের কিরূপ অবনতি ঘটে, তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান তাও-ধর্ম্ম।

প্রাচীন চীনদেশে লোক-শিক্ষার জন্য কন্‌ফিউসিয়াস্ ও লেও-জু এই দুইটি মহাপুরুষের জন্ম হইয়াছিল। কতকগুলি কৃত্রিম নিয়ম ও ব্যবস্থা

প্রণয়ন করিয়া কন্‌ফিউসিয়াস্ সাম্রাজ্য-সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু লেও জু সমাজের প্রথম অবস্থায় ফিরিয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন, মানুষ তখনও আইন-কানুনের দাস হয় নাই, তখন স্বচ্ছন্দ বনজাত ফলমূলে তাহার উদর পূর্ণ হইত ; স্বার্থপরতা, কৃত্রিমতা তাহার স্বাভাবিক পবিত্রতা কলুষিত করে নাই ; তখন সম্রাট্‌গণ পবিত্র তাও অবলম্বন করিয়া শান্তির সহিত তাঁহাদের সন্তুষ্ট প্রজাগণের উপর আধিপত্য করিতেন।

ছুরি ও বাঁক শিক্ষা

শ্রী পুলিনবিহারী দাস

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

যুযুৎসু

চতুর্থ পাঠ

"যাওয়া", "শিরদক্ষিণ", "ত্রিহর", প্রভৃতিতে আক্রান্ত হইলে আক্রান্ত-ব্যক্তি (যুযুৎসু-প্রয়োগকারী) ঈষৎ অগ্রসর হইতে-হইতে তুরন্তে দক্ষিণ মণিবন্ধের কনিষ্ঠাঙ্গুলীর দিকের পার্শ্ব আক্রমণকারীর দক্ষিণ মণিবন্ধে প্রয়োগ করিয়া ঐ হস্তের গতি প্রতিরোধ করিবে, এবং সঙ্গে-সঙ্গেই বাম হস্ত আক্রমণকারীর দক্ষিণ পার্শ্বের দিক্ হইতে তাহার কফোণির (কনুইয়) অভ্যন্তরের দিক্ দিয়া লইয়া নিজ দক্ষিণ হস্তের প্রকোষ্ঠ (পুরোবাহু) ধারণ করিবে ; (যথা, দ্বাবিংশ, ত্রয়োবিংশ ও চতুর্বিংশ চিত্রে) এবং দ্রুতবেগে ও সবলে তন্মুহূর্ত্তেই নিজ বাম-পার্শ্বের দিকে হেলিয়া

২২শ চিত্র

২৩শ চিত্র

আক্রমণকারীর দক্ষিণ বাহুকে তাহার (আক্রমণকারীর) দক্ষিণদিকে চাপিয়া তাহাকে ভূপতনোন্মুখ করিবে (যথা, পঞ্চবিংশ চিত্রে)।

সঙ্গে-সঙ্গেই প্রতিকারে অসমর্থ হইলে, আক্রমণকারীর

দক্ষিণহস্ত সম্পূর্ণ আড়ষ্ট ও বিকল হইয়া পড়িবে, এবং তাহার ফলে সে নিজ দক্ষিণপার্শ্বের দিকে ভূপতিত হইবে।

২৪শ চিত্র

২৫শ চিত্র

আক্রমণকারীর প্রতিকার ঃ—

প্রতিকার হেতু আক্রমণকারীকে যুযুৎসুপ্রয়োগকারীর প্রথম প্রচেষ্টার সঙ্গে-সঙ্গেই তুরন্তে "ব্র্যাত্রথাবা" প্রয়োগের

২৬শ চিত্র

২৭শ চিত্র

উপক্রম করিতে হইবে; যথাসময়ে ও সফলতাসহ "ব্যাঘ্রথাবা" প্রয়োগ করিতে না পারিলে, আক্রমণকারী তুরন্তে নিজ বামহস্ত যুযুৎসু-প্রয়োগকারার দক্ষিণ

২৮শ চিত্র

২৯শ চিত্র

কফোণির (কনুইএর) অভ্যন্তরের দিকে প্রবেশ করাইয়া বামহস্ত নিজ বামদিকে এবং দক্ষিণবাহু নিজ দক্ষিণ-দিকে সবলে ও সবেগে চালনা করিয়া যুযুৎসু-প্রয়োগকারীর

৩০শ চিত্র

৩১শ চিত্র

বাহুদ্বয়কে অপসারিত করিয়া নিজে মুক্ত হইয়া যাইবে (যথা, ষড়্‌বিংশ, সপ্তবিংশ ও অষ্টবিংশ চিত্রে)।

পঞ্চম পাঠ

"হীনায়ন," "যবেগা দক্ষিণ," "মুণ্ডাদক্ষিণ" প্রভৃতিতে আক্রান্ত হইলে, আক্রান্ত-ব্যক্তি (যুযুৎসু-প্রয়োগকারী) বামহস্ত দ্বারা তুরন্তে আক্রমণকারীর দক্ষিণ মুষ্টির ঊর্দ্ধ ভাগে ধারণ করিবে, এবং সঙ্গে-সঙ্গেই নিজ দক্ষিণ মুষ্টি আক্রমণকারীর দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে তাহার দক্ষিণ-কফোণির (কনুইর) অভ্যন্তরের দিকে প্রবেশ করাইয়া, নিজ দক্ষিণ মণিবন্ধ জড়াইয়া ধরিবে; তদবস্থায় যুযুৎসু-প্রয়োগকারীর

৩২শ চিত্র

৩৪শ চিত্র

৩৩শ চিত্র

৩৫শ চিত্র

ছুরি আক্রমণকারীর মণিবন্ধের পৃষ্ঠের দিক্ দিয়া নির্গত হইয়া পড়িবে (যথা, উনত্রিংশ, ত্রিংশ ও একত্রিংশ চিত্রে)।

৩৬শ চিত্র

তৎকালে আক্রমণকারী নিজ দক্ষিণহস্ত সামান্য অসতর্কতার সহিত সঞ্চালন করিবার প্রয়াস পাইলেই যুযুৎসু-প্রয়োগকারীর ছুরি হইতে গুরুতর ক্ষত প্রাপ্ত হইবে।

৩৮শ চিত্র

৩৭শ চিব

৩৮শ চিত্র

তৎপর যুযুৎসু প্রয়োগকারী বামহস্ত আনয়ন করিয়া আক্রমণকারীর দক্ষিণ-কফোণির (কনুইর) ভঙ্গের নিম্নে স্থাপন করিয়া তাহার (আক্রমণকারীর) কফোণি (কনুই) উর্দ্ধ দিকে চালনা করিয়া দিবে। (যথা, দ্বাত্রিংশ ও ত্রয়স্ত্রিংশ চিত্রে)

সঙ্গে-সঙ্গেই প্রতিকারে অসমর্থ হইলে, এই প্রক্রিয়ার ফলে আক্রমণকারী তাহার স্কন্ধ-সন্ধিতে অত্যন্ত বেদনা বোধ করিবে, এবং তাহার মণিবন্ধে ও যুযুৎসু প্রয়োগ-কারীর ছুরি হইতে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইতে পারে।

৪০শ চিত্র

৪২শ চিত্র

৪১শ চিত্র

৪৩শ চিত্র

আক্রমণকারীর প্রতিকার ঃ—

প্রতিকার হেতু যুযুৎসু-প্রয়োগকারীর প্রথম প্রচেষ্টার সঙ্গে-সঙ্গেই আক্রমণকারী "ব্যাঘ্র থাবার" প্রয়োগ করিয়াই নিজ বামহস্ত দ্বারা যুযুৎসু-প্রয়োগকারীর দক্ষিণ মুষ্টি ও ছুরি ধরিয়া সুকৌশলে নিজ দক্ষিণ হস্ত মুক্ত করিয়া লইবে।

৪৪শ চিত্র

৪৫শ চিত্র

ঐরূপ করিতে না পারিলে, তুরন্তে বামাবর্ত্তে ঘুরিতে আরম্ভ করিবে এবং সঙ্গে-সঙ্গেই নিজ বামহস্ত দ্বারা যুযুৎসু-প্রয়োগকারীর দক্ষিণ মুষ্টি এরূপভাবে আকর্ষণ করিয়া ধরিবে, যে কোনোরূপেই যুযুৎসু-প্রয়োগকারী ছুরি দ্বারা তাহার (আক্রমণকারীর) দক্ষিণ মণিবন্ধে আঘাত করিতে না পারে (যথা, চতুস্ত্রিংশ ও পঞ্চত্রিংশ চিত্রে)।

৪৬শ চিত্র

৪৭শ চিত্র

ক্রমে সম্পূর্ণ বামাবর্ত্তে ঘুরিয়া আসিতে-আসিতে নিম্নের দিকে সবেগে ও সবলে চালনা করিয়া (ঝাঁকি দিয়া) নিজ দক্ষিণহস্ত মুক্ত করিয়া লইয়া যুযুৎসু-প্রয়োগকারীর সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইবে। (যথা, ষড়্ত্রিংশ, সপ্তত্রিংশ ও অষ্টত্রিংশ চিত্রে)

ষষ্ঠ পাঠ

পূর্ব্ব পাঠে বর্ণিত একত্রিংশ. চিত্র-সম্পর্কিত প্রক্রিয়ার পরে আক্রমণকারীর কফোণির (কনুইর) ভঙ্গের উপরে যুযুৎসু-প্রয়োগকারী নিজ বামহস্ত স্থাপন করিয়া, উভয় হস্ত দ্বারা আক্রমণকারীর দক্ষিণ-বাহু সবলে ও সবেগে নিম্নের দিকে বিপ্রকর্ষণ করিবে (চাপিয়া ধরিবে)। (যথা,উনচত্বারিংশ ও চত্বারিংশ চিত্রে)

৪৮শ চিত্র
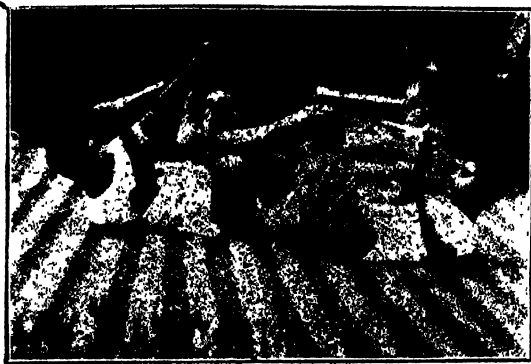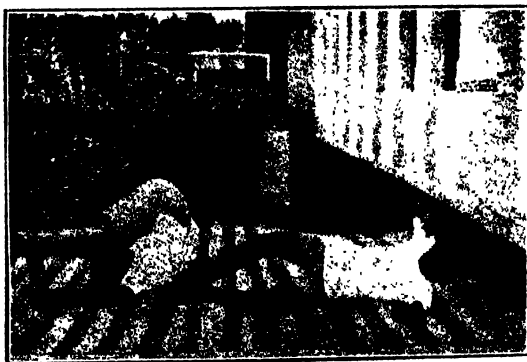
৪৯নং চিত্র

সঙ্গে-সঙ্গেই প্রতিকারে অসমর্থ হইলে, এই প্রক্রিয়ার ফলে আক্রমণকারীর দক্ষিণ স্কন্ধ-সন্ধিতে তীব্র যাতনা উদ্ভূত হইবে ; এবং সম্পূর্ণ অতর্কিতে হইবে বলিয়া যাতনার তীব্রতাও অত্যন্ত গুরুতর হইবে। এমতাবস্থায় আক্রমণকারী অকৌশলে বল প্রয়োগ দ্বারা মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করিলে তাহার যাতনা আরও অধিক গুরুতর-ভাবে অনুভূত হইবে, এমন-কি, যাতনা স্থায়ী হইয়াও যাইতে পারে, কিম্বা ঐ সন্ধি-সংযোগ বিচ্যুত হইয়াও যাইতে পারে।

আক্রমণকারীর প্রতিকার ঃ—

প্রতিকার হেতু যুযুৎসু প্রয়োগকারীর প্রথম প্রচেষ্টার সঙ্গে-সঙ্গেই, তাহার পশ্চাতে যাইতে-যাইতে, আক্রমণকারী বামহস্ত যুযুৎসু-প্রয়োগকারীর মস্তকের বামপার্শ্ব দিয়া আনিয়া অঙ্গুলীর প্ররোহ-সমূহ (nodes ; tips of

৫০নং চিত্র

৫১নং চিত্র

fingers) দ্বারা তাহার (যুযুৎসু-প্রয়োগকারীর) চিবুক-তলে ("জনার্দ্দনে") সবলে টিপিয়া ধরিবে। (যথা, একচত্বারিংশ চিত্রে) এবং তদবস্থায়ই চক্ষুর নিমেষে যুযুৎসু-প্রয়োগকারীর মস্তক ঈষৎ ঊর্দ্ধে ও পরে পশ্চাদ্দিকে আকর্ষণ করিয়া, ক্রমে তাহাকে উত্তানভাবে

(চিৎ করিয়া) ভূপাতিত করিয়া ফেলিবে। (যথা, দ্বিচত্বারিংশ, ত্রিচত্বারিংশ ও চতুশ্চত্বারিংশ চিত্রে)

এই প্রক্রিয়ার কালে আক্রমণকারী তাহার বামপদ দ্বারা যুযুৎসু-প্রয়োগকারীর বামপদের অঙ্গুলিগুলি কিম্বা পার্ষ্ণিদেশ (গোড়ালি) দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিলে, যুযুৎসু-প্রয়োগকারীর প্রতি প্রতিকার-পক্ষে অনেক ব্যাঘাত জন্মিবে। কারণ, যুযুৎসু-প্রয়োগকারীর

৪২নং চিত্র

৪৩নং চিত্র

বামপদ মুক্ত থাকিলে, আক্রমণকারীর প্রক্রিয়ার প্রচেষ্টার সঙ্গে-সঙ্গেই, সে (যুযুৎসু-প্রয়োগকারীর) সুযোগ মতে দক্ষিণাবর্ত্তে কিম্বা বামাবর্ত্তে ঘুরিয়া গেলে, নিজকে সহজেই সুকৌশলে মুক্ত করিয়া লইতে পারিবে।

আক্রমণকারী বর্ণিত প্রক্রিয়ার সাহায্যে যুযুৎসু-প্রয়োগকারীকে ভূপাতিত করিতে পারিলে, তাহার বক্ষঃ-স্থলে চাপিয়া বসিয়া পুনরায় তীব্ররূপে আক্রমণের উপক্রম করিবে।

যুযুৎসু-প্রয়োগকারীর প্রতি-প্রতিকার :—

ভূপতিত হওয়ার উপক্রম হইলেই যুযুৎসু-প্রয়োগকারী পূর্ব্ব হইতেই দক্ষিণপদ শূন্যে তুলিয়া এবং কটিদেশে নির্ভর রাখিয়া পৃষ্ঠদেশ প্রায় ধনুক ⌒ পৃষ্ঠাকৃতি বক্র করিয়া এরূপ-ভাবে পতিত হইবে যেন, মস্তক ও শ্রোণিদেশ (পাছা) শূন্যেতেই থাকে। (চিত্র-মধ্যে বর্ণনারূপ প্রক্রিয়া সম্যক্ পরিস্ফুট হয় নাই।)

৪৪নং চিত্র

ভূপতিত হইয়াই তুরন্তে উভয় জঙ্ঘা নিজ বক্ষোপরি সঙ্কুচিত করিয়া লইয়াই আক্রমণকারীর বক্ষঃস্থলে পাদতল-দ্বয় নিবদ্ধ করিয়া চক্ষুর নিমেষে সবেগে ও সবলে পদদ্বয় চালনা করিয়া আক্রমণকারীকে উত্তানভাবে (চিৎ করিয়া) ভূপাতিত করিয়া ফেলিবে। (যথা, পঞ্চচত্বারিংশ, ষট্‌-চত্বারিংশ, সপ্তচত্বারিংশ ও অষ্টচত্বারিংশ চিত্রে)

নিষ্কৃতি :—

নিষ্কৃতি হেতু যুযুৎসু-প্রয়োগকারী তুরন্তে বামামোটনের উপক্রম করিয়াই উঠিয়া বসিয়া ক্রমে প্রতিপক্ষের সম্মুখীন

হওয়ার উপক্রম করিবে, এবং আক্রমণকারী উত্তানভাবে (চিৎ হইয়া) পড়িয়াই, উত্তানামোটনে ঘুরিয়া আসিয়া (ডিগ্‌বাজি খাইয়া) ক্রমে প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হওয়ার উপক্রম করিবে। (যথা, উনপঞ্চাশৎ ও পঞ্চাশৎ চিত্রে)

অথবা ঃ—

যুযুৎসু-প্রয়োগকারী উত্তানভাবে পতিত হইয়াই ত্বরান্বে মস্তক ও পৃষ্ঠ তুলিয়া উঠিয়া বসিয়া ক্রমে স্থিরভাবে প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হওয়ার উপক্রম করিবে, এবং আক্রমণকারী উত্তানামোটনে ঘুরিয়া আসিয়া ক্রমে প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হওয়ার উপক্রম করিবে (যথা,এক পঞ্চাশৎ, দ্বিপঞ্চাশৎ, ত্রিপঞ্চাশৎ ও চতুষ্পঞ্চাশৎ চিত্রে)।

যুযুৎসু-প্রয়োগকারীর ভূমি হইতে উঠিতে-উঠিতে যে সময়ের প্রয়োজন হইবে,তন্মধ্যেই আক্রমণকারীকে উত্তানামোটন সম্পন্ন করিয়া যুযুৎসু-প্রয়োগকারীর সম্মুখীন হইতে হইবে। ইহাই বুঝাইবার নিমিত্ত পূর্ব্বের চিত্রগুলি প্রদর্শিত হইল। সুকৌশলে ও সক্ষিপ্রতাসহ অঙ্গামোটনগুলি সম্পন্ন করিতে হইলে, শিক্ষার প্রারম্ভকাল হইতেই বারম্বার অভ্যাস দ্বারা উহাতে সুদক্ষ ও ক্ষিপ্রকারী হওয়া নিতান্তই আবশ্যক।

উত্তানামোটন ও অধঃশিরামোটন পদ্ধতি পরে বর্ণিত হইবে।

(ক্রমশঃ)

পূজার তত্ত্ব

শ্রী সীতা দেবী

সমস্ত দিন হাড়ভাঙা খাটুনীর পর বৃন্দাবন সবে আসিয়া আপনার সর্ব্বদুঃখহারী হুঁকাটিকে হাতে লইয়া বসিয়াছে, এমন সময় তাহার ভাইঝি কাত্যায়নী আসিয়া ঝড়ের মতন তাহার পিঠের উপর আছাড় খাইয়া পড়িল। কোনোমতে নিজেকে এবং হুঁকা-কলিকা সাম্‌লাইয়া বৃন্দাবন জিজ্ঞাসা করিল "কি হয়েছে কাতু, কাঁদ্‌ছিস কেন?

কাতু ফোঁপাইতে-ফোঁপাইতে বলিল, "জেঠাইমা মেরেছে।"

বৃন্দাবন কিছু বলিবার আগেই তাহার স্ত্রী ঘর হইতে গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিল, "না মারবে না, ওঁকে মাথায় ক'রে রাখ্‌বে। একটা জিনিষ ত কোনোদিন হাতে তু'লে দিতে পারেনি এপর্য্যন্ত, আদরের ভাইঝি পাঠিয়েছেন আমার বাপের বাড়ীর দেওয়া জিনিষপত্র ভাঙ্‌তে।"

বৃন্দাবন একটু ঝাঁঝিয়া বলিয়া উঠিল, "কি আবার ভাঙ্‌ল তোমার? এসে অবধি মেয়েকে কি যে বিষ নজরে দেখেছ! খিচিমিচির জালায় আর বাড়ী ফির্‌তে ইচ্ছা হয় না। নিজের পেটে ত একটাও হয়নি, এটাকেই না হয় একটু আদরযত্ন করো, তা তোমার কুষ্ঠীতে লেখেনি।"

"হ্যাঁ, আদর কর্‌বে, ঝাঁটা মার্‌তে হয় অমন মেয়ের মুখে। শ্বশুরবাড়ী যাবার বয়স হ'ল, এখনও মেয়ে যেন বাঁদরের মতন নেচে বেড়াচ্ছেন। এই দেখনা আমার আরশীখানা কেমন কুচি-কুচি ক'রে ভেঙেছে।" বৃন্দাবনের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী লবঙ্গলতা একখানা ভাঙা আরশী হাতে করিয়া বাহির হইয়া আসিল।

কাতু ততক্ষণ জ্যাঠার পিঠের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইয়া চোখ মুছিতেছিল। তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনিয়া বলিল, "ও বুঝি আমি ভেঙেছি, ও ত পুষি ভেঙেছে।

লবঙ্গ চটিয়া গিয়া চড়া-গলায় বলিল, "পুষিকে শিকল খু'লে আমার ঘরে ঢুকিয়েছিল কে?"

কাতু অম্লানবদনে বলিল, "আমি তোমার ঘরে মা-দুর্গার ছবি দেখ্‌তে গিয়েছিলাম, পুষি আমার কোল

থেকে ঝাঁপিয়ে তোমার আরশীর উপর পড়্‌ল ত আমি কি করব ?"

"কি আর করবে, আদরের জ্যাঠার কোলে উ'ঠে নালিশ করো গিয়ে আমার নামে," বলিয়া রাগে গর্‌-গর্‌ করিতে-করিতে লবঙ্গ নিজের কাজে চলিয়া গেল। কাতু খেলার সাথীর সন্ধানে বাহির হইল, বৃন্দাবন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আবার হুঁকায় মনোনিবেশ করিল।

বৃন্দাবনের ছোটো ভাই নিবারণ ও তাহার স্ত্রী বছর-ছয় আগে কলেরায় প্রায় একই দিনে দেহত্যাগ করে। তাহাদের চার-বছরের মেয়ে কাত্যায়নী জ্যাঠার কাছে তাহার পর হইতে মানুষ হইতেছে। একটি বুড়ী ঝির সাহায্যে কিছু কাল কাজ চালানোর পর সেও যখন হঠাৎ ধরাধাম হইতে বিদায় গ্রহণ করিল তখন পাড়া-প্রতিবাসীর পরামর্শে এবং নিজেও উপায়ান্তর না দেখিয়া, বৃন্দাবন পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে রাজি হইল। পাশের গাঁয়ের পরাণ মণ্ডলের মেয়ে বয়সেও বড় এবং দেখিতে-শুনিতেও মন্দ নয় বলিয়া শোনা গেল, সুতরাং দিন-ক্ষণ দেখিয়া তাহাকেই বিবাহ করিয়া আনিয়া বৃন্দাবন গৃহে অধিষ্ঠিত করিল।

কিন্তু কাতুকে মানুষ করিবার জন্য যাহাকে বিশেষ করিয়া আনা হইল, দেখা গেল বিশেষ করিয়া কাতুর প্রতিই তাহার বিরাগ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। একে ত বাপের বাড়ীতে কিছু আদরে পালিত বলিয়া লবঙ্গের মেজাজ একটু অসহিষ্ণু এবং আরামপ্রিয় ছিল, তাহার উপর যে দেওরঝিটির ভার তাহার হাতে দেওয়া হইল, সেটিও অতিমাত্রায় আদর পাইয়া একেবারে শাসনের বাহিরে গিয়া পড়িয়াছিল। কাজেই জ্যাঠাই এবং দেওর-ঝির কলহ ও মারামারির চোটে শীঘ্রই বৃন্দাবনের বাড়ী মুখর হইয়া উঠিল। বৃন্দাবন-বেচারা হিতে বিপরীত দেখিয়া হুঁকার শরণ লইল, তাহাও যখন আর সান্ত্বনা দিতে অক্ষম হইল, তখন বাড়ী ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িতে লাগিল কাজে এবং অকাজে। নববিবাহিতা পত্নীর সহিত প্রেমালাপের সুযোগমাত্র তাহার কপালে ঘটিয়া উঠিল না। এমন-একটা হাড়জ্বালানী পাজী মেয়ে তাহার ঘাড়ে তুলিয়া দেওয়ার জন্য পত্নীটিও তাহার প্রতি খুব যে খুসি হইয়া রহিল, তাহাও নয়।

হুঁকায় কয়েকটান দিতে না দিতেই বাইরের দরজায় ধাক্কা দিয়া কে উঁচুগলায় হাঁক দিল, "বৃন্দাবন আছ হে ?" বৃন্দাবন ত্রস্ত হইয়া ফিস্‌-ফিস্‌ করিয়া ডাকিল, "কাতু, কাতু !" কাতু আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিল "কি বল্‌ছ ?"

"চুপ কর্‌, অত চেঁচাস্‌নে, বাইরে নবীন-খুড়ো এসেছে, ব'লে আয় জ্যাঠামশায় বাড়ী নেই।"

কাতু বাহির হইয়া গেল, এবং উচ্চকণ্ঠে আগন্তুককে খবর দিল "জ্যাঠামশায় বাড়ীতে নেই গো !"

নবীন আসিয়াছিল সুদের টাকার খোঁজে, সুতরাং সহজে হাল না ছাড়িয়া সে বলিল, "বাড়ী নেই কি ? আমি এইমাত্তর যে তা'কে বাড়ী আস্‌তে দেখ্‌লাম। কোথা গেল সে ?"

"অত-শত জানিনে বাপু, আমাকে বল্‌তে বলেছে বাড়ী নেই,তাই বল্‌লাম," বলিয়া কাতু ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পলায়ন করিল ; নবীন আরো কয়েকবার বৃন্দাবনের নাম ধরিয়া বৃথা হাঁক-ডাক করিয়া আপন-মনে গজ্‌-গজ করিতে-করিতে প্রস্থান করিল।

সে যে চলিয়া গিয়াছে, এ-বিষয়ে যখন আর কোনো সন্দেহ রহিল না,তখন বৃন্দাবন আস্তে-আস্তে আসিয়া সদর দরজার কাছে দাঁড়াইল। লবঙ্গ চেঁচাইয়া উঠিল "এখুনি বেরোও যে ? গিল্‌তে-কুট্‌তে হবে না,বেড়িয়ে বেড়ালেই চল্‌বে ?"

"আর গেলা-কোটা ! তোদের জ্বালায় ঘরেও আমায় দুদণ্ড বস্‌বার জো নেই। বাইরে গেলে নব্‌নে পথে-ঘাটে অপমান করে, আর ঘরে এলে তোরা জ্বালাস, না মর্‌লে, আমার হাড় আর জুড়বে না।"

স্বামীর অবস্থা দেখিয়া লবঙ্গ একটু নরম হইয়া গেল। অপেক্ষাকৃত শান্তকণ্ঠে বলিল "তা হ'লে এখুনি বেরুচ্ছ কেন ? নবীন-খুড়ো এখনও হয়ত রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে আছে—"

"না গিয়ে আর করি কি ? মেয়ে দেখ্‌তে-দেখ্‌তে মস্ত হয়ে উঠ্‌ল, এর পর বিয়ের চেষ্টা না করলে শেষে কি একঘ'রে হ'য়ে থাক্‌তে বলিস্‌ ?"

লবঙ্গ বলিল "মিথ্যে না বাপু। দশ বছরের মেয়ে কে বল্‌বে! মাথা যেন তালগাছে গিয়ে ঠেকেছে। হবে না? যা আদরের ঘটা! মেয়েছেলেকে অমন গোগ্রাসে গিল্‌তে দিতে আছে? পেট কাঁদিয়ে খেতে দেবে, উঠ্‌তে-বস্‌তে ঝাঁটা লাথি দেবে, তবে না সে-মেয়ে মেয়ের মতন থাক্‌বে? তা কোথা যাচ্ছ এখন?"

বৃন্দাবন বলিল "একটা সম্বন্ধের কথা কাল শুন্‌ছিলাম দিবাকরের কাছে। ছেলের বয়স বেশী, দ্বিতীয় সংসার কর্‌বে, তাই একটু কমে হ'তে পারে কি না তাই দেখ্‌তে যাচ্ছি।"

ভাঙা-ঘরের বেড়ার ফাঁকে প্রদীপের স্নিগ্ধ আলো যখন বাহিরের আঁধারের কোলে আসিয়া পড়িয়াছে, তখন ম্লানমুখে বৃন্দাবন ফিরিয়া আসিল। লবঙ্গ ব্যস্ত হইয়া বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কি হ'ল গা?"

বৃন্দাবন হতাশভরা স্বরে বলিল, "হবে আর কি, আমার মুণ্ড! ঐ ত ছেলের ছিরি, তাও সাত-আট শ' টাকার কমে হ'যে উঠ্‌বে না।"

লবঙ্গ গালে হাত দিয়া বলিল, "ওমা অত টাকা কোথায় পাবে গো? শেষে কি ভাইঝির জন্যে লোকের ঘরে সিঁধ্‌ কাটতে যাবে?"

বৃন্দাবন বলিল "সে বল্‌লে ত আর কেউ শুন্‌বে না? শেষে কি বুড়ো বয়সে জাত খুইয়ে গো-ভাগাড়ে গিয়ে মর্‌ব? দেখি, এই বাড়ী আর বাগানখানা বন্ধক রেখে কি পাই। কাতুর মায়েরও দু-চারটে সোনা-রূপোর কুচি আছে, দুইয়ে মিলিয়ে কোনোরকমে যদি কাজ উদ্ধার হয়।"

লবঙ্গ বলিল "বাড়ী ঘর বাঁধা দিয়ে কি পথে দাঁড়াবে? ভাইঝি তোমার কি স্বগ্‌গে বাতি দেবে যে তা'র জন্যে সর্ব্বস্ব খোয়াতে বসেছ?"

"ও-ছাড়া আমার আর আছেই বা কে? ওর একটা ভালো রকম হিল্লে লাগিয়ে দিতে পার্‌লে আমার পথই বা কি আর ঘরই বা কি? ক'দিন আর আছি?"

লবঙ্গ একখানা পাখা হাতে করিয়া স্বামীর সেবার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়াছিল, স্বামীর মুখে এ-হেন উদার মন্তব্য শুনিয়া "তবে আমায় হাড় জ্বালাতে বিয়ে করে-ছিলে কেন? আমি পরের বাড়ী ভিখ্‌ মেগে খাবো এর পর," বলিয়া পাখাখানা আছ্‌ড়াইয়া ফেলিয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে চলিয়া গেল।

যাহার জন্য এত ভাবনা সে কিন্তু দিব্য নিশ্চিন্ত-মনে পা ছড়াইয়া বসিয়া কাঁচা পেয়ারা চিবাইতেছিল। জ্যাঠাই-মার রাগ বা জ্যাঠার দুশ্চিন্তায় তাহাকে একে-বারেই কাবু করিতে পারে নাই। কান্নার শব্দে বাহিরে আসিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "জ্যাঠাইমা কাঁদছে কেন?" বৃন্দাবনের মুখে কান্নার কারণ শুনিয়া সে বলিল "আমি বুড়োকে বিয়ে কর্‌ব না, নিশি-দাদা দেখ্‌তে বেশ ভালো তাকেই বিয়ে কর্‌ব। সে টাকা নেবে না বলেছে।"

এত দুঃখেও বৃন্দাবনের হাসি পাইল। সে কাতুকে কাছে টানিয়া লইয়া গায়ে হাত বুলাইতে-বুলাইতে বলিল "কা'কে বলেছে রে, তোকে?"

"হ্যাঁ, কাল আমাকে জিগ্‌গেস কর্‌লে 'তোর জ্যাঠা তোকে নাকি বুড়ো বরে বিয়ে দিচ্ছে?' আমি বললাম, 'কে জানে।' সে বললে 'বারণ কর্‌ না? আমি তোকে টাকা না নিয়েই বিয়ে কর্‌ব।' "

বৃন্দাবন বলিল "ছি মা! তুই এখন বড় হয়েছিস, ব্যাটাছেলেদের সঙ্গে কি এখন খেলা করে, গল্প করে! ওতে নিন্দে কর্‌বে যে লোকে? শ্বশুরবাড়ী যাবি দুদিন পরে, তা'রা শুন্‌লে মন্দ বল্‌বে।"

"বলুক গে, তাই ব'লে আমি খেল্‌ব না নাকি? আমি শ্বশুরবাড়ী চাই নে।"

কিন্তু কাতু না চাওয়া সত্ত্বেও তাহার একটি শ্বশুরবাড়ী জুটাইয়া দিবার চেষ্টায় বৃন্দাবন প্রায় আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিতে বসিল। অনেক বলা-কহা, অনুনয়-বিনয় করিয়া সেই দ্বিতীয় পক্ষের পাত্রটিকে সে জামাতৃত্ব-স্বীকারে সম্মত করিয়া ফেলিল, কিন্তু টাকার সংখ্যা কমাইতে তাহাকে কোনো-প্রকারেই রাজি করিতে পারিল না। লবঙ্গ বলিল, "হ্যা গা খুব ত পাকা কথা দিয়ে বস্‌ছ, কিন্তু এ ভাঙাবাড়ী বেচ্‌লেও ত আটশ' টাকা হবে না, কোথা থেকে দেবে?"

"বাড়ী কেন আমাকে বেচ্‌লেও হবে না।"

"তবে রাজি হ'লে কি ব'লে?"

"রাজি না হ'য়ে আর উপায় কি? কোনোরকমে

হাতে পায়ে ধ'রে বিয়েটা দিয়ে দেবো, তা'র পর কাতুর কপাল! আমার নিজের অপমানের জন্ত ভাবিনে, দু-ঘা জুতো মারলেও স'য়ে যাবো।"

লবঙ্গ বলিল "ওমা; তা'র পর সভায় ব'সে, টাকা কম দে'খে যদি বিয়ে না করে, তখন যে-জাতের জন্তে অত, তাই ত খোয়াবে। তোমার ঘটে কি এক-ফোঁটা বুদ্ধি নেই?"

বৃন্দাবন বলিল, "তা করবে না। দিবাকরদের বাড়ী কাতুকে দে'খে তা'র ভারি পছন্দ হয়েছে। নিজের ভাইঝি, *বলতে নেই, কিন্তু দেশে অমন মেয়ে আর-একটি খুঁজলেও* পাবে না। নিতান্ত অদেষ্ট তাই দোজবরের হাতে দিচ্ছি, তা না হ'লে কাতু আমার রাজার ঘরে পড়বার যুগ্যি।"

দেওর ঝির রূপবর্ণনায় কিছুমাত্র উৎসাহ বোধ না করিয়া লবঙ্গ রাগে গর্‌গর্‌ করিতে-করিতে ঘরে চলিয়া গেল।

নিতান্ত না হইলে নয় এইরূপ দুচারখানা গহনা কাপড় প্রভৃতি কোনোপ্রকারে জোগাড় করিতে-করিতেই বিবাহের দিন আসিয়া পড়িল। বৃন্দাবনের জীর্ণবাড়ী লোকজনের কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিল। কাতু এতদিন এ-বিবাহে বিন্দুমাত্রও আগ্রহ প্রকাশ করে নাই। আজ কিন্তু তাহার একটু ভাব-পরিবর্ত্তন দেখা গেল। এই ছেঁড়া সামিয়ানা, এই লাল চেলীর শাড়ী, রূপার ও সোনার গহনা, শোলার মুকুট, সব-কিছু তাহারই জন্ত আমদানি হইয়াছে মনে করিয়া সে একটু উৎসাহ অনুভব না করিয়া থাকিতেই পারিল না। সমবয়সী বাল্য-সঙ্গিনীদের সঙ্গে সমানে চীৎকার করিয়া ফুর্ত্তি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। সে যে বিয়ের ক'নে, তাহার যে এমন করিতে নাই, ইত্যাদি নানা কথা বলিয়া বর্ষীয়সীরা তাহাকে বিন্দুমাত্রও দমাইতে পারিলেন না।

চেলী-চন্দনে সুসজ্জিতা কাতুর কচি মুখের দিকে তাকাইয়া বৃন্দাবন কেবলই চোখ মুছিতে লাগিল। তাহার ঘর আঁধার করিয়া এই আনন্দরূপিণী স্নেহের পুত্তলি ত চলিল, কিন্তু ভবিষ্যতে তাহার অদৃষ্টেই বা কি আছে, তা কে জানে? প্রাণপণ-চেষ্টা করিয়াও সে চার-শতের বেশী টাকা জোগাড় করিতে পারে নাই। বর-পক্ষের হাতে নিজে সে সব-রকম লাঞ্ছনা সহিতেই প্রস্তুত হইয়াছিল, কিন্তু কাতুকে যদি তাহারা ইহার জন্ত ব্যথা দেয়? উপবাস-ক্লিষ্ট বৃন্দাবন চোখে অন্ধকার দেখিয়াই যেন বসিয়া পড়িল।

কিন্তু বসিয়া থাকিবারই বা তাহার অবসর কোথায়? বরযাত্রীগণের শুভাগমনের শব্দে উঠিয়া পড়িয়া তাহাকে তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্ত ছুটিতে হইল। ছেঁড়া সামিয়ানার তলায় পরম গম্ভীর-মুখে বর তাহার সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া উপবেশন করিলেন। কয়েকটা হুঁকা ঘন-ঘন এ-হাত হইতে ও-হাতে ফিরিতে লাগিল, ফাটা চিম্‌নি-ওয়ালা কেরোসিনের বাতি-কয়েকটা প্রচুর ধূম উদ্গারণ করিতে-করিতে অন্ধকার-নাশের ব্যর্থ প্রয়াস করিতে লাগিল এবং বৃন্দাবনের মন আশঙ্কার কালিমায় ক্রমেই আগাগোড়া মসীলিপ্ত হইয়া উঠিতে লাগিল।

পণের টাকা লইয়া ষোল-আনা গোলমাল। অনুনয়-বিনয়, হাতে-পায়ে ধরা কিছুতেই কিছু হইল না। বরপক্ষ সভা ছাড়িয়া যাইবার জোগাড় করিল।

কিন্তু এ-হেন সময়ে প্রৌঢ় বরটি হঠাৎ বাঁকিয়া বসিয়া এমন পাকা ঘুঁটি একেবারে কাঁচা করিয়া তুলিল। কাতুর গৌরীর মতন ফুটফুটে মুখখানি তাহার কঠোর মনে বেশ একটু দাগ কাটিয়া বসিয়াছিল বোধ হয়। সে গোঁজ হইয়া বসিয়া রহিল, আপনার মামা কাকা প্রভৃতির সম্মান রক্ষা করিয়া আসন ছাড়িয়া উঠিবার কোনো লক্ষণই দেখাইল না।

বৃন্দাবন মনে-মনে ইষ্টদেবতার নাম জপিতে-জপিতে কোণে দাঁড়াইয়া বলির পাঁঠার মতন কাঁপিতেছিল। সমস্ত ব্যাপারটা তাহাকে এমন করিয়া অভিভূত করিয়াছিল যে, সে চোখের সামনে কি যে হইতেছে, তাহাও যেন ভালো করিয়া বুঝিতে পারিতেছিল না। তাহার প্রতিবেশী যাদব যখন তাহাকে ঠেলা মারিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিল যে নিতান্তই তাহার বাপ্পিতায় আজ শেষ রক্ষা হইয়াছে, তখনও সে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। যাদব তাহাকে আর-এক ঠেলা মারিয়া বলিল, "কি হে, অমন ভেড়ার মতন তাকিয়ে রইলে যে? মেয়ে-সম্প্রদান করতে হবে না?"

বৃন্দাবন যন্ত্র-চালিতের মতন আগাইয়া আসিল।

পুরোহিত তাহাকে মন্ত্র পড়াইলেন, সে যে বিড়-বিড় করিয়া কি বলিল, তাহা স্বয়ং ব্যাসদেবও বুঝিতেন কি না সন্দেহ। যাহা হউক,তাহাতে কাতুর বিবাহ আট্‌কাইল না।

খাইতে বসিয়া বরের মামা একটা বিকট হাসিতে সমস্ত মুখখানা ভরিয়া তুলিয়া বলিলেন, "আচ্ছা হে বেয়াই, খুব ঠাট্টাটা আজ ক'রে নিলে। এর পর ঠাট্টার পালা আমাদের সেটা মনে রেখো; মেয়ে ত আমাদের ঘরেই থাকল।"

বৃন্দাবন তাঁহার রসিকতায় হাসিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু হাসি তাহার ঠোঁটের কাছে আসিতে-না আসিতেই মিলাইয়া গেল।

পরদিন ভোর হইতে না হইতে বরযাত্রীর দল বর-ক'নে লইয়া বিদায় হইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল। ক'নের মা নাই, কাজেই মেয়ে বিদায় হইবার সময় চেঁচাইয়া হাট বসানোর পালাটা লবঙ্গ কোনো-প্রকারে সংক্ষেপে সারিয়া লইল। ক'নের জিনিষপত্র গোছানো, তাহাকে সাজাইয়া দেওয়া প্রভৃতির ভার লইল, পাড়া-প্রতিবেশিনীরা। কিন্তু সবাইকে অবাক্ করিল বৃন্দাবন। বর-ক'নে তাহাকে প্রণাম করিবামাত্র সে ভাইঝিকে জড়াইয়া ধরিয়া ছেলে মানুষের মতন হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। আশীর্ব্বাদের ধানদূর্ব্বা তাহার হাত হইতে খসিয়া কোথায় যে পড়িল তাহার ঠিকানা নাই, কান্নার আবেগে সে নিজেই যেন ভাঙিয়া দুম্‌ড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

একজন প্রতিবেশিনী ফিশ্‌-ফিশ্‌ করিয়া বলিল, "এ বাপু আদিখ্যেতামো। নিজের মেয়েও না, ভাইয়ের মেয়ে, তা'র উপর শ্বশুরঘর করতে যাচ্ছে, আর কিছু মন্দ না, তা'তে লোকটা করে দেখ না।"

লবঙ্গ এতক্ষণ ক্রুদ্ধ-দৃষ্টিতে স্বামীর কাণ্ড দেখিতেছিল, এতক্ষণে একজন মতে মত দিবার লোক পাইয়া বলিল, "যা বলেছ মাসী, ওর ধারাই অমনি সৃষ্টিছাড়া। এই ক'বছর বিয়ে হয়েছে, এরই মধ্যে আমার হাড় ভাজাভাজা ক'রে তুলেছে।"

কাতু কাঁদিতে-কাঁদিতে বিদায় হইয়া গেল। তাহার পোষা বিড়ালছানা কাতরধ্বনি করিতে-করিতে এঘর-ওঘর করিয়া বেড়াইতে লাগিল, তাহার পরিত্যক্ত ঘরের জান্‌লা ঝোড়ো-হাওয়ায় আছ্‌ড়াইয়া-আছ্‌ড়াইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। একটা নিদারুণ শূন্যতা বৃন্দাবনের বুকে যেন পাথরের মতন জাঁতিয়া বসিয়া রহিল, সে নির্জ্জীবের মতন মাটিতে লুটাইয়া পড়িল, লবঙ্গের তীব্র কণ্ঠের বক্তৃনিও তাহাকে কিছুমাত্র সচেতন করিতে পারিল না।

* * * *

সন্ধ্যার আকাশটা কাল-বৈশাখীর ভ্রুকুটিতে ভরিয়া উঠিয়াছে। পাঁজী দেখিলে যদিও দেখা যায় যে বৈশাখ মাস আর নাই, তিনি প্রচণ্ডতর জ্যৈষ্ঠকে আসন ছাড়িয়া দিয়া ধরাতল হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন, তবু ঝড়ের বিরাম নাই। ধূলি ধ্বজা তুলিয়া প্রবল বিক্রমে তিনি জয়রথ হাঁকাইয়া চলিয়াছেন তাপক্লিষ্টা পৃথিবীর-বুকের উপর দিয়া।

বৃন্দাবন দাওয়ার উপর বসিয়া গামছা ঘুরাইয়া বাতাস খাইতেছিল। তাহার জীর্ণ বাড়ীখানির চেহারা জীর্ণতর হইয়া উঠিয়াছে,একটা নিরানন্দতার প্রলেপ কে যেন অদৃশ্য-হস্তে গৃহ ও গৃহস্বামীর মুখে সমানভাবে মাখাইয়া দিয়াছে। কাতু নাই, তাই এ-বাড়ীতে আর হাসি নাই, কোলাহল নাই, তরুণ প্রাণের কোনো সাড়া নাই। আপনার দুঃখ ও চিন্তার ভারে অকালজরাগ্রস্ত বৃন্দাবন কোনোরূপে টিঁকিয়া আছে, স্বামী কর্ত্তৃক সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিতা লবঙ্গ আরো যেন কঠিন ও কঠোর হইয়া আপনার হৃদয়ের জ্বালায় চারিদিকে জ্বালা ধরাইয়া বেড়াইতেছে।

ভাঙা সদর-দরজা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক, তাহার পিছনে একটি কিশোরী বিধবা। দুজনের মাথাতেই বেতের প্রকাণ্ড ঝুড়ি। বৃন্দাবন আশঙ্কাপূর্ণ-দৃষ্টিতে তাহাদের দিকে তাকাইতেই বৃদ্ধাটি কাংস্যকণ্ঠে বলিয়া উঠিল "খুব জায়গায় পাঠিয়েছিলে কায়েত-খুড়ো। আমরা ছোটোলোক বটি, কিন্তু এমন ছোটোলোকোমি বাপের কালে দেখিনি। তত্ত্ব তা'রা নিলে না গো, এই নাও তোমাদের জিনিষপত্তর।" ঝুড়ি-দুইটা দুম্‌দুম্ করিয়া দাওয়ার উপর নামাইয়া তাহারা মায়ে-ঝিয়ে বসিয়া পড়িল।

একটা ঝুড়ি ভর্ত্তি বাসি মিষ্টান্ন, অল্পদামী খেল্‌না, পানের মশ্‌লা। আর-একটাতে একখানা খয়ের-রঙের শাড়ী, গোলাপী কাপড়ের উপর কালো লেসের ঝালর-লাগানো একটি জ্যাকেট, লাল ডুরে গামছা, কোঁচানো

ফরাস্‌ডাঙার ধুতি-চাদর, বিলাতী এসেন্স্‌, চুলের তেল, সাবান, ফিতা, কাঁটা। লবঙ্গকে ঘরের বাহিরে মুখ বাড়াইতে দেখিয়া বুড়ী আর-একপালা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল "এই নাও গো, জিনিষ-পত্তর মিলিয়ে নাও। যেমন গেছে তেম্‌নি এসেছে, কিছু তা'রা ছোঁয়নি। হেঁটে-হেঁটে পা-দুটো ত খসিয়ে এসেছি; তাও যদি গাল-মন্দ-ছাড়া একটা ভালো কথা শু'নে আস্‌তাম। কুটুমের বাড়ী প্রথম তত্ত্ব, কোথায় পেট ভ'রে খাবো, কাপড় টাকা বখ্‌শিশ পাবো, তা না এক-ফোঁটা জলসুদ্ধ মুখে দিতে বল্‌লে না গা, এমন চামার কুটুম করেছ।"

"তা আমায় বল্‌ছিস্‌ কেন না, আমি কি তোদের পাঠিয়েছিলাম? যার সোহাগের কুটুম, তা'কে শোনাগে যা, জিনিষ বুঝিয়ে দিগে যা," বলিয়া লবঙ্গ দড়াম্‌ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

দুই পক্ষ হইতে গাল-মন্দ খাইয়া বুড়ীর মেজাজ ভীষণ রকম চড়িয়া উঠিল। সে চেঁচামেচি করিয়া একটা প্রলয় কাণ্ড করিবার জোগাড় করিতেছে দেখিয়া বৃন্দাবন ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—"থাম্‌ বাছা থাম্‌, রাগ করিস্‌নে। বৌটা নানা জ্বালা-যন্ত্রণা পেয়ে-পেয়ে পাগলের মতন হ'য়ে গেছে, তা'র কথা কি ধর্‌তে আছে? বোস্‌, একটু জিরিয়ে নে, জলটল খা, বুড়ো মানুষ এতটা পথ হেঁটে এসেছিস্‌।"

মিষ্ট কথায় একটুখানি শান্ত হইয়া বুড়ী বাক্যের স্রোত মাঝ-পথে থামাইয়া চুপ করিয়া গেল। তত্ত্বের ঝুড়ি হইতে মিষ্টান্ন তুলিয়া, ভাঁড়ার হইতে মুড়ি বাহির করিয়া আনিয়া বৃন্দাবন তাহাদের তৃপ্তিপূর্ব্বক জলযোগ করাইল। তা'র পর ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল "তা'রা কি বল্‌লে?"

বুড়ী বলিল, "না বল্‌লে কি? শাশুড়ীটা যেন সাক্ষাৎ রাক্ষুসী গা, আমাকেই যেন তেড়ে খেতে এল। বলে, 'নিয়ে যা তোর আড়াই-আনার তত্ত্ব, তা না হ'লে ঝাঁটা মেরে বিদায় কর্‌ব। চার-শ টাকা দিতে এখনও বাকি, তা বেয়াই-বেহায়ার খেয়াল আছে? তা'র এক পয়সা না দিয়ে দুটো কাপড় আর মিষ্টি পাঠিয়েছেন মেয়ে-জামাইকে সোহাগ ক'রে! লাথি মারে আমার ছেলে অমন তত্ত্বের মুখে। গিয়ে তা'কে বলগে যা, পুজোর তত্ত্ব ভালো ক'রে করে যেন, ভালো চায় যদি। তখনো যদি টাকা না পাঠায় ত তা'র মেয়েরই একদিন কি আমারই একদিন।'"

বৃন্দাবন শুষ্ককণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল "কাতুকে দেখ্‌তে দিলে?"

"সেইসময় পুকুর থেকে জল নিয়ে ফির্‌ল, তাই দেখ্‌তে পেলাম, তা না হ'লে কি আর দেখা কর্‌তে দিত? আহা, অমন সোনার পিরতিমে, তা'র যা দশা হয়েছে খুড়ো! তুমি দেখ্‌লে চিন্‌বে না; দুখানি হাড়-ছাড়া কিছু আর বাকি নেই, অমন যে দুধে-আল্‌তা-গোলা রং, তাও যেন কালী হ'য়ে গেছে।"

বৃন্দাবন বলিল "কথা-বার্ত্তা কইলে কিছু?" "শাশুড়ীটা একবার ঘরের ভিতর গেল। তখন আমার কাছে এসে ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে বল্‌লে, 'কৈবর্ত্ত দিদি, জ্যাঠাকে বলিস্‌ পুজোর সময় যেন ভালো ক'রে তত্ত্ব ক'রে আমায় নিয়ে যায়, তা না হ'লে এরা আমায় মেরে ফেল্‌বে। আমাকে একবেলা মোটে খেতে দেয়, আর সবাই মি'লে বকে, মাঝে-মাঝে মারে।"

বৃন্দাবন স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার সদা-হাস্য-ক্রীড়াময়ী আদরিণী ভাইঝিটিকে এই ভয়াবহ বর্ণনার মধ্যে সে যেন চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। খাইতে দেয় না, গাল দেয়, মারে। কি নিদারুণ যন্ত্রণার ভিতর সে স্বহস্তে তাহার স্নেহের পুত্তলিকে ঠেলিয়া দিয়াছে।

বৃন্দাবনের শীর্ণ বক্ষের পঞ্জর ভেদ করিয়া একটা বিপুল দীর্ঘ-নিশ্বাস বাহির হইয়া পড়িল। সে ত রিক্ত, সর্ব্বস্ব-হারা, কিসের জোরে কাতুকে তাহার নির্য্যাতনকারীদের হাত হইতে উদ্ধার করিবে? বাগান, বাড়ী,—সব মহাজনের কাছে বাঁধা পড়িয়াছে, দুদিন পরে তাহাকেই সস্ত্রীক পথে দাঁড়াইতে হইবে। নগদ টাকা, কাতুর মায়ের গহনা, এমন-কি, নিজের পরলোকগতা পত্নীর এক-জোড়া সোনার বালা, যাহা সে অনেক-কষ্টে এতকাল লবঙ্গের শ্যেন দৃষ্টি হইতে লুকাইয়া রাখিয়াছিল, সমস্তই কাতুর বিবাহে খরচ হইয়া গিয়াছে। নিজেকে বন্ধক রাখিলেও আর তাহার কোথাও এক-পয়সা ধার পাইবার আশা নাই। লবঙ্গের গুটি-কয়েক গহনা আছে, কিন্তু তাহা সে চাহিবে কোন্‌

মুখে? নিজে বিবাহের পর স্ত্রীকে একটা সোনা রূপার কুচি কখনও হাত তুলিয়া দেয় নাই, আদর-যত্নও যে অত্যধিক করিয়াছে তাহা কোনো শত্রুতেও বলিবে না। এখন কি বলিয়া সে লবঙ্গের বাপের-দেওয়া গহনা-ক'খানা দাবি করিবে? আর করিলেই বা কি? লবঙ্গকে কাটিয়া ফেলিলেও যে সে আপনার শেষ সম্বলটুকু ছাড়িতে রাজি হইবে না, তাহা বৃন্দাবনের বেশ ভালো করিয়াই জানা ছিল।

"ব'সে ভাব্‌লে আর কি হবে? যা হয় একটা বিহিত কোরো, মেয়েটা তা না হ'লে বাঁচ্‌বে না," বলিয়া কৈবর্ত্ত-বুড়ী তাহার কন্যা লইয়া বিদায় হইয়া গেল। বৃন্দাবন পাথরের মতন বসিয়াই রহিল। খানিক পরে লবঙ্গ বাহির হইয়া তত্ত্বের জিনিষগুলা বকিতে-বকিতে ঘরের মধ্যে লইয়া গেল।

বৃন্দাবন সারাদিন ভূতাবিষ্টের মতন ঘুরিয়া বেড়াইল। টাকার চেষ্টায় বৃথা সকলের দ্বারে-দ্বারে ঘুরিয়া অপমানিত হইয়া আসিল। সন্ধ্যা বেলা ঘরে আসিয়া মাটির উপর বসিয়া পড়িল, সহস্র সাধ্য সাধনা বাক্য-ব্যয় করিয়াও লবঙ্গ তাহাকে কিছু-একটু মুখে দেওয়াইতে পারিল না।

কিন্তু দিন কাটিয়াই চলিল। আষাঢ়ের বিপুল ধারা-বর্ষণে জ্যৈষ্ঠের তাপ জুড়াইয়া গেল, আবার দেখিতে-দেখিতে মেঘ কাটিয়া গেল, খালে, বিলে, কুমুদ-কহ্লারের আগুন ধরিয়া উঠিল, দূরে মাঠে শরৎলক্ষ্মীর কাশখচিত হরিৎ বসনাঞ্চল দুলিয়া-দুলিয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু ভগ্ন-হৃদয় বৃন্দাবনের জীবনের মেঘ কাটিল না, বৈশাখের কাল ঝড় যেন তাহার বুকে চিরন্তন বাসা বাঁধিয়া বসিল।

পূজার ত আর দেরি নাই। বৃন্দাবন যেন পাগল হইয়া উঠিল। সে যার-তার কাছে গিয়া পায়ে ধরে, যাকে-তা'কে মারিতে যায়। লবঙ্গ তাহার রকম-সকম দেখিয়া বলিল "আমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও বাপু, এখানে থেকে কি শেষে পাগলের হাতে খুন হ'য়ে মরব?" বৃন্দাবন কিছু জবাব না দিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। সারাদিন আর তাহার দেখাই পাওয়া গেল না।

তাহার ভাত আগ্‌লাইয়া বসিয়া থাকিয়া-থাকিয়া যখন শ্রান্ত লবঙ্গ রান্নাঘরেই আঁচল পাতিয়া শুইয়া পড়িয়াছে-তখন বৃন্দাবন চুপি-চুপি ফিরিয়া আসিল। তাহার পদ-শব্দে জাগিয়া উঠিয়া লবঙ্গ নিদ্রা-জড়িত-কণ্ঠে বলিল, "কে গা?"

বৃন্দাবন সাড়া দিয়া বলিল, "আমি। একবার এ-দিকে শু'নে যাও।"

লবঙ্গ বিরক্ত হইয়া বলিল, "এখন শুন্‌ব কি ঘোড়ার ডিম, গিল্‌বে না, কত-রাত আর ব'সে থাক্‌ব?"

"না আমার খিদে নেই, তুমি শু'নেই যাও না।" লবঙ্গ অনিচ্ছা-সত্ত্বেও উঠিয়া আসিল।

বৃন্দাবন তাহাকে শোবার ঘরে টানিয়া আনিয়া বলিল "তোমার গোটা-দুই গয়না আমায় ধার দাও, আস্‌চে-মাসে আবার গড়িয়ে দেবো।"

রাগে ও বিস্ময়ে লবঙ্গের প্রায় বাক্‌-রোধ হইয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া সে চেঁচাইয়া উঠিল, "একেবারে সব লজ্জা-সরমে মাথা খেয়ে এসেছ? আমার গয়না চাও তুমি কোন্ হিসেবে? কখনো কিছু দিয়েছ আমায়? দাসীর মতন হাড়ভাঙা খাটুনী খেটে, এক-বেলা ভিক্ষে ক'রে,ধার ক'রে খাই আমি,অন্য স্বামী হ'লে এতদিন গলায় দড়ি দিত স্ত্রীর এমন দশা দে'খে। আর তুমি বুড়া ধাড়ী এসে স্বচ্ছন্দে বল্‌ছ, 'গয়না দাও, আবার গড়িয়ে দেবো। কি দিয়ে গড়াবে শুনি? এই ঘরের ভাঙা বাঁশ-গুলো দিয়ে?"

বৃন্দাবন গোঁজ মুখ করিয়া বলিল, "যা দিয়েই গড়াই, দিলেই ত হ'ল, তুমি এখন দাও না?"

লবঙ্গ গলার স্বর আরো চড়াইয়া বলিল, "আমাকে খুন কর্‌লেও দেবো না। কি কর্‌বে তুমি আমার গয়না নিয়ে?"

"কাতুকে আন্‌ব, তাঁ'রা বাকি টাকা না দিলে কিছুতেই পাঠাবে না। ওকে তা'রা মারে, খেতে দেয় না, বড় যন্ত্রণায় আছে।"

"আর আমি বড় সুখে আছি নয়? খেয়ে-খেয়ে ফু'লে উঠ্‌ছি। মরুক গে তোমার ভাই-ঝি, হাড়জ্বালানী, সর্ব্বনাশী তা'র জন্যেই না এই দুর্গতি আজ।"

বৃন্দাবন চোখ পাকাইয়া বলিল, "গয়না দাও বল্‌ছি, তা না হ'লে ভালো হবে না।"

"মা গো, খুন ক'রে ফেল্‌লে গো, তোমরা কে কোথায় আছ, এস গো," বলিয়া লবঙ্গ এমন বিকট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল যে বৃন্দাবন উর্দ্ধশ্বাসে ঘর ছাড়িয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল। তাহার দুঃখভার-পীড়িত মস্তিষ্কে যেন আগুন ধরিয়া গিয়াছিল। হিতাহিত কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞান একেবারেই লোপ পাইয়াছিল। সমস্ত মন জুড়িয়া বুদ্ধিকে অভিভূত করিয়া কেবল একটা কথাই জাগিয়াছিল, টাকা চাই।

চলিতে-চলিতে সে যে কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাও তাহার জ্ঞান ছিল না। হঠাৎ সাম্‌নে জলরাশি দেখিয়া সে থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। নিজের অজ্ঞাতে কখন সে গ্রাম ছাড়িয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে, এই ত তাহাদের গ্রামের সীমান্তপ্রবাহিনী বাঁকা নদী। সে চলিয়াছে কোথায়, কেনই বা?

শুক্লা দশমীর আধো জ্যোৎস্নায় বহুদূর পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছিল। জনমানব নাই, চারিদিক্ খাঁ-খাঁ করিতেছে। বৃন্দাবনের কোনোদিকেই খেয়াল ছিল না, কেবল একটা ভাবনাই তাহার মনের মধ্যে ঘুরপাক খাইতেছিল, 'টাকা চাই।'

হঠাৎ একটা অস্পষ্ট মুর্ত্তি তাহার চোখে পড়িল, আগা-গোড়া বস্ত্রাবৃত, নদীর স্বল্প-গভীর জল পার হইয়া তাহারই দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। বৃন্দাবনের গাটা একবার ছম্‌-ছম্ করিয়া উঠিল, এই বাঁকা নদীর ধারেই যে তাহাদের দুইগ্রামের শ্মশান! কিন্তু তাহার অভিভূত মন বেশীক্ষণ ভয়কেও আমল দিল না ভূতই যদি হয়,তাহাতেই বা ক্ষতি কি? তাহার আর ভয় কিসের?

মূর্ত্তিটি ততক্ষণ কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। ক্ষীণ আলোকে বৃন্দাবন দেখিল তাহার হাতে ছোটো একটি ক্যাশ-বাক্স, চাদরের ভিতর হইতে উঁকি মারিতেছে। মানুষটি এমনভাবে চাদর মুড়ি দিয়াছে যে সে স্ত্রী কি পুরুষ তাহা বুঝিবার উপায় নাই।

বৃন্দাবন হঠাৎ একলাফে তাহার ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িয়া ক্যাশবাক্সটি কাড়িয়া লইল। মানুষটি অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া সেইখানেই বালির উপর গড়াইয়া পড়িল। তাহার চাদরের আচ্ছাদন খুলিয়া গেল।

বৃন্দাবনের তখন সে-দিকে লক্ষ্য ছিল না, সে আছ্‌ড়াইয়া ক্যাশবাক্সটা ভাঙিতে ব্যস্ত ছিল। দুইচারবার আছাড় দিতেই তাহার ডালাটা খসিয়া আসিল, গুটি-কয়েক ছোটো ছোটো গহনা বাহির হইয়া পড়িল।

এক-জোড়া সোনার বালার উপর চোখ পড়িতেই বৃন্দাবন সর্পাহতের মতো চম্‌কিয়া উঠিল। তাহার পর বাক্স, গহনা, সব ফেলিয়া দিয়া ছুটিয়া আসিয়া সেই ভূপতিতা নারী-মূর্ত্তির পাশে আছাড় খাইয়া পড়িল। জ্যোৎস্নার ক্ষীণ আলোয় দেখিল, সে বিস্ফারিত-স্থির-নেত্রে আকাশের দিকে চাহিয়া আছে, বুকের উপর হাত দিয়া দেখিল সেখানে কোনো স্পন্দন নাই।

এমন-একটা হৃদয়-ভেদী হাহাকার সেই শ্মশানভূমিও কখনো শোনে নাই বোধ হয়। "মা গো, তুই আমার কাছে আস্‌ছিলি, আমিই তোকে যমের মুখে ঠে'লে দিলাম।" তা'র পর দুইটি দেহ পাশাপাশি সেই বালির উপর পড়িয়া রহিল, কোন্‌টি জীবিত, কোন্‌টি মৃত কিছুই আর বোঝা গেল না।

ভোর হইতে-না-হইতে সেই পথে লোকচলাচল সুরু হয়। পথিকের দৃষ্টি ক্রমে তাহাদের উপর পড়িল। তাহার পর গাঁয়ের লোক, পুলিশ, দারোগা, ডাক্তার সবই একে-একে উপস্থিত হইল।

ডাক্তার মৃত বালিকার দেহ সংক্ষেপে পরীক্ষা করিয়া রায় দিলেন, হৃদ্‌-যন্ত্রের ক্রিয়া হঠাৎ বন্ধ হইয়া মারা গিয়াছে।

জীবিতটিকে লইয়া যাহাদের কারবার তাহাদের কাজ অত সংক্ষিপ্ত হইল না। হত-চেতন বৃন্দাবনকে কোনোপ্রকারে সচেতন করিয়া যখন সহস্র প্রশ্নেও তাহার নিকট হইতে কোনো সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া গেল না, তখন মারের চোটে তাহাকে তাহারা পুনর্ব্বার হতচেতন করিয়া ফেলিল।

একখানি গরুর গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। মৃতা বালিকা এবং তাহার জ্যাঠা পাশাপাশি শুইয়া চলিল। কাতু পূজার সময় বাপের বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

ক্রৌঞ্চ-মিথুন

শ্রী মোহিতলাল মজুমদার

'আর্ত্তোয়া' আর 'ফ্লাণ্ডার্সে'র ভিতর দিয়ে যে রাস্তাটা গিয়েছে, সে যেন আর শেষ হ'তে চায় না—কী একঘেয়ে একটানা! কোনোখানে একটি গাছ নেই, রাস্তার দু'পাশে পয়নালাও নেই—কেবল মাঠ আর মাঠ! আর আগাগোড়া লালরঙের কাদা! ১৮১৫ সালের মার্চ্চ মাসে এই রাস্তা দিয়ে যাবার সময় যে ঘটনাটি ঘটেছিল তা আজও ভুলতে পারিনি।

আমি ঘোড়ায় চ'ড়ে যাচ্ছিলাম। আমার গায়ে বেশ চটকদার শাদা ওভার-কোট আর লাল কুর্ত্তি, মাথায় কালো রঙের উঁচু টুপি, কোমরে গোটা-দুই পিস্তল, আর একখানা লম্বা তলোয়ার। চার-দিন চার-রাত্রি অবিশ্রাম বৃষ্টি মাথায় ক'রে রাস্তা চলেছি। বেশ মনে পড়ে, আমি খুব চীৎকার ক'রে একটা গান ধরেছি—গানের ধুয়োটা হচ্ছে, "বাহবা কি বাহবা!"—বয়সটা তখন খুবই কাঁচা কি না! রাজার পক্ষে তখন কেবল বাচ্ছা আর বুড়োর দল—সম্রাটের (নেপোলিয়ন) কল্যাণে জোয়ানেরা বড় একটা কেউ আর বেঁচে নেই।

আমার দলের লোকেরা তখন রাজা 'লুই'এর পিছন-পিছন অনেকখানি এগিয়ে পড়েছে—সামনের দিকে আকাশের কিনারার কাছে তাদের লাল কুর্ত্তি তখনো দেখা যাচ্ছে। আর পিছন পানে, আকাশের অপর পারে, বোনাপার্ট-সৈন্যের বর্শার মাথায় ত্রিবর্ণ নিশানগুলো থেকে থেকে চোখে পড়ছে—তারা আমাদের পিছু নিয়েছে, খুব সাবধানে একটু-একটু ক'রে অগ্রসর হচ্ছে। আমার ঘোড়ার একটা নাল খুলে যাওয়ায় আমি পিছিয়ে পড়েছিলাম। ঘোড়াটা ছিল যেমন জোয়ান, তেমনি তাজা; সঙ্গীদের ধ'রে ফেলবার জন্যে খুব জোরে হাঁকিয়ে চলেছি। একবার ট্যাঁকে হাত দিয়ে প্রাণটা খুশী ক'রে নিলাম—থলিটি গিনি-মোহরে ভরা! তলোয়ারের লোহার খাপখানা যখন থেকে-থেকে রেকাবের উপর লেগে ঝন্‌ঝন্ ক'রে উঠছিল, তখন সত্যিই বুকটা খুব চওড়া হ'য়ে উঠছিল!

জলও থামে না, আমার গানেরও বিরাম নেই। তবু নিজের গলা নিজে শুনতে কতক্ষণ ভালো লাগবে? কাজেই শেষটা চুপ করতে হ'ল। ঝুপ-ঝুপ ক'রে ত বৃষ্টি হচ্ছে, আবার, গাড়ীর চাকা চ'লে চ'লে রাস্তার মাঝখানে যেসব খানা-খন্দ হয়েছে, তা'র ভিতর ঘোড়ার পা ঢু'কে গিয়ে কেবলি ঝপাৎ-ঝপাৎ শব্দ হচ্ছে। শেষকালে 'আর পারিনে' ব'লে, রাশ টেনে ধ'রে, একটু আস্তে-আস্তে চলতে লাগলাম। হাঁটু-পর্য্যন্ত-উঁচু বুট জোড়াটার গায়ে গেরী-মাটির মতন লাল কাদা পুরু হ'য়ে উঠেছে, জুতোর ভিতরটা ত জলে টইটম্বুর! একবার আমার কাঁধের উপরে সোনার-কাজ-করা তকমাখানার দিকে চেয়ে একটু সোয়াস্তি বোধ হ'ল, কিন্তু তা'র অবস্থা দে'খে একটু দুঃখও হ'ল—ক্রমাগত জলে ভি'জে-ভি'জে সেগুলো যেন শক্ত কাঠ হ'য়ে উঠেছে!

ঘোড়া একবার মাথাটা নীচু করলে, আমিও সেইসঙ্গে ঘাড় হেঁট করলাম, অমনি হঠাৎ—সেই যেন প্রথম, মনটায় কেমন হ'ল! একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে ভাবতে লাগলাম—এ যাচ্ছি কোথায়? কোথায় যে চলেছি, এ ভাবনা ত একবারও মাথায় ঢোকেনি! আমার দল যাচ্ছে, আমিও চলেছি—ব্যস! সেটা আমার কর্ত্তব্য কাজ। হাঁ কর্ত্তব্য বটে!—প্রাণের ভিতর কেমন একটি গভীর স্বস্তি বোধ করলাম—কর্ত্তব্যের নামে বেশ যেন শান্তি পেলাম! তখনই মনে হ'ল, এই ত চারিদিকে দেখছি, কত বড়-ঘরের ছেলে, যারা কখনো কষ্ট করেনি, তা'রাই হাসিমুখে এই দারুণ অনভ্যাসের দুঃখ সহ্য করছে; কত সম্ভ্রান্ত বংশের লোক ধনদৌলত সুখ সুবিধা—যা নিশ্চিত, তাই ছেড়ে এই অনিশ্চিত অদৃষ্টকে বরণ ক'রে নিয়েছে। আমিও তেমনি নিজের বিশ্বাস ও পৌরুষের খাতিরে, মান-রক্ষার জন্যে, কর্ত্তব্য মনে ক'রে নিজের সর্ব্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে বেশ একটা তৃপ্তি পাচ্ছি! এ কাজের মজাই এই। ভাবতে-ভাবতে মনে হ'ল লোকে আত্ম বলিদান জিনিষটাকে যতটা শক্ত ব'লে মনে করে, কাজটা আসলে তা'র চেয়ে ঢের সোজা—সেজন্যে অনেকেই ওটা করে, দেখা যায়।

আবার ভাবতে লাগলাম—আচ্ছা, এই আত্মবিসর্জ্জন করার প্রবৃত্তিটা মানুষের সহজ-ধর্ম্ম কি না। এই যে পরের আদেশ মেনে চলা—পরবশ হওয়া—এর অর্থ কি? নিজের ইচ্ছে ব'লে কিছু রাখব না, নিজের বুদ্ধিটাও পরকে স'পে দেবো—সেটা যেন একটা মস্ত ভার, একটা বোঝা! এই বোঝা ঝেড়ে ফেলে যেন হাঁপ ছাড়ার মতন নিশ্চিন্ত হওয়া—এ-ভাব আসে কোথা থেকে? মানুষের অভিমানে যা লাগে না? আমি বেশ ক'রে বু'ঝে দেখলাম, জীবনে প্রায় সর্ব্বত্রই মানুষ এই অন্ধ প্রেরণার বশে অনেক দিকে অনেক কাজ করছে বটে, কিন্তু সৈনিক-জীবনে এই প্রবৃত্তি যেরকম পূর্ণ ও দুর্দ্দম হ'য়ে ওঠে, এমন আর কোথাও নয়—এ-অবস্থায় মানুষ যেন সর্ব্ব সমর্পণ ক'রে বসে। আপনার ব'লে তা'র যেন কিছুই নেই—কাজ, কথা, ইচ্ছা, এমন-কি চিন্তাটি পর্য্যন্ত! সমাজে বা সংসারে যে শাসন মেনে চলতে হয়, তার মধ্যে বুদ্ধি বিচারের অবকাশ আছে—এমন অবস্থা প্রায়ই হয় যাতে নিয়ম ভঙ্গ করাও চলে। এমন ত দেখা যায়, কোনো অন্যায় কার্য্য করার সময় খুব অনুগত স্ত্রীও স্বামীর অবাধ্য হয়, আইনেও সে অবাধ্যতা দণ্ডনীয় নয়। কিন্তু সৈনিক যখন উপরওয়ালার হুকুম তামিল করে, তখন তা'কে একটি অসম্ভব কাজ করতে হয়—হুকুমটি মেনে নেবার সময় নিজের ইচ্ছেটা একেবারে মু'ছে ফেলতে হয়, আবার সেই একই মুহূর্ত্তে হুকুম তামিল করার সময়, নিজের অসীম ইচ্ছাশক্তি জাগিয়ে তুলতে হয়! সে যখন যুদ্ধ করে, তখন যেন নিয়তির মতন অন্ধ হয়েই তা'কে অস্ত্রচালনা করতে হয়। এই অন্ধ আত্ম-বিসর্জ্জনের ফলে সৈনিকের জীবনে যে কত-রকমের ভীষণ ঘটনা ঘটে, তা'কে যে কি কঠোর, কি নির্ব্বিকার হ'য়ে উঠতে হয়, আমি তাই মনে-মনে ভেবে দেখছিলাম।

এমনি ভাবতে-ভাবতে চলেছি। রাস্তাটা সোজা সামনে প'ড়ে আছে—একটা বাড়ী নেই, গাছ নেই,—যেন পাঁশুটে রঙের ক্যাম্বিসের উপর একটা লাল ডোরা! এই ডোরাটা বেশ ক'রে অনেক দূর পর্য্যন্ত তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। প্রায় তিন পোয়া পথ দূরে একটা কালো দাগ নড়ছে ব'লে বোধ হ'ল। একটু আহ্লাদ হ'ল—একজন কেউ ত বটে! দেখলাম এই কালো দাগটা আমারই মতন "লীল"-সহরের দিকে চলেছে। ঘোড়াটা আবার একটু জোরে হাঁকিয়ে জিনিষটার অনেকটা কাছে এসে পৌঁছলাম। আমার বোধ হল, একটা গাড়ীর মত কি চলেছে। বড় ক্ষুধা পেয়েছিল, ভাবলাম হয়ত কোনো খাবার-ওয়ালীর গাড়ী, তাই ঘোড়াটাকে আরও একটু জোরে হাঁকিয়ে দিলাম।

আর একশো হাত কাছাকাছি এসে স্পষ্ট দেখ্‌তে পেলাম, একটা শাদা-রঙের কাঠের গাড়ী—তিন-ধনুকের ছই, কালো অয়েলক্লথ দিয়ে ঢাকা; যেন দু'খানি চাকার উপর ঢাকা-দেওয়া একটি শিশুর বিছানা বসানো রয়েছে। একটি লোক একটা টাটু-ঘোড়ার লাগাম ধ'রে অতি কষ্টে কাদার উপর দিয়ে সেটাকে টেনে নিয়ে চলেছে। আমি আরও কাছে এসে লোকটাকে বেশ ক'রে দেখ্‌তে লাগ্‌লাম।

তা'র বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি ব'লে বোধ হ'ল—শাদা গোঁফ, দেহ বেশ মজবুত ও লম্বা। তা'র পোষাক পদাতি-সৈন্যের সর্দ্দারদের মতন—অতিশয় জীর্ণ নীলরঙের খাটো ওভার-কোটের ভিতর থেকে মেজরের তক্‌মা একটুখানি দেখা যাচ্ছে। চেহারা রুক্ষ হ'লেও প্রাণটা কঠোর ব'লে মনে হ'ল না—সৈন্যদলে এমন ধরণের চেহারা অনেক দেখা যায়। লোকটা আমার পানে একবার আড়চোখে চেয়েই গাড়ীর ভিতর থেকে খপ্‌ ক'রে একটা বন্দুক বার ক'রে ঘোড়া টান্‌লে—টেনেই গাড়ীটার ওপাশে গিয়ে দাঁড়াল, সেইটেই হ'ল তা'র আড়াল। লোকটার পোষাকের এক জায়গায় ফাঁসের মতন ক'রে একটু শাদা ফিতে আটকানো রয়েছে দে'খে আমার কোনো চিন্তা কর্‌তে হ'ল না, তখখনি আমার লাল কোর্ত্তার হাতাটা তা'কে দেখিয়ে দিলাম। লোকটা তখন বন্দুকটা গাড়ীর ভিতর রেখে ব'লে উঠ্‌ল—

"ওঃ, তা হ'লে ত আর কথাই নেই! আমি মনে করেছিলাম তুমি বুঝি ও-দলের—ওই যারা পিছু নিয়েছে। একটু মদ্যপান কর্‌বে?"

তা'র গলায় বোতলের-মতো-করা একটা নারকেলের মালা ঝুল্‌ছিল—বেশ কাজ করা, মুখটা রুপোয় বাঁধানো, সেটি যেন তা'র একটা দেখাবার জিনিষ। আমার হাতে সেটা তু'লে দিতেই আমি একরকম শাদা-রঙের পান্‌সে মদ বেশ এক-চুমুক টেনে নিয়ে সেটা আবার তা'কে ফিরিয়ে দিলাম।

সে পান কর্‌তে-কর্‌তে ব'লে উঠ্‌ল—"রাজার জয় হোক্‌।—তাঁর দয়াতেই ত আজ মেজর হয়েছি। এই তক্‌মাখানা বই আর কি আছে আমার? আবার যাচ্ছি সেই সৈন্যদলটির ভার নিতে—কাজের বেলায় কাজ কর্‌তে হবে ত।"—এই ব'লে সে তা'র টাটুটাকে তাড়া দিতে লাগ্‌ল, আমিও সঙ্গে সঙ্গে একটু জোরে হাঁকিয়ে চল্‌লাম। আমি ক্রমাগত তা'র দিকে চাইতে লাগ্‌লাম, কথা একটিও কইলাম না।

প্রায় মাইল-খানেক এইরকম নিঃশব্দে চলেছি, তা'র পর, সে যেমন টাট্টুটাকে বিশ্রাম দেবার জন্যে একটু দাঁড়াল, আমিও থেমে গেলাম। আমি আমার বুটজোড়াটা নিংড়ে জল বার কর্‌ছি দে'খে সে বল্‌লে,

"তোমার বুট যে পায়ে কামড়ে ধরেছে হে।"

আমি বল্‌লাম, "চার রাত্রি পা থেকে খোলা হয়নি কিনা।"

"হোঃ, আর হপ্তাখানেক পরে ওসব আর লক্ষ্যই থাক্‌বে না। আর দেখ, যে-রকম সময় কাল পড়েছে, সঙ্গে যে আর কেউ নেই, এও একটা বাঁচোয়া। আমার ওটাতে কি আছে বল্‌তে পারো?"

আমি বললাম "না।"

"একটা স্ত্রীলোক।"

আমি, যেন কিছুমাত্র আশ্চর্য্য হইনি এমনিভাবে বল্‌লাম—"বটে!"—ব'লে যেমন যাচ্ছিলাম তেম্‌নি চল্‌তে লাগ্‌লাম, সেও আমার পিছু-পিছু আস্‌তে লাগ্‌ল।

সে ভয়ানক ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে দে'খে তা'কে আমার ঘোড়াটায় উঠ্‌তে বল্‌লাম। সে তাই শু'নে আমার রেকাবের কাছে স'রে এসে আমার হাঁটুতে এক থাপ্পড় মেরে ব'লে উঠ্‌ল—

"আরে তুমি ত বেশ ছোকরা হে!—তবু ত তুমি লাল-যাত্রীর দলে!"

আমাদের মতন লাল-কোর্ত্তার বাবু-কর্ম্মচারীদের এই নাম দেওয়ায়, এবং তা'র কণ্ঠস্বরের তিক্ততায় আমি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌লাম, এইসব সাধারণ সৈনিকের চক্ষে আমাদের নবাবী চাকরি কি-রকম বিষ হ'য়ে উঠেছে।

সে বল্‌তে লাগ্‌ল—"আমি তোমার ঘোড়ায় চড়্‌তে চাইনে,—আমার ত ঘোড়ায় চড়া অভ্যেস নেই, আর ও আমার কাজও নয়।"

"কেন মেজর! তোমাদেরও ত ঘোড়ায় চড়্‌তে হয়?"

"তুমিও যেমন! বছরে একবার ক'রে ওদারক কর্‌বার সময় একটা ভাড়াটে ঘোড়ায় চড়ি বইত নয়। আমি বরাবর জাহাজে ছিলাম, এই শেষের দিকে পদাতি-সৈন্যের কাজ কর্‌ছি, ওসব ঘোড়ায় চড়া-টড়া আমার কর্ম্ম নয়।"

এর পর সে প্রায় আরও কুড়ি পা চ'লে এল, এক একবার আমার দিকে আড়ে-আড়ে তাকায়, ভাবে কিছু জিজ্ঞাসা কর্‌ব, কিন্তু কোনো সাড়া শব্দ না পেয়ে, শেষটা আপনিই বল্‌তে লাগ্‌ল,

"আরে বাঃ। তোমার যে দেখছি কিছুই জান্‌তে ইচ্ছে করে না। এই একটু আগে তোমাকে যা বল্‌লাম, তাতে তোমার একটুও তাক লাগ্‌ল না?"

'আমি অবাক্‌ বড় একটা কিছুতে হইনে।'

"বটে। আমার জাহাজ ছেড়ে আসার গল্পটা যদি বলি ত কেমন অবাক্‌ হও না দেখি।"

আমি বল্‌লাম, 'আচ্ছা ব'লেই দেখ না কেন,—তাতে তুমিও একটু চাঙ্গা হ'য়ে উঠ্‌বে, আমিও কিছুক্ষণের জন্যে ভুলতে পারবো যে, বৃষ্টির জল আমার পিঠের দাঁড়ায় গড়িয়ে পড়ছে, আর জমছে এসে আমার গোড়ালির তলায়।"

মেজর লোকটা বড় ভালো। আমার কথায় তার প্রাণটা ছোটো ছেলেদের মত খুশী হ'য়ে উঠ্‌ল, গল্পটা বল্‌বার জন্যে সে যেন একটু বিশেষ ক'রে তৈরী হ'য়ে নিলে, মাথার টুপিটার অয়েলক্লথখানা ঠিক করে নিয়ে কাঁধটা একবার ঝাড়া দিলে, তা'র পর নারকেলের মালা থেকে আর-এক চুমুক টেনে নিয়ে, টাটুটার পেটে আর একটা খোঁচা দিয়ে, সে তা'র গল্প জুড়ে দিলে।

তোমাকে প্রথমেই একটা কথা ব'লে রাখি। আমার জন্ম হয় ব্রেষ্ট শহরে। আমার বাপ ছিল সেনিক, আমিও ন বছর বয়সে, আধা-ভাতা আর আধা-মাইনের সৈন্যদলে ভর্ত্তি হই। কিন্তু ছেলে বেলা থেকেই আমার সমুদ্দুর বড় ভালো লাগ্‌ত। তাই একদিন ভারি পরিষ্কার রাত্রি—আমি তখন ছুটিতে—পালিয়ে গিয়ে এক মহাজনী জাহাজে উঠে তার খোলের মধ্যে লুকিয়ে রইলাম। মাঝ সমুদ্দুরে পাড়ি দেবার সময় কাপ্তেন আমায় দেখ্‌তে পেলে, তখন আর কি করে! জলে ফেলে না দিয়ে আমাকে তা'র ক্যাবিনের চাকর ক'রে নিলে। দেশে যে সময়টা রাজ্যিসুদ্ধ ওলট পালট হ'য়ে গেল, তখন আমার বেশ একটু উন্নতি হয়েছে, প্রায় পনেরো বছর সমুদ্দুর পারাপার ক'রে তখন নিজে একটি ছোটোখাটো মহাজনী জাহাজের কাপ্তেন হয়েছি। আগে যেসব খাস-সরকারী যুদ্ধ-জাহাজ ছিল—খুব উঁচু-দরের বহর ছিল সে!—হঠাৎ তা'তে লোকের অভাব হ'ল, তখন মহাজনী জাহাজ থেকে লোক নিতে লাগ্‌ল; সেইসময় আমাকেও একখানা ছোটো যুদ্ধের জাহাজে কাপ্তেন ক'রে দিলে, জাহাজখানার নাম ছিল 'মায়া।'

১৭৯৭ সালের ২৮ শে সেপ্টেম্বর হুকুম এল, আমেরিকার 'কাইয়েন' দেশে যাত্রা কর্‌তে হবে। সঙ্গে যাবে বাট জন সৈন্য,—আরও একটি লোক যাবে, তা'র নির্ব্বাসন দণ্ড হয়েছে; এই লোকটিকে বিশেষ নজরে রাখ্‌তে হবে—শাসন-পরিষদের যে চিঠিতে এই হুকুম ছিল তা'র ভিতরে আর-একখানা লেফাফা ছিল, এই লেফাফায় উপরে তিনটে লাল শীল

মোহরের ছাপ ; এই ভিতরের চিঠিখানা উপস্থিত খুল্‌তে মানা ছিল, বিষুবরেখা পার হবার এক ডিগ্রির মধ্যে খুল্‌তে হবে, তা'র আগে নয়।

আমার কোনো আজগুবি বিশ্বাস বা কুসংস্কার কোনোকালে ছিল না। তবু এই খামখানা দেখলেই কেমন ভয় হ'ত। আমার কামরার বিছানার ঠিক্ উপরেই একটা খুব কম দামের ইংরেজী ক্লক্ ঘড়ি ছিল, তা'রই কাচের ডালার ভিতর চিঠি খানা রেখে দিয়েছিলাম।

জাহাজের কামরার ভিতরটা কেমন জানো ত ? জান্‌বেই বা কি ক'রে,কিই বা জানো। তোমার বয়েসই বা কি।—বড় জোর ষোলো ? প্রত্যেক জিনিষটির একটি ক'রে পেরেক আছে, তাইতে আট্‌কে রাখ্‌তে হয়, কোনো-কিছু নড়বার চড়বার যো নেই। জাহাজ যতই দুলুক না কেন, একটি জিনিষও একটু স'রে যাবে না। একটা সিন্দুক ছিল আমার শোবার জায়গা, সেইটে খু'লে তা'র মধ্যে আমি ঘুমোতাম ; আবার বন্ধ কর্‌লেই সেইটে হ'ত আমার আরাম চৌকি—তা'র উপর ব'সে তোফা চুরুট টান্‌তাম। কা'মরার মেজটা ছিল মোম দিযে মাজা, ঘ'সে ঘ'সে মেহাগিনির মতন চক্‌চক্ কর্‌ত—যেন একখান আয়না। এই ঘর টুকুতে ব'সে আমোদের অন্ত ছিল না। গোড়ার দিকে খুব ফুর্ত্তিতেই থাকা গিয়েছিল, কেবল যদি—কিন্তু সে-কথা এখন নয়।

ক'দিন ধ'রে বেশ সুবাতাস বচ্ছিল। আমি ক্লক ঘড়িটার মধ্যে চিঠিখানা আট্‌কে রাখ্‌বার চেষ্টা কর্‌ছি, এমন সময় নির্ব্বাসন-দণ্ডের যাত্রীটি একটি বছর-সতেরোর সুন্দরী মেয়ের হাত ধ'রে আমার কামরায় ঢুক্‌ল। ছোক্‌রার বয়স বল্‌লে, উনিশ ; খাসা চেহারা। কেবল মুখখানা যা একটু ফ্যাকাসে, আর রংটা পুরুষ মানুষের পক্ষে একটু যেন বেশী ফুট্‌ফুটে। তা হলেও সে যে একটা মরদ-বাচ্ছা—দর্‌কার হ'লে সে যে অনেক পুরুষের বাবা হ'তে পারে, তা'র পরিচয় সে পরে দিয়েছিল। তা'র সেই ছোটো বউটির বাহুতে তা'র নিজের বাহু বাঁধা,—আহা, বউ ত' নয়, যেন ছেলেবেলার খেলার সাথী! বড় সরল, বড় মন-খোলা তা'র ভাবখানি, চোখে-মুখে হাসি উছ্‌লে উঠ্‌ছে। তাদের দুটিকে দে'খে মনে হ'ল, যেন এক জোড়া বনের পায়রা। আমার বড় ভালো লাগ্‌ল, বল্‌লাম—

'বলি, বাচ্ছারা।—কি মনে ক'রে ? বুড়ো কাপ্তেনটার সঙ্গে আলাপ কর্‌তে এসেছ ?—এস, এস। আমি তোমাদের অনেক দূরে নিয়ে যাচ্ছি বটে, কিন্তু সে এক-রকম ভালোই হয়েছে—খুব আলাপ জমাবার সময় পাওয়া যাবে। এই কোট-খোলা অবস্থাতেই মহিলাটির অভ্যর্থনা কর্‌তে হ'ল,. এজন্যে ভারি লজ্জিত হচ্ছি।—আরে, এই এক চিঠি নিয়ে বড় হাঙ্গামায পড়েছি, এটা'ক পেরেক মেরে ঐখানটায় আট্‌কে রাখ্‌তে হবে ; এস না, তোমরাও একটু দেখ না।

দু জনেই বড় লক্ষ্মী। ছেলেমানুষ বরটি তখুনি হাতুড়ি ধর্‌লে, আর ছোট্ট বৌটি আমার কথামতন পেরেকগুলো তু'লে দিতে লাগ্‌ল। জাহাজের দোলা লেগে ক্লকটা একবার এ পাশ একবার ও পাশ কর্‌ছে দে'খে, মেয়েটির হাসি দেখে কে। বলে, "রাইট্—লেফ্‌ট্। কেমন কাপ্তেন ?" আজও আমি তা'র সেই ছোটো কণ্ঠের আওয়াজ যেন পরিষ্কার শুন্‌তে পাচ্ছি—"রাইট লেফ্‌ট।—কেমন কাপ্তেন ?"—সে আমাকে ঠাট্টা কর্‌ছিল ; আমি বল্‌লাম "দাঁড়াও ত দুষ্টু। তোমার বরকে দিয়ে এখ্‌খুনি বকুনি খাওয়াচ্ছি, দেখ্‌বে ?"—তাই শু'নে সে তা'র হাত দুখানি দিয়ে স্বামীর গলা জড়িয়ে তা'কে চুমু খেলে—বড় চমৎকার। সত্যি।—এম্‌নি ক'রে আমাদের প্রথম পরিচয় হ'ল,এক নিমেষেই ঘনিষ্ঠতা হ'য়ে গেল।

সেবার মাঝ-সমুদ্রে পাড়ি জমাতে কোনো কষ্ট হয়নি, জল-বাতাস খুব ভালো ছিল। আমি রোজ খাবার সময় এই দুটি প্রণয়ীকে নিয়ে খেতে বস্‌তাম। বিস্কুট ও মাছ খাওয়া শেষ হ'লে পর, এই দুটি অল্প বয়সী স্বামী-স্ত্রী এম্‌নি ক'রে এ ওর পানে চেয়ে থাক্‌ত, যেন এর আগে কেউ কাউকে আর কখনো দেখেনি। তখন আমি খুব জোর হাসি-ঠাট্টা কর্‌তাম, তা'রাও সঙ্গে-সঙ্গে হাস্‌ত। তাদের সুখের ব্যাঘাত যেন কিছুতেই হয় না, যা করো তা'তেই খুসী। সে ভালোবাসা একটা দেখ্‌বার জিনিষ। একটি দড়ির দোলা-বিছানায় তা'রা দুটিতে শুয়ে ঘুমোত—আমার ওই গাড়ীতে ঝোলানো ভিজে রুমালখানায় ওই যে আপেল-দুটো বাঁধা রয়েছে, ওরা যেমন গায়ে-গায়ে গড়াগড়ি কচ্ছে—জাহাজের দোলানিতে তাদেরও ওইরকম অবস্থা হ'ত। আমি তোমার মতন ছিলাম, কিছু জিজ্ঞাসা ক'রে জান্‌বার ইচ্ছে হ'ত না। কি দর্‌কার ?—আমি পারাপারের মাঝি বই ত নয়। লোকের নাম-ধামের খবরে আমার কাজ কি বাপু ?

মাস খানেক যেতে না যেতে, তাদের দুটির উপর আমার সন্তানের মতন মায়া প'ড়ে গেল। দিনের মধ্যে যখনি ডাকি, দুটিতে মিলে আমার কাছে এসে বসে। ছোকরাটি আমার হিসেব-পত্তরের কাজ করে' দেয়, অল্প দিনেই একাজে সে আমারই মতন লায়েক হ'য়ে উঠেছিল, আমার ত দে'খে তাক লাগ্‌ত। ছেলেমানুষ বউটি একটা পিপের উপর ব'সে ব'সে সেলাইএর কাজ কর্‌ত।

একদিন কজনে মি'লে এইরকম ব'সে আছি, মাঝখান থেকে হঠাৎ আমি ব'লে ফেল্‌লাম—

"আচ্ছা, এই যে আমরা ব'সে আছি—এ দে'খে মনে হয় না কি, যে আমরা কটিতে মিলে একই পরিবার। আমি কিছু জিজ্ঞাসা কর্‌তে চাইনে, তবু একথা বোধ হয় ঠিকই যে তোমাদের হাতে পয়সা কড়ি বিশেষ-কিছু নেই ; আর, তোমাদের দুজনের এমন সুখী শরীর—তোমরা কি 'কাইয়েনে' গিয়ে দিন-মজুরের মত কোদাল-কুড়ুল ধ'রে দিন গুজ্‌রান কর্‌তে পার্‌বে ? আমি হ'লে অবিশ্যি সব পার্‌তাম, আমার শরীর জলে ভি'জে,রোদ্দুরে পু'ড়ে একেবারে বুনো হ'য়ে গিয়েছে। আমাকে তোমাদের বোধ হয় ভালোই লাগে ? যদি বলো ত' জাহাজ-কাহাজ ছেড়ে দিয়ে সেখানে গিয়ে তোমাদের নিয়ে সংসার পাতি। আমার ত থাক্‌বার মধ্যে একটা কুকুর আছে, আপনার বল্‌তে কেউ নেই—তা'তে সুখ পাইনে। তবু যাহোক তোমাদের পেলে এমন একা থাক্‌তে হয় না। আমি তোমাদের অনেক কাজে লাগ্‌ব, তা-ছাড়া কিছু সঞ্চয় করিনি এমন নয়—তা'তেই চ'লে যেতে পারে। যখন শেষের ডাক আস্‌বে তখন তোমাদেরই সব দিয়ে যাবো।"

আমার কথা শু'নে তা'রা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল—যেন বিশ্বাসই কর্‌তে পার্‌লে না। মেয়েটির যেমন অভ্যেস—ছু'টে গিয়ে তা'র স্বামীর গলাটি জড়িয়ে ধরে কোলের উপর গিয়ে বস্‌ল, তা'র মুখ রাঙা হ'য়ে উঠেছে, একেবারে কাঁদো-কাঁদো। স্বামীর চোখেও জল, সে তা'কে বুকে চেপে ধর্‌লে। স্ত্রী তখন কানে কানে কি বল্‌তে লাগ্‌ল ; তা'র খোঁপাটি কাঁধের উপর লতিয়ে পড়েছে, দড়ির পাক হঠাৎ খু'লে গেলে যেমন হয়, তা'র চুলগুলি তেম্‌নি আলুগা হ'য়ে ছড়িয়ে পড়্‌ল।—সে কি চুল।—একেবারে সোনার রং। তা'রা চুপি-চুপি কথা কইতে লাগ্‌ল। ছোকরাটি মাঝে-মাঝে তা'র স্ত্রীর কপালে চুমু খাচ্ছে, মেয়েটির চোখ দিয়ে টস্ টস্ ক'রে জল পড়্‌ছে। আমি আর থাক্‌তে পার্‌লাম না, শেষে ব'লে উঠ্‌লাম, "কি গো, তোমাদের সুবিধে হবে না বুঝি ?"

স্বামীটি বললে, "কিন্তু—কিন্তু—তোমার বড় দয়া, কাপ্তেন। তবে কিনা—তুমি কি কয়েদী নিয়ে ঘর কর্‌তে পার্‌বে ? তা-ছাড়া—।" ছোকরা মুখ হেঁট কর্‌লে।

আমি বল্‌লাম, "তোমরা কি এমন অপরাধ করেছ যার জন্যে দ্বীপান্তরের হুকুম হয়েছে, সে আমি জানিনে,—এর পরে কখনো

আমার বলতে ইচ্ছে হয় বোলো, যা বল্‌তে হয় বোলো না। আমার ত মনে হয় না, তোমরা একটা কোনো ভয়ানক পাপের বোঝা বইছ, বরং একথা আমি বল্‌তে পারি, যে আমার জীবনে আমি এমন অনেক কাজ করেছি যার তুলনায় তোমরা নিষ্পাপ। অবিশ্যি তাই ব'লে যতক্ষণ এই জাহাজে আমার হেপাজতে তোমরা আছ, ততক্ষণ আমি যে তোমাদের ছেড়ে দেবো, তা ভেবো না,—বরং দর্‌কার যদি হয়, ত তোমাদের ওই মাথা-দুটো একজোড়া পায়রার মুণ্ডুর মতন অনায়াসে উড়িয়ে দেবো। কিন্তু এই সারেঙ্গের পোষাক যখন খুলে ফেল্‌ব, তখন কেই বা মানে হুকুম আর কেউ বা মানে হাকিম!"

সে বল্‌লে, "কি জানো কাপ্তেন, আমাদের সঙ্গে তোমার পরিচয় থাকাটাই তোমার পক্ষে এক বিপদ্। আমরা যে এত হাসি—সে আমাদের বয়সের গুণে। আমাদের সুখী ব'লে মনে হয়, তা'র কারণ—আমরা দুজনা দুজনকে ভালোবাসি। সত্যি বল্‌তে কি, এক-একসময় বরাতে কি আছে ভেবে আমি আকুল হই—কি জানি আমার 'লয়া'র শেষটা কি হবে!"

এই ব'লে সে তা'র বালিকা-স্ত্রীর মাথাটি বুকে একবার চেপে ধর্‌লে, ধ'রে বল্‌লে, "কাপ্তেনকে কথাটা বলে'ই ফেল্‌লাম; তুমিও কি চুপ ক'রে থাক্‌তে পার্‌তে, লয়া?"

আমি চুরুটটা হাতে ক'রে উ'ঠে দাঁড়ালাম, চোখ দুটো ভিজে আস্‌ছিল—ওটা আবার আমার সয় না। বল্‌লাম, "ওসব কথা এখন রাখো। ক্রমে সব কেটে যাবে। তামাকের ধোঁয়া যদি মহিলাটির সহ্য না হয় তবে অনুগ্রহ ক'রে উনি কেন একটু স'রে যান না। তাই শু'নে মেয়েটি উ'ঠে দাঁড়াল; তা'র মুখখানি লাল হ'য়ে উঠেছে, চোখের জলে ভাস্‌ছে—ছোটো ছেলেদের ধম্‌কালে যা হয়। সে তখন ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বল্‌লে, "যাই বলো, তোমাদের মতন লোকেরও মাথা গুলিয়ে যায়!—বলি, চিঠিখানার কি হ'ল?" কথাটায় আমার বড় লাগ্‌ল, আমার চুলের গোড়া পর্য্যন্ত টন্ টন্ ক'রে উঠ্‌ল। বল্‌লাম,

"কি সর্ব্বনাশ! আমি ত সত্যিই ভু'লে গিয়েছিলাম! আচ্ছা ক্যাসাদে পড়েছি ত! এর মধ্যে যদি বিষুব-রেখার এক ডিগ্রি পেরিয়ে গিয়ে থাকে, তা হ'লে ত নিস্তার নেই,—জলে ঝাঁপ দেওয়া ছাড়া গতি নেই। ভাগ্যিস্ মনে ক'রে দিয়েছ!—বাঁচালে, লক্ষ্মীটি!"

তাড়াতাড়ি জলপথের ছক-খানা খু'লে দেখ্‌লাম, এখনো সে-জায়গায় পৌঁছতে এক হপ্তা লাগ্‌বে। আমার মাথাটা হাল্কা হ'য়ে গেল, কিন্তু কি জানি কেন, বুকটা ভারী হ'য়েই রইল। বল্‌লাম, "আর ত কিছু নয়, কর্ত্তাদের কাছে হুকুমের একটুখানি এদিক্ ওদিক্ হবার জো নেই। এবার থেকে আমি ঠিক হ'য়ে রইলাম, আর ভুল হবে না।"

তিন জনেই চিঠিখানার দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে রইলাম—যেন সেটা কখন হঠাৎ কথা ক'য়ে ওঠে! একটা ব্যাপার দে'খে আশ্চর্য্য হলাম। ঠিক সেই সময়ে ছাদের উপরকার ঘুলঘুলি দিয়ে খানিকটা আলো এসে পড়ল ঠিক চিঠিখানার উপর, সেই আলোতে লাল শীলমোহর-তিনটে যেন কি-রকম দেখাচ্ছিল!—যেন আগুনের ভিতর থেকে একখানা মুখ আমাদের পানে চেয়ে রয়েছে! আমি একটু আমোদ করে' বল্‌লাম, "চোখগুলো যেন কপাল থেকে ঠিক্‌রে বেরিয়ে আস্‌ছে, নয়?"

মেয়েটি ব'লে উঠ্‌ল, "ওগো, দেখ দেখ, ঠিক যেন টক্‌টকে রক্তের দাগ!"

তা'র স্বামী তখন তা'র একটি বাহু নিজের বাহুতে পরিয়ে জবাব দিলে "ছি, লয়া! ও আবার কি কথা! রক্ত হবে কেন? ও যেন ঠিক বিয়ের চিঠির উপরকার লাল রঙ্। এখন একটু বিশ্রাম করবে এস দিকি। ও চিঠিখানা দে'খে অমন মন খারাপ হ'ল কেন?"

তা'রা দুজনে হাত-ধরাধরি ক'রে ডেকের উপর বেরিয়ে পড়্‌ল। আমি একা সেই লেফাফাটার সাম্‌নে ব'সে-ব'সে পাইপ টান্‌তে লাগ্‌লাম। শেষটা চিঠিখানার পানে চেয়ে-চেয়ে আমার মেজাজ বিগ্‌ড়ে গেল, আমার একটা জামা দিয়ে ঘড়িটা ঢেকে দিলাম, চিঠিখানা যাতে আর চোখে না পড়ে; ঘড়ি দে'খেও আর কাজ নেই।

খানিক পরে আমিও ডেকের উপর এসে দাঁড়ালাম, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বাইরেই কাটালাম। আমরা তখন 'ভার্দ্দ'-অন্তরীপের সামনে দিয়ে চলেছি; পিছনে বাতাস পেয়ে জাহাজ বেশ জোরে ছুটেছে। পৃথিবীর যে অংশটাকে গ্রীষ্মমণ্ডল বলে, আমরা তখন তা'র মধ্যে রয়েছি। এমন সুন্দর রাত্রি গ্রীষ্মমণ্ডলেও বড়-একটা পাইনি। সূর্য্যের মতন বড় হ'য়ে চাঁদ উঠ্‌ছে, তখনো অর্দ্ধেকটা জলের নীচে; সমুদ্রের অনেকখানি বরফে-ঢাকা মাঠের মতন শাদা হ'য়ে গেছে, মাঝে-মাঝে যেন হীরের কুচি ছড়ানো! জাহাজের কর্ম্মচারী থেকে মাল্লারা কেউ একটি কথা কইছে না, সবাই আমারই মতন চুপ ক'রে জাহাজের ছায়ার পানে চেয়ে রয়েছে। এইরকম শান্তি ও শৃঙ্খলা আমি বড় পছন্দ করি, আলো-জ্বালা বা কোনো-রকম শব্দ করা বারণ ছিল। হঠাৎ কিন্তু প্রায় আমার পায়ের কাছে একটি সরু লাল আলোর রেখা দেখ্‌তে পেলাম; আর কেউ হ'লে একটা কাণ্ড বাধিয়ে দিতাম, কিন্তু এযে আমার বাচ্ছা-কয়েদীদের কামরার আলো। কি কর্‌ছে না দে'খে কি রাগ করতে পারি! একটু হেঁট হ'লেই হয়, আকাশ-মুখো ঘুলঘুলিটার ভিতর দিয়ে তাদের ছোট ঘরখানির সবটুকু দেখা যায়। আমি চেয়ে দেখ্‌লাম—

মেয়েটি হাঁটু গেড়ে ব'সে উপাসনা কর্‌ছে। একটি বাতির ছোটো আলো তা'র মুখের উপর পড়েছে, তা'র পরনে রাতের কাপড়। উপর থেকে আমি তা'র আদুল গা, খালি পা আর একরাশ এলোচুল দেখ্‌তে পাচ্ছিলাম। একবার ভাব্‌লাম স'রে যাই, আবার ভাব্‌লাম হ'লই বা, দোষ কি? আমি একটা বুড়ো সেপাই বইত নয়। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লাম।

তা'র স্বামী দুই হাতে মাথা দিয়ে একটা টাঙ্কের উপর ব'সে আছে—তা'র উপাসনা-করা দেখ্‌ছে। বৌটি একবার তা'র ডাগর নীল চোখ-দুখানি তু'লে উপর পানে চাইলে—চোখ জলে ভাস্‌ছে! যেন যীশুর পদ-সেবিকা কৃপাভিখারিনী ম্যাগ্‌ডেলেন। যখন সে জোড়হাতে প্রার্থনা কর্‌তে লাগ্‌ল, তখন স্বামীটি তা'র সেই খোলা লম্বা চুলের ডগাগুলি হাতে ক'রে তু'লে, আস্তে-আস্তে ঠোঁটে ঠেকাচ্ছিল। উপাসনা শেষ হ'লে, মেয়েটি তা'র হাত-দুখানি ক্রুসের মতন ক'রে বুকের উপর ধর্‌লে, তা'র মুখে যেন স্বর্গের হাসি ফু'টে উঠ্‌ল! ছোকরাটিও তা'র দেখাদেখি হাত-দুখানি সেইরকম কর্‌লে। তা'র যেন একটু লজ্জা কর্‌ছিল—কর্‌বেই ত, পুরুষ মানুষের কি ওসব পোষায়!

দাঁড়িয়ে উ'ঠেই লয়া তা'র স্বামীকে চুমু খেলে। যেমন শিশুকে দোল্‌নায় শুইয়ে দেয়, তা'র স্বামী তা'কে তেমনি ক'রে কোলে তু'লে আস্তে-আস্তে দড়ির দোলা-বিছানায় শুইয়ে দিলে। জাহাজের দোলায় দোল খেতে-খেতে তা'র তখনি ঘুম আস্‌ছিল। দোলনায় তা'র মাথাটি আর ছোট্ট পা-দুখানি উঁচু হ'য়ে ছিল, মাঝখানটি নীচু; দেহখানি একটি সাদা সেমিজের মতন কাপড়ে আগাগোড়া ঢাকা। আধ-ঘুমে সে ব'লে উঠ্‌ল,

"প্রিয়তম, তোমার কি ঘুম পাচ্ছে না? রাত যে অনেক হ'ল!"

তা'র স্বামী তখনো মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে, কোনো উত্তর দিলে না। এতে সে যেন একটু উদ্বিগ্ন হ'য়ে, তা'র ছোট্ট মাথাটি দোল্‌না থেকে একটু বের ক'রে স্বামীর পানে চেয়ে রইল, ঠোঁটদুখানি একটু ফাঁক

করলে মাত্র, কথা কইতে সাহস হ'ল না। শেষে তার স্বামী আপনিই বললে, "ত্রাইত লরা! যতই আমেরিকার কাছে আসছি ততই যেন প্রাণের ভিতর কেমন ক'রে উঠছে! কেন জানিনে, মনে হচ্ছে জীবনের যে ক'টা সবচেয়ে সুখের দিন তা এই জাহাজেই কাটল।"

লরা বললে, "আমারও তাই মনে হয়। সেখানে পৌঁছতে একটুও মন সরছে না।"

এইকথা শু'নে তা'র যেন আনন্দ ধরে না। নিজের হাত দু'খানা জোরে মুঠো করে সে ব'লে উঠল,

"দেবী আমার!—তবু ত তুমি রোজ প্রার্থনার সময় কাঁদো! ওতে আমার ভারি কষ্ট হয়। কারণ, তোমার মনে সে-সময় যে কি হয় তা আমি বুঝতে পারি। বোধ হয়, যা' ক'রে ফেলেছ তা'র জন্যে তোমার এখন দুঃখ হয়।"

শুনে লরা বড় ব্যথা পেলে, বললে, "কি বললে?—আমার দুঃখ হয়! তোমার সঙ্গে চ'লে এসেছি ব'লে দুঃখ হয়! প্রাণের প্রাণ আমার! তোমার কি মনে হয়, আমি তোমায় অল্পদিন মাত্র পেয়েছি ব'লে, এখনো তেমন ভালোবাসতে পারিনে? আমি কি মেয়েমানুষ নই! সতেরো বছর বয়স ব'লে আমার ধর্ম্ম আমি বুঝিনে? আমার মা, আমার দিদিরা—সবাই যে আমায় বলেছে, তুমি যেখানে যাচ্ছ আমারও সেইখানে যাওয়া উচিত। এটা বেশী কথা কি! বরং আশ্চর্য্য হচ্ছি, যে তুমি এটাকে এত বেশী মনে করছ। তুমি কি ক'রে বল, যে আমি এর জন্য দুঃখ করছি! আমি জীবনে-মরণে তোমার সাথী, তোমার সঙ্গে-সঙ্গে থাকব ব'লে এসেছি।"

এত আস্তে-আস্তে, এত মিষ্টি ক'রে কথা-গুলি সে বলছিল, যে আমার মনে হ'ল যেন গান শুনছি। আমার প্রাণ গ'লে গেল, আমি মনে-মনে বললাম, "তুমি বড় লক্ষ্মী মেয়ে—বড় লক্ষ্মী!"

ছোকরা স্বামীটি কেবল নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল, আর পা দিয়ে মেজেটা ঠুকতে লাগল। বউটি তা'র হাতখানি সবটা আদুল ক'রে বাড়িয়ে দিলে, সে কেবল তাইতে একটি চুমু খেলে।

"লরেট! রাণী আমার! বিয়েটা যদি আর চারটে দিন পিছিয়ে দিতাম, তা হ'লে একাই গ্রেপ্তার হ'তাম, তোমাকে সঙ্গে আসতে হ'ত না—একথা ভাবলে আমার যে কি আফশোস হয়, তা কি বলব!"

বউ তখন বিছানা থেকে একেবারে দুই হাত বাড়িয়ে দিয়ে বরের মাথাটি এমনি ক'রে জড়িয়ে ধরলে, যেন সেটিকে নিয়ে বুকের ভিতর লুকিয়ে রাখবে। তা'র কপাল, চোখ, মাথা আস্তে-আস্তে চাপড়াতে লাগল। শিশুর মতন সরল হাসিতে তা'র মুখখানি ভ'রে গেল; ভারি মিষ্টি-মিষ্টি সব কথা বলতে লাগল, সেসব চমৎকার মেয়েলি কথা, আমি এর আগে কখনো শুনিনি।—কেবল নিজেই কথা কইবে ব'লে আঙুল দিয়ে বরের ঠোঁট চেপে ধরেছে। নিজের বড়-বড় চুল গোছা ক'রে ধ'রে, তাই দিয়ে রুমালের মতন ক'রে চোখ মুছতে লাগল, আর বলতে লাগল, "আচ্ছা বলত, একজন ভালোবাসার লোক কেউ সঙ্গে থাকা ভালো নয়? আমার সেখানে যেতে কোনো দুঃখ নেই,—কত বুনো মানুষ দেখব, নারকেল-গাছ দেখব—কত কি! তুমি তোমার গাছ আলাদা পুতো, আমার গাছ আমি আলাদা পুতব—দেখব কে মালীর কাজ ভালো জানে! দুজনে মি'লে কেমন একটি ঘর বাঁধব, দরকার হয় দিনরাত্রি খাটব। আমার গায়ে জোর আছে! দেখ, আমার হাত দুখান দেখ! আচ্ছা, আমি তোমাকে ধ'রে তু'লে ফেলতে পারি কি না দেখবে?—হাসচ যে! আমি ছুঁচের কাজ জানি—কাছে কোনো শহর নেই কি? ভালো সেলাইএর কাজ কেউ কিনবে না? যদি গান বা ছবি-আঁকা কেউ শেখে ত তাও শেখাতে পারি। আর যদি লেখাপড়া-জানা লোক সেখানে থাকে, তা হ'লে তুমিও লি'খে রোজগার করতে পারবে।"

এই শেষ-কথাটা শু'নে বেচারী একেবারে পাগলের মতন হ'য়ে চেঁচিয়ে ব'লে উঠল,

"লেখা!—আবার লেখা!"—ডান হাতখানা বাঁ হাত দিয়ে মোচড়াতে লাগল, আর বলতে লাগল, "হায়, হায়, কেন মরতে লিখতে শিখেছিলাম!—লেখা! সে ত উন্মাদের বৃত্তি! নিজের বিশ্বাস-মতন লেখবার অধিকার নাকি সকলেরই আছে! আমিও তাই বিশ্বাস করেছিলাম!......এমন বুদ্ধি আমার কেন হ'ল? আর তাই বা এমন কি অপরাধ!—পাঁচটা কি ছ'টা অতি সাধারণ লেখা লি'খে ছাপিয়েছিলাম, যার ভালো লাগে পড়বে, না হয় উনুনের ভিতর ফে'লে দেবে—এই ত দোষ! এর জন্যে এত শাস্তি! আমি নিজের জন্যে ভাবিনে,—কিন্তু তুমি! প্রেমের পুতলি! লক্ষ্মীর প্রতিমা! তখন সবে বারোদিন—তুমি বালিকা ছিলে, নারী হয়েছ!—বলো দেখি, আমি তোমার হাতে ধ'রে বলছি, তুমি উত্তর দাও—আমি কোন্ প্রাণে তোমায় সঙ্গে আসতে দিতে রাজি হলাম—এত ভালো তোমাকে হ'তে দিলাম কি ক'রে! হা, হতভাগিনী! তুমি এখন কোথায় তা ভেবে দেখছ কি?—কোথায় যাচ্ছ, জানো? আর ক'দিন পরেই তুমি তোমার মা ও দিদিদের কাছ থেকে সাড়ে চার হাজার মাইল দূরে গিয়ে পড়বে। তোমার এ দুর্গতি কেন?—সে ত আমারি জন্যে!"

মেয়েটি একটিবার মাত্র তা'র মুখখানি বিছানা'র মধ্যে লুকিয়ে নিলে—উপর থেকে দেখতে পেলাম, সে কাঁদছে, তা'র বর তা দেখতে পেলে না। একটু পরেই স্বামীকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে সে হাসি-হাসি মুখ ক'রে ফি'রে তাকালে।

'হ্যাঁ, উপস্থিত টাকাকড়ি কিছু নেই বটে"—ব'লেই সে হেসে উঠল, 'আমার কাছে কেবল একটি টাকা আছে—তোমার?"

এবার সেও ছেলেমানুষের মত হাসতে লাগল, বললে, "আমার শেষ পর্য্যন্ত একটি আধুলিতে ঠেকেছিল; তাও, তোমার বাক্সটি যে ব'য়ে এনেছিল সেই ছেলেটিকে দিয়েছি।"

বউ বললে, "বেশ করেছ, তা'তে কি হয়েছে? হাতে কিছু না থাকাই ত সবচেয়ে মজার!—ভাবনা কি? আমার মা যে হীরের আংটি-দুটি আমাকে দিয়েছিলেন, তা আমার তোলা আছে; যখন দরকার বোঝো বিক্রী করলেই হবে। আরো একটা কথা আমার মনে হয়। ওই বুড়ো কাপ্তেন বড় ভালো লোক—তিনি সব কথা জানেন, এখনো কিছু খু'লে বলেননি। চিঠিখানা বোধ হয় আর-কিছু নয়—আমাদের যাতে সুবিধা হয় সেইরকম কিছু ক'রে দেবার জন্যে 'কাইয়েন'এর শাসনকর্ত্তাকে অনুরোধ করা হয়েছে।"

ছোকরা বললে "হবে বা! কে বলতে পারে?" বউটি ব'লে উঠল, "তা নয় ত কি? তুমি এত ভালো, তোমার উপর গবর্ণমেণ্ট কি সত্যিই রাগ করতে পারে? নিশ্চয় দিনকতকের জন্যে তোমাকে স্থানান্তর করেছে মাত্র।"

বেশ কথাগুলি কিন্তু! আবার আমাকেও ভালো লোক ব'লে জানে—শুনে আমার প্রাণটা যেন গ'লে গেল। শীলমোহর-করা চিঠিখানার কথা যা বললে, তা শু'নেও আমার আহ্লাদ হ'ল। এখন দেখি তা'রা দুজনেই দুজনকে চুমু খাচ্ছে। এইবার তাদের চুপ করাবার জন্যে আমি

ডেকের উপর খুব জোরে পায়ের শব্দ কর্‌তে লাগ্‌লাম, তা'র পর চেঁচিয়ে ডেকে বল্‌লাম,

"বলি, শুন্‌ছ!—ও গো ক্ষুদে বন্ধুরা। আর নয়। জাহাজের সব আলো নিবিয়ে দেবার হুকুম হয়েছে, তোমাদের আলোটা নিবিয়ে ফেল দেখি!"

তখনি আলো নিবিয়ে ফেল্‌লে, তবু অন্ধকারে স্কুলে পড়া ছেলে-মেয়েদের মতন চাপা গলায় হাসি-গল্প চল্‌তে লাগ্‌ল। আমি একাই ডেকের উপর পায়চারি কর্‌তে লাগ্‌লাম, আর চুরুট টান্‌তে লাগ্‌লাম। গ্রীষ্মমণ্ডলের আকাশ! সব তারাগুলি ফু'টে উঠেছে,—তারা ত নয়, যেন এক-একটা ছোটো-ছোটো চাঁদ! বাতাসটিও বেশ মিঠে লাগ্‌ছিল।

ভাব্‌লাম, বাচ্ছারা যা মনে করেছে তাই বোধ হয় ঠিক, একটু ভরসা হ'ল। খুব সম্ভব, শাসন-বৈঠকের পাঁচজন কর্ত্তার মধ্যে অন্তত এক-জনেরও মনটা গেলে গলেছে, তিনিই বোধ হয় ওদের সম্বন্ধে আমাকে একটু পৃথক্ আদেশ দিয়ে থাক্‌বেন। এসব ব্যাপারের অর্থ আমি আগে বুঝ্‌তে চেষ্টা করিনি, রাজনীতির ভিতর কত মারপ্যাঁচ আছে—কে জানে? মোট কথা, বুঝি আর নাই বুঝি, আমার এইটেই বিশ্বাস হ'ল আর মনটাও একটু ঠাণ্ডা হ'ল।

নীচে নেমে গেলাম। কামরায় ঢু'কে আমার কোটের তলা থেকে চিঠিখানা বের ক'রে একবার তাকিয়ে দেখ্‌লাম। মনে হ'ল যেন তা'র মুখখানা বদ্‌লে গিয়েছে, যেন হাস্‌ছে। শীল-মোহরগুলো গোলাপী দেখাচ্ছে। তা'র মতলব যে ভালোই—সে বিষয়ে আর সন্দেহ রইল না, তাই একটু ইঙ্গিত ক'রে তা'কে জানিয়ে দিলাম, যে সে আমার বন্ধু।

(আগামী বারে সমাপ্য)

মেণ্ডেলীফ্ ও নব্য-রসায়ন

শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র রায়

রুশ-দেশ আজকাল নানা কারণে জগতে প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। রাজনীতি, কাব্য, উপন্যাস এবং নৃত্য, গীত ও অভিনয় প্রভৃতি ললিত কলায় রুশেরা যুগান্তর আনিয়াছে। রুশিয়াই প্রথমে বলশেভিকবাদ স্থাপনে কৃতকার্য্য হইয়াছে। কাব্যে পুশ্‌কিন, উপন্যাসে টল্‌ষ্টয়, ডষ্টয়-এফ্‌স্কি, টুর্গেনিভ, গর্কি, গল্পসাহিত্যে শেকভ্, নৃত্যে পাব্‌লোভা সকলেই নিজ-নিজ ক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় রুশ-দেশ নানা মনীষীর জন্মভূমি হইয়াও বিজ্ঞানে একমাত্র মেণ্ডেলীফ্ ব্যতীত অন্য কোনো বিশেষজ্ঞকে নিজস্ব বলিয়া গণনা করিতে পারে না। বৈজ্ঞানিক টিল্‌ডেন বলিয়াছেন যে, রাজনৈতিক অবস্থাই ইহার জন্য প্রধানত দায়ী। জারের স্বেচ্ছাতন্ত্র-শাসনকালে অতি সামান্য কারণেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য ও বীক্ষণাগার বন্ধ করিয়া দেওয়া হইত। বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হইলে কেবলমাত্র প্রতিভা থাকিলে চলে না, প্রতিভার সঙ্গে বিরাট্ সাধনা ও পরীক্ষাগারে অক্লান্ত পরিশ্রম দরকার। প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা সাধারণত একটু স্বাধীনচেতা হন এবং তাঁহারা শিক্ষা-বিভাগে থাকিলে বিভাগের উপরিস্থ কর্ম্মচারীরা তাঁহাদিগকে সুদৃষ্টিতে দেখেন না। এজন্য তাঁহাদের গবেষণা ক্ষেত্রে নানারূপ বাধা-বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়। এই কারণেই প্রতিভাশালী হইয়াও রুশেরা অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় বিজ্ঞানে অতিশয় অল্প প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। মেণ্ডেলীফ্‌কেও রাজনৈতিক বাধাবিপত্তি অতিক্রম করিতে হইয়াছিল, কিন্তু তাহার প্রকাশিত মৌলিক প্রবন্ধের সংখ্যা নগণ্য নয়। তিনি সর্ব্বসমেত ২৫২টি মুদ্রিত প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন।

মিত্রি ইভানোভিচ মেণ্ডেলীফ্ ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ২৭শে জানুয়ারী সাইবিরিয়ার অন্তঃপাতী টোবোলস্ক্ নগরে জন্ম-গ্রহণ করেন। তিনি পিতামাতার চতুর্দ্দশ ও সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র। তাঁহার মাতৃকুল তাতার বংশোদ্ভূত, কিন্তু তাঁহার চরিত্রে বিশেষ-কোনো প্রাচ্যভাব ছিল না। তাঁহার জন্মের কিছুদিন পরেই তাঁহার পিতা দৃষ্টিশক্তি হারাইয়া সামান্য-মাত্র পেন্‌সন্ লইয়া শিক্ষকের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। মেণ্ডেলীফের মাতা অতিশয় বুদ্ধিমতী, স্নেহশীলা ও কর্ম্মদক্ষা রমণী ছিলেন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে মেণ্ডেলীফের ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মাতা তাঁহাকে লইয়া

মস্কো যান। সেখানে নানা কারণে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে তিনি সেণ্ট্ পিটার্স্‌বার্গে যাইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন ও সঙ্গে-সঙ্গে তাঁহার মাতার বন্ধুদের সাহায্যে গবর্ণ্‌মেণ্ট্-প্রদত্ত বৃত্তি লাভ করেন। এখানে তিনি চারি বৎসর অধ্যয়ন করেন, কিন্তু শেষ পরীক্ষা দিবার কিছু আগেই তাঁহার মাতার মৃত্যু হয় ও তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। ইহার পর তিনি ক্রিমিয়ার অন্তঃপাতী সিম্‌ফেরপোল নগরে কিছুদিন বিজ্ঞান-শিক্ষকের কার্য্য করেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে তিনি সেণ্ট্ পিটার্স্‌বার্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া এম্-এ ডিগ্রীলাভ করেন। শিক্ষা-সচিবের অনুমতি লইয়া তিনি ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক রেনোর অধীনে গবেষণা করিবার জন্য প্যারী গমন করেন। তৎপরে জার্ম্মানীর অন্তর্গত হাইডেল্‌বার্গ্ নগরে আসিয়া তিনি তাহার গবেষণা শেষ করেন। দুইবৎসর পরে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি ডাক্তার উপাধিতে বিভূষিত হন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

মেণ্ডেলীফ্ নিপুণ শিক্ষক ও ছাত্রবৎসল ছিলেন। ছাত্রেরাও তাঁহাকে অতিশয় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত। কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষের সহিত ছাত্রদের বিবাদ হইলে, তিনি ছাত্রদের পক্ষাবলম্বন করিতেন এবং তাঁহার ব্যক্তিগত প্রভাবের জন্যই অনেক সময় বিবাদ থামিয়া যাইত। অবশেষে কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে কলেজ-শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁহার মত-ভেদ হয় ও তিনি ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে পদত্যাগ করেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজ্যস্থ ওজন ও মাপ-সম্বন্ধীয় সমস্ত ব্যাপারের পরিচালক (Director of the Bureau of Weights and Measures) নিযুক্ত হন। ১৯০৬ সালে তাঁহার মৃত্যু-পর্য্যন্ত এই পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

মেণ্ডেলীফ্ অতিশয় সরলভাবে জীবন যাপন করিতেন। তাঁহার বেশভূষা খুব সাধারণ রকমের ছিল। মস্তকের কেশ-সম্বন্ধে তাঁহার এক বৈশিষ্ট্য ছিল। বৎসরের মধ্যে বসন্ত-কালে তিনি একবার মাত্র কেশ ছেদন করিতেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধে গল্প আছে যে, জার তৃতীয় আলেক-জান্দারের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে বন্ধুবান্ধবদের আপত্তি-সত্ত্বেও তিনি লম্বা চুল লইয়া দরবারে উপস্থিত হন।

মেণ্ডেলীফ্ ঊনত্রিশ বৎসর বয়সে ১৮৬৩খৃষ্টাব্দে বিবাহ করেন। কিন্তু এ-বিবাহ বিশেষ সুখের হয় নাই, অবশেষে এ-বিবাহের ভঙ্গ হয় (divorce)। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে তিনি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। তাঁহার দ্বিতীয় বিবাহ বেশ সুখের হইয়াছিল এবং তাঁহার শেষ জীবন সুখে ও শান্তিতে কাটিয়াছিল।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে বিশ বৎসর বয়সে মেণ্ডেলীফ্ প্রথম গবেষণা-মূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। প্রবন্ধের বিষয় ছিল অর্থাইট (Orthite) নামক আকরিক পদার্থের বিশ্লেষণ। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি তরল পদার্থের গুণ-ও ধর্ম্ম-সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করেন। তাপ-প্রয়োগ করিলে সকল পদার্থের অবয়ব বৃদ্ধি হয় তাহা সকলেই জানেন, কিন্তু তিনিই প্রথমে তরল পদার্থের তাপ-বৃদ্ধির সঙ্গে অবয়ব বৃদ্ধির একটি সরল নিয়ম আবিষ্কার করেন।

মেণ্ডেলীফের প্রধান কীর্ত্তি মৌলিক পদার্থ-সম্বন্ধে তাঁহার তালিকা। তিনি যখন প্রথমে নব্য রসায়ন-শাস্ত্রের গবেষণায় প্রবৃত্ত হন, তখন ইহা কেবলমাত্র শৈশব অতিক্রম করিয়া কৈশোরে পদার্পণ করিয়াছে। আমাদের শাস্ত্রে "ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোম" বলিয়া যে উল্লেখ আছে, অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহার চারিটিকে (মৃত্তিকা, জল, অগ্নি ও বায়ু) ভূত অর্থাৎ মূল পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতেন। ইহাদের বিশ্বাস ছিল, ভূপৃষ্ঠের প্রাণী, উদ্ভিদ্, শিলা, কঙ্কর সকলেই সেই চারিটি মূল পদার্থে গঠিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর পণ্ডিতগণ যখন বহু যুগের অসম্বদ্ধ ভাব, চিন্তা ও অদ্ভুত কাহিনীর আবর্জ্জনা হইতে রাসায়নিক তত্ত্বের সারোদ্ধার করিয়া তাহাকে মূর্ত্তিমান্ করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, তখনও ইহারা সেই চাতুর্ভৌতিক সিদ্ধান্তে বিশ্বাস করিতেন।

নব্য রসায়নের জন্ম হইয়াছে ঊনবিংশ শতাব্দীতে। বসন্তের দক্ষিণ বায়ুর স্পর্শ যেমন সমস্ত প্রকৃতিকে সজীব করিয়া তোলে, ঊনবিংশ শতাব্দীর উষালোকের স্পর্শ তেম্‌নি সমগ্র সভ্যদেশকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছিল। বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সমাজতত্ত্ববিৎ, অর্থনীতিবিৎ

প্রভৃতি সকলেই দীর্ঘকালের জড়তা ত্যাগ করিয়া সত্যকে বুঝিবার জন্য লালায়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। রসায়নবিদ্‌গণ প্রাচীন পুঁথির পাতা উল্টাইয়া মৃত্তিকা, জল, বায়ু ও অগ্নি কি কারণে মূলপদার্থ হইয়া দাঁড়াইল, তাহার অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়া দিলেন। বীক্ষণাগারেও দেশবিদেশের পণ্ডিতগণ পরীক্ষা সুরু করিয়া দিলেন। অল্পদিনের মধ্যে স্থির হইয়া গেল, জল বায়ু অগ্নি বা মৃত্তিকার কোনোটিই মূল পদার্থ নয়, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি কয়েকটি বায়ব পদার্থ এবং কার্ব্বন, গন্ধক, তাম্র, লৌহ, স্বর্ণ, রৌপ্য, পারদ প্রভৃতি কয়েকটি তরল ও কঠিন পদার্থ সৃষ্টির মূল উপাদান। এইসকল মূল পদার্থের গুণ বিভিন্ন, আপেক্ষিক গুরুত্ব বিভিন্ন। আমরা চারিদিকে যে-সকল পদার্থ দেখিতে পাই, তাহারা হয় এইসকল মূল পদার্থ অথবা দুই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থের মিলনে সংগঠিত যৌগিক পদার্থ। গব্য ঘৃত দিয়া আতপ তণ্ডুলই ভক্ষণ করি বা মুরগীর ঠ্যাংই চুষি, ঐ কার্ব্বন হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন পেটের মধ্যে পুরি মাত্র।

কোনো-একটা মৌলিক পদার্থকে যদি ক্রমাগত ভাঙিতে থাকা যায়, তাহা হইলে তাহার আকার ক্রমশঃ ছোটো হইতে থাকে, কিন্তু তাহার গুণ অবিকৃত থাকে। তবে এই ভাঙারও একটা সীমা আছে। ভাঙিতে-ভাঙিতে উহা এমন-এক অবস্থায় পৌঁছায় যখন আর উহাকে ভাঙা চলে না।

বৈজ্ঞানিক উহার নাম দিলেন atom বা পরমাণু। মৌলিক পদার্থের এই পরমাণুকে চোখে দেখা যায় না বটে, কিন্তু অনেক ব্যাপারে ইহার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, এবং শুধু অস্তিত্ব নয়, উহার আকারেরও হুবহু মাপ-জোখও পাওয়া গিয়াছে। পৃথিবীর তুলনায় একটি ক্রিকেট বল যেরূপ, এক-ফোঁটা জলের কাছে একটি পরমাণুও আকারে সেইরূপ ছোটো।

এই পরমাণুবাদ অতিশয় প্রাচীন। কণাদ বলিয়াছেন পরমাণু-দ্বারা বিশ্ব গঠিত, তবে কণাদের মতে পরমাণু মাত্র চারি-প্রকার, কঠিন পরমাণু, তরল পরমাণু মারুত পরমাণু এবং তেজঃপরমাণু। কিন্তু তিনি এক কঠিন পদার্থের পরমাণুর কোনো বিভিন্নতা স্বীকার করেন নাই। বেকন, নিউটন প্রভৃতি অনেক মনীষীই পরমাণুবাদে বিশ্বাস করিতেন, কিন্তু ড্যাল্টন উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পরমাণুবাদকে বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপিত করেন। তাঁহার মতে পরমাণু অবিভাজ্য। কোনো মৌলিক পদার্থের পরমাণুসমূহ একইপ্রকারের, কিন্তু বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণুর প্রকৃতি ও গুরুত্ব বিভিন্ন। মৌলিক পদার্থের সংমিশ্রণে যখন যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয়, তখন সংযোগ পরমাণুর মধ্যেই হইয়া থাকে। এই কয়েকটি তথ্যের দ্বারা সমস্ত রাসায়নিক ক্রিয়া-মীমাংসিত হইল এবং এই তথ্যগুলিকেই ড্যাল্‌টনের পরমাণুবাদ বলে।

বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণুর গুরুত্ব সমান নয়। হাইড্রোজেন পরমাণু সর্ব্বাপেক্ষা লঘু। ইউরেনিয়াম ধাতুর পরমাণু সর্ব্বাপেক্ষা গুরু। হাইড্রোজেন পরমাণুর গুরুত্ব এক ধরিয়া রাসায়নিকেরা অন্যান্য মৌলিক পদার্থের আণবিক গুরুত্ব বাহির করিলেন। এদিকে রাসায়নিক বিদ্যার উন্নতির সঙ্গে-সঙ্গে নূতন নূতন মৌলিক পদার্থ আবিষ্কৃত হইতে লাগিল। বৈজ্ঞানিকেরা এই সকল মৌলিক পদার্থকে শ্রেণীবদ্ধ করিবার (classification) চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কতকগুলি মৌলিক পদার্থের মধ্যে ধাতুর গুণ পাওয়া গেল, কতকগুলির মধ্যে পাওয়া গেল না। এইরূপে মৌলিক পদার্থগুলিকে ধাতু এবং অধাতু (non-metals) এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হইল, কিন্তু আর্সেনিক প্রভৃতি কয়েকটি মৌলিককে উভয় শ্রেণীরই গুণ দেখা গেল, সুতরাং এইভাবে শ্রেণীবিভাগ বেশ সন্তোষজনক হইল না। মৌলিকসমূহের অন্যান্য গুণের (properties) উপর নির্ভর করিয়া শ্রেণীবিভাগ করিবার চেষ্টা হইতে লাগিল, কিন্তু দেখা গেল অবস্থা-অনুসারে অধিকাংশ মৌলিকের গুণের পরিবর্ত্তন ঘটে। অবশেষে স্থির হইল যে, পরমাণবিক গুরুত্বের যখন পরিবর্ত্তন হয় না, তখন পরমাণবিক গুরুত্বকে ভিত্তি করিয়া শ্রেণীবিভাগ করা বিজ্ঞান-সম্মত। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে নিউল্যাণ্ড্‌ দেখাইলেন যে, সঙ্গীতের স্বরলিপিতে যেমন প্রত্যেক সপ্তকের পর সুরের পুনরাবৃত্তি হইতে

থাকে মূল পদার্থগুলিকে পরমাণবিক গুরুত্ব-অনুসারে সাজাইয়া গেলে, সেইরূপ দেখা যায় যে, প্রথম সাতটি মৌলিকের পরবর্ত্তী মৌলিকসমূহে পূর্ব্বের গুণসমূহের পুনরাবির্ভাব হইতে থাকে। ইহাকে নিউল্যাণ্ডের অষ্টম মৌলিকের নিয়ম বলে (Newland's Law of Octaves)। মেণ্ডেলীফ্ নিউল্যাণ্ডের এই নিয়ম না জানিয়াও ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে এইপ্রকারেই অথচ ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নিয়ম বাহির করিয়া মৌলিক-সমূহের এক তালিকা প্রস্তুত করেন। এই তালিকাকে মেণ্ডেলীফের তালিকা (Mendeleef's Table) বলে। এই তালিকাই অজৈব রসায়নের মূল ভিত্তি। ইহা দ্বারা সমস্ত মৌলিক পদার্থকে সুশৃঙ্খলভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে ও ইহার সাহায্যে মৌলিক পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে ও হইতেছে।

পেট্রোলিয়ম্ বা কেরোসিন তৈলের প্রকৃতি ও ভূগর্ভে জন্মবৃত্তান্ত-সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া মেণ্ডেলীফ্ এক মতবাদ প্রচার করেন। এইপ্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ে। বাল্য-কালে কে যেন আমাদিগকে বলিয়াছিল যে, দেশের সমস্ত মৃত জন্তুর গলিত দেহ কলের ঘানিতে ফেলিয়া সাহেবেরা যে তৈল বাহির করেন, তাহাই কেরোসিনের রূপ পরিগ্রহ করিয়া বাজারে বিক্রীত হয়। কেরোসিন তৈলের এই জন্মবৃত্তান্ত বহু দিন ধরিয়া সত্য বলিয়া বিশ্বাস ছিল এবং এইজন্য কেরোসিন তৈল স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতাম না। অবশ্য এখন আর সে-বিশ্বাস নাই, কিন্তু কেরোসিনের উৎপত্তি-তত্ত্বের সহিত এই কুসংস্কারের অনেকটা সাদৃশ্য দেখা যায়। কলের ঘানিতে মৃতদেহ পেষণ করিয়া সাহেবেরা তেল বাহির করেন না, প্রকৃতিই ভূপ্রোথিত জীব-দেহের উপর চাপ দিয়া কোনো-প্রকারে তৈল উৎপাদন করেন, আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের উক্তির ইহাই সারমর্ম্ম।

বৈজ্ঞানিকের নিকট হীরক ও কয়লা একই জিনিষ। কয়লা বহুকাল ভূপ্রোথিত থাকিলে, পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ উত্তাপে ও উপরের মৃত্তিকার চাপে তাহার মলিনতা ঘুচিয়া যায়। ধরাকুক্ষির বৃহৎ কর্ম্মশালায় কি করিয়া কেবল চাপ ও তাপের সাহায্যে তুচ্ছ কৃষ্ণ-অঙ্গার বহু-মূল্য হীরকে পরিণত হয়, তাহা জানা ছিল না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একজন ফরাসি বৈজ্ঞানিক কয়লাকে ভূগর্ভের অবস্থায় ফেলিয়া হীরকে রূপান্তরিত করিয়াছেন।

অঙ্গার যেরূপ হীরকের মূল উপাদান, মার্শ্ গ্যাসও তজ্জাতীয় পদার্থসমূহ সেইরূপ পেট্রোলিয়ামের মূল উপাদান। অগভীর জলভূমিতে গাছপালা লতাপাতা পচিলে তাহা হইতে মার্শ্ গ্যাস নামক একপ্রকার সহজ-দাহ্য লঘু পদার্থ উত্থিত হইয়া বায়ুর সংস্পর্শে আসিয়া জ্বলিয়া উঠে। এই অগ্নিশিখাই আমাদের আলেয়া। অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকের মতে পেট্রোলিয়াম জৈব পদার্থ ও সুদূর অতীত যুগে নানা-প্রকার প্রাণী ও উদ্ভিদ্ ভূমি-কম্পের ফলে ভূগর্ভে চাপা পড়িয়া পচিয়া প্রথমে মার্শ্-গ্যাসের সৃষ্টি হইয়াছে ও পরে মার্শ্ গ্যাস উপরিস্থ মাটির চাপের প্রভাবে তৈল-জাতীয় পদার্থে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু মেণ্ডেলীফ্ ককেসাস্এর তৈলখনিসমূহ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পেট্রোলিয়ামের এই জৈবিক উৎপত্তিবাদ-সম্বন্ধে সন্দিহান হন এবং ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে অ্যাট্‌লান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করিয়া আমেরিকার যুক্তরাজ্যে উপস্থিত হন ও পেনিসিল্‌ভেনিয়া প্রদেশস্থ তৈলখনিসমূহ পর্য্যবেক্ষণ করেন। ফিরিয়া আসিয়া তিনি এক অজৈব মতবাদ প্রচার করেন। তাঁহার মতে ধরাকুক্ষিতে দিবানিশি যে আগুন জ্বলিতেছে, তাহাতে কয়লা ও লৌহ গলিয়া গিয়া রাসায়নিক সঙ্গমের ফলে কারবাইড (Iron Carbide) প্রস্তুত হইতেছে। পরে উহা জলীয় বাষ্পের সংস্পর্শে আসিলে বিকার প্রাপ্ত হয় ও মার্শ্ গ্যাস ও তজ্জাতীয় পদার্থ উৎপন্ন হয় এবং অবশেষে অত্যধিক চাপের প্রভাবে এই গ্যাসসমূহ তরল ও কঠিন তৈলজাতীয় পদার্থে পরিণত হয়। আধুনিক রাসায়নিকেরা জৈববাদেরই অধিক পক্ষপাতী; তবে এ-বিষয়ে আর সন্দেহ নাই যে, পেট্রোলিয়ামের কিয়দংশের উৎপত্তি মেণ্ডেলীফ্এর উক্ত প্রণালী-অনুসারে হইয়াছে।

কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে-সঙ্গে, অণু-পরমাণুর মৌলিকত্ব সম্বন্ধেও ধারণার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মেণ্ডেলীফের অনেক সিদ্ধান্ত নব্য রসায়নের উন্নতির সহিত পরিত্যক্ত হইতেছে। একই মূল পদার্থ হইতে যে সমগ্র জগতের উৎপত্তি হয়, ইহা অনেক প্রাচীন পণ্ডিত ও মেণ্ডেলীফের

সমসাময়িক বৈজ্ঞানিকেও বিশ্বাস করিতেন। খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে মিলেটুস নগরস্থ থালেস বিশ্বাস করিতেন যে, জলই একমাত্র মূল পদার্থ। ছান্দোগ্য-উপনিষদে সনৎকুমার নারদকে বলিতেছেন—জলই আদি পদার্থ, জল বিভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলে পৃথিবী, আকাশ, পর্ব্বত, কীট, পতঙ্গ, গোমহিষাদি মনুষ্য ও উদ্ভিদাদি উৎপন্ন হয়। অ্যানেক্সিমিনেস বায়ুকে, হেরাক্লাইটস্ অগ্নিকে ও ফেরেকাইডস্ মৃত্তিকাকে মূল পদার্থ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। প্রাচীন যুগের কথা ছাড়িয়া দিয়া আধুনিক কালে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রাউট বলিলেন যে, হাইড্রোজেনই সমস্ত মূল পদার্থের উপাদান। সমস্ত মূল পদার্থ বিভিন্ন সংখ্যায় হাইড্রোজেন-পরমাণুর সমষ্টি-মাত্র। কিন্তু এখন শুধু মত প্রচারের যুগ আর নাই, প্রকৃত পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান-যুগের আরম্ভ হইয়াছে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গেল, অধিকাংশ মৌলিক পদার্থের পরমাণবিক গুরুত্ব অভগ্নরাশি না হইয়া ভগ্নাংশ হইতেছে। কাজেই বৈজ্ঞানিকের নিকট প্রাউটের অনুমানের কোনো ভিত্তি থাকিল না। মেণ্ডেলীফ্ এই একমাত্র মূল পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকারের অতিশয় বিরোধী ছিলেন ও পুরাতন গ্রীক পণ্ডিতগণের উদ্দেশে ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছেন, ইঁহারা অনেকগুলি দেবতাকে বিশ্বাস করিয়া কি-প্রকারে এক মূল পদার্থে বিশ্বাস করেন, বুঝিতে পারি না। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর আয়ুঃশেষের সঙ্গে-সঙ্গে মেণ্ডেলীফের এই ধারণারও আয়ুঃশেষ হইয়াছে। ড্যাল্টনের পরমাণু এখন আর অবিভাজ্য নয়। সকল পরমাণুর শেষ বিকার হইতেছে ইলেক্ট্রন্ বা অতিপরমাণু।*

মৌলিক পদার্থের সব পরমাণু স্বভাবাপন্ন ও সমান গুরুত্বের, ড্যাল্টনের এই তথ্যটিও এখন চালিয়া সাজাইতে হইবে। এখন প্রমাণিত হইয়াছে যে, মৌলিকের পরমাণুর মধ্যে ভিন্নতা থাকিতে পারে, কিন্তু এতদিন ধরা পড়ে নাই, উপযুক্ত যন্ত্রের অভাবে। কোনো মৌলিক পদার্থকে লইয়া যখন তাহার পরমাণবিক গুরুত্ব নির্ণয় করি, তখন পদার্থের পরিমাণ যতই অল্প করি না, তাহার মধ্যে লক্ষ-লক্ষ পরমাণু থাকে। সুতরাং পরীক্ষা দ্বারা যে আণবিক গুরুত্ব পাওয়া যায়, তাহা গড়পড়তা ফলমাত্র। ক্লোরিনের আণবিক গুরুত্ব সাড়ে পঁয়ত্রিশ। ইহা হইতেই প্রমাণ হয় না যে প্রত্যেক পরমাণুর গুরুত্ব সাড়ে পঁয়ত্রিশ। কোনো পরমাণুর গুরুত্ব ৩৫, কাহারো ৩৬, কাহারো ৩৭ হইতে পারে। মুস্কিল হইতেছে এই যে, একটি অণুকে বাছিয়া লইয়া পরীক্ষা করিতে পারা যায় না, তাই ড্যাল্টনের সময় হইতে একথাটা কাহারও মনে হয় নাই যে, সমধর্ম্মা পরমাণুর গুরুত্ব এক নাও হইতে পারে। একদিন পরীক্ষায় কেবল কতকগুলি অণুর গড়পড়তা হিসাব পাওয়া যাইত। কিন্তু সম্প্রতি Mass Spectrograph বা আণবিক গুরুত্ব-বিশ্লেষক এমন-এক যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, তাহার সাহায্যে একই মৌলিক পদার্থের বিভিন্ন গুরুত্ব-যুক্ত অণুগুলি পৃথক্ হইয়া পড়ে। একটি ত্রিকোণ কাচ-ফলকের মধ্য দিয়া, আলোকের বিভিন্ন বর্ণ যেমন পৃথক্ হইয়া যায়, সেইরূপ এই যন্ত্রে বিভিন্ন-গুরুত্বের অণু পৃথক্-পৃথক্ পথে পরিচালিত হয়। পার্শ্বস্থিত তড়িৎ ও চুম্বকের বলে কে কতটা বাঁকিল দেখিয়া তাহাদের আপেক্ষিক গুরুত্বের নিরূপণ করা হইয়াছে। দেখা গিয়াছে যে, যে-ক্লোরিন-গ্যাসের অণুর গুরুত্ব সাড়ে পঁয়ত্রিশ বলিয়া জানা ছিল, উহা কতকগুলি বিভিন্ন-গুরুত্বের পরমাণুর সমষ্টিমাত্র। কোনো পরমাণুর গুরুত্ব ৩৫, কোনো পরমাণুর গুরুত্ব, ৩৭, বিভিন্ন-পরমাণুর গুরুত্বে ভগ্নাংশের নাম-গন্ধ নাই। পারদের আণবিক গুরুত্ব ২০০'০৬, কিন্তু এই যন্ত্র দ্বারা বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, পারদের মধ্যে ১৯৭, ১৯৮, ১৯৯, ২০০, ২০২, ২০৪, এই ছয়প্রকার গুরুত্বের পরমাণু আছে। এই যন্ত্রের সাহায্যে প্রমাণিত হইয়াছে যে, অনেক মৌলিক পদার্থের মধ্যে বিভিন্ন-গুরুত্বের পরমাণু আছে এবং যেখানেই দেখা গিয়াছে যে, সাধারণভাবে নির্দ্ধারিত পরমাণুর গুরুত্বে ভগ্নাংশ আছে, সেইখানেই এই ব্যাপার। অ্যান্টিমনি নামক ধাতুকে এইপ্রকারে বিশ্লেষণ করিয়া ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে অ্যাষ্টন নামক একজন ইংরেজ রাসায়নিক নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন। অতএব সব পদার্থই যে হাইড্রোজেনের সমষ্টি, এ-কথার বিপক্ষে

* ইলেক্ট্রনের আবিষ্কার সম্বন্ধে ১৩৩১ সালের মাঘের প্রবাসী 'নূতন ভূত' প্রবন্ধ দেখুন।

প্রাউটের সময় যে যুক্তি দেওয়া হইয়াছিল, তাহা এখন আর খাটে না।

এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে, অধিকাংশ তথাকথিত মৌলিকের পরমাণু যদি বিভিন্ন-গুরুত্বের হয়, এবং সকল মৌলিক ইলেক্‌ট্রনে রূপান্তরিত হয়, তবে তাহাদিগকে মৌলিক বলি কি করিয়া? মৌলিক পদার্থের সংজ্ঞাই বা কি হওয়া উচিত। কেহ-কেহ বলেন যে মেণ্ডেলীফের তালিকায় যাহাদের স্থান আছে, তাহারাই মৌলিক, কিন্তু এখন মেণ্ডেলীফের তালিকাকেই বা অভ্রান্ত বলি কি করিয়া। ইহার প্রধান ভিত্তি পরমাণবিক গুরুত্বেরই যে আর স্থিরতা নাই। সেজন্য নূতন করিয়া তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে। মেণ্ডেলীফের সমস্ত নিয়ম ঠিক আছে, কেবল আণবিক গুরুত্বের পরিবর্ত্তে আণবিক সংখ্যা (Atomic Number) হইয়াছে, তালিকার মূল ভিত্তি।

বৈজ্ঞানিক মোজ্‌লী ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে দেখাইয়াছেন যে, ক্যাথোড রশ্মি মৌলিক পদার্থকে ধাক্কা দিবার পর যে রণ্ট্‌গেন রশ্মি উৎপাদন করে, উহার তরঙ্গের দৈর্ঘ্য ও কম্পন-সংখ্যা মৌলিক পদার্থের প্রকৃতি-অনুসারে ভিন্ন হইয়া থাকে। এইরূপে উদ্ভূত রণ্ট্‌গেন রশ্মি বিশ্লেষণ-যন্ত্রের (Spectrograph) মধ্য দিয়া ফোটোগ্রাফের কাঁচের উপর পাতিত করা হয়। ফোটোগ্রাফের কাঁচটি ক্রমবিকশিত করিয়া উহার সাহায্যে উদ্ভূত রণ্ট্‌গেন রশ্মির কম্পন সংখ্যা (frequency) নির্ণয় করা হয়। কম্পন-সংখ্যা হইতে গণনার সাহায্যে দেখা যায় যে প্রত্যেক মৌলিকের সঙ্গে একটি বিশিষ্ট সংখ্যার একই-রূপ সম্বন্ধ আছে। এই বিশিষ্ট সংখ্যাটি আণবিক সংখ্যা নামে পরিচিত। মেণ্ডেলীফের তালিকার যা গলদ ছিল, এই আণবিক সংখ্যার সাহায্যে তাহা দূরীভূত হইয়াছে। আণবিক গুরুত্বের মধ্যে ভিন্নতা থাকিলেও প্রত্যেক মূল পদার্থের আণবিক সংখ্যা মাত্র একটি। গণনা দ্বারা ইহাও দেখা গিয়াছে যে, মৌলিকের সংখ্যা অগণনীয় বা অনির্দ্দিষ্ট নয়। মৌলিকের সংখ্যা বিরানব্বই, ইহার মধ্যে সাতাশীটি জ্ঞাত ও বাকী পাঁচটি অজ্ঞাত?

সম্রাট্ অক্‌বরের কবিতা

শ্রী অমৃতলাল শীল

অক্‌বর বাদশাকে অনেকে নিরক্ষর বলিয়া থাকেন; তাঁহারা ইহার দুইটি প্রমাণ দেখান, (১) আজ পর্য্যন্ত কোনো স্থানে অক্‌বরের হস্তাক্ষর পাওয়া যায় নাই, ও (২) তাঁহার পুত্র জহাঙ্গীর আপনার তুজ্‌কে তাঁহাকে উম্মী অর্থাৎ অশিক্ষিত বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বাল্যজীবনের যতটুকু ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহাতে তাঁহাকে অল্প শিক্ষিত বলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ নিরক্ষর বিবেচনা করা অন্যায় হয়। সেকালের সম্ভ্রান্ত মুসলমান-দের, বিশেষতঃ তৈমূরবংশীয়দের, হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ছিল, কিন্তু বোধ হয় অক্‌বরের হাতের লেখা বালকোচিত ছিল বলিয়া তিনি কোনো কাগজে নিজের নাম সই করিতেন না।

অক্‌বর যে-বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রতিষ্ঠাতা বা আদিপুরুষ তৈমূর বাল্যাবস্থায় মধ্য-এশিয়ার বিস্তৃত ঘাস-বনে নগরবাসীদের অশ্ব, অল্প অর্থের বিনিময়ে চরাইতেন। কালে, ঐ অশ্বের সাহায্যে তিনি সেনাপতি ও মহাপ্রতাপশালী দিগ্বিজয়ী সম্রাট্ হইয়াছিলেন। তিনি খঞ্জ ছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে লঙ্গ বা তৈমূর-লঙ্গ বলিত, ইংরেজিতে তাঁহার নাম Tamerlane হইয়া গিয়াছে। তিনি যদিও স্বয়ং নিরক্ষর ছিলেন, তথাপি তাঁহার রাজ-সভাতে বিদ্বানেরা যথেষ্ট সম্মান লাভ করিত, ও তিনি বহু বিদ্বান্ পালন করিতেন। তাঁহার সম্মুখে সভাতে তর্ক ও তাঁহার অকাতরে দানের নানা গল্প প্রচলিত আছে। তাঁহার বিস্তৃত সাম্রাজ্য তাঁহার

বংশধরেরা ভাগ করিয়া লইয়াছিল। তাঁহার বংশে নানা দেশে বহু বিদ্বান্ নরপতি রাজ্যশাসন করিয়াছেন, একজন রাজকুমার প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী * ও গ্রন্থকর্ত্তা ছিলেন।

তাঁহার অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ বাবর-বাদশা ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে দিল্লী ও আগরার সাম্রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। তাহার জীবনের ইতিহাস, উত্থান ও পতনের এক অদ্ভুত কাহিনী। তিনি বারো বৎসর বয়সে পিতৃহীন হইয়া ফরগনার সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন; তাহার পর কখনও তাঁহাকে সমরকন্দে তৈমূরের গৌরবান্বিত সিংহাসনে বসিয়া রাজ্যশাসন করিতে দেখি, আবার, কখনও একমুষ্টি অন্নের জন্য লালায়িত, আপনার পরিবারবর্গ ও নিকট আত্মীয়াদের † ওজবক শত্রুদের কবলে ফেলিয়া, কেবলমাত্র প্রাণ লইয়া দেশ-দেশান্তরে পলাতক দেখি। কিন্তু এত কষ্টের জীবন-যাপন সত্ত্বে ও তিনি পার্সী ও তুর্কী ভাষায় বিদ্বান ছিলেন, অল্প বিস্তর অরবীও জানিতেন। তাঁহার হাতের লেখা অতি সুন্দর ছিল। সেকালে, মুসলমান সম্ভ্রান্তবংশীয়েরা অবসর-কালে নানা ভঙ্গীর লেখা অভ্যাস করিতেন, অনেকে সুন্দর চিত্রের মতন লিখিতে পারিতেন। বাবর আপন জীবন-কাহিনী প্রাঞ্জল তুর্কি ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন। অকবরের আদেশে বেরমপুত্র আবদুল-রহীম খান-খানা ঐ পুস্তকখানি (১৫৮৯ খৃঃ) পার্সী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন, এখন নানা ভাষাতে অনূদিত হইয়াছে, ও Memoirs of Babar নামে প্রসিদ্ধ।

ইস্‌লাম-ধর্ম্ম-মতে, কোনো মনুষ্যের চিত্র-অঙ্কন নিষিদ্ধ, সেইজন্য পার্সী ও অরবী ভাষায় লেখক শিল্পীরা হাতের লেখাকে চিত্র-শিল্পের মতন সুন্দর শিল্পে পরিণত করিয়াছেন। পার্সী ও অরবী ভাষাতে নানা ভঙ্গীর সুন্দর চিত্রের মতন লিখন-প্রণালী প্রচলিত আছে। বাবর বাদশা একপ্রকার নূতন লিখন-প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা এখন "খত্ত-এ-বাবরী" নামে প্রসিদ্ধ। তিনি একখানি খাতাতে স্বরচিত অনেকগুলি কবিতা স্বহস্তে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, এখন সেই খাতাখানি রোহেলখণ্ডের রামপুরাধিপতি নবাবের পুস্তকাগারে সযত্নে রক্ষিত আছে, নবাবের অনুমতি হইলে সৌভাগ্যবান্ দর্শকের নয়নগোচর হওয়া সম্ভব।

বাবর-পুত্র হুমায়ুঁ একজন বিদ্বান্, সুলেখক, ও কবি ছিলেন; তাঁহার রচিত অনেকগুলি পার্সী কবিতা আছে। তিনি যখন ভারত-সিংহাসন হইতে তাড়িত হইয়া ইরানের শাহের শরণ লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তখন যদিও শাহ স্বয়ং হুমায়ুঁকে সাহায্য করিতে ইচ্ছুক ছিলেন, তথাপি শাহের আত্মীয় ও পার্ষদ মধ্যেই হুমায়ুঁর অনেকগুলি শত্রু জুটিয়া গিয়াছিল। শাহ ও ইরানীরা সিয়া ধর্ম্মাবলম্বী, ও হুমায়ুঁ তুরানীদের মতন সুন্নী ছিলেন; ইহা ছাড়া, ইরানী ও তুরানীরা চিরশত্রু। ‡ শাহের পরামর্শদাতারা ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বী তুরানী সুন্নীকে সাহায্য করিতে ঘোরতর আপত্তি করিলে, তিনি কর্ত্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া ইতস্তত করিতে লাগিলেন। এই সংবাদ পাইয়া হুমায়ুঁ তাঁহাকে স্বরচিত কবিতাতে এক বিনয়পূর্ণ পত্র লিখিয়াছিলেন। এই পত্র পাঠ করিয়া শাহ্ সকল সঙ্কোচ ত্যাগ ও

---

* অলগ মির্জার সারিনী astronomical tables প্রসিদ্ধ। ইঁহার পুস্তক দেখিয়া জয়পুরের মির্জা রাজা জয়সিংহ জয়পুর, মথুরা, দিল্লী, উজ্জয়িনী ও কাশীতে মানমন্দির প্রস্তুত করিয়া গবেষণা করিয়াছিলেন। ঐ মানমন্দিরের ভগ্নাবশেষ এখনও আছে।

† বাবর সমরকন্দ অধিকার করিবার অল্প পরে, স্তাবানি খাঁ ওজবক সমরকন্দ আক্রমণ করিলেন। বাবর প্রাণ লইয়া নগর-প্রাচীর হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া পলাইলেন; তাঁহার আত্মীয়ারা ওজবকের বন্দিনী হইল। ইঁহাদের মধ্যে বাবরের ভগ্নী খাঁজাদ বেগমও ছিলেন। স্তাবানী খাঁ তাঁহাকে বলপূর্ব্বক বিবাহ করিলেন, কিছুকাল পরে, ত্যাগ করিয়া সৈয়দ হাদী নামক এক ব্যক্তিকে দান করিলেন। দশ বৎসর পরে ইরাণের শাহ তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া বাবরের কাছে পাঠাইয়া দিলেন, তখন শোকে ও অত্যাচারে তাঁহার স্মরণশক্তি লোপ পাইয়াছিল, তিনি ভ্রাতাকে চিনিতে পারেন নাই। কয়েক মাসের চিকিৎসার পর তাঁহার পূর্ব্ব কথা মনে পড়িয়াছিল।

‡ পৌরাণিক কালে ইরানে ফরেদুঁ নামক সম্রাট্ ছিলেন। তিনি আপন তিন পুত্রকে সাম্রাজ্য ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ সেলেমকে আধুনিক তুর্কী ও পশ্চিম দেশ, দ্বিতীয় তুরকে সমরকন্দ ও মধ্য-এশিয়া Turkistan দিয়া আপনার প্রধান দেশ ও সিংহাসন কনিষ্ঠ এরজকে দিয়াছিলেন। সেলম ও তুর এরজকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজের সময় মারিয়া ফেলিয়াছিলেন। এরজের একমাত্র কন্যার পুত্র মেনুচেহর তখন শিশু। বড় হইলে মহাবীর মেনুচেহর আপনার মাতামহের হত্যাকারীদের মারিয়া শোধ লইলেন। তুরের দেশকে তুরান ও এরজের দেশকে ইরান বলে, সেই সময় হইতে ইরানী ও তুরানীরা উভয়ে শত্রু। ইস্‌লাম প্রচারিত হইবার পর তুরানীরা সুন্নী ও ইরানীরা সিয়া হইল; ইহা শত্রুতার গৌণ কারণ।

নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া প্রার্থনামতো দশ সহস্র কজলবাশ সেনা দিয়া কান্দার জয় করিতে সাহায্য করিলেন। হুমায়ুঁর এই কবিতা রাজাদের রচনা ও কেবল তোষামোদকারী সভাসদ্ দ্বারা প্রশংসিত নিম্ন শ্রেণীর কবিতা নহে, সাহিত্যে স্থান পাইবার উপযুক্ত।

অক্‌বর এমন পিতামহ ও পিতার সন্তান, কিন্তু তিনি তাঁহাদের মতন (কিম্বা পরবর্ত্তী সম্রাট্‌দের মতন) বিদ্বান্ ছিলেন না। ১৮৫৭ খৃঃ পর্য্যন্ত তাঁহার অনেকগুলি ভারত-বাসী মুকুটধারী ও মুকুটহীন বংশধর কবিতা-রচনার জন্য খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, ও আজকাল তাঁহার কয়েকটি বংশধর সাহিত্য-সেবা করিয়াই উদরপালন করিতেছেন।

ইতিহাসে যে অক্‌বরের চার বৎসর, চার মাস, চার দিন বয়সে বিস্‌মল্লা (পাঠারম্ভ) হইয়াছিল, ও মোল্লা অসামউদ্দীন তাঁহার শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিছু-কাল পরে হুমায়ুঁ পুত্রের পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া দেখিলেন, তাঁহার লেখাপড়া আশানুরূপ অগ্রসর হইতেছে না, তখন পূর্ব্ব শিক্ষকের স্থানে মোল্লা বায়জীদকে নিযুক্ত করিলেন, কিন্তু তাঁহার শিক্ষকতা নিষ্ফল হইল; তখন মৌলনা অব্‌দুল কাদির শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। কিছুকাল পরে হুমায়ুঁ দেখিলেন যে, কুমার পায়রা, ঘোড়া, উট ও শিকারী-কুকুর লইয়াই উন্মত্ত থাকেন, লেখাপড়াতে মনোযোগ দেন না, অথবা শিক্ষক তাঁহাকে মনোযোগী করিতে পারেন না। তখন তিনি প্রিয় বন্ধু বেরমের পরামর্শানুসারে মোল্লা পীর মহম্মদকে শিক্ষার ভার দিলেন। কিন্তু পীর-মহম্মদও কিছু করিতে পারিলেন না। যখন ইচ্ছা হইত তখন কুমার বই লইয়া পড়িতে বসিতেন, কিন্তু সেরূপ ইচ্ছা প্রত্যহ বা সচরাচর হইত না। যে কারণেই হউক শিক্ষকেরা পীড়ন করিতেন না বা করিতে সাহস করিতেন না; সম্ভবতঃ, ভবিষ্যতে কৃপা লাভের আশায় ইচ্ছা করিয়াই ঐরূপ প্রশ্রয় দিতেন। ইহার পর হুমায়ুঁ ভারত আক্রমণ করিলেন ও কিছুকাল অক্‌বর যুদ্ধ-বিগ্রহেই লিপ্ত ছিলেন, তখন লেখাপড়ার বড় অবসর পান নাই। ৯৬৩ হিজরীতে [১৫৫৬ খৃঃ] অক্‌বর রাজ্য লাভ করিয়া মীর অব্‌দুল লতিফের কাছে দীবান-ই-হাফিজ [হাফিজের কবিতাবলী] পড়িতে আরম্ভ করিলেন। তিনি হাফিজের কবিতা ভালো বাসিতেন, হাফিজের অনেক উক্তি ও কবিতা তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল, তিনি কথা কহিবার সময়ে অথবা তর্ক করিবার সময়ে প্রায়ই হাফিজের উক্তি প্রয়োগ করিতেন। এই হাফিজ পাঠ প্রমাণিত করে যে তিনি কিছু বিদ্যা নিশ্চয় অর্জ্জন করিয়াছিলেন, কেন না, হাফিজের কবিতা পড়িতে ও বুঝিতে বিদ্যার প্রয়োজন, উহা নিরক্ষরে পারে না।

ইহার বহুকাল পরে, যখন মোল্লারা ইচ্ছামত-ব্যবস্থান পত্র লিখিয়া ও তাহার ইচ্ছামতন অর্থ করিয়া অক্‌বরকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল, তখন অরবী ভাষায় লিখিত ব্যবস্থাপত্র স্বয়ং বুঝিয়া বিচার করিবার জন্য ৯৮৭ হিজরী [১৫৭৯ খৃঃ] অবুল ফজল ও ফৈজীর পিতা শেখ মোবারকের কাছে অরবী ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু রাজকার্য্যে সময়াভাব হইতে লাগিল ও সেই সময়ে [সেপ্টেম্বর ১৫৭৯] মোবারকের লিখিত এক ব্যবস্থাপত্রের বলে উপরোক্ত মোল্লাদের বিষদন্ত ভগ্ন হইয়া গেল, অতএব অরবী বিদ্যা অর্জ্জন করিবার আর প্রয়োজন রহিল না, অতএব পাঠ বন্ধ হইল। এইসকল ঐতিহাসিক সত্য সংবাদের পর তাঁহাকে নিরক্ষর বলা অন্যায় হইবে।

কিন্তু তিনি নিরক্ষর না হইলে তাঁহার পুত্র তাঁহাকে "উম্মী" বলিলেন কেন? এ-প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, কোনো বিদ্বান্ বংশের একজন অল্প শিক্ষিত ব্যক্তিকে সেই বংশের অন্য বিদ্বানেরা অল্প শিক্ষিত না বলিয়া "মূর্খ"ই বলিয়া থাকে, ইহা চিরকালের প্রথা ও সংসারে [সকল দেশে] ইহার ভূরি-ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। জহাঙ্গীরও সেই কারণে পিতাকে উম্মী বলিয়াছেন তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। ঐতিহাসিক বদাউনীর উক্তি দ্বারাও অক্‌বরকে নিরক্ষর বলিয়া বোধ হয় না। অক্‌বর যখন অনুবাদকমণ্ডলীকে কোনো পুস্তক অনুবাদ করিতে দিতেন, তখন নিয়ম করিয়াছিলেন যে, কতক অংশ অনুবাদ করিয়া তাঁহাকে শোনাইতে হইত; তিনি ঐ অংশ শুনিয়া লিখন-ভঙ্গী (style) ও ভাষা অনুমোদন করিলে তবে অন্য অংশ সেই ভঙ্গী ও ভাষাতে অনুবাদ

করা হইত। লেখার ভঙ্গী ও ভাষা অনুমোদন করিতে বিদ্যার প্রয়োজন, নিরক্ষরেরা কখনই পারে না। বদাউনী (৯৯০ হিঃ) মহাভারতের অনুবাদ বর্ণনা-সময়ে লিখিয়াছেন ঃ "সম্রাট্ কয়েক রাত্রি নকীব খাঁকে মহাভারতের ভাবগুলি স্বয়ং বুঝাইয়া দিতেন, নকীব সেইরূপ পার্সী অক্ষরে লিখিয়া লইতেন।" একজন বিদ্বান্ অনুবাদককে মহাভারতের মতন পুস্তকের ভাবার্থ এরূপে বুঝাইয়া দেওয়া নিরক্ষরের কর্ম্ম হইতে পারে না।

সেকালের কোনো-কোনো কবিতা-সংগ্রহে পাঁচটি পার্সী ও পাঁচটি হিন্দী কবিতা অকবরের রচিত বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ-কেহ সন্দেহ করেন, যে ঐ কবিতাগুলি অন্য কোনো কবির রচিত, অকবরের নামে প্রচলিত মাত্র; কিন্তু এরূপ সন্দেহ করিবার কোনও বিশ্বসনীয় কারণ নাই। সেকালে পার্সী, অরবী, হিন্দী ও সংস্কৃত ভাষার কবির অভাব ছিল না, অবুলফজল, ফৈজী ও (ইরানবাসী, কিছুকাল আগরা-প্রবাসী) উর্ফীর মতন উচ্চ দরের কবি অকবরের রাজসভা অলঙ্কৃত করিতেন, ইহা ছাড়া বদাউনী অনেকগুলি কবির তালিকা দিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই অকবরের অনুগ্রহপ্রার্থী ছিলেন; অকবরেরও অর্থের অভাব ছিল না। তাঁহার কবিরূপে প্রসিদ্ধ হইবার ইচ্ছা থাকিলে, আজ তাঁহার নামের ভণিতাযুক্ত বহু উৎকৃষ্টতম কবিতা পাওয়া যাইত, কেবল ঐ কয়েকটি নিম্নশ্রেণীর কবিতা তাঁহার কবিতামালার অঙ্গ পুষ্ট করিয়া রাখিত না।

একবার [৯৯৭ হিঃ ১৫৮৯ খৃঃ] অকবর বেগমদের সঙ্গে লইয়া ভূস্বর্গ কাশ্মীরে বেড়াইতে গিয়াছিলেন, সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া অবুল ফজলকে বলিলেন, আমার মাতা মরিয়ম-মকানী [হামীদা বানু বেগম] এখানে থাকিলে, তিনিও এই দৃশ্য দেখিয়া আনন্দিতা হইতেন; অতএব, তাঁহাকে একখানি আর্জদাশ্ত [বিনয় পত্র] লিখিয়া দাও, যদি কষ্ট করিয়া একবার আসেন, তবে সৌভাগ্য বিবেচনা করিব। যখন ফজল ঐ পত্র লিখিতেছিলেন, তখন অকবর মনে-মনে একটি কবিতা রচনা করিয়া বলিলেন, ঐ পত্রে এই কবিতাটিও লিখিয়া দাও।

হাজী ব-সূয়ে কাবা রওয়ন্দ, অজ বরায় হজ।
য়া রব্! বুওয়দ, কি কাবা বি-আয়দ ব-সূয়ে মা॥

হাজী [তীর্থযাত্রী]-রা কাবাতে [মক্কার প্রধান উপাসনালয়ে] হজ [তীর্থ] করিতে গিয়া থাকে। হে ঈশ্বর! এমন হউক, যে (আমার) কাবা [কাবার মতন পূজনীয়া ব্যক্তি অর্থাৎ মাতা] আমার দিকে আসেন।

অর্থাৎ যাত্রীরা তীর্থ করিতে পবিত্র তীর্থস্থানে ত গিয়াই থাকে, হে ঈশ্বর! আমার পূজনীয়া তীর্থস্বরূপা মাতাকে আমার কাছে আনিয়া দাও।

অকবর তাঁহার প্রিয় পার্ষদ, রাজা বীরবরের মৃত্যু-সংবাদ [১৫৮৬, ফেব্রুয়ারী] পাইয়া, রাজ-সভাতে বসিয়া মুখে-মুখে রচনা করিয়া বলিয়াছিলেন :—

দীন জানি সব দীহ্ন, এক দুরায়ো দুঃসহ দুঃখ।
সে-দুঃখ হম কঁহ দীহ্ন, কছু ন রাখ্যো বীরবর॥

দীন দুঃখী জানিয়া তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব দান করিয়াছেন, একমাত্র দুঃসহ দুঃখ কাহাকে কখনো দেন নাই; সো দুঃখ এখন আমাকে দিয়া গেলেন, নিজের জন্য বীরবর কিছুই রাখিলেন না।

অকবর শাহ্ বলিতেছেন :—

গিরিয়া কর্দম্ জে গমৎ, মুজবে খুশ্-হালী শুদ্।
রেখ্তম্ খুনে দিল্ অজ্ দীদা, দিলম্ খালী শুদ্॥

তোমার জন্য শোক করিয়া ক্রন্দন করিলাম, তাহাতে আমার উপকার হইল। আমি চক্ষু হইতে অশ্রুরূপ রক্তপাত করিলাম, তাহাতে আমার হৃদয় (শোক)-শূন্য হইল।

মি নাজ্ কি দিল্ খুঁ শুদা? অজ্ দূরি-ও।
মন্ ইয়ারে-গমম্, অজ্ দস্তে মহ্জুরি-ও॥
দর্ আঈনা-এ-চর্খ ন কওস-কজাহ অস্ত।
অক্‌স্ অস্ত হুমায়ুঁ শুদ্ অজ্ জওরি-ও॥

[রে মন] তুই কি গর্ব্ব করিস্, যে তাহার [প্রিয়ার] বিরহে তোর হৃদয় রক্তপূর্ণ [দুঃখিত] হইয়াছে? আমি তাহার বিরহে শোকের সহচর হইয়া রহিয়াছি। আকাশরূপ

সরবৎ

শ্রী শ্রীমতী দেবী

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

দর্পণে যাহা দেখিতেছিস, তাহা ইন্দ্রধনু নহে, তাহার অত্যাচারে পীড়িত হইয়া আমার (রক্তাক্ত) হৃদয়ের প্রতিবিম্ব ঐরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

দোশবীনা বকূয়ে ম্যা ফরোর্শাঁ। প্যামানা-এ-ম্যা
বজর্ খরীদম॥
অকন্ জে খুমার্ সর্‌গরানম্। জর্ দাদম্, ওর্দর্দ
সর্ খরীদম্॥

গত রাত্রে মদ্য-বিক্রেতাদের পল্লীতে ধন দিয়া একপাত্র মদ্য ক্রয় করিলাম। এখন খোঁয়ারিতে মাথা ভার হইয়াছে। [হায়] অর্থ ব্যয় করিলাম, ও (তাহার পরিবর্তে) মাথা-ব্যথা ক্রয় করিলাম।

মন্ বঙ্গ্ নমী-খুরম্, ম্যা আরেদ্ (মে-আরেদ)
মন্ চঙ্গ্ নমী-জনম্, ন্যা আরেদ্ (নে-আরেদ)॥

আমি ভাঙ্ খাই না, মদ্য আনো। আমি চঙ্ বাজাই না, বাঁশি আনো। অথবা আমি ভাঙ্ খাই না, আনিও না। আমি চঙ্ বাজাই না, আনিও না॥

এ-কবিতাতে "ম্যা আরেদ" দুইটি ভিন্ন শব্দ রূপে উচ্চারণ করিলে অর্থ হয় :—

ম্যা—মদ্য; আরেদ—আনো। কিন্তু দুইটি জড়াইয়া উচ্চারণ করিলে, ম—না negative prefix আরেদ—আনো। আনিও না। সেইরূপে ন্যা—বাঁশি, ও জড়াইয়া উচ্চারণ করিলে ন—না, ইহা একটি হেঁয়ালি মাত্র।

জা কো জস্ হ্যা জগৎ মে, জগৎ সরা হ্যা জাহি,
তা কো জীবন সফল্ হ্যা, কহৎ অক্‌ব্বর সাহি

যাহার জগতে যশ আছে, ও যে জগৎকে অনিত্য বাসস্থান (সরাই) বিবেচনা করে, অক্‌বর শাহ বলিতেছেন, তাহার জীবনই সার্থক।

সাহ অক্‌ব্বর এক সময় চলে কাহ্ন-বিনোদ বিলোকন্
বালহি।
আহট ত্যা অবলা নিরখ্যো চকি চওঁক চলি করি
আতুর চাল হি॥
তোঁ বলি বেনী সুধার ধরি, সুভই ছবি য়ো ললনা
অরু লাল হি।
চম্পক চারু কমান চঢ়াবৎ কাম জ্যো হাথ লিয়ে
আহি বাল হি॥

শ্রীকৃষ্ণ যেরূপে লুকাইয়া সুন্দরীদের পশ্চাদ্গমন করিয়া দেখিতেন, সেইরূপে অক্‌বর শাহ একবার সুন্দরী দেখিতে চলিলেন। তাঁহার পদশব্দ পাইয়া, অবলা চকিত হইয়া, দ্রুত-গতিতে চলিতে লাগিল। তখন বেণী দুলিতে লাগিল, তখন কেমন দেখিতে হইল, যেন স্বয়ং কাম চম্পক-ধনুতে সর্পের মতন বেণীর গুণ দিতেছিল।

শাহ অক্‌ব্বর বাল কী বাঁহ অচিন্ত গহী চল ভিতর
ভৌনে।
সুন্দরী দ্বার হী দৃষ্টি লগায় কে ভাগিবে কো ভ্রম
পাবত গৌনে॥
চওঁকৎসী সব ওর বিলোকৎ শঙ্ক, সঙ্কোচ রহি মুখ
মৌনে।
য়োঁ ছবি নয়ন ছবীলে কে, ছাজৎ মানো বিছোহ
পরে মৃগ-ছৌনে॥

অক্‌বর শাহ ঘরে ঢুকিয়া হঠাৎ বালার হাত ধরিয়া ফেলিলেন। সুন্দরী দ্বারের দিকে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া পলাইবার পথ দেখিতে লাগিল, কিন্তু সুবিধা পাইল না। চকিত হইয়া বালা চারিদিকে দেখিতে পাইল, তখন সঙ্কুচিত হইয়া মৌনী হইয়া রহিল। তখন ছবিখানি কেমন দেখিতে হইল, যেন মাতৃহারা মৃগশাবক চাহিয়া রহিয়াছে। ভৌনে—ভবনে। গৌ—সুবিধা। মৌনে—মৌনী। বিছোহ—বিচ্ছেদ; ছৌনে—ছানা।

সমাজ

শ্রী সজনীকান্ত দাস

হে সমাজ, হে চির-স্থবির
স্থাণু হ'য়ে ব'সে আছ এক ঠাঁই লোল-চর্ম্ম দেহে
ধূলি-বালি-সমাকীর্ণ, গণ্ডীবদ্ধ, কালজীর্ণ গেহে
অতীতের স্মৃতিভারে দীর্ঘশ্বাস ফেলিছ গভীর!
ছিন্নবাসে
যৌবনের উন্মাদ বাতাসে
শীতার্ত্ত ও-অঙ্গ তব মুহুর্মুহু উঠিছে কাঁপিয়া;
থাকিয়া-থাকিয়া
বার্দ্ধক্য-শিথিল শীর্ণ হস্তে মুষ্টি বাঁধি'
অতি ক্রোধে ফেলিতেছ কাঁদি',
পক্ক কেশ বিরল মস্তক নাড়িয়া সঘনে
দন্তহীন বদন-বিবরে জিহ্বা-কণ্ডূয়নে
করিতেছ কদর্য্য ভ্রূকুটি;
কভু খুলি' মুঠি
অক্ষম নিষ্ফল হাহাকারে
অভিশাপ হানিতেছ বন্ধহারা যৌবনের দ্বারে।
সহস্র শৈবাল দামে বাঁধি' আপনায়,
তন্ত্রে মন্ত্রে সংহিতায়
আচার্য্যের বাণী কিম্বা ব্রাহ্মণের পবিত্র শিখায়,—
স্রোতোমুখে ছোটে যারা,
উল্লসিত যারা হেরি' মুক্ত জলধারা,
প্রসারিয়া আপনার শীর্ণ বাহুপাশ,
প্রচারিয়া অতীতের পর্য্যুষিত মৃত শাস্ত্র-ভাষ,
চাহ রাখিবারে
শৃঙ্খলিত করি' তব আচারে-বিচারে!
অশুভের শত পথ অশুচির নিত্য আক্রমণ
শাস্ত্র-মন্ত্রে করিবারে চাহ নিবারণ
সৃজন করিয়া নিত্য সহস্র বন্ধন
যত ছিল মুক্তি দ্বার
সকলি করেছে বন্ধ অন্ধ-করা অর্গল দুর্ব্বার;
শুচিরে অশুচি করি' জীবনেরে করি' প্রাণহীন
রুদ্ধ করি' নির্গমন-পথ প্রতিদিন
মৃত ও অশুচি যত হ'য়ে উঠে পর্ব্বত-প্রমাণ,
বদ্ধপথে মুক্তবায়ু নবপ্রাণ নবীন কল্যাণ
নাহি আনে,
তুমি রহ শঙ্কিত পরাণে
পাসরিয়া বাহিরের উন্মুক্ত বাতাস
জীবনের নিশ্বাস-প্রশ্বাস
ক্ষুদ্র হ'তে ক্ষুদ্রতর অসংখ্য গণ্ডীর রেখা টানি'
নিত্য খ'সে-খ'সে-পড়া শুষ্ক তব শীর্ণ দেহখানি
সযতনে করিছ লালন,
রৌদ্র হ'তে বায়ু হ'তে জীবনের নিত্য উদ্বোধন
সযত্নে নিবারি';
হায় বৃদ্ধ, জীর্ণচীরধারী
গতিহীন হে মুমূর্ষু, নাহি সাথী নাহি মুক্তিপথ
কোথা বর্ত্তমান তব অনিশ্চিত দূর ভবিষ্যৎ।
অতি-অতীতের সাথে আপনারে রেখেছ জড়ায়ে,
সহস্র গণ্ডীর বাধা সংশয়ের বিচারে গড়ায়ে।
হে অক্ষম হে শীর্ণ স্থবির,
হে চির-কোপন বৃদ্ধ, মিথ্যা তব আক্ষেপ গভীর,
জীবিতে মৃতের সাথে দিতে চাও জীবন্ত সমাধি
মিথ্যা মৃত শাস্ত্র-ফাঁদ ফাঁদি'
এ তোমার নিষ্ফল সাধন!
তা'র চেয়ে টেনে ফে'লে জীর্ণবাস ভেঙে ফে'লে সকল বাঁধন
নবীন প্রাণের হাতে তোমার পতাকা দাও আনি'
শুনিও না সংশয়ের শুষ্ক কানাকানি,—
উন্মত্ত প্রাণের বেগে উল্লাসে ছুটিয়া চলো আজ
স্রোতোমুখে ভেসে যাক সংশয়-বিচার
প্রাচীনে-নবীনে আজি হোক্ একাকার
পরি' প্রাণ-সাজ;
বার্দ্ধক্য-খোলস ত্যজি' নব জন্ম লহ হে সমাজ!

প্রাচীন ভারতে ধর্ম্মের বিকাশ

শ্রী অমূল্যচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সাংখ্য ও যোগ শাস্ত্রের পরই সত্যধর্ম্ম ভারতে প্রচারিত হয়। এই ধর্ম্মমতে "যোগ-সাধনায় কোনো ফল নাই। পরোপকার, দান, সত্যবাক্য প্রভৃতিই প্রকৃত ধর্ম্ম।" মহাভারত বনপর্ব্বে একটি উপাখ্যান আছে। তাহাতে এই ধর্ম্মের সার-মর্ম্ম অবগত হওয়া যায়। উপাখ্যানটি এই ;—কৌশিক নামে এক ব্রাহ্মণ যোগ-সাধনা করিয়া সিদ্ধ হইলেন। একটি বক তাঁহার গাত্রে পুরীষ পরিত্যাগ করায় তিনি সক্রোধে ঐ বকের প্রতি দৃষ্টি করিবামাত্র বক পঞ্চত্ব পাইল। তখন কৌশিক তথা হইতে অন্যত্র গমন করিয়া ভিক্ষার্থে এক গৃহস্থের আবাসে প্রবেশ করিলেন। তথায় এক পতিব্রতা কামিনী স্বামীর সেবা করিতেছিলেন, তিনি অতিথিকে ভিক্ষা দিতে গমন করিলেন। কিন্তু তাঁহার কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইয়াছিল। সেইজন্য ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে শাপ দিতে উদ্যত হইলেন। তখন সেই স্ত্রীলোক ব্রাহ্মণকে বলিলেন "আমি বলাকা নহি যে শাপে ভস্ম করিবে। আমি পতিব্রতা রমণী।" অনন্তর তিনি ব্রাহ্মণকে অনেক উপদেশ দিলেন। তিনি কহিলেন "হে বিপ্রেন্দ্র। ক্রোধ মনুষ্যগণের পরম শত্রু। যিনি ক্রোধ মোহ পরিত্যাগ করেন, সতত সত্যবাক্য কহেন ও গুরুজনকে সন্তুষ্ট করেন, যিনি হিংসিত হইয়াও হিংসা করেন না, সতত শুচি, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মপরায়ণ, ও স্বাধ্যায়-নিরত হইয়া থাকেন এবং কাম, ক্রোধ প্রভৃতি রিপুবর্গকে বশীভূত করেন, যিনি সমুদয় লোককে আত্মবৎ বিবেচনা করেন.........দেবগণ তাঁহাকেই যথার্থ ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন।". বন—২০৫।

নৈতিক ধর্ম্ম ও শিষ্টাচারের নিকট যোগ যে কিছুই নহে, তাহা দেখানোই উক্ত উপাখ্যানের উদ্দেশ্য। ভারতে যখন যে-ধর্ম্ম উদ্ভূত হইয়াছে সে ধর্ম্ম তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্ম অপেক্ষা নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছে। বেদের জ্ঞানকাণ্ড কর্ম্মকাণ্ডকে মিথ্যা ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়াছে, সাংখ্য সমুদয় বেদকেই অস্বীকার করিয়াছে, যোগও নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছে, ইহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। এখন দেখিতেছি নৈতিক ধর্ম্ম যোগ-অপেক্ষা নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিল। ইহা হইতেই এই ধর্ম্ম বিবর্ত্তনের মধ্যে কোন্ স্তরটির পর কোন্ স্তর গঠিত হইয়াছিল তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

উক্ত পতিব্রতা নারী কৌশিককে ধর্ম্মশিক্ষার নিমিত্ত মিথিলায় এক ব্যাধের নিকট পাঠাইলেন। ব্যাধ তাঁহাকে শিষ্টাচার ধর্ম্ম শিক্ষা দিলেন। ব্যাধ কহিলেন "বেদোক্ত পরম ধর্ম্ম, ধর্ম্ম শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম, ও শিষ্টাচার এই তিনটি শিষ্টদিগের ধর্ম্ম। যাঁহাদিগের বিদ্যায় পারদর্শিতা, তীর্থে অবগাহন, ক্ষমা, সত্য, সরলতা, সদাচার দর্শন, সর্ব্বভূতে দয়া, অহিংসা, অপারুষ্য, দ্বিজগণে প্রীতি, শুভাশুভ কর্ম্মের পরিণাম দর্শন থাকে, যাঁহারা ন্যায়ানুগত গুণবান্, সর্ব্বলোকহিতৈষী, শত্রুযোগসম্পন্ন, স্বর্গজিৎ, সৎপথাবলম্বী, দাতা, দীনানুগ্রহকারী, সকলের পূজনীয়, শাস্ত্রসম্পন্ন, তপস্বী ও সর্ব্বভূতে দয়াবান্ তাহারাই শিষ্ট-সম্মত শিষ্ট।" বন ২০৬।

এই শিষ্টাচার ধর্ম্ম যে 'বেদোক্ত ধর্ম্ম' ও 'ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম' অর্থাৎ মনুসংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম হইতে পৃথক্ তাহা উক্ত বাক্য হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে। তবে ইহা কোন্ ধর্ম্ম? আমরা ইহাকে বৌদ্ধ বা জৈন ধর্ম্ম বলিয়া অনুমান করি। উক্ত ধর্ম্মদ্বয়ের মূল নীতিগুলি ইহাতে আছে। উক্ত ধর্ম্মদ্বয় বোধ হয় প্রথম-প্রথম 'সত্যধর্ম্ম' বা 'শিষ্টাচার ধর্ম্ম' নামে প্রচারিত হইয়াছিল।

বৌদ্ধধর্ম্মের আর-একটু নমুনা দেখুন। যুধিষ্ঠির কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর রাজ্য করিতে নারাজ হইলেন। তিনি তখন ভ্রাতৃগণকে বলিতেছেন "এই নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর সংসার জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ও বেদনায় নিতান্ত সমাকীর্ণ রহিয়াছে। যে-ব্যক্তি ইহা পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ সুখলাভে সমর্থ হন।" শান্তি ৯। পৃথিবী দুঃখময়, (জরা, মৃত্যু, ব্যাধি প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ), এই দুঃখের কারণ আছে ও এই দুঃখের নিবৃত্তি আছে, এই যে তিনটি সত্য ইহা বুদ্ধদেব সাত বৎসর তপস্যার পর আবিষ্কার করেন। ইহা বৌদ্ধ-ধর্ম্মের ভিত্তি। মহাভারতকারগণ বৌদ্ধ বা জৈনধর্ম্মের মূল সত্যগুলি মহাভারতের নানা স্থানে কোথাও উপাখ্যানচ্ছলে, কোথাও উপদেশচ্ছলে প্রসিদ্ধ-প্রসিদ্ধ ব্যক্তির মুখ দিয়া বলাইয়াছেন, কিন্তু কোথাও বুদ্ধদেবের নাম নাই। একস্থানে 'বৌদ্ধ' এই শব্দটির উল্লেখ আছে। নিম্নে সেই স্থানটি উদ্ধৃত হইল। মহারাজ দুষ্মন্ত যখন কণ্ব মুনির আশ্রমে গমন করিলেন তখন তিনি তথায় দেখিলেন "কোথাও শব্দ-সংস্কারসম্পন্ন দ্বিজগণ বেদগান দ্বারা সেই ব্রহ্মলোক সদৃশ আশ্রমকে নিনাদিত করিতেছেন, কোনো স্থলে যজ্ঞানুষ্ঠানুক্রম, পুরাণ, ন্যায়, তত্ত্ব, আত্মবিবেক, শব্দশাস্ত্র, ছন্দ, নিরুক্ত ও বেদ বেদাঙ্গ প্রভৃতি নানা শাস্ত্রে পারদর্শী বিশেষ কার্য্যজ্ঞ, মোক্ষধর্ম্ম-পরায়ণ, উহাপোহ সিদ্ধান্তকুশল, দ্রব্যকর্ম্মের গুণজ্ঞ, কার্য্যকারণবেত্তা, পক্ষী ও বানর প্রভৃতি জীবজন্তুর বাক্যার্থবেত্তা মহর্ষিগণ নানা শাস্ত্রের বিচার করিতেছেন এবং বৌদ্ধমতাবলম্বী লোকেরা নিজ ধর্ম্মের আলোচনা করিতেছেন।" আদি ৭০।

মহাভারতের আর-একস্থলে (শান্তি ৩০৯) 'বুদ্ধ' শব্দের উল্লেখ আছে। তথায় 'বুদ্ধ' পরমাত্মা অর্থে ও অবুদ্ধ জীবাত্মা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। বৌদ্ধগণ জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা একজন আদিবুদ্ধের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন। এস্থলেও 'বুদ্ধ' শব্দে পরমাত্মা ধরা হইয়াছে। সে-কারণ ইহা বৌদ্ধধর্ম্ম বলিয়াই বোধ হয়। বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারের পর যে মহাভারতের অনেক অংশ রচিত হইয়াছিল পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশগুলিই তাহার প্রমাণ। সেইজন্যই সত্যধর্ম্ম ও শিষ্টাচার-ধর্ম্মকে আমরা বৌদ্ধধর্ম্ম বলিতে সাহসী হইয়াছি। আরো দেখুন, মিথিলায় ব্যাধ ব্রাহ্মণকে ধর্ম্ম-উপদেশ দিলেন। ইহা একটি আশ্চর্য্য ঘটনা নয় কি? এতদিন ব্রাহ্মণগণই অন্য জাতিকে ধর্ম্ম-উপদেশ প্রদান করিতেন। তাঁহাদিগকে আবার কে উপদেশ দিবে? যাহাদিগকে ম্লেচ্ছ ও অস্পৃশ্য বলিয়া ব্রাহ্মণগণ সদা-সর্ব্বদা দূরে রাখিতেন, যাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া তাঁহারা পাপ মনে করিতেন, সেই নীচ, পতিত ও অধম জাতি এই যুগে শিক্ষিত হইয়াছে ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি ব্রাহ্মণকে ধর্ম্মশিক্ষা দিতেছে। সমাজটি এই সময় ঠিক উল্টাইয়া যায় নাই কি? পতিত অধম জাতির এই উন্নতি ভারতে কোন্ যুগে হইয়াছিল? ব্রাহ্মণ-শূদ্র কোন্ যুগে সমভাবে ধর্ম্মাধিকারী হইয়াছিল? ইহাই বৌদ্ধযুগ। ব্যাধ ব্রাহ্মণকে যে উপদেশ দিলেন তাহা বুদ্ধদেবেরই অমৃতময়ী বাণী। ব্যাধ কি বলিতেছেন শুনুন ;— "মনুষ্য জন্ম, মৃত্যু ও জরাজনিত দুঃখ পরম্পরা-প্রভাবে নিরন্তর সন্তপ্ত

হয় ও আত্মকৃত পাপে ক্রমাগত নিরয়গামী হয়। তাহারা কাল-গ্রাসে নিপতিত হইয়া আত্মকৃত সমস্ত অশুভকর্ম দ্বারা একান্ত দুঃখিত হয় এবং সেই দুঃখ ভোগ করিবার নিমিত্ত অশুভ জন্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকে।" বন ২০৮। এস্থলে ঈশ্বর বা স্বর্গের কোনোরূপ কল্পনা নাই। মনুষ্য কর্ম-ফলে জন্ম গ্রহণ করে ও পুনঃপুনঃ পৃথিবীতে জন্ম, জরা, মৃত্যুদ্বারা জীবগণ সন্তপ্ত হয়। ইহা বৌদ্ধ মত।

অন্তস্থলে তিনি বলিতেছেন "মনুষ্যের রাগ দোষজনিত অধর্ম ত্রিবিধ; পাপচিন্তা, পাপকথন ও পাপাচরণ।" "যে-ব্যক্তি সমুদয় দোষ সবিশেষ পর্য্যালোচনাকরতঃ কি সুখ, কি দুঃখ সকল অবস্থাতেই সাধু ব্যবহার করে, তাহার বুদ্ধি ধর্মে সাতিশয় অনুরক্ত হয়।" বন ২০৯। ইহাও বৌদ্ধ মত।

ধর্মব্যাধ ব্রাহ্মণকে অনেক উপদেশ দিলেন। তাহার মধ্যে ব্রাহ্মণ-দিগের ব্রহ্মবিদ্যাও কীর্তন করিলেন। তাঁহার কীর্তিত ধর্ম-মতের সহিত ব্রাহ্মণদিগের ধর্মমত স্থানে-স্থানে মিশিয়া গিয়াছে বা পরবর্ত্তীযুগে ঐ রচনাগুলি ক্রমশঃ ইহাতে প্রবিষ্ট হইয়াছে। ব্যাধোক্ত ধর্ম যে পৃথক একটি ধর্ম সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। কৌশিক কহিতেছেন "হে সত্তম! তুমি যে সত্যধর্মের কীর্তন করিতেছ ইহার বক্তা অন্য আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না।" ২০৯। ব্যাধের ধর্ম যে সম্পূর্ণ নূতন ধর্ম তাহা ব্রাহ্মণের এই উক্তিতেই প্রমাণিত হয়। ব্রাহ্মণ ইহাকে সত্য ধর্ম বলিতেছেন। ব্যাধ ইহাকে শিষ্টাচার ধর্ম বলিয়াছেন। তবে একটি কথা হইতেছে এই যে, ব্যাধ অহিংসা ধর্মের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া নিজে পশুবধ করিতেন কিরূপে? ইহার তিনি একটি কৈফিয়ৎও দিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে ঐরূপ নিষ্ঠুর কার্য্য তাঁহাকে বাধ্য হইয়া পূর্ব্বকৃত কর্মদোষে করিতে হয়। বন ২০৭। কিন্তু বেদোক্ত পশুবধ ধর্মটি ইহার পরই সংযোজিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। উহা ব্যাধের উক্তি নয় বলিয়াই বোধ হয়।

ব্যাধ আরো বলিতেছেন "অতএব যাহা সাধারণের একান্ত হিতজনক তাহাই সত্য।" বন ২০৮।

অন্যত্র তিনি বলিতেছেন। "হে ব্রাহ্মণ! অধিক কি বলিব যদি শূদ্র-জাতীয় কোনো ব্যক্তিও সদ্‌গুণসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে সে বৈশ্যত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিতে পারে এবং সেই আর্জবসম্পন্ন ব্যক্তির ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে।" বন ২১১। ঋষি বা ব্রাহ্মণ-প্রবর্তিত কোনো ধর্মে এরূপ ব্যবস্থা নাই ও থাকিতে পারে না।

মহাদেব একস্থলে পার্ব্বতীকে কহিতেছেন, "এই ভূমণ্ডলে মানবদিগের অনুষ্ঠানের নিমিত্ত ভগবান্ স্বয়ম্ভু বৈদিক, স্মার্ত ও শিষ্টাচারসম্ভূত এই তিন-প্রকার ধর্ম নির্দেশ করিয়াছেন।" অনুশাসন ১৪১। মহাদেবও ব্যাধের মতন এই তিনটি ধর্মকে পৃথক্-পৃথক্ ধর্ম বলিলেন। সে যুগে এই তিনটি লৌকিক ধর্মই সমাজে প্রচলিত ছিল, ইহাই বুঝিতে পারা যাইতেছে। বৈদিক ধর্ম এ-সময় একেবারে লোপ পায় নাই। অনেকে উহার অনুসরণ করিয়া চলিতেন; অনেকে আবার যথাবিধি শাস্ত্রোক্ত বর্ণাশ্রম ধর্ম মানিয়া চলিতেন, ও কেহ কেহ শিষ্টাচার ধর্ম বা সত্য ধর্ম মানিয়া চলিতেন। দর্শনগুলি উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি ও যতি সন্ন্যাসী প্রভৃতি সকলে আলোচনা করিতেন। আর সাধারণ লোকে পূর্ব্বোক্ত তিনটি লৌকিক ধর্মের কোনোটি-না-কোনোটি মানিয়া চলিত। আরও দেখুন ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন "সর্ব্বাত্মসংবৃত ধর্ম চারি প্রকার, বেদনির্দ্দিষ্ট, স্মৃতিনির্দ্দিষ্ট, সাধুজনাচরিত ও আত্ম-বিচার সিদ্ধ।" শান্তি ১৩২। এস্থলে আত্মবিচারসিদ্ধ একটি পৃথক্ ধর্মরূপে উক্ত হইয়াছে। স্বাধীন মতাবলম্বিগণ স্ব-স্ব মতে চলিতেন। আমরা প্রাচীন ধর্ম-মত-সম্বন্ধে অনেক ভুল ধারণা পোষণ করি। আজকাল একদল লোক আছেন, যাঁহারা মনে করেন সংস্কৃত ভাষার যতগুলি শাস্ত্রগ্রন্থ আছে, সবগুলি একধর্মের অঙ্গ ও যতগুলি দর্শন আছে সবগুলির ভাবার্থ এক। তাঁহারা ঐরূপভাবেই ঐসমস্ত গ্রন্থকে ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করেন।

আমরা এই যুগের রচনা হইতে আরও কতকগুলি অংশ নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি।

ব্যাসদেব শুকদেবকে কহিতেছেন "যিনি অহিংসা প্রভৃতি সংযম ও স্বাধ্যায় প্রভৃতি নিয়ম পালনে অপরাঙ্মুখ হন এবং যিনি সন্ন্যাস-বিধি-অনুসারে আত্মান্বেষণ ও যজ্ঞোপবীত নিক্ষেপ করেন, সেই আত্মজ্ঞ ব্যক্তির সদ্য বা ক্রমশঃ মুক্তিলাভ হইয়া থাকে।" শান্তি ২৪৪।

অন্যত্র তিনি বলিতেছেন "যেমন মাতঙ্গের পদচিহ্নে অন্যান্য সমুদয় পাদচারী জীবের পদচিহ্ন বিলীন হইয়া যায়, তদ্রূপ এক অহিংসা ধর্মে অন্যান্য সমুদয় ধর্মই বিলীন রহিয়াছে।" শান্তি ২৪৫। এখানে অহিংসা ধর্মকে অন্যান্য ধর্ম-অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হইল।

জাজলি-নামক এক ব্রাহ্মণ দীর্ঘকাল তপস্যা করেন। তাঁহার তপস্যাকালে তাঁহার মস্তকে চটক পক্ষী কুলায় নির্ম্মাণ করিল ও তথায় বাস করিতে লাগিল। ক্রমে ঐ চটক পক্ষীর শাবক উৎপন্ন হইল ও উহারা কিছুদিন থাকিয়া যখন বড় হইল তখন উড়িয়া গেল। জাজলি মনে করিলেন, "আমিই যথার্থ ধর্মোপার্জ্জন করিয়াছি।" এই মনে করিয়া তিনি মহা আস্ফালন করিতেছিলেন। এমন সময়ে আকাশবাণী হইল, "তুমি কখনই ধর্মানুষ্ঠান-বিষয়ে মহাত্মা তুলাধারের তুল্য হইতে সমর্থ হইবে না।" জাজলি এই কথা শুনিয়া অনেক অনুসন্ধান করিয়া বারাণসী-ধামে গমন করিয়া তুলাধারের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তুলাধার বারাণসীর একজন বণিক্। তিনি জাজলিকে ধর্ম-উপদেশ প্রদান করিলেন। তিনি কহিলেন, "জাজলে! আমি সর্ব্বভূত-হিতকর পুর্ব্বতন সনাতন ধর্ম পরিজ্ঞাত হইয়াছি। প্রাণিগণের প্রতি অহিংসা অথবা বিপৎকালে অল্পমাত্র হিংসা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করাই প্রধান ধর্ম।" "আমি সমুদয় লোককে সমান বলিয়া জ্ঞান করি।" শান্তি ২৬২। এই উপাখ্যানে কৌশিক ও ব্যাধের উপাখ্যানের ন্যায় তিনটি জিনিষ আমরা দেখিতে পাইতেছি। প্রথম, যোগ বা তপস্যা দ্বারা কোনো ফল হয় না, কেন না জাজলি বহুকাল তপস্যা করিয়াও মসলা-বিক্রেতা তুলাধারের সমান হইতে পারিল না। দ্বিতীয় নিম্নশ্রেণীর লোক সর্ব্বোচ্চ জাতি ব্রাহ্মণকে ধর্মোপদেশ প্রদান করিল। তৃতীয়, অহিংসা-ধর্ম সমস্ত ধর্ম-অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আর-একটি জিনিষ আমরা এখানে দেখিতে পাইতেছি। সকল লোক সমান। এই তিনটির কোনোটিই বেদ, স্মৃতি প্রভৃতি ব্রাহ্মণ-প্রণীত শাস্ত্র-সম্মত নহে।

অন্যত্র কোনো ব্যক্তি তাঁহার পিতাকে বলিতেছেন, "সত্যব্রতপরায়ণ ও শমদমাদিগুণসম্পন্ন হইয়া কেবল সত্য-বলে মৃত্যুকে পরাজয় করা অবশ্য-কর্তব্য। এই অনিত্য দেহ-মধ্যে মৃত্যু ও অমৃত উভয়ই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। মোহান্ধ হইলেই মৃত্যুলাভ হয় এবং সত্যপথ অবলম্বন করিলেই অমৃতলাভ হইয়া থাকে। অতএব আমি হিংসা ও কাম, ক্রোধ পরিপূর্ণ হইয়া একমাত্র সুখকর সত্যকে অবলম্বনপূর্ব্বক অমরের ন্যায় মৃত্যুকে উপহাস করিব এবং দিবাকরের উত্তরায়ণ-সময়ে শান্তিমার্গ অবলম্বন, বেদাধ্যয়ন এবং কর্ম, মন ও বাক্যের সংযমে-প্রবৃত্ত হইব। মাদৃশ ব্যক্তির অতি হিংস্র পশুযজ্ঞ অথবা পিশাচের ন্যায় বিনাশকর ক্ষত্রিয়-যজ্ঞে দীক্ষিত হওয়া কদাপি বিধেয় নহে।" শান্তি ২৭৭। যখন বেদের কর্ম-কাণ্ড পরিত্যাগ করিয়া ঋষিগণ জ্ঞানকাণ্ড অবলম্বন করেন, ইহা সেই যুগের কথা। তবে ইহার সহিত সত্য-ব্রতের মহিমা বর্ণিত হওয়ায় ইহা আমরা এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

দেবস্থান যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন "বিদ্বান্ ব্যক্তিরা এই সমস্ত বিষয় সম্যক্ আলোচনা করিয়া অহিংসাকেই সাধু-সম্মত পরম ধর্ম বলিয়া স্থির

করিয়াছেন। শান্তি ২১। ভীষ্ম কহিতেছেন, "ধর্ম্মরাজ! অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, অনৃশংসতা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও ঋজুতা এ-কয়েকটি ধর্ম্মের প্রকৃত লক্ষণ।" অনুশাসন ২২।

অন্যত্র তিনি বলিতেছেন, "তুলাদণ্ডের একদিকে সহস্র অশ্বমেধ ও অপরদিকে সত্য আরোপিত করিলে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ অপেক্ষা সত্যই গুরুতর হইয়া উঠে।" অনুশাসন ৭৫। এই 'সত্য' সত্যধর্ম্ম ছাড়া আর-কিছু নয়। এ যুগে অশ্বমেধ যজ্ঞ কিরূপ নগণ্য হইয়া গিয়াছিল দেখুন।

বেদব্যাস মৈত্রেয়কে কহিতেছেন, "বেদে যে-সকল কার্য্যের প্রশংসা-বাদ কীর্ত্তিত হইয়াছে, দান সে-সমুদয়-অপেক্ষাই উৎকৃষ্ট।" অনুশাসন ১২০। এই দান সত্যধর্ম্মের অঙ্গ।

মহারাজ যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে এক নকুল যজ্ঞ-স্থলে আসিয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিল। তাহার অর্দ্ধদেহ সুবর্ণময় ছিল। এক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ কয়েকদিন উপবাসের পর কিছু ছাতু সংগ্রহ করেন। এমন সময় এক অতিথি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ সপরিবারে উপবাসী থাকিয়া অতিথিকে সেই ছাতু খাইতে দিলেন। অতিথি ছাতু খাইয়া চলিয়া গেল। ব্রাহ্মণ সপরিবারে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিলেন ও দিব্যযানে আরোহণ করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। অতিথি যে-স্থানে ভোজন করিয়াছিলেন সেইস্থানে গড়াগড়ি দেওয়ায় উক্ত নকুলের অর্দ্ধেক দেহ সুবর্ণময় হইয়াছিল। বাকী অর্দ্ধেক দেহ সুবর্ণময় করিবার আশায় সে যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ-যজ্ঞস্থলে গড়াগড়ি দিতে আসিয়াছিল। কিন্তু তাহার বাকী অর্দ্ধেক দেহ সুবর্ণময় হইল না। এই উপাখ্যানের সার-মর্ম্ম এই যে—শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দান অশ্বমেধ যজ্ঞ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। সত্যধর্ম্ম খাঁটি সোনার ন্যায়, বৈদিক ধর্ম্ম ইহার নিকট কিছুই নয়। আশ্বমেধিক ৯০।

বৃহস্পতি কোনো স্থলে যুধিষ্ঠিরকে কহিতেছেন, "ধর্ম্মরাজ! এইসমস্ত ধর্ম্মকার্য্য শ্রেয়ঃসাধনোপায় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অহিংসাই পুরুষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরমার্থ সাধন বলিয়া পরিগণিত হয়। যে-ব্যক্তি কাম, ক্রোধ ও লোভকে দোষের আকর জ্ঞান করিয়া পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অহিংসাধর্ম্ম প্রতিপালন করে, তাহার নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে।" অনুশাসন ১১৩।

ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে কহিতেছেন, "মাংস-ভোজন-পরিত্যাগ ধর্ম্ম, স্বর্গ ও সুখের মূলীভূত কারণ, অতএব অহিংসাকেই পরমধর্ম্ম, উৎকৃষ্ট তপস্যা ও সত্যস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।" অনুশাসন ১১৫।

বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে বলিতেছেন, "মহাত্মা মহর্ষিগণ সাধ্যানুসারে উঞ্ছবৃত্তিলব্ধ ফল, মূল, শাক ও জলদান করিয়াই অনায়াসে স্বর্গারোহণ করিতে সমর্থ হন। পণ্ডিতেরা এইরূপ দানকে সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। মহাযোগ, দয়া, ব্রহ্মচর্য্য, সত্য, ধৈর্য্য ও ক্ষমা এ-সমুদয়ই সনাতন ধর্ম্মের মূল।" ফলতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণই তপস্যায় অনুরক্ত হইয়া বিশুদ্ধ চিত্তে ন্যায়লব্ধ বস্তু প্রদান করিলে অনায়াসে স্বর্গলাভে সমর্থ হইতে পারেন সন্দেহ নাই।" আশ্বমেধিক ৯১। সত্য ধর্ম্মের এই দান হইতে বর্ত্তমান ভারতীয় সমাজে অন্নদান, জলদান, বস্ত্রদান, ভূমিদান, বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা, জলাশয় প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের উৎপত্তি হইয়াছে।

যে-সময় যোগ ও সাংখ্য মত প্রচারিত হয় সেই সময় আরও কতক-গুলি দার্শনিক মত ভারতে উদ্ভূত হইয়াছিল। চার্ব্বাক দর্শন তাহার মধ্যে একটি। এই মতাবলম্বী লোকগণ ঈশ্বর মানিতেন না, বেদ মানিতেন না, অদৃষ্ট পরকাল বা পরজন্ম—এ-সকল কিছুই বিশ্বাস করিতেন না, এমন-কি আত্মার অস্তিত্বেও অবিশ্বাস করিতেন। ইঁহাদের মতে আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে। লোকায়তিক দর্শন বলিয়া আর-একটি মত ছিল। ইঁহারা পরলোক গমনক্ষম সূক্ষ্ম শরীরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না, তবে শীত ও জ্বরের নিবৃত্তির জন্য দেবতা-দিগের নিকট প্রার্থনা করিতেন। অর্থাৎ দেবতার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন।

তৃতীয় মত হইতেছে ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী সৌগতদিগের মত। ইঁহারা কহিতেন যে, অবিদ্যা, কার্য্যলালসা, লোভ, মোহ এবং অন্যান্য দোষই পুনর্জ্জন্মের কারণ। যদি জ্ঞানপ্রভাবে ঐ সমুদয় অবিদ্যাদি একেবারে ধ্বংস হইয়া যায়, তাহা হইলে দেহনাশের পর আর জন্ম-পরিগ্রহ করিতে হয় না। উহার নাম মোক্ষ। বৌদ্ধ দর্শনের সহিত ইহার অনেকটা সাদৃশ্য আছে।

বেদ-বিরোধী এতগুলি ধর্ম্ম ও দর্শনের যে উৎপত্তি হইল, ইহাতে বৈদিক ব্রাহ্মণগণ নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তাঁহারা বেদরক্ষার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। এইসমস্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বাক্-বিতণ্ডা, লড়াই-ঝগড়া হইত; পরস্পর পরস্পরকে ভীষণভাবে আক্রমণ করিতেন, গালাগালি দিতেন, মহাভারতে তাহার আভাস পাওয়া যায়।

নকুল যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন, "যাহারা বেদোক্ত নিয়ম পরিত্যাগ করে তাহারাই নাস্তিক।" শান্তি ১২।

অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন, "বেদনিন্দক নাস্তিকদিগকে দণ্ড-প্রভাবে নিপীড়িত হইয়া অবিলম্বে নিয়ম অবলম্বন করিতে হয়।" শান্তি ১৫। ইহাতে বোধ হইতেছে রাজশক্তির সাহায্যে বেদবিরোধী দলকে শাসন করা হইত। বৈদিকগণ মোক্ষবেত্তা সন্ন্যাসিগণকেও গালি দিতেন। নকুল যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন, "যিনি গার্হস্থ্য সুখাস্বাদনে নিরপেক্ষ হইয়া মোক্ষ-কামনায় বনে পরিভ্রমণ করিয়া দেহ পরিত্যাগ করেন, তিনি তামস সন্ন্যাসী।" শান্তি ১২।

বিদেহ-রাজ জনক কোনো সময়ে রাজ্য, ধন, রত্ন, পুত্র-কলত্র প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষুকাশ্রম অবলম্বন করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার মহিষী আসিয়া ক্রোধভরে তাঁহাকে কহিলেন, "তুমি সমুদয় রাজ্য ধন পরিত্যাগ করিয়াছ বটে, কিন্তু তুচ্ছ যবমুষ্টি গ্রহণে লোভ থাকাতে তোমার স্বার্থত্যাগের প্রতিজ্ঞা বিফল হইয়াছে।" ইতিপূর্ব্বে সহস্র-সহস্র ত্রিবিদ্যাসম্পন্ন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য অসংখ্য লোক তোমার নিকট জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন। এক্ষণে তুমিই অন্যের অনুগ্রহে আপনার উদর পূরণ করিবার চেষ্টা করিতেছ। আজই স্বীয় সমুজ্জ্বল রাজলক্ষ্মী পরিত্যাগপূর্ব্বক কুকুরের ন্যায় পরান্ন-প্রত্যাশায় ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করাতে তোমার জননী পুত্রহীন ও ভার্য্যা পতিবিহীন হইয়াছে।" শান্তি ১৮। এই উপাখ্যানে বুদ্ধদেবের রাজ্যত্যাগ ও ভিক্ষা-বৃত্তিগ্রহণকে প্রচ্ছন্নভাবে আক্রমণ করা হইয়াছে। কেবল বুদ্ধদেবের নামের পরিবর্ত্তে জনকের নাম দেওয়া হইয়াছে মাত্র। সত্যধর্ম্মাবলম্বিগণও পাল্টা জবাবে বৈদিক ব্রাহ্মণগণকে ধূর্ত্ত, লুব্ধপ্রকৃতি ও পিশাচ বলিত, ইহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

সাংখ্যমতাবলম্বিগণও বৈদিক ধর্ম্মকে অনেক স্থলে আক্রমণ করিয়াছে। কপিল ও স্যূমরশ্মির তর্কবিতর্ক পূর্ব্বেই হইয়াছে। শান্তি ২৬৮।

আশ্বমেধিক ২৮ অধ্যায়ে এইরূপ হিংসা ও অহিংসা-সম্বন্ধে অনেক বাদানুবাদ আছে। যখন বেদের পসার এইরূপে চলিয়া গেল, সাংখ্য, যোগ প্রভৃতি দর্শন সকল সমাজের উচ্চশিক্ষিত ব্রাহ্মণের মতি ফিরাইয়া দিল, সত্যধর্ম্ম বা শিষ্টাচার ধর্ম্ম প্রভৃতি লোকপ্রিয় ধর্ম্মসকল সমাজের নিম্ন হইতে উচ্চ স্তর পর্য্যন্ত সর্ব্ব-শ্রেণীর লোককে নিজের আয়ত্ত করিয়া ফেলিল, তখন বৈদিক ব্রাহ্মণগণ সঙ্কটে পড়িলেন। বৈদিক ধর্ম্ম আর পুনর্জ্জীবিত হইবার আশা নাই দেখিয়া তাঁহারা বেদ ত্যাগ করিলেন। বেদ ত্যাগ করিলেন বটে কিন্তু নিজেদের সুবিধামত একটি

ধর্ম্ম-প্রচারের চেষ্টা ছাড়িলেন না। তাঁহারা দেখিলেন সাধারণ লোকে দেবতা-পূজা ভালোবাসে। সেজন্য তাঁহারা ঈশ্বরকে লৌকিক দেবতা-রূপে সাধারণের সমক্ষে প্রচারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রথম দেবতা যাহা তাঁহাদের চক্ষে পড়িল, তাহা রুদ্র বা শিব বা মহাদেব। প্রথমে ইনি কিরাত জাতির দেবতা ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। কিরাত বা ব্যাধ জাতির অনেক উপাখ্যানের সহিত এই মহাদেব বিশেষভাবে জড়িত। শিবরাত্রির উপাখ্যান তাহাদের মধ্যে অন্যতম। তথায় কথিত আছে, ব্যাধ-কর্ত্তৃকই শিবের পূজা জগতে বিদিত হয়। যাহা হউক আমরা মহাভারতে যাহা পাইয়াছি তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছি। ইনি বৈদিক দেবতা নহেন। দক্ষ-যজ্ঞে ইঁহার নিমন্ত্রণ হয় নাই। পার্ব্বতী যখন মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন তাঁহার নিমন্ত্রণ হয় নাই, তখন তিনি উত্তর দিলেন, "পূর্ব্বকালে যজ্ঞভাগ-কল্পনার সময় দেবগণ আমার ভাগ নির্দ্দেশ করেন নাই। সেই পূর্ব্বরীতি-অনুসারে অদ্যাপি তাঁহারা আমাকে যজ্ঞভাগ প্রদান করেন না।" শান্তি ২৮৩। মহাদেবের এই উক্তি হইতেই জানা যাইতেছে, শিব বৈদিক দেবতা নহেন। বৈদিক দেবতা হইলে ইঁহার যজ্ঞভাগ থাকিত। যাহা হউক দক্ষ-যজ্ঞে শিব জোর করিয়া যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিলেন ও তদবধি শিবের পূজা প্রচারিত হইল। ক্রমে বেদের সহিত তাঁহার সংযোগ করিয়া দেওয়া হইল। বেদে রুদ্র নামে এগারোটি দেবতা ছিলেন। এই শিবকেও রুদ্র বলা হয়। কিন্তু বেদে রুদ্র বলিয়া কোনো একজন দেবতা নাই। বেদোক্ত একাদশ রুদ্রের মধ্যে পিনাকী, ত্র্যম্বক, শম্ভু, ঈশ্বর প্রভৃতি দেবতা আছেন সত্য, কিন্তু ইঁহারা পৃথক্-পৃথক্ দেবতা; একটি দেবতা নহেন। আর বেদের রুদ্রগণ মহর্ষি কশ্যপের সন্তান। কিন্তু মহাদেবকে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, আদিপুরুষ এমন কি ব্রহ্মারও সৃষ্টিকর্ত্তা বলা হয়। অনুশীলন ১৪। এখন ভাবিয়া দেখুন যিনি ব্রহ্মার পৌত্র, তিনি কিরূপে ব্রহ্মার সৃষ্টিকর্ত্তা হইবেন? অতএব ইনি যে বৈদিক রুদ্র নহেন তাহা সুনিশ্চিত। আর আমাদের মনে যেরূপ সন্দেহ হইতেছে দক্ষের মনেও সেইরূপ সন্দেহ হইয়াছিল। দক্ষ দধীচিকে কহিতেছেন, "মহর্ষি ইহলোকে জটাজুটধারী শূলহস্ত একাদশ রুদ্র বর্ত্তমান রহিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে মহাদেব কে তাহা আমি অবগত নহি।" শান্তি ২৮৪। যাহা হউক এই শৈব ধর্ম্মের বিকাশ আমরা মহাভারতে যেরূপ দেখিতে পাই, এখন তাহারই উল্লেখ করিতেছি।

বাসুদেব যুধিষ্ঠিরকে কহিতেছেন, "উনি (মহাদেব) তীক্ষ্ণ, উগ্র, প্রবল-প্রতাপ, জগতের দহনকর্ত্তা ও শোণিত-মিশ্রিত মজ্জা-মাংস-ভক্ষক বলিয়া উঁহার নাম রুদ্র; উনি দেবগণের মধ্যে মহান্।" শান্তি ১৬১।

মহাদেব প্রথমে মাংসাশী ছিলেন। আজকাল নিরামিষাশী। ইহাতেই বুঝা যায়, তিনি অনার্য্য দেবতা ছিলেন।

আবার দেখুন "পাণ্ডুতনয়গণ ধৃতরাষ্ট্রতনয় যুযুৎসুকে রাজ্যরক্ষার্থ নিযুক্ত করিয়া ব্রাহ্মণগণ দ্বারা স্বস্তিবাচন, মোদক, পায়স ও মাংস-নির্ম্মিত পিষ্টক দ্বারা দেবাদিদেব মহাদেবের পূজা সমাধান, আশ্রিত ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ এবং শোকসন্তপ্ত ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী ও পৃথার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক অর্থ্য আহরণার্থ নগর হইতে বহির্গত হইলেন।" আশ্বমেধিক ৬৩।

দক্ষপ্রজাপতি মহাদেবকে স্তব করিতেছেন, "তুমি শৃগালের ন্যায় হৃদয়াদির মাংস-প্রিয়, পাপ-মোচনের কারণ এবং যজ্ঞ, যজমান, হুত ও প্রহুতস্বরূপ।" শান্তি ২৮৫।

আশ্বমেধিক ৬৫ অধ্যায়ে দেখি, "তখন বেদ-পারদর্শী পুরোহিত ধৌম্য যথাবিধি হুতাশনে আহুতি-প্রদানপূর্ব্বক চরু প্রস্তুত করিয়া সেই মন্ত্রপূত চরু এবং বিবিধ বিচিত্র পুষ্প, মোদক, পায়স, মাংস দ্বারা প্রথমত মহেশ্বরের অর্চ্চনা করিলেন।

প্রথম-প্রথম মাংস ব্যতিরেকে যে মহাদেবের পূজা হইত না, তাহা এইসমস্ত উদ্ধৃত অংশ হইতে বুঝিতে পারা যায়। এই গেল শৈব ধর্ম্মের প্রথম স্তর।

শৈব ধর্ম্মের দ্বিতীয় স্তরে আমরা ইহাতে বৌদ্ধ প্রভাব দেখিতে পাই। ভগবান্ রুদ্র দক্ষকে বলিতেছেন, "আমি ষড়ঙ্গ বেদ, সাংখ্য ও যোগ শাস্ত্র হইতে যুক্ত্যনুসারে পাশুপত ধর্ম্ম উৎপাদন করিয়াছি।" "সকল আশ্রমেরই উহাতে অধিকার আছে।" "বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্মের সহিত উহার অনেকাংশেই সাদৃশ্য নাই, কেবল কোনো-কোনো অংশে সাদৃশ্য নিরীক্ষিত হইয়া থাকে।" শান্তি ২৮৫।

এই উক্তি হইতে আমরা দুইটি বিষয় জানিতে পারিতেছি। প্রথম বেদ, বেদাঙ্গ, সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রের প্রচারের পর এই ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়। দ্বিতীয় বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের সহিত ইহার সাদৃশ্য ছিল না ও সকল আশ্রমীরই ইহাতে সমান অধিকার ছিল। এইজন্যই আমরা এই স্তরকে বৌদ্ধ প্রভাবান্বিত বলিয়াছি। এসময় শৈবদিগের মধ্যে জাতি-ভেদ ছিল না।

মহর্ষি বশিষ্ঠ রাজর্ষি করালকে বলিতেছেন, জীব কর্ম্মফলে নানা জন্ম গ্রহণ করিয়া "কখন বিধিবিহিত চান্দ্রায়ন ব্রত, কখন চারি আশ্রমের ধর্ম্ম, কখন পাশুপত ধর্ম্ম ও কখন পাষণ্ড-পথ অবলম্বন-পূর্ব্বক অভিমান করিয়া থাকে।" শান্তি ৩০৪। পাশুপত ধর্ম্ম যে চারি আশ্রমের ধর্ম্ম হইতে পৃথক্ ধর্ম্ম তাহা হইতেই ইহা বুঝিতে পারা যাইতেছে।

যাহা হউক শিব ক্রমশঃ সর্ব্বপ্রধান দেবতা হইয়া উঠিলেন ও পরমেশ্বরের আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তারকাসুরের পুত্রগণ যখন প্রবল হইয়া স্বর্গে, মর্ত্তে উৎপাত করিতে লাগিল, তখন কোনো দেবতাই তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে পারিলেন না। অবশেষে মহাদেব তাহাদিগকে নিহত করিলেন। কর্ণ ৩৪।৩৫। এই কার্য্যে মহাদেবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইল।

শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে কহিতেছেন, "তিনি (মহাদেব) অক্ষয়, অচিন্ত্য, নিত্য, পূর্ণব্রহ্ম, নির্গুণ, অথচ গুণ-বিষয়ীভূত এবং যোগিগণের পরমানন্দ ও মোক্ষ-স্বরূপ।" অনুশাসন ১৬।

মহাত্মা তণ্ডি মহাদেবের স্তব করিতেছেন, "যজ্ঞশীল ব্যক্তিরা ভূরি-দক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া যে স্বর্গাদি লোক লাভ করেন, তুমি সেই স্বর্গাদি লোক; শান্তি, যোগ, জপ ও কঠোর নিয়মানুষ্ঠান-নিরত তাপসগণ যে নক্ষত্র-লোক লাভ করিয়া থাকেন, তুমি সেই নক্ষত্র-লোক; কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসীগণ যে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন তুমি সেই ব্রহ্মলোক; বীতস্পৃহ মুমুক্ষু ব্যক্তিরা যে মোক্ষ লাভ করেন, তুমি সেই মোক্ষ এবং তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন মহাত্মারা যে নির্ব্বাণ-মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন, তুমি সেই নির্ব্বাণ।" অনুশাসন ১৬। ইহার পর ২।৩টি অধ্যায় মহাদেবের মাহাত্ম্যে পরিপূর্ণ। এখানে তিনিই জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা আদিদেব বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। উপরে যে-অংশটি উদ্ধৃত হইল তাহা হইতে ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে, শাস্ত্রাদিতে শৈব ধর্ম্মের উৎপত্তির পূর্ব্বে পাঁচ প্রকার গতি নির্দ্দিষ্ট ছিল। এই "নির্ব্বাণ" বৌদ্ধ সন্ন্যাসিদিগের নির্ব্বাণ বলিয়াই বোধ হয়।

উপমন্যু ইন্দ্রকে বলিতেছেন, "তিনি (মহাদেব) স্বীয় মহিমায় সমুদয় ব্যাপ্ত করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি সম্পাদনপূর্ব্বক উহার মধ্যে ভূত-ভাবন ভগবান্ ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন।" "লোকে পিতামহ ব্রহ্মাকে জগৎস্রষ্টা বলিয়া থাকে, তিনি ঐ দেবাদিদেবকে আরাধনা করিয়া জগৎসৃষ্টির ক্ষমতা-লাভ করিয়াছেন। তাঁহারই প্রভাবে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর উৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্য

হইয়াছে। তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই।" অনুশাসন ১৪। এখানে মহাদেব, ব্রহ্মারও সৃষ্টিকর্ত্তা।

বাসুদেব অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, "রুদ্র ও আমি,—আমরা উভয়ই একাত্মা।" "রুদ্র-ভিন্ন আর কেহই আমাকে বর প্রদান করিতে সমর্থ নহে।" "আত্মস্বরূপ রুদ্র ব্যতিরেকে আমি আর কোনো দেবতাকেই প্রণাম করি না।"

অন্যত্র তিনি যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন, "ভগবান্ ভবানীপতিই এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ত্তা। তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। তিনি এই ত্রিলোকের আদিকারণ।" অনুশাসন ১৬০।

ধর্ম্মের এই চতুর্থ যুগে আর-একটি ধর্ম্ম উদ্ভূত হয়। ইহা বৈষ্ণব ধর্ম্ম। বিষ্ণু বা নারায়ণের পূজা ও তাহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা বলিয়া বিশ্বাস এই ধর্ম্মের মূল। বৈষ্ণব ধর্ম্ম শৈব ধর্ম্ম অপেক্ষা কিঞ্চিৎ আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। শৈবধর্ম্মে মধ্যাবস্থায় বৌদ্ধভাব প্রবেশ করে, কিন্তু বৈষ্ণব ধর্ম্ম একেবারে বৌদ্ধ হইয়াই জন্মগ্রহণ করে। বিষ্ণুর মাংস ভোজনের কথা কোথাও শোনা যায় না।

এই বিষ্ণুপূজার উৎপত্তি কিরূপে হইল এবং কোথা হইতে আসিল মহাভারতে তাহার কেবল একটু আভাস পাওয়া যায়। নারদ-ঋষি শ্বেত দ্বীপ হইতে এই পূজা ভারতে প্রচার করেন।

নারদ-ঋষি ভগবান্ নারায়ণকে বলিতেছেন, "হে দেব! তুমি স্বয়ম্ভু হইয়াও লোকের হিতসাধনের নিমিত্ত ধর্ম্মের আলয়ে চারি অংশে অবতীর্ণ হইয়াছ। এক্ষণে তুমি স্বকার্য্য সাধন করো। আমি অদ্য তোমার শ্বেত-দ্বীপস্থিত আদ্য মূর্ত্তি দর্শন করিবার নিমিত্ত প্রস্থান করি।" শান্তি ৩৩৬। শ্বেতদ্বীপে নারায়ণের আদ্য মূর্ত্তি ছিল। পরে অন্য স্থানে প্রচারিত হয়। এই শ্বেতদ্বীপ কোথায় ছিল? মহাভারত বলেন, সুমেরু পর্ব্বতের বায়ু-কোণে ক্ষীরোদ-সাগরের উত্তরে এই দ্বীপ অবস্থিত। শান্তি ৩৩৬। হিমালয় পর্ব্বতকে অনেক স্থলে সুমেরু বলা হইয়াছে। তাহা হইলে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ শ্বেতদ্বীপ হইল। ঐ স্থানে কিন্তু শ্বেত নদী, শ্বেত জনপদ, শ্বেত পর্ব্বত (Swat river, Swat Valley, Sufed Koh শ্বেতদ্বীপ) এখনও বিদ্যমান। পঞ্চরাত্র-শাস্ত্র এই বৈষ্ণব ধর্ম্মের গ্রন্থ। রাজা উপরিচর যজ্ঞ করিয়া সর্ব্বপ্রথমে নারায়ণের যজ্ঞভাগ কল্পনা করেন। সেই যজ্ঞে তিনি পশুহত্যা করেন নাই। শান্তি ৩৩৭। মহর্ষি একত, দ্বিত ও তৃতের প্রতি দৈববাণী হইতেছে, "ক্ষীরোদ সমুদ্রের উত্তর ভাগে শ্বেতদ্বীপ নামে এক প্রভাসম্পন্ন প্রসিদ্ধ স্থান আছে। ঐ দ্বীপে চন্দ্রের ন্যায় তেজস্বী বহুসংখ্যক মহাত্মা বাস করেন।.........ঐ মহাত্মারাই পুরুষোত্তম ভগবান্ নারায়ণের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে সমর্থ হন। ঐ স্থানে দেব-দেব নারায়ণের আবির্ভাব রহিয়াছে।"

নারদ ঋষি ভগবান্ নারায়ণের দর্শনলালসায় শ্বেতদ্বীপে গমন করিয়া নারায়ণের স্তব করিতে লাগিলেন। "তুমি সত্যময়, আদিদেব।......তুমি বিশ্ব-কর্ত্তা ও বিশ্বরূপী। তুমি সৃষ্টিসংহার কর্ত্তা...... ইত্যাদি ইত্যাদি।" শান্তি ৩৩৯।

এইসমস্ত উক্তি হইতে ইহাই উপলব্ধি হয় যে, শ্বেত দ্বীপ হইতেই নারায়ণের পূজা ভারতে প্রচারিত হয়।

যাহা হউক বিষ্ণু যখন প্রথম আবির্ভূত হইলেন তখন মহাদেবের ন্যায় একটু সঙ্কটে পড়িলেন। তিনি বৈদিক দেবতা নহেন, সেকারণ তাঁহার যজ্ঞভাগ ছিল না। তখন তিনি মহাদেবের ন্যায় জোর করিয়া যজ্ঞভাগ লইতে প্রস্তুত হইলেন। ব্রহ্মা অষ্ট ঋষি ও অন্যান্য দেবতা-গণকে সৃষ্টি করিয়া জগৎ সৃষ্টি কিরূপে করিবেন ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলেন না। তখন সমস্ত দেবতা ও ঋষি সমুদয় মিলিয়া ভগবান্ নারায়ণের আরাধনা করিতে লাগিলেন। দেবগণের সহস্র বৎসর আরাধনার পর নারায়ণ প্রসন্ন হইলেন ও দেবগণকে কহিলেন 'তোমরা আমার যজ্ঞভাগ প্রদান করো, তাহা হইলে আমি তোমাদিগের অধিকার নির্দ্দেশ করিয়া দিব।" সেরূপ, বৈষ্ণব-যজ্ঞ করিলেন ও নারায়ণের উদ্দেশে ভাগ কল্পনা করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন তিনি বিশ্বের মধ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া দেব-গণকে স্ব-স্ব অধিকারে স্থাপন করিলেন ও কিরূপে বিশ্ব প্রতিপালন করিতে হইবে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। এইরূপে নারায়ণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতারূপে পরিণত হইলেন। শান্তি ৩৪১।

নারায়ণের মূর্ত্তি কিরূপ ছিল আমরা তাহারও একটু নমুনা মহাভারতে পাই। উক্ত বৈষ্ণব-যজ্ঞ শেষ হইলে দেবতারা সকলে স্ব-স্ব স্থানে গমন করিলেন। কেবল ব্রহ্মা নারায়ণের মূর্ত্তি দর্শন করিবার নিমিত্ত তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। "তখন ভগবান্ নারায়ণ হয়গ্রীব মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক কমণ্ডলু ও ত্রিদণ্ড হস্তে লইয়া সামবেদ উচ্চারণ করিতে-করিতে ব্রহ্মার সমক্ষে প্রাদুর্ভূত হইলেন।" শান্তি ৩৪১।

এইরূপে নারায়ণের পূজা যখন বহুলরূপে প্রচারিত হইয়া গেল, তখন বৈদিক ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে আপনার করিয়া লইলেন। বেদে দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে বিষ্ণু বলিয়া এক দেবতা আছেন। ইনি দেবতাগণের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ। "কশ্যপের পত্নীগণের মধ্যে অদিতি হইতে মহাবল-পরাক্রান্ত দেবশ্রেষ্ঠ আদিত্যগণ উৎপন্ন হইলেন। ঐ আদিত্যগণের মধ্যে বামনরূপী বিষ্ণু অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।" শান্তি ২০৭।

ব্রাহ্মণগণ নারায়ণকে এই বিষ্ণু বলিয়া প্রচার করিলেন। এরূপ হওয়া একেবারে অসম্ভব। কেননা বেদের দেবতাগণ কশ্যপের সন্তান। কিন্তু এই নারায়ণ সকলের আদিপুরুষরূপে কল্পিত হইয়াছেন। এক-জনের পুত্র বা কাহারও পৌত্র কিরূপে জগতের আদিপুরুষ ও বিশ্বের স্রষ্টা হইবেন?

বশিষ্ঠ কহিতেছেন, "পণ্ডিতেরা সেই নারায়ণকেই হিরণ্যগর্ভ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। বেদে ঐ মহাত্মা মহান্, বিরিঞ্চি ও অজ নামে এবং সাংখ্য শাস্ত্রে উনি বিচিত্ররূপ, বিশ্বাত্মা, এক ও অক্ষর প্রভৃতি বিবিধ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।" শান্তি ৩০৩। আজকাল আমরা যেমন বলিয়া থাকি, মুসলমানের আল্লাও যে, আমাদের হরিও সেই; সেইরূপ বশিষ্ঠ বলিতেছেন, এই নারায়ণই আমাদের বেদের হিরণ্যগর্ভ, উভয়ই এক।

এইরূপে নারায়ণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা হইয়া গেলেন।

কমলযোনি কোনো সময়ে নারায়ণের নিকট স্তব করিয়া কহিতেছেন, "ভগবন্! তুমি ব্রহ্ম-স্বরূপ ও আমার পূর্ব্বজাত। তুমি লোকের আদি, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সাংখ্য-যোগ-নিধি। তুমি মহত্তত্ত্ব ও প্রকৃতির স্রষ্টা, অচিন্তনীয় ও শ্রেয়ঃপথাবলম্বী। তুমি বিশ্বসংহারক, সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা ও স্বয়ম্ভু, তোমাকে নমস্কার। আমি তোমার অনুগ্রহেই জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি।" শান্তি ৩৪৮।

ব্রহ্মা নারায়ণের দেহ হইতে উৎপন্ন হন ও তৎপরে ব্রহ্মা লোক-সৃষ্টি করেন। শান্তি ৩৪৯।

ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে কহিতেছেন, "এই ভূমণ্ডলে দেবাদিদেব পরম পুরুষ বাসুদেবই অদ্বিতীয়।" "সেই অনাদি নিধন ত্রিলোকাধিপতি নারায়ণকে ধ্যান, নমস্কার ও তাঁহার উদ্দেশে যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেই সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করা যায়।" "যিনি সমুদয় তেজ অপেক্ষা অতি উৎকৃষ্ট তেজ, ...যিনি দেবতাদিগের দেবতা, যিনি সমুদয় জীবের পিতা ও পরব্রহ্ম-স্বরূপ এবং কল্পের আদিকালে যাহা হইতে সমুদয় জীব উৎপন্ন ও কল্পান্তে যাহাতে সমুদয় জীব বিলীন হয়, আমি এক্ষণে সেই লোকপ্রধান বিষ্ণুর সহস্র নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করো।" অনুশাসন ১৪৯। শ্রীকৃষ্ণকে প্রথমত নারায়ণের পূর্ণ অবতার বলা হইত না।

ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে কহিতেছেন, "ধর্ম্মরাজ! সেই সর্ব্বাগ্রে চৈতন্য-স্বরূপ পরমব্রহ্ম স্বীয় অসীম তেজঃপ্রভাবে নানারূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। এই মহাত্মা কেশব তাহারই অষ্টমাংশ-স্বরূপ এবং এই ত্রিলোক তাঁহারই অষ্টমাংশ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে।" শান্তি ২৮০।

ক্রমে এই শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের আসনে উপবিষ্ট হন। পরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের হস্তে পতিত হইয়া তিনি নারায়ণের বহু উর্দ্ধে উঠিয়া গিয়াছেন।

এই বৈষ্ণব ধর্ম্মের একটি বিশেষত্ব হইতেছে, ইহা ভক্তিপ্রধান ধর্ম্ম। বৈষ্ণব ধর্ম্মের পূর্ব্বে দুই-একস্থলে ভক্তির উল্লেখ আছে, কিন্তু ভক্তির উপর অধিক জোর দেওয়া হয় নাই। এই ভক্তির অপর একটি নাম ঐকান্তিক ধর্ম্ম। বৈদিক যুগে যাগযজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেই মুক্তি হইত। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরে জ্ঞানে মুক্তি হইত, বা যোগসাধনায় মুক্তি হইত। স্মৃতিশাস্ত্র-মতে চারি আশ্রমের নিয়ম পালন করিলেই স্বর্গ লাভ হইত। সত্য ধর্ম্মের যুগে চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন ও বিশ্বের সেবা করিলে নির্ব্বাণ লাভ হইত। এই চতুর্থ স্তরে কেবল বৈষ্ণব ধর্ম্ম আমরা দেখিতে পাই, ভগবানে ভক্তি করিলে মুক্তি হয়, ভক্তি ভিন্ন মুক্তি নাই।

জনমেজয় কহিতেছেন, "ভগবন্! ভগবান্ নারায়ণ একান্ত ভক্তি-পরায়ণ মহাত্মাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া স্বয়ং তাঁহাদিগের পূজা গ্রহণ করেন, ইহা সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।" শান্তি ৩৪৯।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, "সত্যযুগে ভগবান্ নারায়ণ সেই সামবেদ সম্মত ঐকান্তিক ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়া তদবধি স্বয়ং উহা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।" শান্তি ৩৪৯।

অন্যত্র তিনি বলিতেছেন, "ঐকান্তিক ধর্ম্ম ও অহিংসা-ধর্ম্মযুক্ত সৎকর্ম্ম-প্রভাবে নারায়ণ প্রীত হন।" শান্তি ৩৪৯।

অন্যত্র, "এই জগৎ হিংসাপরিশূন্য, সর্ব্বভূতহিতৈষী তত্ত্বজ্ঞান-সম্পন্ন ঐকান্তিক ধর্ম্মাবলম্বী লোক-সমুদয়ে পরিবৃত হইলেই সত্যযুগের আবির্ভাব হইবে এবং সমুদয় লোক নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে।" শান্তি ৩৪৯।

অহিংসাময় সত্যধর্ম্মে কেবল ঐকান্তিক ধর্ম্ম যোগ করিয়া দেওয়ায় বৈষ্ণব ধর্ম্ম হইয়াছে। সত্যধর্ম্মে ভগবান্ নাই, ঐকান্তিক ধর্ম্মে আছে। ইহাই উভয়ের পার্থক্য। কেবল ইহার গৌরব-বৃদ্ধির জন্য ইহাকে বেদ-সম্মত বলা হইত।

ইহার পর আমরা পঞ্চরাত্র-শাস্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাই। বোধ হয় এই সময় ইহা রচিত হয়।

বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে কহিতেছেন, "সাংখ্য, যোগ, পঞ্চরাত্র, বেদ ও পাশুপত প্রভৃতি নানাবিধ শাস্ত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। তন্মধ্যে মহর্ষি কপিল সাংখ্যের পুরাতন পুরুষ, ব্রহ্মা যোগের, অপান্তরতমা বেদের, ব্রহ্মার পুত্র ভগবান্ মহাদেব পাশুপত ধর্ম্মের এবং ভগবান্ নারায়ণ স্বয়ং সমুদয় পঞ্চরাত্র শাস্ত্রের প্রণেতা।" শান্তি ৩৫০।

এখানে আমরা দেখি অপান্তরতমা ঋষি বেদের বিভাগ-কর্ত্তা। বেদ-ব্যাস ইহার অবতার।

বৈশম্পায়ন কহিতেছেন, "মহারাজ! ....সাংখ্যযোগ, আরণ্যক বেদ ও পঞ্চরাত্র এই শাস্ত্রসমুদয় পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভূত।" শান্তি ৩৪৯।

শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের মধ্যে পরস্পর দ্বন্দ্ব-বিগ্রহ প্রায়ই চলিত। প্রত্যেকে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিত। কোথাও মহাদেব ব্রহ্মা ও বিষ্ণু অপেক্ষা বড় ও তাহাদের সৃষ্টিকর্ত্তা এইরূপ লিখিত আছে, আবার কোথাও বিষ্ণু সকলের অপেক্ষা বড় ও সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা এইরূপ দৃষ্ট হয়, আবার কোথাও ব্রহ্মাকে সকলের বড় বলা হইয়াছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন দেবতারই উপাসকশ্রেণী বর্ত্তমান ছিল।

আজকাল আমরা যে বলিয়া থাকি ব্রহ্মা জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, বিষ্ণু পালন-কর্ত্তা, ও শিব সংহার-কর্ত্তা, ইহা পরবর্ত্তীকালের কল্পনা। মহাভারতের যুগে এরূপ কল্পনার কল্পনাও হয় নাই। মহাভারতে যখন যাহার শ্রেষ্ঠত্ব দেখানো হইয়াছে তখন তাহাকেই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা আদি-পুরুষ বলা হইয়াছে। এইরূপে তিন জনকেই সৃষ্টিকর্ত্তা বা আদিপুরুষ বলা হইয়াছে। ইহারা এক-একজন পৃথক পৃথক সম্প্রদায় বা ধর্ম্মের ঈশ্বর। খৃষ্টানের গড্ ও আমাদের 'হরি'তে যে তফাৎ শিব ও বিষ্ণুতেও সেই তফাৎ। পরবর্ত্তীকালে এই ধর্ম্মগুলি মিলাইয়া একধর্ম্ম করিবার জন্য ইহাদিগকে বিশ্বের পৃথক্‌পৃথক্ বিভাগের কর্ত্তারূপে কল্পনা করা হইয়াছে। যেন একজন ঈশ্বর তিন অংশে বিভক্ত হইয়া ভিন্ন-ভিন্ন কার্য্য করিতেছেন, আবার ইহাদিগকে একত্র মিলাইয়া দিলেই এক ঈশ্বরে পরিণত হন। আবার পরবর্ত্তী কালে দুর্গা, কালী প্রভৃতি শক্তিপূজা প্রবর্ত্তিত হয়, তখন ইঁহাদিগকেও পূর্ব্ব দেবতাদিগের সঙ্গে মিলাইয়া দেওয়া হইল। এইরূপে দুর্গা, কালী প্রভৃতিকে মহাদেবের স্ত্রীরূপে কল্পনা করায় শাক্তধর্ম্ম ও শৈবধর্ম্ম এক ধর্ম্ম হইয়া গেল। আরও পরবর্ত্তী যুগে কার্ত্তিক গণেশ প্রভৃতিকে শিবদুর্গার পুত্র ও ষষ্ঠী, মনসা প্রভৃতিকে শিব-কন্যা কল্পনা করিয়া এইসমস্ত উপধর্ম্মকেও প্রাচীন ধর্ম্মের অঙ্গীভূত করিয়া লওয়া হইয়াছে। ভারতবর্ষে এক ধর্ম্ম অন্য ধর্ম্মের উচ্ছেদ করে নাই বা করিতে পারে নাই। যত ধর্ম্ম এদেশে উৎপন্ন হইয়াছে, সমস্ত ধর্ম্ম মিলিত হইয়া এক অভিনব ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহারই নাম 'হিন্দু' ধর্ম্ম। ইহা একটি ধর্ম্ম নহে। ইহা নানা ধর্ম্মের সমবায়। উপরি-উক্ত প্রকারে এইসমস্ত ধর্ম্মকে একত্র সংযুক্ত করা হইয়াছে। অন্য ধর্ম্মাবলম্বীকে নিজ ধর্ম্মে আনয়ন করিবার ইহা ভারতীয় প্রথা। উপাস্য দেবতাগণ যদি এক পরিবারভুক্ত হইয়া যায় তাহা হইলে উপাসকগণও এক ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া পড়ে। যদিও নানাধর্ম্মাবলম্বী এইরূপে একত্র মিলিয়া গিয়াছেন, তথাপি প্রত্যেকে নিজের-নিজের দেবতাকে অন্য সকল দেবতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন। শাক্তগণ বলেন যে, শক্তিই জগতের আদি। তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রসব করিয়াছেন। কেহ শিবকে ঐ স্থান দেন, কেহ ব্রহ্মাকে, কেহ বিষ্ণুকে, কেহ গণপতিকে, ইত্যাদি। আবার মনে করুন কোনো দৈত্য প্রবল হইয়া স্বর্গমর্ত্ত্য জয় করিল, তাহাকে কেহ পরাজয় করিতে পারে না, তখন দুর্গা বা কালী তাহাকে বধ করিলেন। যথা শুম্ভ, নিশুম্ভ ইত্যাদি। ইহাতে দুর্গা, কালী প্রভৃতির মাহাত্ম্য বর্দ্ধিত হইল। প্রত্যেক সম্প্রদায়ই এইরূপ করিয়াছেন। এইরূপে শিব ত্রিপুরাসুরকে সংহার করেন ও বিষ্ণু মধুকৈটভ, হিরণ্যকশিপু, রাবণ, কুম্ভকর্ণ, কংস প্রভৃতি অসুরগণকে সংহার করেন। ভিন্ন-ভিন্ন উপাসক সম্প্রদায় নিজ-নিজ দেবতার মাহাত্ম্য বাড়াইবার জন্য এইসমস্ত উপাখ্যান সৃষ্টি করিয়াছেন। আবার মনে করুন, রামচন্দ্র রাবণবধ করিলেন। ইহাতে বিষ্ণুর মাহাত্ম্য বাড়িয়া গেল। তখন শাক্তগণ ইহার মধ্যেও কিছু কৌশল করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, রামচন্দ্র দুর্গোৎসব করিয়া দুর্গাকে প্রসন্ন করিয়া তবে রাবণ বধ করিতে পারিয়াছিলেন।

ইন্দ্র এইরূপে বৃত্রাসুরকে বধ করেন। ব্রাহ্মণগণ বলিলেন, আমাদের দধীচি মুনির অস্থিতে বজ্র প্রস্তুত হইয়াছিল, সেইজন্য বৃত্র নিহত হয়। শৈবগণ লিখিল যে শিব জ্বররূপে বৃত্রের শরীরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহাতেই বৃত্র নিহত হয়। বৈষ্ণবগণও ছাড়িলেন না, তাঁহারা বলিলেন যে, বিষ্ণুতেজ ইন্দ্রের বজ্রে প্রবেশ করিয়াছিল সেইজন্য বৃত্র নিহত হয়। এইরূপে ভিন্ন-ভিন্ন উপাসকগণ কর্ত্তৃক ভিন্ন-ভিন্ন সময়ে আমাদের শাস্ত্রসমূহ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া বর্ত্তমান আকারে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি ধর্ম্ম আবির্ভূত হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মের বিনাশ সাধন করিতে পারে নাই, তবে অনেকটা হীনবল করিয়াছিল। উক্ত ধর্ম্মগুলি বৌদ্ধ ধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরোধী না হইয়া উহার সহিত সন্ধি করিয়া লইয়াছিল। শৈব ধর্ম্মে সর্ব ও আশ্রমের ধর্ম্মের প্রাধান্য ছিল না ইহা আমরা

পূর্ব্বে দেখিয়াছি ; আর বৈষ্ণব ধর্ম্মেও ইহার তেমন মর্য্যাদা রক্ষিত হইত না। ব্রাহ্মণগণ এই ধর্ম্মবিপ্লবে যোগ দিয়াও আপনাদিগের নষ্ট প্রাধান্ত ফিরিয়া পাইবার কোনো উপায় দেখিতে পাইলেন না। তখন তাঁহারা এক নূতন মত প্রচার করিলেন। ইহা ধর্ম্ম-বিপ্লবের পঞ্চম স্তর। এই মতে ব্রাহ্মণকেই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ও সমস্ত দেবতাদিগের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ রুষ্ট হইলে সৃষ্টি নাশ করিতে পারেন, আবার ইচ্ছা করিলে জগৎ সৃষ্টি করিতে পারেন, তাঁহাদের ক্ষমতা অসীম, ব্রাহ্মণকে পূজা করিলেই মুক্তি হয়, ব্রাহ্মণকে দান করিলে স্বর্গলাভ হয় ইত্যাদি বিশ্বাস এই সময় প্রচারিত হয়। নিম্নোদ্ধৃত অংশগুলি হইতে পাঠক বুঝিতে পারিবেন, এই মত কিরূপ ছিল।

নারদ শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন "উহারা সকলেই (ব্রাহ্মণেরা) সর্ব্ব লোক শ্রেষ্ঠ ও সমুদয় লোকের অন্ধকার-নাশক। অতএব তুমিও প্রতি-নিয়ত ব্রাহ্মণগণকে পূজা করো।" অনুশাসন ৩১।

ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন "ব্রাহ্মণগণের আরাধনাই রাজাদিগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কার্য্য।" "জলধর যেমন জলধারা বর্ষণ করিয়া শস্যোৎপাদন-পূর্ব্বক লোকের জীবন রক্ষা করিতেছে, সেইরূপ তাঁহাদিগের প্রসাদেও লোক-যাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছে" "তাঁহারা ক্রোধাবিষ্ট হইলে সমুদয় ভস্মসাৎ করিতে সমর্থ হয়েন।" "ব্রাহ্মণেরা পিতৃ, দেবতা, মনুষ্য ও উরগগণের পূজ্য।" "উহারা দেবতাকে ও অদেবতাকে দেবতা করিয়া থাকেন।" অনুশাসন ৩৩।

ভীষ্ম কহিতেছেন, "ব্রাহ্মণগণকে হবনীয় দ্রব্য প্রদান করিলে দেবগণ তাহা গ্রহণ করেন। অতএব ব্রাহ্মণই সর্ব্বপ্রধান; তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। চন্দ্র, সূর্য্য, জলবায়ু ভূমি, আকাশ ও দিক্ সমুদয় ব্রাহ্মণ-শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া অন্নগ্রহণ করিয়া থাকে।" "ব্রাহ্মণগণ পরিতৃপ্ত হইলেই দেবতা ও পিতৃগণ পরম পরিতুষ্ট হন সন্দেহ নাই।" অনুশাসন ৩৪। ব্রাহ্মণগণকে ভূমিদান, অন্নদান, ফল, বস্ত্র, ধন প্রভৃতি দান, জলদান, পাদুকাদান, গাভীদান করিলে অক্ষয় স্বর্গলাভ হয়। অনুশাসন পর্ব্বের ৬৩ অধ্যায় হইতে ৭০ অধ্যায় পর্য্যন্ত কেবল ব্রাহ্মণগণকে কোন্ বস্তু দান করিলে কি ফল হয় তাহাই লিখিত আছে। এইরূপ স্বর্গের লোভ দেখাইয়া ব্রাহ্মণেরা অন্যান্য জাতির নিকট হইতে পূজা পাইবার ব্যবস্থা করিলেন। আজ-পর্য্যন্ত এইরূপ বিশ্বাস ভারতে চলিয়া আসিতেছে।

কেবল স্বর্গের লোভ নয় ইঁহারা সকলকে অভিশাপের ভয়ও দেখাইতেন। ইঁহারা কুপিত হইলে দেবতাকে অদেবতা করিয়া দিতে পারিতেন। ইহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

ভীষ্ম কহিতেছেন,"মেকল, দ্রাবিড়, লাট, পৌণ্ড্র, কোন্নশির—প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের কোপেই শূদ্রতা প্রাপ্ত হইয়াছে।" অনুশাসন ৩৫।

ব্রাহ্মণদিগের পরাভব নিবন্ধন অসুরগণ সলিলে এবং ব্রাহ্মণগণের প্রসাদ-বলে দেবগণ স্বর্গ-মধ্যে অবস্থান করিতেছেন।" অনুশাসন ৩৫।

যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "এই জীবলোকে কাহারা পূজনীয়?" ভীষ্ম উত্তর দিলেন, "ব্রাহ্মণগণকেই নমস্কার করা কর্ত্তব্য। এই জীবলোকে তাঁহারাই পূজনীয়।" "উহারা কুপিত হইলে দেবতার অদেবত্ব ও অদেবতার দেবত্ব সম্পাদন এবং নূতন লোক সমুদয় ও লোক-পালগণের সৃষ্টি করিতে সমর্থ হন।" অনুশাসন ১৫১। এ-যুগে ব্রাহ্মণেরাই ঈশ্বর হইয়া গিয়াছিলেন।

আবার "ঐ মহাত্মাদিগের শাপ-প্রভাবেই সাগরজল নিতান্ত অপেয় হইয়াছে। উহাদিগের কোপানলে দণ্ডকারণ্য অদ্যাপি নির্ব্বাপিত হয় নাই।" অনুশাসন ১৫১। এইগুলি প্রাকৃতিক ঘটনা। ব্রাহ্মণেরা সকলের মনে ত্রাসের সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত এগুলি ব্রাহ্মণের শাপ-প্রভাবেই হইয়াছে, তাহাই প্রচার করিতে লাগিলেন। এইসমস্ত বিশ্বাসের জন্যই লোকে ব্রাহ্মণ দেখিলেই ভয়ে কাঁপিত।

অন্যত্র দেখুন "যেমন তেজস্বী অগ্নি শ্মশানে অবস্থান করিলেও দূষিত হয় না, প্রত্যুত যজ্ঞ ও গৃহে বিধিবৎ ব্যবহৃত হইতে পারে, তদ্রূপ ব্রাহ্মণ যদিও সতত অনিষ্টকর কার্য্যে নিরত থাকেন, তথাপি তাঁহাকে পরম দেবতা-স্বরূপ বলিয়া সমাদর করা কর্ত্তব্য।" অনুশাসন ১৫১। এই সমস্ত অনুশাসনের বলে নিগুণ ব্রাহ্মণগণ আজ পর্য্যন্ত সমাজে পূজিত হইয়া আসিতেছেন ও এইজন্যই ব্রাহ্মণগণ আরও অবনত হইয়া পড়িলেন। কারণ নিগুণ হইয়াও তাঁহারা যদি সমাজের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতে পারেন, তাহা হইলে গুণবান্ হইবার চেষ্টা করিবেন কেন?

নানারূপ অতিপ্রাকৃত ঘটনাও ব্রাহ্মণ-কৃত বলিয়া বহুসংখ্যক উপাখ্যান এইসময় রচিত হয়। পবন কার্ত্তবীর্য্যকে বলিতেছেন "পূর্ব্বে পৃথিবীর অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা অঙ্গরাজের স্পর্দ্ধা সহ্য করিতে না পারিয়া পৃথিবীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক গমন করিলে মহর্ষি কশ্যপ উহাকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে মহর্ষি অঙ্গিরা অনায়াসে পৃথিবীস্থ সমুদয় সলিল পান করিয়া পরিশেষে সমুদয় পৃথিবী সলিলপূর্ণা করিয়াছিলেন। মহাত্মা কপিলদেব ক্রুদ্ধ হইয়া সাগর-মধ্যে সাগর সন্তানদিগকে ভস্মসাৎ করিয়াছেন।" ইত্যাদি। অনুশাসন ১৫৩।

মহর্ষি উতথ্য হ্রদের জল পান করিয়াছিলেন। অনুশাসন ১৫৪। মহর্ষি উতথ্য সরস্বতী নদীকে কহিলেন "তুমি অবিলম্বে এই স্থান হইতে অপসৃত হইয়া মরুদেশে প্রবাহিত হও।" অনুশাসন ১৫৪। সরস্বতী উতথ্যের এই কথা শুনিয়া তথা হইতে অপসৃত হইলেন।

মহর্ষি অগস্ত্যের ক্রোধানলে অসংখ্য দানব দগ্ধ হইয়া অন্তরীক্ষ হইতে নিপতিত হইয়া শমন-সদনে গমন করিল। অনুশাসন ১৫৪।

মহর্ষি বশিষ্ঠ খলী নামে দানবসমুদয়কে ভস্ম করিয়া ফেলিয়াছিলেন। অনুশাসন ১৫৫। পূর্ব্বে দেবাসুর-যুদ্ধের সময় অসুরগণ চন্দ্র সূর্য্যকে শরদ্বারা বিদ্ধ করায় সমস্ত জগৎ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া যায়, ঐ সময় মহর্ষি অত্রি চন্দ্র ও সূর্য্যের রূপ ধারণ করিয়া জগৎ আলোকিত করেন ও তেজোবলে দানবগণকে দগ্ধ করেন। অনুশাসন ১৫৬। মহর্ষি চ্যবন দেবরাজ ইন্দ্রকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। অনুশাসন ১৫৬। কপ নামে অসুরগণ প্রবল হইয়া স্বর্গরাজ্য অধিকার করিলে দেবগণ তাহাদের সহিত যুদ্ধে অসমর্থ হইয়া অবশেষে ব্রাহ্মণদিগের শরণাপন্ন হইলেন। ব্রাহ্মণ-গণ তাহাদিগকে কোপানলে দগ্ধ করিলেন। অনুশাসন ১৫৭। এই-সমস্ত উপাখ্যানে ব্রাহ্মণগণ যে দেবতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহা প্রতিপন্ন হইল।

বাসুদেব প্রদ্যুম্নকে বলিতেছেন "ব্রাহ্মণগণ হইতে সমুদয় কল্যাণ-লাভ হইয়া থাকে, উহাদের অর্চ্চনা করিলে আয়ু, কীর্ত্তি, যশ ও বল পরিবর্দ্ধিত হয়। উহারাই সকলের আদি ও ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।" "ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাঁহাদিগের অগোচর কিছুই নাই। তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইলে সমুদয় জগৎ ভস্মসাৎ করিয়া নূতন লোক ও লোকেশ্বর সমুদয়ের সৃষ্টি করিতে পারেন।" অনুশাসন ১৫৯। এক্ষণে ব্রাহ্মণেরাই ঈশ্বর স্থানীয় হইলেন।

একবার মহর্ষি দুর্ব্বাসা শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণীকে রথে যোজিত করিয়া তদুপরি আরোহণ করিয়া ভ্রমণ করিয়াছিলেন ও তাঁহাদের উপর নানাবিধ উৎপাত করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ ও রুক্মিণী নীরবে সমস্ত উৎপাত সহ্য করিয়াছিলেন। কোনরূপ আপত্তি করিতে সাহসী হন নাই। অনুশাসন ১৫৯।

এইরূপে মহর্ষি চ্যবন রাজা কুশিক ও তাঁহার পত্নীকে রথে যোজিত

করিয়াছিলেন ও তাঁহাদের উপর যৎপরোনাস্তি দৌরাত্ম্য করিয়াছিলেন। তাঁহারা নীরবে সমস্ত সহ্য করিয়াছিলেন। অনুশাসন ৫৩।

পৃথিবীতে শুভ বা অশুভ যে-কোনো বৃহৎ ঘটনা ঘটিত তাহাই ব্রাহ্মণের অনুগ্রহ বা কোপদৃষ্টিতে হইত। এইরূপ উপাখ্যানও বড় কম নহে। এ-সমস্ত এইযুগে রচিত হইয়া নানা শাস্ত্র মধ্যে ও নানা স্থানে সন্নিবেশিত হয়।

যদুবংশ-ধ্বংস ভারতের একটি বৃহৎ ঘটনা। ব্রাহ্মণের অভিশাপেই ইহা ঘটিয়াছিল বলিয়া প্রচার করা হইল। মহর্ষি বিশ্বামিত্র, কণ্ব ও নারদ এই তিন জনকে যদুবংশীয় বালকগণ প্রতারণা করেন। তাঁহারা শাম্বকে স্ত্রীবেশ পরাইয়া মহর্ষিগণের নিকট লইয়া যাইয়া জিজ্ঞাসা করেন, "ইঁহার কি পুত্র হইবে?" মহর্ষিগণ প্রতারণা বুঝিতে পারিয়া ক্রোধভরে কহিলেন "দুর্ব্বৃত্তগণ! এই বাসুদেব তনয় শাম্ব বৃষ্ণি ও অন্ধক-বংশ বিনাশের নিমিত্ত ঘোরতর লৌহময় মুষল প্রসব করিবে।" মৌষল ১। এইরূপ আরও অনেক ঘটনা ব্রাহ্মণের বাক্যে ঘটিয়াছিল বলিয়া মহাভারতে উল্লিখিত আছে।

এইবার আমরা ষষ্ঠ স্তরে আসিয়া পৌঁছিলাম এই স্তরে কতকগুলি উপধর্ম্ম ভারতে প্রচারিত হয়। গোধর্ম্ম তন্মধ্যে একটি। গো-সমূহকে দেবতারূপে পূজা করাই হইতেছে এই ধর্ম্মের অঙ্গ। পূর্ব্বে গো-সমূহ যজ্ঞে বলিরূপে উৎসর্গীকৃত হইত। রন্তি-দেব প্রভৃতি রাজগণ উক্ত যজ্ঞের ফলে স্বর্গে গমন করেন। তৎপরে মনু, কপিল প্রভৃতি মহাত্মাগণ কর্ত্তৃক গো-হত্যা রহিত হয়। অনুশাসন-পর্ব্বের ৭৬ অধ্যায়ে লিখিত আছে, "এক্ষণে উহারা (গো-সমূহ) আর যজ্ঞীয় পশুত্বে কল্পিত হয় না। উহারা এক্ষণে দানের বিষয় হইয়াছে।" পরে তাহারা দেবতা হইয়া দাঁড়ায়। মহর্ষি চ্যবন নহুষকে কহিতেছেন "উহারা সমুদয় লোকের নমস্ত ও অমৃতের আধার-স্বরূপ।" "গাভী স্বর্গের সোপান-স্বরূপ। স্বর্গে দেবগণও উহার পূজা করিয়া থাকে।" অনুশাসন ৫১। গাভীগণ দেবগণেরও পূজনীয় হইয়া গেল।

নচিকেতা যমালয়ে গমন করিলে যম তাঁহাকে বলিতেছেন "তপোধন! যাহারা দুগ্ধাদি প্রদান করেন, এই দুগ্ধাদির হ্রদ তাহাদিগের নিমিত্ত প্রস্তুত রহিয়াছে। যাঁহারা গোদান করেন তাঁহাদের নিমিত্ত এই সমস্ত লোকপূজ্য নিত্য লোক প্রতিষ্ঠিত আছে।" অনুশাসন ৭১।

ব্রহ্মা একসময় ইন্দ্রকে বলিতেছেন,'গোলোক নানা-প্রকার, ঐ লোক-সমুদয় আমার ও পতিব্রতা রমণীগণের দৃষ্টিগোচর হয়।" 'আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি ঐসমুদয় লোকে যেসমস্ত কামচারিণী ধেনু আছে তাহারা স্ব-স্ব অভিলাষানুসারে বিবিধ ভোগ্য বস্তু প্রাপ্ত হইয়া থাকে।" 'ঐ লোক-সমূহে বিবিধ মনোহর বাপী, সরোবর, নদী, বন, পর্ব্বত ও গৃহ সকল বিদ্যমান আছে। ফলতঃ সুবিস্তীর্ণ গোলোক সমূহ অপেক্ষা আর কোনো লোকই উৎকৃষ্ট নহে।" অনুশাসন ৭৩। এখানে দুইটি জিনিষ লক্ষ্য করিবার আছে। প্রথমতঃ আর্য্যদিগের প্রথম স্তরের স্বর্গের কল্পনা আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। চতুর্থ স্তরে ইহার সূত্রপাত হয়। শৈবদিগের স্বর্গ কৈলাস; তথায় শিব তাঁহার স্ত্রীপুত্র, ভৃত্য ও অনুচরবর্গ লইয়া বাস করেন। তথায় মাদক দ্রব্যও আছে। বৈষ্ণবদিগের স্বর্গ বৈকুণ্ঠ। তথায় নারায়ণ সস্ত্রীক ভৃত্যবর্গ লইয়া বাস করেন। মুনি ঋষিগণ মধ্যে-মধ্যে নারায়ণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে তথায় গমন করেন। ইত্যাদি। প্রথম স্তরের স্বর্গ ছিল ইন্দ্রের সভা। তথায় নৃত্য-গীত, সুরা এসমস্ত ছিল। সেখানে মুনি ঋষিগণ বেড়াইতে যাইতেন। ইত্যাদি। দার্শনিক যুগের স্বর্গ বা ঈশ্বর-সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা কোথায় চলিয়া গেল। আজ-পর্য্যন্ত স্বর্গ-সম্বন্ধে এইরূপ বালকের ন্যায় কল্পনা প্রচলিত ধর্ম্মসমূহে চলিয়া আসিতেছে। উপরি-উদ্ধৃত অংশে লক্ষ্য করিবার দ্বিতীয় বিষয় গোলোক। আমাদের ধারণা ছিল গোলোকে শ্রীকৃষ্ণ বাস করেন বা লীলা করেন। এখানে দেখিতেছি গোলোক গোসমূহের লোক; এখানে কেবল কামচারিণী ধেনুসকল বিচরণ করিয়া থাকে।

দক্ষ-দুহিতা সুরভি এক সময় কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা তাঁহার তপে তুষ্ট হইয়া এই বর দিলেন "তুমি আমার প্রসাদে চিরকাল সমুদয় লোকের উপরিভাগে বাস করিতে পারিবে। তোমার লোক গোলোক বলিয়া লোকসমাজে বিখ্যাত হইবে।" অনুশাসন ৮৩।

গৌতম ধৃতরাষ্ট্রকে বলিতেছেন, "ধৃতরাষ্ট্র! প্রজাপতি লোকের ঊর্দ্ধে যে পবিত্র গন্ধ-সম্পন্ন রজো-গুণবিহীন, লোকপূজ্য নিতান্ত দুর্লভ গোলোক-সমুদয় বিদ্যমান রহিয়াছে, তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া এই হস্তী গ্রহণপূর্ব্বক তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।" অনুশাসন ১০২। গোলোকের স্থান প্রজাপতি লোকেরও ঊর্দ্ধে।

ধৃতরাষ্ট্র গৌতমকে কহিলেন যে-যে ব্যক্তি প্রতিবৎসর বহু গোদান করেন তিনিই গোলোক লাভ করিয়া থাকেন। অনুশাসন ১০২। বশিষ্ঠ রাজা সৌদাসকে কহিতেছেন "গোদান-কার্য্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কার্য্য কখনও হয় নাই, হইবেও না," "যাহা দ্বারা এই সচরাচর জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, সেই ভূতভবিষ্যের প্রসূতি ধেনুকে নমস্কার করি।" অনুশাসন ৮০।

ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে কহিতেছেন, "ধর্ম্মরাজ! এই ত্রিলোকের মধ্যে গো-সমুদয় দেবগণের উপরিভাগে অবস্থান করিয়া থাকে।" অনুশাসন ৮১।

অন্যত্র তিনি কহিতেছেন, "যে-মহাত্মা গোদানে একান্ত নিরত হন, তিনি সূর্য্যের ন্যায় প্রভা-সম্পন্ন দিব্য বিমানে আরূঢ় হইয়া জলদজাল ভেদপূর্ব্বক অনায়াসে স্বর্গে গমন করিয়া বিরাজিত হন। তথায় পৃথুনিতম্বিনী সুচারুবেশা, সুরনারীগণ হাবভাবাদির দ্বারা তাঁহাকে সতত আহ্লাদিত ও বীণা বল্লকী, ও নূপুর প্রভৃতির মধুর নিনাদ দ্বারা নিদ্রাবসানে জাগরিত করে।" অনুশাসন ৭৯। প্রথম স্তরের স্বর্গের ন্যায় অপ্সরা ও সুরকন্যার কল্পনাক্রমে গোলোকের সহিত সংযুক্ত হইল।

ভীষ্ম কহিতেছেন, "যেসকল সাধুব্যক্তি অহঙ্কার-পরিশূন্য হইয়া গোদান করেন, তাঁহারাই ইহলোকে কৃতী ও সর্ব্বপ্রদ বলিয়া পরিগণিত হন; এবং পরলোকে পরমলোক গোলোক লাভ করিয়া থাকেন। গোলোকের বৃক্ষ সমুদয় সতত সুগন্ধ পুষ্প সুমধুর ফল ও সুকণ্ঠ বিহঙ্গম-গণে পরিপূর্ণ, ভূমি-সমুদয় মণিময় ও বালুকা-সকল কাঞ্চনময়। ঐ স্থানের জলাশয়-সমুদয় বালার্ক-সদৃশ রক্তোৎপল বনে সুশোভিত, পঙ্ক-বিরহিত এবং সর্ব্বর্ত্তু-সুখপ্রদ সরোবর-সকল মণিময় পত্র ও সুবর্ণ সদৃশ কেশরসমন্বিত নীলপদ্ম ও অন্যান্য পদ্মে পরিপূর্ণ; নদী সমুদয়ের তীরভূমি নির্ম্মল মুক্তা, মহাপ্রভাযুক্ত মণি, সুবর্ণ বিকশিত করবীর বৃক্ষ, কল্পবৃক্ষ এবং নানা রত্নময় ও সুবর্ণময় বিবিধপাদপে সমলঙ্কৃত এবং সুবর্ণগিরিসকল মণিরত্নখচিত অতি মনোহর শিলাতল ও রত্নময় উন্নত শৃঙ্গে সুশোভিত।" অনুশাসন ৮১। মানুষ যত-রকম ঐশ্বর্য্যের কল্পনা করিতে পারে তাহা এখানে করা হইয়াছে। ঐশ্বর্য্যে ইহা অন্য সকল স্বর্গকে পরাস্ত করিয়াছে।

আরও কতকগুলি উপধর্ম্ম এই যুগে প্রচারিত হয়। যথা তীর্থ-যাত্রা, উপবাস, দান, ধর্ম্ম, বার-ব্রত ইত্যাদি। এই সকল ধর্ম্মের অধিকাংশই শিষ্টাচার-যুগে বা বৌদ্ধযুগে উৎপন্ন হয়, পরে ব্রাহ্মণদিগের হস্তে পড়িয়া কিছু রূপান্তরিত হইয়াছে।

দুর্গা, কালী, গঙ্গা প্রভৃতি দেবীগণের পূজা ইহার পরবর্ত্তী যুগে প্রচারিত হয়। দুর্গা নাম মহাভারতে ২।১ স্থলে দৃষ্ট হয়। পাণ্ডবেরা

যখন বিরাট নগরে প্রবেশ করিতেছেন তখন যুধিষ্ঠির দুর্গাকে আহ্বান করিয়া পাণ্ডবগণকে রক্ষা করিতে বলিতেছেন। দুর্গা তাঁহার স্তবে তুষ্ট হইয়া পাণ্ডবদিগকে দর্শন দিলেন। বিরাট ৬। কালীনাম মহাভারতে আরও কম দৃষ্ট হয়। উপমন্যু মহাদেবের স্তব করিতেছেন, হে দেবাদিদেব মহাদেব! তুমি ইন্দ্রস্বরূপ বজ্রধারী এবং পিঙ্গল ও অরুণ বর্ণ।............কালীমূর্ত্তি তোমার একান্ত প্রিয়। ইত্যাদি। অনুশাসন ১৪।

এইরূপ একটি কি দুইটি স্থান ব্যতীত দুর্গা, কালী নাম বা উক্ত দেবীগণের মাহাত্ম্য মহাভারতে দৃষ্ট হয় না। এজন্য বোধ হয় এগুলি খুব আধুনিক।

অনুশাসন ২৬ অধ্যায়ে গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। গঙ্গাকে দেবীরূপে কল্পনা, ইহা মহাভারতের অনেক স্থলে দৃষ্ট হয়।

মহাভারত রচনার পর ভারতে ধর্ম্মের অনেক স্তর পড়িয়াছে। যথা:—শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদ, তান্ত্রিকধর্ম্ম, রামানুজ ও চৈতন্যের ধর্ম্ম, নানক কবীর ও রামদাস স্বামীর ধর্ম্ম আর আধুনিক যুগের রামমোহন,কেশব সেন, দয়ানন্দ, বিবেকানন্দ, ও ম্যাডাম্ ব্ল্যাভাট্স্কি প্রভৃতির ধর্ম্ম।

অনেকে মনে করেন ভারতে একটি মাত্র ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে ও প্রাচীন কাল হইতে তাহাই চলিয়া আসিতেছে। এই ধারণা কতদূর ভ্রমাত্মক তাহা এখন সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। আর এই ধারণাটিই নূতন। প্রাচীন ভারতে কাহারও এরূপ বিশ্বাস ছিল না। অনেকে বলেন, আমাদের ধর্ম্ম এক তবে ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীর নিমিত্ত ঋষিগণ কেবল ভিন্ন ভিন্ন পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন। মহাভারতে এই অধিকারীর কথা কোথাও নাই। বরং এই বিভিন্ন মতগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম বলা হইয়াছে। অন্যকে স্বধর্ম্মে আনয়ন করিবার নিমিত্ত বা স্বমত স্থাপনের নিমিত্ত বা নিজের ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিবার নিমিত্ত তাঁহারা কত তর্ক-বিতর্ক, বাদ-বিসম্বাদ করিতেন তাহা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। ভীষ্ম কি বলিতেছেন শুনুন, "যেমন বর্ষাকালে বৃষ্টি দ্বারা নূতন বিবিধ স্থাবরজঙ্গমের সৃষ্টি হয়, তদ্রূপ প্রতি যুগেই নূতন নূতন ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়া থাকে।" শান্তি ২৭২।

ভারতে কতগুলি ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা স্বর্গের সংখ্যা হইতেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। জগতে দেখা যায় প্রত্যেক ধর্ম্মে একটি করিয়া স্বর্গ থাকে। ইহাই স্বাভাবিক। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মে স্বর্গের ধারণা বৈদিক যুগের পিতৃলোক, ইন্দ্রলোক, যমলোক প্রভৃতি পরবর্ত্তী কালের ব্রহ্মলোক, শিবলোক বা কৈলাস, বিষ্ণুলোক বা বৈকুণ্ঠ, গোলক প্রভৃতি স্বর্গ সমূহ ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের উৎপত্তির সাক্ষ্য দিতেছে।

বেদে যে নানা দেবতা ও নানা লোকের কথা আছে, ইহাতে বোধ হয় বৈদিক ধর্ম্মও অনেকগুলি ধর্ম্মের সমষ্টি। কোন সম্প্রদায় ইন্দ্রের উপাসনা করিত, কোন সম্প্রদায় বরুণের উপাসনা করিত, কেহ যমের উপাসনা করিত, ইত্যাদি। বেদে প্রত্যেক দেবতাকেই ঈশ্বর-স্বরূপে উপাসনা করা হইয়াছে। এক ধর্ম্মে বহু ঈশ্বর থাকিতে পারে না, বহু খণ্ড দেবতা থাকিতে পারে। ইহাতেই বোধ হয় বৈদিক ধর্ম্ম নানা ধর্ম্মের সমষ্টি। বহু পূর্ব্বকালে এইসমস্ত ধর্ম্মাবলম্বীকে এক সূত্রে গাঁথিবার চেষ্টা করা হয়। তাহারই ফলে বোধ হয় বেদ সঙ্কলিত হয়। এই কার্য্য ইন্দ্রপূজকগণই বোধ হয় করিয়াছিলেন। কারণ ইন্দ্রই বৈদিক স্বর্গের রাজা। ভারতে যুগে-যুগে নানা ধর্ম্ম ও উপধর্ম্ম মিলাইবার চেষ্টাও বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। পিতৃপুরুষের পূজা বোধ হয় সর্ব্বপ্রাচীন ধর্ম্ম। নানা ধর্ম্মবিপ্লবের মধ্যে দিয়া এই একটি মাত্র বহু প্রাচীন অনুষ্ঠান ভারতে চলিয়া আসিতেছে। যে যে সম্প্রদায়েরই লোক হউক না কেন পিতৃপুরুষের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ তর্পণ প্রভৃতি সকলেই করিয়া থাকে। আমরা যে পূর্ব্বপুরুষগণকে সর্ব্বজ্ঞ ও অসীম ক্ষমতাপন্ন প্রমাণ করিবার চেষ্টা করি তাহা এই পিতৃপুরুষগণের উপর অসামান্য ভক্তির জন্যই।

এখন আমরা দেখিলাম ভারতে যুগে যুগে নানা প্রকার ধর্ম্ম উদ্ভূত হইয়াছে। বর্ত্তমান ভারতীয়গণ ইহার মধ্যে কোন-একটি বিশেষ ধর্ম্মাবলম্বী নহেন। তাঁহারা এই সমস্ত ধর্ম্মের প্রত্যেকেরই কিছু কিছু অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপে আমরা দেখি সর্ব্বপ্রাচীন ধর্ম্মের শ্রাদ্ধ, তর্পণ, বৈদিক ধর্ম্মের সন্ধ্যা গায়ত্রী ও স্বর্গের কল্পনা উপনিষদের এক ব্রহ্ম, সাংখ্যের প্রকৃতিবাদ, যোগশাস্ত্রের প্রাণায়ামাদি, বেদান্তের মায়াবাদ; বৌদ্ধধর্ম্মের জন্মান্তরবাদ, বার ব্রত, দান ধর্ম্ম ধর্ম্মপূজা জগন্নাথ পূজা প্রভৃতি; শৈব ধর্ম্মের শিবপূজা বৈষ্ণবে বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিষ্ণুপূজা ও এই উভয়বিধ ধর্ম্মের নানাবিধ অনুষ্ঠান, তান্ত্রিক ধর্ম্মের কালীপূজা দুর্গাপূজা ও নানা উপধর্ম্মের মধ্যে গঙ্গাপূজা,গো-পূজা,তীর্থযাত্রা, ব্রাহ্মণ-ভক্তি,চৈতন্যের হরিনাম ও রাধাকৃষ্ণ উপাসনা, রামানুজের রামনাম-দ্রাবিড় জাতির সর্পপূজা ও অসংখ্য গ্রাম্যদেব দেবীর পূজা, রোগ উপশমের জন্য শীতলা, ওলাদেবী প্রভৃতির পূজা এই সমস্ত একত্র মিশিয়া বর্ত্তমান 'হিন্দু' নামক কল্পিত মহাধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা একবারও ভাবিয়া দেখি না এতগুলি পরস্পর-বিরোধী মত একত্রে এক ধর্ম্মের অঙ্গী হইয়া কি করিয়া থাকিতে পারে।

রাগ-রাগিণীর রূপ ও আলাপ

সঙ্গীতাচার্য্য শ্রী গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

ভৈরবী, সিন্ধু ও রামকেলী

গত সংখ্যায় যে ভৈরব রাগের রূপ ও আলাপ ইত্যাদি প্রকাশ করা হইয়াছে তাহার ছয়টি রাগিণী অর্থাৎ ভৈরবের পত্নী পর-পর দেওয়া হইবে।

হনুমন্ত-মতে ছয় রাগ ত্রিশ রাগিণীর বিবরণ অনেক পুরাতন গ্রন্থে প্রকাশ আছে। কিন্তু "সংস্কৃত সঙ্গীতসার" নামক গ্রন্থে এই মতেই ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীর বিবরণ আছে। অতএব এই মতই উত্তম, কারণ ছয় রাগ ত্রিশ

রাগিণী অপেক্ষা ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীর বিষয় সকলে বিদিত আছেন, তবে পূর্ব্বের গ্রন্থে এ-সম্বন্ধে যে-প্রকার অনৈক্য দৃষ্ট হয়, তাহা পাঠকগণ দেখিলে বুঝিবেন, অর্থাৎ কোনো মতে যাহা রাগ অন্য মতে তাহা রাগিণী। পুত্রপুত্রাদি সম্বন্ধেও ছেলাখেলার ন্যায় লিখিত হইয়াছে। হয়ত কেহ বলিতে পারেন যে, পূর্ব্বের গ্রন্থ কি ভুল? কিন্তু ভুল হওয়ায় আশ্চর্য্য কি; পূর্ব্বের যে-সকল ভালো-ভালো গ্রন্থ আছে তাহা হয়ত সকলে দেখেন নাই। সঙ্গীত-অনভিজ্ঞ লোক নিজে মনগড়া কোনো মত করিয়াছেন।

উপস্থিত ক্ষেত্রে কত লোক রহিয়াছেন, যাঁহারা সঙ্গীত শিক্ষা না করিয়া পরের জিনিষ লইয়া এবং তাহা ভুল কি ঠিক, ইহা বিচার করিবার ক্ষমতা না থাকাতেও অন্ধের ন্যায় লিখিবার রীতি ছাড়েন না। হয়ত এক-আধটা গান শিক্ষা করিয়াই বড়-বড় লোকের বিষয় আলোচনা করেন। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, পাশ্চাত্য-জগতের ন্যায় সুবিচার এতদ্দেশে নাই, তথায় প্রকৃত গায়ক-ভিন্ন অন্য কেহ আচার্য্যপদ প্রাপ্ত হন না। কিন্তু এতদ্দেশে শিক্ষা-ব্যতীতও কেহ নিজেকে আচার্য্য বলিয়া লেখেন, ইহাতে তাঁহাদের মনে একটুও লজ্জা হয় না। যদি এমন-কিছু নিয়ম থাকিত যে, ঐপ্রকার মিথ্যাবাদীদিগকে পুলিশে ধরিয়া লইয়া যায়, তাহা হইলে ভালো হইত। এইসব লোক দ্বারা প্রকৃত বিদ্যার মান লোপ পায়। এক্ষণে গ্রন্থ-সম্বন্ধে বহু মত-ভেদ সত্ত্বেও যে মত হিন্দুস্থানে বহুলভাবে প্রচারিত তাহাই দেওয়া হইতেছে। রাগিণী-সম্বন্ধে কিছু পরিবর্ত্তন করা হইল। কিজন্য পরিবর্ত্তন করা হইল, তাহা ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণী লেখা শেষ হইলে বুঝাইয়া দিব।

ভৈরবী সৈন্ধবী রামকিরী মাঙ্গলিকা তথা।
বঙ্গালী কলিঙ্গা চৈব ভৈরবস্য বরাঙ্গনাঃ॥

অর্থাৎ ভৈরবী, সৈন্ধবী, রামকিরী, মাঙ্গলিকা, বঙ্গালী, কলিঙ্গা, এই ছয়টি ভৈরব-রাগের পত্নী।

চলিত কথায় সিন্ধু, রামকেলী, মঙ্গল, কলিঙ্গড়া এইরূপ ব্যবহার হয়।

কেহ-কেহ বলেন, রামকিরী, রামকেলী হইল কেন? কিন্তু র ও লয়ের ভেদ নাই; "রলয়োরভেদঃ" (সংক্ষিপ্তসার)। অর্থাৎ 'র'-এর স্থানে 'ল' এবং 'ল'-এর স্থানে 'র', ইহা শাস্ত্র-সঙ্গত ব্যবহার। যথা—বারঃ বালঃ; মূরং মূলম; অরং অলমং ইত্যাদি।

ভৈরবী-ধ্যানম্

কাসারমধ্যস্ফটিকোচ্চগেহে, পঙ্কেরুহৈর্ভৈরবমর্চ্চয়ন্তী।
তারস্বরা বদ্ধবিশুদ্ধগীতা, বিশালনেত্রা কিল ভৈরবীয়ম্॥

ভাবার্থ—বিশাললোচনা ভৈরবপত্নী ভৈরবী অতি রমণীয়
সরোবরমধ্যস্থ উচ্চ স্ফটিকগৃহে উপবিষ্টা হইয়া
তারস্বরে বিশুদ্ধ গীতি দ্বারা পদ্ম-পুষ্পের অঞ্জলি-
সহকারে ভৈরবের অর্চ্চনা করিতেছেন।

সম্পূর্ণ জাতি।
র, গ, ধ ও নি
কোমল।
ম...বাদী।
প...সংবাদী।

ভৈরবী—আলাপ

অস্থায়ী।

সা	ণ্‌া	সা	জ্ঞা	মা	-া	জ্ঞা	ঋা	জ্ঞা	সা	।
তা	•	•	লা	•	•	তে	•	•	না	•
ণ্‌া	দ্‌া	পা	-া	-া	ম্‌া	ণ্‌া	দ্‌া	ণ্‌া	সা	-া
তে	•	না	•	•	তো	•	ম্	না	•	•

দা্ ণ্া সঋা জ্ঞা -া -া মা জ্ঞা ঋা জ্ঞা সা -া
তে ০ রি ০ ০ ০ ০ রে ০ ০ ০ না ০
সা দা -া । পা । । মজ্ঞা জ্ঞা -া মা ণা দা -পা
তে ০ ০ ০ না ০ ০ তো ০ ম্ না ০ নে তে
মজ্ঞা -া । সঋা সা মা জ্ঞা ঋা -া সা ।
না ০ ০ তো ০ ০ ০ ০ ০ ম্ না ০
সা সা সা সণা সণা ঋা -া সা -া ॥
তে রে না তে না ০ ০ তো ম্

অন্তরা

মা ণা দা ণা র্সা -া র্সা । দা ণা র্সা র্ঋা র্জ্ঞা -া র্সা র্ঋা
তো ০ ম্ না ০ ০ নে ০ তে ০ রি ০ ০ ০ রে ০
র্মা র্জ্ঞা -া র্ঋা -া র্জ্ঞা র্সা -া । ণা দা ণা র্সা র্সা র্ঋা
০ না ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ তে ০ ০ ০ না ০
ণা র্ঋা র্সা -া । । ণদা পা মজ্ঞা জ্ঞা ঋা জ্ঞা সা -া
০ ০ না ০ ০ ০ রো০ ম্ না০ ০ ০ ০ না ০
সা সা সা সণ্া সণ্া ঋা । সা -া ॥
তে রে না তে না ০ ০ তো ম্

সঞ্চারী

সা দা -া পা পা মা জ্ঞা জ্ঞা । । সা ঋা সা জ্ঞা
আ ০ ০ নে তে ডে রে না ০ ০ তো ০ ০ দ্
দা্ ণ্া জ্ঞা্ । । মা মা জ্ঞা ঋা -া জ্ঞা সা -া ।
না ০ ০ ০ ০ তে ০ না ০ ০ ০ না ০

আভোগ

দা মা দা ণা র্সা । । । র্জ্ঞা র্ঋা র্সা র্মা
না ০ তে রো ০ ০ ০ ম্ না ০ ০ তে
র্জ্ঞা -া র্ঋা -া র্জ্ঞা সা -া ণা দা পা মা জ্ঞা
রি ০ ০ ০ রে না ০ তে রে নে রি ০
ঋা -া জ্ঞা সা -া সা সা সা সণ্া সণ্া ঋা -া
রে ০ ০ না ০ তে রে মা তে না ০ ০
সা -া ॥
তো ম্

ভৈরবী—চৌতাল

আদ রমা জ্যোতি কো জো জন জানে অন্তর্য্যামী,
পাবে জৈসে জোই ধাবে তাহে দেত অচল শরণ।
হোত প্রথম তেজ ঔর পূর্ণকো প্রতাপ বঢ়ত,
ঘটত অঘ য়ে জ্ঞান কুমতি প্রীতি অপ্রতীত চরণ।
গাবত গুণ নারদাদি, আদি সে সুরেশ শেষ,
অন্ত নাহি পাবে পার, তুম সে সব হোয়ী স্বজন।
মাঙত হৈঁ ভক্তি অভেদ, দেহি মা কৃপা আনন্দ,
ঔর কাকো যাচ ভয়ে, তুম সবকো দালিদ্র হরণ॥

আনন্দ ঘন।

অস্থায়ী

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪ ১´
ণঃ দাঃ । া পমা । পা - া । মা - া । জ্ঞা মজ্ঞা া । ণ্‌া । সা ঋা ।
অা ০ ০ দ র মা ০ জ্যো ০ তি কো ০ সো জ ০
০ ২ ০ ৩ ৪ ১ ০
মা - া । দা পা । মা জ্ঞা । জ্ঞা ঋা । জ্ঞা সা । সা - া । দা - া ।
ন ০ জা নে অ ০ ন্ত র্য্যা ০ মী পা ০ বে ০
২ ০ ৩ ৪ ১´ ০ ২
দা পা । মা ণা । দা ণা । র্সা র্সা । ণা - া । পা ধণা । -া পা ।
জৈ সে জো ই ০ ধা ০ বে তা ০ হে দে০ ০ ত
০ ৩ ৪
পা দ । মা পা । জ্ঞা মা ।
অ চ ল শ র ণ

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪ ১
*দা - া । দা দা । ণা ণা । র্সা - া । র্সা র্সা । র্সা র্সা । সা র্জ্ঞা ।
হো ০ ত প্র থ ম তে ০ জ অ ও র পূ ০
০ ২ ০ ৩ ৪ ১
র্জ্ঞা র্জ্ঞা । া র্মা । র্জ্ঞা -া । র্ঋা র্ঋা । র্সা র্সা । দা র্জ্ঞা ।
র্ণ কো ০ প্র তা ০ প ব ঢ় ত ঘ ট
০ ২ ০ ৩ ৪ ১´ ০
র্জ্ঞা র্জ্ঞা । র্জ্ঞা র্মা । র্জ্ঞা -া । র্ঋা র্ঋা । র্সা র্সা । ণা -া । পা দা ।
ত অ ঘ য়ে জ্ঞা ০ ন কু ম তি প্রী ০ তি অ
২ ০ ৩ ৪
-া র্সা । ণদা পা । মা পা । জ্ঞা মা ।
০ প্র তী০ ০ ত চ র ণ

* রমা—লক্ষ্মী, এই গানটি লক্ষ্মী-বিষয়-বর্ণন

সঞ্চারী

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
ণ্‌া সা । জ্ঞা মা । পা পা । দা -া । দা পা । -া পা ।
গা ০ ব ত গু ণ না ০ র দা ০ দি
১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
জ্ঞা পা । পা ণদা । া পা । মা জ্ঞা । জ্ঞা জ্ঞঋা । া সা ।
আ ০ দি সে০ ০ সু রে ০ শ শে০ ০ ষ
১´ ০ ২ ০ ৩ ৪ ১´
ণ্‌া -া । দ্‌া ণ্‌া । সা সা । ণা দ্‌া । দ্‌া প্‌া । া প্‌া । সা দা ।
অ ০ স্ত না ০ হি পা ০ বে পা ০ র তু ম
০ ২ ০ ৩ ৪
পা মা । দা পা । মা জ্ঞা । জ্ঞা জ্ঞা । ঋা সা ।
সে ০ স ব হো ০ য়্যী সু জ ন

আভোগ

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪ ১´
দা মা । দা ণা । র্সা -া । র্সা -া র্ঋা ণা । র্সা র্সা । র্জ্ঞা -া ।
মা ০ ঙ্গ ত হৈঁ ০ ভ ০ ক্তি অ ভে দ দে ০
০ ২ ০ ৩ ৪ ১´ ০
জ্ঞা র্জ্ঞা । া র্মা । র্জ্ঞা র্ঋা । র্ঋা র্সা । -া র্সা । দা র্জ্ঞা । জ্ঞা র্জ্ঞা ।
হি মা ০ ক্রু পা ০ আ ন ০ ন্দ ঔ ০ র কা
২ ০ ৩ ৪ ১´ ০ ২
া র্মা । র্জ্ঞা র্ঋা । র্ঋা র্জ্ঞা । র্সা -া । ণা ণা । পা দা । ণা পা ।
০ কো যা ০ চ ভ য়ে ০ তু ম স ব কো দা
০ ৩ ৪
দা -া । মা পা । জ্ঞা মা ॥
লি ০ দ্র হ র ণ

সৈন্ধবী-ধ্যানম্

ত্রিশূলপাণিঃ শিবভক্তিরক্তা, রক্তাম্বরা ধারিতবন্ধুজীবা।
মনোহর-সরস-স্বর-যুক্তা সা সৈন্ধবী ভৈরবরাগিণীয়ম্ ॥

ভাবার্থ :—শিবভক্তিমতী সৈন্ধবীর পরিধানে রক্তবস্ত্র, একহস্তে
ত্রিশূল ও অন্যহস্তে একটি বাঁধুলী পুষ্প ধারণ করিয়াছেন।
ভৈরবপত্নী সৈন্ধবী সুমিষ্ট এবং রসযুক্ত স্বর।

সম্পূর্ণ জাতি।
র—বাদী।
প—সংবাদী।
গ ও নি কোমল।

সিন্ধু—আলাপ

অস্থায়ী

সণ্‌া সা রা -া রা পা -া মা রমা জ্ঞা -া রা সা -া
তো০ ম্ না ০ তে ০ ০ রি রে০ ০ ০ না ০ ০

সরা জ্ঞা রা -া ণ্া সা ণ্া ধ্া প্া -া -া মা -া
তে৹ ৹ না ৹ রি ৹ রে ৹ না ৹ ৹ তো ম্

প্ধ্া ণ্সা -া ণ্া জ্ঞা রা -া -া রপা মপা রমা
না৹ ৹৹ ৹ তে ৹ না ৹ ৹ তে৹ ৹৹ ৹৹

জ্ঞা -া রা সা -া সা সা সা সণ্া সণ্া সা রা -া সা
৹ ৹ না ৹ ৹ তে রে না তে না ৹ তো ৹ ম্

অন্তরা

মা -া পধা ণর্সা -র্া র্সা র্সা -া ধণা র্সর্রা র্জ্ঞা র্রা -া
তে ৹ না৹ ৹৹ ৹ তে রে ৹ না৹ ৹৹ তে ৹ ৹

র্পা র্মা র্রর্মা র্জ্ঞা র্রা র্সা -া র্সা ণা -া ধপা মা -া
তো ৹ ৹ম না ৹ ৹ ৹ রি ৹ ৹ রে৹ ৹ ৹

পা র্সা ণা -া ধা পা মজ্ঞা -া রা ণা ধপা মা
না ৹ ৹ ৹ নে তে রি৹ ৹ রে না ৹৹ ৹

জ্ঞা রা -া রমা জ্ঞা -া রা সা সা সা সা
৹ ৹ ৹ তো৹ ৹ ম্ না ৹ তে রে না

সণ্া সণ্া সা রা -া সা ॥
তে না ৹ তো ৹ ম্

সঞ্চারী

মা পা মা জ্ঞা রা রমা জ্ঞা -া রসা সণ্া সা জ্ঞা রা -া
তে রে নে রি ৹ রে৹ না ৹ ৹৹ তো৹ ম্ না ৹ ৹

মা পা ণা জ্ঞা রা -া রমা জ্ঞা রা সা -া ।
রি ৹ ৹ রে না ৹ তা৹ ৹ না ৹ ৹

অভোগ

ণধা মা -া পা র্সা -া র্সা ণা র্জ্ঞা রা -া -া
তে৹ ৹ ৹ না ৹ ৹ রি রে ৹ না ৹

ণা র্সা -া -া ণা -া ধপা মা মা ধপা
তো ৹ ৹ ম্ না ৹ ৹৹ ৹ রি ৹৹

মা জ্ঞা রা রমা জ্ঞা রা সা সা সা সা
রে ৹ ৹ না৹ ৹ ৹ ৹ তে রে না

সণ্া সণ্ সা রা -া সা -া ॥
তে না ৹ তো ৹ ৹ ম

সিন্ধু—চৌতাল-

এ লালা জীয়ো জোঁলোঁ গঙ্গা যমুনা জল
তরণি ধরণী ধ্রুব তারো।
বেগ বঢ়ো বঢ় হোহু বিরধ লট
যশোমতি পুত তিহারো।
ভক্ত হেত অবতার লিয়ো হৈ
মেটন কোঁ ভুব ভারো।
ধোঁধিকে প্রভু তুম চির জীও
ব্রজ-জন-প্রাণ অধারো॥

ধোঁধি খাঁ

৩ ৪ ১ ০ ২
সা -রা । মা -পা I সা -র্সা । -ণা ণা । -ধা পা ।
এ ০ লা ০ লা ০ ০ জী ০ য়ো

০ ৩ ৪ ১ ০ ২
মা জ্ঞা । -জ্ঞা রসা । -রা রা । রা -পা । -পা মা । জ্ঞা রা ।
জোঁ লোঁ ০ গ০ ০ ঙ্গা য ০ ০ মু ০ না

০ ৩ ৪ ১ ০ ২
রা -জ্ঞা । -মা জ্ঞা । -রা সা । সা ণ্‌া । -সা রা । -মা -মা ।
জ ০ ০ ল ০ ০ ত র ০ ণি ০ ০

০ ৩ ৪ ১ ০ ২
পা পা । -মা পা । -র্সা -ণা । ণা ধা । -পা মা । -পা মা ।
ধ র ০ ণী ০ ০ ধ্রু ব ০ তা রো

০
-জ্ঞরা মজ্ঞা II
০ ০

১ ০ ২ ০ ৩ ৪
মা -া । পা -ধা । ণা -র্সা । র্সা -না -র্সা র্সা । -র্সা র্সা I
বে ০ গ ০ ব ০ ঢ়ো ০ ০ ব ০ ঢ়

১ ০ ২ ০ ৩ ৪
র্সা -া । -না র্সা । -র্রা র্রা । র্সা -র্সা । ণা ধা । পা মা]
হো ০ ০ হ ০ ০ বি ০ র ধ ল ট

১ ০ ২ ০ ৩ ৪
মা -পা । না -র্সা । র্রা র্রা । র্রা -র্জ্ঞা । -মা র্জ্ঞা । -র্রা -র্সা
ষ ০ শো ০ ম তি পূ ০ ০ ত ০ ০

১ ০ ২ ০
র্সা -ণা । ধা -পা । -মপা মা । -জ্ঞরা -মজ্ঞা II
তি ০ হা ০ ০০ রো ০ ০ ০ ০

১ ০ ২ ০ ৩ ৪
পা -র্সা । না র্সা । -সা র্রা । র্সা -র্সা । ণা ধা । -পা মা I
ভ ০ ক্ত হে ০ ত ঋ ০ ব তা ০ র

১ ০ ২ ০ ৩ ৪
মা জ্ঞা । -রা রা । -পা -মা । রা -মা । জ্ঞা জ্ঞা । -রা সা I
লি য়ো ০ ঠৈ ০ ০ মে ০ ০ ট ০ ন

১ ০ ২ ০ ৩ ৪
সা ণ্‌া । -সা রা । -পা মা । পা -মা । -মা জ্ঞা । -রসা রা I
কোঁ ০ ০ ভু ০ ব ভা ০ ০ ০ ০ ০ রো

১ ০ ২ ০ ৩ ৪
মা -া । পা -ধা । ণা -র্সা । র্সা -না । -র্সা র্সা । -া -র্সা I
ধেঁ ০ ধি ০ কে ০ প্র ০ ০ ভু ০ ০

১ ০ ২ ০ ৩ ৪
র্সা -না । -র্সা র্সনা । -র্সা -র্রা । র্সা র্সা । ণা ধা । -পা মা I
ভু ০ ০ ম ০ ০ ০ চি ০ র জী ০ ও

১ ০ ২ ০ ৩ ৪
মা -পা । না -র্সা । র্রা র্রা । র্রা -র্জ্ঞা । -র্মা -জ্ঞা । র্রা -সা I
ত্র ০ জ ০ জ ন প্রা ০ ০ ০ ণ ০

১ ০ ২ ০
র্সা ণা । ধা পা । -মপা মা । -জ্ঞরা -মজ্ঞা II II
অ ০ ধা ০ ০০ রো ০০ ০

রামকিরী-ধ্যানম্

স্বর্ণপ্রভা ভাস্বরভূষণাঢ্যা, সমিন্দ্রনীলং বপুষা বহন্তী।
কান্তে পদোপান্তমধিস্থিতেঽপি, মানোন্নতা রামকিরী প্রদিষ্টা॥

ভাবার্থ:—স্বর্ণপ্রভা, উজ্জ্বল-বসন-ভূষিতা, নীলকান্তমণিধারিণী, মানিনী রামকিরী পদপ্রান্তস্থিত কান্তের প্রতি দৃক্‌পাতও করিতেছেন না।

ঋ ও ধ কোমল
দুই নি
গ বাদী
প সংবাদী

রামকেলী—আলাপ

আস্থায়ী

সন্‌া সা মগা ম্া পা দা -া পা মা গা -া ঋা সা ঋা মা গা -া
না০ ০ তে ০ ০ না ০ ০ ০ ০ ০ তো ০ ০ ম্ না ।
ঋা সা া সা ন্‌া দ্‌া‿সা -া সা ঋা গা -া মা পা -া
০ ০ ০ তে ০ ০ ০ ০ না ০ ০ ০ তে ০ ০
দা র্সা নর্সা দা -া পা পদা পা মা গা -া সা ঋা
রো ০ ০০ ০ ম্ না ০০ ০ ০ ০ ০ রি ০
গা -া মা গা ঋা -া সা সা সা সা সন্‌া সন্‌া ঋা া সা -া ॥
০ ০ ০ রে ০ ০ না তে রে না তে না ০ • তো ম্

অন্তরা

দা দা র্সনা র্সা -া র্সা র্সা -া র্সা র্গা র্মা র্গা র্ঋা -া র্সা -া
তা ০ ০০ ০ ০ নে তে ০ তে ০ ০ রি ০ ০ রে ০
র্সা -া না দা পা -া া পা দা মা পা গা -া দা পা মা পা
না ০ ০ ০ ০ ০ ০ তো ০ ০ ০ ০ ম্ না ০ ০ ০
র্সা -া দা -া পা মা পা গা পা মা গা ঋা -া সা -া
০ ০ ০ ০ রি ০ ০ ০ রে ০ ০ ০ না ০
সা সা সা সনা সনা ঋা -া সা -া ॥
তে রে না তে না ০ ০ তো ম্

সঞ্চারী

দা দা পা -া মা পা গা -া মপা -া
তে রে না ০ রি ০ ০ ০ ০ ০
দপা পমা মগা ঋা গা -া মগা ঋা -া সা সন্‌
রে০ না০ তোন্ না ০ ০ ০০ ০ ০ না তে০
দা -া সা -া I
০ ০ ০ ০

অভোগ

নদা নদা দা পা
তে রে না ০

পদা র্সা -া র্সা -া । র্সনা র্সদা সর্না ঋর্সা -া র্সা দা পা
তো ০ ম্ না ০ ০ তে রে ০ ০ ০ না ০ ০ ০

নদা -া দা পা মা গা পা -া দমা পা গা মা গা ঋা -া সা -া
রি ০ রে না ০ তে রে ০ ০০ ০ ০ ০ না ০ ০ ০ ০

সা সা সা সনা সনা ঋা -া সা -া ॥
তে রে না তে না ০ ০ তো ম

রামকেলী—চৌতাল

আজ স্বপন মে সাঁবরী সলোনী স্থুরত
দেখি, শৈনন করি মোসো বাত।
তব তে মৈ বহুত স্থুখ পায়ো,
জাগত ভয়ি পরভাত॥
মধুর বচন বোল মদন, মন্ত্র পঢ় ভারী
উন বিন ছিন ছিন কছু ন শোহাত।
বৈজু কে প্রভু ব্রজ কি নারী যন্ত্র মন্ত্র
লিখি সারী, কল ন পরত ছিন ঘরি দিন রাত॥

বৈজুবাবরা

অস্থায়ী

০ ৩ ৪ ১ ০ ২
দা পদা । মপা মগা । মা পা । দা দা । পদা দা । পা পা
আ জ০ স্ব০ প০ ন মে সা ব রী ম লো নী

০ ৩ ৪ ১ ০ ২ ০
মা দপা । পদা পদা । মপা গা । মা দা । পা মা । মা গা । পা গা
স্থু ০০ ০০ র০ ০০ ত দে ০ ০ ০ ০ ০ খি ০

৩ ৪ ১ ০ ২ ০ ৩
মা গা । ঋা সা । সনা সা । গা মা । মা গা । মা দা । পা পমা
০ ০ ০ ০ শৈ১ ০ ন ০ ন ০ ক রি ০ মো০

৪ ১ ০ ২
পা পা । র্সনা র্সা । র্সা না । দা পা ।
০ সো বা০ ০ ০ ০ ০ ত

১´　০　২　০　৩　৪　১´
দা দা । পা মা । ণদা র্সা । র্সা না । র্সা র্সা । র্সা র্সা । র্সা না ।
ত ব　০ তে　০০ ০　মৈ ০　০ ব　০ হূ　ত ০

০　২　০　৩　৪　১´　০
র্সা র্ঋা । র্সা র্সা । র্সা না । র্সা নদা । । পা } ॥ দা দা । পা মগা ।
সু ০　০ খ　পা ০　০ য়ো০ ০　০　জা গ　ত ভ০

২　০　৩　৪　১´　০　২
মা পা । ণদা র্সা । -া র্সনা । র্ঋা র্সা । র্সনা র্সা । র্সা না । দা পা ।
০ ০　য়ি০ ০　০ প০　০ র　ভা০ ০　০ ০　০ ত

সঞ্চারী

১´　০　২　০　৩　৪　১´
দা দা । দা ণদা । পা পা । মা দা । পা পা । মা গা । গমা মা ।
ম ধু　র ব০　চ ন　বো০　ল ম　দ ন　ম ০

০　২　০　৩　৪　১´
পা মা । গা মা । গা গা । ঋা সা । সা সা । সা সা ।
০ ত্র　০ ০　প ঢ়　০ ভা　০ রী　উ ন

০　২　০　৩　৪　১´
গা মা । দা পা । দা দা । ণা দা । পা মগা । মা ণা ।
বি ০　০ ন　ছি ন　০ ছি　ন ০০　ক ০

০　২　০　৩　৪
দা পা । মা পা । মা মা । গা ঋা । া সা ।
ছু ন　০ শো　হা ০　০ ০　০ ত

আভোগ

১´　০　২　০　৩　৪　১
দা দা । না র্সা । র্সা র্সা । র্না র্সনা । র্ঋা র্সা । র্সা র্সা । দা দা ।
বৈ জু　কে ০　প্র ভু　ব্র জ০　কি না　০ রী　ষ স্থ

০　২　০　৩　৪　১　০
র্সা র্সা । র্সা র্সা । র্সা র্সনা । সা নদা । া পা ॥ মা পা । মা গা
০ ম　০ ন্ত্র　নি খি০　০ সা০　০ রী　ক ল　ন প

২　০　৩　৪　১´　০　২
মা গা । মা ণদা । দা র্সনা । র্সা র্সা । র্সনা র্সা । র্সা না । দা পা ।
ব ত　ছি ন০　ঘ রি০　দি ন　রা০ ০　০ ০　০ ত

দেহবৃদ্ধিকারী লসিকা—

বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে একটি ক্ষুদ্রকায় ইঁদুরকে একটি raccoonএর মতন প্রকাণ্ড করা সম্ভবপর হইয়াছে। এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে সকল-প্রকার জীব-জন্তুরই আকার তিন-চার গুণ বাড়ানো যাইতে পারে। একটি ভেড়া একটি হাতীর আকারে পরিণত হইবে। যেসকল জন্তুর মাংস ভক্ষণ করা হয়, তাহাদের আকার এইপ্রকারে বাড়ানো হইলে পর বর্তমান যত জন্তু বৎসরে নিহত হয়, তাহার অর্দ্ধেক সংখ্যাতেই মানুষের ক্ষুধার নিবৃত্তি হইবে বলিয়া মনে হয়।

নয় বৎসরের কঠিন চেষ্টা এবং নানা-প্রকার পরীক্ষার পর ডাঃ হার্বার্ট এম্ ইভান্স্ ইহা আবিষ্কার করিয়াছেন। এই ডাক্তার আরো বলেন যে, এক-প্রকার বিশেষ খাদ্য খাওয়াইয়া বন্ধ্যা স্ত্রী-জন্তুদের সন্তানবতী করা

ক্যালিফোর্নিয়ার বৃহদাকার কণ্ডোর পক্ষী। মৃত জন্তুদের মগজ খাওয়াতে ইহাদের আকার বৃদ্ধি পায়

যাইতে পারে। এই পরীক্ষার প্রথম আবিষ্কার pituitary gland নামক একটি মাংস-গ্রন্থি। এই গ্রন্থিটি মস্তিষ্কের নীচে অতি লুক্কায়িত অবস্থায় থাকে। এই গ্রন্থির লসিকা যদি জন্তুদের পেশীর (tissue) মধ্যে চালাইয়া দেওয়া যায়, তবে তাহাদের দেহের আকার বৃদ্ধিলাভ করিবে। যতদিন পর্য্যন্ত এই লসিকা ইন্‌জেক্ট্ করা হইবে, ততদিনই শরীর ক্রমশঃ আকারে বৃদ্ধি পাইবে। ইঁদুরের দেহে এই গ্রন্থি লসিকা-চালাইয়া তাহাকে তাহার সাধারণ আকারের দু-গুণ করা হইয়াছে। ইঁদুরের উপর এই পরীক্ষার সময় ইহাও দেখা গিয়াছে যে, লসিকা-চালানো বন্ধ করিবা-মাত্র তাহার দেহ-বৃদ্ধিও বন্ধ হইয়াছে।

ডাঃ ইভান্স্ বলেন যে, যদি এই বিশেষ লসিকা কোনো জন্তুর দেহের মধ্যে, মুখ ছাড়া অন্য কোনো পথ দিয়া চালাইয়া দেওয়া যায়, তবে একটি গৃহপালিত বা বন্য পশুকে প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড দৈত্য-দানবে পরিণত করা যায়। লসিকা চালাইবার সময় বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে যেন, এই লসিকা পাকস্থলীর মধ্যে গিয়া না পড়ে।

জীব-জন্তুর বাড়িবার বয়স পার হইয়া যাইবার পরেও যদি এই লসিকা ইন্‌জেক্ট্ করা যায়, তাহা হইলেও তাহার আকার বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ হইবে। ডাক্তার বলেন যে, তাঁহার পরীক্ষা এখনও সমাপ্ত হয় নাই বলিয়া মানুষের দেহে কবে এই লসিকা চালানো সম্ভব হইবে, তাহা তিনি এখনও বলিতে পারেন না। Pituitary glandএর লসিকা পাওয়ার কাঠিন্যও ইহার আর-একটি কারণ। পরীক্ষাতে যে লসিকা ব্যবহার হয় তাহা ব্যাঙাচি হইতে গ্রহণ করা হয়।

অধিকাংশ স্তন্যপায়ী জন্তুর শরীরবৃদ্ধি অতি ধীরে হয়। অনেক জন্তুর দুই বৎসর সময়ের মধ্যে বৃদ্ধির শেষ হয়। এই নিয়মের একমাত্র ব্যতিক্রম ক্যালিফোর্নিয়া প্রদেশের একপ্রকার পক্ষী। পৃথিবীর এত প্রকাণ্ড খেচর অন্য কোনো-প্রকার জীব নাই। বৈজ্ঞানিকদের মতে ইহার কারণ, এই পক্ষীরা যে-সকল জীবজন্তুর মস্তক ভক্ষণ করে, তাহার মধ্য হইতে কোনো-প্রকারে শরীরবৃদ্ধিকারী বিশেষ লসিকা পায়।

পিটুইট্রিন (Pituitrin) খাওয়াইয়া দেহের আকার কমানো বাড়ানো পরীক্ষা করার কার্য্যে ব্যবহৃত দুইটি ইঁদুর

ডাক্তার ইভান্সের এই পরীক্ষা-কার্য্যে দ্বিতীয় আবিষ্কার, গমের embryo বা germ হইতে তৈয়ারী তেলের মধ্যে স্থিত একপ্রকার বিশেষ vitamine. ইহার সাহায্যে বন্ধ্যা জীবজন্তুকে সন্তান জন্ম দিবার ক্ষমতা দান করা যাইবে। কয়েক-প্রকার বিশেষ খাদ্য দিলে ইঁদুর বন্ধ্যা হইয়া যায়। কমলানেবুর রস এইসকল খাদ্যের একটি। কিন্তু যে-সময় হইতে এই বন্ধ্যা ইঁদুরকে whcat-embryo extract খাওয়ানো হয়, সেই সময় হইতেই তাহারা আবার সন্তান জন্ম দিবার ক্ষমতা লাভ করে।

এতদিন ধরিয়া ইঁদুরের উপর এই পরীক্ষা চলিয়াছিল, এইবার গরু, ভেড়া ইত্যাদির উপর এই পরীক্ষা আরম্ভ হইবে। তাহার পর মানুষের পালা। গৃহপালিত জন্তুদের উপর পরীক্ষা সফল হইলে মানুষের উপরেও এই পরীক্ষা সফল হইবে বলিয়া মনে হয়। তখন পৃথিবীতে বেঁটে বা

ক্ষুদ্রকার এবং হীনবল আর কোনো লোক দেখা যাইবে বলিয়া মনে হয় না।

—

রেলগাড়ীর শত-বার্ষিক জন্ম-উৎসব—

রেল-গাড়ীর আবিষ্কারে মানুষের যত কল্যাণ সাধিত হইয়াছে, এমন আর কোনো-প্রকার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। পৃথিবীর প্রথম রেল-গাড়ী চলে ২৭এ সেপ্টেম্বর ১৮২৫ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডে। ইহাই প্রথম মানুষ- এবং মাল- বহনকারী রেল-গাড়ী। জর্জ্জ্ স্টীফেন্‌সন্‌ স্টীম ইঞ্জিনের জন্মদাতা। প্রথম স্টীম ইঞ্জিনখানি ৩১ খানি গাড়ি লইয়া ঘণ্টায় ১০।১২ মাইল বেগে রেলপথের উপর দিয়া চলিয়াছিল। পৃথিবীর ইতিহাসে ইহা একটি অতি শুভ দিন।

১৯২৫ খৃঃ অব্দে রেল-গাড়ীর জন্মের ১০০ বর্ষ পূর্ণ হইল। আমেরিকাতে এই বছর রেল-গাড়ী জন্মের শত বার্ষিক উৎসব হইবার নানা-প্রকার আয়োজন হইতেছে। আমেরিকার পেন্‌সিলভ্যানিয়ার ২১এ মার্চ্চ ১৮৬২
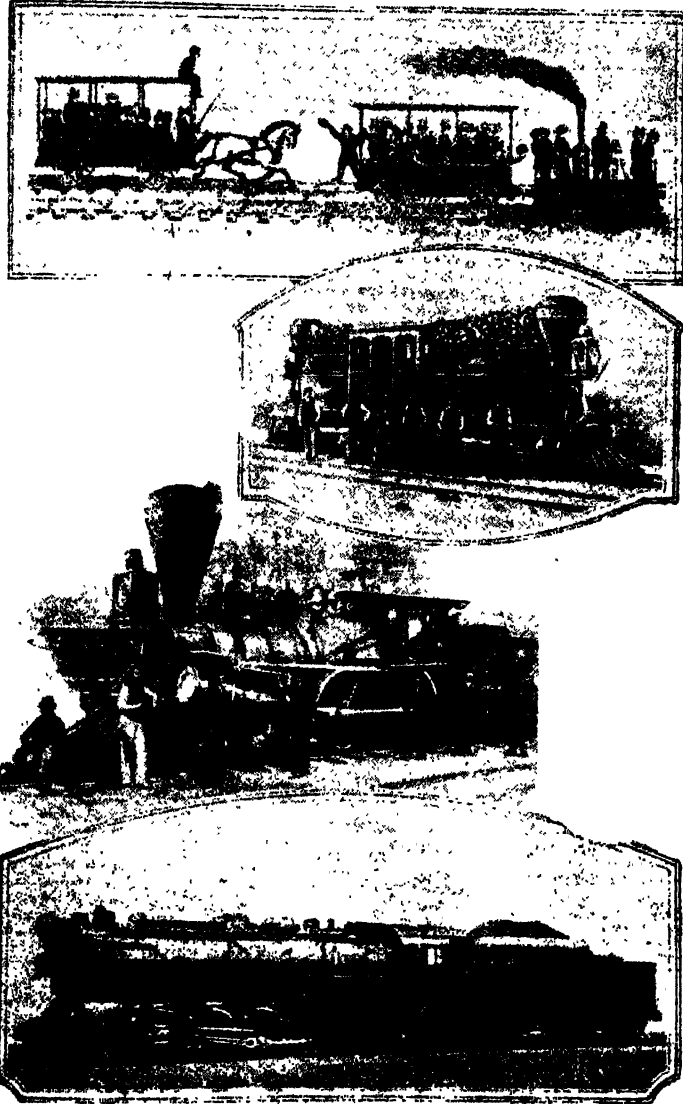
স্টীম এঞ্জিনের ক্রম-বিকাশ

উপরের ছবিখানিতে একখানি পুরাতন-ধরণের ইঞ্জিন ও ঘোড়ার টানা রেলগাড়ীর ছবি পাশাপাশি দেখানো হইয়াছে।
দ্বিতীয় ছবিখানির ইঞ্জিন কয়লার পরিবর্ত্তে কাঠ-পোড়াইয়া-চালিত
তৃতীয় ছবিখানি একখানি উন্নতধরণের কাঠ-পোড়াইয়া-চালিত ইঞ্জিন
চতুর্থ ছবিখানিতে আধুনিকতম ইঞ্জিনের চিত্র দেওয়া হইয়াছে

খৃঃ অব্দে প্রথম রেল গাড়ী চলে। কর্নেল জন্ স্টীভেন্স্ আমেরিকার রেল-গাড়ীর জন্মদাতা। ১৮২৫ খৃঃ অব্দে স্টীভেন্স্ একটি রেল লাইন স্থাপন করিয়া তাঁহার জমিদারির ভিতর প্রথম রেলগাড়ী চালান। এই রেলগাড়ী ঘণ্টায় ১২ মাইল করিয়া চলিত। অনেকের মতে এই রেল-গাড়ী আমেরিকার আদি-রেলগাড়ী। তা'রপর পিটার কুপার নামক একজন অতি প্রতিভাবান্ যান্ত্রিক "টম থাম্ব" নামে একটি স্টীম্ ইঞ্জিন তৈয়ার করেন। ২৮এ আগষ্ট ১৮৩০ খৃঃ অব্দে এই স্টীম্ ইঞ্জিনের ঘোড়ার-টানা গাড়ীর সহিত প্রতিযোগিতা হয়,এবং স্টীম্-ইঞ্জিনটিই গতি এবং কার্য্যকারিতায় ঘোড়ার গাড়ী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বলিয়া প্রমাণিত হয়। বাষ্পীয় শকট প্রথম ১৮২৫ খৃঃ চলে, কিন্তু স্টীম্-ইঞ্জিনের দ্বারা নানা-প্রকার কার্য্য ১৮০৪ খৃঃ অব্দ হইতেই আরম্ভ হয়।

১৮০৪ হইতে ১৮২৫ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, এবং জর্ম্মানিতে এই কয়জন আবিষ্কর্ত্তা স্টীম্-ইঞ্জিন-সম্বন্ধে নানাপ্রকার পরীক্ষা চালাইতে-ছিলেন—ওয়াট্, কুগ্নো হেড্লি ব্ল্যাকেট, ব্লেন্কিন্সপ্, হ্যাক্ওয়ার্থ, ট্রেভিথিক্ এবং স্টীফেন্সন্ (Watt, Cugnot, Hedley, Blackett, Blenkinsop, Hackworth, Trevithick, and Stephenson) স্টীফেন্সন্ ১৮১৪ খৃঃ অব্দে "ব্লুচার" নামক একটি কার্য্যকরী স্টীম্ ইঞ্জিন তৈয়ার করেন। ট্রেভিথিকের তৈয়ারী একটি ইঞ্জিন ১৮০৪ খৃঃ অব্দে Merthyr Tydfil নামক স্থানে প্রথম রেল-পথের উপর দিয়া চলে—কিন্তু ১৮৩০ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে মানুষের সভ্যতার সাহায্যকারীরূপে কোনো রেলগাড়ী রেল-পথের উপর দিয়া চলে নাই।

রেলগাড়ী আবিষ্কারের সঙ্গে-সঙ্গে কত বনজঙ্গল যে মানুষের আরাম-প্রদ আবাস-ভূমিতে পরিণত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। যে-সমস্ত স্থানে একসময় কেবল নরখাদক বন-মানুষ এবং হিংস্র জন্তু আদি বাস করিত সেই-সমস্ত অগম্য স্থানও আজ রেলগাড়ীর কৃপাতে সুগম্য হইয়াছে, এবং মনুষ্য-সভ্যতার কেন্দ্র বলিয়া পরিচিত হইতেছে।

আদিকালের স্টীম ইঞ্জিনগুলির সহিত বর্ত্তমান ইঞ্জিনগুলির তুলনা করিলে বর্ত্তমান ইঞ্জিনগুলিকে প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড দৈত্য বলিয়া মনে হইবে। গত কয়েক বছরে ইঞ্জিনের পোরাকির কোনো-প্রকার বিশেষ বৃদ্ধি না করিয়াও তাহাদের গতির বেগ অনেক-পরিমাণে বৃদ্ধি করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে অনেক স্থানে স্টীম্ ইঞ্জিনকে ত্যাগ করিয়া বৈদ্যুতিক ইঞ্জিন ব্যবহার হইতেছে। এইপ্রকার ইঞ্জিনের গতির বেগ অনেক বেশী, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে একটি ইঞ্জিন চালানোর খরচও অনেক বেশী বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনের বেগ যতই বেশী হউক, স্টীম্ ইঞ্জিনকে বাতিল করিতে তাহার এখনও অনেক দিন সময় লাগিবে।

এইসঙ্গে যে ছবিখানি দেওয়া হইল, তাহা দেখিলে স্টীম্ ইঞ্জিনের ক্রমবিকাশ খানিক-পরিমাণে বুঝা যাইবে।

—

ইলেক্‌ট্রিক ঘোড়া—

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার একটি ইলেক্‌ট্রিক ঘোড়া আছে, এই সংবাদে বাহির হইবার পর অনেক আলোচনা আমেরিকাতে হয়। এই ঘোড়াতে প্রেসিডেণ্ট্ কুলিজ্ প্রত্যহ আরোহণ করেন। ঘোড়ার মধ্যে এক-ঘোড়ার-সমান-জোরওয়ালা একটি মোটরে ঘোড়াটিকে চলন্ত ঘোড়ার মতন করিয়া নাড়া দেয়। ঘোড়ার পিট হুবাহু একটি চলন্ত ঘোড়ার মতন পিছনে-সামনে, উঁচুদিকে এবং নীচে দোলে। দুইটি লেভারের সাহায্যে ইহার নাচুনি কমানো বা বড়ানো যায় অর্থাৎ ঘোড়াকে দৌড়ানো বা হাঁটানো যায়। ঘোড়ায় চড়াতে যে কসরৎ এবং আরাম লাভ করা যায়, ঘরে বসিয়াই তাহা প্রেসিডেণ্ট্ কুলিজ্ লাভ করেন।

—

ডাক-বাক্সর গাড়ী—

নানা কাজে অনেকের অনেক সময় দরকারী চিঠিপত্র সময়ে ডাক-বাক্সে ফেলা হয় না, সেইজন্য ইংলণ্ডের বার্কিংসাইডে রাস্তার বাসগুলিতে বাক্স বসানো হইয়াছে। ডাক-বাক্সের চিঠি পিয়ন শেষবার লইয়া যাইবার পরেও এক ঘণ্টা-পর্য্যন্ত এই গাড়ীর ডাক যথাস্থানে পৌঁছানো চলিবে

ট্রলি-গাড়ীর সম্মুখে ডাক-বাক্স

ইহাতে অনেকের বিশেষ সুবিধা হইতেছে। এই বাসগুলি লোক বহন করিতে-করিতেই নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তর কোনো একটি পোষ্ট্ আপিসে ডাক-বাক্স খালি করিয়া দিয়া আসে।

—

তুর্কী সম্রাটের প্রাচীন বজ্‌রা—

২৮০ বছর পূর্ব্বে এই বজ্‌রাখানি নির্ম্মিত হয়। সুলতান এবং তাঁহার পরিবারের লোকদের জন্যই ইহা বিশেষভাবে তৈয়ার করা হয়। ১৪৪ জন লোকে ইহার দাঁড় বাহিত। ময়ূরের নৌকার মতন করিয়া এই বজ্‌রা-খানিকে তৈয়ার করা হয় এবং ইহার গায়ের কাঠে-খোদাই করা নক্সা-গুলি অতি চমৎকার। এই জাহাজখানির ওজন ১১০ টন, বর্ত্তমানে এই নৌকাখানি শুক্‌নো ডাঙার ডকের একপাশে রক্ষিত আছে। এই
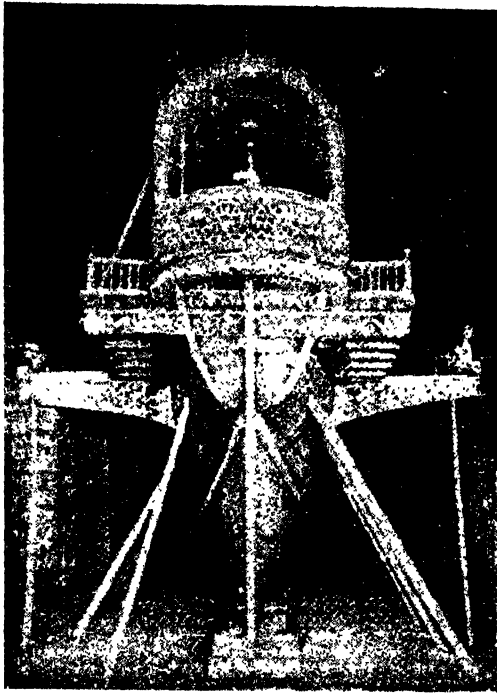
২৮০ বৎসর পূর্ব্বে তুর্কী-সম্রাটের মুর-জাতীয়-ধরণের নক্সায় নির্ম্মিত বজরা। এই বজরা চালাইতে ১৪৪ জন দাঁড়ীর দরকার

জাহাজখানি বসফোরাস প্রণালীর নৌকাগুলির ধাচে একটি caique নামক নৌকার আকারে নির্ম্মিত।

—

অতি বৃহৎ বাঁধাকপি—

ইংলণ্ডের একটি প্রদর্শনীতে একটি বাঁধাকপিকে ওজন করিতে বিচারকদের বিশেষ বেগ পাইতে হয়। তুলাযন্ত্রে ইহাকে ধরানো প্রায়

ইংলণ্ডের একটি প্রদর্শনীতে আনীত একটি বৃহদাকার কপি

অসম্ভব হইয়াছিল। বাঁধাকপির মধ্যে সারাংশ খুব কম হইলেও ইহার ভোজ্যরূপে ব্যবহার আলুর পরেই। প্রায় ৭০ প্রকারের বাঁধাকপি মানুষের জানা আছে। কয়েকপ্রকার বাঁধাকপি লম্বায় প্রায় ১০ ফুট হয়, ইহাদের ডাঁটা বেতের মতন ব্যবহার হয়। সাধারণ বাঁধাকপির শতকরা ৯০ ভাগ জল। ....

চীনা নাবিকদের অভিনয়ের বিকট বেশ—

নিউইয়র্কের চীনা নাবিকরা তাহাদের একটি অভিনয়ে অতি বিকট-দর্শন নানাপ্রকার বেশ পরিধান করে। নানা-প্রকার দৈত্য দানবের এবং পৌরাণিক জীবজন্তুর পোষাক তাহারা পরিয়াছিল। একটি বিশেষ
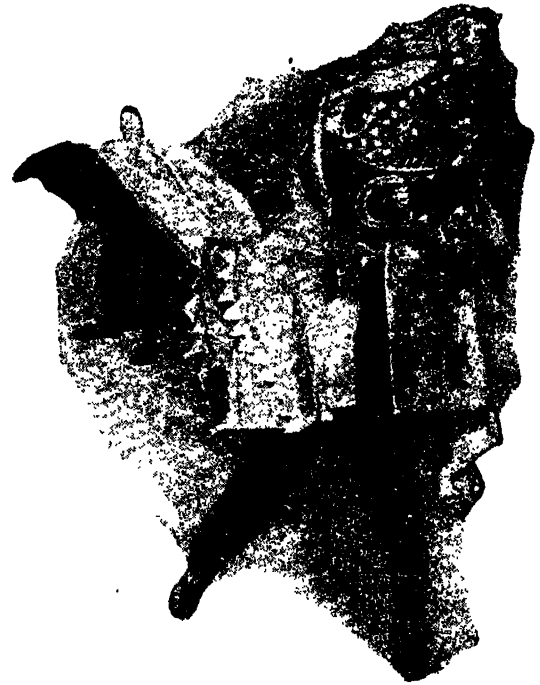
চীনা নাবিকদের অভিনয়ে ব্যবহৃত অদ্ভুত মুখোষ ও পোষাক

দৈত্যের পোষাক তাহারা করিয়াছিল, এই পোষাকের মুখোষের দুইটি চোয়াল অভিনেতা ইচ্ছামত নাড়াইতে পারিত। ছবি দেখিলে এই অতি বিকট পোষাক এবং মুখোষের পরিচয় পাইবেন।

—

গ্রেট্ লেভিয়াথান জাহাজ—

দক্ষিণ বোষ্টনের শুক্নো ডকে এই জাহাজটি এখন রক্ষিত আছে। এই জাহাজটিকে রাখিবার মতন আমেরিকাতে আর-কোনো শুক্নো-ডক নাই। ছবির নীচে লোকগুলিকে জাহাজখানির আকারের সহিত তুলনা করুন। ১৯১৪ খৃঃ পর্য্যন্ত এই জাহাজখানি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ জাহাজ ছিল। এখন ইহা অপেক্ষা বৃহৎ আর-একটি জাহাজ আছে.

গ্রেট্ লেভিয়াথান জাহাজ
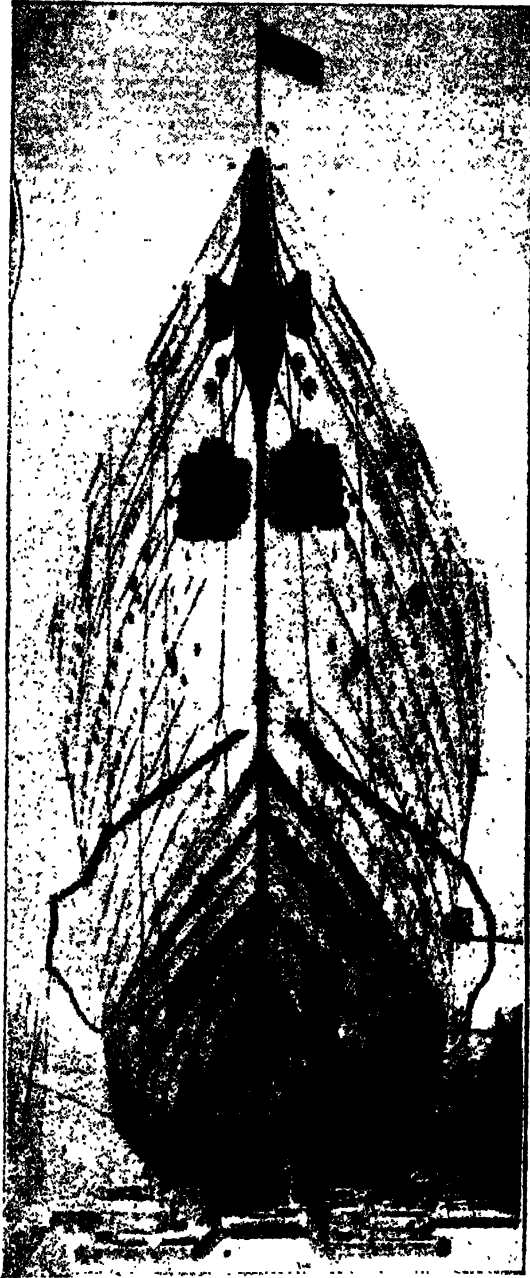
তাহার নাম "ম্যাজেস্টিক্"। জাহাজখানিকে ৮৪০০ লোক বহন করিবার মতন করিয়া তৈয়ার করা হয়, কিন্তু ইহাতে গত যুদ্ধের সময় ১২০০০ পল্টন বহন করা হয়।

মানুষের পূর্ব্বপুরুষের মাথার খুলি—

মাথার খুলির যে ছবি দেওয়া হইয়াছে, তাহা আফ্রিকার টাঙস্ (Taungs) নামকস্থানে অধ্যাপক রেমণ্ড্ এ ডার্ট্ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই মাথার খুলিটি দেখিয়া মনে হয়, ইহা বাঁদর এবং মানুষের ক্রমবিকাশের পথের মাঝামাঝি কোনো জীবের। কিন্তু ইহার মস্তিষ্ক বোধ

দক্ষিণ আফ্রিকার টাঙস্ নামক স্থানে আবিষ্কৃত একটি প্রস্তরীভূত মাথার খুলি

হয় একেবারে মানুষের মতনই ছিল। মানুষের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে এই মাথার খুলিটি যেমন সাড়া আনিয়াছে, এমন আর কোনো কিছুতে আনে নাই বলিলেই হয়। এই খুলিটি প্রস্তরীভূত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে।

বায়ু-গোলকের সাহায্যে ভাসমান নৌকা—

বায়ুপূর্ণ গোলকের সাহায্যে ভাসমান একপ্রকার তলাবিহীন নৌকার আবিষ্কার হইয়াছে। এই নৌকার মধ্যে জল ঢুকিতে পারে না বলিয়া ইহারা ডুবিতে পারে না। নৌকার ওজনও এত কম যে ইহাকে দাঁড়ের সাহায্যে চালাইতে কোনো কষ্ট হয় না। মাথার সামনে মুখের উপর হইতে

জল আটকাইবার জন্ত একটি আড়াল আছে। বায়ুর মুখে চলিবার সময় এই আড়ালটি পালের কাজ করে। দরকার মত এই নৌকাটির বল-গুলিকে বায়ুশূন্ত করিয়া সহজেই ঘাড়ে করিয়া ডাঙায় লইয়া চলা যাইতে

বায়ু-গোলকের সাহায্যে চালিত ভাসমান নৌকা

পারে। সন্তরণকারী এবং প্রথম শিক্ষার্থীদের পক্ষে ইহা খুব কাজের হইবে বলিয়া মনে হয়।

হাউয়াই দ্বীপের আগ্নেয়-গিরির ১৯২৪ সালের অগ্ন্যুৎপাত—

কিলানিয়া আগ্নেয়-গিরির (ইহা Hawaii National Parkএ অবস্থিত) ১৯২৪ সালের অগ্নিবৃষ্টি বৈজ্ঞানিক মহলকে নাড়া দিয়াছে। শ্বেতাঙ্গরা এইখানে এই প্রথম অগ্নিবৃষ্টি দেখিল। ১৭৯০ খৃঃ অব্দে এই-খানে আর একবার ভয়ানক অগ্ন্যুৎপাত হয় এবং ইহার বিবরণ রেভারেণ্ড্ আই ডিবল্. এই দেশের লোকেদের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া লিপি-বদ্ধ করিয়াছেন। যে-সমস্ত লোকেরা এই অগ্ন্যুৎপাত দেখিয়াছিল, তাহাদের নিকট হইতেই ইহার সমস্ত বিবরণ সংগ্রহ করা হয়। বিবরণটি সংক্ষেপে এই :—

"এই সময় Kamehameha দ্বারা তাড়িত হইয়া হাউয়াইএর সর্দ্দার Keonaর সৈন্তদল Kilaneaর নিকটেই অবস্থান করিতেছিল। সৈন্তদল এইখানে আসিবার দুইরাত্রি পূর্ব্ব হইতেই অগ্নিবৃষ্টি হইতেছিল। এই অগ্নিবৃষ্টির সঙ্গে-সঙ্গে পাথরাদিও ভূগর্ভ হইতে বাহির হইয়া আসিতেছিল। Keonaর সৈন্তদল তিনভাগে বিভক্ত হইয়া চলিতে আরম্ভ করিল। অগ্রগামীদল সামান্ত পথ অগ্রসর হইবামাত্র তাহাদের পায়ের তলার মাটি দুলিতে আরম্ভ করিল, এবং তাহাদের সোজা হইয়া দাঁড়ানো অসম্ভব হইল। একটু পরেই আগ্নেয়গিরির মুখ হইতে অন্ধকার করিয়া ধোঁয়া উঠিতে দেখা গেল, এবং সঙ্গে-সঙ্গে মাটির নীচে গর্জ্জন শোনা গেল এবং সামনে বিদ্যুৎ চমকাইতে দেখা গেল। ক্রমে এই-সমস্ত চারিদিকে প্রলয়ের মতন ছড়াইয়া পড়িল এবং দিনের আলো একেবারে চোখের সামনে হইতে সরিয়া গেল। মাঝে মাঝে ভূগর্ভ হইতে নীল এবং লাল রংএর অগ্নিশিখা বাহির হইয়া অন্ধকারকে ভীষণ-তর করিয়া তুলিল। তাহার পর আগ্নেয়গিরির মুখ হইতে ভীষণভাবে গরম বালি এবং গলিত ধাতুমল আকাশে বহু উচ্চ পর্য্যন্ত উঠিতে লাগিল এবং কয়েক মাইল স্থান ব্যাপিয়া ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। অগ্রসর দলের অনেকে ইহাতে প্রাণ হারাইল।

"পিছনের দল এই সময় আগ্নেয়গিরির মুখের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে ছিল—তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদে ছিল। বালি এবং ধাতুমল বৃষ্টি আসিবার পর তাহারা তাহাদের অগ্রবর্ত্তী দলকে বিপদের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে বলিয়া আনন্দজ্ঞাপন করিবার জন্ত অগ্রসর হইল। কিন্তু তাহারা মধ্যবর্ত্তী দলটিকে সম্পূর্ণভাবে মৃত অবস্থায় দেখিল। কেহ বা দাঁড়াইয়া, কেহ বা বসিয়া আর কেহ বা শুইয়া আছে। কাহারো দেহে প্রাণের কোনো লক্ষণ নাই। প্রথমে তাহাদের দেখিয়া জীবিত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু নিকটে আসিয়া তাহাদের দেহে হাত দিয়া বুঝা গেল, তাহাদের মৃত্যু হইয়াছে। কেহ-কেহ মরণের পূর্ব্বে স্ত্রী-পুত্র-কন্তাকে জড়াইয়া পড়িয়া আছে, সে দৃশ্য অতি ভয়ানক।"

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সময়কার একটি ৭ হাজার ফুট উচ্চ ধূলিস্তম্ভ

হালেমাউমাউ প্রদেশের লাভা হ্রদ আগ্নেয় গহ্বরের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। এই স্থানটি (কিলানিয়া) প্রদেশের প্রধান অগ্নি-নির্গম। ১৯২৪ সালের অগ্ন্যুৎপাতের পূর্ব্বে এই হ্রদের সমস্ত লাভা ক্রমশঃ ৩০০ ফুট গহ্বরে ডুবিয়া গেল। ২০এ ফেব্রুয়ারী, উপর হইতে লাভার আর চিহ্নমাত্র দেখা গেল না। ২৯এ এপ্রিল পর্য্যন্ত সমস্ত চুপচাপ—কোনো-প্রকার শব্দ এই স্থান হইতে পাওয়া যায় নাই। তাহার পর ২৯এ এপ্রিল হইতে এই গহ্বর হইতে ভয়ানক ধূলা উঠিতে আরম্ভ হইল। তাহার পর ক্রমশঃ গহ্বর-গাত্র ভীষণভাবে বসিয়া পড়িতে লাগিল। ইহার ফলে গহ্বরের আসে-পাশের স্থানগুলিতে সামান্ত কম্পন

অনুভূত হইতে লাগিল। এই-প্রকার ভাব ১০ই মে পর্য্যন্ত ছিল, তাহার পরই প্রথম অগ্ন্যুৎপাত সুরু হইল এবং প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড পাথর গহ্বর হইতে আকাশে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। ১১ই মে ভোর বেলা ভয়ানক-রকম অগ্ন্যুৎপাত হইল। এই অগ্নিবৃষ্টি মাত্র কয়েক মিনিটকাল বর্ত্তমান ছিল, তাহার পরই অগ্ন্যুৎপাত বন্ধ হইয়া অগ্নি-গহ্বর-হইতে বাষ্প ধোঁয়া ও মেঘ বাহির হইতে লাগিল এবং সঙ্গে-সঙ্গে পর্ব্বত-গাত্র ধসিয়াও পড়িতে লাগিল। ১৮ই মে পর্য্যন্ত এইপ্রকার ভাব বর্ত্তমান ছিল।

৪ হাজার ফুট উচ্চ অপর একটি ধূলিস্তম্ভ

১৮ই মে সকাল সাড়ে দশটার সময় একটি দুর্ঘটনা ঘটিল। মিঃ ট্রুম্যান্ এ টেলার নামক একজন লোক অগ্ন্যুৎপাতের ছবি তুলিতে গেলেন। এই সময় গহ্বর হইতে নানা-প্রকার অসংখ্য ধাতব পদার্থাদি এবং বাষ্প আকাশে প্রায় ২০০০ ফুট পর্য্যন্ত উঠিতেছিল। হঠাৎ একটা ভয়ানক অগ্ন্যুৎপাত হইল। গহ্বর হইতে একেবারে খাড়াই একটা ভয়ানক ধূলার মেঘ আকাশে নিক্ষিপ্ত হইল। এই ধূলার মেঘের সঙ্গে হাজার-হাজার মণ অসংখ্য পাথর ইত্যাদি বাহির হইল এবং ৪৫ সেকেণ্ডের মধ্যে এইসমস্ত গরম প্রস্তরাদি টেলারের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। টেলার এইসময় অগ্নি-গহ্বরের পুরাতন মুখের কিনারা হইতে প্রায় ১৮০০ ফুট দূরে ছিলেন। একটি পাথর টেলারের দুটি পা-কে গুঁড়া করিয়া দিয়া গেল। টেলারের কয়েকজন বন্ধু কিছু দূরে একটি মোটর লইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন—তাঁহারা টেলারের কি হইল কিছুই বুঝিতে পারিলেন না—এবং অবশেষে যখন গাড়ীর ছাত ভাঙিয়া পাথর আসিয়া পড়িতে লাগিল তখন তাঁহারা পলাইতে বাধ্য হইলেন।

প্রায় ৪৫ মিনিট পরে অগ্ন্যুৎপাত কিছু-পরিমাণে কমিলে উদ্ধার-কারীর দল টেলারকে মৃতপ্রায় অবস্থায় দেখিতে পাইল। টেলারকে প্রাথমিক সাহায্য দেওয়া হইতেছে, এমন সময় পুনরায় অগ্নিবৃষ্টি আরম্ভ হইল এবং উদ্ধারকারীরা কোনো-প্রকারে টেলারকে লইয়া নিরাপদ্ স্থানে আনিয়া ফেলিতে সক্ষম হইল।

টেলারকে যখন পাওয়া যায়, তখন তাঁহার জ্ঞান ছিল। টেলার উদ্ধারকারীদের দেখিতে পাইয়া একটু হাসিয়া বলিলেন যে, তাহার আঘাতটা বড় জোরেই লাগিয়াছে, তবে ছবিখানা ক্যামেরাতে ভালোই উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয়। অতিরিক্ত রক্তপাতের ফলে সেই রাত্রেই টেলার মারা যান। শ্বেতাঙ্গ কর্তৃক কিলাউয়া আবিষ্কৃত হইবার পর সে ইহাই প্রথম নরবলি গ্রহণ করিল। ১১ই মে হালেমাউমাউ হইতে ২০০০ ফুট রাস্তা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিকদিগের অগ্নিগহ্বর হইতে ঐ সীমানা পর্য্যন্ত যাইতে দেওয়া হইল। ১৩ মে সীমা বাড়াইয়া ১ মাইল করা হইল এবং ১৬ই মে অগ্নিগহ্বর হইতে ২ মাইল দূর পর্য্যন্ত রাস্তা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। কেবলমাত্র একজন হাওয়াইয়ের পুরোহিতকে একটি পাছে বলিদান দিয়া ম্যাডাম পেলের রোষ শান্তি করিবার জন্য বিপদ্ সীমানা পার হইয়া যাইবার অনুমতি দেওয়া হয়। এই দেশের লোকেদের বিশ্বাস যে এইসব ভূমিকম্প এবং অগ্ন্যুৎপাত এইখানে অধিষ্ঠাত্রী দেবীর কোপের জন্যই হইয়া থাকে। তাহাদের বিশ্বাস যে উপযুক্ত-পরিমাণ বলিদান পাইলেই ম্যাডাম পেলে নামক দেবীর কোপ শান্ত হয় এবং অগ্ন্যুৎপাত ইত্যাদি সবই থামিয়া যায়।

২২এ মে আবার অগ্নিগহ্বর হইতে ধূম্র এবং পাথর ইত্যাদি বাহির হয়। এই দিন যে ধোঁয়া বাহির হয়, তাহা দূর হইতে একটা ফুলকপির মতনই মনে হইয়াছিল। সঙ্গে-সঙ্গে নানা-প্রকার বিকট শব্দ এবং সামান্য-পরিমাণ ভূকম্পন দূর হইতে অনেকেই বোধ করিয়াছিল। অগ্নিগহ্বরের চারিদিকের দৃশ্য তখন অনেকটা গত মহাযুদ্ধের গোলাধসা ফ্রান্সের গ্রাম-গুলির মতন হইয়াছিল। ২৫এ তারিখে বালি-বৃষ্টি এত ভয়ানক হইতেছিল যে সামান্য দূরে অবস্থিত গৃহাদিও দেখা যাইতেছিল না এবং লোকজন অনেকেই হারিকেন বাতি লইয়া আসা যাওয়া করিতেছিল। এই বালি-বৃষ্টি বহুদূর পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ২৬এ মে অগ্নি গহ্বর যেন একটু পরিশ্রান্ত হইল। এইসময় গহ্বরের তল ১৩০০ ফুট নীচে ছিল। নানা স্থান হইতে বাষ্প বাহির হইতেছিল। ১৯এ জুলাই গহ্বরের পাশের পাথরের মধ্য দিয়া গহ্বরের মধ্যে লাভা আসিয়া পড়িতে লাগিল। ক্রমে-ক্রমে চারিদিক ঠাণ্ডা হইয়া গেল। লাভা-পূর্ণ গহ্বরের মধ্যে এমন ভয়ানক অগ্ন্যুৎপাত যে কেন হয় তাহার কারণ এখনও বলা যায় না। কোনোরকমে সমুদ্রের জল আসিয়া গরম লাভার সংস্পর্শে আসাতেও ইহা ঘটিতে পারে, কিম্বা লাভার মধ্যস্থিত গ্যাসের জন্যও এই ভূমিকম্প এবং অগ্ন্যুৎপাত ঘটিতে পারে।
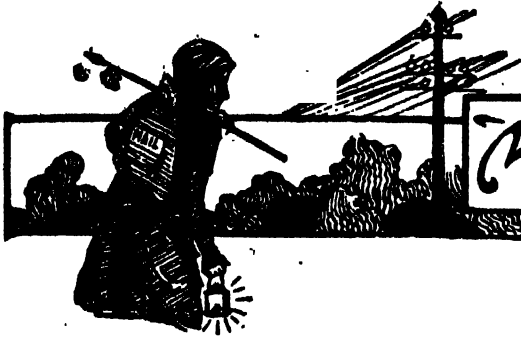
বাংলা

দেশের অবস্থা—

অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হওয়ায় অনেক স্থলে বোরো-ধান পূর্ব্বেই নষ্ট হইয়াছে। ঐ-কারণে আউস-ধান্ত ও পাটের অবস্থাও অতি শোচনীয়। দেশের ভবিষ্যৎ দুর্দ্দশার কথা মফঃস্বলের প্রায় সমস্ত কাগজই সাধারণের গোচরীভূত করিতেছেন। মৈমনসিংহের চারুমিহির লিখিতেছেন—"কিশোরগঞ্জ সব্‌ডিভিসনের অন্তর্গত ঢাকী,রাধাপুর, বাজিতপুর, বড়কান্দা, আতপাশা, মামুদপুর, কুড়া ও অন্যান্য গ্রামে আজ ৪.৫ বৎসর যাবৎ অনাবৃষ্টির দরুন্ ফসল মারা যাওয়ায় এদেশের অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। এ-বৎসর বর্ত্তমান বোরো ফসলের অবস্থা এমন ভালো ছিল যে, কৃষক উত্তমরূপে এই ফসলটি তুলিতে পারিলে অনেকটা বিপদ্ কাটাইয়া উঠিতে পারিত। কিন্তু কতক ক্ষেত কাটা হইতে না হইতে কয়েকদিন যাবৎ অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইয়া পাকা ধান সব জলের নীচে পড়িয়াছে, বিল ঝিল খাল সব জলে ভরিয়া গিয়াছে। কৃষক বহু পরিশ্রমের সহিত দিনরাত্রে এইসব ভিজা পচা ধান কাটিতে ও মাড়াইতেছিল, ইহাতে চারি আনার বেশী নষ্ট হওয়ার কারণ ছিল না। নদীর জল এরূপভাবে বৃদ্ধি হইয়াছে যে, বাঁধ ইত্যাদি ভাঙিয়া মাঠ, বিল, খাল বর্ষার জলে এই বৈশাখ মাসেই বর্ষার ন্যায় হইয়া পড়িয়াছে। বহু পাটক্ষেতে জল উঠিয়া চারা মরিয়াছে, বহু কাটা ধানের স্তূপ জলে পড়িয়া কৃষকের দুর্দ্দশার একশেষ করিয়াছে। এই আকস্মিক বিপদে "ভহর" অঞ্চলের বহু ক্ষতি হইয়াছে।"

বাংলায় বিদেশী বস্ত্র—

ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্র ব্যবসায়ীগণ কোনো দিনই ভারতীয় বণিক্‌দের স্বার্থ দেখে না। ফলে ১৯২৬ সাল হইতে এ-দেশী বিদেশীবস্ত্রব্যবসায়ীগণ ক্রমাগত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমানে মাড়োয়ারী বস্ত্রব্যবসায়ীগণের ব্যবসায় অবস্থা খারাপ হওয়ায় গত ২৪ শে মে তাঁহারা এক সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি পাশ্ করেন :—

(১) চার মাস কাল কেহ নূতন মালের জন্য ফরমাইস্ দিতে পারিবে না।

(২) ৪ মাসের পর, আরও অধিক সময়ের জন্য ফরমাইস্ বন্ধ রাখা হইবে কি না, বণিক্-সভা সে সম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন।

(৩) কেহ যদি এই নিয়মের অন্যথাচরণ করিয়া কন্ট্রাক্ট্ দেয়, সভা তাঁহার সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

দেশে বিলাতী-বস্ত্র বর্জ্জন করিবার জন্য আন্দোলন বহুকাল হইতেই হইয়া আসিতেছে, কিন্তু মাড়োয়ারী বণিকগণ সে-সব কথায় কর্ণপাত করেন নাই। এবারে বাধ্য হইয়া বিদেশী-বস্ত্র আমদানি বন্ধ করিতে হইল। এ-প্রস্তাবটি চিরস্থায়ী-রূপে গৃহীত হইলে দেশের আরো মঙ্গল হইত।

দান—

কলিকাতা-অন্ধ-বিদ্যালয় "স্যার্ ভিক্টর্ সেসুন ফণ্ড" হইতে দশ হাজার টাকা দান পাইয়াছে।

বঙ্গীয় কেন্দ্রীয় ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতিকে শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম দাস বিড়লা পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ইহাতে সমিতির কার্য্য বিশেষরূপে প্রসার লাভ করিবে।

বরিশালের প্রস্তাবিত ডাক্তারি-শিক্ষা বিদ্যালয়ে কলিকাতার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর পনেরো হাজার টাকা দান করিয়াছেন। কলিকাতার বরিশাল-প্রবাসী অন্যান্য অনেক ভদ্রলোকও এ-প্রতিষ্ঠানে সাহায্য করিয়াছেন।

ঢাকা অনাথ-আশ্রম—

সম্প্রতি ঢাকা অনাথ-আশ্রমের ষোড়শ বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই আশ্রমে জাতিবর্ণনির্বিশেষে অনাথ বালক-বালিকাদিগকে প্রতিপালন, অন্নবস্ত্র, লেখাপড়া এবং জীবিকানির্ব্বাহোপযোগী শিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়। এ পর্যন্ত আশ্রমের কয়েকটি বালক প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিতেছে এবং ৬।৭টি বালিকা বিবাহিতা হইয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। বর্ত্তমানে ২ মাস হইতে ১৭ বৎসর বয়স্ক ১০টি বালক ও ১৫টি বালিকা প্রতিপালিত হইতেছে—আরও ১০।১২টির স্থান আছে। আশ্রমের সভ্য ও সহানুভূতিকারিগণের নিকট সনির্ব্বন্ধ নিবেদন এই যে তাঁহারা নিম্নলিখিত কোনো প্রকারে সাহায্য করেন :—(১) নিজে সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইবেন, অর্থ, বস্ত্র বা খাদ্য দান অথবা ইহা সংগ্রহ এবং নূতন সভ্য সংগ্রহের চেষ্টা করিবেন। (২) ৮ বৎসরের ন্যূন নিরাশ্রয় বালক-বালিকাকে আশ্রমে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলে আশ্রম কর্ত্তৃপক্ষ বাধিত হইবেন।

স্বরাজ্যদলের পল্লীসংগঠন কার্য্য—

বাংলার স্বরাজ্যদলের পল্লীসংগঠন কার্য্যের সম্পাদক জানাইতেছেন যে পল্লীসংগঠনের স্কীম্, কেন্দ্র ও কর্ম্মী নির্ব্বাচনের জন্যই স্বরাজ্যদলের পল্লী-সংগঠন কার্য্যের বিলম্ব ঘটিয়াছে। যাহা হউক, আগামী জুন মাসের মাঝামাঝি হইতে নির্ব্বাচিত কেন্দ্রগুলিতে কার্য্য আরম্ভ হইবে, আশা করা যায়। মোট ৫০টি কেন্দ্রে কাজ করিবার জন্য কর্ম্মীনির্ব্বাচন করা হইয়াছে। কিরূপভাবে কার্য্য চালাইতে হইবে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য মফঃস্বলের কর্ম্মীদিগকে কলিকাতায় আহ্বান করা হইয়াছে।

এই-সম্পর্কে সহযোগী 'নীহার' কতকগুলি সারবান্ কথা বলিয়াছেন। তাহা এই :—"পল্লীগঠনের প্রধান উদ্দেশ্য হইবে কৃষকগণের এবং অন্যান্য কৃষিজীবীদের উৎকর্ষ (Welfare) সাধন। পল্লীগঠন এমনভাবে করা আবশ্যক, যার দ্বারা গ্রামবাসীদের প্রত্যেকের স্বাধীনতা থাকবে এবং অন্যের ক্ষতি না ক'রে প্রত্যেকে নিজের উন্নতি করবার স্বাধীনতা পাবে।

এই-উদ্দেশ্য সমুখে রেখে পল্লীগঠন করা উচিত। এই গঠন-কার্য্যে বাধাও আছে; সেগুলি এই :—

১। গ্রামের পঞ্চায়েতে দেখা গেছে, জমিদার বা অন্য কোনো ধনবান্ লোকের উপস্থিতি গরীব গ্রামবাসীর স্বাধীনতা নষ্ট করে।

২। তথাকথিত নীচ জাতির মতামত গ্রহণ করা হয় না, কিম্বা মতামত গ্রহণ করা হ'লেও যথোচিত বিবেচনা করা হয় না।

৩। গ্রামের পুরোহিত শ্রেণী সব সময়েই ধনী লোকের সাহায্য ক'রে থাকে।

৪। গ্রাম্য সাধারণতন্ত্রে প্রত্যেক পল্লী সমাজের সমবেত উৎকর্ষ (Collective Welfare) সাধনের চেষ্টা করবে। প্রতি গ্রামবাসী পার্থিব (Material) উপভোগযোগ্য কিছু কাজ করবে। খুব সম্ভব পুরোহিত-শ্রেণী এ-প্রকার কাজ করতে ইচ্ছুক হবেন না।

৫। গ্রামের মহাজনদের অত্যন্ত সুদ গ্রহণ এবং শ্রাদ্ধ ও বিবাহ উপলক্ষে অযথা ব্যয়, গ্রামবাসীর স্বাধীনতা এবং আবশ্যক দ্রব্যাদি কিনবার ক্ষমতা নষ্ট করে।

বাংলার মিউনিসিপ্যালিটিসমূহ—

বাংলার মিউনিসিপ্যালিটিসমূহের ১৯২৩-২৪ সালের সরকারী রিপোর্ট্ প্রকাশিত হইয়াছে।

আলোচ্য বৎসরে মিউনিসিপ্যালিটিসমূহের কার্য্যের মধ্যে সন্তোষ জনক এইটুকু যে, সাধারণ স্বাস্থ্য-সংস্কার এবং জলসরবরাহের অধিকতর উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু এইটুকু ছাড়া আর কোনো উল্লেখ যোগ্য কাজ হয় নাই। প্রত্যেক মিউনিসিপ্যালিটির বার্ষিক আয় গড়ে ৭০ হাজার টাকা এবং মাথা প্রতি বার্ষিক আয় চারি টাকা মাত্র। মিউনিসিপ্যালিটি-সমূহের যে-আয় হইয়াছিল, তাহার মধ্যে রাস্তাঘাট, জল-নিকাশন, জল সরবরাহ, আলোর ব্যবস্থা এবং সাধারণ কার্য্যপরিচালনার জন্য মোট ৫৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে এবং শিক্ষা, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য, টীকার ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য-সংস্কার, জলনিকাশ, অগ্নিদাহ-নিবারণ প্রভৃতি বাবদ মোট ২৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। বাংলার মিউনিসিপ্যালিটিগুলি এত দরিদ্র যে, আধুনিক কোনো উন্নততর প্রথার তাহারা প্রবর্ত্তন করিতে পারে না।

বাংলার সমবায়-ঋণদান সমিতি—

বাংলার সমবায় ঋণদান-সমিতিসমূহের ১৯২৪ সালের রিপোর্ট্ বাহির হইয়াছে। সর্ব্ব-রকম সমিতির সংখ্যা ৭৮২২ হইতে ৯৩৪২ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। ইহার মধ্যে শতকরা ৯৩টি কৃষি সমিতি। সমিতিগুলিতে ১৭৭৮৯২৫১ টাকা মূলধন খাটিতেছে। সমিতির সংখ্যা যতই বৃদ্ধি হয়, ততই মঙ্গল।

সরোজনলিনী দত্ত স্মৃতি-সমিতি—

কিছুকাল ধরিয়া বাংলাদেশের নারীদিগের উন্নতি-বিষয়ক নানা-প্রকার আলোচনা সংবাদ-পত্রাদিতে ও সভা সমিতিতে হইয়া আসিতেছে। স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তার ও নারীদের সঙ্ঘবদ্ধভাবে কার্য্য করিবার সুযোগ দিবার জন্য প্রত্যেক সহরে ও প্রতিষ্ঠাপন্ন গ্রামে মহিলা-সমিতি গঠন করা অবশ্য-প্রয়োজনীয়। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ সরোজনলিনী স্মৃতি-সমিতির কর্ম্মীগণ বাংলার নানা স্থানে তাঁহাদের প্রচারক পাঠাইতেছেন। সামান্য কয়েক মাসের মধ্যেই এই সমিতি বাংলার বিভিন্ন জেলায় ১০।১২টি মহিলা-সমিতি স্থাপন করিয়াছেন। বাংলার সকল জেলার মহিলাগণই এই সমিতির কার্য্য-প্রসারে সাহায্য করিলে ভালো। সমিতির ঠিকানা ৮নং জ্যাক্‌সন্ লেন, কলিকাতা।

স্মৃতি-তর্পণ—

গত মাসে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় স্মৃতি-সমিতির উদ্যোগে কলিকাতায় ও অন্যান্য স্থানে তাঁহার প্রথম বার্ষিক স্মৃতি-সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

মহাপ্রাণ ডেভিড্ হেয়ারের ও আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মৃত্যু-স্মৃতি-বার্ষিকীও গত মাসে হইয়াছে।

বাংলার বজেট—

ব্যবস্থাপক সভার গত অধিবেশনে আয়ব্যয় হিসাবের সময় রক্ষিত বিভাগের যে-সমস্ত খরচ অগ্রাহ্য হইয়াছিল তাহা মঞ্জুর করিয়া বাংলা সরকার এক ইস্তাহার প্রকাশ করিয়াছেন।

সার্ভে ও সেট্‌লমেন্টের জন্য ২০,০৫,০০০ টাকা সার্টিফিকেট্ বলে পুনঃ মঞ্জুর করা হইয়াছে।

গবর্ণরের ব্যাণ্ডের জন্য সম্প্রতি ১৪,০০০ টাকা অনুমোদিত হইয়াছে, পূর্ব্ব দাবি আগামী বর্ষের অধিবেশনে পুনঃ উপস্থিত করা হইবে।

সরকারী উকীলের জন্য বরাদ্দ ৪২,০০০ সম্পূর্ণ মঞ্জুর হইয়াছে। কেননা গবর্ণর মনে করেন যে, ঐ-টাকার কমে কাজ ভালো চলিবে না।

কলিকাতা পুলিশের জন্য যে সমস্ত বরাদ্দ অগ্রাহ্য হইয়াছিল তাহার মধ্যে ইন্‌স্পেক্টরদের জন্য ১০ হাজার টাকা বাদে সমস্তই সার্টিফিকেট বলে আবার মঞ্জুর হইয়াছে।

এই সম্পর্কে কলিকাতার সাপ্তাহিক সংবাদপত্র "গার্ডিয়ান্" যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। তাহা এই :—

"যে দেশে ম্যালেরিয়া দমন জন্য সরকার বাহাদুর ৫০,০০০ ব্যয় করিতে পারেন না, যে দেশের কালা-জ্বর নিবারণ জন্য গভর্ণমেণ্ট ২৫,০০০ ব্যয় করিতে অসমর্থ, যে-দেশের মফঃস্বলের দাতব্য সরকারী চিকিৎসালয়ে যন্ত্রপাতি এবং ডিসপেন্‌সারির অন্যান্য খরচা জন্য বজেটে বাৎসরিক ২,৩১,০০০ টাকার বেশী ধার্য্য হয় না, সে-দেশে লাটসাহেবের ব্যাণ্ডের জন্য বাৎসরিক ১৪০০০ ব্যয় সার্টিফিকেটের জোরে বরাদ্দ করা বেশ একটু বে হিসেবী ব্যাপার। ম্যালেরিয়ার এবং কালাজ্বরের তাড়নায় গ্রামে-গ্রামে অকাল-মৃত্যুর জন্য যে মর্ম্মভেদী শ্মশান-সঙ্গীত উত্থিত হইতেছে সেজন্য ৫০,০০০ টাকা মঞ্জুর করিতে গভর্ণমেণ্ট অক্ষম আর লাট প্রাসাদে ব্যাণ্ড সঙ্গীতের জন্য ১৪,০০০, ব্যয়-ব্যাপারটা প্রয়োজনীয়? ইহা বিস্ময়ের বিষয়। সাধারণত বিশেষ জরুরী ব্যাপার ব্যতীত কোনো-ক্রমে সার্টিফিকেটের ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয় না, সরকারী ভবনে ব্যাণ্ডের সঙ্গীত-উৎসব যে বিশেষ জরুরী ইহাও বিস্ময়কর ব্যাপার। এই ব্যাণ্ড্ ব্যতীত কি বঙ্গেশ্বর বাহাদুর রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে পারেন না? তা যদি হয় তবে, পঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের লাটগণ কিরূপে শাসন কার্য্য চালাইতেছেন? তাঁহারা ত ব্যাণ্ড্ উপভোগ করেন না। বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব লেফটেন্যাণ্ট্ গভর্ণরগণও এই "ব্যাণ্ডের" অধিকার পান নাই।"

(The Guardian, 21-5-25, page 212)

রাজনৈতিক বন্দীদের কথা—

গত ৪ঠা মে তারিখে ইংলণ্ডের কমন্স্ সভাতে লর্ড্ অলিভিয়ারের প্রশ্নের উত্তরে আর্ল্ উইণ্টারটন্ জানাইয়াছেন যে, রাজনৈতিক অপরাধে বর্ত্তমান সময়ে বাঙালা অর্ডিন্যান্স্ অনুসারে ৬ জন ও ১৮১৮ সনের তিন আইন অনুসারে ৩০ জনকে বন্দী করা হইয়াছে। শেষোক্ত ৩০ জনের মধ্যে বাংলা দেশের ২৭ জন বন্দী আছে।

মান্দালয়ে রাজবন্দী—

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু বর্ত্তমানে মান্দালয় জেলে আছেন। সেখানে তাঁহার অসুবিধার সম্পর্কে তাঁহার ভ্রাতা গভর্ণমেণ্ট্‌কে ২৪ শে এপ্রিল যে-পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার উত্তরে বাংলা সরকারের অতিরিক্ত ডেপুটী সেক্রেটারী জানাইয়াছেন যে, রাজবন্দীদের চিঠি পরীক্ষা করিবার জন্য মোটামুটি উপদেশ গবর্ণমেণ্ট্‌ দিয়াছেন। বিশেষ-বিশেষ ক্ষেত্রে পরীক্ষাকারী কর্ম্মচারীরা নিজ-নিজ বিচার বুদ্ধিমতে কাজ করেন, কোনো-কোনো সময় তাঁহারা গভর্ণমেণ্টের মতামত চাহিয়া থাকেন। জেল-পরিদর্শকের নিকট অভাব-অভিযোগ জানাইতে দিতে গভর্ণমেণ্টের কোনো আপত্তি নাই, তবে চিঠি লিখিবার সুযোগ পাইয়া রাজবন্দীরা তাহাতে সংবাদপত্রে আলোচনা চালান, ইহা গভর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত নয়।

প্রত্যেক রাজবন্দীকেই তাঁহাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ-সম্বন্ধে বিচার করিবার জন্য যে জজ নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট লিখিত জবানবন্দী করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। রাজবন্দীদের বিরুদ্ধে যে-সকল অভিযোগ আছে, তাহার মোটামুটি বিবরণ তাঁহাদিগকে জানান হয়। প্রকাশ্য বিচার কেন করা হইতেছে না, তাহা গবর্ণমেণ্ট্‌ ইতিপূর্ব্বেই জানাইয়াছেন, কাজেই তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

রাজবন্দীদিগের জন্য পুস্তক কিনিবার টাকা গবর্ণমেণ্ট দিয়াছেন, তবে পুস্তক নির্ব্বাচন ও ক্রয়ে বিলম্ব ঘটিবার সম্ভাবনা আছে।

রাজবন্দীদিগকে ২খানির বেশী চিঠি লিখিবার অনুমতি দিবার সম্বন্ধে কিছুদিন হইল বিবেচনা করা হইতেছে। সাময়িক-ভাবে তাহাদিগকে বর্ত্তমানে সপ্তাহে ৩খানা করিয়া চিঠি লিখিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। যদি চিঠি পরীক্ষাকারী কর্ম্মচারীর পক্ষে অসুবিধা হয়, তবে এই অনুমতির পরিবর্ত্তন হইবে।

রাজবন্দীদিগকে সম্বোধন করিবার সম্বন্ধে কোনো বিশেষ নির্দ্দেশ গবর্ণমেণ্ট্‌ দেন নাই।

চর মনাইর মানহানির মোকদ্দমা—

চর মনাইর গ্রামে পুলিশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানহানিকর বাক্য প্রয়োগ করার অজুহাতে শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র গুহ রায়কে ফরিদপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ এক বৎসরের কারাদণ্ডের আদেশ দেন। হাইকোর্টে আপিলের ফলে মামলা পুনর্ব্বিচারের জন্য প্রেরিত হয়। মামলা পুনরায় আরম্ভ হইলে সরকারী উকিল মামলা প্রত্যাহার করিয়াছেন। এই মামলায় প্রভূত অর্থ ব্যয় হইতেছে। ঐ-আবেদন মঞ্জুর হইয়াছে ও শ্রীযুক্ত গুহ রায় খালাস পাইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে 'হিন্দুরঞ্জিকা' বলিতেছেন;—মামলায় যে অর্থ ব্যয় হয়, তাহা কি গবর্ণমেণ্ট্‌ জানিতেন না? এই যে দেশের অর্থ ব্যয় হইল—ইহার জন্য দায়ী কে? তার পর ডাঃ গুহ রায় যে এই মামলার জন্য অযথা শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ ভোগ ও অর্থ নষ্ট করিতে বাধ্য হইলেন তাহার ক্ষতিপূরণ কে করিবে? পুলিসের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলির কি কোনোই তদন্ত হইবে না?

কংগ্রেসকর্ম্মীর পরিবার অনশনে—

মৈমনসিংহের কংগ্রেস কর্ম্মী স্বর্গীয় মৌলবী আবদুল হামেদ চৌধুরী সাহেবের পরিবারবর্গ অনশনকষ্ট ভোগ করিতেছেন। প্রায় এক মাস যাবৎ কলিকাতায় বসন্ত-রোগে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির এবং অসহযোগ আন্দোলনের ও আঞ্জুমান ওয়াজীনের একজন সুদক্ষ প্রচারক ও কর্ম্মী ছিলেন। স্বাধীনচিন্তা, হিন্দু-মুসলমানের একতায় প্রগাঢ় বিশ্বাস এবং রাজনৈতিক মুক্তি লাভের জন্য ব্যগ্রতায় তিনি নিজের দুরবস্থা বিস্মৃত হইয়াছিলেন। তিনি হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ সমাধানের নিমিত্ত মেদিনীপুর যাইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৌলবী-সাহেব দুইটি পত্নী ও একটি কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আরও চারিজনের গ্রাসাচ্ছাদন তাঁহার উপরই নির্ভর করিত। সর্ব্বসাধারণের সাহায্য ব্যতিরেকে তাঁহার দুঃস্থ পরিবারবর্গকে অনাহারে কাল যাপন করিতে হইবে। এই দুঃস্থ পরিবারকে বাংলার হিন্দু-মুসলমান সকলেরই সাহায্য করা উচিত। এতদর্থে সর্ব্বপ্রকার চাঁদা কলিকাতা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদকের নিকট ৩০নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটে প্রেরণ করিতে হইবে।

সামাজিক উৎপীড়ন—

হিন্দু-সমাজের অসম্ভব আচারনিষ্ঠা দ্বারা সমাজের লোক উৎপীড়িত হইতেছে এবং ফলে অনেকে সমাজ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছে। সহযোগী 'সঞ্জীবনী' হইতে আমরা নিম্নলিখিত ঘটনাটি উদ্ধৃত করিয়া আমাদের উপরোক্ত মন্তব্যের সারবত্তা প্রমাণ করিতেছি।

"ঢাকা জেলার বিক্রমপুর থানার অধীন, শ্রীপুর গ্রামের তিলকদাস একটি গরু ক্রয় করিয়া এক বৎসরের মধ্যে কিঞ্চিৎ লাভে উহা বিক্রয় করে। এইজন্য তাহার স্বজাতীয়েরা তাহাকে একঘ'রে করে। সে প্রায়শ্চিত্ত করিতে চাহিলে পণ্ডিতগণ তাহাকে ১০০৲ টাকা খরচের ফর্দ্দ দেয়। সে বলে যে, সে মাত্র ৫০৲ টাকা খরচ করিতে পারে। কিন্তু পণ্ডিতগণ তাহাতে অস্বীকৃত হয়। অতঃপর সে সমাজের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া সপরিবারে মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে।"

মৈমনসিংহ-জেলার ভালুকা থানার অন্তর্গত বাইরপাথর গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্র বৈরাগী নিজ পরিবারস্থ ৮ জন স্ত্রীপুরুষ সহ ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে। জেলা খুলনার অন্তর্গত শীতলপুর গ্রামে গত ২রা জ্যৈষ্ঠ বাবু উমেশচন্দ্র বসু নামক একজন কায়স্থ যুবক ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

—মোহাম্মদী

বিধবা বিবাহ—

গত ১৭ই মে মেদিনীপুর সহরের অনতিদূরে জিনসর নামক গ্রামে একটি বালবিধবার পরিণয় সাধিত হইয়াছে। বর-আজুয়া গ্রামনিবাসী শ্রী রাখালচন্দ্র ঘোষ। কন্যাটি অতি অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছিল এখন। তাহার বয়স ত্রয়োদশ বৎসর মাত্র। মেদিনীপুর বিধবা বিবাহ সমিতি হইতে সমিতির সম্পাদক অন্যান্য কয়েকজন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জাতীয় সদস্য এই বিবাহে যোগদান করিয়াছিলেন। বর ও কন্যা উভয়েই সদ্গোপ জাতীয়।

—সত্যবাদী

নারীনির্য্যাতন—

সম্প্রতি ঝালকাঠী থানার অন্তর্গত বাউকাঠী গ্রামের পূর্ব্ববর্ত্তী মানপাশা গ্রাম হইতে একটি ভীষণ নারী-নিগ্রহের সংবাদ আসিয়াছে। সুখের বিষয়, মুসলমান গুণ্ডার অত্যাচারে ভীত না হইয়া নমঃশূদ্রগণ দলবদ্ধভাবে অনুসন্ধান করিয়া অত্যাচারিতা নারীর উদ্ধার সাধন করিয়াছে এবং উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্তের পর তাহাকে সমাজে গ্রহণ করা হইবে বলিয়া ঠিক করা হইয়াছে।

—বরিশাল

গুণ্ডা কর্ত্তৃক নারী-নির্য্যাতনের কথাই লোক-সমাজে প্রচারিত হয় ও আদালতে কোনো-কোনো স্থলে দুর্ব্বৃত্তেরা শাস্তি পায়। কিন্তু

বাংলার অন্তঃপুরে নারীর উপর যে ভীষণ অত্যাচার হয় তাহা কদাচিৎ বাহিরে প্রকাশিত হয়। সহযোগী আনন্দবাজার পত্রিকা এই বিষয়ে অনেকগুলি সংবাদ প্রকাশ করিয়া হিন্দু-সমাজের চরম দুর্গতির কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। আনন্দবাজার পত্রিকা লিখিতেছেন—

"অন্তঃপুরে নারী-নির্য্যাতনের কত দৃষ্টান্ত দিব? আহিরীটোলার আনন্দময়ীর কথা কাহার না মনে আছে? কিছুদিন পূর্ব্বে পাবনা জেলার বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-পরিবারের একটি বধূর উপর যে পৈশাচিক অত্যাচার হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় অনেকেই ভুলেন নাই। সম্প্রতি কলিকাতায় বালিকা-বধূর হত্যার অপরাধে একজন স্বামীরূপী পিশাচের প্রাণদণ্ড হইয়াছে, একথাও সকলে জানেন। দশ বৎসরের বালিকা স্ত্রীর উপর অত্যাচারে বাধা পাইয়া ঐ-পশুটা মাথায় প্রস্তরাঘাত করিয়া হতভাগিনীকে হত্যা করে।......পল্লীগ্রামের কোনো ভদ্রলোক কোনো মাননীয়া হিন্দু-মহিলাকে পত্রযোগে জানাইয়াছেন :—

'* * গ্রাম নিবাসী......দুই সহোদর ভাই। দুই ভাইয়েরই দুইটি করিয়া বিবাহ। বড়-ভাইয়ের বড় স্ত্রীকে, দুই ভাই ও মা মিলিয়া মারপিট ও জ্বালা যন্ত্রণার দ্বারা এমনই নির্য্যাতন করিত যে, বৌটি বাধ্য হইয়া গ্রামস্থ অন্য ভদ্রলোকের বাড়ী আশ্রয় লইত। মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্ব্বে বৌটিকে তাহারা এরূপ মারপিট করিয়াছিল যে, তাহার ফলে তাহার জ্বরবিকার হয় ও সে মারা যায়।...কনিষ্ঠের প্রথমা স্ত্রীকে পুত্রের মাতা পিঁড়ির দ্বারা রগে এমন ভীষণ আঘাত করে যে, সে অচেতন হইয়া পড়িয়া যায়।......পরে দেখা গেল, বৌটি জলে ডুবিয়া মরিয়াছে।

'জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার দ্বিতীয়া-স্ত্রীও শুনা যায় গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছে। মৃত্যুর তিন চারি দিন পূর্ব্ব হইতে শাশুড়ী ও স্বামী তাহাকে অনাহারে রাখিয়াছিল। শাশুড়ী ঝাঁটা ও অন্যান্য হাতিয়ার দ্বারা বৌটিকে প্রহারও করিত। বৌটির মৃত্যুর পরে আদালতে মোকদ্দমা হয়।'

"এই দুই ভাই ব্রাহ্মণ, 'শিক্ষিত' ও চাকুরিয়া; বোধ হয় হিন্দু ধর্ম্ম ও সমাজের ধ্বজা বলিয়াও ইঁহারা গণ্য হইয়া থাকেন।"

মহাত্মা গান্ধীর বাংলা-ভ্রমণ—

মহাত্মাজীর বাংলা-ভ্রমণের প্রথম অধ্যায় শেষ হইয়াছে। তিনি পূর্ব্ব বঙ্গ ও উত্তর-বঙ্গের অনেক জেলা ভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি যেখানে গিয়াছেন সেখানেই নর-নারী তাঁহাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়াছে। তিনিও সকল স্থানেই গঠন-কার্য্যের—বিশেষভাবে চরকার—কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু বাংলার নর-নারী কি মহাত্মাজীর উপদেশ গ্রহণ করিয়াছেন? চট্টগ্রামের জ্যোতি লিখিতেছেন—

"বিফল ভ্রমণ।—বঙ্গীয় খাদি প্রতিষ্ঠানের প্রধান নায়ক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয় অতি দুঃখে বলিয়াছেন যে,—'বঙ্গদেশে মহাত্মার পরিভ্রমণ সম্পূর্ণ বিফল হইয়াছে। লোকেরা দলে-দলে কেবল তাঁহাকে দর্শন করিতে আসে, কিন্তু তিনি যে উপদেশ দেন তদনুসারে কাজ করিতে খুব অল্প লোকেই চায়। তাঁহাকে দর্শন করিলেই যেন তাহাদের কর্ত্তব্য শেষ হইয়া যায়। আমরা এখন জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, দেশের অবস্থা না বুঝিয়া তাঁহারা মহাত্মাজীর ভ্রমণের বন্দোবস্ত করিলেন কেন? এদেশে স্বদেশসেবার চেষ্টা বারম্বার কেন বিফল হইতেছে, সতীশ-বাবুরা কি তাহা চিন্তা করেন? আমাদের আশঙ্কা মহাত্মাজীর এবারকার বিফল ভ্রমণ তাঁহার ভবিষ্যৎ চেষ্টার পথে বিষম অন্তরায় উপস্থিত করিবে।"

কিন্তু মহাত্মাজি নিজে বড় আশার কথা বলিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন;—

"আমি বাঙালী-জীবন যতই দেখিতেছি, তাহার বিভিন্ন দিকে অপরিমেয় বিকাশের সম্ভাবনা সম্পর্কে ততই নিঃসন্দেহ হইতেছি। বাঙালী এ যুগে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিকে দিয়াছে। বাঙ্গালী এমন দুইজন বৈজ্ঞানিককে দিয়াছে, যাঁহারা জগতের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণের সমতুল্য বলিয়া গৃহীত। বাঙ্গালায় যে সব সঙ্গীতজ্ঞ আছেন, তাঁহাদের পরাজয় করা দুঃসাধ্য। বাঙ্গলার চিত্রকরগণের রূপ সৃষ্টি ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমাদৃত। বাঙ্গলার গৌরবময় আত্মোৎসর্গ রহিয়াছে।...আমি সত্যই জানিতাম না যে, বাংলায় এমন-সমস্ত যুবক রহিয়াছেন, যাঁহারা এমন অভাব ও দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করিতেছেন, যাহার ফলে তাঁহারা ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছেন এবং ব্যাধির একমাত্র কারণ পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব ও স্বাস্থ্যকর স্থানে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য যাইবার অসুবিধা। এখন আমি এ-সমস্ত স্থান এবং এইরূপ অনেককে দেখিয়াছি।

"বাঙ্গালার নর-নারী-নির্ব্বিশেষে সকলেরই চর্‌কা কাটিবার এক বিশেষ দক্ষতা আছে। আমি স্ত্রী পুরুষ উভয়কেই চাঁদপুর, চট্টগ্রাম, মহাজন হাট, নোয়াখালী, কুমিল্লা, ঢাকা ও ময়মনসিংহে চর্‌কা কাটিতে দেখিয়াছি। সকল স্থানের কার্য্য দেখিয়া আমার প্রতীতি হইয়াছে যে, ভারতের আর কুত্রাপি আমি এমন উৎকৃষ্ট সূতাকাটা দেখি নাই।"

মহাত্মাজি যেখানেই গিয়াছেন সেখানেই তিনি মহিলাবৃন্দ-কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়াছেন। মহাত্মাজী কয়েকদিন বোলপুরে শান্তিনিকেতনে বিশ্রাম করিয়াছেন। সেখানে তিনি কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত এণ্ড্রুজ, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, বিশপ ফিশার প্রভৃতির সহিত নানা-বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি দার্জ্জিলিং গিয়াছিলেন ও সেখান হইতে আবার বাংলার অন্যান্য জেলায় ও আসামে ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন।

শ্রী প্রভাত সান্যাল

ভারতীয় দুর্ভিক্ষের ইতিহাস

ব্রেগার সাহেব লিখিত "ভারতের দুর্ভিক্ষ" নামক গ্রন্থ হইতে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দুর্ভিক্ষসমূহের একটা তালিকা দিলাম।

বৎসর	স্থান	বৎসর	স্থান
৯৪২	উঃ ভারত	১৭৯০	বোম্বাই
১২০০	উড়িষ্যা	১৭৯২	উড়িষ্যা
১৩৪৫	দিল্লী	১৭৯৪	বোম্বাই
১৩৯৬	দাক্ষিণাত্য	১৭৯৯-১৮০১	মাদ্রাজ
১৪৭১	উড়িষ্যা	১৮০৩	উঃ পঃ অঞ্চল ও
১৫২১	বোম্বাই		বোম্বাই
১৫৪০	ঐ		
১৫৫৬	দিল্লী	১৮০৭	বোম্বাই
১৫৯৬	মধ্যপ্রদেশ	১৮১০	ঐ
১৬৩১	দাক্ষিণাত্য	১৮১২	ঐ
১৬৬১	উঃ পঃ অঞ্চল ও	১৮১৩	উঃ পঃ অঞ্চল ও
	পঞ্জাব		রাজপুতানা
১৭০৩	বোম্বাই	১৮১৯	উঃ পঃ অঞ্চল
১৭৩৩	ঐ	১৮২০-২২	বোম্বাই
১৭৩৯	...	১৮২৫-২৭	উঃ পঃ অঞ্চল
১৭৪৪	...	১৮৩২	ঐ ও মাদ্রাজ
১৭৫২	...	১৮৩৪	বোম্বাই
১৭৫৯	বোম্বাই ও	১৮৩৬	ঐ ও মাদ্রাজ
	সিন্ধুপ্রদেশ	১৮৩৭	উঃ পঃ অঞ্চল
১৭৬৫	ঐ	১৮৫৩	মাদ্রাজ
১৭৭০	বঙ্গদেশ	১৮৬০	উঃ পঃ অঞ্চল
১৭৭৩	বোম্বাই		পঞ্জাব ও বোম্বাই
১৭৮৩	উঃ পঃ অঞ্চল ও	১৮৬৫	উড়িষ্যা ও বঙ্গদেশ
	পঞ্জাব	১৮৬৮-৭০	উঃ পঃ অঞ্চল
১৭৮৬	বোম্বাই		ও রাজপুতানা
১৭৮৯-৯২	মাদ্রাজ	১৮৭৩	বঙ্গদেশ

এই তালিকা সম্পূর্ণ নয়। সরকারের নীতিবিগর্হিত শাসন-প্রণালীর ফলে ও শত্রুর আক্রমণ জনিত যে-সকল দুর্ভিক্ষের উদ্ভব হইয়াছিল তাহা এই তালিকায় স্থান পায় নাই।

স্থানীয় গ্রন্থকারগণের লিখিত বৃত্তান্ত হইতে আমরা প্রথম যে দুর্ভিক্ষের বর্ণনা পাই তাহা ঘটিয়াছিল ৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে।

"৯৪১-৪২ অব্দে একটি ধূমকেতুর আবির্ভাব হইয়াছিল। এই ধূমকেতুর পুচ্ছ পূর্ব্ব গগন হইতে পশ্চিম গগন পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, এবং ১৮ দিন পর্য্যন্ত আকাশে বর্ত্তমান ছিল। ইহার ধ্বংসকারী গুণের প্রভাবে প্রচণ্ড এক দুর্ভিক্ষের উদয় হইল। ইহার ফল এইরূপ হইল যে, "জারিব" পরিমাণ জমির গম ৩২০ "মিস্কা" স্বর্ণের বিনিময়ে বিক্রীত হইত। শস্যের একটা শীষের দাম সপ্তর্ষিমণ্ডলের উচ্চতার সহিত উপমিত হইত; অতএব গমের মূল্য যে কিরূপ ছিল সহজেই অনুমেয়।"

"দুর্ভিক্ষ এত তীব্রভাবে অনুভূত হইয়াছিল যে মানুষ মানুষকেই ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইত; এবং মৃত্যুর সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, তাহাদের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া করিয়া উঠা অসম্ভব হইয়াছিল।"

আলাউদ্দীনের রাজত্বকালে (১২৯৬-১৩১৮ খ্রীষ্টাব্দে) একবার আহার্য্য-সামগ্রী ভয়ানক দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠে। আইন দ্বারা মূল্য নির্দ্ধারিত করা ব্যতীত অন্য কোনো উপায় নাই দেখিয়া এই সিদ্ধান্ত অনুসারে শস্য বিক্রয় ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধীয় আইন ও নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ হইল।

১ম নিয়ম—শস্যের মূল্য নির্দ্ধারিত হইল, এবং এই নির্দ্ধারিত মূল্য সুলতানের সমগ্র রাজত্বকালই স্থায়ী ছিল।

২য় নিয়ম—যাহাতে প্রথম নিয়মানুযায়ী কার্য্য হয় তাহার বন্দোবস্ত করা হইল।

৩য় নিয়ম—যে-উপায়ে রাজার গোলায় প্রচুর ধান্য সংগৃহীত হইতে পারে তাহার নিয়মাবলী। কথিত আছে সুলতান আদেশ করিলেন যে, "দো আবের" অন্তর্ভুক্ত খালসা গ্রামসমূহে শস্য দ্বারা রাজস্ব দিতে হইবে। এইসকল শস্য দিল্লীর গোলা-ঘরে আনীত হইত। দিল্লীর চতুষ্পার্শ্বের গ্রাম হইতেও রাজস্বের অর্দ্ধপরিমাণ শস্য আদায় করা হইত। "ঝাইন" সহরে এবং তাহার গ্রামসমূহে প্রথমত শস্য সংগৃহীত হইত। পরে পর্য্যটক-দলসমূহ দ্বারা (caravans) দিল্লীতে আনীত হইত। এইরূপে সংগৃহীত শস্যের পরিমাণ এত অধিক হইত যে, অন্ততঃ ২।৩ গোলা সর্ব্বদাই পূর্ণ থাকিত। যদি কখনও অনাবৃষ্টি হইত কিম্বা কোনো কারণে পর্য্যটকদল আসিতে বিলম্ব হইত, এবং বাজারে শস্যের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে দেখা যাইত, তখনই এই রাজকীয় গোলা খুলিয়া আবশ্যক-মতন শস্য নির্দ্ধারিত মূল্যে বিক্রীত হইত। আবার আবশ্যক হইলে পর্য্যটকদলের সঙ্গে শস্য দিল্লী হইতে গ্রামেও পাঠানো হইত। এই নিয়ম অবলম্বন করার ফলে আর কখনও শস্য বাজারে হ্রাস পাইবার অবসর পায় নাই।

৪র্থ নিয়ম—যে-পর্য্যটকদল সুলতানের শস্য-বাহকের কার্য্য করিত এই নিয়ম তাহাদের জন্য। সমস্ত শস্যবাহকগণের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণের জন্য একটি বাজার-পরিচালক (controller of markets) নিযুক্ত হইল। শস্যবাহকগণের দলপতিদিগকে গ্রেপ্তার করিবার আদেশ হইল। যে-পর্য্যন্ত তাহারা সকলে এক নিয়মে কার্য্য করিতে স্বীকৃত না হয় এবং পরস্পরের কার্য্যের জন্য জামিন না দেয়, সে-পর্য্যন্ত বাজার-পরিচালক তাহাদিগকে অবরুদ্ধ রাখিবে। তাহাদিগকে মুক্ত করা হইবে না যে পর্য্যন্ত তাহারা স্ত্রী পুত্র পশুসম্পত্তি ইত্যাদি তাহাদের সমস্ত লইয়া আসিয়া যমুনার তীরবর্ত্তী গ্রামসমূহে বাসস্থান নির্দ্দেশ না করিবে। বাজার পরিচালকের সাহায্যের জন্য শস্যবাহকদিগের কার্য্যের একজন পরিদর্শক overseer থাকিত।

আলাউদ্দিনের রাজত্বকালে অনেক বৎসর অনাবৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও কখনও শস্যের অভাব ঘটে নাই; কিম্বা মূল্য বৃদ্ধি হয় নাই। অনাবৃষ্টির সময়ে দুই একবার মাত্র পরিদর্শক সংবাদ দিয়াছিলেন যে, মূল্য অর্দ্ধ "জিটেল" বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সংবাদের জন্য পরিদর্শককে কুড়ি ঘা বেত খাইতে হইয়াছিল। সহরের চতুর্থাংশের উপযোগী শস্য দৈনিক শস্য-বিক্রেতাদিগকে দেওয়া হইত এবং সাধারণ ক্রেতাদিগকে প্রত্যহ অর্দ্ধমণ-পরিমাণ শস্য দেওয়া হইত। এই নিয়মে যে-সকল ভদ্রলোক ও

ব্যবসাদারগণের বাড়ী কিম্বা জমি ছিল না, তাহারাও অনায়াসে বাজার হইতে শস্য ক্রয় করিতে পারিত। এইরূপ কোনো প্রতিকূল সময়ে যদি কখনো কোনো দরিদ্র লোক বাজারে যাইয়া কোনো রূপ সাহায্য না পাইয়া ফিরিয়া আসিত, সে-খবর সুলতানের কর্ণগোচর হইলে পরিদর্শককে উপযুক্ত দণ্ডবিধান করা হইত।"

(স্বাবলম্বী, পৌষ ১৩৩১) শ্রীযোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

—

শিশু-জীবনের বিপদ্ ও প্রতিকার

ভারতে প্রত্যেক ৩টি শিশুর মধ্যে একটি শিশু তাহার প্রথম জন্মতিথির পূর্ব্বে অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। অথচ ইংলণ্ডে প্রত্যেক দশটির মধ্যে ১টি শিশুর মৃত্যু হয়। আমরা দেশের প্রত্যেক নরনারীকে বুঝাইতে চাই যে, প্রতি বৎসর ২০,০০,০০০ কুড়ি লক্ষের অধিক শিশু বলি হইতেছে।

প্রসূতিরা প্রসবগৃহের জন্য একটি অপরিষ্কার অস্বাস্থ্যকর কুঁড়ে-ঘরের আশ্রয় লন। ফলে প্রসূতি ও নবজাত শিশু অসুস্থ হইয়া পড়ে এবং উভয়ের মৃত্যুর কারণ হয়।

মাতারা গুরুতর পরিশ্রম-সহকারে গৃহকার্য্য করিয়া থাকেন, ফলে গর্ভস্রাব ও সন্তান বিকৃতভাবে জরায়ুর মধ্যে অবস্থান করায় প্রসব-কালে উভয়ের প্রাণ নষ্ট হয়।

তাঁহারা যাহা ইচ্ছা খান; ফলে পেটের অসুখে চিররুগ্ন হন এবং পরোক্ষভাবে গর্ভস্থ শিশুর অমঙ্গল আনয়ন করেন।

তাঁহারা প্রসবের পূর্ব্বে নিজের জন্য কিম্বা শিশুর জন্য কোনো জামা কাপড় বা বিছানা তৈয়ার করেন না। এ-কারণ প্রসবসময়ে উপযুক্ত ধাত্রী বা চিকিৎসকের উপদেশমতে চলিতে পারেন না। যে-সে বস্ত্র পরিয়া রোগ ডাকিয়া আনেন।

তাঁহারা অশিক্ষিত ধাত্রীর সাহায্য লন। ধাত্রীগণ ময়লা কাপড়ে ময়লা হাতে ও অপরিষ্কারভাবে প্রসব-দ্বারে হস্তস্পর্শ করায় নানাপ্রকার উৎকট ব্যাধি উৎপাদন করে।

বাঙ্গালা দেশে যত লোক জন্মায় তাহার মধ্যে কতগুলি কত বয়সে মরে তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :—

১০০০ একহাজার শিশু জন্মিলে এক মাসের মধ্যে মৃত্যু ৮৭টি

১ মাস হইতে ৬ মাস মধ্যে—	৪৭টি
৬ ,, ১২ ,,	৫১টি
১ বৎসরে মোট—	১৮৭টি
১ হইতে ৫ বৎসরের মধ্যে—	১৩০টি
৫ ,, ১০ ,, ,,	৮৪টি
১০ ,, ১৫ ,, ,,	৪৮টি
১৫ ,, ২০ ,, ,,	৫২টি

২০ বৎসরের মধ্যে মোট ৫১১টি।

২০ হইতে ৩০ বৎসরের মধ্যে—	১২২টি
৩০ ,, ৪০ ,, ,,	১০১টি
৪০ ,, ৫০ ,, ,,	৮৮টি
৫০ ,, ৬০ ,, ,,	৭৫টি
৬০ বৎসরের বেশী বয়সে—	১০৪টি

মোট ৭০ বৎসরের মধ্যে ১০০০টির মৃত্যু হয়।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে প্রতি বৎসরে পাঁচ ভাগের এক ভাগ লোক জন্মের সঙ্গেই মরিতেছে।

ফরিদপুর জেলায় ১০০ শিশুর ভিতর ২৩টির ১ বৎসরের ভিতর মৃত্যু হয়। প্রতিদিন ১৮৮টি শিশু জন্মে, প্রতিঘণ্টায় ৮টি মাত্র, (পূর্ব্ববঙ্গের সকল জেলা অপেক্ষা গড়ে ২ জন ক'রে কম) প্রতিদিন ৩৭টির মৃত্যু হয়।

নিম্নলিখিত উপদেশগুলি নিজের সন্তানের মঙ্গলের জন্য পালন করা উচিত।

(১) শিশু-রক্ষা-কল্পে স্থিরসংকল্প হউন।

(২) আপনার বাসগৃহকে স্বাস্থ্যকর স্থানে পরিণত করুন।

(৩) গৃহের ময়লা ধুলা আবর্জ্জনা পুড়াইয়া ফেলুন।

(৪) মাছি ধ্বংস করুন।

(৫) দিবারাত্র বিশুদ্ধ বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা করুন।

(৬) নির্দ্দিষ্ট সময়ে সুসিদ্ধ পুষ্টিকর আহার দেওয়ার ব্যবস্থা করুন।

(৭) যথা-প্রয়োজন সুনিদ্রার ব্যবস্থা করুন।

(৮) বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করুন।

(৯) সূতিকাগার শাস্ত্রানুযায়ী স্বাস্থ্যকর করুন। যে-ঘরে দেবশিশু জন্মগ্রহণ করিবে তাহা দেব-মন্দিরের মত খট্‌খটে, আলো-বাতাস লাগে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে, এরূপ ভাবে প্রস্তুত করুন।

(১০) অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীলোক গুরুভার বহন করিবেন না, জলের কলসী কক্ষে লইবেন না, ছবি টাঙাইবেন না, কারণ পড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

(১১) এমন খাদ্য খাইবেন না, যাহাতে পেটের অসুখ অথবা উত্তেজনা আনিতে পারে।

(১২) প্রসবের পূর্ব্বে যথানিয়মে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জামা-কাপড় ও বিছানার বন্দোবস্ত করিবেন।

(১৩) শিক্ষিত ধাই না পাইলে কাহাকেও প্রসব-দ্বার স্পর্শ করিতে দিবেন না। উহাতে প্রসূতির আসন্ন বিপদ্ ঘটিতে পারে, শিশুরও অমঙ্গলের বিশেষ সম্ভাবনা। গ্রাম্য ধাইদের নিজেরা উপদেশ দিয়া যথাসাধ্য শিক্ষিতা করিয়া লইবেন।

(১৪) বাল্য-বিবাহ নিবারণ করিতে হইবে। অধিকাংশ ভারত-রমণী অতি অল্প বয়সে সন্তানের জননী হন। কাজেই তাঁহারা প্রকৃত মাতৃত্বের কর্ত্তব্যগুলি যথারীতি শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ পান না।

প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙিলে শিশু খেলা করিতে থাকিবে, ইহাই সুস্থ শিশুর লক্ষণ। এই শিশুকে প্রথমেই স্তন্যদান করিতে হইবে। যদি দুর্ভাগ্যক্রমে স্তনদুগ্ধ বিকৃত হয়, বা তাহার অভাব হয়, তাহা হইলে যে-পাত্রে উহাকে গরুর বা ছাগীর দুগ্ধ খাওয়ানো হইবে, তাহা খুব পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে।

দুগ্ধ যেন খাঁটি টাট্‌কা হয়। বাসি দুগ্ধে যে-সকল বীজাণু জন্মে তাহা অতি ভীষণ রোগের কারণ হয়।

শিশু ক্ষুধা ছাড়াও জলতেষ্টায় বেশী কাঁদে। শিশুর পোষাক ঠাণ্ডা ও সাদাসিদে হওয়া দরকার। গ্রীষ্মকালে মাত্র একটি নেংটি বা জাঙ্গিয়া সেফ্‌টিপিন্ বা সুতা দিয়া বাঁধিয়া দিবেন এবং একটি পাত্‌লা জামা ফিতা দিয়া বাঁধিয়া দিলেই চলিবে। শিশুর জামা-কাপড় সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিবেন।

প্রস্রাব বা বাহ্যের দ্বারা অপরিষ্কৃত কাপড় গরমজলে কাচিতে হইবে। জন্মের দশদিন পর হইতেই শিশুকে প্রতিদিন অন্তত একবার করিয়া ভালো করিয়া স্নান করাইবেন। গ্রীষ্মকালে ইহা ছাড়া একবার বা দুবার ভিজা গামছা দিয়া গা মুছাইয়া দেওয়া ভালো।

শিশুর ঘুম বেশী হওয়া দরকার। উহাদের নিকট গোলমাল করিয়া ঘুম ভাঙানো উচিত নয়। খুব ছোটো শিশুকে নাড়াচাড়া করা ভালো নয়। যতটা খোলা হাওয়ায় শরীর ঢাকিয়া ঘুমাইতে দেওয়া হয় তাহাই ভালো। গায়ে যেন মশামাছি না বসিতে পারে।

খাদ্য খারাপ হওয়ায় পেটের অসুখ হয়। এবিষয় খুব সাবধানে থাকিবেন। ময়লার রং যদি সবুজ হয়, তৎক্ষণাৎ ডাক্তার দেখাইবেন। প্রথমেই সব খাওয়ানো বন্ধ করিয়া কেবল গরম জল খাওয়াইবেন।

অতিরিক্ত খাওয়ানো, তাড়াতাড়ি খাওয়ানো কিংবা খারাপ খাওয়ানোর জন্ম অথবা অতিরিক্ত নাড়াচাড়া করায় শিশুর বমি হইতে পারে।

২৪ ঘণ্টায় একবার হইতে তিনবার পায়খানা হইতে পারে। বাহ্যের রং যদি হলুদে হয় এবং কোনো-প্রকার হড়্‌হড়ে পুঁজ অথবা দইয়ের মতন দেখিলে বুঝিবেন শিশুর খাওয়ানোর কোনো-প্রকার দোষ আছে।

মাতাপিতার স্বাস্থ্য যেন কোনো কারণে অসুস্থ না হয়, তবেই সুস্থকায় সন্তান জন্মিবে।

মাতার শরীর ভালো থাকিলে শিশু স্তনদুগ্ধ ভালোরূপে পাইবে; তবেই শিশু বলবান্ হইবে।

শিশুর জন্মের পূর্ব্বে মায়ের শরীর অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষা করানো উচিত।

যে ধাই প্রসবগৃহে ঢুকিবে, সে যাহাতে কাপড় ছাড়িয়া পরিষ্কার ধৌত কাপড় পরে, নখ কাটিয়া এবং ভালো করিয়া সাবান-জল এবং বিশোধক-দ্রব্যের জলে হস্ত ধৌত করিয়া প্রসূতকে স্পর্শ করে তৎপ্রতি সাবধানতা অবলম্বন করিবে।

শিক্ষিত ধাত্রী প্রসবকালে প্রসূতির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া শিশুর গলায় নাড়ী জড়ানো থাকিলে শিশুর তখনই মৃত্যু হইতে পারে মনে করিয়া, উহা ছাড়াইয়া দিবে।

শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে, উহার শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়মিতভাবে না চলিলে, তাহাকে নিয়মিত প্রক্রিয়া দ্বারা স্বাভাবিক অবস্থায় আনিবে।

পরে কাঁচি ও সুতা জলে ফুটাইয়া লইয়া সুতা দ্বারা নাড়ী বাঁধিয়া ঐ কাঁচি দ্বারা নাড়ী কাটিবে।

শিশুর জন্মের প্রথম এক বৎসর শিশু বেশীর ভাগই স্তন্য দুগ্ধ খাইবে। একথা যেন সর্ব্বদা মনে থাকে।

(স্বাস্থ্য ও শক্তি, বৈশাখ)　　শ্রী অক্ষয়কুমার সরকার

মুসলমান বৈষ্ণব কবি

অনেক মুসলমান বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া গৌরাঙ্গদেবের ভক্ত হইয়াছিলেন এবং বৈষ্ণবধর্ম্মের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। রাজসাহী জেলার অন্তর্গত নরোত্তম ঠাকুরের জন্মভূমি খেতরি গ্রামের মেলায় বহু বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী মুসলমান ও কালাচাঁদ নামে জনৈক মুসলমান ভক্তকে দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম। কালাচাঁদ মুসলমান হইলেও হিন্দুধর্ম্মের সমস্ত তত্ত্ব পরিজ্ঞাত আছেন। অনেক ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট গীতার ব্যাখ্যা শুনিতে দলে-দলে সেখানে আসিয়াছিলেন। এপর্য্যন্ত ৪৫ জন মুসলমান বৈষ্ণব কবির আবির্ভাব-সংবাদ জানিতে পারা গিয়াছে। তাহার অধিকাংশই চট্টগ্রাম বিভাগের স্কুল ইন্‌স্পেক্টর্ শ্রীযুত মৌলবী আব্‌দুল করিম সাহেব-বাহাদুরের চেষ্টা ও অনুসন্ধানের ফল। নদীয়া জেলার অন্তর্গত মেহেরপুরের জমিদার স্বর্গীয় বাবু রমণীমোহন মল্লিক মহাশয়ই সর্ব্বপ্রথমে মুসলমান বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলী সংগ্রহ ও প্রকাশ করেন। মল্লিক মহাশয় তাঁহার প্রকাশিত দুইখণ্ড পদাবলী লেখককে উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। রমণী-বাবু ঐসমস্ত পদসংগ্রহের জন্ম ৺বৃন্দাবনধাম পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন এবং অনেক মুদ্রিত ও হস্তলিখিত গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থে নয় জন মুসলমান কবির পদাবলী সংগৃহীত হইয়াছে। যথা,—আক্‌বরসাহ, নসীর মামুদ, সৈয়দ মর্ত্তুজ্যা, ফকির হবিব, সালবেগ, কবির, সেখলাল, ফতন ও সেখ ভিখন। ভক্ত সৈয়দ মর্ত্তুজ্যা চারিটি পদ রচনা করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের রূপবিষয়ক একটি, মানের একটি এবং ভাববিষয়ক দুইটি। নসীর মামুদের গোষ্ঠলীলা ও অনুরাগের দুইটি পদ পাওয়া গিয়াছে। আক্‌বর সাহ, ফকির হবিব, সালবেগ, কবির, সেখলাল, ফতন এবং সেখ ভিখন, ইঁহাদের প্রত্যেকের এক-একটি রচিত পদ সাহিত্য-জগতে পরিচিত আছে।

আক্‌বর শাহ্‌ ও সৈয়দ মর্ত্তুজ্যার সংক্ষিপ্ত জীবনী ভিন্ন আর কোনো কবির জীবনী পাওয়া যায় নাই। আক্‌বর সাহ এক নূতন ধর্ম্মমত স্থাপন করিয়াছিলেন। এই ধর্ম্মমত তৌহিদ-ই-ইলাহি নামে পরিচিত হইয়াছিল। হিন্দুধর্ম্মের বহুমত এই তৌহিদ-ই-ইলাহি গঠনে গৃহীত হইয়াছিল। বীরবল সিংহ সূর্য্যের অপার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া আক্‌বর শাহকে সূর্য্যোপাসক করিয়া তুলিয়াছিলেন। অগ্নি-উপাসনার ও বৈষ্ণবধর্ম্মের অনেক বিষয় তাঁহার নূতন ধর্ম্মে স্থান পাইয়াছিল। সৈয়দ মর্ত্তুজ্যা ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত জঙ্গীপুর গ্রামের সন্নিহিত কালিয়াঘাটায় জন্মগ্রহণ করেন। পশ্চিমাঞ্চলের বেরেলীতে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের বাস ছিল। সৈয়দ মর্ত্তুজ্যা জঙ্গীপুরের নিকট চড়কা নামক স্থানের রেজাক সাহেবের শিষ্য হইয়া তত্রত্য সুতীর নিকট ছাপঘাটিতে এক আস্তানা স্থাপন করেন। মর্ত্তুজ্যা সাহেব এক-জন প্রসিদ্ধ ধর্ম্মনিষ্ঠ ফকির ছিলেন।

জেলা চট্টগ্রামে সৈয়দ মর্ত্তুজ্যা নামধারী আর-একজন মুসলমান বৈষ্ণব কবি ছিলেন। তাঁহার ১৯টি কবিতা শ্রীযুত আব্‌দুল করিম সাহেব সংগ্রহ করিয়াছেন।

পাবনা জেলায় অনেক দরবেশ, ফকির, সাধু ও বৈষ্ণব আছেন।

(সুবর্ণবণিক্‌-সমাচার, বৈশাখ)　　শ্রীরাধাবল্লভ দে
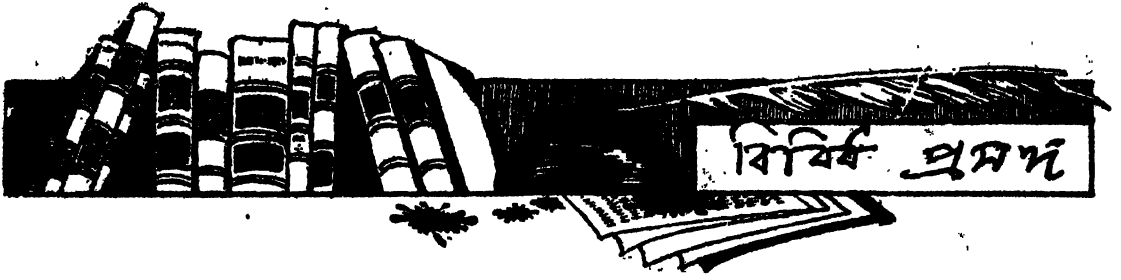
ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক স্বরাজ

মডারেট্-দল কয়েক বৎসর হইল "উদারনৈতিক" নাম গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের রাজনৈতিক আদর্শ কিন্তু অপরিবর্ত্তিত আছে। তাঁহারা বহুপূর্ব্ব হইতেই বলিয়া আসিতেছেন, যে, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি ব্রিটিশ উপনিবেশগুলির শাসনপ্রণালী যেরূপ, তাঁহারা সেই ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন পাইতে ইচ্ছা করেন এবং তাহার জন্ত চেষ্টা করিবেন। মহাত্মা গান্ধীর মত অনেকদিন হইতেই মোটামুটি এইরূপ আছে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্সের গত ফরিদপুর অধিবেশনে সভাপতি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ ঔপনিবেশিক স্বরাজকেই তাঁহার লক্ষ্য বলিয়াছেন, এবং গান্ধী-মহাশয় তাহাতে সায় দিয়াছেন। শ্রীমতী এনী বেসাণ্ট্ ভারতবর্ষকে স্বরাজ দিবার জন্ত ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টে যে আইন পাস্ করাইবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতেও ঔপনিবেশিক স্বরাজকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

এইসব রাজনৈতিক দলের মধ্যে মোটামুটি লক্ষ্য-সম্বন্ধে মিল দেখা যাইতেছে; অথচ সকলে এক-যোগে কাজ করিতেছেন না। ইহা দুঃখের বিষয়। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু সকল দলের সম্মিলিত চেষ্টা যাহাতে হয়, সে বিষয়ে উদ্যোগী আছেন। তাঁহার চেষ্টা সফল হইলে দেশের পক্ষে ভালো হইবে।

আমরা যদিও পূর্ণ স্বাধীনতা ভিন্ন অন্ত-কোন রাজনৈতিক আদর্শকে চরম আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক ও অসমর্থ, তথাপি বর্ত্তমানে আমাদের রাষ্ট্রীয় অধিকার ও ক্ষমতা যাহা আছে, ঔপনিবেশিক স্বরাজে সেই নাম-মাত্র অধিকার ও ক্ষমতা অপেক্ষা আমাদের অধিকার ও ক্ষমতা বাড়িবে এবং আমরা অধিকতর শক্তিশালী ও [illegible]

আমরা এইপ্রকার স্বরাজলাভ-চেষ্টার বিরোধী নহি। সম্ভবতঃ যাঁহারা ঔপনিবেশিক স্বরাজলাভের জন্ত চেষ্টিত আছেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে শেষ পর্য্যন্ত পূর্ণ স্বাধীনতাই চান; কিন্তু তাহা লাভ করিবার কোন কন্‌স্টিটিউশ্যনাল বা মূলরাষ্ট্রবিধিসঙ্গত উপায় তাঁহারা জানেন না বলিয়া মনের কথা মনের মধ্যেই রাখিয়াছেন। তাহার জন্ত তাঁহাদিগকে দোষ দিতেছি না। যাঁহারা কেজো অর্থাৎ প্রাক্‌টিক্যাল রাজনৈতিক কর্ম্মী, তাঁহারা স্বপ্ন দেখাটা দোষের বিষয় মনে করেন, যাহা পাওয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে, তাহার জন্তই চেষ্টা করেন এবং তাহাকেই লক্ষ্যস্থল বলেন। আমাদের মতন অকেজো স্বপ্নবিলাসী রাজনৈতিক অকর্ম্মীদিগকে তাঁহারা অবজ্ঞা করিতে পারেন; তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই, দুঃখও হয় না।

কিন্তু যদি কেজো ব্যক্তিরা তাঁহাদের অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসলভ্য ঈপ্সিতার্থকে পূর্ণ স্বাধীনতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন, তখন আমাদের আপত্তির কারণ ঘটে। সেই আপত্তির কোন-কোন কারণ আমরা জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে জানাইয়াছি।

আমাদের মতন যাহারা অকেজো, নিজে কিছু করিতে পারে না, অথচ কেজোদের সমালোচনা করে, তাহাদিগকে স্বভাবতই অনেকে বিদ্রূপ ও অবজ্ঞা করিয়া থাকেন। কিন্তু সমালোচনা-ব্যবসায়ীদেরও কিছু বলিবার আছে। বিস্তর স্বশাসক স্বাধীন জাতি আছে, যাহাদের মধ্যে অনেক সম্পাদক ও অন্ত সাংবাদিক কখনও রাজনৈতিক দলপতি হইবার চেষ্টা করে না, হয়ত তাহার উপযুক্তও নহে; কিন্তু তথাপি তাহারা কেজো রাজনৈতিক দলপতি ও অন্ত কর্ম্মীদের মতের ও কাজের সমালোচনা করিয়া থাকে। শুনিয়াছি ও পড়িয়াছি, যে, তাহাতে তাহাদের জাতির সুবিধাও হয়, এবং দলপতিরা কখন-কখন নিজনিজ [illegible] [illegible] সতর্ক হন।

কোন সমালোচকের ড্রাইডেনের মত নাটক লিখিবার ক্ষমতাও না থাকিতে পারে ; তথাপি ড্রাইডেন্ অপেক্ষা শেক্স্পীয়ারকে শ্রেষ্ঠ কবি বলিবার, এমন-কি শেক্স্পীয়ারেরও খুঁৎ ধরিবার অধিকার তাহার থাকিতে পারে ; কোন-প্রকারে অনুষ্টুপ্ বা পয়ার লিখিবার ক্ষমতাও যাহার নাই, ঘটকর্পর অপেক্ষা কালিদাসকে, রাজকৃষ্ণ রায় অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শ্রেষ্ঠ কবি বলিবার এবং কালিদাসের ও রবীন্দ্রনাথের খুঁৎ ধরিবার অধিকার তাহার থাকিতে পারে।

বস্তুতঃ বর্ত্তমান ধাঁচের ঔপনিবেশিক স্বরাজে যে মহাত্মা গান্ধী ও শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ সন্তুষ্ট হইতে পারেন না, তাহা তাঁহাদের কথা হইতেই অনুমান করিতে পারা যায়। তাঁহারা উভয়েই এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, যে,ভারতবর্ষ নিজের মঙ্গলের জন্য যাহা করিতে চায়, ইংলণ্ডের সহিত যুক্ত থাকিয়া তাহা করিবার সুযোগ না পাইলে ভারতবর্ষ স্বতন্ত্র হইবার চেষ্টা করিবে। তাঁহারা জানেন এবং আমরাও জানি, যে, বর্ত্তমানে ব্রিটিশ স্বশাসক উপনিবেশগুলির আভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রীয় বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতা থাকিলেও বৈদেশিক ব্যাপারে তাহাদের ক্ষমতা নাই, এবং এইজন্য তাহারা অসন্তুষ্ট। ঔপনিবেশিক স্বরাজ আমরা পাইলে আমাদেরও ঐরূপ অসন্তোষ জন্মিবার কারণ নিশ্চয়ই ঘটিবে। তাহা পরে দেখাইতেছি।

—

অষ্ট্রেলিয়ার মনের ভাব

মেল্‌বোর্নে অষ্ট্রেলিয়ার বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী মিষ্টার ব্রুস্ সম্প্রতি একটি বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "স্বশাসক উপনিবেশগুলির সহিত ব্রিটেন্ যদি তাহার বৈদেশিক রাষ্ট্রনীতি-সম্বন্ধে আগে হইতে পরামর্শ না করে, তাহা হইলে তাহারা উহার সিদ্ধান্ত দ্বারা বাধ্য থাকিতে প্যরে না।" ("The Dominions could not be bound by decisions on British foreign policy unless they were consulted in connection with these decisions".) অধিকন্তু তিনি এই আশাও প্রকাশ করেন, যে, অষ্ট্রেলিয়া শীঘ্রই লণ্ডনে রাষ্ট্রদূতের ক্ষমতাবিশিষ্ট একজন প্রতিনিধি রাখিতে পাইবে।

দু-একটা দৃষ্টান্ত লইলে অষ্ট্রেলিয়ার মনের ভাব বুঝা সহজ হইবে।

ভারতবর্ষে বিপ্লবচেষ্টা বা বিদ্রোহ হইলে তাহা দমন করিবার নিমিত্ত জাপানের সাহায্য-লাভের জন্য গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে ও মধ্যে ইংলণ্ডে ও জাপানে একটা সন্ধি ছিল। যদি ঐরূপ কোন কারণে ইংলণ্ড্ আবার জাপানের সহিত সন্ধি করিতে চায় এবং তাহাতে একটা এইরূপ সর্ত্ত থাকে, যে, জাপানের লোকেরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র বাণিজ্য ও বসবাস করিতে পারিবে, তাহা হইলে অষ্ট্রেলিয়া নিশ্চয়ই তাহাতে আপত্তি করিবে ; কেননা, অষ্ট্রেলিয়ার রাষ্ট্রনীতি শ্বেতকায়-ভিন্ন অন্য কাহাকেও সে-দেশে বাস করিতে দেয় না। সেইরূপ ইংলণ্ড যদি অষ্ট্রেলিয়াকে সুরক্ষিত করিবার বন্দোবস্ত না করিয়াই জাপানের সহিত কোন কারণে যুদ্ধ ঘোষণা করে, তাহাতেও অষ্ট্রেলিয়ার আপত্তি হইবে। কারণ, ইংলণ্ডের বিস্তর রণতরী ও আকাশতরী সমুদ্রে ও আকাশে অষ্ট্রেলিয়ার উপকূল বেষ্টন করিয়া রক্ষার জন্য প্রস্তুত না থাকিলে জাপানের পক্ষে সদলবলে অষ্ট্রেলিয়ায় অবতরণ মোটেই কঠিন বা অসম্ভব নহে।

—

ভারতবর্ষের হীনতা

নরহত্যা সভ্যসমাজে সর্ব্বত্র নিন্দিত হইয়া থাকে। নরহত্যার পরিমাণটা যদি বেশী হয় এবং যদি তাহাকে যুদ্ধ নাম দেওয়া যায়, তাহা হইলে অনেকেরই তাহাতে আর আপত্তি থাকে না বটে, বরং তাহা বীরত্ব বলিয়া অভিহিত হয়। তথাপি যুদ্ধের নিন্দা করিবার লোকও বাড়িয়া চলিয়াছে।

কিন্তু যুদ্ধ-সম্বন্ধে অধিকাংশের প্রচলিত মত বিবেচনা করিলেও দেখা যায়, লোকে যুদ্ধের প্রকারভেদে কোনটাকে শ্রেষ্ঠ কোনটাকে বা নিকৃষ্ট আসন দিয়া থাকে। স্বদেশ-রক্ষার নিমিত্ত কিম্বা স্বাধীনতা লাভের জন্য—অর্থের জন্য নহে—স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যাহারা যুদ্ধ করে, তাহারা সর্ব্বত্র

প্রশংসিত ও সম্মানিত হয়; যাহারা বিদেশী হইয়াও অন্ত কোন পরাধীন জাতিকে স্বাধীন করিবার নিমিত্ত তাহাদের বিদ্রোহে যোগ দেয় এবং তাহাদের দলভুক্ত হইয়া যুদ্ধ করে, তাহারাও প্রশংসা ও সম্মান লাভ করে;—যেমন বায়রন্ গ্রীসের পক্ষে তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু পরাধীনদেশবাসী যাহারা বেতনভোগী ভাড়াটিয়া সৈন্ত, যাহারা কেবল প্রভুর আদেশে যুদ্ধ করে —স্বদেশরক্ষার জন্ত নহে, স্বাধীনতালাভের জন্ত নহে, অন্ত কোন জাতিকে স্বাধীন করিবার জন্ত নহে—তাহারা হেয়।

চীন-দেশে জোর করিয়া আফিং চালাইবার নিমিত্ত গত শতাব্দীতে ইংলণ্ড চীনের সহিত দুইবার যুদ্ধ করিয়াছিল। চীনের সহিত ভারতবর্ষের কোন শত্রুতা ছিল না, অথচ চীনের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষকে লড়িতে হইয়াছিল। চীনে বক্সার যুদ্ধের সময় চীন ভারতবর্ষের কোন ক্ষতি করে নাই, করিবার কল্পনাও করে নাই; কিন্তু তথাপি ভারতের সিপাহীদিগকে চীনে গিয়া লড়িতে হইয়াছিল। এইরূপ কত অশত্রু জাতির সহিত ভারতবর্ষকে ইংলণ্ডের আদেশে লড়িতে হইয়াছে। গত মহাযুদ্ধের সময় ভারতীয় সিপাহীরা যত জাতির সহিত লড়িয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কে-কে ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে কি-কি শত্রুতাসূচক কাজ করিয়াছিল বা করিবার আয়োজন করিয়াছিল?

পরাধীন জাতি, যে, নিজের সুবিধা বা কল্যাণের জন্ত বৈদেশিক জাতিদের সহিত যথাযোগ্য সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে না, তাহা তাহাদের হীন দশার পরিচায়ক। ভারতবর্ষ প্রকৃত মিত্রজাতির সহিতও মিত্রতাসূচক সন্ধি করিতে পারে না। তাহা দুঃখের বিষয় ও ক্ষতিকর। আমাদের ব্যক্তিগত মত এই, যে, যাহারা ভারতবর্ষের শত্রু তাহাদেরও সহিত যুদ্ধ করা উচিত নহে; সকলের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলা উচিত। কিন্তু প্রচলিত মত সকলস্থলেই যুদ্ধবিরোধী নহে বলিয়া বলিতেছি, প্রকৃত শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা থাকিলেও ভারতবর্ষের তাহা করিবার জো নাই। এই অসামর্থ্য সম্মানকর নহে।

কিন্তু এই উভয় প্রকারের অসামর্থ্য অসুবিধাজনক ও ক্ষতিকর হইলেও বরং সহ্য করা যায়। দুর্বিবহ অপমান এই, যে, ভারতবর্ষের কে মিত্র কে শত্রু তাহা বিবেচনা না করিয়াই, ইংলণ্ডের স্বার্থ রক্ষার জন্ত ইংলণ্ডের হুকুমে ভাড়াটিয়া গুণ্ডার মত ভারতবর্ষকে শত্রুমিত্রনির্ব্বিশেষে যুদ্ধ করিতে হইয়াছে, হইতেছে এবং বর্ত্তমান-রকমের ঔপনিবেশিক স্বরাজ পাইলেও হইবে। অকেজো আমরা কিছু করিতে পারিতেছি না বটে। কেবল এই প্রার্থনা করিতেছি, ভগবান্ আমাদিগকে ভাড়াটিয়া নরহন্তার হীন দশা উপলব্ধি করিতে সমর্থ করুন, এবং আমাদের প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে সেই হীনতা স্বীকার না করিতে সমর্থ করুন।

মহাত্মা গান্ধীর মত লোকও যখন গত মহাযুদ্ধে ইংলণ্ডের পক্ষে ভারতীয় সৈন্ত সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তখন এই উপলব্ধি জাজ্বল্যমান হইবার প্রয়োজন আছে স্বীকার করিতে হইবে।

—

নিজের লাভের জন্য অন্যের শত্রুতা

ইংলণ্ডের জন্ত সৈন্তসংগ্রহের কাজ অন্ত অনেক ভারতবাসীও গত মহাযুদ্ধের সময় করিয়াছিলেন। কিন্তু এই-প্রসঙ্গে নেতৃস্থানীয় লোকদের ছাড়া অন্তদের নাম করিবার প্রয়োজন নাই।

অবশ্য মহাত্মা গান্ধী নিজের কোন স্বার্থ সিদ্ধির জন্ত কোন ব্যক্তিগত প্রলোভনের বশবর্ত্তী হইয়া এই কাজ করেন নাই; কর্ত্তব্যবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়া, ইহার দ্বারা ভারতবর্ষের সুবিধা হইবে ভাবিয়া, ঐ কাজ করিয়াছিলেন। তথাপি আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং এখনও মনে করি এই কাজটি ভালো হয় নাই, গান্ধীজির ভ্রম ও দোষ হইয়াছিল।

যুদ্ধের সময় লোকমান্ত টিলকও, তাঁহার ঈপ্সিত ভারতবর্ষের যথেষ্ট সুবিধার বিশ্বাসযোগ্য প্রতিশ্রুতি ইংলণ্ডের নিকট হইতে পাইলে সৈন্তসংগ্রহের কাজ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। সুবিধাবাদী রাজনৈতিকেরা এইরূপ কাজ করিতে অভ্যস্ত হইলেও, ভারতীয় জাতির বিশেষত্বের অভিব্যক্তি আমরা যেরূপ দেখিতে চাই, তদনুসারে আমাদের কোন নেতার সৈন্ত-

সংগ্রাহকত্ব আমরা দোষের বিষয় মনে করি। নিজেদের দেশরক্ষার জন্য আততায়ীর সহিত বা স্বাধীনতা লাভের জন্য বিজেতা প্রভুর সহিত যুদ্ধ করা অনুচিত নহে, এই মতের প্রচলন খুব বেশী। কিন্তু নিজেদের সুবিধার জন্য, ইংরেজের আদেশে বা ইংরেজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যাহারা আমাদের শত্রু নহে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করা বা সৈন্যসংগ্রহ করা আমাদের ধর্ম্মসঙ্গত কর্ত্তব্য ছিল, আশা করি ইহা কেহই বলিবেন না।

স্বরাজ বা স্বাধীনতা লাভ হউক বা না হউক, যাহা অনুচিত তাহা করা কখনও বিধেয় হইতে পারে না।

ভারতীয় জাতির বিশেষত্বের যে অভিব্যক্তির কথা উপরে বলিয়াছি, তাহার আভাস সহজেই দিতে পারা যায়। গান্ধীজি অহিংসা ও সাত্ত্বিকতা প্রচার করিতেছেন। এই আদর্শে তিনি এখন আন্তরিক বিশ্বাসী বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। যুদ্ধের সময় যখন তিনি সৈন্যসংগ্রাহকের কাজ করিয়াছিলেন, তখনও তিনি অহিংসায় বিশ্বাসী ছিলেন কি না জানি না। যাহা হউক, আত্মার যাহাতে অকল্যাণ হয়, হিংসাদ্বেষাদি দ্বারা তামসিকাদি দ্বারা যাহাতে আত্মা কলুষিত হয়, পার্থিব কোন লাভ বা সুবিধার জন্য, এমন কি স্বরাজ বা স্বাধীনতার জন্যও, তাহা করা উচিত নহে, এই মন্ত্রের সাধনাই ভারতবর্ষের বিশেষত্ব বলিয়া আমরা মনে করি।

—

শান্তিনিকেতনে গান্ধীজি

মহাত্মা গান্ধী রবীন্দ্রনাথের সহিত দ্বিতীয় বার সাক্ষাৎ করিয়া দীর্ঘ কাল যে কথোপকথন করেন, তাহাতে ভারতবর্ষের বিশেষত্ব-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মত উক্তরূপ বলিয়া প্রকটিত হয়। এই কথোপকথনের সময় অনেক ক্ষণ আমরা উপস্থিত ছিলাম। তাহাতে গোপনীয় কিছু না থাকিলেও তাহার বিস্তারিত কোন অনুলাপ প্রকাশিত হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ আরোগ্য লাভ করিয়া বল পাইবার পর যদি কখনও নিজের অতুলনীয় ভাষায় স্বীয় আদর্শ ব্যক্ত করেন, তাহা হইলে মানবের উপকার হইবে।

বহুবৎসর পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথের মুখে বলী দ্বীপের হিন্দুদের সম্বন্ধে একটি ঘটনার বৃত্তান্ত শুনিয়াছিলাম। ঘটনাটি এই:—ওলন্দাজেরা যখন বলীদ্বীপ জয় করিবার জন্য তথাকার অধিবাসী হিন্দুদিগকে আক্রমণ করে, তখন হিন্দুরা যজ্ঞোপযোগী শুভ্র বস্ত্র পরিহিত হইয়া আততায়ীদের সম্মুখীন হইল এবং বলিল, আমরা পরাধীনতা স্বীকার করিব না, কিন্তু যুদ্ধও করিব না; তোমরা স্বেচ্ছায় আমাদিগকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিতে পার। হল্যাণ্ডের রাণী ঘোষণা করিলেন, যে, এরূপ সাহসী ও মহৎ লোকেরা স্বাধীন থাকিবার উপযুক্ত, এবং তাহাদিগকে বশ্যতা স্বীকার করাইবার আর চেষ্টা করিলেন না।

ঘটনাটির বৃত্তান্ত আমাদের মোটামুটি যেরূপ মনে ছিল লিখিলাম। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এণ্ড্রুজ সাহেবের এক পত্রের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজী যে চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহা বিশ্বভারতী ত্রৈমাসিকে বাহির হইয়াছে। তাহার এক স্থানে কবি বলিতেছেন:—

"Of course, we must not think that killing one another is the only form of war. Man is preeminently a moral being: his war instinct should be shifted to the moral plane and his weapons should be moral weapons. The Hindu inhabitants of Bali, while giving up their lives before the invaders, fought with their moral weapons against physical power. A day will come when men's history will admit their victory. It was a war. Nevertheless it was in harmony with peace, and therefore glorious."

তাৎপর্য্য। "অবশ্য ইহা মনে করিলে চলিবে না, যে, পরস্পরের প্রাণবধই যুদ্ধের একমাত্র রূপ। মানুষ সর্ব্বোপরি নৈতিক জীব; তাহার যুযুৎসাত্মক যুদ্ধপ্রবৃত্তিকে নৈতিক স্তরে উন্নীত করা উচিত, এবং তাহার অস্ত্র নৈতিক বা আত্মিক অস্ত্র হওয়া উচিত। বলী দ্বীপের হিন্দু অধিবাসীরা আক্রমণকারীদের নিকট প্রাণবলি দিতে প্রস্তুত হইয়া পাশব বলের বিরুদ্ধে নিজেদের নৈতিক বা আত্মিক অস্ত্রদ্বারা যুদ্ধ করিয়াছিল। একদিন আসিবে যখন মানুষের ইতিহাস তাহাদের জয় স্বীকার করিবে। তাহারা যুদ্ধই করিয়াছিল। কিন্তু তথাপি শান্তির সহিত ইহার সামঞ্জস্য ছিল, এবং এই হেতু ইহা মহিমামণ্ডিত।"

—

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নূতন নাম

ব্রিটিশ স্বশাসক উপনিবেশগুলি সাম্রাজ্য নামটা ভালো বাসে না। ইংরেজদের মধ্যেও কেহ-কেহ এই নামটা ভালো বাসে না। আমরা ত ভালো বাসিই না। কিন্তু

আমাদিগকে খুশি করিবার জন্ত কাহারও মাথা-ব্যথা হয় নাই, সম্ভবতঃ ঔপনিবেশিকদিগকেই খুশি করিবার জন্ত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বল্ডুইন সম্প্রতি তাঁহার এক বাণীতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটা নূতন নামের অবতারণা করিয়াছেন। তাহা, "দি কমন্‌ওয়েল্‌থ্‌ অভ্‌ ব্রিটিশ্‌ নেশুন্‌স্‌;" অর্থাৎ ব্রিটিশ-জাতিদিগের কমন্‌ওয়েল্‌থ্‌। কমন্‌ওয়েল্‌থ্‌ মানে এরূপ রাষ্ট্র যাহার লক্ষ্য সর্ব্বসাধারণের কল্যাণ। এই শব্দটি সাধারণতন্ত্র-অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে; কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একজন নৃপতি আছেন বলিয়া আমরা সাধারণতন্ত্র কথাটি ব্যবহার করিলাম না।

কেবল **ব্রিটিশ** জাতিদিগের কমন্‌ওয়েল্‌থ্‌ই যদি ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হয়, তাহা হইলে তাহাতে **অব্রিটিশ** ভারতের স্থান কি ও কোথায়?

লেখক তাহার পিতামহ-সম্বন্ধে একটি গল্প শুনিয়াছিল, যে, তিনি অনাথ ও দরিদ্র বালক ছিলেন বলিয়া কোন সচ্ছল-অবস্থার লোক তাঁহাকে পোষ্য পুত্র লইতে চাহিয়াছিল; তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, "পরের বাবাকে বাবা বল্‌তে পার্‌ব না"। দারিদ্র্য সেই ক্ষুদ্র মানুষটিকে বার্দ্ধক্যেও ত্যাগ করে নাই, যদিও তাঁহার সরস্বতীর কৃপা-লাভ ঘটিয়াছিল।

কোন রাষ্ট্রীয় সুবিধার জন্ত আমরা ত মিথ্যা ব্রিটিশ নাম লইতে পারিব না; কেহ যদি দিতে চায়, তাহা হইলেও প্রত্যাখ্যান করিতে হইবে।

অবশ্য কেহ যে ঐ নাম আমাদিগকে দিতে চাহিতেছে, তাহা নহে। ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী আমাদিগকে সম্ভবতঃ ব্রিটিশ জাতিসমূহের সম্পত্তি, তাহাদের খোঁয়াড়ের নরাকার গোরু-রূপে স্বাধিকারভুক্ত রাখিতে চান।

তাহা হইলেও ইহা স্বীকার্য্য, যে অল্পসংখ্যক ইংরেজ এবং তদপেক্ষা অধিকসংখ্যক ভারতবাসী মনে করেন, যে, ভারতীয়দিগকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমান অংশী করা উচিত ও করা হইবে।

—

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে আমাদের সমান-অংশিতা

আমরা ধরিয়া লইলাম, যে, আমাদিগকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বা কমন্‌ওয়েল্‌থের সমান অংশীদার করা হইবে। কেমনটি হইলে সমান-অংশিত্ব ঘটে তাহাই এখন বিচার্য্য।

প্রথমেই ত নামটাতে খট্‌কা লাগে। প্রত্যেক জিনিষের নাম এরূপ হওয়া উচিত, যাহাতে তাহার প্রকৃতি ঠিক বুঝা যায়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বা কমন্‌ওয়েল্‌থ্‌ বলিলে এমন-একটা রাষ্ট্রসমষ্টি, জাতি বা জাতিসমষ্টি বুঝায়, যাহার সবটা বা অধিকাংশই ব্রিটিশ, কিম্বা যাহার প্রভু ব্রিটিশ-জাতি।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মোট লোক-সংখ্যা ৪৭ কোটি।

তাহার মধ্যে ভারতের লোক-সংখ্যা ৩২ কোটি।

এই সাম্রাজ্যের শ্বেত-অধিবাসীদের সংখ্যা ১১ কোটি।

সুতরাং প্রথম অর্থে ব্রিটিশ কথাটি এই জাতিসমষ্টির প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না। সাম্য স্থাপিত হইবে, ইহা ধরিয়া না লইলে যখন সমান-অংশিত্বের কথাই উঠিতে পারে না, তখন, ব্রিটিশেরা যাহাদের প্রভু ইহা এরূপ জাতিসমষ্টির নাম, এ-অর্থও করা যাইতে পারে না। কেবল ব্রিটিশদের অর্থে বা বাহুবলে এত-সব দেশ একছত্র হয় নাই; সুতরাং সে অর্থেও "ব্রিটিশ" বিশেষণটির প্রয়োগ হইতে পারে না। তা-ছাড়া, যখন সাম্যকেই এই সম্মিলিত রাষ্ট্রের ভিত্তি করা হইবে বলিয়া ধরা যাইতেছে, তখন বিজেতার নামের ছাপে ইহা পরিচিত হইতে পারে না।

যে দেশ বা জাতির লোকসংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তাহার নামে এইসব রাষ্ট্রের নাম রাখিতে হইলে, নাম হয় "ভারতীয় কমন্‌ওয়েল্‌থ্‌"। কিন্তু এই সাম্রাজ্যের শ্বেত অধিবাসীদের তাহাতে রাজি হইবার বিন্দুমাত্রও সম্ভাবনা নাই। অন্যদিকে বত্রিশ কোটি মানুষকে সাম্যলাভ করিয়াও বেমালুম নামহীন হইতে কেমন করিয়া বলা যায়?

একটা রফা চলে বটে। ব্রিটিশেরা এত দিন প্রভুত্ব করিতেছে এবং তাহাদের পরাক্রম ও কৃতিত্বও আছে; অন্যদিকে আমরা সংখ্যায় খুব বেশী এবং আমাদের ঐতিহাসিক প্রাচীনতা ও গৌরবও আছে। সুতরাং ভারত-ব্রিটিশ কমন্‌ওয়েল্‌থ্‌ বা তদ্রূপ একটা-কিছু নাম চলিতে পারে। কিন্তু ইহাতেও শ্বেতকায়দের রাজি হইবার সম্ভাবনা দেখিতেছি না।

নামের কথা ছাড়িয়া দিয়া রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাক্।

যতগুলি রাষ্ট্র ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত আছে,তাহারা সমান অধিকার লাভ করিলে প্রত্যেকের আভ্যন্তরীণ সমুদয় রাষ্ট্রীয় কার্য্য নির্ব্বাহের সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকিবে। কিন্তু যে-সকল ব্যাপারে তাহাদের পরস্পরের সম্পর্ক আছে এবং সহযোগিতা দর্কার, এবং সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সহিত অন্য-সব দেশের যে-সকল বিষয়ে সম্বন্ধ আছে, সেই-সকলের সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত সমুদয় সাম্রাজ্যের একটি সাধারণ ব্যবস্থাপক সভা বা মন্ত্রণা-সভার প্রয়োজন হইবে। এই প্রয়োজন বর্ত্তমান সময়েও অনুভূত হইয়াছে; কয়েক বৎসর আগে হইতেই ইম্পীরিয়াল কন্‌ফারেন্সের বা সাম্রাজ্যিক মন্ত্রনাসভার অধিবেশন হইয়া আসিতেছে। অবশ্য অধিবেশনগুলি প্রতিবৎসরই কোন নির্দ্দিষ্ট তারিখে কোন নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য হইবার কোন ব্যবস্থা এখনও হয় নাই, প্রয়োজনমত অধিবেশন হয়; ইহাতে কোন্ রাষ্ট্রের কিরূপ অধিকার ও দায়িত্ব, তাহাও নির্দ্ধারিত হয় নাই। আমরা যেরূপ সাম্রাজ্যিক ব্যবস্থাপক সভার কথা বলিতেছি, তাহা অন্য-রকমের। বর্ত্তমানে প্রত্যেক রাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্ট্ ২।১ জন করিয়া প্রতিনিধি সাম্রাজ্যিক কন্‌ফারেন্সে পাঠান, কিন্তু ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যকে নৃপতি-বিভূষিত বৃহৎ সাধারণতন্ত্রে পরিণত করিতে হইলে ইহার অন্তর্গত প্রত্যেক রাষ্ট্রের যেমন ব্যবস্থাপক সভা থাকিবে, সবগুলির সম্মিলিত একটি ব্যবস্থাপক সভারও তেম্নি প্রয়োজন হইবে; যেমন আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সের প্রত্যেক রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভা আছে, এবং তা-ছাড়া সকলগুলির সম্মিলিত সাধারণ ব্যবস্থাপক সভাও আছে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যিক ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের হইবে। সুতরাং যে দেশের লোকসংখ্যা যত বেশী, তাহার প্রতিনিধির সংখ্যাও তত বেশী হইবে। সাম্রাজ্যের আর-সকল অংশের অধিবাসীর মোট-সংখ্যা অপেক্ষা ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা অনেক বেশী। সুতরাং সাম্যের খাতিরে সাম্রাজ্যিক ব্যবস্থাপক সভায় ভারতবর্ষের প্রতিনিধির সংখ্যাও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইবে। এরূপ বন্দোবস্তে সাম্রাজ্যের শ্বেত অধিবাসীরা রাজী হইবেন কি? তাহার ত কোন সম্ভাবনা দেখিতেছি না।

অবশ্য, এরূপ প্রস্তাবও হইতে পারে, যে, এই সাধারণ ব্যবস্থাপক সভায় প্রত্যেক রাষ্ট্র সমানসংখ্যক প্রতিনিধি পাঠাইবে। কিন্তু সওয়া কোটি লোকের বাসভূমি নিউ-জীলণ্ড, পৌনে পাঁচকোটির বাসভূমি ব্রিটেন, এবং বত্রিশ কোটির বাসভূমি ভারতবর্ষ, সবাই সমান-সমান প্রতিনিধি পাঠাইবে বলিলে সাম্যসঙ্গত প্রস্তাব হয় না।

রাজধানীতেই সাম্রাজ্যিক ব্যবস্থাপক সভার স্থায়ী অধিবেশনস্থান থাকা বাঞ্ছনীয়; নতুবা ঘুরিয়া-ঘুরিয়া সব দেশে এক-একবার অধিবেশন করিতে গেলে প্রতিনিধি ও কর্ম্মচারীদের রাহাখরচ, খাই-খরচ প্রভৃতিতে এবং সর্ব্বত্র অধিবেশনগৃহ-নির্ম্মাণে অত্যন্ত অধিক ব্যয় হইবে, কাজের অসুবিধাও খুব হইবে। সাম্রাজ্যের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লোক ভারতবর্ষে বাস করে। অধিকতম লোকের সুবিধা দেখাই উচিত। সুতরাং রাজধানী ভারতবর্ষেই স্থাপিত হওয়া উচিত। ইহাতে কি সাম্রাজ্যের শ্বেত অধিবাসীবর্গ রাজি হইবেন? তাহা ত মনে হয় না।

তাহার পর নৃপতি বা রাষ্ট্রপতি প্রভৃতির কথা উঠে। এখন বৃটিশ সাম্রাজ্যের মুকুটস্বরূপ একজন রাজা আছেন। এইরূপ বন্দোবস্ত যদি ভবিষ্যতেও থাকে, তাহা হইলে সাম্যের খাতিরে এই রাজাকে ভারতবর্ষে অবস্থিত রাজধানীতে জীবনের অধিকাংশ সময় যাপন করিতে হইবে, কিম্বা সকল দেশেই ঘুরিয়া-ঘুরিয়া দর্‌বার করিয়া বেড়াইতে হইবে। এই উভয়ের মধ্যে কোনটিই শ্বেতকায়দের মনঃপূত হইবার সম্ভাবনা নাই।

তা-ছাড়া, সাম্যই যদি স্থাপিত হয়, তাহা হইলে ভিক্টোরিয়ার মত রাণী বা পঞ্চম জর্জের মত রাজা বরাবর খাঁটি ইউরোপীয়বংশসম্ভূত কেন থাকিবেন, বুঝা যায় না। সাম্য চায়, যে, সাম্রাজ্যের যে-জাতির লোকসংখ্যা সকলের চেয়ে বেশী, রাজা তাহাদের জাতির হাওয়া উচিত। কিন্তু ব্রিটিশ রাজা বা রাণীকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহাদের জায়গায় কোন ভারতীয় রাজবংশকে প্রতিষ্ঠিত করা চলিবে না;—ভারতীয় রাজবংশ হিন্দু বা মুসলমান হইবেন, তাহা লইয়াও ঝগড়া নিশ্চয় উঠিতে পারে। অতএব,

এইরূপ ব্যবস্থা হইতে পারে, যে, উত্তরাধিকার-সূত্রে যখন কোন ব্রিটিশ মহিলা সিংহাসনের অধিকারিণী হইবেন, তখন তিনি ভারতীয় কোন পুরুষকে বিবাহ করিবেন, এবং উত্তরাধিকার সূত্রে যখন কোন ব্রিটিশ পুরুষ সিংহাসনের অধিকারী হইবেন, তখন তিনি কোন ভারতীয় মহিলাকে বিবাহ করিবেন। এইরূপে ক্রমশঃ রাজবংশ আর খাঁটি ইউরোপীয় বা খাঁটি ভারতীয় থাকিবে না। ইহাতে এই আপত্তি উঠিতে পারে, যে, রাণী বা রাজা কাহাকে বিবাহ করিবেন, সে-সম্বন্ধে নিয়ম করিলে তাঁহাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয়। ইহা সত্য কথা। কিন্তু ব্যক্তিগত স্বাধীনতার এইরূপ সীমাবদ্ধতায় ব্রিটিশ রাজবংশ অভ্যস্ত;—বর্ত্তমানেও ব্রিটিশ রাজা ও রাণী কেবল মাত্র প্রটেষ্টাণ্ট্-সম্প্রদায়ে বিবাহ করিতে পারেন, রোমান ক্যাথলিক্ বিবাহ করিতে পারেন না। তাহা হইলেও, আমরা যেরূপ নিয়মের আভাস দিলাম, তাহাতে শ্বেতকায়েরা এবং ব্রিটিশ রাজবংশও আপত্তি করিবেন।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে সাধারণতন্ত্রে পরিণত করিয়া কয়েক-বৎসর অন্তর-অন্তর, আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সের মত, উহার প্রেসিডেণ্ট বা রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করিলে তাহাই ঠিক্ সাম্যসঙ্গত হয়। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সাধারণতন্ত্রে পরিণতি সুদূরপরাহত। উহার পরিণাম ঐরূপ হইলে, প্রতিনির্ব্বাচনেই না হউক, অনেক-বারই রাষ্ট্রপতি ভারতীয় হইবার সম্ভাবনা ঘটিবে। তাহা শ্বেত-মনুষ্যদের ভালো লাগিবে না।

আমরা কেবল বড় বড় কয়েকটা বিষয়ের উল্লেখ করিলাম; গবর্ণর-জেনের‍্যাল ও গবর্ণর হইতে আরম্ভ করিয়া আমাদের দেশের সমুদয় কর্ম্মচারী ভারতীয় হইবে. সৈনিক বিভাগে জঙ্গী লাট হইতে আরম্ভ করিয়া সবাই ভারতীয় হইবে, ইত্যাদি ছোট-ছোট বিষয়ের উল্লেখ করিলাম না।

মোট কথা এই, যে, সাম্য স্থাপন করিতে হইলে সাম্রাজ্যের কোন জাতির লোকই যাহাতে বামন হইয়া থাকিতে বাধ্য না হয়, সকলেই যাহাতে দেহ মন আত্মার পূর্ণ বিকাশ লাভ করিবার সুযোগ পায়, ব্যবস্থা তদনুরূপ করিতে হইবে। বিকাশের এইরূপ সুযোগ পাইলে অধিকাংশ ভারতবাসী অধিকাংশ ইংরেজের সমকক্ষ হইবে, এবং ভারতবাসীর সমষ্টি ইংরেজের সমষ্টি অপেক্ষা বৃহৎ বলিয়া ভারতীয়দের সমষ্টি ইংরেজসমষ্টি অপেক্ষা অধিক প্রভাবশালী ও শক্তি-শালী হইবে। কিন্তু একই সাম্রাজ্যের বা সাধারণতন্ত্রের মধ্যে কোন রাষ্ট্রের লোকদের এইপ্রকারে স্থায়ীভাবে অধিকতর প্রভাবশালী হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে; কারণ তাহাতে অন্য রাষ্ট্রগুলির বিকাশে বাধা ও খর্ব্বতা ঘটে, যেমন বর্ত্তমানে ইংলণ্ডের অধিকতর শক্তিশালিতায় ভারতবর্ষের বিকাশে বাধা ঘটিতেছে ও তজ্জন্য আমরা দেহ মন আত্মায়, বিদ্যাবুদ্ধিতে, লোকহিতসাধন-কার্য্যে, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে, আধ্যাত্মিকতায়, পূর্ণ বিকাশ লাভ করিতে না পারিয়া ছোট ও খাট হইয়া আছি।

আমরা উপরে যাহা লিখিলাম, তাহার অনেক কথা ব্যঙ্গের মত শুনাইতে পারে। কিন্তু যদি তাই হয়, তাহার জন্য আমরা দায়ী নহি; দায়ী তাঁহারা যাঁহারা নানা দেশের ধর্ম্মের ভাষার জাতির মহাদেশের লোককে একই সাম্রাজ্য বা সাধারণতন্ত্রের অন্তর্গত রাখিয়াও সাম্য স্থাপন সম্ভব মনে করেন। আমরা তাহা সম্ভব মনে করি না। আমরা দেখাইয়াছি, যে, ভারতবর্ষের লোকদের যত বড় হওয়া উচিত, যত বড় হইবার বিধিদত্ত অধিকার ও সম্ভাব্যতা তাহাদের আছে, তাহারা তত বড় হইলে ইংলণ্ডকে চাপা পড়িতে, ভারতের আওতায় পড়িতে হইবে; যেমন এখন ভারতবর্ষকে চাপা পড়িয়া, ইংলণ্ডের আওতায় পড়িয়া, ছোট হইয়া থাকিতে হইয়াছে। কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতির পক্ষেও ইহা সত্য। এই কারণে আমরা মনে করি, যে, বর্ত্তমানে যে-সব দেশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত আছে, তাহাদের সকলেরই সম্পূর্ণ-স্বাধীন হইয়া পরস্পরের সহিত মিত্রভাব অবলম্বন করা উচিত। অবশ্য, অন্য সব দেশের সঙ্গেও সদ্ভাব রক্ষার সমান চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

—

ডাঃ প্রতাপচন্দ্র গুহরায়ের নির্য্যাতন

কোন একজন নামজাদা জমিদারের সম্বন্ধে এইরূপ

গল্প শুনিয়াছিলাম, যে, তিনি উন্নতশির প্রজাদিগের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিয়া হারিয়া গেলে ক্রমাগত আপীল করিতেন এবং নূতন-নূতন-রকম মোকদ্দমা করিতেন ;—বলিতেন, তাহাদিগকে জিতাইয়া-জিতাইয়া হারাইব। অর্থাৎ প্রজাদের ত তাঁহার মত অর্থবল নাই, তাহারা নানা আদালতে জিতিলেও মোকদ্দমার ব্যয়ই তাহাদের পক্ষে বিষম বোঝা ও জরিমানার মত হইবে।

চরমনাইরের নৃশংস ও লজ্জাকর ঘটনা-উপলক্ষ্যে ডাঃ প্রতাপচন্দ্র গুহরায় গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে যেরূপ ব্যবহার পাইয়াছেন, তাহাতে ঐ "দ ম্ভে" জমিদারের কথা মনে পড়ে। প্রতাপ-বাবু নির্দোষ হইতে পারেন, এবং ভিন্ন-ভিন্ন আদালতে মূল বিচারে, আপীলে বা পুনর্বিচারে শেষ পর্য্যন্ত তিনি খালাস পাইতে পারেন; কিন্তু মানসিক উদ্বেগ, ধর্ম্মাধিকরণের স্বর্গসুখভোগ, অর্থব্যয় প্রভৃতিতে তাঁহার খুব সাজা হইয়া গিয়াছে। তাহার পর দীর্ঘকাল পরে গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে তাঁহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা তুলিয়া লওয়া হইল এই ওজুহাতে, যে, মোকদ্দমাটা অনেকদিন হইল রুজু করা হইয়াছে, অতএব উহা আর চালাইবার ইচ্ছা গবর্ণমেণ্টের নাই। গবর্ণমেণ্ট অবশ্য কখনও বক্রোক্তি ব্যঙ্গ বিদ্রূপাদি করেন না। কিন্তু কোন ব্যাখ্যাকার বলিতে পারেন, গবর্ণমেণ্টের কথার মানে এই, যে, লোকটাকে যথেষ্ট হায়রান্ পরেশান্ করা হইয়াছে, আর দরকার নাই।

প্রকৃত দোষী ব্যক্তিকে গবর্ণমেণ্ট কেবল কালা-ন্যায়বশতঃ অব্যাহতি দিলেন, ইহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না।

প্রতাপ-বাবুর নির্য্যাতন দুঃখের বিষয়; ইহাতে গবর্ণ-মেণ্টের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা বাড়ে নাই। কিন্তু ইহা দুঃখ-কর হইলেও, ইহার মধ্যে একটু মজাও আছে। মোকদ্দমা যখন তুলিয়া লওয়া হইল তখন গবর্ণমেণ্ট উকীলের তুলিয়া লইবার প্রার্থনা-অনুসারে তাহা করা হইল; শিখণ্ডিস্বরূপ যে-লোকটাকে ফরিয়াদী খাড়া করা হইয়াছিল জিজ্ঞাসা করিয়াও প্রতাপ-বাবু তাহার কোন সন্ধান পাইলেন না। ইহার দ্বারা বেশ বুঝা গেল, যে, ব্যক্তিগতভাবে তাহার প্রতাপ-বাবুর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ ছিল না, গবর্ণমেণ্টই আসল ফরিয়াদী ছিলেন।

—

চর-মনাইরের অত্যাচার

কেহ-কেহ চর মনাইরের অত্যাচারের দিনটিকে চির-স্মরণীয় করিতে চাহিতেছেন। কিন্তু ইহাতে ত গৌরব করিবার কিছু নাই। একদিকে কাপুরুষতা ও অন্যদিকে পৈশাচিক নৃশংসতা ও পশুত্ব। তাহা বৎসর-বৎসর স্মরণ করিয়া কি লাভ?

কতকগুলি মুসলমান ও হিন্দু পুরুষ নিজেদের প্রতি পুলিসের অত্যাচারের ভয়ে বাড়ীর স্ত্রীলোকদিগকে অরক্ষিত ও অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া চলিয়া গেল এবং পুলিশের লোকেরা আসিয়া পিশাচের মত ও পশুর মত বীভৎস লজ্জাকর ব্যবহার মুসলমান ও হিন্দু স্ত্রীলোকগুলির উপর করিল; এই নিষ্ঠুরতা ও কাপুরুষতা যেমন গবর্ণ-মেণ্টের তেম্‌নি দেশের লোকদিগেরও ঘোরতর কলঙ্ক।

পুলিশ কর্ম্মচারী মাত্রেই খারাপ লোক, এরূপ মিথ্যা উক্তি কাহারও করা উচিত নহে। কিন্তু পুলিশের হাতে শান্তিরক্ষার জন্য যে প্রভূত ক্ষমতা অর্পিত আছে, তাহার ঘোরতর অপব্যবহার অনেক সময় হয়, এই কঠোর সত্য শত লাট লিটনের শত চেষ্টাতেও চাপা পড়িবে না। তেম্‌নি সাংবাদিকগণ ও সভামঞ্চে বক্তৃতাকারীগণ চেষ্টা করিলেও আমাদের কাপুরুষতার কাহিনীগুলাকে চির-স্মরণীয়তার গৌরব দিতে পারিবেন না।

—

শিশুপত্নী-হত্যা

কলিকাতার শাঁখারিটোলার এক ময়রার আট বৎসরের একটি মেয়েকে যোগেন্দ্র নাথ খাঁ বিবাহ করে। দু-বৎসর পরে মেয়েটি যখন দশ বৎসরের, তখন যোগেন্দ্র উহাকে নিজের বাড়ীতে লইয়া যাইবার জন্য আসে। ভালো দিন ছিল না বলিয়া যোগেন্দ্রের শ্বশুর-শাশুড়ী তাহাকে পাঁচ দিনের জন্য অপেক্ষা করিতে বলে। শিশু মেয়েটি দুই রাত্রি স্বামীর কামরায় থাকিয়া তৃতীয় রাত্রিতে খোল

মতেই তথায় যাইতে চায় নাই। তাহার মা যোগেন্দ্রকে পান দিবার জন্য তাহাকে প্রেরণ করায়, লোকটা দরজা বন্ধ করে। কতক্ষণ পরে, একটা গোঁগানি শব্দ শোনা যায়। দরজা খুলাইবার পর দেখা গেল, মেয়েটি উবুড় হইয়া রক্তাক্ত দেহে মরিয়া পড়িয়া আছে;—তাহার মাথা নোড়া দিয়া ছেঁচিয়া ভাঙিয়া ফেলায় মস্তিষ্ক বাহির হইয়া পড়িয়াছে। মেয়েটি কেন স্বামীর ঘরে শুইতে চায় নাই, কেনই বা তাহার স্বামী তাহাকে মারিয়া ফেলিল, তাহা বলা অনাবশ্যক।

আদালতের বিচারে যোগেন্দ্রের ফাঁসীর হুকুম হইয়াছে। নিহত শিশু-বালিকাটির পিতা মাতার কোন শাস্তি হয় নাই। অনেকটা দেশাচার ও লোকাচারের দোষেও শিশুটির প্রাণ গিয়াছে বলিয়া সমাজেরও শাস্তি পাওয়া উচিত ছিল; কিন্তু সমাজকে শাস্তি দিবার ত কোন উপায় নাই। তাহা হইলেও, দেশের ধার্ম্মিকতম ও মহত্তম লোকেরাও অনুভব করিবেন, যে, তাঁহারা এবং দেশের অন্যসব লোকেরা—সকলেই—এইরূপ ঘটনার জন্য অল্পাধিক-পরিমাণে দায়ী। কারণ মহৎ লোকেরা ও আমরা সাধারণ লোকেরা, যে দেশাচার ও লোকাচার, যে বাল্যবিবাহ প্রথা, স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে যে ধারণা, স্ত্রীদের উপর স্বামীদের "অধিকার"-সম্বন্ধে যে ধারণা, এবং স্ত্রীলোকদের যে হীন অসহায় অবস্থা দেশে বিদ্যমান থাকায় এরূপ হৃদয়বিদারী, অরুন্তুদ, লজ্জাকর, নৃশংস ঘটনা ঘটিয়াছে, তৎসমুদয়ের উচ্ছেদসাধনার্থ যথোচিত চেষ্টা আমরা কেহই করি নাই। অতএব অপরাধ ও লজ্জা আমাদের সকলেরই।

যাহারা গোঁড়ামির ভয়ে বালিকাদের সম্মতির বয়স বাড়াইতে চায় না, তাহাদের দায়িত্ব অত্যন্ত অধিক। সম্মতির বয়স বাড়াইয়া দিলেই তৎক্ষণাৎ বালিকা বধূদের যন্ত্রণা, অপঘাত-মৃত্যু, আত্মহত্যা ও অকাল-মৃত্যু বন্ধ হইয়া যাইবে বা কমিবে, আমাদের এমন কোন ভ্রান্ত ধারণা নাই। কিন্তু এই দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের আছে, যে, বয়স বাড়াইয়া দিলে অনতিবিলম্বে বিবাহের বয়সও বাড়িবে, এবং অতি অল্পবয়স্কা নববধূর পিতৃগৃহ হইতে শ্বশুরালয় বা স্বামীর শয়নকক্ষ-গমনে কিছু বাধা জন্মিবে। তাহার পিতামাতা তাহাকে বিলম্বে পাঠাইবার একটা খুব ন্যায়সঙ্গত, যুক্তিসঙ্গত ও প্রকাশ্য কারণ দেখাইতে পারিবে। এইজন্য, যখন সম্মতির বয়সসম্বন্ধীয় বিল আবার ব্যবস্থাপক সভায় পেশ্ হইবে, তখন গোঁড়ারা বাধা না দিলে দেশের কল্যাণ হইবে।

যোগেন্দ্র যাহা করিয়াছে, তাহার উপযুক্ত বিশেষণ অভিধানে নাই। পশুরা এরূপ কাজ করে না; পিশাচ আছে কি না জানি না, থাকিলেও তাহারা এমন কাজ করে বলিয়া শুনি নাই। সুতরাং পাশব ও পৈশাচিক উপযুক্ত বিশেষণ নহে। যাহা হউক, উপযুক্ত বিশেষণ খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা না করিয়া যাহাতে ওরূপ নরাধমের কাজ আর কাহারও দ্বারা না হয়, দেশে সেইরূপ অবস্থা আনয়নের চেষ্টা সর্ব্বপ্রযত্নে সকলের করাই বিধেয়। হইতে পারে, যে, ঠিক্ এইরূপ ঘটনা বিরল কিম্বা এই একবার মাত্র প্রথম ঘটিল। কিন্তু দুই-এক মিনিটে বালিকাপত্নী হত্যাই হত্যার একমাত্র প্রকার নহে; হত্যা আরও অনেক-রকমে হইয়া থাকে। অবশ্য ইহাও ঠিক্, যে, যত বালিকা বধূ ও বালিকা মাতার মৃত্যু হয়, তাহার অধিকাংশ মৃত্যু কেহ জানিয়া-শুনিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক ঘটায় না; কিন্তু অকাল মৃত্যু-যে-প্রকারেই ঘটুক, তাহা শোচনীয়; তাহা মৃতের পক্ষে অবাঞ্ছনীয় এবং তাহা সমাজের পক্ষে কলঙ্কের বিষয় ও ক্ষতিকর।

যত বালিকা ও তরুণীর কাপড়ে আগুন লাগাইয়া বা অন্যপ্রকারে আত্মহত্যার কাহিনী প্রকাশিত হয়, তাহার কোন-কোনটি আত্মহত্যা নহে মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। সত্য-সত্য আত্মহত্যা যাহারা করে, তাহাদের শোচনীয় মৃত্যুর পশ্চাতে যেসব দুঃখের কথা থাকে, তাহাও সব সময় প্রকাশ পায় না। আমরা অনেকবার বলিয়াছি ও দেখাইয়াছি, যে, পাশ্চাত্য দেশে আত্মহত্যার সংখ্যা পুরুষদের মধ্যে বেশী, স্ত্রীলোকদের মধ্যে কম; আমাদের দেশে ঠিক্ তাহার বিপরীত। ইহা বলিবার উদ্দেশ্য অবশ্য এরূপ নহে, যে, বাঙালী পুরুষেরা আরও বেশী করিয়া আত্মহত্যা করিয়া এ-বিষয়ে নারীদিগকে পরাস্ত করুক; উদ্দেশ্য এই, যে, আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক

কোন সমালোচকের ড্রাইডেনের মত নাটক লিখিবার ক্ষমতাও না থাকিতে পারে; তথাপি ড্রাইডেন্ অপেক্ষা শেক্‌স্‌পীয়রকে শ্রেষ্ঠ কবি বলিবার, এমন-কি শেক্‌স্‌পীয়রেরও খুঁৎ ধরিবার অধিকার তাহার থাকিতে পারে; কোন-প্রকারে অনুষ্টুপ্ বা পয়ার লিখিবার ক্ষমতাও যাহার নাই, ঘটকর্পর অপেক্ষা কালিদাসকে, রাজকৃষ্ণ রায় অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শ্রেষ্ঠ কবি বলিবার এবং কালিদাসের ও রবীন্দ্রনাথের খুঁৎ ধরিবার অধিকার তাহার থাকিতে পারে।

বস্তুতঃ বর্ত্তমান ধাঁচের ঔপনিবেশিক স্বরাজে যে মহাত্মা গান্ধী ও শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ সন্তুষ্ট হইতে পারেন না, তাহা তাঁহাদের কথা হইতেই অনুমান করিতে পারা যায়। তাঁহারা উভয়েই এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, যে,ভারতবর্ষ নিজের মঙ্গলের জন্য যাহা করিতে চায়, ইংলণ্ডের সহিত যুক্ত থাকিয়া তাহা করিবার সুযোগ না পাইলে ভারতবর্ষ স্বতন্ত্র হইবার চেষ্টা করিবে। তাঁহারা জানেন এবং আমরাও জানি, যে, বর্ত্তমানে ব্রিটিশ স্বশাসক উপনিবেশগুলির আভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রীয় বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতা থাকিলেও বৈদেশিক ব্যাপারে তাহাদের ক্ষমতা নাই, এবং এইজন্য তাহারা অসন্তুষ্ট। ঔপনিবেশিক স্বরাজ আমরা পাইলে আমাদেরও ঐরূপ অসন্তোষ জন্মিবার কারণ নিশ্চয়ই ঘটিবে। তাহা পরে দেখাইতেছি।

—

অষ্ট্রেলিয়ার মনের ভাব

মেল্‌বোর্নে অষ্ট্রেলিয়ার বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী মিষ্টার ব্রুস্ সম্প্রতি একটি বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "স্বশাসক উপনিবেশগুলির সহিত ব্রিটেন্ যদি তাহার বৈদেশিক রাষ্ট্রনীতি-সম্বন্ধে আগে হইতে পরামর্শ না করে, তাহা হইলে তাহারা উহার সিদ্ধান্ত দ্বারা বাধ্য থাকিতে পারে না।" ("The Dominions could not be bound by decisions on British foreign policy unless they were consulted in connection with these decisions".) অধিকন্তু তিনি এই আশাও প্রকাশ করেন, যে, অষ্ট্রেলিয়া শীঘ্রই লণ্ডনে রাষ্ট্রদূতের ক্ষমতাবিশিষ্ট একজন প্রতিনিধি রাখিতে পাইবে।

দু-একটা দৃষ্টান্ত লইলে অষ্ট্রেলিয়ার মনের ভাব বুঝা সহজ হইবে।

ভারতবর্ষে বিপ্লবচেষ্টা বা বিদ্রোহ হইলে তাহা দমন করিবার নিমিত্ত জাপানের সাহায্য-লাভের জন্য গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে ও মধ্যে ইংলণ্ডে ও জাপানে একটা সন্ধি ছিল। যদি ঐরূপ কোন কারণে ইংলণ্ড্ আবার জাপানের সহিত সন্ধি করিতে চায় এবং তাহাতে একটা এইরূপ সর্ত্ত থাকে, যে, জাপানের লোকেরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র বাণিজ্য ও বসবাস করিতে পারিবে, তাহা হইলে অষ্ট্রেলিয়া নিশ্চয়ই তাহাতে আপত্তি করিবে; কেননা, অষ্ট্রেলিয়ার রাষ্ট্রনীতি শ্বেতকায়-ভিন্ন অন্য কাহাকেও সে-দেশে বাস করিতে দেয় না। সেইরূপ ইংলণ্ড যদি অষ্ট্রেলিয়াকে সুরক্ষিত করিবার বন্দোবস্ত না করিয়াই জাপানের সহিত কোন কারণে যুদ্ধ ঘোষণা করে, তাহাতেও অষ্ট্রেলিয়ার আপত্তি হইবে। কারণ, ইংলণ্ডের বিস্তর রণতরী ও আকাশতরী সমুদ্রে ও আকাশে অষ্ট্রেলিয়ার উপকূল বেষ্টন করিয়া রক্ষার জন্য প্রস্তুত না থাকিলে জাপানের পক্ষে সদলবলে অষ্ট্রেলিয়ায় অবতরণ মোটেই কঠিন বা অসম্ভব নহে।

—

ভারতবর্ষের হীনতা

নরহত্যা সভ্যসমাজে সর্ব্বত্র নিন্দিত হইয়া থাকে। নরহত্যার পরিমাণটা যদি বেশী হয় এবং যদি তাহাকে যুদ্ধ নাম দেওয়া যায়, তাহা হইলে অনেকেরই তাহাতে আর আপত্তি থাকে না বটে, বরং তাহা বীরত্ব বলিয়া অভিহিত হয়। তথাপি যুদ্ধের নিন্দা করিবার লোকও বাড়িয়া চলিয়াছে।

কিন্তু যুদ্ধ-সম্বন্ধে অধিকাংশের প্রচলিত মত বিবেচনা করিলেও দেখা যায়, লোকে যুদ্ধের প্রকারভেদে কোনটাকে শ্রেষ্ঠ কোনটাকে বা নিকৃষ্ট আসন দিয়া থাকে। স্বদেশ-রক্ষার নিমিত্ত কিম্বা স্বাধীনতা লাভের জন্য—অর্থের জন্য নহে—স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যাহারা যুদ্ধ করে, তাহারা সর্ব্বত্র

প্রশংসিত ও সম্মানিত হয়; যাহারা বিদেশী হইয়াও অন্য কোন পরাধীন জাতিকে স্বাধীন করিবার নিমিত্ত তাহাদের বিদ্রোহে যোগ দেয় এবং তাহাদের দলভুক্ত হইয়া যুদ্ধ করে, তাহারাও প্রশংসা ও সম্মান লাভ করে;—যেমন বায়্‌রন্‌ গ্রীসের পক্ষে তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু পরাধীনদেশবাসী যাহারা বেতনভোগী ভাড়াটিয়া সৈন্য, যাহারা কেবল প্রভুর আদেশে যুদ্ধ করে —স্বদেশরক্ষার জন্য নহে, স্বাধীনতালাভের জন্য নহে, অন্য কোন জাতিকে স্বাধীন করিবার জন্য নহে—তাহারা হেয়।

চীন-দেশে জোর করিয়া আফিং চালাইবার নিমিত্ত গত শতাব্দীতে ইংলণ্ড চীনের সহিত দুইবার যুদ্ধ করিয়াছিল। চীনের সহিত ভারতবর্ষের কোন শত্রুতা ছিল না, অথচ চীনের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষকে লড়িতে হইয়াছিল। চীনে বক্সার যুদ্ধের সময় চীন ভারতবর্ষের কোন ক্ষতি করে নাই, করিবার কল্পনাও করে নাই; কিন্তু তথাপি ভারতের সিপাহীদিগকে চীনে গিয়া লড়িতে হইয়াছিল। এইরূপ কত অশত্রু জাতির সহিত ভারতবর্ষকে ইংলণ্ডের আদেশে লড়িতে হইয়াছে। গত মহাযুদ্ধের সময় ভারতীয় সিপাহীরা যত জাতির সহিত লড়িয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কে-কে ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে কি-কি শত্রুতাসূচক কাজ করিয়াছিল বা করিবার আয়োজন করিয়াছিল ?

পরাধীন জাতি, যে, নিজের সুবিধা বা কল্যাণের জন্য বৈদেশিক জাতিদের সহিত যথাযোগ্য সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে না, তাহা তাহাদের হীন দশার পরিচায়ক। ভারতবর্ষ প্রকৃত মিত্রজাতির সহিতও মিত্রতাসূচক সন্ধি করিতে পারে না। তাহা দুঃখের বিষয় ও ক্ষতিকর। আমাদের ব্যক্তিগত মত এই, যে, যাহারা ভারতবর্ষের শত্রু তাহাদেরও সহিত যুদ্ধ করা উচিত নহে; সকলের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলা উচিত। কিন্তু প্রচলিত মত সকলস্থলেই যুদ্ধবিরোধী নহে বলিয়া বলিতেছি, প্রকৃত শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা থাকিলেও ভারতবর্ষের তাহা করিবার জো নাই। এই অসামর্থ্য সম্মানকর নহে।

কিন্তু এই উভয় প্রকারের অসামর্থ্য অসুবিধাজনক ও ক্ষতিকর হইলেও বরং সহ্য করা যায়। দুর্বিবহ অপমান এই, যে, ভারতবর্ষের কে মিত্র কে শত্রু তাহা বিবেচনা না করিয়াই, ইংলণ্ডের স্বার্থ রক্ষার জন্য ইংলণ্ডের হুকুমে ভাড়াটিয়া গুণ্ডার মত ভারতবর্ষকে শত্রুমিত্রনির্ব্বিশেষে যুদ্ধ করিতে হইয়াছে, হইতেছে এবং বর্ত্তমান-রকমের ঔপনিবেশিক স্বরাজ পাইলেও হইবে। অকেজো আমরা কিছু করিতে পারিতেছি না বটে। কেবল এই প্রার্থনা করিতেছি, ভগবান্‌ আমাদিগকে ভাড়াটিয়া নরহন্তার হীন দশা উপলব্ধি করিতে সমর্থ করুন, এবং আমাদের প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে সেই হীনতা স্বীকার না করিতে সমর্থ করুন।

মহাত্মা গান্ধীর মত লোকও যখন গত মহাযুদ্ধে ইংলণ্ডের পক্ষে ভারতীয় সৈন্য সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তখন এই উপলব্ধি জাজ্বল্যমান হইবার প্রয়োজন আছে স্বীকার করিতে হইবে।

নিজের লাভের জন্য অন্যের শত্রুতা

ইংলণ্ডের জন্য সৈন্যসংগ্রহের কাজ অন্য অনেক ভারতবাসীও গত মহাযুদ্ধের সময় করিয়াছিলেন। কিন্তু এই-প্রসঙ্গে নেতৃস্থানীয় লোকদের ছাড়া অন্যদের নাম করিবার প্রয়োজন নাই।

অবশ্য মহাত্মা গান্ধী নিজের কোন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কোন ব্যক্তিগত প্রলোভনের বশবর্ত্তী হইয়া এই কাজ করেন নাই; কর্ত্তব্যবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়া, ইহার দ্বারা ভারতবর্ষের সুবিধা হইবে ভাবিয়া, ঐ কাজ করিয়াছিলেন। তথাপি আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং এখনও মনে করি এই কাজটি ভালো হয় নাই, গান্ধীজির ভ্রম ও দোষ হইয়াছিল।

যুদ্ধের সময় লোকমান্য টিলকও, তাঁহার ঈপ্সিত ভারতবর্ষের যথেষ্ট সুবিধার বিশ্বাসযোগ্য প্রতিশ্রুতি ইংলণ্ডের নিকট হইতে পাইলে সৈন্যসংগ্রহের কাজ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। সুবিধাবাদী রাজনৈতিকেরা এইরূপ কাজ করিতে অভ্যস্ত হইলেও, ভারতীয় জাতির বিশেষত্বের অভিব্যক্তি আমরা যেরূপ দেখিতে চাই, তদনুসারে আমাদের কোন নেতার সৈন্য-

সংগ্রাহকত্ব আমরা দোষের বিষয় মনে করি।* নিজেদের দেশরক্ষার জন্য আততায়ীর সহিত বা স্বাধীনতা লাভের জন্য বিজেতা প্রভুর সহিত যুদ্ধ করা অনুচিত নহে, এই মতের প্রচলন খুব বেশী। কিন্তু নিজেদের সুবিধার জন্য, ইংরেজের আদেশে বা ইংরেজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যাহারা আমাদের শত্রু নহে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করা বা সৈন্যসংগ্রহ করা আমাদের ধর্ম্মসঙ্গত কর্ত্তব্য ছিল, আশা করি ইহা কেহই বলিবেন না।

স্বরাজ বা স্বাধীনতা লাভ হউক বা না হউক, যাহা অনুচিত তাহা করা কখনও বিধেয় হইতে পারে না।

ভারতীয় জাতির বিশেষত্বের যে অভিব্যক্তির কথা উপরে বলিয়াছি, তাহার আভাস সহজেই দিতে পারা যায়। গান্ধীজি অহিংসা ও সাত্বিকতা প্রচার করিতেছেন। এই আদর্শে তিনি এখন আন্তরিক বিশ্বাসী বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। যুদ্ধের সময় যখন তিনি সৈন্যসংগ্রাহকের কাজ করিয়াছিলেন, তখনও তিনি অহিংসায় বিশ্বাসী ছিলেন কি না জানি না। যাহা হউক, আত্মার যাহাতে অকল্যাণ হয়, হিংসাদ্বেষাদি দ্বারা তামসিকাদি দ্বারা যাহাতে আত্মা কলুষিত হয়, পার্থিব কোন লাভ বা সুবিধার জন্য, এমন কি স্বরাজ বা স্বাধীনতার জন্যও, তাহা করা উচিত নহে, এই মন্ত্রের সাধনাই ভারতবর্ষের বিশেষত্ব বলিয়া আমরা মনে করি।

—

শান্তিনিকেতনে গান্ধীজি

মহাত্মা গান্ধী রবীন্দ্রনাথের সহিত দ্বিতীয় বার সাক্ষাৎ করিয়া দীর্ঘ কাল যে কথোপকথন করেন, তাহাতে ভারতবর্ষের বিশেষত্ব-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মত উক্তরূপ বলিয়া প্রকটিত হয়। এই কথোপকথনের সময় অনেক ক্ষণ আমরা উপস্থিত ছিলাম। তাহাতে গোপনীয় কিছু না থাকিলেও তাহার বিস্তারিত কোন অনুলাপ প্রকাশিত হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ আরোগ্য লাভ করিয়া বল পাইবার পর যদি কখনও নিজের অতুলনীয় ভাষায় স্বীয় আদর্শ ব্যক্ত করেন, তাহা হইলে মানবের উপকার হইবে।

বহুবৎসর পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথের মুখে বলী দ্বীপের হিন্দুদের সম্বন্ধে একটি ঘটনার বৃত্তান্ত শুনিয়াছিলাম। ঘটনাটি এই:—ওলন্দাজেরা যখন বলীদ্বীপ জয় করিবার জন্য তথাকার অধিবাসী হিন্দুদিগকে আক্রমণ করে, তখন হিন্দুরা যজ্ঞোপযোগী শুভ্র বস্ত্র পরিহিত হইয়া আততায়ীদের সম্মুখীন হইল এবং বলিল, আমরা পরাধীনতা স্বীকার করিব না, কিন্তু যুদ্ধও করিব না; তোমরা স্বেচ্ছায় আমাদিগকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিতে পার। হল্যাণ্ডের রাণী ঘোষণা করিলেন, যে, এরূপ সাহসী ও মহৎ লোকেরা স্বাধীন থাকিবার উপযুক্ত, এবং তাহাদিগকে বশ্যতা স্বীকার করাইবার আর চেষ্টা করিলেন না।

ঘটনাটির বৃত্তান্ত আমাদের মোটামুটি যেরূপ মনে ছিল লিখিলাম। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এণ্ড্রুজ সাহেবের এক পত্রের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজী যেচিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহা বিশ্বভারতী ত্রৈমাসিকে বাহির হইয়াছে। তাহার এক স্থানে কবি বলিতেছেন:—

"Of course, we must not think that killing one another is the only form of war. Man is preeminently a moral being: his war instinct should be shifted to the moral plane and his weapons should be moral weapons. The Hindu inhabitants of Bali, while giving up their lives before the invaders, fought with their moral weapons against physical power. A day will come when men's history will admit their victory. It was a war. Nevertheless it was in harmony with peace, and therefore glorious."

তাৎপর্য্য। "অবশ্য ইহা মনে করিলে চলিবে না, যে, পরস্পরের প্রাণবধই যুদ্ধের একমাত্র রূপ। মানুষ সর্ব্বোপরি নৈতিক জীব; তাহার স্বাভাবিক যুদ্ধপ্রবৃত্তিকে নৈতিক স্তরে উন্নীত করা উচিত, এবং তাহার অস্ত্র নৈতিক বা আত্মিক অস্ত্র হওয়া উচিত। বলী দ্বীপের হিন্দু অধিবাসীরা আক্রমণকারীদের নিকট প্রাণবলি দিতে প্রস্তুত হইয়া পাশব বলের বিরুদ্ধে নিজেদের নৈতিক বা আত্মিক অস্ত্রদ্বারা যুদ্ধ করিয়াছিল। একদিন আসিবে যখন মানুষের ইতিহাস তাহাদের জয় স্বীকার করিবে। তাহারা যুদ্ধই করিয়াছিল। কিন্তু তথাপি শান্তির সহিত ইহার সামঞ্জস্য ছিল, এবং এই হেতু ইহা মহিমামণ্ডিত।"

—

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নূতন নাম

ব্রিটিশ স্বশাসক উপনিবেশগুলি সাম্রাজ্য নামটা ভালো বাসে না। ইংরেজদের মধ্যেও কেহ-কেহ এই নামটা ভালো বাসে না। আমরা ত ভালো বাসিই না। কিন্তু

আমাদিগকে খুশি করিবার জন্ম কাহারও মাথা-ব্যথা হয় নাই, সম্ভবতঃ ঔপনিবেশিকদিগকেই খুশি করিবার জন্ম ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বল্ডুইন সম্প্রতি তাঁহার এক বাণীতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটা নূতন নামের অবতারণা করিয়াছেন। তাহা, "দি কমন্‌ওয়েল্‌থ্ অভ্ ব্রিটিশ্ নেশুন্স্;" অর্থাৎ ব্রিটিশ-জাতিদিগের কমন্‌ওয়েল্‌থ্। কমন্‌ওয়েল্‌থ্ মানে এরূপ রাষ্ট্র যাহার লক্ষ্য সর্ব্বসাধারণের কল্যাণ। এই শব্দটি সাধারণতন্ত্র-অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে; কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একজন নৃপতি আছেন বলিয়া আমরা সাধারণতন্ত্র কথাটি ব্যবহার করিলাম না।

কেবল **ব্রিটিশ** জাতিদিগের কমন্‌ওয়েল্‌থ্ই যদি ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হয়, তাহা হইলে তাহাতে **অব্রিটিশ** ভারতের স্থান কি ও কোথায়?

লেখক তাহার পিতামহ-সম্বন্ধে একটি গল্প শুনিয়াছিল, যে, তিনি অনাথ ও দরিদ্র বালক ছিলেন বলিয়া কোন সচ্ছল-অবস্থার লোক তাঁহাকে পোষ্য-পুত্র লইতে চাহিয়াছিল; তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, "পরের বাবাকে বাবা বল্‌তে পার্‌ব না"। দারিদ্র্য সেই ক্ষুদ্র মানুষটিকে বার্দ্ধক্যেও ত্যাগ করে নাই, যদিও তাঁহার সরস্বতীর কৃপা-লাভ ঘটিয়াছিল।

কোন রাষ্ট্রীয় সুবিধার জন্ম আমরা ত মিথ্যা ব্রিটিশ নাম লইতে পারিব না; কেহ যদি দিতে চায়, তাহা হইলেও প্রত্যাখ্যান করিতে হইবে।

অবশ্য কেহ যে ঐ নাম আমাদিগকে দিতে চাহিতেছে, তাহা নহে। ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী আমাদিগকে সম্ভবতঃ ব্রিটিশ জাতিসমূহের সম্পত্তি, তাহাদের খোঁয়াড়ের নরাকার গোরু-রূপে স্বাধিকারভুক্ত রাখিতে চান।

তাহা হইলেও ইহা স্বীকার্য্য, যে অল্পসংখ্যক ইংরেজ এবং তদপেক্ষা অধিকসংখ্যক ভারতবাসী মনে করেন, যে, ভারতীয়দিগকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমান অংশী করা উচিত ও করা হইবে।

—

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে আমাদের সমান-অংশিতা

আমরা ধরিয়া লইলাম, যে, আমাদিগকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বা কমন্‌ওয়েল্‌থের সমান অংশীদার করা হইবে। কেমনটি হইলে সমান-অংশিত্ব ঘটে তাহাই এখন বিচার্য্য।

প্রথমেই ত নামটাতে খট্‌কা লাগে। প্রত্যেক জিনিষের নাম এরূপ হওয়া উচিত, যাহাতে তাহার প্রকৃতি ঠিক্ বুঝা যায়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বা কমন্‌ওয়েল্‌থ্ বলিলে এমন-একটা রাষ্ট্রসমষ্টি, জাতি বা জাতিসমষ্টি বুঝায়, যাহার সবটা বা অধিকাংশই ব্রিটিশ, কিম্বা যাহার প্রভু ব্রিটিশ-জাতি।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মোট লোক-সংখ্যা ৪৬ কোটি।

তাহার মধ্যে ভারতের লোক-সংখ্যা ৩২ কোটি।

এই সাম্রাজ্যের শ্বেত-অধিবাসীদের সংখ্যা ১১ কোটি।

সুতরাং প্রথম অর্থে ব্রিটিশ কথাটি এই জাতিসমষ্টির প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না। সাম্য স্থাপিত হইবে, ইহা ধরিয়া না লইলে যখন সমান-অংশিত্বের কথাই উঠিতে পারে না, তখন, ব্রিটিশেরা যাহাদের প্রভু ইহা এরূপ জাতিসমষ্টির নাম, এ-অর্থও করা যাইতে পারে না। কেবল ব্রিটিশদের অর্থে বা বাহুবলে এত-সব দেশ একছত্র হয় নাই; সুতরাং সে অর্থেও "ব্রিটিশ" বিশেষণটির প্রয়োগ হইতে পারে না। তা-ছাড়া, যখন সাম্যকেই এই সম্মিলিত রাষ্ট্রের ভিত্তি করা হইবে বলিয়া ধরা যাইতেছে, তখন বিজেতার নামের ছাপে ইহা পরিচিত হইতে পারে না।

যে দেশ বা জাতির লোকসংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তাহার নামে এইসব রাষ্ট্রের নাম রাখিতে হইলে, নাম হয় "ভারতীয় কমন্‌ওয়েল্‌থ্"। কিন্তু এই সাম্রাজ্যের শ্বেত অধিবাসীদের তাহাতে রাজি হইবার বিন্দুমাত্রও সম্ভাবনা নাই। অন্যদিকে বত্রিশ কোটি মানুষকে সাম্যলাভ করিয়াও বেমালুম নামহীন হইতে কেমন করিয়া বলা যায়?

একটা রফা চলে বটে। ব্রিটিশেরা এত দিন প্রভুত্ব করিতেছে এবং তাহাদের পরাক্রম ও কৃতিত্বও আছে; অন্যদিকে আমরা সংখ্যায় খুব বেশী এবং আমাদের ঐতিহাসিক প্রাচীনতা ও গৌরবও আছে। সুতরাং ভারত-ব্রিটিশ কমন্‌ওয়েল্‌থ্ বা তদ্রূপ একটা-কিছু নাম চলিতে পারে। কিন্তু ইহাতেও শ্বেতকায়দের রাজি হইবার সম্ভাবনা দেখিতেছি না।

নামের কথা ছাড়িয়া দিয়া রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাক।

যতগুলি রাষ্ট্র ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত আছে, তাহারা সমান অধিকার লাভ করিলে প্রত্যেকের আভ্যন্তরীণ সমুদয় রাষ্ট্রীয় কার্য্য নির্ব্বাহের সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকিবে। কিন্তু যে-সকল ব্যাপারে তাহাদের পরস্পরের সম্পর্ক আছে এবং সহযোগিতা দরকার, এবং সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সহিত অন্য-সব দেশের যে-সকল বিষয়ে সম্বন্ধ আছে, সেই-সকলের সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত সমুদয় সাম্রাজ্যের একটি সাধারণ ব্যবস্থাপক সভা বা মন্ত্রণা-সভার প্রয়োজন হইবে। এই প্রয়োজন বর্ত্তমান সময়েও অনুভূত হইয়াছে; কয়েক বৎসর আগে হইতেই ইম্পীরিয়্যাল কন্‌ফারেন্সের বা সাম্রাজ্যিক মন্ত্রণাসভার অধিবেশন হইয়া আসিতেছে। অবশ্য অধিবেশনগুলি প্রতিবৎসরই কোন নির্দ্দিষ্ট তারিখে কোন নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য হইবার কোন ব্যবস্থা এখনও হয় নাই, প্রয়োজনমত অধিবেশন হয়; ইহাতে কোন্ রাষ্ট্রের কিরূপ অধিকার ও দায়িত্ব, তাহাও নির্দ্ধারিত হয় নাই। আমরা যেরূপ সাম্রাজ্যিক ব্যবস্থাপক সভার কথা বলিতেছি, তাহা অন্য-রকমের। বর্ত্তমানে প্রত্যেক রাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্ট্ ২।১ জন করিয়া প্রতিনিধি সাম্রাজ্যিক কন্‌ফারেন্সে পাঠান, কিন্তু ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যকে নৃপতি-বিভূষিত বৃহৎ সাধারণতন্ত্রে পরিণত করিতে হইলে ইহার অন্তর্গত প্রত্যেক রাষ্ট্রের যেমন ব্যবস্থাপক সভা থাকিবে, সবগুলির সম্মিলিত একটি ব্যবস্থাপক সভারও তেম্‌নি প্রয়োজন হইবে; যেমন আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সের প্রত্যেক রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভা আছে, এবং তা-ছাড়া সকলগুলির সম্মিলিত সাধারণ ব্যবস্থাপক সভাও আছে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যিক ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের হইবে। সুতরাং যে দেশের লোকসংখ্যা যত বেশী, তাহার প্রতিনিধির সংখ্যাও তত বেশী হইবে। সাম্রাজ্যের আর-সকল অংশের অধিবাসীর মোট-সংখ্যা অপেক্ষা ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা অনেক বেশী। সুতরাং সাম্যের খাতিরে সাম্রাজ্যিক ব্যবস্থাপক সভায় ভারতবর্ষের প্রতিনিধির সংখ্যাও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইবে। এরূপ বন্দোবস্তে সাম্রাজ্যের শ্বেত অধিবাসীরা রাজী হইবেন কি? তাহার ত কোন সম্ভাবনা দেখিতেছি না।

অবশ্য, এরূপ প্রস্তাবও হইতে পারে, যে, এই সাধারণ ব্যবস্থাপক সভায় প্রত্যেক রাষ্ট্র সমানসংখ্যক প্রতিনিধি পাঠাইবে। কিন্তু সওয়া কোটি লোকের বাসভূমি নিউ-জীলণ্ড, পৌনে পাঁচকোটির বাসভূমি ব্রিটেন, এবং বত্রিশ কোটির বাসভূমি ভারতবর্ষ, সবাই সমান-সমান প্রতিনিধি পাঠাইবে বলিলে সাম্যসঙ্গত প্রস্তাব হয় না।

রাজধানীতেই সাম্রাজ্যিক ব্যবস্থাপক সভার স্থায়ী অধিবেশনস্থান থাকা বাঞ্ছনীয়; নতুবা ঘুরিয়া-ঘুরিয়া সব দেশে এক-একবার অধিবেশন করিতে গেলে প্রতিনিধি ও কর্ম্মচারীদের রাহাখরচ, খাই-খরচ প্রভৃতিতে এবং সর্ব্বত্র অধিবেশনগৃহ-নির্ম্মাণে অত্যন্ত অধিক ব্যয় হইবে, কাজের অসুবিধাও খুব হইবে। সাম্রাজ্যের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লোক ভারতবর্ষে বাস করে। অধিকতম লোকের সুবিধা দেখাই উচিত। সুতরাং রাজধানী ভারতবর্ষেই স্থাপিত হওয়া উচিত। ইহাতে কি সাম্রাজ্যের শ্বেত অধিবাসীবর্গ রাজি হইবেন? তাহা ত মনে হয় না।

তাহার পর নৃপতি বা রাষ্ট্রপতি প্রভৃতির কথা উঠে। এখন বৃটিশ সাম্রাজ্যের মুকুটস্বরূপ একজন রাজা আছেন। এইরূপ বন্দোবস্ত যদি ভবিষ্যতেও থাকে, তাহা হইলে সাম্যের খাতিরে এই রাজাকে ভারতবর্ষে অবস্থিত রাজধানীতে জীবনের অধিকাংশ সময় যাপন করিতে হইবে, কিম্বা সকল দেশেই ঘুরিয়া-ঘুরিয়া দরবার করিয়া বেড়াইতে হইবে। এই উভয়ের মধ্যে কোনটিই শ্বেতকায়দের মনঃপূত হইবার সম্ভাবনা নাই।

তা-ছাড়া, সাম্যই যদি স্থাপিত হয়, তাহা হইলে ভিক্টোরিয়ার মত রাণী বা পঞ্চম জর্জের মত রাজা বরাবর খাঁটি ইউরোপীয়বংশসম্ভূত কেন থাকিবেন, বুঝা যায় না। সাম্য চায়, যে, সাম্রাজ্যের যে-জাতির লোকসংখ্যা সকলের চেয়ে বেশী, রাজা তাহাদের জাতির হাওয়া উচিত। কিন্তু ব্রিটিশ রাজা বা রাণীকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহাদের জায়গায় কোন ভারতীয় রাজবংশকে প্রতিষ্ঠিত করা চলিবে না;—ভারতীয় রাজবংশ হিন্দু বা মুসলমান হইবেন, তাহা লইয়াও ঝগড়া নিশ্চয় উঠিতে পারে। অতএব,

এইরূপ ব্যবস্থা হইতে পারে, যে, উত্তরাধিকার-সূত্রে যখন কোন ব্রিটিশ মহিলা সিংহাসনের অধিকারিণী হইবেন, তখন তিনি ভারতীয় কোন পুরুষকে বিবাহ করিবেন, এবং উত্তরাধিকার সূত্রে যখন কোন ব্রিটিশ পুরুষ সিংহাসনের অধিকারী হইবেন, তখন তিনি কোন ভারতীয় মহিলাকে বিবাহ করিবেন। এইরূপে ক্রমশঃ রাজবংশ আর খাঁটি ইউরোপীয় বা খাঁটি ভারতীয় থাকিবে না। ইহাতে এই আপত্তি উঠিতে পারে, যে, রাণী বা রাজা কাহাকে বিবাহ করিবেন, সে-সম্বন্ধে নিয়ম করিলে তাঁহাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয়। ইহা সত্য কথা। কিন্তু ব্যক্তিগত স্বাধীনতার এইরূপ সীমাবদ্ধতায় ব্রিটিশ রাজবংশ অভ্যস্ত ;—বর্ত্তমানেও ব্রিটিশ রাজা ও রাণী কেবল মাত্র প্রটেষ্টাণ্ট্-সম্প্রদায়ে বিবাহ করিতে পারেন, রোমান ক্যাথলিক্ বিবাহ করিতে পারেন না। তাহা হইলেও, আমরা যেরূপ নিয়মের আভাস দিলাম, তাহাতে শ্বেতকায়েরা এবং ব্রিটিশ রাজ-বংশও আপত্তি করিবেন।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে সাধারণতন্ত্রে পরিণত করিয়া কয়েক-বৎসর অন্তর-অন্তর, আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সের মত, উহার প্রেসিডেণ্ট বা রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করিলে তাহাই ঠিক্ সাম্যসঙ্গত হয়। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সাধারণতন্ত্রে পরিণতি সুদূরপরাহত। উহার পরিণাম ঐরূপ হইলে, প্রতিনির্ব্বাচনেই না হউক, অনেক-বারই রাষ্ট্রপতি ভারতীয় হইবার সম্ভাবনা ঘটিবে। তাহা শ্বেত-মনুষ্যদের ভালো লাগিবে না।

আমরা কেবল বড় বড় কয়েকটা বিষয়ের উল্লেখ করিলাম; গবর্ণর-জেনেরাল ও গবর্ণর হইতে আরম্ভ করিয়া আমাদের দেশের সমুদয় কর্ম্মচারী ভারতীয় হইবে. সৈনিক বিভাগে জঙ্গী লাট হইতে আরম্ভ করিয়া সবাই ভারতীয় হইবে, ইত্যাদি ছোট-ছোট বিষয়ের উল্লেখ করিলাম না।

মোট কথা এই, যে, সাম্য স্থাপন করিতে হইলে সাম্রাজ্যের কোন জাতির লোকই যাহাতে বামন হইয়া থাকিতে বাধ্য না হয়, সকলেই যাহাতে দেহ মন আত্মার পূর্ণ বিকাশ লাভ করিবার সুযোগ পায়, ব্যবস্থা তদনুরূপ করিতে হইবে। বিকাশের এইরূপ সুযোগ পাইলে অধিকাংশ ভারতবাসী অধিকাংশ ইংরেজের সমকক্ষ হইবে, এবং ভারতবাসীর সমষ্টি ইংরেজের সমষ্টি অপেক্ষা বৃহৎ বলিয়া ভারতীয়দের সমষ্টি ইংরেজসমষ্টি অপেক্ষা অধিক প্রভাবশালী ও শক্তি-শালী হইবে। কিন্তু একই সাম্রাজ্যের বা সাধারণতন্ত্রের মধ্যে কোন রাষ্ট্রের লোকদের এইপ্রকারে স্থায়ীভাবে অধিকতর প্রভাবশালী হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে; কারণ তাহাতে অন্য রাষ্ট্রগুলির বিকাশে বাধা ও খর্ব্বতা ঘটে, যেমন বর্ত্তমানে ইংলণ্ডের অধিকতর শক্তিশালিতায় ভারত বর্ষের বিকাশে বাধা ঘটিতেছে ও তজ্জন্য আমরা দেহ মন আত্মায়, বিদ্যাবুদ্ধিতে, লোকহিতসাধন-কার্য্যে, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে, আধ্যাত্মিকতায়, পূর্ণ বিকাশ লাভ করিতে না পারিয়া ছোট ও খাট হইয়া আছি।

আমরা উপরে যাহা লিখিলাম, তাহার অনেক কথা ব্যঙ্গের মত শুনাইতে পারে। কিন্তু যদি তাই হয়, তাহার জন্য আমরা দায়ী নহি; দায়ী তাঁহারা যাঁহারা নানা দেশের ধর্ম্মের ভাষার জাতির মহাদেশের লোককে একই সাম্রাজ্য বা সাধারণতন্ত্রের অন্তর্গত রাখিয়াও সাম্য স্থাপন সম্ভব মনে করেন। আমরা তাহা সম্ভব মনে করি না। আমরা দেখাইয়াছি, যে, ভারতবর্ষের লোকদের যত বড় হওয়া উচিত, যত বড় হইবার বিধিদত্ত অধিকার ও সম্ভা-ব্যতা তাহাদের আছে, তাহারা তত বড় হইলে ইংলণ্ডকে চাপা পড়িতে, ভারতের আওতায় পড়িতে হইবে; যেমন এখন ভারতবর্ষকে চাপা পড়িয়া, ইংলণ্ডের আওতায় পড়িয়া, ছোট হইয়া থাকিতে হইয়াছে। কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতির পক্ষেও ইহা সত্য। এই কারণে আমরা মনে করি, যে, বর্ত্তমানে যে-সব দেশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত আছে, তাহাদের সকলেরই সম্পূর্ণ-স্বাধীন হইয়া পরস্পরের সহিত মিত্রভাব অবলম্বন করা উচিত। অবশ্য, অন্য সব দেশের সঙ্গেও সদ্ভাব রক্ষার সমান চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

—

ডাঃ প্রতাপচন্দ্র গুহরায়ের নির্য্যাতন

কোন একজন নামজাদা জমিদারের সম্বন্ধে এইরূপ

গল্প শুনিয়াছিলাম, যে, তিনি উন্নতশির প্রজাদিগের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিয়া হারিয়া গেলে ক্রমাগত আপীল করিতেন এবং নূতন-নূতন-রকম মোকদ্দমা করিতেন;—বলিতেন, তাহাদিগকে জিতাইয়া-জিতাইয়া হারাইব। অর্থাৎ প্রজাদের ত তাঁহার মত অর্থবল নাই, তাহারা নানা আদালতে জিতিলেও মোকদ্দমার ব্যয়ই তাহাদের পক্ষে বিষম বোঝা ও জরিমানার মত হইবে।

চরমনাইরের নৃশংস ও লজ্জাকর ঘটনা-উপলক্ষ্যে ডাঃ প্রতাপচন্দ্র গুহরায় গবর্ণ্মেণ্টের নিকট হইতে যেরূপ ব্যবহার পাইয়াছেন, তাহাতে ঐ "দঁস্থে" জমিদারের কথা মনে পড়ে। প্রতাপ-বাবু নির্দ্দোষ হইতে পারেন, এবং ভিন্ন-ভিন্ন আদালতে মূল বিচারে, আপীলে বা পুনর্বিচারে শেষ পর্য্যন্ত তিনি খালাস পাইতে পারেন; কিন্তু মানসিক উদ্বেগ, ধর্ম্মাধিকরণের স্বর্গসুখভোগ, অর্থব্যয় প্রভৃতিতে তাঁহার খুব সাজা হইয়া গিয়াছে। তাহার পর দীর্ঘকাল পরে গবর্ণ্মেণ্ট্ পক্ষ হইতে তাঁহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা তুলিয়া লওয়া হইল এই ওজুহাতে, যে, মোকদ্দমাটা অনেকদিন হইল রুজু করা হইয়াছে, অতএব উহা আর চালাইবার ইচ্ছা গবর্ণ্মেণ্টের নাই। গবর্ণ্মেণ্ট্ অবশ্য কখনও বক্রোক্তি ব্যঙ্গ বিদ্রূপাদি করেন না। কিন্তু কোন ভাষ্যকার বলিতে পারেন, গবর্ণমেণ্টের কথার মানে এই, যে, লোকটাকে যথেষ্ট হায়রান্ পরেশান্ করা হইয়াছে, আর দরকার নাই।

প্রকৃত] দোষী] ব্যক্তিকে গবর্ণ্মেণ্ট্ কেবল কালাত্যয়বশতঃ অব্যাহতি দিলেন, ইহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না।

প্রতাপ-বাবুর নির্য্যাতন দুঃখের বিষয়; ইহাতে গবর্ণ্মেণ্টের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা বাড়ে নাই। কিন্তু ইহা দুঃখকর হইলেও, ইহার মধ্যে একটু মজাও আছে। মোকদ্দমা যখন তুলিয়া লওয়া হইল তখন গবর্ণ্মেণ্ট উকীলের তুলিয়া লইবার প্রার্থনা-অনুসারে তাহা করা হইল; শিখণ্ডিস্বরূপ যে-লোকটাকে ফরিয়াদী খাড়া করা হইয়াছিল জিজ্ঞাসা করিয়াও প্রতাপ-বাবু তাহার কোন সন্ধান পাইলেন না। ইহার দ্বারা বেশ বুঝা গেল, যে, ব্যক্তিগতভাবে তাহার প্রতাপ-বাবুর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ ছিল না, গবর্ণ্মেণ্ট্ই আসল ফরিয়াদী ছিলেন।

—

চর-মনাইরের অত্যাচার

কেহ-কেহ চর মনাইরের অত্যাচারের দিনটিকে চিরস্মরণীয় করিতে চাহিতেছেন। কিন্তু ইহাতে ত গৌরব করিবার কিছু নাই। একদিকে কাপুরুষতা ও অন্যদিকে পৈশাচিক নৃশংসতা ও পশুত্ব। তাহা বৎসর-বৎসর স্মরণ করিয়া কি লাভ?

কতকগুলি মুসলমান ও হিন্দু পুরুষ নিজেদের প্রতি পুলিসের অত্যাচারের ভয়ে বাড়ীর স্ত্রীলোকদিগকে অরক্ষিত ও অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া চলিয়া গেল এবং পুলিশের লোকেরা আসিয়া পিশাচের মত ও পশুর মত বীভৎস লজ্জাকর ব্যবহার মুসলমান ও হিন্দু স্ত্রীলোকগুলির উপর করিল; এই নিষ্ঠুরতা ও কাপুরুষতা যেমন গবর্ণ্মেণ্টের তেম্নি দেশের লোকদিগেরও ঘোরতর কলঙ্ক।

পুলিশ কর্ম্মচারী মাত্রেই খারাপ লোক, এরূপ মিথ্যা উক্তি কাহারও করা উচিত নহে। কিন্তু পুলিশের হাতে শান্তিরক্ষার জন্য যে প্রভূত ক্ষমতা অর্পিত আছে, তাহার ঘোরতর অপব্যবহার অনেক সময় হয়, এই কঠোর সত্য শত লাট লিটনের শত চেষ্টাতেও চাপা পড়িবে না। তেম্নি সাংবাদিকগণ ও সভামঞ্চে বক্তৃতাকারীগণ চেষ্টা করিলেও আমাদের কাপুরুষতার কাহিনীগুলাকে চিরস্মরণীয়তার গৌরব দিতে পারিবেন না।

—

শিশুপত্নী-হত্যা

কলিকাতার শাঁখারিটোলার এক ময়রার আট বৎসরের একটি মেয়েকে যোগেন্দ্র নাথ খাঁ বিবাহ করে। দু-বৎসর পরে মেয়েটি যখন দশ বৎসরের, তখন যোগেন্দ্র উহাকে নিজের বাড়ীতে লইয়া যাইবার জন্য আসে। ভালো দিন ছিল না বলিয়া যোগেন্দ্রের শ্বশুর-শাশুড়ী তাহাকে পাঁচ দিনের জন্য অপেক্ষা করিতে বলে। শিশু মেয়েটি দুই রাত্রি স্বামীর কামরায় থাকিয়া তৃতীয় রাত্রিতে কোন

মতেই তথায় যাইতে চায় নাই। তাহার মা যোগেন্দ্রকে পান দিবার জন্ত তাহাকে প্রেরণ করায়, লোকটা দরজা বন্ধ করে। কতক্ষণ পরে, একটা গোঁগানি শব্দ শোনা যায়। দরজা খুলাইবার পর দেখা গেল, মেয়েটি উবুড় হইয়া রক্তাক্ত দেহে মরিয়া পড়িয়া আছে;—তাহার মাথা নোড়া দিয়া ছেঁচিয়া ভাঙিয়া ফেলায় মস্তিষ্ক বাহির হইয়া পড়িয়াছে। মেয়েটি কেন স্বামীর ঘরে শুইতে চায় নাই, কেনই বা তাহার স্বামী তাহাকে মারিয়া ফেলিল, তাহা বলা অনাবশ্যক।

আদালতের বিচারে যোগেন্দ্রের ফাঁসীর হুকুম হইয়াছে। নিহত শিশু-বালিকাটির পিতা মাতার কোন শাস্তি হয় নাই। অনেকটা দেশাচার ও লোকাচারের দোষেও শিশুটির প্রাণ গিয়াছে বলিয়া সমাজেরও শাস্তি পাওয়া উচিত ছিল; কিন্তু সমাজকে শাস্তি দিবার ত কোন উপায় নাই। তাহা হইলেও, দেশের ধার্ম্মিকতম ও মহত্তম লোকেরাও অনুভব করিবেন, যে, তাঁহারা এবং দেশের অন্যসব লোকেরা—সকলেই —এইরূপ ঘটনার জন্য অল্পাধিক-পরিমাণে দায়ী। কারণ মহৎ লোকেরা ও আমরা সাধারণ লোকেরা, যে দেশাচার ও লোকাচার, যে বাল্যবিবাহ প্রথা, স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে যে ধারণা, স্ত্রীদের উপর স্বামীদের "অধিকার"-সম্বন্ধে যে ধারণা, এবং স্ত্রীলোকদের যে হীন অসহায় অবস্থা দেশে বিদ্যমান থাকায় এরূপ হৃদয়বিদারী, অরুন্তুদ, লজ্জাকর, নৃশংস ঘটনা ঘটিয়াছে, তৎসমুদয়ের উচ্ছেদসাধনার্থ যথোচিত চেষ্টা আমরা কেহই করি নাই। অতএব অপরাধ ও লজ্জা আমাদের সকলেরই।

যাহারা গোঁড়ামির ভয়ে বালিকাদের সম্মতির বয়স বাড়াইতে চায় না, তাহাদের দায়িত্ব অত্যন্ত অধিক। সম্মতির বয়স বাড়াইয়া দিলেই তৎক্ষণাৎ বালিকা বধূদের যন্ত্রণা, অপঘাত-মৃত্যু, আত্মহত্যা ও অকাল-মৃত্যু বন্ধ হইয়া যাইবে বা কমিবে, আমাদের এমন কোন ভ্রান্ত ধারণা নাই। কিন্তু এই দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের আছে, যে, বয়স বাড়াইয়া দিলে অনতিবিলম্বে বিবাহের বয়সও বাড়িবে, এবং অতি অল্পবয়স্কা নববধূর পিতৃগৃহ হইতে শ্বশুরালয় বা স্বামীর শয়নকক্ষ-গমনে কিছু বাধা জন্মিবে। তাহার পিতামাতা তাহাকে বিলম্বে পাঠাইবার একটা খুব ন্যায়সঙ্গত, যুক্তিসঙ্গত ও প্রকাশ্য কারণ দেখাইতে পারিবে। এইজন্য, যখন সম্মতির বয়সসম্বন্ধীয় বিল আবার ব্যবস্থাপক সভায় পেশ্ হইবে, তখন গোঁড়ারা বাধা না দিলে দেশের কল্যাণ হইবে।

যোগেন্দ্র যাহা করিয়াছে, তাহার উপযুক্ত বিশেষণ অভিধানে নাই। পশুরা এরূপ কাজ করে না; পিশাচ আছে কি না জানি না, থাকিলেও তাহারা এমন কাজ করে বলিয়া শুনি নাই। সুতরাং পাশব ও পৈশাচিক উপযুক্ত বিশেষণ নহে। যাহা হউক, উপযুক্ত বিশেষণ খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা না করিয়া যাহাতে ওরূপ নরাধমের কাজ আর কাহারও দ্বারা না হয়, দেশে সেইরূপ অবস্থা আনয়নের চেষ্টা সর্ব্বপ্রযত্নে সকলের করাই বিধেয়। হইতে পারে, যে, ঠিক্ এইরূপ ঘটনা বিরল কিম্বা এই একবার মাত্র প্রথম ঘটিল। কিন্তু দুই-এক মিনিটে বালিকাপত্নী হত্যাই হত্যার একমাত্র প্রকার নহে; হত্যা আরও অনেক-রকমে হইয়া থাকে। অবশ্য ইহাও ঠিক্, যে, যত বালিকা বধূ ও বালিকা মাতার মৃত্যু হয়, তাহার অধিকাংশ মৃত্যু কেহ জানিয়া-শুনিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক ঘটায় না; কিন্তু অকাল মৃত্যু-যে-প্রকারেই ঘটুক, তাহা শোচনীয়; তাহা মৃতের পক্ষে অবাঞ্ছনীয় এবং তাহা সমাজের পক্ষে কলঙ্কের বিষয় ও ক্ষতিকর।

যত বালিকা ও তরুণীর কাপড়ে আগুন লাগাইয়া বা অন্যপ্রকারে আত্মহত্যার কাহিনী প্রকাশিত হয়, তাহার কোন-কোনটি আত্মহত্যা নহে মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। সত্য-সত্য আত্মহত্যা যাহারা করে, তাহাদের শোচনীয় মৃত্যুর পশ্চাতে যেসব দুঃখের কথা থাকে, তাহাও সব সময় প্রকাশ পায় না। আমরা অনেকবার বলিয়াছি ও দেখাইয়াছি, যে, পাশ্চাত্য দেশে আত্মহত্যার সংখ্যা পুরুষদের মধ্যে বেশী, স্ত্রীলোকদের মধ্যে কম; আমাদের দেশে ঠিক্ তাহার বিপরীত। ইহা বলিবার উদ্দেশ্য অবশ্য এরূপ নহে, যে, বাঙালী পুরুষেরা আরও বেশী করিয়া আত্মহত্যা করিয়া এ-বিষয়ে নারীদিগকে পরাস্ত করুক; উদ্দেশ্য এই, যে, আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক

আচরণ ও ব্যবস্থার উন্নতি হইয়া স্ত্রীলোকদের জীবন এরূপ আনন্দময় হউক, যে, তাঁহাদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবৃত্তি লোপ বা খুব বেশী হ্রাসপ্রাপ্ত হউক।

সংবাদপত্রে অহরহ পথে ঘাটে মাঠে সর্ব্বত্র নারী-নির্য্যাতনের সংবাদ পড়িয়া মন দুঃখে লজ্জায় আত্মগ্লানিতে অভিভূত হইয়া পড়ে। তাহার উপর গৃহাভ্যন্তরে নারীর দুঃখময় জীবনের কথা ভাবিলে, প্রতিকারের উপায় সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা কঠিন হইয়া উঠে। বঙ্গে নারীজীবনের কথা ভাবিয়া পুনর্জন্মবিশ্বাসী কাহারও আর এ-ইচ্ছা হয় না, যে, যিনি একবার এদেশে নারী হইয়া জন্মিয়াছিলেন, পুনর্ব্বার তিনি নারী হইয়া এই দেশেই জন্মগ্রহণ করুন;—এ-জন্মে যে অল্পসংখ্যক বাঙালী মহিলা সৌভাগ্যবতী ছিলেন, ইহার পরের জন্মে তাঁহাদের যদি সে-সৌভাগ্য না ঘটে! যাঁহারা এ-জন্মে দুঃখ-ভোগ করিয়াছেন, তাঁহারা আবার বাঙালীর মেয়ে হইয়া জন্মগ্রহণ করুন, পুনর্জন্মে বিশ্বাসী কেহই এ-কামনা করিবেন না।

বাংলা দেশে নারীজন্মের দুঃখের জন্য আমরা আপনাদিগকেই প্রধানতঃ দোষী করিতেছি। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট্‌কে এ-বিষয়ে যথেষ্ট কর্ত্তব্য-পরায়ণ বলিতে পারি না। নারীদের শিক্ষার জন্য যাহা করা উচিত, গবর্ণমেণ্ট্‌ তাহার অতি সামান্য অংশই করিয়াছেন। সামাজিক যে-যে কুপ্রথার জন্য নারীদের দুর্দ্দশা হয়, তাহার বিলোপ সাধনের জন্য কিম্বা তাহার অনিষ্টকারিতা কমাইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট্‌কে আজকাল উদ্যোগী ত দেখা যাইতেছেই না, বরং সম্মতির বয়স-সম্বন্ধীয় আইনের আলোচনার সময় সরকারী সভ্যদের প্রতিকূলতায় নারীহিতৈষীদের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। একথা বলিবার জো নাই, যে, গবর্ণমেণ্ট্‌ সামাজিক বিষয়ে কখনও হস্তক্ষেপ করেন না। সহমরণপ্রথার বিরুদ্ধে আইন করিয়া এবং আরও অনেক আইন করিয়া গবর্ণমেণ্ট্‌ একসময় সমাজসংস্কার ও ধর্ম্মসংস্কারের পথ সহজ করিয়া দিয়াছিলেন। এখন আবার গবর্ণমেণ্ট্‌ সম্মতির বয়স বাড়াইয়া দিয়া ন্যূনকল্পে চৌদ্দ করিয়া দিলে দেশের মঙ্গল হইবে! এরূপ আইন করিলে দেশে কোন বিদ্রোহ বা বিপ্লবের আয়োজন কেহ করিবে না, জোর করিয়া বলিতে পারা যায়। বস্তুত সম্মতি-আইনের সংশোধন-চেষ্টা বেসরকারী সভ্যদের পক্ষ হইতে হইয়াছিল ও হইবে। গবর্ণমেণ্ট্‌ এ-বিষয়ে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিলেই ত নারীহিতৈষীদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। তাহাতে গবর্ণমেণ্ট্‌কে দোষ দিবার কোন কারণ থাকিবে না।

—

কলিকাতায় নারী-মৃত্যুর আধিক্য

কালকাতার স্বাস্থ্য-কর্ম্মচারী ১৯২৩ সালের রিপোর্ট্‌ বাহির করিয়াছেন; ১৯২৪এর রিপোর্ট্‌ পরে বাহির হইবে। এই রিপোর্ট্‌ হইতে জানিতে পারা যায়, ঐ সালে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে মৃত্যুসংখ্যা হাজারে ৩৮৮ এবং পুরুষদের হাজারকরা ২৩৬ ছিল। দারিদ্র্য, শহরের অস্বাস্থ্যকরতা প্রভৃতি কারণ স্ত্রীলোক ও পুরুষ উভয়েরই আয়ু হ্রাস করে। অতএব স্ত্রীলোকদের মৃত্যুর আধিক্যের কারণ সেইগুলি, যেগুলি পুরুষদের উপর বর্ত্তে না, স্ত্রীলোকদের উপর বর্ত্তে। তাহার মধ্যে প্রধান কারণ দুটি; (১) পর্দ্দা বা অবরোধ-প্রথা, এবং (২) বাল্যমাতৃত্ব। পর্দ্দার জন্য অধিকাংশ স্ত্রীলোককে এরূপ ঘরে জীবনের অধিকাংশ সময় কাটাইতে হয়, যেখানে আলো ও বায়ু-চলাচল কম। কলিকাতার স্বাস্থ্য-কর্ম্মচারী ইহাকে স্ত্রীলোকদের মধ্যে যক্ষ্মা-রোগের প্রাদুর্ভাবের একটি প্রধান কারণ বলিয়াছেন। তাঁহার মতে বাল্য-বিবাহ ও বাল্য-মাতৃত্ব নারীদের যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগে অকাল মৃত্যুর আর একটি প্রধান কারণ।

তিনি লিখিয়াছেন :—

"Between the age of 15 and 20 years, for every boy that dies of tuberculosis five girls die. What is the reason for this truly appalling state of affairs? Well, to put it brutally, these girls were suffocated behind the purdah."

তাৎপর্য্য। "যক্ষ্মা রোগে মৃত ১৫ ও ২০ বৎসর বয়সের প্রত্যেক বালকের জায়গায় ঐ রোগে ঐ বয়সের পাঁচটি বালিকার মৃত্যু হয়। এই সত্যসত্যই ভয়াবহ অবস্থার কারণ কি? কঠোর সত্য বলিতে গেলে বলিতে হয়, এই বালিকাদিগকে পর্দ্দার পশ্চাতে নিঃশ্বাসরোধ করিয়া মারিয়া ফেলা হয়।" [অর্থাৎ, যথেষ্ট পরিমাণে বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিতে না পাওয়ায় তাহাদের মৃত্যু হয়।]

অল্পবয়সে জননী হওয়ায় জন্যও যে অনেক বালিকার মৃত্যু হয়, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। যক্ষ্মারোগে কোন্‌ বয়সে হাজারকরা কত পুরুষ ও স্ত্রীলোকের মৃত্যু হয়,

কলিকাতার স্বাস্থ্য-কর্ম্মচারী ডাক্তার ক্রেকের রিপোর্ট্ হইতে তাহা নীচে উদ্ধৃত হইতেছে।

যক্ষ্মায় হাজারকরা মৃত্যুসংখ্যা

বয়স	পুরুষ	স্ত্রীলোক
১০-১৫	'৪৭	২'১
১৫-২০	১'৪	৭'১
২০-৩০	১'৭	৬'২
৩০-৪০	২'১	৪'৯
সকল বয়সের	১'৬	৩'৭

অল্পবয়সে সন্তান হওয়ার কুফল যে-বয়সে জননীদের দেহে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফলে, সেই ১৫-২০ বয়সে তাহাদের হাজারকরা মৃত্যুও হয় সকলের চেয়ে বেশী।

আলো-বাতাসহীন স্যাঁৎসেঁতে সূতিকাগার, সূতিকাগারে বাসকালীন কুসংস্কারবশতঃ স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মভঙ্গ, অজ্ঞ ধাত্রীর সাহায্যে সন্তান-প্রসব, পীড়ার সময় পুরুষদের যতটা চিকিৎসা হয় স্ত্রীলোকদের ততটা না-হওয়া, বহু পরিবারে পুরুষদের চেয়ে স্ত্রীলোকদের আহারের অপ্রাচুর্য্য,—এইগুলিও স্ত্রীলোকদের মৃত্যুর আধিক্যের কারণ।

কলিকাতা-সম্বন্ধে যাহা লেখা হইয়াছে, বঙ্গের অন্য বড় শহরগুলি সম্বন্ধেও তাহা কতকপরিমাণে সত্য।

স্বাস্থ্য-কর্ম্মচারী যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অনেক দিনের পুরাতন জানা কথা। তৎসত্ত্বেও যথোচিত প্রতিকার না হওয়ায় আমরা সকলেই নারীহত্যার পাতকগ্রস্ত হইতেছি।

—

মুসলমানদের স্বতন্ত্র শিক্ষার দাবি

সম্প্রতি মুর্শিদাবাদ-জেলায় মুসলমানদের একটি কন্‌ফারেন্সে তাঁহাদের শিক্ষার জন্য বার্ষিক সরকারী বজেটে স্বতন্ত্র বরাদ্দের দাবি করা হইয়াছে। সকল সম্প্রদায়ের শিক্ষার জন্য যে সাধারণ বন্দোবস্ত আছে, মুসলমানদের শিক্ষার জন্য তা-ছাড়া কিছু অতিরিক্ত ব্যবস্থা বর্ত্তমানেও আছে। সেইজন্য মনে হইতেছে, এই নূতন দাবির মানে এই, যে, মুসলমানরা তাঁহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা ও বরাদ্দ অন্য সব সম্প্রদায় হইতে সম্পূর্ণ আলাদা চান। আমাদের এই ধারণা যদি ঠিক্ হয়, তাহা হইলে একাধিক কঠিন সমস্যার আবির্ভাব হইবে।

মুসলমানদের জন্য যদি সম্পূর্ণ আলাদা বরাদ্দ হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের ছাত্রছাত্রীরা বর্ত্তমান সরকারী শিক্ষালয়গুলির সুযোগ গ্রহণ করিবে কি না? যদি না করে, তাহা হইলে সব জেলায় তাহাদের জন্য আলাদা করিয়া যথেষ্টসংখ্যক শিক্ষালয় স্থাপন ও পরিচালন কি সম্ভব হইবে? সম্ভব হইলেও তাহাতে কত বৎসর লাগিবে? ততদিন মুসলমান ছাত্রছাত্রীরা কি ঘরে বসিয়া থাকিবে?

যদি মুসলমানরা চান, যে, তাঁহাদের ছাত্রছাত্রীরা বর্ত্তমান সরকারী শিক্ষালয়গুলিতেও পড়িবেন, এবং তা-ছাড়া তাহাদের জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দে স্বতন্ত্র স্কুল-কলেজও চলিবে, তাহা হইলে তাঁহাদের দাবি কতটা ন্যায়সঙ্গত তাহা ভাবা উচিত।

শিক্ষার স্বতন্ত্র ব্যবস্থার শিক্ষাই যে খারাপ হইবে এবং অন্য অনেক কুফল ফলিবে, তাহা বলিয়া কোন লাভ নাই; কারণ মুসলমানেরা অমুসলমানের মতকে সন্দেহ করিবেন।

কোন সম্প্রদায়ই দুইবার করিয়া ট্যাক্স দেন না, এবং কোন সম্প্রদায়ের লোককেই সরকারী স্কুল-কলেজ সকলের সুবিধা হইতে কখন বঞ্চিত করিয়া রাখা হয় নাই। কোন সম্প্রদায় শিক্ষায় অনগ্রসর হইয়া থাকিলে, তাহা উহার সামাজিক মত ও বিশ্বাসাদি সামাজিক কারণে ঘটিয়াছে।

আমাদের একথা বলিবার উদ্দেশ্য এ নয়, যে, কোন সম্প্রদায় যে-কোন কারণেই হউক শিক্ষায় অনগ্রসর হইয়া পড়িলে তাহাকে বিশেষ সাহায্য দিতে হইবে না। বিশেষ সাহায্য অবশ্যই দিতে হইবে। কিন্তু মুর্শিদাবাদের দাবিটা ত শিক্ষার সাধারণ বরাদ্দের অতিরিক্ত বিশেষ সাহায্য নহে; উহা মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র বরাদ্দের (সেপারেট্ বজেটের) দাবি।

অতিরিক্ত বিশেষ সাহায্য-সম্বন্ধেও আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। শিক্ষায় অনগ্রসর শ্রেণীর লোকদিগকে যখন বিশেষ সাহায্য দিতে হইবে, তখন অনগ্রসরতা-হিসাবেই দেওয়া কর্ত্তব্য, ধর্ম্মসম্প্রদায়-হিসাবে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। বিশেষ সাহায্য পাইবার কারণ যখন অনগ্রসরতা, তখন অনগ্রসর শ্রেণী-মাত্রেরই এই দাবি আছে, এবং যে যত

অনগ্রসর তাহার দাবি তত বেশী। কোন বিশেষ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়-ভুক্ত থাকায় দাবির হ্রাসবৃদ্ধি হইতে পারে না। কারণ, গবর্ণ্‌মেণ্ট্‌টা অসাম্প্রদায়িক ব্যাপার, এবং সকল সম্প্রদায়ের লোকদের জন্যই ট্যাক্সের হার একই।

এক-একটি ধর্ম্মসম্প্রদায়কে একটি-একটিমাত্র শ্রেণী ধরিলে আমরা দেখিতে পাই, চারি বৎসরের অধিকবয়স্ক লোকদের মধ্যে হাজার-করা ৮৪২ জন হিন্দু নিরক্ষর, ৯৪১ জন মুসলমান নিরক্ষর, এবং ৯৯৩ জন ভূতপ্রেত-পূজক আদিমনিবাসী নিরক্ষর। সুতরাং বিশেষ সাহায্য পাইবার দাবি মুসলমানদের চেয়েও ভূতপ্রেত-পূজকদের বেশী।

কিন্তু এক-একটি ধর্ম্মসম্প্রদায়কে একটিমাত্র শ্রেণী গণনা করা অযৌক্তিক; কারণ, একই সম্প্রদায়ের মধ্যে খুব অগ্রসর ও অনগ্রসর জা'ত বা শ্রেণী আছে। হিন্দুসমাজে চারি বৎসরের অধিকবয়স্ক লোকদের মধ্যে হাজারকরা ৬৬২ জন বৈদ্য লিখনপঠনক্ষম, কিন্তু হাজার-করা কেবলমাত্র সাত জন বাউরী লিখনপঠনক্ষম। মুসলমান-সমাজে হাজার করা ২৪৬ জন সৈয়দ লিখনপঠনক্ষম; কিন্তু হাজার-করা কেবলমাত্র ২৭ জন বেহারা লিখনপঠনক্ষম।

বঙ্গের ১৯২১ সালের সেন্সস্ রিপোর্টে নিম্নলিখিত-শ্রেণীর মুসলমানদের হাজার-করা লিখনপঠনক্ষমের সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

শ্রেণী বা জা'ত	হাজারকরা লিখনপঠনক্ষমের সংখ্যা।
বেহারা	২৭
জোলাহা	৫২
কুলু	৩৪
নিকারী	৬২
সৈয়দ্	২৪৬
শেখ্	৫৭

মুসলমান সৈয়দগণ অপেক্ষা নিম্নলিখিত হিন্দু জা'তের লোকেরা শিক্ষায় অনগ্রসর।

জা'ত	হাজারকরা লিখনপঠনক্ষমের সংখ্যা
বাগদী	২৪
বৈষ্ণব	১৪২
বারুই	২২৯
বাউরী	৭
ভুঁইমালী	৫১
ভূঁইয়া	২৪
চামার	৩৫
ধোবা	৮৮
গারো	১৪
গোয়ালা	১১৯
গুরুং (দার্জিলিং ও সিকিম)	১১৪
হাড়ি	২১
জুগী বা যোগী	১৭৬
কৈবর্ত্ত চাষী	১৩৯
কৈবর্ত্ত জালিয়া	৬৮
কলু	১৫২
কামার	২০২
কপালী	১১৫
খাম্বু ও জিমদার (দার্জিলিং ও সিকিম)	১০১
কোচ	৩৮
কুমার	১১৬
লিম্বু (দার্জিলিং ও সিকিম)	৮০
মালো	৪৮
মঙ্গর (দার্জিলিং ও সিকিম)	৯৪
মুচি	২২
নমশূদ্র	৮৫
নাপিত	১৫২
নেওয়ার (দার্জিলিং ও সিকিম)	১২২
পাটনী	৭০
পোদ	১৩৮
রাজবংশী	৬৫
সদ্গোপ	২০০
শূদ্র	১৩৭
শুঁড়ি	১৮৮
সূত্রধর	১২১
তাঁতি	১৬৮
তেলী ও তিলি	২২৫
টিপরা (ত্রিপুরা রাজ্য)	৯১
তিয়র	৫৪

উপরের তালিকায় দৃষ্ট হইবে, যে, মুসলমানদের মধ্যে

যেহারায়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নিরক্ষর; কিন্তু হিন্দুদের মধ্যে বাগদী, বাউরী, ভুইয়া, গারো, হাড়ি ও মুচিরা উহাদের চেয়েও শিক্ষায় পশ্চাৎপদ।

মুসলমানদের মধ্যে সৈয়দদিগকে বাদ দিলে, নিকারী-রাই শিক্ষায় প্রথমস্থানীয় হয়। হিন্দুদের মধ্যে বাগদী, বাউরী, ভুইয়া, গারো, হাড়ি, মুচি, ভুঁইমালী, চামার, কোচ, মালো, এবং তিয়রেরা নিকারীদের চেয়েও শিক্ষায় অনুন্নত।

ইহা হইতে বুঝা যাইবে, শিক্ষায় অনগ্রসর বলিয়া মুসলমানদিগকে বিশেষ সাহায্য দিয়া যদি সেইরূপ সাহায্য ভূতপ্রেত-পূজকদিগকে এবং অনুন্নত হিন্দুজাতিদিগকে দেওয়া না হয়, তাহা হইলে কিরূপ অন্যায় হয়।

মুসলমানরা বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হউন, ইহা আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইচ্ছা করি। কিন্তু আমরা সেই সঙ্গে-সঙ্গে ইহাও চাই, যে, অমুসলমান যে-যে শ্রেণীর লোক মুসলমান-দের সমান বা তাহাদিগের অপেক্ষাও অনগ্রসর-তাঁহারাও উপযুক্ত সরকারী বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হউন। শিক্ষা-বিষয়ে মুসলমানদের বিশেষ সাহায্যের প্রয়োজন তাঁহাদের নেতারা পুনঃপুনঃ গবর্ণ্‌মেণ্টের গোচর করিয়া আপনাদের কর্ত্তব্য পালনই করিতেছেন। দুঃখের বিষয়, আদিম নিবাসীদিগের এবং হিন্দুসমাজভুক্ত অনুন্নত জাতিদিগের শিক্ষার জন্য বিশেষ সাহায্যের প্রয়োজন ঐরূপ অধ্যবসায় ও নির্ব্বন্ধের সহিত গবর্ণ্‌মেণ্ট্‌কে জানাইবার তত লোক নাই।

কে কম আন্দোলন করে, কে বেশী আন্দোলন করে, কাহাদের অসন্তোষ বেশী অসুবিধাজনক বা অনিষ্টকর, কাহাদের আন্দোলন কম অসুবিধাজনক বা অনিষ্টকর, প্রধানতঃ তাহা বিবেচনা করিয়াই গবর্ণ্‌মেণ্টের কাজ করা উচিত নয়। যাহারা এখনও আন্দোলন করিতে শিখে নাই, যাহাদের অসন্তোষ দাঙ্গা-হাঙ্গামায় পরিণত হয় না, যাহাদের সধর্ম্মী স্বাধীন কোন জাতি নাই, যাহাদিগের সুবিধা করিয়া দিলে ভেদনীতি-প্রয়োগের কোন সুযোগ হইবে না, তাহাদিগকেও শিক্ষার পথে অগ্রসর করিয়া দিবার নিমিত্ত গবর্ণ্‌মেণ্টের বিশেষ চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

—

হিন্দুরা ক্ষয়িষ্ণু কিনা?

ফরিদপুরে প্রাদেশিক হিন্দু-সভার অধিবেশনে উহার সভাপতি আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলিয়াছেন :—

প্রায় ২০ বৎসর গত হইল আমার শ্রদ্ধের বন্ধু ডাঃ উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যে-বিপদ্‌বার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, তাহা আজ অক্ষরে-অক্ষরে ফলিয়াছে। নিম্নে যে-তালিকা প্রদত্ত হইল, তাহা দেখিলেই বোধগম্য হইবে, হিন্দুজাতি আজ কি-প্রকারে ধ্বংসের পথে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে।

প্রতি-দশবৎসরে হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি।
(প্রতি-দশহাজারে)

	১৮৮১	১৮৯১	১৯০১	১৯১১	১৯২১
হিন্দু	৪৮৮২	৪৭৬৭	৪৭০০	৪৫২৩	৪৩৭২
মসলমান	৪৯৬৯*	৫০৬৮	৫১১৯	৫২৩৪	৫৩৫৫

বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর সার্ভেণ্ট্‌ অব্‌ ইণ্ডিয়া ও ইণ্ডিয়ান্‌ সোশ্যাল্‌ রিফর্ম্মার্‌ নামক ইংরেজী দুটি সাপ্তাহিক বলিয়া-ছেন, রায় মহাশয়ের উদ্ধৃত এই অঙ্কগুলি দ্বারা প্রমাণ হয় না, যে, হিন্দুরা ধ্বংসের পথে যাইতেছে; ইহাই প্রমাণ হয়, যে, হিন্দুদের চেয়ে মুসলমানরা বেশী দ্রুত বাড়িতেছে। অর্থাৎ তাঁহারা বলিতেছেন, হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের সংখ্যাই বাড়িতেছে; কিন্তু মুসলমানদের বৃদ্ধির হার হিন্দু-দের বৃদ্ধির হার অপেক্ষা বেশী বলিয়া আগে হিন্দুরা বঙ্গের মোট অধিবাসীদিগের মধ্যে প্রতি-দশহাজারে যত জন ছিল, এখন তদপেক্ষা কম, এবং মুসলমানেরা যতজন ছিল, তদপেক্ষা বেশী। তাঁহাদের কথার প্রমাণস্বরূপ তাঁহারা বলেন, গত চল্লিশ বৎসরে বঙ্গে হিন্দুরা শতকরা ১৫·২ বাড়িয়াছে, মুসলমানেরা শতকরা ৩৮·৫ বাড়িয়াছে। †

* জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে ইহা ভ্রমক্রমে ৫৯৬৯ ছাপা হইয়াছিল।

† সার্ভেণ্ট্‌ অব্‌ ইণ্ডিয়া বলেন :—

"These figures show no doubt that the Hindu strength, relatively to Mahomedan, is steadily decreasing. But it does *not* show that the Hindus are dwindling or that their numbers are decreasing absolutely. During the last forty years, despite all natural and social checks to the growth of population in Bengal, the Hindus have increased by 15·2 per cent, while the Mahomedans have increased by 38·5 per cent. It is grossly inaccurate to call a community *dwindling* which is not stationary, but is growing at the rate of 4 per cent. per decennium in one of the most densely peopled parts of the earth."

বোম্বাইয়ের কাগজ-দুটি যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য। কিন্তু আচার্য্য রায় বঙ্গের হিন্দুদিগকে ক্ষয়িষ্ণু প্রমাণ করিবার জন্য যে অঙ্কগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার দ্বারা তাঁহার সিদ্ধান্ত প্রমাণ না হইলেও, তাঁহার আশঙ্কা একেবারে অমূলক নহে। তাহার প্রমাণ দিতেছি।

১৮৮১ হইতে ১৯২১ পর্য্যন্ত ৪০ বৎসরে হিন্দুরা শতকরা ১৫·২ জন বাড়িয়াছে, ইহা সত্য কথা। কিন্তু তাহাদের বৃদ্ধির হার ১৮৯১ সাল হইতে কমিতে-কমিতে এখন হ্রাসে দাঁড়াইয়াছে। কোন্ সাল হইতে কোন্ সাল পর্য্যন্ত তাহারা শতকরা কত বাড়িয়াছিল বা কমিয়াছিল দেখুন।

বঙ্গের হিন্দুর শতকরা হ্রাস-বৃদ্ধি।

বৎসর		শতকরা হ্রাস বা বৃদ্ধি
১৮৮১-১৮৯১	বৃদ্ধি	৫·০
১৮৯১-১৯০১	"	৬·২
১৯০১-১৯১১	"	৩·৯
১৯১১-১৯২১	হ্রাস	০·৭

দেখা যাইতেছে, যে, ১৮৯১ সাল হইতে হিন্দুর বৃদ্ধির হার কমিতে আরম্ভ হয়, এবং ১৯২১এর সেন্সসে তাহা হ্রাসে পরিণত হইয়াছে। হিন্দুরা আগে-আগে বাড়িয়া থাকিলেও, ১৯১১-১৯২১ দশ বৎসরে কমিয়াছে। সুতরাং তাহাদিগকে বর্দ্ধিষ্ণু বলা যায় না। যদি আগামী ১৯৩১ সালের সেন্সসে দেখা যায়, যে, তাহারা আবার বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে আশার কথা হইবে; কিন্তু যদি দেখা যায়, তাহারা আরো কমিয়াছে তাহা হইলে আশঙ্কা বাড়িবে।

কিন্তু আশঙ্কার মানে নিরাশা নহে। ১৯১১ হইতে ১৯২১ এই দশ বৎসরেও পশ্চিম বঙ্গে হিন্দু কমিয়াছে বটে, কিন্তু মধ্যবঙ্গে বাড়িয়াছে; উত্তরবঙ্গে কমিয়াছে বটে, কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে বাড়িয়াছে। পরে ইহার কারণ-নির্দ্দেশ ও এই বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল

ইণ্ডিয়ান্ সোশ্যাল্ রিফর্ম্মার এই বিষয়ে আরও বলেন:—

We are inclined to go somewhat farther and to doubt if the real position of the Bengali Hindu population is represented by the proportion of them to be found in Bengal. Bengali Hindus are largely to be found in Bihar and Orissa, in Assam, in the United Provinces, in the Punjab and in Burma. If their numbers in these provinces are added to the number in Bengal, it may be found that their total numerical strength is not appreciably less than that of Bengali Mahomedans.

তাৎপর্য্য। "আমরা এ-বিষয়ে আরও বেশী দূর যাইতে চাই; বাংলা দেশে বাঙালী হিন্দু যত আছেন, কেবল তাহাদের সংখ্যা গণনা করিয়াই মোট বাঙালী হিন্দুর প্রকৃত স্থান বুঝা যায় কিনা আমাদের সন্দেহ হয়। বিহার-ওড়িশ্যা, আসাম, আগ্রা-অযোধ্যা, পঞ্জাব ও ব্রহ্মদেশে অনেক বাঙালী হিন্দু দেখা যায়। বঙ্গের বাঙালী হিন্দুদের সহিত ইহাদের সংখ্যা যোগ করিলে হয়ত দেখা যাইবে, যে, তাহাদের মোট-সংখ্যা বাঙালী মুসলমানদের মোট-সংখ্যা-অপেক্ষা বিশেষ কম নয়।"

"We have roughly worked out the following estimate of the total of Bengali Hindus in India: The population of Bengal is about 48 millions, made up of over 24 million Mahomedans and nearly 20 million Hindus. 43 millions of them speak the Bengali language. The total number of Bengali speakers in the whole of India is 49 millions. That is to say, 6 million Bengali-speaking persons were enumerated outside Bengal. As the Bengali Mahomedan is not much in evidence outside Bengal, it may be safely assumed that the bulk of the 6 millions are Bengali Hindus. Adding only 5½ millions to the Hindus in Bengal, we get 25½ millions as their total in the country, which is rather more than the total of Bengali Mahomedans."—*The Indian Social Reformer.*

তাৎপর্য্য। "ভারতে মোট বাঙালী হিন্দুর সংখ্যার আমরা মোটামুটি এইরূপ আন্দাজ করিয়াছি:—বঙ্গের লোক সংখ্যা প্রায় ৪৮ নিযুত; তার মধ্যে ২৫ নিযুতের উপর মুসলমান এবং ২০ নিযুতের উপর হিন্দু। বঙ্গে ৪৩ নিযুত লোক বাংলা বলে। সমগ্র ভারতে বাংলা-ভাষীর সংখ্যা ৪৯ নিযুত। অর্থাৎ ৬ নিযুত বাংলা-ভাষী লোক বঙ্গের বাহিরে গণিত হইয়াছিল। যেহেতু বাংলা-ভাষী মুসলমানদিগকে বাংলার বাহিরে বড় বেশী দেখা যায় না, অতএব ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে, যে, বঙ্গের বাহিরের এই ৬ নিযুত বাংলাভাষী লোকের অধিকাংশই হিন্দু। ছয় নিযুতের মধ্যে সাড়ে পাঁচ নিযুত বঙ্গবাসী ২০ নিযুতের সহিত যোগ করিলে, সমগ্র ভারতে সাড়ে পঁচিশ নিযুত বাঙালী হিন্দু পাওয়া যায়; তাহা মোট বাঙালী মুসলমানের সংখ্যা অপেক্ষা বেশী।" ইণ্ডিয়ান্ সোশ্যাল্ রিফর্ম্মার্।

ইণ্ডিয়ান্ সোশ্যাল রিফর্ম্মারের অনুমান ঠিক কি না, তাহা আমরা পরীক্ষা করিতে চেষ্টা করিব

মহাত্মা গান্ধীর বঙ্গ-ভ্রমণ

মহাত্মা গান্ধী ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিয়া রাজনৈতিক আতসবাজী দ্বারা লোককে চমৎকৃত করিতে চেষ্টা করেন নাই; তৎসম্পর্কে কংগ্রেসের কাজের ভার স্বরাজী

দলের উপর অর্পিত হইয়াছে। সাক্ষাৎভাবে গবর্ণমেণ্টের কাজের ও অকাজের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিলে ও বাধাদান-নীতি প্রয়োগ করিলে, সহজেই লোকের চিত্ত আকর্ষণ এবং মনোযোগ প্রায় একচেটিয়া করা যায়। এইসকল কারণে, ভাসাভাসা বিচারে আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে বটে, যে, মহাত্মা গান্ধী আর ভারতের রাজনৈতিক নেতা নাই; কিন্তু বাস্তবিক তিনি এখনও নেতা আছেন।

অবশ্য তিনি সকলের ও সকলদলের নেতা নহেন, কখনও ছিলেন না। রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে তাঁহার প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, এবং তাঁহার মতানুবর্ত্তী লোকদের সংখ্যা অন্য যে-কোন দলের লোকদের সংখ্যার চেয়ে বেশী, ইহাই আমাদের বক্তব্য।

তাঁহার নেতৃত্বের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া আমরা স্বরাজীদলের প্রাপ্য প্রশংসা কমাইতে চাই না। মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড্ শাসনসংস্কার-অনুযায়ী দ্বৈরাজ্য জিনিষটি যে কি, তাহা অন্য অনেকে এবং আমরা গোড়া হইতে বুঝিয়া-ছিলাম। কিন্তু ইহা যে দেশের লোকদের মতানুযায়ী নহে এবং ইহার দ্বারা যে দেশের কাজ ভালো করিয়া চলিতে পারে না, ইহা অংশতঃ স্বরাজীদলের বাধাদাননীতি সুস্পষ্ট করিয়াছে এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট্‌কে স্বাভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত নূতন পথ, কৌশল ও উপায় চিন্তা করিতে বাধ্য করিয়াছে,—এই প্রশংসা স্বরাজীদলের প্রাপ্য।

মহাত্মা গান্ধী যখন ভারতবর্ষের প্রধান রাজনৈতিক নেতা, তখন সকল প্রদেশের অবস্থা তাঁহার স্বচক্ষে দেখিয়া ভালো করিয়া জানা দরকার। ইহা তিনি বুঝেন এবং সেই-জন্য আপনাকে তিনি ইন্‌স্পেক্টর্ জেনারেল্ বা প্রধান পরিদর্শক বলিয়াছেন।

বঙ্গভ্রমণ তাঁহার পরিদর্শনের অঙ্গীভূত। সমস্ত দেশের সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞানবৃদ্ধি হইলে তাঁহার লাভ ত আছেই, অধিকন্তু সেই লাভে সমস্ত দেশেরই উপকার হইবে।

বাঙালীদের লাভ নানাবিধ। গান্ধীজি মানবপ্রেমিক, কিন্তু প্রেমিক বলিয়া তিনি আবশ্যকমত অপ্রিয় সত্য বলিতে কখন বিমুখ হন না। তিনি বঙ্গভ্রমণ করিবার সময় এবং পরে আমাদের যে-সব দোষত্রুটি দেখাইবেন, তাহা শ্রদ্ধার সহিত বিবেচনা করিয়া আমাদের প্রকৃত দোষত্রুটি সংশোধন করিবার সুযোগ হইবে। তিনি যে উপদেশ দিবেন, প্রয়োজন-মত তাহা পালন করিবার সুযোগও আমাদের হইবে। আমাদের প্রশংসা তিনি যাহা করিবেন, আমরা তাহার যতটুকুর যোগ্য তাহার দ্বারা আমাদের উৎসাহ বাড়া উচিত, তজ্জন্য অহঙ্কৃত হইলে ক্ষতিগ্রস্ত আমরাই হইব।

গান্ধীজির বঙ্গভ্রমণ হইতে আমাদের সকলের চেয়ে বেশী লাভ ইহাই হইতেছে, যে, আমরা অনেকে এমন একজন লোকের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিতেছি, যিনি দেশহিতসাধনকে জীবনের একমাত্র কাজ করিয়াছেন এবং তাহার জন্য সর্ব্ব-প্রকার ত্যাগ-স্বীকার ও দুঃখভোগ করিতে প্রস্তুত হইয়া-ছেন। ইঁহার সংস্পর্শে আসিয়া যে-পরিমাণে যাঁহার পরার্থপরতা জাগিয়া উঠিবে, সেই পরিমাণে তিনি লাভবান্ হইবেন, দেশ উপকৃত হইবে।

—

অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ

গান্ধী মহাশয়ের নির্দ্দিষ্ট প্রধান কাজগুলির মধ্যে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ একটি। অস্পৃশ্যতা দক্ষিণ ভারতে যে আকার ধারণ করিয়াছে, বঙ্গে তাহার সে রূপ নাই। কিন্তু যাহা আছে, তাহাও অনিষ্টকর ও অবাঞ্ছনীয়। বস্তুতঃ, কতকগুলি লোক বিশেষ একটা জা'তের বলিয়া শুচি ও উৎকৃষ্ট এবং অন্য কতকগুলি লোক বিশেষ আর একটা জা'তের বলিয়া অশুচি ও অধম, এই ধারণাই ভ্রান্ত ও অনিষ্টকর। জাত্যভিমান মনের মধ্যে পোষণ করিয়া একজন মেথরকে হাত দিয়া ছুঁইলে বা তাহার দেওয়া জল খাইলেই অস্পৃশ্যতার মূলোচ্ছেদ হইল মনে করিবার কোন কারণ নাই।

আমরা যে-প্রকার জাত্যভিমানের কথা বলিতেছি, তাহা যে কেবল হিন্দুসমাজের ঐক্য-সাধনের এবং ভারতীয়-দের স্বরাজ-লাভের অন্তরায়, তাহা নহে, তাহা মনুষ্যত্ব এবং আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ-লাভের পথেও অন্যতম প্রধান বিঘ্ন।

অনেকে অনেকবার বলিয়াছেন, হিন্দুসমাজে অস্পৃশ্যতা থাকায় "নিম্ন" শ্রেণীর অনেক হিন্দু খৃষ্টিয়ান্ বা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করে। অল্পসংখ্যক লোক যে তাহা করে

বিশেষতঃ খৃষ্টীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহাও করিবার যে বস্তুতঃ প্রয়োজন না হইতে পারে, তাহা আমরা জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে দেখাইয়াছি।

সামাজিক কারণে কোনও হিন্দুরই ধর্মান্তর গ্রহণ যাঁহারা ইচ্ছা করেন না, তাঁহারা কেবল গান্ধীজির নির্দ্দিষ্ট প্রকারে বা পরিমাণে অস্পৃশ্যতা পরিহার করিলেই সিদ্ধকাম হইবেন না। মুসলমান ও খৃষ্টিয়ানদের নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃভাব ও সামাজিক সাম্য যতটা আছে, হিন্দুদের মধ্যে অন্ততঃ ততটা ভ্রাতৃভাব ও সামাজিক সাম্য স্থাপন করিতে হইবে; তাহার কমে হিন্দুসমাজের সংরক্ষক ও ঐক্যকামীদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। ঐ উদ্দেশ্যে আর-একটি কাজও হিন্দুদিগকে করিতে হইবে। প্রত্যেক খৃষ্টিয়ান স্বয়ং সাক্ষাৎভাবে খৃষ্টিয়ানদিগের যিনি পূজ্য তাঁহার আরাধনা ও তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে অধিকারী। প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষেও ইহা সত্য। ইহা অতি উচ্চ অধিকার। অবশ্য শুধু এই অধিকার নামে থাকিলেই বিশেষ-কিছু লাভ নাই; কিন্তু বাস্তবিক যাঁহারা প্রাত্যহিক জীবনে পূজ্যের সম্মুখীন হইয়া কার্য্যতঃ এই অধিকার ভোগ করেন, তাঁহারা উন্নত, পবিত্র ও আন্তরিক শক্তিশালী হন। প্রত্যেক হিন্দু যাহাতে কার্য্যতঃ এই অধিকার পান, হিন্দু-সমাজের সংরক্ষক ও ঐক্য বিধায়কদিগকে তাহা করিতে হইবে।

সামাজিক অস্পৃশ্যতার মত থাকিবে এক-রকম ধর্ম্ম-বিষয়ক অস্পৃশ্যতাও আছে। অস্পৃশ্যজাতির লোক যেমন ব্রাহ্মণাদি "উচ্চ" জাতির লোকদিগকে ছুঁইতে পারে না, ব্রাহ্মণাদিও অস্পৃশ্যকে ছুঁইতে পারে না, উভয়-প্রকার স্পর্শেই ব্রাহ্মণাদি অশুদ্ধ হয়, তেমনই অর্চ্চনীয় যিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎসম্পর্ক-স্থাপনের বা সংস্পর্শের অধিকারও সকল হিন্দুর নাই; যেন সর্ব্বভূতে বিরাজমান যিনি এবং সর্ব্বভূত যাঁহাতে লব্ধাশ্রয়, তিনি কাহারও সংস্পর্শে অশুচি হইতে পারেন! ভগবানের পূজার্চ্চনায় সকল হিন্দুর সম্পূর্ণ সমান অধিকার স্থাপন করিতে হইবে।

—

হিন্দু-সংগঠন

হিন্দুদের ঐক্য-বিধান যারা তাহাদিগকে সাহসী ও ও শক্তিশালী করিবার নিমিত্ত তাহাদের মধ্যে দল বাঁধিবার চেষ্টা প্রধানতঃ পঞ্জাবে ও আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে হইতেছে। ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে "হিন্দু-সংগঠন।" এই চেষ্টা যাঁহারা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করিতেছি, যে, একের উপাসকদিগের পক্ষে দলবদ্ধ হওয়া যত সহজ, বহুর উপাসকদিগের পক্ষে দলবদ্ধ হওয়া তত সহজ নহে। হিন্দু শব্দটি ব্যাপকভাবে বুঝিলে আর্য্য-সমাজীরা হিন্দু-সমাজের অন্তর্গত। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে আর্য্য-সমাজীরা সর্ব্বাপেক্ষা উদ্যোগী ও কর্ম্মিষ্ঠ। একের উপাসনা যে ইহার অন্যতম কারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ঐক্য, একতা, একাগ্রতা, একনিষ্ঠতা, একপ্রাণতা, এইসকলের প্রশংসা সকলেই করেন। এক যাহার মূলে তাহার প্রশংসা যাঁহারা করেন, একের আরাধনার একান্ত প্রয়োজন উপলব্ধি করা তাঁহাদের পক্ষে কঠিন হইবে না।

—

চরখা ও হিন্দু-মুসলমানের একতা।

চরখা-সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধীর মত সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে না পারিলেও আমরা উহার উপকারিতা ও উপযোগিতার কথা অনেকবার লিখিয়াছি।

৪ঠা জুনের ইয়ং ইণ্ডিয়া কাগজে গান্ধীজি লিখিয়াছেন, উত্তরবঙ্গে বন্যাপ্লাবিত স্থানসমূহে বিপন্ন লোকদের সাহায্যদানে চরখা কিরূপ কাজে লাগিয়াছে। তিনি কয়েকটি স্থান দেখিয়া ও সব বৃত্তান্ত শুনিয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

বর্ত্তমানে ১০টি সূতা কাটিবার কেন্দ্র ও তিনটি কাপড় বুনিবার কেন্দ্রে খদ্দরের কাজ হইতেছে। কর্ম্মীরা ১৯৯টি গ্রামের সেবা করিতেছেন এবং ২৯৮৭ জন কাটুনীকে ঐ-সংখ্যক চরখা দেওয়া হইয়াছে। অধিকাংশ কাটুনী মুসলমান, কারণ ঐ অঞ্চলে হিন্দুর সংখ্যা খুব কম। শতকরা পাঁচজন কাটুনীও হিন্দু নহে। তিনটি বয়ন-কেন্দ্রে ২০০ তন্তুবায়ের মধ্যে কেবল ১২ জন হিন্দু। ১০৪

জন খাঁটি খদ্দর বুনে। তাহাদের বার্ষিক আয় ১১০ হইতে ১৫০ টাকা। কাটুনীদের মধ্যে কয়জান বিবি সকলের চেয়ে বেশী (মাসিক ৭৸/৫) এবং তন্তুবায়দের মধ্যে ওসমৎ সকলের চেয়ে বেশী (মাসিক ৩১৲ টাকা) রোজগার করিয়াছে।

৬২ জন কর্ম্মীর মধ্যে ওসমান্ কাজী ও মিঞাজান পরামাণিক সকলের চেয়ে ভালো কাটুনী। প্রথম ব্যক্তি ২০ নং সুতা ঘণ্টায় ৮২০ গজ এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি ২০নং সুতা ঘণ্টায় ৭৯০ গজ কাটিতে পারে।

বন্যা-পীড়িত লোকদিগকে সাহায্য দিবার এই প্রতিষ্ঠানের নেতারা হিন্দু এবং অধিকাংশ কর্ম্মী হিন্দু, কিন্তু যাহাদের সাহায্যের জন্য কাজ করা হইতেছে তাহাদের অধিকাংশ মুসলমান। উপকৃত ব্যক্তিদের মধ্যে খুব বেশী-সংখ্যক লোক মুসলমান। মুসলমান কর্ম্মীদিগকে কখনও অনুভব করিতে হয় না, যে, তাহাদের কাজ হিন্দু কর্ম্মীদের চেয়ে কম মূল্যবান্। বস্তুতঃ দক্ষতা ও কর্ম্মিষ্ঠতা দ্বারা মুসলমানদের মধ্যে দুইজন কাটুনীদের মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। এইপ্রকারে বন্যাপীড়িত লোকদিগকে সাহায্য দিবার এই কার্য্য দ্বারা হিন্দু-মুসলমানের মিলন সাধিত হইতেছে।

—

কাপাসের চাষ, চর্‌খা ও খদ্দর

প্রত্যেক পরিবার যদি কাপাসের চাষ করিয়া তাহা হইতে প্রাপ্ত তুলা হইতে সুতা কাটিয়া নিজেদের কাপড় বুনিত, তাহা হইলে কাপড়ের জন্য নগদ ব্যয় সামান্যই হইত। কিন্তু এইরূপ সব কাজ প্রত্যেক পরিবারের পক্ষে করা সম্ভব নহে। প্রত্যেকে সুতা কাটিয়া তাহা হইতে বানী দিয়া কাপড় বুনাইলেও কাপড় কতকটা সস্তা হয়। কিন্তু আজকাল তুলার দাম যেরূপ বেশী হইয়াছে, তাহাতে তুলা কিনিয়া নিজে সুতা কাটিলেও খরচ বড় কম পড়ে না। যাহারা প্রথম সুতা কাটিতে আরম্ভ করে, তাহাদের ত প্রথম-প্রথম অনেক সুতা ছিঁড়িয়া নষ্ট হওয়ায় লোক্‌সান ও খরচ অনেক হয়। এইজন্য যাহাদের সামান্য জমিও আছে, তাহাদের পক্ষে কাপাসের চাষ করা বিধেয়। কাপাস চাষ করিবার বীজ নানাস্থান হইতে পাওয়া যায়, উপদেশও খাদি-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি দিয়া থাকেন।

বিশ্বভারতীর কৃষিবিভাগের মুখপত্র "ভূমিলক্ষ্মী"র আষাঢ় সংখ্যায় অন্যান্য অনেক ভালো লেখার মধ্যে কাপাসের চাষ-সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞের লেখা দুটি ভালো প্রবন্ধ আছে। তাহা হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে। সাপ্তাহিক ও দৈনিক সংবাদপত্রসমূহে এই দুটি প্রবন্ধ উদ্ধৃত হইলে ভালো হয়।

—

কুমিল্লা অভয়-আশ্রম

কুমিল্লা অভয়-আশ্রমের দ্বিতীয় বার্ষিক কার্য্যবিবরণী পাঠ করিয়া এই ধারণা হইল, যে, ইহার দ্বারা অনেক ভালো কাজ হইতেছে। ইহার কোন-কোন অংশ আমরা উদ্ধৃত করিতেছি।

আমাদের আশ্রমে প্রত্যেক সেবককে নিম্নলিখিত ৭টি প্রতিজ্ঞা পালনে যত্নবান্ হইতে হয়।

১। অভয় প্রতিজ্ঞা [Vow of Fearlessness]—(ভগবান্ ব্যতীত অন্য কাহাকেও ভয় না-করা। এই অভয় শব্দ হইতেই আশ্রমের নাম "অভয় আশ্রম")।

২। সত্য প্রতিজ্ঞা [Vow of Truth]—(সত্যই ধর্ম্ম। সত্য স্থাপনের প্রাণপণ চেষ্টা ও অসত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা—ইহাই সত্যাগ্রহ)।

৩। অস্তেয় প্রতিজ্ঞা [Vow of Non-Stealing[—(অস্তেয় অর্থ, নিজের প্রয়োজনাতিরিক্ত জিনিষ ব্যবহার না করা। গীতার অপরিগ্রহ শব্দের অর্থে এই শব্দ ব্যবহৃত)।

৪। সংশুদ্ধি প্রতিজ্ঞা [Vow of Purity]—(নিজের মনকে রিপুনিচয়, কুসংস্কার ও অজ্ঞানতা হইতে মুক্ত করা)।

৫। বীর্য্য প্রতিজ্ঞা [Vow of Activity]—(নিজের মুক্তি ও দেশের মঙ্গলের নিমিত্ত প্রাণপণ কার্য্য করা)

৬। মৈত্রী প্রতিজ্ঞা [Vow of Love]—(ভগবান্‌ই বিশ্বব্যাপী সকল মানবের একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা, পিতা; এবং মানবমাত্রকেই ভগবানের সন্তানজ্ঞানে সমজ্ঞান করিয়া তাহাদিগকে প্রেমের সহিত সেবা করা)।

৭। স্বদেশী প্রতিজ্ঞা [Vow of Swadeshi]—(দেশের সঙ্গে মনে-প্রাণে এক হইয়া যাওয়াই দেশাত্মবোধ)।

আশ্রমে ২০ জন সেবক আছে। তন্মধ্যে ৮ জন চিকিৎসা-বিভাগে, ৯জন খদ্দর-বিভাগে এবং তিন জন শিক্ষা ও কৃষি-বিভাগে। অন্যান্য বিভাগের সেবকগণকেও শিক্ষাবিভাগে কিছু-সময়ের জন্য কাজ করিতে হয়। কাজের পরিমাণানুযায়ী আশ্রমে সেবক-সংখ্যার অভাব। সমস্ত বিভাগকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিতে আরও অন্ততঃ ১০ জন সেবকের প্রয়োজন। বর্ত্তমানে প্রত্যেক সেবককে ১০।১১ ঘণ্টা করিয়া কাজ করিতে হয়। এইভাবে বেশী দিন চলিবে না।

আশ্রমের দৈনন্দিন কার্য্য—প্রাতে ৫টা হইতে ৬টা প্রার্থনা ও সুতাকাটা, এই সুতাকাটা সেবকমাত্রেরই বাধ্যতামূলক। ৭টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট নিজ-নিজ বিভাগীয় কার্য্য। ১২টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত অধ্যাপনার কার্য্য। ৫টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত খেলা, সন্ধ্যায় ৭টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত প্রার্থনা, পাঠ ও আলোচনা। আহার সমাপনান্তে নিজ-নিজ লেখাপড়া, ইত্যাদি।

আশ্রমে কোনো বিষয়েই জাতিভেদ মানা হয় না। ঠাকুর-চাকর নাই। নিজেদের যাবতীয় কার্য্য নিজেদেরেই করিতে হয়। সেবকদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ৫ জন, কায়স্থ ১০ জন, তাঁতি ২ জন, তিলি ১ জন, সাহা একজন ও নমঃশূদ্র ১ জন। খদ্দর-বিভাগের প্রত্যেক কর্ম্মীকেই তাঁত বোনা, রং করা এবং হিসাব-রাখা-সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানলাভ করিতে হয়।

আশ্রমে বর্ত্তমানে কার্য্যের সুবিধার জন্য ৫টি বিভাগ আছে। ১। চিকিৎসা বিভাগ। ২। চর্‌কা ও খদ্দর বিভাগ। ৩। শিক্ষা বিভাগ। ৪। গ্রন্থাগার ও পাঠ-ভবন। ৫। গোপালন, ইত্যাদি।

চিকিৎসা-বিভাগে আউট্‌ডোর ডিস্পেন্সারিতে ৪১৭৫ জন রোগী ১৪,৬৫৯ বার উপস্থিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে হিন্দু পুরুষ ১৪৫০, মুসলমান পুরুষ ২০৩২, হিন্দু স্ত্রীলোক ৩২৮, মুসলমান স্ত্রীলোক ৩৬৪।

উপস্থিত রোগীদিগের শতকরা প্রায় ৭৫ জন লোকের নিকট ঔষধের মূল্য লওয়া হয় না। বাকী শতকরা ২৫ জন লোক হইতে তাহাদের শক্তি-সামর্থ্যানুযায়ী যে মূল্য লওয়া হয়, তাহাতে আউট্‌ডোর ডিস্পেন্সারির সর্ব্ববিধ খরচ নির্ব্বাহিত হয়। গত বৎসর এইভাবে প্রায় ৪৫৩২৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। আমাদের উদ্দেশ্য বিশেষভাবে নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের মধ্যেই আমাদের আদর্শ প্রচার করা। এই বিষয়ে এই ডিস্পেন্সারি আমাদিগকে বিশেষ সাহায্য করিতেছে। ডিস্পেন্সারির মুদ্রিত লিপিতে একপৃষ্ঠায় রোগীর নামধাম ও রোগের কথা এবং অপর পৃষ্ঠায় আমাদের আশ্রমের প্রধান উদ্দেশ্য—স্বরাজ, হিন্দু-মুসলমান মিলন, অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন এবং খদ্দর-সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে লিখিত আছে। উপস্থিত রোগীদিগকে রোগ-সম্বন্ধে উপদেশ দানের সঙ্গে-সঙ্গে উক্ত বিষয়সমূহেও বিশেষভাবে উপদেশ প্রদান করা হয়। সুতরাং ডিস্‌পেন্সারি ক্রমশঃই একটি প্রচার-ক্ষেত্রে পরিণত হইতেছে। উপস্থিত রোগীগণ যাহাতে বিলাতী ও মিলের কাপড়ের পরিবর্ত্তে বিশুদ্ধ খদ্দর ব্যবহার করে, তদ্বিষয়ে তাহাদের মনোযোগ সর্ব্বদা আকর্ষণ করা হয়।

ত্যাগের ভাবে অনুপ্রাণিত না হইলে কোনো ডাক্তারই বড়-বড় সহর ছাড়িয়া দরিদ্রবহুল পল্লীগ্রামে যাইবেন না। ত্যাগী চিকিৎসক ব্যতীত এই দরিদ্র দেশের অন্নবস্ত্রহীন রোগীর চিকিৎসা-কার্য্যও কখনও সুসম্পন্ন হইবে না। সমপ্রাণতা ও দেশাত্মবোধপরায়ণ চিকিৎসকেরাই কেবল এই অন্ন, নিরন্ন দেশবাসীর দুঃখদারিদ্র্যের ব্যথা অনুভব করিয়া তাহাদিগকে প্রাণ দিয়া সেবা করিতে সমর্থ।

এতদুদ্দেশ্যে আমরা একটি মেডিকেল স্কুল স্থাপন করিয়া জাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত একদল ত্যাগী ডাক্তার দেশসেবক গঠন করিতে চাই। এই কার্য্যের জন্য আরও ২৫,০০০ হাজার টাকা পাইলে পারিলেই আমাদের আশা সাফল্যযুক্ত হইতে পারে।

বঙ্গদেশে, শুধু বঙ্গদেশেই বা কেন, সমস্ত ভারতবর্ষেই কোন জাতীয় মেডিকেল মিশন আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। বিদেশী ৩৫০ জন ডাক্তার ভারতের নানা স্থানে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত অনেক মেডিকেল মিশন্ চালাইতেছেন এবং এইসকল মিশনকে তাহাদের দেশের লোকেরা প্রচুর-পরিমাণে ঔষধ, যন্ত্র ও পুস্তকাদিদ্বারা সদাসর্ব্বদা সাহায্য করেন। আমরাও আমাদের দেশের ঔষধ ও ডাক্তারি যন্ত্র-ব্যবসায়ীদের এই বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

আশ্রমের চতুর্দ্দিকস্থ গ্রামসমূহে যাহাতে প্রত্যেক পরিবারে সুতাকাটা প্রচলিত হয় এবং উৎপন্ন সুতাদ্বারা যাহাতে প্রত্যেক পরিবার নিজ-নিজ ব্যবহার্য্য কাপড় বুনাইয়া লয়, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা আরম্ভ করা হইয়াছে। ইহাদের নিকট হইতে কাপড় বুনিবার মজুরী হাতপ্রতি এক পয়সা কম লওয়া হয়। এইসব গ্রামের প্রত্যেক স্ত্রীলোকই সূতা কাটিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু অর্থাভাবে তাঁহারা চর্‌কা ক্রয় করিতে পারেন না, আমরাও দান করিতে পারি না। স্বদেশপ্রেমিক মহোদয়গণ যদি এই বিষয়ে আমাদিগকে কিছু অর্থসাহায্য করেন, তবে এই শুভ কার্য্য সাধিত হইতে পারে। কিস্তিবন্দি হিসাবে আমরা কাটুনীদের নিকট হইতে চর্‌কার মূল্য বাবৎ কিছু টাকা আদায় করিয়া ফেরৎও দিতে পারিব। আপাততঃ তিনটি গ্রাম লইয়া আমরা কাজ আরম্ভ করিয়াছি।

গত বৎসর কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইবার সময়ে আমাদের শিক্ষায়তনে মোট ২০টি ছাত্র ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে শিক্ষায়তনে ছাত্র-সংখ্যা দেড় শতের অধিক। তন্মধ্যে ১২০ জন আশ্রম-বিদ্যালয়ে। মেথর পাড়ার বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ২২ জন এবং আশ্রমস্থিত নৈশ-বিদ্যালয়ে ১০ জন।

আশ্রম-বিদ্যালয়ে ১২০ জনের মধ্যে মুসলমান কৃষক ৭২ জন, তাঁতি ১৩, ধোপা ১, নাপিত ২, নমঃশূদ্র ২২, বৈরাগী ২, ব্রাহ্মণ ৭, সূত্রধর ১ জন। মেথর বিদ্যালয়ে মেথর ১৪ জন, বেশ্যার ছেলেমেয়ে ৪ জন ও মুসলমান ৪ জন। নৈশ বিদ্যালয়ে মুসলমান মজুর ৯ ও হিন্দু ১।

শিক্ষায়তন অবৈতনিক।

আশ্রম বিদ্যালয় প্রতিদিন ১২টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে। সকালে এবং সন্ধ্যায় প্রত্যেক ছাত্রই নিজ-নিজ পরিবারের কাজে বাপ-মাকে সাহায্য করে। ইহার মধ্য দিয়া ভবিষ্যতে তাহারা যাহাতে পৈতৃক ব্যবসায়ে অনুরাগী হইয়া উঠে, তদ্বিষয়ে শিক্ষকগণ বিশেষ দৃষ্টি রাখেন।

এই বিদ্যালয়ে এক দিকে কঠোর অনুশাসন, অপর দিকে খেলা-ধূলা, গান-বাজনার আতিশয্য দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। এখানে প্রভুত্ব এবং দাসত্বের সম্পর্ক নাই। ছাত্রবৃন্দ সমস্ত অনুশাসন নিজেরাই গঠন করে ও তাহাদের জীবনের উন্নতির অনুকূলবোধে আনন্দ-সহকারে মানিয়া চলে।

বিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর ছাত্রগণ নিম্নতম শ্রেণীতে অধ্যাপনার কার্য্যও সুরু করিয়াছে। ইহাই তাহাদের প্রীতি ও সদ্ভাবের প্রকৃষ্ট পরিচয়। একদিকে খেলাধূলা, লেখাপড়া, গানবাজনা; অপরদিকে কঠোর গৃহকর্ম্মাদি, চর্‌কা কাটা, প্রকৃতির ঝড়-বাদল রৌদ্রবৃষ্টির মধ্যে মাঠে-মাঠে বেলা কাটানো—এইসমস্ত কার্য্যকরী ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দ্বারা ছাত্রদের জীবন সকল দিক্ দিয়া গড়িয়া উঠে।

এই বিদ্যালয়ে কোনও সাম্প্রদায়িকতা নাই। ভগবানের সৃষ্ট মানুষের মধ্যে এক ভ্রাতৃভাব স্থাপন করাই এই বিদ্যালয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য।

মেথর বিদ্যালয়—এই বিদ্যালয় আমরা তিন মাস হইল আরম্ভ করিয়াছি। এই বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার ফলে মেথর ছাত্রদের মধ্যে একটু ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে। তাহারা অনেকে মদ খাওয়া বন্ধ করিয়াছে এবং অন্যান্য সকলে মদ ত্যাগ করিবার চেষ্টা করিতেছে। মেথর ছাত্রেরা শিক্ষকদের সঙ্গে প্রায়ই আশ্রমে বেড়াইতে আসে, এবং সঙ্গে-সঙ্গে আশ্রমের ভাবও যে কিছু না লইয়া যায়, এমন নহে। কিছুদিন পূর্ব্বে একদিন মেথর ছাত্রদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আশ্রম-সেবকবৃন্দ এক পংক্তিতে ভোজন করিয়াছে। ইহার ফলে হৃদয়ের যে আদান-প্রদান হইতেছে, তাহাতে অচিরে এই পতিত সর্ব্বদা-ঘৃণ্য মদ্যপানাসক্ত মেথর-জাতি ও যে একদিন মানুষের ন্যায় সজোরে সগর্ব্বে নিজেদের দাবি

লইয়া বিশ্বের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিবে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আমরা চাই প্রত্যেকে আপন-আপন ব্যবসা বজায় রাখিয়া মানুষের মত চলিতে শিখুক। আমরা কোনো কাজই ছোটো মনে করি না, বা জন্মগত জাতিভেদও মানি না।

অভয় আশ্রম হিন্দুদের দ্বারা পরিচালিত হইলেও যাঁহারা ইহার দ্বারা উপকৃত হন, তাঁহাদের অধিকাংশ মুসলমান।

—

আব্‌কারীর আয়

বিলাতে পার্লেমেন্টে এক প্রশ্নের উত্তরে ভারতবর্ষে আব্‌কারী আয়-সম্বন্ধে সরকারী ভারতসচিব উইণ্টার্‌টন্ যাহা বলেন তাহা হইতে জানা যায়, ঐ আয়,

১৯২১-২২ সালে ১৭,০৩,৪০,৬৪০ টাকা,
১৯২২-২৩ " ১৮,৪২,৩০,০১৪ টাকা,
১৯২৩-২৪ " ১৯,২০,৪৭,০৯২ টাকা,

হইয়াছিল। ইহা খরচ-খরচা বাদ সরকারী আয়। যাহারা নেশা করে, তাহারা অবশ্য কুড়ি কোটির চেয়ে অনেকগুণ বেশী টাকা মদ প্রভৃতি মাদক জিনিষ কিনিয়া আপনাদের ও দেশের অনিষ্ট করিয়াছিল। প্রজাদের অধোগতি যাহাতে হয়, তাহাই জোগাইয়া রাজস্ব-বর্দ্ধন কখনই গবর্ণ্‌মেণ্টের উচিত নহে। এবং ইহাও দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিবার বিষয়, যে, আব্‌কারী রাজস্ব ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে।

আব্‌কারী রাজস্ব কোন্ প্রদেশের ১৯২৩-২৪ সালের মোট রাজস্বের শতকরা কত অংশ, তাহা নীচের তালিকায় প্রদর্শিত হইল।

প্রদেশ।	লোকসংখ্যা।	মোট রাজস্ব।	আব্‌কারী রাজস্ব।	শতকরা কত অংশ।
মাদ্রাজ	৪২৩১৮৯৮৫	১২৯৯·৪ লক্ষ	৫১৭·৬ লক্ষ	৩৯·৮
বোম্বাই	১৯৩৪৮২১৯	১৪৫২·৮ "	৪১৭·৪ লক্ষ	২৮·৭
বাংলা	৪৬৬৯৫৫৩৬	১০১৩·২ "	২০৮·৮ লক্ষ	২০·৬
আগ্রা-অযোধ্যা	৪৫৩৭৫৭৮৭	১০৩১·১ "	১৩০·৮ "	১২·৭
পঞ্জাব	২০৬৮৫০২৪	৯১৫·৮ "	১০৪·১ "	১১·৪
ব্রহ্মদেশ	১৩২১২১৯২	৮৫৮·২ "	১১৯·৪ "	১৩·৯
বিহার-ওড়িশা	৩৪০০২১৮৯	৫২৮·৩ "	১৮৩·৩ "	৩৪·৭
মধ্যপ্রদেশ-বেরার	১৩৯১২৭৬০	৫১৭·১ "	১৩০·৭ "	২৫·৩
আসাম	৭৬০৬২৩০	২১০·৯ "	৬০·৫ "	২৮·৭

মাদ্রাজের লোক-সংখ্যা বাংলার চেয়ে কম, অথচ উহার আব্‌কারী আয় বঙ্গের প্রায় আড়াই গুণ। বোম্বাইয়ের লোক-সংখ্যা বাংলার অর্দ্ধেকেরও কম, অথচ উহার আব্‌কারী আয় বাংলার দ্বিগুণ। লোক-সংখ্যার অনুপাতে বাংলার আব্‌কারী আয়ও আগ্রা-অযোধ্যা এবং পঞ্জাব অপেক্ষা বেশী।

পঞ্জাবের মোট রাজস্বের শতকরা ১১।৵০ আব্‌কারী হইতে প্রাপ্ত। ইহা সকল প্রদেশের মধ্যে কম হইলেও শোচনীয় অবস্থার পরিচায়ক। মাদ্রাজের অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর। তথায় মোট-রাজস্বের শতকরা ৩৯৸৵০ নেশার জিনিষ হইতে প্রাপ্ত। বিহার-ওড়িশার অবস্থাও খুব খারাপ। তাহার পর আসাম, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ-বেরার অধঃপতিত। ইহার পর বাংলা, ব্রহ্মদেশ, আগ্রা-অযোধ্যা ও পঞ্জাব হীনদশাপ্রাপ্ত।

বাংলার লোক-সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, কিন্তু মোট রাজস্বে প্রদেশগুলির মধ্যে উহা চতুর্থ স্থানীয়। এইজন্য বাংলা গবর্ণ্‌মেণ্টের এত টাকার টানাটানি।

—

মেদিনীপুরের ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রিপোর্ট

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ শাসমল মেদিনীপুর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সভাপতি-রূপে উহার ১৯২৩-২৪ সালের রিপোর্টের উপর যে-সব মন্তব্য লিপিবদ্ধ ও মুদ্রিত করিয়াছিলেন, তাহা হইতে মফঃস্বলে অনেক জায়গায় কাজকর্ম্ম কিরূপ-ভাবে চলে এবং কোন-কোন স্থলে এইসব স্থানিক স্বায়ত্তশাসনের প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি ম্যাজিষ্ট্রেটদের মনের ভাব কিরূপ, তাহা বেশ বুঝা যায়। শাসমল-মহাশয় প্রাথমিক বিদ্যালয়-সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পড়িলে বড় ক্লেশ হয়। পাঠশালা বহুকাল উঠিয়া গিয়াছে কিম্বা মোটেই নিয়মিত খোলা হয় না ও তথায় শিক্ষা দেওয়া হয় না, অথচ জেলা-বোর্ডের সাহায্য নিয়মিত আদায় হইতেছে; হয়ত এক বৎসর বা ছয় মাস কেহ পাঠশালা ইন্‌স্পেক্ট্ করেন নাই, কিম্বা পরিদর্শক কর্ম্মচারী ঘরে বসিয়াই পাঠশালার ভিজিটর্‌স্ বুক্ বা দর্শকের মন্তব্য-বহি আনাইয়া তাহাতে পরিদর্শন রিপোর্ট্ লিখিতেছেন; কোন ছাত্র হয়ত পাঠশালায় পড়ে না, গ্রামই ত্যাগ করিয়াছে, অথচ পাঠশালার হাজরী-বহিতে তাহার নাম লিখিত আছে ও তাহাকে উপস্থিত চিহ্নিত করা হইতেছে;—ইত্যাদি প্রবঞ্চনার কথা শিক্ষা-বিভাগ-সম্বন্ধেও পাঠ করিয়া বড় বেদনা পাইতে হয়। আমরা ছেলেবেলা শুনিতাম, শিক্ষা বিভাগের চাকরী রোজগারের পক্ষে ভাল না হইলেও, বড় নির্দ্দোষ; ঘুষ, "উপরি-পাওনা," ইত্যাদি নাই। ইহা যে সকল স্থলে সত্য নহে, তাহা পরে জানিয়াছি।

—

ছোটনাগপুরে শিক্ষা

ছোটনাগপুর প্রদেশটি বিহার ও ওড়িশার সামিল করিয়া উহার নামটি পর্য্যন্ত উক্ত সংযুক্তপ্রদেশ-দুটির নামের সঙ্গে ব্যবহার করা হয় না। নামটি না হয় অবহেলিত হইল; কিন্তু কার্য্যতঃ উহার যাহা প্রয়োজন,

তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তৃপক্ষের উচিত। ছোটনাগপুরে মোটে একটি কলেজ আছে; তাহা মিশনারীরা হাজারী-বাগে চালাইতেছেন। আর-একটি কলেজ রাঁচিতে খুলিবার আয়োজন করা হয়; কিন্তু পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট তাহা নামঞ্জুর করিয়াছেন। হইতে পারে, যে, যেরূপ হইলে সেনেট্ কলেজ খোলা মঞ্জুর করেন, উহা সেরূপ নহে। তাহা হইলে, সেনেটের বলা উচিত, কিরূপ হইলে উহাকে বিশ্ববিদ্যালয় নিজের অনুমোদিত কলেজ বলিয়া গ্রাহ্য করিবেন। কারণ, উচ্চশিক্ষার উন্নতি ও বিস্তার করা যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তব্য এবং ছোটনাগপুরে যে একাধিক কলেজ থাকা উচিত, ইহা প্রমাণ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। ছোটনাগপুর ছাত্র-সভা বিহারের গবর্ণরকে এই অনুরোধ করিয়াছেন, যে, তিনি যেন সেনেট্‌কে এই বিষয়ে পুনর্বিবেচনা করিতে বলেন।

ঐ সভা গবর্ণ্‌মেণ্ট্‌কে ছোটনাগপুরের প্রধান শহর রাঁচীতে একটি মেডিক্যাল স্কুল খুলিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। এই অনুরোধ খুবই ন্যায়সঙ্গত। ছোট-নাগপুরে ইহার আবশ্যক আছে। পাটনায় একটি মেডিক্যাল কলেজ আছে, কটকে একটি মেডিক্যাল স্কুল আছে, দারভাঙ্গায় একটি নূতন মেডিক্যাল স্কুল খোলা হইবে; ছোটনাগপুরেও নিশ্চয়ই চিকিৎসা শিখাইবার বন্দোবস্ত থাকা উচিত।

—

ওড়িশায় বাঙালী চাকর্‌য়েদের অসুবিধা

বেহার হেরাল্‌ড্ বলেন, ওড়িশা মেডিক্যাল স্কুলে একটি নিয়ম আছে, যাহার ফলে কার্য্যতঃ সেইসব বাঙালী সরকারী চাকর্‌য়েদের ছেলেরা উহাতে পড়িতে পায় না, যাঁহারা বিহার-ওড়িশায় ডোমিসাইল্‌ড্ অর্থাৎ স্থায়ী বাসিন্দা শ্রেণীভুক্ত হন নাই। স্থায়ী বাসিন্দা বলিয়া গণ্য হইবার নিয়মগুলিও এমন চমৎকার, যে, কর্ত্তৃপক্ষ যে-কোন বাঙালীর স্থায়ী বাসিন্দা হইবার আবেদন নামঞ্জুর করিতে পারেন। সরকারী চাকরী না-হয় বিহার-ওড়িশার স্থায়ী অধিবাসী বাঙালীদিগকেও না দেওয়া হউক। কিন্তু বিহার-ওড়িশাকে স্বতন্ত্র প্রদেশ করিবার সময় যে-সব বাঙালী চাকর্‌য়েকে গবর্ণ্‌মেণ্ট্ নিজ প্রয়োজনবশতঃ বিহার-ওড়িশায় রাখিয়াছিলেন এবং এখনও রাখিয়াছেন, তাঁহাদের ছেলে-দিগকে ঐ প্রদেশে কোন-প্রকার শিক্ষালাভের সুযোগ হইতে বঞ্চিত করা অত্যন্ত অন্যায়। যিনি কটকে চাকরী করেন, তথায় চিকিৎসা শিখিবার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও, তাঁহাকে প্রদেশের বাহিরে স্থিত দূরবর্ত্তী কোন স্থানে শিক্ষালাভের জন্য পুত্রকে প্রেরণ করিতে এবং তজ্জন্য বহু ব্যয় করিতে বাধ্য করা মস্ত জুলুম নয়।

—

শ্রীনিকেতন পল্লীসেবা-বিভাগ

শ্রীনিকেতন পল্লীসেবা-বিভাগের প্রতিবেদন পাঠ করিয়া আহ্লাদিত হইয়াছি। ইহাতে ব্রতীবালকদলের কার্য্যের বৃত্তান্ত আছে, কলেরার প্রাদুর্ভাব ও অগ্নিদাহে কর্ম্মীদের কাজের বিবরণ আছে, এবং তদ্ভিন্ন বালিকা বিদ্যালয়, নৈশ বিদ্যালয়, বাগান তৈয়ার করা, ম্যাজিক লণ্ঠন সাহায্যে বক্তৃতা দেওয়া, বয়নশিল্প শিক্ষা-দান, পল্লী পাঠাগার এবং জিলাসম্মিলনীর বৃত্তান্ত আছে।

ব্রতীবালকদলের সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে :—

বর্ত্তমান সময়ে ২৩টি বিভিন্নস্থানে ৬০৮টি ব্রতীবালক পল্লীসেবার কার্য্যে শিক্ষালাভ করিতেছে। ব্রতীবালকদলের অধিনায়ক অক্লান্ত-কর্ম্মা শ্রীমান্ ধীরানন্দ রায়ের একনিষ্ঠ চেষ্টায় এই কার্য্য আশানুরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছে। এই বৎসর নিকটবর্ত্তী সাঁওতাল বালকদিগকে লইয়া একটি ব্রতীবালকদল গঠিত হইয়াছে।

পাশাপাশি ১০টি গ্রামের ব্রতীবালকগণ সর্ব্বসুদ্ধ ২৬৩টি রোগীকে নিয়মিতরূপে কুইনাইন বিতরণ করিয়াছে, ২০১টি পুকুর ও ডোবায় নিয়মিতরূপে কেরোসীন তৈল প্রয়োগ করিয়া মশা ধ্বংস করিয়াছে। এইসকল গ্রামের পল্লীসমিতির সভ্যগণের সহযোগিতায় ব্রতীবালকগণ ৫টি ড্রেন্ কাটিয়াছে ও ৫টি রাস্তা মেরামত করিয়াছে। তাহাদের স্ব-স্ব গ্রামের জঙ্গল পরিষ্কার করিয়াছে। মৌদপুর গ্রামের প্লীহারোগীর সংখ্যা পূর্ব্বে ৬০জন ছিল, গত বৎসর ১৮ জন ও এবৎসর ৬জন মাত্র পাওয়া গিয়াছে। এসকল গ্রামে এই বৎসর ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব অতি অল্পই দেখা গিয়াছে।

আমাদের প্রতিবেশীদিগের মধ্যে, কাহারও মুখাপেক্ষী না হইয়া নিজেদের চেষ্টায় পল্লীসমিতি স্থাপন করিয়া গ্রামের উন্নতি বিধানের চেষ্টা লক্ষিত হইতেছে। সুরুল গ্রামের দক্ষিণ পাড়ায় ও উত্তর পাড়ায় ২টি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই সমিতি-দুটি পল্লীর রাস্তা-ঘাটের উন্নতি-বিধান, শিক্ষা-বিস্তার ও আর্ত্তের সেবার সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন।

অধিনায়ক ধীরানন্দ-বাবুর নেতৃত্বে ব্রতীবালকগণ কেন্দুলী, কঙ্কালী ও মুলুকের মেলায় যাত্রীদিগের সেবা ও স্বাস্থ্যরক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিল।

জয়দেবের জন্মস্থান কেন্দুলীতে যে বার্ষিক মেলা হয়, তাহাতে পঞ্চাশ হাজারের উপর যাত্রীর সমাগম হয়। এই বৃহৎ মেলায় স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য, গুণ্ডা বদমাইস্‌দের চৌর্য্য ও অত্যাচার দমন করিবার জন্য, জুয়াখেলা বন্ধ করিবার জন্য যাহা-যাহা করা হইয়াছিল, তাহার বিস্তারিত বিবরণ প্রতিবেদনে আছে। যাত্রী ও চারিপাশের গ্রামের লোক-দিগকে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সম্বন্ধে জ্ঞানদানার্থ ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে বক্তৃতা দেওয়া হইয়াছিল।

কলেরা-সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে :—

গত বৎসর জলাভাববশত এই জিলার সর্ব্বত্র কলেরা মহামারীর প্রাদুর্ভাব হয়। জিলাবোর্ডের সহযোগিতায় আমাদের কর্ম্মীগণ নিম্নলিখিত গ্রামে সেবাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকে—নারকবাজার, মুলুক, চণ্ডীপুর, সিয়ান, বাহুরা, বাহিরী, লোহাগড়, বোলপুর। ফেব্রুয়ারী হইতে এপ্রিল পর্য্যন্ত স্বেচ্ছাসেবকদল ও ব্রতীবালকদল কলেরা-প্রতিকারার্থে তাঁহাদের সকল চেষ্টা নিয়োজিত করেন।

অগ্নিদাহে বিপন্ন লোকদের সাহায্যার্থও চেষ্টা করা হয়।

গত এপ্রিল মাসে বাইনি গ্রামে অগ্নিদাহে ৫০০ গৃহ ভস্মীভূত হয়। এই গ্রামের অধিবাসীগণ দরিদ্র মুসলমান। ইহাদের দুরবস্থার কথা অবগত হইয়া আমাদের সেবকগণ বোলপুর-সেবা-সমিতির সহযোগিতায় চাউল, ডাল, লবণ ও অর্থ সংগ্রহ করিয়া দরিদ্র অধিবাসীদিগের জীবন-রক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল। জুন মাসের ব্যাংচাত্রা গ্রামে অগ্নিদাহে ১০৭ খানি গৃহ ভস্মীভূত হয়। এই সংবাদ অবগত হইয়া স্বেচ্ছাসেবকগণ ৫/০ মণ চাউল, ৬০ সের ডাল ও ।০ সের লবণসহ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। এই গ্রামের জন্য সাহায্য সংগ্রহ করিতে বোলপুর-সেবা-সমিতির সভ্যগণ যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করিয়াছেন। আমরা এই গ্রামে সর্ব্বসমেত ১৪/০ মণ চাউল, ২।৩ ডাল ও ৬৫ লবণ বিতরণ করি। ইহা ব্যতীত এই গ্রামের কয়েকজন দরিদ্র শিল্পীকে যন্ত্রাদি ক্রয় করিবার জন্য ১০৩৲ টাকা দেওয়া হয়। ইহার মধ্যে জিলার কলেক্টর বাহাদুর ৬৪৲ টাকা দান করেন ও বাকী অর্থ ও চাউল ডাল ইত্যাদি, সেবকগণ ভিক্ষাদ্বারা সংগ্রহ করিয়াছেন।

প্রতিবেদন হইতে অন্যান্য কয়েকটি জ্ঞাতব্য কথা উদ্ধৃত করিতেছি।

সুরুল গ্রামের দরিদ্র বালিকাদের শিক্ষার জন্য একটি অবৈতনিক বালিকাবিদ্যালয় পরিচালিত হইয়াছে। তাহার ছাত্রীসংখ্যা বর্ত্তমান সময়ে ৩৬টি। লেখাপড়া শিক্ষার সহিত তাহাদের সেলাই ও বাগানের কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

সুরুল গ্রামের অবনত শ্রেণীর বালকদিগের শিক্ষার জন্য একটি নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে। ছাত্রসংখ্যা ৫০ জন। মহিদাপুর গ্রামে সম্প্রতি একটি নৈশ বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে। তাহার ছাত্রসংখ্যা ২৫ জন।

স্থানীয় ব্রতীবালকদিগকে কৃষিসম্বন্ধে শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীনিকেতনের নিকটবর্ত্তী ৬টি বিভিন্ন গ্রামে ব্রতীবালকগণকর্তৃক বাগান তৈয়ার করান হয়। এই বাগানের জন্য বিশ্বভারতীর কৃষিবিভাগ হইতে বীজ ও চারা সরবরাহ করা হয়। গত বৎসর বাহাদুরপুর ও মহিদাপুরের ব্রতীবালক-দলের বাগান সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছিল।

বীরভূমের পল্লীসমস্যা-সম্বন্ধে গত বৎসর ৬০ খানি Magic Lantern Slides তৈয়ারী করা হয়। গত বৎসর ১৫টি বিভিন্ন স্থানে (পল্লীসংস্কার-সম্বন্ধে) ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে বক্তৃতা করিয়া গ্রাম-বাসীদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়।

শান্তিনিকেতনের নিকটবর্ত্তী ভুবনডাঙা গ্রামের ব্রতীবালকদিগকে বয়নশিল্প শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ভুবনডাঙা প্রসাদ বিদ্যালয়ের শিক্ষক-মহাশয় শ্রীনিকেতনের বয়নবিভাগে শিক্ষালাভ সমাপ্ত করিয়া গ্রামে ফিরিয়া গিয়া ব্রতীবালকদিগকে শিক্ষা দিতেছেন। এই শিল্প-শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ে তাঁত ও চর্‌কা বসানো হইয়াছে। বর্ত্তমানে এই গ্রামের ব্রতীবালকেরা তোয়ালে, গামছা, ফিতা, ও আসন বুনিতে শিখিয়াছে।

গত ডিসেম্বর মাস হইতে এই বিভাগের চেষ্টায় একটি পল্লীপাঠাগার (Circulating Library) স্থাপিত হইয়াছে। আমরা নিকটবর্ত্তী ১০টি গ্রামে পণ্ডিতদিগের সাহায্যে ৫খানি করিয়া পুস্তক বিতরণ করি, পনের দিন অন্তর বিভিন্ন গ্রামের পুস্তকগুলিকে বদলাইয়া দেওয়া হয়। সুখের বিষয় এই যে, গ্রামে বাংলাভাষা পড়িতে সক্ষম এরূপ কৃষকগণ এই পাঠাগারের পুস্তক অতি আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেছে। তজ্জন্য আমরা আগামী বৎসর এই পাঠাগার যাহাতে বিস্তৃতিলাভ করে সেবিষয়ে যত্নশীল হইয়াছি। এই মিশ্রিত পাঠাগারে পুস্তকাদি দান করিবার জন্য আমরা সর্ব্বসাধারণকে সানুনয় অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি।

গত বৎসর ৭২টি ছাত্র নানাস্থান হইতে আগমন করিয়া শ্রীনিকেতনের বয়নবিভাগে গৃহ-শিল্প শিক্ষা করে। তন্মধ্যে ৪১ জন শিক্ষক ছিলেন। এই বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র সেনের ঐকান্তিক চেষ্টায় শতরঞ্চি, নেওয়ার, কার্পেট, কম্বল ও অন্যান্য বস্ত্রবয়ন, রংকরা, ছাপ দেওয়া (Calico-printing) ইত্যাদি নানাবিধ শিল্পশিক্ষার আয়োজন হইয়াছে। উল্লিখিত ছাত্রগণ এসকল শিল্প শিক্ষা করিয়া এ-জেলার নানা স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে।

—

দলের পরিবর্ত্তে কৃতিত্ব ও কর্ম্মশক্তি

আমরা পূর্ব্বে এই মত প্রকাশ করিয়াছি, যে, জেলা-বোর্ড, মিউনিসিপালিটি,প্রভৃতিতে দলের বিচার না করিয়া এরূপ লোকদিগকেই নির্ব্বাচন করা উচিত যাঁহাদের দ্বারা জেলার বা শহরের হিত সাধিত হইয়াছে ও ভবিষ্যতেও হইতে পারে। আজকাল দেখিতে পাওয়া যায়, স্বরাজীদলের লোক বলিয়া পরিচয় দিয়া এমন অনেক লোক নির্ব্বাচিত হয়, যাহারা জেলার বা মিউনিসিপালিটির হিতের জন্য স্বাস্থ্য, ভালো পথঘাট, কৃষি, শিক্ষা, জলসরবরাহ, প্রভৃতি বিষয়ে কোন কাজ করে নাই, করিবার ক্ষমতাও নাই; অথচ যাহাদের এইসব বিষয়ে কৃতিত্ব আছে, আগ্রহ, অনুরাগ ও কর্ম্মিষ্ঠতা আছে, তাহারা অনেকে নির্ব্বাচিত হয় না।

আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, জেলা মিউনিসিপালিটি, প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র ভূখণ্ডে আমরা যাহা কর্ত্তব্য বলিয়াছিলাম,আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌স্-এ সার্চ লাইট্ নামক কাগজের পরিচালক ও পৃষ্ঠপোষকগণ তাঁহাদের বিশাল সমগ্র দেশের কংগ্রেস্ নামক ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধি নির্ব্বাচন-সম্বন্ধেও তাহাই কর্ত্তব্য বলিয়া তজ্জন্য আন্দোলন করিতেছেন। তাঁহাদের কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে তাঁহারা যাহা লিখিয়াছেন, তাহা যাইতে আমরা কেবল দুটি বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি।

"Elect, non-partisanly, a Congress of statesmen, rather than politicians."

"Organize Congress on a non-partisan basis of efficiency rather than spoils, perquisites and boss power......"

তাৎপর্য্য। "দলনিরপেক্ষভাবে কংগ্রেস, অর্থাৎ ব্যবস্থাপক সভার এরূপ প্রতিনিধিদিগকে নির্ব্বাচন করুন, যাঁহারা রাষ্ট্রনীতিবিৎ ও রাষ্ট্রহিত-সাধন-সমর্থ, কেবল মাত্র রাজনৈতিক দলাদলির কৌশল ও কার্য্য-প্রণালীতে অভ্যস্ত লোক নহে।"

"লুট, উপরি-পাওনা, এবং দলের চাঁইয়ের অপ্রতিহত ক্ষমতার উপর ব্যবস্থাপক সভার ভিত্তি স্থাপন না করিয়া, কার্য্যকারিতার ভিত্তির উপর উহা সংগঠন করুন।"

নিজেদের দলের লোকদের মধ্যে চাকরী ও অর্থাগমের অন্যান্য উপায় ভাগ করিয়া লওয়াকে আমেরিকায় স্পয়েল্‌স্ সিষ্টেম্ বা লুট্-প্রথা বলে। ইহা এদেশেও প্রবর্তিত হইতেছে। একেবারে পাশ্চাত্য দেশ হইতে না আসিলে, কিম্বা এদেশী যাহা তাহাও একবার পাশ্চাত্য দেশ হইতে ভোল্ ফিরাইয়া না আনিলে, কোন-কিছুর আদর আমাদের দেশে সহজে হয় না। আমরা যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা পাশ্চাত্য দেশ হইতে ব্যাপকতর আকারে আসিতেছে। এখন কি এ-বিষয়ে মান্যগণ্যদের দৃষ্টি পড়িবে?

—

গঙ্গাজলঘাটী জাতীয় বিদ্যালয় ও আশ্রম

ইহা বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত গঙ্গাজলঘাটীর নিকটে অবস্থিত। ইহার অন্যতম ত্যাগী অক্লান্তকর্ম্মী সেবক স্বর্গীয় শ্রীমান্ অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নাম-অনুসারে ইহার নাম 'অমর-কানন' রাখা হইয়াছে।

অমর কাননের নিকটে পাহাড়, শৈলবাহী নদী পাশ দিয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলিয়াছে। পাশে বনের গাঢ় সবুজ বর্ণ এবং আশে-পাশে ধানের ক্ষেতের মনোরম দৃশ্য। দুই-এক মাইল দূরে চারিপাশে গণ্ডগ্রাম। সব দিক্‌ই খোলা। প্রকৃতি যেন সকল-রকমেই ইহা আশ্রমের উপযোগী করিয়াছে। এখানে আকাশ বাতাস স্বাস্থ্য, সবই যেন আশ্রম-কুমারকে সরল ও উদার করিতে ব্যগ্র। মোটর-গাড়ীর সংযোগে ইহাকে বাঁকুড়া সহরের নিকট করিয়া দিয়াছে। কর্ম্মীগণ গ্রীষ্মকালে ভীষণ রৌদ্রকে তুচ্ছ করিয়া স্বহস্তে আশ্রম তৈয়ার করিতে, কূপ খনন করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। প্রাণই প্রাণের সাড়া আনিল। কর্ম্মীগণের পরিশ্রমে এবং জনসাধারণের সহানুভূতি ও সাহায্যে আশ্রমের দুইটি ঘর, কুড়ি বিঘা ধানের জমি, সাত বিঘা তরকারীর জমি ও পনের বিঘা আশ্রমের জমি পাওয়া গিয়াছে এবং বাৎসরিক ছয় মাপ চালের ব্যবস্থাও হইয়াছে। আশ্রমে বর্ত্তমানে ১০ জন কর্ম্মী ও ছয়জন প্রাক্তন ছাত্র কর্ম্মী থাকেন। 'আশ্রম-কাননে' একটি আস্ত পরীক্ষোপযোগী বিদ্যালয় ও একটি প্রাথমিক পাঠশালা—ছাত্র-সংখ্যা ১০০ শত এবং গঙ্গাজলঘাটীতে প্রাথমিক পাঠশালার ছাত্র-সংখ্যা ৩৫ জন। ৪টি তাঁত, একটি সেলাইয়ের কল, চর্‌কা এবং বাগান ও গৃহ-নির্ম্মাণ—কার্য্যকরী শিক্ষার জন্য রহিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে আশ্রমের ছয়টি বাসগৃহ, একটি পাঠাগার, একটি অতিথি-ভবন, একটি রান্নাঘর এবং একটি মন্দিরগৃহ নির্ম্মাণ সুরু হইয়াছে।

আশ্রমের উদ্দেশ্য—"আত্মনো মোক্ষার্থ জগদ্ধিতায়"—এই আদর্শকে ছাত্রজীবনে ও সামাজিক জীবনে প্রচার ও কার্য্যে পরিণত করিয়া ভারতের অতীত ও বর্ত্তমান জগতের অভিজ্ঞতার সামঞ্জস্যে মানুষ-গঠনে সাহায্য করাই আশ্রমের উদ্দেশ্য।

মাতৃভাষায় ও স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় পাঠ ও তরুতলে পাঠ এখানের বিশেষত্ব। গ্রামের বিজ্ঞ চাষীদিগের পরামর্শ ও সহযোগে কৃষিবিভাগ চলিতেছে, বয়ন-বিভাগে গ্রাম্য যুবকদিগকেও শিক্ষা দেওয়া হয়। কৃষি ও বয়ন দ্বারা আশ্রমের ছাত্র ও কর্ম্মীগণ গ্রাসাচ্ছাদন চালাইতে সমর্থ হইয়াছেন। এক-একটি তাঁতে ১২ ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া দুইজন মাসে ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত আয় করিয়াছেন।

—

জাপানী ও ভারতীয় সংবাদপত্র

—সকল দেশেই কোন-কোন খবরের কাগজ বৎসরে একটি বা কোন-কোন বিশেষ ঘটনা উপলক্ষ্যে একটি বিশেষ সংখ্যা বাহির করেন, কেহ-কেহ উহার নাম সাপ্লেমেণ্ট্ বা প্রপূর্ত্তি দিয়া থাকেন। জাপানের আসাহী নামক প্রসিদ্ধ কাগজের ঐরূপ একটি প্রপূর্ত্তি অল্পদিন হইল আমাদের নিকট আসিয়াছে। আসাহী কাগজখানি জাপানী ভাষায় পরিচালিত হয়। কিন্তু এই প্রপূর্ত্তিটি বিদেশীদের জন্য অভিপ্রেত বলিয়া ইংরেজীতে লেখা; নাম, প্রেজেণ্ট-ডে জাপান, অর্থাৎ আজিকার জাপান। ইহার পৃষ্ঠার আয়তন এদেশের ইংরেজী দৈনিকগুলির পৃষ্ঠার মত। পৃষ্ঠার সংখ্যা ১০৬। সুন্দর জমকাল রঙীন ছবির মলাটে প্রপূর্ত্তিটি আচ্ছাদিত। পাতায়-পাতায় ছবি। তা ছাড়া সেপিয়া রঙে আর্ট পেপারে ছাপা আটটি পৃষ্ঠায় কেবল ছবিই আছে।

প্রপূর্ত্তিটিতে ৭২ পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপন আছে। ভারতবর্ষে যে-সব ইংরেজী দৈনিকে খুব বেশী বিজ্ঞাপন বাহির হয়, তাহার অধিকাংশ ও বড়-বড় বিজ্ঞাপন ইউরোপীয়দিগের দোকান ও কারখানার; কিন্তু আসাহীর এই ৭২ পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপনের সবগুলিই জাপানী দোকান, কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের। সভ্যতার বাহ্য দিকে জাপান কতদূর অগ্রসর হইয়াছে, ইহা হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষে দেশী বা বিদেশী যে-সব খবরের কাগজ-ওয়ালা খুব বেশী কাট্‌তির দাবি করেন, তাঁহারাও ত্রিশ বা চল্লিশ হাজারের বেশী কাট্‌তি বলিতে সাহস করেন না। আসাহীর কাট্‌তি কিরূপ শুনুন। উহা ওসাকা ও তোকিও, এই দুই শহর হইতে বাহির হয়। ওসাকা আসাহীর কাট্‌তি সাড়ে বার লক্ষ, তোকিও আসাহীর কাট্‌তি সাড়ে সাত লক্ষ;—মোট কাট্‌তি কুড়ি লক্ষ। ভারতবর্ষের সমুদয় দেশী ও ইংরেজী দৈনিকগুলির মোট কাট্‌তি কুড়ি লক্ষ হইবে না।

জাপানে খবরের কাগজের কাট্‌তির এরূপ আধিক্যের প্রধান কারণ দুটি। জাপানে ৪।৫ বৎসর বয়সের শিশুরা ভিন্ন স্ত্রীপুরুষ সবাই পড়িতে জানে ও পড়ে। সেইজন্য সংবাদপত্রের প্রচার বেশী। ভারতবর্ষে শতকরা ৯৩।৯৪ জন পড়িতে পারে না। আর-একটা কারণ, জাপানীদের স্বাধীনতা বা ইণ্ডিপেণ্ডেন্স্ আছে (অবশ্য তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ডোমিনিয়ন্ স্ট্যাটাস্ নামক স্বরাজ্য নাই)। এইজন্য তাহারা স্বদেশী ও বিদেশী রাজনীতি, বাণিজ্য, টাকার বাজার, যুদ্ধবিগ্রহ, কলকারখানা, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, সাহিত্য, শিল্প, ধর্ম্ম প্রভৃতি সকল বিষয়েরই সংবাদ জানিতে ব্যগ্র; কারণ, তাহারা জানে, এইসকল

বিষয়েই তাহাদের যেমন কিছু কর্ত্তব্য আছে, তেমনি স্বাধীন বলিয়া করিবার ক্ষমতাও আছে।

লণ্ডন, নিউইয়র্ক, প্যারিস্, বার্লিন, মস্কো, পেকিং, টিয়েণ্ট্‌সিন্, ও শাংহাইয়ে আসাহীর নিজের সংবাদদাতা আছে। তা-ছাড়া, ওয়াশিংটন্, সান্‌ফ্রান্সিস্কো, ভ্যাঙ্কুভার, হনলুলু, মানিলা, ভ্লাডিভষ্টক্, হংকং, সিঙ্গাপুর, কলিকাতা, জাভা, ব্যাঙ্কক, টংকং, সাঁ পাউলো, লীমা, বুয়েনস্ এয়ারেস্, নাঙ্কিং ও হাংকাউয়েও সংবাদদাতা আছে।

পৃথিবীর সকল সভ্যজাতি যুদ্ধ, বাণিজ্য, ডাক ও যাত্রী বহনের নিমিত্ত আকাশযানের উন্নতি করিতে ব্যস্ত। জাপানের গবর্ণ্‌মেণ্ট্ এবিষয়ে নিজের কর্ত্তব্য করিতেছে। অধিকন্তু, আসাহী কাগজটিও ১৯১১ সাল হইতে নিজে বাণিজ্যাদির জন্য এই যানের ব্যবহারে উৎসাহ দিতেছে। পাশ্চাত্য নানা জাতির ব্যোমচরেরা আকাশযানে পৃথিবী প্রদক্ষিণ উপলক্ষ্যে কলিকাতা বা ভারতবর্ষের অন্য শহরে মধ্যে-মধ্যে নামিয়াছে। আসাহীর উদ্যোগে ও তাহার সম্পূর্ণ নিজের ব্যয়ে শীঘ্রই জাপানী ব্যোমচরেরা তোকিও হইতে প্যারিস উড়িয়া যাইবে। তাহারা লণ্ডন, রোম, ব্রসেল্‌স্, বার্লিন, প্রভৃতিও যাইতে পারে। যে-আকাশযান তাহারা ব্যবহার করিবে, তাহার ছবি আসাহী-প্রপূর্ত্তিতে দেওয়া হইয়াছে।

—

ফিজি দ্বীপের ভারতীয়দের অবস্থা

ফিজি দ্বীপে ভারতীয়েরা প্রথমতঃ চুক্তিবদ্ধ কুলীরূপে নীত হইয়াছিল। তাহার পর স্বাধীনভাবেও কেহ-কেহ রোজগারের আশায় গিয়াছে। কুলিদের দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা কাগজে অনেকবার বর্ণিত হইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও ভালো কি হইয়াছে, তাহাও জ্ঞাতব্য। মন্দ হইতেও ভালো হয়, বিশ্বের এমনই মঙ্গল-বিধান। ফিজিতে পাদ্রী ম্যাক্‌মিলান্ সাহেব ভারতীয়দের মধ্যে কাজ করেন। তিনি গার্ডিয়ান্ নামক কলিকাতার কাগজে ফিজি-সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা কতকগুলি সংবাদ সংগ্রহ করিয়া দিতেছি।

১৯২১ সালে ১৫ বৎসরের ঊর্দ্ধ বয়সের পুরুষদের মধ্যে শতকরা ৩৮·৫০ জন লিখনপঠনক্ষম ছিল। খৃষ্টীয় মিশনরীদের চেষ্টায়, ভারতীয়দের বেসরকারী জাতীয় বিদ্যালয়গুলির চেষ্টায়, এবং বণিক্, দর্জ্জি ও শিখ প্রভৃতিদের আগমনে এই সুফল ফলিয়াছে। স্ত্রীলোকদের মধ্যে কিন্তু এখনও শিক্ষার বিস্তার বড় কম হইয়াছে। ১৫ বৎসরের অধিক বয়সের মেয়েদের মধ্যে কেবল শতকরা ২·৫০ জন লিখিতে পড়িতে পারে। বাংলাদেশে কুড়ি ও তদূর্দ্ধ বয়সের পুরুষদের মধ্যেও কেবল শতকরা ২২·৫ জন মাত্র লিখনপঠনক্ষম; ঐবয়সের স্ত্রীলোকদের মধ্যে শতকরা কেবল ২·১ জন লিখিতে-পড়িতে পারে। অতএব দেখা যাইতেছে, ফিজিতে যাহারা প্রধানতঃ কুলী হইয়া গিয়াছিল, তাহাদের ও তাহাদের সন্তানসন্ততিদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার সুসভ্য ও অহঙ্কৃত বাংলা-দেশ অপেক্ষা অধিক হইয়াছে।

কিন্তু আমাদের পক্ষে ইহা অপেক্ষাও লজ্জার কথা আছে।

ফিজিদ্বীপের যে-সব আদিমনিবাসীর পিতামহ-পিতামহীরা অসভ্য ও নরখাদক ছিল, তাহাদেরই বাড়ীর স্ত্রীলোকদের মধ্যে শতকরা ৭৩ (তিয়াত্তর) জন লিখিতে-পড়িতে পারে। খৃষ্টীয় মিশনারীদের চেষ্টায় এই সুফল ফলিয়াছে।

ইহার সহিত বাংলা দেশের অবস্থা তুলনা করুন। বাংলা দেশে বৈদ্যদিগের মধ্যে লেখাপড়ার বিস্তার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের বাড়ীর মেয়েদের মধ্যেও কেবলমাত্র শতকরা ৪১·৭ জন লিখিতে-পড়িতে পারেন; অথচ ফিজির নরখাদকদের নাত্‌নীদের শতকরা ৭৩ জন লিখনপঠনক্ষম! বঙ্গের ব্রাহ্মণীদের মধ্যে শতকরা কেবল ১৯·২ জন লিখিতে পড়িতে পারেন, কায়স্থানীদের মধ্যে ১৭·৫ জন।

ফিজির ভারতীয়দিগের মধ্যে ৫২৯১২ জন হিন্দু, ৬৪৪২ জন মুসলমান এবং ৭১০ জন খৃষ্টিয়ান। ভারতবর্ষ হইতে আগত লোকদের মধ্যে শতকরা ২৮ জন মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সী হইতে এবং ৫৯ জন হিন্দীউর্দ্দুভাষী উত্তর ভারতবর্ষ হইতে ফিজি গিয়াছে।

ফিজির ভারতীয়দের মধ্যে ১৫৩০৩ জন পুরুষ স্বাধীন চাষী ও আকের আবাদের মালিক, ৪১৩৬ জন কৃষিক্ষেত্রের মজুর। ইহা ইউরোপীয় কৃষিক্ষেত্র ও ইক্ষুক্ষেত্রের মালিকদের বড় বিরক্তির কারণ; তাহারা চায় হাজার-হাজার মজুর, কিন্তু না পাইয়া কার্য্যক্ষেত্র বিস্তার করিতে পারে না। ভারতীয়েরা নিজের স্বাধীনতা পছন্দ করে, পরের মাইনের মজুর হইতে তত রাজি নয়, তাহা দেখিয়া ইউরোপীয়দের মেজাজ বড় বিগড়িয়া যায়। ভারতীয়দের মধ্যে ১০৮৩ জন অন্য শ্রমিক এবং ৭৮০ জন গৃহভৃত্য আছে; ৩৩৫ জন মুদীর দোকান করে, ১১২ জন ব্যবসাদার, ১৬৭ জন দোকানদারের সহকারী। ১৯২১ সালে ৮৯ জন মোটর-গাড়ীর মালিক ও চালক ছিল; এখন তাহাদের সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে। ৮৮ জন সেকরা ও অলঙ্কারবিক্রেতা আছে; তাহারা সর্ব্বদাই কাজে ব্যস্ত থাকে। শিক্ষকের সংখ্যা বড় কম; মোটে ৬৮ জন মাত্র। ফিজি ভারতীয় সমাজে শিক্ষাদানবিদ্যায় শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকের প্রয়োজনই

বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। পুরোহিতের সংখ্যা ৬২, ছুতার ও কামারের সংখ্যা ৭৭।

বিদেশে গিয়া ভারতীয়দের সমাজে যে-সব গুরুতর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, ম্যাক্‌মিলান সাহেব তাহার কয়েকটির উল্লেখ করিয়াছেন।

(ক) ঝাড়ুদার ও মেথরের তিরোভাব। ঝাড়ুদার বা মেথর বলিয়া আর কোন স্বতন্ত্র জাতি নাই। তাহারা সব অন্ত কাজের কাজীদের মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে। ফিজিতে, যে-কেহ ঝাড়ুদার ও মেথরের কাজ করে।

(খ) জুলাহা বা তাঁতীর তিরোভাব। ইহাতে অত্যন্ত বেশী ক্ষতি হইয়াছে, এবং তজ্জন্ত ইহা বড় আপ্‌সোসের বিষয় হইয়াছে। ফিজিতে খুব ভালো কাপাস জন্মে, এবং ম্যাঞ্চেষ্টারের কলের ধুতি আট টাকা চারি আনা জোড়া দরে বিক্রী হয়। সুতরাং এখানে চর্‌কা-কাটুনী ও তন্তুবায় কাপড়ের দাম খুব সহজেই কমাইতে পারিত। এখানে খাদ্য প্রচুর-পরিমাণে ও সস্তায় পাওয়া যায়, বস্ত্র মহার্ঘ। কিন্তু ইহাও দেখা যায়, যে, এখানকার ভারতীয়েরা স্বদেশী কাপড় বা খদ্দরকে অবজ্ঞা করে।

(গ) ভারতবর্ষে লক্ষ-লক্ষ স্ত্রীলোক মজুরী করে, কিন্তু ফিজিতে মজুরীর কাজে নিযুক্ত স্ত্রীলোকের সংখ্যা খুব কমিয়া যাইতেছে। সেন্সস্‌ রিপোর্টে দেখা যায়, যে, বাড়ীর চাকরানীর কাজ করে ৮৩ জন স্ত্রীলোক, ৪০৮ জন মজুরী করে, কিন্তু ১২৬২৯ জন নিজের বাড়ীর কাজ করে। ভারতে বাস্তি ও আজমগড় জেলায় থাকিতে তাহারা যেমন পারিবারিক আয় দৈনিক তিন আনা বাড়াইবার জন্ত সকালসন্ধ্যা কাজ করিতে বাধ্য হইত, ফিজিতে তাহা হয় না। ফিজিতে কোন স্ত্রীলোকের পক্ষে বাড়ীর বাহিরে গিয়া কাজ করা অসম্রমের বিষয় মনে হয়। তা-ছাড়া, চুক্তি-বদ্ধ কুলীরূপে কাজ করিবার সময় স্ত্রীলোকদের যে নৈতিক দুর্দ্দশা অনেক সময় হইত, তাহাতে এখন একটা প্রতিক্রিয়া ঘটিয়াছে—এখন পুরুষেরা তাহাদের বাড়ীর স্ত্রীলোকদিগকে বাড়ীতে রাখা কিম্বা নিজেদের ক্ষেতেই কাজ করিতে দেওয়া নিরাপদ্‌ মনে করে।

ফিজির আদিমনিবাসী ও ভারতীয়দিগের মধ্যে জাতি-মিশ্রণ হইতেছে না। তাহাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ প্রায় হয় না, যদিও তাহারা পরস্পরের সহিত বেশ সদ্ভাবে বাস করে। ইঙ্গ-ভারতীয় ফিরিঙ্গীও নাই। পিতা ইংরেজ ও মাতা ফিজির আদিমনিবাসী, এরূপ লোক দেখা যায়।

ফিজির অধিবাসী ভারতীয়দিগকে সুস্থ, উন্নতিশীল এবং কৃতী জাতি বলিয়াই মনে হয়। তাহারা নূতন দেশে নূতন পরিবেষ্টনের সহিত নিজেদের জীবনের সামঞ্জস্ত সাধনের উপযোগী পরিবর্ত্তন বেশ করিয়া লইতেছে, এবং দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জের ভবিষ্যৎ ইতিহাসে যে নূতন জাতি কৃতিত্ব দেখাইবে, ইহারা নিশ্চয়ই তাহাদের পথনির্ম্মাতা ও পথ-প্রদর্শক, ম্যাকমিলন্‌ সাহেব এই মত প্রকাশ করিয়াছেন।

—

রাষ্ট্রহীন মানুষ

বহু বৎসর পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া মুষ্টিমেয় কয়েক জন ভারতীয় আমেরিকার ইউনাইটেড্‌ ষ্টেট্‌স্‌এর স্থায়ী বাসিন্দা শ্রেণীভুক্ত হইয়া তথাকার পৌর অধিকার পাইয়াছিলেন। আধুনিক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা-অনুসারে কেহ একই সময়ে দুটা স্বাধীন রাষ্ট্রের পৌর অধিকার পাইতে পারে না। যে অল্পসংখ্যক ভারতীয় আমেরিকার আইনের চক্ষে আমেরিকান্‌ হইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারা আর রাষ্ট্রীয় হিসাবে ব্রিটিশ গবর্ণ্‌মেণ্টের ভারতীয় প্রজা ছিলেন না।

দুই বৎসরের অধিক পূর্ব্বে ঠিন্দ-(Thind) পদবীধারী একজন পঞ্জাবী ভদ্রলোক আমেরিকান্‌ হইবার দরখাস্ত করেন। ১৯২৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আমেরিকার সুপ্রীম কোর্ট্‌ তাহার উপর রায় দেন, যে, ভারতীয়েরা আমেরিকার আইন-অনুসারে তথাকার স্থায়ী বাসিন্দা শ্রেণীভুক্ত হইয়া পৌর অধিকার পাইতে পারে না। তাহার পর হইতে, আগে যাঁহারা গবর্ণ্‌মেণ্টের নিকট হইতে পৌর অধিকার পাইয়াছিলেন ও আমেরিকান্‌ হইয়াছিলেন, একে-একে তাঁহাদের সেই অধিকার কাড়িয়া লওয়া হইতেছে। তাঁহারা আর আমেরিকান্‌ থাকিতেছেন না; কিন্তু তাঁহারা পূর্ব্বে ব্রিটিশ-প্রজাত্ব ত্যাগ করিয়া তবে আমেরিকান্‌ হইতে পারিয়াছিলেন: সুতরাং তাঁহারা এখন আইনের চক্ষে কোন দেশেরই মানুষ নহেন; তাঁহারা রাষ্ট্রহীন!

তাঁহাদের মধ্যে কেহ-কেহ আমেরিকায় বিবাহও করিয়াছিলেন। তথাকার আইন-অনুসারে তাঁহাদের স্ত্রীরা আমেরিকান্‌ বা ইউরোপীয়বংশোদ্ভূত হইলেও এখন আর আমেরিকান্‌ বলিয়া গণ্য হইবেন না। তাঁহারাও রাষ্ট্রহীন হইলেন।

আমেরিকায় ভারতবর্ষের এই লাঞ্ছনা ও অপমান হইল, অথচ ভারতবর্ষে আমেরিকানরা আসিয়া দিব্য আরামে বসবাস ও উপার্জ্জন করিতেছে এবং দেশের লোকদের চেয়ে উচ্চ অধিকার ভোগ করিতেছে।

আমেরিকায় ভারতীয়দের প্রতি এরূপ ব্যবহার কেন হইল? তাহার কারণ অনেক। আমেরিকার আইনে

আছে, যে, আফ্রিকার নিগ্রো এবং ফ্রী হোয়াইট্ পার্সন্ (অর্থাৎ দাস নহে এরূপ শ্বেত-মনুষ্য) আমেরিকান্ হইতে পারিবে। পৃথিবীর কোন দেশের মানুষই বাস্তবিক শাদা নয়। ১৯২৩ সালের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ফ্রী হোয়াইট্ পার্সনের মানে আমেরিকার জজেরা ককেশীয়জাতীয় ধরিয়াছিলেন। ভারতীয় উচ্চ জা'তের লোকেরা ককেশীয়,কাশ্মীরী কত্রী প্রভৃতি অনেকে দক্ষিণ ইউরোপের লোকদের চেয়ে কম ফর্সা নয়। এইরূপ নানা কারণে আগে-আগে কয়েকজন ভারতীয় আমেরিকান্ পৌর আখ্যা ও অধিকার পাইয়াছিলেন। নানা কারণে কয়েক বৎসর হইতে আমেরিকায় জাপান-ভীতি জন্মিয়াছে বা সৃষ্টি করা হইয়াছে। জাপানী বলিয়া তাহাদিগকে আমরিকায় যাইতে না দেওয়া বা সেখান হইতে তাড়াইয়া দেওয়া অপেক্ষা এশিয়া মহাদেশের লোক বলিয়া তাড়ানোই কম অসুবিধাজনক। তাহাই করা হইয়াছে; এবং ভারতীয়েরাও এশিয়াবাসী বলিয়া তাহারাও ঐ সঙ্গে-সঙ্গে আমেরিকান্ হইবার অযোগ্য বিবেচিত হইয়াছে।

ইহা-ছাড়া আরও একটি কারণের অস্তিত্ব অনেকে সন্দেহ করেন, আমরাও করি। ইহার কোন সাক্ষাৎ প্রমাণ আমরা অবগত নহি; কিন্তু পরোক্ষ প্রমাণ কিছু-কিছু আছে।

যে-জাতি যত প্রবল-পরাক্রান্ত হউক না কেন, জগতের মত,বিশেষতঃ সভ্য জগতের মত, তাহাদের সম্বন্ধে ভালো হয়, ইহা তাহারা চায়; শক্তিশালী মিত্রজাতির মত তাহাদের সম্বন্ধে ভালো হয়, ইহা ত তাহারা খুবই চায়। আমেরিকান্‌রা ইংরেজদের এইরূপ সভ্য শক্তিশালী মিত্রজাতি। আমেরিকান্‌দের প্রশংসা পাইবার জন্য ইংরেজরা তাহাদের ভারতশাসন-সম্বন্ধে প্রশংসা-পূর্ণ বহি ও সংবাদপত্রাদিতে প্রবন্ধ লিখায়, আমেরিকায় বক্তৃতা করায়, এবং ভারতবর্ষের লোকদের অসভ্যতা-সম্বন্ধে বায়োস্কোপের ছবি তোলায়। কিন্তু ইহাতেও সব সময় ইংরেজদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। আমেরিকায় যে-সব ভারতহিতৈষী ভারতীয় আছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ-কেহ, এবং তাঁহাদের সাহায্যে কোন-কোন সদাশয় আমেরিকান্, ভারতে ইংরেজশাসনের দোষ দেখাইয়া দেন এবং ইংরেজের ভারতশাসনের স্তুতিকারী-দিগের ভ্রম দেখাইয়া দেন। ইহাতে ইংরেজের বড় রাগ হয়। তাহারা চায় না, যে, আমেরিকায় তাহাদের দোষ দেখাইবার জন্য কোন ভারতীয় থাকে। এইজন্য সন্দেহ হয়, আমেরিকান্-অধিকার প্রাপ্ত ভারতীয়দিগকে ঐ অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার মূলে অংশতঃ ব্রিটিশ গবর্ণ্‌মেণ্টের প্ররোচনা ছিল (ঠিন্দের আবেদনে যে আমেরিকান্ জজ সহকর্ম্মীদের মুখপাত্র হইয়া রায় দিয়াছিল. সে-ব্যক্তি জন্মতঃ ইংরেজ, পরে আমেরিকান্ হইয়াছে)।

ইংরেজরা আমেরিকাপ্রবাসী ভারতীয় ছাত্র ও অন্য ভারতীয়দিগকে কখনও সুনজরে দেখে নাই। তাহাদের অভাব অভিযোগ ও অসুবিধার কথা আমেরিকার ব্রিটিশ রাজদূতেরা কখনও সহানুভূতির সহিত শুনেন নাই, এবং প্রতিকার-চেষ্টা করেন নাই। যুদ্ধের সময় ও তাহার পরেও কয়েক জন ভারতীয়কে আমেরিকা হইতে বহিষ্কৃত করাইয়া ও ভারতবর্ষে আনাইয়া দণ্ড দিবার চেষ্টা বিলাতী গবর্ণ্‌মেণ্ট্ করিয়াছিল।

আমেরিকায় কেবল নিজেদের সুখ্যাতি বজায় রাখিবার জন্যই যে ইংরেজেরা তথায় ভারতীয়দের স্থায়ী বসবাস চায় না, তাহা নহে। অন্য প্রবল কারণও আছে। আয়ার্ল্যাণ্ডের আধুনিক ইতিহাসের পাঠকেরা জানেন, আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা লাভের আন্দোলনে ও অন্যবিধ চেষ্টায় আমেরিকাপ্রবাসী আইরিশ্‌রা কিরূপ প্রভূত সাহায্য করিয়াছিল। এইসব প্রবাসী আইরিশ্ আমেরিকান্ হইয়া গিয়াছে। তাহারা আমেরিকান্ গবর্ণ্‌মেণ্ট্‌কে অনেকটা নিজেদের মতের প্রভাবে আনিতে পারে। আয়ার্ল্যাণ্ড্ সম্পূর্ণ স্বাধীন না হউক, অন্ততঃ কার্য্যতঃ স্বাধীন না হইলে, আমেরিকা-প্রবাসী আইরিশ্-দিগকে সন্তুষ্ট করা যাইবে না, এবং তাহারা সন্তুষ্ট না হইলে যুদ্ধবিগ্রহে এবং অন্য প্রয়োজনের সময় আমেরিকার সাহায্য সহজে পাওয়া যাইবে না, ইংরেজ গবর্ন্মেণ্টের এই সত্য ধারণা থাকাতে যে আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রায়স্বাধীন হইবার কতকটা সাহায্য হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সম্ভবতঃ ইংরেজদের এই ভয় বরাবর ছিল, যে, আমেরিকাপ্রবাসী ভারতীয়ের সংখ্যা বাড়িলে ক্রমে-ক্রমে আমেরিকার জন-সাধারণের ও গবর্ণ্‌মেণ্টের উপর তাহাদেরও কতকটা প্রভাব জন্মিতে পারে, এবং তাহার ফলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ইংরেজ গবর্ণ্‌মেণ্ট্ ভারতবর্ষকে অনেক রাষ্ট্রীয় অধিকার দিতে বাধ্য হইতে পারে।

অতএব, আমেরিকায় ভারতীয়দের অধিকার লোপ অংশতঃ ইংরেজদের প্ররোচনায় হউক বা না হউক, তাহা যে ইংরেজদের পক্ষে সুবিধাজনক হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

৯১, আপার সার্কুলার রোড কলিকাতা, প্রবাসী প্রেসে শ্রী অবিনাশচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
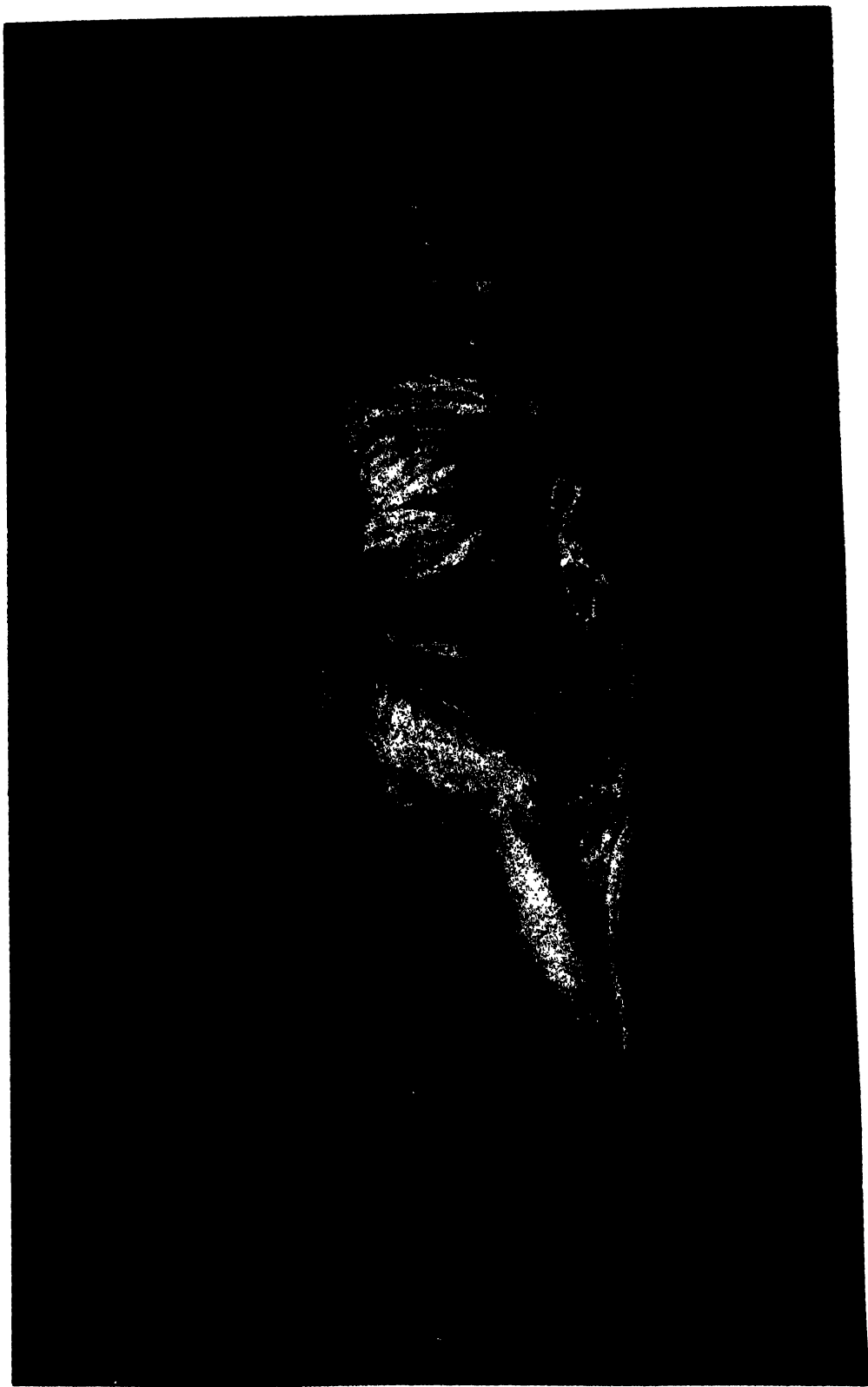
নিদ্রিত

শিল্পী শ্রীভবানীচরণ লাহা
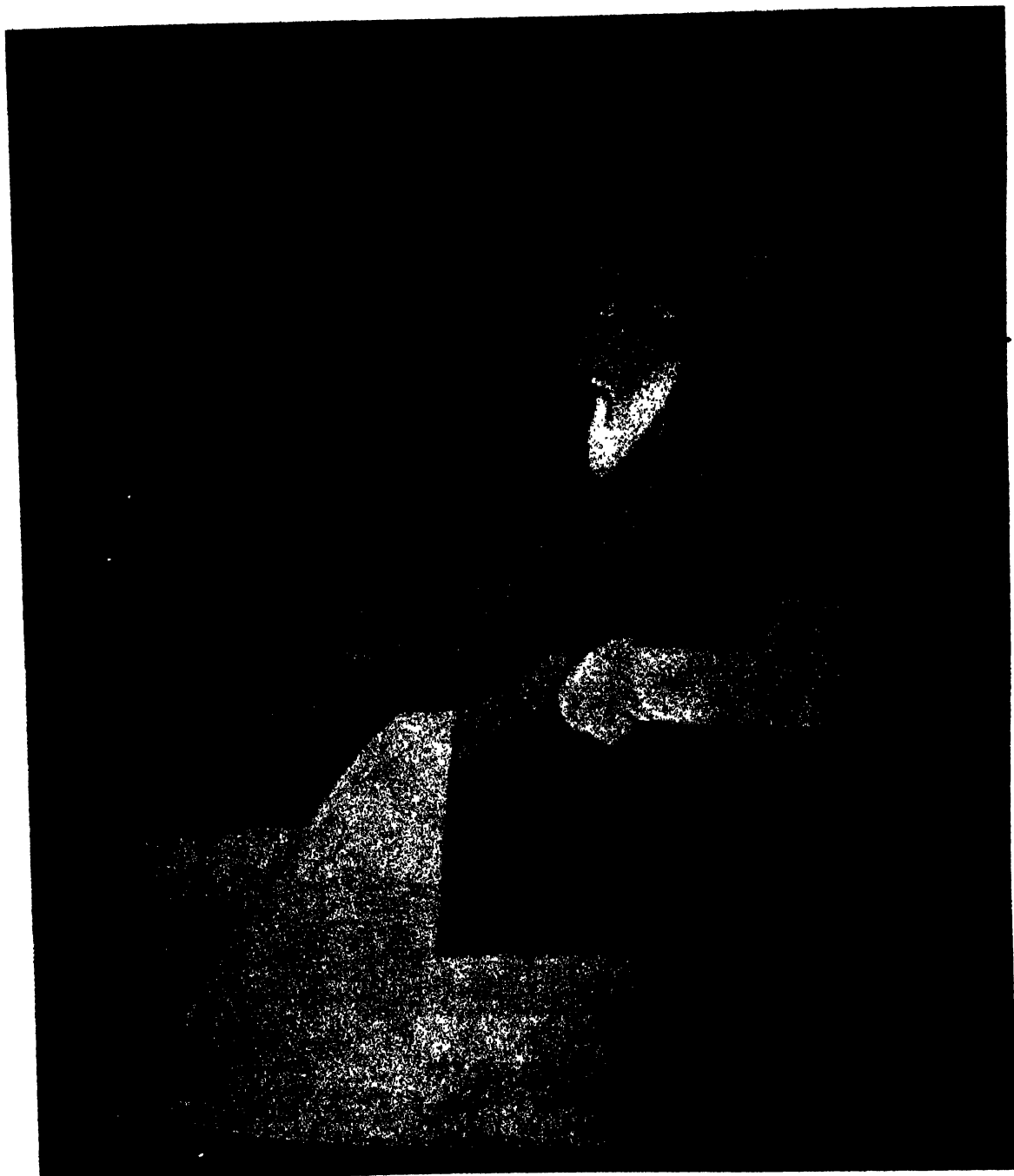
সাজাহান

শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা ।

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

২৫শ ভাগ
১ম খণ্ড

শ্রাবণ, ১৩৩২

৪র্থ সংখ্যা

ভারতবর্ষীয় বিবাহ

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতবর্ষীয় বিবাহ সম্বন্ধে কিছু লেখবার জন্মে য়ুরোপ থেকে আমার কাছে অনুরোধ এসেছে। সেই কারণেই প্রথমেই আমার চোখে পড়্ছে য়ুরোপীয় বিবাহের সঙ্গে আমাদের বিবাহের প্রভেদ। সে প্রভেদ কেবল বাহিরের অনুষ্ঠানের নয়, আন্তরিক অভিপ্রায়ের।

বিবাহ জিনিষটা সভ্যসমাজের অন্যান্য সকল ব্যাপারের মতই প্রকৃতির অভিপ্রায়ের সঙ্গে মানুষের অভিপ্রায়ের সন্ধি স্থাপনের ব্যবস্থা। এই দুই অভিপ্রায়ের মধ্যে বিরোধ বেশি অথবা মিল বেশি তাই নিয়েই ভিন্ন ভিন্ন বিবাহের মধ্যে চেহারা ও ভাবের প্রধান পার্থক্য ঘটে। কেন না জীবপ্রকৃতি ও সমাজপ্রকৃতি এই দ্বৈরাজ্যের শাসনে মানুষ চালিত। যেখানে সমাজ এই জীবপ্রকৃতির পেয়াদাগুলোকে অত্যন্ত বেশি অমান্য ক'রে চল্‌তে চায় সেখানেই ধর্ম্মবিধি, শাসনবিধি, আত্মপীড়নবিধি, বিচিত্র ও কঠিন হ'য়ে উঠ্‌তে থাকে। বিশেষত এই দ্বৈরাজ্যে প্রকৃতির হাতেই রসদ, ধনভাণ্ডারের মালিক সেই; এই জন্মে তার অত্যন্ত বিরুদ্ধে যেতে হ'লে মানুষকে অষ্টপ্রহর আটঘাট বেঁধে উঠে প'ড়ে লাগ্‌তে হয়। এমন অবস্থায় প্রকৃতির চলাচলের গোপন পথগুলোতে মানুষ নানা সতর্ক পাহারা রেখেও কিছুতে যেন নিশ্চিন্ত হ'তে পারে না। কেন না প্রকৃতির হাতে কেবল যে সিঁধকাটি আছে তা নয়, সে ঘুষ দেবার নানা উপায় জানে।

যে দেশে সমাজ বহুব্যাপক সম্বন্ধজালে জটিল, সেদেশে ব্যক্তিগত মানুষের স্বাভাবিক ইচ্ছাকে নানাদিক থেকে দাবিয়ে রাখ্‌তে হয়। জীবনধারণের জন্মে যেখানে মানুষকে সর্ব্বদা দূরে দূরান্তরে যেতে বাধ্য করে, সেখানে সমাজ-বন্ধন বহুব্যাপক হ'য়ে উঠ্‌তে পারে না, সেখানে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের দাবী সহজেই অপেক্ষাকৃত শিথিল থাকে। যেখানে জীবনযাত্রা সহজ নয়, যেখানে প্রয়োজন বেশি ও আয়োজন দুঃসাধ্য সেখানে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের দাবী-স্বীকার সমাজবিধির অন্তর্গত হয় না, তা স্বেচ্ছাধীন হ'য়ে থাকে। আমাদের দেশে আমরা

ছোটোখাটো সকল প্রকার আনুকূল্যেই কৃতজ্ঞতা-স্বীকারের কোনো বাক্য ব্যবহার করিনে, এই নিয়ে য়ুরোপীয়েরা আলোচনা ক'রে থাকে। অনেকে তাড়াতাড়ি স্থির ক'রে বসে যে আমাদের স্বভাবেই কৃতজ্ঞতার উপসর্গ নেই। কিন্তু আসল কথা এই যে, আমাদের সমাজের প্রকৃতি এমন যে, এখানে সাহায্য পাওয়ার দায়িত্বের চেয়ে সাহায্য করার দায়িত্ব বেশি। যিনি বিদ্যালাভ করেছেন, বিদ্যাদানের দায়িত্ব তাঁরই, বিদ্যার্থীর প্রতি তা অনুগ্রহ নয়। অকিঞ্চন আগন্তুকের প্রতি যথাসাধ্য আতিথ্য করায় গৃহকর্তারই সার্থকতা। জাতকর্ম থেকে আরম্ভ ক'রে অন্ত্যেষ্টিসৎকার পর্য্যন্ত যে সকল অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে ঘরের মধ্যে বাহিরের অধিকার স্বীকার করাকে আমরা ধর্ম্মের নির্দেশ ব'লে জানি, সেই সকল ক্রিয়াকর্ম্মে আমন্ত্রিতদের কাছেই গৃহস্থ আপন কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা কর্ত্তব্য ব'লে গণ্য করে।

ভারতে আর্য্যেরা প্রথমে ছিলেন বনচারী, তারপরে ক্রমে হলেন পল্লীবাসী, পুরবাসী। প্রথমে ধেনু ছিল তাঁদের ধন, পশুচারণ ছিল তাঁদের জীবিকা। অবশেষে আর্য্যাবর্ত্তের ঐতিহাসিক রঙ্গমঞ্চ থেকে ঘন অরণ্যের যবনিকা ক্রমে ক্রমে উঠে গেল। তার নদীলালিত প্রশস্ত সমভূমির উপরে কুল-পতি-শাসিত গোষ্ঠীগুলি রূপান্তরিত হ'য়ে নরপতি-শাসিত রাজ্য আকারে চাক বেঁধে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। বনের জায়গায় দেখা দিল শস্যক্ষেত্র। তখন বৃহৎ জনসঙ্ঘের জীবিকার জন্যে কৃষিই প্রধান অবলম্বন হ'য়ে উঠ্‌ল। বৈদিক লড়াইয়ের মূল ছিল ধেনুহরণ, রামায়ণিক লড়াইয়ের মূল হচ্ছে সীতাহরণ, অর্থাৎ কৃষিক্ষেত্রের প্রতি উপদ্রব। রামচন্দ্র যে কৃষিধর্ম্মরক্ষক বীরত্বের প্রতিরূপক (symbol) তা তাঁর লোকবিখ্যাত নবদূর্ব্বাদলের মত শ্যামবর্ণের দ্বারাই প্রমাণিত হয়।

এ'র মধ্যে বিশেষ লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, এক কালে যে-কাহিনী ছিল কৃষিরক্ষা ও কৃষিপ্রচারের জয়গান, পরবর্ত্তী কালে সেই রামায়ণকাহিনীই বিশেষভাবে গৃহধর্ম্মনীতির মহিমাকীর্ত্তনরূপেই বিকাশ পেয়েছে। কেননা উপায়ে বহুলোকের সমবায়ে যে-অন্ন উৎপন্ন হয় বহুলোক সমবেত হ'য়ে সেই অন্ন ভোগ করতে পারে। অন্ন সংগ্রহ যখন অনিশ্চিত হয় না, অন্নই যখন মানুষকে একজায়গায় একত্র ক'রে স্থিতিদান করে, তখন মানুষের মধ্যে সেই সকল হৃদয়বৃত্তি অভিব্যক্ত হ'য়ে ওঠে যাতে ব্যবহার-বিধিতে অন্যের জন্যে ত্যাগস্বীকার সহজ হ'তে পারে।

রামায়ণের সেই আদিম কালের ভারত-ইতিহাসে আমরা তিন পক্ষ দেখ্‌তে পাই। এক হচ্ছে আর্য্য, আর হচ্ছে বানর ও রাক্ষস। বানরেরা বর্ব্বরজাতীয়; রাক্ষসেরা সুশিক্ষিত ও প্রবল। একদিন এ'দের মধ্যে পরস্পর বিরোধই ছিল প্রধান ব্যাপার, তখন সেই নিরন্তর যুদ্ধের অবস্থায় ভারতে সর্ব্বজাতীয় সমাজবন্ধন সম্ভবপর হয়নি। তারপরে ক্ষত্রিয় রাজাদের প্রভাব বিস্তারের সঙ্গে যখন লোকালয়গুলি ব্যাপক হ'য়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল, তখন যুদ্ধের চেয়ে শান্তির প্রয়োজন ও গৌরবই বড় হ'যে দেখা দিল। তখন মানুষের পরস্পর শান্তিমূলক যোগের সত্যই পরিস্ফুট হ'য়ে উঠ্‌ল। তাই রামায়ণে আর্য্যদের সঙ্গে বানর ও রাক্ষসের সম্বন্ধ বিস্তারই হচ্ছে প্রধান কীর্ত্তনীয় বিষয়।

শান্তিনীতির যে-বীরত্ব সে ত্যাগের বীরত্ব, তাতে নিবৃত্তির জয়। যে-দেশে সেই ত্যাগ ও নিবৃত্তির চর্চ্চা হ'য়ে থাকে, সেখানে সমাজের মূল উপাদান ব্যক্তি নয়, গৃহ; এবং সে গৃহ প্রশস্ত। তাই দেখ্‌তে পাই, রামায়ণ যখন ক্রমে ক্রমে মহাকাব্যরূপে অভিব্যক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল, তখন তার প্রধান বিষয় হ'ল গৃহধর্ম্মনীতির গৌরবঘোষণা। পিতা পুত্র, ভাই ভাই, স্বামী স্ত্রী, রাজা প্রজা, প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধ রক্ষার জন্য যে একনিষ্ঠ আত্মত্যাগশীল চরিত্রবলের প্রয়োজন, রামায়ণে তারই মহিমাকীর্ত্তন করা হয়েছে।

তাতে আর একটা নীতির প্রশংসা আছে, সে হচ্ছে যাকে বলে সত্যরক্ষা। যে-সমাজ বিপুল ও বিচিত্র, পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসরক্ষার প্রতিই তার একান্ত নির্ভর। আমাদের পুরাণে ইতিহাসে নানা কাহিনী নানা উপদেশে এই নীতি মানুষের মনে দৃঢ় ক'রে মুদ্রিত করবার চেষ্টা

যদি অন্যায়ে যদি অধর্ম্মে নিয়ে যায় তবে তাও পালনীয়, এ কথা মানতেও ভারতবর্ষ কুণ্ঠিত হয় নি।

অন্যকে আক্রমণের উদ্দেশ্যে নয়, কিন্তু পরস্পরকে রক্ষণ ও পালনের উদ্দেশ্যে যেখানেই বহু লোক সমবেত হয় সেখানে স্বভাবতই পরার্থপর ধর্ম্মনীতির উদ্ভব হ'য়ে থাকে। অর্থাৎ গোড়ায় যেটা প্রয়োজনের পথ অনুসরণে আসে, ক্রমে তার লক্ষ্যটা স্বার্থকে অতিক্রম ক'রে পরমার্থ দেখ্‌তে পায়। নিজেকে খর্ব্ব করা ত্যাগ করাই ক্রমে চরমধর্ম্মরূপে প্রকাশ পেতে থাকে। আমাদের দেশে তাই একদিন, প্রধানতঃ বাস-সুখের জন্যে নয়, বিষয়ভোগের জন্যে নয়, ধর্ম্মসাধনের জন্যেই অর্থাৎ মুক্তিপথের সোপান-রূপেই গৃহস্থাশ্রম সম্মান পেয়েছিল। নিজের স্ত্রীপুত্রের প্রতি আত্মীয়ভাব স্বাভাবিক ব'লেই সেটার চর্চ্চার দ্বারা স্বার্থবন্ধন শিথিল না হ'য়ে বরং দৃঢ় হ'তেই পারে, কিন্তু যে গৃহে দূরসম্পর্কীয়েরাও বাসের অধিকার পায়, যেখানে পরপ্রায়ের সঙ্গেও আপন সঞ্চয় ভাগ ক'রে চালাতে হয়, যেখানে রক্তের টানের দাবীর সঙ্গে নামমাত্র সম্পর্কের দাবীকে অভেদ ক'রে না মানলে লজ্জা ও নিন্দা, সেখানে আত্মীয়ের প্রতি স্বাভাবিক প্রীতিকে ছাড়িয়েও কল্যাণের ইচ্ছা ব'লে একটা বিশেষ হৃদয়বৃত্তির উদ্ভব হ'তে থাকে। সেটা ক্রমে এমন প্রবল হয় যে, নিজের প্রবৃত্তির ও রুচির প্রবর্ত্তনায় গৃহধর্ম্মের বিরুদ্ধাচার অত্যন্ত আত্মগ্লানি ও লোক-নিন্দার বিষয় হ'য়ে ওঠে। সেই জন্যে একথা ভারতবর্ষ কোনোদিন বলে নি যে, আপন গৃহ আপন প্রভুত্বের স্থান, আপন দুর্গ। সেখানে পদে পদে নানা উপলক্ষ্যে অন্যের অধিকার স্বীকার করতে গিয়ে অর্থের ও সময়ের ক্ষতি হ'লেও কল্যাণের হিসাবে তার হিসাব চলে, স্বার্থের হিসাবে নয়।

ব্যক্তিবিশেষের সুখ-সুবিধার ভিত্তিতেই যদি গৃহের পত্তন হয়, তাহলে গার্হস্থ্যস্বীকার তার আপন ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করে। সে যদি বলে গৃহসুখ চাইনে, স্বাতন্ত্র্যেই আমি সুখ পাই, তাহ'লে তা নিয়ে আপত্তি করবার কোন কারণ থাকে না। কিন্তু হিন্দুভারতে যেহেতু গার্হস্থ্যই সমাজের আবশ্যক উপাদান, এই জন্যে সেখানে বিবাহ সম্বন্ধে প্রায় জবরদস্তি চলে। সে যেন য়ুরোপীয় যুদ্ধসঙ্কটের আশঙ্কায় সর্ব্বজনীন কন্‌স্ক্রিপ্‌শন্ নীতির মত। গৃহে যে-ব্রাহ্মণ বাস করে অথচ অবিবাহিত, তাকে যে-ব্যক্তি দান করে বা তার দান গ্রহণ করে, ধর্ম্মশাস্ত্রমতে সে নরকে যায়। অত্রি বলেন, যে-ব্যক্তি বিবাহ না ক'রে গৃহস্থভাবে থাকে, তার অন্ন অভক্ষ্য। ধর্ম্মশাস্ত্রকার গৃহস্থাশ্রমকে বনস্পতির সঙ্গে তুলনা করেছেন; এই গাছের যেমন স্কন্ধ শাখা পল্লব, তেমনি সমাজের সকল অঙ্গই গৃহের প্রাণে প্রাণবান্। শাস্ত্রকার বলছেন, রাজা গৃহস্থাশ্রমীকে যেন সম্মান করেন। কিন্তু যে-মানুষ ঘর বানিয়ে যথেচ্ছা বাস করে, শাস্ত্রমতে সেই যে গৃহী তা নয়।

"গৃহস্থোঽপি ক্রিয়াযুক্তো ন গৃহেণ গৃহাশ্রমী।
ন চৈব পুত্রদারেণ স্বকর্ম্ম পরিবর্জ্জিতঃ॥"

এখানে কর্ম্ম অর্থে স্বার্থসাধন বোঝায় না, এ হচ্ছে লোক-যাত্রা, সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য পালন।

"তথা তথৈব কার্য্যাণি ন কালস্ত বিধীয়তে,
অস্মিন্নেব প্রযুঞ্জানো হ্যস্মিন্নেব প্রলীয়তে।"

দক্ষসংহিতা।

এই সংসারের সঙ্গেই আমাদের যোগ, এই সংসারেই আমাদের লয়, অতএব যখন যা কর্ত্তব্য তখনই তাই করা চাই, সুবিধা হিসাবে কালের বিধান করবে না।

বস্তুত গৃহস্থধর্ম্ম পালনকে শাস্ত্রে তপস্যা ব'লেই গণ্য করেন।

বসিষ্ঠ বলেন :—

"গৃহস্থ এব যজতে গৃহস্থস্তপ্যতে তপঃ
চতুর্ণামাশ্রমাণান্তু গৃহস্থস্তু বিশিষ্যতে॥"

দেবতার যাজন ও কর্ত্তব্য উপলক্ষে কৃচ্ছ্রসাধন গৃহস্থেরা ক'রে থাকেন, অতএব চার আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থাশ্রমই শ্রেষ্ঠ।

গৃহ যে-সমাজে ব্যক্তিবিশেষের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের একান্ত আশ্রয়, সেখানে গৃহস্থের বিষয়সম্পত্তিও একান্ত ব্যক্তিগত হয়। কেন না সম্পত্তিই গৃহতন্ত্রের ভিত্তি। এই সম্পত্তি যদি ব্যক্তিগত মানুষেরই ভোগের উপায়রূপে গণ্য হয়, তাহলে এই সম্পত্তিতে সাধারণে আনন্দ পায় না, তা তাদের ঈর্ষারই কারণ হ'য়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, এই সম্পত্তি অর্জ্জনে

সমাজধর্ম্মের কোনো নৈতিক বাধা থাকে না, প্রতিযোগিতার বিষ কেবলি তীব্র হ'য়ে উঠ্‌তে থাকে। প্রাচীন ভারতে যে সম্প্রদায়ের জীবনের লক্ষ্য ছিল জীবিকা সঞ্চয়ের সীমাবিহিত প্রয়োজন অতিক্রম ক'রে ধনেরই অনুরাগে ধন অর্জ্জন করা, সমাজে তাদের সম্মান কিছুমাত্র ছিল না। এমন কি, আজকের দিনেও সেই বণিকজাতির স্পৃষ্ট জল অশুচি। পাশ্চাত্য সমাজে আজকাল একদল সম্পত্তিকে বিপত্তি জ্ঞান ক'রে জোর ক'রে তাকে ঝাড়ে মূলে উপ্‌ড়ে ফেলবার চেষ্টা করছে। কেন না সেখানে বিশ্বমানুষের সঙ্গে বিশেষ মানুষের বিরোধের একটা প্রবল শক্তিই হচ্ছে এই দায়িত্ববিহীন সম্পত্তির শক্তি। সেখানকার পলিটিক্স্‌ও এ পর্য্যন্ত এই বিরোধে সম্পত্তিবানের পক্ষে সহায়তা ক'রে এসেছে।

মানুষের অনেক খাদ্য আজ আছে যা গোড়ায় ছিল তিতো, এমন কি বিষাক্ত। মানুষ তাকে ত্যাগ না ক'রে দীর্ঘকাল ভালোরকম চাষের দ্বারা তাকে উপাদেয় স্বাস্থ্যকর ক'রে তুলেছে। ভারতবর্ষও সম্পত্তিকে অস্বীকার করে নি, গৃহকে ধর্ম্মক্ষেত্র ব'লে স্বীকার করার দ্বারাই তার বিষ শোধন করেছে। বহুশতাব্দী ধ'রে ব্যক্তিগত সম্পত্তির সাহায্যেই ভারতবর্ষে সমাজধর্ম্ম পালিত হয়েছে; ভারতবর্ষের অন্ন বস্ত্র শিক্ষা ধর্ম্ম কর্ম্ম প্রভৃতি সমস্ত মঙ্গলই এই সম্পত্তির দ্বারাই বাহিত। ধনীর যথেচ্ছাকৃত বদান্যতার উপর সমাজ যখন নির্ভর করে, তখন তাতে দোষ ঘটায়। কারণ, দান যে-ব্যক্তি অবিচারে গ্রহণ করে তার দুর্গতি ঘটে, কিন্তু ভারতবর্ষে গৃহীর দ্বারা লোকহিত সাধন তার বদান্যতা নয়, সে তার বৈধ কর্ত্তব্য, তাতে তার নিজেরই সার্থকতা। এই দায়িত্ব কেবল-যে ধনীর তা নয়, সাধ্যানুসারে সকল গৃহীরই। শ্রাদ্ধ বিবাহ প্রভৃতি সকল ক্রিয়াকর্ম্মে আপামরসাধারণ সকলকেই সমাজকে নানা রকম টেক্সো দিতে হয়। মনু বলেছেন, ঋষিগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, ভূতসকল ও অতিথিরা গৃহীর উপর আশা স্থাপন করে, জ্ঞানী গৃহস্থ সেই বুঝেই কাজ করবেন। এমনি ক'রে বারে বারে নানা আকারেই স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় যে, বিশ্বজনের যথাবিহিত দাবীরক্ষা করাই গৃহধর্ম্মের লক্ষ্য। সেই জন্যেই মনুর মতে যারা দুর্ব্বলেন্দ্রিয়, তারা এই আশ্রমের অনুষ্ঠান করতে পারে না। প্রবৃত্তির উপরে যার প্রভুত্ব নেই গৃহস্থাশ্রমের সে অযোগ্য।

ভারতবর্ষের বিবাহের তত্ত্ব জান্‌তে হলে ভারতবর্ষের গৃহমূলক সমাজের তত্ত্ব ঠিকমত জানা চাই। তাহলে সহজেই বোঝা যায় যে, এমন সমাজে বিবাহে নিজের ইচ্ছার পথে চল্‌তে চাইলে বিপদ ঘটে; এখানে বিবাহের বাঁধ বাঁধা থাক্‌লে সমাজের বাঁধ টেঁকে। হিন্দুবিবাহ ব্যক্তিবিশেষের রুচি ও প্রবৃত্তির স্বাতন্ত্র্যকে খাতির করে না, ভয় করে। কোনো য়ুরোপীয় এই মনোভাবকে যদি বুঝ্‌তে চায়, তবে গত যুদ্ধকালের অবস্থা চিন্তা ক'রে দেখুক। সাধারণত য়ুরোপীয় ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে পরস্পর বিবাহের বাধা নেই। কিন্তু যুদ্ধের সময় যখন একটিমাত্র উদ্দেশ্যের কাছে মানুষের আর-সমস্ত অভিপ্রায় ছোটো হ'য়ে গেল, তখন শত্রুজাতির মধ্যে বিবাহ অসম্ভব হ'য়ে উঠেছিল। এমন কি, পূর্ব্ব হতেই যারা বিবাহে বদ্ধ ছিল তাদের মধ্যে কঠোরভাবে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিতে সমাজের সঙ্কোচ রইল না। এ'র কারণ, য়ুরোপে যুদ্ধরত জাতিদের মধ্যে তৎকালে সমবায়ের ভাব নিবিড় হওয়াতে, কেবল বিবাহ নয়, আহার বিহার সম্বন্ধেও নির্দ্দিষ্ট নিয়মের দ্বারা সকলকে সমভাবে সঙ্কুচিত হ'য়ে চল্‌তে হয়েছিল। তখন পরস্পরের ব্যবহারের বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্য প্রায় লোপ পেয়ে গেল। য়ুরোপীয় দেশের সেই অবস্থা অনেকটা পরিমাণে আমাদের দেশের সামাজিক অবস্থার সঙ্গে তুলনীয়। অর্থাৎ এখানে সমস্ত সমাজের একটা সম্মিলিত অভিপ্রায় অত্যন্ত নিবিড়; তাই পালন করাকেই যদি ধর্ম্ম ব'লে স্বীকার করতে হয়, তবে ব্যক্তিগত মানুষের স্বভাবদত্ত প্রবৃত্তিগুলিকে পদে পদেই সম্বরণ করা চাই। ভারতবর্ষে মানব সভ্যতাকে বিশুদ্ধ রাখবার সমস্যার এই ভাবেই সমাধান হওয়াতে সকলের কাছেই এখানকার সমাজ নানাদিক থেকেই, বিশেষত বিবাহ সম্বন্ধে, ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্যের খর্ব্বতা কঠোরভাবে দাবী করেছে।

একটা কথা মনে রাখা দরকার যে হিন্দুসমাজের মধ্যে একটা স্থায়ী যুদ্ধের অবস্থা রয়ে গেছে। কারণ এই সমাজ ভারতবর্ষে একমাত্র সমাজ নয়—নানা প্রকারের ভিন্ন আচার ব্যবহারের দ্বারা এই সমাজ চারিদিকে বেষ্টিত।

তাদের আক্রমণ থেকে নিজের সত্তাকে রক্ষা করবার জন্যে এ'কে অত্যন্ত সতর্ক থাকৃতে হয়েছে। এইজন্যে এ সমাজ সর্ব্বদাই গড়ের মধ্যে বাস করে। এইজন্যে আত্মপরের ভেদ ও বিরোধ সম্বন্ধে এ-সমাজ এত অতি-মাত্রায় সসঙ্কোচ ভাবে সচেতন। অন্য কোনো সভ্যদেশে হিন্দুসমাজের মত অবস্থা কোনো সমাজের নেই। এই জন্যে সে সকল সমাজে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার এমন খর্ব্বতা ঘটেনি। আমাদের সমাজে এই খর্ব্বতা খাওয়া-ছোঁওয়া প্রভৃতি তুচ্ছ বিষয়ে—সকলের চেয়ে বেশি বিবাহে,—কারণ বিবাহ গৃহবন্ধনের মূলে, এবং গৃহই আমাদের সমাজের মূলভূত। যাই হোক আমাদের সমাজকে ঠিকমত বিচার করতে হ'লে বোঝা চাই যে, এ সমাজে যুদ্ধের অবস্থার বিরাম নেই, এবং এই অবস্থা বহুযুগ হ'তে চ'লে আসছে। এই যুদ্ধের দুর্গ হচ্ছে গৃহ, এই যুদ্ধের যোদ্ধা হচ্ছে গৃহী।

ভারতবর্ষে সমাজের এই অভিব্যক্তি একদিনেই হয় নি। তাকে অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন পরিণামের ভিতর দিয়ে যে'তে হয়েছে। পূর্ব্ব ইতিহাসের সেই সকল পরিশিষ্ট অনেকদিন পর্য্যন্ত নূতন কালেও সজীব ছিল। এই জন্যে গান্ধর্ব্ব রাক্ষস আসুর পৈশাচ বিবাহকেও মনু তাঁর সমাজবিধির মধ্যে স্থান দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু ঐ সকল বিবাহে সামাজিক ইচ্ছা নয়, ব্যক্তিগত মানুষের ইচ্ছাই প্রবল। কন্যাকে টাকা দিয়ে কিনে নেওয়া আসুর বিবাহ, তাকে বলপূর্ব্বক হরণ করা রাক্ষস বিবাহ। সুপ্তা বা প্রমত্তা কন্যাতে উপগত হওয়া পৈশাচ বিবাহ। ধর্ম্মশাস্ত্রে এইগুলোকে অগত্যা স্বীকার ক'রেও নিন্দা করা হয়েছে। কেন না অর্থবল, বা বাহুবল, বা রিপুর বল স্বভাবতই উদ্ধত, তা' পরের বিধি মানতে চায় না।

গান্ধর্ব্ব-বিবাহও নিন্দিত, কিন্তু অনেকদিন পর্য্যন্ত এ'র স্থান ভারতবর্ষীয় সমাজে প্রশস্ত ছিল, আমাদের প্রাচীন ইতিহাসে সাহিত্যে তার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। স্থিতিশীল সমাজের স্থিতিধর্ম্ম সেই সমাজের সকল শ্রেণীর পক্ষেই সমান প্রবল হ'তে পারে না। স্বভাবতই ক্ষাত্রধর্ম্মে নিবৃত্তির চর্চ্চাকে একান্ত ক'রে তোলা সহজ নয়। যে ক্ষত্রিয় নব নব ক্ষেত্রে আপন চঞ্চল শক্তির সাধনা করতে ছোটে, তাকে স্থাবর গার্হস্থ্যনীতির জটিল জালে একান্ত বেঁধে রাখা অসম্ভব। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে সমুদ্রপারে যেতে নিষেধ, তার কারণই এই। সমাজকে অচল বিধিতে বাঁধবার জন্যেই সমাজের মানুষকেও সে অচল ক'রে রাখতে চেয়েছে। কারণ, যে-চলাতে মনকে চঞ্চল ক'রতে পারে, যাতে আমাদের চিন্তার, বিশ্বাসের ও ব্যবহারের অভ্যাস কিছুমাত্র ন'ড়ে যায় তাতে আমাদের সমাজের একেবারে ভিতে গিয়ে ঘা মারে। শুধু সমুদ্রযাত্রা নয়, ম্লেচ্ছ দেশে বাসও নিষিদ্ধ ও সমাজে দণ্ডনীয় ছিল। আজকাল, পাশ্চাত্য দেশে দেখতে পাই, বলশেভিক মতকে স্বদেশের মন থেকে ঠেকিয়ে রাখবার জন্যে নানাপ্রকার বল প্রয়োগ করা হচ্ছে। এ জিনিষটা সমুদ্রযাত্রানিষেধের সঙ্গে তুলনীয়। অর্থাৎ এখনকার কালে যে নীতিকে রাষ্ট্র-স্থিতির প্রতিকূল ব'লে গণ্য করা হয় তার সম্পর্ক তিরস্কৃত রাখবার অভিপ্রায়ে কঠিন শাসন চলছে। এ সম্বন্ধে জনসাধারণের মতের বা আচরণের স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করা হচ্ছে না। আমাদের দেশে রাজনিষিদ্ধ সাহিত্য এই শ্রেণীর। আজকের দিনে ফ্যাসিজ্‌ম্ নামে যে-একটি পীড়নশক্তি পাশ্চাত্য মহাদেশে প্রবল হ'য়ে উঠেছে, সে হচ্ছে আমাদের সমাজপ্রচলিত নিষেধনীতির অবিকল প্রতিরূপ। ব্রাহ্মণের পন্থা নেবার স্পর্দ্ধা শূদ্র যদি করত তবে একদা ভারতে নিষ্ঠুরভাবে তার প্রাণ-দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। পাশ্চাত্য দেশে ফ্যাসিজ্‌ম্, কু-ক্লুক্স-ক্যানিজ্‌ম্, লিঞ্চিং প্রভৃতি নানাপ্রকার নিষ্ঠুর চেষ্টায় সেই মনো-বৃত্তিরই আদর্শ দেখতে পাই। সমাজে সকল লোকেরই মনোভাব ও আচরণ কতক গুলি প্রধান প্রধান বিষয়ে অবিকল একই রকম হ'লে তাতে ব্যক্তিগত মানুষের বুদ্ধি ও চরিত্র বিকাশের বাধা দিতে পারে কিন্তু সমাজের স্থিরত্বপক্ষে সেটা যে অনুকূল তাতে সন্দেহ নেই। যে-সমাজে চলিষ্ণুতাকে সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধা করে না সে সমাজে ব্যক্তিগত ইচ্ছা, রুচি ও বিশ্বাসের স্বাতন্ত্র্যকে কঠোরভাবে দমন করা হয় না। যে-সমাজ গাছের মতো নয় মন্দিরের মতো, অবৃদ্ধিশীল স্থাবরতাই যার সম্পদ, তার একখানি ইঁটও নড়তে দিলে সেটা ক্ষতি।

কিন্তু এই নিশ্চলতার কঠোর বন্ধনে সমাজের সব মানুষকে সমভাবে বেঁধে রাখা যায় না; সেটা মানব-ধর্ম্মের বিরোধী, প্রাণ ধর্ম্মের প্রতিকূল। এই জন্যে কোনো দেশে যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রাণশক্তি সবল থাকে ততক্ষণ প্রাণের চঞ্চলতা নিশ্চল নিষেধগুলিকে নিয়ত আঘাত না ক'রে থাক্‌তে পারে না। এ দেশে ক্ষত্রিয়েরা যখন যথার্থভাবেই ক্ষত্রিয় ছিলেন তখন নিত্যনৈমিত্তিক রীতিপালনের অভ্যাসে তাঁদের শক্ত ক'রে বেঁধে রাখা সম্ভব ছিল না। তাই তখনকার কালে ভারতইতিহাসে ধর্ম্মবিপ্লব সমাজ-বিপ্লব যা-কিছু ঘটেছে তা ক্ষত্রিয়দের দ্বারা। এ কথা মনে রাখ্‌তে হবে, বুদ্ধ ছিলেন ক্ষত্রিয়, মহাবীর ছিলেন ক্ষত্রিয়, কৃষ্ণ যে-যদুবংশের লোক ছিলেন সে বংশের রীতিনীতি একেবারেই সাধুশাস্ত্রসম্মত ছিল না। সমস্ত মহাভারত পড়্‌লে বারেবারেই এ কথা মনে আসে যে, সেই প্রাচীন-কালে সমাজের পাকা বাঁধ বাঁধবার চেষ্টা যতই থাক্ তাকে নানাপ্রকারে লঙ্ঘন না করেছে এমন বিখ্যাত বংশ একটিও ছিল কিনা সন্দেহ। একদিন অপেক্ষাকৃত অধুনাতন কালে যখন ভারতে ক্ষত্রিয়ের অভিভব হ'য়ে ব্রাহ্মণই সমাজে প্রায় একেশ্বরতা লাভ করেছে, তখনই সমাজবন্ধন এমন কঠিন দৃঢ় হ'য়ে উঠ্‌তে পেরেছে। প্রাচীনকালে ভারতে স্থিতিশীল সমাজের ক্ষেত্রের মাঝখান দিয়েই গতিশীল প্রাণের ধারা প্রবাহিত হবার একান্ত বাধা ঘটে নি। এই জন্যে তখন নানা উপলক্ষেই ধর্ম্মশাস্ত্রকে বল্‌তে হয়েছে, "প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা"।

মনু বলেছেন, বরকন্যার পরস্পর ইচ্ছাসংযোগে বিবাহকে গান্ধর্ব্ব বিবাহ বলে। কিন্তু তাকে কামসম্ভব ব'লে তিনি একটু খোঁটা দিয়েছেন। কামনার দীপ্ত মশাল যে-বিবাহে পথ দেখায় সে বিবাহের মুখ্য লক্ষ্য সমাজবিধি-রক্ষা নয়, প্রবৃত্তির চরিতার্থতা। এমন কি, অপেক্ষাকৃত শিথিলবন্ধন য়ুরোপীয় সমাজেও নরনারীর দ্বন্দ্ব-সংঘটনে কামনার বেগে মানুষকে পদে পদে যে অসামাজিক সঙ্কটে নিয়ে যায় তা সকলের জানা আছে। কিন্তু সেখানকার সমাজ অনেকটা চলিষ্ণু ব'লেই এরকম সঙ্কট সমাজের পক্ষে আমাদের দেশের মতো একেবারে সাংঘাতিক হয় না। আমাদের শাস্ত্রে ব্রাহ্ম বিবাহই শ্রেষ্ঠ ব'লে গণ্য। এই বিবাহের রীতি অনুসারে কন্যাকে বর প্রার্থনা করবে না, অযাচক বরকে কন্যাদান করতে হবে। বর যে-কন্যাকে নিজে প্রার্থনা করে তার সামাজিক উপযোগিতাকে সে নিরপেক্ষভাবে বিচার করতে পারে না। অতএব বিবাহ অনুষ্ঠানকে সামাজিক হিসাবে যদি বিশুদ্ধ রাখ্‌তে হয়, তবে বরকন্যার ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে সতর্কভাবে বাঁচিয়ে চলতেই হবে। য়ুরোপে রাজকুলে বিবাহে যেরকম কঠিন ও সঙ্কীর্ণ নিয়ম আমাদের সমাজে সর্ব্বত্রই তাই।

ভারতবর্ষে বিবাহরীতির মূলে যে মনোভাবটি আছে কোনো য়ুরোপীয় যদি তা স্পষ্ট ক'রে বুঝ্‌তে চান তাহলে পাশ্চাত্যে আজকাল সৌজাত্য নিয়ে (Eugenics) যে আলোচনা চল্‌ছে সেইটে বিচার ক'রে দেখ্‌লে সুবিধা হ'তে পারে। বিজ্ঞান ব্যক্তিগত ভাবাবেগকে যথেষ্ট আমল দিতে চায় না। বিবাহে সুসন্তান হ'বে এই যদি লক্ষ্য হয়, তাহলে কামনা-প্রবর্ত্তিত পথকে নিষ্ঠুরভাবে বাধা না দিলে চলে না। বিজ্ঞান বলে, স্ত্রীপুরুষের মধ্যে যেখানে কোনো বংশসঞ্চারী দৈহিক রোগ বা মানসিক বিকার আছে সেখানে রাজদণ্ডের বা সমাজশাসনের সাহায্যে বিবাহকে বাধা দেওয়া কর্ত্তব্য। একথা স্বীকার করলেই বিবাহকে ভাবাবেগের টান থেকে সরিয়ে এনে বুদ্ধির এলেকায় দাঁড় করাতে হয়। কেন না ভাবা-বেগকে এ'র মধ্যে স্থান দিতে গেলেই সমস্যা কঠিন হ'য়ে ওঠে। ফলাফল বিচার করতে সে চায় না; বিচারকের বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহ সর্ব্বদাই অনিবার্য্য হ'য়ে উঠবেই। ভারতবর্ষ নির্ম্মমভাবেই তাকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল।

য়ুরোপীয় সমাজের মূলপ্রকৃতি রাষ্ট্রিক, আর্থিক; তার আকার, আয়তন ও প্রভাব যতই বৃহৎ ও প্রবল হ'য়ে উঠ্‌বে ততই তার প্রয়োজনের কাছে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে বলি দিয়ে চল্‌তে হবে। তার নানা লক্ষণ সেখানে দেখা যাচ্ছে। আমাদের দেশে সমাজের মূল-প্রকৃতি সাম্প্রদায়িক অর্থাৎ শ্রেণী বিশেষের আচার-ধারাকে রক্ষা করার দ্বারা তার ধর্ম্মকে (culture) বিশুদ্ধ রাখার ব্যবস্থাতন্ত্র। এই ব্যবস্থার প্রয়োজন একদা অত্যন্ত বলবান হওয়াতে তার কাছে ব্যক্তিগত বিচার ও ব্যবহারের স্বাতন্ত্র্যকে এ দেশে অত্যন্ত খর্ব্ব করা

হয়েছে। আমাদের দেশের সমাজনীতি ও বিবাহরীতি আলোচনা করবার সময় আমাদের দেশের এই সামাজিক সমস্যার কথা বাহিরের লোকের চিন্তা ক'রে দেখা দরকার।

পূর্ব্বেই বলেছি, ক্ষত্রিয়েরা বিবাহে কড়া নিয়মের শাসন তেমন ক'রে মানেন নি। কিন্তু সেই না-মানাটা সমস্ত সমাজের আদর্শকে যে পীড়া দিত, তা কালিদাসের কাব্য থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়। সমাজনীতি রক্ষার উদ্দেশে ভারতবর্ষের বিবাহ যে-সৌজাত্যের প্রতি লক্ষ্য করত, তার সম্বন্ধে কবির বিশেষ বেদনা ছিল সন্দেহ নেই। অথচ বিশ্বের লীলাময়ী প্রাণ-প্রকৃতির মাঝখানে নরনারীর স্বাভাবিক প্রেমচাঞ্চল্যের সৌন্দর্য্য বিকাশও কবির চিত্তকে মুগ্ধ করেছে। কালিদাসের প্রায় সকল বড় কাব্যেরই মধ্যে এই দ্বন্দ্ব দেখা যায়। ভরতবংশের জন্ম ভারত ইতিহাসের একটা প্রধান ঘটনা, অথচ এই বংশের আদিতে প্রবৃত্তির আকর্ষণে স্ত্রীপুরুষের যে-আত্মবিস্মৃতি ঘটেছিল কবি তাঁর নাটকে তার বৃত্তান্তকে সৌন্দর্য্যদৃষ্টিতে স্বীকার ক'রেও অবশেষে কল্যাণদৃষ্টিতে শোধন ক'রে নিয়েছিলেন। তপোবনে অরণ্যের সহজশোভার মধ্যে শকুন্তলা সেখানকার তরুলতার সঙ্গে সঙ্গেই নব যৌবনে দেহে মনে হিল্লোলিত হ'য়ে উঠ্‌ছে। সেখানে প্রকৃতির ইঙ্গিত সব জায়গাতেই, সমাজশাসন এখনো তার তর্জ্জনী তোলবার অবকাশ পায় নি। এই অবস্থায় দুষ্যন্তের সঙ্গে শকুন্তলার যে-মিলন ঘটেছিল, সমস্ত সমাজের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য ঘট্‌তে পায় নি। কবি বললেন সেই কারণে এ'র মধ্যে একটা অভিশাপ র'য়ে গেল। সে হচ্ছে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আত্ম-বিস্মৃতির প্রতি অভিশাপ। শকুন্তলা আতিথ্যধর্ম্ম পালন করতে ভুলে গেলেন; তার কারণ, প্রকৃতি যখন আপন উদ্দেশ্য সাধনে লাগে তখন অন্য সব উদ্দেশ্যকে খাটো ক'রে দেয়। এইখানে জৈব ধর্ম্মের সঙ্গে মানবধর্ম্মের বিরোধ বাধ্‌ল। রাজসভায় শকুন্তলার প্রেমের উপর অপমানের বজ্র এসে পড়্‌ল; তার যে বাঁচবার পথ ছিল না।

সপ্তমাঙ্কে যে-তপোবনে রাজার সঙ্গে তপস্বী কন্যার স্থায়ী মিলন ঘটল. সেখানে প্রকৃতির প্রাণলীলাকে আচ্ছন্ন ক'রে দিয়ে কবি তপস্যার কঠোর মূর্ত্তিকেই সর্ব্বত্র প্রকাশ করলেন। সেখানে মহর্ষি তখন পতিব্রতধর্ম্ম ব্যাখ্যায় নিযুক্ত ছিলেন। শকুন্তলা সেখানে ব্রতধারিণী জননী মূর্ত্তিতে দেখা দিলেন। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে নরনারীর মিলনের দুই বিরুদ্ধ মূর্ত্তিকে কবি এই নাটকে উজ্জ্বল ক'রে দেখিয়েছেন। ভরতজন্মের ভূমিকাটিকে তিনি তপস্যার অগ্নিদাহনে শুচি ক'রে দিয়ে বলেছেন প্রেমের এইত চরিতার্থতা। কেন না জৈব প্রকৃতি যখন প্রেমের সারথ্য নেয় তখন সে যে প্রবৃত্তির জোয়ালে তাকে বাঁধে। কিন্তু ধর্ম্ম যখন তার চালক হয়, তখন সে-প্রেম মুক্তিরূপে প্রকাশ পায়। নিবৃত্তিশান্ত আত্মত্যাগরত প্রেমের সেই অচঞ্চল মুক্ত স্বরূপই পরমসুন্দর। কবি এই কথাটিকে শাস্ত্র উপদেশের আকারে ব্যাখ্যা করেন নি, তিনি সুন্দরের সংযত গম্ভীর কঠোর নির্ম্মল মূর্ত্তিটিকে মোহ আবরণ থেকে মুক্ত ক'রে তাঁর নাটকে দেখিয়ে দিয়েছেন।

তাঁর কুমারসম্ভবেও এই একই কথা। সে কাব্যে কবি নরনারীর চিরকালীন প্রেমের পবিত্র দৈবস্বরূপ দেখিয়েছেন। তাঁর কথা হচ্ছে এই যে, যখন দৈত্য জয়ী হয়, দেবতার পরাভব ঘটে, তখন নরনারীর প্রেম তপস্যা হ'য়ে স্বর্গকে উদ্ধার করে। সংসারে পাপবিজয়ী কুমারের জন্মই দেবতাদের চির-আকাঙ্ক্ষিত ব্যাপার। সেই কুমারকে আন্‌তে গেলে কামনার উদ্দাম বেগকে নিরস্ত ক'রে দিয়ে নিবৃত্তিপূত সাধনাকে আশ্রয় করতে হবে। সিদ্ধির সেই কঠোররূপই যথার্থ সুন্দর; শিব রূপবান নন্ ব'লে যখন উমার কাছে তাঁর নিন্দা করা হয়েছিল তখন উমা এই ভাবেই তার উত্তর দিয়েছিলেন। মোহের সৌন্দর্য্যকে বসন্তপুষ্পাভরণে আস্‌তে হয় কিন্তু মুক্তির সৌন্দর্য্য নিরাভরণ।

যাই হোক, কালিদাসের রঘুবংশই হোক্, কুমারসম্ভবই হোক্ আর ভরতজন্মের আখ্যানমূলক অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকই হোক্, তিনের মধ্যেই বিবাহ সম্বন্ধে ভারতীয় কবির মনের কথাটি ব্যক্ত হয়েছে। বিবাহকে তিনি তপস্যা বলেছেন;—এই তপস্যার পন্থা কিম্বা এ'র লক্ষ্য আত্মসুখভোগ নয়। এ'র পন্থা হচ্ছে কামনাদমন এবং এ'র লক্ষ্য হচ্ছে কুমারসম্ভব, যে-কুমার সমস্ত কু, সমস্ত মন্দকে মারবে, স্বর্গরাজ্যকে ব্যাঘাতশূন্য ক'রে দেবে।

কালিদাসের এই তিন কাব্যেরই ভিতরকার বেদনা

দে'খে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তাঁর সময়ে ক্ষত্রিয় রাজারা বিবাহে সংযত আর্য্য আদর্শ লঙ্ঘন ক'রে কামনার অনুসরণে সমাজে অপজনন (degeneracy) ঘটাচ্ছিলেন। এই সর্ব্বনেশে ব্যাঘাতকে দূর করবার জন্তে শিবের জ্ঞাননেত্রের ক্রোধাগ্নির প্রয়োজন হয়েছিল। নইলে সমাজকে দৈত্য-রাজকতা থেকে বাঁচাবার উপায় ছিল না। তাই কবি বিবাহকে কন্দর্পের শাসন থেকে উদ্ধার ক'রে শিবের তপোবনে আহ্বান ক'রে আন্‌তে চেয়েছিলেন।

যাই হোক্, কবির এই কাব্যগুলি থেকে ভারতীয় বিবাহের যথার্থ আদর্শ যেমন বোঝা যায় এমন কোনো ধর্ম্ম-শাস্ত্র থেকে নয়। এ'তে তিনি প্রবৃত্তির আকর্ষণের সঙ্গে ধর্ম্মের দাবীর সংগ্রাম দেখিয়েছেন। প্রকৃতির প্রাণলীলার মধ্যে যে-সৌন্দর্য্য আছে, তাকে তিনি একটুও খাটো করেন নি, কিন্তু মানুষের তপস্তার মহিমাকে তার উপরেও জয়ী ক'রে দেখিয়েছেন। কেন না, মানুষকে প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত হ'তে হবে; সেই মুক্তির শরীরীরূপ হচ্ছে কুমার—কুমারই মুক্তি সংগ্রামের বিজয়ী বীর; সমাজকে পাপ থেকে, পরাভব থেকে সে রক্ষা করে।

এইখানে প্রশ্ন ওঠে, বিবাহ থেকে ইচ্ছাকে যদি সম্পূর্ণ নির্ব্বাসিত করা হয়, তা হলে দাম্পত্যের মধ্যে প্রেমের স্থান হয় কি ক'রে? এ দেশের সঙ্গে যাদের যথার্থ পরিচয় নেই এবং যাদের বিবাহপ্রথা আমাদের থেকে সম্পূর্ণ অন্তরূপ তারা গোড়াতেই ধ'রে নেয় যে,আমাদের বিবাহ প্রেমহীন। কিন্তু সেই ধারণা যে সম্পূর্ণ মিথ্যা তা আমরা প্রত্যক্ষ জানি। খাঁটি প্রেম নরনারীর স্বেচ্ছাসম্মত বিবাহেও যে সুলভ নয়, তার অনেক প্রমাণ প্রত্যহ পাওয়া যায়। বিবাহকে যদি মান্‌তে হয়, তবে একথাও স্বীকার করতে হবে যে, মানুষ এমন কোনো ব্যবস্থাই করতে পারে না, যা'তে বিবাহের পূর্ব্বে যা স্থির করা যায়, স্ত্রীপুরুষের সুদীর্ঘ বিবাহিত কালে তা' অক্ষুন্ন সত্য হ'য়ে টি'কতে পারে। এই জন্তেই বাইরের দিক থেকে এত লোকলজ্জা, এত আইনের শাসন। অথচ যে-সম্বন্ধ পরস্পর প্রেমের উপরেই সত্য, যখনই তাকে বাহিরের বাঁধনে জোর ক'রে বাঁধা যায়, তা অত্যন্ত অশুচি হয়, তার মত দুঃখ অপমান মানুষের পক্ষে আর কিছুই নেই। সন্তানের দায়িত্ব চিন্তা ক'রে মানুষ এসমস্তই স্বীকার করেছে কিন্তু আজো কোনো সমাজই বল্‌তে পারে নি যে বিবাহ-সমস্তার নির্দ্দোষ সমাধান সে করেছে। সর্ব্বত্রই অনিশ্চিতের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে প'ড়ে, তারপরে আকস্মিক সুযোগ দুর্য্যোগের ভিতর দিয়ে হয় তলায় তলানো, নয় ঘাটে পৌঁছনো হ'য়ে থাকে।

এই সমস্তার সমাধান চিন্তা করতে গিয়ে ভারতবর্ষ বলেছে বিবাহের গোড়াতেই ইচ্ছার বেগকে স্বীকার না করাই নিরাপদ। কেননা ইচ্ছা কল্যাণ বিচার করতে অসমর্থ। তা হ'তে পারে, কিন্তু যে-ইচ্ছার সঙ্গে লড়াই সেটা যে প্রকৃতির সব চেয়ে বড় সৈনিক। যখন সে অস্ত্র উদ্যত করে তখন তাকে ঠেকাবে কে? ভারত বলেছে, যে-ইচ্ছা স্ত্রীপুরুষের দ্বন্দ্ব ঘটায় তার একটা বিশেষ বয়স আছে। অতএব যদি বিবাহকে সমাজের সম্পূর্ণ ইচ্ছানুমত করাই শ্রেয় হয়, তবে সেই বয়সের পূর্ব্বেই বিবাহ চুকিয়ে দেওয়া ভালো। ভারতে অল্প বয়সে বিবাহের মূল কারণই হচ্ছে এই।

মনে আছে কোনো একজন কৃষিতত্ত্বজ্ঞের কাছে যখন আক্ষেপ ক'রে বলেছিলুম, যে আমাদের দেশে সাধারণ গোচারণ ভূমি প্রত্যহ সঙ্কীর্ণ হ'য়ে আসাতেই গো-জাতির অবনতি হচ্ছে, তিনি বলেছিলেন, মাঠে স্বেচ্ছা-চারণের দ্বারাই গোরুরা উপযুক্ত খাদ্য পায়, এটা কল্পনা করা ভুল। প্রয়োজনমত বিশেষ খাদ্য চাষ ক'রে সেইটে গোরুকে খাওয়ানোই বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিসঙ্গত। দাম্পত্য-প্রেম সম্বন্ধে সেইভাবেই আমাদের দেশে তর্ক উঠেছিল। আমাদের দেশ বলেছিল স্বেচ্ছা-উদগত প্রেমের উপর ভরসা নেই, প্রেমের চাষ করতে হ'বে। তার আয়োজন হ'য়ে থাকে বিবাহের পূর্ব্বথেকেই। স্বামী ব'লে একটি ভাবকে শিশুকাল হতেই বালিকারা ভক্তি করতে শেখে। নানা কথা কাহিনী ব্রত পূজার ভিতর দিয়ে এই ভক্তিকে মেয়েদের রক্তের সঙ্গে একেবারে মিশিয়ে দেওয়া হয়। তারপরে স্বামীকে যখন পায় তখন তাকে তারা ব্যক্তি ব'লে নয় স্বামী ব'লে দেখে। সেই স্বামী অনেকখানিই তাদের নিজেরই মনের জিনিষ, বাইরের জিনিষ নয়। বিচার বুদ্ধি পরিণত হবার পূর্ব্ব হতেই বিশেষ ব্যক্তির উপরে এই স্বামীভাব আরোপ ক'রে দিনে দিনে এই

পত্নিগত সংস্কার তাদের দেহমনকে অধিকার ক'রে তোলে। নানা প্রকার সেবা ও ব্যবহারের দ্বারা এই সংস্কার কেবলি প্রবল হ'তে থাকে।

আমাদের সমাজে সতী স্ত্রীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধেও একটা সংস্কারের প্রচলন আছে। স্ত্রীর প্রতি সাধ্বী গৃহিণী ভাবে একটি ভক্তিভাবের চর্চ্চা আমাদের দেশে দেখা যায়। অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষের প্রেম ব'লে যে একটি স্বাভাবিক হৃদয়বৃত্তি আমাদের আছে তাকে অতিক্রম ক'রে দাম্পত্য-প্রেম নামক একটি সামাজিক হৃদয়বৃত্তিকে সাধনার দ্বারা গ'ড়ে তোলবার বিশেষ চেষ্টা আমাদের দেশে আছে। কিন্তু একথা মান্‌তেই হ'বে যে, মেয়েদের স্বভাব হৃদয়-প্রবণ (Emotional) ব'লে এই দাম্পত্যপ্রেম মেয়েদের পক্ষে যত সহজ হয়েছে, পুরুষের পক্ষে তত সহজ হয় নি। পুরুষের পক্ষে দাম্পত্য একনিষ্ঠতা সম্বন্ধে সমাজের কিঞ্চিৎ অনুমোদন আছে, কিন্তু কিছুমাত্র অনুশাসন নেই। এমন কি, স্ত্রীর বর্ত্তমানে বা অবর্ত্তমানে এই একনিষ্ঠতা লঙ্ঘনের পক্ষে বিশেষ বিধিরও অভাব নেই। তা ছাড়া অবৈধ লঙ্ঘনকে শাসন করবার সামান্য চেষ্টা মাত্রও দেখা যায় না। বস্তুত একপক্ষে দাবীকে অত্যন্ত বেশি কড়া করার দ্বারাই অন্যপক্ষে শিথিলতাকে সহজ ক'রে দেওয়া হয়েছে।

অতএব ভারতীয় বিবাহের বিচার করতে হ'লে একথা জানা চাই যে এ-বিবাহে স্ত্রী পুরুষের অধিকারের সাম্য নেই। এখানে অধিকার বল্‌তে আমি বাহ্য অধিকারের কথা বল্‌ছি নে। এই অসাম্যের দ্বারা স্ত্রীলোকের চরিত্রে হীনতা ঘট্‌তে পার্‌ত। তা যে ঘটেনি তার কারণ, স্বামী তার পক্ষে আইডিয়া। ব্যক্তির কাছে পাশববলে সে নত হয় না, আইডিয়ার কাছে ধর্ম্মবলে সে আত্মসমর্পণ করে। স্বামী যদি মানুষের মতো হয়, তা হলে স্ত্রীর এই আইডিয়াল প্রেমের শিখা তার চিত্তেও সহজে সঞ্চারিত হয়। আমরা এমন দৃশ্য দেখেছি। এই আইডিয়াল প্রেম হচ্ছে যথার্থ মুক্ত প্রেম। এ প্রেম প্রকৃতির মোহবন্ধনকে উপেক্ষা করে।

একথা মনে রাখা চাই, ভারতসমাজ গৃহকেও চরম ব'লে স্বীকার করে নি। মুক্তির অন্বেষণে একদিন গৃহকে পরিত্যাগ করতে হ'বে, এই ছিল তার উপদেশ। ভারতের উদ্দেশ্য ছিল গৃহকে মুক্তিপথের সোপান ক'রে গড়া। সন্তানেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হ'লে আজও আমাদের দেশে অনেক গৃহী গৃহ ছেড়ে তীর্থে বাস করে। ভারত সভ্যতার মূলে এই একটা স্বতোবিরোধ আছে। একদিকে এ সভ্যতা গৃহপ্রধান, এবং এই গৃহ মানুষের সঙ্গে আপন সম্বন্ধ অত্যন্ত ব্যাপকভাবে স্বীকার করে। ভারত আবার আর একদিকে আত্মার মুক্তির প্রতি লক্ষ্য রেখে সকল সম্বন্ধই একে একে ছিন্ন করতে বলে। সম্বন্ধকে স্বীকার করতে বলবার কারণ এই যে, তার মধ্য দিয়ে না গেলে তাকে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। মানুষের মনে যে সকল স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে তাদের ক্ষয় করতে গেলেও তাদের ব্যবহার করতে হয়। এই ব্যবহারকে নিবৃত্তির দ্বারা নিয়মিত ক'রে তবে প্রকৃতির বন্ধনগুলিকে একদিন কাটানো সম্ভবপর হয়। বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের এই তফাৎ। প্রকৃতির শাসন সম্বন্ধে বৌদ্ধধর্ম্ম গোড়া থেকেই একেবারে নৈরাজ্যপন্থী, anarchist।

ভারতসমাজের মুস্কিল এই যে, চারিদিক থেকে অতি যত্নে রক্ষিত না হ'লে এ সমাজ বিশ্লিষ্ট হ'য়ে পড়ে। কারণ এসমাজ বিচারকে শ্রদ্ধা করতে সাহস করে নি; আচারকেই একান্তভাবে অবলম্বন করেছে; প্রধানত এ'র বন্ধন আভ্যন্তরিক স্নায়ু শিরার নয়, বাহ্যিক দড়িদড়ার। এইজন্যেই নড়াচড়ার সম্বন্ধে এ'র এত বেশি সতর্কতা। বাহিরের বন্ধনের গ্রন্থি পাছে বাহিরের একটুমাত্র আঘাতে খু'লে যায় এইজন্যেই বাহিরকে সে এত বেশি ভয় করে। এই সতর্কতা আর তো খাটে না। সমুদ্রের এ পারের লোককে ওপারে যেতে আটকানো যায় কিন্তু ওপারের লোক যখন এপারে এসে পড়ে তখন কি করা যাবে? নূতন শিক্ষা নূতন মত, নূতন অভ্যাস বাঁধভাঙা বন্যার মত ভারতবর্ষের উপর আছ্‌ড়ে পড়েছে। যে সব বিশ্বাস ছিল তার সমাজের স্তম্ভ, সে সব বিশ্বাসে প্রতিদিনই ছোটো বড় ছিদ্র দেখা দিচ্ছে। মত ও বিশ্বাসের এই পরিবর্ত্তন হ'ল ভিতরকার কথা, কিন্তু বাইরের দিকের প্রবল আক্রমণটা আর্থিক। অন্নস্বচ্ছলতা না থাকলে বহুলসম্বন্ধ-বিশিষ্ট সমাজের নিয়ম কখনই পালিত হ'তে পারে না। পর-সমাজের মত-

বিশ্বাসের স্রোত যেমন নিয়তই আমাদের চিত্তের উপর এ'সে পড়ছে,আমাদের অন্নের স্রোতও তেমনি নানা শাখায় পর-দেশের দিকে ছুটেছে। এখন এদেশের মানুষ খুব কড়াকড় ক'রেই ব্যক্তিগত স্বার্থের বিচার করতে বাধ্য হচ্ছে। প্রত্যেক গৃহের সামাজিক পরিধি দিনে দিনে সঙ্কীর্ণ হ'য়ে আসছে। তাই একদিন এ সমাজে যেসকল মনোভাবচর্চ্চার বিচিত্র অবকাশ ছিল, এখন তা না থাকাতে সে সকল মনোভাব ম'রে আসছে। অথচ সমাজের কাঠামো এখনো সম্পূর্ণ বদলে যে'তে পারে নি। সেই জন্মে আজকাল আমরা সমাজের সমস্ত বাধাকেই বহন করছি, অথচ লক্ষ্যকে স্বীকার করতে পারছি নে। এই কারণে এই প্রভূত বাধাগ্রস্ত সমাজে মানুষের পরাভবের আর অন্ত নেই। আমাদের পরিবারবন্ধন সকলের চেয়ে সাংঘাতিক বন্ধন হ'য়ে উঠেছে। তার বহু বিচিত্রজালে মানুষকে বিশ্বক্ষেত্র থেকে সে নিরস্ত ক'রে জড়িয়ে রেখেছে। আমরা যতই বেশি পারিবারিক হ'য়ে উঠছি ততই বিশ্বব্যবহারের অযোগ্য হ'য়ে পড়ছি। কেন না, আজকালকার দিনে যারা নিছক ঘরের ছেলে, তারা কেবলি হ'টে যাবে। আমরা একদিন ঘর ছাড়ব ব'লেই ঘর ফেঁদেছিলুম। আজ আমরা আর সমস্তই ছেড়েছি কেবল ঘরখানাই আছে। স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় যারা তারা স্বাতন্ত্র্যরক্ষার জন্যেই শক্তি সঞ্চয় করে, অবশেষে তাদের শক্তিই তাদের স্বাতন্ত্র্যের ঘাড়ে চেপে বসে। আমাদের দেশে তাই ঘটেছে, আমরা মুক্তির প্রেমে বন্ধনকে মেনেছিলুম, আজ বন্ধনের প্রেমে মুক্তিকে খুইয়ে বসেছি।

যে নদী গভীর সেই নদীই নৌবাহ্য (navigable)। তার গভীরতাই তাকে উত্তীর্ণ হ'বার আনুকূল্য করে। কিন্তু পার হ'বার সব ব্যবস্থা যদি রহিত হয়, তাহ'লে এই গভীরতাই দুস্তর হ'য়ে ওঠে। গৃহকে যখন পার হ'য়ে যাবার কথা ছিল তখন গার্হস্থ্যের উদার গভীরতাই আনুকূল্য করত কিন্তু আজ যখন পারের খেয়া বন্ধ তখন এই গভীরতা মানুষকে গ্রাস করছে, তাকে ত্রাণ করছে না। তার আশা আকাঙ্ক্ষা শক্তিকে নিজের তলায় তলিয়ে দিচ্ছে। এককালে ভারতের তপস্বী ছিল গৃহী, কারণ গৃহ তখন মুক্তিপথের চরম বাধা ছিল না, আজকালকার দিনে ভারতে কোনো বড় তপস্যা গ্রহণ করতে গেলে গৃহত্যাগ করা ছাড়া উপায় নেই, কারণ গৃহ একটা গর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে। আজ ভারতের দুর্গতির প্রধান কারণ তার গৃহধর্ম্মের গভীরতা। অর্থাৎ গৃহের সেই প্রবল ও বিচিত্র দাবী যাতে মানুষের সকল শক্তিকে আশাকে তলার দিকেই নিয়ে যায় ঘাটের দিকে না। এই গার্হস্থ্যের আবর্ত্তে প্রতিদিন ভারতের বড় বড় নৌকাডুবি চলছে, এই আমাদের সকলের চেয়ে দুঃসহ ট্রাজেডি। উপলক্ষ্যকে লক্ষ্য ক'রে তোলার মানেই হচ্ছে ছোটোকে বড় ক'রে তোলা। পথকে আলয় করে যে, তার মত দরিদ্র আর নেই। বিশ্বকেই স্বীকার করবার অনুশীলনক্ষেত্র ছিল যখন গৃহ, তখন গৃহের দাবী মানুষকে ছোটো করে নি। আজ হিন্দুসমাজে সেই দাবী নিজের দিকেই অত্যন্ত বড় হ'য়ে উঠেছে ব'লে মানুষকে অত্যন্ত ছোটো করছে। আমাদের যে-ত্যাগ বিশ্ববিধাতার প্রাপ্য প্রতিমুহূর্ত্তে সেই ত্যাগ গৃহের উপদেবতা চুরি করছে; এই চুরি স্বীকার ক'রেও যারা স্বচ্ছন্দে থাকতে অভ্যস্ত হয়েছে বিশ্বসমাজে তাদের স্থান দাসশালায়। আজ ভারতবাসী বিশ্বসমাজের পরিত্যক্ত; গৃহগুহার অচল অন্ধকারে সেই অকিঞ্চনের নির্ব্বাসন। এইখানে আপন প্রদীপ জ্বে'লে, আপন দেবতার বেদী প্রতিষ্ঠা ক'রে বরঞ্চ নারী আপন মহিমা রক্ষা করতেও পারে, কিন্তু পুরুষ এখানে বন্দী, এখানে তার নিরন্তর আত্মবিস্মৃতি। পুরুষের আত্মবিস্মৃতির সেই অপরিসীম অবসাদে সমস্ত ভারতবর্ষ আজ ভারগ্রস্ত।

এতদিন ভারতীয় সমাজের যে আধারের উপরে তার বিবাহপ্রথা প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেই আধারের বিকৃতি হওয়াতে বিবাহের মূলগত ভাবসকল ও তার ব্যবহার সকল কিছুর সঙ্গে ঠিকমত খাপ খাচ্ছে না। সত্যযুগের জন্যে একদল আক্ষেপ করছে, সে আক্ষেপের ডাকে সত্যযুগ সাড়া দিচ্ছে না। এখন সময় এসেছে নূতন ক'রে বিচার করবার, বিজ্ঞানকে সহায় করবার, বিশ্বলোকের সঙ্গে চিন্তার ও অভিজ্ঞতার মিল ক'রে ভাববার।

নরনারীর মধ্যে প্রকৃতি যে-বিচ্ছেদ ঘটিয়ে রেখেছেন, সেই বিচ্ছেদের আকাশে একটি প্রবল শক্তি সর্ব্বদা বিচিত্র

আকর্ষণলীলায় প্রবৃত্ত। এ শক্তি সংহার করে, সৃষ্টিও করে। এই শক্তি পর্দার আড়াল থেকে আমোদের চিত্ত-বৃত্তির উপর উদ্বোধন মন্ত্র চালায়। এ'র প্রবল ক্রিয়া থেকে সমাজকে যদি বঞ্চিত করি, তাহলে সমাজ'ক নিরাপদ করা হয় সন্দেহ নেই, কিন্তু তেমনি নিঃসম্পদও করা হয়। পুরুষের চিত্তের উপর স্ত্রীলোকের যে প্রভাব তাকে আমাদের দেশে শক্তি বলে। অর্থাৎ তার অভাব ঘট্‌লে সমাজে সৃষ্টি ক্রিয়ার নির্জ্জীবতা ঘটে। মানুষ এ অবস্থায় নিস্তেজের মত গতানুগতিক হ'য়ে চলে। তখন সে নানা অক্রিয় চিত্তবৃত্তির (passive) অধিকারী হ'তে পারে কিন্তু তার সক্রিয় গুণগুলোকে সে হারিয়ে বসে। আমাদের দেশে বিবাহের যে-ব্যবস্থা ও সাধারণত নরনারীদের সম্বন্ধ যে ভাবে নিয়মিত তাতে স্ত্রীপুরুষের পরস্পর-মধ্য-গত শক্তিক্রিয়ার অবকাশকে একেবারে বিলুপ্ত ক'রে দেওয়া হয়েছে। কারণ আমাদের সমাজ সক্রিয় শক্তিকেই ভয় করেছে। অচল স্থিতিকে সে চেয়েছিল, তাই অক্রিয়-গুণের চর্চ্চাতেই একদিন সে প্রবৃত্ত ছিল। আজ হঠাৎ জেগে উঠে দেখে বাইরের আঘাতের কাছ থেকে আত্ম-রক্ষার শক্তিকে সে হারিয়ে বসেছে। এতটুকু ভাববারও তার সামর্থ্য নেই যে, দুর্ব্বলতা তার আপন সমাজেরই মধ্যে, বাইরের কোনো আকস্মিক কারণের মধ্যে নয়।

সকল সমাজই নানা কারণে প্রকৃতির ব্যবস্থার সঙ্গে লড়াই করতে বাধ্য। মানুষের সভ্যতা সেই লড়াইয়ে জেতা ধন। আমাদের সমাজে এই লড়াই অত্যন্ত একান্ত হয়েছিল। তাই আমাদের সমাজে পথ যত, বেড়া তার চেয়ে অনেক বেশি। তার সঙ্গত কারণ ছিল না তা বলি নে। কিন্তু সেই কৈফিয়তে মানুষ শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা পায় না। যে-বেড়া কেবলি পথ বন্ধ ক'রে বাহিরকে ঠেকায়, সে বেড়া নিজেকেও ঠেকায়। স্বভাবতই জীবন নানা ক্লান্তি ও ক্ষতিজনিত বিষ আপনার মধ্যে জমিয়ে তুল্‌তে থাকে। এই বিষ কাটিয়ে চলবার উপায় প্রকৃতির সহজ বিধির মধ্যেই থাকে। কিন্তু কৃত্রিম ব্যবস্থায় প্রতিকারের বাহ্য চেষ্টা যতই জটিল হ'য়ে ওঠে, তার প্রতিষেধের আন্তরিক উপায় ততই দুর্ব্বল হ'য়ে অন্ত-র্হিত হ'তে থাকে। তা'তে চোখকে যতই চষমার আঁচল-ধরা ক'রে দেয় ততই পরিবর্দ্ধমান অন্ধতার সঙ্গে দৌড়ে চষমা পরাস্ত হ'তে থাকে। প্রাণপ্রকৃতির স্থান জু'ড়ে যন্ত্র তন্ত্র যতই বেশি উপদ্রব বিস্তার করে ততই শরীরমনের নূতন নূতন ব্যাধি ও দুর্ব্বলতার সৃষ্টি হয়। যত বড় বড় সভ্যসমাজ পৃথিবীতে কিছুকাল আধিপত্য ক'রে অন্তর্হিত হয়েছে তারা প্রকৃতিকর্ত্তৃক পরাভূত ও পরিত্যক্ত। তারা আপন সভ্যতাজনিত বিষেই জর্জ্জর হ'য়ে আত্ম-হত্যা করেছে। প্রকৃতির নিয়মে যে-প্রাণ আপনাকে আপনি শোধন ক'রে চলে, তা'কে তারা আপন বিশেষ অভিপ্রায়ের তলে চাপা দিয়েছে।

বোধ হচ্ছে যেন সম্প্রতি যে-যুগ এসেছে, এই যুগে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষ নিরন্তর লড়াই ক'রে জয়ী হবার দুরাশা ত্যাগ করবার কথা ভাব্‌ছে। এখন তার সঙ্কল্প এই যে, সে সন্ধি ক'রে শান্তি পাবে। নইলে কোনো-মতেই লড়াইয়ের অন্ত থাক্‌বে না। এই সন্ধি স্থাপনের ভার বিজ্ঞানের উপর। সকল সমাজেই বিবাহ প্রথা সেইকালের, যখন মানুষ জীবনের পার্লামেণ্টে নিরন্তর প্রকৃতির opposition bench অধিকার ক'রে নিজের কর্ত্তৃত্ব জাহির করবার চেষ্টা কর্‌ত। প্রকৃতি পদে পদেই তার শোধ তু'লে আস্‌ছে। প্রাকৃত ধর্ম্মের সঙ্গে মানব ধর্ম্মের সন্তোষজনক রফা এ পর্য্যন্ত হয় নি। সেই কারণে বিবাহ প্রভৃতি আত্মীয়তম অনুষ্ঠানে অন্তরের ত্রুটী বাহি-রের বন্ধন দিয়ে সারবার যতই বেশি চেষ্টা চল্‌ছে, অন্তরের সত্যকে ততই অপমানিত ক'রে মানুষের সকলের চেয়ে বড় সম্বন্ধকে দুর্গতিগ্রস্ত করা হচ্ছে।

মানব-সংসারে দুই সৃষ্টিধারা গঙ্গাযমুনার মতো মিল্‌ছে, এক হচ্ছে প্রাকৃতিক মানুষের সন্তানসৃষ্টি আর হচ্ছে, সামাজিক মানুষের সভ্যতাসৃষ্টি। একটা প্রাণের জগৎ আরেকটা মনের জগৎ। এই দুই সৃষ্টির মধ্যেই স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই যোগ আছে কারণ সৃষ্টিমাত্রেই দ্বৈতের লীলা। কিন্তু এই যোগের স্বভাব দুই সৃষ্টিতে ভিন্ন রকমের।

সন্তান সৃষ্টিতে পুরুষের দায়িত্ব গৌণ অথচ অপরিহার্য্য। নারীর অপেক্ষাকৃত অক্রিয় বীজকে পুরুষের সক্রিয় বীজ প্রাণ-চঞ্চল ক'রে দেওয়ার পর থেকে গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসবের সুদীর্ঘভার নারীর, কঠিন দুঃখস্বীকার তারই।

জীবজননে পুরুষের প্রয়োজন লঘুতর ব'লেই কীট-পতঙ্গ-রাজ্যে অনেক স্থলেই স্ত্রীকীট অনাবশ্যক পুরুষ কীটকে সংহার করে। পশুরাজ্যেও পুরুষ পশুর স্বভাবে যে ঈর্ষাপরায়ণ হিংস্রতা আছে তাতে পুরুষ পশুর সংখ্যা হ্রাস ক'রে রাখে। এর থেকে প্রমাণ হয় যে জীব প্রকৃতির দিক থেকে সৃষ্টিকার্য্যে পুরুষের প্রয়োজন স্ত্রীলোকের চেয়ে সামান্যতর।

মানুষের মধ্যে মনঃপ্রকৃতি বড় হ'য়ে দেখা দিল। তখন সংসারে পুরুষ আপন যথার্থ গৌরব পাবার অবকাশ পেলে। যে প্রাণপ্রকৃতি এতকাল স্ত্রীকে প্রাধান্য দিয়ে এসেছে, তারই দায়িত্ব বন্ধনে স্ত্রী যখন বাঁধা থেকে আপন কাজে জড়িয়ে রইল তখন বন্ধনমুক্ত পুরুষ মনঃপ্রকৃতির উত্তেজনায় মানস সৃষ্টির বিচিত্র অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত হ'তে পার্‌ল। পুরুষ আপন আবশ্যকতা প্রবলভাবে সৃষ্টি কর্‌তে লাগ্‌ল।

গোড়ায় এই সৃষ্টি যখন অত্যন্ত বেশি প্রাধান্য লাভ কর্‌লে তখন সভ্যতার প্রথম দিকের অধ্যায়ে নারী অপেক্ষাকৃত অনাবশ্যক ব'লেই গণ্য হয়েছিল। তাই নয়, নারী এই সৃষ্টিতে অনেক পরিমাণে বাধাস্বরূপ। কারণ যে-সংসার নারীর সে-সংসার পুরুষের অন্বেষণশীল মনকে বেঁধে রাখ্‌তে চায়। সভ্যতাসৃষ্টিকার্য্যে নারীর এই স্বল্প প্রয়োজনীয়তার অগৌরব আজও লেগে আছে। সেইজন্য আজ বিদ্রোহিণীর দল প্রাণপ্রকৃতির দায়িত্ব লাঘব ক'রে সমাজ সৃষ্টিকার্য্যে পুরুষের সমকক্ষতা দাবী কর্‌ছে।

কিন্তু বাহিরের দিক থেকে কৃত্রিম চেষ্টার অবকাশ সৃষ্টি করলেই অবকাশ পাওয়া যায় না। নারীর প্রকৃতির মধ্যে যে হৃদয় বৃত্তির প্রবলতা আছে তাকে বাহির থেকে তাড়া দিয়ে বিদায় করা যায় না। সেই হৃদয়বৃত্তিগুলি স্বভাবতই চলবার দিকে প্রমুখ নয় আঁকড়াবার দিকেই তার ঝোঁক। এইজন্যে স্থিতির মধ্যে যে সম্পদ, নারী তারই সাধনা কর্‌লে সার্থকতা লাভ করে। গতিবান অধ্যবসায়ের কাজে যদি সে জোর ক'রে যায় তাহলে নিজের প্রকৃতির সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব বাধ্‌বে এবং সেই নিরন্তর দ্বন্দ্বের বিক্ষেপ বহন ক'রে পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সে প্রধান স্থান কখনই পাবে না।

কিন্তু পুরুষ যেমন প্রাণপ্রকৃতির শাসনতন্ত্রে দীর্ঘকাল নিম্নপদে থেকে অবশেষে মনঃপ্রকৃতির রাজ্যে প্রাধান্য পেলে, নিজের অপেক্ষাকৃত নিরাবশ্যকতার লাঞ্ছনা মুছে ফেল্‌তে পার্‌লে, তেমনি সভ্যতার একটি উচ্চস্তর আছে সেখানে নারী আপন অগৌরব দূর করবার অধিকারী। তাকে কি নাম দেব হঠাৎ ভেবে পাওয়া শক্ত;—আধ্যাত্মিক শব্দটির ঠিক সংজ্ঞা নিয়ে নানা তর্ক উঠ্‌তে পারে, কিন্তু দায়ে প'ড়ে আপাতত ঐ নামটাই গ্রহণ করা যাক্‌।

হৃদয়বৃত্তির একটি আনুষঙ্গিক উৎপন্ন জিনিষ আছে তাকে মাধুর্য্য বলা যায়। এই মাধুর্য্য আলোর মত, এ একটি শক্তি। এ'কে স্পষ্ট ক'রে ধরা ছোঁওয়া মাপাজোখা যায় না—কিন্তু এ'রই অমৃত না পেলে মনঃপ্রকৃতির কাজ পূর্ণ সফলতায় পৌঁছয় না। গাছের শিকড় মাটি আশ্রয় ক'রে দাঁড়ায়, মাটির থেকে রস ও খাদ্য সংগ্রহ করে, এ-সব জিনিষের মোটা হিসাব পাওয়া যায়। কিন্তু সূর্য্যের আলোকটিকে সেই সুনির্দ্দিষ্ট হিসাবের অঙ্কে বাঁধা যায় না, কিন্তু তবু সেই আলো যদি শক্তি সঞ্চার না করে, তবে গাছের সকল কাজই নির্জ্জীব হয়।

পুরুষের সৃষ্টিকার্য্যে নারীস্বভাবের এই অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য চিরদিনই যোগ দিয়েছে। তা অলক্ষিত কিন্তু অপরিহার্য্য। পুরুষের চিত্তকে নারীর এই প্রাণবান মাধুর্য্য ভিতরে ভিতরে সক্রিয় না কর্‌লে তা আপন পূর্ণ ফল ফলাতে পারে না। বীরের বীর্য্য, কর্ম্মীর কর্ম্মোদ্যম, রূপকারের কলাকৃতিত্ব প্রভৃতি সভ্যতার সমস্ত বড় বড় চেষ্টার পিছনে নারীপ্রকৃতির গূঢ় প্রবর্ত্তনা আছে।

এই মাধুর্য্যের শক্তি সভ্যতার অপেক্ষাকৃত বর্ব্বর অবস্থায় অনতিগোচর ও গৌণভাবে আপন কাজ করে। তখন যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি দুরন্ত ভাঙাগড়ার যুগে এই শক্তির ক্রিয়া স্পষ্ট অনুভব করা যায় না। কিন্তু মানবসভ্যতা যখন আধ্যাত্মিক অবস্থায় উত্তীর্ণ হয়, অর্থাৎ যখন মানুষের পরস্পর বিচ্ছেদের চেয়ে পরস্পর যোগই মূল্যবান ব'লে স্বীকৃত হবার সময় আসে তখন নারীর মাধুর্য্যশক্তি গৌণ-ভাবে নয় মুখ্যভাবে আপন কাজ করবার অবকাশ পায়। তখন পুরুষের জ্ঞানের সঙ্গে নারীর ভাবের সমান যোগে

তবে সংসার টি‍ঁক্‌তে পারে। তখন উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য আছে সেই পার্থক্যদ্বারা উভয়েই সভ্যতাসৃষ্টির এক মহাগৌরবের সমান অংশী হ'তে পারে। তখন সেই পার্থক্যে পরস্পরের মধ্যে উচ্চনীচতা সৃষ্টি করে না।

আজও মানুষের মধ্যে সভ্যতায় সেই আধ্যাত্মিক প্রয়োজনকে ঠিকমতে স্বীকার করা যায় নি। এই জন্যে, বিবাহে আজও স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ সত্য হয় নি। আজও সেই দ্বন্দ্বের মধ্যে কিছু না কিছু বিরোধ ও কোনো না-কোনো পক্ষের অবমাননা আছে। তাই আজও বিবাহে গায়ের জোর আপন জায়গা ছাড়্‌তে চাচ্ছে না, স্ত্রীপুরুষ পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষা ও সন্দেহ নিত্য আন্দোলিত। এই-জন্যেই মানুষের সব চেয়ে বড় দুঃখদুর্গতি বড় অপমান ও গ্লানি নর নারীর এই বিবাহ সম্বন্ধেই। কিন্তু যাঁরা মানবসমাজে আধ্যাত্মিকতা বিশ্বাস করেন তাঁরা বিবাহ সম্বন্ধকে সামাজিক পাশব-বলের অত্যাচার থেকে মুক্ত ক'রে দিয়ে সমাজে প্রেমের শক্তিকে সত্যভাবে বিকীর্ণ করবার উপায় অন্বেষণ করবেন তাতে সন্দেহ নাই। বিবাহ অনুষ্ঠানে এখনো সমস্ত প্রথায় অভ্যাসে ও আইনে আমরা বর্ব্বর যুগে আছি ব'লেই বিবাহ আজও নরনারীর মিলনকে পূর্ণ কল্যাণ-রূপে প্রকাশ না ক'রে তাকে আবৃত ক'রে রেখেছে। সেইজন্যেই আমাদের দেশে কামিনী-কাঞ্চনকে দ্বন্দ্বসমাসের সূত্রে গেঁথে নারীকে ইতর ভাষায় অপমান করতে পুরুষ কুণ্ঠিত হয় না। কেননা পুরুষ এখানে এখনো মনে করে যে সেই হ'ল মানুষ, তারই মুক্তি মানুষের একমাত্র লক্ষ্য, নারীকে সে কাঞ্চনের মতই নিজের ইচ্ছা ও প্রয়োজন অনুসারে স্বীকার করতেও পারে ত্যাগ করতেও পারে। ত্যাগ করার দ্বারা সে যে আত্মহত্যা করে তা সে জানেই না। তা ছাড়া নারীর মাধুর্য্য বিলাসসামগ্রী নয়, তা যে মানুষের সকল সাধনাতেই পরম সম্পদ একথা বোঝবার মতো সময় তার আজও হ'ল না,—আমাদের সর্ব্বব্যাপী শক্তিহীনতার সে একটা প্রধান কারণ॥

ভারতের জন্য সরকারি শিক্ষা ও পুলিশ ব্যয়

প্রত্যেক দেশের সরকারি আয় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সেই-দেশবাসীই বিবিধ কর-রূপে প্রদান করিয়া থাকে। সুতরাং দেশের মঙ্গলামঙ্গলের প্রতিনিধি শাসক-সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্য, দেশবাসী-প্রদত্ত অর্থ জনসাধারণের কল্যাণের জন্য বেশীরভাগ ব্যয় করা এবং দেখাও যায়, যাবতীয় সুসভ্য দেশমাত্রেই এইরূপ ভাবে সরকারি আয় ব্যয় হইয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের শাসক-সম্প্রদায় দেশবাসীর মত ও যুক্তিকে পদ-দলিত করিয়া দরিদ্র দেশবাসীর অর্থ কি-প্রকারে অপব্যয় করিতেছে, তাহা দেখিলে, কেহই বলিতে পারে না, সরকার দেশের প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।

শিক্ষাই মানুষের সর্ব্ববিধ উৎকর্ষ লাভের পন্থা কিন্তু সেই-শিক্ষার জন্য আমাদের সরকার কি-পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিতেছে ও পুলিশ-পোষণের জন্যই বা কত অর্থ খরচ করিতেছে, তাহা নিম্নলিখিত হিসাব হইতে পরিষ্কাররূপে বুঝা যাইবে।

বরাবরই আমরা শুনি, সরকার বজেটে পুলিশ-খরচের বরাদ্দ বেশী পরিমাণে ধার্য্য করিয়াছে; নিম্ন-প্রদর্শিত হিসাবে বৎসরের পর বৎসর পুলিশ-ব্যয় বর্দ্ধনের অনুপাত ও সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা-ব্যয়ের অনুপাতও দ্রষ্টব্য। ভারতের আয় ব্যয় বলিতে আমরা ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষেরই (British India) আয়ব্যয় বুঝিব।

সাল	কেবলমাত্র পুলিশ ব্যয় লক্ষ টাকা	সর্ব্ববিধ শিক্ষাব্যয় লক্ষ টাকা
১৯১২	৬,৬৪	৪,৯৯
১৯১৩	৬,৯৩	৫,১৩
১৯১৪	৭,২১	৬,৩৫
১৯১৫	৭,৩৬	৬,২৩
১৯১৬	৭,৫৬	৬,১৫
১৯১৭	৭,৭৩	৬,৪৮
১৯১৮	৮,৪৮	৭,১৭
১৯১৯	৯,১৫	৮,৪৫
২৯২০	১০,৭৩	১০,০৭
১৯২১	১২.২৩	১১.৫০

গোবিন্দদাসের কড়চার ঐতিহাসিকতা

শ্রী অমৃতলাল শীল

মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১৪৩২ শকের বৈশাখের আরম্ভে [এপ্রেল ১৫১০খৃঃ] নীলাচল হইতে দক্ষিণ দেশ ভ্রমণে যাত্রা করিয়াছিলেন এবং বাইশ মাস পরে মাঘ মাসে [জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৫১২ খৃঃ] জগন্নাথ-পুরীতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। এই-সময়ের মধ্যে দুইটি বর্ষার চতুর্মাস্য, আট মাস শ্রীরঙ্গধাম ও অন্য-কোনো অজানিত স্থানে কাটাইয়াছিলেন, অবশিষ্ট চৌদ্দ মাস ভ্রমণ করিয়াছিলেন। এই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত কেবল দুইখানি পুস্তকে পাওয়া যায়,—বৃন্দাবন-বাসী কবিরাজ কৃষ্ণদাস প্রণীত চৈতন্য-চরিতামৃতে ও গোবিন্দদাসের কড়চাতে। ভ্রমণের প্রায় ৭০ বৎসর পরে চরিতামৃত-গ্রন্থখানির লেখা শেষ হয় (১৫০৩ শক, ১৫৮১ খৃঃ)। গোবিন্দের কড়চাখানি ঠিক কোন্ সময়ে লেখা হইয়াছে জানা নাই। কিন্তু গোবিন্দ বলেন, তিনি মহাপ্রভুর ভ্রমণে একমাত্র সঙ্গী ছিলেন, তখন তিনি বৃদ্ধ,

"কড়চা করিয়া রাখি শক্তি অনুসারে"।

নীলাচলে ফিরিবার পর ২।১ বৎসরের মধ্যেই লেখা শেষ করা সম্ভব; অতএব, চরিতামৃতের ৬০।৬৫ বৎসর পূর্ব্বে লেখা হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, চরিতামৃতের বর্ণনার সহিত কড়চার বর্ণনার মিল নাই। কিন্তু যখন কড়চাকার স্বচক্ষে দেখিয়া, ও চরিতামৃতকার ৬০।৬৫০ বৎসর পরে পরের মুখে নানা-প্রকার অত্যুক্তি, মিশ্রিত বর্ণনা শুনিয়া বা পরের লেখা পুস্তক দেখিয়া লিখিয়াছেন, তখন কড়চাকেই ঐতিহাসিক ও বিশ্বসনীয় বলা উচিত। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'কার ও অমিয়-নিমাই-চরিত-প্রণেতা কড়চাকে প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া বিশ্বাস করেন, ও আজকাল অনেকে তাহাকে মৌলিক ও প্রামাণিক প্রমাণ করিতে সচেষ্ট; কিন্তু মৌলিকত্বের কারণ বা প্রমাণ অনুরূপ নির্দ্দেশ করেন। বসুমতী [দৈনিক, ১৯ চৈত্র] লিখিয়াছেন, "কড়চার প্রাচীন কীটদষ্ট পুঁথি ৪০।৪৫ বৎসর পূর্ব্বে শান্তিপুরে কোনো গোস্বামীর নিকট অনেকে দেখিয়াছেন, এই অবস্থায় কড়চা মৌলিক ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলিলে অন্যায় হয় না।" অর্থাৎ ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কোনো সময়ে কীটদষ্ট অবস্থায় তাহার অস্তিত্বকে ঐতিহাসিকতায় প্রমাণ বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। কিন্তু চরিতামৃত রচনার সময়ে (১৫৮১ খৃঃ) খুব সম্ভব, কড়চার অস্তিত্ব ছিল না; তাহার পর কোনো সময়ে রচিত হইয়াছে, অতএব ইহা মহাপ্রভুর সঙ্গীর—তিনি কৃষ্ণদাস হউন বা গোবিন্দ বা অন্য কোনো ব্যক্তি হউন—রচনা হওয়া সম্ভব নহে। আবার, ১৫৮১ খৃষ্টাব্দের পর রচনা হইলেও ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রাচীন ও কীটদষ্ট হইবার পক্ষে যথেষ্ট অবসর পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া, বিংশ শতাব্দীর অনুসন্ধানের যুগে কীটদষ্টতাকে ঐতিহাসিকতার প্রমাণ বিবেচনা করা কতদূর সঙ্গত, সুধীগণ তাহার বিচার করিবেন।

কড়চাখানিকে কাল্পনিক বিবেচনা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে:—

১। মহাপ্রভুর জীবনের যে-সময়ে যে-যে গ্রন্থকার বা কড়চাকারেরা তাঁহার নিকটে ছিলেন এবং যে-সময়ের ঘটনার সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা বেশী, সেইসময়ের কথাগুলিই তাঁহারা বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, অন্য সময়ের ঘটনাগুলি হয় মোটে লেখেন নাই; অথবা সূত্ররূপে কেবল ঘটনার ফর্দ্দ মাত্র লিখিয়াছেন। যেমন, মুরারি গুপ্ত প্রভুর বাল্যজীবন সবিস্তারে লিখিয়াছেন, তিনি পরবর্ত্তী কালের কথা জানিতেনও না, লেখেনও নাই। রামরায় কেবল প্রভুর গম্ভীরা লীলা ও শেষ জীবন-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, ইত্যাদি। আবার ইহাদের লেখা সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকের অবোধ্য সংস্কৃতে লেখা। ১৫৭০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে শ্রীবৃন্দাবনে প্রত্যহ চৈতন্য-ভাগবত পাঠ করা হইত; সে-সময়ে ইহাকে "চৈতন্য-মঙ্গল" বলিত। কিন্তু ভাগবতে

প্রভুর শেষ বয়সের লীলা-কথা প্রায় কিছুই নাই বা অতি সংক্ষেপে আছে। বৃন্দাবনের বৈষ্ণব-প্রধানেরা অশীতিপর বৃদ্ধ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীকে বাঙ্গালাতে একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ সবিস্তারে লিখিতে অনুরোধ করিলেন। বৃদ্ধাবস্থা বলিয়া কবিরাজ প্রথমে স্বীকৃত হইলেন না, কিন্তু ঠিক এই সময়ে গোবিন্দজীর পূজারী আদেশমালা দিয়া গেলেন। বৃদ্ধ গোস্বামী আর এড়াইতে পারিলেন না, কেননা ভক্তদের অনুরোধ এখন ভগবানের আজ্ঞা-রূপ ধারণ করিল। তিনি লিখিয়াছেন :—

আমি লিখি ইহা মিথ্যা করি অনুমান।
আমার শরীর কাষ্ঠ পুতলী-সমান।
বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির।
হস্ত হালে, মনোবুদ্ধি নহে মোর স্থির।
নানা রোগগ্রস্ত চলিতে বসিতে না পারি।
পঞ্চ রোগ পীড়ায় ব্যাকুল রাত্রিদিন মরি।

এই অবস্থাতে ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিয়া নয় বৎসর অক্লান্ত চেষ্টায় ১৫০৩ শকে [১৫৮১ খৃঃ] চরিতামৃত শেষ করিলেন। ইনি পুস্তকে যখন যে গ্রন্থকার বা কড়চাকারের উক্তি গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তাহা স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন; কোনো স্থানে পরের লেখা নিজের বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করেন নাই। ঘটনার সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য আদি লেখকের উল্লেখ এইরূপে করিয়াছেন :—

১। দামোদর স্বরূপ আর গুপ্ত মুরারি।
মুখ্য-মুখ্য লীলা-সূত্রে লিখিয়াছেন বিচারি। আদি ১৩
২। আদি লীলার মধ্যে প্রভুর যতেক চরিত।
সূত্ররূপে মুরারি গুপ্ত করিলা গ্রথিত। আদি ১৩
৩। বৃন্দাবন দাস ইহা চৈতন্যমঙ্গলে।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন প্রভু-কৃপা-বলে। আদি ১৭
৪। দামোদর স্বরূপের কড়চা-অনুসারে।
রামানন্দ মিলন লীলা করিল প্রচারে। মধ্য ৯
৫। রথাগ্রে মহাপ্রভুর নৃত্য-বিবরণ।
চৈতন্যাষ্টকে রূপ গোসাঞি করিয়াছেন বর্ণন। মধ্য ১৩
৬। শিবানন্দ সেনের পুত্র কবি কর্ণপুর।
রূপের মিলন গ্রন্থে লিখিয়াছেন প্রচুর। মধ্য ১৯
৭। স্বরূপ গোসাঞি আর রঘুনাথ দাস
এই দুই কড়চাতে এ লীলা প্রকাশ
সেকালে এ দুই রহে মহাপ্রভুর পাশে।
আর সব কড়চা-কর্ত্তা রহে দূর দেশে। অন্ত্য ১৪
৮। রঘুনাথ দাসের সদা প্রভু-সঙ্গে স্থিতি।
তাঁর মুখে শুনি' লিখি করিয়া প্রতীতি। অন্ত্য ১৪
৯। চটক গিরি গমন লীলা রঘুনাথ দাস।
চৈতন্য-স্তব-কল্প-বৃক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ। অন্ত্য ১৪
ইত্যাদি

কিন্তু কোনো স্থানে গোবিন্দ কর্ম্মকারের কড়চার উল্লেখ করেন নাই। প্রভুর ভ্রমণ-কাহিনী সম্বন্ধে কেবল বলিয়াছেন :—

অতএব নাম মাত্র করিয়ে গণন।
কহিতে না পারি তার যথা অনুক্রম।

দক্ষিণ-ভ্রমণ-কথা কাহার লেখা দেখিয়া লিখিয়াছেন, বলেন নাই। সম্ভব যে প্রভুর প্রত্যাগমনের পর তাঁহার সঙ্গী কৃষ্ণদাসের [অথবা যে-কেহ সঙ্গে ছিলেন তাঁহার] কাছে কোনো ভক্ত দক্ষিণের তীর্থস্থানের নামগুলি লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, কিম্বা যখন পুরীতে আসিয়া প্রথম রাত্রিতে

সার্ব্বভৌমের সঙ্গে আর লৈয়া নিজগণ।
তীর্থ যাত্রা কথা কহি কৈলা জাগরণ। মধ্য ৯]

তখন প্রভুর মুখে ভক্তেরা শুনিয়া থাকিবেন, সেইসময়ে কেহ কড়চা করিয়া রাখিয়া থাকিবে। ক্রম কাহারও মনে ছিল না, থাকা সম্ভবও নহে, যতটা মনে ছিল বলিয়াছিলেন। নামগুলিও যাহা মনে ছিল বলিয়াছিলেন, কতক অশুদ্ধ উচ্চারণ বলিয়াছিলেন, অথবা পরবর্ত্তী কালের আখরিয়াগণ [নকলকারী] ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আপনার বিদ্যামত উচ্চারণ ওলট-পালট করিয়া দিয়াছিল। যেমন

"পীতাম্বর শিবস্থানে গেলা গৌরহরি।"

চরিতামৃতে আছে, সম্ভব যে আদি-পুঁথিতে ছিল "চিতাম্বর শিব স্থানে গেলা গৌর হরি" কিম্বা প্রভু "চিতাম্বর" বলিয়াছেন। আখরিয়া কখনও "চিতাম্বর" শব্দ শোনে নাই, কিন্তু "পীতাম্বর" একটা শব্দ আছে জানিত, অতএব "চিতাম্বর" কাটিয়া "পীতাম্বর" করিয়া দিল। মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলনের সময়ে কেহ ভুল সংশোধনের প্রয়োজন বিবেচনা করে নাই, অগত্যা আধুনিক চরিতামৃতের সকল সংস্করণেই "পীতাম্বর শিব" স্থায়ী হইয়া গিয়াছেন। চিতাম্বর শিব মাদ্রাস হইতে রামেশ্বরের পথে ১৫১ মাইল দূরে চিদাম্বরম্ (Chidambaram) নগরে। চরিতামৃতে আরও অনেক ভুল আছে, যথা, চরিতামৃতের "ত্রিপদী" "তিরুপতি" হইবে; "ত্রিমল্ল" "তিরুমলাই" হইবে, "তিলকাঞ্চী" "তেন-কাশী" হইবে, ইত্যাদি। চরিতামৃতে বর্ণিত রামরায়ের স্থান

গোদাবরী-তীরে বিদ্যানগর একটি কাল্পনিক স্থান মাত্র, এইরূপে চরিতামৃত অভ্রান্ত না হইলেও কড়চাকে ঐতিহাসিক বলা যায় না।

২। গোবিন্দের কড়চা-অনুসারে একমাত্র গোবিন্দ দক্ষিণ-ভ্রমণে প্রভুর সঙ্গে গিয়াছিলেন, পরে আহমদাবাদের কাছে আর দুইজন বঙ্গবাসী সঙ্গী জুটিয়াছিল। কিন্তু চরিতামৃত-অনুসারে :—

> কৃষ্ণদাস-নাম শুদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণ।
> যাঁরে সঙ্গে লৈয়া কৈল দক্ষিণ গমন। আদি ১০
> কৃষ্ণদাস নাম এই সরল ব্রাহ্মণ।
> ইঁহা সঙ্গে করি' লহ, ধর নিবেদন। মধ্য ৭
> গোসাঞির সঙ্গে রহে কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণ। মধ্য ৯

বসুমতী বলেন, "বলভদ্র ও কৃষ্ণদাস প্রভুর সহিত পশ্চিমে ছিলেন, এইরূপ একটা প্রবাদ ছিল মাত্র। কবিরাজ এই প্রবাদ-অনুসারে বলভদ্রকে পশ্চিমের ও কৃষ্ণদাসকে দক্ষিণের সঙ্গী করিয়া দিয়াছেন।"

খুব সম্ভব, কে সঙ্গে ছিল ঠিক জানা নাই। কিন্তু প্রভুর মত ব্যক্তিকে [যিনি প্রায়ই বিহ্বল অবস্থায় থাকিতেন] তাঁহার পার্ষদ ভক্তেরা কখনই একা যাইতে দেন নাই; সেবক নিশ্চয় সঙ্গে ছিল; সে-সেবক কৃষ্ণদাস হউক বা অন্য কেহই হউক ঐ সেবক গোবিন্দ কর্ম্মকার হইলে একজন ব্রাহ্মণও রাঁধিয়া দিবার জন্য নিশ্চয় সঙ্গে ছিল। যাহা হউক যে-কেহই সঙ্গে থাকুক না কেন, তিনি কোনোরূপ কড়চা করিয়া রাখেন নাই, কড়চা থাকিলে নিশ্চয় একটা ক্রম থাকিত। চরিতামৃতের নামগুলি একখানি মানচিত্রে চিহ্নিত করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, পুরীতে প্রত্যাগমনের পর কেবলমাত্র স্মরণশক্তির উপর নির্ভর করিয়া কতকগুলি তীর্থস্থানের নাম বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

গোবিন্দের কড়চাখানি প্রামাণিক গ্রন্থ ধরিলে বিশ্বাস করিতে হইবে, যে ইহা চরিতামৃতের প্রায় ৬০।৬৫ বৎসর পূর্ব্বে লেখা হইয়াছিল, অতএব কবিরাজ গোস্বামী নিশ্চয় ইহা দেখিয়া থাকিবেন। বসুমতী বলেন—"গোবিন্দ কর্ম্মকার তাঁহার কড়চা প্রকাশ করেন নাই। তাহাও যদি সত্য হয় তবে গোবিন্দ আপন জীবন-কালেই তাহা গোপন করিতে পারেন, গোবিন্দের মৃত্যুর পর উহা নিশ্চয় প্রকাশ পাইয়া থাকিবে, ও ১৫৭২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ১৫১০ খৃষ্টাব্দের বৃদ্ধ গোবিন্দের জীবিত থাকা অসম্ভব। কবিরাজ স্বীকার করুন বা না করুন, প্রভুর সঙ্গীর চক্ষে-দেখা কড়চা করা বর্ণনা থাকিতে তিনি অন্য বর্ণনা বা শোনা কথার সাহায্য কখনই লন নাই, অর্থাৎ চরিতামৃতের বর্ণনা কড়চা হইতে সংগৃহীত, কিন্তু পুস্তক-দুইখানি পাশাপাশি রাখিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, যে উভয়ে মিল নাই; তীর্থস্থানের নামের ক্রমে বর্ণনায়—কিছুতেই মিল নাই, এমন-কি চরিতামৃতের লেখক গোবিন্দ কর্ম্মকার নামক কোনো ব্যক্তির অস্তিত্বেরও উল্লেখ করেন নাই।

৩। চরিতামৃত-অনুসারে কেবল কৃষ্ণদাস নামক এক সরল ব্রাহ্মণ প্রভুর সঙ্গে ছিলেন, কড়চা-অনুসারে কেবল গোবিন্দ। কেহ হয়ত ভাবিতে পারেন কৃষ্ণদাস ও গোবিন্দ একই ব্যক্তি, কিন্তু কড়চাকার সে-সন্দেহ করিবার অবসর দেন নাই, তিনি স্বয়ং বলিতেছেন যে, দক্ষিণ-যাত্রার কথা উঠিতে নিত্যানন্দ বলিলেন—

> দক্ষিণযাত্রায় তুমি যাবে অতিদূর।
> সঙ্গে যাক কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণ ঠাকুর॥
> পবিত্র হইয়া বিপ্র তাহাই করিবে।
> যখন ইহারে যাহা করিতে বলিবে॥
> এত শুনি প্রভু মোর কন হাসি'-হাসি'।
> গোবিন্দের সঙ্গ আমি বড় ভালবাসি॥
> যে যাক সে নাহি যাক, গোবিন্দ যাইবে।
> আমার যে কার্য্য তাহা গোবিন্দ করিবে॥

অর্থাৎ প্রভু কৃষ্ণদাসকে সঙ্গে লইলেন কি না, স্পষ্ট করিয়া বলা হইল না, কিন্তু কৃষ্ণদাস ও গোবিন্দ যে একব্যক্তি নহে, তাহা প্রমাণিত হইল। ইহার দশ ছত্র পরে কড়চাকার বলিতেছেন—

> তিন জনে বাহিরিনু দক্ষিণযাত্রায়।

এই "তিন জন" পদ দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে, যে প্রভু কৃষ্ণদাসকে নিত্যানন্দের অনুরোধে, ও গোবিন্দকে আপন ইচ্ছায় সঙ্গে লইলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ইহার পর সমস্ত কড়চাতে কোনো স্থানে কৃষ্ণদাসের, অথবা অন্য সঙ্গীর অস্তিত্বের প্রমাণ নাই, বরং অনুপস্থিতির যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

দক্ষিণভ্রমণ-কালে আহমদাবাদের কাছে কুলীনগ্রামবাসী জমিদার রামানন্দ বসু ও তাঁহার ভৃত্য গোবিন্দ চরণের সহিত দেখা হইল। কড়চালেখক গোবিন্দদাস এই

সেবক গোবিন্দচরণের সহিত মিতালি পাতাইলেন দেখিয়া প্রভু বলিলেন :—

গোবিন্দ যদ্যপি মিতে হইল তোমার।
তবে রামানন্দ মিতে হইল আমার॥

ইহার পর চার জনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, যেথানে যখন আহার জোগাড় করিয়া, অথবা ভিক্ষা করিয়া প্রভু ভোগ দেন, সেখানেই

প্রসাদ পাইনু তবে মোরা তিন জনে।
মুহি রামানন্দ আর গোবিন্দচরণে॥

এই পদ পুস্তকে তিন স্থানে একইপ্রকার আছে। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, গোবিন্দদাস ছাড়া কৃষ্ণদাস বা অন্য কোনো সেবক বা সঙ্গী প্রভুর সহিত ছিল না।

৪। কড়চার কোনো-কোনো বর্ণনা সম্পূর্ণ অসঙ্গত। যেমন গোবিন্দ যেখানেই ভিক্ষা করিতে গিয়াছেন, সেখানেই গ্রামবাসীরা তাঁহাকে কেবল "আটা চূনা"ই ভিক্ষা দিয়াছে, কেহ কখন ভুলিয়াও একমুষ্টি তণ্ডুল দেয় নাই। প্রভু আটার "রুটি পাকাইয়া ভোগ" দিয়াছেন। কিন্তু প্রভু যে-পথে তীর্থভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশ পথ অন্ধ্র (তৈলঙ্গ). দ্রমিড় (তামিল), মল্লার (মলায়ালি), ও কর্ণাটদেশে ; এবং এ-কয়টি বিস্তৃত দেশই খাঁটি চাউল-খাদকের দেশ। এসকল দেশে আজকাল রেলের কৃপায় বড়-বড় নগরে গোধূম পাওয়া সম্ভব হইলেও পল্লীগ্রামে এখনও পাওয়া যায় না। কাহারও গৃহে যদি আটা থাকে, তবে সে অতিথিকে (বিশেষতঃ সন্ন্যাসীকে) কখনও আটা দেয় না। ১৫১০।১১ খৃষ্টাব্দে ঐ প্রদেশে আটার অস্তিত্ব থাকা অসম্ভব। ১৯১৯।২০ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাসের কাছে কাঞ্চীর মতন জেলার সদর স্থানে ও বড় নগরের বাজারে আমি গমের আটা খুঁজিয়া পাই নাই। একজন কাশীবাসী যাত্রীতোলা ব্রাহ্মণ বলিল, সে গম সংগ্রহ করিয়া রাখে, উত্তর ভারতের ধনবান্ যাত্রীরা চাহিলে আটা পিশিয়া দেয়, বাজারে আটা পাওয়া যায় না। কড়চা-অনুসারে একবার জনমানবহীন স্থানে

ত্রিরাত্রি চলিয়া গেল বৃক্ষের তলায়।
অনাহারে উপবাসে কিছু নাহি খায়॥
চতুর্থ দিবসে এক রমণী আসিয়া।
আতিথ্য করিয়া গেল "আটা চূনা" দিয়া॥

এঘটনা আধুনিক কড়াপা (Cuddapah) জেলার কোনো স্থানে ঘটিয়াছিল, কিন্তু কড়াপা সম্পূর্ণ তণ্ডুল-খাদকের দেশ ; এখনও সেখানে আটা পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। যুক্তপ্রদেশে বা পঞ্জাবে এরূপ "আটা চূনা" দিয়া আতিথ্য করা সম্ভব হইতে পারে বটে, কিন্তু কড়াপাতে সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব।

"থোড়া থোড়া চূণা আটা সংগ্রহ করিয়া"।

এদান কাবেরী কূলে, ইহাও সম্পূর্ণ চাউলের দেশ।

"একজন গ্রাম্য লোক চূণা আনি দিল"

ত্রিবঙ্কু দেশে (Travancore), ইহাও চাউলের দেশ।

"ফল মূল চূণা আনি দেয় যোগাইয়া"

ইহাও ত্রিবঙ্কু দেশে—চাউলের দেশে।

কেহ ফল মূল আনে কেহ আনে আটা।
কেহ চূণা আনি দেয় অতিথির বাটা॥

ইহাও ত্রিবাঙ্কু দেশের কথা। কেবল তুঙ্গভদ্রা নদী-তীরে

আটা ভিক্ষা দিল মোরে বহুত আদর

সম্ভব হইতে পারে, কেননা সেখানে জোয়ারি উৎপন্ন হয়। একমাত্র এই দোষে কড়চাকে অনৈতিহাসিক ও কাল্পনিক বলা যাইতে পারে।

৫। কড়চাতে রামানন্দ বসুর চরিত্র অদ্ভুত। রামানন্দ প্রভুর ভক্ত, ধনবান্ জমিদার, সেবক সঙ্গে করিয়া তীর্থভ্রমণ করেন, জগন্নাথের রথের পট্টডোরের যজমান হইয়া আজ চারশত বৎসর তাঁহার বংশধরেরা পট্টডোর জোগাইতেছেন। সোমনাথের পাণ্ডারা প্রভুর কাছে অর্থ চাহিলে

হাসিয়া বলিলা প্রভু সন্ন্যাসীর ঠাঁই।
টাকা, কড়ি, অন্ন, বস্ত্র, কিছু দিতে নাই॥

কিন্তু

এই বাত শুনি কাণে গোবিন্দচরণ।
দুই মুদ্রা পাণ্ডাহস্তে করিল অর্পণ॥

স্মরণ রাখিতে হইবে, যে তখনকার দিনে দুই মুদ্রা মূল্যে এখনকার দুই টাকা অপেক্ষা অনেক বেশী, ও সাধারণ যাত্রীরা পাণ্ডাকে দুই মুদ্রা দিতে পারিত না। এই ঘটনার কয়েক দিবস পরে একদিন আমঝোরা নগরে ভিক্ষা জুটিল না।

কড়চার কবি বলিতেছেন—

ক্ষুধার জ্বালায় মোরা ছট্ ফট্ করি।

সমস্ত দিনের পর গোবিন্দ দুই সের আটা ভিক্ষা করিয়া আনিলেন; প্রভু যোলো খানা রুটি গড়িয়া ভোগ দিলেন। সকলে খাইতে বসিতেছিল, তখন এক ভিখারিনী একটি শিশু-বালক কোলে করিয়া অনাহারে কষ্ট পাইতেছিল বলিয়া কাঁদিয়া ভিক্ষা চাহিল। প্রভু আপনার ভাগ সমস্তই তাহাকে তুলিয়া দিলেন। সে তুষ্টা হইয়া আশীর্ব্বাদ করিতে-করিতে চলিয়া গেল, আর

অনাহারে ছিল প্রভু দিন কাটাইয়া।

পরে গোবিন্দ

রজনীতে কিছু ফল ভিক্ষা মেগে আনি।
ফল সেবা করি প্রভু কাটায় রজনী॥

প্রভুর এমন অবস্থাতেও তাঁহার ভক্ত, ধনবান্ সঙ্গী, জমিদার রামানন্দ বসু সম্ভবতঃ স্বয়ং নগরের হাটে খাদ্য ক্রয় ও আহার করিয়া, অথবা "প্রভুর প্রস্তুত যোলোখানা রুটি হইতে আপনার ভাগ উদরস্থ করিয়া সুখে নিদ্রা দিতেছিলেন, "ক্ষুধার জ্বালায় ছট্‌ফট্‌কারী" প্রভুকে ভিক্ষা দিতে অগ্রসর হন নাই। বর্ণনাটি বাঙালী (বিশেষতঃ প্রবাসী), চরিত্রের সহিত ভক্ত-চরিত্রের সহিত, বৈষ্ণব-চরিত্রের সহিত, তীর্থযাত্রী-চরিত্রের সহিত, কোনো চরিত্রের সহিত খাপ খায় না।

৬। ইহার কয়েক দিবস পরে দ্বারিকা হইতে ফিরিবার সময়ে বরদা নগরে পঁহুছিয়া এই ধনবান্ যাত্রীর সেবক, পাণ্ডাকে দুই মুদ্রা-দাতা

গোবিন্দচরণ মুহি ভিক্ষা করিবারে
উপস্থিত হইলাম গৃহস্থের দ্বারে॥

এখানে এমন ধনবান্ যাত্রীরা গৃহস্থের দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায় কেন? সে-কালে কি ধনবান্ গৃহস্থ তীর্থযাত্রীরা দ্বারে-দ্বারে ভিক্ষা করিয়া খাইত?

৭। কয়েক স্থানে আছে, প্রভু সন্ন্যাসীর ভিক্ষালব্ধ অন্ন রাঁধিলে

প্রসাদ পাইনু তবে মোরা তিন জনে।
মুহি রামানন্দ আর গোবিন্দচরণে॥

রামানন্দের মত গৃহস্থ ধনবান্ জমিদার, তীর্থযাত্রী সন্ন্যাসীর ভিক্ষালব্ধ অন্ন খায় কেন? সেকালে কি এরূপ খাওয়া প্রচলিত ছিল? এ চরিত্রের সামঞ্জস্য হয় কেমন করিয়া?

৮। প্রভু ৩রা মাঘ সন্ন্যাস লইবার সময়ে মাথা মুড়াইয়াছিলেন, বৈশাখের আরম্ভে দক্ষিণ যাত্রা করেন, রামরায়ের কাছে দশ দিন ছিলেন; অতএব সিদ্ধবট পঁহুছিতে জ্যৈষ্ঠের প্রথম সপ্তাহের বেশী হইতে পারে না। কড়চাতে সিদ্ধবটকে অক্ষয়বট বলা হইয়াছে, কিন্তু ঐ স্থানের নাম অক্ষয়বট নহে, অক্ষয় বট নামে কোনো স্থান নাই। অথচ কড়চা অনুসারে সিদ্ধবটে

খসিল জটার ভার ধূলায় ধূসর।

এই চারমাসে খসিবার মতন জটা হইল কেমন করিয়া? অবশ্য পরচুলে বটের আঠা মাখাইয়া অনেক ভণ্ড সন্ন্যাসীরা জটা সৃজন করে, কিন্তু প্রভু তাহা কখনও করিতে পারেন না। তিনি দক্ষিণ ভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসিবার পর যখন পুরীতে তাঁহার গুরুস্থানীয় ব্রহ্মানন্দ ভারতী চর্ম্মাম্বর পরিয়া আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে চিনিতে চাহেন নাই। মুকুন্দ তাঁহাকে ভারতী গোসাঞিয়ের আগমন সংবাদ দিয়া

মুকুন্দ কহে এই আগে দেখ বিদ্যমান।
প্রভু কহে তেঁহো নহে, তুমি অগেয়ান॥
অন্যেরে অন্য কহ নাহি তোমার জ্ঞান।
ভারতী গোসাঞি কেন পরিবেন চাম॥

চর্ম্মাম্বর ত্যাগ করিলে তবে ভারতীকে প্রণাম করিয়াছিলেন। যে-ব্যক্তি আপনার গুরুর গুরুভ্রাতার সহিত এত কঠোরতা করিতে পারে, সে কখনই জটা পাকাইয়া ধারণ করিতে পারে না, অতএব কড়চার লেখা কবির কল্পনামাত্র।

বসুমতী বলেন—"রাম যে-দিন বনবাসী হইলেন, সেই দিন বল্কলের সঙ্গে জটা পরিয়াছিলেন; কিন্তু রাম ক্ষত্রিয়, পিতৃসত্য পালনে বনবাসী ব্রহ্মচারী, ও প্রভু সন্ন্যাসী, উভয়ের তুলনা হয় না। যে-প্রভু ভণ্ডামির উপর এত চটা, তিনি স্বয়ং জটা পাকাইতে পারেন না। ইহা সাধারণ মনুষ্য-চরিত্র-বিরুদ্ধ হয়।"

৯। চরিতামৃতে আছে—

গোসাঞির সঙ্গে রহে কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণ।
ভট্টমারি সহ তার হৈল দরশন॥
স্ত্রী ধন দেখাইয়া তাঁরে লোভ জন্মাইল।
আর্য্য সরল বিপ্রের বুদ্ধি নাশ হইল॥

কৃষ্ণদাস প্রভুকে ছাড়িয়া ভট্টমারি গৃহে চলিয়া গেলেন, কিন্তু প্রভু তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া

> কেশে ধরি বিপ্র লঞা করিলা গমন।

নীলাচলে আসিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে সকল কথা বলিয়া, পরে রাগ করিয়া বলিলেন :—

> এবে আমি ইহা আনি করিল বিদায়।
> যাঁহা তাঁহা যাহ আমা সনে নাহি আর দায়।

কিন্তু ভক্তরা কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় দিলেন, তবে সে-সময়ে প্রভুর সম্মুখে থাকিতে দিলেন না, প্রভুর প্রত্যাগমন-সংবাদ-সহ তাঁহাকে নবদ্বীপে পাঠাইয়া দিলেন। কৃষ্ণদাস-সম্বন্ধে চরিতামৃতের এই বিস্তৃত বর্ণনা অবিশ্বাস করিবার কোনো কারণ নাই, কিন্তু বিশ্বাস করিলে গোবিন্দ কর্ম্মকার ও তাহার কড়চায় অবিশ্বাস করিতে হয়।

১০। চরিতামৃতে বর্ণিত ভট্টমারির গল্প যে কাল্পনিক নহে, তাহা ঐ ভট্টমারি শব্দই প্রমাণিত করিতেছে। মল্লার দেশে [মলায়ালি] পুরোহিত ব্রাহ্মণদের "ভট্টন" বলে, উহা বাঙ্গালার "ভট্ট"। মলায়ালি ভাষার ব্যাকরণ-অনুসারে ভট্টন-শব্দের বহুবচন "ভট্টনমারি" হয়। কোন শব্দের পর "মারি" পদ যোগ করিলে তাহার বহুবচন হয়, যথা "ক্রিশ্চানমারি"।

মলায়ালি দেশের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে নম্বুরি অথবা নম্বুদ্রি বলে। শঙ্করাচার্য্য এই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহাদের বিবাহ-পদ্ধতি বাঙ্গালা দেশের মতন নহে। কোনোও নম্বুরি ব্রাহ্মণের যদি চারিটি পুত্র থাকে, তবে তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্রই সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকার পায়, অন্য পুত্রেরা জীবিতাবস্থায় কেবলমাত্র ভরণপোষণের অধিকারী হয়। কেবলমাত্র জ্যেষ্ঠপুত্র স্বঘরে ব্রাহ্মণ-কন্যা বিবাহ করিয়া বংশ রক্ষা করে, অন্য পুত্রেরা ব্রাহ্মণ-বংশে বিবাহ করিতে পায় না, তাহারা ক্ষত্রিয় নায়র কন্যার সহিত "সম্বন্ধম্" বা অর্দ্ধবিবাহ করে। এই সম্বন্ধমে ত্যাগ (divorce) চলে, কিন্তু কার্য্যত কেহ কখনও স্ত্রী ত্যাগ করে না। এই নায়র কন্যার গর্ভজাত পুত্রকন্যারা নায়র (ক্ষত্রিয়) হয়, ব্রাহ্মণ হয় না, তাহাদের পিতা ব্রাহ্মণ-সন্তান বলিয়া তাহদের মান বা অপমান হয় না। জ্যেষ্ঠ পুত্রের পুত্র না হইলে, অথবা পুত্র হইবার পূর্ব্বে তাহার কাল হইলে দ্বিতীয় পুত্র ব্রাহ্মণ-বংশে বিবাহ করিয়া বংশ রক্ষা করে; তাহার নায়র স্ত্রী ও সেই স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানেরাও গৃহে সসম্মানে স্থান পায়, কিন্তু তাহারা নায়র বলিয়া উত্তরাধিকারও পায় না, বংশরক্ষাও করিতে পারে না। প্রত্যেক বংশের কেবল জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্রাহ্মণ-কুলে বিবাহ করিতে পারে, অতএব ব্রাহ্মণ-কন্যাদের বিবাহ হওয়া অতি কঠিন, অনেকে চিরকাল অবিবাহিতা থাকে। এ-নিয়মে দেশের ব্রাহ্মণ-সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে পারে না; বংশ লোপ হওয়া সম্ভব কিন্তু বৃদ্ধি অসম্ভব।

নায়রদের মধ্যে কন্যারাই বিষয়ের অধিকারিণী, তাহারা ইচ্ছা ও ক্ষমতা মতন একাধিক বিবাহ করে, যখন যাহাকে ইচ্ছা আপনার শয়ন-মন্দিরে আসিতে অনুমতি দেয়। এরূপ স্ত্রীর গর্ভে সন্তান হইলে তাহার পিতৃত্ব স্থির করা অসম্ভব, অতএব তাহারা মাতৃ-নামে পরিচিত হইয়া থাকে। আজকাল শিক্ষিত নায়রেরা এপ্রথা পরিবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। যে-সকল বংশে স্ত্রীদের বহু-বিবাহপ্রথা উঠিয়া গিয়াছে, তাহাদেরও উত্তরাধিকার-সম্বন্ধে প্রাচীন কালের নিয়ম এখনও প্রচলিত আছে, অর্থাৎ মাতার বিষয়ের উত্তরাধিকার কেবল কন্যারা পায়, পুত্রেরা বিবাহ করিয়া আপনার-আপনার স্ত্রীদের বিষয় ভোগ করে।

মলায়ালী নায়র-রমণীরা নিখুঁত সুন্দরী, গৌরাঙ্গী, কর্ম্মদক্ষা, কষ্টসহিষ্ণু, ও পরিশ্রমী। যাহাদের অর্থ নাই তাহারাও পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জ্জন করে ও স্বামী প্রতিপালন করে। কৃষ্ণদাস, সম্ভবত এইরূপ সুখের অন্ন ও সুন্দরী স্ত্রী দেখিয়া ভুলিয়াছিলেন। পুস্তকের ভট্টমারি শব্দ প্রমাণিত করিতেছে যে, মল্লার দেশের কোনো সত্য ঘটনা হইতে গ্রন্থকার এই শব্দটি পাইয়াছেন, তিনি আপন কল্পনা-বলে ভট্ট শব্দের মলায়ালী ব্যাকরণ অনুমোদিত বহুবচন গড়িয়া লইতে পারেন নাই।

চরিতামৃতে আছে, প্রভু ভট্টমারিদের বলিতেছেন :—

> তুমিও সন্ন্যাসী দেখ, আমিও সন্ন্যাসী।
> আমার দুখ দেহ তুমি, ন্যায় নাহি বাসি।

এইপদের প্রথম "সন্ন্যাসী"-শব্দটি (চরিতামৃতের

বহু ভুলের মধ্যে একটি) ভুল। ভট্টমারিরা সন্ন্যাসী নহে, গৃহী।

১১। চরিতামৃত-অনুসারে প্রভু দক্ষিণভ্রমণকালে মহীশূর সীমানায় পয়স্বিনী তীরে, আদিকেশব মন্দিরে ব্রহ্মসংহিতা ও তাহার কিছু কাল পরে সতারা নগরের নিকট কৃষ্ণ-বেণ্বা (Krishna-Yenna) তীরে, বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ-সমাজে কর্ণামৃত গ্রন্থ পাইয়াছিলেন। কড়চাতে এ-গ্রন্থদ্বয়-সংগ্রহের উল্লেখ নাই। বেণ্বা (Yenna) একটি ক্ষুদ্র নদী, কৃষ্ণার সহায়ক। সতারা জেলার পাশে বেণ্বা ও কৃষ্ণার মধ্যবর্ত্তী স্থান অতি পবিত্র তীর্থ স্থান বলিয়া গণ্য। প্রভু এই দুই পুস্তক রামরায়কে (১৫১২ খৃঃ) দিয়াছিলেন, রামরায় বঙ্গীয় সমাজে প্রচলিত করিয়াছেন। কর্ণামৃত পুস্তকখানি পুন্তনম নম্বুরি (Puntanam Namburi) নামক এক মলায়ালি নম্বুরি ব্রাহ্মণ রচনা করিয়াছেন ; তিনি আধুনিক ত্রিবঙ্কুর (Travancore) রাজ্যের অন্তর্গত অঙ্গদিপুরম (Angadi-puram) নামক নগরের অধিবাসী। তিনি একজন অসাধারণ প্রতিভাবান্ কবি ও ভক্ত ছিলেন। কর্ণামৃত গ্রন্থখানি প্রভুর দক্ষিণ ভ্রমণের কয়েক মাস পূর্ব্বেই (১৫১০ খৃঃ) রচিত হইয়াছিল। প্রভু এপুস্তকখানি ত্রিবঙ্কুতে আদিকেশব মন্দিরে সংগ্রহ করিয়াছিলেন ; কৃষ্ণবেণ্বা-তীরে ব্রহ্মসংহিতা পাইয়া থাকিবেন, কেননা ১৫১০ খৃষ্টাব্দে ত্রিবঙ্কুর অঙ্গদিপুরমে রচিত পুস্তক ১৫১১ খৃষ্টাব্দে সতারার বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ-সমাজে প্রচলিত হওয়া কার্য্যত অসম্ভব। সম্ভব, যে যখন প্রভু আদিকেশব মন্দিরে পঁহুছিলেন, তখন এই প্রতিভাবান্ যুবক কবির যশ ছড়াইয়া পড়িয়াছে বা পড়িতেছে ; তাঁহার রচিত পুস্তকখানি মন্দির-প্রাঙ্গণে, বিগ্রহের সম্মুখে, বৈষ্ণব-সমাজে পাঠ করা হইত। প্রভুও ঐ কবিতা শুনিয়া মুগ্ধ হইলেন ও তাহার নকল করাইয়া লইলেন। এখানে চরিতামৃত ওলট পালট করিয়া ফেলিয়াছেন। এই কর্ণামৃতের উপক্রমণিকাতে বিল্বমঙ্গলের গল্প আছে। এখন মুদ্রাযন্ত্রের কৃপায় বঙ্গীয় পাঠক মাত্রেই বিল্বমঙ্গলের গল্প জানে। কিন্তু যখন কড়চা লেখা উচিত [অর্থাৎ ১৫১৫ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে] তখন বোধ হয় প্রভুর পার্ষদ ছাড়া আর-কেহ এ-গল্প শোনে নাই। ইহা ছাড়া আধুনিক বাঙ্গালা কর্ণামৃতে বিল্বমঙ্গলের যে-গল্প প্রচলিত, তাহাতে বিল্বমঙ্গল আপনার চক্ষু-দুটি স্বয়ং অন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, পরে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে আবার দৃষ্টিশক্তি দান করিয়াছিলেন। ১৫৮১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কোনো সময়ে কবিরাজ গোস্বামী কর্ণামৃত সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহাতে বিল্বমঙ্গলের গল্প দিয়াছেন, কিন্তু সে-গল্পে বিল্বমঙ্গলের চক্ষু নষ্ট হইবার কথা নাই। দ্রাবিড় দেশের মলায়ালি ও কর্ণাটি অক্ষরে লিখিত কর্ণামৃতে, অথবা মহারাষ্ট্রের কর্ণামৃতেও বিল্ব-মঙ্গলের অন্ধ হইবার উল্লেখ নাই। কবিরাজ গোস্বামীর সম্পাদিত কর্ণামৃত, ও দ্রাবিড় ও মহারাষ্ট্রের কর্ণামৃতে বিল্বমঙ্গলের গল্প একই-প্রকার, মোটে প্রভেদ নাই। বিল্ব-মঙ্গল চিন্তামণি-নাম্নী বেশ্যার প্রেমে আসক্ত ছিলেন, পরে তাহাকে ছাড়িয়া সোমগিরি-নামক কোনো সাধকের কাছে দীক্ষা লইয়া পরম ভক্ত হইয়া বৃন্দাবনে চলিয়া গেলেন, ও প্রেমোন্মত্ত অবস্থাতে বৃন্দাবনে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, ও মধ্যে-মধ্যে এক-একটি শ্লোক বলিতেন ; ঐ শ্লোকের সমষ্টি কর্ণামৃত। কর্ণামৃতের একটি শ্লোকের পরবর্ত্তী শ্লোকের সহিত কোনো সম্বন্ধ নাই। অতএব বিল্ব-মঙ্গলের চক্ষু নষ্ট হইবার গল্পটি ১৫৮১ খৃষ্টাব্দের পর কোনো সময়ে রচিত হইয়াছে. ও উহা খাঁটি বঙ্গদেশীয় কল্পনা। কিন্তু গোবিন্দ তাঁহার কড়চাতে প্রভুর দক্ষিণ যাইবার পথে গ্রন্থ সংগ্রহ করিবার বহু পূর্ব্বে পদ্মকোটে (Puddoo-cotah), এক অন্ধ দ্বারা প্রভুর স্তুতি করাইয়াছেন ; সেই অন্ধ বলিতেছে :—

> বস্ত্ররূপে দ্রোপদীর রাখিলে সম্মান।
> অন্ধ বিল্বমঙ্গলের চক্ষু দিলা দান॥

স্তুতির মধ্যে এরূপ কোনো পূর্ব্ব ঘটনার উল্লেখ কেবল এমন অবস্থায়ই সম্ভব, যেখানে শ্রোতামাত্রেই অর্থ ও ভাব বুঝিতে পারে। এই বিল্বমঙ্গলের চক্ষুদানের উল্লেখ দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, এই কড়চা এমন সময়ের রচনা, যখন চক্ষুদানের গল্প রচিত হইয়া পুরাতন ও সর্ব্বজন-বিদিত হইয়াছিল ও বঙ্গীয় পাঠকমাত্রেই বিল্বমঙ্গলের গল্পের ঐরূপ পাঠ জানিত। সেরূপ সময় ১৫৮১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ত সম্ভবই নহে, ১৫৮১ খৃষ্টাব্দের বহু পরে হইবে। সেকালে যখন মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, তখন বিল্বমঙ্গলের চক্ষু

নষ্ট হইবার গল্প রচিত ও বঙ্গদেশে প্রচলিত হইতে ২০।২৫ বৎসর সময় লাগিয়াছিল ধরিলে অন্যায় হয় না। অর্থাৎ কড়চাখানি ১৫৮১ খৃষ্টাব্দের অনেক পরে রচিত হইয়াছে; যতই পরে হউক না কেন, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে পুঁথি প্রাচীন ও কীটদষ্ট হইবার পক্ষে যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়। আবার কীটদষ্ট হইবার জন্য কোনো বিশেষ সময়ের প্রয়োজন হয় না; অবস্থা-বিশেষে, অতি অল্পসময়েও কীটদষ্ট হওয়া সম্ভব। অন্য কোনো প্রমাণ না থাকিলেও এই একটি প্রমাণই কড়চাকে ১৫৮১ খৃষ্টাব্দের বহু পরে রচিত, অতএব অনৈতিহাসিক প্রমাণিত করিবার পক্ষে যথেষ্ট।

১২। কড়চা-লেখক স্থান-বিশেষে চরিতামৃতের লেখাকে অশুদ্ধ অথবা গ্রাম্য ভাষা ভাবিয়া নিজে বুদ্ধি খাটাইয়া সাধুভাষাও শুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়া, শুদ্ধকে অশুদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছেন; যেমন চরিতামৃতে আছে :—

"শিয়ালী ভৈরবী দেবী করি দরশন"

ইহা দেখিয়া কড়চার কবি ভাবিয়াছেন, ভৈরবী ঠাকুরাণী একটি জীবন্ত স্ত্রী-শিয়াল (she-fox) বা শৃগালী ছিলেন, ও শৃগালীর পক্ষে নদীতীরে এক গর্ত্ত করিয়া তাহাতে বাস বা আশ্রম স্থাপন করাই সম্ভব। তাই তিনি লিখিয়াছেন

শৃগালী ভৈরবী নামে আর এক মুরতি।
নদীর কূলেতে হয় তাঁহার বসতি॥

কিন্তু চরিতামৃতে নদীতীরে কুটীর বা গর্ত্তবাসিনী কোনো শৃগালকুলোদ্ভবা তপস্বিনীর, অথবা শৃগালী নামধারিণী ভৈরবীর কথা লেখা হয় নাই। মান্দ্রাস হইতে রামেশ্বর পর্য্যন্ত যে সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলপথ (South Indian Railway) বিস্তৃত, তাহার ধারে, মাদ্রাস হইতে ১৬৪ মাইল দূরে, শিয়ালী (Shiyali) নামক একটি ক্ষুদ্র নগর আছে, উহা আধুনিক তাঞ্জোর (Tonjore) জেলার অন্তর্গত। শিয়ালীতে একটি প্রসিদ্ধ শিবমন্দির আছে; নগর ও মন্দির ছোটো হইলেও পবিত্রতার জন্য প্রসিদ্ধ। সেখানে প্রতি বৈশাখ মাসে একমাসব্যাপী মেলা হয়, তাহাতে বহু যাত্রী একত্রিত হয়। বৈশাখের শেষ দশ দিন অত্যন্ত জনসমাগম হয়। বোধ হয়, পূর্ব্বে পদটি ছিল :—

শিয়ালী ভৈরব শিব করি দরশন

পরে, কোনো আখরিয়া শিয়ালী শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গ ভাবিয়া "শিয়ালী ভৈরবী দেবী" করিয়া দিয়াছিল; তাহার বহুকাল পরে কড়চার কবি সাধু-ভাষাতে শিয়ালীকে শৃগালী করিয়া ফেলিয়াছেন, ও নদীতীরে তাঁহার আশ্রম বাঁধিয়া দিয়াছেন।

এ প্রমাণটিও এরূপ, যে, একমাত্র ইহার বলে কড়চাকে অনৈতিহাসিক বলা অন্যায় হয় না।

১৩। কড়চা-অনুসারে প্রভু তাম্রপর্ণী নদী অতিক্রম করিয়া কন্যাকুমারী গমন করিলেন, উহা ভারতবর্ষের শেষ দক্ষিণ সীমা। পরে, আবার উত্তর দিকে হাঁটিতে আরম্ভ করিলেন, ১৫ ক্রোশ হাঁটিয়া সাঁতলে আসিলেন, সেখানে এক সন্ন্যাসীর দলের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সাঁতলে এক রাত্রি থাকিয়া, পর্ব্বত ভেদ করিয়া ত্রিবঙ্কু (Travancore) প্রবেশ করিলেন। ত্রিবঙ্কু দেশের বর্ণনায় কেবল সেখানকার রাজা রুদ্রপতির সহিত কথাবার্ত্তা ও সুখ্যাতি মাত্র আছে। রাজার ও প্রজার সুখ্যাতি ছাড়া একটিও দেবস্থান দর্শনের কথা নাই। বোধ হয় কড়চার কবি ত্রিবঙ্কু দেশের নাম শুনিয়াছিলেন, কিন্তু সেখানে কি কি দেখিবার বস্তু আছে, তাহা জানিতেন না। প্রভু রাজার আতিথ্য গ্রহণ করিয়া পয়োষ্ণি নগরে প্রবেশ করিলেন। স্থানবর্ণনার মধ্যে কেবল এইটুকু আছে যে, ত্রিবঙ্কুর রাজধানীর নিকট যেখানে প্রভু আসন করিয়াছিলেন তাহার পূর্ব্ব দিকে একটি গিরি আছে, তাহাকে রামগিরি বলে, সেখানে, লঙ্কাজয় করিয়া সীতার সহিত রাম তিন দিন বাস করিয়াছিলেন। এইটুকু ছাড়া আর কোনো বর্ণনা নাই। প্রভু পয়োষ্ণিতে শিবনারায়ণ দেখিয়া শিঙারির মঠে [শৃঙ্গেরী Sringeri] শঙ্করের স্থানে উপস্থিত হইলেন। মলাবারের অনন্তপদ্মনাভ, আদিকেশব ও জনার্দ্দনের মন্দির পবিত্রতা ও প্রাচীনত্বে দক্ষিণ দেশে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অতএব ভারতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; কেননা উত্তর ভারতে প্রাচীন মন্দির তখনও ছিল না, এখনও নাই। মুসলমানদের সময়ে, সিকন্দর লোদীর রাজত্বকালে [১৪৮৯ খৃঃ—১৫১৬ খৃঃ] উত্তর ভারতের সকল মন্দির ও তীর্থগুলি চেষ্টা করিয়া লুপ্ত করা হইয়াছিল। ত্রিবঙ্কুর রাজধানীতেই প্রাচীন প্রসিদ্ধ মূর্ত্তি মধ্যে অনন্তপদ্মনাভ, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবরাহ, ও

নরসিংহ এই চারিটি প্রধান বিষ্ণুমন্দির, একটি ত্রিমূর্ত্তি, একটি শিবের কিরাত বেশে মূর্ত্তি ও একটি ভগবতীর মূর্ত্তি আছে, ও সেকালে ছিল। এগুলি ছাড়া নিকটেই [কয়েক মাইল দূরে] আদিকেশব, ও জনার্দ্দনের অতি প্রাচীন ও অতি পবিত্র মন্দির আছে। এ-সকল না দেখিয়া ও কর্ণামৃত সংগ্রহ না করিয়াই তিনি কেবলমাত্র পয়োষ্ণি দেখিয়া ও রুদ্রপতির আতিথ্য ভোগ করিয়া শিঞারি চলিয়া গেলেন। এরূপ বর্ণনা বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না।

১৪। কড়চাকার ভূগোল অগ্রাহ্য করিয়াছেন। প্রভু আমেদাবাদের কাছে ঘোগা নামক গণ্ডগ্রামে বারমুখী নামিকা বেশ্যাকে ভক্তি দান করিলেন, পরে

বারমুখী কুলটারে প্রভু ভক্তি দিয়া।
সোমনাথ দেখিবারে চলিলা ধাইয়া॥
জাফরাবাদের দিকে প্রভু চলি যায়।
বহু কষ্টে তিন দিনে পঁহুছায় তথায়॥

কিন্তু ঘোগা হইতে জাফরাবাদ আকাশ-পথে ১৬০ মাইল অপেক্ষা কিছু বেশী। পথঘাট সে-কালে কিরূপ ছিল ঠিক জানা নাই, তবে মধ্যে-মধ্যে বন-জঙ্গল ছিল। পাকা সোজা রাস্তা কল্পনা করিলেও প্রত্যহ ৫৩।৫৪ মাইল পথ অতিক্রম করা অসম্ভব। জাফরাবাদ হইতে

প্রভাতে উঠিয়া মোরা সোমনাথে যাই।
ছয় দিন পরে গিয়া সেখানে পৌছাই।

জাফরাবাদ হইতে সোমনাথ আকাশ-পথে বড় জোর ৬০ মাইল। এই ৬০ মাইল অতিক্রম করিতে ছয়দিন লাগিল আর তাহার ঠিক পূর্ব্বেকার ১৬০ মাইল অতিক্রম করিতে তিন দিন !!!

১৫। কড়চাকার যেমন ভূগোল অগ্রাহ্য করিয়াছেন, তেমন ইতিহাসও অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তিনি বলেন প্রভু কন্যা-কুমারী হইতে ত্রিবঙ্কু দেশেপ্রবেশ করিলেন—

"এখানকার রাজা তার নাম রুদ্রপতি।"

কড়চাকার এই রুদ্রপতির অনেক সুখ্যাতি করিয়াছেন; কিন্তু দাক্ষিণাত্যে রুদ্র নাম বৈষ্ণবে রাখে না, ও ত্রিবঙ্কুর রাজারা চিরকাল ঘোর বৈষ্ণব। এমন-কি অনন্তপদ্মনাভ বিগ্রহ দেশের রাজা বলিয়া পরিচিত ও রাজা দেবতার প্রধান সেবক ও রাজ্য-রক্ষক মাত্র। প্রভু যখন দক্ষিণে ভ্রমণ করিয়াছিলেন (১৫১০।১১ খৃঃ) তখন ত্রিবঙ্কুর রাজা ছিলেন শ্রীবীর এরবী বর্ম্মা রাজা (Sri Veer Erwi Varma Raja) তিনি ১৫০৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫২৮ পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। ইতিহাসে ১৩৩৫ খৃষ্টাব্দ হইতে অদ্যাবধি কোনো রাজার নাম রুদ্রপতি নাই। কড়চা-লেখক যে কল্পনা-বলে এ-নাম সৃজন করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

বসুমতী [চৈত্র] বলেন, "আমাদের বিশ্বাস ত্রিবঙ্কুর রাজগণের রুদ্রপতি উপাধি ছিল। রাজাদের বংশাবলীতে পোশাকী নাম ও জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত নাম ব্যবহৃত হওয়ার দৃষ্টান্ত অনেক স্থলে পাওয়া যায়। সেলিম জহাঙ্গীর বাদশাহের নাম এবং আলমগীর আওরঙ্গজেবের নাম একথা সকলেই জানেন। সে-সময়ের উড়িষ্যার রাজার নাম ছিল প্রতাপরুদ্র, কিন্তু কোনো-কোনো স্থানে তাঁহাকে গজপতি বলা হইয়াছে।"

প্রতাপরুদ্র গজপতি-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহাকে স্থানবিশেষে গজপতি বলা হইয়াছে। রামায়ণে রামচন্দ্রকে স্থানবিশেষে রাঘব, কাকুৎস্থ, সূর্য্যবংশ-সিংহ ইত্যাদি বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণকে যদুপতি, যদুকুল-চূড়ামণি ইত্যাদি বলা হইয়াছে। ঐসকল বংশ এখন লোপ পাইয়াছে, কিন্তু ইতিহাসে ঐসকল নাম পাওয়া যায়। মুসলমান-বাদশাহের নামের যে-দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, তাহার একটি নাম, অন্যটি উপাধি। ইতিহাসে দুই নামই আছে। ইহা ছাড়া, হিন্দুরাজাদের উপাধি ছাড়া, এক একজনের ৫।৭।১০টি ডাক নাম পাওয়া যায়। কিন্তু হিন্দুরাজারা যেমন মুসলমানী নাম, অথবা মুসলমান রাজারা হিন্দু নাম রাখিত না ও রাখে না, সেইরূপ বৈষ্ণবেরা শৈব নাম রাখিত না ও এখনও রাখে না। আজকাল ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে অনেক কমিলেও দাক্ষিণাত্যে শৈব ও বৈষ্ণবে যথেষ্ট বিদ্বেষ আছে। ইহা ছাড়া কেবল "বিশ্বাস" ইতিহাসের প্রমাণ হইতে পারে না। সে-সময়ের ত্রিবঙ্কুর রাজবংশ এখনও রাজ্যশাসন করিতেছে, বংশ পরিবর্ত্তনও হয় নাই, লোপও পায় নাই। ঐ বংশের কোনো কালে রুদ্রপতি উপাধি ছিল বা কোনো রাজার পোশাকী বা আটপৌরে নাম রুদ্রপতি ছিল, ইতিহাসে সে-কথা পাওয়া যায় না; অতএব কেবল বিশ্বাস করা নিষ্ফল।

১৬। গোবিন্দ কর্ম্মকারের নাম একমাত্র জয়ানন্দের

চৈতন্যমঙ্গলে আছে, আর কোনো পুস্তকে নাই। নিমাই পণ্ডিত সন্ন্যাস গ্রহণ-সম্বন্ধে বলিতেছেন :—

মুকুন্দ দত্ত বৈদ্য, গোবিন্দ কর্ম্মকার।
মোর সঙ্গে আইস কাটোয়া গঙ্গা পার॥
*　　*　　*
তোমা সভা বিদ্যমানে লইব সন্ন্যাস॥

এখানে দশ জন লোকের নাম করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় গোবিন্দ কর্ম্মকার একজন পার্ষদের নাম ছিল, কিন্তু এ-নাম আর কোনো সমসাময়িক গ্রন্থে নাই। জয়ানন্দকে প্রভুর সমসাময়িক বলা চলে। তিনি বর্দ্ধমান জেলার আমাইপুরা গ্রামের, (প্রভুর পূর্ব্ব শিষ্য) সুবুদ্ধি মিশ্রের পুত্র। প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের পর যখন একবার পুরী হইতে দেশে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বয়স ২৮ বৎসর তিন মাস; সেইসময় জয়ানন্দের বাটী গিয়াছিলেন, তখন জয়ানন্দের নাম (মায়ের মড়াছিয়া বাদে) গুআ ছিল, প্রভু নাম বদ্‌লাইয়া জয়ানন্দ রাখিলেন। জয়ানন্দ তখন শিশু। ভবিষ্যতে জয়ানন্দ "চৈতন্যমঙ্গল" রচনা করিয়া গ্রামে-গ্রামে গাহিয়া উদর পালন করিতেন। সাহিত্যপরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গলের সম্পাদকদ্বয় জয়ানন্দকে প্রামাণিক গ্রন্থকার বিবেচনা করেন। বৃন্দাবন দাস যেসকল সংবাদ দেন নাই বা জানিতেন না, তাহাও জয়ানন্দ লিখিয়াছেন বলিয়া সম্পাদকদের বিশ্বাস জয়ানন্দ অনুসন্ধান (Research) করিয়া ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু জয়ানন্দ গীত গাহিয়া শ্রোতার তুষ্টিসাধন করিতেন, অনুসন্ধান করিয়া ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কার করিতে জানিতেন না। তিনি আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত ইতিহাস লেখেন নাই, দশ কথা বাড়াইয়া গুণগান করিতে ঐতি-হাসিক সত্যকথা মাত্র বলিতে হইবে এমন কোনো নিয়মের অধীন তিনি ছিলেন না। তাঁহার রচনা মধ্যে এমন অনেকগুলি অসংলগ্ন কথা আছে যে, তাহাকে ঐতিহাসিক বা প্রামাণিক বলা যায় না। তাঁহার যাহা মুখে আসিয়াছে, ও যাহা ভালো বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন, তাহা বলিয়াই প্রভুর গুণগান করিয়াছেন। গুণগান-কালে অনেক কথা বাড়াইয়া বলাতে দোষ বিবেচনা করেন নাই। গুণগান করাই তাঁহার উদ্দেশ্য, ইতিহাস লেখা নহে; অতএব তিনি ইতিহাসের কোনো ধার ধারেন না। সম্ভব, যে, প্রভুর পার্ষদ- বা সেবক-মধ্যে একজনের নাম গোবিন্দ ছিল, তিনি এত নগণ্য ছিলেন যে, অন্য লেখকেরা তাঁহার নামোল্লেখের প্রয়োজন দেখেন নাই। এইমাত্র সত্য হইতে পারে।

চরিতামৃত লেখা হইবার বহুকাল পরে, বিল্বমঙ্গলের দৃষ্টিপ্রাপ্তির গল্প রচিত, প্রচলিত ও সর্ব্বজনবিদিত হইবারও বহুকাল পরে [সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে বা অষ্টা-দশের আরম্ভে] কোনো রসিক লেখক আপনার অভিজ্ঞতা মত ভ্রমণকাহিনী রচনা করিয়া প্রভুর একজন নগণ্য পার্ষদের নামে চালাইয়াছেন। প্রভুর পার্ষদরূপে গোবিন্দের অস্তিত্ব প্রমাণিত করিতে পারিলেই কড়চাখানি যে সেই গোবিন্দের রচনা, ইহা প্রমাণিত হয় না।

১৭। প্রভু দক্ষিণের প্রায় সকল প্রসিদ্ধ বিষ্ণু-মন্দির ও অধিকাংশ শিব-মন্দির দেখিয়াছিলেন, কিন্তু কামাক্ষী, মীনাক্ষী ইত্যাদি প্রসিদ্ধ শক্তিমন্দিরে গিয়াছিলেন কি না তাহার উল্লেখ নাই। সম্ভবতঃ যান নাই, কেননা সে-কালে বাঙ্গালার বৈষ্ণবেরা শাক্তদের অতি ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণবেরা এখনও অবৈষ্ণব মাত্রকেই "পাষণ্ডী" বলে। চৈতন্যভাগবতকার লিখিয়াছেন:—

পতিত পাবন কৃষ্ণ সর্ব্ব বেদে কহে।
অতএব শাক্ত সহ প্রভু কথা কহে॥

প্রভু পতিতপাবন স্বয়ং কৃষ্ণ তাই শাক্তের সহিত কথা কহেন, যে-সে বৈষ্ণবে পারে না। শঙ্করাচার্য্যও প্রথমে শাক্ত ধর্ম্মকে "অধর্ম্ম" বলিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে যে, পরে কোনো-প্রকার স্বপ্নাদেশ পাইয়া কাঞ্চীর কামাক্ষী ও মথুরার (Madura) মীনাক্ষী মন্দিরে বসিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। তিনি কোনোপ্রকার চমৎকার দর্শন করিয়া শাক্ত ধর্ম্মে বিশ্বাস করিয়াছিলেন, ও ভগবতীর স্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন। উভয় স্থানে মন্দির-প্রাঙ্গণে যেখানে বসিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন, সেখানে শঙ্করের মূর্ত্তি এখনও স্থাপিত আছে।

১৮। প্রভু যখন দক্ষিণ যাত্রা করিলেন তখন তাঁহার

ভক্ত পার্ষদের দল বেশ পুষ্ট, তাহাদের মধ্যে কায়স্থ ও অন্য জাতি থাকিলেও ব্রাহ্মণ ও বিদ্বানের সংখ্যাই বেশী। তখনকার সন্ন্যাসীদের মধ্যে প্রায়ই বিদ্বান্ মানুষ ছিল। গৈরিক বসন ধারণ করিয়া গঞ্জিকা সেবন তখন সন্ন্যাসের একমাত্র লক্ষণ ছিল বলিয়া বোধ হয় না। শুনিতে পাই, সন্ন্যাসীদের জাতি ও অন্নের বিচার নাই, তথাপি সেকালের সন্ন্যাসীরা ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্যজাতীয় সেবক রাখিতেন না; অন্নের এত বিচার ছিল, যে (চরিতামৃত) বৃন্দাবনে একজন সনোড়িয়া ব্রাহ্মণ প্রভুকে রাঁধিয়া খাওয়াইতে সাহস করেন নাই; যখন প্রভু শুনিলেন যে, মাধবেন্দ্রপুরী ঐ সনোড়িয়ার হাতে খাইয়াছিলেন, তখন তিনিও তাহাকে রাঁধিতে অনুরোধ করিলেন। কড়চার কবি স্বয়ং বলিতেছেন যে, দক্ষিণযাত্রার কথা উঠিতেই নিত্যানন্দ বলিলেন:—

> পবিত্র হইয়া বিপ্র তাহাই করিবে।
> যখন ইহারে যাহা করিতে বলিবে॥

এত বিচারের কালে ও এতগুলি ব্রাহ্মণ থাকিতে ভক্তেরা বাছিয়া-বাছিয়া একটি পেটুক কামারকে সঙ্গে দিলেন; প্রভুকে প্রত্যহ আপনার প্রেম ও বিহ্বলতা ভুলিয়া হাত পোড়াইয়া ভৃত্যের ও নিজের উদর পূরণ করিতে হইত। কথাটা এত অশ্রদ্ধেয় যে, বিশ্বাস করা যায় না। বসুমতী বলেন,

> 'প্রভুর সহিত কে ছিল ঠিক জানা নাই। বলদেব ভট্ট ও কৃষ্ণদাস নামক দুই ব্যক্তি পশ্চিম ভ্রমণ-কালে সঙ্গে ছিল, এইরূপ একটা প্রবাদ ছিল মাত্র, সম্ভব কবিরাজ সেই প্রবাদ অনুসারে বলদেবকে পশ্চিম ভ্রমণের ও কৃষ্ণদাসকে দক্ষিণ ভ্রমণের সঙ্গী করিয়াছেন।"

প্রভু প্রায়ই বিহ্বল অবস্থায় থাকিতেন, তাঁহাকে যত্ন করিয়া খাওয়াইতে হইত; এমন অবস্থায় তাঁহার পার্ষদ ভক্তেরা কখনই তাঁহাকে একা দক্ষিণে যাইতে দেন নাই, একজন ব্রাহ্মণ তাঁহাকে রাঁধিয়া খাওয়াইতে নিশ্চয় সঙ্গে গিয়াছিল, সে কৃষ্ণদাসই হউক বা আর-কেহ হউক।

১৯। কড়চাতে প্রভুর দ্বারিকা-গমনের সবিস্তার বর্ণনা আছে, কিন্তু চরিতামৃতে কিছুই নাই। চরিতামৃত-কার লিখিতে ভুল করেন নাই; তিনি বেশ জানিতেন যে, প্রভু দ্বারিকা যান নাই, যদিও কেন যান নাই, সে-কথা বলেন নাই। চরিতামৃতে আছে যে, প্রভু ও শ্রীরঙ্গপুরী একসঙ্গে পাণ্ডুপুরে ৫।৭ দিন ছিলেন:—

> এই মত গোঙাইল পাঁচ সাত দিনে।
>
> * * * *
>
> এইমত দুই জনে ইষ্ট গোষ্ঠী করি।
> দ্বারকা দেখিতে চলিলা শ্রীরঙ্গপুরী॥
> দিন চারি প্রভুকে তাঁহা রাখিল ব্রাহ্মণ।
> ভীমরথী স্নান করি বিঠ্ঠল দর্শন॥
> তবে মহা প্রভু আইলা কৃষ্ণ-বেন্না তীরে।
> নানা তীর্থ দেখি তাঁহা দেবতা-মন্দিরে॥

অর্থাৎ পণ্ঢরপুর হইতে শ্রীরঙ্গপুরী দ্বারকা চলিয়া গেলেন, আর প্রভু চার দিন সেইখানে রহিলেন; পরে, কৃষ্ণ-বেণ্বা-তীরে দেবতা-মন্দির দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার দ্বারকা যাইবার ইচ্ছা থাকিলে শ্রীরঙ্গপুরীর সঙ্গত্যাগ করিতেন না। চরিতামৃতের লেখার ধরণে বোধ হইতেছে, যে প্রভুর না-যাওয়া-সম্বন্ধে লেখকের সম্পূর্ণ জ্ঞান ছিল, কেন যান নাই তাহার কারণ তিনি জানিতেন না। কিন্তু ইহাও বিশ্বাস হয় না যে প্রভু এত দেশ ভ্রমণ করিয়া দ্বারকার দ্বারের নিকট হইতে না দেখিয়াই ফিরিয়া আসিলেন। কাঠিয়াওয়াড়ে সোমনাথ ও দ্বারকা দুইটি বড় তীর্থস্থান। সোমনাথকে উপেক্ষা করিলেও দ্বারকাকে উপেক্ষা করিবার কারণ বুঝিতে পারা যায় না। আমার বিশ্বাস তিনি নিশ্চয় দ্বারকা গিয়াছিলেন, চরিতামৃতকার লিখিতে ভুল করিয়াছেন।

২০। বসুমতী বলেন, "কড়চাতে দাক্ষিণাত্যের যে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আছে, তাহা কেহ বঙ্গদেশে বসিয়া লিখিতে পারে না।" অবশ্য যে-কেহ লিখিয়া থাকুক সে দেখিয়াই লিখিয়াছে, অথবা যে দেখিয়াছে এমন লোকের মুখে শুনিয়া লিখিয়াছে, কিন্তু সে-লেখক যে প্রভুর সঙ্গী গোবিন্দ তাহার প্রমাণ কোথায়? আবার ঐ বর্ণনাও ঠিক নহে, যেমন প্রভুর যেথা-সেথা আটা-চুনা ভিক্ষা লাভ করা, নগর শিয়ালীকে শৃগালী বলা ইত্যাদি। উত্তর ভারতের তীর্থগুলি সিকন্দর লোদী বহু চেষ্টা করিয়া (১৪৮৯-১৫১৬) লুপ্ত করিয়াছিলেন। পুলিন-বাবু বলেন, প্রাচীন বৃন্দাবন লুপ্ত হইবার পর আধুনিক বৃন্দাবনের প্রথম মন্দির ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার পর অকবর বাদশার রাজত্বকালে আবার তীর্থরূপ ধারণ করিয়াছে। এইসময়ে ও ইহার বহুকাল পরে বঙ্গের তীর্থযাত্রীরা দাক্ষিণাত্যেই যাইত; দক্ষিণের মন্দিরগুলি

তখন ভাল অবস্থায় ছিল, ও এখনও আছে। এখনও অনেক বাঙ্গালী তীর্থযাত্রী দাক্ষিণাত্যে যায়। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে আমি কাঞ্চীতে একদল কলিকাতাবাসী তীর্থ-যাত্রী পাইয়াছিলাম, তাঁহারা তখন নয় মাসের বেশী দাক্ষিণাত্যে ঘুরিতেছেন, আর ছয় সাত মাস পরে কলিকাতায় পঁহুছিবেন বলিলেন। অতএব দাক্ষিণাত্যের তীর্থস্থান-সম্বন্ধে জ্ঞান, তীর্থযাত্রী বাঙ্গালী মাত্রেরই ছিল। কেবল এই জ্ঞান দ্বারা বিশেষ কিছুই প্রমাণিত হয় না।

২১। বসুমতী বলেন, "৩৫০বৎসর পূর্ব্বে বৈষ্ণবকবি বলরাম দাস তাঁহার এক পদে লিখিয়াছেন যে,গোবিন্দ দাস মহাপ্রভুর সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে গিয়াছিলেন"; আরও বলেন যে, গোবিন্দ আপনার স্ত্রীর হাতে ধরা পড়িবার ভয়ে আপনাকে প্রচ্ছন্ন করিয়া ঈশ্বরপুরীর প্রেরিত সেবক বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল, ও ধরা পড়িবার ভয়েই কড়চা গোপন করিয়াছিল। কিন্তু ইহা কিরূপে সম্ভব বুঝিতে পারা গেল না। গোবিন্দর স্ত্রী জানিত যে, গোবিন্দ প্রভুর সহিত পুরী গিয়াছিল। গোবিন্দর স্ত্রী যদি পুরীতে গিয়া গোবিন্দকে দেখিত, তাহা হইলে কি তাহাকে আপনার স্বামী বলিয়া চিনিতে পারিত না, ঈশ্বরপুরীর ভৃত্য বলিয়া সন্দেহ করিত? কিম্বা সেকালে কড়চাখানি গোপন না করিয়া প্রকাশিত করিবামাত্র বঙ্গদেশের গ্রামে গ্রামে, বৈষ্ণব-সমাজে প্রচারিত হইত, তাহার স্ত্রী সেই পুস্তক দেখিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিত? আজকাল মুদ্রাযন্ত্র, বিজ্ঞাপন ও মাসিক পত্রের সমালোচনা-সাহায্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ গ্রন্থকারেরা যে সুফল আশা করিতে সাহস করেন না, চারশত বৎসর পূর্ব্বে হাতে-লেখা তাল-পাতের পুথির কালে গোবিন্দ তাহাই আশা করিয়া পুথি গোপন করিয়াছিল? কিন্তু এ গোপনও ত কেবল নিজের জীবিতাবস্থায় করা সম্ভব। চরিতামৃত লেখা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ১৫১০ খৃষ্টাব্দের বৃদ্ধ গোবিন্দ নিশ্চয় মরিয়া থাকিবে। প্রভুর তিরোধানের পর তাঁহার পার্ষদেরা পুরী হইতে কড়চাসহ বৃন্দাবনে আসিয়া থাকিবেন, অতএব কবিরাজ নিশ্চয় দেখিয়া থাকিবেন। কিন্তু চরিতামৃতে কড়চার উল্লেখ না থাকায় স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, চরিতামৃত রচনার সময়ে কড়চার অস্তিত্ব ছিল না।

বলরাম দাসের কথা অবিশ্বাস করিবার কোনো কারণ নাই, কিন্তু তাহাতে এই মাত্র প্রমাণিত হয়,যে দাক্ষিণাত্যে প্রভুর সঙ্গীদের মধ্যে গোবিন্দ নামক এক ব্যক্তি ছিল, কিন্তু ঐ সঙ্গী গোবিন্দই যে প্রচলিত "গোবিন্দ দাসের কড়চা" রচয়িতা তাহা প্রমাণিত হয় না। যে পুস্তকখানি কড়চা নামে প্রচলিত তাহার আভ্যন্তরীন প্রমাণ যখন তাহাকে কাল্পনিক, অনৈতিহাসিক ও বহু পরবর্ত্তী কালের রচনা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিতেছে, তখন গোবিন্দ নামক কোনো ব্যক্তি ছিল কি না, সে কর্ম্মকার কি কায়স্থ, সে-ই আত্মগোপন করিয়া আপনাকে ঈশ্বরপুরীর প্রেরিত ভৃত্য বলিয়াছিল কি না, সে সকল তুচ্ছ বিষয়ের আলোচনার কোনো ফলই হয় না। বরং বলরাম দাসের উক্তিতে ইহাই সন্দেহ হয়, যে পরবর্ত্তী কালে কোনো রসিক লেখক কড়চা রচনা করিয়া প্রভুর এক নগণ্য সঙ্গী গোবিন্দ কর্ম্মকারের নামে প্রচলিত করিয়াছে।

২২। গোবিন্দের কড়চার বর্ণনার অধীনে বসুমতী বলিতেছেন—

> চৈতন্য ভাগবতে পরিষ্কার লেখা আছে, যে হরিদাস মুসলমান; এই অপমান (?) ঢাকিবার জন্য শেষে হরিদাসকে মুসলমান-গৃহে লালিত ব্রাহ্মণপুত্র বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। এমন-কি, তাহার পিতামাতার শুদ্ধ ব্রাহ্মণোচিত নামও পরিকল্পিত হইয়া তাহার জাতি শোধন করিয়া লইবার চেষ্টা হইয়াছে। তিনি যদি ব্রাহ্মণ সন্তানই হইবেন, তবে কি কাজীর রাগ এত হইতে পারিত যে, তাহাকে ২২টি বাজারে লইয়া গিয়া এরূপ নির্দ্দয়ভাবে চাবুক মারা হইত?"

কিন্তু যে জয়ানন্দকে সাহিত্য পরিষৎ বেশী পরিচয় সংগ্রহ করিয়া লিখিয়াছেন বলিয়া প্রামাণিক বিবেচনা ও বিশ্বাস করেন সেই জয়ানন্দই হরিদাসের পিতামাতা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন

> 'উজ্জ্বলা মায়ের নাম, বাপ মনোহর।'

খুব সম্ভব, হরিদাস ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া বাল্যা-বস্থায়, যে-কোনো কারণে, কোনো মুসলমান-পরিবারে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, সেখানে তিনি ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। হরিদাস যে-বংশেই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকুন, তিনি ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যখন একবার ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তখন তিনি মুসলমান। মুসলমান বলিলে তাঁহার মুসলমান পিতামাতার গৃহে জন্ম প্রমাণিত হয় না, মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়াই প্রমাণিত

হয়। যে-বংশেই জন্ম হউক না কেন, একবার ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার পর ইস্‌লামের অবমাননা করিলে, ইস্‌লামের ধর্ম্ম সংক্রান্ত আইন-(Religious Law)অনুসারে কাজী তাহাকে ঐরূপ কঠোর শাস্তি দিতে কেবল অধিকারী নহে, বাধ্যও বটে। হরিদাস যদি ইস্‌লাম ত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম্মের আশ্রয় লইতেন, তবে কাজী কিছুই করিত না। হিন্দুরা মুসলমানকে হিন্দু বলিয়া গ্রহণ ও স্বীকার করেন না, অতএব হরিদাসের কৃষ্ণ নাম করিবার অর্থ ইস্‌লামে দীক্ষিত অবস্থায় ইস্‌লামকে বিদ্রূপ করা মাত্র। হরিদাস যদি ক্রিশ্চান হইয়া যাইতেন, তবে কাজী কিছুই করিত না, বা করিতে পারিত না। কেবল কাজীর কঠোর শাস্তি দ্বারা মুসলমানবংশে জন্ম প্রমাণিত হয় না; এইমাত্র প্রমাণিত হয় যে, তিনি যে-বংশেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন, তিনি ইতিপূর্ব্বে ইস্‌লাম-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন ও তখন পর্য্যন্ত কোনো অনুষ্ঠান করিয়া ইস্‌লাম ত্যাগ করেন নাই, অতএব মুসলমান ছিলেন।

এ আইন এখনও হায়দ্রাবাদ-রাজ্যে প্রচলিত আছে, যদিও ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে যত কঠোরভাবে ইহা ব্যবহার করা হইত, এখন আর ইহার সম্বন্ধে তত কঠোরতা করা হয় না।

গোবিন্দের কড়চা বৈষ্ণব-সমাজে আদৃত, উহা প্রামাণিক প্রমাণিত হইলে সুখী হইব, তবে আজকাল, অনুসন্ধানের যুগে, ৪৫ বৎসর পূর্ব্বে একখানি কীটদষ্ট পুঁথির অস্তিত্ব দেখিয়া ঐতিহাসিক বলা হাস্যোদ্দীপক। উহাকে ঐতিহাসিক বিবেচনা করিবার বাস্তবিক কোনো কারণ থাকিলে, সেগুলি প্রকাশিত করিলে বাধিত হইব।

গালা-প্রস্তুত-পদ্ধতির উন্নতি-সাধন

ডাঃ রসিকলাল দত্ত, ডি-এস্‌সি, এফ-সি-এস, এফ্-আর্-এস্-ই, ইণ্ডাস্‌ট্রিয়্যাল্ কেমিস্‌ট্

বাঙ্গালার কয়েকটি গালা-প্রস্তুত করিবার কার্‌খানায় যে-সকল পরীক্ষা করা হইয়াছিল, তাহার ফল এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করা হইল। এইসকল কার্‌খানায় অল্প পরিমাণে কুটীর শিল্পের উপযোগী গালা-প্রস্তুতের যে-পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, তাহা অত্যন্ত অসন্তোষজনক—তাহাতে নিতান্ত অপকৃষ্ট শ্রেণীর গালা প্রস্তুত হইয়া থাকে। সেই পদ্ধতিতে যে-উন্নতির উপায় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ লাক্ষা বাটিবার, গুঁড়াইবার ও ধৌত করিবার প্রণালীতেই আবদ্ধ; সেইজন্য প্রচলিত যে-প্রক্রিয়ায় গালা গলানো হয়, তাহার বিবরণ এই প্রসঙ্গ হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। ঐসকল কার্‌খানায় এক্ষণে কুটীর-শিল্পের উপযোগী অল্প-পরিমাণে প্রস্তুতের যে-পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, তাহা সংক্ষেপে নিম্নে বিবৃত করা হইল।

স্বাভাবিক বা অসংশোধিত লাক্ষা (crude lac) যাহা ক্রয় করা হয়, তাহা নানা-আকারের ভাঙা-ভাঙা টুক্‌রার সমষ্টি, তাহাতে বহু পরিমাণে বালি, মাটি, ধুলা ও কাঠিকুটা মিশ্রিত থাকে। উহা সেই অবস্থাতেই শিল-নোড়ায় বাটিয়া অথবা অপেক্ষাকৃত বড়-বড় কার্‌খানায় হস্ত-চালিত কলের জাঁতা-কলে পিষিয়া লওয়া হয়। সেই বাটা বা পেষা মাল ছয়-ঘরা চালনীতে (six-mesh sieve) ছাঁকিয়া বড়-বড় দানাগুলি, যাহা ঐ চালনীর ছিদ্রে গলে না, তাহা পুনরায় গুঁড়াইয়া লওয়া হয়—যে-পর্য্যন্ত না সমস্ত মাল ছয়-ঘরা চালনীর ভিতর দিয়া গলিয়া ছাঁকা হইয়া যায়। তৎপরে উহা ধৌত করা হয়। কোনো-কোনো কার্‌খানায় কাঁচা বা স্বাভাবিক লাক্ষাকেই প্রথমে ছয়-ঘরা চালনীতে ছাঁকিয়া ছোটো-ছোটো লাক্ষার কণিকাগুলি বাহির করিয়া লইয়া, বড়-বড় দানাগুলি, যাহা চালনীর ছিদ্রে গলে না, তাহা বাটিয়া গুঁড়াইয়া, যাহাতে সমস্ত মাল ছয় ঘরা চালনীর ভিতর দিয়া ছাঁকিয়া বাহির হয়, এরূপ করিয়া লওয়া হয়। উক্ত দুই দফার মালই শেষে মিশ্রিত করিয়া

ধৌত করা হয়। এই উপায়ে লাক্ষার যে-সকল চূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থাতেই ছয়-ঘরা চালনীর ভিতর দিয়া গলিয়া যায়, সেগুলিকে পুনরায় গুঁড়াইবার শ্রম লাঘব করা হয়।

উক্ত প্রস্তুত-প্রণালীতে বহুবিধ দোষ থাকায় উহা দ্বারা উৎপন্ন বস্তুও অত্যন্ত অপকৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা দেখা গিয়াছে যে, উৎপন্ন গালার ভালোমন্দ গুণ নিম্নলিখিত তত্ত্ব বা মূল সূত্রগুলির প্রয়োগের উপর নির্ভর করে। এইসকল নিয়ম বা মূলতত্ত্ব যথাযথভাবে পালন করিলে অত্যুৎকৃষ্ট (superfine), উৎকৃষ্ট (fine) এবং নির্দ্দিষ্ট আদর্শের (standard) গালা সকলেই সকল সময়ে প্রস্তুত করিতে পারিবে। কাঁচা মাল (raw materials) বা স্বাভাবিক উপকরণ যেরূপই হউক না কেন, বীজ-লাক্ষার (seed lac) গুণানুযায়ী প্রস্তুত গালা অত্যুৎকৃষ্ট বা নিম্নশ্রেণীর হইবে। কাঁচা মাল সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর হইলে প্রস্তুত দ্রব্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুণবিশিষ্ট হয়, মধ্যম শ্রেণীর হইলে আংশিক অত্যুৎকৃষ্ট এবং আংশিক উৎকৃষ্ট হয় এবং যারপরনাই নিকৃষ্ট শ্রেণীর কাঁচা মাল হইতেও উৎকৃষ্ট এবং নির্দ্দিষ্ট আদর্শের গালা উৎপন্ন হইয়া থাকে। নিতান্ত নিম্নশ্রেণীর এবং T. N. শ্রেণীর গালা প্রস্তুত করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই; কারণ, উচ্চতর স্তরের সহিত তুলনায় উহা অত্যন্ত অল্প-মূল্যে বিক্রীত হয়।

গালা প্রস্তুত করিবার প্রণালী নিম্নলিখিত তত্ত্ব বা মূল সূত্রগুলির উপর নির্ভর করে :—

(১) ইহা দেখা যায় যে, স্বাভাবিক অবস্থায় প্রাপ্ত বা অসংশোধিত লাক্ষা ছয়-ঘরা চালনীর ছিদ্রের ভিতর দিয়া যাইতে পারে, কেবলমাত্র এইভাবে চূর্ণ করিয়া লইলে, সেই লাক্ষা-চূর্ণের মধ্যে অনেক লাক্ষারস (lac dye) আবদ্ধ হইয়া থাকে। লাক্ষা ধৌত করিলেও সেই লাক্ষারস ভিতরে অধৌত থাকিয়া যায় এবং শেষে গলাইবার সময় প্রস্তুত গালাকে দূষিত করে। যদি ঐ লাক্ষাখণ্ডগুলিকে দশ-ঘরা চালনীর ছিদ্রের ভিতর দিয়া যাইবার মতন গুঁড়ানো হয়, তাহা হইলে সমস্ত লাক্ষারস সম্পূর্ণভাবে ধৌত করিয়া দিতে পারা যায়; ঐ ক্ষুদ্র কণাগুলির মধ্যে উহা একটুও থাকিবার সম্ভাবনা থাকে না।

(২) লাক্ষার বড়-বড় দানাগুলিকে চালনীতে ছাঁকিয়া পৃথক্ করিয়া লইয়া স্বতন্ত্রভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে;

(৩) যে-সকল দানা অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং ধূলিমিশ্রিত সেগুলিকেও পৃথক্‌ভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে এবং ধূলা, মাটি ও অন্যান্য অপরিচ্ছন্নতা বাদ দিয়া তবে গুঁড়া করিতে হইবে।

(৪) ধূলা ও বাজে জিনিষের গুঁড়া-বাদ-দেওয়া বাছা লাক্ষা, চূর্ণ করিবার পরে কুলায় ঝাড়িতে নাই, কারণ তাহাতে অপচয় হইবার কথা। বিশুদ্ধ লাক্ষার গুঁড়াগুলি যাহার সহিত কোনো বাজে জিনিষ মিশ্রিত নাই সেগুলি নষ্ট হইয়া যায়। সেইসকল নির্ম্মল লাক্ষার কণিকাগুলিকে আর কুলায় না ঝাড়িয়া একেবারে ধুইয়া গলাইয়া লইলেই হয়;

(৫) ধৌত করিবার পূর্ব্বে সমস্ত ধূলা-মাটি বাদ দেওয়া একান্ত প্রয়োজন; কারণ, ধূলা-মাটি ভিজা অবস্থায় লাক্ষাতে দৃঢ়ভাবে জড়াইয়া থাকিতে চায় এবং ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র বালুকার কণাগুলিও লাক্ষার গায়ে লাগিয়া থাকিবার খুব সম্ভাবনা। শেষে গলাইবার সময় সেগুলি ময়লার দাগের বা কলঙ্কের মতন থাকিয়া গিয়া গালার উৎকর্ষ বহুপরিমাণে হ্রাস করিয়া দেয়।

(৬) যদি মলামাটি, যাহা শুষ্ক অবস্থাতেই বাদ দেওয়া যায়, তাহা বিদূরিত করিয়া তাহার পরে কাঁচা বা অবিশুদ্ধ লাক্ষাতে ধৌত করা হয়, তাহা হইলে ধৌত করিবার প্রক্রিয়া অধিকতর সন্তোষজনক হইতে পারে এবং মলিনতার চিহ্নও নিঃশেষে বিলুপ্ত করিতে পারা যায়।

(৭) ধৌত করিবার প্রক্রিয়া অতি অল্পসময়েই এবং ঘষা-মাজা সচরাচর যত করিতে হয়, তাহার অনেক কমেই তাহা নিষ্পন্ন হইতে পারে, যদি ধৌত-কার্য্য করিবার পূর্ব্বে লাক্ষাকণাগুলিকে দশ ঘরা চালনীর ছিদ্রে গলিবার যোগ্য করিয়া গুঁড়াইয়া লওয়া হয় এবং তাহা হইতে সমস্ত মলা-মাটি ও বাজে জিনিষ বাদ দেওয়া হয়।

যে-পদ্ধতি কার্য্যকালে অবলম্বন করিতে হইবে, তাহা সংক্ষেপে নিম্নে বিবৃত করা হইল।

স্বাভাবিক বা অবিশুদ্ধ (crude) লাক্ষা প্রথমে ছয়-ঘরা চালনীতে চালিয়া দুই ভাগে বিভক্ত করিতে হইবে। যাহা চালনীর ছিদ্রে না লাগিয়া তাহার উপরে জড়ো হইবে তাহাকে (ক) চিহ্নিত বলা হইবে এবং যাহা ছিদ্রের ভিতর দিয়া গলিয়া তলায় পড়িবে তাহাকে (খ) চিহ্নিত বলা হইবে। এই দুই দফায় মালগুলিকে শেষ-প্রক্রিয়া—গলান—পর্য্যন্ত পৃথক্‌ভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে। (ক) চিহ্নিত দফা, যাহা ছয়-ঘরা চালনীর উপরে জড়ো হয়, তাহা অবশ্যই একেবারে পরিষ্কার, ধূলা ও বাজে জঞ্জাল-বিবর্জ্জিত। উহা গুঁড়াইয়া ও দশ-ঘরা চালনীতে চালিয়া বড়-বড় দানাগুলিকে পুনরায় গুঁড়াইয়া ও চালনীতে ছাঁকিয়া লইতে হয়, যে-পর্য্যন্ত না সমস্ত মাল দশ-ঘরা চালনীর জালের ভিতর দিয়া ছাঁকিয়া বাহির হয়। ইহা দেখা গিয়াছে যে, দশ-ঘরা চালনীর ভিতর দিয়া ছাঁকিয়া বাহির-হওয়া দানাগুলির অভ্যন্তরে লাক্ষারস (lac-dye) আবদ্ধ থাকিতে পারে না। সেইসমস্ত মালই কুলায় না ঝাড়িয়া, একেবারে ধৌত করিবার বিভাগে লইয়া যাওয়া হয়।

(খ) চিহ্নিত দফাটি তৎপরে দশ-ঘরা চালনীতে ছাঁকিয়া বড়-বড় দানাগুলিকে গুঁড়াইয়া লইতে হয়, যে-পর্য্যন্ত না সমস্ত মাল দশ-ঘরা চালনীর ছিদ্রের ভিতর দিয়া ছাঁকিয়া বাহির হয়। উহা আলাদা রাখা হয়। যে-দানাগুলি দশ-ঘরা চালনীর ছিদ্রের ভিতর দিয়া গলিয়া বাহির হয়, সেগুলিকে আর গুঁড়াইতে নাই। সেগুলিকে কেবল ৩০ হইতে ৪০-ঘরা চালনীতে ছাঁকিয়া বালি ও কাঁকর বাদ দিতে হয়। হাল্‌কা গুঁড়াগুলি হস্তদ্বারা কুলায় ঝাড়িয়া ফেলিতে হয়।

উক্ত দুই ভাগের মাল অর্থাৎ (১) যাহা দশ-ঘরা চালনীর জালের উপর হইতে জড় করিয়া গুঁড়াইয়া লওয়া হইয়াছিল, এবং (২) যাহা দশ-ঘরা চালনীর জালের ভিতর দিয়া গলিয়া পড়িয়াছিল ও যাহা হইতে ধূলা-কুটা বাদ দেওয়া হইয়াছিল, একত্রে মিশাইয়া (খ) চিহ্নিত দফা প্রস্তুত হয়। উহা তৎপরে ধৌত করিবার বিভাগে স্থানান্তরিত করা হয়।

যে-দানাগুলি ৩০ হইতে ৪০ ঘরা চালনীর ছিদ্রের ভিতর দিয়া গলিয়া পড়ে, সেগুলিকে ১০০-ঘরা চালনীতে চালিয়া লওয়া হয়; তাহাতে অধিকাংশ বালি ও কাঁকর বা ভারী ধূলিকণা বাদ পড়িয়া যায়। এই প্রক্রিয়ার ফলে যাহা পাওয়া যায়, তাহা কাঁচা বা অপরিশোধিত লাক্ষার শতকরা দশভাগ হইবে; উহা শ্রমিকদিগের হস্তদ্বারা কুলার বাতাসে ঝাড়িয়া একটি স্বতন্ত্র বখ্‌রা করা হয়, উহাকে (গ) চিহ্নিত দফা বলা যাইতে পারে।

(ক) ও (খ) চিহ্নিত দফায় ধূলা বা বাজে জিনিষের গুঁড়া একেবারে থাকে না বলিয়া উহাদের ধৌত করার কার্য্য খুব সহজে ও সুচারুরূপে সাধিত হইয়া থাকে। ঐ চূর্ণগুলি অতি ক্ষুদ্র এবং দশ-ঘরা চালনীর ছিদ্রের মধ্য দিয়া ছাঁকিয়া বাহির হওয়াতে উহাদের মধ্যে লাক্ষারস (lac dye) আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে না।

সাধারণতঃ লাক্ষা ১২ হইতে ২৪ ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া রাখা প্রয়োজন। সেই সময়ের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে সমস্ত লাক্ষারস গলিয়া যায়। তৎপরে উহা হস্ত বা পদদ্বারা ঘষিয়া একখানি বস্ত্রের ভিতর দিয়া গাঢ় রক্তবর্ণ ধোয়া জল ছাঁকিয়া বাহির করিয়া দেওয়া হয় ও যে-সকল লাক্ষা-চূর্ণ ভাসিয়া উঠে, সেগুলিকে ঐ বস্ত্রে আট্‌কাইয়া পুনরায় গ্রহণ করা হয়। দ্বিতীয় বার ধুইয়া ঘষিয়া লইলেই সচরাচর (ক) চিহ্নিত দফার প্রস্তুত কার্য্য সম্পূর্ণ হয় এবং (খ) চিহ্নিত দফার শেষ ধৌত-করা মাল পাইতে হইলে তিন বার ধুইয়া ঘষিয়া লইলেই যথেষ্ট হয়।

অবশেষে গালা প্রচলিত প্রথামত শুষ্ক করা হয় এবং ধৌত করিবার পূর্ব্বেই সমস্ত ধূলা ও বাজে জিনিষ বাদ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া আর কুলায় না ঝাড়িয়া একেবারে গলাইয়া লইবার ব্যবস্থা করা হয়। গলাইবার প্রক্রিয়া সচরাচর যেরূপ হইয়া থাকে সেইরূপই হয়।

কখনও-কখনও কাঁচা লাক্ষা (crude lac) চাপ্‌ড়া বাঁধিয়া বড়-বড় শক্ত তালে পরিণত হয়। লাক্ষা কতকটা পুরাতন হইলে এবং কিছুকাল থলিয়ায় পুরিয়া সংকীর্ণ স্থানে ফেলিয়া রাখিলে ঐরূপ হয়। ঐরকম মাল প্রাপ্ত হইলে উহাকে দশ-ঘরা চালনীর ছিদ্রে গলিবার উপযোগী করিয়া গুঁড়াইয়া লইয়া ৩০ হইতে ৪০ ঘরা চালনীতে ছাঁকিয়া ধূলিকণা বাদ দিতে হয়। তৎপরে উহা ধৌত করিয়া

শুকাইয়া লইতে হয়। এরূপ-স্থলে শুষ্ক করিয়া লইবার পরে সমস্ত তৈয়ারী মাল কুলায় ঝাড়িয়া সূক্ষ্ম চালনীতে চালিয়া ধৌত করিবার সময় যে-সমস্ত বালি ও বাজে জিনিষের গুঁড়া গালা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারে, সেগুলি বিদূরিত করিতে হয়। যে-দানাগুলি ৩০ কি ৪০-ঘরা চালনীর ছিদ্রে গলিয়া যায়, তাহা কুলায় ঝাড়িয়া যে-সকল গালার গুঁড়া তাহাতে মিশ্রিত থাকে, তাহা সংগ্রহ করিয়া লইতে হয়।

ইহা দেখা গিয়াছে যে, উক্ত প্রস্তুত-প্রণালী অবলম্বন করিলে (ক) চিহ্নিত উত্তম শ্রেণীর লাক্ষা হইতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুনির্ম্মল (superfine) গালা এবং (ক) চিহ্নিত অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্ট শ্রেণীর কাঁচা লাক্ষা হইতে যে-গালা পাওয়া যায়, তাহা অত্যুৎকৃষ্টের কাছাকাছি; উৎকৃষ্ট (fine) হইতে নিকৃষ্টতর নহে। (খ) চিহ্নিত উত্তম শ্রেণীর লাক্ষা হইতে উৎকৃষ্ট (fine) এবং অত্যুৎকৃষ্ট (superfine) এবং (খ) চিহ্নিত যে-কোনো নিকৃষ্ট শ্রেণীর কাঁচা বা অসংশোধিত লাক্ষা হইতে ১নং উচ্চ আদর্শের (high standard no. 1) এবং উৎকৃষ্ট (fine) শ্রেণীর গালা পাওয়া যায়। (গ) চিহ্নিত দফায়, সমস্ত সূক্ষ্মতম কণাগুলি থাকে; তাহা হইতে মলামাটি একেবারে বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব। উহা সমস্ত মালের শতকরা দশভাগের অধিক হইবে না। উহা হইতে কেবল T. N., অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট স্তরের গালা পাওয়া যায়। যে-লাক্ষা তাল পাকাইয়া গিয়াছে এবং যাহা হইতে ইতঃপূর্ব্বে T. N., অর্থাৎ নিকৃষ্টতম ব্যতীত অপর কোনো উচ্চতর গুণবিশিষ্ট গালা পাওয়া যাইত না, তাহা হইতেও উপরে-বর্ণিত প্রণালীতে ১নং আদর্শের (standard No. 1) অথবা উৎকৃষ্ট (fine) শ্রেণীর গালা পাওয়া যায়।

খাতড়া গালার কারখানায় (Khatra Shellac Factory) একটি আদর্শ পরীক্ষার অনুষ্ঠান করা হয়। তাহার ফল নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল।

৬০ সের কাঁচা (crude) লাক্ষা লওয়া হয়। উহা ছয়-ঘরা চালনীতে চালিয়া অপেক্ষাকৃত বড়-বড় ও ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র দানাগুলি, যাহাতে কোনো বাজে জিনিষ মিশ্রিত নাই, তাহা সংগ্রহ করা হইল। ছয়-ঘরা চালনীর ছিদ্রে গলে না, এরূপ মালের ওজন হইল ৩০ সের। উহাকে কুলায় বাতাসে ঝাড়িয়া এবং গুঁড়াইয়া দশ-ঘরা চালনীতে ছাঁকিবার উপযোগী করিয়া লওয়া হইল। উহাই ১ম দফা মাল ধৌত করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। ছয়-ঘরা চালনীর ছিদ্রের ভিতর দিয়া যাহা ছাঁকিয়া নীচে পড়িয়াছিল তাহা কুলার বাতাসে হস্তদ্বারা ধূলা ঝাড়িয়া নিম্নলিখিত বস্তু পাওয়া গেল :—

	সের	ছটাক
ছয়-ঘরা চালনীর ছিদ্রের ভিতর দিয়া গলিয়া-পড়া মাল	২২	১২
লঘু বাদ-দেওয়া জিনিষ যাহাতে লাক্ষা নাই	১	০
ধূলা ও অন্যান্য বাদ দেওয়া বাজে জিনিষ (যাহা হইতে লাক্ষা সংগ্রহ করিতে হইবে)	৪	৪
লঘু পরিত্যক্ত জিনিষ হইতে সংগৃহীত লাক্ষা যাহা পরবর্ত্তী দফায় ব্যবহার করিতে হইবে	১	০

ছয়-ঘরা চালনীর ছিদ্রের ভিতর দিয়া গলিয়া-পড়া গুঁড়াগুলিকে পরে দশ-ঘরা চালনীতে ছাঁকিয়া যে-গুঁড়াগুলি যথেষ্ট সূক্ষ্ম, সেগুলিকে আবার গুঁড়াইবার ব্যয় ও অযথা ধূলি-বৃদ্ধি করিবার সম্ভাবনা যতদূর সম্ভব লাঘব করিবার জন্য তাহা আলাদা করিয়া রাখিতে হয়। দশ-ঘরা চালনীর উপরে জড়ো-করা অপরিষ্কৃত মাল জাঁতায় পিষিয়া লইতে হয়, যাহাতে সমস্ত মালই ঐ চালনীর ছিদ্রের ভিতর দিয়া ছাঁকিয়া বাহির হয়; ঐগুলি ধৌত করিয়া লইবার জন্য প্রস্তুত দ্বিতীয় দফার মাল হইল।

ধূলা ও বাদ-দেওয়া মাল (যাহা হইতে লাক্ষা সংগ্রহ করিতে হইবে) ধৌত করিবার জন্য পৃথক্ করিয়া রাখিতে হইবে। প্রথম দফার লাক্ষার গায়ে যে-সামান্য ধূলা লাগিয়া থাকে এবং তাহার মধ্যে যে-লাক্ষারস বা রং মিশ্রিত থাকে তাহা সম্পূর্ণরূপে দূরীকরণের জন্য ঐ লাক্ষা দুইবার মাত্র ধৌত করিয়া ও মাজিয়া-ঘষিয়া লওয়া দরকার। দ্বিতীয় দফার লাক্ষা তিনবার মাত্র ঐরূপ ধুইয়া ঘষিয়া লইলেই শেষে ধৌত-করা তৈয়ারী মাল পাওয়া যায়। ধূলা ও বাদ-দেওয়া ৪ সের ৪ ছটাক মাল তৎপরে ধৌত করা

হয়। অধিকাংশ বালুকাই সহজে পৃথক্ হইয়া যায়, কারণ সেগুলি ভারী বলিয়া তলায় গিয়া জমা হয়। শেষের তৈয়ারী মাল পাইবার জন্ম চার-পাঁচ বার ধুইয়া লওয়া দরকার।

কাঁচা (crude) লাক্ষা বাটিবার ও ধুইবার পূর্ব্বে কুলার বাতাসে ধূলা ঝাড়িয়া লওয়া হয় বলিয়া ধৌত করিবার পরে আর তাহা ঝাড়িয়া ধূলা বাহির করিয়া লইবার দরকার হয় না। প্রথম ও দ্বিতীয়-দফা মালে ওজন যথাক্রমে ২৩-১/২ সের ও ১৭-৩/৪ সের এবং উহাই প্রধানত সমস্ত লাক্ষার সমষ্টি। ধূলা ও বাদ-দেওয়া মাল ছাঁকিয়া ও ঝাড়িয়া মোট ২ সের ১১ ছটাক লাক্ষা গলাইবার জন্ম প্রস্তুতভাবে পাওয়া যায়। ধৌত-করা লাক্ষার পরিমাণ—

	সের	ছটাক
১ম দফা	২৩	৮
২য় দফা	১৭	১২
ধূলা ও বাদ-দেওয়া বা "ঝাড়্তি" মাল	২	১১
লঘু বাদ-দেওয়া জঞ্জাল হইতে সংগৃহীত লাক্ষা যাহা পরবর্ত্তী দফায় ব্যবহারের জন্ম রক্ষিত	১	০
মোট	৪৪-১৫	

উক্ত তৈয়ারী মাল, ঐ কারখানায় সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট-ভাবে কাজ করিয়া সুফলের যে উচ্চতম পরিমাণ লিপিবদ্ধ আছে তাহার সমকক্ষ। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, প্রস্তুত মালের পরিমাণ-বৃদ্ধির জন্ম উহার গুণের উৎকর্ষের ক্ষতি করা হয় নাই। ঐ কারখানায় সচরাচর উৎপন্ন মালের পরিমাণ উহা হইতে অনেক কম।

ইহাও পরিদৃষ্ট হইবে যে, এই নূতন পদ্ধতিতে কোনো অতিরিক্ত শ্রমের প্রয়োজন হয় নাই, কারণ ঝাড়িবার যে-ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা ধৌত করিবার পরে করা হইত, তাহা না হইয়া ধৌত করিবার পূর্ব্বে করা হইয়াছে। যদিও দশ-ঘরা চালনীতে গলিবার উপযোগী করিয়া গুঁড়াইবার জন্ম কিছু-বেশী শ্রমের দরকার হইয়াছে, তেম্নি ধূলা ও সূক্ষ্ম চূর্ণগুলিকে গুঁড়াইতে না দিয়া অনেক শ্রম লাঘব করা হইয়াছে।*

* বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের শিল্পবিভাগের সৌজন্যে প্রাপ্ত

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্যসম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশন

শ্রী শচীন্দ্রনাথ ঘোষ

গত ১০ই ও ১২ই এপ্রিল তারিখে লক্ষ্ণৌতে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের তৃতীয় বৈঠক হইল। "ভারতী" সম্পাদিকা শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী সরলা দেবী চৌধুরাণী মহাশয়া সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। আশা করি অধিবেশনের বিস্তারিত কার্য্যবিবরণী যথাসময়ে প্রকাশিত হইবে।

কোনো বড় জিনিষ গড়িয়া তুলিতে হইলে কর্ম্মকর্ত্তাদের খুব সাবধান-তার সহিত কার্য্যারম্ভ করিতে হয়; তথাপি একটু-আধটু ত্রুটি অনিবার্য্য এবং উপেক্ষণীয়। কিন্তু ত্রুটি যখন ইহার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির এবং ভবিষ্যৎ মঙ্গল ও উন্নতির পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায় তখনই সমালোচনার প্রয়োজন হয়। তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও কর্ত্তব্যের অনুরোধে দু একটি বিষয়ের উল্লেখ করিতে হইতেছে।

১ম—প্রতিনিধিগণের দেয় চাঁদা:—প্রয়াগের অধিবেশনে সর্ব্ব-সম্মতি ক্রমে ইহা ৫৲টাকা ধার্য্য হইয়াছিল, এবং স্থায়ী নিয়মরূপে বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। লক্ষ্ণৌ এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়াছে। সাধারণ সভায় স্বীকৃত প্রস্তাব কোনো স্থানীয় সভা বা সমিতি বদ্লাইতে পারে না ইহাই চিরন্তন প্রথা। লক্ষ্ণৌএর এই কাজ নিয়ম বহির্ভূত (Uncon-stitutional) হইয়াছে।

২য়—আমন্ত্রণ পত্র:—কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায়-মহাশয় প্রকাশ্য সভায় মার্জ্জনা ভিক্ষার পরও তাঁহার ত্রুটির সমালোচনা করা বড়ই অশোভন হয়; কিন্তু যখন মনে হয় তাঁর এই ত্রুটির জন্ম আমাদের এই শিশু-প্রতিষ্ঠানটিকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে তখনই লোভ উপস্থিত হয়। যে প্রতিষ্ঠানটি প্রবাসী বাঙ্গালী-জীবনের লুপ্ত এবং সুপ্ত চেতনাকে জাগাইয়া তুলিয়া তা'কে তা'র জাতীয়তার পথে অগ্রসর করাইয়া দিবে, তার নীরস প্রবাসজীবনকে সরস করিবে; তা'র নত মস্তককে আবার উন্নত করিবার সহায়তা করিবে,—সেই প্রতিষ্ঠানটিকে কার্য্যকরী করিবার ক্ষমতা যে রাধাকমল-বাবুর নাই, এ-কথা আমি বিশ্বাস করি না।

যখন শুনিলাম বঙ্গমাতার তাঁহার ন্যায় প্রতিভাবান্, মনীষী, কার্য্যকুশল

কৃতী সন্তান কার্য্যাধ্যক্ষ হইয়াছেন, তখন প্রাণে বড় আশার সঞ্চার হইয়াছিল। নিরাশাটা সেইখানেই বড় পীড়াদায়ক হয় যেখানে বেশী আশার সম্ভাবনা থাকে। তাই আন্তরিক দুঃখের সহিত তাঁহার কার্য্যের সমালোচনা করিতে হইতেছে। বোধ হয় সকলেই বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন এবার দিল্লী, মিরাট, ঝান্সি, গোয়ালিয়র প্রভৃতি স্থান হইতে প্রতিনিধিগণ আসেন নাই; কারণ তাঁহাদিগের নিকট আমন্ত্রণ-পত্র প্রেরিত হয় নাই। এটা oversight বলা যায় না। প্রয়াগের সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট শুনিলাম তিনি কিঞ্চিদধিক নয় শত প্রতিনিধির নাম রাধাকমল-বাবুর নিকট পাঠাইয়াছিলেন; জানি না কেন সেই তালিকানুযায়ী আমন্ত্রণ পত্র পাঠানো হয় নাই। ইহা বলাই বাহুল্য যে, প্রবাসের এই প্রতিষ্ঠানটিকে কার্য্যকরী করিতে হইলে কাহাকেও বাদ দিলে চলিবে না। এই দিকে লক্ষ্য রাখা কর্ম্মকর্ত্তাদের প্রধান এবং প্রথম কর্ত্তব্য হওয়া উচিত এবং এই ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টাও তাঁহাদের প্রথম কর্ত্তব্য হওয়া উচিত। আমারও মনে হয় রাধাকমল-বাবুর উচিত তিনি ঐসকল স্থানের প্রতিনিধিগণের নিকট ত্রুটি স্বীকার করিয়া পত্র লেখেন। ইহা তাঁহার আন্তরিকতা ও উদারতার পরিচয় দিবে এবং আগামী অধিবেশনের উদ্যোগ-কর্ত্তাগণের কার্য্যের সফলতায় অনেক সহায়তা করিবে। সভাস্থলে এত ত্রুটির জন্ম তিনি যে ক্ষমা চাহিয়াছিলেন তাহা আন্তরিক হইলেও অনেকে ইহা অন্যভাবেও লইতে পারেন।

৩য়—সভায় পঠিত প্রবন্ধগুলির সম্বন্ধে :—এবার সম্মিলনে যে-সকল গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল সেগুলিকে মাননীয়া সভানেত্রী মহোদয়া খুব উচ্চস্থান দিয়াছেন এবং এরূপ প্রবন্ধ যে বঙ্গের সাহিত্য সম্মিলনগুলিতে খুব কম দেখা যায় এই মন্তব্য তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। বাস্তবিকই প্রবাসী-বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা খুবই গৌরবের বিষয়। কিন্তু সভায় সেই প্রবন্ধগুলির কয়েকটির যে শোচনীয় দুর্দ্দশা হইয়াছিল, তাহা মনে করিলে কষ্ট হয়। ইহাতে প্রবন্ধ-লেখকগণের উৎসাহকে ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে। Literary Conferenceএর নিয়ম কি জানি না; কিন্তু প্রবন্ধ-নির্ব্বাচন-সম্বন্ধে প্রয়াগের অবলম্বিত উপায়টি আমার সমীচীন বলিয়া মনে হয়। সভানেত্রী মহাশয়াকেই যখন প্রবন্ধ নির্ব্বাচনের ভার দেওয়া হইয়াছিল তখন আমার মতে কার্য্যাধ্যক্ষ-মহাশয়েরও উচিত ছিল প্রাপ্ত-প্রবন্ধগুলির প্রত্যেকের এক-একটি সংক্ষিপ্তসার সংকলন করিয়া সভানেত্রী মহাশয়াকে দেওয়া এবং যাহাতে তিনি নির্ব্বাচিত প্রবন্ধগুলি একবার পাঠ করিতে পারেন এতটা সময়ও তাঁহাকে দেওয়া উচিত ছিল। তাহা হইলে সভায় এতটা বিশৃঙ্খলা হইত না এবং সারগর্ভ প্রবন্ধগুলির ওরূপ শোচনীয় দুর্দ্দশাও হইত না বা শ্রোতাগণের ধৈর্য্যচ্যুতি হইত না এবং আপত্তিজনক প্রবন্ধ-সম্বন্ধে সভানেত্রী মহাশয়াকে আক্ষেপ করিতেও হইত না।

৪র্থ—প্রস্তাবগুলির সম্বন্ধে :—এ-বিষয়েও প্রয়াগের অবলম্বিত পন্থাই আমার ঠিক মনে হয়। এবার বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতির কার্য্যের বড়ই বিশৃঙ্খলা হইয়াছিল; তাহার কারণ আমার ত মনে হয় কার্য্যাধ্যক্ষমহাশয় বিষয়-নির্ব্বাচন সমিতির হাতে না দিয়া নিজেই সব জিনিষ সভায় উপস্থিত করিয়া দিলেন; কিন্তু সমস্ত প্রস্তাবগুলি একবার ভালো করিয়া পড়েন নাই, বা প্রস্তাবকারীদের সঙ্গে পরামর্শও করেন নাই। তাই প্রস্তাবগুলির যে কাহার সহিত কিরূপভাবে সম্বন্ধ এবং কোন্‌টার পর কোন্‌টি উত্থাপন করিলে কার্য্যের শৃঙ্খলা থাকিবে তাহা বুঝিতে পারেন নাই। এমন-কি, প্রয়াগের অধিবেশনে স্বীকৃত প্রস্তাবও দু-একটি এই সভায় উপস্থিত করিয়াছিলেন। যে-বিষয় প্রবাসী বাঙ্গালীর প্রবাস-জীবনের সকল সমস্যার সমাধান করিবে—প্রবাসে তার ছেলেমেয়ের শিক্ষা-সমস্যা—, সেইটির কোনো আলোচনাই হয় নাই।

আমন্ত্রণ-পত্রে ও অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মহাশয়ের এবং সভানেত্রী-মহাশয়ার অভিভাষণে এ-বিষয়ে একটু আভাস পাইয়া আশা করিয়াছিলাম এই সমস্যার সমাধানের পানে আমরা আর-একটু অগ্রসর হইব।

প্রয়াগের অধিবেশনে বরং এই গুরুতর বিষয়টি লইয়া বিশেষ আলোচনা হইয়াছিল; কিন্তু লক্ষৌতে তাহা একেবারেই হয় নাই। শেষকালে কয়েকটি প্রস্তাব স্বীকৃত হইবার সময় এত বেশী তাড়াতাড়ি ও গণ্ডগোল হইয়াছিল যে, অনেকে প্রস্তাবগুলির মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারেন নাই।

তবে এবার কাজের মতন কাজ একটি হইয়াছে; সেটি সম্মিলনের মুখপত্র একখানি মাসিক পত্রিকার ব্যবস্থা। ইহা বলাই নিষ্প্রয়োজন যে সম্মিলনের উদ্দেশ্য-সাধনকল্পে ইহা আমাদের খুবই সহায়তা করিবে। আমাদের সমস্ত অভাব-অভিযোগ বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ পক্ষে ১২ বার আলোচন করিবার এবং তাহা পূর্ণ করিবার চেষ্টার সুযোগ আমরা পাইব। এই পত্রিকা পরিচালনের সাহায্যের জন্য সভায় উপস্থিত প্রতিনিধি, দর্শক, ও মহিলাগণের যে সহানুভূতি, উৎসাহ ও আগ্রহ দেখা গেল, তাহাতে মনে হয় এরূপ একখানি পত্রিকার অভাব সকলেই অনুভব করিয়াছিলেন। এখন ইহার সফলতা সহৃদয় গ্রাহক ও অনুগ্রাহকবর্গের উপর এবং কর্ম্মকর্ত্তাদের উপর নির্ভর করিতেছে। প্রতিনিধিগণের থাকিবার স্থান ও আহারাদির ব্যবস্থা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল, তাঁহাদের আরাম ও সুবিধার জন্য স্বেচ্ছাসেবকগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অমায়িক ব্যবহার প্রশংসনীয় এবং অনুকরণীয়। তাঁহাদিগকে প্রাণের গভীর কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

ভেড়াঘাট

শ্রী রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

জব্বলপুর শহরের তেরো মাইল দক্ষিণে নর্ম্মদা-নদীর একটি জলপ্রপাত আছে, তাহা স্থানীয় লোকের কাছে ভেড়াঘাট নামে পরিচিত। স্থানটি একটি অতি প্রাচীন তীর্থ, কারণ এইস্থানে নর্ম্মদা-নদীর একটি জলপ্রপাত আছে। নর্ম্মদা এইস্থানে শুভ্র মর্ম্মরের পর্ব্বত বিদীর্ণ করিয়া উচ্চ ভূমি হইতে নিম্ন ভূমিতে পড়িতেছেন, সেইজন্ম ইংরেজরা

এই স্থানটিকে শ্বেত-মর্ম্মরের পাহাড় বা marble rocks বলিয়া থাকেন। জব্বলপুরের মতন প্রাচীন শহর ও সেনা-নিবাস নিকটে অবস্থিত বলিয়া বহুদেশীয় ও বিদেশীয় লোক প্রতিবৎসর নর্ম্মদা-নদীর জলপ্রপাত দেখিতে আসেন। তীর্থ বলিয়া মধ্য-প্রদেশের শত-শত হিন্দু নর-নারী নর্ম্মদা-তীরে গৌরীশঙ্করের মন্দিরে তীর্থযাত্রায়

নর্ম্মদার জল প্রপাত

আসিয়া থাকেন। ইংরেজ ও বিশিষ্ট ভদ্রলোকদিগের জন্ত ভেড়াঘাটে দুইটি ডাকবাঙ্গালা আছে। তীর্থ যাত্রীরা সাধারণত ধর্ম্মশালায় বাস করেন। এই ডাকবাঙ্গালা দুইটির নীচে নর্ম্মদা-নদীর গর্ভে পাথরের বাঁধ দিয়া একটি প্রকাণ্ড সরোবরের সৃষ্টি করা হইয়াছে; সেইজন্য জল-প্রপাত হইতে ডাকবাঙ্গালা দুইটি পর্য্যন্ত ক্ষুদ্রকায়া নর্ম্মদার গর্ভে সর্ব্বদা জল থাকে। বাঁধের নীচে বর্ষাকাল-ব্যতীত অপর সময়ে জল দেখিতে পাওয়া যায় না। ডাক-বাঙ্গালা হইতে নর্ম্মদা-নদীর জলপ্রপাতে যাইবার জন্য এই সরোবরে অনেকগুলি ক্ষুদ্র নৌকা বাঁধা থাকে। নৌকাপথ-ভিন্ন জলপ্রপাতের নিকট পৌঁছানো একপ্রকার অসম্ভব বলিলেই চলে, কারণ জব্বলপুরের এই-অংশ পর্ব্বতসঙ্কুল ও বনময়।

ডাকবাঙ্গালা পরিত্যাগ করিয়া নৌকায় চড়িয়া জল-প্রপাতের দিকে যাইবার সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে, নদী ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে। এবং দুই দিকে প্রাচীরের মতন উচ্চ শুভ্র মর্ম্মরের তট দেখিতে পাওয়া যায়। এই-স্থানের দৃশ্য অতি সুন্দর। বর্ষাকাল-ব্যতীত অপর সময়ে নর্ম্মদার জল কাক-চক্ষুর মতন নির্ম্মল, জলের দুইদিকে পঞ্চাশ হইতে ষাট ফুট উচ্চ শুভ্র মর্ম্মরের পর্ব্বত। দিবালোকে এই মর্ম্মর পর্ব্বতের প্রতিচ্ছবি নর্ম্মদার জলে পতিত হয় এবং তাহা দেখিলে বোধ হয় যে উভয় তটে অমলধবল শ্বেত মর্ম্মর নির্ম্মিত অভ্র-চুম্বী প্রাসাদমালার ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত। এই স্থানটি

ধর্ম্মধারে সঙ্কীর্ণ মর্ম্মর সঙ্কটের মধ্যে নর্ম্মদা

রমণীয় হইলেও অত্যন্ত ভয়াবহ,কারণ আবশ্যক হইলে এই-স্থানে নৌকা হইতে তীরে নামিয়া পলায়ন করিবার উপায় নাই, কারণ তট অত্যন্ত উচ্চ। এইস্থানে নদীর উভয় তটে সহস্র-সহস্র কৃষ্ণ-ভ্রমরের চক্র আছে এবং তাহারা বিরক্ত হইলেই মানুষকে আক্রমণ করে। এইজন্ত এইস্থানে ধূমপান করা নিষেধ, এবং নৌকার মাঝিরা আরোহীদের এইস্থানে সাবধান করিয়া দেয়। দুইচারি জন ইংরেজ-সৈনিক এই স্থানে মাঝিদের নিষেধ না শুনিয়া জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছে। তাহারা নৌকায় ধূমপান করিতে আরম্ভ করিয়াছিল বলিয়া শত-শত ভ্রমর তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল এবং তাহারা নৌকা হইতে জলে পড়িয়াও ভ্রমরের আক্রমণ হইতে রক্ষা পায় নাই। তাহা-

দিগের মৃত্যুর পরেও অনেকগুলি ভ্রমর তাহাদিগের দেহ দংশন করিয়াছিল।

নৌকা জলপ্রপাতের দিকে অগ্রসর হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তীরের উচ্চতা ক্রমশঃ

চৌষট্টি যোগিনীর মন্দিরে আবিষ্কৃত বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি

কমিয়া আসিতেছে। জলপ্রপাতের নিকটে নদীগর্ভে বহু শুভ্র মর্ম্মর দেখিতে পাওয়া যায়, এইস্থানের দৃশ্য অতি সুন্দর। নর্ম্মদার শুভ্র জলরাশি, শুভ্র-মর্ম্মরের বক্ষের উপর দিয়া নাচিতে-নাচিতে নিম্ন ভূমিতে অবতরণ করিতেছে, জলরাশি মর্ম্মরের উপর আছাড়িয়া পড়িয়া সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র জলকণা ও ধূমে পরিণত হইতেছে। এই মনোরম জলপ্রপাত বর্ষাকালে অতি ভীষণ আকার ধারণ করে—তখন ক্ষুদ্রকায়া নর্ম্মদা কূলে-কূলে ভরিয়া উঠে এবং পঙ্কিল জলরাশি প্রপাতের নিকটে প্রকাণ্ড ঘূর্ণাবর্ত্তের আকার ধারণ করে। সময়-সময় শত-শত গো-মহিষ, বর্ষায়-স্ফীত নর্ম্মদার জলে নামিয়া এই ঘূর্ণাবর্ত্তে চূর্ণ হইয়া যায়।

অতি প্রাচীনকাল হইতে ভেড়াঘাটের জলপ্রপাত হিন্দুর অতি পবিত্র তীর্থরূপে পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। ভেড়াঘাটের অতি প্রাচীন ইতিহাস অন্ধকারে আচ্ছন্ন, কিন্তু খ্রীষ্টাব্দের প্রথম শতাব্দী হইতে এই-স্থানের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়। প্রথম শতাব্দীতে কুষাণবংশের একজন রাজা ভেড়াঘাটের নিকটে একটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সেই মন্দিরে ভেড়াঘাট হইতে বহু দূরে অবস্থিত কৈমূর পর্ব্বত হইতে রক্তবর্ণ প্রস্তর আনয়ন করিয়া যে সমস্ত মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার অনেকগুলি ভেড়াঘাটের অনতিদূরে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সমস্ত মূর্ত্তির উপরে কুষাণযুগের ব্রাহ্মী অক্ষরে অনেকগুলি শিলালেখ আছে। কুষাণবংশীয় সম্রাট্গণের অধঃপতনের পরে সমুদ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক গুপ্তরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইলে, পরিব্রাজক-বংশীয় সামন্তরাজগণ এই প্রদেশের শাসনভার পাইয়াছিলেন। গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অধঃপতনের অবস্থায় এই পরিব্রাজকবংশীয় মহারাণা হস্তী ও তাঁহার পুত্র সংক্ষোভ স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। ভেড়াঘাটের ডাক-বাঙ্গালা দুইটির অনতিদূরে একটি ক্ষুদ্র গোলাকার পর্ব্বতের উপরে একটি নূতন-ধরণের মন্দির আছে। এই জাতীয়
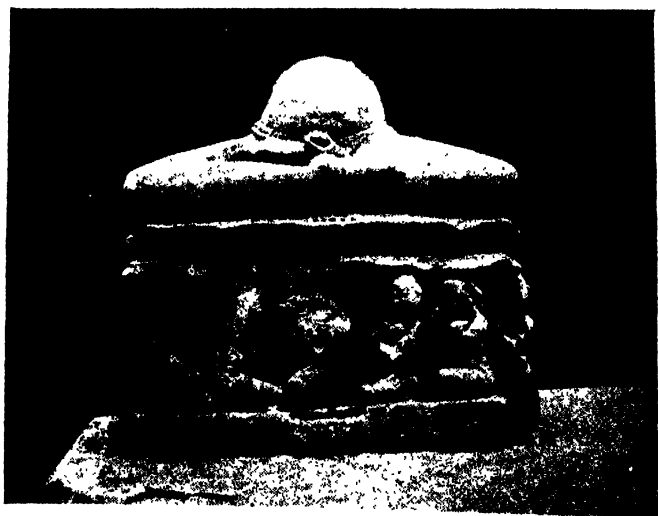
উক্ত মূর্ত্তির নিম্নাংশ—প্রথম যুবরাজদেবের আমলে নির্ম্মিত

প্রথম যুবরাজদেবের আমলে নির্ম্মিত গরুড়-পৃষ্ঠে লক্ষ্মীজনার্দ্দন-মূর্ত্তি

মন্দির সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। মন্দিরটি গোলাকার এবং ইহার বৃত্তের কিনারায় একাশীটি দেবমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। এই দেবমূর্ত্তিগুলির কতকগুলি কুষাণ-যুগের মূর্ত্তি। এই ক্ষুদ্র পর্ব্বতের উপরে উঠিবার যে সোপানাবলী আছে তাহা কোনো প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ লইয়া নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই সোপানাবলীর পাষাণখণ্ডের অনেকগুলিতে গুপ্ত-যুগের শিল্পের নিদর্শন পাওয়া যায়। সম্ভবত হস্তী বা সংক্ষোভের রাজ্যকালে এইস্থানে একটি মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের এই অংশের প্রাচীন নাম ডাভল বা ডাহল। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে কলচুরি, হৈহয় বা চেদী-বংশীয় রাজা কোকল্লদেব ডাহলে একটি নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বংশধরগণ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত ডাহল রাজ্য ভোগ করিয়া গিয়াছিলেন। ডাহলে কলচুরি বা চেদীবংশের রাজ্যকালে ভেড়াঘাট অত্যন্ত উন্নতি লাভ করিয়াছিল। চেদীবংশের রাজধানী ত্রিপুরী নগর ভেড়াঘাটের তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিত। বর্ত্তমান কালে ত্রিপুরী তেবর নামে পরিচিত। জব্বলপুরে হইতে গাড়ী বা মোটরে ভেড়াঘাটে আসিতে হইলে ত্রিপুরীর ধ্বংসাবশেষের মধ্য দিয়া আসিতে হয়। পথ তেবর গ্রামের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড পুষ্করিণীর তীর দিয়া আসে এবং ইহার দুই ধারে অনেক ঘর-বাড়ী ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। কলচুরী, হৈহয় বা চেদীবংশের তৃতীয় রাজা প্রথম যুবরাজ দেব ভেড়াঘাটে চৌষট্টি-যোগিনীর মন্দির সংস্কার করাইয়াছিলেন এবং পুরাতন কুষাণ ও গুপ্তযুগের ভাঙা মূর্ত্তিগুলি ফেলিয়া দিয়া অনেকগুলি নূতন যোগিনীর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এইসমস্ত মূর্ত্তির বিশেষত্ব এই যে ইহাদের প্রত্যেকটির নীচে যোগিনীর নাম ক্ষোদিত আছে। এইসমস্ত ক্ষোদিত-লিপির অক্ষর হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, চেদীবংশীয় রাজা প্রথম যুবরাজ-দেবের রাজ্যকালে এই মূর্ত্তিগুলি তৈয়ারী হইয়াছিল।

প্রথম যুবরাজ-দেব মালবদেশের উপেন্দ্রপুর হইতে মত্ত-ময়ূর-সম্প্রদায়ভুক্ত অনেক শৈব-সন্ন্যাসী ডাহল দেশে আনিয়াছিলেন। মত্ত-ময়ূর-সম্প্রদায়ের শৈব-সন্ন্যাসীরা কুৎসিত অঘোরী-সম্প্রদায়-ভুক্ত। ইহারা বোম্বাই প্রদেশের কঙ্কণ উপবিভাগে শিলাহার-বংশের রাজাদের রাজ্যকালে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন এবং সেইস্থান হইতে মালব দেশের উপেন্দ্রপুরে একটি মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন। মালব-দেশে অধুনা গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত রানোড্ নামক স্থানে ইহাদিগের একটি পাথরের তৈয়ারী মঠ ও মন্দির আছে। যুবরাজ-দেব ও তাহার পিতামহ কোকল্লদেবের সহিত দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট-বংশীয় রাজাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। কোকল্লদেবের কন্যার সহিত রাষ্ট্রকূট-বংশীয় মহারাজ দ্বিতীয় কৃষ্ণদেবের বিবাহ হইয়াছিল। দ্বিতীয় কৃষ্ণদেবের পুত্র দ্বিতীয় জগত্তুঙ্গের সহিত কোকল্লদেবের পুত্র শঙ্করগণের কন্যা লক্ষ্মী ও গোবিন্দাম্বার বিবাহ হইয়াছিল। দ্বিতীয় জগত্তুঙ্গ ও লক্ষ্মীদেবীর পুত্র মহারাজা তৃতীয় ইন্দ্ররাজের সহিত কোকল্লদেবের পৌত্র অম্মণদেবের কন্যা বিজাম্বাদেবীর বিবাহ হইয়াছিল। মহারাজ তৃতীয় ইন্দ্ররাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজ তৃতীয় অমোঘবর্ষদেবের সহিত

প্রথম যুবরাজ দেবের কন্যা কুণ্ডক-দেবীর বিবাহ হইয়াছিল। এই কুণ্ডক দেবীর পুত্র মহারাজ তৃতীয় কৃষ্ণরাজদেব তাঁহার মাতুল-পুত্র দ্বিতীয় যুবরাজ-দেবকে পরাজিত করিয়া সমস্ত চেদীরাজ্য অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। রাষ্ট্রকূট-বংশীয় মহারাজ তৃতীয় কৃষ্ণদেব
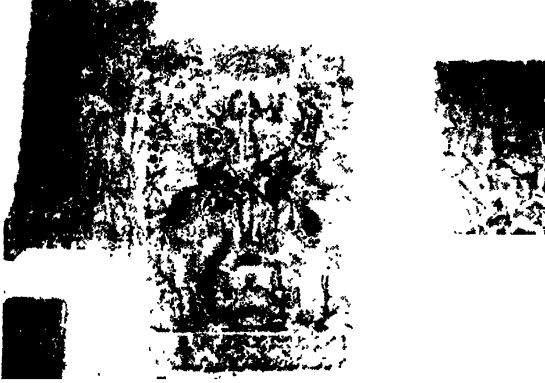
মহারাণী অহল্যাদেবী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত গৌরীশঙ্কর মূর্ত্তি

মাতামহের রাজ্য জয় করিয়া যে জয়স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহা এখনও জব্বলপুরের উত্তরে অবস্থিত মৈহাররাজ্যে একখানি ক্ষুদ্র গ্রামে দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রথম যুবরাজ দেব ও তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণরাজদেবের রাজ্যকালে শৈব-তন্ত্রভুক্ত যে উপাসনা-পদ্ধতি উত্তর ভারতবর্ষে আসিয়াছিল তাহা নূতন-রকমের। গোল বৃত্তের আকারে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে চৌষট্টি-যোগিনীর মূর্ত্তি ও শিবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া বৃত্তের মধ্যভাগে ষট্‌কোণ চক্রের দুইটি কেন্দ্রে দুইটি মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। দাক্ষিণাত্যনিবাসী শৈব-সন্ন্যাসীগণ কর্ত্তৃক খ্রীষ্টীয় দশম-শতাব্দীর প্রারম্ভে ভেড়াঘাটের চৌষট্টি যোগিনীর মন্দিরে যে-সমস্ত যোগিনী-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল, তাহা নূতন-রকমের।

১। শ্রীগণেশর, ২। শ্রীছত্রসংবরা, ৩। শ্রীঅজিতা, ৪। শ্রীচণ্ডিকা, ৫। শ্রীআনন্দা, ৬। শ্রীকামদা, ৭। ৮। শ্রীমাহেশ্বরী, ৯। শ্রীটাকারী, ১০। শ্রীজয়ন্তী, ১১। শ্রীপদ্মহংসা, ১২। শ্রীরণাজিরা, ১৩। শ্রীহংসিনী, ১৪। শ্রীঈশ্বরী, ১৫। শ্রীধাণা, ১৬। ইন্দ্রজালী, ১৭। শ্রীথকিনী, ১৮। শ্রীফণেন্দ্রী, ১৯। শ্রীউত্তালা, ২০। শ্রীলম্পটা, ২১। শ্রীজহ্ণা, ২২। শ্রীরুৎসমাদা, ২৩। শ্রীগাংধারী, ২৪। শ্রীজাহ্নবী, ২৫। শ্রীডাকিনী, ২৬। শ্রীবংধনী, ২৭। শ্রীদর্পহারী, ২৮। শ্রীবৈষ্ণবী, ২৯। শ্রীরজিনী, ৩০। শ্রীরুবিনী, ৩১। শ্রীথাংকিনী, ৩২। শ্রীঘংটালী, ৩৩। শ্রীঢঢ ঢরী, ৩৪। শ্রীঝজিনী, ৩৫। শ্রীশতনুসবরা, ৩৬। শ্রীএহনী, ৩৭। শ্রীডুডুরী, ৩৮। শ্রীবারাহী, ৩৯। শ্রীণালিনী, ৪০। শ্রীনংদিনী, ৪১। শ্রীইন্দ্রাণী, ৪২। শ্রীএড়ুরী, ৪৩। শ্রীষণ্ডিনী, ৪৪। শ্রীঐন্ধিনী, ৪৫। শ্রীতেরম্বা, ৪৬। শ্রীপাডনী, ৪৭। শ্রীবায়ুবেগী, ৪৮। শ্রীনাদিরবর্দ্ধনী, ৪৯। শ্রীসর্ব্বতোমুখী, ৫০। শ্রীমংদোদরী, ৫১। শ্রীখেমুখী, ৫২। শ্রীজাম্ববী, ৫৩। শ্রীতুরাগা, ৫৪। শ্রীথিরচিন্তা, ৫৫। শ্রীযমুনা, ৫৬। শ্রীবীভৎসা, ৫৭। শ্রীসিংহসিংহা, ৫৮। শ্রীনীলডম্বরা, ৫৯। শ্রীঅণ্ডকারী, ৬০। শ্রীপিঙ্গলা, ৬১। শ্রীঅংখলা, ৬২। শ্রীঋতুধর্ম্মিণী, ৬৩। শ্রীবীরেন্দ্রী, ৬৪। শ্রীরীঢালীদেবী।

অহল্যাদেবীর মন্দিরে মহারাজ প্রথম যুবরাজদেবের আমলের যোগিনী মূর্ত্তি

কেবল একটি মূর্ত্তির নাম পড়িতে পারা যায় না। আমাদের দেশে তন্ত্রশাস্ত্র লইয়া এখনও যাঁহারা চর্চ্চা করেন, তাঁহারা নামগুলি পড়িলে বুঝিতে পারিবেন যে, এই-সকল যোগিনীর উপাসনা উত্তর ভারতবর্ষে চলিত নাই।

প্রথমে যুবরাজ-দেবের বৃদ্ধ প্রপৌত্র গাঙ্গেয়-দেব কাশী ও এলাহাবাদ জয় করিয়া একটি বিস্তৃত রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। গাঙ্গেয়দেবের পুত্র কর্ণদেব বাঙ্গালা-দেশ হইতে পাঞ্জাব এবং হিমালয়-পর্ব্বত হইতে নর্ম্মদা-তীর পর্য্যন্ত এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কর্ণদেবের পুত্র যশঃকর্ণদেবের রাজ্যকালে ত্রিপুরী হৈহয়-বংশীয় রাজাদের অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছিল। যশঃকর্ণদেবের পুত্র গয়ঃকর্ণ দেবের সহিত মালবের পরমার-বংশীয় রাজা উদয়াদিত্যের দৌহিত্রী ও চিতোরের গুহিলট-বংশীয় রাজা বিজয়সিংহের কন্যা অহ্লণা দেবীর বিবাহ হইয়াছিল। ভেড়াঘাটে প্রথম যুবরাজ-দেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত চৌষট্টি যোগিনীর মন্দির ধ্বংসোন্মুখ হওয়ায় দেবী মহারাণী অহ্লনাদেবী তাহা পুনর্নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ভেড়াঘাটে ডাক-বাঙ্গালার নিকটে ক্ষুদ্র পর্ব্বতের উপরে এখন যে গোলাকার মন্দির দেখিতে পাওয়া যায় তাহা মহারাণী অহ্লনা দেবী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। গয়ঃকর্ণ ও অহ্লণাদেবীর জ্যেষ্ঠ পুত্র মহারাজাধিরাজ নরসিংহ দেবের রাজ্যকালে কলচুরী চেদী-সম্বৎসরের ৯০৭ বর্ষে অর্থাৎ ১১৫৫ খ্রীষ্টাব্দে এই মন্দির নির্ম্মাণ হইয়াছিল। ইহাতে যে সমস্ত মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, সেগুলি তিনটি ভিন্ন-ভিন্ন যুগের। প্রথম যুগের মূর্ত্তিগুলি কুষাণ-বংশীয় সম্রাট্‌গণের রাজ্যকালের এবং রক্তপ্রস্তর-নির্ম্মিত। দ্বিতীয় বিভাগের মূর্ত্তিগুলি প্রথম যুবরাজদেবের রাজ্যকালে নির্ম্মিত ও পীতাভ প্রস্তরের। তৃতীয় বিভাগের মূর্ত্তিগুলিও পীতাভ প্রস্তরের, কিন্তু ইহাতে কোনো ক্ষোদিত-লিপি নাই। এই মূর্ত্তিগুলি অহ্লণা দেবীর আদেশে নির্ম্মিত। ষট কোণ চক্রের দুইটি মন্দিরের একটি ভাঙিয়া গিয়াছে, অপরটি গৌরীশঙ্করের মন্দির নামে পরিচিত, তীর্থযাত্রীরা ভেড়াঘাটে আসিয়া এই মন্দিরে পূজা করিয়া থাকে। মন্দিরটির নিম্নাংশ পুরাতন, কিন্তু উপরের অংশটি নূতন। ইহার মধ্যে দণ্ডায়মান বৃষের পৃষ্ঠে উপবিষ্ট পীতাভ-প্রস্তর-নির্ম্মিত হরগৌরীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।
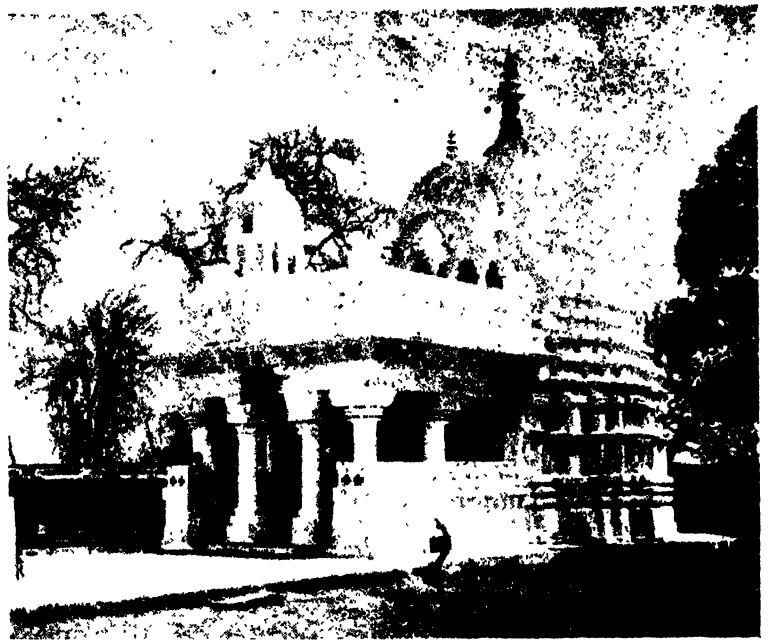
মহারাণী অহল্যাদেবী নির্ম্মিত গৌরীশঙ্করের মন্দির

ক্রৌঞ্চ-মিথুন

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রী মোহিতলাল মজুমদার

এর পর দিনকতক চিঠিখানার কথা আমার মনেই হয়নি. সকলে বেশ আনন্দেই ছিলাম ; কিন্তু সেই এক ডিগ্রির যেই নিকট হ'তে লাগ্‌ল, আমাদের কথাবার্ত্তাও কেমন বন্ধ হ'য়ে এল।

একদিন সকালে ঘুম থেকে উ'ঠে একটু আশ্চর্য্য বোধ কর্‌লাম—জাহাজখানা একটুও দুল্‌ছে না। আমি ঘুমোতাম—এক চোখ খু'লে, যেই জাহাজের দোলাটি থাম্‌ল. অম্‌নি দু'চোখ খু'লে ফেল্‌লাম। সমুদ্দুর একেবারে নিথর নিঝ্‌ঝুম—বিষুব-রেখার প্রথম ডিগ্রির ভিতরে এসে পড়েছি। বাইরে এসে দেখি, সমুদ্দুর ত নয়, যেন একবাটি তেল! তখনি ঘাড় ফিরিয়ে চিঠিটার উদ্দেশে বল্‌লাম 'এইবার তোমার বিদো বার ক'চ্ছ, দাঁড়াও!' তবু কিন্তু সূর্য্যি-ডোবা পর্য্যন্ত চুপ ক'রে রইলাম। শেষে কি করি, না খুল্‌লে নয় যে। তাই ক্লক-ঘড়িটা খুলে কাচের ভিতর থেকে ফস্ ক'রে লেফাফাটা টেনে নিলাম। বল্‌তে কি বাপু!—আমি ত' প্রায় পনেরো মিনিট চিঠিখানা হাতে ক'রেই ব'সে রইলাম, খুল্‌তে আর সাহস হয়—না!—শেষকালে, "দুত্তোর!" ব'লে বুড়ো-আঙুলটা দিয়ে মোহর-তিনটে ভেঙে ফেল্‌লাম—বড়টাকে ত' গুঁড়িয়ে ফেল্‌লাম।

চিঠি প'ড়ে আমি চোখ-দুটো একবার রগ্‌ড়ে নিলাম, ভাব্‌লাম আমার পড়ারই ভুল!

আবার সবটা পড়্‌লাম—ফের পড়্‌লাম। তা'র পর শেষের দুই ছত্র থেকে আরম্ভ ক'রে প্রথম ছত্রে ফি'রে এলাম। আমার বিশ্বাস হ'ল না। শেষে পা দুটো কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল, ব'সে পড়্‌লাম। মুখের উপরকার চামড়াটা যেন ভির্‌ ভির্‌ কর্‌তে লাগ্‌ল। একটু ব্র্যাণ্ডি ঢে'লে নিয়ে গাল-দুটো বেশ ক'রে রগ্‌ড়ে নিলাম, হাতের তেলোতেও খানিকটা মাখালাম। মনটা এত দুর্ব্বল দে'খে নিজে'কেই নিজের দয়া হ'ল—কিন্তু সে একবারটি! তখনি খোলা বাতাসে এসে দাঁড়ালাম।

সেদিন 'লরা'কে এত সুন্দর দেখাচ্ছিল, যে, তা'র কাছে আর যেতে ইচ্ছে হ'ল না। একটি শাদা ফ্রক্ পরেছে, খুব সাদাসিদে—হাত দু'খানি কাঁধ পর্য্যন্ত আদুল—একঢাল চুল এলিয়ে দিয়েছে। একটা ছোটো পোঁঘাকে দ'ড়ি বেঁধে, সেইটে জলের উপর ঝুলিয়ে দিয়ে সে খেলা কর্‌ছিল। এই জায়গায় আঙুরের মতন থোলো-থোলো ফল ওয়ালা একরকম গাছ জলে ভেসে যায়—সে তাই ধর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছিল, আর কেবলই হাস্‌ছিল।

"ওগো, শিগ্‌গীর!—দেখ দেখ!—কেমন আঙুর দেখ!" ব'লে সে চেঁচাচ্ছিল। তা'র বর তখন তা'র কাঁধের উপর দিয়ে মাথাটা হেঁট ক'রে তাকিয়ে দেখ্‌ছিল—জলের দিকে নয়, বউএর মুখখানি বড় করুণ মধুর চোখে চেয়ে দেখ্‌ছিল।

আমি ছোক্‌রাকে ইসারায় ডে'কে আমার সঙ্গে উপর-তলায় দেখা কর্‌তে বল্‌লাম। মেয়েটা ফিরে দাঁড়াল। আমার মুখের চেহারাটা তখন ঠিক কেমন হয়েছিল বল্‌তে পারিনে,—তার হাত থেকে দড়িটা প'ড়ে গেল। সে তা'র স্বামীকে জাপ্‌টে ধ'রে ব'লে উঠ্‌ল,

"ওগো, যেয়ো না, যেয়ো না! ওর মুখটা কি ফ্যাকাশে দেখ!"

তা আর হবে না! মুখ ফ্যাকাশে হওয়ার মতনই ব্যাপার কিনা!

তবু ছোকরা এক কথাতেই আমার কাছে চ'লে এল, সিঁড়ির ধারের ছাদটায় এসে দাঁড়াল। মেয়েটা বড়-মাস্তলটায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের পানে চেয়ে রইল। দুজনে অনেকক্ষণ পায়চারি কর্‌লাম—কথা আর বেরোয় না! আমার মুখে একটা সিগার ছিল, সেটা তেতো লাগ্‌ছিল—থু' ক'রে জলে ফে'লে দিলাম। সে তখন আমার চোখের পানে চে'য়ে রইল, আমি তার হাতখানি হাতে নিলাম, কিন্তু আমার যেন বাক্‌রোধ হয়েছিল—সত্যি, যেন বাক্‌রোধ! কতক্ষণ পরে বল্‌লাম,

"আচ্ছা, কি হয়েছিল বলো ত? সেই পাঁচ-পাঁচটা খাপ্পাখাঁ বাদ্‌শা—সেই আইন-ওয়ালা ডালকুত্তাদের সঙ্গে তুমি কি কর্‌তে গিয়েছিলে? তা'রা যে বিষম খাপ্‌পা হ'য়ে উঠেছে? ব্যাপার কি বলো ত?"

সে এবার কাঁধটা নাড়া দিলে, তার পর মাথাটা একটু হেঁট ক'রে বল্‌'ল,

"তোমাকে যথার্থ বল্‌ছি, কাপ্তেন, সে এমন কিছুই নয়। শাসন-বৈঠকের মন্ত্রীদের লক্ষ্য ক'রে গোটা-তিনেক ছড়া লিখেছিলাম—আর কিছু নয়!"

আমি বল্‌লাম, "হ'তেই পারে না—অসম্ভব!"

"হ্যাঁ, তাই। আমি দিব্যি ক'রে বল্‌ছি, আর কিছু আমি করিনি। ১৫ই সেপ্টেম্বর আমি গ্রেপ্তার হই, ১৬ই বিচার হয়—প্রথমটা মৃত্যুদণ্ড হয়েছিল, পরে দয়া ক'রে দ্বীপান্তরের হুকুম দিলে।"

আমি বল্‌লাম "আশ্চর্য্য বটে! শাসনসভার মন্ত্রীদের একটুতে এত অসহ্য!—সেই যে চিঠিখানা দেখেছ, তা'তে তোমাকে গুলি ক'রে মেরে ফেল্‌তে হুকুম দিয়েছে।"

শু'নে সে চুপ ক'রে রইল। মুখের ভাবে নিজেকে যে-রকম সাম্‌লে নিলে, তা একজন উনিশ বছরের ছোক্‌রার পক্ষে কম বাহাদুরি নয়! একবারটি তা'র স্ত্রীর পানে চাইলে, চেয়ে হাত দিয়ে কপালখানা মুছে নিলে—কপালে পিন্‌ পিন্‌ ক'রে ঘাম বেরুচ্ছিল। আমার কপালেও তাই—আবার চোখ-দুটো আর-এক-রকমের ফোঁটায় ভর্ত্তি হ'য়ে উঠেছিল! আমি বল্‌লাম, "এখন দেখা যাচ্ছে, কর্ত্তারা দেশের মধ্যে তোমার সদ্‌গতি কর্‌বার ইচ্ছে করেন-নি—ভেবেছেন, এইরকম জায়গায় সমুদ্রের উপর সে কাজটা সেরে ফেল্‌লে, কেউ আর ততটা লক্ষ্য কর্‌বে না। কিন্তু আমার পক্ষে এ যে ভারি মুস্কিল হ'য়ে পড়্‌ল হে!—তুমি যতই ভালো হও না কেন, আমার ত আর উপায়ান্তর নেই! পরোয়ানাখানা একেবারে আইন-মাফিক পাকা ক'রে ছেড়ে দিয়েছে ; হুকুমনামায় যে সই আছে, তা'র তলার-টানটি পর্য্যন্ত নির্ভুল! আবার মোহরের ছাপও আছে—কিছুই বাদ যায়নি!"

ছোক্‌রার মুখখানা লাল হ'য়ে উঠ্‌ল ; সে আমাকে খুব ভদ্র-ভাবে অভিবাদন ক'রে, ভারি নরম-সুরে বিনয় ক'রে বল্‌লে,

"আমি কিছুই চাইনে, কাপ্তেন! আমার জন্যে তোমার কর্ত্তব্যহানি হয়—এ আমার দরকার নেই। আমি কেবল লরার সঙ্গে কিছুক্ষণ

কথা কইতে চাই, আর—বোধ হয় তা হবে না—যদি এর পরেও সে বেঁচে থাকে, তবে তা'কে তুমিই দেখো, কাপ্তেন।"

"আহা! সে-সব ঠিক হ'য়ে যাবে অখন, বাবা!—তা'র জন্যে ভেবো না। তোমার যদি কোনো আপত্তি না থাকে, ফ্রান্সে ফি'রে গিয়ে তা'র আপন-জনের কাছে তা'কে রেখে আস্‌ব, যতদিন না সে নিজে আমাকে বল্‌বে, ততদিন তা'কে ছেড়ে কোত্থাও যাবো না। তবে, আমার মনে হয়, এ-বিষয়ে কোনো ভাব্‌নাই কর্‌তে হবে না, এ-শোক কি সে সাম্‌লাতে পার্‌বে, মনে করো?—আহা, বাছা আমার!"

আমার হাত দু'খানা বেশ ক'রে চেপে ধ'রে সে বল্‌তে লাগ্‌ল,

"কাপ্তেন, এ ব্যাপারে তোমার অবস্থা আমার চেয়েও কষ্টকর তা বুঝ্‌তে পারছি, কিন্তু উপায় ত নেই! তোমার উপর আমি এইটুকু ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে চাই, যে আমার যা-কিছু আছে তা'র থেকে যেন লরা বঞ্চিত না হয়, তা'র বুড়ো মা তা'কে যদি কিছু দিয়ে যায়, তা যেন সে পায়। তা'র প্রাণ আর মান,—দুই-ই রক্ষার ভার তুমি নেবে ত? দেখ, ওর স্বাস্থ্য মোটেই ভালো নয়, সেদিকে বরাবর চোখ রাখ্‌তে হবে, কাপ্তেন!" গলাটা একটু নামিয়ে আস্তে-আস্তে বল্‌তে লাগ্‌ল, "তোমায় তবে বলি। ওর শরীর বড়ই পল্‌কা! বুকটা সময় সময় এমন ক'রে ওঠে, যে, দিনের মধ্যে চার-পাঁচ বার মূর্চ্ছা হয়; ওকে সর্ব্বদা ঢেকে-ঢুকে রাখ্‌তে হবে কিন্তু! আসল কথা, তোমাকে ওর বাপ, মা, আমি—এই তিনেরই যত্ন একা করতে হবে,—নয় কি? ওর মা ওকে যে আংটি-দুটি দিয়েছেন, তা যদি ওর থাকে ত বড় ভালো হয়। তবে ওর জন্যেই যদি বিক্রী করা দরকার হয়, করবে বৈ কি! আহা, বেচারী লরা আমার!—দেখ কাপ্তেন, কী সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে!"

ব্যাপারটা যেমন বুক-কাটা-রকমের হ'য়ে আস্‌তে লাগ্‌ল, তা'তে আমার বড়ই অস্বস্তি হ'তে লাগ্‌ল—মুখখানা অন্ধকার হ'য়ে উঠ্‌ল। পাছে মনটা বড় দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ে, তাই তা'র সঙ্গে এতক্ষণ যতদূর সম্ভব সহজভাবে কথা কচ্ছিলাম, কিন্তু আর সে ভাবনা নিষ্প্রয়োজন দেখে আমি একেবারে ব'লে ফেল্‌লাম,

"আচ্ছা, হয়েছে!—আর নয়। যারা খাঁটি লোক, তাদের মধ্যে বোঝাপড়া সহজেই হ'য়ে যায়। এখন যাও, ওর সঙ্গে কথা ক'য়ে নাও-গে। চটপট সেরে নেওয়া চাই!"

তা'র হাতটা হাতে নিয়ে একটু চেপে দিতে গিয়ে দেখি, সে আর আমার হাত ছাড়ে না, কেমন একরকম ক'রে আমার মুখের পানে চেয়ে রইল। তখন বল্‌লাম,

"আচ্ছা, দেখ, তোমাকে তা হ'লে একটি সুপরামর্শ দিই—ওকে এ বিষয়ে একটি কথাও বোলো না। কাজটা এমনভাবে সেরে নেওয়া যাবে, যাতে আগের থেকে ও কিছু টের না পায়। বুঝ্‌লে? তুমিও জান্‌তে পারবে না, সে ভার আমি নিলাম।"

"সে হ'লে ত ভালোই হয়। ওই বিদায়-নেওয়ার ব্যাপারটা আমায় বড় কাবু করে কিন্তু!"

আমি বল্‌লাম, "না না, কোনোরকম ছেলেমানুষি না করাই ভালো। দেখো, বন্ধু, যদি পারো ত চুমু খেয়ো না বল্‌ছি—তা হ'লেই গিয়েছ!"

আমি আর-একবার তা'র হাতখানি চেপে ধ'রে তা'কে ছেড়ে দিলাম। ওঃ! ব্যাপারটা সত্যিই ভারি সঙ্গীন হ'য়ে উঠ্‌ছিল!

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কথাটা সে গোপন রাখ্‌তে পেরেছিল; কারণ, দেখ্‌লাম দুটিতে হাতে হাত বেঁধে, প্রায় পনেরো-মিনিট কাল পায়চারি করলে, তা'র পর—সেই দড়ি-বাঁধা জামাটা আমার একটা খালাসী জল থেকে তু'লে নিয়েছিল—সেইটে নেবার জন্যে তারা জাহাজের পিছন দিকে ফি'রে গেল। দেখ্‌তে-দেখ্‌তে রাত্রি এসে পড়্‌ল—অন্ধকার রাত্রি! এই সময়েই কাজ হাসিল করব ঠিক ক'রে রেখেছিলাম। কিন্তু আজও পর্য্যন্ত সেই সন্ধ্যার অন্ধকার আমার চোখে আর ঘুচ্‌ল না! যতদিন বেঁচে থাক্‌ব, সেই রাত্রির সেই-ক্ষণটাকে একটা ভারী শিকলে-বাঁধা পাথরের মতন আমাকে টেনে-টেনে নিয়ে বেড়াতে হ'বে!

এই পর্য্যন্ত ব'লে বুড়ো মেজর আর পারলে না, চুপ ক'রে গেল। পাছে তা'র ঘোরটা কেটে যায়, তাই আমি খুব সাবধান হলাম,—পাছে কথা ক'য়ে ফেলি! একটু পরেই দেখি, সে বুক চাপ্‌ড়াতে-চাপ্‌ড়াতে বল্‌তে লাগ্‌ল,

"সে-সময়টাতে আমার যে কি হয়েছিল, তা এখনো বুঝ্‌লাম না! পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত গাটা রাগে রী-রী কর্‌ছিল, তবু কিসে যেন আমাকে ধ'রে-বেঁধে সেই হুকুম তামিল করবার জন্যে ক্রমাগত ঠেলা দিচ্ছিল। আমি আমার লোকদের ডাক্‌লাম, ডেকে একজনকে ব'লে দিলাম,

'দেখ হে, একখানা বোট এখ্‌খুনি জলে নামিয়ে দাও ত!—এখন আমাদের জল্লাদ হ'তে হবে!—ওই মেয়েটাকে নৌকোয় ক'রে খানিকটা দূরে নিয়ে যাও, তা'র পর যখন বন্দুকের আওয়াজ শুন্‌তে পাবে, তখন ফিরিয়ে এনো।'

একটুক্‌রো কাগজের হুকুম এম্‌নি ক'রে মান্‌তে হ'ল!—কাগজের টুকরো বই আর কি? সেদিনকার হাওয়াটাই কেমন ছিল!—আমাকে যেন কিসে পেয়েছিল! দূর থেকে ছোক্‌রার দিকে চেয়ে দেখ্‌লাম—ওঃ সে কি দৃশ্য! লরেটের সামনে হাঁটু পেতে ব'সে সে তা'র পা-দুখানিতে আর হাঁটুতে চুমু খাচ্ছে! বলো দেখি, আমার প্রাণটায় তখন কি হচ্ছিল!

আমি ঠিক পাগলের মতন চীৎকার ক'রে উঠলাম—'ওদের দুজনকে তফাৎ ক'রে দাও, তফাৎ করে দাও! আমরা সবাই পাজী বদ্‌মায়েস! ......ফরাসীর গণতন্ত্র আর বেঁচে নেই, মরে প'চে উঠেছে! এখন যারা শাসন করছে, তা'রা ওই পচা-মড়ার পোকা! আমি আর জাহাজের কাজ করব না, ইস্তফা দেবো! যারা আইনের ভয় দেখায়, তাদের আমি থোড়াই কেয়ার করি! শোনে শুনুক, ব'য়ে গেল!'—আহা, তাদের আমি বড় কেয়ার করতাম কিনা! একবার যদি পেতাম তাদের—সেই পাঁচ-পাঁচটা রাস্কেলকে গুলি ক'রে মারতাম! এই ত আমার জীবন, এর জন্যে ভারি মায়া কি না?—সত্যি, আমি বড় দুঃখী!"

মেজরের কণ্ঠস্বর ক্রমেই নেমে এল, শেষকালে কথা অস্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌ল। লোকটা কেবলই এগিয়ে চল্‌তে লাগ্‌ল—একেবারে যেন উন্মাদের ভঙ্গি, কেমন একটা অধীর অন্যমনস্ক ভাব! দাঁতে ঠোঁট চেপে ধরেছে, থেকে-থেকে ভীষণ ভ্রূভঙ্গি করছে! এক-একবার ঝাঁকি মেরে উঠছে, কখনো বা তলোয়ারের খাপখানা দিয়ে ঘোড়াটাকে এমন মারছে, যেন তা'কে মেরেই ফেল্‌বে! সব চেয়ে দে'খে আশ্চর্য্য হলাম—তা'র ফ্যাকাশে হল্‌দে মুখখানা কেমন যেন কাল্‌চে লাল দেখাচ্ছে! জামার বোতামগুলো টেনে ছিঁড়ে ফেলে বুকটা ঝড়-বৃষ্টিতে আদুল ক'রে দিলে। এইভাবেই আমরা পথ চল্‌তে লাগ্‌লাম, কারো মুখে কথাটি নেই। আমি দেখ্‌লাম, এবারে আর নিজে হ'তে কিছু বল্‌বে না, কথাটা কোনো-রকমে আমাকেই পাড়্‌তে হবে। যেন গল্প শেষ হ'য়ে গেছে—এম্‌নি ভাব দেখিয়ে বল্‌লাম, "হ্যাঁ, এমন কাণ্ডর পর জাহাজের কাজ কি আর ভালো লাগে!"

অম্‌নি সে ব'লে উঠ্‌ল, "কাজের কথা বল্‌ছ? তুমি পাগল! কাজের দোষ কি? জাহাজের কাপ্তেনকে কি কখনো জল্লাদের কাজ কর্‌তে হয়? সে কর্‌তে হয় কখন?—যখন রাজ্যের যারা মালিক তা'রা হয় খুনে-ডাকাত। গরীব চাকর—যার স্বভাবই হ'য়ে গেছে চোখ বুজে হুকুম তামিল করা, তা সে যে হুকুমই হোক্—একেবারে কলের

পুতুলের মতন।—নিজের প্রাণটা 'দলে' ফেলে যে কেবল হুকুমই মানে—তাকে দিয়ে এই কাজ করানো।"—বলতে বলতে পকেট থেকে একখানা লাল রুমাল বের করে' তাইতে মুখ ঢেকে সে একেবারে ছোট-ছেলের মতোই হাউ-হাউ করে' কাঁদতে লাগল। পাছে আমি সামনে থাকায় তার এই কান্না দেখে ফেলি, আর তার অপমান বোধ হয়—তাই আমি আমার ঘোড়াটা একবার থামালাম,—যেন রেকাবটা ঠিক করে নিচ্ছি, এই ভান করে' একটু সরে' গিয়ে কিছুক্ষণ তার পিছন-পিছন যেতে লাগলাম।

যা ভেবেছিলাম তাই! মিনিট-কতক পরে সেও গাড়ীখানার পিছন দিকে ফিরে এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, আমার পোর্ট-ম্যাণ্টোতে ক্ষুর আছে কি না। আমি বললাম, "ক্ষুর আমি কি জন্যে রাখব?—আমার ত দাড়ী গোঁফ কিছু হয় নি।" কথাটা শুনে সে কিন্তু নিরাশ হ'ল না। সে ত' সত্যিই ক্ষুর চায়-নি—কেবল এতক্ষণকার কথাবার্ত্তা পাল্‌টে নেবার জন্যে ওটা জিজ্ঞাসা করেছিল। একটু পরেই আবার গল্পটা সুরু করবার চেষ্টা করছে দেখে ভারী খুসী হয়ে উঠলাম। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে,

"তুমি কখনো জাহাজ দেখ-নি বোধ হয়?" আমি বললাম, "একবার পারী-শহরের প্রদর্শনীতে দেখেছিলাম বটে, সে-দেখা কোনো কাজের নয়।"

"তাহ'লে জাহাজের কোন্ জায়গাটাকে 'বিড়াল-মুখ' বলে, জানো না?"

"একেবারেই না।"

তখন গলাটা একটু খাটো করে' সে বললে,

"জাহাজের গলুইএর মুখে কড়ি-কাঠ দিয়ে ছাদের মতন একটু জায়গা করা আছে, সেটা জলের উপর বেরিয়ে থাকে। সেই থান থেকে নোঙর ফেলা হয়। কোনো লোককে যখন গুলি করা হয়, তখন তাকে সেইখানে দাঁড় করিয়ে দেয়।"

"ও! বুঝেছি, লোকটা তখন একেবারে জলের মধ্যে প'ড়ে যায়?"

এ কথার কোনো উত্তর না দিয়ে সে কেবল—জাহাজে কতরকমের নৌকো থাকে, কোন্‌টা কোন্ জায়গায় তোলা থাকে—তাই বলে' যেতে লাগল, তারপর হঠাৎ কথার মধ্যে কোনো যোগ না রেখে, আবার গল্প সুরু করলে। অনেক দিন সৈনিক-বিভাগে কাজ করলে, সব বিষয়ে একটা কুছ-পরোয়া-নেই ভাব আসে, সকলের কাছে দেখাতে হয়—বিপদ বল, মানুষ বল, মরা বাঁচার কথা বল, কিছুরই তোয়াক্কা রাখিনে, এমন কি আপনার মনটাকেও গ্রাহ্য করিনে। এবার সে এই রকম ভঙ্গীতেই গল্পটা ব'লে যেতে লাগল। কিন্তু যেখানে উপরের ভাবটা এমনি নির্ম্মম, সেখানে প্রায়ই ভিতরে গভীর মমতা লুকিয়ে থাকে। সৈনিকের এই নির্ম্মমতা যেন একটা লোহার মুখোস মাত্র, ভিতরের চেহারাটা ঠিক উল্টো।—যেন পাথরের পাতাল-পুরীতে রাজপুত্র বন্দী হ'য়ে আছে। সে তখন বলতে লাগল,

"এ-সব নৌকোয় দু'জন ক'রে লোক ধরে। লরাকে তা'রা ধ'রেই একটা নৌকোয় তুলে ফেল্লে, তাকে কথা কইবার বা চীৎকার করবার সময়টুকু দিলে না। আহা! এমন কাজ যাকে করতে হয়, তার যদি এতটুকু ধর্ম্মজ্ঞান থাকে, তবে কি আর রক্ষে আছে? তার আপসোস কি কখনো ঘোচে? একথা বার বার বলেই বা কি ফল? ভোলাও যে যায় না! ……উঃ আজকের দিনটা কী দিন গো! কী ভূতে পেয়েছে আমায়!—কেন বলতে গেলাম? না শেষ করে' যে থাকবার যো নেই! আমাকে যেন মাতাল করে' তুলেছে! আকাশেও কী দুর্য্যোগ!—আমার জামাটা ভিজে সপ্‌ সপ্‌ কচ্ছে, দেখ!

"হ্যাঁ, সেই মেয়েটির কথা বলছিলাম, না? তার বয়েসই বা কি! আহা, ম'রে-যাই! সংসারে এত আকাট মুখ্যুও আছে! লোকটা এমন নিরেট—যে নৌকোখানাকে জাহাজের সমুখ দিকেই নিয়ে চল্‌ল! এই জন্যেই বলেছে, মানুষ যা ভাবে তার উল্টোটাই হয়! আমি ভেবেছিলাম অন্ধকারে কিছুই চোখে পড়বে না। এটা বুদ্ধি হ'ল না—একেবারে বারোটা বন্দুক আওয়াজ করলে, তার সে আলো যাবে' কোথায়? স্বামীর প্রাণহীন দেহ যখন সমুদ্দুরের জলে পড়ে' গেল, লরা যে তা' দেখতে পেয়েছিল—তার আর কথা!

"এইবার যে ঘটনার কথা বলব তা যে কেমন করে' ঘট্‌ল, তা' উপরে ঐখানে ভগবান বলে' যদি কেউ থাকে, কেবল সেই জানে, আমি তার কিছুই জানিনে, আমি কেবল দেখেছি আর শুনেছি মাত্র। আমার লোকগুলো যেই বন্দুক আওয়াজ করলে, অমনি লরা তার মাথাটা দুই হাতে চেপে ধরলে, যেন তারই মাথায় গুলি ঢুকেছে! কোনো কথা নয়, চীৎকার নয়, মূর্চ্ছাও নয়,—নৌকোর ভিতর নিস্পন্দ হ'য়ে ব'সে রইল! তাকে কখন কোন দিক দিয়ে জাহাজে ফিরিয়ে আন্‌লে, সে হুশও তার নেই! আমি তার কাছে গিয়ে অনেকক্ষণ ধ'রে যা পারলাম কথা কইতে লাগলাম। সে আমার মুখের পানে চেয়ে যেন শুনতে লাগল, আর সঙ্গে-সঙ্গে নিজের কপালে হাত বুলোতে লাগল। একটা কথাও সে বুঝতে পারে-নি। তার মুখে একটুও রক্ত ছিল না, কেবল কপালটা লাল হ'য়ে উঠেছে! তার সর্ব্বশরীর তখন কাঁপছে, মানুষ দেখলেই যেন ডরিয়ে উঠছে!—এই ভাবটা তার আর কাট্‌ল না, চিরদিন র'য়ে গেল! এখনো সেই রকম অচৈতন্য হ'য়েই আছে। তার বয়েসও যেন আর বাড়ল না, তেম্‌নি ছোট্টটিই আছে! যেন জন্তুর মতন হ'য়ে গেছে!—হাবাই বল, আর পাগলই বল! তার মুখে আর কথাটি নেই, কেবল মাঝে মাঝে লোক দেখলে, তার মাথায় কি ঢুকে রয়েছে- তাই বের করে' দিতে বলে।

"সেই দিন থেকে তার প্রাণের যত ব্যথা আমার বুকেও ভরে উঠল। কে যেন আমায় বললে,—ও যতদিন বেঁচে থাকবে, ওকে সঙ্গে-সঙ্গে রাখিস, যেন ওর অযত্ন না হয়। এ পর্য্যন্ত তাই করে' এসেছি। ফ্রান্সে ফিরে গিয়েই কর্ত্তাদের বলে করে, নিজেকে সেই পদেই স্থল-সৈন্যবিভাগে বদ্‌লি করিয়ে নিলাম। সমুদ্দুরের উপর একটা বিতৃষ্ণা হ'য়ে গিয়েছিল!—আমি যে সমুদ্দুরের জলে নির্দ্দোষীর রক্তপাত করেছি! লরার আত্মীয়-স্বজনদের খুঁজে বের করলাম। তার মা তখন মারা গিয়েছেন। তার বোনেরা তার পাগল-অবস্থা দেখে কাছে রাখতে চাইলে না—পাগলদের আস্তানায় রেখে দিতে চাইলে। আমি রাজী হ'লাম না, নিজের কাছেই রাখলাম।……ওহো!…দয়াময়!"

"তুমি তাকে দেখবে একবার?"

"ওর ভিতর কি সেই নাকি!"

"আবার কে?—এই! দাঁড়া!—হোয়া!—এই!—বেটার ঘোড়া!"

এই বলে' তার রুগ্ন জীর্ণ ঘোড়াটা থামালে; সঙ্গে-সঙ্গে গাড়ীর উপরকার অয়েল-ক্লথখানা তুলে ধরে', ভিতরকার খড়ের গাদাটাই যেন গোছাতে লাগল। তারি মধ্যে একটি ভারি বিষণ্ণ মূর্ত্তি আমার চোখে পড়ল। একখানি পাণ্ডুর মুখের উপর এক-জোড়া বেশ ডাগর নীল চোখ, যেন ডব্‌-ডব্‌ কচ্ছে, মাথায় একরাশ সুন্দর চুল সটান সটান হ'য়ে ছড়িয়ে রয়েছে। দেখার মধ্যে আমি কেবল সেই চোখ দু'খানিই দেখেছিলাম,কারণ এই দুটি ছাড়া, মুখের আর যা কিছু—সব যেন মরে গিয়েছে! কপালখানি লাল হ'য়ে রয়েছে, গালদুটি গর্ত্ত হ'য়ে গেছে,হাতের কাছটায় যেন নীল দেখাচ্ছে। সে খড়ের গাদার ভিতর এমন গুটিসুটি হয়ে শুয়ে আছে যে, তার হাঁটু দুখানি হঠাৎ চোখে পড়ে না; এই হাঁটু দুটির উপর রেখে সে আপনা-আপনি 'ডমিনো' খেলছিল। আমাদের পানে একবারটি একটুখানি চাইলে—অনেকক্ষণ কাঁপতে লাগল; আমাকে দেখে একটু হাসলে বোধ হ'ল, তার পর যেমন খেলছিল খেলতে লাগল। আমার মনে হ'ল, সে

যেন ভেবে পাচ্ছিল না—কেমন করে' বাঁ-হাত দিয়ে ডান হাতটার টোকা দেবে। মেজর আমায় বল্‌লে, "এই যে দেখ্‌ছ—এ খেলা প্রায় একমাস ধরে' খেল্‌ছে, আবার হয় ত' কালই নতুন খেলা সুরু কর্‌বে, সেও এমনি অনেক দিন চল্‌বে—আশ্চর্য্য বটে, না ?" সঙ্গে-সঙ্গে ছইটার উপরকার অয়েলক্লথখানা ঠিক করে' দিতে লাগ্‌ল—ঝড়ে বৃষ্টিতে সেটা একটু সরে' গিয়েছিল।

আমি বলে' উঠ্‌লাম, 'আহা, লরেট ! তুমি যা' হারিয়েছ, তা' জন্মের মতনই হারিয়েছ বটে !"

ঘোড়াটা খুব কাছে নিয়ে গিয়ে আমার হাতটা তাকে বাড়িয়ে দিলাম—সে যেন অভ্যাস মত তার হাতখানি আমার হাতে একবার রাখ্‌লে, আর কেমন একটু মধুর হাসি হাস্‌লে! আমি তার দুই লম্বা শীর্ণ আঙ্‌লে দুটি হীরের আংটি দেখে চম্‌কে গেলাম, বুঝ্‌লাম, এ সেই মায়ের-দেওয়া আংটি! কিন্তু কি করে' এত কষ্টে, এত অভাবেও সে দুটি এখনও র'য়ে গেছে ভেবে পেলাম না। বুড়ো মেজরকে এ কথা জিজ্ঞাসা করা ভালো দেখায় না। কিন্তু সে আপনিই আমার লক্ষ্যটা বুঝ্‌তে পেরে একটু যেন গর্ব্ব ক'রেই বল্‌লে—

"হীরে দুটি নেহাৎ ছোট্ট নয়, কি বল ? সুবিধে মতন বেচ্‌তে পার্‌লে বে' দামে বিক্রী হয়! কিন্তু, ও আংটি কি আমি ওর হাত থেকে খুল্‌তে পারি—বাপ্‌রে! ওতে হাত দিতে গেলেই ও কেঁদে উঠ্‌বে, একদণ্ড ও-দুটো কে খুল্‌বে না—ওই যা আব্‌দার, নইলে আর কোনো হাঙ্গাম নেই। আমি ওর স্বামীর কাছে যে কথা দিয়েছি তার অন্যথা করি-নি, আর সে জন্যে দুঃখও করি-নে। একদিনের জন্যেও ওকে কাছ-ছাড়া করি নি। যেখানে গিয়েছি সেখানেই ওকে আমার পাগল মেয়ে বলে' পরিচয় দিয়েছি—সবাই ওকে তাই বলেই জানে। সৈনিকদের সমাজে সব ব্যবস্থাই কেমন সহজে হ'য়ে যায়!—তোমাদের প্যারী-সহরেও তেমনটি হয় না। আমি ওকে নিয়ে সম্রাটের সব যুদ্ধে ঘুরেছি,—ওর গায়ে আঁচড়টি লাগে-নি! …………আগে মাইনেও বেশী পেতাম, তার উপর 'ভাতা' ছিল, আবার 'লীজন-অব-অনার'এর দরুণ পেন্‌সনটাও ছিল, কাজেই তখন ওকে আরো ভালো পোষাক পরিয়ে রাখ্‌তাম,—বেশ সুখে স্বচ্ছন্দেই রেখেছিলাম। এখনো যত্নের ত্রুটি করি-নে; একখানা গাড়ী আর চারটি খড় বইত নয়—এ আর হবে না কেন ? ওকে নিয়ে কখনো আমায় মুস্কিলে পড়্‌তে হয়-নি। বড়-বড় অফিসার্‌রা ওর ছেলেমানুষী খেলা দেখে বরং কত আমোদ করেছে!"

এই বলে' কাছে গিয়ে তার কাঁধের উপর দুবার টোকা দিয়ে সে তাকে বল্‌লে, "কেমন লক্ষ্মী-মেয়ে আমার! —এসো ত', লেফ্‌টেনান্টের সঙ্গে একটা কথা কও দেখি ?" সে তার খেলাতেই মগ্ন হ'য়ে রইল। তখন মেজর বল্‌লে, "ওঃ তাও ত' বটে! আজ জলবৃষ্টি হচ্ছে কি না, তাই একটু বেশী চুপচাপ। ওর কিন্তু ঠাণ্ডা লাগে না—ওই এক সুবিধে!—পাগলদের অসুখ-বিসুখ বড় একটা করে না!—না, না, তুমি খেলা কর, লক্ষ্মীটি!—আমরা কিছু বল্‌ব না, লরেট, তোমার যা' ভালো লাগে তাই করো।"

মেজরের সেই শক্ত শীর্ণ প্রকাণ্ড হাতখানা এতক্ষণ তার কাঁধের উপরেই ছিল; এবার দেখি, সেই হাতখানা সে নিজের হাতে নিয়ে যেন কত সন্তর্পণে মুখের কাছটিতে নিয়ে গেল, তারপর, বড় দীন—বড় অনাথার মত ভক্তিভরে নিজের ঠোঁট দুখানি তার উপর ঠেকালে—দেখে আমার বুক যেন ফেটে গেল, খুব জোরে টান মেরে ঘোড়াটাকে ফিরিয়ে সরে' দাঁড়ালাম। বল্‌লাম, "এবার চল্‌তে সুরু করা যাক, কি বল সর্দ্দার? বেথুঃ-শহরে ফির্‌তে রাত হয়ে যাবে।"

সে তখন তলোয়ারের মুখটা দিয়ে তার বুটের উপরকার লাল কাদাগুলো চাঁচ্‌তে লেগেছে; সে-কাজ শেষ করে', লরার মাথায় ঘোমটার মতন টুপিটা টেনে দিয়ে, নিজের সিল্কের চাদরটা তার গলায় জড়িয়ে দিলে। সবশেষে টাটুটাকে একটা খোঁচা মেরে বল্‌লে, "চল্ এখন—তুই বেটা বড় অপদার্থ!" আমাদের চলাও সুরু হ'ল।

তখনো সেই একভাবে বৃষ্টি হচ্ছে। ওপরে আকাশটা যেমন ঘোলাটে, নীচেও তেমনি বরাবর পাঁশুটে রঙের জমি, তার যেন আর শেষ নেই! পশ্চিমে সূর্য্যি পাটে বসেছে—চারিদিকে যেন একটা ম্লান রুগ্ন আলো, এমন কি সূর্য্যিটাও যেন পাণ্ডুবর্ণ—স্যাঁৎসেতে!

মেজর খুব বড়ো বড়ো পা ফেলে এগিয়ে চলেছে। মাঝে-মাঝে তার মাথার টোকাটা তুলে,—টাক-পড়া মাথায় যে ক'গাছি পাকাচুল ছিল তার থেকে—আর সাদা গোঁপ জোড়াটা থেকে, বৃষ্টির জল মুছে ফেল্‌ছে। গল্পটা আমার কেমন লাগ্‌ল, তার নিজের সম্বন্ধে আমার মতামত কি—এ সব ভাবনা তার আছে বলে' মনে হ'ল না। নিজের সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ উদাসীন—যেন, সে যা—তাই!—তার আর বলাবলি কি আছে ? এসব কথা যেন তার মাথায় আসেই না। প্রায় মিনিট-পনেরো যেতে না যেতেই, সে আর একটা গল্প জুড়ে দিলে। মার্শাল মাসেনা একবার কি রকম করে' যুদ্ধ করেছিলেন, তারি কথা!—সে যুদ্ধে নাকি মেজর তার পদাতিক-সৈন্য নিয়ে কোন্ এক অশ্বারোহী সেনার গতিরোধ করেছিল। মেজর বল্‌তে চায়, ঘোড়-সোয়ারের চেয়ে পদাতিক ঢের ভালো যুদ্ধ করে। সে সব কথা আমার কানে ভালো করে' যাচ্ছিল না।

ক্রমে রাত্রি এল। আমরা খুব জোরে চল্‌তে পার্‌ছিলাম না। পথের কাদা আরও গভীর, আরও পুরু হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। এক জায়গায় রাস্তার ধারে একটা খুব বড় শুক্‌নো গাছ প'ড়ে ছিল, আমি তারি তলায় এসে দাঁড়ালাম। আমার মতন মেজরও প্রথমেই ঘোড়ার তদ্‌বির কর্‌লে। তারপর, মা যেমন মাঝে-মাঝে বিছানার ঢাকা খুলে ছেলে কি কচ্ছে দেখে, তেমনি করে' গাড়ীর ভিতরে একবার চেয়ে দেখ্‌লে।—শুন্‌লাম, বল্‌ছে, "এসো ত, মাণিক আমার! এই জামাটা পায়ের উপর দিয়ে রাখো—একটু ঘুমোও দিকিন্! হ্যাঁ, এইবার হয়েছে! না!—গায়ে একটুও বৃষ্টি লাগেনি। আরে, এ কি! ঘড়িটা গলায় পরিয়ে দিয়েছিলাম, ভেঙ্গে ফেলেছে! আমার অমন রূপোর ঘড়িটা গেল?—তা যাক্ গে! তুমি ঘুমোও ত এখন, লক্ষ্মীটি!—ভাবনা কি? আকাশ পরিষ্কার হয়ে যাবে এখন। আশ্চর্য্য কিন্তু!—গায়ে অষ্টপ্রহর যেন জ্বর লেগে রয়েছে!—পাগলদের ঐ এক দশা! চকোলেট খাবে না?—আচ্ছা, এই নাও, খাও।"

এর পর সে গাড়ীখানাকে সেই মরা-গাছের গুঁড়িতে ঠেশ দিয়ে রাখ্‌লে, তারি চাকার তলায় বসে' আমরা সেই অবিশ্রান্ত ধারার মধ্যে কতকটা আশ্রয় পেলাম। তার কাছে একখানা, আর আমার কাছে একখানা—এই দু'খানা রুটি ছিল, তাই ভাগ করে' আমরা সে দিনের মত আহার শেষ কর্‌লাম। খেতে খেতে সে বললে,

"আজকের দিন এর চেয়ে ভালো কিছু জুট্‌ল না, এতে দুঃখ কর্‌বার কি আছে? একগাদা ছাই সরিয়ে, সেই আগুনে ঘোড়ার মাংস পুড়িয়ে, আর তাইতে নুনের বদলে খানিকটা বারুদ দিয়ে খাওয়ার চেয়ে ত ঢের ভালো!—রাশিয়াতে আমরা সেবার তাই খেয়েছিলাম। ও বেচারীকে অবিশ্যি তাই খেতে দিই-নি! কারণ, আমার ক্ষমতায় যত দূর হয়ে উঠে, ওকে ভালো জিনিষই দিতে হবে যে! দেখ্‌তেই পাচ্ছ, আমি ওকে সব বিষয়ে আলাদা করে'—একটু আড়াল করে' রাখি। সেই কাণ্ডর পর থেকে ও' আর মানুষ হ'তে পার্‌লে না! আমিত' এখন বুড়ো হয়েছি, আর ওর এখন বিশ্বাস হয়ে গেছে—আমিই ওর বাপ, তবু ওর কপালে একটি চুমু খেতে যাই দিকি!—তা'হলে কি আর রক্ষে থাক্‌বে? একেবারে গলা টিপে' আমার দফা রফা করে দেবে!—ভারী আশ্চর্য্য! নয়?"

তার সম্বন্ধে এইরকম আলোচনা হচ্ছে, এমন সময় শুনতে পেলাম, লরা একটি গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে গাড়ীর ভিতর থেকে বলে' উঠ্‌ল, "ওগো আমার মাথা থেকে গুলিটা বার করে' দাও না গো!"—আমি উঠে দাঁড়াতেই মেজর আমাকে বসিয়ে দিলে, বল্‌লে "চুপ করে' বস, ও কিছু নয়। ও ত সর্ব্বদাই ওই কথা বলে, ওর বিশ্বাস—ওর মাথার ভিতর একটা গুলি ঢুকে রয়েছে,—ওর মাথায় সর্ব্বদাই একটা যন্ত্রণা হয়।—তবু, যখন যেটি বল, তখুনি করে, বেজার হয় না।" আমি চুপ করে' শুনে গেলাম, বড় কষ্ট হ'ল। হিসেব করে' দেখ্‌লাম, ১৭৯৭ সাল থেকে আজ এই ১৮১৫ সাল—এই আঠারো বচ্ছর লোকটার এমনি করে' কেটেছে। অনেকক্ষণ চুপ করে' বসে' বসে' মানুষটার অদৃষ্ট আর তার কর্ম্মের কথা ভাব্‌ছিলাম। হঠাৎ, কি মনে হ'ল জানি নে, তার হাতটা চেপে ধরে' খুব জোরে নেড়ে দিলাম। সে অবাক হ'য়ে গেল। আমি খুব আবেগের ভরে বলে' উঠ্‌লাম, 'তুমি মহাপ্রাণ!' উত্তরে সে বল্‌লে, "তার মানে ?......ওঃ, ওই মেয়েটার জন্যে বুঝি ? তুমি ত জানোই ভায়া, ও যে আমার কর্ত্তব্য। আর নিজের সুখ-দুঃখ ?—সে ত অনেক দিন হ'ল চুকিয়ে দিয়েছি!"—এই বলে' খানিক পরে আবার মাসেনার গল্প আরম্ভ করলে।

পরদিন ঠিক ভোরে আমরা বেথুন-সহরে গিয়ে উঠ্‌লাম। সেখানে তখন চারিদিকে হুলুস্থূল—আসন্ন বিপদের সাড়া পড়ে' গেছে। চারিদিকে 'সাজ সাজ'-রব—রণভেরী আর ঢাকের শব্দ! রাজার দলের বন্দুকধারী অশ্বারোহী-সেনার সঙ্গে সেই দেখা, অমনি আমি আমার দলে ভিড়ে গেলাম ; ভিড়ের মধ্যে আমার সাথীদের আর দেখ্‌তে পেলাম না। দুঃখ এই, সেই যে ছাড়াছাড়ি হ'ল, আর দেখা হ'ল না।

জীবনে সেই প্রথম, আসল সৈনিকের প্রাণটা যে কি বস্তু, তা ভালো করে' দেখে নিয়েছিলাম। এই পরিচয়ের ফলে, এক রকমের মনুষ্য-চরিত্র আমার কাছে খুব স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। এ আমি আগে ভালো বুঝ্‌তাম না, দেশের লোকও বোঝে না, তাই এ জিনিষের আদর নেই। প্রায় চোদ্দ বচ্ছর আমি সেনা-বিভাগে কাটালাম, এমন চরিত্র আমি আরও দেখেছি, কিন্তু সে কেবল ওই নিম্নতম পদাতিক সৈন্যের মধ্যে। এদের প্রাণটা প্রাচীনযুগের মানুষের মতন ; কর্ত্তব্য-বোধটাই এদের ধর্ম্মবিশ্বাস, সেটাকে এরা চূড়ান্ত করে' ছেড়েছে। আদেশ পালন করার দরুণ কোনো দুঃখ নেই, গরীব বলে' এরা লজ্জা করে না। এদের কথাবার্ত্তা চাল-চলন খুব সাদাসিদে ; নিজে যশ চায় না, চায় দেশের গৌরব ; সারা জীবনটা লোকচক্ষুর আড়ালেই কাটিয়ে দেয়—খায় পোড়া রুটি, আর দাম দেয় গায়ের রক্ত।

অনেকদিন এই মেজরের কোনো খবর আমি পাই-নি, তার একটা কারণ, আমি তার নাম জান্‌তাম না, সেও বলে নি, আমিও জিজ্ঞাসা করি-নি। ১৮২৫ সালে একদিন একটা কাফি-খানায় বসে' এক পদাতিক-সেনার কাপ্তেনের কাছে আমি এই ঘটনাটা বর্ণনা কর্‌ছিলাম, সে তখন প্যারেডের জন্যে অপেক্ষা করে' বসেছিল, আমার কথা শুনে সে লাফিয়ে উঠ্‌ল, বল্‌লে—

"আরে! লোকটাকে যে আমি চিন্‌তাম! বেড়ে লোক ছিল সে। আহা বেচারী।—ওয়াটার্লু'র যুদ্ধে একটা গুলি খেয়েই সাবড়ে গেল। তার তল্পি-তল্পার সঙ্গে একটা পাগলাটে-গোছের মেয়েমানুষ ছিল বটে, তাকে আমরা 'আমিয়ে'-শহরের হাঁসপাতালে রেখে এসেছিলাম। সেখানে সে দিন-তিনেক পরেই ভীষণ উন্মাদ-অবস্থায় মরে' গেল।"

আমি বল্‌লাম, "কথাটা খুব সম্ভব বটে। তার পালক-পিতাও শেষটায় মারা গেল কি না!"

সে বল্‌লে, "হ্যাঁ! পালক-পিতা—না আরও কিছু!......কি ? কি বল্‌লে ?"—তার কথাগুলোর ভিতর বেশ একটু বাঁকা অর্থ ছিল। আমি বল্‌লাম,

"নাঃ, কিছু বলি-নি, বল্‌ছি—প্যারেডের বাজ্‌না বাজ্‌ছে।" বলে'ই বেরিয়ে গেলাম। সেবার আমিও কম আত্ম-সংযম করি-নি।*

* ফরাসীর ইংরেজী অনুবাদ অবলম্বনে

ফকির লালন সাহ

শ্রী বসন্তকুমার পাল

শৈশব হইতেই দেখিতে পাই, এক সম্প্রদায়ের ফকির-গণ সারঙ্গ কিম্বা গোপীযন্ত্র বাজাইয়া হিন্দু বৈরাগীদিগের ন্যায় গান গাহিয়া ভিক্ষা করিতে আসে। কৌতূহল-বশে আমার পিতামহের নিকট এক দিন ইহাদের বিষয় জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারিলাম, ইহারা সাঁইজীর শিষ্য বা বালক। এই সাঁইজী যে কে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে পাঠককে তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস দিব। আমার জন্মের পূর্ব্বে সাঁইজী সমাধিস্থ হইয়া ইহলোক হইতে অন্তর্ধান করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার বিষয় সাধারণ সমক্ষে বিবৃত করা আমার পক্ষে একটি সমস্যার কথা।

কুষ্টিয়া রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে প্রায় এক মাইল পূর্ব্ব দিকে সেউড়িয়া নামক পল্লীতে সাঁইজীর আখ্‌ড়া, সাঁইজীর শিষ্যগণ এই স্থানে বাস করিতেছেন। এই আখ্‌ড়াতেই বঙ্গের সমাজহারা সাঁইজী সমাধিস্থ হইয়া শান্তি-শয়নে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার শিষ্য ভোলাই ও পাঁচু সার নিকট শুনিলাম এবং তৎকালে কুষ্টিয়ার হিতকরী নামে

যে পত্রিকা প্রচলিত ছিল তাহাও পড়িয়া জানিলাম, মহা-যাত্রার সময় তাঁহার বয়ঃক্রম ১১৬ বৎসর হইয়াছিল।

যে-স্থানে আমার বাড়ী তাহার অপর পাড়া অর্থাৎ ভাঁড়ারা বা ভাণ্ডারিয়া গ্রামে যে-স্থানে দুঃখী সেখ চৌকীদার বাড়ী করিয়া আছে ঠিক সেই স্থানেই সাঁইজীর জননী শেষ জীবন অতিবাহিত করিয়া যান। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের বিষয় ঠিক বলিতে পারে এমন কেহ সম্প্রতি এখানে নাই। কিন্তু সাঁইজী যে এই গ্রামেরই লোক তাহা প্রায় সকলেরই জানা আছে। এই স্থানে সাঁইজীর কোনো সন্ধান করিতে না পারায় ছেঁউড়িয়া আখ্‌ড়ায় যাই, তথায় তাঁহার শিষ্য পাঁচু সা, ভোলাই সা ও ভাজুরী ফকিরাণীর সহিত সাক্ষাৎ করি, পাঁচু সাও বৃদ্ধ, তাঁহার বয়ক্রম বর্ত্তমান ১৩২৯ সালে ৯৯ বৎসর, সাঁইজীর বিষয় যাহা কিছু সংগ্রহ করি তাহা ইঁহাদেরই বাচনিক।

সাঁইজী কায়স্থ-কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার প্রথম বাসস্থান কুষ্টিয়া মহকুমার অধীন গোরী নদীর তীরস্থ ভাঁড়ারা গ্রামে। সন্ধান করিয়া যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহাতে বোধ হয় তিনি শৈশবে এই স্থানে তাঁহার মাতামহ-গৃহে প্রতিপালিত হন, এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া দারপরিগ্রহ করিয়া বিধবা জননী সমভিব্যাহারে স্বতন্ত্র হইয়া এই গ্রামেই বাস করিতে থাকেন। তাঁহার পিতা বা পিতৃকুলের কাহারও পরিচয় জানিতে পারি নাই, তবে মাতৃকুলের দিক্‌ দিয়াই তাঁহার পরিচয় দিতে পারিব। ইহা তাঁহার মাতৃস্বসা-বংশীয়ের নিকট হইতে জানা গিয়াছে।

সাঁইজীর জননীর নাম পদ্মাবতী এবং মাতামহের নাম ভস্মদাস; তাঁহার মাতামহের দুই পুত্র ও তিন কন্যা। পুত্রদ্বয়ের নাম কৃষ্ণদাস ও রাজুদাস। কন্যাত্রয়ের নাম রাধামণি নারায়ণী ও পদ্মাবতী। রাধামণির বংশ নির্ম্মূল-প্রায়, তাঁহার এক বিধবা পৌত্রীই শেষ বংশধর। নারায়ণীর বংশও এইরূপ। তাঁহার দত্তক-প্রপৌত্র শ্রীযুক্ত অনন্তদাস ভৌমিক সম্প্রতি জলপিণ্ডের একমাত্র অধিকারী।

এই ভৌমিকদিগের বাড়ী গিয়াই জানিতে পারিলাম সাঁইজী জীবিতাবস্থায় কথনো তাঁহাদের বাড়ীতে আসেন নাই, তবে ভৌমিকগণই সময়-সময় সাঁইজীর আখ্‌ড়া ছেঁউড়িয়া গিয়া সদালাপ শ্রবণ করিতেন। সাঁইজীর শিষ্যেরা বলেন, ভৌমিকেরা আসিলে যত্নসহকারে তাঁহাদের আহারাদির ব্যবস্থা করা হইত।

সাঁইজীর বাল্য নাম লালন দাস। তিনি যে-পাড়ায় বাস করিতেন তাহা অদ্যাপি দাস-পাড়া নামে খ্যাত; কিন্তু দুঃখ ও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই দাস-পাড়ায় কতকগুলি পুরাতন পতিত বাস্তু ভিটা ও প্রকাণ্ড বিটপী-শ্রেণী ব্যতীত মনুষ্যের বসতি আর এখন নাই। সে দাস-বংশ এখন বিলুপ্ত।

সাঁইজী এই দাস-বংশের বাউল দাস নামক কোনো প্রতিবাসীর সহিত সহরে গঙ্গাস্নানে যাত্রা করেন। তখন রেল ছিল না; তীর্থযাত্রীগণ নৌকাযোগে যাতায়াত করিতেন। লালন দাস গঙ্গাস্নান সমাপণ করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে বসন্ত রোগে গুরুতর রূপে আক্রান্ত হন। রোগের আক্রমণ এতই বর্দ্ধিত হয় যে, ক্রমে তাঁহার সংজ্ঞা লোপ পায় এবং দুরন্ত ব্যাধির প্রকোপে তিনি মৃতবৎ অসাড় হইয়া পড়েন। সঙ্গীগণ তাঁহাকে মৃত মনে করিয়া যথাবিহিত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিয়া মুখাগ্নি দ্বারা গঙ্গা-বক্ষে নিক্ষেপ করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

লীলাময়ের ইচ্ছায় পতিতোদ্ধারিণীর স্নিগ্ধ লহরে অন্ত্যেষ্টিকৃত লালনের অন্তঃসংজ্ঞাশীল দেহ তীরে উঠিয়া পড়ে, এই সময় তাঁহার কণ্ঠ হইতে অস্ফুট স্বর উত্থিত হয়। কোনো দয়াবতী মুসলমান রমণী তখন নদীতে জল লইতে আসিয়া এই মৃদু কণ্ঠস্বর শুনিতে পান এবং দূরে ছুটিয়া গিয়া গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত শবটিকে দর্শন করিয়া জানিতে পারেন তাহাতে প্রাণবায়ু তখনো বহমান। স্নেহ-প্রবণ রমণী-হৃদয় এই নিদারুণ দৃশ্যে গলিয়া গেল। তিনি এই মৃতকল্প মানব বপুটিকে টানিয়া তুলিলেন এবং স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিয়া স্বকীয় পরিজনবর্গের নিকট এই আশ্চর্য্য শবের বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করেন। কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া সকলেই নদীতীরে আসেন এবং মমতা-বিগলিত হইয়া এই জীবন্মৃত ব্যক্তিকে বাড়ী লইয়া যান

এই মুসলমান রমণী তন্তুবায় (বা জোলা) জাতীয়া। আমার মনে হয় তিনি সামান্ত রমণী নহেন, মাতৃরূপিণী মূর্ত্তিমতী করুণা। ভীষণ পীড়ায় জীবনে হতাশ, তীর্থবন্ধু-কর্ত্তৃক অপরিচিত এবং জনশূন্য সৈকতে পরিত্যক্ত লালন যখন প্রাণ খুলিয়া অকূলের কাণ্ডারীকে আশ্রয় লাভের জন্য ডাকিতে লাগিলেন তখন সেই নিরাশ্রয়ের আশ্রয় যেন নারীরূপ পরিগ্রহ করিয়া বিজন বেলায় তাঁহাকে আপন অভয় অঙ্কে স্থান দিতে ছুটিয়া আসিলেন। বসন্ত অতি সংক্রামক রোগ, সুতরাং জননী রোগীকে লইয়া তাঁত-ঘরে রাখিয়া দিলেন এবং আপন সন্তান জ্ঞানে যত্ন ও শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার আন্তরিক শুশ্রূষায় রোগীর অবস্থা ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। ইতি-পূর্ব্বে পাড়ার সকলেই লালনের জীবন রক্ষা বিষয়ে সম্পূর্ণ হতাশ হইয়াছিলেন; কিন্তু যখন দিনের পর দিন অতীত হইতে লাগিল, রোগী এক ভাবেই রহিল তখন সকলেই আগ্রহ-সহকারে সংবাদ রাখিতে লাগিলেন। অবশেষে লালন সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করিল। তাঁহার আশ্রয়দাত্রীর প্রাণের প্রচ্ছন্ন মমতার স্বজীব মূর্ত্তি মেঘমুক্ত সূর্য্যের ন্যায় লোকচক্ষে উদ্ভাসিত হইল। সুস্থ হইবার পর লালন তাঁহার জীবন-দাত্রী জননীর নিকট স্বীয় পরিচয় ও তীর্থ-পর্য্যটনের আনুপূর্ব্বিক অবস্থা যথাযথ বিবৃত করিলেন। অনন্তর সবল-হইয়া পদব্রজে আপন গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যে সমস্ত গুণধর সহযাত্রী মৃত লালনের মুখাগ্নি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া গঙ্গাবক্ষে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই গ্রামে আসিয়া তীর্থস্থানে ভাগ্যবান লালনের গঙ্গা-প্রাপ্তির সৌভাগ্যের কথা তদীয় জননী ও সহধর্ম্মিণীর নিকট সুললিত ভাষায় প্রকাশ করিয়া আপন আপন দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিলেন। অন্যান্য যাত্রীর সঙ্গে তীর্থ করিয়া লালন ঘরে ফিরিতেছে, লালনের স্ত্রী ও জননী কত আশায় দিনের পর দিন গণিয়া পথ চাহিয়া আছেন,—হায়! অদৃষ্টের নিদারুণ পরিহাসে এই মর্ম্মান্তিক সংবাদ যখন তাঁহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল, তাঁহারা অন্তরের অব্যক্ত যন্ত্রণায় পাষাণে মাথা ভাঙ্গিতে লাগিলেন। কিন্তু বিধিলিপির উপর হস্তক্ষেপ করে কে? যাহা হউক সঙ্গীদিগের কথামত নির্দ্দিষ্ট দিবসে লালনের শ্রাদ্ধাদি পারলৌকিক ক্রিয়া যথা-বিধি সম্পন্ন করিয়া তাঁহার স্ত্রী বৈধব্যাচার পালন করিতে আরম্ভ করিলেন।

সংসারে পদ্মাবতীর আর এমন কেহই অন্তরঙ্গ নাই, একমাত্র বিধবা পুত্রবধূ, অতি কষ্টে তাঁহার দিনপাত হইতেছে! এই সময়ে সহসা একদিন অপরাহ্নে কোনো অপরিচিত যুবক পদ্মাবতীর দ্বার-দেশে আসিয়া পরিচিত কণ্ঠে "মা" বলিয়া ডাকিয়া দাঁড়াইল। পদ্মাবতী স্বপ্নচকিতের ন্যায় শিহরিয়া উঠিলেন তাঁহার প্রাণের সমুদ্র অনন্ত লহরীতে গর্জ্জাইয়া উঠিল; মমতাময়ী জননীর প্রাণ মুহূর্ত্ত মধ্যে আপন সন্তানকে চিনিয়া ফেলিল। পুত্র বসন্ত রোগে মারা গিয়াছে, জ্ঞাতিগণ তাহার মুখাগ্নি-ক্রিয়া পর্য্যন্ত সম্পন্ন করিয়া আসিয়াছেন, তাহার পর তাঁহার শ্রাদ্ধাদিও যথারীতি নিষ্পন্ন হইয়াছে, তাঁহার স্ত্রী এখন বৈধব্যাচার পালন করিয়া কঠোরভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন এখন সেই স্বর্গবাসী লালন কেমন করিয়া পুনরায় মানব-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া পদ্মাবতীর কুটীর-দ্বারে সমাগত হইল! কিন্তু একদিকে বসন্তের প্রকোপে মুখশ্রী কিঞ্চিৎ বিকৃত অন্যদিকে আবার মুখাগ্নি-সলিতার ক্ষত-চিহ্নও ওষ্ঠ-প্রান্তে জাজ্বল্যমান পরিস্ফুট; একদিকে তীর্থ-প্রত্যাগত জ্ঞাতিগণের প্রদত্ত বিবরণ অন্য-দিকে নবাগত লালনের মুখশ্রী,—এই সকল একত্র সমাবেশ করিয়া দেখিলে এই প্রহেলিকা মুক্ত যুবককে প্রকৃত লালন বলিয়া সন্দেহ করিতে কেহই সাহস করিবে না। লালনের স্ত্রী ও পদ্মাবতী উভয়েই তাঁহাদের সম্বলকে চিনিয়া ফেলিলেন।

পদ্মাবতী আপন বুকের সংশয় বুকে লুকাইয়া পর-লোক হইতে পুনরাগত পুত্রকে বসিতে দিলেন। ক্রমে সমস্ত বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিলেন। তাঁহার প্রাণে উল্লাস-লহরী রঙ্গে রঙ্গে নৃত্য করিতেছে, কিন্তু তাহা আর কেহ জানিতে পারিতেছে না। ইহার পর যখন শুনিলেন পুত্র মুসলমানের অন্ন গ্রহণ করিয়াছে তখন তাঁহার প্রাণের উদীয়মান হর্ষ-সুধাকর ক্রমে বিষাদ-বারিদে সমাচ্ছন্ন হইতে আরম্ভ হইল। রাত্রি আসিল। পদ্মাবতী পুত্রকে ভোজন করিতে দিলেন, কিন্তু থালার পরিবর্ত্তে

কদলীপত্রে এবং রন্ধনশালার পরিবর্ত্তে শয়ন-গৃহের বারান্দায়; লালন এই পরিবর্ত্তনের কথা জননীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু বিশেষ কোনো উত্তর পাইলেন না।

পরদিন প্রাতে পদ্মাবতীর গৃহ লোকে লোকারণ্য হইল। রাত্রি-মধ্যেই সর্ব্বত্র সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে যে, লালনদাস যমপুরী হইতে লোকালয়ে ফিরিয়া আসিয়াছে; বসন্তের চিহ্নে লালনের মুখশ্রী কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তথাপি সম্মুখে আসিলে সকলেই স্পষ্টরূপে লালনকে চিনিতে পারিল এবং লালনও গ্রামের সকলকেই চিনিয়া ফেলিল। এখন কথা হইল লালনের সম্বন্ধে সমাজ কি ব্যবস্থা করিবে। সে যে মুসলমানের অন্নে জীবন রক্ষা করিয়াছে, তাহা নিজ মুখেই কৃতজ্ঞতা-গদগদচিত্তে প্রকাশ করিতেছে; তাহার পর মুখাগ্নি-ক্রিয়া শেষ করিয়া তাহাকে গঙ্গাবক্ষে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল এবং তাহার পারলৌকিক ক্রিয়াদিও যথারীতি সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এইসকল কথা লইয়া লোক-সমাজে খুব গুরুতর আলোচনা ও সমালোচনা চলিতে লাগিল। লালন যখন গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতার নাম ধরিয়া চিনিয়া ফেলিল, তখন তাহাকে প্রকৃত লালন বলিয়া স্বীকার করাতে কাহারও আপত্তি রহিল না, তবে পূর্ব্বোক্ত কারণগুলি বিদ্যমান থাকায় তাহাকে সমাজে গ্রহণ করায় ঘোর আপত্তি উঠিয়া পড়িল। কেহ বলিল, যবনান্নভোজীকে সমাজে আদৌ গ্রহণ করা যায় না; আবার কেহ কেহ "মিষ্টান্নম্ ইতরে জনাঃ"র ব্যবস্থা দিতে লাগিলেন। দুঃখিনী পদ্মাবতী নিরুপায়, তাঁহার এমন সঙ্গতি নাই যে, রসনা-তৃপ্তিকর অন্নব্যঞ্জনাদি দ্বারা সমাজকে পরিতৃপ্ত করাইয়া পুত্রকে ঘরে লইবার জন্য তখনই অনুমতি লইতে পারেন। ইহার পর যখন তাঁহার শ্রাদ্ধাদিও হইয়া গিয়াছে তখন সে-সম্বন্ধে প্রায়শ্চিত্তাদিই বা কি দিয়া করিবেন। এইসমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে কেবলই অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু এখন তিনি পথের ভিখারিণী; সুতরাং এইসকল সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার সন্তানকে আপন মায়ের ঘরে পরের ছেলের মতন বাস করিতে হইবে। পদ্মাবতী প্রাণের বেদনায় উন্মাদিনী। প্রথম দিনের মতন আজও তিনি আপন হারানিধিকে কদলী-পত্রে করিয়া ভোজন করিতে দিলেন।

আপন বাড়ীতে আপন জননীর হস্তে লালনের এই শেষ অন্ন-গ্রহণ। যিনি হীন পতিতকে আপন অন্তরঙ্গ জ্ঞানে উপযুক্ত শিক্ষা দ্বারা উচ্চে স্থাপন করিবেন, যিনি সমগ্র বঙ্গদেশে এক অভিনব পবিত্রতার বিমল ধারা ঢালিয়া দিবেন, তাঁহার পক্ষে কি সামান্য গণ্ডীর মধ্যে অপবিত্র হইয়া পড়িয়া থাকা সম্ভব! যেখানে আপন জননী একমাত্র সন্তানকে বুকে করিয়া রাখিতে অক্ষম, এমন সঙ্কীর্ণ ও অভিশপ্ত সমাজে লালনের মত উদার, মহৎ এবং উন্নতমনার অবস্থান করা কি কখনো সম্ভবপর হয়? এই সময়ে যশোহর জিলায় ফুলবাড়ী গ্রামে সিরাজসাঁই নামক জনৈক দরবেশ বাস করিতেন। লালন যখন তাঁহার জীবনদাত্রী জননীর বস্ত্রবয়ন-গৃহে শায়িত, ঘটনাক্রমে সেই-সময় এই দরবেশও পর্য্যটন করিতে করিতে এই গ্রামে আসিয়া লালনের বৃত্তান্ত শুনিতে পান এবং অচিরে তাঁহার রোগ-শয্যার পার্শ্বে আসিয়া সমাসীন হন। লালন যখন কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন তখন হইতেই সিরাজ সাঁই তাঁহাকে উপদেশ দিতে আরম্ভ করেন। সিরাজের প্রাণস্পর্শী উপদেশে লালনের হৃদয় এক অভিনব ভাবের আবেশে আবিষ্ট হইয়া পড়ে। এই উপদেশরাশি তাঁহার যাতনাক্লিষ্ট প্রাণে এক নব পর্য্যায় আনিয়া দেয়। ইহার পর গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া সমাজের অবৈধ নিগ্রহ ও অসহ্য অবজ্ঞার নিবিড় কৃষ্ণ মেঘরাশি যখন তাঁহার সম্মুখে পুঞ্জীভূত হইতে লাগিল তখন তিনি আপন হৃদয়ের গোপন ভাবে আপনিই উন্মত্ত হইয়া পড়িলেন। তিনিও সঙ্কীর্ণ সমাজের বাহাড়ম্বর ও ক্ষুদ্রগণ্ডীর প্রতি ভ্রূভঙ্গী করিয়া বিস্তীর্ণ ও আলোকময় রাজ্যে প্রবেশ করিতে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। অনন্তর স্বীয় জননী ও অর্দ্ধাঙ্গিনীর নিকট শেষ বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক জন্মের মতন গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

যখন তিনি এই সীমাবদ্ধ সমাজের প্রতি ভ্রূকুটি প্রদর্শন করিয়া স্বগৃহ হইতে বিদায় লইলেন তখন তাঁহার প্রাণ কোন্ অভিনব রাগিণীর মধুর সঙ্গীতে মুখরিত হইয়া উঠিল, যে-রাজ্যের এই সঙ্গীত তথায় প্রবেশ করিতে তিনি
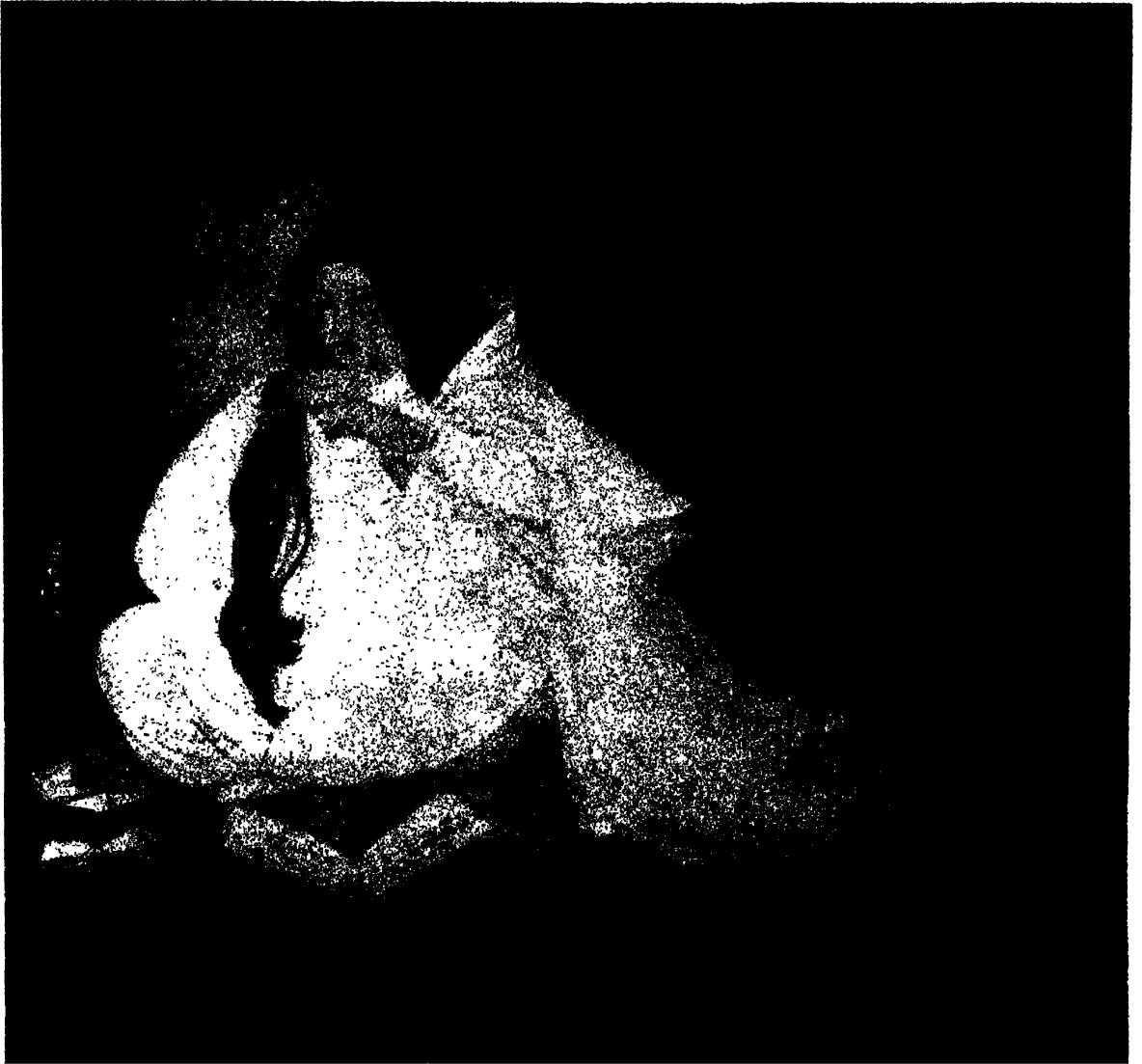
যৌবনের কবর
শ্রী দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

আকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি এখন সামান্ত লালন দাস নহেন, তিনি এখন সাঁইজী ; এক অদৃষ্টপূর্ব্ব সমাজে প্রবেশ করিয়াছেন। সেখানে অন্ধকারের লেশমাত্র নাই কেবল জ্যোতি। এই সমাজের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি পরে বলিয়াছেন—

চেয়ে দেখনা রে মন দিব্য নজরে
চারি চাঁদ দিচ্ছে ঝলক মণি-কোঠার ঘরে।
হ'লে সে চাঁদের সাধন অধর চাঁদ হয় দরশন,
আবার চাঁদেতে চাঁদের আসন রেখেছে ফিকিরে।
চাঁদে চাঁদ ঢাকা দেওয়া, চাঁদে দেয় চাঁদের খেওয়া
(দেয় রে)।
জমিতে ফল্‌ছে মেওয়া চাঁদের সুধা ঝরে।
নয়ন চাঁদ প্রসন্ন যার সকল চাঁদ দৃষ্ট হয় তার (হয় রে)।
লালন কয় বিপদ আমার গুরুচাঁদ ভুলে রে।

তাঁহার অন্তরে এই আলোকময় ভাবের উন্মেষ হওয়ায় তিনি ক্ষুদ্র সমাজের অবজ্ঞার প্রতি আর দৃক্‌পাত করিতে পারিলেন না। সিরাজ সাইজীর উপদেশে যেখানে 'চারি চাঁদ ঝলক দিচ্ছে' সেই মণি-কোঠার ঘরে গিয়া উপবিষ্ট হইলেন ; সুতরাং স্বজাতি বা সমাজের উপেক্ষায় তিনি কেন ঘরের ছেলে পরের হইয়া থাকিবেন। তাই কোন্ সুদূর বন্ধুর আকুল আহ্বানে প্রাণ খুলিয়া সাড়া দিলেন।

আমি বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি লালনের স্ত্রী তাঁহার অনুগামিনী হইতে নিতান্ত উৎসুক ছিলেন এবং ইহার পর লালন যখন সেঁউড়িয়া গ্রামে আখ্‌ড়া স্থাপন করেন, তখনও এই পতিপ্রাণা রমণী স্বামীর ধর্ম্মভাগিনী হইতে অনেকবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন কিন্তু সমাজের মুখ চাহিয়া আত্মীয়-স্বজন কেহই তাঁহার সে ইচ্ছা ফলবতী হইতে দেন নাই। ইহার সামান্ত কয়েক বৎসর পরেই লালনের স্ত্রী ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বীয় হৃদয়ের গভীর বেদনা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন।

লালনের স্নেহময়ী জননীই এখন বিশ্ব-পিতার মমতাময় সংসারে একাকিনী পরিত্যক্তা। তাঁহার গৃহ নির্জ্জন মরুভূমি; তাঁহার প্রাণ আত্মীয়-স্বজনের মমতা হইতেও সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। তিনি একে কাঙ্গালিনী, তাহার পর একাকিনী ; কেহ তাঁহাকে আর ডাকিয়াও জিজ্ঞাসা করে না, নিরুপায় হইয়া গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নাম স্মরণ করিয়া তিনিও অন্তরঙ্গহীন সমাজ হইতে বিদায় লইয়া ভেকাশ্রিতা হন। প্রাণপ্রতিম পুত্রের অভাবে কেহই আর তাঁহাকে ভুলাইতে পারে নাই। যে-সমাজের ভয়ে দেবতার মতন তনয়কে উপেক্ষা করিলেন, সেই সমাজও তাঁহাকে আবরিয়া রাখিতে পারিল না। ভাঁড়রা গ্রামে বৈরাগী "গুপ্তমিত্রের আখ্‌ড়ায়" তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত হয় এবং এখানেই তিনি ভবলীলা সম্বরণ করেন। ভাঙ্গরী ফকিরাণী ও পাঁচু সার নিকট শুনিলাম আখ্‌ড়া হইতে দ্রব্য-সামগ্রী পাঠাইয়া সাঁইজী জননীর মহোৎসবাদি যথাবিধি সুসপন্ন করান।

সমাজের মুখ চাহিয়া স্ত্রী অকালে কালগ্রস্তা, জননী তথাকথিত আত্মীয়-স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা ও ভেকাশ্রিতা, আর লালন এ-হেন সমাজকে কটাক্ষ প্রদর্শন করিয়া আজ দরবেশ, তিনি সর্ব্বজন-পূজিত সাঁইজী। শত শত ব্যক্তি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া শান্তি-ছায়ায় আশ্রয় লইতেছে, প্রাণ রক্ষার জন্য মুসলমানের অন্ন গ্রহণ করা অপরাধে যদিও তিনি মুসলমান, তথাপি অনেক সম্পত্তিসম্পন্ন হিন্দু-গৃহস্থ পর্য্যন্ত তাঁহাকে আপন গৃহে লইয়া প্রাণের পিপাসা নিবৃত্তি করিতেছে। বঙ্গের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি এমন কি স্বর্গীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া শিলাইদহে নৌকায় লইয়া ধর্ম্মালাপে পরিতৃপ্ত হইয়াছেন। সাঁইজীর নিকট জাতিভেদ নাই, হিন্দু মুসলমান, খৃষ্টীয়ান, সকলে সমানভাবে ধর্ম্মপিপাসু হইয়া তাঁহার আখ্‌ড়ায় যাতায়াত করিতেছেন। সম্প্রতি সাঁইজী যে কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী,তাহা নির্ণয় করিবার মতন সাধ্য কাহারও নাই। হিন্দুগণ তাঁহার হস্তে প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জনাদি গ্রহণ করিতেন না। সাঁইজীর মাসতুত ভাইগণ পর্য্যন্ত সেঁউড়িয়া আখ্‌ড়ায় গিয়া স্বহস্তে রন্ধন করিয়া আহারাদি করিতেন। সাঁইজীর শিষ্য ও তাঁহার মাসতুত ভায়ের বংশধরের মুখে একথা শুনিতে পাইয়াছি। সাঁইজী হিন্দু কি মুসলমান একথা আমিও স্থির বলিতে অক্ষম, এমন-কি তিনি নিজেও বলিয়াছেন,

সবে বলে লালন ফকির হিন্দু কি যবন,
লালন বলে আমার আমি না জানি সন্ধান।

তবে মুসলমানের হস্তে প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জনাদি ভোজন করিতেন, এই অপরাধে তাঁহাকে মুসলমান বলিয়া সাব্যস্ত করা যায়। তবে প্রকৃত মানব-সমাজের দিক দিয়া বিচার করিলে তাঁহার স্থান ভেদ-জ্ঞান-সম্পন্ন ক্ষুদ্র সমাজের বহু উর্দ্ধে। তিনি যে-রাজ্যের অধিবাসী, সেখানে হিন্দু-মুসলমানের ভেদ-বিচার নাই, সমগ্র বিশ্ব-মানব তথায় একই জনক-জননীর সন্তান। জাতির কথা উল্লেখ করিয়া ঘরের ছেলেকে পরের হইয়া থাকিতে হয়, লালন সে-রাজ্যের অধিবাসী নহেন; তিনি সমস্ত মনুষ্যের মধ্যে তাঁহার "মনের মানুষ"টিকে দেখিয়া ভাবে আত্মহারা হইতেন, সুতরাং সমস্ত মানবই তাঁহার চক্ষে এক। তাঁহার কথা "এই মানুষে দেখ সেই মানুষ আছে"। এই মানুষে সেই মানুষ দেখা সামান্য সৌভাগ্যের কথা নহে। লালন পরম ভাগ্যবান্, তাই তাঁহার চক্ষে ভেদজ্ঞান-সম্পন্ন মনুষ্য দৃষ্ট না হইয়া সর্ব্বভূতে বিরাজমান মনুষ্যই সর্ব্বত্র পরিদৃষ্ট হইত। প্রকৃত কথায় বলিতে গেলে তিনি একজন মনস্তত্ত্ববিদ্ মহা-ঋষি। নচেৎ সমস্ত মানবের মধ্যে ভগবদ্দর্শন-লাভ সামান্য লোকের ভাগ্যে ঘটে না। ইহাতে অশেষ সাধ্য-সাধনা চাই, লালনের তাহাই ছিল; তাই তিনি গাহিয়াছেন—

সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে,
লালন ভাবে জেতের কি রূপ দেখ্‌লেম না এ নজরে।
যদি, শুন্নত দিলে হয় মুসলমান,
নারীর তবে কি হয় বিধান?
বামন চিনি পৈতা প্রমাণ,
বামনী চিনি কিসে রে?
কেউ মালা কেউ তস্‌বি গলায়,
তাইতে কি জাত ভিন্ন বলায়!
যাওয়া কিম্বা আসার বেলায়
জেতের চিহ্ন রয় কার রে!
জগৎ বেড়ে জেতের কথা;
লোকে, গৌরব করেন যথা তথা;
লালন সে জেতের ফাতার
বিকিয়েছে সাধ বাজারে।

এই কথাগুলি শুনিয়া লালনের জাতি পরিচয় লইতে যাওয়া বড়ই সমস্যাময় ব্যাপার। ভেদ-বিচারে যেখানে,

এই মানুষে দেখ সেই মানুষ আছে,
কত মুনি-ঋষি চারি যুগ ধ'রে বেড়াচ্ছে খুঁজে।
জলে যেমন চাঁদ দেখা যায়
সে-চাঁদ ধর্‌তে গেলে হাতে কে পায়,
ও যে, আলেক মানুষ তেম্‌নি সদায়
আছে আলেকে ব'সে।
অচিন দলে বসতি তার,
দ্বিদল পদ্মে বারাম তার;
দল নিরূপণ হবে যাহার
সে রূপ দেখ্‌বে অনায়াসে।
আমার হ'ল কি ভ্রান্তি মন—
আমি বাইরে খুঁজি ঘরেরি ধন;
সিরাজ সাঁই কয় ঘুর্‌বি লালন
আত্মতত্ত্ব না বুঝে।

সাঁইজীর প্রথম কথা সর্ব্বাগ্রে নিজের পরিচয় লও "কস্ত্বং কোঽয়ং কুত আয়াত।" তুমি কে? কি নিমিত্ত কোথা হইতে এই ধরাধামে আগমন করিয়াছ? অন্তিমেই বা তোমার কি গতি হইবে! আত্মপরিচয় অবগত না হইলে জগতে কেহ কখনো কোনো কার্য্য করিতে সক্ষম হয় না। আমরা মোহান্ধ মানব আপনার পরিচয় রাখি না, কিন্তু বাতুলের মত অচেনা মানুষের সন্ধানে কৃতকার্য্য হইতে যাই। লালন ইহা ভাবিয়া বলিয়াছেন—

আপন খবর আপনারে হয় না,
আপনারে চিনিলে পরে যায় অচেনার চেনা।
আত্মারূপে কর্ত্তা হরি;
মনে নিষ্ঠা হ'লে মিল্‌বে তারি ঠিকানা,
বেদ-বেদান্ত পড়্‌বি যত বেড়্‌বি তত লখ্‌না;
ধড়ের আত্মকর্ত্তা কারে বলি—
কোন্ মোকাম তার কোথায় গলি
আওনা যাওনা,—
সেই মহলে লালন কোন্ জন
তাও লালনের ঠিক হ'ল না।

সেউড়িয়া আখ্‌ড়া স্থাপন করিয়া সাঁইজী গৃহস্থের

স্থায় বাস করিতে থাকেন, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার বিষয়াসক্তি ছিল না। পার্থিব সুখ-দুঃখের প্রতি তিনি ভ্রমেও দৃক্‌পাত করিতেন না। তাঁহার মন "অধর মানুষ" ধরিবার প্রবল বাসনায় অনুক্ষণ আকুল রহিত। তাঁহার অন্তঃকরণের ভাবরাশি যখন দু'কূলপ্লাবিনী তটিনীর স্থায় আকুল উচ্ছ্বাসে উথলিয়া উঠিত, তখন আর তিনি আত্ম-সংবরণ করিতে পারিতেন না। শিষ্যগণকে ডাকিয়া বলিতেন, "ওরে আমার পুনা মাছের ঝাঁক এসেছে"। শুনিবামাত্র শিষ্যেরা যে যেখানে থাকিত ছুটিয়া আসিত। তখন সাঁইজী আপন ভাবের আবেশে গান ধরিতেন; শিষ্যেরাও সঙ্গে-সঙ্গে গাহিয়া চলিত। ইহাতে সময়-অসময় কিছু ছিল না, সদা-সর্ব্বদাই এই পোনা মাছের ঝাঁক আসিত। তিনি গৃহস্থ হইয়া সদানন্দ-ধামে বাস করিতেন।

পরমহংসদেবের উপদেশে একটি উপমা পড়িয়াছি,—যে-ব্যক্তি মাছ ধরিতে বসে, তাহার দৃষ্টি ফাতনার উপরই নিবদ্ধ থাকে; কিন্তু প্রয়োজনমতো সঙ্গীর সহিতও সে কথা বলে; সেইরূপ সংসারের কাজ-কর্ম্ম করিবে কিন্তু মনশ্চক্ষু পরমেশ্বরেই নিবিষ্ট রহিবে। সাঁইজীরও ঠিক তাহাই ছিল। তিনি সংসারের কাজ-কর্ম্ম করিতেন, এমন-কি মহাযাত্রার ১০।১২ দিন পূর্ব্বেও অশ্বারোহণে দূরস্থ ভক্তবৃন্দের গৃহে যাতায়াত করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মন (মানসিক চিন্তার ধারা) পরমেশ্বরেই সংযোজিত রহিত। কেবল তাহাই নহে বিষয়াসক্তির প্রতি সর্ব্বদাই সতর্ক ছিলেন। আসক্তি জন্মিবে বলিয়া সর্ব্বক্ষণ শঙ্কাযুক্ত রহিতেন। তাই বলিয়াছেন,

বিষয়-বিষে চঞ্চল মন দিবা-রজনী,
মন ত বুঝিলে বোঝে না ধর্ম্ম-কাহিনী।
বিষয় ছাড়িয়ে কবে মন আমার শান্ত হবে হে—
আমি কবে সে চরণ করিব স্মরণ
যাতে শীতল হবে তাপিত পরাণী।
কোন্ দিন শ্মশান-বাসী হব, কি ধন সঙ্গে লয়ে যাব হে,—
আমি কি করি কি হই ভূতের বোঝা বই
একদিনও ভাব্‌লেম না শ্রীগুরুর বাণী।
অনিত্য দেহেতে বাসা তাইতে এতই আশার আশা হে,—
অধীন লালন তাই বলে নিত্য হইলে
আর কতই কি মনে ক'র্‌তেম না জানি।

অন্তশ্চক্ষু খুলিয়া গেলে মানব আর সংসারের কোনো বস্তুর বাহ্যিক অবয়ব-দর্শনে পরিতৃপ্ত হয় না। তাহার অভ্যন্তরে বিরাজমান প্রচ্ছন্ন জ্যোতির দিকেই দৃষ্টিক্ষেপ করিতে লালায়িত হয় এবং সেই জ্যোতির্ম্ময়ের দিকে আকৃষ্ট হইয়া আপনাতে আপনি বিভোর থাকে। সাঁই-জীর ঠিক তাহাই হইয়াছিল। তিনি সাধক-শ্রেণী উত্তীর্ণ হইয়া সিদ্ধরূপে পরিণত হন, নচেৎ আত্মতত্ত্বে এইরূপ পূর্ণ জ্ঞান কি সাধারণ মানবে সম্ভবে! এই তত্ত্বের বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন,

লীলা দেখে লাগে ভয়
নৌকার উপর গঙ্গা বোঝাই
ডেঙ্গা ব'য়ে যায়।
আব হায়াত নাম গঙ্গা সেজে
সংক্ষেপে কেউ দেখে বুজে,
পলখে পাহাড় ভাসে পলখে শুকায়।
ফুল ফোটে তার গঙ্গা-জলে
ফল ধরে তার অচিন দলে,
যুক্ত হয় সে ফুলে ফলে তাতে কথা কয়।
গাজ জোড়া এক মীন ঐ গাঙ্গে
খেল্‌ছে খেলা পরম রঙ্গে
লালন বলে জল শুকালে মীন যাবে হাওয়ায়।

এই জ্ঞান লাভ পুস্তক-পাঠে হয় না, সাঁইজী ভালরূপ লেখা-পড়াও জানিতেন না, রাশি রাশি পুস্তক পাঠও তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। এবং এই "বই-পড়া জ্ঞান"ও তিনি তাদৃশ আবশ্যক বোধ করেন নাই। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, আত্মতত্ত্ব লাভই তাঁহার প্রথম উপদেশ এবং কেমন করিয়া এই তত্ত্বে অধিকার জন্মে, তাহাও তিনি নিম্নের গানটিতে বিবৃত করিয়াছেন।

দেল-দরিয়ায় ডুবিলে সে দরের খবর পায়
নৈলে পুঁথী প'ড়ে পণ্ডিত হইলে কি হয়!
স্বয়ং রূপ দর্পণে ধরে　　মানবরূপ সৃষ্টি করে হে,
দিব্য জ্ঞানী যারা　　ভাবে বোঝে তারা
মানুষ ধ'রে কার্য্য সিদ্ধি ক'রে লয়।

একেতে হয় তিনটি আকার অজনী সহজ সংস্কার হে,
যদি, ভাব-তরঙ্গে তর মানুষ চিনে ধর
দিনমণি গেলে কি হবে উপায়।
মূল হতে হয় ডালের সৃজন ডাল হতে পায় মূল অন্বেষণ হে
তেম্‌নি রূপ হ'তে স্বরূপ তারে ভেবে রূপ
অধীন লালন সদা নিরূপ ধর্ত্তে চায়।

সাঁইজীর সাধন-সৌধের প্রথম সোপান ভক্তি। ভক্তি-ভাবই তিনি সাধকের হৃদয়ে সঞ্চার করিতে প্রয়াসী হইতেন। সে-ভাব সহজ নহে। বিশ্ব ভুলিয়া প্রাণের একমাত্র আরাধ্য দেবতাকে আত্মহারা হইয়া ভালবাসা। যাহা একদিন যমুনা-পুলিন-বিহারিণী, বেণুধ্বনি-উন্মনা গোপিনীগণকে উন্মত্ত করিয়াছিল, ইহার অন্য নাম ব্রজের ভাব। ইহারই উল্লেখ করিয়া সাঁইজী বলিয়াছেন,

সে ভাব সবাই কি জানে?
যে ভাবে শ্যাম আছে বাঁধা গোপীর সনে।
গোপী বিনে জানে কেবা
শুদ্ধরস অমৃত সেবা
গোপীর পাপ-পুণ্য জ্ঞান থাকে না কৃষ্ণ-দরশনে।
গোপী অনুগত যারা
ব্রজের সেভাব জানে তারা,
নীর হেতু অধর ধরা গোপীর মনে।
টলে জীব অটল ঈশ্বর
তাইতে কি হয় রসিক নাগর;
লালন কয় রসিক বিভোর রস-ভিয়ানে।

কেবল ইহাই নহে। চৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত প্রভৃতির ভাবেও তিনি বিভোর ছিলেন। এই ভাব যে তিনি কেমন করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন নিম্নের গানটিতে তাহার আভাস পাওয়া যাইবে,

তোরা কেউ যা'স্‌নে ও পাগলের কাছে,
তিন পাগলের হ'ল মেলা নদে এসে।
দেখ্‌তে যে যাবি পাগল
সেইত হবি পাগল, বুঝ্‌বি শেষে,
ছেড়ে তার ঘর দুয়ার ফিরবি নে যে।
একটি নারিকেলের মালা,
তাইতে জল তোলা ফেলা—করঙ্গ যে,
হরি ব'লে পড়্‌ছে ঢ'লে ধূলার মাঝে।
পাগলের নামটি এমন
শুনিতে অধীন লালন হয় তরাসে,
চৈতে, নিতে, অদে, পাগল নাম ধ'রেছে।

মানবের চিত্তচকোর যখন সেই জগজ্জ্যোতির্ময় সুধাকরের সুধাপানে মাতোয়ারা হয়, তখন সে আর সাধারণ মানব বলিয়া বিবেচিত হয় না, বিশ্বগ্রাসী বিষয়-বাসনার প্রতি বিতৃষ্ণ হইয়া কোনো অনির্ব্বচনীয় এবং অনাঘ্রাত রস আস্বাদন করিতে নিরন্তর উন্মত্ত রহিয়া যায়, তখন সে সংসারে পাগল বলিয়া অখ্যাত হয়। সাঁইজীর সঙ্গীতোক্ত মহাত্মা-ত্রয়ও এইরূপ পাগল ছিলেন। তিনি ইহা অন্তরের সহিত উপলব্ধি করিয়া এই সঙ্গীত গাহিয়াছেন।

সাঁইজী যে কেবল এই ভাবই পোষণ করিতেন, তাহা নহে। তিনি সার্ব্বজনীন ভাবের ভাবুক ছিলেন। যিনি যে পথেই যান না কেন, অন্তিমে সকলকেই যে একই স্থানে সম্মিলিত হইতে হইবে ইহা বুঝাইয়া তিনি আত্মত্যাগ, আমিত্ব লোপ ও বৃথা আড়ম্বর পরিহার করিয়া "অধরে" মিশিবার উপদেশ দিয়া গাহিয়াছেন—

সাঁই দরবেশ যারা,—
আপনারে ফাণা ক'রে অধরে মেশে তারা;
মন যদি আজ হওরে ফকির,
নাও জেনে সে ফাণার ফিকির,
ফাণার ফিকির না জানিলে
ভস্মমাখা হয় মস্কারা।
কূপ জলে যে গঙ্গার জল
পড়িলে সে হয় রে মিশাল
উভয় একধারা।
তেম্‌নি জেনো ফাণার করণ
রূপে রূপ মিলন করা।
মুরসীদ রূপ আর আলেক ছুরী
একমনে কেমনে করি দু রূপ নিহারা;
লালন বলে রূপ সাধিলে
হ'স্‌নে যেন রূপহারা।

কষ্টিপাথর

মালাবারের ধর্ম্ম

যে-সব ইউরোপীয় ধর্ম্মযাজকরা মালাবারে গিয়াছিলেন তাঁহারা পারীয়াদিগকে ভৃত্য রাখিয়া ও মৃত-গরুর মাংস খাইয়া ম্লেচ্ছরূপে অভিহিত হন। তাঁহাদের এই ভুলের জন্ত মালাবারে খৃষ্টধর্ম্ম একটা বিভিন্ন ধর্ম্ম হইয়া রহিয়াছে। কোরাণ-সম্বন্ধে মুসলমানদের গভীর অজ্ঞতা ও সেই অজ্ঞতাজাত ধর্ম্মান্ধতার জন্ত মুসলমান ধর্ম্ম এখানকার অধিবাসীদিগের নিকট হইতে দূরেই আছে। এই দুই ধর্ম্মই মালাবারের অধিবাসীদিগকে দীক্ষিত করিবার জন্ত এখানে প্রবেশ করিয়াছে। তাই তাইর নিকট যাইতে পারিবে না, সাধারণের রাস্তা পুকুর বা কূপ এমন-কি বিদ্যালয় ব্যবহার করিতে পারিবে না—এই সবের দ্বারা জাতিভেদ নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগকে যে-পীড়া দিতেছে তাহাতে জর্জ্জরিত হইয়া লোকে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া সামাজিক স্বাধীনতা লাভ করিতে চাহিতেছে। নিয়মিত প্রচার-কার্য্য ছাড়া খৃষ্টীয়ান্ ধর্ম্মযাজকগণ বিদ্যা-লয় ও হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠা দ্বারা লোকদিগকে আকৃষ্ট করে। হিন্দুধর্ম্ম কেবল যে অলস হইয়া রহিয়াছে তাহা নয়, অর্থহীন কুসংস্কার হইতে একটু কিছু বিচ্যুতি ঘটিলেই লোকদিগকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিবার জন্ত উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। ত্রিবাঙ্কুরে তথাকথিত অবনত শ্রেণীর লোকদের শত শত ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে; এবং যে থীয়গণ সংখ্যায় অধিক, উন্নতিশীল, শিক্ষায় দ্রুত অগ্রসর এবং হিন্দুসমাজে থাকিতে ইচ্ছুক তাহাদের সম্মুখে দুইটি পথ এখন মুক্ত—ধর্ম্মান্তর গ্রহণ কিম্বা বিদ্রোহ। গত বিদ্রোহের মোপ্‌লাগণ প্রায় সকলেই হিন্দু হইতে, বিশেষ করিয়া নিম্ন শ্রেণী হইতে, মুসলমান হইয়াছে। হিন্দুদের ঔদাসীন্যই এই-সমস্ত বিদ্রোহের জন্ত দায়ী। প্রত্যেক বিদ্রোহেই কতকগুলি করিয়া ধর্ম্মান্ধ লোকের সংখ্যা বাড়ে; কারণ, জোর করিয়া যাহারা ধর্ম্মান্তরিত হইয়াছে তাহাদিগকে ফিরাইয়া লইতে হিন্দুরা নারাজ। অন্ধ ব্রাহ্মণ বুঝিতে পারে না নিজের কি ক্ষতি সে করিতেছে। বিগত বিদ্রোহে ঐরূপে ধর্ম্মান্তরিত আরো কতকগুলি নিঃসহায় লোক মোপ্‌লাদের সংখ্যাই বৃদ্ধি করিত যদি না আর্য্যসমাজীগণ তথায় উপস্থিত হইতেন। ধর্ম্ম-বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের নির্লিপ্ততা যেন অত্যাচারিত হিন্দুগণের খৃষ্টীয়ান হওয়ারই সহায়ক।

(ডি, এ, ভি কলেজ ইউনিয়ন্ ম্যাগাজিন্)

এম্ রাম বর্ম্মা

—

শিবাজীর মাতা

শিবাজীর মাতার আত্মসম্মানজ্ঞান খুব প্রখর ছিল। ১৬২৭ সালে জাহাঙ্গীর যখন দেখেন যে, বলশালী মারাঠাদের সাহায্যে আমেদনগরের ক্ষুদ্র সৈন্তদল বার বার তাঁহার বিপুল সেনবাহিনীকে পরাস্ত করিতেছে তখন তিনি মারাঠা নায়কদিগকে জয় করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হয়। যাহারা মারাঠা পক্ষ ছাড়িয়া মোগল দলে যায়, জিজা বাঈর পিতা যাদব রাও তাহাদের অন্ততম। মোগল দলে যোগ দিবার কিছু পরেই এক সেনাদল লইয়া যাদব রাও আমেদনগর আক্রমণ করিতে আসে। কিন্তু জামাতার শক্তি সম্বন্ধে অজ্ঞ না হওয়ায় যাদব রাও ষড়যন্ত্র করিয়া শাহাজীর উপর সন্দেহের বিস্তার করে, এবং তাহাতে শাহাজী নিজের স্ত্রী ও চার বৎসরের পুত্র লইয়া পলাইতে বাধ্য হন। যাদব রাও ও তাহার সেনাদল দ্রুত গতিতে শাহাজীর অনুসরণ করে। জিজা বাঈর স্বাস্থ্যও এ সময়ে খারাপ ছিল; কিন্তু তিনি সাহসের সহিত স্বামীর সহযাত্রী হন। অবশেষে তাঁহাকে শ্রীনিবাস রাওএর তত্ত্বাবধানে একটি দুর্গে রাখা হয়; এবং শাহাজী পলায়ন করিতে থাকেন। ইতিমধ্যে যাদব রাও কন্তার অবস্থা জানিতে পারিয়া কন্তার কাছে উপস্থিত হয়। জিজা বাঈ তাঁহার গর্ব্বিত অগ্নিদৃষ্টি যাদব রাওএর উপর নিক্ষেপ করিয়া বলেন—"আমার স্বামীর হাতে না পড়ে' আমি তোমার হাতে পড়েছি; তুমি আমার স্বামীর উপর যে-ব্যবহার করতে আমার উপর সেই ব্যবহার করো।" তাঁহার পিতা কন্তার তীব্র দৃষ্টির নিম্নে অবনত হইয়া কন্তাকে তাহার গৃহে আসিতে অনুনয় করে। কন্তা দৃঢ়স্বরে উত্তর করিলেন—"না, আমি তোমার সঙ্গে যাব না; আমি এখানে থাকব।" এই সময়েই কিন্তু জিজা বাঈর যত্ন-পরিচর্য্যার বিশেষ প্রয়োজন ছিল; এবং এখানে তিনি নিতান্ত অনিশ্চিততার মধ্যে বাস করিতেছিলেন; শত্রু যে-কোনো সময়ে আসিয়া তাঁহাকে ধরিতে পারিত। ইহা ছাড়া তাঁহার দুঃখ ও দুশ্চিন্তা এই ছিল যে, পুত্রকে তাঁহার দুরবস্থার ভাগী হইতে হইতেছিল এবং স্বামী কোথায় ও তাঁহার অবস্থা কিরূপ তাহা তিনি জানিতে পারিতেছিলেন না। তবুও এ-কষ্ট তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন তথাপি বিশ্বাসঘাতকের আতিথ্য গ্রহণ করেন নাই। দশ বৎসর ধরিয়া তাঁহার স্বামী যখন অসীম সাহসে যুদ্ধ করিতে ছিলেন, জিজা বাঈ তখন তাঁহার ক্ষুদ্র গৃহে পুত্রের সহিত সংসারকষ্টের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছিলেন।

(দি ভলান্‌টিয়ার্)

—

কবি শাদী ও রাজনীতি

রাজাকে বলিও না—"আপনার পূজ্য পদযুগল আকাশে স্থাপন করুন।" বরং তাঁহাকে বলিবে—"সরল চিত্তে ভূমিতলে আপনার মুখ আনত করুন।" ইহা কবি শাদীর উক্তি।

ইহা দ্বারা শাদী বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, রাজকার্য্য মানে সেবা; এবং ইহাই তিনি বারংবার তাঁহার রচনায় জোর দিয়া বলিয়াছেন গুলিস্তাঁর প্রথম অধ্যায়ে শাদী একটি দরিদ্র দরবেশের কথা বলিয়াছেন। সে দরবেশ এক নির্জ্জন মরুভূমিতে বাস করিতেন এবং লোভ লালসা তাঁহার মোটেই ছিল না। একদিন সেখানকার রাজা সেইস্থান দিয়া যাইবার সময় দেখিলেন, দরবেশ তাঁহার প্রতি তাকাইয়াও দেখিল না। ইহাতে রাজার ক্রোধ হইল। তিনি উজিরকে ডাকাইয়া দরবেশকে জিজ্ঞাসা করিতে বলিলেন যে, কেন তিনি রাজার প্রতি যথোচিত সম্মান দেখান নাই। দরবেশ তাহা শুনিয়া উজিরকে বলিলেন, "যাহারা রাজার নিকট হইতে কিছু পাইবার প্রত্যাশা করে তাহাদিগের নিকট হইতেই রাজা সম্মানের আশা করিতে পারেন; প্রজাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবার জন্তই রাজার সৃষ্টি; এবং প্রজারা রাজাদের সেবা করিবার জন্ত সৃষ্ট নয়। ছাগপালকের জন্ত ও

ছাগ সৃষ্ট হয় নাই; ছাগদিগকে রক্ষা করিবার জন্যই ছাগপালকের সৃষ্টি।"

গুলিস্তাঁর প্রথম অধ্যায়ের শেষ ভাগে শাদী আলেক্‌জাণ্ডার-সম্বন্ধে একটি গল্প বলিয়াছেন। তাহা এই :—

লোকে একবার আলেক্‌জাণ্ডারকে জিজ্ঞাসা করে—"আপনি কি উপায়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভূমির এতগুলি দেশ জয় করিলেন? আপনার পূর্ব্বে আরো অনেক রাজা ছিলেন; তাঁহাদের বিস্তৃততর সাম্রাজ্য, অধিকতর সৈন্যবল ও ধনবল ছিল; তবুও তাঁহারা এত দেশ জয় করিতে পারেন নাই।"

আলেক্‌জাণ্ডার বলিলেন, "ভগবানের সহায়তায় যে-দেশ আমি জয় করিয়াছি সেখানেই আমি মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম যে, সেখানকার অধিবাসীদিগের মনে আঘাত দিব না। আর সে-দেশের প্রাচীন কালের রাজার আমল হইতে প্রচলিত কোনো-একটি সৎ বা দাতব্য কার্য্য আমি বজায় রাখিয়াছি এবং অতীত রাজাদের সৎকীর্ত্তি মনে-মনে স্মরণ করিয়াছি। সে-দেশের অধিবাসীদিগের নিকট যখনই সেইসব রাজাদের উল্লেখ করিয়াছি তখনই তাঁহাদের গুণাবলীর কথা বলিয়াছি। যে-লোক পূর্ব্বগত মহৎ লোকদের নিন্দা করে জ্ঞানী লোকে তাহাকে মহৎ বলেন না। ঐহিক সমস্ত জিনিষই তুচ্ছ, কেননা ক্ষণস্থায়ী—তা সে সিংহাসন হোক্, বা আদেশকারী ও নিষেধকারী শক্তিই হোক্, বা অধিকার করিবার ও শাসন করিবার শক্তি হোক্। আপনাদের নাম বাঁচিয়া থাকুক ইহা যদি আপনারা চান তাহা হইলে পরলোকগত লোকদের সৎ নাম আপনাদিগকে বজায় রাখিতে হইবে।"

আলেক্‌জাণ্ডারের কথা আমাদের ব্রিটিশ সর্‌কারের প্রণিধানযোগ্য।

(দি নিউ ওরিয়েণ্ট্) সেখ আবদুল কাদির

—

চীনে শিক্ষা

প্রাচীন কালে চীনে আজকালকার মতন রাজ-সর্‌কার-প্রচলিত শিক্ষা ছিল না। রাজনিরপেক্ষ ভাবে জনসাধারণ শিক্ষাকার্য্য চালাইত। কেবল চাকরী দিবার জন্য রাজ-সর্‌কার হইতে একটি পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল। চীন দেশে পণ্ডিত সমাজই দেশের পরিচালক। পদমর্য্যাদা বা অর্থ হিসাবে চীনে অভিজাত সম্প্রদায় গণ্য নয়, পাণ্ডিত্য হিসাবে গণ্য। আজকাল যে সর্‌কারী শিক্ষার চলন হইয়াছে তাহা আধুনিক, মাত্র বিশ বৎসরের। পাশ্চাত্য জাতির সহিত সংস্পর্শে ইহার উৎপত্তি। এই আধুনিক শিক্ষাপ্রণালী যখন আরম্ভ হয় তখন ইহাতে পাশ্চাত্য জাতির সঙ্গে সমভূমিতে মিলন হইবে আশা করিয়া চীনবাসীরা ইহা গ্রহণ করিতে ব্যগ্র হয়, তাহারা বিশেষ করিয়া এমন শিক্ষা চায় যাহাতে যুদ্ধকার্য্যের সাজসরঞ্জাম তৈয়ারে সহায়তা করিবে। প্রথমে পাঁচটি বিদ্যালয় সর্‌কার হইতে স্থাপিত হয়, এবং সেগুলির হইতেই চীনের মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যাইবে। সেগুলি—ইম্পিরিয়্যাল টেক্‌নিক্যাল কলেজ, আর্মি ট্রেনিং কলেজ, ন্যাভ্যাল ট্রেনিং কলেজ আর্মি মেডিক্যাল কলেজ, এবং পি ইয়াং এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। এই তালিকা হইতেই বেশ বুঝা যাইবে কেন চীনদেশ আধুনিক শিক্ষালাভের অভিলাষী হয়। পরে বুঝা যায়, এই প্রণালীর শিক্ষা যথেষ্ট নয়, এবং আরো ব্যাপক প্রণালীতে শিক্ষাদান আরম্ভ হয়।

আধুনিক শিক্ষাপ্রণালী বাস্তবিক পক্ষে চীনে আরম্ভ হয় ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে; এই সময়ে পুরাতন সর্‌কারী পরীক্ষার ব্যবস্থা একেবারে উঠিয়া যায়। এখন আধুনিক ভাবে শিক্ষা পাইতেছে প্রায় ৫১৮৭৪০০ বালক ও বালিকা।

(ইণ্টার্‌ন্যাশন্যাল্ রিভিউ অব্ মিশন্‌স্) টি জেড্ কু

অহিংসাপরায়ণ জার্ম্মান্

মহাত্মা এণ্ড্রুজ সাহেব এ্যালবার্ট শুইট্‌জার্ নামক একজন অহিংসা-পরায়ণ জার্ম্মান্ ভদ্রলোকের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

সকালে আমরা দুইজনে (এণ্ড্রুজ ও শুইট্‌জার) তাড়াতাড়ি ষ্টেশনে যাইতেছিলাম। একটা লাঠিতে গুঁজিয়া তাঁহার ভারী পোঁটলাটি আমরা দুইজনে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিলাম। বরফ পড়িয়া পথ পিচ্ছিল হইয়াছিল। হঠাৎ শুইট্‌জার্ লাফাইয়া সাম্‌নের দিকে এমন খানিকটা আগাইয়া গেলেন যে, লাঠির টানে আমি প্রায় মুখ থুব্‌ড়াইয়া পড়িয়া গেলাম। তিনি আমার কাছে ক্ষমা চাহিয়া মাটি হইতে একটি পোকা তুলিয়া লইলেন; পোকাটি বরফে অর্দ্ধমৃত হইয়া গিয়াছিল। রাস্তার একটি বেড়ার ধারে পোকাটাকে সযত্নে রাখিয়া তিনি বলিলেন—"ওখানে এধারে পোকাটা নিরাপদে থাক্‌বে, পথে মারা যেত।" এই মহৎ কার্য্যে তাঁহার মুখে যে স্নেহময় সৌন্দর্য্য দেখিয়াছিলাম তাহা বর্ণনা করা দুরূহ। সমস্ত সৃষ্ট জীবের প্রতি এই করুণা আমার স্মৃতিতে অক্ষয় হইয়া রহিবে।

(কারেণ্ট্ থট্)

—

মনুষ্যত্বের জাগরণ

গতবার ইউরোপ-ভ্রমণের সময় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মিলানে যে-বক্তৃতা প্রদান করেন আমরা তাহার সার সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

আমাদের ভাষায় 'জাগ্রত দেবতা' এই শব্দ আছে; ইহা হইতেছে মানুষের মধ্যে ঈশ্বরী ভাবের চেতন অবস্থা। ব্যক্তিগত জীবনে সর্ব্বদা এবং সর্ব্বত্র এই ভাব কার্য্যকরী নয়। যখন আমাদের চেতনা ও বুদ্ধি প্রেমের আলোকে উদ্ভাসিত হয়, তখনই আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের কাজ চলিতে থাকে। যথার্থ ভক্ত-লোকের বংশ-পরম্পরার মিলনের দ্বারা ভক্তি ও বিশ্বাসের আব্‌হাওয়া যেখানে সৃষ্ট হয় সেইখানেই জাগ্রত দেবতার মন্দির বিরাজ করে। এইজন্যই যেখানে ভক্ত লোকের ধর্ম্মময় জীবন ও কর্ম্মের দ্বারা ঈশ্বরী সত্তা কার্য্যকরী বলিয়া লোকে মনে করে, ভারতবর্ষে সেইখানেই তীর্থযাত্রীরা আকৃষ্ট হয়।

১৯১২ সালের এক সময়ে আমি মানুষের মধ্যে চিরন্তন সত্তাকে মুখোমুখি দেখিবার জন্য মনুষ্যত্বের মন্দিরে তীর্থ যাত্রা করিবার অভিলাষ বোধ করি—যেখানে মানুষের মন সম্পূর্ণ চেতন এবং তাহার সকল প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত। আমার মনে হইয়াছিল যে, এই বর্ত্তমান যুগ ইউরোপীয় মনোভাবে পরিচালিত, কারণ ইউরোপের মনই সম্পূর্ণ চেতন। আপনারা সকলেই জানেন, মহৎ এশিয়ার সত্তা আজ কিরূপে রাত্রির গভীরতায় যুগব্যাপী নিদ্রায় আচ্ছন্ন রহিয়াছে,—কেবল দুই চারিটি নিঃসঙ্গ প্রহরী সেখানে তারকার দিকে তাকাইয়া অন্ধকারভেদী সূর্য্যের উদয়-লক্ষণের প্রতীক্ষা করিতেছে। এইজন্যই ইউরোপে আসিতে এবং মানব-সত্তার শক্তি ও সৌন্দর্য্যের পূর্ণ দীপ্তি দেখিতে আমার অভিলাষ হইয়াছিল। এই ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া কিছুদিনের জন্য শান্তিনিকেতনের কাজ এবং আমার প্রিয় বালকবালিকাগণকে ত্যাগ করিয়া আমি এই যাত্রা—ইউরোপ অভিমুখে তীর্থযাত্রা গ্রহণ করি।

আকাশের কোন্ এক সুদূর স্থান হইতে আমার নিকট তীর্থযাত্রার আহ্বান আসিল; সে-আহ্বানে আমাকে স্মরণ করাইয়া দিল যে, আমরা সকলেই আজন্ম তীর্থযাত্রী, এই সবুজ পৃথিবীতে তীর্থযাত্রী।

একটি স্বর আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—"মানুষের চিন্তায় স্বপ্নে ও কর্ম্মে যেখানে ঈশ্বর প্রকাশিত সেই মন্দিরে কি তুমি গিয়াছ?" আমার মনে হইল—সম্ভবত ইউরোপেই আমি ইহার সন্ধান পাইব এবং এজগতে মানুষ হইয়া আমার জন্মলাভের সার্থকতা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিব।

মানুষ মানুষের কি করিয়াছে—ইহা ভাবিয়া মহাপ্রাণ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়াছিলেন; আমিও তাঁহার সঙ্গে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছি। মানুষের হাতে—ব্যাঘ্র, সর্প বা প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা নয়—মানুষ আমরা পীড়িত হইয়াছি। মানুষই মানুষের প্রধানতম শত্রু। আমি ইহা অনুভব করিয়াছি ও বুঝিয়াছি। এ-চিন্তা সত্ত্বেও আমার হৃদয়ে একটি গভীর আশা ছিল,—তাহা এই যে, এমন স্থান আমি বাহির করিতে পারিব, এমন মন্দির—যেখানে মানুষের মৃত্যুহীন সত্তা মেঘাবৃত সূর্য্যের-মতন গোপনে বাস করিতেছে।

তবুও যখন আমি এই অন্বেষণলব্ধ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, আমার মনে বারম্বার যে-প্রশ্ন জাগিতে লাগিল তাহা আমি রোধ করিতে পারিলাম না; নৈরাশ্যের প্রশ্ন আমাকে পীড়া দিতে লাগিল; প্রশ্ন এই—সমস্ত শক্তির অধিকারী হইয়াও ইউরোপ অশান্তি-বিধ্বস্ত কেন? ইহাই বা কি যে, সন্দেহ বিদ্বেষ ও লোভের ঘূর্ণা বাত্যায় ইউরোপ অভিভূত? তাহার মহত্ব পরস্পর-দ্বন্দ্বী ইন্দ্রিয়ের পৈশাচিক নৃত্যের এ কি অবকাশ দিতেছে!"

ইতালি হইতে ক্যালের পথে আসিতে-আসিতে আমি রেলপথের উভয় পার্শ্বের চমৎকার শোভা দেখিলাম। আমার মনে হইল, এদেশের লোকের মাতৃভূমিকে ভালোবাসিবার শক্তি আছে; আর এই ভালোবাসা কী মহান শক্তি! ইহারা কি বীরোচিত ত্যাগের বলে সমস্ত মহাদেশটিকে সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত ও ফলবান করিয়া তুলিয়াছে! প্রেমের শক্তিতে ইহারা সমগ্রভাবে আপনার দেশকে জয় করিয়াছে। ইহাদের এই নিত্যকর্ম্মমুখী সেবা বংশানুক্রমে ইহাদের মধ্যে এক অদম্য শক্তির উদ্ভব ঘটাইয়াছে। কারণ, প্রেম হইতেছে মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ সত্য, এবং সত্যই জীবনের পরিপূর্ণতা দান করে। জড়ের মধ্যে যে অনমনীয় বন্ধ্যাত্ব তাহাকে দূর করিবার জন্য মানুষ কী সংগ্রামই করিয়াছে! তাহার আবেষ্টনের মধ্যে যাহা কিছু প্রতিকূল তাহার সহিত সে কত সংগ্রাম করিয়াছে ও কিরূপে তাহা জয় করিয়াছে! তবুও কেন ইউরোপের উপর এই অন্ধকারাচ্ছন্ন দুর্দ্দশা? তবুও কেন তাহার আকাশে ধ্বংসের এই ছায়া বিস্তৃত?

কারণ, নিজের ভূমি ও সন্তানাদির প্রতি প্রেমেই এখন আর ইউরোপ তৃপ্ত নয়। যতদিন ইউরোপের ভাগ্য তাহাকে একটি সীমাবদ্ধ সমস্যা দিয়াছিল ততদিন সে আনন্দের সহিত তাহার অল্প বিস্তর সমাধান করিয়াছে। তাহার সমাধান ছিল পেট্রিয়টিজিম্, ন্যাশন্যালিজম্,—অর্থাৎ যে জিনিষ ও যাহাদের সহিত সে সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে তাহাদের প্রতি ভালোবাসা। এই প্রেমে সত্যের মাত্রা যতটুকু সেই অনুপাতে সে আপনার হিত লাভ করিয়াছে। কিন্তু আজ বিজ্ঞানের সহায়তায় সমস্ত জগৎ তাহার হাতে আসিয়াছে একটি সমস্যারূপে। সত্যের পূর্ণতায় ইহার সমাধান কিরূপ হইবে এখনও ইউরোপকে তাহা শিখিতে হইবে। সমস্যা বিপুল বলিয়া ভ্রান্ত সমাধানে বিপদ্ প্রচুর।

আপনাদের সম্মুখে একটি মহান্ সত্য আজ উদ্ঘাটিত, এবং আপনারা ইহাকে যেরূপে গ্রহণ করিবেন সেই অনুপাতে সাফল্য লাভ করিবেন। ইহার যথার্থস্বরূপে ইহাকে গ্রহণ করিবার শক্তি যদি আপনাদের না থাকে তাহা হইলে আপনাদের মনুষ্যত্ব দ্রুত অবনতি লাভ করিবে, আপনাদের স্বাধীনতা-প্রেম, ন্যায়বিচারানুরক্তি, সত্যানুরক্তি, সৌন্দর্য্য-প্রেম মূলে শুকাইতে থাকিবে, এবং ঈশ্বর আপনাদিগকে ত্যাগ করিবেন।

বিজ্ঞানে গৌরবান্বিত হইবার কারণ আছে, সন্দেহ নাই। বিজ্ঞান দান করার জন্য আমরা ইউরোপকে বিনিময়ে সম্মান দিতেছি। আমাদের ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন—"অনন্তকে জানিতে হইবে, উপলব্ধি করিতে হইবে। মানুষের পক্ষে অনন্তই হইতেছে সুখের একমাত্র সত্য উৎস।" বিস্তৃত জগতের মধ্যে ও বহিঃপ্রকৃতির রাজ্যের মধ্যে যে অনন্ত, ইউরোপ তাহার মুখোমুখি হইয়াছে।

আমি স্থূল জগতের নিন্দা করি না। আমি ভালো রকমই বুঝি যে, স্থূল জগৎই আধ্যাত্মিকতার ধাত্রী। স্থূল জগতের মধ্যে যে অনন্ত তাহা লাভ করিয়া আপনারা এপৃথিবীর যে-ঔদার্য্য ছিল না তাহা ইহাকে দান করিয়াছেন। কিন্তু কেবল একটা সমৃদ্ধ বাস্তবতায় পৌঁছিলেই তাহাকে অধিকারে রাখার শক্তি অর্জ্জন করা যায় না। যে মহৎ বিজ্ঞান আপনারা আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা এখনও আপনাদের যোগ্যতাবর্দ্ধন-শক্তির অপেক্ষা রাখে। বাহ্যত আপনারা যাহা লাভ করিয়াছেন তাহাতে আপনারা সাফল্য লাভ করিতে পারেন; কিন্তু সাফল্য-সত্ত্বেও মহত্ত্ব হইতে বঞ্চিত হইবার সম্ভাবনা আছে।

আপনারা নিঃসংশয়েই এই সমস্ত আবিষ্কারের উপযোগী, কেননা আপনারা অত্যন্ত পরিশ্রমে মনঃশক্তির অনুশীলন করিয়াছেন এবং আপনাদের পর্য্যবেক্ষণের বিশুদ্ধি ও বিচার-শক্তির উন্নতি লাভ হইয়াছে। কিন্তু আবিষ্কারসমূহকে সত্য করিতে হইবে সমগ্র মনুষ্যত্বের দ্বারা। সত্যকে সম্পূর্ণ সম্মান দেখাইতে হইলে জ্ঞানকে আত্মার বশে আনিতে হইবে। মনুষ্য-জগতের ভিত্তিগত বাস্তবতা স্বরূপ আমাদের এই আত্মা, যাহার সহিত অন্যান্য সমস্ত সত্যকে যে কোনোরূপে একতানে বাঁধিতেই হইবে,—এই আত্মা বিজ্ঞানের রাজ্যে নাই। সত্যকে আমরা যখন তাহার ন্যায্য ব্যবহার দিই না, তখন সে ফিরিয়া আসিয়া আমাদের উপর ধ্বংস বিস্তার করে। আপনাদের বিজ্ঞানই আপনাদের ধ্বংসকারী হইয়া উঠিতেছে।

যদি আপনারা শক্তি দ্বারা একটি বজ্র অর্জ্জন করেন, তাহা হইলে নিরাপদ্ হইবার জন্য দেবতার দক্ষিণ হস্তও আপনাদিগকে অর্জ্জন করিতে হইবে। বিজ্ঞানের উপর সম্পূর্ণ রাজোচিত অধিকার জন্মাইবার পক্ষে যে-সব গুণ তাহাদের চর্চ্চা আপনারা করিতে পারেন নাই। সেইজন্যই আপনারা শান্তি হারাইয়াছেন। আপনারা শান্তির জন্য চীৎকার করিতেছেন এবং সঙ্গে-সঙ্গে অপর-কিছু ভীষণ যন্ত্রের উদ্ভাবন করিতেছেন। বাহিরের চাপে কিছুদিনের জন্য স্তব্ধতা আসিতে পারে; কিন্তু শান্তি আসে অন্তর হইতে, সমবেদনার শক্তি হইতে, আত্মত্যাগের শক্তি হইতে—দলগঠনের শক্তি হইতে নয়।

মনুষ্যত্বে আমার বিপুল বিশ্বাস। সূর্য্যের মতন ইহা মেঘাবৃত করা যায়, কিন্তু নির্ব্বাপিত করা যায় না। এখন যখন অভিনব ভাবে মনুষ্য জাতির নানা ধারা একত্র সম্মিলিত হইয়াছে, তখন হীন প্রবৃত্তি ও আকাঙ্ক্ষাসমূহ প্রাধান্য লাভ করিতেছে, স্বীকার করি। যাহারা শক্তিমন্ত তাহারা তাহাদের শিকারের সংখ্যা বাহুল্য দেখিয়া উল্লাস করিতেছে। যেমন ভূমিকম্পের তাণ্ডব শক্তি পৃথিবীর ভাগ্যের উপর তাহার কর্তৃত্ব দাবী করে তেমনি যাহারা শক্তিমান তাহারা শারীরিক কয়েকটি লক্ষণ দেখাইয়া পৃথিবী শাসন করিবার চিরন্তন অধিকার দাবী করে। স্কুল-বালকেরা এই কুসংস্কারের চর্চ্চা করিবার জন্য বিজ্ঞানের দোহাই দেয়। কিন্তু তাহাদিগকে নিরাশ হইতে হইবে।

তাহাদের চীৎকার অতীত কালের চীৎকার, সে-অতীতের অবসান ঘটিয়াছে। জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের স্বার্থ-সংকীর্ণ বুদ্ধির উপর সে-অতীত বাড়িয়া উঠিয়াছে…সে-স্বাতন্ত্র্য তাহার আবেষ্টনের সঙ্গে বরাবর বেসুরা হইয়া

আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিবে না। সেইসব জাতিই উন্নতি লাভ করিবে, যাহারা নিজেদের উৎকর্ষ ও চিরন্তন আপৎশূন্যতা লাভ করিবার জন্য মনের আধ্যাত্মিক ঔদার্য্যের অনুশীলন করিতে প্রস্তুত, যে-ঔদার্য্য সমস্ত জাতির অন্তরে মানব-আত্মার উপলব্ধি করিতে সক্ষম করে।

মানুষ পরস্পর কাছে আসিতেছে অথচ মনুষ্যত্বের দাবী অগ্রাহ্য করিতেছে ইহা আত্মহত্যার পথ। আমরা সেই সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছি যখন যুগধর্ম্ম একটি অখণ্ড সত্যে মূর্ত্ত হইয়া উঠিবে এবং মানুষের একত্র হওয়া যখন একতায় পরিণত হইবে।

আমি আপনাদের দ্বারে মনুষ্যত্বের উদ্বোধনের সন্ধানে আসিয়াছি। উদাত্ত আহ্বানে তাহা জাগিয়া উঠিবেই এবং দাস-শাসনকারী লোভমত্ত জনতার চীৎকারকে তাহা ডুবাইয়া দিবেই, হয়ত সে-আহ্বান এখন বদ্ধ দ্বারের মধ্যে অনুচ্চ স্বরে উচ্চারিত হইতেছে এবং অবশেষে তাহা ন্যায়ের বজ্রনির্ঘোষে বাজিয়া উঠিবে, সঙ্গে-সঙ্গে পাশবিক শক্তির ক্ষুদ্রতাপূর্ণ চীৎকার ভয়ে অবলুপ্ত হইয়া যাইবে।

(দি বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্‌লি)

বাণী-বৈজয়ন্তী

(সুইনবার্ণের অনুসরণে)

শ্রী মোহিতলাল মজুমদার

বিদেশের নদীকূলে বসিয়া সকলে মোরা স্মরিনু তোমায়
তিতি' অশ্রুনীরে—
বন্দী ছিনু পরবাসে,—যুগান্ত-যাতনা সহি' তুমি অসহায়,
চাহ নাই ফিরে'!

বিদেশের নদীকূলে দাঁড়ায়ে উঠিনু মোরা, গাহিলাম গান—
নূতন রাগিণী,
গাহিলাম, 'ওই শোন—জননীর মুক্তি-ভেরী! হ'ল অবসান
যন্ত্রণা-যামিনী!'

বজ্রসম তূর্য্যনাদে, জাগরণী গানে-গানে জাগায়ে মেদিনী
উদিল আলোক!
নিশারে দিবস যথা—তোমারে তুলিল ঠেলি' শক্তি
আহ্লাদিনী—
ভুলাইল শোক!

ঘুরেছিনু তব লাগি' কত দূর দূরান্তরে, বিজন শ্মশানে,
রুদ্র পিপাসায়—
চিত্তে জ্বালি' চিতানল ফিরেছিনু দিশে-দিশে জলের সন্ধানে,
বুক ফেটে যায়!

শুনেছিনু রূঢ়বাণী—"জানি বটে' হৃৎপিণ্ড কঠিন তুহার,
তবু হবি নত!
তোরা দাস দাসীপুত্র!—তুহাদের বেত্রদণ্ড, উগ্র কর্ম্মভার—
প্রভুসেবা ব্রত!"

তপ্ত লৌহশূলমুখে শরীর বিঁধিল তা'রা, পশুপালসম
বাঁধিল সবলে,—
গ্রীষ্ম-শেষে বর্ষা আসে, বর্ষ পরে বর্ষ যায়, তবু সে নির্ম্মম
ভাগ্য নাহি টলে!

তব তটিনীর তটে নগর-নগরী যত নাগরীর বেশে
মগ্ন নিরন্তর
দিবাস্বপ্ন-নৃত্যগীতে, যতদিন না উদিল দীর্ঘ নিশাশেষে
সৌভাগ্য-ভাস্কর!

ফুল-হিন্দোলায় শুয়ে সুখতন্দ্রারত সবে চন্দ্রাতপ-তলে,
—ওষ্ঠে মৃদু জ্বালা!
ললাটে কলঙ্ক, তবু কুঞ্চিত কুন্তলদাম—পরিয়াছে গলে
মল্লিকার মালা!

তা'রা কভু হেরে নাই তব গিরি-নদীতীর,—পিতৃ-পিতামহ-
পরিচয়-হারা!
ভুলেছিল শক্তিমন্ত্র, ইষ্ট দেবদেবীগণে—ছিল অহরহ
মধু-মাতুয়ারা।

তব নদনদীপথে শুক্ল-খাতে যবে পুনঃ আইল জুয়ার
তীব্র তৃষাহরা—
মিথ্যার মুকুট খুলি' ফেলিল ধূলায় টানি' সন্তান তুহার,
—কলঙ্ক পসরা!

যারা ছিল মুখে চেয়ে, নিতান্ত ব্যথার ব্যথী, দূর পরবাসে—
মৃতকল্প তা'রা
মহাহর্ষে নেহারিল অরুণ-আলোকে তব ললাট-সকাশে
শুভ্র শুকতারা!

চিরসাথী ছিনু মোরা তোমার দুখের দিনে—তব অনুরাগ-
বিরাগে অটল,
শ্মশানের শূলাসনে দাঁড়ায়েছি তব পাশে, লাঞ্ছনার ভাগ
লয়েছি সকল!
বধ্যভূমি সিক্ত করি' বহিয়াছে রক্তস্রোত,—দুই নেত্র ছাপি'
শোণিতাশ্রু-ধারা!
হেরিয়াছি অরুন্তুদ যাতনা সে জননীর—যুগযুগব্যাপী,
আদি-অন্ত-হারা!

দক্ষিণে দেখেছি শুধু, ধূ-ধূ ধূ-ধূ চারিদিক, নাহি ফুল ফল—
দগ্ধ দীর্ণ তরু!
উত্তরে পিশাচ-পুরী—লোহিত-বরণ ধূমে অন্ধ নভোতল,
জলহীন মরু!

* *

দূর বন্দীশালা হ'তে তোমার সমাধি-পাশে ফিরে এনু যবে,
করিতে রোদন—
চমকি' হেরিনু, একি!—উঠিয়া গিয়াছ তুমি! প্রহরীরা সবে
ঘুমে অচেতন!

মুক্ত সে গহ্বর-দ্বার—কবাট-পাথর 'পরে দেবতা-সমান
হেরিনু মূরতি!—
সহসা সে দিব্যকণ্ঠে উদীরিল ঐশ তেজে শ্লোক সুমহান—
উদাত্ত ভারতী!

"হের দেখ, জননীর দেহ হ'তে ঘুচিয়াছে প্রেতের বসন
শ্মশান-আগারে,
পিশাচ প্রহরী যত মন্ত্রৌষধিবশে যেন ঘুমে অচেতন
স্বপন-বিকারে!

হের হেথা শূন্য শয্যা!—স্বর্ণজ্যোতি-কিরীটিনী অনিন্দ্যসুন্দরী
নাহি যে-শয়ান!
মাতা আর মৃতা নয়!—ভুবন-ললাম সে যে রাজরাজেশ্বরী!
মুছ দু'নয়ান!

সেই মাতা কহিছেন মোর কণ্ঠে তোমা সবে, কর্ণে—মর্ম্মমূলে,
আজি এ বারতা—
কোরো না বিশ্বাস কেহ অভিজাত-জনে কভু, কিম্বা রাজকুলে,
রাজাদের কথা।

নিজকর্ম্মফলভুক্ পুরুষ নিজেই পাতে নিজ সিংহাসন
ধরণীর 'পর,
বিশ্বতরে আত্ম-প্রাণ যেবা করে পরিহার—জেনো সেই জন
মরিয়া অমর!
মিটায়ে দিয়েছে সে যে মৃত্যুর সকল দাবী, আছে তার কিবা
শমন-শাসনে?
দু'দিনের বিনিময়ে বরিয়া লয়েছে বীর অন্তহীন দিবা
অমর্ত্ত্য আসনে!

প্রহরেক অদর্শন!—পাবে না তাহারে শুধু দণ্ডদুই তরে,
—মুহূর্ত্ত সংশয়!
তার পর ঊর্দ্ধে চাও!—হেরিবে অম্লান মুখ, মাথার উপরে
মুকুট অক্ষয়!

স্মৃতির হিমাদ্রি-শিরে, জীবযাত্রা-উৎস মূলে, মানব-মানসে—
সে কীর্ত্তি-কিরণ
যে-ঠাঁই যেখানে পড়ে, মৃত-সঞ্জীবন সেই প্রাণের পরশে
মরিবে মরণ!

যে দীপ নির্ব্বাণ আজি—বিফল হয়েছে যেই পুণ্য অবদান
কালকুক্ষিগত,
সেই ব্যথা, ব্যথিতের চন্দ্রানন হারাবে না!—রবে জ্যোতিষ্মান্
সুন্দর শাশ্বত!"

এই বাণী প্রচারিল দেশ-জাতি ত্রাতা সেই দেবতার মুখে,
আজও সেই গান
শোনা যায়!—বাঁচিয়া উঠেছি তাই মৃতপ্রায়া জননীর বুকে
স্তন্য করি' পান।

মায়ের মন্দিরে আর হইবে না পশুযাগ—বেদীর পাষাণ
রবে শুভ্র-শিলা!
বিদেশ নদীর কূলে কাঁদিব না!—দেশে হেথা আলোর নিশান,
—দেবতার লীলা!

টাকার মূল্যের তেজীমন্দাতে আমাদিগের লাভ-লোকসান্

শ্রী নরেন্দ্রনাথ রায় তত্ত্বনিধি, বি, এ ; এফ, আর, ই, এস্ (লণ্ডন)

পথে-ঘাটে দেশের জনসাধারণের সঙ্গেই মিশি আর বৈঠকে পরিষদে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলোচনা করি, সর্ব্বত্রই টাকার মূল্যের পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে দুইটি মত শুনিতে পাই। একদল বলেন, টাকার মূল্য বাড়াইয়া দিয়া গভর্ণ্মেণ্ট্ দেশের অত্যন্ত ক্ষতি করিতে-ছেন। আবার কেহ-কেহ বলেন "না, উহাতে দেশের মঙ্গলই হইবে।" আসল কথা, অনেকেই আর্থিক অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া নিছক সত্য জানিবার জন্য চেষ্টা করেন না। তাহা হইলে তাঁহারা দেখিতেন, টাকার মূল্য বাড়িলে কাহারও-কাহারও সাময়িক লাভ হয়, আবার কাহারও-কাহারও কিছু-দিনের জন্য লোকসান্ হয়। তেম্‌নি, টাকার মূল্য কমিলেও কাহারও সাময়িক লাভ কাহারও লোকসান্ হয়। টাকার মূল্যের তেজীমন্দাতে ভারতবর্ষের স্থায়ী লাভ-লোকসান্ কিছুই হইতে পারে না। শুধু চল্‌তি অর্থের মূল্য বাড়াইয়া বা কমাইয়া একটা দেশকে স্থায়ীভাবে ধনী বা গরীব করা যায় না। দেশের সম্পদ্ হইল কয়লা, লৌহ, তেল, জল, উৎকৃষ্ট জমি, স্বাস্থ্য দেশবাসীর মার্জ্জিত বুদ্ধি, চরিত্র, শিক্ষা ও কর্ম্মক্ষমতা ইত্যাদি। দেশের লোক যদি বুদ্ধি খাটাইয়া ওই-সব জিনিষের সদ্ব্যবহারের দ্বারা ধনবৃদ্ধি করেন তাহা হইলেই দেশ ধনী হয়। কেবল টাকার মূল্যের তেজীমন্দার নড়-চড় করাইয়াই একটা দেশকে ধনী বা গরীব করা যায় না।

আজ আমরা এই-প্রবন্ধে টাকার মূল্য বাড়িবার ও কমিবার ফলে আমাদের দেশের বাস্তবিক লাভ-লোকসান্ কি হয় সেই হিসাব খতিয়ানের চেষ্টা করিব।

দেখা যাক্ টাকার মূল্য কমিয়া এক টাকায় ১৫ পেনির পরিবর্ত্তে যদি ১২ পেনি পাওয়া যায় অর্থাৎ ১৫৲ টাকায় ১ পাউণ্ড্ পাওয়ার পরিবর্ত্তে যদি ২০৲ টাকায় এক পাউণ্ড্ পাওয়া যায় তাহা হইলে অবস্থা কি হয়।

মনে করুন, আমাদের দেশে এক বিঘা জমিতে যে-পরিমাণ পাট হয় উহা বিলাতী সওদাগরগণ কিনিতে চাহেন ১০ পাউণ্ড্ দাম দিয়া। যখন ১৫৲ টাকার বিনিময়ে ১ পাউণ্ড্ পাওয়া যায় তখন বিলাতী সওদাগর তাঁহার ১০ পাউণ্ডের সাহায্যে আমাদিগের দেশী টাকা কিনিতে পারেন মাত্র ১৫০৲ টাকা। সুতরাং তিনি এক বিঘা জমির পাটের জন্য আমাদিগের কিষাণকে ১৫০৲ টাকার বেশী দিতে রাজি হইবেন না। কিন্তু টাকার মূল্য কমিয়া টাকায় ১৬ পেনির পরিবর্ত্তে যদি ১২ পেনি হয়, অর্থাৎ ১৫৲ টাকার বিনিময়ে ১ পাউণ্ড্ না হইয়া যদি ২০৲ টাকার বিনিময়ে ১ পাউণ্ড্ হয়, তাহা হইলে বিলাতী সওদাগর তখন তাঁহার ১০ পাউণ্ডের সাহায্যে আমাদিগের দেশী টাকা কিনিতে পারিবেন ২০০৲ টাকা। সুতরাং এই পরিবর্ত্তিত অবস্থায় তিনি ভারতীয় কিষাণকে একবিঘা জমির পাটের দাম ২০০৲ টাকা পর্য্যন্ত দিতে রাজি হইবেন। টাকার মূল্য কমিলে আমাদের দেশে যে-সব কিষাণ পাট উৎপন্ন করেন, প্রথম বৎসরে তাঁহাদের খুব লাভ হইবে।

পাটের চাষে খুব লাভ হইতেছে দেখিয়া যে-সব কিষাণ খাদ্য-শস্যের চাষ করিতেন তাঁহারা উহা ছাড়িয়া বা কমাইয়া দিয়া পাটের চাষ সুরু করিবেন। ফলে, দ্বিতীয় বৎসরে দেশে পাট উৎপন্ন হইবে বেশী। পাটের টান যদি আগের মতনই থাকে তাহা হইলে পাটের জোগান্ বাড়িয়া যাইবার ফলে বাজারে পাটের দাম কমিয়া যাইবে। পাটের বিলাতী গ্রাহক যখন দেখিবেন যে, বাজারে পাটের টানের চেয়ে জোগান্ বেশী হইতেছে তখন তিনি আর পূর্ব্বের ন্যায় একবিঘা জমির পাটের জন্য ১০ পাউণ্ড্ দিতে রাজি হইবেন না। তিনি হয়ত তখন উহার জন্য মাত্র ৯ পাউণ্ড্ অর্থাৎ ১৮০৲ দিবেন। এদিকে ধানী-জমির চাষ কমিয়া যাওয়াতে খাদ্য-শস্য উৎপন্ন হইয়াছে আগের চেয়ে কম। খাদ্য শস্যের টান্ ত

আর কমে না। কাজেই বাজারে খাদ্যশস্যের টানের চেয়ে জোগান্ কমিয়া যাওয়াতে উহার দাম বাড়িয়া যাইবে। টাকার মূল্য কমিয়া যাওয়ার দরুণ বিদেশ হইতে যে-সব জিনিষ আম্‌দানি করা হয় তাহাদের দামও বাড়িবে। কারণ যে জিনিষটির দাম ১ পাউণ্ড, আগে তাহা পাইতাম ১৫৲ টাকা দিয়া। এখন টাকার মূল্য কমিয়া যাওয়ার ফলে উহা ২০৲ টাকা দিয়া কিনিতে হইতেছে। রেল-কোম্পানী বিদেশ হইতে যে-সব লোহা-লক্কর, সাজ-সরঞ্জাম, কলকব্জা ইত্যাদি আম্‌দানি করেন উহাদেরও দাম বাড়িয়া যাইবে। সরঞ্জামি খরচ বাড়িয়া যাইবার ফলে রেল-কোম্পানী ও রেলে মাল চালানের মাশুল এবং যাতায়াতের ভাডা বাডাইয়া দিতে বাধ্য হইবে।

কয়েক বৎসর পরে কিষাণ দেখিবে পাটের আবাদ করিয়া প্রথম বৎসরের মতন অত টাকা পাওয়া যায় না। এদিকে খাদ্য শস্যের দাম বাড়িয়া যাওয়াতে খাই খরচাও বাড়িয়া যাইতেছে। সুতরাং ধানের আবাদ ছাড়িয়া দিয়া পাটের চাষে মোটের উপর আর সুবিধা নাই। যদিও এক বিঘা জমিতে ধানের বদলে পাটের আবাদ করিয়া পূর্ব্বের ১৫০৲ টাকার চেয়ে বেশী পাওয়া যায়, তাহা হইলেও বেশী দাম দিয়া খাদ্য-শস্য ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনিতে বাধ্য হওয়ায় লাভের গুড পিঁপড়ায় খায়। কাজেই কিষাণের মধ্যে অনেকেই আবার পাট ছাড়িয়া ধানের চাষ সুরু করিবে। ফলে ১৫৲ টাকায় ১ পাউণ্ড্ বিনিময় হারের সময়ে দেশে যতটা পাট ও যতটা ধান উৎপন্ন হইত পুনরায় আবার তাহাই হইবে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, টাকার মূল্য কমিবার ফলে আমাদের দেশের স্থায়ী লাভ অথবা স্থায়ী লোকসান্ কিছুই হইল না।

টাকার মূল্য টাকা প্রতি ১৬ পেনি না রাখিয়া বাড়াইয়া যদি ২৪ পেনি করা যায়, অর্থাৎ ১৫৲ টাকায় এক পাউণ্ডের পরিবর্ত্তে যদি ১০৲ টাকায় ১ পাউণ্ড্ পাওয়া যায়, তাহা হইলে কি ফল হয় দেখা যাউক। বিনিময় হার ১৫৲ টাকায় ১ পাউণ্ড্ থাকাতে বিলাতী সওদাগর তাঁহার ১০ পাউণ্ডের বিনিময়ে পাইতেন ১৫০৲ টাকা। এখন টাকার মূল্য বাড়িয়া যাইয়া ১০৲ টাকায় ১ পাউণ্ড্ হওয়াতে সেই সওদাগর তাঁহার ১০ পাউণ্ডে পাইবেন ১০০৲ টাকা। তিনি আমাদিগের এক বিঘা জমির পাটের দাম ১০ পাউণ্ড্ দিতে রাজি। ১৫৲ টাকায় ১ পাউণ্ড্ বিনিময় হার থাকা কালীন কৃষক এক বিঘা জমিতে পাট উৎপন্ন করিয়া পাইত ১৫০৲ টাকা। কিন্তু, এখন টাকার মূল্য বাড়িয়া ১০৲ টাকায় ১ পাউণ্ড্ হওয়াতে সে ওই পরিমাণ পাটের জন্য পাইবে মাত্র ১০০৲ টাকা কাজেই দ্বিতীয় বৎসর হইতেই পাটের আবাদে আগের মতন সুবিধা নাই দেখিয়া কৃষকগণ পাটের চাষ কমাইয়া ধান অথবা অন্য খাদ্যশস্যের চাষ বাড়াইবে। দ্বিতীয় বা তৃতীয় বৎসরে বিলাতী সওদাগর যখন দেখিবেন যে বাজারে পাটের টানের চেয়ে জোগান্ কম হইতেছে, তখন তিনি কিছু বেশী দামে পাট কিনিতে রাজি হইবেন। এদিকে খাদ্যশস্যের আবাদ বেশী হওয়াতে ইহার দাম কমিতে থাকিবে।

কিষাণের খাই-খরচা কমিবে। বিদেশে হইতে যে-সব জিনিষ আমাদের দেশে আম্‌দানি করি উহাও সস্তা হইবে। কারণ ১ পাউণ্ড্ মূল্যের জিনিষের জন্য আগে দিতে হইত ১৫৲ টাকা, এখন দিতে হইবে ১০৲ টাকা। এইরূপে জিনিষ-পত্র সস্তা হওয়াতে গৃহস্থের খরচ কমিবে। সংসার-খরচ কমিবার সঙ্গে-সঙ্গে পাটের দামও অল্প অল্প বাড়িতেছে দেখিয়া কিষাণেরা প্রতিবৎসরই কিছু-কিছু করিয়া পাটের আবাদ বাড়াইবে। ফলে, কয়েকবৎসর পরে দেশে খাদ্যশস্যের ও পাটের আবাদ আবার আগের মতন, ১৫৲ টাকায় ১ পাউণ্ড্ বিনিময় হারের সময় যেমন ছিল প্রায় তেমনই হইবে। কাজেই, দেখা যাইতেছে, টাকার মূল্য বাড়িবার ফলেও আমাদের দেশে স্থায়ী লাভ বা স্থায়ী লোকসান্ কিছুই হইল না।

অনেকে আবার বলেন "টাকার মূল্য কমাইয়া রাখিতে পারিলেই ভাল; কারণ উহাতে আমাদের দেশী-শিল্পের সাহায্য হয়। আর, টাকার মূল্য বাড়িলে দেশী-শিল্পের অনিষ্ট হয়।"

কেন? কথাটা যাচাই করিয়া দেখা যাক্। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে টাকার মূল্য যদি কমে তাহা হইলে যাহা কিছু

আম্‌দানি করি উহাদের দাম বাড়িয়া যাইবে। বিনিময়-হার ১৫৲ টাকায় ১ পাউণ্ড্ থাকিলে, ১০ পাউণ্ড্ মূল্যের যে বিলাতী জিনিষের দাম ১৫০৲ দিতাম, টাকার মূল্য কমিয়া ২০৲ টাকায় ১ পাউণ্ড্ হইলে উহারই দাম দিতে হইবে ২০০৲ টাকা। আম্‌দানি জিনিষের দাম বাড়িয়া যাওয়াতে দেশের ভিতরে ওই-সব পণ্যদ্রব্য সস্তায় উৎপন্ন করিবার চেষ্টা হওয়া স্বাভাবিক।

কিন্তু তখন কোনো ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠা করিতে গেলে বিদেশ হইতে বেশী দামে কলকব্জা এঞ্জিন ইত্যাদি আনিতে হইবে। তাহাতে সরঞ্জামি খরচ বেশী পড়িবে। আগেই বলিয়াছি টাকার মূল্য কমিবার ফলে খাদ্যশস্যের দাম বাড়িতে থাকে ও খাই-খরচা বাড়ে। কলের মজুর-দিগকে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য মজুরী দিতে হয় বেশী। এই অবস্থায় দেশের ভিতরে ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠা করিয়া পণ্য-দ্রব্য উৎপন্ন করিতে গেলে খরচ পড়ে বেশী। দেশী-শিল্পের পক্ষে বিদেশী-শিল্পের সঙ্গে টক্কর দিয়া টিকিয়া থাকা অসম্ভব হইয়া উঠে। কারণ, বাজারে বেচিবার সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে দেশের ভিতরে বেশী খরচে তৈয়ারী করা দেশী জিনিষের ও বেশী দাম দিয়া আম্‌দানি করা বিলাতী জিনিষের পরতা পড়ে প্রায় একই রকম।* কাজেই টাকার মূল্য কমিবার ফলে দেশী-শিল্পের উন্নতি যে আশা করা যায় তাহা কার্য্যতঃ ঘটিয়া উঠে না। তার-পর আমাদের দেশের গত ২৫ বৎসরের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে সুযোগ জুটিলেও আমাদের দেশের ব্যবসায়ী ও মূলধনীগণ দেশী-শিল্পের উন্নতির জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগেন না।

টাকার মূল্য বাড়িয়া যখন ১৫৲ টাকায় এক পাউণ্ডের পরিবর্ত্তে ১০৲ টাকায় ১ পাউণ্ড্ পাওয়া যায় তখন বিদেশী বণিকের খুব সুবিধা। তাঁহারা বিলাতী সওদা এই দেশে আনিয়া আগের চেয়ে সস্তায় বেচিতে পারেন। আগে যে বিলাতী জিনিষটি ১৫০৲ টাকায় পাওয়া যাইত, টাকার মূল্য বাড়িবার দরুণ্ তাহাই এখন ১০০৲ পাওয়া যাইবে। পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে টাকার মূল্য বাড়িলে খাদ্য-পণ্য সস্তা হওয়ার সম্ভাবনা। তাহাতে খাই-খরচা কমে। বিদেশ হইতে কলকব্জা ইত্যাদি ও সুবিধাদরে আনা যায়। ফ্যাক্টরী প্রতিষ্টার অনুকূল অবস্থা হয়।

আমাদিগের আর্থিক অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া লাভা-লাভের যে হিসাব খতিয়ান করিয়া দেখাইলাম উহার কিছুই চিরস্থায়ী হইতে পারে না। ওই-সব ফলাফল সম্ভাবনা মাত্র। যদি কোনো অন্তরায় না জোটে, যদি কোনো বিরোধী ঘটনা না ঘটে তাহাহইলে ওই-সব কারণে ওই-রকম ফলাফল স্বভাবতই হইবে। কারণের অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও যদি স্বাভাবিক ফলাফলের অভাব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলেই সেখানে বিরোধী কারণের ও অন্যান্য ঘাত-প্রতিঘাতের খোঁজ করা একান্ত দরকার।

* অবশ্য এই টক্করের (competition) অসুবিধার আরও কয়েকটি কারণ আছে।

মানব-গীতা*

(সমালোচনা)

অধ্যাপক শ্রী কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত এম-এ

বাঙ্গলার পদ্য ও গদ্য-সাহিত্যে কবিভূষণ যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, সকলেরই তাহা সুপরিচিত। পদ্য-সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত তাঁহার প্রথম ও প্রধান গ্রন্থ এবং সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতিষ্ঠার ভিত্তি এই গ্রন্থরচনার কৃতিত্বের উপরেই স্থাপিত হয়।

ইহার পর কবিতাপ্রসঙ্গ নামে বাল-পাঠ্য ছোট একখানি কাব্যগ্রন্থ তিনি রচনা করেন। বহু বিদ্যালয়ে অতি আদরে তাহা পাঠ্যরূপে

* মানব-গীতা (পারমার্থিক কাব্য)—কবিভূষণ শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু প্রণীত। ৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট; সংস্কৃত প্রেস ডিপজীটারী হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১।০।

গৃহীত হয়। ইহার মধ্যে ভাবের উচ্চতায় ও রচনায় সরল মধুর গাম্ভীর্য্যে ভারতের মানচিত্র-প্রদর্শন কবিতাটি বালপাঠ্য সাহিত্যের অতি শ্রেষ্ঠ-একস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। উৎসব-উপলক্ষে অনেক বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে এই কবিতাটি আবৃত্তি করিতে শুনিয়াছি; দেশভক্তির যে মধুর উচ্ছ্বাস তখন শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে উঠিয়াছে তাহা দেখিয়াছি। যে-কবিতা সকলেই আনন্দে পড়ে, আবৃত্তি করে, আর যাহা শুনিয়া সকলেই ভাববিভোর হইয়া উঠে সেই কবিতাই কবিতা। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পৃথ্বীরাজ ও শিবাজী নামে বড় দুইখানি কাব্যগ্রন্থ যোগীন্দ্রবাবু রচনা করেন। অলঙ্কারশাস্ত্রের লক্ষণে তাহা মহাকাব্য এই আখ্যা পাইতে পারে এবং তাহাই পাইয়াছে। তাঁহার মানবগীতা অলঙ্কারশাস্ত্রমতে মহাকাব্য না হইলেও অনেকটা এই শ্রেণীরই একখানি কাব্য এবং পারমার্থিক কাব্য নামে ইহার বিশেষত্ব যোগীন্দ্রবাবু নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই সংসারে, আধ্যাত্মিক কি ধর্ম্মে স্থিত থাকিয়া ব্যক্তিগত জীবনে কি চরিত্র-নীতি প্রভাবে, এবং সামাজিক কি ধর্ম্মপালনে ও কর্ম্মসাধনায় মানব তাহার পরমার্থ লাভ করিতে পারে, অনন্তভট্ট নামে একজন সাধুগৃহীর জীবনের ঘটনা অবলম্বনে ইহাই যোগীন্দ্রবাবু এই গ্রন্থে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখে মহামানব ধর্ম্ম কীর্ত্তিত হইয়াছে। এইগ্রন্থে পরমভাগবত সাধুমানব অনন্তভট্টের জীবন-দৃষ্টান্তে ও মুখের বাণীতে পরমা সিদ্ধির উপায়-স্বরূপ যুগোপযোগী এই ধর্ম্মের কথাই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাই মানব-গীতা এই নামে গ্রন্থকার ইহার পরিচয় দিয়াছেন।

যোগীন্দ্র বাবু নিজে যে ভাবের ভাবুক, মনুষ্যত্বের যে সমুন্নত আদর্শ নিজের অন্তরে ধরিয়া রাখিয়াছেন, সরল ভক্তিতে ভগবৎ চরণে মনপ্রাণ একান্তভাবে সমর্পণ করিয়া সামাজিক যে সেবাব্রতকে শ্রেষ্ঠ কর্ম্মযোগসাধনা বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন, সেই ভাব, সেই আদর্শ সেই সাধনার কথাই সহজ উচ্ছ্বাসে এই কাব্যখানিতে তিনি বিবৃত করিয়াছেন। সেই অতীত যুগে দেশে সেবা ও রাষ্ট্রনীতির আদর্শ কি হইলে ভালো হইত,পৃথ্বীরাজে ও শিবাজীতে যোগীন্দ্রবাবু তাহাই দেখাইয়াছেন। কিন্তু এই মানবগীতায় দেখাইয়াছেন, বর্ত্তমান এইযুগে আমাদের সাধারণ জীবনের অবস্থার মধ্যে সমাজ সেবাব্রতের আদর্শ কি হইবে, তাহার প্রেরণা কোথা হইতে আসিবে, এবং তিনি নিজে কিভাবে সেই প্রেরণাবশে এই ব্রত পালন করিতে পারিলে কৃতার্থ হইতেন ও আমরা দশজনেও হইতে পারি। নিজের আকুল একটা আগ্রহ ইহাতে প্রকাশ পাইয়াছে এবং আমাদের দশজনেরও যাহাতে পায় সেই প্রয়াস তিনি করিয়াছেন।

তাঁহার এই কাব্যের নায়ক, মানব গীতার গায়ক অনন্তভট্ট হরিপুর নামক কল্পিত কোনো গ্রামনিবাসী এক সাধুব্রাহ্মণ গৃহস্থ। গৃহে মাতা, পত্নী ও বালকপুত্রকে ফেলিয়া অকালে সংসার ত্যাগ করিয়া, হিমাচলবাসী এক সিদ্ধ যোগীর আশ্রয় তিনি গ্রহণ করেন। জ্ঞানে ও আধ্যাত্মিক সাধনার বলে যথোপযুক্ত উন্নতিলাভ করিলে গুরু শিষ্যকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করেন। বলেন——

"এ পৃথিবী কর্ম্মভূমি কর্ম্ম বিসর্জ্জিয়া তুমি
রহিও না হেথা উদাসীন;
কোটি কণ্ঠে কোটি স্বরে তোমারে আহ্বান করে
কত আর্ত্ত কত দীন হীন।
পূজাধ্যান-পরায়ণ আছে ভক্ত বহুজন,
কর্ম্মীভক্ত দুর্লভ ধরায়;
কর্ম্ম-অনুষ্ঠানে তাই তোমারে প্রেরিতে চাই;
যোগ্য পাত্র বুঝেছি তোমায়।
শাস্ত্রলব্ধ দিব্য জ্ঞান শিষ্যে গিয়া কর দান,
অবিদ্যা-তিমিরে মগ্ন দেশ;
সহি রোগ দুঃখ শোক অবসন্নপ্রায় লোক,
দুর্গতির নাহি বৎস শেষ।
* * * * *
সন্ন্যাসী আমার মত এভারতে কত শত
নিত্য তুমি পাবে দেখিবারে;
সুগৃহস্থ একজন মিলে বৎস কদাচন,
গৃহী ঋষি দুর্লভ সংসারে।

এইরূপ একজন গৃহী ঋষি হইয়া শিক্ষাদানে ও কর্ম্মশক্তির জাগরণে লোক-সমাজকে উন্নত করিয়া তুলিবার উদ্দেশে গুরু অনন্তভট্টকে গৃহে ফিরাইয়া পাঠান। অনিচ্ছা-সত্ত্বেও গুরুর আদেশ শিরে ধরিয়া অনন্তভট্ট গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

গৃহে ফিরিয়াই দেখিলেন তাঁহার একমাত্র পুত্র প্রশান্ত পূর্ব্ব রাত্রিতে সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। ধীর চিত্তে অনন্ত পুত্রের সৎকার করিয়া আসিলেন। শোকাভিভূতা পত্নীকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন:··· কর্ম্ম অনুসারে
আসিয়াছি ফিরি গৃহে। প্রবেশি সংসারে
আরম্ভিব নব কর্ম্ম; প্রতি নরনারী—
আমাদের পুত্র কন্যা, অন্তরে বিচারি,
এস দোঁহে পাতি পুনঃ নবীন সংসার,
সহায় ব্রহ্মাণ্ডপতি হবেন দোঁহার।

অনন্তভট্টের নূতন কর্ম্ম-জীবন আরম্ভ হইল। কোনো শত্রুর প্ররোচনায় গ্রাম্য সামাজিক বর্গ তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে সমাজচ্যুত ও গ্রাম হইতে বহিষ্কৃত করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু দুঃশাসন-নামক অতি উগ্রস্বভাব অথচ সহৃদয় এক মল্লযুবা তাঁহার পক্ষে দাঁড়াইল, ভয়ে তখন সামাজিকগণ নিরস্ত হইলেন।

ইহার পর কয়েকটি অধ্যায়ে, নানা প্রসঙ্গে কখনও মাতার, কখনও পত্নীর কখনও বা শিষ্যদের প্রশ্নের উত্তরে সৃষ্টি-প্রকরণ, পরলোক, আত্মা ও পরমাত্মা প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক সারগর্ভ তত্ত্বকথা অতি চিত্তগ্রাহী ভাবে ও ভাষায় অনন্তভট্টের মুখে বিবৃত হইয়াছে। যে ভাবে এইসব রহস্যের তত্ত্ব যোগীন্দ্র বাবু বুঝাইতে চাহিয়াছেন এদেশের তত্ত্ববিদ্যার সিদ্ধান্তের সঙ্গে তাহার পুরাপুরি একটা মিল আছে এবং সকলেই তাহা দার্শনিক যুক্তিতে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবেন, একথা বলিতে পারি না। তবে এমন উচ্চ একটা ভাব, ভগবানের মঙ্গলবিধানের এমন সরল একটা বিশ্বাসের দৃঢ়তা তাহাতে প্রকাশ পাইয়াছে যাহা পাঠকমাত্রেরই প্রাণ স্পর্শ করিবে।

কোনো-কোনো স্থলে, যেমন পরলোকগত জীবের জীবন ও অবস্থা-সম্বন্ধে, এমন-একটা সংশয়ের ভাবও অনন্তভট্টের কথায় প্রকাশ পাইয়াছে যাহা অতবড় একজন সিদ্ধ যোগীর অতবড় সাধক শিষ্যের মুখে শোভা পাইয়াছে বলিয়া মনে হইল না। যোগী যাহারা এ-সম্বন্ধে যাহা-কিছু বলিয়াছেন, সংশয় রাখিয়া কিছু বলেন নাই। সে-জগত ও জগতের জীবন এই জগতের মতনই যেন তাঁহাদের চক্ষে দেখা এমনইভাবে তাহার সকল কথা তাঁহারা বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাদের কোনো ভক্ত শিষ্যের চিত্তে কোনো সংশয় এসব বিষয়ে থাকিতে পারে না। এই সংশয় বোধ হয় যোগীন্দ্র বাবুর নিজের এবং এইস্থলে ভাবকল্পনায় তিনি অঙ্কিত চিত্রের সঙ্গে সমান স্তরে গিয়া উঠিতে পারেন নাই। চিত্রও তাই তেমন স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠে নাই। অনন্তভট্টের চরিত্রমাহাত্ম্য বড় সুন্দর ফুটিয়াছে একটি দৃশ্যে এবং সেটি দুঃশাসনের দীক্ষায় গুরু। কথিত

তাঁহার ভাব-কল্পনার এই স্থলে যত উচ্চস্তরে গিয়া উঠিয়াছেন এমন এইগ্রন্থে আর কোথাও উঠিতে পারেন নাই। শিষ্যের সম্বন্ধেও যে-ভাবটি কবি এখানে দেখাইয়াছেন, সেরূপও বড় কোথাও দেখা যায় না।

* * * বাসনা শিষ্যের
পাপে লভিবারে ত্রাণ—আত্ম-সমর্পণে ;
বাসনা গুরুর তার লয়ে পাপ ভার
অখণ্ড মণ্ডলাকারে ব্যাপ্ত বিশ্বে যিনি
দেখাইতে তাঁর পদ মোক্ষধাম ভবে।
সমাপিয়া যথারীতি, পূজা, হোম, পাঠ
ডাকি দুঃশাসনে নিজ আসন সমীপে,
স্পর্শি ব্রহ্মরন্ধ্র, জপি মন্ত্র একাক্ষর,
কহিলা মধুর ভাবে "আজ হ'তে তব
লইলাম পাপভার আপনার শিরে ;
মুক্ত তুমি মুক্ত তুমি, মুক্ত হ'লে তুমি"

নিজের পাপের ভার গুরু গ্রহণ করিলেন, দুঃশাসন ইহাতে বড় শঙ্কিত ও ব্যথিত হইল। গুরু প্রবোধ দিয়া কহিলেন :...

"চিন্তিত হয়োনা তুমি, উভয়ের ভার
লইবেন তিনি, যিনি পতিত-পাবন।

তা'র পর দক্ষিণার কথা। দীক্ষার পর আপনার সর্ব্বস্ব গুরুকে দক্ষিণা দিতে হইবে, এইরূপ একটা নির্দ্দেশ শাস্ত্র-বিধিতে আছে। দুঃশাসন যখন দক্ষিণার কথা জিজ্ঞাসা করিল

"হাসি উত্তরিলা গুরু, সর্ব্বস্ব তোমার"

দুঃশাসন দানপত্র লিখিয়া তাহার সকল ধনসম্পত্তি দিতে চাহিল। গুরু কহিলেন :—

* * * "সর্ব্বস্ব তোমার
শ্রীহরির নাম এবে ; প্রীতি হেতু মোর
কর গিয়া দান তাহা গ্রামবাসী সবে।"

গুরু অনেক আছেন, শিষ্যও অনেক আছে, দীক্ষাও অনেক হইয়া থাকে। কিন্তু এমন গুরু, এমন শিষ্য, এমন দীক্ষা কোথাও দেখা যায় কি ? তাহা যদি যাইত পৃথিবী আজ স্বর্গরাজ্যে পরিণত হইত।

পাঠমাত্রেই অর্থবোধ হয় অথচ বর্ণিত বিষয়ে স্থায়ী একটা ভাব চিত্তে অঙ্কিত হইয়া থাকে এবং গ্রাম্য শব্দ ব্যবহৃত হয় না, ভাষা ও রচনা প্রণালীর এই গুণকে অলঙ্কার-শাস্ত্র প্রসাদ-গুণ বলেন। পদ্য কি গদ্য-সাহিত্যে এই প্রসাদ-গুণই যোগীন্দ্রবাবুর রচনা-প্রণালীর বড় একটি বিশিষ্ট গুণ। তাঁহার গ্রন্থগুলি যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন সকলেই অনুভব করিবেন এই প্রসাদ-গুণে তাহার তুলনা আধুনিক সাহিত্যে অতি অল্পই মিলে। মানবগীতাতেও এই প্রসাদ-গুণটি তাঁহার অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

মিত্র ও অমিত্রাক্ষর পয়ার ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দে যোগীন্দ্রবাবু কাব্য রচনা করেন, মানব-গীতায়ও তা'াই করিয়াছেন। নব্য অনেক কাব্য-সমালোচক হয়ত বলিবেন এসব সেকেলে ছন্দ এখন অচল।...এসব সেকেলে বটে...কিন্তু অচল বলিয়া কি উপেক্ষা করা যায় ? সে-যুগের কাশীরাম, কৃত্তিবাস ও মুকুন্দরাম, এ-যুগেরও মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র এই ছন্দে তাঁহাদের সব কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদেরই আদর্শের অনুবর্ত্তন যোগীন্দ্রবাবু করিয়াছেন। বঙ্গ-সাহিত্যে সে-সব অচল হয় নাই, হইবেও না, তা যদি না হয়, যোগীন্দ্রবাবুর কাব্যও অচল হইবে না ; কেবল ছন্দোবদ্ধ কতকগুলি বাজে কথা না হইয়া সত্যকার কাব্য যদি তাহা হয়।

এসম্বন্ধেও নব্য একমত হয়ত যোগীন্দ্রবাবুর এইসব কাব্যকে কাব্যই বলিতে চাহিবে না। কারণ অন্য কোনোরূপ লক্ষ্যবর্জ্জিত কেবলমাত্র প্রাকৃত সৌন্দর্য্যরসের সৃষ্টি তিনি করেন নাই। অনেক ধর্ম্মের কথা, জীবন-রহস্যের অনেক অনেক তত্ত্বের কথা তিনি বলিয়াছেন। সামাজিক লোক-সেবারও অনেক উচ্চতর আদর্শ তিনি দেখাইয়াছেন। এই বিতর্কের মধ্যে এইপ্রসঙ্গে প্রবেশ করিতে চাই না, এইমাত্র বলিতে চাই পড়িয়া যাহা ভালো লাগে, পড়িয়া আরও পড়িতে ইচ্ছা হয়, উচ্চভাবের প্রেরণা যাহা হইতে পাওয়া যায়, প্রবৃত্তি-রক্ত-রাগের লোভন আকর্ষণ হইতে মানুষের প্রাণকে যাহা নিবৃত্তি-ধর্ম্মের শান্ত ও নির্ম্মল অলকানন্দে সত্য শিব ও সুন্দরের দিকে টানিয়া তোলে, তাহাই কাব্য।

কেবল কাব্য নহে, কাব্যরসের চরম প্রকাশ তাহাতেই হয়। পরম সুন্দর যাহা এই কাব্যে তাহাই ফুটিয়া উঠে। সত্য শিব ও সুন্দর তাঁহার কাব্য প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন, তাহারি দিকে পাঠককে আকৃষ্ট করিতে চাহিয়াছেন, ইহাতে কতদূর তিনি সার্থক হইয়াছেন সেই মানেই তাঁহার কাব্য বিচার করিতে হইবে।

[এই বিভাগে চিকিৎসা ও আইন-সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর ছাড়া সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্ন ছাপা হইবে। প্রশ্ন ও উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। একই প্রশ্নের উত্তর বহুজনে দিলে যাঁহার উত্তর আমাদের বিবেচনায় সর্ব্বোত্তম হইবে তাহাই ছাপা হইবে। যাঁহাদের নামপ্রকাশে আপত্তি থাকিবে তাঁহারা লিখিয়া জানাইবেন। অনামা প্রশ্নোত্তর ছাপা হইবে না। একটি প্রশ্ন বা একটি উত্তর কাগজের এক-পিঠে কালীতে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। একই কাগজে একাধিক প্রশ্ন বা উত্তর লিখিয়া পাঠাইলে তাহা প্রকাশ করা হইবে না। জিজ্ঞাসা ও মীমাংসা করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিশ্বকোষ বা এন্‌সাইক্লোপিডিয়ার অভাব পূরণ করা সাময়িক পত্রিকার সাধ্যাতীত। যাহাতে সাধারণের সন্দেহ-নিরসনের দিগ্‌দর্শন হয় সেই উদ্দেশ্য লইয়া এই বিভাগের প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা এরূপ হওয়া উচিত, যাহার মীমাংসায় বহু লোকের উপকার হওয়া সম্ভব, কেবল ব্যক্তিগত কৌতুক কৌতূহল বা সুবিধার জন্য কিছু জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। প্রশ্নগুলির মীমাংসা পাঠাইবার সময় যাহাতে তাহা মনগড়া বা আন্দাজী না হইয়া যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত হয় সে-বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। প্রশ্ন এবং মীমাংসা দুইয়ের যাথার্থ্য-সম্বন্ধে আমরা কোনোরূপ অঙ্গীকার করিতে পারি না। কোনো বিশেষ বিষয় লইয়া ক্রমাগত বাদ-প্রতিবাদ ছাপিবার স্থান আমাদের নাই। কোনো জিজ্ঞাসা বা মীমাংসা ছাপা বা না-ছাপা সম্পূর্ণ আমাদের ইচ্ছাধীন—তাহার সম্বন্ধে লিখিত বা বাচনিক কোনোরূপ কৈফিয়ৎ আমরা দিতে পারিব না। নূতন বৎসর হইতে বেতালের বৈঠকের প্রশ্নগুলির নূতন করিয়া সংখ্যাগণনা আরম্ভ হয়। সুতরাং যাঁহারা মীমাংসা পাঠাইবেন, তাঁহারা কোন্ বৎসরের কত-সংখ্যক প্রশ্নের মীমাংসা পাঠাইতেছেন তাহার উল্লেখ করিবেন।]

জিজ্ঞাসা

(১)

জাতিভেদ ও ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-লোপ

অনেকের এইরূপ ধারণা আছে যে, জাতিভেদ-প্রথা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-লোপের অন্যতম কারণ। প্রামাণিক কোন্-কোন্ ঐতিহাসিক গ্রন্থে এইরূপ বিশ্বাসের সমর্থক কোন্-কোন্ ঘটনা ও তথ্যের বৃত্তান্ত আছে?

শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

(২)

বিষ্ণুপুরে মারাঠাদের পরাজয়।

বাঁকুড়া জেলা ও বিষ্ণুপুর (মল্লভূম) সম্বন্ধীয় কোনো-কোনো বহিতে লিখিত আছে, যে, বিষ্ণুপুর যখন মারাঠা সেনাপতি ভাস্করপণ্ডিত কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, তখন মরাঠারা মল্লভূমের রাজার দ্বারা পরাজিত ও তাড়িত হইয়াছিল। এইরূপ বৃত্তান্তের ঐতিহাসিক ভিত্তি কি? ইহার কোনো সমসাময়িক প্রমাণ আছে কি? মরাঠী ভাষায় লিখিত কোনো বহিতে বিষ্ণুপুর আক্রমণের বিবরণ থাকিলে তাহার বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক।

শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

(৩)

ময়ূর-সিংহাসন

মোগল-সম্রাট্ সাজাহান-নির্ম্মিত "ময়ূর-সিংহাসনের" ধারাবাহিক ইতিহাস কোথায় পাওয়া যাইবে? কোন্-কোন্ পুস্তকে ইহার বিবৃত ইতিবৃত্ত আছে। উহা বর্ত্তমানে কোথায় আছে? শুনা যায় বর্ত্তমান গবেষণার ফলে জানা গিয়াছে যে, ময়ূর-সিংহাসন একটি কাহিনীমাত্র। এ-বিষয় সত্য কি? প্রমাণ চাই।

শ্রী হরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

(৪)

কলাগাছের ব্যারাম

কলা বাগানে মাঝে-মাঝে খুব সুস্থ সবল কলাগাছের পাতায় হলুদে রঙ্ ধ'রে ক্রমে-ক্রমে গাছ দুর্ব্বল হ'য়ে যায়। সাধারণত ইহাকে 'জিরে-ধরা' বলে। ফলে কলা বাগান নষ্ট হ'য়ে যায়। কলা গাছের এই-প্রকার ব্যারাম নিবারণের সহজ উপায় কি?

মার্গিস্-আসার খাবস্

(৫)

গাছ নোয়াইবার প্রথা

আশ্বিন মাসের সংক্রান্তির দিন আমাদের দেশে ঘর ও গাছ নোয়াইবার প্রথা প্রচলিত আছে। সেই দিন বৈকালে চালিতা পাতা দ্বারা উক্ত কার্য্য করিবার সময় নিম্নোক্ত ছড়াটি বলা হয়

"আম পাত চালিতা পাত
ঘর নোয়াইলাম আড়াই হাত।
যদি ঘর গঙ্গায় যায়,
বাঁদীর পাতে ব'সে খায়।

উক্ত কার্য্যের কারণ কি? যদি ঝড় বা জল হইতে রক্ষা করিবার জন্য উক্ত কার্য্য করা হইয়া থাকে তবে কেনই বা উহা আশ্বিন মাসের সংক্রান্তির দিন করা হয়? বর্ষার পূর্ব্বভাগেই বা কেন করা হয় না?

শ্রী ধীরাজকুমার ভট্টাচার্য্য, ঢাকা হল্।

(৬)

খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার

১। ভারতবর্ষের ভিতর কোন্ স্থানে সর্ব্বপ্রথম খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হয়, প্রথমে কোন্ খৃষ্টান্ মিশনারী ভারতে আগমন করেন, এবং ভারতের আদি-গির্জ্জা কোন্ স্থানে কাহা কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়?

শ্রী অবনীমোহন দাসগুপ্ত।

(৭)

বিধবা-বিবাহ

পরাশরমতানুযায়ী বিধবাবিবাহ-প্রচলন-সম্বন্ধে শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন-সম্পাদিত ধর্ম্মসংহিতায় এইরূপ দেখিতে পাইলাম 'পত্যন্তরগ্রহণং কলেঃ প্রথমে অংশে প্রাদুর্ভূত যেন নাগরাজসুতা মৃতভর্ত্তৃকা চিত্রাঙ্গদা শ্রীমদর্জ্জুনং পতিত্বেনাভ্যুপাগচ্ছৎ। চিত্রাঙ্গদাকে 'নাগরাজসুতা মৃতভর্ত্তৃকা' বলা হইয়াছে। এ-সম্বন্ধে মহাভারতে কোনো প্রকার উল্লেখ পাওয়া যায় না (আদিপর্ব্ব, ২১৬ অধ্যায়) অথচ মহাভারতকেই এ-সম্বন্ধে প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া অনেকে মনে করেন। কোন্ গ্রন্থে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায় এবং সে-গ্রন্থের প্রামাণিকতা-বিষয়ে কি বিশ্বাসযোগ্য নিদর্শন আছে ?

শ্রী হরিপদ মুখোপাধ্যায়। মুঙ্গের।

(৮)

বাংলাদেশে বিবাহ

১। ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক, পৌষ ও চৈত্রমাসে বাংলায় বিবাহ প্রথা নেই কেন? ভারতের অন্যান্য জাতির মধ্যে কি-কি মাসে বিবাহ প্রথা নেই ?

শ্রী অপর্ণা দেবী

(৯)

চাউল-রক্ষণ

কি উপায় অবলম্বন করিলে চাউল অনেক দিন পর্য্যন্ত টাট্‌কা রাখা যায়? অর্থাৎ জড়িত অম্ল ইত্যাদি না হয়, এবং পোকায় না ধরে।

আক্তর নবী চৌধুরী

(১০)

খনার বচন

প্রায় সকল পঞ্জিকায় নিম্নলিখিত খনার বচনটি দেখিতে পাওয়া যায় :—

যদি দেখ মাকুন্দ চাপা, এক-পা না বাড়াও বাপা,
খনা বলে এরেও ঠেলি, যদি সাম্‌নে দেখি তেলী।

এই বচনটির প্রকৃত অর্থ কি ? এই তেলী শব্দের বাচ্য কোন্ জাতি ? তেলী শব্দটি তৈলী শব্দের অপভ্রংশ কি না? মনুসংহিতায় ৪র্থ অধ্যায় ৮৪ শ্লোকের ব্যাখ্যায় টীকাকার লিখিয়াছেন চক্রবান্—বীজ-বধ বিক্রয়-জীবী তৈলিক অর্থাৎ যাহারা তিলাদি বীজ হইতে স্নেহ বাহির করিয়া বিক্রয় করে। তৈলী ও তৈলিকে কোনো প্রভেদ আছে কি না? সম্বন্ধ-নির্ণয়ে লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় নবশাখের বর্ণনায় লিখিয়াছেন "তৈলী, মালী, তাম্বুলী, গোপ, নাপিত, গোছালী, কামার, কুমার, পুটুলী এই নবশাখাবলী।" এই তিলি শব্দ কোথাহ ইতে পাইলেন। সংস্কৃত বাক্যে তৈলী শব্দের প্রয়োগ আছে। "গোপো মালী তথা তৈলী তন্ত্রী মোদকোবারকী কুলালঃ কর্ম্মকারশ্চ নাপিতো নব শারকাঃ। তিনি তিলি কথাটি কোথায় কিরূপে পাইলেন ?

শ্রী হরিলাল সাহা

(১১)

মহিষী

মহিষী শব্দের ব্যুৎপত্তি কি ?

শ্রী দিনেন্দ্রনাথ পালিত

(১২)

ষাট বলা

অরণ্য-ষষ্ঠী পূজার সময় স্ত্রীলোকগণ তাঁহাদের স্ব-স্ব সন্তান-সন্ততিগণকে স্নান করিয়া উঠিয়া "ষাট-ষাট" বলিয়া মাথায় জল দিয়া থাকেন। কারণ উহা নাকি ৬০ বৎসরকাল বাঁচিয়া থাকার আশীর্ব্বাদ-স্বরূপ। উহার মূলে কোনো সত্য আছে কি না? এ-সম্বন্ধে কেহ বেতালের বৈঠকে আলোচনা করিলে বড়ই উপকৃত হইব।

শ্রীমতী কমলকামিনী দেবী.

(১৩)

প্রাচীন ভারতে সঙ্গীতবিদ্যা

প্রাচীন ভারতীয় সঙ্গীত-সম্বন্ধীয় কি-কি মুদ্রিত পুস্তক পাওয়া যায়, তাহাদের নাম, ভাষা, রচয়িতা ও প্রকাশকের নাম, প্রাপ্তিস্থান কোথায় ?

(ক) পাঠকবর্গের কাহারও নিকট কোনো প্রাচীন গ্রন্থ থাকিলে গ্রন্থ ও রচয়িতার নাম, মুদ্রিত কি হস্তলিখিত, ভাষা, মুদ্রিত হইলে কোথা হইতে কবে মুদ্রিত, প্রকাশকের নাম ও মূল্য কত ?

(খ) কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি ও ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী অথবা ভিন্ন প্রদেশস্থ কোনো পুস্তকালয়ে কোনো গ্রন্থ আছে কি না তাহা কেহ অবগত থাকিলে তদ্বিবরণও প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয় হইবে ?

শ্রীব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী

মীমাংসা

গত বৎসরের

(১৬)

ভরতের সিংহাসনারোহণ

'ভরত অগ্রজ বর্ত্তমানে পিতৃপিতামহের রাজ্য একশত বৎসর পরে নির্ব্বিবাদে পাইবেন'—এরূপ অর্থ কৈকেয়ীর বাক্যের তাৎপর্য্য নহে। কৈকেয়ীর বলিবার উদ্দেশ্য এই ভরত ইচ্ছা করিলে এক্ষণে, এমন-কি শতবর্ষ পরেও রাজ্য গ্রহণ করিতে পারেন। পিতা ও অগ্রজ বর্ত্তমানে ভরত কিরূপে রাজ্যাধিকারী হইতে পারেন? এইরূপ সন্দেহ মন্থরার মনে যাহাতে আসিতে না পারে তজ্জন্য 'কৈকেয়ী পিতৃপৈতামহং রাজ্যং' বলিয়াছেন। কারণ বংশপরম্পরাগত রাজ্যে বা সম্পত্তিতে পিতা ও পুত্রের তুল্য স্বামিত্ব। যথা বিষ্ণু সংহিতায় "পৈতামহে ত্বর্থে পিতৃপুত্রয়োস্তুল্যং স্বামিত্বং।" আচার্য্য রামানুজ "ভরতশ্চাপি" ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন 'পিতৃবৎ ভ্রাতৃন্ বিভাগেন পালয়তো রামস্য বর্ষশতাৎ পরমপি যদা বিভাগেচ্ছা তদা ভরতোঽপি রাজ্যমবাপ্স্যতি। প্রবাপিশব্দাত্তাং লক্ষ্মণশত্রুঘ্নয়োরপি রাজ্যপ্রাপ্তিরেবেতি সূচিতম্।" জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পৈতৃকসম্পত্তি সম্পূর্ণ উপভোগ করিতে পারে ততক্ষণ যতক্ষণ তাহার অনুজগণ 'ভক্তাচ্ছাদনার্থ' জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উপর পিতৃবৎ নির্ভর করিয়া তদধীনে বাস করে। যথা মনুসংহিতায় নবম অধ্যায়ের ১০৫ শ্লোকঃ—"জ্যেষ্ঠ এব তু গৃহ্নীয়াৎ পিত্র্যং ধনমশেষতঃ। শেষাস্তমুপজীবেয়ুর্যথৈব পিতরং তথা।" কুল্লুক ভট্ট ইহার টীকা করিয়াছেন "যদা পুনর্জ্যেষ্ঠো ধার্ম্মিকো ভবতি তদা জ্যেষ্ঠ ইতি। জ্যেষ্ঠ এব পিতৃসম্বন্ধি ধনং গৃহ্নীয়াৎ কনিষ্ঠাঃ পুন র্জ্যেষ্ঠং ভক্তাচ্ছাদনার্থং পিতরমিবোপজীবেয়ুঃ এবং সর্ব্বেষাং সহৈবাবস্থানং। মনু আরও বলিয়াছেন "এবং সহবসেয়ুর্ব্বা পৃথগ্বা ধর্ম্মকাম্যয়া। পৃথগ্বিবর্দ্ধতে ধর্ম্মস্তস্মাদ্ধর্ম্ম্যা পৃথক্ ক্রিয়া।" ইহার দ্বারা ভ্রাতৃগণ একত্র বা

ধর্মার্থ পৃথক্ ভাবে বাস করিতে পারে নির্ণীত হইল। ভ্রাতৃবিচ্ছেদ করা কৈকেয়ীর ইচ্ছা ছিল না এবং তিনি স্বীয় পুত্র ভরত ও রামকে একভাবেই দেখিতেন, তাহা তাঁহার "রামে বা ভরতে বাহং বিশেষং নোপলক্ষয়ে" ইত্যাদি বাক্যে বুঝিতে পারা যায়। ভরত যদি জ্যেষ্ঠের অধীনে থাকিতে ইচ্ছুক না হয়, তবে শতবর্ষ পরেও রাজ্যের তুল্যাংশ গ্রহণ করিতে পারিবে। কৈকেয়ীর বাক্যের এরূপ তাৎপর্য্য গ্রহণ করাই সমীচীন মনে হয়। রামায়ণেও দেখিতে পাওয়া যায় যে রামচন্দ্র তাঁহার পুত্রদ্বয়ের মধ্যে ও ভরত প্রভৃতির অনুজগণের পুত্রগণের মধ্যে রাজ্যবিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। এতৎসম্বন্ধে বঙ্গবাসী সংস্করণ রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ১১৪, ১১৫, ১২০, ও ১২১ সর্গ দ্রষ্টব্য।

শ্রী ক্ষিতীশকুমার সাহা

(১৭)

দেশলাইয়ের কারখানা

১। বন্দে মাতরম্ ম্যাচ ফ্যাক্টরী টালীগঞ্জ, কলিকাতা।
২। সুন্দরবন ম্যাচ ফ্যাক্টরী ১২ ডালহাউসী স্কোয়ার, কলিকাতা।
৩। সি এ মহম্মদের ম্যাচ ফাক্টরী টালীগঞ্জ কলিকাতা।
৪। ন্যাসন্যাল্ ম্যাচ ফ্যাক্টরী উল্টাডিঙ্গি, কলিকাতা।
৫। বেঙ্গল ম্যাচ ফ্যাক্টরী এবং স মিলস্ লিঃ ২০৫।১০ বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৬। মোহন ম্যাচ ফ্যাক্টরী, মালদহ।
৭। স্বরাজ ম্যাচ ফ্যাক্টরী কুড়িগ্রাম, রংপুর
৮। ভবানী ম্যাচ ফ্যাক্টরী ১২২।১ অপার সারকুলার রোড, কলিকাতা
৯। পাইওনীয়ার ম্যাচ ফ্যাক্টরী, কুমিল্লা
১০। বিনাজুরী ম্যাচ ফ্যাক্টরী বিনাজুরী, চট্টগ্রাম
১১। হিরণ্ময়ী ম্যাচ ফ্যাক্টরী চট্টগ্রাম।
১২। পটিয়া ম্যাচ ফ্যাক্টরী পটিয়া চট্টগ্রাম।
১৩। ঘোষের ম্যাচ ফ্যাক্টরী কুমিল্লা।
১৪। ইসলোমিয়া ম্যাচ ফ্যাক্টরী চাতরা কুমিল্লা।
১৫। ব্রাহ্মণবাড়িয়া ম্যাচ ফ্যাক্টরী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ত্রিপুরা।
১৬। বরিশাল ম্যাচ ফ্যাক্টরী, বরিশাল।
১৭। ডাক্তার নন্দীর ম্যাচ ফ্যাক্টরী, কালীকচ্ছ, ত্রিপুরা।
১৮। সাহাতলী ম্যাচ ফ্যাক্টরী পুরাণবাজার, চাঁদপুর, ত্রিপুরা।
১৯। জয়-দুর্গা ম্যাচ ফ্যাক্টরী মোহানী, নোয়াখালী।
২০। ভৌমিক ভাইদের ম্যাচ ফ্যাক্টরী, রাজারামপুর, নোয়াখালী।
২১। ফেনী ম্যাচ ফ্যাক্টরী ফেনী নোয়াখালী।
২২। কাউন অভ্ লেবারস্ ম্যাচ ফ্যাক্টরী, কুমিল্লা।
২৩। কালচাঁদ শিল্পজের ম্যাচ ফ্যাক্টরী, মৈমনসিংহ।
২৪। প্রসন্নম্যাচ ফ্যাক্টরী, মেছুয়াবাজার, মৈমনসিংহ।
২৫। সোনারং ম্যাচ ফ্যাক্টরী, ঢাকা।
২৬। অধর ম্যাচ ফ্যাক্টরী নরশিংদী, ঢাকা।
২৭। বিক্রমপুর ম্যাচ ফ্যাক্টরী ঢাকা।
২৮। গোবিন্দ ম্যাচ ফ্যাক্টরী, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা।
২৯। নারায়ণগঞ্জ ইণ্ডাস্ট্রিয়েল কোরে ম্যাচ ফ্যাক্টরী, নারায়ণগঞ্জ।
৩০। ভারতমাতা ম্যাচ ফ্যাক্টরী, ঢাকা।
৩১। বঙ্গীয় নিরাপদ্ ম্যাচ ফ্যাক্টরী, ফরিদপুর।
৩২। ঘটক কোংর ম্যাচ ফ্যাক্টরী বেহালা, কলিকাতা।

শ্রীরামানুজ কর
ও
এন্ মুখোপাধ্যায়

(২২)

রাহু চণ্ডাল

"বৃহজ্জাতকাদয়ঃ" নামক গ্রন্থে রাহু চণ্ডাল বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে 'শব্দকল্পদ্রুমে' এইরূপ লিখিত আছে—

রাহু :—অস্য স্বরূপং শনিবৎ। স চ চণ্ডালজাতিঃ। সর্পাকৃতিঃ। ইতি বৃহজ্জাতকাদয়ঃ

শ্রী বিজয় কৃষ্ণ রায়

(২৪)

পৌষ মাসে যাত্রা নিষেধ

ভাদ্র, পৌষ ও চৈত্র মাসে দূর যাত্রা করিতে নাই।

প্রমাণ—

ভাদ্রপৌষচৈত্রেষ্বমাসেষু দূরযাত্রা কর্ত্তব্যা। ইতি জ্যোতিষতত্ত্বম্।

শ্রী বিজয়কৃষ্ণ রায়

(২৫)

দিল্লী

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রারম্ভে দিলু নামক জনৈক রাজা ইন্দ্রপ্রস্থের অতি নিকটে একটি নূতন নগরী নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় রাজধানী স্থাপন করেন এবং স্বীয় নামানুসারে তাহার নাম দিল্লী রাখেন। দিলু মৌর্য বংশের শেষ রাজা বলিয়া অনুমিত।

শ্রী বিজয়কৃষ্ণ রায়

(২৬)

মনকাকরের কাঁটা

মনকাকরের গাছ এই গাছে খুব বড়-বড় কাঁটা হয়। ইহার কাঁটা বেল গাছের কাঁটা অপেক্ষাও অনেক বড়। এই গাছে একপ্রকার ছোটো-ছোটো গোটা বা ফল হয়। তাহা পাকিলে খাইতে খুব ভালো লাগে। এই গাছ প্রায়ই জঙ্গলে হয়।

শ্রী ফণীন্দ্রকুমার অধিকারী

(২৭)

কুড়াপাখী

ইহা একপ্রকার জলচর পাখী। বর্ষার প্রারম্ভে পূর্ব্ব মৈমনসিংহের বিল-ঝিল যখন নূতন জলে পূর্ণ হইতে থাকে তখন এই পাখী আসিয়া ঐসমস্ত বিল ঝিলে বাসা তৈয়ার করে। কুড়া একপ্রকার শিকারী পাখী। সৌখীন লোকেরা উহা পালন করে এবং পালিত কুড়ার সাহায্যে বন্য কুড়া শিকার করে। ইহার শিকার বড় কৌতুকপ্রদ। কুড়ার মাথায় একটা লাল চিহ্ন হয়। শুধু বর্ষার প্রারম্ভেই এই চিহ্ন্ গজাইয়া থাকে। কুড়ার মতন হিংসুটে পাখী আর নাই। এক বিলে বা ঝিলে একটির (সস্ত্রীক) বেশী কুড়া থাকিতে পারে না।

খালেক দাদ

(২৮)

চৈত্তার বউ

পাপিয়াকে একটি টাকা ধার দিয়াছিল অন্য একটি পাখী, তৎ-পরিবর্ত্তে সে দিয়াছিল তাহাকে এক কানা কড়ি, আর বলিয়াছিল যে শীতকালে সে তা'র টাকা পরিশোধ করিবে। শীত যখন শেষ হইল তখন সেই পাখীটি তা'র টাকা লওয়ার জন্য পাপিয়ার খোঁজে বাহির হইল কিন্তু তাহার দেখা সে পাইল না। তাই সে নানা দেশ খুঁজিয়া চৈত্র মাসে

(চৈত্র মাসে) আমাদের দেশে আসিয়া পাপিয়াকে টাকার জন্য অনুরোধ করে। আবার ঋণদাতা পাখীর শ্বশুরের নাম ছিল পপী। আমাদের দেশে শ্বশুরের নাম লওয়া অন্যায়, তাই আমাদের দেশের ঐ পাখীটিও পাপিয়াকে চৈতার বৌ বলিয়া ডাকিতে লাগিল। ময়মনসিংহে একটি ছড়া আছে-- "চৈতার বৌ গো তোর কড়ি নে, মোর টাকা দে গো।" সে বার-বার তাহাকে 'চৈতার বৌ চৈতার বৌ' বলিয়া ডাকিতে লাগিল। সেই হইতে পাপিয়ার নাম হইল চৈতার বৌ।

খালেক দাদ

(৩০)

ফুলদোল

অধুনা ফাল্গুনী পূর্ণিমায় দোল হইয়া থাকে। কিন্তু চৈত্র পূর্ণিমায় দোলের বিধানও আছে। ঐ দোল একমাস ব্যাপী এবং বৈশাখী পূর্ণিমায় উহা শেষ হয়। ঐ দিন ফুলদোল বলিয়া কথিত হয়। প্রমাণ—

চৈত্রে মাসি সিতেপক্ষে দক্ষিণাভিমুখং হরিম্
দোলারূঢ়ং সমভ্যর্চ্চ্য মাসমান্দোলয়েৎ কলৌ॥

ইতি গারুড়ে

আরও

চৈত্রে মাসি সিতেপক্ষে তৃতীয়ায়াং রমাপতিম্।
দোলারূঢ়ং তমভ্যর্চ্চ্য মাসমান্দোলয়েৎ কলৌ॥

ইতি হরিভক্তিবিলাসে

শ্রী বিজয়কৃষ্ণ রায়

(৩১)

ময়মনসিংহের বাক্যাবলী

(ক) বউ পড়া—আমাদের অঞ্চলে বিবাহের পরদিন বর যখন বধূসহ ঘরে ফিরিয়া আসে তখন যাত্রা হয়; অর্থাৎ বর-বধূকে বরণ করিয়া ঘরে আনা হয়। বাহিরে মাঙ্গলিক দ্রব্য সহ যাত্রা হইয়া গেলে মা এবং মাতৃ-স্থানীয়া আর-একজন দরজায় দুইটি পিঁড়িতে উপবেশন করেন। তৎপর বর ও বধূকে আনিয়া তাহাদের কোলে কিছুক্ষণ বসানো হয়। ইহার তাৎপর্য্য এই, মা আদর করিয়া পুত্রের সহিত পুত্র-বধূকে চিরদিনের জন্য ঘরে আনিলেন। বউপড়া—বধূকে বরণ করিয়া ঘরে আনা।

(খ) করিবা আমার কাজ হইয়া 'সামনি।'

সামনি—সম্মুখীন।

সম্মুখ=সাম্‌নে

সম্মুখীন—সাম্‌নিয়া—সাম্‌নি।

তুমি সম্মুখে থাকিয়া আমার কাজ করিবা।

শ্রী ফণীন্দ্রকুমার অধিকারী

পুস্তক-পরিচয়

শ্রীঅরবিন্দের গীতা—শ্রী অনিলবরণ রায়। প্রকাশক সারথি-কার্য্যালয়। মূল্য ১৷০।

পুস্তকখানি আমি যত্ন-সহকারে পাঠ করিয়াছি। যনামখ্যাত অরবিন্দ ঘোষ মহাশয় ভগবদ্‌গীতার ব্যাখ্যান ও বিবৃতি করিয়া যে ইংরেজি-পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন, অনিলবরণ-বাবুর গ্রন্থ সেই পুস্তকের অনুবাদ। এ অনুবাদকার্য্যে গ্রন্থকার বেশ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন—কারণ গ্রন্থ পড়িয়া অনেক স্থলেই ইহা অনুবাদ বলিয়া অনুভব হয় না।

বর্ত্তমান যুগে আমাদের জাতীয় জীবন-গঠনে গীতার বিশেষ উপ-যোগিতা আছে—অতএব গীতার যতই আলোচনা ও অনুশীলন হয় ততই ভাল। বিশেষতঃ সে-আলোচনা যদি শ্রীঅরবিন্দের মত সাধনোজ্জ্বলা বুদ্ধির দ্বারা সম্পন্ন হয় তবে তাহার সার্থকতা সমধিক। জিজ্ঞাসু পাঠক এই গ্রন্থ পাঠে গীতার অনেক মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিতে পারিবেন এবং গীতা-রহস্যের অনেক প্রচ্ছন্ন গুহা নবালোকে উদ্‌ভাসিত দেখিবেন। একজন সৎপুরুষ গীতার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—It has several octaves of meaning (গীতার্থের কয়েকটি বিভিন্ন স্তর বা গ্রাম আছে)।

আমরা যেমন-যেমন সাধনার উচ্চতর গ্রামে উঠিব, গীতার নবতর ভাব তেমনি আমাদের চিত্তে ফুটিয়া উঠিবে। গীতা-সম্পর্কে শেষ কথা এখনও বলা হয় নাই—ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা। কিন্তু একথা ঠিক যে, এই 'শ্রীঅরবিন্দের গীতায়' অনেক নূতন কথা নূতনভাবে বলা হইয়াছে।

শ্রী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

মোগল বিদুষী—লেখক শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২য় সংস্করণ। ৯০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৷৵০।

ইহাতে বাবর বাদসাহের কন্যা গুল্‌বদন এবং আওরংজীব বাদসাহের কন্যা জেব্-উন্-নিসা, এই দুই মহিলার চরিত কীর্ত্তিত হইয়াছে। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, গুল্‌বদন "যথাক্রমে বাবর, হুমায়ুন ও আকবর—মোগলের এই তিন পুরুষের অভ্যুদয়, ভাগ্য-বিপর্য্যয় এবং প্রতিষ্ঠা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া মানব-জীবনের অপরিসীম অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের সুযোগ পাইয়াছিলেন।......গুল্‌বদনের জীবনী, শুধু ব্যক্তিগত জীবন-কথা নহে—ইতিহাস—মোগল সাম্রাজ্যের প্রথম ও প্রধান কাহিনী।" দেখিতেছি তাই; গ্রন্থকার গুল্‌বদনকে আশ্রয় করিয়া তিন মোগল বাদসাহের রাজত্ব বর্ণনা করিয়াছেন। জেব্-উন্-নিসার ইতিহাস অল্প, চরিত আরও অল্প।

আমি ঐতিহাসিক নই, সামান্য পাঠক। কোন্ বাদসাহের কত জন

বেগম ছিলেন, তাঁহাদের নাম-ধাম ও সন্তান-সন্ততি কি ছিল, ইত্যাদি শুনিবার আমার প্রয়োজন নাই, সুতরাং অবসরও নাই। কিন্তু সে-কালের বাদশাহজাদীরা কি করিয়া দিন কাটাইতেন; রাজ্যশাসনে তাঁহারা কিছু করিতে পাইতেন কি না; মানব-চরিত্রের যে অগণ্য অর্থ আছে, তাঁহাদের ভাগ্যে কোন্ অর্থ লাভ হইয়াছিল;—ইত্যাদি কাহিনী জানাইতে পারিলে শ্রোতার অভাব হয় না। গ্রন্থকার ইতিহাস লিখিয়াছেন; বোধ হয় উপাদানের অভাবে অর্থযুক্ত বৃত্ত রচিতে পারেন নাই, অত্যল্প হইলেও জেব্-উন্-নিসার মানব-চরিত পাইতেছি। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, জেব-উন্-নিসা "পবিত্র কুসুম, রমণী-রত্ন" ছিলেন। কোরান্ তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল, "আরবীয় ধর্ম্মতত্ত্বে তিনি ব্যুৎপন্ন ছিলেন।" কিন্তু দেখিতেছি, তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতা আক্‌বরের সহিত যোগ দিয়া পিতার বিদ্রোহী হইয়াছিলেন, ৬৪বৎসর-জীবনের শেষ ২২ বৎসর আওরংজীবের আদেশে কারায় রুদ্ধ ছিলেন।

গুল্‌বদন বিবাহিতা হইয়াছিলেন। জেব-উন্-নিসা হন নাই। গ্রন্থকার বলেন, ইনি "সৌন্দর্য্যের ললামভূতা" ও কবি ছিলেন। ইনি "বিদ্যা-চর্চ্চা-নিরতা, নিষ্ঠাবতী, নির্ম্মল-স্বভাবা" ছিলেন। দুঃখের বিষয় কল্পনাজীবীরা ইঁহার "অকলঙ্ক নির্ম্মল মূর্ত্তি ঘোর মসীবর্ণে চিত্রিত" করিয়াছেন। গ্রন্থকার ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন, কিন্তু কুপিত হইয়া পড়িয়াছেন। এখানে এবং গ্রন্থের প্রায় সর্ব্বত্র তিনি "যুনা" ঐতিহাসিক হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। যদি বাদ-প্রতিবাদ ও সন তারিখ লইয়া বসি, যদি প্রতিবাদের আশঙ্কায় পদে-পদে প্রমাণ তুলিতে থাকি, তাহা হইলে পাঠকের ধৈর্য্য ধারণ দুষ্কর হইয়া উঠে। বোধ হয় এই কারণে এবং অত্যুক্তি-হেতু তাঁহার প্রতিবাদে প্রত্যয় হইতেছে না।

গ্রন্থের নাম "মোগল বিদুষী" এবং গ্রন্থকার পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন, গুল্‌বদন ও জেব্-উন্ নিসা বিদুষী ছিলেন। কিন্তু বিদ্যার পরিচয় না পাইলে পাঠকের তৃপ্তি হয় না। গুল্‌বদন "হুমায়ুন-নামা" লিখিয়াছিলেন। কিন্তু গ্রন্থকার বলেন, এই পুস্তক "সাহিত্য-হিসাবে রচিত হয় নাই"। জেব্-উন্ নিসার রচিত কবিতা "খুঁজিয়া বাহির করিবার উপায় নাই"। এই অবস্থায় "বিদুষী"—এই নামেও যেন সন্দেহ হয়।

বইখানি ইস্কুলের পাঠ্য নহে, নামজাদা লেখকের রসাল উপন্যাসও নহে। অথচ দেখিতেছি, পাঁচ বৎসরের মধ্যে প্রথম সংস্করণ বিক্রী হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যের বাজারে নূতন খবর বটে। ব্রজেন্দ্র বাবু মোগলরাজত্বসময়ের এক-এক চরিত্র লইয়া পাঠককে সে-কালের ইতিহাস শোনাইবার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। এরূপ পুস্তক প্রচার দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্য সমৃদ্ধ হইতেছে, এবং হিন্দু মুসলমানের মিলনের সোপানও নির্ম্মিত হইতেছে।

শ্রী যোগেশচন্দ্র রায়

ভারতে জাতীয় আন্দোলন—শ্রী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (গ্রন্থাগারিক, বিশ্বভারতী) প্রণীত। প্রকাশক বরদা এজেন্সি, ১২।১ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা। মূল্য ২৷৹ আড়াই টাকা। (১৩৩১)

এই পুস্তকখানি চার খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে জাতীয় আন্দোলনের অভিব্যক্তি, দ্বিতীয় খণ্ডে ভারতে বিপ্লববাদের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ডে মোস্‌লেম ভারত, চতুর্থ খণ্ডে প্রবাসী ভারতবাসীর কথা আলোচিত হইয়াছে। ইংরেজ আমলের প্রথম হইতে এদেশে কিরূপে দেশের লোকের মনে নিজেদের অবস্থা-সম্বন্ধে চৈতন্যসঞ্চার হইতে লাগিল ও কিরূপে দেশে রাজনীতিক আন্দোলন আরম্ভ হইল তাহার ইতিহাস হইতে আধুনিক কালের অসহযোগ আন্দোলন পর্য্যন্ত ইহাতে দেশীয় লোকের রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টার কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এইহিসাবে বইখানি বাংলা ভাষার একটি অভাব পূরণ করিয়াছে। সেজন্য লেখক ধন্যবাদার্হ। লেখক অনেক পুস্তকাদি ঘাঁটিয়াছেন ও প্রাচীনকালের অনেক বিস্মৃত ও অর্দ্ধ-বিস্মৃত তথ্য তাহা হইতে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন। খিলাফতের ও প্রবাসী ভারতবাসীর ইতিহাস এধরণের আর-কোনো পুস্তকে এপর্য্যন্ত এরূপভাবে আলোচিত হয় নাই।

তবে মফঃস্বলে থাকিয়া পুস্তকরচনা করিতে হইয়াছে বলিয়া লেখক ভালো করিয়া সমসাময়িক দৈনিক কাগজের ফাইল দেখিবার অবকাশ পান নাই। তাই ঘটনার পর্য্যায়ক্রমে ও অন্যান্য বিষয়ে তাঁহার পুস্তকে ত্রুটি রহিয়া গেছে। স্থানাভাবে এখানে মাত্র দু একটির উল্লেখ করিতেছি। ৪৬ পৃষ্ঠায় লেখা আছে—"শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় 'সঞ্জীবনী'পত্রিকায় বিলাতী দ্রব্য বয়কট করিবার কথা প্রস্তাব করিলেন"। তৎকালীন সাময়িক পত্রিকা খুঁজিলেই পাওয়া যাইবে যে মফঃস্বলের এক ভদ্রলোক সংবাদ-পত্রে চিঠি লিখিয়া প্রথম প্রস্তাব করেন ও পরে সুরেন্দ্রনাথ, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতি নেতারা পরামর্শ করিয়া বয়কট ঘোষণা করেন। ১৩১২ সালে ৩০শে আশ্বিন যে-সব অনুষ্ঠান ব্যবস্থিত হয় তাহার মধ্যে অরন্ধনের ব্যবস্থার উল্লেখ নাই। ৺রামেন্দ্রসুন্দর এই অঙ্গটি যোগ করিয়াছিলেন ও এই উপলক্ষে 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রত-কথা' লিখিয়াছিলেন। ৫৫ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, 'রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে শিবাজী উৎসব সম্বন্ধে যে-কবিতা লেখেন' ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের কবিতা কলিকাতায় শিবাজী উৎসব প্রথম যখন আরম্ভ হয় তখনকার লেখা, ভবানীপূজা ও শিবাজী উৎসব-উপলক্ষে তিলক ও খাপার্দ্দে যখন কলিকাতায় আসেন তখনকার নয়। ৫৮ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, "বিচারালয়ে বিপিন-বাবু ইংরেজের কোর্টে সাক্ষী দিবেন বলেন।" প্রথমত, এখানে একটি "না" যোগ হইবে। দ্বিতীয়ত, বিপিন-বাবুর আপত্তি ছিল বিবেক-সম্পর্কিত (conscientious scruples)। ইংরেজ আদালত বলিয়া কোনো আপত্তি তিনি তোলেন নাই। লেখক এখানে উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের মামলার সহিত বিপিন-বাবুর মামলা মিশাইয়া ফেলিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়।

অসহযোগ আন্দোলন এত হালের ব্যাপার যে তাহা লইয়া ইতিহাস রচিত হইবার সময় আসে নাই; তাই তাঁহার বর্ণনা অনেক স্থানে সমীচীন হয় নাই।

বইখানিকে লেখক ইতিহাস বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু ইহা যেন একপ্রকার বর্ষপঞ্জী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পঞ্চম পর্ব্বে নূতন আইনের (Ordinance) সব ব্যবস্থার অনুবাদ ও গান্ধী-নেহেরু-দাশ সন্ধিপত্রের বিস্তৃত বিবরণের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই এ-কথা বুঝা যাইবে।

পুস্তকখানির কিছু-কিছু ত্রুটির উল্লেখ করিয়া তাহার অন্যান্য গুণের কিছুমাত্র লাঘব করা এই পুস্তক-পরিচয়-লেখকের উদ্দেশ্য নয়। ভবিষ্যৎ সংস্করণে এইরূপ ত্রুটি যাহাতে না থাকে তাহাই বাঞ্ছনীয়। এ-পুস্তকের বহুলপ্রচার সর্ব্বদাই প্রার্থনীয়। প্রুফ দেখার দোষের জন্য লেখক দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে লইলেও অনেক ভুলই ভালো প্রুফ না-দেখিতে পারার দরুন্ হয় নাই, কারণ ভুলগুলি বরাবরই একরকমের। আশা করি দ্বিতীয় সংস্করণে বইখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে।

সন্দ্বীপের ইতিহাস—শ্রী রাজকুমার চক্রবর্ত্তী, এম্ এ বি এল্, ও শ্রী আনন্দমোহন দাস প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—রায় অ্যাণ্ড রায়চৌধুরী, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। মূল্য ছয় সিকা মাত্র। ১৩৩০।

পুস্তকের ভূমিকা-লেখক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় যথার্থই লিখিয়াছেন:—"বর্ত্তমান এই পূর্ণাবয়ব ইতিহাস প্রকাশের পূর্ব্বে সন্দ্বীপ-ইতিহাসের ছিটাফোঁটা পুস্তকে বা প্রবন্ধে

কোথাও-কোথাও পাওয়া যাইত মাত্র। একজায়গায় সন্দীপের সকল খবর এই নূতন। ইহাতে যে ভুলভ্রান্তি নাই, একথা বলি না। প্রথম উদ্যম 'সকল সময় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় না।" "বর্ত্তমান গ্রন্থকারেরা সন্দীপের অধিবাসী। তাঁহারা নিজেরা অনুসন্ধান করিয়া সন্দীপের নানা সম্প্রদায়ের অতীত ও বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থা, সন্দীপে শিক্ষা ও সাহিত্যের আরম্ভ ও বিস্তার এবং সেইখানকার কৃষিশিল্প ও বাণিজ্য-বিষয়ক যাবতীয় সংবাদ আমাদিগকে দিয়াছেন।"

মোটের উপর ইহা বলিতে পারা যায় যে, পুস্তকখানি পাঠ করিলে সন্দীপ-সম্বন্ধে আধুনিকতম কাল পর্য্যন্ত খুঁটিনাটি অনেক তথ্য জানিতে পারা যায়।

অ. ঘ.

প্রহ্লাদ—শ্রী রেবতীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক শ্রী পরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ২০৬ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম দেড় টাকা।

অমিত্রাক্ষর ছন্দে পুণ্যচরিত প্রহ্লাদের জীবন-কথা। প্রহ্লাদচরিত্রের প্রতি যে-শ্রদ্ধা ব্যক্ত হইয়াছে তাহা প্রশংসনীয়। কিন্তু বইটি কাব্য হয় নাই,—ছন্দ কটমট, রচনা ভারাক্রান্ত। অতিমাত্রায় ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝাইতে গিয়া কাব্য মারা পড়িয়াছে।

অভিজ্ঞানশকুন্তলা—শ্রী কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় বি-এ কর্ত্তৃক অনূদিত। দেওয়ান সিনিয়র, সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া। দাম এক টাকা।

কালিদাসের শকুন্তলার বঙ্গানুবাদ পদ্যে ও গদ্যে। অনুবাদ সরল হয় নাই। পদ্য অনুবাদ একেবারে ব্যর্থ অ-বোধগম্য। গদ্য অনুবাদ চলনসই।

মিবার-কলঙ্ক—শ্রী নরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক পুলিশ ড্রামাটিক্ ক্লাব, মেদিনীপুর। দাম বারো আনা।

প্রসিদ্ধ বিক্রমসিংহ, বনবীর ও ধাত্রী পান্নার কাহিনী অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। স্থানে-স্থানে অনাবশ্যক উচ্ছ্বাস আছে। তবে লেখা একবারে কবিত্ববর্জ্জিত নয়।

পরীরাণী বা স্পেন্সারের গল্প—শ্রী শরৎচন্দ্র ঘোষ, এম্ এ সঙ্কলিত। গোল্ড্ কুইন্ অ্যাণ্ড্ কোং, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। দাম ছয় আনা।

স্পেন্সারের The Faerie Queene কাব্যের অনুবাদ। বিদেশী সাহিত্য, বিশেষ করিয়া ইংরেজি-সাহিত্য হইতে লইবার জিনিস অনেক আছে। সেইহিসাবে সঙ্কলয়িতার চেষ্টা প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু তাঁহার অনুবাদ সরল ও স্বাভাবিক হয় নাই। চলিত কথায় তাঁহার দখল নাই; সেইজন্য ভাষার দোষ আছে।

টুকটুকে রামায়ণ—শ্রী নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। ১৬৬ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে প্রকাশিত। মূল্য দেড় টাকা।

কবিতায় সপ্তকাণ্ড রামায়ণ ছেলেদের উপযোগী করিয়া রচিত। নবকৃষ্ণ-বাবু বঙ্কিম-আমলের লোক এবং তাঁহার "শিশুরঞ্জন রামায়ণ" বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশংসিত সুবিখ্যাত শিশুগ্রন্থ। আলোচ্য রামায়ণখানি দ্বিতীয় সংস্করণের। বইখানিতে প্রচুর ছবি আছে এবং ছবিগুলি ছেলেদের চিত্তাকর্ষক। বইটির বিশেষত্ব এই—ইহা সর্ব্বতোভাবে বাল্মীকির রামায়ণের অনুসরণে রচিত। বাল্মীকির রামায়ণের সহিত ছেলেদের পরিচয় হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ-বিষয়ে বইটি মূল্যবান্। অস্বাভাবিকতা ও কৃত্রিমতা-বর্জ্জিত বলিয়া ইহা অসঙ্কোচে ছেলেদের হাতে দেওয়া যায়। রামায়ণের কথা এমনভাবে সংক্ষিপ্ত করা হইয়াছে, যাহাতে কাহিনীর কোনোই অঙ্গহানি হয় নাই, অথচ তাহা অনাড়ম্বর সরল মূর্ত্তিতে সরসভাবে ছেলেদের চিত্তহারী হইয়াছে, বয়স্কদেরও কম আনন্দ দেয় না। কবিতার ভাষা সরল, প্রাঞ্জল; ছন্দ ছেলেদের উপযোগী। বইটি এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর যে, ইহার সুদীর্ঘ পরিচয় দিবার লোভ হয়; কিন্তু আমাদের স্থানাভাব। ছেলেদের জন্য কবিতায় আজ অবধি যতগুলি রামায়ণ বাহির হইয়াছে, সে-সমস্তগুলির মধ্যে এখানিকে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ বলা যাইতে পারে। এমন একখানি পুস্তক বাহির করিয়া বসুমতী সাহিত্য-মন্দির সর্ব্বসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

এ-যুগের দাসত্ব—শ্রী দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ১২।১ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা, বরদা এজেন্সী হইতে প্রকাশিত। দাম আট আনা।

টলস্টয়ের প্রসিদ্ধ পুস্তক Slavery of Our Times অবলম্বনে ইহা রচিত। আধুনিক কালে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের সমস্যা হইতেছে শ্রমজীবী-সমস্যা, অর্থাৎ দরিদ্রদের সমস্যা। ইহার সমাধানে সকল দেশের মনীষীরাই ব্যস্ত। সুতরাং এ-বিষয়ে যত চিন্তা ও আলোচনা হয় ততই ভালো। লেখক টলস্টয়ের চিন্তা অবলম্বন করিয়া নিজের আন্তরিকতায় বক্তব্য আরো পরিস্ফুট করিয়াছেন। বইখানি সুপাঠ্য এবং চিন্তনীয় বিষয়ে পূর্ণ।

চর্‌খার গান—শ্রী হেমেন্দ্রলাল রায় প্রণীত। প্রকাশক খাদি প্রতিষ্ঠান, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

কয়েকটি গানে চর্‌খার গুণকীর্ত্তন। গানগুলি খুব ভালোও নয়, মন্দও নয়—মাঝামাঝি-ধরণের। পুস্তিকার শেষে খাদি-প্রতিষ্ঠান-সম্বন্ধে কতকগুলি জ্ঞাতব্য বিষয় আছে।

ছেলেদের টলষ্টয়—শ্রী অক্ষয়কুমার রায়, বি-এ, বি-টি, প্রণীত। ঢাকা, রিপন লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। আট আনা।

টলস্টয় আধুনিক কালের যুগ-প্রবর্ত্তক মনীষীগণের অন্যতম ঋষিকল্প ব্যক্তি। বাল্যে ও যৌবনে নানারূপ বিরুদ্ধ লোভপঙ্কিল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিতে-করিতে একমাত্র আপনার তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্বলিত ভক্তিবলের সাহায্যে টলস্টয় আপনার জীবনকে উচ্চতম আদর্শ ভূমিতে উন্নীত করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনে শিক্ষণীয় ও অনুকরণীয় জিনিষ প্রচুর। এমন জীবন বালকবালিকাদের নিকট সম্পূর্ণ বিবৃতিযোগ্য। এ-পুস্তকে গ্রন্থকার টলস্টয়ের জীবন কথা লিখিয়া, লোকসেবা যে ঈশ্বর-লাভের উপায়—এইসম্বন্ধীয় টলস্টয়ের কয়েকটি গল্প ছেলেদের উপযোগী করিয়া অনুবাদ করিয়াছেন। পুস্তকটি সুন্দর হইয়াছে। এখানি বিদ্যালয়ের পাঠ্য হইলে ছেলেরা মনীষী টলস্টয় ও তাঁহার রচনার পরিচয় লাভ করিবার সুযোগ পাইবে।

প্রাথমিক প্রতিবিধান—শ্রী সুধীরচন্দ্র মজুমদার, বি-এ, প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান ষ্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরী, ৫৭ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। এক টাকা।

আকস্মিক বিপদ্-আপদ্ মানুষের প্রায় নিত্যসঙ্গী। তাহার প্রতিবিধানের মোটামুটি কয়েকটি প্রাথমিক তত্ত্ব জানিয়া রাখিলে গুরুতর কষ্টের খানিকটা লাঘব করিতে পারা যায়। আলোচ্য বইখানিতে আকস্মিক বিপদ্-আপদের প্রাথমিক প্রতিকারের কতকগুলি মূল্যবান্

নির্দেশ আছে। এ-নির্দেশগুলি পালন করিলে ডাক্তারের খরচ অনেকটা কমানো যায়। বইখানিকে সাধারণে উপকারী মনে করিয়াছে;—তাহার প্রমাণ এখানির দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে। প্রত্যেক গৃহস্থের এ-পুস্তক একখানি করিয়া ঘরে রাখা দরকার—এটি এম্‌নি প্রয়োজনীয় ও বিপদ্-বন্ধু।

ভারত-পথিক-সহায়—শ্রী সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম টি ডি (শিকাগো), এম-আর-এ-এস (লণ্ডন), ইত্যাদি, প্রণীত। প্রকাশক শ্রী হেমচন্দ্র আচার্য্য, মডেল লাইব্রেরী, ঢাকা ও ময়মনসিংহ। দুই টাকা।

নাম হইতেই বুঝা যাইবে—ভারতের নানা স্থানে যাঁহারা পথিকরূপে ঘুরিবেন বইটি তাঁহাদের সহায়ক, অর্থাৎ গাইড্-বুক। কলিকাতা হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত ভারতের উত্তর সীমায় প্রধান দেশগুলির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে; সে-দেশগুলিতে দ্রষ্টব্য স্থান কি কি, কোন্ পথে যাইতে হয়, স্থানগুলির ঐতিহাসিক তথ্য, প্রভৃতি অভিজ্ঞাতব্য বিষয় সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। বিবরণে অনাবশ্যক উচ্ছ্বাস বা কবিত্ব নাই; পথিকের অনুসন্ধিৎসা-তৃপ্তিকর দরকারী কথাগুলি আছে; এইজন্ত বইটি গাইড্‌বুক বলিতে যাহা বুঝায়, যথার্থই তাহা হইয়াছে। ভারত ভ্রমণ-বিষয়ক প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড পুস্তক বাংলা ভাষায় আছে; তাহা সঙ্গে লইয়া ভ্রমণ করা অসম্ভব। বর্ত্তমান বইটি আকারে ছোটো, প্রায় ২৫০ পৃষ্ঠার। এজন্ত ইহা সঙ্গে লইয়া ভ্রমণ করা কষ্টকর নয়, এবং ভ্রমণ-সুবিধার যে সব নির্দ্দেশ ইহাতে আছে তাহা ভারত ভ্রমণকারীকে যথার্থই সহায়তা করিবে। বর্ণনা আড়ম্বরবর্জ্জিত, ভাষা সরল, পরিচয় সংক্ষিপ্ত—বইটির এই বিশেষত্ব বিশেষভাবে চোখে পড়ে। বইটির আরো তিনটি ভাগ প্রকাশিত হইবে, তাহাতে ভারতের অপর তিন দিককার প্রধান স্থানগুলির পরিচয় থাকিবে। আশা করি প্রকাশক-মহাশয় সেগুলি বাহির করিতে বিলম্ব করিবেন না।

গুপ্ত

রিক্তা—শ্রী নীহারবালা দেবী। ইণ্ডিয়ান পাব্‌লিশিং হাউস, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

এই উপন্যাসখানি আমাদের ভালো লাগিয়াছে। একটি অতি মনোরম গল্প সুন্দর ভাষায় সহজ করিয়া বলা হইয়াছে। সবিতার চরিত্র আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি আকর্ষণ করে। 'মেনকা'ও দোষে গুণে সুন্দর, তবে সবিতা 'দিদি'র সুরমাকে ও অরুণ অমরকে বিশেষভাবে স্মরণ করাইয়া দেয়। লেখিকার ভাষার উপর সত্যই দখল আছে।

মুখরক্ষা—শ্রী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক নারায়ণ সাহিত্য-মন্দির, বাগবাজার, কলিকাতা।

ভাগ্যক্রমে প্রসিদ্ধ উপন্যাসিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নামটি প্রাপ্ত হইয়াই সম্ভবত লেখক উপন্যাস লিখিতে সুরু করিয়াছেন। এক নাম-মাহাত্ম্য ছাড়া বইটির প্রশংসা করিবার কিছুই নাই। সুপ্রসিদ্ধ শরৎ-বাবুকে অনুকরণ করিবার ব্যর্থ প্রয়াস ছত্রে-ছত্রে প্রকাশ পাইতেছে; লেখকের নামসইটিও শরৎবাবুর মতো—তাহাতে আসল শরৎবাবুর ভয় পাইবার যথেষ্ট কারণ আছে।

রেণুকণা—শ্রীমতী শৈলবালা দেবী। সেন রায় অ্যাণ্ড্ কোং, কর্ণওয়ালিস বিল্ডিংস্ এবং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য বারো আনা।

ইহা একটি কবিতা-পুস্তক। রেণু ও কণা এই দুই ভাগে বিভক্ত। রেণু সম্ভবত গান-হিসাবে লেখা। মনে হয় লেখিকা রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির সহিত পাল্লা দিতে চাহিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের এক-একটি গান লেখিকা নিজের অবোধ্য ভাষায় বিশ্রী ছন্দে লিখিয়াছেন। লেখিকা যদি সাহিত্য-ক্ষেত্রে নূতন অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। তবে অবশ্য ভাঙা-ভাঙা ছন্দের মধ্যে ভবিষ্যতের কিছু ভরসা আছে। নতুবা ইহা অপাঠ্য।

১। ভিনিসের বণিক্ ১৲ ২। ম্যাকবেথ ১৲

শ্রী আশুতোষ ঘোষ, এল্-এম্-এস্ কর্ত্তৃক শেক্‌স্পীয়রের মারচেন্ট্ অভ্ ভিনিস্ ও ম্যাকবেথের অমিত্রাক্ষর ছন্দে অনুবাদ। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড্ সন্স্, কলিকাতা।

অমিত্রাক্ষর ছন্দে শেক্‌স্পীয়রের অনুবাদের চেষ্টা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু অবোধ্য গদ্যভাঙা ছন্দে বিশ্ববিশ্রুত কবিকে এমনভাবে বধ করিয়া লেখক সৎসাহসের পরিচয় দেন নাই। মাঝে-মাঝে পড়িতে-পড়িতে হাঁপাইয়া উঠিতে হয়; এবং বলিতে ইচ্ছা হয় Shakespeare thou art translated! বাংলা-ভাষা কতদূর কদর্য্য হইতে পারে তাহার নমুনা পাইতে হইলে এই দুইটি কাব্যের যে-কোনো স্থান পাঠ করুন।

স

The Economic History of Ancient India (প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস)—নেপাল ত্রিভুবনচন্দ্র কলেজের অধ্যাপক শ্রী সন্তোষকুমার দাস প্রণীত। গ্রন্থকার কর্ত্তৃক ৫।২ নং অন্নদা দত্ত লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য তিন টাকা।

ঋগ্বেদের যুগেও যে প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা বেশ জটিল ছিল একথা প্রাচীন-ভারত-ইতিহাস-লেখকেরা অনেকে স্বীকার করেন না। অনেক শিক্ষিত ভারতবাসী তৎকালীন অর্থনৈতিক-সমস্যাগুলি-সম্বন্ধে কোনো বিশেষ সংবাদ রাখেন না। এই পুস্তকখানিতে অধ্যাপক দাস ভারতবর্ষের অতি প্রাচীন যুগ হইতে রাজা হর্ষের যুগ পর্য্যন্ত ভারতীয় অর্থনৈতিক ইতিহাস প্রণালীবদ্ধভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এই তথ্যপূর্ণ গ্রন্থখানির যে আদর হইবে একথা আমরা নিঃসন্দেহেই বলিতে পারি।

অ

মহারাষ্ট্র—শ্রী সুধীরনাথ রাহা প্রণীত। মূল্য ১।০। প্রাপ্তিস্থান পাল ভট্টাচার্য্য অ্যাণ্ড্ কোং, ২১ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ইহা একখানি পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটক। লেখক বর্ত্তমান কালোপযোগী করিয়া নাটকখানি রচনা করিয়াছেন। তাঁহার রচনাভঙ্গী প্রশংসনীয়। বইখানির ছাপা ভালো হইয়াছে।

প্র

Ghosal's Pocket Dictionary—J Ghosal. Price Re. 1-৪-0. এই অভিধানখানি অল্পবয়স্ক ছাত্রছাত্রীদের ক্লাশের পড়ার বিশেষ সাহায্য করিবে। গ্রন্থকার অভিধানখানিকে (ইংরেজি-বাংলা) যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া সুন্দর এবং সুযুক্ত করিয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থখানি দ্বিতীয় সংস্করণ—ইহাতেই বইখানি যে ছাত্র-মহলে আদর লাভ করিয়াছে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। বইখানির ছাপা ও বাঁধাই মন্দ হয় নাই; কিন্তু দাম অত্যন্ত বেশী হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

সুপ্রভাত (উপন্যাস)—শ্রী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। নারায়ণ সাহিত্য-মন্দির, ৮ নং রাধামাধব গোস্বামী লেন, কলিকাতা। দাম ১৲।

এই গ্রন্থকারের প্রথম দুই-একখানি বই ভালো লাগিয়াছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে গ্রন্থকার যাহা লিখিতেছেন, তাহার প্রশংসা কোনো-প্রকারেই করা যায় না। সমালোচ্য উপন্যাসটি কোনো-রকমে শেষ পর্যন্ত পড়া যায়। প্লট মামুলি। বইখানির দাম ১৲ দেখিয়া মনে হয় ইহা বিক্রয় করিবার জন্য ছাপানো হয় নাই।

লাল পতাকা (উপন্যাস)—শ্রী সন্তোষকুমার দত্ত। দাম এক-টাকা। গুরুদাস-বাবুর দোকান।

এইপ্রকার উপন্যাস না লিখিলেও চলিত। লেখক যদি এই সৎ-পরামর্শ গ্রহণ করেন তবে তাঁহার অনেক অর্থ এবং পরিশ্রম বাঁচিয়া যাইবে—তাহা দেশের জন্য ভালো কাজে লাগিতে পারে।

ব্যথার শেষ—শ্রী সুশীলকুমার শীল প্রণীত। দাম ১৲।

এই বইখানিও উপন্যাস। চলনসই; বিশেষ বলিবার মতন কিছুই নাই। দাম চার আনা হইলে শোভন হইত।

সোনালি—শ্রী ব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। দাম দেড় টাকা।

উপন্যাস। প্লটটিকে টানিয়া অনাবশ্যক লম্বা করা হইয়াছে। এত লম্বা হইয়া বইখানি পাঠকের ক্লান্তিকর হইয়াছে। প্রথম দিকটা পড়িতে বেশ লাগে—কিন্তু শেষের দিকে বড় একঘেয়ে হইয়া যায়। উপন্যাসের নায়িকার চরিত্রও মাঝে-মাঝে বিষম অস্বাভাবিক হওয়াতে সৌন্দর্য্যহানি হইয়াছে।

ছোটদের বঙ্কিম—(১) দেবী চৌধুরাণী ১৲, (২) আনন্দমঠ ৸৴০। শ্রী শিশিরকুমার নিয়োগী সম্পাদিত।

বঙ্কিমবাবুর সমস্ত পুস্তক ছেলেমেয়েদের হাতে নিঃসঙ্কোচে দেওয়া যায় না। শিশিরবাবু আপত্তিজনক অংশগুলিকে পরিবর্ত্তন করিয়া বা বাদ দিয়া বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসগুলিকে বাংলা দেশের ছেলেমেয়েদের হাতে দিবার যোগ্য করিয়া সকল ছেলেমেয়ের এবং তাহাদের পিতামাতাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। বইগুলির বাঁধাই এবং ছাপাও নয়নরঞ্জন হইয়াছে। বইগুলি-সম্বন্ধে কেবল একটি কথা আপত্তি করিবার আছে। এইসকল শিশুপাঠ্য পুস্তকের দাম আরো অনেক কম করিলে দরিদ্র ছেলেমেয়ে সকলে ইহা পড়িতে পারে।

ছত্রপতি শিবাজী—শ্রী ভবসিন্ধু দত্ত প্রণীত। ভট্টাচার্য্য অ্যাণ্ড সন্স, কলিকাতা। ২৲।

বাংলা ভাষায় শিবাজীর ইতিহাস বিশেষ নাই বলিলেই হয়। বর্ত্তমান আলোচ্য পুস্তকখানি বাংলা সাহিত্যের এই অভাব পূর্ণ করিবে। গ্রন্থকার প্রচুর পরিশ্রম করিয়া শিবাজী-সম্বন্ধীয় নানা পুস্তকের সাহায্য লইয়া গ্রন্থখানিকে মূল্যবান্ করিয়াছেন। গ্রন্থকারের বর্ণনাভঙ্গী চমৎকার। সমস্ত বইখানিতে ঘটনাবলির বর্ণনা অতি সুন্দরভাবে করা হইয়াছে। আমাদের দেশের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থা যে-রকম, তাহাতে শিবাজীর জীবনী পাঠের উপকারিতা অত্যধিক। আলোচ্য বইখানিতে শিবাজী-সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য যাহা-কিছু সবই জানা যাইবে। শিবাজী-সম্বন্ধে নূতন অনেক তথ্য এই বইখানিতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

বইখানিতে অনেক ছবি থাকাতে বইখানি সুখপাঠ্য হইয়াছে। ছবিগুলি চমৎকার এবং অতি যত্নের সহিত ছাপা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। বইখানির মলাটের উপর রঙীন ছবিখানি সুন্দর। বাঁধাই এবং ছাপা ভালো। বইখানিকে প্রাইজ ও পাঠ্যপুস্তকরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

ছোটপাতা (উপন্যাস)—শ্রী সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। রায় অ্যাণ্ড রায় চৌধুরী। কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। দাম দেড় টাকা।

ছোটো একটি জীবনের কাহিনী সুন্দরভাবে এবং ভাষায় লেখা। পড়িতে-পড়িতে মাঝে-মাঝে বিশাখার বেদনা যেন নিজের বেদনা বলিয়া মনে হয়। দরিদ্রের জীবনকে লেখক অতি চমৎকারভাবে পাঠকের সামনে ধরিয়াছেন। বইখানি আমাদের বেশ ভালো লাগিয়াছে। এক গাদা রাবিশ পড়িতে-পড়িতে এই বইখানি একটু আনন্দ দান করিল।

মনের ভ্রম (উপন্যাস)—শ্রী শ্যামাচরণ দে। দি বুক কোম্পানি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। দাম পাঁচ সিকা।

সামাজিক উপন্যাস-হিসাবে বইখানি মন্দ হয় নাই। কিছুকাল পূর্ব্বের বাঙ্গালা সমাজের চিত্রগুলি সুন্দর হইয়াছে। উপন্যাসের মূল প্লট মন্দ নয়; তবে বইখানিকে আরো-একটু ছোটো করিলে ভালো হইত। মাঝে-মাঝে এত একটানা লেখা হইয়াছে যে কিছুক্ষণ বিশ্রাম না করিয়া বইখানিকে পুনরায় পড়া অসম্ভব। দাম বড় বেশী। ছাপা এবং বাঁধাই ভালো।

লীলার শিক্ষা (উপন্যাস)—শ্রী শৈলবালা ঘোষজায়া। রায় অ্যাণ্ড রায় চৌধুরী, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। দাম ১৷০।

এই লেখিকার নাম আজকালকার বাংলা কেতাব পড়ুয়াদের জানা আছে। বর্ত্তমান বইখানি "ফিরিঙ্গী" সমাজের একটি চিত্র। অনুবাদ বলিয়া মনে হয়, তবে না হইতেও পারে। আগাগোড়া পড়িতে বেশ লাগিল।

কমলের দুঃখ (উপন্যাস)—শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত। রায় অ্যাণ্ড রায় চৌধুরী, কলিকাতা। দাম দুই টাকা।

গোড়ার দিকে পড়া একটু কষ্টকর, কিন্তু শেষের দিকে বইখানি বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। এই বইখানি একটু নূতন-ধরণে লেখা হইয়াছে। আগাগোড়া পত্র এবং পত্রোত্তর। এইভাবে গল্পের গোড়া পত্তন হইয়াছে, এইভাবে শেষও হইয়াছে। কিন্তু বইখানির যদি কিছু অংশ বাদ দেওয়া হইত তবে বইখানি আরো সুখপাঠ্য হইত।

অপূর্ণ (উপন্যাস)—শ্রী মাণিক ভট্টাচার্য্য। গুরুদাস-বাবুর দোকান। দাম দুই টাকা।

মাণিক-বাবুর বইএর নূতন পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন নাই। তবে তাঁহার উপন্যাস অপেক্ষা ছোটো গল্প ভালো। আলোচ্য উপন্যাস-খানি মন্দ নয়; তবে তাঁহার ছোটো গল্পের কাছে দাঁড়াইতে পারে না।

গ্রন্থকীট

ঝড়ের ফুল—শ্রী নির্ম্মল দেব প্রণীত। প্রকাশক রায় এম্ সি সরকার এণ্ড সন্স, কলিকাতা। মূল্য ১৷০। পৃ ২৪৭। ১৩৩২।

এই উপন্যাসখানিতে লেখক একটি অত্যাচারিতা রমণীর জীবন-কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। মধ্যে-মধ্যে অসঙ্গতি থাকিলেও লেখক চরিত্র-অঙ্কনে দক্ষতা দেখাইয়াছেন। আমরা তাঁহার নূতন উদ্যমের প্রশংসা করি। বইখানির ছাপা ও বাঁধা ভালো।

প্র

বামুন-বাগ্দী

শ্রী অরবিন্দ দত্ত

অষ্টম পরিচ্ছেদ

গণপতির স্ত্রীর নাম মহামায়া। ইনিই কলিকাতার ষ্টেশনে পীড়িতা হইয়াছিলেন। সাংসারিক জ্ঞান কানাই-লালের আদৌ ছিল না। মহামায়াকে ঘাঁটাল পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিলে যে তাহার কর্ত্তব্য ফুরায়, তাহা সে বুঝিয়া দেখিল না। সে তাহার মহেশ্বরী মায়ের মতন যে আর-একটি আশ্রয়স্থল পাইল, এইটাই সে বড় করিয়া বুঝিল। ভাবিয়া বসিল এই নবমাতৃ-গৃহেও তাহার বুঝি একটা অধিকার আছে। সপ্তাহ-কাল অতীত হইলেও যখন তাহার নড়িবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না, তখন শেষে মহামায়াই একদিন নলিনীকে ডাকিয়া বলিলেন, "দু'বেলা খালি-খালি সিধে-পত্তর গুছিয়ে দিবি, একটু পড়াশুনা করগে না কানাই-বাবুর কাছে?"

কানাইলালের গৃহস্থালীর সহযোগী হইয়া তাহার ভদ্র এবং শিষ্ট আচরণ নলিনীর বড় ভালো লাগিয়াছিল। সুতরাং তাহার নিকট পড়াশুনা করিতে নলিনীর বেশ কৌতূহল জন্মিল। কিন্তু তাহার মাতা যে ঢংএ কথাটি পাড়িলেন, তাহাতে তাহার মনে বড় আঘাত দিল. ক্ষণিকের উত্তেজনায় তাহার মুখখানা কিছু লাল হইয়া উঠিল। সে কহিল, "গুছিয়ে-গাছিয়ে দিই ব'লেই কি প'ড়ে-শু'নে মূল্য আদায় করতে হবে?"

মহামায়া অবাধে বলিলেন, "তিন রাত্রের বেশী এক-জায়গায় বাস করতে হ'লে ঐরকম একটা-কিছু হাতে না থাকলে উভয় দিক্‌কার মন অপরিষ্কার থেকে যায় যে।" সংসারের নিয়মমতন কথাই তিনি বলিয়াছিলেন।

নলিনী রাগিয়া কহিল, "তুমি অমন চেঁচামেচি ক'রে কথা বোলো না—শুনতে পাবেন যে! কিন্তু তুমি একথা কেমন ক'রে মুখে দিয়ে বের করলে, মা? ষ্টেশনে ওষুধ না পেলে যে ম'রে যেতে? সে-কথা কি এরি ভিতর ভু'লে গেছ?"

মহামায়া কিছু নরম হইয়া বলিলেন, "তা নয়। বাবুটি একা-একা ব'সে থাকেন, পড়া-শুনো নিয়ে না হয় দুটো গল্প করলি তাঁর সঙ্গে। তোরও লাভ; তাঁরও লাভ।"

নলিনী কহিল, "সে পৃথক্ কথা। তা'তে ত আমি আপত্তি করছিনে। কিন্তু তোমার কথার ধরণ ধারণ দেখ্‌লে যে গা জ্ব'লে যায়।"

মহামায়া আর কিছু বলিলেন না।

নলিনীর মনের উত্তেজনাটা আপনা-আপনি যখন থামিয়া গেল, তখন সে বই-দপ্তর লইয়া কানাইলালের নিকট হাজির হইল। কারণ পড়িবার উৎসাহ তাহার অসাধারণ-রকম ছিল, কানাই শিক্ষক হইলে ত কথাই নাই। কানাই তখন বিছানার উপর গড়াইতেছিল। নলিনীকে দেখিয়া উঠিয়া বসিল। বলিল, "মার সঙ্গে ঝগ্‌ড়া করছিলে বুঝি?"

নলিনী হাসিতে-হাসিতে গড়াইয়া পড়িল। বলিল, "মায়ে-ঝিয়ে বুঝি ঝগড়া করে? বেশ বুদ্ধি আপনার!"

কানাই অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে কথা বলছিলে কিনা—তাই।"

নলিনী ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি সব শুনতে পেয়েছেন? বেশ কান-দুটো ত আপনার! বলুন আমি কি বলেছি— মা কি বলেছেন?"

এই সরল জিজ্ঞাসার মধ্যেও বালিকা তাহার সন্দেহটি কাটিয়া-ছাটিয়া পরিষ্কার করিয়া তুলিবে এই প্রলোভন তাহার মনের মধ্যে ছিল।

কানাই বলিল, "তুমি চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে কথা বলছিলে না? তোমার কথাটাই বেশী শুনতে পেয়েছি। মা'র কথা অত শুনিনি। হাতে কি?"

"বই।"

"কেন?"

"মা বল্লেন আপনার কাছে পড়্তে। আপনি বেশ ভালো পড়াতে পারেন, না?"

বাড়ীর মধ্যের কোলাহলটি এইবার কানাইলালের নিকট বেশ পরিষ্কার হইয়া গেল। সবটা না শুনিয়া এতক্ষণ তাহার মন নানা সন্দেহে আকুল হইয়া উঠিতেছিল। সে আপনার মানসিক অবস্থা অনেকটা দমন করিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি বই পড়ো—দেখি?"

নলিনী দপ্তর খুলিয়া এক-একখানি বই তুলিয়া-তুলিয়া দেখাইতে লাগিল,—সাহিত্য ও নীতি—ভূগোল-প্রকাশ—স্বাস্থ্যতত্ত্ব— রচনা-শিক্ষা—পাক-প্রণালী—পূজা-বিধি—চাণক্য-শ্লোক।" একটু হাসিয়া কহিল, "অঙ্ক কিন্তু আমি মিশ্র-ভাগের বেশী পারিনে। আর আমাকে একটু-একটু ড্রয়িং শিখিয়ে দিতে হবে। বই একখানা আছে,—চায়ের পেয়ালা—বদ্না—আরো কত-কি ছাই-ভস্ম ও আবার কি আঁকে? আমি কিন্তু গাছ আঁক্‌ব—পাখী মানুষ এইসব আঁক্‌ব। আর সমুদ্রের কোলে সূর্য্য ওঠে সেটাও আঁক্‌তে বেশ লাগে।"

কানাই কহিল, "আঁক্‌তে ত আমি ভালো জানিনে।"

নলিনী আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "জানেন না? কেন আপনাদের শেখায়নি? আমি ঝাউ গাছ—বটগাছ—এই-সব আঁক্‌তে পারি। একটা-একটা গাছ এঁকে যখন শেষ ক'রে তুলি, তখন তা দে'খে মন কি-রকম মেতে ওঠে! বাবা—বসুমতী, ভারতবর্ষ, প্রবাসী, বাঁশরী এইসব মাসিক-পত্র নেন্ কিনা—তা'রই ছবিগুলো আঁক্‌তে আমার খুব মজা লাগে। দে'খে-দে'খে আঁক্‌তে যাই—এব্ড়ো-খেব্ড়ো হ'য়ে যায়, শিখিনি কিনা!"

বালিকার সরলতায় কানাইলালকে আবার প্রফুল্ল করিয়া তুলিল। সে শিক্ষকতার দেনা-পাওনা-হিসাবের কথা ভুলিয়া গেল। সে বলিল, "আচ্ছা' আমি যতটুকু পারি শিখিয়ে দেবো। দেখি, তুমি পড়াশুনা কেমন করো?"

কানাইলাল তখন এক-একখানি বই লইয়া নলিনীকে পরীক্ষা করিয়া দেখিল। তিনচারিটি অঙ্কও কষাইল। দেখিল বালিকা যাহা যতটুকু শিখিয়াছে তাহার মধ্যে বিশেষ-কিছু ত্রুটি নাই। সে তখন একটা নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি স্থির করিয়া লইয়া নলিনীকে পড়াইতে আরম্ভ করিল। এবং তাহার সুশিক্ষা-দানে নলিনী বেশ দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল। কিন্তু ইহাতেও মহামায়ার মন উঠিল না। নলিনী মেয়ে-সন্তান, পড়িলেও যা না পড়িলেও তা. তাহার পড়াশুনার বিনিময়ে কানাইলালের খোরাক জোগান দেওয়া, তাঁহার নিকট সঙ্গতি রক্ষা করিতে পারিল না—লোক্‌সানই ঠেকিতে লাগিল।

নলিনী নিজেদের রান্না-বান্না করিত, তাহারই মধ্যে সময় করিয়া লইয়া কানাইলালের রান্নার আয়োজন করিয়া দিত। এবং এক-একবার আসিয়া দর্‌কার-অদর্‌কার, কিছু বিশৃঙ্খলা হইতেছে কি না দেখিয়া-শুনিয়া যাইত। কেননা কানাইলালকে একমাত্র তাহারই পথ চাহিয়া থাকিতে হইত। মহামায়া মাঝে-মাঝে ঝাঁকুনি দিয়া উঠিতেন, "রান্না ফে'লে তুশোবার দৌড়োদৌড়ি না কর্‌লেই কি নয়? কি এমন গুরু-পুত্তুর এসে স্থান নিয়েছেন?"

নলিনী বলিত, "মা, তুমি একটু আস্তে কথা বল্‌তে পারো না? আমি ছাড়া তুমি ত কর্‌বে না কিছু—তার জন্যে তোমার অত ভাবনা কি? আমার কাজ আমি বুঝ্‌ব।'

মহামায়া বলিলেন, "তা ত জানি। কিন্তু এদিকে রান্না-বান্না যা কর্‌ছিস্ মুখেই যে দিতে পারা যায় না।"

গাল ফুলাইয়া মেয়ে বলিল "কেন—কোন্ দিন রান্না খারাপ হ'ল? বাবা ত কিছু বলেন না, আমার মুখেও ত মন্দ লাগে না। আগে যেমন রাঁধ্‌তাম—এখনও তাই রাঁধি।"

"নিজের রান্না নিজে খেতে আর কবে খারাপ লাগে? কাঁঠালের বিচিগুলো নিজেরা না খেয়ে তুক্-তুক্ ক'রে ভাঁড়ের মধ্যে লে'পে-পুঁ'ছে রেখেছি, সেইগুলি বের ক'রে দিয়ে আসা হয়েছে বুঝি?"

নলিনী বলিল, "রোজ-রোজ একঘেয়ে আলু-ভাতে দিয়ে কি লোকে খেতে পারে? ডা'ল রাঁধেন না—মাছ রাঁধেন না—এক ভাতে-পোড়া বই ত নয়? একটু দুধ দিতে, তাও বন্ধ ক'রে দিয়েছ।"

মহামায়া রুষ্ট হইয়া কহিলেন, "তোর জ্যাঠামো কর্‌তে

হবে না বল্‌ছি। ফের যদি ফোঁপর-দালালি কর্‌বি ত আমি এ-সকল অতিথ্‌শালা ভেঙে দেবো। কোথায় একদিন ওষুধ এনে দেওয়া হয়েছে—তাই চিরদিন পুষ্‌তে হবে—নয়?"

নলিনী চক্ষু-দুটি বিস্ফারিত করিয়া কিছুকাল জননীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া রান্নাঘরে ঢুকিয়া পড়িল। বাহিরে কানাইলালের কর্ণে সকল কথাগুলিই প্রবেশ করিল। কানাইলালকে লুকাইয়া অন্তরের বিষের ভাণ্ডার শুধু মেয়ের সম্মুখে উদ্গীর্ণ করিতে বোধ হয় মহামায়ার ইচ্ছা ছিল না। সে শুনিতেছে মনে করিয়া তাঁহার কণ্ঠ উচ্চ হইয়া উঠিতেছিল, মনে একটা হিংস্র আনন্দ জাগিতেছিল।

কানাইলাল জড়ের মতন নীরবে বসিয়া থাকিয়া ভাতের হাঁড়িটার দিকে চাহিয়া রহিল। অব্যক্ত রোদন যখন বুকের মধ্যে দুর্নিবার হইয়া উঠিল, তখন সে একবার কাঁদিয়া লুটাইয়া প্রাণ ভরিয়া তাহার মহেশ্বরী-মাকে ডাকিতে চাহিল, কিন্তু তাহার মুখ ফুটিল না। সে কোনোরকমে মুখে চারিটা গুঁজিয়া বিছানার উপর যাইয়া শুইয়া পড়িল। চিরন্তন চিন্তায় যখন তাহার চক্ষু-দুটি বুজিয়া আসিল, তখন সে তাহার স্নেহের নির্ঝরিণী সেই মহেশ্বরী-মাকে সারা-গৃহখানি লইয়া বিদ্যুৎচমকের ন্যায় খেলিয়া-খেলিয়া বেড়াইতে দেখিতে পাইল। কিন্তু তাহাকে তাঁহার স্পর্শ হইতে দূরে রাখিবার জন্য, বায়ু যেন স্তরে-স্তরে জমিয়া উঠিয়া সম্মুখভাগে পাঁচিল তুলিয়া দিয়া আপনার স্বচ্ছতায় মহেশ্বরীকে দেখাইয়া-দেখাইয়া তাহাকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ বাদে নলিনী বই-দপ্তর লইয়া পড়িতে আসিল। সে হাসিয়া বকিয়া কানাইলালের মন হইতে অতীতের বিষাদময় ঘটনাটা যেন সরাইয়া দিতে লাগিল। নলিনীকে দেখিলেই তাহার মনটা খুসী হইয়া উঠিত। নলিনী চক্ষু-দুটি টানিয়া কহিল, "আপনার মুখ-চোখ্‌ দেখ্‌ছি একেবারে ব'সে গেছে—কি হয়েছে আপনার?"

কানাই হাসিয়া কহিল, "কি হবে—কিছুই ত হয়-নি!"

ঘাড় বাঁকাইয়া নলিনী বলিল, "না হয়নি, চোখ-মুখ যা দেখাচ্ছে। আপনি একা-একা ব'সে-ব'সে কি সমস্ত ভাবেন—আর শরীরের ক্ষতি করেন। এ আপনার ভারি অন্যায়।"

কানাই কহিল, "না না, আমার কিছু হয়নি। দেখি তোমার বই বা'র করো। অঙ্ক-কটা কষেছ ত? না কেবল গিন্নিপনা হচ্ছে?"

হাসিয়া নলিনী বলিল, "ওঃ! সে কখন্‌। আজ কিন্তু প্রথমে পড়্‌ব না—প্রথমে আঁক্‌ব। একটা টিয়া পাখী—বুঝ্‌লেন ত? দাঁড়ের উপর ব'সে রয়েছে, দু'পাশে দুটো খাবার বাটি থাক্‌বে।' বাটির ছোলাগুলো আঁক্‌তে পারা যাবে ত?"

কানাই বলিল, "যাবে। টিয়া পাখীর ছবি পেয়েছ?"

"হ্যাঁ—এই দেখুন মাসিক পত্রে কেমন ছবি দিয়েছে! আচ্ছা, রং কর্‌ব কি দিয়ে? কিচ্ছু রংটং নেই আমার।"

কানাই বলিল, "নাই বা থাক্‌ল। রং তৈরি করে' নিতে কতক্ষণ? গাছের পাতা আর হলুদ দিয়ে গায়ের রং, আর লাল কালী দিয়ে ঠোঁট আর পা। দাঁড়টা কালো কালীতে কর্‌লেই হবে। আর এইসব মিশিয়ে-টিশিয়ে অন্য রংও করা যাবে।"

সেদিন পাখীটি সুচারুরূপে অঙ্কিত হইয়া যখন নলিনীর হাত হইতে নামিল, তখন বালিকার আনন্দ দেখিয়া কানাইলালের হৃদয়ের তাপ দূর হইয়া গেল। এই মেয়েটি এতটুকু বটে, কিন্তু ইহাকে খুসী করার ভিতর আনন্দ অফুরন্ত ছিল।

নলিনী পড়াশুনা শেষ করিয়া উঠিয়া গেলে কানাই-লালের অন্তঃকরণ আবার বেদনায় আক্রান্ত হইয়া উঠিল। আনন্দের আলো যেন্‌ হঠাৎ নিভিয়া গেল। এইরূপে নানা আঘাতে আঘাতে কানাইলালের সাংসারিক জ্ঞান একটু-একটু জন্মিতেছিল। সে তখন ভাবিয়া দেখিতে-ছিল যে,---মহামায়া সুস্থ হইয়া উঠিবার পর বাস্তবিক তাহার আর সেখানে দাঁড়াইবার কোনো প্রয়োজনই ছিল না, অথচ দেখাইতে হইল যেন নিতান্তই প্রয়োজন।

নহিলে সে যায় কোথায়? একটা কাজ-কর্ম্মের চেষ্টা দেখিলে হয় না? কিছু-কিছু উপার্জ্জন করিয়া ইঁহাদের হাতে আনিয়া দিতে পারিলে বোধ হয় সংসারের একজন হইয়া থাকিতে পারা যাইবে। তাহা হইলে আশ্রয় ছাড়িয়া আনন্দ ছাড়িয়া গৃহ ছাড়িয়া তাহাকে পথে-পথে ফিরিতেও হয় না, লোকের গলগ্রহও হইতে হয় না। ছোট্ট নলিনীর সেবা-যত্ন, আদর-আব্দারও পাওয়া যায়।

গণপতি লোকটি মন্দ ছিলেন না। কিন্তু তাঁহাকে প্রাতে ও মধ্যাহ্নে দুই বেলাই কার্য্যস্থলে থাকিতে হইত। তিনি রাত্রিবেলা ক্লান্ত হইয়া আসিয়া শয্যা আশ্রয় করিতেন। যেন আর সংসারে কোথায় কি হইতেছে না হইতেছে বড়-কিছু সংবাদ রাখিতে পারিতেন না। অগত্যা সেদিন তিনি গৃহে ফিরিলে কানাই নিজেই তাঁহাকে ডাকিয়া বলিল, "আমি আর অকারণ এখানে ব'সে-ব'সে থাকি কেন? কল্‌কাতায় চ'লে যাই।"

গণপতি যেন বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কেন, বিশেষ-কিছু কাজ আছে?"

"কাজ এমন-কিছু নেই।"

"তবে আর দিন-কতক থাকুন না। আমি একলা মানুষ, আপনা'কে পেয়ে বেশ আছি। নলিনীও একলাটি থাকৃত, এখন সর্ব্বদা আনন্দে কাটাচ্ছে। কেবল নিজের হাতে কষ্ট ক'রে রেঁধে-বেড়ে খাচ্ছেন, তাইতে মনে বড় দুঃখ পাই।"

কানাই কহিল, "সে আমি বেশ আছি, ও সবের জন্যে কোনো কষ্টই নেই। তবে সময়টা আর যেতে চায় না। একটা কাজ-কর্ম্ম জু'টে গেলে আরও কিছুদিন থাকৃতে পারি। না হ'লে ব'সে-ব'সে আর কত কাল কাটানো যায়?"

গণপতি কিছু ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "এ-কথা কেন বল্‌ছেন? কাজ-কর্ম্ম না জুটলে 'যে থাকৃতে পার্‌বেন না, হয়ত এমন-কোনো আচরণ আমাদের মধ্যে পেয়েছেন?"

কানাই হাসিয়া বলিল, "না, না; নলিনী যেরূপ ভায়ের মতন আদর-যত্ন করে, সে আমি জীবনে ভুল্‌তে পার্‌ব না। ওর মতন মেয়ে কম দেখেছি। শুধু-শুধু ব'সে কাটানো আমার নিজের পক্ষেই বড় অসহ্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।"

গণপতি কিছুকাল ভাবিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, আমি চেষ্টা ক'রে দেখ্‌ব।"

সত্বরই এক মহাজনের ঘরে কানাইলালের ত্রিশ টাকা বেতনে একটি কর্ম্ম হইল। সে প্রথম মাসের বেতন গণপতির হাতে দিতে গেলে তিনি কুণ্ঠিত হইয়া কহিলেন, "আপনি আমাদের পরিত্যাগ কর্‌বেন—সেইপথেই চলেছেন দেখ্‌তে পাচ্ছি। আমাদের যাতে গ্লানি হয়, আপনার নিকট তেমন ব্যবহার পাবো কোনো দিনই আশা করিনি। আপনাকে ততটা পরও কোনো দিন ভাব্‌তে পারিনি।"

কানাই কহিল, "কিন্তু বেশী পর ক'রেই ভাব্‌ছেন। আমাকে পরিবারের একজন মনে কর্‌তে পারেননি, তাই বাইরের লোকের সাহায্য নিতে কুণ্ঠিত হচ্ছেন।"

গণপতি হার মানিয়া বলিলেন, "আপনার যুক্তি সত্য, খণ্ডন করা যায় না। কিন্তু আমি সরলভাবে যেটা নিতে পা'র্‌ছিনে, তর্কের দিক্ দিয়ে সেটা নিতে বাধ্য করালে বড় দুঃখিত হবো। আমাকে ওটা জোর কর্‌বেন না। আমার এই মেয়েটি নিয়েই যা কিছু দায়। তা-ছাড়া আমি যা কিছু উপায় করি তা'তেই সংসার বেশ চ'লে যায়। আপনার ঐ সামান্য আয়ের উপর লালসা কর্‌বার আমার কিছু কারণ নেই।"

গণপতি যখন টাকা লইতে সম্মত হইলেন না, তখন কানাইলাল তাহা ব্যয় করিবারও একটা সদুপায় স্থির করিল। সৎকার্য্যে ওই অর্থ ব্যয় করিয়া সে ঋণমুক্তির আনন্দ সংগ্রহ করিতে লাগিল। সে তথাকার স্কুল-পাঠশালাগুলিতে অনুসন্ধান লইয়া দরিদ্র অথচ মেধাবী ছাত্রগণের একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া লইল। এবং তাহাদের পড়িবার ব্যয়ভার নিয়মিতভাবে বহন করিতে লাগিল। অবশিষ্ট যাহা থাকিত, সে-অর্থ সে দীন-দুঃখীকে দান করিত। নিজের জন্য কিছুই রাখিত না।

কিছুদিন পরে কানাইলালের কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া মহাজন তাহার দশ টাকা বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। বেলা দশটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত তাহাকে মনিবের কার্য্যে

করিতে হইত। সন্ধ্যার সময় আসিয়া রান্না শেষ করিয়া সে নলিনীকে পড়াইত। তবুও যে সময়টুকু সে ছাড়া পাইত, তাহাতেই মহেশ্বরীর জন্ত তাহার মন-প্রাণ হাহাকার করিয়া উঠিত। আপনাকে তাহার এমন বাঁধা-ধরার মধ্যে রাখার প্রয়োজনই ছিল এই যে, তাহার দুর্ব্বল মন যেন মুহূর্ত্তের জন্তও বাহিরের দিকে ছুটি না পায়।

তাহার বেতনবৃদ্ধি হইলে সে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ও পুস্তক আনাইয়া গরীব-দুঃখীকে বিনা পয়সায় চিকিৎসা ও ঔষধ বিতরণ করিতে লাগিল। আবশ্তক হইলে সে সেইসঙ্গে-সঙ্গে রোগীর সেবা-শুশ্রূষাও করিত। এবং তাহার দ্বারা যাহার যেটুকু উপকার হইতে পারিত, সে ঘাঁটালবাসী সকলেরই সে-উপকারটুকু উপযাচক হইয়া করিয়া আসিত। অতি-সামান্ত ব্যক্তি হইলেও অত্যল্প-কাল মধ্যে এইরূপে কানাইলাল ঘাঁটালের মধ্যে বেশ সুপরিচিত হইয়া উঠিল।

মহামায়াও আবার কানাইলালের পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিলেন। সে প্রায়ই তাঁহাদের মাছটা-তরকারীটা সংগ্রহ করিয়া আনিত। নিজ ব্যয়েই এসকল করিত। এবং গণপতির অনুপস্থিতিকালে অভাব-অভিযোগের কথা তাহার কর্ণগোচর হইলে সে তাহাও পূরণ করিত। এই-রূপে ঘাটালে তাহার এক বৎসর অতীত হইল।

নবম পরিচ্ছেদ

কানাইলাল সন্ধ্যার সময় গৃহে ফিরিলে নলিনী এক-খানি রেকাবিতে যেদিন যেমন জুটিত তেম্‌নি জলখাবার সাজাইয়া লইয়া উপস্থিত হইত। কানাই জলযোগ করিবার পর নলিনীই জোগাড় করিয়া দিত, তবে রন্ধন হইত; রন্ধন-কার্য্য শেষ হইলে সে তাহার নিকট বসিয়া পড়াশুনা করিত। কানাই তাহাকে বড় স্নেহের চক্ষে দেখিত। এবং যত্নপূর্ব্বক পড়াশুনা বলিয়া দিত। এই ছোটো মেয়েটির সঙ্গই তাহার জীবনের প্রধান আনন্দ ছিল।

সে দশটার সময় খাইয়া কাজে বাহির হইয়া গেলে নলিনী খাওয়া-দাওয়ার পর তাহার গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহার কাপড়-চোপড়, বই, কাগজ, কলম, পেন্‌সিল সমস্ত গোছাইয়া রাখিত। এবং ঘরটি ঝাঁট দিয়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়া আসিত। কানাইলালকে নলিনীও বড় ভালোবাসিত।

মহামায়াও ইদানীং কানাইলালকে খুব আদর যত্ন করিতেছিলেন। কিন্তু মাতৃ-স্নেহের যে একটা স্বচ্ছ প্রবাহ—একটা সুমিষ্ট আস্বাদ কানাইলালের চিত্ত সতত আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, এসকল স্নেহ সেই স্থানটা একটু নাড়া-চাড়া দিতে পারে মাত্র—ঝাঁতিয়া বসিতে পারে না। বরং এই নাড়া দেওয়ার ফলে যে-চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, সেই চিত্ত-চাঞ্চল্যই একটা গতি উৎপাদন করিয়া তাহাকে সেই স্বচ্ছ প্রবাহের দিকে ছুটাইয়া আনিয়া দাঁড় করাইয়া দেয়। মহেশ্বরীর মাতৃ-স্নেহের আস্বাদের মধ্যে সে এমন একটু বিশেষত্ব পাইয়াছিল, যাহার পূর্ণ-বিকাশ সে আর কোথাও দেখিতে পাইতেছে না। যে-স্নেহের পিছনে প্রয়োজন-সিদ্ধি ভিন্ন আর কিছুই নাই, তাহার সংস্পর্শে একটা সাময়িক স্নায়বিক উত্তেজনায় আসিতে পারে বটে, কিন্তু তাহা নিবিড় সম্বন্ধ-স্থাপনে সফলকাম হয় না। দিন গেল—মাস গেল—বর্ষ গেল—তবু মহেশ্বরীর প্রাণের সেই যথার্থ পরিচয়টুকু কানাইলাল ভুলিতে পারিতেছিল না। তাহাকে ভুলাইবার মতন কোনো শক্তির সন্ধান যে সে কোথায়ও পাইতেছিল না।

একদিন সন্ধ্যার পর মহামায়া নলিনীকে ভিতরের বাড়ীতে অন্ত কাজে ব্যস্ত রাখিয়া কানাইলালের গৃহে আসিয়া বসিলেন। আজ তাঁহার কথায় স্নেহধারা উছলিয়া পড়িতেছিল। প্রসন্নমনে নানা কথার পর তিনি বলিলেন, "বাবা, নলিনী যে দিন-দিন ধিঙ্গী হ'য়ে উঠ্‌ল, কি করা যায় বলো না! সহজে যে আর ভাত গিল্‌তে পারি-নে!"

কানাইলাল প্রথমটা কিছুই বুঝিতে পারিল না। সে আর-একটু পরিষ্কার করিয়া শুনিবার জন্ত মহামায়ার দিকে উৎকণ্ঠাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। মহামায়া কহিলেন, "তুমি দেখি সংসার-সম্বন্ধে কোনো খবরই রাখো না। আমাদের হিন্দুর ঘরে আট বছর বয়সে গৌরীদান করতে হয়। মেয়েটি এই বারো পেরিয়ে তেরয় পড়্‌তে যায়, আজও পাত্তর জুটোতে পারা গেল না। বড় মেয়েটি

যা হোক সময়মতন পাত্রস্থ হয়েছিল। এর বেলা কি হবে—তাই ভাবনায় পড়েছি।"

কানাই এতক্ষণে সকল বুঝিল। জিজ্ঞাসা করিল, "কোথাও কথাবার্ত্তা কিছু করা হয়নি ?"

"কই—কিছুই ত দেখিনে। একাপ্রাণী—তা'তে পরের কাজ নিয়েই ব্যস্ত। দেখ্‌ছ ত—হাঁপ্ ছাড়্‌বার সময় নেই। ঘাঁটালে বা তেমন ছেলে কই ? একটু উ'ঠে-প'ড়ে চেষ্টা না কর্‌লে আজকাল ছেলের বাপে কি মেয়ে সেধে নিতে আসে ?"

কানাই একটু চিন্তা করিয়া কহিল, "আমি কি দিন-কতক বের হ'য়ে চেষ্টা ক'রে আস্‌ব ?"

"আস্‌তে পার্‌লে ত ভালোই হ'ত। কিন্তু শেষকালে তোমার চাক্‌রিটাও যাবে! সেটা কি ভালো হবে ?"

কানাইলাল হাসিয়া কহিল, "সেজন্যে ভাবনা নেই। একটা গেলে আর-একটা জুটিয়ে নেওয়া যাবে। যখন এত ক'রে বল্‌ছেন, তখন এইটেই ত আগে দেখা উচিত।"

মহামায়া কিছুকাল ইতস্তত করিয়া কহিলেন, "আমাদের মনে একটা ইচ্ছা জেগে আছে। সাহস ক'রে বল্‌তে পারিনে। তোমারও ত, বাবা, গৃহ-ধর্ম্ম কর্‌তে হবে ?"

কানাই হঠাৎ চম্‌কাইয়া উঠিল ; তা'র পর ললাট-দেশ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, "আমার সঙ্গে আপনার কথার সম্পর্ক কি বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে।"

মহামায়া কহিলেন, "কিছুই দেখি বোঝো না। নলিনীকে তুমি যদি গ্রহণ ক'রে সংসারী হও—তা হ'লে আমাদের জাতি রক্ষা হয়।"

ম্লানমুখে কানাই হাসিয়া কহিল, "এইবার বেশ বলেছেন। আমার কি আছে যে সংসারী হবো ?"

"কেন—বাড়ীঘর আছে, মাও ত আছেন ?"

কানাইলালের মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া উঠিল। একটা উত্তপ্ত বায়ুস্রোত আসিয়া যেন তাহার স্নায়ুগুলির শিহরণ জাগাইয়া দিয়া গেল। সে নিম্নস্বরে কহিল, "মা কি সবারই চিরদিন থাকে ?"

মহামায়া বুঝিলেন যে, তাহার মনের মধ্যে একটা যাতনা উপস্থিত হইয়াছে। তিনি সে-সম্বন্ধে আর-কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া বলিলেন, "তোমাকে পেলেই আমাদের সব পাওয়া হ'ল। আমরা আর-কিছু দেখ্‌তে-শুন্‌তে চাইনে।"

কানাইলাল কিছুকাল আরক্তমুখে চুপ করিয়া রহিল। তা'র পর কহিল, "আপনাদের কথার উত্তর না দিতে পেরে আমি লজ্জিত হচ্ছি। এবিষয়ে মত দেওয়ার কোনো সুযুক্তিই আমি খুঁজে পাচ্ছিনে। হয়ত কতকগুলি বাধা এসে উপস্থিত হবে।"

"কি বাধা ?"

"কি যে বাধা আমি জানিনে। না জেনেও কথা দিতে পারিনে।"

"কার কাছে জান্‌বে ?"

"কার কাছে যে জান্‌ব, তাও ত খুঁজে পাইনে।"

মহামায়া কহিলেন, "বল্‌ছ, বাধা আছে। কি বাধা, তা জানো না। আবার জান্‌বার লোকও খুঁজে পাচ্ছ না। তোমার কথার মর্ম্ম ত কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লাম না। বুঝিয়ে বলো না ; সব যে হেঁয়ালির মতন ঠেক্‌ছে।"

কানাই বলিল, "আমিই বুঝিনে মা, তা আপনারা কি বুঝ্‌বেন ?"

মহামায়া ক্ষুণ্নমনে চলিয়া গেলেন। এ রহস্য না ছলনা, না আর-কিছু, তাহা বুঝিতে পারিলেন না।

তা'র পর তিনি একসময় গণপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মুখ বুজে ত খেয়ে বের হও। মেয়ের দিকে কখনও চেয়ে দেখ ?"

গণপতি কহিলেন, "দে'খে আর কি কর্‌ব ? যা বরাতে আছে হবে। পেটের চিন্তা না থাক্‌লে না হয় ঐ কাজে লেগে পড়া যেত।"

"তা বল্‌লে ত আর লোকে শুন্‌বে না। আচ্ছা, ঘরেই না হয় একবার চেষ্টা করো ; কানাইএর সঙ্গে হ'লে কেমন হয় ?"

"ছেলেটি ত বেশ। কিন্তু এতদিন রয়েছে নিজের পরিচয় কিছুই দিতে চায় না। বাড়ী-ঘরও জানা নেই। তাইতে ত খট্‌কা লাগে।

গৃহিণী স্বর চড়াইয়া বলিলেন, "নিজে পাও না হাঁপ ছাড়্‌বার সময়…অত শত তোমায় কে দেখা-শুনা ক'রে

দেবে ? ছেলেটি ভালো—করিয়ে-কম্মিয়ে হয়েছে, আর-কিছু দেখার কাজ নেই। অত-শত আমার চাই নে। জাত রক্ষা পেলেই বাঁচা যায়।" নিরীহ গণপতি বলিলেন, "তা বেশ। তা'কে একবার জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ না?"

"সকল ভূতই বুঝি আমাকে দিয়ে ঝাড়াতে চাও? আমি জিজ্ঞাসা করেছি, কোনো সদুত্তর পাইনি।"

"কেন…কি বল্লে?"

"কি জানি ছোঁড়াটার ধরণধারণ যেন কেমন হেঁয়ালি-মতন। নিজে রাঁধে-বাড়ে—খায়-দায়—উচ্ছিষ্ট ছুঁতে দেয় না। বিয়ের কথা পাড়্লে বল্লে যে,…কি নাকি বাধা আছে, সে বাধা আবার নাকি সে জানে না, জান্বার লোকও খুঁজে পায় না।"

"তবে আর কি কর্বে, বলো! ও-আশা ছেড়েই দাও।

গৃহিণী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তুমি একবার জিজ্ঞেস ক'রে দেখ না? সব তা'তে হাল ছাড়্লে সংসারে কোনো কাজ করা চলে না।"

গণপতি কহিলেন, "তোমাদের সঙ্গে যখন মন খুলে বলেনি, তখন আমার সঙ্গে কি আর বল্বে? তুমি বরং আর-একবার বুঝিয়ে-পড়িয়ে চেষ্টা ক'রে দেখো। সেই ভালো হবে।"

মহামায়া আর-এক সময় নির্জ্জনে কানাইলালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, ভেবে-চিন্তে দেখ্লে কি একবার?"

ম্লানস্বরে কানাই কহিল "দেখেছি মা, প্রতিপদেই বাধা পাই।"

"কে বাধা দেয়?"

"আমার বিবেক।"

মহামায়া চমৎকৃত হইয়া কহিলেন, "তোমার বিবেক কি বলে না—আমাদের দায় মুক্ত কর্তে?"

কানাই মলিনমুখে কহিল, "কি জানি মা, হয়ত আমারও আপনাদের পেতে অধিকার নেই—আপনাদেরও হয়ত নেই।"

মহামায়া কহিলেন, "তোমার কথার অর্থ বোঝা যায় না। কেবলই কথার প্যাঁচ-পোঁচ দিচ্ছ—অথচ স্পষ্ট ক'রে কিছু বল্‌ছ না।"

কানাই দুঃখিত হইয়া কহিল, "না মা, আমি প্রতারণা কর্‌ছি না। আমি কিছুই জানিনে। কিন্তু আমার বিবেকে যে কাজ কর্‌তে নিষেধ করে, আমি তা কর্‌তে পারিনে।" সে আর কিছু বলিল না। বেদনায় তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল।

মহামায়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু তাঁহার বক্ষের মধ্যে একটা আক্রোশ উঠিয়া-পড়িয়া বিদ্রোহ জমাইয়া তুলিতে লাগিল। তিনি মরীয়া হইয়া কিছুকাল আঙিনার উপর বসিয়া রহিলেন। তিনি কাহার ঘাড়ে গিয়া এ-উপেক্ষার অগ্নি নির্ব্বাপিত করিবেন ভাবিতেছিলেন, এমন সময় দেখিলেন, নলিনী কানাই-লালের জন্য জলখাবার লইয়া বাহির হইতেছে। তিনি রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিলেন "আর সোহাগ জানাতে হবে না। বলে,—কেঁদে-কেঁদে লুটি পায়, সে আমার ফি'রে না চায়। আমি মা—আমাকে এই অপমানটা ক'রে ছেড়ে দিলে, মেয়ে আমার খাইয়ে দাইয়ে স্বয়ম্বরা হ'তে চলেছেন।"

নলিনী স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। মুহূর্ত্ত পরেই হাতের রেকাবিখানা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিল এবং হাঁটুর উপর মাথাটি রাখিয়া ভূমিতলে বসিয়া পড়িল। তাহার চক্ষু-দুটি দিয়া জলধারা গড়াইতে লাগিল।

কানাইলালের সুমিষ্ট ব্যবহারে তাহার প্রতি নলিনীর মধ্যে যে সহজ সরল ভালোবাসা জমিয়া উঠিতেছিল, মহামায়া বোধ হয় কোনো সঙ্গত কারণ দেখাইতে না পারিলে তাহাদের এ স্নেহ-বন্ধন ছিন্ন করিতে পারিতেন না। কিন্তু তিনি এমন-একদিক্ দিয়া বাক্য প্রয়োগ করিলেন যাহাতে কন্যার পা-দুখানা খোঁড়া করিয়া দিতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না। মাতার বিষ-দংশনে জর্জ্জরিত হইয়া নলিনী সেইভাবে সেইখানে বসিয়া পড়িয়া রহিল। তাহার মনে একটা নূতন সত্যের ছায়াও দেখা দিল।

মহামায়া ঘরের কাজকর্ম্মগুলি সারিয়া আসিয়া যখন দেখিলেন, নলিনী উঠে নাই, সেইভাবেই বসিয়া আছে, তখন তিনি সুর নরম করিয়া কহিলেন, "নে ওঠ, আর আমাকে চারিদিক্ থেকে জ্বালাস্‌নে। যা রান্না-ঘরার

জোগাড় ক'রে দিয়ে আয়। বাড়ী এসে যদি এ-সকল দেখ্‌তে-শুন্‌তে পায় তা হ'লে আর রক্ষা থাকবে না।"

নলিনী দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজিয়া ফোঁপাইয়া-ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

মহামায়া তাহার হাত ধরিয়া টানিতে-টানিতে বলিলেন, "নে মা, ওঠ, ভর সন্ধ্যে-বেলায় কাঁদ্‌তে নেই। তোদের পেটে ধরেছি—মার একটি কথা সইতে পার্‌বিনে? আমার লক্ষ্মী, দিয়ে আয় একটু জোগাড়-যন্তর ক'রে, মানুষটা অনাহারে থাক্‌বে নইলে!"

নলিনী তাহার মাতার হাত ঝাড়া মারিয়া ফেলিয়া কহিল, "আমি পার্‌ব না—পারো তুমি যাও।"

মহামায়া কহিলেন, "আমি কোন্‌দিকে যাবো, এদিকে ঘরে এখনও কত কাজকর্ম্ম সার্‌তে প'ড়ে রয়েছে।"

"সে আমি কর্‌ব—তুমি যাও।"

"না মা, তুই যা। তা'র যা দর্‌কার লজ্জায় হয়ত আমার কাছে ভালো ক'রে চাইবে না।" নিজে যাইবার তাঁহার বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা ছিল না। নলিনীকে দিয়াই নলিনীর কার্য্যোদ্ধার যদি হয়, এই আশায় তাহারই শরণ তিনি লইতেছিলেন।

নলিনী উঠিয়া দাঁড়াইল। সে দেখিল, তাহার মাতা তাহার চক্ষু-দুটি যে রঙে ফুটাইয়া দিলেন, তাহাতে যেন একগাছি লজ্জার শৃঙ্খল তাহার পা-দুখানিতে বন্ধন আঁটিয়া ক্রমাগত মাটির দিকে টানিতেছে। তাহার মাতা যাহা চাহেন, সে ত তাহা চাহে নাই। অন্তত ইতিপূর্ব্বে এ-কথা সে একবার ও-ভাবে নাই। সে কিছু উদ্ধত-স্বরে কহিল,

"আমার দাদা না—কেন তুমি এসকল কথা বলো তাঁকে? পার্‌ব না আমি—যাও তুমি।"

এই বলিয়া সে মাটির উপর বসিয়া পড়িল। মহামায়া তাহার হাত ধরিয়া তুলিয়া কহিলেন, "তা'র শাস্তি ত আমি পেয়েছি। এখন যা, আর দেরী করিস্‌নে। এখুনি তিনি এসে পড়্‌বেন।"

নলিনী রান্নার সামগ্রীগুলি লইয়া গিয়া একে-একে রাখিয়া আসিল। চুল্লীটাও ফুঁ দিয়া ধরাইয়া দিল। কিন্তু সে একটি কথাও বলিল না। কানাইলালও কিছুই জিজ্ঞাসা করিল না। বাড়ীর মধ্যের অনেক কথাই তাহার কর্ণে পৌঁছাইয়া তাহার দেহখানি রোমাঞ্চিত করিয়া দিয়াছিল। নলিনীকে কিছু বলিবার মুখও তাহার ছিল না, শক্তিও ছিল না।

কানাইলাল উঠিয়া যাইয়া ভাত চাপাইয়া দিল। নলিনী বাড়ীর মধ্যে আসিয়া রাঁধিতে বসিল। সে এক-সময় উঁকি মারিয়া যখন দেখিয়া আসিল, তাহার মাতার রান্নাঘরের দিকে হঠাৎ আর আসিবার সম্ভাবনা নাই, তখন সে রেকাবিতে আর একবার জলখাবার সাজাইয়া লইয়া চুপি-চুপি পা টিপিয়া টিপিয়া কানাইলালের সম্মুখে গিয়া রাখিল। কিছুক্ষণ থাকিবার পর বলিল,

"আমি আজ কিন্তু পড়্‌তে আস্‌ব না।"

"কেন?"

"মাথাটা বড্ড ধরেছে।"

কানাইলাল কিছু বলিল না। সে-ও আর বেশীক্ষণ সেখানে না দাঁড়াইয়া চলিয়া আসিল। কিন্তু কানাই-লালের মনে বেশ ধারণা জন্মিল,—এই মিত্র পরিবারে আর অধিক দিন বাস করিতে গেলে উভয়ের মধ্যে একটি প্রাচীর সগর্ব্বে মস্তকোত্তলন করিয়া দেখাইয়া দিবে যে, এই আপনার জন হইতেও সে কত পৃথক্। নলিনীকে তাহাকে ছাড়িয়া যাইতেই হইবে; এইবেলা নিষ্ঠুরহস্তে আপনাকে আঘাত দিয়াই সরিয়া যাওয়া ভালো; বিলম্বে হয়ত সে নলিনীকেও দুঃখ দিতে পারে।

(ক্রমশঃ)

সাঁওতালদের গান

চৈত্র-মাসের প্রবাসীতে "সাঁওতালি" গান-নামক প্রবন্ধে লেখক সাঁওতালি গানের যে নমুনা উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাকে সাঁওতালি গান বলা ভুল—এ-ধরণের গান রেলে-রেলে যে কুলীরা মাটি কাটিয়া বেড়ায় তাহাদের মধ্যেই সাধারণত আবদ্ধ। সত্যকার সাঁওতালি গানের মধ্যে যে সহজ সরল একটি সৌন্দর্য্য আছে, কোড়া, বাংলা, হিন্দুস্থানী সাঁওতালির খিচুড়ী এই নমুনাগুলির ভিতর তাহার কোনো সন্ধান মেলে না।

আমাদের আশে-পাশে অনেক সাঁওতালের বাস। ইহাদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মেলা-মেশার এবং ইহাদের ছোটোবড় সুখদুঃখের সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ আমাদের সর্ব্বদাই ঘটে। সাঁওতাল কুলী এবং প্রজা না থাকিলে এ-অঞ্চলের চাষবাস একদিনও চলিতে পারে না, অথচ জমিদার মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, মহাজনদের অত্যাচার ইহাদের উপর বাড়িয়াই চলিয়াছে। সাত বৎসরের মধ্যে জমিদার নানা অছিলায় খাজনা পাঁচ টাকা হইতে চল্লিশ টাকায় লইয়া গিয়াছেন, এমন দৃষ্টান্ত বিরল নহে। ইঁহারা অনুর্ব্বর কঙ্করময় অসমতল উচ্চভূমি বহু পরিশ্রমে ইহাদের দ্বারা উর্ব্বর ক্ষেত্রে পরিণত করাইয়া লন, এবং তাহার পর নানা জবর-দস্তি জাল-জুয়াচুরির সাহায্যে সেই জমি ইহাদের হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া উচ্চহারে অন্যকে বিলি করেন। তথাপি ইহাদের জীবনযাত্রার মধ্যে যে সংযম, যে শান্তি, যে সৌন্দর্য্য এবং অনাবিলতা আছে, সভ্যতাভিমানী খুব অল্প মানব-সমাজেই তাহা সুলভ। ইহারা দরিদ্র, কিন্তু বর্ব্বর নহে।

কিছুকাল হইতে সাঁওতালি প্রেমের এবং বিবাহের গান আমি সংগ্রহ করিতেছি। সংগৃহীত চার পাঁচ শত গানের মধ্যে এমন-কিছু পাই নাই যাহাকে অশ্লীল অথবা ইতর বলা চলে। সব ভাষাতেই অল্পাধিক-পরিমাণে অশ্লীল গান প্রচলিত থাকে, সাঁওতালি ভাষাতেও আছে।—এই শ্রেণীর গান "বীরগান" নামে পরিচিত। সাঁওতালি ভাষায় 'বীর' শব্দের অর্থ জঙ্গল—বৎসরের মধ্যে দুই-একবার যখন ইহারা শিকারে যায়, গভীর জঙ্গলের মধ্যে পুরুষেরা তখন এইসকল গান গাহিয়া থাকে। এদলে মেয়েরা কখনও থাকে না। অল্প বয়স্ক ছেলেদেরও এখানে প্রবেশ নিষেধ। অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, লেখক এই বীরগানকে সাঁওতালদের কোর্ট্‌শিপের পূর্ব্বরাগের গান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ পক্ষে মদ্যপানে বিহ্বল কোনো সাঁওতালও এধরণের কোনো গান গ্রামের কাছাকাছি গাহিলে কঠিন সামাজিক দণ্ড ভোগ করে এবং এ-অপরাধে আটত্রিশ বছরের মধ্যে গ্রামে দুই-এক জনকেও অপরাধী হইতে শোনা যায় না।

সাঁওতালি গানের কয়েকটি নমুনা এবং তাহার যথাযথ অনুবাদ দিয়ে দেওয়া হইল।

(১)

গাডা নাড়িতে তিরিয়ো বদনরে
নালন্ নরম্
ধীরি মাগররে দাদো বদনরে
নালম বডে।

ওরে বদন নদীর ধারে বাঁশি আর বাজিও না, পাথরের তলায় যে জল রয়েছে, তাকে ঘাঁটান কি উচিত বদন।

(২)

গাডা নাড়ি নাড়িতে
সুইউড়্ মুইউড়্ কোড়া গোগল কামা
হড়মড়ে সাজবাজী চিকায় তামা
ওড়ারে অন ধন বাসুত্তমা।

নদীর পাড়ে-পাড়ে সুপুরুষটি ত বেশ শিস্ দিয়ে-দিয়ে ফিরছ, শরীরের সাজ দে'খে আর কি করব, ঘরে তোমার না আছে ধন, না আছে অন্ন।

(৩)

সাতেরে আপাকাতে
চেদা তোয়া-দারে
রাঃ জোং কান্।
রাঃ বাং শাং দোন চিকায়া
বাটিরে বাসাং দা বুরসি সিজেল
নাডি যতন লিঞ হায়া লিদি।

ছাচতলায় ঠেস দিয়ে, দুধের লতা মাগো কেন কান্নাকাটি করছিস।—
রা কাড়্‌ব বৈকি, গুমরে-গুমরে কাঁদব বৈকি।—বাটিতে গরম জল—বড়শিতে কত ক'রে সেঁকা, অনেক যত্নে ডাগর করা এই আমার মেয়েটি।—

(৪)

নায়ক্রো হয় গুয়েন বাবা হঁয় গুয়েণ
অকয় মিত্তেঞা দেমাই ছুড়প্।
নালে রাচারে কায়রা দারে
কয়রা গে নিঞ গাঁঞ কয়রে গে
না পুঞ্
কয়রা গে মিত্তৈয়া দেমাই ছুড়প্

মাও ম'রে গেল বাবাও ম'রে গেল, কে আর আমাকে বল্‌বে, মা এসে বোস্।

আমাদের উঠানের সেই কলাগাছটি। ওই কলাগাছটিই আমাদের মা, ওই কলাগাছই আমাদের বাবা, ওই আজ বল্‌ছে, মা আয়, বোস্।

(৫)

নাম মাহুল কুঁইডি মিরু
মালম সাধা সিয়া কানছু ক্যাকড়াঃ
থান থান্দ সারি ঠেপে ঠেপে
ধরাগে ফুমড়ো পুসি সরি জবেয়ানাং।

তোমার পোষা মহুয়া বীজের রঙের এই টিয়েটির ওড়্বার পাখা-দুটি কেটো না সখা, তা হ'লে সে ঝটপট্ কর্‌বেই, হয়ত বা চোর বিড়াল তা'কে খেয়েই বা ফেল্‌বে।

(৬)

সিদাই হুড়ুঃ ল্যো-ইয়া মান্দার বুরুরে
সিঞ্জো বিলে জিকা পোতাম বিলে।
সরিসে মাসেহ রোড়ফুল,
সরু সাকাম জিকা বিজাড় বাহা ?

অনেক দিন আগের সেকালের সবাই বলে, মান্দার পাহাড়ে ঘুঘুর ডিম বেল ফলের মতন, কচুপাতার মতন বেগুনের ফুল। হাঁ ভাই বকুল-ফুল সত্যি না মিথ্যে এসব কথা ?—

(৭)

গতেএাঃ সাজদ সোনাগে সাজ,
রূপা গে আভরং।
নোয়াকো সাজবাজ চিকাতেএ
হিড়িং এ্যা।
নালেঃ রাচারে মারাং অকয়
জকেঁ'ঃদারে—
জজোঃ দারেরেএ রাকাপ কাদা।
রাচা জঃ জঃ রেজ হিড়িং কিদা।

আমার ভাবের লোকের সাজ ছিল সোনার, তা'র আভরণ ছিল রূপার—সেসব সাজসজ্জা কি ক'রে ভুল্‌ব। আমাদের উঠানে ওই প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছ, তেঁতুল গাছের উপর উঠিয়ে দিলুম সে-সব।

উঠান ঝাঁট দিতে ভুল হ'য়ে যাচ্ছে।—

(৮)

কাথা কাথাঃ তেলাং রপঃ রেণাঃ
হড়া কাথা তেলাং বাগাঃ গে নাঃ
বছর-মা-দিনরে চিঠিদ' কোলমে
জানিম্ নৈহার গিয়া মনেতে দঃ!

কথায়-কথায় আমরা দুটিতে কথা কাটাকাটি কর্‌লুম, লোকের কথায় আমরা ভিন্ন হ'য়ে গেলুম।—বছরের মধ্যেই যেন তোমার চিঠি আসে, তোমার মনেতেও কি আর বিরহের ব্যথা নেই।

(৯)

আলে দিসাম দ বুগিতে মাতকম দারি।
তিকিন তারা সিং এর আকানা।
হয়মা হিসালিয়ে সিতুং চিমালিয়ে
হয় লল দিন দুলাড় আলোম্ হালাং।

আমাদের দেশে ত মহুয়া গাছের অভাব নেই, দুপুরে-বিকালে সব সময়েই ত মহুয়া ঝ'রে পড়্‌ছে। বাতাস হিংস্থকে, রোদ্দুরটা অলস—প্রিয় গরম বাতাসের দিনে আজ মহুয়া না-ই কুড়ুলে।

(১০)

ইপন মাঁয় জাঁওয়াই দ
চিকাতে বাং সরি-এ মারড়া গিয়া ?
চেৎ বৈশাখ চান্দু গাইয়ে গুপীং
ললঃ সিতুংতে বাকাও ভুরেন।

ছোটো মেয়েটির জামাই কি ক'রেই না এমন মুচকুন্দ হ'ল সত্যি ?—তা জানো না!—চৈত্র বৈশাখ মাসে গরুর রাখালি করতে গিয়ে গরম রোদ্দুরে তেতে উ'ঠে মোছ-জোড়াটি যে খ'সে গেছে! (বিবাহের সময় বরকে ঠাট্টা)

(১১)

মারাং নোড়া তালারে
মেচ্ মাচি চিড়ানরে
চুটুম এ এ কান জুলুং
জুলুং
চুঁটি এ এ দ বাগিমেসে
ধুঁয়াতে তল এম্ রইলা
গুচুঃ।

বড় বাড়ীর মাঝখানে হেলান দেওয়া দড়ি-বোনা চৌকীটার উপরে ব'সে তুমি বিড়ি টান্‌ছ জল্‌জ্বলিয়ে! বিড়ি খাওয়াটা ছেড়ে দাও—গোঁফ-জোড়াটা হয়েছে যেন ধোঁওয়াতে বাঁধা-পড়া পাঁশুটে রংএর শকুনি!

(১২)

ইং জুরি কুড়ি ই বান্‌ কুয়া
ইংদ কু রারিরে।—
ইএদং অডং চালাঃ এট্রাদিসাম!
দারিরে জাপাঃকাতে
চান্দোসেচ্ সামাং কাতে
চান্দু কয়েমে দিনি জুরিঃ।

আমার সমবয়সী মেয়ে ত আর নেই, আমিও কুমার থেকে গেলুম!—বেরিয়ে চ'লে যাবোই আমি অন্য কোনো দেশে।—(আহা তাও কি হয়—?) গাছে ঠেস দিয়ে, চাঁদের দিকে মুখ ক'রে, চাঁদকে বলো—ওগো আমার জুড়িটি জুটিয়ে দাও।—

শ্রী সন্তোষচন্দ্র মজুমদার

জ্ঞানের ডাক *

অধ্যাপক শ্রী সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

'দর্শন'-শব্দটির প্রথম উল্লেখ বোধ হয় বৈশেষিক সূত্রেই পাওয়া যায়। কিন্তু সেখানে দর্শন বলিতে অলৌকিক উপায়ে অতীন্দ্রিয়বস্তুর দর্শনের কথাই বলা হইয়াছে, (আর্ষং সিদ্ধদর্শনঞ্চ ধর্ম্মেভ্যঃ)। বৌদ্ধেরা তাঁহাদের প্রতিপন্থী অন্যান্য দার্শনিকদিগের মতকে দিঠি (দৃষ্টি) বলিতেন। খৃঃ৫ম শতাব্দীর লেখক হরিভদ্র সূরি তাঁহার গ্রন্থে ছয় দর্শনের সমালোচনা করিয়া, সেই গ্রন্থের নাম রাখিয়াছিলেন ষড়্দর্শনসমুচ্চয়। তাঁহার অনেক পরবর্ত্তী কালে মাধবও তাঁহার গ্রন্থের নাম সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ রাখিয়াছিলেন; রত্নকীর্ত্তির ক্ষণভঙ্গসিদ্ধি বইখানি বোধ হয় খৃ ১০ম শতাব্দীতে লিখিত। এইগ্রন্থের বিভিন্ন দর্শন-মতের কথা বলিতে গিয়া তিনিও দর্শন শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন (যদি নাম দর্শনে দর্শনে নানাপ্রকারং সত্ত্বলক্ষণমুক্তমাস্তে) অধ্যাত্মবিদ্যা, আত্মবিদ্যা, তত্ত্ববিদ্যা প্রভৃতি শব্দের দ্বারাও বোধ হয় অনেক স্থানেই দর্শনজাতীয় তত্ত্বানুশীলনই বুঝাইত। নামের আলোচনাকে আমি প্রাধান্য দিতে চাই না। কিন্তু নামের মধ্যদিয়া দর্শনালোচনার বস্তুগত কি পার্থক্যের পরিচয় পাওয়া যায় তাহারই অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা করিতেছি। এই যেমন অধ্যাত্মবিদ্যা এই নামটিতে যেমন অনেকগুলি দর্শন শাস্ত্রের মর্ম্মকথা প্রকাশ পায় তেমনি যাঁহারা আত্মা মানেন না, তাঁহাদের দর্শনানুশীলনকে অধ্যাত্মবিদ্যা নাম দেওয়া চলে না। কিম্বা মীমাংসকেরা যখন বৈদিক বিধিনিষেধের তাৎপর্য্যনির্ণয়প্রসঙ্গে গৌণভাবে আত্মার স্বরূপের আলোচনা করেন তখন তাঁহাদের সেই চেষ্টাকে অধ্যাত্মবিদ্যা বলিতে দ্বিধা না করিয়া পারা যায় না। ইহা ছাড়া যাঁহারা আত্মার স্বরূপনির্ণয়, মোক্ষ, অপবর্গ বা কৈবল্যকেই চরম ও পরম বলিয়া মনে করিয়াছেন, তাঁহাদের আলোচনার মধ্যেও দুটি দিক্‌কে স্বতন্ত্র করিয়া দেখা যায়। একটি হইতেছে আত্মা, ঈশ্বর, মন, জড় প্রভৃতির স্বরূপনির্ণয় ও সম্বন্ধ বিচার, অপরটি হইতেছে সেই বিচারের অনুকূল যুক্ত্যাশ্রিত অনুশীলনপদ্ধতি। উপনিষদাদিতে যখন কোনো তত্ত্বের উল্লেখ পাওয়া যায়, তখন দেখা যায় যে, সেই তত্ত্বটি ঋষিদের প্রাণের বেদনায় পরিস্ফুট মূর্ত্তিমান্ হইয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়। সেটা যে আমাদের যুক্ত্যবলম্বিনী জ্ঞানবৃত্তিকে জাগ্রত করিয়া যুক্তিধারায় নেতি নেতি দ্বারা সত্যকে উপস্থিত করে তাহা নয়। সেটা যেন প্রাণের কোনও গুপ্তদ্বারে নিভৃতে অচঞ্চলহস্তে আঘাত দিয়া অন্তরের মূলকে কোন অলৌকিক স্পর্শে সঞ্জীবিত, অঙ্কুরিত ও পল্লবিত করিয়া তুলে। ঋষি যখন বলেন তস্য ভাসা সর্ব্বমিদংবিভাতি, তখন সত্যই যেন চক্ষুতে কোন অমৃতময় জ্ঞানাঞ্জন সংলেপিত হয়। এখানে কোনও যুক্তি নাই, কোনও পরীক্ষা নাই, কোনও ব্যাপ্যব্যাপক নির্ণয় নাই, কোনও যুক্তির অনুসন্ধান নাই, তবু যেন অবাঙ্‌মনসোগোচর কোন নিগূঢ় সত্যের নিকটবর্ত্তী হইলাম বলিয়া প্রাণ সাড়া দিয়া উঠে, অন্তর জাগ্রত হয়। এ সত্যের সোনার কাঠী তাঁহাদের কাছে আছে যাঁহারা সাধনার দীপ্তজ্যোতিতে প্রভাতের নব জাগরণের সহিত তাহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এ সত্য লৌকিক জ্ঞানোপায়ে যুক্তিধারার ক্রমসঞ্চারে শুধু অনুশীলনের বলে পাইবার নয়। ইহা একপ্রকার দিব্যদর্শন, দিব্যানুভূতি। ইহা সত্যের মূলকে স্পর্শ করে, তাহার অন্তরের রসকে পান করে, তাহার মধ্যে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু বহু শাখা-প্রশাখা বিস্তারে সত্যের যে রূপ নানা বিশেষের মধ্য দিয়া আপনাকে বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছে সত্যের সেই বিশেষ-বিশেষ রূপগুলি ইহাতে ধরা পড়ে না। অত্যন্ত গভীর বলিয়াই যাহা ভাসিয়া আছে তাহাকে ইহা ছাড়িয়া দেয়। তত্ত্বের পাঁজর ছাড়িয়া দিয়া তত্ত্বের প্রাণকে স্পর্শ করে, ফেনবুদ্বুদকে

* কাঁঠালপাড়ার সাহিত্যসম্মিলনীর দর্শন-শাখার সভাপতির অভিভাষণ

পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রের অতল গভীরে নিমগ্ন হয়। কিন্তু শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা যে অংশে সাধারণের নিকট মননলভ্য বলিয়া উপস্থাপিত করিতে পারা যায় সেই অংশটি ত এই অগভীরের উপরেই ছড়াইয়া রহিয়াছে। তাহাকে ধরিবার উপায় ভূয়োদর্শন ভূয়োবিচার যুক্ত্যনুসন্ধিৎসা বা অন্বীক্ষা। ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি বা শ্রুতিবাক্যদ্বারা যাহা ধ্রুব সত্য বলিয়া আপাততঃ প্রতীত হইয়াছে, অনুমানের নূতন আলোকের দ্বারা তাহাকেই পুনর্ব্বার পরীক্ষা করিয়া দেখার নাম অন্বীক্ষা। দর্শন বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহা ঠিক অধ্যাত্ম বিদ্যা এইজন্যই নয় যে যাহা কেবলমাত্র অধ্যাত্মবিদ্যা তাহা কেবলমাত্র আত্মার স্বরূপোপলব্ধির আস্বাদ দিয়াই নিবৃত্ত হইতে পারে, তাহার অতিরিক্ত আর কিছু না দিলে তাহার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কিন্তু দর্শনশাস্ত্র বা মননশাস্ত্র, এর প্রধান জোরই এইখানে যে তত্ত্বসাক্ষাৎকারের দ্বারা উপেয় বলিয়া ইহারা যাহা উপস্থাপিত করিবে অনুমানাদি বিচারের দ্বারা তাহা নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণ করিবে। প্রত্যক্ষকে অবলম্বন করিয়া এবং পদে-পদে প্রত্যক্ষের দ্বারা সংশোধিত হইয়া অনুমান দ্বারা প্রত্যক্ষ-তত্ত্ব বা সম্বন্ধকে প্রত্যক্ষবদুপস্থাপিত করার নাম অন্বীক্ষা। এই অন্বীক্ষাই দর্শনশাস্ত্রের প্রাণ; যুক্তির আগুনে পোড়াইয়া পরখ করিয়া যতক্ষণ না লইতে পারিব ততক্ষণ কোন কথাই মানিব না, এইটাই হইতেছে দার্শনিকের নিষ্ঠা। ঋষির নিষ্ঠা তাঁর আত্মোন্মেষের জ্যোতিতে, কর্ম্মীর নিষ্ঠা সকাম বা নিষ্কাম কর্ম্মের প্রেরণার কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে, ভক্তের নিষ্ঠা ভক্তির ব্যাকুলতায়, কিন্তু দার্শনিকের নিষ্ঠা প্রমাণাশ্রিত জ্ঞান সন্ধানে। হৃদয়ের আকস্মিক অলৌকিক উন্মেষে কিম্বা ভক্তির মধুরাস্বাদনে কিম্বা বিশ্বাসের অটল স্থৈর্য্যে আমরা যাহা পাই তাহা মিথ্যা বলিবার কাহারও অধিকার নাই, কিন্তু প্রত্যক্ষ অনুমান প্রভৃতি প্রমাণের দ্বারা যে পর্য্যন্ত কোন বস্তু নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণিত হয় নাই সে পর্য্যন্ত দার্শনিকের নিকট তাহা সত্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না। সেইজন্য তত্ত্বজ্ঞানের যেরূপ প্রয়োজন, কি উপায়ে সেই তত্ত্বের জ্ঞান হইল দার্শনিকের নিকট তাহার নির্ণয়ও সেইরূপই প্রয়োজন ও প্রধান। এই কথাটিরই ইঙ্গিত করিয়া বাৎস্যায়ন তদীয় ন্যায়সূত্রভাষ্যে লিখিয়াছেন যে, যদি প্রমাণাদির পৃথক্ পৃথক্ বিচার না করা হইত তবে ন্যায়দর্শনটি উপনিষদের ন্যায় কেবল মাত্র অধ্যাত্মবিদ্যা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিত। (তেষাং পৃথগ্ বচনমন্তরেণ অধ্যাত্মবিদ্যামাত্রমিয়ংস্যাৎ যথোপনিষদঃ)। কৌটিল্য এই অন্বীক্ষাকেই লক্ষ্য করিয়া তাঁহার অর্থশাস্ত্রের বিদ্যোদ্দেশাধিকরণে লিখিয়াছেন যে এই অন্বীক্ষাই সমস্ত বিদ্যার প্রদীপ-স্বরূপ, সমস্ত কর্ম্মের উপায়ভূত এবং সর্ব্ব ধর্ম্মের আশ্রয় (প্রদীপঃ সর্ব্ববিদ্যানাং উপায়ঃ সর্ব্বকর্ম্মণাং। আশ্রয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মাণাং বিদ্যোদ্দেশে প্রকীর্ত্তিতঃ।)

প্রাচীন ভারতের বেদই সর্ব্বপ্রাচীন। এই বেদ-মন্ত্রকে অবলম্বন করিয়া যে জটিল যজ্ঞবিধি গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাই ভারতীয় আর্য্যদের প্রথম কীর্ত্তি। কেমন করিয়া বেদমন্ত্রের আপাত প্রতীত অর্থ কেবলমাত্র বিধিনিষেধে পরিবর্ত্তিত হইল তাহা অনুমান করা কঠিন। কিন্তু যখন ক্রমশঃ এই বিশ্বাস ছড়াইয়া পড়িল যে, বেদের কাজ কেবল মাত্র হুকুম করিয়া কোন কাজ করান বা কোন কাজ হইতে নিবৃত্ত করা, এবং মানুষ তাহার বুদ্ধি দিয়া যাহা বুঝিতে পারে না তাহাই বুঝাইবার জন্য বেদের সার্থকতা এবং সেই জন্যই বেদের আদেশ অনুসারে যথাযথভাবে যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে সেই যজ্ঞের শক্তিতেই মানুষের অতি দুঃসম্পাদ্য কামনাও সফল হইতে পারে তখন হইতেই এদেশে অবিচারিতভাবে বেদবিহিত যজ্ঞানুষ্ঠান পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা, কিন্তু আরণ্যক ও উপনিষদ্গুলি পড়িলে বুঝিতে পারা যায় যে, একদিকে যেমন যজ্ঞের বাঁধন খুব আঁটিয়া ধরিয়াছিল অপরদিকে তেমন তাহা শিথিল হইয়া আসিতেছিল। আমরা দেখিতে পাই সেই আদিম যুগেও কতকগুলি লোকের মনে এই যজ্ঞবিধির প্রাধান্য ও আধিপত্য এমনই নিঃসার বলিয়া মনে হইয়াছিল যে তাঁহারা এগুলিকে ঘৃণা ও অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া ইহা হইতে সারবত্তর মহত্তর মহত্তম কোনও বিরাট্ ভূমা সত্যের অনুসন্ধানে নিযুক্ত হন। কত নিষ্ফল চেষ্টা, কত ব্যর্থ সাধনার পর তাঁহারা তাঁহাদের প্রিয়তম সত্যের দ্বারে উপস্থিত হন, উপনিষদে তাহার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়।

কিন্তু এই সাধনার ঠিক কি প্রণালীটি তাঁহারা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার তেমন কোনও বিশেষ চিহ্ন তাঁহারা রাখিয়া যান নাই। নাভি-গন্ধে কস্তুরীমৃগ যেমন ইতস্ততঃ ধাবমান হয় তেম্‌নি ঋষিদের অন্তরে অনির্ব্বচনীয় উপায়ে যে অন্তঃসৌরভ উপচিত হইয়া উঠিতেছিল তাহাতেই মত্ত হইয়া তাঁহারা কোথায় ব্রহ্ম, কোথায় ব্রহ্ম বলিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেন। ভিতরের গন্ধ বাহিরের বলিয়া মনে করিয়া যতদিন তাঁহারা আকাশ বাতাস চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতিকে ব্রহ্ম বলিয়া মনে করিয়া তাহাদের উপাসনায় ব্যস্ত ছিলেন, ততদিন তাঁহাদের দুর্ভাগ্যের শেষ ছিল না। যেদিন তাঁহারা বুঝিলেন যে এ গন্ধ বাহিরের নয়, অন্তরের অন্তরাল হইতে ইহার উৎপত্তি সমস্ত প্রাণ মন ইন্দ্রিয়ের অন্তরালে থাকিয়া সমস্ত প্রাণ মন ইন্দ্রিয়কে ইহাই স্বকার্য্যে নিয়োজিত করিতেছে, ইহা অপেক্ষা আমাদের প্রিয়তম নিকটতম আর কিছুই নাই। ইহা আমাদের প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, মনের মন, ইহাই ভিতরে বাহিরে চারিদিকে বহুরূপে আপনাকে ফুটাইয়া রাখিয়াছে, ইহারই জ্যোতিতে সমস্ত দেদীপ্যমান, তখন যেন এক নিমিষে সত্যের হিরণ্ময় আবরণটি উন্মোচিত হইয়া গেল এবং তাহার পূর্ণ জ্যোতিধারায় ঋষিদের প্রাণ স্নাত পূত ও অভিষিক্ত হইল। সেই আনন্দে তাঁহারা অমৃতত্বের আস্বাদ পাইয়া বলিয়া উঠিলেন, আত্মৈবেদং সর্ব্বং ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্‌। কোন মননের পদ্ধতি নাই বলিয়া উপনিষৎকে আমরা দর্শনশাস্ত্র-হিসাবে দর্শন বলিতে পারি না। কিন্তু আত্মানন্দে যে আত্মদর্শন, যে আত্মাবিষ্কার ইহাতে আমরা দেখিতে পাই পৃথিবীর কোন জাতির ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। আনন্দ হইতে ইহার উৎপত্তি, আনন্দেই ইহার প্রতিষ্ঠা, আনন্দেই ইহার জীবন ও আনন্দেই ইহার বিশ্রাম।

উপনিষদের এই আত্মবাদ ও এই আনন্দবাদ প্রচারের অল্পকাল পরেই মহামতি বুদ্ধের দুঃখবাদ ও নৈরাত্মবাদের প্রচার। উপনিষৎ বলেন, আনন্দই আত্মা ও আত্মাই আনন্দ। এই আনন্দই আমাদের স্বরূপ বলিয়া আমরা সকলেই অমৃতের পুত্র অজর অমর নিত্য শাশ্বত। বুদ্ধ বলেন, সমস্তই দুঃখ, যাহা দুঃখ তাহা কখনই আত্মা হইতে পারে না, যাহা আত্মা নয় তাহা কখনও নিত্য হইতে পারে না, তাই সমস্তই দুঃখ, সমস্তই অনাত্ম, সমস্তই ক্ষণভঙ্গুর। উপনিষদে পাই যে, রূপ মাত্রই শুধু কথার ছলনা, চোখের ভুল, রূপের মূলে যে অরূপ-রূপী সেইটিই সত্য। মৃত্তিকা সত্য আর তা'র যত রূপ সে শুধু ছলনা মাত্র। বুদ্ধদেব বলেন, রূপধর্ম্মই আমরা দেখি, অরূপ-রূপী কোথাও নাই, একটিকে আশ্রয় করিয়া অপরটি, সেটিকে আশ্রয় করিয়া অপর আর-একটি, এম্‌নি করিয়া রূপ ও ধর্ম্মের ভিতরে-বাহিরে নিঃসার ছায়াবাজি চলিয়াছে। সিনেমার ছায়ার মতন চিত্রের পর চিত্র পর্য্যায় চলিয়াছে। একটিকে আশ্রয় করিয়া আর-একটি, এম্‌নি করিয়া এই ক্ষণভঙ্গুর নিঃসার সন্তানধারা সারযুক্ত স্থায়ী বলিয়া প্রতীতি জন্মাইতেছে। বুদ্ধের এই মত নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া বিবিধ মতবাদ ও বৌদ্ধ মনন শাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের অন্বীক্ষামূলক চিন্তাধারার মূল খুঁজিতে গেলে উপনিষৎ ও বৌদ্ধ মতের বিরোধের দিকেই আমাদের দৃষ্টি পড়ে। বিরোধ না হইলে সংশয় আসে না, সংশয় না আসিলে অন্বীক্ষারও প্রয়োজন বোধ হয় না। বুদ্ধের উপদেশাবলী পড়িলে বুঝা যায় যে, তাঁহার প্রতিপক্ষের মধ্যে একদিকে ছিলেন ব্রাহ্মণেরা, অপরদিকে ছিলেন জৈনেরা। বৈশেষিক সূত্র ছাড়া হিন্দুর আর-সমস্ত দর্শনগুলির মধ্যেই বৌদ্ধদের সহিত বিচারতর্কের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তা'র পর এক-একটি দর্শনসূত্র যখন তৎসম্প্রদায়ভুক্ত মনীষীদের ক্রমবর্দ্ধমান ভাষ্য, ভাষ্যটীকা, ভাষ্যটীকাটীকা ক্রমে পরিবর্দ্ধিত যুক্ত্যাপূরিত ও পরিস্ফুট হইতে লাগিল তখন তাহার প্রতিস্তরেই বৌদ্ধদের সহিত ও অপরাপর দর্শনশাস্ত্রের মতের সহিত যে সংঘাত ও বিরোধ চলিতেছিল তাহাই এই টীকা-পরম্পরার মধ্য দিয়া প্রত্যেক দার্শনিক সিদ্ধান্তটিকে পরিষ্কৃত, বিরোধ-বর্জ্জিত ও পরিস্ফুট করিয়া তুলিতেছিল। সেইজন্যেই শুধু সূত্র ভাষ্য দ্বারা পাঠ করিলে কোন হিন্দু দর্শনেরই প্রকৃত রূপ ও পরিচয় পাওয়া যায় না। বাহির হইতে কোনও বিজাতীয় চিন্তা আসিয়া ভারতীয় চিন্তাকে আক্রান্ত, অভিভূত বা যুদ্ধার্থে সুসজ্জিত করিয়াছিল এরূপ কোন প্রমাণই নাই। কিন্তু ভারতবর্ষের মধ্যেই যে-সমস্ত

হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনদিগের মতবাদগুলির সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহারা যে পুরুষানুক্রমে হাজার-হাজার বৎসর ধরিয়া পরস্পরের বিরোধে পরস্পরের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য নিত্যনূতন উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টায় আপনাদিগকে পরস্পর ক্রমবর্দ্ধিত ও ক্রমপরিস্ফুট করিয়া তুলিতেছিল ইহার পরিচয় সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। এই পরস্পর সংগ্রামই ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের অন্বীক্ষাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া অধ্যাত্ম-বিদ্যাকে দর্শনশাস্ত্রে পরিণত করে। সেইজন্যই কোনও আদিম স্তরের ভাষ্য বা টীকা পড়িলে সেই দর্শনশাস্ত্রের যথার্থ দার্শনিকতা উপলব্ধি করা যায় না। শিশু যেমন আহারসঞ্চয় ও পারিপার্শ্বিক অবস্থানিচয়ের সহিত সংগ্রাম করিয়া নিজের অস্থিকে দৃঢ় করে ও বলসঞ্চয় করিয়া ওজোভূয়িষ্ঠ হয়, ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রগুলিও ক্রম-ধারায় যতই পরস্পরের দ্বারায় বিরোধিভাবে আক্রান্ত হইয়াছে, ততই নূতন-নূতন চিন্তা দ্বারা আত্ম-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়া মননমূলক দৃঢ়তা লাভ করিয়া দর্শনশাস্ত্র-হিসাবে আপনাদিগকে দৃঢ় করিয়াছে। আত্ম-লাভের উপায় অনুসন্ধানের চেষ্টায় আমাদের দেশের অধিকাংশ দার্শনিক মতবাদগুলিই অতি পূর্ব্বকালেই অল্লাধিক ব্যবধানে প্রায় এককালেই উৎপন্ন হইয়াছিল। তা'র পর প্রত্যেকটিই পরস্পরের ঘাত-প্রতিঘাতে স্বতন্ত্রভাবে স্ফুটতর হইয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে। সেইজন্য অন্য দেশের দর্শন শাস্ত্রের ইতিহাসে যেমন কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে-সঙ্গে নূতন-নূতন দর্শন-মতের উৎপত্তির কথা বর্ণিত আছে, এদেশের দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাসে সেরূপ করা চলে না। কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে-সঙ্গে নূতন-নূতন মত অল্পই হইয়াছে। পূর্ব্ব হইতে যে মতগুলি রহিয়াছে হাজার বৎসর ধরিয়া শিষ্যপ্রশিষ্যগণের ব্যাখ্যানুব্যাখ্যার ক্রম-পর্য্যায়ে সেইগুলিই ক্রমশঃ স্ফুটতর হইয়া উঠিয়াছে। এমন কি যেসমস্ত বৈষ্ণব ও তান্ত্রিক মতগুলি আধুনিক বলিয়া বিবেচিত হয়, অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, অনেক স্থলেই সেগুলিরও মূল খুঁজিলে অনেক-প্রাচীন কালেই পৌঁছিতে হইবে।

ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, দুইটি বিষয় ভারতীয়দিগের চিত্ত-ভূমিতে অতি আদিম কাল হইতেই এমনিভাবে নিরূঢ়মূল হইয়াছিল যে, সেগুলি-সম্বন্ধে কোনও সন্দেহই তাহাদের মনে স্থান পায় নাই এবং অন্বীক্ষা দ্বারা সেগুলির যে পরীক্ষা করা প্রয়োজন তাহাও কখনও মনে হয় নাই। চার্ব্বাককে বাদ দিলে সমস্ত দর্শনশাস্ত্রেই সে-দুইটি স্বীকৃত হইয়াছে এবং তাহাদের চরম লক্ষ্যের ঐক্য সম্পাদন করিয়া তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছে। ইহাদের একটি হইতেছে কর্ম্মের দ্বারা জন্মমৃত্যু-ধারার পুনঃপুনরাবর্ত্তন এবং অপরটি হইতেছে কর্ম্ম বা জ্ঞান দ্বারা জন্মমৃত্যু-ধারার একান্ত বিচ্ছেদ-সাধন। প্রথমটিতে কর্ম্মবশে সুখদুঃখ-ভোগ ও সংসার এবং দ্বিতীয়টিতে মোক্ষ বা নির্ব্বাণ। বৌদ্ধকে বাদ দিলে আর সকলেই স্থায়ী আত্মা মানিয়াছেন এবং জন্মমৃত্যু-ধারা হইতে আত্মাকে মুক্ত করাকেই জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। বৌদ্ধ আত্মা না মানিলেও ভোগধারাকে মানেন,দীপ হইতে দীপান্তরের প্রজ্বলনের ন্যায় দুঃখ ভোগ-ধারার ক্রমসন্তান চলিয়াছে, যেদিন তৃষ্ণাক্ষয়ে এই দুঃখ-ধারার আলোকধারা একেবারে নিবিয়া যাইবে, সেই দিনই সেই নির্ব্বাণে এই ধারার পরম সমাপ্তিতে পরম প্রাপ্তি ও পরম বিচ্ছেদ সংসাধিত হইবে। মানুষের চরম পাওয়া, তা'র চরম সার্থকতা, শুধু যুক্তিতর্কবিচারের দ্বারা হয় না, সেইজন্য চাই তা'র সাধনা, তপস্যা, আত্মদমন। শুধু পরীক্ষার দ্বারা, তর্কবিচারের দ্বারা সত্যকে পাওয়া যায় না। মানুষের সমস্ত প্রকৃতিটা সত্যে পরিণত হওয়া চাই, তবেই সত্যকে পাওয়া যাইবে, নচেৎ বহু শাস্ত্রাধ্যয়নে কোনও ফল নাই। সত্যকে পাওয়া শুধু যুক্তি বিচারের ধর্ম্ম নয়। মানুষের সমস্ত প্রবৃত্তিনিচয়কে, তা'র সুখৈশ্বর্য্য ভোগাকাঙ্ক্ষাকে যখন সংযত করিয়া কল্যাণের দিকে, মুক্তির দিকে ধাবিত করা যায়, তখনই তা'র যথার্থতঃ সত্যানুষ্ঠানের আরম্ভ। জ্ঞানের উদ্দেশ্য শুধু যুক্তিবৃত্তির ঔৎসুক্য নিবারণ নয়, কিম্বা জড়জগতের উপর আধিপত্য বিস্তার নয়, বা চিন্তার জিমন্যাষ্টিক করা নয়। কিন্তু সংসার-ধারা হইতে মুক্তি লাভ। সমস্ত ভারতীয় দর্শনের জ্ঞানানুসন্ধানের মূলেই আত্মোপলব্ধির এই গভীর প্রেরণা লক্ষিত হয়, লক্ষ্যহীন সূক্ষ্ম তর্কের এখানে কোনও আদর নাই;

জ্ঞানবৃত্তির সঙ্গে আমাদের অন্যান্য বৃত্তিগুলি ও ভোগ তৃষ্ণার আকর্ষণগুলি এমন গাঢ়ভাবে সংসক্ত হইয়া রহিয়াছে যে শুধু যুক্তি দ্বারা কোনও বস্তুকে ধরিতে পারিলেই তাহাকে পাওয়া যায় না, সমস্ত জীবনের তপস্যা দ্বারা যখন চিত্তকে বন্ধমুক্ত করিতে পারি, যথার্থতঃ তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের তখনই সম্ভব। এই তত্ত্বসাক্ষাৎকারই দর্শনশাস্ত্রের উপেয়, তাই শম দম তিতিক্ষাদি দ্বারা চিত্ত যতদিন কল্যাণ ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত না হয় ততদিন পর্যন্ত শুধু তর্ক বিচারের দ্বারা ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্রের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। বুদ্ধদেবের সন্ন্যাসগ্রহণের পর রাজমন্ত্রী আসিয়া যখন তাঁহাকে বলিল যে, কেহ বলে পুনর্জন্ম আছে, কেহ বলে নাই, কেহ বলে স্বভাবেই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, কেহ বলে ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, এ-সমস্ত বিষয়ে কিছুই ঠিক নাই, এই অনিশ্চিত সন্দিগ্ধ বিষয়ের অনুসন্ধানে জীবন ব্যয় না করিয়া আপনি রাজ্যে ফিরিয়া আসিয়া বিধানানুসারে স্বকার্য্য অনুষ্ঠান করুন, তখন ভগবান্ বুদ্ধ উত্তর করিয়াছিলেন যে, পুনর্জন্ম আছে বা নাই এ-সমস্ত সন্দেহ মিটাইবার জন্য আমি পরের কথায় নির্ভর করিতে পারি না, তপস্যা ও আত্মসংযম অবলম্বন করিয়া আমি সত্যের সন্ধান করিয়া তাহা গ্রহণ করিব (ইহাস্তি নাস্তীতি য এষ সংশয়ঃ পরস্য বাক্যৈর্ন মমাত্র নিশ্চয়ঃ। অবেত্য তত্ত্বং তপসা শমেন বা স্বয়ং গ্রহীষ্যামি যদত্র নিশ্চিতম্॥) যে বুদ্ধদেব পরীক্ষা ও আত্মবিশ্লেষণ দ্বারা উপনিষদের ধারা হইতে স্বতন্ত্রভাবে একটি অত্যন্ত অভিনব দার্শনিক মতের সৃষ্টি করেন তিনিই সেই মত আবিষ্কারের জন্য তপস্যা ও শমের আশ্রয় গ্রহণ করেন। অশ্বঘোষের উপরোক্ত বাক্য অবশ্য বুদ্ধবচন নহে। কিন্তু তাহা বুদ্ধ-বচনের অনুবৃত্তি বলিয়া মনে করা যাইতে পারে, কারণ বুদ্ধ যে ধ্যানের দ্বারা বোধি লাভ করিয়াছিলেন, এ-সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। তাহা ছাড়া চতুর্ব্বিধ যোগের দ্বারা জ্ঞানলাভের কথা বুদ্ধবচনের মধ্যেও পাওয়া যায়। অন্বীক্ষা ছাড়া ও ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞান ছাড়া এই আর-একটি তৃতীয় উপায়ের জ্ঞানের কথা কোনও-না-কোনও প্রকারে প্রায় সমস্ত ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রেই স্বীকৃত হইয়াছে। যোগ-দর্শনে দেখিতে পাই যে মনকে কোনও একটি কেন্দ্রে বা বিষয়ে স্থির ও নিরুদ্ধ করিতে পারিলে সেই নিরোধের দ্বারা নূতন এক-প্রকার জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, তাহাকে বলা যায় প্রজ্ঞা। প্রত্যক্ষ অনুমান প্রভৃতি যে-সমস্ত লৌকিক জ্ঞানের কথা আমরা জানি, সেগুলি সমস্তই সংকল্প-বিকল্পের দ্বারা Assimilation, Differentiation, Integration, Association, Retention প্রভৃতি দ্বারা পর্য্যায়ক্রমে মনের যে চাঞ্চল্য ও স্থৈর্য্য সাধিত হয় তাহারই ফলে তাহা নিষ্পন্ন হয়। প্রত্যেক নিষ্পন্ন জ্ঞানটি স্মৃতি-সহযোগে অপরাপর জ্ঞানের পরিস্ফূর্ত্তি ও বিকাশের নিয়ামক হয়। কিন্তু যোগজ প্রজ্ঞা ইহা হইতে একেবারেই বিভিন্ন-জাতীয়। যোগী বলেন যে মনের সমস্ত চাঞ্চল্য সমস্ত গতি বন্ধ করিয়া দিয়া যদি তাহাকে কোন একটি বিষয়ে অচঞ্চলভাবে নিরুদ্ধ করিয়া রাখিতে পার তবে সেই বিষয়-সম্বন্ধে অত্যন্ত পরিষ্কার সুনির্ম্মল প্রজ্ঞা বা জ্ঞান জন্মিবে, যাহা ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞানের ন্যায় অপরোক্ষ অথচ অভ্রান্ত ও সুস্পষ্ট। অথচ ইহার স্মৃতি হয় না এবং প্রত্যক্ষানুমানাদি হইতে ইহা এতই বিভিন্ন যে সেগুলির সহিত ইহাকে পাশাপাশি বসান যায় না বা সেগুলির সহিত ইহার কোনও মিল সাধন করা যায় না। প্রত্যুত প্রজ্ঞাজ্ঞান প্রত্যক্ষানুমানাদি বৃত্তিজ্ঞানকে ধ্বংস করিয়া ক্রমশঃ তাহাদের মূলীভূত কারণ মনকেও ধ্বংস করে। ইহা সহজেই বুঝা যাইবে যে, এই প্রজ্ঞার সহিত অন্বীক্ষামূলক দার্শনিকতার কোনও সম্পর্ক নাই। দার্শনিক হিসাবে চিন্তা বা বিচার করিতে গেলে প্রজ্ঞাকে একরূপ ঘরের বাহির করিয়া দিতে হয়। যাঁহারা প্রজ্ঞাকে অবলম্বন করিয়া থাকিতে চান তাঁহাদিগকে প্রজ্ঞার অতলেই ডুব দিতে হয়, কারণ প্রজ্ঞায় যাহা পাওয়া যায় তাহার সম্বন্ধে চিন্তা করা চলে না, ভাষায়ও তাহা প্রকাশ করা যায় না। এমন মনে করা যায় না যে, প্রজ্ঞা হইতে চিন্তা বা চিন্তা হইতে প্রজ্ঞা, এই উভয় কোটিতে ঘড়ির পেণ্ডুলামের ন্যায় পুনঃপুনঃ ছুটাছুটি করিলে প্রজ্ঞালব্ধ তত্ত্বকে চিন্তার মধ্যে সন্নিবিষ্ট করা যায়, কারণ এই দুইটি এমনই বিজাতীয় যে একটির সহিত অপরটিকে কিছুতেই মিশান যায় না।

ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, যতই প্রাচীন কালের দিকে আমরা যাই ততই অবীক্ষার অংশ ক্রমশঃ ক্রমশঃ কম দেখিতে পাই। কেমন করিয়া সাংখ্যকার তাঁহার সত্ত্ব-রজস্তমোগুণাত্মক. প্রকৃতি ও তাহার বিকারভূত মহদহংকারাদি তত্ত্বনিচয়ের খোঁজ পাইলেন তাহা আমরা জানি না, কেমন করিয়া কণাদ ঋষি দ্রব্য গুণ কর্ম্ম সামান্ত বিশেষ সমবায়ের সন্ধান পাইলেন আমরা জানি না, কেমন করিয়া ব্রহ্মবাদী ঋষি "আত্মৈবেদং সর্ব্বম্" "তত্ত্বমসি শ্বেত-কেতো" এইসমস্ত মহাবাক্যের সন্ধান পাইলেন তাহাও আমরা জানি না। হয়ত ইহাদের মূলে অন্বীক্ষা ছিল, হয়ত বা ছিল না। পুঁথি খুঁজিয়া ইহার কোনও দলিলপত্র আমরা পাই না, কিন্তু যতই পরবর্ত্তী কালের দিকে আমরা চলিয়া আসি, ততই দেখি যে অবীক্ষার প্রয়োগে প্রত্যেক দর্শনের বিভিন্ন বিষয়ের দার্শনিক কল্পনাগুলি স্ফুটতর ও উজ্জ্বলতর হইয়া স্ফূর্ত্তি পাইয়া উঠিতেছে। য়ুরোপীয় দর্শনের সহিত বিশেষভাবে নিবিষ্টচিত্তে তুলনা করিয়া দেখিয়া আমার ইহাই মনে হইয়াছে যে আজ পর্য্যন্ত য়ুরোপে যেসমস্ত দার্শনিক চিন্তা প্রসার লাভ করিয়াছে, তাহার অধিকাংশই ভারতীয়দিগের মধ্যে কোনও-না-কোনও দার্শনিক সিদ্ধান্তে বহু পূর্ব্বেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। গত বৎসর নেপল্‌স্ নগরে পৃথিবীর সমস্ত দেশের প্রধান-প্রধান দার্শনিকদিগের যে মহাসম্মিলনী হইয়াছিল, সেখানে সেইসমস্ত মনীষীবৃন্দের সমক্ষে আমি এইকথাই বিশেষভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। দৃষ্টান্তস্বরূপ য়ুরোপের একজন সর্ব্বপ্রধান দার্শনিক ক্রোচেকে অবলম্বন করিয়া আমি ইহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম যে,তাঁহার দর্শনের সমস্ত প্রধান কল্পনাগুলিই ধর্ম্মোত্তর ও ধর্ম্মকীর্ত্তির বৌদ্ধ দর্শনে পাওয়া যায়, যেখানে উভয়ের মতের পার্থক্য দেখা যায়, সেখানে দার্শনিকতা-হিসাবে ক্রোচের মতই ভ্রান্ত। ক্রোচে নিজে সেই সভায় সভাপতি ছিলেন এবং বহু বাগ্‌বিজয়ের পর কথাগুলি একরূপ মানিয়াই লইয়াছিলেন। এবং বৌদ্ধদর্শনের সহিত তাঁহার মতের তুলনা করিয়াছি দেখিয়া গৌরব অনুভব করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

যদিও পরবর্ত্তীকালে অবীক্ষালব্ধ দার্শনিক কল্পনাগুলির এমন উন্নতি দেখা যায়, তথাপি এই অন্বীক্ষা হইতেই যে ভারতীয় দর্শনের উৎপত্তি তাহা বলা যায় না। য়ুরোপীয় দর্শন-শাস্ত্রের গোড়ার দিকে ও গ্রীস্ দেশের অবীক্ষার তেমন বল দেখা যায় না। কিন্তু তাহার ভিত্তিটা বরাবরই অবীক্ষামূলক জ্ঞানান্বেষণের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেখানে প্রথম-প্রথম অবীক্ষার যে দৌর্ব্বল্য দেখা যায় তাহার প্রধান কারণ এই যে, দার্শনিক চিন্তা ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠ ও বলিষ্ঠ হয়। নূতন নূতন পরীক্ষা দ্বারা অপরীক্ষিত তত্ত্বের সহিত নিত্যনূতন পরীক্ষার সংগ্রামে চিন্তা ও যুক্তির শক্তি ধীরে-ধীরে বাড়ীতে থাকে। কিন্তু গ্রীস্ দেশের সমগ্র চিন্তা-ধারার মধ্যে অলৌকিক উপায়ে তপস্যা-সাধন বা সমাধি দ্বারা বা কোন স্বয়ংপ্রকাশ শ্রুতিদ্বারা জ্ঞানোদ্ঘাটনের কোন চেষ্টাই দেখিতে পাই না। প্রাচীন গ্রীসীয় চিন্তা তা'র ক্রমবিকাশের নানা স্তরে যে ভারতীয় চিন্তাদ্বারা স্পৃষ্ট হইয়াছিল, তা'র কিছু-কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়; কিন্তু এই ভারতীয় চিন্তার সংস্পর্শ হইতে গ্রীসীয় দর্শন-চিন্তা কোন্ অংশে কতটুকু আক্রান্ত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য; কারণ কোন্-কোন্ সময়ে ভারতীয় মতের দ্বারা কোন্-কোন্ গ্রীসীয় মত কোন্ বাহ্য উপায়ে সংস্পৃষ্ট হইয়াছিল, তাহার বাহিরের ইতিহাস এখনও খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। তবে Pythagoras যে ভারতীয়দিগের সংস্পর্শে আসিয়া-ছিলেন; ইহা একরূপ সর্ব্ববাদিসম্মত এবং তাঁহার জন্মান্তর-বাদে বিশ্বাস ও ছোট-খাট অন্যান্য কতকগুলি বিধিনিষেধ ও মত ও বিশ্বাস দেখিয়া তাহা সত্য বলিয়াই মনে হয়। Scepticsদের প্রধান প্রবর্ত্তক Pyrrho Anaxarchus-এর শিষ্য হইয়া Alexanderএর দলের সহিত ভারতবর্ষে আসেন ও ভারতবর্ষের যোগীদের নিকট অনেক বিষয় শিখিয়া তাহারই ভিত্তিতে তাঁহার মতবাদ গঠিত করেন। গ্রীস-সভ্যতার প্রধান গুণগায়ক Burnet তাঁহার Sceptics-প্রবন্ধে Pyrrhoর কথা বলিতে গিয়া বলিয়াছেন।

"Subsequently he attached himself to Anaxarchus and followed him everywhere so that he associated with the "Gymnosophists" and Magi of India. That was of course when Anaxarchus went there.[1]

the train of Alexander the Great in 326 B.C. Antigonus of Carystus Pyrrhoর জীবনী-সম্বন্ধে একখানা গ্রন্থ লেখেন, Diogenes Laertius সেই গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার Apollodorus Chronic গ্রন্থে লিখিয়াছেন, Antigonus of Carystus in his work on Pyrrho says of him that he was originally a poor painter ...He used to frequent solitary and desert places and showed himself on rare occasions to his people at home. This he did from hearing an Indian reproaching Anaxarchus saying that he could not teach anything good to any one else, since he himself haunted the courts of kings." Burnet বলেন, 'Those who knew Pyrrho well described him as a sort of Buddhist Arhat and that is doubtless how he should regard him. He is not so much of a sceptic as an ascetic and a quietist. [অতঃপর তিনি এনেক্সারকাসের সহিত সর্ব্বত্রই যাইতেন এবং জিম্নোসেফিষ্ট্ সম্প্রদায় ও ভারতীয় পণ্ডিতদের সংস্পর্শে আসেন। তিনি অবশ্য সিকন্দর সাহের সহিতই খৃঃ পূঃ ৩২৬ অব্দে ভারতবর্ষে গমন করেন। এণ্টিগোনাস্ (করিষ্টাস্) তাঁহার গ্রন্থে পির্হো সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে তিনি প্রথমতঃ একজন দরিদ্র চিত্রকর ছিলেন......তিনি একাকী জনপরিত্যক্ত নির্জ্জন স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন এবং কদাচিৎ আত্মীয়বর্গের নিকট দেখা দিতেন। ইহার কারণ-সম্বন্ধে এই কথা শোনা যায় যে কোনও ভারতীয় মনীষীকে তিনি এক সময় এনেক্সারকাস্‌কে এই বলিয়া নিন্দা করিতে শুনিয়াছিলেন যে "তুমি আবার কাহাকে কি শিখাইতে যাও, তুমি নিজেই রাজাদের দরজায়-দরজায় ঘোর"। বার্ণেড্ বলেন যাহারা পির্হোকে জানিত তাহারা সকলেই তাহাকে একজন বৌদ্ধ অর্হতের মতনই বর্ণনা করিয়াছে এবং আমাদেরও তাহাকে সেইরূপই মনে করা উচিত। তিনি যথার্থতঃ সন্দেহবাদী ছিলেন না বরং একজন তপস্বী এবং মৌনীই ছিলেন।

প্লেটোর idea of the good ও non-being প্রভৃতির সহিত ভারতীয় ব্রহ্মবাদের বেশ সাদৃশ্য আছে, কিন্তু Neo-Platonistদের tranceএর সহিত ভারতীয় সমাধি জ্ঞানের যে সাদৃশ্য আছে এবং Neo-Platonistদের সহিত ভারতীয়দের সংস্পর্শের সম্বন্ধে আর যাহা শুনা যায় তাহাতে বেশ ভরসা করিয়াই বলিতে পারা যায় যে, তাহাদের মধ্যে এই যে সমাধিতে আত্মবিলয় ও সমাধি জ্ঞানের কথা শুনিতে পাই ইহা ভারতীয়দিগের নিকট হইতেই গৃহীত। তবেই দেখা যাইতেছে যে বুদ্ধিজ্ঞানাতিরিক্ত বেদ্য ও নিরোধজ জ্ঞানের কথা যুরোপীয় দর্শন-শাস্ত্রে সর্ব্ববাদিসম্মতভাবে গৃহীত হইয়াছিল বলিয়া বলা যায় না। কিন্তু বিক্ষিপ্তভাবে সমাধির অবস্থার কথা খৃষ্টীয় Mysticsদের মধ্যে ও সাধারণভাবে য়ুরোপীয় সাহিত্যের মধ্যে পাওয়া যায়।

James তাঁহার Varieties of Religious Experience গ্রন্থে ইহার কতকগুলি প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। Dionysius হইতে Erigena, Eckhart, Boehme, Swedenborg প্রভৃতি অনেকের মধ্যেই আত্মবিলয় এই ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। Eckhartএর এক শিষ্যের কথা শুনা যায়, যে একসময় সমাধিতে একপভাবে তাঁহার বাহ্যসংজ্ঞা লোপ হয় যে সকলে তাঁহাকে মৃত বলিয়া মনে করিয়া গোর দিতে লইয়া গিয়াছিল। Thomas Aquinas এই ধ্যান সমাধির কথা বলিতে গিয়া বলিয়াছেন "The higher our mind is raised to the contemplation of spiritual things, the more it is abstracted from sensible things. But the final term at which contemplation can possibly arrive is the divine substance. Therefore the mind that sees the divine substance must be wholly divorced from the bodily senses either by death or by some rapture." অতিপ্রাকৃতিক বিষয়ের ধ্যানে আমাদের মন যতই ক্রমশঃ উচ্চে উঠিতে থাকে ততই তাহা ইন্দ্রিয়গোচর বস্তু হইতে ক্রমশঃ ব্যাবর্ত্তিত হইতে থাকে। কিন্তু এই ধ্যান-পথের চরম প্রাপ্তি দিব্য-তত্ত্বের সাক্ষাৎকার, সেইজন্ত দিব্যতত্ত্বসাক্ষাৎকারের উপযোগী করিতে হইলে মনকে কোনও ভাব প্রেরণাদ্বারা বা মৃত্যুদ্বারা ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ হইতে সর্ব্বতোভাবে বিচ্ছিন্ন করিতে হইবে। ওয়াই নদীর তীরে বেড়াইতে গিয়া এইরকমেরই একটি ভাবের বর্ণনা করিতে গিয়া Wordsworth লিখিয়াছেন :—

To them I may have owed another gift
Of aspect more sublime, that blessed mood
In which the burthen of the mystery
In which the heavy and the weary weight
Of all this unintelligible world,
Is lightened; that serene and blessed mood,
In which the affections gently lead us on
Until the breath of this corporeal frame
And even the motion of our human blood
Almost suspended, we are laid asleep
In body, and become a living soul
While with an eye made quiet by the power
Of harmony, and the deep power of joy
We see into the life of things.

কত না পেয়েছি আমি তব সুগভীর.
কত শান্তিময় ভাব তাহাদের কাছে ;
সে ভাব পরশে যেন এ মূঢ় ধরার
দুর্ব্বহ প্রাস্তিভার, ক্লান্তিভারগুলি
ধীরে যেন হয় গো শিথিল, সেই
শান্তি সুখ সুধা উৎস ধীর নিঃসরণে
নিয়ে যায় ধীরে ধীরে কোন্ দূর দেশে ;
শরীর-নিঃশ্বাস যেন হয় গো নিরোধ,
রক্তস্রোত আসে যেন একেবারে থেমে
নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে দেহখানি যেন
লভে গো বিশ্রাম, প্রাণময় আত্মা শুধু
দীপ্ত অচঞ্চল ; কোন্ দিব্য চক্ষু যেন
ধীরে জেগে ওঠে, গভীর আনন্দবশে ;
সমতান ল'য়ে নবীন জনম লভি
সমস্ত রহস্যতত্ত্ব করে গো সাক্ষাৎ।

টেনিসনও ঠিক এইরকম ভাবের কথাই উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছিলেন

"For knowledge is the swallow on the lake
That sees and stirs the surface shadow there,
But never yet hath dipt into the abyss,
The Abysm of Abysms beneath within" etc., etc.

জ্ঞান সে ত হংস-সম ভাসে সরোবরে
উপরের ছায়া শুধু ধরিবারে পারে
না পারে ডুবিতে কভু গভীর অতলে
অতলের অতল সুতল যেথা জলে।

কিন্তু এগুলিদ্বারা শুধু এইটুকুই প্রমাণ হয় যে, যে নিরোধজ বা সমাধিজ প্রজ্ঞার এমন প্রাধান্য দিয়া গিয়াছেন তাহা ভারতীয় মনীষীদেরই একটা পাগ্‌লামি নয়, য়ুরোপীয়েরাও কোনও-কোনও সময়ে তাহার আস্বাদ পাইয়াছেন। কিন্তু আস্বাদ পাইলেও দুই-একজন সাধক ছাড়া আর কেহই এই নিরোধজ জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা মানেন নাই বা এই নিরোধজ জ্ঞান কি উপায়ে আয়ত্ত করিতে হয় য়ুরোপীয় দর্শনে তাহার কোনও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহারা এই নিরোধজ জ্ঞানের আস্বাদে লুব্ধ হইয়াছে, য়ুরোপ তাহাদিগকে Mystic বলিয়া দর্শন-সমাজের পংক্তির বাহির করিয়া রাখিয়াছে। য়ুরোপীয় দর্শন-শাস্ত্রের মূল-ধারা বরাবরই অন্বীক্ষাকেই প্রধানভাবে অবলম্বন করিয়া চলিয়াছে। যাঁহাদের অন্বীক্ষা-শক্তি যত কম, তাঁহাদের দর্শনে সেইপরিমাণে অপরীক্ষিত মত ও বিশ্বাস স্থান পাইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের আদর্শ বরাবরই অন্বীক্ষা, শৈথিল্য যেখানে ঘটিয়াছে, তা'র মূলে সেই দার্শনিকেরও দুর্ব্বলতারই পরিচয় পাই। মধ্যযুগের খৃষ্টীয় ধর্ম্মের উন্মাদনায় এই অন্বীক্ষা-বৃত্তি যেমন দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, বর্ত্তমান যুগের নবোন্মেষের প্রারম্ভে আবার তেম্‌নি করিয়া অন্বীক্ষা আশ্চর্য্য বলসঞ্চয় করে। য়ুরোপের এই দিকের নবোন্মেষের কথা মনে হইলেই Baconএর কথা মনে পড়ে। Bacon যে-বিষয়ে পুনঃপুনঃ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন, তা'র মূল কথাই এই যে প্রত্যক্ষ ও তন্মূলক পরিশুদ্ধ অনুমানের দ্বারা পুনঃপুনঃ পরীক্ষা না করিয়া কোনও ধারণা বিশ্বাস বা লোকবাদকেই সত্য বলিয়া স্বীকার করিব না। Bacon নিজে কোনও বড়-রকমের বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার করিতে পারেন নাই, কিন্তু তিনি তাঁহার সমস্ত গ্রন্থে ভূয়োদর্শন ও ভূয়ঃ-সহচারের সমর্থনের দ্বারা উহাপোহমূলক তর্কের দ্বারা নানাবিধ স্বাভাবিক সম্বন্ধ আবিষ্কার করিয়াই যে আমাদিগকে ক্রমশঃ ক্রমশঃ প্রকৃতির অজ্ঞাত তথ্যগুলিকে বাহির করিতে হইবে এসম্বন্ধে য়ুরোপের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। তাঁহার পরবর্ত্তী কালে য়ুরোপে আজ পর্য্যন্ত জড় জগতের ও মনোজগতের আলোচনায় যাহা-কিছু পাওয়া গিয়াছে, সমস্তই Baconএর এই অন্বীক্ষা-মূলক পরীক্ষা দ্বারা। ভারতীয় দর্শনের অন্বীক্ষার সহিত বর্ত্তমান জগতের বিজ্ঞান ও দর্শন আলোচনার অন্বীক্ষার সহিত একটু বেশ পার্থক্য আছে। ভারতের বিভিন্ন দর্শন-মতের ক্রম-বিকাশের ইতিহাসে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে যখন কোনও দর্শনের বিশেষ কোনও একটি মত অপর দর্শনের অনুবর্ত্তীদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে; তখন সেই দর্শনের অনুবর্ত্তীরা নানাবিধ সূক্ষ্ম তর্ক-জালের দ্বারা সেই আক্রান্ত মতটির সমর্থন করিয়া তাহাকে নির্দ্দোষ ও অক্ষুণ্ণ বলিয়া প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আবার অন্য কেহ বা অপর কোনও মতের নূতন দোষ বাহির করিতে চেষ্টা করিয়াছেন ও তাহার পরবর্ত্তীকালে তাহার অপর নূতন সমর্থনের চেষ্টা চলিয়াছে, এম্‌নি করিয়া প্রত্যেক দর্শনের দার্শনিক কল্পনা-গুলি ধীরে-ধীরে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। প্রত্যেক দর্শনের অনুবর্ত্তীরা শিষ্য প্রশিষ্যানুক্রমে সেই-সেই দর্শনের সিদ্ধান্তগুলি ধ্রুব সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়া বরাবর তাহার সমর্থনের চেষ্টাই করিয়াছেন, কিন্তু নিজেদের বিচার বুদ্ধিকেই প্রধান করিয়া লইয়া মনকে সম্পূর্ণ স্বাধীন করিয়া দিয়া শুধু যুক্তি-বিচারের উপর নির্ভর করিয়া সত্যনির্ণয়ের চেষ্টা করেন নাই। উকীল যেমন যুক্তিতর্কদ্বারা শুধু স্বপক্ষেরই সমর্থনের চেষ্টা করে এবং তদনুকূলে প্রতিবাদীর মত নিরাস করে, হাজার-হাজার বৎসর ধরিয়া শিষ্য-প্রশিষ্যানুক্রমে তেম্‌নি এক-একটি দর্শন-শাস্ত্রের সমর্থনের চেষ্টা চলিয়াছে; কিন্তু বিচারক যেমন নিরপেক্ষভাবে দোষগুণ বিচার করিয়া সত্য নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করেন; সেভাবে পূর্ব্ববর্ত্তীদের ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত বর্জ্জন করিয়া নূতন-নূতন সিদ্ধান্ত নির্ণয়ের চেষ্টা ছিল না। প্রত্যক্ষকে অন্বীক্ষা দ্বারা যাচাই করিয়া লইয়া যাহা সত্য বুঝিব, সেইটিই যতদিন তাহার ভুল না দেখিতে পাই ততদিন সত্য বলিয়া

মানিব, এই যে একটি মনের অবস্থা—এটি না জন্মিলে সত্যাবিষ্কারের পথ নির্ব্বাধ ও নিষ্কণ্টক হইতে পারে না। য়ুরোপেও মধ্যযুগে যখন কেবল Plato ও Aristotleএর সমর্থন চলিত বা Bibleএর মত ও বিশ্বাসের সমর্থন চলিত, তখন য়ুরোপীয় চিন্তা কত যে ঘূর্ণীতে পাক খাইয়া মরিয়াছে তাহা বলা যায় না। পাশাপাশি অনেকগুলি বিভিন্ন মতপরস্পরের সংঘর্ষে পরস্পরকে সংশোধনের চেষ্টা করিয়াছে বলিয়া আমাদের দর্শন-শাস্ত্রকে য়ুরোপের মধ্য-যুগের স্থায় দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হয় নাই বটে, কিন্তু দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্র যদি এদেশে যথার্থভাবে উদার থাকিত, তবে এদেশের দর্শন-শাস্ত্রের উন্নতি যে আরও কত বেশী হইত তাহা বলা যায় না। এবং অতি প্রাচীনকাল হইতে এ-দেশের চিন্তার যেমন তীক্ষ্ণতা দেখা যায়, তাহাতে হয়ত এই দেশেই নব্য জড়-বিজ্ঞান, প্রাণ-বিজ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্রের সর্ব্বাগ্রে প্রতিষ্ঠা হইত। নব্য য়ুরোপের সমস্ত উন্নতি, সমস্ত বিজ্ঞান-সাধনার ঐটিই প্রধান কারণ বলিয়া মনে হয়, যে মধ্যযুগের অবসানের পর হইতেই য়ুরোপীয়দের নাড়ীতে-নাড়ীতে এই একটি নূতন চেতনার সঞ্চার হয় যে অন্বীক্ষাকে প্রত্যক্ষদ্বারা ও প্রত্যক্ষকে অন্বীক্ষাদ্বারা সংশোধন করিয়া যাহা সত্য বলিয়া পাইব, তাহাই নিঃসংকোচে মানিয়া লইয়া সেই প্রণালীতে জগতের সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়ের তথ্য আবিষ্কার করিব; ইহাকেই অনেক সময় চলিত কথায় বলা হয় appeal to experience। মন-গড়া কল্পনাকে অবলম্বন করিলে চলিবে না, পূর্ব্বগৃহীত ধারণার বা অভ্যস্ত মত ও বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইলে চলিবে না; প্রত্যক্ষ ও অন্বীক্ষার আগুনে যতক্ষণ পর্য্যন্ত পোড়াইয়া পরখ করিয়া না লইব ততক্ষণ কিছুই মানিব না। এইটিই হইতেছে বর্ত্তমান যুগের আধুনিকতার মূল মন্ত্র। কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রদ্ধেয় বন্ধু মনীষী Lord Haldane আমার ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস-সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন—

"But there is also the contribution to the substantive side: Indian philosophy has a longer history than that even of Grecian thought which it precedes. I am struck at the same time, with the way in which some of the most complete developments of post-Kantian objective idealism in Europe are anticipated in several of the Indian systems which you describe. Where the West however appears to have been stronger is in the strenuous effort which it has made, since the days of Bacon, to avoid losing touch with actual experience. It is difficult to think for instance that Einstein or Niels Boher could have done their work under any but western moulding influence.

কিন্তু আপনার গ্রন্থে আর একটি বিশেষ কথা এই পাই যে ভারতীয় দর্শন গ্রীক্ দর্শনের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং গ্রীক্ দর্শন হইতে দীর্ঘতর কাল ধরিয়া ইহার প্রসার ও বিস্তার চলিয়াছিল। আমি বড়ই আশ্চর্য্য হইয়াছি যে, আপনি যে সমস্ত ভারতীয় দর্শনের মত বিবৃত করিয়াছেন তাহার অনেকগুলিতেই নব্য য়ুরোপের ক্যাণ্টের পরবর্ত্তীকালের বাহ্য বিজ্ঞানবাদের মতগুলি অতিসম্পূর্ণভাবে পূর্ব্বেই আবিষ্কৃত হইয়া গিয়াছে। প্রতীচ্য দেশের এইখানেই প্রধান বল যে বেকনের কাল হইতেই প্রত্যক্ষের সহিত যাহাতে কোনওরূপে বিযুক্ত হইয়া না পড়িতে হয় সেইজন্য বরাবরই প্রাণপণ চেষ্টা চলিয়াছে। নিলস্ বর্ ও আইন্‌ষ্টাইন্ এর মতন বৈজ্ঞানিকেরা যে অন্য কোনও দেশের মানসিক আব্‌হাওয়ায় তাঁহাদের কাজ করিতে পারিতেন তাহা আমরা ভাবিতেও পারি না—

য়ুরোপে এই প্রত্যক্ষান্বীক্ষা-মূলক experience এক-দিকে যেমন নূতন-নূতন দার্শনিক চিন্তা ও তথ্যাবিষ্কার করিতেছে, অপরদিকে তেম্‌নি জড় জগতের গোপন তত্ত্বগুলি আবিষ্কার করিয়া তাহার সাহায্যে মানুষের সুখ-সুবিধার বৃদ্ধি করিতেছে। বর্ত্তমান য়ুরোপের জ্ঞানার্থিতার আমরা যে পরিচয় পাইতেছি, তাহাতে এই বিশেষত্বটুকু দেখিতে পাই যে, যতদিকে যাহা-কিছু জানিবার আছে সবদিকেই প্রায় সমান আগ্রহে বিদ্যার্থীরা নব নব সন্ধানে ছুটিয়া চলিয়াছে। জড়তত্ত্ব, প্রাণতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধ প্রস্থানের পথিকেরা একনিষ্ঠ সাধনায় দুর্গম পথে ধীরে-ধীরে সাবধানে অগ্রসর হইতেছেন। যত নূতন-নূতন জ্ঞানের রাজ্য আবিষ্কার হইতেছে ততই আরও নূতন-নূতন অনাবিষ্কৃত রাজ্যের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে ও তাহার আবিষ্কারের জন্য নূতন-নূতন যাত্রিবৃন্দ অদম্য উৎসাহে লাগিয়া পড়িতেছেন। নূতন পন্থা, নূতন প্রণালী, নূতন উপায় প্রতিদিনই মানুষের আয়ত্তের মধ্যে আসিয়া পড়িতেছে। জ্ঞাত তথ্যের পরিমাণ যতই বাড়িতেছে, ততই এক-একটি বিদ্যাস্থান বিবিধ বিদ্যাস্থানে বিবিক্ত ও বিভক্ত হইয়া আলোচিত, পরীক্ষিত ও অধীত হইতেছে। শুধু জড় তত্ত্ব বলিয়া এখন আর কোন বিদ্যাস্থানের প্রচলন

নাই, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা প্রভৃতি নানা বিভাগে ইহার আলোচনা চলিতেছে। আবার এগুলিরও প্রত্যেকটিই নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়াছে এবং তাহার প্রত্যেকটি একটি স্বতন্ত্র বিদ্যাস্থানরূপে পরিগণিত হইয়া অনুশীলিত হইতেছে ; এবং এক-একটি শাখার অতি সামান্য এক-একটি অংশ লইয়া আলোচনা ও পরীক্ষা করিতে কত মনীষী বিদ্যার্থীরা সমস্ত জীবনের একনিষ্ঠ সাধনা নিয়োজিত করিতেছেন, একজনের পরীক্ষিত আবিষ্কার অপরের পরীক্ষিত জ্ঞানদ্বারা আলোচিত, তিরস্কৃত ও সংশোধিত হইতেছে ; এবং এম্নি করিয়া বহু ব্যক্তির ভূয়োদর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া দৃঢ় হইয়া সত্য ও তথ্য রূপে পরিণত হইয়া চলিয়াছে। কিন্তু বিভিন্ন প্রস্থানের এই ক্রমোপচিত বিস্তার-প্রাপ্ত জ্ঞান-পর্য্যায় যতই একদিকে বিভিন্ন বিদ্যাস্থানের মধ্যে আপাত-বিরোধ সৃষ্টি করিতেছে এবং আপাত প্রতীয়মান ঐক্য প্রতিভাসকে ভ্রম-সঙ্কুল এবং মিথ্যা বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছে, ততই আবার অপরদিকে এমন অনেক অন্তর্নিগূঢ় মূল ঐক্যসূত্রকে স্পষ্ট প্রতিভাস করিয়া তুলিতেছে যে বিদ্যাপ্রস্থানগুলির আপাত-বিরোধের অন্তরালে সর্ব্বদাই কোনও না-কোনও বন্ধন, কোনও-না-কোনও ঐক্যের আশ্বাস ও একের দ্বারা অপরের সাহায্যের সম্ভাবনার কথা আমাদের মনে স্বতঃই জাগ্রত হইতেছে। য়ুরোপে তাই কোনও বিদ্যাস্থানেরই অনাদর নাই। জড় বিজ্ঞানের শাখা-প্রশাখার প্রদেশ-বিশেষের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মাংশে যেমন কাজ চলিতেছে, নভোমণ্ডলের দূরতম প্রদেশের জ্যোতির রেখায় যেমন অনুসন্ধান চলিতেছে, মনোবিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্রের আলোচনাও ঠিক তেম্নি জোরেই চলিয়াছে। একের চর্চ্চার দ্বারা অপরের চর্চ্চার সাহায্য ও পরিপূরণ হইতেছে। বস্তুতঃ জড় বিজ্ঞানাদি-চর্চ্চার প্রণালীর সহিত দর্শন-চর্চ্চার প্রণালীর কোনও প্রকৃতিগত বিরোধ নাই, কেবল জড়বিজ্ঞান-চর্চ্চার অনেকাংশেই ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের সুবিধা আছে, তাই অন্বীক্ষার সঙ্গে প্রত্যক্ষ মিলাইয়া লওয়ার ব্যবস্থা করিয়া সহজেই কোনও সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায়। কিন্তু জড়বিজ্ঞানের মধ্যেও এমন অনেক অংশ আছে, যেখানে ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ করা সহজ নয়, সেখানে শুধু অনুমানের উপরেই নির্ভর করিয়া চালাতে হয়। এবং সেইজন্য সে-সমস্ত স্থলের সিদ্ধান্ত ও দার্শনিক সিদ্ধান্তের মতনই দুরূহ হইয়া পড়ে। কিন্তু কি বিজ্ঞানে, কি দর্শনে, কি অন্যবিধ ব্যবহার-শাস্ত্রে, কি লৌকিক, কি সামাজিক বা রাষ্ট্রিয় ব্যবহারে, সব দিক্ দিয়া অন্বীক্ষা-বৃত্তির এই স্বাধীনতাই বর্ত্তমান য়ুরোপের উন্নতির মূল। নিত্য-নূতন জ্ঞানের, কর্ম্মের ও ভোগের অনুসন্ধানে য়ুরোপ যে কোন্ অনন্তের দিকে উধাও হইয়া চলিয়াছে, তাহার ঠিক-ঠিকানা নাই। নূতনের দ্বারা প্রাচীনকে সংশোধন করিয়া নবতর অবস্থার উন্মেষ সাধন, thesis (স্থাপন) antithesis (প্রতিস্থাপন) and synthesis, (সংস্থাপন) এই ধারা-প্রবাহে নবতর কল্যাণতর রূপের অনুসন্ধান, ইহারই নাম progress (উন্নতি), ইহারই নাম advancement (অগ্রগতি)। ইহাই বর্ত্তমান য়ুরোপের মূল মন্ত্র ; অনন্ত কালের অনন্ত বিকাশের উদ্দেশ্য এই যে, বাধাহীন শ্রান্তি-ক্লান্তিহীন চির যাত্রা—ইহাই নবীন য়ুরোপের আদর্শ।

প্রাচীন ভারতবর্ষ কিন্তু নির্ব্বাধ গতির আদর্শে আপনাকে গড়িতে চেষ্টা করে নাই। এক-একটি স্থিতির বৃত্তের দ্বারা সর্ব্বদাই তাঁহারা গতির প্রসারকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া চলিয়াছিলেন, এই নিয়ন্ত্রণের মর্য্যাদা রক্ষা করায় তাঁহাদের কাছে বেশ একটা সার্থকতা ছিল, তাই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের গণ্ডীর এত জোর, তাই জ্ঞান ও কর্ম্মের ভেদ। নিরবচ্ছিন্ন গতির কথা শুনিলে তাঁহারা ভয় পাইতেন, তাই নিরন্তর জন্ম-মৃত্যুর সংসার-ধারার হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাঁহারা ব্যস্ত হইতেন। শেষ কোথায়, চির বিশ্রাম কোথায়, তৃষ্ণা ও কর্ম্মের হাত হইতে মুক্তি পাইব কেমন করিয়া, চির আনন্দের চির স্থিতি কেমন করিয়া লাভ করিব, ইহাই ছিল তাঁহাদের চরম লক্ষ্য। মুক্তিতে আমাদের পরম সার্থকতা, কিন্তু এ-সার্থকতা য়ুরোপীয় হিসাবে সার্থকতা নয়, ইহা আমাদের লৌকিক জ্ঞান, কর্ম্ম, সুখ, দুঃখ, তৃষ্ণা, কামনা-এ সমস্তের চরম লয় ; আত্মার স্ব-স্বরূপে অবস্থান, বৌদ্ধ বলিবেন সন্তান-ধারার চরম নির্ব্বাণ। এ-অবস্থায় আত্মার কোনও জ্ঞান বা

আনন্দ থাকে কি না, এ-সম্বন্ধে আত্মবাদীদের মধ্যে মতভেদ আছে। কিন্তু কোনও-না-কোনও রূপে জ্ঞান, কর্ম্ম, সুখ দুঃখ ভোগ, এবং মনের সহিত যে আত্মার চির বিচ্ছেদ সাধন, ইহাই মানুষের চরম ও পরম উদ্দেশ্য। জ্ঞানই বন্ধ, তাই জ্ঞানের চরম উদ্দেশ্য জ্ঞানলয়, সমস্ত দার্শনিকতার চরম সার্থকতা, এই সংকল্পবিকল্পমূলক অবীক্ষামূলক জ্ঞানের চরম ধ্বংস, মনের বিকাশসাধনের উদ্দেশ্য মনের লয় বা মনের সহিত আত্মার চিরবিচ্ছেদ। প্রমাণমূলক জ্ঞান চিরলুপ্ত হইয়া যেদিন নিরোধজ স্থির প্রজ্ঞা অচলভাবে চির দেদীপ্যমান থাকিবে, সে-অবস্থাকে কৈবল্যই বল, জ্ঞানহীন মোক্ষাবস্থাই বল, আর ব্রহ্মভূত আনন্দস্বরূপই বল, সেইখানেই সমস্ত শাস্ত্রের সমস্ত উদ্দেশ্যের, সমস্ত গতির চরম বিশ্রাম এবং এই বিশ্রামেই আমাদের পরম সার্থকতা। এই আদর্শের বিরুদ্ধে অল্প-স্বল্প প্রতিবাদ ভারতবর্ষেও যে একেবারে হয় নাই তা বলা যায় না। প্রত্যেক দর্শনেই পরবর্ত্তী লেখকদের মধ্যে দেখা যায় যে, যদিও মূল সিদ্ধান্তের সহিত তাঁহারা সম্পূর্ণ এক-মত, তথাপি বিচারমূলক দার্শনিক চিন্তার দিকেই তাঁহাদের ঝোঁক। মুক্তির চরম লক্ষ্যটি ক্রমশঃই যেন তাঁহাদের মধ্যে শিথিল হইয়া আসিতেছিল। আবার অন্যদিকে গীতার নিষ্কাম কর্ম্মের আদর্শ ও বৈষ্ণবদিগের সারূপ্যসাযুজ্যস্পৃহা, ভগবল্লীলাস্বাদনস্পৃহা, শ্রীভগবানের অপ্রাকৃতলীলার অপ্রাকৃত আনন্দবিহার প্রভৃতির আদর্শ প্রাচীন মুক্তির আদর্শের একরূপ প্রতিবাদ ও একটি নূতন আদর্শের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা বলিয়াই মনে করা যায়। এবং নিরোধজ জ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান, কৈবল্য বা নির্ব্বাণের পরিবর্ত্তে, শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তি ও প্রীতির সম্পাদন ও মানুষের সহিত প্রীতি-বিস্তার, এইটিই ক্রমশঃ প্রধান হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু এখানেও জ্ঞানের আদর্শের জ্ঞানেই চরম সার্থকতা ও চরম প্রাপ্তি হইতে পারে না, তাহার চরম হইতেছে ভক্তিতে ও প্রীতিতে এবং কর্ম্মের চরম সার্থকতা হইতেছে ভগবৎ প্রীতিতে ও সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগে। এত-বড় জ্ঞানপ্রধান (intellectual) দেশের হাড়ে-হাড়ে একটা প্রকাণ্ড জ্ঞান-বিরোধিতা (anti-intellectualism) অতি আদিমকাল হইতে রাজত্ব করিতেছিল। জ্ঞানধ্বংসই জ্ঞানের চরম সন্ন্যাস। এইজন্যই বুদ্ধিজ্ঞান অপেক্ষা প্রজ্ঞার স্থান এত উচ্চে। এইটিই ভারতীয় দর্শনের mysticismএর ধারা।

এই ভারতীয় আদর্শের সহিত য়ুরোপীয় আদর্শের একটি মৌলিক বিরোধ সহজেই প্রতীত হয়। আজ য়ুরোপীয় চিন্তার বন্যা আসিয়া সমস্ত পশ্চিম সাগরের ঊর্ম্মি-কোলাহলে আমাদিগের উপর পড়িয়া আমাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছে। আমরা যেন এই যুগ-সন্ধির প্রান্তে আসিয়া পৌঁছিয়া একেবারে আশ্রয়হীন হইয়া পড়িয়াছি, পায়ের তলা হইতে যেন মাটি সরিয়া যাইতেছে। কেহ বলিতে-ছেন, সমস্ত পাশ্চাত্য সভ্যতা বর্জ্জন কর, কেহ বলিতেছেন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা কর, back to the past। কেহ বলিতেছেন, ভারতের প্রাচীন আদর্শকে তুচ্ছ করিয়া সর্ব্বতোভাবে বর্ত্তমান য়ুরোপের সঙ্গে গা ভাসাইয়া দেও। সর্ব্বাপেক্ষা বিপদ্ এইখানে যে, য়ুরোপ আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করিয়াছে বটে, কিন্তু প্রাণে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। আবার ভারতবর্ষের প্রাচীন আদর্শকে যতই না কেন দুই হাতে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতে চাই, ভারত-বর্ষের প্রাচীন আসন আমাদের মন হইতে টলে নাই, ভারতবর্ষের প্রাচীন আদর্শের কথা বলিয়া যখনই কেহ আমাদের ডাকে, তখনই সমস্ত প্রাণ তাহাতে সাড়া দিয়া উঠে, ভোগের রাজবেশ দুই হাতে আঁকড়াইতে চাই অথচ ত্যাগের গৈরিকের জন্য প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। পথ বুঝিলেই যে আমরা সহজে পথ ধরিতে পারিব, তাহা মনে হয় না। সমস্ত পথের যিনি মালিক, সমস্ত গতির যিনি আশ্রয়, সেই পরম পতিই নানা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া আমাদের সংশয়চ্ছেদন করিবেন, তবু এই প্রশ্ন মন হইতে ঠেকানো যায় না—কঃ পন্থাঃ, প্রাচ্য না প্রতীচ্য?

প্রাচ্য পদ্ধতিতে উত্তর দিতে হইলে আমার এই উত্তর মনে আসে যে, বিভজ্য বচনীয়োঽয়ং প্রশ্নঃ, অর্থাৎ এককথায় হাঁ বা না, এটা বা ওটা বলিয়া ইহার জবাব হয় না, যথাযোগ্য নিবেশের দ্বারা ইহার উত্তর খুঁজিতে হইবে। দুইটি বিরাট্ সভ্যতার মধ্য দিয়া যে দুইটি আদর্শ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে; ইহার কোনওটিকেই আমরা মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিব না; বা কোনওটিকেই শ্রেষ্ঠ বা অপকৃষ্ট বলিতে পারি না, দুইটিকেই পর্য্যায়ক্রমে ও অধিকারী-বিশেষে

আমাদের মধ্যে স্থান দিতে হইবে। সমস্ত জ্ঞান ও কর্ম্মের আদর্শই যে মুক্তি, ইহা আমরা স্বীকার করিব না। জ্ঞানই জ্ঞানের চরম লক্ষ্য হোক। নিরোধজ জ্ঞানের মধ্যে প্রমাণ-মূলক বা অন্বীক্ষামূলক জ্ঞানকে আমরা বিনাশ করিতে চাই না। পরন্তু অন্বীক্ষাকেই বাড়াইয়া য়ুরোপের মত সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়ের উদ্ঘাটনে আমরা ব্রতী হইতে চাই। আবার জ্ঞানকে এড়াইয়া জ্ঞানলয়ের মধ্যেও যে একটা বোধি, একটা আত্ম সার্থকতা আছে, ইহা অস্বীকার করিবার কোনও কারণ নাই। ভোগবৃত্তিতে একটা তৃপ্তি আছে বলিয়া ত্যাগবৃত্তির মধ্যে যে একটা পরম সার্থকতা, পরম আনন্দ আছে, ইহা অস্বীকার করিবার হেতু নাই। নানা আদর্শের সমষ্টিতে ও আবর্ত্তন-পরিবর্ত্তনে মানুষের চিত্ত প্রতিষ্ঠিত, তাহার একটির যে অপরটিতে লয় হইতে হইবে এমন কথা নাই। মানুষ একদিকে যেমন গভীর-ভাবে একটি আদর্শের সাধনা করিয়া সার্থকতা লাভ করিতে পারে, তেমনি অল্পাধিক-পরিমাণে সরলভাবে বিভিন্ন আদর্শের দাবী মিটাইবার চেষ্টা করিয়াও একটা সার্থকতা লাভ করিতে পারে। কৈবল্যে নিজেকে শেষ করিয়া দেওয়া মানব জীবনের চরম উপেয় নয়, আবার ভোগ-পরম্পরা ও চিন্তা-পরম্পরার মধ্যে অবিশ্রাম গতি ছাড়া আর যে মানুষের কিছু উপেয় নাই এমনও নহে। যে-মানুষের মধ্যে যে-বিশেষ আদর্শটি মূর্ত্তিমান্, সে তাহারই সাধনা করিয়া জীবনকে ধন্য করিবে। ভারতীয় প্রাচীন আদর্শের শান্তস্নিগ্ধ মাহাত্ম্য যদি য়ুরোপের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিত, তবে সে দেশ হয়ত আরও একটু অন্তর্মুখ হইতে পারিত এবং য়ুরোপের যে-জীবনীশক্তি, যে জ্ঞানানু-সন্ধিৎসার প্রাবল্য দেখিতে পাই তাহা যদি আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত; তবে এই অসাড় দেশটা জগতের জাতিবর্গের জীবন-মরণ-যুদ্ধে পরাজয়ের গ্লানি হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিত। শুধু ভোগবৃত্তি-নিরূপিত আদর্শে যে-জাতি চলিতে চায় তাহার পতন যেমন অবশ্যম্ভাবী, শুধু ত্যাগবৃত্তি নিরূপিত আদর্শে যে চলিতে যায়, তাহার মৃত্যুও তেমনিই অনিবার্য্য। পাখী যেমন তার দুই ডানায় ভর করিয়া ব্যোমমার্গে উড্ডীন হয়, মানুষও তেমনই ভোগ ও ত্যাগ এই উভয়কে অবলম্বন করিয়া, তাহার জীবনযাত্রা অনুসরণ করিবে। আমাদের মধ্যেও নীতিশাস্ত্রে এই নীতিরই প্রশংসা করা হইয়াছে, ধর্ম্মার্থকামাঃ সমমেব সেব্যা যোহ্যেকসক্তঃ স জনো জঘন্যঃ। কেহ আত্মস্থ হইয়া আত্মানন্দ অনুভব করিতে চান করুন, কিন্তু সেইটিই চরম উদ্দেশ্য নয়, প্রমাণবৃত্তি দ্বারা জ্ঞানান্বেষণের চেষ্টাকে কোনও রকমেই আমরা হতাদর করিতে পারি না।

বাহিরের সুখ-সুবিধার নির্ণয়ের দ্বারা যাহার মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায়, তাহারই একটা বাহিরের প্রয়োজন নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায়, কিন্তু কাব্য শিল্প, সঙ্গীত, কি নানা বিষয়ক জ্ঞানান্বেষণ, ইহাদের কোন বাহ্য প্রয়োজন নির্ণয় হয় না; যদি বা কোনও সময় কোনও প্রয়োজন নির্ণয় করা যায়, তখন সেই প্রয়োজন-নির্ণয়ে তাহাদের যথার্থ মূল্য নির্দ্ধারণ হয় না। শুধু আনন্দ পাওয়া যায় বলিলে কাব্যের প্রয়োজন বলা হয় না, কারণ কাব্যের যে বিশেষ আনন্দ সেই আনন্দ কাব্যানুশীলনের সঙ্গে এমনই বিশেষভাবে জড়িত যে, তাহাকে তাহা হইতে পৃথক্ করা যায় না। এবং আনন্দের জন্য কাব্যানুশীলন করি বলাও যেমন সত্য, কাব্যানুশীলনের জন্য কাব্যানুশীলন বলিলেও ঠিক্ তাহাই বুঝায়। তেমনি দর্শনশাস্ত্রে যে অন্বীক্ষা-মূলক তত্ত্বানুশীলন আরব্ধ হয়, তাহা আমাদের তত্ত্বান্বেষী মনকে তাহার আহার জোগায়। এইখানেই তাহার বিশেষত্ব। চোখের সাম্‌নে যাহা শুধু ভাসিয়া বেড়ায়, শুধু তাহাই লইয়া আমাদের মন তৃপ্ত হইতে পারে না; মন আরও গভীরভাবে তাহাদের মধ্যে নিবিষ্ট হইয়া তাহাদের যথার্থ তাৎপর্য্য বুঝিতে চায়, সেই চাওয়ার ফলেই দর্শন-শাস্ত্রের উৎপত্তি এবং সেই-খানেই তাহার যথার্থ সার্থকতা। অন্বীক্ষা-মূলক শাস্ত্রই দর্শন-শাস্ত্র, সেইহিসাবে অন্বীক্ষা-মূলক সর্ব্ববিধ জড়-বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানকেই ব্যাপক অর্থে দর্শন-শাস্ত্র বা philosophy বলা চলে। কিন্তু আরও ছোট করিয়া দেখিলে ইহাকে তত্ত্ববিজ্ঞান বা মনোবিজ্ঞান বা অধ্যাত্ম বিদ্যা প্রভৃতি অর্থেও ব্যবহার করা চলে। কিন্তু যে অর্থেই ব্যবহার করা হউক না কেন, ইহার মূল উদ্দেশ্য মানুষের অন্তর্নিহিত তত্ত্বানুসন্ধান-বৃত্তি; এমনকি নিরো-

ধর্ম্ম জ্ঞানের অনুসন্ধানেও এই গভীর ও গহনের দিকে আমাদের যে স্বাভাবিক টান আছে, তাহাকেই কারণ বলিতে হয়; তবে এই নিরোধজ প্রজ্ঞানুসন্ধান মনোবৃত্তির স্বাভাবিক সংকল্প-বিকল্প-বৃত্তিকে উল্লঙ্ঘন করিতে চায় বলিয়া ইহাকে আমাদের স্বতন্ত্র করিয়াই রাখিতে হয়। যুক্তি-বিচারের মধ্য দিয়া যখন আমরা আমাদের জ্ঞানের স্বরূপ বিচার করি বা সত্য-মিথ্যার তথ্য উদ্‌ঘাটন করিতে চেষ্টা করি, আত্মানাত্মের স্বরূপ অনুসন্ধান করি তখনই তাহাকে বলি তত্ত্ব-বিজ্ঞান বা দর্শন-শাস্ত্র। ইহার অন্বেষণ-প্রণালী ঠিক্ জড়-বিজ্ঞানাদির মতনই, তবে জড় বিজ্ঞানাদিতে যেরূপ পরীক্ষিত সত্য প্রত্যক্ষ করা চলে, এখানে সেরূপ সম্ভব নয় এবং সেইটি সম্ভব নয় বলিয়াই এখানে যুক্তি-বিচারের প্রণালী অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে ও সাবধানে সম্পাদন করিতে হয়; সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চিন্তার প্রকার-ভেদকেও মনের সম্মুখে দৃঢ়ভাবে ধরিতে হয় এবং ভেদের মধ্যে ঐক্য ও ঐক্যের মধ্যে ভেদকে বুঝিয়া একটা সামঞ্জস্যের ক্ষেত্রে অবতরণ করিতে হয়। এইজন্য তত্ত্ববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে মনকে চালিত করিতে চেষ্টা করিলে মনের স্বাধীনতা এবং বল উভয়ই বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। চারিদিকের মত ও বিশ্বাসের সঙ্গে যখন আমাদের মন গড়িয়া উঠে, তখন তাহারই চাপে মনে একটা যেন চাপ বাধিয়া যায়, সেই জড়তা হইতে মনকে চেতন করিয়া তোলা একটা যথার্থ শক্ত কাজ। দর্শন-শাস্ত্রের অনুশীলন আমাদের এই কার্য্যে সাহায্য করে। য়ুরোপের নূতন জীবনের প্রথম উন্মেষের (Renaissance) সঙ্গে-সঙ্গেই দেখিতে পাই যে কতকগুলি দার্শনিক আসিয়া প্রাচীন চিন্তাগুলিকে একেবারে ওলট্-পালট্ করিয়া নূতন-নূতন মতের প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিলেন; এই যে নূতন মতের হাওয়া বহিল, তাহাতেই জড়বিজ্ঞানের দিকেও নূতন-নূতন মতের উৎপত্তি আরম্ভ হইল। ফরাসী বিপ্লবের যে এত বড় ঘটনা ঘটিয়াছিল, এইরূপ নবীন চিন্তা-ধারার উচ্ছ্বাসই তাহার জন্য পথ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। Napoleon এর ন্যায় বীর্য্যবান্ সম্রাট্ও ভয় করিতেন যে দর্শন-চর্চ্চায় লোকের মনে স্বাধীনতা বাড়িয়া যাইবে এবং তাহারা তাহার ফলে তাঁহার রাজতন্ত্রকে দূর করিয়া ফেলিয়া পুনরায় গণতন্ত্রের উপাসনা করিবে। সেইজন্য ১৭৯৬ খৃঃ Napoleon Institute of France হইতে দর্শন-শাস্ত্রের চর্চ্চা উঠাইয়া দিয়াছিলেন। ইংরেজ আমাদের রাষ্ট্রীয় প্রভু, কিন্তু সমস্ত য়ুরোপ আমাদের চিন্তা-রাজ্যের প্রভু। য়ুরোপের নিকট হইতে যাহা পাইতেছি, তাহার উপরই আমাদের সমস্ত চিন্তা, সমস্ত কাজ নির্ভর করিয়া রহিয়াছে। এই যে intellectual slavery এইটাই অতি প্রধানভাবে সমস্ত political slaveryর অন্যতম কারণ। য়ুরোপ যাহাদের মধ্যে স্থান পায় নাই, মূঢ় দেশাচার লোকাচার হাজার-হাজার বৎসরের জঞ্জাল ও আবর্জ্জনা তাহাদের মনকে এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছে, যে স্বাধীনভাবে একটি পাও তাহাদের অগ্রসর হইবার উপায় নাই। নিজেদের ভালমন্দ স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়া সেই-অনুসারে চলিবার ও নানা পরিবর্ত্তনের দ্বারা জীবন যুদ্ধের জন্য অনুকূল ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের না হইবে, ততদিন রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা পাইলেও তাহা পরাধীনতার নামান্তর হইবে; স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারে পরিণত হইবে এবং স্বাধীনতার আশীর্ব্বাদ অমঙ্গলের অভিশাপে পরিণত হইবে। প্রাচীন ভারতবর্ষের গৌরবের দিনে নানাদিকেই তাহার চিন্তাশীলতা ও শক্তি প্রসার লাভ করিয়াছিল, কিন্তু তথাপি দর্শনের দিকে তাহা যেমন বিকাশ লাভ করিয়াছিল, এমন আর কোন দিকেই নয়; দর্শনচিন্তা দ্বারা ভারতবর্ষ—যে তত্ত্বগুলি আবিষ্কার করিয়াছিল, সেইগুলির উপরই ভর করিয়া ও সেইগুলিকেই অস্থিস্বরূপ করিয়া আর সমস্ত দিক্‌গুলি গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাই ভারতীয় সভ্যতার মধ্যে সকল দিকে এমন একটা সামঞ্জস্যের ভাব দেখিতে পাই। মনকে স্বাধীন করিতে মুক্ত করিতে দর্শন-শাস্ত্রের মতন এমন সহায় আর নাই। ভারতবর্ষের প্রাচীন প্রাণকে বুঝিতে হইলে তাহার দর্শন শাস্ত্রের মধ্যে ডুব না দিলে তাহার যথার্থ সাক্ষাৎ পাওয়া কঠিন। তাই মনে হয় যে, আমাদের নিজেদের পরিচয় নিজেদের কাছে ভাল করিয়া প্রকাশ করিবার জন্য, মনকে স্বাধীন ও মুক্ত করিবার জন্য জগতের সহিত নিজেদের সম্বন্ধকে ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য, স্বাধীনতাকে শুধু ছাপার হরপে বা মুখের কথায় না

রাখিয়া তাহার তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের জন্য এবং শ্রীভগবানের সহিত, মানুষের সহিত, জগতের সহিত, আমাদের কি সম্বন্ধ তাহা বুদ্ধিপূর্ব্বক যথার্থভাবে বুঝিবার জন্য অন্বীক্ষামূলক দর্শনশাস্ত্রের চর্চ্চার প্রয়োজন। তাই আমি আজ এই শুভ বাসরে অজ্ঞান-মোহ-ধ্বংসিনী অন্বীক্ষাবৃত্তিকে মাতা সরস্বতীর রাজহংসের শুভ্র পক্ষকে আশ্রয় করিয়া আমাদের মধ্যে অবতরণ করিবার জন্য আহ্বান করিতেছি; আবিরাবির্ম এধি; আপনারা আপনাদের চিত্তের ঐকান্তিক আগ্রহের দ্বারা আমার প্রার্থনা সমর্থন করুন। আপনাদের পূত সাধনা ভগীরথ-পথ প্রবৃত্ত গঙ্গাপ্রবাহের ন্যায় নির্ব্বাধ নির্ম্মল জ্ঞান-প্রবাহকে দেশের সর্ব্বত্র আবাহন করিয়া আনুক। আমাদের চিত্ত জাগিয়া উঠুক এবং মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধন জ্ঞান-রত্নকে লাভ করিয়া যেন আমরা ধন্য হই—

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত ॥

বিদায়-দিনের স্মৃতি

শ্রী হেমচন্দ্র বাগ্‌চী

সেই যে হ'ল দেখা
তোমায়-আমায় বিদায়-কালে;—এই স্মরণের রেখা
রইল লেখা মনের কোণের জমাট স্মৃতির স্তূপে।
রইল চুপে চুপে;
রইল গোপন নিবিড় বেদন, সরল নাকো' বাণী—
ওগো আমার রাণী!

তোমার সাড়ীর রক্ত রেখা আজ্‌কে থেকে-থেকে
আস্‌ছে যেন অনেক দূরের হেনার গন্ধ মেখে
বাদল-ভেজা মেঠো পথের ব্যাকুল গন্ধ নিয়ে
আমার বিধুর মনের মাঝে ওগো আমার প্রিয়ে!
সেই রেখাটি আমার মনে রইল জল-জল;
তাই ত ছল-ছল
অকারণেই আঁখির কোণে জমছে অশ্রুধারা,—
অনেক দিনের আঁটন-বাঁধন-হারা।
অনেক দুখে শোকে
অশ্রু ছিল কঠিন হ'য়ে, আজ্‌কে তা'রে রাখে
সাধ্য এমন কোনো লোকের নাই।
বিফল হ'ল কঠিন হওয়ার গোপন সাধনাই।
হায় রে আমার বিদায়-দিনের স্মৃতি,
এই কি তোমার অভিসারের রীতি?
এই কি তোমার ব্যথার কাঁটা হানা?
দিন-যাপনের গ্লানির মাঝে আস্‌তে তোমার ছিল যে
হায় মানা।

আবার কবে ভবিষ্যতের পথে
তোমায়-আমায় হবে দেখা—কোথায়, কেমন মতে?
কেমন ক'রে চাইবে তুমি প্রিয়া,
আতুর, বিধুর, আশায় ভরা, কোমল দৃষ্টি দিয়া?
কেমন ক'রে কাঁপ্‌বে আমার বেদন-ভরা, গুমরে-মরা হিয়া-
সেই বিদায়ের দিন
আমার মনে রইল প্রিয়া, রইবে যে নবীন।
রইব যত কাল
এই জীবনের কাঁদন-মাখা ব্যাকুল ব্যথার জাল—
মাঝে মাঝে হেরব তা'রি ফাঁকে
অধীর স্মৃতি সেই দিনেরে কেমন গোপন রাখে
আপন বুকের মাঝে?
তোমার সাড়ীর রক্ত রেখা কেমন রাগে হায় গো
সেথা রাজে
আঁধার, মেঘের গায়
তড়িৎ সখি যেমন ক'রে চমক দিয়ে যায়;—
তেম্‌নি ক'রে মোর পরাণের নিবিড়, ঘন মেঘে
বিদায় দিনের স্মৃতির হাওয়া লেগে
তোমার পাড়ের রক্ত-রেখা শুধুই চমক হানে!
আলোর বাণী নাই যে কোথা, গুমরে মরি প্রাণে!
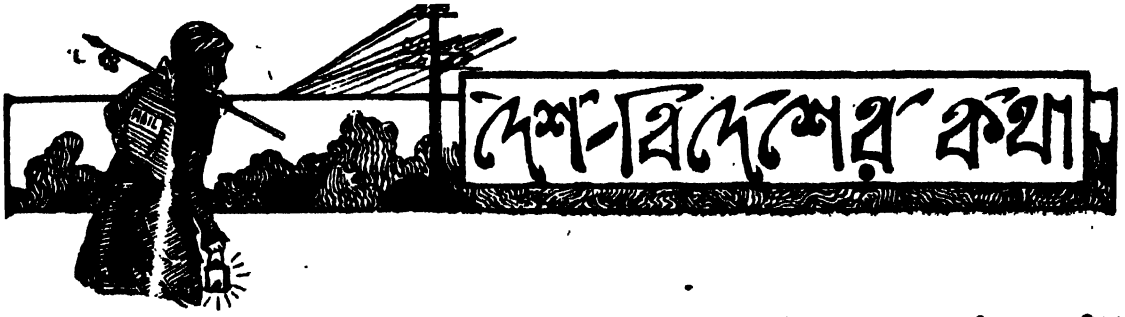
বাংলা

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ—

গত ২রা আষাঢ় মঙ্গলবার সন্ধ্যা পাঁচটার সময় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ দার্জ্জিলিংএর "ষ্টেপ্ অ্যাসাইড" ভবনে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। ফরিদপুর প্রাদেশিক সভার অধিবেশনের পর মে-মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে তিনি স্বাস্থ্যলাভার্থ দার্জ্জিলিং যান। কিন্তু হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া লোপ হওয়ায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

রসা-রোডের বাড়ীতে দেশবন্ধুর আত্মীয়গণ
(শবদেহ চলিয়া যাইবার পর)
(১) শ্রীযুক্ত প্রফুল্লরঞ্জন দাশ (২) শ্রীমতী বাসন্তী দেবী (৪) শ্রীযুক্ত সুধীর রায় (৩) শ্রীযুক্ত সুধীর রায়ের পুত্র

এই দুঃসংবাদ অল্প সময়ের মধ্যেই দেশ-বিদেশে প্রচারিত হইয়া পড়ে। ভারতের এবং বিদেশের বহু স্থানের লোকই জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতের ষ্টেট্ সেক্রেটারী, ভারতের বড়লাট প্রভৃতি অন্যান্য রাজকর্ম্মচারীগণও তাঁহার অকাল-মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়াছেন।

দেশবন্ধুর মৃত্যু-সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াই কলিকাতার অধিবাসীগণ স্থির করেন যে, এখানেই তাঁহার সৎকার হইবে। দেশবন্ধুর মৃত দেহ লইয়া কলিকাতায় আসিবার পথে প্রত্যেক ষ্টেশনে সহস্র-সহস্র লোক উপস্থিত হইয়া নীরবে শোক ও ভক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। যেদিন প্রাতে তাঁহার শব-দেহ কলিকাতায় পৌঁছায় সেদিন শিয়ালদহ ষ্টেশনে এক বিপুল জনতা সমবেত হইয়াছিল। পূর্ব্বদিন রাত্রি হইতেই নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ হইতে অনেক লোক আসিয়া ষ্টেশনে অপেক্ষা করিয়াছিলেন।

এক প্রকাণ্ড শোক যাত্রা করিয়া মৃতদেহ কালীঘাট কেওড়াতলা শ্মশানে লইয়া যাওয়া হয়। লক্ষ-লক্ষ লোক নীরবে অসহ্য কষ্ট সহ
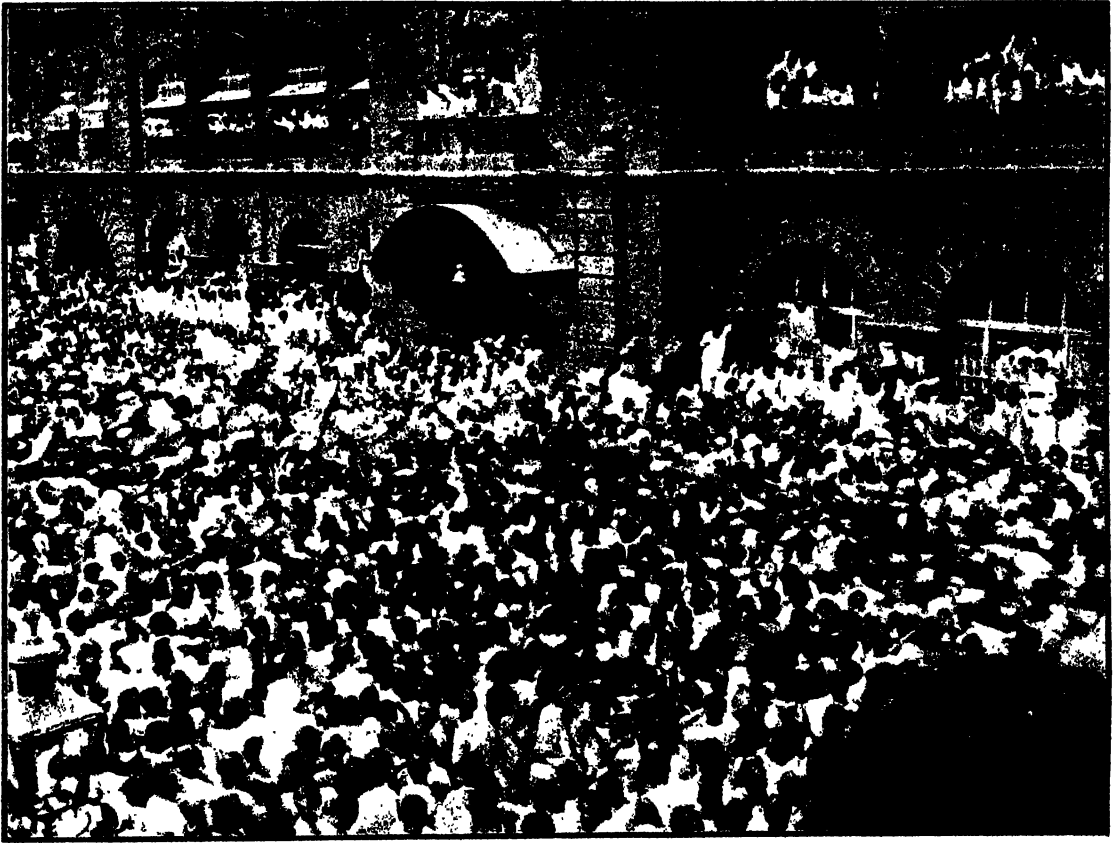
কলিকাতা কর্পোরেশন আফিসের সম্মুখে দেশবন্ধুর শবদেহ

করিয়া এই ছয় মাইল শবানুগমন করেন। পথে কলিকাতা কর্পোরেশন্ আফিসে তাঁহার মৃতদেহ নামানো হয় ও কর্পোরেশনের সদস্যবৃন্দ কলিকাতার প্রথম মেয়রের মৃতদেহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন।

শ্মশান-ঘাটেও লক্ষ-লক্ষ লোক উপস্থিত হইয়া দরিদ্রবন্ধু দেশবন্ধুর প্রতি সম্মান জ্ঞাপন করিয়াছিল।

গত ১লা জুলাই দেশবন্ধুর শ্রাদ্ধের দিনে জাতীয় শোক প্রকাশের দিন নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। সেদিন কলিকাতায় ও মফঃস্বলে নানা স্থানে তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়। অনেকস্থলে মহিলাদের বিশেষ-সভাতেও দেশবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়। সেদিনকার জনতার ভাব দেখিয়া মহাত্মা গান্ধীর কথাই মনে হয়:—

"নরের মধ্যে এক নর-কেশরী চলিয়া গিয়াছেন। বাঙলা আজ বিধবা! কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে দেশবন্ধুর একজন সমালোচক আমাকে বলিয়াছিলেন, 'এ-কথা সত্য যে, আমি তাঁহার অনেক দোষ দর্শন করি; কিন্তু আমি সর্ব্বান্তঃকরণে বলিতেছি, আমাদের মধ্যে তাঁহার স্থান পূরণ করিবার মতো দ্বিতীয় কেহই নাই।'...কবি রবীন্দ্রনাথের স্থান অধিকার করিতে পারেন, এমন কাহারও নাম যদি আমি করিতে পারিতাম, তাহা হইলে নেতা-হিসাবে কে দেশবন্ধুর স্থান অধিকার করিবে বলিতে পারিতাম। বাংলায়, এমন-কি দেশবন্ধুর সমীপবর্ত্তী হইতে পারে এমন লোক কোথাও নাই। তিনি শত-শত যুদ্ধের বীর। তিনি অতিরিক্ত উদার। তিনি ব্যবসায়ে লক্ষ-লক্ষ টাকা রোজগার করিয়াছেন, কিন্তু কখনো নিজেকে ঐশ্বর্য্যশালী করেন নাই। এবং এমন কি নিজের বাস্তুভিটা পর্য্যন্ত দান করিয়া গিয়াছেন।"

দেশবন্ধুর মৃত্যুতে দেশের যে ক্ষতি হইল তাহা অনুমান করা যায় না। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই তিনি নেতা ছিলেন। তাই তাঁহার মৃত্যুতে মৌলানা মহম্মদ আলী কমরেড পত্রে লিখিয়াছেন:—

"আজ যখন ভারতের হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বেশীর ভাগ লোক এরূপ পরিদৃষ্ট হইতেছেন, যাঁহারা ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক স্বার্থের জন্য

ট্রেন আসিবার পূর্ব্বে শিয়ালদহ ষ্টেশনে ভীড়

দেশের বড় স্বার্থকে পদদলিত করিতে দ্বিধাবোধ করিতেছেন না, এমন সময়ে দাশের মৃত্যু আমার নিকট আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা বড় বিপদ্। দাশ মুসলমানদিগের সহিত যে ব্যবহার করিয়াছেন, কোনো ভদ্র মুসলমান তাহা ভুলিতে পারেন না। কিন্তু মরিবার পূর্ব্বে দাশ ইংরেজদিগকেও একথা স্পষ্ট জানাইয়া গিয়াছেন যে, তিনি কোনো সম্প্রদায় ও ধর্ম্মাবলম্বী-দিগের প্রতি অবিচার করা সহ্য করেন না। আসল কথা হইতেছে এই যে, দাশ মরিবার আগে সকলেরই ঋণ পরিশোধ করিয়া গিয়াছেন, এমন কি হিন্দু আর কি মুসলমান, আর কি ইংরেজ কাহারো নিকট দাশ এক পয়সার জন্যও ঋণী নহেন, বরং তাঁহারই গুরুতর ঋণভারে আমাদের সকলের মস্তক অবনত। পরমেশ্বর আমাদিগকে শক্তি দান করুন, তিনি যেমন স্বীয় ঋণ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, আমরাও যেন তাঁহার ঋণ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি।"

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পরলোকগত আত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে হইলে তাঁহার আদর্শানুগামী কাজ করিতে হইবে। এইপ্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর কথা প্রণিধান-যোগ্য :

"সকল দলকে এক করিবার চেষ্টায় তিনি আমাকে সাহায্য করিতে বলিয়াছিলেন। আজ শিক্ষিত ভারতবাসী মাত্রেরই দেশবন্ধুর ইচ্ছার তৃপ্তিসাধনে সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য—স্বরাজের সর্ব্বোচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে না পারিলেও যতদূর সম্ভব আরোহণ করিয়া তাঁহার ঈপ্সিত আদর্শের স্বরূপ উপলব্ধি করা প্রয়োজন। তাহা হইলেই আমরা আমাদের হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে বলিতে পারিব দেশবন্ধুর মৃত্যু হইয়াছে,—কিন্তু দেশবন্ধু অমর।"

দেশবন্ধুর স্মৃতিরক্ষা—

দেশবন্ধু জীবিতকালেই তাঁহার রসা-রোডস্থ বাসগৃহ সাধারণকে দান করিয়া গিয়াছেন; দেশবন্ধুর তাঁহার বাড়ীটি দান করিবার প্রধান উদ্দেশ্য

চিতায়

ছিল, বাংলার মাতৃজাতির উন্নতিসাধন করা। যদি উপরোক্ত বাড়ীটিতে জাতি-বর্ণ নির্ব্বিশেষে স্ত্রীলোকদের জন্য একটি হাঁসপাতাল স্থাপিত করা হয় এবং ঐ স্থানে নার্স্‌দের শিক্ষার বন্দোবস্ত করা যায়, তাহা হইলে দেশবন্ধুর ইচ্ছা পূর্ণ করা যাইতে পারে।

১০লক্ষ টাকার কমে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য নেতারা দেশবন্ধুর শ্রাদ্ধের পূর্ব্বেই ঐ টাকা তুলিয়া দিবার জন্য দেশবাসীকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু এ-পর্য্যন্ত (২৬ শে আষাঢ়) প্রায় ৪ লক্ষ টাকা উঠিয়াছে। ৩১ শে জুলাইয়ের মধ্যে সমস্ত টাকা উঠাইবার চেষ্টা চলিতেছে।

রাজবন্দীদের কথা—

বাংলা ও বাংলার বাহির হইতে বাঙালী-রাজবন্দীদের অভাব-অভিযোগের অনেক কথা প্রকাশ হইয়াছে। বহরমপুর-জেলে রাজবন্দীরা কর্ত্তৃপক্ষের ব্যবহারের প্রতিবাদ করিয়াছেন। মান্দালয়-জেলে রাজবন্দী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দাস গুরুতর ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছেন। তাঁহাকে রেঙ্গুনে আনয়ন করা হইয়াছে। এই সংবাদে পূর্ণবাবুর আত্মীয়বর্গ ও দেশবাসী আশঙ্কান্বিত হইয়াছেন। তাঁহার আত্মীয়গণকে ও দেশবাসীকে এ-সম্বন্ধে বিস্তারিত সংবাদ জানানো সরকারের উচিত। ভারতীয় জেলগুলির বন্দীদের কষ্টের কথা সাধারণের জানা আছে। বিনাবিচারে আবদ্ধ রাজবন্দীরা সাধারণ কয়েদীদের অপেক্ষা ভালো ব্যবহার পাইবার অধিকারী। এ-বিষয় কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

শ্রীহট্টের বঙ্গভুক্তি—

১৮৭৪ সালে লর্ড, নর্থব্রুকের আদেশে শ্রীহট্টজেলাকে বাংলাদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আসামের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অর্দ্ধ শতাব্দী চলিয়া গেল—শ্রীহট্টবাসী সেই অবিচারের কথা ভুলিতে পারে নাই। সেই অবধি কত দরখাস্ত সরকারে পেশ হইয়াছে, কত ডেপুটেশন লাট-বড়লাটের দরবারে প্রেরিত হইয়াছে—কিন্তু আমলাতন্ত্র তাহাতে কর্ণপাত করে নাই। মণ্টেগু সংস্কারের সময় যখন ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা পরিবর্ত্তনের সম্ভবনা দেখা দিল, তখনও শ্রীহট্টবাসী তাঁহাদের স্বায্যদাবী উপস্থিত করিল। কিন্তু তাহাতেও বিশেষ ফল হইল না। ১৯২১ সালে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীহট্টের বঙ্গভুক্তি সম্বন্ধে প্রস্তাব উত্থাপন করা

হইল। সরকার-পক্ষ হইতে বলা হইল, "আসাম কাউন্সিলের মত না পাইলে ভারত-সরকার এ-সম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন না।" গত বৎসর জুলাই মাসে আসাম-কাউন্সিলেও শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলা বঙ্গদেশের অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব সরকারের বিরুদ্ধাচরণ-সত্ত্বেও গৃহীত হয়। এখন সরকার বলিতেছেন, ইহাতেও জনসাধারণের "প্রকৃত ইচ্ছা" প্রকাশ হয় নাই। এই বিষয়ে মতামত সংগ্রহের জন্ম দুইজন সরকারী কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন। সমস্ত বেসরকারী সভা-সমিতি ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শ্রীহট্টের বঙ্গভুক্তির সাপক্ষে মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন। কেবল কয়জন সরকারী কর্ম্মচারী ও স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি ইহার বিরুদ্ধে মত দিয়াছেন। এখন দেখা যাক্ আমলাতন্ত্র জনমত কিরূপভাবে গ্রহণ করেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আগামী অধিবেশনে শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দত্ত শ্রীহট্টের বঙ্গভুক্তির সপক্ষে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন। স্বজন-বিচ্ছিন্ন পঁচিশ লক্ষ বাঙালীর বঙ্গদেশের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষা নিশ্চয়ই জয়যুক্ত হইবে।

পুলিশের অত্যাচার—

ঢাকা পুলিশের বিরুদ্ধে গুরুতর অত্যাচারের অভিযোগ প্রকাশিত হইয়াছে। গত ৫ই জুন তারিখে সূত্রাপুর থানার একজন পুলিশের দারোগা বাজারের মধ্য দিয়া আসিবার সময় একটি লোককে ঠেলা দেয়; ফলে বাজারের কয়েকজন লোক নাকি দারোগাকে অপমান করে। ইহার প্রতিশোধস্বরূপ থানার দারোগা ও কনেষ্টবল প্রভৃতি রেগুলেশন লাঠি হস্তে বাজারের মধ্যে আসিয়া লোকজনকে মারধর করে, কতকগুলি লোককে গ্রেপ্তার করে, কয়েকটি বাড়ী খানাতল্লাস করে এবং কতকগুলি পর্দ্দানশীন স্ত্রীলোকও নাকি তাহাদের হস্তে অপমানিতা হয়। ঢাকার পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ এই অভিযোগের তদন্ত করিয়া অপরাধীদের শাস্তি বিধান করিয়াছেন। ঢাকার জনসাধারণ এই ব্যাপারে খুব উত্তেজিত ও চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল।

বাংলায় খাদির প্রসার—

মহাত্মার পর্য্যটন বাংলার প্রাণে এক অপূর্ব্ব সাড়া জাগাইয়া তুলিয়াছে। চর্কা এবং খাদির মন্ত্রে বাংলার মন উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। খাদি প্রতিষ্ঠান জানাইতেছেন :

গত এপ্রিল এবং মে— এই দুই মাসে এক খাদি-প্রতিষ্ঠান হইতেই যে খদ্দর বিক্রয় হইয়াছে, তাহার দাম ৩৬ হাজার টাকাকেও ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। অথচ ইতিপূর্ব্বে খাদির বিক্রয়-লব্ধ অর্থের অঙ্ক কোনো মাসে খাদি প্রতিষ্ঠানে ৬।৭ হাজার টাকা ছাড়াইয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

কয়েকটি সদনুষ্ঠান—

কলিকাতা ভিজিলান্স্ এসোসিয়েসন—

কলিকাতা "ভিজিল্যান্স্ এসোসিয়েসনের" বা রক্ষা-সমিতির ১৯২৪-২৫ সালের রিপোর্ট্ প্রকাশিত হইয়াছে। কলিকাতার অসহায়া পথভ্রষ্টা পতিতা নারী ও বালিকাদের রক্ষার জন্যই এই সমিতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। রিপোর্টে প্রকাশ যে, সমিতি প্রধানতঃ দুইটি কার্য্য করিবার চেষ্টা করিতেছেন :—(১) একটি প্রধান ক্লিয়ারিং হাউস বা উদ্ধারাশ্রম (২) এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক বালিকাদের জন্য একটি আশ্রম ও শিল্পশিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করা। কলিকাতার প্রোটেষ্টাণ্ট্ হোম্ তাঁহাদের অধিকৃত জমির কতকাংশ প্রথম কার্য্যের জন্য বিক্রয় করিতে প্রস্তুত আছেন। অপ্রাপ্তবয়স্ক বালিকাদের আশ্রম ও শিল্প শিক্ষালয়ের জন্য এ-পর্য্যন্ত প্রায় ১২।০ হাজার টাকা চাঁদা উঠিয়াছে। আরও টাকা সংগৃহীত হইলে আশ্রম-গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া কার্য্য আরম্ভ করা হইবে। পতিতা ও বলপূর্ব্বক নিগৃহীতা হিন্দু রমণী ও বালিকাদের জন্য কোনো উদ্ধারাশ্রম নাই। হিন্দুধনীরা প্রস্তাবিত আশ্রমের জন্য যথেষ্ট অর্থসাহায্য করিয়া উহা অবিলম্বে কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন। আমরা আশা করি প্রস্তাবিত উদ্ধারাশ্রমের জন্য কর্ম্মী ও অর্থের অভাব হইবে না।

দেবানন্দপুর পল্লীসমিতি—

দেবানন্দপুর পল্লীসমিতির বার্ষিক বিবরণ পাঠে জানা যায় এই পল্লীসমিতি মাত্র কয়েকবৎসর হইল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; কিন্তু ইহার মধ্যেই ইহার কার্য্যক্ষেত্র নানাদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। জঙ্গল পরিষ্কার, কেরোসিন ঢালিয়া মশক-ধ্বংস, কুইনাইন বিতরণ, রোগী সেবা, রাস্তামেরামত, পুষ্করিণী সংস্কার, অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন, খদ্দর প্রচার—এসমস্ত কার্য্যই এই পল্লীসমিতি উৎসাহের সঙ্গে করিতেছেন। সমিতির নেতৃত্বে একটি বালকবিদ্যালয়, বালিকাবিদ্যালয় ও নৈশবিদ্যালয় চালিত হইতেছে। গ্রামের শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র সর্ব্বশ্রেণীর লোকই সমিতির কার্য্যে যোগদান করিয়া সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেছেন। বাংলার অন্যান্য পল্লী দেবানন্দপুরের আদর্শ অনুসরণ করিলে লাভবান্ হইবেন।

পাবনা নারী-শিল্পাশ্রম—

সম্প্রতি পাবনা নারী-শিল্পাশ্রমের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের ট্রেনিং বিভাগের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী শ্রীযুক্তা পূর্ণিমা বসাক এবং শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ বসাক উভয়ে নারীশিক্ষা সমিতির প্রতিনিধিরূপে আশ্রমের কর্তৃপক্ষের অনুরোধে এই উপলক্ষে পাবনা গিয়াছিলেন। আশ্রমের সম্পাদিকা বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন। সভায় মহিলাদের প্রয়োজনোপযোগী কার্য্যকারী শিল্পের ও সাধারণ শিক্ষার বিষয় এবং খদ্দর সূতা কাটা ও অন্যান্য কুটীর-শিল্পের উন্নতির বিষয় আলোচনা হয়। সভানেত্রী মহিলাদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রা যাহাতে নিজের পক্ষে প্রীতিদায়ক এবং আত্মীয় স্বজনের পক্ষে মঙ্গলদায়ক হয়, তাহার উপায় আলোচনা করিয়া সভার কাজ শেষ করেন।

সভার অধিবেশন শেষ হইলে মহিলা-শিল্প-প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটিত হয়। এই প্রদর্শনীতে চর্কার সূতা কাটা এবং মহিলাদিগের স্বহস্তে নির্ম্মিত তাঁতে কাপড় বোনার কাজ দেখানো হয়।

বাংলায় নারী-নির্য্যাতন—

বাংলা-দেশে নারী-নিগ্রহের অবসান হইল না। নানা জেলা হইতে নির্য্যাতনের সংবাদ দৈনিক কাগজগুলিতে প্রকাশিত হইতেছে।

রংপুরের পীরগঞ্জ-থানায় অল্পসংখ্যক নমঃশূদ্রের বাস। প্রকাশ যে, সেখানকার কতিপয় মুসলমান দুর্ব্বৃত্ত তাহাদের মহিলাদের উপর অত্যাচার করিয়াছে। সেদিন আলিপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে কদমদাসী নাম্নী এক ব্যাধিগ্রস্তা বালিকা তাহার উপরে বীভৎস অত্যাচার-কাহিনী বিবৃত করিবার সময় মূর্চ্ছা যায়। রাজসাহী, কুমিল্লা, ঢাকা, মৈমনসিংহ প্রভৃতি জেলা হইতেও এ-সম্বন্ধে নিদারুণ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

ইহার প্রতিকারের উপায় কি? পঞ্জাব হিন্দুসভার সভাপতির অভিভাষণে লালা লজপৎ রায় এই-প্রসঙ্গে কয়েকটি উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন; যথা (১) হিন্দু-বিধবাদের জন্য আশ্রম স্থাপন; (২) হিন্দু রমণীদিগকে এরূপ শিক্ষা দিতে হইবে, যাহাতে তাঁহারা বিপদের সময় আত্মরক্ষা করিতে পারেন; (৩) বদমায়েসেরা

বলপূর্ব্বক যে-সমস্ত নারীদিগকে নির্য্যাতিত করিয়াছে, সমাজ ও পরিবার হইতে তাঁহাদিগকে বহিষ্কৃত করা হইবে না ; (৪) নারী-নির্য্যাতন-সম্পর্কীয় মোকদ্দমা ভালোরূপে চালাইতে হইবে, যাহাতে অপরাধীদের শাস্তি হয় ; (৫) প্রত্যেক প্রদেশে পুলিশের মধ্যে যাহাতে উপযুক্ত সংখ্যায় হিন্দু-পুলিশ থাকে, তাহার ব্যবস্থা করা।

বাংলাদেশে হিন্দু নারী-নির্য্যাতন-সমস্যা সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। বাঙালী-হিন্দুরা লালাজীর প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন করিলে, বাংলাদেশে নারী-নির্য্যাতন-সমস্যার সমাধান সহজ হইতে পারে।

কলিকাতায় হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা—

এ-বৎসর ঈদের দিন ভারতবর্ষের অন্য কোনো সহর হইতে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সংবাদ আসে নাই ; কিন্তু দুঃখের বিষয় কলিকাতার নিকটে খিদিরপুর ডকে হিন্দু কুলীরা মুসলমানগণকে আক্রমণ করিয়া রক্তপাত করিয়াছে। মহাত্মা গান্ধী ও অপর কয়জন নেতা ঘটনার যে-বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় যে, হিন্দু কুলীরাই এই দাঙ্গাহাঙ্গামার জন্য প্রধানত দায়ী। মুসলমানেরা ডকের এলাকার মধ্যে গো-কোরবানী করিয়াছে, এই জনরবে উত্তেজিত হইয়া হিন্দু-কুলীরা মুসলমান-কুলীদের আড্ডায় যাইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করে। মুসলমানেরা সংখ্যায় অল্প ছিল ; হিন্দুদের আক্রমণের ফলে তাহাদের অনেকে আত্মরক্ষার জন্য পলায়ন করিলেও, তাহারা নিস্তার পায় নাই। ৩৮ জন মুসলমান আহত হইয়াছে এবং তাহার মধ্যে একজনের মৃত্যু হইয়াছে। পুলিশ আসিয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলে, দাঙ্গাহাঙ্গামা কিছুক্ষণের জন্য থামে বটে, কিন্তু অপরাহ্ণে চারিপার্শ্বের মুসলমানেরা এই সংবাদ পাইয়া দলবল লইয়া হিন্দুদিগকে পাল্টা আক্রমণ করিবার উপক্রম করে। মহাত্মা গান্ধী ও মৌলানা আজাদ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া উত্তেজিত হিন্দু ও মুসলমান কুলীদিগকে শান্ত করিতে সমর্থ হন। তাঁহারা না গেলে শোচনীয় কাণ্ড ঘটিত।

বিশ্বভারতীতে দান—

বোম্বাইয়ের ২৫শে জুনের সংবাদে প্রকাশ লিম্‌ড়ীর শ্রী ঠাকুর-সাহেব স্যার্ দৌলত সিংহজী বিশ্বভারতীতে ৫০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

আমেরিকায় বাঙালী পালোয়ান—

প্রসিদ্ধ বাঙালী পালোয়ান শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ গুহ ওরফে গোবর বহুদিন হইল আমেরিকাতে আছেন। তিনি সেখানে অনেক পাশ্চাত্য পালোয়ানকে কুস্তিতে পরাস্ত করিয়াছেন। সম্প্রতি পৃথিবীর বিখ্যাত কুস্তীগীর মিঃ জিবস্কোর সঙ্গে কুস্তীতে গোবর হারিয়া গিয়াছেন। এই সংবাদে গোবরের অনুরাগী বন্ধুবর্গ দুঃখিত হইবেন, সন্দেহ নাই।

শ্রী প্রভাত সান্যাল

—

ভারতবর্ষ

লর্ড বার্কেণ্‌হেড্‌ বিলাতের এক ভোজে বলিয়াছেন যে—ভারতবর্ষকে দয়া করিয়া রক্ষা করিবার যে-কষ্ট তাহা ইংরেজ জাতিকে চিরকাল বহন করিতেই হইবে, কারণ এ-ভার অতি পবিত্র এবং দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে ভগবান্ তাহাদের উপর এই ভার দিয়াছেন। ভারতবর্ষ যখন মারামারি কাটাকাটি করিয়া মরিতেছিল তখন ইংরেজরা দয়া করিয়া এবং বহুৎ কষ্ট স্বীকার করিয়া এই ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়া ভারতের প্রাচীন সভ্যতাকে রক্ষা করে। আজ যদি ইংরেজ ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় তবে ভারতবর্ষ পুনরায় সেই দেড়শত বছরকার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইবে, এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষ রক্ষা করিবার যে-দায়িত্ব, তাহা নাকি ইংরেজদের "ঐতিহাসিক দায়িত্ব।" ভারতবর্ষ সম্বন্ধে চরম কর্ত্তব্য ইংরেজদের—ইহাতে পৃথিবীর অন্য কোন জাতির কোন কথা বলিবার নাই। লর্ড বার্কেনহেড্‌ মহা পণ্ডিত, তাঁহার এইপ্রকার মত। লর্ড বার্কেনহেড্‌কে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, তাঁহাদের ভারতবর্ষ রক্ষা করিবার পবিত্র ভার কে, কোথায় এবং কবে দিয়াছিল ? কথায় কথায় ইংরেজ রাজনৈতিকগণ sacred trust এবং mission এর দোহাই দিয়া থাকেন। এইসমস্ত বুজরুকির দিন বহুকাল হইল চলিয়া গিয়াছে। এখন ইংরেজদের বোঝা উচিত যে, পৃথিবীর অন্যান্য সকল জাতিও (কৃষ্ণ) একদিন ভাগ্যবান্ হইতে পারে এবং তখন হয়ত তাহারা শ্বেতাঙ্গ জাতিবিশেষের ঘাড়ে বসিয়া ইংরেজদের এই বুলি আওড়াইতে পারে। এই একই-প্রকার ভাকামো এবং ভণ্ডামোর বুলিতে মানুষের মন বেশী দিন ভুলাইয়া রাখা যায় না। ভারতবর্ষকে কেবল বুলিতে ভুলাইয়া রাখিতে হইলে ইংরেজদের এখন অন্য কোনো-প্রকার বুলি আবিষ্কার করিতে হইবে।

লর্ড বার্কেণ্‌হেডের এই বক্তৃতার প্রতিবাদ করিবার জন্য সিমলা টাউন হলে এক বিপুল জনসভা হয়। সেই সভাতে লালা লজপত রায় এই কথাগুলি বলিয়াছেন :

"আমি লর্ড বার্কেণ্‌হেডের এই বক্তৃতায় সুখী বই দুঃখিত হই নাই ; কেননা ইহাতে তিনি ভারতের ব্রিটিশ শাসনের মূলনীতি স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন। বিশেষত ইহাতে সমস্ত জগতের সমক্ষে সোজাসুজি বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, ভারত আজ ভারতবাসীর ইচ্ছার উপর ভিত্তি করিয়া শাসিত হইতেছে না। তরবারির সমক্ষ লইয়া ভারত শাসন করা হইতেছে। কিন্তু যদিও আমি ব্রিটিশ নীতির এরূপ খোলাখুলি প্রচার দেখিয়া সুখী হইয়াছি, তথাপি আমি বলিতে বাধ্য যে, ভারত-সচিবের এই বক্তৃতা জ্ঞানী ও রাজনীতিকের উপযুক্ত হয় নাই। তিনি ঐতিহাসিক সভ্যতা-সম্বন্ধে যে ভ্রমাত্মক উল্লেখ করিয়াছেন, আমি জোরের সহিত তাহার প্রতিবাদ করিতেছি। হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ মিটাইবার জন্য ইংরেজ কখনই এদেশে আসে নাই। বরং তাহারা আসিয়া এই বিরোধকে বাড়াইয়া তুলিয়াছে এবং এখনো তাহাই করিতেছে। এই বিরোধের জন্যই তাহারা তরবারির দ্বারা তাহাদের শাসন চালাইতেছে। কিন্তু ভারতসচিবকে আমি একথা বলিয়া রাখিতে পারি যে, যে-মুহূর্ত্তে আমাদের এই সাম্প্রদায়িক গোলযোগ মিটিয়া যাইবে, তাহার পর আর এক সপ্তাহও তাঁহারা এই তরবারির শাসন চালাইতে পারিবেন না। এই সাম্প্রদায়িক গোলযোগ মিটাইবার একমাত্র উপায় হিন্দুদের সংস্কার করা। তাহাদের নিজেদের সংগঠন থাকা প্রয়োজন, কারণ যে-মুহূর্ত্তে তাহাদের সংস্কার হইবে, অন্যান্য প্রতিষ্ঠান-গুলি তাহাদের নিকট সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করিবে।

"ভারত-সচিবের কথায় আমি আরও সন্তুষ্ট হইয়াছি, কারণ, আমাদের যে-সমস্ত বন্ধু মিষ্ট কথায় ও অর্থহীন প্রতিজ্ঞায় চমক দেখিয়া ভুলিতেছেন, ভারত-সচিবের এই বক্তৃতা তাঁহাদের সেই ভুল ভাঙিয়া দিবে। দেশবাসীর প্রতি আমার এই অনুরোধ যে, তাঁহারা যেন কখনো এই কথাটি বিস্মৃত না হন যে, ব্রিটিশ কখনো নিজের কাজ ভুলে না।. যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা একতাবদ্ধ হইয়া তাহাদের এই তরবারির শাসনকে ব্যর্থ করিতে না পারি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাদের কাছ হইতে কোন কিছু প্রাপ্তির আশা নাই।"

জাতীয় আন্দোলনে ভারত, মিশর ও চীনের ছাত্রগণের যোগ দেওয়া-সম্বন্ধে লর্ড্‌ বার্কেণ্‌হেড্‌ যে-মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, লালাজী তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন, এখানেও লর্ড্‌ বার্কেণ্‌হেড্‌ ইউরোপের ইতিহাস

ভুলিয়া গিয়াছেন। এমন কোনো দেশ আছে কি যেখানকার ছাত্রগণ স্বাধীনতা-আন্দোলনে যোগ দেয় নাই? ভারতবর্ষের ছাত্রগণ কার্য্যত জাতীয় আন্দোলন হইতে তফাতে থাকিয়া আসিতেছে। কারণ, ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এমন নিয়ম রহিয়াছে, যাহাতে ছাত্রগণ ঐসমস্ত আন্দোলনে যোগ দিতে সক্ষম হয় না। জগতের মধ্যে এমন কোনো দেশ আছে কি যেখানকার অধিবাসী বিশ্ববিদ্যালয়ের এই নিয়ম সহ্য করিতে পারে? চীনে এখনো স্বাধীনতার নামগন্ধ আছে, সেই-জন্যই সেখানকার ছাত্রদের জাতীয় সংঘর্ষে যোগ দেওয়াতে বাধাপ্রদান করিতেই নাই। লালাজীর কথাগুলি সকলেরই পাঠ করা উচিত। লর্ড বার্কেণহেডের এই বক্তৃতায়, আমাদের দেশের যে-সকল লোক ইংরেজদের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া থাকে, ইংরেজদের প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস করে, তাহাদের চোখ ফুটিবে বলিয়া আশা করা যায়। স্যার্ সুরেন্দ্রনাথ তার করিয়া লর্ড মহোদয়ের বক্তৃতার প্রতিবাদ করিয়াছেন। এই প্রতিবাদের ফল চিরকাল যাহা হয়, আজিও তাহাই হইবে—সনাতন নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম হইবে বলিয়া মনে হয় না। ইংরেজরা এবং অন্যান্য শ্বেতাঙ্গ দেশের লোকেরা কৃষ্ণ লোকেদের স্বাধীন হওয়াটা পছন্দ করে না—অন্তত বিদ্রোহ করিয়া। তাহারা নিজেদের দেশের ইতিহাস ভুলিয়া যায়। ইংলণ্ড জনমত বজায় রাখিবার জন্য একজন রাজার মুণ্ডটা ধড় হইতে খসাইয়া ফেলিতেও কোনো কসুর করে নাই। ফ্রান্সও এ-বিষয়ে বড় কম নয়। কিন্তু আজ মরক্কোর রিফ্ জাতি স্বাধীনতা লাভ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করাতে শ্বেতাঙ্গরা তাহাদের বিরুদ্ধে লাগিয়া গিয়াছে। কেহ সামনাসামনি তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছে, কেহ বা গোপনে স্পেন এবং ফ্রান্স্‌কে সাহায্য করিতেছে। লালাজীর বক্তৃতা প্রত্যেক ভারতবাসীর পাঠ করা উচিত।

লর্ড বার্কেণহেড্ দয়া করিয়া হাউস্ অব্ লর্ড্‌সে বলিয়াছেন "no decision can be reached on the future of the reforms before the Government of India and the Assembly had been consulted." ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু Government of India মানে ত সেই এক দল ইংরেজ অথবা ইংরেজ খোসামদকারী খয়ের খাঁ ভারতীয়—যাহারা কোনো কালেই প্রভুদের মতের বিরুদ্ধে কোনো মত দেয় নাই—কোনোকালে দিবে বলিয়া মনেও হয় না। আর Assemblyর মত লইবার কোনো দরকার আছে বলিয়া আমরা মনে করি না, কারণ অনেক বিষয়েই Assemblyর মত লওয়া হয়—যেমন লবণ-কর, Bengal Ordinance Act, কিন্তু সেই মত ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের প্রীতিকর না হইলে কি তাহা কোনো দিন গ্রাহ্য করা হয়? 'ভারতবর্ষে জনমতই সব' এইপ্রকার ভড়ং দেখাইবার কি সার্থকতা আছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। তবে লর্ড বার্কেণহেড্ বলিয়াছেন যে "the constitution undoubtedly required revision and dyarchy must be decided by results." ইহা আমাদের পরম সান্ত্বনার কথা। তিনি আরো বলেন যে "A Royal Commission to review the constitution, he added, might be accelerated when Indian leaders evidenced a genuine desire to co-operate in making the best of the existing constitution." ভাবার্থ, ভারতবর্ষীয় নেতারা যদি বর্ত্তমান শাসনযন্ত্রের সুব্যবহার করেন এবং এই দানের পূর্ণ মাহাত্ম্য বুঝিতে পারেন, এবং যদি পূর্ণভাবে (অর্থাৎ দাস-মনোবৃত্তি লইয়া) ইংরেজদের সহিত সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত থাকেন তবেই তাড়াতাড়ি রয়েল্ কমিশন্ বসানো সম্ভবপর হইতে পারে—নতুবা নয়। এক কথায় বলিতে গেলে লর্ড মহোদয় ইহাই বলিতে চান যে, "বাপু হে, যাহা দিতেছি হাসিমুখে লও, যাহা আজ্ঞা করিতেছি হাসিমুখে করো। তাহা হইলেই তোমাদের ভবিষ্যতে আরো কিছু খাবারের টুক্‌রা পাইবার ভরসা থাকিবে—নতুবা নয়—। আমরা প্রভু, তোমরা দাস, এইকথা সকল সময় মনে রাখিও।"

—

দেশের অনেক স্থানে আজকাল পতিতা নারীদের উদ্ধার করিবার চেষ্টা চলিতেছে। এ-চেষ্টা প্রশংসার্হ। কিন্তু ইহা অতীব দুঃখের বিষয় যে, অনেক স্থলেই উদ্ধার-কার্য্য অতি কদর্য্য আকার ধারণ করিতেছে। উদ্ধারকারীদের অনেকের বিরুদ্ধেই নানা কথা নানা লোকে বলিতেছে। মহাত্মা গান্ধী এই পতিতা উদ্ধার করা সম্পর্কে যে কথাগুলি বলিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। মহাত্মা বলিতেছেন :—

"মাদারীপুরের অভ্যর্থনা-সমিতি পতিতা ভগ্নীদের দিয়া এক চরকা-কাটা প্রদর্শনীর বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। সেই দৃশ্য দেখিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছিলাম, কিন্তু ঐ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার মধ্যে যে বিপদ্ আছে, তাহার প্রতিও অনুষ্ঠাতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি। কিন্তু বরিশাল—যেখানে পতিতা উদ্ধারের প্রচেষ্টা সর্ব্বপ্রথম কার্য্যে পরিণত হইয়াছে, সেখানে ইহা সুসঙ্গত ও সম্যক্ পন্থায় না হইয়া অতি কদর্য্য আকার লাভ করিয়াছে, সন্দেহ নাই। এই সঙ্ঘের যে নামকরণ করা হইয়াছে, তাহাও ভ্রমোৎপাদক। ইহার 'বর্ত্তমান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য' নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল :—

"১। দরিদ্রদিগকে সাহায্যদান এবং পীড়িত ভ্রাতাভগ্নীদের সেবা।

"২। (ক) ইহাদের (পতিতা) মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করা।

(খ) 'নারী শিল্পাশ্রম' প্রতিষ্ঠা করিয়া চরকা, খদ্দর, বস্ত্রবয়ন, দর্জ্জীর কাজ, সূচীকার্য্য এবং অন্যান্য হস্তচালিতশিল্পের প্রচার ও শ্রীবৃদ্ধিসাধন।

(গ) উচ্চাঙ্গের গীতবাদ্যাদি শিক্ষাদান।

"৩। সত্যাগ্রহ এবং অহিংসা যে-সমস্ত প্রতিষ্ঠানের নীতি, সেইসব প্রতিষ্ঠানে যোগদান করা। অল্প করিয়া বলিতে হইলে, ইহা অনেকটা ঘোড়ার সম্মুখে গাড়ী স্থাপন করার মতন। এইসব ভগ্নীগণকে অগ্রে নিজেদের সংস্কার না করিয়াই জনহিতকর কার্য্য করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। উচ্চাঙ্গের গীতবাদ্য শিক্ষাদানের প্রস্তাবটির ভাবী ফল যদি বেদনাবহ নাও হয়, তাহা হইলেও অতীব কৌতুকাবহ। এ ক্ষেত্রে ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, এই স্ত্রীগণ কেমন করিয়া নাচিতে হয় বা গান করিতে হয়, কিছুমাত্র অবগত নহে এবং যদিও সদাসর্ব্বদা তাহারা তাহাদের ব্যবসা দ্বারা অহিংসা ও সত্যের ব্যভিচার করিতেছে, তথাপি তাহারা সত্যাগ্রহ ও অহিংসা-নীতিতে বিশ্বাসী প্রতিষ্ঠানমাত্রেই যোগদান করিতে পারিবে।

"আমার নিকট যে প্রামাণ্য কাগজ আছে, তাহাতে উহাও উল্লিখিত আছে যে, ইহাদিগকে কংগ্রেসের সদস্য করা হইয়াছে এবং "নিজেদের সামাজিক অবস্থানুযায়ী সাধ্যমত জাতীয় কার্য্য" করিবারও অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। ইহাদিগকে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করা হইয়াছিল। ইহাদের নামে যে-বিজ্ঞাপনী প্রচারিত হইয়াছিল তাহা আমি দেখিয়াছি এবং আমি উহা অশ্লীল ঘোষণাপত্র বলিয়া মনে করি। উদ্দেশ্য যাহাই হউক এই ঘটনার প্রসার আমি বীভৎস না মনে করিয়া পারি না। আমি সূতাকাটার প্রশংসা করি;—কিন্তু তাই বলিয়া সূতাকাটাকে পাপের ছাড়পত্র হিসাবে ব্যবহার করা সঙ্গত নহে। সকলেই সত্যাগ্রহ অবলম্বন করুক, ইহা আমি পছন্দ করি। কিন্তু একজন অনুতাপহীন পেশাদার হত্যাকারীকে সত্যাগ্রহের সঙ্কল্পপত্রে স্বাক্ষর করিতে আমি আমার সমস্ত শক্তি উদ্যত করিয়া বাধা দিব। আমার হৃদয় এইসব ভগ্নীদের জন্য সতত উন্মুক্ত। কিন্তু বরিশালে যে-উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা সমর্থন করিতে আমি অশক্ত। এইসব ভগ্নীগণ এমন একটা মর্য্যাদালাভ করিয়াছে, যাহা সমাজের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য করিলে কোনোমতেই

পাওয়া উচিত ছিল না। এই স্ত্রীগণ যে-উদ্দেশ্যে সঙ্ঘ গড়িয়াছে, সেই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য পরিচিত চোরদের লইয়া গঠিত সঙ্ঘ আমরা অনুমোদন করিতে পারি না। এই সঙ্ঘের প্রয়োজন আরও কম, কেননা ইহারা চোর অপেক্ষাও অধিকতর বিপজ্জনক। চোর পার্থিব সম্পদ্ চুরি করে, আর ইহারা ধর্ম্ম চুরি করে। সমাজে এইসব হতভাগিনীদের অস্তিত্বের জন্য যদিও প্রথমতঃ পুরুষই দায়ী, তথাপি তাহারা সমাজের অনিষ্ট করিবার জন্য অপরিসীম শক্তি অর্জ্জন করিয়াছে। আমি বরিশালে শুনিলাম, এইসব বারবনিতার সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় এক অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া সৃষ্টি হইয়াছে এবং ইতিমধ্যেই তাহারা বরিশালের যুবকগণের উপর অপবিত্র প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। আমার ইচ্ছা, এই সঙ্ঘ বাতিল করা হউক। এ-সম্বন্ধে আমার দৃঢ় মত এই যে, যতদিন তাহারা পাপব্যবসায় চালাইবে, ততদিন তাহাদের নিকট চাঁদা বা তাহাদের সহায়তা গ্রহণ করা অথবা তাহাদিগকে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন বা তাহাদিগকে কংগ্রেসের সদস্য হইতে উৎসাহদান করা অন্যায়। অবশ্য কংগ্রেসের আইনমত তাহাদের সদস্য হইবার বাধা নাই, তথাপি জনসাধারণের ইহাদিগকে কংগ্রেস হইতে দূরে রাখা কর্ত্তব্য এবং ইহাদেরও বিনয়ী হইয়া কংগ্রেস হইতে সরিয়া যাওয়া উচিত।

"আমার একান্ত ইচ্ছা, আমার এইসব কথা তাহাদের গোচরে আসুক। আমি তাহাদিগকে অনুরোধ করিতেছি, তাহারা কংগ্রেস ত্যাগ করুক, সঙ্ঘ ভাঙিয়া দিক এবং অতি সত্বর দৃঢ়তার সহিত পাপ-ব্যবসায় ত্যাগ করুক। তাহার পর—কেবল তাহার পরই তাহারা আত্মশুদ্ধির জন্য চরকা বা বস্ত্র-বয়ন ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারে অথবা জীবিকার্জ্জনের জন্য কোনো সাধু ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারে।"

(ইয়ং ইণ্ডিয়া)

—

"ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনে, মাতা-কর্ত্তৃক জারজ শিশুসন্তান হত্যা সাধারণ হত্যারই সামিল, কিন্তু অন্যান্য সভ্যদেশে ইহা স্বতন্ত্র অপরাধরূপে গণ্য এবং ইহার জন্য লঘুদণ্ডের ব্যবস্থা আছে। সম্প্রতি যুক্তপ্রদেশের একটি মোকদ্দমায় বিচারক ম্যাজিষ্ট্রেট্ তাঁহার রায়ে বলিয়াছেন যে, দণ্ডবিধি আইনের ৩১৮ ধারাও এইরূপ অসম্পূর্ণ এবং ভারতীয় সামাজিক রীতিনীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। যদি কোনো ব্যক্তি কোনো শিশুসন্তানের জন্ম গোপন করিবার জন্য তাহাকে মাটিতে পুঁতিয়া ফেলে বা অন্য কোনোরূপে তাহাকে নষ্ট করে, তবে ৩১৮ ধারা অনুসারে তাহার দণ্ড হইবে। বলা বাহুল্য, জারজ সন্তানের জন্ম গোপন করিবার চেষ্টায় হিন্দু বিধবারাই এই অপরাধে অধিকাংশ স্থলে অভিযুক্ত হয়। উপরোক্ত মোকদ্দমায় শ্রীমতী কুমারী নাম্নী একটি হিন্দু-বিধবা তাহার সদ্যোজাত জারজ সন্তানকে জলে ফেলিয়া দিয়াছিল। আদালতে বিধবা নিজের দোষ স্বীকার করে এবং কোনো পুরুষকর্ত্তৃক প্রলুব্ধা হইয়াই যে সে সন্তানের জননী হইয়াছিল, ইহাও বলে। যদি সমাজ তাহার এই পাপকার্য্যের কথা জানিতে পারিত, তবে আর তাহার দাঁড়াইবার স্থান ছিল না, মুহূর্ত্তের ভ্রমের জন্য, চিরজীবনের জন্য তাহাকে অধঃপতনের গভীর গহ্বরে পড়িতে হইত; কাজেই লোকলজ্জা-ভয়ে নিরুপায় হইয়া সে শিশু-সন্তানকে জলে ফেলিয়া দিয়াছিল। বিচারক বলিয়াছেন, ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন এ-সম্বন্ধে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও পক্ষপাত-দুষ্ট। যে-পুরুষ কোনো হতভাগিনী স্ত্রীলোককে পাপপথে প্রলুব্ধ করিয়া তাহাকে দুর্দ্দশার চরম-সীমায় উপস্থিত করে, তাহার জন্য কোনো দণ্ডের ব্যবস্থা নাই; ঐ দুর্ব্বৃত্ত সমাজে মাথা উঁচু করিয়া স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে; কেবল প্রতারিতা, নির্য্যাতিতা স্ত্রীলোকের উপরেই আইনের যত আক্রোশ।

বিচারক আরও বলিয়াছেন যে, ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের প্রণয়ন-কর্ত্তারা এদেশের সমাজের রীতিনীতি জানিতেন না; জানিলে কখনই তাঁহারা এই নিষ্ঠুর আইন করিতেন না। এ-দেশের মেয়েরা প্রায়ই অবরোধবন্দিনী—লজ্জা ও ভয়ে তাহারা সর্ব্বদা সঙ্কুচিতা; তাহার উপর সমাজ ব্যভিচারের যত-কিছু শাস্তি তাহাদেরই মস্তকে চাপাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে। একবার যদি কোনো কারণে কোনো হতভাগিনীর পদস্খলন হয়, তবে আর তাহার সাধুভাবে জীবন যাপন করিবার কোনো সুযোগ নাই, তাহাকে সমাজ হইতে বিতাড়িতা হইয়া বাধ্য হইয়া পতিতার দলে যোগ দিতে হইবে। সুতরাং পুরুষকর্ত্তৃক নিগৃহীতা বা প্রলুব্ধা হইয়াও এদেশের রমণীরা অনেকস্থলে প্রকাশ্যে তাহা ব্যক্ত করিতে পারে না;—নিজের লজ্জা ও কলঙ্ক যতদূর সাধ্য গোপন করিতেই চেষ্টা করে। এরূপ অবস্থায় আইনও যদি তাহাদের প্রতি নিষ্ঠুর হয়, তবে তাহারা দাঁড়াইবে কোথায়? বিচারক ম্যাজিষ্ট্রেট এইসমস্ত যুক্তি দেখাইয়া শ্রীমতী কুমারীর প্রতি লঘুদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া প্রকারান্তরে তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন।

হতভাগিনী কুমারীর শোচনীয় আত্মকাহিনীর প্রতিও আমরা তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। বাংলাদেশেও নিত্যই এরূপ শোচনীয় ঘটনা ঘটিতেছে। সম্প্রতি একটি বিবাহিতা ও স্বামী-পরিত্যক্তা মেয়ের যে শোচনীয় দুর্গতির কাহিনী "সঞ্জীবনী"তে বাহির হইয়াছে এই মেয়েটি যদি তাহার জারজ সন্তানকে হত্যা করিত, তবে আইন তাহাকে গুরুতর দণ্ড দিত; কিন্তু যে দুর্ব্বৃত্ত যুবক হিন্দু-পরিবারের পবিত্রতা ভঙ্গ করিয়া মেয়েটিকে বিপথ-গামিনী করিয়াছে, তাহার প্রতি সমাজ বা আইন কোনো শাস্তিরই ব্যবস্থা করিবে না। আমরা হিন্দুসমাজ ও দেশের শাসক ও আইন-কর্ত্তাদের এইসমস্ত কথা চিন্তা করিয়া দেখিতে বলিতেছি। বর্ত্তমান দণ্ডবিধি আইনের পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে; ৩১৮ ধারায় যাহাতে কেবল নারীরাই শাস্তিভোগ না করে, তাহাদের দুর্দ্দশার মূল পুরুষেরাও দণ্ডনীয় হয়, তাহার ব্যবস্থা হওয়া চাই। আর, নিরুপায় হইয়া নারী যেখানে জারজ সন্তানের জন্ম গোপনের চেষ্টা করে, সেখানে তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা এবং লঘুদণ্ডের ব্যবস্থা করা সভ্য-সমাজ ও তাহার প্রবর্ত্তিত আইনের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য।

—

লর্ড্ মেষ্টন্ "সান্‌ডে টাইমস্" নামক পত্রে ভারত-শাসন-সংস্কার-সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধটির সামান্য অংশ তুলিয়া দিলাম:—

মানুষের উদ্ভাবিত যে-কোনো শাসন-ব্যবস্থায় দোষ ত্রুটি থাকিবেই; সমবেত চেষ্টার সম্মুখে এইসকল ত্রুটি-বিচ্যুতি বেশী দিন টিকিতে পারিবে না। কিন্তু একটা জিনিষই কেবল দূর করা অসাধ্য; সেটা হইতেছে পাশ্চাত্য আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত যে-কোনো শাসন-ব্যবস্থাকে কার্য্যে পরিণত করিবার পক্ষে ভারতীয় চরমপন্থীদের অনিচ্ছা।

"আমাদের প্রদত্ত সংস্কারের ফলে গণতন্ত্র স্থাপিত হইবে: কিন্তু গণতন্ত্রের সম্মুখে যে প্রাচীন হিন্দু-সমাজের ভিত্তি ভাঙিয়া পড়িবে, ইহা চরমপন্থীদের নিকট অসহ্য; কিন্তু হিন্দু-সমাজের খুব বড় এক অংশ তথাকথিত উন্নতিশীল দলের বাড়াবাড়িতে ও নব্য ভাবে বিরক্ত হইয়া পড়িতেছেন", ইত্যাদি—

তাঁহার মতে গবর্ণমেণ্ট্ যদি একটু দৃঢ়তার সহিত কাজ করেন, তাহা হইলেই জনমত তাঁহাদের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িবে।

সকল দেশেই এই কথার সত্যতা প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। ভারত-বর্ষেও যে তাহাই হইবে তাহার আর বিচিত্রতা কি?

——

রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ বর্ত্তমানে জাপানে বাস করিতেছেন। তিনি "তেজ" পত্রে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একখানি পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ ১৯১৪ সনে ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন, তাহার পর আর তাঁহাকে ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিতে দেওয়া হয় নাই। তিনি এই দশ বৎসর ধরিয়া পৃথিবীর নানা দেশে ভারতবর্ষের সম্বন্ধে নানা কথার প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন। রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের পত্রখানি এই :—ভারতের স্বাধীনতা লাভ এবং এই স্বাধীনতা রক্ষার জন্ত অন্তান্ত রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে-ভারতের সদ্ভাব স্থাপন একান্ত প্রয়োজনীয়। মনে-মনে এই ধারণা লইয়া গত ১৯১৪ সন হইতে ১০ বৎসর যাবৎ আমি জার্ম্মানী-অস্ট্রিয়া, তুরস্ক, পারস্ত, আফগানিস্থান, রুশিয়া, ফ্রান্স, ইটালী, সুইট্জার-ল্যাণ্ড, আমেরিকা, মেক্সিকো, জাপান, চীন, প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করিয়া ঐসমস্ত দেশে ভারতীয় সভ্যতার বিষয় প্রচার করিতেছি। নিজের অভিজ্ঞতা হইতে আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, এসমস্ত দেশে বহু ভারত-হিতৈষী ব্যক্তি আছেন। বিশেষভাবে আফগানিস্থান, রুশিয়া ও জাপান ভারতের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন ; কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিব্বত ও নেপালে ভারতীয় ভাব এখনও ভালোরকম প্রচার হয় নাই। উদয়পুর রাজ-বংশেরই একজন বর্ত্তমান নেপালের অধিপতি। তিব্বতেও ভারতীয় দেবনাগরী লিপি বর্ত্তমান। এই দেশে অনেক ভারতীয় আছেন। এই দুই দেশ আমাদের প্রতিবেশী, কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের কোনো নিকট সম্পর্ক নাই। আমি এই উদ্দেশ্যে দুইবার নেপাল যাইতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু ইংরেজদের জন্ত সফল হইতে পারি নাই। বর্ত্ত-মানে ক্যালিফোর্নিয়া এবং আমেরিকার ভারতীয়গণ আমাকে এই উদ্দেশ্যে ২০ হাজার টাকা দিয়াছেন, ৬ জন ভারতীয় আমার সঙ্গে যাইতে রাজি হইয়াছেন। শীঘ্রই চীনের মধ্য দিয়া আমি তিব্বত ও নেপাল যাইব। যদি কিছু করিতে পারি, তবে তাহা ভারতের মঙ্গলের জন্তই হইবে।"

—

মহীশূরের মহারাজা, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের অনুরোধে চর্কায় সূতা কাটিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে এই সংবাদটি তুলিয়া দিলাম :—"মহীশূরের মহারাজা চর্কায় সূতা কাটিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি নিজে আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার প্রজাবর্গের ভিতর চর্কাকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে চান। মহাত্মা গান্ধী এইধরণের আদর্শের প্রতিষ্ঠার জন্তই ধনবান্, পদস্থ ও সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর ভদ্রলোকদিগকে পুনঃপুনঃ আহ্বান করিয়াছেন। কারণ জনসাধারণ সমাজের উচ্চশ্রেণীর পদাঙ্কই চিরকাল অনুসরণ করিয়া চলে।

"বাংলার রাজা জমীদারদের কাছে আমারও সানুনয় নিবেদন, তাঁহারা যেন আর চর্কাকে উপেক্ষা না করেন, দিবসের অন্ততঃ আধ ঘণ্টাকাল তাঁহাদের যেন চর্কা কাটার কাজে ব্যয় হয়।—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।"

—

জাপানীরা বোম্বাই-বাজারে হঠাৎ ভয়ানক তুলা কিনিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহার ফলে বোম্বাই-বাজারে তুলার দর শতকরা ৩৫ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার কারণ বিষয়ে নানা জনে নানা কথা বলিতেছে। কেহ কেহ বলিতেছেন যে, চীনে জাপানের বহু পরিমাণ তুলা কেনা ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে চীনের গোলমালের জন্ত সেই তুলা অধিক পড়িয়া আছে। চীনে-জাপানে হয়ত যুদ্ধ লাগিতে পারে তাহার জন্তও হয়ত জাপান পূর্ব্ব হইতে সতর্কতা অবলম্বন করিতেছে। কিন্তু কারণ যাহাই হোক, ভারতবাসীরও সতর্ক হওয়া ভাল। জাপান যাহাতে ভারতীয় তুলা বেশী চালান না দিতে পারে, তাহার উপায় উদ্ভাবন করা কর্ত্তব্য। জাপান ভারতের বাজারে তুলা কিনিয়া সস্তায় এদেশেই কাপড় চালান দিতে থাকিলে ভারতীয় বস্ত্র-শিল্পের সর্ব্বনাশ হইবে।

—

মাদ্রাজের গুণ্টাকাল বোমার মামলার কথা সংবাদপত্র-পাঠকারী মাত্রেই অবগত আছেন। অনন্তপুরের সেশন্ আদালতের বিচারে পাঁচ জন আসামীর প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল। মাদ্রাজ হাইকোর্ট কিন্তু এই পাঁচ জন আসামীকেই বেকসুর খালাস করিয়া দিয়াছেন। রায়ে বিচারপতিগণ পুলিশের আচরণের অতিশয় প্রশংসা করেন। বিচারপতি-গণ বলিয়াছেন যে :—"পুলিশ কয়েকদিন পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিল যে, একটি বাড়ীতে গুলী, বারুদ প্রভৃতি আছে, কিন্তু তবুও তাহারা ঐ বাড়ী খানাতল্লাস করে নাই বা এ-সম্বন্ধে কোন সাবধানতা অবলম্বন করে নাই। পুলিশের পক্ষে বাহাদুরি বটে। সেশন্ জজের বাহাদুরি আরও বেশী ; তিনি কিরূপ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া পরম নিশ্চিন্ত-ভাবে পাঁচজন হতভাগ্যকে ফাঁসিকাঠে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, তাহাই ভাবিয়া আমরা আশ্চর্য্য হইতেছি। মানুষের প্রাণ-সম্বন্ধে যিনি এত উদাসীন, তাঁহার পক্ষে বিচারাসনে না বসাই উচিত।"

—

কমন্স সভায় ভারতকথা—

কমন্স সভায় আর্ল্ উইণ্টারটন্ বলেন, কলিকাতা, সহরতলী ও হাওড়া প্রভৃতি স্থানে ১৯২৩—২৪ প্রতি ১০০০ লোকের মধ্যে ১৮৫ পাউণ্ড আফিং ব্যবহৃত হইয়াছে। অমৃতসর জেলায়, বোম্বাই, করাচী ও মাদ্রাজে—৫৬, ৮৬, ৪৩, ও ৫৩ পাউণ্ড করিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে।

—

কাউন্সিল সদস্যের মুখবন্ধ—

অধ্যাপক রুচিরাম সাহানি এবং মিঃ লাভ সিং ইঁহারা দুইজন পঞ্জাব কাউন্সিলের সদস্য। ইঁহারা স্বরাজ পার্টির সভ্য। কাউন্সিলের মধ্যে এই দুইজন সদস্ত দেশবন্ধুর মৃত্যু উপলক্ষ্যে কিছু বলিবার অনুমতি পান নাই। কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট্ ইঁহাদের মুখ বন্ধ করিয়াছিলেন। এ-ব্যবহারের মহিমা বোঝা মুস্কিল। আরো আশ্চর্য্যের কথা যে-পঞ্জাব কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট্ একজন ভারতবাসী মুসলমান, তাঁহার নাম সেখ আবদুল কাদির। ঐ দুইজন সদস্য প্রেসিডেন্ট্ মহোদয়কে একখানি পত্র লিখিয়াছেন ; আনন্দবাজার হইতে তাহার বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল :—'অদ্য ২৩শে তারিখ কাউন্সিলে দেশবন্ধুর জন্ত যে শোকসূচক প্রস্তাব উপস্থিত হয় তাহাতে কয়েকটি কথা বলিবার জন্ত অনুরোধ করা সত্ত্বেও আপনি আমাকে কোনো কিছু বলিতে দেন নাই। আমাদের মহান নেতা পরলোক গমন করিয়াছেন। পাছে আমাদের নীরবতাকে কেহ ভুল বুঝেন তজ্জন্ত জানাইতেছি যে, আমরা এবং স্বরাজ্যদল তাঁহার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করিতেছি। আমি বিবৃতি সাধারণের কাছে প্রকাশ করিলাম—আশা করি ইহাতে আপনার আপত্তি হইবে না।"

—

আলিগড়ে অন্ধ বিদ্যালয়—

গত ১৩ই জুন আলিগড়ে মুস্লিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার নবাবেবন্ আগুাব মহম্মদ খাঁ আলিগড়ে একটি অন্ধবিদ্যালয় স্থাপন

করিয়াছেন। এই বিদ্যালয়ে সকল ধর্মাবলম্বীকেই শিক্ষা দেওয়া হইবে। সাহিবজাদার পিতা গোয়ালিয়রে এক অন্ধ-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। আলিগড় বিদ্যালয়ে কোরান্ শিক্ষারও বিশেষ ব্যবস্থা করা হইবে।

—

শ্বেতাঙ্গের মনুষ্যত্ব—

একখানি বাংলা দৈনিক কাগজ হইতে আমরা নিম্নলিখিত সংবাদটি সম্পূর্ণভাবে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। মূল সংবাদটি বম্বে ক্রনিকেল পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

'বোম্বে ক্রনিকেল', 'রাই ফুকুমারু' নামক জাপানী জাহাজ জলমগ্ন হওয়ার বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। এতদিন মনে ভাবিতাম যে পরাধীন এসিয়া ও আফ্রিকাবাসী দিগকেই বুঝি পাশ্চাত্য শ্বেতাঙ্গ জাতিরা ঘৃণা করে, কিন্তু এখন দেখিতেছি যে, সমস্ত এসিয়াবাসীদের উপরেই তাহাদের একটা বিজাতীয় অবজ্ঞার ভাব; এমন-কি, জাপানীরা স্বাধীন হইলেও পাশ্চাত্য শ্বেতাঙ্গদের নিকট তাহাদের প্রাণের কোনো মূল্য নাই। জাপানী জাহাজ জাপানী আরোহী লইয়া সাকাতে জলমগ্ন হইলেও ইংরেজ জাহাজের কাপ্তেন বা আরোহীবর্গ তাহাদের প্রাণরক্ষার কোনো চেষ্টা করে নাই—অথচ তাহারা যে ইচ্ছা করিলেই বহু জলমগ্ন ব্যক্তির প্রাণরক্ষা করিতে পারিত, তাহা ইংরেজ জাহাজ "হোমারিক"এর জনৈক সম্ভ্রান্ত আরোহীই লিখিয়াছেন। আরও অদ্ভুত কথা এই যে, যখন জাপানী আরোহীরা জলে ডুবিয়া মৃত্যুর সঙ্গে প্রাণপণ যুদ্ধ করিতে- . . . কতকগুলি শ্বেতাঙ্গ আরোহী সেই দৃশ্যের .ফটো" লইতেছিলেন,—বোধ হয় বায়স্কোপের ছবি তুলিয়া হাজার-হাজার সুসভ্য শ্বেতাঙ্গ শ্বেতাঙ্গিনীদের চিত্তবিনোদন করিবার জন্য। এরূপ অদ্ভুত আনন্দ উপভোগের কথা অসভ্য এসিয়াবাসীরা বোধ হয় ধারণাই করিতে পারিবে না। জাপানের প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র 'ওসাকা আসাহী'তে একজন কর্নেল্ লিখিয়াছেন যে, তিনি 'হোমারিক' নামক ইংরেজ জাহাজখানির কাপ্তেনকে এসম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন,—'জলমগ্ন ব্যক্তিদের মধ্যে সকলেই জাপানী ছিল, উহাদের মধ্যে একজনও শ্বেতাঙ্গ ছিল না।' এই কয়টি কথার মধ্যে ইংরেজ কাপ্তেনের মনের যে জঘন্য নীচতা, পশুর ন্যায় ক্রূর আনন্দ, কুৎসিত বর্বরতা ও অ-শ্বেত এসিয়াবাসীদের প্রাণের প্রতি একটা দারুণ অবজ্ঞা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা লইয়া আলোচনা করিতেও আমরা ঘৃণা বোধ করি।

—

কাশীতে গোঁড়াদের সভা—

কাশীতে সাধু-পণ্ডিত-মোহান্ত-মহারাজগণ সমবেত হইয়া এক সভায় মহাত্মা গান্ধীর সমাজ-সংস্কার উক্তির প্রতিবাদ করিয়াছেন। মহাত্মা সম্প্রতি বলিয়াছেন যে, তিনি অস্পৃশ্যতা-সম্বন্ধে হিন্দু জনসাধারণের মতামত জানেন। জনসাধারণের মতামতেরই তিনি প্রকাশক—প্রচারক। সাধু-পণ্ডিত-মোহান্তগণ এই কথায় চটিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা দেশবাসীকে ও গবর্ণমেণ্ট্‌কে জানাইয়াছেন যে, মহাত্মা গান্ধী হিন্দু সমাজের নেতা নহেন— এই স্বয়ংসিদ্ধ নেতাকে তাঁহারা কেহই নেতা বলিয়া মনে করেন না। মহাত্মার দল এতকাল সরকারকে ধ্বংস করিতে চাহিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন, এখন হিন্দু-সমাজকে ভাঙিতে ব্যস্ত হইয়াছেন; ইত্যাদি ইত্যাদি। পাঁচশত সাধু-পণ্ডিত-মোহান্ত এই সিদ্ধান্তে সহি করিয়াছেন, সভাক্ষেত্রে তাঁহাদের অভিমত পঠিত হইয়াছে।—"আনন্দবাজার"

—

ডাঃ গৌরের নূতন বিল—

ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য সার্ হরি সিং গৌর এই মর্মে এক বিলের নোটিশ দিয়াছেন—বাল্যকালে সন্তানদিগকে পাশবিক অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা হউক। ঐ বিলের নাম "শিশু-রক্ষা বিল" দেওয়া হইবে। গত বৎসর শীতকালে ব্যবস্থা-পরিষদে সহবাস-সম্মতি বিল অগ্রাহ্য হওয়ায় সার হরি সিং এই নূতন বিল আনিতেছেন। বিলে (১) ১৩ বৎসরের কম বয়স্ক সকলকে রক্ষা করা হইবে (২) ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত বিদেশীর হাত হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করা হইবে (৩) ১৪ বৎসর পর্য্যন্ত বিবাহিতা বালিকাদিগকে তাহাদের স্বামীর আক্রমণ হইতে রক্ষা করা হইবে। ১৩ বৎসরের কম বয়স্ক বালিকাদিগের উপর অত্যাচারই বলাৎকার বলা হইবে—ইহাই বিলের কথা। ১৩ হইতে ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের বালিকাদিগের উপর স্বামী ভিন্ন অপর লোক অত্যাচার করিলে তাহার ২ বৎসর কারাদণ্ড হইবে—কিন্তু স্বামীর বেলায় মাত্র ১ বৎসর হইবে।

—

ভাগলপুর কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী লিখিতেছেন যে, ঐখানে হিন্দু-মুসলমানে সদ্ভাব নাই; স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের ব্যবহারে মনোমালিন্য বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া মনে হয়। ইতিপূর্ব্বে ম্যাজিষ্ট্রেট্ ১৪৪ ধারা জারি করিয়া স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে হিন্দু-সংগঠন ও অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন প্রভৃতি সম্বন্ধে সভা করিতে দেন নাই; হিন্দুদের পক্ষে সাধারণ সভাসমিতি করাও নিষিদ্ধ হইয়াছে। তা'র পর কর্ত্তৃপক্ষ এমন আচরণ করিতেছেন, যাহাতে দুষ্ট-প্রকৃতির মুসলমানেরা হিন্দুদের উপর অত্যাচার করিতে সাহস পাইতেছে। মুসলমান মহল্লার মধ্য দিয়া যাইবার সময়ে অনেক হিন্দু অপমানিত হইয়াছে, কোনো-কোনো স্থলে বিশিষ্ট হিন্দুরাও এই অপমানের হাত হইতে নিষ্কৃতি পান নাই; কিন্তু জেলার কর্ত্তৃপক্ষেরা এইসব মুসলমান গুণ্ডাদের দমন করিবার জন্য কোনোরূপ চেষ্টা করিতেছেন না। হিন্দুরা আদালতে নালিশ করিয়াও কোনো ফল পাইতেছে না। কর্ত্তৃপক্ষের ব্যবহার দেখিয়া মনে হয়, তাঁহারা যেন—মনোমালিন্য বৃদ্ধি পায়—ইহাই চান।

হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

পার্ব্বতীর প্রেম

শ্রী অমিয়া চৌধুরী

(১)

পৌষের শেষ বেলা; অস্তগামী সূর্য্যের রাঙা আলো গায়ে মাখিয়া পার্ব্বত্যনগরী তুরা একখানা ছবির মতন সুন্দর দেখাইতেছিল।

পাহাড়ের উপরে আফিস ও বড় সাহেবের কুঠি···দুই-খানিই কাঠের বাংলা,—সে দেশে যেমন হয়, মাচার উপর তৈরী। আর-কিছু নীচে একটু সমতল জায়গায় কেরানী-দের বাসা।

আফিস-বাংলার বড় বড় শালকাঠের দরজাগুলি ভারি শব্দে বন্ধ হইতে লাগিল। গারো চাপ্‌রাশী খাতাপত্র গুছাইয়া চট্‌পট্ কাজ সারিতে আরম্ভ করিল। আর কেরানীরা সমস্ত দিন খাটুনীর পরে অবসন্ন শ্রান্ত শরীরে সরু ঘোরা-পথ বাহিয়া নীচে নামিয়া যাইতে লাগিলেন।

আফিসের বড়-বাবু শ্রীশচন্দ্রের বাড়ীর দরজায় একটি সাত-আট বছরের মেয়ে দাঁড়াইয়া পথের দিকে চাহিয়া ছিল; শ্রীশ বাড়ীর নিকটে আসিতেই সে প্রায় চীৎকার করিয়া কহিয়া উঠিল, "বাবা, বংশী আজও আসেনি, মা সমস্ত কাজ নিজে কর্‌ছেন।"

শ্রীশ কোনো কথা কহিলেন না। কিন্তু তাঁর মুখের প্রত্যেক রেখায় অপ্রসন্ন-ভাব খুব স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিল।

বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তাঁহার নিত্যরোগিণী পত্নী কিরণবালা অত্যন্ত শ্রান্তভাবে গৃহকর্ম্ম করিতেছেন। শ্রীশ কহিয়া উঠিলেন, "বংশীকে নিয়ে আর চল্‌বে না দেখ্‌ছি। মাসের মধ্যে পনেরো দিন আস্‌বে না—আজ আবার গেল কোথায়?"

ঘরের ভিতর হইতে কিরণ উত্তর দিলেন, "সে ত আর আমাকে ঠিকানা দিয়ে যায়নি! আর আমার ত'তে দর্‌কারও নেই। আর আমি তাকে রাখ্‌ছিনে। সেই-সময়েই বলেছিলাম—একটা হিন্দুস্থানী চাকর রাখো, তা সে টাকা বেশী লাগ্‌বে—,বেশ তোমার টাকা জমুক—কাজ আমিই সব কর্‌ব। মেয়েমানুষের শরীর—ও আর তোয়াজ কর্‌লে চলে না। এই সক্ষোভ অভিমান-বাক্য শুনিয়া শ্রীশ কোনো উত্তর করিতে পারিলেন না। তাঁহার বংশীর উপর অত্যন্ত রাগ হইল।

বংশী গারো ভৃত্য। একবৎসর হইল শ্রীশ তুরা সহরে চাকুরি করিতেছেন, বংশী প্রথম হইতেই তাঁহার বাসার কাজ করিতেছিল; সে খুব খাটিতে পারে। প্রত্যেক দিন নিয়মিত কাজ করিয়া দিয়া যাইত। কিন্তু আজ দুইমাস যাবৎ সে প্রায়ই কাজে অনিয়ম করিতেছে; দুইমাস আগে সে বিবাহ করিয়াছে। বৌ একদিন স্বামীর মনিব-বাড়ী বেড়াইতে আসিয়াছিল। সেই খর্ব্বনাসা ক্ষুদ্রাকৃতি সুগৌরবর্ণা বধূই বংশীর কাজে অমনোযোগিতার হেতু, ইহা কিরণ স্পষ্ট জানিতেন। স্বামীর নিকট এই লইয়া আলোচনা করিতেন। দুইজনেরই হাসিও পাইত, রাগও হইত। যাহাদের পেটে অন্ন জুটে না, তাহাদের হৃদয়ে যে কেমন করিয়া প্রেম থাকিতে পারে তাহা এই কেরাণী-গৃহকর্ত্তা ও তাঁর স্ত্রীর বোধগম্য হইত না।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শ্রীশ কহিলেন, "ছাড়িয়েই দেবো ওকে। মাইনেগুলো নেহাত জলে যাচ্ছে—আজ একবার নীচে যাবো, দেখি ঘরে আছে না কোথায় গেছে!"

কিরণ কহিলেন, "থাক ওর ঘরে গিয়ে আর তোমার খোঁজ নিতে হবে না। ইচ্ছে হয় আস্‌বে নয়ত না আস্‌বে; আমাদের খোঁজের দর্‌কার কি? একটা ভালো চাকর দেখো—"

"তাই দেখি। আর এর মধ্যে যদি বদ্‌লি হ'তে পারি—,তোমার আজ আর জ্বরভাব হয়নি ত?" কিরণ কহিলেন, "হয়নি এখনো। তবে মাথা ধ'রে আস্‌ছে, এই জল ঘাঁটা, বাসন মাজা—জ্বর আস্‌তে আর কতক্ষণ?"

শ্রীশ কহিলেন, "কি উপায়ই বা করি! আচ্ছা বংশী

যেদিন অন্য কোথাও কাজে যায়, সেদিন বৌটাকে পাঠালেও ত পারে।”

“হ্যাঁ তেম্‌নি কিনা! আর কোথায় আবার অন্য কাজে গেছে? ঘরে ব'সে দু'জনে হাসি-তামাসা হচ্ছে।”

তাহার নিজের অসুস্থ দেহ লইয়া সংসারের সকল কাজ করিতে হইতেছে, এই অবস্থায় বংশী বধূর সহিত আরাম করিয়া হাসিগল্প করিতেছে, ইহা কল্পনা করিয়াই যেন কিরণের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। অবশ্য তাঁহার জ্বরও আসিতেছিল।

পরদিন সকাল-বেলা কিরণ গায়ে আলোয়ান জড়াইয়া রান্না-ঘরের বারান্দায় তরকারী কুটিতেছেন, খুকী শোবার ঘর ঝাঁট দেওয়া, বিছানা তোলা প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত আছে; এমন সময় বংশীর বৌ ময়না আসিয়া অঙ্গনে প্রবেশ করিল।

কিরণ জিজ্ঞাসা করিলেন, “বংশী কোথায়?”

ময়না উত্তর দিল, “আসেনি।”

“সে ত দেখ্‌তেই পাচ্ছি, কিন্তু আসেনি কেন? ইচ্ছে না হয় চাক্‌রি ছেড়ে দিক—কিন্তু এমন ক'রে আমাদের ভোগাচ্ছে কেন? আর আস্‌বে না সে?”

ময়না মৃদুস্বরে কহিল, “কাল আস্‌বে। আজ আমায় পাঠিয়েছে কাজ ক'রে দিতে।”

“ইচ্ছে মতন? নয়? কেন, সে বাড়ী নেই?”

ময়না মাথা নাড়িল।

কিরণ জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোথা গেছে?”

“জঙ্গলে কাঠ কাট্‌তে—”

“কেন? বিয়ে ক'রে এই মাইনেতে আর কুলোচ্ছে না বুঝি? এ-শাড়ী কে দিলে তোকে?”

ময়নার মুখে স্মিতহাস্য ফুটিল। কহিল “ওই দিয়েছে...”

নির্ব্বোধ পাহাড়ী মেয়েটার হাসি দেখিয়া কিরণ অবাক্ হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, “এত ভালো শাড়ী পরিস কেন? তোদের দেশের মেয়েরা যে কাপড় পরে, তেম্‌নি...”

ময়না মাঝখানেই কহিল “ও ভালো নয়।”

কিরণ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,“ছোটোলোক তোরা! তোদের আর বোঝাবো কি?”

ময়না কহিল, “মা, কি কাজ আছে দাও...”

কিরণ যদিও ময়নার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না, তবুও সেদিন নিজের কাজ করিবার শক্তি ছিল না বলিয়াই তিনি অগত্যা ময়নাকে কার্য্য নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। ময়নার দেহ খুব সবল, মুখ সদাহাস্যময়। সে অনায়াসে যেন খেলা-ধূলার মতন হাসিমুখে কাজ করিতে লাগিল।

বিকাল-বেলা সে কহিল, “মা বাড়ী যাই?”

কিরণ কহিলেন, “এখনি যাবি? জলটল তুলেছিস?”

ময়না জানাইল, তুলিয়াছে।

তাহার কাজ-কর্ম্ম দেখিয়া কিরণ-বালা একটু খুসী হইয়াছিলেন, কহিলেন, “আর-একটু থাক্‌না; সন্ধ্যের পর খেয়ে তবে বাড়ী যাস...”

খুকী উপর হইতে কহিল, “সন্ধ্যের পর সে যাবে, পথে যদি বাঘে ধ'রে নেয়।”

পাহাড়ের উপর আজ কয়দিন বাঘের ডাক শুনা যাইতেছিল। কিন্তু শব্দটা তেমন নিঃসন্দেহভাবে সত্য নয়, আর গরু-ভেড়াও মারা পড়ে নাই। তাই বাঘের কথাটা সকলে বিশ্বাস করে নাই; কিন্তু বাঙালী অধিবাসীরা ভয় পাইয়াছিল। কিরণ জিজ্ঞাসা করিলেন, “সত্যি বাঘ এসেছে নাকি রে ময়না?”

ময়না কহিল, “জানিনে; বাঘের ভয় আমি করিনে।”

“তবু ত পালাতে চাচ্ছিস...”

ময়না অগত্যা সত্য প্রকাশ করিয়া কহিল, বাড়ী গিয়া ভাত রাঁধিতে হইবে। বংশী সন্ধ্যার পরে বাড়ী আসিবে, আসিয়া ভাত না পাইলে তা'র কষ্ট হইবে।

কিরণ বিরক্ত হইয়া ছুটি মঞ্জুর করিলেন।

ময়না নীচে নামিয়া গেল।

সেইদিন শুক্লা ত্রয়োদশী; খুব সুন্দর জ্যোৎস্না উঠিয়াছে। বংশী তাহার ক্ষুদ্র কুটীরের সম্মুখে খোলা জমির উপরে বসিয়া আছে। ময়না কতকগুলি শুষ্ক পাতা জড় করিয়া আগুন করিতেছে।

বংশী জিজ্ঞাসা করিল, "আজ অনেক কাজ ক'রে দিয়ে এসেছিস, না; কষ্ট হ'ল?"

ময়না হাত দুইখানি আগুনের উপর ধরিয়া গরম করিতে-করিতে কহিল, "এতেই কষ্ট হবে? আর তুমি যে রোজ কর্‌ছ।"

"আমিও আর কর্‌ব না। বাঙালী বাবুরা বড় বকে; ওদের সব আলাদা, ওখানে আর কাজ কর্‌তে পার্‌ব না।"

"তবে কি কর্‌বে?"

"মায়া ত তা'র দেশে যাচ্ছে, আমাকে তা'র কাজ দিয়ে যাবে। আর সাহেবের দুটো ছেলে আছে, একজন আয়া চাচ্ছে, তুই আয়ার কাজ কর্‌তে পার্‌বি?"

ময়না কহিল, "খুব পার্‌ব। আগে আমি কত কাজ করেছি…"

ময়নার মা-বাপ ছিল না। দূরসম্পর্কীয় এক আত্মীয়ের ঘরে মানুষ হইয়াছিল, সেখানে অনেক কাজ করিতে হইত। ময়না কহিল, "কাল মনিব-বাড়ী যাবে ত?"

"যাবো, কিন্তু পরে আর-ক'দিন জঙ্গলে যেতে হবে। একজন সাহেব এসে বন কাটাচ্ছে—শাল-কাঠ চালান দেবে।"

"কোথায়?"

"ঐ সে কোন্ খানে রেলগাড়ীর রাস্তা হচ্ছে। তুই রেলগাড়ী দেখেছিস ময়না?"

ময়না ঈষৎ ক্ষুণ্ণচিত্তে কহিল, "না।"

বংশী কহিল, "আমি একবার দেখেছি। টাকা জমাই আগে, তা'র পর তোকে ধুব্‌ড়ীতে নিয়ে যাবো, আর সোনার বালা গড়িয়ে দেবো।"

ইতিপূর্ব্বে ময়না কিরণের হাতে স্বর্ণবলয় দেখিয়া আসিয়া স্বামীর নিকট তাহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছিল।

বংশীর কথা শুনিয়া সে কল্পনায় একবার নিজের হাতে সোনার বালা পরিয়া লইল; কিন্তু তা'র পর একটু শঙ্কিতভাবে কহিল, "দেখ তুমি যে রোজ জঙ্গলে যাচ্ছ, শোনোনি বাঘ বেরিয়েছে…"

বংশী উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল, ময়না তাহার দিকে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল।

বংশী হাসিতে-হাসিতে কহিল, "আমাকে কি তুই ছেলেমানুষ পেয়েছিস ময়না? বাঘের ভয় দেখাচ্ছিস তুই…"

বংশীর মুখের কথা মুখে রহিল। সহসা যেন বজ্র-নির্ঘোষে কঠিন পর্ব্বত-গাত্র একদিক্ হইতে আর-একদিক্ পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। শিকারী-ভয়ভীতা ত্রস্ত হরিণীর মতো ময়না ছুটিয়া আসিয়া স্বামীর দেহ-লগ্ন হইল। বংশী একটুও কাঁপিল না। সে কেবল দুই হাতে ময়নার কম্পিত দেহ জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "ভয় কিসের ময়না? উপরের পাহাড়ে বাঘ ডাক্‌ছে, এখানে ভয় কি?"

দুইবার-তিনবার ভীষণ গর্জ্জন-শব্দে বনভূমি কম্পিত হইল। তা'র পর সব নিস্তব্ধ; চারিপাশে ভীতিজনক অটুট নীরবতা। চন্দ্রালোকিত আকাশে কেবল ভয়লেশহীন চন্দ্রতারা উজ্জ্বল নেত্র মেলিয়া স্থিরসুপ্ত নগরীর পানে চাহিয়া আছে।

বংশী ময়নার অসাড় দেহটি তুলিয়া লইয়া কহিল, "চল্, ঘরে যাই চিরকাল বনে বাস কর্‌ছিস, তবু আজ এত ভয় পেলি কেন?"

ময়না উত্তর দিল না। কোনোমতে আসিয়া ঘরে শুইয়া পড়িল।

সমস্ত রাত্রি ময়না ঘুমাইতে পারিল না। ঊষার ধূসর আলো যখন বেড়ার ফাঁকে তাহাদের ঘরের ভিতর আসিয়া পড়িল, তখন একটু নিশ্চিন্ত হইয়া ময়না চোখ বুজিল। বংশী গভীর ঘুম ঘুমাইতেছিল। ময়নার যখন ঘুম ভাঙিল, তখন সুপ্তোত্থিত শত বিহগের কল-গীতে সমস্ত বন ঝঙ্কৃত হইতেছে; বালসূর্য্যের অরুণ আলো তৃণাবৃত সবুজ উপত্যকায় অপূর্ব্ব রূপের ছবি ফুটাইয়া তুলিয়া'ছে।

ময়না দেখিল, বংশী বসিয়া-বসিয়া একখানা মোটা লাঠি তৈরী করিতেছে।

ময়না কহিল, "তুমি এখনো যাওনি? এত বেলা হয়েছে?"

বংশী উত্তর দিল, "আজ উপরে যাবো না।"

"যাবে না? কোথায় যাবে? ও লাঠি কি হবে?

দেখ আজকের দিনটি জঙ্গলে যেয়ো না। কাল রাত্রে—"

বংশী এতক্ষণ মৃদু-মৃদু হাসিতেছিল; মুখ তুলিয়া কহিল, "তুই ভেবেছিস কি বল্ ত? আমাকে বুঝি বাঘে নিয়ে যাবে? আমি ত আর তোর মতন নই; তুই চুপ ক'রে দোর দিয়ে ঘরে ব'সে থাক্। আমি আমার কাজে যাই।"

ময়নার একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। কহিল, "আমি একা থাকতে পারব না। দোর ভেঙে বাঘ বুঝি ঘরে ঢুকতে পারবে না?"

"দিনের বেলা? তুই আমাকে পাগল পেয়েছিস্ যে যা-তা কথায় ভুলোবি! টাকা বেশী হ'লে কেমন সোনার বালা হাতে পরবি, সুখে থাবি; সে-টুকত ভালো হবে। সে-সব তুই বুঝ্‌বি না, খালি বাধা, খালি বাধা।"

ময়না কহিল, "আমি সোনার বালা পরতে চাইনে। তুমি বাড়ী থাকো।"

বংশী কহিল, "তুই আজ ভয়ে বল্‌ছিস, চাইনে—কিন্তু সেদিন কেন বলেছিলি?"

ময়না সহসা উত্তর খুঁজিয়া পাইল না।

বংশী তাহার মুখের দিকে একবার চাহিয়া উঠিয়া পড়িল। লাঠিখানা, একটা উঁচু পাথরের গায়ে ঠেসান দিয়া রাখিল। তা'র পর মাথায় একটা পাগ্‌ড়ী বাঁধিতে-বাঁধিতে কহিল, "তুই ভাবছিস্ কেন ময়না। ঠিক সন্ধ্যেয় যদি আমি এই বাড়ী ফি'রে না আসি তবে তখন বলিস। তোর যদি একা থাকতে ভয় করে, মনিব-বাড়ী যা না. কাজকর্ম্ম ক'রে খেয়ে-দেয়ে আসিস। সন্ধ্যেবেলা তুই ফি'রে দেখ্‌বি, আমি এসে তোর আগেই ঘরে ব'সে আছি।"

ময়না অনেক অনুনয় করিল, কিন্তু বংশী কোনো কথাই কানে তুলিল না। তাহার প্রবল ইচ্ছার নিকটে ময়নার সমস্ত ক্ষুদ্র যুক্তি ব্যর্থ হইয়া গেল। ময়নাকে মনিব-বাড়ীর কাছাকাছি পৌঁছিয়া দিয়া বংশী আর-একটা পথ ধরিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় কহিল, "সন্ধ্যেবেলা ঠিক আস্‌ব, তোর ভয় নেই।"

ময়না পথের উপর চিত্রার্পিতের স্থায় দাঁড়াইয়া সজল নয়নে স্বামীর পানে চাহিয়া রহিল।

যখন বংশীর দীর্ঘ দেহ ঘন বনের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেল, তখন সে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া মনিব-বাড়ীর দিকে চলিল।

কিরণ ময়নাকে দেখিয়াই ব্যাপার অনুমান করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজকেও তুমি যে! সে নবাব সাহেবের হয়েছে কি?"

আজ ময়নার হাসিখুসি ছিল না। বিষণ্ণ-নতমুখে কহিল, "জঙ্গলে গেছে—"

ঘরের ভিতর হইতে শ্রীশচন্দ্র সকল কথা শুনিতেছিলেন, ময়নার কথা শেষ হইবার আগেই তিনি কহিলেন, "বেটার প্রাণে ভয়-ডরও নেই। সারা পাহাড় বাঘে হাঁক দিয়ে বেড়াচ্ছে—আজও গেছে সেই জঙ্গলে কাঠ কাটতে। ফি'রে এলে হয়।"

ময়না সকল কথা ভালো বুঝিল না; কিন্তু একটু যাহা বুঝিল, তাহাতে তা'র বুক কাঁপিয়া উঠিল, শুষ্কমুখে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, বাবু কি বল্‌লেন?" দরিদ্রা রমণীর এই প্রশ্ন কিরণের কানে অসঙ্গত ঠেকিল; কহিলেন, "সব কথা আব শু'নে কাজ নেই, কাজ করগে যাও।"

একটা অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কার বোঝা বুকে বহিয়া ময়না কাজ করিতে লাগিল। সন্ধ্যার সময় কিন্তু তা'র মন বাড়ী ফিরিবার জন্য উতলা হইয়া উঠিল। বংশী সন্ধ্যার পরে আসিবে, আসিয়া খাইতে পাইবে না, তাও কি হয়?

আজ সারাদিন এদিকে বাঘের সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় নাই; বাঘ সম্ভবত অন্য পাহাড়ে সরিয়া পড়িয়াছে, এই ভাবিয়া ময়না সাহস সঞ্চয় করিল। কিরণের কাছে গিয়া কহিল, "আমি এবার বাড়ী যাই, মা।"

কিরণ কহিলেন, "যাও, কাল থেকে একেবারেই যাবে। তোমাদের নিয়ে আমাদের মতন লোকের চলে না। কেবলি নিজের সুখ নিয়ে ব্যস্ত, আমাদের কাজ কখন করবি বল্।"

আজই আপিসে শ্রীশচন্দ্র বদলি-মঞ্জুরের পত্র পাইয়াছেন। কিরণ-বালার মন বেশ খুশী হইয়াছে। এই

ব্যাঘ্রভীতিপূর্ণ নির্জ্জন পার্ব্বত্য প্রদেশ ছাড়িবার কল্পনায় তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া উঠিয়াছেন।

কর্ত্রীর অনুমতি পাইয়া ময়না বাড়ীর বাহির হইয়া কেবল পথের উপর পা দিয়াছে, এমন সময় আবার গত রজনীর অনুরূপ ভীষণ গর্জ্জনে যেন আকাশ-পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া গেল। ময়নার দেহ নিঃস্পন্দ হইল। ভয়ে, উৎকণ্ঠায় ও স্বামীর জন্ম উৎকট ভাবনায় যেন তাহার সমস্ত চৈতন্ত একসময়ের জন্ম লুপ্ত হইয়া গেল।

কতক্ষণ পরেই ভয়ানক গর্জ্জনে মাটি কাঁপিতে লাগিল। ময়না বাড়ী যাইতে পারিল না। কিরণ তাঁহার শয়নকক্ষের একটা জানালা খুলিয়া ডাকাডাকি করিতে-ছিলেন, সেই ডাকেই ময়না ফিরিয়া চাহিল। না ফিরিয়া উপায় নাই। শিথিলচরণে কম্পিতবক্ষে ময়না ধীরে-ধীরে আসিয়া কিরণের ঘরের দরজায় দাঁড়াইল।

কিরণ দ্বার মুক্ত করিয়া কহিলেন, "শীগ্‌গির ঘরে আয়। আজ আর বাড়ী যাবার নাম করিস্‌নে, এখুনি ত বাঘের পেটে গিয়েছিলি—"

ময়না শুষ্কস্বরে কহিল, "বাঘ ত এত কাছে আসেনি মা, দূরের জঙ্গলে ডেকেছে।"

কাছে আসিলে ময়নার এত চিন্তা, এত ভয় হইত না। তাহার ভয় হইয়াছিল স্বামীর জন্ম। যদি সে এখনো বাড়ী না আসিয়া থাকে। কতক্ষণ পরে সেই ভয়ানক শব্দ থামিল। আবার চারিদিকে বনভূমির স্বাভাবিক নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। ময়না কহিল, "মা, আমি বাড়ী যাই, ভাত রাঁধ্‌তে হবে।"

কিরণ এই মূর্খ মেয়েটাকে নিশ্চিত মরণের মুখে সমর্পণ করিতে রাজি হইলেন না। কহিলেন, "কার জন্ম ভাত রাঁধ্‌বি গিয়ে? আজ রাত্রিটা চুপ ক'রে শুয়ে থাক্। বংশী যদি নাই-ই ফেরে, তা হ'লে তুই—"

ময়না শিহরিয়া উঠিয়া কহিল, "না মা, সে ত ব'লে গেছে সন্ধ্যের পর আস্‌বে।"

কিরণ অর্থসূচক মাথা নাড়িলেন।

পাশের ঘর হইতে শ্রীশ কহিলেন, "ওগো, ওকে বুঝিয়ে দাও, বংশী আজ রাত্রে ফিরবে না। একটা গাছে চ'ড়ে-ট'ড়ে কোনোমতে রাতটা কাটাবে, সকালে বাড়ী আস্‌বে। বাঘ বেরুলে ওরা ত ওইরকমই করে।" তা'র পর ঈষৎ মৃদুস্বরে কহিলেন, "বাছাধন আজ বাঘের কবলেই পড়েছেন কি না, ভগবান্ জানেন।"

কিরণ কহিলেন, "পাপের শাস্তি আর কি! তিনদিন জ্বরগায়ে সংসারের সকল কাজ করেছি, আত্মাটা দুঃখ পেয়েছে ত! তা'র একটা অভিশাপ আছে ত? ভগবান্ সব বিচার করেন।" বলিয়া শুইতে গেলেন। ময়নাকে কহিলেন, "সাবধান, যেন দরজা খুলে চ'লে যাস্‌নে।" ময়না হতচৈতন্যের মতন এক-কোণে শুইয়া পড়িল। বংশী যে সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিয়াছে, সে-বিষয়ে ময়নার কোনো সংশয় ছিল না। কেবল বাড়ী গিয়া স্বামীকে সচক্ষে দেখিবার ও তাহাকে রাঁধিয়া খাওয়াইবার অত্যন্ত প্রলোভন ছিল। শ্রীশ ও কিরণের সমালোচনা ও শাসন তাহার ইচ্ছা-শক্তিকে যেন জড়ীভূত করিয়া দিল।

(২)

সপ্তাহ অতীত হইয়াছে। বংশী আর ফিরিয়া আসে নাই। তা'র সঙ্গে আর কয়জন গারো কাঠ কাটিতে গিয়াছিল। তা'রা পরদিন সকালে ফিরিয়াছিল, বংশী তাদের সহিত ছিল না। ময়না তাদের কাছে গিয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে অনেক প্রশ্ন করিল; তাহারা কহিল, সেইদিন সন্ধ্যাবেলা বাড়ী ফিরিবার পথে তাহারা বাঘের ডাক শুনিয়া যে যেদিকে পারে ছুটিয়া পলাইয়াছিল; সকালে অনেক বন ঘুরিয়া অনেক পথ হারাইয়া সবাই ভিন্ন-ভিন্ন পথে বাড়ী ফিরিয়াছে। বংশী কেন ফিরিল না, তা'র কারণ খুব সুস্পষ্ট! ময়না আর সেই শূন্য গৃহে ফিরিল না। কিরণের কাছে আসিয়া ধূলায় লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

শ্রীশচন্দ্র একদিন পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেয়েটা খুব কাঁদছে নাকি?"

কিরণ মুখ বাঁকাইয়া কহিলেন, "এখন ত খুব কেঁদে খুন হচ্ছে, দুদিন বাদে আবার বিয়ে কর্‌বে না! ওরা আবার মানুষ নাকি? জন্তু!"

"আমি ভাবছিলাম, এক কাজ করলে হয়—"

কিরণ উৎসুক হইয়া কহিলেন, "কি?"

শ্রীশ কহিলেন, "চাকর-বাকর পাওয়া ত বিষম কষ্ট!

এখানে যা অসুবিধা হচ্ছে, এ-বিষয়ে সেখানে গেলেও একতিল কম হবে না। মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে গেলে হ'ত! বুঝ্‌লে না?"

কিরণ উত্তর দিলেন, "বুঝি ত, কিন্তু ওকি যেতে চাইবে?"

"দেখ না ব'লে। ওদের কি কোনো বিষয়ে মনের জোর আছে? দু-চার বার জোর ক'রে বলো, কার্য্যোদ্ধার হ'য়ে যাবে। আমাদের কাছে ওদের ইচ্ছা কতক্ষণ খাটে, নীচু জা'ত!"

সেই বিষয়ে কিরণেরও সন্দেহমাত্র ছিল না। তিনি সুযোগের অপেক্ষায় রহিলেন; কান্নাকাটি একটু থামিলে তবে বলিবেন।

ইহার পরদিন কিরণ ঘুম হইতে উঠিয়া দেখিলেন, ময়না বাঁশের নলের কাছে ঘড়া ধরিয়া জল ভরিতেছে। উঠানের দিকে চাহিয়াই বুঝিতে পারিলেন, কিছুক্ষণ আগে ঝাঁট দেওয়া হইয়াছে। তিনি খুসী হইলেন; এই কয়দিন ময়না কোনো কাজ করে নাই। জল তুলিয়া ময়না তরকারীর বাগানের দিকে গেল। কিরণ ডাকিয়া কহিলেন, "একটা ডালা নিয়ে যাস্ ত, গোটা-কয়েক সিম-বেগুন হয়েছে, আজ পেড়ে আন্‌ব।"

ময়না একটি ডালা তুলিয়া লইল। কিরণও তাহার সঙ্গে গেলেন। সিম পাড়িতে-পাড়িতে ময়না কহিল, "মা আমাকে তোমাদের কাজ কর্‌বার জন্যে রাখ্‌বে?"

কিরণ প্রসন্নকণ্ঠে কহিলেন, "বেশ ত, থাক্ না তুই। এই-ই ত ভাল। মিথ্যে ক'দিন কেঁদে মর্‌লি তোদের জাতে ত আবার বিয়ে আছে, তোদের কষ্ট কি? আমাদের পোড়া দেশে জন্মালে তবে বুঝ্‌তিস বিধবার দুঃখ!"

ময়না শান্তস্বরে কহিল, "কি-রকম, মা?"

কিরণ বঙ্গ-বিধবার সমস্ত বিবরণ খুব বিস্তৃত করিয়া কহিলেন, ময়না তাহার মুখ-পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

এর পরে ময়না আর কাঁদিল না। ধীরস্থিরভাবে নিয়মের কাজগুলি করিত। বাকী সময়টা নীরব চিন্তায় কাটাইয়া দিত। মোটেই বাড়ীর বাহির হইত না। কিরণ দ্বিতীয়বার বিবাহ-সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করিতেন; ময়না উত্তর দিত না। বংশীর বন্ধু মান্না একদিন আসিয়াছিল; ময়নাকে আর-একবার বিবাহ করিয়া সংসার পাতাইতে অনুরোধ করিয়াছিল, কিন্তু ময়না স্বীকৃত হইল না। মান্না জিজ্ঞাসা করিল, "তবে খাবি কি?"

ময়না উত্তর দিল, "চাক্‌রি ক'রে।"

"এই বাবুরা ত অন্য সহরে চ'লে যাচ্ছে।"

"আরও ত বাবু আছে—"

"সেইখানে চাক্‌রি নিবি? না হয় নিলি, কিন্তু তুই ত তবু ঘরে টিক্‌তে পারবিনে। সবাই তোকে জ্বালাবে। তোর যে কেউ নেই, সে ত সকলে জানে।"

সে-কথা ময়না বুঝিয়াছিল। বিবাহার্থী গারো-যুবকেরা যে তাহাকে শান্তি দিবে না, তা সে আগেই বুঝিয়াছিল। কয়দিন সে বাড়ীর ভিতরে আবদ্ধ হইয়া থাকিবে? চাক্‌রি যদি নাই-ই জোটে, তখন ত বাহির হইয়া খাইবার জোগাড় করিতে হইবে। নিজের নিঃসহায় অবস্থা স্মরণ করিয়া তা'র কান্না পাইল। হায়, কেন বংশী ফিরিয়া আসিল না? সে যে বলিয়াছিল সন্ধ্যার সময় ফিরিবে। কত অশ্রুসিক্ত সন্ধ্যা অতীত হইয়া গেল, বংশী আসিল না!

ময়না গিয়া কিরণকে কহিল, "মা, তোমরা আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে?"

কিরণ উৎসাহিত হইয়া কহিলেন, "যাবি তুই?" তাঁহার আনন্দ ও বিস্ময়ের সীমা রহিল না; একটা কথাও বলিতে হইল না, অনায়াসে ময়নাকে হাতে পাওয়া গেল।

ময়না অন্য স্থানে পলাইয়া যাওয়া ভিন্ন উপায় খুঁজিয়া পাইল না। নিজেদের জা'তটাকে তা'র যেন বাঘের চেয়েও মারাত্মক বলিয়া বোধ হইল।

তবুও মধ্যে-মধ্যে তা'র মন বলিতেছিল, যদিই বংশী ফিরিয়া আসে! সে ত কখনও মিথ্যা বলিত না। যদি আসিয়া তাহার আশায় ঘরে বসিয়া থাকে? কে ভাত রাঁধিয়া দিবে? সে আবার ভাবিল—"ও বলেছিল আমার কাছে আস্‌বে, তা হ'লে আর কি? আমি যেখানে যাবো সেইখানেই ত যাবে।" বংশী ফিরিয়া আসিয়া

তাহার কাছে যাইবেই এ-বিষয়ে যেন ময়নার মনে কোনো সংশয় রহিল না।

* * * *

রাঙাপানির ডাকবাংলায় শ্রীশচন্দ্র সপরিবারে আসিয়া পৌঁছিলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। দুইখানি গোরুর গাড়ী; একখানায় শ্রীশ, কিরণ ও খুকী। অন্যটিতে জিনিষপত্র লইয়া ময়না। গতকল্য তাঁহারা তুরা ছাড়িয়া বাহির হইয়াছেন। বাংলার সম্মুখে গাড়ী থামিলে সকলে নামিলেন। আপিসের একজন চাপ্‌রাশীও সঙ্গে আসিয়াছিল, সে বৃদ্ধ হিন্দুস্থানী চাক্‌রি ছাড়িয়া দেশে ফিরিয়া যাইতেছে। দুর্গম পথে তাহাকে সাথী পাইয়া কেরানী-পরিবার খুসী হইয়াছিলেন। সে পশ্চাতের গাড়ী হইতে নামিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, ময়না অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীশ আতঙ্কিত হইয়া কহিলেন, "কি হয়েছে?" হিন্দুস্থানী বৃক্ষতলে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিল। সেইখানে তাহারা ময়নাকে নামাইয়াছিল। ময়না মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়াছে। তাহার কলেরা হইয়াছে। আসন্নমৃত্যুর সমস্ত চিহ্ন তাহার দেহে ফুটিয়া উঠিয়াছে। শ্রীশ দূর হইতে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

অবশেষে কিরণের ডাকে তাঁহার চৈতন্য হইল। কিরণ কহিলেন, "চ'লে এস বাংলার ভিতরে। চাপ্‌রাশীকে কাছে থাক্‌তে ব'লে দাও।" গোরুর-গাড়ীর চারিজন লোক ও চাপ্‌রাশীর হাতে মৃত্যুপথ যাত্রিণীকে সমর্পণ করিয়া শ্রীশ স্ত্রী-কন্যাসহ বাংলায় প্রবেশ করিলেন। কিরণ ষ্টোভ জ্বালিয়া রন্ধনের জোগাড় করিলেন। একজন গারো রমণী বাহিরে পড়িয়া মরিতেছে; কিন্তু তাহাতে কি? সেইজন্য কিরণ স্বামী বা কন্যার আরামের আয়োজন না করিয়া থাকিতে পারেন না। ঘরের পোষা কুকুর-বিড়ালটা মারা গেলে আমরা আহার-নিদ্রা ত্যাগ করি না। কিরণের কাছে এই দরিদ্র পাহাড়ীরা কুকুর-বিড়ালের চেয়ে উপরে নয়। তিনি কেবল ভাবিতেছিলেন, আবার তাঁহাকে চাকরের কষ্ট পাইতে হইবে। বাহিরে উজ্জ্বল জ্যোৎস্না উঠিয়াছে। শীতের মেঘহীন আকাশে অগণ্য তারা ফুটিয়াছে। রাত্রি নিস্তব্ধ; কেবল অদূর-প্রবাহিনী গিরিনদীর মৃদু-কলতান শুনা যাইতেছে।

ময়না আস্তে-আস্তে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িতেছিল। তবু একবার জোর করিয়া সে চোখ খুলিয়া চারিদিকে চাহিল; জড়িতস্বরে কহিল, "সন্ধ্যে-বেলা আস্‌বে বলেছিলে, কিন্তু অনেক রাত হ'য়ে গেছে। ভাত ত রাঁধা হয়নি।"

ময়নার মৃত্যু ছায়াছন্ন নয়নে স্বামীর মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

ওদিকে বাংলার ভিতরে কিরণের রন্ধন সমাপ্ত হইল। খুকী ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। শ্রীশ আহারে বসিলেন, কিন্তু কিছুই খাইতে পারিলেন না। কোনোমতে আচমন করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। কিরণ তাঁহার আহার সমাপ্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "একবার খোঁজ নেবে না?"

শ্রীশ বিরস-মুখে কহিলেন, "ওতো গেল ব'লে, কি আর খোঁজ নেবো?" জিজ্ঞাসা করিতে ভয় হইতেছিল, পাছে তাহারা ব'লে সত্যই মরিয়াছে।

কিরণও শুইয়া পড়িলেন; কিন্তু কাহারও ঘুম আসিতেছিল না।

কতক্ষণ পরে কথা-বার্ত্তার শব্দে দুইজনেরই তন্দ্রা টুটিয়া গেল।

শ্রীশ চমকিয়া শয্যায় উঠিয়া বসিলেন। শিয়রের জানালাটা খুলিয়া দেখিলেন, নদীতীরে চিতা জ্বলিতেছে। আকাশের খানিকটা অংশ ও পরপারের বন চিতালোকে উজ্জ্বল দেখাইতেছে।

শ্রীশ কহিলেন "শুনছ—? ওরা আগুন দিচ্ছে।" কিরণ কথা কহিলেন না। খুকীকে বুকে টানিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন।

* * * *

ভোরবেলা তুরা নগরী তখনও কুয়াসার আড়ালে আরামে নিদ্রামগ্ন। কেবল সাহেবের চাপরাশী মাম্না দুগ্ধ-পাত্র হস্তে গয়লা-বাড়ীর দিকে ছুটিয়াছিল। ঘন কুয়াসা; কোলের মানুষ চেনা যায় না। মাম্না তাড়াতাড়ি ছুটিতেছে, পাছে সাহেবের চা তৈরি করিতে বিলম্ব ঘটে, এই ভয় ছিল। এমন সময় একজন তাহার উপরে আসিয়া পড়িল।

"কে আরে, চোখে দেখ্‌তে পাস্‌নে নাকি?"

"একি ? তুমি কোথা থেকে এলে ?"

মান্না চমকিয়া উঠিল। যমালয় হইতেও মানুষ ফিরিয়া আসে ?

বংশী সহাস্যে প্রশ্ন করিল, "কি ভেবেছিলি তোরা ? আর আস্‌ব না ? সেদিন পথ হারিয়ে খুব বিপদেই পড়েছিলাম বটে, কিন্তু বাঘের পেটে যাইনি—"

বিস্মিত মান্না জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছিল রে ? এতদিন ছিলি কোথা ?"

"চা বাগানে—"

বংশীকে আড়কাঠিতে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল—আসামের বাগানে কুলী করিয়া চালান দিবার জন্য।

মান্না কহিল, "কতদূর নিয়েছিল ?"

বংশী কহিল, "গোয়াল-পাড়া—"

"পালিয়ে আস্‌তে পার্‌লি ?"

"কেন পার্‌ব না ?" বলিয়া বংশী পা চালাইয়া দিল।

মান্না জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা যাচ্ছিস—"

"বাড়ী যাই। ওটা যে ভীতু, হয়ত কেঁদে-কেটে—"

"সে নেই ?"

কুয়াসা সরিয়া গিয়াছে। পাহাড়ের ওদিকে সূর্য্যোদয় হইতেছিল। কিন্তু বংশীর চোখের সাম্‌নে আলো নিবিয়া গেল। সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "ম'রে গেছে ?"

"না।"

"তবে ? আবার বিয়ে করেছে ? বল্‌ শীগ্‌গি—"

মান্না সকল কাহিনী কোনোমতে সংক্ষেপে সারিয়া দিল। তাহার বড় দেরি হইয়া গিয়াছিল। বংশী প্রত্যেক কথা শুনিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "তা যাক্‌, কতদিন সেখানে থাক্‌বে ? ফি'রে আস্‌বেই—তা'কে তোরা চিনিস্‌নে—"

অবিশ্বাসের মৃদু হাসি হাসিয়া মান্না চলিয়া গেল।

* * * *

তা'র পর কত বৎসর কাটিয়াছে। সেই নির্জ্জন শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্য-উপত্যকায় শূন্যগৃহে বংশী আজও ময়নার অপেক্ষা করিতেছে।

বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতেছে; নির্ব্বোধ গারোর সে সময়-জ্ঞানও নাই। সে রোজ ভাবে—'কাল আস্‌বে।'

সাঁতারীর নিরাপদ পেটি—

এক-প্রকারের নতুন ধরণের সাঁতারীর পেটির চলন হইয়াছে। এই পেটি পরিয়া জলে নামিলে ডুবিবার কোনো ভয় নাই। এই পেটির ওজন আধসের, ইহাতে বায়ুপূর্ণ করিবার চারিটি কক্ষ আছে। দুইটি

নতুন-ধরণের সাঁতারের পেটি

সামনে এবং দুইটি পিছনে। এই পেটির প্রস্তুতকারক বলেন, যে, পেটি ভালো করিয়া লাগাইয়া লইলে ইহা আর কোনো রকমেই খুলিয়া যাইবে না। ইচ্ছামতন এই পেটি বায়ুপূর্ণ এবং বায়ুশূন্য করা যাইতে পারে। চিত্র দেখিলে পেটির গড়ন বুঝিতে পারিবেন।

—

দাবাগ্নির সহিত লড়াই—

গত বৎসর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে মোট ৫,৩৭,০০০ একর পরিমাণ জঙ্গল পুড়িয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। প্রায় ৮০০০টি বিভিন্ন অগ্নিকাণ্ডে এই বন নষ্ট হইয়া যায়। অনাবৃষ্টিকে এইসকল অগ্নিকাণ্ডের একটি কারণ বলা যাইতে পারে, কিন্তু বেশীর ভাগ আগুন মানুষের অসাবধানতার জন্যই লাগিয়া থাকে। বজ্র-পাতের জন্য যেসকল আগুন লাগিয়া থাকে, তাহার পরিমাণ মানুষের অসাবধানতার জন্য আগুন লাগিবার ঠিক পরেই। সম্প্রতি এইসকল আগুন যাহাতে আর না লাগে, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতেছে, এবং জঙ্গল, বাগান ইত্যাদি পাহারা দিবার জন্য বিশেষ শিক্ষা দিয়া লোক তৈয়ারী করাও হইতেছে। সহরের আগুন নিবাইবার জন্য যে ফায়ার-ব্রিগেড্ দল থাকে, তাহাদের যেমন বিশেষ শিক্ষার বন্দোবস্ত থাকে, জঙ্গলের আগুন নিবাইবার কার্য্যে যাহারা শিক্ষা লাভ করিবে, তাহাদের জন্যও এইরূপ শিক্ষার দরকার আছে এবং শিক্ষালয়ও আছে। নিউমেক্সিকোতে ম্যারো-নামক একটি জঙ্গলে এই শিক্ষালয় অবস্থিত। এইখানে সত্যকার জঙ্গলে সত্যকার আগুন লাগাইয়া লোক শিক্ষা দেওয়া হয়। এইখানে স্কাউটরা ট্রেঞ্চ খুঁড়িয়া আগুনকে জব্দ করিবার জন্য কেমন করিয়া নানাদিক্ হইতে আক্রমণ করিতে হয় তাহা শিক্ষা পায়। আগুনের সহিত লড়াইয়ের প্রণালী অনেকটা মানুষের সহিত যুদ্ধ করিবার মতনই।

হাওয়ার বেগ না থাকিলে, প্রথম অবস্থায় আগুন বৃত্তাকারে বাড়িতে থাকে। হাওয়ার বেগ থাকিলে আগুন অর্দ্ধবৃত্ত বা oval আকারে বাড়িতে থাকে, এই অবস্থায় প্রথমে যেখানে আগুন লাগে সেইখানে একটি কোণ গঠিত হয়। হাওয়ার দিকে আগুন আস্তে আস্তে আগাইয়া চলিতে থাকে। এই অবস্থায় অগ্নি-যোদ্ধার দল দুইভাগে বিভক্ত হইয়া আগুন-লাগা স্থানটিকে দুইভাগে ভাগ করিয়া ফেলিতে চেষ্টা করে এবং যেখানে হাওয়া লাগিয়া ক্রমশঃ আগুন বৃদ্ধি পায়, সেই দিকে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করে। পার্ব্বত্য প্রদেশে আগুন লাগিলে, নিবাইবার চেষ্টার সঙ্গে-সঙ্গে আগুনকে পাহাড়ের পার্শ্বস্থ হ্রদ বা প্রস্তর দ্বারা ঘেরা সীমানার দিকে ঠেলিয়া লইবার চেষ্টা করা হয়। অনেক সময় আগুনকে back-fired strip দ্বারা ঘেরাও করিয়াও ফেলা হয়—ইহাতে আপনা হইতেই ক্রমশ আগুন নিবিয়া যায়। জঙ্গলে আগুন লাগাইয়া ছাত্রদিগকে হাতে-কলমে আগুন নিবাইবার বিবিধ উপায় শিক্ষা দেওয়া হয়। নানা-প্রকার অগ্নিসংহারক অস্ত্র ব্যবহার করিবার শিক্ষাও এইখানে দান করা হয়। এইসমস্ত যন্ত্রের মধ্যে, আগুনের পথ হইতে গাছের গুঁড়ি ইত্যাদি বারুদের সাহায্যে উড়াইয়া দিবার জন্য, গাছের গায়ে গর্ত্ত করিবার যন্ত্র একটি বিশেষ অস্ত্র। কোদাল এবং শাবল গর্ত্ত এবং ট্রেঞ্চ খুঁড়িবার বিশেষ কাজে লাগে। জল-বহন করিবার ঝোলা এবং জলের বালতি—বিশেষ প্রয়োজনীয়। হাত-পাম্পের মতন হাত মশাল এক-প্রকার বিশেষ অস্ত্র। এই মশালের সাহায্যে আগুন আসিয়া পড়িবার পূর্ব্বেই আগুনের পথ হইতে কিছু-পরিমাণ গাছ-পালা পুড়াইয়া দিয়া তাহার গতিরোধ করা হইয়া থাকে। আগুনের সহিত লড়াই করিবার সময় অগ্নি-যোদ্ধাদের মাথার অর্থাৎ বুদ্ধির ব্যবহার বিশেষভাবে করিতে হয়। এইসমস্ত বিপদের সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখিয়া ধীরভাবে কার্য্য করিবার শিক্ষা লাভ করা অত্যন্ত দরকারী। তাড়াতাড়ির জন্য অনেক সময় আগুন কমিবার স্থানে মানুষের দোষে আগুন বাড়িয়া গিয়া থাকে। প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এইসব সময় সর্ব্বাপেক্ষা বড় অস্ত্র। অগ্নির সহিত যুদ্ধকার্য্যে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে ছাত্রদের নানা-প্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহাতে তাহাদের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের বহুল প্রমাণ পাওয়া যায়। "আগুনের সহিত যুদ্ধ করিবার সময় যদি কোনো অগ্নিযোদ্ধার পা ভাঙিয়া যায়, তবে তুমি তাহার কি ব্যবস্থা করিবে"—এই প্রশ্ন একটি অতি সাধারণ প্রশ্ন।

আমেরিকাতে জঙ্গল রক্ষা করিবার চেষ্টা গত ২৫ বছরমাত্র আরম্ভ

হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে এরোপ্লেন সাহায্যে এবং প্রহরী দ্বারা নানাভাবে সকল সময় বন-জঙ্গলের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়। কোথাও আগুন লাগিবার সম্ভাবনা হইবামাত্র অগ্নিযোদ্ধাদের নিকট খবর চলিয়া যায়। অগ্নি যোদ্ধাদের কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য বনজঙ্গলের রাস্তাও আজ-কাল তৈয়ার হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে আমেরিকাতে বছরে বন জঙ্গলে ৩০,০০০ হইতে ৪০,০০ অগ্নিকাণ্ড হয়। এইসমস্ত অগ্নিকাণ্ড হইতে বন-জঙ্গল বাঁচাইবার জন্য যেসমস্ত লোকজন নিযুক্ত আছে, তাহাদের বেতনাদির জন্য বছরে খরচ হয় প্রায় ৯,০০০,০০০৲ টাকা।

নতুন-ধরণের ইঞ্জিন—

লম্বা এবং ভারী-ভারী গাড়ী টানিবার জন্য ফরাসী দেশে এক-প্রকার নতুন ইঞ্জিন তৈয়ার হইয়াছে। ইঞ্জিনখানির ওজন ১১৮ টন, লম্বা ৫০ ফুট। ইহার অতি প্রকাণ্ড ৮ খানি চাকা আছে। ইঞ্জিনের সামনেটা

কার্ত্তিজ-আকারের ইঞ্জিন—ইহা অতি সহজে বাতাস কাটিয়া যায়

দেখিতে একটি বন্দুকের কার্ত্তিজের মতন ছুঁচালো ইহাতে বায়ুতে ইঞ্জিনকে কম বাধা দেয়। এই ইঞ্জিনখানির আরো কতকগুলি বিশেষত্ব আছে।

—

"পুলিং-জ্যাক্"—

এই যন্ত্রটির সাহায্যে একজন লোক ২৭০০ মণ ওজনের কোনো জিনিষকে টানিয়া লইয়া যাইতে পারে। ইহা নতুন আবিষ্কার। রেল গাড়ী লাইনের উপর তুলিবার এবং পুরানো বাড়ী ভাঙিবার কাজে ইহার

ভার বহিবার নতুন কৌশল—পুলিংজ্যাক্

বিশেষ ব্যবহার হয়। এই যন্ত্র সময় এবং পরিশ্রম উভয়ই বহু-পরিমাণে বাঁচাইবে বলিয়া মনে হয়। বড়-বড় গাছের গুঁড়ি মাটি হইতে তুলিয়া ফেলিতে এই নতুন 'পুলিং-জ্যাক' খুব বেশী সাহায্য করিবে। এই জ্যাক্‌টিকে ছয়-প্রকার বিভিন্ন গতিতে চালাইতে পারা যায়।

—

দু-মুখো টেবিল-ফ্যান্—

আমরা সাধারণত যে সকল টেবিল ফ্যান ব্যবহার করি, তাহা এক-দিকেই হাওয়া দেয়। একজন আবিষ্কারক, দুদিকে হাওয়া দেয় এমন
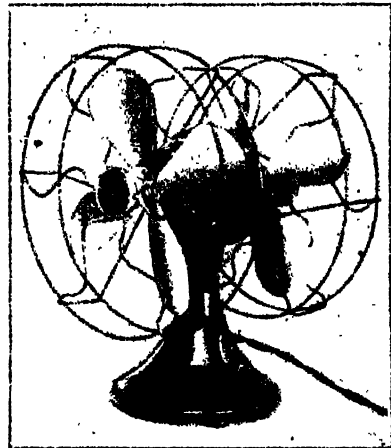
দু-মুখো ফ্যান (দুইদিকেই ব্লেড আছে)

একটি ফ্যান আবিষ্কার করিয়াছেন। একটি কলের দুই পাশে দুইটি সেট্ ব্লেড্ লাগানো আছে। ইহাতে হাওয়া বেশী হয় এবং ঘরের দুই প্রান্তের লোকেরা সমানভাবে হাওয়া পায়।

—

রৌদ্রের উপকারিতা—

একজন ভ্রমণকারী বলিয়াছিলেন যে, অসভ্যদের মধ্যে মৃত্যুসংখ্যা সাধারণত কম। তাহাদের ঘা ইত্যাদি অনেক-কিছুই হয়—কিন্তু তাহারা কোন প্রকার ডাক্তারী ঔষধ ঐ ঘায়ে না লাগাইয়া কেবলমাত্র রোদ লাগাইয়া ঐ ঘা ভালো করিয়া থাকে।

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে রৌদ্রের মধ্যে তীব্র বেগুনি-আলো থাকে—ঐ আলো রোগ-বীজাণু অতি অল্প সময়ের মধ্যে হত্যা করিয়া থাকে। সূর্য্য-কিরণের মধ্যে উৎকট বেগুনি (ultra-violet) আলোর স্থিতি ১৫০ বছর পূর্ব্বে প্রথম আবিষ্কার হয়, কিন্তু মাত্র ১০ বৎসর পূর্ব্বে ইহার নানা উপকারিতা-সম্বন্ধে মানুষ প্রথম জ্ঞান লাভ করে।

বর্ত্তমান সময়ে এই উৎকট বেগুনি-আলোক যে কেবলমাত্র রোগ বীজাণু নষ্ট করিবার জন্য ব্যবহৃত হইতেছে, তাহা নহে, তাড়াতাড়ি শস্য উৎপাদন করিবার জন্য, বেশী-সংখ্যক ডিম উৎপাদন করিবার জন্য, নানা-প্রকার রং এবং বস্ত্রাদি পরীক্ষার কাজে, কাঠ পোক্ত করিবার জন্য এবং জল বিশুদ্ধ করিবার জন্য এই বেগুনি-আলোর প্রচুর ব্যবহার হইতেছে।

উৎকট বেগুনি-আলোককে যেন আমরা সাধারণ বেগুনি-আলোকের সহিত ভুল না করি। এই উৎকট আলোক সূর্য্যকিরণের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া থাকে, ইহার রং চোখে ধরা যায় না। একটুকরা তেশিরা কাঁচের মধ্যে সূর্য্যকিরণকে- লাল, কমলা লেবু, হলুদে, সবুজ, নীল, indigo এবং বেগুনি এই কয় রংএ বিভক্ত অবস্থায় দেখা যায়। প্রত্যেকটি রংএর ঢেউগুলির একটি করিয়া সীমা আছে। এই সীমার পরেও চক্ষুর অদৃশ্য অবস্থায় বিভিন্ন রংএর ঢেউ থাকে। বেগুনি রংএর দৃশ্যমান সীমার পর, আরো অনেক ছোটো-ছোটো ঢেউ থাকে, ইহা চোখে

দেখা যায় না। কিন্তু এই ঢেউএর ছায়া ফোটোগ্রাফিক্ প্লেটে পড়ে। এই ঢেউগুলি উৎকট বেগুনি-আলোক-রশ্মি। এই উৎকট বেগুনি-আলোকের ঢেউএর লম্ব এত কম যে, তাহা মাপে বুঝান যায় না—তবে

সুইট্জারল্যাণ্ডে যক্ষ্মা রোগীরা বরফের সূর্য্যতাপ গায়ে লাগাইতেছে

এই ঢেউএর ১০,০০০,০০০ টুক্‌রাকে যদি পাশে-পাশে রাখা যায়, তবে তাহা মানুষের একটি চুলের ব্যাসের সমান হইবে।

পরীক্ষাতে দেখা গিয়াছে উৎকট বেগুনি-আলোকের ছোটো ঢেউগুলি তাড়াতাড়ি রোগ-বীজাণু হত্যা করিতে পারে—বড় এবং লম্বা ঢেউগুলিতে সময় বেশী লাগে। বিজ্ঞানের সাহায্যে উৎকট বেগুনি আলোকের ছোটো-ছোটো ঢেউ উৎপন্ন করা যায়। সূর্য্য কিরণ হইতে এত ছোটো আলোর ঢেউ কার্য্য-উপযোগী অবস্থায় পাওয়া অসম্ভব।

তড়িৎ-প্রবাহকে হঠাৎ মাঝখানে ভাঙিয়া দিয়া তাহাকে কোনো বৃত্তখণ্ডের উপর লাফাইয়া এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে পাঠাইতে পারিলে বেগুনি-আলো দেখা যায়। চিকিৎসকগণ এই আলোর চিকিৎসায় কাচমণির নলমধ্যের পারার pole-যুক্ত আলো ব্যবহার করেন। কাচের মধ্যে দিয়া বেগুনি-আলোর তেজ বাহির হইতে পারে না বলিয়া কাচমণির ব্যবহার।

উৎকট বেগুনি-আলোর তেজ ভয়ানক। এই আলোর নীচে যদি দুই ঘণ্টা কাল কোনো লোককে রাখা হয়, তবে তাহাকে দুই ঘণ্টা পরে চেনা শক্ত ব্যাপার হইবে, তাহার সমস্ত শরীর একেবারে কালো হইয়া যাইবে। উৎকট বেগুনি-আলোকে স্নান করিবার পূর্ব্বে রোগীর চোখের উপর কাচমণি ব্যতীত অন্য-কোনো দ্রব্যের প্রস্তুত চশমা দিতে হয়।

সূর্য্য-কিরণকে ঔষধরূপে প্রথম সুইট্জারল্যাণ্ডে ব্যবহার করা হয়। এইখানে যক্ষ্মারোগগ্রস্থ বালকবালিকাদের প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় রৌদ্রের তলায় বরফের উপর খেলা করিতে ছাড়িয়া দেওয়া হইত। বরফের উপর রোদ পড়িলে উৎকট বেগুনি-আলো প্রতিফলিত হয়। ইহাতে রোগীরা উপর এবং নীচ উভয় দিক্ হইতেই উৎকট বেগুনি-আলো লাভ করিত। Hayfever, হাঁপানি এবং Scurvy রোগে এই আলোর চিকিৎসা বহুল-পরিমাণে হইতেছে। যে-সমস্ত রোগীর হাড় কমজোরী, তাহাদের উৎকট বেগুনি-আলোতে স্নান করাইয়া আশাতীত ফল লাভ করা গিয়াছে। ক্যাল্সিয়াম্ এবং ফস্ফরাসের অভাবেই দেহের হাড় দুর্ব্বল হয়। রোগীকে ক্যাল্সিয়াম্ এবং ফস্ফরাস খাওয়াইয়া বেগুনি-আলোকে স্নান করাইলে সে শতকরা ৬০ ভাগ ঐ দুই দ্রব্য হজম করিতে পারে।

ডাঃ পার্সিভল নামক একজন ইংরেজ চিকিৎসক উৎকট বেগুনি আলোকের সাহায্যে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা এবং আমাশয় আরোগ্য করিবার চেষ্টা করিতেছেন। শীতকালেই এই দুইটি রোগ বেশী হয়—এবং শীতকালে আমাদের শরীরে রোগের সহিত যুদ্ধকারী লাল রক্তাম্বু কম-পরিমাণে থাকে। লাল রক্তাম্বুর সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিলে শরীরে রোগও কম হইবে।

ইহাতে আশা করা যায়, যে, যাহাদের মাথায় চুল কম অথবা প্রায় নাই, উৎকট বেগুনি-আলোক তাহাদের মাথায় সুচিক্কণ কালো চুল গজাইয়া উঠিবে। খালি-মাথায় যাহারা বাহিরে রোদে বেড়ায়, তাহাদের মাথায় চুলের আধিক্যের ইহাই প্রধান কারণ।

মোটের উপর প্রায় সকল-প্রকার চর্ম্মরোগ হইতে আরম্ভ করিয়া কঠিন-কঠিন শরীর মধ্যস্থিত ব্যাধিও এই উৎকট বেগুনি-আলোকের সাহায্যে তাড়ানো যাইবে। দুর্ব্বল সবল হইবে—অ-চুল মাথা স চুল হইবে। দাদ এবং পাঁচড়াপূর্ণ দেহ নিরাময় হইবে। দেশে ভালো শস্য জন্মিবে—এবং তাহাতে দেশের অবস্থা ভালো হইবে। উৎকট বেগুনি-আলোর কৃপাতে মানুষ এইসকলই লাভ করিবে।

নানা দেশের বৈজ্ঞানিকেরা নানা-প্রকার খাদ্য-দ্রব্যে উৎকট বেগুনি

যক্ষ্মা-রোগীরা সূর্য্যের আলোকে স্নান করিতেছে

আলো absorb করাইবার চেষ্টা করিতেছেন। এই কার্য্য সফল হইলে পৃথিবীতে এত বড় রোগ-প্রতিষেধক আর কোনো ঔষধ থাকিবে না।

ডিম-পাড়া মুরগীকে প্রত্যহ ১০ মিনিটকাল উৎকট বেগুনি-আলোর তলায় রাখিয়া দেখা গিয়াছে, সে পূর্ব্বাপেক্ষা চারগুণ বেশী ডিম পাড়ে। তা-দিবার ডিমের সংখ্যাও দু-গুণ বাড়িয়া যায়।

—

নতুন-ধরণের লোকোমোটিভ্—

আমেরিকার প্যাসিফিক্ কোষ্ট্ রেল-ওয়েতে কিপ্রকার প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড ইঞ্জিন গাড়ি টানিবার জন্য ব্যবহৃত হয়, তাহা এই ছবির
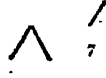
এই দুটি লম্বা রেখা কি সমান?

এই ইঞ্জিনটির উপর ২০০ লোক রহিয়াছে

ইঞ্জিনটিকে দেখিয়া বুঝিতে পারিবেন। ইঞ্জিনটির উপরে ২০০ জন লোক কেমন চড়িয়া আছে দেখুন। ভারতবর্ষে বা ইউরোপে এতবড় রেলওয়ে ইঞ্জিন নাই।

—

চোখের দেখা—

মানুষ কথায় বলে, "আমি নিজের চোখে দেখে এলাম—এই এই হ'ল—।" ইহার পর আর কেহ তর্ক করে না, কারণ যখন কেহ কোনো ব্যাপার চোখে দেখিয়াছে, তখন তাহা ধ্রুব সত্য। কিন্তু মানুষের চোখও যে মানুষকে ভুল দেখায় এবং মিথ্যা বিশ্বাস জন্মায় তাহা অনেকেরই বোধ হয় জানা নাই। মানুষের চোখ অতি সহজেই ভ্রমে পড়ে—কান অপেক্ষা চোখই অতি সহজে ভ্রমে পড়ে। চোখ অপেক্ষা কানই মানুষের বেশী কাজে লাগে। অন্ধকারে, ঘুমাইবার সময়, এবং দূরের নানা-প্রকার শব্দ শ্রবণ করিয়া কান মানুষকে সকল সময় সচকিত করিয়া দেয়। এইসমস্ত সময়ে চোখ মানুষকে কোনো প্রকার সাহায্য করিতে পারে না। "আমার চোখের যে কোনো প্রকার দোষ আছে" এ-কথা সহজে কাহারো মনে হয় না। কিন্তু একটু ভালো করিয়া পরীক্ষা করিলে অনেকের চোখেই নানা-প্রকার গলদ বাহির হইবে। গত যুদ্ধের সময় প্রথম আবিষ্কার হয় যে, কোনো

রেখাঙ্কন-কৌশলে সমচতুষ্কোণকে অসমান মনে হইতেছে

পোষাকের কাট-ছাঁটের গুণে মানুষের চেহারাকে সুন্দর করা যায়

কলার পরিবার দোষে একটি গলাকে বড় বলিয়া মনে হইতেছে—
বাস্তবিক পক্ষে দুটি গলাই সমান লম্বা
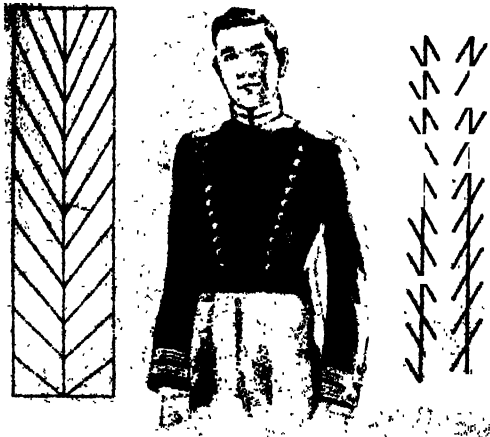
জিনিষকে কিছু-দূরের লোকদের চক্ষুর অগোচর করিতে হইলে সেই জিনিষকে তাহার চারিপার্শ্বের সাধারণ দ্রব্যের সঙ্গে একরঙে রং করিয়া দিতে হয়। সমুদ্রে কিন্তু ইহা খাটে না, কারণ সমুদ্রের জলের

যখন-তখন বদলাইয়া যায়। সেইজন্য জাহাজের গায়ে নানা প্রকার আঁকা-বাঁকা দাগ কাটিয়া দূরত্ব-সম্বন্ধে শত্রুর ভ্রম জন্মাইয়া দেওয়া হইত। দূরত্ব কতখানি তাহা ঠিকমত বুঝিতে না পারিলে টর্পেডো টিপ করিয়া ছোড়া যায় না। নানা-প্রকার দাগ, নানা-রঙের ফোঁটা ইত্যাদি জাহাজের গায়ে থাকিলে কিছুদূর হইতে দেখিলে

দৃষ্টি বিভ্রম হয়। বড় জাহাজকে হয়ত ছোট মনে হয়, ছোটো জাহাজকে হয়ত বড় মনে হয়—দূরের জাহাজ কাছে এবং কাছের জাহাজ দূরে বলিয়া মনে হয়।
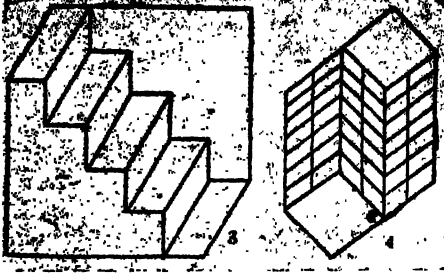
(ক) নিবিষ্টভাবে বাঁদিকের ছবিখানির সিঁড়িগুলি দেখুন—সহসা তাহারা উল্টাইয়া যাইবে। (খ) ডানদিকের ছবিটিও দেখুন—উহাতেও ঐরূপ হইবে
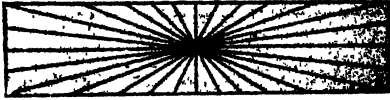
এই চতুষ্কোণটির বাহিরের রেখাগুলি কি সরল রেখা ?

তিনজন সাহেব—কেহ বেশী লম্বা কেহ বা কম লম্বা বলিয়া মনে হইতেছে—মাপিয়া দেখুন

নানা-প্রকার দাগ নানাভাবে কাটা থাকিলে কি-রকম দৃষ্টি বিভ্রম ঘটে, তাহা ছবিগুলি দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। আপনার চোখের উপর যদি আপনার অতি বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে (ক) নং এবং (খ) নং ছবি আপনার সে-বিশ্বাস দূর করিবে। (ক) নং ছবির দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকুন, কি দেখিতেছেন বুঝিতে পারিবেন। হঠাৎ দেখিবেন আপনার চোখের সামনে সিঁড়ির উপর নীচে চলিয়া গেল এবং নীচের দিক্ উপরে উল্টাইয়া গেল। এখন (খ) নং ছবির দিকে দেখুন। (খ) নং ছবিও আপনার চোখের সঙ্গে (ক) নং ছবির মত চালাকি খেলিবে। (খ) নং ছবিটিকে দেখুন—ইহা একটি নিরেট বস্তুখণ্ড—ইহার বাঁদিকে নীচে একটু

সাহেব দুজনের পা-গুলি বাঁকা—কিন্তু ছবিখানিকে চোখের সমসূত্রে ধরিয়া দেখুন—পা-গুলি কেমন দেখায়

খোলা জায়গা আছে—ইহার চূড়া ডানদিকে দর্শকের দিকে ঝুঁকিয়া আছে। ইহার দিকে দু-এক মুহূর্ত চাহিয়া থাকুন, কি দেখাইবে দেখুন। দেখিতে-দেখিতে মনে হইবে চূড়াটি ডান দিক্ হইতে বাঁদিকে সরিয়া আসিল এবং বাঁদিকের খোলা জায়গাটি সরিয়া ডানদিকে চলিয়া গেল। এইপ্রকার দাগের বা আঁকের সাহায্যে দৃষ্টি-বিভ্রম করাকে ইংরেজিতে ambiguous perspective বলে। গত মহাযুদ্ধের সময় জাহাজের গায়ে এইপ্রকার আঁক-জোঁক কাটা হইত—ইহাতে জাহাজ শত্রুর চোখে অদৃশ্য হইত না, কিন্তু তাহার দৃষ্টি বিভ্রম ঘটাইত।

খানিক একটুক্রা কাগজ লইয়া তাহা ক্ষণকাল দেখুন, তা'র পর তাহার উপর পাৎলা লম্বা-লম্বা টুক্রা ধূসর বর্ণের কাগজ রাখুন—ধূসর বর্ণকে অদ্ভুত ধরণের সবুজ রং বলিয়া মনে হইবে। এইপ্রকার নীল দ্রব্যের উপর ধূসর রঙের কাগজের টুক্রাগুলিকে কমলালেবুর রং বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। একটি জোরাল ইলেকট্রিক (জ্বলন্ত) বাতির দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকুন—তাহার পর সাদা চুনকাম করা দেওয়ালের দিকে তাকান—দেওয়ালে আর-একটি ইলেকট্রিক্ বাতি দেখিতে পাইবেন, তাহার রং বেগুনি মনে হইবে।

পোষাক-পরিচ্ছদ-বিষয়ক একটি কেতাবে দেখা যায় যে, কমলা লেবু রংএর পোষাক পরা ভালো নয়—কারণ এই রং মুখের উপর নীল ছায়া ফেলে। লাল, নীল, হলুদে, সবুজ, কমলালেবু-রং এবং বেগুনি এই কয়টি মূল রং সাধারণত চোখকে তাহাদের উল্টা রং দেখায়—অর্থাৎ লাল রং দেখিয়া অন্য দিকে চাহিলে মনে হইবে যেন খানিকটা কালো রং কোথাও মাখানো রহিয়াছে ইত্যাদি।

এইসমস্ত নানাপ্রকার প্রমাণের সাহায্যে প্রমাণিত হয় যে, মানুষ তাহার চোখকে অতি-বিশ্বাস করিতে পারে না। কিন্তু মানুষের চোখ বিভ্রম জন্মাইয়া যে কেবল ক্ষতিই করে তাহা নহে—ইহাতে অনেক কুদৃশ্য জিনিষ অনেকসময় মানুষের চোখে সুন্দর হইয়া উপকারই করিয়া থাকে। প্রত্যেক জিনিষ যদি তাহার যথার্থ রূপ লইয়া আমাদের চোখের সামনে হাজির হয়, তাহা হইলে তাহা আমাদের পক্ষে বিশেষ প্রীতিকর হইবে না।

—

সর্দ্দির কারণ—

আমাদের কাহারো ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি হইলেই আমরা সাধারণতঃ আব্‌হাওয়ার দোষ দিয়া থাকি। নানাভাবে জল-হাওয়ার দোষ গাহিয়া থাকি। কিন্তু সব সময় যে জল হাওয়ার দোষেই সর্দ্দি কাশি হয়, একথা সত্য নহে। বেশীর ভাগ সময়েই পায়ে ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি হইয়া থাকে, এই জন্যই সর্দ্দি হইলে খালি পায়ে স্যাঁত-সেঁতে জমির উপর হাঁটা বিধেয় নহে। নানা প্রকার পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, হঠাৎ ঠাণ্ডা পড়িলে মানুষের সর্দ্দি-কাশি হইবার কোনো কারণ নাই। বরং ইহা প্রায়ই দেখা যায় যে, গরম দেশসমূহে সর্দ্দি এবং কাশির প্রকোপ বেশী। অন্যান্য ব্যাধির মতন সর্দ্দি কাশিও বছরের একটা বিশেষ সময়ে হইয়া থাকে। পরীক্ষা এবং পর্য্যবেক্ষণের ফলে দেখা গিয়াছে যে, শীতকালে সর্দ্দির বিশেষ প্রকোপ থাকে না। গ্রীষ্মকালের ঠিক পরেই, অর্থাৎ আশ্বিন কার্ত্তিক মাসেই সর্দ্দি কাশি বেশী হইয়া থাকে।

পরীক্ষা দ্বারা দেখা যায় যে, আমাদের সাধারণ বিশ্বাস ভুল। এই কথা অনেক রোগ সম্বন্ধেই খাটে। নানা-প্রকারের লোক (ছাত্র, অধ্যাপক, সৈনিক, দোকানদার, ইত্যাদি) পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, বছরে একবারও সর্দ্দির কবলে পড়ে না, এমন লোকের সংখ্যা অতি কম, এমন-কি নাই বলিলেও চলে। শতকরা দশজন লোক সর্দ্দির হাত হইতে রক্ষা পায় কি না সন্দেহ। বছরের একটা বিশেষ সময়ে একদল লোক একই প্রকার সর্দ্দিতে ভুগিয়া থাকে। চিকিৎসকেরা বলিয়া থাকেন যে, সাধারণ সর্দ্দি বয়সের বাচ-বিচার করে না, ছেলে-বুড়া সকলেরই হইয়া থাকে। ছেলে-মেয়ে, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা যে কেহ সাধারণ সর্দ্দিতে ভুগিয়া থাকে। কিন্তু সর্দ্দি পাত্র-ভেদ না করিলেও স্থান ভেদ করিয়া থাকে। যে-সকল স্থানে লোকের ভীড় কম—সহর হইতে দূরে সেইসকল স্থানে সর্দ্দি বেশী দূর ছড়াইতে পারে না। ইহার কারণ এই যে সহরের ঘর-বাড়ীর ভিতরের তাপ প্রায় সকল সময় ৭০ ডিগ্রি বা তাহার উপর থাকে—এবং এই তাপ-আধিক্য মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসের নানা-প্রকার গোলমাল সৃষ্টি করিয়া থাকে। যে-সকল ঘরে তাপ অধিক, সেইসকল ঘরের মধ্যের হাওয়ায় আর্দ্রতা বড় কম। হাওয়ার (আর্দ্রতার) উপর আমাদের সুখ এবং স্বাচ্ছন্দ্য বহুল-পরিমাণে নির্ভর করিয়া থাকে।

শীতকালে বাহিরের বাতাসের তাপ অতি কম—সেই জন্য এই বাতাসে জলকণাও কম থাকে। এই বাহিরের বাতাস যখন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে, তখন ইহার তাপ বৃদ্ধি পায়, এবং সঙ্গে-সঙ্গে ইহা বেশী-পরিমাণে জলকণা ধারণ করিতে সক্ষম হয়। হাওয়ার এই অবস্থা হইলেই ইহার আপেক্ষিক আর্দ্রতা কমিয়া যায়। অনেক বাড়ীতে শীতকালে ঘরের ভিতরের বাতাস মরুভূমির বাতাস অপেক্ষাও শুষ্ক হয়। ইহার ফলে মানুষের দেহের ঘাম বাহির হইবামাত্র শুকাইয়া যায় এবং সঙ্গে-সঙ্গে শরীরকে অতিরিক্ত ঠাণ্ডা করিয়া দিয়া যায়। যদিও এইসময় ঘরের তাপ অপেক্ষাকৃত বেশী থাকে—তবুও মানুষকে শীতে ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতে হয়। যদি ঘরের মধ্যের আপেক্ষিক আর্দ্রতা শতকরা ৫০ বা ৬০ হয়, তাহা হইলে ৬৮ ডিগ্রি তাপ আরামদায়ক হইবে। কিন্তু শুষ্কবায়ুর সঙ্গে ঘরের তাপ অন্তত ৭০ ডিগ্রি হইতে ৭৫ ডিগ্রি হওয়া দরকার।

শুষ্ক হাওয়া চোখের পক্ষে পীড়াদায়ক এবং ইহা স্নায়ুকেও অস্বস্তি দান করে। ইহা নাক এবং গলার (ঝিল্লীকে) অতিশয় শুক্‌নো করিয়া দেয় এবং ইহা অতিশয় ক্ষতিকর। শুষ্ক, গরম হাওয়া মানুষকে অতি সহজে সর্দ্দির কবলে ফেলিতে পারে। ঘরের আর্দ্রতাকে কখনও শতকরা ৪০-এর নীচে নামিতে দেওয়া ঠিক নয়। স্বাস্থ্যের পক্ষে ঘরের মধ্যের আর্দ্রতা শতকরা ৫০-এর উপর থাকা দরকার।

যদি ঘরের আর্দ্রতা শতকরা ৫০-এর কম হয় তবে ঘরের মধ্যে জল বাষ্পে পরিণত করা প্রয়োজন। ঘরের আর্দ্রতা কত জানিতে হইলে hygrometer অথবা dry-and-wet-bulb thermometer এর সাহায্যে জানা যাইতে পারে।

বড়-বড় সহরের বায়স্কোপে, থিয়েটারে, মোটর-বাসে এবং অন্যান্য জনাকীর্ণ স্থানসমূহে নানাপ্রকার রোগের বীজের সঙ্গে-সঙ্গে সর্দ্দির বীজও সহজেই বৃদ্ধি পায় এবং চারিদিকে ছড়াইতে পারে। গ্রামে জনাকীর্ণ স্থান নাই, সেই কারণে এখানে রোগ হয় কম, এবং কোনো কারণে রোগ হইলে সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে। গৃহ আবদ্ধ হইয়া যে-সমস্ত লোকদের বেশীর ভাগ সময় কাজ করিতে হয়, তাহাদের সর্দ্দি-কাশি এবং অন্যান্য রোগাদি বেশী হয়। খোলা হাওয়ায় যাহারা কাজ করে, তাহাদের বেশী সর্দ্দি-কাশি হয় না। খোলা হাওয়ায় কাজ করিতে-করিতে গরম এবং ঠাণ্ডা দুইই সহ্য করিবার ক্ষমতা ক্রমশঃ বাড়ে, কিন্তু যাহারা ঘরের মধ্যে বসিয়া দিনরাত কাজ করে, তাহারা সামান্য কারণেই ঠাণ্ডার দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পড়ে এবং অনেক সময় সামান্য ঠাণ্ডাতেই নিউমোনিয়া ইত্যাদির মত সাংঘাতিক রোগাক্রান্ত হইয়া প্রাণ দেয়। অবশ্য যে-সকল লোককে অতিরিক্ত ঠাণ্ডা কিম্বা গরমে কাজ করিতে হয় (বাহিরে) তাহাদেরও রোগ প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা ক্রমশঃ কমিয়া যায়।

চিকিৎসকেরা সর্দ্দিকে দুইভাগে ভাগ করিয়া থাকেন। (১) সাধারণ সর্দ্দি—ইহা অত্যন্ত সংক্রামক। এই সর্দ্দি সামান্য কারণেই একজন হইতে অন্যজনে বর্ত্তিতে পারে। হাত ধরা, এক পাত্রে জলপান করা, এক গামছা ব্যবহার করা ইত্যাদি নানাভাবে সাধারণ সর্দ্দি সংক্রামিত হইতে পারে। হাঁচি-কাশির দ্বারাও সাধারণ সর্দ্দি পাশের এবং সামনের লোককে আক্রমণ করিতে পারে। (২) দ্বিতীয়-প্রকার সর্দ্দি পেটুক, কম-মেহনতি, এবং কুণো লোকদের বেশীর ভাগ হয়। সর্দ্দির হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে নিয়মিত ভোজন, তাজা তরিতরকারি এবং ফলমূলাদি খাওয়া উচিত। প্রত্যহ বাহিরে খানিকক্ষণ ব্যায়াম করা দরকার। বেশী মোটা ফ্লানেল বা অন্যরকমের গরম কাপড় ব্যবহার করা সকল সময় উচিত নয়। তবে পোষাক-পরিচ্ছদ-সম্বন্ধে কোনো নিয়ম করা যায় না—নিজের শরীরের প্রয়োজনমত পোষাক-পরিচ্ছদ সকলে ঠিক করিয়া লইতে পারে। সকালে ঘুম হইতে উঠিয়া ঠাণ্ডা জল দিয়া মুখহাত, ঘাড় ইত্যাদি ভালো করিয়া রগ্‌ড়াইয়া

ধোয়া ভালো। ভিজা পা, অনিদ্রা এবং অত্যধিক ক্লান্তি সর্দ্দির একটি প্রধান কারণ।

সর্দ্দির প্রথম অবস্থায় চিকিৎসা করা ভালো। গরম একটব জলে ভালো করিয়া স্নান করিয়া লইয়া, বিছানায় শুইয়া পড়া—(দুয়ার-জানালা সমস্ত খুলিয়া রাখিয়া)—অন্তত ২৪ঘণ্টা বিশ্রাম বিশেষ দরকার। ২৪ঘণ্টা এইভাবে পূর্ণ বিশ্রাম করিলে সর্দ্দি অনেক-পরিমাণে কমিয়া যায়। ৩ দিনে পূর্ণ আরোগ্যলাভ হইতে পারে। সর্দ্দিকে অনেকে সামান্য ব্যাধি বলিয়া অবহেলা করিয়া থাকেন—কিন্তু ইহা মনে রাখা উচিত যে, সর্দ্দি হইতে নানাপ্রকার ভয়ানক ব্যাধি হইয়া প্রাণনাশের হইতে পারে।

চিত্তরঞ্জন

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

নবীন নীরদজাল ছিন্ন ক'রি আষাঢ়ের
জ্যোতির্ম্ময় সুপর্ণসমান
মুহূর্ত্তে মৃত্যুর সিন্ধু পার হ'য়ে উতরিলে
অমরত্বে; চির-আয়ুষ্মান্!
জাগরকালের চিন্তা—নিশীথের সুখস্বপ্ন—
স্বদেশের কল্যাণ-কামনা
টু'টে গেল আচম্বিতে; আধাপথে বাধা পেল
জীবনের অক্লান্ত সাধনা!

যে প্রেমে পাগল হ'য়ে নিমেষে পতঙ্গ করে
বহ্নিমাঝে আত্মসমর্পণ
তেমনি দুরন্ত প্রেম স্বদেশের তরে তব—
প্রাণ দিয়ে করিলে তর্পণ!
আত্মার আগুনে যবে পুষ্ট দেহ পলে-পলে
হবি-সম হইল হে ক্ষয়,
ছিলে তুমি নির্ব্বিকার ধ্যানমগ্ন মুনি-সম
মনে তব জাগেনি সংশয়!

আসমুদ্র হিমাচল প্রকম্পিয়া হাহাকারে
কহে সবে—গাহে যবে জয়—,
মুক্তিমন্ত্র বিঘোষিলে, আর্ত্তজনে সম্ভাষিলে
ভীতজনে দিলে গো অভয়!
সত্যসন্ধ ভীষ্মসম নিদারুণ পণ তব
বর্ণে-বর্ণে করিলে পালন—
পরাজিত দেশে তুমি তপ্ত-হৃদিরক্তে-রাঙা
উড়াইলে বিজয়-কেতন!

বৈশাখের ঝঞ্ঝাসম চকিতে উদয় হ'লে,
টঙ্কারিলে তোমার গাণ্ডীব—
ছিন্নভিন্ন শত্রুদল; মুহূর্ত্তে বিলয় পেল
যেথা ছিল যতেক নকীব!

সপ্তরথী-পরিবৃত অভিমন্যুসম তুমি
যুঝিলে হে অমিতবিক্রমে—
সংশয়ের অন্ধকারে, আত্মার আলোক ধরি'
চি'নে পথ পড়োনি বিভ্রমে।

অযুত পঙ্গুর মাঝে তুমি ছিলে শক্তিধর
দাস-মাঝে ছিলে গো স্বাধীন—
বুকে নিল হিমালয় দোসরের সম তোমা
হ'লে তুমি তা'রই মাঝে লীন!
আজি তব তিরোধানে বজ্রাহতসম দেশ
প'ড়ে আছে রুধিয়া নিশ্বাস—
হতাশা অচলসম বুকে বাসা বাঁধিয়াছে
কোনোখানে না পায় আশ্বাস!

দয়া তব সীমাহীন, জ্ঞান তব সুমহান্,
ত্যাগ তব অতুল ভুবনে—
বীর্য্য তব যুগে-যুগে অনাগত ভবিষ্যতে
বেঁচে রবে মানুষের মনে!
মুক্তির পিপাসা তব মুক্তিহারা মানবেরে
নিরন্তর করিবে অধীর—
তোমার জীবনাহুতি ভাতিবে হিরণ্যদ্যুতি
ইতিহাসে ওহে মহাবীর!

গোচরের সীমাশেষে চিরতারুণ্যের দেশে
বিরাজিছ মৌনমহিমায়—
কোটিকণ্ঠ-উৎসারিত অনুপম স্তবগান
হের কাঁপে সূর্য্যের শিখায়!
অবিরাম যুদ্ধশেষে লভিলে বিরাম আজি
মহাকাল-মরম-মাঝারে—
বেদনায় বিদ্ধ কবি আঁকিয়া অক্ষম ছবি,
নিবেদিছে নতি বারে-বারে!

নষ্টচন্দ্র

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

পরদিন প্রভাতে অনল স্নান করে' সাজি নিয়ে পূজার জন্যে ফুল তুল্‌ছিল। গৌরী ঘুম থেকে উঠে' অনলকে খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে উঠানে নেমেই অনলকে দেখ্‌তে পেয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—বাবা, কি কর্‌ছ?

অনল হাসিমুখে গৌরীর দিকে চেয়ে স্নিগ্ধস্বরে বল্‌লে—ভগবানের পূজা কর্‌ব বলে' ফুল তুল্‌ছি মা।

ভোলা কথা মনে পড়াতে গৌরী উচ্চকিত হ'য়ে বলে' উঠ্‌ল—কাল রাতে ত আমার উপাসনা করা হয়নি, আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আজ তুমি যখন পুজো কর্‌বে তখন আমাকেও পূজা করিয়ে দিতে হবে।

অনল হেসে বল্‌লে—আচ্ছা গো মা-ঠাকরুণ, আচ্ছা।

গৌরী তার ফ্রকের তলাটা বাঁ-হাত দিয়ে তুলে' কোঁচড় করে' ফুল তুল্‌তে প্রবৃত্ত হ'ল।

অনল ফুল তোলা শেষ করে' সাজিটা দাওয়ার উপরে রেখে চন্দন ঘস্‌তে বস্‌ল।

একটু পরেই গৌরী এক কোঁচড় ফুল নিয়ে অনলের কাছে দাওয়ার নীচে এসে দাঁড়াল এবং কোঁচড় থেকে ডান হাতে করে' এক মুঠো ফুল তুলে' এক গাল হেসে বল্‌লে—বাবা, দেখ, আমি কত ফুল তুলেছি!

অনল গৌরীর দিকে মুখ ফিরিয়ে হেসে বল্‌লে—বাঃ বেশ! তোমার ক্ষিদে পায়নি? খাবে না? শোবার ঘরে খাবার আর জল……হাঁ-হাঁ-হাঁ ওতে রেখো না…… যাঃ! সব ফুল নষ্ট করে' দিলে!

গৌরী তার তোলা ফুল ক'টি কোঁচড় থেকে মুঠোয় করে' অনলের সাজিতে রেখে দেবামাত্র অনল ব্যস্ত হ'য়ে যে-রকম ভৎর্সনা-ভরা দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল, তাতে গৌরী ভয় পেয়ে বিমূঢ়ের মতন অনলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, দ্বিতীয় বার ফুল তোল্‌বার জন্যে সে তার হাত কোঁচড়ের মধ্যে ভরেছিল, সে হাত বার কর্‌তে তার আর সাহসে কুলাল না।

গৌরী ভয় পেয়েছে দেখে অনল নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে হাস্‌বার চেষ্টা করে' শুষ্কভাবে বল্‌লে—রাখো মা রাখো, তোমার ফুল সাজিতে রাখো—সাজিশুদ্ধ ফুল তুমি নিয়ে যাও, খেলা করো গে। ওটা আমি তোমাকেই দিলাম্। যাও লক্ষ্মী মেয়ে।

অনলের এই সান্ত্বনা ও আশ্বাস-বাক্য শুনে'ও গৌরীর মন প্রসন্ন ও নির্ভয় হ'ল না, সে বুঝ্‌তে পার্‌লে, সে একটা-কিছু অপকর্ম্ম করে' ফেলেছে। সে মনে-মনে ভাব্‌ছিল সে ত কতবার মার সঙ্গে ফুল নিয়ে চার্চ্চে গেছে, তার হাত থেকে ফুল নিয়ে পাদ্রি তাকে কত আদর করেছেন, কত ভালো বলেছেন। জ্যাঠা-মশায়কেও সেইরকম খুশী কর্‌বে বলে'ই সে ফুল তুল্‌তে গিয়েছিল। কিন্তু এখানে তার কেন যে অপরাধ হ'ল তা সে ঠিক বুঝে উঠ্‌তে না পার্‌লেও অপরাধ যে হয়েছে তা সে বেশ স্পষ্টই বুঝ্‌তে পার্‌লে। সে অশ্রুভরা ছল্‌ছল্ চোখে অনলের মুখের দিকে কাতর দৃষ্টিতে তাকিয়ে করুণস্বরে বল্‌লে—আর আমি কখনো দুষ্টুমি কর্‌ব না বাবা।

শিশুর এই কাতরতা দেখে অনলের চোখও সজল হয়ে' উঠ্‌ল; সে চন্দন ঘসা ফেলে' রেখে তাড়াতাড়ি উঠে' গৌরীকে কোলে তুলে' নিলে এবং সান্ত্বনা দিয়ে বল্‌লে—না মা, তুমি কিছু দুষ্টুমি করোনি, তুমি ত আমার লক্ষ্মী মেয়ে। ওসব ফুল আমি তোমাকে দিলাম, তুমি খেলা কর্‌লেই আমার ঠাকুর খুশী হবেন। তুমি চলো, খাবে।

অনল গৌরীকে যখন ছুঁয়েই ফেল্‌লে, তখন তাকে খাইয়ে দিয়ে একেবারে শুচি নিশ্চিন্ত হয়ে' পূজায় বস্‌বে বলে' গৌরীকে কোলে করে' নিয়ে যেখানে গৌরীর খাবার ঢাকা ছিল সেইখানে গেল।

গৌরীর খাওয়া হ'লে অনল তাকে বল্‌লে—এইবার তুমি ফুল নিয়ে খেলা করো, আমি পুজো করিগে—আমার পুজোর জায়গায় তুমি যেয়ো না……

গৌরী অবাক্ হয়ে' অনলের মুখের দিকে তাকিয়ে

রইল, সে তার জ্যাঠা-মশায়ের আচরণের অর্থ বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ছিল না—তার জ্যাঠা যে তাকে ভালোবাসেন, তা ত দেখাই যায়—তিনি তাকে কোলে করে' কত আদর করেন, কিন্তু সে নিজে থেকে জ্যাঠার কাছে গেলে তিনি অমন সঙ্কুচিত হন কেন, তাঁকে ছুঁয়ে দিলে তিনি বিরক্ত হন কেন, তিনি স্নানই বা করেন কেন, সে ভেবে ভেবে এইসবের কারণের কূল-কিনারা পাচ্ছিল না।

গৌরীকে নির্ব্বাক্ দেখে অনল বল্‌লে—তুমি খেলা করো মা, আমি চট্ করে' স্নান করে' আসি।

শিশু গৌরীর মনটা আবার ছাঁৎ করে' উঠ্‌ল—ঐ সেই স্নান!

অনল স্নান কর্‌তে গেছে। এমন সময় মাধবী দাসী, তুলসী চাকর, ও রামখেলাওয়ান সিং জমাদার অনলের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হ'ল। জমাদার সদর দরজায় এবং তুলসী বাড়ীর ভিতরের উঠানে এসেই থেমে গেল, মাধবী দালানে গিয়ে উঠ্‌ল। দালানে উঠেই মাধী দেখ্‌লে, —গৌরী এক সাজি ফুল সাম্‌নে করে' নিয়ে চুপ করে' বসে' আছে। গৌরীকে দেখেই মাধী বলে' উঠ্‌ল—কি-গো মেম-সাহেব, তোমার জ্যাঠা-মশায় কোথায়?

মাধবীর কথার একটি বর্ণও গৌরী বুঝ্‌তে পার্‌লে না, সে নির্ব্বা'ক্ হয়ে' মাধবীর দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বসে' রইল।

মাধবীর গলার আওয়াজ শুনে' অনলের বুড়ী-ঝি হরির মা ঝাঁটা হাতে করে' ঘর থেকে বেরিয়ে এল এবং মাধবীকে অভ্যর্থনা করে' বল্‌লে—এসো মাধু-দিদি, এসো। ও কার সঙ্গে কথা কইছ বোন, ও কি ছাই আমাদের কথা কিছু বোঝে! ওর কিচির-মিচির এক কেবল আমাদের বাবুই একটু-একটু বুঝ্‌তে পারেন, আর ওও কেবল বাবুর কথাই বোঝে।

মাধবী হরির মাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—বাবু কোথায়?

হরির মা বল্‌লে—বাবুর কথা আর বলো কেন বোন্, মেলেচ্ছ মেয়েটাকে বাড়ীতে এনে অবধি বেরাস্তন্ নেয়ে-নেয়েই সারা হ'ল! এ যেন হয়েছে ওঁর কড়ির বিষ,—ফেল্‌লেও লোক্‌সান, রাখ্‌লেও সর্ব্বনাশ! মা-বাপ-মরা ভাই-ঝি, তাকে কাছে না রাখ্‌লেও অধর্ম্ম, আবার কাছে রাখ্‌লেও অধর্ম্ম!

মাধবী জিজ্ঞাসা কর্‌লে—বাবু আজ এত বেলাতে যে নাইতে গেছেন? এখনো পুজো হয়নি ত?

হরির মা বল্‌লে—কেমন করে' আর হ'ল বোন? ফুল তুলে চন্দন ঘসে নিয়ে পুজোয় বস্‌তে যাবে, মেলেচ্ছ মেয়েটা দিলে সাজি সুদ্ধ ফুল ছুঁয়ে—ঐ দেখ না সাজি-সুদ্ধ ফুল নিয়ে বসে' রয়েছে—ফুলগুলো না দেবায় না ধর্ম্মায়! ছোঁয়া যখন পড়্‌লই তখন বাবু ওকে খাইয়ে দিয়ে আবার নাইতে গেছে। এই মাঘ মাসের শীত! কাল রাতেও দুবার নেয়েছে। কাল রাতে বাবুর ঠাণ্ডা উপোষ গেছে—মেয়ে ছাড়্‌লেও না, আর ছোঁয়া-নাড়া করে' এই শীতে কতবার নাইতে পারে লোকে!

এই সমস্যার কি যে সমাধান হ'তে পারে, তা ঠিক কর্‌তে না পেরে মাধবী কেবল বল্‌লে—"তাই ত!" তার জীবনের ইতিহাসে এমন সমস্যার উদয় ত আর কখনো হয়নি।

অনল স্নান করে' ভিজে কাপড়ে উঠানে এসেই তুলসী-চরণকে দেখে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কি তুলসীচরণ, কি খবর?

তুলসী হাত-জোড় করে' কোমর থেকে দেহার্দ্ধ মাটির সঙ্গে সমান্তরালে নত করে' অনলকে প্রণাম করে' বল্‌লে—এজ্ঞে, রাণী-মা মেম্-দিদিমণিকে নিয়ে যাবার জন্যে আমাদের পাঠিয়েছেন।

অনল প্রফুল্ল হ'য়ে বল্‌লে—ওঃ! বেশ ত নিয়ে যাও!

তার পর গৌরীকে ডেকে অনল বল্‌লে—গৌরী, তোমার নূতন মা তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন, তুমি এদের সঙ্গে যাও, আমিও একটু পরেই যাচ্ছি।

কথা বল্‌তে বল্‌তে অনল বারান্দায় উঠ্‌ল এবং মাধবীকে দেখে বল্‌লে—এই যে মাধবীও এসেছ! গৌরীকে তোমাদের রাণী-মা যখন নিয়ে যেতে বল্‌বেন তখনই এসে নিয়ে যেও, আমি বাড়ীতে থাকি আর না থাকি।

তার পর আবার গৌরীর দিকে তাকিয়ে অনল

বল্‌লে—গৌরী মা, ওঠো, যাও তোমার নূতন মার কাছে।

গৌরী নির্ব্বাক্ হ'য়ে অনলের মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে' বসে' রইল।

মাধবী গৌরীর সাম্‌নে ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে বল্‌লে—এসো দিদিমণি, কোলে এসো।

গৌরীর কোনও ভাবান্তর লক্ষ্য না করে' মাধবী তাকে কোলে তুলে' নিলে।

গৌরী অনলের দিকে তাকিয়ে ভয়- ও সংশয়-ভরা স্বরে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—বাবা, এ যে আমাকে ছুঁলে, এ'কেও নাইতে হবে?

অনল লজ্জা ও ব্যথা পেয়ে গৌরীর কথার কোনও উত্তর না দিয়ে তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর চলে' গেল। তাঁর মুখে কথা জোগাল না। গৌরীর প্রশ্নভরা ব্যথিত দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি মেলাতেও তার সাহস হচ্ছিল না।

* * *

দূর থেকে গৌরীকে আস্‌তে দেখেই ধনিষ্ঠা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে মাধবীর কোল থেকে গৌরীকে নিজের কোলে তুলে' নিলে এবং তার গাল টিপে আদর করে' বল্‌লে—এসো মা, এসো। তুমি কিছু খেয়েছ?

গৌরী ধনিষ্ঠার কথার এক বর্ণও বুঝ্‌তে না পেরে তার মুখের দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে' তাকিয়ে রইল।

ধনিষ্ঠা মাধবীর দিকে ফিরে বল্‌লে— কামিনীকে বল্, আমি যে গৌরীর খাবার সাজিয়ে রেখেছি, সেই খাবারটা বার করে' দেবে।

মাধবী একথালা খাবার এনে ধনিষ্ঠার সাম্‌নে রেখে দিলে। ধনিষ্ঠা গৌরীকে কোলে করে' নিয়ে নিজের হাতে তাকে খাইয়ে দিতে লাগ্‌ল।

ধনিষ্ঠা গৌরীকে খাইয়ে দিচ্ছে, একজন চাকর এক ঝুড়ি খেলনা এনে ধনিষ্ঠার সাম্‌নে রাখ্‌লে। ধনিষ্ঠা সকালে উঠেই গৌরীর জন্যে খেলনা আন্‌তে লোক পাঠিয়েছিল; পাড়াগাঁয়ের সকল দোকান উজাড় করে' যতরকমের খেলনা পাওয়া গেছে সমস্তই সংগ্রহ করে' আনা হয়েছে। খেলনা দেখে গৌরী উৎফুল্ল হয়ে' উঠ্‌ল। গৌরী ধনিষ্ঠার মুখের দিকে ফিরে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—মা, এই সব খেলনা কি আমার?

কেউ কারও ভাষা বোঝে না, ধনিষ্ঠাও গৌরীর ভাষার একবর্ণ বুঝ্‌তে পার্‌লে না, কিন্তু গৌরী যে তাকে অনলের শিক্ষা-মত মা বলে' ডাক্‌লে সেইটুকুতেই ধনিষ্ঠার অন্তর বাৎসল্যে অভিষিক্ত হয়ে' গেল। সে বল্‌লে—তুমি খেলনা নেবে? নাও। এ সমস্ত খেলনাই তোমার।

এই বলে' ধনিষ্ঠা কতকগুলি খেলনা তুলে' গৌরীর সাম্‌নে রেখে দিলে। গৌরী একটি গাউন-পরা পুতুল তুলে' নিয়ে ছেলেকে কোলে করার মতন কোলে করে' বস্‌ল।

ধনিষ্ঠা গৌরীকে খাইয়ে মুখ ধুইয়ে দিয়ে খেলনা নিয়ে তার সঙ্গে খেল্‌তে বস্‌ল। কলের গাড়ি, পশু, পক্ষী প্রভৃতি খেলনায় ধনিষ্ঠা দম দিয়ে ছেড়ে দেয় এবং খেলনাগুলি নানা ভঙ্গি করে' ছুট্‌তে থাকে এবং গৌরীও আনন্দ-কাকলি কর্‌তে কর্‌তে সেই খেলনার পিছনে-পিছনে ছোটে এবং খেলনা থেমে গেলে সেটাকে ধরে' নিয়ে ধনিষ্ঠার কাছে ফিরিয়ে এনে দেয়। শিশুর এই খেলা আর আনন্দ দেখে সন্তানহীনা ধনিষ্ঠার মনও আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠ্‌ছিল, এই সুন্দর ফুটফুটে মেয়েটিকে আপনার করে' তুল্‌বার জন্যে ধনিষ্ঠার অন্তরে সঞ্চিত সমস্ত স্নেহ উন্মুখ হয়ে' উঠ্‌ছিল। গৌরীর কথা একটিও বুঝ্‌তে না পার্‌লেও অস্ফুটবাক্ শিশুকে নিয়ে মা খেলা করে' যে আনন্দ ও সুখ পায়, ধনিষ্ঠা গৌরীকে নিয়ে খেলা করে'ও সেই অনির্ব্বচনীয় আনন্দের প্রথম আস্বাদ উপভোগ কর্‌ছিল। তার সুপ্ত মাতৃ প্রকৃতি নানা দিক্ দিয়ে নানাভাবে জেগে উঠ্‌ছিল।

কিছুক্ষণ পরে সেখানে অনল এসে উপস্থিত হ'ল এবং ধনিষ্ঠা ও গৌরীকে ক্রীড়ারত দেখে তারও মুখ প্রফুল্ল হয়ে' উঠ্‌ল।

অনলকে আস্‌তে দেখেই গৌরী উৎফুল্ল হয়ে চেঁচিয়ে বলে' উঠ্‌ল—বাবা, দেখো, মা আমাকে কত খেলনা কিনে' দিয়েছে।

এবং এই বলে'ই গৌরী একটা খেলনা হাতে করে'

নিয়ে অনলের কাছে ছুটে গেল। এমন সম্পদ্ জ্যাঠা-মশায়ের কোলে বসে' উপভোগ না কর্‌তে পেলে তার আনন্দ যে পূর্ণ হয় না।

ধনিষ্ঠার বাড়ীতে অনলের খেতে হবে; এখানে গৌরীকে ছুঁলে' তার কাপড় ছাড়ার অসুবিধা হবে বলে' অনল গৌরীর আগ্রহ এড়িয়ে কয়েক পা পিছিয়ে গেল। কথাটা যেন শোনেনি এমনি ভাণ করেই তাকে সরে' যেতে হ'ল।

গৌরী কিন্তু বুঝ্‌লে। অনলকে পিছিয়ে যেতে দেখেই তার আনন্দোচ্ছ্বাস একেবারে দমে' গেল।

গৌরী অনলকে দেখেই আনন্দে উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে যে কথাগুলি বল্‌লে, তার অর্থ ধনিষ্ঠা বুঝ্‌তে পারে-নি; কিন্তু গৌরীর কথার মধ্যে যে দুটি বাংলা শব্দ ছিল, সেই দুটি শব্দ ধনিষ্ঠার বোধের ক্ষেত্রে গিয়ে পাশা-পাশি দাঁড়াতেই ধনিষ্ঠার মুখ লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠ্‌ল। কিন্তু সে লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে থাক্‌বার অবসর পেলে না; গৌরীর স্পর্শ এড়িয়ে অনলকে সরে' যেতে ও গৌরীকে নিরুৎসাহিত ম্লানমুখে থম্‌কে দাঁড়াতে দেখে তার স্নেহ-প্রবণ মন ব্যথায় আকুল হয়ে উঠ্‌ল। ধনিষ্ঠা দ্রুতপদে এগিয়ে গিয়ে গৌরীকে টপ করে' কোলে তুলে নিলে এবং আদর করে' বল্‌লে—এসো আমরা দুজনে খেলা করি।

গৌরী ধনিষ্ঠার কথা বুঝ্‌তে না পার্‌লেও তার স্নেহ ও সান্ত্বনা অনুভব কর্‌লে। সে ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ছিল না, যে, কেনই বা একজন তাকে ছোঁয়, আর একজন ছোঁয় না। আবার যে তাকে ছোঁয় সেও একবার তাকে ছোঁয় আবার অন্য সময়ে ছোঁয় না, এও বড় অদ্ভুত।

গৌরীর এই চিন্তা বেশীক্ষণ স্থায়ী হ'তে পার্‌লে না, গৌরী একটা টিনের হাঁসকে দম দিয়ে ছেড়ে দিতেই সেই খেলনাটা গলা নেড়ে-নেড়ে প্যাক-প্যাক শব্দ কর্‌তে-কর্‌তে ছুটে চল্‌ল, এবং সেই নির্জীব খেলনার রকম-সকম দেখে কৌতুক অনুভব করে' গৌরী সকল চিন্তা ভুলে আবার আনন্দিত কলহাস্যে ঘর ভরে' তুল্‌লে।

অনল গৌরীর আনন্দে আনন্দিত হয়ে হাসিমুখে ধনিষ্ঠাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—আপনার স্নান-আহ্নিক এখনো হয়নি?

গৌরী পলাতক কলের হাঁসটাকে ধরে' এনে ধনিষ্ঠার হাতে দিয়েছিল, ধনিষ্ঠা তাতে আবার দম দিতে-দিতে অনলের দিকে মুখ তুলে' হেসে বল্‌লে—না, আজ আমার মেয়ে নিয়ে খেল্‌বার ছুটি। আপনি বৈঠক-খানায় বসুনগে, ভাত হ'লে মাধী আপনাকে ডেকে আন্‌বে।

অনল হাসিমুখে গৌরীকে বল্‌লে—গৌরী মা, তুমি তোমার মার সঙ্গে খেলা করো, আমি..... ....

গৌরী একটা বল্ গড়িয়ে নিয়ে ছুটে' যাচ্ছিল; বল্‌টা হঠাৎ এক দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে ঠিক্‌রে বেঁকে এক পাশের ঘরে ঢুকে পড়্‌ল। গৌরী সেই বল্ অনুসরণ করে' সেই ঘরের মধ্যে ঢুক্‌তে যাচ্ছে দেখে অনল তাড়াতাড়ি তাকে ধরে' কোলে করে' নিলে এবং গৌরীকে বল্‌লে—তোমার মা যেখানে তোমাকে নিয়ে না যাবেন, কিম্বা যেতে না বল্‌বেন সেখানে তুমি কখ্‌খনো যেও না লক্ষ্মীটি।

পদে-পদে বাধা ও স্বাধীনতার সঙ্কোচে গৌরীর শিশু-মন একেবারে মুষ্‌ড়ে পড়্‌ছিল, সে কুণ্ঠিত-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—ও ঘরে আমি গেলে কি হয়? কেন তোমরা বার বার অমন কথা বলো?

গৌরীর ঠোঁট ফুলে উঠ্‌ল।

শিশুর এই দুরূহ প্রশ্নের কোনও সদুত্তর খুঁজে না পেয়ে অনল বল্‌লে—সকলের সকল ঘরে যেতে নেই।

গৌরী জিজ্ঞাসা করে' উঠ্‌ল—যেতে নেই—কেন যেতে নেই?

অনল মহাবিব্রত হয়ে' পড়্‌ল, কারণ হিন্দুধর্ম্মের আচারে নিষেধের পর নিষেধ আছে, কিন্তু তার সঙ্গে যুক্তির সম্পর্ক নেই বল্‌লেও হয়। যদিবা কিছু আছে তাও গৌরীকে বোঝানো অসম্ভব।

অনল ও গৌরীর কথোপকথনের অর্থ ধনিষ্ঠা বুঝ্‌তে না পার্‌লেও অনলের ভাব দেখে সে বুঝ্‌তে পার্‌ছিল গৌরীর সঙ্গে তার এমন-কিছু কথা হচ্ছে যাতে অনল বিব্রত হয়ে পড়েছে। তাই সে গৌরীকে ডেকে বল্‌লে—গৌরী তুমি এসো, আমরা খেলা করি।

গৌরী ধনিষ্ঠার আহ্বানে খুশী হয়ে অনলের কোল থেকে নেমে পড়ে' ধনিষ্ঠার কাছে দৌড়ে' এল। অনল

অকারণে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সেখান থেকে চলে' গেল।

দশটার সময় অনলের ভাত দেওয়া হ'লে একজন চাকর বৈঠকখানা থেকে তাকে ডেকে নিয়ে এল। খাবারের কাছে এসেই ধনিষ্ঠার সঙ্গে ক্রীড়ারতা গৌরীকে দেখেই অনলের মনে পড়্‌ল,এই কাপড়-জামা পরে'ই সে গৌরীকে ছুঁয়েছিল। এই কাপড়ে খেতে বস্‌তে তার মনটা সঙ্কুচিত ও দ্বিধান্বিত হয়ে' উঠ্‌ল, কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হ'ল কল্‌কাতায় কলেজে পড়্‌বার সময় ইংরেজ অধ্যাপক ও মুসলমান প্রভৃতি ছত্রিশ-জাতের সহপাঠীদের সংস্পর্শ বিচার করে' সে চল্‌তে পারেনি; বাড়ীতে এসে বসার পর থেকে তার হিন্দুয়ানি বিচার ও আচার-নিষ্ঠা তাকে নিষ্কর্ম্মা দেখে পেয়ে বসেছিল বটে, কিন্তু এখন গৌরীকে কাছে রেখে লালন-পালন করুতে হ'লে সেই আচার-নিষ্ঠা অনেকখানি শিথিল করে' ফেল্‌তেই হবে। তাই আজ সে মনের কিন্তু ভাব দমন করে' গৌরীকে-ছোঁয়া কাপড়েই আসনে গিয়ে বস্‌ল। বাড়ীতে হ'লে সে হ'য়ত কাপড় ছেড়েই খেতে বস্‌ত এবং আচার-নিষ্ঠা শিথিল করবার যে কোনো আবশ্যকতা আছে,সে-কথাও তার মনে পড়্‌ত না; কিন্তু আজ পরের বাড়ীতে হিন্দুয়ানির আড়ম্বর করতে সঙ্কোচ বোধ হওয়াতেই তার মনে আচার রক্ষা-সম্বন্ধে অসুবিধার কথা উদয় হ'ল।

অনলকে যখন খাবার জন্যে ডেকে আনা হ'ল, তখন ধনিষ্ঠার মনেও অনলের কাপড় ছাড়ার কথা একবার উদয় হয়েছিল; কিন্তু তখনই ধনিষ্ঠার মনে পড়্‌ল অনল প্রথম যেদিন কাছারীর ফেরৎ তাকে পড়াতে এসেছিল এবং ধনিষ্ঠা অনলকে জল খেতে দিয়ে অনল কাপড় ছাড়্‌বে কি না জিজ্ঞাসা করেছিল; সেদিন অনল বলেছিল কল্‌কাতায় থেকে লেখাপড়া করবার সময় সে ব্রাহ্মণ্য-আচার রক্ষা করতে পারেনি; তাই ধনিষ্ঠা অনলকে আজ আর কাপড় ছাড়্‌বার কথা জিজ্ঞাসাও করলে না।

অনল খেতে বস্‌লে রাঁধুনী বামুন একথালা ভাত বেড়ে নিয়ে এসে ধনিষ্ঠাকে জিজ্ঞাসা করলে—মা, মেম-দিদিমণির ভাত এনেছি, কোথায় দেবো?

ধনিষ্ঠা বল্‌লে—দাঁড়াও, আমি ওর আলাদা বাসন এইখানে পেতে দিই, তুমি তাতেই ওর ভাত ঢেলে দিয়ে যাও।

গৌরী ধনিষ্ঠার বাড়ীরও একটি বিষম সমস্যা হয়ে' উঠেছে। ধনিষ্ঠা কাল থেকে ক্রমাগত ভাব্‌ছে, অনল দুপুর বেলা কাছারী চলে' গেলে গৌরীকে কোথায় রাখা যাবে; গৌরীকে অবশ্য এই বাড়ীতেই এনে রাখ্‌তে হবে; এই বাড়ীতে কোথায়-কোথায় তার গতিবিধি থাকবে পারবে, এবং কোথায় কোথায় বা তার প্রবেশ ও স্পর্শ নিষেধ করা হবে, কোন্ পাত্রে তাকে খেতে দেওয়া হবে এবং সেই পাত্রগুলি ধোয়া-মাজাই বা কেমন করে' হবে, কে তার উচ্ছিষ্ট ছোঁবে, ইত্যাদি শতেকপ্রকার জটিল ও কঠিন প্রশ্ন ক্রমাগতই ধনিষ্ঠার মনের মধ্যে আন্দোলিত হচ্ছিল। গৌরীর খেল্‌বার ও থাক্‌বার জন্যে বৃহৎ বাড়ীর একটা অংশ স্বতন্ত্র করে' দিতে পারা যত সহজে হয়েছিল, অন্য সমস্যাগুলির সমাধান তেমন সহজ হয়নি। ধনিষ্ঠা একবার ভাব্‌লে, গৌরীর আহারের জন্য প্রত্যেকবার কলার পাতা কিম্বা মাটির বাসনের ব্যবস্থা করলে তার উচ্ছিষ্ট বাসন ধোয়া-মাজা ও তুলে রাখার দায় থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়; কিন্তু সেই-সব উচ্ছিষ্ট পাতাই বা তুলে ফেল্‌বে কে? গৌরী একে ছেলেমানুষ, তায় মোমের পুতুলের মতন সুন্দর, তার উপর সে স্নেহের পাত্রী, তাকে দিয়ে ঐ কর্ম্ম করানো চিন্তারও অতীত; এমন স্নেহভাজনকে অবহেলিতের মতন মাটির বাসনেই বা খেতে দেওয়া যায় কেমন করে'? ভাব্‌তে-ভাব্‌তে ধনিষ্ঠার মনে হ'ল, চীনে মাটির বাসনে ত সাহেবেরা খেয়ে থাকে, এবং সেই বাসনেই খেতে তারা বেশী পছন্দ করে; অতএব সাধারণ মাটির বাসনের বদলে গৌরীকে পোর্সি-লেনের বাসন দেওয়া যেতে পারে। সেই-সব বাসন নিত্য ফেলে দেওয়াতে কিছু অপব্যয় হবে বটে, কিন্তু তার আর উপায় কি? পোর্সিলেনের বাসন নিত্য ফেলে দেওয়াই যেন স্থির হ'ল, কিন্তু ফেল্‌বে কে? যে ফেল্‌বার জন্যে ছোঁবে, সেই ত সেগুলিকে মেজে ধুয়ে এক ঘরের এক পাশে রেখে দিতে পারে। এই ম্লেচ্ছের উচ্ছিষ্ট ছুঁতে কোন্ হিন্দু চাকর-দাসী সহজে সম্মত হবে? মুসলমান্ চাকর রাখ্‌লে সকল সমস্যার সমাধান হয় বটে,

কিন্তু বাড়ীর মধ্যে মুসলমানকে প্রবেশ করতে দেওয়া যাবে কেমন করে'? ধনিষ্ঠার এই কথাটুকু মনে পড়্‌ল না যে ম্লেচ্ছ গৌরীকে যদি বাড়ীর মধ্যে আন্‌তে পারা গিয়ে থাকে তবে একজন মুসলমানকেও অনায়াসেই প্রবেশাধিকার দিতে পারা যায়। এই-সমস্ত সমস্যার কোনো সুমীমাংসা করতে না পেরে ধনিষ্ঠা স্থির কর্‌লে, সে-ই নিজে গৌরীর উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করবে এবং তার পরে স্নান করে' গঙ্গাজল স্পর্শ করবে। তাই যখন রাঁধুনী বামুন গৌরীর ভাত দিতে এল, তখন ধনিষ্ঠা নিজে তার জন্য স্বতন্ত্রভাবে নির্দ্দিষ্ট আসন-বাসন এনে পেতে নিজেই তাকে খাওয়াতে বস্‌ল।

কিছুমাত্র দ্বিধা ইতস্তত না করে' ধনিষ্ঠা গৌরীকে খাওয়াতে বস্‌ল দেখে অনলের যেমন বিস্ময় হ'ল, তেম্‌নি আনন্দও হ'ল; সে গৌরীর জ্যাঠা, গৌরী তার অতি প্রিয় ভাই অনিলের একমাত্র কন্যা, অনিলের স্মরণ-চিহ্নের অবশেষ-কণিকা, তার উচ্ছিষ্ট ছুঁয়ে তাকে খাইয়ে দিতে অনল যে কতখানি বিশ্রী ও নির্ম্মমভাবে ইতস্তত করেছিল, তা এখন ধনিষ্ঠার অতি সহজ নিঃসঙ্কোচ ভাব দেখে তার স্মৃতিতে অতি অশোভনভাবে পুনরুদিত হ'ল এবং নিজের আচরণের জন্য সে এখন অত্যন্ত লজ্জা অনুভব কর্‌তে লাগ্‌ল। অনল এই মনে করে' কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা কর্‌লে যে, সকল ভেদ ও বাধা ভুলে একেবারে নিঃসম্পর্কীয় পরকে আপনার কর্‌বার ক্ষমতা আছে কেবলমাত্র মায়ের জাত মেয়েদেরই। কিন্তু ধনিষ্ঠা যে কত চিন্তার পর কোন্ কোন্ কারণে জাতের ও স্পর্শ-দোষের সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠ্‌তে পেরেছিল সেই মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে' দেখার কথা অনলের একবারও মনে হ'ল না। গৌরী যে ধনিষ্ঠার কাছে মায়ের আদর-যত্ন পেয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে থাক্‌বে সে-সম্বন্ধে সংশয়শূন্য হয়ে' অনল নিশ্চিন্তমনে কাছারীতে চলে' গেল। কেন যে এই অস্পৃশ্য গৌরীকেই বিশেষ করে' ধনিষ্ঠা তার সমস্ত মাতৃ-স্নেহ ঢেলে দিচ্ছে, তার রহস্য ভেদ করার কথা তার মনেও এল না।

গৌরীকে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে স্নান-আহ্নিক সেরে ধনিষ্ঠার নিজের খেয়ে উঠ্‌তে একেবারে অপরাহ্ণ হ'য়ে গেল। ধনিষ্ঠা মনে-মনে স্থির কর্‌লে, কাল থেকে খুব ভোরে উঠে স্নান-আহ্নিক সেরে গৌরীর ও অনলের আগমনের জন্য প্রস্তুত হ'য়ে থাক্‌বে। রোজ-রোজ লেখা-পড়া কামাই করা ত তার চল্‌বে না।

(ক্রমশঃ)

আনন্দ-লহরী

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মাতৃত্বের যে অংশ শরীরগত এবং সন্তানপালনের সঙ্গে জড়িত, মোটের উপরে সেটা ইতর প্রাণীদের সঙ্গে অভিন্ন। সেটা সাধারণ জীবসৃষ্টির পর্য্যায়ভুক্ত, তাতে মানুষের সৃষ্টিশক্তির স্বকর্তৃত্ব নেই, তাতে প্রকৃতির দূত প্রবৃত্তিরই শাসন। কিন্তু মাতা যখন ভাবী কুমারের জন্যে তপস্যা করেন, স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলিকে সংযত করে' শরীরের ক্রিয়ার উপর মন ও আত্মার কর্তৃত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেন, তখনই সেটা যথার্থ তাঁর সৃষ্টিশক্তির অধীন হয়। আজকাল পাশ্চাত্য দেশে অনেক সময়ে দেখা যায়, মেয়েরা মাতৃত্বের মধ্যে হীনতা অনুভব করে, অর্থাৎ মেয়েদের উপর প্রকৃতির জবরদস্তিকে তারা অপমানকর বলেই জানে। কিন্তু এই অপমান থেকে রক্ষা পাবার উপায় মাতৃত্বকে পরিহার করে নয়, মাতৃত্বকে আপন কল্যাণ-অভিপ্রায়ের সঙ্গে সঙ্গত করে' তাকে আত্মশক্তির দ্বারা নিয়মিত করা। প্রাচীন ভারতে সুসন্তান লাভের সেই-রূপ একটি সাধনা ছিল, তা যথেচ্ছকৃত ব্যাপার ছিল না। সেই সাধনা বর্ত্তমান বিজ্ঞানের নিয়মানুমোদিত কি না সে প্রশ্ন বিশেষভাবে জিজ্ঞাস্য নয়,—কিন্তু এই আত্মসংযত

মানসিক আধ্যাত্মিক সাধনার দ্বারাই মানবমাতা আপন মর্য্যাদা লাভ করেন, এইটেই বড় কথা। কালিদাসের কয়টি কাব্যের মধ্যে সেই মর্য্যাদার গৌরব বর্ণিত দেখি।

নারীর দুইটি রূপ, একটি মাতৃরূপ, অন্যটি প্রেয়সীরূপ। মাতৃরূপে নারীর একটি সাধনা আছে সে কথা পূর্ব্বেই বলেছি। এই সাধনায় সন্তানের নয়, সুসন্তানের সৃষ্টি। সেই সুসন্তান সংখ্যাপূরণ করে না, মানবসংসারে পাপকে অভাবপূর্ণতাকে জয় করে। প্রেয়সীরূপে তার সাধনায় পুরুষের সর্ব্বপ্রকার উৎকর্ষ-চেষ্টাকে প্রাণবান্ করে' তোলে। যে গুণের দ্বারা তা সিদ্ধ হয় পূর্ব্বেই বলেছি সে হচ্চে মাধুর্য্য। একথাও বলেছি ভারতবর্ষ এই মাধুর্য্যকে শক্তিই বলে। আনন্দলহরী নামে একটি কাব্য শঙ্করাচার্য্যের নামে প্রচলিত। তাতে যাঁর স্তবগান আছে তিনি হচ্চেন বিশ্বের মর্ম্মগত নারীশক্তি। সেই শক্তি আনন্দ দেন। একদিকে বিশ্বকে যেমন আমরা জানি, ব্যবহার করি, অন্যদিকে তেমনি বিশ্বের সঙ্গে আমাদের অহেতুক তৃপ্তির যোগ। বিশ্বকে আমরা জানি, তার কারণ, বিশ্বে সত্যের আবির্ভাব। বিশ্বে আমাদের তৃপ্তি, তার কারণ, বিশ্ব আনন্দের প্রকাশ। ঋষিরা বলেছেন এই বিশ্বব্যাপী আনন্দেরই নানা মাত্রা জীবসকল নানা উপলক্ষ্যে ভোগ করে। "কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ," কারো প্রাণচেষ্টার উৎসাহ মাত্র থাকৃত না যদি আকাশ পূর্ণ করে' এই আনন্দ না থাকতেন। ইংরেজ কবি শেলি Intellectual Beauty নাম দিয়ে তাঁর কবিতায় যাঁর স্তব করেছেন তাঁর সঙ্গে এই সর্ব্বব্যাপী আনন্দের ঐক্য দেখি। এই বিশ্বগত আনন্দকেই আনন্দলহরীর কবি নারীভাবে দেখেছেন। অর্থাৎ তাঁর মতে মানবসমাজে এই আনন্দশক্তির বিশেষ প্রকাশ নারীপ্রকৃতিতে। এই প্রকাশকে আমরা বলি মাধুর্য্য। মাধুর্য্য বলতে কেউ যেন লালিত্য না বোঝেন। তার সঙ্গে ধৈর্য্যত্যাগসংযমযুক্ত চারিত্রবল আছে; সহজ বুদ্ধি, সহজ নৈপুণ্য, দরদ, চিন্তায় ব্যবহারে ভাবে ও ভঙ্গীতে শ্রী প্রভৃতি নানা গুণের মিশোল আছে। কিন্তু এর গূঢ় কেন্দ্রস্থলে আছে আনন্দ যা আলোর মত স্বভাবতই আপনাকে নিয়ত বিকীর্ণ (radiate) করে, দান করে।

প্রেয়সীস্বরূপিণী নারীর এই আনন্দশক্তিকে পুরুষ লোভের দ্বারা আপন ব্যক্তিগত ভোগের পথেই আজ পর্য্যন্ত বহুলপরিমাণে বিক্ষিপ্ত করেছে, বিকৃত করেছে, তাকে বিষয়সম্পত্তির মত নিজের ঈর্ষাবেষ্টিত সঙ্কীর্ণ ব্যবহারের মধ্যে বদ্ধ করেছে। তাতে নারীও নিজের অন্তরে আপন যথার্থ শক্তির পূর্ণ গৌরব উপলব্ধি করতে বাধা পায়। সামান্য সীমার মধ্যে মনোরঞ্জনের লীলায় পদে পদে তার ব্যক্তিস্বরূপের মর্য্যাদাহানি ঘটেচে। তাই মানবসমাজের বৃহৎ ক্ষেত্রে নারী আপন প্রকৃত আসন পায়নি বলেই আজ সে আত্মমর্য্যাদার আশায় পৌরুষ-লাভের দুরাকাঙ্ক্ষায় প্রবৃত্ত। অন্তঃপুরের প্রাচীর থেকে বাইরে চলে আসার দ্বারায় নারীর মুক্তি নয়। তার মুক্তি এমন একটি সমাজে যেখানে তার নারীশক্তি, তার আনন্দশক্তি, আপন উচ্চতম প্রশস্ততম অধিকার সর্ব্বত্র লাভ করতে পারে। পুরুষ যেমন আপন ব্যবসায় অতিক্রম করেও বিশ্বক্ষেত্রে নিজেকে ব্যক্ত করবার অবকাশ পেয়েছে, তেমনি যখন গৃহস্থালীর বাইরেও সমাজসৃষ্টি-কার্য্যে নারী আপন বিশেষ শক্তির ব্যবহারে বাধা না পাবে, তখন মানবসংসারে স্ত্রীপুরুষের যথার্থ যোগ হ'তে পারবে। পুরাকাল হ'তে আজ পর্য্যন্ত যে-বিবাহ প্রথা চলে আসচে তাতে স্ত্রীপুরুষের সেই পূর্ণ যোগ বাধাগ্রস্ত, আর সেই জন্যেই সমাজে নারীশক্তির প্রভূত অপব্যয় ও বিকার; সেই জন্যেই পুরুষ নারীকে বাঁধতে গিয়ে তার দ্বারা নিজের দৃঢ়তম বন্ধন সৃষ্টি করেছে। বিবাহ এখনো সকল দেশেই ন্যূনাধিক পরিমাণে নারীকে বন্দী ক'রে রাখবার পিঞ্জর। তার পাহারাওয়ালারা পুরুষ-প্রভাবের তকমা পরা। তাই সকল সমাজেই নারী আপন পরিপূর্ণতার দ্বারা সমাজকে যে-ঐশ্বর্য্য দিতে পারৃত তা দিতে পারচে না, আর এই অভাবের দৈন্যভার সকল সমাজই বহন করে' চলেছে।
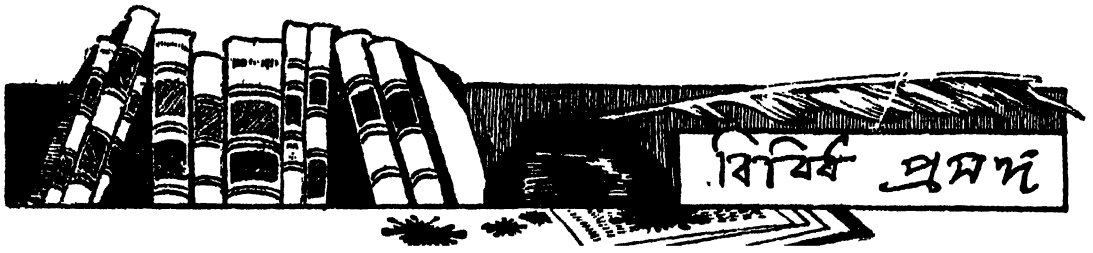
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

কোন মানুষের মহত্ত্বের বিচার করিতে হইলে দেখিতে হয়, তিনি কোন্ উদ্দেশ্য সাধনে নিজের শক্তি প্রয়োগ করিতেছেন, সমুদয় শক্তি তাহাতে প্রয়োগ করিতেছেন কি না, এবং তদর্থে সমুদয় শক্তি প্রয়োগের সমুদয় বাধা বিনষ্ট করিতেছেন কি না।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা চাহিতেন। তিনি যখন যৌবনকালে ছাত্ররূপে বিলাতে অবস্থান করিতেছিলেন, তখনও তিনি ভারতবর্ষকে যাহারা চিরপদানত রাখিতে চায় কিংবা ভারতের অযথা নিন্দা করে এরূপ ইংরেজদের কথায় প্রতিবাদ করিতেন। খবরের কাগজে পড়িয়াছি, এইরূপ এক প্রতিবাদের ফলে তিনি সিবিল্ সার্বিস্ প্রতিযোগিতায় কৃতকার্য্য হইয়াও চাকরীর জন্য নির্ব্বাচিত হন নাই। ইহা সত্য কি না, তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনচরিতলেখক স্থির করিবেন। কিন্তু তিনি চাকরী না পাওয়ায় তাঁহার ও দেশের ক্ষতি না হইয়া লাভই হইয়াছিল।

ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিবার পর তিনি বরাবরই স্বাধীনতালিপ্সু ছিলেন, এবং যাঁহারা সেই উদ্দেশ্যে কাজ করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেককে আর্থিক ও অন্যবিধ সাহায্য করিতেন। বিদ্রোহী হইয়া কোনপ্রকার অস্ত্র ব্যবহার করিয়া দেশকে যাঁহারা স্বাধীন করিতে চান, কেহ তাঁহাদের সাহায্য করিলে তাহা প্রকাশিত হয় না; কেননা, সেরূপ সাহায্যদান নীতিবিরুদ্ধ না হইলেও আইনবিরুদ্ধ। চিত্তরঞ্জন অন্য নানা দলের রাজনৈতিক কর্ম্মীদিগকে সাহায্য দিতেন, ইহা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে এবং পূর্ব্বেও অনেকের জানা ছিল। বিদ্রোহী বিপ্লবীদলের একজন লোকেরও একটি চিঠি মুদ্রিত হইয়াছে, যাহাতে লেখক বলিয়াছেন, যে, যদিও ঐ দলের লোকদের সহিত চিত্তরঞ্জনের মতের মিল ছিল না, তথাপি তাঁহারা অর্থাভাবে বিপন্ন হইলে তিনি তাঁহাদিগকে সাহায্য দিতেন।

এইপ্রকারে দেশের নানাবিধ রাজনৈতিক প্রচেষ্টার সহিত বরাবরই চিত্তরঞ্জনের যোগ থাকিলেও এবং দেশের লোকদের রাষ্ট্রীয় শক্তি-হীনতা দূর করিবার ইচ্ছা তাঁহার বরাবর থাকিলেও, অসহযোগ আন্দোলনের পূর্ব্বপর্য্যন্ত তাঁহার সময় ও শক্তি প্রধানতঃ অর্থোপার্জ্জনে ব্যয়িত হইয়াছিল। তাহার পর তিনি যখন রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টায় ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন, তখন রোজগারের ইচ্ছা ও চেষ্টা একেবারে ছাড়িয়া দিলেন। তখন হইতে তাঁহার সময় ও শক্তির উপর স্বদেশ ও স্বজাতি ভিন্ন আর কাহারও দাবী রহিল না।

তখন হইতে তাঁহার উদ্দেশ্য হইল, স্বজাতির শক্তিহীনতা অধিকারহীনতা দূর করিয়া স্বদেশের সকল কাজে তাহাদিগের অধিকার স্থাপন এবং তাহা করিবার শক্তি অর্জ্জন। এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁহার শক্তি উৎসর্গীকৃত হইল। ইহার সঙ্গে-সঙ্গে উপার্জ্জনের চেষ্টাও থাকিলে দেশের কাজে একাগ্রতা নষ্ট হইত; কিন্তু তিনি উপার্জ্জনের চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তিনি যখন রোজগারী ছিলেন, তখন বিলাসিতায় ও নানাবিধ সুখভোগে অনেক সময় যাইত ও শক্তিক্ষয় হইত। দেশের সেবক যখন হইলেন, তখন পূর্ব্বকার অভ্যাস-সকল থাকিলে কায়মনোবাক্যে পূর্ণ শক্তিতে সেবা করিতে পারিবেন না বলিয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। সুখ লালসা ত্যাগের ইহাই যে প্রধান বা একমাত্র কারণ, তাহা নহে; এইরূপ হিসাব করিয়া মানুষ বড় হইতে পারে না। তাঁহার সহিত আমাদের বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ঠতা না থাকায় আমরা নিশ্চয় করিয়া তাঁহার অন্তরের কথা বলিতে পারি না; কিন্তু অনুমান হয়, দেশের সেবার আনন্দ ও উন্মত্ততা তাঁহার হৃদয়ে ক্ষুদ্রতর ও নিকৃষ্টতর সুখের বাসনাকে পরাজিত করিয়াছিল।
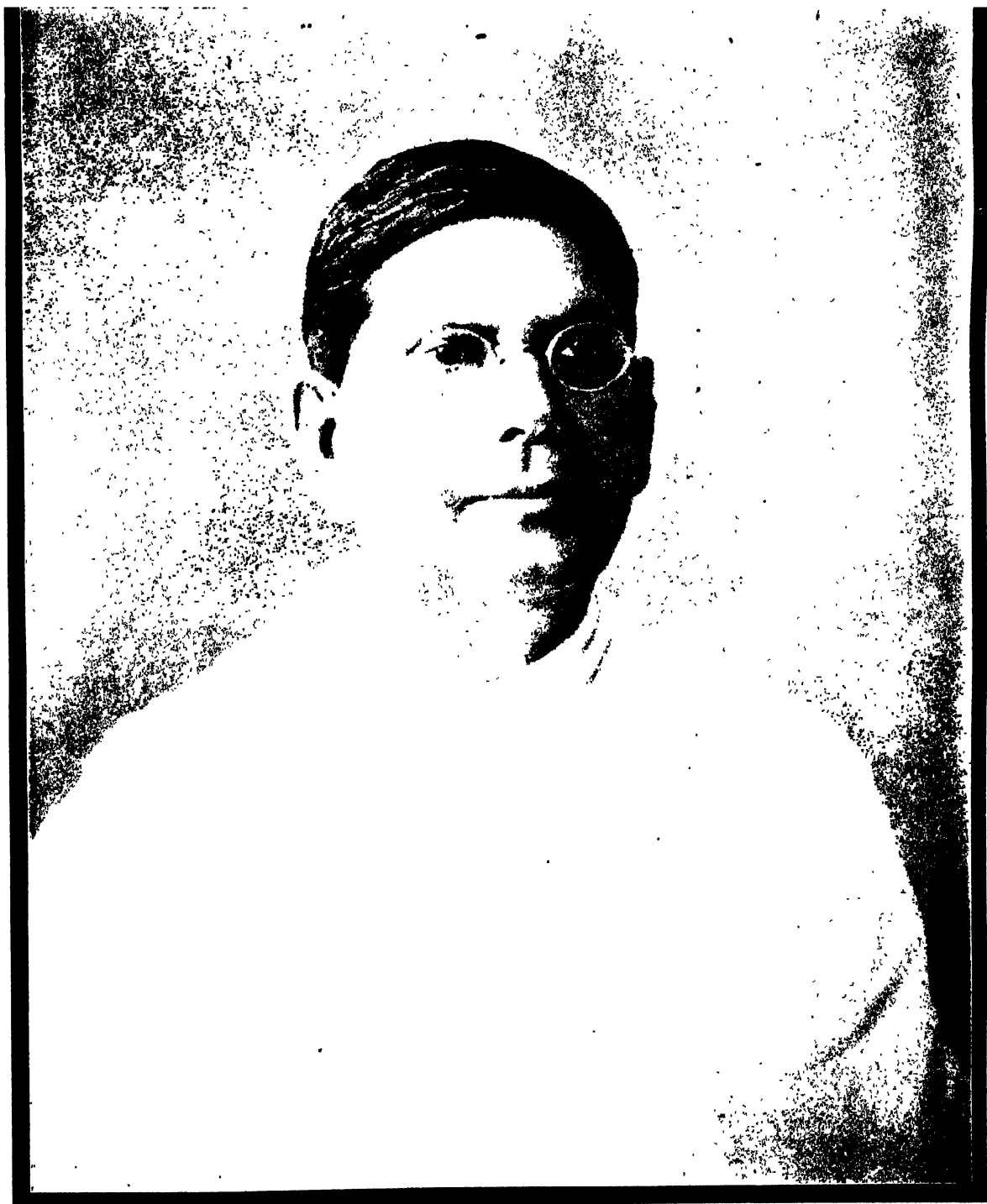
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

দেশবন্ধুর প্রস্ত -প্রতিমূর্ত্তি
ভি, পি কর্ম্মকার কর্ত্তৃক নির্ম্মিত

ভারতবর্ষের নানাবিধ কার্য্যক্ষেত্রে এমন কর্ম্মী দেখা গিয়াছে, যাঁহারা প্রাপ্তবয়স্ক হইবার পর রোজগারের পথে মোটেই যান নাই, কিম্বা অল্পকাল সে-পথের পথিক থাকিয়া তাহা চিরকালের জন্য ত্যাগ করিয়াছেন এবং কোন-না কোন প্রকারে দেশের ও পৃথিবীর সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। এমন লোকও ছিলেন এবং আছেন, অর্থোপার্জ্জন যাঁহাদের জীবনের লক্ষ্য নহে, অন্যবিধ ও উচ্চতর চেষ্টার আনুষঙ্গিক ফল মাত্র। ইঁহারা সকলেই নমস্য ও শ্রদ্ধেয়। চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের জীবনের বিশেষত্ব এই, যে,তিনি নিজের কৃতিত্ব ও অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিয়াছিলেন এবং অপরকেও দেখাইয়াছিলেন, যে, তিনি প্রভূত ধন উপার্জ্জন করিতে পারেন, করিয়াও ছিলেন,

কিন্তু যখনই তাহাকে অভীষ্টসিদ্ধির অন্তরায় বলিয়া বুঝিলেন, তখনই ধনসম্পদের আকাঙ্ক্ষা, বিলাস লালসা ত্যাগ করিলেন, আসক্তি তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না। ধন উপার্জ্জনের নেশা ও আসক্তি এবং সাংসারিক সুখের বন্ধন যাঁহারা কখনও অনুভব করেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে উহা হইতে দূরে থাকা অপেক্ষাকৃত সহজ; কিন্তু ধনের ও সুখের পশ্চাৎ দৌড়িতে-দৌড়িতে হঠাৎ থামিয়া দাঁড়ান এবং মুখ ফিরাইয়া শ্রেয়ের দিকে অগ্রসর হওয়া কঠিন। স্নানরতা নারীগণ যুবা শুকদেবকে লজ্জা না করিয়া বৃদ্ধ ব্যাসদেবকে কেন লজ্জা করিয়াছিলেন, তাহা মনে রাখিলে বিষয়সুখাসক্ত ব্যক্তির পক্ষে অবিষয়ী হওয়া কিরূপ কঠিন, বুঝা যাইবে।

চিত্তরঞ্জন যখনই ব্যারিষ্টারী ত্যাগ করিলেন, তখনই তাঁহার মুখ একেবারে শ্রেয়ের দিকে ফিরিয়াছিল কি না, বলিতে পারি না। কিন্তু জীবনের শেষের দিকে তিনি আসক্তি ও বন্ধন হইতে মুমুক্ষু হইয়াছিলেন, তাঁহার কোন-কোন বন্ধুর কথায় এইরূপ মনে হয়।

আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে কেহই চিত্তরঞ্জনের মত প্রভূত ধনাগমের ইচ্ছা ও আশা ত্যাগ করিয়া একাগ্রতার সহিত দেশের রাষ্ট্রীয় সমস্যার সমাধানের নিমিত্ত তাঁহার মত আত্মোৎসর্গ করেন নাই। এবিষয়ে তিনি অতুলনীয় ছিলেন, এবং এই কারণেই ঠিক্ তাঁহার স্থান অধিকার করিবার লোক বাংলা দেশে নাই। তাঁহার অকালমৃত্যুর অন্য অনেক কারণ থাকিতে পারে, কিন্তু স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া দেশের জন্য গত কয়েক বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম যে অন্যতম কারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মানুষ যদি একা থাকে, যদি তাহার স্ত্রী পুত্র পরিবার না থাকে, তাহা হইলে হাজার বিলাসিতা ও আরামে অভ্যস্ত থাকিলেও তাহার পক্ষে সাদাসিধা রকমের জীবন যাপন করা, এমন-কি সন্ন্যাস অবলম্বন ও কৃচ্ছ্রসাধনও, অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। কিন্তু গৃহস্থের পক্ষে সমুদয় প্রিয়জনকে পূর্ব্বাভ্যস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করিতে বলা বড় কঠিন। বস্তুতঃ কেহ-কেহ এই কারণেই উপার্জ্জন-চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া সম্পূর্ণরূপে লোকহিতব্রত হইতে পারেন নাই। সাংসারিক সর্ব্ববিধ সুখ তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র। তাহা অগ্রাহ্য করিয়া শ্রেয়ের, ভূমার, অন্বেষণে যে-আনন্দ পাওয়া যায়, তাহা সকল মানুষেরই অধিগম্য। ইহা বিশ্বাস করিতে পারিলেই প্রিয়জনকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে বঞ্চিত করিতে হৃদয়ে বল পাওয়া যায় বটে। কিন্তু এরূপ বিশ্বাস বিরল, এবং তাহার উদ্ভব হইলেও অনেকেই প্রিয়জনের প্রতি মমতাবশতঃ তাহাদিগকে দারিদ্র্যের মধ্যে নিক্ষেপ করিতে পারেন না।

যে গৃহস্থের পরিবারবর্গ তাঁহার দারিদ্র্য গ্রহণে বাধা না দিয়া অকুণ্ঠিত চিত্তে তাহাতে সায় দেন, তাঁহারা ধন্য এবং নব জীবন লাভ করা তাঁহাদের পক্ষেও সহজ হয়।

দেশবন্ধু খুব ভাবপ্রবণ মানুষ ছিলেন। যখন যে-দিকে ঝুঁকিতেন, তাহাতে একেবারে গা ঢালিয়া দিতেন। বাস্তবিক ভিতরে এইরূপ কোন প্রবর্ত্তক শক্তি না থাকিলে মানুষ বড় কাজ করিতে, বড় হইতে, পারে না। এঞ্জিনের ভিতরে বাষ্পীয় শক্তি থাকিলে তবে তাহার দ্বারা কাজ হয়; তাহা না থাকিলে, খুব দক্ষ চালকও তাহা হইতে কাজ আদায় করিতে পারে না। ভাল কাজ করিতে হইলে, সৎপথে চলিতে হইলে, অবশ্য বুদ্ধি-বিবেচনা চাই, জ্ঞান চাই, বিবেক চাই; কিন্তু ভিতরে প্রবল প্রবর্ত্তক শক্তিও চাই। এই শক্তি মানুষকে বিপথেও লইয়া যাইতে পারে, স্বীকার করি। নানা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ভক্তচরিত-মালায় দেখা যায়, যে, অনেক সাধু ব্যক্তি প্রথমে উন্মার্গগামী ছিলেন; কিন্তু যাহা তাঁহাদিগকে বিপথে লইয়া গিয়াছিল, তাহাই পরে তাঁহাদিগকে প্রবল বেগে সুপথে চালিত করিয়াছিল। অন্তরে ভাবের ও প্রবর্ত্তক শক্তির প্রবলতা থাকিলেই কোন-না-কোন সময়ে বিপথগামী হইতেই হইবে, এমন নয়; ঐরূপ ভাব ও শক্তি-সম্পন্ন অনেক লোক কখনও বিপথে না গিয়া বরাবর সৎ পথে ছিলেন, দেখা যায়।

এটা করা উচিত নয়, ওটা করা উচিত নয়, এইরূপ নিয়ম মানিয়া চলা খুব দরকার ও উচিত; এইপ্রকার নিষেধ মানিয়া চলিলে নির্দোষ থাকিবার পক্ষে এবং নিখুঁত জীবন লাভ করিবার পক্ষে সাহায্য হয়, নির্দোষ ও নিখুঁত হওয়া কম কৃতিত্ব ও কম লাভ নহে। কিন্তু মহতী

রসা রোডের বাড়ীতে শবদেহের প্রতীক্ষায় দেশবন্ধুর আত্মীয়গণ
(১) শ্রীযুক্ত প্রফুল্লরঞ্জন দাশ (২) শ্রীযুক্ত সতীশরঞ্জন দাশ (৩) শ্রীমতী সুজাতা দেবী (দেশবন্ধুর পুত্রবধূ) (৪) শ্রীমতী বাসন্তী দেবী
(৫) শ্রীমতী অপর্ণা দেবী (৬) শ্রীমতী কল্যাণী দেবী (৭) শ্রী ভাস্করানন্দ মুখোপাধ্যায় (দেশবন্ধুর কনিষ্ঠ জামাতা)

সিদ্ধির পক্ষে, নিষেধ পালন আবশ্যক হইলেও, উহাই যথেষ্ট নহে; যে প্রবর্ত্তক বা প্রেরক শক্তির কথা উপরে বলিয়াছি, তাহা বেশী পরিমাণে থাকিলে তবে মহতী সিদ্ধি লাভ সম্ভবপর হয়।

চিত্তরঞ্জনের মধ্যে এই শক্তি কাজ করিতেছিল। এই-জন্য তিনি কৃতী হইয়াছিলেন; আরও কয়েক বৎসর বাঁচিয়া থাকিলে মহত্তর অবদানপরম্পরায় তাঁহার জীবন মহিমামণ্ডিত হইত।

তিনি দাতা, ত্যাগী, সাহসী ও প্রেমিক পুরুষ ছিলেন। এইসব কারণে যাঁহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিতেন, তাঁহারা তাঁহার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারিতেন না। ইহাতে অনেক কাজ উদ্ধারের সুবিধা হইত বটে, কিন্তু এই ব্যক্তিগত প্রভাবের দ্বারা কাজ উদ্ধার করিতে গিয়া তাঁহাকে যে কতকটা অল্পায়ু হইতে হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাঁহারা তাঁহার দলের লোক, কিংবা যাঁহারা তাঁহার দলের লোককে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বা কলিকাতা মিউনিসিপালিটীতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলে যদি ঐ দলের মতবিশ্বাস-আদর্শ ও নীতির খাতিরেই কাজ করিতেন, তাঁহাদিগকে কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইবার নিমিত্ত দেশবন্ধুর ব্যক্তিগত

রাস্তায় শবদেহ

প্রভাবের অপেক্ষা না রাখিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া ভগ্নদেহকে আরো ভগ্ন করিতে হইত না। তাঁহার দলের লোককে নির্ব্বাচিত করাইবার জন্য, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় গবর্ণমেণ্টকে বার-বার পরাজিত করিবার জন্য, এবং অন্য অনেক কাজ উদ্ধার করিবার জন্য তাঁহাকে নিজে যত অনুরোধ, উপরোধ ও পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, স্বরাজ্য-দলের মতবিশ্বাস-আদর্শ প্রভৃতিতে প্রগাঢ় আস্থা ব্যাপকতর হইলে তাহা আবশ্যক হইত না, এবং তিনি স্বাস্থ্য-লাভের জন্য যথেষ্ট অবসর পাইতে পারিতেন।

টাকা-কড়ি-সম্বন্ধে দেশবন্ধু যেমন হিসাবী ছিলেন না, নিজের সময় ও শক্তি সম্বন্ধেও তিনি তেম্নি মিতব্যয়ী ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার সময় ও শক্তির ভাণ্ডার ত অফুরন্ত ছিল না—কোন মানুষেরই থাকে না। তিনি দেশের কাজের জন্য তাঁহার জ্ঞানবুদ্ধি-অনুসারে অকাতরে আত্মদান করিতে প্রস্তুত ছিলেন ও আত্মদান করিয়াছিলেন। তাহার জন্য তিনি নমস্য ও শ্রদ্ধেয়। কিন্তু যেমন কোন-প্রকারে যুদ্ধে প্রাণ দিলেই বিজয়ী মহাসেনাপতি হওয়া যায় না, তেম্নি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভার্থ রক্তপাতহীন সংগ্রামেও কেবল অকাতরে আত্মদানই যথেষ্ট নহে; নিজের শক্তি সংরক্ষণের, এবং নিজের স্থলাভিষিক্ত হইবার ও দলের নানা কার্য্য করিবার উপযুক্ত সহায়ক গড়িবারও প্রয়োজন আছে। এই বিষয়ে স্বরাজ্যদলের নেতা, পার্ষদগণ ও অনুচরগণ যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন বলা যায় না। তাঁহাদের কৃতিত্ব যথেষ্ট হইলে নেতাকে এত অধিক ব্যক্তিগত চেষ্টা করিয়া আয়ুঃক্ষয় করিতে হইত না। পার্ষদ ও অনুচরগণ তাঁহার ব্যক্তিগত চেষ্টার ক্ষেত্র সংকীর্ণতর করিতে পারিলে তাঁহাদের নিজের কর্ত্তব্য করা হইত, এবং নেতার ও দেশের কল্যাণ হইত।

চিত্তরঞ্জন আযৌবন যাহা কিছু বলিয়াছেন করিয়াছেন,

তাহাতে কোন দোষ, ত্রুটি, ভ্রম, প্রমাদ কখনও লক্ষিত হয় নাই, এরূপ অপ্রকৃত কথা বলিবার কোন প্রয়োজন নাই—কোন মানুষ সম্বন্ধেই তাহা বলা যায় না। ভুল ভ্রান্তি দোষ-ত্রুটি তাঁহার হইয়াছে। কিন্তু গদ্যে-পদ্যে লেখায়, বক্তৃতায়, তিনি, লোকে কি বলিবে বা কি মনে করিবে, এই ভয়ে নিজের ভাব ও মত-বিশ্বাস প্রকাশ করিতে যৌবন কাল হইতেই ভীত হইতেন না। স্বাধীন-চিত্ততা এবং নিজের মতপ্রকাশ সম্বন্ধে দৃঢ়তা ও নির্ভীকতা তাঁহার ছিল। আরও এই নির্ভীকতা ছিল, যে, নিজের কথার ও কাজের ফলস্বরূপ দুঃখ ভাগী হইতে তিনি কখনও ভীত ও পশ্চাৎপদ হইতেন না। নেতা হইবার মত জ্ঞান বুদ্ধি বিবেচনা অনেকের থাকে, কিন্তু দায়িত্ব স্বীকার করিবার মত সাহস ও দৃঢ়তা না থাকায় তাহারা নেতা হইতে পারে না। দেশবন্ধু দায় ঝুঁকি কখন ঝাড়িয়া ফেলিতে চাহিতেন না। প্রভুত্বপ্রিয় তিনি ছিলেন বটে, এক-নায়কত্ব তাঁহার মজ্জাগত ছিল বটে; কিন্তু ঐরূপ পদের দায়িত্ব এবং দুঃখও তিনি স্বীকার করিয়া নিজের দৃঢ়তা, সাহস ও সহিষ্ণুতা সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন।

ইংরেজ জাতিকে পৃথিবীর বৃহত্তম সাম্রাজ্য চালাইতে হয়। সুতরাং তাহাদের মধ্যে চা'লবাজীতে সুদক্ষ কৌশলী লোক অনেক গড়িয়া উঠিয়াছে এবং বিদ্যমান আছে, ইহা না বলিলেও চলে। বড় সাম্রাজ্যের এমন-কি, নিজ-নিজ প্রদেশের সব কাজ চালাইবার অধিকার ভারতীয়দের নাই। তাহা সত্ত্বেও কৌশলে ভারতীয়দের মধ্যে ইংরেজদের সমকক্ষতা করিবার লোক জন্মিয়াছে। বাংলা দেশে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ আর-এক দৃষ্টান্ত। নানা-প্রকার লোভ দেখাইবার, ভয় দেখাইবার ও ঘুস দিবার উপায় গবর্ণমেণ্টের হাতে আছে। তাহা সত্ত্বেও চিত্তরঞ্জন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় গবর্ণমেণ্ট্‌কে বার-বার পরাজিত করিতে পারিয়াছিলেন। অবশ্য কেবল চা'লবাজী ও কৌশল দ্বারাই পরাজিত করিতে পারিয়াছিলেন বলিলে সত্য কথা বলা হইবে না। যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছিলেন, তাঁহারা অনেকে স্বদেশ-প্রীতি বশতই দিয়াছিলেন। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কিংবা চিত্তরঞ্জন দাশ গবর্ণমেণ্ট্‌কে বাগ্‌-যুদ্ধে বা ভোট-যুদ্ধে পরাজিত করিয়াও প্রকৃত জয়লাভ কেন করিতে পারেন নাই, তাহার কারণ অনেক। একটা কারণ এই, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাটা সম্পূর্ণরূপে ইংরেজের হাতে আছে। তাহা হইলেও দরিদ্রতম নিরক্ষর লোক হইতে শিক্ষিততম ও ধনবত্তম সমুদয় শ্রেণীর অধিকাংশ লোক কোন নেতার পক্ষ অবলম্বন করিলে গবর্ণমেণ্টের প্রকৃত পরাজয় এবং দেশ-নায়কের প্রকৃত জয় অবশ্যম্ভাবী হইবে।

চিত্তরঞ্জন দাশ ব্রাহ্ম পিতা-মাতার সন্তান এবং ব্রাহ্ম-পরিবারে যৌবনের উন্মেষকাল পর্য্যন্ত লালিত-পালিত হইয়া বি-এ পাশ করিবার পর বিলাত গিয়াছিলেন। মতের স্বাধীনতার হাওয়ায় তিনি মানুষ হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পালের একটি লেখা হইতে জানিয়াছি, যখন চিত্তরঞ্জন বিলাত হইতে ফিরিয়া আসেন, তখন তিনি অজ্ঞেয়তাবাদী ছিলেন, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ব্রাহ্ম-পদ্ধতি-অনুসারে তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন। বিপিন-বাবু আরও বলেন, অতঃপর অধ্যাপক ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের উপদেশে চিত্তরঞ্জন ব্রাহ্মধর্ম্মে আন্তরিক আস্থাবান্ হন এবং অনেক বৎসর ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের সভ্য ছিলেন। তাহার পর তিনি কয়েক বৎসর হইল বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। বৈষ্ণব কীর্ত্তন তাঁহার অতি প্রিয় ছিল। তাঁহার রসপিপাসু ও ভাবপ্রবণ হৃদয় তাঁহাকে এই দিকে লইয়া গিয়া থাকিবে। তাঁহার এইরূপ মত-পরিবর্ত্তন-বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজের সামাজিক বা অন্যবিধ কোন দায়িত্ব ছিল কি না, আমরা ঠিক্ অবগত নহি।

দেশবন্ধু স্বয়ং অসবর্ণ বিবাহ করিয়াছিলেন এবং সন্তানগণেরও অসবর্ণ বিবাহ দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকিলেও, সামাজিক বিষয়ে তাঁহার মত ব্রাহ্মসমাজের অনুরূপই বরাবর ছিল। বঙ্গীয় হিত-সাধনমণ্ডলীর এক কন্‌ফারেন্সে তিনি প্রকাশ্যভাবে বলিয়াও ছিলেন, যে, তিনি সমাজসংস্কারের পক্ষপাতীই আছেন।

তিনি অসহায়া বিধবা ও অনাথ বালক-বালিকাদের

ভরণপোষণ ও শিক্ষাবিধানার্থ বন্ধুবর্গের সহিত একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, যে, তিনি খুব দাতা ছিলেন। দান মুক্তহস্তে করিতেন। এইপ্রকার দয়ার্দ্র-চিত্ত দাতাদের দান কখন-কখন অপাত্রে পড়িয়া থাকে। চিত্তরঞ্জন নিজেও তাহা জানিতেন। কিন্তু তাঁহার দান কখন-কখন অবিচারিত হইলেও তিনি গান্ধীজিকে বলিয়াছিলেন, যে, তাহাতে তাঁহার কোনও ক্ষতি হয় নাই। দয়ালু লোকেরা কখন-কখন ন্যায়পরতার দাবী ভুলিয়া যান। এরূপ বিস্মৃতি দেশবন্ধু দাশ মহাশয়ের কখন হইয়াছে কি না, তাঁহার বন্ধুরা তাহা বলিতে পারিবেন।

চিত্তরঞ্জন কবি ছিলেন। বিলাত হইতে আসিবার পর তিনি "মালঞ্চ" নামক একখানি কবিতার বহি প্রকাশিত করেন। তাহার অনেক পরে "সাগরসঙ্গীত" প্রকাশিত হয়। গদ্য রচনাও তাঁহার অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু আইনের ব্যবসায় তাঁহাকে সাহিত্য-সেবায় বেশী অবসর দেয় নাই; নতুবা বাংলা-সাহিত্যে তাঁহার স্থান উচ্চতর হইতে পারিত।

মানুষের হৃদয়মনের উপর তাঁহার প্রভাব কিরূপ অসাধারণ ছিল, সে-বিষয়ে তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং সহকর্ম্মীদেরও সম্যক্ ধারণা ছিল না—অন্য লোকদের ত ছিলই না। এই অসামান্য প্রভাবের ও লোকপ্রিয়তার কারণ নির্ণয় করিবার সময় এখনও আসে নাই; এখন কেবল ইহাই বক্তব্য, যে, এদেশে কখনও কোন নৃপতি, সম্রাট্, সাধু, ধর্ম্মসংস্থাপক, রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টার নেতা, লোকহিতসাধক বা অন্য কাহারও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া-উপলক্ষে লক্ষ-লক্ষ লোক এমন করিয়া শবানুগমন করে নাই। এত বড় ও এত বেশী শোকসভাও কাহারও জন্য হয় নাই।

ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র তাঁহার জন্য শোক প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের বাহিরে বহু দূর দেশেও তাঁহার জন্য শোক প্রকাশিত হইয়াছে। স্বদেশবাসী বা প্রবাসী ভারতীয়েরাই যে শোক করিয়াছেন, তাহা নহে; ভিন্ন জাতীয় সরকারী ও বেসরকারী অনেক লোকও দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।

তাঁহার সম্বন্ধে সম্যক্ প্রত্যক্ষ জ্ঞান না থাকায়, তাঁহার বিষয়ে যাহা লেখা উচিত ছিল, যেমন করিয়া লেখা উচিত ছিল, তাহা পারিলাম না। আমরা তাঁহার সদ্‌গুণাবলীর জন্য তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত এবং তাঁহার স্বদেশ প্রীতি ও মানব-প্রেমে আমরা যেন অনুপ্রাণিত হইতে পারি, এই আকাঙ্ক্ষা পোষণ করি।

—

চিত্তরঞ্জন দাশের স্মৃতিরক্ষা ফণ্ড্

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্মৃতি-রক্ষার জন্য প্রস্তাব হইয়াছে, যে, তাঁহার বাসগৃহটি ঋণমুক্ত করিয়া তাহাতে নারীদের জন্য একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত ও রক্ষিত হইবে, এবং তথায় নারীদিগকে শুশ্রূষার কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হইবে। তাঁহার বাড়ীটি এইরূপ কাজের জন্যই তিনি দান করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার যে ঋণ আছে, তাহা শোধ না করিলে বাড়ীটি ব্যবহার করিতে পাওয়া যাইবে না। বাড়ীটি বিক্রী করিয়া ঋণ শোধ করিলে লক্ষাধিক টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে বটে, কিন্তু বাড়ীটি হস্তান্তরিত হইয়া যাইবে। এইজন্য স্মৃতিরক্ষা-সমিতি যে-প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা বেশ সমীচীন।

ন্যূনকল্পে দশ লক্ষ টাকা আবশ্যক হইবে, অনুমিত হইয়াছে। উদ্দেশ্য বিবেচনা করিলে ইহা মোটেই বেশী নয়।

উদ্দেশ্যটি এরূপ, যে, ইহাতে কোন ধর্ম্ম-সম্প্রদায় বা রাজনৈতিক দলের আপত্তি হইবে না; এবং ইহা রাজনৈতিক নহে বলিয়া গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীদেরও ইহাতে টাকা দিতে কোন বাধা হইবে না।

বেসরকারী দেশী লোকদের স্মৃতিরক্ষার জন্য বাংলা-দেশে এপর্য্যন্ত প্রস্তাব ও কমিটি-নিয়োগ বিস্তর হইয়াছে; কিন্তু খুব কম স্থলেই কার্য্যতঃ কিছু হইয়াছে। এইজন্য ইতিমধ্যেই [২৯ আষাঢ় ১৩৩২] যে দেশবন্ধুর স্মৃতিরক্ষার জন্য ৪,১০,১৯৩৲ উঠিয়াছে, ইহা খুব সুলক্ষণ এবং তাঁহার লোকপ্রিয়তার বিশেষ পরিচায়ক।

—

ভারত-সচিবের মূর্খতা

গত ৩০শে জুন লণ্ডনে সেণ্ট্রাল এসিয়ান্ সোসাইটির ভোজের পর ভারত-সচিব লর্ড্ বার্কেন্‌হেড্ একটি বক্তৃতা

দেশবন্ধুর কলিকাতার বাসগৃহ

করেন। ভোজের পর বক্তৃতা করা পাশ্চাত্য রীতি—যদিও ইহা এখন এদেশেও অনুসৃত হইতেছে। খানাপিনায় তাঁহার মাথা গরম হইয়াছিল কি না, স্মৃতি-বিভ্রম ঘটিয়াছিল কি না, বলা যায় না। কিন্তু তাঁহার বক্তৃতায় তাঁহার মূর্খতা, নির্বুদ্ধিতা, দাম্ভিকতা প্রভৃতির পরিচয় ভাল করিয়া পাওয়া গিয়াছে।

—

ভারত-রক্ষার দায়িত্ব

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তিনি বলেন, একমাত্র ব্রিটেন্‌কেই ভারত-রক্ষার দায়িত্বভার বহন করিয়া চলিতে হইবে ("Britain must continue to sustain exclusive responsibility for the protection of India")। ইহা হইতেই এই বুঝায়, যে, এপর্য্যন্ত ব্রিটেন্ একাই ভারত-রক্ষার ভার বহন করিয়া আসিতেছে। ভার-বহন দু-রকমের, ব্যয়ভার বহন এবং সৈন্য জোগান। ভারত-রক্ষার জন্য ব্রিটেন্ কখনও আধ-পয়সা নিজের পকেট হইতে ব্যয় করে নাই; সমুদয় খরচ ভারতবর্ষ দিয়াছে। অধিকন্তু ভারতের বাহিরে ইংরেজদের সাম্রাজ্য রক্ষা ও বৃদ্ধির জন্য ভারতবর্ষের ব্যয়ে ভারতীয় সিপাহীরা অনেক জায়গায় লড়িয়াছে। গত মহাযুদ্ধের সময় ভারতবর্ষীয় সৈন্যেরাই ইউরোপের বাহির হইতে ইংরেজ ও ফরাসীর সাহায্যার্থ প্রথম যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয় এবং সাহসের সহিত যুদ্ধ করে। তাহারা না পৌঁছিলে, প্যারিস্ নিশ্চয়ই জার্মে্যনদের হস্তগত হইত এবং তাহারা ইংলণ্ড আক্রমণ করিত। অতএব, ব্রিটেন্ একাই ভারতবর্ষ রক্ষা করিয়া আসিতেছে, একথা যদি সত্য হইত, তাহা হইলেও পূর্ণ-সত্য-কথনের খাতিরে ইহাও বলা আবশ্যক হইত, যে, ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ও ব্রিটেন্ রক্ষার ভার বহন করিয়াছে। অধিকন্তু আরো বলা দরকার হইত, যে, যুদ্ধদ্বারা ভারতবর্ষের যতটুকু ব্রিটেন্ দখল করিয়াছে, তাহা

সম্পূর্ণরূপে ভারতবর্ষ হইতে লক্ষ টাকার সাহায্যে এবং প্রধানতঃ ভারতীয় সিপাহীদের সহায়তায় অধিকৃত হইয়াছে। ইহা আমরা লজ্জার সহিত বলিতেছি। আমাদের পায়ের বেড়ী আমাদেরই জ্ঞাতভাইয়েরা পরাইয়াছে বলায় কোন গৌরব নাই;—কেবল ঐতিহাসিক সত্যের খাতিরে বলিতেছি।

ভারত-রক্ষার জন্য সৈন্যও প্রধানতঃ ভারতবর্ষই জোগাইয়াছে। এখনও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে যত সৈন্য আছে, তাহার অধিকাংশ ভারতীয়।

ইংরেজরা এই দাবী করিতে পারে বটে, যে, ভারত রক্ষার কাজ ইংরেজ সেনাপতিদের নেতৃত্বে হইয়া থাকে। কিন্তু তাহার কারণ ভারতীয়দের নেতৃত্বের অযোগ্যতা নহে—সেনাপতির কাজ করিবার উপযুক্ত লোক এখনও ভারতবর্ষে পাওয়া যাইতে পারে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট্ ভারতীয়দিগকে বিশ্বাস করে না, তাহাদিগকে উচ্চ কাজে নিযুক্ত করিলে তাহারা নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণ বর্ত্তমান সময়েও জগতের চোখের সাম্‌নে ধরিবে, ইহা তাহারা চায় না, প্রভুত্ব ও প্রচুর অর্থ-উপার্জ্জনের উপায় ভারতীয়দের হাতে চলিয়া যায়, ইহা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত নহে;—এইসকল কারণে সেনা-নায়কের কাজে ভারতীয়েরা নিযুক্ত হয় না। গত আট বৎসরে একাশী জনকে নীচের-দিকের কয়েকটি পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে বটে; কিন্তু এখনও তিন হাজার তিন শত ইংরেজ অফিসার ভারতে সেনা-নায়কের কাজ করে। এই কাজগুলি ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্ট্ থাকিতে-থাকিতে যদি কখনও ভারতীয়-দের হাতে আসে, তাহা হইলেও সবগুলি পাইতে সাধারণ ত্রৈরাশিক-অনুসারে তাহাদের তিন শত ছাব্বিশ বৎসর লাগিবে।

যদি ইহা সত্য হইত, যে, এপর্য্যন্ত একমাত্র ইংরেজরাই ভারতবর্ষ রক্ষা করিয়া আসিতেছে, তাহা হইলেও ইহা কেমন কথা, যে, ভবিষ্যতেও তাহাদিগকেই এই কাজ করিতে হইবে? ভারতীয়েরা কখনও সম্পূর্ণরূপে আত্ম-রক্ষায় সমর্থ হইবে না, মনে করিলে, তাহাদের মনুষ্যত্ব-সম্বন্ধে কিরূপ নীচ ধারণা প্রকাশ পায়, তাহা বলিতে হইবে না। তা-ছাড়া, ইংরেজ যে ভারতরক্ষা করিতেছে বলিতেছে, তাহা ত আমাদের উপকারার্থ নহে; নিজের সম্পত্তি রক্ষা-হিসাবে করিতেছে। অতএব, লর্ড্ বার্কেন্‌-হেডের মনোগত অভিপ্রায় এই, যে, চিরকাল ভারতবর্ষ ব্রিটেনের পদানত হইয়া থাকুক এবং তাহার ধনসম্পত্তি ইংরেজদের হস্তগত হইতে থাক্।

এই অল্পদিন আগে লর্ড্ বার্কেন্‌হেড্ ইংরেজ ও ভারত-বাসীর মধ্যে সহযোগিতা এবং সমান-অংশিত্বার কথা আওড়াইতেছিলেন। এখন যে মনের কথাটা খুলিয়া বলিয়াছেন, তাহা আমাদের পক্ষে ভালই। ভারতবর্ষে অনেক নামজাদা লোক আছেন, যাঁদের চোখ কোন মতেই ফুটিতে চায় না—যাহারা না-দেখিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তাহাদের মত অন্ধ আর কে হইতে পারে? উচ্চপদস্থ ইংরেজরা বার-বার খাঁটি মনের কথাটা বলিলে, ইংরেজদের মিষ্ট কথায় "গলায়মান" এইসব লোকেরও হয়ত কালক্রমে চেতনা হইতে পারে।

—

ইংরেজদের ভারত-আগমনের কারণ

ইংরেজরা ভারতবর্ষে কেন আসিয়াছিল, সে-সম্বন্ধে ভারত-সচিব লর্ড্ বার্কেন্‌হেড্ বলেন :—

"The fundamental fact in the Indian situation is that we went to India centuries ago for composing with the sharp edge of the sword differences which would have submerged and destroyed the Indian civilization. We went there on that basis and hold it by that charter, and it is true to say today that if we left India tomorrow it will be submerged by the same anarchical and murderous disturbances as in the days of Clive."

তাৎপর্য্য। "ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থার ভিত্তীভূত তথ্য এই, যে, আমরা অনেক শতাব্দী পূর্ব্বে, যে-সব ঝগড়া-বিবাদ ভারতীয় সভ্যতাকে ডুবাইয়া ও বিনষ্ট করিয়া দিতে পারিত, তাহা তলোয়ারের তীক্ষ্ণ ধারের দ্বারা মিটাইয়া দিবার জন্য ভারতবর্ষে গিয়াছিলাম। ঐ মূলীভূত কারণে আমরা সেখানে গিয়াছিলাম, এবং তলোয়ারের সনন্দেই আমরা ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া আছি; এবং আজ ইহা বলা সত্য, যে, আমরা যদি কাল ঐ দেশ ছাড়িয়া আসি তাহা হইলে ক্লাইবের দিনের মত এখনও অরাজকতা-মূলক, নরহত্যা-প্রণোদিত উপদ্রবে উহা ডুবিয়া যাইবে।

একনিঃশ্বাসে এত বড় ঐতিহাসিক অসত্য প্রচার করা কম অজ্ঞতা ও দাম্ভিকতার পরিচায়ক নহে। ইংরেজ রাজত্বের প্রথম যুগে ইংলণ্ডের রাজা সাক্ষাৎসম্বন্ধে এদেশের প্রভু বা শাসক ছিলেন না; ঈস্ট্-ইণ্ডিয়া কোম্পানী এদেশে প্রথমে ইংরেজ-রাজত্ব স্থাপন করিয়া ১৮৫৭ সাল পর্য্যন্ত শাসন করিয়াছিল।

এনেছিলে সাথে ক'রে
মৃত্যুহীন প্রাণ ;
মরণে তাহাই তুমি
করি গেলে দান ।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ফোটোগ্রাফার মিঃ এম সেনের (দার্জ্জিলিং) সৌজন্যে ।

এই ফটোগ্রাফ মিঃ সেনের নিকট ৩৷৹ টাকায় পাওয়া যায়।
বিক্রয়ের সমস্ত টাকা দেশবন্ধুর স্মৃতি-ভাণ্ডারে জমা হইবে ।

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

১৬১৩ সালে প্রথম ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানী এদেশে আসে। ভারতবর্ষে ও এসিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশে বাণিজ্য করিয়া ধন উপার্জ্জন করিবার জন্যই বিলাতে এই কোম্পানী গঠিত হয়। ভারতবর্ষের কোন অংশের বা সমগ্র ভারতবর্ষের প্রভু হইবার বাসনা কোম্পানীর এদেশে আসিবার দীর্ঘকাল পরে উহার কোন-কোন কর্ম্মচারীর হৃদয়ে উত্থিত হয়। কোম্পানীর এদেশে আসিবার উদ্দেশ্য যে এই ছিল, তাহা ভারতবর্ষের প্রতি ন্যায়বিচার-পরায়ণ কোন ঐতিহাসিকের গ্রন্থেই লিখিত আছে, এমন নয়; ইংরেজ ভারতেতিহাসলেখকদের মধ্যে যাহার সত্যনিষ্ঠা যেরূপই হউক, ঈস্ট্-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এদেশে আসিবার কারণ-সম্বন্ধে সকলেই একমত; সকলেই এই সত্য কথাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, যে, কোম্পানী বাণিজ্য করিবার জন্য এদেশে আসিয়াছিল।

ভারতবর্ষে ইংরেজ-রাজত্ব-কালের ইতিহাসের কোন-কোন ঘটনা বা উহাতে বর্ণিত কোন-কোন ব্যক্তি-সম্বন্ধে আগেকার ঐতিহাসিকেরা যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, পরবর্ত্তী ঐতিহাসিকেরা তাহা ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কোন-কোন ক্ষেত্রে আগেকার লেখকদের বহিতে ইচ্ছাকৃত বা অজ্ঞতা-প্রসূত অপ্রকৃত কথার সমাবেশ হইয়াছিল, প্রমাণিতও হইয়াছে। কিন্তু ঈস্ট্-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারত-আগমনের উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে সাবেক ও আধুনিক ঐতিহাসিকেরা একমত। চেম্বার্সের এন্‌সাইক্লোপীডিয়ার যে নূতন সংস্করণ বাহির হইতেছে, তাহার দশ খণ্ডের মধ্যে ছয় খণ্ড বাহির হইয়াছে, চারি খণ্ড এখনও বাহির হইতে বাকী। এপ্রকার আধুনিক বহিতে ঈস্ট্-ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে প্রথমতঃ বণিক্ই বলা হইয়াছে, এবং ইহাও বলা হইয়াছে, যে, অর্থলোলুপতা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা ক্রমে-ক্রমে কোম্পানী বা তাহার কর্ম্মীদিগকে দেশী রাজাদের ঝগড়ায় কোন-না-কোন পক্ষ অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত করে; ভারতীয় সভ্যতাকে বাঁচাইবার জন্য তাহারা কখনও কোন পক্ষ অবলম্বন করে নাই। *

কোম্পানী যে-সব ঝগড়া-বিবাদের সুযোগ পাইয়া কোন-না-কোন পক্ষ অবলম্বন করিয়া ক্রমে-ক্রমে রাজ্য-স্থাপন ও প্রভুত্ব-লাভ করিতে সমর্থ হয়, তাহার আরম্ভ হয় কোম্পানীর এদেশে আসিবার অনেক পরে। আওরংজীবের রাজত্ব-কালের পূর্ব্বেই ব্রিটিশ বণিকেরা এদেশে আসিয়াছিল। তখন মুসলমান রাজত্ব সুদৃঢ় ছিল। আওরংজীবের রাজত্ব-কালে (১৬৫৮-১৭০৭) মোগল-সাম্রাজ্যের বিনাশের বীজ রোপিত হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর উহার পতন আরম্ভ হয়। তখন হইতে দেশী মুসলমান ও হিন্দুরাজাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ চলিতে থাকে; এবং সেই সুযোগে, কথামালার ধূর্ত্ত শৃগালের মত, ইংরেজরা শিকার দখল করিতে আরম্ভ করে।

পৃথিবীতে যে-সব জাতি অন্য জাতিদের দেশ দখল করিয়া আছে, তাহারা নিজের-নিজের ব্যবহারে কোন দোষ দেখিতে পায় না; কিন্তু অন্য মাস্‌তুতো ভাইদের সমালোচনা তাহারা করে। এই মাস্‌তুতো ভাইদের মুখ বন্ধ করিবার প্রয়োজন হইলে ইংরেজরা বলে, যে, তাহাদের রাজত্ব ভারতীয়েরা খুবই পছন্দ করে, ভারতীয়দের সম্মতিক্রমেই তাহারা শাসন করিতেছে। কিন্তু আলোচ্য বক্তৃতায় লর্ড্ বার্কেন্‌হেড বলিতেছেন, যে, তলোয়ারের সনন্দেই ইংরেজরা রাজত্ব করিতেছে।

* "Properly speaking, the company were only merchants: sending out bullion, lead, quicksilver, woollens, hardware, and other goods to India; and bringing home calicoes, silk, diamonds, tea, porcelain, pepper, drugs, saltpetre, etc. from thence. Not merely with India, but with China and other parts of the East, the trade was monopolised by the Company: and hence arose their great trade in China tea, porcelain, and silk. Until Clive's day, however, paltry and insufficient salaries were paid to the servants of 'John Company', who were permitted to supplement their income by every means in their power—to 'shake the pagoda tree'. By degrees avarice and ambition led the Company, or their agents in India, to take part in the quarrels among the native princes; this gave them power and influence at the native courts, and hence arose the acquisition of sovereign powers over vast regions. India thus became valued by the Company not only as commercially profitable, but as affording to the kinsfolk and friends of the directors opportunities of making vast fortunes by political or military enterprises."

এখানে ভারতীয় সভ্যতা সংরক্ষণের কোন কথাই নাই। ভারতবর্ষ কোম্পানীর পক্ষে লাভজনক ছিল এবং ডিরেক্টরদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদের বিশাল ঐশ্বর্য্য লাভের উপায় ছিল, ইহাই এখানে লেখা আছে। এবং ইহাই সত্য কথা।

এই দম্ভটা যে একেবারে নিছক মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা বলা যায় না।

চেম্বার্সের এন্‌সাইক্লোপীডিয়ার নূতন সংস্করণে ভারতবর্ষ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে স্যার্ রিচার্ড্ টেম্প্‌ল্ তথাকথিত সিপাহী-বিদ্রোহের পর ভারতীয় সৈন্যদল-সম্বন্ধে পরিবর্ত্তিত নূতন ব্যবস্থা বর্ণন-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন ঃ—

"The crisis past, no time was lost in rectifying the military faults which had rendered the revolt possible. The native troops were reduced in number, the European troops were augmented. The physical predominance at all strategic points was placed in the hands of European soldiers, and almost the whole of the artillery was manned by European gunners.....The army was reorganised so as to guard against the danger from which the country had just been saved. As compared with the relative proportions of former times, the European force was doubled, while the native force was reduced by more than one-third. Thus the European and the natives were as one to two; moreover, the European was placed in charge of the strategic and preminent position, so that the physical power was now in his hands."

তাৎপর্য্য। সঙ্কট উত্তীর্ণ হইবার পর, যে সব সামরিক ব্যবহার ত্রুটিতে বিদ্রোহ সম্ভব হইয়াছিল তাহা সংশোধন করিতে কাল বিলম্ব করা হইল না। দেশী সিপাহীর সংখ্যা কমাইয়া ও ইউরোপীয় সৈন্যের সংখ্যা বাড়াইয়া ইউরোপীয়দিগকে সংখ্যায় দেশীদের অর্দ্ধেক করা হইল (বিদ্রোহের আগে দেশী সৈন্যের সংখ্যা ইউরোপীয়দের ছয় গুণ ছিল); যে-যে জায়গাগুলির সামরিক গুরুত্ব ও প্রয়োজন বেশী সেখানে ইউরোপীয় সৈন্যদের সংখ্যা সিপাহীদের চেয়ে খুব বেশী করা হইল; এবং কামান-বিভাগের প্রায় সমস্তটারই ভার ইউরোপীয় গোলন্দাজদের উপর অর্পিত হইল।

অধ্যাপক সীলি তাঁহার এক্সপ্যান্‌শুন্ অব্ ইংল্যাণ্ড নামক বহিতে ইংরেজদের ভারতবর্ষদখল-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "this is not a foreign conquest, but rather internal revolution," "ইহা বিদেশীর দ্বারা দেশ জয় নহে, বরং ইহা আভ্যন্তরীণ বিপ্লব।" তিনি আরও বলেন, "we are not really conquerors of India, and we cannot rule her as conquerors," "আমরা বাস্তবিক ভারতবর্ষের বিজেতা নহি, এবং বিজেতার মত উহা শাসন করিতে পারি না।"

ইহা সত্ত্বেও ইহা ঠিক্ যে, ভারতীয়েরা যদি ইংরেজের অধীন থাকিতে না চায়, ইংরেজের সামরিক ও অন্যান্য চাকরী না করিতে চায়, তাহা হইলে ইংরেজের তলোয়ার ভারতবর্ষকে তাহার অধীন রাখিতে সমর্থ হইবে না। সুতরাং ইংরেজ-রাজত্ব প্রধানতঃ তলোয়ারের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে; ভারতীয়েরা উহাতে সায় দিয়া আছে বলিয়াই, প্রধানতঃ উহা টিকিয়া আছে। এই সায়-দেওয়াটা ভয়-প্রসূত, ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত বা দলগত স্বার্থপ্রসূত, পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস-জাত, এবং ইংরেজের সম্মোহন-বিদ্যা বা হিপ্‌নটিজমের ফলীভূত এই ভারতীয় বিশ্বাস হইতে উৎপন্ন, যে, ইংরেজশাসন এত উৎকৃষ্ট যে, আমরা হাজার চেষ্টা করিলেও এই শ্রেষ্ঠতা আমাদের অধিগম্য হইবে না। ভয় অনেকটা ভাঙ্গিয়াছে; ব্যক্তিগত স্বার্থের মায়া বিস্তর লোকে কাটাইয়াছে; দলগত সম্প্রদায়ের স্বার্থ তত লোক অগ্রাহ্য করিতে না পারিলেও, কতকগুলি লোকে পারিয়াছে; ভিন্ন-ভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের শিক্ষিত লোকদের চেষ্টায় পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস আপাততঃ বাড়িয়া থাকিলেও কালক্রমে বিশ্বাস জন্মিবার আশা আছে; এবং ইংরেজের অনধিগম্য ও দুরতিক্রম্য শ্রেষ্ঠতায় এখন আর লোকে বিশ্বাস করে না। সুতরাং লর্ড্ বার্কেন্‌হেডের তলোয়ারের (বা জিহ্বার) ধার যতই হউক, উহা ব্রহ্মাস্ত্র নহে, এবং চিরকাল অমোঘ থাকিবে না।

—

ইংরেজদের ভারতত্যাগের ফল

ইংরেজরা অনেকদিন হইতে বলিয়া আসিতেছে, তাহারা আজ যদি ভারত ছাড়িয়া চলিয়া যায়, তাহা হইলে কাল অরাজকতা ও খুনোখুনিতে দেশ ছারখার হইবে। এই মামুলী প্রাচীন ভীতি-উৎপাদক কথায় আর বেশী দিন কাজ চলিবে না। যে কোন দেশ হইতে তথাকার রাষ্ট্রীয় কর্ম্মকর্ত্তারা হঠাৎ চলিয়া গেলে বিশৃঙ্খলতা ঘটিবার খুব সম্ভাবনা। ভারতবর্ষের নিকৃষ্টতাবশতঃ কেবল ভারতবর্ষের পক্ষেই এই কথা সত্য, ইহা বলা যায় না। দেড়শত বৎসরের অধিক প্রভুত্ব করিয়াও ইংরেজ যে একথা ভারতের পক্ষেই সত্য মনে করে, ইহা তাহার পক্ষে সাতিশয় লজ্জার কথা। ইহাতে ইহাই বুঝা যায়, যে, ইংরেজ ভারতীয় নানা সম্প্রদায় ও শ্রেণীর লোককে পরস্পরের সহযোগে রাষ্ট্রীয় কার্য্যনির্ব্বাহে ও দেশরক্ষায় সমর্থ করিবার চেষ্টা করে নাই। লর্ড্ বার্কেন্‌হেডের মতে

ইংরেজ এদেশে আসিয়াছিল বিরোধ মিটাইবার জন্য ("For composing the differences.")। প্রকৃত কথা তাহা নহে; তাহারা বিরোধের সুযোগে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করিয়াছিল, মনোমালিন্য জাগাইয়া রাখিয়াছিল, এবং যেখানে বিরোধ ও মনোমালিন্য ছিল না, সেখানে চক্রান্ত দ্বারা তাহা জন্মাইয়াছিল। এবিষয়ে ইংরেজের নীতি এখনও অপরিবর্ত্তিত আছে।

লর্ড্ বার্কেন্‌হেড ক্লাইবের নাম করিয়া ভাল করেন নাই। ক্লাইবের মত অসচ্চরিত্র ও বিশ্বাসঘাতক লোক ভারতীয় সভ্যতাব রক্ষকতা করিয়াছিল, এমন কথা সূচিত করিতে অতিবড় ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-উপাসকেরও লজ্জিত হওয়া উচিত।

ইংরেজরা ত বরাবর বলিয়া আসিতেছিল, যে, তাহারা আয়র্ল্যাণ্ড ত্যাগ করিলেই আইরিশরা মারামারি কাটাকাটি করিয়া মরিবে, কখনও স্বদেশের কাজ চালাইতে পারিবে না। কিন্তু আইরিশ্‌রা নিজেদের কাজ বেশ চালাইতেছে এবং ইতিমধ্যেই এমন অনেক উৎকৃষ্ট রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও কর্ম্ম করিয়াছে, যাহা ইংলণ্ড্ বহুশতাব্দী ধরিয়া আয়র্ল্যাণ্ডের মালিক থাকিয়াও করে নাই বা করিতে পারে নাই।

কানাডা স্বশাসক হইবার আগে তাহার সম্বন্ধেও ঐরূপ আশঙ্কা ইংরেজরা করিত; ভারতবর্ষে বর্ত্তমান সময়ে ইংরেজ-রাজত্ব-কালে ভীষণ দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইতেছে। ইংরেজরা বলে, তাহারা চলিয়া গেলে ইহা অপেক্ষাও অধিক রক্তপাত হইবে। কানাডা যখন স্বশাসন-ক্ষমতা পায় নাই, তখন সেখানে ফরাসীতে-ইংরেজে ঝগড়া এবং বিদ্রোহ অনেক হইত; অশান্তি, অসন্তোষ খুব ছিল। কিন্তু উহা স্বশাসন-ক্ষমতা পাইবামাত্র আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখা দিল। বৈদেশিক শাসনে যাহা অসম্ভব ছিল, এরূপ একতা-বোধের আবির্ভাব হইল; দেশের ভিন্নভিন্ন অংশের সাধারণ স্বার্থ-বোধ বিকশিত হইতে লাগিল; সকলে সাধারণ হিতসাধনের জন্য মিলিত হইতে লাগিল; এবং সর্ব্বত্র এমন সন্তোষ ও শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল ও শাসন-যন্ত্রের কার্য্যকারিতা এরূপ বৃদ্ধি পাইল যে, সেরূপ পূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নাই।

ভারতবর্ষেও যে স্বশাসনের ফল আয়ার্ল্যাণ্ডের ও কানাডার মত হইবে না, তাহা মনে করিবার কি কারণ আছে?

অখ্যাতনামা ও নামজাদা বহু ইংরেজ বরাবর এইরূপ কথা বলিয়া আসিতেছে, যেন আমরা তাহাদিগকে **হঠাৎ কালই** গাঁটরী, তৈজস-পত্র, ডেরাডাণ্ডা লইয়া বিলাত চলিয়া যাইতে বলিতেছি। এরূপ কথা আমরা কখন বলি নাই। ভারতীয়দের প্রকাশ্যক্রিয়াশীল সকল রাজনৈতিক-দলের দাবী বরাবর এই আছে, যে, একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, একটা নির্দ্দিষ্ট তারিখে, ভারতীয়দিগের স্বদেশের সব কাজ চালাইবার অধিকার চাই; এবং ঐ তারিখের পূর্ব্বে তাহাদিগকে অধিক হইতে অধিকতর কার্য্যভার দিয়া রাষ্ট্রীয় কার্য্য-নির্ব্বাহে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা দেওয়া হউক। ঐ তারিখের পরেও ইংরেজদিগকে এই দেশ ছাড়িয়া যাইতে কেহ বলে না। এই কথাই আমরা বলি, তাহারা প্রভু হইয়া থাকিতে পারিবে না; বন্ধু হইয়া, কর্ম্মচারী হইয়া থাকিতে পারিবে; সমান-সমান হইয়া (বিশেষসুবিধা-ভোগী না হইয়া) বাণিজ্য করিতে পারিবে।

ইংরেজরা বরাবর বলিয়া আসিতেছে, ভারতীয়েরা স্বশাসনের যোগ্য নহে। কুড়ি-ত্রিশ বৎসর আগে, তাহারও আগে, ঐ জবাব দিয়াছিল, এখনও ঐ জবাব দিতেছে, এবং (ভগবান্ না করুন) যদি তাহারা আরও কুড়ি-ত্রিশ বৎসর প্রভু থাকে, তখনও ঐ জবাব দিবে; আমরা উপযুক্ত হইলেই তাহারা নাকি আমাদিগকে স্বশাসন ক্ষমতা দিবে—"ভদ্রলোকের এক কথা"। তারিখটা নির্দ্দিষ্ট করিতেই তাহাদের যত আপত্তি!* নির্দ্দিষ্ট করেই বা কি করিয়া? পোল্যাণ্ড্ ২৷৩ বৎসরে **স্বাধীন** হইল, ৫ বৎসরের মধ্যে চেকোস্লোভাকিয়ায় **স্বাধীন** সাধারণ-তন্ত্রের নব অভ্যুদয় হইল, চীন কয়েক বৎসরের মধ্যে সাধারণতন্ত্র হইল, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ ২০ বৎসরের মধ্যে স্বশাসক হইয়া উঠিয়া কয়েক বৎসর হইতে পূর্ণ স্বাধীনতা চাহিতেছে, জাপানে প্রজাতন্ত্র-শাসন-প্রণালী স্থাপিত

* একজন অধমর্ণ উত্তমর্ণকে বলিয়াছিল, কাল তোমার টাকা দিব। মহাজন যে দিন টাকা চাহিত, সেই দিনই ঐ জবাব দিত। পুনঃপুনঃ তাগিদে বিরক্ত হইয়া দেনদার একদিন বলিল, "আমি ত বলিয়াছি কাল দিব; ভদ্রলোকের এক কথা।"

হইবার ৬০ বৎসর পরেই এই বৎসর তথায় প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি সম্পত্তি ও শিক্ষা-নির্ব্বিশেষে ব্যবস্থাপক সভাদিতে প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনের অধিকার লাভ করিয়াছে। ইংরেজরা ভারতবর্ষকে সব সে সেরা বানাইবার জন্য অনির্দ্দিষ্ট দীর্ঘকালের জন্য তলোয়ারের জোরে উহার ঘাড়ে চড়িয়া থাকিতে চায়; ভারতীয়েরা এত বড় অকৃতজ্ঞ ও অবুঝ, যে, তাহারা এমন মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য জন্মজন্মান্তরে ইংলণ্ডের ক্রীতদাস হইয়া থাকিতে চায় না।

লর্ড বার্কেনহেড্ ভুলিয়া যাইতেছেন, যে, চিরদাসত্ব, চির-অসহায়তা, চিরপরমুখাপেক্ষিতা সাময়িক (কিংবা দীর্ঘকালব্যাপী) অরাজকতা অপেক্ষা অবাঞ্ছনীয় হইতে পারে।

মানুষ যতদিন পরমুখাপেক্ষী ও পরাধীন থাকে, ততদিন তাহার মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ ত হয়ই না, বরং তাহার অধোগতিই হইতে থাকে। যে নিজের জন্য ভাবিবার ও নিজের দরকারী কাজ করিবার সুযোগ পায় না, বা যাহাকে নিজের জন্য ভাবিবার ও কাজ করিবার প্রয়োজন হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয়, তাহার চিন্তাশক্তি ও কর্ম্মশক্তি বৃদ্ধি না পাইয়া কমিতে থাকে। তাহার প্রতিভা নষ্ট হয়, তাহার সাহস কমিয়া যায়, তাহার উদ্যোগিতা ও কর্ম্মিষ্ঠতা হ্রাস এবং পরিণামে লোপ পায়। ভারতবর্ষে অল্পাধিক-পরিমাণে এইসব কুফল ফলিয়াছে।

অরাজকতার নানা দুঃখ ও দোষ বর্ণনা করা বাহুল্য মাত্র। কিন্তু উহা দাসত্ব, অধীনতা ও পরমুখাপেক্ষিতা অপেক্ষা একটি বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। মানুষ যখন দেখে, যে, তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য, তাহার নিমিত্ত ভাবিবার জন্য কেহ নাই, তখন হয় তাহাকে মরিতে হয়, নতুবা স্বাবলম্বনপূর্ব্বক নিজেই উপায় চিন্তা ও স্থির করিয়া আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। এইজন্য দাসত্ব অপেক্ষা অরাজকতা মনুষ্যত্বসংরক্ষণের, চিন্তাশক্তি কর্ম্মশক্তি ও সাহস-সংরক্ষণের অধিক সুযোগ দিতে পারে। অতএব, লর্ড বার্কেনহেড্ ও তাঁহার মতাবলম্বী ইংরেজেরা ভাবিয়া দেখিবেন, যে, ভারতীয়দের মধ্যে যাহারা মানুষ হইতে ও থাকিতে চায়, তাহারা ইংরেজের তলোয়ারের রক্ষাধীন চিরদাস থাকা অপেক্ষা অরাজকতাই বাঞ্ছনীয় মনে করিতে পারে—অরাজকতার ভয় তাহাদের কাটিয়া যাইতে পারে।

তলোয়ার ও অহিংসা

যাঁহারা অহিংস আন্দোলন ও অসহযোগ দ্বারা স্বরাজ লাভ করিতে প্রয়াসী, লর্ড বার্কেনহেড যেন ঠিক্ তাহাদিগকেই লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, "তোমাদের অহিংস অসহযোগ আছে, আমাদের আছে তলোয়ার; তলোয়ারের দ্বারাই আমরা চিরকাল প্রভুত্ব করিব। দেখি তোমরা কি করিতে পার।" এ যেন ঠিক্ অসহযোগীদিগকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান। ভারত-সচিবের বাহ্বাস্ফোটে ভারতীয়েরা অহিংস যুদ্ধে আরও উৎসাহে প্রবৃত্ত হইবেন কি না, ভাবিয়া দেখুন। অধীনতাটা যাহাদের সম্পূর্ণ গা-সহা হইয়া গিয়াছে, তাহারা ভিন্ন আর সকলেই দাসত্ব-মোচনের চেষ্টা করিবেন না কি? কিন্তু তলোয়ারের বিরুদ্ধে মরিচা-ধরা তলোয়ার কেহ ভুলিয়া না ধরিলেই ভাল হয়। কেন না, অযথেষ্ট বলপ্রয়োগ দমন করা ইংরেজের পক্ষে, অহিংস প্রতিরোধ দমন করা অপেক্ষা সহজ হইবে।

—

"ঐতিহাসিক দায়িত্বের বোঝা"

ভারত-সচিব এই আর-একটা কথা বলিয়াছেন:—

"No man was entitled to speak as a representative of Britain and the momentary trustee of India—whether Labourite, Liberal or Conservative who would not find himself in a position in which it was possible for him to liquidate the obligations of history with honour."

তাৎপর্য্য। "শ্রমিক, উদারনৈতিক বা রক্ষণশীল, কোন ইংরেজ যে-দলেরই হউন, যদি তিনি মনে না করেন, যে, তাঁহার পক্ষে ঐতিহাসিক দায়িত্ব ঋণ শোধ করা সম্ভব, তাহা হইলে ব্রিটেনের প্রতিনিধি বা ভারতবর্ষের বর্ত্তমান-ক্ষণের অছি-স্বরূপে কথা বলিবার তাঁহার কোন অধিকার নাই।"

বার্কেনহেড্ বলিতে চান, যে, ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের সম্মিলিত ইতিহাস হইতেই উদ্ভূত কতকগুলি দায়িত্বের ভার ইংলণ্ডের ঘাড়ে চাপিয়াছে; ইংরেজরা সেইসব দায়িত্ব পালন করিতে অঙ্গীকারবদ্ধ; এবং এই অঙ্গীকার-পালনরূপ ঋণ শোধ করিতে তাহারা বাধ্য। ভারত-রক্ষা ঐরূপ একটি দায়িত্ব। ভারতসচিবের মতে ভারত-রক্ষার জন্য ব্রিটেনই একা দায়ী এবং এই দায়িত্বপালন তাহাকে একাই করিয়া চলিতে হইবে। যাহাদিগকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি ও প্রভুত্ব রক্ষার জন্য বিদেশী জাতিসকলকে পরাধীন রাখিতে

হয়, তাহারা তাহাদের আসল উদ্দেশ্যটাকে একটা শোভন আবরণে আচ্ছাদিত করিতে অভ্যস্ত হইয়া যায়। সোজা কথায় বল, যে, ভারতবর্ষ আমাদের কামধেনু, চিরকাল দোহন করিব এবং তাহা করিবার নিমিত্ত উহাকে চির-পদানত রাখিব। কিন্তু তাহা বলিলে নিজেদের কাছে ও জগতের অপর লোকদের নিকট খাট হইতে হয়। সেই-জন্য বলা হইতেছে, আমরা ভারতবর্ষীয় সভ্যতাকে বাঁচাইবার জন্য সে-দেশে গিয়াছিলাম, সেদেশের আমরা অছি, তাহা রক্ষা করিবার ঐতিহাসিক দায়িত্ব একমাত্র আমাদেরই আছে, এবং সেই দায়িত্ব আমরা চিরকালই পালন করিতে থাকিব।

এসব হইতেছে স্বার্থপর প্রভুত্বপ্রিয় ভণ্ড লোকদের ইতিহাস-ব্যাখ্যা। কিন্তু ভারতের ইতিহাসে ইংরেজদের অন্যরকম প্রতিশ্রুতির কথাও আছে। সেই সব অঙ্গীকারের ঋণশোধ-সম্বন্ধে ভারত-সচিব একটি কথাও বলেন নাই কেন? এক শতাব্দীরও অধিক পূর্ব্বে বড়লাট মার্কুইস্ অব্ হেষ্টিংস্ তাঁহার ডায়েরীতে লিখিয়াছিলেন, এমন দিন আসিবে যখন ব্রিটিশ গবর্ণ্মেণ্ট্ বন্ধুভাবে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিয়া চলিয়া যাইবে; লর্ড্ মেকলেও ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের ফলে ঐরূপ কিছু-একটা গৌরবময় ফল ফলিবে আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু এইরূপ কথার তালিকা করিতে চাই না কারণ, এগুলো ব্রিটেনের রাজার বা ব্রিটিশ গবর্ণ্‌মেণ্টের কথা নহে। গবর্ণমেণ্টের ও রাজার কথাই বলিব।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন, জাতি-ধর্ম্মবর্ণ-নির্ব্বিশেষে তাঁহার সব প্রজাকে তিনি সমানচক্ষে দেখিবেন। তাহা হইলে, ইংরেজরা যেমন নিজের দেশকে রক্ষা করে, আমরা কেন সেইরূপ নিজের দেশ রক্ষার দায়িত্ব, অধিকার, সুযোগ পাইব না? আমরা অবশ্য জানি, যে, এসব কেহ কাহাকেও দিতে পারে না, পৌরুষের দ্বারা অর্জ্জন ও রক্ষা করিতে হয়, কিন্তু ভারত-সচিব ঐতিহাসিক দায়ের, বাধ্যতার, কথা বলিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার অঙ্গীকার পালন করিতে ব্রিটিশ গবর্ণ্মেণ্ট্ বাধ্য কি না? যদি সে-দায়িত্ব উহার না থাকে, তাহা হইলে মহারাণীর ঘোষণার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন কি ছিল?

আমাদের দেশের লিখন-পঠনক্ষম তরুণদেরও জীবিত-কালের দুটা ঐতিহাসিক প্রতিশ্রুতির কথা বলি। ১৯১৭ সালে ব্রিটিশ গবর্ণ্মেণ্ট্ ভারতবর্ষে রেস্পন্সিব্ল্ গবর্ণ্‌মেণ্ট্ অর্থাৎ দেশের লোকদের কাছে দায়ী শাসনযন্ত্র দিবার অঙ্গীকার করিয়াছিল। সেই অঙ্গীকারের দায়িত্বটা কোথায় গেল?

ইংলণ্ডের রাজা পঞ্চম জর্জ্জ, "স্বরাজ উইদিন্ মাই এম্পায়ার্", "আমার সাম্রাজ্যের মধ্যে স্বরাজ," ভারতীয়-দিগকে দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। তাহার কোন উল্লেখও ভারত-সচিবের বক্তৃতায় দেখা গেল না।

কেবল দেখান হইতেছে, ভারতীয়েরা চিরকাল অপ-রের তলোয়ারের দ্বারা রক্ষিত হইবার গৌরব ভোগ করিবে; "দায়ী গবর্ণ্মেণ্টের" বা "আমার সাম্রাজ্যের মধ্যে স্বরাজের" অঙ্গীকার মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা-পত্রের মত রদী কাগজের টুকরার দশা পাইতে বসিয়াছে।

অধ্যাপক সুশীলকুমার রুদ্র

আটত্রিশ বৎসর অধ্যাপকের কাজ করিয়া শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার রুদ্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দিল্লীর সেণ্ট স্টীফেন্স্ কলেজের প্রিন্সিপ্যালের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। সম্প্রতি সিমলা-শৈলের সোলন-নামক স্থানে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

তাঁহার পূর্ব্বে বোধ হয় কোন ভারতীয় অধ্যাপক খৃষ্টীয় মিশনারী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হন নাই। তাঁহার সহকর্ম্মীদের মধ্যে আটজন ইউরোপীয় অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহারা সকলে যে একবাক্যে তাঁহাকে কলেজের অধ্যক্ষ মনোনীত করেন, অন্য কোন প্রমাণ না থাকিলেও ইহা হইতেই তাঁহার বিদ্যাবত্তা, শিক্ষা-দানকর্ম্মে অভিজ্ঞতা, এবং সাধু চরিত্রের প্রমাণ পাওয়া যাইত। কিন্তু অন্য প্রমাণও বিস্তর আছে। পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য ও তাহার সীণ্ডিকেটের সভ্যরূপে তিনি উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে পঞ্জাবের অনেক উপকার করিয়া গিয়াছেন। দিল্লী বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপনেও তাঁহার সহযোগিতা ছিল; তিনি স্বদেশ-প্রেমিক বিশ্ব-প্রেমিক লোক ছিলেন। ১৯১৯ সালে দিল্লীতে

যখন সামরিক আইন ঘোষিত হইবার কথা হয়, তখন প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় তাহা হইতে পায় নাই।

অধ্যাপক শ্রী সুশীলকুমার রুদ্র

১৮৬১ সালে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি রেভারেণ্ড প্যারীমোহন রুদ্র মহাশয়ের একমাত্র পুত্র ছিলেন। আমরা বাল্যকালে যখন বাঁকুড়া জিলা-স্কুলের ছাত্র ছিলাম, তখন প্যারীমোহন রুদ্র মহাশয় কখন-কখন আমাদের শিক্ষক স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য কেদার-নাথ কুলভী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন দেখিতাম। উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল।

তিনি ডাফ কলেজ হইতে এম্ এ পাস্ করিবার পর প্রথমে রেভিনিউ বোর্ডে দুই বৎসর চাকরী করেন। পরে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে সেণ্ট্ স্টীফেন্স্ কলেজে লেক্চ্যারার হইয়া দিল্লী যান। এই কলেজেই তিনি জীবনের সমুদয় শক্তি ও অনু-রাগের সহিত কাজ করিয়া গিয়াছেন। তিনি ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ইহার ভাইস্ প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত হন। ১৯০৬ সালে তাঁহাকে ইহার প্রিন্সিপ্যালের পদ দিবার প্রস্তাব হয়। যখন কেম্ব্রিজ মিশন কর্তৃক এই কলেজ স্থাপিত হয়, তখন মিশনের কর্তৃপক্ষ গবর্ণমেণ্টের সহিত এই সর্ত্তে আবদ্ধ হন, যে, ইহার প্রিন্সিপ্যাল সর্ব্বদাই ইংরেজ হইবেন। রুদ্র মহাশয়কে অধ্যক্ষের পদ দিবার কথা হওয়ায় গবর্ণ্মেণ্ট্ এই সর্ত্ত প্রত্যাহারে রাজী হন। বহুসংখ্যক ইউরোপীয় অধ্যাপকের মাথার উপর একজন বাঙালীকে স্থাপন করায় তখন কিছু উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল, এবং অনেকেই ইহার ফল-সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন। রুদ্র মহাশয়ও অনিচ্ছার সহিত, তাঁহার সহকর্ম্মী এণ্ড্রুজ সাহেবের অনেক বলা কহার পর, এই কাজ লইয়াছিলেন। তাঁহার সহিত তাঁহার ইউরোপীয় সহকর্ম্মীদের বরাবরই খুব সদ্ভাব ছিল; দেশী অধ্যাপকদের ত ছিলই। অথচ তিনি ইংরেজ অধ্যাপক-দের হাতের পুতুল ছিলেন না; তিনি যেমন শান্ত ও ধৈর্য্যশীল ছিলেন, তেম্নি দৃঢ়ও ছিলেন। ছাত্রদিগকে তিনি ভালবাসিতেন ও বিশ্বাস করিতেন; অথচ তাঁহার ব্যবহারে দৃঢ়তার অভাব ছিল না। ছাত্রেরাও তাঁহাকে ভালবাসিত ও বিশ্বাস করিত। সর্ব্বসাধারণে তাঁহার জলন্ত স্বদেশপ্রীতির কথা জানিত। এইসব কারণে তাঁহার কলেজের পর লোকের এরূপ শ্রদ্ধা ছিল, যে ১৯০৭, ১৯১৯, ১৯২০-২১ সালের উত্তেজনা ও সংক্ষোভের সময়েও, যখন প্রধানতঃ ইউরোপীয় অধ্যাপকদের দ্বারা চালিত অন্য অনেক কলেজে ছাত্র ও অধ্যাপকে মনো-মালিন্য ও সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, তখন, সেণ্ট্ ষ্টিফেন্স্ কলেজে ছাত্র ও অধ্যাপকদের মধ্যে পরস্পরে বিশ্বাস টলে নাই। এই কলেজকে কেহ-কেহ "রাজভক্তি-হীন" মনে করিত বটে; কিন্তু ইহা বস্তুতঃ ভারতীয় ও ইংরেজের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন ও রক্ষার কাজই করিয়াছে।

এই সমুদয় কৃতিত্বের মূলে, এবং অসহযোগ আন্দোলনের খুব প্রাদুর্ভাবের সময়ও যে কলেজ ভাঙিয়া যায় নাই তাহার মূলে, প্রধানতঃ ছিল প্রিন্সিপ্যাল রুদ্রের ব্যক্তিত্ব। গবর্ণমেণ্টের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সমুদয় সম্পর্ক ত্যাগ করা হইবে কি না, সে-বিষয়ে রুদ্র মহাশয় ছাত্র ও অধ্যাপকগণকে কলেজেই পুরাপুরি মন খুলিয়া তর্ক-বিতর্ক করিতে দিয়াছিলেন। তাঁহার

ফলে অধিকাংশের মতে পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগ রক্ষা করাই স্থির হয়। এই তর্কবিতর্কের সময় আমরা দিল্লীতে ছিলাম এবং রুদ্র মহাশয়ের মুখে এইসব কথা শুনিয়াছিলাম।

৩৭ বৎসর কলেজের সেবা করিয়া তিনি ১৯২৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে অবসর গ্রহণ করেন। সে-সময় প্রাক্তন ছাত্র, অধ্যাপক, ভিন্ন ভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের লোক সকলে তাঁহার প্রতি প্রীতি শ্রদ্ধা জানাইয়া তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে তাঁহার পুরাতন জাট ছাত্রেরা, বর্ত্তমানে পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রী রায় সাহেব চৌধুরী ছোটু রামের নেতৃত্বে, তাঁহার নিকট আসিয়া বলেন, যে, তাঁহার নামে তাঁহারা একটি বৃত্তি স্থাপনের জন্য টাকা তুলিয়াছেন।

প্রিন্সিপ্যাল রুদ্রের প্রভাবের প্রধান কারণ, যে, তিনি জাতিধর্ম্ম নির্বিশেষে সকলের সহিত সমান ব্যবহার করিতেন।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার বন্ধু ছিলেন।

প্রিন্সিপ্যাল রুদ্র বহু বৎসর দিল্লীর সমাজ-সেবা সংঘের সভাপতি এবং ভারতীয় ছাত্রদের পরামর্শ-দাতা কমিটির সেক্রেটরী ছিলেন।

লালা লাজপৎ রায় বলিয়াছেন, সুশীলকুমার রুদ্র ভারতীয় জাতীয় জীবনে মহত্তম চরিত্রবান্ অন্যতম ব্যক্তি ছিলেন, এবং তাঁহার প্রকৃতিতে হিন্দুর শান্ত স্বভাব, মাধুর্য্য ও আতিথেয়তা সংরক্ষিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে তিনিই প্রথমে তাঁহার সম্প্রদায়ের জন্য কোন বিশেষ রাজানুগ্রহ বা ব্যবস্থাপক সভাদিতে নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক প্রতিনিধি চাহিবার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। তিনি নিজের সমাজের জীবন সমগ্র জাতির ব্যাপকতর জীবনের সহিত মিশাইয়া ফেলিবার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার গৃহ সকল ধর্ম্মের ভারতীয়দের মিলন স্থান ছিল। দিল্লীতে তিনি নীরবে নিজ ভক্ত জীবন যাপন করিতেন, এবং সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাববর্দ্ধন ও শান্তিস্থাপনের চেষ্টা করিতেন।

তিনি স্বার্থত্যাগী সংযত মানুষ ছিলেন। প্রৌঢ়ত্বের পূর্ব্বেই তাঁহার পত্নী বিয়োগ হয়। তাহার পর তিনি আর বিবাহ করেন নাই।

দিল্লীর সকল সম্প্রদায়ের লোক চাহিয়াছিলেন, যে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার মৃতদেহ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য দিল্লীতে আনীত হউক এবং সমারোহের সহিত তথায় সমাধিস্থ হউক। কিন্তু তিনি নিরাড়ম্বর লোক ছিলেন; এইজন্য মৃত্যুর পূর্ব্বে বলিয়া গিয়াছিলেন, যে, সোলনেই যেন তাঁহার দেহ সমাধিস্থ হয়।

কুড়ি বৎসর ধরিয়া তিনি পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সীণ্ডিকেটের সভ্য ছিলেন, এবং লাহোরবাসী হইলে তাঁহাকে ভাইস্-চ্যান্সেলারও করা হইত। তাঁহার সুবিবেচনা ও নিরপেক্ষতায় সকলের এমন বিশ্বাস ছিল, যে, তিনি প্রত্যেকবার নির্বাচনের সময় প্রধানতঃ হিন্দু ও মুসলমান সদস্যদের ভোটের জোরে নির্ব্বাচিত হইতেন।

অধ্যাপক রুদ্র গান্ধী-মহাশয়ের বন্ধু ছিলেন। গান্ধী-মহাশয় দিল্লীতে অনেকবার তাঁহার গৃহে অতিথি-রূপে বাস করিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এণ্ড্রুজ সাহেব সেণ্ট্ স্টীফেন্স কলেজে বহু বৎসর রুদ্রমহাশয়ের সহকর্ম্মী ছিলেন।

অধ্যাপক রুদ্র খৃষ্টীয় ধর্ম্মে প্রগাঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বের কয়েকদিন তিনি দুঃসহ রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন। ভগবদ্ভক্তি তাঁহাকে এই যন্ত্রণা ধৈর্য্যের সহিত সহ্য করিতে সমর্থ করিয়াছিল।

তাঁহার মৃত্যুর পর লাহোরে তাঁহার ভূতপূর্ব্ব ছাত্রেরা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনার্থ সভা করিয়াছিলেন।

তিনি লর্ড্ হার্ডিঞ্জের সময়ে দিল্লীর বিপ্লবীদের কোন-কোন গোপনীয় কথা শিক্ষকরূপে জানিতে পারিয়াছিলেন, এবং যুবকদিগকে বিপথ হইতে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু অনুরুদ্ধ বা আদিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও যুবকদের বিশ্বাসভাজন শিক্ষকরূপে যাহা জানিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, তাহা কখনও প্রকাশ করেন নাই। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যখন তিনি কিছুকাল শান্তিনিকেতনে বাস করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার মুখে আমরা ইহা শুনিয়াছিলাম।

তাঁহার প্রকৃতির কিঞ্চিৎ পরিচায়ক কয়েকটি সামান্য কথা এখন মনে পড়িতেছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমরা দিল্লী দেখিতে গিয়া সপরিবারে পঞ্জাব হিন্দু-হোটেলে

ছিলাম। তথাকার অন্য বাঙালী ভদ্রলোকদের সঙ্গে তাঁহারও সহিত একদিন সন্ধ্যাকালে তথাকার বাংলা-লাইব্রেরীতে কথোপকথনের সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। তাঁহার কলেজের বিশেষ প্রয়োজনীয় একটি সভার অধিবেশনের সময় ঐ সন্ধ্যাতেই নির্দ্দিষ্ট থাকা সত্ত্বেও তিনি প্রবাসী বাঙালীদের সামাজিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তাহার পরদিন রাত্রি প্রায় সাড়ে নয়টার সময় পঞ্জাব হিন্দু-হোটেলে আমাদের কাম্‌রার দরজায় কে মৃদু করাঘাত করিতেছেন শুনিয়া কপাট খুলিয়া দেখি রুদ্র মহাশয়! এত রাত্রে তাঁহাকে দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করায় তিনি বলিলেন, যে, আমার বিরুদ্ধে তাঁহার একটা নালিশ আছে, তাহা তিনি আগে জানাইবার সুযোগ পান নাই, এক্ষণে জানাইতে চান। তাহার পর বলিলেন, "আপনি জানেন, আমি এখানে থাকি, ও আমার একটা বাড়ী আছে, এবং ইহাও জানেন, যে, আপনি ইচ্ছা করিলে স্বতন্ত্র পাকের বন্দোবস্তও করিতে পারিতেন। অথচ আপনি হোটেলে আছেন। ইহাই আমার নালিশ।" আমি বলিলাম, "স্বতন্ত্র পাকের কোন আবশ্যক হইত না"; কিন্তু তাঁহার অনুযোগের কোন উত্তর দিতে পারিলাম না।

বহু বৎসর পূর্ব্বে সেণ্ট্ স্টীফেন্স কলেজের প্রিন্সিপ্যাল থাকা-কালে তিনি দুখানি মডার্ণ্ রিভিউ লইতেন। উহা প্রেরণের ঠিকানা-সম্বন্ধে কিছু গোলযোগ হওয়ায় তিনি কার্য্যাধ্যক্ষকে চিঠি লেখেন, যে, কলেজের কাগজখানি শুধু প্রিন্সিপ্যাল লিখিলেই পৌঁছিবে, এবং তাঁহার নিজের খানি "বাবু সুশীলকুমার রুদ্র, দিল্লী" লিখিয়া পাঠাইতে হইবে।

গান্ধী মহাশয়ের অবিবেচনা

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের মৃত্যুর পর ভারতীয়-দের চালিত সকল কাগজে এবং সকল শোক-সভায় কেবল তাঁহার সদ্‌গুণাবলীরই উল্লেখ হইতেছে, তাঁহার কার্য্য, কার্য্য-প্রণালী, মত প্রভৃতির কোন সমালোচনা হইতেছে না; কারণ, তাহা সময়োচিত হইবে না। এই হেতু, তৎসংক্রান্ত যাহা-কিছু তর্ক-বিতর্কের বিষয়ীভূত হইয়াছে, তাহার উত্থাপন এখন, বিশেষতঃ শোকসভায়, অবিবেচনার কাজ। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী কলিকাতা ইউ-নিভার্সিটী ইন্‌স্টিটিউটে ছাত্রদের শোকসভায় বলেন, স্বরাজ্যদলের বিরুদ্ধে যে নির্ব্বাচনাদিতে ঘুষ দেওয়ার অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহা অমূলক, এবং কলিকাতা মিউনিসিপালিটির কাজে আমেরিকার ট্যাম্যানী হলের কার্য্য-প্রণালী অনুসৃত হয় নাই। গান্ধীজি যাহা বলিয়াছেন, তাহার সত্যাসত্যতার আলোচনা আমরা এখন করিব না; কিন্তু যে-বিষয়গুলি দেশবন্ধুর মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্ব্বপর্য্যন্ত খবরের কাগজে তর্ক বিতর্কের বিষয় ছিল, শোকসভায় তাহার উল্লেখ ও বিপক্ষের মতের প্রতিবাদ সময়ানুচিত হইয়াছে।

মহাত্মা গান্ধী আর-একটি বিষয়ে অবিবেচনার কাজ করিয়াছেন। তিনি ফতোআ দিয়াছেন, স্বরাজ্যদলের নেতাকেই কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর মেয়র নির্ব্বাচন করা উচিত। স্বরাজ্যদলের নেতা যদি এই কাজের জন্য উপযুক্ততম লোক হন, তাহা হইলে অবশ্যই তাঁহাকে নির্ব্বাচন করা উচিত, স্বরাজী হওয়াটা অযোগ্যতার অন্যতম কারণ হইতে পারে না। কিন্তু এরূপ কোন আইন নাই, যে, স্বরাজীকেই কলিকাতার মেয়র করিতে হইবে; বিধির বিধানও ইহা নহে, যে, স্বরাজী হইলেই মেয়রের কাজে যোগ্যতম ব্যক্তি হইবে। তা-ছাড়া, কলিকাতার কৌন্সিলারদেরই মেয়র নির্ব্বাচন করিবার কথা। তাঁহাদের মধ্যে স্বরাজীরা অবশ্য দাসখত লিখিয়া দিয়াছেন, যে, মেয়র প্রভৃতির নির্ব্বাচনে তাঁহারা বঙ্গীয়-প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির নির্দ্ধারণ-অনুসারে কাজ করিবেন। কিন্তু স্ব-রাজ স্থাপনের প্রধান উদ্যোগী মহাত্মা গান্ধীর কি অপর সকলকে পরহস্তচালিত স্ব বিহীন যন্ত্রের মত কাজ করিতে উপদেশ দেওয়া বা হুকুম করা উচিত? এ কি-রকম স্ব-রাজ, যে, স্থানীয় নির্ব্বাচকেরা নিজ নিজ বিবেক-বুদ্ধি, বিবেচনা-অনুসারে কাজ না করিয়া অন্যের নির্দ্দেশ-অনুসারে যন্ত্রবৎ কাজ করিবে?

স্বরাজীরা কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর কাজ ভাল করিয়া চালাইতেছে কি না, তাহারা কার্য্যভার গ্রহণ কালে যাহা-যাহা করিবে বলিয়াছিল, তাহা করিতে পারিয়াছে কি না, ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য মহাত্মা গান্ধীর

দেশবন্ধু দাশ ও তাঁহার পরিবারবর্গ। বামদিক্ হইতে—শ্রীমতী কল্যাণী দেবী (কনিষ্ঠা কন্যা), শ্রীযুক্তা হালদার শ্রীমতী বাসন্তী দেবীর মাতা), শ্রী চিররঞ্জন দাশ, শ্রীমতী বাসন্তী দেবী, শ্রীমতী অর্পণা দেবী (জ্যেষ্ঠা কন্যা)। দাঁড়াইয়া)—দেশবন্ধু দাশ ও শ্রীযুক্ত সুধীর রায় (জ্যেষ্ঠ জামাতা)।

জানিবার কথা নহে, জানিতে হইলে যত সময় দিতে হয়, তত অবসর গান্ধীজির নাই। অথচ এই বিষয়ে তিনি মত প্রকাশ করিয়া ফতোআ জারী করিয়া বসিলেন। তিনি সর্ব্বজ্ঞতার দাবী করেন না, জানি; কিন্তু তিনি আর্ট্, চিকিৎসা, হিন্দুশাস্ত্র, সমাজবিজ্ঞান, বংশানুক্রমতত্ত্ব, প্রভৃতি নানাবিষয়ে এমন দ্বিধাশূন্যভাবে মত প্রকাশ করেন, যাহা কেবল ঐ-ঐ বিষয়ের বিশেষজ্ঞের মুখেই শোভা পায়। অবশ্য, যাহারা সকল বিষয়েই তাঁহার মত জানিতে চায়, তাহাদেরও দোষ আছে।

—

শ্রীযুক্ত রাধিকামোহন লাহিড়ী

রায় বাহাদুর রাধিকামোহন লাহিড়ী মহাশয়ের মৃত্যুতে বাংলাদেশ একজন সহৃদয় অকপট কর্ম্মী হারাইয়াছে। তিনি কার্য্যদক্ষতাগুণে ডাক-বিভাগে সহকারী

শ্রীযুক্ত রাধিকামোহন লাহিড়ী

ডিরেক্টর জেনার‍্যাল্ হইয়াছিলেন। সরকারী কাজ হইতে অবসর লইয়া তিনি দেশের সেবায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। গ্রামসকলের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য তিনি আন্তরিক চেষ্টা করিতেন। সমবায়-সমিতি স্থাপন ও পরিচালনের জন্য যে প্রতিষ্ঠান আছে, তিনি তাহার অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন। সমাজ-সংস্কার কার্য্যে তিনি উৎসাহী ও উদ্যোগী ছিলেন। বালিকা-বিধবাদের পুনর্ব্বিবাহ দান, অস্পৃশ্যতা-দূরীকরণ, প্রভৃতি কাজে তাঁহার আগ্রহ ছিল। তিনি ফরিদপুর জেলার কড়কদি গ্রামের অধিবাসী। উহার উন্নতির জন্য বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। উহার জলাশয় সকল হইতে কচুরী পানা তুলিয়া নষ্ট করিতে তিনি সকলকে অনুরোধ করিতেন। একখানি খবরের কাগজে পড়িয়াছি, এ-বিষয়ে সকলকে দৃষ্টান্ত দ্বারা উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত তিনি স্বয়ং এই কাজ করিতে গিয়া জরাক্রান্ত হন, এবং সেই জ্বরেই তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইয়াছে।

লর্ড্ রেডিঙের বাজে কথা

যে রেডিং-সহর বিস্কুটের জন্য বিখ্যাত ও যাহার নাম-অনুসারে তাঁহার উপাধির নাম হইয়াছে, লর্ড্ রেডিং কিছুদিন হইল, তথায় একটি বক্তৃতা করিয়া ইংরেজ-জাতির নানা গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন।

ইংরেজদের অনেক সদ্‌গুণ আছে। অনেক ইংরেজ কবি ও অন্যান্য লেখকদের নিকট আমরা জ্ঞান ও আনন্দের জন্য ঋণী। অন্য-প্রকারের কোন কোন ইংরেজকেও আমরা ভালবাসি ও শ্রদ্ধা করি। সেই কারণে এবং বিশেষতঃ অনর্থক কাহারও দোষোদ্‌ঘাটন করিতে ভাল লাগে না বলিয়া আমরা কোনজাতির দোষ দেখাইতে ব্যগ্র নহি; যদিও সাংবাদিকের কর্ত্তব্যই এরূপ, যে, তাহাকে প্রায় বিশ্বনিন্দুক হইয়া উঠিতে হয়। তথাপি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইংরেজ জাতির যে-প্রশংসা পাওনা নহে, তাহা কেহ তাহাদিগকে দিলে, নীরব থাকা উচিত নহে বলিয়া আমাদিগকে লর্ড্ রেডিঙের বক্তৃতা-সম্বন্ধে দু-এক কথা বলিতে হইতেছে। ইংরেজদের যে সব গুণের উল্লেখ তিনি করেন, নীচে তাহার কয়েকটি মুদ্রিত হইল।

"A spirit of fairplay, a determination to keep promises, a desire to understand the people amongst whom they ruled and a determination to administer with tenacity of purpose."

তাৎপর্য্য। "সকলকে সমান সুযোগ দান এবং সকলের প্রতি ন্যায়ানুগত ব্যবহার করিবার প্রবৃত্তি, অঙ্গীকার পালন করিবার প্রতিজ্ঞা, তাহারা যাহাদের মধ্যে কর্তৃত্ব করে তাহাদিগকে বুঝিবার ইচ্ছা, এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সহিত শাসনকার্য্যনির্ব্বাহের উদ্দেশ্যে অবিচলিত থাকা।"

এই গুণগুলির মধ্যে শেষটির অস্তিত্ব আমরা স্বীকার করি। যেন-তেন প্রকারেণ আমাদিগকে শাসন তাঁহারা প্রলয়-কাল পর্য্যন্ত করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, আমাদিগকে (অবশ্য আমাদিগেরই হিতের জন্য) কখনও নিজেদের দেশে কর্ত্তা হইতে না দিতে তাঁহারা স্থিরসংকল্প, ইহা অবশ্যস্বীকার্য্য। সেনাপতি ডায়ারের অবদান, বিনা বিচারে মানুষের স্বাধীনতা হরণ, প্রভৃতি নানা কাজে ইহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

সামরিক ও অসামরিক নানা সর্‌কারী কাজে, ফৌজদারী বিচারে, রেল-ষ্টিমারে, পথেঘাটে, কলকার্‌খানায় ও বাণিজ্যে, শিক্ষায় ভারতীয়েরা কেমন সমান সুযোগ ও ন্যায়ানুগত ব্যবহার পায়, তাহা বলা অনাবশ্যক।

ভারত-সম্বন্ধে অঙ্গীকার পালনটা ইংরেজ গবর্ণ্‌মেণ্ট ও জাতির দুর্ব্বলতা বলিয়া আমরা কোন প্রমাণ পাই নাই; অ-ইংরেজ কোন বিদেশী জাতিও পায় নাই। ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড্‌ লিটন একবার লিখিয়াছিলেন, যে অঙ্গীকারের কথা উচ্চারণ করিয়া তাহা পালন না-করা ব্রিটিশ গবর্ণ্‌মেণ্টের একটা দোষ; লর্ড্‌ রেডিং কি তাহা জানেন না? না, জানেন বলিয়াই সেটা চাপা দিবার জন্য তাহার উল্টা কথা বলিতেছেন?

ঈস্ট্‌ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে ডিরেক্টর্‌রা জাতিবর্ণ-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে ভারতের উচ্চ কাজে সকলকে নিযুক্ত করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা পালিত হয় নাই; মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্র-অনুসারে কাজ হয় নাই, ইত্যাদি প্রাচীন কাহিনীর উল্লেখ আমরা করিতে চাই না। কিন্তু ১৯১৭ সালে "দায়ী গবর্ণ্‌মেণ্ট্‌" দিবার অঙ্গীকার ব্রিটিশ গবর্ণ্‌মেণ্ট্‌ করিয়াছিলেন, তাহার পর সম্রাট্‌ পঞ্চম জর্জ "আমার সাম্রাজ্যের মধ্যে স্বরাজ" দিবার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। ভূতপূর্ব্ব ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীরূপেই কিন্তু বর্ত্তমান সংস্কৃত শাসন-প্রণালীটাকে একটা এক্স্‌পেরিমেণ্ট্‌ বলিয়াছেন, অন্য উচ্চপদস্থ কোন-কোন রাজপুরুষও এইরূপ কথা বলিয়াছেন। কোন প্রতিজ্ঞার কথা তাঁহারা জানেন না। তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন, চির-শিশু ভারতীয়েরা সাবালক হইবার কোন লক্ষণ দেখাইতেছে কি না; তাহার কোন চিহ্ন দেখিতে যাইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই আমাদিগকে ক্রমে-ক্রমে (একেবারে নয়!) আত্মকর্তৃত্ব দিবেন। কিন্তু আমাদের মধ্যে সাবালকের মত চিন্তা ও কর্ম্মশক্তির বিকাশ যাঁহাদের স্বার্থসিদ্ধির অন্তরায় এবং সুতরাং আমাদের যোগ্যতার প্রতি অন্ধ থাকিতে স্বভাবতঃ যাঁহাদের প্রবৃত্তি আছে, বলা বাহুল্য তাঁহাদের বিচারে আমরা ফেল্‌ই হইব, পাস্‌ হইব না। সুতরাং সংস্কৃত শাসন-প্রণালীটাকে একটা এক্স্‌পেরিমেণ্ট্‌ মাত্র বলিয়া প্রতিজ্ঞাভঙ্গের নৈরাশ্যটা আমাদের একটু গা-সহা করা হইতেছে; অর্থাৎ আমরা যাহাতে একেবারে আকাশ হইতে না পড়ি।

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা খুলিবার দিনে ব্রিটিশ গবর্ণ্‌মেণ্ট কর্তৃক বিলাত হইতে প্রেরিত উহার প্রতিনিধি রাজ-খুল্লতাত ডিউক্‌ অভ্‌ কনট বলেন, the principle of autocracy has been abandoned," "একনায়কত্বের নীতি পরিবর্জ্জিত হইয়াছে"। কিন্তু সবাই দেখিতেছেন, এখনও পূর্ব্বেরই মত কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম হইতেছে, এখনও জবরদস্ত শাসন ও জুলুমবাজী চলিতেছে, ব্যবস্থাপক সভার নির্দ্ধারণ বা সুপারিশ অনুসারে কাজ হইতেছে না, ইত্যাদি। ১৯২১ সালে স্যার্‌ ম্যাল্‌কম্‌ হেলী ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভাকে বলেন, "If we impose taxation; it will be by your vote," "আমরা যদি ট্যাক্স্‌ বসাই, তাহা হইলে তাহা আপনাদের মত-অনুসারেই হইবে।" লবণের ট্যাক্স্‌ দ্বিগুণিত হইয়াছে ব্যবস্থাপক সভার মতের বিরুদ্ধে। বেশী দৃষ্টান্ত দিবার প্রয়োজন নাই। ভারতীয় রাজকোষের অবস্থা ভাল হইলেই ভারত-জাত কার্পাস-পণ্যের উপর শুল্ক উঠাইয়া দিতে লর্ড্‌ হার্ডিং স্পষ্ট ভাষায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন; কিন্তু

২জেটে ব্যয় অপেক্ষা আয় বেশী হওয়া সত্ত্বেও সে-প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হয় নাই। সামরিক কলেজস্থাপনের পরিষ্কার প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হয় নাই। ইত্যাদি।

আমাদিগকে বুঝিবার চেষ্টা যে ইংরেজরা কিরূপ করে, তাহা ভারতবর্ষ-সংক্রান্ত উচ্চপদে অধিষ্ঠিত রাজপুরুষদের ভারতীয় নানা বিষয়ের কথা-সম্বন্ধেও অজ্ঞতা দ্বারা জানিতে পারা যায়। আমরা খুব সোজা ইংরেজীতে আমাদের মনের ভাব ও আকাঙ্ক্ষা ও দুঃখ জানাইলেও ইংরেজরা তাহাতে কর্ণপাত করে না; বলে, ওটা ক্ষুদ্র শ্রেণী-বিশেষের স্বার্থসিদ্ধির ইচ্ছা-প্রণোদিত। কিন্তু ইংরেজদের এই একটা ভারি অদ্ভুত শক্তি আছে, যে, তাহারা "ডাম্ মিলিয়নস্" অর্থাৎ মূক নিযুতদের মনের কথা অজ্ঞাত অনির্ব্বচনীয় উপায়ে জানিতে পারে এবং তজ্জন্য তাহাদের মঙ্গলের জন্য প্রাণপাত করে—যদিও এরূপ অলৌকিক আত্মোৎসর্গ-সত্ত্বেও ভারতবর্ষের মত দুর্ভিক্ষ, প্লেগ, নিরক্ষরতা, নগ্নতা, কৃশতা, অনাগারিতা, কোনও সভ্য বা অসভ্যদেশে একত্র সমাবিষ্ট দেখা যায় না।

স্যার্ ব্যাম্‌ফিল্ড ফুলার ভারতীয়দিগের পক্ষে টানিয়া কোন কথা বলিবার লোক নহেন। তিনি "Studies of Indian Life and Sentiment" নামক বহিতে কি লিখিয়াছেন দেখুন :—

"Young British officials go out to India most imperfectly equipped for their responsibilities. They learn no law worth the name, a little Indian history, no political economy, and gain a smattering of one Indian vernacular. In regard to other branches of the service, matters are still more unsatisfactory. Young men who are to be police officers are sent out with no training whatever, though for the proper discharge of their duties an intimate acquaintance with Indian life and ideas is essential. They land in India in absolute ignorance of the language. So also with forest officers, medical officers, engineers, and (still more surprising) educational officers...It is hardly too much to say that this is an insult to the intelligence of of the country.

তাৎপর্য্য। "ব্রিটিশ ছোকরা কর্ম্মচারীরা তাহাদের দায়িত্বপালনের জন্ত অসম্পূর্ণতম মানসিক সজ্জা লইয়া ভারতে যায়। তাহারা উল্লেখের অযোগ্য সামান্ত আইন, অল্প একটু ভারতেতিহাস, অর্থনীতি একটুও না, এবং একটা ভারতীয় ভাষার অতি অল্প-কিছু শিখে। পুলিশের কাজ করিতে যুবকদিগকে ঐ কাজের কোন শিক্ষা না দিয়াই পাঠান হয়, যদিও তাহাদের কর্ত্তব্যের যথোচিত নির্ব্বাহের জন্ত ভারতীয় জীবন ও ভাবের ঘনিষ্ঠ জ্ঞান একান্ত আবশ্যক। ভারতীয় ভাষা-সম্বন্ধে পূর্ণ অজ্ঞতা লইয়া তাহারা ভারতে পদার্পণ করে। অরণ্য, চিকিৎসা, পূর্ত্ত এবং (আরও বিস্ময়কর) শিক্ষা-বিভাগের কর্ম্মচারীরাও এইরূপ। দেশের বুদ্ধিমান্ শ্রেণীর লোকদের ইহা দ্বারা অপমান করা হয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না।"

এলাহাবাদের এংলোইণ্ডিয়ান্ কাগজ পাইয়োনায়ার একবার লিখিয়াছিল :—

"It may be affirmed without fear of contradiction, that there are less than a score of English civilians in these provinces who could read unaided, with fair accuracy and rapidly, even a short article in a vernacular newspaper, or a short letter written in the vernacular: and those who are in the habit of doing this, or could do it with any sense of ease or pleasure could be counted on the fingers of one hand."

তাৎপর্য্য। "ইহা বলিলে প্রতিবাদের কোন ভয় নাই, যে, এই প্রদেশে কুড়ি জনেরও কম ইংরেজ সিভিলিয়ান্ আছেন যাঁহারা চলনসই বিশুদ্ধতার সহিত বিনা সাহায্যে একটি দেশী ভাষার সংবাদপত্রে ছোট প্রবন্ধ বা দেশ ভাষায় লিখিত একটি ছোট চিঠি দ্রুত পড়িতে পারেন; এবং যাঁহারা ইহা করিতে অভ্যস্ত কিম্বা যাঁহারা ইহা অনায়াসে বা সাহ্লাদে ইহা করিতে পারেন, তাঁহাদিগকে এক হাতের আঙুলে গুনা যায়।"

ইংরেজদের পক্ষপাতী ইংরেজদিগেরই দ্বারা লিখিত এইসব কথা হইতে কি মনে হয়, যে, ইংরেজজাতি তাহাদের শাসনাধীন লোকদিগকে বুঝিতে ইচ্ছুক ?

শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন দেব বর্ম্মা

পরলোকগত প্যারীমোহন দেব বর্ম্মা বিখ্যাত লোক ছিলেন না, যদিও দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারিলে তিনি বিজ্ঞান-রসিক লোকদের মধ্যে যশ লাভ করিতে পারিতেন। উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানের বিস্তৃত জ্ঞানলাভ করিয়া উহাতে গবেষণা করিবার আন্তরিক ইচ্ছা তাঁহার ছিল, এবং তিনি নিজের চেষ্টা-প্রসূত অনেকগুলি প্রবন্ধ রচনা করিয়া স্বদেশে ও বিদেশে নানা কাগজে প্রকাশিত করিয়াছিলেন।

মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স চল্লিশ হইয়াছিল। তিনি ত্রিপুরা রাজ্যের এক সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি-এস্‌সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তিনি বোটানিক্যাল সার্ভে-বিভাগে প্রথমে অস্থায়ীভাবে ও পরেস্থায়ী ভাবে সহকারী নিযুক্ত হন। তিনি ঐ কাজই শিবপুরের কোম্পানীর বাগানে থাকিয়া করিতেন। তাঁহার অনেক প্রবন্ধ, নেচার্, জার্ন্যাল্ অব্ হেরিডিটি, জার্ন্যাল্ অব্ ইণ্ডিয়ান্ বটানি,

মডার্ণ-রিভিউ, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, কৃষক, প্রভৃতি কাগজে বাহির হইয়াছিল। তিনি লণ্ডনের লিনিয়ান্ সোসাইটী ও রয়্যাল্ এসিয়াটিক্ সোসাইটীর এবং আমেরিকার জেনেটিক্ এসোসিয়েশ্যন্ প্রভৃতির সভ্য ছিলেন।

শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন দেব বর্ম্মা

ত্রিপুরা রাজ্যের উত্তরাংশে কৈলা-সহর-নামক উপ-বিভাগে এক পর্ব্বত-শৃঙ্গে অবস্থিত উনকোটি-তীর্থ নামক প্রাচীন তীর্থ-সম্বন্ধে তিনি একটি পুস্তিকা প্রকাশিত করিয়াছিলেন। মেজর বামনদাস বসু-প্রণীত ভারতীয় ভেষজ-সম্বন্ধীয় গ্রন্থের নূতন সংস্করণ বাহির করিবার নিমিত্ত উদ্ভিদ-বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় অংশে তিনি গ্রন্থকারকে সাহায্য করিতেছিলেন। ত্রিপুরা-রাজ্যের উদ্ভিদসমূহ-সম্বন্ধে তিনি একটি বৃহৎ বহি লিখিতে আরম্ভ করেন। নিজের ব্যয়ে পাহাড়ে-পাহাড়ে ঘুরিয়া তিনি নানা উদ্ভিদের বিস্তর নমুনা সংগ্রহ করেন, এবং তাহার কতকগুলি গবর্ণ্মেণ্ট্‌কে উপহার দিয়া প্রশংসাপত্র লাভ করেন। এই বহিটি শেষ করিয়া যাইতে পারিলে তাঁহার একটি কীর্ত্তি থাকিত।

—

সাম্রাজ্যিক প্রেস্ কন্‌ফারেন্সে ভারতের প্রতিনিধি

অষ্ট্রেলিয়াতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সংবাদপত্রসমূহের স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদকদিগের এক কন্‌ফারেন্স্ বসিবে। লণ্ডনের টাইম্‌স্ কাগজ গত ৯ই জুন তারিখের সংখ্যায় খবর দিতেছেন, যে, ইহাতে বিলাতের ত্রিশ, কানাডার আট, নিউজীল্যাণ্ডের চার, দক্ষিণ আফ্রিকার চার, ভারতের দুই, এবং ব্রিটিশ ওয়েস্ট্ ইণ্ডীজের, সিঙ্গাপুরের ও মাল্টার এক-এক জন করিয়া প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিবে। ভারত-বর্ষের জন্য নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ত যথেষ্ট নহেই; তাহার উপর প্রতিনিধি হইবেন ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্ কাগজের মিষ্টার্ মূর্ এবং রেঙ্গুন গেজেটের মিষ্টার্ স্মাইল্‌স্। বেসর্‌কারী ব্যাপারেও পরাধীন দেশের প্রতিনিধি হইবে ইংরেজ। আশা করি জেনিভায় আফিং কন্‌ফারেন্সে ক্যাম্বেল্ নামক মনুষ্যটির মত মিষ্টার্ মূর্ ও স্মাইল্‌স্‌ও ভারতীয় মানুষদেরই প্রতি-নিধি বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিবেন! বোম্বাইয়ের, কলিকাতার ও দিল্লীর সাংবাদিক সমিতিগুলি কি বলেন?

—

রবীন্দ্রনাথের প্রতি সরকারী নেক্‌নজর্

গত মহাযুদ্ধের সময় বিদেশ হইতে ডাকে যাহাদের চিঠিপত্র যত আসিত, তাহা সেন্সর্-নামক সর্‌কারী কর্ম্ম-চারীর আফিসে খোলা হইত এবং পরে কোন-কোন চিঠি মালিককে দেওয়া হইত, কোনটা বা দেওয়া হইত না। প্রবন্ধাদি বাহির হইতে আসিলে তাহাদের সম্বন্ধেও এই-রূপ ব্যবস্থা হইত। যাহা হউক, ইহা গবর্ণ্মেণ্ট্ বলিয়া-কহিয়া প্রকাশ্যভাবে করাইতেন। যুদ্ধান্তে এখনও যে গোপনে এই কাজ হয়, তাহা অনেকেই জানেন না ও সন্দেহ করেন না। কিন্তু এই চমৎকার কাজটি যে এখনও গবর্ণ্-মেণ্টের কোন বিভাগ করিয়া থাকে, তাহার একটি কৌতুকজনক প্রমাণ সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে।

গত ৩রা জুলাই শুক্রবার রবি-বাবু শান্তিনিকেতনে জার্ম্মানী হইতে একটি রেজিষ্টরী চিঠি পান। তৎপূর্ব্বে ২৭শে জুন শান্তিনিকেতনে ইউরোপীয় ডাক বিলি হইয়া-ছিল; ঐ চিঠিখানি রেজিষ্টরী বলিয়া ২৯শে সোমবার

কিম্বা জোর ৩০শে মঙ্গলবার তাঁহার পাওয়া উচিত ছিল। তাহা না পাইয়া তিনি উহা পাইলেন শুক্রবার ৩রা জুলাই। ইহাই ত সন্দেহের একটি কারণ এবং এরূপ সন্দেহ রবি-বাবুর মধ্যে-মধ্যে আগেও হইত। যাহা হউক, তিনি চিঠির খামটি ছিঁড়িয়া খুলিয়া তাহার মধ্যস্থিত পত্রটি পড়িলেন। উহা যে আগে কেহ খুলিয়াছিল, তাহার কোন চিহ্নই ছিল না। তাহার পর তাঁহার মনে হইল, খামটিতে যেন আরও কিছু রহিয়াছে। তাহা টানিয়া বাহির করিয়া দেখিলেন, উহা একটি বাংলা চিঠি, ঢাকা শহর হইতে ২৬শে জুন এক ভদ্রলোক তাঁহাকে লিখিয়াছেন। ঢাকার ২৬শে জুনের চিঠি শান্তিনিকেতন পৌঁছিল ৩রা জুলাই; ইহাই ত এক রহস্য; তাহার উপর কোন্ জাদুমন্ত্র-বলে উহা জার্মানীর রেজিষ্টরী চিঠির মধ্যে ঢুকিল, তাহা দুর্ভেদ্যতর রহস্য।

আমাদের অনুমান এই, কলিকাতায় কোন দেশরক্ষক সরকারী আফিসে রবীন্দ্রনাথের জার্ম্যান্ চিঠি ও ঢাকাই চিঠি দুই-ই খোলা হইয়াছিল। তাহার পর চিঠি-দুটি আলাদা-আলাদা খামে না পুরিয়া অসাবধানতাবশতঃ জার্মানীর খামেই পুরিয়া বেমালুম্ বন্ধ করিয়া তাঁহাকে পাঠান হইয়াছে। এরূপ আহাম্মক ও অসাবধান কর্ম্মচারীকে গবর্ণ্মেণ্টের রায়সাহেব বা খাঁসাহেব উপাধি ও পেন্স্যান দিয়া বাড়ী পাঠাইয়া দেওয়া উচিত। কর্ম্মচ্যুত করিলে লোকে পাছে ব্যাপারটার ঠিক্-ঠিক্ খবর পাইয়া যায়, এইজন্য এই পরামর্শ দিতেছি।

রবীন্দ্রনাথ আমাদিগকে ঘটনাটি বলিয়া ঢাকার চিঠি-খানি দিবার সময় পরিহাস করিয়া বলিলেন, যে, এখনও তাঁহার প্রতি (কোন অনামিত কর্ত্তৃপক্ষের বা বিভাগের) শ্রদ্ধা আছে, তাঁহাকে একেবারে (অকর্ম্মণ্য বলিয়া) অগ্রাহ্য করিয়া দেয় নাই!

বস্তুতঃ তাঁহার কিরূপ ভয়ানক ষড়যন্ত্রপূর্ণ চিঠির নকল বা ফোটোগ্রাফ রাখা হইতেছে, তাহা বক্ষ্যমাণ চিঠিটির নিম্নে প্রদত্ত নকল হইতে বুঝা যাইবে। লেখকের নাম ও বাড়ীর ঠিকানা বাদ দিলাম।

Dacca. June 26, 1925.

সবিনয় নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—

এইমাত্র আমার সেই প্রবন্ধটি ফেরত পেলাম, আপনার চিঠি কাল পেয়েছি।

একজন সত্যকার কবিকে বুঝে নিঃশেষ করে ফেলা, বিশেষ করে তাবার তা পুরোপুরি প্রকাশ করা অসম্ভব ব্যাপার। তাঁর সম্বন্ধে যত আলোচনা যত তাত্ত্বিকতা সবই, মোটের উপর "আংশিক" হ'তে বাধ্য। আর আমার বিশ্বাস, এই আংশিক হওয়াতেই সে-সমস্তের সার্থকতা।

তাই আপনি যে লিখেছেন, "ছবিটি মূল বাস্তবের ঠিক্ প্রতিরূপ হইল কি না তাহা বিচারের অধিকার ও সামর্থ্য আমার নাই"—একথার অর্থ পুরোপুরি বুঝে উঠ্‌তে পারলাম না। আরোও গোলমালে পড়েছি এইজন্য যে আপনি লিখেছেন এ-লেখাটি আপনার একটু ভাল লেগেছে।

এসম্বন্ধে কিছু স্পষ্টতর ইঙ্গিত পেলে খুবই অনুগৃহীত হব। আপাততঃ এ-লেখাটি আর ছাপ্‌তে দিলাম না। নিবেদন ইতি—

শ্রদ্ধানুরক্ত

—

কলিকাতার প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল

সেকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইলে দেখা যাইত, প্রথম বিভাগে সকলের চেয়ে কম, দ্বিতীয় বিভাগে তার চেয়ে কিছু বেশী এবং তৃতীয় বিভাগে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ছেলে পাস্ হইয়াছে। এবং সেকালে শতকরা যত ছেলে পাস্ হইত, তাহাও খুব বেশী ছিল্ না। কিন্তু অধুনা অনেক বৎসর হইতে দেখা যাইতেছে, শতকরা পাস্ও হয় বেশী, এবং সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পাস হয় প্রথম বিভাগে, তার পর দ্বিতীয় বিভাগে, ও সকলের চেয়ে কম হয় তৃতীয় বিভাগে। গত দুইবারের ফল দেখা যাক্।

১৯২৪ সালে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১৮৩৪৭। তাহার মধ্যে উত্তীর্ণ হয় ১৪১৪৬ জন; প্রথম বিভাগে ৭৯৭৮, দ্বিতীয় বিভাগে ৫০২৩, তৃতীয় বিভাগে ১১৪৫। শতকরা ৭৭ জনের কিছু বেশী পাস্ হইয়াছিল। ১৯২৫ সালে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১৮৯৫৮। তাহার মধ্যে পাস্ হইয়াছে ১৩৯৭৫; শতকরা ৭৪·২। প্রথম বিভাগে ৮১৫৫, দ্বিতীয় বিভাগে ৫০৯০, তৃতীয় বিভাগে ৭৩০। শুনা যাইতেছে প্রত্যেক ছাত্রকে দয়া করিয়া ইংরেজীতে দশ নম্বর বেশী দিয়া পাসের সংখ্যা ও অনুপাত এইরূপ দাঁড় করাইতে হইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকায় পাশের অনুপাত বেশী হওয়ায় বঙ্গের বাহিরে সর্ব্বত্র এইরূপ একটা ধারণা দেখিতে পাওয়া যায়, যে, কলিকাতার এই পরীক্ষাটা সোজা করিয়া করা হয়, এবং সেইজন্য ইহাতে কেহ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইলেও নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না, যে, সে চলনসই-রকম জ্ঞান-লাভ করিয়াছে। বাংলা দেশেরও অনেক অধ্যাপকের ধারণা এই, যে, আজ-কাল এইরূপ বিস্তর ছেলে কলেজে পড়িতে আসে, যাহারা অধ্যাপকদের ইংরেজী ব্যাখ্যান ও পাঠনা বুঝিতে অসমর্থ। যাঁহারা বর্ত্তমান সময়ে বাংলাদেশে কলেজে শিক্ষা দিতেছেন, তাঁহারা বলিতে পারিবেন আজ-কাল সাধারণতঃ প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের জ্ঞান কতটুকু। যাঁহারা এইসব ছেলেকে ভিন্ন-ভিন্ন-রকমের চাকরী দিয়া তাহাদের কাজ দেখিয়াছেন, তাঁহারাও তাহাদের শিক্ষার উৎকর্ষাপকর্ষের বিচার অনেকটা করিতে পারিবেন।

বর্ত্তমানে ইংরেজী স্কুলসকলে শিক্ষা আগেকার চেয়ে ভাল না মন্দ হইতেছে, বা পূর্ব্বের মতই হইতেছে, তাহা

মডার্ণ-রিভিউ, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, কৃষক, প্রভৃতি কাগজে বাহির হইয়াছিল। তিনি লণ্ডনের লিনিয়ান্ সোসাইটী ও রয়্যাল্ এসিয়াটিক্ সোসাইটীর এবং আমেরিকার জেনেটিক্ এসোসিয়েশ্যন্ প্রভৃতির সভ্য ছিলেন।

শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন দেব বর্ম্মা

ত্রিপুরা রাজ্যের উত্তরাংশে কৈলা-সহর-নামক উপ-বিভাগে এক পর্ব্বত-শৃঙ্গে অবস্থিত উনকোটি-তীর্থ নামক প্রাচীন তীর্থ-সম্বন্ধে তিনি একটি পুস্তিকা প্রকাশিত করিয়াছিলেন। মেজর বামনদাস বসু-প্রণীত ভারতীয় ভেষজ-সম্বন্ধীয় গ্রন্থের নূতন সংস্করণ বাহির করিবার নিমিত্ত উদ্ভিদ-বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় অংশে তিনি গ্রন্থকারকে সাহায্য করিতে-ছিলেন। ত্রিপুরা-রাজ্যের উদ্ভিদ্‌সমূহ-সম্বন্ধে তিনি একটি বৃহৎ বহি লিখিতে আরম্ভ করেন। নিজের ব্যয়ে পাহাড়ে-পাহাড়ে ঘুরিয়া তিনি নানা উদ্ভিদের বিস্তর নমুনা সংগ্রহ করেন, এবং তাহার কতকগুলি গবর্ণ্‌মেণ্ট্‌কে উপহার দিয়া প্রশংসাপত্র লাভ করেন। এই বহিটি শেষ করিয়া যাইতে পারিলে তাঁহার একটি কীর্ত্তি থাকিত।

—

সাম্রাজ্যিক প্রেস্ কন্‌ফারেন্সে ভারতের প্রতিনিধি

অষ্ট্রেলিয়াতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সংবাদপত্রসমূহের স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদকদিগের এক কন্‌ফারেন্স্ বসিবে। লণ্ডনের টাইম্‌স্ কাগজ গত ৯ই জুন তারিখের সংখ্যায় খবর দিতেছেন, যে, ইহাতে বিলাতের ত্রিশ, কানাডার আট, নিউজীল্যাণ্ডের চার, দক্ষিণ আফ্রিকার চার, ভারতের দুই, এবং ব্রিটিশ ওয়েস্ট্ ইণ্ডীজের, সিঙ্গাপুরের ও মাণ্টার এক-এক জন করিয়া প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিবে। ভারত-বর্ষের জন্য নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ত যথেষ্ট নহেই; তাহার উপর প্রতিনিধি হইবেন ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্ কাগজের মিষ্টার্ মূর্ এবং রেঙ্গুন গেজেটের মিষ্টার্ স্মাইল্‌স্। বেসরকারী ব্যাপারেও পরাধীন দেশের প্রতিনিধি হইবে ইংরেজ। আশা করি জেনিভায় আফিং কন্‌ফারেন্সে ক্যাম্বেল্ নামক মনুষ্যটির মত মিষ্টার্ মূর্ ও স্মাইল্‌স্‌ও ভারতীয় মানুষদেরই প্রতি-নিধি বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিবেন! বোম্বাইয়ের, কলিকাতার ও দিল্লীর সাংবাদিক সমিতিগুলি কি বলেন?

রবীন্দ্রনাথের প্রতি সরকারী নেক্‌নজর্

গত মহাযুদ্ধের সময় বিদেশ হইতে ডাকে যাহাদের চিঠিপত্র যত আসিত, তাহা সেন্সর্-নামক সরকারী কর্ম্ম-চারীর আফিসে খোলা হইত এবং পরে কোন-কোন চিঠি মালিককে দেওয়া হইত, কোনটা বা দেওয়া হইত না। প্রবন্ধাদি বাহির হইতে আসিলে তাহাদের সম্বন্ধেও এই-রূপ ব্যবস্থা হইত। যাহা হউক, ইহা গবর্ণ্‌মেণ্ট্ বলিয়া-কহিয়া প্রকাশ্যভাবে করাইতেন। যুদ্ধান্তে এখনও যে গোপনে এই কাজ হয়, তাহা অনেকেই জানেন না ও সন্দেহ করেন না। কিন্তু এই চমৎকার কাজটি যে এখনও গবর্ণ্-মেণ্টের কোন বিভাগ করিয়া থাকে, তাহার একটি কৌতুকজনক প্রমাণ সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে।

গত ৩রা জুলাই শুক্রবার রবি-বাবু শান্তিনিকেতনে জার্ম্মানী হইতে একটি রেজিষ্টরী চিঠি পান। তৎপূর্ব্বে ২৭শে জুন শান্তিনিকেতনে ইউরোপীয় ডাক বিলি হইয়া-ছিল; ঐ চিঠিখানি রেজিষ্টরী বলিয়া ২৯শে সোমবার

কিম্বা জোর ৩০শে মঙ্গলবার তাঁহার পাওয়া উচিত ছিল। তাহা না পাইয়া তিনি উহা পাইলেন শুক্রবার ৩রা জুলাই। ইহাই ত সন্দেহের একটি কারণ এবং এরূপ সন্দেহ রবি-বাবুর মধ্যে-মধ্যে আগেও হইত। যাহা হউক, তিনি চিঠির খামটি ছিঁড়িয়া খুলিয়া তাহার মধ্যস্থিত পত্রটি পড়িলেন। উহা যে আগে কেহ খুলিয়াছিল, তাহার কোন চিহ্নই ছিল না। তাহার পর তাঁহার মনে হইল, খামটিতে যেন আরও কিছু রহিয়াছে। তাহা টানিয়া বাহির করিয়া দেখিলেন, উহা একটি বাংলা চিঠি, ঢাকা শহর হইতে ২৬শে জুন এক ভদ্রলোক তাঁহাকে লিখিয়াছেন। ঢাকার ২৬শে জুনের চিঠি শান্তিনিকেতন পৌঁছিল ৩রা জুলাই; ইহাই ত এক রহস্য; তাহার উপর কোন্ জাদুমন্ত্র-বলে উহা জার্মানীর রেজিষ্টরী চিঠির মধ্যে ঢুকিল, তাহা দুর্ভেদ্যতর রহস্য।

আমাদের অনুমান এই, কলিকাতায় কোন দেশরক্ষক সরকারী আফিসে রবীন্দ্রনাথের জার্ম্যান্ চিঠি ও ঢাকাই চিঠি দুই-ই খোলা হইয়াছিল। তাহার পর চিঠি-দুটি আলাদা-আলাদা খামে না পুরিয়া অসাবধানতাবশতঃ জার্মানীর খামেই পুরিয়া বেমালুম্ বন্ধ করিয়া তাঁহাকে পাঠান হইয়াছে। এরূপ আহাম্মক ও অসাবধান কর্ম্মচারীকে গবর্ণ্মেণ্টের রায়সাহেব বা খাঁসাহেব উপাধি ও পেন্স্যন দিয়া বাড়ী পাঠাইয়া দেওয়া উচিত। কর্ম্মচ্যুত করিলে লোকে পাছে ব্যাপারটার ঠিক্-ঠিক্ খবর পাইয়া যায়, এইজন্য এই পরামর্শ দিতেছি।

রবীন্দ্রনাথ আমাদিগকে ঘটনাটি বলিয়া ঢাকার চিঠিখানি দিবার সময় পরিহাস করিয়া বলিলেন, যে, এখনও তাঁহার প্রতি (কোন অনামিত কর্ত্তৃপক্ষের বা বিভাগের) শ্রদ্ধা আছে, তাঁহাকে একেবারে (অকর্ম্মণ্য বলিয়া) অগ্রাহ্য করিয়া দেয় নাই!

বস্তুতঃ তাঁহার কিরূপ ভয়ানক ষড়যন্ত্রপূর্ণ চিঠির নকল বা ফোটোগ্রাফ রাখা হইতেছে, তাহা বক্ষ্যমাণ চিঠিটির নিম্নে প্রদত্ত নকল হইতে বুঝা যাইবে। লেখকের নাম ও বাড়ীর ঠিকানা বাদ দিলাম।

Dacca. June 26, 1925.

সবিনয় নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—

এইমাত্র আমার সেই প্রবন্ধটি ফেরত পেলাম, আপনার চিঠি কাল পেয়েছি।

একজন সত্যকার কবিকে বুঝে নিঃশেষ করে ফেলা, বিশেষ করে তাবার তা পুরোপুরি প্রকাশ করা অসম্ভব ব্যাপার। তাঁর সম্বন্ধে যত আলোচনা যত তাত্ত্বিকতা সবই, মোটের উপর "আংশিক" হ'তে বাধ্য। আর আমার বিশ্বাস, এই আংশিক হওয়াতেই সে-সমস্তের সার্থকতা।

তাই আপনি যে লিখেছেন, "ছবিটি মূল বাস্তবের ঠিক্ প্রতিরূপ হইল কি না তাহা বিচারের অধিকার ও সামর্থ্য আমার নাই"—একথার অর্থ পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারলাম না। আরোও গোলমালে পড়েছি এইজন্য যে আপনি লিখেছেন এ-লেখাটি আপনার একটু ভালও লেগেছে।

এসম্বন্ধে কিছু স্পষ্টতর ইঙ্গিত পেলে খুবই অনুগৃহীত হব। আপাততঃ এ-লেখাটি আর ছাপ্‌তে দিলাম না। নিবেদন ইতি—

শ্রদ্ধানুরক্ত

—

কলিকাতার প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল

সেকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইলে দেখা যাইত, প্রথম বিভাগে সকলের চেয়ে কম, দ্বিতীয় বিভাগে তার চেয়ে কিছু বেশী এবং তৃতীয় বিভাগে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ছেলে পাস্ হইয়াছে। এবং সেকালে শতকরা যত ছেলে পাস্ হইত, তাহাও খুব বেশী ছিল না। কিন্তু অধুনা অনেক বৎসর হইতে দেখা যাইতেছে, শতকরা পাস্ও হয় বেশী, এবং সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পাস হয় প্রথম বিভাগে, তার পর দ্বিতীয় বিভাগে, ও সকলের চেয়ে কম হয় তৃতীয় বিভাগে। গত দুইবারের ফল দেখা যাক্।

১৯২৪ সালে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১৮৩৪৭। তাহার মধ্যে উত্তীর্ণ হয় ১৪১৪৬ জন; প্রথম বিভাগে ৭৯৭৮, দ্বিতীয় বিভাগে ৫০২৩, তৃতীয় বিভাগে ১১৪৫। শতকরা ৭৭ জনের কিছু বেশী পাস্ হইয়াছিল। ১৯২৫ সালে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১৮৯৫৮। তাহার মধ্যে পাস্ হইয়াছে ১৩৯৭৫; শতকরা ৭৪.২। প্রথম বিভাগে ৮১৫৫, দ্বিতীয় বিভাগে ৫০৯০, তৃতীয় বিভাগে ৭৩০। শুনা যাইতেছে প্রত্যেক ছাত্রকে দয়া করিয়া ইংরেজীতে দশ নম্বর বেশী দিয়া পাসের সংখ্যা ও অনুপাত এইরূপ দাঁড় করাইতে হইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকায় পাশের অনুপাত বেশী হওয়ায় বঙ্গের বাহিরে সর্ব্বত্র এইরূপ একটা ধারণা দেখিতে পাওয়া যায়, যে, কলিকাতার এই পরীক্ষাটা সোজা করিয়া করা হয়, এবং সেইজন্য ইহাতে কেহ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইলেও নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না, যে, সে চলনসই-রকম জ্ঞান-লাভ করিয়াছে। বাংলা দেশেরও অনেক অধ্যাপকের ধারণা এই, যে, আজ-কাল এইরূপ বিস্তর ছেলে কলেজে পড়িতে আসে, যাহারা অধ্যাপকদের ইংরেজী ব্যাখ্যান ও পাঠনা বুঝিতে অসমর্থ। যাঁহারা বর্ত্তমান সময়ে বাংলাদেশে কলেজে শিক্ষা দিতেছেন, তাঁহারা বলিতে পারিবেন আজ-কাল সাধারণতঃ প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের জ্ঞান কতটুকু। যাঁহারা এইসব ছেলেকে ভিন্ন-ভিন্ন-রকমের চাকরী দিয়া তাহাদের কাজ দেখিয়াছেন, তাঁহারাও তাহাদের শিক্ষার উৎকর্ষাপকর্ষের বিচার অনেকটা করিতে পারিবেন।

বর্ত্তমানে ইংরেজী স্কুলসকলে শিক্ষা আগেকার চেয়ে ভাল না মন্দ হইতেছে, বা পূর্ব্বের মতই হইতেছে, তাহা

স্থির করিবার অন্য উপায় নাই। পাসের অনুপাত বেশী হইলেই শিক্ষা খারাপ হইতেছে, বা পরীক্ষা সোজা হইতেছে, নিশ্চিত এরূপ বলা যায় না। এরূপ বলা যাইতে পারে, যে, আগেকার চেয়ে ভাল শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষাদানের সরঞ্জাম-বৃদ্ধি, শিক্ষাদান-প্রণালীর উৎকর্ষ সাধন, প্রভৃতি কারণে আজকাল স্কুলে শিক্ষা ভাল হওয়ায় পাসের হার বাড়িয়াছে। এরূপ তর্কের উত্তর দিতে হইলে কলেজের নিরপেক্ষ অধ্যাপকদের এবং প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের নিযোক্তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা দরকার।

পাসের আধিক্যের সুব্যাখ্যা যাহা হইতে পারে, তাহা বলিলাম; যদিও আমাদের ধারণা এই, যে, এই ব্যাখ্যা হইতে পাসের আধিক্যের প্রকৃত কারণ জানা যায় না। পরীক্ষা সহজ হওয়াটাই আমাদের মতে প্রকৃত কারণ এবং পরীক্ষা সহজ করিবার উদ্দেশ্য অর্থ-লাভ,—অবশ্য আমাদের মত ভ্রান্ত হইতে পারে।

পাসের আধিক্যের একটা সুব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভবপর হইলেও প্রথম বিভাগে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং তৃতীয় বিভাগে সর্ব্বাপেক্ষা কম ছাত্রের উত্তীর্ণ হওয়ার কোন স্বাভাবিক সুব্যাখ্যা আমরা কল্পনা করিতে পারি নাই। ভারতে ও অন্যত্র সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ ছাত্রের সংখ্যা তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ ছাত্রদের সংখ্যা অপেক্ষা কম হইয়া থাকে শুনিয়াছি। কলিকাতায় ইহার ব্যতিক্রমের কারণ কি? যে-কোন বিদ্যা, যে-কোন কাজ লওয়া হউক, দেখা যাইবে উহাতে বিশেষ পারদর্শী লোকের সংখ্যা সাধারণরকম পারদর্শী লোকের সংখ্যা অপেক্ষা কম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই নিয়মের ব্যতিক্রম কি-প্রকারে হইল?

ব্যতিক্রমের কারণ কোন কৃত্রিম প্রয়োজন ও কৃত্রিম উপায় বলিয়া মনে হয়। যাঁহারা ভিতরের রহস্য জানেন, তাঁহাদের কেহ এই কৃত্রিম প্রয়োজন ও উপায় প্রকাশ করিবেন, এ-আশা করিতে পারি না। কিন্তু যদি ব্যতিক্রমের কোন যুক্তিসঙ্গত সুব্যাখা থাকে এবং এই ব্যতিক্রমের দ্বারা ছাত্রদের কোন কল্যাণ সাধিত হয়, তাহা হইলে আমরা তাহা শুনিতে ও সর্ব্বসাধারণকে জানাইতে প্রস্তুত আছি।

—

প্রবেশিকার বাংলা পাঠ্যপুস্তক

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশিকার একটি বাংলা পাঠ্যপুস্তক বাহির করিয়াছেন। ইহা গদ্যপদ্যময়, এবং নানা গ্রন্থকারের রচনাবলী হইতে সংকলিত। পুস্তকখানির ছাপা, কাগজ, আয়তন, বিক্রয়ের নিশ্চিততা এবং ইহার সব পাতাগুলি পরীক্ষার্থীদের পাঠ্য নহে, বিবেচনা করিলে মূল্য বেশী রাখা হইয়াছে মনে হয়। কিন্তু অর্থাগমের প্রতি অধিক দৃষ্টি থাকায় সম্ভবতঃ এবিষয়ে দৃষ্টি পড়ে নাই। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ের উপায়ও বড় কম নহে। ফী-ই কত-রকম লওয়া হয়, তাহার তালিকা ঘোষের ডায়েরী হইতে তুলিয়া দিতেছি, যদিও সকল ফী-র উল্লেখ ইহাতে আছে কি না বলিতে পারি না।

Fees for Examination*

	Rs. A.
Matriculation	15 0
I.A. and I. Sc.	30 0
B.A. and B. Sc. (Pass)	45 0
" " (Hon.)	55 0
M.A. and M.Sc.	80 0
Law (Prel., Inter. or Final)	30 0
Prel. Sc. M.B.	25 0
First M.B. (Pass)	30 0
" " (Hon.)	60 0
Final M.B. Parts I and II (Pass)	50 0
" (Hon.)	80 0
" Part I or II "	30 0
I.E.	30 0
B.E.	40 0
L.T.	30 0
B.T.	40 0
M.D., M.S., M.O, D.P.H., Ph.D., D.Sc., D.L., or M.L.	100 0

Rates of fees.

	Rs. A.
Marks for all Examinations	2 0
Detailed marks for (I.A., I.Sc., B.A., B.Sc., M.A., M.Sc., M.B., or Law)	4 0
Crossed Lists for all Examinations*	0 4
Duplicate Matriculation Certificate	2 0
Duplicate Matriculation Admission Card*	2 0
Duplicate I.A., or I.Sc., Certificate*	4 0
Duplicate Diploma*	5 0
Duplicate Admission Card for I.A., I.Sc., B.A., B.Sc., M.B., Law, etc.*	4 0
Special Matriculation or I.A., or I.Sc., Certificate*	5 0
Provisional Diploma*	5 0
Diploma Fee	5 0
Changing name or surname for College Student †	5 0
Alteration of age-entry †	5 0
Change of Centre for Examinations §	5 0
Certified Copy of application for admission to Examination—*	
Matriculation	2 0
Any other Examination	4 0
Scrutiny of Answer-papers*	10 0
Migration Fee	10 0
Non-Collegiate Students' Fee	10 0

Fees for Registration of students.

	Rs. A.
Registration Fee	2 0
Fee for Duplicate Receipt	1 0
Re-entry Fee	1 0
Registration Certificate	3 0

Fees for Registration of Graduates.

	Rs. A.
Admission	10 0
Admission after due date	20 0
Annual Subscription	10 0

প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট বহিতে সমুদয় বাংলা

---

* *Application should come through the Head of the Institution.*
† *Do. with affidavit and other documentary evidence.*
§ *Do. with a letter of identification.*

লেখকের লেখাই কিছু-কিছু থাকিবে, এরূপ মনে করা অনুচিত। কিন্তু যাঁহাদের লেখা উৎকৃষ্ট, এবং সহজবোধ্যও বটে, তাঁহাদের কাহারও কোন লেখাই উহাতে না থাকিলে এবং তদপেক্ষা নিরেস লেখা থাকিলে খট্‌কা লাগে। যে-সব কবির লেখা বহিটিতে আছে, তাঁহাদের সকলের চেয়েই দ্বিজেন্দ্রলাল রায় নিকৃষ্ট কিম্বা তাঁহার কোন লেখাই ১৪।১৫ বৎসরের ছেলেমেয়েদের পঠনীয় বা বোধগম্য নহে, বলিতে পারি না। কিন্তু তাঁহার কোন কবিতা নির্ব্বাচিত হয় নাই। মহিলা কবিদের মধ্যে শ্রীযুক্তা কামিনী রায়ের স্থান সকলের উপরে; এবং বহিখানিতে যে-সব পুরুষ-কবিদের লেখা দেখিলাম, তাঁহারাও সকলেই তাঁহার চেয়ে বড় কবি নহেন। কিন্তু তাঁহারও কোন উৎকৃষ্ট ও সহজবোধ্য কবিতা পুস্তকটিতে দেখিলাম না। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়েরই বা একেবারে বাদ পড়িবার কারণ কি?

কোন্ কোন্ গদ্য রচনা বা কবিতা বহিটিতে না-থাকা উচিত ছিল, তাহা বলিয়া ভীমরুলের চাকে কাঠি দিতে চাই না। কিন্তু যাহা ভাল পদ্যও নহে, এমন "কবিতা"ও ইহাতে স্থান পাইয়াছে, এবং ছন্দোবদ্ধ উপদেশকে কবিতা মনে করিবার একটা ঝোঁক বহিখানিতে লক্ষিত হয়।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের পড়িবার জন্য বাছিয়া ও বিশেষভাবে "সম্পাদন" করিয়া "পাঠ-সঞ্চয়" নামক একটি বহি প্রকাশ করিতে দিয়াছিলেন। উহা ছাপা হইবার পর কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় তখন উহা মনোনীত করেন নাই; করিলে অবশ্য টাকাটা বিশ্ববিদ্যালয় পাইত না। সম্প্রতি প্রবেশিকার জন্য সংকলিত বহিটিতে রবীন্দ্রনাথের যতগুলি গদ্যরচনা গৃহীত হইয়াছে, সমস্তই "পাঠসঞ্চয়" হইতে লওয়া হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এখন লাভের টাকাটা সমস্তই বিশ্ববিদ্যালয় পাইবে।

যাহাতে সম্প্রদায়বিশেষের ছাত্রদের মনে আঘাত লাগিতে পারে, এরূপ কিছু লেখা বহিটিতে আছে।

—

অষ্ট্রেলিয়ায় ভারতীয়দের পৌর অধিকার

খবর আসিয়াছে, যে, অষ্ট্রেলিয়া-বাসী ভারতীয়দিগকে তথাকার ব্যবস্থাপক সভাদির প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে ভোট দিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে, অষ্ট্রেলিয়ায় মোটে কেবল হাজার দুই ভারতীয় আছে, এবং নূতন কোন ভারতীয় তথায় যাহাতে যাইতে না পারে আইনে এরূপ ব্যবস্থা আছে। তথাপি, এই অধিকার দেওয়া হইয়া থাকিলে ভাল।

—

কুর্দ্ বিদ্রোহীদের ফাঁসী

কুর্দ্‌রা তুর্ক্ নহে, যদিও তাহারা তুর্কের অধীন। উভয় জাতিই মুসলমান। কিন্তু যে-কারণে খৃষ্টিয়ান রুশিয়া ও খৃষ্টিয়ান জার্ম্যানী খৃষ্টিয়ান পোল্যাণ্ডের উপর প্রভুত্ব করিতে অধিকারী ছিল না, সেই কারণে মুসলমান তুর্ক্ মুসলমান কুর্দের উপর প্রভুত্ব করিতে অধিকারী নহে। সেখ্ সৈদের নেতৃত্বে কুর্দ্‌রা স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় নেতার এবং তাঁহার ৪৬ জন অনুচরের তুর্ক্‌রা ফাঁসী দিয়াছে। এই কাজ সাম্রাজ্যবাদীদের নীতিসঙ্গত হইয়াছে, স্বাধীনতাকামীদের উপযুক্ত হয় নাই।

—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার-সাধনের জন্য এবং উহার জন্য যাহা ব্যয় হয়, তাহার সমস্তটি যাহাতে সদ্ব্যয় হয়, তন্নিমিত্ত আমরা মডার্ণ্ রিভিউ ও প্রবাসীতে অনেক বৎসর ধরিয়া লেখালিখি করিতেছি। সংস্কার এখনও হয় নাই, শীঘ্র হইবার কোন লক্ষণ দেখিতেছি না। তথাপি একেবারে আশা ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার-সম্বন্ধে জুলাই মাসের মডার্ণ্ রিভিউ পত্রিকায় অধ্যাপক যদুনাথ সরকারের প্রবন্ধটির প্রতি মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক। ৮ই জুলাই-য়ের ক্যাথলিক হেরাল্ড্ অব্ ইণ্ডিয়া এই প্রবন্ধ-সম্বন্ধে বলিতেছেন:—

"We recommend to the powers that be the article of Prof. Jadunath Sarkar on the Calcutta University. When will the reforms begin at last?"

"অধ্যাপক যদুনাথ সরকারের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধটি প্রভুদিগকে পড়িতে অনুরোধ করি। সংস্কার-কার্য্য কবে আরম্ভ হইবে?"

অমৃতবাজার পত্রিকা ১১ই জুলাই (মফঃস্বল সংস্করণে) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি প্রবন্ধ ছাপিয়াছেন। তাহাতে রাখাল-বাবু দেখাইয়াছেন, যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন-কোন বিভাগে শিক্ষার উৎকর্ষ না কমাইয়া খুব ব্যয়-সংক্ষেপ হইতে পারে। এই প্রবন্ধও প্রণিধানযোগ্য।

—

আব্‌কারীর আয়

প্রবাসীর একজন বন্ধু লিখিয়াছেন—

আষাঢ় মাসের প্রবাসীতে (৪৫০ পৃঃ) বৃটিশ-অধিকৃত ভারতের ভিন্ন-ভিন্ন প্রদেশের আবকারীর আয় দেখান হইয়াছে। উহার সহিত প্রত্যেক প্রদেশের জন প্রতি বার্ষিক কত আবকারীর কর দেয় দেখাইলে আরও সুবিধা হইবে।

প্রদেশ	প্রত্যেক অধিবাসীর দেয় কর টাকা
মাদ্রাজ	১. ২২৩
বোম্বাই	২. ১৫৬
বাংলা	০. ৪৪৭
আগ্রা-অযোধ্যা	০. ২৯০
পঞ্জাব	৫০৩
ব্রহ্মদেশ	৯০৪
বিহার ওড়িশা	৫৩৯
মধ্যপ্রদেশ বেরার	৯৩৯
আসাম	৭৯৬

অর্থাৎ বোম্বাই প্রদেশে প্রত্যেক লোক ২৵১০ দেয় ও আগ্রা প্রদেশে প্রত্যেক লোক ।১২।০ দেয়, বোম্বাই আগ্রা অপেক্ষা ৭.৪৩৪ গুণ বেশী কর দেয়। ভিন্ন-ভিন্ন প্রদেশে এত তারতম্য হইবার কারণ অনুসন্ধান করা উচিত।

—

ভারত-সচিবের বক্তৃতা

ভারত-সচিব লোকের মনে এইরূপ একটা আশা জাগাইয়াছিলেন, যে, তিনি হাউস্ অব্ লর্ড্‌স-এ কিনা অপূর্ব্ব কথাই শুনাইবেন। কিন্তু তাঁহার বক্তৃতা পড়িয়া ভারতবর্ষের মডারেটরাও খুসী হন নাই; কেহ-কেহ ত চটিয়াই লাল হইয়াছেন। উহার শেষ প্যারাগ্রাফে তিনি বলিতেছেন, "মানসনেত্রে, কল্পনার চক্ষে, যাহা আগে হইতে দেখা যায়, এমন কোন ভবিষ্যৎ মুহূর্ত্ত আমি দেখিতে পাইতেছি না যখন আমাদের পক্ষে বা ভারতবর্ষের পক্ষে নিরাপদে আমরা আমাদের অছিত্ব ত্যাগ করিতে পারি।......অনেক পুরুষ ধরিয়া আমাদের পূর্ব্বজগণ যেরূপ করিয়াছেন, আমরাও সেইরূপ, দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সহিত অক্লান্তভাবে সমস্ত হৃদয় দিয়া, ভারতের কল্যাণের জন্ম পরিশ্রম করিতে সংকল্প করিয়াছি।" অর্থাৎ আরব্য উপন্যাসের বৃদ্ধ যেমন সিন্দবাদ নাবিকের ঘাড়ে চাপিয়াছিল, ইংরেজরা চিরকাল সেইরূপ আমাদের ঘাড়ে চাপিয়া থাকিবেন।

তিনি বলিয়াছেন, ম্যাডিম্যান্ কমিটির রিপোর্ট সম্বন্ধে এখনও কিছু ঠিক্ হয় নাই। ভারত গবর্ণমেণ্ট্ ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় লর্ড্ রেডিং ও লর্ড্ বার্কেন্‌হেডের আলোচনার ফল জানাইয়া, উক্ত সভায় তর্ক-বিতর্কের বিবরণ মন্ত্রি-সভাকে জানাইলে তখন কিছু ঠিক্ হইবে। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার মতের উপর কর্ত্তাদের যে কিরূপ শ্রদ্ধা তাহা জানাই আছে। বড়লাট ও ভারত-সচিব যাহা স্থির করেন, মন্ত্রিসভাও সচরাচর তাহাতেই সায় দেন। সুতরাং লর্ড্ বার্কেন্‌হেডের কথার মানে এই দাঁড়ায়, যে, তিনি ও লর্ড্ রেডিং যাহা স্থির করিয়াছেন, কতকগুলা দস্তুর-মোতাবেক প্রক্রিয়ার পর তাহাই ঠিক্ থাকিবে।

তিনি ভারতশাসনসংস্কার আইনটাকে বার-বার (কতবার তাহা গণনা করি নাই) একটা এক্স্‌পেরিমেণ্ট্ বা পরীক্ষা বলিয়াছেন। ম্যাডিম্যান্ কমিটির অধিকাংশ সভ্যের রিপোর্টের উপরই জোর দিয়াছেন। সেনাদলে ভারতীয় অফিসার এখন যেরূপ শম্বুক-গতিতে ঢুকান হইতেছে, তাহা অপেক্ষা দ্রুত কিছু করা হইবে না পরিষ্কার ভাষায় বলিয়াছেন। অসামরিক সমুদয় উচ্চ চাকরী-সম্বন্ধেও এখন যেরূপ ব্যবস্থা আছে, তাহারও যে বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন হইবে না, তাহার আভাস দিয়াছেন। ১৯২৯ সালের আগে, ভয় দেখাইয়া বা বলপ্রয়োগ করিয়া ইংরেজকে আমরা কোন পরিবর্ত্তন করাইতে পারিব না, এই মামুলী ধমকটা দিয়াছেন। তবে, দয়া করিয়া ইহাও বলিয়াছেন, যে পরিবর্ত্তনের দরজাটা একেবারে বন্ধ নাই। ভারতের নেতারা যদি ভাল ছেলের মত সহযোগিতা করেন এবং যাহা দেওয়া হইয়াছে তাহার সদ্ব্যবহার করিবার আন্তরিক ইচ্ছা ও চেষ্টার প্রমাণ দেখান, তাহা হইলে প্রভু ইংরেজের মন নরম হইতেও পারে এবং আরও কিছু বর মিলিতেও পারে। সহযোগিতার মানে একেবারে ইংরেজের পায়ে আত্মসমর্পণ। কোন প্রকার সর্ত্ত বা সমালোচনা করিলে চলিবে না। সমগ্র বক্তৃতাটাতে একটা অসহ্য দর্প ও প্রভুত্বের ভাব দেদীপ্যমান। যাহা-কিছু করা হইয়াছে, সবই ইংলণ্ডের দান (গিফ্‌ট্); আমাদের কোন অধিকার নাই, এবং ইংরেজের মর্জ্জি না হইলে আমরা যাই করি না কেন বিধাতারূপী গবর্ণ্‌মেণ্টের ব্যবস্থাচক্র আর-একটি পাকও ঘুরিবে না।

বক্তৃতাটার সব কথারই জবাব আছে; কিন্তু জবাব দিবার পণ্ডশ্রম করিব না। বাগ্‌যুদ্ধে জিতিয়া কোন ফল নাই। ভারতীয়েরা একতা দ্বারা যদি দেখাইতে পারে, যে, তাহারা মুরুব্বিয়ানা সহ্য করিবে না, তবেই কিছু ফল ফলিতে পারে।

ভারতসচিব আশা দিয়াছেন, ভারতে কৃষির উন্নতির জন্য বিশেষ একটা কিছু করিবেন। তাহা যদি প্রধানতঃ বিস্তর ইংরেজ কর্ম্মচারীর আমদানি, বিলাতী লাঙল, ট্রাক্টর প্রভৃতির আমদানি এবং কৃষিজাত কাঁচা মাল আরও অধিক-পরিমাণে বিলাতে রপ্তানিতে পর্য্যবসিত না হয়, তাহা হইলে ভারতকে সৌভাগ্যবান্ মনে করা যাইতে পারিবে। ভারতে নূতন-নূতন পণ্য-শিল্প প্রবর্ত্তনের ও প্রাচীন পণ্য-শিল্পের পুনরুজ্জীবনের যে বিশেষ প্রয়োজন আছে, এবং তাহা না করিয়া শুধু কৃষির দ্বারা এদেশের আর্থিক অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হইতে পারে না, ভারতসচিব তাহা বলেন নাই; হয়ত বুঝিয়াও বুঝেন না; কারণ ভারতে পণ্য-

শিল্পের উন্নতি ও বিস্তার হইলে ব্রিটেনের একটা বৃহৎ বিক্রয়ের জায়গা আর থাকিবে না।

—

ভারতসচিব ও ছাত্র-সম্প্রদায়

লর্ড্ বার্কেন্‌হেড্ সেন্ট্রাল্ এসিয়ান্ সোসাইটীতে যে-বক্তৃতা করেন, তাহাতে বলেন, চীন, মিশর, বা ভারতবর্ষ, সর্ব্বত্রই ছাত্রেরাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান শত্রু; তাহারা ধ্রুব বিশ্বাস করে, যে, সাম্রাজ্যটা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে, এবং তাহারাই অবিলম্বে বিধাতার হাতে বিনাশের উপযুক্ত অস্ত্র-স্বরূপ হইবে। লর্ড্ মহোদয় যে-ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা ঠিক্ নহে; কিন্তু ইহা ঠিক্, যে, ছাত্রেরা স্বাধীনতা-প্রিয় ও নির্ভীক এবং সাংসারিক ক্ষতিলাভ গণনার দ্বারা তাহারা চালিত হয় না। তাহারা ইংরেজের দর্প, দম্ভ, মুরুব্বিয়ানা ও প্রভুত্ব সহ্য করিতে সর্ব্বাপেক্ষা কম পারে। ইহার নাম যদি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শত্রুতা হয়, তাহা হইলে ভারতসচিবের কথা সত্য।

লর্ড্ সাহেবের বড় দুঃখ ও রাগ, যে, চীন দেশের ছাত্রেরা কংফুচের অবিনশ্বর পাণ্ডিত্যের চর্চ্চা না করিয়া ইংরেজী খবরের কাগজ পড়ে! বক্তা ঐসব খবরের কাগজে লিখিয়া হাজার-হাজার টাকা রোজগার করেন; তাহা ইংরেজ ছাত্রেরা পড়িলে ক্ষতি নাই। কিন্তু এসিয়ার ছাত্রেরা পড়িলে বড়ই পরিতাপের বিষয়। প্রাচ্যহিতৈষী সব ইউরোপীয়েরাই চায়, যে, আমাদের ছেলেরা বর্ত্তমান জগতের কোন খবর না রাখিয়া অতীত লইয়াই ব্যস্ত থাকে। তাহা হইলে ইত্যবসরে আমাদের চিরন্তন অভিভাবকেরা আমাদিগকে সাংসারিক ধনৈশ্বর্য্যের বন্ধন হইতে মুক্তি দিয়া আমাদের পারত্রিক মঙ্গলের সুব্যবস্থা খুব শীঘ্র করিয়া ফেলিতে পারেন।

—

বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বজেট

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটে ১৯২৫-১৯২৬ সালের আনুমানিক আয়-ব্যয়ের হিসাব কয়েকদিন হইল পেশ্ করেন। তাহা বেঙ্গলী ও অন্যান্য কাগজে বাহির হইয়াছে। তাহাতে তিনি দেখান যে, ১৯২৫ ২৬ সালের শেষ-নাগাদ ৩,২১,৬৭৬ টাকা ঘাটতি পড়িবার সম্ভাবনা। অনাবশ্যক ও অযোগ্য অধ্যাপক ও কর্ম্মচারী ছাড়াইয়া দিলে ঘাটতি অনেক কম হইতে পারে। কিন্তু আশ্রিতবৎসল আশুতোষের রাজত্ব এখনও চলিতেছে বলিয়া তাহা কেহ করিতে পারিতেছে না।

বজেটে একটা কৌতুকজনক ব্যাপার বর্ণিত আছে। ১৯২৩ ২৪ সালের বজেটে ধরা হইয়াছিল, যে, পুস্তক-বিক্রয় হইতে ৮১০০০ টাকা আয় হইবে, কিন্তু কার্য্যতঃ আয় হইয়াছিল ২,১৪,৫০০; অর্থাৎ আন্দাজের আড়াইগুণেরও বেশী। যিনি আন্দাজ করিয়াছিলেন, তাঁহার ভবিষ্য-দর্শিতা খুব তারিফের যোগ্য। অথবা এমনও হইতে পারে কি. যে, গবর্ণ্‌মেণ্টের কাছে বেশী টাকা আদায় করিবার নিমিত্ত আনুমানিক আয় কম দেখাইয়া আনু-মানিক ঘাট্‌তিটা বেশী দেখান হইয়াছিল?

আয়-ব্যয়ের তালিকায় যে-যে দফায় আয় দেখান হয়, ব্যয়ও সেই-সেই দফায় দেখাইবার একটা রীতি আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ের হিসাবে ক্যাল্‌কাটা রিভিউয়ের আয় ৭৮০০ (সাত হাজার আটশত) টাকা দেখান হইয়াছে। কিন্তু ঐ মাসিক পত্র চালাইতে ব্যয় কত হয়, তাহা দেখান হয় নাই। একবার বলা হইয়াছিল, যে, ঐ মাসিক পত্রের সমস্ত ব্যয় উহা নিজেই চালায়। বজেটে ব্যয়ের পরিমাণটা দেখাইলে বুঝা যাইত, কথাটা সত্য কি না। আয়ের পরিমাণ হইতে দেখা যাই-তেছে উহার গ্রাহক-সংখ্যা এক-হাজারেরও কম। একহাজার গ্রাহক দ্বারা অত বড় মাসিক চালান যায় কি না, মাসিক পত্র প্রকাশকেরা তাহা সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

—

স্বরাজ্য দলের নূতন নেতা

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস্ কমিটির সভাপতি ও বঙ্গীয় স্বরাজ্যদলের সভাপতি হইয়াছেন। হয়ত তিনিই কলিকাতার মেয়রও হইবেন। ব্যারিষ্টরী ব্যবসাও তাঁহাকে করিতে হইবে। এ অবস্থায় এইসমস্ত অবৈতনিক কাজ তিনি চালাইতে পারিবেন কি না, সন্দেহ করিলে তাঁহার প্রতি কোন অবিচার হয় না। বস্তুতঃ স্বরাজ্যদলের বিরুদ্ধবাদী অনেকেও তাঁহার যোগ্যতাতে সন্দিহান নহেন, যদিও কর্ত্তব্য পালন সামর্থ্যের একটা সীমা আছে। "সঞ্জীবনী" বলেন:—

মিঃ জে, এম্, সেনগুপ্ত মিঃ সি, আর, দাসের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। মিঃ সি, আর, দাস অসুস্থ হইয়া পড়িলে মিঃ সেনগুপ্তই ব্যবস্থাপক সভায় স্বরাজ্যদলকে পরিচালিত করিয়াছিলেন। আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে ধর্ম্মঘটের সময় মিঃ সেনগুপ্ত অসাধারণ উৎসাহের সহিত ধর্ম্মঘটকারীদের পক্ষ হইয়া কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনিও মিঃ সি, আর, দাসের মত ব্যারিষ্টারী পরিত্যাগ করিয়া অসহযোগ-ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনিও মিঃ সি, আর, দাসের মত নিজের বিষয়-সম্পত্তি ঘর বাড়ী সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া দেশের কাজে মনপ্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিলেন। রাজকোপে পতিত হইয়া তিনি কারাদণ্ড ভোগ করেন। সুতরাং আমরা দেখিতেছি মিঃ সেনগুপ্ত নানা দিক্ হইতেই মিঃ সি, আর, দাসের উত্তরাধিকারী হইবার যোগ্য ব্যক্তি।

—

সাধারণ লোকদের মূল্য

আমেরিকার প্রসিদ্ধতম ও যোগ্যতম রাষ্ট্রপতি এব্রাহাম্ লিঙ্কন্ বলিয়াছেন, ঈশ্বর সাধারণ লোকদিগকে ভালবাসেন

এবং এইজন্যই এত বেশী সাধারণ লোকের সৃষ্টি করিয়াছেন।

নিজেদের শক্তিতে অবিশ্বাসী হইয়া, কিংবা আলস্য বা স্বার্থপরতাবশতঃ, আপন-আপন কর্ত্তব্য না করিয়া মহাপুরুষের অপেক্ষায় বসিয়া থাকা অগণিত লোকের অভ্যাস। যখনই দেশে কোন-একজন নামজাদা নেতার মৃত্যু হয়; অমনি লোকে এরূপ হাহুতাশ জুড়িয়া দেয়, যেন বিশ্বকার্য্য আর চলিবে না। অথচ বিশ্বব্যাপার চলিতে থাকে, এবং সাধারণ লোকদের দ্বারাই ঈশ্বর তাহা চালান। অসাধারণ প্রতিভাবান্ বা শক্তিশালী লোকের দ্বারা কোন কাজ হয় না, বা তাঁহাদের কোন দরকাই নাই, বলিতেছি না; কিন্তু সাধারণ লোকেরা নিজেদের কর্ত্তব্য না করিলে তাঁহারা বিশেষ কিছু করিতে পারেন না, ও সাধারণ লোকেরা নিজেদের সময় ও শক্তির সদ্ব্যবহার করিলে এতটা মহাপুরুষের মুখাপেক্ষী হইতে হয় না।

বোম্বাইয়ের স্যার্ নারায়ণ চন্দাবরকরের রাজনৈতিক অনেক মতের সঙ্গে আমাদের মিল না থাকিলেও তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতায় আমাদের বিশ্বাস ছিল। তিনি বলিয়া গিয়াছেন—

This world can go on by us, by you and me. We are the bulk of the world and God has not been so ungenerous as to leave us entirely at the mercy of the great man. The world has to be carried on by average men. It is we who have to carry on its business. Let us see that we get planted in us those powers by the development of which we can do what lies in our power in order to make the world more onwards, and towards the goal which we have all at heart.

তাৎপর্য্য: "এই সংসারটা আমাদের দ্বারা তোমার-আমার দ্বারা চলিতে পারে। আমরাই পৃথিবীর অধিকাংশ লোক। ঈশ্বর আমাদের প্রতি এত কৃপণ হন নাই, যে, আমাদিগকে একেবারে বড় লোকদের দয়ার উপর ফেলিয়া দিয়াছেন। মাঝামাঝি-রকমের লোকদের দ্বারাই সংসারটাকে চালাইতে হইবে। আমাদিগকেই ইহার কাজ চালাইতে হইবে। যে-লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়া আমাদের হৃদগত বাসনা, পৃথিবীকে তাহার দিকে চালাইবার জন্য যে-যে শক্তির প্রয়োজন, তাহা বিকাশ করিবার জন্য আমরা যেন যথাসাধ্য চেষ্টা করি।"

—

ইংরেজী ভাষার প্রসার

অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাবে অনেক ইংরেজী জানা লোকও ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি ঔদাসীন্য ও অবহেলা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ইহা বোধ হয় প্রধানতঃ মৌখিক, কার্য্যগত নহে; কারণ এইসব লোক বক্তৃতায়, চিঠিপত্রে, কথাবার্ত্তায় এবং মুদ্রিতব্য জিনিষে ইংরেজী খুব ব্যবহার করেন।

আমরা ইংরেজীর উপাসক নহি,কিন্তু ইংরেজীকে কেবল অর্থ-উপার্জ্জনের উপায় মনে করি না। ইহার সাহিত্যে এমন বিস্তর জিনিষ আছে,যাহা হইতে আনন্দ পাওয়া যায়, এবং হৃদয়, মন ও আত্মার ঐশ্বর্য্য বাড়ে। ভাব ও চিন্তা প্রকাশের ইহা একটি উপযুক্ততম উপায় হইয়া উঠিয়াছে।

পৃথিবীর যে-সব দেশের ভাষা ইংরেজী নহে, তাহার সহিতও ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইতে হইলে ইংরেজী জানা খুব দরকার। আন্তর্জাতিক ব্যাপারে আগে একমাত্র ফরাসী ভাষার চলন ছিল। এখন ইংরেজী কোন কোন স্থলে তাহাকে বেদখল করিতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে যে রুশ-জাপানী চুক্তিপত্র প্রস্তুত হয়, তাহা ইংরেজীতে লিখিত এবং তাহাও তৎসংক্রান্ত সমুদয় সর্ত্ত ও চিঠি-পত্র জাপানী সর্কারী গেজেটে ইংরেজীতে ছাপা হইয়াছে। অথচ রুশিয়া বা জাপান কোন দেশেরই ভাষা ইংরেজী নহে। জাপানে ও চীনে ইংরেজী শিক্ষা ও ব্যবহার খুব বাড়িতেছে।

—

গোয়ালিয়রে শিক্ষার জন্য বৃত্তি

গোয়ালিয়রের মৃত মহারাজা মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে প্রজাদের হিতের জন্য যে-সকল কাজ করিয়া গিয়াছেন, প্রজাদের উচ্চ শিক্ষার্থ বৃত্তি স্থাপন তন্মধ্যে অন্যতম। ইহার জন্য তিনি ৭৫,০০০ টাকা বরাদ্দ করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে চল্লিশ হাজার দেশে থাকিয়া শিক্ষা লাভের জন্য, পঁয়ত্রিশ হাজার বিদেশে শিক্ষার জন্য। দেশের চল্লিশ হাজারের মধ্যে ১৫ হাজার অনুন্নত শ্রেণীর লোকদের প্রারম্ভিক শিক্ষার জন্য রাখা হইয়াছে। বিদেশী শিক্ষার বৃত্তিগুলি ভূতত্ত্ব ও খনিজবিজ্ঞান, রেলওয়ে নির্ম্মাণ, ইলেক্ট্রিক্যাল্ ও যান্ত্রিক এঞ্জিনীয়ারিং, চিকিৎসা এবং সামরিক শিক্ষার জন্য অভিপ্রেত। স্থানীয় বৃত্তিগুলি আরণ্য-বিদ্যা, যুদ্ধ-বিদ্যা, সিবিল্ এঞ্জিনীয়ারিং, চিকিৎসা আইন, রেলওয়ে দ্বারা মাল ও যাত্রী বহন, হিসাব রক্ষা ও হিসাব পরীক্ষা এবং কৃষি শিখিবার জন্য।

—

বালিকা-রক্ষা আইন

স্যার্ হরিসিং গৌড়, তৎপ্রণীত সম্মতি আইন পাস্ না হওয়ায়, হাল ছাড়িয়া দেন নাই। তিনি "চিল্ড্রেন্স্ প্রোটেকশ্যান্ বিল্" নাম দিয়া আর-একটি আইনের খসড়া প্রস্তুত করিয়াছেন। তাহার উদ্দেশ্য—(ক) তের বৎসরের ন্যূনবয়স্ক বালিকাদিগকে স্বামী বা অপর পুরুষ সকলের হাত হইতে রক্ষা করা, (খ) পনর বৎসর বয়স পর্য্যন্ত স্বামী ব্যতীত অন্য পুরুষদিগের অত্যাচার হইতে রক্ষা করা, এবং (গ) চৌদ্দবৎসর বয়স পর্য্যন্ত স্বামীর অনিষ্টকর সান্নিধ্যাগমন হইতে রক্ষা করা। তের বৎসর পর্য্যন্ত অত্যাচারী স্বামী বা অন্য পুরুষের সমান দণ্ডের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তের ও চৌদ্দ বৎসরের মাঝামাঝি বয়সে অত্যাচারী স্বামীর দণ্ড অন্য পুরুষের অর্দ্ধেক করা হইয়াছে।

এইরূপ কোন আইন দ্বারা বালিকাদের রক্ষা একান্ত আবশ্যক

—

নারীরক্ষা সমিতি

রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনের উন্মাদনা বড় বেশী। উহা প্রবল হইলে মানুষের শক্তি ও দান প্রধানতঃ উহার সাহায্যার্থই ব্যয়িত হয়। প্রবল রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন ও প্রচেষ্টার প্রয়োজন অস্বীকার করিবার জন্য ইহা বলিতেছি না; উহার প্রয়োজন স্বীকার করি। কিন্তু ইহাও বলিতে চাই, অন্য অত্যাবশ্যক কাজও করা চাই। অসহযোগ আন্দোলনের প্রাদুর্ভাবের সময় লোকহিতকর অনেক কাজের জন্য লোক ও টাকা পাওয়া যাইত না। তৎ-পরবর্ত্তী সময়ে স্বরাজ্যদলের নেতা ও উপনেতারা যখন যে-কাজের জন্য টাকা চাহিয়াছেন, পাইয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা রাজনৈতিক কাজ ভিন্ন অন্য কাজে হাত দেন নাই বলিলেও চলে। গ্রামের জীবন আবার বিকশিত করিবার ও গড়িয়া তুলিবার সঙ্কল্প তাঁহাদের ছিল, হয়ত এখনও আছে; কিন্তু কাজে এখনও কিছু তাঁহারা করেন নাই। তাঁহারা পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় জীবনের মূল-বিনাশক একটি জিনিষের প্রতি, যে কারণেই হউক, মন দেন নাই। যাঁহারা মন দিয়াছেন, তাঁহারা প্রধানতঃ অন্য দলের লোক। এইজন্য দুর্বৃত্ত লোকদের অত্যাচার হইতে নারীদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অনেক দিন হইল যে নারীরক্ষা সমিতি গঠিত হইয়াছে, তাহার লোক-বল ও অর্থবল এপর্য্যন্ত যথেষ্ট হয় নাই। তৎসত্ত্বেও ইহা এপর্য্যন্ত যাহা করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহা অতীব প্রশংসনীয়।

বাংলা খবরের কাগজ খুলিলেই কোথাও-না-কোথাও নারীর উপর অত্যাচারের কাহিনী দৃষ্টিগোচর হয়। দুর্বৃত্তদের দমন হওয়া একান্ত আবশ্যক। তাহাদের জন্য গ্রামে সকল-ধর্ম্মাবলম্বী লোক লইয়া গঠিত সাহসী কর্ম্মীর দল চাই। তদ্ভিন্ন দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালাইবার জন্য টাকা চাই। নারীদের উপর অত্যাচার হইলে তাহার উপর তাঁহারা আবার জাতিচ্যুতি ও সমাজচ্যুতিরূপ সাতিশয় অন্যায় ও অমানুষিক সামাজিক শাস্তি যাহাতে না পান, তাহার ব্যবস্থা চাই। নারীরা যাহাতে ঘরের বাহিরে আসিলেই লজ্জায় ও ভয়ে জড়সড় হইয়া পড়া-প্রযুক্ত আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতেও অসমর্থ না হইয়া পড়েন, এরূপ শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা তাঁহাদিগকে দিবার জন্য সামাজিক ব্যবস্থা চাই। মুসলমান সম্প্রদায়ের কোন-কোন কাগজ এই মিথ্যা ধারণা জন্মাইতেছেন, যে নারীরক্ষা সমিতি কেবলমাত্র হিন্দুদের একটি প্রতিষ্ঠান এবং মুসলমানদের শত্রুতা করা উহার উদ্দেশ্য। ইহা ভ্রান্ত ধারণা। এই সমিতির সভ্যদের মধ্যে মুসলমান আছেন, কর্ম্মীদের মধ্যে মুসলমান আছেন, এবং ইহা অত্যাচারিতা মুসলমান নারী ও বালিকারও পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের উপর অত্যাচারকারী লোকদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালাইয়াছেন। এরূপ ভ্রান্ত-ধারণা পোষণ করা ও উৎপাদন করা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়।

—

পৃথিবীব্যাপী বিপ্লব

লর্ড্‌ মর্লীর মত লর্ড্‌ বার্কেন্‌হেড্‌ও বলিয়া চুকিয়াছেন, যে, ইংরেজ মানসনেত্রে দৃশ্যমান কোন সুদূর ভবিষ্যতেও ভারতের অছিত্ব ও কল্যাণ করিতে ছাড়িবে না। অন্য দিকে সোভিয়েট্‌ রুশিয়ার নেতা জিনোভিয়েফ্‌ বলিতে-ছেন, চীন ও মরোক্কোতে যাহা ঘটিতেছে তাহা ভাবী জগদ্ব্যাপী বিপ্লবের ক্ষুদ্রায়তন রিহার্স্যাল্‌ মাত্র; চীন ও মরোক্কোর ব্যাপারের পরিণাম হইবে প্রাচ্য সব দেশে ও ভারতবর্ষে সোভিয়েট্‌ গবর্ণ্‌মেণ্ট্‌। জিনোভিয়েফ্‌ বলেন, পাশ্চাত্য দেশে বিপ্লব-প্রচেষ্টা মন্থরগতিতে চলিতেছে বটে, কিন্তু প্রাচ্যে তাহার দ্রুতবিস্তার দ্বারা ক্ষতিপূরণ করিয়া লওয়া যাইতেছে।

ভারতে সোভিয়েটের চর আছে কি না, ও থাকিলে তাহারা কি করিতেছে, জানি না। কিন্তু ইহা সহজবোধ্য যে, যে-দেশেই গরীব দুঃখী ও নিম্নশ্রেণীর লোকদের উপর কোনপ্রকার অত্যাচার আছে, সেখানেই রুশিয়ার বিপ্লব-চেষ্টা ফলবতী হইবার সম্ভাবনা আছে। আমাদের দেশে কোন-রকম অত্যাচারেরই অভাব নাই। অতএব সময় থাকিতে আমাদের সাবধান হওয়া উচিত, এবং জাতিধর্ম্ম-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা-নির্ব্বিশেষে, সব মানুষের সহিত মনুষ্যোচিত সহৃদয় ও শিষ্ট ব্যবহার করা উচিত। নতুবা রুশিয়ায় অভিজাত ও সম্ভ্রান্তশ্রেণীর এবং বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যে দুঃখ-দুর্দ্দশা হইয়াছে, এদেশের ঐ-ঐ শ্রেণীর লোকদের তাহা হওয়া অসম্ভব নহে।

—

কচুরীপানা ও গ্রিফিথ্‌সের ঔষধ

পূর্ব্ববঙ্গে ও মধ্যবঙ্গে কচুরীপানায় নদী, খাল, বিল, পুকুর আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে। এই পানার উচ্ছেদের উপায় নির্দ্ধারণ করিবার নিমিত্ত বাংলা গবর্ণ্‌মেণ্ট্‌ আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে এক কমিটি নিযুক্ত করেন। গ্রিফিথ্‌স্‌-নামক দক্ষিণ আফ্রিকার একজন লোক বলে, যে, সে উহা বিনাশ করিবার ঔষধ জানে; তাহাকে এক লক্ষ বা এরূপ বেশী কিছু টাকা দিলে সে উহার উপাদানও প্রস্তুত করিবার প্রণালী গবর্ণ্‌মেণ্টকে বলিয়া দিবে। বসু মহাশয় পরীক্ষা করিয়া বলেন এবং কমিটির অধিকাংশ সভ্য তাহাতে সায় দেন, যে, ঐ ঔষধের কচুরীপানা নষ্ট করিবার ক্ষমতা নাই। তথাপি গবর্ণ্‌মেণ্ট্‌ ঐ ঔষধ প্রয়োগ করিয়া পানা বিনাশের চেষ্টা করেন। এক্ষণে বলিতেছেন, যে, উহা অকেজো জিনিষ। আগেই

ত বসু-কমিটি একথা বলিয়াছিলেন। তবে উহার পরীক্ষার জন্য টাকা খরচ কেন করা হইল, এবং সে কত টাকা? গ্রিফিথ্‌স্‌কে টাকা পাওয়াইবার জেদ কেন হইল এবং গ্রিফিথ্‌স্‌ ছাড়া আর কাহারও অর্থলাভের সম্ভাবনা ছিল কি না, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক-সভা তাহা নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করিবেন কি? —

খিদিরপুরে ঈদের দাঙ্গা

গত ঈদ্‌-উপলক্ষ্যে খিদিরপুরে হিন্দুমুসলমানে দাঙ্গা মারামারি হইয়া গিয়াছে। গান্ধীমহাশয় ও অন্য সকলে বলিতেছেন, ইহা হিন্দুদের দোষেই হইয়াছে, মুসলমানেরা যেখানে গোরু জবাই করিয়াছিল বলিয়া তাহারা তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল, সেখানে গরু জবাই হয় নাই। হিন্দুদের এই ব্যবহার সাতিশয় নিন্দনীয়।

—

এম্‌-এ পরীক্ষার্থী রাজবন্দী

শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার মিত্র তিন নম্বর রেগুলেশ্যন-অনুসারে রাজবন্দীরূপে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে আটক আছেন। তিনি দর্শন-শাস্ত্রে সম্মানসহ দ্বিতীয় বিভাগে বি-এ পাস্‌ করেন। দর্শনে এম্‌-এ পরীক্ষা দিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট অনুমতি চাহিয়া আবেদন করিয়াছিলেন। বঙ্গবাসী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যরূপে আবেদনে সন্তোষকুমার সচ্চরিত্র বলিয়া লিখিয়া দিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় অনুমতি দিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়, যে, কোন-প্রকার কাল্পনিক ভয় করেন নাই, ইহা আহ্লাদের বিষয়। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পরলোক-গমনের পরেও ভয়বিহ্বলতা বিশ্ববিদ্যালয়কে গ্রাস করে নাই। তাহার আর-এক দৃষ্টান্ত প্রবেশিকার বাংলা পাঠ্যপুস্তকে "শিবাজী" কবিতার অন্তর্নিবেশ। উহাতে বাস্তবিক ভীত হইবার কিছু নাই; তথাপি কাল্পনিক ভয়কে অতিক্রম করিতেও সাহসের দরকার হয়।

—

নেপালকে আর্থিক সাহায্য দান

বিলাতী পার্লেমেণ্টে এক প্রশ্নের উত্তর হইতে জানা গিয়াছে, যে, ভারত-গবর্ণমেণ্ট্‌ নেপালকে বৎসর-বৎসর দশ লক্ষ (বা এক কোটি?) টাকা দিয়া থাকেন, এবং ইহা কত বৎসর দিবেন, তাহার কোন সীমা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই।

নেপালকে এই টাকাটি কেন দেওয়া হয়? নেপাল ভারতের প্রভু নহে, যে, করস্বরূপ এই টাকা পাইবে। উহা ভারতবর্ষের অধীনও নহে, যে, ভারত উহার কোন বিপদ্‌-আপদ্‌ দেখিয়া ঐ টাকা সাহায্য করিতেছে; তাহা হইলেও নিরবধি কালের জন্য টাকা দিবার কথা নয়।

টাকা দিবার দু-রকম কারণ হইতে পারে। (১) তিব্বতের মধ্য দিয়া নেপালের পথে আসিয়া রুশিয়া বা চীন যাহাতে ভারতে কোন উপদ্রব করিতে না পারে, তাহার জন্য নেপালকে সমর-সজ্জা প্রস্তুত রাখিবার জন্য ইহা দেওয়া হয়; (২) ভারতবর্ষে কোন অন্তর্বিপ্লব হইলে নেপাল তাহা দমন করিবার জন্য সৈন্য দিবে এই আশায় দেওয়া হয়। ইহার কোন একটি বা দুইটি যদি প্রকৃত কারণ হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের হিতার্থ টাকাটা দেওয়া হইলে ব্যবস্থাপক সভায় উহার আলোচনা হইয়াছিল কি না? না হইয়া থাকিলে কেন হয় নাই? যদি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ইহাতে স্বার্থ থাকে, তাহা হইলে একা ভারতবর্ষকেই কেন টাকাটা দিতে বাধ্য করা হইতেছে? আফগানিস্থানে ব্রিটিশ দূত থাকিবার খরচটা, আফগানিস্থানের সহিত বিলাতী গবর্ণমেণ্টের সাক্ষাৎসম্পর্ক স্থাপন-সত্ত্বেও, ভারতবর্ষকেই দিতে হইতেছে। নেপালকে ভারতের অর্থদান কি ঐরূপ আর-একটি ন্যায়সঙ্গত কাজ?

এসিয়াটিক্‌ সোসাইটির সেক্রেটরী অধ্যাপক ভ্যান্‌ মানেন্‌ সেদিন নেপাল-সম্বন্ধীয় এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "নেপালের লোকদের মুখে প্রতিফলিত সন্তোষ ও সুখের পরিমাণ লক্ষ্য করিবার বিষয়। ভারতে একমাসে যত হাসি দেখা যায়, নেপালে একদিনে তার চেয়ে বেশী দেখা যায়।" সুখী দেশকে দুঃখী ভারত বৎসর-বৎসর লক্ষ-লক্ষ টাকা দিতেছে। —

বিদ্যাসাগর স্মৃতি-সভা

এই মাসের প্রথম পক্ষেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিবার জন্য নানা স্থানে সভা হইবে। শুধু বাংলাদেশেই, প্রত্যেক গ্রামে ও নগরে বিস্তর বালিকা বিধবা আছেন। যাঁহারা সভা করিবেন, তাঁহারা বিধবা-বিবাহের পক্ষে কি না, নিজেই নিজেকে যেন জিজ্ঞাসা করেন। রাম-বিহীন রামায়ণ যেমন, বিধবাবিবাহ-প্রচলন-চেষ্টার আন্তরিক সমর্থন না করিয়া বিদ্যাসাগরের প্রশংসা করাও সেইরূপ।

—

অকালীদের কৃতিত্ব

শিখ গুরুদ্বারগুলি মহান্তদের হাত হইতে উদ্ধার করিয়া শিখ সমাজের কর্ত্তৃত্বাধীন করিবার নিমিত্ত ও জাইটোতে অখণ্ড পাঠ প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত অকালী শিখেরা নিজে অহিংস থাকিয়া নানা অমানুষিক অত্যাচার ও উৎপীড়ন অসাধারণ বীরত্বের সহিত সহ্য করিয়াছেন। পঞ্জাবে গুরুদ্বার-সম্বন্ধীয় আইন পাস্‌ হওয়ায় তাঁহাদের অহিংস প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হইল। ইহা অতীব সন্তোষের বিষয়। গবর্ণমেণ্ট্‌ যে প্রচেষ্টা-সংসৃষ্ট অনেক অকালী বন্দীকে খালাস দিয়াছেন ও দিবেন, তাহাও সম্পূর্ণ আহ্লাদের বিষয় হইত যদি কারামুক্তি কতকগুলি সর্ত্তসাপেক্ষ করা না হইত। অহিংস-প্রচেষ্টার এই জয়ে দেশহিতব্রতে সকলে উৎসাহিত হউন।

৯১, আপার সার্কুলার রোড্‌, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেসে শ্রী অবিনাশচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

২৫শ ভাগ
১ম খণ্ড

ভাদ্র, ১৩৩২

৫ম সংখ্যা

মরমিয়া

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের হিন্দী কাব্যসাহিত্য পড়তে গিয়ে দেখা গেল হিন্দুস্থানী খেয়ালটপ্পার মতই তার তান তার মানকে কেবলি ছাড়িয়ে চলেছে। অলঙ্কারই হয়েছে লক্ষ্য, মূর্তিটি হয়েছে উপলক্ষ্য।

কবি সত্যকে যখন উপলব্ধি করেন তখন বুঝতে পারেন সত্যের প্রকাশ সহজেই সুন্দর। এইজন্যে তখন তিনি সত্যের রূপটিকে নিয়েই পড়েন তার অলঙ্কারের আড়ম্বরে মন দেন না। বৈষ্ণব-পদে পড়েছি, রাধা যখন কৃষ্ণের মিলন চান, তখন গলার হারগাছির আড়ালটুকুও তাঁর সয় না। তার মানে, কৃষ্ণই তাঁর কাছে একান্ত সত্য; সেই সত্যকে পেতে গেলে অলঙ্কার শুধু যে বাহুল্য, তা নয়, তা বাধা।

সংসারে যেমন, সাহিত্যেও তেম্‌নি, বিষয়াসক্ত লোক আছে। বিষয়ী লোকের লক্ষণই এই যে, তারা সত্যকে পায় না ব'লেই বস্তুকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করে। সাহিত্যেও রস জিনিষটার প্রতি যদি স্বাভাবিক দরদ না থাকে তা হ'লেই কৌশলের পরিমাণ নিয়ে তার দর যাচাই চলে। রসটা সত্যের আপন অন্তরের প্রকাশ, আর কৌশলটা বাহিরের উপসর্গ, তাই নিয়ে বাহিরের বাহনটা ভিতরের সত্যকে ছাপিয়ে আপন গুমর করে। এ'তে রসিক লোকেরা পীড়িত হয়, বিষয়ী লোকেরা বাহ্‌বা দিতে থাকে।

আমার অপরিচিত হিন্দীসাহিত্যের মহলে কাব্যের বিশুদ্ধ রসরূপটি যখন খুঁজছিলুম, এমন সময় একদিন ক্ষিতিমোহন সেন মশায়ের মুখ থেকে বঘেলখণ্ডের কবি জ্ঞানদাসের দুইএকটি হিন্দী পদ আমার কানে এল। আমি ব'লে উঠ্‌লুম, এই ত পাওয়া গেল। খাঁটি জিনিষ, একেবারে চরম জিনিষ, এর উপরে আর তান চলে না।

অলঙ্কারের স্বভাবই এই যে, কালে-কালে তার বদল হয়। একসময়ে বাজারে একরকম ফ্যাশানের চল্‌তি, আর-একসময়ে আর-একরকমের। সাবেক কালে অনুপ্রাসের, বক্রোক্তির খুবই আদর ছিল। এখন তার অল্প আভাস চলে, কিন্তু বেশি সয় না। কোনো একটি কাব্যকে সাবেক-কালের ব'লে চিন্‌তে পারি তার

সাবেকি সাজ দে'খে। যেখানে সাজের ঘটা নেই, সত্য আপন সহজ বেশে প্রকাশমান, সেখানে কালের দাগ পড়বে কিসের উপরে ? সেখানে অলঙ্কারের বাজারদরের ওঠানামার খবরই পৌঁছয় না। কালে কালে হাটের মার্কা দাগা দেবে এমন মরা জিনিষ তার আছে কোথায় ?

জ্ঞানদাসের কবিতা যখন শুনলুম তখন এই কথাটি বার বার মনে এল, এ যে আধুনিক ! আধুনিক বলতে আমি এই কালেরই বিশেষ ছাঁদের জিনিষ বলচিনে। এসব কবিতা চিরকালই আধুনিক। কোনো কালে কেউ বলতে পারবে না, এর ফ্যাশান বদলেছে। আমাদের পুরাতন বাংলা সাহিত্যে অল্প কবিতাই আছে যার সম্বন্ধে এমন কথা পুরোপুরি বলা যায়। মাঝে মাঝে পাওয়া যায়, এবং পুরাতনের মধ্যে চিরন্তনকে দে'খে চমকে উঠি। যেমন দুটো ছত্র এইমাত্র আমার মনে পড়ছে :—

তোমার গরবে গরবিনী আমি
রূপসী তোমার রূপে।

"রূপসী তোমার রূপে", একথাটা একেবারে বাঁধা-দস্তুরের কথা নয়। বাঁধা দস্তুর বড়ই ভীতু, নজীরের কেল্লা বেঁধে তবে সে সর্দ্দারী করে। গরবিনী গরব ভাসিয়ে দিয়ে বলচে, আমার রূপ আমার নয়, এ তোমারি, —এমন কথা তার মুখেই আসত না ; সে মাথায় হাত দিয়ে ভাবত, এত বড় অত্যুক্তির নজীর কোথায় ? যারা নজীর সৃষ্টি করে, নজীর অনুসরণ করে না তারাই আধুনিক, চিরকালই আধুনিক।

ক্ষিতিবাবুর কল্যাণে ক্রমে হিন্দুস্থানের আরো কোনো কোনো সাধক কবির সঙ্গে আমার কিছু কিছু পরিচয় হ'ল। আজ আমার মনে সন্দেহ নেই যে, হিন্দী ভাষায় একদা যে-গীত-সাহিত্যের আবির্ভাব হয়েছে তার গলায় অমরসভার বরমাল্য। অনাদরের আড়ালে আজ তার অনেকটা আচ্ছন্ন ; উদ্ধার করা চাই, আর এমন ব্যবস্থা হওয়া চাই যাতে ভারতবর্ষের যারা হিন্দী ভাষা জানে না তারাও যেন ভারতের এই চিরকালের সাহিত্যে আপন উত্তরাধিকার-গৌরব ভোগ করতে পারে।

এইসকল কাব্যে যে-রস এত নিবিড় হয়ে প্রকাশ পেয়েছে সে হচ্চে ভগবানের প্রতি প্রেমের রস। য়ুরোপীয় সাহিত্যে আমরা ত ঈশ্বর-সম্বন্ধে কাব্যরচনা কিছু কিছু পড়েছি, বার বার মনে হয়েছে মেজ্‌রাপটাই কড়া হয়ে আওয়াজ করচে, তারটা তেমন বাজ্‌চে না। তাই খৃষ্টান-ধর্ম্ম-সঙ্গীতের বইগুলি সাহিত্যের অন্দরমহলে ঢুকতে পারলে না, গির্জ্জাঘরেই আটকা প'ড়ে গেল। আসল কথা, শাস্ত্রের যে-ভগবান ধর্ম্মকর্ম্মের ব্যবহারে লাগেন, যিনি সনাতনপন্থী ধার্ম্মিক লোকের ভগবান, তাঁকে নিয়ে আনুষ্ঠানিক শ্লোক চলে ; তাঁর জন্যে অনেক মন্ত্রতন্ত্র ; আর যে-ভগবানকে নিজের আত্মার মধ্যে ভক্ত সত্য ক'রে দেখেছেন, যিনি অহৈতুক আনন্দের ভগবান তাঁকে নিয়েই গান গাওয়া যায়। সত্যের পূজা সৌন্দর্য্যে, বিষ্ণুর পূজা নারদের বীণায়।

কবি ওয়ার্ডস্বার্থ্‌ আক্ষেপ ক'রে বলেছেন জগতের সঙ্গে আমরা অত্যন্ত বেশি ক'রে লেগে আছি। আসল কথাটা, জগতের সঙ্গে, আমরা বেশি ক'রে নয়,অত্যন্ত খুচ্‌রো ক'রে লেগে আছি। আজ এটুকু দরকার, কাল ওটুকু, আজ এখানে ডাক, কাল ওখানে। পুরো মন দিয়ে পুরো বিশ্বকে দেখিনে। আমাদের দরকারের সঙ্গে তার খানিকটা জোড়া, খানিকটা ছেঁড়া, খানিকটা বিরুদ্ধ। প্রতিদিনের এই দেনাপাওনার জগতে আমাদের হিসাবী বুদ্ধিটাই মনের আরসব বিভাগকে কমবেশিপরিমাণে দাবিয়ে রেখে মুরুব্বিআনা ক'রে বেড়ায়। যে-হিসাবী বুদ্ধিটা গুনতি করে, ওজন করে, মাপ করে, ভাগ করে, তার কাছ থেকে আমরা অনেক খবর পাই, তার যোগে ছোটোবড়ো নানা বিষয়ে সিদ্ধিলাভও করি, অর্থাৎ তার মহলটা হ'ল লাভের মহল, কিন্তু বিশুদ্ধ আনন্দের মহল নয়।

পূর্ব্বে কোথাও কোথাও একথা বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করেছি যে, যেখানে স্বার্থের বাইরে, প্রয়োজনের বাইরে মানুষের বিশেষ-কোনো বাস্তব লাভক্ষতির বাইরে কোনো একটি একের পূর্ণতা হৃদয়ে অনুভব করতে পারি সেখানে আমাদের বিশুদ্ধ আনন্দ। জ্ঞানের মহলেও তার পরিচয় পেয়েছি, দেখেছি টুকরো-টুকরো তথ্য মনের পক্ষে বোঝা, যেই কোনো-একটিমাত্র তত্ত্বে সেই বিচ্ছিন্ন বহু ধরা দেয় অমনি আমাদের বুদ্ধি আনন্দিত হয়, বলে,

পেয়েছি সত্যকে। তাই আমরা জানি, ঐক্যই সত্যের রূপ, আর আনন্দই তার রস।

অধিকাংশ মানুষকেই আমরা বহুর ভিড়ের ভিতরে দেখি, বিপুল অনেকের মধ্যে তারা অনির্দ্দিষ্ট। যে-মানুষকে ভালোবাসি, সাধারণ অনেকের মাঝখানে সে বিশেষ এক। এই নিবিড় ঐক্যের বোধেই বন্ধু আমার পক্ষে হাজার লক্ষ অবন্ধুর চেয়ে সত্যতর। বন্ধুকে যেমন বিশেষ একজন ক'রে দেখ্‌লুম, বিশ্বের অন্তরতম এককে যদি তেম্‌নি স্পষ্ট ক'রে দেখ্‌তে পাই তা হ'লে বুঝ্‌তে পারি সেই সত্য আনন্দময়। আমার আত্মার মধ্যে একের উপলব্ধি যদি তেম্‌নি সত্য ক'রে প্রকাশ পায় তা হ'লে জীবনের সুখে দুঃখে লাভে ক্ষতিতে কোথাও আমার আনন্দের বিচ্ছেদ ঘটে না। যতক্ষণ সেই উপলব্ধি আমাদের না হয় ততক্ষণ আমাদের চৈতন্য বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে বিচ্ছিন্ন। যখন সেই উপলব্ধিতে এসে পৌঁছই আমাদের চৈতন্য তখন অখণ্ডভাবে সেই সৃষ্টিসঙ্গীতেরই অঙ্গ হয়ে ওঠে। তখন সে শুধুমাত্র জানে না, শুধুমাত্র করে না, সমস্তের সঙ্গে সুরে বেজে ওঠে।

সৃষ্টিতে অসৃষ্টিতে তফাৎ হচ্চে এই যে, সৃষ্টিতে বহু আপন একককে দেখায়, আর অসৃষ্টিতে বহু আপন বিচ্ছিন্ন বহুত্বকেই দেখায়। সমাজ হ'ল মানুষের একটি বড় সৃষ্টি, সেখানে প্রত্যেক মানুষই অন্যসকলের সঙ্গে আপন সামাজিক ঐক্যকে দেখায়; আর ভিড় হচ্চে অসৃষ্টি, সেখানে প্রত্যেক মানুষ ঠেলাঠেলি ক'রে আপনাকেই স্বতন্ত্র দেখায়; আর দাঙ্গাবাজি হচ্চে অনাসৃষ্টি; তার মধ্যে কেবল পরস্পরের অনৈক্য নয় বিরুদ্ধতা। ইমারৎ হ'ল সৃষ্টি, ইঁটের গাদা হ'ল অসৃষ্টি, আর যখন দেয়াল ভেঙে ইঁটগুলো হুড়মুড় ক'রে পড়চে, সে হ'ল অনাসৃষ্টি।

এই ঐক্যটি বস্তুর একত্র হওয়ার মধ্যে নয়, এ যে একটি অনির্ব্বচনীয় অদৃশ্য সম্বন্ধের রহস্য। ফুলের মধ্যে যে-ঐক্য দে'খে আমরা আনন্দ পাই, সে তার বস্তুপিণ্ডে নেই, সে তার গভীর অন্তর্নিহিত এমন একটি সত্যের মধ্যে যা সমস্ত বিশ্বভুবনে একের সঙ্গে আরকে নিগূঢ় সামঞ্জস্যে ধারণ ক'রে আছে। এই সম্বন্ধের সত্য মানুষকে আনন্দ দেয়, মানুষকেও সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত করে।

মানুষের অন্তর্ব্বর্ত্তী সেই সৃষ্টিকর্ত্তা মধ্যযুগের সাধকদের মধ্যে যে-ভগবানের স্পর্শ পেয়েছিলেন, তিনি শাস্ত্রে বর্ণিত কেউ নন, তিনি মনে প্রাণে হৃদয়ে আবিষ্কৃত অদ্বৈত পরমানন্দরূপ। সেইজন্যেই মন্ত্র প'ড়ে তাঁর পূজা হ'ল না, গান দিয়ে তাঁর আবাহন হ'ল। তিনি প্রত্যক্ষ সত্যরূপে জীবনে আবির্ভূত হয়েছিলেন ব'লে সহজ-সুন্দররূপে কাব্যে প্রকাশ পেলেন।

ইংরেজ কবি শেলি তাঁর সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মীর স্তব নামক কবিতায় বল্‌চেন, একটি অদৃশ্য শক্তির মহতী ছায়া বিশ্বে আমাদের মধ্যে ভেসে বেড়াচ্চে। সেই ছায়াটি চঞ্চল, সে মধুর, সে রহস্যময়, সে আমাদের প্রিয়। তারই আবির্ভাবে আমাদের পূর্ণতা, তারই অভাবে আমাদের অবসাদ। প্রশ্ন এই মনে জাগে যাঁর এই ছায়া তাঁর সঙ্গে ক্ষণে ক্ষণে আমাদের বিচ্ছেদ কেন? কেন জগতে সুখদুঃখ, আশা নৈরাশ্য, রাগ-দ্বেষের এই নিরন্তর দ্বন্দ্ব? কবি বলেন, শাস্ত্রে জনশ্রুতিতে দেবতা দৈত্য স্বর্গ প্রভৃতি যেসব পদার্থের কল্পনা পাওয়া যায়, তাদের নাম ধ'রে প্রশ্ন করলে জবাব মেলে কই? কবি বলেন, তিনি তো অনেক চেষ্টা করেছেন, তত্ত্বকথা জেনে নেবেন ব'লে পোড়ো বাড়ির শূন্য ঘরে, গুহায় গহ্বরে অন্ধকারে ভূতপ্রেতেরও সন্ধান ক'রে ফিরেছেন, কিন্তু না পেলেন কারো দেখা, না পেলেন কারো সাড়া। অবশেষে একদিন বসন্তে যখন দক্ষিণ হাওয়ার আন্দোলনে বনে বনে প্রাণের গোপন-বাণী জাগ্‌বে-জাগ্‌বে করচে এমন সময় হঠাৎ তাঁর অন্তরের মধ্যে এই সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মীর স্পর্শ নেমে এল, মুহূর্ত্তে তাঁর সংশয় ঘুচে গেল। শাস্ত্রের মধ্যে যাঁকে খুঁজে পাননি তিনি যখন হঠাৎ চিত্তের মধ্যে ধরা দিলেন, তখনই জগতের সমস্ত দ্বন্দ্বের মধ্যে একের আবির্ভাব প্রকাশিত হ'ল, তখন কবি দেখ্‌লেন, জগতের মুক্তি এইখানে, এই মহা সুন্দরের মধ্যে। তখনই কবির আত্মনিবেদন গানে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌ল।

আমাদের সাধক কবিদের অন্তর থেকে গানের উৎস এম্‌নি ক'রেই খুলেছে। তাঁরা রামকে, আনন্দস্বরূপ পরম একককে আত্মার মধ্যে পেয়েছিলেন। তাঁরা সকলেই প্রায় অন্ত্যজ, সমাজের নীচের তলাকার, পণ্ডিতদের বাঁধা মতের

শাস্ত্র, ধার্ম্মিকদের বাঁধা নিয়মের আচার তাঁদের কাছে সুগম ছিল না। বাইরের পূজার মন্দির তাঁদের কাছে বন্ধ ছিল ব'লেই অন্তরের মিলনমন্দিরের চাবি তাঁরা খুঁজে পেয়েছিলেন। তাঁরা কত শাস্ত্রীয় শব্দ আন্দাজে ব্যবহার করেছেন, শাস্ত্রের সঙ্গে তার অর্থ মেলে না। তাঁদের এই প্রত্যক্ষ উপলব্ধির রাম কোনো পুরাণের মধ্যে নেই। তুলসীদাসের মত ভক্ত কবিও এদের এই বাঁধনছাড়া সাধনভজনে ভারি বিরক্ত। তিনি সমাজের বাহ্য বেড়ার ভিতর থেকে এ'দের দেখেছিলেন, একেবারেই চিন্‌তে পারেননি।

এঁরা হলেন এক বিশেষজাতের মানুষ। ক্ষিতিবাবুর কাছে শুনেছি, আমাদের দেশে এঁদের দলের লোককে ব'লে থাকে "মরমিয়া।" এঁদের দৃষ্টি, এঁদের স্পর্শ মর্ম্মের মধ্যে; এঁদের কাছে আসে সত্যের বাহিরের মূর্ত্তি নয়, তার মর্ম্মের স্বরূপ। বাঁধা পথে যাঁরা সাবধানে চলেন তাঁরা সহজেই সন্দেহ করতে পারেন যে, এঁদের দেখা এঁদের বলা সব বুঝি পাগলের খামখেয়ালি। অথচ সকল দেশে সকল কালেই এই দলের লোকের বোধের ও বাণীর সাদৃশ্য দেখ্‌তে পাই। সব গাছেরই দেখি কাঠের থেকে একই আগুন মেলে। সে আগুন তারা কোনো চুলো থেকে যেচে নেয়নি—চারদিক্ থেকে আপনিই ধ'রে নিয়েছে। গাছের পাতায় সূর্য্যের আলোর ছোঁওয়া লাগে, অম্‌নিই এক জাগ্রৎ শক্তির জোরে বাতাস থেকে তারা কার্ব্বন ছেঁকে নেয়, তেম্‌নি মানবসমাজের সর্ব্বত্রই এই মরমিয়াদের একটি সহজ শক্তি দেখা যায়, উপর থেকে তাঁদের মনে আলো পড়ে আর তাঁরা চারদিকের বাতাস থেকে আপনিই সত্যের তেজোরূপটিকে নিজের ভিতরে ধ'রে নিতে পারেন, পুঁথির ভাণ্ডারে শাস্ত্রবচনের সনাতন সঞ্চয়ের থেকে কুড়িয়ে বু'ড়য়ে তাঁদের সংগ্রহ নয়। এই জন্যে এঁদের বাণী এমন নবীন, তার রস কখনো শুকোয় না।

অনন্তকে ত জ্ঞানে কুলিয়ে ওঠে না,—ঋষি তাই বলেন, তাঁকে না পেয়ে মন ফিরে আসে! সেই অনন্তের সমস্ত রহস্য বাদ দিয়ে তাঁকে সম্প্রদায়ের ঈশ্বর, শাস্ত্রবাক্যের ঈশ্বর, কবুলতিপত্রে দশে মিলে দস্তখতের দ্বারা স্বীকার ক'রে-নেওয়া, হাটে বাটে গোলে হরিবোলের ঈশ্বর ক'রে নিই। সেই বরদাতা, সেই ত্রাণকর্ত্তা, সেই সুনির্দ্দিষ্টমতের ফ্রেম-দিয়ে বাঁধানো ঈশ্বরের ধারণা একেবারে পাথরের মত শক্ত; তাকে মুঠোয় ক'রে নিয়ে সাম্প্রদায়িক ট্যাঁকে গুঁজে রাখা চলে, পরস্পরের মাথা ভাঙাভাঙি করা সহজ হয়। আমাদের মরমিয়াদের ঈশ্বর কোনো একটি পুণ্যাভিমানী দলবিশেষের সরকারী ঈশ্বর নন, তিনি প্রাণেশ্বর।

কেননা ঋষি বলেচেন, জ্ঞানে তাঁকে পাওয়া যায় না, আনন্দেই তাঁকে পাওয়া যায়। অর্থাৎ হৃদয় যখন অনন্তকে স্পর্শ করে তখন হৃদয়মন তাঁকে অমৃত ব'লে বোধ করে, আর এই নিবিড় রসবোধেই সমস্ত সংশয় দূর হয়ে যায়। শেলি সেই বোধের গানই গেয়েছেন, মরমিয়া কবিদের কণ্ঠে সেই বোধেরই গান। যা রহস্য, জ্ঞানের কাছে তা নিছক অন্ধকার, তা একেবারে নেই বল্‌লেই হয়। কিন্তু যা রহস্য, হৃদয়ের কাছে তারই আনন্দ গভীর। সেই আনন্দের দ্বারাই হৃদয় অসীমতার সত্যকে প্রত্যক্ষ চিন্‌তে পারে। তখন সে কোনো বাঁধা রীতি মানে না, কোনো মধ্যস্থের ঘটকালিকে কাছে ঘেঁষতে দেয় না।

অমৃতের রসবোধ যার হয়নি, সেই মানে ভয়কে ক্ষুধাকে, ক্ষমতাকে। সে এমন একটি দেবতাকে মানে, যিনি বর দেন, নয় দণ্ড দেন। যাঁর দক্ষিণে স্বর্গ, বামে নরক। যিনি দূরে ব'সে কড়া হুকুমে বিশ্বশাসন করেন। যাঁকে পশুবলি দিয়ে খুসি করা চলে, যাঁর গৌরব প্রচার করবার জন্যে পৃথিবীকে রক্তে ভাসিয়ে দিতে হয়, যাঁর নাম ক'রে মানবসমাজে এত ভেদবিচ্ছেদ, পরস্পরের প্রতি এত অবজ্ঞা, এত অত্যাচার।

ভারতের মরমিয়া কবিরা শাস্ত্রনির্ম্মিত পাথরের বেড়া থেকে ভক্তের মনকে মুক্তি দিয়েছিলেন। প্রেমের অশ্রুজলে দেবমন্দিরের অঙ্গন থেকে রক্তপাতের কলঙ্ক-রেখা মুছে দেওয়া ছিল তাঁদের কাজ। যাঁর আবির্ভাব ভিতরের থেকে আনন্দের আলোকে মানুষের সকল ভেদ মিটিয়ে দেয়, সেই রামের দূত ছিলেন তাঁরা। ভারত-ইতিহাসের নিশীথরাত্রে ভেদের পিশাচ যখন বিকট নৃত্য করছিল তখন তাঁরা সেই পিশাচকে স্বীকার করেননি।

ইংরেজ মরমিয়া কবি যেমন দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে বলেছিলেন যে, বিশ্বের মর্ম্মাধিষ্ঠাত্রী দেবী আনন্দলক্ষ্মীই মানুষকে সকল বন্ধন থেকে মুক্তি দেবেন, তেম্‌নি তাঁরা নিশ্চয় জান্‌তেন যাঁর আনন্দে তাঁরা আপনাকে অহমিকার বেষ্টন থেকে ভাসিয়ে দিতে পেরেছিলেন, তাঁরই আনন্দে মানুষের ভেদবুদ্ধি দূর হ'তে পারবে; বাইরের কোনো রফারফি থেকে নয়। তাঁরা এখনো কাজ করচেন। আজও যেখানে কোথাও হিন্দু মুসলমানের আন্তরিক প্রেমের যোগ দেখি সেখানে দেখ্‌তে পাই তাঁরাই পথ ক'রে দিয়েছেন। তাঁদের জীবন দিয়ে গান দিয়ে সেই মিলনদেবতার পূজাপ্রতিষ্ঠা হয়েছে যিনি "সেতুর্বিধরণরেষাং লোকানামসম্ভেদায়।" তাঁদেরই উত্তরসাধকেরা আজও বাংলা দেশের গ্রামে গ্রামে একতারা বাজিয়ে গান গায়; তাদের সেই একতারার তার ঐক্যেরই তার। ভেদবুদ্ধির পাণ্ডা শাস্ত্রজ্ঞের দল তাদের উপর দণ্ড উদ্যত করেচে। কিন্তু এতদিন যারা সামাজিক অবজ্ঞায় মরেনি, তারা-যে সামাজিক শাসনের কাছে আজ হার মানবে একথা বিশ্বাস করিনে।

যেহেতু ভারতীয় সমাজ ভেদবহুল, যেহেতু এখানে নানা ভাষা, নানা ধর্ম্ম, নানা জাতি, সেই জন্যেই ভারতের মর্ম্মের বাণী হচ্চে ঐক্যের বাণী। সেই জন্যেই যাঁরা যথার্থ ভারতের শ্রেষ্ঠপুরুষ তাঁরা মানুষের আত্মায় আত্মায় সেতু নির্ম্মাণ করতে চেয়েছেন। যেহেতু বাহিরের আচার ভারতে নানা আকারে ভেদকেই পাকা ক'রে রেখেছে এইজন্যেই ভারতের শ্রেষ্ঠ সাধনা হচ্চে বাহ্য আচারকে অতিক্রম ক'রে অন্তরের সত্যকে স্বীকার করা। পরম্পরাক্রমে ভারতবর্ষের মহাপুরুষদের আশ্রয় ক'রে এই সাধনার ধারা চিরদিনই চলেছে। অথচ ভারতসমাজের বাহিরের অবস্থার সঙ্গে তার অন্তরের সাধনার চিরদিনই বিরোধ, যেমন বিরোধ ঝরনার সঙ্গে তার স্রোতঃপথের পাথরগুলোর। কিন্তু অচল বাধাকেই কি সত্য বল্‌ব, না সচল প্রবাহকে? সংখ্যাগণনায় বাধারই জিত, তার ভারও কম নয়, কিন্তু তাই ব'লেই তা'কে প্রাধান্য দিতে পারিনে। ঝির্ ঝির্ ক'রে একটুখানি যে-জল শৈলরাজের বক্ষ-গুহা থেকে বেরিয়ে আস্‌চে, বহু আঘাতব্যাঘাতের ভিতর দিয়ে বিপুল বিস্তীর্ণ বালুকারাশির একপ্রান্তে কোনোমতে পথ ক'রে নিয়ে সমুদ্রসন্ধানে চলেছে, পর্ব্বতের বরফ-গলা বাণী তারই লহরীতে। এই শীর্ণ স্বচ্ছ প্রচ্ছন্ন ধারাটিই মহায়তন বহুবিচ্ছিন্নতার ভিতরকার ঐক্যসূত্র।

ভারতের বাণী বহন ক'রে যে-সকল একের দূত এদেশে জন্মেছেন তাঁরা যে প্রথম হ'তেই এখানে আদর পেয়েছেন তা নয়। দেশের লোক নিতান্তই যখন তাঁদের অস্বীকার করতে পারেনি তখন নানা কাল্পনিক কাহিনী দ্বারা তারা তাঁদের স্মৃতিকে চেয়েছে শোধন ক'রে নিতে, যতটা পেরেছে তাঁদের চরিতের উপর সনাতনী রঙের তুলি বুলিয়েছে। তবু ভারতের এই শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা অনাদর পেতে বাধা পেয়েছিলেন একথা মনে রাখা চাই; সে আদর না পাওয়াই স্বাভাবিক, কেননা তাঁরা ভেদ-প্রবর্ত্তক সনাতন বিধির বাহিরের লোক, যেমন খৃষ্ট ছিলেন য়িহুদী ফ্যারিসি-গণ্ডীর বাহিরে। কিন্তু বহুদিন তাঁরা অনাদরের অসাম্প্রদায়িক ছায়ায় প্রচ্ছন্ন ছিলেন ব'লে তাঁরাই যে অভারতীয় ছিলেন তা নয়। তাঁরাই ছিলেন যথার্থ ভারতীয়, কেননা তাঁরাই বাহিরের কোনো সুবিধা থেকে নয় অন্তরের আত্মীয়তা থেকে হিন্দুকে মুসলমানকে এক ক'রে জেনেছিলেন—তাঁরাই ঋষিদের সেই বাক্যকে সাধনার মধ্যে প্রমাণ করেছিলেন যে-বাক্য বলে, সত্যকে তিনিই জানেন যিনি আপনাকেই জানেন সকলের মধ্যে।

ভারতীয় এই সাধকদেরই সাধনাধারা বর্ত্তমান কালে প্রকাশিত হয়েছে রামমোহন রায়ের জীবনে। এই যুগে তিনিই উপনিষদের ঐক্যতত্ত্বের আলোকে হিন্দুমুসলমান খৃষ্টানকে সত্যদৃষ্টিতে দেখ্‌তে পেয়েছিলেন, তিনি কাউকেই বর্জ্জন করেননি। বুদ্ধির মহিমায় ও হৃদয়ের বিপুলতায় তিনি এই বাহ্যভেদের ভারতে আধ্যাত্মিক অভেদকে উজ্জ্বল ক'রে উপলব্ধি করেছিলেন এবং সেই অভেদকে প্রচার করতে গিয়ে দেশের লোকের কাছে আজও তিনি তিরস্কৃত। যাঁর নির্ম্মল দৃষ্টির কাছে হিন্দুমুসলমান খৃষ্টানের শাস্ত্র আপন দুরূহ বাধা সরিয়ে দিয়েছিল তাঁকে আজ তারাই অভারতীয় বল্‌তে স্পর্দ্ধা করছে পাশ্চাত্য-

বিদ্যা ছাড়া আর কোনো বিদ্যায় যাদের অভিনিবেশ নেই। আজকের দিনেও রামমোহন রায় আমাদের দেশে যে জন্মেছেন তাতে এই বুঝতে পারি যে, কবির নানক দাদু ভারতের যে সত্যসাধনাকে বহন করেছিলেন আজও সেই সাধনার প্রবাহ আমাদের প্রাণের ক্ষেত্র পরিত্যাগ করেনি। ভারতচিত্তের প্রকাশের পথ উদ্ঘাটিত হবেই।

মাটির নীচের তলায় জলের স্রোত বইচে, ঘোর শুষ্কতার দিনে এই আশার কথাটি মনে করিয়ে দেওয়া চাই। মরুর বেড়া লোহার বেড়ার চেয়ে দুস্তর। আমাদের দেশে সেই শুষ্কতার সেই অপ্রেমের বেড়াই সকলের চেয়ে সর্ব্বনেশে হয়ে দিকে দিকে প্রসারিত। প্রয়োজনের যোগ মশকে জল-বহে-নেওয়া সার্থবাহের যোগের মত। তাতে ক্ষণে ক্ষণে বিশেষ কোনো একটা কাজ দেয়, কখনো বা দেয়ও না, বালির আঁধিতে সব চাপা দিয়ে ফেলে; মশকের জল তেতে উঠে, শুকিয়ে যায়, ফুটো দিয়ে ঝ'রে পড়ে। এই মরুতে যেখানে মাটির নীচের চিরবহমান লুকানো জল উৎসারিত হয়ে ওঠে সেইখানেই বাঁচোয়া। মরমিয়া কবিদের বাণীস্রোত বইচে সমাজের অগোচর স্তরে। শুষ্কতার বেড়া ভাঙ্‌বার সত্যকার উপায় আছে সেই প্রাণময়ী ধারার মধ্যে। তাকে আজ সাহিত্যের উপরিতলে উদ্ধার ক'রে আন্‌তে হবে। আমাদের পুরাণে আছে যে-সগর বংশ ভস্ম হয়ে রসাতলে পড়েছিল তাদেরই বাঁচিয়ে দেবার জন্যে বিষ্ণুপাদপদ্মবিগলিত জাহ্নবীধারাকে বৈকুণ্ঠ থেকে আবাহন ক'রে আনা হয়েছিল। এর মধ্যে গভীর অর্থটি এই যে, প্রাণ যেখানে দগ্ধ হয়ে গেছে সেখানে তাকে রসপ্রবাহেই বাঁচিয়ে তোলা যায়, কেবল মাত্র কোনো একটা কর্ম্মের আবর্ত্তনে তাকে নড়ানো যায় মাত্র, বাঁচানো যায় না। মৃত্যু থেকে মানুষের চিত্তকে পরিত্রাণ করার জন্যে বৈকুণ্ঠের অমৃতরসপ্রস্রবণের উপরেই আমাদের মরমিয়া কবিরা দৃঢ় আস্থা রেখেছিলেন, কোনো একটা বাহ্য আচারের বাজিনামার উপরে নয়। তাঁরা যে রসের ধারাকে বৈকুণ্ঠ থেকে এনেছিলেন, আমাদের দেশের সামাজিক বালুর তলায় তা অন্তর্হিত। কিন্তু তা ম'রে যায়নি। ক্ষিতিমোহন বাবু তার নিয়েছেন বাংলা দেশে সেই লুপ্তস্রোতকে উদ্ধার ক'রে আন্‌বার। শুধু কেবল হিন্দী ভাষা থেকে নয়, আশা ক'রে আছি বাংলা ভাষার গুহার থেকে বাউলদের সেই সুবর্ণরেখার বাণীধারাকে প্রকাশ করবেন যার মধ্যে সোনার কণা লুকিয়ে আছে।*

*এই প্রবন্ধটি শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের দাদুর পদসংগ্রহের ভূমিকা। এই পুস্তক শীঘ্র মুদ্রিত হইবে। —প্রবাসীর সম্পাদক

নষ্টচন্দ্র

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

বিকাল বেলা কাছারীর ছুটির পর অনল আবার যখন প্রাত্যহিক নিয়ম-মতো ধনিষ্ঠার বাড়ীতে ধনিষ্ঠাকে পড়াতে এল, তখন ধনিষ্ঠা সবেমাত্র খেয়ে উঠে' মুখ-শুদ্ধি মুখে দিয়ে দালানে এসে দাঁড়িয়েছে। অনল এসে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—এ-বেলা পড়্‌বেন না? এ-বেলাও ছুটি?

ধনিষ্ঠা হেসে বল্‌লে—পোড়ো ত পালাতে পার্‌লেই বাঁচে, কিন্তু মাষ্টার মশায়ের উচিত কড়া হয়ে ছুটি নামঞ্জুর করা। আপনি বসুন, আমি দেখে আসি আমার সহ-পাঠীটি কি কর্‌ছে?

অনল আশ্চর্য্য হয়ে কৌতুকভরা হাসিমুখে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—আপনার আবার সহপাঠী কে জুটল?

ধনিষ্ঠা কৌতুকে আনন্দে দেহখানিকে হিল্লোলিত

করে' চোখের কোণে চমকে-যাওয়া কটাক্ষ ঠিকরে ঠোঁটের কোণে রঙীন হাসির আভাস টিপে বললে—আন্দাজ করুন ত!

অনল নিরন্তর-ব্রতচারিণী তপঃকৃশা সুগম্ভীরা তরুণী ধনিষ্ঠাকে আজ অকস্মাৎ বয়োধর্ম্ম-আনন্দ-চঞ্চলতা প্রকাশ করতে দেখে নিজেরও গাম্ভীর্য্য রক্ষা করতে পারলে না, সে হেসে বললে—আপনি কাকে সহপাঠী জুটিয়ে এনেছেন আমি কেমন করে' আন্দাজ করব?

ধনিষ্ঠা আবার চোখের কোণে কৌতুকের হাসি চলকে লীলা-হিল্লোলিত গতিতে সেখান থেকে চলে' যেতে-যেতে মুখ ফিরিয়ে বলে' গেল—দাঁড়ান, আমি এনে আপনাকে দেখাচ্ছি।

ধনিষ্ঠা সেখান থেকে চলে' গেলে পর অনল ধনিষ্ঠার গমন-পথের দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আজ তারও মনের মধ্যে অনাস্বাদিতপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় একটি আনন্দের আভাস তাকে ক্ষণে-ক্ষণে স্পর্শ করে' যাচ্ছিল।

ধনিষ্ঠা গৌরীকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে স্নান-আহার করতে গিয়েছিল। সে অনলের কাছ থেকে এসে গৌরীর ঘরে গিয়ে ঢুকল। ধনিষ্ঠা ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখলে বিছানায় গৌরী নেই। সে ঘরের চারিদিকে চোখ ফিরিয়ে দেখলে, কিন্তু গৌরীকে কোথাও দেখতে পেলে না। ধনিষ্ঠা ফিরে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ কোথা থেকে দুখানি ছোট-ছোট হাত ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরলে।

ধনিষ্ঠা হাসিমুখ ফিরিয়ে বলে' উঠল—দুষ্টু মেয়ে? কোথায় লুকিয়ে থাকা হয়েছিল?

গৌরী পক্ষী-কাকলির মতন খিল্-খিল্ করে' হেসে বলে' উঠল—আমি কেমন দরজার আড়ালে লুকিয়ে ছিলাম, তুমি ত আমাকে দেখতে পাওনি।

ধনিষ্ঠা নীচু হয়ে গৌরীকে কোলে তুলে নিলে। তারা দুজনেই কেউ কারো কথা একটুও বুঝতে পারলে না, কিন্তু তবুও তারা দুজনেই কৌতুক-ক্রীড়ার আনন্দ সম্পূর্ণই সম্ভোগ করতে পারলে। স্নেহ-বন্ধন তাদের অন্তরের ভাষা হয়ে উঠছিল।

গৌরীকে কোলে করে' তুলেই ধনিষ্ঠার মনে পড়ল তার মুখে মুখশুদ্ধি আছে। সে তৎক্ষণাৎ জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে মুখশুদ্ধি ফেলে দিয়ে গৌরীকে কোলে করে' নিয়ে অনলের কাছে ফিরে এল।

অনল তাদের দূর থেকে আসতে দেখেই আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল; ধনিষ্ঠা নিকটে আসতেই সে বললে—ও! ইনিই বুঝি আপনার সহপাঠী হবেন আজ থেকে?

ধনিষ্ঠা মাথা দুলিয়ে হাসিমুখে বললে—হ্যাঁ।

বৈকালিক জলযোগ সমাপ্ত করে' অনল পড়াতে এবং ধনিষ্ঠা ও গৌরী পড়তে বসল। অনল ধনিষ্ঠাকে ইংরেজি পড়াচ্ছে, গৌরী শিক্ষক ও ছাত্রী উভয়েরই উচ্চারণের ভুল ধরে' হেসে উঠল। অনল গৌরীর কথা ধনিষ্ঠাকে বুঝিয়ে দিলে, গৌরীর সঙ্গে-সঙ্গে ধনিষ্ঠাও হাসতে লাগল। তার পরে গৌরীর বাংলা পড়ার পালা, তাতেও সকলের হাস্য-কৌতুকের খোরাক জুটতে লাগল পদে-পদে। গম্ভীর অনল ও ধনিষ্ঠার মাঝখানে আনন্দময়ী এই বালিকার আবির্ভাব হওয়াতে তাদের গাম্ভীর্য্য ক্ষণে-ক্ষণে ভঙ্গ হয়ে হাস্যমুখর চঞ্চলতায় পরিণত হচ্ছিল।

সন্ধ্যার সময় অনল গৌরীকে বললে—চলো মা-লক্ষ্মী, বাড়ী যাই।

গৌরী জিজ্ঞাসা করলে—আমি মার কাছে থাকব না?

অনল বললে—কাল আবার এসো।

শান্ত মেয়ে গৌরী আর দ্বিরুক্তি না করে' উঠে দাঁড়াল।

ধনিষ্ঠা তাদের কথা কিছুই বুঝতে না পেরে উৎসুক ও কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাদের দিকে চেয়ে আছে দেখে অনল হেসে বললে—গৌরী যে এক দিনেই মাকে ছেড়ে বাড়ী যেতে চায় না।

ধনিষ্ঠা লজ্জিত হয়ে নতমুখে মৃদুস্বরে বললে—ও আমার কাছেই থাক না।

অনল হেসে বললে—একে আমি পুরুষ-মানুষ, পরিচিত আত্মীয়কেও আপনার করে' তোলবার যাদুবিদ্যা আমার জানা নেই, অপরিচিত আত্মীয়কে আপনার করে' তোলা আমার পক্ষে এক কঠিন সাধনা। এখন থেকেই গৌরী

আমার কাছছাড়া হয়ে থাক্‌লে আমাদের মধ্যে স্নেহের বন্ধন দৃঢ় হবার অবসর ঘট্‌বে না। কিছুদিন আমার কাছে থেকে ও আমার ঘনিষ্ঠ আর নেওটা হয়ে উঠ্‌লে ওকে কাছছাড়া করতে আর ভয় থাক্‌বে না।... ...ওকে ত আপনি এক দিনেই আপনার করে' ফেলেছেন, ও আপনারই হয়ে থাক্‌বে।

ধনিষ্ঠা নীরব হয়ে রইল, অনলের ঐ কথার পর সে প্রকাশ্যে জেদ্‌ বা অনুরোধ কর্‌তে পার্‌লে না, কিন্তু মনে-মনে সে ভাব্‌ছিল, গৌরী তার কাছে থাক্‌লেই ভালো হ'ত; গৌরীকে ছোঁয়া-নাড়া নিয়ে অনলের যে কি-রকম অসুবিধা ভোগ কর্‌তে হচ্ছে,তার খবর মাধবীর মুখে শুনেই ধনিষ্ঠা সঙ্কল্প করেছিল গৌরীকে সে নিজের কাছেই রাখ্‌বে; একদিনেই অনলকে বার-চারেক স্নান কর্‌তে ও রাত্রে অনাহারে থাক্‌তে হয়েছে, বারোমাস ত্রিশ দিন এ-রকম কষ্ট কর্‌লে কি পুরুষ-মানুষের শরীর টিক্‌বে? গৌরী তার কাছে থাক্‌লে অনল যে কষ্ট ভোগ করেছে সেটা যে তাকেই ভোগ কর্‌তে হবে, এই সম্ভাবনায় তাকে কিছুমাত্র শঙ্কিত করে' তোলেনি; বরং ধনিষ্ঠার ভাব দেখে মনে হ'ল পরের কষ্ট সে নিজে নিতে না পেরে বিশেষ রকম ক্ষুণ্ণই হয়েছে।

সন্ধ্যার পর অনল গৌরীকে খাইয়ে আঁচিয়ে দিয়ে বিছানায় এনে শোয়ালে এবং নিজে তার কাছে বস্‌ল।

গৌরী তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—তুমি খাবে না বাবা?

অনল বল্‌লে—তুমি ঘুমোও, তার পরে খাব। এখনও ত বেশী রাত হয়নি।

গৌরী আবার জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কাল সকালে আবার মার বাড়ীতে যাবো?

—হ্যাঁ, যাবে বই কি, রোজ যাবে। তুমি তোমার মাকে ভালোবাসো গৌরী?

—হুঁ, মা যে আমাকে ভালোবাসে।

—তুমি আমাকে ভালোবাসো না?

গৌরী বলে' উঠ্‌ল—তোমাকেও ভালোবাসি বাবা। তুমি যদি মার বাড়ীতে থাকো তা হ'লে বেশ হয়, আমি তোমার কাছেও থাকি, মার কাছেও থাক্‌তে পাই।

অনল হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল, এবং একটুক্ষণ চুপ করে' থেকে বল্‌লে—তোমার মার বাড়ীতে গিয়ে খুব সাবধানে থেকো—যে যে-ঘরে তিনি তোমাকে নিয়ে যাবেন কেবল সেই-সব ঘরেই তুমি ঢুকো; অন্য-সব ঘরে, বিশেষ করে' যে-ঘরে খাবার জিনিস থাকে বা যে-ঘরে ঠাকুর আছেন, সে-সব ঘরে তুমি খবর্‌দার কখনো ঢুকো না। তোমার মা যখন পূজো কর্‌বেন কিম্বা খাবেন তখন তাঁর কাছে খবর্‌দার যেও না।

গম্ভীর অনলের মুখ থেকে এই দীর্ঘ উপদেশ শুনে গৌরীর আনন্দ কেমন ঝাপ্‌সা ম্লান হয়ে উঠ্‌ল। কেবল নিষেধ নিষেধ নিষেধ! বাধা আর নিষেধ দুই মুঠি দিয়ে যেন তার কোমল-কচি প্রাণটিকে চেপে ধরে' নিশ্বাস বন্ধ করে' মার্‌তে চাচ্ছে। গৌরী ভয় পেয়ে উদ্বিগ্নস্বরে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কেন বাবা, আমি ঘরে ঢুক্‌লে কি হয়? শীত কর্‌লেও চার বার নাইতে হয়?

গৌরীর প্রশ্নে নিজের আচরণের কথা মনে পড়ে' যাওয়াতে অনল একটু লজ্জা ও অস্বস্তি অনুভব কর্‌তে লাগ্‌ল, কিন্তু সে ভাব্‌লে লজ্জা করে' সত্য গোপন করে' চল্‌লে গৌরী যে-সমস্ত উৎপাত ও অসুবিধা নিরন্তর ঘটাতে থাক্‌বে সে-সমস্ত সে সহ্য কর্‌লেও ধনিষ্ঠাকে সেই অসুবিধায় ফেল্‌তে সে ত কিছুতেই পারে না; সুতরাং গৌরীর কাছে রূঢ় হ'লেও, এবং বল্‌তে নিজের কষ্ট হ'লেও সত্য কথা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে' গৌরীকে বুঝিয়ে দিতেই হবে। এই ভেবে অনল গৌরীর প্রশ্নের উত্তরে বল্‌লে—হ্যাঁ।

এই ছোট্ট একটু হ্যাঁ বল্‌তেই অনলের গলাটা অকারণ কান্নার আবেশে একটু কেঁপে উঠ্‌ল। সে আর কিছু বল্‌তে পার্‌লে না। এর চেয়ে বেশী নিষ্ঠুর হ'তে পার্‌লে না।

গৌরী অনলের কাছ থেকে আর কোনো উত্তর না পেয়ে নিজেই বল্‌তে লাগ্‌ল—তোমার রান্নাঘরে আর খাবার ঘরে বামুন ঠাকুর যায়, হরির মা যায়, উমেশ যায়, তাতে ত কিছু দোষ হয় না?

অনল বিব্রত হয়ে আম্‌তা-আম্‌তা কর্‌তে-কর্‌তে বল্‌লে—ওরা বড় মানুষ কিনা, ওরা গেলে দোষ হয় না; ছেলেমানুষ গেলেই দোষ হয়।

গৌরী জিজ্ঞাসা করলে—আমি যখন ওদের মতন বড় হবো তখন আর কোনো দোষ হবে না?

অনল একটু কথা ঘুরিয়ে বললে—না—বড় হয়ে তুমি নিজে বুঝে-সুঝে যেখানে যাবে, সেখানে গেলে কোনো দোষ হবে না।

গৌরী একটুক্ষণ চুপ করে' থেকে ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করে' উঠ্‌ল—আমি কবে বড় হবো—আজ, না কাল? বলো না, বাবা।

অনল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সস্নেহে গৌরীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে-দিতে মিষ্টস্বরে বল্‌লে—তুমি লক্ষ্মী মেয়ে, আরো শান্ত হয়ে থাক্‌লে শীগগিরই বড় হয়ে উঠ্‌বে।

গৌরী নিদ্রাজড়িতস্বরে বল্‌লে—আমি শান্ত হয়ে থাকব। খুব খুব শান্ত হবো।

গৌরীর ঘুম এসেছে দেখে অনল বল্‌লে—তুমি আর কথা বোলো না, ঘুমোও; এখন রাত জাগ্‌লে সকালে উঠ্‌তে দেরী হবে, আর তোমার মার বাড়ী থেকে তোমাকে নিয়ে যাবার জন্যে লোক এসে ফিরে' চলে' যাবে, তোমার যাওয়া হবে না।

গৌরী ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি বলে' উঠ্‌ল—না বাবা না, আমাকে নিতে এলে তুমি তাদের একটু দাঁড়াতে বোলো, আর আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিও।

অনল ঈষৎ হেসে বল্‌লে—আচ্ছা, তাই হবে।

গৌরী পাশ ফিরে' ছোট্ট মাথাটি কাত করে' লেপের মধ্যে গুটিশুটি হয়ে শুলো এবং সঙ্গে-সঙ্গেই চোখ-দুটি বুজে ক্লান্ত নিশ্বাস টেনে-টেনে ঘুমিয়ে পড়্‌ল। কিছুক্ষণ পরে গৌরীর ঘুম গাঢ় হয়ে উঠেছে দেখে অনল উঠে কাপড় ছাড়্‌লে, হাত-পা ধুলে, এবং গঙ্গাজল স্পর্শ করে' ভৃত্যকে ডেকে বললে—উমেশ, বামুন-ঠাকুরকে ভাত দিয়ে যেতে বল্।

অনল এখন বড়লোক হয়েছে, তার বাড়ীতে এখন চাকর দাসী রাঁধুনী দারোয়ান গাড়া ঘোড়া কোচ্‌ম্যান্ সহিস! দারিদ্র্যের চিহ্ন তার কোনো দিকে নেই।

*

* *

পরদিন গৌরী আস্‌বার আগেই ধনিষ্ঠা স্নান করে' পূজা আহ্নিক সেরে একটু জল খেয়ে নিয়েছিল, কারণ লেখাপড়া করে' গৌরীকে খাইয়ে ও ঘুম পাড়িয়ে তার খেতে একেবারে অপরাহ্ণ হয়ে যাবে।

গৌরী তার নূতন মার সঙ্গে দুজনেরই না-বোঝা ভাষায় গল্প কর্‌তে-কর্‌তে ঘুমিয়ে পড়েছে, এবং এই অবসর পেয়ে ধনিষ্ঠা আবার স্নান করে' শুচি হয়ে খেতে বসেছে।

অল্পক্ষণ পরেই গৌরীর ঘুম ভেঙে গেল, সে চোখ মেলে দেখ্‌লে তার পাশে মা শুয়ে নেই। মাকে খোঁজ্‌বার জন্যে সে ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে এল এবং চারি দিকে দৃষ্টি বুলাতে-বুলাতে লম্বা বারাণ্ডা দিয়ে আপন মনে এক দিকে এগিয়ে চল্‌ল। কিছু দূর গিয়েই বারাণ্ডার একটা বাঁকের মোড় থেকে সে হঠাৎ দেখ্‌তে পেলে সাম্‌নের এক ঘরে গরদের কাপড় পরে' দরজার দিকে পিঠ করে' একখানি বড় পুরু গালিচার আসনের উপর তার মা বসে' আছে। দরজার দিকে পিঠ ফিরিয়ে থাকাতে তার মা যে কি করছেন তা গৌরী দেখ্‌তে পাচ্ছিল না, এমন সময় এমন ভাবে মা যে কি কর্‌তে পারেন ভেবে দেখ্‌বার মতন তার বুদ্ধি কি শক্তি ছিল না। মার পিছন দিক্ থেকে অতর্কিতে গিয়ে মার গলা হঠাৎ জড়িয়ে ধরে' মাকে চম্‌কে দেবে মনে করে' গৌরী কৌতুকে উজ্জ্বল হয়ে একমুখ হাসি চেপে পা টিপে-টিপে ঘরের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করলে। সেই সময় মাধবীও একখানি শাদা পাথরের থালার উপরে কয়েকটি শাদা আর কালো পাথরের বাটি বসিয়ে ধনিষ্ঠার জন্যে ক্ষীর দই সন্দেশ নিয়ে আস্‌ছিল; দুই হাত তার বদ্ধ, ভারাক্রান্ত, তার ইচ্ছা হ'লেও সে ছুটে এসে গৌরীকে ধরে' ফেল্‌তে পার্‌লে না, সে দূর থেকেই চেঁচাতে লাগ্‌ল—ও মেম্-দিদি-মণি তুমি ও-ঘরে যেও না, ও মেম্-দিদি-মণি তুমি ও-ঘরে যেও না!...

গৌরী মাধবীর এই অকস্মাৎ চীৎকার শুনে কতকটা ভয় পেয়ে এবং কতকটা মাধবী চীৎকার করে' তার মজার খেলাটুকু নষ্ট করে' দিচ্ছে ভেবে ছুটে গিয়ে ধনিষ্ঠার পিঠের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে' দুই হাতে তার গলা জড়িয়ে

ধর্‌লে। সে ভয় পেয়ে না গেলে মাধবীর ভাষা না বুঝেও তার নিষেধের তাৎপর্য্য বুঝ্‌তে পারৃত, কিন্তু ব্যস্ততার জন্যে সে তাৎপর্য্যের দিকে মনোযোগ কর্‌তে পারেনি। মাধবীর চীৎকার শুনে ব্যাপার কি দেখ্‌বার জন্যে ঠিক যেই মুহূর্ত্তে ধনিষ্ঠা পিছন দিকে মুখ ফিরিয়েছে ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই গৌরী তার পিঠের উপর গিয়ে পড়্‌ল এবং তার এঁটো মুখের সঙ্গে গৌরীর মুখের হঠাৎ ঠেকাঠেকি হয়ে গেল।

ধনিষ্ঠা মুখের গ্রাস পাতের গোড়ায় উগ্‌লে ফেলে দিয়ে হাস্যপ্রফুল্ল মুখে বল্‌লে—কি রে পাগ্‌লী, এর মধ্যে ঘুম হয়ে গেল! ছাড়্‌, মুখ ধুয়ে আসি, তার পর দুজনে খেলা কর্‌ব, তার পর বিকালবেলা আবার পড়্‌তে হবে।

হাতের খাবারগুলো ম্লেচ্ছ-সংস্পর্শে নষ্ট না হয়ে যায় এইজন্যে আগে থাক্‌তেই সাবধান হয়ে মাধবী সেগুলিকে অন্য ঘরে রেখে এসেছিল। তার পর ধনিষ্ঠার ঘরে তাড়াতাড়ি ছুটে এসেই গৌরীকে ধনিষ্ঠার গলা জড়িয়ে থাক্‌তে দেখে কপালে করাঘাত করে' আর্ত্ত বিরক্ত স্বরে বলে' উঠ্‌ল—আঃ আমার পোড়া কপাল! দিনান্তে একটিবার হবিষ্যিতে বসে' হাতে-ভাতে করে' ত ওঠো, তাতেও আজ বিঘ্নি হয়ে গেল!

গৌরী ধনিষ্ঠাকে মুখের গ্রাস ফেলে দিয়ে খাওয়া থেকে নিবৃত্ত হয়ে হাত গুটিয়ে বস্‌তে দেখে এবং মাধবীর ভাব-ভঙ্গী দেখে ধনিষ্ঠার গলা ছেড়ে দিয়ে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে শিটিয়ে দাঁড়াল; তার মনে পড়ে' গেল কাল রাত্রে অনল তাকে কি-কি নিষেধ করে' উপদেশ দিয়েছিল। নিজের অপরাধ স্মরণ করে' লজ্জায় ভয়ে তার মুখখানি শাদা পাংশুবর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

শিশুর ভয়ার্ত্ত মুখ দেখে ব্যথিত হয়ে ধনিষ্ঠা আসন ছেড়ে তাড়াতাড়ি উঠে হাস্‌তে-হাস্‌তে গৌরীকে কোলে তুলে নিলে, যেন সে কোনো অন্যায় অপকর্ম্মই করেনি। গৌরীকে কোলে করে' নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে-যেতে ধনিষ্ঠা মাধবীকে বল্‌লে—একবার কাউকে পাঠিয়ে দিয়ে পুরুত-ঠাকুরকে ডেকে পাঠা ত।

মাধবী বিরক্তস্বরে বলে' উঠ্‌ল—একদিন খাওয়া নষ্ট হয়েছে বলে' আর কদিন খাওয়া বন্ধ রেখে উপোষ কর্‌তে হবে তারই ব্যবস্থা নেওয়া হবে বুঝি?

ধনিষ্ঠা হাসিমুখে কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করে' বলে' গেল—যা যা, তোর আর মোড়লি কর্‌তে হবে না।

ধনিষ্ঠা মুখ ধুয়ে গৌরীকে নিয়ে খেল্‌তে প্রবৃত্ত হ'ল, কিন্তু গৌরীর মন কিছুতেই স্বচ্ছন্দ ও প্রফুল্ল হয়ে উঠ্‌তে পার্‌ছিল না। জ্যাঠামহাশয়ের নিষেধ ও আপনার অপরাধ মনে পড়ে' তার মনটা অশান্ত হয়ে উঠেছিল। তার উপর ভয় ছিল, না জানি আবার কখন কি করে' ফেলে।

ধনিষ্ঠা ও গৌরীর খেলা কিছুতেই জম্‌ছিল না, অনল এসে তাদের অস্পষ্ট সঙ্কোচ থেকে অব্যাহতি দিলে। ধনিষ্ঠা অনলকে দেখে গৌরীকে বল্‌লে—চলো গৌরী, এবার আমরা পড়্‌তে যাই।

গৌরীর যেন স্বচ্ছন্দ-বিচরণের শক্তি একেবারে লোপ পেয়ে গিয়েছিল, সে ধনিষ্ঠার হাতে পুতুলের মতন যেদিকে চালিত হচ্ছিল সেই দিকেই যাচ্ছিল।

ধনিষ্ঠা ও গৌরী পড়্‌তে বসেছে, মাধবী এসে খবর দিলে—ভট্‌চায্যি মশায় এসেছেন।

ধনিষ্ঠার মুখ হঠাৎ আরক্ত হয়ে উঠ্‌ল। সে কারো দিকে না তাকিয়ে মৃদুস্বরে বল্‌লে—তাঁকে ওদিকের দালানে বস্‌তে দিগে যা, আমি যাচ্ছি।

অনল জিজ্ঞাসা কর্‌লে—আবার নূতন ব্রত নাকি?

ধনিষ্ঠা অনলের কথার শব্দ শুনে তার দিকে চোখ তুল্‌তে-তুলতে ও তার প্রশ্ন শুনে চোখ না তুলে লজ্জিত হয়ে মৃদুস্বরে বল্‌লে—"না, ব্রতট্রত কিছু নয়। আমি এখনি আস্‌ছি।" এই বলে' ধনিষ্ঠা সেখান থেকে উঠে চলে' গেল।

ধনিষ্ঠা চলে' গেলে অনল গৌরীকে আদর করে' কোলের কাছে টেনে নিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—মা-মণি, সমস্ত দিন তোমার মার সঙ্গে কি কর্‌লে?

গৌরী মাতাল পিতার সন্তান; তার মার মেজাজও স্বামীর আচরণে ও অত্যাচারে বিশেষ মোলায়েম্ ছিল না; তাদের দুজনের যত খাম্‌খেয়ালি রাগ আর অভিমানের উৎপীড়ন আজন্ম তাকেই সহ্য কর্‌তে হয়েছে; এ-জন্যে গৌরী স্বভাবতীরু নিরুৎসাহ শান্তপ্রকৃতি হয়ে

উঠেছিল; বয়সধর্ম্ম-অনুসারে সে মাঝে-মাঝে প্রফুল্ল ও আনন্দচঞ্চল হয়ে উঠ্‌তে চাইত, কিন্তু বার-বারই একটা বাধা এসে তাকে নিরস্ত করে' দিয়ে যেত। এখানে এসে পরের কাছে অত্যাচারের পরিবর্ত্তে আদর পেয়ে সে অপরিচয়ের সঙ্কোচ উত্তীর্ণ হয়ে উৎফুল্ল হয়ে ওঠ্‌বার উপক্রম করতে-না-করতেই তাকে চারিদিক্ থেকে নিষেধের বেড়াজালে ঘিরে বিব্রত করে' তুলেছে। তাই অনলের প্রশ্ন শুনে তার ভয় হ'ল—তার বাবা কাল তাকে বিশেষভাবে নিষেধ করে' দেওয়া সত্ত্বেও আজ সে নিজের গণ্ডী অতিক্রম করে' মায়ের খাওয়া নষ্ট করেছে, এই খবর তার বাবা পেলে তাকে হয়ত কোনো গুরু শাস্তি ভোগ করতে হবে। এজন্যে ভয়ে-ভয়ে সে বল্‌লে—আমি জানিনে, মা জানে।

গৌরীর এই উত্তর শুনে অনল কৌতুক অনুভব করলে এবং একটু হেসে গৌরীকে পড়াতে লাগ্‌ল। ছেলেমানুষের মনস্তত্ত্ব তার জানা ছিল না, কাজেই গৌরীর উত্তরের অর্থ নিয়ে সে বেশী মাথা ঘামালে না।

ধনিষ্ঠা পুরুতঠাকুরের নিকটে গিয়ে উপস্থিত হ'তেই সে জিজ্ঞাসা করলে—মা-জননী, আবার কেন আমাকে স্মরণ করেছ? আবার কি নূতন ব্রত নিতে হবে? হিন্দু-শাস্ত্রের কোনো ব্রত কি তুমি বাকী রেখেছ?

ধনিষ্ঠা লজ্জিত হয়ে বল্‌লে—ব্রতের জন্যে নয়। একটা বিশেষ গোপন-কথা আপনাকে বল্‌বার জন্যে ডেকেছি।

পুরুতঠাকুর আশ্চর্য্য হয়ে ধনিষ্ঠার মুখের দিকে অবাক্ হয়ে তাকিয়ে রইল। না জানি কি কথা সে শুনবে। বিস্ময়ে কৌতূহলে তার আয়ত চক্ষু ঠিক্‌রে বেরিয়ে আস্‌ছিল।

কথা বলতে-বলতে ধনিষ্ঠার কণ্ঠস্বর কুণ্ঠা ত্যাগ করে' কঠোর গম্ভীর হয়ে উঠ্‌ল। সে বল্‌লে—এই গোপন কথা কেবল আমি জানি, আপনাকে জানাচ্ছি, আর তৃতীয় ব্যক্তি যদি কেউ জান্‌তে পারে তার জন্যে আপনি দায়ী হবেন। আপনি আমার এই গোপন কথা ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করলে আমি পুরোহিত ত্যাগ করতেও কুণ্ঠিত হবো না, আর……

পুরোহিত ভয় পেয়ে আম্‌তা-আম্‌তা করতে-করতে বলে' উঠ্‌ল—আমাকে অত করে' তোমার বলতে হবে না মা, আমি কি……

ধনিষ্ঠা দৃঢ়স্বরে বল্‌তে লাগ্‌ল—আমার ম্লেচ্ছের উচ্ছিষ্ট খাওয়া হয়েছে; আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে; এর প্রায়শ্চিত্ত কি?

পুরোহিত বল্‌লে—এর প্রায়শ্চিত্ত প্রাজাপত্য। ভোজনের পর মুখ প্রক্ষালন না করা পর্য্যন্ত উচ্ছিষ্ট অবস্থায় যদি অজ্ঞানতঃ অন্ত্যজাতি-স্পর্শ ঘটে, তা হ'লে প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। প্রাজাপত্য দ্বাদশদিবসীয় ব্রত। প্রথম তিন দিন কেবলমাত্র রাত্রিকালে বাইশ গ্রাস ভোজন; পরে তিন দিন দিবাকালে ছাব্বিশ গ্রাস মাত্র ভোজন; তার পরে তিন দিন অযাচিতভাবে কারো কাছ থেকে ভোজ্য-বস্তু পেলে চব্বিশ গ্রাস মাত্র ভোজন; পরের তিন দিন উপবাস; উপবাসে অশক্ত হ'লে পয়স্বিনী ধেনু দান করতে হয়; তদভাবে ধেনু-মূল্য দেবার ব্যবস্থাও আছে।

ধনিষ্ঠা জিজ্ঞাসা করলে—মাথা মুড়োতে হবে কি?

ভট্টাচার্য্য বল্‌লে—না, স্ত্রীলোকের মস্তকমুণ্ডন করা বিধিসঙ্গত নয়—মিতাক্ষরা বলেছেন—'বিদ্বদ্-বিপ্র-নৃপ-স্ত্রীণাং নেষ্যতে কেশবাপনম্।' ভব-দেব ভট্ট বলেছেন—বপনং নৈব নারীণাং।

মাথা নেড়া করতে হবে না জেনে ধনিষ্ঠার মন থেকে একটা মহাদুর্ভাবনা দূর হ'ল; গৌরী তাকে ছুঁয়ে দেওয়ার পরেই যেই তার মনে হয়েছিল, যে এই অনাচারের জন্যে তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, তখনই তার এ আশঙ্কাও মনে জেগে উঠেছিল যে প্রায়শ্চিত্ত করতে হ'লে তাকে মাথা নেড়া করতে হবে; প্রায়শ্চিত্ত চুপিচুপি করা যেতে পারে, কিন্তু নেড়া মাথা ত আর লুকিয়ে রাখা চলবে না; মাথা নেড়া করলে যে তাকে কুশ্রী দেখাবে, এজন্যে তার চিন্তা হয়নি, পাছে লোকে নেড়া মাথা করার কারণ জিজ্ঞাসা করে এই চিন্তাই তার প্রবল হয়ে আশঙ্কায় পরিণত হয়ে উঠেছিল; সে যে কঠোর নিষ্ঠার সহিত হিন্দু বিধবার আচার রক্ষা করছে এতে তার লজ্জা সঙ্কোচ বা গোপন করবার কোনো কারণই ছিল না, বরং এ সংবাদ প্রচার হ'লে তার ধর্ম্মনিষ্ঠার প্রতিষ্ঠাই বেড়ে যেত,

লোকের কাছে তার সম্মান অনেক বৰ্দ্ধিত হ'ত; কিন্তু প্রায়শ্চিত্তার্হ অনাচার যার জন্তে ঘটেছে সেই গৌরী যে অনলের স্নেহপাত্রী!—গৌরী ছুঁয়েছে বলে' সে প্রায়শ্চিত্ত কর্‌ছে জান্‌তে পার্‌লে অনল যদি ক্ষুণ্ণ হয়, মনে ব্যথা পায়, এই হয়েছিল তার ভয়। সেই ভয় থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে ধনিষ্ঠার মনের একটা ভার যেন নেমে গেল। ধনিষ্ঠা বল্‌লে—তার জন্তে যা-যা চাই সে-সব আপনি নিজে আনিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দেবেন। কাল ভোরে এসেই আপনি আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করাবেন। আমি যে প্রায়শ্চিত্ত কর্‌ছি আর কেন কর্‌ছি তা আপনি ছাড়া আর কেউ জান্‌বে না।

পুরোহিত বল্‌লে—তা তা···আমাকে আর···তা মা, ঐ-সব মেলেচ্ছ-টেলেচ্ছ নিয়ে ঘর করা কি তোমার পোষায়···

ধনিষ্ঠা দৃঢ়স্বরে বল্‌লে—কি কর্‌ব বলুন, মাওড়া মেয়ে, তাকে যদি আমি না দেখি ত কে দেখ্‌বে···

পুরোহিত অম্‌নি গদ্‌গদকণ্ঠে বলে' উঠ্‌ল—আহা মার আমার কি দয়ার শরীর! মা যেন আমার সাক্ষাৎ জগদম্বা জগদ্ধাত্রী···

ধনিষ্ঠা পুরোহিতের কথা শোন্‌বার অপেক্ষা না করে' বল্‌লে—আপনি তা হ'লে এখন আসুন, আমার কাজ আছে।

ধনিষ্ঠা ফিরে এসে পড়্‌তে বস্‌ল। পড়া শেষ হ'লে অনল যখন বাড়ী যাবার জন্তে গৌরীকে কোলে করে' উঠে দাঁড়াল তখন ধনিষ্ঠা মাথা নীচু করে' মৃদুস্বরে বল্‌লে—কাল সকালে আমাকে একটু ছুটি দিতে হবে।

অনল জুতো পায়ে দিতে-দিতে বল্‌লে—যে আজ্ঞে।

ধনিষ্ঠা মুখ না তুলেই সেই-রকম মৃদুস্বরে বল্‌লে—কাল আপনার মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ রইল।

অনল হেসে বল্‌লে—আমি ত অন্নপূর্ণার সদাব্রতের নিত্য নিমন্ত্রিত অতিথি! আমাকে আবার নূতন করে' নিমন্ত্রণ কর্‌বার কি দর্‌কার?

ধনিষ্ঠা মৃদু হেসে লজ্জিত ও নত মুখেই বল্‌লে—কাল আরো কয়েকজন ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করা হবে কিনা···

অনল হাসিমুখেই বল্‌লে—আমাদের শাস্ত্রে বলে—বিশেষ পুণ্যের বলে লোকের ব্রাহ্মণকুলে জন্ম হয়; সেটা যে কতখানি সত্য তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই গ্রামের ব্রাহ্মণদের দেখ্‌লে; ব্রাহ্মণদের পুণ্যের জোরের পরিচয় কাল যে পাওয়া যাবে তার উপলক্ষ্যটা কি?

ধনিষ্ঠা মুখ আর-একটু নত করে' বল্‌লে—উপলক্ষ্য পরকে খাওয়ানোর আনন্দ।

অনল হেসে বল্‌লে—আমরা ব্রাহ্মণেরা আপনাকে দেখিয়ে দিয়ে যাবো পরকে খাওয়ানোর আনন্দের চেয়ে নিজে খাওয়ার আনন্দ কত বেশী!

ধনিষ্ঠা হাস্তোদ্ভাসিত-মুখ নত করে' নীরব হয়ে রইল। অনলের কৌতুকে তার মুখে ঘনিষ্ঠতার পরিচয় ফুটে উঠে ধনিষ্ঠার সলজ্জ আনন্দের আভা ছড়িয়ে দিচ্ছিল।

ধনিষ্ঠাকে নীরব দেখে অনল গৌরীকে বল্‌লে-- মা-মণি, তোমায় মার কাছ থেকে বিদায় নাও।

গৌরী কলের পুতুলের মতন বলে' উঠ্‌ল--"মা ডিয়ার, গুড্‌ নাইট্‌!" সে মার কাছে এগিয়ে আর গেল না।

ধনিষ্ঠা লজ্জারুণ স্মিত মুখ গৌরীর দিকে তুলে লজ্জা-কুণ্ঠিত-স্বরেও পরিষ্কার অ্যাক্‌সেণ্ট্‌ দিয়ে ইংরেজিতে বল্‌লে—গুড্‌ নাইট্‌, মাই ডার্‌লিং গুড্‌ নাইট্‌!

গৌরীর সঙ্গে নিরন্তর কথাবার্ত্তা বলায় ধনিষ্ঠার পঠিত ইংরেজির সামান্ত জ্ঞান অপ্রত্যাশিত-রকম বৰ্দ্ধিত হয়েছে এবং উচ্চারণ সুশ্রাব্য হয়েছে দেখে খুশী হয়ে অনল প্রস্থান কর্‌লে।

*

* *

ধনিষ্ঠার আজ খাওয়াও নেই, আহ্নিক পূজাও নেই, কাল প্রায়শ্চিত্ত করে' শুদ্ধ হয়ে পূজা-আহ্নিক কর্‌বার অধিকার ফিরে পাবে, না হওয়া-পর্য্যন্ত তাকে উপবাসীই থাক্‌তে হবে। তাই আজ তার আর কোনো কাজ নেই। ভট্টাচার্য্যের বাড়ী থেকে প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠানের দ্রব্যাদি এখনও এসে পৌছেনি। অনল চলে' গেলে ধনিষ্ঠা বাড়ীর পাশে একটি খোলা

বারাণ্ডার ধারে গিয়ে চুপ করে' বস্‌ল। সে বসে'-বসে' দেখ্‌তে লাগ্‌ল তার বাড়ীর প্রকাণ্ড হাতাঘেরা উঁচু পাঁচিলের ওপারে সুবিস্তীর্ণ মাঠ; সবুজ মাঠের উপর শীত-কালের পড়ন্ত-রৌদ্র ফিকে সোনালী আভা ছড়িয়ে দিয়েছে; এক পাল গরু নিবিষ্ট মনে খুঁটে খুঁটে ঘাস খাচ্ছে আর সৈন্যদলের সমতালে পা ফেলে চলে' যাওয়ার মতন একসঙ্গে অনেকগুলি ল্যাজ দুলিয়ে গায়ের মশা-মাছি তাড়াচ্ছে; মাঠের মাঝখানে পত্রহীন নিরাভরণ একটা শিমুল গাছের তলায় গুটি-কতক রাখাল ছেলে ডাণ্ডা-গুলি খেল্‌ছে; মাঠটিকে চক্রাকারে ঘিরে রেলের লাইন উধাও হয়ে দিগন্তে মিলিয়ে গেছে; রেল-লাইনের ধারে-ধারে জোড়া-জোড়া লোহার খুঁটি আশ্রয় করে'-করে' টেলিগ্রাফের তার নীল আকাশের গায়ে আশ্‌মানি রঙের শাড়ির আঁজি-কাটা পাড়ের মতন দেখাচ্ছে; একটা নীলকণ্ঠ পাখী তারের উপর চুপ করে' বসে' ছিল, একটা ফিঙে এসে তার এলাকায় অনধিকার প্রবেশ করাতেই নীলকণ্ঠ যেন বিরক্ত হয়ে দুটি নীল পাখা মেলে আকাশের একটি টুক্‌রার মতন ঠিক্‌রে উড়ে' গেল আর তার পাখার উপর পড়ন্ত রৌদ্র ঝিক্‌মিকিয়ে উঠ্‌ল; রেল-লাইনের ওপারে সর্‌ষে-ক্ষেতে হল্‌দে ফুলের ফরাস পাতা হয়েছে; সর্‌ষে-ক্ষেতের পাশেই রেলের কুলিদের খান পাঁচ সাত নীচু-নীচু খোড়ো-ঘর, একখানা ঘরের চালের খানিকটা খড় ঝড়ে উড়ে' গেছে, সেখানটায় একখানা দরমা চাপা দেওয়া রয়েছে; একখানা ঘরের বেড়া নেই, কেবল খুঁটির মাথায় ঝুপ্‌সি দুখানা চাল আছে, সেইখানি ওদের গোয়াল-ঘর; বাড়ীর পিছনে গোটা-কতক কলা-গাছ, ছিন্ন-বসন দরিদ্রের মতন শতছিন্ন পাতাগুলি শীতের হাওয়ায় হিহি করে' কাঁপ্‌ছে; কলা-গাছের পাশেই একটা কুল-গাছ; কতকগুলি ছেলে ক্রমাগত লাঠি আর ঢিল ছুড়ে-ছুড়ে সেই কুল-গাছটির সহিষ্ণুতা আর দানশীলতার কঠোর পরীক্ষা কর্‌ছে; সর্‌ষে-ক্ষেতের পাশেই গুটিকতক স্ত্রীলোক—একজন সাম্‌নের দিকে ঝুঁকে ক্রমাগত তাড়াতাড়ি হাতের নীচে হাত রাখছে, ঐখানে বোধ হয় একটা কুয়ো আছে, ঐ কুয়ো থেকে ও জল তুল্‌ছে; একটি মেয়ে ক্রমাগত ঝুঁক্‌ছে আর সোজা হচ্ছে—বোধ হয় সে কাপড় কাচ্‌ছে; একটি মেয়ে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল, এইবার সে ঝুঁকে একটা মাটির কলসী তুলে ডান কাঁখে কর্‌লে, আর একটু এগিয়ে গিয়ে সেই কলসীর জলটা কপির ক্ষেতে ঢেলে দিলে, ক্রমাগতই জল ঢালা আর জল তোলা চল্‌ছে—এত পরিশ্রম করে' ওরা বাবুদেরকে দু-চার পয়সা দামের কপি খাওয়ায়; কয়লার মতন কালো সম্পূর্ণ উলঙ্গ একটি শিশু এসে ক্ষেত্রে-জল-সেচনকারিণী মাতার কাপড় চেপে ধর্‌লে; মা এই অল্প কারণেই বিরক্ত হয়ে শিশুর পিঠে এক কিল কষিয়ে দিলে; ছেলেটিও অম্‌নি সেই ক্ষেতের মধ্যেই পা ছড়িয়ে বসে' পড়্‌ল, এবং দূর থেকে দেখ্‌তে এবং শুন্‌তে পাওয়া না গেলেও এটা অনুমান করা সহজ যে সে চীৎকারে গগন বিদীর্ণ কর্‌ছে; ঝুপ্‌সি ঘরের ভিতর থেকে স্বল্পবস্ত্রপরিহিত একটি পুরুষ হুঁকো হাতে করে' বেরিয়ে এল আর ছেলেটিকে নড়া ধরে' কোলে তুলে নিলে এবং তার দিকে দৃক্‌পাত মাত্র না করে' দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তামাক টান্‌তে লাগ্‌ল; অল্পক্ষণ পরে ক্ষেত্রে জলসেচন সমাপ্ত করে' শিশুর মা শিশুর কাছে ফিরে এল এবং শূন্য কলসীটা মাটিতে নামিয়ে স্বামীর কোল থেকে ছেলেকে কোলে নিলে; শূন্য কলসীটা মুখ লুটিয়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়্‌ল; সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে' স্বামী-পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে গৃহিণী গৃহে চলে' গেল। অল্পক্ষণ পরে একজন পুরুষ কাঁধের উপর একটি মাটির কলসী এক হাতে ধরে' অপর হাত একটি স্ত্রীলোকের কাঁধের উপর রেখে সেই কুয়োর ধারে এল—সে বোধ হয় অন্ধ, সেও বাড়ীর বা ক্ষেতের জন্য জল নিতে এসেছে! এইসব দেখে ধনিষ্ঠার মনটা গৌরীকে কাছে পাবার জন্যে উতলা হয়ে উঠ্‌ল; সে হতাশার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌লে। দেখ্‌তে-দেখ্‌তে শীতের সন্ধ্যা অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে উঠ্‌ল। ছ'টার ট্রেন ঝড়ের মতন শব্দ তুলে চোখের সাম্‌নে দিয়ে ছুটে চলে' গেল; অন্ধকারের ভিতর দিয়ে আলোকিত গাড়ীগুলি পরীস্থানের সৌন্দর্য্য-মায়া রচনা করে' অন্ধকারেই মিলিয়ে গেল।

ধনিষ্ঠা অন্ধকারে একলা বসে'-বসে' ভাব্‌ছিল—আমার যদি একটা ছেলে কি মেয়ে থাক্‌ত! গৌরী যদি আমার মেয়ে হ'ত! গৌরী পরের মেয়ে হয়েছে, হোক, কিন্তু

সে যদি মেলেচ্ছ না হ'ত! তা মেলেচ্ছ হয়েছে হয়েছে, তাকে আমি কখনই আমার কাছ-ছাড়া করতে পারব না।......

তার চিন্তায় বাধা দিয়ে মাধবী সেখানে এসে বলে' উঠ্‌ল—ও মা! আপনি এখানে বসে' রয়েছ, আমি সারা বাড়ী আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।......

ধনিষ্ঠা অন্ধকারের মধ্য থেকে উন্মনস্কভাবে বল্‌লে—কেন?

মাধবী বলে' উঠ্‌ল—রাত্তির হয়ে গেছে, পুজো আহ্নিক করবে কখন? দিনের বেলা খাওয়া হয়নি, শীগ্‌গির করে' কাপড় কেচে পুজো করে' নিয়ে কিছু খাবে চলো!

ধনিষ্ঠা বল্‌লে—আজ আমি পুজোও করব না, কিছু খাবোও না। বামুন-দিদিকে বল্‌গে আমার জন্যে আজ কিছুই করতে হবে না।

ধনিষ্ঠার উপোষ করা আজ নূতন নয়, কিন্তু পুজো বাদ দেওয়া নিতান্তই অভিনব ব্যাপার। তাই মাধবী আশ্চর্য্য হয়ে বলে' উঠ্‌ল—সে কি মা! আজ পুজোও করবে না?

ধনিষ্ঠা শুধু বল্‌লে—না।

মাধবী অবাক্ হয়ে চলে' গেল। তার আর কথা জোগাল না।

ধনিষ্ঠাদের ঠাকুর-বাড়ীতে ঠাকুরের আরতি শেষ হয়ে কাঁসর-ঘণ্টার বাদ্য থেমে গেল, শঙ্খ বেজে উঠ্‌ল। শাঁখের শব্দ শুনে এক দল শেয়াল ডেকে উঠ্‌ল এবং শেয়ালের ডাক শুনে নানান্ দিক থেকে কতকগুলো কুকুর বিবিধস্বরে ডাকতে আরম্ভ করে' দিলে। সে এক বিচিত্র সুর-সঙ্গত।

মাধবী আবার ফিরে এসে বল্‌লে—মেম্-দিদি-মণির জন্যে বিনোদা চারজন ঝি নিয়ে এসেছে।

ধনিষ্ঠা বল্‌লে—একটা আলো নিয়ে আয়, আর তাদেরও ডেকে নিয়ে এইখানেই আয়।

মাধবী চলে' গেল এবং ক্ষণকাল পরেই একটা তীব্রোজ্জ্বল আলো হাতে করে' সেইখানে ফিরে এল; তার পিছনে-পিছনে এল চারটি স্ত্রীলোক।

মাধবী আলোটা এনে ধনিষ্ঠার সাম্‌নে রাখ্‌লে। ধনিষ্ঠা সেই মেয়েগুলিকে অভ্যর্থনা করে' ডেকে বল্‌লে—এস।

ঝি-চারজন নিকটে এসে গড় হয়ে প্রণাম করে' ধনিষ্ঠার কাছ থেকে একটু তফাতে তটস্থ হয়ে বসল।

ধনিষ্ঠা তাদের সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করলে—তোমরা আমার কাছে থাকবে? কি বলো? তা হ'লে সব কথাবার্ত্তা ঠিক করি।

—আপনি দয়া ছেদ্দা করে' ছিচরণে রেখ্‌লেই থাকতে পারি।

—তোমাদের খাওয়া-পরা বাদে ছ'টাকা করে' মাইনে দেবো, তোমাদের সংসারের কোনো কাজ করতে হবে না। আমি একটি মেয়ে পুষ্যি নিয়েছি; সেটি আমাদের জাত নয়—সে মেমের মেয়ে। আমাদের হিন্দু-বিধবার ঘরে তাকে ত সব জায়গায় যেতে দেওয়া যায় না, সব-কিছু ছোঁয়া-নাড়া করতে দেওয়াও যায় না। সে ছেলে-মানুষ, তার ত এখনও জ্ঞানবুদ্ধি কিছুই হয়নি যে কোন্‌টা উচিত কোন্‌টা অনুচিত বুঝ্‌তে পারবে; তাই তাকে একটু আগ্‌লানো দরকার; তোমাদের পালা করে' সমস্ত দিন এই কাজটি করতে হবে। তোমরা তাকে কেবল আদর-যত্ন করে' সাম্‌লে রাখ্‌বে, একটুও শাসন করতে পারবে না। কেউ আমার মেয়েকে শাসন করেছ কি ভয় দেখিয়েছ যদি দেখি কি শুনি তা হ'লে তার চাকরি যাবে।......

—তা সব বিনোর কাছে শুনেছি মা, তুমি হচ্ছ সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, তোমার দয়ার শরীল!...

আগন্তুকদের স্তুতিবাদের প্রবাহে বাধা দিয়ে ধনিষ্ঠা বল্‌লে—মাধী, তুই এদের নিয়ে যা; খাবার আর থাকবার ব্যবস্থা করে' দিস্—এরা বিনোদার ঘরেই ত শুতে পারবে।

মাধবী বল্‌লে—হ্যাঁ, দরাজ ঘর, বিনোদা ত এক টেরে পড়ে' থাকে। এদের পাত্‌তে আর গায়ে দিতে কি দেবো?

ধনিষ্ঠা বল্‌লে—আমি গিয়ে দেখে দিচ্ছি।

মাধবী ঝিদের বল্‌লে—তোমরা আমার সঙ্গে এস।

মাধবীর পিছন-পিছন পরিচারিকা চারজন চলে' গেল।

ক্ষণকাল পরেই মাধবী আবার ফিরে এসে ধনিষ্ঠাকে খবর দিলে—অনেক ভারী করে' জিনিষ-পত্তর নিয়ে ভট্‌চায্যি-মশায় এসেছেন।

ধনিষ্ঠা কিছু না বলে' উঠে দাঁড়াল, এবং সেখান থেকে চল্‌ল। মাধবী লণ্ঠন তুলে নিয়ে তার সঙ্গে-সঙ্গে আলো দেখিয়ে চল্‌তে লাগ্‌ল।

(ক্রমশঃ)

বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালী-সম্বন্ধে কয়েকটি ভাবিবার কথা

শ্রী সরোজেন্দ্রনাথ রায়, এম-এ

আজ প্রায় একশতাব্দী হইল এই দেশে ইংরাজী শিক্ষা ও বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ধীরে-ধীরে আমাদের সংস্কৃত টোলগুলি উঠিয়া গিয়াছে। গ্রাম্য বিদ্যালয়গুলি এখন প্রাথমিক স্কুলে পরিণত হইয়াছে। আগে যাহা শেষ শিক্ষা ছিল, এখন তাহা মাত্র প্রাথমিক হইয়াছে। গ্রামের ছাত্রগুলি এখন আর শুধু হাতে লেখা, বানান, শুভঙ্করী, চিঠি ও দলিল লেখা শিখিয়াই তুষ্ট নহে। তাহারা এখন যে-জেলায় ও যে-বিভাগে বাড়ী তাহার সহিত পরিচিত হয়, তাহাদের ও তাহাদের গৃহ তথা গ্রামের স্বাস্থ্য যাহাতে উন্নত হয় তাহার ব্যবস্থা শিখে। যাহাতে তাহারা সুশৃঙ্খলার সহিত সংঘবদ্ধভাবে কাজ করিতে পারে তাহার জন্ত ড্রিল-শিক্ষা পায়। চিত্রাঙ্কন দ্বারা ললিত কলার সূচনাও হয়। ইহার উপর প্রয়োজনীয় গৃহশিল্পও আছে। যাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ঘর হইতে আঙিনাকে বিদেশ বলিয়া ভাবিত, এইরূপে তাহাদের হৃদয়ের সহিত বিশ্বের যোগসূত্র রচিত হইয়াছে। পক্ষী-মাতা যেমন কত কৌশলে, কত মধুর প্রলোভনের সাহায্যে শাবককে উড়িতে শেখায়, তেম্‌নি সেই শিশুটি যে পল্লীর নিবিড় ঘনচ্ছায়ার শীতল অবসরের মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়াছিল হঠাৎ একদিন জগৎ আসিয়া তাহার প্রাণকে আন্দোলিত করিল—সুদূর আসিয়া মোহন আহ্বানে তাহাকে ঘরের বাহির করিল। কত মধুর আশার স্বপ্ন লইয়া সে গ্রাম ছাড়িয়া সহরে আসিয়া পড়িল। ইহার ফল প্রথম-প্রথম ভালোই হইয়াছিল। প্রাচ্যের সহস্র বৎসরের পুঞ্জীভূত শক্তি পশ্চিমের সোনার কাঠির স্পর্শে একমুহূর্ত্তে স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছিল। সে কি উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছিল!

কিন্তু আজ কি দৃশ্য দেখিতেছি! কোথায় সে উৎসাহ, কোথায় সে উদ্যম? কোথায় সেই বিশ্বের ভাণ্ডার লুট করিবার অজেয় ইচ্ছাশক্তি? আজ সহস্র-সহস্র ছাত্র বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছে। ইহাদের জীবনের দিকে চাহিলে আমরা দেখিতে পাই, একটা গভীর নৈরাশ্যজনিত অবসাদ, লক্ষ্যবিহীনতা, চিন্তাশূন্যতা, সংকল্পের একান্ত অভাব। কেন এমন হইল? কোন্ ক্রূর শক্তি এতগুলি প্রাণের আনন্দরস একেবারে নিঃশেষে পিষিয়া বাহির করিয়া ফেলিয়াছে? হয়ত আমরা পরাধীন বলিয়া আমাদের জীবনগুলিকে নিজ রুচি অনুযায়ী কার্য্যে লাগাইতে পারি না বলিয়া এমন হইয়াছে, হয়ত বা বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির কৃত্রিমতা ইহার জন্ত দায়ী, অথবা উভয়েই সমান দায়ী।

প্রথমেই শিক্ষা-পদ্ধতির কথা মনে আসে। যে জাতির প্রাণের তন্ত্রী মেঠো সুরে বাজিয়া উঠে—সহরের ধূলি ও কোলাহলকে যে কোনো দিনই আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিল না—যাহাদের ইতিহাসে জমাট সংঘবদ্ধ-ভাব কোনো দিনই স্থায়ী হইয়া ফুটিয়া উঠে নাই, তাহাদিগকে প্রাচীরের ঘন বন্ধনের মধ্যে সওদাগরী

আফিসের কেরাণীদের মতন কাতারে-কাতারে বসাইয়া দেশী শিক্ষক ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ইহার ফল যাহা হইল তাহা ত দেখিতেই পাইতেছি। শিক্ষক মনে-মনে ভাবিলেন,আমি যাহা করিতেছি তাহার সহিত আমার প্রাণের গভীর আকাঙ্ক্ষার মিল নাই। ছাত্র ভাবিলেন, ইহার সবই মিথ্যা—এখানে সত্যের কোনো স্থান নাই। ইহা উপার্জ্জনের একটা পন্থামাত্র। সত্যবস্তুর সন্ধান যদি করিতে হয়, তবে অন্যত্র যাইতে হইবে। স্কুল-কলেজে তাই ছাত্রেরা পরীক্ষা পাশ করিবার জন্ত এমন-সব উপায় অবলম্বন করে, যাহা তাহারা জীবনের অপর ক্ষে. . ঘৃণিত বলিয়া মনে করে। কিন্তু স্কুল ও কলেজে স্বাভাবিক বলিয়া ধরিয়া লয়। কলেজে ছাত্র ও শিক্ষকের সহিত সম্বন্ধ কি? শিক্ষক প্রাণের কৃত্রিমতা ও দৈন্য ঢাকিয়া ছাত্রকে তাঁহার বাহিরের দিক্ দিয়া আকৃষ্ট করিতে চান। ছাত্র জানে, সে কোনোরকমে শুধু উপস্থিত হইয়াছে ইহা লিখাইতে পারিলেই হইল। কলেজে গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক কতকটা পুলিশ ও প্রজার সম্পর্ক। একটা গাঢ় সন্দেহের ব্যবধান উভয়কে দূরে দূরে রাখে। আবার স্কুল-কলেজের যিনি প্রধান শিক্ষক, তিনি হাকিমী চালে পর্দ্দার অন্তরালে বাস করেন। হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের যে যোগ, যাহা না থাকিলে মানুষ মানুষকে প্রভাবান্বিত করিতে পারে না, সেই যোগের একান্ত অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সহস্র-সহস্র বালক প্রতিবৎসর আসিতেছে যাইতেছে। ইহারা শিক্ষকের সঙ্গে পরিচিত হওয়া ত দূরের কথা, শিক্ষকের নামেরও খোঁজ রাখে না। এমন-কি, এমন ছাত্রও আছে যে সেই কলেজের প্রধান শিক্ষককে জীবনে দু-একবারের বেশী দেখে নাই, নামও জানে না। শিক্ষকও নিয়মিত সময়ে ক্লাসে আসেন। তার পর তাঁহার বক্তৃতা শেষ করিয়া গৃহে চলিয়া যান। উভয়ের জীবনের মধ্যে যে রহস্যের প্রাচীর খাড়া ছিল, সে আরও উচ্চ হয়। উভয়ের মধ্যে সন্দেহ অবিশ্বাস, অপ্রেম, অশ্রদ্ধা দিনের পর দিন ঘনীভূত হয়। গুরু ভয়ে-ভয়ে থাকেন ছাত্র বুঝি আমাকে অপমানিত করিল; ছাত্রও সুবিধা পাইলে ছাড়েন না, উভয়ে উভয়কে ঠকাইবার চেষ্টায় থাকে। ছাত্র যদি শিখিতে না চায়, শাস্তি দাও—আমি এত ভালো কথা রোজ-রোজ বলিব,আর ছাত্র তাহা শুনিবেন না ছাত্রের এ ঔদ্ধত্য অসৎ। ছাত্র তাই তাহার দেহটি ক্লাসে উপস্থিত রাখিয়া গুরুকে ঠকায়, কিন্তু তাহার গোপন অন্তরখানি সে কোন্ আনন্দলোকে বিহার করে কে জানে!

আমরা প্রতিদিন দুঃখ করি এত সুন্দর বাড়ী, এত সুন্দর ব্যবস্থা—এত বিদ্বান্ শিক্ষক—কিন্তু সব বৃথা হইল। কোনো কাজে লাগিল না। কিন্তু হায় বনের পাখী খাঁচায় সকল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-সত্ত্বেও যে বনে যাইতে চায়। এ-রহস্য কে উদ্ঘাটন করিবে? বিশ্ববিদ্যালয়ের নিখুঁত ব্যবস্থার পেষণে প্রাণের রস চুঁয়াইয়া বাহির হইয়া যায়। তাই প্রতিছাত্রের মুখে দেখি একটা ক্লান্তি, শ্রান্তি, নিরানন্দ—অবসাদ! যেখানে শ্রদ্ধা নাই, প্রেম নাই, সেখানে শিক্ষা দেওয়া ও পাওয়ার মতন বিড়ম্বনা আর কিছু নাই। আমাদের স্কুল-কলেজগুলির discipline প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে—শাস্তির ভয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রাণের শতদল যদি আলোকের অভিমুখী হইয়া নিজকে খুলিয়া না দেয়, আলোক-সাগরে আত্মসমর্পণ না করিয়া তবে সে পুষ্ট হইবে কি করিয়া—বাঁচিবে কি করিয়া?

প্রাচীন ভারত ও গ্রীসের দিকে চাহিয়া আমরা গুরু-শিষ্যের কি মধুর সম্পর্ক দেখিতে পাই! সোক্রাটীস্ যখন সত্যের জন্ত ও জ্ঞানের জন্ত মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন তখন ধন ও প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিবার জন্ত তাঁহার শিষ্যেরা দাঁড়াইয়াছিলেন। প্লেটো, জেনোফোন, ক্রিটোন, আপল্লডোরাস্, ফাইডোন, এথেক্রাইটীস, সিম্মিয়াস, ও কেবীস, ইঁহাদের গুরুপ্রেম জগতের নিকট অমর হইয়া রহিয়াছে। আমাদের দেশেও ও কি সুন্দর আলেখ্য সব আমাদের চক্ষের সম্মুখে উজ্জল হইয়া রহিয়াছে।

এই দেশের মাটিতে এককালে যাহা জন্মিয়াছিল, এখন তাহা শুকাইয়া যাইতেছে কেন? ইহা কি শুধু ছাত্রেরই দোষ? তা ত নয়, শিক্ষকদিগেরও যথেষ্ট চিন্তা করিবার বিষয় আছে। আমরা আজকাল যে-সব শিক্ষক দেখিতে পাই—তাঁহাদের মধ্যে কয়জন ইচ্ছা করিয়া শিক্ষাকে জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন? শিক্ষক জীবনের

অভাব ও দুঃখকে কয়জন আনন্দের সঙ্গে বরণ করিয়া লইয়াছেন? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ত দেখিতে পাই যে, ইহা একটা উপার্জ্জনের পথমাত্র। অর্থাগমের অন্য সুবিধা যখন দেখিতে না পাওয়া যায়, তখনই অধিকাংশ লোকে শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। সেই জন্য শিক্ষক দালাল, শিক্ষক উকিল, শিক্ষক ব্যবসাদার, শিক্ষক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক, শিক্ষক অর্থপুস্তক-প্রণেতা, শিক্ষক মদ ভাং গাঁজা বিক্রেতা। আমরা আজকাল এও দেখিতে পাই—তাঁহাদের অধিকাংশই দিনের মধ্যে শিক্ষাকার্য্যে একঘণ্টা সময়ও যাপন করেন না। অনেক ক্ষেত্রে পারিবারিক অভাব-নিবন্ধন তাঁহারা এরূপ করিতে বাধ্য হন। কিন্তু শিক্ষক-জীবনের অভাবে একটা সীমা থাকা দরকার। শিক্ষকের ক্রোরপতি হইবার আকাঙ্ক্ষাও আমরা আজকাল দেখিতে পাই। সেকালের বিখ্যাত "বুনো-রামনারায়ণের" মতন তেঁতুল পাতার ঝোল খাইয়া কেহই জীবন কাটাইতে চান না। আজকাল এমন শিক্ষকও অনেক দেখা যায়, যাঁহাদের বাড়ীর দারোওয়ানের ভয়ে ছাত্রেরা তাঁহাদের সঙ্গে দেখা করিতে পারে না—যাঁহার সঙ্গে দেখা করা অপেক্ষা বোধ করি বঙ্গের লাট সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া অধিকতর সহজ। প্রেমের সম্পর্ক—হৃদয়ের সম্পর্ক হইবে কি করিয়া? এত কৃত্রিমতার মধ্যে স্বাধীন প্রাণ বাড়িবে কি করিয়া? জীবনের সকল ক্ষেত্রে দেখিতে পাই, হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের মিলন হয় প্রেমের মধ্য দিয়া—সরল শুদ্ধ জীবন্ত আত্মার সঙ্গে তন্ত্রাবাপন্ন আত্মার মিলন হয়। কেবল শিক্ষাক্ষেত্রেই কি এ চিরন্তন নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে? যেমন কলসের ছিদ্র বন্ধ করিতে হইলে আর একটি ধাতুকে উত্তাপ দিয়া গলাইতে হয়, তেমনি একটি হৃদয় যদি আর একটি হৃদয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে চায়, তবে প্রেমে তাহাকে দ্রবীভূত হইতে হইবে, নতুবা অপর জীবনের উপর শক্ত হইয়া লাগিতে পারিবে না।

শিক্ষাক্ষেত্রে বোধ হয় আমরা গোড়া হইতেই একটা ভুলকে স্বীকার করিয়া লইয়া চলিয়াছি। বুদ্ধি দ্বারা বুদ্ধিকে প্রভাবান্বিত করিতে চাই। ছাত্র শুধু আমার বুদ্ধিকে দেখিয়া শিক্ষা গ্রহণ করুক। ইহাতে ছাত্র অনেক পুস্তক পাঠ করিতে শিখে, এমন-কি শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রসরও হইতে পারে—সে বিশ্বের সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেও পারে—কিন্তু সে কখনও মানুষ হয় না। তাহার প্রাণের ভিতরে যে সুপ্ত আত্মাটি থাকে, সে জাগ্রত হয় না। কোনো সমাজ বা দেশ যদি জগতে কিছু হইতে চায় বা দিতে চায়, তবে তাহার অন্তর্গত লোকগুলিকে মানুষ হইতে হইবে। প্রত্যেকটি আত্মার জাগরণ চাই। তাহাকে বুঝিতে হইবে যে, সে অমৃতের সন্তান—অমৃতস্বরূপ। সকল শিক্ষার ইহাই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। যে শিক্ষিত, তাহার জ্ঞানে গভীরতা ত চাইই—শুধু তাহাতেই চলিবে না। তাহার প্রাণ সতেজ ও ইচ্ছা অজেয়ও হওয়া চাই। প্রেমে বিশালতা, কর্ম্মে দৃঢ়তা, জীবনে শুদ্ধতা থাকা চাই। এ-শিক্ষা দিতে হইলে আই, ই, এস্ এর আবশ্যক নাই। বরং দরকার বুনো-রামনারায়ণের, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের, রামতনু লাহিড়ীর ও রাজনারায়ণ বসুর—যাঁহারা দেশের ও মানবের কল্যাণ সাধনের জন্য তিল-তিল করিয়া রক্ত দিয়াছেন। এবং দারিদ্র্যকে আনন্দচিত্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। আজকাল কথা উঠিয়াছে রেডিওর সাহায্যে সমুদ্রের অপর পার হইতে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইবে। শিক্ষককে বাদ দিয়া কেবল যন্ত্রের সাহায্য লইলে এমন শিক্ষার ফল অধিকাংশই ফলিবে না। যেন কতকগুলি বুলি আওড়াইতে পারিলেই শিক্ষাকার্য্য শেষ হইয়া গেল!

যদি কোনো দেশকে উন্নত হইতে হয়, তবে আদর্শ শিক্ষকের আবশ্যক অত্যন্ত আছে। শুধু সেই শিক্ষকই চাই, যিনি শিক্ষণকার্য্যকে জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কোনো বিদ্যালয়ের শিক্ষক-নিয়োগ অত হাল্কা ভাব হইলে চলিবে না। ইহা সেই বিদ্যালয়ের একটি বিশেষ দিন হওয়া উচিত—যেমন দীক্ষা-অভিষেক—আচার্য্য-পদে বরণ প্রভৃতি সমাজের পবিত্র দিন। শিক্ষক যেমন জীবন উৎসর্গ করিবেন—সমাজেরও তেমনি দেখা দরকার যেন তিনি অভাবে পড়িয়া তাঁহার ব্রত হইতে চ্যুত না হন। আজকাল শিক্ষকদিগের নৈতিক জীবন এত হীন হইয়াছে কেন? অভাবের পীড়নে কতকটা ত বটেই। শিক্ষক ঘুঁষ

লইয়া প্রশ্ন বলিয়া দিতেছেন বা পরীক্ষকরূপে পাশ করাইয়া দিতেছেন—শিক্ষক পুস্তক নির্ব্বাচন-কালে প্রকাশকের পুরস্কারের আশায় অযোগ্য লেখকের পুস্তক পাঠ্য করিতেছেন কেন? অভাবে পড়িয়াই ত। সুতরাং সমাজের দেখা আবশ্যক যে, এমন শিক্ষক নিযুক্ত হন যাঁহার অভাব অল্প এবং যে অভাব তাঁহার আছে সে অভাবের তাড়নায় তিনি যেন লোভের অধীন না হন।

স্বরাজ-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা দুঃখ করিতেছি যে আমাদের যুবকেরা মানুষ হইল না—যতই শিক্ষিত হউক না কেন, তাহাদের দাস মনোভাব গেল না। আমাদের নেতারা তাহার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে দোষারোপ করিতেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থার মধ্যে দাস মনোভাব শিক্ষা পাইবার কোনো ব্যবস্থা আছে কি না জানি না, কিন্তু যাঁহারা আমাদের শিক্ষা দিতেছেন তাঁহাদের অনেকের দৃষ্টান্ত যে এই ভাব-প্রচারের পক্ষে অনুকূল তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। সামান্য অর্থলোভে সামান্য সাংসারিক সুবিধার জন্য আমাদের অধ্যাপক, পরীক্ষক মহোদয়েরা কী না করিতেছেন! ব্যক্তিবিশেষের তোষামোদ করিতেছেন। যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, তাঁহারা জানেন তাঁহাদের শিক্ষকমহোদয়দিগের স্বভাব। কি ক্ষুদ্র বুদ্ধি ও কি দাম্ভিকতা!—দেখিয়া-দেখিয়া আমাদের মন কত হীন হইয়া পড়িয়াছে! ইঁহাদের প্রতি কি শ্রদ্ধা থাকিবে। সকল ছাত্রই চায় তাহার শিক্ষক সরল শুদ্ধ স্বাধীন হউন। যাঁহার মধ্যে এইসব গুণ ছাত্রেরা দেখে, তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধায় তাহার চিত্ত নত হয়। কিন্তু যখন দেখে শিক্ষকের চরিত্রে এইসমস্ত গুণের একান্ত অভাব, তখন তাঁহার সহস্র পাণ্ডিত্য থাকিলেও তাঁহার প্রতি ঘৃণায় তাহার হৃদয় ভরিয়া থাকে।

এই দেশে আদর্শ শিক্ষক বলিয়া যাঁহাদের খ্যাতি আছে, তাঁহাদের জীবনের দিকে চাহিলে দেখিতে পাই তাঁহারা কি নির্ভীক ও সরলচিত্ত ছিলেন। তাঁহাদের অনাড়ম্বর জীবনে অভাব খুব কমই ছিল। তাই তাঁহারা যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছেন, তাহাকে অর্থ বা পদলোভে কোনো দিন বিসর্জ্জন দেননি। ছাত্রের যুবক হৃদয় মহত্ব দেখিলেই মুগ্ধ হয়—তাহাকে ভালোবাসিতে চায়।—সে যে আদর্শ গুরুর আদেশে প্রাণ দিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

সেকাল আর একালে কত তফাৎ হইয়া পড়িয়াছে, এখন পল্লীতে-পল্লীতে স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। কত পরিবারের সন্তান কতভাবে একত্রে মিলিত হইতেছে। পিতামাতা দুঃখ করেন, বাড়ী হইতে ভালো ছেলে পাঠাইলাম, খারাপ হইয়া গেল। কত পরিবারের কত দূষিত হাওয়া একত্র মিলিত হইতেছে। বিভিন্ন পরিবারের কত কুসংস্কার, কত ব্যভিচার, কত কলুষ আসিয়া স্কুল-ঘরে সমান আশ্রয় পাইতেছে। তরুণমতি বালক-বালিকা ভালো-মন্দ বিচার করিতে না পারিয়া আপাতমধুর মন্দকে গ্রহণ করিবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি?

আর এত যে স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, ইহাদের উপযুক্ত শিক্ষক এদেশে কোথায়? স্কুলের সম্পাদক-মহাশয় বা প্রধান শিক্ষক মহাশয়দের আবার সস্তার দিকে বিশেষ দৃষ্টি থাকে। একবার দেখিয়াছিলাম কোনো স্কুলে সস্তা শিক্ষক চাই; এক পুলিশের দারোগা ঘুঁষ খাইবার ফলে বরখাস্ত হইয়াছেন। তিনি এই শিক্ষকপদ প্রার্থী হইলেন। বলা বাহুল্য, সস্তায় পাওয়া যাইতেছে বলিয়া তিনি কাজটি পাইয়া গেলেন। এইসমস্ত শিক্ষকদের কাছে আমরা কি শিক্ষার আশা করিব? এ-সব ঘটনা ত আমাদের আশে-পাশে কত হইয়াছে—আমরা সকলেই তাহা অল্প-বিস্তর জানি। এইসব দেখিয়াও যদি আমাদের চোখ না ফোটে, তবে আমাদের স্বরাজ সহস্র বৎসরেও আসিবে না।

বামুন-বাগ্দী

শ্রী অরবিন্দ দত্ত

দশম পরিচ্ছেদ

কানাইলাল যাহা ভাবিল, কার্য্যত তাহাই ফলিতে আরম্ভ হইল। মহামায়া যত সহজে কন্যাকে সান্ত্বনা দিয়া আসিলেন, তত সহজে মনের গ্লানিটা নির্ব্বিবাদে পরিপাক করিতে পারিলেন না। কানাইলাল যখন এপথে অগ্রসর হইবার আর কোনো লক্ষণও দেখাইল না, তখন কানাই-লালের প্রতি আক্রোশে তাঁহার শরীর ঝিম্-ঝিম্ করিতে লাগিল। তিনি যেন প্রতিকার্য্যে ফুটাইয়া দেখাইতে চান্ এখানকার দ্বারপথ প্রতিদিন ঠেলাঠেলি করিয়া গৃহে প্রবেশ করিতে সে যেন আর বৃথা চেষ্টা না করে। যে কাছে ডাকিলে আসে না, তা'র একেবারে দূরে যাওয়াই ভালো। এইরূপে তাহাকে জড়াইয়া লইয়া তিনি এক-এক-দিন কন্যাকে হুঙ্কার দিয়া উঠিতেন। সেদিন নলিনী পড়িতে যাইত না। কানাইলালের গৃহে জামা, জুতা, বিছানা, কাগজ, পেন্সিল সকলই অবিন্যস্ত অবস্থায় পড়িয়া থাকিত। কিছুই গোছাইয়া রাখিয়া আসিত না। মহামায়াও কানাই-লালের সঙ্গে ভালো করিয়া কথা বলিতেন না। এমন ছাড়া-ছাড়া হইয়া বাস করিতে সে দুইদিনেই হাঁপাইয়া উঠিবে। কিসের আকর্ষণে তবে সে পরের ঘরে এমন গায়ে পড়িয়া গলগ্রহ হইয়া থাকিবে? শুধু চোখের দেখায় পরকে আপন করিয়া লইতে ত সে পারিবে না।

সেদিন মহাজনের কুঠী হইতে ফিরিবার সময় নদীর ধারে বসিয়া তাহার অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের কত কথাই সে ভাবিতে লাগিল। এত অসংখ্য নদ, হ্রদ, সমুদ্র থাকিতে সে একটা জলকণা উত্তপ্ত বালুকার উপর শুকাইয়া যাইবে? কোথাও আশ্রয় পাইবে না! সে দেখিল, বাহিরের কাজকর্ম্ম শেষ করিয়া কত-কত লোক আপনা-আপন গৃহের দিকে ছুটিয়াছে, তাহার মতন নিরাশ্রয় বোধ হয় জগতে আর একটিও নাই। তাহার কেমন আশ্চর্য্য বোধ হইতে লাগিল যে, এই বিশাল বিশ্বে সে অসংখ্য গৃহ দেখিতেছে। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, পুত্র, পরিবার লইয়া সকলে সুখে বাস করিতেছে, তাহারই বেলায় কি বিধাতা গালে আঙুল ঠেকাইয়া বসিয়াছিলেন? কেন তাহার কেহ নাই, কেন তাহাকে বারবার গৃহের স্বাদ দিয়া বিধাতা আবার বঞ্চিত করেন? সে কোথা হইতে আসিল—কোথায় আসিল—কোথায় সে-গৃহ? মহেশ্বরী বলিয়াছিলেন,—তাঁহাদেরই গ্রামে—উত্তরপাড়ায়; সেখানে এখন অন্য লোকে বাস করিতেছে। তা যে হয় সে বাস করুক—সে মাটিটা একবার সে দেখিতে চায়! সে দেখিবে সে-মৃত্তিকার শৃঙ্খলে তাহাকে বাঁধিতে পারে কি না? এ বিরাট্ শূন্যের মাঝখানে সে আর ঘুরিতে-ফিরিতে পারিতেছে না! আশ্রয় চাই বেড়িয়া ধরিতে, একটি প্রাণের আলিঙ্গন চাই। কোন্‌খানে সে সংসারের সমস্ত দাবি-দাওয়া হারাইয়াছে—কোন্ স্থানে তাহার এই সংযোজক সূত্রটি ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, তাহা তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। তাহার জীবনের এমন কোনো সংজ্ঞাই কি নাই, যে তাই ধরিয়া এই সংসারের উপর তা'র একটু দাবি করা চলে? কেন সে কেবলি পথে-বিপথে পরের কাছে হৃদয়ের দাবি করিয়া মরে? এইরূপ নানা চিন্তা করিতে-করিতে অতি পবিত্র—অতি নির্ম্মল—অতি বিচিত্র একখানি মুখের কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। ছিঃ! ছিঃ! সে কেন এমন ভাবিতেছে—কেন এমন লালসা করিতেছে? যে স্নেহের নির্ঝরিণীকে দেখিলে জগৎ ত তুচ্ছ কথা, প্রাণের অনন্ত তৃষ্ণাও মিটিয়া যায়, একটা বৃথা অভিমানের বেড়া দিয়া সে যে সে-অতুল সম্পদ্ হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে! সংসারের আর কোন্ সম্পদে তাহাকে অধিক সম্পদশালী করিতে পারিবে? যেখানে তাপ নাই—স্নিগ্ধতা আছে, তাড়না নাই—ক্ষমা আছে, ভয় নাই—ভরসা আছে, এমন জুড়াইবার স্থান সে হেলায় হারাইয়া আসিয়াছে! তাহার

এক-একবার মনে হইতে লাগিল যে, ছুটিয়া গিয়া সে অভয়-চরণে লুটাইয়া পড়ে। কিন্তু বড় লজ্জা করে! মাতার স্নেহের উদ্যানে নিজের হাতে আগুন জ্বালাইয়া দিয়া তাহার দগ্ধ-চিহ্নটাও দেখিবার জন্ম তাহার প্রাণ কাঁদিল না—সে আজ কোন্ মুখে সে পবিত্র চরণতলে যাইয়া দাঁড়াইবে? কানাইলালের চক্ষু দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

সে এইরূপ তন্ময় হইয়া ভাবিতেছে, এমন সময় একটি ভদ্রলোক সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "এই যে, আপনি এখানে ব'সে আছেন। আমি আপনারই খোঁজ ক'রে বেড়াচ্ছি। মেয়েটার পেটটা বড় ফেঁপেছে—একবার দে'খে আস্তে হবে।"

কানাই আপনাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া লইয়া কহিল, "হ্যাঁ—চলুন।" ভদ্রলোকটি বলিলেন, "বাসা হ'য়ে যাবেন কি একবার? দু'চারটা ওষুধ সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলে আমায় আর আস্তে হয় না।"

"তাই চলুন।" এই বলিয়া উভয়ে চলিতে আরম্ভ করিলেন।

গণপতি সেদিন বাড়ীতে ছিলেন না। মনিবের কার্য্যে কোন্নাঘাটে গিয়াছিলেন। কানাই আসিয়া দেখিল, তাহার ঘরে আলো জ্বলে নাই। সে বাহিরে দাঁড়াইয়া ডাকিল, "নলিনি, একটা আলো দিয়ে যাও ত দিদি!"

নলিনী আসিয়া আলো রাখিয়া গেল।

কানাই বাক্স হইতে দুই-চারিটা ঔষধ লইয়া বাহির হইতে যাইতেছে, এমন সময় মহামায়া তাহাকে শুনাইয়া কহিলেন, "নলিনি, ব'লে দে সকাল-সকাল ফিরতে। আমার শরীর ভালো নেই, দরজা আগ্‌লে ব'সে থাকবে কে?"

নলিনীর কিছুই বলিতে হইল না। কানাইলাল যে তাহার মাতার সকল কথাগুলিই শুনিতে পাইল, তাহা সে বেশ বুঝিতে পারিল। এবং বুঝিয়া লজ্জায় রাঙা হইয়া ব্যথিত-হৃদয়ে দূরে সরিয়া গেল।

কানাইলাল আসিয়া দেখিল, মেয়েটি বড় গোলমেলে হইয়া পড়িয়াছে। পেট ফাঁপিয়াছে, হাত-পা বরফের মতন ঠাণ্ডা, মাঝে-মাঝে প্রলাপ বকিতেছে; জ্ঞান হইলে তৃষ্ণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে।

সে তাহাকে একদাগ ঔষধ খাওয়াইয়া দিয়া গা-হাত-পা গরম কাপড়ের দ্বারা ঢাকিয়া দিল। পেটের উপরি-ভাগে একটি বাহ্যিক প্রলেপ ও মালিস করিয়া দেওয়া হইল। চার-পাঁচ ঘণ্টা বিশেষ তদ্বিরের পর মেয়েটির অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল। একবার দাস্ত হইয়া পেটটি কমিয়া গেল। হাত-পা গরম হইল এবং ভুল বকাও থামিল। সে তখন ঔষধ পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়া বাসায় ফিরিল।

সে যখন বাসায় ফিরিল, তখন রাত্রি বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। মহামায়া নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সে ভয়ে-ভয়ে ডাকিল, "নলিনি!"

নলিনী এক-ডাকেই উত্তর দিল। কানাইলালের প্রতি মহামায়ার স্বভাব ক্রমশঃ যেরূপ হিংস্র হইয়া উঠিতে-ছিল, তাহাতে তাহার ফিরিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া নলিনী বুঝিতে পারিয়াছিল, আজ আবার একটা-কিছু বাধিবে। কানাইলালকে আঘাত হইতে বাঁচাইবার জন্ম এবং মায়ের দোষস্খালনের জন্ম তাই সে না ঘুমাইয়া জাগিয়াই ছিল। সে ঘরের মধ্যে সাড়া শব্দ না করিয়া আলো জ্বালিল এবং চুপি-চুপি আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। কানাই ভিতরে প্রবেশ করিলে সে জিজ্ঞাসা করিল, "রান্না কর্‌বেন ত?" আজ তাহার কথায় বালিকা-সুলভ আনন্দচঞ্চলতা ছিল না। তার গলার স্বর আজ ব্যথায় গভীর।

কানাই বলিল "এত রাত্রে কি রাঁধা যায়। আজ আর কিছু খাবো না।"

নলিনী কহিল, "আচ্ছা, আপনি একটু বসুন, আলো নিবিয়ে শোবেন না যেন—আমি এখুনি আস্‌ছি!"

এই বলিয়া সে চলিয়া গেল। এবং অবিলম্বে একটা বাটিতে করিয়া দুধ, কিছু ময়দা, পাকা কলা ও কিছু গুড় আনিয়া দিল। বলিল, "এইটে মেখে খান, খেতে মন্দ হবে না—সিন্নি আর কি।" কানাইকে অনাহারে রাত্রি যাপন করিতে দিতে সে পারে না।

পরদিন প্রাতে মহামায়া নলিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কানাই কখন এসেছিল?"

ভয়ে-ভয়ে নলিনী কহিল "শুতে-শুতে।"

মা বলিলেন "দোর খুলে দিলে কে ?"

"আমি।" নলিনীর বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। মা না জানি কি বলিবে।

মা একবার মাত্র চক্ষু ঘুরাইয়া বলিলেন, "সেয়ানা মেয়ে আমাকে না ব'লে-ক'য়ে দোর খু'লে দিতে গেলি ? ভয়ডর, লজ্জাসরম নেই !"

নলিনীর কান দিয়া তাপ নির্গত হইতে লাগিল।

মহামায়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাত্রে খেলে কি ?"

নলিনী তিক্তস্বরে কহিল, "তোমার মুণ্ডু।"

মহামায়া কহিলেন, "যেখানে কব্‌রেজি কর্‌তে যাওয়া হয়েছিল, সেইখানে খেলে-শুলে পার্‌তেন। বাড়ীর ওপর না খেয়ে প'ড়ে থাকা এতে কি লক্ষ্মী ভাগ্যি থাকে ? বল্‌লেই হ'ত, গুছিয়ে-গাছিয়ে দেওয়া যেত—গতরটা ত বারোভূতের জন্যেই জল কর্‌তে ব'সে আছি।"

কানাই বসিয়া-বসিয়া সকল কথাগুলি শুনিল। এবং কিছুক্ষণ পরে গায়ে একটি জামা দিয়া বাহির হইয়া গেল।

সে যখন মহামায়ার দ্বারে তাহার লাঞ্ছনার শেষ করিয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন ছায়াবাজির মতন তাহার এই দু'দিনের হাসি-কান্না কোথায় উধাও হইয়া গিয়া মহেশ্বরীর বিচ্ছেদের সেই প্রথম হাহাকারটি তাহাকে আবার চারিদিক্ হইতে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু তাহার অন্তরের এই ক্রন্দনের মধ্যে নলিনীর সুমিষ্ট স্নেহ-ব্যাকুলতা যেন থাকিয়া-থাকিয়া নিঃস্বভাবে উঁকি-ঝুঁকি দিয়া উঠিতে লাগিল। যাহাকে ছাড়িয়া যাইতেই হইবে, সে যে তাহার মনকে এমন কোমল বন্ধনে বাঁধিয়াছে আগে তাহা কে জানিত ? তাহা হইলে এমন ফাঁদে সে কখনও পা দিত না। সে হাঁটিতে-হাঁটিতে একটি ময়দানের ধারে আসিয়া উপবেশন করিল। ভাবিয়া দেখিল, তাহার প্রাণের বেদনা জানাইতে পৃথিবী ফাটাইয়া চীৎকার করিলেও বোধ হয় তাহার ডাকে উত্তর দিবার কেহ নাই। যে-দুটি মানুষ হয়ত সাড়া দিত, দৈব তাহাকে তাহাদের কাছ হইতে টানিয়া লইয়া যায় কেন ?

কিছুকাল সেইখানে বসিয়া থাকিবার পর সে আপনার দুর্ব্বলতাকে প্রাণপণে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া আবার উঠিয়া দাঁড়াইল। বাজার হইতে কিছু খাবার কিনিয়া খাইয়া মহাজনের কুঠীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। এবং নিজের কাজে মনোনিবেশ করিল।

বেলা যখন দুইটা, তখন একটা গোলমালের শব্দে সকলে ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখিল বাজারের একপার্শ্বে আগুন লাগিয়াছে। লেলিহান অগ্নিশিখা আকাশমার্গে উঠিয়া সমস্ত বাজারটিকে গ্রাস করিবার জন্য যেন সম্মুখ-ভাগে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। কুঠীর লোকজন সকলে দ্রুতপদে তথায় ছুটিল। কানাইলালও সঙ্গে-সঙ্গে চলিল। ইতিমধ্যে সেখানে অনেক লোক জড় হইয়াছিল।

কানাইলাল দেখিল, ভয়ে ও উদ্বেগে সকলেই কাষ্ঠ-পুত্তলিকাবৎ দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া দেখিতেছে, কেহ-কেহ আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করিতেছে, কিন্তু অগ্নি নির্ব্বাণের চেষ্টা কেহই করিতেছে না। হঠাৎ কানাই দেখিতে পাইল, একটি প্রজ্বলিত ঘরের মধ্যে একটি স্ত্রীলোক আপনার শিশু পুত্রটিকে ক্রোড়ে লইয়া ঘরের বাহির হইবার জন্য গৃহের মধ্যে ছুটাছুটি করিতেছে। কিন্তু গৃহটি চারিদিক্ হইতে এরূপ অগ্নিময় হইয়া উঠিয়াছে যে বহির্গমনের পথ নাই। ভয়ে মেয়েটি দিগ্‌বিদিক জ্ঞান হারাইয়া আগুনের ভিতরই ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। কানাই তাড়াতাড়ি নিকটবর্ত্তী এক দোকান-ঘর হইতে দুইখানি শতরঞ্জি সংগ্রহ করিয়া জলসিক্ত করিয়া লইল। সকলে অবাক্ হইয়া দেখিতে লাগিল। কানাই শতরঞ্জি দিয়া সমস্ত শরীর মুড়িয়া আগুন ঠেলিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। পরে শিশুটিকে আপনার ক্রোড়ে লইয়া একখানি সতরঞ্চ দ্বারা নিজের দেহ আবৃত করিল। অপরখানির দ্বারা শিশুর জননীকে আচ্ছন্ন করিয়া সকলকে লইয়া নির্ব্বিঘ্নে ঘরের বাহির হইয়া আসিল।

তাহার উপস্থিতবুদ্ধি দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। যাহারা এতক্ষণ হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাহারা দলে-দলে ছুটিয়া আসিয়া কানাইলালকে তাহার সৎসাহসের জন্য প্রশংসা করিতে লাগিল। কানাইলাল সে-দিকে লক্ষ্য না করিয়া যাহাতে এই অগ্নি বহুস্থানব্যাপী না হয়, তজ্জন্য একটি কলসী হস্তে লইয়া নিকটবর্ত্তী জলাশয়ের দিকে ছুটিল। কাহারও কথায় মন দিবার

তখন সময় ছিল না। সকলকে ডাকিয়া উত্তেজনাপূর্ণস্বরে সে কহিল, "হাঁ ক'রে দেখ্‌ছ কি তোমরা? যেখানে যে জলপাত্র পাও শীঘ্র নিয়ে এস।"

কানাইলালকে অগ্রবর্ত্তী হইতে দেখিয়া তখন দল বাঁধিয়া সকল লোক ভারে-ভারে জল আনিয়া জলন্ত অগ্নি-শিখার উপর ঢালিতে লাগিল। সে কি দৃশ্য! কেহই দাঁড়াইয়া নাই—পিপীলিকাশ্রেণীর মতন জনস্রোত দলবদ্ধ হইয়া ক্রমাগতই সেই ভীষণ অগ্নিস্রোতের উপর ছুটিয়া-ছুটিয়া আসিয়া জল ঢালিতেছে,ক্রমাগত জলই ঢালিতেছে। শরীরের প্রতি মায়া নাই—বিশ্রাম নাই। মায়ামন্ত্রে সকলে যেন আসুরিক শক্তি পাইয়াছে। কেহ-কেহ বা কানাইলালের উপদেশ মতন কাঁথা, শতরঞ্চি ও মাদুর প্রভৃতি শয্যাদ্রব্য জলসিক্ত করিয়া আনিয়া নিকটবর্ত্তী গৃহগুলি আবৃত করিয়া দিতেছে। এইরূপে কানাইলালের উৎসাহে ও যত্নে অতিশীঘ্রই অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল। কতক গৃহ অর্দ্ধদগ্ধ, কতক বা অদগ্ধ অবস্থাতেই রক্ষা পাইল। যাহারা গৃহহারা হইল তাহারা আজ প্রতিবাসীর গৃহে অনায়াসে স্থান পাইল। বিপদ্ তাহাদের পরস্পরের আত্মীয় করিয়া তুলিয়াছে।

মনিবের বাসা হইতে সন্ধ্যার সময় কানাই যখন গৃহে ফিরিবে তখন গণপতির গৃহে যাইতে তাহার মন উঠিল না। এই নিদারুণ পরিশ্রমে সে যেমন ক্লান্ত হইয়াছিল, সেইরূপ ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অত্যধিক কাতরও হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু মহামায়ার বিষাক্ত কথাগুলি তখনও পর্য্যন্ত তাহার কর্ণে বাজিয়া-বাজিয়া উঠিতেছিল। সে-গৃহে আর সে যাইবে না—যাইতে পারিবে না। রাত্রি ঘনাইয়া আসিতেছে, সে ক্লান্ত—ক্ষুধার্ত্ত—তাহার আশ্রয় নাই; তাহার সাধু ব্যবহারে ঘাঁটালবাসী ইতরভদ্র সকলেই তাহার পরমাত্মীয় হইয়া পড়িয়াছিলেন। সে আশ্রয়প্রার্থী হইলে সকলেই তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিতেন। কিন্তু উপযাচক হইয়া কি করিয়া আশ্রয় ভিক্ষা করিতে হয় সে তাহা জানিত না। কাহারও গৃহের দ্বারে গিয়া সে দাঁড়াইতে পারিল না। আপনি বাজার হইতে দুইটি ডাব-নারিকেল খরিদ করিয়া খাইল। এবং পরিচিত একটি ঔষধের দোকানে আসিয়া সামান্য একটা মাদুরে পড়িয়া রাত্রি যাপন করিল।

তাহার সৎসাহসের কথা লোকমুখে ইতিমধ্যে সহরের সর্ব্বত্রই প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল। গণপতিরাও এ-সংবাদ পাইয়াছিলেন। গণপতি গৃহে আসিয়া যখন শুনিলেন কানাইলাল আসে নাই, গতরাত্রে কিছু খায় নাই,প্রাতে সেই যে জামা গায়ে দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে, দুপুরেও আসিয়া খাওয়া-দাওয়া করে নাই, তখন তাঁহার মন কিছু চঞ্চল হইয়া উঠিল। হাওড়া ষ্টেশনে এই বালকই যে তাঁহার স্ত্রীর জীবন রক্ষা করিয়াছিল! তা'র পর বৎসরাধিক-কাল সে ত তাঁহারই পরিবারভুক্ত হইয়া বাস করিতেছে। বিশেষতঃ এই অগ্নিকাণ্ডে তাহার নিঃস্বার্থ পরোপকারবৃত্তির পরিচয় নূতন করিয়া পাইয়া তাঁহার মনের চাঞ্চল্য একটু বাড়িয়াই উঠিল। সাধারণত তিনি অল্প কথা কহিতেন, লোকদেখানো ভালোবাসা তাঁহার ছিল না; কিন্তু আজ তিনি কানাইকে না খুঁজিয়া আনিয়া শান্ত হইতে পারিতে-ছিলেন না। তিনি একটি লণ্ঠন জ্বালিয়া লইয়া তাহার অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। মহাজনের ঘরে আসিয়া শুনিলেন, সে অনেকক্ষণ বাসায় চলিয়া গিয়াছে। তা'র পর আরও অনেকস্থানে খোঁজ করিবার পর কোথাও তাহাকে না দেখিয়া তিনি বিষণ্ণ-মনে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। মহামায়াকে বলিলেন, "না—কোথাও তা'কে খুঁজে পেলাম না। ছেলেটা কোথায় যে গেল! ঘরের ছেলের মতন ছিল।"

মহামায়া বলিলেন, "তুমিও যেমন সারাদেশ খুঁজে বেড়াতে গেছ—কাজকর্ম্ম না থাক্‌লে যা হয়। সে কোথায় মজা লুটে বেড়াচ্ছে, তুমি মরছ ঘু'রে।"

গণপতি কহিলেন, "বলো কি? কাল কিছু খায়নি—আজও খেলে না! আজ বাজারটা বল্‌তে গেলে সেই-ই রক্ষা করেছে।"

মহামায়ার বলিতে বাধিল না যে "ওড়্‌বাজ ভবঘুরে যারা—যাদের চাল-চুলো নেই, তা'রাই ঐসব ক'রে বেড়ায়।"

গণপতি স্ত্রীর কথায় কিছু উত্তর দিলেন না। এমন কথা যে বলিতে পারে, তাহার সঙ্গে তর্ক করিতে যাওয়াও বৃথা।

(ক্রমশঃ)

শ্রী অন্নদাশঙ্কর রায়

সুন্দর, তুমি খুঁজিয়া ফিরিছ কারে ?
নাই সে খোঁজার আদি আর অবসান।
সুরের দূতীরে পাঠাও কাহার দ্বারে ?
নাই সে জনের কোথা কোনো সন্ধান।
তুমি শুধু সুর, তুমি পথে চলা সুর,
তুমি চলি' যাও বাঁশিতে-বাঁশিতে বেজে ;
দূর হ'তে আসি নিকট, পালাও দূর ;
এক যুগ হ'তে আর যুগে চলা এ যে !
তোমার খোঁজার সমারোহ দে'খে মরি !
ওগো সুন্দর, এত জানো ছলা-কলা !
কত রূপ কত বর্ণ বিকাশ করি'
গন্ধে-ছন্দে অবিরাম তব চলা।
প্রাতে খুলে ফেলি যামিনীর যবনিকা
চিনিবার তরে কার মুখ তুলে ধরো ?
উষার অলকে আঁকি' সিন্দুর-লিখা
মেঘে চুম দিয়া সরমে অরুণ করো।
সারাদিন ছোটো হেথায়-হোথায় মিছে
আলোয় উজলি' মুগ্ধ ধরণী সারা ;
দিন-শেষে তবু বারুণীর পিছে-পিছে
মশাল ধরিয়া তিমিরে হও যে হারা !
লক্ষ নয়ন ফুটে উঠে দিকে-দিকে
নিশি-ভোর চলে শুধু খোঁজা, শুধু খোঁজা :
ছায়া-পথ বেয়ে চরণ-চিহ্ন লিখে
অসীমের মাঝে ছুটে বাহিরাও সোজা।
যৌবন তব পথ-পাশে জাগে হাসি' ;
কুসুমে-কুসুমে মাতামাতি কানাকানি
কেলি-কদম্ব ঝরায় মুকুল-রাশি ;
কুঞ্জে-কুঞ্জে ফুলবাণ হানাহানি।
দখিনা সমীর আবেশে মূরছি' মরে ;
বরষা-বাদলে শুধু বাজে রিম্ ঝিম্ ;
শরৎ-শেফালী আলুগোছে ঝরি' পড়ে ;
নিশুৎ রাতের অঙ্কে ঝিমায় হিম।

সে কি তুমি ? সে কি তুমি সুন্দর কহি ?
যত শোভা যত সৌরভ ল'য়ে সাজো ?
ঋতু পটে যার নিতি-নিতি আঁকো ছবি
ভুলাইতে তার মন পারিলে না আজো ?
রঙে-রঙে তুমি রাঙাইলে দিশি-দিশি
রঙের নেশায় সৃজিয়া চলিলে কি যে !
কালো হ'য়ে গেল সবগুলি রঙ্ মিশি
তুমি সে কালিমা গর্ব্বে মাখিলে নিজে।
ওগো যৌবন, ওগো চির যৌবন,
নিতি-নিতি তুমি জাগাও নবীন প্রাণ :
জরারে জোগাও সবুজের রসায়ন,
কচি ও কাঁচারে শক্তির অভিমান।
এত করি তবু হয় নাকো মনোমত
প্রিয়ার লাগিয়া আরো বুঝি কিছু চাই !
মরণ সাজিয়া ভাঙো সবি অবিরত
কচি ও কাঁচার গলা টিপে মারো তাই !
ওগো নিষ্ঠুর সুন্দর, ওগো কালো,
কোথা পেলে ঐ সাপ খেলাবার বাঁশি ?
দিকে-দিকে কি যে সুরের আগুন জ্বালো
যারা শোনে তা'রা ঝাঁপ দিয়ে পড়ে হাসি' !
এক দিক্ হ'তে আর-দিকে পড়ে সাড়া ;
নৃত্যের তালে চরণে শিহরে সুখ ;
উদ্দাম বেগে ঘুরে মরে রবি-তারা ;
বিপুল ব্যথায় দোলে সিন্ধুর বুক।
কুহকী ! এত যে কুহক লাগাও প্রাণে
বিশ্বের প্রতিকণায় স্বপন সৃজে'
আমরা বৃথাই খুঁজে মরি ওর মানে ;
তুমি শুধু হাসো ; হয়ত জানো না নিজে।
বিশ্বের তুমি শোভারূপ, তুমি কান্ত,
কোটি সুষমার নির্যাসে তুমি গড়া ;
মনোহর তুমি হ'য়ে-ওঠো অবিশ্রান্ত ;
তোমার মাধুরী তোমারি সৃজন-করা।

এত সুন্দর, তবু তুমি চাও কারে ?
খুঁজিয়া বেড়াও কি বিপুল পূর্ণতা ?
কত কি গড়িলে নিজ হাতে বারে-বারে ;
মন ভরিল না, করি' দিলে চূর্ণ তা।
জানি জানি, তুমি কি ধন খুঁজিয়া ফির,
কার তরে তব অবিরাম অভিসার ;
পাইলে না, তাই বিরহী সেজেছ চির ;
যতবার গেলে ফিরে এলে ততবার।
নিখিলের রূপ কেঁদে মরে যার তরে,
সে যে নিখিলের বক্ষে লুকানো প্রীতি !
তারে তুমি যত চাহিলে বাহিরে ঘরে
পাইলে না ; তুমি নাহি জানো তার রীতি।
সে আছে তোমার অন্তর আলো করি',
সে আছে তোমার বাঁশরীর সুরে বাঁধা ;
তুমি ঘুরে মরো সারাটি গোকুল ভরি',
তোমারি বক্ষে লতাইয়া আছে রাধা।

বিশ্বের শোভা উপবাসী যার আশে
সে যে বিশ্বের মরমে লুকানো প্রেম ;
যত বাড়ে খোঁজা হেথা-হোথা আশে-পাশে
খনির আড়ালে হাসিয়া লুটায় হেম।
পথ খোঁজা রীতি ঘুচিবে তোমার কবে ?
চলিতে-চলিতে কবে দাঁড়াইবে থেমে ?
সুন্দর, তুমি প্রেমিক যেদিন হবে ;
সুষমা সেদিন সার্থক হবে প্রেমে।
জানি জানি কভু আসিবে না হেন দিন ;
তুমি নিষ্ঠুর, প্রেমপাশ যাও টুটি' ;
তুমি তো পালালে মথুরায় উদাসীন ;
বিরহিণী রাধা ভূতলে পড়িল লুটি'।
সেই তুমি কভু প্রেমে কি পড়িবে ধরা ?
সুচির বিরহ, বিলাস তোমার সে যে !
তুমি শুধু সুর ; শুধু পথ-খুঁজে মরা ;
তুমি চলি' যাও বাঁশিতে-বাঁশিতে বেজে।

অতৃপ্ত তৃষা

শ্রী পরেশনাথ চৌধুরী

প্রাবৃট্ গগনতলে স্তব্ধ আজি শ্রাবণ-শর্ব্বরী,
নিশীথের পাত্রখানি ভরি'
তমসা ছাপিয়া পড়ে,
মেঘজল ঝরে
অবিরত
কত !

মুকুল মেলেনি আঁখি—ঝিল্লী আজি ভয়ে স্বরহারা,
ঘনমেঘে লুপ্ত যত তারা ;
বরিষা বিভল মনে
শিখী বনে-বনে
ডাকে একা
কেকা !

কাঁপিয়া-কাঁপিয়া মরে বল্লরী সে আসন্নপ্রসবা,
উচ্চকিত বিদ্যুতের প্রভা
থমকি' চমক হানে,
দ্বিধাহত প্রাণে
কারে চায়,
হায় !

আমারো অন্তর আজি চায় যেন কারে যেন চায়,
পিয়াসিত বিশ্বের হিয়ায়
অসীম কামনা মাঝে
যে বেদনা বাজে,
মোর হৃদে
বিঁধে।

কি যেন হারায়ে গেছে, কা'র তরে প্রাণ মোর কাঁদে
তৃপ্তিহীন কামনার ফাঁদে
ঘুরিয়া-ঘুরিয়া সারা,
তপ্ত আঁখি-ধারা
আজি ঝ'রে
পড়ে।

মুকুলে ঝরেছে যাহা—হয়নিকো দেখা যার সনে,
আজি রাতে প্রাণে সংগোপনে
তাদের বিরহগীতি,
অচেনার প্রীতি
ধ্বনি' যায়,
হায় !

জয়-পরাজয়

শ্রী সীতা দেবী

১

ভোরের বেলাটা খোকার অত্যাচারে সুখনিদ্রার ব্যাঘাত হওয়াতে ঘোষালদের বড়-বউ কনকলতার মেজাজ এমনিই যথেষ্ট খারাপ হইয়াছিল। তাহার উপর সাড়ে-সাতটা বাজিতে চলিল, এখনও চা খাইবার ডাক আসিল না। ইহাতে তাঁহার মনের উত্তাপ বেশ প্রচুর-পরিমাণেই বাড়িয়া গেল। মেজ-জা সৌদামিনী মরিয়াছে নাকি? সারারাত তাহার কুম্ভকর্ণের নিদ্রা দিবার অবকাশ, কারণ তাহার ছেলেটা তিন বছরের। সকাল-সকাল উঠিয়া চায়ের এবং রান্নাবান্নার ব্যবস্থা করা তাহারই কর্ত্তব্য, ইহা বাড়ীর সকলেই বোঝে, বিশেষ করিয়া কনকলতা। একে তাঁহার স্বামী রোজগারী এবং কোলের ছেলে ছোট, তাহার উপর তিনি আবার দ্বিতীয় পক্ষের গৃহিণী। সৌদামিনীর স্বামীর মাস-দশ হইল কাজ গিয়াছে, একটু নড়িয়া-চড়িয়া নূতন কাজের চেষ্টা দেখিবে তাহাও সে অকর্ম্মণ্যটার দ্বারা ঘটিয়া ওঠে না, বাড়ী বসিয়া ছেলে-বউ লইয়া গো-গ্রাসে গিলিতেছে। তাহার স্ত্রীর আবার অত জাঁক কিসের? তাও যদি চেহারাখানা একটু মানুষের মতন হইত, কি, বাপের বাড়ী হইতে দু-পাঁচ শ লইয়া আসিবার ক্ষমতা থাকিত!

বড়গিন্নি ঘড়ির দিকে তাকাইয়া দেখিলেন। সাড়ে-সাতটা। রাগে-বিরক্তিতে তাঁহার প্রায় কণ্ঠরোধ হইবার উপক্রম হইয়া আসিল। অনেক কষ্টে ডাক দিলেন, "মেজ-বউ।"

কোনোই সাড়া পাওয়া গেল না। তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। মেজ-বউ-এর ঘরের কপাট আধখানা খোলা, চৌকাঠের এধারে বসিয়া তিন বছরের ছেলে মণ্টু খেলা করিতেছে। তাহার গায়ে জামা নাই, মুখে দুধের দাগ এবং সর্ব্বাঙ্গ দুগ্ধধারায় অভিষিক্ত। দেওর-পোর মূর্ত্তি দেখিয়া কনকের অঙ্গে যে পুলক সঞ্চার হইল না তাহা বলাই বাহুল্য। তিনি তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিলেন "হ্যাঁ রে, তোর মা গেল কোন্ চুলোয়?"

মণ্টু সংক্ষেপে উত্তর দিল, "ঘরে।" "ঘরে কি কর্‌ছে? ঘুমুচ্ছে? নিজের ছেলেকে ত গেলানো হয়েছে দেখ্‌ছি, আর কারো বুঝি আর খেতে হবে না?"

মণ্টু বলিল, "কাওয়ায়নি। আমি নিজে কেয়েছি। মা মাটিতে ব'ছে আছে।"

তাহার জ্যাঠাইমা কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া এবার মেজ-জায়ের ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িলেন। খাটের পাশে সৌদামিনী চুপ করিয়া মেঝের উপর বসিয়া আছে। তাহার দুই চোখ রোদনস্ফীত, মাথায় কাপড় নাই। দেওর সুখ-রঞ্জনের কোনোই চিহ্ন নাই।

বড় বউ জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ গা, সকাল বেলা অমন ক'রে ব'সে কেন? হয়েছে কি? কাজকর্ম্ম কিছু কর্‌তে হবে না?"

সৌদামিনী কথা না বলিয়া তাহার দিকে তাকাইল। তাহার পর হাতের মুঠা হইতে একখানা দলা পাকানো কাগজ তাহার দিকে অগ্রসর করিয়া দিল।

বড় বউ আরো খানিকটা অবাক্ হইয়া দলা পাকানো কাগজখানা প্রসারিত করিয়া পড়িয়া ফেলিল। তাহার পর মাথায় এক চাপড় মারিয়া বলিল "ওমা, একি কাণ্ড! কোথায় যাবো মা! সাতজন্মে এমন ব্যাপার দেখিনি। ওরে মণ্টু, শীগ্‌গির তোর জ্যাঠামশায়কে ডাক্।"

চিঠিখানি সুখরঞ্জনের লেখা। তাহাতে তিনি সংক্ষেপে জানাইয়াছেন যে, পরের গলগ্রহ হইয়া থাকা তাঁহার অসহ্য হইয়াছে। চক্ষুশূলরূপিণী কুরূপা এবং কটু-ভাষিণী পত্নীর জ্বালায় ঘরেও তাঁহার কোনো সুখশান্তি নাই। অতএব তিনি গৃহত্যাগ করিয়া চলিলেন। পাথেয়-স্বরূপ অবশ্য সৌদামিনীরই গহনা ক'খানি লইয়াছেন। ভাগ্য ফিরিলে আবার গৃহে ফিরিবেন, নচেৎ নয়। পরি-

শেষে অতি উচ্ছ্বসিত এবং গদগদ ভাষায় তিনি দাদা এবং বউদিদিকে তাঁহার একমাত্র স্নেহের ধন, নয়নের মণি মণ্টুকে দেখিতে অনুরোধ করিয়াছেন। সে যেন পিতার অভাবে কোনো কষ্টে না পড়ে।

মণ্টুর ডাকে তাহার জ্যাঠামশায় ভবরঞ্জন এবং তাঁহার চীৎকারে বাড়ীর আর সকলে অতি শীঘ্রই আসিয়া জুটিল। পাড়া-প্রতিবেশীরও আসিয়া উপস্থিত হইতে খুব বেশী বিলম্ব হইল না। সকলেই গলা ছাড়িয়া আপন আপন অভিমত ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। চুপ করিয়া রহিল কেবল সৌদামিনী। এমন-কি শাশুড়ী বা ভাশুরকে দেখিয়া মাথায় কাপড় পর্য্যন্ত দিল না। কনক ফিশ্‌ফিশ্‌ করিয়া পাশের এক প্রতিবেশী বধূকে বলিল, "কি ঢ্যাটা মেয়ে বাবা! চোখে এক-ফোঁটা জল নেই। সাধে স্বামী কে'লে গেছে। শ্বশুর-ভাশুরের সাম্‌নে মাথার কাপড়টা-সুদ্ধ নেই! মেয়ে-মানুষের অত তেজ, অত বেহায়াপানা শোভা পায় না।"

পাড়ার লোকে এক এক করিয়া সরিয়া পড়িল। আজ আর সৌদামিনীর দ্বারা কিছু হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া বড়-বউ নিজেই কোনোরকমে রুটী গড়িয়া চা করিয়া, সকালের জলযোগের পালাটা সারিয়া ফেলিলেন। স্বামী সাড়ে নটার ডেলি প্যাসেঞ্জার। তাঁহার অফিসের ভাতটাও না রাঁধিলে নয়, কাজেই সেটাও তাঁহাকেই করিতে হইল। ইহাতে তাঁহার মেজাজের যতখানি উন্নতি হইল, তাহার ফলে মণ্ট সেদিন শুধু ডালের জল দিয়া ভাত খাইল, এবং সৌদামিনীর জলবিন্দুও স্পর্শ করা ঘটিয়া উঠিল না।

কলিকাতার নিকটের একটি ম্যালেরিয়ার আড্ডা ছোট গ্রামে এই পরিবারটির বাস। গৃহকর্ত্তা নিত্যরঞ্জন বাঁচিয়া থাকিতে ইহাদের অবস্থা মোটের উপর সচ্ছলই ছিল। বড় ছেলে বি-এ পাশ করিয়া একটি বড় লোকের মেয়ে বিবাহ করিয়া আনিয়া পারিবারিক সমৃদ্ধি কিঞ্চিৎ বাড়াইয়া ছিলেন। মেজ-ছেলে চিরকাল অকাজের। প্রতি-পরীক্ষায় দু-তিনবার ফেল করিয়া করিয়া 'বি-এ'র গণ্ডীতে সে একেবারে পাকাপাকি-রকম আট্‌কাইয়া গেল। কিন্তু বিয়ে তা'তে আটকাইল না। বধূ সৌদামিনী তেমন মনের মতন হইল না। রং তাহার ময়লা, মুখশ্রীর ভিতরও চোখ-দুটি ছাড়া প্রশংসা করিবার মতন কিছু ছিল না। বাপের বাড়ীর অবস্থাও তাহার ভালো নয়, নিতান্ত যা না হইলে নয়, তাহা ছাড়া আর কোনো স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি সে সঙ্গে আনিতে পারে নাই।

কিন্তু তাহার হৃদয়ের ভিতর সে যতটুকু আত্মসম্মান ও তেজ বহন করিয়া আনিয়াছিল, তাহা শ্বশুর-বাড়ীর কোনো কাজে না লাগিলেও, তাহার নিজের যথেষ্টই কাজে লাগিয়াছিল। সমস্ত আঘাত-অপমান তাহার এই সহজাত কবচে ঠেকিয়া যেন চূর্ণ হইয়া যাইত। গালাগালি দিয়া যাহাকে কাঁদাইতে পারা যায় না, তেমন স্ত্রীলোককে অন্তত বাংলাদেশে কেহ পছন্দ করে না। সৌদামিনীরও শ্বশুর-বাড়ীতে কিছু সুখ্যাতি লাভ হইল না। তাহার অকারণ দেমাকে সবাইকার হাড় সারাক্ষণই জ্বালা করিতে লাগিল, এবং সেই জ্বালাটা ক্রমাগতই তাহাদের জিহ্বাগ্রে বিষদংকার করিয়া রাখিল। তবে যতই দেমাকে হউক, মেজ-বউকে ভগবান্ যে দুর্জ্জয় গতর দিয়াছিলেন, তাহার জোরেই সে একটা জায়গা অধিকার করিয়া রহিল।

এমন সময় হঠাৎ কলেরা হইয়া কর্ত্তা নিত্যরঞ্জন ও বড়-বউ বিজলী দুই দিনের মধ্যেই পরলোক গমন করিলেন। বাড়ীতে হাহাকার পড়িয়া গেল।

কিন্তু দুঃখ বা সুখ কিছুই সংসারে চিরকাল জায়গা জুড়িয়া বসিয়া থাকে না। কর্ত্তার শোকও ক্রমে সকলের সহিয়া গেল এবং বছর ফিরিতে না ফিরিতে কনকলতা আসিয়া বিজলীর শূন্যঘর অধিকার করিয়া বসিলেন। অবশ্য কর্ত্তার পেন্সনের টাকাটা বাদ পড়াতে সংসারের অবস্থা অনেকখানিই অসচ্ছল হইয়া উঠিল। বড় ছেলে সবে কাজে ঢুকিয়াছে, তাহার রোজগার অল্প। অগত্যা সুখরঞ্জনকে বাধ্য হইয়াই কাজে নামিতে হইল। কাজটা তাহার মোটেই পছন্দ হইল না, এবং তা'র জন্য সমস্ত রাগটা গিয়া পড়িল তাহার স্ত্রীর উপর। বড় ভাই শ্বশুরের সুপারিশে তবু একটা চলনসই কাজ জুটাইতে পারিয়াছিলেন, তাহার শ্বশুর সেটুকু ক্ষমতাও রাখে না বলিয়া সে শ্বশুরের কন্যার উপর মর্ম্মান্তিক চটিয়া গেল।

বাড়ীর ঝি, রাঁধুনী প্রভৃতি প্রায় সবাই বিদায় গ্রহণ

করিল, এবং সকলের কাজে একলা ভর্ত্তি হইল সৌদামিনী। তাহার পাথরের মতন শরীর, ছেলেও একটা, কাজে কাজই করিতে তাহার কোনোই অসুবিধা নাই। মণ্টুর যা অযত্ন হইতে লাগিল, সেটা কেহ ধর্ত্তব্যের মধ্যে আনিল না। কয়েকমাস পরে সুখরঞ্জনের চাকরিটিও গেল, কাজেই এ-বিষয়ে কাহারও আর কোনো কথা বলিবার রহিল না।

সুখরঞ্জনের পলায়নের পর দুই-তিনটা দিন একরকম করিয়া কাটিয়া গেল। কিন্তু এরকম করিয়া ত সব দিন চলিতে পারে না! ভ্রাতা যতই উচ্ছ্বসিত ভাষায় পত্র রাখিয়া যান, তাহার খাতিরে ভবরঞ্জন বা কনকলতা চিরদিনের মতন সৌদামিনী বা মণ্টকে ঘাড়ে করিতে একেবারেই রাজী ছিলেন না। মণ্টর ঠাকুর-মা তাহাকে ছাড়িতে নারাজ, তাহার মামার বাড়ী হইতেও তাহার বিশেষ কোনো সাদর আহ্বান আসিল না। এ-ক্ষেত্রে কি যে করা উচিত, তাহা ভাবিয়া গ্রামসুদ্ধ অস্থির হইয়া উঠিল। সৌদামিনী নীরবে আপনার অভ্যস্ত কাজগুলি করিয়া যাইতে লাগিল।

বাড়ীতে হঠাৎ আবার একদিন সোরগোল বাধিয়া গেল, তবে সকালে নয়, বিকালে। পাড়া-প্রতিবাসীরও ছুটিয়া আসিতে বিলম্ব হইল না। সৌদামিনী যেন এবাড়ীর সবাইকে সব-তা'তে জ্বালাইবার জন্যই আসিয়াছিল। সে এক খ্রীষ্টান মিশনারী মেমের সঙ্গে ঘর ছাড়িয়া চলিয়াছে। এতদিনে সকলেই এক-বাক্যে স্বীকার করিল যে, এমন সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার তাহারা কেহই কখনও দেখে নাই বা শোনে নাই। স্বামী পরিত্যাগ করিয়াছে বলিয়া কি স্ত্রীলোককে এম্‌নি বাড়াই বাড়িতে হইবে? শ্বশুর বাড়ী যদি এতই অসহ্য হইয়া উঠিয়া থাকে, না হয় বাপের বাড়ীই চলিয়া যাও বাপু!

ভবরঞ্জন প্রচুর গালাগালি বর্ষণ করিলেন, তবে মিশনারী মেম এবং তাঁহার সহচর একটি অল্পবয়স্ক পাত্রী উপস্থিত থাকাতে তাহার বেশী-কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। মণ্টুর ঠাকুর মা চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং সৌদামিনী পাথরের মূর্ত্তির মতন দাঁড়াইয়া রহিল। সকলের কান্না-কাটি তর্জ্জন-গর্জ্জন যখন নিতান্ত শক্তির অভাবেই ফুরাইয়া আসিল, তখন সে শাশুড়ী, ভাসুর ও বড়-জাকে প্রণাম করিয়া পুরানো টিনের ট্রাঙ্ক ও বিছানার পুঁটুলি মেমের আনীত কুলীর মাথায় তুলিয়া দিয়া ধীরে-ধীরে বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গেল। ভবরঞ্জনের সে দিন অফিস কামাই গেল। ভাত রাঁধিবার লোকেরও অভাব ছিল, তাহা ছাড়া তাঁহার বৃদ্ধা জননী কাঁদিয়া-কাটিয়া অবস্থাটা বড়ই সঙ্গীন করিয়া তুলিলেন।

২

সেবারে শীতটা যেমন সকাল-সকাল পড়িল, তেম্‌নি তাহার প্রকোপটাও হইল অসাধারণ-রকম বেশী। রাস্তায় বাহির হইলে বাতাস যেন তীরের মতন বুক-পিঠ ফুটা করিয়া বাহির হইয়া যায়। কলিকাতার রাস্তাঘাট ত জমাট ধোঁয়ার কল্যাণে প্রায় চক্ষুর অদর্শনীয় হইয়া উঠিল।

এ-হেন শীতের সন্ধ্যায় একটি প্রৌঢ়বয়স্ক ব্যক্তি আপাদমস্তক র‍্যাপার মুড়ি দিয়া বৌবাজ্‌ ষ্ট্রীট্‌ ধরিয়া হন্‌হন্‌ করিয়া চলিয়াছিল। মুখের ভিতর তাহার দেখা যাইতেছিল কেবল একজোড়া চোখ, তাহা যেমন ঘোলাটে তেম্‌নি ক্ষুদ্র। গায়ে তাহার র‍্যাপারের তলায় ছেঁড়া সার্জ্জের কোট উঁকি মারিতেছিল। প্রৌঢ়ের পশ্চাতে একটা প্রকাণ্ড কালো ট্রাঙ্ক্‌ মাথায় করিয়া একজন কুলী চলিয়াছে। লোকটি যাইতে-যাইতে রাস্তার দুধারী বাড়ীর প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া চলিয়াছে।

একটি বাড়ীর দোতালার গাড়ী-বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া তিন-চারিটি মেয়ে গল্প করিতে-করিতে রাস্তা দেখিতে-ছিল। ইহার সম্মুখে আসিয়া লোকটি দাঁড়াইয়া পড়িল এবং চীৎকার করিয়া বলিল, "ঢাকাই কাপড় নেবেন মা? খুব ভালো-ভালো ঢাকাই কাপড় আছে।"

মেয়ে কটি ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহাকে দেখিতে লাগিল। একজন ঘরের ভিতর ছুটিয়া গেল, তা'র পর বাহিরে আসিয়া ডাকিয়া বলিল, "উপরে নিয়ে এস, একেবারে সোজা দোতলায়।"

ঢাকাই-কাপড়ওয়ালা কুলীকে লইয়া উপরে উঠিতে আরম্ভ করিল। মেয়েরা তাহার অপেক্ষায় সিঁড়ির মুখের জায়গাটায় আসিয়া দাঁড়াইল।

বাড়ীখানি বেশ বড়, বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং

ফ্যাল-ফ্যাশানে সুসজ্জিত। মেয়েগুলির বয়সও বাইশ-তেইশ হইতে আরম্ভ করিয়া তের চৌদ্দর মধ্যে, কিন্তু সিঁথিতে কাহারও সিন্দুরের চিহ্ন নাই।

দোতালায় উঠিয়া আসিয়া প্রৌঢ় লোকটি খুব ঘটা করিয়া অবনত হইয়া সকলকে নমস্কার করিল। তা'র পর ট্রাঙ্ক্ খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে একখানা ময়লা চাদর বাহির করিয়া পাতিয়া ফেলিল। বাক্সের ভিতর হইতে ক্ষিপ্রহস্তে থাক্ করিয়া সাজানো রং-বেরংএর শাড়ী বাহির করিয়া গুছাইয়া রাখিতে লাগিল।

মেয়েদের চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, মেঝের উপর উবু হইয়া বসিয়া তাহারা শাড়ী নাড়িতে-নাড়িতে মহা-উৎসাহে দরদস্তর ও আলোচনা সুরু করিয়া দিল।

"ওমা, এই বেগুনী জরিপেড়ে শাড়ীটা কি চমৎকার! তুই এটা নে বেলা, তোকে যা দেখাবে! এম্‌নিই গাড়ীর পিছনে লোক ছোটে, এটা প'রে গেলে সব চাকার তলায় শুয়ে পড়্‌বে।"

"যা, যা, বাঁদ্‌রামি কর্‌তে হবে না। তুই নে না ঐ খয়ের রংএর উপর জরির কল্কা দেওয়াটা। সেদিন সুরেশ বল্‌ছিল না, যে, পুরোনো প্যাটার্‌ন্‌-এর শাড়ীতে তোকে সবচেয়ে ভালো মানায়?"

"আচ্ছা গো আচ্ছা, তোমরা একটু মুখগুলো সাম্‌লাও ত। কাপড়ওয়ালার সাম্‌নে যত হাঁড়ির খবর বার কর্‌তে হবে না," বলিয়া তাহাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠা মেয়েটি বকিয়া উঠিল। "নেবার মতলব থাকে কাপড় বেছে নেও, নিয়ে মায়ের দরবারে হাজির হও, কপালে থাকে ত জু'টে যাবে।"

একটি মেয়ে বলিল "দিদি, তুমি কাপড় নেবে না?"

দিদি কপাল কুঞ্চিত করিয়া বলিল "বুড়ো বয়সে আর রঙীন কাপড় প'রে না" "আহা, কি তিন কালের বুড়ী গো! তবু যদি আল্‌মারি ভর্ত্তি রঙীন কাপড়ই না থাক্‌ত।" বলিয়া অন্য মেয়ে-তিনটি কাপড় বাছিতে মন দিল। একজন সেই বেগুনী শাড়ীখানি পরম আগ্রহে তুলিয়া লইল, আর দুজন ও দুখানা বেশ জম্‌কালো শাড়ী বাছিয়া লইয়া একছুটে সামনের ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। বড় মেয়েটি শাদার উপর কালো বাঘনখী ফুলতোলা একটা ব্লাউস্‌পীস্ তুলিয়া লইয়া তাহাদের পিছন-পিছন চলিল।

ঘরের ভিতর মস্তবড় জোড়া খাট, তাহার উপর শুইয়া একটি মহিলা একখানা উপন্যাস পড়িতেছিলেন, তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহারই প্রায় সমবয়স্কা একজন স্ত্রীলোক একখানা খাতা হইতে তাঁহাকে কি যেন পড়িয়া শুনাইতেছিল। মেয়েগুলিকে ছুটিয়া ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া তাহাদের মা চোখ তুলিয়া বলিলেন, "কি? আবার কাপড়! প্রত্তিমাসে নূতন কাপড় না হ'লে চলে না? কাপড়ের দোকান দিবি নাকি তোরা?"

মেয়েরা কোলাহল্ করিয়া একসঙ্গে কথা বলিতে আরম্ভ করিল। গৃহিণী বিরক্তি-মিশ্রিত হাসি হাসিয়া বলিলেন, "সদু, তোমার হিসেব রইল এখন, আগে এদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাই।"

সৌদামিনী একটু হাসিয়া খাতা হাতে করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। সম্মুখেই কাপড়ের দোকান সাজাইয়া ঢাকাই-কাপড়ওয়ালা বসিয়া আছে। তাহার দিকে চোখ পড়িবামাত্র কে যেন সৌদামিনীকে মাটিতে পুঁতিয়া দিল। সে দরজা ধরিয়া দাঁড়াইয়া গেল। ঢাকাই-কাপড়ওয়ালা মাথা নীচু করিয়া মনে-মনে কি হিসাব করিতেছিল, সে সৌদামিনীকে দেখিতে পায় নাই।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া সৌদামিনী নিঃশব্দ-পদ-সঞ্চারে সেখান হইতে সরিয়া গেল। পরক্ষণেই গৃহিণী তাঁহার বালিকা-পল্টন লইয়া বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "আর দিন সাত পরে এসো বাপু, এখন মাসকাবারের সময়; আমার হাতে টাকা নেই।"

ঢাকাইওয়ালা উচ্ছ্বসিত হইয়া বক্তৃতা করিতে লাগিল। "কাপড় আপনি রাখুন মা, টাকার জন্যে ভাবনা কি? যখন আপনার সুবিধা হবে, দেবেন। আর আজ বাড়ী চি'নে গেলাম, কতবার আস্‌ব! আমার কাছে ঢাকার শাঁখা, হাতীর দাঁতের খেল্‌না, পাথরের বাসন এসবও আছে, সব নিয়ে আস্‌ছে রবিবারে আবার আস্‌ব। আমার দোকানও আছে, এই কাছেই। এই নিন আমার কার্ড্।" গৃহিণী বলিলেন, "দোকানে আর কা'কে পাঠাবো

বাপু, তা'র চেয়ে তুমি রবিবারে এসে তোমার টাকা নিয়ে যেও। শাদা কাপড় গোটাকয়েক নিয়ে এসো, দেখ্‌ব এখন।"

মেয়েরা যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল, টাকা হাতে নাই শুনিয়া ছোট মেয়েটি ত প্রায় কাঁদিবার জোগাড় করিতেছিল। তাহার এত সাধের শ্যাওলা-রংএর কাপড়খানা বুঝি হাত ছাড়া হইয়া যায়! বাক্স বন্ধ করিয়া কাপড়-ওয়ালা চলিয়া যায়, এমন সময় সে বলিয়া উঠিল "এই রকম ব্লাউস্-পীস্ নেই?"

ঢাকাইওয়ালা বলিল, "আছে বই কি মা! তবে সেটা আমি আজ ফে'লে এসেছি, আস্‌ছে রবিবার নিয়ে আস্‌ব।"

মেয়েটি বলিল, "ওমা, তা হ'লে কি ক'রে হবে? আমার যে মঙ্গলবারে দর্‌কার! আমি ত মহম্মদকে কাল আস্‌তে ব'লে দিয়েছি।"

মা বলিলেন, "তবে ত মহা বিপদ্। সংসার রসাতলে যাবে আর কি! তোর কি আর একটাও ব্লাউস্ নেই যে অম্‌নি কাঁদ্‌বার জোগাড় কর্‌লি?"

"না, আমি এক-রকমই চাই" বলিয়া ছোট মেয়েটি প্রায় কাঁদিয়াই ফেলিল। "এই নাও, মেয়ের পান্‌সে চোখে অম্‌নি জল এসে গেল। আচ্ছা বাপু, আমি লোক পাঠাচ্ছি, কাপড়ওয়ালার সঙ্গে গিয়ে নিয়ে আসবে। দরোয়ানকে ডাক্ ত বেলা!"

বেলা রেলিংএর উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া ডাকিতে লাগিল, "দরোয়ান, দরোয়ান!"

নীচ হইতে কে যেন বলিল,"দরোয়ান ত নেই, বড়বাবু তা'কে আপিসে কি-সব কাগজ নিয়ে যেতে বলেছিলেন, সে তাই নিয়ে গিয়েছে।"

ছোট মেয়ে লীলা প্রায় নাচিতে-নাচিতে বলিল, "ওমা, তুমি মণ্টুকেই পাঠাও মা, তুমি বল্‌লে ও নিশ্চয় যাবে এইটুকু।"

মা হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা রে বাপু আচ্ছা, তোর ব্লাউস্ না হ'লে যে তুই আমার গায়ের মাংস ছিঁড়ে খাবি তা কি আর আমি জানিনে? মণ্টু, ও মণ্টু, একবার উপরে শু'নে যাও।"

কাপড়ওয়ালা কুলীকে লইয়া কয়েক সিঁড়ি নামিয়া দাঁড়াইয়াছিল। মণ্টু নাম শুনিয়া সে যেন একটুখানি আগ্রহসহকারে নীচের দিকে চাহিয়া দেখিল। পরক্ষণেই কালো কোট গায়ে দিতে-দিতে সতেরো-আঠারো বছরের একটি ছেলে উপরে উঠিয়া আসিল। তাহাকে দেখিয়া প্রৌঢ়ের ঘোলাটে চোখ অস্বাভাবিক-রকম তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল। সে বারবার করিয়া বালকের আপাদমস্তক দেখিতে লাগিল। বাঁ গালের উপর বড় একটা তিল, তাহার নীচে একটা ক্ষতচিহ্ন, এই দেখিয়া তাহার জীর্ণ বক্ষ ভেদ করিয়া একটা নিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল।

গৃহিণী বলিলেন,"মণ্টু, একটু এই কাপড়ওয়ালার সঙ্গে যেতে পার্‌বে? একটা ব্লাউস্-পীস্ ওর দোকান থেকে নিয়ে আস্‌তে হবে। বেশী দূর না।"

"নিশ্চয় পার্‌ব," বলিয়া বালক নামিতে আরম্ভ করিল। ঢাকাই-ওয়ালার অনর্গল বাক্যস্রোত কেমন করিয়া জানি না হঠাৎ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। সে নীরবে নমস্কার করিয়া নামিতে লাগিল।

মেয়েরা কাপড় লইয়া আনন্দিত ও হাস্যবিকশিত মুখে ঘরে চলিয়া গেল। তাহাদের মাও অসমাপ্ত উপন্যাসপাঠে আবার মন দিলেন।

গাড়ী-বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া সৌদামিনী একদৃষ্টে কাপড়-ওয়ালা ও মণ্টুর দিকে চাহিয়াছিল। তাহার ভাঁড়ার দেওয়া, তরকারী কোটা, সবই যে পড়িয়া আছে তাহা যেন তাহার একেবারেই মনে ছিল না!

আধ-ঘণ্টার মধ্যে কাগজে জড়ানো ব্লাউস্-পীস্ লইয়া মণ্টু ফিরিয়া আসিল। লীলা এতক্ষণ বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া হাঁ করিয়া পথের দিকে তাকাইয়া ছিল। মণ্টু আসিবা-মাত্র সে কাগজের প্যাকেটটা প্রায় তাহার হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া দৌড় দিল। মণ্টু নীচে চলিয়া গেল।

নীচে ভাঁড়ার ঘরের সাম্‌নে বসিয়া তাহার মা তরকারী কুটিতেছিল। ছেলের পায়ের শব্দে চাহিয়াও দেখিল না। বালক একটু অবাক্ হইয়া বলিল, "হ্যাঁ মা, আজ আমার জলখাবার নেই? স্কুল থেকে এসে আমি কিছু খাইনি।"

সৌদামিনী মাথা তুলিয়া বলিল "ঐ ঘরে ঢাকা-দেওয়া রয়েছে। তোর হাতে ওটা কি রে?"

"ঐ সেই কাপড়ওয়ালার কার্ড্।" বলিয়া কার্ড্খানা ফেলিয়া মণ্টু খাইতে চলিল। তাহার মা চট্ করিয়া সেটা কুড়াইয়া লইল। কার্ডে লেখা, 'শ্রী সুখেন্দু ঘোষ, ঢাকাই কাপড় ও শাঁখা বিক্রেতা।—নং বিডন ষ্ট্রীট্।'

সৌদামিনী এধার-ওধার তাকাইয়া কার্ড্খানা জামার ভিতর ঢুকাইয়া ফেলিল।

সেদিন কলেজ হইতে ফিরিয়া ইলা ও বেলা একটা অত্যন্ত দরকারী কাজে ব্যস্ত হইয়া লাগিয়া গেল। কাল তাহাদের এক গার্ডেন পার্টিতে নিমন্ত্রণ। সেখানে কি কাপড় ও গহনা পরিয়া যাইতে হইবে, তাহা এখনই ঠিক করিয়া রাখা দরকার; তাহা না হইলে যদিই বা সময়াভাবে কোথাও কিছু ত্রুটি থাকিয়া যায়! বড় বোন শীলা অনেক কষ্টে মুখের উপর একটুখানি অবজ্ঞার হাসি টানিয়া আনিয়া ছোট-বোনদের কীর্ত্তি দেখিতেছিল। এ-সবে যেন তাহার কোনোই আগ্রহ নাই! মনে-মনে অবশ্য কোন্ কাপড়ের সঙ্গে কোন্ ব্লাউস্ মানায় এবং পান্নার ধুক্‌ধুকি তাহাকে ঠিক মানাইবে কি না, তাহারই আলোচনায় সেও ব্যস্ত ছিল।

লীলা দৌড়িয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "ছোড়্দি, দেখ, ব্লাউস্‌টা কি সুন্দর করেছে মহম্মদ! যা প্যাটার্‌ন্ দিয়েছিলাম, তা'র চেয়েও ভালো হয়েছে।"

ইলা শ্যাওলা রংএর উপর জরির বুটীদার একটা ব্লাউসের দিকে তাকাইয়া বলিল "হু, ভালোই করেছে দেখ্ছি। লীলাটা বোধ হয় মহম্মদকে লুকিয়ে-লুকিয়ে ঘুষ দেয়, তা না হ'লে ওর জামা সর্ব্বদা ভালো হয়, আর আমাদের বেলা ঠিক খ'লে সেলাই ক'রে আনে কেন?"

বেলা বলিল, "এই দেখ্, দিদি, মায়ের কাছ থেকে সেই জয়পুরের পাথরের-কাজ-করা নেক্‌লেস্‌টা চেয়ে এনে দিবি? আমার কাপড় জামার উপর যে রংএর আর যে-ধরণের ফুল, সেটারও অনেকটা সেই-রকম ডিজাইন্, বেশ মানাবে একসঙ্গে পর্‌লে। এখন থেকে সব গুছিয়ে একসঙ্গে রেখে দিই, তা না হ'লে কাল তাড়াহুড়োয় আর জুটবে না।"

মনের মতন ব্লাউস্ পাইয়া লীলার মেজাজ ভালোই ছিল, সে আপত্তি না করিয়া মায়ের কাছে গহনা চাহিতে চলিল।

নেক্‌লেস্ লইয়া ফিরিয়া আসিতেও তাহার খুব বেশী বিলম্ব হইল না। পরদিন সাজসজ্জা সকলেরই মনের মতন হইল, এবং সেইজন্যই বোধ হয় গার্ডেনপার্টি তাহাদের এত ভালো লাগিল যে, বাড়ী ফিরিয়া সিঁড়ি দিয়া উঠিবারও তাহাদের তর সহিল না। সন্ধ্যা-বেলাটা তাহাদের মা প্রায়ই ভাঁড়ার-ঘরে দাঁড়াইয়া সৌদামিনী'র সহিত দৈনিক খরচের হিসাব-নিকাশ করিতেন। ইলা, বেলা ও লীলা নিজেদের উচ্ছ্বসিত আনন্দের ভাগ তাঁহাকে খানিকটা দিবার জন্য সেইদিকে ছুটিল। শীলা নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। মায়ের কানের গোড়ায় আশা মিটাইয়া আবোল-তাবোল বকিয়া তিন বোন একটু পরে উপরে উঠিয়া আসিল। তা'র পর সকলে ধীরে-সুস্থে উৎসববেশ ত্যাগ করিয়া সেগুলি গুছাইয়া রাখিতে লাগিল।

বেলা নেক্‌লেস্ খুলিতে-খুলিতে বলিল, "বাবা! মিসেস্ মুখার্জ্জি যা চমৎকার সেজে আজ গিয়েছিলেন! এমন sight আমি সাত জন্মে যদি দেখেছি। গোলাপী ব্লাউস্ 'নেভি ব্লু' শাড়ী আর লাল পাথর-বসানো গহনা! ঐ দুধে-আল্‌তা রংএর উপর যা মানিয়েছিল!"

এমন সময় দরজার কাছ হইতে কে বলিল, "মা ঘরে রয়েছেন কি? সেই ধুতি আর চাদর নিয়ে এসেছি।"

লীলা গিয়া দরজার পর্দা তুলিয়া ধরিল। সুখেন্দু-ঢাকাইওয়ালা গোটা-কতক কাপড় হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বেলা তাড়াতাড়ি নেক্‌লেস্‌টা বালিশের তলায় গুঁজিয়া সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল। লীলা বলিল, "মা ত নীচে রয়েছেন, আচ্ছা দাঁড়াও তাঁকে খবর দিচ্ছি..."

গৃহিণী এই সময় নিজেই উপরে উঠিয়া আসিলেন, তাঁহার পিছন-পিছন কয়েকখানা বাঁধানো খাতা বহন করিয়া আসিল মণ্টু। স্বজাতির পরিধেয় জিনিষ দেখিয়া সেও সেখানে দাঁড়াইয়া গেল।

কাপড় দেখিতে-দেখিতে গৃহিণী বলিলেন, "পরশু

একজোড়া ধুতি-চাদরের হঠাৎ দর্‌কার হ'ল, তা একটা যদি মানুষ ঘরে ছিল যে তোমার কাছে পাঠাবো। শেষে সাম্‌নের ঐ দোকানটা থেকে যা-তা কি'নে কাজ সার্‌লাম।"

সুখেন্দু বলিল, "আমিও আস্‌ছে মাসের গোড়ার থেকে এই বাইশ নম্বরে দোকান উঠিয়ে আন্‌ছি মা। তখন যখন ডাক্‌বেন তখনই আস্‌তে পার্‌ব।"

সেদিনকার সভাটা বেশীক্ষণ জমিবার সুবিধা হইল না। অল্পক্ষণের মধ্যেই যে যাহার কাজে চলিয়া গেল। তবে আশা রহিল যে কাল আর একপালা বসিতে পারে, কারণ টাকা লইবার জন্য গৃহিণী তা'র পরদিন কাপড়-ওয়ালাকে আসিতে বলিয়া দিলেন। সুখেন্দুর জানা ছিল যে, এ বাড়ীর মেয়ে-কটির কল্যাণে কাপড় আনিলে কখনও কিছু বিক্রয় না করিয়া ফিরিতে হয় না, সুতরাং কাপড়ের পুঁটুলি-বিহীন অবস্থায় তাহাকে কখনও এবাড়ীর চৌকাঠ মাড়াইতে দেখা যাইত না।

ভোর রাত্রে ঘুমাইতে-ঘুমাইতে লীলা স্বপ্ন দেখিতেছিল যে, মিসেস্ মুখার্জ্জি তাহাকে গোলাপী ব্লাউসের সহিত ঘন নীল শাড়ী পরাইতে চেষ্টা করিতেছেন এবং সে তাঁহার হাত এড়াইবার জন্য ঘরময় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। এমন সময় কার এক প্রচণ্ড ধাক্কায় তাহার স্বপ্নলোকের দৌড় মাঝ-পথেই থামিয়া গেল। বেলা তাহাকে ঠেলা মারিতে-মারিতে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন-কণ্ঠে বলিতেছিল, "হ্যাঁরে লিলি, মায়ের সেই নেক্‌লেস্‌টা কি তুই কাল তাঁকে দিয়ে এসেছিলি?"

লীলার স্বপ্নের ঘোর একেবারেই কাটিয়া গেল, সে উঠিয়া বসিয়া ভয়জড়িত-কণ্ঠে বলিল, "কই না, তুমি ত আমাকে দিয়ে আস্‌তে বলোনি?"

চার বোন একেবারে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। লীলা বকিতে আরম্ভ করিল, ইলা সব-ক'টা বালিশ ওলট্‌-পালট্ করিয়া খুঁজিতে লাগিল, বেলা ভয়ে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল এবং লীলা কাঁদিয়াই ফেলিল।

সমস্ত ঘর তন্ন-তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও যখন নেক্‌লেসের কোনো চিহ্ন পাওয়া গেল না, তখন অত্যন্ত কাতরমুখ করিয়া চার বোনে মায়ের শয়ন-কক্ষের দিকে চলিল।

বাড়ীতে শীঘ্রই সোরগোল বাধিয়া গেল। গহনাটি শুধু যে বহুমূল্য তাহা নহে, গৃহিণী বিবাহের সময় উহা তাঁহার ভাবী পতির নিকট উপহার পাইয়াছিলেন, সেই জন্য নেক্‌লেস্‌টি তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। বেলা ত বকুনি খাইয়া কাঁদিতে বসিল, অন্য মেয়েরা, সৌদামিনী ও গৃহিণী স্বয়ং বাড়ীময় জিনিষটির খোঁজ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

কোথাও যখন অলঙ্কারখানির সন্ধান মিলিল না, তখন গৃহ-স্বামী পুলিশের শরণাপন্ন হওয়াই স্থির করিলেন। বাড়ীর চাকর-বাকর ত ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল, পলাইবার উপায় থাকিলে বোধ হয় সকলে এক-চোটে দৌড় মারিত।

সুখেন্দু-কাপড়ওয়ালা ঠিক এই সময় কাপড়ের বাক্স লইয়া আসিয়া হাজির। সদা শান্তিময় হাস্য-কোলাহল-মুখরিত বাড়ীর এমন অবস্থা দেখিয়া সে ত ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া দাঁড়াইয়া গেল। বাড়ীর লোকগুলির মুখ ভার, চাকর-বাকর ভয়ে আধ-মরা, ব্যাপারখানা কি?

পুলিশ আসিয়া পৌঁছিল, এবং ব্যাপার জানিতে তাহারও বেশী দেরী হইল না। প্রথমেই দোতলার সব-ক'টি ঘর পুলিশের লোকে আবার ভালো করিয়া খুঁজিতে আরম্ভ করিল।

বাড়ী হইতে এখন কাহারও বাহিরে যাওয়া নিষেধ, কাজেই কাপড়ের পোঁট্‌লা লইয়া বসিয়া-বসিয়া সুখেন্দু চারিদিকের ব্যাপার দেখিতে লাগিল।

দেখিবার জিনিষের অভাব ছিল না। এইসময় কার্য্যোপলক্ষ্যে সৌদামিনী উপরে আসাতে দুজনের চোখো-চোখি হইয়া গেল। সুখেন্দুর মনে মন্টুকে প্রথম দেখিয়াই যে সন্দেহ হইয়াছিল, তাহা বালকের সঙ্গে কয়েকবার কথা বলিয়া একরকম দৃঢ় বিশ্বাসেই পরিণত হইয়াছিল। সৌদামিনীকে দেখিয়া আর তাহার মনে সন্দেহের লেশমাত্র রহিল না। কি একটা বলিবার দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছায় তাহার ঠোঁট-দুটা নড়িয়া উঠিল, কিন্তু তাহার মুখের দিকে অপরিসীম ঘৃণাভরে একবার তাকাইয়াই সৌদামিনী সেখান হইতে চলিয়া গেল। প্রৌঢ়ের ম্লান মুখের উপর অন্ধকার আরো যেন ঘন হইয়া

উঠিল, সে মাথা নীচু করিয়া যেমন বসিয়াছিল, তেমনি বসিয়াই রহিল।

একটা কিসের শব্দে সে মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, মণ্টু দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার মুখ ছাইয়ের মতন, চোখ দিয়া যেন ভয় ঠিক্‌রাইয়া বাহির হইতেছে। সুখেন্দুকে তাহার দিকে চাহিতে দেখিয়াই সে চোখ নামাইয়া ফেলিল।

গৃহিণী দু-জনের দিকে তাকাইয়াই তিক্তকণ্ঠে বলিলেন, "নীচে গিয়ে বোসো এখন, চারিদিকে জিনিষপত্রের ছড়াছড়ি, এর ভিতর দাঁড়িয়ে কাজ নেই।" গহনা হারাইয়া তাঁহার মেজাজ একান্তই খারাপ হইয়া গিয়াছিল।

সুখেন্দু ও মণ্টু নীচে নামিয়া আসিল। মণ্টুকে অত্যন্ত অধীর দেখিয়া সুখেন্দু বলিল, "তুমি অত ভয় খাচ্ছ কেন বাবু? পুলিশ এসেছে ব'লেই ত আর যে-যেখানে আছে, সবাইকে গ্রেপ্তার করছে না?"

মণ্টু কথা না বলিয়া অস্থিরভাবে একবার নিজেদের ঘরে ঢুকিতে লাগিল, একবার বারাণ্ডায় বাহির হইতে লাগিল।

উপরতলা খোঁজা শেষ করিয়া পুলিশ নীচে নামিল। রান্নাঘর, ভাঁড়ার, চাকর-দরোয়ানের ঘরে খানাতল্লাসি সুরু হইল।

মণ্টু হঠাৎ কাঁদিয়া বলিয়া উঠিল, "সুখেন্দু-বাবু, কি হবে?"

মণ্টুর প্রতি মমতা জন্মিবার সুখেন্দুর যথেষ্টই কারণ ছিল। সুখেন্দু-সম্বন্ধে কোনোপ্রকার আকর্ষণ জন্মিবার স্বাভাবিক কোনো কারণ যদিও মণ্টুর জানা ছিল না, তবু এই মাস-দুই-এর আলাপেই প্রাণপণ চেষ্টায় প্রৌঢ় তাহাকে অনেকখানিই আপনার করিয়া লইয়াছিল। বায়োস্কোপ, সার্কাস দেখাও অনেক দিন ইহার কল্যাণে এরি মধ্যে ঘটিয়া গিয়াছে। মায়ের আত্মসম্মান বোধটা উত্তরাধিকার-সূত্রে মণ্টুর জুটিয়া ওঠে নাই, যেখানে যা পাওয়া যায়, তাহা পাইতে তাহার কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না।

পুত্রের ভয়কাতর মুখের দিকে চাহিয়া সুখেন্দুর মন মমতায় ভরিয়া গেল। কিন্তু এতখানি ভয়ের কারণ বুঝিতে না পারিয়া সে একটু বিস্মিতও হইল। বলিল, "কি আবার হবে? কিছু হবে না।"

মণ্টু ফিশ্‌ফিশ্‌ করিয়া বলিল, "এ-ঘরে এলেই তা'রা সব জান্‌তে পার্‌বে।"

সুখেন্দু স্তব্ধ হইয়া গেল। খানিক পরে বলিল, "তুমি ভদ্রলোকের ছেলে হ'য়ে এমন্‌ কাজ কেন কর্‌লে, বাবু?"

মণ্টু কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিল, "মা আমাকে একটা পয়সা হাতে দেয় না। ক্লাসের ছেলেদের কাছে আমার মুখ থাকে না। ধার ক'রে-ক'রে তাদের রেস্তরাঁতে খাওয়াই, বায়োস্কোপে নিয়ে যাই। সে-সব টাকা কোথা থেকে দেবো?"

সুখেন্দু দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মনে-মনে বলিল, "আমার ছেলে ত! পিতৃরক্ত যাবে কোথায়?"

মণ্টু ভয়ে পাগলের মতন হইয়া বলিতে লাগিল, "কি হবে? আমি পুলিশের মার খেতে পার্‌ব না। কি কর্‌ব বলুন? শীলাদিদের সাম্‌নে চোর হ'য়ে দাঁড়াতে পার্‌ব না, তা'র চেয়ে আমি বিষ খেয়ে মর্‌ব।"

সুখেন্দু তাহার হাত চাপিয়া ধরিল। বলিল, "তোমায় কিছু কর্‌তে হবে না মণ্টু। ওদের এদিকে আস্‌তে এখনও দু-চার মিনিট দেরি আছে। তুমি নেক্‌লেস বার ক'রে আমাকে দাও।"

পাশের একটা দরজা খট্‌ করিয়া খুলিয়া গেল। সৌদামিনী বাহির হইয়া আসিল। তাহার মুখ তাহার কাপড়েরই মতন শাদা, কেবল দুই চোখ লাল, রোদনস্ফীত।

মণ্টুর দিকে ফিরিয়া সে বলিল, "মণ্টু, গহনা আমার কাছে এনে দে।"

মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া ছেলের আর কথা বলিবার সাহসে কুলাইল না। সে ঘরে গিয়া ঢুকিল।

সৌদামিনী সুখেন্দুর দিকে ফিরিয়া বলিল, "ছেলেকে এতদিন আমিই বাঁচিয়েছি, আজ তোমার দর্‌কার হবে না।"

মণ্টু নেক্‌লেস আনিয়া মায়ের হাতে দিল। সুখেন্দু মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া পড়িল।

অল্পক্ষণ পরেই একটা যা-তা বলিয়া পুলিশ বিদায় করিয়া দেওয়া হইল।

গৃহিণী বলিলেন, "মানুষকে আর এ-জন্মে বিশ্বাস করব না। তুমি বাছা মেয়েমানুষ, কি আর করব, তোমাকে পুলিশে দিতে পারিনে। এতদিনের বিশ্বাস তুমি এম্‌নি ক'রে রাখ্‌লে? আজই তুমি আমার বাড়ী থেকে বিদায় হও।"

অনেককাল আগে যে ভাঙা বাক্স লইয়া সৌদামিনী এ-বাড়ীতে ঢুকিয়াছিল, তাহাই লইয়া পুত্রের হাত ধরিয়া সে বাহির হইয়া আসিল।

ফুটপাথের উপর সুখেন্দু দাঁড়াইয়াছিল, তাহার দিকে জলন্ত চোখে চাহিয়া সে আপন মনে চলিতে লাগিল। মুখে তাহার একটা অদ্ভুত হাসি একবার দেখা দিয়া মিলাইয়া গেল।

সাঁওতালদের গ্রামে

শ্রী প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়

আজ প্রায় ২৫।২৬ বৎসরের কথা, তখন আমি সাঁওতাল পরগণায় স্কুল-পরিদর্শনের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম। একবার গড্ডা মহকুমায় যাইবার আদেশ হইল। ডেপুটি কমিশনার সাহেব সেখানে যাইবেন! যাঁহারা জেলার পরিদর্শন-কার্য্যে নিযুক্ত আছেন তাঁহাদের সকলকেই সেখানে যাইতে হইবে।

ফাল্গুন কি চৈত্র মাস। সন্ধ্যার পর খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া দুম্‌কা হইতে গো-শকটে উঠিলাম। গোশকটটি আমার মনোমত করিয়া প্রস্তুত করাইয়াছিলাম। শকটের উপরে একটি বৃহদাকার পাল্কী, তাহার তলায় দুইদিকে দুইটি বাক্স। একটিতে চাল ডাল আলু ঘী তেল ইত্যাদি রাখিতাম, অপরটিতে রন্ধনের উপকরণ বাসন ইত্যাদি থাকিত। চাল ডাল সঙ্গে না থাকিলে মফস্বলে বড়ই কষ্ট ভোগ করিতে হইত। এইজন্য সঙ্গে রসদ না লইয়া বাহির হইতাম না।

জ্যোৎস্নালোকে পথ ঘাট বন উপবন আলোকিত। শালবনের উপর দিয়া জ্যোৎস্নার ঢেউ খেলিতেছে; ছোট-ছোট পাহাড়গুলি নীরবে চন্দ্র-কিরণ উপভোগ করিতেছে। আমার শকট মন্থরগতিতে চলিয়াছে, দুই ধারে নিবিড় শাল-জঙ্গল, তাহার মধ্য হইতে সাঁওতাল-রমণীদের নৃত্য-গীতের ধ্বনি, মাদলের শব্দ শোনা যাইতেছিল—সেই গান শুনিতে-শুনিতে আমি নিদ্রিত হইলাম। সেই রাত্রের মধ্যে প্রায় ২০ মাইল রাস্তা অতিক্রম করিলাম। সকালে একটি বাঙ্গালায় থাকিবার কথা ছিল, কিন্তু সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখি, দুইটি ইংরেজ বাঙ্গালার দুইটি কামরা অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন, বাঙ্গলায় আর স্থান নাই। আমার চাপ্‌রাসী পাঠককে বলিলাম—"পাঠক এখন কি করা যায়, মধ্যাহ্ন ভোজন কোথায় হইবে?" পাঠক বলিল, "বাবু নিকটে একটি সাঁওতালের গ্রাম আছে—সেখানে একটি পাঠশালাও আছে, যদি বলেন সেইখানে গিয়া রসুই করি, আপনার পাঠশালা দেখাও হইবে।" আমি বলিলাম, "আমি তাহাই চাই! বেশ কথা, সাঁওতালের গ্রামেই চল, সেখানে যাহা হয় করা যাইবে।" পাঠক-চাপরাসী আমার আগেই সেই গ্রামে চলিয়া গেল—আমি একটি বাঁধের ধারে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া পুনরায় শকটে আরোহণ করিলাম ও সাঁওতালদের গ্রামে যাইবার জন্য উৎসুক হইলাম। দুম্‌কায় অনেক সাঁওতালের সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম বটে, কিন্তু তাহারা সহরের নিকটে থাকায় তাহাদের মধ্যে সভ্যতা ও কৃত্রিমতা প্রবেশ করিয়াছে—সেইজন্য তাহাদের আচার-ব্যবহার ভাল নয়। সেখানকার সাঁওতাল রমণীদের চরিত্র-সম্বন্ধে বিশেষ পরিচয় দিতে ইচ্ছা নাই, দিতে কুণ্ঠিত বোধও করিতেছি।

এইজন্য জঙ্গলের মধ্যে সহরের অতিদূরে খাঁটি অকৃত্রিম সাঁওতাল দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলাম।

ধীরে-ধীরে গো-শকট সাঁওতালদের গ্রামের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। গাড়ী হইতে দেখিলাম গ্রামের বহির্ভাগে গ্রাম্য রাস্তার দুই ধারে কতকগুলি সাঁওতাল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে—তাহাদের মধ্যে যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ছোটছোট ছেলে-মেয়ে নির্ব্বাক্ নিঃস্পন্দ হইয়া আমার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। সে-গ্রামে কখনও ডেপুটি ইনেস্‌পেক্টারের শুভাগমন হয় নাই—সুতরাং অদ্য তাহাদের পক্ষে একটা বিশেষ ঘটনা। স্কুলের বড়-বাবু কি-প্রকারের জীব তাহা তাহারা দেখিতে আসিয়াছে—গ্রাম হইতে প্রায় ৮।১০ টা কুকুরও তাহাদের নিকট দাঁড়াইয়া আছে।

আমি তাহাদিগকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি গাড়ী হইতে নামিলাম ও কি-প্রকারে তাহাদের সম্ভাষণ করিব ভাবিতে লাগিলাম—একটা বুদ্ধি চট্ করিয়া জোগাইল। আমার তখন নস্য লওয়া অভ্যাস ছিল (এখনও আছে)। নস্যের ডিবেটা বাহির করিলাম এবং সকলকে বলিলাম, 'হাত পাত।' নিজে হস্ত প্রসারণ করিয়া দেখাইয়া দিলাম। কিছু-মাত্র দ্বিধা না করিয়া গম্ভীরভাবে তাহারা হাত পাতিল। আমি একটু-একটু নস্য লইয়া সকলের হাতে দিলাম (অবশ্য ছোট ছেলেমেয়েদিগকে রেহাই দিয়াছিলাম)। তাহারা নস্য লইয়া কি করিবে তাহা জানিত না, আমি তাহাদের সম্মুখে একটু নস্য লইলাম এবং বলিলাম 'এই-রকম কর'। তাহারা দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহাই করিল—তাহার পর যাহা হইল তাহা বর্ণনা করা আমার পক্ষে অসাধ্য। হাঁচির সঙ্গে-সঙ্গে হাসির ফোয়ারা খুলিল—এমন মুখভরা হাসি কখনও শুনি নাই। হাঁচি, হাসি, চক্ষে জল, নাসিকার জল, ইহাদের একত্র সমাবেশে দৃশ্যটি বড়ই অদ্ভুত-রকমের হইয়াছিল। মেশিন কামানে যেমন শত্রুপক্ষ ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়—তেম্‌নি দুএক কণা নস্যের প্রভাবে সাঁওতালদের দল ভাঙিয়া গেল—হাসিতে-হাসিতে এ উহার গায়ে পড়ে, এ উহার গলা জড়াইয়া ধরে, এ মাটিতে গড়াগড়ি দেয়…কোথায় তাহাদের গাম্ভীর্য্য অন্তর্দ্ধান করিল। কুকুরগুলাও বেগতিক দেখিয়া চীৎকার আরম্ভ করিল, গ্রাম হইতে যাহারা গৃহকার্য্যে ব্যস্ত ছিল তাহারা উৰ্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিল ও ব্যাপারটি কি দেখিয়া-শুনিয়া তাহারাও সেই কোলাহলে যোগদান করিল। আমার কার্য্য সমাধা করিয়া আমি পদব্রজে স্কুলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম, তাহারাও পশ্চাতে কিয়দ্দূর আমার অনুসরণ করিল—পরে হাসিতে-হাসিতে আপন আপন ঘরে ফিরিয়া গেল, তাহারা বুঝিল যে স্কুলের ডেপুটি একটি অদ্ভুত জীব নয় তাহাদেরই মতন মানুষ।

স্কুলগৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, আমার চাপ্‌রাসী রন্ধনের উদ্যোগ করিতেছে। ঘরটি বেশ পরিষ্কৃত হইয়াছে ঘরের এক কোণে উনান কাটা হইয়াছে—মধ্য স্থলে একটি কম্বল বিছান হইয়াছে। আমি সেই কম্বলে বসিলাম। স্কুল-গৃহটির নিম্নদেশ দিয়া একটি ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত—স্থানটি বেশ নির্জ্জন, অদূরে নদীর ওপারে শালজঙ্গল—তাহাতে কৃষ্ণকায় সাঁওতাল বালকেরা গরু-মহিষ চরাইতেছে ও বাঁশী বাজাইতেছে। তাহাদের পরিধানে একটি করিয়া কৌপীন—দৃশ্যটি বড়ই ভাল লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে দেখিলাম, দুই-একজন সাঁওতাল আমার নিকট আসিতেছে—তাহাদের মধ্যে একজন গ্রামের 'প্রধান' নিকটে আসিয়া বলিল, "বাবু তোকে কিছু খেতে দিব, লিবি ত?" সাঁওতাল আমাকে কি খাইতে দিবে? ভাবিলাম ভুট্টা, জুনার ভিঙ্‌লা—এই দু-চারটা আমাকে উপহার দিবে, আমি বলিলাম, "খাব বই কি। কি খেতে দেবে··নিয়ে এস"—তাহারা খুব খুসী হইয়া ফিরিয়া গেল—আমি ভুট্টা জুনারের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। আমার পাঠক-ঠাকুর তখন হাঁড়ি চাপাইয়া দিয়াছে।

পনর মিনিটের মধ্যে একদল সাঁওতাল-বালক আসিতেছে দেখিলাম। পশ্চাতে 'প্রধান,' তাহাদের সকলের হাতেই কিছু-না-কিছু জিনিষ আছে—প্রথম বালকটি রন্ধন-কাঠের বোঝা মাথায় করিয়া আনিতেছে, দ্বিতীয়টি দুইটি পায়রা ছানা ও ৪টি মাগুর মাছ। তাহার পশ্চাতে একটি ডালায় সরু চাল ও অরহরের ডাল—তাহার পশ্চাতে ময়দা ঘী ও উৎকৃষ্ট গুড়। তাহার পশ্চাতে গৃহজাত তরি-তরকারী। তাহার পশ্চাতে দধি ও দুগ্ধ। তাহার

পশ্চাতে আর-কি, মনে নাই। তাহারা একে-একে সমস্ত জিনিষগুলি আমার সম্মুখে রাখিয়া দিল। আমি ত দেখিয়াই অবাক্। প্রধান-মহাশয়কে বলিলাম, 'আমি এত জিনিস লইয়া কি করিব? আমি ত একবেলা খাইব?'

প্রধান উত্তর দিল—"তুই আস্‌বি তা ত আমরা জান্‌তাম না—যা সামান্য জিনিস্ পেলম্ তাই দিয়েছি—এগুলি সব তোকে লিতেই হবে।"

আমার একটু রাগ হইল, বলিলাম, "তুমি ত বেশ মজার লোক হে, সামান্য জিনিষ বলিয়া এক গাড়ী জিনিষ আনিয়াছ। আমার এত দরকার নাই। তুমি নিয়ে যাও। আর যদি আমাকে নিতে হয়, তবে দাম নাও!"

সাঁওতাল বলিল, "দাম যদি দিবি তবে আগে গলায় ছুরি দে।"

এইসময় পাঠক আমাকে ডাকিয়া বলিল, "বাবু একবার উঠিয়া আসুন ত"—আমি তাহার নিকট উঠিয়া গিয়া বলিলাম, "কি"—পাঠক বলিল, "বাবু উহাদিগকে দাম-টামের কথা কথা বলিবেন না—তাহাতে উহারা অতিশয় অসন্তুষ্ট হয় ও অপমান বোধ করে, আপনি জিনিষগুলি লউন। উহাদের গ্রামে ভদ্রলোক আসিলে উহারা ঐ-প্রকারই করিয়া থাকে—আর ঐ প্রধানটি গ্রামের মধ্যে বড় লোক। আপনি আর-কিছুবলিবেন না।"

আমিও বুঝিলাম যে উহাদিগকে চটাইয়া লাভ নাই। অগত্যা প্রধানকে বলিলাম—"আচ্ছা, তোমাদের জিনিষগুলি লইলাম।" এই বলিয়া প্রথমতঃ পায়রা ছানাগুলির বন্ধন দশা মুক্ত করিয়া বাহিরে আসিয়া উড়াইয়া দিলাম আর বলিলাম, "আমি মাংস খাই না"—পাখীগুলি উড়িয়া গেল। তাহার পর প্রধানকে বলিলাম, "তোমাদের স্কুল দেখিয়া আসি চল।" অন্য পাঠশালা-গৃহটি আমাকে ছাড়িয়া দিয়া প্রধান আপনার আটচালাতেই পাঠশালা বসাইয়াছিল।

পাঠশালায় গিয়া সাঁওতাল-বালকদের সহিত দেখা করিলাম—কতকগুলি বালক আমার ভয়ে জঙ্গলে পলাইয়া গিয়াছিল—১০।১৫ জন মোটে উপস্থিত ছিল—তাহারাও ভয়ে জড়সড়। কি করি তাহাদের ভয় ভাঙাইতে হইল—সকলকে বাহিরে আসিতে বলিলাম। একটা হাঁড়ি জোগাড় করিয়া আনা হইল—হাঁড়িটি কিছু দূরে রাখা হইল—একটি ছেলের চোখ বাঁধিয়া দিয়া হাতে একটি শালের লাঠি দিয়া বলিলাম, "ঐ হাঁড়িটিকে ভাঙিতে হইবে, যে পারিবে সে একটি লাল-নীল পেন্সিল প্রাইজ পাইবে।"

এই বলিয়া ছেলেটিকে একবার ঘুরাইয়া দিয়া বলিলাম, "যাও হাঁড়িটিকে ভাঙিয়া এস।" সে বেচারি ঘুরপাক খাইয়া পূর্ব্বদিকে দিকে না গিয়া দক্ষিণ দিকে হাঁড়ি ভাঙিতে গেল ও খানিক দূর গিয়া হাঁড়ি নিকটে আছে ভাবিয়া মাটিতে লাঠি মারিল। আর চারি দিকে হাসির লহরী উঠিল। তাহার চোখ খুলিয়া দেওয়া হইল, আর-একজনকে ঐরকম পাঠানো হইল। সে উত্তর দিকে গেল ও মাটিতে লাঠি মারিল। এই-প্রকার ৫।৭টি ছেলে অকৃতকার্য্য হওয়ার পর একটা দুষ্ট ছেলে কোন-গতিকে বোধ হয় চোখের কাপড়টিকে একটু আল্‌গা করিয়া চারিদিক্ ভাল করিয়া দেখিল, এবং হাঁড়িটির দিক্ ঠিক করিয়া লইয়া সেই-দিকে গিয়া হাঁড়িটিকে ভাঙিয়া ফেলিল ও প্রাইজ পাইল। বলা বাহুল্য, এই সময় গ্রামের সমস্ত পুরুষ, রমণী আমাদের চারি ধারে দাঁড়াইয়াছিল ও তাহদের হাস্য ধ্বনিতে চারিদিক্ মুখরিত হইতেছিল। সাঁওতাল রমণীদের (বিশেষতঃ অল্পবয়স্কাদের) হাসি একটা শুনিবার জিনিষ, ইহার তুলনা নাই। তাহাদের চোখের চাহনিটিও দেখিবার জিনিষ। সে চাহনির মধ্যে কোন-প্রকার হাবভাবের লেশমাত্র নাই। ইংরেজীতে "sexless stare of infancy" পড়িয়াছিলাম। এই দৃষ্টি সেইপ্রকার সরল স্বচ্ছ ও কপটতাশূন্য, সেইজন্য এতই মধুর—রমণীদের চুলের পারিপাট্যটা কিছু বেশী, আর তাহাদের নিকট ফুলের আদরটা আরও বেশী। প্রত্যেক যুবতীর খোঁপায় ও কানে ফুল দেখিলাম। প্রত্যেকের চুলগুলি তৈলসিক্ত ও সুচিক্কণ। প্রত্যেকের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুকোমল অথচ বলিষ্ঠ। তাহদের নিকট আর-একবার নস্যের ডিবাটা বাহির করিয়া নস্য দিতে চাহিলাম, কিন্তু সে-বার তাহারা হাসিয়া ছুটিয়া পলাইল।

তাহার পর বালকদের পরীক্ষা লইলাম। তখন

তাহাদের ভয় ভাঙিয়াছে—বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত পুস্তক তাহারা পড়ে—আবার ইংরেজী হরফে লিখিত সাঁওতালি-ভাষাও কোথাও-কোথাও শিক্ষা দেওয়া হয়। মিশনরী সাহেবেরা সাঁওতালি-পুস্তক লিখিয়াছেন ও সাঁওতালি-ব্যাকরণ রচনা করিয়াছেন—ব্যাকরণটি গ্রীক্ কি সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণের অপেক্ষাও শক্ত। যাহা হউক, তাহাদিগকে একটু পড়াইয়া, একটু লিখাইয়া দুচারিটি মানসাঙ্ক জিজ্ঞাসা করিয়া ছুটি দিলাম ও এক দিনের জন্য স্কুল বন্ধ দিতে বলিলাম। তাহাতে তাহাদের খুব আনন্দ। পাঠশালা দেখিয়া যখন ফিরিলাম তখন প্রায় ১২টা বাজিয়াছে। তাহার পর নদীর জলে স্নান করিয়া আহারে বসিলাম। এ-প্রকার মধ্যাহ্ন-ভোজন প্রায়ই ঘটে না—মাগুর-মাছের ঝোল, অরহরের ডাল, সুগন্ধি চালের অন্ন, দু-তিনটা ভাজা, ডালনা, দধি ও দুগ্ধ—পাকও অতি সুন্দর হইয়াছিল—আহারও প্রচুর-পরিমাণে হইল। সাঁওতালের গ্রামে যে বিধাতা এরূপ আহার জোগাইবেন তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া সাঁওতালদের নিকট বিদায় লইয়া আবার গো-শকটে উঠিলাম—পিছনে-পিছনে সাঁওতাল পুরুষ, রমণী ও ছেলের দল অনেক দূর পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে গিয়াছিল। শেষে তাহাদিগকে অনেক কষ্টে বিদায় দিলাম। তাহাদের সেই অকপট সরল ব্যবহারে আমি যে মুগ্ধ হইয়াছিলাম, সে-কথা বলাই বাহুল্য। তাহারা যেন আমার কত আপনার লোক, কতকালের পরিচিত বন্ধু। তাহাদের সেই নীরব আদর-অভ্যর্থনা আমার চিরকাল মনে থাকিবে। সভ্যতার শুষ্ক হাসি ও অভ্যর্থনা ইহার তুলনায় অতি তুচ্ছ।

সেকালের সংস্কৃত কলেজ

শ্রী হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন

(১)

একদিন (অর্থাৎ ১৩ই বৈশাখ, সন ১৩৩২ সাল ; বা ২৬ শে এপ্রিল, ১৯২৫ ইং সন) আমার প্রেসিডেন্সী কলেজের বন্ধু জগদ্বিখ্যাত শ্রীযুক্ত সার্ জগদীশচন্দ্র বসু-মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম। সাদর-সংবর্দ্ধনার পর তিনি কহিলেন—"কবিরত্ন! আপনার বয়স কত হইয়াছে?" আমি উত্তর দিলাম, "৮২ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছি"। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"ডাক্তার, আপনার এখন বয়স কত?" তিনি কহিলেন—"৬৫ বৎসর"। পরে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার স্বাস্থ্য কিরূপ?" আমি কহিলাম, "স্বাস্থ্য নিতান্ত মন্দ নহে, তবে চক্ষু একটু নিস্তেজ হইয়াছে।" আমি তাঁহাকে তাঁহার স্বাস্থ্যের বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে তিনি কহিলেন,—"আমার স্বাস্থ্য বেশ আছে। আমি মাংস ত্যাগ করিয়াছি, মাছের ঝোল ভাত খাই। রাত্রিতে যৎসামান্য আহার করি—ভাত নহে।" তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি রাত্রিতে কি আহার করেন?"—আমি কহিলাম,—"আমি প্রায় ৬০ বৎসর রাত্রিতে সাগুর মণ্ড বা বার্লির মণ্ড আহার করিয়া আসিতেছি।" তাঁহাকে উপহার দিবার জন্য আমি দুখানি পুস্তক লইয়া গিয়াছিলাম। ১ম, A Book on Translation, ২য় খানি, "অর্জ্জুন-বিজয়"। এই দুইখানি তাঁহাকে দিয়া আমি বলিলাম, "ডাক্তার! আমি পেন্‌সন্ লইয়া এই দুইখানি পুস্তক লিখিয়াছি। প্রায় বাইশ বৎসর হইল আমি পেন্‌সন্ ভোগ করিতেছি।" ইহা শুনিয়া ডাক্তার বলিলেন, "আপনি প্রাচীন কালের স্মৃতি-সূচক বিষয় লিপিবদ্ধ করুন।" আমি বলিলাম, "তাহা কি লোকে পড়িবে?" তাহাতে তিনি কহিলেন, ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বে সংস্কৃত কলেজের যেরূপ অবস্থা ছিল, প্রেসিডেন্সী কলেজের যেরূপ অবস্থা ছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের যেরূপ

অবস্থা ছিল, কলিকাতা নগরীর যেরূপ অবস্থা ছিল, বালক-বালিকাদিগের অবস্থা যেরূপ ছিল—ইত্যাদি প্রাচীন বিষয় শুনিতে লোকে—আমার বিশ্বাস—আগ্রহ করিবে।” আমি বলিলাম,—“আচ্ছা চেষ্টা করিব।”

এক্ষণে প্রথমতঃ সংস্কৃত কলেজের পূর্ব্বতন অবস্থা লিখিতেছি।—সন ১২৪৯ সালের ১৫ই চৈত্র আমার জন্ম হয়। আমার জন্মভূমি ২৪ পরগণার অন্তর্গত রাজপুর গ্রামে। পিতা ৺গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় আমাকে অষ্টমবর্ষে (গর্ভ হইতে) উপনীত করিয়া কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট করিয়া দেন। তখন কোনো ছাত্রকেই ছাত্র-বেতন দিতে হইত না। প্রবেশ বেতনও দিতে হইত না। আমার ৺পিতৃদেব যখন কলেজে পাঠ করিতেন, তখন ছাত্র-বেতন দেওয়া দূরে থাক, প্রতিমাসে পাঁচ টাকা করিয়া বৃত্তি পাইতেন। তৎকালে গবর্ণমেণ্ট্ ছাত্রদিগকে টাকা দিয়া কলেজে আকর্ষণ করিতেন। কারণ তৎপূর্ব্বে টোলে পাঠ করাই প্রচলিত ছিল। বিদ্যালয়ে পড়া প্রচলিত ছিল না। এখনকার সহিত কতই প্রভেদ ছিল! কিন্তু আমি যখন কলেজে পাঠ করিতে আরম্ভ করি, তখন আর টাকা পাইতাম না, কিছু দিতেও হইত না।

আমাদের পাঠকালে ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহার সময় প্রতি রবিবারে কলেজ বন্ধ থাকিত। তৎপূর্ব্বে শুনিয়াছি, অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমা ইত্যাদি অনধ্যায় দিনে কলেজ বন্ধ থাকিত। অদ্যাপি কোনো-কোনো চতুষ্পাঠীতেও এই নিয়ম প্রচলিত আছে। পঞ্জিকাতে যেসকল দিনে অনধ্যায় বলিয়া লেখা থাকে, সেইসকল দিনে টোলের পাঠকার্য্য বন্ধ থাকে। যাহা হউক, আমি দেখিলাম,—রবিবার কলেজে যাইতে হয় না। এই প্রথা কত দিন পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত হইয়াছে, তাহা আমি ঠিক্ বলিতে পারি না। আমি কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলাম, ১০।টা হইতে ৪।০টা পর্য্যন্ত কলেজের কার্য্য হয়। ৺বিদ্যাসাগর মহাশয় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন, যে, ১০। হইতে ১টা পর্য্যন্ত রোজ পড়া হইবে। তৎপরে ১টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত খেলিবার ছুটি হইবে। তৎপরে ২টা হইতে ৪।০ পর্য্যন্ত সংস্কৃত পাঠনা হইবে। এই নিয়ম-অনুসারে প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক মহাশয়দিগকে * প্রায় বৈকালে আসিতে হইত। এই নিয়ম অনেক দিন চলিয়াছিল। পরে খেলিবার ছুটি আধ ঘণ্টা হওয়াতে ৪ টার পর কলেজ বন্ধ হইতে লাগিল।

আমরা দেখিয়াছি—৺বিদ্যাসাগর মহাশয় ১০। টার ঘণ্টা বাজিলে একবার প্রত্যেক গৃহে শিক্ষক আসিয়াছেন কি না দেখিয়া যাইতেন; খেলিবার ছুটির পর আর-একবার প্রত্যেক গৃহে আসিয়া দেখিয়া যাইতেন। ফলতঃ কলেজটি যেন তাঁহার নিজের সংসার ছিল।

এসময়ে কিরূপ পাঠনার নিয়ম ছিল তাহা বলা যাইতেছে।—আমাদের সময় ১২ বৎসর সর্ব্বসমেত পাঠকাল ছিল। (১) প্রথম বৎসর সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীতে গিয়া ভর্ত্তি হইতে হইত। তথায় ৺বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রণীত সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা পাঠ করিতে হইত।

২য় বৎসর ঋজুপাঠ ১ম ও বিদ্যাসাগর প্রণীত ব্যাকরণ-কৌমুদী ১ম ভাগ
৩য় ” ঐ ২য় ভাগ ঐ ২য় ভাগ
৪র্থ ” ঐ ৩য় ভাগ ঐ ৩য় ভাগ
৫ম ” রঘুবংশ ৯ম সর্গ পর্য্যন্ত ঐ ৪র্থ ভাগ
৬ষ্ঠ ” রঘুবংশ ১০ম হইতে ১৯শ সর্গ মুগ্ধবোধ }
৭ম ” কুমারসম্ভব ৭সর্গ পর্য্যন্ত ও মেঘদূত ঐ }
৮ম ” ভারবি শেষ ঐ } ৪ বৎসর
৯ম ” মাঘ শেষ ঐ }

১০ম বৎসর। সাহিত্যদর্পণ শেষ—নাটক—শকুন্তলা, রত্নাবলী, মুদ্রারাক্ষস, মৃচ্ছকটিক, বিক্রমোর্ব্বশী, বীরচরিত ও উত্তরচরিত, মালতীমাধব, বেণীসংহার। আমাদের সময়ে নাগানন্দ ছাপা হয় নাই।

১১শ বৎসর। স্মৃতি—দায়ভাগ, মিতাক্ষরা ব্যবহারাধ্যায়; দত্তকমীমাংসা ও দত্তকচন্দ্রিকা।

১২শ বৎসর। দর্শন—ভাষাপরিচ্ছেদ; (সটীক) গোতমসূত্রম্ এবং ব্যাপ্তিপঞ্চকম্ ও নৈষধ পূর্ব্বভাগ উপরি উক্ত সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করিয়া এণ্ট্রেন্স্ ক্লাসে উঠিতে হইত।

ইতিপূর্ব্বে—

* ন্যায়, স্মৃতি ও অলঙ্কার—এই তিন শ্রেণীর অধ্যাপকদিগকে।

1st Book of Reading
2nd " " "
Rudiments of Knowledge
Moral Class-Book

Entrance Preparatory Class ও Entrance Classএ ২ বৎসরে Entrance Course পাঠ্য ছিল।

এইরূপে ৬ বৎসর ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি শিক্ষা করিয়া এণ্ট্রেন্স্ পাশ করিতে হইত। সুতরাং আমাদিগকে এণ্ট্রেন্স্ পাশ করিতে প্রায় ১৯ বৎসর লাগিত। তৎপর ২ বৎসর ফার্ষ্ট্ আর্টস্ পাঠ করিয়া পাশ হইলে বি-এ পড়িবার জন্ত প্রেসিডেন্সী কলেজে গিয়া পড়িতে হইত, এবং সংস্কৃত পাঠার্থ সংস্কৃত কলেজে আসিতে হইত। বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকগুলি আমাদের ইতি-পূর্ব্বে পড়া হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং আর পড়িতে হইত না। তৎকালে সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদিগের জন্ত পৃথক্ পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট হইত; যথা—এণ্ট্রেন্স্ পরীক্ষায় রঘুবংশ এবং ফার্ষ্ট্ আর্ট্সের জন্ত কিরাত বা মাঘ।

সংস্কৃত কলেজে প্রতিবৎসর বার্ষিক পরীক্ষা হইত, এবং উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে পারিতোষিক দেওয়া হইত। অলঙ্কার-শ্রেণী হইতে ছাত্রবৃত্তি প্রদত্ত হইত। ১ম বৎসর ৮৲ টাকা করিয়া, ২য় বৎসর ১০৲ টাকা করিয়া ও ৩য় বৎসর ১২৲ টাকা করিয়া মাসিক বৃত্তি ছিল। ১৬৲ করিয়া ২ বৎসর এবং ২০৲ করিয়া ২ বৎসর ক্রমান্বয়ে ফার্ষ্ট্ আর্ট্স্ ও বি-এর জন্ত নির্দ্দিষ্ট ছিল। এইসকল বৃত্তি থাকাতে অনেক ছাত্রকে ঘর হইতে কিছুই বেতন দিতে হইত না। আমাকেও কখন দিতে হয় নাই।

আমরা যে-বৎসর এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা দিয়াছিলাম সে-বৎসর গড়ের মাঠে তাঁবুর মধ্যে বসিয়া পরীক্ষা দিয়াছিলাম। তখন বিশ্ববিদ্যালয় বাটী বা প্রেসিডেন্সী কলেজবাটী কিছুই হয় নাই। সংস্কৃত কলেজের বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-দিগকে পুস্তক পারিতোষিক দেওয়া হইত। আমার মনে হয়—এক বৎসর টাউন হলে গিয়া পারিতোষিক দু-খানি পুস্তক আনিয়াছিলাম। তৎকালে এ-সকল বিষয়ে বড়-বড় সাহেবদিগের খুব উৎসাহ ছিল। তৎকালে এটকিন্সন্ সাহেব শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর ছিলেন। তিনি যদিও সেনা-বিভাগের লোক ছিলেন, তথাপি শিক্ষাবিভাগের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট যত্ন ও উৎসাহ ছিল। কলেজের বার্ষিক পারিতোষিক-দান-সময়ে অনেক ভাল-ভাল সাহেবকে নিমন্ত্রণ করিতেন। হিন্দুকলেজে কাপ্তেন রিচার্ডসন্ সাহেব অন্ততম শিক্ষক ছিলেন, এবং শেক্স্পীয়র-কৃত নাটকগুলি অতি সুন্দর পড়াইতেন। প্রসন্নকুমার সর্ব্বা-ধিকারী এবং প্যারীচরণ সরকার প্রভৃতি তাঁহার বিখ্যাত পণ্ডিত-ছাত্র ছিলেন। এইচ্ এইচ্ উইলসন সাহেব সংস্কৃত কলেজের স্থাপয়িতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি যখন বিলাত যাত্রা করেন, তখন গবর্ণ্মেণ্ট্ মেকলে সাহেবের পরামর্শে সংস্কৃত কলেজ উঠাইয়া দিবার সংকল্প করেন। মেকলে সাহেব সংস্কৃত কলেজের সংস্কৃতপুস্তক-পূর্ণ লাইব্রেরী দেখিয়া বড়ই চটিয়া উঠিয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন এই রাবিশগুলি গঙ্গার জলে ফেলিয়া দেওয়া উচিত।

মেকলে সাহেবের Essayগুলি বোধ হয় পাঠক মাত্রেই পাঠ করিয়াছেন। এবং ঐ সাহেব মহাশয় যে সকল কটু কথায় বাঙ্গালীদিগকে ভূষিত করিয়া গিয়াছেন তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন। যাহা হউক, এমন সময় হইয়াছিল, যে সংস্কৃত কলেজের ভিত্তি টলমল হইয়াছিল। ঐ সময় কলেজস্থ পণ্ডিতগণের মধ্যে জয়-গোপাল তর্কালঙ্কার নামক একটি পণ্ডিত ও প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয় দুইটি সংস্কৃত শ্লোক লিখিয়া বিলাতে উক্ত উইলসন-সাহেবের নিকট পাঠান। সাহেব কবিতা-গুলি পাঠ করিয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন, এবং উত্তর দিয়া পণ্ডিতদিগকে সাহস দিয়াছিলেন। ঐ শ্লোকগুলি ও তাহার উত্তর উইলসন সাহেব যাহা দিয়াছিলেন সেগুলি পাঠকগণকে উপহার দিলাম। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার কৃত শ্লোক যথা—

অস্মিন্ সংস্কৃতপাঠসদ্মসরসি ত্বৎ স্থাপিতা যে সুধী
হংসাঃ কালবশেন পক্ষরহিতা দূরংগতে তে ত্বয়ি।
তত্তীরে নিবসন্তি সংহিতশরা ব্যাধাস্তদুচ্ছিত্তয়ে
তেভ্যস্ত্বং যদি পাসি পালক তদা কীর্ত্তিশ্চিরং স্থাস্যতি॥"

উইলসন সাহেব প্রদত্ত উত্তরের শ্লোকগুলি এই :—

"বিধাতা বিশ্বনির্ম্মাতা হংসাস্তৎপ্রিয়বাহনম্।
অতঃ প্রিয়তরত্বেন রক্ষিষ্যতি স এব তান্ ॥১॥
অমৃতং মধুরং সম্যক্ সংস্কৃতংহি ততোধিকম্।
দেব-ভোগ্যমিদং যস্মাদ্ দেবভাষেতি কথ্যতে ॥২॥
ন জানে বিদ্যতে কি তন্মাধুর্য্যমত্র সংস্কৃতে।
সর্ব্বদৈব সমুন্মত্তা যেন বৈদেশিকা বয়ম্ ॥৩॥
যাবদ্ ভারতবর্ষংস্যাদ্ যাবদ্ বিন্ধ্যহিমাচলৌ।
যাবদ্ গঙ্গা চ গোদা চ তাবদেবহি সংস্কৃতম্ ॥৪॥

প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয় কৃত শ্লোক এই :—

"গোলশ্রীদীর্ঘিকায়া বহুবিটপিতটে কোলিকাতানগর্য্যাং
নিঃসঙ্গোবর্ত্ততে সংস্কৃতপঠনগৃহাখ্যঃ কুরঙ্গঃ কৃশাঙ্গঃ।
হন্তুং তং ভীতচিত্তং বিধৃতখরশরো মেকলে-ব্যাধরাজঃ
সাশ্রু ব্রূতে স ভো ভো উইলসন-মহাভাগ মাং রক্ষ রক্ষ ॥'

উক্ত শ্লোকের উইলসন সাহেব কৃত উত্তর এই :—

"নিষ্পিষ্টাপি পরং পদাহতিশতৈঃ শশ্বদ্বহুপ্রাণিনাং
সন্তপ্তাপি করৈঃ সহস্রকিরণেনাগ্নিস্ফুলিঙ্গোপমৈঃ।
ছাগাদ্যৈশ্চ বিচর্ব্বিতাপি সততং মৃষ্টাপি কুদ্দালকৈঃ
দূর্ব্বা ন ম্রিয়তে কৃশাপি নিতরাং ধাতুর্দয়া দুর্ব্বলে ॥"

কি সুন্দর ভাব! ও ভগবানের উপর কি নির্ভর!

কি প্রণালীতে কলেজ শাসিত হইত তাহা বলা উচিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় অতীব গম্ভীরপ্রকৃতি লোক ছিলেন। তিনি "অধৃষ্যশ্চাভিগম্যশ্চ যাদোরত্নৈরিবার্ণবঃ। (কালিদাস-রঘু) ছিলেন। আমরা ভয়ে তাঁহার সম্মুখে যাইতে পারিতাম না। কলেজে যখন গোলমাল হইত, তখন তিনি দোতালার বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া "আস্তে" বলিয়া যেরূপ চীৎকার করিতেন, তাহা শুনিয়া কলেজ নিস্তব্ধ হইত। তিনি যখন শুনিতেন যে, কোনো ছাত্রদ্বয় পরস্পর বিবাদ-বিসংবাদ করিয়াছে, তখন তিনি দুইজনকেই কলেজ হইতে দূরীকৃত করিতেন। এমন-কি, নিজের পুত্রকেও মন্দ ব্যবহার-হেতু কলেজ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার ভয়ঙ্কর গাম্ভীর্য্য কলেজের ডিসিপ্লিন রক্ষা করিত। আমি একবার শুনিয়াছিলাম একজন অধ্যাপক বলিয়াছিলেন—"যদিও বিদ্যাসাগর আমার ছাত্র, তথাপি তাহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতে আমার ভয় হয়।" বিদ্যাসাগর যেমন গম্ভীর ছিলেন তেমনি দয়ালুও ছিলেন। আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন, এবং প্রতিদিন ১॥০ টার সময় আমাকে ডাকাইয়া জল খাবার খাইতে দিতেন। তাঁহার দয়ার কথা আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। 'ভকি' নামে এক বৃদ্ধ দপ্তরি যখন পেন্‌সন্ লইয়া কলেজ হইতে চলিয়া যায়, তখন তাহাকে ১০০৲ টাকা দিয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অধ্যক্ষতাকালে হিন্দু স্কুলের ছাত্রগণের সহিত সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদিগের বিবাদ উপস্থিত হইত। সে-বিবাদে বন্দুক কামান প্রভৃতির ব্যবহার ছিল না, অসভ্য জাতির ন্যায় ইট্-পাটকেল ছোঁড়া হইত। তাহাতে কোনো-কোনো ছাত্রের দেহ ক্ষত-বিক্ষত হইত। বিদ্যাসাগর মহাশয় দেখিতেন, কোন্ পক্ষের জিত হয় এবং কোন্ পক্ষের হার হয়। এক-এক সময় এত গুরুতর মারামারি হইত, যে, পুলিস হইতে কন্‌ষ্টেবল আনিতে হইত। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রেরা তেতালার ছাদের উপর ইট্-পাটকেল সংগ্রহ করিয়া রাখিত, এবং উপর হইতে ঐগুলি হিন্দুস্কুলের ছাত্রদিগের মস্তক লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িত। এক-এক দিন এরূপ ভারি মারামারি হইত, যে, আমরা ৪টার ছুটি হইলেও নিজ নিজ গৃহে যাইতে পারিতাম না। পুলিসের লোক না আসিলে আমরা কলেজের বাহির হইতে পারিতাম না।

বিদ্যাসাগর-মহাশয়ের সংস্কৃত-নাটক-অভিনয়ে বিশেষ আমোদ ছিল। নিকটবর্ত্তী বিশ্বাস-মহাশয়ের বাটী হইতে অলঙ্কার ও বস্ত্র আনিয়া তিনি ছাত্রদিগকে সাজাইতেন এবং কলেজের একটি গৃহে নেপথ্য করিতেন। আমার মনে পড়ে—৺নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় "অভিজ্ঞান শকুন্তলম্" নাটকের ভরত সাজিতেন। ৺মহেশ চট্টোপাধ্যায় করভক সাজিতেন। ৺শিবনাথ শাস্ত্রী কণ্বমুনি সাজিতেন। এইরূপ "বেণীসংহার" নাটকে ডাক্তার উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অশ্বত্থামা সাজিতেন। আমি নেপথ্যের কার্য্য করিতাম। কিছু সাজিতাম না।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবন-চরিতে নানাবিধ ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং সেগুলি আর পুনরুক্ত করিব না। একবারের ঘটনা লিখিয়া নিরস্ত হই। লাইব্রেরী-

গৃহ লইয়া প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রিন্‌সিপাল সাট্‌ক্লিফ সাহেবের সহিত অনেক বাদানুবাদ হয়। উক্ত সাহেব সংস্কৃত কলেজের দ্বিতলস্থিত গৃহটি লইতে চান এবং বলেন সংস্কৃত পুস্তকগুলি একতলায় লইয়া যাওয়া হউক। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন, সংস্কৃত পুস্তকগুলি বহুমূল্য দিয়া গবর্ণ্‌মেণ্ট্‌ ক্রয় করিয়াছেন, ঐগুলি যত্ন করিয়া রাখা আমার কর্ত্তব্য। এই বিষয় মীমাংসা করিবার জন্য উক্ত সাহেব বিদ্যাসাগর-মহাশয়কে বলেন, "তুমি একদিন আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও।" তদনুসারে বিদ্যাসাগর-মহাশয় উক্ত সাহেবের ঘরে যান; গিয়া দেখেন সাহেব জুতা-পরা দুইখানি চরণ টেবিলে তুলিয়া চুরট খাইতেছেন। বিদ্যাসাগর-মহাশয় তাঁহার পদতলে দাঁড়াইয়া কথা কহিতে লাগিলেন। সাহেব তাঁহাকে চেয়ারে বসিতে বলেন নাই, বা পদদ্বয় নামাইয়া লন নাই। সেদিন কথাবার্ত্তা শেষ না হওয়াতে বিদ্যাসাগর-মহাশয় বলিলেন, "সাহেব, তুমি একদিন আমার ঘরে যাইও, কথাবার্ত্তা শেষ হইবে।" তদনুসারে সাহেব বিদ্যাসাগর-মহাশয়ের বসিবার গৃহে আসেন, এবং দেখেন বিদ্যাসাগর মহাশয় চটিযুক্ত পদদ্বয় টেবিলে তুলিয়া আল্‌বোলায় তামাক খাইতেছেন। সাহেবকে দেখিয়া তিনি শশব্যস্ত হইলেন না, যেমন ছিলেন তেম্‌নি বসিয়া রহিলেন, এবং ঐভাবে সাহেব দাঁড়াইয়া রহিলেন; তিনি কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। এইরূপ ব্যবহারে সাহেব ডিরেক্টর্‌-সাহেবের নিকট বিদ্যাসাগর-মহাশয়ের নামে নানাবিধ নিন্দা করেন। ডিরেক্টর-সাহেব বিদ্যাসাগর-মহাশয়কে ডাকাইয়া পাঠান। বিদ্যাসাগর-মহাশয় রাইটার্স্‌ বিল্‌ডিংএ গিয়া ডিরেক্টর-সাহেবের সহিত দেখা করেন। ডিরেক্টর-সাহেব বিদ্যাসাগর-মহাশয়কে কহিলেন,—"তুমি সাট্‌ক্লিফ-সাহেবকে অপমান করিয়াছ কেন?" বিদ্যাসাগর-মহাশয় উত্তর দিলেন, "আমি ত অপমান করি নাই, আমি ইংরেজি-এটিকেট-অনুসারে কার্য্য করিয়াছি।" ডিরেক্টর-সাহেব বলিলেন, "আমাকে সমস্ত বিষয় খুলিয়া বল, কি ঘটনা হইয়াছে।" তখন বিদ্যাসাগর-মহাশয় সাট্‌ক্লিফ-সাহেবের ব্যবহার বর্ণনা করিয়া নিজেরও ব্যবহার বর্ণন-করিলেন, এবং কহিলেন, "আমরা অসভ্য জাতি, তোমরা সভ্য জাতি। তোমরা যেরূপ ব্যবহার করিবে আমরা তাহা শিক্ষা করিব। সাট্‌ক্লিফ-সাহেব আমার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহাতে আমি বুঝিয়াছিলাম এইটি সভ্য জাতির আচরণ, অর্থাৎ জুতাসুদ্ধ দুইখানি পা টেবিলে দিয়া চুরটমুখে অভ্যাগত ব্যক্তিকে পদতলে দাঁড় করাইয়া কথাবার্ত্তা করা। আমি অসভ্য ব্যক্তি, মনে করিলাম এইটি সভ্য জাতির আচরণ; সুতরাং তদ্রূপ আচরণ করিয়া সাহেবকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলাম।" এট্‌কিন্‌সন-সাহেব ডিরেক্টর খুব বুদ্ধিমান্‌ ও বিবেচক ছিলেন। তিনি ভাবিলেন, বিদ্যাসাগর প্রথমতঃ অপমানিত হইয়া এইরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। পরে সাট্‌ক্লিফ-সাহেবকে ডাকাইয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, "তুমি বিদ্যাসাগরের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছ, তিনিও তোমার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাতে তোমার রাগ করিবার কারণ দেখিতেছি না।"

এক্ষণে সংস্কৃত কলেজের কয়েকজন প্রধান অধ্যাপকের বিষয় বর্ণনা করা যাইতেছে। আমি পিতৃদেবের মুখে শুনিয়াছিলাম—উইল্‌সন্‌-সাহেব পরীক্ষা করিয়া ঐসকল অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, নাথুরাম শাস্ত্রী প্রভৃতি কলিকাতার পণ্ডিতগণ পরীক্ষা করিয়াছিলেন। ৯০ টাকা বেতনে তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ১৫০ টাকা পর্য্যন্ত বেতন হয়। ব্যাকরণ, অলঙ্কার, স্মৃতি ও ন্যায়-শাস্ত্রের অধ্যাপকগণ কখনো পুস্তক দেখিয়া অধ্যাপনা করিতেন না। যিনি যাহা পড়াইতেন, তাঁহার সেগুলি মুখস্থ ছিল। প্রথম লাইন বলিয়া দিলেই আর তাঁহাকে কিছু বলিতে হইত না, তিনি সমস্ত মুখস্থ বলিতেন। প্রথমতঃ ব্যাকরণের অধ্যাপক পূজ্যপাদ তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের কথা বলা যাইতেছে। তিনি কি ব্যাকরণ, কি স্মৃতি, কি অলঙ্কার, বা কি ন্যায়শাস্ত্র, সর্ব্বশাস্ত্রেই বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তদ্ভিন্ন তিনি বেদের ও উপনিষদের শিক্ষায় সুপটু ছিলেন। তৎকালে তিনিই পাণিনি-ব্যাকরণবেত্তা ছিলেন। অনর্গল সংস্কৃত ভাষায় কথা কহা তাঁহার সিদ্ধ বিদ্যা ছিল। পঞ্জাব বা বম্বে হইতে কোনো পণ্ডিত-মহাশয় সংস্কৃত-কলেজে আসিলে তিনিই

তাঁহার সহিত সংস্কৃত ভাষায় কথাবার্ত্তা করিতেন। তিনি যে "বাচস্পত্য অভিধান" লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা দেখিলে পাঠক তাঁহার অগাধ বিদ্যা বুঝিতে পারিবেন। বাণিজ্য-ব্যবসায়েও তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি শাল ও ঘড়ির ব্যবসায় করিতেন। অম্বিকা, কাল্না তাঁহার জন্মভূমি ছিল। একবার ঐ স্থানে প্রায় ১০০ ঢেঁকী বসাইয়া চাউল প্রস্তুত করিয়া কলিকাতায় বিক্রয়ার্থ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি যে কত সংস্কৃত পুস্তক সটীক ছাপাইয়া গিয়াছেন, তাহা সংখ্যা করা যায় না। এদিকে তিনি এত পাকপটু ছিলেন, যে, চিরজীবন নিজে পাক করিয়া খাইতেন। তিনি আমাদিগকে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ ও রঘুবংশ-কাব্য পড়াইতেন। তিনি পশ্চিম দেশীয় লোক-দিগের স্থায় শুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ করিতেন। ফলতঃ তাঁহার বিদ্যার সীমা ও বুদ্ধির পরিমাণ আমি বর্ণনা করিতে অক্ষম। তিনি তদানীন্তন সংস্কৃত কলেজের একটি উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন। অঙ্কশাস্ত্রে ও জ্যোতিষ-শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি ই, বি, কাউয়েল সাহেবকে একটি অঙ্ক দিয়াছিলেন, ঐ অঙ্কটি উক্ত সাহেব সম্প্রতি এল্ফিন-ষ্টোনকৃত ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে ছাপা-ইয়া দিয়াছেন। তিনি আপনার কোষ্ঠী আপনি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। আমার মনে হয়, তিনি যখন বুঝিলেন যে, আর অধিক দিন বাঁচিবেন না, তখন একদিন আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব ৺গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে আসেন। তিনি আসিয়া বলিলেন—"গিরিশ আমি চলিলাম; তোমাদের সহিত আর দেখা হইবে না।" আমার পিতৃদেব উত্তর করিলেন—"বাচ-স্পতি! সে কি কথা কও।" তাহাতে বাচস্পতি মহাশয় বলিলেন—"হাঁ আর ১৫ দিন বই আমার জীবন নাই, আমি কাশীধামে যাইব।" তিনি সত্যবাদী ছিলেন, সুতরাং ঠিক ১৫ দিনের পর কাশীধামে তিনি দেহত্যাগ করেন। বাহুমূলে একটি কার্বাংকল্ হওয়াতে তাঁহার জীবন শেষ হয়। তাঁহার পদে আমার শত-শত প্রণাম।

দ্বিতীয়তঃ—অলঙ্কারের অধ্যাপকের বিষয় বর্ণন করিব। পূজ্যপাদ প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয় অলঙ্কার-শ্রেণীর অধ্যাপক ছিলেন। আমি শুনিয়াছি তিনি বিদ্যাসাগর-মহাশয়েরও অধ্যাপক ছিলেন। আমার পিতৃদেব বলি-তেন, তিনিও তাঁহার নিকট পড়িয়াছিলেন। ফলতঃ পূজ্যপাদ তর্কবাগীশ-মহাশয় বহুকাল কলেজে চাকরি করিয়াছিলেন। তিনি যোগসাধন করিতেন, ইহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি; আসন হইতে একটু উর্দ্ধে উঠিতে পারিতেন তাহাও আমরা ভগ্ন জানালা দিয়া দেখিয়া-ছিলাম। তাঁহার অনুবৃত্তি করিয়া বিদ্যাসাগর, শ্রীশ বিদ্যা-রত্ন ও আমার পিতৃদেব ঠন্ঠনিয়ার ৺কালীতলা হইতে নিশ্বাস বন্ধ করিয়া কলেজে যাইতে আরম্ভ করেন। প্রায় ৬ মাসে ৫ মিনিট বন্ধ করিতে পারিতেন। তিনি এক-বৎসরে সমগ্র সাহিত্য-দর্পণ শেষ করিয়া দিতেন। তদ্ভিন্ন প্রায় নয়খানি নাটক পড়াইতেন (তাহার তালিকা ইতি-পূর্ব্বে দিয়াছি)। ইহা ছাড়া প্রতিশনিবার আমাদিগকে একটি-একটি সমস্যা দিতেন। ঐ সমস্যা আমরা সোম-বারে পূর্ণ করিয়া আনিয়া দিতাম। ঐগুলির দোষগুণ তিনি বিচার করিয়া দিয়া পরে পাঠনা আরম্ভ করিতেন। একবার আমি একটি সমস্যা পূর্ণ করিয়া দিয়াছিলাম। তাহা পাঠ করিয়া তিনি এতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, যে, আমাকে "কবিরত্ন" উপাধি দিয়াছিলেন। আমার বয়স তখন ১২ বৎসর। পাঠকগণের অবগতির জন্য ঐ সমস্যা নিম্নে লিখিয়া দিলাম। সমস্যাটি এই—"কথমুদ্যমস্তে"। তিনি যে শনিবার ঐ সমস্যা দেন, সেই শনিবার সায়ংকালে আমাদিগের বাসা-গৃহের সম্মুখবর্ত্তী "নিচুবাগানে * অনেক জোনাকি পোকা নিচুগাছগুলি ভূষিত করিয়া উড়িতেছিল। আমি তাহা দেখিয়া হঠাৎ শ্লোকটি রচনা করিলাম—"খদ্যোত তে দ্যুতিরিয়ং তিমিরে প্রগাঢ়ে যদ্দ্যোততে তদপিতে বহুমাননীয়ম্। মার্ত্তণ্ডচণ্ডকিরণ-প্রতিসারণীয়-ঘোরান্ধকারদমনে কথমুদ্যমস্তে॥" এতদ্ভিন্ন তিনি "মহিম্নস্তোত্রম্" সটীক আমাদিগকে লিখিয়া দিয়া-ছিলেন, অর্থাৎ তিনি বলিতেন, আমরা লিখিয়া লইতাম। আমাদের আমলে "সাহিত্য-দর্পণ" ছাপা হইয়াছিল। এসিয়াটিক্ সোসাইটি উহা মুদ্রিত করে। কিন্তু আমার

---

* এক্ষণে ঐ নিচুবাগানে Deaf and Dumb School হইয়াছে।

পিতৃদেবের সময় ঐ পুস্তক ছাপা না থাকায় তিনি পুথি-আকারে লিখিয়া পাঠ করিয়াছিলেন। আমিও ঐখানি দেখিয়া পড়িতাম। ছাপা পুথির সহিত মিল না হইলে আমার গুরুদেব তর্কবাগীশ-মহাশয় আমার পুস্তকের পাঠই গ্রহণ করিতেন। বর্দ্ধমান জিলার অন্তঃপাতী শাকরাঢ়া (শাকনাড়া) নামক গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি পণ্ডিতের বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। একদিনের ঘটনা এইরূপ। ক্লাসে অলঙ্কারের প্রশ্নোত্তরে আমি "কাশীস্থিতগবান্" এইরূপ লিখিয়াছিলাম। অধ্যাপক মহাশয় আমাকে তিরস্কার করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলিলেন, "ঈশ্বর এইসকল ছেলের মাথা খাইতেছ, বাঙ্গালায় সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা লেখাতে ইহারা কিছুই শিখিতেছে না"। তদুত্তরে বিদ্যাসাগর-মহাশয় বলিলেন, "ভট্টাচার্য্য মহাশয়! আমি ব্যাকরণকৌমুদী লিখিয়াছি আর কোনো চিন্তা নাই।"

তৃতীয়তঃ অলঙ্কার শ্রেণীর পর আমরা স্মৃতির শ্রেণীতে উঠিতাম। তৎকালে ২৪ পরগণা জিলার অন্তঃপাতী লাঙ্গল-বেড়িয়া-নামক গ্রামের দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ পূজ্যপাদ ভরতচন্দ্র শিরোমণি মহাশয় স্মৃতির অধ্যাপক ছিলেন। স্মৃতি-শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি "দায়ভাগ"-নামক একখানি স্মৃতিসংগ্রহ বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত করিয়াছিলেন। ঐ পুস্তকখানি আমরা পাঠ করিতাম। তিনি অতিশয় রসিক লোক ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহার ছাত্র ছিলেন। সুতরাং আমরা তাঁহার নাতি-সম্পর্ক হইতাম। তিনি তদনুসারে আমাদের সহিত প্রায়ই তামাসা করিতেন। একদিন শীতকালে তিনি একখানি লালবর্ণ বনাত গায় দিয়া কলেজে আসিতে-ছিলেন। আমরাও তাঁহার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ আসিতেছিলাম। আমাদের মধ্যে একজন ছাত্র বলিল—"ভট্টাচার্য্য মহাশয় আপনার লাল বনাতের উপর সূর্য্যকিরণ পড়াতে আপনার তেজ যেন সূর্য্যের মত দেখাইতেছে। তিনি কোনো উত্তর না করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা একটু দ্রুতপদে চলিতে লাগিলেন। আমরাও তাঁহার পশ্চাৎ তদ্রূপ দ্রুতপদে আসিতে লাগিলাম। পরে তিনি কলেজে গিয়া তাঁহার চেয়ারে বসিয়া এক দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"বাপ! ভাগ্যিস্! এখনি বগলে পুরিয়াছিল"। তখন আমরা সকলে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলাম। যে-ছাত্র তাঁহাকে সূর্য্যের সচিত্র তুলনা করিয়াছিল, তাহাকে হনুমান্ বলিয়া তামাসা করিলেন। সেও অপ্রস্তুত হইল। এইরূপ তামাসা মধ্যে-মধ্যে হইত। একদিন "লংসাহেব * নামে একজন পাদ্‌রী পণ্ডিত সংস্কৃত কলেজ দেখিতে আসিয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গালা ভাষা বেশ শিখিয়াছিলেন, এবং সকলের সহিত বাঙ্গালায় কথাবার্ত্তা কহিতেন। তিনি স্মৃতির শ্রেণীতে আসিয়া আমাদের ভট্টাচার্য্য-মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"শিরোমণি! কি পুস্তক পড়াইতেছেন?" অধ্যাপক মহাশয় দায়ভাগ-পুস্তকখানি তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, "এই দেখুন, 'দায়ভাগ' পুস্তক।" সাহেব সংস্কৃত পুস্তক বাঙ্গালা অক্ষরে ছাপা দেখিয়া বিরক্তভাবে বলিলেন—"শিরোমণি! ব্রাহ্মণকে চণ্ডালের পোষাক পরাইয়াছেন।" শিরোমণি মহাশয় উত্তর করিলেন—"আমাদের দেশের পণ্ডিতেরা দেবনাগর অক্ষর বড় একটা পড়িতে পারে না; তজ্জন্য বাংলা অক্ষরে ছাপাইয়াছি।" সাহেব বলিলেন "ভারি অন্যায় কাজ করিয়াছেন।" আমার স্বর্গীয় ভগিনীপতি কেদারনাথ তর্ক-রত্ন যৎকালে স্মৃতি-শ্রেণীতে পাঠ-করিত, তখন তাহার সঙ্গে শিরোমণি মহাশয়ের বিশেষ তামাসা চলিত। একদিন কেদারের উপর ভারি চটিয়া তিনি বলিলেন—"আমি বিদ্যাসাগরের নিকট তোর নামে নালিশ করিগে।" কেদারও উঠিয়া তাঁহার সঙ্গে-সঙ্গে চলিল। তিনি কহিলেন—"তুই যাইতেছিস্ কেন?" কেদার কহিল—"আমিও নালিশ করিতে যাইতেছি।" তিনি কহিলেন—"তুই কি বলিয়া নালিস্ করিবি?" কেদার বলিল—"আমি বলিব, বিদ্যাসাগর মহাশয়, শিরোমণি-মহাশয় কিছুই পড়াইতে পারেন না। উহাকে কলেজ হইতে বিদায় করিয়া দিন।" এই কথাতে তিনি উচ্চ হাস্য করিয়া ক্লাশে ফিরিয়া আসিলেন, তিনি তামাসা করিয়া সময় কাটাইতেন বটে, কিন্তু একবৎসরে দায়ভাগ সমগ্র, দত্তক-মীমাংসা, দত্তক-চন্দ্রিকা এবং মিতাক্ষরা (ব্যবহারাধ্যায়) পড়াইয়া দিতেন।

* লংসাহেবের গির্জা অদ্যাপি আমহার্ষ্ট্ ষ্ট্রীটে বর্ত্তমান আছে।

তিনি ব্যবস্থা-দর্পণ-গ্রন্থ প্রস্তুত করিবার সময় শ্যামাচরণ সরকার মহাশয়কে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। হাই-কোর্টের বিচারকগণ তাঁহার মত গ্রাহ্য করিতেন। একবার দুইটি দত্তক গ্রহণ করা যাইতে পারে কি না, এইমর্ম্মের একটি প্রশ্ন উঠে। হাইকোর্টের প্রধান বিচারক মহাশয় স্মৃতির পণ্ডিতকে তলব করেন। হাতীবাগানের ৺ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ হাইকোর্টে গিয়া স্ব-স্ব মত দিয়া আসিয়াছিলেন। শিরোমণি মহাশয় যে মত দেন, তাহাই গ্রাহ্য হইয়াছিল অর্থাৎ একবার একটি দত্তক-লইলে আবার একটি দত্তক লওয়া যায় না, এইটি দত্তক-মীমাংসা প্রভৃতি গ্রন্থের মত। তৎকালে কোনো ধনী লোকের দুই পত্নী প্রত্যেকে এক-একটি দত্তক লইয়াছিলেন, তজ্জন্য এই মোকদ্দমা উঠে। আমার মনে হয়, এইটি ৺দুলাল সরকার মহাশয়ের বাড়ীর মোকদ্দমা।

চতুর্থতঃ—স্মৃতির পাঠ শেষ হইলে আমরা ন্যায়ের শ্রেণীতে উঠিলাম। এস্থলে একটি ঘটনা বলা যাইতেছে—৺রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী (যিনি বহুকাল পরে হিন্দু-পেট্রিয়ট্ কাগজের সম্পাদক হইয়াছিলেন) ৺প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারীর ভ্রাতা ছিলেন, এবং আমাদের সঙ্গে পড়িতেন। তিনি বলিলেন, "আমি কায়স্থ (পূর্ব্বে সংস্কৃত কলেজে কেবল ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ব্যতীত অন্য কোন জাতির প্রবেশাধিকার ছিল না। বিদ্যাসাগর-মহাশয় প্রিন্‌সিপাল হওয়ার পর হইতে কায়স্থ ছাত্রও প্রবেশলাভ করিতে পারিত। এক্ষণে সকল হিন্দুজাতিই প্রবেশ করিতে পারে।) আমি স্মৃতি পড়িয়া কি করিব? আমি ত আর ব্যবস্থা দিব না।" এই বলিয়া তিনি স্মৃতির শ্রেণীতে না পড়িয়া একেবারে ন্যায়ের শ্রেণীতে উঠিয়া যান। সেই হইতে তাঁহার সহিত আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়।

তৎকালে পূজ্যপাদ জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয় ন্যায়শাস্ত্র পড়াইতেন। তিনি এক বৎসরে মুক্তাবলীসমেত ভাষা-পরিচ্ছেদ, গোতমসূত্র, ও নৈষধপূর্ব্বভাগ শেষ করিয়া দিতেন। তিনি কখন পুস্তক স্পর্শ করিতেন না। সকল পুস্তকই তাঁহার মুখস্থ ছিল। পাঠ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে আমরা কেবল প্রথম লাইনের কিয়দংশ বলিয়া দিতাম, তাহার পর আর তাঁহাকে কিছুই বলিয়া দিতে হইত না। তাঁহার শরীর স্থূল ও দীর্ঘ ছিল। পড়াইবার সময় তিনি বাম হস্তের তল তাঁহার কেশশূন্য মস্তকে বুলাইতেন, এবং পাঠ্যগুলি অনর্গল বলিয়া যাইতেন। অন্যান্য অধ্যাপকগণের সঙ্গে তাঁহার একটু প্রভেদ ছিল। অন্যান্য অধ্যাপক-মহাশয় স্বহস্তে কাল কাপড়ের ছাতি ধরিয়া কলেজে আসিতেন। তর্কপঞ্চানন-মহাশয় কিন্তু নিজে ছাতি ধরিতেন না। তাঁহার একটা প্রকাণ্ড তাল-পাতার ছাতি ছিল। তাহার পরিধি প্রায় ১০।১২ হাত হইবে, এবং দণ্ডটি প্রায় ৮ হাত হইবে। একজন চাকর ঐ বৃহৎ তালপত্রের ছত্র স্কন্ধে করিয়া আসিত। ভট্টাচার্য্য মহাশয় একটি যষ্টি হস্তে করিয়া ঐ ছত্রের ছায়ায় 'থপ্ থপ্' করিয়া চলিয়া আসিতেন। তর্কপঞ্চানন-মহাশয়ের বাড়ী নারিকেলডাঙ্গায় ছিল। একটি দোতালা কোটা ও দু-খানি লম্বা খোড়ো ঘর ছিল। কোটাতে তিনি সপরিবারে বাস করিতেন। একটি খোড়ো ঘরে তাঁহার চণ্ডীমণ্ডপের কার্য্য চলিত; আর-একখানিতে ছাত্রগণ বাস করিতেন। আমাদের আমলে দেখিয়াছি, মহেশ ন্যায়রত্ন, হরচন্দ্র, গৌরীশঙ্কর ঘোষাল ও আর-একজন ছাত্র, তাঁহার নাম আমার মনে নাই, তাঁহার টোলে পাঠ করিতেন। আমরা যখন ভাষা-পরিচ্ছেদ পাঠ করি, তখন মহেশ ন্যায়রত্ন আমাদের সঙ্গে সংস্কৃত কলেজে আসিয়া পড়িতেন। কারণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিয়াছিলেন—"দুইবার করিয়া ভাষা-পরিচ্ছেদ পড়ানো দর্‌কার নাই; একসঙ্গে পড়া হইলে আমার পরিশ্রম লাঘব হয়।" সংস্কৃত কলেজে যেসকল ন্যায়ের পুস্তক পড়া হইত, তাঁহার টোলে তদপেক্ষা অনেক বেশী হইত। তাঁহার বিরচিত সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ-নামক পুস্তকের বঙ্গানুবাদের বিজ্ঞাপনে তিনি মহেশ ন্যায়রত্নকে যেসকল পুস্তক পড়াইয়াছিলেন, তাহার একটি তালিকা দিয়াছেন। তাহা দেখিয়া আমরা অবাক্ হইয়াছিলাম, যে, ন্যায়রত্ন মহাশয় এত দর্শনের গ্রন্থ পড়িয়াছিলেন। আমরা (দুইতিন জন ছাত্র) কোনো কোনো রবিবার তাঁহার বাটী পড়িতে যাইতাম। এক্ষণে তাঁহার নামে ("জয়-নারায়ণ তর্কপঞ্চানন রোড") একটি পথ বিদ্যমান আছে। হায়! তিনি এক্ষণে কোথায়! বিদ্যালঙ্কার-মহাশয় ও আমার

পিতৃদেব গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহার ছাত্র ছিলেন। একবার ছুটির সময় তিনি পশ্চিম দেশে তীর্থ-দর্শনার্থ গমন করেন। সঙ্গে ছাত্ররূপে আমার পিতৃদেব গিয়াছিলেন। ঐসময়ে একখানি এক্কায় তিনি বসিয়া যাইতেন; আর-একখানি এক্কায় পিতৃদেব যাইতেন ও অন্য দ্রব্য যাইত। তৎকালে সকল স্থানে রেলগাড়ী হয় নাই। অধিকাংশ পথ এক্কায় যাইতে হইত। পিতৃদেবের মুখে শুনিয়াছি, গয়াতীর্থে পিতৃশ্রাদ্ধের পর কোনো গয়ালী পাণ্ডার বালক-পুত্র তাঁহার কেশশূন্য চিক্কণ মস্তকের উপরে স্বীয় পদ স্থাপন করাতে, আমার পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলে বৃদ্ধ গয়ালী বলিয়াছিল, "পণ্ডিতের পিতৃপুরুষ উদ্ধার লাভ করিল।" অধ্যাপক মহাশয় কিছু মাত্র ক্রুদ্ধ না হইয়া বলিয়াছিলেন—"গিরিশ, তুমি ক্ষান্ত হও।" ভট্টাচার্য্য-মহাশয়ের পদে আমার শত-শত প্রণাম।

প্রধান চারিজনের বৃত্তান্ত বর্ণিত হইল। এক্ষণে অপর অধ্যাপকদিগের কথা বলা যাইতেছে। প্রথমতঃ পূজ্যপাদ দ্বারকানাথ বিদ্যা-ভূষণের কথা বলিব। তিনি আমাদিগের স্বদেশীয় ও স্বশ্রেণীয় বৈদিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার বাড়ী চাঙ্ড়িপোতায় অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। বিখ্যাত শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁহার ভাগিনেয় ছিলেন। তিনি আমাদিগকে মাঘ-কাব্য পড়াইতেন। মাঘ-কাব্যের ২০টি সর্গের মধ্যে নারীগণের ক্রীড়া-সম্বন্ধে যে ৫টি সর্গ আছে, তাহা ত্যাগ করিয়া তিনি অবশিষ্ট ১৫টি সর্গ ১ বৎসরে পড়াইতেন। এখনকার ছেলেরা শুনিলে অবাক্ হইবে; কারণ তাহারা ২।৩ সর্গ বই আর পড়ে না। বিদ্যাভূষণ মহাশয় যেরূপ সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন, প্রায় তদ্রূপ ইংরেজি-ভাষায়ও ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি Chambers' Series History of Rome and History of Greece, এই দুইখানির বাঙ্গলা অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। তদ্ভিন্ন "সোমপ্রকাশ" নামক বিখ্যাত সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের সম্পাদক ছিলেন। তিনি স্থূলাঙ্গ ও দীর্ঘাকৃতি পুরুষ ছিলেন। (তিনি চিন্তাশীল ও গম্ভীরপ্রকৃতি ছিলেন।) তিনি সংস্কৃত কলেজে যে মাসিক ১৫০ দেড় শত টাকা বেতন পাইতেন, তাহা সমস্তই তাঁহার স্বদেশীয় বিদ্যালয় হরিনাভি এংলো-সংস্কৃত স্কুলে দান করিতেন। সোমপ্রকাশ-সংবাদপত্রের আয়ে তাঁহার সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। ধর্ম্ম-সম্বন্ধে তিনি বিদ্যাসাগরের মতাবলম্বী ছিলেন। তিনি সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলেন ও পরে অধ্যাপকও হইয়াছিলেন।

সংস্কৃত কলেজের ঈশান কোণে একটি প্রকাণ্ড ঘণ্টা ঝুলানো ছিল। ঐ ঘণ্টা বাজিলে বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হইত। ঐ ঘণ্টা-গৃহের পূর্ব্বদিকে একটি মালীর ঘর ছিল। ঐ ঘরে অধ্যাপক মহাশয়গণ বিশ্রাম করিতেন ও কেহ-কেহ তামাক খাইতেন। ঐ গৃহের পূর্ব্বদিকে আর-একটি বৃহৎ 'হল্' ঘর ছিল। ঐটিতে 'পণ্ডিতগণ' কুস্তি প্রভৃতি ব্যায়াম করিতেন। আমি "পণ্ডিতগণ" বলিলাম, তাহার কারণ, উর্দ্ধতন অধ্যাপক-মহাশয়-চতুষ্টয় অর্থাৎ জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, ভরতচন্দ্র শিরোমণি, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ ও তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় ঐ কুস্তির আড্ডায় যোগ দিতেন না। অপেক্ষাকৃত বয়ঃ-কনিষ্ঠ পণ্ডিতগণ অর্থাৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, মদন-মোহন তর্কালঙ্কার, এবং তারাশঙ্কর তর্করত্ন—এই কয়েকজন কুস্তির আড্ডায় যোগ দিতেন, আমার মনে পড়ে, আমি শয্যা হইতে উঠিয়া দেখিতাম, পিতৃদেব ধূলিধূসরিত ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে কলেজ হইতে আসিতেন; তিনি কত প্রত্যূষে উঠিয়া যাইতেন তাহা আমরা জানিতে পারিতাম না। এই ব্যায়াম-কার্য্য বিদ্যাসাগর-মহাশয় স্থাপিত করেন এবং এ কার্য্যে তাঁহার খুব উৎসাহ ছিল। এই ব্যায়াম করাতে পণ্ডিত মহাশয়গণ সকলেই খুব সুস্থশরীর ছিলেন এবং প্রায় রোগে পড়িতেন না। আমার মনে পড়ে আমার পিতৃদেবের জ্বর আমি তাঁহার ৫০ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে দেখি নাই। বিদ্যাসাগর-মহাশয় খুব সুস্থ শরীর ছিলেন। তাহা তাঁহার জীবন-চরিত-গ্রন্থে লিখিত আছে। *

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।)

---

* অধুনা 'কলেজ স্কোয়ারে' তাঁহার যে প্রতিমূর্ত্তি আছে, তাহা তাঁহার বৃদ্ধ বয়সের শীর্ণ মূর্ত্তি। যৌবনে তদপেক্ষা হৃষ্টপুষ্ট ছিলেন।

গণতন্ত্রের হিসাব-নিকাশ

শ্রী নীহাররঞ্জন রায়, বি-এ

অতিবৃদ্ধা লক্ষকোটি জীবের মা এই বসুধার বয়সের অনুমান কেউ করেনি। কে জানে পৃথিবীর বয়স কত? তবুও বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা ঠিক করেছেন, হাজার নয়, লক্ষ নয়, কয়েক কোটি তার বয়স। মানব-শিশু মা বসুধার কোলে যে-দিন প্রথম নয়ন মেলে চেয়েছিল, সেও হয়ত আজ লাখ লাখ বছরের আগেকার কথা। এই যে লক্ষকোটি জীব নিয়ে বিশ্বের খেলা চলেছে, এ-খেলা ত চলেছে আজ লক্ষ বছর ধ'রে; কিন্তু মানুষ প্রথমেই ত আর সভ্য ছিল না, প্রথম হ'তেই মানুষ একটা সুনিয়ন্ত্রিত সমাজ বা রাষ্ট্র গড়ে' তোলেনি, কোনো কলকৌশল উদ্ভাবন ক'রে ধন-সম্পদ্ বাড়িয়ে তোল্‌বার একটা বিধি-ব্যবস্থা কর্‌তে পারেনি, অর্থাৎ মা-বসুধার কোলের সন্তানটি নিতান্তই অসভ্য-বর্ব্বর ছিল ব'লে পৃথিবীর কোলে কি ক'রে খেলাঘর পাত্‌তে হয়, তা সে শেখেনি। আজ এই যে এক-একটা নির্দ্দিষ্ট ভূমি-খণ্ডে এক-একটা দেশে মানুষ পরস্পর মিলে-মিশে তাদের খেলাঘরটিকে এত সুন্দর, সুসজ্জিত ও সুপরিচালিত ক'রে তুলেছে, এ ত আলাদিনের প্রদীপের কৃপায় একদিনেই গ'ড়ে ওঠেনি; হাজার যুগের ক্রমবিকাশের ফলে এই পরিণতি।

মানুষ কোনোদিনই একা বাস করেনি; চিরকালই সে সমষ্টিগতভাবে একত্র বসবাস করেছে, নিজেদেরই সুশাসন সুপরিচালনের জন্যে সে সমাজ গড়েছে, রাষ্ট্র গড়েছে, যা-হোক কিছু একটা আইনের সৃষ্টি ক'রে নিজেদের জীবন-যাত্রাকে একটা সুনির্দ্দিষ্ট পথে পরিচালিত কর্‌তে প্রয়াস পেয়েছে। কত শত বছর ধ'রে সে প্রয়াস সমাজে রাষ্ট্রে কত বর্ষ ধ'রে কত-রকমের শাসন-প্রণালী বিধি-ব্যবস্থা চলেছে, কিন্তু কোনো-একটা নির্দ্দিষ্ট বিধি-ব্যবস্থা বা নির্দ্দিষ্ট শাসন-প্রণালী আজ-পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠা-লাভ কর্‌তে পারেনি। কত বিবর্ত্তন কত পরিবর্ত্তনের ফলে মানুষ আজকার রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থাতে এসে পৌঁচেছে। এ-ব্যবস্থাও নিশ্চয়ই অচল হ'য়ে থাক্‌বে না। মানুষের মন ত কোনোদিনই কোনো নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থায় অনেক দিন সন্তুষ্ট হ'য়ে থাক্‌তে পারে না। সে চিরকালই মুক্তির অন্বেষণ করেছে; সমাজ-বন্ধন, আইন-বন্ধন, রাষ্ট্রের বন্ধন, সকল বন্ধন সকল শাসন মানুষ নিজ হাতেই সৃষ্টি করেছে সত্য, কিন্তু সকল বন্ধন, সকল শাসনের মধ্যে থেকেই মানুষের মন সর্ব্ব-বন্ধন-মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় কেঁদে মরেছে। মুক্তির এই অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, এই চিরন্তন ক্রন্দন কোনোদিন দূর হয়নি ব'লেই কোনো নির্দ্দিষ্ট শাসন অথবা বিধি-ব্যবস্থা অধিক-দিন প্রতিষ্ঠা লাভ কর্‌তে পারেনি। খৃষ্টীয়ান ধর্ম্ম-জগতে একদিন পোপের রাজত্ব ছিল। এমন যে ক্ষমতাশালী সম্রাট তাকেও পোপের পদানত হ'তে হয়েছে; ভারতবর্ষে এক-দিন ব্রাহ্মণের আধিপত্য ছিল, সমাজ-ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণই ছিলেন নায়ক; কিন্তু পোপের ব্রাহ্মণের আধিপত্য আজ আর নাই। রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় এমন-একদিন ছিল যখন রাজাই ছিলেন রাষ্ট্রের সর্ব্বময় প্রভু, তাঁর ইচ্ছাই ছিল আইন, খেয়ালই ছিল বিচার; কিন্তু সেদিন আজ গিয়েছে। তা'র পর এমন ব্যবস্থাও ছিল যখন অভিজাত-সম্প্রদায়ের শ্রেণী-বিশেষ সমস্ত রাষ্ট্র-ব্যবস্থাটা পরিচালনা কর্‌ত। সে ছিল ধনতন্ত্রের, আভিজাত্যের শাসন। এই আভিজাত্যের প্রতিষ্ঠা আজও নানান্ দেশে নানান্ সমাজে নানান্ রাষ্ট্রে অল্প-বিস্তর বিদ্যমান। কিন্তু কোনো বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের সর্ব্বময় আধিপত্যের দিনও আজ গিয়েছে একথা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে। মানুষ দেখেছে কি ধর্ম্মে, কি সমাজে, কি রাষ্ট্রে এক যেখানে কর্ত্তা, যেখানে একজনের অঙ্গুলি-হেলনে সমস্ত কর্ম্ম-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয়, জনগণের মন সেখানে স্ফূর্ত্তিলাভ কর্‌তে পারে না, মুক্তির দিশা সেখানে হারিয়ে যায়। একা পোপ বা একা রাজা যে সমাজে বা রাষ্ট্রে সর্ব্বময় প্রভুত্ব বিস্তার করেছে, সে-রাষ্ট্রের বিধি-ব্যবস্থায় আর কারো কোনো হাত

থাকে না, সমাজ বা রাষ্ট্রের আরো বিধি-ব্যবস্থায় সে মিশিয়ে থাকে না। একের বিধি-ব্যবস্থা বহুর স্বাধীন আত্মা, স্বাধীন মনের চিন্তা ও কর্মধারাকে পি'ষে মারে; একের অনলে বহুকে আহুতি দিতে গিয়ে বহুর অস্তিত্ব সেখানে লোপ পায়। প্রশ্ন উঠ্‌তে পারে একের ব্যবস্থা কি বহুর মঙ্গলকর হয় না? রাজা সর্ব্বময় প্রভু হ'লে রাষ্ট্রের কি সুব্যবস্থা হয় না, রাষ্ট্রের অধীন জনগণের জীবনমনের উন্নতিসাধন কি হয় না? ইতিহাসে কি সে প্রমাণ নেই?—আছে। য়ুরোপে মধ্যযুগে (Middle Ages) ফ্লোরেন্সের মেডিচি (Medici) রাজবংশ ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ। ফ্লোরেন্স্ যে তখন ব্যবসা-বাণিজ্যে, শিল্পকলায় সকল ক্ষেত্রে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার কর্‌তে পেরেছিল তা এই রাজবংশের কৃপায়। প্রাচীন কালে গ্রীসের যথেচ্ছাচারের যুগে এথেন্সে পেসিট্রেটাস (Pesistratus) প্রভৃতি প্রজাপীড়করা এথেন্সের উন্নতির জন্য কম-কিছু করেননি। এথেন্স্ তখন ধনে-জনে শিল্পে-সৌন্দর্য্যে ভ'রে উঠেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর য়ুরোপের ইতিহাসে enlightened বা benevolent despotsদের দান মোটেই তুচ্ছ কর্‌বার নয়। কিন্তু এসমস্ত স্বীকার ক'রে নিলেও একের শাসন, একের প্রভুত্ব বহুর মনের স্বাধীনতার, আত্মার বিকাশের পক্ষে কখনো মঙ্গলকর হ'তে পারে না। রাজার কল্যাণশাসনে যদি জনপদ স্বর্ণশস্যে ভ'রেও ওঠে, শাসনব্যবস্থায় প্রজাপুঞ্জ যদি সুখে ও ঐশ্বর্য্যে কালাতিপাতও করে তবু রাজার সর্ব্বময় প্রভুত্ব কিছুতেই কল্যাণকর হয় না; মানুষের স্বাধীন শক্তি ও কর্ম্মাকাঙ্ক্ষা প্রয়োগের অভাবে সেখানে লোপ পায়। যে সমাজ বা রাষ্ট্রের অধীনে মানুষ বাস করে প্রত্যেক মানুষ সেই সমাজের বা রাষ্ট্রের একটা স্বাধীন একক বা Independent Unit; তাকে বাদ দিলে সমাজ বা রাষ্ট্র সামান্য-পরিমাণে হ'লেও দুর্ব্বল হয়। ব্যষ্টিকে বাদ দিলে সমষ্টির রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক সত্তা কল্পনা করা চলে না। কাজেই সমষ্টির সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ব্যষ্টির প্রত্যেকের একটা বিশিষ্ট স্থান কল্পনা করা স্বাভাবিক এবং থাকাই উচিত। সেইজন্যে একের আধিপত্য জনগণের পক্ষে পার্থিব সুখসমৃদ্ধির হিসাবে কল্যাণকর হ'লেও মানবমনের মুক্তি ও স্বাধীনতার পরিপন্থী। রাজা যদি রাষ্ট্রের এক এবং অদ্বিতীয় প্রভু হন এবং রাষ্ট্রের সকল কর্ম্মব্যবস্থা আপন হাতেই পরিচালনা করেন, তা হ'লে প্রজাপুঞ্জ সে-রাষ্ট্রকে কখনও আপন বলে' মনে কর্‌তে পারে না; স্বাধীন চিন্তা ও কর্ম্মশক্তি লোপ পেয়ে ক্রমে দাসমনোভাব সেখানে প্রসার লাভ করে। তাই আমরা দেখেছি ইতিহাসে এমন দিন এসেছে যখন চারিদিকে রাজার মুকুট খ'সে পড়েছে, মানুষ কোনো-একটা নির্দ্দিষ্ট রাজশক্তির প্রভুত্ব অস্বীকার কর্‌বার জন্যে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে পড়েছে সে নিজে নিজের প্রভু হ'তে চেয়েছে। কেবল এক যেখানে সর্ব্বময় প্রভু সেখানেই এই ভাব জেগেছে তা নয়—কোনো এক বিশিষ্ট সম্প্রদায় ধন বা আভিজাত্যের প্রতিষ্ঠায় যেখানে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পরিচালনা করেছে সেখানেও এই একই ব্যাপার দেখা গেছে। সম্প্রদায়-বিশেষের প্রভুত্ব কিছুতেই গণশক্তির দাবীদাওয়ার সম্মুখে টিঁকে থাক্‌তে পারেনি; সকল-রকম আভিজাত্যের প্রতিষ্ঠা বারবার মাটির ধূলায় লুটিয়ে পড়েছে। হাজার-হাজার বছর ধ'রে মানুষের খেলাঘরে সমাজ-ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার উলটপালট চলেছে; এতদিন মানুষ হয় একের, না হয় কোনো সম্প্রদায়-বিশেষের শাসনব্যবস্থার কাছে মাথা হেঁট ক'রে এসেছে। মানুষ-হিসাবে মানুষের যে একটা স্বাভাবিক দাবি আছে, নিজের শাসন ও বিধিব্যবস্থা প্রণয়নে একটা স্বাধীন অধিকার আছে, নিজে-নিজে প্রভু হবার যোগ্যতা আছে, গণশক্তি এ-কথা ভাব্‌তেও পারেনি। ইতিহাসে তাই বারবার দেখা গেছে, দেশ যতবার পররাষ্ট্রদ্বারা আক্রান্ত হয়েছে, যতবার দেশের স্বাধীনতা বিলোপের আশঙ্কা হয়েছে, ততবার দেশের গণশক্তি আপন বুকের রক্ত দিয়ে স্বদেশ রক্ষা এবং উদ্ধার ক'রে স্বাধীনতার জয়োল্লাসে মেতে উঠেছে; কিন্তু ঘরে ফিরে এসে পরক্ষণেই স্বদেশী রাজার সর্ব্বময় প্রভুত্বের নীচে মাথা নুইয়ে দিয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যদিন পর্য্যন্ত গণতন্ত্রের পীঠস্থান য়ুরোপে আমরা এই ব্যাপারই প্রত্যক্ষ করেছি। মানুষ-হিসাবে মানুষের অধিকারসম্বন্ধে সজাগ হ'য়ে গণশক্তি কোথাও আপনার হাতে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার দায়িত্বভার তুলে নেয়নি।

একশ' বছর আগেও য়ুরোপে এক সুইট্‌সার্‌ল্যাণ্ডের

কয়েকটি ক্যান্টন্ (Canton) ছাড়া আর কোথাও গণতন্ত্র রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রচলন ছিল না। ইংলণ্ড্ তার চাইতে অনেকটা বেশী স্বাধীনতা ভোগ করত বটে, কিন্তু তার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাটা ছিল বরাবরই অলিগার্কিক (Oligarchic) বা মুখ্যতান্ত্রিক ; গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রচলন সেখানে ছিল না। ১৭৮৭-৮৯ খৃষ্টাব্দে মার্কিন স্বাধীনতা আন্দোলনের পর সেখানে যখন সংহততন্ত্রের বা চুক্তিবদ্ধ সখ্যনীতির (Federal Constitution) প্রচলন হয় তখন এক সুইট্‌সার্‌ল্যাণ্ড্ বা প্রাচীন এথেনীয় গণতন্ত্রের নজীর ছাড়া শাসনব্যবস্থা প্রণেতাদের সাম্‌নে আর কোনো নজীর ছিল না। কিন্তু একশতাব্দীর মধ্যে রাষ্ট্রব্যবস্থার কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তনই হ'য়ে গেল! পৃথিবীর সর্ব্বত্র আজ রাজতন্ত্রের অবসান ঘটেছে; সর্ব্বত্র গণশক্তি আজ আপনার মাথা তোল্‌বার প্রয়াস করছে। কিন্তু তার চাইতেও বেশী লক্ষ্য কর্‌বার বিষয় হচ্ছে পৃথিবীর সকল মানুষের মনোভাবের পরিবর্ত্তন। গত মহাযুদ্ধের পরে অবশ্য রাষ্ট্রীয়-ব্যবস্থার ভিতর ধনসাম্য, রাষ্ট্রসাম্য ইত্যাদি অনেক নূতন-নূতন সমস্যা এসে গিয়েছে; কিন্তু যুদ্ধের পূর্ব্বে এক-শতাব্দী যে সম্পূর্ণ গণতন্ত্রেরই যুগ—একথা জোর ক'রেই বলা যেতে পারে। যদিও সকল দেশেই গণতন্ত্র-রাষ্ট্র-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন হয়নি, কিন্তু গণতান্ত্রিক আন্দোলন সকল দেশেই কম-বেশী দেখা গিয়েছিল এবং "Equal rights and equal privileges for all men" এর (সকল মানুষের জন্ত সমান সুবিধা ও সমান অধিকার) আদর্শে সকলে অনুপ্রাণিত হ'য়ে উঠেছিল। গণতন্ত্রই যে একমাত্র স্বাভাবিক ও প্রকৃতিসিদ্ধ রাষ্ট্র-ব্যবস্থা একথা সকলেই স্বীকার কর্‌তে বাধ্য হয়েছিলেন এবং এখনও অনেকে গণতন্ত্র-শাসন-পদ্ধতিকেই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় শেষ-কথা ব'লে মনে করেন। অর্দ্ধশতাব্দী আগেও গণশক্তি যখন দ্রুত-পদবিক্ষেপে আপন ন্যায্য অধিকারটুকু আয়ত্ত ক'রে নেবার জন্ত স্থির লক্ষ্যের পানে অগ্রসর হচ্ছিল, য়ুরোপের সমগ্র শিক্ষিত সমাজ তখন ভয়ে আঁৎকে উঠেছিল, শান্তি ও শৃঙ্খলার পরিপন্থী ব'লে গণশক্তির সকল বিকাশকে চেপে মার্‌বার উপক্রম করেছিল। কিন্তু সেদিন আর এদিন এ-দুয়ের মাঝখানে মস্ত একটা ব্যবধান।

গণতন্ত্র কথাটা মোটেই আজকার নতুন সৃষ্টি নয়। খৃষ্ট জন্মাবার তিনশ' বছর আগে ঐতিহাসিক হেরোডোটাসের (Herodotus) সময় থেকে এই কথাটার প্রচলন হ'য়ে এসেছে। গণতন্ত্র বল্‌তে আমরা মোটামুটি বুঝি একটা শাসন-যন্ত্র—যার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কলকাঠিটি কোনো নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি, শ্রেণী বা শ্রেণীসমূহের হাতে ন্যস্ত নয়; শাসন-যন্ত্রের আগাগোড়া সমস্ত ব্যবস্থাটি যেখানে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে শাসিত ভূমিখণ্ডের সমস্ত অধিকারীর হস্তে ন্যস্ত। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় বিধি-ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সকল গণের, দেহ, মন ও আত্মা মিশে থাকা চাই। একথা আমাদের মনে রাখ্‌তে হবে যে, গণতন্ত্র-রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাটা শুধু একটা প্রাণহীন শাসনযন্ত্র মাত্র নয়। আমরা আগে বলেছি সমাজবন্ধন, রাষ্ট্রবন্ধন, সকল বন্ধনের মাঝে থেকেও মানুষ সর্ব্বদা সর্ব্ববন্ধনমুক্তির অন্বেষণ করেছে। গণতন্ত্র মানুষের সর্ব্ববন্ধনমুক্তির পরিপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার একটা বহির্বিকাশ। কিন্তু কোনো যন্ত্রই মানুষকে মুক্তি দিতে পারে না, যদি সে-যন্ত্রের সঙ্গে প্রাণশক্তির সংযোগ না থাকে। গণতন্ত্রকে সফল কর্‌তে হ'লে তা'তে প্রাণ-রসের অভিসেচন চাই। শুধু যন্ত্র বা কাঠামোর উপর নির্ভর কর্‌লে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা মুক্তিপিপাসুর অন্তরে শান্তি দিতে পারে না।

বলা হয়েছে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় সকল অধিবাসীর সমান অধিকার থাক্‌বে। কিন্তু একটা রাষ্ট্রব্যবস্থাতে একটা ভূমিখণ্ডের সকল অধিবাসীর হাতে থাক্‌বে, সোজা-সুজিভাবে সকলের মতামত নিয়ে একটা রাষ্ট্র চল্‌বে একি সর্ব্বত্র সম্ভব? যে-দেশ লোকসংখ্যায় বা আয়তনে বড় সে-দেশে এই সোজাসুজি গণতন্ত্রের (direct democracy) প্রচলন সম্ভব কি? প্রাচীন কালে এথেন্সে অথবা আধুনিক কালে সুইট্‌সার্‌ল্যাণ্ডে যে এই সোজাসুজি গণতন্ত্রের প্রচলন আমরা দেখ্‌তে পাই, তার কারণ হচ্ছে এই, দুই জায়গাতেই দেশের আয়তন ও লোকসংখ্যা ভারত-বর্ষ, আমেরিকা বা অন্যান্য সব দেশের তুলনায় নিতান্তই মুষ্টিমেয়। কাজেই শাসন-যন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ-ব্যাপারে সকলেই মতামত দিতে পারে, ভোট দিতে পারে। গণতন্ত্রের এই হচ্ছে নিখুঁত আদর্শ। কিন্তু বড়-বড় দেশে গণতন্ত্র-

শাসনব্যবস্থা কি ক'রে চল্‌তে পারে ? দেখা গিয়েছে সোজা গণতন্ত্র বা direct democracy সেখানে চলে না। কাজেই সেখানে গণতন্ত্র চালাতে হ'লে সংহতিতন্ত্রের অথবা চুক্তিবদ্ধ সখ্যনীতির আশ্রয় নিতে হয়। এই federal principle বা সংহতিতন্ত্র চলেছে আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যে। এই নীতি অনুসরণ করতে হ'লে একটা দেশকে অনেকগুলো ছোট-ছোট State (খণ্ডরাষ্ট্র) এ ভাগ ক'রে নিতে হয়। প্রত্যেকটা বিভিন্ন রাষ্ট্রে গণতন্ত্র শাসন-প্রণালীতে রাষ্ট্রীয় ব্যাপার নিষ্পন্ন করতে হয় এবং প্রত্যেকটা State একটা চুক্তিবদ্ধ সখ্যে আবদ্ধ থাকে। এই একত্র সখ্যবদ্ধ (State Government) ষ্টেটগবর্ণমেণ্ট্‌-গুলির আবার একটা কেন্দ্র গবর্ণমেণ্ট্‌ (Central Government) থাকে। Federal Principle বা সংহতিতন্ত্রের ইহাই হচ্ছে মোটামুটি নিয়ম।

কিন্তু প্রশ্ন উঠ্‌তে পারে জনগণের সর্ব্বসাধারণের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বল্‌তে আমরা কি বুঝি ? কোনো রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে গণশক্তির অধিকার বল্‌তে আমরা কি সেই নির্দ্দিষ্ট ভূমিখণ্ডের সকল লোককেই বুঝি না শুধু পৌর-অধিকার (civic right) যাদের আছে তাদের বুঝি ? দক্ষিণ কেরোলিনা ও ট্রান্সভ্যালে বেশীর ভাগ লোকই "কালা আদমি" ব'লে রাষ্ট্রশাসন-ব্যাপারে তাদের কোনো ক্ষমতাই নেই। কিন্তু পৌরজন ব'লে যাদের ধরা হয়, civic right (নাগরিকের অধিকার) যাদের আছে (qualified citizens যারা) তাদের সকলেরই শাসন-ব্যবস্থায় হাত আছে। এ অবস্থায় দক্ষিণ কেরোলিনা বা ট্রান্সভ্যালে গণতন্ত্র শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত একথা বলা চলে কি না। পর্ত্তুগালে ও বেলজিয়ামে নারীদের ভোটা-ধিকার নেই, কিন্তু নরওয়ে ও জার্ম্মানীতে আছে ; এদের গণতন্ত্র বলা যায় কি ? আবার এমন দেশও আছে যেখানে সকল প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীর শাসন-বিষয়ে মতামতের অধিকার আছে, কিন্তু কতকটা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অভিজাত-সম্প্রদায়ের মুঠোর চাপে রেখে দেওয়া হয়েছে। গত মহা যুদ্ধের আগে জার্ম্মানী এবং অষ্ট্রিয়াতে এমনটি ছিল। এমন দেশের শাসনতন্ত্রকে গণতন্ত্র বলা যাবে কি না ? এমনি-ধারার অনেক প্রশ্নই উঠেছে। এই যে বিভিন্ন শাসন ব্যবস্থা—এতে জনসাধারণের অধিকারের পার্থক্য আছেই। নামে কি যায় আসে ? কোন্‌টাকে ডেমোক্র্যাসি বল্‌ব কোন্‌টাকে বল্‌ব না, সে-তর্কের কোনো প্রয়োজন নেই। আসলে দেখ্‌তে হবে কোন্‌ শাসন ব্যবস্থায় জনসাধারণের অর্থাৎ দেশে যত মানুষ বাস করে জাতি, ধর্ম, ক্ষমতা এবং বর্ণনির্ব্বিশেষে সকলের অধিকার কতটুকু ? অনেকে ভুল করেন রিপাব্লিক বা সাধারণতন্ত্রে—ডেমোক্র্যাসি বা গণতন্ত্রে এবং ভাবেন, যে রাষ্ট্রে মাথার উপর একজন রাজা থাকেন সে রাষ্ট্র কিছুতেই গণতন্ত্র হ'তে পারে না। এ যে কত বড় ভুল তা আজ সকলেই বুঝ্‌তে পারেন। ইংলণ্ডে ও নরওয়েতে রাষ্ট্রের মাথার উপর একজন রাজা আছেন, তাই ব'লে ইংলণ্ড ও নরওয়ের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা জন-সাধারণের মতামতের সম্মান রক্ষা করে না একথা বলা চলে না। নামে একজন রাজা আছেন অথচ শাসন-যন্ত্রটি অল্পাধিক-পরিমাণে জনগণের মতামতের এবং কর্ম্ম-ব্যবস্থার উপর নির্ভর করছে একথা বল্‌লেই বুঝ্‌তে হবে গণশক্তি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাটাকে এবং রাজ-কার্য্যটা'ক রাজার হাত থেকে কেড়ে নিজেদের হাতে নিয়ে এসেছে, রাজার কিংবা রাজকার্য্য নির্ব্বাহ কর্ত্তাদের (Executive) হাতে 'শাসন' ছেড়ে দেয়নি। জনসাধারণই সমস্ত রাজকার্য্যের পথ বাত্‌লিয়ে দেয়, রাজা শুধু নাম দস্তখৎ করেন এবং রাজকর্ম্মচারীরা (Executive) সেই বাতলানো-পথে নিতান্ত অনুগত ভৃত্যটির মত পথ চলেন—একটু এদিক্‌-ওদিক্‌ হ'লেই দেশসুদ্ধ লোক ক্ষেপে ওঠে, মন্ত্রিসভা বিদায় গ্রহণ করে এবং সমস্ত দেশ নতুন নীতির প্রতিষ্ঠাকল্পে নতুন উৎসাহে মেতে ওঠে—রাজা শুধু সব-কাজেই মাথা নেড়ে যান মাত্র। পক্ষান্তরে এমন অনেক সাধারণতন্ত্র আছে যা ডেমোক্র্যাসির ধার দিয়েও যায় না। সাধারণতন্ত্র হ'লেও সেখানে একের অথবা অন্য কোনো নির্দ্দিষ্ট অভিজাত-সম্প্রদায়ের সর্ব্বময় প্রভুত্ব চলেছে। কাজেই বেশ বুঝা যাচ্ছে নামে কিছু আসে যায় না। দেখ্‌তে হচ্ছে রাষ্ট্রের সমস্ত ব্যাপারে দেশবাসীর হাত আছে কি না, যে রাষ্ট্র-সংরক্ষণে দেশবাসী সকলে অর্থ ও রক্ত দিচ্ছে, সে অর্থের আয় ও ব্যয়ে এবং রক্তের মর্য্যাদা-ক্ষয়ে ও রক্ষণে সমস্ত দেশবাসীর মতানুকূল্য আছে কি না। যে-শাসন-ব্যবস্থায়

যে-পরিমাণে জনসাধারণের এই অধিকার আছে, সে শাসন-ব্যবস্থা সেই-পরিমাণে গণতান্ত্রিক বা democratic.

মানুষ প্রথমে ভাব্‌ত রাষ্ট্র বুঝি একটা কৃত্রিম ব্যবস্থা। আপাতদৃষ্টিতে তা কৃত্রিম ব্যবস্থা বলে'ই মনে হয়। কিন্তু আজ একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হ'য়ে গিয়েছে যে, রাষ্ট্র কৃত্রিম ব্যবস্থা নয়, সমাজের মতন রাষ্ট্রও একটা স্বাভাবিক ব্যবস্থা এবং মানুষের মতনই রাষ্ট্র জীবনীশক্তি-সম্পন্ন ও গতিশীল। এই যে আজ নানান্ দেশে জনমত-শাসনের প্রাধান্য দেখ্‌তে পাচ্ছি, এত রাষ্ট্রের গতি-শীলতারই পরিচয়। প্রথম হ'তেই কোনো রাষ্ট্রে নিশ্চয়ই বর্ত্তমানের শাসন-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল না—হাজার যুগের ক্রমবিকাশের ফলে হয়ত আজ জনমত শাসনপদ্ধতি সর্ব্বত্র মাথা তুলেছে। কিন্তু এই ক্রমবিকাশের ধারাটি কোন্ পথ ধ'রে চ'লে এসেছে? মানুষ কি একের শাসন * একের প্রভুত্ব কিংবা কোনো সম্প্রদায়ের আধিপত্য সহ্য কর্‌তে না পেরে অত্যাচারে অবিচারে জর্জ্জরিত হ'য়ে বহুর শাসনের পক্ষপাতী হ'য়েছে, না রাষ্ট্রীয় বিধি ব্যবস্থায় এক-মাত্র জনগণেরই শুদ্ধ অধিকার, শাসন-ব্যাপারে একমাত্র স্বাভাবিক দাবি তাদেরই—এই স্থির বিশ্বাস থেকেই গণতন্ত্রকেই স্বাভাবিক ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ব'লে স্বীকার করেছে? এইদুটো শক্তি থেকেই গণতন্ত্র শাসন-প্রণালীর উদ্ভব। এইদুটির কোন্ শক্তিটি জনমত শাসন-প্রণালীর প্রচলনে কতখানি ক্রিয়া করেছে সেটাই এখন দেখা যাক্।

'প্রাচীন প্রাচী'র অবগুণ্ঠনতলে সভ্যতার যেদিন প্রথম উন্মেষ হ'ল সেদিন দেখা গেল, সকল দেশে সকল রাষ্ট্রেই রাজার শ্বেতচ্ছত্রছায়া প্রজাপুঞ্জকে আশ্রয় দিচ্ছে। যেখানে রাষ্ট্র গ'ড়ে ওঠেনি সেখানে হয়ত সংঘকর্ত্তার আশ্রয়ের নীচে সংঘের সকলে আশ্রয় নিয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষসন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রাচ্যে সর্ব্বত্র এই রাজতন্ত্র রাষ্ট্রপদ্ধতির প্রচলন ছিল। গণতন্ত্র-রাষ্ট্র-ব্যবস্থা প্রাচীন ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, আধুনিক ঐতিহাসিক গবেষণায় তাহা প্রমাণিত হয়েছে, কিন্তু ব্যাপকভাবে তাহা কোথাও ছিল না; গ্রাম্য সভায়, ব্যবসাদারের সমিতিতে কিংবা খণ্ড রাষ্ট্রে এই শাসন প্রচলিত ছিল। কিন্তু এসব কথা আজও ঐতিহাসিক গবেষণার বিষয়; কাজেই এ-সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে কিছুই বলা যাচ্ছে না। রাজা যদি স্বেচ্ছাচারী কিংবা অত্যাচারী হ'তেন, প্রজাপুঞ্জ মনে কর্‌ত এ তাদের কপালের লিখন, গ্রহের ফের। রাজা যে সব-সময়ই স্বেচ্ছাচারী বা অত্যাচারী হ'তেন এমন নয়। অশোক আকবর বা আলাদিনের মতন রাজা যখন রাজত্ব কর্‌তেন, রাজ্যে যখন অপেক্ষাকৃত শৃঙ্খলা ও সুব্যবস্থা বিরাজ কর্‌ত, প্রজাপুঞ্জ ভাব্‌ত এও বিধাতারই দান, তাঁরই অনুগ্রহ। এমন ক'রেই বরাবর তা'রা রাজার শাসন মাথা পেতে মেনে এসেছে। মাঝে-মাঝে বিদ্রোহ-বিপ্লবের ফলে কোনো রাজাকে সিংহাসনচ্যুত হ'তে হয়েছে বটে, কিন্তু রাজ-সিংহাসন কোনো সময়ই মাটির ধুলায় লুটিয়ে পড়েনি; সমস্ত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে উল্‌টিয়ে দেবার কল্পনা কারু মাথায় জাগেনি।

প্রাচীন কালে পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে মিশর, পারস্য অথবা ভারতবর্ষের মতন রাজার এত বড় রাজত্ব ছিল না। মানুষ ছোট-ছোট ভাগে সংঘবদ্ধ হ'য়েই একজন সংঘপতির অধীনে বাস কর্‌ত এবং প্রয়োজন হ'লে সকলে মি'লে একজায়গায় জড় হ'য়ে একটা বিধিব্যবস্থা কর্‌ত। গ্রীস, ইতালী অথবা ফিনিসিয়া ছাড়া সেখানে আর কোনো সুগঠিত রাষ্ট্র গ'ড়ে উঠেনি। এই গ্রীস ইতালী ও ফিনিসিয়ার রাষ্ট্রব্যবস্থাটা প্রথম রাজতন্ত্রই ছিল কিন্তু রাজার সর্ব্বময় আধিপত্য ধনী ও অভিজাত-সম্প্রদায় সইতে পার্‌ত না; কাজেই বারংবার বাধা-প্রদানের ফলে রাষ্ট্রব্যবস্থাটা তাদের হাতে চ'লে আসে, কিন্তু তাদের অত্যাচারে অবিচারে এবং ক্ষমতার অন্যায় প্রয়োগে জনসাধারণ ক্ষিপ্ত হ'য়ে উ'ঠে রাষ্ট্রব্যবস্থাটা নিজেদের করায়ত্ত ক'রে নেয়। এই যে রাজতন্ত্র থেকে মুখ্যতন্ত্র, মুখ্যতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন,

* একের শাসন Rule of the One—Monarchy; Tyranny (Tyranny in Greece did not necessarily mean arbitrary and oppressive rule)

সম্প্রদায়-বিশেষের আধিপত্য Rule of the Few—Oligarchy, Aristocracy: The rule of a class based on birth or property qualification.

বহুর শাসন: Polity or Democracy (Rule by the People or Demos)

গ্রীক রাষ্ট্রগুরু আরিস্ততলের মতে এই হচ্ছে রাষ্ট্রব্যবস্থার সাধারণ নিয়ম। রাষ্ট্রের বিধিব্যবস্থায় জনগণের একটা বিধিসঙ্গত দাবি আছে এমন-কোনো ভাব থেকে প্রাচীন কালের গণতন্ত্রের উদ্ভব হয়নি। একের অথবা কোনো সম্প্রদায়-বিশেষের অত্যাচার-অবিচারের হাত হ'তে মুক্তি পাবার জন্যই প্রাচীনকালে গণতন্ত্রের সৃষ্টি হয়েছিল। আইনের চোখে সকলেই সমান হবে,প্রাচীন গ্রীসের ইহাই ছিল মূলতন্ত্র এবং এই নিয়েই যত বিদ্রোহবিপ্লব ঘটে ও অবশেষে গণতন্ত্র রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রবর্ত্তন হয়। মানুষ-মাত্রেরই যে কতগুলি জন্মসুলভ বিধিসঙ্গত দাবি ও অধিকার আছে, এসব কথার সৃষ্টি তখন হয়নি। গ্রীসে যে কারণে গণতন্ত্রের সৃষ্টি হয় প্রাচীন রোমেও সেই কারণেই গণতন্ত্রের উদ্ভব সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু রোমের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কোনো সময়ই পুরাদস্তুর গণতন্ত্র হ'য়ে উঠ্‌তে পারেনি। মানুষ-হিসাবে মানুষের কোনো 'থিওরী' প্রাচীন দর্শনে অথবা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কোথাও ছিল না। ছিল না যে তার প্রমাণ দাসত্বপ্রথা। এই দাসত্বপ্রথা প্রাচীন গ্রীস ও রোম—গণতন্ত্রের দুই মহাপীঠস্থান—এই দুই জায়গাতেই প্রচলিত ছিল। মনুষ্যত্বের অবমাননার কথা তাদের মনে জাগ্‌ত না। একথা তা হ'লে সহজেই বুঝা যায় যে, প্রাচীন গণতন্ত্রের সৃষ্টিকর্ত্তারা কোনো থিওরীর ধার ধারতেন না—অত্যাচার, অবিচার, অনাচারের হাত হ'তে মুক্তি পাওয়াই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। এ-সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ Bryce-সাহেব বল্‌ছেন—

"The earlier steps towards democracy came not from any doctrine that the people have a right to rule, but from the feeling that an end must be put to lawless oppression by a privileged class.......The development of popular or constitutional governments as we see in Hellenic or Italic peoples of antiquity was due to the pressure of actual grievances far more than to any theories regarding the nature of government and claims of the people." (Modern Democracies. Vol. I.).

"জনসাধারণের রাষ্ট্রপরিচালনায় অধিকার আছে, এমন-কোনো নীতির জোরে গণতন্ত্রের অঙ্কুর উদ্ভূত হয়নি; হয়েছিল ক্ষমতাপ্রাপ্ত সম্প্রদায়-বিশেষের অরাজক অত্যাচারের অবসান করার ইচ্ছায়। প্রাচীন হেলেনিক কি ইতালীয় জাতিসমূহে যে গণতন্ত্রের বিকাশ দেখ্‌তে পাই তা শাসন-তন্ত্র-সম্বন্ধে অথবা জনগণের অধিকার-বিষয়ক কোনো মতবাদের ফলে ততটা হয়নি, যতটা হয়েছিল, বাস্তব অভিযোগের তাড়নায়।"

রোম যেদিন গণশক্তির শাসন অগ্রাহ্য ক'রে সম্রাটের রাজদণ্ডের কাছে মাথা নুইয়ে দিলে সেই দিন থেকে তা'র পতন সুরু হ'ল। রোম-সাম্রাজ্যের ইতিহাস তার পতনের ইতিহাস। রোমে সাধারণ-তন্ত্র পতনের সঙ্গে-সঙ্গে প্রাচীন গণতন্ত্রের অবসান হ'ল। গণশক্তির সম্মিলিত হবিঃ প্রদানে যে যজ্ঞশিখাটি মানব-ইতিহাসের প্রাচীন যুগটিকে উজ্জ্বল ক'রে রেখেছিল, রোম এক-ফুৎকারে তাকে নিভিয়ে দিলে। তা'র পর সুদীর্ঘ শতাব্দীর পর শতাব্দী পাশ্চাত্য সভ্যতার বুকের উপর কেবলি অন্ধকার। এই অন্ধকারের ভিতর কোথাও-কোথাও গুণীজন জ্ঞানবিজ্ঞানের আলো জ্বালিয়েছেন বটে, কিন্তু শাসন-ব্যবস্থা উন্নত কর্‌বার জন্য, রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের জন্য কেউ এতটুকু প্রয়াসও করেনি। মানুষ রাজনীতির ধার মাড়িয়েও যেতে চাইত না; স্বাধীন রাষ্ট্র-ব্যবস্থার প্রচলনের চেষ্টা ক'রেও কৃতকার্য্য হ'তে না পেরে হাল ছেড়ে দিয়েছিল। তাই স্বেচ্ছাচারী রাজদণ্ড সর্ব্বত্র মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

এই অন্ধকারের যুগ পার হ'য়ে আমরা যখন বর্ত্তমান যুগে এসে পৌঁছই এবং নবযুগের আলোক দেখ্‌তে পাই তখন য়ুরোপ জুড়ে অনেকগুলি ছোট-বড় রাজ্য গ'ড়ে উঠেছে এবং প্রত্যেক সীমারেখা-বেষ্টিত দেশ ও রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা ও অদ্বিতীয় অধীশ্বর হ'য়ে বিরাজ কর্‌ছেন একজন রাজা। এই রাজার যথেচ্ছশাসনের উপর কারু কিছু বল্‌বার ছিল না; কারণ তা'র অধিকার ছিল "ভগবৎসিদ্ধ"। এর ইংরেজী সূত্র হচ্ছে "Kingship existed by divine right"। এই রাজশক্তির যথেচ্ছাচারকে সংযত কর্‌বার ক্ষমতা আর কারো ছিল না। কিন্তু য়ুরোপের বুকের

উপর যা হচ্ছিল ইংলণ্ডে ঠিক তাই হয়নি; ইংলণ্ডের ইতিহাস য়ুরোপের ইতিহাস থেকে অনেকটা বিভিন্ন। য়ুরোপে রাজার এই একচ্ছত্র আধিপত্য ও divine right theory (দৈব অধিকারের মতবাদ) ভেঙে চূর্‌মার ক'রে মাটির ধূলায় মিশিয়ে দিলে ফরাসী-বিপ্লব; সে বিপ্লবের অগ্নিশিখা মধ্যযুগের ফিয়ুড্যাল্ প্রথার ভগ্নাবশেষের বুকে আগুন লাগিয়ে, রাজসিংহাসন ভস্মীভূত ক'রে, আভিজাত্যের গর্ব্ব পুড়িয়ে দিয়ে জনগণের প্রাণে মুক্তির তিয়াষা জাগিয়ে দিলে। এযুগে সেই দিন থেকে য়ুরোপে গণশক্তির উদ্ভব। কিন্তু ইংলণ্ডের ইতিহাস চলেছে অন্য একটা ধারা বেয়ে। দ্বীপ ব'লে ইংলণ্ডের একটা সুনির্দ্দিষ্ট সীমা রেখা ছিল এবং নানান্ কারণেই সে য়ুরোপীয় ব্যাপার হ'তে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখ্‌তে পেরেছিল। কাজেই য়ুরোপীয় রাজন্যবর্গ যখন নিজেদের মধ্যে সীমারেখা নিয়ে মারামারি কাটাকাটি কর্‌তে ব্যস্ত, ইংলণ্ডে তখন রাজায়-প্রজায় ক্ষমতা ও অধিকারের দাবি-দাওয়া নিয়ে মস্ত একটা tug-of-war (দ্বন্দ্বযুদ্ধ) সুরু হ'য়ে গিয়েছে। স্বাধীন ও লোকমতের উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার আন্দোলন ইংলণ্ডে সুরু হয়েছিল সেই টুডর (Tudor) রাজাদের যুগ থেকে, কিন্তু তা পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে ফরাসী বিপ্লবেরও ঢের পরে। প্রথম চার্ল্‌সের মস্তকাহুতি পেয়ে ইংলণ্ডের জনগণের বুকের উপর যে যজ্ঞাগ্নি জ্ব'লে উঠেছিল সে আগুনের হবিস্তৃষ্ণা মিটেছে সেদিন ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে যেদিন সকলে রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় অধিকার পেয়েছে। সুদীর্ঘ তিনশো বছরের এই বিবর্ত্তনের ইতিহাসে দেশের কৃষাণ ও শিল্পীকুলের কোনো স্থান নেই। এক ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের রিফর্ম্-বিল ছাড়া তা'রা কোনো দিনই কোনো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার জন্য আন্দোলন করেনি। প্রাচীন ও জীর্ণ শাসন-যন্ত্রটাকে ভেঙেছিল মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়; তা'রা মনে কর্‌ত রাজার ইচ্ছার চাইতে পার্লামেন্টের ইচ্ছাটা বড়; পার্লামেন্ট্‌কে প্রাধান্য দেবার জন্যই তা'রা সচেষ্ট হয়েছিল এবং সেই সূত্রে সকলেই কতকটা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হ'য়ে পড়েছিল। মানুষ-হিসাবে মানুষের দাবির কথা, রাষ্ট্র-সাম্যের কথা যে তাদের জানা ছিল না, তা নয়; মাঝে-মাঝে ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের Glorious Revolution-এর (বিদ্রোহের) সময়, ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের Reform Bill-র (সংস্কার আইন) সময় মানুষ এসব কথা আওড়াতে মোটেই কসুর করেনি কিন্তু এইসব abstract theory-র (নিছক মতবাদ) উপর ইংলণ্ডের অধিবাসীদের বিশ্বাস বরাবরই কম ছিল এবং আজও তাই আছে। প্রয়োজনের খাতিরেই ইংলণ্ড্ তা'র রাষ্ট্র-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন কর্‌তে বাধ্য হয়েছে; কোনো রাষ্ট্রীয় মতবাদ তা'কে এদিকে এক-পা অগ্রসর ক'রে দেয়নি, দিতে পারেনি। ঠিক এইজন্যই ইংলণ্ডে শাসনতন্ত্রের একটা বৈশিষ্ট্য দাঁড়িয়ে গেছে। ইংলণ্ডের এই গণতন্ত্র গ'ড়ে উঠেছে কোনো একটা নির্দ্দিষ্ট আদর্শ ধ'রে নয়—আজ পর্য্যন্তও ইংলণ্ডের কোনো লিখিত ব্যবস্থা-পত্র, বা Written Constitution বল্‌তে যা বুঝি, তা নেই। এই জিনিষটি আমার চাই; 'রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সকলকে অধিকার দিতে হবে,'মানুষ-হিসাবে তা'রা তাদের জন্মসুলভ অধিকার দাবি কর্‌তে পারে,'এমন কোনো আদর্শ চোখের সাম্‌নে ধ'রে আজ তা'রা গণতন্ত্রের সৃষ্টি করেনি; কোনো নির্দ্দিষ্ট লেখাপড়া করা আইনের পথ দিয়ে তা'রা বর্ত্তমানে এসে পৌছায়নি। কতগুলো সংস্কার, কতকগুলো আচার মেনে চ'লে-চ'লে তা'রা আজকার ব্যবস্থায় এসে পৌছেছে। রাজা কি-কি কর্‌তে পারেন, কি কর্‌তে পারেন না, কতদূর পর্য্যন্ত তাঁর ক্ষমতার সীমারেখা, রাষ্ট্রের বা শাসনতন্ত্রের কর্ত্তব্য কি, উদ্দেশ্য কি, রাষ্ট্রের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ কোথায় এবং কতটুকু, মানুষের জন্মগত অধিকার কি, এসব-সম্বন্ধে ইংলণ্ডের কনস্‌টিটিউশন আজপর্য্যন্তও নীরব। একসময় ইংলণ্ডের রাজশক্তি ইউরোপের বহু রাজশক্তির মতনই স্বেচ্ছাচারী এবং প্রজাপুঞ্জের সর্ব্বময় প্রভু ছিল। কিন্তু যুগের পর যুগ ধ'রে ইংরেজ জনসাধারণ কখনও মুখে প্রতিবাদ ক'রে, কখনও প্রাণের ভয় দেখিয়ে, কখনও মাথা কে'টে রাজশক্তিকে নানান্ দিকে ছেঁটে-কেটে এখন বর্ত্তমানে সেই শক্তিকে একটা ছায়ায় এনে দাঁড় করিয়েছে। রাজা একাজ কর্‌তে পারেন না, ওকাজ কর্‌বার ক্ষমতা তাঁর নেই, এশক্তি নেই, ও-শক্তি নেই, এইভাবেই রাজশক্তিকে তা'রা খর্ব্ব করেছে। 'নেতি' 'নেতি' ক'রেই তা'রা 'ইতি'তে এসে পৌছেছে। এইভাবেই তারা কন্‌স্‌টিটিউশ্যানাল

মনার্কির (Constitutional Monarchy) সৃষ্টি করেছে। ঠিক এই কারণেই অনেক দিন পর্য্যন্ত শাসন-যন্ত্রটার প্রতি তাদের দৃষ্টিটা ছিল খুব বেশী—যন্ত্রটা নিয়েই তা'রা মাতামাতি সুরু ক'রে দিয়েছিল। গণতন্ত্র রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা যে শুধু একটা শাসন-যন্ত্র মাত্র নয়, তা'র যে একটা প্রাণ আছে; একথা ইংলণ্ড বুঝেছে সেদিন ফরাসীবিপ্লবের পর।

কিন্তু ইংলণ্ডের নিজের ঘরের ছেলে হ'লেও আমেরিকার যুক্তরাজ্য-সম্বন্ধে এ-কথাটি খাটে না। যন্ত্র নিয়ে তা'রা মাথা ঘামায়নি মোটেই; গণতন্ত্রের মন্ত্র-শক্তিতেই তা'রা উদ্বুদ্ধ হ'য়ে উঠেছিল। শাসন-তন্ত্রের আত্মাটির সন্ধানেই তা'রা উন্মাদের মতন পথে বেরিয়েছিল। ধর্ম্মের যথেচ্ছাচার সইতে না পেরে যেদিন তা'রা কর্ত্তার ভূতটিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে ইংলণ্ডের উপকূল পরিত্যাগ ক'রে অজানা দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিল, সেইদিন থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধের শেষ দিনটি পর্য্যন্ত মুক্তি-মন্ত্রের সঞ্জীবনী স্পর্শে তাদের প্রাণটি কানায়-কানায় ভ'রে উঠেছিল। তাই তা'র স্বাধীনতার ও শাসন-তন্ত্রের প্রথম কথাই হচ্ছে,

"We hold these truths to be self-evident that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain inalienable rights, that among these are life, liberty and the pursuit of Happiness; that to secure these rights Governments are instituted delivering their just powers from the consent of the governed." (American Declaration of Independence 1776)

সব মানবই যে সমতুল্যরূপে সৃষ্ট হয়েছে, স্রষ্টার নিকট জীবন, স্বাধীনতা, সুখস্পৃহা প্রভৃতি কতকগুলি অনন্তদেয় অধিকার লাভ করেছে, এইসকল অধিকার-রক্ষার জন্যই রাষ্ট্র-যন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছে এবং শাসিতজন-বর্গের অনুমতি-ক্রমেই রাষ্ট্র ন্যায্য ক্ষমতা বিতরণ করছে, এসব কথা আমরা স্বতঃসিদ্ধ ব'লে মনে করি।

ঠিক একই মন্ত্রের উন্মাদন-রসে ফ্রান্সের জীবন-পাত্রও কানায় কানায় ভ'রে উঠেছিল। শাসন-যন্ত্রের দিকে মোটেই সে ফি'রে চাইলে না। যন্ত্র গড়্‌বার আগেই সে মন্ত্রের সৃষ্টি করলে। গণতন্ত্র-শাসন প্রণালীটাকে শুধু-শুধুই একটা প্রাণহীন দেহ ব'লে মনে করতে পারলে না, সে ভাবলে যে একে দিয়ে শুধু ঘরকন্না রাঁধা-বাড়ার কাজ সারিয়ে নিলেই চল্‌বে না; ভাবে, সৌন্দর্য্যে, রূপে, রসে, গন্ধে এই শাসনযন্ত্রের দেহটিকে ভ'রে দিতে হবে, তবেই মানুষ এ'কে ভালোবাস্‌তে শিখ্‌বে, আদর করতে শিখ্‌বে; তবেই গণতন্ত্র-শাসন-পদ্ধতি সার্থক হ'য়ে উঠ্‌বে। তা'র মুক্তির দিশা হচ্ছে এই —

"Men are born and continue equal in respect of their rights. The end of political society is the preservation of natural and imprescriptible rights of man. These rights are liberty, property, security and resistance to oppression.

All citizens have right to concur personally or through their representatives in making the law. Being equal in its eyes, then they are all equally admissible to all dignities, posts and public employments.

No one ought to be molested on account of his opinions."

(Declaration of Rights of Man made by the National Assembly of France, August 1791) .

"মানুষ সাম্যের অধিকার পেয়েই জন্মায় ও চলে। রাষ্ট্রীয় সমাজের লক্ষ্যই হচ্ছে মানুষের স্বাভাবিক অধিকার রক্ষা করা। স্বাধীনতা, সম্পত্তি, নিঃশঙ্কতা, এবং অত্যাচার-নিরোধের শক্তি এ-সকলই মানুষের সেই অধিকার।

"নাগরিকদের স্বয়ং অথবা প্রতিনিধির সাহায্যে পরস্পরের সহিত মিলিত হ'য়ে আইন প্রস্তুত করবার অধিকার আছে। আইনের চক্ষে সমতুল্য ব'লে তাহারা সব পদ, সম্মান ও রাষ্ট্রীয় কর্ম্মে সমভাবে নিয়োগের অধিকারী।
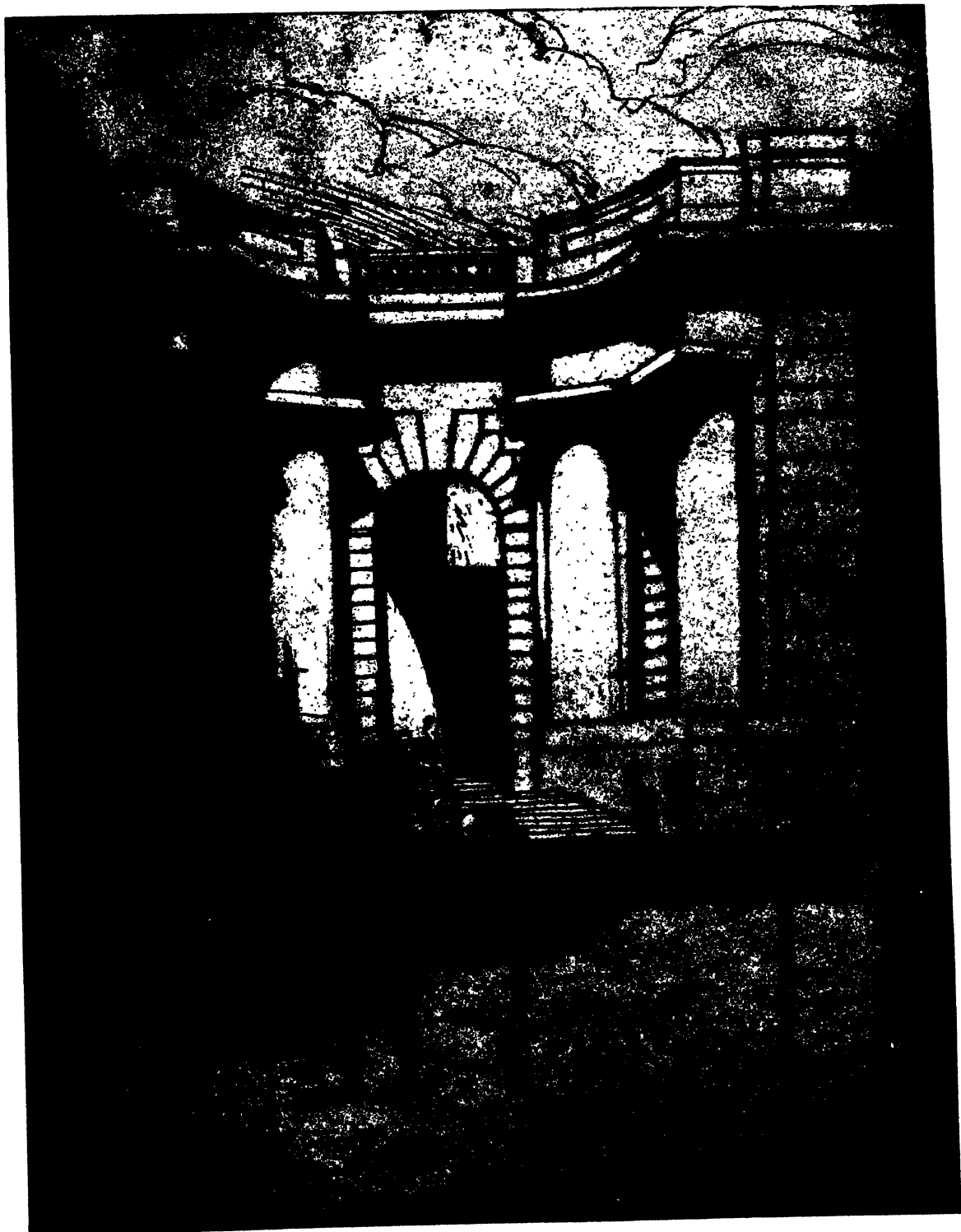
পাথার পুরী

শিল্পী—শ্রীযুক্ত কার

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

"কোনো মানুষের মতের জন্ত তা'কে পীড়ন করা উচিত নয়।"

ফ্রান্স্ বরাবরই য়ুরোপের অন্তান্ত দেশের চাইতে কতকটা সেন্টিমেন্টাল; abstract principles এর উপর তা'র বিশ্বাস বরাবরই কিছু বেশী। সম্ভব-অসম্ভবের হিসাব খতিয়ে সে দেখেনি, মুক্তিমন্ত্রের নেশায়ই সে এত-বড় একটা রক্ত-বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। য়ুরোপের অন্তান্ত দেশ, যেমন ইংল্যাণ্ড, সুইট্সার্ল্যাণ্ড্ ধীরে-ধীরে স্থির পদবিক্ষেপে ধাপের পর ধাপ উঠে গণতন্ত্র-পদ্ধতিতে এসে পা দিয়েছিল—ফ্রান্স তা পারেনি। Absolute monarchyর (বিশুদ্ধ রাজতন্ত্রের) যুগ থেকে ফ্রান্স এক রাত্রিতে রক্ত-সমুদ্র পার হ'য়ে এসে জনগণের হাতের মুঠোয় তা'র শাসন-ব্যবস্থা তু'লে দিয়েছে। এ-সম্বন্ধে "Modern Democracies" বইএর লেখক Viscount Bryceর উক্তি হচ্ছে এই—

"She adopted Democracy by a swift and sudden stroke, springing at one bound out of absolute monarchy into the complete political equality of all citizens. And France did this not merely because the rule of the people was deemed the completest remedy for pressing evils, nor because other governments have been tried and found wanting but also in deference to general abstract principles which were taken for self-evident truths."

Reformation এবং Civil Warএর যুগের পর চতুর্থ হেন্‌রী, রিশ্‌ল্যু ও মেঁজেরা থেকে আরম্ভ করে ষোড়শ লুই পর্য্যন্ত সকলেই চতুর্দ্দশ লুইয়ের মতো বল্‌তে পার্‌ত, l'etat c'est moi (I am the State) আমিই রাষ্ট্র রাষ্ট্রের এম্‌নি সর্ব্বময় প্রভু ছিল তা'রা। য়ুরোপের আর কোনো দেশেই রাজার এমন সর্ব্বময় প্রভুত্ব ছিল না। এক-চতুর্থ শতাব্দী রক্তের নদীতে স্নাত হ'য়ে ফ্রান্স্ তা'র শতাব্দীব্যাপী অধীনতার প্রায়শ্চিত্ত করেছে।

য়ুরোপের মাটিতে স্বাধীনতা-জননীর প্রথম সন্তান সুইট্সারল্যাণ্ড্। প্রাচীন গ্রীক গণতন্ত্রের কথা ছেড়ে দিলে একমাত্র সুইট্সারল্যাণ্ডেই সোজাসুজি গণতন্ত্র-শাসন-পদ্ধতি প্রচলিত। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম প্রভাতে কয়েকটা সুইস্ ক্যাণ্টন্ হাপ্‌সবুর্গ আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে মুক্তিলাভ করে এবং কয়েক দিন পরেই কয়েকটা সহরের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়। এই সহরগুলিতে মুখ্যতন্ত্র বা Oligarchic শাসন প্রচলিত ছিল, কিন্তু ক্যাণ্টন্‌গুলির শাসন-ব্যবস্থা বরাবরই ছিল গণতান্ত্রিক। এই দুই তন্ত্রই একত্র হ'য়ে তাদের Federal Assemblyতে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের বিধিব্যবস্থা করত। ইউরি, স্থিজ, য়্যাণ্টারহ্বাল্‌ডেন্ প্রভৃতি ক্যাণ্টন্‌গুলির নিজেদের শাসনব্যবস্থা গণতান্ত্রিক হ'লেও তাদের অধীন নগর ও ক্যাণ্টন্‌গুলিতে শাসন-ব্যবস্থাটা ছিল মুখ্য তান্ত্রিক। কাজেই দেখা যায় সাম্য ও স্বাধীনতার কোনো মন্ত্রই তাদের মনের উপর কোনো আধিপত্য বিস্তার করতে পারেনি। তা'র আর-একটি প্রমাণ হচ্ছে নতুন লোককে তা'রা কিছুতেই তাদের পৌরজনাধিকার দিতে চাইত না, এমন-কি ফরাসী বিপ্লবের সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার মন্ত্রে যখন সমস্ত পৃথিবী এক নতুন আদর্শের সন্ধানে ব্যগ্র হ'য়ে উঠেছিল তখনও গণতান্ত্রিক সুইট্সার্ল্যাণ্ডের অধিকারীরা সে মন্ত্রের ধার ঘেঁসে যেতে চাইত না।

১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে ফরাসী বিপ্লবের সেনাদল সুইস্ কনফেডারেশন্‌কে ভেঙে চুরমার ক'রে দিয়ে একটা (Helvetic) হেল্‌ভেটিক রিপাব্লিকের সৃষ্টি ক'রে দিলে। এই রিপাব্লিকের আয়ু বেশী দিন ছিল না; দুদিন পরেই সে মারা গেল কিন্তু একটা লাভ হ'ল এই যে রিপাব্লিকের অধীন সকল প্রজাপুঞ্জই পৌরজনের অধিকার (rights of citizenship) লাভ করলে। তা'র পর ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের ঘরোয়া যুদ্ধের পর ১৮৪৮ এবং ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের আইন ব্যবস্থায় সুইট্সার্ল্যাণ্ড্ একটা পুরোপুরি Democratic Federal State হ'য়ে দাঁড়ায় এবং বাইশটি ক্যাণ্টনের প্রত্যেকটিতেই গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়। গণতন্ত্রের মন্ত্রশক্তি সুইট্সার্ল্যাণ্ডে ক্রিয়া করেছে ফরাসী বিপ্লবের পর।

প্রাচীন গ্রীসে ও বর্ত্তমান য়ুরোপে জনশক্তির সম্মিলিত শাসন যেখানে-যেখানে, প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, তা'র প্রধান-

প্রধান কয়েকটি দেশে এথেন্সে, ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে, মার্কিন যুক্তরাজ্যে ও সুইট্‌সার্‌ল্যাণ্ডে গণতন্ত্রের সৃষ্টি-রহস্যটুকু আমরা মোটামুটিভাবে দেখ্‌তে চেষ্টা করেছি। এই সৃষ্টির মূলে যে শক্তি যেখানে ক্রিয়া করেছে তাও খুব সাধারণভাবে ভেবে দেখ্‌বার চেষ্টা করা গিয়েছে। কিন্তু আজ যদি আমরা সকলে ভেবে বসি বর্ত্তমান য়ুরোপ উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাচীন গ্রীসের গণতন্ত্র-শাসন-ব্যবস্থা লাভ করেছে তা' হ'লে নিশ্চয়ই ভুল বোঝা হবে। প্রাচীন গ্রীকো-রোমান্ গণতন্ত্র ও বর্ত্তমানের এই নবীন পাশ্চাত্য গণতন্ত্র—এ দু'য়ের মাঝখানে কোথাও কোনো মিল নেই। উভয়ই গণতন্ত্র বটে, কিন্তু উভয়ের প্রাণ এক নয়, যন্ত্র ব্যবস্থাও এক নয়। যন্ত্রের কলকব্জা ও গঠন-পদ্ধতি একেবারেই বিভিন্ন-রকমের এবং যে মন্ত্রশক্তি নবীন গণতন্ত্রের প্রাণ, সেই মন্ত্রশক্তির সন্ধান প্রাচীন গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় কেউ খুঁজেও পায়নি, এ-কথা আগেও বলেছি, এখনও তা'র পুনরুক্তি করলাম। গ্রীকো-রোমান্ ডেমোক্র্যাসি ছিল অনেকটা সংকীর্ণ—তার গণ্ডীটা ছিল নেহাৎ ছোটো। এক-একটা ছোটো ছোটো সহরকে (City States) অবলম্বন ক'রে তাদের ডেমোক্র্যাসি গ'ড়ে উঠেছিল। ছোটো ছোটো সহরে খুব বেশী লোক বাস করত না। কাজেই সহরের শাসন-ব্যবস্থা-বিষয়ে সকল পৌরজনেরই মতামত নেওয়া সম্ভব হ'ত। প্রত্যেক পৌরজনেরই রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় মতামত প্রকাশ করবার একটা অধিকার ছিল বটে, কিন্তু সহরে যারা বাস করত তা'রাই সকলে পৌরজন ব'লে গণ্য হ'ত না অর্থাৎ পৌরজনাধিকার লাভ করতো না প্রায় অর্দ্ধেক বাসিন্দাই ছিল কেনা গোলাম; তা ছাড়া বাইরে থেকে যারা 'উড়ে এসে জুড়ে' বস্‌ত তা'রা ত ছিলই। এদের কোনো মতামতের ক্ষমতাই ছিল না অথচ রাষ্ট্র পরিচালন-কার্য্যে এদের কাছ থেকে পাওনা-গণ্ডা যে কেউ আদায় ক'রে নিত না এমন নয়। কাজেই আদর্শ গণতন্ত্র প্রাচীন য়ুরোপে ছিল, একথা বলা চলে না। কিন্তু রাষ্ট্র ব্যবস্থাটা ছিল সোজাসুজি গণতন্ত্র Direct Democracy। আধুনিক গণতন্ত্র ও প্রাচীন গণতন্ত্রের রাষ্ট্র-ব্যবস্থাতেই এই একটা পার্থক্য র'য়ে গেছে। একালের গণতন্ত্র রাষ্ট্র কোথাও কোনো একটা নগর মাত্রকেই অবলম্বন ক'রেই গড়ে ওঠে নি—ওঠা সম্ভবপরও নয়। তা'র কারণ আজ্‌কালকার রাজ্য বা সাম্রাজ্য কিছুই কোনো সহরের সীমানায় আবদ্ধ নয়। অনেকগুলি খণ্ড-খণ্ড দেশ বা রাজ্য নিয়ে এক-একটা প্রকাণ্ড রাজ্য গ'ড়ে উঠেছে, হয়ত বা সে রাজ্যগুলি আবার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত; তা'র মধ্যে বাস করে নানান্ জাতি, নানান্ ভাষাভাষী নানান্ ধর্ম্মাধর্ম্মের লোক। এদের সমাজে বা ধর্ম্মে কারুর সঙ্গে হয়ত কারু মিল নেই কিন্তু রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় তা'রা একজাতি। তাই আধুনিক ডেমোক্র্যাসিতে জাতিধর্ম্মের কোনো বিচার নেই। তাই নতুন রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারা-অনুসারে আধুনিক ডেমোক্র্যাসিতে রাষ্ট্রের অন্তর্গত সকল প্রজাকেই জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় মতামত প্রকাশ করবার অধিকার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সকলের এই অধিকার প্রয়োগ করবার সরাসরি ব্যবস্থা নেই—এক-একটা রাজ্যে এত অসংখ্য লোক বাস করে এবং এত অসংখ্য লোকের ভোটের অধিকার আছে যে সকলে একত্র ব'সে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পরিচালনা বা আইন প্রণয়ন করা এক অসম্ভব ব্যাপার। তাই একালের লোকেরা নিজদের মধ্য হ'তে কতকগুলো প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করে এবং তাদের রাষ্ট্র-সভায় নিজদের অধিকার প্রয়োগের জন্য প্রেরণ করে। তা'রাই রাষ্ট্র-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করে। এরই নাম হচ্ছে Representative Government বা প্রতিনিধি-মূলক গণতন্ত্র—যার সব-চাইতে বড় নমুনা হচ্ছে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট্। কিন্তু এই প্রতিনিধি-মূলক গণতন্ত্র সকল স্থানে জনগণের আত্মাকে শান্তি দিতে পারে না। জনগণের যারা প্রতিনিধি তা'রা জনগণকে উপেক্ষা ক'রে নিজদের স্বৈরাচারকেই প্রবল ক'রে তোলেন, কাজেই গণতন্ত্রের সম্মান রক্ষা হয় না। তাই এর প্রতিকারের জন্য যে নতুন রাষ্ট্র-ব্যবস্থার প্রচলন দু-চারিটি দেশে আছে তাকে বলে সংহততন্ত্র বা চুক্তিবদ্ধ সখ্যনীতি (Federal Principle)। এই সংহততন্ত্রের একটুখানি পরিচয় আগেই দেওয়া হয়েছে। বড়-বড় দেশের পক্ষে এই সংহত-তন্ত্রই সকলের চাইতে উপযোগী ব'লে অনেকে মনে করেন; কিন্তু কি প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র, কি চুক্তিবদ্ধ সখ্যনীতি কিছুই গণতন্ত্রের আসল স্বরূপকে

ফোটাতে পারে না—জনমত সর্ব্বত্র রক্ষিত হচ্ছে একথাও বলা চলে না।

এই কারণেই আজ রাষ্ট্রক্ষেত্রে নানান্ নতুন-নতুন সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে এবং তাই নিয়েই নানান্ পরীক্ষা, নানান্ জল্পনা-কল্পনা চল্‌ছে। জনগণের ইচ্ছাকে, গণশক্তির সাধনা ও সঙ্কল্পকে পুরোভাগে স্থাপন কর্‌বার প্রচেষ্টাতেই সকল সমস্যার উদ্ভব, সকল-রকম পরীক্ষার সৃষ্টি।

মানুষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা একসময়ে গণতন্ত্রকেই একমাত্র নিখুঁত রাষ্ট্রব্যবস্থা ব'লে স্বীকার কর্‌ত—এখনও অনেকে করেন। নিখুঁত মানে অবশ্য একেবারে সর্ব্বদোষলেশশূন্য নয়। গণতন্ত্রকেই সকল রোগের একমাত্র মহৌষধ বলা যেতে পারে না, কিন্তু এই রাষ্ট্র-ব্যবস্থার ভিতর দিয়েই একটা সুস্পষ্ট শান্তিময় রাষ্ট্রীয় জীবনের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে এ আশা খুব দুরাশা নয় ব'লেই অনেকে মনে করেন। কারণ গণতন্ত্র বল্‌তে শুধু একরকম শাসন-তন্ত্র মাত্র বা রাষ্ট্রব্যবস্থা মাত্রকেই বোঝায় না, গণতন্ত্র হচ্ছে একটা জাতির আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক অর্থাৎ জীবনের সকল ক্ষেত্রের একটা পূর্ণ পরিণত রূপ। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারেই কেবল মানুষ সমস্ত বন্ধন মুক্ত হবে, শুধু এই জন্যেই গণতন্ত্রের সৃষ্টি হয়নি। মানুষ অন্তরে-বাহিরে সমস্ত ব্যাপারে সকল বন্ধন সকল সংস্কার মুক্ত হবে তবে ত গণতন্ত্রের সার্থকতা!

আদর্শ গণতান্ত্রিক সমাজ বা রাষ্ট্র বল্‌ব তা'কে যেখানে একটা সুগভীর কর্ত্তব্য-জ্ঞান এবং পরার্থপরতা-বোধ জনগণের সমস্ত কর্ম্ম ও চিন্তাকে নিয়ন্ত্রিত করে, যেখানে রাষ্ট্র বা সমাজের প্রত্যেকটি বাসিন্দা সর্ব্বসাধারণের কর্ম্ম এবং স্বার্থকে নিজের কর্ম্ম এবং স্বার্থ ব'লে মনে করে এবং আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক জীবনের পক্ষে যা মঙ্গলকর, নিজের স্থির বিশ্বাসে তাহা জনগণের সমক্ষে উপস্থিত করে এবং সমস্ত জনগণের চিত্তকে মুক্তির পানে উন্মুখ ক'রে রাখে। এই ভাব, এই অনুভূতি যখন সকল বাসিন্দাকে অনুপ্রাণিত করে তখন তা'রাই হ'য়ে ওঠে আদর্শ গণতন্ত্রের আদর্শ বাসিন্দা। রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য ও আদর্শ-সম্বন্ধে প্রত্যেক পৌরজনেরই একটা সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা চাই এবং ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ-সম্বন্ধে সর্ব্বত্র সজাগ থাকা চাই। যেখানে এই জ্ঞানের এবং দায়িত্ববোধের অভাব দেখা যায়, সেখানেই রাষ্ট্রের বাসিন্দারা Demagoguesদের* হাতে খেলার পুতুল হ'য়ে দাঁড়ায়। ব্যক্তির বা দলের প্রাধান্য-রক্ষার জন্যেই এই Demagoguesরা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে অভিজ্ঞতাহীন লোকদের ক্ষেপিয়ে বেড়ায়—এরাই গণতন্ত্রকে ধ্বংসের পথে টেনে নেয়। গণতন্ত্রের তখন আর কোনো সার্থকতাই থাকে না। প্রাচীন আথেনীয় গণতন্ত্র এই Demagoguesদের হাতে প'ড়েই ধ্বংস হ'য়ে গিয়েছিল। Aristides ও Periklesর হাতে যে গণতন্ত্র পরিপূর্ণ মুক্তির প্রতীক হ'য়ে উঠেছিল; Kleon Hyperbolusর হাতে পড়ে' সেই গণতন্ত্রই মুক্তির পরিপন্থী হয়ে দাঁড়াল। তাই Demagoguesদের হাতে গণতন্ত্রকে ধ্বংসের পথ থেকে বাঁচাতে হ'লে রাষ্ট্রের অধিকাংশ বাসিন্দার—বিশিষ্ট না হোক্—অন্ততঃ একটা সাধারণ রাজনৈতিক জ্ঞান থাকা চাই, রাষ্ট্রীয় ব্যাপার-সম্বন্ধে একটু-আধটু অভিজ্ঞতা থাকা চাই, সর্ব্বোপরি একটা স্বাধীন বিচার বুদ্ধি এবং সমস্ত সঙ্কীর্ণতা থেকে মনকে মুক্ত রাখা চাই। এই হচ্ছে গণতন্ত্রের কষ্টিপাথর—গণতন্ত্রকে সার্থক কর্‌তে হ'লে তা'র জন্য এতখানি মূল্যই দিতে হয়। আর তা যদি না হয় তবে ডিমোক্র্যাসির নামে অটোক্র্যাসির পূজাই হয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে বিভিন্ন দলের সৃষ্টি হওয়া মোটেই খুব অসম্ভব বা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু তা'র সঙ্গে-সঙ্গে দলাদলির এবং গালাগালির সৃষ্টি হওয়া গণতন্ত্র রাষ্ট্র-ব্যবস্থার বিরোধী। দেশ এবং জাতির সেবায় সকলেই উৎসুক থাকবে এবং একের উপর অন্যের সুদৃঢ় বিশ্বাসে সমস্ত রাষ্ট্রের ভিত্তিও সুদৃঢ় হ'য়ে উঠ্‌বে। রাষ্ট্র-নেতাদের সকলের মতামতের ঐক্য না থাকতে পারে, সকলেই খুব বড় রাষ্ট্রনীতিবিদ্ হ'তে না পারেন, জনসভা-সমূহ খুব জ্ঞানগরিষ্ঠ না হ'তেও পারে, কিন্তু সকলেরই খুব ন্যায়বান্ ও বিশ্বাসী হওয়া চাই এবং জনগণের সেবায় অনন্যচিত্ত হওয়া চাই। কেউ কারু প্রভু নয়,

---

* Demagogue—অব্যবস্থিতচিত্ত রাষ্ট্রীয় নেতা। ইহারা যখন যেরকম সুবিধা হয় এমন রাষ্ট্রনীতির প্রবর্ত্তন ক'রে যে-কোনো উপায়ে নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় খুঁজে বেড়ায়—অনভিজ্ঞ লোকদের ক্ষেপিয়ে নিজেদের কাজ হাসিল করাই ইহাদের রাজনীতি। আমাদের দেশে এরকম রাষ্ট্রনেতার মোটেই অভাব নেই।

কেউ কারু দাস হবে না—সকলের অন্তরে বিরাজ করবে একটা সেবার ভাব। রাষ্ট্রের অধীনে মানুষ পদগ্রহণ করবে—অর্থ বা ব্যক্তিগত প্রতিপত্তি লাভের জন্য নয়; জাতির সেবার সুযোগলাভ হবে এই ভেবে। রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় সকলেরই সমান অধিকার থাকবে—নইলে ছোটো বড়র পার্থক্য, উচ্চ-নীচে বিদ্বেষ ফু'টে উঠ্‌বেই; গণতন্ত্র এই পার্থক্য,এই বিদ্বেষকে এড়িয়ে চল্‌তে চায়। রাষ্ট্র-নেতা হবার অধিকার একজন কোটিপতির যতখানি থাকবে, একজন অর্থহীন দরিদ্র জ্ঞানবান্ চরিত্রবান্ ও সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত অপরিচিতেরও সেই অধিকারটুকু থাকা চাই। এই হচ্ছে আদর্শ গণতন্ত্রের স্বপ্নময়ী কল্পনা, আজিও বাস্তবে এই কল্পনার প্রতিষ্ঠা কোথায়ও হয়নি—কোনো দিন হবে কি না, বর্ত্তমান রণোন্মত্ত, ধনগর্ব্বিত এবং বিদ্বেষ-মুখরিত পৃথিবীর অবস্থা দে'খে সে ভবিষ্যদ্বাণীও কেউ করতে পারেন ব'লে মনে হয় না। যে গণতন্ত্রের স্বপ্নময়ী মূর্ত্তির পরিকল্পনায় ফরাসী-বিপ্লবের য়ুরোপ উন্মাদ হ'য়ে উঠেছিল, সে কল্পনা আজও কল্পনাই র'য়ে গিয়েছে। দেড়শত বৎসরের গণতন্ত্র রাষ্ট্র-ব্যবস্থা মানুষের মন নৈরাশ্যেই ভ'রে দিয়েছে—পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়নি। আজিও পৃথিবীতে ক্ষমতার আধিপত্য, ধনের আধিপত্য, দলের প্রভুত্ব সমভাবে বিরাজমান। আজিও পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশ লোক ব্যক্তিবিশেষের বা দল-বিশেষের প্রভুত্বের পদপ্রান্তে বিক্রীত, যথেচ্ছাচারে জর্জ্জরিত এবং তাদের ক্ষীণ কণ্ঠ ধনগর্ব্বিতের ঢক্কানিনাদের চাপে নির্ম্মজ্জিত।

বধূ-বরণ

শ্রী দেবেন্দ্রনাথ মিত্র

(১)

মণিদা'দের বংশগৌরবটি ছিল অত্যন্ত বেশী। তাঁদের আচার-বিচারের আর অন্ত ছিল না। সমাজে যে-কয়টি বৃদ্ধ ছিলেন, তাঁহারা সকলেই ত এক-একটি কুলধ্বজা, অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্কেরাও মনে-মনে রীতিমত অনুভব করিত তাহারা কেউ-কেটা নয়—এই বিস্তৃত হিন্দুসমাজের মুকুটখানির কোহিনূরই বা হইবে তাহাদের ঘোষ-বংশটা।

বিবাহাদির সময়ে তন্ন-তন্ন করিয়া দেখা হইত বৈবাহিক কুলের পালিশটা বেশ ঝক্‌ঝকে আছে কি না। মণিদা'দের কোন্ বৃদ্ধপিতামহের প্রপিতামহ নাকি কুলত্যাগ করিয়া মাল্যচন্দন অর্জ্জন করিয়া তাহাদিগকে কুলগৌরবের শেষমঞ্চে তুলিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। সেই থেকে কোনো-রকমে সেখান হইতে একটি ধাপ না নামিতে হয়, বংশধরদের সেদিকে সদা জাগ্রত প্রখর দৃষ্টি ছিল।

মাত্র দুটি ঘরে ছাড়া মণিদা'দের কন্যা-সম্প্রদানের জো ছিল না। সুতরাং মণিদা'দের বংশের প্রায় সকল মেয়েই কুলসাগরে আর সমস্ত নিমজ্জিত করিয়া মাথাটি-মাত্র ভাসাইয়া আসিতেছেন। ঐদুটি ঘর ছাড়া অন্য কোনো বংশের কন্যাকে বধূরূপে আনিবার রীতিও ছিল না। ফলে এ-বংশের বধূরা রূপগুণের ছটায় গৃহ যতই অন্ধকার করুন না কেন, কেহ ভ্রূক্ষেপও করিতেন না। কুলগৌরব-শিখাটির মূলে কে কতখানি তৈলসেচন করিতে পারিলেন তাহারই হিসাব 'ঘটককারিকাপাত' হইতে সংগ্রহ করিয়া সে-বংশের সকল পুরুষই বধূর মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

সেই বংশের মণিদা সে-বার বাড়ী আসিয়া একান্ত গোপনে যখন আমাকে বলিলেন, কলমজোড়ের বিশ্বাসদের কোন্ এক অসামান্য রূপগুণসম্পন্ন কন্যাকে বিবাহ করিতে তিনি কৃতসঙ্কল্প, তখন বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম, কথাটা যেন মাথায় ঢুকিলই না। আমার মানসিক অবস্থা বুঝিতে পারিয়া মণিদা

কহিলেন, "বিশ্বাস হচ্ছে না, অনন্ত? কিন্তু সত্যিই বলছি এ আমার হৃদয়ের কথা, এর মাঝে কোথায়ও এতটুকু মিথ্যা নেই।" হৃদয়ের ত কথা! ভাবনার কথাও কম নয়। উপায়? "এর ত দ্বিতীয় উপায় নেই। একমাত্র যে উপায় আমি তাই করব। সেই কথাই ত তোকে বলছি।"

আমি চুপ করিয়া গেলাম। এই মণিদা'রই কিছুকাল পূর্ব্বে পাশের এক গ্রামে বন্ধুর বিবাহোপলক্ষে নিমন্ত্রণ ছিল। কথা ছিল, যাইবার পথে নৌকা লাগাইয়া বর বন্ধুকে তুলিয়া লইবেন। যথাসময়ে লাল-পেড়ে ধুতি পরিয়া নৌকা হইতে নামিয়া আসিয়া মণিদা'র বন্ধু হাসিয়া কহিয়াছিলেন, "চট্‌পট্ ওঠ ভাই। বুড়োরা বলছেন, দেরি করলে পৌঁছতে লগ্ন পেরিয়ে যাবে।" ঘটা করিয়া সাজ-পোষাক করিয়া রুমালে এসেন্স্ ঢালিতে-ঢালিতে মণিদা' হঠাৎ বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "হরিপুরের তোমার শ্বশুর ওঁরা ত দত্ত! সেখানে আমাদের খাওয়া-দাওয়া চলে কি না জানিনে ত! থামো, ছোটো খুড়োকে জিজ্ঞেস ক'রে আসি।" ফিরিয়া আসিয়া পাঞ্জাবীর বোতাম খুলিতে-খুলিতে ম্লানমুখে মণিদা' কহিয়াছিলেন, "নিমল, ভাই, কিছু মনে কোরো না—ও সমাজে আমাদের ত খাওয়া-দাওয়ার রীতি নেই! একেবারে পাশের গ্রাম—এসকল সামাজিক ব্যাপার—তা আমি তোমাদের বাড়ী যেয়ে খুব খেয়ে আসব—কিছু মনে কোরো না—।" "আচ্ছা, আচ্ছা," বলিয়া মণিদা'র বন্ধু লজ্জিত-আরক্ত-মুখে নৌকায় ফিরিয়া গিয়াছিলেন।

সেদিনকার সেই মণিদা'ই আজ বলিতেছেন, কোথাকার কোন্ বিশ্বাস-বংশের এক মেয়েকে বিবাহ করাই তাঁহার সত্যকার ইচ্ছা—তাহার মধ্যে কোথাও ফাঁকি নাই!

(২)

অনেক আলোচনা করিয়াও শেষপর্য্যন্ত কোনো মতেই স্থির হইল না কেমন করিয়া, কোন্ পথ অবলম্বন করিলে মণিদা'র এই বিবাহটা কোনো-প্রকার গোলমালের সৃষ্টি না করিয়া সহজ সরলভাবে নিষ্পন্ন হইতে পারে। মণিদা' বলিলেন, "অনন্ত, জানিসনে! ছোটো খুড়ার যতই স্নেহের পাত্র আমি হই না কেন, কি প্রকাশ্যে কি অপ্রকাশ্যে আমার এই বিয়েতে তিনি যোগদান করবেন, এমন ত আমি ভাবতে পারিনে।"

আমি বলিলাম, "আচ্ছা, প্রস্তাবটা ক'রেই দেখা যাক্ না।"

"তা'তে যে শুধুই লাভ নেই তা নয়। বিয়ের আগে এবিষয় ঘুণাক্ষরে জানতে পারলেই তিনি যেমন ক'রে হোক্ এ পণ্ড করবার চেষ্টা করবেন। এ ত সোজা কথা। তাঁর কাছে এটা-একটা উচ্ছৃঙ্খল খেয়াল ছাড়া ত আর কিছুই মনে হবে না। যে সমবেদনাতে তুমি আমার জন্যে এত ভাবছ, তাঁর কাছ থেকে ত তা আশা করা যায় না। আর সেজন্য তাঁকে দোষ দেওয়াও যায় না। শুধুমাত্র একটা খেয়ালের জন্যে এতদিনকার একটা প্রথা বিসর্জ্জন দিতে তিনি সম্মত হবেন কি ক'রে?"

সত্যই ত! যে-আঘাতে মণিদা'র কাছে তাহাদের চিরাগত সযত্নরক্ষিত প্রথাটা ভূয়ো প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছে, তাঁর প্রৌঢ় খুড়ার পক্ষে তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও কল্পনা করা অসম্ভব। মণিদা'র প্রাণের কষ্টিপাথরে আজ বিবাহের যে-দাগ জল্‌জল্ করিতেছে তাহারই জোরে এতদিন যে পিত্তলকে সোনা বলিয়া তাঁহারা আঁকড়াইয়া ছিলেন তাহা লোষ্ট্রখণ্ডের মতন দূরে নিক্ষেপ করিতে তাঁহার এতটুকু দ্বিধা হইতেছে না।

মণিদা' বলিলেন, "কি বলিস্?"

নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম, "কি আর বলব। যাই হোক্, বিয়ে তুমি যেখানে যেমনভাবেই করো না কেন, বিয়ের পরে কিন্তু আমাদের ভুলো না। বিয়ের লুচিমণ্ডার আশা না হয় ছাড়্‌চি, কিন্তু ফুলশয্যা, বৌভাত ইত্যাদিতে সেটা পুষিয়ে নিতে চাই।"

"বলিস্ কি, বিয়ের পরই সটান এখানে?"

"তা নয় ত সেখানেই থাকবে নাকি? তোমার কল্‌কাতার বাসায় ত আর মাত্র বৌটি নিয়ে গেরস্তালী ফাঁদা চলবে না। শ্বশুরের মস্ত বাড়ী বটে, কিন্তু সেটা ত গ্র্যাণ্ড্ হোটেল নয় যে সপরিবারে তুমি সেইখানেই বাস করবে?"

"তুই বুঝতে পারছিসনে অনন্ত, এত সত্বর এখানে এলেই একটা মহা হৈ-চৈ বাধবে। আমি বলি—"

"মণিদা,' বিয়ে-টিয়েতে গোলমাল হওয়াটা বিয়েরই একটা প্রধান অঙ্গ। সেটা তুমি নিরিবিলি সারবে, পরেও যদি একটু-আধটু হৈ-চৈ না হয় তা হ'লে আর হ'ল কি? দোলপূজোর ঢাকের বাড়িটি পড়্‌তে দেবে না, এ তোমার কোন্-দেশী আব্‌দার!"

মণিদা' চলিয়া যাইবার পর হইতে একটা অনির্দ্দিষ্ট অস্পষ্ট আশঙ্কার গোপন ভার হইতে মনটাকে কিছুতেই মুক্ত করিতে পারিতেছিলাম না। মণিদা' যে-কাব্যটি কাঁদিয়া শেষকালে সমাজের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহার ইতিহাস আমার কাছে ব্যক্ত করেন নাই। তবে মনে-মনে বুঝিতেছিলাম আর দশজন যুবকের যেমন হয় মণিদা'র তদপেক্ষা বিশেষ কিছু একটা হয় নাই এবং আর দশজনও এমন অবস্থায় যেমন আকাশ-পাতাল ভাবিয়া, ভয়ে-ভাবনায় আধখানা হইয়া সমাজের গেটে ধাক্কা খাইয়া শেষ পর্য্যন্ত আবার তাহারই ভিতর দিয়া পার হইয়া যায়, মণিদা'ও তেম্‌নি যাইবে। তাঁহাদের সমাজ-তরীখানি অকস্মাৎ ধাক্কা খাইয়া এদিকে-ওদিকে ভয়ঙ্কর দুলিয়া উঠিয়া আবার তাঁহাকেই বহন করিয়া দিব্য বাহিয়া যাইবে। তাই সাহস করিয়া বলিয়া দিয়াছিলাম, নববধূর হাত ধরিয়া তিনি যেন এখানে আসিয়াই হাজির হন। ভরসা ছিল, মণিদা' যখন গলায় মালা দোলাইয়া সদ্যপরিণীতা নূতন বধূর কনকাঙ্গুলি ধরিয়া হঠাৎ আসিয়া সকলকে সচকিত করিয়া দিবে তখন আর কুলশীলের সন্ধান করিয়া বিচার-বিতর্কের অবসর কোথায়? ক'নে অনুসন্ধান ত নয়, তখন যে বধূবরণের পালা। তা'র পর ফুলশয্যা, বৌভাত, উৎসবের পর উৎসবের অবিশ্রাম আনন্দ-কলরবের নিম্নে সামাজিক বৈঠকের সূক্ষ্ম বিচারকে তখনকার মতন ধামাচাপা পড়িতেই হইবে।

(৩)

যথাসময়ে কবিতায়-লেখা পত্রে মণিদা'র নিকট হইতে বিবাহের নিমন্ত্রণ পাইলাম। তাহা হইলে মণিদা'র বিবাহ কল্পনা নয়? সত্যই সে কোনো বাধাবিঘ্ন খেয়াল করিল না। মনে পড়িল, এই মণিদা'ই মর্য্যাদাহানির আশঙ্কায় মৌলিক বলিয়া দত্ত বাড়ীতে বন্ধুর বিবাহে নিমন্ত্রণ রক্ষা পর্য্যন্ত করিতে পারে নাই। সে খুব বেশী দিনের কথা নহে, এরই মাঝে মণিদা কি এমন তত্ত্ব লাভ করিল, কিসের এমন সন্ধান পাইল যাহার কাছে এতদিনকার ধারণা, কত বংশানুগত সংস্কার এমনভাবে পরাভূত হইল?

আমার মনের আধখানি আন্তরিক সহানুভূতিতে গলিয়া গিয়া মণিদা'কে উৎসাহ দিয়াছে, ভরসা দিয়াছে, আর-আধখানি তাঁর সামাজিক বিদ্রোহের অবশ্যম্ভাবী কতকগুলি পরিণাম স্মরণ করিয়া ভয়ে-ভাবনায় মুষ্‌ড়াইয়া পড়িতেছে। যতই মনকে বুঝাইতেছি এ এমন আর কি? মণিদা ব্রাহ্মও বিবাহ করিতেছে না, খৃষ্টানও বিবাহ করিতেছে না, সমাজের বেড়া ডিঙাইয়া একেবারে বাহিরে যাইয়াও পড়িতেছে না। ধর্ম্ম, আচার, সামাজিক রীতি প্রথা ইত্যাদি লইয়া সংসারে যে-সকল বড়-বড় সংগ্রাম নিয়ত চলিতেছে তাহার কাছে মণিদা'র এই অতি তুচ্ছ একটু কুলপ্রথার একটুখানি বেড়া কত নগণ্য? সহরে কত বক্তৃতা, কত লেখা, কত রোমাঞ্চকর সমাজ-সংস্কার দিব্য হজম করিয়াছি—এতটুকু বিচলিত হই নাই। কিন্তু শিক্ষা দীক্ষা উদারতা অভিজ্ঞতা সকল বালাইয়ের বাহিরে এই পল্লীগ্রামের অত্যন্ত ঘরোয়া আব্‌হাওয়ার মধ্যে সে-সকল কেন যেন কিছুতেই আমাকে নিশ্চিন্ত করিতে পারিতেছিল না। ফুলশয্যাই হউক, বৌভাতই হউক, সমস্ত উৎসব সমাপ্ত করিয়া বরক'নেকে একদিন না একদিন গৃহস্থ হইয়া বসিতে হইবেই। সেদিন এই বড়-বড় কুলধ্বজেরা কোন্ দিক হইতে কেমনভাবে আঘাত করিয়া মণিদা'র স্বেচ্ছাচারের কি শাস্তি বিধান করিবে কোনো মতেই ঠাহর করিতে পারিতেছিলাম না। অন্য দিক্ দিয়া এই সমাজটিতে যত আঘাতই লাগিয়া থাকুক না কেন, কি পুরুষ কি স্ত্রী যত-রকম লীলাই করিয়া থাকুন না কেন, বিশেষ-কিছু গায়ে লাগে নাই, কেননা কুলকর্ম্মে ইঁহারা কোনো দিন একচুল এদিকে-ওদিকে নড়েন নাই। সেই গৌরবের মূলে যে এমন কুঠারাঘাত করিতে পারে তাহার শাস্তির ওজন আঁচ করা সহজ নহে।

সম্মুখের ছোটো জানালা দিয়া দেখা যাইতেছে, বাহিরের গাঢ় অন্ধকার জমাট করিয়া বড়-বড় দেবদারুগাছগুলি চুপ

করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদেরই মাথার উপর দিয়া তারা-ভরা খানিকটা আকাশ একান্ত ঝুঁকিয়া পড়িয়া দৃষ্টির অন্তরালে দিগন্তে বিলীন হইয়া গিয়াছে। মনে হইল, ঐ অবনত বিলুপ্ত খানিকটা আকাশের সহিত মণিদা'র অন্তরের কোথায় যেন একটা সাদৃশ্য আছে।

পাশের দরজা দিয়া বড় বৌঠাকুরাণী প্রবেশ করিলেন। চাপা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, "হাঁরে অনন্ত, বলি কাণ্ডটা কি?"

"কি, বড় বৌঠাকরুন?"

"আহা! কিছুই যেন জানো না? গোলাবাড়ীর মণি নাকি কোথাকার ছোটো জাতের মেয়ে বিয়ে কর্‌ছে?"

"কলমজোড়ের বিশ্বাসদের।"

"ওমা! লেখা-পড়া শিখে মণিটে হ'ল কি? বংশের মুখ ডোবালে। লজ্জাও করে না! কচি খোকাটি নাকি? অনেক দেখেছি, কিন্তু বিয়ে নিয়ে এমন পাগ্‌লামি আর কখনো দেখিনি। বেঁচে থাক্‌লে আরও কত দেখ্‌ব।"

"যা বলেছেন। শাশুড়ী-ননদের সঙ্গে কোমর বেঁধে উঠ্‌তে-বস্‌তে শাসন করা, শোকে-দুঃখে অসুখে বিসুখে বৌকে অবহেলা অযত্ন করাই যেখানে ভালোমানুষটির লক্ষণ সেখানে বিয়ে নিয়েই এতখানি বাড়াবাড়ি পাগলামি না ত কি? ঘটকের দেখিয়ে-দেওয়া পিঁড়ির ওপর ব'সে চোখ বু'জে পাশের পুঁটুলিটির গায়ে দুটি ফুল ফে'লে দিয়ে বাড়ী এনে ফেল্‌বে তা না মণিদা'—"

"তোর বাপু যত অনাছিষ্টি কথা। বিশ্বেসের মেয়ে বিয়ে কর্‌লে এত বড় বংশটার মুখে যে কালি পড়্‌বে তা কি আর সার্‌বে? তোর ত—"

"সেদিকে বৌঠাকরুন্ আপনি নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারেন। এতকাল ধ'রে এক-এক ক'রে আপনারা যে রং ফুটিয়েছেন, মণিদা'র বৌয়ের এক্‌লার সাধ্য কি তা'র গায়ে কালি দেন।"

কতকটা খুসী হইয়া তিনি বলিলেন, "আমি ভাব্‌ছি মণিকে পাক্‌ড়ালে কেমন ক'রে? তুই জানিস্?"

"সেটা ত তা'রা আমায় বলেনি, বৌঠাকরুন।"

"তা হবে, বিশ্বেস বুনো-বাগ্দীর সামিল। তাও দেশে-ঘরে থাক্‌লে তবু একটু কাণ্ডজ্ঞান থাকৃত। একে ছোটো কায়েত, তা'র পর কল্‌কাতায় নাকি ফিরিঙ্গিয়ানা চাল। মেয়ে-টেয়ের কি আর লজ্জা-সরম আছে? ভদ্দর লোকের ছেলে পেয়েছে আর নানা-রকম ছলা-কলা ক'রে দিয়ে ভুলিয়েছে।"

"বৌঠাকরুন, মণিদা' যে ভিন্ন-জাতের। কলা-টলা দিয়ে তা'কে ভোলাতে পেরেছে ব'লে আমার মনে হয় না। বোধ হয় আর কিছু—"

"ওরে বাপু আর কিছু না, আর কিছু না। আমি ব'লে দিচ্ছি ঠিক ঐ দিয়ে ভুলিয়েছে। ওমা! এরা আবার পুরুষ-মানুষ।"

ইহাদের পুরুষত্বের একান্ত অভাব স্মরণ করিয়া ঘৃণায় নথ নাড়া দিয়া বৌঠাকরুন বাহির হইয়া গেলেন। রাত্রি বাড়িয়া চলিল। অন্ধকার স্বচ্ছ করিয়া আকাশ তারায়-তারায় ভরিয়া গেল। সম্মুখের অপ্রশস্ত রাস্তার উপরের নিমগাছ হইতে ফুলের মৃদুগন্ধ সেই অন্ধকার নির্জ্জন পথে আনাগোনা করিতে লাগিল।

(৪)

মণিদা'র চিন্তা ঠেলিয়া ফেলিয়া উঠি-উঠি করিতেছি, খট্ করিয়া দরজা খুলিয়া মণিদা'রই ছোটো খুড়ো প্রবেশ করিলেন। সম্মুখের খাটখানির উপরে ধপ করিয়া বসিয়া পড়িয়া দুই ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিলেন, "এ-সব কি শুন্‌ছি?" যেন আমিই আসামী—তিনি বিচারক জিজ্ঞাসা করিতেছেন, দোষী কি নির্দ্দোষী? কণ্ঠস্বর নরম করিয়া কহিলাম, "কি শুন্‌ছেন?" দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া খুড়ো বলিলেন, "কি শুন্‌ছি? একেবারে ন্যাকা! তোমরা ন্যাকা সাজ্‌লেই ত সকলে নিজের-নিজের চোখে ধূলো ছড়িয়ে ব'সে থাক্‌বে না। আমার ত বাপু ব্রাহ্ম-খৃষ্টান হ'লে চল্‌বে না। মেয়েটা যখন গলায় ঝুল্‌ছে, যেমন ক'রেই হোক তা'কে ত পার কর্‌তেই হবে।"

"একটু স্থির হ'য়ে বসুন দেখি। পরিষ্কার ক'রে সব আপনাকে—"

"আর পরিষ্কার করা! আমার দফা ত পরিষ্কার ক'রেই ফেলেছ। ছেলেটাকে এত ক'রে তার কাকী মানুষ কর্‌লে! বাড়ী-ঘর-দোরে ত বড় আঁটিস্‌নে;

তা না হয় নাই এলি। কিন্তু একেবারে মায়া কাটালি ?"

"আপনি বলেন কি ? মায়া কাটাবে কেন ? বিয়ের পরেই মণিদা' বৌ নিয়ে বাড়ী এসেই ত উঠ্‌বে।"

"বাড়ী এসে উঠ্‌বে ? আমার কাঁধে পা দিয়ে একেবারে তলিয়ে দিক ! এম্‌নি কি হয় তা'র ঠিক নেই। ছেঁটে ফেল্‌বেই, ছেঁটে ফেল্‌বেই। এমন কাণ্ড সমাজ বরদাস্ত করে ? ধোবাটা-নাপিতটে রক্ষে হ'লেই বাঁচি।"

এত বড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা হজম করিবার সময় দিয়া আমি চুপ করিয়া রহিলাম। গলার স্বর নামাইয়া আমাকে ঈষৎ ধাক্কা দিয়া খুড়ো জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলি, দিচ্ছে-থুচ্ছে কি ? একখানা বাড়ী মণি লিখে নিয়েছে নিশ্চয়ই। ওদের কার্‌বারের একটা অংশও অম্‌নি—?" বলিয়া মাথা নাড়িয়া ইঙ্গিত করিলেন।

"কি তাঁরা দেবেন আর কি মণিদা' নেবেন, আমি কিছু জানিনে খুড়ো-মশায়। তবে আমার মনে হয়, মণিদা' ওসকল কিছুই নেবে না।"

"সবই নগদ ? হাঁ, ও হাতে-হাতে চুকিয়ে নেওয়াই ভালো ! দেখ সেই যে সেবারকার মামলায় তার কাকীমার গয়নাগুলো বন্ধক দিতে হয়েছিল এইবার মণি যদি হাজার-দুই ফেলে দিয়ে সেটা খালাস ক'রে নেয়—"

"সে মোকদ্দমা আপনি যে রায়দের বাগান ভেকে নিয়েছিলেন তাই নিয়ে হয়েছিল শুনেছিলাম যেন—"

"আরে ও ত একই কথা। নামেই আমার। দাদা কি সে বাগানের ফলটা-আশটা খাননি ? মণিও কি খাচ্ছে না ? এই ত সেদিন সেই বাগানের গাছ থেকে বিশগণ্ডা কাগজি-নেবু তা'র কাকীমা তা'কে পাঠিয়েছেন শুন্‌লাম। আরে গুরুজনের সোনাগুলো—"

"যখনই পার্‌বে মণিদা' ছাড়িয়ে নেবে নিশ্চয়ই।"

আমি যতই বলি,"মণিদা' টাকা-কড়ি কিছুই নিচ্ছে না", খুড়ো ততই মনে করেন, "এ আবার একটা কথা ? একটি পয়সাও না ছাড়্‌বার ফন্দি।" এত বড় কুলমর্য্যাদাটা খামকা কেউ বিলাইয়া দেয় ? নিশ্চয়ই বড়-রকমের একটা অঙ্ক বিশ্বাসেরা দিয়েছে। দশ হাজার ? পনের হাজার ? বিশ হাজার, কত সে ? রক্ত গরম হইয়া উঠে, খুড়ো চঞ্চল হইয়া পড়েন। আমি তাঁহাকে ঠাণ্ডা করিবার ব্যর্থ প্রয়াস করি। গয়নাটা যদিও মণি না খালাস করে, দর্‌দালানটা পড়-পড় সেইটাই না হয় মেরামত করাইয়া দিক। তিনি না হয় বাসই করিতেছেন, পৈতৃক বাড়ী ত ?

রাত্রি প্রভাতের পথে পা বাড়ায়,অগত্যা তিনি উঠিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্রের কল্যাণ-কামনায় কেন এতরাত্রে ছোটো খুড়ো ছুটিয়া আসিয়াছিলেন তাহা অত্যন্ত পরিষ্কার; এবং তাঁহার গহনার না হউক অন্তত দর্‌দালানটার উদ্ধার না করিলে তিনি যে কোনো-মতেই কুলাঙ্গার ভ্রাতুষ্পুত্রকে মার্জ্জনা করিবেন না, তাহাও কিছুমাত্র অস্পষ্ট রাখিয়া গেলেন না। মণি মেলা টাকার বিনিময়ে বিশ্বাসের ঘরে বিবাহ করিতেছে। তিনিও কিছু পাইলে না হয় সামাজিক ঠেলাটা সহ্য করিতেন। 'পেটে খেলে পিঠে সয়'।

(৫)

মণিদা' তাহার কবিতায়-লেখা পত্রে গ্রামের আর কাহাকেও নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, না, সেটা ছোটো খুড়োর কারসাজি ঠিক্ জানি না, কিন্তু পরদিনই সংবাদটা চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। চারিদিকেই ঐ একই প্রশ্ন—মণি নাকি সব ডুবাইল ? সুপ্ত কুলগৌরব জাগিয়া উঠিয়া পাড়া চঞ্চল করিয়া তুলিল। বৃদ্ধেরা অসীম উৎসাহে লাঠি ঠক্-ঠক্ করিয়া দ্বারে-দ্বারে টহল দিয়া সমাজ সরগরম করিয়া তুলিলেন। বাড়ীতে-বাড়ীতে বাড়া-ভাত ঠাণ্ডা হইয়া যায়; দিবা-নিদ্রার সময় বহাইয়া দ্বিপ্রহরের রৌদ্র ক্রমে অপরাহ্নের কোলে ঢলিয়া পড়ে—কর্ত্তাদের খেয়াল নাই। কলমজোড়ের বিশেসের মেয়ে ময়নাপুরের ঘোষেদের ঘরে ! আরে, ওরা যে কৈবর্ত্ত ছিল। ঘন-ঘন অনেক তামাক পুড়িল, অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা হইল, কিন্তু কেমন করিয়া এই কলঙ্ক হইতে আত্মরক্ষা করা যায় স্থির হইল না। যে আসামী সে এই প্রবীণ বৈঠকটিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া কোথায় বিবাহোৎসবে বিভোর, তাহার নাগাল পাইবার উপায় নাই। খুল্লতাত সর্ব্বসমক্ষে ভ্রাতুষ্পুত্রকে উচ্চৈঃস্বরে গালি পাড়িয়া 'আত্মানং সততং রক্ষেৎ' বচনের অনুসরণ করিতেছেন এবং ইহাও ঘোষণা করিতেছেন তিনিই
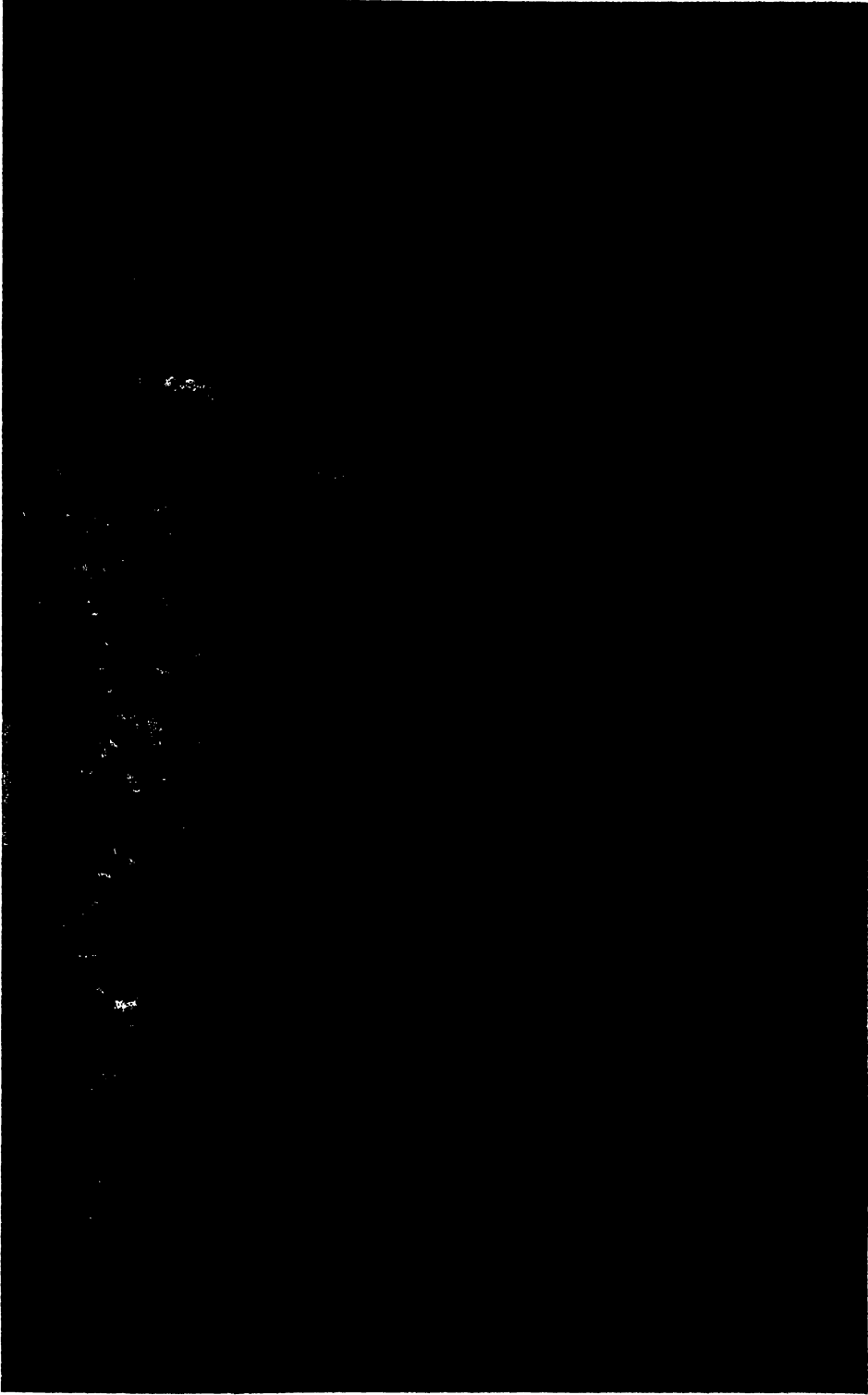
অরণ্যানী
চিত্রশিল্পী শ্রী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা।

যখন অভিভাবক, তখন ঠকাইয়া মণির সঙ্গে মেয়ে ঘুরাইয়া দিবার জন্ত কেশব বিশ্বাসের সাতটি বচ্ছর শ্রীঘরবাসের ব্যবস্থা তাঁহাকেই করিতে হইবে। দেখা যাইবে, কে তখন তাহাকে রক্ষা করে, ইত্যাদি।

আমার নামটা সকলেরই মুখে-মুখে ফিরিতেছে—"অনন্তও কম পাত্র নহে, বিয়ের সলা-পরামর্শ সকলই মণি তাহার সহিত করিয়াছে। মণির মতন ওটিও এই দৈত্যকুলে আর-একটি প্রহ্লাদ।" কোনো প্রবীণ ব্যক্তির সম্মুখে পড়িয়া গেলেই আর কিছু না হোক, এক-চোট সওয়াল-জবাব যে আমার উপর দিয়া হইয়া যাইবে তাহা আমি নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছিলাম। অথচ আমার কোনো অপরাধ নাই। অপরাধ করিবার মতন ফাঁকটুকুই যে মণিদা' দেয় নাই। কোথায় কোন্ মহিলার পদমূলে মণিদা' আপনার সঙ্গে কুলমর্য্যাদা, বংশগৌরব সকল তিল-তিল করিয়া উজাড় করিয়া দিয়াছে, কিছুই দেখিতে পাই নাই যে! শেষকালে তাঁর দেউলে হইবার খবরটা আমাকে ছুকথায় শুনাইয়া দিয়াছে। সে বিবাহ করিবে, কোনো কিছুরই তোয়াক্কা করিবে না। সে তা'র নিজের গরজ—আমার সে-মতি তাহাকে দিতে হয় নাই। বাধাও দিই নাই, দিবার কথা মনেই আসে নাই। শুধু আমি তাহাকে বৌ লইয়া বাড়ী আসিতে বলিয়াছিলাম। হয়ত সে অমনিই আসিত, আজ না হয় কাল আসিত, তবু আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম। আর কোথায়ও আমার কিছুরই অপেক্ষা সে রাখে নাই। সুতরাং অপরাধ আমার নাই। কিন্তু যৌবনের যে-মানুষটি আকাশে চাহিয়া, বাতাসে কান পাতিয়া কাহার একটি প্রসন্ন দৃষ্টিপাত, একটি অর্দ্ধস্ফুট কথা খুঁজিয়া-খুঁজিয়া ফেরে আমার ভিতরকার সেই মানুষটিই সেই অজানার আকর্ষণে মণিদা'র অপ্রয়োজনেও তাহার সাথে-সাথে অনুক্ষণ লাগিয়াই আছে। কাজে-কাজেই ভয় ত আমার আছেই। আমি বাহিরের দিকে আর ঘেঁসিলামই না। সেদিনকার বৈঠকে কিছু স্থির হইল না। প্রশ্ন অত্যন্ত জটিল, বিষয় গুরুতর, একদিনে শেষ হইবে কেমন করিয়া? একটা-কিছু হইয়া গেলে আমি স্বস্তি পাইতাম। এই সমাজের দেওয়া দণ্ডটি না জানি মণিদা'কে কেমন করিয়া পাড়িয়া ফেলিবে সেই অনিশ্চিত ভয়েই মনের মধ্যে ঢিপ্-ঢিপ্ করিতেছে। দণ্ডটির রূপ দেখিলে হয়ত তাহা থামিত। বিবাহের দিন আসন্ন, আজও কিছু হইল না। বিবাহ পণ্ড করিবার রেজল্যুশন্ আর যে চলিবে না, ইহা স্থির নিশ্চিত। যাক্, বিয়ে ত ঠেকাইবে না। তাই যদি না ঠেকে, তবে বৌ লইয়া বাড়ীর ছেলে বাড়ী আসিলে কি আর এমন একটা ঘটিবে যে ভয়ে সারা হইতেছি? হয়ত এমনি একটু হৈ-চৈ হইবে, ছোটো খুড়ো দুটো তিরস্কার করিবেন, হয়ত ঠাট্টার সম্পর্কীয়েরা নতুন বৌকে একটু তীব্ররহস্ত-বিদ্রূপ করিবেন, হয়ত তাঁহার পিতার কুল-পরিচয় লইয়া খানিকটা অপ্রিয় কঠোর আলোচনা হইবে। তাহার পর যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, আর ফিরিবে না বলিয়া শেষ-মন্তব্য পাস হইয়া যাইবে।

সত্যই ত! মণিদা ইহা নিশ্চয়ই বুঝিয়াছে। নতুবা এত বড় বিপদের মাঝে কি কেহ এমন অনাড়ম্বরে ঝাঁপাইয়া পড়ে? সেই যে সে গিয়াছে তাহার পর আসা ত দূরের কথা, একদিন একটি ছত্র লিখিয়াও জানিতে চাহে নাই, এদিক্কার ব্যাপার কি। সে ঠিক জানে, আমাদের পল্লী-পঞ্চায়েৎ যত গর্জ্জে তত বর্ষে না। না হইলে, সমস্ত জানিয়া-শুনিয়া কি কেহ এমন নিশ্চিন্তভাবে দিন কাটাইতে পারে? সে গ্রামের জমিদার নয়, তাহার অবস্থা অসচ্ছল না হইলেও অসাধারণও নয়, সহায়-শক্তির অধিকাংশ খুল্লতাত আত্মসাৎ করিয়া বসিয়া আছেন। তবে কোন্ ভরসায় কি সাহসে সে এক নিম্নশ্রেণীর কন্তা বিবাহ করিয়া গ্রামের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইবে?

ফাল্গুনের শেষাশেষি। রৌদ্র পড়িয়া আসিতেছে। গোলাবাড়ীর যে প্রকাণ্ড বটগাছটি পাড়া ছাড়াইয়া মাথা তুলিয়াছে তাহার ডালে-ডালে নূতন পাতার সবুজ আভা ফাটিয়া পড়িতেছে। বাড়ীর পাশের আমবাগানটা অযত্নে জঙ্গলে পূর্ণ, সেখানে ঠাসাঠাসি ভাঁটফুলের উপরে আমের বোল ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। বিশ্বপ্রকৃতি যেন আপনার পরিপূর্ণতার আবেশে ঢুলিতেছে।

মণিদা'দের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বাহিরের ঘরে ফরাসের একধারে সরকার-মহাশয় তেলকুচকুচে শরীরটি তখনও একটু গড়াইয়া লইতেছেন। ভিতরে

দালানের বারান্দায় সুখোর মাসী পা দিয়া জাঁতা ঘুরাইয়া নূতন মটরের ডাল ভাঙিতেছে এবং তাহারই অনতিদূরে মণিদা'র কাকীমা নিবিষ্টমনে একটি নূতন সরা চিত্র করিতেছেন।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি চিত্র করছেন?"

মুখ তুলিয়া বলিলেন, "অনন্ত? আয় বাবা বোস্। এ মণির বিয়ের সরা চিত্তির করছি। এসব কি আর এখন হয়? পোড়া চোখে সব ঝাপ্‌সা দেখি।"

"আচ্ছা, কাকীমা মণিদা' বৌ নিয়ে এখানেই তোমার কাছে আসবে?"

"হাঁ আসবে। করব না করব না ক'রে সেই বিয়েই ত বাপু করলি। চার-চারটে পাস, মেয়ের অভাব কি, পাল্টিঘরে খাসা মেয়ে পাওয়া যেত। তা না—মণিটে ছোটোবেলা থেকেই ঐ কেমন এক-রকম যেন।"

"ছোটোকাকা কিন্তু—"

"ওমা! তিনি ত রেগেই খুন! বলেছিলাম, ছোঁড়াটা ত গোল্লায় যাচ্ছেই মানা ত শুনলই না। তখন আশীর্ব্বাদটা না পাঠালে মিছিমিছি শুভকর্ম্মে চুক থেকে যাবে। হাঁ, তিনি সে-কথায় কান পাতেননি! সরকার-মশায়কে দিয়ে গোপনে আমিই পাঠিয়ে দিলুম।"

"ফুলশয্যা, বৌভাত দেবেন কেমন ক'রে?"

"তাই ত ভাবচি। আর যদি কেউ না-ই আসে, কোনো-রকমে নমো-নমো ক'রে সারতে হবে। বিয়ের অঙ্গ ত বাদ দেওয়া যাবে না। এমন শত্রুও ছিল! মা-মরা ছেলে এত বড়টি করলাম। বৌ নিয়ে বাড়ী আসচে, বাদ্যি নেই, বাজী নেই, বাড়ীতে কাক-পক্ষীটি পাত পাতবে না—যেমন আমার কপাল!" নিজের মনে কি ভাবিয়া খুড়ী আবার হাসিয়া কহিলেন, "লিখেচে, তোমার পায়ে যে দাসী নিয়ে যাচ্ছি, সে তোমাকে কোনো দিন দুঃখ দেবে না—কত কি ছাই সব। চিঠিপত্র লেখায়, কথাবার্ত্তায় মণি চিরটাকালই খুব দুরন্ত। বিয়ে-বাড়ী একটু মিষ্টিমুখ কর, অনন্ত! পোড়াও কপাল আমার! ওলো, ও সরলা, তোর অনন্তদা'কে একটু জলখাবার দে।" একটু থামিয়া বলিলেন, "ছোটো কর্ত্তা ত হৈ-চৈ করছে, মণি এইবার ভিন্ন বাসা করুক। সরলা গলায় ঝুলছে, একঘরে-টরে করলে, নামানো যাবে না। তাঁর কি বাপু, তিনি পুরুষ মানুষ। আমার যে যেতেও বেঁধে, আসতেও বেঁধে। আজ যদি মণি বউ নিয়ে পেরথক হয়, শত্তুরে অমনি কবে, ঐ খুড়ীই মণিকে ভাসিয়ে দিলে। ভাসুরপোর ওপর দরদ! একটু ছুতো পেলে, আর ঝেড়ে ফেললে। অপবাদ দিতে কেউ ডাইনে-বাঁয়ে চায় না, বাছা। তুই একটু চুপ ক'রে বোস্ ত। আমি এটা সেরে ফেলি; তুই সব পণ্ড ক'রে দিলি।"

বাহির হইয়া পড়িলাম। মণি ত চিরকালই মাথা-ভাঙা, কথা শুনিবার পাত্র নহে। তাই বলিয়া তাহাকে ফেলিয়া দেওয়া যায় কেমন করিয়া? তাই তাহার কাকীমা রাগে গুম্ হইয়া ছেলে-বৌ বরণ করিবার আয়োজনে বরণডালা সাজাইতে বসিয়াছেন। আমার মনের উপর একটি কুটিল ভ্রূকুটি অনুক্ষণ স্থির হইয়া ছিল। কিছুতেই তাহাকে নড়াইতে পারিতেছিলাম না। রাস্তায় পড়িয়া সেটি আর চোখে পড়িল না—কখন আপনিই সরিয়া গিয়াছে।

(৬)

ঘণ্টা-দুই হইবে সূর্য্য উঠিয়াছে, তখনও বিছানায় পড়িয়া প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিবার উপকারিতা মনে-মনে আলোচনা করিতেছি, এমন সময়ে পুঁটি ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে-ছুটিতে চীৎকার করিয়া বলিয়া গেল, মণি বৌঠানকে নিয়ে ঘাটে এসেছে। মনে পড়িল গতপরশ্ব মণিদা'র বিবাহ হইয়া গিয়াছে। গতকল্য রাত্রিতে কলিকাতা হইতে গাড়ীতে চাপিলে চৌহাটি ষ্টেশন হইতে নৌকা করিয়া এতক্ষণে ঘাটে পৌঁছিবারই কথা বটে।

ফাল্গুনের রৌদ্র ইহারই মধ্যে বেশ চন্‌চনে হইয়া উঠিয়াছে। নদীর ঘাটে দেখিলাম, আসিতে আর কেহ বাকী নাই। ছোটো খুড়া গম্ভীর মুখে পায়চারি করিয়া বোধ হয় বর-বধূ তুলিবার তত্ত্বাবধানই করিতেছেন। গোলাবাড়ীর মেজ জ্যাঠা, নতুন বাড়ীর হৃদয়-ঠাকুর্দ্দা, দক্ষিণ পাড়ার নিতাই কাকা ইত্যাদি আস্ত সমাজটি সেখানে হাজির। বকুলগাছের ওধারে কুণ্ডলী পাকাইয়া মেয়েদের দল অস্ফুট কলরবে ঘাটের একটা পাশ মুখরিত

করিয়া তুলিয়াছেন—তখনও কেহ নৌকার ধারে অগ্রসর হন নাই।

মস্ত একখানি ভেপাটে পান্‌সী লগি ফেলিয়া স্থির হইয়া আছে। তাহার মাস্তলে বাঁধা একখানি লাল গামছা বাতাসে নিশানের মতন পত্‌ পত্‌ করিয়া উড়িতেছে। জানালা দিয়া একটা মস্ত ট্রাঙ্কের একটা পাশ দেখা যাইতেছে এবং তাহারই ফাঁক দিয়া লাল বেনারসীর আঁচ্‌লাখানার খানিকটা উঁকি দিতেছে। বটগাছের শিকড়ের উপরে মণিদা' হাঁটুর উপরে কনুয়ের ভর দিয়া গম্ভীর মুখে বসিয়া আছে। ঈষৎ হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিলাম।

ভরা বসন্তে, চিরন্তন বিস্ময়, নূতন বধূ দ্বারে—হাসি নাই, বাদ্য নাই, কলকণ্ঠের সম্বর্দ্ধনা নাই। সমস্ত হাসি-আনন্দের মুখে অটল গাম্ভীর্য্যের পাথর চাপা দিয়া প্রাচীনের দল বসিয়া আছেন। ছোটো-খুড়া ভ্রাতুষ্পুত্রকে উদ্দেশ করিয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "তোমার কি বাপু, খুসী হ'ল নৌকো বেয়ে এল, আবার খুসী হ'লে বৌএর হাত ধ'রে ফর্‌ ফর্‌ ক'রে চ'লে যাবে। কিন্তু, আমাকে ত এই মাটি কাম্‌ড়েই প'ড়ে থাকতে হবে। আমি কোন্‌ বুকের পাটা নিয়ে এঁদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবো বলো ?" বলিয়া কর্ত্তারা যেদিকে বসিয়াছিলেন সেইদিকে একবার চাহিলেন। মেজ জ্যাঠা অম্‌নি বিজ্ঞভাবে মাথা দোলাইয়া যেন স্বগতই বলিলেন, "দুপাতা ইংরেজী প'ড়েই যদি তোমরা জাত-কুল না মানো, যার-তা'র মেয়ে ঘরে আনো, তা হ'লে আমাদের ত স'রে দাঁড়াতেই হয়। আমরা ত তোমাদের সঙ্গে মাথা যোড়াতে পারিনে।" তাঁহার আশে-পাশে সমর্থনসূচক ধ্বনি উঠিল,—বটেই ত! মণিদা' নির্ব্বাক্‌। তাহার কুঞ্চিত ভ্রূযুগলের নিম্নে চঞ্চল চোখদুটি যেন অগ্নিবর্ষণ করিতে চাহে, দন্তে অধরোষ্ঠ চাপিয়া প্রাণপণে সে তাহাই রোধ করিয়া হেঁটমুখে বসিয়া রহিল।

মণি বৌ বলিয়া কি-একটা জীব লইয়া আসে তাহাই দেখিবার অদম্য কৌতূহলে বোধ হয় বৃদ্ধদের এখানে এই শুভ সমাগম হইয়াছিল—তাঁহাদের কর্ত্তব্যটি লইয়া এখানেই তোলপাড় করিবার ইচ্ছা হয়ত ছিল না। কিন্তু কথাটা যখন উঠিয়া পড়িল, সুযোগ যখন জুটিল, তখন একটা হেস্তনেস্ত না করিয়াই বা ক্ষান্ত হন কেমন করিয়া। আমার কেবলি একটা কথা মনে হইতে লাগিল, কেমন করিয়া এই মঙ্গল-বিধানের হাত হইতে অন্তত এখনকার মতন এই নূতন অতিথিটিকে পরিত্রাণ করা যায়।

মণিদা'র শ্যালক দিদির হাত ধরিয়া বাহিরে মাস্তলের ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। ছেলেটি সলজ্জ হাসিতে উপরের দিকে চাহিল। তাহার মুখ দেখিয়া মনে হয় না, নৌকার বাহিরের ব্যাপার ভিতরে কিছু প্রবেশ করিয়াছে। নব বধূর পরিধানে বেনারসী; উজ্জ্বল রক্তিম ছটার মধ্যে অরুণোদয়ের মতন অবগুণ্ঠনের মাঝে সুন্দর মুখখানি অপরূপ সৌন্দর্য্যে ফুটিয়া উঠিল। রৌদ্র পড়িয়া সর্ব্বাঙ্গে যৌবন-লাবণ্য টক্‌টক্‌ করিতে লাগিল। কে একজন বর্ষীয়সী বলিলেন, বৌয়ের মাথা যে মাস্তল ছাড়াইয়া উঠিতে চায়, এবং তাহার কারণ দর্শাইয়া অপর-একজন কহিলেন, বয়েসের যে গাছ-পাথর নাই।

হৃদয়-ঠাকুর্দ্দা অগ্রসর হইয়া বালক কুটুম্বকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বলি, "বাবাজী, তোমার বাবা শুধুমাত্র মেয়েটি সঙ্গে দিয়ে পাঠিয়ে তোমাকে বিপদেই ফেলেছে দেখ্‌চি। বাড়ী-ঘর-দোর ক'রে জ্ঞাতি-কুটুম্ব বসিয়ে তা'র পর পাঠালেই ত হ'ত ভালো। এখানকার ঘোষেদের ঘরে কলমজোড়ের বিশ্বাসের ক'ন্তে বৌ হ'য়ে ওঠে কেমন ক'রে এটা তোমার বাবা বিবেচনা কর্‌লেন না।" বালকটি তাহার পিতার বিবেচনার ভুল বোধ হয় বুঝিতে না পারিয়া মুখ ফিরাইয়া দিদির দিকে চাহিল। দিদিটি মাথা আরও হেঁট করিয়া পাশের মাস্তলের সঙ্গে একেবারে মিশিয়া যাইতে চাহিলেন।

মণিদা'র বিবাহ লইয়া কর্ত্তারা যে অল্পে ক্ষান্ত হইবেন না সেটা জানা কথা। সামাজিক কাণ্ড একটা ঘটিবেই। কিন্তু এ কি লাঞ্ছনা ? লঘু-গুরু সম্পর্কের সকলে মিলিয়া ঘাটে বসিয়াই সদ্য-আগত বরবধূর প্রতি সামাজিক শাসনের নামে কদর্য্য অপমান সুরু করিয়া দিল ? লজ্জা-সরম শোভা-সম্রম আর কিছু নাই; আছে একমাত্র বংশমর্য্যাদা ? অগ্রসর হইয়া কহিলাম, "আহা, ও সকল

কথা এখানে কেন? উঠুন ওঁরা। সময় ত প'ড়েই আছে—"

ছোটো-খুড়া বীরদর্পে আমার সম্মুখে আসিয়া কহিলেন, "তুমি ত ভিজে বেড়ালটি। উঠ্‌চেন যে আমারই ঘরে—, তোমার বাড়ী ত নয়, জবাব দেবে কি?" কতকটা নিরুপায়ের ভাবে চারিদিকে চাহিতেই দেখি, মণিদা'র কাকীমা বাম-কক্ষে বরণডালা ডান হাতে সরলার হাত ধরিয়া ঘাটের এক পাশ দিয়া নীচে নামিতেছেন। মণিদা' উঠিয়া আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনি তাঁহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং পরক্ষণেই তাঁহার দীর্ঘ ঘোমটার ভিতর হইতে উলুধ্বনি উত্থিত হইল। সঙ্গে সরলা যোগ দিল এবং তাহারই ধুয়া ধরিয়া উপরে যে নাতিক্ষুদ্র নারীসঙ্ঘটি বৌ তুলিতে আসিয়া তামসা দেখিতেছিলেন তাঁহারা সকলেই বিরাট চীৎকার করিয়া হুলুধ্বনি দিয়া উঠিলেন। কাকীমা নৌকায় উঠিয়া আড়ষ্ট মূর্ত্তির মতন বধূর চিবুক স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া হাত ধরিলেন। সরলা বধূর কানে কি বলিল, উপর হইতে কিছুই শোনা গেল না। বধূ নত হইয়া সেইখানেই কাকীমার পায়ের উপর প্রণাম করিল। সকলে নির্ব্বাক্ হইয়া চাহিয়া আছে। বকুলগাছ হইতে একটি পাখী "বউ কথা কও" ডাকিতে ডাকিতে মাথার উপর দিয়া ওপারে উড়িয়া গেল।

কাকীমা বধূ লইয়া নামিবার উদ্যোগ করিতেই যেন সকলের চমক ভাঙিল। কে যেন ছোটো-খুড়াকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "শ্যাম বুঝি বৌমাকে টিপে দিয়ে এসেছিলে—" পরক্ষণেই ছোটো-খুড়ো উন্মত্তের মতন লম্ফ দিয়া নীচে আসিয়া পড়িয়া চীৎকার করিয়া কাকীমাকে বলিলেন, "খবরদার, ঘাট-ভরা পুরুষ মানুষ—ভাসুর শ্বশুর প্রভৃতি গুরুজন!" কাকীমা লজ্জায় ভয়ে অপমানে বধূর হাত ছাড়িয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। মণিদা' ছুটিয়া গিয়া কাকীমাকে ধরিল। মূর্চ্ছিতপ্রায় বধূ টলিতে-টলিতে নৌকার ভিতরে প্রবেশ করিয়া মুখ লুকাইল। কি জানি কেন আমিও অদম্য বেগে ছুটিয়া আসিয়া জুতা-সমেত জলে থামিয়া থম্‌কিয়া দাঁড়াইলাম। কাকীমা অশ্রুরুদ্ধ অস্ফুট কণ্ঠস্বরে মণিদা'কে কহিলেন, "আর কত অপমান হবে, কত লাঞ্ছনা কর্‌বে, বৌমার?"

শূন্যদৃষ্টিতে তাকাইয়া আছি,—চতুর্দ্দিকের এই ভয়ঙ্কর সত্য স্বপ্নের মতন মনে হইতেছে,কিছুই যেন আমার চৈতন্য স্পর্শ করিতে পারিতেছে না। মণিদা' নৌকার উপর হইতে আমাকে ঈষৎ ধাক্কা দিয়া বলিল, "ভেবে আর কি হবে! আমি তখনই বলেছিলাম বিয়ের সঙ্গে-সঙ্গে এলেই—কিন্তু এমন ব্যাপার কে আর ভাব্‌তে পারে? হাসিও আসে। যাক্‌গে। তুই কাকীমাকে নিয়ে বাড়ী যা।" মণিদা' নৌকার লগিতে টান দিয়া মাঝিকে বলিল, "খোল্।"

আমি ব্যস্ত হইয়া বলিলাম, "মণিদা' এইভাবে চ'লে যাবে—সে কিছুতেই হবে না।"

মণিদা' বিষণ্ণ হাসি হাসিয়া কহিল তবে কি হাতাহাতি কর্‌ব? আমরা না হয় খুব বীরত্ব কর্‌লাম। কিন্তু মরণ যে ঐ বেচারীর।" বলিয়া বধূর প্রতি ইঙ্গিত করিল। "তা ছাড়া, কাকীমারও প্রাণান্ত। ক'দিন বাদে—"

"কিন্তু এই বিধানের কাছে মাথা পেতে দেবে?"

"বিধান কই? তা হ'লে ত মাথা উঁচু করাই যেত। কাকীমা দুঃখ কোরো না। ক'দিন বাদেই আমরা তোমার পায়ের নীচে—"

নৌকা খুলিয়া গেল। সেই ঘাট-ভরা জনতার মধ্যে একটি নারী-হৃদয়ের পুত্র-পুত্রবধূ বরণ করিবার অতৃপ্ত বাসনা অশ্রুর করুণা-ধারায় ঝরিয়া পড়িল। সমবেত পুরুষের বুক গর্ব্বে ফুলিয়া উঠিল। শুধু আমার উদ্ধত পৌরুষ অপমানে আহত হইয়া ব্যর্থ রোষে গুম্‌রাইয়া-গুমরাইয়া মরিতে লাগিল।

ফাল্গুনের মাতাল হাওয়া বসন্তের এই নব দূত-দূতির পিছনে পাগল হইয়া ছুটিল এবং সেই বাতাসে পাল তুলিয়া মণিদা'র নৌকা বাঁকের মোড় ঘুরিয়া গেল। হায় রে ফুলশয্যা! হায়রে বৌভাত! হায় রে নববধূকে ঘিরিয়া উৎসবের পর উৎসব!

অদ্ভুত বনমানুষ—

পূর্ব্ব-কঙ্গোর কিভু নামক প্রদেশে এই গরিলাটিকে হত্যা করা হয়। কিভু-প্রদেশের জঙ্গলে বাঁদরদের আবাস-ভূমি। এই জঙ্গলে মানুষ প্রবেশ করে নাই বলিলেই হয়। এই গরিলাটির ছাতির মাপ ৭২

বনমানুষের তুলনায় মানুষ

ইঞ্চি। এই গরিলার পাশে একজন শিকারী একটি শিম্পাঞ্জি লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। উভয়ের চেহারা তুলনা করিলে গরিলাটির সবিশেষ পরিচয় পাইবেন।

মানুষের শত্রু—সাপ—

"মানুষের চিরশত্রু সাপ—" এই-প্রকার একটি প্রবাদ-বাক্য বাইবেলে পাওয়া যায়। এই বাক্যটির সত্যতা খুব ভালোরকমেই প্রমাণ হয়, যখন

(১) গোখ্‌রো সাপ

জানা যায় যে প্রতিবছর ২২,০০০ লোক ইংরেজ-শাসিত ভারতবর্ষে সাপের কামড় খাইয়া প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে।

"কোব্‌রা" অর্থাৎ গোখ্‌রো সাপই সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ সাপ, এবং এই সাপের কামড় খাইয়াই বোধ হয় বেশীর ভাগ লোক মারা যায়। অবশ্য

(২) অজগর সাপ

বেশীর ভাগ লোকই রাত্রিকালে সাপের কামড় খাইয়া প্রাণত্যাগ করে বলিয়া কোন্ সাপে কামড়াইয়াছে তাহা স্থির নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। দিনের গরম কমিয়া গেলে, সন্ধ্যাকালের অন্ধকারে বহুলোক ভ্রমণাদি কার্য্যের জন্য গৃহের বাহিরে আসে। সেই সময় সাপেরাও ঠাণ্ডা গর্ত্তাদি হইতে বাহিরে আসিয়া উষ্ণ বালি বা ধূলার উপর পড়িয়া থাকে। কোনো লোকের পা তাহার গায়ে পড়িলে তাহার আর নিস্তার নাই।

সকল সাপই বিষাক্ত নহে। অনেক সাপ পোকামাকড় এবং ইঁদুর আদি ভক্ষণ করিয়া মানুষের নানা-প্রকার উপকার করে। সম্প্রতি একটি "antitoxin" বাহির হইয়াছে ইহাতে সাপে-কামড়ানো লোক বাঁচিবে। ব্রেজিল দেশে একটি বিশেষস্থানে বিষাক্ত সাপ পালন করা

হয় এবং তাহাদের বিষ বাহির করিয়া লইয়া এই antitoxin তৈয়ার হয়। এই antitoxin ব্যবহারের ফলে ব্রেজিলে সর্পাঘাতে মৃত্যুর হার বহুল-পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে।

রহিয়াছে,উহাকে ইংরেজীতে Schlegel's tree viper বা গেছো সাপ বলে। ইহা বিষাক্ত সাপ এবং মধ্য-আমেরিকাতে পাওয়া যায়। এই সাপের বিষ খুব তীব্র নহে। ইহাদের গায়ের রং এমন অদ্ভুত যে

(৩) গেছো সাপ

(৫) স্প্রেডিং অ্যাডার্

(৪) গ্যাবুন সাপ
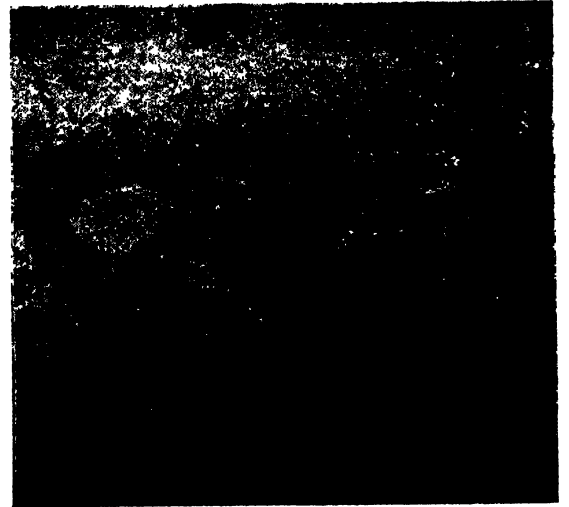
(৬) কিং স্নেক্ (রাজা সাপ)

কতকগুলি সাপের পরিচয় ছবি হইতে পাইবেন। (১) গাছের উপর যে প্রকাণ্ড সাপটি দেখা যাইতেছে উহার ইংরেজী নাম boa constrictor অর্থাৎ অজগর সাপ। মালয়া পেনিন্সুলাতে ইহা বাস করে। ইহা অপেক্ষা বৃহৎ সাপ নাই বলিলেই হয়। অজগর সাপকে নিরীহ বলা যায়। (২) এক হাত উচ্চে মাথা তুলিয়া যে সাপটি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে উহারই নাম গোখ্‌রো সাপ। এই রকম হিংস্র এবং বিষাক্ত সাপ খুব কমই আছে। (৩) গাছের ডাল জড়াইয়া যে-সাপটি

ইহারা অতি সহজেই গাছের ডালে পাতায় এবং ঝোপে আত্মগোপন করিতে পারে। (৪) গ্যাবুন সাপ আফ্রিকা মহাদেশের জঙ্গলের এক-প্রকার অতি ভয়ানক সাপ। ইহাদের গায়ের রং এমন চমৎকার যে শুষ্কপ্রায় ডাল-পাতার সহিত ইহারা বেশ সহজে অন্ত জন্তুর দৃষ্টির আড়ালে থাকিতে পারে। (৫) Spreading adder অতি নির্দ্দোষ সাপ, কিন্তু ইহার ভীষণ মুখাকৃতির জন্ত সকল লোকেই ইহাকে ভয় করে। লোক দেখিলেই এই সাপ হাঁ করিয়া তাহার সমস্ত

দাঁতগুলিকে দেখায়—তাহাতেই সকল লোকে ভয় পায়। (৬) কিং স্নেক-যুক্তরাষ্ট্রে (আমেরিকায়) পাওয়া যায়। এই সাপকে মানুষের বন্ধু বলা চলে, কারণ ইহা র‍্যাট্‌ল্‌ নামক অতি ভয়ানক সাপ মারিয়া ভক্ষণ করে। এই সাপের বিষ নাই, অতি সহজে পোষ মানে এবং গৃহপালিত বিড়াল-কুকুরের মতন মানুষের সঙ্গে একই ঘরে বাস করে।

—

তিমি-শিকার—

বর্ত্তমান সময়ে সকল-প্রকার কাজই বৈজ্ঞানিকভাবে করা হয়। তিমি-শিকারও আজকাল এই কারণে বৈজ্ঞানিকভাবে করা হইয়া থাকে। কিছুকাল পূর্ব্বে পর্য্যন্ত অনেকগুলি ছোটো ছোটো নৌকাতে করিয়া বহু লোক একসঙ্গে মিলিয়া তিমি শিকার করিতে যাইত। এখন আর সেভাবে তিমি-শিকার করা হয় না। এখন বড় জাহাজে করিয়া মাত্র কয়েকজন লোক গিয়া
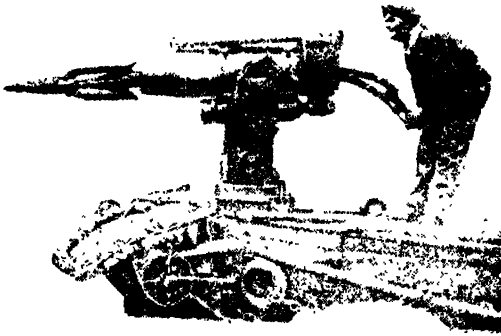
তিমি-শিকার করিবার কামান

একদিনেই, সুবিধা পাইলে তিন-চারটি তিমি-শিকার করিয়া আসিতে পারে। তিমি-মাছের তেল এবং হাড় খুব দামী বলিয়াই তিমি-শিকার করা হয়। তিমি-শিকার করিবার জাহাজ যুদ্ধ-জাহাজের মতন প্রকাণ্ড হয় না। এই জাহাজের মাস্তুলে একজন লোকের বসিয়া পাহারা দিবার মতন একটি ডুলি থাকে। এই ডুলিতে বসিয়া পাহারাওয়ালা সমুদ্রের চারিদিকে দেখে, কোথাও তিমির দেখা পাওয়া যায় কি না। দূরে কোথাও তিমি দেখিতে পাইলেই সে চীৎকার করিয়া নীচে জাহাজের কাপ্তেনকে বলে "whale-ho-o-o" (তিমি হো-ও-ও)। কাপ্তেন জিজ্ঞাসা করে—কোথায়, কোন্‌ দিকে? তখন সে বলে, কোন্‌ দিকে। যদি দুটি তিমির খবর দেয়, তবে আর একজন লোককে উপরে পাঠাইয়া দেওয়া হয়—দুজন লোক দুটি তিমির গতিবিধির উপর প্রখর দৃষ্টি রাখে। কাপ্তান তিমির সংবাদ পাইবামাত্র জাহাজের গতিবেগ বাড়াইয়া দেন। তিমিরা সাধারণত ঘণ্টায় ১৫ নট (১ নট=১।০ মাইল) বেগে সাঁতরাইতে পারে। তিমি-শিকারী জাহাজের বেগ ঘণ্টায় ১৭নট্‌ পর্য্যন্ত হয়। তিমির কাছে আসিলে জাহাজের বেগ কমাইতে-কমাইতে একেবারে থামাইয়া ফেলা হয়। তা'র পর ঘুম্‌ করিয়া শব্দ হইবার সঙ্গে-সঙ্গেই তিমি-মাছটি দু তিনবার ল্যাজের ঝাপ্‌টা দিয়া জলের উপর ভাসিয়া উঠে। কামানের সাহায্যে তিমির গায়ে দড়ি বাঁধা বল্লম বিদ্ধ করিয়া তাহাকে হত্যা করা হয়। তিমি মরিয়া গেলে পর তাহাকে ধীরে-ধীরে জাহাজের কাছে টানিয়া আনা হয়। পুরাকালে তিমিকে শিকার করার পরেই তাহাকে খণ্ড-খণ্ড করিয়া কাটিয়া নৌকা বোঝাই করিয়া লইয়া যাওয়া হইত—বর্ত্তমান সময়ে তিমিকে জাহাজের কাছে টানিয়া আনিয়া, তাহার পেটে ছিদ্র করিয়া তাহার শরীর-মধ্যে হাওয়া পাম্প করিয়া দেওয়া হয়। তিমি বেলুনের মতন ফাঁপিয়া ওঠে। তা'র পর মৃত তিমিকে পতাকা দ্বারা চিহ্নিত করিয়া জলে ভাসমান অবস্থায় ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তা'র পর জাহাজখানি অন্য তিমির সন্ধানে যায়। শিকার শেষ হইয়া গেলে তিমিকে টানিতে-টানিতে ডাঙ্গায় লইয়া গিয়া

জাহাজের পাশে হাওয়া-পাম্প-করা তিমি

তোলা হয়। এক-একটি সাধারণ তিমি লম্বায় ৬০ ফুট এবং ওজনে ৬০ টন্‌ হয়। পুরাকালে কেবল তিমির তেলই বাহির করা হইত—মাংস এবং হাড় ফেলিয়া দেওয়া হইত। বর্ত্তমান সময়ে তিমির হাড় মাংস সবই মানুষের নানা-প্রকার কাজে লাগে। এক-একটি তিমির দাম মোটমাট প্রায় ১২,০০০্‌ হইতে ১৬,০০০ টাকা পর্য্যন্ত হয়।

—

কীট-পতঙ্গের ঘ্রাণেন্দ্রিয়—

মেরুদণ্ডহীন অনেক কীট-পতঙ্গের জীবন-ধারণের এবং প্রাণ-রক্ষার কাজে তাহার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ই সকল অঙ্গের অপেক্ষা অধিক সাহায্য করে। চতুষ্পদ অনেক জন্তুর নাসিকার শক্তি অতি প্রখর, কিন্তু কীট-পতঙ্গের নাসিকার তুলনায় তাহার স্থান অনেক নীচে। অনেক কীট-পতঙ্গের শব্দ শুনিবার জন্য কান নাই এবং চক্ষুর দৃষ্টিও অতি ক্ষীণ, সেই জন্যই তাহাদের নাসিকার শক্তি এত প্রখর বলিয়া মনে হয়। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে কীট-পতঙ্গ শত্রু মিত্র বুঝিতে পারে এবং কোথায় তাহার খাদ্য আছে তাহার সন্ধান করিয়া চলিতে পারে।

গ্রন্থীপদী জন্তুদের (arthropods) শৃঙ্গ বা শুঁড়াই তাহাদের নাসিকার কাজ করে। এই বিষয় লইয়া অনেক তর্ক বিতর্ক হইয়া গিয়াছে, কিন্তু বিপক্ষমতবাদীদিগকে অবশেষে এই মতের যাথার্থ্য মানিয়া লইতে হইয়াছে কারণ শৃঙ্গওয়ালা জন্তুদের শৃঙ্গসমেত খাদ্যানুসন্ধানে যেমন তৎপর দেখা গিয়াছে, শৃঙ্গবিহীন অবস্থায় তাহা'রা তেম্‌নিই অসহায় বলিয়া প্রমাণ হইয়াছে। এই শৃঙ্গ দ্বারা তাহারা আসন্ন শত্রুর বার্ত্তা জানিতে পারে এবং দরকারমত পলায়ন করে বা যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হয়। বায়ুর স্পন্দনে ইহা তাহারা জানিতে পারে। অনেক জন্তু চোখ এবং কানের সাহায্যে যাহা করিয়া থাকে, এই গ্রন্থীপদী জন্তুরা তাহাদের শৃঙ্গের দ্বারা তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী কাজ

পুং ও স্ত্রী ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের পার্থক্য—বামে পুং-ইন্দ্রিয় ও দক্ষিণে স্ত্রী-ইন্দ্রিয়
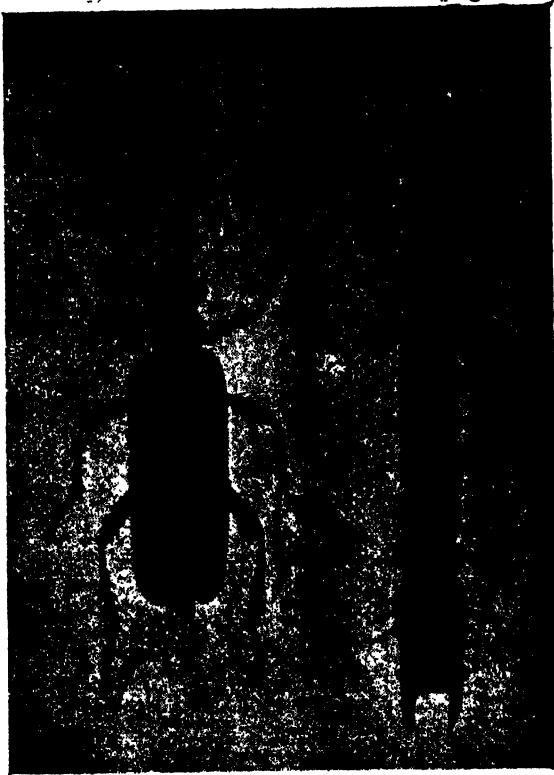
একটি গুবরে-পোকার দুই অবস্থা

করিয়া থাকে। এই শৃঙ্গ যে কেবল খাদ্য সন্ধান এবং শত্রুর আগমন বার্ত্তা বলিয়া দেয় তাহা নহে। এই শৃঙ্গ স্ত্রী-পুরুষের মিলনও সম্ভবপর করিয়া তোলে। একটি সহরে একটি স্ত্রী মথ-পোকাকে লইয়া গিয়া দেখা গিয়াছে যে তিন মাইল দূরবর্ত্তী গ্রাম বা জঙ্গল হইতে পুং মথ-পোকা তাহার কাছে আগমন করিয়াছে। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতার জন্যই ইহা সম্ভবপর হইয়া থাকে। মৌমাছিকে ভালো করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে সে কেমন করিয়া হাওয়ার গতির সাহায্যে মধুসম্পন্ন পুষ্পের দিকে চলিয়া যায়, এবং ঘ্রাণশক্তির সাহায্যে একটু-একটু অগ্রসর হইতে-হইতে অবশেষে সেই ফুলের উপর গিয়া বসে। অনেক সময় সে হয়ত ফুল ছাড়াইয়া একটু আগাইয়া যায়, কিন্তু একটু পরেই আবার ফিরিয়া আসে এবং নির্দ্দিষ্ট ফুলের উপর বসে।

শিংওয়ালা পোকারা যখন শিকার ধরে,তখন তাহা দেখিবার জিনিষ। সে হয়ত চুপ করিয়া শিকারের আশায় বসিয়া আছে—যে-মুহূর্ত্তে তাহার কাছে একটি মাকড়সা বা ফড়িং আসিল, অম্‌নি সে চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহার শৃঙ্গটি মাকড়সা বা ফড়িংএর গতি-অনুসারে সাম্‌নে-পশ্চাতে দুলিতে থাকে। তা'র পর যদি মাকড়সা বা ফড়িংটি পশ্চাতে গিয়া বসে তবে শিকারী পোকাটি হঠাৎ পশ্চাতে ঘুরিয়া দাঁড়ায় এবং শিকারের ঘাড়ে পড়িয়া তাহাকে হত্যা করে। এইসমস্ত ব্যাপারটি কেবল শৃঙ্গ বা শুঁয়া বা ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সাহায্যেই হইয়া থাকে। শুঁয়াওয়ালা পোকার শুঁয়া খুব ধারালো কাঁচি দিয়া কাটিয়া দিলে, পোকা কিছুকাল পরে কোনো-প্রকার বিশেষ অসুবিধা ভোগ করে না। এই-প্রকার অঙ্গহানিতে পোকার কোনো-প্রকার শারীরিক ক্ষতি হয় না। কীট-পতঙ্গের palpi ও (শুণ্ড) নাসিকার কাজ করিতে পারে। তবে ইহার সাহায্যে দূরের কোনো দ্রব্যের ঘ্রাণ পোকা পাইতে পারে না। মাকড়সার শুঁয়া নাই—সে তাহার শুণ্ডের (palpi) সাহায্যেই তাহার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের কাজ চালাইয়া থাকে। কিন্তু মাকড়সার ঘ্রাণ-শক্তি প্রবল নহে। ইহা সহজেই প্রমাণ করা যাইতে পারে। মাকড়সার সুতা কেহ ধরিয়া থাকিলে মাকড়সা

কতিপয় পতঙ্গের শৃঙ্গ
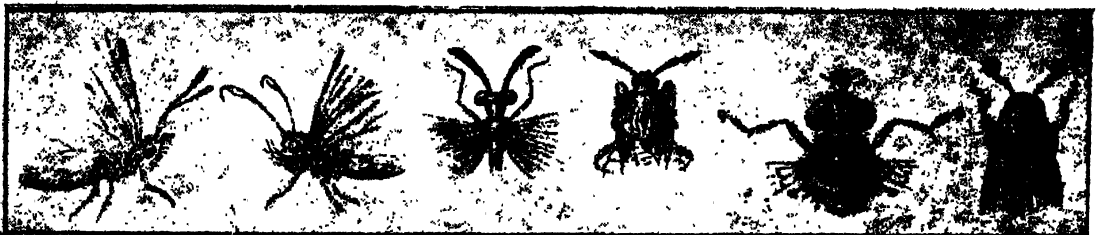
তাহা বাহিয়া সেই হাত পর্য্যন্ত উঠিবে। তাহার পর সে মানুষের হাতের গন্ধ পাইয়া সেখান হইতে নীচে পড়িয়া যাইবে—কিন্তু শুঁয়াযুক্ত কোনো ফড়িং বা প্রজাপতি মানুষের আগমন দূর হইতেই বুঝিতে পারিয়া সতর্ক হয়।

কীট পতঙ্গের শুঁয়া বা শৃঙ্গের কোনো-প্রকার নির্দ্দিষ্ট আকার নাই। এক একপ্রকার পোকার এক-একপ্রকার শুঁয়া। শুঁয়ার অনেক গাঁট থাকে। শেষের গাঁট একটু বড় হয়, এবং তাহার জন্যই অনেক পোকার শুঁয়া দেখিতে একটা গদার মতন। অনেক পোকার শুঁয়া ডালপালা যুক্তও হয়—যেমন ঘাস ফড়িংএর শুঁয়া।

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে শুঁয়াবিহীন মাছি বা অন্য কোনো-

দীর্ঘ অথচ সূক্ষ্ম ঘ্রাণেন্দ্রিয়যুক্ত পোকা
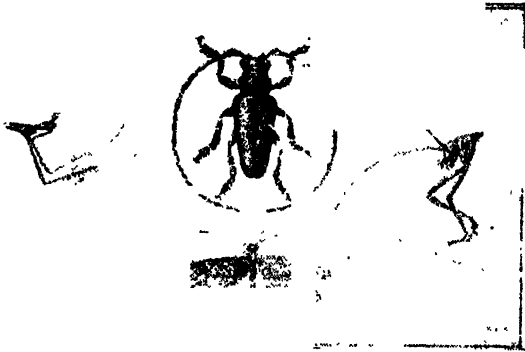
প্রকার পোকার অবস্থা বড়ই খারাপ হয়। শুঁয়াবিহীন পোকা যদি পুরুষ হয়, তবে তাহার স্ত্রী জোটে না, এবং সে যদি স্ত্রী হয় তবে তাহার পুরুষ জোটে না। শুঁয়া থাকিলে পোকারা নিজেই চেষ্টা করিয়া ঘ্রাণ শক্তির সাহায্যে দরকার-মতন স্ত্রী-পুরুষ জুটাইয়া লয়—শুঁয়া না থাকিলে তাহাকে সকল সময় অন্যের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। জালতির ভিতর স্ত্রী-মথ্ বন্ধ রাখিয়া তাহার কিছু দূরে পুং মথ্ ছাড়িয়া দিয়া দেখা গিয়াছে যে পুং-মথ্ জালতির উপর স্ত্রী মথ্‌টির নিকটতম স্থানে আসিয়া বসিয়াছে। পোকার শুঁয়াকে shellac দিয়া আবৃত করিয়া দেখা গিয়াছে, যে, সে তাহার শুঁয়াকে কাজে লাগাইতে পারে নাই, কিন্তু অন্ধ শুঁয়াযুক্ত পোকা কেবল মাত্র তাহার শুঁয়ার সাহায্যেই সব কাজ চালাইয়া লইতে পারে।

—

অপূর্ব্ব তারকা—

প্রায় ৩০০ বছর পূর্ব্বে জার্ম্মান জ্যোতির্ব্বিদ্ Fabricius তাঁহার অনুন্নত-ধরণের দূরবীন্ দিয়া আকাশ দেখিতে-দেখিতে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতে পাইলেন। একটি লাল তারা, যাহা তিনি কিছুদিন পূর্ব্বে Cetus (তিমি) তারকাপুঞ্জের মধ্যে দেখিয়াছিলেন তাহা ক্রমশ দৃষ্টিপথ হইতে অদৃশ্য হইতেছিল। ইতিপূর্ব্বে তিনি এমন দৃশ্য দেখেন নাই। তা'র পর কয়েক রাত্রি ধরিয়া তিনি এই তারাটিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিতে লাগিলেন—ইহা ক্রমশ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া দৃষ্টিপথ হইতে একেবারে সরিয়া গেল।

তা'র পর দিবারাত্রি ধরিয়া Fabricius এই হারানো তারাটির সন্ধান করিতে লাগিলেন। বিফল হইতে-হইতে তাঁহার এই অক্লান্ত চেষ্টা একদিন সাফল্য-মণ্ডিত হইল। তারাটি একরাত্রে খুব অস্পষ্ট হইয়া দেখা দিল, তা'র পর ক্রমশ স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া আবার পূর্ব্বরূপ ধারণ করিল। এই তারা আবার ক্রমশঃ অদৃশ্য হইয়া গেল। তিনি এই তারার নাম ওমিক্রন্ রাখিয়াছিলেন।

Fabricius অন্যান্য জ্যোতির্ব্বিদ্‌দের তাঁহার অপূর্ব্ব আবিষ্কারের কথা বলিলেন এবং অন্য কোনো তারা যে এ-প্রকার ব্যবহার করে না, ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া এই অপূর্ব্ব তারার নাম রাখিলেন "Mira" (the Wonderful)। সেই সময় হইতে এই তারা জ্যোতির্ব্বিদ্‌দের কাছে এক পরম রহস্যময় জিনিষ হইয়া রহিয়াছে। উন্নত-ধরণের দূরবীনের সাহায্যে ইহাও জানা গিয়াছে যে "মীরা" সত্য-সত্যই শূন্যে মিলাইয়া গিয়া আবার ফুটিয়া উঠে না—ইহা শূন্যমার্গে ভ্রমণ করিতে-করিতে

"মীরা"

এই তারকা প্রস্থে ২৫০,০০০,০০০ মাইল

এত দূরে চলিয়া যায় যে খুব ভালো দূরবীন্ না হইলে তাহাকে আর কোনো-প্রকারেই দেখা যায় না। এই তারার ভ্রমণের একটি নির্দ্দিষ্টবৃত্ত আছে এবং বৃত্তটিকে একবার ঘুরিয়া আসিতে মীরার ১১ মাস সময় লাগে।

বহুকাল ধরিয়া ক্রমাগত চেষ্টা করিবার ফলে কিছুদিন পূর্ব্বে জার্ম্মান জ্যোতির্ব্বিদের আবিষ্কৃত "মীরা" নামক তারার বিষয়ে অনেক তথ্য আবিষ্কার বৈজ্ঞানিকগণ করিয়াছেন। আমেরিকার কার্‌নেগি ইন্‌স্টিটিউশনএর জ্যোতির্ব্বিদ্ এফ্ জি পিজ্ 'হুকার' নামক ১০০" ইঞ্চি মুখওয়ালা দূরবীনের এবং একটি ২০ ফুট Michelson interferometerএর সাহায্যে মীরা নামক তারার ব্যাসের দৈর্ঘ্য মাপিতে সক্ষম হইয়াছেন। আরো নানা-প্রকার তথ্য-আবিষ্কারের ফলে ইহা জানা গিয়াছে যে Antares-নামক তারকাকে বাদ দিলে "মীরা" সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ তারকা। এই "মীরা"'র তুলনায় Betelgeuse নামক প্রকাণ্ড তারকাকে অতি নগণ্য বলিয়া মনে হয়।

"মীরা"র এক-প্রান্ত হইতে আর-এক প্রান্ত পর্য্যন্ত ২৫০,০০০,০০০ মাইল অর্থাৎ সূর্য্য হইতে পৃথিবীর দূরত্বের প্রায় তিন গুণ। ইহার ব্যাস সূর্য্যের ৩০০ এবং পৃথিবীর ৩০,০০০ গুণ বড়। যদি ঘণ্টায় ৬০ মাইল বেগে কোনো যান দৌড়ায় তবে মীরার ব্যাস অতিক্রম করিতে তাহার ৬০০ বৎসর সময় লাগিবে। মীরাকে যদি 'প্রবাসী'র এই পৃষ্ঠার সমান একটি বৃত্ত বলিয়া ধরা হয়, তবে পৃথিবী ইহার তুলনায় যাহা হইবে তাহা বড় দূরবীনের সাহায্যেও দেখা দুষ্কর। পৃথিবীর দিন-প্রতি একবার করিয়া নিজেকে প্রদক্ষিণ করিতে-করিতে মীরাকে একবার ঘুরিয়া আসিতে ১০০ বছর সময় লাগিবে। পৃথিবী হইতে "মীরা"র দূরত্ব ১৬৯ আলোক-বৎসর। ইহার মানে এই যে "মীরা" হইতে যে আলোক-রশ্মি আজ বাহির হইল তাহা এক সেকেণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল বেগে ভ্রমণ করিতে-করিতে ১৬৯ বৎসর পরে পৃথিবীতে আসিয়া পৌঁছাইবে।

"মীরা"র দূরত্ব ছাড়াও ইহার সম্বন্ধে আরো অনেক-কিছু জানিতে পারা গিয়াছে। ইহার উত্তাপ 8000° Centigrade—Spectroscope-এ দেখা যায় যে মীরাতে titanium oxide বর্ত্তমান

আছে—এই দ্রব্য বেশী temperatureএ কোনো-প্রকারেই থাকিতে পারে না। মীরার লাল রং দেখিয়া জ্যোতির্ব্বিদগণ বহুকাল পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছিলেন যে মীরা অতি শীতল তারকা। হলদে রং এর তারকা ভয়ানক গরম। সূর্য্যের রং হলদে। সূর্য্যের তাপ প্রায় ৬০০০ ডিগ্রি। শাদা তারকাদের তাপ ১০,০০০ হইতে ১৫,০০০ ডিগ্রী।

মীরার পরিমাণ (Volume) সূর্য্য অপেক্ষা ২৭,০০০,০০০ বেশী। কিন্তু ইহার দ্রব্যভাগ (mass) সূর্য্য অপেক্ষা ১০০ গুণ কম। মীরা নানা-প্রকার

পৃথিবী হইতে মীরার দূরত্ব

জলন্ত গ্যাসে পরিপূর্ণ। মীরার আলোক কম-বেশী হওয়ার এক কারণ বৈজ্ঞানিকগণ বলিয়া থাকেন। তাহা এই :—এই তারকা হইতে যেমন খানিক তাপ এবং আলোক বাহির হইয়া গেল, অমনি ইহা কিছু-পরিমাণে সঙ্কুচিত হইল এবং ঠাণ্ডা হইয়া মেঘ সঞ্চার করিল। এই মেঘ কিছুকালের মতন আলো এবং তাপ আট্‌কাইয়া রাখে, পরে তাপ অত্যধিক হইলেই তাহা মেঘাবরণ ভেদ করিয়া শূন্যমার্গে ছুটিয়া যায়।

—

ছাগল-ছানাকে দুধ খাওয়াইবার কল—

ক্যালিফোর্নিয়ার এক ছাগলের খোঁয়াড়ে ছাগল ছানাদের দুধ খাওয়াইবার কল আবিষ্কার হইয়াছে। কতকগুলি পাত্রে দুধ ভরিয়া তাহার গায়ে কয়েকটি করিয়া নিপল্ লাগাইয়া দেওয়া হয়। ইহার সাহায্যে বাচ্চারা বেশ আরামে দুধ পান করিতে পারে। দুগ্ধ পাত্রগুলি দেওয়ালে আট্‌কানো থাকে—এবং যাহাতে ছাগল-ছানাদের মুখ নিপল্ পর্য্যন্ত পৌঁছায় তাহার ব্যবস্থা থাকে। দিনে তিনবার করিয়া এই দুগ্ধ-

ছাগল-ছানাকে দুধ পান করাইবার কল

পাত্রগুলি দুগ্ধপূর্ণ করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু একটি বড় মুস্কিল এই-খানে হয়। সকল ছাগল-বাচ্চারাই একটি নিপল্ লইয়া বড় কাড়াকাড়ি করিতে থাকে—ভাব দেখিয়া মনে হয় যেন সবাই একটি নিপল্ হইতে দুগ্ধ পান করিতে চায়।

পিপীলিকার ভাষা—

পিপীলিকারা কেমন করিয়া তাহাদের স্বজাতীয়দের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান করে সেই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ আমেরিকার Daily Science News Bulletin নামক পত্রিকায় বাহির হইয়াছে। প্রবন্ধটি অধ্যাপক ফন্ এচ্ আইড্‌মানের (Prof. von H. Eidmann) লেখা। অধ্যাপক-মহাশয় নিজে পিপীলিকাদের অনেক দিন ধরিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। পিপীলিকারা কেমন-ভাবে খাদ্য অন্বেষণ করে এবং খাদ্যের সন্ধান পাইলেই কেমন করিয়া তাহা দলের অন্যান্য সকলকে খবর দেয়, ইহাই অধ্যাপক-মহাশয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন। একটি পিপীলিকা বড় এক-টুক্‌রা খাদ্য দেখিতে পাইবামাত্র তাহাকে একলাই বহন করিয়া আবাসে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিল ; কিন্তু যখন তাহা করিতে পারিল না, সোজা পথে আবাসে গিয়া অন্যান্য সকলকে খবর দিল। পিপীলিকার আবাস ভূমিতে সকল সময় কড়া পাহারা থাকে। আবাস-ভূমির দুয়ারে একটি প্রহরা-ঘর থাকে—এই ঘরে সকল সময়েই সাহায্যকারী পিপীলিকা তৈয়ার থাকে—সাহায্য করিবার ডাক আসিবামাত্র তাহারা বাহির হইয়া যায়। খাদ্য-আবিষ্কারক পিপীলিকা আবাসে ঢুকিয়াই অন্যান্য সকলের শৃঙ্গে নিজের শৃঙ্গ ঠেকাইয়া তাহাদের খাদ্য-প্রাপ্তির সুসংবাদ প্রদান করে। খবর পাইবামাত্র সকলে সারি বাঁধিয়া আবাস হইতে খাদ্যের দিকে চলিতে থাকে। যে খাদ্যের সন্ধান লইয়া আসিয়াছিল

সেই সকলকে পথ দেখাইয়া লইয়া যায়। সকলেই তাহার নির্দ্দেশ-অনুসারে চলে। তা'র পর খাদ্যের নিকটে আসিয়া সকলে মিলিয়া খাদ্যটুক্‌রাকে ভাঙিয়া গুঁড়া-গুঁড়া করিয়া লইয়া বাসার দিকে বহন করিয়া লইয়া যায়। এই-প্রকারে সমস্ত টুক্‌রাটিই পিপীলিকা-খাদ্য-ভাণ্ডারে গিয়া জমা হয়। অনেক সময় দেখা যায় যে, আবাস হইতে সাহায্যকারী দল লইয়া খাদ্যের দিকে যাত্রী পিপীলিকার দলের মোড়লের পথের উপর সাদা একটুক্‌রা কাগজ পাতিয়া দিলে তাহার দিক্‌ভ্রম হয়। ইহা যে কেন হয় তাহা বলা যায় না। পথের বিশেষ গন্ধের জোরে ইহারা দিক্ নির্দ্দেশ করে কি না, তাহাও বলা যায় না।

অধ্যাপক আইড্‌ম্যান্ পিপীলিকাদের কতকগুলি আশ্চর্য্য সদ্‌গুণের আবিষ্কার করিয়াছেন। পিপীলিকারা প্রাণপণ করিয়াও যে ভার একলা বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারে,তাহার জন্ত কোনো সাহায্য প্রার্থনা করে না। ছোটো-ছোটো অনেক টুক্‌রা খাবার পিপীলিকার সাম্‌নে ছড়াইয়া দিয়া দেখা গিয়াছে সে বারবার এক্‌লা আসিয়া সমস্ত খাদ্যটুক্‌রাগুলিকে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছে। পিপীলিকার কর্ত্তব্যজ্ঞান প্রশংসনীয়। যখন তাহারা কোনো স্থানে বিশেষ খাদ্যের খোঁজ পাইয়াছে, তখন তাহাদের সামনে অন্য খাদ্যের টুকরা ফেলিয়া দিলেও তাহা একবার মাত্র শুঁকিয়া পূর্ব্বপ্রাপ্ত খাদ্যের আহরণে চলিয়া যায়। পূর্ব্বপ্রাপ্ত খাদ্য অপেক্ষা ভালো এবং উত্তম খাদ্যও সাম্‌নে ছড়াইয়া দিয়া একই ফল পাওয়া গিয়াছে। খারাপ হইতে ভালো বিচার করিবার যে মানসিক ক্ষমতার দরকার তাহা পিপীলিকাদের নাই বলিয়াই হয়ত এইরূপ হয়। কিম্বা যাহা পূর্ব্বে পাওয়া, তাহা আগে গ্রহণ করিতে হইবে, এইপ্রকার কর্ত্তব্যবোধের জন্যই তাহারা এরূপ ব্যবহার করে, ইহাও হইতে পারে। পিপীলিকাদের স্মৃতিশক্তি বোধ হয় অল্পকালস্থায়ী, কিন্তু ইহাও দেখা গিয়াছে যে বিশেষ-কোনো স্থানে প্রাপ্ত খাদ্য বহন করা শেষ হইয়া যাইবার পরেই পিপীলিকার দল বার-বার সেই একই স্থানে ফিরিয়া আসে।

—

অগ্নি-নির্ব্বাপকদলের নতুন বর্ম্ম—

অগ্নি নির্ব্বাপকদের আগুনের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য জার্ম্মানিতে এক-প্রকার নতুন ধরণের বর্ম্ম পরীক্ষা হইতেছে। অগ্নি নির্ব্বাপক ওয়াটার্‌প্রুফ্ পোষাক এবং দস্তানা পরিধান করে, তাহার মাথায় একটি ফোয়ারার মতন জলের কল বসানো থাকে—এই কলের সহিত রাস্তার জলের নলের যোগ থাকে। এই মাথার উপরকার ফোয়ারা দিয়া

অগ্নি-নির্ব্বাপক ফোজের বর্ম্ম

ক্রমাগত জল বাহির হইয়া অগ্নি-নির্ব্বাপকের চারিদিকে পড়ে এবং তাহাকে আগুন এবং তাপ হইতে বাঁচায়। এই-প্রকার বর্ম্মের সাহায্যে অগ্নি-নির্ব্বাপক আগুনের অতি নিকটে গিয়া তাহার সহিত লড়াই করিতে পারিবে।

—

মৃত্যুঞ্জয়

শ্রী অমরেশ রায়

চাহ নাই যশ তুমি চাহ নাই দশের সম্মান!
নিজ কীর্ত্তি গান,
আপনার নিন্দাবাদ, স্তুতি
ঘটায়নি সত্যপথে তিলেক বিচ্যুতি,
কর্ত্তব্যের বিন্দু অবহেলা।

বিক্ষুব্ধ-বারিধি-বক্ষে ভাসাইয়া ভেলা
চাহ নাই মেঘলুপ্ত আকাশের পানে;
ঝটিকার দীপ্ত-রুদ্রগানে
ত্রস্তচোখে চাহনি পশ্চাতে।

ক্ষুব্ধ অন্ধরাতে
দিক্‌হারা ঘনান্ধ তিমিরে
সভয়ে সম্মুখ ত্যজি' শান্ত তটে চল নাই ফি'রে!

সুদূর আকাশ-প্রান্তে দেখি কোন আশার আলোক
মুক্তির সে কোন পুণ্যলোক,
সেই দিকে দৃষ্টি রাখি' হয়েছ সম্মুখে অগ্রসর ;—
বিশ্রামের বিন্দু অবসর
খোঁজো নাই শান্ত উপকূলে!

সব ভু'লে
সত্যেরে চেয়েছ শুধু তুমি ;—
ভালোবেসেছিলে তব দুঃখী মাতৃভূমি ;
স্বজাতির দুখে
অনন্ত বেদনা তব বেজেছিল বুকে!

তাই তুমি সেবিতে স্বদেশে,
সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর বেশে,
ক্লান্তিহীন সেবা ল'য়ে, মৃত্যুহীন প্রেমে,
দীপ্তজ্যোতিষ্কের মতো এসেছিলে নেমে
অন্ধকার ভারত-গগনে!

আমরণে
ভারতের মুক্তি লাগি' করেছ সাধনা,
দেশমাতৃকার আরাধনা ;
হে মুক্তি-সাধক
আপন জীবন-অর্ঘ্যে মৃত্যু তব করেছ সার্থক!
চ'লে গেছ চির শান্তিলোকে!
মুক্তির হে মূর্ত্ত আশা! তোমারে হারায়ে আজি শোকে
বহিতেছে অশ্রুধার।

মহান্ তোমার
শূন্য সিংহাসন,—
বিরাটের সে মহা আসন
কে পারে করিতে পূর্ণ, কিসের স্পর্দ্ধায়,
কোন্ ত্যাগে, কোন্ যোগ্যতায়!
মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাসে ধ্বনিয়া উঠেছে আজি, তাই,
এ-দুর্দ্দিনে, "নাই তুমি নাই!"

"নাই তুমি?" মিথ্যা কথা!
ত্যাগে প্রেমে লভেছ যে চির-অমরতা,
সেকি মিথ্যা হবে?
সেকি তবে
ভিত্তিহীন মিথ্যার কল্পনা?
অলীক জল্পনা!

নহে, কভু নহে!
আজও বহে
মৃত্যুহীন তব প্রাণধারা
ভেদি' মৃত্যুকারা
অনন্ত উৎসাহে,—
মৃত্যুঞ্জয়ী অমৃত-প্রবাহে!

আছে তব প্রাণ!
তুমি ত ত্যজনি তা'রে করেছ যে দান।
বিদ্যুৎবহ্নির স্রোতে সর্ব্ব চিত্ত ভরি'
শিরায়-শিরায় আজি বন্যাবেগে উঠিছে সঞ্চরি'
সর্ব্বগ্রাসী মৃত্যুরে দহিয়া,
সে বিরাট্ প্রাণ তব দীপ্ত স্রোতে চলেছে বহিয়া!

জাপানবাসীর চরিত্র

নয় বৎসর পূর্ব্বে যখন আমি য়োকোহামায় শ্রীযুক্ত হারার বাটীতে অবস্থান করিতেছিলাম তখন প্রতিদিনই দেখিতাম—দুপুরবেলায় কলকারখানা হইতে মজুররা ধীরে-ধীরে বাহির হইয়া হারা মহাশয়ের সুন্দর বাগানে ঢুকিয়া খানিক দূর যাইয়া ঝাউগাছের তলায় বসিত এবং অন্তত পাঁচ মিনিটের জন্য বিপুল সমুদ্রের সঙ্গে আকাশের পরস্পর মিলন লক্ষ্য করিত, যেন ইহা তাহাদের কাছে খাদ্য ও পানীয় স্বরূপ; তাহার পর ধীরে-ধীরে চলিয়া যাইত;—রোজ ইহা দেখিতাম ও বিস্মিত হইতাম। জাতির পক্ষে এটি একটি মস্ত লাভের কথা যে, সমস্ত জাপানবাসীর চিত্তে শান্ত ও মহীয়ান্ সৌন্দর্য্যের জন্য একটি ক্ষুধা আছে—যে-সৌন্দর্য্য স্থূল ইন্দ্রিয়ভোগের বিষয়ীভূত নয়, যে-সৌন্দর্য্যে দিবাভাগের প্রচণ্ড কর্ম্মতাড়নার মধ্যেও তাহারা চিত্ত নিমগ্ন রাখিতে পারে এবং এইরূপে অনন্তের মধ্যে তাহাদের স্বাধীনতা উপলব্ধি করে।

প্রত্যেক শনিবার ও রবিবারে পুরুষ, নারী ও বালক-বালিকারা বাগানের ঝোপে-ঝোপে নিকুঞ্জে জমায়েত হইয়া সন্ধ্যার ধূসর আলোকে কোনো খোলা জায়গায় গিয়া হাজির হইত। কোনো গোলমাল নাই, ঘাসের উপর দাবাদাবি নাই, ফুল ছেঁড়াছিঁড়ি নাই, কলার খোসায়, লেবুর খোসায় বা খবরের কাগজের টুকরায় পথ ভর্ত্তি হইত না। কোনোরূপ অভদ্র ব্যাপার ঘটিত না, মাতালের মাতামাতি নাই, হাসির হল্লা নাই।

এইসব লোক শ্রমিক শ্রেণীর। অপর দেশে আমরা জানি এইসব লোকের উপভোগের বিষয় কি, এদের কিরূপ উত্তেজনার প্রয়োজন। কিন্তু এখানে (জাপানে) ইহাদের ছুটির দিনটি আকাশের বিশুদ্ধ আলোকের প্রতি উন্মুক্ত একটি পদ্মের মতন বলিয়া আমার মনে হইত, ইহারা যেন সেই পদ্মটির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া নীরবে তাহার গুপ্ত মধু আহরণ করিবার জন্য ঝাঁকে-ঝাঁকে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই ব্যাপারটি জাতীয় প্রকৃতির মধ্যে যে কিছু মহত্ব আছে তাহারই পরিচয় দেয় এবং ইহা দেখিয়া আমার চিত্ত মুগ্ধ হইয়াছিল।

ইহাতে আমার মনে প্রায় হিংসাই হইত যে, যদি আমাদের দেশবাসীর মধ্যে এমন-একটি সুন্দর উপভোগ-শক্তি থাকিত। সৌন্দর্য্যের প্রতি এই গভীর সহানুভূতি, এমন একটি সর্ব্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ-বোধ তাহাদের দৈনন্দিন আচরণে নানা-ভাবে পরিলক্ষিত হয়। তাহাদের দৈনন্দিন জীবনে যে সহিষ্ণুতার অনুশীলন তাহা শক্তির সহিষ্ণুতা—ইহা তাহাদের অনুপম আচার-ব্যবহারকে নিয়মিত করিয়াছে এবং তাহার সহিত আত্ম-সংযমের মিশ্রণ ঘটাইয়াছে; সে-আত্মসংযম প্রায় আধ্যাত্মিক শ্রেণীর।

একদিন আমরা মোটরে করিয়া বেড়াইতেছি এমন সময় একটি প্রকাণ্ড মাল-বোঝাই গাড়ী সামনে আসিয়া রাস্তা বন্ধ করিয়া দিল। আমাদের মোটর-চালকের ধৈর্য্য দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম; সে একটিও কড়া কথা বলিল না, ধীরভাবে ধীর-মনে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিল, যতক্ষণ না সে গাড়ীটি পথ ছাড়িয়া দিল। তাহার পর দুই চালকে পরস্পর অভিবাদন করিয়া চলিয়া চলিল। আর-একবার আমাদের মোটর-চালক ভুল করিয়া একটি সাইকেল-চালককে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিল। সাইকেল-চালকের শরীরে জায়গায়-জায়গায় ছড়িয়া গেল; তাহা সত্ত্বেও সে একটি কথা বলিল না, আমাদের চালককে ভুলের জন্য বকিল না। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া গাল হইতে রক্ত মুছিয়া ফেলিল এবং সাইকেল চড়িয়া চলিয়া গেল—যেন কিছুই হয় নাই। এই ক্ষুদ্র ব্যাপারটির মধ্যে মস্ত বড় কথা আছে।

নানা ব্যাপারে আমি জাপানীদের আচরণে আশ্চর্য্য আত্মসংযম ও ক্ষমার ভাব অথবা অন্তত পরস্পরকে ঠিকভাবে বোঝার ভাব লক্ষ্য করিয়াছি। যে-ঘটনাগুলির উল্লেখ করিলাম তাহাতে উভয় পক্ষই পরস্পরের ভুলের জন্য নীরবে সহ্য করিয়া গেল। ইহা সহজ ব্যাপার নয়। ইহা প্রচুর অনুশাসন ও শতাব্দীর সভ্যতার ফল। আমি জগতের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়াছি। যদি অন্য জায়গায় বা ভারতবর্ষের সহিত জাপানের তুলনা করি তাহা হইলে আমাকে স্বীকার করিতে হইবে—জাপানীদের মধ্যে বীরত্বের কতকগুলি উপাদান আছে যাহা অন্যত্র বিরল। সে-বীরত্বের সঙ্গে তাহাদের সৌন্দর্য্য-প্রতিভার সামঞ্জস্য আছে।

(বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

—

সুল্‌তান মাহ্‌মুদ ও ইস্‌লাম

ইস্‌লাম ধর্ম্মের যাহা হইবার কথা নয় মাহ্‌মুদের হাতে তাহার তাহাই হইল—অর্থাৎ ইহা রক্তপাত ও নির্ম্মমতার আকর এবং অত্যাচার ও সর্ব্বৈব লুণ্ঠনের কারণ হইয়া উঠিল। কোনো ধর্ম্মের বিচার হয় সেই ধর্ম্মাবলম্বী লোকদের নৈতিক চরিত্র দেখিয়া। যদি তাহারা নৈতিকতায় হীন হয় তাহা হইলে তাহাদের ধর্ম্মের মধ্যে গলদ আছে বলিয়া লোকে মনে করে। একাদশ শতাব্দীর হিন্দু জাগরণের কালে সেতুস্থানীয় হিন্দুগণ মুসলমান-ধর্ম্ম-সম্বন্ধে বিচার করিয়া বলেন—"পরীক্ষা করা গেল সুবিধা হইল না," এবং তাঁহারা যে মনে-মনে আহত হইয়াছিলেন তাহার যথেষ্ট কারণও আছে। ইহা বলিলে বাহুল্য হইবে না যে, মাহ্‌মুদ ভারতে ইস্‌লামের সাফল্য বিনষ্ট করিয়াছিলেন; যে সামান্য সাফল্য ঘটিয়াছে তাহার মূলে বিভিন্ন আন্দোলন ও বিভিন্ন শ্রেণীর লোক আছে। যে-ধর্ম্ম মাহমুদের নিকট লাভের উপায় ছিল, তাহাই জীবন-মৃত্যু-সমস্যায় জর্জ্জরিত পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর নিকট আধ্যাত্মিক সান্ত্বনার বিষয় ছিল। এইসব সন্ন্যাসী মাহমুদের এক-শতাব্দী পরে নূতন জায়গায় নূতন ধর্ম্মকে গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা রাজদরবার ও যুদ্ধক্ষেত্র হইতে দূরে থাকিয়া এবং মাহ্‌মুদ হইতে স্বতন্ত্র প্রণালী অবলম্বন করিয়া ভারতের এক শ্রেণীর লোকের চিত্ত মহম্মদের ধর্ম্মের প্রতি অনুরক্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

(ইণ্ডিয়ান্ রিভিউ) মহম্মদ হাবিব

—

ইস্‌লাম ধর্ম্ম

ইস্‌লাম আজ একটি জীবন্ত শক্তি; পৃথিবীর বহু জাতির মধ্যে ইহা প্রচলিত; বৌদ্ধ ও খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রবল প্রতিপত্তির সময়েও এরূপ বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে নাই। সারল্য এবং ঋজুত্ব-গুণে ইস্‌লাম আধুনিক কালে ইউরোপ, আমেরিকা এবং এসিয়ার মনস্বী লোকদের চিত্ত আকৃষ্ট করিয়াছে। সর্ব্বোপরি, মহৎ এবং উদার ধর্ম্মের যে দৃঢ়ত্ব ও ওজস্বিতাগুণ সেই গুণে ইহা লোকের চিত্ত অধিকার করিয়াছে। পুস্তকে পড়িয়াছি যে, জেনেরাল্ গর্ডন্, যিনি গোঁড়া খৃষ্টান ছিলেন, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে

ইস্‌লামের মধ্যে যে গভীর ধর্ম্মভাব এবং সারল্য তাহার প্রতি তিনিও শ্রদ্ধান্বিত হইয়া উঠেন।

ভারতবর্ষে আসিয়া প্রথম-প্রথম যখন আমি দিল্লীতে ছিলাম তখন হিন্দু আদর্শ অপেক্ষা ইস্‌লাম আদর্শের প্রতি আমার চিত্ত অধিকতর আকৃষ্ট হয়। সে-সময়ে আমি বাস্তবিকই ইস্‌লামে নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম; ইস্‌লামের ইতিহাস ও জ্ঞানবত্তা আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল; ইস্‌লাম-সম্বন্ধে আমি যথাসাধ্য পাঠ ও গবেষণা করিয়াছিলাম। এখন যদিও আমার কিছু ভাবান্তর হইয়াছে তথাপি ইস্‌লামের প্রতি আমার সেই প্রথম শ্রদ্ধা এখনও অবিচলিত আছে।

যে দিক্ দিয়াই আমরা দেখি না কেন সমস্ত পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিব যে, মানুষের ইতিহাসে ইস্‌লামের শক্তি ক্ষীণ হয় নাই। আফ্রিকার লোকের বসতির অনুপাতে অপর ধর্ম্ম অপেক্ষা ইস্‌লাম বেশী প্রসার লাভ করিতেছে। মনুষ্য-সমাজে ইস্‌লামের কতকগুলি প্রয়োজনীয় দান আছে যাহা অপর কোনো উপায়ে লাভ করা যাইতে পারে না। সে-দান কি?

আমার মনে হয় না যে, ইস্‌লাম মানবের ইতিহাসে সর্ব্বপ্রথম কোনো নূতন পন্থা বা উপায় আবিষ্কার করিয়াছে। খৃষ্ট ও হিন্দু-বৌদ্ধ ধর্ম্ম বাস্তবিক কিছু আবিষ্কার করিয়াছে। উক্ত উভয় ধর্ম্মেই ধর্ম্মের সার যে অহিংসা তাহারই উপর বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে। ধর্ম্মের এই দিকটিতে ইস্‌লামে জোর দেওয়া হয় নাই। আমি কোরান্ পড়িয়া যেরূপ বুঝিয়াছি তাহাতে অহিংসা-সমস্যার অধিক সমাধান হয় নাই; বরং প্রতিশোধ লইবার বাসনার অনুমোদন আছে।

যখন বহু বৎসরের দ্বন্দ্বের পর মক্কায় প্রবেশলাভ ঘটিল তখন মহম্মদের সহনশীলতা ও ঔদার্য্যের অদ্ভুত দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি। কিন্তু এরূপ উদার কাজের দ্বারা খুব উচ্চ শ্রেণীর রাজনৈতিক লাভের চেষ্টাই হইয়াছিল; আবার মহম্মদের উদার ক্ষমাশীলতার পাশেই কঠোর শাস্তি-বিধান-কার্য্যেরও পরিচয় আছে। মহত্তর মুসলমানদের একজনের সহিত যুক্তিতর্কে তিনি আমার শেষ কথা বলিয়াছিলেন—'আমি প্রতিশোধ-গ্রহণে বিশ্বাস করি।" অপর একজন মুসলমান আমাকে বলিয়াছিলেন—"আমার ধর্ম্ম কোনো-কোনো ক্ষেত্রে তরবারি গ্রহণ করিতে আদেশ করে।' '

আমি অনেক সময়ে বিস্ময়ের সহিত চিন্তা করিয়াছি যে, অহিংসা-নীতিতে হয়ত কার্য্যত কোনো গলদ আছে। অহিংসা-নীতিকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য বহু আয়াস-সত্ত্বেও মহাত্মা গান্ধীর অদম্য ব্যক্তিত্ব ইস্‌লামের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। গান্ধীজির চরিত্রের ইহা এক গভীর বিশেষত্ব। কখন-কখন আমি মনে করিয়াছি যে, বর্ত্তমানে অল্প মানুষে অহিংসা গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া ঐ নীতিতে গান্ধীজি অজ্ঞাতভাবে কোনো দৌর্ব্বল্য বোধ করিয়াছেন এবং তাহার প্রতিবিধান ইস্‌লামে পাইয়াছেন।

ইস্‌লামে কেবল জীবনযাত্রার সারল্য নাই, বিশ্বাসের সারল্য আছে। এক ঈশ্বর, এক ভ্রাতৃত্ব, এক বিশ্বাস—ইহা খুবই কড়া সারল্যের কথা, বিশেষ যখন পূর্ব্বে এমন ধর্ম্মমত ছিল যাহা কেহ বুঝিত না এবং অর্থহীন ব্রতাচার প্রভৃতিরও চলন ছিল। কেবল আরবে নয়, খৃষ্ট জগতেও প্রতিমা প্রভৃতি বিসর্জ্জিত হইল। জীবন এক হইয়া উঠিল; সরল হইয়া উঠিল। মিশরের দীনতম ফেলাহিন এবং সিরিয়ার অতি-অত্যাচারিত কৃষকগণ সাম্যনীতিতে এবং সমান ধর্ম্মোপাসনায় এক নূতন মর্য্যাদা লাভ করিল।

(বিশ্বভারতী কোয়াটার্‌লি) সি এফ এণ্ড্রুজ্

—

ছেলেদের অপরাধের জন্য দায়ী কে?

পিতামাতার মনে নিঃসংশয়রূপে এই বিশ্বাস জন্মাইয়া দিতে হইবে যে, তাঁহাদের পুত্রকন্যার ভবিষ্যৎ উন্নতি বা অবনতির জন্য তাঁহারাই সম্পূর্ণরূপে দায়ী। এ-বিষয়ে চীনদেশ অনুকরণযোগ্য। সেখানে ছেলে-মেয়েরা অন্যায় করিলে পিতামাতা এবং প্রতিবাসীকে সেজন্য দায়ী বিবেচনা করা হয়। চীনে একটি ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে—একটি বালক তাহার পিতাকে হত্যা করিয়াছিল, এবং তাহাতে আইনের ব্যবস্থা নিম্নলিখিতরূপ হয়:—ছেলেটির জ্যাঠা ছিল তাহার অভিভাবক, সেই জ্যাঠাকে ও ছেলেটিকে ফাঁসি দেওয়া হইল; ছেলেটির মাষ্টারকে ২০০০ মাইল দূরে নির্ব্বাসিত করা হইল; এবং ছেলেটির বাড়ীর দুই পাশের প্রতিবাসীদিগকে ১০০০ মাইল দূরে এক-গ্রামে নির্ব্বাসন দেওয়া হইল। এইরূপে ঐ হত্যাপরাধের জন্য প্রত্যক্ষভাবে ও অপ্রত্যক্ষভাবে যাহাদের দায়িত্ব ছিল তাহাদিগকেই শাস্তি দেওয়া হইল। মাষ্টার ছেলেটিকে ভালো শিক্ষা দেয় নাই এবং প্রতিবাসীরা হত্যা-নিবারণের চেষ্টা করে নাই বা কাজটির গুরুত্ব-সম্বন্ধে ছেলেটিকে সতর্ক করিয়া দেয় নাই।

(দি ওয়ার্ল্ড্ টুডে)

—

জাপানে পারিবারিক নিয়ম

জাপানের মিৎসুই পরিবার সেখানকার অন্যতম প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী বংশ। সেই পরিবারের কয়েকটি নিয়ম প্রণিধানযোগ্য।

(১) পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তি বিনা-বিশৃঙ্খলায় বিনা-কলহে শান্তি ও প্রীতিতে বাস করিবে।

(২) যেহেতু মিতব্যয়িতা স্বাচ্ছন্দ্যের কারণ এবং অমিতব্যয়িতা ধ্বংসের কারণ, সেইজন্য মিতব্যয়িতা পরিবারের সকলের পালনীয়।

(৩) পরিবারের কোনো ব্যক্তি ঋণ করিবে না, কিম্বা পরিবারের অভিভাবকদের বিনা-সম্মতিতে বিবাহ করিবে না।

(৪) পরিবারের বাৎসরিক মোট আয় প্রত্যেক ব্যক্তিকে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে, যাহারা অপর পরিবারে বিবাহ করিয়াছে তাহাদিগকেও।

(৫) যতদিন বাঁচিবে ততদিন প্রত্যেককে কাজ করিতে হইবে, এবং যত দিন না একবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে ততদিন কাজ হইতে অবসর লইতে পারিবে না।

(৬) পরিবারের সমস্ত শাখার সমস্ত হিসাবপত্র কেন্দ্রীয় পরিবার কর্ত্তাদের কাছে উপস্থিত করিতে হইবে এবং তাঁহারা তাহা পরীক্ষা করিবেন।

(৭) যোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্য কাজে লাগাইলে ব্যবসায়ের উন্নতি হইবে। বার্দ্ধক্য বা রোগের জন্য অকর্ম্মণ্য কর্ম্মচারীদিগকে সরাইয়া যুবকদিগকে কাজে লাগাইতে হইবে।

(৮) আমাদের নিজেদের কাজ এত বেশী যে তাহাতে আমাদের পরিবারের সকলেই কাজ পাইতে পারে। কর্ত্তাদের বিনা-সম্মতিতে কেহ অপর কোনো ব্যবসায় করিতে পারিবে না।

(৯) সুশিক্ষা-ব্যতিরেকে কাজের তত্ত্বাবধান করা যায় না। পরিবারের প্রত্যেক যুবককে বিনা-বেতনে সামান্য কাজ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যবসায় শিখিতে হইবে; তাহার পর তাহাদিগকে নিজেদের দায়িত্বে কাজ করিতে পাঠানো হইবে।

(১০) ব্যবসায়ে ধীর বিচারের প্রয়োজন। ভবিষ্যতে বড় লোকসান করা অপেক্ষা বর্ত্তমানে ছোটো লোকসান ভালো।

(১১) ভুল-ভ্রান্তি যাহাতে না হয় সেজন্য সকল দরকারী ব্যাপারে

পরিবারের সকলে মিলিয়া আলোচনা করিবে। পরিবারের মধ্যে অন্যায়কারী ব্যক্তিকে অন্যায়ের উপযুক্ত শাসন করিতে হইবে।

(১২) ভগবানের রাজ্যে সকলের বাস; ভগবানে ভক্তি করিতে হইবে; সম্রাট্‌কে সম্মান করিতে হইবে; দেশকে ভালোবাসিতে হইবে; দেশবাসীর প্রতি কর্ত্তব্য সাধন করিতে হইবে।

(দি লিভিং এজ্)

—

বিবাহোপলক্ষে অসমীয়া প্রথা

বরকে 'কলর গুরিত স্নান' করাইবার কালে সকল শ্রেণীর কামরূপীয়া হিন্দু মহিলারা যে-ধরণের গীত গাহিয়া থাকেন, তাহার দুইটি গীত নমুনা-স্বরূপ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

কলর গুরিত গোয়া নাম।
হাতীদাতর কণি খিনি রত্নরে রত্নরে চিতিকা।
মেলিছি বিচিত্র কেশ ধুয়ায়ে চণ্ডিকা॥
কলর গুরিত শির হে বাপু এ কেইমন লিখিলা গাঁও।
সকল আয়াতি বেঢ়ি ধুয়ায়ে আকলা মায়ের নাউ॥
গা ধুই উঠি চানা বাপু এ পতুয়াত দিলা ভরি।
তোমার চেনেহর দাদাই নিব কোলা করি॥ *

কলর গুরিত গোয়া নাম।
হাতীদাতর কণি গলে হীরামণি
ধুয়ায়ে যশোদারাণি হে রাম।
বাপুর চুলিকোছা দেখিবাকে খাছা
লাগে দের পোয়া তেল হে রাম॥
চুচিবা না পালু মাজিবা না পালু
আয়তির হুহিতে গেল হে রাম।
কলর গুরিতে নাচে অপসরা
ধুয়ায়ে সরগর ভয়া হে রাম॥ +

বিবাহের দিন কন্যার বাটীতে 'কলর গুরিত গা-ধুয়া"নর পর কন্যা নববস্ত্র পরিধান করিয়া আসনে বসে। তৎকালে তাহার ভ্রুযুগলের মধ্যে সিঁন্দুরের টিপ অথবা তাহার সিঁথায় সিঁন্দুরের রেখা দেওয়া হয়। বরের বাটীতে কলর গুরিতগা-ধুয়ানর পর বরকে বাটীস্থ প্রাঙ্গণে আসনে বসাইয়া রাখা হয়। তৎপরে "সুয়াগতুলা" কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়।

কামরূপ দরঙ্গ ও নগাঁও অঞ্চলে আমরা দেখিতে পাই, বরের মাতা সন্ধ্যাকালে গ্রামের স্ত্রীলোকবৃন্দ ও আত্মীয়গণ সহ একটি ডালায় করিয়া চাউলের দোনা, প্রদীপ, হরীতকী, আতপ চাউল, ঘৃতঘট প্রভৃতি মাঙ্গল্য-দ্রব্য লইয়া কোন-একটি পুষ্করিণী বা নদীর ঘাটে গমন করেন। তৎকালে ঐ স্ত্রীলোকেরা গীত গাহিতে-গাহিতে যায়, ঢুলীরা ঢোল এবং খুলীরা খোল বাজাইতে-বাজাইতে তাঁহাদের পশ্চাৎ গমন করে। বরের মা ঐ নদী অথবা পুষ্করিণী-তীরে অর্দ্ধহস্ত অথবা তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন দুইটি উচ্চ "দোল" নির্ম্মাণ করত উহার চতুর্দ্দিকে উলুখড় পুঁতিয়া দেন। এই উলুখড়ের চতুর্দ্দিকে সুতার বেড় দেওয়া হয়। ইহার পর তিনি জলে নামিয়া ডুব দিয়া কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা তুলিয়া স্থলে উঠিলে জনৈকা আত্মীয়া তিনটি আম্রপল্লব দ্বারা তাঁহাকে কোমলভাবে স্পর্শ করত জিজ্ঞাসা করেন, "কি দেখিলে?" তদুত্তরে বরের মা বলেন, "ঢোলর দুব" অর্থাৎ ঢোলের বাজনা। অতঃপর ঐ উত্তোলিত মৃত্তিকার কিয়দংশ উপরিউক্ত ডালায় দোনায় ও দোলে দেওয়া হইলে পুনরায় তিনি জলে গিয়া ডুব দিয়া কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা তুলিয়া আনিয়া ঐরূপ করেন। দেশীয় প্রথা অনুসারে ৩।৫ অথবা ৭ বার এইরূপ করিবার পর আর-একবার তিনি স্নান করেন—সেবার মাটি আনেন না, স্থলভাগে উঠিয়া গা মুছিয়া শুকবস্ত্র পরিধান করেন। অতঃপর ৩ বার অথবা ৭ বার জলে আতপ চাউল ফেলিয়া দেওয়া হয়। এই চাউল ফেলিবার কালে দুইজন অথবা তিন জন আত্মীয় উহা হইতে কিছু পরিমাণ লইয়া রাখেন। তৎপরে বরের মা ৩ জন অথবা ৫ জন আত্মীয়া সধবা স্ত্রীলোকের "কোঁচড়"-এ আতপ চাউল ফেলিয়া দেন। ইহার পর বরের মা পুনরায় স্নান করিয়া মুখে জল ভরিয়া লন ও শুকবস্ত্র পরিধান করিয়া বাড়ী ফিরিয়া যান। ফিরিবার কালে একব্যক্তি কোদাল দ্বারা রাস্তায় ছোট ছোট গর্ত্ত কাটিতে কাটিতে যায়। একজন স্ত্রীলোক ঐ গর্ত্তে উত্তমরূপে মিশ্রিত দুগ্ধকদলী দিয়া যায়। বরের মাতা কয়েকটি উলুখড় সংযোগে এই মিশ্রিত দুগ্ধ-কদলীর কিয়ৎ পরিমাণ তুলিয়া একটি কাংসপাত্রে রাখেন। এই পাত্রে পূর্ব্ব হইতে একটি টাকা, চাউল ও মাসকলাই রাখা হয়। বরের মাতা বাটীর প্রাঙ্গণে পৌঁছিলে দুইজন স্ত্রীলোক বরের মস্তকোপরি একখানি বস্ত্র প্রসারিত করত ধারণ করেন। বরের মাতা তখন তাহার সম্মুখে ৫ বার অথবা ৭ বার প্রদক্ষিণ করিলে ঐ কাংসপাত্রস্থ টাকা বরের মস্তকোপরি ধৃত কাপড়ের উপর ফেলিয়া দেওয়া হয়। কাপড়খানির এক দিক নীচু করিয়া দিলে জনৈক ব্যক্তি টাকাটি ধরিয়া লন। তৎপরে পাত্রস্থ চাউল ও মাসকলাইয়ের কিয়দংশ ঐ কাপড়ে ফেলিয়া দেওয়া হয়। বর উপরিউক্ত টাকাটি তাম্বুল ও পান সহ একটি বাটায় করিয়া তাহার মাতাকে দিয়া প্রণাম করেন। এই সময় তিনি তাঁহাকে মনে মনে আশীর্ব্বাদ করেন। অনন্তর সুয়াগতুলার সময় মুখে করিয়া আনীত জল তিনি ফেলিয়া দেন এবং কাংস্যপাত্র হইতে একটি মাত্র চাউল আনিয়া তিনি তাঁহার পুত্রের মুখে দিয়া থাকেন।

কন্যার বাটীতেও কন্যার মাতা এইরূপ পদ্ধতির অনুষ্ঠান করেন, কিন্তু "দেউলের" পরিবর্ত্তে তিনি অর্দ্ধহস্ত দীর্ঘ দুইটি ছোট ছোট পুষ্করিণী খনন করেন। সঙ্গিনী আত্মীয়েরা আম্রপল্লব দ্বারা তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া "কি দেখিলে?" বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলে তদুত্তরে তিনি বলিয়া থাকেন, "গঙ্গার দুর্গায় বিয়া।" সুয়াগতুলার পর বর, কন্যার বাটীতে যাত্রা করেন। সেখানে বিবাহ-কার্য্য সমাপ্ত হয়। কন্যার বাটীতে কন্যার মাতা সুয়াগতুলিবার পর কন্যাকে ঘরের মধ্যেই রাখিয়া দেন।

বড়পেটা মহকুমায় বরের সহিত একদল স্ত্রীলোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কন্যার বাটীতে গীত গাহিতে গাহিতে গমন করেন। তাহাদের সহিত ঢুলিয়ারা থাকে। এই মহিলাদিগকে নিমন্ত্রিত করিতে হয় না বলিয়া তাঁহারা কোনরূপ পারিশ্রমিক পান না। বরকর্ত্তা তাঁহাদের প্রত্যেককে কেবল মাত্র সিধা দিয়া থাকেন। বরের প্রতিবাসিনী কলিতা, কেওট বা কৈবর্ত্ত, কোচ প্রভৃতি জাতির কতিপয় স্ত্রীলোকেরা তাহার সঙ্গিনী হইয়া থাকে। সিধার পরিমাণ হ্রাস করিবার জন্য অনেক সময় বরকর্ত্তা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক মহিলাদিগকে গমন করিতে অনুমতি প্রদান করেন।

বরের বাড়ী কন্যার বাড়ী হইতে ১০।১২ মাইলের অধিক দূরে এবং বিবাহ দারুণ গ্রীষ্মকালে অথবা বর্ষাকালে হইলেও সঙ্গিনী মহিলাগণ স্বেচ্ছায় ও উল্লাসে এই দীর্ঘ পথ গীত গাহিতে-গাহিতে কন্যার বাড়ী গিয়া উপস্থিত হন। অন্যূন ১১।১২ বৎসর হইতে ৪০।৪৫ বৎসরের মধ্যে উপরিউক্ত যে-কোন জাতির যে-কোন বয়স্কা মহিলা বরের সঙ্গিনী

---

* অসমীয়া শব্দার্থ :—কণি—চিরুণি; থিয়—স্থির; অকলা—একমাত্র; নাউ—নাম; পতুয়াত—কলার গুঁড়িতে; ভরি—পা; চেনেহর—স্নেহের।

+ অসমীয়া শব্দার্থ :—বাপুর—কনিষ্ঠ ভ্রাতার; কোছা—গুচ্ছ, খাছা—খাসা, খুব ভাল; দেখিবাকে—দেখিতে; চুচিবা—পরিমার্জ্জিত করা; হুহিতে—কোলাহলধ্বনিতে

হইতে পারে। কন্তাগৃহ অধিক দূরবর্ত্তী না হইলে কুমারীগণও তাহাদিগের দল বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

অসমীয়া ব্রাহ্মণ, দৈবজ্ঞ ও সম্রান্ত ঘরের কলিতা বা কৈবর্ত্তের কন্তারা বিবাহ-অন্তে প্রথমবার দোলায় উঠিয়া বরের বাটীতে যাতায়াত করে। পিত্রালয় অধিক দূর না হইলে তৎপরে তাঁহারা পদব্রজে সেখানে গমনাগমন করিয়া থাকেন। কিন্তু গোয়ালপাড়া ও কামরূপ অঞ্চলের এবং মঙ্গলদৈ মহকুমার খাতি কায়স্থের এবং উজনীয়া কায়স্থ সত্রাধিকারী-দিগের কন্তারা বিবাহ-অন্তে বরাবর কাষ্ঠ-নির্ম্মিত দোলায় উঠিয়া পিত্রালয়ে যাতায়াত করেন। মঙ্গলদৈয়ে মাত্র ৫ ঘর খাতি কায়স্থ আছেন। আসাম অঞ্চলের বড় বড় পল্লীতে বর্ত্তমানেও এই দোলার প্রচলন আছে। দোলাগুলি সাধারণতঃ দৈর্ঘ্যে তিন হাত।

(মাতৃমন্দির, শ্রাবণ ১৩৩২) শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষ-চৌধুরী

ছুরি ও বাঁক-শিক্ষা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রী পুলিনবিহারী দাস

যুযুৎসু

সপ্তম পাঠ

পঞ্চম পাঠে বর্ণিত একত্রিংশ-চিত্র সম্পর্কিত প্রক্রিয়ার পরে আক্রমণকারীর দক্ষিণ কফোণির (কনুইএর) ভঙ্গের উপরে যুযুৎসুপ্রয়োগকারী নিজ বাম হস্ত দ্বারা আক্রমণ-কারীর দক্ষিণ বাহু সবলে ও সবেগে নিম্নের দিকে বিপ্রকর্ষণ করিলে (চাপিয়া ধরিলে পর) ষষ্ঠ পাঠে বর্ণিত প্রতিকারের পরিবর্ত্তে (অর্থাৎ, একচত্বারিংশ চিত্র সম্পর্কিত প্রক্রিয়ার পরিবর্ত্তে) আক্রমণকারী যুযুৎসু-প্রয়োগকারীর পশ্চাতে যাইতে-যাইতে নিজ বাম হস্ত দ্বারা যুযুৎসুপ্রয়োগকারীর দক্ষিণ স্কন্ধের উপর দিয়া তাহার (যুযুৎসুপ্রয়োগকারীর) বাম মণিবন্ধ ধরিয়া ঊর্দ্ধ দিকে আকর্ষণ করিয়া তাহাকে (যুযুৎসুপ্রয়োগকারীকে) উত্তানভাবে (চিৎ করিয়া) ভূপাতিত করিবার উপক্রম করিবে; যথা, পঞ্চপঞ্চাশৎ, ষট্‌পঞ্চাশৎ, সপ্তপঞ্চাশৎ, ও অষ্টপঞ্চাশৎ চিত্রে :—

(যদি আক্রমণকারী যুযুৎসুপ্রয়োগকারীকে ভূপাতিত করিতে সমর্থ হয়, তবে প্রতিকার-হেতু যুযুৎসুপ্রয়োগকারী পঞ্চম পাঠে বর্ণিত চতুশ্চত্বারিংশ, পঞ্চচত্বারিংশ প্রভৃতি চিত্র সম্পর্কিত প্রক্রিয়ানুরূপ উপায় অবলম্বনে নিজকে মুক্ত করিয়া লইবে।)

যাহাতে প্রতিদ্বন্দ্বী নিজকে অতর্কিতে ভূপাতিত করিতে সমর্থ না হয়, তৎপ্রতিকার হেতু যুযুৎসুপ্রয়োগকারী আক্রমণকারীর প্রক্রিয়ার ফলে পতনোন্মুখ হইলে পরই নিজ দেহ (মস্তক হইতে পাদমূল পর্য্যন্ত) যথাসম্ভব ভূমির উপরে লম্ব রেখার সমসূত্রে রাখিবার চেষ্টা করিবে।

যুযুৎসুপ্রয়োগকারীর সতর্কতা হেতু তাহাকে ভূপাতিত করিতে অসমর্থ হইলে, আক্রমণকারী নিজ দক্ষিণ হস্ত যুযুৎসুপ্রয়োগকারীর আবদ্ধ দক্ষিণ হস্ত সহ ঘুরাইয়া নিজ ছুরির অগ্রবিন্দু দ্বারা যুযুৎসুপ্রয়োগকারীর বক্ষমধ্যে আক্রমণের উপক্রম করিবে, যথা, ঊনষষ্টিতম চিত্রে :—

যুযুৎসুপ্রয়োগকারীর প্রতিকার :—

প্রতিকার হেতু যুযুৎসুপ্রয়োগকারী বাম জানুসন্ধি ভূমিতে স্থাপন করিয়া উপবেশন করিতে-করিতে নিজ দক্ষিণ হস্ত নিজ বাম পার্শ্বের দিকে আকর্ষণ করিয়া লইবে; যথা, ষষ্টিতম চিত্রে :—

তৎপর বাম জানু ও বাম পাদাঙ্গুলিতে নির্ভর রাখিয়া আক্রমণকারীর আবদ্ধ দক্ষিণ হস্ত সহ যুযুৎসু প্রয়োগকারী নিজ বাম-শরীর-পার্শ্ব ভূমি-সংলগ্ন করিবার উপক্রম করিবে, যথা, একষষ্টিতম চিত্রে :—

এই প্রক্রিয়ার ফলে আক্রমণকারী-ধৃত যুযুৎসু-প্রয়োগকারীর বাম হস্তের বন্ধন যথেষ্ট শিথিল হইয়া পড়িবে, অধিকন্তু আক্রমণকারীর দক্ষিণ হস্ত ক্রমেই অধিকতর আড়ষ্ট হইতে থাকিবে।

তৎপর যুযুৎসুপ্রয়োগকারী ক্রমে নিজ বাম পার্শ্বের দিকে নিজ মস্তক ভূমিসংলগ্ন করিয়া দক্ষিণামোটনের উপক্রম করিবে; যথা, দ্বিষষ্টিতম চিত্রে :—

তৎকালে আক্রমণকারী অনুরূপ সতর্কতা অবলম্বন না করিলে যুযুৎসু-প্রয়োগকারীর অঙ্গচালনার ফলেই

পঞ্চপঞ্চাশত্তম চিত্র

সপ্তপঞ্চাশত্তম চিত্র

ষট্‌পঞ্চাশত্তম চিত্র

অষ্টপঞ্চাশত্তম চিত্র
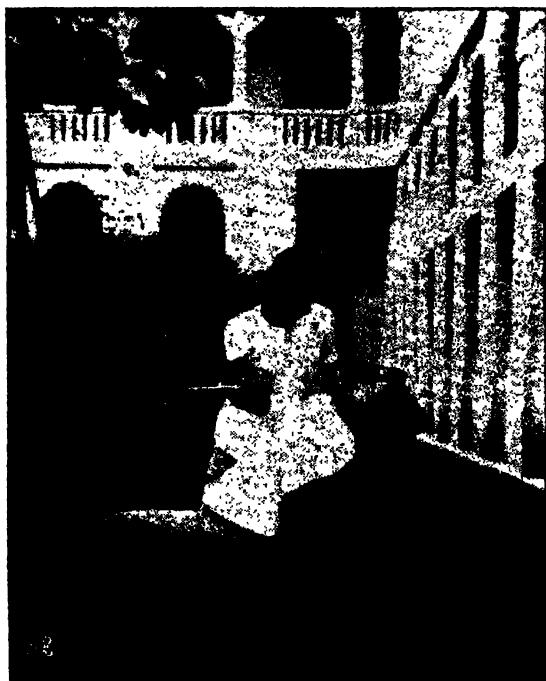
উনষষ্টিতম চিত্র

একষষ্টিতম চিত্র
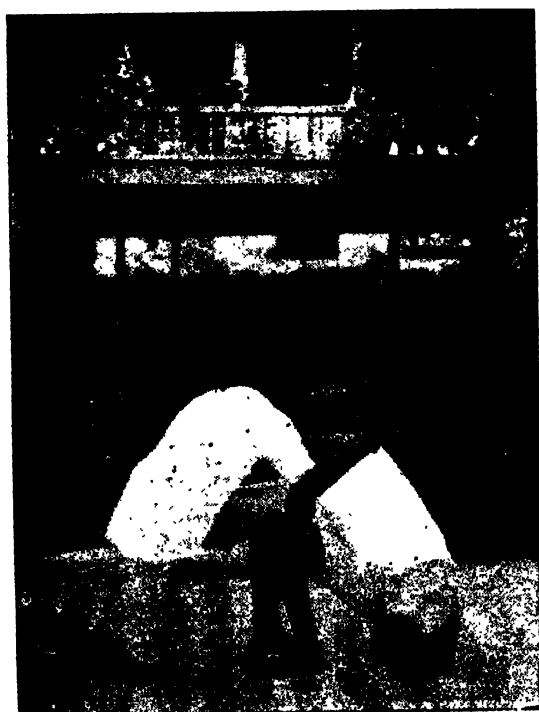
ষষ্টিতম চিত্র

দ্বিষষ্টিতম চিত্র

ত্রিষষ্টিতম চিত্র

পঞ্চষষ্টিতম চিত্র

চতুঃষষ্টিতম চিত্র

ষট্‌ষষ্টিতম চিত্র

সপ্তষষ্টিতম চিত্র

আক্রমণকারী নিজ দক্ষিণ মণিবন্ধে যুযুৎসু-প্রয়োগকারীর ছুরি হইতে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইবে।

তৎপর যুযুৎসু-প্রয়োগকারী মস্তক উত্তোলন করিয়া ও বাম শ্রোণি পার্শ্ব ভূমিতে সংলগ্ন করিয়া ক্রমান্বয়ে দক্ষিণামোটনে নিজ শরীর ঘুরাইবার উপক্রম করিবে; যথা, ত্রিষষ্টিতম চিত্রে :—

নিষ্কৃতি-হেতু আক্রমণকারীকেও অনুরূপ ভঙ্গীতে বামামোটনে ঘুরিবার উপক্রম করিতে হইবে।

ক্রমে যুযুৎসু-প্রয়োগকারী সম্পূর্ণ দক্ষিণামোটনে এবং আক্রমণকারী সম্পূর্ণ বামামোটনে ঘুরিয়া আসিয়া পরস্পর মুক্ত হইয়া যাইবে; যথা, চতুঃষষ্টিতম ও পঞ্চষষ্টিতম চিত্রে :—

পরে পরস্পর সম্মুখীন হইয়া উভয়েই পুনরাক্রমণের উপক্রম দেখিবে; যথা, ষট্‌ষষ্টিতম ও সপ্তষষ্টিতম চিত্রে :—

(ক্রমশঃ)

ভারতবর্ষ

ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের অবস্থা—

ভারতীয় কাপড়ের কলের অবস্থা বর্ত্তমান সময়ে বড় খারাপ হইয়া দাড়াইয়াছে। বোম্বাইয়ের কয়েকটি কল বন্ধ হইয়াছে, বাকী কলগুলির অবস্থাও বিশেষ সুবিধাজনক বলিয়া মনে হয় না। ম্যান্‌চেষ্টার এবং জাপানের সস্তা মালের প্রতিযোগিতায় ভারতীয় কলে প্রস্তুত কাপড় বিক্রয় একপ্রকার নাই বলিলেই চলে। জাপানের কাপড় ইত্যাদি ভারতের সকল স্থানের বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে। জাপানী ব্যবসায়ীরা তাহাদের গবর্ণ্‌মেণ্ট্‌ হইতে সাহায্যলাভ করিয়া অতি কম মূল্যে ভারতের বাজারে মাল চালাইতে সহজেই সক্ষম হইতেছে। ভারতীয় কলওয়ালারা ভারত সরকারের শুল্কের জন্য মাল কম দরে ছাড়িতে সক্ষম হইতেছে না। বোম্বাইএর কলের মালিকেরা এই বিপদের সময় দায়ে পড়িয়া শ্রমিকদের বেতন শতকরা ১১।০ কমাইয়া দিয়াছে। শ্রমিক মহলে এইজন্য বিশেষ চাঞ্চল্য আসিয়াছে। এ-ব্যবস্থায় তাহারা রাজি নয়। ইহার প্রতিকারের জন্য শ্রমিকেরা দলবদ্ধ হইয়া ধর্ম্মঘট করিবার চেষ্টায় আছে বলিয়া জানা যাইতেছে। দেড়লক্ষ শ্রমিক একসঙ্গে ধর্ম্মঘট করিলে কি বিষম অবস্থা বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলগুলির হইবে তাহা বলা যায় না। কয়েকজন সদস্য বোম্বাইয়ের ব্যবস্থাপক সভায় প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, বোম্বাইয়ের তুলা ও বস্ত্রশিল্পের সঙ্কটাপন্ন অবস্থা ভারতগবর্ণ্‌মেণ্ট্‌কে জানানো হোক এবং কলওয়ালা ও শ্রমিকদের কষ্ট ও বিপদ্‌ লাঘব করিবার জন্য কোনোরূপ উপায় অবলম্বন করিবার জন্য তাঁহাদিগকে অনুরোধ করা হোক। প্রস্তাবটি ব্যবস্থাপক সভাতে গৃহীত হইয়াছে। গবর্ণ্‌মেণ্টের পক্ষ হইতে রাজস্ব-সচিব এবং সভার প্রধান সরকারী মুখপাত্র উভয়েই সহানুভূতিপূর্ণ বক্তৃতা করেন। তাঁহারা স্বীকার করেন, দেশীয় বস্ত্রশিল্পের অবস্থা বিপদসঙ্কুল এবং শ্রমিকদের বেতন শতকরা ১১।।০ টাকা কমাইয়াও যে সে বিপদের অবসান হইবে, তাহাও তাঁহারা মনে করেন না। তাঁহাদের মতে টেরিফ্‌ বোর্ডের নিকট এ-বিষয়ে দরখাস্ত করা উচিত এবং ভারত-গবর্ণমেণ্ট যদি টেরিফ্‌ বোর্ড্‌কে এ-সম্বন্ধে তদন্ত করিতে অনুরোধ করেন তবে প্রতিকারের একটা পন্থা আবিষ্কৃত হইতে পারে বোম্বাইয়ের কলওয়ালারা অবশ্য বহুকাল হইতেই এবিষয় সরকারের কাছে জানাইয়াছে, কিন্তু এতদিন তাহাতে কোনো ফল হয় নাই। টেরিফ বোর্ডেরও এ-বিষয় তদন্ত করিতে এবং তাহার পর রিপোর্ট্‌ প্রস্তুত করিতে কতদিন সময় লাগিবে তাহা বলা যায় না। এইরূপ বিপদের সময় ব্রিটিশ গভর্ণ্‌মেণ্ট্‌ ইংলণ্ডে যাহা করিয়াছেন তাহা ভারত-সরকারের অনুকরণ করা উচিত বলিয়া অনেকের মনে হইতে পারে। বিলাতে কয়লাওয়ালারা খনির শ্রমিকদের বেতন কমাইবার মতলব করিয়া ছিল। কারণ কয়লার ব্যবসায়ে এখন প্রচুর ক্ষতি হইতেছে। এবং এই ক্ষতির পরিমাণ এত বেশী যে খনির মালিকেরা শ্রমিকদের ১৯২৪ সালের হারে এখন বেতন দেওয়া অসম্ভব বলিয়া মনে করে। শ্রমিকেরা এ-প্রস্তাবে রাজি হয় নাই, তাহারাও ধর্ম্মঘট করিবার জন্য তৈয়ার হইল। এই ধর্ম্মঘট হইলে ইংলণ্ডের ব্যবসা বাণিজ্যের এবং লোকজনের যে কি ভয়ানক কষ্ট এবং দুর্দ্দশা হইত তাহা বলা যায় না—সেইজন্য প্রধানমন্ত্রী মিঃ বল্‌ডুইন প্রথমতঃ খনির মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে আপোষের জন্য চেষ্টা করেন; কিন্তু তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া এখন তিনি ঘোষণা করিয়াছেন যে, শ্রমিকেরা ১৯২৪ সালের হারেই মজুরি পাইবে এবং এইজন্য খনির মালিকদের যে ক্ষতি হইবে, তাহা গবর্ণ্‌মেণ্ট্‌ পূরণ করিয়া দিবেন। সম্ভবতঃ এই ক্ষতিপূরণের টাকার পরিমাণ ১০।১২ কোটির কম হইবে না

বম্বের কাপড়ের কলওলাদের ক্ষতির পরিমাণ—

গত মার্চ্চ মাসের লেজিস্লেটিভ্‌ অ্যাসেম্ব্লির অধিবেশনের এক বক্তব্য হইতে জানিতে পারা যায় যে বম্বের কাপড়ের কলওয়ালাদের ১৯২৩ সালে মোট ১১৭ লক্ষ টাকা লোক্‌সান হয়। ১৯২৪ সালে ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ১৫০ লক্ষে গিয়া দাঁড়ায়। কলওলাদের সঙ্ঘের সভাপতির কথা হইতে জানিতে পারা যায়, বর্ত্তমানে বম্বের কাপড়ের কলওয়ালাদের মাসিক ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২৪ লক্ষ টাকা। এইভাবে প্রতিমাসেই যদি ক্ষতি হইতে থাকে তবে বছরের শেষে ক্ষতির পরিমাণ ২৮৮ লক্ষ টাকায় গিয়া ঠেকিবে। জাপানী প্রতিযোগিতা নাকি ইহার একমাত্র কারণ। জাপান হইতে ১৯২২-২৩ সালে ২১০ লক্ষ পাউণ্ড সূতা ভারতে আমদানি হয়, ১৯২৩-২৪ সালে হয় ২৯০ লক্ষ পাউণ্ড। কাপড়ের আম্‌দানিও ১৯২২—২৩ সালে ৯১০ লক্ষ পাউণ্ড হইতে ১৯২৩-২৪ সালে ১২৯০ লক্ষ পাউণ্ডে ঠেকিয়াছে। বর্ত্তমান অবস্থায় জাপান ভারতবর্ষে তুলা কিনিয়া জাপানে রপ্তানি করিয়া তাহাকে সূতা এবং বস্ত্রে পরিণত করিয়া শতকরা ৫ এবং ১১ টাকা খাজনা দিয়াও ভারতের প্রস্তুত সূতা এবং কাপড় অপেক্ষা কম-দরে বাজারে বিক্রি করিতে পারে। ইহার কারণ কি? জাপানী কার্‌খানাওয়ালারা তাহাদের কার্‌খানা দিনে-রাতে মোট ২২ ঘণ্টা দুইদল লোক দ্বারা চালায়। প্রত্যেক দল ১১ ঘণ্টা করিয়া খাটে। জাপানের কার্‌খানাতে রাত্রিকালেও স্ত্রীলোকেরা কাজ করিতে পারে। এই কারণে জাপানের কার্‌খানায় কম সময়ে অধিক মাল উৎপন্ন হইতেছে। এদিকে বম্বের কার্‌খানাওয়ালারা দিনে-রাতে মাত্র দশ ঘণ্টা তাহাদের কার্‌খানা চালায় এবং কলের শ্রমিকদের বেশী বেতন দেয়। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ইহা অসুবিধার কারণ।

বম্বের কলওয়ালা এবং শ্রমিকদের, বেতন কমানো লইয়া, একটি সভা হইয়া গিয়াছে। স্থির হইয়াছে যে আগামী সেপ্টেম্বর মাস হইতে শ্রমিকদের বেতন শতকরা ১১।০ টাকা কমানো হইবে। শ্রমিকেরা ইহা কেমনভাবে লইবে তাহা বলা যায় না। শ্রমিকেরা যদি এই সর্ত্তে রাজি হয়, তবে তাহাদের বেকার হইতে হইবে না। তাহারা যদি রাজি না হয়, তাহা হইলে, কলগুলির স্থায়িত্ব-সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

লাহোরের জেলে অত্যাচার—

লাহোরের "বন্দে মাতরম্" নামক খবরের কাগজের সম্পাদকের বিরুদ্ধে মানহানির মোকদ্দমা হইয়াছিল। তাহাতে তিনি হারিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার অর্থদণ্ড হইয়াছে। এই মামলার সম্পর্কে পঞ্জাবের জেল-সমূহের ভিতরের অবস্থা-সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত ব্যাপার প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। অসহায় বন্দীদের উপর কি-প্রকার অত্যাচার চলে তাহা সকলে জানিতে পারিয়াছে। "বন্দে মাতরম্" মামলার বিচারক বলিয়াছেন যে মুলতান জেলের ভিতরের অবস্থা বিষয়ে যেসকল গুরুতর অভিযোগ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার বেশীর ভাগই সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। লালা লাজপৎরায় তাঁহার "দি পিপ্‌ল্" নামক পত্রিকায় বলিতেছেন :—

"জেলের কর্ম্মচারীরা বন্দীদের নিকট হইতে অর্থ আদায় করিবার জন্ত যে সমস্ত ধূর্ত্ততা ও কৌশলপূর্ণ উপায় অবলম্বন করে, তাহা আমি সমস্তই জানি। কয়েদীদের শাসন করিবার নামে বা তাহাদের নিকট হইতে অর্থ আদায় করিবার জন্ত যেসমস্ত অমানুষিক নিষ্ঠুর অত্যাচার হয়, সে-সমস্তই আমার জানা আছে। জেলের কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে যেসমস্ত বন্দী অভিযোগ করিতে সাহস করে, অথবা তাহাদের প্রার্থিত অর্থ না দেয়, তাহাদের উপর যেরূপভাবে প্রতিশোধ লওয়া হয় তাহাও আমার জানা আছে।

"বন্দে মাতরম্"-এর মোকদ্দমায় জেলের আভ্যন্তরীণ অত্যাচার ও নির্য্যাতন সম্বন্ধে যেসকল ভীষণ সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেই সমস্ত ব্যাপার নিঃশেষ হয় নাই। তাহা ছাড়াও জেলের মধ্যে আরও অনেক-প্রকার অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

"আমি অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলিতেছি যে, মনুষ্যত্বের আদর্শ দিয়া বিচার করিলে বলিতে হয়, পঞ্জাবের জেলগুলি এক-একটি নরক বিশেষ!" ভারতবর্ষের অন্যান্য জেলগুলির অবস্থাও বিশেষ ভালো নহে। কয়েদীদের উপর ব্যবহার-সম্বন্ধে নানা-প্রকার অভিযোগ প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়। গবর্ণমেন্টের নিযুক্ত জেল সংস্কার-কমিটিও এ বিষয়ে অনেক ঘটনা প্রকাশ করিয়াছেন। সংবাদ-পত্রে জেল-সম্বন্ধে যেসমস্ত বিরুদ্ধ সমালোচনা হইতেছে, গবর্ণমেন্ট্ অনেক স্থলে তাহাদের বিরুদ্ধে মামলা করিতেছেন। উদাহরণ-স্বরূপ "বন্দে মাতরম্" এবং বিহারের অধুনা-লুপ্ত "মাদারল্যাণ্ডে"র সম্পাদকের বিরুদ্ধে মামলার কথা বলা যাইতে পারে।

সি-আই-ডির শিক্ষা—

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সকল দেশের গোয়েন্দা পুলিশদের শিক্ষার ব্যবস্থা লণ্ডনের বিখ্যাত গোয়েন্দা-আড্ডা Scotland Yardএ হইয়াছে। মাদ্রাজ সরকার ইতিমধ্যে দুইজন কর্ম্মচারীকে লণ্ডনের Scotland Yardএ পাঠাইয়া দিয়াছেন। সমস্ত ব্যাপার শিক্ষা করিতে মোট তিন সপ্তাহ লাগিবে। যাহারা এইখানে গোয়েন্দাগিরি শিক্ষা করিতে যাইবে, তাহাদের আপন-আপন রাজ সরকার হইতে অনুমতিপত্র গ্রহণ করিয়া Scotland Yardএর Commissionerকে দিতে হইবে।

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন আইন—

এলাহাবাদের ৩রা আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ, বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি ঠিক করিয়াছেন যে, ভাইস-চ্যান্সেলারের অনুমতি ভিন্ন কোনো মহিলা ছাত্রী ছাত্রগণের সহিত বি-এ ক্লাসে অধ্যয়ন করিতে পারিবেন না। "লীডার" পত্রিকার মতে ইহা আইনসঙ্গত নহে।

কংগ্রেস্-কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সিদ্ধান্ত—

মিঃ ভি, জে, প্যাটেল 'ইণ্ডিয়ান্ ডেইলি মেলে' লিখিয়া জানাইতেছেন যে সম্প্রতি কলিকাতার ওয়ার্কিং কমিটির যে সভা হইয়া গিয়াছে তাহাতে সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে খদ্দর পরিধান না করিয়া গেলে কেহই কংগ্রেসের সভায় বা কার্য্যে যোগদান করিবার অধিকারী হইবে না। খদ্দর অবশেষে উর্দ্দীর স্থান দখল করিল। পল্টনের সিপাহীদের যেমন কুচ-কাওয়াজে যাইবার সময় নির্দ্দিষ্ট উর্দ্দী পরিধান করিয়া যাইতে হয়—এবার হইতে সেইভাবে খদ্দর-রূপ উর্দ্দী পরিধান করিয়া কংগ্রেসের কুচকাওয়াজে যোগদান করিতে হইবে।

রাজনৈতিক বন্দিগণের মুক্তির জন্য আবেদন—

মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু দাশের মৃত্যুর পর ভারতের রাজনৈতিক বন্দিদিগকে মুক্তি দিবার জন্ত লর্ড্ বার্কেনহেড্‌কে আবেদন করিয়াছিলেন। আর্ল্ উইনটারটন গত ২৭এ জুলাই হাউস্ অব্ কমন্সে এই আবেদনের জবাবে বলিয়াছেন যে—

"Lord Birkenhead was always glad to consider suggestions for allaying animosities in India, but this suggestion did not seem practicable.—Rueter."

ভাবার্থ :—লর্ড্ বার্কেনহেড্ ভারতবাসীদিগকে খুসী করিতে পারিলে বড়ই আনন্দিত হইতেন, কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর পরামর্শ-মতন কাজ করা সম্ভবপর নয়।

পুনায় তিলক-স্মৃতি-মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন—

মিঃ খাপার্দ্দে পুনায় তিলক-স্মৃতি-মন্দিরের দ্বার খুলিয়াছেন। শ্রীযুত কেল্‌কার বলেন যে ভারতীয় হোমরুল লীগের কর্তৃপক্ষগণ ৬ষ্ঠ অধিবেশনে এই স্মৃতি-মন্দিরের জন্ত ১ লক্ষ টাকা দান করেন।

শ্রীমৎ জগন্নাথ মহারাজ একলক্ষ টাকা মূল্যের একটি অর্দ্ধসমাপ্ত গৃহ ও তৎসংলগ্ন প্রাঙ্গণ এবং ভাস্কর শ্রীযুত মহাত্রে তিলকের একটি মূর্ত্তি দান করিয়াছেন। হোমরুল লীগের প্রদত্ত অর্থ নিম্নলিখিত কার্য্যে ব্যয়িত হইবে :—(১) লোকমান্য তিলকের প্রিয় বিষয়সমূহ সম্বন্ধে গ্রন্থাদি সংগ্রহ (২) তাঁহার প্রবর্ত্তিত নীতি-বিষয়ক পুস্তকাদি প্রকাশ ও জাতীয় কার্য্যের জন্ত কর্ম্মীদল গঠন। এই স্মৃতিমন্দির একটি নিখিল ভারতীয় প্রতিষ্ঠান, অতএব সকল প্রদেশের লোকেরই ইহাতে অর্থ সাহায্য করা উচিত।

শ্রীহট্ট মুরারিচাঁদ কলেজ—

শ্রীহট্টবাসীরা বাঙ্গালার সঙ্গে পুনর্ম্মিলিত হইবার জন্ত বহুদিন হইতে চেষ্টা করিতেছেন। আসামের অস্থায়ী গবর্ণর রীড্ সাহেব শ্রীহট্টের মুরারীচাঁদ কলেজের নূতন গৃহ-প্রতিষ্ঠা করিবার সময় বক্তৃতা করিয়াছেন যে, মুরারীচাঁদ কলেজের গৃহ, লেবরেটরী, লাইব্রেরী প্রভৃতি সম্পূর্ণ করিতে এখনও বহু টাকার প্রয়োজন। শ্রীহট্ট যদি বাঙ্গালার মধ্যে যায়, তবে আসাম গবর্ণমেন্ট্ আর ঐসমস্ত টাকা দিবেন না,—বাঙ্গালা গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে তাহা লইতে হইবে। রীড্ সাহেব শুধু এইটুকু বলিয়া ক্ষান্ত হন নাই। তিনি শ্রীহট্টবাসীকে জানাইয়াছেন যে, যতদিন পর্য্যন্ত শ্রীহট্টের বাঙ্গলার অন্তর্ভুক্ত হওয়া-সম্বন্ধে শেষ মীমাংসা না হয়, ততদিন আসাম-গবর্ণমেন্ট্ মুরারীচাঁদ কলেজের উন্নতি ও বিস্তারের জন্ত টাকা দেওয়া স্থগিত রাখিবেন।

অস্পৃশ্যতার পরিণাম—

ব্যাঙ্গালোরের সেশন্ জজ একজন পারিয়াকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের দণ্ডাদেশ দিয়াছেন। এই অস্পৃশ্য পারিয়া একদিন একটি সরু পথ দিয়া একটা তাড়ির দোকানে তাড়ি পান করিতে যাইতেছিল—এমন সময়

পথের উল্টা দিক্ হইতে আর-একজন প্রথম পারিয়া হইতে নিম্নতর-জাতীয় পারিয়া আসিতেছিল। সে প্রথম পারিয়াকে রাস্তা ছাড়িয়া না দেওয়াতে প্রথম পারিয়া বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া দ্বিতীয় পারিয়াকে ছুরিকাঘাত করে।

জ্যামেকা দ্বীপে ভারতবাসীর অবস্থা—

মিঃ পদ্মনাভ আয়ার "হিন্দুস্থান টাইম্‌স্‌" নামক পত্রে লিখিয়াছেন যে ১৯১১ সালের সেন্‌সাস্ অনুসারে জ্যামেকা দ্বীপের ৮ লক্ষ ৩০ হাজার অধিবাসীর মধ্যে ১৭,৬০০ ভারতীয়। ইহারা সকলেই কুলীগিরি করিবার জন্ত মাতৃভূমি ত্যাগ করিয়া ঐস্থানে গিয়াছে। তাহাদের আয় অতি সামান্ত, এমন-কি উপযুক্ত কাপড়চোপড় কিনিবার পয়সাও তাহাদের জোটে না। শিক্ষা বলিয়া তাহাদের মধ্যে কিছু নাই—এমন একজনও ভারতীয় সেখানে নাই, যাহার লেখাপড়া জানা আছে। যুবকগণ ভারতবর্ষ-সম্বন্ধে কিছুই জানে না—যাহা জানে, তাহাও বিকৃত সংবাদ। এককথায় নিজের দেশ বলিতে তাহাদের কোনো স্থান নাই। উহাদের মধ্যে ধর্ম্মশিক্ষারও কোনো ব্যবস্থা নাই। খৃষ্টান মিশনারীগণ দিনরাত উহাদের মধ্যে প্রচার-কার্য্য করিয়া উহাদিগকে খৃষ্টান করিতেছে। জ্যামেকায় যে-সমস্ত নিগ্রো আছে, তাহাদের অবস্থাও ভারতবাসীদের অপেক্ষা ভালো।

উৎকলে হিন্দু-সংগঠন কার্য্য—

লালা লাজপৎ রায় উড়িষ্যার পণ্ডিত নীলকণ্ঠ দাস এম্. এল্. এ, মহাশয়কে উৎকলে হিন্দু-মহাসভার পক্ষে প্রচার-কার্য্যের জন্ত নিযুক্ত করিয়াছেন। তিনি গত মাসে গঞ্জাম জেলার অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়া ৬টি হিন্দুসভা স্থাপন করিয়াছেন, একস্থানে একটি সেবক সভাও স্থাপিত করিয়াছেন। বর্ত্তমান মাসে পদ্মমাড়ীতে একটি জেলা হিন্দু-সম্মিলনও তাঁহার উদ্যোগে হইয়াছিল। সভাতে সকলেই খুব উৎসাহ দেখাইয়াছিল। গত ১৩ই তারিখে মান্দার নামক স্থানেও তিনি একটি সভা করেন। মান্দারের রাজা সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই সভাতে পণ্ডিত দাস হিন্দু-মহাসভার উদ্দেশ্য বিবৃত করেন। রাজা সাহেব তাঁহার রাজ্যস্থিত ২ শত গ্রাম লইয়া একটি হিন্দু-সভা স্থাপন করিয়াছেন এবং নিজে উহার সভাপতি হইয়াছেন। পুরী, কটক, বালেশ্বর, সিংহভূম প্রভৃতি জেলাতেও বিভিন্ন কর্ম্মী হিন্দু সভার পক্ষে কাজ করিতেছেন।

জি-আই পি রেলের ড্রাইভার-পত্নীর দাবি—

জি, আই, পি, রেলের একজন পয়েন্টম্যানের অসাবধানতার জন্ত ট্রেন্ হইতে পড়িয়া গিয়া ব্রাউন নামক একজন ড্রাইভার নিহত হয়। এই কারণে তাহার স্ত্রী মিসেস ব্রাউন আদালতে রেল-কোম্পানীর বিরুদ্ধে ৮০ হাজার টাকার দাবিতে নালিশ করে। গত ১৩ই জুলাই তারিখে অমরাবতীর অতিরিক্ত জজ মিসেস্ ব্রাউনকে ৬০ হাজার টাকার ডিক্রি দিয়াছেন।

স্বরাজ্যদলের হাতে কংগ্রেস—

মহাত্মা গান্ধী এবং পণ্ডিত মোতিলাল নেহরুর মধ্যে নিম্নলিখিতরূপ পত্র ব্যবহার হইয়াছে। ইংরেজি পত্রের বাংলা অনুবাদ দেওয়া হইল।

কলিকাতা, ১৯শে জুলাই ১৯২৫

প্রিয় পণ্ডিতজী,

দেশবন্ধুর স্মৃতির জন্ত আমি কি করিতে পারি এবং লর্ড্ বার্কেনহেডের বক্তৃতাতে যে সমস্তার সৃষ্টি হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমার দ্বারা কি হওয়া সম্ভব আজ কিছুদিন হইতে কেবল সেই চিন্তাই করিতেছি। আমি এই সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, গত বৎসর চুক্তিতে স্বরাজ্যদলকে যে-সব বাধ্যবাধকতায় আবদ্ধ করা হইয়াছিল, আমি সেগুলি হইতে ঐ দলকে মুক্তি দিব। আমার এই কার্য্যের ফল এই হইবে যে, কংগ্রেস আর প্রধানতঃ সূতা-কাটার প্রতিষ্ঠান থাকিবে না, লর্ড্ বার্কেনহেডের বক্তৃতায় যে-সমস্তার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে স্বরাজ্যদলের কর্ত্তৃত্ব এবং প্রভাব বৃদ্ধি করার আবশ্যকতা আমি বুঝিতেছি। ঐ দলের শক্তি বৃদ্ধি করিতে আমার সাধ্যমত আমি যদি কোনো চেষ্টার ত্রুটি করি, তাহা হইলে আমার কর্ত্তব্য পালন করা হইবে, কংগ্রেসকে যদি প্রধানতঃ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হয়, তাহা হইলেই আমার সেই কার্য্য প্রতিপালিত হইবে। গত বৎসরের চুক্তি-অনুসারে কংগ্রেসের তৎপরতা কেবল গঠনমূলক কার্য্যের মধ্যে নিবদ্ধ আছে। দেশের অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, এই পরিবর্ত্তিত অবস্থায় দেশের সম্মুখে আজ যে-সমস্তা দেখা গিয়াছে, তাহাতে ঐ বাধা-নিষেধ আর থাকা উচিত নয়। সেজন্ত আমি ব্যক্তিগতভাবে শুধু আপনাদিগকে ঐ-সব বাধা-নিষেধ হইতে অব্যাহতি দিতেছি না, আমি ইহাও প্রস্তাব করিতেছি যে, আগামী নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সভায় আমি ঐভাবেই কাজ করিব এবং সমগ্র কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান আপনার হাতে ছাড়িয়া দিব; দেশের স্বার্থের পক্ষে আপনি যেরূপ আবশ্যক সেইরূপ রাজনৈতিক প্রস্তাবসমূহ কমিটির নিকট উপস্থিত করিতে পারিবেন। মোটের উপর স্বরাজ্যদলের জন্ত বিবেকানুযায়ী পথে আমার দ্বারা যেটুকু কাজ হওয়া সম্ভব, তাহা করিবার জন্ত আপনার নির্দ্দেশ-মতন চলিতে আমি প্রস্তুত আছি, ইহা আপনাকে জানাইতেছি।

একান্ত
এম. কে, গান্ধী
কলিকাতা, ২১ জুলাই, ১৯২৫

পণ্ডিত মোতিলালের জবাব

প্রিয় মহাত্মাজী—

স্বরাজ্যদলের জনমান্ত নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের অকাল-মৃত্যুতে স্বরাজ্যদলের যে অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে; তাহার পর আপনার ঔদার্য্যপূর্ণ সমর্থন পাইয়া স্বরাজ্যদল আপনার নিকট গভীর কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ আছে। ১৯শে জুলাইয়ের চিঠিতে আপনি যে-প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতে সে ঋণতায় আপনি দ্বিগুণিত করিলেন। বিনীতভাবে আপনার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া লর্ড্ বার্কেনহেডের বক্তৃতায় যে-সমস্তার সৃষ্টি হইয়াছে দেশবন্ধু দাশের ফরিদপুরের বক্তৃতায় নির্দ্দেশিত পথে সেই সমস্তার সমাধানের জন্ত আপনার সাহায্যে চেষ্টার দ্বারাই আপনার সে-ঋণ পরিশোধিত হইবে। দেশবন্ধু সম্মানজনক সহযোগিতা করিতে চাহিয়া-ছিলেন, কিন্তু লর্ড্ বার্কেনহেড্ প্রস্তাব উপেক্ষাই করিয়াছেন, মনে হয়; স্বাধীনতার জন্ত যে-সংগ্রাম আমরা আরম্ভ করিয়াছি, সেই সংগ্রামে আমাদিগকে এখনও অনেক অনাবশ্যক বাধাবিঘ্নের এবং যাঁহারা খাঁটি খবর রাখেন না এমন বিরোধীর সম্মুখীন হইতে হইবে। এরূপ অবস্থায় আমাদের কর্ত্তব্য হইল, আমাদের জন্ত যে-পন্থা নির্দ্দেশিত আছে, সেই পথে আগাইয়া গিয়া দায়িত্বজ্ঞানহীন, উদ্ধত কর্ত্তৃপক্ষের সমুচিত জবাব দিবার জন্ত দেশকে প্রস্তুত করা; ফরিদপুরের সেই প্রসিদ্ধ অভিভাষণের ভাষায় অল্প কথায় আমরা লড়াই করিব, বীরের মতই লড়াই করিব; সেই-সঙ্গে এ-কথাও মনে রাখিব যে, আপোষের সময় যে দিন আসিবে, তাহা আসিবেই, সেদিন আমাদিগকে ঔদ্ধত্যের সহিত নহে, সমুচিত বিনয়ের সহিতই, শক্তি-সংসদে উপস্থিত হইতে হইবে। লোকে তখন যেন এই কথাই বলে যে, বিপদের সময় অপেক্ষা বিজয়ের সময়ই আমরা মহত্তর।

কংগ্রেসের ঐক্যবদ্ধ শক্তি আমাদিগকে দান করিয়া আপনি দেশবন্ধু দাশের বাণী কার্য্যে পরিণত করিতেই আমাদিগকে এখন সক্ষম করিলেন।

এমন শুভ উদ্যোগের ফল-সম্বন্ধে আমাদের মনে কোনোই সন্দেহ নাই; ইহার ফল সকল যুগে, সকল দেশে যেমন হইয়াছে, তেমনই হইবে। শক্তির উপর ভারই পরিশেষে বিজয়লাভ করিবে।

আপনি যে চুক্তি হইতে স্বরাজ্যদলকে উদারতার সহিত অব্যাহতি দিয়াছেন, আমি সেই চুক্তির সম্বন্ধে একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। আপনার কেন, এই বৎসরের মধ্যে ঐ চুক্তি পরিবর্ত্তিত করি, এরূপ ইচ্ছা দেশবন্ধুর এবং আমার উভয়েরই ছিল না। আমরা উহার পরীক্ষার সমস্ত সুবিধাই দিতে চাহিয়াছিলাম, উহাকে সফল করিবার জন্য ব্যক্তিগতভাবে সকল-রকমে সাহায্য করিবার ইচ্ছাই আমাদের ছিল। স্বাস্থ্যহীনতা এবং অন্যান্য কাজের জন্য আমরা ঐদিকে যতটা কাজ করিতে চাহিয়াছিলাম, তাহা করিতে পারি নাই। সম্প্রতি যে-সব ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহাতে দেশে যে নূতন সমস্যা দেখা দিয়াছে, এবিষয়ে আমি আপনার সহিতই একমত; এমন অবস্থায় অবস্থানুযায়ী কংগ্রেসকে প্রধানতঃ রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করাই উচিত। এইজন্য আপনার ঐপ্রস্তাব আমি আনন্দের সহিত গ্রহণ করিতেছি। কিন্তু ইহার অর্থ এই হইবে না যে, কংগ্রেস গঠনমূলক কার্য্য কোনোরূপে পরিহার করিবে। সংহত জাতির শক্তি যদি আমাদের পিছনে না থাকে, তাহা হইলে আমাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইবে।

এখন কাউন্সিলে এবং গঠন-মূলক কার্য্যে কাউন্সিলের বাহিরে আমরা পূর্ণ বিশ্বস্ততার সহিত কার্য্যে অগ্রসর হইব; এবং দেশে যদি সুশৃঙ্খলিত-ভাবে কার্য্যের চাহিদা আসে, তাহা হইলে একথা বলাই বাহুল্য যে, স্বরাজ্য-দল সর্ব্বান্তঃকরণে তেমন চেষ্টার সাহায্যই করিবেন।

মোতিলাল নেহরু

পুলিসের কার্য্যকুশলতা—

ভারতীয় সাম্যবাদীদলের সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যভক্ত গত ১৪ই জুলাই কানপুর হইতে এক ইস্তাহার জারি করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে, গত ৭ই তারিখে সাম্যবাদী দলের কার্য্যালয় খানাতল্লাস করিবার সময় পুলিস এই কারণ দেয় যে, ভারতে সাম্যবাদ-বিষয়ে পুস্তকাদি যাহাতে প্রচার না হয় তাহার জন্যই এই খানাতল্লাস। ইহার কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে তিনি ভারত গবর্ণমেন্টের হোম্ সেক্রেটারীর নিকট এক পত্র লিখিয়া কোন্ কোন্ পুস্তক বাজেয়াপ্ত বা নিষিদ্ধ তাহা জানিতে চান। পত্রের উত্তরে হোম্ সেক্রেটারী তাঁহাকে জানান যে, তিনি এসংবাদ তাঁহাকে দিতে অক্ষম। ৭ই তারিখে পুলিশ যে-সকল বই লইয়া যায়, তাহা সমস্তই ইংলণ্ড হইতে আনীত এবং এইসকল বই বিক্রয়ের বিজ্ঞাপনও দেওয়া হইয়াছিল। পুলিসকেও দুই সপ্তাহ পূর্ব্বেই এই-সকল পুস্তকাদি দেখানো হয়। ভারতবর্ষে প্রকাশিত সমাজতন্ত্রবাদ-সম্বন্ধে কয়েকখানি পুস্তক পুলিশে লইয়া গিয়াছে। এই পুস্তকগুলি কিন্তু বাজেয়াপ্ত পুস্তকের তালিকায় নাই। ইংলণ্ডের সাম্যবাদীদলের প্রকাশিত পুস্তক বলিয়াই বোধ হয় তাহা পুলিশে লইয়া গিয়াছে।

ভাইকোমের পুনরভিনয়—

"টাইমস্ অব্ ইণ্ডিয়ার" কালিকটস্থ সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, ভাইকোমের মতন আম্বালপারা নামক স্থানে একটি মন্দির আছে। তাহার চতুর্দ্দিকে সদর রাস্তা। কিন্তু অবনত সমাজের সে-রাস্তায় চলিবার অধিকার নাই। তথায় সত্যাগ্রহ অবলম্বন করিবার ব্যবস্থা চলিতেছে। একজন 'একবুয়া' নেতার অধীনে একদল স্বেচ্ছাসেবক ইতিপূর্ব্বেই তথায় পৌছিয়াছে। তাহারা স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ এবং উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদিগকে তাহাদের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছে। ব্যাপার অনেক দূর অগ্রসর হইবে আশঙ্কা হইতেছে।

অকালীবন্দীদের মুক্তির সর্ত্ত—

গুরুদ্বার বিল পাশ হইয়া গেলে, অকালী বন্দীদিগকে যে-সর্ত্তে মুক্তি দেওয়া হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে, অকালী বন্দীরা সে-সর্ত্তে মুক্তি লইতে রাজি নহে। অকালী নেতাগণ কোনোপ্রকার চুক্তিপত্রে সহি করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। এই নূতন সমস্যা সমাধানের যথাবিহিত ব্যবস্থা করিবার জন্য শিরোমণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটির এক্সিকিউটিভ্ কাউন্সিলের এক সভা আহ্বান করা হইয়াছে।

অকালী-নেতাগণ এ-বিষয়ে একমত যে, এই একটিমাত্র ক্রটির জন্য বিলটিকে অগ্রাহ্য করা হইবে না। কেহ-কেহ বলেন যে, শিরোমণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটি যখন কার্য্যতঃ এই বিল গ্রহণ করিয়াছে, তখন তাঁহারা যদি বিল গ্রহণ করিলেন বলিয়া ঘোষণা করেন, তাহা হইলে অকালীদিগের ব্যক্তিগতভাবে আর কোনোপ্রকার সর্ত্তে সহি না করিলেও চলিতে পারে।

প্রবন্ধক কমিটির সভা—

গত ১৩ই জুলাই প্রবন্ধক-কমিটির এক্সিকিউটিভ্ কমিটির এক সভা হইয়া গিয়াছে। সভায় প্রবল বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। কমিটিতে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয়।—

"গুরুদ্বার আন্দোলনে পাঞ্জাবের গবর্ণর স্যার মালকম্ হেইলির সহানুভূতিসূচক মনোভাবের কথা বিবৃত না হওয়া সত্ত্বেও এই কমিটি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হইতেছে যে, বন্দীদিগকে মুক্তি দিবার যে সর্ত্ত দেওয়া হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক, অন্যায় এবং অপমানজনক। এমতাবস্থায় এই কমিটি প্রস্তাবিত ব্যবস্থা অন্যায় বলিয়া মনে করে এবং এইজন্য ইহার পোষকতা করে না।"

১৪ই জুলাই পর্য্যন্ত সভা চলিতে থাকে। কমিটির ভবিষ্যৎ কার্য্য-প্রণালী তাহাতে বিবেচনা করা হয়। এপর্য্যন্ত কোনো স্থির সিদ্ধান্ত হয় নাই।—"আনন্দবাজার"

এলাহাবাদে লিবারেল্ সম্মেলন—

গত ২৬শে জুলাই লর্ড্ বার্কেন্‌হেডের বক্তৃতার সমালোচনা করিবার জন্য লিবারেল্ দলের এক সভা হয়। সভাপতি স্যার তেজ বাহাদুর সপ্রু পণ্ডিত লোকনাথ মিশ্র, সি ওয়াই চিন্তামণি প্রভৃতি সভায় উপস্থিত ছিলেন।

স্যার তেজ বাহাদুর সপ্রু বলেন, তিনি এই বক্তৃতা পাঠ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন। তাঁহার মতে লর্ড্ বার্কেন্‌হেডের বক্তৃতা রাজ-নীতিকের উপযুক্ত হয় নাই, ইহা আইনজীবীর উপযুক্ত হইয়াছে। তিনি বলেন, এই বক্তৃতার পরে মুডিম্যান কমিটির অল্লাংশ সভ্যের অভিমতের আর কোনো মূল্যই রহিল না।

সহযোগ-সম্বন্ধে বক্তা বলেন, যাঁহারা কিছুদিন পূর্ব্বে সহযোগের পন্থা হইতে দূরে সরিয়া ছিলেন, তাঁহারাও বর্ত্তমানে এই পথে ফিরিয়া আসিতেছেন। অতএব এ-বিষয়ে বিশেষ কিছু বলিবার নাই।

বক্তা বলেন, আমাদিগকে বর্ত্তমানে একটি শাসনপ্রণালীর খসড়া প্রস্তুত করিতে হইবে।

এই কার্য্যে বিভিন্ন দলকে ক্ষুদ্র স্বার্থ পরিত্যাগ করিতে হইবে। যদি সকল সম্প্রদায়ের ঐক্য সংস্থাপিত হয়, তাহা হইলেই পার্লামেণ্ট্‌কে আমরা জোর করিয়া বলিতে পারিব যে, "এই এই অধিকার আমাদিগকে দিতে হইবে।"

অতঃপর লর্ড্ বার্কেন্‌হেডের উক্তিতে লিবারেল্ দলের অসন্তোষ জ্ঞাপন করিয়া এক প্রস্তাব করা হয়। লিবারেল্ দলের পক্ষ হইতে মুডিম্যান

কমিটির অল্পাংশ সভ্যের মতানুযায়ী কার্য্য করিতে সরকারকে অনুরোধ করা হয়। সর্ব্বশেষে দক্ষিণ-আফ্রিকার "ভারত-বিদ্বেষ" আইনের প্রতিবাদসূচক এক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

—"আনন্দবাজার"

মাইশোরে ফোর্ড্ কারখানা—

"Planter's Journal of Agriculturist নামক পত্র খবর দিতেছেন যে, মাইশোরের বাদ্রবতী নামক স্থানে প্রসিদ্ধ মোটরকার-নির্ম্মাতা ফোর্ডের একটি কারখানা খোলা হইবে। এই সম্বন্ধে নাকি মাইশোরের মহারাজা এবং হেন্‌রি ফোর্ডের সহিত পত্র ব্যবহারও চলিতেছে। বাদ্রবতীকে একটি লোহার কারখানাতে পরিণত করিবার মৎলব চলিতেছে। হেন্‌রি ফোর্ড্ এবং মাইশোরের মহারাজা যৌথভাবে এই কারখানার কারবার চালাইবেন।

রেলওয়ে গার্ডের আত্মত্যাগ—

তক্ষশিলার ১৮ই জুলাইএর খবরে প্রকাশ যে, ১ নং আপ্ কলিকাতা মেলের গার্ড মিঃ স্মেন নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া একজন ভারতীয় যাত্রীর প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন। যাত্রী পা পিছ্‌লাইয়া চলন্ত গাড়ী এবং প্ল্যাটফর্ম্মের মধ্যে পড়িয়া যায়। ব্যাপারটি মধ্য-রাত্রে ঘটে। মিঃ স্মেন প্রাণপণে দৌড়াইয়া গিয়া যাত্রীকে টানিয়া তুলিলেন, কিন্তু নিজে পা পিছলাইয়া রেললাইনের উপর পড়িয়া চাকার তলায় দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেলেন। এই বীর গার্ডের মৃতদেহকে সামরিক সম্মানের সহিত কবরস্থ করা হইয়াছে। ভারতীয়ের জন্ত শ্বেতাঙ্গের এমন নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ খুব কমই শোনা যায়। বম্বেতেও একজন শ্বেতাঙ্গ নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া সমুদ্র হইতে একজন বৃদ্ধ মুসলমানকে উদ্ধার করিয়াছে। এই শ্বেতাঙ্গ বালকের নাম কিং বয়স মাত্র ১৮। লজ্জার কথা এই যে, একদল ভারতীয় কূলে দাঁড়াইয়া হাবুডুবু খাইতে দেখিয়াও তাহার সাহায্যের জন্ত অগ্রসর হয় নাই।

রেলগাড়ীতে বায়োস্কোপ—

জি-আই-পি রেলওয়ে কর্ম্মচারীদিগকে কেমন করিয়া কাজকর্ম্মাদি ঠিক ভাবে করিতে হয়, তাহা শিক্ষা দিবার জন্ত রেলগাড়ীর মধ্যে সিনেমার ব্যবস্থা করিতেছেন। রেলওয়ের সমস্ত লাইনে এই গাড়ীখানি ঘুরিবে। চাষাদিগকে উন্নত-ধরণের চাষবাসের প্রণালীও এই গাড়ীর সিনেমার সাহায্যে দেখাইবার প্রস্তাব হইয়াছে। ইহা কাজে হইলে যথেষ্ট সুফল পাইবার সম্ভাবনা আছে।

—

হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

বাংলা

বাংলায় অন্নকষ্ট—

নানাস্থান হইতে অন্নকষ্টের ও দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ কাহিনী আসিতেছে। সহযোগী "বরিশাল" হইতে আমরা মাত্র দুইটি সংবাদ দিলাম :—

গত ৩রা আষাঢ় উত্তর বাখরগঞ্জের হারতা নিবাসী ৺ভোলানাথ পাকরা—বয়স ৪০ বৎসর না-খাইয়া-খাইয়া দুর্ব্বল হইয়া হঠাৎ পড়িয়া গিয়া মারা গিয়াছে। হারতার হাটে ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিল, সেই হাটের ভিতরই হাটের সময় উক্ত ৺ভোলানাথের ভবলীলার সাঙ্গ হয়।

১০ই আষাঢ় ব্রাহ্মণবাড়িয়া-নিবাসী ৺রামানন্দ কড়ের পুত্র শ্রীবঙ্কী কড়ের বয়স ২০।২২ বৎসর। উপবাস ক্লেশ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া গলায় রশি দিয়া আত্মহত্যা করিয়া জঠর-জ্বালার হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্ত বৃক্ষারোহণ করিয়াছিল। অন্য লোক টের পাইয়া হতভাগাকে আত্মহত্যার হাত হইতে রক্ষা করিয়াছে।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র—

সম্প্রতি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুকে বিশ্বজন-সমিতির আগামী জেনেভা-অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্ত আহ্বান করিয়াছেন।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র সম্প্রতি অনেকগুলি উচ্চাঙ্গের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করিয়াছেন। এইসকল আবিষ্কারের ফলে জীবশক্তি-সম্বন্ধীয় অনেক নূতন গূঢ় রহস্য প্রকাশিত হইবে। তাঁহার এইসমস্ত নূতন বৈজ্ঞানিক গবেষণা শীঘ্রই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে।

বিদ্যালয়ে শিল্পশিক্ষা—

সম্প্রতি বঙ্গীয় শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর্ সমস্ত উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে জানাইয়াছেন যে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়ার পূর্ব্বে প্রত্যেক ছাত্রকে নিম্নলিখিত কোনো-একটি বিষয়ে পারদর্শিতার সার্টিফিকেট্ দেখাইতে হইবে। বিষয়গুলির নাম :

(১) কৃষি, (২) সূত্রধরের কাজ ও বাগান গঠন, (৩) কর্ম্মকারের কাজ, (৪) হিসাব-রক্ষা, (৫) সূতা কাটা ও বস্ত্র বয়ন, (৬) দরজীর কাজ, (৭) সঙ্গীত, (৮) গৃহস্থালী, (৯) চুব্‌ড়ী বোনা, (১০) টেলিগ্রাফ-বিদ্যা।—

বঙ্গে বেকার সমস্যা—

বেকার সমস্যা সমাধানের জন্ত বঙ্গীয় হিতসাধন-মণ্ডলী একটি স্কুল খুলিয়াছেন। সেখানে (ক) দর্জ্জির কাজ (খ) সীবন-কাজ (গ) বই বাঁধাই (ঘ) ফোটো তোলা ইত্যাদি হইয়া থাকে। এ-পর্য্যন্ত ৬৬৭জন ছাত্র এই বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছে। যাহারা পাশ করিয়াছে, তাহাদের আয় মাসিক ৫০্ টাকা থেকে ২০০্ টাকা পর্য্যন্ত।

ছাত্রগণের দৈহিক ব্যায়াম—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন স্কুল এবং কলেজ সমূহে ছাত্রগণের দৈহিক ব্যায়াম-ব্যবস্থার জন্ত কিছুদিন হইতে শিক্ষা-বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি পড়িয়াছে। এ-বিষয়ের তদন্ত এবং সিদ্ধান্ত নির্ণয়ের জন্ত গত ১৯২৪ ইংরেজীর ২৩শে আগষ্ট্ তারিখে এক কমিটি গঠিত হইয়াছিল। কমিটি পরামর্শ দিয়াছেন যে, স্কুল এবং কলেজসমূহে ছাত্রগণের জন্ত ব্যায়ামের ব্যবস্থা করা অবশ্যকর্ত্তব্য। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সভায় এই বিষয়ের চূড়ান্ত আলোচনা হইয়া গিয়াছে। সভায় স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকাধীন স্কুল ও কলেজ সমূহে অতঃপর ব্যায়াম-শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইবে। শারীরিক ব্যায়ামের অভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণের স্বাস্থ্য যে দিন-দিন কিরূপ খারাপ হইয়া পড়িতেছে, তাহা ভুক্তভোগীমাত্রেই অবগত আছেন। শরীর ও মন পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ। এই উভয়ের পাশাপাশি উন্নতির ব্যবস্থা না করিলে শিক্ষার অঙ্গহানি ঘটে। —ঢাকা প্রকাশ

বাংলা সরকারের শাসন-বিবরণী—

বাংলা সরকারের ১৯২৩-২৪ সালের শাসন-বিবরণীতে প্রকাশ যে আলোচ্য বর্ষে সাধারণ অপরাধের সংখ্যা কিছু কমিয়াছে কিন্তু সশস্ত্র ডাকাতি ও চুরির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। রিপোর্টে প্রকাশ যে এই সমস্ত অস্ত্র বিদেশ হইতে গুপ্তভাবে আমদানি হইয়াছে।

শিল্প-বিভাগের বিবরণীতে প্রকাশ যে ঐ বিভাগের কার্য্যের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। গালার কারখানায় বিশুদ্ধ গালা প্রস্তুত করিবার উপায় বাহির করিবার চেষ্টা সফল হইয়াছে। ভালো চামড়া প্রস্তুত করিবার

প্রণালী বাহির হওয়াতে ব্যবসা-ক্ষেত্রের খুব সুবিধা হইয়াছে। রিপোর্টে বলা হইয়াছে অর্থের অনটন-প্রযুক্ত সরকার এ-বিভাগকে যথাসম্ভব সাহায্য দান করিতে পারিতেছেন না এবং শিল্প শিক্ষা আশানুরূপ প্রসার লাভ করিতেছে না। আলোচ্য বর্ষে সরকার কর্তৃক চালিত টেক্‌নিক্যাল এবং শিল্প বিদ্যালয় মোট ২৮টি। বেসরকারী বিদ্যালয় মোট ৬৪টি। ইহাদের মধ্যে ৫৯টি সরকারের সাহায্য পায়। সর্ব্বসমেত ছাত্রের সংখ্যা গত বৎসর ৪,০৩৯ ছিল।

সরকারী কৃষিবিভাগের বিবরণীতে প্রকাশ যে আলোচ্য বর্ষে প্রাথমিক স্কুলসমূহে প্রাকৃতিক শিক্ষার কোনোই উন্নতি হয় নাই। চুঁচুড়ার কৃষি বিদ্যালয়টি বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের হাতে দেওয়া হইয়াছে। ঢাকা বে-সরকারী বিদ্যালয়টিও ছাত্রাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। কৃষিশিক্ষা উন্নতি-বিষয়ক কয়েকটি প্রস্তাব এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন আছে।

রবীন্দ্রনাথের "গোরা"—

সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসখানি মিঃ জে, স্নামো কর্তৃক জাপানী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। ইহা কাইটো ও টোকিও দুইটি পুস্তকালয় হইতে একযোগে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকাশ জাপানী অনুবাদ খুব সুন্দর হইয়াছে; ইহাতে রবীন্দ্রনাথের একখানি ফোটো, তাঁহার হস্তাক্ষরে লিখিত একটি কবিতা এবং শ্রীযুত নন্দলাল বসু ও শোকিন কাম্পতার অঙ্কিত কয়েকখানি ছবি আছে।

শ্রী হিরণ্ময়ী দেবী—

শিক্ষা-বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী শ্রীযুক্ত পি, মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী গত ১৩ই জুলাই সোমবার তাঁহাদের বালীগঞ্জস্থ ভবনে ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রথমা কন্যা। জীবিতকালে তিনি বরাবরই দেশহিতব্রতে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। তাঁহারই প্রচেষ্টায় "মহিলা শিল্পাশ্রম" স্থাপিত হইয়াছে এবং তিনি স্বয়ং ইহার সম্পাদিকার কার্য্য করিতেন। এই শিল্পাশ্রমে কার্য্য করিয়া বর্ত্তমানে শতাধিক নিঃসহায় বিধবা তাঁহাদের জীবিকার্জ্জন করিতেছেন। সাহিত্যক্ষেত্রেও তাঁহার সুযশ ছিল। একসময়ে তাঁহার হাতে 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদনের ভার ছিল।

কয়েকটি সদনুষ্ঠান—

(১) রায়পুর সমাজসেবক সঙ্ঘ।

লর্ড সিংহ তাঁহার স্বগ্রাম রায়পুরে (জেলা বীরভূম) উন্নতির জন্য চেষ্টিত হইয়াছেন। গ্রামের মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য তিনি চল্লিশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। শীঘ্রই লাইব্রেরী স্থাপন ও কালাজ্বর ও ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য ঔষধ ও চিকিৎসালয়ের ব্যবস্থা করা হইবে।

(২) অভয় আশ্রম, কুমিল্লা—

অভয় আশ্রমের চিকিৎসা-বিদ্যালয়ে কয়েকজন নমঃশূদ্র ছাত্র লওয়া হইবে। তাহাদের যাবতীয় খরচ আশ্রম হইতেই বহন করা হইবে, আই কিম্বা ম্যাট্রিক পরীক্ষোত্তীর্ণ, চরিত্রবান্, সবল সুস্থ ও অবিবাহিত যুবক চাই। নিম্নলিখিত নিয়মাবলী তাহাদিগকে মানিয়া চলিতে হইবে। আমরা আশা করি,তাঁহারা পাঠ-সমাপনান্তে স্বজাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করিবেন। নিয়মাবলী—(১) ৪ বৎসর আশ্রমে থাকিতে হইবে। (২) বৎসরে ১ মাস ছুটি দেওয়া হইবে। (৩) পাঠাবস্থায় বিবাহ করিতে পারিবেন না। (৪) আশ্রমের যাবতীয় নিয়মাবলী মানিয়া চলিতে হইবে।

(৩) শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম—

সন্ন্যাসিনী গৌরীপুরী দেবী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত বাংলা আদর্শ হিন্দু বালিকাবিদ্যালয় ও আশ্রমের ১৩৩০-৩১ সালের কার্য্য-বিবরণী আমরা পাইয়াছি। আলোচ্য বর্ষে আশ্রমবাসিনীদের সংখ্যা ৩৩ জন ছিল—তন্মধ্যে ২৭ জন কুমারী ৫ জন বিধবা ও একজন সধবা। ইঁহাদের মধ্যে ২১ জন আশ্রমের খরচে শিক্ষালাভ করেন। আশ্রমের বালিকাদিগের সাংখ্য, বেদান্ত, ন্যায় ও ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। আশ্রমে ৩ খানা তাঁত, ১৩টি চরকা ও ৩টি সেলাইএর কল ও অন্যান্য-প্রকার শিল্প শিক্ষার বন্দোবস্ত আছে। আলোচ্য বর্ষে আশ্রমের ক্রীত জমিতে বাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে। এজন্য কর্তৃপক্ষের এখনও আঠারো হাজার টাকা ঋণ আছে। সহৃদয় দেশবাসীর বদান্যতায় তাহা নিশ্চয়ই শোধ হইবে। আশ্রমের পাঠাগারও সাধারণের সাহায্যপ্রার্থী। এই সুন্দর প্রতিষ্ঠানটির উন্নতি ও দীর্ঘ-জীবনের জন্য দেশের কল্যাণকামীগণ যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন, সন্দেহ নাই।

পদব্রজে রেঙ্গুন—

ঢাকার শ্রীযুক্ত পরাগরঞ্জন দে কলিকাতা হইতে পদব্রজে রেঙ্গুন পৌঁছিয়াছেন। কলিকাতা হইতে রেঙ্গুন প্রায় ২০০ হাজার মাইল। এই দীর্ঘ পথ. অতিক্রম করিতে তাঁহার পাঁচ মাস চার দিন সময় লাগিয়াছে। রেঙ্গুন যাওয়ার পথে নানা-প্রকারে তাঁহাকে যথেষ্ট কষ্ট পাইতে হইয়াছে, তিনি শিলচড় ও মণিপুরের মধ্যবর্ত্তী পথে প্রকাণ্ড এক বাঘের সম্মুখে পতিত হইয়াছিলেন আসামের কাকড়াঝাড় জঙ্গলের ভিতর বন্যহস্তী দেখিতে পাইয়া তাঁহার সঙ্গী ডি, এম, গুহ যে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখাইয়াছিলেন, তাহারই ফলে তাঁহারা দুজনই রক্ষা পাইয়াছিলেন। সম্মুখে আসাম-বেঙ্গল রেল লাইন ধরিয়া তিনি মণিপুর পৌঁছিয়া নাগা-দেশের ভিতর দিয়া অবশেষে ব্রহ্মদেশে উপস্থিত হন। তাঁহার সঙ্গে কোনো বন্দুক না থাকিলেও যেসব পার্ব্বত্য অঞ্চলের ভিতর দিয়া তিনি ভ্রমণ করিয়াছেন, সেইসব পার্ব্বত্যজাতি তাঁহার প্রতি অতি শিষ্ট ব্যবহার করিয়াছে। তিনি জাহাজে করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবেন।

জাতীয় চরিত্রের দৌর্ব্বল্য—

শ্রীযুক্ত পরাগরঞ্জনের দুঃসাহসিক কার্য্য প্রশংসনীয়। কিন্তু তাহার পার্শ্বে নিম্নলিখিত চিত্রটি আমাদের জাতীয় চরিত্রের আর-একটি দিক্ দেখাইতেছে। সহযোগী স্বরাজে প্রকাশ—

নীরদকুমার সরকার নামক একটি বাঙ্গালী যুবক ফুটবল খেলায় মোহনবাগানের পরাজয় ঘটায় দুঃখে অহিফেন সেবন করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। ঘটনার সত্যমিথ্যা জানি না। এইসকল মৃত্যুসংবাদে আমাদের জাতীয় চরিত্রের দৌর্ব্বল্যের জন্য লজ্জায় মাথা নুইয়া পড়ে। বাঙ্গালী যুবক মোহনবাগানের পরাজয়ে মনের দুঃখে আত্মহত্যা করিল। এমন করিয়া মরিবার খেয়াল যাহাদের পাইয়া বসে, কে তাহাদের বাঁচাইবে? বাঙ্গালার যুবক, প্রাণ দিবার আর ক্ষেত্র পাইল না। এই ব্যাধির প্রতিকার কোথায়? কোন্-জাতীয় বৈদ্য এই জাতীয় ব্যাধি দূর করিতে পারিবেন? বাঙ্গালীর হইল কি? এই সংবাদ মিথ্যা হউক।

নারী নির্য্যাতন—

বাংলার নানা স্থানেই বিশেষ-ভাবে রংপুরে নারী নির্য্যাতন চলিয়াছেই। প্রতিকারের প্রচেষ্টা আশানুরূপ সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। কুড়িগ্রাম নারী-রক্ষা সমিতির সম্পাদক আমাদের নিকট একখানি পত্র পাঠাইয়াছেন। তিনি নারী-নির্য্যাতনের প্রতিকারের জন্য নিম্নলিখিত উপায়-গুলি নির্দ্দেশ করিয়াছেন:—

১। প্রচার কার্য্য, ২। গ্রামে-গ্রামে নারী-রক্ষা সমিতি স্থাপন, ৩। নির্য্যাতিতা নারীদের সমাজে গ্রহণ ৪। অবিবাহিতাগণকে বিবাহ দেওয়া ৫। সামাজিক শাসন, ৬। রক্ষী সেবকদল গঠন, ৭। একতাবদ্ধ হওয়া ৮। শারীরিক বলবৃদ্ধির জন্ম লাঠি-খেলার প্রচলন ৯। আত্মশক্তির প্রতিষ্ঠা, ১০। ধর্ম্মভাব-জাগরণ, ১১। মামলাদি পরিচালন। আমাদের মনে হয় একটি প্রস্তাব বাদ পড়িয়াছে। নারী রক্ষার প্রধান উপায় নারীদের আত্মরক্ষার শক্তিতে দুর্জ্জয় করিয়া তোলা।

নারী নির্য্যাতনের কয়েকটি অন্তরকম নমুনাও আমরা পাইয়াছি। সহযোগী আনন্দ বাজারে প্রকাশ "ত্রিপুরা জেলার বোগাচর নামক স্থানে আজকালও নাকি মেয়ে বিক্রয় হয়। একটি মেয়ে বাজারে বসে; মেয়েদের সেখানে লইয়া যাওয়া হয়। দরকষর করিয়া মেয়ে প্রকাশ্রেই বিক্রয় হয়। বারাঙ্গনারা 'সেই'বাজারে উপস্থিত হইয়া মেয়ে ক্রয় করিয়া লইয়া আসে এবং নিজেদের দলবৃদ্ধি করে। সম্প্রতি নারায়ণগঞ্জের কোনো পতিতা নাকি এই-রকম তিনটি মেয়ে ক্রয় করিয়া লইয়া আসিয়াছে।

দেশবন্ধু স্মৃতি-ভাণ্ডার—

এ-পর্য্যন্ত (২৪শে শ্রাবণ দেশবন্ধু-স্মৃতি-ভাণ্ডারে মোট ৬,৪৭,৯৩০।/১০ পাই টাকা উঠিয়াছে।

মহাত্মা গান্ধী আশা করিয়াছিলেন একমাসের মধ্যেই প্রার্থিত দশ লক্ষ টাকা সংগ্রহ হইবে। কিন্তু এখনও অনেক টাকা উঠিতে বাকী রহিয়াছে। আচার্য্য রায় এই-সম্পর্কে আবেদন করিয়াছেন "মহাত্মাজী বাঙ্গালা হইতে প্রস্থানের পূর্ব্বে সম্পূর্ণ টাকা সংগৃহীত দেখিয়া যাইতে চাহেন; যদি প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে আগষ্ট মাসের শেষ পর্য্যন্ত তিনি কলিকাতাতেই থাকিবেন। আমাদের চিত্তরঞ্জনের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া দিবার জন্ম এই মহাপুরুষকে আর কতদিন বাঙ্গালায় আবদ্ধ করিয়া রাখিব।"

মুসলমান সমাজের সংবাদপত্র সত্যাগ্রাহী লিখিয়াছেন—

"দেশবন্ধু মোসলমান সমাজের পরম বন্ধু ও সুহৃদ ছিলেন।...... আমরা আশা করি মোসলমান সমাজ দেশবন্ধুর স্মৃতির প্রতি সম্মান ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের জন্ম স্মৃতি-ভাণ্ডারে স্ব-স্ব শক্তি-অনুসারে অর্থদান করিবেন।...সাহায্য দাতাদের অধিকাংশই হিন্দু, মোসলমানগণ কি তাঁহাদের কর্ত্তব্য করিবেন না? এই ভাণ্ডারে সাহায্য করিলে একদিকে যেমন দেশবন্ধুর প্রতি সম্মান দেখানো হইবে, অন্তদিকে তেমনি হাঁসপাতাল স্থাপনে সাহায্য করিয়া পুণ্যের অধিকারী হওয়া যাইবে।

এখন হইতেই যদি প্রত্যেক বাঙ্গালী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া অর্থসংগ্রহে প্রবৃত্ত হন তাহা হইলে অনায়াসেই বাকী টাকা সংগ্রহ হইবে ও বাঙ্গালী তাহার কর্ত্তব্য পালন করিয়া দেশবন্ধুর ঋণমুক্ত হইবে।"

স্মৃতিরক্ষা-সম্পর্কে কয়েকটি প্রস্তাব—

বঙ্গীয় মুসলমান মহিলাদের একটি সমিতি নিম্নলিখিত প্রস্তাব করিয়াছেন:

বঙ্গদেশে নারী-শিক্ষার উপযুক্ত স্কুল, কলেজ, হাঁসপাতাল সবই আছে, কিন্তু সে সকল শিক্ষালয়ে পর্দ্দার ব্যবস্থা না থাকায়, হিন্দু-মুসলমান-সমাজের মহিলাগণ ঐসমস্ত হইতে বঞ্চিতা। আমাদের নিবেদন এই যে, অবরোধ-প্রথাপীড়িত হিন্দু, মুসলমান মহিলাদের জন্ত উচ্চ বিদ্যালয় এবং বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা সধবাদের জন্ত আশ্রম সহ অর্থকরী বিদ্যা-শিক্ষাগার স্থাপিত করা হউক। ইহা সর্ব্বজনহিতৈষী দেশবন্ধুর পুণ্য স্মৃতিরূপে যাবচ্চন্দ্রদিবাকর বিদ্যমান থাকিবে।

নদীয়ার নদী-সমস্যা—

গত ২৬শে জুলাই নদীয়ার নদীপথের উন্নতি-বিধানের জন্ত এক কন্‌ফারেন্স্ হইয়া গিয়াছে। কন্‌ফারেন্স্ বাঙ্গালা-সরকারকে একটি "জলপথ-বোর্ড্" করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। নদীয়ার নদীগুলির অবস্থা পার্শ্ববর্ত্তী জেলাসমূহের নদীগুলির অবস্থার উপর নির্ভর করে। কন্‌ফারেন্স্ ঐ-জেলাসমূহের জেলাবোর্ডগুলিকে "নদীয়া-নদীপথ ও জলপথ বোর্ডে"র সহিত একযোগে কার্য্য করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। উক্ত বোর্ড্ গত ২৬ জুলাইয়ের অধিবেশনে গঠিত হয়।

পরলোকে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—

গত ২১শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার বেলা দেড়টায় আজীবন অক্লান্ত-কর্ম্মী স্বদেশ-সেবক ও ভারতের রাজনৈতিক গুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইয়াছে। কয়েকদিন পূর্ব্বে তাঁহার ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়। বৃহস্পতিবার দিন সকালে অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয় ও সেইদিনই বেলা দেড়টায় তাঁহার মৃত্যু হয়। স্যার্ সুরেন্দ্রনাথ ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পাশ করিয়া তিনি শ্রীহট্টের সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন। ২ বৎসর পর গবর্ণমেণ্ট্ তাঁহার কার্য্যে অসন্তুষ্ট হইয়া কয়েকটি অভিযোগ আনয়ন করে ও তাঁহার পদচ্যুতি হয়। তৎপরে তিনি মেট্রোপলিটন কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপক হন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তিনি রিপন কলেজ স্থাপন করেন। তিনি এই সময়ে বেঙ্গলীর সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন। সুরেন্দ্রনাথের সংবাদপত্র পরিচালনা হইতেই ভারতে রাজনৈতিক আন্দোলনের আরম্ভ বলা যায়। ১৮৭৬ সালে তাঁহার চেষ্টায় ভারত-সভা স্থাপিত হয়। কংগ্রেসের সূচনা হইতেই তিনি তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন এবং নিজের প্রতিভা অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও কর্ম্মশক্তির বলে তিনি কংগ্রেসে অবিসম্বাদী প্রাধান্ত এবং ভারতব্যাপী নেতৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তিনি দুই বার কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করেন। ১৯০৫ হইতে বঙ্গভঙ্গের পর দেশে যে প্রবল আন্দোলনের ও বিদেশী জিনিস বর্জ্জনের প্রস্তাব হয় সুরেন্দ্রনাথ তাহার অন্যতম নেতা ছিলেন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৯৯ পর্য্যন্ত তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের সভ্য ছিলেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে মেকেঞ্জী আইনের প্রতিবাদ-কল্পে তিনি ও তাঁহার ২৭ জন সহকারী মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারি ছাড়িয়া দেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচিত হন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে নূতন ভারত শাসন আইন হইলে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হন ও স্থানীয় আত্মশাসন বিভাগের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে তিনি নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে পরাজিত হইয়া কিছুদিন বিশ্রাম গ্রহণ করেন। এইসময় তিনি তাঁহার জীবন-স্মৃতি লেখেন ও সম্প্রতি বেঙ্গলী, নিউ এম্পায়ার ও স্বরাজ পত্রের সম্পাদকতা গ্রহণ করেন। তাঁহার মৃত্যুতে দেশের প্রভূত ক্ষতি হইল। যতদিন ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী থাকিবে ততদিন সুরেন্দ্রনাথের কীর্ত্তি-সমুজ্জল চরিত্র-মহিমা দেদীপ্যমান থাকিবে।

শ্রী প্রভাত সান্যাল

বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের কার্য্যাবলী

শ্রী দেবেন্দ্রনাথ মিত্র

কৃষি-বিভাগের প্রতিনিধি-হিসাবে আজ আপনারা আমাকে কৃষি-বিভাগের কার্য্যাবলী-সম্বন্ধে কিছু বলিবার যে সুযোগ দিয়াছেন, সেইজন্য আমি আপনাদিগকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আমি প্রথমেই আপনাদিগকে জানাইতেছি যে, আপনাদের এত বড় সভায় বিশেষতঃ মহাত্মা গান্ধীর সম্মুখে দাঁড়াইতেই আমার বিশেষ সঙ্কোচ বোধ হইতেছে। যাহা হউক আপনাদের যে অনুগ্রহ ও সহানুভূতির বলে আমি এই স্থানে দাঁড়াইতে সাহসী হইয়াছি, আশা করি আপনাদের সেই অনুগ্রহ ও সহানুভূতি দ্বারা আমার সকল ত্রুটি উপেক্ষিত হইবে।

আমি আপনাদের সময়ের মূল্য বুঝি; এবং আমি ইহাও জানি যে, এই মুহূর্ত্তেই আপনাদিগকে দেশের নানাবিধ সমস্যার আলোচনায় ব্যাপৃত হইতে হইবে। সেইজন্য আমাদের দেশে কৃষির প্রয়োজনীয়তা-সম্বন্ধে বিশেষ-কিছু বলিয়া আপনাদের সময় নষ্ট করিতে সাহসী হইব না। সভাপতি-মহাশয় এ-বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন ও আমার পরবর্ত্তী বক্তা-মহাশয় এ-বিষয়টি বিশদভাবে আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিবেন। আমি বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের উদ্দেশ্য, কার্য্য-প্রণালী ও এযাবৎ বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগকর্ত্তৃক কৃষির কি-কি উন্নতি সাধিত হইয়াছে কেবলমাত্র তাহাই সংক্ষেপে বলিবার চেষ্টা করিব। অতি দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগ-সম্বন্ধে এখনও অনেকের অনেক ভ্রান্ত ধারণা আছে। কেহ-কেহ মনে করেন যে, আমাদের দেশীয় কৃষি-প্রণালীর উচ্ছেদ সাধন করিয়া উহার স্থানে পাশ্চাত্য দেশের কৃষি-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করাই কৃষিবিভাগের উদ্দেশ্য। প্রসিদ্ধ চিকিৎসক বিধানচন্দ্র রায় মহাশয় "গ্রাম-সংস্কার-সম্বন্ধে" যে-প্রস্তাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই সম্পর্কে তিনি বলিয়াছিলেন, "কৃষির উন্নতি বা পুনঃসংস্কারই যে দেশের স্বাস্থ্য-সমস্যার সমাধান করিবে, এ-কথা বলা যায় না; বরং বলা যায় যে, পাশ্চাত্য কৃষি-প্রণালীর অনুকরণে আমাদের কৃষির সংস্কার ও এদেশীয় হস্ত-চালিত কৃষি যন্ত্রাদির পরিবর্ত্তে কলের সাহায্যে চালিত যন্ত্রাদির প্রচলন আমাদের আর্থিক সমস্যার সমাধান করিতে মোটেই পারিবে না।" অপর একদল ঠিক ইহার বিপরীত অভিযোগ করেন; তাঁহারা বলেন, যদিও কৃষি-বিভাগ কুড়ি বৎসর-কাল এ-দেশের কৃষির উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন, তথাপি স্থানীয় কৃষি-প্রণালী বা কৃষি যন্ত্রাদির

ফরিদপুর গ্রাম্য কৃষি সমিতির জনৈক সভ্য

কিছুই পরিবর্ত্তন হয় নাই; বলদের সাহায্যে এখনও লাঙ্গল চলিতেছে। দেশী লাঙ্গল, কাঁচি, খুরপী, বাঁশের মই এখনও কৃষকেরা ব্যবহার করিতেছে! কলের লাঙ্গল (Tractor) শস্য কাটার যন্ত্র প্রভৃতি দেশে ত প্রচলিত হয়ই নাই—এমন কি সরকারী কৃষিক্ষেত্রেও ইহাদের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না। কৃষির উন্নতি-সম্বন্ধে কৃষি-বিভাগ তাহা হইলে কি করিয়াছেন? এইরূপ কৃষি-বিভাগের প্রয়োজনীয়তাই বা কি? তৃতীয় দল যদিও কৃষি-বিভাগের আবিষ্কৃত বীজসমূহের উপকারিতা স্বীকার করেন, তথাপি তাঁহারা বলেন যে, সামান্য বীজ আবিষ্কার

করিবার জন্ত কৃষিবিভাগ অত্যধিক সময় নষ্ট করিতেছেন। চতুর্থ দল বিশেষ কিছু না বলিয়াই "কৃষি-বিভাগকে" সরকার-পোষিত "শ্বেতহস্তী" আখ্যা দিয়া থাকেন। আমরা সকল দলেরই মতামতকে শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতেছি। এইসকল সমালোচনার দ্বারা ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, যে-কৃষি এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত অবহেলার বিষয় ছিল, আজ তাহা সকল সম্প্রদায়ের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে। ইহা এখন সকলেই স্বীকার করিতেছেন যে, যে-দেশের শতকরা ৯০ জন লোক কৃষিজীবী, সে-দেশের কৃষির অবহেলা করিয়া জাতীয় উন্নতি সাধন করা সম্ভবপর

সরকারী কৃষি-ক্ষেত্র—ফরিদপুর

নহে। দেশের স্বাস্থ্য ও সম্পদ্ কৃষির ও তৎসম্পর্কীয় শিল্পাদির উপরই নির্ভর করিতেছে। ইহা সকলেই জানেন যে, বাংলাদেশে এমন অনেক কাঁচা মাল উৎপাদিত হয় যাহা দ্বারা নানাবিধ মূল্যবান্ শিল্প-সামগ্রী প্রস্তুত হয়। সেইজন্ত উন্নত প্রণালীতে কাঁচা মাল উৎপাদনও যেমন প্রয়োজন তাহার সঙ্গে-সঙ্গে সেইসকল কাঁচা মালের সাহায্যে যে-সকল শিল্পের অনুষ্ঠান হইতে পারে, তাহার প্রতিষ্ঠা করাও আবশ্যক। বোধ হয় আমাদের মধ্যে এ বিষয়ের সূক্ষ্মাংশ লইয়া মতভেদ থাকিলেও মূলাংশ লইয়া কাহারও সহিত কাহারও মতভেদ নাই।

অন্ন-সমস্তাই এখন আমাদের প্রধান সমস্তা এবং আমরা সকলেই বোধ হয় এ-বিষয়ে এক মত যে, আমাদের যুবকবৃন্দেরা যদি কৃষি-কার্য্যে ও তৎসম্পর্কীয় শিল্পের দিকে অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ করেন, তাহা হইলে এই বর্ত্তমান অন্ন-সমস্তার কতক-পরিমাণ সমাধান হইতে পারে।

ইংরেজী ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে পৃথক্‌ভাবে কৃষি-বিভাগের সৃষ্টি হয়। বারম্বার পরীক্ষা করিয়া যে-সকল উন্নত কৃষি-প্রণালী অত্যধিক ব্যয়-ব্যতিরেকে বেশী অর্থাগমের পথ বিস্তার করিতে পারিবে, কেবল সেইসকল কৃষিপ্রণালী কৃষকগণের সমক্ষে প্রত্যক্ষভাবে দেখানোই কৃষিবিভাগের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল। এবং প্রথম হইতে এখন পর্য্যন্ত কৃষি-বিভাগ এই উদ্দেশ্যে কার্য্যে নিয়োজিত আছে। আমাদের দেশের কৃষকেরা অত্যন্ত গরীব; কোনো প্রকার ব্যয়বহুল পরীক্ষাতে অর্থব্যয় করিবার ক্ষমতা যে তাহাদের নাই, এ-কথা কৃষিবিভাগ জানেন।

এ-দেশের কৃষির উন্নতি প্রধানতঃ তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে, যথা—

(১) বীজ, (২) বলদ, (৩) কৃষি যন্ত্র, সার ও অন্যান্য কৃষি-প্রণালী। কোন্ বিষয়টির কোথায় উন্নতি করা সম্ভব তাহা বাহির করিতে হইলে প্রত্যেক বিষয়টির সহিত আদ্যোপান্ত পরিচয় থাকা আবশ্যক এবং এইজন্য কৃষি-বিভাগ স্থাপনের পর প্রথম কয়েক বৎসর দেশীয় কৃষি-সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে কৃষি-বিভাগের কর্ম্মচারী-দের অনেকটা সময় লাগিয়াছিল।

আপনারা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, বীজই "কৃষি-অট্টালিকার" প্রধান ভিত্তি; আমাদের দেশে উন্নত শ্রেণীর ফসলের প্রবর্ত্তনের দ্বারা কৃষির উন্নতি করা একটি খুব সহজ ও প্রকৃষ্ট পন্থা। ভারতবর্ষে সকল স্থানেই উন্নত শ্রেণীর ফসলের প্রবর্ত্তন করিয়া কৃষির যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে; বিশেষতঃ বাংলাদেশে যেখানে প্রত্যেক গৃহস্থের জমি অত্যন্ত অল্প ও বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত এবং উন্নত কৃষি-যন্ত্র কিম্বা সার ব্যবহার করিবার কৃষকদের ক্ষমতা নাই। এখানে উন্নত-শ্রেণীর ফসল-প্রচলনের দ্বারা কৃষির উন্নতি করাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। যদি কোনো কৃষক তাহার স্থানীয় বীজের পরিবর্ত্তে উন্নত বীজ ব্যবহার করিয়া একমণ পাট বা একমণ ধান বেশী পায়, তাহা হইলে সে উপকার

স্থানীয় পাট ও কৃষি বিভাগের প্রবর্ত্তিত পাট, ফরিদপুর

স্পষ্টই দেখিতে পাইবে, কারণ এই একমণ ধান বা একমণ পাট উৎপন্ন করিতে তাহার কিছু মাত্র বেশী খরচ লাগিল না বা তাহাকে প্রচলিত কৃষি-প্রণালীর কোনো পরিবর্ত্তন করিতে হইল না, অথচ সে বেশী ফসল পাইল।

ধানই বাংলাদেশের প্রধান খাদ্য-শস্য। ইহা ব্যতীত পাট, আক, ও তামাকের চাষ হইতে যথেষ্ট অর্থাগম হয়, সুতরাং এইসকল ফসলের উন্নতি করিতে পারিলে যে, দেশের মঙ্গল হইবে সে-বিষয়ে ভিন্নমত নাই। বঙ্গীয় কৃষিবিভাগ প্রথম হইতেই এইসকল ফসলের উন্নতি-সাধনে নিযুক্ত আছেন এবং উন্নত শ্রেণীর ধান, পাট, ইক্ষু, তামাক প্রভৃতি আবিষ্কার করিয়াছেন; বর্ত্তমানে কৃষকেরা এইসকল উন্নত শ্রেণীর শস্যের বীজ বহুল পরিমাণে ব্যবহার করিয়া ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতেছে। কৃষি-বিভাগের আবিষ্কৃত রোয়া ধান ইন্দ্রশাইল ও সুখসার, আউসধান—কটকতারা ও সূর্য্যমুখী, এখন অনেক স্থানেই ছড়াইয়া পড়িয়াছে; এইসকল উন্নত শ্রেণীর আমন কিম্বা আউস ধান, স্থানীয় সকল প্রকার আমন কিম্বা আউস ধান অপেক্ষা প্রত্যেক বিঘায় অন্ততঃ এক মণ করিয়া বেশী ফলন দেয়।

কাকিয়া বোম্বাই, ঢাকা ১৫৪, চিনসুরা গ্রীণ নামক উন্নত শ্রেণীর পাটের কথা বাংলা দেশে এমন কোনো পাট-চাষী নাই যে জানে না। কৃষি-কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন এমন একজন শিক্ষিত লোক বলিয়াছেন, কৃষি-বিভাগের উন্নত শ্রেণীর পাট, বাংলাদেশের পাটচাষের ইতিহাসে যুগান্তর আনিয়া দিয়াছে। এইসকল পাট কেবলমাত্র বিঘাপ্রতি অন্ততঃ একমণ বেশী ফলন দেয় বলিয়া যে কৃষকদের সমাদর লাভ করিয়াছে তাহা নহে—ইহা অধিক দামেও বিক্রীত হইতেছে।

টানা আক উচ্চ জমির আক-হিসাবে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইহা হইতে কেবলমাত্র যে অধিক গুড় পাওয়া যায় তাহা নহে—অনাবৃষ্টিতে ইহার বেশী ক্ষতি করিতে পারে না—ইহা খুব শক্ত বলিয়া শিয়াল-শূয়রে বেশী নষ্ট করিতে পারে না। ইহা সকলেই জানেন যে,

বর্ত্তমান সময়ে শিয়াল-শূয়রের অত্যাচারের জন্ম আকের চাষ কমিয়া আসিতেছে, সুতরাং টানা আক এই অনিষ্ট নিবারণ করিতে পারিবে। কৃষকগণ নির্ব্বাচিত তামাকের বীজ ব্যবহার করিয়া বেশী ফলন ত পাইতেছে এবং উহা অধিক দামেও বিক্রীত হইতেছে। যে-সকল ফসলের কথা এইমাত্র উল্লেখ করিলাম, ইহাদের বীজের জন্ম চাহিদা এত বেশী হইয়া উঠিয়াছে যে, কৃষি-বিভাগ উহা সরবরাহ করিতে পারিতেছেন না।

এই জেলায় ৪০ হাজার একর জমিতে কৃষি-বিভাগের প্রবর্ত্তিত পাটের চাষ বর্ত্তমান বৎসরে হইয়াছে—ইহা হইতে কৃষকগণ মোটামুটি ১২০০০০ মণ পাট বেশী পাইবে, অথচ ইহাতে খাদ্য শস্তের জমির পরিমাণ কিছুই হ্রাস হইবে না। যে-সকল স্থানে কৃষি বিভাগের প্রবর্ত্তিত ধানের চাষ হইতে পারে কেবলমাত্র সেইসকল স্থানের জমির পরিমাণ লইয়া হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ধানের চাষের দ্বারা বাংলাদেশের কৃষকগণ তিন কোটী টাকা বেশী পাইতে পারে এবং ঠিক ঐরূপ হিসাবেই দেখা গিয়াছে যে, পাটের চাষে কৃষকদের ৫ কোটী টাকা অধিক আয় হইতে পারে। টানা আকের চাষের দ্বারা শতকরা ৩৩ ভাগ ফলন বাড়াইতে পারা যায়।

আমাদের বিশেষজ্ঞদের গবেষণার বিরাম নাই; তাঁহারা এইসকল উন্নত শ্রেণীর ফসল আবিষ্কার করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া বসিয়া নাই; ইহাদের অপেক্ষা অধিকতর উন্নত শস্যাদি বাহির করিতে ব্যস্ত আছেন। পরিতাপের বিষয় এই যে, যখন কোন-প্রকার উন্নত শ্রেণীর ফসল আবিষ্কার করা হয়, তখন সাধারণতঃ লোকে মনে করেন যে, ইহা যেন আপনা হইতেই বাহির হইল, ইহার আবিষ্কার যে কি পরিমাণ গবেষণা- ও পরিশ্রমসাপেক্ষ, তাহা তাঁহারা একবারও উপলব্ধি করেন না। ইহা অনেকেই বুঝিতে চান না যে, ২০০০ হাজার রকম ধান উপর্য্যুপরি পরীক্ষা করিবার পর উহা হইতে ইন্দ্রশাইল ধান বাহির হইয়াছে। ২০০ শত রকমের আউস ধানের পরীক্ষা হইতে কটকতারা আউস ধান আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই দুই প্রকার ধানই আবার স্ব স্ব জাতীয় এক-একটি শিষ হইতে উদ্ভূত। পাটের বীজের কোনো নমুনা লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিলে উহা হইতে শুদ্ধ উন্নত বীজ বাহির করিতে কমপক্ষে সাত বৎসর সময় লাগে। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে যে, এইসকল পরীক্ষা কিরূপ সময়-সাপেক্ষ ও ইহাতে কি পরিমাণ যত্ন ও অধ্যবসায়ের দরকার।

পূর্ব্বোল্লিখিত ফসল ব্যতীত চীনা-বাদাম, আলু ও কপি প্রভৃতি শীতকালের সব্জী কৃষি-বিভাগকর্ত্তৃক নূতন নূতন স্থানে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। পশ্চিম বঙ্গের এরূপ অনেক স্থানে যেখানে পূর্ব্বে কোনো ফসল উৎপন্ন হইত না এখন সেইসকল স্থানে চীনা-বাদামের চাষ করিয়া কৃষকগণ লাভবান হইতেছে। আলুর চাষ যদিও পশ্চিমবঙ্গে বহু-দিন হইতে প্রচলিত আছে, কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে আলুর চাষের উপযুক্ত জমি থাকা সত্ত্বেও আলুর চাষ কেহ জানিত না। কিন্তু কৃষি-বিভাগের চেষ্টায় এখন প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীর সংলগ্ন জমিতে আলুর চাষ দেখা যায়। কপি প্রভৃতি শীতকালের সব্জীও এখন চাষ হইতেছে।

যাবতীয় ডাইল শস্য ও তৈলপ্রদ বীজ লইয়াও অনুসন্ধান চলিতেছে এবং ইতিমধ্যেই ইহাদের উন্নত শ্রেণী আবিষ্কৃত হইয়াছে।

আমি এখন এমন একটি ফসলের কথা বলিতে যাইতেছি, যাহাতে আপনারা বর্ত্তমান সময়ে বিশেষভাবে মনোযোগ দিতেছেন। আপনারা সকলেই শুনিয়া সন্তুষ্ট হইবেন যে, কাপাসের উন্নতি-কল্পে কৃষিবিভাগ বিশেষভাবে নিযুক্ত আছেন। বাংলাদেশের কাপাসের জমির পরিমাণ কত ও কোথায় কি প্রকারের কাপাস জন্মে, সে-বিষয়ে বিশেষভাবে অনুসন্ধান চলিতেছে। মোটামুটি বাংলা-দেশে ৬০ হাজার একর অর্থাৎ ১৮০ হাজার বিঘা জমিতে কাপাসের চাষ হয়; ইহার মধ্যে ৫ হাজার একর অর্থাৎ ১৫ হাজার বিঘাতে সাধারণ কাপাস সমতল ভূমিতে জন্মে। অবশিষ্ট "কুমিল্লা" কাপাস। ইহা অত্যন্ত মোটা ও ইহার আঁশ ছোট বলিয়া ইহা হইতে সূতা কাটা যায় না; সাধারণতঃ পশমের সহিত মিশ্রিত করিবার জন্ম ইহা বিদেশে রপ্তানী করা হয়। "কুমিল্লা" কাপাসের উন্নতি কি করিয়া হইতে পারে, সে-বিষয়ে বিশেষ পরীক্ষা চলিতেছে। ১৯২২-২৩ সালের কৃষি-বিভাগের বাৎসরিক

স্থানীয় গেণ্ডারি ইক্ষু ও কৃষি-বিভাগের আবিষ্কৃত টানা ইক্ষু
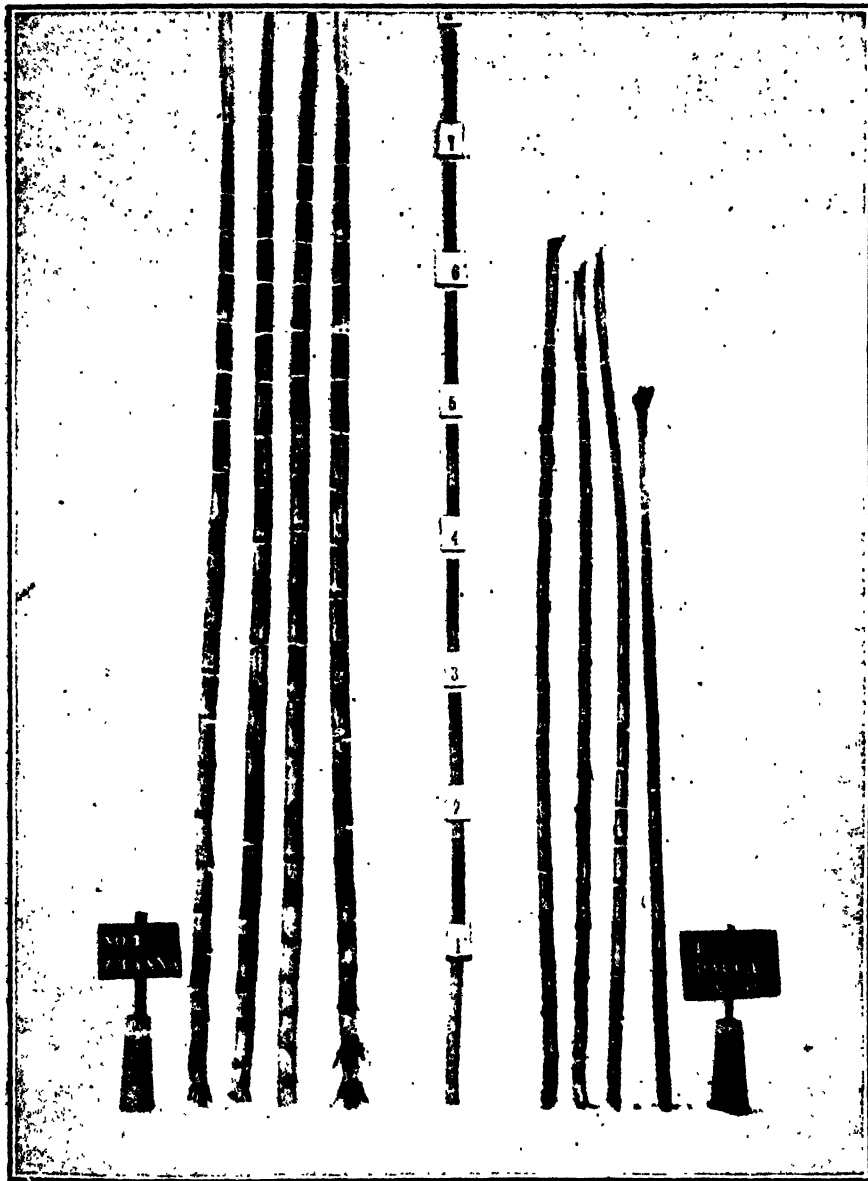
রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, কাপাস সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই যে অনুসন্ধান করা হইয়াছে তাহাতে বুঝা যায় যে, ভারতে অন্য অন্য স্থানে যে-প্রকার উৎকৃষ্ট কাপাস জন্মে, পূর্ব্ববঙ্গেও সেই প্রকার উৎকৃষ্ট কাপাস জন্মিতে পারে। উক্ত রিপোর্টে ইহাও বলা হইয়াছে যে, বর্ত্তমান সময়ে পশ্চিম বঙ্গের অনেক স্থানের রোয়াধানের আবাদ অনিশ্চিত; ঐসকল স্থানের জমি মধ্য-প্রদেশের "কাপাস জমির" ন্যায় এবং উহাতে অড়হর কিম্বা শনের সহিত পর্য্যায়ক্রমে কাপাসের চাষ করিলে ফল ভালোই পাওয়া যাইবে। তবে এইসকল স্থানের জমির আর্দ্রতা-অনুসারে শীঘ্র পাকে এইরূপ কাপাসের দরকার; এ-বিষয়ে অনুসন্ধান চলিতেছে। ইহা ব্যতীত আপনারা শুনিয়া বিশেষ সুখী হইবেন যে, এইরূপ

এক শ্রেণীর কাপাসের গাছও আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহা আমাদের পূর্ব্বের ঢাকা মস্‌লিন্ কাপাসের বিবরণের সহিত মিলিয়া গিয়াছে। এই আবিষ্কারের ফলে অনেকেই আশা করিতেছেন যে, পূর্ব্ববঙ্গে আবার কাপাসের চাষ বিস্তৃতভাবে হইবে। কৃষি-বিভাগকর্ত্তৃক কাপাসের বীজ সরবরাহ করা হইতেছে ও ইহার চাষ-সম্বন্ধে যাবতীয় উপদেশ জনসাধারণকে দেওয়া হইতেছে।

এখন আমি গবাদির কথা আলোচনা করিব। আমাকে অতি লজ্জা ও দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট গরুর জন্য বঙ্গদেশ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে; দুগ্ধের জন্য ও কৃষির জন্য গরুই আমাদের প্রধান অবলম্বন এবং ইহার বর্ত্তমান দুরবস্থা একটি জাতীয় সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কৃষিবিভাগের অধীনে রংপুর গো-জনন ক্ষেত্রে গো-জাতির উন্নতি-সাধনের জন্য যথেষ্ট অনুসন্ধান ও চেষ্টা চলিতেছে। দুগ্ধবতী গাভী ও লাঙ্গল টানার জন্য বলিষ্ঠ বলদ সৃষ্টি করাই এই গো-জনন ক্ষেত্রের উদ্দেশ্য। বর্ত্তমানে রংপুরে দুই শ্রেণীর গরু সৃষ্টি হইয়াছে। উৎকৃষ্ট দেশী গাভীর সহিত উৎকৃষ্ট দেশী ষাঁড়ের সঙ্গমে এক শ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছে ও দেশী গাভীর সহিত হিসার প্রদেশ হইতে আনীত ষাঁড়ের সঙ্গমে অপর শ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছে। এ-বিষয়ে পুসার গবেষণায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, গাভীর দুগ্ধ-উৎপাদিকা শক্তি জন্মদাতা হইতে সঞ্চারিত হয়। সুতরাং দুগ্ধবতী গাভী উৎপাদন করিতে হইলে দুগ্ধ-উৎপাদিকা-শক্তি-সঞ্চারণ-পটু ষাঁড় অধিক পরিমাণে উৎপন্ন করিয়া দেশের মধ্যে বিস্তৃতভাবে সরবরাহ করিতে হইবে। অধিক সংখ্যায় এই প্রকারের ষাঁড় উৎপন্ন করাই রংপুরের উদ্দেশ্য। উপস্থিত রংপুরে যে-সকল গাভী গড়ে দৈনিক ৪ সের পরিমাণ দুধ দিতেছে, তাহাদিগকে নির্ব্বাচন-প্রণালী হইতে দূরে রাখা হইতেছে। এখন রংপুরে এমন গাভী আছে, যাহা দৈনিক গড়ে ১৩ সের পর্য্যন্ত দুধ দিতেছে। রংপুরে উৎকৃষ্ট দুগ্ধ-উৎপাদিকা-শক্তিসম্পন্ন ষাঁড় বিক্রয়ের জন্য মজুত আছে, এবং যে-সকল জেলায় সরকারী কৃষিক্ষেত্র আছে, সেইসকল কৃষিক্ষেত্রে এইরূপ একটি করিয়া ষাঁড় রাখা হইয়াছে; ইহার দ্বারা স্থানীয় কৃষকেরা এই ষাঁড়ের সাহায্যে স্থানীয় গো-জাতির উন্নতি করিতে সক্ষম হইবে। ইহা আশা করা যায় যে, শীঘ্রই প্রত্যেক জমিদার, খাসমহল, কোর্ট্ অব্ ওয়ার্ড্‌স্, জেলাবোর্ড্ প্রভৃতি নিজ-নিজ এলাকায় গো-জাতির উন্নতির জন্য অন্ততঃ একটি এইরূপ ষাঁড় রাখিবার বন্দোবস্ত করিবেন। ইহা হইলে আমাদের দেশের গো-জাতির উন্নতি ও দুগ্ধের পরিমাণ অনেক পরিমাণে বাড়ানো সম্ভব হইবে।

গরুর খাদ্যের যথোচিত ব্যবস্থা না করিয়া গো-জাতির উন্নতির চেষ্টা করা বৃথা। কৃষকদিগকে ইহা ভালো করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, একটি সুস্থ ও বলিষ্ঠ গরু তিনটি কৃশ ও দুর্ব্বল গরু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অধিক কার্য্যকরী। কৃশ ও দুর্ব্বল গরু উপস্থিত যে অল্পপরিমাণ ও অপুষ্টিকর খাদ্য পায় তাহা দ্বারা জীবন রক্ষা করিতেই তাহার সমস্ত তেজ ও উৎসাহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। প্রত্যেক বৎসরই বিহার হইতে এদেশে বহুসংখ্যক গরু, ষাঁড় আনা হয়; কিন্তু উহাদের অনেকেই খাদ্যাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এইজন্য গরুর খাদ্যের উন্নতিকল্পে ও উহার পরিমাণ বাড়াইবার জন্য কৃষি-বিভাগ বহু অনুসন্ধান করিতেছেন,এবং নানাবিধ শস্য যথা—ভুট্টা, জোয়ার, গিনিঘাস প্রভৃতি গরুর খাদ্য-হিসাবে প্রচলন করিবার চেষ্টা হইতেছে।

কৃষি-প্রণালী ও কৃষিযন্ত্র-সম্বন্ধে বলিবার সময়ে আমি সম্প্রতি কোনো কাগজে আমাদের বর্ত্তমান কৃষকদের যে-বিবরণ পড়িয়াছিলাম, তাহা আপনাদিগকে জানাইবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। "ভারতের কৃষক কষ্টসহিষ্ণু সরল ও দরিদ্র, কিন্তু সুশ্রী নহে; অধিক পরিশ্রমশীল নহে, তথাপি সকল সময়ে কার্য্যে লিপ্ত আছে; তাহার যন্ত্রাদি সম্পূর্ণ আদিকালের, তাহার লাঙ্গলে কেবলমাত্র একখানি কাষ্ঠখণ্ড ও তাহার সহিত একটুকরা ইস্পাত লাগান আছে। ইহা জমি আঁচ্‌ড়ানো ছাড়া আর বেশী কিছু করিতে পারে না, তাহার বীজ বোনা ও শস্য আছড়াইবার যন্ত্র সম্পূর্ণ মোটা রকমের; তাহার মন্দগতি বলদই একমাত্র সাহায্যকারী, এবং অনেক স্থানেই দূরে অবস্থিত কূপ হইতে জল টানিয়া তাহাকে তাহার শস্য বাঁচাইয়া রাখিতে হয়।" এই বিবরণ বিশেষ অতিরঞ্জিত নহে।
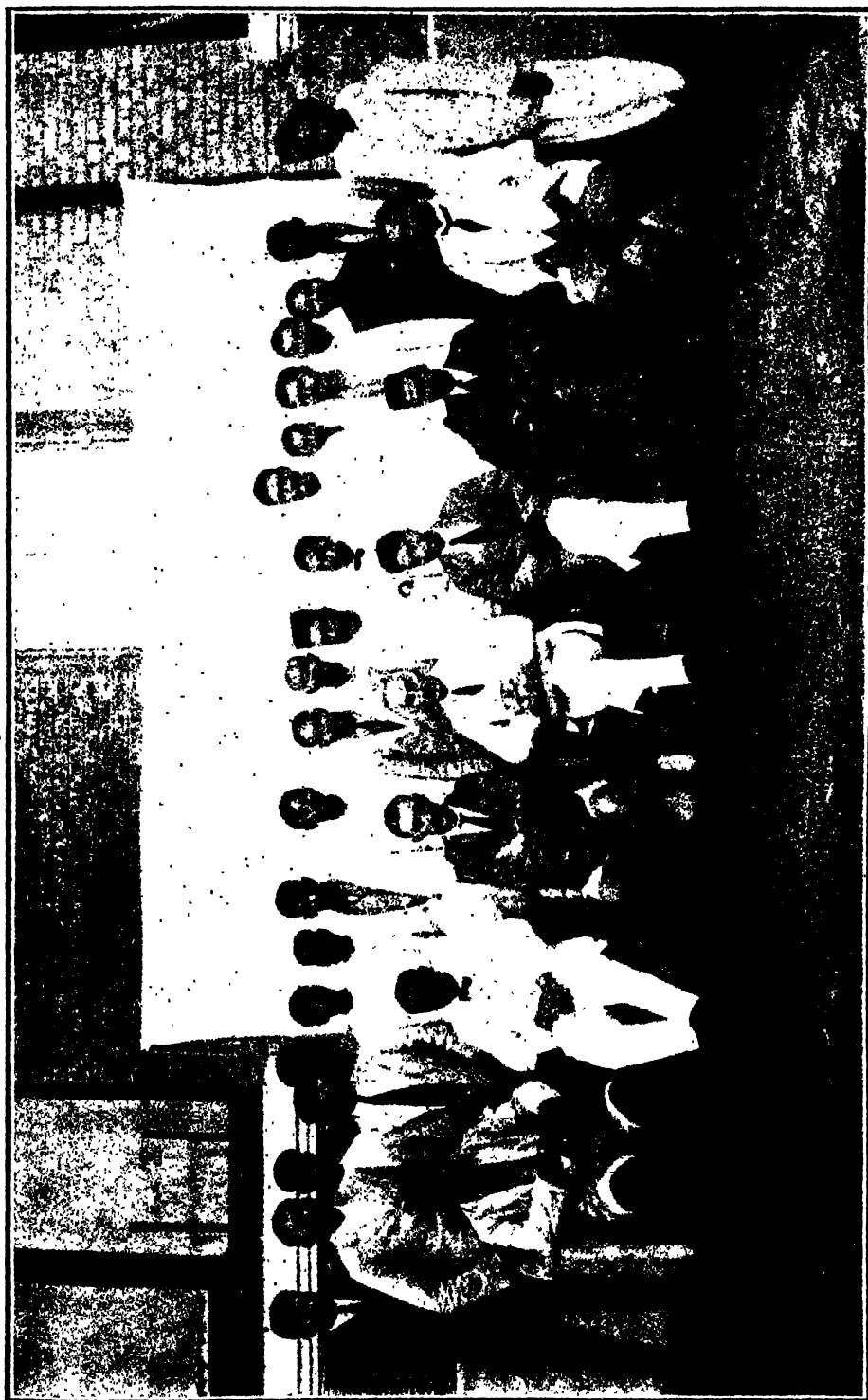
কৃষি-বি　　অধ্যক্ষ

কৃষি-যন্ত্রাদির যে উন্নতি করা দরকার, তাহা কৃষি-বিভাগ বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন এবং কোনো-কোনো কৃষি-যন্ত্রের উন্নতিও করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের কৃষকদিগের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র জোত (Holding) ও অর্থের অভাবই উন্নত কৃষি-যন্ত্রের বিস্তৃতির প্রধান অন্তরায়; যাহা হউক লোহার লাঙ্গল, নিড়ানী প্রভৃতি উন্নত কৃষিযন্ত্র অনেক স্থানেই ব্যবহৃত হইতেছে।

আমাদের কৃষির জন্য জলসেচনের সুব্যবস্থা আর-একটি প্রয়োজনীয় কার্য্য এবং কৃষিবিভাগ এ-বিষয়ে যথাসম্ভব মনোযোগ দিতেছেন। পশ্চিমবঙ্গের অনেক জেলায় জল-সেচনের সুব্যবস্থা করা হইয়াছে; কারণ তাহা না করিতে পারিলে কৃষির অবনতি ভিন্ন উন্নতির আশা নাই; পশ্চিমবঙ্গের সরকারী কৃষিক্ষেত্রসমূহে সাধারণ ফসলে জল সেচন করিয়া দেখা যাইতেছে, উহাতে ফসলের পরিমাণ কত বাড়ে ও জল-সেচন লাভজনক কি না। সম্ভবতঃ আক, আলু, তামাক প্রভৃতি অর্থকরী ফসলে জলসেচন লাভজনক হইতে পারে। বীরভূম, বাঁকুড়া এবং মেদিনীপুর জেলায় জল সরবরাহ করিবার জন্য সমবায় সমিতি স্থাপিত হইয়াছে, এবং ঐসকল সমিতি জল সংগ্রহ করিয়া উপযুক্ত সময়ে উহা ফসলে প্রয়োগ করিবার জন্য বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়াছে।

বিভিন্ন প্রকার মাটিতে বিভিন্ন রকমের সার প্রয়োগ-সম্বন্ধে আমাদের রাসায়নিক পরীক্ষা চলিতেছে। বাংলা দেশের কোন্ জেলায় কোন্ স্থানের মাটি কিরূপ তাহার সবিশেষ অনুসন্ধানের সমাপ্তি হইয়াছে। বিশেষ-বিশেষ স্থানের বিশেষ-বিশেষ ফসলে কি কি সার প্রয়োগ করিতে হইবে সে-বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হইতেছে। কৃষকদিগের অর্থাভাবই সারের বিস্তৃত প্রচলনের প্রধান অন্তরায়। যাহা হউক উপযুক্ত উপায়ে গোবর সংরক্ষণ-বিষয়ে কৃষকদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

ইহা ছাড়া কৃষি-সম্বন্ধে অপরাপর বিষয় যথা—খেজুর-গুড় উৎপাদন, তামাক শুষ্ক করা প্রণালী, আমন ধানের চারা রোপণ প্রভৃতি বিষয়ে বহু অনুসন্ধান করিয়া যে ফলাফল পাওয়া গিয়াছে, তাহা কৃষকদিগের মধ্যে প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে।

অন্যান্য কার্য্যের মধ্যে কচুরি পানা ধ্বংস করিয়া উহা কার্য্যে লাগাইবার উপায় উদ্ভাবন করিবার জন্য কৃষি-বিভাগ যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। ইহা সকলেই জানেন যে, কচুরি পানা দেশের মধ্যে ক্রমশঃ ছড়াইয়া পড়িতেছে। কোনো-কোনো খালে-বিলে নৌকা চলাচল একেবারে অসম্ভব হইয়া গিয়াছে। আমাদের দেশে, বিশেষতঃ বর্ষাকালে, খাল-বিলই যাতায়াতের প্রধান উপায়; সুতরাং এইসকল খাল-বিলে নৌকা চলাচল বন্ধ হইলে দেশের যথেষ্ট ক্ষতি হইবার কথা। উপস্থিত সময়ে কচুরিপানাকর্ত্তৃক স্থানে-স্থানে শস্যের ক্ষতির কথাও শুনা যাইতেছে। ইহা বিশেষ-ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, কচুরি পানা ছাইরূপে বা পচাইয়া ব্যবহার করিলে ইহা উৎকৃষ্ট সারের কার্য্য করে। সেইজন্য কচুরি পানা উঠাইয়া উহা সাররূপে ব্যবহার করিবার জন্য কৃষকদিগকে বিস্তারিত উপদেশ ও শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। স্বাবলম্বনেরই উপর এই উপায়ের সফলতা নির্ভর করিতেছে।

দেশের মধ্যে সকল প্রকার কৃষি-শিক্ষা প্রবর্ত্তন করিবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা হইতেছে এবং এ-বিষয়ে সরকারী ও বেসরকারী লোক লইয়া বৈঠক বসিয়াছে। আশা করা যায় শীঘ্রই এ-বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা হইবে।

কৃষি-বিভাগের অন্তর্ভুক্ত একটি রেশম চাষ-শাখা আছে। গবর্ণমেণ্ট্ নার্সারিগুলিতে নির্ব্বাচন-প্রক্রিয়ার দ্বারা এবং নির্ব্বাচিত চাষীদের সাহায্যে সুস্থ ও নীরোগ গুটীর বীজ প্রস্তুত করা, উন্নত জাতীয় রেশম-কীট উৎপাদন করা, নানা প্রকার তুঁত-গাছ ও তুঁত-গাছের জন্য যে-সমস্ত সারের প্রয়োজন তৎসম্বন্ধে গবেষণা করা এবং চাষীদিগকে আধুনিক প্রণালীতে রেশম চাষ করিতে শিক্ষা দেওয়া—এই বিভাগের উদ্দেশ্য।

কৃষি-বিভাগের বীজের শ্রেষ্ঠতা সকলেই স্বীকার করেন। সাধারণতঃ যে-গুটী বিক্রয় করা হয়, গড়ে তাহার দ্বিগুণ মূল্য বিভাগীয় গুটী হইতে পাওয়া যায়। ১৯২৩-২৪ খৃষ্টাব্দে ৯টি গবর্ণমেণ্ট্ নার্সারী হইতে ২২০০০ কাহন গুটী (১ কাহন ১,২৮০ গুটীর সমান অর্থাৎ মোটামুটি ১ সের) ৭৫,২৭০ টাকায় বিক্রয় হইয়াছিল; এবং কৃষি-

বিভাগের তত্ত্বাবধানে নির্ব্বাচিত চাষীরা ১২০০ কাহন বিক্রয় করিয়াছিল। বাংলাদেশে মোট যত বীজ সরবরাহ করা হয়, নির্ব্বাচিত বীজের মোট পরিমাণ এখন প্রায় তাহার এক তৃতীয়াংশ। যতদিন পর্য্যন্ত সমস্ত বীজ সরবরাহ করিতে না পারা যায়, ততদিন পর্য্যন্ত নির্ব্বাচিত চাষীদের সংখ্যা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করা এই বিভাগের উদ্দেশ্য।

এখন আমি মোটামুটি কৃষি-বিভাগের প্রধান কার্য্যাবলীর ও গত ২০ বৎসরের মধ্যে যে-ফলাফল পাওয়া গিয়াছে তাহার বিবরণ দিলাম।

কৃষি-বিভাগের গঠন-সম্বন্ধে ও কৃষকদিগের মধ্যে আমরা কি ভাবে কার্য্য করিতেছি সে-বিষয়ে কিছু সংক্ষেপে বলিতে ইচ্ছা করি। এই বিভাগের কর্ত্তৃত্ব একজন পরিচালকের উপর ন্যস্ত আছে। গবেষণা ও প্রদর্শন এই বিভাগের প্রধান কার্য্য; গবেষণার জন্য উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্, তন্তুতত্ত্ববিদ্ রাসায়নিক নিযুক্ত আছেন; ঢাকা কৃষি-পরীক্ষা-ক্ষেত্রে এইসকল বিশেষজ্ঞগণ অবস্থিতি করেন, এবং ইঁহারা উক্ত পরীক্ষা-ক্ষেত্রে ও সরকারী অন্যান্য কৃষি-ক্ষেত্রে নিজ নিজ বিষয়ের যাবতীয় পরীক্ষা করিতেছেন। প্রদর্শন-বিভাগের কাজ, সহকারী পরিচালকের সাহায্যে হইতেছে; কোনো নূতন ফসল কিম্বা সার অথবা অন্য কোনো উন্নত কৃষি-প্রণালী বিশেষজ্ঞরা উপর্য্যুপরি অনুসন্ধানের ফলে আবিষ্কার করিয়া সহকারী পরিচালককে জানান। সহকারী পরিচালককে সাহায্য করিবার জন্য প্রত্যেক জিলায় একজন করিয়া জিলা কৃষিকর্ম্মচারী ও কয়েকজন কৃষি-প্রদর্শক আছেন; কৃষি-প্রদর্শকেরা সাধারণতঃ গ্রামের মধ্যে অবস্থিতি করেন ও সকল সময়ে কৃষকদের সংস্পর্শে থাকেন। পূর্ব্বে জিলা কর্ম্মচারীরা গ্রামে-গ্রামে যাইয়া এক-এক জন কৃষকের ক্ষেতে উন্নত বীজ প্রয়োগ করিয়া উহার প্রাধান্য দেখাইতেন। ইহার ফলে দেশে বিক্ষিপ্ত ভাবে অধিকসংখ্যক কৃষকের সহিত আমাদের কাজ করিতে হইত। কিন্তু আমাদের অল্পসংখ্যক কর্ম্মচারী সুচারুরূপে ঐসকল কাজ তত্ত্বাবধান করিতে সক্ষম হইতেন না। আবার এইরূপ বিক্ষিপ্তভাবের কার্য্য জনসাধারণের গোচরে পৌঁছিতে পারে না। তখন কৃষকদিগকে সংঘবদ্ধ করিয়া তাহাদের সহিত কাজ করিবার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইল। এবং গ্রামে-গ্রামে ও থানায়-থানায় কৃষকদিগকে লইয়া কৃষি-সমিতি-গঠন করিয়া ঐসকল সমিতির মধ্যে আমাদের কার্য্য আরম্ভ হইল। ঐসকল সমিতির মধ্যে কাজ করিবার ফলে উপস্থিত সময়ে অনেক স্থানে কেবল কৃষি বিভাগের উন্নত বীজ ছাড়া অন্য বীজ ব্যবহৃত হইতেছে না—এবং উন্নত বীজের চাহিদা অত্যন্ত অধিক হইয়া পড়িয়াছে।

উপস্থিত সময়ে অধিক পরিমাণে বীজ উৎপাদনের জন্য কৃষি-সমবায়-সমিতি স্থাপন করিবার চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু এবিষয়ে স্থানীয় লোকের সাহায্য ভিন্ন কৃষি বিভাগের কৃতকার্য্য হওয়া অসম্ভব। কারণ বাংলাদেশের লোক-সংখ্যা ৪॥০ কোটী, অথচ তাহার তুলনায় কৃষি-বিভাগের কর্ম্মচারীর সংখ্যা অতি অল্প। সেইজন্য কৃষি-বিভাগের আবিষ্কার দেশের জনসাধারণের উপকারে আনিতে হইলে স্থানীয় লোকদিগের সাহায্যের প্রয়োজন। স্থানীয় উৎসাহী ও শিক্ষিত লোকেরা যদি নিজ-নিজ স্থানে কৃষি-বিভাগের উপদেশ কৃষকদিগের মধ্যে প্রচার করেন ও দেশের মধ্যে উন্নত বীজ উৎপাদন করিবার চেষ্টা করেন তাহা হইলেই স্থানীয় কৃষির উন্নতি সম্ভবপর হইবে। উপস্থিত আমরা এই অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি ও কৃষি-বিভাগ দেশের কৃষির উন্নতির জন্য আপনাদের সাহায্য চাহিতেছেন। ইহা আমার বলা বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন যে, এই কাজ প্রত্যেক দেশহিতৈষীর একটি পবিত্র কার্য্য বলিয়া গণ্য করা উচিত। কেননা কৃষির উন্নতির দ্বারাই দেশের অর্থের উন্নতি করা যাইবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পানীয় জল প্রভৃতি যে কম প্রয়োজন, সে-কথা বলিতেছি না; কিন্তু এই-সকল বিষয়ের সমাধান করিতে হইলে অর্থের আবশ্যক এবং এই অর্থ অধিক পরিমাণে একমাত্র কৃষি হইতেই আসিবার সম্ভাবনা। দেশের কৃষক যতই সম্পদশালী হইবে দেশেও তত অর্থসচ্ছলতা হইবে। দেশের অভাব-অনটন দূর করিবার জন্য তখন অর্থের তত অভাব হইবে না। ড্যানিয়েল্ হ্যামিল্টন্ বলিয়াছেন—ভারতের এক-

এক জন কৃষক ক্ষুদ্র, কিন্তু ৩০কোটী কৃষককে এক করিলে তাহারা ক্ষুদ্র থাকিবে না; তাহার শক্তি উৎসাহ, তাহার সুনাম (credit) একযোগে কার্য্যে লাগাইতে পারিলে সে বৃহৎ হইবে; তখন সে মিউনিসিপ্যালিটী, জেলা-বোর্ড্ ও দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পানীয় জলের জন্য অর্থ ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। যদি অধিকসংখ্যক লোকের হিতসাধন করাই সকল প্রকার বিজ্ঞানের, শিক্ষার ও আবিষ্কারের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে দেশের প্রতিভাবান ব্যক্তিগণের অগ্রসর হইয়া আমাদিগকে সাহায্য করা উচিত।

ডেন্‌মার্কের বর্ত্তমান উন্নতি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। কিন্তু এ উন্নতি তাহারা কি করিয়া করিল? ইউরোপের নিকৃষ্টতম জমিই তাহাদের জীবিকা-উপার্জ্জনের একমাত্র অবলম্বন ছিল। তাহারা তাহাদের দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যায় নাই; কোনো সাহায্যের নিমিত্ত তাহারা তাহাদের দেশের সম্ভ্রান্ত লোকের মুখাপেক্ষা করে নাই; প্রত্যেকটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের জন্য তাহাদের গবর্ণ্‌মেণ্টের নিকট আবেদন-নিবেদন করে নাই, কিন্তু তাহারা এক অসাধারণ কাজ করিয়াছিল—তাহারা নিজেরাই নিজেদের সাহায্য করিয়াছিল। দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সাহায্যে তাহারা তাহাদের সকল সমস্যার সমাধান করিয়াছিল। আমাদিগকেও সেইরূপ পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিতে হইবে। নিজেদের গঠন নিজেদেরই করিতে হইবে। রাসেলের কথায় আমি বলিতে পারি যে, এখন আমরা চাই যে, আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা অগ্রণী, তাঁহারা প্রেম ও উৎসাহে অনুপ্রাণিত হইয়া গ্রামের ভিতরে প্রবেশ করুন ও গ্রামগুলিকে আলোর রাজ্যে পরিণত করুন। আমাদের পথে আর কোনো বাধা নাই—কেবল আছে আমাদের নিজেদের ঘনীভূত জড়তা ও আলস্য। যে-কোনো গ্রামের লোক একত্রিত হইয়া নিজেদের গ্রামকে ড্যামাস্কাসের উপত্যকার মত মনোরম করিয়া তুলিতে পারেন। কেবল আমাদের সকলকে একত্রিত হইতে হইবে, সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করিতে হইবে; তবেই আমরা একটির পর আর-একটি উন্নতি সাধন করিতে পারিব। পৃথিবীর সকল জাতির, সকল সভ্যতার যাবতীয় মহৎ কাজই কেবলমাত্র দেশের লোক একত্রিত হইয়া স্বেচ্ছায় সাধন করিয়াছেন।

ঢাকায় ও চুঁচুড়ায় অবস্থিত কৃষিক্ষেত্র ও রংপুরের গো-জনন ক্ষেত্র ব্যতীত উপস্থিত ২০টি জেলায় সরকারী কৃষি-ক্ষেত্র আছে। প্রত্যেক জেলায় এক-একটি কৃষি-ক্ষেত্র স্থাপন করাই কৃষি-বিভাগের উদ্দেশ্য; কৃষি-বিভাগের অনুমোদিত কৃষি-প্রণালী অবলম্বন করিলে কৃষিকার্য্য যে লাভজনক, তাহা দেখানো ও নানাবিধ কৃষির উন্নতি-বিষয়ে পরীক্ষা করাই প্রত্যেক জেলার কৃষি-ক্ষেত্রের উদ্দেশ্য। এই ফরিদপুর জেলায় সম্প্রতি উক্তরূপ একটা কৃষি-ক্ষেত্র স্থাপিত হইয়াছে।

আমাদের প্রধান-প্রধান কার্য্যের ফলাফল-সম্বন্ধে আপনারা যাহাতে কতকটা ধারণা করিতে পারেন, আমরা এই কৃষি-প্রদর্শনীতে সেইরূপ ভাবে যথাসম্ভব আমাদের দ্রষ্টব্য জিনিষ রাখিয়াছি। আমি আশা করি আপনারা সকলে এই প্রদর্শনী পরিদর্শন করিবেন এবং আপনাদের পরামর্শ দিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিবেন।

আমার বক্তব্য বিষয় আমি প্রায় শেষ করিয়াছি। প্রথমেই আমি আমাদের প্রতিকূল সমালোচকগণের কথা বলিয়াছি। কিন্তু এখন আমি বলিব যে, আমাদের কার্য্য সম্বন্ধে অনুকূল সমালোচকও আছেন এবং তাঁহাদের মধ্যে একজন আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়; যিনি কাহারও অনুগ্রহ বা ভ্রূকুটির ধার ধারেন না। তিনি অনেক বার আমাদের কার্য্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়াছেন এবং আমাদের কার্য্যের উপকারিতা-সম্বন্ধে প্রকাশ্যভাবে তাঁহার মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। যাঁহারা জানিতে চান তিনি কি বলিয়াছেন, আমি তাঁহাদিগকে তাঁহার বাঁকুড়া ও রাজবাড়ীর কৃষি ও শিল্প-প্রদর্শনীর অভিভাষণ পড়িতে অনুরোধ করিতেছি। উহা "প্রবাসীতে" প্রকাশিত হইয়াছিল।

আমি আশা করি আমি এখন আমাদের প্রথম তিন শ্রেণীর সমালোচক বন্ধুদের সমালোচনার উত্তর দিয়াছি। কৃষি-বিভাগ আমাদের দেশীয় কৃষি-প্রণালী ধ্বংস করিবার জন্য নিযুক্ত নহেন, কৃষকদিগের অবস্থা অনুসারে আমাদের দেশীয় প্রণালীর উন্নতি করাই কৃষিবিভাগের উদ্দেশ্য।

আমি তৃতীয় শ্রেণীর সমালোচকগণকে ধৈর্য্য ধরিবার জন্ত অনুরোধ করিতেছি ; চতুর্থ শ্রেণীর সমালোচকদিগের জন্ত আমার কোনো উত্তর নাই।

আমার বক্তব্য-বিষয় শেষ করিবার পূর্ব্বে গৃহসংলগ্ন ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কৃষিক্ষেত্রের উপকারিতা-সম্বন্ধে আমেরিকার একজন মহিলা-লিখিত পুস্তকে যে ভূমিকাটি পড়িয়াছি তাহা আপনাদিগকে শুনাইতে চাই।—

আমি একজন মঙ্গলবাদী ; আমি বিশ্বাস করি, বিশ্ব-মানবের সর্ব্বজনীন মঙ্গলের জন্ত এই পৃথিবী দশ বৎসরে হউক কিম্বা একশত বৎসরেই হউক অধিকতর উন্নত হইবেই হইবে। আমি ইহাও বিশ্বাস করি, অনন্তর মাটির জন্ত মানবজাতি অধিকতর উত্তেজিত হইবে। কারণ তাহা হইলেই প্রত্যেক ঘটনাকে আমরা হস্তগত করিয়া স্বাধীনতার সীমাকে অধিকতর বিস্তৃত করিতে সক্ষম হইব। কিন্তু জীবনের যদি পরিবর্ত্তন হয়, যদি নূতন-প্রকারের শ্রমশিল্পের বা সমাজের উত্থান হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে আমাদের পুরাতন জীবন বিফল হইয়াছে, ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, এবং সেইজন্ত উহার বিলয় অবশ্যম্ভাবী। ইহা আমি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি। ইহার দ্বারা আমি কোনো-প্রকার নৈরাশ্যের ঘোষণা করিতেছি না বরং আমি আশার ও ভবিষ্যতের উপর অসীম বিশ্বাসের ঘোষণা করিতেছি। আমি জানি মৃত্তিকাই মানবজাতির সকল দেশের মানব-জাতির সকল সমস্যার প্রতিকার করিবে, সকলকে রক্ষা করিবে। ইহা ব্যতীত আর-কোনো আশ্রয়-স্থল নাই ; কিন্তু নূতন জীবন গঠন করিবার পূর্ব্বে আমাদের ভালো করিয়া বুঝিতে হইবে যে আমাদের পুরাতন জীবন বিফল ও কেন উহা বিফল হইয়াছে। তাহার পর আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন কোন্-কোন্ মূল সূত্রের উপর নির্ভর করিবে তাহা আবিষ্কার করিতে হইবে। ইহা করিবার সময় ঈশ্বরের ইচ্ছার নিকটবর্ত্তী হইয়া মানবজাতিকে মৃত্তিকাতে নিয়োজিত করাই কি আমাদের স্বাভাবিক কার্য্য হইবে না? এবং তাহা হইলেই কি আমরা এমন-এক আধ্যাত্মিক মনুষ্যের সৃষ্টি করিব না যে ঈশ্বরের অংশ-রূপে নিজেকে মনে করিবে ও অবশেষে তাঁহারই প্রকৃত রাজ্যে প্রবেশ করিবে?*

* বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীর কৃষি ও শিল্প-প্রদর্শনীর মহাত্মা গান্ধীকর্ত্তৃক দ্বারোদ্ঘাটনের সময় পঠিত ইংরেজী প্রবন্ধের অনুবাদ।

রাগ-রাগিণীর রূপ ও আলাপ

সঙ্গীতাচার্য্য শ্রী গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

মাঙ্গলিকা—ধ্যানম্

পত্যা সহ স্থিরোপবিষ্টা বালা, সুন্দরদেহা কমলায়তাক্ষী,
স্বর্ণদ্যুতিঃ কুঙ্কুমলিপ্তদেহা, সা মাঙ্গলিকা ভৈরবস্য ভার্য্যা ॥

ভাবার্থ :—পতির সহিত স্থিরভাবে উপবিষ্টা সুন্দরদেহা পদ্মের ন্যায় আয়ত-চক্ষু স্বর্ণপ্রভা কুঙ্কুমরঞ্জিত-শরীর যিনি ভৈরবের ভার্য্যা তিনিই মাঙ্গলিকা।

সম্পূর্ণ জাতি।
ঋ—কোমল।
ম—বাদী।
ধ—সংবাদী।

মঙ্গল—আলাপ

আস্থায়ী

সা	ঋা	মা	-।	মা	মা	গা	মা	ধপা	ধা	।	।	পা	ধা	র্সা	-।	না	ধা	-।
না	•	•	•	তে	•	•	না	••	নে	•	•	তে	•	•	•	না	•	•

পা	।	মা	ধা	পা	-।	মা	গা	ঋা	গা	ঋা	-।	সা	-।
•	•	তে	•	•	•	•	রি	•	রে	•	•	না	•

সন্‌া সা ন্‌া ধ্‌া -া প্‌া ধ্‌া সা -া সা ঋা মা পা ধা -া

তা০ ০ ০ ০ ০ না ০ ০ ০ নে তে ০ ০ ০ ০

মা ধপা মা গা -া সা ঋা মা গা ঋা -া সা -া

রি ০০ ০ ০ ০ রে ০ ০ না ০ ০ ০ ০

সা সা সা সন্‌া সন্‌া ঋা -া সা -া ॥

তে রে না তে০ না০ ০ ০ তো ম

অন্তরা

পা ধা -া র্সা -া -া র্সা র্সা র্সা ঋা র্মা -া র্মা র্গা র্ঋা -া

তে ০ ০ না ০ ০ নে তে তো ০ ০ ম্‌ না ০ ০ ০

র্সর্সা -া র্সা না ধা -া পা পা ধা মা ধা -া পা

০ ০ ০ তে ০ ০ ০ না তা ০ ০ ০ ০ না

মা গা সা ঋা মা গা গা ঋা মা গা ঋা -া সা -া

রো ০ ০ ০ ০ ম্‌ না ০ ০ ০ ০ ০ না ০

সা সা সা সন্‌া সন্‌া ঋা -া সা -া ॥

তে রে না তে০ না০ ০ ০ তো ম্‌

সঞ্চারী

পা মগা মা ধপা ধা পা মা গা ঋা -া সসা -া সা ঋা মা গা ঋা সা -া

তে না০ ০ ০০ নে তে রে না ০ ০ ০০ ০ তো ০ ০ ম্‌ না ০ ০

ঋা মা পা ধপা ধা পা মা গা ঋা -া সা -া -া ।

রি ০ ০ ০০ রে না ০ ০ ০ ০ না ০ ০

আভোগ

পা ধা মা পা ধা র্সা -া র্সা -া র্সা র্সা র্ঋা না র্সা

রি ০ ০ ০ রে ০ ০ না ০ ০ তে ০ ০ ০

না ধা -া পা পা মা ধা পা মা -া গা ঋা -া সা -া

নে না ০ ০ তে ০ ০ না ০ ০ ০ ০ ০ না ০

সা সা সা সন্‌া সন্‌া ঋা -া সা -া ॥

তে রে না তে না ০ ০ তো ম্‌

ধ্রুপদ

মঙ্গল—চৌতাল

নৈন তেরে ধুমর * ভয়ে + আজ
বিন দেখে এ মন ভাবন।
কল ‡ ন পরত মোহেরী এক
পল কব হোই রে পিয়া আবন।
শুন কুহুক কোয়লকী কবধোঁ ‡
হোয় পর লগাবন।
শাহবহাদুর প্রভু তুম বহু নায়ক
কৈসে কহুঁ দিন শাবন §। শাহবহাদুর।

আস্থায়ী

০ ৩ ৪ ১´ ০ ২ ০ ৩

পগা মা । গা ঋা । সা ঋা । মা -া । -া মা । পা মগা । মা মা । ধপা ধা

নৈ০ ০ ন তে রে ০ ধু ০ ০ ম ০ য়০ ভ য়ে ০০ আ

* ধুমর=ধূম্র। + ভয়ে=হয়েছে। ‡ কল=আরাম, সুখ। ‡ কবধোঁ=কতদিনে। § শাবন=শ্রাবণ মাস।

৪ ১´ ০ ২ ০ ৩ ৪ ১´ ০

া ধা । পা ধা । র্সা না । ধা পা । পা ধা । মা ধপা । ধা পা । মা গা । মা

০ ন্ন বি ন ০ দে ০ খে এ ০ ০ ০০ ম ন ভা ০ ০

২

গা । ঋা সা ॥

ব

অন্তরা

১´ ০ ২ ০

মা ধা । ধা র্সা । র্সা র্সা । র্স -া । র্সা র্সনা । র্সা র্সা । র্সা র্ঋা । র্মা র্গা ।

ক ল ন প র ভ মে ০ ০ হে০ ০ রী এ ০ ক ০

১ ০ ৩ ৪ ১´ ০ ২

র্ঋা র্সা । সা না । র্সা না । ধা ধা } পা ধা । সা সা । না ধা ।

প ল ক ব ০ হো ০ ই য়ে ০ ০ ০ ০ ০

০ ৩ ৪ ১ ০ ২

ধা পা । ধা পা । মা পা । মা গা । মা গা । ঋা সা ॥

পি ০ ০ য়া ০ ০ আ ০ ০ ব ০ ন

সঞ্চারী

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪

র্সা র্সা । া সা । না ধা । ধপা ধা । পা মা । মা -া

শু ন ০ কু হু ক কো০ ০ য় ল কী ০

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪

পা মা । গা গা । ঋা সা । সা ঋা । মা -া । মা গা

ক ব ০ ধোঁ ০ ০ হো ০ য় ০ গ র

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪

মা ধপা । ধা র্সা । না ধা । পা ধপা । মা গা । ঋা সা ।

ল ০০ গা ০ ০ ০ ০ ০০ ০ ব ০ ন

আভোগ

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪

{ধা পা । ধা র্সা । া র্সা । র্সা -া । র্সা র্সনা । র্সা সা ।

শা ০ ০ হ ০ ব হা ০ ০ হু০ ০ র

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪

র্সা র্ঋা । র্মা র্গা । র্ঋা র্সা । র্সা না । র্সা না । ধা পা

প্র ভু তু ম ব হু না ০ ০ য় ০ ক

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪

পা ধা । মা ধপা । ধা -া । পা ধা । র্সা না । ধা পা ।

কৈ ০ সে ক র্ক ০ দি ০ ০ ন ০ ০

১´ ০ ২

মা . গা । মা গা । ঋা সা ॥

শা ০ ০ ব ০ ন

বঙ্গালী-ধ্যানম্

কক্ষানিবেশিতকরণ্ডধরায়তাক্ষী, ভাস্বরত্রিশূলপরিমণ্ডিতবামহস্তা।
ভস্মোজ্জ্বলা নিবিড়বদ্ধজটাকলাপা, বঙ্গালিকেত্যাভিহিতা তরুণার্কবর্ণা ॥

ভাবার্থ— তরুণারুণবর্ণা, বিশালনেত্রা, জটাকলাপমণ্ডিতা ভস্মোজ্জ্বলদেহা বঙ্গালী কক্ষে পুষ্পপাত্র বহন করিয়া বামহস্তে ভাস্বর ত্রিশূল ধারণ করিয়াছেন।

ঔড়ব জাতি।
ম ও নি—বিবাদী।
গ—বাদী।
প—সংবাদী।
ঋ ও ধ কোমল।

বঙ্গালী—আলাপ

আস্থায়ী

সা ঋা গা -। গা পা দা পা -। পা গা -।
তা ০ ০ ০ না তে ০ ০ ০ না ০ ০

ঋা -। গা ঋা -। সা -। সা দ্া -। প্া -। প্া দ্া সা -। সা
০ ০ তো ০ ম্ না ০ তে ০ ০ ০ ০ নে ০ ০ ০ রি

সা ঋা গা ঋা -। সা -। পা দা পা গা_ঋা -। সা - সা সা সা
তা ০ ০ ০ ০ ০ ০ না ০ ০ ০ ০ ০ না ০ তে রে না

সা দ্া সা ঋা -। সা -।
তে না ০ তে ০ ০ ম

অন্তরা

গা পা দা র্সা । র্সা র্সা র্সা র্সা । । র্সা ঋা র্গা র্ঋা র্সা ।
তো ০ ০ ০ ম্ না তে রে না ০ ০ নে তে তে না ০ ০

র্সা দা -। পা পা দা পা গা । গা পা দা র্ঋা র্সা দা -।
রি ০ ০ ০ রে ০ না ০ ০ তে ০ ০ ০ রে ০ ০

পা পা গা ঋা গা ঋা -। সা সা সা সা সা দ্া সা
না তে ০ ০ ০ না ০ ০ তে রে না তে না ০

ঋা -। সা -। ॥
তো ০ ০ ম্

সঞ্চারী

দা পা গা দা -। পা পা_গা ঋা -। সা -।
তে ০ ০ ০ ০ না তো ০ ০ ম না ০

দ্া সা ঋা গা -। গা পা দা র্সা_দা -। দা পা -।
রি ০ রে ০ ০ না তা ০ ০ ০ ০ ০ না ০

গা পা -। দা পা গা -। ঋা -। সা -।।
তে ০ ০ ০ না ০ ০ ০ ০ না ০

আভোগ

দা দা র্সা র্সা -া র্সা র্সা -া র্সা র্ঋা র্গা র্পা র্গা র্ঋা -া
তে রে নে রি ০ রে না ০ আ না নে তে না ০ ০

র্সা -া র্সা -া দা র্সা দা -া পা গা পা দা -া র্সা
নে ০ তে ০ ০ ০ ০ ০ না রি ০ ০ ০ ০

র্ঋা র্গা র্ঋা র্সা দা -া পা গা পা গা ঋা -া সা -া
রে ০ না ০ ০ ০ নে তে ০ ০ ০ ০ না ০

সা সা সা সা দা সা ঋা -া সা -া ॥
তে রে না তে না ০ তো ০ ০ ম

ধ্রুপদ

বঙ্গালী—চৌতাল

সুখ বিসরাই মোরিরে না আয়ে
আলি মানো কৌন ঔগুণবা।
হর দরশনকী লালসা মনমে
নিশ দিন গনত সগুণবা*।
কহা করু রস নহি মেরো
অব দুখ দে গায়ো দুনবা।
শ্যামদাস বাসো শ্যাম বিলব
রহে ইত ব্রজকর গয়ো গুনবা॥

আস্থায়ী　　　　শ্যামদাস

১　　০　　২　　০　　৩　　৪
গা গা । ঋা গা । ঋা সা । সাঃ সঃ । দা সা । ঋা সা I
সু খ ০ বি ০ স রা ০ ই মো রি রে

১　　০　　২　　০　　৩　　৪
সা ঋা । গা পা । দা পা । র্সা -া । র্সা দা । দা পা I
না ০ ০ আ ০ য়ে আ ০ লি ০ মা নো

১　　০　　২　　০　　৩　　৪
দা -া । পা গা । দা পা । পা গা । ঋা গা । ঋা সা II
কৌ ০ ন ঔ ০ ০ গু ণ ০ বা ০ ০

* সগুণবা—সগুণওআ এইরূপ উচ্চারণ, অর্থাৎ অন্ত্যস্থ 'ব'এর উচ্চারণ হইবে। 'ঔগুণবা' 'গুনবা' 'বাসো' ইত্যাদি সমস্ত অন্ত্যস্থ 'ব'এর ন্যায় উচ্চারণ হইবে।

অন্তরা

১ ০ ২ ০ ৩ ৪
দা দা । পা দা । র্সা র্স । ঋ্লা র্সা । -া র্সা । -া -া
হ র ০ দ র শ ন ০ ০ কী ০ ০

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
র্সা -া । দা র্সা । ঋ্লা র্গা । ঋ্লা র্সা । দা র্সা । দা পা I
লা ০ ল সা ০ ০ ম ন ০ মে ০ ০

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
দা দা । -া দা । দা দা । র্সা -া । দা দা । দা পা I
নি শ ০ দি ০ ন গ ০ • ন ০ ত

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
পা পা । দা দা । দা পা । পা গা । গা ঋা । ঋা সা I
স ঙ্গ ০ প ০ ০ বা ০ ০ ০ ০ ০

সঞ্চারী

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
দা দা । -া পা । -া পা । পা গা । পা গা । ঋা সা I
ক হা ০ ক ০ রু ব স ০ না ০ হি

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
সা ঋা । গা পা । দা পা । পা গা । পা গা । ঋা সা I
মে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ রো ০ ০

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
সা সা । দা সা । ঋা সা । সা ঋা । গা পা । গা ঋা I
অ ব ০ ০ ০ ০ দু খ ০ ০ দে ০

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
সা ঋা । গা পা । দা পা । পা গা । ঋা সা । -া -া I
গ ০ যো ০ ০ ০ দু ন ০ বা ০ ০

আভোগ

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
গা পা । দা র্সা । -া র্সা । ঋ্লা র্সা । -া -া । র্সা -া I
ভা ০ ম দা ০ স বা ০ ০ ০ সো ০

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
সা ঋ্লা । র্গা র্পা । র্গা ঋ্লা । র্গা -া । ঋ্লা র্গা । ঋ্লা র্সা I
ভা ০ ম বি ল ম্ব ০ ০ ০ ০ হে

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
র্সা র্সা । দা র্সা । দা পা । দা পা । গা -া । ঋা গা I
ই ত ০ ০ ব্র জ ক র ০ ০ ০ ০

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
পা দা । র্সা দা । দা পা । দা পগা । পা গা । ঋা সা II
গ যো ০ ০ ০ ০ ভু ন০ ০ বা ০ ০

কলিঙ্গা—ধ্যানম্

বিনোদয়ন্তী কলিঙ্গা সুকেশী
প্রেমরসানাং স্বয়দেহযুক্তা,
শ্রবণে চারুসুরবৃক্ষপুষ্পং
ভৈরব-ভার্য্যা কথিতা মুনীন্দ্রৈঃ ।

ভাবার্থ :—যাঁহার কর্ণে সুরবৃক্ষপুষ্প শোভিত, যিনি প্রেমরসের স্বয়মূর্ত্তি, সুকেশা সেই আনন্দদায়িনী ভৈরবভার্য্যা কলিঙ্গা নামে বিহিতা।

কলিঙ্গড়া—আলাপ

সম্পূর্ণ জাতি
ঋ ও ধ কোমল
গ—বাদী
প—সংবাদী

আস্থায়ী

সন্‌া সা গা -া মা পা দা -া পা -া া মা পা গা মা গা ঋা -া সা
তা0 0 না 0 নে তে না 0 0 0 0 তো 0 0 0 ম্ না 0 0
ন্‌া -া সা গা মা পা দা -া র্সা না -া দা পা মা গা মা দা -া পা
তে 0 0 না 0 0 0 0 তো 0 0 0 ম্ না 0 0 0 0 0
মা গা গমা পদা গা মা গা ঋা সা -া -া সা সা সা
তে 0 রি0 00 0 0 0 রো না 0 0 তে রে না
সন্‌া সন্‌া ঋা -া সা -া ।
তে0 না0 ঋা -া তো ম্

অন্তরা

দা দা না র্সা -া র্ঋা না -া র্সা র্সা -া র্সা র্গা র্পা র্মা
তে রে না 0 0 তা 0 0 0 না 0 তে 0 0 সা
র্গা র্ঋা -া র্সা -া না র্ঋা র্সা র্ঋা না র্সা না দা -া পা
0 0 0 না 0 তো 0 0 0 0 ম্ না 0 0 0
মা দা -া পা মা গা ঋা -া সা -া সা সা সা সন্‌া সন্‌া
তে 0 0 না 0 0 0 0 0 0 তে রে না তে না
ঋা -া সা -া ॥
0 0 তো ম্

সঞ্চারী

দা দা পা মা পা গা -া গা মা দা -া পা মা গা ঋা সা -া
তে রে না 0 0 0 0 তা 0 0 0 না নে তে রে 0 0
ন্‌া সা গা মা পা দা পা -া মা গা ঋা -া সা -া ।
না 0 0 0 তে 0 0 0 না 0 0 0 0 0

আভোগ

মা দা না র্সা -া র্ঋা না র্সা -া দা না র্সা র্গা
তে 0 রো 0 ম্ না 0 0 0 তে রে না 0
র্ঋা -া র্সা নর্সা না দা -া পা -া দা দা পা -া
0 0 0 তো 0 0 0 ম্ না 0 তে রে না 0
গা মা গা ঋা সা -া সা সা সা সন্‌া সন্‌া
তা 0 নে না 0 0 তে রে না তে0 না
ঋা -া সা -া ॥
0 0 তো ম্

ধ্রুপদ

কলিঙ্গড়া—চৌতাল

ঐ সে কৈসে বসেগী প্রীত
প্রীতকী বিলত নাহি মন লায়।
কবহুঁক দেখত বংশীবট পৈ
বার বার মিডরায়।
বিন দেখে কলম পরত পল
সুন্দর শ্যাম লোভায়।
প্রেমরঙ্গ তন-মন-ধন বারো
বিন দেখে রহো ন জায়॥

প্রেমরঙ্গ।

আস্থায়ী

০ ৩ ৪ ১´ ০ ২
{ দমা পা । গা মা । পমা পা । পা দা । সা না । দা পা } ।
ঐ০ ০ সে কৈ ০০ সে ব সে ০ গী ০ ০

০ ৩ ৪ ১´ ০ ২ ০ ৩
দা পমা । পা মা । গা -া । গা পা । মা গা । ঋা সা । ন্‌া সা । গা মা ।
প্রী ০০ ০ ত ০ ০ প্রী ০ ত কী ০ ০ বি ০ ল ত

০ ১´ ০ ২
পা দা । না না । র্সা না । দা পা ॥
না হি ম ন ০ লা ০ য়

অন্তরা

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪ ১´ ০
{ দা দা । া না । া না । র্সা -া । া র্ঋ না । র্সা র্সা । না র্সা । র্গা র্ঋা ।
ক ব ০ হুঁ ০ ক দে ০ ০ খ ০ ০ ত বং ০ ০ শী

২ ০ ৩ ৪ ১´ ০ ২
র্সনা র্সা । র্ঋা র্সা । নর্সা না । দা পা } দা পা । মা গা । মা পা ।
০০ ০ ব ট ০০ পৈ ০ ০ বা ০ ০ ০ ০ র

০ ৩ ৪ ১´ ০ ২
মা দা । না -া । র্সা র্সা । র্ঋা র্সনা । র্সা না । দা পা ॥
বা ০ ০ ০ ০ র মি ড০ ০ রা ০ য়

সঞ্চারী

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪ ১´ ০
মা মা । গা মা । পা পা । দা দা -া পা । মা পা । পা দা । ন না ।
বি ন ০ দে ০ খে ক ল ০ ন ০ ০ প ০ ০ র

২ ০ ৩ ৪
র্সা র্সা । না র্ঋনা । র্সা না । দা পা ।
০ ত প ০০ ০ ল ০ ০

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
দা দা । দা পা । -া মা । পা -া । মা পা । ঋা সা ॥
সু ন্দ র জ্যো ০ ম লো ০ ০ ভা ০ য়

ভাগ

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
মা দা । দা না । র্সা র্সা । র্ঋা র্সা । না র্সা । র্সা র্সা ।
প্রে ০ ম র ০ ঙ্গ ত ন ০ ম ০ ন
১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
দা না । সা র্গা । র্ঋা র্সা । র্ঋা না । র্সা না । দা পা ।
ধ ন ০ ০ ০ ০ বা ০ ০ রো ০ ০
১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
দা পা । দা মা । পা গা । মা দা । -া না । র্সা -া
বি ন ০ দে ০ খে র ০ ০ হো ০ ০
১´ ০ ২
র্ঋা না । র্সা না । দা পা II
ন ০ ০ জা ০ য়

(ক্রমশঃ)

তুর্কী কবির জন্মোৎসব

আবদুল হক হামীদ বে ভারতের মুসলমান-সমাজে নেহাৎ অপরিচিত নহেন। মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে তিনি তুরস্কের রাজনৈতিক প্রতিনিধি-হিসাবে কয়েক বৎসর লণ্ডনে অবস্থান করিয়াছিলেন। সেই সময় তাঁহার অনন্য-সুলভ রাজনীতি-জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া ইউরোপের পলিতদন্ত, পলিত-কেশ বৃদ্ধদিগকেও স্তম্ভিত হইতে হইত। কিন্তু হামীদ বের প্রতিভা রাজনীতি অপেক্ষা কবিত্বেই অধিক স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছে। সম্প্রতি তিনি ৭৫ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন। এই উপলক্ষে তুরস্কের মনীষীরা শান শওকতের সহিত কবি-সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন। সুলতান আবদুল আজীজ প্রতিষ্ঠিত মকতব-ই-সুলতানী নামক সুপ্রসিদ্ধ সভা গৃহে এই মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সকল শ্রেণীর নেতৃ-স্থানীয় ব্যক্তিরা এই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। সভা-গৃহে তিলধারণের জায়গা ছিল না। ইস্‌মিত পাষার মতন উচ্চ রাজকর্ম্মচারীরাও উপস্থিত ছিলেন। আঙ্গোরা-সরকারের অনুমতিক্রমে তুর্কী সৈন্যদল জাতীয় কবির প্রতি সামরিক সম্মান প্রদর্শন করিয়াছে।

কবিবর আবদুল হামিদ তুরস্কের কাব্য সাহিত্যে এক নূতন অধ্যায়ের অবতারণা করিয়াছেন। পাশ্চাত্য কবিদের বিশেষতঃ ফরাসী সাহিত্যের প্রভাব তাঁহার উপর দেদীপ্যমান। ইউরোপের বিভিন্ন ভাষার মৃত্য-দোদুল ছন্দ তুরস্কে আমদানি করিয়া তিনি তুর্কী সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছেন। তিনি কুড়ি বৎসর বয়সে কাব্য-জগতে প্রবেশ করেন। ৫৫ বৎসর যাবৎ তিনি তুরস্কের সাহিত্য-রসিকদের আত্মার খোরাক জোগাইয়া আসিতেছেন। এখনো তাঁহার পুঁজি শেষ হয় নাই। এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া বিশ্ববাসীকে তাঁহার সম্পদ্ বিলাইতেছেন। সম্প্রতি 'ওকিত' পত্রিকায় কবি তাঁহার 'জীবনস্মৃতি' লিখিয়াছেন। ভারতবর্ষের প্রতি তিনি খুবই সহানুভূতি-সম্পন্ন। "Yabanji Dostlor" নামক পুস্তকে তাঁহার ভারতপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার 'দুখতার-ই হিন্দু' নামক একখানি নাটক তুরস্কে বেশ সমাদৃত। হামীদ-বে যখন কন্‌সাল জেনারেল হইয়া বোম্বে আসিতেছিলেন তখনই এই পুস্তক লিখিবার বাসনা তাঁহার অন্তরে জাগ্রত হয়। তাঁহার 'তারীখ' ও 'মকবির' নামক পুস্তক-দু'খানা আবালবৃদ্ধ-বনিতার আদরের বস্তু।

কবি আবদুল হক হামীদ বে তুরস্কের এক উচ্চ আলেম বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার পিতামহ স্বনামখ্যাত আবদুল হক মোল্লা সুলতান দ্বিতীয় মহমুদের উপদেষ্টা ও চিকিৎসক ছিলেন। মুস্‌লিম-জাহানে ডাঃ ইকবাল ব্যতীত আর কোনো কবি নাই যাহার সহিত হামীদ বের তুলনা হইতে পারে। একবার গুজব রটিয়াছিল হামীদ-বে নোবেল প্রাইজ পাইবেন।

—যাহার

[এই বিভাগে চিকিৎসা ও আইন-সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর ছাড়া সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্ন ছাপা হইবে। প্রশ্ন ও উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। একই প্রশ্নের উত্তর বহুজনে দিলে যাঁহার উত্তর আমাদের বিবেচনায় সর্ব্বোত্তম হইবে তাহাই ছাপা হইবে। যাঁহাদের নামপ্রকাশে আপত্তি থাকিবে তাঁহারা লিখিয়া জানাইবেন। অনামা প্রশ্নোত্তর ছাপা হইবে না। একটি প্রশ্ন বা একটি উত্তর কাগজের এক-পিঠে কালীতে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। একই কাগজে একাধিক প্রশ্ন বা উত্তর লিখিয়া পাঠাইলে তাহা প্রকাশ করা হইবে না। জিজ্ঞাসা ও মীমাংসা করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিশ্বকোষ বা এন্‌সাইক্লোপিডিয়ার অভাব পূরণ করা সাময়িক পত্রিকার সাধ্যাতীত। যাহাতে সাধারণের সন্দেহ-নিরসনের দিগ্‌দর্শন হয় সেই উদ্দেশ্য লইয়া এই বিভাগের প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা এরূপ হওয়া উচিত; যাহার মীমাংসায় বহু লোকের উপকার হওয়া সম্ভব, কেবল ব্যক্তিগত কৌতুক কৌতূহল বা সুবিধার জন্য কিছু জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। প্রশ্নগুলির মীমাংসা পাঠাইবার সময় যাহাতে তাহা মনগড়া বা আন্দাজী না হইয়া যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত হয় সে-বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। প্রশ্ন এবং মীমাংসা দুইয়ের যাথার্থ্য-সম্বন্ধে আমরা কোনোরূপ অঙ্গীকার করিতে পারি না। কোনো বিশেষ বিষয় লইয়া ক্রমাগত বাদ-প্রতিবাদ ছাপিবার স্থান আমাদের নাই। কোনো জিজ্ঞাসা বা মীমাংসা ছাপা বা না-ছাপা সম্পূর্ণ আমাদের ইচ্ছাধীন—তাহার সম্বন্ধে লিখিত বা বাচনিক কোনোরূপ কৈফিয়ৎ আমরা দিতে পারিব না। নূতন বৎসর হইতে বেতালের বৈঠকের প্রশ্নগুলির নূতন করিয়া সংখ্যাগণনা আরম্ভ হয়। সুতরাং যাঁহারা মীমাংসা পাঠাইবেন তাঁহারা কোন্ বৎসরের কত-সংখ্যক প্রশ্নের মীমাংসা পাঠাইতেছেন তাহার উল্লেখ করিবেন।]

জিজ্ঞাসা

(১৪)

মেয়েদের কি ব'লে সম্বোধন করা যেতে পারে

পুরুষদের নামের পেছনে "বাবু" ইত্যাদি বলে' সম্বোধন করা হ'য়ে থাকে, কিন্তু মেয়েদের সম্বোধন করবার বেলা মুস্কিল বাধে। অনেকে মিস্ রায়, কি মিসেস্ বসু ব'লে থাকেন, কিন্তু সে হচ্ছে বিলিতি ফ্যাশান। ঔপন্যাসিক শ্রী হেমেন্দ্র রায় তাঁর 'যেনোজলে' নায়ক রঞ্জনের মুখ দিয়ে নায়িকা পূর্ণিমাকে সম্বোধন করিয়েছেন 'পূর্ণিমা দেবী' বলে' কিন্তু তা কেমন যেন খাপছাড়া ঠেকে; কারণ বারে-বারে পুরোনাম (অর্থাৎ নামের পেছনে দেবী যোগ ক'রে) ধ'রে ডাকা ভালো শোনায় না আর বলাও যায় না। প্রবাসীর পাঠকরা এর একটা সুমীমাংসা ক'রে দেবেন ?

শ্রী জ্যোৎস্নানাথ চন্দ

(১৫)

বজ্রযোগিনী

'হিন্দু ও বৌদ্ধে তফাৎ' নামক প্রবন্ধে পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন "আমিই বজ্রযোগিনী হইয়াছি, আমিই লোকেশ্বর হইয়াছি, আমিই প্রজ্ঞাপারমিতা হইয়াছি বলিয়া পূজা করেন।"

পূর্ব্ব বঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ বিক্রমপুর পরগণায় বজ্রযোগিনী-নামে অতি প্রাচীন একটি সুপ্রসিদ্ধ গণ্ডগ্রাম আছে। বৌদ্ধধর্ম্মোক্ত বজ্রযোগিনী নামের সহিত উহার কোনো ঐতিহাসিক সম্বন্ধ আছে কি ?

কেহ-কেহ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের জন্মভূমিও বজ্রযোগিনী বলিয়াই নির্দ্দেশ করেন। ইহার কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে কি ?

শ্রী রাজেন্দ্রকুমার বসু

(১৬)

নিমদুধ

কোনো-কোনো নিমগাছ হইতে স্বভাবতঃ একরূপ শ্বেতবর্ণ ফেনময় রস নির্গত হয় এবং তাহাই নিম-দুধ নামে কথিত। খেজুর-গাছের রস যেরূপ-পরিমাণে বাহির করা হয়, নিমদুধ তাহা অপেক্ষা বেগে ও শব্দের সহিত নিঃসৃত হয়। উক্ত প্রাকৃতিক ক্রিয়া কোন্ বৈজ্ঞানিক কারণে সাধিত হয় ?

নিমগাছ মানবের পরম উপকারী বস্তু সন্দেহ নাই, কিন্তু নিম-দুধ হইতে আমাদের কি-কি উপকার সাধিত হইতে পারে এবং উহার রক্ষা ও ব্যবহার-প্রণালী কিরূপ ? যে-গাছ উক্ত-প্রকারে রস ত্যাগ করে তাহার পরিণাম কিরূপ হয় ?

শ্রী ধরণীধর শাখা-ঠাকুর

—

মীমাংসা

(২)

বিষ্ণুপুরে মারাঠাদের পরাজয়

মারাঠা সেনাপতি ভাস্কর-পণ্ডিতের মল্লভূমির বিষ্ণুপুর রাজ্য আক্রমণ করিয়া পরাজিত ও তাড়িত হওয়ার কথা যে-সকল পুস্তকে আছে তাহার ভিত্তি বোধ হয় বর্গী-হাঙ্গামার কিছু পরে রচিত এবং এখনও বিষ্ণুপুরের বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক কচিৎ গীত বর্গীর "মদনমোহনের বন্দনা" নামক গ্রাম্য গাথাটি। এই গাথাটির সবটি ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে না পারিলেও, ঐ গাথার উক্ত ভাস্কর পণ্ডিতের নেতৃত্বাধীনে (১৭৪২ খৃঃ অব্দে) মারাঠাদের (বর্গী) বিষ্ণুপুরে আগমনের কথাটি ঐতিহাসিক সত্য।

"বন্দনা"-কারের মতে মারাঠারা মল্লরাজার দ্বারা পরাজিত ও তাড়িত হন না—তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেন স্বয়ং বর্গীর মদনমোহন জীউ "দলমাদল"-নামক কামান দাগিয়া। এই বিবরণটি ঐতিহাসিক না হইলেও আমরা তৎকালীন ঐতিহাসিক ঘটনাবলী আলোচনা করিলে এই বুঝিতে পারি যে, নবাব আলিবর্দ্দী কর্ত্তৃক কাটোয়ার নিকট পরাজিত হইয়া পলায়নের সময়ে মারাঠারা ভাস্কর পণ্ডিতের নেতৃত্বাধীনে (১৭৪২খৃঃ অব্দে) বিষ্ণুপুরে আসিয়া পড়ে এবং যাইবার পথে হয়ত কিছু লুটপাটও করিয়াছিল, কিন্তু বিষ্ণুপুর আক্রমণ করিবার সাহস হয়ত তাহাদের

পূর্ব্ব হইতে ছিল না এবং তাহারা পলায়মান বলিয়া হয়ত খুব শীঘ্র বিষ্ণুপুর পরিত্যাগ করিয়া চন্দ্রকোণার জঙ্গল হইয়া মেদিনীপুরে উঠে। এই অতি সত্বর বিষ্ণুপুর পরিত্যাগ করার নিমিত্তই বোধ হয় অতি দুর্দ্ধর্ষ মারাঠাদের পরাজয়, সামান্য মানবকর্ত্তৃক সংসাধিত করিতে সাহস না করিয়া "মদনমোহন বন্দনা"-কার ৺ মদনমোহন দেবকেই মারাঠাদলের খাড়া করিয়া ভক্ত (রাজা গোপাল সিংহ) ও ভগবানের মহিমা বাড়াইবার প্রয়াস পাইয়াছেন মাত্র।

শ্রী গঙ্গাগোবিন্দ রায়

(৪)

কলাগাছের ব্যারাম

কলাগাছের গোড়ায় কেঁচো, ঘুরেপোকা ইত্যাদি বাস করে। এরাই কলাগাছের যে-অংশে হ'তে থোড় উৎপন্ন হয় সেই অংশ ভেদ ক'রে যখন উপরে উঠ্‌তে থাকে, তখনই হঠাৎ গাছ হলদে রং ধ'রে ক্রমে ক্রমে ম'রে যায়। বিষ-কাঁটালি গাছ থেঁতো ক'রে কলাগাছের গোড়ায় দিয়ে তা'তে জল দিলে, ঐ জল পেয়ে পোকাগুলি ম'রে যায় বা উপরে উ'ঠে পড়ে। এতে কলাগাছের কোনো ক্ষতি হয় না এবং ব্যারামের হাত হ'তেও নিষ্কৃতি পায়।

শ্রী ভবানীচরণ দত্ত

(৮)

বাঙ্গালাদেশে বিবাহ

হিন্দু-শাস্ত্রমতে বিবাহ অতি পবিত্র বন্ধন। সেই পবিত্র বন্ধন শুভ মাসে ও শুভ মুহূর্ত্তেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। যাহাতে কোনো ভবিষ্যৎ অমঙ্গল সূচিত হয়, তাহা পরিবর্জ্জন করিয়া বিবাহকার্য্য অনুষ্ঠিত হয়— ইহাই হিন্দুশাস্ত্রসম্মত। এই মতের বশবর্ত্তী হইয়া বঙ্গীয় হিন্দুগণ ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক, পৌষ ও চৈত্র—এই কয় মাসে বিবাহ-কার্য্য হইতে বিরত থাকেন। তাহার কারণ জ্যোতিষতত্ত্বেই স্পষ্টরূপে বর্ণিত আছে। উক্ত গ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ভাদ্রমাসে বিবাহ হইলে কন্যা বেশ্যা, আশ্বিনে মৃত্যু, কার্ত্তিকে রোগযুক্তা, পৌষে আচারভ্রষ্টা ও স্বামি-বিয়োগিনী, এবং চৈত্রে কন্যা মদোন্মত্তা হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন মাসে বিবাহ হইলে কন্যা পতিব্রতা ও ঐশ্বর্য্যযুক্তা হয়। কিন্তু অরক্ষণীয়া কন্যার বেলায় শুধু পৌষ ও চৈত্র মাস ত্যাগ করিয়া অন্যমাসে বিবাহ দেওয়ার বিধান আছে। প্রমাণ—

"বেশ্যা ভাদ্রপদে ইষে চ মরণং রোগান্বিতা কার্ত্তিকে।
পৌষে প্রেতবতী বিয়োগবহুলা চৈত্রে মদোন্মাদিনী।
অন্যেষেব বিবাহিতা পতিরতা নারী সমৃদ্ধা ভবেৎ।
অরক্ষণীয়াবিষয়ে তু—বশমাসাঃ প্রশস্তস্তে
চৈত্রপৌষবিবর্জ্জিতাঃ।"
ইতি জ্যোতিষবচনার্থঃ।

উল্লিখিত কারণ-পরম্পরায় বাঙ্গালাদেশে ভাদ্রাদি মাসে বিবাহ-প্রথা প্রচলিত নাই। কাশী-অঞ্চলেও এই নিয়মে বিবাহ হইয়া থাকে। বিহার উড়িষ্যায় ও আসামে কেবল পৌষ ও চৈত্র মাস বাদ দিয়া বিবাহ হয়। তদ্ভিন্ন দেশের সঠিক বিবরণ আমার জানা নাই।

শ্রী রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

(৯)

চাউল-রক্ষণ

নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিলে চাউল বহুদিন পর্য্যন্ত টাট্‌কা থাকে। যথা—

১। যে-পাত্রে চাউল রাখিবেন তাহা ভালোরূপে শুকাইয়া পরে চাউল রাখিবেন। ঐ চাউলের উপর ১ ইঞ্চি পরিমাণ ছাই ছড়াইয়া রাখিলে পোকা ধরার আর আশঙ্কা থাকে না। তাহার কারণ এই যে, কোনো পোকারই শ্বাস লইবার উপযোগী নাক নাই। মাত্র দেহের দুই পার্শ্বে ছোটো-ছোটো কতকগুলি ছিদ্র আছে। উক্ত ছিদ্র দ্বারাই উহারা শ্বাসের কার্য্য নির্ব্বাহ করে। ছাই বা অন্য-কোনো গুঁড়া দ্বারা ঐ ছিদ্র-মুখ বন্ধ হইলেই বায়ুচলাচলের পথ রুদ্ধ হয়। ফলে পোকা মরিয়া যায়।

২। চা-খড়ির গুঁড়া বা চুণ মিশাইয়া রাখিলেও চাউলে পোকা ধরিতে বা কোনো গন্ধ হইতে পারে না।

৩। মাঝে-মাঝে চাউল রৌদ্রে দিয়া শুকাইয়া লওয়া ভালো। তাহাতে দূষিত বীজাণু নষ্ট হইয়া চাউলের গন্ধ নিবারিত হয়।

৪। চাউল ভালোরূপে ঝাড়িয়া উহা মাঝে-মাঝে নিমপাতা দিয়া (প্রথমে পাত্রের তলাতেও কিছু নিমপাতা দিতে হইবে; তাহার উপর চাউল রাখিবেন) কোনো পাত্রে বায়ুশূন্য অবস্থায় অর্থাৎ যাহাতে বাহিরের বায়ুর সঙ্গে কোনোরূপ সংস্রব না থাকে, এমনভাবে রাখিয়া দিবেন। তাহা হইলে সহজে আর পোকা আক্রমণ করিতে পারিবে না।

৫। চাউলের সঙ্গে রশুন রাখিলেও পোকা ধরিতে পারিবে না।

৬। চাউলের সহিত চুণের জল, ফট্‌কিরির জল কর্পূরের জল হরিদ্রার জল মিশ্রিত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া রাখিয়া দিলে পোকা ধরার ভয় থাকে না।

শ্রী রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

চাউল-রক্ষণ

বাংলা পল্লীর অনেক গৃহস্থঘরেই কিছু-কিছু পুরাতন চাল সযত্নে রক্ষিত হইয়া থাকে। অনুসন্ধান করিলে এই অন্ন-সমস্যার দিনেও পল্লীগ্রামে ৪।৫ বৎসর এমন কি ততোধিক বৎসরেরও পুরাতন চালের অভাব হয় না।

তাঁদের চাল রক্ষা প্রণালী খুব কঠিন নহে। তাঁরা চালগুলিতে পর-পর কয়েক বার রোদ লাগাইয়া উত্তমরূপে শুকাইয়া লন ও সঙ্গে-সঙ্গে যে-হাঁড়িতে বা কলসিতে (মাটির পাত্রই সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে) চাল রক্ষা করিবেন তাহাও রোদে দেন। চাল বেশী শুষ্ক হইলে তাহা ঝাড়িয়া ঐসমস্ত পাত্রে ভর্ত্তি করেন। হাঁড়িতে ভরিবার সময় হাঁড়িটিকে বারবার ঝাঁকি দিতে হয়। তাহাতে হাঁড়িতে কোনোরূপ ফাঁকা জায়গা থাকিতে পায় না। পাত্রের গলা পর্য্যন্ত ভর্ত্তি হইলে মুখে কিছু শুষ্ক ছাই ঢালিয়া মুছি বা কড়া চাপা দিয়া তদুপরি কাদার লেপ দিয়া আঁটিয়া দেন। পাত্রটি স্যাঁৎসেঁতে জায়গায় রাখিতে নাই, আর মাসে দুএকদিন করিয়া রোদে দিতে হয়। আবার দুএক মাস বাদে হাঁড়ির মুখ খুলিয়া চালে পূর্ব্বোক্তরূপে রোদ লাগাইয়া তুলিতে হয়। ইহাতে চালে কিছুতেই পোকা ধরিতে পারে না, এবং খুব বেশী দিন না হইলে অন্নস্বাদও হয় না। কেহ-কেহ চালের পরিবর্ত্তে ধান্য রক্ষা করিয়া থাকেন এবং আবশ্যকানুযায়ী চাল তৈয়ার করাইয়া লন। ইহাতে ধান্য যত পুরাতনই হউক না কেন চালে মোটেই অন্নস্বাদ হয় না।

যাঁহারা রাখী কারবার করেন তাঁহাদের নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করাই শ্রেয়।—

১। গোলা-ঘর এরূপভাবে প্রস্তুত করিবে যেন বাহির হইতে পোকা আসিয়া শস্যে প্রবেশ করিতে না পারে; এবং এরূপ জায়গায় প্রস্তুত করিবে যেখানে যথেষ্ট-পরিমাণে রোদ লাগে।

২। চাল গোলাজাত করিবার পূর্ব্বে উপর্য্যুপরি ৩।৪ দিন খুব শক্ত রোদ লাগাইয়া উত্তমরূপে ঝাড়িয়া কুঁড়া ছাড়াইয়া লইবে।

৩। গোলায় তুলিবার পূর্ব্বে গোলাঘর বেশ পরিষ্কার করিয়া লইবে। কীটদষ্ট কোনো শস্য বা যাহাতে কীট লুকাইয়া থাকিতে পারে, এমন কোনো শস্য গোলায় থাকিলে তাহা বাহির করিয়া ফেলিবে।

৪। পোকা-ধরা শস্য পোকা নষ্ট না করিয়া কদাচ গোলায় রাখিবে না।

৫। গোলা হইতে চাল মাঝে-মাঝে নামাইয়া রোদে দিবে।

৬। চালের সহিত চূণ, সফেদা ইত্যাদি মিশাইয়া রাখিলে পোকা ধরিতে পারে না।

৭। গোলাঘরে চাল বা অন্যান্য শস্য ঢালাই করিয়া না রাখিয়া বিভিন্ন পাত্রে রক্ষা করিয়া পাত্রের মুখে ২।৩ ইঞ্চি পুরু করিয়া ছাই ছড়াইয়া রাখিলে আরো নিরাপদ হওয়া যায়। শুষ্ক ছাইয়ের ভিতর কোনো পোকারই ঢুকিবার সাধ্য নাই, কারণ সূক্ষ্মকণা ছাইয়ের ভিতর ঢুকিতে গেলে উহাদের গাত্রস্থিত ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র শ্বাস-যন্ত্রগুলির মুখ বন্ধ হইয়া যায়।

পোকা-ধরা শস্যের পোকা নষ্ট করিবার কয়েকটি প্রণালী নিম্নে লিখিত হইল।—

১। হাইড্রোসিয়ানিক্ বা প্রসিক্ এসিড্ (Hydrocyanic or Prussic Acid) নামে একপ্রকার অতিশয় উগ্র বিষ আছে, ইহার বাষ্প শরীরের ভিতর প্রবেশ করিলে জন্তু মাত্রেই মরিয়া যায়। একটি চারিদিক্ আঁটা ঘরে শস্য ঢালিয়া অতি সতর্কতার সহিত উহার ভিতর সালফিউরিক্ এসিড্ (Sulphuric Acid) ও পোটাসিয়াম্ সিয়ানাইড্ (Potassium Cyanide) নামক দুইটি রাসায়নিক পদার্থ একত্রে রাখিয়া বাহিরে আসিতে হয়। এই দুই বস্তুর রাসায়নিক ক্রিয়ায় হাইড্রোসিয়ানিক্ অ্যাসিড্-গ্যাস্ উৎপন্ন হইয়া ঘরময় ছড়াইয়া পড়ে ও সমস্ত পোকা নষ্ট হইয়া যায়।

২। কারবন্ বাইসাল্ফাইড্ (Carbon Bisulphide) নামে একপ্রকার বিষাক্ত আরক আছে, খোলা থাকিলে ইহা বাষ্পাকারে উড়িয়া যায়। ইহার বাষ্প পোকার পক্ষে বড় সাংঘাতিক। চাল, গম, কলাই ইত্যাদি শস্যে পোকা ধরিলে এই বিষাক্ত বাষ্পের সাহায্যে নষ্ট করা যায়। ইহার প্রয়োগ-প্রণালীও পূর্ব্বোক্তরূপ। চারিদিক্-আঁটা একটি ঘরে শস্য রাখিয়া এই বাষ্প ২৪ ঘণ্টাকাল আবদ্ধ রাখিলে সমস্ত পোকা নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু এই বাষ্প প্রয়োগ করিতে খুব সতর্ক হওয়া দরকার, কারণ সামান্য আগুনের স্পর্শে ইহা মহাশব্দে জ্বলিয়া উঠে।

৩। অল্পপরিমাণ শস্য হইলে ন্যাপ্থেলিন্ (Napthalene) দ্বারা পোকা দূর করা যাইতে পারে।

প্রবাসীর বেতালের বৈঠক বিভাগে প্রায়ই নানাবিধ পোকার দৌরাত্ম্য ও তন্নিবারণকল্পে বহু প্রশ্ন দেখিতে পাই। পোকার আকৃতি প্রকৃতি ও স্বভাব না জানিয়া ঔষধ প্রয়োগেও আশানুরূপ ফল লাভ হয় না। সুপ্রসিদ্ধ কীটতত্ত্ববিদ্ মিঃ লেফ্রয় The Insect Pests of India নামে একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। পুস্তকখানি সকলেরই পঠিতব্য।

শ্রী পূর্ণেন্দুভূষণ দত্ত রায়

শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ দত্তও এই প্রশ্নের এই জাতীয় উত্তর দিয়াছেন।

(১০)

যদি দেখো মাকুন্দ চোপা, এক পা না যেয়ো বাপা।
খনা বলে এরেও ঠেলী, যদি সাম্‌নে না দেখি তেলী॥

প্রশ্নকর্ত্তা উক্ত "বচনটা" লিখিতে "মাকুন্দ চাপা" লিখিয়াছেন, কিন্তু উহা "মাকুন্দ চোপা" হইবে। "মাকুন্দ" শব্দের অর্থ গোঁফদাড়ীশূন্য পুরুষ। "চোপা"-শব্দের অর্থ "মূর্খ"। যাত্রাকালীন গোঁফদাড়ীশূন্য পুরুষের মুখ দর্শন অশুভ, তদধিক অশুভ "তেলী"-দর্শন। বচন-রচয়িত্রী "তেলী" শব্দদ্বারা নবশায়ক তৈলী জাতিকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। তৈলী ও তৈলিক একার্থবোধক। তৈল শব্দে ইন্ করিয়া "তৈলী" এবং তৈল শব্দে ষ্ণিক করিয়া "তৈলিক" শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে।

শ্রী অনঙ্গমোহন দাস

পুস্তকপরিচয়

কার্পাস শিল্প—শ্রী সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত প্রণীত, ১৫নং কলেজ স্কোয়ার খাদি-প্রতিষ্ঠান হইতে প্রকাশিত—দাম বারো আনা মাত্র। ১৩৩০।

বস্ত্র-শিল্পের দিকে দেশের ঝোঁক পড়িয়াছে, অথচ এদেশের বস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রটা যে কিরূপ বিরাট্ ছিল তাহার সম্বন্ধে আমাদের অনেকেরই অভিজ্ঞতা নাই।

কার্পাস-শিল্পের গ্রন্থকার তাঁহার এই গ্রন্থখানিতে ভারতবর্ষের কার্পাসশিল্পের বিলুপ্ত-প্রায় ইতিহাসকে বাংলার জন-সাধারণের চোখের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। সে ইতিহাস যেমন করুণ, তেম্‌নি অত্যাচারের বীভৎস কাহিনীতে পরিপূর্ণ। এদেশের কার্পাস-শিল্প ধ্বংস হইয়াছে। সেই ধ্বংসটা যত বড় কথাই হোক না কেন, যে উপায়ে ধ্বংস হইয়াছে তাহাও ছোটো কথা নহে। কারণ তাহার ভিতর দিয়াই পাশ্চাত্য বণিক্ সভ্যতার চেহারাটা একেবারে নগ্ন হইয়া ধরা পড়িয়াছে। অনেক ইংরেজকে এখনও বলিতে শোনা যায় যে, এ-দেশের উপকার করার জন্যই এদেশের বুকের উপর তাঁহারা পাথরের মতন চাপিয়া বসিয়াছিলেন, কথাটা যে কত বড় মিথ্যা, এইসব ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয় থাকিলে তাহা বুঝিতে কিছুমাত্র দেরি হয় না। ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিষ্ঠার সঙ্গে-সঙ্গে এই অত্যাচারগুলি কিরূপ নগ্ন মূর্ত্তিতে যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল—ইংরেজ ঐতিহাসিকদেরই পুঁথি-পাজি খুঁজিয়া সতীশবাবু তাহার প্রমাণ দিয়াছেন।

কোনো-কোনো ঐতিহাসিক এরূপ কথাও বলিয়াছেন,......

অসম্ভব চড়াশুল্ক যদি ভারতীয় বস্ত্রের উপর ধার্য্য করা না হইত, তবে পেইস্‌লে এবং ম্যাঞ্চেষ্টারের কলগুলি গোড়াতেই অচল হইত, বাষ্পের

আবিষ্কার সত্ত্বেও তাহাদের শক্তি-লাভের কোনোই সম্ভাবনা থাকিত না। ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের ধ্বংসের দ্বারাই তাহাদের প্রতিষ্ঠা। ......বিদেশী বণিকেরা রাজনৈতিক অবিচারের অস্ত্রে তাহাকে পরাজিত করিয়া অবশেষে গলা টিপিয়া হত্যা না করিলে সমতলের উপরে দাঁড়াইয়া যদি যুদ্ধ চলিত, তবে এই প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করা তাহার পক্ষে কখনো সম্ভব না।" (কার্পাস-শিল্প পৃঃ ২৭)। চর্‌খার দ্বারা আজ যাঁহারা ভারতবর্ষের বস্ত্রশিল্পকে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিতেছেন এবং যাঁহাদের চর্‌খার উপর বিশ্বাস নাই এসব উক্তি এই উভয় সম্প্রদায়েরই বিচার করিয়া দেখিবার বিষয়।

কার্পাস-শিল্পের ভিতর দেশের অতীতকে জানিবার, বুঝিবার এবং চিনিবার মালমশলা প্রচুর-পরিমাণে আছে। এ গ্রন্থ কেবলমাত্র মনের দরদ দিয়াই লেখা হয় নাই, ইহার ভিতর ঐতিহাসিক সত্যকেও সর্ব্বত্র অক্ষুণ্ণ রাখা হইয়াছে। 'কার্পাস শিল্প' ইতিহাস গ্রন্থ, কিন্তু ইতিহাস হইলেও ইহাতে অত্যাচার, অন্যায় এবং ব্যবসাদারীর যে-সব নিশানা আছে, তাহা কাহিনীর মতই অদ্ভুত। ভালো এণ্টীক কাগজে ছাপা। বইখানি ১৬০ পৃষ্ঠায় শেষ হইয়াছে।

রায়

বোকার কাণ্ড—শ্রী দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায় বি-এ প্রণীত এবং শিশিরকুমার নিয়োগী কর্ত্তৃক বরদা এজেন্সী, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট হইতে প্রকাশিত। দাম বারো আনা। ১৩৩২।

এখানি রুশিয়ার ঋষি সাহিত্যিক টলষ্টয়ের Ivan the Fool নামক গল্পটির অনুসরণে লিখিত। গ্রন্থকারের বলিবার ভঙ্গি সহজ ও সরল। শিশুদিগকে টলষ্টয়ের মতন চিন্তাশীল মনীষীদের ভাবধারার সহিত পরিচিত করিবার চেষ্টাও প্রশংসনীয়। টলষ্টয় এই গল্পটি লিখিয়া বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরুদ্ধে লোকের মনে একটা ধা দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিষয়টি অত বড় জটিল হইলেও গল্পটি শিশুদের উপযোগী করিয়াই লেখা। গ্রন্থের বাঁধা, ছাপা কাগজ ভালো।

বুকার ওয়াশিংটন—শ্রী শরৎকুমার সেন প্রণীত; কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট; বরদা এজেন্সী হইতে প্রকাশিত। দাম বারো আনা। বুকার ওয়াশিংটন নিগ্রোজাতির অদ্ভুত কর্ম্মবীর। তাঁহার জীবনের বড়-বড় ঘটনাগুলি লইয়া এই গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকারের নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীর এই মহাপুরুষেরই জীবনের বিস্তৃত আলোচনা। কিন্তু তাহা আয়ত্ত করা সব বালকের পক্ষে সহজ নয়। আলোচ্য-পুস্তক বালকদিগকে সেই মহাপুরুষের জীবনের সঙ্গে কতকটা পরিচিত করিতে পারিবে। পরাধীনতার আওতায় পুষ্ট হইয়াও মানুষ যে কেমন করিয়া বড় হইতে পারে, আমাদের মত পরাধীন জাতির বালকদের পক্ষেও তাহা বোঝা ও জানার প্রয়োজন অল্প নহে। সুতরাং এদেশে এরূপ গ্রন্থের বহুল-প্রচার প্রয়োজন আছে।

চিন্তাকণা—প্রকাশক শ্রী নবকিশোর দে। মূল্য তিন আনা। ১৩৩১

এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানির লেখক অনেকগুলি প্রবাদ বাক্য সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই উপদেশ বাক্যগুলি মূল্যবান্। প্রকাশক এই সংগ্রহগুলির জন্য ধন্যবাদার্হ।

পথিক—শ্রী গোকুলচন্দ্র নাগ প্রণীত উপন্যাস। দাম সাড়ে তিন টাকা। ইণ্ডিয়ান্ পাবলিশিং হাউস্, কলিকাতা। ১৩৩২।

বইখানির মলাটের উপর একখানি ছবি। দুইটি বৃহৎ পা, একটি পা একটি পদ্মফুলকে দলিয়া চলিয়া যাইতেছে। পথিকের পা-দুটি ছাড়া অন্য কোনো অঙ্গ দেখা যাইতেছে না। চিত্রকর এই চিত্রের দ্বারাই উপন্যাসের ভিতরের একটি প্রধান চিত্রকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এক নারী তাহার প্রাণ-মন তাহার অল্পকালের পাওয়া প্রেমাস্পদের দিকে তুলিয়া ধরিল, সে তাহাকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেল। সমস্ত উপন্যাসখানিতে "মায়া"র কথাই পাঠকের মনকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আকৃষ্ট করে। মায়াকে মাঝে-মাঝে এত সজীব বলিয়া মনে হয়, যে তাহাকে যেন চোখের সামনে চলিয়া-ফিরিয়া বেড়াইতে দেখিতেছি বলিয়া ভ্রম হয়। উপন্যাসের গোড়াতেই মায়া পাঠকের সাম্‌নে প্রথম রূপ ধরিয়া হাজির হয়, বিদায় লইবার সময়, উপন্যাসের শেষে, সেই মায়ার ব্যথাই পাঠকের মনকে ভরিয়া রাখে। সমস্ত উপন্যাস খানিতে মায়া ছাড়া আর কিছু নাই। মায়ার চলা-ফেরা, মায়ার কথা বলা, মায়ার হাসি, মায়ার অঙ্গ-ভঙ্গি এবং মায়ার চোখের জল—পাঠকের মনকে ভরিয়া রাখে। বইখানি পড়া শেষ হইয়া গেলেও মায়া যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া চোখের সাম্‌নে ঘুরিয়া বেড়ায়। লেখক মায়াকে নিজের সমস্ত অন্তর দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।

মায়ার দ্বারা পুস্তকের অন্যান্য চরিত্রগুলি ঢাকা পড়িয়া গেছে। মায়া ছাড়া আর কাহারো কথা বিশেষ মনে থাকে না। এই নূতন উপন্যাসটির বিষয়ে দু-একটি কথা বিশেষ দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে। লেখক এমন-একটি সমাজের বিষয় লিখিয়াছেন, তাহা আমাদের দেশে আছে বলিয়া মনে হয় না, কোন্ দেশে যে আছে, তাহাও জানি না। এত প্রচণ্ড স্ত্রী স্বাধীনতা পৃথিবীর কোন্ দেশে আছে তাহা জানা নাই। উপন্যাসটির মধ্যে এমন কতকগুলি ব্যাপার এমন ইঙ্গিত-পূর্ণ ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে, যে তাহা মাঝে-মাঝে সুরুচির সীমা পার হইয়া গিয়াছে। উপন্যাসটির মধ্যে বিশেষ একজন ডাক্তারের কথা বাদ দিলে কোনো ক্ষতিই হইত না। সমাজের মধ্যে নানা-প্রকার গলদ থাকে সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে বীভৎসভাবে সাহিত্যে ফুটাইয়া তোলাকে আর্ট্‌ বলিয়া মানিয়া লইতে পারি না। আর-একটি ব্যাপার মনে বিশেষভাবে লাগে। এই উপন্যাসের ভিতর সকল স্ত্রীপুরুষই ধনী সন্তান। কাহারো টাকার কোনো অভাব নাই। কেহ গরীব নয়। কোথা হইতে টাকা আসিতেছে, কেহ জানে না, সকলে দুই হাতে কেবল খরচ করিয়া যাইতেছে। ইহা সত্য হইলেও বড় অদ্ভুত মনে হয়, বিশেষত আমাদের এই গরীব দেশে। উপন্যাসের মধ্যে বিলাতী খানা-পিনার বাহুল্য বড় খারাপ লাগে। বাঙ্গালার ছেলেমেয়ে, তাহারা রসগোল্লা, কচুরি, ডালবড়া, চানাচুর্ ইত্যাদি মিষ্ট এবং সুখাদ্য না খাইয়া ক্রমাগত স্যাণ্ডউইচ্, চপ কাটলেট এবং এপ্রিকট নামক বিশেষ ফলই খাইতেছে, এ বড় অদ্ভুত ব্যাপার। তবে ধনী এবং বিলাতী ছাঁচে ঢালা বাঙ্গালীদের এই হয়ত নিয়ম। উপন্যাস-খানি অনাবশ্যক অত্যন্ত দীর্ঘ করা হইয়াছে। সেই কারণে দামও বোধ হয় সাড়ে তিন টাকা করিতে হইয়াছে। তবে পুস্তকের দাম লইয়া আমরা ধন্দে পড়িয়াছি, পুস্তকের শেষে, বিজ্ঞাপনে "পথিকের মূল্য লেখা আছে ২।০, কিন্তু বইএর গোড়ায় লেখা আছে ৩।০। কোন্‌টি যে ঠিক তাহা জানি না।

বইখানির ছাপা, বাঁধাই কাগজ ইত্যাদি বিষয়ে বলিবার কিছুই নাই।

দেশের শত্রু—শ্রী প্রমথনাথ বিশী প্রণীত প্রবন্ধোপন্যাস। প্রাপ্তিস্থান, বাণীমন্দির সদর ঘাট রোড, ঢাকা এবং ১০ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। দাম কুড়ি আনা। ১৩৩২।

লেখক উপন্যাস লিখিবার ছলে বর্ত্তমান একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠাবান্ রাজনৈতিক দলের বিবিধ কার্য্যাবলির সমালোচনা করিয়াছেন। সমালোচনা সকল স্থানে সমীচীন না হইলেও উপাদেয় হইয়াছে, উপাদেয় হইবার প্রধান কারণ লেখকের লিখিবার ভঙ্গি। লেখক পরিহাস-রসিক।

রসিকতার মধ্যে কোথাও ভঁাড়ামো নাই। রসিকতার মধ্য দিয়া লেখক যাহাদের তীব্র কশাঘাত করিয়াছেন তাহাদের ইহাতে বেদনা পাইবার যথেষ্ট কারণ আছে। দেশের কাজের নামে যেসব ভঁাড়ামো এবং জুয়াচুরি এবং "আত্মত্যাগের" জলন্ত দৃষ্টান্ত আজকাল পথেঘাটে পাওয়া যায়, তাহা লেখক তীব্র রসিকতার মধ্য দিয়া লোকের চোখের সামনে সহজে ধরিয়াছেন। উপন্যাসখানির শেষের দিকে কেবল একটি বিশেষস্থানে লেখক মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছেন। ইহা অতীব ঘৃণনীয়—কাদা দেখাইতে গিয়া কাদা মাখিয়া বসার কোনো বাহাদুরি নাই। লেখকের সত্য প্রকাশ করিবার সৎসাহস প্রশংসা পাইবার যোগ্য। বইখানির দাম অত্যধিক হইয়াছে।

পরীস্থান—শ্রী গোকুলচন্দ্র নাগ অনুবাদিত। প্রাপ্তিস্থান কল্লোল পাব্‌লিশিং হাউস। ২৭ কর্ণ্‌ওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম বারো আনা। ১৩৩২।

মরিস্ ম্যাতারলিঙ্কের বিখ্যাত নাটক ব্লুবার্ডের বাংলা অনুবাদ। এই বইখানির নাম সাহিত্য রসিকদের জানা আছে। অনুবাদ ছেলে-মেয়েদের যোগ্য হইয়াছে। অনুবাদ পড়িতে কোথাও বাধে না, মনে হয় যেন লেখকের মূল কোনো বই পড়িতেছি। অনুবাদ অতি স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার হইয়াছে। কোথাও জড়তা নাই। ছেলেমেয়েরা এই বইখানি পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিবে এবং বিদেশী সাহিত্য রসিকের লেখার রস গ্রহণ করিবার ইচ্ছা বৃদ্ধি হইবে। প্রচ্ছদপটের ছবিখানি সুন্দর—দেখিলেই মনে হয় যেন কোনো স্বপ্নময় দেশের ছবি দেখিতেছি। ভিতরের ছবি-দুখানিও চমৎকার। বইখানির ছাপা বাঁধাই ইত্যাদি সবই খুব ভালো হইয়াছে। যাহাদের জন্ত লেখা, তাহাদের কাছে এই বইএর আদর হইবে।

গঙ্গোত্তরী ও যমুনোত্তরী—শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু লিখিত সচিত্র ভ্রমণ কাহিনী। দাম দুই টাকা। ১৩৩০।

বইখানি হিমালয়ের উক্ত দুই স্থানের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত। বর্ণনা ভঙ্গি সরস এবং সরল। বইখানি পড়িতে-পড়িতে মাঝে-মাঝে মনে হয় যেন বর্ণিত স্থান সমূহে ভ্রমণ করিতেছি। তবে মাঝে-মাঝে সামান্ত-সামান্ত ঘটনার বিবরণ বড় বেশী করিয়া দেওয়া হইয়াছে, এই সব অনায়াসে বাদ দেওয়া চলে। বইখানি মাঝে-মাঝে ছবি থাকাতে পাঠকের পক্ষে সুবিধা হইয়াছে। পুস্তকের গোড়াতেই গঙ্গোত্তরী ও যমুনোত্তরী পথের মানচিত্র আছে—ই হা পাঠকদের যথেষ্ট সাহায্য করিবে। মোটের উপর পুস্তকখানি উপাদেয় হইয়াছে। এই বইখানি পড়া থাকিলে ঐ দুই স্থানের তীর্থযাত্রীদের অনেক সুবিধা হইবে আশা করা যায়।

গ্রন্থকীট

টলষ্টয়ের গল্প—(১) মাটির নেশা (২) ধর্ম্মপুত্র—শ্রী দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়, বি-এ ও শ্রীকামিনী রায়, বি-এ প্রণীত। প্রকাশক বরদা এজেন্সী, ১২।১ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য প্রত্যেকখানি ।০।

টলষ্টয়ের দুইটি প্রসিদ্ধ গল্পের অনুবাদ। বই দুইটি বিশ্বভারত গ্রন্থমালা সিরিজের অন্তর্ভুক্ত। এই সিরিজের আরো দুই একখানি বইয়ের আমরা সমালোচনা করিয়াছি। বরদা এজেন্সীর প্রচেষ্টা সফল হইতেছে। আলোচ্য বইদুটির অনুবাদ ভালো হইয়াছে।

গোরুর গাড়ী—শ্রী ভোলানাথ সেনগুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক শ্রী কালীকৃষ্ণ সেনগুপ্ত, বোলপুর, বীরভূম। মূল্য ছয় আনা।

এখানি একটি কাব্য। সভ্যতার কোন্ এক অজ্ঞাত আদিম দিনে মানুষ যখন পায়ে হাঁটিয়াই সব কাজ সারিত, যান-বাহন মোটেই ছিল না, তখন এক বুদ্ধিমান্ কারিকর একটি গাছের গুঁড়ির মাঝখানে ছেঁদা করিয়া তাহাতে একখানা বাঁশ গুজিয়া দিল এবং তাহা গড়াইয়া লইয়া যাইবার জন্ত একটা বলদ জুড়িয়া দিল ; তাহাতে বাঁশের দণ্ডের দুইধারে দুইজন লোক বসিতে পারিত ; কিন্তু রাজবাড়ীতে পরীক্ষার সময় আরোহীদের পতন ঘটিল ; কারিকর নিজের আবিষ্কারের ব্যর্থতা দেখিয়া মনের দুঃখে মরিয়া গেল। সেই কারিকরের ছেলে বহু বৎসরের চেষ্টার পর দুইখানি চাকা করিল, চাকার একটু উন্নতি ঘটাইল, বসিবার মাচাও করিল ; বাপের আবিষ্কারকে অনেকটা আগাইয়া দিল। আবার বহু বৎসর পরে আর-এক কারিকর চাকা একেবারে আধুনিক-রকমের করিয়া তুলিল ; চারিদিকে ধন্ত-ধন্ত পড়িয়া গেল। এইরূপে আমাদের সনাতন গোরুর গাড়ী, সমস্ত যান-বাহনের অতিবৃদ্ধ পিতামহের সৃষ্টি হইল। এই ব্যাপারটি লেখক কল্পনা করিয়া অতি সুন্দর সরল সরস ছন্দমাধুর্য্যপূর্ণ কবিতায় ব্যক্ত করিয়াছেন। বইখানি রসে-মাধুর্য্যে বাঙালীর পরম চিত্তহারী বস্তু হইয়াছে। আলোচ্য বইটিতে কবি সনাতন গোরুর গাড়ীর কথা বলিতে-বলিতে অধুনালুপ্ত সভ্যতার আদিম যুগের সারল্য ও বাহুল্যহীনতার জন্ত যে আক্ষেপ করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত সত্য ও মর্ম্মস্পর্শী।

আনন্দমঠ—৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক বরদা এজেন্সী, ১২।১ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

বর্ত্তমান বাংলার তথা ভারতবর্ষের জীবন-গীতা অমর আনন্দমঠের নূতন সংস্করণ। সংস্করণ অতি সুন্দর হইয়াছে। বাঁধা ও ছাপা চমৎকার। গল্প-পরিচায়ক কতকগুলি ভালো ছবি ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। আগেকার সংস্করণ হইতে ইহা যথেষ্ট ভালো হইয়াছে। এ সংস্করণ সাধারণের নিকট আদরণীয় হইবে, সন্দেহ নাই।

প্রাচীন রাজমালা—শ্রী রামপ্রাণ গুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক শ্রী পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, ২৬ বেচারাম দেউড়ী, ঢাকা। মূল্য তিন টাকা।

পুস্তকটিতে ভারতের উত্তর, দক্ষিণ, পশ্চিম প্রভৃতি দিকের দেশ-সমূহের প্রাচীন রাজবংশসকলের কাহিনী সংক্ষেপে গবেষণার সহিত আলোচিত হইয়াছে। মাত্র একটি পুস্তকে ভারতের বহু-বহু রাজবংশের পরিচয় জ্ঞানপিপাসু পাঠকের নিকট সুবিধাজনক হইবে। গ্রন্থকার পৌরাণিক ভারতকে বাদ দিয়া ঐতিহাসিক ভারতকেই অবলম্বন করিয়াছেন। এ-বিষয়ে আজ অবধি যতগুলি প্রামাণ্য পুস্তক বাহির হইয়াছে, লেখক তাহার অধিকাংশেরই মতামত আলোচনা করিয়াছেন এবং তাঁহার নিজের মতামত বেশ সংক্ষিপ্ত ও সুবিচারপূর্ণ হইয়াছে। ঐতিহাসিক গবেষণায় ও রচনায় লেখকের যথেষ্ট প্রসিদ্ধি আছে। বর্ত্তমান পুস্তকটি তাঁহার প্রচুর পরিশ্রম ও প্রচুর চিন্তার পরিচায়ক এবং তাঁহার খ্যাতি বর্দ্ধিত করিবে। আলোচনার বিষয় বিপুল-প্রসর হইলেও গ্রন্থকার তাহাকে অতি-প্রকাণ্ড হইতে দেন নাই—ইহাই বইটির বিশেষত্ব। বইটি ইতিহাসপাঠেচ্ছু পাঠকের নিকট প্রচুর সমাদর লাভ করিবে, সন্দেহ নাই।

ভক্তপ্রসঙ্গ—প্রথম খণ্ড—হরিদাস ঠাকুর—শ্রী শচীশচন্দ্র মিত্র সঙ্কলিত। প্রকাশক আশুতোষ লাইব্রেরী, কলিকাতা ও ঢাকা। মূল্য এক টাকা।

আমরা যাঁহাকে 'যবন হরিদাস' বলিয়া জানি, এ পুস্তকখানিতে সেই সাধু হরিদাসের জীবন-চরিত সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। তিনি যে ব্রাহ্মণতনয় ছিলেন এবং যবন ছিলেন না, বহু প্রমাণাদিসহ তাহার আলোচনা করা হইয়াছে। বইখানি বৈষ্ণবভক্তগণের আদরের জিনিষ হইবে। ছাপা এবং বাঁধানো ভালো।

নবধ্বন্যালোক*

শ্রী ধ্বনিপ্রাণ আনন্দবর্দ্ধন

(১)

রে পাষাণ, শ্মশান শয়নে ছিন্ন তন্ত্রিহীনা বীণার গুঞ্জনে
নেচে নেচে ওঠে ফিরে পর্য্যুষিত প্রলয়ের অনন্ত-লালসা!
ক্রন্দনে ত্যজিল প্রাণ অন্তপুরে কার ক্রুদ্ধ প্রণয় প্রতিমা
বদ্ধ মালঞ্চের বক্ষে লুটাইল কার ভগ্ন মর্ম্মর-মালসা!

(২)

রে ভীষণ, অশনে বসনে স্নিগ্ধ গোধূলির তমিস্রা-মিশানো
দিশাহীন উর্ণনাভ আম্রকুঞ্জে আকুলিল বিফলে ভ্রূকুটি,
কার দীর্ঘ আবেশের অনর্গল ভাবগ্রাসী স্বপন-গর্জ্জনে
পক্ষ মেলি' বিদারিলি তীক্ষ্ণনাসা শীর্ণ কার শ্রীচরণে লুটি'?

(৩)

রে মরণ, মিথ্যা-সনাতনী ধনি! বৈধব্যের তুহিন-নির্ঝরে
জ্বালাইল স্বপ্নহর অক্ষমের অপাঙ্গিনী অপূর্ণ কামনা
শুষ্কমুখ গৃধিনীরা আত্মহারা পান করে লোহিত-গরল
গুরুগুরু মেঘমন্দ্রে ভদ্রাসনে ফল্গুনদী বহে আনমনা।

(৪)

রে করাল, কণ্টকে-কণ্টকে কীট মধুলোভে সতত শঙ্কিত
প্রাঙ্গণের বালুবক্ষে লক্ষ্যভেদে চক্ষুহীন মাতিল কাহারা—
দানবে মানবে রুদ্ধ সর্ব্বত্যাগী গর্ব্বধৃত পর্ব্বত কন্দরে
হৃতবুদ্ধি গন্ধর্ব্বের মর্ম্মভেদী শাপগ্রস্ত কোন্ সে সাহারা!

(৫)

রে সরল, গরলসিঞ্চনে শুভ্র তারুণ্য-তরলে আত্মহারা
দোলায় দোদুল দোলা পদ্মবনে মেঘোন্মত্ত সহস্র দাদুরী
খঞ্জনা গঞ্জনা গান গেয়েছিল আতুরীর বিবাহ-বাসরে
সর্পিণী দংশিল কারে ঝলকিয়া আচম্বিতে বিদ্যুতের ছুরী।

(৬)

রে তাণ্ডব, খাণ্ডব-দাহন-কালে গাণ্ডীবীর গণ্ডে দিলি জ্বালি'
আজন্মের স্নেহতৈলে অভিষিক্ত বেণুলব্ধ দণ্ডের আরতি,
চক্ষে তার মুহূর্ত্তে উঠিল জাগি কোটিতারা উল্কার ছলনা
অনাহূত আর্ত্তনাদে আরম্ভিল সুন্দরের ভগ্নদূত গীতি!

(৭)

রে কঠিন, অন্ধ-কারাগার-গর্ভে ফাল্গুনের শ্রাবণ-শর্ব্বরী
দ্বন্দ্বে-দ্বন্দ্বে ছন্দহীন জীর্ণদেহে পঞ্জরের কালান্ত মূরতি
আজ এই মধ্যাহ্নের নীলাকাশে ইরম্মদ ছুটিল উন্মাদ
ভৈরব গর্জ্জিল তা'র রুদ্রনৃত্যে হুঙ্কারিয়া 'রে সতি!
রে সতি?'

(৮)

রে দানব, অন্তগামী মর্ম্মব্যথা ইস্তাম্বুল গগন-গম্বুজে
ব্রাহ্মণের ব্রহ্মরন্ধ্রে নেমিহারা উৎকণ্ঠার যবন-যাতনা
সেইদিন শীর্ণকণ্ঠে গেয়েছিল সংহিতার ইতর-বিধান
দক্ষযজ্ঞে পঞ্জপাল সজলোভে গুঞ্জরিল আসরে কত না।

---

* ভাষা বর্ত্তমান জগতের ক্ষুদ্রতার প্রমাণ। যাহা অনন্তকালের কোল জুড়িয়া ব্যাপ্ত তাহাকে মানুষ তিনটি দাগ অথবা চারিটি শব্দের সাহায্যে প্রকাশ করিতে চায়। ইহা ধৃষ্টতা।

প্রাচীনেরা জানিতেন রূপ, রস, বর্ণ, ধ্বনি ও গন্ধের আবেশ। তাঁহারা দুঃখ প্রকাশ করিতে হইলে নাকী সুরে "আমার মনে ব্যথা লেগেছে" বলিয়া জগতকে হাসাইতেন না। দুঃখের দিনে অন্তরের অনন্ত বেদনা হৃদয়োত্থিত সঙ্গীতের মীড় ও মূর্চ্ছনার মধ্য দিয়াই তাঁহারা জগতকে জানাইতেন। তাঁহারা কখন ন্যাকামির সুরে বলিতেন না "মা আমায় বড় ভালোবাসে"। প্রাচীন শিল্পী অঙ্কিত অথবা নির্ম্মিত মাতৃমূর্ত্তির মুখজ্যোতি স্বতঃই জগতবাসীকে মাতৃহৃদয়ের প্রেমোচ্ছ্বাসে অভ্রসিক্ত করিয়া তুলিত। আমি ভাষা ও অর্থবহুল কথামালা বক্ষে ঝুলাইয়া আপনাদের নিকট আসি নাই। অতি পুরাকালে শুধু ধ্বনির আন্দোলনে আমি নিজ মনোভাবে অপর হৃদয় দুলাইয়াছি। অধুনা কতিপয় ভাষামত্ত অর্ব্বাচীনের তাড়নায় আবার আমাকে ধ্বনি-বীণার তন্ত্রীতে ঝঙ্কার তুলিতে হইল। এই শব্দগুঞ্জনে আপনারা মাতিয়া উঠুন।

মনসার মানৎ

শ্রী সুরজিৎ দাসগুপ্ত

মহিম মালী ছেলের অসুখে মানৎ ক'রে বসেছে, "মা মনসা, তোমাকে পাঁঠা দেবো, ছেলে ভালো ক'রে দাও!"

মনসার পাঁঠার লোভেই হোক্ বা সুর্য্য ডাক্তারের হাতযশেই হোক, ছেলে ত ভালো হ'য়ে গেল; এখন মানৎ শোধ হয় কিসে। মা মনসা কাঁচা-খেকো দেব্‌তা; তা'কে ত আর মোষ মানৎ ক'রে ফড়িং ধ'রে খেতে বলা চলে না।

ঘটি-বাটি বাঁধা দিয়ে গরীব মহিম পাঁচ সিকার পয়সা জোগাড় করেছে। সাম্‌নের শনিবারে পুজো; মঙ্গলবারের হাটে পাঁঠা না কিন্‌লেই নয়।

মহিম সকাল-সকাল চারটি খেয়ে, ভাঙা ছাতাটা বগলে ক'রে লাঠিগাছটা নিয়ে বেরিয়ে পড়্‌ল।

বাজারে এসে দেখে তিন টাকার কমে একটা পাঁঠা পাওয়া যায় না। সারাদিন ঘুরে-ঘুরে নিরাশ হ'য়ে বাড়ী ফির্‌ছে; দেখে লম্বাদাড়ী এক মিঞা, গলায় দড়ি দিয়ে হেঁচ্‌ড়ে নিয়ে যাচ্ছে হাড়গোড়-বের-করা একটা বাচ্চা পাঁঠা। গায়ে মাংস নেই বল্‌লেই হয়, থাকার মধ্যে আছে দু'টো লম্বা কান।

পাঁঠাটা চল্‌তে চাচ্ছে না, চা'র পা শক্ত ক'রে রাখ্‌ছে। বুড়ো মিঞার দড়ির টানে মাটি আঁচ্‌ড়ে একটু এগিয়ে গিয়ে শুয়ে পড়্‌ছে। মিঞা বিরক্ত হ'য়ে দড়ি-সুদ্ধ উঁচু ক'রে শূন্যে তু'লে খানিকটা নিয়ে গিয়ে ফেলে দিচ্ছে। পাঁঠাটা 'ক্যাঁক্' ক'রে উঠে কান ঝেড়ে 'ভ্যাঁ ভ্যাঁ' কর্‌ছে।

মহিম দর-কষাকষি করে' আঠারো আনায় পাঁঠাটা কিন্‌লে। মহিমও বাঁচ্‌ল, মিঞাও বাঁচ্‌ল। মহিম পাঁঠাটাকে সারা রাস্তা কাঁধে ক'রে নিয়ে এল। পাঁঠা দে'খে মহিমের স্ত্রী আহ্লাদে আট্‌খানা। গায়ে হাত বুলোতে-বুলোতে বল্‌তে লাগ্‌ল "বেশ পাঁঠা, বেশ পাঁঠা"।

পরদিন সকালে পাঁঠাটাকে একটা দড়িতে বেঁধে দেওয়া হ'ল ঘাস খেতে। সে খাবে কি, দড়ির ভারে মাথা তুল্‌তেই পারে না। সারাদিন কিছু খেলে না; মাথা নীচু ক'রে কেবল ডাক্‌তে লাগ্‌ল। পালাবার সম্ভাবনা নেই দে'খে দড়ি খুলে দেওয়া হ'ল। পাঁঠা সাম্‌নের পা-দুটো মুড়ে ঝুঁকে প'ড়ে দু'একটা ঘাস চিবুতে লাগ্‌ল।

ঢোলের মতো মস্ত মাদুলি গলায়, একটা ফুটো পয়সা আর চাবি বাঁধা ঘুন্‌সী কোমরে, পেট্-টিনটিনে মহিমের ন্যাংটা ছেলেটা লেগে গেল পাঁঠার পিছনে। সারাদিন পাতা ছিঁড়ে-ছিঁড়ে দিতে লাগ্‌ল।

দু'দিন একরকমে কেটে গেল; পুজার আগের দিন পাঁঠার অবস্থা খারাপ হ'য়ে পড়্‌ল। ডেকে-ডেকে গলা ভেঙে গেল, আর ডাক্‌তে পারে না। সাপে-ধরা ব্যাঙের মতো মাঝে-মাঝে শব্দ ক'রে ওঠে। মাথার ভার সইতে না পেরে ঘাড় পেতে পড়েছে। মহিমের বৌ বড় ভাবনায় পড়্‌ল।

সন্ধ্যার পর অবস্থা আরও খারাপ। চার পা ছড়িয়ে একেবারে নেতিয়ে পড়েছে। ডাক্‌তে গিয়ে ডাক্‌তে পার্‌ছে না, হাঁ কর্‌ছে। আর থেকে-থেকে চম্‌কে উঠ্‌ছে। মহিম আর তা'র স্ত্রী ল্যাম্‌পোটা জেলে সারা রাত ব'সে কাটালে। তা'রা কেবল বল্‌তে লাগ্‌ল—"মা, কোনো-রকমে কা'ল পুজোতক্ ওর প্রাণটা রাখো! তোমার ধার শুধে নিই।"

পাঁঠার কল্যাণে আর-একটা পাঁঠা মানত কর্‌তে সাহস হ'ল না।

"দুর্গা দুর্গা" ক'রে কোনো-রকমে রাতটা কেটে গেল। রাতও পোহালো আর পাঁঠা চোখ উল্‌টে খাবি খেতে লাগ্‌ল। মহিমের ছুটাছুটি লেগে গেল পুরুত্ খুঁজ্‌তে। ঠাকুর-মশায় যেখানে দু'পয়সা বেশী প্রাপ্তি সেখানে গেছেন আগে।

অনেক খোঁজা-খুঁজির পর পুরুত্ পাওয়া গেল। পুরুত ঠাকুর ত চ'টেই আগুন—"ব্যাটা দক্ষিণার বেলা এক পয়সা, আর ওর পূজো করো আগে!" অনেক ধরা-পাকড়ির পর পুরুত্ ঠাকুর এলেন।

মহিমের স্ত্রী আগে বল্লে—"বাবা, পুজো পরে হবে, ওর প্রাণ থাক্তে-থাক্তে আগে বলিটা সেরে নাও! পুজোতক্ তর্ সইবে না।"

ঠাকুর-মশায়ও তাই চা'ন। নমো নমো ক'রে কোনো-রকমে দায় সেরে বল্লেন—"পাঁঠা নামিয়ে আন্!"

মহিমের স্ত্রী বল্লে—"বাবা, জল পেলে বাঁচ্বে না।"

তখন একটু জলের ছিটে দিয়ে, মহিমের স্ত্রী পাঁঠাটাকে কোলে ক'রে বস্ল। পাঁঠার কপালে একটা সিঁদুরের ফোঁটা গলায় একছড়া ফুলের মালা দিয়ে ঠাকুর-মশায় বল্লেন, "পাছ্ড়ে ধরো!

পাঁঠাকে হাড় কাঠে পুরে মহিম টেনে ধর্লে। মহিমের স্ত্রী গলায়—আঁচল দিয়ে, জোড়হাতে দাঁড়িয়ে ডাক্তে লাগ্ল—"দোহাই মা, দোহাই মা"। ন্যাংটা ছেলেটা লাফাতে লাগ্ল, "আমি মুড়িটা নেবো, আমি মুড়িটা নেবো।"

পাঁঠাটা চ্যাঁও কর্লে না, ভ্যাঁও কর্লে না। কেবল ল্যাজটা নাড়্তে লাগ্ল। ঠাকুর-মশায় নামাবলি কোমরে বেঁধে, খাঁড়া তুলে "মা নাও" ব'লে জোড়ে দিলেন এক কোপ্। পাঁঠাটা "ক্যাঁক্" ক'রে র'য়ে গেল। সে যেন ব'লে গেল "মর্ছিলামইতো, আর কেন? আপনি ম'লে কি মা নেয় না?"

পরশ-পাথর

শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র রায়

রসায়ন-শাস্ত্রের ইতিহাস অনুসরণ করিলে দেখা যায় যে, একসময়ে একদল লোক পরশপাথরের খোঁজে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন আধুনিক রসায়ন-শাস্ত্রের জন্ম হয় নাই। এই সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ছিল যে, পৃথিবীতে এমন-একটা বস্তুর অস্তিত্ব আছে, যাহার স্পর্শে লৌহ প্রভৃতি ইতর ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করিতে পারা যায়। আধুনিক রসায়নবিদ্গণের ন্যায় বৈদ্যুতিক চুল্লী, বুন্সেনের শিখা, তাপমান, বায়ুমান প্রভৃতি কোনো যন্ত্রই তাঁহারা ব্যবহার করিতেন না তাঁহাদের যন্ত্রাদির সংখ্যা অতি অল্প ও প্রকৃতি অতি স্থূল (crude) ছিল, তবে তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন তন্ত্র ও মন্ত্রে, জপ ও হোমে এবং ইহা দ্বারাই তাঁহারা লৌহ, সীসক, রাঙ্ প্রভৃতি ইতর ধাতুকে (baser metals) স্বর্ণে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেন। অনেকের বিশ্বাস ছিল যে তাঁহারা এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। এই বৈজ্ঞানিকদের অস্তিত্ব আর নাই, তাঁহাদের পুঁথি-পত্রের অধিকাংশ লুপ্ত হইয়াছে, আছে কেবল তাহাদের নাম—অ্যাল্কেমিষ্ট্। (Alchemist)

কোন্ সূত্র ধরিয়া তাঁহারা পরশ-পাথরের আবিষ্কারে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহা এখন ঠিক জানিবার উপায় নাই। খুব সম্ভব পরশ-পাথরের ধারণা তাঁহারা পাইয়াছিলেন প্রাচীন মিসরীয় ও চালদীয়দের (Ancient Egyptians and Chaldens) নিকট হইতে; তবে অ্যাল্কেমির বিস্তৃতি ও প্রচার হয় মধ্যযুগে, আরবীয় আধিপত্যের সময়ে। অ্যারিস্টট্ল্ প্রভৃতি গ্রীক দার্শনিকগণ মতবাদ প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন, কোনোরূপ পরীক্ষার ধার ধারিতেন না। প্রাচীন গ্রীস ও ইতালীর অধঃপতনের পর মুসলমানদের অভ্যুদয় হয়, তাহারা সমস্ত উত্তর আফ্রিকা হস্তগত করিয়া স্পেন পর্য্যন্ত নিজেদের অধিকার বিস্তৃত করে। মিসরে আধিপত্যের সময় তাহারা গ্রীক ও মিসরীয় বিজ্ঞান এবং দর্শনের সহিত পরিচিত হয় এবং

তাহারাই সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে জ্ঞানশলাকা পুনঃ প্রজ্বলিত করে। পরীক্ষা-মূলক বিজ্ঞানের ভিত্তি এই সময়েই স্থাপিত হয় এবং পরশ-পাথরের ধারণা এইসময়েই প্রসারিত হয়। মিশর হইতে স্পেনে ও স্পেন হইতে সমগ্র ইউরোপে এই ধারণা বিস্তৃতি লাভ করে।

মুসলমানদের অভ্যুদয়ের সঙ্গে গ্রীকদের চাতুর্ভৌতিক সিদ্ধান্তেরও (Four Element Theory) পরিবর্ত্তন হইল। পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে জড়-পদার্থের উপাদান বিষয়ে এক নূতন মতবাদের সৃষ্টি হইল। ইহার নাম গন্ধক-লবণ-পারদ মতবাদ। ইহার পরিপোষকগণ বলিতেন, যাবতীয় জড়-পদার্থ গন্ধক, লবণ ও পারদ এই তিনটি উপাদানে নির্ম্মিত। ধাতুমাত্রেই গন্ধক ও পারদ সম্ভূত, তবে বিভিন্ন ধাতুতে পারদ ও গন্ধক বিভিন্ন অনুপাতে বর্ত্তমান। গন্ধক যত কম থাকে, ততই ধাতুর দগ্ধ হইবার ক্ষমতাও কমিয়া যায় এবং ততই সেই ধাতু বহুমূল্য হয়। লোকে ভাবিল, এ যদি সত্য হয়, তবে লৌহ, তাম্র প্রভৃতি হীন ধাতুদিগকে গন্ধকের সহিত রাসায়নিক সংযোগ করিয়া স্বর্ণ ও রৌপ্যে পরিণত করা যাইতে পারে। এই ধারণা লইয়া প্রকাশ্যে ও গোপনে বহুমূল্য ধাতু প্রস্তুত করিবার একটা বিরাট্ চেষ্টা চলিতে লাগিল এবং সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত ইহা অ্যাল্‌-কেমিষ্ট্‌দের সাধনা হইয়া রহিল।

লৌহ, সীসক প্রভৃতি ইতর ধাতুকে (baser metals) 'রুগ্নস্বর্ণ' (diseased gold), পারদকে 'পীড়িত রৌপ্য' (ailing silver), তাম্র, লৌহ, সীসক ও রাঙ্‌কে 'কুষ্ঠ-ব্যাধিগ্রস্ত' (lepers) বলা হইত। চিকিৎসকেরা যেমন রুগ্ন ব্যক্তিকে চিকিৎসা দ্বারা সুস্থ করেন, অ্যাল্‌-কেমিষ্ট্‌রা তেম্‌নি রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা এই সমস্ত রোগগ্রস্ত ধাতুকে সুস্থ অর্থাৎ স্বর্ণে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহারা আরও বিশ্বাস করিতেন যে, প্রকৃতি-দেবী নিজেই ধরা-কুক্ষিতে ইতর ধাতুর সৃষ্টি ও পরে তাহাকে সুবর্ণে পরিণত করেন। মানবের অজ্ঞাত কোনো বাধা-বিপত্তির জন্য যখন প্রকৃতি দেবী তাঁহার কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন না, তখনই ইতর ধাতুর উৎপত্তি হয়। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা নিঃশোষিত খনিসমূহ (exhausted mines) কয়েক বৎসর পরে ফলপ্রসূ হইবার আশায় সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করিয়া দিতেন।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে প্যারাসেল্‌সাস্ (Paracelsus) বলিলেন যে, প্রত্যেক ধাতুর ভিতর একপ্রকার রস বা seminal fluid আছে, যাহার প্রভাবে একটি ধাতু অপর ধাতুতে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। এই কল্পনার আলোকে আকৃষ্ট হইয়া স্পর্শমণির অন্বেষণে বৈজ্ঞানিকগণের দিনরাত্রি অতিবাহিত হইতে লাগিল, কিন্তু ফল কিছুই হইল না। ল্যাভোয়সিয়ে প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত নব্য রসায়নের জন্মের সঙ্গে এ-ধারণার পরিবর্ত্তন ঘটিল, লৌহকে সুবর্ণে ও রাঙ্‌কে রৌপ্যে পরিণত করিবার চেষ্টা পরিত্যক্ত হইল।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ ও সাহিত্যিকগণ এই অ্যাল্‌-কেমিষ্ট্‌দের অদ্ভুত খেয়াল বা পাগ্‌লামির কথা স্মরণ করিয়া কত যে বিদ্রূপ করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। কাব্যে ব্রাউনিং ও ঐতিহাসিক উপন্যাসে আনাতোল ফ্রাঁস ও স্কট তাঁহাদের প্রতি কিছু সমানুভূতি প্রদর্শন করিলেও অন্যান্য সাহিত্যিকরা বিশেষত মার্ক্ টোয়েন ও বুলওয়ার লিটন্ তাহাদিগকে যে বিদ্রূপ করিয়াছেন, তাহা উপভোগ্য ও আংশিক সত্য হইলেও পূর্ণ সত্য নয়। গত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে রসায়নে ও পদার্থ-বিজ্ঞানে যে-সকল অদ্ভুত তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে বেশ বুঝা যায়, অ্যাল্‌-কেমিষ্ট্‌রা পাগল ছিলেন না, তাঁহাদের সাধনারও অভাব ছিল না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বিখ্যাত রসায়নবিৎ স্যার্ উইলিয়াম্ র্যাম্‌জে বলিয়াছেন, মৌলিককে মৌলিকান্তরে পরিণত করা অসাধ্যসাধন নয়। সুতরাং বহু শতাব্দী পূর্ব্বে সেই অ্যাল্‌কেমিষ্টের দল যে পরশ-পাথরের সন্ধানে ছুটিয়াছিলেন, আধুনিক বৈজ্ঞানিককে প্রায় তাহারই সন্ধানে ছুটিতে হইতেছে।

সৃষ্টিতত্ত্বের কথা উঠিলেই প্রাচীন পণ্ডিতগণ পাঞ্চ-ভৌতিক বা চাতুর্ভৌতিক সিদ্ধান্তের অবতারণা করিতেন। প্রাচীনদের এই সিদ্ধান্ত আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের হাতে পড়িয়া স্থির থাকিতে পারে নাই। অজ্ঞাতকুলশীল ব্যোম ভিন্ন অন্য ভূতের ভূতত্ব ঘুচিয়া গিয়াছে। উনবিংশ

শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক গবেষণায় স্থির হইয়াছিল যে, হাইড্রোজেন্, অক্সিজেন্ প্রভৃতি বিরানব্বইটি মূলপদার্থে জগৎ নির্ম্মিত এবং ঐ মূল পদার্থের ধ্বংস বা রূপান্তর নাই। এই সিদ্ধান্ত দীর্ঘকাল ধরিয়া বৈজ্ঞানিক সমাজে আদৃত হইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু প্রায়বায়ুশূন্য কাচের নলের মধ্যে তড়িৎ প্রয়োগ করিয়া ইলেক্ট্রনেরও কতকগুলি নূতন তেজোনির্গমশীল (radio-active metals) ধাতুর আবিষ্কারের পরে এই সুপ্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্তের মূলেও কুঠারাঘাত হইয়াছে।

ক্রুক্‌স্ নলের মধ্যে বিদ্যুৎ চালনা করিলে ক্যাথোড্-রশ্মি উৎপন্ন হয়। * বিদ্যুৎ-পরিমাপক যন্ত্রের (electroscope) সাহায্যে দেখা গিয়াছে যে, ক্যাথোড্ রশ্মি ঋণাত্মক তড়িৎপূর্ণ। চুম্বকের প্রভাবে ক্যাথোড্ রশ্মি বাঁকিয়া যায় ও উহা ধাতুর পাত্‌লা পাত ভেদ করিয়া যাতায়াত করিতে পারে, কিন্তু খুব পুরু পাত ভেদ করিয়া যাইতে পারে না। ক্যাথোড্ রশ্মির প্রকৃতি ক্রুক্‌স্ নলের মধ্যস্থ বায়ুর উপর মোটেই নির্ভর করে না; যে-কোনো গ্যাসই ব্যবহৃত হউক না কেন, ইহাদের ধর্ম্মের ও গুণের কোনো পরিবর্ত্তন হয় না। আবিষ্কর্ত্তা ক্রুক্‌স্-প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ দেখিলেন যে, ক্যাথোড্ রশ্মি একপ্রকার কণা-প্রবাহ মাত্র। কণিকাগুলিতে কঠিন তরল বা বায়ব কোনো পদার্থের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় নাই। কাজেই আবিষ্কর্ত্তা উহাদিগকে পদার্থের চতুর্থ অবস্থা বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। আধুনিক গবেষণার ফলে জানা গিয়াছে যে, তাহারা আকারে ও গুরুত্বে লঘুতম পরমাণু অপেক্ষাও সহস্রগুণ ক্ষুদ্র ও ঋণতড়িৎবিশিষ্ট। এই অতি ক্ষুদ্র তড়িৎ-কণাগুলি বর্ত্তমান কালে ইলেক্ট্রন্ বা অতিপরমাণু নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

ক্রুক্‌স্ নলের মধ্যে সাধারণ ক্যাথোড্ বা প্রতিলোম মেরুর পরিবর্ত্তে ছিদ্র-বিশিষ্ট ক্যাথোড্ ব্যবহার করিয়া গোল্ড্‌ষ্টাইন্ (Goldstein) একপ্রকার নূতন রশ্মি আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহাদের গতি সরল হইলেও ইহা ক্যাথোড্ রশ্মির বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয় এবং গতির বেগ অপেক্ষাকৃত অল্প। বিদ্যুৎ-পরিমাপক যন্ত্রের (electroscope) সাহায্যে দেখা গিয়াছে যে, ইহা ধনাত্মক তড়িৎপূর্ণ, সেজন্য ইহাদিগকে ধনাত্মক রশ্মি বা positive ray বলা হয়। ইহাদের গতি চুম্বকের প্রভাবে সামান্য-পরিমাণে বাঁকিয়া যায়। আরও দেখা গিয়াছে যে, কোনো পদার্থের উপর ক্যাথোড্ অথবা ধনাত্মক রশ্মি পতিত হইলে র‍্যণ্ট্‌গেন্ রশ্মির উদ্ভব হয়। এইসমস্ত পরীক্ষা (experiments) হইতেই আভাস পাওয়া যায় যে, পদার্থমাত্রেই ঋণাত্মক ও ধনাত্মক বিদ্যুৎ হইতে উৎপন্ন ও সকল পদার্থেই ইলেকট্রন্ বর্ত্তমান। এইপ্রসঙ্গে একটি অতি পুরাতন অথচ নব বিজ্ঞান-সম্মত মতের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই মতবাদের সৃষ্টি করেন অ্যানেক্সাগোরাস্ (Anaxagoras)। তিনি অ্যারিস্‌টট্‌লের পূর্ব্ববর্ত্তী ও খ্রীষ্টপূর্ব্ব পঞ্চ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার মতে আদিতে শৃঙ্খলা ছিল না, নিয়ম ছিল না, কোনো মৌলিক পদার্থ ছিল না, শুধু একপ্রকার জড়-কণিকা ছিল। তিনি এই জড়কণিকাকে Homeomery নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। সৃষ্টির সময় কোনো বুদ্ধিমান পুরুষ এই সময়ে জড়পিণ্ডগুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও নির্দ্দিষ্টভাবে সংযোজিত করিলে জড় পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছিল। একটি Homeomery অন্যটি হইতে বিভিন্ন নয়, বিভিন্নসংখ্যক Homeomeryর সমবায়ে বিভিন্ন পদার্থের উৎপত্তি হয়। এই Homeomery-বাদের সহিত আধুনিক বিজ্ঞানের অতিপরমাণুবাদের (electron-theory) খুব সাদৃশ্য আছে। ক্রুক্‌সও এইপ্রকারের একটা বিশ্বরচনার স্বপ্ন বীক্ষণাগারে বসিয়া দেখিয়াছিলেন। তাঁহার মনে হইয়াছিল যে, তাঁহার আবিষ্কৃত সূক্ষ্ম কণাগুলি যেন কোনো অজ্ঞাত শক্তিতে একত্র হইয়া হাইড্রোজেনের পরমাণু রচনা করিতেছে। তাহারই সহিত আবার কতকগুলি নূতন কণিকা অল্পাধিক-পরিমাণে মিলিত হইয়া গন্ধক, পারদ, লৌহ, স্বর্ণাদির সৃষ্টি করিতেছে ও সমবেত কণিকার সমষ্টি অত্যন্ত অধিক হইয়া পড়িলে ইউরেনিয়াম্ প্রভৃতি গুরু ধাতুর সৃষ্টি হয়। স্বপ্নের শেষে দেখিতে পাইলেন যে, সেই বিদ্যুৎবাহক কণিকা লঘু-গুরু পদার্থের জন্ম দিয়া ক্ষান্ত হইতেছে না, গুরু ধাতু হইতে গোলা-গুলির মতন ছুটিয়া বাহির হইয়া তাহাকে লঘুতর পদার্থে পরিণত

* ক্যাথোড্ ও র‍্যণ্ট্‌গেনরশ্মি-সম্বন্ধে ১৩৩১ সালের মাঘ মাসের প্রবাসীতে বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

করিতেছে। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে ক্রুকসের এই চিন্তা সত্যই স্বপ্নের ন্যায় ছিল, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর অবির্ভাবের সঙ্গে রেডিয়াম্ প্রভৃতি কতকগুলি সক্রিয় (radio-active) ধাতুর আবিষ্কারে স্বপ্ন সত্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে বেকুরেল (Becquerel) ইউরেনিয়াম-যুক্ত যৌগিক পদার্থ লইয়া নানাবিধ পরীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি আলোক-বিকীরণকারী (phosphoroscent) ইউ-রেনিয়াম্-গঠিত পদার্থের একটি খণ্ড তুইখানি কালো কাগজে আবৃত রাখিয়া তাহার সম্মুখে একটি ফোটোগ্রাফের কাচ রাখিয়া দেন। চব্বিশ ঘণ্টা পরে কাচটি ক্রমবিকশিত (develop) করিয়া দেখা গেল যে,প্রস্তর-খণ্ডের একটি ছবি উঠিয়াছে। ইহা হইতে বোঝা গেল যে, ইউরেনিয়াম্ হইতে এমন-এক-প্রকার কিরণ বিকীর্ণ হয়, যাহা সাধারণ আলোর পক্ষে অস্বচ্ছ, কৃষ্ণবর্ণের কাগজ ভেদ করিয়া যাইতে পারে এবং ফোটোগ্রাফের কাঁচের উপরে অবস্থিত রৌপ্য-ঘটিত পদার্থের সঙ্গে রাসায়নিক প্রক্রিয়া করে। যে-সকল পদার্থ হইতে এরূপ কিরণ বিকীর্ণ হয় তাহাদের নাম দেওয়া হইল কিরণ-বিকীরণকারী বা সক্রিয় (Radio-active) পদার্থ। বেকুরেল দেখাইলেন যে, তড়িৎ-পরিমাপক যন্ত্রের (electroscope) সাহায্যে প্রত্যেক সক্রিয় পদার্থের তেজোবিকীরণের ক্ষমতার পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে।

ফ্রান্সের বিখ্যাত পণ্ডিত পরলোকগত কুরি সাহেব ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী মাদাম কুরি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে বোহিমিয়ার (Bohemia) অন্তঃপাতী জোয়াকিমস্টাল (Joachimstahl) হইতে আনীত পিচ্ ব্লেণ্ড (pitch-blende) নামক আকরিক পদার্থের কিরণ-বিকীরণ-ক্ষমতা ইউরেনিয়াম হইতে অনেকগুণ বেশী; তাঁহারা অনুমান করিলেন যে ঐ আকরিক পদার্থের মধ্যে কোনো নূতন অজ্ঞাত মৌলিক পদার্থ আছে। নানাপ্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়ার পর পাঁচ টন পিচ্-ব্লেণ্ড্ হইতে একগ্রাম একটি নূতন মৌলিক পদার্থ পাওয়া গেল। দেখা গেল ইহা ইউ-রেনিয়াম্ অপেক্ষা দশলক্ষগুণ সক্রিয় (radio-active), এই-জন্য উহার নাম দেওয়া হইল রেডিয়াম (radium)।

সকল সক্রিয় পদার্থই কিরণ বিকীরণ করে। বেকুরেলের সম্মানার্থ রশ্মিগুলিকে "বেকুরেল রশ্মি" নামে অভিহিত করা হইল। পরে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গেল যে, বেকারেল-রশ্মি তিন-প্রকার রশ্মির সংমিশ্রণে উৎপন্ন; এই রশ্মিগুলিকে গ্রীক বর্ণমালার প্রথম তিনটি অক্ষরের নামানুসারে আল্ফা (Alpha,), বিটা (Beta,) ও গামা (Gamma) নামে অভিহিত করা হইয়াছে। চুম্বকের সাহায্যে বেকুরেল রশ্মি ত্রিধা বিভক্ত করা যায়, যে একভাগ চুম্বকের দিকে আকৃষ্ট হয়, ইহার নাম বিটা রশ্মি, অপরভাগ চুম্বকের দিকে আকৃষ্ট হয় না, বরং বিকর্ষিত হয় (deflected) হয়,এই ভাগের নাম আল্ফা রশ্মি; তৃতীয় ভাগের কোনোরূপ পরিবর্ত্তন হয় না,এই ভাগকে গামা রশ্মি বলা হয়। আল্ফা রশ্মির সঙ্গে ধনতড়িৎযুক্ত হিলিয়াম্ নামক গ্যাসের পরমাণুর সাদৃশ্য আছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ক্যাথোড্ রশ্মি দ্রুতগামী ঋণতড়িৎ-বিশিষ্ট তড়িৎ কণা (electron) ব্যতীত কিছুই নয়। সুতরাং পরমাণু ভাঙিয়া-চুরিয়া যে তড়িৎ-কণা পাওয়া যায়, সক্রিয় পদার্থ হইতেও সেই তড়িৎ-কণা পাওয়া যায়, তবে সক্রিয় পদার্থের তড়িৎ-কণা বিকীরণ বৈজ্ঞানিকেরা নিজেদের শাসনাধীনে আনিতে পারেন নাই। সক্রিয় পদার্থ সর্ব্বদা স্বেচ্ছায় আলোক, উত্তাপ, তড়িৎ-কণা বিকীরণ করে কোনোরূপ বাহ্য শক্তি-দ্বারা এই আলোক, উত্তাপ, তড়িৎ-কণা বিকীরণ শক্তির প্রতিরোধ করা যায় না। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে কিরণ বিকীরণ করিয়া রেডিয়াম্ নাইটন্ ও হিলিয়াম্ এই দুই-প্রকার গ্যাসে পরিণত হইতেছে। নাইটন্ আবার রেডিয়াম্ এ (Radium A)-নামক আর এক মূল পদার্থ ও হিলিয়ামে পরিণত হইতেছে। এইরূপে রূপান্তরিত হইতে-হইতে অবশেষে রেডিয়াম্ সীসকে পরিণত হইতেছে।

এখন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, এই রূপান্তরিত হইবার ক্ষমতা বা সক্রিয় পদার্থের তড়িৎকণা বিকীরণ কতকাল ধরিয়া চলিবে? ইহার কি শেষ নাই? সক্রিয় পদার্থগুলি কি এক অসীম শক্তির ভাণ্ডার? এ শক্তির কি অপচয় নাই? বৈজ্ঞানিকগণ ইহার উত্তর দিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে সক্রিয় পদার্থের এই সক্রিয়তা একদিন

শেষ হইবে। প্রাণিজগতের প্রাণীগণের মতন জড় জগতের এই সক্রিয় পদার্থগুলিও মৃত্যুর নিয়মাধীন। রেডিয়াম্ এখন বৈজ্ঞানিকের, গৃহস্থের, ব্যবসায়ীর সহস্র কার্য্যে নিযুক্ত হইতেছে, কিন্তু রেডিয়াম্ চিরজীবী নহে, ২৫০০ বৎসর পরে ইহার লীলা খেলার শেষ হইবে। আজ যে রেডিয়াম্ জড় পদার্থের একছত্র সম্রাট্, ইহার শেষ পরিণতি হইবে সীসকে।

আবার মনে প্রশ্ন আসিতে পারে যে, ২৫০০ বৎসর পৃথিবীর বয়সের তুলনায় কিছুই নয়, তবে রেডিয়াম্ আজ পর্য্যন্ত বাঁচিয়া আছে কি করিয়া? কি সঞ্জীবনী মন্ত্র-প্রভাবে ইহা মরিয়াও মরিতেছে না? ইহার অনুসন্ধান করিতে গিয়া বৈজ্ঞানিকেরা আবিষ্কার করিয়া বসিয়াছেন যে, ইউরেনিয়াম্ হইতেছে রেডিয়ামের পূর্ব্ব পুরুষ। যেখানেই ইউরেনিয়াম্ পাওয়া যায়, সেইখানেই রেডিয়ামের অস্তিত্ব দেখা যায়। সুতরাং ইউরেনিয়াম্ ইলেক্ট্রন ত্যাগ করিয়া ক্ষয় পাইয়া যে লঘুতর ধাতু রেডিয়ামের উৎপত্তি করে, এ-বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। ইউরেনিয়ামও চির-জীবী নয়, ইহারও কালে ধ্বংস হইবে, কিন্তু হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে ইহার জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত বয়স গণনা করিলে তাহা আট শত কোটি বৎসর হওয়া উচিত। পৃথিবীর বয়স ইহার তুলনায় কিছুই নয়। রেডিয়াম্ যেরূপ সীসকে রূপান্তরিত হইতেছে, সেইরূপ ইউরেনিয়াম্ রেডিয়ামে পরিণত হইতেছে। এই ভাঙা-গড়া, জন্ম-মৃত্যু বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া অবিরাম গতিতে চলিয়াছে। এইজন্যই পৃথিবীতে রেডিয়ামের ভাণ্ডার নিঃশেষিত হয় নাই।

বংশের পরিচয় দিতে গেলে বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম-তালিকা শীর্ষে স্থান পায়। তা'র পর পুত্র, কন্যা, পৌত্র, দৌহিত্রের নাম যথাক্রমে বংশ-তালিকায় লেখা হইয়া থাকে। ইউরেনিয়ামের এক বংশ-তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে। ইউরেনিয়াম্ জ্ঞাত ও অজ্ঞাত, ধাতু ও অধাতু মৌলিকের মধ্যে গুরুত্বে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কাজেই ইহাকে প্রতিষ্ঠাতার আসন দিতে হইয়াছে। তাহার পর ইহা হইতে ইলেক্ট্রন বিচ্যুত হইয়া কোনো কোনো পদার্থের উৎপত্তি হইল দেখিয়া তাহাদিগকে তালিকাভুক্ত করা গিয়াছে। দেখা গিয়াছে যে, সক্রিয় পদার্থ আল্‌ফা রশ্মি পরিত্যাগ করিয়া যে নূতন মৌলিকে পরিণত হয়, উহার পরমাণবিক গুরুত্ব পিতার পরমাণবিক গুরুত্ব হইতে ৪ কম। আর বিটা রশ্মি পরিত্যাগ করিবার পর পিতা-পুত্রের পরমাণবিক গুরুত্ব একই থাকে, কিন্তু পিতার প্রকৃতি হইতে পুত্রের প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এইপ্রকারে ইউরে-নিয়ামের পুত্র-পৌত্রাদির নামসহ এক প্রকাণ্ড বংশ-তালিকা পাওয়া গিয়াছে। সন্তানগণের মধ্যে কে কোন্ খনিতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কি আকারে আছে, আজও তাহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই; তথাপি উহার বংশধরের সংখ্যা প্রায় পঁচিশ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উহাদের কেহ-কেহ ইউরেনিয়ামের মতন দীর্ঘ-জীবী, কেহ বা আবার জন্মের কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইহাদের সকলেই মূল পদার্থ অর্থাৎ খাঁটী কুলীন, কিন্তু ভাঙিয়া-চুরিয়া মৌলিকান্তরে পরিণত হইয়া ইহারা নিজের কুল-গৌরব হারাইতেছে।

বংশ-তালিকা হইতে দেখা যায় যে, রেডিয়াম্ রূপান্তরিত হইয়া নাইটনে পরিণত হয় এবং নাইটন্ বহু তাপ ত্যাগ করিয়া হিলিয়াম্ ও রেডিয়াম্‌এ-নামক পদার্থে রূপান্তরিত হয়। এ সমস্ত ভোজ-বাজি শক্তিরই লীলা। র‍্যাম্‌জে সাহেব হিসাব করিয়া দেখাইলেন যে, এক ঘন-সেন্টিমিটার (1 cubic centimetre) স্থানে আবদ্ধ নাইটন্ বিশ্লিষ্ট হইয়া হিলিয়াম্ ইত্যাদিতে পরিণত হইলে সেই আয়তনের চল্লিশ লক্ষগুণ হাইড্রোজেন পোড়াইলে যে তাপ উৎপন্ন হয়, সেইপ্রকার তাপ আপনা হইতে জন্মে। তাঁহার ধারণা ছিল যে, এই বিপুল শক্তিরাশি খুব নিবিড়ভাবেই রেডিয়ামে লুক্কায়িত থাকে এবং রেডিয়াম্ নিজেকে ক্ষয় করিয়া যখন লঘুতর পদার্থে পরিণত হয় তখন ঐ শক্তিই তাপরূপে প্রকাশিত হয়। র‍্যাম্‌জে সাহেবের বিশ্বাস হইল যে ব্রহ্মাণ্ডের সকল বস্তুতেই এই বিশাল শক্তিস্তূপ সঞ্চিত আছে। এবং সেই সযত্ন-রক্ষিত শক্তি-ভাণ্ডারের দ্বার খুলিয়া প্রকৃতি-রাণী জগতে ভাঙা-গড়ার ভেল্কি দেখান। রেডিয়ামের ন্যায় গুরুধাতু যখন তাহার অন্তর্নিহিত শক্তি পরিত্যাগ করিয়া লঘুতর পদার্থে পরিণত হয়, তখন লঘু পদার্থের উপরে প্রচুর শক্তি

প্রয়োগ করিয়া তাহাকে গুরুতর পদার্থে পরিণত করা সম্ভব ইহা তাঁহার মনে হইল। এই রাসায়নিক প্রক্রিয়াটি আবিষ্কার করিলে লৌহকে স্বর্ণে পরিবর্ত্তন করা কঠিন হইবে না।

প্রাকৃতিক কার্য্যের প্রণালী আবিষ্কার করা কঠিন নয়, কিন্তু যে-সকল উপকরণ সংগ্রহ করিয়া এবং যে অপরিমিত শক্তি প্রয়োগ করিয়া প্রকৃতি-রাণী জগতের কার্য্য চালাইয়া থাকেন, তাহার অনুকরণ করা সকল সময়ে মানব-বিশ্বকর্ম্মার পক্ষে সম্ভব হয় না। সেইজন্যই কৃত্রিম উপায়ে শক্তি প্রয়োগ করিয়া লঘু পদার্থকে গুরু পদার্থে পরিণত করা সম্ভব হইল না। রেডিয়াম্ বিযুক্ত হইবার সময় যে বিপুল শক্তি দেহ হইতে নির্গত করে, সে-প্রকার শক্তিরও সন্ধান পাওয়া গেল না। র‍্যাম্‌জে ভাবিলেন, নাইটন্ বিযুক্ত হইবার সময় যে বিপুল শক্তিরাশি দেহচ্যুত করে, তাহা যদি কোনো উপায়ে অপর লঘু পদার্থের উপর প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে হয়ত সেই লঘু বস্তু কোনো গুরু পদার্থে পরিণত হইতে পারে। এই ধারণায় তিনি বিশুদ্ধ জলে নাইটন নিক্ষেপ করিলেন। জল বিশ্লিষ্ট হইয়া হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনে পরিণত হইতে লাগিল, নাইটন্ হইতে হিলিয়ামের উৎপত্তি হইতে লাগিল। অবশেষে দেখা গেল, এই তিনটি গ্যাস ছাড়াও নিয়ন (Neon) নামক আর একটি মূল পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে। র‍্যাম্‌জে সাহেবের বিস্ময় ও আনন্দের সীমা রহিল না। জলের হাইড্রোজেন বা নাইট্রোজেনকে যখন গুরুভার-বিশিষ্ট নিয়নে পরিণত করা গেল, তখন অদূর ভবিষ্যতে লৌহকে স্বর্ণে পরিণত করাও সম্ভবপর বলিয়া তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল। আর একটি পরীক্ষায় র‍্যাম্‌জে ও ক্যামেরন সাহেব দেখিলেন যে, তাম্র-ঘটিত একটি যৌগিক পদার্থ (copper nitrate) হইতে আর্গন-নামক একটি নূতন গ্যাসের সৃষ্টি হইতেছে এবং থোরিয়াম ও জিরকোনিয়াম্-নামক ধাতু হইতে অঙ্গারের জন্ম হইয়াছে। এই অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কার লইয়া বৈজ্ঞানিক মহলে বিরাট্ আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু রাদারফোর্ড, সডি, মাদাম ক্যুরি প্রভৃতি বিশেষজ্ঞগণও ইহাতে বিশেষ আস্থা স্থাপন করেন নাই। র‍্যাম্‌জে সাহেবের আনন্দ স্থায়ী হইল না, পূর্ব্বোক্ত বৈজ্ঞানিকগণ দেখাইলেন যে, যন্ত্রাদির দোষে (leak in the apparatus) এবং দ্রব্যাদির অবিশুদ্ধতার জন্যই র‍্যাম্‌জে সাহেব নূতন পদার্থের সন্ধান পাইয়াছিলেন। পরীক্ষা-কালে জলের মধ্যে বাতাস প্রবেশ করিয়াছিল, বাতাসের নিয়নকে র‍্যাম্‌জে সদ্য উৎপন্ন নিয়ন বলিয়া ভ্রম করিয়াছিলেন।

র‍্যাম্‌জে সাহেবের অকৃতকার্য্যতায় বৈজ্ঞানিকেরা নিরুৎসাহ হইলেন না। তাঁহারা আবার নূতন শক্তির সন্ধান করিতে লাগিলেন। অবশেষে রাদারফোর্ড নাইট্রোজেনের মধ্যে দ্রুতগামী আল্‌ফা রশ্মি প্রয়োগ করিয়া দেখাইলেন, যে নাইট্রোজেন-পরমাণু তিনটি হিলিয়াম্ ও দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণুর সমষ্টি মাত্র। আল্‌ফা রশ্মির আঘাতে নাইট্রোজেন-পরমাণু ভাঙিয়া গিয়া হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম্ পরমাণুতে পরিণত হয়। এইরূপে বোরোণ, ক্লোরিন, সোডিয়াম্, অ্যালুমিনিয়াম্ ও ফস্‌ফরাসকেও হিলিয়াম্ ও হাইড্রোজেনে পরিণত করা হইয়াছে। রাদার্‌ফোর্ডের এই আবিষ্কারে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। সকল বৈজ্ঞানিকই ইহাতে আস্থা স্থাপন করিয়াছেন। এতদিনে মানব-বিশ্বকর্ম্মাও প্রকৃতি-রাণীর অনুকরণ করিয়া গুরু পদার্থকে লঘু পদার্থে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু লঘু পদার্থকে গুরু পদার্থে পরিণত করিবার উপায় আবিষ্কৃত হয় নাই, সুতরাং লঘু লৌহকে স্বর্ণে পরিণত করিবার আশা এখন সুদূরপরাহত বলিয়া মনে হয়, কিন্তু গুরু সীসক ও পারদকে লঘুতর স্বর্ণে পরিণত করা আর অসম্ভব নয়।

আধুনিক গবেষণায় রাদারফোর্ড ও বোর-কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, প্রতি পরমাণু গোলকের মধ্যে একটি কোষ (nucleus) বর্ত্তমান। এই কোষের মধ্যে সমগ্র সংযোগ তড়িৎ ও কিয়দংশ ঋণাত্মক তড়িৎ সঞ্চিত আছে। এই কোষকে কেন্দ্র করিয়া সৌর জগতের গ্রহের ন্যায় ইলেক্ট্রনগুলি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কোষটির মধ্যে আবার অনেকগুলি ধনতড়িৎ-সংযুক্ত হিলিয়াম্-পরমাণু থাকে। হিলিয়ামের পরমাণবিক গুরুত্ব ৪। পারদের আণবিক গুরুত্ব প্রায় ২০১ এবং স্বর্ণের গুরুত্ব প্রায় ১৯৭। পারদের পরমাণুর কোষ হইতে একটি হিলিয়াম পরমাণু

বিচ্যুত করিতে পারিলে স্বর্ণের উৎপত্তি অসম্ভব হইবে না। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া বার্লিনের শার্লোটেন্‌বুর্গ্‌ টেক্‌নিকেল কলেজের (Charlottenburg Technical College) অধ্যাপক ডাক্তার মিথে (Miethe) পারদের মধ্যে অত্যধিক চাপে বিদ্যুৎ পরিচালনা (high tension electric discharge) করেন। অনেক দিন ধরিয়া বিদ্যুৎ পরিচালনা করিবার পর পারদের মধ্যে সামান্য-পরিমাণ স্বর্ণ পাওয়া গিয়াছে। বিশুদ্ধ পারদ ব্যবহৃত হইয়াছিল ও পূর্ব্বে ইহার মধ্যে মোটেই স্বর্ণ ছিল না, সুতরাং অনুমান করা গিয়াছে যে পারদ পরমাণু হইতেই স্বর্ণ-পরমাণুর সৃষ্টি হইয়াছে। স্বর্ণের পরিমাণ অতি অল্প। লক্ষভাগ পারদের একভাগ মাত্র স্বর্ণে পরিণত হইয়াছে। অ্যাল্‌কেমিষ্ট্‌দের স্বপ্ন ও সাধনা সফল হইয়াছে। লৌহ না হউক, ইতর-ধাতু পারদ স্বর্ণে পরিণত হইয়াছে। তবে স্বর্ণের পরিমাণ অতি অল্প বলিয়া মুদ্রা-বিভ্রাটের আশঙ্কা নাই।

একদল রাসায়নিক বলেন যে, পৃথিবীর আদিতে ইউরেনিয়াম্‌ বা তাহা অপেক্ষাও এক গুরু পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাই ভাঙিয়া-চুরিয়া বিভিন্ন ধাতু ও পদার্থে পরিণত হইয়াছে। ইহাকে অবরোহণবাদ (devolution theory) বলা যাইতে পারে। ওদিকে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ বলেন যে, জগতের গঠন ক্রমশঃ সরল হইতে জটিল হইতেছে। দেখা গিয়াছে যে, নক্ষত্র যতই শীতল হয়, ততই তাহাতে নূতন-নূতন মৌলিকের আবির্ভাব হয়। যে-সমস্ত নক্ষত্র অতিশয় উত্তপ্ত, তাহাতে মাত্র হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম্‌ এই দুই লঘুতম পদার্থ বিদ্যমান, অপেক্ষাকৃত শীতল নক্ষত্রে ক্যাল্‌সিয়াম্‌, ম্যাগ্‌নেসিয়াম্‌ প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত গুরু মৌলিক পদার্থ পাওয়া যায় এবং নক্ষত্র আরও শীতল হইলে আরও গুরুভার ধাতুর অস্তিত্ব পাওয়া যায়। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের এই ক্রমবিকাশ-বাদ (evolution theory), যেমন পরীক্ষার উপর অবস্থিত, রাসায়নিকগণের অবরোহণ-বাদও (devolution theory) সেইরূপ পর্য্যবেক্ষণের উপর প্রতিষ্ঠিত।

আমেরিকার কতিপয় বৈজ্ঞানিক পৃথিবীতেই নক্ষত্রের মতন উত্তাপের সৃষ্টি করিয়া গুরু পদার্থ হইতে লঘু পদার্থের সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিতেছেন। বৈদ্যুতিক চুল্লীতে এখন নানা পদার্থকে সেন্টিগ্রেডের ৪০০০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উষ্ণ করা যাইতেছে, কিন্তু এই উত্তাপে পরমাণুর কোনো পরিবর্ত্তন হয় না। সম্প্রতি শিকাগো নগরীতে উহল্‌সন্‌ বিজ্ঞানাগারে ১0,000 হইতে ৩০,০০০ ডিগ্রী উত্তাপ করিবার এক অভিনব পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে। অত্যধিক বৈদ্যুতিক চাপে (voltage) অধিক-পরিমাণ বৈদ্যুতিক প্রবাহ অতি ক্ষুদ্র ও অতি সূক্ষ্ম একটি ধাতব তারের মধ্যে চালনা করিয়া এই তাপের সৃষ্টি করা হইয়াছে। বিদ্যুৎ-প্রবাহের সঙ্গে-সঙ্গে বিস্ফোরণ ও এত ভীষণ নিনাদ হয় যে, তত্রস্থ সকল ব্যক্তিরই কর্ণ বিশেষভাবে আবৃত রাখিতে হইয়াছিল। প্রথম সেকেণ্ডের প্রথম ৩,০০,০০০ অংশ যে আলোক উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহা সূর্য্যালোক অপেক্ষা দুই শত গুণ প্রখর।

এই তাপ প্রয়োগ করিয়া হ্বেণ্ট্‌ (Wendt) ও ইরিওন (Irion) নামক দুই বৈজ্ঞানিক টাংস্‌টেন্‌-নামক গুরু ধাতু হইতে হিলিয়াম্‌ প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। তবে অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকই এই আবিষ্কারের সত্যতা-সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

এতক্ষণ কেবল গুরু হইতে লঘু পদার্থের উৎপত্তির কথা বলা হইল। লঘু পদার্থ হইতে গুরু পদার্থের উৎপত্তি অসম্ভব না হইলেও মানব-বিশ্বকর্ম্মার সাধ্যাতীত বলিয়া মনে হইয়াছিল, কিন্তু এই বিজ্ঞানের যুগে কিছুই অসম্ভব নয়। সম্প্রতি কেম্‌ব্রিজ বীক্ষণাগার হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, রাদারফোর্ডের পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি করিয়া ব্লাকেট (Blacket) ফোটোগ্রাফের সাহায্যে দেখাইয়াছেন যে, আল্‌ফা রশ্মির আক্রমণে নাইট্রোজেন-পরমাণু, হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম্‌-এর পরমাণুতে পরিবর্ত্তিত হইবার সঙ্গে-সঙ্গে নাইট্রোজেন-পরমাণুর কিয়দংশ আল্‌ফা-রশ্মির সহিত সংযুক্ত হইয়া গুরুভার অক্সিজেন পরমাণুতে রূপান্তরিত হইতেছে। এ-পরীক্ষা এখন বিচারাধীন। এ-পরীক্ষার ফল সত্য হইলে লঘু হইতে গুরু ও গুরু হইতে লঘু উভয়-প্রকার পরিবর্ত্তনই সম্ভব হইবে। সুতরাং অ্যাল্‌কেমিষ্ট্‌রা লৌহকে স্বর্ণে পরিণত করিবার যে সাধনা আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া করেন নাই। লৌহকে স্বর্ণে পরিণত করিবার পরশ-পাথর এই ভূমণ্ডলে এবং প্রকৃতির মধ্যেই আছে।

হিন্দী সাহিত্যে কবি-সমাদর

শ্রী সূর্য্যপ্রসন্ন বাজপেয়ী চৌধুরী

আমার লিখিত "ভারতী"তে প্রকাশিত "হিন্দী সাহিত্য ও ভাষা" প্রবন্ধের একজায়গায় লিখেছিলুম, "হিন্দীভাষায় কাব্যগ্রন্থ ও কবিতা অজস্র আছে। অনেক বড়-বড় কবি বহু প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন। নানা ছন্দের এত কবিতা বোধ হয় অন্য ভাষাতে কমই আছে। পূর্ব্বে কবিগণের সম্মান ও আদর যে কত বেশী ছিল এবং লোকে যে তাদের কি শ্রদ্ধার চোখে দেখ্‌ত, তা জান্‌লে এদেশকে শতমুখে প্রশংসা কর্‌তে হয়। রইস্ ও রাজাদের সভায় বরাবরই একজন করে প্রসিদ্ধ কবি থাক্‌তেন। এক-একটি নতুন ছন্দের জন্য একজন কবি ছত্রিশ লাখ টাকা পর্য্যন্ত পেয়েছেন"...

হিন্দীভাষায় পুরানো ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই চোখে পড়ে কবিদের প্রতি জনসাধারণের অবিচলিত শ্রদ্ধা, অপরিসীম সমাদর ও অগাধ সহানুভূতি। কবি যে prophet, মানব জাতির মহা-হিতৈষী ও মানব-মনের নিত্য নব-নব আনন্দের সৃজনকর্ত্তা—তা এরা খুব ভালো ক'রে বুঝে নিয়েছিল। কবিকে যথোপযুক্ত সম্মান করা, তাঁহার মনের শান্তি বিধান করা, দারিদ্র্য ও নানা-প্রকারের সাংসারিক কষ্ট যাতে কবিকে না সইতে হয়, তা'র জন্য ধনী গরীব সবাই মিলে নানা-প্রকারের ব্যবস্থা করা, এ ছিল সেকালের একটা কাজ। এ কবি-সমাদর যেম্‌নি অসীম তেম্‌নি আন্তরিকও ছিল।

হিন্দীভাষায় অতীত যুগ অত্যন্ত উজ্জল ও গৌরবের ছিল। এক-একজন মহাকবি তাঁদের অমর কাব্যগ্রন্থ রচনা ক'রে দেশবাসীর নিকট চির-আদরণীয় হ'য়ে রয়েছেন। তখনকার দিনে একদেশের কবিকে অন্যদেশের লোকে চিন্‌ত না। কিন্তু কোনো-কোনো হিন্দী-কবির প্রতিষ্ঠা এতদূর বেড়ে গিয়েছিল যে ভিন্ন-ভিন্ন প্রদেশের লোকেও তাঁকে পরম সম্মান ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছে। চন্দ, সুরদাস তুলসীদাস, মীরাবাঈ, কবীর, গুরু গোবিন্দসিংহ, রহীমের কথা কোন্ প্রদেশের ভারতবাসীরা না শুনে থাক্‌বেন?

হিন্দী-কবিদের মধ্যে কবিবর ভূষণ সকলের চেয়ে বেশী সম্মান ও সমাদর পেয়েছেন। শোনা যায়, তিনি যেখানেই গিয়েছেন সেখানেই অপরিমিত ধন-রত্ন, হাতী, ঘোড়া, পাল্‌কী নানা-প্রকারের পুরস্কার লাভ করেছেন। তিনি আওরঙ্গজেব্ বাদ্‌শার সময়ের কবি। দেশবাসীরা তাঁর কবিত্বে মুগ্ধ হ'য়ে তাঁকে কবি-ভূষণ উপাধি দিয়েছিল এবং তখন থেকেই তিনি এত লোকপ্রিয় হ'য়ে উঠেছিলেন যে সবাই তাঁকে ভূষণ-কবি বলে ডাক্‌ত। তাঁর আসল নামটি কি ছিল, তা এখনও অজ্ঞাত। গরীবের ঘরে তাঁর জন্ম হয়েছিল এবং শৈশবে তিনি বড় অলস ছিলেন। তাঁর কবিত্ব-শক্তি পুষ্পিত, পল্লবিত ও অবশেষে মহা মহীরুহ-রূপে পরিণত হয় ভ্রাতৃবধূর ভর্ৎসনায়। বৌদি তাঁকে একদিন কিছু খেতে না দেওয়ায় তিনি রাগ ক'রে বাড়ী ছেড়ে চ'লে যান। বহুদিন পরে মহাযশস্বী কবি হ'য়ে বাড়ী ফিরে এসে ইনি নাকি ভ্রাতৃবধূকে এক লাখ টাকা দেন।

এঁরা ছিলেন চার ভাই—চিন্তামণি, ভূষণ, মতিরাম ও নীলকণ্ঠ। চার জনই অসাধারণ কবি ছিলেন, কিন্তু তা'র মধ্যে ভূষণ ছিলেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আওরঙ্গজেব্ বাদ্‌শার দরবারে থেকে ভূষণ কবিতা রচনা ক'রে তাঁকে শুনাতেন। সেখানে তাঁর ভাই চিন্তামণিও থাক্‌তেন। কিন্তু আওরঙ্গজেব্ হিন্দু-বিদ্বেষী হওয়ার দরুন্ তিনি তাঁর সভা ত্যাগ ক'রে ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের সভাকবি নিযুক্ত হন। কথিত আছে, শিবাজী তাঁর কবিতা শুনে তাঁকে লক্ষ-লক্ষ টাকা ও বহু জায়গীর দিয়েছিলেন। একবার শিবাজীর দর্‌বার থেকে বাড়ী ফির্‌বার সময় ভূষণ-কবি বুঁদেলার মহারাজা ছত্রশালের বাড়ী গিয়েছিলেন। বহু-মানভাজন ভূষণ-কবির যথোচিত সম্বর্দ্ধনা ক'রে বিদায় দেওয়ার সময় মহারাজা কবির পাল্‌কীর দণ্ড নিজ স্কন্ধে ধারণ করেছিলেন। ভূষণ-কবির রচিত প্রধান গ্রন্থ হচ্ছে "ভূষণ হজারা" ও "ভূষণ উল্লাস" ইত্যাদি।

কবিবর হরিনাথ শাহাজান বাদ্‌শার অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন। হরিনাথের কবিতা শু'নে তিনি খুব মুগ্ধ হ'য়ে যেতেন এবং বহু ধন ও জায়গীর তাঁকে দান ক'রে পুরস্কৃত করেছিলেন। শাজাহান বরাবরই সৌন্দর্য্যের উপাসক ছিলেন। বাদ্‌শা তাঁকে অনেকবার হাতী, রথ ও জায়গীর দান করেছিলেন। হরিনাথ যেম্‌নি অতুল প্রতিভাশালী কবি ছিলেন তেম্‌নি মহাপ্রাণ দাতা ছিলেন। শোনা যায় একবার তিনি অম্বরের রাজা মেওয়ার মানসিংহকে কবিতা শুনিয়ে মহা খুসী করেছিলেন। রাজা আনন্দিত হ'য়ে তাঁকে একলাখ টাকা ও একটি হাতী পুরস্কার দিয়েছিলেন। পথে ফির্‌বার সময় এক গরীব ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখা। সে একটি কবিতা রচনা ক'রে হরিনাথকে শোনালে। কবি হাতীতে চ'ড়ে যাচ্ছিলেন। তখনই তিনি হাতীর হাওদা থেকে নেমে তাঁর সঙ্গে যা ছিল সব ঐ গরীব ব্রাহ্মণকে দান ক'রে দিলেন আর নিজে খালি-হাতে বাড়ী ফিরে এলেন। এম্‌নি দয়ার কাজ তিনি অনেক করেছিলেন।

কবিবর গঙ্‌্ আক্‌বর বাদ্‌শার সময়ের কবি এবং তাঁর দর্‌বারে গঙ্‌্-কবির খুব প্রতিষ্ঠা ছিল।

দেশের রাজা-রাজড়া ও ধনী ব্যক্তিগণের অনেকেই গঙ্‌্-কবির কাব্যরচনার জন্য নানা-প্রকারের পুরস্কার দিয়েছিলেন।

আক্‌বর বাদ্‌শা কবিদের এবং জ্ঞানী গুণী-লোকদের একজন মহাপ্রাণ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তাঁর "নবরত্নের" অন্তর্গত সদস্যগণও জ্ঞানী-গুণীর পরম সমাদর কর্‌তেন। আক্‌বর বাদ্‌শার "নবরত্নের" অন্যতম রত্ন নবাব-বাহাদুর আব্‌দুল রহিম খান্‌খানা সাহেবের সঙ্গে গঙ্‌্-কবির গভীর সৌহার্দ্দ ছিল। রহীম নিজে একজন হিন্দী ভাষার বিখ্যাত কবি ছিলেন। তাঁর রচিত কবিতা অতি উঁচু-ধরণের। সম্রাটের পরমপ্রিয়, সাম্রাজ্যের একজন উচ্চ-পদাধিকারী, দানবীর, ভক্ত, রসিক কবি রহিমের কীর্ত্তির কথা লোকমুখে আজও ভক্তির সহিত বর্ণিত হ'য়ে থাকে। তিনি গুণের আদর জান্‌তেন আর গুণের পাত্র যে জাতিরই হোক না কেন তা'র জন্য তিনি কখনও পক্ষপাত কর্‌তেন না। লোকমুখেই শোনা যায় যে গঙ্‌্-কবির কবিতা শুনে একবার তিনি এতই প্রীত ও মুগ্ধ হন্ যে তিনি তাঁকে ছত্রিশ লাখ টাকা দান ক'রে ফেলেন। এত বড় দানের কথা আর কোনো কবির ভাগ্যে জুটেছে ব'লে শোনা যায়নি।

"রহিম-সত্‌সঙ্গ" ব'লে তিনি একখানি কাব্য রচনা করেছিলেন; তা ছাড়া কবিতায় নতুন ছন্দের সৃষ্টিকর্ত্তা ব'লে তাঁর নাম হিন্দী সাহিত্যে অক্ষয়-অমর হ'য়ে থাকবে। ফার্‌সী ও আরবীর একটি শব্দও ব্যবহার না ক'রে প্রাঞ্জল হিন্দীতে তিনি অবাধে কবিতা রচনা ক'রে যেতেন। মনে হ'ত যেন সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ পণ্ডিতের লেখা।

"নবরত্নের" অন্যতম প্রধান রত্ন মহারাজা বীরবলও একজন মহাকবি ও গুণের সমঝ্‌দার্ ছিলেন। তিনি বহু কাবকে অনেক হাতী, ঘোড়া, পাল্‌কী, রথ ও জায়গীর দান করেছিলেন। বীরবলের সঙ্গে রহীমের মিত্রতা ছিল। বীরবলের আসল নাম ছিল মহেশ দাস। এক গরীব ব্রাহ্মণের ঘরে তাঁর জন্ম হয়েছিল। চরিত্র, বিদ্যা ও অসামান্য প্রতিভার বলে তিনি আক্‌বর বাদশাহের অতি প্রিয়পাত্র হয়েছিলেন। অনেক যুদ্ধে তিনি সেনা-পতির কাজও করেছিলেন। আক্‌বর তাঁকে বহু জায়-গীর ও মহারাজা উপাধি দিয়েছিলেন।

বীরবল ব্রজভাষায় কবিতা লিখ্‌তেন এবং তা যেমন সরল হ'ত তেমনি উচ্চভাবপূর্ণ হ'ত। লোকে বলে, কেশোদাস-কবির কবিতা-রচনায় মুগ্ধ হ'য়ে তিনি তা'কে ছয় লাখ্ টাকা দান করেছিলেন।

কবি-কেশোদাস হিন্দীভাষায় আর-একজন মহাকবি ছিলেন। ওড়ছার মহারাজা রামসিংহ তাকে নিজের সভা-কবি নিযুক্ত করেছিলেন। মহারাজার ভাই ইন্দ্রজিৎ সিংহের সহিত কবির বন্ধুত্ব ছিল এবং তিনি বহুবার কেশোদাসকে পুরস্কৃত করেছিলেন।

কবিদের অনেকেই নানাপ্রকারে দেশবাসীদের উপকার করার চেষ্টাও কর্‌তেন। নরহরি একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। তখন আক্‌বর বাদ্‌শা দিল্লীর সিংহাসনে সমাসীন। সে-সময় কসাইরা অসংখ্য গো-বধ ক'রে দেশের গো-ধন কমিয়ে দিচ্ছিল। একবার কসাইর হাত থেকে

কোনো রকমে পালিয়ে এসে একটি গরু কবি নরহরির বাড়ীতে আশ্রয় নেয়। কবির খুব দয়া হ'ল এবং দুঃখও হ'ল। তিনি একটুক্‌রা কাগজে দুলাইনের একটি কবিতা লি'খে গরুটির গলায় ঝুলিয়ে তা'কে আকবর বাদ্‌শার দর্‌বারে হাজির কর্‌লেন। বাদ্‌শা প্রকৃত ঘটনাটি জান্‌তে পেরে এতই দুঃখিত হয়েছিলেন যে তিনি গো-বধ-প্রথা একেবারেই উঠিয়ে দিয়েছিলেন। বাদ্‌শা কবিকেও বিশেষভাবে পুরস্কৃত করেছিলেন। আক্‌বর-বাদ্‌শার মতন গুণের সমঝ্‌দার মুসলমান বাদশাহের মধ্যে বোধ হয় আর একটিও পাওয়া যাবে না। জ্ঞানী-গুণীর সমাদর আর কোনো রাজার রাজ্যে এত বেশী ক'রে হয়নি।

আওরঙ্গজেব বাদ্‌শার পুত্র শাহজাদা মুয়জ্জমের প্রিয় কবি ছিলেন আলম। ইনি নানা-রকমের সমস্যাপূর্ত্তির কবিতা রচনা কর্‌তেন। তাঁর সমস্যা পূরণের অদ্ভুত ক্ষমতা দে'খে শাহজাদা তাঁকে অনেকবার পুরস্কৃত করেছিলেন।

আলমের বিবাহ হয়েছিল শেখের সঙ্গে। এ-বিবাহ যেম্‌নি বিচিত্র তেম্‌নি কবিত্বপূর্ণ। একবার আলম তাঁর পাগড়ীটি রং কর্‌বার জন্য এক টুক্‌রা কাগজে মুড়ে শেখ ব'লে একটি রং-ওয়ালীর (হিন্দীতে বলে রং রেজিন্) দোকানে পাঠিয়ে দেন। সেই পাগড়ী বাঁধা কাগজে কবি আলমের রচিত কবিতার একটি লাইন লেখা ছিল—অনেক চেষ্টা ক'রেও তিনি পরের লাইনটি লিখে কবিতার মিল করতে পারেননি। শেখ পাগড়ী খোল্‌বার সময় ঐ কাগজ দেখ্‌লে এবং পরের লাইনটি তৎক্ষণাৎ রচনা করে আলমের লিখিত লাইনের নীচে লি'খে দিলে। তা'র পর নতুন রংকরা পাগড়ী আবার ঐ কাগজে মুড়ে কবি আলমের কাছে পাঠিয়ে দিলে। কবি পাগড়ী খোল্‌বার সময় কাগজে দেখ্‌লেন যে তাঁর সেই রচিত কবিতাটির একলাইনের নীচে কে আর-এক লাইন লিখে দিয়েছে। তিনি শেখের দোকানে গিয়ে ব্যাপারটি জান্‌তে পার্‌লেন এবং তারি খুসী হ'য়ে পাগড়ী রং করার জন্য এক-আনা আর কবিতা-পূর্ত্তির জন্য এক-হাজার টাকা শেখকে দিলেন। ক্রমে উভয়ের খুব ঘনিষ্ঠতা হ'য়ে সখ্য বিবাহে পরিণত হ'ল।

আলম্-শেখ মিলিত হ'য়ে হিন্দীতে অনেক কবিতা রচনা ক'রে গেছেন। সে-কবিতার ভাষার ছটা যেম্‌নি অপূর্ব্ব তেম্‌নি মনোহারী। একটি কবিতার অর্দ্ধেক অংশ রচনা করেছেন আলম্ আর বাকীটা রচনা করেছেন শেখ; এম্‌নি ক'রে কবিতার ধারা ব'য়ে চলেছে। কোথায়ও বেমানান হয়নি।

আলম্ ও শেখের একটি ছেলে হয়েছিল। তা'র নামকরণ করা হয় জহান্। অপূর্ব্ব-প্রতিভাশালিনী কবি শেখের যেম্‌নি অতুল কবিত্ব ছিল, তেম্‌নি আশ্চর্য্য বাকচাতুর্য্যও ছিল। একবার শাহ্‌জাদা মুয়জ্জম শেখের নিকট জিজ্ঞাসা করেন, "আলম্ কী আওরৎ আপহি হ্যায়?" উত্তরে শেখ বল্‌লেন, "জাহাপনা? জাহাব কী মা ময় হি হুঁ।" শাহজাদা ব্যঙ্গ ক'রে এ-কথাটি জিজ্ঞেস করেছিলেন, কিন্তু শেখের উত্তরে রসিকতা সেখানেই থেমে গিয়েছিল।

দেশী রাজাদের দর্‌বারে কবিদের "বিদাই" (কবিত্বের পুরস্কার) দেওয়ার প্রথা ছিল। কবিদের উৎসাহ দেওয়া, কবিদের সম্মান দেখানো তখনকার একটা রীতি ছিল। তারি ফলে তখন হিন্দীভাষার খুব উন্নতি হয়েছিল; বহু শ্রেষ্ঠ কবির উদ্ভব হয়েছিল। কবিতায় গানে যেন দেশ ছেয়ে গিয়েছিল।

হিন্দী কবিতা রচনার মধ্য দিয়ে দেশবাসীর অপার আনন্দের ধারা বহুমুখী হ'য়ে বয়েছে আর সবাই তা আকণ্ঠ পান করেছে—একথা ভাব্‌তে গেলে মন অপূর্ব্ব পুলকে ভ'রে ওঠে।
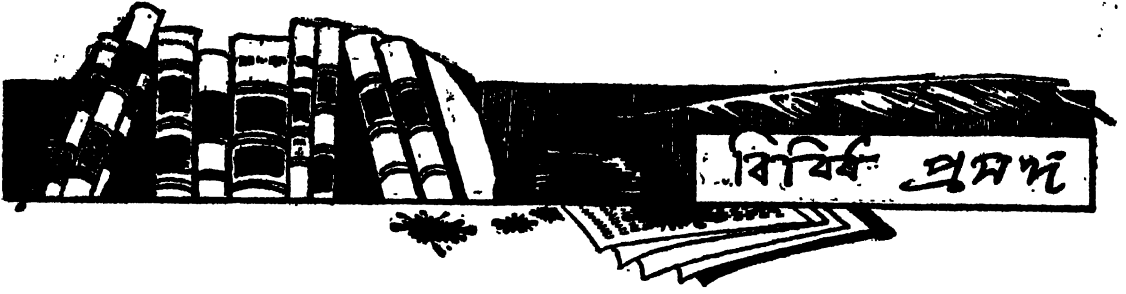
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতবর্ষের শিক্ষিত সমাজে দীর্ঘায়ু কর্ম্মিষ্ঠ লোক বেশী দেখা যায় না। এইজন্য ৭৭ বৎসর বয়সে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তিনখানা দৈনিক কাগজের প্রধান সম্পাদকের পদ গ্রহণ করায় ঘটনাটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। যেসকল সভ্যদেশে অনেক বেশী বয়স পর্য্যন্ত লোকেরা কার্য্যক্ষম থাকে, সেখানেও এতবেশী বয়সে নূতন করিয়া সম্পাদকীয় কার্য্যে ব্রতী হওয়ার দৃষ্টান্ত বিরল। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ যৌবন-কাল হইতেই কর্ম্মিষ্ঠ, উদ্যোগী ও উৎসাহী পুরুষ ছিলেন। যখন তাঁহার ধারণা হইল, উদারনৈতিক দলের এখনও কিছু বলিবার ও করিবার আছে, এখনও তাঁহাদের পক্ষ হইতে যুদ্ধের প্রয়োজন আছে, তখন তিনি আবার কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার দেহমন বরাবর বলিষ্ঠ ছিল; সেই কারণেই তিনি কয়েক মাস পূর্ব্বে তাঁহার চরিত্রগত আশাশীলতার সহিত মহাত্মা গান্ধীকে বলিয়াছিলেন, যে, তিনি ৯১ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বাঁচিবেন ও কাজ করিবেন। কিন্তু সম্ভবতঃ সম্পাদকীয় কাজে পুনর্ব্বার প্রবৃত্ত হওয়ায় তাঁহার জীবনীশক্তির হ্রাস হইতেছিল। তাঁহার শরীর নিদারুণ ব্যাধির আক্রমণ সহ্য করিতে পারিল না; সেরূপ পীড়া না হইলে তাঁহার পক্ষে ৯১ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত জীবিত ও সমর্থ থাকা অসম্ভব ছিল না।

সুরেন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতা ছিলেন। তৎকালে ভারতবর্ষের ইংরেজ-সম্পাদকেরা উপহাসচ্ছলে তাঁহার নাম রাখিয়াছিল, "সারেণ্ডার্ নট্"। অর্থাৎ তাহাদের ইহাই বলা উদ্দেশ্য ছিল, যে, তিনি পরাজয় স্বীকার করিয়া আত্মসমর্পণ করিবার লোক ছিলেন না।

বস্তুতই তাঁহার প্রকৃতিতে অদম্য উৎসাহ ও আশাশীলতা ছিল। যৌবন কাল হইতে তাঁহার জীবনে এই

[প্রেস কন্‌ফারেন্সের সময় (১৯০৯) ইংলণ্ডে তোলা ছবি হইতে
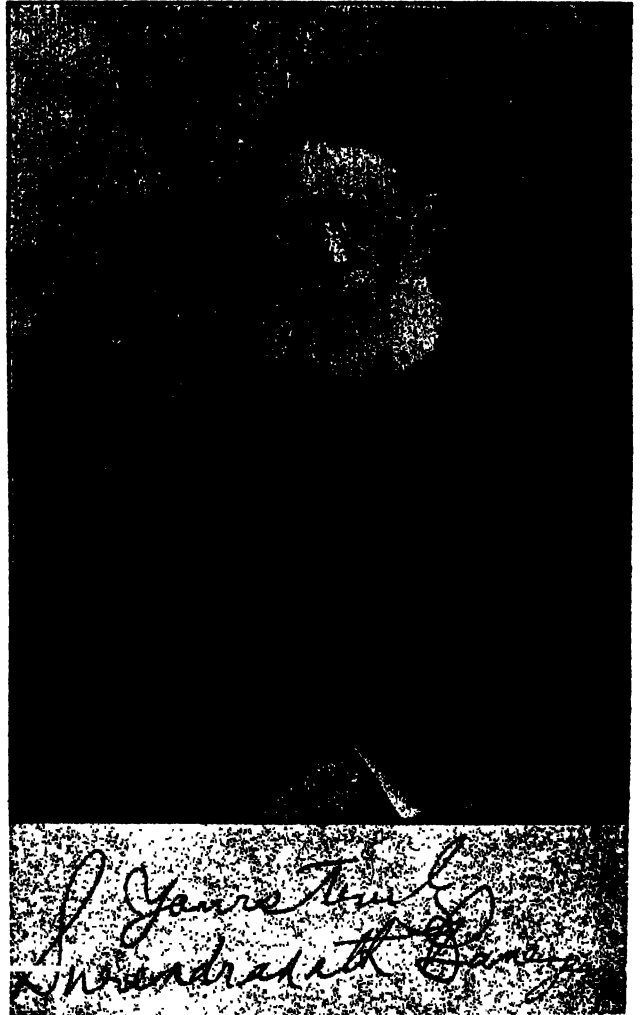
গুণগুলি লক্ষিত হয়। যখন তিনি সিবিলিয়ান্ হইবার জন্ত বিলাত যাত্রা করেন, তখন বিলাত বা তাহা অপেক্ষাও দূরদেশে যাওয়া আজকালকার মত সাধারণ জিনিষ হইয়া উঠে নাই। তাঁহাদের বাড়ীর অনেকে তাঁহার বিলাত

সুরেন্দ্রনাথের বসতবাটী, (ব্যারাকপুর)

যাওয়ার বিরোধী হইলেন; কিন্তু তিনি সেই বাধা অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন। বিলাতে পরীক্ষা দিয়া তিনি সিবিল সার্বিসে কাজ পাইবার যোগ্য বিবেচিত হইলেন। কিন্তু সিবিল সার্বিস্ কমিশনারেরা তাঁহার বয়স-সম্বন্ধে আপত্তি তুলিয়া যথেষ্ট অনুসন্ধান না করিয়াই তাঁহার নাম নির্ব্বাচিত যুবকদের তালিকা হইতে তুলিয়া দিলেন। সুরেন্দ্রনাথ কিন্তু তাহাতে দমিলেন না। তিনি বিলাতে কুইন্স্ বেঞ্চ্ ডিবিজনে মোকদ্দমা করিয়া জিতিলেন এবং সিবিল সার্বিস্ কমিশনারদিগকে তাঁহাকে পুনর্নিযুক্ত করিতে বাধ্য করিলেন।

দেশে ফিরিয়া আসিয়া তিনি প্রথম শ্রীহট্ট জেলার আসিস্টান্ট্ ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল বেঙ্গলীতে লিখিয়াছেন, সুরেন্দ্রনাথ হ্যাট্ ও গলা-খোলা কোট পরিতেন না, লম্বা পার্সী কোট ও টুপি পরিতেন। শ্রীহট্টে থাকিতেই অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার চাকরী যায়। হাকিমদিগকে রোজ বিস্তর কাগজ সহি করিতে হয়; তাঁহারা কেহই সমস্ত কাগজ আদ্যোপান্ত পড়িয়া সহি করেন না, পেশকার বা অন্ত কর্ম্মচারীর উপর তাঁহাদিগকে নির্ভর করিতে হয়। সুরেন্দ্রনাথ যে-সব কাগজ সহি করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একটিতে যুধিষ্ঠির নামক একজন আসামীকে ফেরার্ বলিয়া বর্ণনা করা হয়। বস্তুতঃ সে ফেরার্ হয় নাই। সুরেন্দ্রনাথ ইচ্ছা করিয়া জানিয়া শুনিয়া এরূপ মিথ্যা বর্ণনায় স্বাক্ষর করিয়াছিলেন মনে করিবার কোনই কারণ নাই। জ্ঞাতসারে এরূপ মিথ্যা বর্ণনা যদি কেহ করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহার পেশকারই তাহা করিয়াছিল। তাহার সেরূপ করিবার কারণ যাহা অনুমিত হইতে পারে, তাহা সুরেন্দ্রনাথের ইংরেজী আত্মচরিতে এবং বিপিনবাবুর বেঙ্গলীতে প্রকাশিত প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য। যাহা হউক, এই সামান্ত অসাবধানতার জন্ত সুরেন্দ্রনাথের বিচারার্থ কমিশন বসিল; সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতায় বিচার প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু বিচার সিলেটেই হইল। তিনি পদচ্যুত হইলেন। বলা বাহুল্য, তিনি ইংরেজ হইলে বিচারও হইত না, পদচ্যুতিও ঘটিত না; খুব বেশী কিছু হইলে গোপনে কিছু তিরস্কার হইত।

ইহাতে সুরেন্দ্রনাথ দমিলেন না। তিনি বিলাত যাত্রা করিলেন ও তথায় তাঁহার পদচ্যুতির হুকুম রদ্ করাইতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাহাতে সফলকাম হইলেন না। যাহা হউক, ইহাতেও হাহুতাশ না করিয়া তিনি ব্যারিষ্টার হইবার জন্ত মিডল্ টেম্পলে টর্ম্ পূরা করিলেন, কিন্তু বেঞ্চার্-নামধেয় তথাকার কর্ত্তৃপক্ষীয় ব্যারিষ্টারেরা সিবিল সার্বিস হইতে তাঁহার পদচ্যুতির ওজুহাতে, তাঁহাকে ব্যারিষ্টার শ্রেণীভুক্ত করিলেন না। তিনি তাঁহাদিগের দ্বারা পুনর্ব্বিবেচনা করাইবার নিমিত্ত খুব চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না।

পরলোকগত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা।

ইহাতেও তিনি ভগ্নোদ্যম হইলেন না। তাঁহার এই অদম্যতার প্রতি আমরা আমাদের তরুণ-বয়স্ক স্বদেশবাসীদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিতেছি। আজকাল দেখিতে পাই, কোন-কোন ছেলে এক ক্লাস হইতে আর-এক ক্লাসে প্রোমোশন্ না পাইলে, টেস্ট্ পরীক্ষার ফলে প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রেরিত না হইলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে, আত্মহত্যা করে। সেদিন কাগজে দেখিলাম, একটি ছেলে ফুটবলে তাহার প্রিয় দল না জেতায় আত্মহত্যা করিয়াছে। যাহারা আত্মহত্যা করে, তাহাদের জন্য বড় ক্লেশ হয়। কিন্তু মৃত্যুটাই এরূপ ঘটনার প্রধান শোচনীয় বিষয় নহে। চারিত্রিক দুর্ব্বলতাই শোক ও লজ্জার প্রধান কারণ। এরূপ দুর্ব্বলতা সুরেন্দ্রনাথের চরিত্রে বিন্দুমাত্রও ছিল না। তিনি যতবার নিরাশ হইয়াছেন, ততবার পূর্ণ উদ্যমে আবার কৃতিত্বের নূতন পথে চলিতে চেষ্টা করিয়াছেন; যতবার ভূপতিত হইয়াছেন, ততবার ধুলা ঝাড়িয়া খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহার এই পৌরুষের জন্য তাঁহাকে প্রণাম করি।

তিনি ইংলণ্ড হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পর বিদ্যাসাগর-মহাশয় তাঁহাকে অধুনা বিদ্যাসাগর কলেজনামে পরিচিত মেট্রপলিটান্ ইন্‌স্টিটিউশনে ইংরেজি-সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। তিনি তখন সিটি স্কুলেও পড়াইতেন। কিছুদিন পরে তিনি ফ্রী চর্চ্চ্ কলেজে কিছুকাল অধ্যাপকতা করেন। ১৮৮২ সালে তিনি বৌবাজারে স্থিত একটি ছোট স্কুলের মালিক হন। উহাই পরে রিপন কলেজ নামে পরিচিত হয়। উহাকে প্রথম শ্রেণীর কলেজ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে বিস্তর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। উহা বহু বৎসর তাঁহার নিজের সম্পত্তি ছিল, এবং তিনি উহাতে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করিতেন। ১৫ বৎসরের অধিক হইল তিনি উহা কয়েক জন ট্রস্টীর হস্তে ন্যস্ত করেন।

অধ্যাপক রাজনৈতিক নেতা হইলে তাহার সুবিধা-অসুবিধা দুইই আছে। সুবিধা এই, যে, তাঁহার প্রভাবে, দৃষ্টান্তে, ও উপদেশে ছাত্রেরা লোকহিতকর অনুষ্ঠানের দিকে আকৃষ্ট হইতে ও তাহাতে ব্রতী হইতে শিখে। অসুবিধা এই, যে, ঐরূপ অধ্যাপক কর্ত্তব্যপরায়ণ না হইলে এবং হুজুকপ্রিয় হইলে, ছাত্রদের অধ্যয়ন ও জ্ঞানান্বেষণ-রূপ তপস্যায় বাধা জন্মে।

বর্ত্তমান সময়ে সরকারী আইন-অনুসারে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়-সকলের ও তাহাদের অঙ্গীভূত কলেজ-সকলের অধ্যাপকবর্গের রাজনৈতিক আন্দোলনে নেতৃত্ব করা বা তাহার উদ্যোগী কর্ম্মী হওয়া আগেকার-মত সম্ভবপর নহে।

সুরেন্দ্রনাথ যদি সিবিলিয়ান্ থাকিয়া যাইতেন, তাহা হইলে তাঁহার জীবনের গতি কোন্ দিকে যাইত এবং তিনি পেন্‌স্যন্ পাইবার পর কি করিতেন, সে-সম্বন্ধে জল্পনা করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া এবং পরে পেন্‌স্যন্ লইয়াও যে দেশের হিত কতকটা করা যায়, পরলোকগত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাহার দৃষ্টান্তস্থল।

অধ্যাপকরূপে সুরেন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল শত-শত বাঙালী যুবকের চরিত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। যুবকদের উপর ও অপর সাধারণের উপর প্রভাববিস্তারের তাঁহার অন্যতম উপায় ছিল বেঙ্গলী সংবাদপত্র। উহা প্রথমে সাপ্তাহিক ছিল। ১৮৭৯ সালে তিনি উহা আগেকার স্বত্বাধিকারীর নিকট হইতে নামমাত্র দশটাকা মূল্যে ক্রয় করেন। ২১ বৎসর সাপ্তাহিকরূপে পরিচালিত করিবার পর তিনি বেঙ্গলীকে দৈনিক কাগজে পরিণত করেন। একসময়, বিশেষতঃ বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সময়, বেঙ্গলীর প্রভাব খুব বেশী ছিল।

১৮৮২ সালে হাইকোর্টে একটা মোকদ্দমা উপলক্ষ্যে বেঙ্গলীতে জজ নরিস্‌কে ইংলণ্ডের কুখ্যাত জজ জেফ্রিসের সহিত তুলনা করা হয়। তাহার জন্য সুরেন্দ্রনাথ আদালতের অবমাননা অপরাধে অভিযুক্ত হন, এবং তাঁহার ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার পক্ষ হইতে দোষস্বীকার ও ক্ষমা প্রার্থনা করা সত্ত্বেও হাইকোর্টের বিচারে তাঁহার তিন মাস জেল হয়। তিনি যে কিরূপ লোকপ্রিয়, এই মোকদ্দমায় তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে দেশে খুব বেশী উত্তেজনার সঞ্চার হয়। বিচারের দিনে হাইকোর্টে লোকারণ্য হইয়াছিল। প্রিন্সিপ্যালের

শেষ শয্যায় সুরেন্দ্রনাথ

মৌখিক সহানুভূতি প্রদর্শন সম্ভ্রান্ত ও ধনীব্যক্তিদের মধ্যে সচরাচর দেখা যায় নাই। বর্ত্তমান সময়েও অবস্থা ঐরূপ আছে।

সেকালে সুরেন্দ্রনাথ কিরূপ লোকপ্রিয় ছিলেন, তাঁহার মুক্তির সময় আবার তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। যেদিন তাঁহার খালাস পাইবার কথা, সেই দিন অতি প্রত্যুষে হাজার-হাজার লোক প্রেসিডেন্সী জেলের অভিমুখে যাত্রা করে। উহা তখন হরিণবাড়ী জেল নামে অভিহিত ছিল। এখন গড়ের মাঠে যেখানে ভিক্টোরিয়া স্মৃতিমন্দির অবস্থিত উহা তাহার নিকটে ছিল। সেদিন শেষ রাত্রি হইতে মুষলধারে বৃষ্টি হইতে থাকে। আমরা ভিজিতে-ভিজিতে জেলের ফাটকের নিকট পৌঁছিয়া কিছুক্ষণ পরে জানিতে পারিলাম, যে, তাঁহাকে রাত্রি থাকিতেই মুক্তি দিয়া গাড়ী করিয়া তালতলায় তাঁহার পৈতৃক বাটীতে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তখন আবার জনতা তালতলার অভিমুখে রওনা হইল। সেখানে গিয়া দেখিলাম, সুরেন্দ্রনাথের গৃহ জনাকীর্ণ, আর স্থান নাই; তাঁহার বন্ধু আনন্দমোহন বসু মহাশয় বক্তৃতা করিতেছেন।

নিষেধ সত্ত্বেও প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রেরা পর্য্যন্ত হাইকোর্টে ভিড় করিয়াছিল। ভবিষ্যতে সুপ্রসিদ্ধ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাহাদের মধ্যে ছিলেন। অনেক ছাত্রের সঙ্গে পুলিশের হাতাহাতি হইয়াছিল। হাইকোর্ট ও ইডেন গার্ডেনের মধ্যস্থিত ঝাউগাছগুলার ডাল ভাঙিয়া কোন-কোন ছাত্র আক্রমণ ও আত্মরক্ষা করিয়াছিল। আমরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকায় ইহা দেখিয়াছিলাম। অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত ছাত্রদিগকেই পলায়ন করিতে হইয়াছিল। যতদূর মনে পড়ে, প্রমথ নামক একজন বলিষ্ঠ ছাত্র ধৃত হন। তাঁহার অন্য পরিচয় মনে নাই, এবং তাঁহার শাস্তি হইয়াছিল কি না মনে নাই।

এই মোকদ্দমার কথায় সেকালের সহিত একালের একটা প্রভেদ উল্লেখের যোগ্য, বিচারের দিন পাইকপাড়ার কুমার ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ বিস্তর টাকা লইয়া আদালতে উপস্থিত ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের খুব বেশী অর্থদণ্ড হইলেও ইন্দ্রচন্দ্র তাহা তৎক্ষণাৎ দিয়া তাঁহাকে খালাস করিয়া আনিবেন, এই অভিপ্রায়ে তিনি হাইকোর্টে গিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে, রাজনৈতিক অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে কার্য্যগত বা

১৯২০ সাল পর্য্যন্ত সুরেন্দ্রনাথ যোগ্যতার সহিত বেঙ্গলী পরিচালন করেন। ১৯২১ সালের গোড়ার দিকে তিনি বাংলা গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করায় কাগজটির সম্পাদকতা তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হয়। তাহার পর দুই মাসের কিছু অধিক পূর্ব্বে তিনি আবার বেঙ্গলীর এবং নিউ-এম্পায়ার ও বাংলা স্বরাজের প্রধান সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন।

আনন্দমোহন বসু ও শিবনাথ শাস্ত্রীর সহযোগে তিনি ১৮৭৬ সালে ভারতসভা স্থাপন করেন। ভারতসভা-

স্থাপনের জন্ম জনসাধারণের প্রারম্ভিক সভার অধিবেশনের যে দিন ধার্য্য হয়, তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে সুরেন্দ্রনাথের তদানীন্তন একমাত্র পুত্রের মৃত্যু হয়। কিন্তু তিনি তাহা সত্ত্বেও, শোকে অভিভূত না থাকিয়া ধৈর্য্য-অবলম্বন-পূর্ব্বক সভায় উপস্থিত হন এবং বক্তৃতা প্রদানাদি তাঁহার কার্য্য করেন।

ভারতসভা-স্থাপনের সময় বেসরকারী জনমত প্রকাশাদি কাজ ব্রিটিশ্ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশ্যনের একচেটিয়া ছিল, যদিও উহা জমীদারদের সভা ছিল বলিয়া উহাকে সর্ব্বসাধারণের মুখপাত্র মনে করা যাইতে পারিত না, এখনও করা যায় না। ভারতসভা জনসাধারণের প্রতিনিধির কাজ করিবে, এই উদ্দেশ্যেই স্থাপিত হয়। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশ্যনের কর্ত্তারা উহার জন্ম সুনয়নে দেখেন নাই; তাঁহারা সুরেন্দ্রনাথকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করিতেন, অথচ অবজ্ঞার ভাণও করিতেন। যাহা হউক, সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার সহকর্ম্মীদের লোকহিতৈষণা, উৎসাহ, কর্ম্মিষ্ঠতা ও সাহসের গুণে ভারতসভা কালক্রমে প্রভাবশালী হইয়া উঠে, এবং উহার দ্বারা, আসামের চাবাগানের কুলীদের অবস্থার কিঞ্চিৎ উন্নতিসাধন প্রভৃতি দেশের অনেক মঙ্গল সাধিত হয়। সুরেন্দ্রনাথ চল্লিশ বৎসরেরও উপর ইহার অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন। গত বৎসর তিনি ইহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন।

সুরেন্দ্রনাথ রাজনৈতিক আন্দোলন উপলক্ষ্যে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে দেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ভ্রমণ করেন ও প্রধান-প্রধান স্থানে বক্তৃতা করেন। তিনি ইহা একাধিক বার করিয়াছিলেন। তাঁহার অসাধারণ বাগ্মিতা-প্রভাবে সর্ব্বত্র স্বদেশপ্রেমের উন্মেষ হয়। দক্ষিণ ভারতের কথা ঠিক্ বলিতে পারি না, কিন্তু বাংলা হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদয় উত্তরভারত-সম্বন্ধে ইহা সত্য, যে, সুরেন্দ্রনাথ এই ভূখণ্ডে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রবর্ত্তক ও অগ্রণী। তাঁহার বক্তৃতাগুলির বিশেষত্ব এই, যে, তিনি জাতিধর্ম্ম-নির্বিশেষে সমুদয় ভারতীয়দিগকে একই মহাজাতি অর্থাৎ নেশ্যন্ বলিয়া মনে করিয়া আসিয়াছেন, এবং সকলের মধ্যে একজাতীয়তা প্রচার করিয়াছেন; কেবল হিন্দু বা কেবল বাঙ্গালীর জন্ম তিনি পরিশ্রম করেন নাই।

তাঁহার যেসকল বক্তৃতা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সবগুলিই যে রাজনৈতিক বক্তৃতা, তাহা নহে। চৈতন্য, বুদ্ধ প্রভৃতি ধর্ম্মগুরুদের সম্বন্ধেও তিনি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তিনি নিজে হিন্দুসমাজভুক্ত থাকিলেও, ধর্ম্মসংস্কারার্থী ও সমাজসংস্কারকদিগের কোন-কোন কাজের উপকারিতা প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করিয়াছেন—নিজ ইংরেজী আত্মচরিতে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। গত শতাব্দীতে যখন স্যার্ এণ্ড্রু স্কোব্‌ল্ সম্মতির বয়স ১০ হইতে ১২ করিবার জন্ম একটি বিল ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করেন, তখন উহার বিরুদ্ধে দেশময় তুমুল আন্দোলন হয়। সুরেন্দ্রনাথ কিন্তু এই বিলের সমর্থন করেন। তিনি এইরূপ আরো অনেক সংস্কার-কার্য্যের সমর্থন করিয়াছিলেন।

বঙ্গ-বিভাগের পর তিনি কয়েক বৎসর ধরিয়া উহার বিরুদ্ধে আন্দোলনের নেতৃত্ব করেন। উহা যে রহিত হইবে, এ-বিশ্বাস তাঁহার বরাবর ছিল। ঐ আন্দোলন উপলক্ষে স্বদেশী জিনিষের প্রচলন এবং বিলাতী জিনিষ বর্জ্জন ও বহিষ্কারের নিমিত্ত আন্দোলনও হয়। তাহাতেও তিনি নেতৃত্ব করেন। এই আন্দোলনের সময় কোন-কোন স্থানে কোন-কোন কর্ম্মীর দ্বারা অন্যের সম্পত্তি বিলাতী কাপড় জোর করিয়া পোড়ানো হয়, এবং কোথাও-কোথাও অন্যের বিলাতী লবণ জলে নিক্ষিপ্ত হয়। অন্য কোন-কোন অপকর্ম্মও কোথাও-কোথাও অনুষ্ঠিত হয়। এইসকলের সহিত সুরেন্দ্রনাথের প্রকাশ্য বা গোপন যোগ ছিল না, এরূপ মনে করিবার অনেক কারণ আছে। তন্মধ্যে একটি ঘটনার সাক্ষাৎ জ্ঞান আমার আছে; তাহার উল্লেখ করিতেছি। কোন জেলার একটি ইংরেজী স্কুলের পণ্ডিতের ভয় হয়, যে, তিনি স্বদেশী আন্দোলন-উপলক্ষ্যে গবর্ণ্‌মেণ্ট্ কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইবেন। তিনি সুরেন্দ্রনাথের সাহায্যপ্রার্থী হইয়া কলিকাতা আসেন। আমি তাঁহাকে সুরেন্দ্রনাথের নিকট লইয়া যাই। সুরেন্দ্রনাথ এইরূপ মত প্রকাশ করেন, যে, পণ্ডিত-মহাশয় গর্হিত কিছু না করিয়া থাকিলে তিনি তাঁহার সাহায্য করিবেন।

সুরেন্দ্রনাথের শবদেহ

বঙ্গ বিভাগের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সময় বাংলা দেশে চরমপন্থী ও বিপ্লবীদের আবির্ভাব হয়। সুরেন্দ্রনাথ এই দলভুক্ত ছিলেন না, বরং ইহাদের বিরোধিতাই করিয়া আসিয়াছেন। তিনি বৈধ আন্দোলনের পক্ষপাতী ছিলেন। অথচ রাজপুরুষেরা যাহা করিবে, তাহাই ঘাড় পাতিয়া মানিয়া লইতে হইবে, বৈধ প্রচেষ্টার মানে তিনি এরূপ বুঝেন নাই; বরিশালে যে-বৎসর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্স্ ম্যাজিস্ট্রেটের হুকুমে ভাঙিয়া দেওয়া হয় এবং অনেক প্রতিনিধি পুলিশের লাঠিতে আহত হন, তখন সুরেন্দ্রনাথের পুরুষোচিত আচরণ হইতে ইহা বেশ বুঝা গিয়াছিল।

সুরেন্দ্রনাথ রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের জন্য কন্‌স্টিটিউশ্যনাল্ আন্দোলন অর্থাৎ বৈধপ্রচেষ্টার পক্ষপাতী ছিলেন; কিন্তু স্বাধীনতা-লাভের জন্য পরাধীন জাতির কোন অবস্থাতেই যুদ্ধ করা উচিত নয়, তাঁহার মত এরূপ ছিল না। ইটালীর অন্যতম ঐক্যবিধায়ক ও উদ্ধারকর্ত্তা ম্যাট্‌সিনি তাঁহার অন্যতম আদর্শ ছিলেন; কিন্তু ম্যাট্‌সিনি সকল অবস্থায় যুদ্ধ-বিমুখতায় বিশ্বাস করিতেন না। সুরেন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের অবস্থা যেরূপ বুঝিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বলপ্রয়োগের বৈধতায় ও সফলতায় বিশ্বাসী ছিলেন না। কিন্তু বল-প্রয়োগ করিবার জন্য যথেষ্ট-সংখ্যক দক্ষলোক জুটিলে এবং তাহাতে নিশ্চিত ফললাভ হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, বল-প্রয়োগ যে তাঁহার বিবেকবিরুদ্ধ হইত না, এরূপ অনুমান করিবার মত কথা তাঁহার মুখ হইতে আমরা একবার শুনিয়াছিলাম এবং তাঁহার তদানুষঙ্গিক হস্তভঙ্গীও তখন দেখিয়াছিলাম। বোম্বাইয়ে যে-বৎসর স্যার্ হেনরী কটন কংগ্রেসের সভাপতি হন, সেই বৎসর সমুদ্র-কূলে কংগ্রেস্ প্রতিনিধিদের জন্য নির্দ্দিষ্ট কোন তাঁবুতে আমরা ইহা শুনিয়াছিলাম ও দেখিয়াছিলাম। ইহা প্রকাশ্য ঘটনা না হইলেও তাঁহার পক্ষে ইহা অপযশস্কর নহে বলিয়া লিপিবদ্ধ করিলাম।

তিনি রাজনৈতিক আন্দোলন ও অন্য কাজ উপলক্ষ্যে কর্ম্মজীবনে বিলাতে একাধিক বার গিয়াছিলেন। তখন তথাকার লোকেরা তাঁহার ইংরেজী ভাষার উপর দখল, পরিষ্কার বিশুদ্ধ উচ্চারণ এবং অসাধারণ বাগ্মিতায় চমৎকৃত হন। আমরা যখন ছাত্ররূপে কলিকাতায় আসি, তখন হইতেই তাঁহার বাগ্মিতার সহিত পরিচিত ছিলাম; সুতরাং বিলাতের লোকের যে তাহাতে তাক্ লাগিবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় মনে করি নাই।

বাগ্মিতার মত তাঁহার স্মৃতিশক্তিও অসাধারণ ছিল। তিনি কংগ্রেসের সভাপতিরূপে দুইবার যে দীর্ঘ-বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা অবশ্য আগে হইতেই মুদ্রিত ছিল। কিন্তু তিনি তাহা পাঠ না করিয়া আলখিত বক্তৃতার মত বলিয়া যান, একবারও মুদ্রিত একটি-পৃষ্ঠারও উপর দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন নাই। অনেকবার তিনি বক্তৃতা করিয়া আসিয়া বেঙ্গলীতে ছাপিবার জন্য তাহা অবিকল

লিখাইয়া দিতেন। কখন কখন বক্তৃতা করিতে যাইবার আগেই, যাহা বলিবেন, তাহা অবিকল বেঙ্গলীর জন্ত লিখাইয়া দিয়া যাইতেন। একবার কোন কার্য্য উপলক্ষ্যে তাঁহার সহিত কোলুটোলায় বেঙ্গলী আফিসে দেখা করিতে গিয়া দেখিলাম, তিনি সেদিন একটি সভায় যে বক্তৃতা করিবেন, একজন কর্ম্মচারীকে তাহা লিখাইয়া দিতেছেন।

সমগ্র-ভারতীয় কাজের সঙ্গে যেমন, তেমনি স্থানিক কাজেরও সহিত সুরেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। তিনি কুড়ি বৎসরেরও অধিককাল কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর সভ্য ছিলেন এবং উৎসাহ ও কর্ম্মিষ্ঠতার সহিত কর্ত্তব্য সাধন করিয়াছিলেন। ১৮৯৯ সালে বঙ্গের তদানীন্তন ছোট লাট ম্যাকিঞ্জি কলিকাতা মিউনিসিপালিটীকে স্বায়ত্ত শাসক প্রতিষ্ঠানের পরিবর্ত্তে গবর্ণমেন্টের আজ্ঞাকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবার উদ্দেশ্তে যে আইনের খসড়া ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করান, তাহার সমর্থনার্থ নির্ব্বাচিত কমিশনারদের বিরুদ্ধে ঘুষ লওয়া প্রভৃতি অভিযোগ প্রকাশ্যভাবে উপস্থিত করেন। তাহার প্রতিবাদ স্বরূপ সুরেন্দ্রনাথ ও অন্ত অনেক কমিশনার পদত্যাগ করেন। ম্যাকেঞ্জির বিলের বিরুদ্ধে সুরেন্দ্রবাবু ব্যবস্থাপক সভায় ও তাহার বাহিরে খুব লড়িয়াছিলেন, কিন্তু তাহা আইনে পরিণত হইয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথ বহুবৎসর ধরিয়া উত্তর বারাকপুর মিউনিসিপালিটীর সভাপতিরূপে অনেক কাজ করিয়াছিলেন।

তিনি সাবেক বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রথম নির্ব্বাচিত সভ্যদের একজন ছিলেন। তিনি আট বৎসর উহার সভ্যরূপে খাটিয়াছিলেন। তাঁহার তৎকালীন বক্তৃতাগুলি পড়িলে বুঝা যায়, জনপ্রতিনিধির কর্ত্তব্য ঠিকমত করিতে হইলে কিরূপ পরিশ্রমের সহিত তথ্য নির্ণয় ও সংগ্রহ প্রভৃতি করিয়া প্রস্তুত হওয়া দরকার।

সুরেন্দ্রবাবু ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভারও সভ্য হইয়াছিলেন, এবং তথায় জনসাধারণের প্রতিনিধির কর্ত্তব্য নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান লর্ড্ লিটনের পিতা ভূতপূর্ব্ব লর্ড্ লিটন্ ভারতীয় ভাষায় লিখিত খবরের কাগজগুলিকে শৃঙ্খলিত করিবার জন্ত যে-আইন প্রণয়ন করেন, সুরেন্দ্রবাবু তাহার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়াছিলেন। তাহার ফলে বড়লাট রিপনের আমলে উহা রদ্ হয়। তিনি অস্ত্র-আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়াছিলেন; তাহা উঠিয়া যায় নাই বটে, কিন্তু তাহার কঠোরতা অনেক কমিয়াছে। সিবিল্ সার্ব্বিস্ পরীক্ষা ভারতবর্ষে ও বিলাতে যুগপৎ গ্রহণ করাইবার জন্ত তিনি আন্দোলন করিয়াছিলেন; এখন উহা ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ড্ দুই দেশেই গৃহীত হয়, এবং তাঁহার যৌবন-কালে ও প্রৌঢ় বয়সে শতকরা যত জন ভারতীয় লোক সিবিল্ সার্ব্বিসে ছিলেন, এখন তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী লোক তাহাতে প্রবেশ করিতে পারিয়াছেন। তিনি স্থানিক স্বায়ত্তশাসনের জন্ত বহু বৎসর ধরিয়া চেষ্টা করিয়াছিলেন। বাংলা গবর্ণ্মেন্টের মন্ত্রীরূপে তিনি কলিকাতা মিউনিসিপালিটী-আইন প্রণয়ন করিয়া কলিকাতাকে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিতে পারিয়াছেন। ইহাতে তিনি নিশ্চয়ই বিশেষ আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন।

কোন নিরপরাধ ব্যক্তির রাজনৈতিক কারণে গবর্ণ্মেণ্ট্ কর্ত্তৃক নিগ্রহ হইবার সম্ভাবনা হইলে সুরেন্দ্রনাথ গবর্ণ্মেন্টের সন্দেহভাজন ব্যক্তিদিগকে নিগ্রহ হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেন। আমাদের সাক্ষাৎ জ্ঞান হইতে ইহার দৃষ্টান্ত আমরা দিতে পারিতাম, কিন্তু নাম উল্লেখ করা উচিত হইবে না বলিয়া তাহা করিলাম না। গবর্ণ্মেণ্ট্ কর্ত্তৃক নিগৃহীত চরমপন্থী বা বিপ্লবীদলের কোন-কোন ব্যক্তিকে তিনি কাজ দিয়া ও অন্ত প্রকারে সাহায্য করিয়াছেন, ইহা অনেকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিবেন। তিনি দল ভালোবাসিতেন না বা দলপতি ছিলেন না, বলিলে সত্য কথা বলা হইবে না; কিন্তু অনেক বিষয়ে তিনি দলাদলির উর্দ্ধে উঠিয়া মহানুভবতা প্রদর্শন করিতে পারিয়াছিলেন, ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। তিনি খবরের কাগজে ও বক্তৃতায় তর্ক-বিতর্ক অনেক করিয়াছেন। সে-সম্বন্ধে মোটের উপর আমাদের ধারণা এই, যে, তিনি ব্যক্তিগত প্রতিহিংসাপরায়ণতা ও ক্ষুদ্রাশয়তা অপেক্ষা উদারচিত্ততা ও মহানুভবতাই অধিক প্রদর্শন করিয়াছেন। যাঁহারা তাঁহাকে "পালি"

দিতেন, তিনি অনায়াসেই তাঁহাদিগকে কমা করিতে পারিতেন।

তাঁহার দেশহিতার্থ উৎসর্গীকৃত পঞ্চাশ-বৎসরব্যাপী জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি বাংলাদেশের সর্ব্ববাদি-সম্মত নেতা এবং ভারতবর্ষের অন্যতম প্রধান নেতা ছিলেন। এক-এক প্রদেশে এক-একজন নেতার প্রভাব, যেমন মহারাষ্ট্রে লোকমান্য টিলকের প্রভাব, তাঁহা অপেক্ষা বেশী ছিল; কিন্তু সমগ্র ভারতের উপর তাঁহা অপেক্ষা তাঁহার সমবয়স্ক তাঁহার সমসাময়িক কাহারও তাঁহার সমান বা তাঁহা অপেক্ষা বেশী প্রভাব ছিল না। হৃদয়-মনের নানা গুণে তিনি এই উচ্চ স্থান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বহু বৎসর ধরিয়া বাংলাদেশে এমন এক সময় ছিল, যখন সুরেন্দ্রবাবু নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া কোন বিষয়ে বক্তৃতা বা আন্দোলন না করিলে তাহাতে সর্ব্ব-সাধারণের দৃষ্টি পড়িত না।

সুরাটে যখন কংগ্রেসের দুই দলে বিরোধ হয়, তাহার পর সুরেন্দ্রনাথের প্রভাব কিছু কমিয়াছিল; কিন্তু তিনি স্বদেশী আন্দোলনে নিজ উৎসাহ ও কর্ম্মিষ্ঠতা দ্বারা নিজের প্রভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিলেন। মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড্‌ শাসন-সংস্কার তিনি ও তাঁহার দল যথেষ্ট মনে না করিলেও তাহাতে দেশহিত কতটা হয়, তাঁহারা তাহা কার্য্যতঃ পরীক্ষা করিতে রাজী হইয়াছিলেন, অন্য রাজনৈতিক দল রাজী হন নাই। তদ্ভিন্ন যখন অসহযোগ আন্দোলন ঝড়ের মত দেশের উপর বহিতে লাগিল, তখন কোন-কোন নেতা নিজের প্রভাব ও মর্য্যাদা বজায় রাখিবার জন্য, কেহ-কেহ বা সত্য-সত্যই রাজনৈতিক মত পরিবর্ত্তন হওয়ায়, ঐ আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রবাবু তাহা করেন নাই। অধিকন্তু তিনি সরকারী মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহার জীবনের শেষ সাত-আট বৎসর জনসাধারণের উপর তাঁহার প্রভাব কমিয়াছিল।

কিন্তু কেবল প্রভাব কমা-বাড়ার দ্বারাই কোন মানুষের বিচার করা উচিত নয়। এমন অনেক লোক পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহারা জীবিতকালে যশস্বী বা লোকপ্রিয় হইতে পারেন নাই, কিন্তু মৃত্যুর পর যাঁহাদের প্রভাব বাড়িয়া চলিয়াছে। সুরেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক অনেক মতের সহিত আমাদের মতের মিল নাই। কিন্তু তাঁহার সপক্ষে একটি কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে;—তিনি লোকপ্রিয়তা এবং জনসাধারণের উপর প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত নিজের রাজনৈতিক মত কখন পরিবর্ত্তন করেন নাই, যাহা অন্য কোন-কোন নেতা একাধিকবার করিয়াছেন। অবশ্য, কন্সিষ্টেন্সী বা মত ও আচরণের পূর্ব্বাপর সঙ্গতি রক্ষার খাতিরেই কোন-একটা মতকে আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকা প্রশংসনীয় নহে; কিন্তু যিনি বাহ্যতঃ মত পরিবর্ত্তন করিলে নিজের প্রভাব রক্ষা করিতে পারিতেন, তিনি সে-লোভ সংবরণপূর্ব্বক যখন নিজের পূর্ব্ব মতে স্থির ছিলেন, তখন বুঝিতে হইবে, কন্সিষ্টেন্সীর জন্য তিনি নিজে স্থির ছিলেন না, গভীরতর কারণে ছিলেন। আরও একটা কারণ অনুমান করা যাইতে পারে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তন এবং অভিজ্ঞতাবৃদ্ধি-বশতঃ মানুষের মতের ও আচরণের পরিবর্ত্তন হয়। কিন্তু এইরূপ পরিবর্ত্তনের একটা সীমা আছে। সুরেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মত যৌবনকালে যাহা ছিল, বার্দ্ধক্যে তাহা ছিল না; অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। কিন্তু আমূল পরিবর্ত্তন কাহারও পক্ষে সম্ভব-পর নহে, তাঁহারও পক্ষে তাহা সম্ভবপর হয় নাই।

কিন্তু তিনি মন্ত্রিত্ব কেন গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই প্রশ্ন উঠিতে পারে। টাকার লোভে তিনি এরূপ করিয়া-ছিলেন বলিলে ন্যায়সঙ্গত কথা বলা হইবে না; কারণ তাঁহার জীবনে তিনি গবর্ণ্‌মেণ্টের সহিত অনেক যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এমন অনেক সময় আসিয়াছিল, যখন তিনি আন্দোলনে ঢিল দিলে, গবর্ণ্‌মেণ্টের সহিত রফা করিলে, অর্থলাভ ও সরকারী সম্মানলাভ উভয়ই হইতে পারিত। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড্‌ সংস্কার কার্য্যতঃ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে সম্মতিদান এবং মন্ত্রিত্বগ্রহণের প্রকৃত কারণ বুঝিতে হইলে আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, যে, সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার সহকর্ম্মীরা যৌবনকাল হইতে নানা ছোট ছোট অধিকার ও সংস্কারের জন্য আন্দোলন করিয়া আসিতে-ছিলেন। তাঁহাদের সাবেক দাবী ও আশার তুলনায়

মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড্‌ সংস্কার তুচ্ছ বিবেচিত হয় নাই। অবশ্য তাঁহারাও ঐ সংস্কারকে যথেষ্ট মনে করেন নাই; কিন্তু তাঁহারা যাহার জন্য জীবনব্যাপী আন্দোলন করিতেছিলেন, তাহার অনেকটা ঐ সংস্কারের অন্তর্ভূত ছিল। এই হেতু, তাঁহারা যাহা চাহিয়া আসিতেছিলেন, তাহার অনেকটা গবর্ণ্‌মেণ্ট্‌ দেওয়ায়, শাসন-সংস্কার-আইন-অনুসারে কাজ করিয়া দেশের কতটা হিত হইতে পারে, তাহা স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখা তিনি উচিত মনে করিয়া থাকিবেন।

বয়ঃকনিষ্ঠ আমাদিগকে ইহাও মনে রাখিতে হইবে, যে, আমাদের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা, দাবী ও আশা যে তাঁহার চেয়ে বেশী হইয়াছে, তাহারও প্রধান কারণ তিনি। তিনি জাতীয়তার ভাব উদ্বুদ্ধ না করিলে, একজাতীয়তার আদর্শ সমগ্র দেশে, সকলের মনে মুদ্রিত করিবার চেষ্টা না করিলে, ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র নানা সংস্কার ও অধিকারলাভের জন্য আন্দোলন না করিলে, আমাদের আকাঙ্ক্ষা, দাবী, আশা ও আদর্শ বর্ত্তমান আকার ধারণ করিত না। ইংরেজীতে একটা পরিহাসাত্মক গল্প আছে, যে, একটি শিশুকে তাহার পিতা নিজের স্কন্ধে স্থাপন করায় শিশুটি বলিয়াছিল, "How taller I am than papa" "বাবার চেয়ে আমি কত ঢ্যাঙা"। আমাদের বাক্য ও আচরণ যাহাতে কখনও এই শিশুর মত না হয়, সে-দিকে আমাদের দৃষ্টি থাকা উচিত।

আমাদের দেশের কোন-কোন সম্পাদকের ও খবরের কাগজের এই বদ্‌ নাম আছে, যে, তাহারা টাকা লইয়া বা অন্যবিধ কোন সুবিধার বিনিময়ে কোন-কোন কাজ করিয়াছিল কিম্বা অন্য কোন-কোন কাজ হইতে নিবৃত্ত ছিল। এরূপ নিন্দা প্রধানতঃ বৈঠকখানায় বা অন্য আড্ডায় গল্পচ্ছলে হইলেও দু-একবার সংবাদ-পত্রে মুদ্রিতও হইয়াছে। সুরেন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল সম্পাদকতা করিয়াছিলেন, কিন্তু কাহারও পক্ষ সমর্থনার্থ টাকা লইয়াছিলেন এরূপ নিন্দা কখন শুনি নাই।

সুরেন্দ্রনাথের নিয়ম-নিষ্ঠা অতীব প্রশংসনীয় ছিল। তাঁহার আহার, বিশ্রাম ও নিদ্রার সময় তিনি যাহা নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন, কোন মতে তাহার ব্যতিক্রম হইতে দিতেন না। তিনি মণিরামপুরে থাকিতেন, অথচ প্রত্যহ কলিকাতায় স্বকীয় ও সার্ব্বজনিক নানা কাজ তাঁহাকে করিতে হইত। তাহা করিয়াও তিনি সুস্থ ও দীর্ঘজীবী ছিলেন নিয়ম-নিষ্ঠার জোরে। শিয়ালদহের একটি ট্রেন্‌ তাঁহার পক্ষে শেষ ট্রেন্‌ ছিল; খুব বিলম্ব হইলেও সেই ট্রেনে তিনি বাড়ী যাইবেনই এইরূপ স্থির ছিল। তিনি জীবনের শেষ কয়েক বৎসর ব্যায়াম করিতেন কি না জানি না, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে, শুনিয়াছিলাম, যে, তিনি প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে মুগুর ভাঁজিতেন। তিনি কোন-প্রকার মাদক সেবন করিতেন না। এই প্রসঙ্গে একটা কৌতুক-জনক আখ্যান মনে পড়িল। অনেক বৎসর পূর্ব্বে ভারত-সভার এক কমিটির অধিবেশনে কাজ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে নানা বাজে গল্প হইতেছিল। বর্ত্তমানের কোন এক-জন উকীল বৃদ্ধ বয়সে রোজ একটু আফিং খাইয়া বেশ ভাল আছেন, একজন সভ্য এই কথা বলায় অপর এক-জন সুরেন্দ্রবাবুকে বলিলেন, "আপনিও রোজ একটু আফিং ধরুন না?" তিনি হাসিয়া বলিলেন, "কর্ত্তা ওসব যথেষ্ট ক'রে গেছেন।"

সুরেন্দ্রনাথের সমসাময়িক লোকদের মধ্যে বাংলা-দেশে ও ভারতবর্ষের অন্যত্র বহুসংখ্যক শক্তিশালী লোক ছিলেন; এরূপ শক্তিশালী এতগুলি লোক এখন জীবিত নাই। তাহা সত্ত্বেও রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি নিজের নেতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিলেন। ইহা কেবল শূন্যগর্ভ কথার জোরে তিনি করিতে সমর্থ হন নাই। অন্য যে-সকল গুণের প্রভাবে তিনি নেতা হইয়াছিলেন, তাহার আভাস পূর্ব্বেই দিয়াছি। তাঁহার বাগ্মিতা কেবল জোর গলায় উচ্চারিত কথার স্রোত, এরূপ মনে করাও ভুল। কংগ্রেসের সভাপতি-রূপে তাঁহার দুটি বক্তৃতা, ওয়েল্‌বী কমিশনে তাঁহার সাক্ষ্য, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ম্যাকেঞ্জির কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর বিলের বিরুদ্ধে তাঁহার কয়েকটি বক্তৃতা, প্রভৃতি পাঠ করিলে বুঝা যাইবে যে, তিনি সুযুক্তি ও তথ্যের যথাযোগ্য প্রয়োগেও পারদর্শী ছিলেন। তিনি বক্তৃতায় যে-বিষয়ের সমর্থন করিতেন, তাহাতে দৃঢ় বিশ্বাস, ভারতবর্ষের ভবিষ্যতে দৃঢ় বিশ্বাস, সত্য ও ন্যায়ের অবশ্যম্ভাবী জয়ে দৃঢ়

বিশ্বাস, তাঁহার নিজের শক্তিতে বিশ্বাস তাঁহার কৃতিত্বের অন্যতম কারণ। তাঁহার জীবিতকালে তাঁহার লোকপ্রিয়তার হ্রাস-বৃদ্ধি যাহাই হউক, তাঁহার কর্ম্মিষ্ঠতা ও কৃতিত্ব ভারতবর্ষের আধুনিক রাজনৈতিক ইতিহাসে তাঁহাকে অমর করিবে। তাঁহার মত নানাগুণশালী রাষ্ট্রনৈতিক নেতা বঙ্গদেশে এ-পর্য্যন্ত জন্মগ্রহণ করেন নাই, তাঁহার স্থান অধিকার করিতে পারেন, বঙ্গে এরূপ অন্য কাহাকেও দেখা যাইতেছে না।

—

ছাত্রদের স্বাস্থ্য

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিবার বন্দোবস্ত করেন। এ-পর্য্যন্ত বহুসংখ্যক ছাত্রের স্বাস্থ্য পরীক্ষিত হইয়াছে। তাহার ফলে জানা গিয়াছে, যে, অধিকাংশ ছাত্রেরই স্বাস্থ্য ভাল নয়। অথচ ইহাও ঠিক্, যে, সাবধান হইলে ও উপযুক্ত ব্যবস্থা করিলে অধিকাংশের স্বাস্থ্য ভাল হইতে পারে। কলেজের ছাত্রদের মত বিদ্যালয়ের ছাত্রদেরও স্বাস্থ্য পরীক্ষিত হওয়া উচিত। তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, বিদ্যালয়ের ছাত্রদেরও স্বাস্থ্য ভাল নয়। ছাত্রদের পক্ষে যাহা সত্য, ছাত্রীদের পক্ষেও তাহা সত্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন অর্থ নাই যাহার দ্বারা সমুদয় কলেজ ও বিদ্যালয়ের ছাত্রদের স্বাস্থ্যের নিয়মিত পরীক্ষা হইতে পারে। এই কাজটি গবর্ণ্‌মেণ্টের করা উচিত। ডিষ্ট্রিক্ট্‌-বোর্ড্‌ ও মিউনিসিপালিটীর অধীনে যে-সব বিদ্যালয় আছে, তাহাদের ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার বন্দোবস্ত ডিষ্ট্রিক্ট্‌বোর্ড্‌ ও মিউনিসিপালিটীসমূহের দ্বারা হওয়া উচিত।

শুধু স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিলেই চলিবে না, স্বাস্থ্যের উন্নতির চেষ্টাও করিতে হইবে, এই সোজা কথা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জানিতেন। এক্ষণে বিশ্ববিদ্যালয় সমুদয় বিদ্যালয়ে ও কলেজে কোন-না-কোন প্রকার অঙ্গচালনা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। উপবাসী থাকিয়া ব্যায়াম করিলে তাহার দ্বারা ইষ্টের পরিবর্ত্তে অনিষ্টই হইবে, ইহাও বিশ্ববিদ্যালয় জানিতেন। সেইজন্য, অভিভাবকদের সহিত পরামর্শ করিয়া ছাত্রদের জল-যোগের বন্দোবস্ত যাহাতে হয়, সে-বিষয়েও বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টি পড়িয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট্-সভায় কলেজের ছাত্রদিগকে সামরিক শিক্ষা দিবার প্রস্তাবও বিবেচিত হয়। ইহার বিরুদ্ধে দু-রকমের তর্ক উত্থাপিত হয়। একজন ইংরেজ ফৌজী কর্ম্মচারী বলেন, দেশী ছাত্রদের শরীর ও স্বাস্থ্য যেরূপ, তাহাতে তাহারা সামরিক শিক্ষার কষ্ট ও কঠোরতা সহ্য করিতে পারিবে না। আমরা যুদ্ধের বিরোধী এবং ইংরেজী ও বাংলায় আমাদের বিরোধিতার কারণ একাধিকবার বলিয়াছি। কিন্তু ফৌজী কর্ম্মচারীর যুক্তির বলবত্তা স্বীকার করিতে পারিলাম না। গত মহাযুদ্ধের সময় অনেক বাঙালী ছেলে বেঙ্গলী রেজিমেণ্ট্‌ভুক্ত হইয়াছিল এবং যুদ্ধ শিখিয়াছিল। ইহারা পদাতিক-শ্রেণীভুক্ত ছিল। তা' ছাড়া কতকগুলি ছেলে বেঙ্গল লাইট্‌হর্স্‌-নামক অশ্বারোহী সেনাদলেও প্রবেশ করিয়া যুদ্ধ শিখিয়াছিল। সুতরাং কোন বাঙালী ছেলেই যুদ্ধশিক্ষার কঠোরতা সহ্য করিতে পারিবে না, ইহা সত্য নহে। পক্ষান্তরে, ইহাও সত্য নহে, যে, সকলেই যুদ্ধ শিক্ষা করিবার মত শক্ত-সমর্থ। কিন্তু গত মহাযুদ্ধের সময় বিলাতেও শতকরা অনেক বেশী-সংখ্যক যুবক যুদ্ধের অনুপযুক্ত বিবেচিত হইয়াছিল। তাহাদের সংখ্যা ও বৃত্তান্ত আমরা মডার্ণ্‌ রিভিউ কাগজে ছাপিয়াছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মুখে যে-প্রস্তাব ছিল, তাহা এ নয়, যে, দেহের পটুতা-অপটুতা নির্ব্বিশেষে সকলকেই যুদ্ধ শিখাইতে হইবে; প্রস্তাব এই, যে, যাহাদের দেহ ও স্বাস্থ্য তদ্রূপ শিক্ষার উপযোগী, তাহাদিগকে ঐ শিক্ষা দিতে হইবে। যত্ন ও উপযুক্ত ব্যবস্থা করিলে আজ যাহাদের শরীর শক্ত ও স্বাস্থ্য ভাল নয়, কিছুকাল পরে তাহাদের শরীর কষ্টসহিষ্ণু ও স্বাস্থ্য ভাল হইতে পারে। এবং তাহাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য।

আর এক রকমের আপত্তি এই উঠিয়াছিল, যে, অনেকের মতে যুদ্ধটা বিবেকবিরুদ্ধ, ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য; সুতরাং তাহারা যুদ্ধ শিক্ষা করিতে পারে না। এ-বিষয়ে বক্তব্য এই, যে, খৃষ্টীয় কোয়েকার সম্প্রদায়ের লোকদের মতে যুদ্ধ করা অধর্ম্ম। ভারতবর্ষে যদি ঐরূপ-মত-বিশিষ্ট

কোন সম্প্রদায় থাকে, তাহা হইলে সেই সম্প্রদায়ের ছাত্রদিগকে যুদ্ধ শিক্ষা করিতে বাধ্য না করিলেই চলিবে।

সেনেটে যে-যে আপত্তি উঠিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে আমাদের মত বলিলাম। যুদ্ধ ও যুদ্ধশিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের নিজের মত আগে কোন-কোন সংখ্যায় বলিয়াছি; এক্ষণে পুনরুক্তির প্রয়োজন দেখিতেছি না।

—

প্রবেশিকা পরীক্ষার শিক্ষণীয় বিষয়

অনেক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্ত ভূগোল ও ইতিহাস অবশ্য শিক্ষনীয় বিষয় ছিল। তাহার পর অনেক বৎসর ধরিয়া এই দুটি বিষয় শিক্ষা করা না-করা ছাত্র-ছাত্রীদের ইচ্ছাধীন ছিল। তাহার ফলে এমন অনেক ছাত্র এম্-এ, ডি-এস্-সি, পি-এইচ-ডি হইয়া থাকিবেন, যাঁহারা স্বদেশ ও বিদেশের ইতিহাস বা ভূগোল কিছুই জানেন না; ইহা বড়ই দুঃখ ও লজ্জার বিষয়।

এখন আবার ইতিহাস ও ভূগোলকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্ত অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট করায় আমরা আহ্লাদিত হইলাম।

ভারতবর্ষের যে-সকল ইতিহাস সচরাচর পঠিত হয়, তাহা না-পড়ারও কিছু যে সুবিধা আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, ঐসকল ইতিহাসে ভারতবর্ষকে ক্রমাগত বিজিত এবং প্রায় চিরপরাধীন দেশ বলিয়া ছাত্রদের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়। আমরা অবশ্য ছাত্রদিগকে ইহার পরিবর্ত্তে উল্টা রকমের অন্তবিধ মিথ্যা কথা শিখাইতে বলিতেছি না। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক যে-সব দুঃখকর পরিবর্ত্তন পুরাকাল হইতে সত্য-সত্যই ঘটিয়াছে, অতীতে এবং বর্ত্তমানে ভারতের যে-দুর্ব্বলতা অবশ্য স্বীকার্য্য, সে-সকলের অপলাপ করিতে আমরা বলিতেছি না। এ-সকল বিষয়ে সত্য যাহা তাহা শিখাইতে হইবে। কিন্তু তাহার সঙ্গে-সঙ্গে ভারতের অতীত নানা যুগ-সম্বন্ধে এরূপ সত্য কথাও শিখাইতে হইবে, যাহাতে বিদ্যার্থীরা স্বদেশ ও স্বজাতি সম্বন্ধে কেবল লজ্জিত না হইয়া কিছু গৌরবও বোধ করিতে পারে, এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশাশীল হইতে পারে।

পৃথিবীতে বহু শতাব্দী ধরিয়া পরাধীন দেশ যে আরও ছিল, ভারতবর্ষই তাহার একমাত্র দৃষ্টান্ত নহে, নানাদেশের ইতিহাসের দৃষ্টান্তের দ্বারা তাহা ছাত্রদিগকে বুঝাইতে পারিলে ভাল হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইটালীর উল্লেখ করা যাইতে পারে। উহা চৌদ্দশত বৎসর পরাধীন ছিল। এই দীর্ঘকাল ধরিয়া উহার একজাতীয়তা ছিল না। *

ইংলণ্ডের ইতিহাসও ইংরেজরা যে-ভাবে লিখিয়াছে, তৎসম্বন্ধেও আমাদের ছাত্রদিগকে সাবধান করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। প্রত্যেক স্বাধীন জাতিই নিজের-নিজের ইতিহাস এমন করিয়া লেখে, যাহাতে তাহাদের জয়গুলি খুব উজ্জ্বল এবং পরাজয়গুলি পাঠকদের চোখে তুচ্ছ হইয়া উঠে, যাহার দ্বারা পাঠকদের এই ধারণা জন্মে যে, তাহারা প্রায় সব সময়েই জয়ী হইয়াছিল এবং তাহাদের ইতিহাসের অধিকাংশ সময় তাহারা এক-একটি স্বাধীন ও সম্মিলিত জাতি ছিল। ইহা ভ্রান্ত ধারণা। ইংরেজের লিখিত ইংলণ্ডের ইতিহাস পড়িয়াও এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা জন্মে; অথচ বস্তুতঃ ইংলণ্ড্ দেশটি বহুবার বিদেশী জাতি দ্বারা পরাজিত হইয়াছিল ও ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দীর্ঘকাল পরাধীন ছিল। এই ভ্রান্ত ধারণা যাহাতে আমাদের ছাত্রদের না জন্মে, তাহার উপায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের করা একান্ত কর্ত্তব্য।

* "The difficulty of Italian history lies in the fact that until modern times the Italians have had no political unity, no independence, no organised existence as a nation. Split up into numerous and mutually hostile communities, they never through the fourteen centuries which have elapsed since the end of the old Western empire, shook off the yoke of foreigners completely; they never until lately learned to merge their local and conflicting interests in the common good of undivided Italy. Their history is therefore not the history of a single people, centralizing and absorbing its constituent elements by a process of continued evolution, but of a group of cognate populations exemplifying diverse types of constitutional developments"—*Encyclopaedia Britannica*, 11th Edition.

ইতিহাস পাঠ ও পাঠনা-সম্বন্ধে আরও একটি কথা বলা দরকার মনে করি। হের্ভে (Herve) নামক একজন ফরাসী গ্রন্থকার ইতিহাস-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"History, so far, has been the most immoral and perverting branch of literature. It exalts greed and wholesale murder when greedy and murderous lusts are satisfied in the names of nations. Fraud is taken as evidence of clever diplomacy. What is counted immoral down low is held admirable in Courts and Thrones."—Quoted in *Welfare* for July, 1925, p. 453.

তাৎপর্য্য। "সাহিত্যের অন্ত সকল শাখা অপেক্ষা ইতিহাস, এ পর্য্যন্ত, অধিক দুর্নীতি-পরিপোষক ও বিপথচালক হইয়াছে। যখন লোভ ও নরহত্যা প্রবৃত্তি কোন-না কোন জাতির (নেশ্যনের) নামে চরিতার্থ করা হয়, তখন ইতিহাস-লুব্ধতাও বিরাট হত্যাকাণ্ডকে গৌরবময় উচ্চ-স্থানে প্রতিষ্ঠিত করে, প্রতারণা সুনিপুণ রাজনীতিকুশলতার প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হয়। যাহা সাধারণ লোকের পক্ষে দুর্নীতি বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহা রাজদরবারে ও রাজবংশে প্রশংসনীয় বিবেচিত হয়।"

বস্তুতঃ পৃথিবীর সর্ব্বত্র ইতিহাস পুনর্লিখিত হওয়া উচিত। কোন-কোন দেশে সে চেষ্টা হইতেছে। যে-সকল পাপ ও অপরাধ ব্যক্তিগতভাবে কেহ করিলে তাহাকে প্রবঞ্চক, জালিয়াৎ, চোর, ডাকাইত, নরহন্তা প্রভৃতি বলা হয়, কোন-একটা দেশের বা জাতির জন্ত তাহা কেহ করিলে সে সাম্রাজ্য-নির্ম্মাতা ও বীর বলিয়া পূজিত হয়। কোন দেশ বা জাতি অন্ত-কোন দেশ বা জাতির স্বাধীনতা হরণ করিলে, দস্যু-জাতিকে বিজেতা বীরজাতি বলিয়া ইতিহাস তাহার পূজা করিয়া থাকে। দুর্ব্বলতা ও কাপুরুষতাকে আমরা সম্মান করিতে বলিতেছি না, পক্ষান্তরে পরস্বাপহারকের পূজারও সমর্থন করিতে পারি না।

সাধারণ একজন পুরুষ বা নারীর (বিশেষতঃ নারীর) চরিত্র মন্দ হইলে সমাজে তাহার যেরূপ পাতিত্য ঘটে, ইতিহাসে দুশ্চরিত্র রাজা বা রাণীর সেরূপ পাতিত্য দৃষ্ট হয় না।

ইতিহাস নূতন করিয়া লিখিবার সময় এ-সব কথা মনে রাখা উচিত। তা' ছাড়া, আগে যেমন ইতিহাসের মানে ছিল প্রধানতঃ রাজা রাণীদের সুকীর্ত্তি বা কুক্রিয়া এবং যুদ্ধ-বিগ্রহের তারিখ ও ফলাফল, তাহার পরিবর্ত্তে ইতিহাসকে এক-একটা দেশের জন-সমষ্টির জীবনের সকল দিকে উন্নতি বা অবনতি এবং ক্রম বিকাশ বলিয়া মনে করিবার ও তদনুসারে উহা রচনা করিবার রীতি বহুবৎসর হইতে অনেক ঐতিহাসিক প্রবর্ত্তন ও অনুসরণ করিতেছেন। বিদ্যালয়-পাঠ্য ইতিহাসও এইভাবে রচিত হওয়া উচিত।

ভূগোল যখন আবার প্রবেশিকার অবশ্য শিক্ষনীয় বিষয়ের মধ্যে নিবিষ্ট হইল, তখন উহাও নূতনভাবে রচনা করিবার দিকে দৃষ্টি দেওয়া কর্ত্তব্য। ভূগোল শিখাইবার নানা উৎকৃষ্ট প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছে। এখানে সে-বিষয়ে আমাদের কিছু বলা উদ্দেশ্য নহে। ভূগোল লিখিবার ও পড়াইবার সময় যে-সকল বিষয়ের প্রতি বেশী দৃষ্টি থাকা দরকার, তাহারই কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি।

দেশ-বিশেষের ভৌগোলিক সংস্থান ও ভূপৃষ্ঠের প্রকৃতি অনুসারে উহার সভ্যতার ও ইতিহাসের বিশেষত্ব কি প্রকারের হইয়াছে, এবং কেন কি প্রকারে তাহা হইয়াছে, তাহা বুঝিবার ও বুঝাইবার চেষ্টা করা দরকার। একটি সমুদ্র-বেষ্টিত দেশ, একটি পার্ব্বত্য দেশ, একটি মরুময় দেশ, একটি সমতল সুজল উর্ব্বর দেশ—এইরূপ নানাদেশের সভ্যতা ও ইতিহাসের দৃষ্টান্ত দ্বারা বক্তব্য বিষয় বুঝান যাইতে পারে।

দেশের সংস্থান, ভূপৃষ্ঠের প্রকৃতি ও ভূগর্ভনিহিত ধন প্রভৃতির সহিত জাতীয় চরিত্রের সম্পর্কও বুঝান দরকার।

বাণিজ্য ও পণ্যশিল্প দেশের ভৌগোলিক বিশেষত্বের উপর কিরূপ এবং কতটা নির্ভর করে, বাণিজ্যিক ভূগোল পাঠনা-উপলক্ষ্যে তাহা শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। আমাদের দেশে উহার এখন বিশেষ প্রয়োজন; কেন না, বাণিজ্য ও পণ্যশিল্পের অভ্যুদয় একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

যাহারা প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে চাহিবে, তাহাদের প্রত্যেককে এইরূপ একখানি সার্টিফিকেট দাখিল করিতে হইবে, যে, সে নির্দ্দিষ্ট কালের জন্ত ছুতার মিস্ত্রীর কাজ, সূতা কাটা, কাপড় বোনা, দর্জ্জির কাজ বা অন্তবিধ কোন বৃত্তি শিখিয়াছে;—এই নিয়মও ভাল। ইহা কেবল একটা রোজগারের উপায় শিখিয়া রাখার দিক্ দিয়া ভাল

বলিতেছি না। হাতের ও চোখের শিক্ষা এবং সুনিয়মে অঙ্গ-চালনা দ্বারা মানসিক জড়তাও দূর হয়। তাহার দ্বারা মনোনিবেশের ক্ষমতা এবং মনের ক্ষিপ্রকারিতা বাড়ে।

—

শিক্ষার ও পরীক্ষার বাহন

ইংরেজী ভাষা-সাহিত্য ব্যতীত অন্য সব বিষয়ের শিক্ষা ও পরীক্ষা বিদ্যার্থীদের মাতৃভাষার সাহায্যে হইবে, এই নিয়ম করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাঙালীর মানসিক উন্নতির ব্যবস্থা স্বাভাবিক ও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত করিয়াছেন।

পরাধীনতা একটা অস্বাভাবিক অবস্থা। সমুদয় শিক্ষা প্রধানত বিদেশী ভাষার মধ্য দিয়া হওয়াও অস্বাভাবিক। আমাদের রাষ্ট্রীয় অবস্থার অস্বাভাবিকতা আমাদের শিক্ষার ব্যবস্থার অস্বাভাবিকতার কারণ। আমরা পরাধীনতার পরিবর্ত্তে স্বশাসন ক্ষমতা লাভ করিয়া রাষ্ট্রীয় অস্বাভাবিকতার উচ্ছেদ সাধনের যেমন চেষ্টা করিতেছি, শিক্ষার ব্যবস্থার অস্বাভাবিকতা বিনষ্ট করিবার চেষ্টাও সেইরূপ করা উচিত।

উচ্চতম বিষয়ের উচ্চতম জ্ঞান এখনই বাংলা ভাষার সাহায্যে দেওয়া যায় কি না, তাহা বিবেচ্য নহে; এখন কেবল প্রবেশিকার কথাই হইতেছে। সে পরীক্ষার মত জ্ঞান নিশ্চয়ই বাংলাভাষার সাহায্যে দেওয়া যায়। আমরা ৫০ বৎসর পূর্ব্বে যখন ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইংরেজী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়াছিলাম, তখনই কেবলমাত্র ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য ছাড়া প্রায় আর সমস্ত বিষয়ই প্রবেশিকার শ্রেণীর ছাত্রদের সমান বাংলা বহির সাহায্যে শিখিয়া আসিয়াছিলাম। গত পঞ্চাশ বৎসরে বাংলা ভাষার আরও অনেক উন্নতি হইয়াছে।

মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা ও পরীক্ষার ব্যবস্থায় মুসলমানদের অসুবিধা হইতে পারে বলিয়া গবর্ণমেণ্ট আশঙ্কা করিয়াছেন। আমরা তাহার কোন কারণ দেখিতেছি না। মুসলমানেরা যে অঞ্চলে বাস করেন, তথাকার কোন ভাষা তাঁহাদেরও মাতৃভাষা। বঙ্গের অধিকাংশ মুসলমানের মাতৃভাষা বাংলা। তাঁহাদের পক্ষে বাংলার সাহায্যে জ্ঞান লাভ করা এবং বাংলায় নিজ-নিজ জ্ঞানের পরিচয় দেওয়া অপেক্ষা ইংরেজীর সাহায্যে জ্ঞান লাভ করা ও পরীক্ষা দেওয়া সহজ বলিলে সত্য কথা বলা হয় না, এবং তাঁহাদের অপমান করা হয়। মাতৃভাষার চর্চ্চা অপেক্ষা বিদেশী কোন ভাষার চর্চ্চা কাহারও পক্ষে সহজ হইতে পারে না। বঙ্গের যে-সব মুসলমানের মাতৃভাষা উর্দ্দু, তাঁহারা উর্দ্দুতেই শিক্ষালাভ করিতে ও পরীক্ষা দিতে পারেন।

ইহা সত্য হইতে পারে, যে, এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালী মুসলমানেরা বাঙালী হিন্দুদের চেয়ে বাংলার চর্চ্চা কম করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ইহাও সত্য, যে, ইংরেজীর চর্চ্চাও বাঙ্গালী মুসলমানেরা বাঙালী হিন্দুদের চেয়ে কম করিয়া আসিতেছেন। সুতরাং বাংলায় শিক্ষা ও পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়া মুসলমানদিগকে নূতন কোন অসুবিধায় ফেলা হইতেছে না। বরং তাঁহাদিগকে নিশ্চিত ও নিঃসন্দিগ্ধরূপে নিজ-নিজ মাতৃভাষা বাছিয়া লইয়া তাহা ভাল করিয়া শিখিতে বাধ্য করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাদের উপকার করিতেছেন।

মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা না হইলে তাহা জাতির অস্থিমজ্জাগত হয় না, তাহা জাতীয় চিন্তাশক্তির পরিপোষক হয় না, এবং তাহার দ্বারা জাতীয় স্থায়ী উন্নতি হয় না। শিক্ষা কথাটি এস্থলে ব্যাপকভাবে বুঝিতে হইবে। আমরা স্কুল কলেজে যে শিক্ষা লাভ করি, তাহাই আমাদের একমাত্র শিক্ষা নহে। বাংলা খবরের কাগজ, বাংলা মাসিক, ত্রৈমাসিক পত্র, বাংলা বহি, বাংলা বক্তৃতা, বাংলা গান, বাংলায় অভিনয় ও যাত্রা প্রভৃতির দ্বারাও আমাদের শিক্ষা হইতেছে। যদি বাংলায় এই সব শিক্ষার উপায় না থাকিত, তাহা হইলে শুধু ইংরেজীর সাহায্যে বাঙালী জাতি কখনই বর্ত্তমান অবস্থাতে উপনীত হইতে পারিত না। বাঙালী বর্ত্তমানে যতটুকু উন্নতি করিয়াছে, তাহাকে শুধু ইংরেজী শিক্ষারই ফল মনে করিয়া যাঁহারা ইংরেজীকেই শিক্ষার সন্তোষজনক বাহন মনে করেন, তাঁহাদের সেই ভ্রম দেখাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

আমরা ইংরেজী শিখিবার বিরোধী নহি; বরং উহা

আরো ভাল করিয়া শিখাইবার এবং অধিকন্তু ফরাসী, জার্ম্যান প্রভৃতি ভাষা শিখাইবার পক্ষপাতী। আমাদের ধারণা এই, যে, সব জিনিষই ইংরেজীর মধ্য দিয়া শিখিতে বাধ্য না হইয়া মাতৃভাষার সাহায্যে শিখিতে পাইলে নানা-বিষয়ের জ্ঞানলাভ ছাত্রদের পক্ষে সহজ এবং অল্প সময়-সাপেক্ষ হইবে, সুতরাং ইংরেজী শিক্ষায় তাহারা অপেক্ষাকৃত বেশী সময় ও শক্তি নিয়োগ করিতে পারিবে। মাতৃভাষার সাহায্যে তাহারা যাহা শিখিবে, তাহা তাহাদের মনে ভাল করিয়া বসিবে এবং মনের অঙ্গীভূত হইয়া যাইবে।

এমন এক সময় ছিল, যখন ইংরেজীর সাহায্যে উচ্চ জ্ঞানলাভ সুসাধ্য ছিল না; কিন্তু এখন তাহা সুসাধ্য হইয়াছে। জাপানীরা উচ্চ জ্ঞান লাভ করিবার জন্য এক সময়ে কেবল বিদেশী ভাষার উপরই নির্ভর করিত; কিন্তু জাপানের ওয়াসেডা (Waseda) বিশ্ববিদ্যালয়ের চেষ্টায় এখন বিদ্যার সকল শাখাতেই জাপানী বহি লিখিত হইয়াছে। অবশ্য এখনও নানা কঠিন বিষয়ের উচ্চতম জ্ঞানলাভার্থ জাপানীরা ইংরেজী, জার্ম্যান, ফরাসী প্রভৃতি ভাষার বহি পড়ে। কিন্তু ইংরেজরাও এখনও কোন-কোন বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক বিষয়ের জ্ঞানলাভার্থ ফরাসী, জার্ম্যান্, ইতালীয় প্রভৃতি ভাষার বহি পড়িতে বাধ্য হয়। এই অবস্থা চিরকালই থাকিবে; কোন কালেই কেবল একটি-ভাষা শিখিয়া জ্ঞানান্বেষী জ্ঞান-পিপাসা মিটাইতে পারিবে না। কিন্তু মাতৃভাষার সাহায্যে অধিকাংশ বিষয়ের মোটামুটি জ্ঞান সব সভ্য জাতিই লাভ করিতে পারিবে, ইহাই আদর্শ।

ভারতবর্ষে হায়দরাবাদের ওস্‌ম্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে উর্দ্দুর সাহায্যে সব শিক্ষা দেওয়া হয়। উর্দ্দুতে অনেক কঠিন বিষয়ে পুস্তকও লিখিত হইয়াছে এবং পরে আরও হইবে, তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। উর্দ্দুতে যাহা সম্ভব, বাংলাতেও তাহা নিশ্চয়ই সম্ভব।

মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষাদান কোন-না-কোন সময়ে আরম্ভ করিতেই হইবে। এখনই কেন তাহা আরম্ভ করা হইবে না, তাহার কোন কারণ আমরা দেখিতেছি না।

অনেকে মনে করেন, মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা ও পরীক্ষার ব্যবস্থা করিলে ছাত্র-ছাত্রীরা ইংরেজী ভাল শিখিবে না। আমাদের বিশ্বাস সেরূপ নহে। ভারতবর্ষে ইংরেজ ছাড়া অনেক ইউরোপীয় আসিয়া থাকেন। তাঁহারা এদেশে আসিয়া ইংরেজীর সাহায্যেই কথাবার্ত্তা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য কাজ চালান; কেহ-কেহও আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলিতে ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা দেন ও অধ্যাপনা করেন। অথচ ইঁহারা সকলেই নিজ নিজ মাতৃভাষার সাহায্যেই শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, ইংরেজী কেবল "দ্বিতীয় ভাষা" রূপে শিখিয়াছিলেন। তাঁহারা ইংরেজী ভাষা "দ্বিতীয় ভাষা" রূপে শিক্ষা করিয়া যদি চলনসইরূপে উহা আয়ত্ত করিতে পারিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরা কেন পারিব না? অবশ্য তাঁহাদের দেশের ইংরেজী শিখাইবার প্রণালী ভাল। ভাল প্রণালীর উদ্ভাবন বা প্রবর্ত্তন আমাদেরও সাধ্যের অতীত নহে।

কিন্তু যদি এমনই হয়, যে, মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা ও পরীক্ষা হইলে ইংরেজী ভাল করিয়া শিখা যাইবে না, তাহা হইলেও আমরা মাতৃভাষার মধ্য দিয়া শিক্ষার সমর্থন করিব। কারণ জ্ঞান লাভ, চিন্তাশক্তির উন্মেষ ও বৃদ্ধি এবং মাতৃভাষায় পারদর্শিতা ইংরেজী জানা ও বলা অপেক্ষা অধিক আবশ্যক; এবং জ্ঞানলাভাদি উদ্দেশ্য মাতৃ-ভাষায় শিক্ষা হইলে অপেক্ষাকৃত সহজে ও অধিকতর সিদ্ধ হইবে।

—

বিবেক ও নেতার আজ্ঞা

বাংলার স্বরাজ্যদলের নেতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন-গুপ্ত কিছুদিন পূর্ব্বে একটি বক্তৃতায় বলিয়াছেন, নিজের নিজের বিবেক অনুসারে কাজ না করিয়া দলপতির আজ্ঞা অনুসারেই কাজ করাই উচিত। আমরা এরূপ উপদেশের সমর্থন করিতে পারি না। কিন্তু একথাও বলা উচিত, যে, তিনি যাহা খুলিয়া বলিয়া ফেলিয়াছেন, এক একটা রাজনৈতিকদলের লোকেরা ও দলপতিরা কার্য্যতঃ তাহার অনুসরণ বরাবর করিয়া আসিতেছেন। যে রাজনৈতিক

দলের সংহতি ও শক্তি যত বেশী, তাহাতেই এইরূপ নিয়ম ও উপদেশ তত দৃঢ়তার সহিত পালন করান হয়;—সাধারণতঃ ইহাই রাজনৈতিক দলের সংহতি ও শক্তির ভিত্তি বলিয়া বিবেচিত হয়।

দল দ্বারা রাষ্ট্রীয় কার্য্য পরিচালন প্রথার ইহা একটি প্রধান দোষ। এই কারণে উক্ত প্রথাটারই পরিবর্ত্তনের এবং তাহার পরিবর্ত্তে অন্য কোন প্রথার উদ্ভাবন ও অবলম্বনের চেষ্টা নানা দেশে হইতেছে।

যুদ্ধের নানা দোষ বর্ণিত হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে একটি দোষ এই, যে, সৈন্যেরা একবার সেনাদল ভুক্ত হইয়া গেলে তাহার পর তাহারা একটা বৃহৎ যন্ত্রের অংশবিশেষের মত হইয়া পড়ে। তাহাদের নিজের ভালমন্দজ্ঞান, তাহাদের নিজের বুদ্ধি বিবেচনা অনুসারে তাহারা কাজ করিতে পারে না। নায়ক যেমন হুকুম করিবেন, বিবেক-বিরুদ্ধ হইলেও তাহা তাহাদিগকে করিতে হইবে। তাহারা ঠিক যেন সেনাপতির হাতের বুদ্ধিবিবেকবিহীন অস্ত্র। বুদ্ধি, ভালমন্দজ্ঞান, হৃদয়ের নানা সদ্‌গুণ, এইগুলিই মানুষের মহত্ত্বের নিদান। যুদ্ধই হউক, বা রাষ্ট্রীয় কার্য্যপরিচালনের কোন প্রচলিত রীতিই হউক, যাহাতে মানুষকে মানুষের বিশেষত্ব বর্জ্জন করিয়া বা চাপা দিয়া রাখিয়া চলিতে হয়, তাহা কখনও মানবের কল্যাণকর হইতে পারে না।

অবশ্য, প্রত্যেক জিনিবই, হয় ধর্ম্মসঙ্গত নয় ধর্ম্মবিরুদ্ধ, হয় বিবেকানুমোদিত নয় বিবেকবিরুদ্ধ, এরূপ মনে করা উচিত নয়। এমন অনেক বিষয় আছে, যাহাতে নানা উপায়ের, নানা ব্যবস্থার মধ্যে কোন একটা অবলম্বিত হইতে পারে, এবং সবগুলাই ন্যায্য। তাহার মধ্যে দলের অধিকাংশ লোক যাহার পক্ষে কিম্বা দলপতি যাহার পক্ষে, তাহার অনুকূলে মত দেওয়ায় কোন দোষ নাই। এরূপ প্রত্যেক বিষয়কেই বিবেকের বিষয় করা ভাল নয়। কংগ্রেসের অভ্যর্থনাসমিতি প্রতিনিধিদের জন্য মুগের ডাল না মসুরের ডাল কিনিবেন, সন্দেশ বা রসগোল্লা আনাইবেন, তাহার যে দিকেই মত দেওয়া যাক্, তাহাতে বিবেকে আঘাত না লাগিতে পারে, ধর্ম্মহানি না হইতে পারে। পক্ষান্তরে, এমন অনেক বিষয় আছে, যাহাতে প্রত্যেক মানুষ নিজের বিবেক বা ধর্ম্মবুদ্ধি অনুসারে না চলিলে নিশ্চয়ই প্রত্যবায়গ্রস্ত ও মনুষ্যত্বে হীন হইবেন।

—

কলিকাতার পেশাদার থিয়েটার

সম্প্রতি গান্ধী মহাশয়ের ইয়ং ইণ্ডিয়া কাগজে কোন ভদ্রলোক লিখিয়াছেন, কলিকাতার পেশাদার দেশী থিয়েটারগুলি প্রধানতঃ পেশাদার অভিনেত্রীদের জোরে চলে এবং তাহারা সকলেই বারবণিতা। ইহার কুফলের দিকেও লেখক দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। গান্ধীজি লিখিয়াছেন, তিনি চান না, যে, বারবণিতারা বারবণিতা থাকিবে এবং অভিনেত্রীরও কাজ করিবে।

বারবণিতা-অভিনেত্রীদের সম্বন্ধে আমরা অনেকবার আমাদের বক্তব্য বলিয়াছি। তাহার বিস্তারিত পুনরাবৃত্তি করিতে চাই না।

এই বিষয়টির আলোচনা দুই দিক্ দিয়া হইতে পারে। (১) বারবণিতারা বারবণিতা থাকিয়াই পেশাদার অভিনেত্রীর কাজ করায় সমাজের ক্ষতি হয় কিনা, এবং ক্ষতি হইলে তাহা নিবারণের উপায় কি? (২) এইরূপ বন্দোবস্ত দ্বারা বারবণিতা-বৃত্তিকে স্থায়ী করার সাহায্য করা হয় কি না, তাহা স্থায়ী করায় সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে সম্মতি দিলে কার্য্যতঃ কতকগুলি স্ত্রীলোককে বারবণিতার জীবন যাপন করিতে হয় বলিয়া সমাজের এক অংশের লোকের প্রতি নির্ম্মমতা প্রদর্শন ও অবিচার করা হয় কি না। আমরা আগে আগে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, যে, বারবণিতারা দুশ্চরিত্রা থাকিয়াই সামাজিক কোন কাজ করিলে তাহাদের সংস্পর্শে ও সংস্রবে সমাজের অনিষ্ট হয়। তাহার অন্য প্রকার দুইটি দৃষ্টান্ত লওয়া যাক্। অনেক কলকারখানায় শ্রমজীবী স্ত্রীলোক কাজ করে। তাহাতে তাহাদের উপার্জ্জন যথেষ্ট হয় না বলিয়া তাহারা কেহ কেহ উপার্জ্জনের জন্য পাপেও লিপ্ত হয়। কলিকাতায় যাহারা ঠিকা ঝি'র কাজ করে, তাহারা অনেকে যথেষ্ট বেতন পায় না, পাপে লিপ্ত হইয়া বেতন ব্যতীত আরও কিছু উপার্জ্জন করে। অবশ্য এই উভয় প্রকার স্ত্রীলোকদের উপার্জ্জনের অংশ.তাই তাহাদের পাপ ব্যবসায়ে লিপ্ত

হওয়ার একমাত্র কারণ নহে; অন্য কারণও আছে। কিন্তু কারণ যাহাই হউক, এই উভয় প্রকার স্ত্রীলোকদের চরিত্রহানি বশতঃ তাহাদের নিজেদের অকল্যাণ হয়, এবং সমাজেরও অকল্যাণ হয়। অতএব, তাহারা যে-যে কারণে বেশ্যাবৃত্তি করে, সেই সেই কারণের উচ্ছেদের দিকে সমাজহিতৈষীদিগের মনোযোগ করা উচিত।

অনেকে মনে করেন, বেশ্যাবৃত্তি স্মরণাতীত কাল হইতে আছে এবং ভবিষ্যতেও চিরকাল থাকিবে; অতএব ইহার প্রতিকার চিন্তা করিয়া মাথা খারাপ করিবার দরকার নাই। আমরা তাহা মনে করি না। ক্রীত বা যুদ্ধে বন্দীকৃত দাসের দ্বারা কষ্টসাধ্য বা ঘৃণিত কাজ করাইবার প্রথা বেশ্যাবৃত্তি অপেক্ষা কম প্রাচীন নহে। কিন্তু এখন তাহা আর কোন সভ্যদেশে নাই বলিলেও চলে। অবশ্য দাসদের স্থানে অন্যবিধ শ্রমিকের শ্রম বলপূর্ব্বক চালাইবার চেষ্টা নানাস্থানে চলিতেছে, কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে সংগ্রামও চলিতেছে। বেশ্যাবৃত্তি সম্বন্ধে আমাদের মনে হয়, যে, সামাজিক সর্ব্ববিধ ব্যবস্থা এরূপ হইতে পারে ও হইবে যাহাতে ক্রমশঃ উহা হ্রাস পাইবে ও উঠিয়া যাইবে।

অভিনয়মাত্রকেই আমরা খারাপ মনে করি না। যাত্রা একপ্রকার অভিনয়। বহুবিধ যাত্রায় আমাদের দেশের লোকে অনাবিল আমোদ ও শিক্ষা পাইয়াছে। থিয়েটারের অভিনয়মাত্রই খারাপ নয়। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে আমরা উহার একান্ত বিরোধী হইতাম। কিন্তু যদি ইহা সত্য হয়, যে, কলিকাতার দেশী থিয়েটারগুলি পেশাদার অভিনেত্রী ভিন্ন চলে না, এবং পেশাদার অভিনেত্রীদের পক্ষে সচ্চরিত্রা হওয়া ও থাকা অসম্ভব, তাহা হইলে সেরূপ অবস্থার উচ্ছেদের কোন না কোন উপায় আবিষ্কার করিতে সমাজ বাধ্য। কেন না, এমন কোন সামাজিক ব্যবস্থা বা প্রতিষ্ঠান্ রাখিবার অধিকার সমাজের নাই, যাহার দ্বারা সমাজের অন্তর্ভূত কোন অংশকে চির অমঙ্গলের মধ্যে নিক্ষিপ্ত রাখিতে হয়।

উপরে দুই শ্রেণীর স্ত্রীলোকের কথা লিখিয়াছি, যাহারা যথেষ্টপারিশ্রমিক না পাওয়ায় বেশ্যাবৃত্তি দ্বারা অভাব পূরণ করে। পাদ্রি হার্বার্ট্ এণ্ডার্সন্‌কে কোন কোন পতিতা নারী বলিয়াছে, যে, সদুপায়ে তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদন চলিলে তাহারা তাহাদের বর্ত্তমান ঘৃণিত জীবন ত্যাগ করিতে পারে। কিন্তু পেশাদার অভিনেত্রীদের বেলায় একথা সত্য বলিয়া মনে হয় না। কারণ অভিনয় করিয়া ত তাহারা যথেষ্ট টাকা পায়; অথচ তাহারা ভাল হয় না! ইহার কারণ কি? থিয়েটার সংসৃষ্ট লোকেরা কি তাহাদিগকে ভাল হইবার ও থাকিবার পরামর্শ, উৎসাহ এবং সুযোগ দেয় না? তাহারা কি, বরং, ইহার বিপরীত অবস্থাসমবায়েরই সৃষ্টি করে? অথবা যাহারা অভিনয় দেখিয়া অভিনেত্রীদের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাহাদেরই মধ্যে কেহ কেহ পেশাদার অভিনেত্রীদের কলুষিত জীবনেই আবদ্ধ থাকিবার অন্যতম কারণ হয়? থিয়েটারগুলির অবস্থা ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমাদের কোন সাক্ষাৎ জ্ঞান না থাকায় এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলাম না। কিন্তু শুনিয়াছি, কোন কোন পেশাদার অভিনেত্রী অভিনয় কার্য্যে বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করিলে কোন-না-কোন ধনী দুশ্চরিত্র বা দুর্ব্বলচিত্ত লোক তাহাদিগকে আর অভিনেত্রী থাকিতে দেয় নাই। ইহা হইতে মনে হয়, অন্ততঃ এই সকলস্থলে অভিনয়কার্য্য অভিনেত্রীদের কেবল রোজ-গারের সদুপায় না হইয়া তাহাদের ও তাহাদের দ্বারা আকৃষ্ট পুরুষদের কলুষিত জীবন যাপনের সহায় হইয়াছে।

যাহারা পেশাদার অভিনেত্রীর কাজ করে, শুনিয়াছি তাহাদের মধ্যে অনেকে ভাল অভিনয় করে। তাহা নানাবিধ মানসিক শক্তির পরিচায়ক। তাহারা প্রাতঃ-স্মরণীয়া অনেক মহিমাময়ী মহিলার ভূমিকা গ্রহণ করে। তাঁহাদের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহাদের চরিত্র ধ্যান করিয়া, অভিনেত্রীদের যদি হৃদয়ের পরিবর্ত্তন হইত, যদি তাহাদের এরূপ মনের বল জন্মিত যে তাহারা আর দেহবিক্রয়ে রাজী হইত না, তাহা হইলে ত তাহারা কোন না কোন আইনের সাহায্যে বিবাহিত হইয়া একচর্য্য একনিষ্ঠ জীবন যাপন করিতে পারিত। কোনও পুরুষের পক্ষে কোনও নারীর ঘনিষ্ঠতম আমরণ সঙ্গলাভের একমাত্র বৈধ মূল্য একনিষ্ঠ প্রেম। কোনও নারীর পক্ষেও কোনও পুরুষের

ঐরূপ সম্মানের একমাত্র বৈধ মূল্য একনিষ্ঠ প্রেম। ইহা বুদ্ধির দ্বারা বুঝিবার এবং কার্য্যতঃ ইহার অনুসরণ করিবার মত হৃদয় মনের শক্তি কোনও পেশাদার অভিনেত্রীর থাকা কি একেবারেই অসম্ভব ?

কোন না কোন প্রকারে যাহারা সমাজের কোন প্রকার কাজ করিয়া দেয়, সমাজ তাহার বিনিময়ে তাহাদের কল্যাণ চিন্তা ও কল্যাণের ব্যবস্থা করিতে বাধ্য। নতুবা সমাজের স্বার্থপরতা ত হয়ই, অধিকন্তু সমাজ ক্ষতিগ্রস্তও হয়। আমাদের মনে হয়, পেশাদার অভিনেত্রীদের নিকট হইতে সমাজ কেবল আমোদ-দানরূপ কাজই লইতেছে কিন্তু তাহাদের কল্যাণ-চিন্তা করিতেছে না। ফলে উক্ত অভিনেত্রীরাই যে কেবল খারাপ থাকিয়া যাইতেছে তাহা নহে, সামাজিক অপবিত্রতাও বৃদ্ধি পাইতেছে। থিয়েটারের সংখ্যা ও আদর বাড়িয়া চলিতেছে। যে কেবল বেশ্যা, ভদ্র সমাজে তাহার নাম উল্লেখ কিম্বা তাহার সম্বন্ধে আলোচনা চলে না; কিন্তু যে বেশ্যা এবং অভিনেত্রী দুই-ই, তাহার সম্বন্ধে আলোচনা এবং তাহার ছবি মুদ্রণ সম্ভ্রান্ত, ভদ্র, সচ্চরিত্র লোকদের দ্বারাও হইতেছে। ইহার দ্বারা সামাজিক পবিত্রতা রক্ষা ও বৃদ্ধি ক্রমশঃ কঠিনতর সমস্যা হইয়া দাঁড়াইতেছে।

—

চীন দেশে বিপ্লব-সূচনা

চীন দেশে বহুকাল হইতেই বিদেশী বিদ্বেষ প্রবল। যদিও চীন দেশ আইনতঃ স্বাধীন দেশ, তবুও কার্য্যত চীনেরা ভারতীয়দের মতই অথবা আরও অধিকতররূপে পরাধীন। চীন দেশ বিশাল দেশ। আয়তনে চীন ৪,২১৮,২০১ বর্গ মাইল, ইহার জনসংখ্যা প্রায় ৪০০,০০০,-০০০ এবং চীনের স্বাভাবিক সম্পদ অতুলনীয়। শুধু কয়লা ও লোহার পরিমাণ ধরিলেই চীনকে অসাধারণ সম্পদশালী বলিয়া প্রমাণ করা যায়। ব্যারণ্ বন্ রিকৃতোফেনের মতে চীন দেশে ৪১৯,০০০ বর্গ মাইল জুড়িয়া কয়লার খনি আছে, এবং এই কয়লার মধ্যে ৬০০,০০০,০০০,০০০ টন উৎকৃষ্ট এ্যান্থ্রাসাইট্ কয়লা। শুধু শেন্-সি প্রদেশে যে পরিমাণ কয়লা আছে, তাহাতে সমগ্র পৃথিবীর হাজার বছরের কয়লার খোরাক জোগান যাইতে পারে। লোহা চীন দেশে এত আছে যে, তাহার হিসাব হয় না। আধুনিক জগতে জাতীয় সম্পদ লোহা ও কয়লার উপরে বিশেষরূপে নির্ভর করে। চীনের লোহা ও কয়লা আছে অপরিমিত কিন্তু তাহা এখনও উপযুক্তরূপে মানুষের ভোগে আসিতেছে না।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই চীন-দেশ জগতে সভ্যতার জন্য বিখ্যাত। অপরাপর দেশীয় লোকেরা যে সময় অসভ্য জীবন যাপন করিতেছিল, চীন দেশীয়রা সেই সময় আগ্নেয় অস্ত্র, চীনামাটির বাসন, জিলাটিন্, ইত্যাদি ব্যবহার করিত। তাহারা ইয়োরোপের পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে ছাপার হরফ তৈয়ারী করে; দিগ্দর্শন যন্ত্র বা কম্পাসের উদ্ভাবনা করে ও ছয় শত মাইল লম্বা একটি খাল কাটে। আধুনিক স্থাপত্যের অবশ্য প্রয়োজনীয় খিলান চীন দেশের দান। প্রাচীন চীনাদের নির্ম্মিত পার্ব্বত্য রাজপথ রোমানদের রাজপথ অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে।

প্রাচীনকালে এতটা উন্নতি করায় চীনাদের যথেষ্ট গর্ব্ব হইয়াছিল। তাহারা চীন সাম্রাজ্যের নাম দিয়াছিল "স্বর্গীয় সাম্রাজ্য"। লর্ড্ নেপিয়ার যখন পার্লামেণ্টের দ্বারা একখানি পত্র লইয়া ব্যবসা-বাণিজ্য-সংক্রান্ত বন্দোবস্ত করিবার জন্য ক্যাণ্টনে প্রেরিত হন ক্যাণ্টনের রাজ-প্রতিনিধি তখন আশ্চর্য্য হইয়া বলেন যে, একজন অসভ্য বর্ব্বর জাতীয় লোকের পত্র তিনি কিছুতেই লইতে পারেন না। "এইরূপ ব্যাপার হইতেই পারে না।" "বর্ব্বর (বৃটিশ) জাতীয় লোকেরা যে ব্যবসা-বাণিজ্য করে, তাহার সহিত স্বর্গীয়-সাম্রাজ্যের কর্ম্মচারীদের কোন সম্বন্ধ নাই। তাহাদের দেওয়া কর পাওয়া না-পাওয়ার উপর স্বর্গীয় সাম্রাজ্যের একটা চুল বা পালক পরিমাণও কিছু নির্ভর করিতেছে না এবং এ সকল বিষয়ে একজন রাজকর্ম্মচারীর মনোযোগ দিবার মত কিছুই নাই।" কিন্তু এই গর্ব্ব চীনের রহিল না। ব্যবসায়ী জাতিদের হস্তেই চীনের চরম লাঞ্ছনা হইল। যে বিশাল চীনদেশ একদিন পৃথিবীর কোল জুড়িয়া সুখসুপ্ত নিশ্চিন্ত-প্রাণ ঐরাবতের মত পড়িয়াছিল;

আজ তাহাকে "বর্ব্বর"-দমনে চঞ্চল হইয়া উঠিতে হইয়াছে।

অতি প্রাচীন কাল হইতেই চীনদেশের সম্রাটগণ দৃঢ়-হস্তে রাজ্যশাসন করিতেন। ফলে চীনদেশের লোকেরা অজ্ঞ নিরক্ষর ও রাজশক্তির নিকট ভীত ও পদানত হইয়া দিন কাটাইতে চিরঅভ্যস্ত। বণিক-জাতীয় লোকেরা যখন চীনের দিকে নজর দিল, তখন স্বর্গীয় সাম্রাজ্যের অহংকার তাহাকে দাসত্ব হইতে বাঁচাইতে পারিল না। অতি সহজেই চীন বিদেশীর অর্থনৈতিক দাসত্বে অভিভূত হইয়া পড়িল। আজ চীন, বৃটিশ, জাপানী, আমেরিকান ও অন্যান্য বণিক-জাতির দাসত্বে আবদ্ধ। চীন দেশে বহুকাল হইতেই এই দাসত্বের বিরুদ্ধে মহাজাগরণের প্রচেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু বহু শতাব্দী ধরিয়া যে জাতীয় ব্যাধি বাড়িয়া উঠে, তাহা দূর করিয়া দেশের স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাওয়া সহজ কার্য্য নয়।

চীনদেশের লোকেরা শুধু বিদেশীকে গালি দিয়াই নিরস্ত হয় নাই। আত্মসংস্কার-কার্য্যেও চীন তাহার প্রাচীন গৌরব ম্লান হইতে দেয় নাই। চীনের যুবকবৃন্দ, ছাত্রমণ্ডলী, জাতির নব জাগরণের দিনে সর্ব্বস্ব ভুলিয়া দেশের উন্নতির জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছে। এই শিক্ষিত যুবকবৃন্দের চেষ্টাতেই চীন আজ বুঝিয়াছে যে. বিদেশীকে দূর না করিলে চীনের আর উন্নতির আশা নাই। বিদেশীকে দূর করিবার উপায় যে তাহার ব্যবসার সর্ব্বনাশ সাধন করা; ইহাও চীনদেশের যুবকের বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। সম্প্রতি চীনে যে বিপ্লবের সূচনা হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য বৃটিশ ও জাপানী বাণিজ্যের সর্ব্বনাশ-সাধন। ইহা হঠাৎ আরম্ভ হয় নাই। ১৯২৪ খৃঃ অব্দের জাপানী ডিপার্টমেণ্ট্ অফ্ ফাইনান্সের রিপোর্টে আমরা দেখিতেছি যে-গতবৎসর মে মাস হইতেই জাপানীরা চীনাদের বয়কট্ বিশেষরূপে অনুভব করিতেছে।

"From about the month of May…export dwindled owing to the boycott of Japanese goods in China." (মে-মাস হইতেই রপ্তানী কমিতে শুরু হয়। কারণ চীনদেশে জাপানী মাল বয়কট) ফলে; যদিও সচরাচর চীনাদের সহিত বাণিজ্যে জাপানীরা আমদানি অপেক্ষা প্রায় বাৎসরিক ১০০,০০০,০০০ ইয়েন মূল্যের দ্রব্য রপ্তানী অধিক করিত, ১৯২৪ খৃঃঅব্দে জাপান রপ্তানী অপেক্ষা ১৩,০০০,০০০ মূল্যের অধিক দ্রব্য চীন হইতে আমদানি করে। "Quite an unusual Phenomenon in our China trade" (আমাদের চীনদেশের সহিত বাণিজ্যের ইতিহাসে ইহা একটি অসাধারণ ঘটনা।)

চীনারা যে দৃঢ়চিত্তে জাতীয় স্বাধীনতা অর্জ্জনে লাগিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। নীচে আমরা ১৯১১ ও ১৯২২ খৃঃ অব্দের চীন দেশ-সম্বন্ধে কতকগুলি তথ্য তুলনা-মূলক ভাবে দেখাইতেছি। ইহাতে বুঝা যাইবে যে, চীনারা শুধু হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া মারপিট্ করিতেছে না; তাহাদের জাতীয় জীবনে সত্য-সত্যই একটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং এই পরিবর্ত্তনের মূলে রহিয়াছে—চীনের যুবকের স্বার্থত্যাগ, একাগ্রতা ও চেষ্টা।

১৯১১		১৯২২	
জন সংখ্যা	৪৩৩,৫৫৩,০৩০	জন সংখ্যা	৪৩৬,৯০৪,৯৫৩
[বিদেশী জন সংখ্যা (১৯০৯ খৃঃ অঃ)]		বিদেশী জন সংখ্যা	
জাপানী	৫৫,৪০১	জাপানী	১৪৩,৯১৮
রুশীয়ান্	৫,৯৫২	রুশীয়ান্	১৪৪,৪১৩
বৃটিশ	৯,৫৯৯	বৃটিশ	১১,০৮২
পোর্ত্তুগিজ্	৩,৩৯৬	পোর্ত্তুগিজ্	২,২৮২
আমেরিকান্	৩,১৪৬	আমেরিকান্	৭,২৬৯
জার্ম্মাণ	২,৩৪১	জার্ম্মাণ	১,০১৩
ফরাসী	১,৮১৮]	ফরাসী	২,৭৫৩]
ইউনিভারসিটি	২	ইউনিভারসিটি	৭
স্কুল ও কলেজ (১৯০৭)	৩৭,০০০	স্কুল ও কলেজ (১৯১৯)	১৩৪,০০০
ছাত্র সংখ্যা	১,০১৩,০০	ছাত্র সংখ্যা	৪,৪০০,০০০
খবরের কাগজ (দৈনিক সাপ্তাহিক, মাসিক)	২০০	খবরের কাগজ (দৈনিক ইত্যাদ)	১০০০
ফ্যাক্টরী	জানা নাই	রেশম ফ্যাক্টরী	১৭
স্পিণ্ডল (১৯১০)	৮০০,০০০	কটন মিল	৫৭
		উলেন মিল	৪
		স্পিণ্ডল	১,৭৪৭,৩১২
		ফ্লাওয়ার মিল	১৫৭
		কাঁচের ফ্যাক্টরী	৪৪৫
		লোহার ফ্যাক্টরী	অনেকগুলি

ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয় আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, গত বহু বৎসর ধরিয়া বিদেশীয় লোকে ক্রমশঃ চীনের উপর ভাল করিয়া চড়াও হইয়া বসিবার চেষ্টা করিতেছে। রেলওয়ে, খনি, ব্যাঙ্ক্, বন্দর, জাহাজী

বাণিজ্য ইত্যাদি সকল ব্যাপারে চীনের জাতীয়তা নাই বলিলেই চলে। বহুকাল হইতেই চীন বিদেশীকে নিজ দেশে ফেরত পাঠাইবার জন্ত উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে। শিক্ষা ও শক্তি সঞ্চয় করিতে করিতে চীন কয়েকবারই তাহার হারান স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইবার চেষ্টা করিয়াছে। আজ আবার তাহার আর এক চেষ্টার সূচনা হইল। আমরা শুধু দূরে থাকিয়া দেখি যে, একটি বিশাল প্রাচীন জাতি কি করিয়া জাগিয়া উঠে। দুঃখের ও লজ্জার বিষয় এই যে, আমাদের দেশের লোক চাকরীর খাতিরে চীনে গিয়া প্রভুর আদেশে স্বাধীনতা-প্রয়াসী চীনদেশীয়দের উপর গুলি চালায় ও সম্ভবতঃ আরও চালাইবে।

অ

—

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংঘর্ষণ

পৃথিবীময় একটি ভীষণ কুরুক্ষেত্রের পূর্ব্বাভাষ দেখা যাইতেছে। এই কুরুক্ষেত্রে কোন্ পক্ষে কে থাকিবে তাহা আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। গত কয়েক শত বৎসর ধরিয়া ইয়োরোপের সাম্রাজ্য-লোলুপ জাতিগুলি যে বিষ পৃথিবীময় ছড়াইয়াছে আজ তাহার ফল ফলিতেছে। মরোক্কোতে আব্‌দ্ এল-ক্রিম নিজের মুষ্টিমেয় অনুচরবৃন্দের সহায়তায় স্পেনের শক্তিকে পরাজিত করিয়া ফ্রান্সের ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সিরিয়াতে ফরাসীবাহিনী পরাজিত ও দামাস্কাসের পথে পলাতক। মিশর, পারস্য, আফগানিস্থান প্রভৃতি সকল মুসলমান রাষ্ট্রগুলিতেই জনমত ইয়োরোপীয় শক্তির বিরুদ্ধে জাগিয়া উঠিয়াছে। তুর্কি মোশালে নিজশক্তি বজায় রাখিতে বদ্ধপরিকর। চীনে আদর্শবাদী জাপানী ও বৃটিশ জাতির বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিহিংসা-পরায়ণতার বন্যা ছুটিয়াছে। ভারতে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয়েরা দণ্ডায়মান। আফ্রিকা ও এশিয়ার বিদেশী অধিকৃত দেশগুলিতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভের জন্ত সকলে বদ্ধপরিকর হইয়াছে। এই যে পৃথিবীব্যাপী উত্তেজনা ও আত্ম-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা; ইহার মূলে রহিয়াছে পাশ্চাত্যের স্বার্থপরতা ও পরধনলিপ্সা। বহুশতবর্ষ ধরিয়া ইয়োরোপের লোকেরা নিজেদের সম্পদবৃদ্ধির জন্ত দেশে দেশে ঘুরিয়াছে ও ছলে-বলে-কৌশলে পরস্বকে নিজস্ব করিয়াছে। ইহার জন্ত তাহারা ধর্ম্ম, পরোপকার বা অপর যে কোন উচ্চ আদর্শের মিথ্যা ভাণ করিতে কখনও পশ্চাৎপদ হয় নাই। আজ যে পৃথিবীর অধিকাংশ লোক নিদারুণ দারিদ্র্যে নিমজ্জিত, আজ যে পৃথিবীর অধিকাংশ লোক সকল জ্ঞানালোক হইতে বঞ্চিত, ইহার মূলে প্রধানত রহিয়াছে পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যলোলুপ বিবেকহীনতা ও প্রাচ্যের সাময়িক নির্ব্বুদ্ধিতা ও আত্মরক্ষাকার্য্যে অক্ষমতা। পৃথিবীর সকল উৎপীড়িত জাতির প্রাণে একই আকাঙ্ক্ষা, একই আশা—স্বাধীনতা, স্বাবলম্বন, আত্মোন্নতি। আব্‌দ্-এল-ক্রিম Buenos Aires এর Grupo Renovacion এর সাদর নিমন্ত্রণের উত্তরে লিখিয়াছেন:—

* * * মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা বাঞ্ছিত ও পূত অধিকার স্বাধীনতা। এই অধিকার অনুসারে সকল জাতিই চায় নিজেকে নিজে শাসন করিতে ও নিজের অতীত ইতিহাস, সভ্যতা ও আকাঙ্ক্ষার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া নিজের রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিতে। মরোক্কোর বীরজাতি আজ সেই একই আদর্শের জন্ত যুদ্ধ করিতেছেন, যে আদর্শ মিরান্ডা, মোরেনো, বোলিভার ও সান মার্টিন প্রচার করিয়াছিলেন। * *

আমাদের জাতীয়তা, সভ্যতা ও ধর্ম্ম কোন দিক্‌ দিয়াই আমরা ইয়োরোপীয় কোন শক্তির দাসত্বে থাকিতে পারি না। তোমরাও যেমন একশত বৎসর পূর্ব্বে স্বাধীনতার জন্ত লড়িয়াছিলে আমরাও আজ তেমনি করিয়াই দেশের স্বাধীনতার জন্ত নিজেদের প্রাণ ও সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছি।

মহাযুদ্ধের পাপে ও পরধনলোলুপতায় কলুষিত ইয়োরোপ আজ অপর জাতির উপর গুরুগিরি ও প্রভুত্ব করিবার অধিকার হারাইয়াছে। আমরা চাই শান্তি ও সুবিচারপূর্ণ একটি সভ্যতা গড়িয়া তুলিতে। আরব জাতীয় আমরা যাহারা আছি; আমরা চাই ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালি ও স্পেনের প্রভুত্ব চূর্ণ করিতে। আমাদের ইজিপ্টের ভ্রাতৃবৃন্দ প্রথম ঘা লাগাইয়াছেন, এবং আমরা মরোক্কোতে দ্বিতীয় ঘা শীঘ্রই লাগাইব। তা'র পর এলজিরিয়া, টিউনিস ও ট্রিপোলি। তাহারাও প্রস্তুত হইতেছে।

আমরা ন্যায়ের দিকে লড়িতেছি। যেমন তোমরা লড়িয়াছিলে। আমাদের মধ্যে স্পেনের প্রতি কোন বিদ্বেষ নাই। স্পেন প্রাচীনকালে আমাদেরই মাতৃভূমি ছিল, আমাদের সভ্যতা সেখানেই গড়িয়া উঠিয়াছিল। সকল শিক্ষিত স্পেনীয়রাই জানেন যে তাঁহাদের দেশের গৌরব আরবের সহিত কতটা জড়িত। যে দিন অন্ধ গোঁড়ামীর জন্ত আমরা স্পেন হইতে বিতাড়িত হই, সেই দিন স্পেনের গৌরব-রবিও অস্তগামী হয়। আজ স্পেন অধোগতির চরমে পৌঁছিয়াছে।

* * * * *

আমরা যুদ্ধ করিতে থাকিব। যতদিন না পূর্ব্ব এশিয়া ও ভূমধ্যসাগরের তীরবর্ত্তী সকল আরব জাতি স্বাধীন হয় ততদিন আমরা লড়িব। স্বাধীন মরোক্কো ও স্বাধীন ইজিপ্ট, এই দুইটি স্তম্ভের উপর আমাদের

জাতি আবার সোজা হইয়া দাঁড়াইবে। এই জাতি প্রাচীনকালে পৃথিবীকে তিনটি বিভিন্ন সভ্যতায় অলঙ্কৃত করিয়াছে।

যে দিন স্পেন আমাদের স্বাধীনতা স্বীকার করিবে সেই দিন হইতে আমরা আবার স্পেনের সহিত সখ্য স্থাপন করিব।"

এই কথাগুলির মধ্যে কোন উন্মত্ত ও উত্তেজিত বর্ব্বরের মনোভাব দৃষ্ট হইতেছে না। ইহার মধ্যে আমরা দেখিতেছি আদর্শবাদীর তেজ ও বীরত্ব। ইয়োরোপের ইম্পিরিয়ালিজ্‌মের ফল ফলিতেছে। এই সময় ইয়োরোপের উচিত তাহার অতীতের পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ইয়োরোপ-অধিকৃত জগৎকে স্বাধীনতা স্বেচ্ছায় ফিরাইয়া দেওয়া। কিন্তু ইয়োরোপ তাহা করিবে না। ইয়োরোপের নানা দেশে সমগ্র ইয়োরোপকে একত্র করিয়া এশিয়ার নবজাগ্রত শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড় করাইবার চেষ্টা চলিতেছে।

M. Joseph Caillaux ভিয়েনার Neue Freie Presseতে লিখিতেছেন—

ইয়োরোপ কি শীঘ্রই একত্র হইবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিবে না? ইয়োরোপ কি দেখিবে না যে প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে যে সকল ঘটনা ঘটিতেছে, তাহাতে ইয়োরোপীয় একতার একান্ত প্রয়োজন?

* * আমাদের চক্ষু খুলিয়া দেখা দরকার যে বিংশ শতাব্দীর দেশভক্তি অর্থে ইয়োরোপ-ভক্তি।

এই ফরাসী রাষ্ট্রনেতার কথাগুলির মধ্যে আমরা আশার বাণী শুনিতেছি না। শুনিতেছি প্রাচ্যকে "যুদ্ধং দেহি, যুদ্ধং দেহি" আহ্বান।

অ

—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সমস্যা

কিছুকাল পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুনর্গঠন কমিটি নিজেদের রিপোর্ট বাহির করেন। কমিটি বসিয়াছিল বিশ্ববিদ্যালয়কে কি করিয়া উন্নতিশীল ও সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায় তাহা স্থির করিতে এবং খরচ কমান চলে কি না, বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরেদের মাহিনা ও চাকরীর অন্যান্য অবস্থা সুবিধাজনক কি না এবং উক্ত চাকুরেরা উচ্চশিক্ষা ও রিসার্চের আদর্শ অনুযায়ী কার্য্য করিতে হইলে যেরূপ বন্দোবস্ত প্রয়োজন সেইরূপ বন্দোবস্ত পাইতেছেন কি না ইত্যাদি নির্ণয় করিতে।

রিপোর্ট বাহির হইবার পর হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি ও আদর্শের কথা যেন হাওয়ায় মিলাইয়া গেল। যেন সমস্যা দাঁড়াইল বিশ্ববিদ্যালয় খরচ কম করিতেছে বা বেশী করিতেছে ও গভর্ণমেন্ট্ বিশ্ববিদ্যালয়কে কিছু টাকা দিবে কি না দিবে। দুই দল লোক; একদল গভর্ণমেন্টের যাহাতে টাকা বাঁচে তাহার জন্য ব্যগ্র ও অপরদল যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরেগণ যেরূপ টাকা পাইয়া আসিতেছেন সেইরূপই পাইতে থাকেন এই চেষ্টায় ব্যস্ত; দুইদল দুই প্রকার কথা প্রচারে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়া গেলেন। যেন টাকা কম অথবা বেশী খরচের উপরেই উচ্চশিক্ষার উন্নতি বা অবনতি নির্ভর করে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বহুকাল ধরিয়া একদল বিশেষ লোকের দ্বারা পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। ইহারা টাকা কম খরচ করেন অথবা বেশী খরচ করেন সে কথা বিচার করিবার অগ্রে বিচার করা দরকার ইহারা টাকা উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ করিবার জন্য ব্যয় করেন কি না। অতিশয় অধিক পরিমাণ টাকা খরচ করিয়াও উচ্চ শিক্ষার কার্য্য সুসাধিত হইবে না যদি উপযুক্ত ব্যক্তিরা শিক্ষক নিযুক্ত না হন। যদি জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদির দ্বারা কে প্রফেসর বা লেক্‌চারার হইবেন স্থির করা না হয় এবং যদি অনুপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে শিক্ষা-কার্য্য ন্যস্ত হয় তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয় গভর্ণমেন্টের সাহায্য পাইলেও উন্নতি লাভ করিবে না। তেমনি খরচ কমাইলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপকার হইবে না। গভর্ণমেন্ট্ শিক্ষার জন্য, অর্থ ব্যয় করিবার জন্য প্রসিদ্ধ নহে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের উপর আস্থা নাই বলিয়াই শিক্ষিত লোকেরা অনেকে গভর্ণমেন্টের পক্ষে সুবিধাজনক মতটি মানিতেছেন। কিন্তু একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, টাকা কম খরচ হইবে কি বেশী হইবে, শিক্ষকগণ সপ্তাহে চার ঘণ্টা বক্তৃতা দিবেন কি দশঘণ্টা দিবেন, সংস্কৃত, পালি, এ্যান্থ্রপলজি বা এক্স্‌পেরিমেন্টাল্ সাইকলজি শিক্ষার জন্য একজন অথবা পাঁচশজন করিয়া শিক্ষক আসিবেন ইত্যাদি আসল প্রশ্ন নহে। আসল প্রশ্ন, বিশ্ববিদ্যালয় দল-বিশেষের করতলগত ও দল-বিশেষের পুষ্টির জন্য থাকিবে, না, জাতির সকল শিক্ষিত লোকের হস্তে আসিবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের

চাকরী উপযুক্ত ও গুণী লোকেরা শ্রেষ্ঠতার জোরে পাইবে না নির্গুণ লোকে সুপারিশ বা দলভক্তির জোরে পাইবে। বিশ্ববিদ্যালয়কে উন্নতিশীল ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে শিক্ষার প্রত্যেক বিভাগে উপযুক্ত লোক নিয়োগ সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। নিকর্ম্মা ও অকর্ম্মাদিগকে যতশীঘ্র পারা যায় বিদায় করা দরকার ও গুণীলোকের যাহাতে উপযুক্ত আদর হয় তাহার ব্যবস্থা করা দরকার।

অপ্রকাশিত বাউল-সঙ্গীত

শ্রী গৌরীহর মিত্র

[বীরভূম অঞ্চলে, বাউল-সম্প্রদায় রচিত বহুসংখ্যক সুন্দর সুন্দর গান প্রচলিত আছে। সেই সকল গান, এ-যাবৎ মুদ্রিত বা প্রকাশিত হয় নাই। আমরা এই স্থলে, বর্দ্ধমান জেলার দ্বিজ-অনন্ত রচিত কয়েকটি অপ্রকাশিত বাউল সঙ্গীত প্রকাশিত করিলাম। এই সঙ্গীত গুলি, বীরভূমের অন্তর্গত কুণ্ডমাগোল গ্রামনিবাসী বাউল-বৈষ্ণব শ্রী গৌরদাস বাবাজীর নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি।]

(১)

সখের ধান ভানা।
আমার মন, ব্যবসা ছেড়োনা॥
কর কৃষ্ণনামের ভানা কুটা, কোনই কষ্ট রবে না॥
অনুরাগ দেহ-ঢেঁকশালে, ঢেঁকী বসাইলে,
ভজন সাধন দুই ধারে তার, দুই পায়া দিলে,
ভক্তিরূপের আঁকশালাই দে' চল্‌বে ঢেঁকী টল্‌বে না॥
রাগ বৈধী দুইজন ভানুনী,
একজন হ'লো চাষার মেয়ে, একজন তেলেনী,
তারা ভানা কুটা ভাল জানে, তাদের গায়ে উপাসনার গহনা।
বৈরাগ্য মুখ্‌শালাই যাতে,
পাপ তুষ্‌ তার যাবে ছেড়ে, পাড় দিতে দিতে,
চাল উঠ্‌বে ফেটে, বিকার কেটে, ঠিক্‌রবেন মিছরী দানা॥
সেঁকে দাও শ্রদ্ধা গৃহিণী,
শুদ্ধরতি শুদ্ধমতি, কুলো চালুনী,
কাম ছেড়ে কামনা ঝেড়ে, ঝেড়ে পাছুড়ে ফেলনা॥
শ্রীগুরু শ্রীমহাজনের ধান,
তাহে হবিরে সাবধান,
ষোল আনা বজায় রেখে, করবি সমাধান,
লাভে লাভে কাল কাটাবি, আসলেতে ভুলো না॥
অনন্ত ধান ভান্‌তে পার্‌বে না তোর ঘরের যন্ত্রণা,
পাপ ঢেঁকী তোর মাথা চালে, গড়ে পড়ে না,
খুব হুঁসিয়ারী, খবরদারি হাতে ঢেঁকী পড়ে না॥

(২)

ওরে পামর মন,
যদি অমর হ'তে সাধ থাকে তোর, ওরে পামর মন।
কর, সুধা পানের আয়োজন॥
সুধাপানে মরে না প্রাণে, চিরজীবী সুরগণ॥
যার কিরণ স্নিগ্ধকর, জীবের জুড়ায় কলেবর,
সাধনে ক্ষীর সমুদ্র, মিল্‌বে সাধু সঙ্গ সুধাকর,
তাথে উঠ্‌বে নিষ্ঠা লক্ষ্মীদেবী, হরির হাথে হবে মন॥
হ'লে সাধনে সিদ্ধ, অসাধ্য সাধ্য,
হরি-সাধন-ক্ষীর-সমুদ্র, কর্‌গে যা মন্থন;
তাথে, শুদ্ধ প্রেমামৃত পাবে, এড়াবে জন্ম মরণ।
শ্রম হবে না পণ্ড, শুন বলি তার কাণ্ড,
মনকে কর মন্দর-গিরি মন্থনের দণ্ড,
কর অনুরাগের রজ্জুযোগে বাসুকীনাগের মতন॥
সুধা অমনি কি মিলে?—পূর্ব্বে দেবাসুর মিলে,
কত কষ্ট করেছিল মন্থনের কালে;
কর সেই অনুযোগ, রিপু-ইন্দ্রিয় যোগ, উদ্যোগে মিলে রতন
তোর দেহেন্দ্রিয়গণ, হবে ইন্দ্রাদি দেবগণ,
দেহে আছে প্রবল, অসুরের দল, কামাদি কয় জন;
তাথে কর বসি, দিবানিশি, শ্রবণাদি সুঘর্ষণ॥
শুধু সুধা লভ্য নয়, তাথে উঠ্‌বে রত্নচয়,
ভক্তি-মুক্তি, শঙ্খ, শুক্তি, উচ্চৈঃশ্রবা হয়;
তাথে উঠ্‌বে নিষ্কামব্রত, ঐরাবত, দেখ্‌লে ভুলে সুরগণ॥
যার সৌরভ অতুল; নাইক সমতুল,
তাথে দেখ্‌তে পাবে ব্রজভাবের পারিজাতের ফুল,
উঠ্‌বে নির্ব্বিকার ধন্বন্তরী, প্রেম-সুধা ক'রে ধারণ॥
সুধা দিবেন বাঁটিয়ে, অসুরে বঞ্চিয়ে,
হরিভক্তি মহারাণী মোহিনী হ'য়ে,
দুষ্ট কাম-রাহুকে বিবেক-চক্রে, তখনি করবে ছেদন॥

ফলে ভাগা-কলে ধন, অনন্তের কর্ম্মফল,
কোথা সুধা পাব!—উঠ লো বিষম হলাহল,
এ বিষ হর হ'লে, পরে হরি বলে, কণ্ঠে করিত ধারণ॥

(৩)

উদর পূরে খেয়ে নে না।
গরম গরম এই হরিনামের নরমলুচি, উদরপূরে খেয়ে নে না॥
যাবে তোর সংসার-ক্ষুধা, এমন জিনিষ আর পাবি না।
(মনরে আমার, হরি নামের মধু আর পাবি না)
রসনা-পাতা পেতে বোস্‌না খেতে, এক গ্রাসেতে বোল খানা,
ছত্রিশ স্বাদে এক মিশালে, ব'সে খেলে এক্‌সারে
জাত যাবে না।

হরিনাম এমনি লুচি, ছুঁলে মুচী, তাথে অশুচি হবে না,
লুচীতে হ'লে রুচি, কাল না বাছি শুচি অশুচি বাধে না॥
অনুরাগ ছোলার ডালে, মিশায়ে খেলে, আর তুমি
ভুল্‌তে পার্‌বে না
নিষ্ঠা করির তর্‌কারী সহকারী,—পূর্ণ হবে তোর বাসনা॥
আনন্দ চিন্ময় রসের, মিল্‌বে শেষে রসগোল্লা মিহিদানা,
পাঁচভাবের পাবি মণ্ডা, গণ্ডা গণ্ডা, ঠাণ্ডা হবে তোর রসনা॥
কলিতে ধন্য ধন্য জীবের জন্য, করেছেন শ্রীচৈতন্য মেওয়াখানা,
বিলাচ্ছে খাস্তা লুচী সমাদরে, নিতাই গৌর ভাই-দু'জনা॥
গোসাঞী কর্‌ছেন তর্ক, ঘৃত পক্ক, এ তোমার পেটে সইবে না,
অনন্ত মুড়ি খেয়ে, বুড়িয়ে গেলে—এ লুচীর স্বাদ আর
বুঝ্‌লি না॥

পাঠকের নিকট প্রার্থনা

একখানি অপ্রকাশিত কিন্তু বহুমূল্য পুঁথির সন্ধান পাইবার নিমিত্ত পাঠকের নিকট প্রার্থনা করিতেছি। পুঁথিখানি আমি দেখি নাই। একশত বৎসর পূর্ব্বে জন্‌ বেণ্ট্‌লি নামক এক সাহেবের চক্ষু ব্যতীত অদ্যাপি আর কাহারও দৃষ্টিতে পড়ে নাই। পুঁথিখানির নামও জানা নাই। কাজেই ইহার একটু বৃত্তান্ত বলা বলিতে হইতেছে।

জন্‌ বেণ্ট্‌লি ভাগলপুরে ইষ্ট্‌ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এক উচ্চ কর্মচারী ছিলেন। তিনি আমাদের জ্যোতিষের ইতিহাস চর্চা করিয়া একখানি বই লেখেন। বইখানির নাম A Historical View of the Hindu Astronomy বইখানি এশিয়াটিক্‌ সোসাইটির দ্বারা প্রকাশিত হয়। এই বইতে তিনি সার অসার অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন। ইয়ুরোপের দুই-এক জন জ্যোতির্বিদ্‌ তাঁহার মতামত বিচার করিয়া গিয়াছেন। এক দোষে বইখানি আমাদের নিকট অনাদৃত হইয়া রহিয়াছে। তিনি সংস্কৃত ভাষা জানিতেন না। তাঁহার যত কিছু আকাশব, তাহা পণ্ডিতের মুখে শুনিয়া নিজের কল্পনাতরঙ্গ। পদে পদে ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষ ফুটিয়া সত্য মিথ্যা মিশাইয়া ফেলিয়াছে।

তাঁহার বইতে এক স্থানে এক বর্ষচক্রের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে। কোথা হইতে তিনি এই চক্র (cycle) পাইয়াছিলেন, তাহার কিছু মাত্র নির্দ্দেশ দেন নাই। এতকাল কেহ এই চক্রের আলোচনাও করেন নাই। তিন বৎসর পূর্ব্বে বোম্বাইর শ্রীবেঙ্কটেশ বাপুজী কেতকর মহাশয় এই বর্ষচক্র হইতে আমাদের জ্যোতিষের এক অজ্ঞাতপূর্ব ইতিহাস আবিষ্কার করিয়াছেন। এখন দেখা যাইতেছে, এই বর্ষচক্র এক অমূল্য বস্তু। ইহাকে উদ্ধার করিতে পারিলে আমাদের পঞ্জিকার প্রাচীন ইতিহাস প্রকাশিত হইবে।

আমাদের পাঁজিতে নিম্নলিখিত পুণ্যতিথিগুলির নাম সকলেই পড়িয়াছেন। যথা,—আশ্বিন মাসে দুর্গাষষ্ঠী, ইহার অপর নাম আদি-কল্প। এইদিন দুর্গাপূজা আরম্ভ। অগ্রহায়ণ মাসে গুহষষ্ঠী চৈত্র মাসে স্কন্দষষ্ঠী জ্যৈষ্ঠমাসে অরণ্যষষ্ঠী শ্রাবণ মাসে লুণ্ঠন বা শীতলা ষষ্ঠী। পুনশ্চ বৈশাখ মাসে জহ্নু সপ্তমী আষাঢ় মাসে বিবস্বৎ সপ্তমী ভাদ্র মাসে ললিতা সপ্তমী মাঘ মাসে আরোগ্য রথ মিত্র বা মাকরী সপ্তমী। এই এই তিথি কেন প্রসিদ্ধ হইল, তাহার উত্তর অদ্যাপি অজ্ঞাত ছিল। পুরাণে অবশ্য তিথিগুলির বিধান ও মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। কিন্তু ইহা দ্বারা উৎপত্তি বুঝিতে পারা যায় না। বেণ্টলি সাহেব প্রাচীন বর্ষচক্রের অকস্মাৎ উল্লেখ না করিলে এই প্রার্থনা করিতে হইত না। কত ইতিহাস লুপ্ত হইয়াছে; উপস্থিত বিষয়ও লুপ্তের প্রকোষ্ঠে ফেলা হইত। ২৪৭ সাবন বর্ষ ১ মাসে এক চক্র হইত। প্রথম চক্রের প্রথম তিথি আদিকল্প ষষ্ঠী। ইহা খ্রিষ্টপূর্ব ১১৯৩ সনে হইয়াছিল আশ্বিন মাসে দ্বিতীয় চক্রের আরম্ভ গুহষষ্ঠী—ইহা খ্রিষ্টপূর্ব্ব ৯৪৬ সনে হইয়াছিল, কার্ত্তিক মাসে। এই চক্রবিস্তার করিয়া এবং তাহার উপযোগ দেখাইয়া শ্রীযুত কেতকর মহাশয় আমাদের আগ্রহ আরও বাড়াইয়া দিয়াছেন। জিজ্ঞাসু পাঠক ১৩৩১ সালের আশ্বিন মাসের ভারতবর্ষে 'পঞ্জিকা-সংস্কার' নামক প্রবন্ধে দেখিতে পাইবেন।

আমার বোধ হইয়াছে, এই বর্ষচক্র কোন প্রাচীন বাঙ্গালী জ্যোতির্বিদের আবিষ্কার। বেণ্ট্‌লি সাহেব বঙ্গদেশে ছিলেন। বর্ষচক্রটি প্রাচীন গ্রহাচার্য্যদিগের বাড়ীতে এখনও থাকিতে পারে। যদি পাঠক মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার গ্রামে অনুসন্ধান করেন, প্রাচীন বাঙ্গালীর লুপ্তকীর্ত্তি এখনও আবিষ্কৃত হইতে পারে। ২৪৭ বৎসর ১ মাস পরে এবং নিরত শুক্ল সপ্তমীতে চক্র আরম্ভ হইত,—এইটুকু ধরিয়া অনুসন্ধান করিতে পারেন। ইতি—

শ্রী যোগেশচন্দ্র রায়

৯১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা প্রবাসী প্রেসে শ্রী অবিনাশচন্দ্র সরকার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
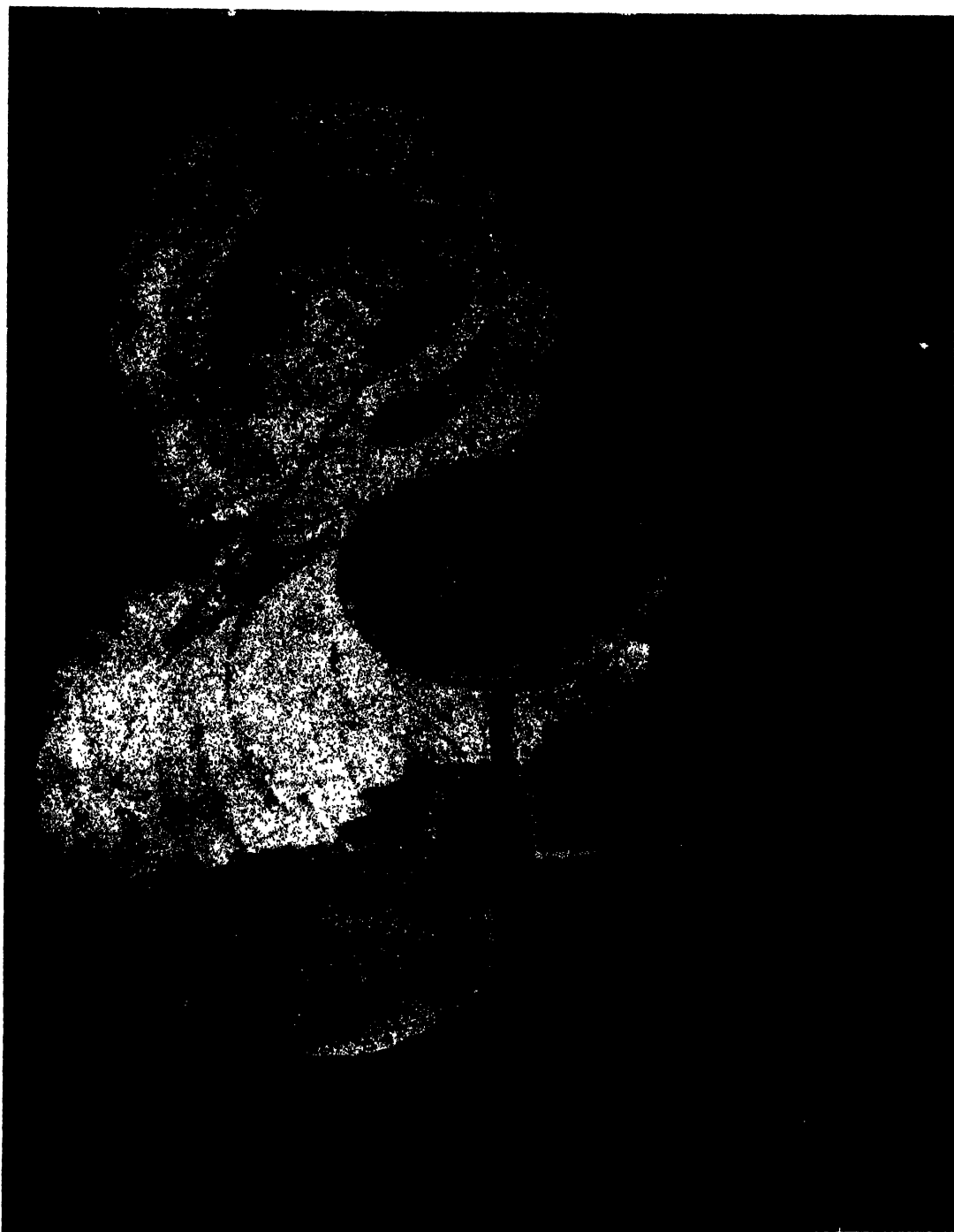
বীণাবাদিনী
শিল্পী শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

২৫শ ভাগ
১ম খণ্ড

আশ্বিন, ১৩৩২

৬ষ্ঠ সংখ্যা

গৃহপ্রবেশ

প্রথম অঙ্ক

যতীনের পাশের ঘরে

প্রতিবেশিনী ও যতীনের বোন হিমি

প্রতিবেশিনী

যতীন আজ কেমন আছে, হিমি?

হিমি

ভালো না, কায়েৎপিসি।

প্রতিবেশিনী

বলি, খিদেটা তো আছে এখনো?

হিমি

না, একচামচ বার্লিও সইছে না।

প্রতিবেশিনী

আমি যা বলি, একবার দেখই না, বাছা। আমার ঠাকুরজামাইয়ের ঠিক ঐরকম হয়েছিল। ঠাকুরের কৃপায় খেতে পারত, খিদে ছিল বেশ, তাই রক্ষে। কিন্তু একটু পাশ ফিরতে গেলেই—যতীনেরও তো ঐরকম পাঁজরের ব্যথা—

হিমি

না, ওঁর তো কোনো ব্যথা নেই।

প্রতিবেশিনী

তা নাই রইল। কিন্তু ঠাকুরজামাইও ঠিক এই-রকম কত মাস ধ'রে শয্যাগত ছিল। তাই বলি বাছা, ফরিদপুর থেকে আনিয়ে নে না সেই কপিলেশ্বর ঠাকুরের —যদি বলিস তো না হয় আমার ছেলে অতুলকে—

হিমি

তুমি একবার মাসিকে ব'লে দেখ তিনি যদি—

প্রতিবেশিনী

তোর মাসি। সে তো কানেই আনে না। সে কি কিছু মানে? [বদি মানত, তবে তার এমন দশা হয়? বলি হিমি, তোদের বউ তো যতীনের ঘরের দিক দিয়েও যায় না।

হিমি

না, না, মাঝে মাঝে তো—

প্রতিবেশিনী

আমার কাছে ঢেকে কি হবে বাছা? তোমরা যে বড়ো সাধ ক'রে এমন রূপসী মেয়ে ঘরে আনলে—এখন দুঃখের দিনে তোমাদের পরী বউয়ের রূপ নিয়ে কি হবে বলো তো? এর চেয়ে যে কালো কুচ্ছিৎ—

হিমি

অমন ক'রে বোলো না কায়েৎপিসি। আমাদের বউ ছেলেমানুষ—

প্রতিবেশিনী

ওমা, ছেলেমানুষ বলিস কাকে? বয়েস ভাঁড়িয়ে বিয়ে দিয়েছিল ব'লেই কি আমাদের চোখ নেই? অমন ছেলে যতীন, তার কপালে এমন—ঐ যে আসচে মণি। (মণির প্রবেশ) এস, বাছা, এস। ছাতে ছিলে বুঝি?

মণি

হাঁ।

প্রতিবেশিনী

শীলেদের বাড়ির বর বেরিয়েচে, তাই বুঝি দেখতে গিয়েছিলে? আহা ছেলেমানুষ দিনরাত রুগীর ঘরে কি—

মণি

আমার টবের গাছে জল দিতে গিয়েছিলুম।

প্রতিবেশিনী

ভালো কথা মনে করিয়ে দিলে। তোমার গোলাপের কলম আমাকে গোটাদুয়েক দিতে হবে। অতুলের ভারি গাছের সখ, ঠিক তোমার মতো।

মণি

তা দেবো।

প্রতিবেশিনী

আর, শোনো বাছা—তোমার গ্রামোফোন তো আজ-কাল আর ছোঁও না—যদি বলো তো ওটা না হয় নিজের খরচায় মেরামত করিয়ে—

মণি

তা নিয়ে যাও না।

প্রতিবেশিনী

তোমাদের বউয়ের হাত খুব দরাজ। হবে না কেন? কত বড়ো ঘরের মেয়ে। বড়ো লক্ষ্মী। ঐ আসচেন তোমাদের মাসি—আমি যাই। যতীনের দরজা আগলে ব'সেই আছেন। ব্যামোকে তো ঠেকাতে পারেন না, আমাদেরই ঠেকিয়ে রাখেন।

[প্রস্থান

হিমি

কি খুঁজ্‌চ বউদিদি?

মণি

আমার কুকুরছানাকে দুধ খাওয়াবার সেই পিরিচটা।

রোগীর পাশের ঘরে; মাসির প্রবেশ

মাসি

বউমা, তোমার পায়ের শব্দের জন্যে যতীন কান পেতে আছে তা জানো। এই সন্ধ্যের মুখে রুগীর ঘরে ঢুকে নিজের হাতে আলোটি জেলে দাও, তার মন খুসি হোক।—কি হ'ল! বলি, কথার একটা জবাব দাও!

মণি

এখনি আমাদের—

মাসি

যেই আসুক না কেন, তোমাকে তো বেশিক্ষণ থাকতে বলচিনে। এই তার মকরধ্বজ খাবার সময় হ'ল। তোমার জন্যেই রেখে দিয়েছি। তুমি খল্‌টা নিয়ে ওর পাস্তলায় দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে মধু দিয়ে মেড়ে দাও। তার পরে ওষুধটা খাওয়া হ'লেই চ'লে এসো।

মণি

আমি তো দুপুর বেলায় ওঁর ঘরে গিয়েছিলুম।

মাসি

তখন তো ও ঘুমিয়ে পড়েছিল।

মণি

সন্ধ্যের সময় ঐ ঘরে ঢুক্‌লে কেমন আমার ভয় করতে থাকে।—

মাসি

কেন তোর ভয় কিসের ?

মণি

ঐ ঘরেই আমার শ্বশুরের মৃত্যু হয়েছিল—সে আমার খুব মনে পড়ে।

মাসি

কেউ মরেনি, সমস্ত পৃথিবীতে কোথাও এমন একটু জায়গা আছে ?

মণি

বোলো না, মাসি, বোলো না, সত্যি বলচি, মরাকে আমি ভারি ভয় করি।

মাসি

আচ্ছা বাপু, দিনের বেলাতেই না হয় তুই আরেকটু ঘন ঘন—

মণি

আমি চেষ্টা করেছি যেতে। কিন্তু আমার কেমন গা ছমছম করে। উনি আমার মুখের দিকে এমন একরকম ক'রে চান—চোখ-দুটো জলজল করতে থাকে।

মাসি

তাতে ভয়ের কথাটা কী ?

মণি

মনে হয় যেন উনি অনেক দূর থেকে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। যেন এ পৃথিবীতে না !

মাসি

আচ্ছা বাপু, বাইরে থেকেই না হয় এই পথ্যিটথ্যি-গুলো তৈরি ক'রে দে। তুই মনে ক'রে নিজের হাতে কিছু করেছিস শুনলে, সেও তবু কতকটা—

মণি

মাসি, আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও। আমি দিন-রাত এইসব রোগের কাজ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে পারব না।

মাসি

একবার জিজ্ঞাসা করি, তুই নিজে যদি কখনো শক্ত ব্যামোয় পড়িস, তা হ'লে—

মণি

কখনো ত ব্যামো হয়েচে মনে পড়ে না। কোন্‌-নগরের বাগানে থাকতে একবার জ্বর হয়েছিল। মা আমাকে ঘরে বন্ধ ক'রে রেখেছিলেন। আমি লুকিয়ে পালিয়ে একটা পচা পুকুরে চান ক'রে এলুম। সবাই ভাবলে, নুমোনিয়া হবে। কিছু হ'ল না। সেই দিনই জ্বর ছেড়ে গেল।

মাসি

তোদের বাড়িতে কারো কি কখনো বিপদ-আপদ কিছু ঘটেনি ?

মণি

আমি তো কখনো দেখিনি। এই বাড়িতে এসে প্রথম মৃত্যু দেখলুম। কেবলি ইচ্ছে করচে, ছাড়া পাই, কোথাও চ'লে যাই। মাসিসের গন্ধ পেলে, মনে হয় বাতাসকে যেন হাসপাতালের ভূতে পেয়েছে।

মাসি

তোর যদি এমনিই মেজাজ হয় তা হ'লে তোকে নিয়ে সংসার—

মণি

জানিনে। আমাকে তোমাদের বাগানের মালী ক'রে দাও না—সে আমি ঠিক পারব।

[দ্রুত প্রস্থান

হিমি

দেখ মাসি, বউদিদির এমন স্বভাব যে চেষ্টা ক'রেও রাগ করতে পারিনে! মনে হয় যেন বিধাতা ওর উপরে কোনো দায় দিয়ে পৃথিবীতে পাঠাননি। ওর কাছে দুঃখকষ্টের কোনো মানেই নেই।

মাসি

ভগবান ওর বাইরের দিকটা বহু যত্নে গড়তে গিয়ে ভিতরের দিকটা শেষ করবার এখনো সময় পাননি। তোর দাদার এই বাড়ির মতো আর কি! খুব ঘটা ক'রে আরম্ভ করেছিল—বাইরের মহল শেষ হ'তে হ'তেই দেউলে—ভিতরের মহলের ভারা আর নাম্‌ল না। আজ ওকে কেবলি ভোলাতে হচ্চে। বাড়িটাকে নিয়েও, মণিকে নিয়েও।

হিমি

বুঝ্‌তে পারিনে, এটা কি আমাদের ভালো হচ্ছে?

মাসি

কি জানিস, হিমি? মৃত্যু যখন সামনে, তখন ঘর তৈরি সারা হোক না হোক, কী এল গেল? তাই ওকে বলি, একান্তমনে সঙ্কল্প করেছ যা, সেইটেই সম্পূর্ণ হয়েছে। হিমি, সেইটেই তো সত্য।

হিমি

বাড়িটা যেন তাই হ'ল। কিন্তু বউদিদি?

মাসি

হিমি, তোর বউদিদিকে যিনি সুন্দর করেচেন, তাঁর সঙ্কল্পের মধ্যে ও সম্পূর্ণ। চিরদিনের যে-মণি, ভগবানের আপন বুকের ধন যে-মণি, সেই তো কৌস্তভ-রত্ন, তার মধ্যে কোথাও কোনো খুঁৎ নেই। মৃত্যুকালে যতীন বিধাতার সেই মানসের মণিকেই দেখে যাক।

হিমি

মাসি, তোমার কথা শুন্‌লে আমার মন আলোয় ভ'রে ওঠে।

মাসি

হিমি, আমি কেবল কথাই বলি, কিন্তু বউয়ের উপরে রাগ করতেও ছাড়িনে। সব বুঝি, তবু ক্ষমাও করতে পারিনে। কিন্তু হিমি, তুই যে ঐ বল্‌লি, তোর বউদিদির উপর রাগ করতে পারিসনে, তাতেই বুঝলুম, তুই যতীনেরই বোন বটে। যাই যতীনের কাছে।

[প্রস্থান

রোগীর ঘরে

যতীন

মাসি, তেতালার ঘরের সব পাথর বসানো হয়ে গেছে?

মাসি

হাঁ কাল হয়ে গেছে সব।

যতীন

যাক, এতদিন পরে শেষ হয়ে গেল। আমার কত কালের ঘরবাঁধা সারা হ'ল, আমার কত দিনের স্বপ্ন।

মাসি

কতলোক দেখতে আসচে তোর এই বাড়িটা, যতীন।

যতীন

তারা বাইরে থেকে দেখচে, আমি ভিতরে থেকে যা দেখতে পাচ্ছি তা এখনো শেষ হয়নি। কোনোকালে শেষ হবে না। কল্পলোকের শেষ পাথরটি বসিয়ে আজ পর্য্যন্ত কোন্ শিল্পী বলেছে, এইবার আমার সাজ হ'ল? বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তাও বলতে পারেননি, তাঁরও কাজ চলচে।

মাসি

যতীন, কিন্তু আর না বাবা, এইবার তুই একটু ঘুমো।

যতীন

না মাসি, আজ তুমি আমাকে সকাল সকাল ঘুমোতে বোলো না—

মাসি

কিন্তু ডাক্তার—

যতীন

থাক ডাক্তার। আজ আমার জগৎ তৈরি হয়ে গেল। আজ আমি ঘুমোবো না—আজ বাড়ির সব আলোগুলো জ্বেলে দাও, মাসি। মণি কোথায়? তাকে একবার—

মাসি

তাকে সেই তেতালার নতুন ঘরটায় ফুল দিয়ে সাজিয়ে বসিয়ে দিয়েছি।

যতীন

এ তোমার মাথায় কি ক'রে এল? ভারি চমৎকার। দরজার দুধারে মঙ্গল ঘট দিয়েচ?

মাসি

হাঁ, দিয়েচি বই কি।

যতীন

আর মেঝেতে পদ্মফুলের আলপনা?

মাসি

সে আর বলতে?

যতীন

একবার কোনো-রকম ক'রে ধরাধরি ক'রে আমাকে

সেখানে নিয়ে যেতে পারো না? একবার কেবল দেখে আসি, আমার মণি আপন তৈরী ঘরের মাঝখানটিতে ব'সে।

মাসি

না যতীন, সে কিছুতেই হ'তে পারে না, ডাক্তার ভারি রাগ করবে।

যতীন

আমি মনে মনে ছবিটা দেখতে পাচ্ছি। কোন্ সাড়িটা পরেচে?

মাসি

সেই বিয়ের লাল সাড়িটা।

যতীন

আমার এই বাড়ির নাম কি হবে জানো, মাসি?

মাসি

কি বল্ তো।

যতীন

মণি-সৌধ।

মাসি

বেশ নামটি।

যতীন

তুমি এর সবটার মানে বুঝ্‌তে পারচ না, মাসি।

মাসি

না সবটা হয়তো পারচিনে।

যতীন

সৌধ বলতে কেবল বাড়ি বুঝ্‌লে চলবে না। ওর মধ্যে সুধা আছে—

মাসি

তা আছে, যতীন—এ তো কেবল টাকা দিয়ে তৈরি হয়নি—তোর মনের সুধা এ'তে ঢেলেছিস।

যতীন

তোমরা হয়তো শুনলে হাসবে—

মাসি

না, হাস্‌ব কেন, যতীন?—বল্, কি বল্‌ছিলি।

যতীন

আমি আজ বুঝ্‌তে পারচি, তাজমহল তৈরি ক'রে সাজাহান কী সান্ত্বনা পেয়েছিলেন। সে সান্ত্বনা তাঁর মৃত্যুকেও অতিক্রম ক'রে আজ পর্য্যন্ত—

মাসি

আর কথা কোসনে যতীন—ঘুমোতে না চাস ঘুমোসনে, চুপ ক'রে একটু ভাব না হয়।

যতীন

মণি তার বিয়ের সেই লাল বেনারসি পরেছে! আজ তাকে একবার—

মাসি

ডাক্তার যে বারণ করে, যতীন—

যতীন

ডাক্তার ভাবে, পাছে আমার—

মাসি

তোমার জন্যে নয়, মণির জন্যেই—ওকে বাইরে থেকে বোঝা যায় না, কিন্তু ওর ভিতরটাতে—

যতীন

দুর্ব্বলতা আছে, ডাক্তার বললে বুঝি—

মাসি

সে আমরা সকলেই লক্ষ্য করেছি—

যতীন

আহা, বেচারা, তা হ'লে সাবধান হোয়ো—কাজ নেই, রুগীর ঘর থেকে দূরে দূরে থাকাই ভালো।

মাসি

ও তো আসতে পেলে বাঁচে, কিন্তু আমরা—

যতীন

না, না, কাজ নেই, কাজ নেই। মাসি, ঐ শেল্‌ফের উপর আলবামটা আছে দিতে পারো?

(আলবাম আনিয়া দিল)

তোমাকে তাজমহলের কথা বলছিলুম। এখন মনে হচ্চে, আমার যেন সেই সাজাহানের মতোই হ'ল,—আমি ক্ষীণ জীবনের এপারে—সে পূর্ণ জীবনের ওপারে—অনেক দূরে, আর তার নাগাল পাওয়া যায় না। যেমন সেই সম্রাটের মমতাজ। তাকেই নিবেদন ক'রে দিলুম আমার এই বাড়িটি—আমার এই তাজমহল। এরই মধ্যে সে আছে, চিরকাল থাকবে, অথচ আমার চোখের কাছে সে নেই।

মাসি

ও যতীন, আর কেন কথা বলচিস? একবার একটু থাম—ঘুমের ওষুধটা এনে দিই।

যতীন

না, মাসি, না। আজ ঘুম নয়। আমি জেগে থেকে কিছু কিছু পাই—ঘুমের মধ্যে আরো সব হারিয়ে যায়। মাসি, তোমার কাছে কেবলি আমি মণির কথা বলি কিছু মনে করো না তো?

মাসি

কিছু না, যতীন। কত ভালো লাগে বলতে পারিনে। জানিস, কার কথা মনে পড়ে?

যতীন

কার কথা?

মাসি

তোর মায়ের। এম্‌নি ক'রে যে একদিন তারও মনের কথা আমাকে শুন্‌তে হ'ত। তোর বাবা তখন আমাদের বাড়িতে থেকে মেডিক্যাল কলেজে পড়তেন। তোর মায়ের সেদিনকার মনের কথা আমি ছাড়া বাড়িতে কেউ জান্‌ত না। বাবা যখন বিয়ের জন্যে অন্য পাত্র জুটিয়ে আনলেন, তখন আমিই তো তাঁকে—

যতীন

সে তোমারি কাছে শুনিচি। মাকে বুঝি দাদামশায় কিছুতেই পারলেন না, শেষ কালে বাবার সঙ্গেই বিয়ে দিতে হ'ল। সেদিনের কথা কল্পনা করতে এত আনন্দ হয়।

মাসি

তোর মায়ের ভালোবাসা, সে যে তপস্যা ছিল। পাঁচ বৎসর ধ'রে তার হোমের আগুন জ্বল্‌ল, তার পরে সে বর পেলে। যতীন, তোর মধ্যে সেই আগুনই আমি দেখি, আর অবাক্ হয়ে ভাবি।

যতীন

মা তাঁর হোমের আগুন আমার রক্তের মধ্যে ঢেলে দিয়ে গেছেন—আমার তপস্যাতেও বর পাবো। কি জানি, মনে হচ্চে, মাসি, সেই বর পাবার সময় আমার খুব কাছে এসেচে। কোথায় ঐ বাঁশি বাজ্‌চে?

মাসি

বিয়ের সানাই। আজ যে বিয়ের লগ্ন।

যতীন

কি আশ্চর্য্য! আজই তো মণি লাল বেনারসি পরেছে! জীবনে বিয়ের লগ্ন বারে বারে আসে। আজ আলো-গুলো সব জ্বালাতে ব'লে দাও না, মাসি। দেউড়ি থেকে আরম্ভ ক'রে—

মাসি

চোখে বেশি আলো লাগলে ঘুমোতে পারবিনে যে, যতীন—

যতীন

কোনো ক্ষতি হবে না। জেগে থেকে ঘুমের চেয়ে বেশি শান্তি পাবো। জানো মাসি, মন্দির হ'ল সারা,—এখন হবে দেবীমূর্ত্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা। আমি বেঁচে থাকতে থাকতে যে এতটা হ'তে পারবে, মনেও করিনি।

মাসি

আমি ঘরে থাকলে তোর কথা থামবে না। আমি যাই। ঘুমোতে না চাস, অন্তত চুপ ক'রে থাক।

যতীন

আচ্ছা, বাড়ির যে প্ল্যান করেছিলুম সেইটে আমাকে দিয়ে যাও—আর আমার সেই খেলাঘরের বাক্সটা। খেলাঘর বলতে গিয়ে সেই গানটা মনে প'ড়ে গেল—হিমি, হিমি—

মাসি

ব্যস্ত হোসনে যতীন, আমি ডেকে দিচ্চি।

[প্রস্থান

হিমির প্রবেশ

হিমি

কী দাদা?

যতীন

ঐ গানটা গা বোন—সেই যে খেলাঘর—

হিমি

(গান)

খেলাঘর বাঁধতে লেগেছি
মনের ভিতরে।
কত রাত তাই তো জেগেছি
বল্‌ব কী তোরে!

পথে যে পথিক ডেকে যায়,
অবসর পাইনে আমি হায়,
বাহিরের খেলায় ডাকে যে
যাবো কি ক'রে ?
যাহাতে সবার অবহেলা,
যায় যা ছড়াছড়ি,
পুরানো ভাঙা দিনের ঢেলা,
তাই দিয়ে ঘর গড়ি।
যে আমার নিত্য খেলার ধন,
তারি এই খেলার সিংহাসন,
ভাঙারে জোড়া দেবে সে
কিসের মন্তরে ॥

ডাক্তারের প্রবেশ

ডাক্তার

গান হচ্চে, বেশ বেশ, খুব ভালো—ওষুধের চেয়ে ভালো। যতীন, মনটা খুসি রাখো, সব ঠিক হয়ে যাবে। পঁচানব্বইয়ের চেয়ে কম বাঁচা একটা মস্ত অপরাধ। ফাঁসির যোগ্য।

যতীন

মন আমার খুব খুসি আছে। জানেন ডাক্তার বাবু, এতদিন পরে আমার বাড়ি-তৈরি শেষ হয়ে গেল। সব আমার নিজেরই প্ল্যান।

ডাক্তার

এই তো চাই। নিজের তৈরি বাড়িতে নিজে বাস করলে, তবে সেটা সাফসই হয়। আসলে পৈতৃক বাড়িও ভাড়াটে বাড়ি, নিজের নয়। তোমার বাবা আমার ক্লাস্‌ফ্রেণ্ড্‌ ছিল; প্রাণটা ছাড়া পূর্ব্বপুরুষের ব'লে কোনো বালাই কেদারের ছিল না। নিজের যা-কিছু নিজেই দেখতে দেখতে গ'ড়ে তুললে। সে কি কম আনন্দ? তার শ্বশুর তার বিবাহে নারাজ ছিলেন ব'লে শ্বশুরের সম্পত্তি রাগ ক'রে নিলেই না। তুমিও নিজের বাসা নিজে বেঁধে তুললে, সেও খুসির কথা বই কি।

যতীন

ভারি খুসিতে আছি।

ডাক্তার

বেশ, বেশ। এবার গৃহপ্রবেশ হোক। আমাদের খাওয়াও, অমন শুয়ে প'ড়ে থাকলে তো হবে না।

যতীন

আমার আজ মনে হচ্চে, গৃহপ্রবেশ হবে। একবার পাঁজিটা দেখে নেবো। যেদিন প্রথম শুভদিন হবে সেই দিনই—

ডাক্তার

বেশ, বেশ। পাঁজি নয় বাবা, সব মনের উপর নির্ভর ক'রে। মন যখনই শুভদিন ঠিক ক'রে দেয়, তখনি শুভ দিন আসে।

যতীন

মন আমার বল্‌চে, শুভদিন এল। তাই তো হিমিকে ডেকে গান শুনচি। গৃহপ্রবেশের সানাই যেন আজ শরতের আকাশে বাজতে আরম্ভ করেছে।

ডাক্তার

বাজুক। ততক্ষণ নাড়িটা দেখি, বুকটা পরীক্ষা ক'রে নিই। সন্দেশ মেঠাই ফরমাস দেবার আগে এইসব বাজে উৎপাতগুলো চুকিয়ে নেওয়া যাক্‌। কি বলো, বাবা?

যতীন

নাড়ী যাই হোক না কেন, তাতে কী আসে যায়?

ডাক্তার

কিছু না, কিছু না। মন ভোলাবার জন্যে ওগুলো করতে হয়। আমরা তো ধন্বন্তরির মুখোসটা পরে রুগীর বুকে পিঠে পেটে পকেটে ক'রে হাত বুলোই, যম ব'সে ব'সে হাসে। স্বয়ং ডাক্তার ছাড়া যমের গাম্ভীর্য্য কেউ টলাতে পারে না। হিমি, মা, তুমি পাশের ঘরে যাও, গিয়ে গান করো, পাখীর মতো গান করো। আমি একটা বই লিখ্‌তে বসেছি, তাতে বুঝিয়ে দেবো, গানের ঢেউ এলে বাতাস থেকে ব্যামো কিরকম ভেসে যায়। ব্যামোগুলো সব বেসুর কিনা—ওরা সব বেতালা বেতালের দল; শরীরের তাল কাটিয়ে দেয়। যা মা, বেশ-একটু গলা তুলে গান করিস।

হিমি

কোন্‌টা গাবো দাদা?

যতীন

সেই নতুন বিয়ের গানটা।

ডাক্তার

হাঁ, হাঁ, সে ঠিক হবে। আজ একটা লগ্ন আছে বটে। পথে তিনটে বিয়ের দল পার হয়ে আসতে হ'ল। তাই তো দেরি হয়ে গেল।

পাশের ঘরে আসিয়া হিমির গান

বাজোরে বাঁশরি বাজো।
সুন্দরি, চন্দনমাল্যে
মঙ্গল সন্ধ্যায় সাজো।
আজি মধু ফাল্গুন মাসে,
চঞ্চল পান্থ কি আসে?
মধুকর-পদভর-কম্পিত চম্পক
অঙ্গনে ফোটেনি কি আজো?
রক্তিম অংশুক মাথে
কিংশুক কঙ্কণ হাতে,—
মঞ্জীর-ঝঙ্কৃত পায়ে,
সৌরভ-সিঞ্চিত বায়ে,
বন্দন-সঙ্গীত-গুঞ্জন-মুখরিত
নন্দন-কুঞ্জে বিরাজো।

পাশের ঘরে; ডাক্তার ও মাসি

ডাক্তার

যেটা সত্যি সেটা জানা ভালোই। যে দুঃখ পেতেই হবে সেটা স্বীকার করাই চাই, ভুলিয়ে দুঃখ বাঁচাতে গেলে দুঃখ বাড়িয়েই তোলা হয়।

মাসি

ডাক্তার, এত কথা কেন বল্‌চ?

ডাক্তার

আমি বলচি আপনাকে প্রস্তুত হ'তে হবে।

মাসি

ডাক্তার, তুমি কি আমাকে কেবল ঐ ছুটো মুখের কথা ব'লেই প্রস্তুত করবে ভাব্‌চ? আমার যখন আঠারো বছর বয়স, তখন থেকে ভগবান স্বয়ং আমাকে প্রস্তুত করচেন—যেমন ক'রে পাঁজা পুড়িয়ে ইট প্রস্তুত করে। আমার সর্ব্বনাশের গোড়া বাঁধা হয়েছে অনেক দিন, এখন কেবল সব শেষের টুকুই বাকি আছে। বিধাতা আমাকে যা-কিছু বলবার খুবই পষ্ট ক'রে বলেচেন, তুমি আমাকে ঘুরিয়ে বল্‌চ কেন?

ডাক্তার

যতীনের আর আশা নেই, আর অল্প কয়দিন মাত্র।

মাসি

জেনে রাখলুম। সেই শেষ ক'দিনের সংসারের কাজ চুকিয়ে দিই—তার পরে ঠাকুর যদি দয়া করেন ছুটির দিনে তাঁর নিজের কাজে ভর্ত্তি ক'রে নেবেন।

ডাক্তার

ওষুধ কিছু বদল ক'রে দেওয়া গেল। এখন সর্ব্বদা ওর মনটাকে প্রফুল্ল রাখা চাই। মনের চেয়ে ডাক্তার নেই।

মাসি

মন! হায়রে! তা আমি যা পারি তা করব।

ডাক্তার

আপনার বউমাকে প্রায় মাঝে মাঝে রোগীর কাছে যেতে দেবেন। আমার মনে হয়, যেন আপনারা ওঁকে একটু বেশি ঠেকিয়ে রাখেন।

মাসি

হাজার হোক, ছেলেমানুষ, রুগীর সেবার চাপ কি সইতে পারে?

ডাক্তার

তা বললে চলবে না। আপনিও ওঁর পরে একটু অন্যায় করেন। দেখেছি বৌমার খুব মনের জোর আছে। এত বড় ভাবনা মাথার উপরে ঝুলচে কিন্তু ভেঙে পড়েননি তো।

মাসি

তবু ভিতরে ভিতরে তো একটা—

ডাক্তার

আমরা ডাক্তার, রোগীর দুঃখটাই জানি, নীরোগীর দুঃখ ভাববার জিনিষ নয়। বউমাকে বরঞ্চ আমার কাছে ডেকে দিন, আমি নিজে তাঁকে ব'লে দিয়ে যাচ্ছি।

মাসি

না, না, তার দরকার নেই—সে আমি তাকে—

ডাক্তার

দেখুন, আমাদের ব্যবসায়ে মানুষের চরিত্র অনেকটা বুঝে নেবার অনেক সুবিধা আছে। এটা জেনেছি—যে, বউয়ের উপরে শাশুড়ির যে-একটা স্বাভাবিক ঈর্ষা থাকে, ঘোর বিপদের দিনেও সে যেন মরতে চায় না। বউ ছেলের সেবা ক'রে তার মন পাবে, এ আর কিছুতেই—

মাসি

কথাটা মিথ্যে নয়, তা ঈর্ষা থাকতেও পারে। মনের মধ্যে কত পাপ লুকিয়ে থাকে, অন্তর্যামী ছাড়া আর কে জানে?

ডাক্তার

শুধু বোনপো কেন? বউয়ের প্রতিও তো একটা কর্ত্তব্য আছে। নিজের মন দিয়েই ভেবে দেখুন না, তার মনটা কিরকম হচ্চে। বেচারা নিশ্চয়ই ঘরে আসবার জন্তে ছটফট ক'রে সারা হ'ল!

মাসি

বিবেচনা শক্তি কম, অতটা ভেবে দেখিনি তো।

ডাক্তার

দেখুন, আমি ঠোঁটকাটা মানুষ, উচিত কথা বলতে আমার মুখে বাধে না। কিছু মনে করবেন না।

মাসি

মনে করব কেন, ডাক্তার। অন্যায় কোথাও থাকে যদি, নিন্দে না হ'লে তার শোধন হবে কি ক'রে? তা তোমার কথা মনে রইল, কোনো ত্রুটি হবে না।

[ডাক্তারের প্রস্থান

মাসি

হিমি, কী করচিস?

হিমি

দাদার জন্তে দুধ গরম করচি।

মাসি

আচ্ছা দুধ আমি গরম করব। তুই যা, যতীনকে একটু গান শোনাগে যা। তোর গান শুনতে শুনতে ওর চোখে তবু একটু ঘুম আসে।

প্রতিবেশিনীর প্রবেশ

প্রতিবেশিনী

দিদি, যতীন কেমন আছে আজ?

মাসি

ভালো নেই, সুরো।

প্রতিবেশিনী

আমার কথা শোনো, দিদি। একবার আমাদের জগু ডাক্তারকে দেখাও দেখি! আমার নাৎনী নাক ফুলে ব্যথা হয়ে যায় আর কি! শেষকালে জগু ডাক্তার এসে তার ডান নাকের ভিতর থেকে এত বড়ো একটা কাঁচের পুঁতি বের ক'রে দিলে। ওর ভারি হাতযশ। আমার ছেলে তার ঠিকানা জানে।

মাসি

আচ্ছা, বোলো ঠিকানাটা পাঠিয়ে দিতে।

প্রতিবেশিনী

সেদিন তোমাদের বউকে আলিপুরে জু-তে দেখলুম যে।

মাসি

ও জন্তুজানোয়ার ভারি ভালোবাসে, প্রায় সেখানে যায়।—

প্রতিবেশিনী

জন্তু ভালোবাসে ব'লে কি স্বামীকে ভালোবাসতে নেই?

মাসি

কে বললে, ভালোবাসে না? ছেলেমানুষ, দিনরাত রুগীর কাছে থাকলে বাঁচবে কেন? আমরাই তো ওকে জোর ক'রে—

প্রতিবেশিনী

তা যাই বলো, পাড়াসুদ্ধ মেয়েরা সবাই কিন্তু ওর কথা—

মাসি

পাড়ার মেয়েরা তো ওকে বিয়ে করেনি, সুরো। আমার যতীন ওকে বোঝে, সে তো কোনোদিন—

প্রতিবেশিনী

তা দিদি, সে কিছু বলে না ব'লেই কি—

মাসি

শুধু বলে না? ও যে কখনো জাদুঘরে কখনো বা বাঘভাল্লুক দেখতে যায়, এতেই তার আনন্দ।

প্রতিবেশিনী

বলো কি, দিদি? সেবাটা কি তার চেয়ে—

মাসি

ও তো বলে, মণির পক্ষে এইটেই সেবা; যতীন নিজে বিছানায় বদ্ধ থাকে, মণি ঘুরে বেড়িয়ে এলে সেইটেতেই যতীন যেন ছুটি পায়। রুগীর পক্ষে সে কি কম?

প্রতিবেশিনী

কি জানি, ভাই, আমরা সেকেলে মানুষ, ওসব বুঝ্‌তে পারিনে। তা যা হোক, আমার ছেলেকে পাঠিয়ে দেবো, দিদি। সে অভ্র ডাক্তারের ঠিকানা জানে। একবার তাকে ডেকে দেখাতে দোষ কি?

[প্রস্থান

রোগীর ঘরে

যতীন

এই যে, হিমি এসেছিস! আঃ বাঁচলুম! সেই কোটোটা কোথাও খুঁজে পাচ্চিনে, তুই একবার দেখ্ না বোন।

হিমি

কোন্ কোটো দাদা?

যতীন

সেই যে বোটানিকেল গার্ডেনে মণির সঙ্গে গাছতলায় আমার যে ছবি তোলা হয়েছিল।

হিমি

সেটা তো তোমার আলবামে ছিল?

যতীন।

এই যে খানিক আগে আলবাম্ থেকে খুলে নিয়েছি। বিছানার মধ্যেই কোথাও আছে,—কিম্বা নীচে প'ড়ে গেছে।

হিমি

এই যে, দাদা, বালিশের নীচে।

যতীন

মনে হয় যেন আর জন্মের কথা। সেই নীম গাছের তলা। মণি পরেছিল কুসুমি-রঙের সাড়ি। খোঁপাটা ঘাড়ের কাছে নীচু ক'রে বাঁধা। মনে আছে হিমি, কোথা থেকে একটা বউ-কথা-কও ডেকে ডেকে অস্থির হচ্ছিল। নদীতে জোয়ার এসেছে,—সে কী হাওয়া, আর ঝাউ গাছের ডালে ডালে কী ঝরঝরানি শব্দ। মণি ঝাউয়ের ফলগুলো কুড়িয়ে তার ছাল ছাড়িয়ে শুঁকছিল—বলে, আমার এই গন্ধ খুব ভালো লাগে। তার যে কী ভালো লাগে না, তা জানিনে। তারি ভালো লাগার ভিতর দিয়ে এই পৃথিবীটা আমি অনেক ভোগ করেছি। সেদিন যেটা গেয়েছিলি, সেই গানটি গা তো, হিমি। লক্ষ্মী মেয়ে। মনে আছে তো?

হিমি

হাঁ, মনে আছে।

(গান)

যৌবন সরসীনীরে
মিলন শতদল,
কোন্ চঞ্চল বন্যায় টলমল টলমল॥
সরম-রক্তরাগে
তার গোপন স্বপ্ন জাগে,
তারি গন্ধ-কেশর-মাঝে
এক বিন্দু নয়ন-জল॥
ধীরে বও ধীরে বও সমীরণ—
সবেদন পরশন॥

শঙ্কিত চিত্ত মোর
পাছে ভাঙে বৃন্তডোর,
তাই অকারণ করুণায়
মোর আঁখি করে ছল ছল ॥

যতীন

সেদিন গাছের তলা কথা ক'য়ে উঠেছিল। আজ এই দেয়ালের মধ্যে সমস্ত পৃথিবী একেবারে চুপ। ঐ দেয়ালগুলো তার ফ্যাকাসে ঠোঁটের মতো। হিমি, আলোটা আর একটু কম ক'রে দে। এ পারে গাছে গাছে কত রকমের সবুজের উচ্ছ্বাস আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে, আর ওপারে কলের চিম্‌নি থেকে ধোঁয়াগুলো পাক দিয়ে আকাশে উঠচে, তারো কি সুন্দর রং, আর কি সুন্দর ডৌল! সবই ভালো লাগছিল। আর তোদের সেই কুকুরটা—জলে মণি বার বার গোলা ফেলে দিচ্ছিল, আর সে সাঁতার দিয়ে—

হিমি

দাদা, তুমি কিন্তু আর কথা কোয়ো না।

যতীন

আচ্ছা, কবো না; আমি চোখ বুজে শুনব, সেই ঝাউ গাছের ঝরঝর শব্দ। কিন্তু হিমি, তুই আজ গাইলি, ও যেন ঠিক তেমন—কে জানে! আর-একটু অন্ধকার হয়ে আসুক, আপনা আপনি শুন্‌তে পাবো, "ধীরে বও ধীরে বও সমীরণ।" আচ্ছা, তুই যা। ছবিটা কোথায় রাখলুম?

হিমি

এই যে!

[প্রস্থান

পাশের ঘরে মাসি ও অখিল

অখিল

কেন ডেকে পাঠিয়েছ, কাকী?

মাসি

বাবা, তুই তো উকীল, তোকে একটা কিছু ক'রে দিতেই হচ্চে।

অখিল

তারা তো আর সবুর করতে পারচে না—ডিক্রি করেছে, এখন জারি করবার জন্যে—

মাসি

বেশি দিন সবুর করতে হবে না। তারা তো তোরই মক্কেল। একটু বুঝিয়ে বলিস, ডাক্তার বলেছে—

অখিল

ডাক্তার আরো একবার বলেছিল কিনা, এবার তারা বিশ্বাস করতে চাচ্চে না। বাড়ি বন্ধক রেখে বাড়ি তৈরি করা, যতীনের এ কিরকম বুদ্ধি হ'ল।

মাসি

ওর দোষ নেই, দোষ নেই, ওর বুদ্ধির জায়গায় মণি বসেচে শনি হয়ে। ভেবেছিল ওর মণিকে, ওর ঐ আলেয়ার আলোকে, ইটের বেড়া দিয়ে ধ'রে রাখবে।

অখিল

ওর তো নগদ টাকা কিছু ছিল।

মাসি

সমস্তই পাটের ব্যবসায় ফেলেচে।

অখিল

যতীনের পাটের ব্যবসা! কলম দিয়ে লাঙল চাষ। হাস্‌ব, না কাঁদ্‌ব?

মাসি

অসাধ্যরকম খরচ করতে বসেছিল, ভেবেছিল পাট বেচাকেনা ক'রে তাড়াতাড়ি মুনফা হবে। আকাশ থেকে মাছি কেমন ক'রে ঘায়ের খবর পায়, সর্ব্বনাশের একটু গন্ধ পেলেই কোথা থেকে সব কুমন্ত্রী এসে জোটে।

অখিল

সর্ব্বনাশ! এখন বাজার এমন, যে, ক্ষেতের পাট চাষীদের কাটবার খরচ পোষাচ্চে না।

মাসি

থাক্, থাক্, আর বলিসনে। ভাববারও আর দরকার নেই—দিন ফুরিয়ে এল।

অখিল

কাকী, পাওনাদার বোধ হয় ওর পাটের ব্যবসায় বুদ্ধি

পেয়েচে—বুঝেছে অনেক শকুনি জমবে, তাই তাড়াতাড়ি নিজের পাওনা আদায় করবার জোগাড় করচে।

মাসি

ওরে অখিল, এ ক'টা দিন সবুর করতে বল্—যমদূতের সঙ্গে আদালতের পেয়াদা যেন পাল্লা দিতে না আসে। না হয় নিয়ে চল্ আমাকে তোর মক্কেলের কাছে। আমি বামুনের মেয়ে তার পায়ে মাথা খুঁড়ে আসিগে।

অখিল

আচ্ছা, তাদের সঙ্গে একবার কথা ক'য়ে দেখি, যদি দরকার হয় তোমাকে হয়তো যেতে হবে। একবার যতীনের সঙ্গে দেখা ক'রে যাই।

মাসি

না, তোকে দেখলেই ওর ব্যবসার কথা মনে প'ড়ে যাবে।

অখিল

আচ্ছা, ও যে মণির নামে অনেক টাকা লাইফ্ ইন্‌স্যোর করেছিল, তার কি হ'ল?

মাসি

সে আমি যেমন ক'রে হোক টিঁকিয়ে রেখেছি। আমার যা-কিছু ছিল তাতেই তো গেল, আর এই ডাক্তার খরচে। যতীনকে তো বাঁচাতে পারব না, যতীনের এই দানটিকে বাঁচাতে পারলুম, আমার মনে এই সুখ থাকবে। মনে তো আছে, মাঝে মাঝে ইন্‌স্যোরের মাশুল যখন তাকে জোগাতে হ'ত তখন সে কী হাঙ্গামা! দোহাই অখিল, তোর মক্কেলকে ব'লে—

অখিল

দেখ মাসি, আমি সত্যি কথা বলি, ওর পরে আমার একটুও দয়া হয় না। এত বড়ো বাদসাই বোকামি—

মাসি

কিন্তু ওর পরে ভগবানের দয়া কত একবার দেখ্। সমস্ত প্রাণ দিয়ে ও এই বাড়িটি তৈরি করতে বসেছিল, শেষ হ'ল না বটে, কিন্তু ওর খেলার সাথী ভাঙা খেল্‌না কুড়িয়ে নিয়ে ওকে সঙ্গে নিয়েই যাচ্চেন। আর কোন্ খেলায় নিমন্ত্রণ পড়েছে কে জানে!

অখিল

কাকী, আমাদের আইনের বইয়ে ভাগ্যে তোমাদের এই খেলার কথাটা কোথাও লেখেনি। তাই অন্ন ক'রে খুঁটে খেতে পাচ্চি। নইলে ঐরকমই খেয়ালের হাওয়ায় একেবারে দেউলের ঘাটে গিয়ে মরতুম।

[প্রস্থান

মণির প্রবেশ

মাসি

বউ, তোমার বাপের বাড়ি থেকে কিছু খবর এসেছে নাকি? তোমার জ্যাঠতুত ভাই অনাথকে দেখলুম।

মণি

হাঁ, মা ব'লে পাঠিয়েছেন আসচে শুক্রবারে আমার ছোটো বোনের অন্নপ্রাশন। তাই ভাবচি—

মাসি

বেশ তো বাছা, একগাছি সোনার হার পাঠিয়ে দাও, তোমার মা খুসি হবেন।

মণি

ভাবচি আমি যাবো। আমার ছোটো বোনকে তো দেখিনি, দেখতে ইচ্ছে করে।

মাসি

ও মা, সে কি কথা! যতীনকে একলা ফেলে যাবে?

মণি

ফিরতে আমার খুব বেশি দেরি হবে না।

মাসি

খুব বেশি দেরি হবে কি না, তা কে বলতে পারে, মা! সময় কি আমাদের হাতে? চোখের একপলকে দেরি হয়ে যায়।

মণি

তিন ভাইয়ের পরে বড়ো আদরের মেয়ে, ধুম ক'রে অন্নপ্রাশন হবে। আমি না গেলে মা ভারি—

মাসি

তোমার মায়ের ভাব, বাছা, বুঝতে পারিনে—কাদের সাত সমুদ্রে ঘেরা যাদের প্রাণ, তোমার মাও তো সেই মায়েরই জাত, তবু তিনি মানুষের এত বড়ো ব্যথা বোঝেন না, ঘন ঘন কেবলি তোমাকে ডেকে ডেকে নিয়ে যান—

মণি

দেখ মাসি, তুমি আমার মাকে খোঁটা দিয়ে কথা কোয়ো না বলচি। তবু যদি আপন শাশুড়ি হ'তে, তা হ'লেও নয় সহ্য করতুম, কিন্তু—

মাসি

আচ্ছা মণি, অপরাধ হয়েছে, আমাকে মাপ করো। আমি শাশুড়ি হয়ে তোমাকে কিছু বলচিনে, আমি এক-জন সামান্য মেয়েমানুষের মতোই মিনতি করচি—যতীনের এইসময়ে তুমি যেয়ো না। যদি যাও, তোমার বাবা রাগ করবেন, সে আমি নিশ্চয় জানি।

মণি

তা জানি, তোমাকে একলাইন লিখে দিতে হবে, মাসি। এই কথা বোলো যে, আমি গেলে বিশেষ কোনো—

মাসি

তুমি গেলে কোনো ক্ষতিই নেই, সে কি আমি জানিনে? কিন্তু তোমার বাপকে যদি লিখ্‌তে হয়, আমার মনে যা আছে খুলেই লিখ্‌ব।

মণি

আচ্ছা বেশ, তোমাকে লিখ্‌তে হবে না। আমি ওঁকে গিয়ে বললেই উনি—

মাসি

দেখ বউ, অনেক সয়েছি—কিন্তু এই নিয়ে যদি তুমি যতীনের কাছে যাও কিছুতেই সইব না।

মণি

আচ্ছা, থাক্ তোমাদের চিঠি। বাপের বাড়ি যাবো তার এত হাঙ্গামা কিসের? উনি যখন জর্ম্মনিতে পড়তে যেতে চেয়েছিলেন তখনি ত পাসপোর্টের দরকার হয়েছিল। আমার বাপের বাড়ি জর্ম্মনি নাকি?

মাসি

আচ্ছা, আচ্ছা, অত চেঁচিয়ে কথা কোয়ো না। ঐ বুঝি আমাকে ডাকচে! যাই যতীন! কি জানি, শুনতে পেয়েছে কি না?

[প্রস্থান

যতীনের ঘরে

মাসি

আমাকে ডাকছিলে, যতীন?

যতীন

হাঁ, মাসি। শুয়ে শুয়ে ভাবছিলুম, উপায় নেই; আমি তো বন্দী; অসুখের জাল দিয়ে জড়ানো, দেয়াল দিয়ে ঘেরা—সঙ্গে সঙ্গে মণিকে কেন এমন বেঁধে রাখি?

মাসি

কি যে বলিস, যতীন, তার ঠিক নেই। তোর সঙ্গে যে ওর জীবন বাঁধা, তুই খালাস দিতে চাইলেই কি ওর বাঁধন খসবে?

যতীন

একদিন ছিল যখন স্ত্রী সহমরণে যেত, সে অন্যায় তো এখন বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু মণির আজ এ যে পলে পলে সহমরণ, বেঁচে থেকে সহমরণ। মনে ক'রে আমার প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে—এর থেকে ওকে দাও মুক্তি, মাসি, দাও মুক্তি!

মাসি

আজ এমন কথা হঠাৎ কেন বলচিস, যতীন? স্বপ্নের ঘোরে এককথা আর হয়ে তোর কানে পৌঁচেছিল নাকি?

যতীন

না, না, অনেকক্ষণ ধ'রে ভাবছিলুম, ঝাউগাছের ঝরঝর শব্দ, নদীতে জোয়ার, দূরে বউকথা-কও পাখীর ডাক।—মনে পড়ছিল, মণির সেই কুসুমি-রঙের সাড়ি, আর কুকুরের সঙ্গে খেলা, আর বিনাকারণে হাসি। ওর দুরন্ত প্রাণ, এই মরা দেওয়ালগুলোর মধ্যে কেন? দাও ছুটি ওকে। কত দিন এ বাড়িতে ওর হাসিই শুনতে পাইনি। ওর স্রোতে নবীন জোয়ার, সে কি ঐসব ওষুধের শিশি আর রুগীর পথ্যের বাঁধ বেঁধে আট্‌কে দেবে? আমার মনে হচ্চে, অন্যায়—ভারি অন্যায়।

মাসি

কিচ্ছু অন্যায় না, একটুও অন্যায় না। যার প্রাণ আছে, সেই তো প্রাণ দিতে পারে। অর্পণ তো ভরা মেঘের। উঠে বসিসনে যতীন, শো—অমন ছটফট করচিস

নেই। কোথায় মণিকে পাঠাতে চাস, বল্; আমি বুঝতে পারচিনে।

যতীন

না হয় মণিকে ওর বাপের বাড়ি—ভুলে যাচ্চি ওর বাবা এখন কোথায়—

মাসি

সীতারামপুরে।

যতীন

হাঁ সীতারামপুরে। সে খোলা জায়গা, সেখানে ওকে পাঠিয়ে দাও।

মাসি

শোনো একবার। এই অবস্থায় তোমাকে ফেলে বাপের বাড়ি যেতে চাইবেই বা কেন ?

যতীন

ডাক্তার কি বলেচে, সেকথা কি সে—

মাসি

তা সে নাই জানলে। চোখে তো দেখতে পাচ্চে। সেদিন বাপের বাড়ি যাবার কথা যেম্‌নি একটু ইসারায় বলা, অম্‌নি বউ কেঁদে অস্থির।

যতীন

সত্যি মাসি, বউ কাঁদলে ? সত্যি ? তুমি দেখেছ ?

মাসি

যতীন, উঠিসনে উঠিসনে, শো। ঐ যাঃ, ভাঁড়ার ঘর বন্ধ করতে ভুলে গেছি—এখনি ঘরে কুকুর ঢুকবে। আমি যাই, তুমি একটু ঘুমোও, যতীন।

যতীন

আমি এইবার ঠিক ঘুমোবো, তুমি ভেবো না। কেবল একটা কথা—গৃহপ্রবেশের শুভদিন ঠিক ক'রে দাও।

মাসি

কী বলছিস যতীন, তোর এ অবস্থায়—

যতীন

তোমরা বিশ্বাস করতে পারো না—আমার মন বলচে গৃহপ্রবেশের দিন এল ব'লে। আমি যেতে পারব, নিশ্চয় যেতে পারব। এই বেলা থেকে সব প্রস্তুত করোগে। তখন যেন আবার দেরি না হয়।

মাসি

তা হবে, হবে, কিছু ভাবিসনে।

যতীন

মণিকেও এই বেলা ব'লে রাখো। তারো তো কাজ আছে।

মাসি

আছে বই কি, যতীন; আছে।

যতীন

তুমি আমাদের দুজনকে বরণ ক'রে নেবে। আচ্ছা মাসি, আমার একটা প্রশ্ন মনে আসে; ভয়ে কাউকে জিজ্ঞাসা করতে পারিনে। তুমি বলতে পারো, পাটের বাজার কি এর মধ্যে চড়েচে ?

মাসি

ঠিক তো জানিনে। অখিল কী যেন বলছিল।

যতীন

কী, কী, কী বলছিল ? তোমাকে ভয় দেখাতে ইচ্ছে করে না, কিন্তু একথা নিশ্চয়, যদি বাজার না চ'ড়ে থাকে তা হ'লে—

মাসি

কি আর হবে !

যতীন

তা হ'লে আমার এ বাড়ি—এক মুহূর্ত্তে হয়ে যাবে মরীচিকা। ঐ যে, ঐ যে, আমাদের আড়তের গোমস্তা। নরহরি, নরহরি—

মাসি

যতীন, চেঁচিয়ো না, মাথা খাও, স্থির হয়ে শোও। আমি যাচ্চি, ওর সঙ্গে কথা ক'য়ে আসচি।

যতীন

আমার ভয় হচ্চে, যেন—মাসি, যদি বাজার খারাপই হয়, তুমি অখিলকে ব'লে কোনোরকম ক'রে—

মাসি

আচ্ছা, অখিলের সঙ্গে কথা কবো। তুই এখন—

যতীন

জানো মাসি, আমি যে টাকা ধার নিয়েছিলুম, সে অখিলেরই টাকা, অন্যের নাম ক'রে—

মাসি

আমিও তাই আন্দাজ করেচি।

যতীন

কিন্তু দেখ, নরহরিকে তুমি আমার কাছে আসতে দিয়ো না—আমার ভয় হচ্চে পাছে কী ব'লে বসে। আমি সইতে পারব না, তুমি ওকে অখিলের কাছে নিয়ে যাও।

মাসি

তাই যাচ্চি—

যতীন

তোমার কাছে পাঁজিটা যদি থাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়ো তো।

মাসি

এখন পাঁজি থাক্, তুই ঘুমো।

যতীন

মণি বাপের বাড়ি যাবার কথায় কাঁদ্‌লে? আমার ভারি আশ্চর্য্য ঠেকচে।

মাসি

এতই বা আশ্চর্য্য কিসের?

যতীন

ও যে সেই অমরাবতীর উর্ব্বশী যেখানে মৃত্যুর ছায়া নেই—ওকে তোমরা ক'রে তুলতে চাও প্রাইভেট হাঁস-পাতালের নার্স?

মাসি

যতীন, ওকে কি তুই কেবল ছবির মতোই দেখবি? দেয়ালে টাঙিয়ে রাখবার?

যতীন

তাতে দোষ কি? ছবি পৃথিবীতে বড়ো দুর্লভ। দেখার জিনিষকে দেখতে পাবার সৌভাগ্য কি কম? তা হোক, তুমি বলছিলে মণি কেঁদেছিল? অন্তিম আসন্ন শয্যায়, সেও দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে ভূলোকে বাতাসকে কাঁদিয়ে দেয়?

মাসি

মেয়েমানুষ যদি সেবা করতে না পারলে তা হ'লে—

যতীন

সাজাহানের ঘরে ঘরকরনা করবার লোক ঢের ছিল —তাদের সকলের মধ্যে কেবল একজনকে তিনি দেখেছিলেন যার কিছুই করবার দরকার ছিল না। নইলে তাজমহল তাঁর মনে আসত না। তাজ-মহলেরও কোনো দরকার নেই। মাসি, আমি সেরে উঠ্‌লেই আবার এই বাড়িটি নিয়ে পড়ব। যত দিন বেঁচে থাকি, এই বাড়িটিকে সম্পূর্ণ ক'রে তোলাই আমার একমাত্র কাজ হবে, আমার এই মণি-সৌধ। বিধাতার স্বপ্নকে যে আমি চোখে দেখলুম, আমার স্বপ্নকে সাজিয়ে তুলে কেবল সেই খবরটি রেখে যেতে চাই। মাসি, তুমি হয়তো আমার কথা ঠিক বুঝ্‌তে পারচ না।

মাসি

তা সত্যি বলচি, বাবা,—তোদের এ পুরুষমানুষের কথা, আমি ঠিক বুঝিনে।

যতীন

এ জানালাটা আরেকটু খুলে দাও। (মাসি জানালা খুলিয়া দিলেন) ঐ দেখ, ঐ দেখ, অনাদি অন্ধকারের সমস্ত চোখের জলের ফোঁটা তারা হয়ে রইল।—হিমি কোথায়, মাসি? সে কি ঘুমোতে গেছে?

মাসি

না, এখনো বেশি রাত হয়নি। ও হিমি, শুনে যা।

হিমির প্রবেশ

যতীন

আমাকে গাইতে বারণ করেছে ব'লেই বারে বারে তোকে ডাকতে হয়, কিছু মনে করিসনে বোন।

হিমি

না দাদা, তুমি তো জানো, আমার গাইতে কত ভালো লাগে। কোন্ গানটা শুন্‌তে চাও, বলো।

যতীন

সেই যে—"আমার মন চেয়ে রয়।"

(হিমির গান)

আমার মন চেয়ে রয় মনে মনে হেরে মাধুরী।
নয়ন আমার কাঙাল হয়ে মরে না ঘুরি।
চেয়ে চেয়ে বুকের মাঝে
গুঞ্জরিল একতারা যে,
মনোরথের পথে পথে বাজ্‌ল বাঁশুরী,
রূপের কোলে ঐ যে দোলে অরূপ মাধুরী॥
কূলহারা কোন্ রসের সরোবরে,
মূলহারা ফুল ভাসে জলের পরে।
হাতের ধরা ধরতে গেলে
ঢেউ দিয়ে তায় দিই যে ঠেলে,
আপন মনে স্থির হয়ে রই, করিনে চুরি।
ধরা দেওয়ার ধন সে তো নয়, অরূপ মাধুরী॥

যতীন

মাসি, তোমরা কিন্তু বরাবর মনে ক'রে এসেছ, মণির মন চঞ্চল—আমাদের ঘরে ওর মন বসেনি—কিন্তু দেখ—

মাসি

না, বাবা, ভুল বুঝেছিলুম, সময় হ'লেই মানুষকে চেনা যায়।

যতীন

তুমি মনে করেছিলে, মণিকে নিয়ে আমি সুখী হ'তে পারিনি, তাই তার উপরে রাগ করতে। কিন্তু সুখ জিনিষটি ঐ তারাগুলির মতো; অন্ধকারের ফাঁকে ফাঁকে দেখা দেয়। জীবনের ফাঁকে ফাঁকে কি স্বর্গের আলো জলেনি? আমার যা পাবার তা পেয়েছি, কিছু বলবার নেই। কিন্তু মাসি, ওর তো অল্প বয়েস, ও কী নিয়ে থাকবে?

মাসি

অল্প বয়েস কিসের? আমরাও তো, বাছা, ঐ বয়সেই দেবতাকে সংসারের দিকে ভাসিয়ে দিয়ে অন্তরের দিকে টেনে নিয়েছি। তাতে ক্ষতি হয়েছে কী? তাও বলি, সুখেরই বা এত বেশি দরকার কিসের?

যতীন

যখন থেকে শুনেছি, মণি কেঁদেছে, তখন থেকেই বুঝেছি, ওর মন জেগেছে। ওকে একবার ডেকে দাও, মাসি। দুপুর বেলা একবার এসেছিল। তখন দিনের প্রখর আলো,—দেখে হঠাৎ মনে হ'ল, ওর মধ্যে ছায়া একটুও কোথাও নেই। একবার এই সন্ধ্যের অন্ধকারে দেখতে দাও, হয়তো ওর ভিতরের সেই চোখের জলটুকু দেখতে পাবো।

মাসি

তোমার কাছে ওর ভালোবাসা ঘোমটা খুল্‌তে এখনো লজ্জা পায়, তাই ওর যত কান্না সবই আড়ালে।

যতীন

আচ্ছা, থাক্, থাক্, না হয় আড়ালেই থাক্। কিন্তু সেই আড়ালের খবরটি, মাসি, তুমি আমাকে দিয়ে যেয়ো। কেননা, যখন তার আড়ালটি স'রে যাবে, তখন হয়তো—আজ কিন্তু সন্ধ্যে বেলায় আমি তার সঙ্গে বিশেষ ক'রে একটু কথা বলতে চাই।

মাসি

কী তোর এমন বিশেষ কথা আছে বল্ তো?

যতীন

আমার মণি-সৌধ তৈরি শেষ হয়ে গেল, সেই খবরটা আপন মুখে তাকে দিতে চাই। গৃহপ্রবেশ আমার নয়, গৃহপ্রবেশ তাকেই করতে হবে—তার জন্যেই আমার এই সৃষ্টি, আমার এই ইটকাঠের বীণায় গান।

মাসি

সে বুঝি জানে না?

যতীন

তবু নিবেদন ক'রে দিতে হবে। হিমিকে বল্‌ব, দরজার বাইরে থেকে ঐ গানটা গাইবে—

মোর জীবনের দান,
করো গ্রহণ করার পরম মূল্যে চরম মহীয়ান্।

যাও মাসি, তুমি ডেকে দাও। মাসি, ঐ দেখ, নরহরি বুঝি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসচে—আমার পাটের আড়তের গোমস্তা—ওকে আজ এখানে আসতে দিয়ো

না। না, না, না, আমি কিছুই শুন্‌তে চাইনে। ওর খবর যাই থাক্ না, সে আমি পরে বুঝ্‌ব।

[মাসির প্রস্থান

যতীন

হিমি, শোন্ শোন্।

হিমির প্রবেশ

তোকে একটা গান শুনিয়ে দিই। এটা তোকে শিখ্‌তে হবে।

হিমি

না, দাদা, তুমি গেয়ো না, ডাক্তার বারণ করে।

যতীন

আমি গুনগুন ক'রে গাবো। অনেক দিন পরে আমাদের কিনু বাউলের সেই গানটা আমার মনে পড়েছে।

(গান)

ওরে মন যখন জাগ্‌লি নারে
তখন মনের মানুষ এল দ্বারে॥
তার চ'লে যাবার শব্দ শুনে
ভাঙ্‌লরে ঘুম,
ও তোর ভাঙ্‌লরে ঘুম অন্ধকারে॥
তার ফিরে যাওয়ার হাওয়াখানা
বুকের মাঝে দিল হানা,
ওরে সেই হাওয়া তোর প্রাণের ভিতর
তুলবে তুফান হাহাকারে॥

তোর মাসির কাছে শুনে বুঝেছি, হিমি, মণির মন জেগেছে। তুই হয়তো আমার কথা বুঝ্‌তে পারচিসনে। আচ্ছা থাক্ সে! এ বাড়ির সবটা তুই দেখেছিস?

হিমি

চমৎকার হয়েছে।

যতীন

উপরের যে ঘরটাতে পাথর বসাতে দিয়েছিলুম—কই, প্ল্যানটা কোথায়? এই যে, এই ঘরে—এর কড়িকাঠ ঢেকে একটা কাঠের চাঁদোয়া হয়েচে তো?

হিমি

হাঁ, হয়েচে বই কি।

যতীন

তাতে কি-রকম কাজ বল্ তো?

হিমি

চার দিকে মোটা ক'রে নীল পাড়, মাঝখানে লাল পদ্ম আর শাদা হাঁসের জমি—ঠিক যেমন তুমি ব'লে দিয়েছিলে।

যতীন

আর দেয়ালে?

হিমি

দেয়ালে বকের সার, ঝিনুক বসিয়ে আঁকা।

যতীন

আর মেঝেতে?

হিমি

মেঝেতে শঙ্খের পাড়। তার মাঝখানে মস্ত একটা পদ্মাসন।

যতীন

দরজার বাইরে দুধারে শ্বেতপাথরের দুটো কলস বসিয়েচে কি?

হিমি

হাঁ, বসিয়েচে। তার মধ্যে দুটো ইলেক্‌ট্রিক আলোর শিশি বসানো—কি সুন্দর!

যতীন

জানিস, সে ঘরটার কি নাম?

হিমি

জানি, মণি-মন্দির।

যতীন

সেদিন অখিল তোর মাসির কাছে এসেছিল। কি বলছিল, কিছু শুনেচিস কি? এই বাড়িটার কথা?

হিমি

তিনি বলছিলেন, কল্‌কাতায় এমন সুন্দর বাড়ি আর নেই।

যতীন

না, না, সেকথা না। অখিল কি এ বাড়ির—থাক্,

কাজ নেই। মাসি বলছিলেন, আজ দুপুর-বেলা মৌরলা মাছের যে ঝোল হয়েছিল, সেটা নাকি মণির তৈরি—ভারি সুন্দর স্বাদ। তুই কি—

হিমি

সে আমি বলতে পারিনে।

যতীন

ছি ছি বোন, তোর বৌদিদির সঙ্গে আজ পর্য্যন্ত তোর ভালো বনল না, এটা আমার—

হিমি

ননদ যে আমি—তাই হয়তো,—

যতীন

তুই বুঝি শাস্ত্র মিলিয়ে ভাব করিস রাগ করিস?

হিমি

হাঁ দাদা, সেই যে হিন্দী গানে আছে, "ননদিয়া রহি জাগি"—

যতীন

তুই বুঝি সেটাকে একটু বদলে নিয়ে করেছিস্ "ননদিয়া রহি রাগি।"

হিমি

হাঁ দাদা, সুরে খারাপ শুনতে হয় না। (গাহিয়া) "ননদিয়া রহি রাগি"—

যতীন

কিন্তু বেসুর করিসনে বোন।

হিমি

সে কি হয়? তোমার কাছেই তো সুর শেখা।

যতীন

ঐরে, আজই যতসব কাজের লোকের ভিড় দেখচি। নয়েন থাঁর লোক দেউড়ির কাছে ঘুরে বেড়াচ্চে। হিমি এক কাজ কর্ তো—কোনোরকম ক'রে আভাসে খবর নিতে পারিস, এখনকার বাজারে—না, না, থাক্‌গে। ঐ দরজাটা বন্ধ ক'রে দে।

পাশের ঘরে

মাসি

এ কি, বউ! কোথাও যাচ্ছ নাকি?

মণি

সীতারামপুরে যাবো।

মাসি

সে কি কথা? কার সঙ্গে যাবে?

মণি

অনাথ নিয়ে যাচ্ছে।

মাসি

লক্ষ্মী, মা আমার, যেয়ো তুমি যেয়ো—তোমাকে বারণ করব না। কিন্তু আজ না।

মণি

টিকিট কিনে গাড়ি রিজার্ভ হয়ে গেছে। মা খরচ পাঠিয়েচেন।

মাসি

তা হোক্, ও লোকসান গায়ে সইবে। না হয় তুমি কাল ভোরের গাড়িতেই যেয়ো। আজ রাত্তিরটা—

মণি

মাসি, আমি তোমাদের তিথি বার মানিনে। আজ গেলে দোষ কি?

মাসি

যতীন তোমাকে ডেকেছে, তোমার সঙ্গে তার একটু বিশেষ কথা আছে।

মণি

বেশ তো, এখনো দশ মিনিট সময় আছে, আমি তাঁকে ব'লে আসচি।

মাসি

না তুমি বলতে পারবে না যে, যাচ্চ।

মণি

তা বলব না, কিন্তু দেরি করতে পারব না। কালই অন্নপ্রাশন, আজ না গেলে চলবেই না।

মাসি

জোড় হাত করচি বউ, আমার কথা একদিনের মতো রাখো। মন একটু শান্ত ক'রে যতীনের কাছে বসো। তাড়াতাড়ি কোরো না।

মণি

তা কি কর্‌ব বলো? গাড়ি তো ব'সে থাকবে না।

অনাথ চ'লে গেছে। এখনি সে এসে আমায় নিয়ে যাবে। এই বেলা তাঁর সঙ্গে দেখা সেরে আসিগে।

মাসি

না, তবে থাক্‌, তুমি যাও। এমন ক'রে তার কাছে যেতে দেবো না। ওরে অভাগিনী, যতদিন বেঁচে থাকবি এদিনের কথা তোকে চিরকাল মনে রাখতে হবে।

মণি

মাসি, আমাকে অমন ক'রে শাপ দিয়ো না বলচি।

মাসি

ওরে বাপরে, আর কেন বেঁচে আছিস রে বাপ! দুঃখের যে শেষ নেই, আমি আর ঠেকিয়ে রাখতে পারলুম না।

[মণির প্রস্থান

শৈলের প্রবেশ

শৈল

মাসি, তোমাদের বউয়ের ব্যাভারখানা কীরকম বলো তো? কি কাণ্ড! স্বামীর এ অবস্থায় কোন্ বিবেচনায় বাপের বাড়ী চল্‌ল।

মাসি

ঐটুকু তো মেয়ে, মনে হয় যেন ননী দিয়ে তৈরি, কিন্তু কী পাথরে গড়া ওর প্রাণ?

শৈল

ওকে তো অনেক দিন থেকে দেখ্‌চি, কিন্তু এতটা যে পারে তা জানতুম না। এদিকে দেখ কুকুর বেড়াল বাঁদর ময়ূর জন্তুজানোয়ার কত পুষেছে তার ঠিক নেই, তাদের কিছু হ'লেই অনর্থপাত ক'রে দেয়, অথচ স্বামীর উপরে—ওকে বুঝ্‌তে পারলুম না।

মাসি

যতীন ওকে মর্ম্মে মর্ম্মেই বুঝেছিল। একদিন দেখেছি যতীন মাথা ধ'রে বিছানায় প'ড়ে, মণি দল বেঁধে থিয়েটারে চলেচে। থাকতে না পেরে আমি যতীনকে পাখার বাতাস করতে গেলুম। ও আমার হাত থেকে পাখা ছিনিয়ে নিয়ে ফেলে দিলে। ওরে বাস্‌রে, কী ব্যথা! সেসব দিনের কথা মনে করলে আমার বুক ফেটে যায়।

শৈল

তাও বলি মাসি, অমনি পাথরের মতো মেয়ে না হ'লেও পুরুষদের উড়ো মন চাপা দিয়ে রাখতে পারে না। যতই নরম হবে, ততই ওরা ফসকে যাবে।

মাসি

কি জানি শৈল, ঐটেই হয়তো মানুষের ধর্ম্ম। বাঁধনের মধ্যে কিছু একটু শক্ত জিনিষ না থাকলে সেটা বাঁধনই হয় না, তা কী পুরুষের কী মেয়ের। ভালোবাসার মালায় ফুল থাকে পারিজাতের, কিন্তু তার সুতোটি থাকে বজ্রের।

শৈল

এখনো যদি গাড়িতে না উঠে থাকে তা হ'লে ওকে একটু বুঝিয়ে দেখিগে।

[প্রস্থান

প্রতিবেশিনীর প্রবেশ

প্রতিবেশিনী

ঠান্‌দি! ওমা, এ কী কাণ্ড! তোমার বউ নাকি বাপের বাড়ী চল্‌ল?

মাসি

তা কী হয়েছে। তা নিয়ে তোমাদের অত ভাবনা কেন?

প্রতিবেশিনী

তা তো বটেই, আমাদের কী বলো? যতীন-বাবুকে পাড়ার লোক সবাই ভালোবাসে সেইজন্যেই—

মাসি

হাঁ, সেইজন্যেই যতীন যাকে ভালোবাসে তোমরা সকলে মিলে তার—

প্রতিবেশিনী

তা বেশ ঠান্‌দিদি, মণি খুবই ভালো কাজ করেছে। অত ভালো খুব কম মেয়েতেই করতে পারে।

মাসি

স্বামীর ইচ্ছা মেনে যে স্ত্রী চলে তাকেই তো তোমরা ভালো বলো। মণি আমাদের সেই স্ত্রী।

প্রতিবেশিনী

হাঁ, সে তো দেখতে পাচ্চি!

মাসি

মণি, ছেলেমানুষ রুগীর কাছে বদ্ধ হ'য়ে আছে, তাই দেখে যতীন কিছুতে সুস্থির হ'তে পারছিল না। শেষকালে ডাক্তার বাবুর মত নিয়ে তবে তো ও—তা থাকুগে। তোমরা যত পারো পাড়ায় পাড়ায় নিন্দে ক'রে বেড়াওগে। যতীনের কানের কাছে আর চেঁচামেচি কোরো না।

প্রতিবেশিনী

বাস্‌রে। মণি যে কোন্ দুঃখে ঘন ঘন বাপের বাড়ি যায় সে বোঝা যাচ্ছে।

[প্রস্থান

ডাক্তারের প্রবেশ

ডাক্তার

ব্যাপারখানা কি? দরজার কাছে এসে দেখি বাক্সো তোরঙ্গ গাড়ির মাথায় চাপিয়ে বউমা তার ভাইয়ের সঙ্গে কোথায় চল্‌ল। আমাকে দেখে একটুও সবুর করলে না। রোগীর অবস্থার কথা কিছু জিজ্ঞাসা করা, তাও না। ওর সঙ্গে ঝগড়া করেছেন বুঝি? (মাসি নিরুত্তর) দেখুন রোগীর এই অবস্থায় অন্তত এই কিছুদিনের জন্যে বউয়ের সঙ্গে আপনার শাশুড়ি-গিরি না হয় বন্ধই রাখতেন।

মাসি

পারি কই, ডাক্তার? স্বভাব ম'লেও যায় না। একসঙ্গে ঘরে থাকতে গেলেই দুটো বকাবকি হয় বই কি?

ডাক্তার

তা বউ-যে গাড়ি ডাকিয়ে এনে চ'লে গেল, আপনি একটু নিবারণ করলেই তো হ'ত। (মাসি নিরুত্তর) কি জানি, বোধ করি গেল ব'লেই আপনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। কিন্তু আমি আপনাকে স্পষ্টই বলচি, এম্‌নি ক'রে বউকে নির্ব্বাসনে দিয়ে আপনি প্রতিমুহূর্ত্তে যে যতীনের আশা ভঙ্গ করচেন তাতে তার কেবলি প্রাণহানি হচ্চে। রুগীর প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য সব আগে, সেইজন্যেই আমাকে এমন স্পষ্ট কথা বল্‌তে হ'ল, নইলে আপনাদের শাশুড়ি-বউয়ের ঝগড়ার মধ্যে কথা কবার অধিকার আমার নেই।

মাসি

যদি দোষ ক'রে থাকি, তা নিয়ে তর্ক ক'রে তো কোনো ফল নেই। আমি-যে নিজেকে খাটো ক'রে বউকে ফিরে আসতে চিঠি লিখ্‌ব, সে প্রাণ ধ'রে পার্‌ব না, তা তুমি আমাকে গালই দাও আর যাই করো। এখন তুমি এক কাজ করতে পারো ডাক্তার।

ডাক্তার

কি, বলো।

মাসি

সীতারামপুরে বউয়ের বাবাকে একখানা চিঠি লিখে দাও। তাতে লিখো যতীনের কি অবস্থা। বউমার বাবাকে আমি যতদূর জানি তাতে আমার নিশ্চয় বিশ্বাস তিনি সেচিঠি পেলেই বউমাকে নিয়ে এখানে আসবেন।

ডাক্তার

আচ্ছা, লিখে দিচ্চি। কিন্তু বউমা-যে বাপের বাড়ি চ'লে গেছেন, এ খবর যেন কোনো মতেই যতীন জানতে না পায়। আমি তোমাকে ব'লেই রাখচি। এ খবরের উপরে আমার কোনো ওষুধই খাটবে না। হিমি, মা, তুমি যে ঐখানে ব'সে আছ, এক কাজ করো; ও যে-গানটা ভালোবাসে, সেইটে ওর দরজার কাছে ব'সে গাও। ও যেন বউমার খবর জিজ্ঞাসা করবার সময় একটুও না পায়! শুন্‌চ, মা? এখন কান্নার সময় নয়। কান্না পরে হবে। এখন গান। তোমাকে বলেচি কি?—একটা বই লিখচি, তাতে দেখিয়ে দেবো, গানের ভাইব্রেশন আর রোগের বীজের চাল একেবারে উল্টো। নোবেল প্রাইজের জোগাড় করচি আর কি, বুঝেচ?

[প্রস্থান

(হিমির গান)

ঐ মরণের সাগর-পারে চুপে চুপে
এলে তুমি ভুবনমোহন স্বপন-রূপে॥
কান্না আমার সারা প্রহর তোমায় ডেকে
ঘুরেছিল চারিদিকের বাধায় ঠেকে,

বন্ধ ছিলেম এই জীবনের অন্ধকূপে ;
আজ এসেছ ভুবনমোহন স্বপনরূপে ॥

আজ কি দেখি কালোচুলের আঁধার ঢালা,
স্তরে স্তরে সন্ধ্যাতারার মাণিক জ্বালা।
আকাশ আজি গানের ব্যথায় ভ'রে আছে,
ঝিল্লিরবে কাঁপে তোমার পায়ের কাছে।
বন্দনা তোর পুষ্পবনের গন্ধরূপে ;
আজ এসেছ ভুবনমোহন স্বপনরূপে ॥

(নেপথ্যে চাহিয়া) যাচ্ছি, দাদা, ভিতরেই যাচ্ছি।

অখিলের প্রবেশ

অখিল

কেন ডেকেছ, কাকী ?

মাসি

তোকে ডেকে পাঠাবার জন্যে কাল থেকে যতীন আমাকে বারবার অনুরোধ করচে। আর ঠেকিয়ে রাখা গেল না।

অখিল

ওর সেই বাড়িবন্ধকের ব্যাপার নিয়ে ?

মাসি

সে কথাটা ওর মনের মধ্যে খুবই আছে, কিন্তু সেটা ও জিজ্ঞাসা করতে চায় না। যতবারই ও-ভাবনাটা ধাক্কা দিচ্ছে ততবারই তাকে সরিয়ে সরিয়ে রাখচে। সেকথা তুমি ওর কাছে কোনোমতেই পেড়ো না—ওও পাড়বে না।

অখিল

তবে আমাকে কিসের দরকার পড়ল ?

মাসি

উইল করবার জন্যে।

অখিল

উইল ? অবাক্ করলে।

মাসি

জানি, কোনো দরকার ছিল না। কিন্তু মাথার দিব্যি দিচ্ছি, এই কথাটি তোমাকে রাখতেই হবে। ও যাকে যা-কিছু দিতে বলে, সম্ভব হোক অসম্ভব হোক, সমস্তই তোমার ঠিক ঠিক লিখে নেওয়া চাই। হেসো না, প্রতিবাদ কোরো না। তার পরে সে উইলের যা দশা হবে তা জানি।

অখিল

জানি বই কি। জর্জ্ দি ফিফ্থের সমস্ত সাম্রাজ্যই আমি যতীনকে দিয়ে উইল করিয়ে নিজের নামে লিখিয়ে নিতে পারি। আমার বিশ্বাস সম্রাট বাহাদুর undue influenceএর অভিযোগ তুলে আদালতে নালিশ রুজু করবেন না। কিন্তু দেখ, কাকী, এইবার তোমার সঙ্গে এই বাড়ির কথাটা ব'লে নিই। আমার মক্কেল—

মাসি

অখিল, এখন দুটো সত্যি কথা কওয়াই যাক। ঘরে-বাইরে কেবলি মিথ্যে ব'লে ব'লে দম বন্ধ হয়ে এল। এখন শোনো, তোমার মক্কেল তুমি নিজেই—একথা গোড়া থেকেই জানি।

অখিল

সে কি কথা, কাকী ?

মাসি

থাক্, ভোলাবার কোনো দরকার নেই। ভালোই করেচ। জানি, আমার সম্পত্তিতে তোমাদেরই অধিকার ব'লে তোমরা বরাবরই তার পরে দৃষ্টিপাত করেচ—

অখিল

ছি ছি এমন কথা—

মাসি

তাতে দোষ কি ছিল, বলো। তোমরা আমার ছেলেরই মতো তো বটে। তোমাদেরই সব দিতুম। কিন্তু আমরা দুইবোন ছিলুম। বাবা দিদির উপরে রাগ ক'রে একলা আমাকেই তাঁর সম্পত্তি দিয়ে গেলেন। সে রাগ প'ড়ে যাবার আগেই তাঁর মৃত্যু হ'ল। স্বর্গে আছেন তিনি ; আজ তাঁর সে রাগ নেই। সেইজন্যেই বাবার সম্পত্তি তাঁরই দৌহিত্রের ভোগে ঢেলে দিয়েছি। লক্ষ্মীর কৃপায় তোমাদের তো কোনো অভাব নেই।

অখিল

তা নিয়ে তোমাকে কি কোনো কথা বলেচি কোনো দিন ?

মাসি

বুদ্ধি থাকলে কথা বলবার তো দরকার হয় না। বাড়ি-তৈরির নেশায় যতীনকে ধরলে। সে-নেশার ভিতরে যে কত অসহ্য দুঃখ তা তোরা পাকা-বুদ্ধি আইনওয়ালারা বুঝবিনে। আমি মেয়েমানুষ, ওর মাসি, আমার বুক ফাটতে লাগল। ধার পাবো কোথায় ? তোরই কাছে যেতে হ'ল। তুই এক ফাঁকা মক্কেল খাড়া ক'রে—

হিমির প্রবেশ

হিমি

মাসি, বামুন-ঠাকরুণ এসেচেন।

মাসি

লক্ষ্মী মেয়ে, তুই তাঁকে একটু বসতে বল্, আমি এখনি আসচি।

[হিমির প্রস্থান

অখিল

কাকী তোমার এই বোনঝির কত বয়স হবে ?

মাসি

সতেরো সবে পেরিয়েচে। এই বছরেই আই-এ দেবে।

অখিল

গলাটি ভারি মিষ্টি, বাইরে থেকে ওঁর গান শুনেচি।

মাসি

ওরা দুই ভাইবোনে একই জাতের। দাদা বাড়ি করচেন, ইনি গান করচেন, দুটোতেই একই সুরের খেলা।

অখিল

বিয়ের সম্বন্ধ—

মাসি

না, ওর দাদার অসুখ হয়ে অবধি সেকথা কাউকে মুখে আনতে দেয় না—পড়াশুনো সব ছেড়ে এইখানেই প'ড়ে আছে।

অখিল

কিন্তু ভালো পাত্র খুঁজে দিতে পারি কাকী, যদি কখনো—

মাসি

যেমন তুই মক্কেল খুঁজে দিয়েছিলি সেইরকমই, না ?

অখিল

না কাকী, ঠাট্টা না। আমি ভাবচি, ওঁকে যদি একটা হার্মোনিয়ম পাঠিয়ে দিই, তাতে কি তোমাদের—

মাসি

কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু ও তো হার্মোনিয়ম ভালোবাসে না।

অখিল

গানের সঙ্গে ?

মাসি

গানের সঙ্গে এস্‌রাজ বাজায়।

অখিল

আচ্ছা তা হ'লে এস্‌রাজই না হয়—

মাসি

ওর তো আছে এস্‌রাজ।

অখিল

না হয় আরো একটা হ'ল। সম্পত্তি বাড়িয়ে তোলাকেই তো বলে শ্রীবৃদ্ধি।

মাসি

আচ্ছা দিস এস্‌রাজ। এখন আমার কথাটা শোন্। এতকাল তোর সেই মক্কেলকে সুদ দিয়ে এসেচি আমারই পৈতৃক গয়না বেচে। মাঝে মাঝে মক্কেল যখনি তিন দিনের মধ্যে শোধ নেবার কড়া দাবি ক'রে চিঠি দিয়েচে, তখনই সুদ চড়িয়ে চড়িয়ে আজ আমার আর কিছু নেই। কাজেই কাকীর সম্পত্তি দেওরপোর সিন্ধুকেই গেছে। প্রেতলোকে আমার শ্বশুরের তৃপ্তি হয়েছে—কিন্তু আমার বাবা, যতীনের মা—পরলোকে তাঁদের যদি চোখের জল পড়ে—

হিমির প্রবেশ

হিমি

দাদা তোমাকে বারবার ডাকচেন, মাসি। ছট্‌ফট্

করচেন আর কেবলি বউদিদির কথা জিজ্ঞাসা করচেন। তার জবাব কিছুতে আমার মুখ দিয়ে বেরোয় না, আমার গলা আট্‌কে যায়। (দুই হাতে মুখ চাপিয়া কান্না)

মাসি

কাঁদিসনে, মা, কাঁদিসনে। আমি যতীনের কাছে যাচ্চি।

অখিল

কাকী, আমি যদি কিছু করতে পারি, বলো, আমি না হয় যতীনের কাছে গিয়ে—

মাসি

হাঁ, যতীনের কাছে যেতে হবে। তার সেই উইলটা।

[প্রস্থান

রোগীর ঘরে

যতীন

মণি এল না? এত দেরি করলে যে?

মাসি

সে এক কাণ্ড! গিয়ে দেখি তোমার দুধ জ্বাল দিতে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলেছে ব'লে কান্না। বড়োমানুষের ঘরের মেয়ে, দুধ খেতেই জানে, জ্বাল দিতে শেখেনি। তোমার কাজ করতে প্রাণ চায় ব'লেই করা। অনেক ক'রে ঠাণ্ডা ক'রে তাকে বিছানায় শুইয়ে রেখে এসেছি। একটু ঘুমোক।

যতীন

মাসি!

মাসি

কী, বাবা?

যতীন

বুঝতে পারচি, দিন শেষ হয়ে এল। কিন্তু কোনো খেদ নেই। আমার জন্যে শোক কোরো না।

মাসি

না বাবা, শোক করবার পালা আমার ফুরিয়েছে। ভগবান আমাকে এটুকু বুঝিয়ে দিয়েচেন যে, বেঁচে থাকাই যে ভালো আর মরাই যে মন্দ, তা নয়।

যতীন

মৃত্যুকে আমার মধুর মনে হচ্চে। আজ আমি ওপারের ঘাটের থেকে সানাই শুন্‌তে পাচ্চি। হিমি, হিমি কোথায়?

মাসি

ঐ যে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে।

হিমি

কেন দাদা, কী চাই?

যতীন

লক্ষ্মী বোন আমার, তুই অমন আড়ালে আড়ালে কাঁদিসনে—তোর চোখের জলের শব্দ আমি যেন বুকের মধ্যে শুন্‌তে পাই। দেখি তোর হাতটা। আমি খুব ভালো আছি। ঐ গানটা গা তো ভাই। "যদি হ'ল যাবার ক্ষণ"—

(হিমির গান)

যদি　হ'ল যাবার ক্ষণ
তবে　যাও দিয়ে যাও শেষের পরশন ॥
বারে বারে যেথায় আপন গানে
　স্বপন ভাসাই দূরের পানে,
　মাঝে মাঝে দেখে যেয়ো শূন্য বাতায়ন—
　　　সে মোর　শূন্য বাতায়ন ॥
　বনের প্রান্তে ঐ মালতীর লতা
　করুণ গন্ধে কয় কী গোপন কথা!
　ওরি ডালে আর-শ্রাবণের পাখী
　　　স্মরণখানি আনবে না কি?
　আজ-শ্রাবণের সজল ছায়ায় বিরহ মিলন,
　　　আমাদের　বিরহ মিলন!

মাসি

হিমি, বোতলে গরম জল ভ'রে আন্। পায়ে দিতে হবে।

[হিমির প্রস্থান

যতীন

কষ্ট হচ্চে, মাসি, কিন্তু যত কষ্ট মনে করচ, তার কিছুই নয়। আমার সঙ্গে আমার কষ্টের ক্রমেই যেন বিচ্ছেদ হয়ে আসচে। বোঝাই নৌকোর মতো জীবন-জাহাজের সঙ্গে সে ছিল বাঁধা,—আজ বাঁধন কাটা পড়েছে, তাকে

দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু আমার সঙ্গে সে আর লেগে নেই। এ তিন দিন মণিকে দিনে রাতে একবারো দেখিনি।

মাসি

বাবা, একটু বেদানার রস খাও, তোমার গলা শুকিয়ে আসচে।

যতীন

আমার উইলটা কাল লেখা হয়ে গেচে—সে কি আমি তোমাকে দেখিয়েচি? ঠিক মনে পড়চে না।

মাসি

আমার দেখবার দরকার নেই যতীন।

যতীন

মা যখন মারা যান, আমার তো কিছুই ছিল না। তোমার খেয়ে তোমার হাতেই আমি মানুষ। তাই বলছিলুম—

মাসি

সে আবার কী কথা? আমার তো কেবল এই একখানা বাড়ি আর সামান্য কিছু সম্পত্তি ছিল। বাকি সবই তো তোমার নিজের রোজগার।

যতীন

কিন্তু এই বাড়িটা—

মাসি

কিসের বাড়ি আমার? কত দালান তুমি বাড়িয়েচ, আমার যেটুকু সে তো আর খুঁজেই পাওয়া যায় না।

যতীন

মণি তোমাকে ভিতরে ভিতরে খুব—

মাসি

সে কি জানিনে, যতীন? তুই এখন ঘুমো।

যতীন

আমি মণিকে সব লিখে দিলুম বটে, কিন্তু তোমারি রইল। ও তো কখনো তোমাকে অমান্য করবে না।

মাসি

সেজন্যে অত ভাবচ কেন, বাছা?

যতীন

তোমার আশীর্ব্বাদেই আমার সব। তুমি আমার উইল দেখে এমন কথা কোনো দিন মনে কোরো না—

মাসি

ওকি কথা, যতীন? তোমার জিনিষ তুমি মণিকে দিয়েচ ব'লে আমি মনে করব—এম্‌নি পোড়া মন?

যতীন

কিন্তু তোমাকেও আমি—

মাসি

দেখ্ যতীন, এইবার রাগ করব। তুই চ'লে যাবি, আর টাকা দিয়ে আমাকে ভুলিয়ে রেখে যাবি?

যতীন

মাসি, টাকার চেয়ে যদি আরো বড়ো কিছু তোমাকে—

মাসি

দিয়েছিস, যতীন, ঢের দিয়েছিস। আমার শূন্য ঘর ভ'রে ছিলি, এ আমার অনেক জন্মের ভাগ্যি। এতদিন তো বুক ভ'রে পেয়েচি, আজ আমার পাওনা যদি ফুরিয়ে থাকে তো নালিশ করব না। দাও,—লিখে দাও বাড়িঘর, জিনিষপত্র, ঘোড়াগাড়ি, তালুকমুলুক—যা আছে মণির নামে সব লিখে দাও—এসব বোঝা আমার সইবে না।

যতীন

তোমার ভোগে রুচি নেই, কিন্তু মণির বয়স অল্প, তাই—

মাসি

ওকথা বলিসনে,—ধন-সম্পদ দিতে চাস দে, কিন্তু ভোগ করা—

যতীন

কেন ভোগ করবে না, মাসি?

মাসি

না গো না, পারবে না, পারবে না, আমি বলচি, ওর মুখে রুচবে না। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে—কিছুতে কোনো রস পাবে না।

যতীন

(চুপ করিয়া থাকিয়া, নিশ্বাস ফেলিয়া) দেবার মতন জিনিষ তো কিছুই—

মাসি

কম কি দিয়ে যাচ্ছ? ঘরবাড়ি টাকাকড়ির ছল

ক'রে যা দিয়ে গেলে তার মূল্য ও কি কোনো দিনই বুঝ্‌বে না?

যতীন

মণি কাল কি এসেছিল? আমার মনে পড়চে না।

মাসি

এসেছিল। তুমি ঘুমিয়ে ছিলে। শিয়রের কাছে অনেকক্ষণ ব'সে ব'সে—

যতীন

আশ্চর্য্য! আমি ঠিক সেই সময়ে স্বপ্ন দেখছিলুম, যেন মণি আমার ঘরে আসতে চাচ্চে—দরজা অল্প একটু ফাঁক হয়েচে—ঠেলাঠেলি করচে কিন্তু কিছুতেই সেইটুকুর বেশি আর খুলচে না। কিন্তু মাসি, তোমরা একটু বাড়াবাড়ি করচ। ওকে দেখতে দাও যে, সন্ধ্যেবেলাকার আলোর মতো কেমন অতি সহজে আমার ধীরে ধীরে—

মাসি

বাবা, তোমার পায়ের উপর এই পশমের শালটা টেনে দিই—পায়ের তেলো ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

যতীন

না মাসি, গায়ে কিছু দিতে ভালো লাগচে না।

মাসি

জানিস যতীন, এ শালটা মণির তৈরি—এতদিন রাত জেগে জেগে তোমার জন্তে তৈরি করছিল। কাল শেষ করেচে।

(যতীন শালটা লইয়া দুই হাত দিয়া একটু নাড়াচাড়া করিল। মাসি তার পায়ের উপর টানিয়া দিলেন।)

যতীন

আমার মনে হচ্চে যেন ওটা হিমি সেলাই করছিল! মণি তো সেলাই ভালোবাসে না—ও কি পারে?

মাসি

ভালোবাসার জোরে মেয়ে মানুষ শেখে। হিমি ওকে দেখিয়ে দিয়েছে বই কি! ওর মধ্যে ভুল সেলাই অনেক আছে—

যতীন

হিমি, তুই পাখা রাখ্ ভাই। আয় আমার কাছে বোস্। আজই পাঁজি দেখে তোকে ব'লে দেবো, কবে গৃহপ্রবেশের লগ্ন আসবে।

হিমি

থাক্ দাদা, ওসব কথা—

যতীন

আমি উপস্থিত থাকতে পারব না—সেই মনে ক'রে বুঝি—আমি থাক্‌ব বোন, সেদিন এ বাড়ির হাওয়ায় হাওয়ায় আমি থাক্‌ব—তোরা বুঝ্‌তে পারবি। যে গানটা গাবি সে আমি ঠিক ক'রে রেখেচি—সেই অগ্নিশিখা,—একবার শুনিয়ে দে,—

(হিমির গান)

অগ্নিশিখা, এস, এস,
আনো আনো আলো।
দুঃখে সুখে শূন্য ঘরে পুণ্য দীপ জ্বালো।
আনো শক্তি, আনো দীপ্তি,
আনো শান্তি, আনো তৃপ্তি,
আনো স্নিগ্ধ ভালোবাসা,
আনো নিত্য ভালো॥
এস শুভ লগ্ন বেয়ে
এস হে কল্যাণী।
আনো শুভ সুপ্তি, আনো
জাগরণখানি।
দুঃখরাতে মাতৃবেশে
জেগে থাকো নির্ণিমেষে,
উৎসব আকাশে তব
শুভ্র হাসি ঢালো॥

গানে কোন্ উৎসবের কথাটা আছে জানিস, হিমি?

হিমি

জানিনে!

যতীন

আহা, আন্দাজ কর্ না।

হিমি

আমি আন্দাজ করতে পারিনে।

যতীন

আমি পারি। যেদিন তোর বিয়ে হবে সেদিন উৎসবের ভোর বেলা থেকে—

হিমি

থাক্, দাদা, থাক্।

যতীন

আমি যেন তার বাঁশি শুন্‌তে পাচ্ছি, ভৈরবীতে বাজচে। আমি লিখে দিয়েছি, তোর বিয়ের খরচের জন্যে—

হিমি

দাদা, তবে আমি যাই।

যতীন

না, না, বোস্। কিন্তু গৃহপ্রবেশের দিন আমার হয়েই তোকে সব সাজাতে হবে, মনে রাখিস, শাদা পদ্ম যত পাওয়া যায়—ঘরে যে আসন তৈরি হবে তার উপরে আমার বিয়ের সেই লাল বেনারসী চাদরটা—

শম্ভুর প্রবেশ

শম্ভু

ডাক্তার বাবু জিজ্ঞাসা করচেন, তাঁকে কি আজ রাত্রে থাকতে হবে?

মাসি

হাঁ, থাকতে হবে।

[শম্ভুর প্রস্থান

যতীন

কিন্তু আজ ঘুমের ওষুধ না। তাতে আমার ঘুমও যায় ঘুলিয়ে, জাগাও যায় ঘুলিয়ে। বৈশাখ দ্বাদশীর রাত্রে আমাদের বিয়ে হয়েছিল, মাসি। কাল সেই তিথি। মণিকে সেই কথাটি মনে করিয়ে দিতে চাই। দুমিনিটের জন্যে ডেকে দাও। চুপ ক'রে রইলে যে? আমার মন তাকে কিছু বলতে চাচ্চে ব'লেই এই দু'রাত আমার ঘুম হয়নি। আর দেরি নয়, এর পরে আর সময় পাবো না। না, মাসি, তোমার ঐ কান্না আমি সইতে পারিনে। এতদিন তো বেশ শান্ত ছিলে। আজ কেন—

মাসি

ওরে যতীন, ভেবেছিলুম আমার সব কান্না ফুরিয়ে গেচে—আজ আর পারচিনে।

যতীন

হিমি তাড়াতাড়ি চ'লে গেল কেন?

মাসি

বিশ্রাম করতে গেল। একটু পরেই আবার আসবে।

যতীন

মণিকে ডেকে দাও।

মাসি

যাচ্চি বাবা, শম্ভু দরজার কাছে রইল। যদি কিছু দরকার হয় ওকে ডেকো।

[প্রস্থান

পাশের ঘরে

(অখিলের প্রবেশ। তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া হিমি উঠিয়া দাঁড়াইল)

হিমি

মাসিকে ডেকে দিই।

অখিল

দরকার নেই। তেমন জরুরি কিছু নয়।

হিমি

দাদার ঘরে কি যাবেন?

অখিল

না, এইখান থেকেই খবর নিয়ে যাবো। যতীন কেমন আছে?

হিমি

ডাক্তার বলেন, আজ অবস্থা ভালো নয়।

অখিল

ক'দিন থেকে তোমরা দিনরাত্রিই খাটচ। আমি এলুম তোমাদের একটু জিরোতে দেবার জন্যে। বোধ হয় রোগীর সেবা আমিও কিছু কিছু—

হিমি

না সে হ'তেই পারে না। আমি কিচ্ছু শ্রান্ত হইনি।

অখিল

আচ্ছা, না হয় আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে কাজ করি।

হিমি

এসব কাজ—

অখিল

জানি, ওকালতির চেয়ে অনেক বেশি শক্ত।

হিমি

না,আমি তা বলচিনে।

অখিল

না, সত্যি কথা। আমাকে যদি বার্লি তৈরি করতে হয়, আমি হয়তো ঘরে আগুন লাগিয়ে দেবো।

হিমি

কী বল্‌চেন আপনি!

অখিল

একটুও বাড়িয়ে বলচিনে। ঘরে আগুন লাগানো আমাদের অভ্যেস। বুঝ্‌তে পারচ না?—দেখ না কেন, তুমি তো যতীনের জন্যে বার্লি তৈরি করচ, আমি হয়তো এমন-কিছু তৈরি ক'রে বসে আছি যেটা রোগীর পথ্য নয়, অরোগীর পক্ষেও গুরুপাক। তুমি বোসো, দুটো কথা তোমার সঙ্গে ক'য়ে নিই।

হিমি

এখন কিন্তু গল্প করবার মতো—

অখিল

রামো! গল্প করতে পারলে আমাদের ব্যবসা ছেড়ে দিতুম, দ্বিতীয় বঙ্কিম চাটুজ্জে হয়ে উঠতুম। হাস্‌চ কি? আমাদের অনেক কথাই বানাতে হয়, একটুও ভালো লাগে না, গল্প বানাতে পারলে এ ব্যবসা ছেড়ে দিতুম। তুমি বোধ হয় গল্প লেখা সুরু করেচ?

হিমি

না।

অখিল

নাটক তৈরি—

হিমি

না, আমার ওসব আসে না।

অখিল

কি ক'রে জানলে?

হিমি

ভাষায় কুলোয় না।

অখিল

নাটক তৈরি করতে ভাষার দরকার হয় না। খাতা-পত্র কিছুই চাইনে। হয়তো এখনি তোমার নাটক সুরু হয়েছে বা, কে বলতে পারে?

হিমি

আমি যাই, মাসিকে ডেকে দিই।

অখিল

না, দরকার হবে না। আমি বাজে কথা বন্ধ করলুম, কাজের কথাই পাড়্‌ব। ভেবেছিলুম যতীনকেই বল্‌ব। কিন্তু তার শরীর যেরকম এখন—

হিমি

তাঁর ব্যবসার কোনো গুজব আমার কানে উঠেচে কি না, এ-কথা প্রায় আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি হয়তো—

অখিল

আমি জানি, ব্যবসা গেছে তলিয়ে—

হিমি

পায়ে পড়ি তাঁকে এ খবর দেবেন না। আর যাই হোক তাঁর এই বাড়িটা তো—

অখিল

যতীন বাড়ির কথা বলে নাকি?

হিমি

কেবল ঐ কথাই বল্‌চেন। একদিন ধুম ক'রে গৃহ-প্রবেশ হবে, তারই প্ল্যান্—

অখিল

গৃহপ্রবেশের আয়োজন তো হয়েচে—

হিমি

আপনি কি ক'রে জানলেন?

অখিল

আমার আপিস থেকেই হয়েচে—পেয়াদারা বেশভূষা ক'রে প্রায় তৈরি—

হিমি

দেখুন অখিল বাবু, এ হাসির কথা নয়—

অখিল

সে কি আর আমি জানিনে? তোমার কাছে লুকিয়ে কি হবে। এ বাড়িটা দেনায়—

হিমি

না, না, না—সে হ'তেই পারবে না—অখিল বাবু দয়া করবেন—

অখিল

কিন্তু এত ভাব্‌চ কেন? তুমি তো সব জানোই। তোমাদের দাদা তো আর বেশি দিন—

হিমি

জানি, জানি, দাদা আর থাকবেন না, সেও সহ্য হবে, কিন্তু তাঁর এই বাড়িটিও যদি যায়, তা হ'লে বুক ফেটে ম'রে যাবো। এ যে তাঁর প্রাণের চেয়ে—

অখিল

দেখ, তুমি সাহিত্যে গণিতে লজিকে ক্লাসে পুরো মার্কা পেয়ে থাকো—কিন্তু সংসার-জ্ঞানে থার্ড্‌ক্লাসেও পাস করতে পারবে না। বিষয় কর্ম্মে হৃদয় ব'লে কোনো পদার্থ নেই, ওর নিয়ম—

হিমি

আমি জানিনে। আপনার পায়ে পড়ি, এ বাড়ি আপনাকে বাঁচাতে হবে। আপনার আপিসের—

অখিল

পেয়াদাগুলোকে সাজাতে হবে বাজনদার ক'রে, হাতে দিতে হবে বাঁশি। ল কলেজে লয়-তত্ত্বের সব অধ্যায় শিখেছি, কেবল তানলয়ের পালাটা প্র্যাক্‌টিস হয়নি। এটা হয়তো বা তোমার কাছ থেকেই—

মাসির প্রবেশ

মাসি

অখিল, কি হচ্চে? হিমি কাঁদচে কেন?

অখিল

গৃহপ্রবেশের প্ল্যানে একটু খট্‌কা বেধেছে তাই নিয়ে—

মাসি

তা ওর সঙ্গে এসব কথা কেন?

অখিল

ওর দাদা যে ওরি উপরে গৃহপ্রবেশের ভার দিয়েছে শুনচি। কাজটাতে কোনো বাধা না হয়, এইজন্যে এত লোককে ছেড়ে আমাকেই ধরেচে। তা তোমরা যদি সকলেই মনে করো, তা হ'লে চাই কি গৃহপ্রবেশের কাজে আমিও কোমর বেঁধে লাগতে পারি। কথাটা বুঝেছ, কাকী?

মাসি

বুঝেছি। শুধু কোমর বাঁধা নয়, বাঁধন আরো পাকা করতে চাও। এখন সে পরামর্শ করবার সময় নয়। আপাতত যতীনকে তুমি আশ্বাস দিয়ো যে তার বাড়িতে কারো হাত পড়বে না।

অখিল

বেশ তো, বললেই হবে পাটের বাজার চড়েছে। এখন এঁকে চোখের জলটা মুছ্‌তে বলবেন—

ডাক্তারের প্রবেশ

ডাক্তার

উকীল যে! তবেই হয়েচে।

অখিল

দেখুন, শনি বড়ো না কলি বড়ো, তা নিয়ে তর্ক ক'রে লাভ কি? বাংলা দেশে আপনাদের হাত পার হয়েও যে ক'টি লোক টি'কে থাকে, তাদেরই সামান্য শাঁসটুকু নিয়েই আমাদের কারবার—

ডাক্তার

এ-ঘরে সে কারবার চালাবার আর বড়ো সময় নেই দেখে এসেচি।

অখিল

ভয় দেখাবেন না মশায়, মৃত্যুতেই আপনাদের ব্যবসা খতম, আমাদেরটা ভালো ক'রে জমে তার পর থেকে। না, না, থাক্‌, থাক্‌, ওসব কথা থাক্‌—কাকী, এই ব'লে যাচ্চি, গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠানের সমস্ত ভার নিতে রাজি আছি—তার সঙ্গে সঙ্গে উপরি-আরো কিছু ভারও। বাইরের ঘরে থাকব, যখন দরকার হয় ডেকে পাঠিয়ো।

[প্রস্থান

ডাক্তার

এখনো বউমা এল না। আপনিও তো অনেকক্ষণ ওর ঘরে যাননি।

মাসি

মণির কথা জিজ্ঞাসা করলে কী জবাব দেবো ভেবে পাচ্চিনে। আর তো আমি কথা বানিয়ে উঠতে পারিনে—

নিজের উপর ধিক্কার জ'ন্মে গেল। ও একটু ঘুমিয়ে পড়লে তার পরে ঘরে যাবো।

ডাক্তার

আমি বাইরে অপেক্ষা করব। রুগী কেমন থাকে ঘণ্টাখানেক পরে খবর দেবেন। ইতিমধ্যে উকীলকে ঠেকিয়ে রাখতে হবে, ওদের মুখ দেখলে সহজ অবস্থাতেই নাড়ী ছাড়্ব ছাড়্ব করে।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক

রোগীর ঘরে। দ্বারের কাছে শম্ভু; প্রতিবেশিনীর প্রবেশ

প্রতিবেশিনী

এই যে, শম্ভু!

শম্ভু

হ্যাঁ, দিদি।

প্রতিবেশিনী

একবার যতীনকে দেখে যেতে চাই। মাসি নেই এই বেলা—

শম্ভু

কি হবে গিয়ে, দিদি?

প্রতিবেশিনী

নাটোরের মহারাজার ওখানে একটা কাজ খালি হয়েচে। আমার ছেলের জন্যে যতীনের কাছ থেকে একখানা চিঠি লিখিয়ে—

শম্ভু

দিদি, সে কোনোমতেই হবে না। মাসি জানতে পারলে রক্ষে থাকবে না।

প্রতিবেশিনী

জানবে কী ক'রে? আমি ফস ক'রে পাঁচ মিনিটের মধ্যে—

শম্ভু

মাপ করো দিদি, সে কোনোমতেই হবে না।

প্রতিবেশিনী

হবে না! তোমার মাসি মনে করেন, আমাদের ছোঁয়াচ লাগলেই তাঁর বোনপো বাঁচবে না। এদিকে নিজের কথাটা ভেবে দেখেন না। স্বামীটিকে খেয়েচেন, একটিমাত্র মেয়ে সেও গেছে, বাপমা কাউকেই রাখলে না! এইবার বাকি আছে ঐ যতীন। ওকে শেষ ক'রে তবে উনি নড়বেন। নইলে ওঁর আর মরণ নেই। আমি ব'লে রাখলুম, শম্ভু, দেখে নিস—মাসিতে যখন ওকে পেয়েছে, যতীনের আশা নেই।

শম্ভু

ঐ আমাকে ডাকচেন। তুমি এখন যাও।

প্রতিবেশিনী

ভয় নেই, আমি চললুম।

[প্রস্থান

ঘরে শম্ভুর প্রবেশ

যতীন

(পায়ের শব্দে চম্‌কাইয়া) মণি!

শম্ভু

কর্ত্তা বাবু, আমি শম্ভু! আমাকে ডাকছিলেন?

যতীন

একবার তোর বউঠাকরুণকে ডেকে দে।

শম্ভু

কাকে?

যতীন

বউঠাকরুণকে।

শম্ভু

তিনি তো এখনো ফেরেননি।

যতীন

কোথায় গেছেন?

শম্ভু

সীতারামপুরে।

যতীন

আজ গেছেন?

শম্ভু

না, আজ তিন দিন হ'ল।

যতীন

তুই কে? আমি কি চোখে ঠিক দেখচি?

শম্ভু

আমি শম্ভু।

যতীন

ঠিক ক'রে বল্ তো, আমার তো কিছু ভুল হচ্ছে না?

শম্ভু

না, বাবু।

যতীন

কোন্ ঘরে আছি আমি? এই কি সীতারামপুর?

শম্ভু

না, কল্‌কাতায় এ তো আপনার শোবার ঘর।

যতীন

মিথ্যে নয়? এসমস্তই মিথ্যে নয়?

শম্ভু

আমি মাসিমাকে ডেকে দিই।

[প্রস্থান

মাসির প্রবেশ

যতীন

আমি যে ম'রে যাইনি, তা কি ক'রে জান্‌ব, মাসি? হয়তো সবই উল্‌টে গেছে।

মাসি

ওকি বলছিল, যতীন?

যতীন

তুমি তো আমার মাসি?

মাসি

না তো কী, যতীন?

যতীন

হিমিকে ডেকে দাও না, সে আমার পাশে বসুক। সে যেন থাকে আমার কাছে। এখনি যেন কোথাও না যায়।

মাসি

আয় তো হিমি, এখানে বোস্ তো।

যতীন

ঐ বাঁশিটা থামিয়ে দাও না। ওটা কি গৃহপ্রবেশের জন্যে আনিয়েছ? ওর আর দরকার নেই।

মাসি

পাশের বাড়ীতে বিয়ে, ও বাঁশি সেইখানে বাজচে।

যতীন

বিয়ের বাঁশি? ওর মধ্যে অত কান্না কেন? বেহাগ বুঝি? তোমাকে কি আমার স্বপ্নের কথা বলেচি, মাসি?

মাসি

কোন্ স্বপ্ন?

যতীন

মণি যেন আমার ঘরে আসবার জন্যে দরজা ঠেলছিল। কোনোমতেই দরজা এতটুকুর বেশি ফাঁক হ'ল না। সে বাইরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগ্‌ল। কিছুতেই ঢুকতে পারলে না। অনেক ক'রে ডাকলুম, তার আর গৃহপ্রবেশ হ'ল না। হ'ল না, হ'ল না, হ'ল না। (মাসি নিরুত্তর) বুঝেছি মাসি, বুঝেছি, আমি দেউলে। একেবারে দেউলে। সব দিকে। এ বাড়িটাও নেই—সব বিক্রি হয়ে গেছে, কেবল নিজেকে ভোলাচ্ছিলুম।

মাসি

না, যতীন, না, শপথ ক'রে বলচি তোর বাড়ি ঠিক আছে—অখিল এসেছে, যদি বলিস তাকে ডেকে দিই।

যতীন

বাড়িটা তবে আছে? সে তো অপেক্ষা করতে পারবে, আমার মতো সে তো ছায়া নয়। বৎসরের পর বৎসর সে দরজা খুলে থাক্ না দাঁড়িয়ে। কি বলো মাসি?

মাসি

থাকবে বই কি যতীন, তোর ভালোবাসায় ভরা হয়ে থাকবে।

যতীন

ভাই হিমি, তুই থাকবি আমার ঘরটিতে। একদিন হয়তো সময় হবে, ঘরে প্রবেশ করবে। সেদিন যে-লোকেই থাকি, আমি জানতে পারব। হিমি, হিমি!

হিমি

কী, দাদা!

যতীন

তোর উপর ভার রইল, বোন। মনে আছে, কোন্ গানটা গাবি?

হিমি

আছে—"অগ্নিশিখা, এস এস।"

যতীন

লক্ষ্মী বোন আমার, কারো উপর রাগ করিসনে। সবাইকে ক্ষমা করিস। আর আমাকে যখন মনে করবি তখন মনে করিস "আমাকে দাদা চিরদিন ভালোবাসত, আজও ভালোবাসে।" জানো মাসি, আমার এই বাড়িতে হিমির বিয়ে হবে। আমাদের সেই পুরোনো দালানে, যেখানে আমার মায়ের বিয়ে হয়েছিল। সে দালানে আমি একটুও হাত দিইনি।

মাসি

তাই হবে, বাবা।

যতীন

মাসি আর-জন্মে তুমি আমার মেয়ে হয়ে জন্মাবে, তোমাকে বুকে ক'রে মানুষ করব।

মাসি

বলিস কি যতীন? আবার মেয়ে হয়ে জন্মাবো? না হয় তোরি কোলে ছেলে হয়েই জন্ম হবে। সেই কামনাই কর না।

যতীন

না, ছেলে না—ছিঃ! ছোটো বেলায় যেমন ছিলে, তেম্‌নি অপরূপ সুন্দরী হয়ে তুমি আমার ঘরে আসবে। আমি তোমাকে সাজাবো।

মাসি

আর বকিসনে, একটু ঘুমো।

যতীন

তোমার নাম দেবো লক্ষ্মীরাণী—

মাসি

ও তো একেলে নাম হ'ল না।

যতীন

না, একেলে না। তুমি চিরদিন আমার সাবেককেলে। সেই তোমার সুধায় ভরা সাবেককাল নিয়েই তুমি আমার ঘরে এসো।

মাসি

তোর ঘরে কন্যাদায়ের দুঃখ নিয়ে আসব, এ কামনা আমি তো করিনে।

যতীন

তুমি আমাকে দুর্ব্বল মনে করো, মাসি? দুঃখ থেকে বাঁচাতে চাও?

মাসি

বাছা, আমার যে মেয়েমানুষের মন, আমিই দুর্ব্বল। তাই তোকে বড়ো ভয়ে ভয়ে সকল দুঃখ থেকে চিরদিন বাঁচাতে চেয়েছি। কিন্তু আমার সাধ্য কী আছে? কিছুই করতে পারিনি।

যতীন

মাসি, একটা কথা গর্ব্ব ক'রে বলতে পারি। যা পাইনি তা নিয়ে কোনোদিন কাড়াকাড়ি করিনি। সমস্ত জীবন হাত জোড় ক'রে অপেক্ষাই করলুম। মিথ্যাকে চাইনি ব'লেই এত সবুর করতে হ'ল। সত্য হয়তো এবার দয়া করবেন।—ও কে ও, মাসি, ও কে?

মাসি

কই, কেউ তো না, যতীন।

যতীন

তুমি একবার ও ঘরটা দেখে এসগে, আমি যেন—

মাসি

না, বাছা, কাউকে দেখছিনে।

যতীন

আমি কিন্তু স্পষ্ট যেন—

মাসি

কিচ্ছু না, যতীন।

ডাক্তারের প্রবেশ

যতীন

ও কে ও? কোথা থেকে আসচ? কিছু খবর আছে?

মাসি

উনি ডাক্তার।

ডাক্তার

আপনি ওঁর কাছে থাকবেন না—আপনার সঙ্গে বড়ো বেশি কথা কন—

যতীন

না, মাসি, যেতে পাবে না।

মাসি

আচ্ছা, বাছা, আমি ঐ কোণটাতে গিয়ে বসচি।

যতীন

না, না, আমার পাশে বোসো, আমার হাত ধ'রে। ভগবান তোমার হাত থেকেই আমাকে নিজের হাতে নেবেন।

ডাক্তার

আচ্ছা, বেশ। কিন্তু কথা কবেন না। আর সেই ওষুধটা খাবার সময় হ'ল।

যতীন

সময় হ'ল? আবার ভোলাতে এসেছ? সময় পার হয়ে গেছে। মিথ্যে সান্ত্বনায় আমার দরকার নেই। বিদায় ক'রে দাও, সব বিদায় ক'রে দাও। মাসি, এখন আমার তুমি আছ—কোনো মিথ্যাকেই চাইনে। আয় ভাই হিমি, আমার পাশে বোস্।

ডাক্তার

এতটা উত্তেজনা ভালো হচ্চে না।

যতীন

তবে আমাকে আর উত্তেজিত কোরো না।

[ডাক্তারের প্রস্থান

ডাক্তার গেছে, এইবার আমার বিছানায় উঠে বসো, তোমার কোলে মাথা দিয়ে শুই।

মাসি

শোও, বাবা, একটু ঘুমোও।

যতীন

ঘুমোতে বোলো না, এখনো আমার আর-একটু জেগে থাকবার দরকার আছে। শুনতে পাচ্চ না? আসচে। এখনি আসবে। চোখের উপর কিরকম সব ঘোর হয়ে আসচে। গোধূলি লগ্ন, গোধূলি লগ্ন আমার। বাসর-ঘরের দরজা খুলবে। হিমি ততক্ষণ ঐ গানটা—"জীবন-মরণের সীমানা পারায়ে।"

(হিমির গান)

মাসি

বাবা, যতীন, একটু চেয়ে দেখ্। ঐ যে এসেচে।

যতীন

কে? স্বপ্ন?

মাসি

স্বপ্ন নয়, বাবা। মণি। ঐ যে তোমার শ্বশুর।

যতীন

(মণির দিকে চাহিয়া) তুমি কে?

মাসি

চিনতে পারচ না? ঐ তো তোমার মণি।

যতীন

দরজাটা কি সব খুলে গেছে?

মাসি

সব খুলেচে।

যতীন

কিন্তু পায়ের উপর ও শালটা নয়, ও শালটা নয়। সরিয়ে দাও, সরিয়ে দাও।

মাসি

শাল নয়, যতীন। বউ তোর পায়ের উপর পড়েছে। ওর মাথায় হাত রেখে একটু আশীর্ব্বাদ কর।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মা

শ্রী শান্তা দেবী

রোদ পড়িয়া আসিতেছে, তবু মাধবীর স্নান-আহার করিবার লক্ষণ নাই। গোয়ালাটা নীচে চীৎকার করিয়া-করিয়া কাহারও সাড়া না পাইয়া মুখ ধুইবার ঘটিতে দুধ মাপিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে, নর্দ্দমার পাশে তাহা আলগাই পড়িয়া রহিয়াছে। ঠিকা-ঝি বাসন-কয়খানা মাজিয়া জল তুলিয়া ডাকিয়া বলিল, "মা, উনানে কি আগুন দেব? বাবুর যে আস্‌বার সময় হ'ল, রান্না চাপাবে না?" মাধবী সাড়া দিল না। ঝি সুবিধা পাইয়া আর বেশী উচ্চবাচ্য না করিয়া মশলাটা না বাঁটিয়াই বাড়ী পলাইল। ভাঁড়ারের চাবি খোলা পড়িয়া আছে দেখিয়া সেই অবসরে একমুঠা বড়ি ও দুখানা পাটালিও কোঁচড়ে পুরিয়া লইল।

মাধবী জানালার ধারে বসিয়া রাস্তার দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। পথের ওপারের পুকুর-পাড়ে তখনও লোক-চলাচল বন্ধ হয় নাই। মুদি-বৌ ঘাটের সিঁড়ির উপর বসিয়া ক্ষার দিয়া তাহার রাঙা শাড়ীখানা আছ্‌ড়াইয়া-আছ্‌ড়াইয়া কাচিতেছে, দূর হইতে ভাল করিয়া তাহার মুখ দেখা যায় না, কিন্তু পিঠের উপর ঝুঁকিয়া-পড়া উলঙ্গ ছেলেটার কচি গড়নের একটা অস্পষ্ট আভাস ধরা যায়। পাড়ার কয়েকটা দুষ্ট ছেলে তখনও জলে পড়িয়া দাপাদাপি করিতেছিল, তাহাদের দৌরাত্ম্যে সমস্ত পুকুরটা তোলপাড় হইয়া উঠিতেছিল। মুদির ছেলেটা তাই দেখিয়া পাখীর-মত-গলায় হাসিয়া আকুল হইতেছিল। পথের ধারে ধোপাদের ছেলেরা পোষা পায়রাগুলিকে ধান ছড়াইয়া খাইতে দিতেছিল ও অনাহূত কাকের দলকে মহাকোলাহল করিয়া তাড়াইয়া দিতেছিল। পাঠশালা-ফেরত ছেলেরা বাঁ-হাতে বই-শ্লেট খাতা চাপিয়া ও ডান হাতে ঢিল ছোঁড়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে-করিতে বাড়ীর দিকে ছুটিয়াছিল। শক্তি-পরীক্ষার মীমাংসা করিতে গিয়া সেই সঙ্গে তুমুল কলহও বাধিয়া উঠিতেছিল। সমস্ত পাড়াটা যেন সেদিন শিশুদের কলকণ্ঠে মুখর হইয়া উঠিয়াছিল। মাধবী খানিকক্ষণ চাহিয়া-চাহিয়া দেখিয়া অশ্রুসিক্ত আঁচলে চোখ-মুখ আর একবার মুছিয়া বিছানার উপর ঘুমন্ত ছেলের মুখখানা বুকে চাপিয়া উপুড় হইয়া পড়িল। মায়ের চোখের জলে ছেলের মুখখানা ভাসিয়া গেল। ছেলে জাগিয়া উঠিয়া মায়ের ফোলা-ফোলা আরক্ত চোখ বিষাদ-ক্লিষ্ট মুখ ও অশ্রুর প্লাবন দেখিয়া দুই হাতে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া ফুঁপিয়া-ফুঁপিয়া কাঁদিয়া বলিল, "মা, বড্ড ভয়।" মাধবী খোকাকে কোলে তুলিয়া হাসিয়া আদর করিতে গিয়া আবার কাঁদিয়া ফেলিল। খোকা নিরুপায় হইয়া মাকে ক্রমাগত ঠেলা দিয়া-দিয়া গলা ছাড়িয়া কান্না জুড়িয়া দিল। ভয়ে-বিস্ময়ে তাহার মুখ শুকাইয়া উঠিয়াছিল।

মাধবী সবে খোকাকে সাম্‌লাইয়া লইয়া উঠিয়াছে, এমন সময় সিঁড়িতে দ্রুত পদধ্বনি শোনা গেল; গৃহকর্ত্তা মহিম বিরক্ত কর্কশ গলায় চীৎকার করিতে-করিতে উঠিতেছেন, "হ্যাগা, তোমার কি বুদ্ধিশুদ্ধি এজন্মে আর হবে না? বাইরের দরজাটা হাঁ ক'রে খোলা, ঘরে যে ডাকাত পড়েনি সেই ঢের; দুধের ঘটিতে মুখ দিয়ে বেরালে উঠান পর্য্যন্ত দুধের বাণ ডাকিয়ে দিয়েছে; আর তুমি এখানে বসে-বসে ছেলে নিয়ে সোহাগ কচ্ছ!"

এরকম কথার উত্তরে অন্যদিন হইলে মাধবী কি উত্তর দিত জানি না, কিন্তু আজ যাহা বলিল তাহা মোটেই অন্যান্য দিনের মত সুরে নয়। মাধবী ঝঙ্কার দিয়া বলিল, "বেশ করব ছেলে নিয়ে সোহাগ করব। জন্ম জন্ম তাই করব। কারুর কাছে ছেলে ধার করতে যাই নি ত!" স্বামী মহিম স্ত্রীর কথার সুরে একটু দমিয়া গিয়া নরম হইয়া বলিল, "আচ্ছা, তা তোমার যা মর্জ্জি তুমি তাই কর। ছেলেদের কি আজ ও-বাড়ী পাঠিয়েছিলে?"

মাধবী সংক্ষেপে বলিল, "হ্যাঁ"।

উৎসুক হইয়া মহিম বলিল, "বৌঠাকরুণ খোকনকে দেখে কি বল্লে ?"

মাধবী খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "খোকন অতখানি হাঁটতে পারে না ত! ওকে আমি পাঠাইনি। মেয়েরা গিয়েছিল আর বলাই গিয়েছিল।"

মহিম হঠাৎ রাগিয়া উঠিয়া বলিল, "দেখ, এই সব স্থাকামির আমি কোনো মানে বুঝ্তে পারি না। তারা ঝি পাঠালে, দরোয়ান পাঠালে, খোকনকে নিয়ে যেতে, খোকনকে হাঁটতে কে বলেছিল! আপনার লোক, দুপয়সা আছে, ছেলেগুলোকে যদি একটু সুনজরে দেখেই থাকে, কোথায় তুমি উদ্যোগ করে' পাঠাবে না আরো আটকে রেখে দিলে ?"

মাধবী বলিল, "হ্যাঁ সুনজর যে কত, তা' আমি বেশ-বুঝ্তে পেরেছি। তুমি আমাকে কতক্ষণ ভাঁড়াবে শুনি ? নিজের ছেলে বেচ্বার মতলবে নিজে গিয়ে ধন্না দিতে লজ্জা করে না তোমার ? আমার ছেলে আমি দেব না; তুমি কি করবে কর দেখি"।

মহিমের মুখখানা একমুহূর্ত্তে সাদা হইয়া গেল। এমন আচম্কা ধরা পড়িয়া যাইবে সে ভাবে নাই। ধীরে ধীরে জিনিষটাকে অনেকখানি অগ্রসর করিয়া লইয়া অর্থ-সম্পদের রূপে মাধবীর মনটা অনেকখানি ভিজাইয়া নিজের দুঃখ-দারিদ্র্যের বহু করুণ অভিনয়ের পালা গাহিয়া তবে সে আসল কথাটি পাড়িবে মনে করিয়াছিল। কিন্তু অকস্মাৎ দেখিল তাহার সে সব জল্পনা-কল্পনাই বৃথা হইয়া গিয়াছে। মহিমকে সুর একেবারে নামাইতে হইল। সে কাছে আসিয়া মাধবীর হাত ধরিয়া বলিল, "মাধু, এ তোমার অন্যায় রাগ নয় কি ? ঘরের ছেলে ঘরেই থাক্বে; মা'র কোল থেকে মামার কোলে যাওয়া কি আবার একটা ভাব্বার কথা! ভেবে দেখ দেখি একবার, তুমি ত ও-বাড়ীরই মেয়ে, ওদের যদি ছেলে-পিলে না থাকে, তবে তোমার ছেলেরই ত সব পাবার কথা। বাপের ধন মেয়ে পাবে তাতে ত গোল-মাল কোথাও নেই।" মাধবী অভিমানের সুরে বলিল, "বাপ যে ধন আমা'য় মেয়ে বলে দিতে পারেন-নি, আজ তাঁর পৌত্তুর নেই বলে' হ্যাংলার মত সেই ধন-দৌলত কুড়োতে যেতে আমার বয়ে গেছে। তাও আবার ছেলে বেচে। তাদের কেউ না থাকে, তারা যেন যক্ষির ধন করে যখ হয়ে আগ্লায়। ওসব কসাইপনা আমাকে দিয়ে হবে না।"

আজ সাত বৎসর আগেকার কথা মাধবীর মনে পড়িয়া গেল। তাহারা দুইটি ভাইবোন ছিল বাপ-মায়ের সম্বল। সংসারে টাকাকড়ির অভাব ত ছিলই না, বরং প্রাচুর্য্যই ছিল। সকল বিষয়ে তাহারা দুই ভাইবোনে সমান তালে চলিত। হৃষীকেশ ও মাধবী একই শিক্ষকের কাছে একভাবে লেখাপড়া করিত, এক গাড়ীতে রোজ সন্ধ্যায় হাওয়া খাইতে যাইত, বায়োস্কোপ, থিয়েটার, ফুটবল-ম্যাচ ইত্যাদি যাহা কিছু হৃষীকেশ দেখিতে যাইত, মাধবীও যে তাহা দেখিতে যাইবে—ইহাই যেন ছিল বাড়ীর বাঁধা আইন। হৃষীকেশের বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে ছেলেবেলা হইতে বন্ধুর মত মেলামেশায় সে কখনও কোনো সঙ্কোচ অনুভব করে নাই। কিন্তু একদিন তাহার দাদারই পুরাতন বন্ধু এই মহিম তাহার মনে লজ্জার বীজ বপন করিয়া দিল। সে অকস্মাৎ একদিন বুঝিল, মহিম তাহাকে ঠিক আর পাঁচজন ছেলের মত দেখে না, তাহার দৃষ্টিতে বিশেষত্ব আছে, কথায় নূতনত্ব আছে, তাহার নীরবতারও অর্থ আছে। আজন্ম তাহাকে অনেকে অনেক আনন্দের খোরাক জোগাইয়াছে, অনেক ধন-ঐশ্বর্য্য তাহার সুখ-সমৃদ্ধির জন্ত উজাড় করিয়া ঢালা হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে ত কোনোদিন তাহাকে এমন আনন্দ দিতে পারে নাই, যেমন অহেতুক আনন্দ দিয়াছিল মহিমের দৃষ্টিটুকু মাত্র। মাধবীর আজ চোখের জলে মনে পড়িয়া গেল সেই দিনের কথা, যেদিন সে বর্ত্তমান-ভবিষ্যৎ ভুলিয়া এই ধন-মানহীন সাথীটির সঙ্গে আপনার ভাগ্যকে চিরদিনের জন্ত নির্ভয়ে সানন্দে বাঁধিয়াছিল। বাপ-মা, ভাই, সকলে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল মহিমের স্পর্দ্ধা দেখিয়া। অবজ্ঞা-ভরে তাহাকে তাহারা বিদায় করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু তাহারই আত্মীয় স্বজনের ধনদর্পে-আহত মহিমের অপমান-ক্লিষ্ট মুখ দেখিয়া মাধবীর সমস্ত মনটা গর্জ্জিয়া উঠিয়াছিল। জীবনে প্রথম বসন্ত-সমীরণকে যে আহ্বান করিয়া আনিয়াছিল, সেই মানুষটিকে সোনারূপার পাঁজার তলায়

চাপা দিয়া আপনার যৌবনকে অপমান করিতে সে পারে নাই।

মাধবী যেদিন পিতৃগৃহ ছাড়িয়া আসে, সেদিনকার সে-প্রতিজ্ঞার কথা সে এত শীঘ্র ত ভুলিতে পারে নাই। মা-বাপকে মুখের উপর বলা যায় না, কিন্তু তবু একথা সে তাঁহাদের জানিতে দিয়া আসিয়াছিল যে, এই যে আজ বিদায় লইতেছে ইহাই তাহার অগস্ত্য-যাত্রা; জীবনে এ গৃহে সে আর ফিরিবে না! মহিমের মুখ আনন্দে-গর্ব্বে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। হরিণ-হরিণীর মত বসন্তের নেশায় মাতিয়া তাহারা নিরুদ্দেশ যাত্রায় বাহির হইয়া পড়িল। মনে করিয়াছিল, সংসারের কৃত্রিম জটিলতার জাল বুঝি তাহারা ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে।

সে বেশী দিনের কথা নয়। কিন্তু আজ মনে হয় তাহা যেন কোন সুদূর অতীতের কোন বহু কালগত যৌবনের উদ্দাম চঞ্চল অভিনয়। শূন্য গৃহে শূন্যহাতে নিঃস্ব নিরবলম্ব দুটি প্রাণী সংসার পাতিয়াছিল। অভাব ছিল তাহাদের একটা পরিহাসের বিষয়, অনটন ছিল একটা খেলা। পরস্পরের জন্য ত্যাগ স্বীকার করাই ছিল জীবনের মহা-আনন্দ। তখন পরস্পরই যে পরস্পরের প্রাণপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল, তাই সংসারের এই সব তুচ্ছ ধনমানের বাধা-বিপত্তিকে তাহারা এমন অনায়াসে হাসিয়া উড়াইয়াছিল; সংসারের দশজনের মত তাহারা যে এই তুচ্ছতার জালে বাঁধা পড়িয়া প্রাণকে বঞ্চিত করে নাই এই গর্ব্বে সংসারকে তাহারা অত্যন্ত কৃপার চক্ষে দেখিত। তাহারা মনে করিয়াছিল, এমনি জয়গর্ব্বে বিশ্বকে উপহাস করিয়াই বুঝি তাহারা দিনগুলা কাটাইয়া দিতে পারিবে।

কিন্তু সে কল্পনা তাহাদের তিলে-তিলে বাস্তবের চাপে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। মাধবী তাহার ক্ষুদ্র গৃহখানি আপনার স্বপ্ন-কল্পনা ও মনের মাধুর্য্য দিয়া গড়িতেছিল। আশাপথ চাহিয়া সে বসিয়া থাকিত যে, দিনান্তে এই নীড়ে ফিরিয়া তাহার কর্ম্মক্লান্ত সাথী সব ক্লান্তি ভুলিয়া যাইবে, আদরে-সোহাগে সে তাহাকে ভরপুর করিয়া তুলিবে। বাহিরের বিশ্বের সহিত তাহার কোনো সম্পর্ক ছিল না, বাহিরের গ্লানি যে মানুষের মনকে কতখানি কলুষিত করিতে পারে, ছোট-বড় কত সংঘাতের ভিতর পড়িয়া মানুষের মন যে সুখশান্তি হারাইয়া ঘুরিয়া মরিতে পারে তাহা সে বুঝিত না। তাই তাহার চক্ষের মোহের অঞ্জন যখন একটুকুও কাটে নাই, তখনই সে ব্যথিত বিস্ময়ের সহিত আবিষ্কার করিতে লাগিল, যে স্বামীর দেহের ক্লান্তি সেবায় ঘুচাইয়া দিয়াও মনের অবসাদ সে দূর করিতে পারে না; সেখানে সে আর আগের মত তল পায় না। মাধবী ঘরদো'র মাজিয়া উজ্জ্বল করিয়া তুলিত, জীর্ণ বস্ত্র নূতন রঙে রঞ্জিত করিয়া পরিত, যখন তখন মহিমকে বাহুলতায় বাঁধিয়া ভবিষ্যতের যত আকাশ-কুসুমের গল্প ফাঁদিত, অতীতের সুখসম্ভার ঘুরাইয়া-ঘুরাইয়া নানাভাবে তাহার চোখের সামনে ধরিতে চেষ্টা করিত, অপটু হাতের সেবায় তাহাকে কচি ছেলের মত যত্ন করিতে গিয়া উদ্বাস্ত করিয়া তুলিত, সামান্য ভাণ্ডার ওলোটপালোট করিয়া নিত্য নূতন আহার্য্যের আমদানি করিতে চাহিত, তাহার পর আর কি উপায়ে স্বামীকে ভালবাসার উপহার দেওয়া যায় ভাবিয়া সমস্ত দুপুর ধরিয়া নূতন-নূতন কল্পনা লইয়া মাতিয়া থাকিত; কিন্তু তবু দেখিত তাহার ভালবাসার ভাণ্ডারে কি-একটা বড় জিনিসের অভাব হইয়াছে। যাহার সন্ধানে ছুটিয়া-ছুটিয়া এসব আদর-সোহাগকে মহিম ছেলে-খেলার মত উপেক্ষা করিয়া চলিতেছে।

হয় ত মাধবী যখন তাহার প্রসাধনের দিকে মহিমের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হাসিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, মহিম অন্যমনস্কের মত বলিয়া বসিত, "দেশের ওরা বৌ দেখ্‌তে চাইছে, বিয়ের সময় কোনো তত্ত্ব-তল্লাস করিনি বলে' সবাই রাগারাগি কর্‌ছে, বল্‌ছে বড় মানুষের বাড়ী বিয়ে করে' ঘরের লোককে ভুলে গেল; আমি যে তাদের কি বলি তার ঠিক নেই! সত্যি বড় লজ্জায় পড়্‌তে হয়।" মাধবী আড়ষ্ট হইয়া যাইত, সে যে সঙ্গে কিছুই আনে নাই, এ-লজ্জা তাহাকেও আঘাত করিত; কিন্তু কেন যে আনে নাই, কাহার জন্য যে আনিতে পারে নাই স্বামীকে কঠিন হইয়া তাহা বলিতে পারিত না। অথচ স্বামীর কথার সুরে মনে হইত শূন্যহাতে আসার জন্য সে যেন তাহাকেই অপরাধী করিতেছে।

কোনো দিন বা মাধবী গর্ব্বিতমুখে তাহার গৃহিণী-

পনার খবর দিয়া স্বামীকে খুসী করিয়া দিতে আসিয়া শুনিত মহিম বলিতেছে, "এবার দেখ্‌ছি দেশত্যাগী না হয়ে উপায় নেই। যা'র তা'র সামনে এই ছেঁড়া চটি পায়ে তোমার বাপ-ভায়ের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, তখন কথা না বলেও উপায় থাকে না, অথচ এমন করে' তাঁদের সামনে আত্মীয় সেজে বেরোনোও এক পরীক্ষা। আমার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, কিন্তু তাঁদেরও যে আমাকে জামাই বলে' পরিচয় দেওয়ার লজ্জায় পড়্‌তে হয় এবড় জ্বালাতন।" তাহার বাপ-ভাই-সম্বন্ধে স্বামীর এরকম দরদ মাধবীর বিস্ময়কর লাগিত, কিন্তু তাহাতে সে খুসী হইতে পারিত না। বুঝিত প্রেমের নেশা কাটিয়া সংসারের সেই তুচ্ছ খ্যাতি-প্রতিপত্তির পীড়াই স্বামীকে পাইয়া বসিয়াছে।

তাহার পর আসিয়া পড়িল পুত্র-কন্যার ভাবনা। তাহারা কি খায়, কি পরে, লোকের সামনে দীনহীনের মত কি করিয়াই বা বাহির হয় এই সকল চিন্তাও পীড়া-দায়ক হইয়া উঠিল। মাধবীকে ইহা যত না পীড়া দিত, তাহার চেয়ে অনেক বেশী পীড়া দিত মহিমকে। মাধবীর কষ্ট-স্বীকারের মধ্যে একটা গর্ব্ব ছিল যে, সে স্বেচ্ছায় এই দুঃখ বরণ করিয়াছে, কিন্তু মহিম যে আপনার অক্ষমতার জন্য অথবা অর্থাভাবে ধনীর আত্মীয় হইয়াও এই দীনতাকে স্বীকার করিতে বাধ্য হইত, ইহা তাহাকে সর্ব্বদাই যন্ত্রণা দিত।

মাধবীর যখন দুইটি মেয়ে হইয়াছে, তখন মাধবীর পিতার কঠিন পীড়া হইল। শেষ সময়ে সকল অপমান ও অভিমান ভুলিয়া তিনি কন্যাকে দেখিতে চাহিলেন। মাধবীকে যাইতে হইল, এত দিনের স্নেহের মায়া কাটাইতে পারিল না, কিন্তু মনে তখনও তাহার দুর্জ্জয় অভিমান। সে পিতাকে দেখিয়াই চলিয়া আসিতে চায়; মহিম হঠাৎ বলিয়া বসিল, "দেখা-শুনার জন্যে ঘরের লোকের কাছে থাকাই ভাল। বাড়ীতে দুদিন না গেলে ক্ষতি কি? আমরা এখানেই থাক্‌ছি আপনি ভাববেন না। আপনি ভাল হয়ে উঠুন তারপর যাওয়ার কথা।" মাধবী একবার তীব্রদৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, মহিম তাড়াতাড়ি চোখ নামাইয়া লইল। মাধবী মেয়ে হইয়া মহিমের প্রস্তাবে আপত্তি করিতে পারিল না, সেই খানেই থাকিয়া গেল। কিন্তু পাছে কেবল এই কারণে তাহার পিতার মন তাহার দুঃখে ব্যথিত হয় ইহা ছিল তাহার বিষম ভয়।

মাধবী ঔষধ-পথ্য লইয়া সারাদিনই পিতার ঘরে যাওয়া-আসা করিত। কিন্তু সেখানে নিশ্চিন্তমনে তাহার কাজ করিবার উপায় ছিল না। তাহাকে ঘরে ঢুকিতে দেখিলেই একদিক হইতে মহিম আসিয়া তাহাকে ভাল করিয়া কাজ করার জন্য উপদেশ দিত ও নিজে তৎপর হইয়া কাজে সাহায্য করিতে আসিত, অন্যদিকে ছিল তাহার ভ্রাতৃবধূ। সে মাধবীকে দেখিবামাত্র বলিত, "ঠাকুর-ঝি, তুমি কেন এখানে ভাই! কচি ছেলের মা, তোমার মেয়ে কাঁদ্‌ছে দেখ গে।" মহিম যেন কোনো-প্রকারে মাধবীকে ধরিয়া পিতার ঘরে বাঁধিয়া রাখিতে পারিলে বাঁচে, আর বধূ বাঁচে তাহাকে বিদায় করিয়া দিতে পারিলে।

ইহারই মধ্যে বৃদ্ধ একদিন মাধবীকে আপনা হইতে বলিলেন, "মাধু, তোর বিয়ের সময়ের জিনিষপত্র ত কিছুই হয়-নি; আমি শুয়ে পড়ে' আছি, কিছু যে করাব তার জো নেই। হৃষীকেশকে বল্‌ছি ওগুলো এই বেলা করিয়ে দিক, আমি যাবার আগে তবু দেখে যেতে পারব।" ঘরে মহিম ছিল, হৃষীকেশের স্ত্রীও ছিল, তাহারা দুইজনেই উৎকর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু মাধবী কথা বেশী অগ্রসর হইতে না দিয়া বলিল, "বাবা, এই কি আমার জিনিষ-পত্র কর্‌বার সময়, না দাদারই তেমন মনের অবস্থা; ও পরে হবে এখন। তুমি আগে সেরে ওঠ।"

বধূও তাড়াতাড়ি বলিল, "সত্যি, আপনি এখন ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। ঠাকুর-ঝি ঠিক্‌ই বলেছে।" কেবল মহিম মুখখানা বিরক্ত করিয়া নীরব হইয়া রহিল।

হঠাৎ একদিন মাধবীর পিতার মৃত্যু হইল। তাহার জন্য কোনো ব্যবস্থা করার অবসর আর হয় নাই। মাধবীর যেন তাহাতে কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়াই বাড়ী ফিরিয়া আসিল। হৃষীকেশের স্ত্রীও মাধবীর উপর প্রসন্ন হইয়া ননদ-নন্দাই ও ভাগ্নে-ভাগ্নীদের নূতন কাপড়-জামা দিয়া ভালমন্দ দুইটা জিনিষ সঙ্গে দিয়া তাহাদের গাড়ীতে

তুলিয়া দিল। মহিম গাড়ীতে উঠিয়া স্ত্রীকে বলিল, "আর দু' চার দিন থেকে গেলে হ'ত না? এ-বাড়ীর সকলের মনটা ঠাণ্ডা হ'লে একেবারে সব ব্যবস্থা ক'রে-টরে গেলেই ভাল হ'ত।" কিসের যে ব্যবস্থা মহিম তাহা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না, মাধবী বুঝিয়াও যেন না বুঝিয়া বলিল, "ওদের ব্যবস্থা ওরাই করবে। বাইরে থেকে এসে আমরা কেন হাত দিতে গেলাম তাতে?"

মহিম তখন কিছু বলিল না, কিন্তু এই নূতন পরিচয়ের সুযোগে সে শ্বশুর বাড়ীর সহিত সম্পর্কটা বেশ পাকা-রকমে ঝালাইয়া লইতে লাগিল। মাধবী ঘর-সংসার, ছেলে-মেয়ের ওজর লইয়া কালে-ভদ্রে কখনও সেখানে যাইত কিনা সন্দেহ, কিন্তু মহিম নিত্যনৈমিত্তিক সব ব্যাপারে খোঁজ-খবর লওয়া একটা নিয়ম করিয়া ফেলিল। শ্বশুর যে তাহাদের সম্পর্কটা ভালভাবেই মানিয়া লইয়াছেন, ইহা নানা কথার ভিতর দিয়া যখন-তখন তাহাদের স্মরণ করাইয়া দিতে সে ভুলিত না।

এই যাওয়া-আসা খোঁজ-খবর লওয়ার ফল যে এমন রূপ ধারণ করিয়াছে, মাধবী তাহা অকস্মাৎ আবিষ্কার করিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহার আহার-নিদ্রা ঘুচিয়া গেল। কি করিয়া খোকনকে রক্ষা করিবে এই হইল তাহার একমাত্র চিন্তা। দেড় বছরের কচি ছেলে, ও যে মাকে ছাড়িয়া এক রাতও কাহারও কাছে থাকে নাই, রাত্রে ঘুমের ঘোরে পাশের বালিশ ঠেলিয়া সে যে ছোট-ছোট হাত দুটি দিয়া খুঁজিয়া-খুঁজিয়া গড়াইয়া আসিয়া মায়ের কোলের ভিতর আশ্রয় লয়। খোকার নধর দেহখানির স্পর্শ না পাইলে মাধবীর ঘুম তখনই ছুটিয়া যায়। ভয়ে সারারাত তাহার বুকের উপর মাধবী একখানা হাত দিয়া রাখে। তাহার ঘুমন্ত দেহমনের মধ্যেও খোকার প্রতি দৃষ্টিটি চিরজাগরুক থাকে। নিদ্রাচ্ছন্ন চোখ যখন কিছু দেখে না, তখনও হাতের সাড় যেন জাগিয়া বসিয়া খোকার প্রত্যেকটি নড়াচড়া তদারক করে। দিনের বেলা খোকা ঘুমাইয়া পড়িলে মনে হয় ঘর যেন শূন্য, অবসরের সময় খোকাকে কোলে না পাইলে মনে হয় শরীরের একখানা অঙ্গ যেন কোথায় হারাইয়া গিয়াছে, হাত দুখানা যেন অনাবশ্যক বোঝার মত ঝুলিতেছে, তাহাদের এমন অকারণ পড়িয়া থাকার কোনোই অর্থ নাই।

এই যে খোকা তাহার জাগ্রত ও নিদ্রিত চৈতন্যকে এমন করিয়া ঘিরিয়া রাখিয়াছে, তাহাকে কোলছাড়া করিয়া পরের কাছে সে কি করিয়া পাঠাইয়া দিবে? বাহিরের সংসার স্বামীকে তাহার নিকট হইতে গ্রাস করিয়া লইয়াছে, এখন ইহারাই ত তাহার সম্বল, তাহার জীবনধারণের লক্ষ্য।

সারাদিন মাধবী এই কথা ভাবিয়াছে। ঘরে-বাহিরে, পথে, পুকুর-ঘাটে যত শিশুর হাসি-খেলা আজ যেন, তাহারই খোকার শতরূপে ফুটিয়া উঠিতেছিল। মুদির ছেলের কলকণ্ঠ যেন মনের দরজায় ঘা দিয়া বলিতেছিল, "তোর খোকা তোর গায়ের উপর পড়ে' অমন করে' আর হাসবে না।" পথের ছেলের দস্যি-পনাও মনে আনিয়া দিতেছিল সেই অচির ভবিষ্যতের কথা, যখন খোকা এমনি দুর্দান্ত দস্যি হইয়া উঠিবে, কিন্তু আদরে-ভৎসনায় খোকার সে দুরন্তপনাকে সে পৌরুষে গড়িয়া তুলিতে পাইবে না।

মহিম অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিল, কাজেই হঠাৎ ধরা পড়িয়া যাওয়ায় অসুবিধায় পড়িলেও সে চেষ্টা ছাড়িতে পারিল না। নরম হইয়া যখন কোনো লাভ হইল না, তখন তাহাকে কঠিন হইতে হইল। মহিম বলিল, "দেখ, ওসব কবিয়ানার বয়স এ নয়; সে যখন ছিল তখন অনেক করেছি। তোমার জন্যে এক কপর্দ্দকের আশাও ছেড়ে পথে বেরিয়েছিলাম, কিন্তু ফলে পেলাম কি? সংসারে টাকা না থাকলে মান নেই মর্য্যাদা নেই, মানুষ বলেই কেউ মনে করে না, বিশ্বের উচ্ছিষ্ট পাত চেটে কোনোরকমে ধড়ে প্রাণটা ধরে' রাখা। নিজের জীবনটা ত এই করে'ই কাটল, ছেলেগুলোকে যদি একটু বাঁচাবার ব্যবস্থা করে' দিতে পারি তবে তা করব না কেন? অত যে বড় মুখ করে কথা বলছ, আমি না থাকলে ছেলেকে খেতে দিতে পারবে?"

মাধবী বলিল, "একটা ছেলে বেচে তুমি আর কটার ব্যবস্থা করবে? এই কি তোমার পৌরুষ নাকি?"

মহিম শ্লেষের সুরে বলিল, "তোমার সতীযুগের

যুক্তি আর এ যুগে চলে না। এ-যুগের পৌরুষ পকেটকাটার পৌরুষ। ছেলে-বেচা আবার কিসের? ফাঁকি দিয়ে আমি তাকে রাজা করে' দিচ্ছি, এ ত তা'র উপকার করা এই ফাঁকি বিদ্যাই ত ভদ্র ভাষায় পৌরুষ।"

মাধবী না পারিয়া বলিল, "কিন্তু খোকনকে দিয়ে আমি বাঁচব কি করে'? ওকে নিয়ে আমি ভিক্ষে করে' খাব। তোমাকে ওর ব্যবস্থা করতে হবে না আমি কথা দিচ্ছি।"

মহিম হাসিয়া বলিল, "ছেলের জন্যে যদি এইটুকু ত্যাগ-স্বীকার না করতে পার, তবে তুমি কিসের মা? তোমার ও কান্না ত' স্বার্থপরের কান্না। যে রাজা হ'তে পারে, তোমার একটা দুর্ব্বলতার জন্যে তুমি তাকে ভিখারী করবে? বড় হয়ে সে ছেলে তোমায় বল্‌বে কি? এই কি তোমার ভালবাসা?"

মাধবী চুপ হইয়া গেল। খানিকক্ষণ পরে বলিল, "তুমি সত্যি বল্‌ছ এ স্বার্থপরতা?" তাহার চোখে জল আসিল। সত্যই ত ছেলেকে যে খাইতে দিতে পারিবে না, নিজের সুখের জন্য, আনন্দের জন্য সে শিশুকে এত বড় সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত করিবার তাহার কি অধিকার আছে? তাহার এমন ধন নাই, বিদ্যা নাই, সামর্থ্য নাই যে, সে মাথা খাড়া করিয়া বলে, "তুমি ছেলেকে খেতে দিতে না পার আমি দেব, আমি মানুষ করব।" ছেলে কোলে করিয়া স্বামীর দরজা ছাড়িয়া গিয়া দাঁড়াইবারও ত তাহার স্থান নাই! কোথায় বাছাকে লইয়া পলাইবে? পথে পা দিলে তাহাকে ত দাঁড়াইয়া মরিতে হইবে। ভিক্ষা করিতে হইলে ত তাহারই দরজায় করিতে হইবে, যে তাহার ছেলেকে ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে যাচিয়া বসাইতে চাহিতেছে।

মাধবী খোকাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া চুম্বনে চুম্বনে তাহাকে ছাইয়া দিল। হায় ভগবান্! তাহার এ বুক-জোড়া হাহাকারের নাম স্বার্থপরতা, তবে জগতে ভালবাসা কি?

মাধবী হঠাৎ স্বামীর হাত ধরিয়া বলিল, "হ্যাঁ গা, তুমি ত খোকাকে সত্যি সত্যি ভালবাস?"

মহিম বলিল, "বাসি বই কি। তা আবার জিজ্ঞেস কর্‌ছ কেন?"

মাধবী ম্লান হাসিয়া বলিল, "আমাকে ভালবাস এখনও?"

স্ত্রীর মুখে বহুদিন পরে এ-কথা শুনিয়া মহিমের মনটা হঠাৎ যেন ভিজিয়া উঠিল। সে তাহার শিরশ্চুম্বন করিয়া বলিল, "মাধু, দুঃখ অনেক দিয়েছি বলে কি এমন সন্দেহও কর্‌তে হয়?"

মাধবী বলিল, "না আর সন্দেহ কর্‌ব না। কিন্তু আমার একটা কথা তোমায় রাখ্‌তে হবে। তুমি আমার গায়ে হাত দিয়ে খোকার মাথায় হাত দিয়ে বল কথা রাখ্‌বে, তবে আমি খোকাকে তার মামার হাতেই সঁপে দেব।"

মহিম বলিল, "কি কথা আগে বল, তবে ত বল্‌তে পারি রাখ্‌ব কি না রাখ্‌ব।"

মাধবী বলিল, "কোনো এমন শক্ত কথা নয়; খোকার সুখে-সৌভাগ্যে আমি বাধা দেব না, তোমার ভয় নেই।"

স্ত্রী-পুত্রকে স্পর্শ করিয়া মহিম বলিল, "রাখ্‌ব। বল কি কথা?'

মাধবী বলিল, "কাল বল্‌ব, আজ থাক্।"

রাত্রে মাধবী খোকাকে লইয়া পাশের ঘরে নিজের আলাদা বিছানা পাতিল। বাকী ছেলেমেয়েদের বিছানা মহিমের ঘরে পাতিয়া দিল। বড় ছেলেমেয়েরা জিজ্ঞাসা করিল, "মা, তুমি কেন পাশের ঘরে শোবে?" মা একে-একে তিনজনের মুখ-চুম্বন করিয়া বলিল, "খোকা-ভাইকে তার নূতন মা নিয়ে যাবে, তাই আজ তাকে একলা আমার কাছে রাখ্‌ছি। আর ত খোকন আমার কাছে শুতে পাবে না।"

বিস্মিত শিশুরা মাকে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "মা, তুমি বড় দুষ্টু! হ্যাঁ, খোকার বুঝি আবার নূতন মা থাকে? তুমিই ত খোকনের মা।"

মাধবী বলিল, "না বাবা, ভগবান খোকনকে আমার কাছে ভুল করে' পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, আমি খোকনের মা নই। তার মা অন্য বাড়ীতে আছে। সে বলেছে

খোকনকে নিয়ে যাবে।" বড় খুকী বলিল, "আমি তাকে মারব। আমার ভাইকে দেব না। দরজায় ইট নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব। এলেই এমন মারব যে মাথা ফেটে যাবে।"

ছোট খুকী বলিল, "বাবার গায়ে অনেক জোর আছে। মা, তুমি বড় বোকা, বাবাকে বলে দাও না, তাহ'লে কেউ খোকনকে নিতে পারবে না।"

মাধবী ছেলে-মেয়েদের কথার উত্তর কি দিবে বুঝিতে না পারিয়া বলিল, "না সোনা, তাকে মারতে হবে না; সে খোকনকে খুব আদর করবে; চল, এখন ঘুমোই গিয়ে।" সবকটি শিশুকে একে-একে ঘুম পাড়াইয়া মাধবী স্বামীকে গিয়া বলিল, "তুমি এদের দেখো। আমি আজ খোকনকে নিয়ে একলা থাকতে চাই।"

ছেলেকে বুকে চাপিয়া শুইয়া শুইয়া মাধবী ভাবিতে লাগিল, খোকাকে ছাড়িয়া সে কেমন করিয়া বাঁচিবে? খোকার সঙ্গে দাসী হইয়া গেলে হয় না! কিন্তু নিজের ভায়ের বাড়ী তাহাকে কে দাসী করিয়া রাখিবে! সকলেই ভাবিবে ছেলে দিয়া সুখ-ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেই সে তাহার পিছন-পিছন আসিয়াছে। তা' ছাড়া দিনের পর দিন নিজের ছেলেকে পরের বলিয়া ঘোষণা করার লজ্জা বিশ্বের কাছে সে কি করিয়া স্বীকার করিবে? ঘটা করিয়া সংসারকে জানাইয়া তাহার সন্তানকে একজন আপনার বলিয়া দাবী করিবার অধিকার লইবে, আর সেই সংসারেরই আশে-পাশে তাহাকে বিচরণ করিতে হইবে' মিথ্যা একটা অভিনয়কে আজীবন সম্ভ্রম দেখাইয়া। তাহার সন্তানকে আদর সোহাগ যদিই বা সে করিতে পায় তাও হৃদয় দিয়া নয় একটা মুখোসের আড়াল হইতে। আর তার চেয়ে বড় সন্তানের ভাল মন্দ, সে সম্বন্ধে ত তাহার কোনো হাতই থাকিবে না। ছেলেকে সে ত আপনার আদর-আব্দারের ক্ষুধা মিটাইবার একটা পুতুল বলিয়া কিনিয়া আনে নাই। তাহার রক্ত-মাংসে গড়া এই শিশুকে সে কেমন করিয়া কেবল সাজানো পুতুলের মত দূর হইতে দেখিয়া চুপ করিয়া থাকিবে? সন্তানের প্রতি পাদক্ষেপে যে তাহার শিরায়-শিরায় নাড়ীতে-নাড়ীতে টান পড়িবে।

তাহার স্বামীর সঙ্গে একদিন সগর্ব্বে সে যে গৃহ ছাড়িয়া আসিয়াছিল, সে গৃহে সে নিজে যদি ফিরিয়া যায় ত তাহার তত লজ্জা নাই; কিন্তু মাথা উঁচু করিয়া সে যাহার হাত ধরিয়া বাহির হইয়াছিল সে যে তাহাকে আপনার পৌরুষ দিয়া এ লজ্জার হাত হইতে বাঁচাইতে পারিল না, দুঃখের ভয়ে অপমানকে মানিয়া লইল, স্বামীর এ পরাজয় সে কেমন করিয়া সহ্য করিবে?

তারপর এই শিশু যখন বড় হইয়া পিতামাতার কথা জানিবে, তখন যদি সে ধনগর্ব্বে মত্ত হয়, তবে দরিদ্র আত্মীয়কে ত মাটির চেয়েও নীচু ভাবিয়া কৃপার চক্ষে দেখিবে; আর যদি তাহার মধ্যে মাতৃরক্তধারা কিছুমাত্র আত্মমর্য্যাদা দিয়া থাকে, তবে সে কি তাহার মাকে ক্ষমা করিবে, সে কি বিস্মৃত মাতৃক্রোড়টুকু মনে করিয়া চিরদিন মনে মনে তাহাকে ধিক্কার দিবে না?

আর যদি সে আজ দারিদ্র্যকে ভিখারিণীর মত বরণ করিয়া লয় তবে ভিখারীর পুত্র ভবিষ্যতে যখন সমস্ত বিশ্বের কাছে লাঞ্ছিত হইবে, তখন মা হইয়া তাহার সৌভাগ্যে এমন করিয়া বাদ-সাধার জন্য কি সে মাকে অভিশাপ দিবে না? কে জানে? মাধবী ভাবিয়া কুল পাইতেছিল না। স্বামীর এই সুবিধাবাদ কিছুতেই তাহাকে ধনের কাছে মাথা হেঁট করাইতে পারিতেছিল না। তাহাও যদি সে-ধনে ধনীর কিছু কৃতিত্ব থাকে! তাহারই পিতার সম্পদ যাহা দৈবক্রমে পুত্র হইয়া জন্মিলে তাহারও হইতে পারিত, কন্যা হইয়া জন্মানোর অপরাধে কিনা মান-মর্য্যাদা বিকাইয়া তাহাকে ভিক্ষা মাগিয়া লইতে হইবে!

কিন্তু ভাবিয়া কি ফল? যে সন্তানকে সে রক্ষা করিতে পারিবে না, সংসারে তাহাকে আনাই আজ তাহার অপরাধ মনে হইতেছিল। ছাড়িয়াই দিবে সে যেমন করিয়াই হউক। সে ত ধাত্রী মাত্র; যে তাহার পালয়িতা পিতা, সে যদি মার বুক হইতে ছিনাইয়া লইয়া তাহাকে বিলাইয়াই দেয়, তবে তাহাই হউক। মাধবী কোন কথা বলিবে না।

* * * *

ভোরবেলা খোকা কাঁদিয়া উঠিতেই মহিমের ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে ব্যস্ত হইয়া জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, খোকা তাহারই পাশে শুইয়া আছে। মহিম হাসিল,ভাবিল কাল মাধবীর অভিমান হইয়াছিল, কিন্তু রাত্রে বিশ্রাম পাইয়া মাথা ঠাণ্ডা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার সে অভিমান ভাঙিয়া গিয়াছে। প্রতিদিনের মতই খোকাকে তাহার পাশে রাখিয়া মাধবী নীচে কাজে নামিয়া গিয়াছে।

মহিমের মনটা নরম হইল। সে বড় মেয়ের কাছে খোকাকে রাখিয়া মাধবীর সন্ধানে চলিল, দুটা মিষ্ট কথা বলিবে বলিয়া। নীচে গিয়া দেখিল মাধবী নাই, মহিম বিস্মিত হইয়া ডাকাডাকি করিল, কেহ সাড়া দিল না। উপরে উঠিয়া পাশের ঘরে গিয়া দেখিল শূন্য শয্যায় কেহ নাই, শুধু একখানা খোলা চিঠি পড়িয়া আছে।

মহিম পড়িল, "আমি চল্লাম। পৃথিবীতে যাদের এনেছিলাম, তাদের আশ্রয় দিতে পারলাম না, এ-লজ্জা নিয়ে সংসারে মুখ দেখাতে চাই না।

"তুমি ব'লেছিলে এখনও আমাকে ভালবাস, তাই তোমাকে আমার শেষ অনুরোধটি রাখ্‌তে বলে যাচ্ছি, আমার ছেলেমেয়েদের কাছে আমার পরিচয় কখনও দিও না। খোকাকে বুঝ্‌তে দিও, সে তার নূতন-মায়েরই সন্তান। আমি যে কার মেয়ে, কার বোন, একথা তাকে জানতে দিও না। তুমি ত বলেছিলে কেবল খোকার ভালর জন্যেই তাকে পরকে দিয়ে দিচ্ছ, তবে নিজের পরিচয়টা আর তার কাছে দিও না। তোমার এ-লজ্জা দূরে থেকেও আমি সইতে পারব না। তুমি শুধু হাতে আমাকে নিয়ে সে সংসার থেকে মাথা উঁচু করে বেরিয়ে ছিলে, আজ যদি দৈব সেইখানেই তোমায় সন্তান দান করতে বাধ্য করছে তবে শুধু সন্তানকেই দিও, নিজের মাথা হেঁট করে' সে ধন-গর্ব্বের পরিহাস সহ্য করে ধন কুড়িও না।

"বড় খোকা-খুকীদের বোলো তাদের মা মরে গেছে।

"খোকনকে ওবাড়ী দিয়ে দেওয়া পর্য্যন্ত আমার কথা ঢাকা দিয়ে রাখ্‌তে পারবে বোধ হয়। ঠিকে ঝিটাকে কোনো রকমে বিদায় ক'রে দিও, তবেই আর জানাজানি হবে না।

"তারপর ছেলেদের ও-বাড়ীতে রেখে দিয়ে কখনও যদি তীর্থভ্রমণের ইচ্ছা হয়, হয়ত আমার সঙ্গে দেখা হ'তেও পারে। বিশ্বাস আছে সেই পুরানো দিনের মত আমার নিঃস্ব সাথীকে আবার পথেই একদিন ফিরে পাবো।"

তৃণফুল

শ্রী সতীশচন্দ্র রায়

ভ্রমরেরা কই তাহার দুয়ারে সাধে ?
তরুণী-আঙুল তা'রে ত মালা না বাঁধে !
মধুরাশি হায় নাহি তা'র দলপুটে,
সৌরভ যাচি' বায়ু ত পায়ে না লুটে।

গোপন মরমে অস্ফুট ভাষার গান,
শিশিরে ঝলকি' আলোকে মেলেছে প্রাণ,
আঁখি-জলে-ভেজা হাসিমাখা মুখখানি
হাসিকান্না সে শরতরাণীর বাণী !

হোক্ না সে হায় ! যত ছোটো তৃণফুল,
প্রভাতের আলো তার বুকে ঢুলঢুল !
তা'র ছোটো গান নীরব অস্ফুট ভাষা,
তা'র ইতিহাস একটু মধুর হাসা !

মেটার্‌লিঙ্কীয় নাটকের রূপ

শ্রী মহেন্দ্রচন্দ্র রায়

মেটার্‌লিঙ্ক্‌ যেসব নাটক রচনা করিয়াছেন, তাহাদের সহিত তাঁহার ভাবজীবনের একটি অতি নিগূঢ় যোগ রহিয়াছে। সেইজন্যই তাঁহার ভাবজীবনের বিকাশ ও পরিণতি, তাঁহার নাটকের ভাববস্তুকেও ক্রমে-ক্রমে নানা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া বিকশিত করিয়া তুলিয়াছে। ভাববস্তুমাত্রই কোনো-না-কোনো রূপের আশ্রয়ে আপনাকে প্রকট করিয়া থাকে; এবং এইজন্যই ভাবজীবনের পরিবর্ত্তন নাটকের রূপকেও পরিবর্ত্তিত করিয়া থাকে। মেটার্‌লিঙ্কীয় নাট্য-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যের সহিত এই কারণেই তাঁহার ভাবজীবনের বৈশিষ্ট্যের একটি নিবিড় যোগ রহিয়াছে।

নাট্যকার তাঁহার ভাববস্তুটিকে প্রকাশ করিতে গিয়া যে রূপটিকে অবলম্বন করেন, তাহা আমাদের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য; প্রকাশের ক্ষেত্রে আসিতে হইলেই তাহার ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য না হইয়া উপায় নাই। কবি তাঁহার শব্দ ও ছন্দের দ্বারা, চিত্রশিল্পী তাঁহার বর্ণ ও রেখার দ্বারা, ভাস্কর তাঁহার মূর্ত্তির বিশেষ ভঙ্গী দ্বারা, গায়ক তাঁহার সুর ও তানের দ্বারা, নর্ত্তকী তাঁহার নৃত্যের ছন্দের দ্বারা ভাবগ্রাহ্য বস্তুটিকে প্রকট করিয়া তোলেন; ভাববস্তুটি ইঁহাদের নিকট একটা অ্যাব্‌স্ট্র্যাক্ট্‌ চিন্তার বস্তু মাত্র নহে; স্বভাবতই ভাববস্তুটি ইঁহাদের চিত্তের সম্মুখে কোনো-না-কোনো একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ লইয়া আসিয়া দাঁড়ায়। নাট্যকারকেও এইজন্য নাটকের আখ্যানবস্তু, ঘটনাসমাবেশ, দৃশ্যবৈচিত্র্য ও বার্ত্তালাপ প্রভৃতির সাহায্যে তাঁহার রসবস্তুটির সাক্ষাৎ লাভ করিতে হয়।

রূপের উপর ভাববস্তুর প্রভাব :—

(ক) আব্‌হাওয়া

মেটার্‌লিঙ্কীয় ভাবজীবন কেমন করিয়া তাঁহার নাটকের রূপটিকেও একটি বৈশিষ্ট্য দান করিয়া, তাঁহাকে নাট্যজগতে একটি বিশেষ নাট্যপদ্ধতির স্রষ্টার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, তাহা একটু আলোচনা করিলেই আমরা বুঝিতে পারিব। মেটার্‌লিঙ্কীয় নাটকের পাঠক-বর্গ জানেন যে, মেটার্‌লিঙ্কের প্রথম যুগের নাটকের * সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্বই জীবনের মধ্যে অতি নির্দ্দয়-ভীষণ, অনতিক্রম্য নিয়তিবোধ। এই বিভীষিকাময় মৃত্যুরহস্যের সম্মুখে মানুষের অস্তিত্ব একেবারে কিছুই নাই। সন্ধ্যার সূক্ষ্মক্ষীণ দীপালোকে একটা ম্লান কম্পিত ছায়ার মতনই অস্তিত্বহীন বস্তুমাত্র। নাটকের আখ্যানাংশের মধ্যে আমরা তাই কেবলই মৃত্যুর নিঃশব্দ সঞ্চারটিকেই দেখিতে পাই। চরিত্রসৃষ্টি বলিয়া কোনো বস্তুই আমরা এই যুগে পাই না; বাস্তবজগতের বহুদূরে, কোন্‌ অন্ধকার গহনলোকে যে এইসব ছায়ামূর্ত্তি বিচরণ করিতেছে, তাহার সন্ধান পাওয়াই যেন অসম্ভব। আসল কথা, এখানে দ্রষ্টব্য ও জ্ঞাতব্য যাহা কিছু, তাহার নাম নিয়তি, নিদারুণ মৃত্যু। কিন্তু এই অজেয়-ভীষণ রহস্যকে বাস্তবিক মূর্ত্ত করিবার কোনোই পন্থা নাই। সেইজন্যই বাধ্য হইয়া, দৃশ্য ও বার্ত্তালাপ-ভঙ্গীর দ্বারা নাট্যকার মেটার্‌লিঙ্ক্‌কে একটা রহস্যভীতির আব্‌হাওয়া সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। আব্‌হাওয়া সৃষ্টিই রহস্য-বোধকে জাগ্রত করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়াই, চরিত্রকে এখানে যতদূর সম্ভব অবাস্তব ও স্বপ্নময় করিয়া তুলিতে হইয়াছে।

(খ) দৃশ্যপরিকল্পনা

দৃশ্যপরিকল্পনার মধ্যেও যে মেটার্‌লিঙ্কের এই ভীতিময়

---

* মেটার্‌লিঙ্কের প্রথম যুগের নাটক :—(১) Princess Maleine, (২) The Intruder, (৩) the Sightless (দৃষ্টিহারা) (৪) The Seven Princesses, (৫) Pelleas and Melisanda, পীলীয়াস ও মেলিস্তাণ্ডা (৬) Alladine and Palomides, (৭) Interior (৮) Death of Tintagiles. যে-দুইখানি নাটকের নাম বাংলায় দেওয়া হইয়াছে সেইদুইখানি নাটকের বাংলা অনুবাদ প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছে। শেষের অষ্টম নাটকখানির (তিন্তাজিলের মৃত্যু) অনুবাদও বিজলীতে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন।

রহস্তবোধ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহা বুঝিতে হইলে আমাদিগকে মেটারলিঙ্কের প্রথমকার নাটকগুলির দৃশ্যের দিকে তাকাইয়া দেখিতে হইবে। আমরা দেখিতে পাই যে, প্রিন্সেস্ ম্যালান হইতে আরম্ভ করিয়া অ্যাগ্লাভেন-সেলীসেৎ পর্য্যন্ত প্রায় সর্ব্বত্রই অন্ধকার রাত্রি,—তাহার স্তব্ধতা দিয়া যেন বিশ্বজগৎকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। আলোকের এই যে অভাব, ইহাকে একটা আকস্মিক ব্যাপার বলিয়া মনে করার কোনো হেতু নাই। বরং ১৮৮৯ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় ১৮৯৬ সাল পর্য্যন্ত, মেটারলিঙ্কীয় নাটকের সর্ব্বত্র এই যে রাত্রির অন্ধকার পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে, তাহার মধ্যে যে প্রথম যুগের অজ্ঞেয় রহস্তই রূপ ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে তাহা বোধ করি নিঃসন্দেহেই বলা যাইতে পারে। এই রাত্রি এবং অন্ধকার সত্য হইয়া উঠিতে পারে না, যদি নীরবতার আবির্ভাব সেখানে না হয়। এবং এই নীরবতা তেমন পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে পারে না, যদি পারিপার্শ্বিকের মধ্যে একটা উৎসন্নতা ও নির্জ্জনতার ভাব না থাকে। এইজন্য মেটারলিঙ্কের প্রথম যুগের নাট্যদৃশ্যের মধ্যে আমরা কেবলই জনহীন বিরাট্ এবং বহু প্রাচীন প্রাসাদ, ঘনান্ধকারময় নিস্তব্ধ নিবিড় বনানী, জনহীন উদ্যানে নিঝুম উৎস, "উইলো"-ছায়া-ঘেরা, কালো-জল-ভরা স্রোতোহীন খাল, প্রাসাদ-ভিত্তিতলে যুগযুগান্তের মৃত্যুদুর্গন্ধময় গহন গহ্বর, মরা-গাছে-ঘেরা ভাঙিয়া-পড়া প্রাচীন দুর্গ, পাহাড়-ঘেরা নিঝুম দেশের মাঝখানে রহস্যময় মিনার, দূর সমুদ্রের কোলে নিঃসঙ্গ আলোকস্তম্ভ—এইসবই কেবল দেখিতে পাওয়া যায়। এইসমস্ত ঘিরিয়া অন্ধকার রাত্রির নিবিড় নিঃশব্দতা যে রহস্য-বিভীষিকাকে ব্যঞ্জিত করিয়া তুলিবার প্রকৃষ্ট উপায়, তাহা মেটারলিঙ্কের প্রথম যুগের নাটকগুলি নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিয়া দিয়াছে। 'অনাহুত', 'দৃষ্টিহারা', 'সপ্ত রাজকুমারী', 'অন্দরে', 'তিন্তাজিলের মৃত্যু'—এইগুলির কথা মনে করিলেই উপরোক্ত উক্তির যাথার্থ্য-সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ থাকিবে বলিয়া মনে হয় না।

দৃশ্যপরিকল্পনায় পারিপার্শ্বিক জগৎ

এই দৃশ্যপরিকল্পনার মধ্যে একদিক্ দিয়া যেমন আমরা তাঁহার ভাব-জীবনের তৎকালীন প্রভাব দেখিতে পাই, তেমনি তাঁহার যৌবনের পারিপার্শ্বিক জগতের প্রভাবও দেখিতে পাই। দৃশ্য মেটারলিঙ্কীয় ভাবজীবন আপনাকে প্রকাশ করিতে গিয়া যে-সব বস্তুকে আশ্রয় করিয়াছে, তাহা তাঁহার জীবনের উপর যে একটা গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। গেন্টের (Ghent) পারিপার্শ্বিক দৃশ্য মেটারলিঙ্কের তরুণ চিত্তের উপর যে ছাপ দিয়াছিল, তাহা তাঁহার দৃশ্য পরিকল্পনায়—নাটকে এবং সেয়ারে শোদ্(Serres Chaudes)এর কবিতায় সর্ব্বত্রই স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে। মেটারলিঙ্ক্ জীবনের যে বিষাদ ও নৈরাশ্যকে, যে ভীতি ও অবসাদকে, মূর্ত্ত করিয়া তুলিয়াছেন, বেল্‌জিয়মের শ্রেষ্ঠ কবি এমিল্ ভেরহারেন্‌ও সেই বিষাদ এবং নৈরাশ্যকেই রূপ দিয়াছেন। অথচ উভয়ের প্রকাশের এই যে বিভিন্নতা তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে আমাদিগকে তাঁহাদের প্রত্যেকের তরুণ বয়সের পারি-পার্শ্বিক জগতের সন্ধান লইতে হইবে। অন্তরের ভাব-বস্তু বাহিরের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কতকগুলি বিশেষ-বিশেষ রূপের মধ্যে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকে; ইহার মূলে একটি বিশেষ মনস্তত্ত্বের নিয়ম রহিয়াছে। সেই নিয়মটি বুঝিতে হইলে আমাদিগকে মনোময় জীবনের বিকাশের ধারাটিকে ভালো করিয়া বুঝিতে হইবে। অল্প কথায় সেই বিকাশের তত্ত্বটিকে প্রকাশ করা অসম্ভব। সুতরাং এখানে সামান্যমাত্র ইঙ্গিত করিয়াই ক্ষান্ত হইব।

নব মনস্তত্ত্বের সিদ্ধান্ত

আজকালকার নবমনস্তত্ত্ব (Psycho-analysis) এই কথাটি বেশ জোরের সঙ্গেই প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, আমাদের সমস্ত অন্তর্জীবন আমাদের রাগাত্মিক জীবনের (affective life) দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। আমাদের সমস্ত চিন্তা ও কল্পনার মূলে এই রাগাত্মিক জীবনের, আমাদের মর্ম্মনিহিত অনুরাগ-বিরাগের গোপন নিয়ন্ত্রণ নিয়ত বর্ত্তমান রহিয়াছে; এমন-কি আমাদের বিচার বিবেচনা এবং যুক্তি-পরম্পরারও মূলে সেই অনুরাগ-বিরাগই রহিয়াছে। এই রাগাত্মিক জীবনেরই প্রভাবে বহির্জ্জগতের বস্তুরাশি আমাদের নিকট

এক-একটা বিশেষ ও জীবন্ত মূল্য লইয়া দাঁড়াইতেছে। ফলে কোনো বস্তু আমাদের নিকট নিতান্ত আনন্দের, আবার কোনো বস্তু ভয়ের হইয়া দাঁড়ায়; অথচ এই রাগাত্মিক জীবনের ধারাটি আমাদের চেতনার নিকট গোপন বলিয়া তাহার কোনো কারণ আমরা অনেক সময় খুঁজিয়া নাও পাইতে পারি। যখন প্রত্যক্ষভাবে কোনো বস্তু আমাদের সুখ বা দুঃখের আশা বা নিরাশার দ্যোতক হইয়া দাঁড়ায়, তখন তাহার মধ্যে সর্ব্বদাই আমরা একটা কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ পাইয়া থাকি। বাঘ দেখিলে ভয় হয়, সুখাদ্য পাইলে আনন্দ হয়, এসব তাহারই সহজ দৃষ্টান্ত। কিন্তু যাঁহারা সন্ধান রাখেন তাঁহারা বলিবেন যে, এমন বস্তুও আমাদের ভীতি এবং আনন্দের কারণ হইতে পারে, যাহা প্রত্যক্ষত কোনোরূপেই আমাদের ভয় বা আনন্দের কারণ হইতে পারে না। এইসব ক্ষেত্রে বস্তুর সহিত ভয় বা আনন্দের আর কোনো জাগ্রত অনুভূতির কোনো-রূপ কার্য্যকারণ সম্বন্ধই প্রত্যক্ষত পাওয়া যায় না। এইরূপ অপ্রত্যক্ষভাবে, একরকম অকারণে স্বভাবতই যেসব বস্তু কোনো ভাবদ্যোতনারই সহায়তা করে, মনস্তত্ত্ববিদেরা সেইসব বস্তুকেই সেইসব ভাবের 'সিম্বল্' বা প্রতীক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

ভাষার ক্রমবিকাশে শব্দ-প্রতীক

কেমন করিয়া মনোময় জীবনে এই প্রতীক (symbol) সৃষ্ট হয়, তাহার মোটামুটি আলোচনা করিতে হইলেও একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ হইয়া পড়িবে। আমরা এখানে মাত্র একটু আভাস দিবার চেষ্টা করিব। আমাদের মনো-জগতে এই প্রতীকের কোনো অভাব নাই। যে-কোনো ভাষার শব্দগুলির ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই অসংখ্য সিম্বলের সাক্ষাৎ পাইতে পারি। একটিমাত্র শব্দকে লইয়া কথাটি স্পষ্ট করিবার চেষ্টা করিব;—'বেদনা' শব্দটিই লওয়া যাক্। এই শব্দটি রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাহিত্যে এবং সেই-সঙ্গে-সঙ্গে বর্ত্তমান বাংলা ভাষায় কি নিগূঢ় অন্তর ব্যথারই ভাবটিকে না প্রকাশ করিয়া চলি-য়াছে। অথচ এই শব্দটি একসময় সামান্ত দৈহিক আঘাতজনিত অনুভূতিকেই মাত্র সূচিত করিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছিল। প্রথম যেদিন বেদনা শব্দটি দৈহিক বেদনাকে অতিক্রম করিয়া একটি মনোময় ব্যথাকে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সেইদিন এই শব্দটি ছিল একটি প্রতীকমাত্র। আজ ব্যবহারের আতিশয্যে বেদনা প্রত্যক্ষভাবেই অন্তর ব্যথার দ্যোতক হইয়া দাঁড়া-ইয়াছে, আর ইহাকে তাই 'সিম্বল' বলা চলে না। কিন্তু 'দখিন হাওয়া' আজও একটি প্রতীক; কারণ 'দখিন হাওয়া' ও তাহার দ্যোতক ভাবটির মধ্যে যে-সম্বন্ধ উহা আজও আমাদের মনের নিকট অগোচরই রহিয়া গিয়াছে। বেদনা শব্দটি কেন অন্তরের নিবিড় ব্যথার ব্যঞ্জক হইয়া উঠিল তাহার কারণ অনুসন্ধান করিবার স্থান ইহা নয়। এখানে শুধু ইহাই বলিতে চাই যে, 'সিম্বল'এর সাধারণ বাচকার্থ ও তাহার ব্যঞ্জিত ভাবটির মধ্যে একটি সাধারণ অনুভূতিগত ধর্ম্মের যোগসূত্র থাকা অত্যাবশ্যক। সিম্বলের বাচকার্থ ও ব্যঞ্জিতার্থের মধ্যে যে যোগসূত্র রহিয়াছে তাহা আবিষ্কার করা মনস্তত্ত্ববিদের পক্ষেও নিতান্তই দুঃসাধ্য ব্যাপার; কারণ সিম্বল বস্তুটি আমাদের মগ্ন চেতনার মধ্যে জন্মলাভ করিয়া, তার পর চেতনার মধ্যে অনুভবের রূপ ধরিয়া প্রকাশ পায়। মগ্নচেতনার মধ্যে নিগূঢ় জীবনের কোন্ নিয়মে কেমন করিয়া যে কোনো-একটি বিশেষ বস্তু বিশেষ-একটি ভাবের 'সিম্বল' হইয়া দাঁড়াইল, তাহা সব সময় আবিষ্কার করা সম্ভব নাও হইতে পারে।

বস্তু-জগতে 'সিম্বল'

এই 'সিম্বল' বস্তুটা কেবল যে ভাষার মধ্যেই আছে তাহা নয়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যে-কোনো ব্যাপারই কোনো একটি 'সুদূর' ভাবের প্রতীক হইয়া দাঁড়াইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ফ্যাক্টরীর চিম্‌নী লওয়া যাক্। রবীন্দ্রনাথের নিকট উহা কি শুধু একটা চিম্‌নী মাত্র? তাহা নয়। শুধু একটা কারখানার অঙ্গ হিসাবে উহাকে দেখিলে উহার প্রয়োজনের দিক্ দিয়া উহার বিচার করিতে গেলে, রবীন্দ্রনাথ উহাকে কখনও এতটা ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিতে পারিতেন না। রবীন্দ্রনাথের নিকট উহা একটা দানব; জগতের অমানুষিকতা, স্বার্থপরতা, বর্ব্বরতা এবং বিশ্রীতার একেবারে সাক্ষাৎ মূর্ত্তি ওই চিম্‌নী। উহা শুধুমাত্র রূপক নয়, উহা জীবন্ত একটি প্রতীক।

সিম্বলের প্রকার-ভেদ

বোধ করি সিম্বলের অর্থ কতকটা স্পষ্ট করিতে সক্ষম হইয়াছি। সিম্বল-সম্বন্ধে আর-একটি কথা বলিয়া আমরা মেটারলিঙ্কের নাট্যদৃশ্যে প্রতীকী পদ্ধতির (Symbolism) প্রভাব দেখাইতে চেষ্টা করিব। আমরা দেখিলাম যে 'সিম্বল' বস্তুটা সর্ব্বদাই একটা আপাতসম্পর্কহীন ভাবের দিকে ইঙ্গিত করিলেও মূলতঃ সিম্বলের সহিত ভাবের একটি নিগূঢ় যোগ মানবচেতনার গোপনক্ষেত্রে না থাকিয়াই পারে না। এইজন্য 'সিম্বল্'কে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে—একটি ব্যক্তিগত, অপরটি জাতিগত বা শ্রেণীগত। কোনো-কোনো 'সিম্বল' শুধু ব্যক্তি-বিশেষের অন্তর্জীবনের গোপন চেতনার মধ্যেই একটি বিশেষ ভাবের দ্যোতক হইয়া থাকিতে পারে, আর কতকগুলি সিম্বল্ আছে যাহারা বহুমানবের চেতনার মধ্যেই জাতিগতভাবে কোনো বিশেষ ভাবের সহিত অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে জড়িত হইয়া থাকিতে পারে। যেমন টিকটিকি দেখিয়া একেবারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়াটা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক না হইলেও, কোনো-কোনো মানুষের চেতনায় এই জন্তটি বিশেষ ভয়ের প্রতীক হইয়া দাঁড়াইতে পারে। কিন্তু অমানিশায় জনহীন প্রান্তরের অন্ধকার বস্তুটা প্রায় সকল মানবের মনেই একটা অজ্ঞাত ও অনির্দ্দেশ্য ভয়ের 'সিম্বল্' হইয়া আছে। এই ভাবের প্রতীককে আমরা জাতিগত প্রতীক বা সিম্বল্ বলিতে পারি। এই-শ্রেণীর সিম্বল্-সৃষ্টির কারণতত্ত্ব যাহাই হোক, সাহিত্য যে-পরিমাণে এই দ্বিতীয় শ্রেণীর সিম্বল্কে আশ্রয় করিবে, সেই পরিমাণেই সাহিত্য সার্থক হইবে। প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিগত 'সিম্বল্' সত্যকার সিম্বল্ হইলেও, অন্তরের একান্ত সত্য অনুভূতি-বিশেষের দ্যোতক হইলেও, তাহা সাহিত্য-ক্ষেত্রে বেশী দিন সমাদৃত হইতে পারে না। তাহার কারণ এই যে ব্যক্তিগত 'সিম্বল্'-সৃষ্টির মূলে ব্যক্তিগত জীবনেরই কোনো বিশেষ রাসায়নিক কারণ থাকায় সেই সিম্বল্ ব্যক্তি-বিশেষের মনকেই সেইভাবে উদ্বুদ্ধ করিতে পারিবে; অপর ব্যক্তির নিকট সেই সিম্বল্ সহজভাবে কিছুতেই সেই বিশেষ ভাবকে জাগাইতে পারিবে না। ব্যক্তিগত সিম্বল্ প্রয়োগের আধিক্য-বশতই মেটারলিঙ্কের কবিতা আমাদিগকে আনন্দ দিতে পারে নাই। এবং বোদ্ওয়াঁ (Charles Baudouin) যতই মনস্তত্ত্ববিদের আসনে বসিয়া ভের্হারেন্কে বোঝান, এই কারণেই ভের্হারেনেরও অনেক কবিতাই আমাদের নিকট নীরস থাকিয়া যাইবে। সাধারণভাবে বলিতে গেলে বলা যায় যে, ইউরোপের প্রতীকী সম্প্রদায়ের (Symbolist) নব্যসাহিত্য এই কারণেই বহুপরিমাণে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু জাতিগত সিম্বল্ জাতিগত মনের জাতীয় চৈতন্যের (collective racial mind) মধ্যে উদ্ভূত বলিয়া উহা জ্ঞাতসারেই হোক বা অজ্ঞাতসারেই হোক প্রত্যেক ব্যক্তির মনে ভাবসৃষ্টি করিবেই। প্রতীকী পদ্ধতি (symbolism) একটা অতি জটিল ব্যাপার; আলোচনা এখানে নিতান্তই অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল। যাহোক ইঙ্গিতমাত্র করিয়া এখন আমরা আমাদের মুখ্য আলোচনার পথে অগ্রসর হইলাম।

দৃশ্যপরিকল্পনায় প্রতীক

ইতিপূর্ব্বেই মেটারলিঙ্কের প্রথম যুগের নাটকগুলির মধ্যে দৃশ্যপরিকল্পনার যেসব বিশেষত্বের কথা বলিয়াছি, তাহার মধ্যে যে প্রতীক যথেষ্ট-পরিমাণে রহিয়াছে, তাহা নাটকগুলির পাঠকমাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে। মেটারলিঙ্কের এইসব নাটকের সর্ব্বত্রই আমরা রাত্রি এবং অন্ধকার দেখিতে পাই। ইহারা কি মানব-অন্তরের অজ্ঞান এবং অসহায়তার ভাবটিকে, মানবাত্মার পথহারা অবস্থাটিকেই ব্যঞ্জিত করিতেছে না? তার পর এই যে সর্ব্বত্রই একটা বহুপ্রাচীন মিনার কালো নিয়তির মতন সমস্ত দৃশ্যের মাঝখানে তাহার ভীতিপ্রদ অস্তিত্বটাকে প্রচার করিতেছে, ইহা কি মেটারলিঙ্কীয় নিয়তিরই প্রতীক নহে? চতুর্দ্দিকের গহন অরণ্যানী, নিস্তব্ধ নির্জ্জন উদ্যান, ভীষণ গহ্বর, রুদ্ধদ্বারের পরপার্শ্বে অজ্ঞাত পদসঞ্চার, স্রোতহীন খাল—এই ভাবের যাহা-কিছু আমরা মেটারলিঙ্কীয় নাটকে পাই, সমস্তই পাঠকের চিত্তের উপর কেমন অপরূপ মায়া বিস্তার করিয়া বসে তাহা কেবল বাংলাভাষাভিজ্ঞ পাঠকও মেটারলিঙ্কের 'দৃষ্টিহারা' (প্রবাসী) এবং 'তিন্তাজিলের মৃত্যু' (বিজলী) পাঠ করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। শুধুমাত্র একটা দৃশ্য কেমন করিয়া একটি ভাবের প্রতীক

গোপিনী
শিল্পী শ্রী নন্দলাল বসু
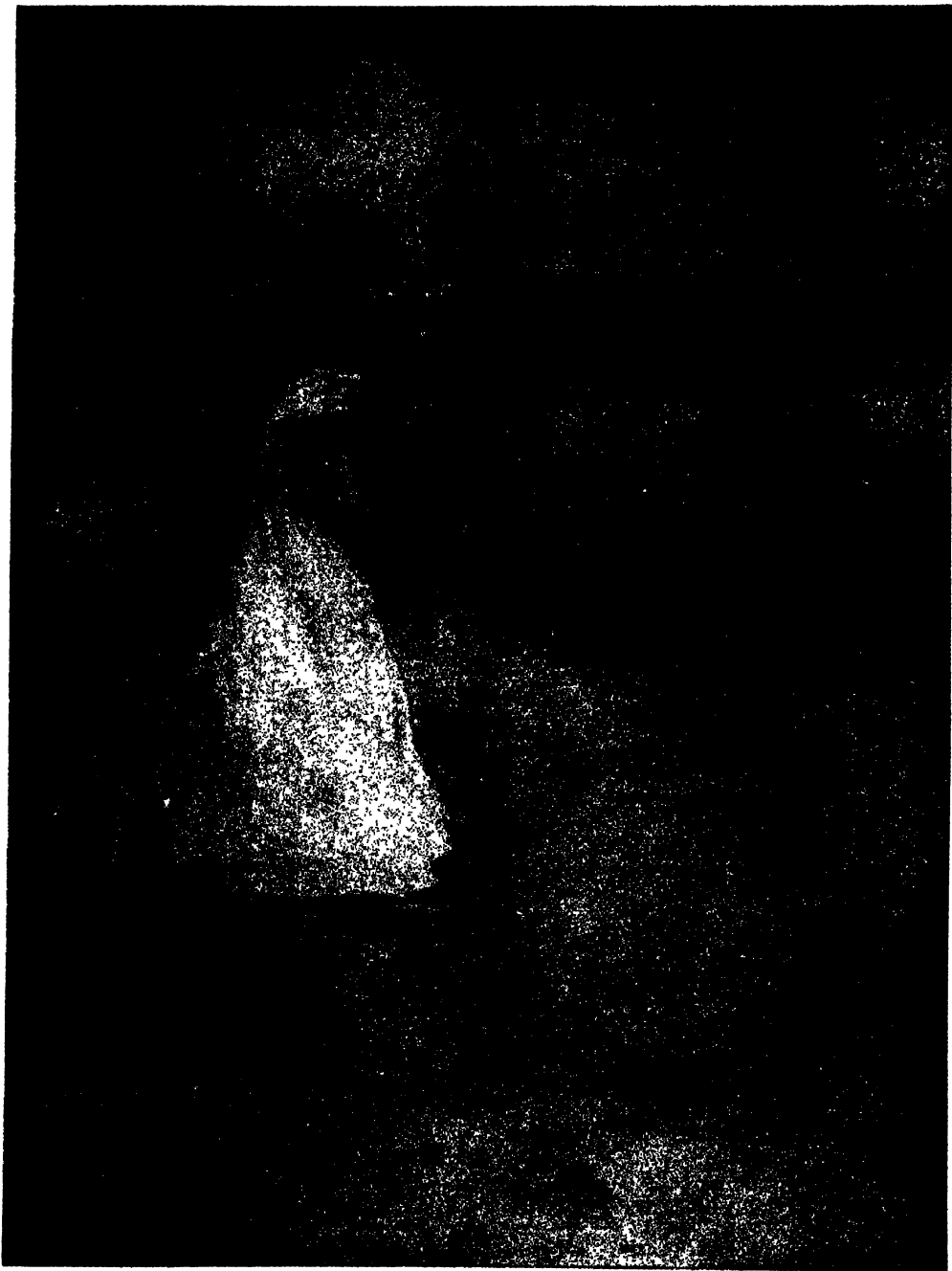
প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

হইয়া উঠিতে পারে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ 'সপ্তরাজকুমারী'র মধ্যে পাওয়া যায়।

প্রতীকী পদ্ধতি ও ভাবজীবন

রহস্যভিত্তির অপসারণের সঙ্গে-সঙ্গেই কিন্তু আমরা মেটারলিঙ্কীয় নাটকে এই ভাবের প্রতীকী পদ্ধতি (symbolism) প্রয়োগের অবসান দেখিতে পাই। যে-নাটকে যে-পরিমাণে এই অজ্ঞেয় রহস্যবোধ ও নিয়তি-বিভীষিকা রহিয়াছে সেই নাটকে সেই-পরিমাণেই এই পদ্ধতির আশ্রয় লইতে হইয়াছে। তাই প্রিন্সেস্ মালেন্ (১৮৮৯) হইতে আরম্ভ করিয়া আর্দ্দিয়ান্ ও নীলদাড়ি (১৯০১) পর্য্যন্ত, এমন-কি জোয়াজেলের (১৯০৩) মধ্যেও, দ্যোতক দৃশ্যরচনা দেখিতে পাই। কিন্তু মোনা ভানা (১৯০২),মেরী মড্‌লীন (১৯১০), বার্গোমাষ্টার (১৯১৮), মেঘাপসরণ ও মৃতের দাবি (১৯২৩) প্রভৃতি নাটকে সর্ব্বত্র দিবালোকের উন্মুক্ত প্রকাশ রহিয়াছে। দৃশ্য প্রতীক না হইয়া বাস্তব হইয়া উঠিয়াছে। তাহার কারণ, এইসব নাটকে মেটার্‌লিঙ্ক্‌ মানব-জীবনের রহস্য ও নিয়তির বিভীষিকাকে দেখাইতে চাহেন নাই। এই নাটকগুলির মধ্যে উচ্চতম নৈতিক সমস্যা লইয়া মেটারলিঙ্ক্‌ আলোচনা করিয়াছেন। এইসব নাটক যে-যুগের সৃষ্টি সেই যুগে মেটার্‌লিঙ্কের অন্তর্জ্জগৎ হইতে যে রহস্য-ভীতি অপসৃত হইয়াছে, তাহা নিঃসঙ্কোচেই বলিতে পারা যায়। এই যুগে মেটারলিঙ্কের জীবনে আশা ও বিশ্বাস ফিরিয়া আসিয়াছে, এবং তিনি এমন-একটি শক্তিশ্রীকে মানবাত্মার মধ্যে আবিষ্কার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, যাহার সম্মুখে মৃত্যুরহস্যও তাহার বিভীষিকা হারাইয়া ফেলিয়াছে। জীবনের মধ্যে নৈতিক বোধের প্রবলতা আসিয়া মানবকে এই বাস্তবজগতের ক্ষেত্রে দৃঢ়তার সহিত চলিতে শিক্ষা দিয়াছে।

মেটারলিঙ্কীয় ভাবজীবনের বিকাশ ও পরিবর্ত্তন কেমন করিয়া তাঁহার নাট্যসৃষ্টির মধ্যেও ধরা পড়িয়াছে, দৃশ্যরচনার দিক্ দিয়াই শুধু তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। তাঁহার নাটকের সমস্ত দৃশ্যের মধ্য দিয়া যে প্রথমযুগের ভাবজীবন একটা রহস্যময় আবহাওয়ার রূপ ধরিয়া প্রকাশ পাইয়াছে, দেখিলাম। নাটকীয় বার্ত্তালাপ-ভঙ্গীর এবং চরিত্র-সৃষ্টির মধ্যেও কেমন আশ্চর্য্যভাবে মেটারলিঙ্কের এই ভাবজীবনের ইতিহাসটি লিপিবদ্ধ হইয়া আছে বারান্তরে তাহা দেখাইবার ইচ্ছা রহিল।

আধুনিক জীবন-ধারা *

৺ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

আচ্ছা তবে শোনো। যার কথা বল্‌ছি সে ছিল চার ছেলের বাবা। বড় ছেলের বয়স ২৪; মেজ ছেলের বয়স ২৩; সেজ ছেলের বয়স ২২; আর চতুর্থ ছেলের বয়স ২১। বাপ গতপত্নীক, একজন কুঠিওয়ালা মহাজন, খুব ধনী।

তিন ছেলে বি-এ পাশ করেছে (আধুনিক জীবনে যা কোনো কাজে লাগে না)।

তিনি একদিন সকলকে ডেকে বল্‌লেন:—"এখন তোমরা কি কাজ পছন্দ ক'রে নেবে ঠিক করো। তোমরা কী হ'তে চাও?"

জ্যেষ্ঠপুত্র "ম্যাহুয়েল" উত্তর কর্‌লে—"বাবা আমি ওকালতি করব"।

বাবা বল্‌লেন—"বেশ কথা। তুমি উকীলই হবে।"

মেজ ছেলে "আন্তনিয়ো" উত্তর দিলে—"আমি ডাক্তার হ'তে চাই।"

* (স্পেনীয় লেখক Eusebio Blasco হইতে)

"আচ্ছা, তুমি ডাক্তারই হবে—আমার তা'তে কোন আপত্তি নেই।"

মেজ "জোসে" বল্‌লে—"আমি বাবা তোমার মতো সওদাগর ও কুঠিওয়ালা হ'তে চাই—আর্ শীঘ্র টাকা রোজকার কর্‌তে চাই।"

"আচ্ছা তুমি যা চাও, সে-বিষয়ে আমি তোমাকে সাহায্য কর্‌ব।"

কনিষ্ঠ ছেলে, "ডিমাস্" অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে শেষে নম্রভাবে বল্‌লে—"বাবা, আমি দস্যু হ'তে চাই।"

এই কথায় একটা হুলস্থূল কাণ্ড হ'ল। বাবা চৌকী থেকে তড়াক্ ক'রে লাফিয়ে উঠ্‌লেন, আর একটু হ'লেই তাঁর মাথাটা ছাদে গিয়ে ঠেক্‌ত। তা'র ভাইরা তা'কে বল্‌লে, তুই ভবঘুরে ভিক্ষুক, আল্‌সে, ঠক্-জুয়াচোর, বদ-ছেলে, বদ্‌ভাই, আর ভবিষ্যতের বদ্ নাগরিক। এমন-কি এই কথা শু'নে বাড়ীর ভৃত্যেরা, প্রতিবাসীরাও লজ্জিত হ'ল। কিন্তু ছেলেটা ক্রমাগত বল্‌তে লাগ্‌ল—"আমি দস্যু হবো, আমি দস্যু হবোই, আর যদি তোমরা আমাকে দস্যু হ'তে না দ্যাও, তা হ'লে আমি বাড়ী থেকে চ'লে যাবো।"

তা'র বাপ বাড়ীর থেকে তা'কে দূর ক'রে দিলেন, অভিসম্পাত কর্‌লেন; ব্যাপারটা একটা পারিবারিক নাটকে পরিণত হ'ল।

সেই রাত্রেই ডিমাস্ বোঁচ্‌কা-বুঁচ্‌কি বেঁধে, বাড়ীর সব-চেয়ে পুরাতন ভৃত্যকে বল্‌লে:—(এ ভৃত্য এই বিষয়ে কিছুই জান্‌ত না—মনে কর্‌লে, তা'র মনিবের আত্মীয়-স্বজনকে দেখ্‌তে ক্যাষ্টিল বা আণ্ডালুসিয়ায় বুঝি যাচ্ছে)

—"দ্যাখ্ রামন্, আমি বাবাকে বিরক্ত কর্‌তে চাইনে—আমি একটা মুস্কিলে পড়েছি। আমাকে ৪০০ টাকা ধার দিতে পারিস্, আমি আগামী হপ্তায় শোধ ক'রে দেবো।"

রামন্ কিছু টাকা জমিয়েছিল; সে ৪০০ টাকা গু'নে ডিমাসের হাতে দিলে।

ঐ টাকা শোধ্‌বার মৎলব ডিমাসের মোটেই ছিল না। সে বল্‌লে—"বেশ ভালো! ধার ত সে ধারই; এখন আরম্ভ কর্‌বার মতন আমার একটা রেস্তো হ'ল।"

২

তা'র পর ২৫ বৎসর কেটে গেছে। সময়টা খুব দীর্ঘ; সেই বদ্ ছোক্‌রার কোনো খোঁজ-খবর নেই…

এখন বাপের বয়স ৭০এর উপর; ক্রমেই খুব বুড়িয়ে যাচ্ছেন, খুব দুর্ব্বল হ'য়ে পড়্‌ছেন। ঐ সময়ের ভিতর, কতকগুলো কপাল-ঠোকা বাজির খেলায় তাঁর সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে…ব্যাঙ্ক ফেল্ হয়েছে, সেই সঙ্গে তাঁর টাকা ও বাজার-সম্ভ্রমও লোপ পেয়েছে। যে তিনজন বন্ধুকে তিনি টাকা ধার দিয়েছিলেন, তা'রা গা-ঢাকা দিয়েছে… একসময়ে যার নিজের গাড়ী-ঘোড়া, বাগান-বাড়ী ছিল, সেই ব্যক্তি কিনা এখন খাঁটি লোকের মতো অল্পে-অল্পে ধার শোধ করে, কষ্টানিলায় ১২ টাকায় দুটো ছোটো কাম্‌রা ভাড়া ক'রে বাস কর্‌ছে বেচারী।

ছেলেদেরও ভাগ্যে শনির দশা।

উকীল ম্যানুয়েল সমস্ত ২৫ বৎসরের ভিতর দুটো ব্রীফ পেয়েছিল। দুটো মোকদ্দমাতেই হার হয়েছে, যদিও লোকে বল্‌ত, ওর মক্কেলদেরই ন্যায্য দাবি ছিল; কিন্তু এদিকে প্রতিপক্ষের মুরুব্বির জোর ছিল। প্রতি-পক্ষের উকীলের সহিত মন্ত্রী,ডেপুটি, সেনেটারদের আলাপ-পরিচয় থাকায় পলকের মধ্যে দুই মামলাই জিতে ফেল্‌লে।

ডাক্তার আন্তনিয়োর অবস্থাও তথৈবচ। ডাক্তারি আরম্ভ কর্‌বার পরেই, তা'র হাতের দুই-তিনটা রোগী মারা গেল; তারা এমনেও মরা, অমনেও মরা, কেননা তাদের কপালে মৃত্যুই লেখা ছিল। তা-ছাড়া এমন অসাধ্য রোগ আছে যে, কেহই আরাম কর্‌তে পারে না। যে ডাক্তারেরা তা'র হিংসা কর্‌ত, তা'রা খুব খুসী হ'ল। তারা বল্‌তে লাগ্‌ল—"ও একজন খুনী—চিকিৎসার কিছুই জান্‌ত না, ওর বাপ ছিল জুয়াচোর, ধূর্ত্ত বণিক্—এমন লোককে কেউ কখনো চিকিৎসার জন্য ডাকে?" সে আর রোগী পেতো না। শেষে হতাশ হ'য়ে মাদ্রিদে ফি'রে এল।

"জোসে"যে তা'র বাপের মতো সওদাগর হ'তে চেয়ে-ছিল, সে পঁচিশ বৎসর ধ'রে কেবল টাকার শ্রাদ্ধ, সময়ের শ্রাদ্ধ ও স্বাস্থ্যের শ্রাদ্ধ কর্‌লে। তা'র পর দেউলে হ'য়ে গেল।

"হবেই ত! 'বাপ কা বেটা সেপাইকা ঘোড়া'! এর কাছ থেকে তুমি কি প্রত্যাশা কর্‌তে পারো?"

তিন ভাই, রোগশয্যাশায়ী বেচারী বাপকে ঘিরে ব'সে থাক্‌ত। ডাক্তার নেই—ঔষধ নেই—কেবল তা'র ছেলে আন্তনিয়ো তা'র চিকিৎসা কর্‌চে—এমন-সব ঔষধের ব্যবস্থাপত্র লি'খে দিচ্চে—যা অতিশয় দুর্মূল্য। সেই ছোটো ঘরটিতে ব'সে তিন ভাই অনেক সময় বলাবলি কর্‌ত—"ডিমাসের না-জানি কি হয়েছে?"

বাপ বল্‌লেন—"নিশ্চয়ই জেলখানায় আছে।"

ম্যান্থয়েল বল্‌লেন—"নিশ্চয়ই মারা গেছে।"

—"ভগবানই জানেন"।

"ভেবে দেখ, ২৫ বৎসরের মধ্যে একখানা পত্রও লিখ্‌লে না"

"অতি ব্যাদ্‌ড়া ছেলে!"

"হতভাগা ছেলে"!

"বদ্ ভাই!

বাপ বল্‌লেন—"তোমরা তা'র জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করো—হতভাগ্য ছেলেটার উপর ঈশ্বর যেন একটু দয়া করেন"।

৩

একদিন অপরাহ্নে (সে-দিন রবিবার ছিল, সমস্ত পরিবার একত্র হয়েছে) একজন ভৃত্য একটা "কার্ড" নিয়ে ঘরে ঢুক্‌ল। বল্‌লেন—"মশায়, একজন সহিস্ এইটে এনেছে, আর দরজায় গাড়ী অপেক্ষা কর্‌ছে।"

ম্যান্থয়েল কার্ড্‌টা নিয়ে পড়্‌লে;—

"সাহাগুনের মার্কিস্"।

খুব একটা হৈ-চৈ প'ড়ে গেল। একজন মার্কিস্! তারা সবাই চেয়ারগুলো যথাস্থানে গুছিয়ে রাখ্‌তে লাগ্‌ল; রোগীর শয্যা গুছিয়ে রাখ্‌লে, গলার "টাই" ঠিক্‌ঠাক্ ক'রে নিলে, বাপের শয্যার পাশে ব'সে তারা তাস খেল্‌ছিল সেই তাসগুলো লুকিয়ে ফেল্‌লেন।

গরীবের ঘরে একজন মার্কিস! না জানি কে তিনি? বৃদ্ধ বল্‌লেন—"সাহাগুনের মার্কিস"... সাহাগুন গ্রাম ত আমার জন্মস্থান—ও-রকম উপাধির লোক ত সেখানে কেউ নেই। ভৃত্য বল্‌লে:—"এই ভদ্র-লোকটি"......

ঘরের ভিতর একটি লোক প্রবেশ কর্‌লে, তা'র বয়স ৪৫।৪৬ হবে, ফিটফাট পরিচ্ছদ; তা'র বোতাম-ছিদ্রে বিশেষ সম্মানসূচক একটা লাল ফিতে আট্‌কানো রয়েছে। আর রুমালে খুব দামী পুষ্পনির্য্যাসের সুগন্ধ ভুরভুর কর্‌ছে। একবাক্যে সকলেই ব'লে উঠ্‌ল—"এ যে ডিমাস"!

হাঁ, এই সেই ডিমাস্‌ই বটে। তা'র সাদাটে দাড়ি ও তা'র পাক-ধরা চুল সত্ত্বেও তা'রা ওকে সহজেই চিন্‌তে পার্‌লে...ডিমাস্ আস্তে-আস্তে শয্যার দিকে এগিয়ে এল, তা'র পর নতজানু হ'য়ে বল্‌লে—বাবা বাইবেলের "উড়নচণ্ডী ছেলে" ছিন্ন বস্ত্রে, দরিদ্রের অবস্থায় বাড়ী ফিরেছিল। সে সেকালের কথা। আমি ফি'রে আস্‌ছি ধন-কুবের হ'য়ে, শক্তিমান্ হ'য়ে। আমাকে কি তুমি ক্ষমা করবে, ধন ও ধনীলোকের চারিদিকে এমন-একটা হাওয়ার ঘের থাকে—যা নির্ব্বোধদিগকে আকর্ষণ করে, মন্ত্রমুগ্ধ করে। সমস্ত পরিবার মুহূর্ত্তের মধ্যেই দেখ্‌তে পেলে ডিমাসের ফি'রে আসাটা সকলের পক্ষেই শুভজনক। তা'র আগেকার সমস্ত অপরাধ, তা'র সম্বন্ধে সমস্ত কুৎসা তা'রা ভু'লে গেল। বাবা বল্‌লেন—"বৎস! এখন ঘরের ছেলে, ঘরে এস!"

ম্যান্থয়েল, আন্তনিয়ে, জোসে, তা'র গলা জড়িয়ে ধ'রে চুম্বন কর্‌লে, ডিমাস সেই ঘরটিতে যেন একটা দেবতা হ'য়ে পড়্‌ল।

কতই আনন্দ-উচ্ছ্বাস, কতই জিজ্ঞাসাবাদ, কতই উল্লাস,—কি শুভ মুহূর্ত্ত!

স্নেহ-বাৎসল্য প্রকাশ ক'রে তা'র পর বাপ বল্‌লেন:—

"এখন বল দিকি, বৎস, কি ক'রে তুমি এত উচ্চ পদে উঠ্‌লে?"

ডিমাস্ দরজার কাছে স'রে এসে, দরজাটা চাবি দিয়ে বন্ধ ক'রে দিলে—তা'র পর যখন দেখ্‌লে, নিজের পরিবার-ছাড়া আর কেউ নেই—তখন তার জীবন-কাহিনী বল্‌তে আরম্ভ কর্‌লে। প্রথমেই বল্‌লে,—

"চুরি-ডাকাতি, বাবা"!

৪

ভয়ত্রস্ত হ'য়ে বৃদ্ধ বিছানার উপর উ'ঠে বস্‌ল।

"ভীত হোয়ো না বাবা, আমি 'খারাপ-কিছু' করিনি।

"আমি মান ও ঐশ্বর্য্যের বোঝাই নিয়ে ফি'রে আস্‌ছি; এখন আমি সকলের সম্মানের পাত্র; যাকে বলে আধুনিক জীবনযাপন করা আমি সেই আধুনিক জীবনযাপন করেছি।

"এই শোনো—

আমি রামনের কাছ থেকে ৪০০ টাকা ধার নিয়ে বেরিয়েছিলেম···ভালো কথা, রামন এখন কি কর্‌ছে?···

"সে এখন খুবই বুড়ো হ'য়ে পড়েছে; সে ছিল একজন পুরোনো সৈনিক তাই তা'কে একটা সৈনিক-আশ্রমে পাঠাতে পারা গেল।"

"আজই অপরাহ্ণে তা'কে আমি হাজার-দুই টাকা দেবো।" এই টাকার সংখ্যা শু'নে সমস্ত পরিবারের মাথায় যেন একটা শিশির-বিন্দু ঝ'রে পড়্‌ল। "আর তোমার জন্ম ম্যানুয়েল, আমি বিশ হাজার টাকা রেখেছি। আর আন্তনিয়ো, জোসে তোমাদের প্রত্যেকের জন্যও অত টাকা রেখেছি। আর বাবা তোমার জন্ম কাস্তেলানায় একটা বাড়ী কিনেছি। সেইখানে আমরা সকলেই একত্র থাকব। তুমি সেখানে রাজার মতো রাজত্ব করবে।"

তা'রা এখন আর তা'র কথা শুন্‌ছিল না, কেবল একজন দেবতার মতো তা'র মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল।

"তা'র পর রামনের কাছ থেকে সেই ৪০০ টাকা নিয়ে আর-একজন বন্ধুর কাছ থেকে হাজার টাকা ধার ক'রে আমি অ্যামেরিকার যুক্তরাজ্যে যাত্রা কর্‌লেম—সেখানে টাকা যথেষ্ট, কিন্তু নীতির ঘরটা একেবারেই ফাঁকা।

যতদিন না একটা নিজের কাজ ফেঁদে বস্‌তে পেরেছিলেম (এখনকার দিনে কাজ মানে, লোকের টাকা অপহরণ করা)—আমি একজন বড় জাহাজ-মালিকের ঘরে কাজ পেয়েছিলেম—লোকটা খুব ধনী। শেষে আমি তার স্ত্রীকে হরণ কর্‌লেম। বাবা ব'লে উঠ্‌লেন—

"কি সর্ব্বনাশ!"

একটা অনিবার্য্য মত্ততা বাবা! য়ুরোপ, অ্যামেরিকা পৃথিবীর দুই অর্দ্ধমণ্ডলের সাহিত্যিকেরাই এই জিনিসটাকে প্রণয়-নাট্য বলে। সকলেই আমার পক্ষে ছিল। সে স্ত্রীলোকটি তরুণী ও জীবন-স্ফূর্ত্তিতে ভরা। তা'র স্বামী বুড়ো ও রুগ্ন; সে তা'র স্ত্রীর সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করত। খবরের কাগজে আমার ফোটো ছাপা হ'ল; স্ত্রীলোকটিরও ফোটো বেরোলো—আর স্বামীর আত্ম হত্যার একটা ছবি ছাপা হ'ল। আমি দেশের একজন প্রসিদ্ধ উপন্যাস-নায়ক হ'য়ে পড়্‌লেম,—আমার প্রণয়িনীর সঙ্গে ক্যালিফর্‌নিয়ায় যাত্রা কর্‌লেম। তা'র কাছ থেকে আমি এক লক্ষ টাকা পেয়েছিলেম—সে-দেশে টাকাতেই মান-সম্ভ্রম। আমি সেখানে একটা কাজ ফেঁদে বস্‌লেম। এমন একটা সোনার খনি যাতে সোনা ছিল না—এমনকি কস্মিনকালেও সোনার অস্তিত্বমাত্র ছিল না।

"কিন্তু এ তো ডাহা জুয়াচুরি!"

"কিন্তু ওরকম ত প্রতিদিনই করা হয়; সমস্ত পৃথিবীময় এমন-সব বিবিধ লোক আছে, যারা বাজারে "শেয়ার" বেরোবামাত্র কি'নে নেয়। তা'র পর সেই কাজটা 'দেউলে' হ'য়ে পড়ে······ তা'র পর একজন নগণ্য লোককে কাজের মাথায় বসানো হয়—তা'রই উপর সমস্ত দায়িত্ব। আমি শুধু বেতনভোগী ম্যানেজার হ'য়ে থাকি। তা'র পর যখন সর্ব্বনাশের চূড়ান্ত উপস্থিত হয় তখন সেই লোকটাই গেরেফ্‌তার হয়—আর আমি ব'লে উঠি—"ঐ চোর!" আঃ! ম্যানুয়েল তুমি হাস্‌ছ অ্যাঁ? তুমি যখন ওকালতি কর্‌তে, তখন এ-রকম ঘটনা নিশ্চয়ই অনেক দে'খে থাক্‌বে; দেখনি কি? এমন-কি দশ হাজার টাকা দিলে তুমি নিশ্চয়ই আমার পক্ষসমর্থন কর্‌তে।

সেই স্পেকুলেশানে আমি যে টাকা রেখেছিলেম (আজকাল এইসব জিনিসকে আমরা স্পেকুলেশান বলি, পুরাকালে এর অর্থ অন্য রকম ছিল।) সেই টাকা নিয়ে আমি প্যারিসে গেলাম। আমি তখন খুব ধনী লোক। সেখানে খুব জম্‌কিয়ে বস্‌লুম। আমি ফরাসী 'সিটিজেন' (নাগরিক) হ'য়ে পড়্‌লেম।"

বাবা বিছানার উপর উঠে ব'সে চীৎকার ক'রে বলে উঠ্‌লেন—"ফরাসী!" 'আমার ছেলে ফরাসী! কখনই না। অসম্ভব।" "কিন্তু বাবা, তুমি কি জান না, এইসম্বন্ধে আমাদের দেশে যে-রকম সুবিধা জনক আইন আছে, এমন

আর কোথাও নেই। যে-ব্যক্তি অন্য দেশের অধিবাসী-দল-ভুক্ত হ'য়ে, নিজের জাত হারিয়ে, দেশে আবার ফিরে আসে; আর ফিরে এসে জিলার সিবিল-রেজিষ্ট্রারের কাছে আবার জাতে উঠ্‌বার ইচ্ছে প্রকাশ করে ;—সে তখনই আবার জাতে উঠ্‌তে পারে। আমি তাই করেছি, এখন আমি পূর্ব্বের মতনই স্পেনীয়; কিন্তু ইতিমধ্যে ফরাসীদের সঙ্গে কার্‌বার ক'রে অনেক অর্থ উপার্জ্জন করেছি।" ম্যানুয়েল বল্লে—"খুব চালাক!" আর সকলে বল্‌লে—

"খুব আশ্চর্য্য!"

"প্যারিস-নগরটা ধন ও ধনীলোকদের দাস। একবার আমি সেই প্যারিসে গিয়ে অসংখ্য ব্যবসায়-কোম্পানী খুল্‌লেম—সবগুলোই অন্যের পক্ষে খারাপ, কিন্তু আমার পক্ষে ভালো; ফরাসীরা শিশুর মতো; তা'রা টোপ্‌টা দিব্যি সহজে গিলে ফেল্‌লে। মনে ক'রে দ্যাখো 'প্যানামা'-সম্বন্ধে "ধাতব দ্রব্যের কোম্পানী"-সম্বন্ধে "ট্রান্‌স্‌ভাল স্বর্ণখনি"-সম্বন্ধে কি ঘটেছিল—সবগুলিই প্রকৃত "ঘোড়ার ডিম!"...প্যারিসে পসার কর্‌তে হ'লে অর্থবল ও মান-সম্ভ্রমের খুবই দর্‌কার, প্রজাতন্ত্রী দেশ হ'লেও লোকেরা আভিজাত্যের জন্য উন্মত্ত। তাই প্রথম বৎসরেই রোমে গিয়ে একটা "সাহাগুনের মার্কিস" এই উপাধি খরিদ কর্‌লেম। বন্ধু ও স্তাবক সংগ্রহ কর্‌তে হ'লে লোকদের প্রচুর ডিনার খাওয়াতে হয়—এ হ'চ্চে আধুনিক পদ্ধতি। এইরকম ক'রে আমি বাজার দখল ক'রে বস্‌লেম। একজন নিঃস্ব উদ্ভাবকের পয়সা দিয়ে তার কাছ থেকে তার উদ্‌ভাবনার মৎলবটা শুনে নিলেম। সেই মৎলবটা চুরী ক'রে তার থেকে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন কর্‌লেম।

"ছি ছি বৎস! এ কী কাণ্ড!"

"কিন্তু তুমি কি জানো না, বাবা, যে-ব্যক্তি কোনো একটা জিনিষ তৈরী করে, উদ্‌ভাবন করে বা সৃষ্টি করে সে তা'র থেকে কোনো লাভ পায় না, গ্রন্থ-প্রকাশক গ্রন্থ-কারকে, রঙ্গশালার পরিচালক অভিনেতাদের, ধনী মহাজন উদ্‌ভাবকদের শোষণ করে। আমি মহাজন, সমস্ত জগৎ আমার পদানত! সকল নারীরাই আমাকে পূজো কর্‌ত; যে খুব একগুঁয়ে, তাকেও আমি জয় করেছিলাম। অর্থ জলের মত আমার কাছে আস্‌তে লাগ্‌ল...'সম্মান-ভূষণ', 'ক্রস', 'উপাধি' পৃথিবীর সব দেশ থেকেই আমি পেতে লাগ্‌লেম, তা-ছাড়া এসব কিন্‌তেও পারা যায়। এক-কথায়, এই দেখ আমি এখানে—আমার বয়স ৪৬ বৎসর মাত্র, আমাকে সবাই "ধনী মহাজন" ব'লে, 'অর্থ-সচিব' ব'লে 'বিশ্বপ্রেমিক' ব'লে সম্মান কর্‌ছে, কেননা আমি গরীবদের হাজার-হাজার টাকা দান কর্‌ছি, আর এখানে হাঁসপাতাল, ইস্কুল, লোকের যা-কিছু দর্‌কার, সবই স্থাপন কর্‌তে যাচ্ছি...দেখ বাবা, কাল আমাদের বড় বাড়ীতে উঠে' যেতে হবে; সমস্ত নীচের তলাটা তোমার জন্য থাক্‌ল, আর এদের জন্য, এদের পরিবারের জন্য, প্রথম তলাটা থাক্‌বে—প্রত্যেকেই ব্যাঙ্ক থেকে ৩০।৪০ হাজার টাকা পাবে; আর আমি এখন রাষ্ট্রীয় সভার প্রতিনিধি হবার চেষ্টা কর্‌ব, সেনেটার হবার চেষ্টা কর্‌ব, মন্ত্রী হবার চেষ্টা কর্‌ব...আমি আইন প্রস্তুত কর্‌ব!"

তা'র পর সকলের মধ্যে একটা হাসির হর্‌রা উঠ্‌ল। আকাশ থেকে যেন হঠাৎ তাদের মাথার উপর স্বর্ণ-বৃষ্টি হয়েছে, এই মনে ক'রে তা'রা সবাই মেতে উঠেছিল। পক্ষাঘাতে অর্দ্ধশরীর-পঙ্গু বাপ শয্যা থেকে লাফিয়ে পড়্‌ল। ম্যানুয়েল বাড়ীর সবাইকে খবর দিতে ছু'টে গেল, আন্তনিয়ো গান গাহিতে লাগ্‌ল, জোসে মনে-মনে মাদ্রিদে একটা ভাণ্ডার স্থাপনের মতলব আঁট্‌তে লাগ্‌ল। ডিমাস সকলকে সুখী দে'খে আনন্দে হাস্‌তে লাগ্‌ল।

যাবার সময় একটি গরীব ছেলে, বক্‌শিস্ পাবার আশায়, তাঁর গাড়ীর দরজা খু'লে দরজাটা ধ'রে ছিল। তিনি তাকে বল্‌লেন—"কাজ করো বাপু, কাজ করো। আমি শিশুকাল থেকে কাজ ক'রে আস্‌ছি।"

তখন সমস্ত পরিবারবর্গ ব'লে উঠ্‌ল "চালাক বটে! বরাবরই ক্ষমতা দেখিয়ে এসেছে।"

"ক্ষমতা ব'লে ক্ষমতা, অসাধারণ ক্ষমতা!"

বাংলায় দুগ্ধ-সমস্যা ও তাহার প্রতিকার

শ্রী অরবিন্দ সিংহ, বি, এস্-সি

বাংলায় অন্ন-সমস্যা, বাংলায় বস্ত্র-সমস্যা, বাংলায় গ্রীষ্মকালে জল-সমস্যা, বর্ষাকালে ম্যালেরিয়া-সমস্যা; বাঙালীর ছেলের শিক্ষা-সমস্যা, বাঙালীর মেয়ের বিবাহ-সমস্যা, বঙ্গনারীর স্বাধীনতা-সমস্যা, বঙ্গযুবকের স্বাস্থ্য-সমস্যা, এই সব সমস্যা এক হইয়া আজ মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়াছে। এ হতভাগ্য দেশ সমস্যায় ভরিয়া গিয়াছে। বাংলায় শিশুমৃত্যুর-হার গণনা করিলে দেশের ভবিষ্যতের আশঙ্কায় প্রাণ শিহরিয়া উঠে। এই শিশুমৃত্যুর মূল কারণ অন্বেষণ করিতে গেলে তিনটি কারণ প্রধানতঃ দেখিতে পাওয়া যায়। (১) বাংলার যুবক-যুবতীর হীনস্বাস্থ্য (২) খাঁটী দুগ্ধের অভাব (৩) ও শিশুপালন-সম্বন্ধে মাতার অজ্ঞতা। প্রথম কারণ আবার অনেকাংশে দ্বিতীয়টির উপর নির্ভর করে। তাই বাংলার দুগ্ধ-সমস্যাকে তুচ্ছ করিলে দেশের ভবিষ্যৎকে তুচ্ছ করা হয়।

শুনিয়াছি আগে বাংলায় গরুভরা গোয়াল ছিল, মাছ-ভরা পুকুর ছিল, ধানভরা ক্ষেত ছিল, তাই, তখন ছেলের অন্নপ্রাশনে দু'মণ দুধের পায়েস হইত, বাবা-তারকেশ্বরের মাথায় মেয়েরা অজস্র ধারায় দুধ ঢালিত,বর-ক'নে বিদায়ের দিন দুধচিঁড়ের ব্যবস্থা ছিল। সেসব দিন ফুরাইয়া গিয়াছে। সে রামও নাই সে অযোধ্যাও নাই। গৃহস্থের ভাগ্যে গরুর দুধ পুকুরের মাছ ত জোটেই না, দুগ্ধ-পোষ্য শিশু মাতৃস্তন্যেও বঞ্চিত, কারণ, মায়ের দুধ শুকাইয়া গিয়াছে। যে গোয়ালা রোজ দুধ দেয় তাহার দুধে কতখানা জল ও কতখানা দুধ তাহা বুঝিয়া ওঠা আজকাল বৈজ্ঞানিকদেরও ভাবনার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। আর সেই দুধের জল যে কত সংক্রামক-রোগের বীজাণুতে পূর্ণ তাহা আর শুনিয়া কাজ নাই। অধিকাংশ সময় এইপ্রকার দুধই বড়-বড় সহরের বিসূচিকা, বসন্ত প্রভৃতি রোগের আদিকারণ। মা-বাপ হইয়া আমরা ছেলের মুখে একপ্রকার জানিয়া-শুনিয়া এই বিষ তুলিয়া দিই। শুধু তাই নয় কত সময় টাকা দিয়াও এই বিষ-টুকু কিনিতে পাওয়া যায় না। বিলাত, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে দুধের সহিত বীজাণু পরিপূর্ণ জল মিশ্রিত করা ত দূরের কথা, এম্‌নি স্বাভাবিক নিয়মে যে-সমস্ত বীজাণু দুধের সহিত মিশিয়া যায় তাহাই দূর করিবার জন্ত তাহারা কত বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করিয়াছে। বিলাত, আমেরিকায় মা ভগবতীর পূজা হয় না; তাহা-দের পুরাণে-উপকথায় কপিলা বা কামধেনুর উল্লেখ নাই, কিন্তু সেখানের গরু বোধ হয় দেবতাদের কপিলাকেও আজ হার মানাইয়া দিয়াছে।

আগে বাঙালী পল্লীতে বাস করিত। নিজের গরু ছিল, গোচারণের মাঠ ছিল; সেখানে চরিত, বিশ্রাম করিত, নিকটেই প্রতিষ্ঠিত পুকুর ছিল, সেখানে স্নান করিত, জল খাইত, গ্রামের জমিদারের পিতৃশ্রাদ্ধে উৎসর্গীকৃত ষাঁড় এই পালের সহিত ঘুরিয়া বেড়াইত। আর দিন-শেষে সূর্য্যাস্তের সঙ্গে-সঙ্গে গোধূলির রেখা আকাশে আঁকিয়া দিয়া গৃহস্থের ঘরে ফিরিয়া আসিত। গৃহিণী গোয়ালে সন্ধ্যা দিতেন,তা'রপর কর্ত্তা-গৃহিণী দুজনে মিলিয়া ভগবতীর সেবা-যত্ন করিতেন, তাই বাংলা তখন সোনার বাংলা ছিল। এখন বাঙালী পল্লী ছাড়িয়া সহরে চলি-য়াছে, কোন্ গ্রামেই গোচারণের মাঠ দেখিতে পাওয়া যায় না, প্রতিষ্ঠিত পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার হয় নাই বলিয়াই, তাহা শুকাইয়া গিয়াছে। আর আজকাল শ্রাদ্ধে বৃষ উৎ-সর্গের প্রথা বর্ব্বরতার পরিচয় বলিয়া সভ্য বাঙালী তাহা উঠাইয়া দিয়াছে।

ফলে সোনার বাংলা আজ শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। দুধের অভাবে শিশুমৃত্যু বাড়িয়াই চলিয়াছে, আর যাহারা কোনোরকমে টিঁকিয়া যাইতেছে তাহারাও জীবন-সংগ্রামে পদে-পদে পরাজিত হইতেছে। এই হীনস্বাস্থ্য

লইয়া তাহারা আবার সন্তানের জনক জননী হইতেছে। হায়! অধঃপতন কত দ্রুত ছুটিয়া চলিয়াছে।

বাংলার সামাজিক ক্রিয়া-কলাপে, পূজাপার্ব্বণে দুগ্ধের প্রয়োজন, অথচ বাংলার গরুর বাঁটে আজ দুধ নাই। কলিকাতা প্রভৃতি বড়-বড় সহরে টাকায় আড়াই সের দুধ; খাঁটী দুধ ত ১ টাকা সের দিলেও অনেক সময় পাওয়া যায় না। গোয়ালা বাড়ীতে দুধের রোজ দেয়; বেলা নয়টা বাজিয়া গিয়াছে, অথচ গোয়ালা হয়ত তখনও দুধ লইয়া আসিল না, ছেলে কাঁদিতেছে, সঙ্গে-সঙ্গে মায়ের মনও কাঁদিতেছে, ওদিকে হয় ত ছেলের বাবার আফিসে যাইবার সময় হইয়াছে, তাড়াতাড়ি চারিটি মুখে গুঁজিয়া আফিসে যাইবেন। ছেলের দুধ নাই বাজার হইতে একটা হর্লিক্‌স্ মিল্ক্ লইয়া আসিলেন, কি জানি আবার কবে গোয়ালা এমনই বিভ্রাট ঘটাইবে। অভাবের সংসারে আবার ৩৲ টাকা বেশী খরচ হইয়া গেল। শুধু স্বাস্থ্য নয়, সংসারে অশান্তিও এর জন্য বড় কম হয় না। বাংলায় দুধের অভাবে সকল দিক্ দিয়া জাতির অবনতি ঘটিতেছে।

টিনের জমাট দুগ্ধ ও হর্লিক্‌স্ মিল্ক্ প্রভৃতিতে এদেশ ছাইয়া গিয়াছে আমেরিকা সুইজারলণ্ড্ ঐসমস্ত বিক্রয় করিয়া এই দরিদ্র দেশ হইতে লক্ষ-লক্ষ টাকা লইয়া যাইতেছে। যত দিন যাইতেছে, আমেরিকা সুইজারলণ্ড্ দুধের বাজার ততই একচেটিয়া করিয়া লইতেছে। কলিকাতায় এমন কোনো ছাত্রাবাস বা চাকুরিয়াদের মেস্ নাই যেখানে চায়ের জন্য জমাট দুগ্ধের ব্যবহার না হয়। আর এই যে লক্ষ-লক্ষ ছাত্র তাহাদের জীবনের শ্রেষ্ঠতম অংশ ছাত্রাবাসে এই জমাট দুগ্ধ খাইয়া খাঁটি দুগ্ধের অভাব পূরণ করিতেছে ইহারাই দেশের ভবিষ্যৎ বংশধরের জনক। কলিকাতা বৃহৎ সহর, সেখানে দুগ্ধের অভাবের কারণ বুঝিতে পারি, কিন্তু বাংলার পল্লীতে দুধের অভাব বড়ই আক্ষেপের বিষয়। পূর্ব্ববঙ্গের কোনো-কোনো জেলায় এখনও দুধের কিছু সুবিধা আছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা সত্যই বড় শোচনীয়। দেশের দারিদ্র্য দিন-দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। দেশের শতকরা একজন লোকও দিনে একবার দুধ খাইতে পায় কি না সন্দেহ। ছোটো ছেলেমেয়েদের যতদিন পর্য্যন্ত দুধ না হইলে চলে না অর্থাৎ অন্য কোনো দ্রব্য তাহারা খাইতে পারে না, ঠিক তত দিনই তাহারা গোয়ালার জোগানো দুগ্ধ পাইয়া থাকে। যেমনই তাহাদের বৎসর-খানেক বয়স হইল, আস্তে-আস্তে দুগ্ধের বন্দোবস্ত উঠিয়া গেল, জীবনে হয়ত তাহাদের দুগ্ধের সাক্ষাৎ আর মিলিল না। ফলে নানা-প্রকার রোগ তাহাদের জীবনের সাথী হইল, জীবন ও সংসার অশান্তিময় হইয়া উঠিল।

এইত গেল দুধের কথা। এই দুধ হইতে রসজ্ঞ বাঙালী ছানাবড়া, রসগোল্লা, প্রভৃতি কত রসের জিনিষের সৃষ্টি করিয়াছে। দুগ্ধের অভাবে ছানার মূল্য বাড়িয়া গিয়াছে, আর দরিদ্র বাঙালী রাস্তা দিয়া যাইবার সময় লোলুপ-দৃষ্টিতে ময়রার দোকানের দিকে চাহিয়া চলিয়া যায়। ছানাবড়া, রসগোল্লা আজ তাহাদের আকাশের চাঁদের মতনই দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। খাঁটি গাওয়া ঘি, ভয়সা ঘি পাওয়া অসম্ভব। চর্ব্বিতে দেশ ভরিয়া গিয়াছে, আর চর্ব্বিপক্ক খাবার খাইয়া বিলাসী বাঙালী তাহার পরমায়ু দিন-দিন কমাইয়া আনিতেছে।

এ-সমস্যার সমাধান করিতে হইবে; এজাতীয় অবনতির প্রতিকার করিতে হইবে; তাহা যদি না করো, তবে রেলে ষ্টীমারে তোমার অপমান ও দুর্গতির সীমা থাকিবে না। তোমার ঘরের কুলবধূদের দুর্বৃত্তেরা ধরিয়া লইয়া যাইবে; তুমি শুধু তাহার সাক্ষী হইয়া রহিবে মাত্র।

বাংলাদেশে দুধের কষ্ট গরুর অভাবের জন্য, একথা বলা ঠিক সঙ্গত নয়। বাংলাদেশে গরু আছে যথেষ্ট, কিন্তু গরুর মতন গরু নাই। বাঙালী নিজে যেমন দৈর্ঘ্যে প্রস্থে সব দিকেই কম, বাংলায় গরুও ঠিক তেম্‌নিই দুর্ব্বল হাড়-সর্ব্বস্ব। বাংলার গরুর নিকট হইতে দুধের আশা করা বাতুলতা মাত্র। তাহাদের শরীরধারণের জন্য যতটুকু রক্তের প্রয়োজন তাহাই তাহাদের শিরাতে নাই, সে তোমাকে দুগ্ধ দিবে কোথা হইতে? বোম্বাইর মিঃ জস্‌ওয়ালা গোজাতির উন্নতিসাধনের জন্য ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদিগকে উদ্দেশ করিয়া খবরের কাগজে একখানি পত্র লিখিয়াছেন তাহাতে তিনি দুইটি উপায়ের

কথা বলিয়াছেন—(১) Saving of prime cows (২) Increase of grazing land. মিঃ অসোয়ালার প্রথম প্রস্তাব-সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন উঠিতে পারে না। তাঁহার দ্বিতীয় প্রস্তাব-সম্বন্ধে কিছু আপত্তি উঠিতে পারে। ১৯২১।২২ সালের সেন্সাস্-অনুসারে সমগ্র ভারতবর্ষে একহাজার চারশত বাটলক্ষ গরু আছে বলিয়া জানা যায় অর্থাৎ প্রত্যেক একশ একর আবাদী জমির জন্য প্রায় ৬৫টা গরু আছে। আমেরিকা প্রভৃতি দেশে প্রত্যেক গাভীর সারা বৎসরের আহারের জন্য প্রায় ১২ একর করিয়া জমির প্রয়োজন। অবশ্য এই জমি হইতে তাহার সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ হয়। এইহিসাবে দেখিতে গেলে যদি সমগ্র ভারতবর্ষকে গোচারণ ভূমিতে পরিণত করা হয় তাহা হইলেও কতকগুলি গরুকে উপবাস করিতে হইবে।

তাহা ছাড়া গোচারণ ভূমির দ্বিতীয় অসুবিধা এই যে, যখন অনাবৃষ্টি হইবে তখন ঐসমস্ত স্থানে গরুর কোনো খাদ্যই জন্মাইবে না এবং সঙ্গে-সঙ্গে দুই দিক্ দিয়া আর্থিক ক্ষতি হইবে। অতএব এই প্রস্তাব কতদূর যুক্তিসঙ্গত তাহা ভাবিবার বিষয়।

দুগ্ধ-সমস্যা সমাধান করিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে মনোযোগী হইতে হইবে।—

(১) আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গোজনন (Scientific Breeding)। সেদিন পাইওনিয়র-এ পড়িলাম যে—India is not in need of quantity but of quality, অর্থাৎ ভারতবর্ষের গরুর উৎকর্ষ-সাধন করিতে হইবে, তাহার সংখ্যা বাড়াইবার প্রয়োজন নাই। উত্তম-জাতীয় ও উত্তম লক্ষণযুক্ত ষাঁড়ের সহিত উত্তম জাতীয়া এবং সুলক্ষণা গাভীর সম্মিলন করাইয়া উত্তম বংশধরের সৃষ্টি করিতে হইবে। এ-বিষয়ে বাংলাদেশের জেলা-বোর্ড্ ও মিউনিসিপ্যালিটির যথেষ্ট কার্য্য করিবার আছে। দেশের লোক দরিদ্র এবং তাহাদের প্রত্যেকের গরুর সংখ্যাও কম, অতএব তাহারা কখনও ভালো ষাঁড় কিনিতে বা রাখিতে পারিবে না। জেলা বোর্ড্ প্রত্যেক থানাতে থানার গরুর সংখ্যা-অনুসারে মণ্ট্গোমেরী, হিসার অথবা সিন্ধি-জাতীয় ষাঁড় রাখিবেন এবং থানার অন্তর্গত সমস্ত গাভীর পালের সঙ্গে এই ষাঁড় ছাড়িয়া দিতে হইবে। সহরে ষাঁড় জোগাইবার ভার মিউনিসিপ্যালিটির উপর থাকিবে। মিউনিসিপ্যালিটি অথবা জেলাবোর্ডের কর্ত্তারা প্রতি গর্ভিণী-গাভীর জন্য সামান্য কিছু কর ধার্য্য করিতে পারেন। গরুর পালের সহিত হীন-স্বাস্থ্য ষাঁড়কে কোনো-প্রকারে ঘুরিতে দেওয়া হইবে না এবং সম্ভব ও প্রয়োজন বিবেচনা করিলে আইন দ্বারা তাহার প্রতিরোধ করিতে হইবে। দেশের গোজাতির উন্নতি করিতে হইলে দেশে ভালো ষাঁড়ের আমদানি করিতেই হইবে।

(২) গোশালার স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে মনোযোগী হইতে হইবে এবং গরুর যখন যাহা প্রয়োজন তাহা বুঝিয়া কার্য্য করিতে হইবে। মানুষের বাসস্থানের জন্য যেমন আলো-বাতাসের প্রয়োজন, গোশালার জন্যও তেমনই আলো বাতাস চাই।

(৩) সস্তাতে গরুর খাদ্য সরবরাহ করিতে হইবে। ইহার জন্য দেশের চাষীদিগকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ করিবার উপায় শিক্ষা দিতে হইবে এবং তাহার ভার গবর্ণ্মেণ্টকে লইতে হইবে।

(৪) সমবায়-সমিতি করিয়া দেশে ডেয়ারি স্থাপন করিতে হইবে এবং এ-বিষয়ে দেশের যুবকদের যত্নবান্ হইতে হইবে তাহা হইলে দেশের অন্ন-সমস্যার কিছু প্রতিকার হইবে।

(৫) কলিকাতা ঢাকা প্রভৃতি সহরের মিউনিসিপ্যালিটি অথবা করপোরেশন্কে তাহাদের নিজেদের তত্ত্বাবধানে ডেয়ারি স্থাপন করিতে হইবে।

(৬) ভালো পানীয় জলের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৭) সহরে দুগ্ধ যোগাইবার জন্য প্রত্যেক রেল কোম্পানীকে সস্তাদরে এবং বৈজ্ঞানিক-সম্মত প্রণালীতে দুগ্ধ লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং তাহার জন্য আইন প্রণয়ন করিতে হইবে।

(৮) দেশের লোককে গোপালন-সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে গোপালন-সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে এবং পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে ডিগ্রি অথবা ডিপ্লোমা দেওয়া হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাহাতে গোপালন শিক্ষার সুব্যবস্থা হইতে পারে সে-বিষয়ে

গ্রীসের পাঠশালা

চিত্রকর র‍্যাফেল্

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

কর্তৃপক্ষকে ও দেশের লোককে উদ্‌যোগী হইতে হইবে। এইসমস্ত বিষয় আর উপেক্ষা করিবার জিনিষ নয়। দেশের লোককে উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইবে, তবেই হিন্দুর ভগবতীপূজা সার্থক হইবে, জাতির স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য ও শক্তি ফিরিয়া আসিবে। অন্ন-সমস্তার প্রতিকার হইবে। ইউরোপ ও আমেরিকা আজ প্রায় একশত বৎসর হইল এ-বিষয়ে মন দিয়াছে ও গোজাতির অসম্ভব উন্নতি করিয়াছে বাঙালী, তুমি কি চিরকালই পিছনে পড়িয়া রহিবে ?

প্রজাপতির ব্রহ্মবাদ

শ্রী মহেশচন্দ্র ঘোষ

প্রজাপতির ব্রহ্মবাদ ছান্দোগ্য উপনিষদের অষ্টম অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। উপাখ্যানচ্ছলে উপদেশ দিলে সেই উপদেশ সহজে হৃদয়ঙ্গম করা যায়, সেইজন্য ঋষি একটা উপাখ্যানের অবতারণা করিয়াছেন। এস্থলে বক্তা—প্রজাপতি; শ্রোতা—ইন্দ্র ও বিরোচন।

একটি উক্তি

একসময়ে প্রজাপতি বলিয়াছিলেন :—

"যে-আত্মা পাপরহিত, জরারহিত, মৃত্যুরহিত, শোক-রহিত, অশনেচ্ছা-রহিত, পিপাসা-রহিত, যিনি সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প—তাঁহাকেই জানিতে হইবে। যিনি তাঁহাকে অনুসন্ধান করিয়া অবগত হন, তিনি সমুদায় লোক ও সমুদায় কাম্যবস্তু লাভ করেন"। ৮।৭।১

দেবগণ ও অসুরগণ উভয়ই লোক-পরম্পরায় এই উপদেশের কথা শ্রবণ করিয়াছিল। এই বিষয়ে চিন্তা করিয়া তাহারা সঙ্কল্প করিল যে, এই আত্মাকে অনুসন্ধান করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র এবং অসুরগণের মধ্যে বিরোচন প্রজাপতির গৃহে আগমন করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। ৩২ বৎসর পরে প্রজাপতি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—

"কি ইচ্ছা করিয়া তোমরা দুইজন ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিলে ?"

তাহারা তখন প্রজাপতির সেই আত্মতত্ত্বের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিল—সেই আত্মাকেই জানিতে ইচ্ছা করিয়া আমরা দুইজন বাস করিয়াছি।

প্রথম উপদেশ

তখন প্রজাপতি বলিলেন—

"চক্ষুতে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হন, ইনিই আত্মা। ইনিই অমৃত, অভয়, ইনিই ব্রহ্ম।" ৮।৭।৩

প্রজাপতি কি অর্থে এই উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা বলা কঠিন। ইহার দুই-প্রকার অর্থ হইতে পারে।

প্রথম অর্থ

যদি কাহারও চক্ষুর প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায়, তাহা হইলে সেই চক্ষুতে একটা পুরুষ দৃষ্ট হয়। এই পুরুষ প্রতিবিম্ব ভিন্ন আর কিছুই নহে। যিনি চক্ষুর দিকে দৃষ্টিপাত করেন, তাঁহারই মূর্ত্তি ঐ চক্ষুতে প্রতিবিম্বিত হয়। এই প্রতিবিম্বকে 'ছায়াপুরুষ' নাম দেওয়া হইয়াছে। কেহ-কেহ বলেন এই ছায়াপুরুষকেই প্রজাপতি এস্থলে আত্মা বলিয়াছেন।

দ্বিতীয় অর্থ

কিন্তু ব্যাখ্যাকর্ত্তৃগণ অনেকেই বলেন, অজ্ঞ লোকেই ছায়াপুরুষকে আত্মা বলিয়া মনে করে। ছায়াপুরুষ দৃষ্ট হয় চর্ম্ম-চক্ষু দ্বারা; আর প্রকৃত চাক্ষুষ পুরুষ যিনি, তাঁহাকে দেখা যায় জ্ঞান-চক্ষু দ্বারা। উভয় পুরুষই চক্ষুতে; তবে ছায়াপুরুষ একটি দৃষ্ট বস্তু, আর চাক্ষুষ পুরুষ স্বয়ং দ্রষ্টা—তিনি চক্ষুতে থাকিয়া চক্ষু দ্বারা দর্শন করেন। শঙ্কর-প্রমুখ পণ্ডিতগণ বলেন—প্রজাপতি দ্রষ্টৃরূপী চাক্ষুষ পুরুষকেই আত্মা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

কোনো অর্থই অসঙ্গত হয় না। কিন্তু আমাদিগের

মনে হয়, প্রজাপতি প্রথম অর্থেই উক্ত বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, কিংবা ইচ্ছা করিয়াই উক্ত উক্তিকে দুর্ব্বোধ করিয়াছিলেন। এ-প্রকার করিবার বিশেষ কারণও ছিল। উচ্চ সাধক উক্ত উক্তিকে উচ্চ অর্থে গ্রহণ করিবে আর নিম্ন সাধক গ্রহণ করিবে নিম্ন অর্থে। ইন্দ্র ও বিরোচন কোন্ শ্রেণীর সাধক, ইহা পরীক্ষা করিবার জন্যই প্রজাপতি হয়ত ঐ দ্ব্যর্থ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন। পরে প্রমাণিত হইয়াছিল যে, ইহারা নিম্নশ্রেণীর সাধক—ইহারা উক্ত বাক্যকে প্রথম অর্থেই গ্রহণ করিয়াছিল। উভয়েই বুঝিয়াছিল যে চক্ষুতে যে ছায়াময় পুরুষ দৃষ্ট হয়, তাহাই আত্মা।

ইহার পরে তাহারা অনুরূপ আরও দুইটি পুরুষের বিষয় প্রশ্ন করিল।

"এই যে পুরুষ জলে দৃষ্ট হয়, আর এই যে পুরুষ দর্পণে দৃষ্ট হয়, ইহা কে?"

প্রজাপতি বলিলেন—"এ-সমুদায়েই আত্মা দৃষ্ট হন"। ৮।৭।৩

অসত্য কথা?

এস্থলে কেহ-কেহ বলেন প্রজাপতি অসত্য কথা বলিয়াছেন। আমরা এ-প্রকার বলি না,—আমাদিগের বিশ্বাস প্রজাপতি যাহা বলিয়াছিলেন তাহা অতি নিম্ন-স্তরের কথা। যাহা নিম্নস্তরের কথা, তাহা যে অসত্যই হইবে, তাহা নহে। আর সত্যেরও শ্রেণী-বিভাগ আছে—কোনো সত্য অল্প-পরিমাণে সত্য, আর কোনো সত্য অধিক-পরিমাণে সত্য। অতি প্রাচীনকালে যে-সমুদায় মানব-সভ্যতার অতি নিম্নতম স্তরে অবস্থিত ছিল, তাহাদিগের নিকট যাজ্ঞবল্ক্যের ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যক্ত করা সম্ভব হইলে, তাহারা কি তাহা বুঝিতে পারিত? তাহারা দেহ লইয়াই থাকিত, দেহের সুখ-দুঃখ ভিন্ন তাহারা অধিক-কিছু বুঝিত না। এই শ্রেণীর লোকের নিকট তত্ত্ববিদ্যা বোধগম্য করিতে হইলে, অতি নিম্নতম সত্য হইতেই আরম্ভ করিতে হয়। ইহাদিগের নিকটে দেহই আত্মা। প্রকৃত পক্ষে একসময়ে দেহই আত্মার স্থান অধিকার করিয়াছিল। আত্মা শব্দের ইতিহাসই তাহার প্রমাণ। ইহার মৌলিক অর্থ দেহ (প্রবাসী, ১৩২৭, কার্ত্তিক, 'আত্মা কি'? নামক প্রবন্ধ)। আমাদিগের নিকট আত্মাই প্রিয়তম ও শ্রেষ্ঠতম বস্তু এবং প্রাচীনতম কালেও আত্মাই প্রিয়তম ও শ্রেষ্ঠতম বস্তু ছিল। তবে সে-যুগে আত্মা বলিতে লোকে বুঝিত 'দেহ'। এই অসভ্যদিগের নিকট যদি কেহ প্রচার করিত যে, দেহই শ্রেষ্ঠতম ও প্রিয়তম বস্তু এবং এই দেহেরই কল্যাণ সাধন করিতে হইবে—আমরা কি বলিব যে এই উপদেষ্টা অসত্য কথা বলিয়া-ছিলেন? অধিকারিভেদ স্বীকার করিতেই হইবে। প্রজাপতিও অধিকারিভেদ স্বীকার করিতেন। এই-জন্য তিনি নিম্নতম সত্য হইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষা দিবার পন্থা ছিল নিম্নতম স্তর হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চতম স্তরে অধিরোহণ।

প্রাচীন কালের বহু আচার্য্য এইপ্রকার পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। নারদ-সনৎকুমার সংবাদে দেখিতে পাই যে, সনৎকুমার নারদকে প্রথমে বলিয়াছিলেন—'নামকেই ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিতে হইবে"। ইহা অতি নিম্ন-স্তরের কথা। নারদ ইহার পরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভগবন্! নাম অপেক্ষা কি শ্রেষ্ঠ কিছু আছে? ইহার পরে আচার্য্য বলিলেন—"নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি?" এই-ভাবে অগ্রসর হইয়া সনৎকুমার সর্ব্বশেষে শ্রেষ্ঠতম তত্ত্বের উপদেশ দিয়াছিলেন। প্রজাপতিও এস্থলে এই পথই অবলম্বন করিয়াছিলেন। এইজন্যই তিনি প্রথমে বলিয়া-ছিলেন অতি নিম্নস্তরের কথা।

কিন্তু ইহা বলিয়া তিনি উদাসীন থাকেন নাই। যাহাতে শিষ্যগণ চিন্তাদ্বারা নিম্নতর স্তর বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারে এবং সেই স্তর অতিক্রম করিয়া উর্দ্ধতর স্তরে আরোহণ করিবার জন্য সচেষ্ট হইতে পারে, তিনি তাহারও উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত উপদেশ দিবার পরই তিনি শিষ্যগণকে বলিলেন:—

"জলপূর্ণ পাত্রে আপনাকে (দেখ), দেখিয়া আত্মার বিষয় যাহা বুঝিতে পারিবে না, তাহা আমাকে বলিও"। ৮।৮।১

তাহারা জলপূর্ণ পাত্রে আপনাদিগকে দেখিল। তখন প্রজাপতি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি দেখিলে?"

তাহারা বলিল :—

আমরা লোম নখ পর্য্যন্ত আত্মার (অর্থাৎ নিজের) প্রতিরূপ দেখিলাম"। ৮।৮।১

ইহার পর তাহারা প্রজাপতির আদেশে সুন্দর অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া সুবসন পরিধান করিয়া এবং পরিষ্কৃত হইয়া জলপূর্ণ পাত্রে আপনাদিগকে আবার দর্শন করিল। তখন প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কি দেখিলে?" ৮।৮।২

তাহারা বলিল—

"হে ভগবন্! এই আমরা যেমন সুন্দর অলঙ্কারে ও সুবসনে বিভূষিত এবং পরিষ্কৃত, জলের মধ্যে এই দুইজনও তেমনি অলঙ্কারে ও সুবসনে বিভূষিত এবং পরিষ্কৃত।"

প্রজাপতি বলিলেন :—

"ইনিই আত্মা; ইনিই অমৃত ও অভয়; এবং ইনিই ব্রহ্ম।" ৮।৮।৩

ইহা শুনিয়া দুই জনে শান্তহৃদয়ে প্রত্যাগমন করিল।

বিশ্লেষণ

বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাউক, ব্যাপারটি কি। আমরা এপর্য্যন্ত চারিটি ঘটনা পাইলাম—

১। প্রজাপতির এই উক্তিটি জনসমাজে প্রচারিত ছিল, "আত্মা অপাপ, অজর, অমর, অশোক, অশনেচ্ছা-রহিত, পিপাসারহিত ইত্যাদি।"

ইহাই শুনিয়া ইন্দ্র ও বিরোচন প্রজাপতির নিকট শিষ্যভাবে উপস্থিত হইয়াছিল।

২। দ্বিতীয় উক্তি—চাক্ষুষ পুরুষই আত্মা।

৩। তৃতীয় উক্তি—জলে প্রতিবিম্বিত মানবদেহই আত্মা।

৪। বেশভূষাতে দেহের পরিবর্ত্তন হইলে প্রতিবিম্বেরও পরিবর্ত্তন হয়। এই প্রতিবিম্বও আত্মা—ইহাই চতুর্থ উক্তি।

শিষ্যগণ চক্ষুতে প্রতিবিম্বিত ছায়াপুরুষকেই চাক্ষুষ পুরুষ বলিয়া মনে করিয়াছিল। এই ছায়াপুরুষ যে আত্মা নহে তাহা নির্ণয় করা কঠিন ছিল না। পূর্ব্বোক্ত চারিটি উক্তিকে একসঙ্গে বিচার করিলেই ইহা সিদ্ধান্ত করা যাইত। কিন্তু শিষ্যগণ এপ্রকার সিদ্ধান্ত করিতে পারে নাই। শেষ দুইটি ঘটনার একমাত্র উদ্দেশ্য যে, ইহা দ্বারা শিষ্যগণ সিদ্ধান্ত করিতে পারিবে যে দেহের প্রতিবিম্ব কখন অপাপ, অজর, অমর, অশোক আত্মা হইতে পারে না। প্রথম উক্তিতে বলা হইয়াছে যে, আত্মা অপাপ, অজর, অমর ইত্যাদি।

কিন্তু ইহা সাধারণ সত্য যে দেহ অপাপ, অজর, অমর নহে; সুতরাং দেহ আত্মা নহে। দেহ যদি আত্মা না হয়, দেহের প্রতিবিম্বও আত্মা হইতে পারে না। জলে নিপতিত প্রতিবিম্বের দুইটি পৃথক্-পৃথক্ দৃষ্টান্ত দেখানো হইয়াছে। প্রথম দৃষ্টান্তকে দৃঢ় করিবার জন্যই দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত। প্রথম দৃষ্টান্ত যদি প্রকৃত জ্ঞান উৎপাদন না করে, দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত করিতে পারে। এইজন্য প্রজাপতি দুইটি ঘটনা উপস্থিত করিলেন। কিন্তু ইহাতেও তখন ইহাদিগের চৈতন্য হইল না।

যাহারা নিজে বিচার করিতে পারে না, তাহারা আত্ম-তত্ত্ব লাভ করিবার অধিকারী নহে। যাহাদের চক্ষু নাই তাহারা কি প্রকারে দর্শন করিবে? ব্রহ্মলাভের জন্য কেবল আচার্য্যের উপদেশ যথেষ্ট নহে। আচার্য্য পারেন কেবল পথ দেখাইয়া দিতে; অগ্রসর হইতে হইবে শিষ্যকে। প্রজাপতি সত্যনির্ণয়ের উপযোগী সমুদায় ঘটনা শিষ্যগণের সমক্ষে আনিয়া দিলেন, তবুও তাহারা সত্য নির্ণয় করিতে পারিল না। উচ্চতর সত্য লাভ না করিয়াই তাহারা গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল। প্রজাপতি বুঝিলেন—এখনও ইহারা আত্মলাভের উপযুক্ত হয় নাই; তিনি বসিয়া-বসিয়া তাহাদিগের ভবিষ্যৎ ভাবিতে লাগিলেন।

ইন্দ্রের সন্দেহ

কিন্তু পথিমধ্যেই ইন্দ্রের মনে ঐ উপদেশ বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইল। তখন সে গুরুসন্নিধানে প্রত্যাগমন করিল। প্রজাপতি বলিলেন :—

"মঘবন্! তুমি শান্তহৃদয়ে বিরোচনের সহিত চলিয়া গিয়াছিলে—আবার কি মনে করিয়া প্রত্যাগমন করিলে?"

ইন্দ্র বলিল :—

"হে ভগবন্! এই শরীর স্বালঙ্কৃত হইলে (জলে প্রতিবিম্বিত) শরীরও স্বালঙ্কৃত হয়। ইহার পরিধানে সুবসন হইলে উহারও পরিধানে সুবসন হয়, ইহা

পরিষ্কৃত হইলে, উহাও পরিষ্কৃত হয়। এইপ্রকার, ইহা অন্ধ হইলে উহাও অন্ধ হয়, ইহা খঞ্জ হইলে উহাও খঞ্জ হয়, ইহা ছিন্নাবয়ব হইলে উহাও ছিন্নাবয়ব হয়। ইহার শরীর নষ্ট হইলে উহাও বিনষ্ট হয়। এবিদ্যাতে আমি কোনো কল্যাণ দেখিতেছি না"।

প্রজাপতি বলিলেন :—

"হে মঘবন্! হাঁ, এইপ্রকারই। তোমার নিকট ইহা পুনরায় ব্যাখ্যা করিব ; তুমি আবার ৩২ বৎসর বাস কর।"

ইন্দ্র আরও ৩২ বৎসর বাস করিলেন। তদনন্তর প্রজাপতি তাঁহাকে উপদেশ দিলেন।

দ্বিতীয় উপদেশ

প্রজাপতির উপদেশ এই :—

"এই যিনি স্বপ্নাবস্থায় পূজ্যমান হইয়া বিচরণ করেন, তিনিই আত্মা ; তিনিই অমৃত ও অভয় ; তিনিই ব্রহ্ম"। ৮।১০।১

এই উপদেশ লাভ করিয়া ইন্দ্র শান্তহৃদয়ে চলিয়া গেল।

আবার সন্দেহ

পথিমধ্যে এবারও ইন্দ্রের মনে ঐ উপদেশ-বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইল। তখন সে আবার গুরুসন্নিধানে আগমন করিল। প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন—

"আবার কি মনে করিয়া ফিরিয়া আসিলে?"

তখন ইন্দ্র বলিল :—

"হে ভগবন্! এই শরীর অন্ধ হইলে যদিও এই স্বপ্নাত্মা অন্ধ হয় না, শরীর খঞ্জ হইলে যদিও ইহা খঞ্জ হয় না, শরীরের দোষে যদিও ইহা দূষিত হয় না ; শরীরকে বিনাশ করিলে যদিও ইহা বিনষ্ট হয় না—তথাপি (স্বপ্নে দেখা যায়) কেহ যেন ইহাকে বিনাশ করিতেছে, কেহ যেন ইহার পশ্চাতে ধাবিত হইতেছে, ইহা যেন দুঃখ ভোগ করিতেছে এবং ইহা যেন ক্রন্দন করিতেছে। এমতে আমি কোনো কল্যাণ দেখিতেছি না।"

প্রজাপতি বলিলেন—"হে মঘবন্! ইহা এইপ্রকারই। আমি তোমার নিকট ইহা আবার ব্যাখ্যা করিব। তুমি আবার ৩২ বৎসর বাস কর।"

ইন্দ্র আবার ৩২ বৎসর বাস করিল। তখন প্রজাপতি তাহাকে অন্য-এক উপদেশ দিলেন।

তৃতীয় উপদেশ

সে উপদেশটি এই :—

"এই যে প্রসুপ্ত জীব একীভূত ও প্রসন্নতা প্রাপ্ত হয় এবং স্বপ্ন দেখে না, ইনিই আত্মা। ইনিই অমৃত, ও অভয় এবং ইনিই ব্রহ্ম।" ৮।১১।১

তখন এই উপদেশ লাভ করিয়া ইন্দ্র প্রত্যাগমন করিল।

এবারও সন্দেহ

এবারও পথিমধ্যে ইন্দ্রের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল। তখন আবার সে প্রজাপতি-সমীপে প্রত্যাগমন করিল। প্রজাপতি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আবার কি মনে করিয়া প্রত্যাগমন করিলে?"

ইন্দ্র বলিল—"হে ভগবন্! সুষুপ্ত অবস্থায় ইহা নিজের বিষয়ই জানিতে পারে না যে 'ইহাই আমি' ; এবং ইহা ভূতসমূহকেও জানিতে পারে না। এই সময়ে ইহা বিনাশ-প্রাপ্তই হয় (অথবা যেন বিনাশপ্রাপ্ত হয়)। এই উপদেশে আমি কল্যাণ দেখিতেছি না"।

প্রজাপতি বলিলেন—

"হে মঘবন্! ইহা এইপ্রকারই। এবিষয়ে তোমাকে পুনরায় উপদেশ দিব এবং প্রকৃত আত্মা হইতে অন্য-কিছু ব্যাখ্যা করিব না। তুমি আরও ৫ বৎসর বাস কর"।

ইন্দ্র আরও পাঁচ বৎসর বাস করিলেন। এই রূপে তাঁহার ১০১ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য উদ্‌যাপন করা হইল। ৮।১১

শেষ উপদেশ

তখন প্রজাপতি বলিলেন—

"হে মঘবন্। এই শরীর মর্ত্ত্য, মৃত্যুগ্রস্ত। কিন্তু ইহাই অমৃত, অশরীর আত্মার অধিষ্ঠান। শরীরী আত্মার প্রিয়াপ্রিয় সংযোগ কখন বিনাশপ্রাপ্ত হয় না (অর্থাৎ প্রিয় ও অপ্রিয়ের সহিত শারীরী আত্মার সর্ব্বদাই যোগ থাকে)। কিন্তু অশরীর আত্মাকে প্রিয় ও অপ্রিয় স্পর্শ করিতে পারে না।

বায়ু অশরীর ; অভ্র, বিদ্যুৎ, মেঘগর্জ্জন—এসমুদায়ও

অশরীর। এই সমুদায় যেমন আকাশ হইতে উত্থিত পরম-জ্যোতিঃ-সম্পন্ন হইয়া স্বীয় স্বীয় রূপে প্রকাশিত হয়, এইরূপ এই প্রসাদগুণসম্পন্ন আত্মা এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরম-জ্যোতিঃ-সম্পন্ন হইয়া বিরাজ করে। (তখন) ইহা উত্তম পুরুষ। তখন—স্ত্রীলোকের সহিতই হউক, বা যানে আরোহণ করিয়াই হউক, বা জ্ঞাতিগণের সহিতই হউক—আহার করিয়া (বা হাস্য করিয়া), ক্রীড়া করিয়া এবং আনন্দ উপভোগ করিয়া বিচরণ করিতে থাকে। যে-দেহে তাহার উৎপত্তি, সেই দেহকে তখন সে ভুলিয়া যায়। যেমন অশ্ব (বা বলীবর্দ্দ) রথে সংযুক্ত থাকে, তেমনি এই প্রাণও এই দেহে সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে।

তাহার পর যখন এই চক্ষু আকাশে* নিবদ্ধ হয়, (তখন দর্শন করেন) সেই চাক্ষুষ পুরুষই; চক্ষু কেবল দর্শন করিবার জন্য (অর্থাৎ পুরুষই দর্শন করেন; চক্ষু কেবল দেখিবার যন্ত্র মাত্র)। যিনি বুঝিয়াছেন যে, ‘এই আমি আঘ্রাণ করিতেছি’ তিনিই আত্মা; নাসিকা কেবল আঘ্রাণ করিবার জন্য। যিনি বুঝিতেছেন যে, ‘এই আমি বাক্য উচ্চারণ করিতেছি’, তিনিই আত্মা বাগিন্দ্রিয় কেবল বাক্য উচ্চারণ করিবার জন্য। যিনি বুঝিতেছেন, ‘এই আমি শ্রবণ করিতেছি’ তিনিই আত্মা, শ্রোত্র কেবল শ্রবণ করিবার জন্য। যিনি বুঝিয়াছেন যে ‘আমিই মনন করিতেছি’—তিনিই আত্মা; মন তাঁহার দৈব চক্ষু। তিনি মনোরূপ এই দৈব চক্ষু দ্বারা সমুদায় কাম্যবস্তু দর্শন করিয়া আনন্দ লাভ করেন।” ৮।১২

এস্থলে প্রজাপতি যাহা বলিলেন তাহার ভাবার্থ এই :—

দেহ মর্ত্ত্য; আত্মা অমর; কিন্তু এই মর্ত্ত্য দেহই অমর আত্মার অধিষ্ঠান। যতদিন দেহ, ততদিনই সুখ-দুঃখ। অশরীর আত্মা সুখদুঃখের অতীত। আত্মা যদি প্রকৃত জ্ঞানলাভ করে, তাহা হইলে দেহান্তে স্ব-রূপ প্রাপ্ত হয়। আত্মাই দ্রষ্টা, ঘ্রাতা, বক্তা ও শ্রোতা; চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহ কেবল দর্শনাদির উপায় মাত্র। যাজ্ঞবল্ক্যাদি ঋষি মনে করিতেন যে যখন আত্মা স্ব-রূপ লাভ করেন তখন তাহার সংজ্ঞা থাকে না। প্রজাপতির মতে তাহার সংজ্ঞা থাকে; কেবল তাহাই নহে, তাহার পক্ষে আমোদ-প্রমোদাদিও সম্ভব।

আত্মবিদ্যার ফল

এই আত্মবিদ্যার ফল-বিষয়ে প্রজাপতি যাহা বলিয়াছেন, তাহা এই :—

“ব্রহ্মলোকস্থ দেবগণ এই আত্মার উপাসনা করেন এবং তাঁহারা সমুদায় লোক ও সমুদায় কাম্যবস্তু লাভ করেন। এবং যিনি এই আত্মাকে অবগত হয়েন, তিনিও সমুদায় লোক ও সমুদায় কাম্যবস্তু লাভ করেন।” ৮।১২।৬

এখানে আত্মার উপাসনার কথা বলা হইল। এই আত্মাই ব্রহ্ম। আত্মাই যে ব্রহ্ম, তাহা এই উপদেশেরই অন্যত্রও বলা হইয়াছে। ৮।৭।৩, ৮।৮।৩, ৮।১০।১, ৮।১১।১।

আত্মবিৎ সমুদায় লোক ও সমুদায় কাম্যবস্তু লাভ করেন; ইহার অর্থ এই—

“আত্মবিৎ অনুভব করেন যে তিনিই ব্রহ্ম, সমুদায় লোক, এবং সমুদায় কাম্যবস্তু তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং সমুদায়ই তাঁহার।”

সিদ্ধান্ত

প্রজাপতির ব্রহ্মবাদ আলোচনা করিয়া আমরা এই সমুদায় তত্ত্ব লাভ করিতেছি।

১। দেহ ও ইন্দ্রিয়সমূহ মর্ত্ত্য; আত্মা দেহাদি হইতে পৃথক্ এবং অমর।

২। যাজ্ঞবল্ক্য ও উদ্দালক সুষুপ্তির অবস্থাকে ব্রহ্মাবস্থা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। প্রজাপতির মতে ইহা বিনাশেরই অবস্থা (বিনাশম্ এব)।

৩। যখন আত্মা পরমজ্ঞান লাভ করিয়া দেহত্যাগ করেন, তখন তিনি স্বরূপে অবস্থান করেন। তাঁহার আত্মজ্ঞান কখনই বিলুপ্ত হয় না।

৪। আত্মাই ব্রহ্ম।

৫। যাজ্ঞবল্ক্যের ব্রহ্মবাদে জগতের স্থান নাই। কিন্তু প্রজাপতি সর্ব্ব অবস্থাতেই জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। আত্মজ্ঞ ব্যক্তি অনুভব করেন যে, তিনি ব্রহ্মই; সুতরাং তিনি ইহাও অনুভব করেন যে সমুদায় জগৎ তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁহারই।

* শঙ্করপ্রমুখ পণ্ডিতগণ এই অংশের এইপ্রকার অর্থ করেন—“তাহার পর এই দর্শনেন্দ্রিয় চক্ষুর অভ্যন্তরস্থ আকাশে যে-স্থলে (অর্থাৎ কৃষ্ণ তারকাতে) অনুপ্রবিষ্ট হয়, সেই স্থলেই চক্ষুর অধিষ্ঠাতৃ পুরুষ।”

মৃত্যু ও নচিকেতা

শ্রী মোহিতলাল মজুমদার

[উদ্দালকি-আরুণির পুত্র বালক নচিকেতা পিতৃসত্যরক্ষার জন্য যমপুরে গমন করেন। সে সময়ে যম গৃহে না থাকায় তাঁহাকে তিন রাত্রি অনশনে থাকিতে হয়। অতঃপর, যম গৃহে ফিরিয়া তাঁহার যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করেন, এবং অতিথিসৎকারে বিলম্ব হওয়ায় নচিকেতাকে ঈপ্সিত বর প্রার্থনা করিতে বলেন।]

নচিকেতা

বৈবস্বত! অতিথির করিবে তর্পণ
বরদানে? অন্য বর দিও না আমায়,—
আমি চাই নিরখিতে চির-অগোচর
তোমার স্বরূপ-রূপ, অমৃত-বান্ধব!
আবরণ কর' উন্মোচন, জ্যোতিষ্মান্!—
অন্ধ আঁখি জ্বলিতেছে দৃষ্টি-পিপাসায়।
বাণী তব কর্ণে পশে প্রতিধ্বনিসম,
বৈতরণী-জলস্রোতে নাহি কলরব—
বায়ু যেন নহে শব্দবহ! নাহি হেথা
ছায়াতপ, নেত্রে মোর কুহেলি দুলিছে!
বিশাল তোমার পুরী দিবানিশাহীন—
তারি মাঝে ধূম্রনীল স্থির স্থাণুসম
কত কাল দাঁড়াইবে, হে মৃত্যু-দেবতা!

মৃত্যু

হে বালক! বৃথা নয় তব অনুযোগ—
তবু সৌম্য! আমি মৃত্যু, তুমি মর্ত্ত্যজন!
এখনো নয়ন দুটি মমতা-মেদুর,
আরক্ত অধরে যেন কাঁপিছে কাকুতি!
পৃথিবীর পাণিস্পর্শে সুন্দর ললাট
সুমসৃণ, নাসিকায় এখনো শ্বসিছে
মর্ত্ত্য-শ্বাস! রূপরসগন্ধভারাতুর
প্রাণের বিচিত্র ছন্দ ধ্বনিছে গভীর
সুললিত কলতানে!—পিতার আদেশে
আসিয়াছ যমপুরে, কেন এ কামনা?
তপন-আতপ্ত ফুলতনু সুকুমার
উপবাসে পথশ্রমে হয়েছে কাতর—
লহ পাদ্য অর্ঘ্য এই, ক্ষম অপরাধ
অতিথির বিলম্ব-সৎকারে; সুস্থ হও,
চাহিও না, নচিকেতা, মৃত্যু-পরিচয়!
যাহা কিছু বরণীয়, শ্রেষ্ঠ, ভূমণ্ডলে—
তাই দিব, সেই সব লহ, প্রিয়তম।

নচিকেতা

ওগো মৃত্যু! কহিয়াছি কামনা আমার—
হেরিব স্বরূপ তব! স্নিগ্ধ কি নির্ম্মম,
করুণ, কোমল, কিবা ভীষণ ভয়াল—
হেরিতে বাসনা চিতে। সহস্র জনম
জন্মিয়া মরেছি আমি, তবু মনে নাই
কেমন তোমার মুখ! আজ প্রাণে মোর
জাগিয়াছে সেই আশা—দেখিব তোমায়!
তোমারে চিনি না, তবু দিবা-বিভাবরী
হেরিয়াছি ওই ছায়া রবিশশিকরে—
হরিৎ, শ্যামল, পীত, লোহিতের মাঝে
উড়ে তব উত্তরীয়!—পদ-চিহ্ন তব
গণিয়াছি কতবার জীবযাত্রাপথে!
বৈবস্বত! করিও না অবিশ্বাস মোরে,
প্রাণে জাগে নিরন্তর তোমার মূরতি!—
পুরাও কামনা মোর, খোল' আবরণ।

মৃত্যু

কি দেখিবে নচিকেতা?—মৃত্যুর স্বরূপ!
মৃত্যু মহা-ভয়ঙ্কর, জানে সর্ব্বজীব;
জীবনের সুখশয্যাতলে দুঃস্বপন
মরণ-কল্পনা!—সেই মৃত্যু দাঁড়াইয়া

তোমার সম্মুখে, আবরিয়া সর্ব্বদেহ
কহিতেছে সুনৃত-বচন, তাই তব
হৃদয় নির্ভয়, সাহস অপরিসীম!
জগতের লঘুলীলা ভুলায়েছে তোমা—
হে গৌতম, নহি আমি জীবনের মিতা!
আমারে দেখিতে চাও!—প্রদোষ-আঁধারে
দারুণ ঝটিকাবর্ত্তে ছিন্ন ক্ষণপ্রভা
হেরিয়াছ—দাঁড়াইয়া তরণীর 'পরে,
তরঙ্গ-দোলায়? মহারণ্যে পথহারা
সহসা সমুখে তব হেরিয়াছ কভু—
ধাবমান অগ্নিকেতু বনস্পতি-শিরে?
অর্দ্ধরাত্রে, নিদ্রোত্থিত ঘোর কলরবে,
করিয়াছ অনুভব—দুলিছে মেদিনী?
সেও তুচ্ছ! তারো চেয়ে কত ভয়ঙ্কর
মৃত্যুর আসন্ন মূর্ত্তি কালান্ত-তিমিরে!
বালক কিশোর তুমি, নবীন বয়স—
ধরণীর স্তন্যরসে স্তিমিত চেতনা,
কি বুঝিবে মরণের রীতি সুকঠোর?
কহ মোরে, এ কামনা কেমনে পশিল
চিত্তে তব, কীট যথা প্রস্ফুট প্রসূনে!

নচিকেতা

শুনিয়াছি, মরজ্যেষ্ঠ পিতৃলোকে তুমি—
পশেছিলে মৃত্যুপুরে তুমিই প্রথম,
তাই দেবগণ বসাইয়া সিংহাসনে,
প্রেতরাজ্যে তোমারেই দিল অধিকার।
হে রাজন্! কহ মোরে—সে কি বিভীষিকা—
সৃষ্টির প্রথম মৃত্যু—তুমি দেখেছিলে!
নহ মরজ্যেষ্ঠ শুধু, জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ বটে—
তোমারে প্রণমে আজ অমৃত-সমাজ!
আত্মার আত্মীয় তুমি, হে সূর্য্যতনয়!
মৃত্যু যদি মহাভয়, দ্যুলোক-দুয়ারে
কেন আছ দাঁড়াইয়া? কেন রাখিয়াছ
সুধাভাণ্ড করতলে?—বৃথা ভয় তুমি
দেখাও বালকে!

বয়সে নবীন বটে,
তবু, মৃত্যু! জেনো আমি জনম-স্থবির!
আমারে করেছে বৃদ্ধ তোমারি ভাবনা!
জাতিস্মর নহি—তবু আবাল্য আমার
নয়নে জ্বলিছে কোন্ দিব্য দীপশিখা!
সে আলোকে জীবনের চারু চিত্রপট
বিবর্ণ মলিন! সে আলোকে নিশিদিন
হেরিয়াছি কার যেন সুগম্ভীর ছায়া!
প্রত্যক্ষ জাগ্রৎ যাহা—সে যেন স্বপন,
নদীজলে প্রতিবিম্ব সম!—সত্য কহি,
হাসিও না!—ঔদ্দালকি-আরুণি-তনয়
মিথ্যা নাহি জানে!

মৃত্যু

অদ্ভুত কাহিনী বটে!—
সতেজ সরস বৃন্তে এ শীর্ণ কুসুম
কেমনে ফুটিল!—পিতার ভবনে
হের নাই সোমযাগ?—বেদমন্ত্রধ্বনি,
হোতার উদাত্ত কণ্ঠে উচ্চ সামরব,
অগ্নিস্তুতি, ইন্দ্রস্তব, বৃত্রজয়গাথা—
দিল না হৃদয়ে বল? সোমরস-পানে
দেবতা-দোসর হয় ক্ষীণজীবী নর!—
এ সব জানো না বুঝি? করিও না শোক,
লহ দীক্ষা, শিক্ষা কর অগ্নিহোত্র-বিধি
আমার সকাশে। কেমনে করিতে হয়
সে অগ্নিচয়ন—নির্ম্মাণ করিবে চিতি,
কোন্ মন্ত্রে হবিঃশেষ করিবে গ্রহণ—
শিখাইব সমুদয়। হে সত্য-পিপাসু,
আমি সেই সত্য-মন্ত্র দানিব তোমায়
এইক্ষণে—না চাহিতে দিনু এই বর।
আরবার কহ, বৎস, কি তব প্রার্থনা?

নচিকেতা

ওগো মৃত্যু সুদক্ষিণ! দাক্ষিণ্য তোমার
হৃদয়ে রহিল গাঁথা; অগ্নিহোত্র-বিধি
যা' কহিলে বুঝিয়াছি, রহিবে স্মরণে।

সে যে মোর নিত্যকর্ম,—জন্মিয়াছি আমি
মহাঋষি-কুলে ! জানি, সে সাবিত্রী-মন্ত্র
বলহীনে করে বলদান—তবু দেব !
শুধু মন্ত্রে, স্তোত্রগীতে, হবিঃশেষ-পানে
ভরে না আমার চিত্ত ! অগ্নি বৈশ্বানর
জ্বলিছেন অহরহ অন্তর-আলয়ে !
আমি চাই উত্তরিতে জন্ম-জলধির
নিস্তরঙ্গ বেলাভূমে—আলোক-আঁধার
উদয়াস্ত অতিক্রমি', পঁহুছিতে সেই
জ্যোতির্ময় দেশে—যেথা নাই দুঃস্বপন,
যেথা দেবগণ নিয়ত অমৃতপানে
জ্যোতিষ্মান্, যথাকাম করে বিচরণ !
ব্রহ্মবাক্য-পূত হ'য়ে যেথা সোমরস,
বিনা যাগযজ্ঞবিধি, বিনা আহরণ—
ক্ষরিছে নিয়ত ! বৈবস্বত ! সেই লোকে
শাশ্বত অমৃত-পদ দিবে না আমায় ?
দেখাও স্বরূপ তব !—জানি, যেই জন
হেরিয়াছে ওই রূপ, ছিঁড়ি' মোহপাশ
যায় সে যে ধ্রুবলোকে—যথা বৎসতরী
ছিঁড়িয়া বন্ধন-রজ্জু ধায় নিরুদ্দেশে !

জানি না কেমন তুমি, তবু মনে হয়
তুমি মনোহর ! বাহিরিয়া গোচারণে,
প্রথম-প্রাবৃটে যবে নব-মেঘোদয়
হেরিয়াছি নদীপারে, চন্দ্রভাগাতীরে—
চাহি' তার অভিরাম সুনীল বয়ানে,
অকারণ অশ্রুবেগে হয়েছি কাতর,
মুহূর্তে জাগর-স্বপ্নে হারায়েছি জ্ঞান !
কোথায় সে পদে পৃথ্বী—রুক্ষ ক্ষেত্রতল,
গবীদের হাম্বারব নাহি পশে কানে,
মাধ্যন্দিন সবনের কথা ভুলে' গেছু !
হেরি' সেই ঊর্দ্ধাকাশ নবঘনশ্যাম—
ভুলে' গেছু কেবা আমি, কোথায় বসতি,
কি নাম আমার ! জন্ম-মৃত্যু-ইতিহাস
নিমেষে পাইল লয় ! যেন সৃষ্টি-প্রান্তে
ফিরে' গেছু—বাজিল এ বক্ষে মোর
আত্মীয়ের আদিম বিরহ !—মেঘ নয় !—
যেন ওই আকাশের বিমল দর্পণে
দোলে নীল স্মৃতিখানি !—সুধাই তোমায়,
সে কি তব প্রতিচ্ছায়া—তোমারি আভাস ?

মৃত্যু

নচিকেতা ! মৃত্যু নীল নহে, নাহি তার
বর্ণ-রূপ !—জানো না কি, করে সে হরণ
নেত্র হ'তে সর্ব্বশোভা ?—সে যে অন্ধকার !

নচিকেতা

তাই বটে !—দিবা, নিশা—দুই ভগিনীর
একজন স্বর্ণসূত্রে করিছে বয়ন
ধরার বরণ-বাস আলোক-দুকূলে !
অপরা সে, অস্তাচল-শিখর-শায়িনী,
জেগে থাকে নির্ণিমেষ,—নিত্য খুলে দেয়
অসংখ্য সে তারকার সূচীমুখ দিয়ে
দিবসের সুদীর্ঘ সীবন !—অন্ধকার !
সান্দ্র স্তব্ধ সুগম্ভীর স্নিগ্ধ অন্ধকার !—
বুঝিয়াছি, তারি তলে তোমার আসন।

মনে পড়ে, একবার আমি, রিষ্টিশেন—
দোঁহে মিলে গিয়েছিনু পর্ব্বত-ভ্রমণে ;
শালবনে সূর্য্য অস্ত যায় ! বহুক্ষণ
দাঁড়াইনু দুইজনে অরণ্য-সীমায়,
মালভূমি 'পরে। দূর পশ্চিমের পানে
উঠিয়াছে অভ্রভেদী চতুঃশৈলচূড়া
তুষার-ধবল—যেন স্তম্ভ-চতুষ্টয়
ধরে' আছে আকাশের নীল চন্দ্রাতপ !—
তারি তলে আলুষ্ঠিতা মুমূর্ষু ঊষার
হেরিলাম মৃত্যুশয্যা !—পূর্ব্বাচল হ'তে
ছুটিয়া এসেছে সে যে সারাটি আকাশ
সবিতার আগে আগে—দেয় নাই ধরা !

ঘরে বাইরে
শিল্পী শ্রী কিরণবালা সেন,
শান্তিনিকেতন।

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

এতক্ষণে, প্রণয়ীর প্রগাঢ় চুম্বনে
খুলে' গেল কালোকেশ, রক্তচেলাম্বর !
আর সে কুমারী নহে, নহে সে অহনা—
কন্যা জ্যোতির্ম্ময়ী !—বধূবেশী সন্ধ্যা সে যে
মৃত্যু-স্বয়ম্বরা ! তখনি সে অন্ধকারে
মুছে গেল রক্তস্রোত, তবুও মানসে
বহুক্ষণ নেহারিনু শোণিত-উৎসব !
মনে হ'ল, পশ্চিমের যজ্ঞ-বেদিকায়
দেবতারা করে যাগ—দীর্ঘ অগ্নিষ্টোম,
ঊষা তায় নিত্যবলি ! সবিতা-ঋত্বিক
হোম করে আপনার পরাণ-বধূরে !
এ রহস্য বুঝি না যে !—তবু কহ শুনি,
সন্ধ্যারক্তরাগ, পশুর শোণিত-পঙ্ক—
সে কি, মৃত্যু ! তোমারি ও আঁধার-ললাটে
লোহিত তিলক ?

মৃত্যু

জানো দেখি এত কথা,
তবু কৌতূহল ? হে বালক, বুঝিলাম
বিজ্ঞ তুমি, বহুদর্শী, সহজ-প্রবীণ !—
তবুও চপল চিত্ত সংশয়-আকুল ?

নচিকেতা

তাই বটে ! মূঢ় আমি, তাই প্রাণে-মনে
এখনো বিরোধ ! প্রাণ বলে, নহে নহে—
এক নহে মৃত্যু আর মরণ-দেবতা !
মৃত্যু, সে যে সুনিশ্চিত দেহ-পরিণাম,
তাহারি শাসনতরে দণ্ডধর তুমি,
মৃত্যু হয় কালে কালে, তুমি মহাকাল !
মনে তবু জাগে সদা সভয় ভাবনা,
তোমারেই স্মরে নর আয়ুঃশেষ কালে !—
গতায়ুর শূন্যদৃষ্টি অক্ষি-তারকায়,
শবিতার সমুদ্যত অসির ঝলকে,
হেরে জীব মরণের মূরতি কঙ্কাল !
একি মোহ ! জীবনের একি প্রবঞ্চনা !

তথাপি তোমারে আমি করিয়াছি ধ্যান
চেতনা-গহনে, তুমি নিঃশব্দ সঞ্চারে
স্বপন-শিয়রে মোর দাঁড়ায়েছ আসি'
সুনির্জ্জনে—আসে যথা রাত্রি তমস্বিনী
শব্দহীন কলস্বনে, গগন-অঙ্গনে,
দু'কূল প্লাবিয়া !—অতিক্ষুদ্র বীচিমালা
তরঙ্গিয়া ধরে শিরে ফেনপুষ্পসম—
নিযুত নক্ষত্ররাজি, স্তব্ধ-মনোহর !
করি' সন্ধ্যা সমাপন, কুটীর ছাড়িয়া
পশিয়াছি কতদিন দেবদারু-বনে ;
বিরাট ন্যগ্রোধ এক আছে দাঁড়াইয়া,
প্রসারিয়া শাখাবাহু শতস্তম্ভময়—
সে বিশাল পত্রঘন আতপত্র-তলে
কাননের অন্ধকার রচিয়াছে যেন
বিশ্বের রজনী মাঝে আরেক রজনী !
সেইখানে মাথা রাখি' বাহু-উপাধানে,
ওগো মৃত্যু ! হেরিয়াছি তোমার স্বপন !
অন্ধকার ভরিয়াছে অন্তর-বাহির,
স্তব্ধ চরাচর, শুধু শোনা যায় দূরে—
গভীর গর্জ্জন-স্বনে পর্ব্বত-নির্ঝরে
ঝরে বারিধারা—যেন বায়ুহীন ব্যোম
শিহরি' উঠিছে তার 'ওম্ ওম্'-রবে !
সেই ক্ষণে মনে হল, আত্মার নিশীথে
সহসা জ্বলিয়া ওঠে প্রভাত-প্রদীপ !—
জন্মান্ত-তিমির টুটি' কে আসি' দাঁড়ালে
আমার নয়ন-আগে ! সে কি তুমি নও ?
কহ, দেব ! কহ মোরে, ঘুচাও ভাবনা।

মৃত্যু

ঋষির তনয় তুমি, বাল-ব্রহ্মচারী—
এ বয়সে করিয়াছ কঠিন সাধনা,
মানস-নিগ্রহ ; তাই কৃচ্ছ্র-তপস্যায়
নিপীড়িত কামনার ক্ষোভ সুগভীর
করিয়াছে অন্যমনা, বিষয়-বিরাগী।
নচিকেতা ! ধরণীর বিপুল সম্পদ

হেরিয়াছ ? জন্ম-মৃত্যু দুই সীমান্তের
অন্তরালে আছে সুখ—দেবতা-দুর্লভ !
দেহের রহস্য নয় সহজ-সন্ধান !
অল্পভোগী দরিদ্রের দীন কল্পনায়
ক্ষুদ্র বটে জীবনের কামনা-পরিধি—
অতৃপ্ত-ক্ষুধার ব্যাধি, নিত্য-উপবাস
করে তারে মর্ত্ত্যসুখে ঘোর উদাসীন,
তাই তার সর্ব্বদুঃখ, দুরাশার আশা
সফল করিতে চায় মৃত্যু-পরপারে।—
তুমিও কোরো না সেই বৈরাগ্য-সাধনা !
তরুণ তাপস তুমি, ভোগ-আয়তন
ফুল্লতনু যৌবন-উন্মুখ ! দুই চক্ষু
নীলোৎপল !—ঢল-ঢল, পীযূষ-পিয়াসী !
উদার তোমার মন, প্রসন্ন ইন্দ্রিয়,—
ভুঞ্জিবে সকল সুখ তুমি মহীতলে !
মহাভূমি, হস্তী, অশ্ব, হিরণ্য প্রচুর
দিব তোমা, পরমায়ু—সহস্র শরৎ,
দেহে কান্তি, বক্ষে বীর্য্য, বল বাহুযুগে ;
দিব নারী অগণন—মোহিনী অপ্সরা,
রথারূঢ়া বাদিত্রবাদিনী !—কর ভোগ
সমুদয়, রতি আর প্রমোদ-কৌতুকে !
অমৃত !—সে ব্যাধিতের বিকার-জল্পনা !
দেহের বিনাশ হয় কাল পূর্ণ হ'লে,
তার পর আবার জনম,—শস্যসম
জন্মিয়া পাকিয়া ঝরে, জন্মে পুনরায়
পৃথ্বী'পরে মর্ত্ত্যজন, বর্ষঋতু-ক্রমে !
আমি শুধু করি উৎপাটন প্রাণ তার—
মুঞ্জা হ'তে ঈষিকার মত। নচিকেতা !
দেহীর সহজ ধর্ম্ম জানে সর্ব্বজন—
নাহি পন্থা অন্যতর, জন্মান্তে আবার
জন্মিতে হইবে ধ্রুব !—কর পরিহার
বিফল বাসনা। জীবনের শ্রেষ্ঠ বর
করিতেছি অঙ্গীকার—বিত্ত আর আয়ু,
তার চেয়ে বড় কিবা, দেখ বিচারিয়া !

নচিকেতা

বিত্তে নহে তর্পণীয় চিত্ত পুরুষের !—
ওগো মৃত্যু ! জীবনের ঐশ্বর্য্য-আড়ালে
তুমি কেন চিরদিন আছ দাঁড়াইয়া ?
ধরার অমরাবতী, রুধি' বাতায়ন,
চিতাধূম নিবারিতে পারে ?—উৎসবের
আনন্দ বাঁশরী, মিলনের মঞ্জুগাথা
কেন বা গুমরি' ধরে বিদায়ের সুর ?
ধরিয়াছ নানা ভোগ সম্মুখে আমার—
আছে সুখ, তৃপ্তি কোথা ? এই মোর দেহ
জরিবে না গুপ্তচর জরা সে তোমার ?
অন্তক তোমার নাম—তুমি কহিয়াছ,
প্রাণীদের প্রাণধন কর উৎপাটন
শস্য হ'তে ঈষিকার প্রায় !—কহ তবে,
কতকাল ভুঞ্জিব সে ভোগ সুদুর্লভ ?
সহস্র-শরৎ আয়ু ? তার বেশি নয় !—
যম বুঝি বাঁধা আছে নিয়ম-শৃঙ্খলে ?
তাই তুমি নিয়তির কঠিন নিগড়
ঢাকিতেছ ফুলদল দিয়া ?—ধিক মৃত্যু !
ধিক্ প্রতারণা ! দেহ-অন্তে এক পথ—
নাহি পন্থা অন্যতর ?—শুনে হাসি পায় !
বৈবস্বত ! নচিকেতা জানে তোমা চেয়ে !
জানিয়াছি সেই সত্য—নহে বহুদিন,
শুনি নাই, হেরিয়াছি স্বচক্ষে আমার !—
এখনো রোমাঞ্চ হয় সে কথা স্মরিলে !
শুন মৃত্যু, সে কাহিনী কহিব তোমায়।

পিতামহ বাজশ্রবা বাণপ্রস্থ-শেষে
প্রায়োপবেশন করি' ত্যজিলেন তনু
বিপাশার তীরে। কৃষ্ণা দ্বাদশীর তিথি,
রজনী তৃতীয় যাম, দক্ষিণাগ্নি-শিখা
তত্ত্বশংসী—পরশিল অগুরুকাষ্ঠ-মূলে,
জ্বলিয়া উঠিল চিতা। নদী পূর্ব্বমুখী—
মিশিয়াছে একেবারে দিক্-চক্রবালে।

দাঁড়ায়ে অনতিদূরে আমি চেয়েছিনু
অন্তমনে, অন্ধকার আকাশের পটে।—
হোথায় সে মহাকায় কৃষ্ণ-তুরঙ্গমে
পিতৃলোকে পিতৃগণ দেন সাজাইয়া
তারার মুকুতা-হারে!—সহসা হেরিনু,
ভূমিতলে চিতা হ'তে হতেছে উদয়
সুবৃহৎ শশিকলা—তরণীর প্রায়,
পূর্ব্বাকাশে! সেই ক্ষণে বিস্ময়-বিহ্বল
হেরিলাম সে কি দৃশ্য স্বপ্ন-অগোচর!—
দেহ-অন্তে পুণ্যবান বৃদ্ধ বাজশ্রবা
আরোহি' আলোক-যানে যান দেবলোকে।
ক্ষণপরে চিতা ছাড়ি' কিছু উর্দ্ধে উঠি'
শোভিল সে চন্দ্রকলা সুদূর আকাশে—
নদীসীমা-শেষে।—দিব্যচক্ষে হেরিলাম
আত্মার অমৃত-পন্থা মৃত্যু-পরিণামে!
ওগো মৃত্যু! পারিবে না ভুলাতে আমায়—
এ বিশ্বাস ত্যজিবে না মূর্খ নচিকেতা!

মৃত্যু

হে ব্রাহ্মণ, ত্যজিওনা বিশ্বাস তোমার—
নহ মূর্খ! তোমা চেয়ে জ্ঞান-গরীয়ান
আছে নাকি আর কেহ সপ্তসিন্ধু-দেশে!
বালক! তোমার চিত্তে সত্য উদিয়াছে
অকলুষা পূর্ণশ্রদ্ধা ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার!
তুমি ভাগ্যবান, প্রসন্ন তোমার 'পরে
আত্মা প্রেমময়! তাই ললাটে তোমার
জলিয়া উঠেছে হেন শুভ্র জ্যোতিশ্ছটা!
প্রবচন, বহুশ্রুত, সুমহতী মেধা—
কিছুই পারে না তাঁরে লাভ করিবারে,
আপনি যাহারে তিনি করেন বরণ,
সেই লভে!—ঔদ্দালকি-আরুণি-তনয়!
লহ বর, যাহা ইষ্ট ঈপ্সিত তোমার।

নচিকেতা

এইবার নয়নের মিটাও পিপাসা—
আবরণ কর উন্মোচন, জ্যোতিষ্মান্!

মৃত্যু

কোথা আবরণ, নচিকেতা? নেত্র হ'তে
আপনি খসিয়া যাবে সূক্ষ্ম মায়াজাল—
মৃত্যুর রহস্য-কথা শুনিতে শুনিতে
শ্রবণ-উৎসুক চিত্ত হবে নির্ব্বিকার,
মুহূর্ত্তে সংশয়মুক্ত নেহারিবে তুমি
আমার স্বরূপ-রূপ অন্তরে বাহিরে!

শুন, নচিকেতা!—হৃদয় দুর্ব্বল যার,
মলিন, সঙ্কীর্ণমনা, স্বভাব-কৃপণ—
সেই নর যূপবদ্ধ পশুর সমান
মৃত্যুর আঘাত সহে জীবযজ্ঞভূমে।
ভয় তারে ক্ষুদ্র করে, মর্ত্ত্য-মরু মাঝে
তৃষায় হারায় দিশা মৃগ-তৃষ্ণিকায়!
বার বার পড়ি' মৃত্যুমুখে, হয় তার
নিত্য অধোগতি; দুই বদ্ধ করতলে
ধরিয়া রাখিতে চায় সর্ব্বস্ব আপন,
তাই মূঢ় অতি-লোভে হারায় সকলি!
মৃত্যু তার মহাভয়! আমারে হেরিলে,
সঙ্কুচিয়া সর্ব্বদেহ, শশকের মত
রহে চক্ষু বুজি'—ভাবে বুঝি, হেন মতে
এড়াইবে হিংস্র ক্রূর ব্যাধের সন্ধান!
সে জন চাহেনা এই রূপ নেহারিতে—
তোমা সম, নচিকেতা! নয়ন বিস্ফারি'!

নচিকেতা

এখনো হেরিনি তোমা—তবু মনে হয়,
সরিছে কুহেলিজাল, ধূম্রনীল দেহ
ঈষৎ দুলিছে!—রজনীর শেষ যামে,
বাঁধিছে ঊষার রথে শুভ্রা-পয়স্বিনী
অশ্বিনীকুমার বুঝি? আর কিছুক্ষণে
উজিবে আঁখিতে মোর হিরণ্ময়ী বিভা
দিগন্ত-প্লাবিনী!

মৃত্যু

এইবার কহি শুন
আমার স্বরূপ—হে ব্রাহ্মণ! কহি তোমা
সেই বাণী, নিহিত যা' গহন গুহায়!
কহিয়াছি কিছু আগে অগ্নিহোত্র-বিধি—
সেই অগ্নি জ্বলিছেন দিব্যজ্ঞানরূপী
তোমারি অন্তরে!—ওই দেহ চিতি তার,
প্রাণ হবিঃ, আমি তার সুচির-আহুতি!
বলবান, আত্মাবান, প্রজ্ঞাবান যেই—
আপনারে আপনি সে দেয় বলিদান
জগতের যজ্ঞযূপে, মহোল্লাসে মাতি'!
বিশ্বপ্রাণে বিলাইয়া নিজ প্রাণধন
ভুলে' যায় হর্ষশোক—চির-উপরতি
লভে বীর, সুমহান্ আত্মার আলয়ে!—
আমি যজ্ঞ, আমি সেই অপরূপ হোম!
যেই অগ্নি সেই সোম!—কহি আরবার,
ওই দেহ সোমের কলস! যজমান
করে সোমযাগ—করে পান আপনি সে
আপনারে, আনন্দই হবিঃশেষ তার!
সে আনন্দ—সেই মৃত্যু—অমৃত-সোপান!
এই যজ্ঞ করেছিনু আমি, নচিকেতা,
তারি ফলে লভিয়াছি ধ্রুব অধিকার
যমলোকে ; এই যজ্ঞ করে যেই জন
মৃত্যুঞ্জয়ী হয় সেই নিঃশেষে মরিয়া!—
করি' স্নান যজ্ঞশেষে, সর্ব্বগ্লানিহারা,
আশ্বিনের অভ্রসম শুভ্র সুনির্ম্মল,
মিশে' যায় মহানভোনীলে!—

নচিকেতা

ওগো মৃত্যু!
কোথা আমি? তুমি কোথা?—নয়নে আমার
নাহি আর কায়া-ছায়া! দৃষ্টি স্মৃতিহারা
ডুবে' যায় বর্ণহীন আলোক-পাথারে!
কর্ণে জাগে স্তব্ধতার মহা মৌন-বাণী!
দেহ হ'ল স্পন্দহীন!—রোমাঞ্চ, পুলক,
স্বেদ, কম্প, শিহরণ—কিছু নাই আর!
বীতরাগ, বীতশোক, বীতমন্যু আমি!
ভয় নাই, আশা নাই!—এই কণ্ঠে মোর
ধ্বনিবে না কভু আর—স্তুতি, আরাধনা,
যাচনা, মিনতি!—এই মৃত্যু!—ধন্য আমি!—
বৈবস্বত! এতক্ষণে তোমার প্রসাদে
মরিলাম চিরতরে আমি নচিকেতা!

মৃত্যু

ধন্য তুমি!—শ্রুতিমাত্রে নিমেষে ঘুচিল
দেহপাশ!—সিদ্ধি যেন ভাবনা-রূপিণী!
কালের সায়রে বুঝি তুমি ফুটেছিলে
অমৃত-পরাগ-ভরা মর্ত্ত্য-শতদল!—
আপন আবেগে তাই আপনি ঝরিলে!
মানিলে না যমের শাসন, পিতৃলোক
তব যোগ্য নহে!—আলো ভালো লাগিল না,
জীবনের অন্ধকার-দুয়ার খুলিয়া
এলে তাই মৃত্যুপুরে, স্বপ্নাতুর-আঁখি,
সত্যের সন্ধানে! স্বপ্নশেষে এইবার
সুষুপ্তি-সাগর,·উদিবে তাহারি কূলে
সেই জ্যোতির্লোক—চন্দ্রতারকার ভাতি
ম্লান যেথা, দ্যুতিহারা বিদ্যুৎ-বল্লরী!
অগ্নি যেথা চিত্রবৎ—নিষ্প্রভ, মলিন!
হে ব্রাহ্মণ! হেরিলাম তোমার মাঝারে,
দেহজয়ী, কালজয়ী, মৃত্যুজয়ী সেই
পুরাণ-পুরুষে!—যাঁর মহা-মহিমায়
ঊর্দ্ধ হ'তে মহানিম্নে পশিছে আলোক,
নিম্ন হ'তে ঊর্দ্ধে উঠে আহুতির ধূম—
স্বর্গে-মর্ত্ত্যে রহিয়াছে নিত্য-পরিচয়!
অমৃতের পুত্র তুমি, হে মর্ত্ত্য-বান্ধব!
মৃত্যুপুরী তীর্থ আজ তোমার পরশে,
তোমারি প্রসাদে আমি চির-জ্যোতিষ্মান্!

গণতন্ত্রের হিন্দু-রাষ্ট্র*

শ্রী বিনয়কুমার সরকার

প্রথম পরিচ্ছেদ

দুনিয়ার গণতন্ত্র

পিতৃতন্ত্রী যথেচ্ছাচার

প্রত্নতত্ত্বের বাস্তব তথ্যগুলা সমকালীন বা গড়ন বিজ্ঞানের চালুনিতে ছাঁকিয়া দেখিলাম যে হিন্দুজাতির 'স্বরাজ' আর "সার্ব্বভৌমিক শান্তি" বিষয়ক অভিজ্ঞতা ইয়োরোপীয়ান্ অভিজ্ঞতা হইতে অভিন্ন। জীবনের গতিবিধি, রক্তের স্রোত চিত্তের সাড়া এবং বিশ্ব সমালোচনার তরফ হইতে এই সাম্য বা সাদৃশ্য ও একজাতীয়ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রাচীন ভারতের ধরণ ধারণ-সম্বন্ধে যে দুইবার দশটা খুঁটিনাটি বাহির হইয়াছে, তাহার ভাবার্থ ও দাম এই।

বুর্বোঁ শাসনের ফরাসী রাজতন্ত্রে আর মৌর্য্য চোল রাজতন্ত্রে কোনো প্রভেদ খুঁড়িয়া পাওয়া যায় না। প্রুশিয়ার ফ্রেডরিক্ অষ্ট্রিয়ার যোসেফ্ এবং রুশিয়ার পিটার্ ইত্যাদি অষ্টাদশ ও সপ্তদশ শতাব্দীর ইয়োরোপীয়ান্ বাদশারা যে দরের "যথেচ্ছাচারী" "প্রকৃতিবঞ্জক" এবং 'পিতৃতন্ত্রী" নরপতি, হিন্দু সার্ব্বভৌমেরা সেইদরের লোকই ছিলেন।

ইয়োরোপের এইসকল রাষ্ট্র কাল-হিসাবে হিন্দু রাষ্ট্রগুলার পরবর্ত্তী। কিন্তু "ধর্ম্ম' হিসাবে ইহারা রোমান্ সাম্রাজ্য, মৌর্য্য সাম্রাজ্য ইত্যাদিরই সমগোত্রজ। খাঁটি "স্বরাজের" মাত্রা এইসকল আমলে অতি কম।

গণতন্ত্র শক্তিযোগ

হিন্দু নরনারীর হাড়েমাসে রাজতন্ত্রের বহির্ভূত গড়নও দেখিতে পাওয়া যায়। এইবার সেইসকল গড়নের কথা বলিব। রাজহীন রাষ্ট্রকে বিদেশী ভাষার 'রিপাব্লিক্" বলে। ভারতে এই বস্তু "গণতন্ত্রী"-রাষ্ট্র বা সোজাসোজি "গণতন্ত্র" নামে পরিচিত।

শাসন-বিজ্ঞানের তরফ হইতে গণতন্ত্রকে একটা কিছু "হাতী ঘোড়া বিবেচনা করা চলিতে পারে না। রাজা নাই অথচ রাষ্ট্র চলিতেছে, এইরূপ ঘটনাকে মানব-জাতির কর্ম্ম সাধনায় অতি-মাত্রায় গৌরবজনক তথ্য বুঝিলে অত্যুক্তির প্রশ্রয় দেওয়া হইবে।

ভারতের রাষ্ট্রীয় অভিজ্ঞতায় গণতন্ত্রের সাক্ষ্য পাওয়া গিয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা লইয়া লাফালাফি করা বেকুবি। রাষ্ট্রের লেন-দেন "দার্শনিক"-ভাবে বিশ্লেষণ করিলে গণ-শাসনের মাহাত্ম্য বড় বেশী দেখা যায় না।

রাজতন্ত্রের রাষ্ট্র চালাইতে নরনারীর পক্ষে যেধরণের শক্তিযোগ দরকার হয়, গণতন্ত্রী রাষ্ট্র চালাইতেও সেই শক্তিযোগই লাগে। ঘটনা-চক্রে কোনো-কোনো ক্ষেত্রে রাজ-রাজড়ারা বংশানুক্রমে হয়ত রাষ্ট্রের দস্তুর নয়। একমাত্র এইকারণেই সেইসকল দেশের লোককে "অতি-মানুষ" ঠাওরানো রাষ্ট্রীয় শক্তিযোগ-সম্বন্ধে অজ্ঞতার পরিচায়ক।

রাজতন্ত্র বনাম গণতন্ত্র

বাস্তবিকপক্ষে দুনিয়ার ইতিহাসে গণতন্ত্রের সংখ্যা নেহাৎ কম। প্রধানত খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতের রাষ্ট্র বর্ত্তমান গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। এই যুগের প্রথম দিক্ ছাড়া আর কখনো ইয়োরোপের কোনো গলি-ঘুঁচে একটাও গণতন্ত্র ছিল না। হিন্দু এবং খৃষ্টিয়ান উভয়েই রাজতন্ত্রী। কেবল খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী শেষ তিন শ বৎসর ধরিয়া রোমে গণতন্ত্র চলিতেছিল। সেই গণতন্ত্রে আর বর্ত্তমান কালের গণতন্ত্রে অনেক প্রভেদ। এই প্রভেদ আলোচনা করিবার সময় নাই।

বর্ত্তমান জগতের প্রথম গণতন্ত্র ইয়োরোপে দেখা দেয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে (১৩১৫ খৃঃ অঃ)। সে সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডে। তাহার পর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ১৭৮৫ সালের ইয়াঙ্কি গণ-তন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতেই ফরাসী-গণতন্ত্র স্থাপিত হয় ১৭৯২ সালে। কিন্তু গণতন্ত্র নেপোলিয়নের তাঁবে রাজতন্ত্রে পরিণত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য নরনারী মোটের উপর সর্ব্বত্রই রাজতন্ত্রী। গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করাই ছিল খৃষ্টিয়ানদের স্বধর্ম্ম।

গণতন্ত্র ও স্বরাজ

(১)

গণতন্ত্রের ইতিহাস ও দর্শন আলোচনা করিবার অবসর বর্ত্তমান গ্রন্থে নাই। এইটুকু সর্ব্বদা মাথায় রাখা আবশ্যক যে,—গণতন্ত্র পশ্চিমা রাষ্ট্রীয় চরিত্রের বিশেষত্ব নয়। চিত্ত-বিজ্ঞানের তরফ হইতে হিন্দু-রাষ্ট্র-শাসনে, আর ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রশাসনে পার্থক্য দেখাইতে বসিলে ভুল করা হইবে। আর যাঁহারা এই তথাকথিত পার্থক্যটা স্বীকার করিয়া লইয়াই আলোচনায় অথবা কর্ম্মক্ষেত্রে হাজির হন, তাঁহারা কুসংস্কারপূর্ণ সন্দেহ নাই।

বিংশ শতাব্দীর মানব গণতন্ত্রের দিকে হু হু করিয়া ছুটিতেছে। দুনিয়ার নরনারী সজ্ঞানে রাজ-রাজড়াগণকে গদি হইতে সরাইতে প্রয়াসী। ইহা "আধুনিকতার" নবীনতম লক্ষণ। বর্ত্তমান যুগের লোকেরা সেই সঙ্গে-সঙ্গে স্বরাজ বা আত্মকর্তৃত্বের দিকেও সজ্ঞানে ছুটিতেছে। স্বরাজ-সাধনা আজকালকার শক্তিযোগের অন্যতম লক্ষণ।

বর্ত্তমান গ্রন্থে মানবজাতির যে স্তর-বিভাগ দেখানো হইতেছে, তাহার পর্দায় পর্দায় এইসকল নবীনতম জীবনবত্তার চিহ্নোৎ খুঁড়িতে গেলে ভুল করিয়া বসা হইবে। প্রাচীন দুনিয়াকে তাহার ন্যায্য ইজ্জৎ দিবার সময় জোর জবরদস্তি করিয়া তাহার ভিতর নবীনকে বসাইবার দরকার নাই। গ্রীক্, রোমান্ এবং হিন্দু গণতন্ত্রের সীমানাগুলা ভুলিয়া গেলে চলিবে না।

(২)

আর-এক কথা। গণতন্ত্র এবং স্বরাজ একার্থক নয়। গণতন্ত্রের বাহিরে অর্থাৎ রাজতন্ত্রেও স্বরাজ থাকিতে পারে। আবার অনেক সময়ে তথাকথিত গণতন্ত্রও রাজতন্ত্রের মতনই স্বরাজের যমবিশেষ,—এইরূপ দৃশ্য খুবই সম্ভব।

ডাইনে-বাঁয়ে সকল দিক্ হইতেই সংযত হইয়া ঠাণ্ডা মাথায় হিন্দু-গণরাষ্ট্রের মুল্লুকে প্রবেশ করা যাউক। গড়ন-বিজ্ঞানের তরফ হইতে হিন্দু-শক্তিযোগের নতুন কতকগুলা চিত্তাকর্ষক রূপ দেখিতে পাইব।

---

* "হিন্দু-রাষ্ট্রের গড়ন"-গ্রন্থের এক অধ্যায়।

মানব-জাতি গণতন্ত্রের সিঁড়িতে কতখানি উঠিয়াছে, তাহা জানিবার জন্য মাঝে-মাঝে ইংরেজ পণ্ডিত ব্রাইস-প্রণীত "মডার্‌ন্ ডেমোক্র্যাসিজ" অর্থাৎ "বর্ত্তমানকালের স্বরাজ" নামক সুবৃহৎ গ্রন্থের দুইখণ্ড ঘাঁটাঘাঁটি করা মন্দ নয়। এই গ্রন্থে ফ্রান্স, সুইট্‌সার্ল্যাণ্ড, ইয়াঙ্কিস্থান, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ডে এই ছয় দেশের রাষ্ট্রশাসন বিবৃত ও সমালোচিত আছে।

সঙ্গে-সঙ্গে "ভবিষ্যবাদীরা" গণতন্ত্র এবং স্বরাজের কোন্ পথে চলিতে চাহেন, তাহার মোসাবিদাটাও বোল্‌শেভিক্ রুশিয়ার সোভিয়েট প্রবর্ত্তক লেনিন্ এবং ট্রট্‌স্কির রাজ-পরিচালনায় পাঠ করা যাইতে পারে। এইরূপ নবীনতন্ত্রের সঙ্গে পরিচয় থাকিলে প্রাচীনের দৌড়, আদর্শ, সাধনা এবং সিদ্ধি সবই বিনা গোঁজামিলে সমঝিবার পক্ষে সাহায্য পাওয়া যাইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গণরাষ্ট্রের শেষ যুগ

(খৃঃ পূঃ ১৫০-৩৫০ খৃঃ অঃ)

পাঁচ শ বৎসর

প্রথমেই হিন্দু গণরাষ্ট্রের শেষ নিদর্শনগুলার কথা বলিব। মৌর্য্য সাম্রাজ্যের অবসান এবং গুপ্ত সাম্রাজ্যের উৎপত্তি, এই দুই ঘটনার মধ্যবর্ত্তী কাল প্রায় পাঁচ শ বৎসর (খৃঃ পূঃ ১৫০—৩৫০ খৃঃ অঃ)। এই পাঁচ শ বৎসরের রাষ্ট্রীয় রঙ্গমঞ্চে ভারতীয় নরনারী একসঙ্গে নানা শাসন নীতি দেখাইতেছিল।

এই যুগে উত্তর-পশ্চিম ভারতে কুষাণ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। দাক্ষিণাত্যে তখন অন্ধ্র সার্ব্বভৌমদের প্রবল প্রতাপ। ইয়োরোপে এই যুগের প্রথম অংশে রোমান্ গণতন্ত্র ভাঙিয়া যাইতেছে। পরে রোমান্ সাম্রাজ্য দেখা দিয়াছিল। রোমান্ সাম্রাজ্যের সঙ্গে কুষাণ এবং অন্ধ্র উভয়েরই লেন-দেন চলিত।

রাজহীন রাষ্ট্রের জীবন-কথা এই যুগের ভারতীয় ইতিহাসের অন্যতম রাষ্ট্রীয় তথ্য। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "প্রাচীন মুদ্রা" নামক গ্রন্থের প্রথম ভাগে (কলিকাতা, ১৯১৫) যেসকল মুদ্রার সচিত্র বিবরণ আছে, তাহার ভিতর কোনো-কোনোটা এইসকল গণরাষ্ট্রেরই প্রচারিত মুদ্রা।

প্রাচীন মুদ্রার সাক্ষ্য

গণরাষ্ট্রগুলার উঠা-নামা-সম্বন্ধে এখনো পরিষ্কার করিয়া কিছু বলা যায় না, রাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের সঙ্গে এইসকল রাজহীন রাষ্ট্রের "ডিপ্লোম্যাটিক্" অর্থাৎ পর-রাষ্ট্রনীতি-বিষয়ক কারবার চলিত, মুদ্রাগুলা হইতে তাহার আন্দাজ করা চলে।

রাষ্ট্রগুলা ভূমিতে অনেক। ইহাদের প্রত্যেকের "দেশ" কত দূর কোন্ দিকে বিস্তৃত ছিল বলা কঠিন। তবে যেখানে-যেখানে মুদ্রাগুলা আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেইসকল স্থানকে গণরাষ্ট্রের চৌহদ্দির ভিতর ফেলা যাইতে পারে। সকলগুলা একত্র করিলে মনে হয় যে,—আজকালকার দক্ষিণ পঞ্জাব, রাজপুতানা এবং মালোয়া, এই সুবিস্তৃত ভূখণ্ডে, গণরাষ্ট্রীয় শাসন-প্রথা চলিতেছিল। মোটের উপরে বলিব যে, উত্তর পশ্চিমে কুষাণ এবং দক্ষিণে অন্ধ্র, এই দুই সাম্রাজ্যের ভিতরকার জনপদ প্রায় সবই গণতন্ত্রের নিয়মে শাসিত হইতেছিল।

গুপ্ত সাম্রাজ্যে "হোম্-রুল্"

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দে পূর্ব্ব মুলুক হইতে দিগ্‌বিজয়ে বাহিরিয়াছিলেন পাটলিপুত্রের সমুদ্রগুপ্ত, তিনি এইসমুদয় "পশ্চিমা" গণরাষ্ট্রকে কাবু করিতে পারিয়াছিলেন কি না, সন্দেহ। বোধ হয়, গণ-রাষ্ট্রগুলি নিজ-নিজ আত্মকর্তৃত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। গুপ্ত সার্ব্বভৌম বাহাদুর ইহাদের নিকট হইতে কিছু কর বা সেলামি পাইবার ব্যবস্থা করিয়াই হয়ত সন্তুষ্ট ছিলেন।

আজকালকার ভাষায় বলিব যে,—গুপ্তসাম্রাজ্যের অধীনে পাঞ্জাবী, রাজপুত এবং মালবীয় গণরাষ্ট্রগুলা "হোম্‌রুল্" ভোগ করিত। পরবর্ত্তী কালে ইহাদের অবস্থা কিরূপ হয়, জানা যায় না। কেননা গুপ্ত সাম্রাজ্যের "পাব্‌লিক্ ল," "শাসন-বিষয়ক আইন" অর্থাৎ রাষ্ট্রশাসন আজ পর্য্যন্ত প্রায় একদম অজ্ঞাত রহিয়াছে।

অবদান-শতকের গল্প

অবদান-শতক-গ্রন্থের একটা গল্পে দেখিতে পাই যে, 'মধ্যদেশের (উত্তর ভারতের) কয়েক জন সওদাগর দাক্ষিণাত্যের কোনো-কোনো জনপদে তেজারতি করিতে গিয়াছিল। কফিন-নামক নরপতির সঙ্গে তাহাদের মোলাকাৎ হয়। নরপতি উত্তর-ভারতের রাজ-রাজড়াদের নাম জানিতে চাহেন। জবাবে উত্তরীয়েরা বলে,—"আমাদের ওখানে কতকগুলা রাষ্ট্রের মালিক রাজারা। কিন্তু অন্যান্য রাষ্ট্র গণ-কর্তৃক শাসিত হয়।"

অবদান-শতকের ফরাসী অনুবাদক ফেয়ার্ ১৮৯১ সালে এই দ্বিতীয় শ্রেণীর রাষ্ট্রকে "গুভের্ণে পার্ র‍্যিয়ন্ ক্রূপ্ (এতা রেপ্যিব্লিকা) অর্থৎ "দল-শাসিত রিপাব্লিক্ রাষ্ট্র" বলিয়া গিয়াছেন। শ্লোকটা সম্প্রতি শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দের সাহায্যে রমেশচন্দ্রের কর্পোরেট্ লাইফ্ ইন্ এন্‌স্যেণ্ট্ ইণ্ডিয়া অর্থাৎ প্রাচীন ভারতে সজ্ঞজীবন-নামক গ্রন্থে (কলিকাতা, ১৯১৮) ঠাঁই পাইয়াছে।

গল্পটার দাম এই যে, সেকালে ভারতে একসঙ্গে একাধিক শাসন-প্রণালী প্রচলিত ছিল। আর এইসম্বন্ধে তখনকার লোক সজ্ঞানভাবেও চর্চ্চাফেরা করিত। অবদানশতক গ্রন্থকে খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী অথবা পরবর্ত্তী প্রথম শতাব্দে ফেলা হইয়া থাকে।

পঞ্জাবের ঔদুম্বর

ঔদুম্বর "গণ" পঞ্জাবের রাভি-ধৌত জনপদে "রাজত্ব" করিত। খৃষ্ট-পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীর মুদ্রার ভিতর ঔদুম্বরদের প্রচারিত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

কুষাণ সাম্রাজ্যের সঙ্গে ঔদুম্বর জাতির কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, জানা যায় না।

যৌধেয়দের নাম-ডাক

ঔদুম্বরদের দক্ষিণে যৌধেয় জাতির রাজ্য অবস্থিত ছিল। কানিংহাম-প্রণীত "কয়েন্‌স্ অব্ এন্‌শেণ্ট্ ইণ্ডিয়া" অর্থাৎ "প্রাচীন ভারতের মুদ্রা" নামক গ্রন্থে (লণ্ডন, ১৮৯১) দেখিতে পাই যে, যৌধেয় 'গণের' কোনো-কোনো মুদ্রা খৃষ্টপূর্ব্ব ১০০ সালে প্রচারিত হইয়াছিল।

পঞ্জাবের সাইলেজ্ নদীর দুইধারেই যৌধেয়দের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব্বদিকে যমুনার কিনারা পর্য্যন্ত তাহাদের প্রভাব লক্ষ্য করা সম্ভব। দক্ষিণে রাজপুতানায়ও যৌধেয়দের হাত ছিল। মোটের উপর যৌধেয় জাতিকে ঔদুম্বরের মতনই পঞ্জাবী ধরিয়া লইতে পারি।

সেকালে লড়াইয়ের আখড়ায় যৌধেয়দের নাম-ডাক ছিল খুব ভারী। ক্ষত্রিয়দের ভিতরেও তাঁহারা ক্ষত্রিয়, এইরূপই ছিল সমাজে খ্যাতি। অর্থাৎ বীর ত বীর যৌধেয় বীর। এই কীর্ত্তি দেশ-বিদেশে রটিয়াছিল।

গ্রীক আলেকজাণ্ডারের বিরুদ্ধে যে-সকল ভারতীয় জাতি লড়িয়াছিল, (খৃঃ পূঃ ৩২৩) তাহাদের ভিতর যৌধেয় অন্যতম। যৌধেয়দের সঙ্গে দেশী রাজরাজড়াদের লড়াইও ঘটিয়াছে। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দের

এক তাম্রশাসনে এই লড়াইয়ের বৃত্তান্ত দেখিতে পাই, ১৯০৫—০৬ সালের "এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা" অর্থাৎ "ভারতীয় লিপি"-নামক পত্রিকায়। লড়াইটা ঘটিয়াছিল রুদ্রদামনের সঙ্গে (খৃঃ অঃ ১২৫-১৫০)। রুদ্রদামন যৌধেয়দের হাড় ভাঙিয়া দিয়াছিলেন।

যৌধেয়গণের নায়ক মহারাজ নামে পরিচিত হইতেন। নায়ককে জনগণ-কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত করিবার ব্যবস্থা ছিল। গণের সর্দ্দারই লড়াইয়ের কাজের জন্য "মহা-সেনাপতি" বিবেচিত হইতেন।

রাজপুত আর্জ্জুনায়ন

যৌধেয় জাতির লাগাও দক্ষিণে রাজত্ব করিত আর্জ্জুনায়ন-"গণ"। ইংরেজ পণ্ডিত র‍্যাপসন-প্রণীত "ইণ্ডিয়ান্ কয়েন্স্"-গ্রন্থে (ষ্ট্রাসবুর্গ, ১৮৯৭) আর্জ্জুনায়নদের মুদ্রা উল্লিখিত আছে। রাজপুতানার উত্তরার্দ্ধে এই জাতির স্বদেশ ছিল, বুঝিতে পারি। খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দী-সম্বন্ধেই প্রমাণ পাওয়া যায়।

মালব-"গণ"

মালবীয়েরা চান্দাল এবং বেত্তোয়া এই দুই দরিয়ার মধ্যবর্ত্তী জনপদের মালিক ছিল। আর্জ্জুনায়নরা ইহাদের উত্তরের লোক।

বোধ হয়, খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দে মালব-"গণের" মুদ্রা জারি হইতে থাকে। যৌধেয়দের মতন মালবীয়েরাও লড়াই-প্রেমিক জাতি। আলেক্জান্দার তাহাদের বাহুবল চাখিয়া গিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দের এক তাম্রশাসনে দেশী রাজাদের সঙ্গে ইহাদের এক সমরকাণ্ড উল্লিখিত আছে।

উত্তমভদ্র নামে এক জাতি ক্ষত্রপ নহপানের অধীনে এক "করদ" রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিয়াছিল। মালবীয়ারা উত্তমভদ্রদের উপর শক্তিযোগের অভিযান চালায়। কাজেই নহপান নিজের আশ্রিতদিগকে সাহায্য করিবার জন্য মালবগণের বিরুদ্ধে সেনাপতি উষবদাতকে পাঠাইয়াছিলেন।

সিবি

মালবীয়দের পশ্চিমে সিবি জাতি অবস্থিত ছিল। খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষদিকে সিবিদের মুদ্রা প্রচলিত হইতে থাকে।

কুনিন্দ ও বৃষ্ণি

এইবার গঙ্গা-যমুনা-মাতৃক জনপদের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাউক। পাঞ্জাবী যৌধেয়দের পূর্ব্বদিকে কুনিন্দ নামে এক জাতির মুলুক ছিল। হিমালয়ের পা-পর্য্যন্ত ইঁহাদের এক্তিয়ার চলিত। গবর্মেণ্টের 'আর্কি-অলজিক্যাল্ সার্ভে রিপোর্ট' অর্থাৎ "প্রত্নতত্ত্বগবেষণার কার্য্যবিবরণী"র চতুর্দ্দশ খণ্ডে কুনিন্দদের সংবাদ বাহির হইয়াছে।

গঙ্গা ও যমুনার মাঝামাঝি উত্তর অঞ্চল কুনিন্দ"গণের" রাষ্ট্রের অন্তর্গত এইরূপ বুঝা যায়। খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে ইহাদের মুদ্রা প্রচলিত ছিল।

বৃষ্ণি-জাতি কুনিন্দদেরই লাগাও কোনো স্বাধীন গণরাষ্ট্রের লোক। খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর ভারতীয় মুদ্রার মধ্যে বৃষ্ণিদের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সমস্যা

গণ-রাষ্ট্রের ইতিহাস রচনা বর্ত্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্য নয়। তবে বিষয়টা বোধ হয় বাংলায় এখনো আলোচিত হয় নাই। এই কারণে গণগুলার ভৌগোলিক তথ্য বিবৃত করা হইল। এই বিষয়ে রমেশচন্দ্রের ইংরেজী গ্রন্থে সর্ব্বপ্রথম সুবিস্তৃত আলোচনা বাহির হইয়াছে।

(১)

গণগুলার "কন্‌ষ্টিটিউশন্" বা রাষ্ট্রশাসন-সম্বন্ধে এখনো বিশেষ-কিছু জানা যায় না। প্রথমেই জিজ্ঞাসা করা দরকার,—এইসকল জন-কেন্দ্রকে "রাষ্ট্র" বলা চলিতে পারে কি?

মুদ্রার সাহায্যে এইমাত্র বুঝি যে, কতকগুলা "জাতির" প্রচারিত টাকা দেশ-বিদেশে প্রচলিত ছিল। এইসকল শব্দে জাতিই বুঝিতে হইবে,—"দেশ" নয়। ঔদুম্বর ইত্যাদি জাতীয় নরনারীর "গণ" টাকা ছাড়িতে অভ্যস্ত ছিল। মুদ্রাগুলার গায়ে কোনো দেশের নাম করা হয় নাই কেন? এই গেল প্রথম সমস্যা।

[২]

দ্বিতীয় সমস্যা উঠিবে "গণ" শব্দ হইতে। গণের শাসন সকলক্ষেত্রেই "রাষ্ট্র"-শাসন নয়। ব্যবসায়ীদের বা শিল্পীদের "শ্রেণী" ও "গণ"-নামে পরিচিত হইতে পারে। শ্রেণী-শাসনকেও গণ-শাসন বলা হইয়া থাকে।

কৌটিল্য যেসকল "সমূহ"কে "বার্ত্তাশাস্ত্রোপজীবী"* সঙ্ঘ বলিয়াছেন ঔদুম্বর ইত্যাদি জাতীয় লোকেরা যে সেইরূপ সঙ্ঘ নয়, তাহার প্রমাণ কি? এইসকল জাতি মুদ্রা চালাইতে অধিকারী, একথা সত্য, কিন্তু "শ্রেণী", গিল্ড্, "বার্ত্তাশাস্ত্রোপজীবী" সঙ্ঘ ইত্যাদি জন-সমষ্টিও টাকা ছাড়িবার এক্তিয়ার রাখে। মুদ্রা চালাইবার এক্তিয়ার আছে বলিয়াই এই "সমূহ"গুলাকে রাষ্ট্র বলা চলিতে পারে না।

(৩)

এইখানেই সমস্যা চুকিল না। ঔদুম্বর ইত্যাদি জাতি সকলেই লড়াইয়ে ওস্তাদ। কেহ-কেহ আলেক্জান্দারের বিরুদ্ধে লড়িয়াছে, কেহ-কেহ নহপান, কেহ বা রুদ্রদামনের সঙ্গে লড়িয়াছে। আবার সমুদ্রগুপ্তকেও ইহাদের কাহারও কাহারও সঙ্গে লড়িতে হইয়াছে।

কিন্তু লড়াই করিবার এক্তিয়ার তাঁহাদের ছিল বলিয়াই কি তাহারা রাষ্ট্র? প্রথম অধ্যায়ে জনগণের সমাজ-কেন্দ্র আলোচনা করিবার সময়ে দেখিয়াছি, পাণিনি "আয়ুধ-জীবী" সঙ্ঘ নামে একপ্রকার সঙ্ঘ জানেন। আবার কৌটিল্যও ক্ষত্রিয় শ্রেণীর কথা বলিয়াছেন। ঔদুম্বর ইত্যাদি জাতির "গণ" যে এইরূপ রণ-ধর্ম্মীদের সঙ্ঘ নয়, তাহা কে বলিতে পারে? অধিকন্তু তাহাদের কেহ-কেহ যে পাণিনির পরিচিত "ব্রাত" বা গুণ্ডার দল নয় তাহাই বা কে বলিল?

"গণ"গুলা "শ্রেণী" না "রাষ্ট্র"?

এইসকল সন্দেহ উঠা অবশ্যম্ভাবী। সম্প্রতি মাত্র একটা কথা বলিব। কোনো মামুলি সঙ্ঘ একসঙ্গে "বার্ত্তাশাস্ত্রোপজীবী" এবং "আয়ুধজীবী" বা "ক্ষত্রিয় শ্রেণী" দুইই হইতে পারে না। শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে-সকল লোক "শ্রেণী" বা "গিল্ড্"রূপে সঙ্ঘবদ্ধ তাহারা লড়াইয়ের ধর্ম্মে মাতে না। টাকা রোজগার করা তাহাদের ধান্ধা, তাহারা টাকা দিয়া লড়াই-ধর্ম্মীদিগকে সাহায্য করে। টাকা দিয়াই খালাস। তাহাদের টাকা "গুখিয়া" ধন-সচিবেরা পল্টনের খোর-পোষ জোগায়। নেহাৎ জরুরি পড়িলে শিল্পী-ব্যবসায়ীরাও কুচ-কাওয়াজে লাগিয়া যাইতে পারে সন্দেহ নাই। কিন্তু তখন তাহারা আর বার্ত্তাশাস্ত্রোপজীবী" রূপে বিবৃত হয় না। তখন তাহারা দেশের সাধারণ পল্টনের বিচ্ছিন্ন ফৌজমাত্র।

আবার যাহারা "আয়ুধজীবী" বা "ক্ষত্রিয় শ্রেণী" রূপে সঙ্ঘবদ্ধ তাহারা মামুলি "বার্ত্তাশাস্ত্রের চর্চ্চায়" অর্থাৎ কৃষি-শিল্প, বাণিজ্যে সময় কাটায় না। কাজেই মুদ্রা চালানো তাঁহাদের নিত্যকর্ম্ম-পদ্ধতির

---

* কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের মহীশূর, লাহোর ও ত্রিবন্দ্রম্ হইতে যে তিনখানি সংস্করণ বাহির হইয়াছে তাহাদের সবগুলিতেই পাঠ হইতেছে বার্ত্তাশস্ত্রোপজীবী (পৃঃ যথাক্রমে ৩৭৬, ২৩১, ১৪৪)। লেখক এখানে "বার্ত্তাশাস্ত্রোপজীবী" পাঠ ধরিয়া লইয়া অনুরূপ অর্থ করিয়াছেন। জয়সওয়াল কিন্তু মনে করেন তাহারা কৃষিজীবীও ছিলেন, যোদ্ধাও ছিলেন (হিন্দুপলিটি পৃঃ ৩৬, ৩৭, ৬৭ ও ৮০)। —প্রবাসীর সম্পাদক

ভিতর গণ্য হইতে পারে না। লড়াই-ধর্মের সঙ্গে ব্যবসার যোগ রাখিয়া জীবন-যাপন করা স্বভাবসিদ্ধ কথা নয়। তাহা ছাড়া যে সব লোক খাঁটি ভণ্ড, তাহাদের পক্ষে সমাজে মুদ্রা প্রচলিত করা একপ্রকার অসম্ভব।

কিন্তু উডুম্বর ইত্যাদি জাতি একসঙ্গে টাকাও ছাড়িতেছে, আবার লড়িতেছেও। এই কারণে মনে হয় যে তাহারা সাধারণ "গিল্ড্" মাত্র নয়, আবার "পল্টনের দল" মাত্রও নয়। তাহাদের "গণ", বাস্তবিক-পক্ষে "রাষ্ট্র"। কৌটিল্য যেসকল "গণ", "সঙ্ঘ" বা "সমূহ"কে "রাজশব্দোপজীবী" বলিয়াছেন, ইহারা সেই নামের দাবি রাখে।

জাতিবাচক শব্দ ?

ইহাদিগকে রাষ্ট্র বলিতেছি বটে, কিন্তু প্রশ্নটা আবার উঠিতেছে, মুদ্রাগুলার সঙ্গে কোনো "দেশ"-বস্তুর যোগাযোগ নাই কেন? জাতি-বাচক শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে কেন? ইহাদিগকে "শ্রেণী" বা 'পল্টনের দল' না বলিয়া যদি "রাজশব্দোপজীবী" জনসমষ্টি বা রাষ্ট্রই বলিতে হয়, তাহা হইলে এইসব কোন্‌ধরণের রাষ্ট্র? মৌর্য্য, চোল ইত্যাদি বংশের রাষ্ট্র যেধরণের রাষ্ট্র, এইগুলা কি সেইধরণের রাষ্ট্র?

জাতি বাচক শব্দ দেখিবামাত্রই নৃতত্ত্ব ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তরফ হইতে এইসকল সন্দেহ উঠিতে বাধ্য। মৌর্য্য চোল ভারতে 'সমাজে'-'রাষ্ট্রে' আকাশ-পাতাল প্রভেদ। রাষ্ট্রনামক বস্তু সমাজ হইতে আলাদা হইয়া পড়িয়াছে। বস্তুতঃ শাসন-যন্ত্রটাকেই শাসন-যন্ত্রের ঘরবাড়ী, দপ্তরখানা, কাগজপত্র, কেরানীকুল "বুরোক্রেসি" বা শাসনাধ্যক্ষদের স্তরবিন্যাস, এইসবকেই 'রাষ্ট্র' বলা সেকালের মেজাজ-মাফিক বিবেচিত হইবে।

উডুম্বর ইত্যাদি জাতির গণ-শাসনে শাসন-যন্ত্রটা কতখানি বিশিষ্টতা এবং স্বাতন্ত্র্যলাভ করিয়াছিল? "সমাজের সঙ্গে শাসন-যন্ত্রের সম্বন্ধ কোন্ আকারে দেখা দিত? তথ্য যখন কিছুই নাই, তখন সন্দেহ করা চলে যে, বোধ হয় এইসকল জাতি-বাচক শব্দের অন্তর্গত জন-কেন্দ্রে রাষ্ট্রনামক বস্তু সমাজ হইতে আলাদা হইয়া পড়ে নাই। সমাজটাই বোধ হয় রাষ্ট্রের কাজকর্ম্ম চালাইত। অর্থাৎ সমাজই ছিল রাষ্ট্র।

এইরূপ সন্দেহ করা যুক্তিসঙ্গত হইলে বলিব যে,—এইসকল "গণকে" "রাষ্ট্র" বলা চলে না। বর্ত্তমান গ্রন্থের অন্যান্য হিন্দু জনসঙ্ঘ যে-হিসাবে রাষ্ট্র, উডুম্বরেরা সেই হিসাবের রাষ্ট্র চিনিত না। মানবজাতির জীবন-বিকাশের যে-ধাপে নরনারী রাষ্ট্র নামক কেন্দ্রের পরিণতি লাভ করে, সেই স্তরে তাহারা উঠিতে পারে নাই। এই অবস্থাকে প্রাক্‌ রাষ্ট্রীয় এবং সঙ্গে-সঙ্গে অ-রাষ্ট্রীয়ও বলা চলে। তবে রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের আসরে এইসকল 'আদিম' গড়নের আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক নয়। হোমর্‌ সাহিত্যের গ্রীক্‌ সমাজ এবং তাকিতুস্‌-বিবৃত জার্ম্মান্‌ সমাজ এইরূপ প্রাক্‌ রাষ্ট্রীয় দেশ-জ্ঞানহীন জন-কেন্দ্র।

আমেরিকার ইরোকোআ জাতি

ইয়াকিস্থানের "লোহিতাঙ্গ-ইণ্ডিয়ান্‌"দের ভিতর অনেক জাতি এই আদিমতর অবস্থা লাভ করিয়াছিল। তাহার উপরের কোঠায় ইহাদের কেহই উঠিতে পারে নাই। নিউইয়র্ক্‌ প্রদেশের ইরোকোআ জাতি এইসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইরোকোআদের জীবনে যে সাম্য, স্বাধীনতা এবং স্বরাজ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা তথাকথিত "উন্নত-তম" নর-নারীর জীবনে বিরল।

যৌধেয়, মালব ইত্যাদি জাতির জীবন-গড়নকে কাঠামো-হিসাবে ইরোকোআ "গণের" অথবা গ্রীক্‌ ও জার্ম্মানদের প্রাক্‌-রাষ্ট্রীয় সমাজ হইতে অভিন্ন বিবেচনা করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে। এইদিকে অনুসন্ধান চালানো যাইতে পারে।* জার্ম্মান্‌ ধনবিজ্ঞানবিৎ এঙ্গেল্‌স্‌-প্রণীত "পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র" নামক গ্রন্থে ইরোকোআদের গণ-শাসন বিশদরূপে আলোচিত আছে। হিন্দু রাষ্ট্রের গড়ন বুঝিবার পক্ষে এই গ্রন্থের নৃতত্ত্ব-বিষয়ক তথ্য হইতে অনেক ইসারা পাওয়া যাইবে।

হিন্দু সভ্যতায় গণতন্ত্রের প্রভাব

যাহা হউক, পারিভাষিক হিসাবে রাষ্ট্র বলা যাউক বা না যাউক, গণতন্ত্রের নিদর্শন-হিসাবে উডুম্বর ইত্যাদি জাতি, হিন্দু নরনারীর প্রাচীন প্রতিনিধি। খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী শেষ দেড়শ বৎসর তাহারা জীবিত ছিল, বেশ বুঝা যায়। সেই সময়ে ইয়োরোপে চলিতেছিল রোমান্‌ গণতন্ত্রের যুগ। রোমে তখন গণতন্ত্রের সর্দ্দারেরা পরস্পর লাঠালাঠি করিয়া রাজতন্ত্রের পথ পরিষ্কার করিতে ব্যাপৃত।

"গণ"গুলা খৃষ্টাব্দের প্রথম সাড়ে তিনশ বৎসর জীবিত ছিল, এরূপও বুঝিতেছি। অর্থাৎ অন্ততঃ পাঁচশ' বৎসর ধরিয়া ভারতে গণ-শাসন চলিতেছিল। যেসকল জনপদে হিন্দু নরনারী গণ-তন্ত্রের শাসনে অভ্যস্ত ছিল, সেইসব একত্র করিলে আজকালকার গোটা ফ্রান্সের বহর পাওয়া যায়।

কাজেই ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে কয়েকটা নতুন সমস্যা উঠিতেছে। প্রথমত বিনা কল্পনাতেই বেশ বুঝা যায় যে, গণগুলা পরস্পর লড়ালড়ি করিত। আবার আশেপাশের রাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের সঙ্গে "আবাপ" অর্থাৎ বন্ধুত্ব অথবা শত্রুতার সম্বন্ধে যোগাযোগও তাহাদের ছিল। ভারতীয় রাজতন্ত্রের বিকাশে পার্শ্ববর্ত্তী গণতন্ত্রের প্রভাব কিরূপ এবং কতটা আন্দাজ করিতে হইবে?

দ্বিতীয়তঃ, খৃষ্টপূর্ব্ব ১৫০ হইতে খৃষ্টীয় ৩৫০ সাল পর্যন্ত পাঁচশত বৎসর হিন্দুজাতির সাহিত্য, দর্শন, সুকুমার শিল্প, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম কর্ম্ম ইত্যাদির পক্ষে অতি বিশেষত্বপূর্ণ কাল।

পরবর্ত্তী গুপ্ত ভারতে কালিদাস-বরাহমিহির হিন্দু সভ্যতার জন্য যাহা-কিছু করিয়া গিয়াছেন তাহার জন্মকালই এই পাঁচশ' বৎসর। কাজেই জিজ্ঞাস্য,— গুপ্ত গৌরবের যাঁহারা জন্মদাতা, পিতামহ অথবা প্রপিতামহ; তাঁহাদের মধ্যে কোন্‌-কোন্‌ চিন্তাবীর ও কর্ম্মবীর গণতন্ত্রী রাষ্ট্রের বা সমাজের লোক ছিলেন? পতঞ্জলি, অশ্বঘোষ, নাগার্জ্জুন, ভরত, মনু ইত্যাদির ভিতর কে-কে রাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের প্রজা আর কেই বা গণতন্ত্রের আবহাওয়ায় জীবিত ছিলেন?

এইসকল ঐতিহাসিক সমস্যা লইয়া সময় কাটানো এখানে চলিতে পারে না. গণগুলার নাম-ধাম বাহির হইয়া পড়িবামাত্র হিন্দুজাতির যৌন-সম্বন্ধ, রক্তসংমিশ্রণ, সমাজ-দর্শন, ধর্ম্মতত্ত্ব, শিল্পকর্ম্ম ইত্যাদি সকল বিভাগেই নতুন গবেষণা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, এইটুকু বলিয়া রাখা দরকার বোধ করিতেছি মাত্র।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আলেকজান্দার-বিরোধী পাঞ্জাবী "গণ"

(খৃঃ পূঃ ৩৫০—৩০০)

গ্রীক ফৌজের গল্পগুজব

উডুম্বর ইত্যাদি আর্য্যাবর্ত্তের "গণ"গুলা আকাশ হইতে খপ্‌ করিয়া

* প্রাচীন ভারতের যুগে-যুগে "একসঙ্গে বিভিন্ন 'স্তরের' রাষ্ট্রীয় গড়ন চলিতেছিল। সকল ভারতীয় প্রদেশ বা জাতিই "সভ্যতা-সিঁড়ির" একই ধাপে অবস্থিত ছিল না। এই "উনিশ" "বিশ" বিশ্লেষণ করিবার দিকে ভারততত্ত্ববিদেরা কোনো উল্লেখযোগ্য চেষ্টা করেন নাই।

মাটিতে পড়ে নাই। ভারতীয় জলবায়ুর পক্ষে এসব নেহাৎ "প্রকৃতির খেয়াল" মাত্র নয়। পূর্ব্ববর্ত্তী যুগেও এইসমুদয়ের সাড়া পাওয়া যায়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বৌধেয় এবং মালব জাতি আলেকজান্দারের বিরুদ্ধে লড়িয়াছিল। কাজেই খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে (৩২৪) গণ-তন্ত্রের শাসন "পশ্চিম" ভারতে সুপ্রচলিত ছিল, সেই ধারাই পরবর্ত্তীকালে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর সমুদ্রগুপ্ত পর্য্যন্ত দেখিতে পাই।

বাস্তবিক পক্ষে আলেকজান্দার ভারতের পশ্চিম সীমানায় (খৃঃ পূঃ ৩২৭-৩২৩) উপস্থিত হইয়া কি দেখিয়াছিলেন? তাঁহার সমর-কাহিনীর গ্রীক ও ল্যাটিন্ ইতিহাসগুলা বিশ্বাস করিলে বলিতে হইবে যে, গ্রীক্-সেনার গতিরোধ করিয়া যে-সকল হিন্দু পল্টন ভারতের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিল, তাহারা প্রায় সকলেই গণতন্ত্রের লোক। এক "পুরুরাজ" ছাড়া আলেকজান্দার হিন্দুসমাজে বোধ হয় অন্ত-কোনো রাজার সাক্ষাৎ পান নাই।

গ্রীক্ ফৌজেরা ভারতের যে-সংবাদ স্বদেশে লইয়া গিয়াছিল, সেই সংবাদে হিন্দু-জাতিকে মোটের উপর গণ-তন্ত্রী ভিন্ন আর কিছু বুঝা সম্ভবপর নয়। গ্রীক্ সিপাহীদের গল্পগুজবই বিশ বৎসর পরে মেগাস্থেনিসের গ্রীক্ কেতাবে স্থান পাইয়াছিল। এই কেতাবই সাড়ে তিন-চারশ বৎসর পরে দিয়োদোরুস্ ইত্যাদি ঐতিহাসিকগণের রচনায় রসদ জোগাইয়াছে।

পতল

সিন্ধু-"বদ্বীপের" মাথার নিকট পতল নগর অবস্থিত ছিল। দিয়োদোরুস (খৃঃ অঃ ৫০) বলেন যে,—এই নগরের জনগণ এক মাতব্বর-সভা কর্তৃক শাসিত হইত। সভাটাই ছিল রাষ্ট্রের সর্ব্বময় কর্ত্তা-বিশেষ, লড়াইয়ের নায়ক ছিল দুইজন। প্রত্যেকেই এক-এক বংশের প্রতিনিধি, জন্মের অধিকারে বংশানুক্রমে এই দুই নায়ক রাষ্ট্রে ঠাঁই পাইত।

কাজেই গ্রীক্‌রা পতলে আসিয়া তাহাদের "পুরাণ"-কথিত স্পার্টা নগরের হিন্দু সংস্করণ দেখিতেছে, এইরূপই ভাবিয়াছিল। মোহিতোজ-ইণ্ডিয়ান্ সমাজের গণ-তন্ত্রেও এইরূপ শাসন-বিধি দেখা যায়।

মালব-ক্ষুদ্রক বন্ধুত্ব

আরিয়ান্ (খৃঃ অঃ ১৩০) তাঁহার "ইন্দিকায়" বলিয়াছেন যে, মালবীরেরা ভারতের এক "স্বতন্ত্র জাতি"। তিনি ক্ষুদ্রকদিগকে স্বাধীনতা-ভক্তরূপে বিবৃত করিয়াছেন।

"রোমান" দিয়োদোরুসের 'পৃথিবীর ইতিহাস"-গ্রন্থের মতন আরিয়ানের ভারত-বিষয়ক গ্রন্থও গ্রীকভাষায় লিখিত। ভারতীয় জাতিপুঞ্জ-সম্বন্ধে তিনি গ্রীক্ ফৌজের প্রচারিত গ্রীক্ নামই চালাইয়াছেন। আরিয়ানের বইয়ে মালবদিগকে "মাল্লোয়" এবং ক্ষুদ্রকদিগকে "অক্‌সিদ্রাকোয়" রূপে দেখিতে পাই।

মালবে আর ক্ষুদ্রকে সম্বন্ধ ছিল আদায়-কাঁচকলায়। গ্রীসের আথেনিয়ান এবং স্পার্টান জাতির মতন এই দুই ভারতীয় জাতি সর্ব্বদা পরস্পর কামড়া-কামড়ি করিয়া মরিতে অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু বিদেশী শত্রু ভারত আক্রমণ করিতে আসিয়াছে শুনিবামাত্র তাহারা "ভাই ভাই এক-ঠাঁই" হইয়া পরস্পর পরস্পরের হাতে "রাখীবন্ধনের" প্রেমে আবদ্ধ হইয়াছিল। খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে পারস্যের ফৌজ যখন গ্রীস্ আক্রমণ করে, সেই সময়ে আথেনীয় এবং স্পার্টান্‌রা এইধরণের বন্ধুত্বই কায়েম করিয়াছিল। গ্রীক্ আর হিন্দু চরিত্রে কোনো প্রভেদ নাই।

মালব-ক্ষুদ্রক বন্ধুত্বের কায়দাটা কিছু বিচিত্র। আলেকজান্দারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হইবার জন্য "জাতিগত পাত্রী-বিনিময়" অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। দিয়োদোরুস বলেন যে, মালবীরদের দশ হাজার কন্যার পাণিগ্রহণ করে দশ হাজার ক্ষুদ্রক যুবা, আবার দশহাজার মালবীয় যুবার সঙ্গে দশহাজার ক্ষুদ্রক যুবতীর বিবাহ হয়।

এই বিবাহের কাণ্ডে কি একমাত্র "রাষ্ট্রনৈতিক" সত্যই সমঝিতে হইবে? না ইহার ভিতর বিবাহ-বিজ্ঞানের, যৌনসংশ্রবের, রক্ত-সংমিশ্রণের নৃতত্ত্ব-বিষয়ক তথ্যও লুকাইয়া আছে? একটা দলকে-দল আর-একটা দলের সঙ্গে বিবাহিত হইতেছে, এই দৃশ্য আজকালকার দিনে কিস্তৃত-কিমাকার সন্দেহ নাই। কিন্তু দলগত বিবাহ"গ্রুপ-ম্যারেজ" মানবজাতির যৌন ইতিহাসে বিচিত্র নয়।

এঙ্গেল্‌সের "পরিবার গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র" নামক গ্রন্থে বিবৃত 'দল-গত বিবাহ" পুরাপুরি হয়ত এই মালব-ক্ষুদ্রক কাণ্ডে না পাওয়া যাইতেও পারে। কিন্তু "বিবাহের মেল" নামক যে-বস্তু আজকালকার ভারতে চলিতেছে, তাহার কোনো পূর্ব্বপুরুষের সঙ্গে দিয়োদোরুস-কথিত রাষ্ট্র-নৈতিক বন্ধুত্বের যোগাযোগ আছে কি না, সমাজ-তত্ত্বের তরফ হইতে ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।

যাহা হউক, এই বন্ধুত্বের ফলে আলেকজান্দারের বিরুদ্ধে এক বিশাল সেনা খাড়া হইতে পারিয়াছিল। ৯০,০০০ পদাতিক, ১০,০০০ ঘোড়সওয়ার এবং ৯০০ রথ নাকি মালব-ক্ষুদ্রক পল্টনের সমবেত সামরিক শক্তি ছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে সমর-বিভাগের আলোচনায় এইসকল সংখ্যা-সম্বন্ধে সতর্ক থাকিবার কথা বলা গিয়াছে।

সম্বাস্তায় ও জেত্রোস্তয়

বহুসংখ্যক জাতির নাম এইসকল ইতিহাসে দেখিতে পাই। ঐতিহাসিকগণ প্রত্যেককেই গণ-তন্ত্রীরূপে বিবৃত করিয়াছেন। কিন্তু নামগুলা দেখিয়া ইহারা যে ভারতের কোন্ জাতি তাহা ঠাওরানো অতি কঠিন।

এক জাতির নাম সম্বাস্তায়। দিয়োদোরুস সংক্ষেপে বলিয়াছেন, সম্বাস্তায় জাতির লোকেরা যে-সকল নগরে বসবাস করিত, সেইসকল নগরের শাসনে স্বরাজ বা আত্মকর্তৃত্বের ব্যবস্থা ছিল।

এইধরণের আর-এক জাতির কথা কুর্ত্তিয়ুস (খৃঃ অঃ ২০০) বলিয়াছেন, তাহার নাম চেত্রোসী বা জেত্রোস্তয়, এইজাতির লোকও স্বরাজী এবং স্বাধীন বলিয়া বিবৃত। তাহাদের রাষ্ট্রের পরিচালনায় সভার বৈঠক বসিত।

সর্ব্বাণী

সামরিক-হিসাবে জবরদস্তরূপে সর্ব্বাণীদিগকে কুর্ত্তিয়ুস বিবৃত করিয়াছেন। এই সর্ব্বাণীরা হয়ত দিয়োদোরুসের সম্বাস্তায় হইতে অভিন্ন।

কুর্ত্তিয়ুস বলেন যে, সর্ব্বাণীদের কোনো রাজরাজড়া ছিল না। স্বরাজ-প্রতিষ্ঠান এই সমাজের শাসনে বদ্ধমূল ছিল।

লড়াইয়ের জন্য তিনজন করিয়া সর্দ্দার বাছাই করা হইত।

আলেক্‌জান্দারের বিরুদ্ধে সর্ব্বাণীরা ৬০,০০০ পদাতিক, ৬,০০০ ঘোড়সওয়ার আর ৫০০ রথ খাড়া করিয়াছিল।

রকমারি গণতন্ত্র

গ্রীক ফৌজেরা ভারতকে গ্রীক্ চোখে দেখিতেছিল, সন্দেহ নাই। রাষ্ট্র শাসন-সম্বন্ধে যেটুকু সিধেট খবর পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে স্বরাজ, স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের আবহাওয়াই পরিস্ফুট। কিন্তু তাহা বলিয়া পেরিক্লেসের আথেনীয় গণতন্ত্র অথবা রোমান্ গণতন্ত্রের যৌবনকাল এইসকল বৃত্তান্তে পাইতেছি, এরূপ বলা চলে না।

আথেন্সের বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন গণতন্ত্রের পরিচয় পাই। রোমের গণতন্ত্রেও নানা যুগ আছে। এইসকল যুগের কোনো-কোনোটার

প্রাচীনতম অবস্থায় লোহিতাক্ষ ইণ্ডিয়ান্ সমাজের গণতন্ত্রী স্বরাজই মূর্ত্তিমান্। সর্ব্বাণী, জেগ্রোস্তর ইত্যাদিকে কোন্ কোঠায় ফেলা যাইবে ?

ক্ষত্রিয় ও অন্যান্য জাতির গণ

আরিয়ানের গ্রন্থে আরও কতকগুলা জাতির নাম পাওয়া গিয়াছে। ওরেভায়, অবস্তানোয়, কৃজাথ্রোয় এবং অরবিতায়-নামক জাতিগুলা স্বাধীন বলিয়া বিবৃত। তাহাদের সর্দ্দারদিগকে রাজতন্ত্রের নায়ক বলা হয় নাই।

এই চার জাতির ভিতর গ্রীক্ ভাষার কৃজাথ্রোয়কে আমাদের ক্ষত্রিয় বিবেচনা করা চলে। ক্ষত্রিয় জাতি নৌকা চালাইতে এবং নৌকা গড়িতে ওস্তাদ ছিল। আলেক্জান্দার ক্ষত্রিয়দের নিকট হইতে ত্রিশ দাঁড়ের জাহাজ পাইয়াছিলেন।

অগলাস্সোয় জাতির বীরত্ব

পঞ্জাবের যে-সকল হিন্দুবীর দৃঢ়পদে ইয়োরোপীয়ান্ শক্রদিগকে পরাস্ত করিতেছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অগলাস্সোয়রা সেকালে ভারতীয় স্বদেশ-সেবার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিল। কুর্ত্তিয়ুস বলেন,—অগলাস্সোয় জাতির নিকট আলেক্জান্দারকে বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল।

আলেকজান্দারকে অগলাস্সোয়রা হটাইতে সমর্থ হয় নাই। এই অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া এই স্বদেশভক্ত জাতির গণনায়কগণ নগরে আগুন লাগাইয়া দিয়াছিলেন। তাহার পর জন্মভূমির সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীপুত্রদিগকে লইয়া সমবেতভাবে আগুনের ভিতর জীবনলীলা সম্পূর্ণ করা তাঁহারা স্বধর্ম্ম বিবেচনা করিয়াছিলেন।

পরবর্ত্তী কালে ভারতের নরনারী পরাধীনতার ডরে আগুনে ঝাঁপাইয়া প্রাণবিসর্জ্জন করিত। গ্রীক্রাও হিন্দু স্বাধীনতা-প্রিয়তার অপূর্ব্ব পরিচয় পাইয়াছিল। ভারতীয় "সতীত্ব" প্রথার ক্রমবিকাশে এই "মুশিদো" রীতির "স্বাধীনতা-"যোগ" কতটা খড়কুটা জোগাইয়াছে তাহা আলোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক।

নিসাইয়াদের গণতন্ত্র-প্রীতি

গ্রীক্রা হিন্দু-চরিত্রের সম্পর্কে আসিয়া ভারতীয় নরনারীর যেসকল ধরণ-ধারণ লক্ষ্য করিতেছিল, তাহার ভিতর গণ-তন্ত্র-নিষ্ঠা অন্যতম। এই বিষয়ে আরিয়ানের "ইন্দিকায়" একটা কাহিনী শুনিতে পাই।

নিসাইয়া-জাতি স্বাধীন গণতন্ত্রীরূপে বিবৃত। এই জাতির মাথায় ছিল একজন "মুখ্য" অর্থাৎ "প্রেসিডেণ্ট সদৃশ জননায়ক বা গণ-সর্দ্দার। কিন্তু শাসন-বিষয়ক সকল কাজ-কর্ম্ম চলিত সভার অধীনে। সভায় তিন শত "জ্ঞানী"দের বৈঠক বসিত। এই তিনশকে জাতির মাতব্বর বা আসল রাজা বিবেচনা করা চলে।

আলেকজান্দার এই তিন শ' মাতব্বরের ভিতরকার এক শ' জনকে নিজের জিম্মায় রাখিতে চাহিয়াছিলেন। নিসাইয়াদের নিকট হইতে এই উপলক্ষ্যে যে-জবাব আসে তাহা উল্লেখযোগ্য। আলেক্জান্দারকে জানানো হইয়াছিল,—"এক শ' জন শ্রেষ্ঠ লোককে বাদ দিলে এমন-কি একটা নগরও সুশাসিত হইতে পারে কি ?"

গ্রীক-রাজের নিকট এই ছিল হিন্দুগণ-তন্ত্রের বাণী। আলেক-জান্দারের পণ্টন পঞ্জাবের সর্ব্বত্র এই আবহাওয়াই ছুঁইয়া গিয়াছিল।

আরট্ট

কোনো-কোনো জাতির গণ বোধ হয় বিশেষ লোভনীয় বস্তু ছিল না। আরট্ট-নামক এক জাতিকে য়ুস্তিন (খৃঃ অঃ ৪০০) ডাকাইতের জাত-রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। পাণিনির "ব্রাত" বেবরণের লড়াই-প্রেমিক গুণ্ডা, আরট্টরা বোধ হয় সেইরূপ। আরট্টদিগকে "অরাষ্ট্রক" বলিলে ভারতীয় নাম পাওয়া যায়।

আরট্টদের জাতি ছিল কাঠিয়া জাতি।

১৯১৪ সালের "ইণ্ডিয়ান্ অ্যাণ্টিকোয়্যারি" নামক ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক পত্রিকায় শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ জয়সওয়াল বলেন যে,—

আরট্টরা মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের কাজে লাগিয়াছিল। চন্দ্রগুপ্ত যখন আলেকজান্দারের উত্তরাধিকারী "ম্লেচ্ছ"দিগকে আফগানিস্থান ও বেলুচিস্থান হইতে খেদাইয়া দিতে ছিলেন, তখন হয়ত এইসকল গুণ্ডার দলও তাঁহার পণ্টনে বাহাল ছিল। স্বদেশসেবক হিসাবে আরট্ট ব্যতীত নিসাইয়া, অগলাস্সোয়, সর্ব্বাণী, মালব এবং ক্ষুদ্রক ইত্যাদির সমানই স্বাধীনতার ইতিহাসে কীর্ত্তিলাভ করিয়াছে।

মেগাস্থেনিসের "গণ"-কাহিনী

আলেক্জান্দারের ভারত ছাড়িবার বাইশ বৎসর পরে মেগাস্থেনিস পাটলিপুত্রে আসিয়াছিলেন (খৃঃ পূঃ ৩০২)। তাঁহার ভারত-বৃত্তান্তে হিন্দু গণ-রাষ্ট্রের কাহিনী ঠাঁই পাইয়াছে।

দ্যোনোস্যুস হইতে চন্দ্রগুপ্ত পর্য্যন্ত নাকি ৬০৪২ বৎসর। এই সময়ের ভিতর নাকি ভারতে তিনবার গণতন্ত্র স্থাপিত হইয়াছিল। এই গল্পের কিম্মৎ যার যেরূপ মর্জ্জি তিনি সেইরূপ বুঝিতে অধিকারী।

মেগাস্থেনিস কতকগুলা নগরের কথা বলিয়াছেন। এইসকল দেশে নাকি রাজতন্ত্র লুপ্ত হয় এবং তাহার ঠাঁইয়ে গণতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হয়। কোনো-কোনো দেশে রাজতন্ত্র নাকি আলেক্জান্দারের আমল পর্য্যন্ত টিঁকিয়াছিল। এইসকল গল্পে ভারতীয় শাসন-প্রণালীর স্বরূপ-সম্বন্ধে ধারণা জন্মিতে পারে সন্দেহ নাই।

কয়েকটা জাতির নাম "ইন্দিকা"য় পাওয়া যায়। এইসকল জাতির মাথায় কোনো "রাজা" ছিল না। জাতিগুলা স্বাধীনও বটে। পার্ব্বত্য নগরে তাহাদের বসবাস। মাল্, ভেক্কোয়ী, সিংযী, মোরুণী, মরোহী ইত্যাদি নামে তাহারা মেগাস্থেনিসের গ্রন্থে পরিচিত।

পাহাড়ী জাতিদের গণ-তন্ত্র-সম্বন্ধে মেগাস্থেনিসের কাহিনী প্রবল সাক্ষ্য দেয়, তাহারা নাকি সমুদ্র পর্য্যন্ত পাহাড়ের মাথায়-মাথায় স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া চলিত। রাজ-রাজড়াদের ধার তাহারা ধারিত না।

মেগাস্থেনিসের বৃত্তান্তে "স্বাধীন নগর" শব্দ পুনঃপুনঃ ব্যবহৃত দেখিতে পাই। একটা রাষ্ট্রে নাকি পাঁচ হাজার লোকের বিরাট্ সভা শাসন চালাইত।

এইসকল পাহাড়ী জাতিকে ষ্টাইন তাঁহার "মেগাস্থেনিস ও কৌটিল্য" নামক জার্ম্মাণ গ্রন্থে (ভিয়েনা ১৯২২)" অর্থশাস্ত্রের "আটবিক" জাতি বিবেচনা করিতে প্রস্তুত। কৌটিল্যের কোনো-কোনো আটবিক জাতি হয়ত মেগাস্থেনিসের কোনো-কোনো জাতির সঙ্গে মিলে। কিন্তু সবটা এই অর্থে পুরাপুরি গ্রহণীয় নয়। "আটবিক" শব্দে 'বুনো' বুঝিতে হইবে না, বুঝিতে হইবে বনভূমির বাসিন্দা।

ভারতীয় "গণের" বিদেশীয় সাক্ষী

আলেক্জান্দারের সমরকার সর্ব্ব পুরাতন সাক্ষী মেগাস্থেনিস। কিন্তু মেগাস্থেনিস নিজে কোনো ভারতীয় গণ-রাষ্ট্র স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন কি ? বলা কঠিন। বোধ হয় না। কেননা চন্দ্রগুপ্তের আমলে সার্ব্বভৌম সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। তখন কোনো "স্বাধীন জাতি" "স্বাধীন নগর" রাজহীন রাষ্ট্রের স্বতন্ত্রতা ইত্যাদি বস্তু বাঁচিয়া ছিল বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না।

মেগাস্থেনিস "শোনা কথা" লিখিয়া গিয়াছেন। কিংবদন্তী, জনশ্রুতি ইত্যাদির যে দাম, গণ-বিষয়ক "ইন্দিকা"র রিপোর্টের দামও ঠিক তাই।

তাহার পর এইসকল বিষয়ের সর্ব্ব-প্রাচীন লেখক দিয়োডোরস। তিনি খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর লোক অর্থাৎ আলেক্জান্দারের ভারত-ত্যাগের প্রায় চার শ বৎসর পরে দিয়োডোরস হিন্দু গণ-রাষ্ট্রের সম্বন্ধ

গ্রীকবীরের লেন-দেন আলোচনা করিয়াছেন। আরিয়ান আরও এক শ' বৎসর পরের লোক। যুস্তিন্ খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষের দিকে জীবিত ছিলেন।

মেগাস্থেনিস ভারতে বসিয়া ভারত-বিষয়ক শোনা-কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু দিয়োদোরুস ইত্যাদির রচনায় সেই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ছায়া পর্য্যন্ত নাই। কাজেই কিম্বদন্তীর কিম্বদন্তী ছাড়া এইসকল ভারত-বিবরণের অন্ত কিম্বৎ দেওয়া অসম্ভব।

"গ্রীক" চোখে হিন্দুগণ-রাষ্ট্র

পূর্ব্বে একবার বলিয়াছি, গ্রীক্ ফৌজেরা গ্রীক্ চোখে হিন্দুস্থানের রাষ্ট্রীয় জীবন দেখিতেছিল। এই ফৌজেরা কতখানি "গ্রীক্" তাহা আলোচনা করিয়া দেখা দরকার।

প্রথমত, ফৌজের মনিব-বাহাদুরই বা কতটুকু "গ্রীক্"? আলেক্জান্দারকে সেকালের "কুলীন" গ্রীকেরা অসভ্য "বর্ব্বর" বিবেচনা করিত। আলেক্জান্দারের পিতা ফিলিপ্ ম্যাসিদোনিয়া দেশের "পাহাড়ী", "বুনো" রাজা ছিলেন। ৩৩৮ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে আসল গ্রীসের খাঁটি গণতন্ত্রী স্বরাজ এই "বর্ব্বরের" পদানত হয়। ফিলিপের "চৌদ্দপুরুষে" কেহ কখনো গ্রীক্‌গণতন্ত্রের 'অ, আ, ক, খ' র হাতে খড়ি দেয় নাই।

গণতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধন করিয়া ফিলিপ গোটা গ্রীক্ জাতিকে গোলামে পরিণত করেন। তৎপুত্র আলেক্জান্দার গদিতে বসিবামাত্র দিগ্‌বিজয়ে বাহির হইলেন। তখন গ্রীসে গণতন্ত্র বা স্বরাজ আর নাই। আলেক্জান্দার সর্ব্বত্র একটা নতুন-কিছু কায়েম করিবার পাণ্ডা ছিলেন।

দ্বিতীয়ত, এই নতুন-কিছুর যুগে যে গোলাম পল্টন আলেক্জান্দারের সঙ্গে এসিয়ায় আসিয়াছিল, তাহাদের ভিতর গণতন্ত্রের অভিজ্ঞতা-ওয়ালা লোক ছিল কত জন? তাহার পর সমগ্র তুরস্ক এবং পারস্য পার হইয়া যখন এই পল্টন আফগানিস্থানে হাজির হইল, তাহার ভিতর খাঁটি গ্রীক্ রক্তের লোক হাজির ছিল কত? আলেক্জান্দারের সেনায় "দেশী-বিদেশী", "বেতনভোগী" তণ্‌খা-সেবক ফৌজ প্রবেশ করিয়াছিল কতগুলা?

তৃতীয়ত, মেগাস্থেনিসের "গ্রীকত্ব"। এই "আবাপ"-হন্ক রাজদূতের মনিব সেলিউকস্ "দো-আঁসলা" গ্রীক্, "হেলেনিষ্টিক" সমাজের রাজা। খোদ গ্রীসের সঙ্গে তাহার কোনো সংস্রব ছিল না। তুর্কীর (এসিয়া-মাইনরের) এক নগরে বাবিলনে তাহার রাজধানী। আলেক্জান্দার এশিয়ার সর্ব্বত্র এবং গ্রীসেও আন্তর্জ্জাতিক বিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই আবহাওয়ায় সেলিউকস্ এবং তাঁহার প্রতিনিধি মেগাস্থেনিস গড়িয়া উঠেন। তাঁহারা উভয়েই গ্রীক্‌ভাষা জানিতেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই গ্রীক্‌কে কুলীন গ্রীকেরা গ্রীক্ বলিত কি না, সন্দেহ আছে। তবে গ্রীক্ সভ্যতা, গ্রীক্ আদর্শ, গ্রীক্ প্রতিষ্ঠান, গ্রীক্ রাষ্ট্র ইত্যাদি যে-বস্তু তাহার সঙ্গে এই দো-আঁসলা সমাজের "স্মৃতি" বা "স্বপ্নের" যোগ আধ কাঁচ্চাও ছিল না বলা চলে।

আসল গ্রীক্-গণতন্ত্র বলিলে যাহা-কিছু বুঝা যায়, সে-সব খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীর আথেন্সীয় মাল। তাহার সঙ্গে আলেক্জান্দারের, আলেক্জান্দারের পল্টনের, সেলিউকসের এবং মেগাস্থেনিসের যোগাযোগ হয় নাই। কাজেই ভারতীয় গণতন্ত্রের বিবরণ লিখিবার সময় মেগাস্থেনিস অথবা তাঁহার পরবর্ত্তী লেখকেরা "গ্রীক্" মত এবং "গ্রীক্" ব্যাখ্যা প্রকাশ করিতেছিল, এইরূপ "স্বীকার" করিয়া লওয়া উচিত নয়। সর্ব্বদাই স্বাধীন আলোচনার দ্বারা ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির দাম কষিতে হইবে।

হিন্দু গণ-রাষ্ট্রের গড়ন

শাসন-বিষয়ক তথ্য যতটুকু পাওয়া গিয়াছে, তাহার সাহায্যে বেশী কিছু বলা চলে না। সিসাইয়াদের সভায় তিন-শ' লোক বসিত। আর মেগাস্থেনিস-বিবৃত এক দেশে পাঁচ হাজার লোকের সভা ছিল। ব্যস্।

যে-দুইটা জাতির সভার কথা বলা হইয়াছে, তাহাদের যে আর-কোনো সভা ছিল না, তাহা কে বলিতে পারে? আলেক্জান্দারের পল্টন ও ভারতীয় রাষ্ট্রপুঞ্জের "পাব্‌লিক ল" বা শাসন-প্রণালী-সম্বন্ধে "রিসার্চ্" করিতে বা অনুসন্ধান চালাইতে আসে নাই।

তিন-শ' সভ্যের সঙ্গে সিসাইয়া-জাতির অন্যান্য লোকের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল? তাহা না জানা পর্য্যন্ত এই জাতিকে "ডেমোক্র্যাটিক্" অর্থাৎ জনসাধারণতন্ত্রী, "অ্যারিস্টোক্র্যাটিক্" বা গুণতন্ত্রী কিম্বা "অলিগার্কিক্" বা ধনতন্ত্রী বলা যুক্তিসঙ্গত কি?

পাঁচ হাজারী-সম্বন্ধেও এইসকল প্রশ্ন উঠিবে। গ্রীক-সমাজে রিপাব্লিক্ বা গণতন্ত্রের তিন শ্রেণী প্রচলিত ছিল; ডেমোক্র্যাসি অ্যারিস্টোক্র্যাসি এবং অলিগার্কি। আজকালকার ইংরেজ, ফরাসী এবং জার্ম্মান্ লেখকেরা প্রাচীন ভারতের গ্রীক্ তথ্য ব্যাখ্যা করিবার সময় এই-সকল পারিভাষিক কায়েম করিয়া থাকেন। কিন্তু এইসব শব্দ ব্যবহার করিতে হইলে যত তথ্য থাকা দরকার তাহার অভাব যৎপরোনাস্তি।

অন্যান্য কয়েকটা জাতি সম্বন্ধে জানি এইটুকু যে, তাহাদের শাসনে সভার বৈঠক বসিত। তবে সঙ্গে সঙ্গে এইরূপও বলা আছে যে তাহাদের কোনো রাজা ছিল না। সুতরাং গণতন্ত্র সম্বিতে কোনো আপত্তি নাই।

প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বহুবচনান্ত শব্দের দ্বারা জাতি বুঝানো হইয়াছে। কোনো দেশের নাম উল্লেখ করা হয় নাই। কাজেই এইসকল স্থলে "রাষ্ট্র" বুঝা হইবে, কি "সমাজ" বুঝিতে হইবে, আলোচনা করিবার বিষয়। পূর্ব্ববর্ত্তী পরিচ্ছেদে এই সমস্যা উঠানো গিয়াছে।

"দেশ"-হিসাবে মাত্র একটা নাম পাওয়া গিয়াছে—সে পত্তল নগর। মেগাস্থেনিস একাধিক বার "স্বাধীন নগর" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। যেখানে যেখানে নগর শব্দের কায়েম হইয়াছে, সেখানে-সেখানে কি গ্রীক্ ধাঁচের "নগর-রাষ্ট্রই" বুঝিতে হইবে? না লেখকেরা অল্পকথায় সংক্ষেপে সারিয়া গিয়াছে? গৌরব যুগের গ্রীক্ নগর-রাষ্ট্রের কাহিনী হইতে দু-একটুকরা ছিট্‌কাইয়া আসিয়া যে মেগাস্থেনিসের মগজে প্রবেশ করে নাই, তাহাই বা কে বলিতে পারে?

(৩)

সকল কথা উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া দেখিলে বুঝি যে,—রাজতন্ত্রহীন "রাষ্ট্র" বা "সমাজ" খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি পঞ্জাবের পশ্চিম জনপদে অনেকগুলা ছিল। এইগুলা কোনো রাজরাজড়ার বশ্যতা স্বীকার করিত না। অর্থাৎ তাহারা পুরামাত্রায় স্বাধীন ছিল। আর এইরূপ স্বাধীন জনসমষ্টিরূপেই তাহারা আলেকজান্দারকে ভারত হইতে বিতাড়িত করিতে প্রয়াসী হইয়াছিল। কোনো রাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের মাহিয়ান তীরন্দাজ বা ঘোড়সওয়ার হিসাবে তাহাদিগকে নকরি করিতে হয় নাই। তবে এইসকল গণতন্ত্রের স্বরাজে পয়সাওয়ালা লোকেরা আত্মকর্তৃত্ব ভোগ করিত কি বিদ্যাওয়ালা লোকেরা কর্ত্তামি করিত, তাহা পরিষ্কার করিয়া বলা যায় না।

এঙ্গেল্‌স্ প্রণীত "পরিবার গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র" নামক গ্রন্থে আথেন্স ও রোমের গণতন্ত্র ধাপে ধাপে দেখানো আছে। প্রাক্-রাষ্ট্রীয় অবস্থা হইতে কিরূপে কখন এই দুই জনপদে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয় এবং পরে গণতন্ত্রের ক্রমবিকাশ সাধিত হয়, সবই বুঝিতে পারি। কিন্তু ভারতীয় গণতন্ত্রের গ্রীক্ ও ল্যাটিন্ ইতিহাস হইতে সেই ধারা বা ক্রমবিকাশ বুঝা অসম্ভব।

পরিশিষ্ট

গণতন্ত্র ও হিন্দু সাহিত্য

'শাস্ত্র"-সাহিত্য

(১)

"পুরু-রাজ" হইতে সমুদ্রগুপ্ত পর্য্যন্ত প্রায় সাতশ' বৎসর। এই সাতশ' বৎসর ধরিয়া ভারতের নানাস্থানে গণ্ডা-গণ্ডা গণ-রাষ্ট্র স্বাধীন-ভাবে "রাজধর্ম্ম" চালাইতেছিল। এই সাতশ' বৎসরের হিন্দু-নরনারীর রাষ্ট্রীয় লেন-দেনে রাজতন্ত্রের সঙ্গে গণতন্ত্রের কর্ম্ম-বিনিময় এবং ভাব বিনিময় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বস্তু।

কিন্তু এই সাতশ' বৎসরের "ধর্ম্ম" "স্মৃতি" ও "নীতি" শাস্ত্রে গণতন্ত্রের টিকি পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। গৌতম, বৌধায়ন, আপস্তম্ব, মনু, যাজ্ঞবল্ক্য ইত্যাদি শাস্ত্রকারেরা গণ-শাসন সম্বন্ধে নীরব। কামন্দক, শুক্র ইত্যাদির নামে প্রচারিত নীতিশাস্ত্রের যেসকল অংশ এই সাত শ' বৎসরের সাক্ষ্য, তাহার ভিতরও গণরাষ্ট্রের নামগন্ধ নাই। বস্তুতঃ নীতি-সাহিত্যের কুত্রাপি এইসম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। জার্ম্মান পণ্ডিত জলি বলিয়াছেন,—"শাস্ত্রগুলা রাজতন্ত্রী মুলুকে উৎপন্ন,—কাজেই গণতন্ত্রের কথা এখানে অপ্রাসঙ্গিক।"

ঝাড়িয়া-বাছিয়া খোঁজ শুরু করিলে হয়ত এইসকল "শাস্ত্র"-সাহিত্য হইতেও কালে দুই-চার-দশটা ভাঙাচুরা-তথ্যের টুক্‌রা বাহির হইতে পারে। কিন্তু মুদ্রার সাক্ষ্য এবং বিদেশীদের ঐতিহাসিক কাহিনী না থাকিলে হিন্দু গণ-রাষ্ট্রের নাম দুনিয়ায় থাকে না।

(২)

শাস্ত্র-গ্রন্থগুলা ভারতীয় জীবন-গড়নের ধারা-সম্বন্ধে কত অসম্পূর্ণ সাক্ষী, এই কথা হইতে তাহার অন্যতম প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, "লিপি"-সাহিত্যে হিন্দু "স্বরাজ" প্রতিষ্ঠানের যে অপূর্ব্ব চিত্র পাই "শাস্ত্র'-সাহিত্যে তাহার আন্দাজ পর্য্যন্ত করা সম্ভব নয়।

আজ পর্য্যন্ত দেশী বিদেশী পণ্ডিত-মহলে এই শাস্ত্র-সাহিত্যের প্রতি মমতা অতি অগাধ। ভারতীয় সমাজ, রাষ্ট্র, আইন-কানুন বুঝিবার জন্য জার্ম্মান পণ্ডিত য়োলি-প্রণীত "রেখট্‌ উণ্ড্‌ সিট্টে" অর্থাৎ "আইন ও রীতিনীতি" নামক গ্রন্থের মতন গ্রন্থ সবিশেষ সমাদৃত হইয়া আসিতেছে। এই মমতা কাটাইয়া না উঠা পর্য্যন্ত বাস্তব হিন্দু সমাজের যথার্থ ধরণ-ধারণ এবং হিন্দু রাষ্ট্রের গড়ন-সম্বন্ধে যুক্‌তিনিষ্ঠ জ্ঞান জন্মিতে পারে না। বর্ত্তমান গ্রন্থের প্রত্যেক পরিচ্ছেদে তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

শান্তিপর্ব্বের গণ-কথা

(১)

বর্ত্তমান গ্রন্থে মহাভারত ইত্যাদি সাহিত্যের কোনো তথ্য আলোচিত হয় নাই। কিন্তু শান্তিপর্ব্বের ১০৭ অধ্যায়ে গণ-শাসনের কথা আছে। বিষয়টা নূতন বলিয়া যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। ১৯১৫ সালের বিহার এবং উড়িষ্যা রিসার্চ্‌ সোসাইটির পত্রিকায় শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ জয়সওয়াল শ্লোকগুলা আবিষ্কার করিয়া দেখাইয়াছেন।

"গণ" শব্দটা মহাভারতের এই স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে। দেখিতে পাই যে, গণের লোকেরা "জাত্যা চ সদৃশাঃ সর্ব্বে কুলেন সদৃশাস্তথা।" জাতিতে আর কুলে ইহারা "সদৃশ" বা একরূপ।

বিবরণ সবিস্তৃত। সকল শ্লোক উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। কাশীপ্রসাদ এই লোকসমষ্টিগুলাকে গণ-রাষ্ট্র বা রিপাব্লিক বুঝিয়াছেন। রমেশচন্দ্রও কাশীপ্রসাদের ব্যাখ্যাই গ্রহণ করিয়াছেন। জার্ম্মান পণ্ডিত হিলেব্রাণ্ট্‌ তাঁহার 'আল্টইণ্ডিশে পোলিটিক" গ্রন্থে (য়েনা, ১৯২৩) অন্য পথের পথিক।

হিলেব্রাণ্টের মতে শান্তি-পর্ব্বের গণগুলা হয় রাজপরিবারেরই আত্মীয়-কুটুম্ব, না হয় দেশের "ছোটো-খাটো রাজরাজড়া।" বড় জোর তাহাদিগকে অভিজাতবংশীয় নর-নারীর গুষ্টি "বাবুসমাজ" ইত্যাদি বিবেচনা করা যাইতে পারে।

(২)

মহাভারতের গণগুলা যে ষোলকলায় পরিপূর্ণ শাসন-কেন্দ্র, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। তাহাদের জজ আছে, আদালত আছে, ধন-সচিব আছে, মায় গুপ্তচর পর্য্যন্ত আছে। স্বাধীনতাশীল রাষ্ট্রের যা-কিছু থাকা দরকার, সবই এইসকল গণের বৃত্তান্তে পাওয়া যায়।

বিদেশী লেনদেনে অর্থাৎ 'আবাপ' বা পররাষ্ট্রনীতির কারবারেও এই-সকল জনসমষ্টির হাত আছে, বস্তুতঃ এইদিকে তাহাদের প্রভাব আছে বলিয়াই রাজরাজড়ারা তাহাদিগকে ভয় করিয়া চলে। আর ছলে বলে কৌশলে গণগুলাকে নিজের কোঠে টানিয়া আনিবার জন্য, অথবা এই-গুলিকে বিষদাঁত ভাঙিয়া ঠুঁঠা করিয়া রাখিবার জন্য রাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের ধুরন্ধরেরা লালায়িত।

"গণ"গুলা কি "বড় ঘরের বাবু-সমাজ ?"

এখন জিজ্ঞাসা, শাসন-যন্ত্র-সমন্বিত স্বাধীন লোক-সমষ্টিকে কি কেবলমাত্র "ড্যার হোহে আডেল ডেস্‌ লাণ্ডেস্" কিম্বা "দুর আইনে বেৎসাই থমুণ্ড্‌ ড্যার আরিস্‌টোক্রাট্‌সি ডেস্‌ লাণ্ডেস্" অর্থাৎ কতকগুলা বড় ঘরের লোকজন মাত্র বলা হইবে, না পুরাপুরি রিপাব্লিক অর্থাৎ গণ-রাষ্ট্র বলা হইবে ? এইসব জনকেন্দ্র যে 'রাজ পরিবারের আত্মীয়স্বজন' অথবা 'দেশের ছোটো-খাটো রাজরাজড়া' মাত্র নয়, তাহা সহজেই বোধগম্য ; কেননা শান্তিপর্ব্বের শ্লোকগুলার ভিতর রাজপরিবারের 'সুনীল রুধিরের' কোনো দাগ নাই। গণের সর্দ্দারেরা "মুখ্য" বা "প্রধান"। মামুলি শিল্প-বাণিজ্যের গণ বা শ্রেণীর সর্দ্দারেরা যে-নামে পরিচিত, এইসকল স্বাধীন ও শাসনশীল জন-কেন্দ্রের নায়কেরাও সেই নামে পরিচিত।

সহজ বুদ্ধিতে সকলেই এই গণগুলাকে "রিপাব্লিক্" ধরিয়া লইবে। কিন্তু অন্যরূপ ভাবিবার দিকে প্রবৃত্তি হয় কেন ? সন্দেহের কারণ বোধ হয় নিম্নরূপ। এইসকল জনসমষ্টিকে কোনো সুপ্রতিষ্ঠিত রাজ্যের অংশ-বিশেষ ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। একটা রাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের ভিতর প্রবল পরাক্রান্ত "বড় ঘরের লোকজন" থাকা অসম্ভব নয়। তাহাদিগকে ভয় করিয়া চলা তাহাদের তোষামদ করা ইত্যাদি ও রাজা-বাদশার স্বার্থ থাকা খুবই স্বাভাবিক। এইধরণের সম্ভ্রান্তবংশীয় পরিবারের কর্ম্মচারী-দিগকে "প্রজ্ঞান্ শূরান্ মহোৎসাহান্ কর্ম্মসু স্থির-পৌরুষান্" ইত্যাদি লম্বা-লম্বা বিশেষণে ভূষিত করাও হয়ত কখনো-কখনো চলিতে পারে।

করদী-কৃত "হোম-রুল"-ভোগী রিপাব্লিক ?

তথাপি জিজ্ঞাসা করিতে হইবে যে, বিচার-আদালত, কোষ-সংনিচয় ইত্যাদি পাব্‌লিক ল বা রাষ্ট্র-শাসনঘটিত কারবার, সম্ভ্রান্তবংশীয় লোক-জনের এরূপ স্বাধীনতা এবং সর্ব্বাঙ্গপরিপূর্ণতা দেখিতেছি কেন ? যে-সকল "বড়ঘরের লোক" শাসন-বিষয়ক সকল লেন-দেনেই পুরাপুরি স্বরাট্‌ এবং এমন-কি কোনো উপরওয়ালা রাজা-বাদ্‌শার তোয়াক্কা রাখে না, তাহারা কি মামুলি 'হোহে আডেল ডেস্‌ ল্যাণ্ডেস্' অর্থাৎ "সমাজের বা দেশের কয়েক ঘর বাবু" মাত্র ?

কাজেই বলিতে হইবে যে, গণগুলা যদি কোনো রাষ্ট্রের অন্তর্গত অংশবিশেষ হয়, তাহা হইলে এইসব লোক-সমষ্টি স্বশাসনের জন্য পরাধীনীকৃত রাজহীন রাষ্ট্র বা রিপাব্লিক। তাহারা আত্মকর্তৃত্ব অর্থাৎ স্বরাজ-শাসনের সকল এক্তিয়ারই ভোগ করে। আর তাহাদের ভাবিলকা 'সভারেনটি' আকার হইল বড় হইয়াছে বলিয়া তাহাদের

সঙ্গে বিদেশী রাষ্ট্রের ষড়যন্ত্র-খুবই চলে। এই কারণে তাহাদিগকে ভয় করিয়া চলা উপর-ওয়ালা রাজ্যের বা সাম্রাজ্যের দস্তুর, সহজ কথায় আজকালকার পারিভাষিক কায়েম করিয়া বলিব যে, গণগুলা "হোমরুল-ভোগী" রিপাব্লিক্।

সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যে মালব ইত্যাদি গণরাষ্ট্রের অবস্থা এইরূপই বিবেচনা করিয়াছি, মৌর্য্য সাম্রাজ্যেও যে এই-ধরণের করদীকৃত নিম্-স্বাধীন স্বরাজশীল গণতন্ত্রী রাষ্ট্র বর্ত্তমান ছিল, তাহা বিশ্বাস করা চলে।

আর শান্তিপর্ব্বের গণগুলাকে যদি অন্য কোনো রাষ্ট্রের অংশ ধরিয়া না লওয়া হয়, তাহা হইলে কাশীপ্রসাদ এবং রমেশচন্দ্রের ব্যাখ্যাই যুক্তিসঙ্গত। অর্থাৎ এইসকল জনকেন্দ্র ষোলো আনা রিপাব্লিক্।

গোষ্ঠী রাষ্ট্র ?

এইবার আর একটা প্রশ্ন আসিতেছে। মুদ্রার "গণ" এবং গ্রীক্ কৌঞ্জদের "স্বাধীন ভারতীয় জাতি" ইত্যাদির সম্পর্কে সেই সন্দেহ তুলিয়াছি। ভারতের এই রিপাব্লিক্গুলা "সমাজ" না "রাষ্ট্র" ?

শান্তিপর্ব্বের গণ-ওয়ালারা "এক-জাতের" লোক এবং "এক কুলের" লোক মনে হইতেছে,—"রক্তের ঐক্য বা সাম্য বুঝানোই কবিদের মতলব। এই সাদৃশ্যকে রাষ্ট্রীয় ডেমোক্রেসির "সাম্য" বিবেচনা করা চলিবে না। বংশ-হিসাবে গণের লোকেরা "সদৃশ" সমরক্তজ নর-নারীর কথা বলা হইতেছে মাত্র। তাহা ছাড়া আর কিছু নয়।

পারিবারিক স্বরাজ "কুল"-রাষ্ট্র ইত্যাদি বলিলে যাহা বুঝা যায় এইখানেও সেইরূপই বুঝিতে প্রবৃত্তি হইতেছে। কিন্তু পরিবারের শাসন, কুলের শাসন,জাতির শাসন,—আত্মকর্ত্তৃত্বশীল অথাৎ ডেমোক্র্যাটিক্ হইতে পারে এবং গণতন্ত্রী রিপাব্লিক্ও হইতে পারে। অথচ তাহাকে "রাষ্ট্র" বলা চলিবে না।

প্রাচীনতম গ্রীসে, রোমে ও অন্যান্য ইয়োরোপীয়—যথা টিউটনিক্ এবং (কেল্টিক্) সমাজে এইধরণের "আদিম" স্বরাজী গণতন্ত্র ছিল। তাহাকে "গেন্স্" বা গোষ্ঠী-প্রথা বলে। আমেরিকার লোহিতাঙ্গ-সমাজে গোষ্ঠী প্রথার চরম উৎকর্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। শান্তিপর্ব্বের "জাত্যা চ সদৃশাঃ সর্ব্বে" এবং "প্রজ্ঞান্ শূরান্ মহোৎসাহান্" ইত্যাদি প্রত্যেক কথাই ইরোকোয়াদের গোষ্ঠী-প্রথা-সম্বন্ধে খাটে। ভারতের অন্যান্য গণরাষ্ট্রের মতন শান্তিপর্ব্বের রিপাব্লিক্গুলাকেও সম্প্রতি এই গেন্স বা গোষ্ঠীর কোঠায় ফেলিয়া রাখা গেল।

"অর্থশাস্ত্রের" "আটবিক" জাতি

এইবার কৌটিল্য-সাহিত্যে প্রবেশ করিব। স্টাইন কৌটিল্যের আটবিক (বনবাসী, তবে "বুনো" বা বর্ব্বর নয়) জাতির পরিচয় দিয়াছেন। তাহারা রাষ্ট্রের বহির্ভাগে বসবাস করে। তাহাদের জমি-জমা আছে। মামুলি চোর ডাকাইতেরা রাত্রির অন্ধকারে লুটপাট চালায়। কিন্তু আটবিকেরা দিনে-দুপুরে "ধরাখানাকে সরা জ্ঞান" করিতে অভ্যস্ত। তাহাদের পল্টন আছে। সর্দ্দার আছে। তাহারা "স্বতন্ত্র"ও বটে।

শান্তিপর্ব্বের গণগুলাকে ভয় করিয়া চলা রাজরাজড়াদের দস্তুর। আটবিকদিগকে ভয় করিয়া চলাও "কৌটিল্যদর্শনের উপদেশ। সীমান্ত-প্রদেশের স্বাধীন জনসমষ্টির শাসন-কেন্দ্রের সঙ্গে কোনো রাষ্ট্রের যেরূপ লেনদেন থাকা স্বাভাবিক কৌটিল্য আটবিক জাতির উপলক্ষ্যে সেইসকল কথা বলিয়াছেন। এইগুলোকে পুরাপুরি রিপাব্লিক্ বা গণরাষ্ট্র বিবেচনা করিতেছি।

কৌটিল্যের সঙ্ঘ-রিপাব্লিক্

প্রথম অধ্যায়ে দেখা গিয়াছে যে, "অর্থশাস্ত্রে" জনসমষ্টি বুঝাইবার জন্য "সঙ্ঘ" শব্দের প্রয়োগ আছে। "গণ" শব্দ বোধ হয় কৌটিল্য কোথাও কায়েম করেন নাই। কৌটিল্যের সঙ্ঘগুলার ভিতর মহাভারতের "গণ-লক্ষণ"ই দেখিতে পাই, এইগুলাকে "রাজশব্দোপজীবী" সঙ্ঘ বলা হয়।

মামুলি "গিল্ড্" বা ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-কৃষি সঙ্ঘগুলিকে বলে "বার্ত্তাশস্ত্রোপজীবী"। লড়াইয়ের ব্যবসায় যাহারা দল গড়ে তাহারা "ক্ষত্রিয়শ্রেণী" নামে পরিচিত আর যাহারা দল বাঁধিয়া "রাজশব্দ ভোগ করে", অর্থাৎ "রাজধর্ম্ম" চালায় তাহারা অন্য সঙ্ঘের অন্তর্গত।

অর্থশাস্ত্রের সাক্ষ্য-অনুসারে যথা পঞ্জাবের মদ্রক, দক্ষিণ সিন্ধুজনপদের কুকুর এবং উত্তর গঙ্গামাতৃক জনপদের কুরু ও পাঞ্চাল এই চারি জাতিকে "দলবদ্ধ রাজার জাত" অর্থাৎ গণরাষ্ট্রের লোক বিবেচনা করা চলে। এই গেল উত্তর ও পশ্চিম ভারতের কথা মুদ্রার এবং গ্রীক সাক্ষ্য ও এই-সকল জনপদে গণরাষ্ট্র দেখিতে পাইয়াছি।

আরও কয়েকটা সঙ্ঘ-রাষ্ট্র "অর্থশাস্ত্রে" আছে। বৃজ্জিক, লিচ্ছিবিক, মল্লক ইত্যাদি বিহার-প্রদেশের জাতিগুলা তাহার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ উল্লিখিত। এইসকল জাতির চরম স্বাধীনতার যুগ জাতক-সাহিত্যের গল্প হইতে উদ্ধার করা যায়। সেই প্রয়াস বর্ত্তমান গ্রন্থের বহির্ভূত।

"আটবিক" জাতি-সম্বন্ধে এবং শান্তিপর্ব্বের গণ-সম্বন্ধে রাজরাজড়াদের যে-নীতি, এইসকল "রাজশব্দোপজীবী সঙ্ঘ" সম্বন্ধে ঐ কৌটিল্যের উপদেশ ঠিক সেইরূপ। কেমন করিয়া তাহাদের তোআজ করা উচিত, কোন্ কৌশলে তাহাদিগকে উচ্ছেদ করা সম্ভব, এইসব প্রশ্ন কৌটিল্য পরিষ্কাররূপে আলোচনা করিয়াছেন।

সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যে গণরাষ্ট্রের যে অবস্থা ছিল, মৌর্য্য সাম্রাজ্যেও বোধ হয় সঙ্ঘ-রাষ্ট্রের "কন্স্টিটিউশ্যনাল্ ষ্ট্যাটাস" বা আইনসঙ্গত ঠাঁই সেইরূপই ছিল। মৌর্য্য সাম্রাজ্য ভাঙিবামাত্র "করদীকৃত" হোমরুল-ভোগী সঙ্ঘগুলা পুরা স্বাধীন রিপাব্লিকে পরিণত হইয়াও থাকিবে।

সম্রাট্ আকবর কি বাস্তবিকই শিক্ষিত ছিলেন ?

গত আষাঢ় সংখ্যার প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল শীল মহাশয় 'সম্রাট্ আকবরের কবিতা' শীর্ষক ঐতিহাসিক প্রবন্ধে দেখাইতে চাহিয়াছেন যে সম্রাট্ আকবর প্রকৃতপক্ষে উম্মী বা অশিক্ষিত ছিলেন না ; তিনি শিক্ষিত ছিলেন, এমন্-কি তিনি নিজে কবিতাদি লিখিতে পারিতেন। লেখক-মহাশয় হিন্দু হইয়া একজন মোসলমান সম্রাটের কলঙ্কভঞ্জনের জন্ত বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন—তাঁহার একটা সদ্‌গুণকে বিবিধ প্রমাণাদি দ্বারা লোক-সমক্ষে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন ইহা বাস্তবিকই বড় সুখের বিষয়। এরূপ সদ্‌ইচ্ছা ও চেষ্টার জন্ত হিন্দুলেখকগণ যথার্থই মোসলমানগণের আন্তরিক ধন্তবাদ পাইবার উপযুক্ত। লেখক মহাশয় 'আকবর শিক্ষিত ছিলেন' তাহাই দেখাইয়াছেন ; আমরা কিন্তু তাহার উল্টাদিক্ অর্থাৎ সম্রাট্ আকবর শিক্ষিত ছিলেন না, ইহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব। আমার উদ্দেশ্ত, প্রতিবাদ দ্বারা লেখক মহাশয়ের সদ্‌ইচ্ছা এবং চেষ্টার খর্ব্বতা-সাধন করা নয়, বরং, প্রতিবাদের মধ্য দিয়া আক্‌বর বাস্তবিকই শিক্ষিত ছিলেন কি না, এ-সম্বন্ধে আরও দুই চারিটি কথার খাঁটি তত্ত্ব লওয়া।

লেখক-মহাশয়ের মতে আক্‌বরকে যাঁহারা নিরক্ষর বলেন তাঁহাদের কথার প্রমাণ মাত্র দুইটি, যথা (১) 'আজ পর্য্যন্ত কোনো স্থানে আক্‌বরের হস্তাক্ষর পাওয়া যায় নাই ও (২) তাঁহার পুত্র জাহাঙ্গীর আপনার তুজুকে তাঁহাকে উম্মী অর্থাৎ অশিক্ষিত বলিয়াছেন'। সম্রাট্ আক্‌বর উম্মী থাকার প্রমাণ মাত্র এই দুইটিই নয়, ইহা ছাড়াও এমন অনেক প্রমাণ আছে যাহার সাহায্যে আক্‌বরকে উম্মী অর্থাৎ নিরক্ষর বলিয়া অধিকতর যুক্তিসঙ্গতরূপে ধরিয়া লওয়া চলে। আমরা ক্রমে সেগুলি দেখাইতে চেষ্টা করিব। কিন্তু প্রথমত লেখকমহাশয় আক্‌বর শিক্ষিত ছিলেন দেখাইবার জন্ত যে-সকল প্রমাণাদি উত্থাপন করিয়াছেন তাহাদের যৌক্তিকতা একটু বিচার করিয়া দেখা দর্‌কার।

লেখক-মহাশয় প্রথমেই বলিয়াছেন "তাঁহার বাল্যজীবনের যতটুকু ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহাতে তাঁহাকে অল্পশিক্ষিত বলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ নিরক্ষর বিবেচনা করা অন্তায় হয়। সেকালের সম্ভ্রান্ত মোসলমানদিগের, বিশেষত তৈমুরবংশীয়দের, হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ছিল, কিন্তু বোধ হয় আক্‌বরের হাতের লেখা বালকোচিত ছিল বলিয়া তিনি কোনো কাগজে নিজের নাম সই করিতেন না।" লেখক-মহাশয় এখানে সম্পূর্ণ অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া আক্‌বরকে শিক্ষিত বলিতে চান। আক্‌বরের বাল্যজীবনের ইতিহাস পাঠ করিয়া আমরা কিছুতেই তাঁহাকে শিক্ষিত বলিতে পারি না। আক্‌বরের হাতের লেখা বালকোচিত ছিল বলিয়া বোধ হয় তিনি কোনো কাগজে কোনো দিন নিজের নাম সই করিতেন না—এ যুক্তি সম্পূর্ণ আনুমানিক ও অস্বাভাবিক। তৎপর লেখক মহাশয়, আক্‌বরের পূর্ব্বপুরুষগণের প্রগাঢ় জ্ঞানবত্তা ও শিক্ষার বিষয় উল্লেখ করিয়া অনেকটা লজিক শাস্ত্রের Argumentum ad populum প্রণালীর সাহায্যে আক্‌বর শিক্ষিত প্রমাণ করিতে চাহিয়াও অগত্যা সত্যের খাতিরে বলিতে বাধ্য হইয়াছেন "আক্‌বর এমন পিতামহ ও পিতার সন্তান, কিন্তু তাঁহাদের মতন বিদ্বান্ ছিলেন না।" এখানে যদি আমরা বলি, আক্‌বর একেবারেই বিদ্বান্ ছিলেন না, তবে বোধ হয় যৌক্তিকতার অভাববশতঃ আমরা লেখক মহাশয় হইতে অধিকতর দূষণীয় হইব না। আক্‌বরের পিতা হুমায়ুন পুত্রকে শিক্ষিত করিবার জন্ত বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহা সত্য কথা এবং আক্‌বরের শিক্ষার জন্ত কয়েকজন সুদক্ষ শিক্ষকও ক্রমান্বয়ে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু হুমায়ুনের চেষ্টা কতদূর সফল হইয়াছিল ? আমরা জানি এবং লেখক মহাশয়ও অনেকটা স্বীকার করিয়াছেন, যে "কুমার, পায়রা ঘোড়া, উট, এবং শিকারী কুকুর লইয়াই উন্মত্ত থাকিতেন, লেখা পড়াতে মনোযোগ দিতেন না অথবা শিক্ষক তাঁহাকে মনোযোগী করিতে পারেন নাই।" কাজেই বাল্যকালে তাঁহার কোনো লেখাপড়াও শিক্ষা হয় নাই।

আক্‌বর শেখ সাদীর এবং বিশেষ করিয়া হাফেজের কবিতাবলীর আবৃত্তি করিতে পারিতেন, "কথা কহিবার সময়ে অথবা তর্ক করিবার সময়ে প্রায়ই হাফেজের উক্তি প্রয়োগ করিতেন।" এই কথার উপর নির্ভর করিয়া লেখক-মহাশয় প্রমাণ করিতে চান যে আক্‌বর শিক্ষিত ছিলেন, নতুবা কি-প্রকারে তিনি হাফেজের কবিতা আবৃত্তি করিতে পারিতেন ? আমরা ত এ-কথার মধ্যে কিছুই যুক্তি দেখিতে পাই না। এমন অনেক লোক আছে যাহারা সম্পূর্ণ নিরক্ষর ও অশিক্ষিত, কিন্তু কথা প্রসঙ্গে প্রচুর কবিতা ও পাঁচালি আবৃত্তি করিতে পারে। কবিতা কণ্ঠস্থ করা এককথা, আর শিক্ষিত হওয়া আর-এককথা। আক্‌বরের অসাধারণ প্রতিভা ছিল একথা কেহই অস্বীকার করেন না, কাজেই নিজের প্রতিভাবলে অনেক উৎকৃষ্ট-উৎকৃষ্ট কবিতা যাহা 'লোক-মুখে' শুনিতেন সহজেই কণ্ঠস্থ করিতে পারিতেন এবং তাহার মর্ম্ম পরিগ্রহ করিতেও সক্ষম হইতেন। ইহাতে নিজে শিক্ষিত থাকার কোনো যুক্তি-সঙ্গত কারণ দেখি না।

লেখক-মহাশয় অন্য একস্থানে ঐতিহাসিক প্রমাণ-সহকারে দেখাইতে চান যে, "যখন মোল্লারা ইচ্ছামত ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া ও তাহার ইচ্ছামত অর্থ করিয়া আক্‌বরকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল তখন আরবী ভাষার লিখিত ব্যবস্থাপত্র স্বয়ং বুঝিয়া বিচার করিবার জন্য শেখ মোবারকের কাছে আরবী ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করিলেন কিন্তু সেইসময় মোবারকের লিখিত ব্যবস্থাপত্রের বলে মোল্লাদের বিষ-দন্ত ভগ্ন হইয়া গেল, আরবী বিদ্যার্জ্জনের প্রয়োজন রহিল না। অতএব পাঠ বন্ধ হইল।" বিদ্যাশিক্ষা অতি সহজ নয় ; দুইএক দিনেই কেহ শিক্ষিত হইতে পারে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না। আক্‌বরও যেই শিখিতে গেলেন সেই পাঠ বন্ধ হইল। এই অল্প সময়ে আকবর শিক্ষিত হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না।

জাহাঙ্গীর তাঁহার পিতা আক্‌বরকে উম্মী অর্থাৎ নিরক্ষর বলিয়াছেন। এই কথা খণ্ডন করিবার জন্ত লেখক-মহাশয় বলেন যে "কোনো বিদ্বান্-বংশের একজন অল্প শিক্ষিত ব্যক্তিকে সেই বংশের অন্ত বিদ্বানেরা অল্প শিক্ষিত না বলিয়া "মূর্খই" বলিয়া থাকে। জাহাঙ্গীরও সেই কারণে পিতাকে উম্মী বলিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।" লেখকের এই যুক্তিও অনেকটা অসঙ্গত এবং কাল ও পাত্র হিসাবে অনেকটা অস্বাভাবিক। অভিভাবকস্থানীয় কোনো লোক না হয় তাঁহার পুত্রস্থানীয় কোনো অল্পশিক্ষিত ব্যক্তিকে কোনো পরিচিত লোকের সহিত কথা

প্রসঙ্গে নিরক্ষর বলিল, ইহা কোনো-রকমে স্বীকার করিয়া লওয়া চলে, কিন্তু কোনো পুত্র, শুধু কথা-প্রসঙ্গে নয়, হাতে-কলমে স্বীয় অল্প শিক্ষিত পিতাকে নিরক্ষর এবং সম্পূর্ণ অশিক্ষিত বলিলে বাস্তবিকই অস্বাভাবিক এবং স্পষ্ট বেয়াদবি মনে হয়। লেখকের এ যুক্তি আমরা কিছুতেই মানিয়া লইতে পারি না। আক্‌বর কিছু শিক্ষিত থাকিলে জাহাঙ্গীর কখনও নিজের জীবনীতে তাঁহার পিতাকে উম্মী বলিতেন না।

তার পর লেখক মহাশয় দেখাইতে চান আক্‌বর যদি নিজে শিক্ষিত না হইতেন তাহা হইলে অন্য লেখকদের লেখার ভাব ও ভাষা লইয়া কি-প্রকারে সমালোচনা করিতেন। আমরা জানি, আক্‌বর সদা-সর্ব্বদা পণ্ডিতমণ্ডলীদ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিতেন, তাঁহাদের সমালোচনা ও তর্ক-বিতর্ক সর্ব্বক্ষণ শুনিতেন। এইরূপে আক্‌বর তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা-বলে নিরক্ষর থাকা সত্বেও শুধু জানিয়া শুনিয়া প্রচুর জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন এবং এই জ্ঞানের বলেই তিনি শিক্ষিত পণ্ডিতদের মতন নানা বিষয়ের সমালোচনা করিতে পারিতেন, এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।

পরিশেষে লেখক-মহাশয় বলেন, "সেকালের কোনো কোনো কবিতা-সংগ্রহে পাঁচটি পার্শি ও পাঁচটি হিন্দী কবিতা আক্‌বরের রচিত বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ সন্দেহ করেন যে ঐ কবিতাগুলি অন্য কোনো কবির রচিত, আক্‌বরের নামে প্রচলিত মাত্র; কিন্তু এইরূপ সন্দেহ করিবার কোনোও উপযুক্ত কারণ নাই।" লেখক মহাশয়ের মতে এই কবিতাগুলি আক্‌বরের কবিতা নয় বলিয়া সন্দেহ করিবার কোনোও উপযুক্ত কারণ নাই। আমরা জিজ্ঞাসা করি এ কবিতাগুলি যে আক্‌বরের রচিত এরূপ স্বীকার করিবারই বা কি বিশ্বসনীয় কারণ আছে ? আর আমরা এ তর্কই বা করিতে যাই কেন ? কবিতা রচনা করা আর শিক্ষিত হওয়া কি এক কথা ? এরূপ লোক অনেক আছে যাহারা আদৌ লেখাপড়া জানে না—কিন্তু ভাল ভাব ও ভাষায় সুন্দর-সুন্দর কবিতা রচনা করিতে পারে। আক্‌বরের যদিও কোনো কবিতা থাকিয়া থাকে তাহাও যে এই প্রকার শিক্ষা ব্যতীতই রচিত তাহাই আমরা অবিশ্বাস করি কিসে ?

আক্‌বর বাল্যকাল একমাত্র ক্রীড়া কৌতুকেই কাটাইয়াছিলেন। লেখাপড়ায় একবারেই মনোযোগ দিতেন না। পায়রা, ঘোড়া, শিকারী-কুকুর প্রভৃতি লইয়াই সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন। কাহারও কোনো উপদেশ গ্রহণ করিতেন না। তাঁহার পিতা হুমায়ুন তাঁহাকে বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য অশেষবিধ চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু কোনো চেষ্টাই ফলবতী হয় নাই। আক্‌বরের বয়স যখন চারি বৎসর চারি মাস চারি দিন তখন তাঁহার পিতা হুমায়ুন, মহা সমারোহে আক্‌বরের কেতাব নেশিন বা হাতেখড়ি উৎসবের আয়োজন করেন। অনেক প্রসিদ্ধ-প্রসিদ্ধ আলেম বা পণ্ডিতগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনা হয়। যখন নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইল তখন বালক আক্‌বরকে সভায় আনাইবার জন্য লোক পাঠান হইল; কিন্তু অনেক খুঁজিয়াও আক্‌বরকে রাজ-প্রাসাদে পাওয়া গেল না। আক্‌বরের বিদ্যা শিক্ষার প্রতি অমনোযোগীতার ইহাই একটি প্রধান নিদর্শন।

হুমায়ুন আক্‌বরের শিক্ষার জন্য যথাক্রমে কয়েকজন উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু আক্‌বর কিছুতেই তাঁহাদের উপদেশ শ্রবণ করিতেন না; সর্ব্বক্ষণ আমোদ আহ্লাদে রত থাকিতেন। এইরূপে আক্‌বরের বিদ্যাশিক্ষার উপযুক্ত সময় বৃথা কাটিতে লাগিল এবং আক্‌বরের বয়স যখন সবে মাত্র ১৩ তের বৎসর তখন তাঁহার পিতা হুমায়ুনের মৃত্যু হইল। বিশাল সাম্রাজ্যের ভার তখন বালক আক্‌বরের উপর পড়িল; বৈরাম খাঁ আক্‌বরের অভিভাবক নিযুক্ত হইয়া রাজ-কার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন; কিন্তু তেজস্বী বালক আক্‌বর বৈরামের কার্য্য-প্রণালী ততটা পছন্দ করিতেন না; অবশেষে যোল বৎসর বয়সের সময় আক্‌বর স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। কাজেই বিদ্যাশিক্ষা করিবার আর সুযোগ কোথায় ? রাজ্যভার গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে আক্‌বর যুদ্ধবিদ্যা শিখিতেন এবং এদিকে তাঁহার অনেকটা ঝোঁকও ছিল। কিন্তু লেখাপড়ার দিকে মন ছিল না; কাজেই লেখা-পড়ার সুযোগ আক্‌বরের আর ঘটিয়া উঠে নাই; তিনি আজীবন নিরক্ষরই থাকিয়া যান। তিনি নিজে শিক্ষিত না হইলেও শিক্ষার কদর করিতে জানিতেন; সদা সর্ব্বদাই বিদ্বমণ্ডলী দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিতেন তাঁহাদের জ্ঞানগর্ভ আলাপাদি শ্রবণ করিতেন, সারবান পুস্তকাদি তাঁহাদিগের দ্বারা পাঠ করাইয়া শুনিতেন। তাহাতেই আক্‌বর অনেক শিখিয়াছিলেন। যদিও তিনি নিরক্ষর ছিলেন তথাপি তাঁহার অসাধারণ জ্ঞানবত্তার কাছে অনেক প্রসিদ্ধ-প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণকেও পরাভব স্বীকার করিতে হইত।

আক্‌বরের পুত্র জাহাঙ্গীর একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও কবি ছিলেন। তিনি তুজুকে জাহাঙ্গীর নামে নিজের এক প্রকাণ্ড জীবন চরিত লিখিয়া গিয়াছেন। তাহাতে তিনি জীবনের প্রত্যেক দিনের ঘটনা পর্য্যায়ক্রমে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পিতা আক্‌বর সম্বন্ধেও অনেক কথা ইহাতে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন। আক্‌বরকে তিনি স্পষ্ট উম্মী বা অশিক্ষিত বলিয়াছেন কিন্তু অন্যান্য গুণবত্তার অনেক প্রশংসা করিয়াছেন। যদি আক্‌বর অল্প শিক্ষিতও থাকিতেন তাহা হইলে জাহাঙ্গীর তাহা নিশ্চয়ই উল্লেখ করিতেন। আক্‌বর আদতেই শিক্ষিত ছিলেন না কাজেই জাহাঙ্গীরও সত্য কথাই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আক্‌বর অল্প শিক্ষিত ছিলেন বলিয়া জাহাঙ্গীর যে তাঁহাকে একেবারে স্পষ্ট মূর্খ বলিয়া গিয়াছেন এ কথা কিছুতেই যুক্তিসঙ্গত এবং বিশ্বসনীয় নয়।

আর এক কথা আমরা জানি—শাহী ফরমানাদিতে বাদশাহের নিজের নাম সহি একান্ত দরকার। সম্রাট্ আক্‌বরের পূর্ব্ব ও পরের অনেক ফরমানাদিতে আমরা সম্রাটদের নাম সহি দেখিতে পাই; বর্ত্তমান সময়েও এই নীতি পৃথিবীর সমস্ত রাজ্যেই প্রচলিত আছে। আক্‌বর যদি অন্ততঃ নাম সহি করিবার উপযুক্ত শিক্ষাও লাভ করিয়া থাকিতেন তবে নিশ্চয়ই কোনো না কোনো ফরমান ও দলিলাদিতে তাঁহার নাম সহি থাকিত। কাজেই আক্‌বর যে অল্প শিক্ষিতও ছিলেন এ কথা আমরা কিছুতেই স্বীকার করিতে পারিব না।

নিম্নের ঘটনাটি হইতে আক্‌বর যে শিক্ষিত ছিলেন না আমরা তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাই। একদিন সম্রাট্ আক্‌বর সভাসদগণ পরিবেষ্টিত হইয়া রাজ সভায় উপবিষ্ট আছেন এমন সময় কাসেদ তাঁহার সম্মুখে কোন একখানা দরখাস্ত পেশ করে। আক্‌বর কাসেদের হাত হইতে দরখাস্তখানা লইয়া এরূপভাবে উলট পালট করিতে লাগিলেন যেন উপস্থিত লোকজন মনে করেন আক্‌বর বাস্তবিকই দরখাস্তখানা পাঠ করিতেছেন। উপস্থিত পণ্ডিতগণ (যাঁহারা জানিতেন আক্‌বর লেখাপড়া জানেন না) ইহা দেখিয়া হাস্য সংবরণ করিতে পারিলেন না। সম্রাট আক্‌বরের অন্তরঙ্গ বন্ধু ফৈজী পণ্ডিতগণকে হাসিতে দেখিয়া সম্রাটের সম্মান বজায় রাখিবার জন্য বলিয়া উঠিলেন—

"নবীয়ে মা উম্মীবুদ পাদ্‌শাহে মা হাম্ উম্মীস্ত" "অর্থাৎ আমাদের নবী (হজরত মোহাম্মদ) অশিক্ষিত ছিলেন আমাদের সম্রাটও (আক্‌বর) অশিক্ষিত।

আবদুল গণি বি-এ

বেদান্ত প্রচার ও রামমোহন

জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা প্রবাসীতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার-মহাশয়ের "বঙ্গদেশে দর্শনশাস্ত্র আলোচনার ইতিহাস" প্রবন্ধে দুই একটি অনবধানতার ত্রুটী রহিয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত বিমানবাবু রামমোহন-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

"সাধারণের ধারণা আছে যে, বেদান্তশাস্ত্রের আলোচনা আমাদের দেশে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, রাজা রামমোহন রায়ই উহার পুনরায় প্রবর্ত্তন করেন। কিন্তু ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের কলিকাতা রিভিউ এর What is Vedanta নামক প্রবন্ধে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার কৃত বেদান্ত চন্দ্রিকার নাম উল্লেখ দেখা যায়। ঐ গ্রন্থ ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে লিখিত। তখনও রাজার দার্শনিক গ্রন্থরাজি বাহির হয় নাই।"

রামমোহন বাঙ্গালাদেশে বেদান্ত আলোচনার সূত্রপাত করেন সাধারণের এই ধারণা খণ্ডন করিতে গিয়া বিমানবাবু ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে বিদ্যালঙ্কার-রচিত বেদান্তচন্দ্রিকার উল্লেখ করিয়াছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই রাজা বেদান্তালোচনার সূত্রপাত করেন। রঙ্গপুরেও তিনি বেদান্ত প্রতিপাদ্য "সত্য ধর্ম্ম" সম্বন্ধে আলোচনায় রত হইয়াছিলেন, এবং তাহার ফলে রঙ্গপুরে কিছু চাঞ্চল্যও দেখা গিয়াছিল। যাহা হউক ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে রাজা কলিকাতায় আসিয়া 'আত্মা-পরমাত্মার অভেদচিন্তনরূপ মুখ্য উপাসনা' প্রচার করে 'বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্যধর্ম্ম' প্রচারে ব্রতী হন। রাজার কলিকাতা আগমনের তিন বৎসর পরে রচিত গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া এবং "১৮১৭ খৃষ্টাব্দে রাজার দার্শনিক গ্রন্থরাজি বাহির হয় নাই" ইহা নিশ্চিতরূপে বলিয়া রাজা-সম্পর্কে সাধারণের ধারণা খণ্ডন করা যায় না। কেননা, সাধারণ যদি মনে করে যে, রামমোহন-প্রবর্ত্তিত বেদান্তালোচনার ফলেই উৎসাহিত হইয়া কথিত বিদ্যালঙ্কার মহাশয় বেদান্তচন্দ্রিকা রচনা করিয়াছিলেন, তাহা কি খুব অসঙ্গত হয়?

এ সম্পর্কে আরও একটি কথা ভাবিবার আছে। ন্যায় বা সাংখ্য যে ভাবের দর্শন, বেদান্ত সে ভাবের দর্শন নহে। বেদান্ত দর্শনের সহিত হিন্দু-সাধন প্রণালী অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। রামমোহনের সময়ে বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত ধর্ম্মের সহিত বেদান্তের যোগসূত্র একেবারেই ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। বিমানবাবুও স্বীকার করিয়াছেন, বৈষ্ণব-সাধন প্রণালীকে শ্রীজীব বলদেব বেদান্তের ভিত্তির উপর আনয়ন করিবার জন্য স্বতন্ত্র ভাষ্য প্রণয়ন করেন এবং অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু পরবর্ত্তী বৈষ্ণবসমাজ তাঁহাদের সাধনার সহিত বেদান্ত দর্শনের কোনো যোগ রাখেন নাই। কি শ্রীজীব ব্যাখ্যাত স্বকীয়াবাদ, কি বিশ্বনাথ ব্যাখ্যাত পরকীয়াবাদ কোনোটিই তাঁহারা দার্শনিকভাবে গ্রহণ করেন নাই। "ফলে বৈষ্ণবসমাজ যৎপরোনাস্তি দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া উঠেন।" যেহেতু "সাধারণ বৈষ্ণবগণ দার্শনিকভাবে পরকীয়াবাদ গ্রহণ না করিয়া স্ব স্ব জীবনে উহার অভিনয় করিতে গিয়াছিলেন।"

বাঙ্গালার বৈষ্ণব সাধনা যেভাবে দার্শনিকতা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অতি স্থূল অভিনয়ে পর্য্যবসিত হইয়াছিল, ঠিক সেইভাবেই বাঙ্গালার শাক্ত সাধনধারাও, তন্ত্রের দার্শনিকতা হইতে স্খলিত হইয়া অতি বীভৎস বামাচারে পরিণত হইয়াছিল। বাঙ্গালার দুইটি পৃথক্ সাধনধারার এই গ্লানির যুগে রামমোহনই সর্ব্বপ্রথম মহানির্ব্বাণতন্ত্র ও উপনিষদের আলোক বর্ত্তিকা তুলিয়া ধরিয়া এক নিরাকার নির্গুণ পরব্রহ্মের প্রতি বাঙ্গালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সেইজন্যই রামমোহনকে অনেকে বাঙ্গালাদেশে বেদান্তশাস্ত্রের পুনঃ প্রবর্ত্তক বলিয়া থাকেন। ইহা সম্ভব যে, রামমোহনের পূর্ব্বে বা তাঁহার সমসাময়িক বেদান্তশাস্ত্রের পণ্ডিত কেহ কেহ ছিলেন; কিন্তু তাঁহারা দর্শনশাস্ত্র হিসাবেই বেদান্তালোচনা করিয়াছেন—উহা অবলম্বনে প্রচলিত ধর্ম্মের বিকৃতি সংশোধনে প্রবৃত্ত হন নাই।

বিমানবাবুর প্রবন্ধ সংক্ষিপ্ত হইলেও, অন্যান্য পণ্ডিত ব্যক্তির দার্শনিক মতের সার সঙ্কলন করিয়া তিনি স্থানে-স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু রামমোহন-সম্পর্কে সেরূপ কিছু করেন নাই। ইহাতে প্রবন্ধটি অসম্পূর্ণ হইয়াছে। আরও একটি বিষয়ে আমরা বিমানবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। রামমোহন-পরবর্ত্তী বেদান্তদর্শন ব্যাখ্যাতাদিগের নাম করিতে গিয়া, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের একজন শক্তিশালী বেদান্ত প্রচারক স্বামী বিবেকানন্দের নাম তিনি উল্লেখই করেন নাই। ইহা একটি বিশেষ ত্রুটী বলিয়া মনে হয়।

শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

মুসলমান সমাজে উপপত্নী ও উপপত্নী পুত্র

সৈয়দউদ্দীন খান্ মহাশয় একটি দীর্ঘ পত্র লিখিয়া জানাইয়াছেন যে, গত বৎসরের ফাল্গুন সংখ্যায় প্রবাসীতে যে লেখা হইয়াছিল,

"মুসলিম (মোস্‌লিম) ব্যবস্থা-অনুসারে পত্নীর ও উপপত্নীর পুত্রেরা পিতার ধনে সমান অধিকারী। সমাজে উপপত্নীদের স্থান হীন না হওয়ায় মুসলমান (মোসলমান) সম্প্রদায়ের যে নৈতিক অবনতি ঘটিয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না।"

তাহা প্রবাসী-সম্পাদকের অজ্ঞতাপ্রসূত।

প্রয়াগ বঙ্গসাহিত্য মন্দির

উত্তর ভারতীয় বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী পুস্তকে উক্ত সম্মিলনীর কার্য্যাধ্যক্ষ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার আচার্য্য মহাশয় প্রয়াগ বঙ্গ সাহিত্য মন্দিরের ইতিহাস লিখিবার সময় লিখিয়াছেন, যে, "পুরাতন কাগজপত্রের অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছি যে, ইহা শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃকই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।"

এই প্রয়াগ বঙ্গসাহিত্য মন্দিরের পূর্ব্ব ইতিহাস আচার্য্য মহাশয় কিছু জানিতে ইচ্ছা করেন কি? খৃষ্টীয় ১৮৯৯ সালে "বাঙ্গলার বাহিরে বাঙ্গালী" পুস্তক-লেখক শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, ও শ্রীযুক্ত বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় বি-এস্-সি (এক্ষণে রায় বাহাদুর) এই সাহিত্য মন্দির স্থাপনের প্রথম প্রস্তাবকারী এবং "প্রয়াগ বঙ্গসাহিত্য মন্দির" এই নাম জ্ঞানেন্দ্র-বাবু কর্ত্তৃকই প্রদত্ত। তাহার পর পরলোকগত ডাক্তার রায় ৺মহেন্দ্রনাথ ওহদেদার বাহাদুর, ডাক্তার ৺শিবপদ রায়, এফ-আর-সি-এস্, ৺নিতাইচরণ মিত্র ও স্বর্গবাসী কবি ৺দেবেন্দ্রনাথ সেন, এম-এ, মহাশয়গণ মন্দিরের ডিরেক্টার্ নিযুক্ত হন এবং আমি সম্পাদকের কার্য্যভার গ্রহণ করি। ৺বিপিনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস সহযোগী সম্পাদক এবং রেলওয়ে কোম্পানীর হেড্-ক্লার্ক ৺যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কোষাধ্যক্ষ ও পূর্ব্বলিখিত শ্রীযুক্ত বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় সহকারী কোষাধ্যক্ষ হন। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস ইতিপূর্ব্বে কর্ণেলগঞ্জের বঙ্গসাহিত্যোৎসাহিনী সভা ও বান্ধব সমিতির সহযোগী সম্পাদক ছিলেন; কিন্তু এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি কর্ণেলগঞ্জের উক্ত সভার সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া ইহাতেই সম্পূর্ণ ভাবে যোগদান করেন। পরে অর্থ সংগ্রহ ও পুস্তক ক্রয় করিয়া যখন আমরা এই সাহিত্য মন্দির স্থাপন করিলাম তখন শ্রীযুক্ত গুরুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে পুস্তকাদি বিতরণের জন্য লাইব্রেরিয়ান্ ও পরে ম্যানেজার নিযুক্ত করা হয়। তাহার

পর বহুদিন পর্য্যন্ত তাঁহার ন্যায় অন্যান্য বিদ্যোৎসাহী যুবকবৃন্দের অক্লান্ত শ্রম ও যত্নে এই মন্দির ক্রমশঃ উন্নতির পথেই অগ্রসর হইতেছিল, কিন্তু এই প্রতিষ্ঠাতাগণের মধ্যে অনেকেই কার্য্যানুরোধে স্থানান্তরে গমন করিলে ইহার কার্য্যভার আমার উপর পতিত হয়। কোনোপ্রকারে প্রায় ১৪।১৫ বৎসর এই মন্দিরকে অতিকষ্টে রক্ষা করিয়া আসিয়াছি। মধ্যে এখানে বেঙ্গলী রিইউনিয়ন্ নামক এক সম্মিলনী গঠিত হয়। সেই সম্মিলনীর সম্পাদক-মহাশয় এই মন্দিরের উন্নতিসাধন করিবেন বলিয়া ইহা গ্রহণ করেন। তবে তখনও আমিই ইহার সম্পাদক ছিলাম, কিন্তু দুইতিন বৎসর পরে ঐ সম্মিলনী বন্ধ হইয়া গেলে পুনর্ব্বার ইহা আমারই তত্ত্বাবধানে আসে। ইহার উন্নতি সাধন করিবেন বলিয়া যাঁহা মনস্থ করিয়াছিলেন, তাহার কিছুই করিতে পারেন নাই। কেবল কিছুদিনের জন্য ইহাকে একটি প্রশস্ত গৃহে লইয়া গিয়াছিলেন মাত্র। কিন্তু ঐ সম্মিলনীর অধ্যক্ষগণ যখন ইহা আমাকে প্রত্যর্পণ করেন, তখন পুনর্ব্বার আমি ইহাকে অন্য-গৃহে লইয়া আসি।

এলাহাবাদ

শ্রী নীলমাধব সেন গুপ্ত

অরূপ-রতনের গানের স্বরলিপি

(১)

স্বরলিপি—শ্রী সাহানা দেবী

তোমার প্রেমে হবো সবার
কলঙ্ক ভাগী।
আমি সকল দাগে হবো দাগী
কলঙ্ক ভাগী।

তোমার পথের কাঁটা করব চয়ন
সেথায় তোমার ধূলায় শয়ন
সেথায় আঁচল পাত্‌ব আমার
তোমার রাগে অনুরাগী
কলঙ্ক ভাগী

(আমি) শুচি আসন টেনে টেনে
বেড়াবো না বিধান মেনে
যে পঙ্কে ঐ চরণ পড়ে
তাহারি ছাপ বক্ষে মাগি
কলঙ্ক ভাগী।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জ্ঞা জ্ঞা II। রা জ্ঞা -া । জ্ঞরা জ্ঞা -া I রা জ্ঞা -া । জ্ঞরা মজ্ঞা -া I দা দা পা ।
আ মি তো মা র প্রে মে - হ বো - স বা ০ ক ল ০

সরা রজ্ঞা জ্ঞধা I সা -া -া I । সা সা I সা সদা । । দমা পা -া I মজ্ঞা মা -া ।
ঙ্ক - - ভা গী - - - আ মি স কল্ ০ দা গে - হ- বো -

জ্ঞরা মজ্ঞা -া I দা দা -পা । সাঃ রজ্ঞঃ ধা I সা -া -া । -া -া -া । II
দা - গী - ক ল - ঙ্ক - - ভা গী - - ০ ০ ০

সা৲ সা I { সা সা -া । সা সা রা । জ্ঞা -া জ্ঞা । মা মা পমা । জ্ঞরা জ্ঞা -া ।
তো মার প থে র কাঁ টা - ক র্ ব চ য় - ন্ সে - থা য়

জ্ঞ
রা মজ্ঞা ঋা । সা সরজ্ঞা মজ্ঞা । ঋা সা -া । } সা সা দা । দা পা জ্ঞা ।
তো মা র্ ধূ লা - - য় শ য় ন্ সে থা য় আ চ ল্

পা দণা ণদা । মপা মমা -া । মপা পমা -া । জ্ঞরা মজ্ঞা -া । দা ণসা ঋজ্ঞা ।
পা ত৲ ব আ মা র্ তো মা - রা- গে - অ নু- - -

রা মজ্ঞা -া । দা দা -ণা । সা ঋজ্ঞা জ্ঞঋা । সা -া -া I
রা গী - ক ল - ঙ্ক - - ভা- গী - -

া৲ দা দপা { । মা ণদা -া । দা দা -ণা । ণা র্সা -া । র্সণা র্সা -া । ণা র্সা র্জ্ঞা ।
৹ আ মি শু চি- - আ স ন্ টে নে - টে নে - বে ড়া -

র্ঋা র্সা র্ঋা । ণা র্সা ণর্সঋা । র্ঋর্সা ণদা -পা । } পর্সা র্সা -া । র্ঋা র্ঋর্সা -া । ণর্সা র্সণা দা ।
ব না - বি ধা - ন্ মে নে ৹ যে- প - ঙ্কে ঐ - চ - র - ণ৲

দা পা -া । পা পা দণা দপা মা পমা । জ্ঞরা -া জ্ঞা । জ্ঞরা মজ্ঞা -া । দা দা - ণা
প ড়ে - তা হা - রি ছা -প৲ ব - ক্ষে মা - গি - ক ল -

সা ঋজ্ঞা জ্ঞঋা । সা -া -া । । II
ঙ্ক - - ভা গী - - -

---

(২)

গান—শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি—শ্রী সাহানা দেবী

এখনো গেল না আঁধার
এখনো রহিল বাধা
এখনো মরণব্রত
জীবনে হ'ল না সাধা।

কবে যে দুঃখজ্বালা
হবে রে বিজয়মালা
ঝলিবে অরুণরাগে
নিশীথরাতের কাঁদা।

এখনো নিজেরি ছায়া
রচিছে কত যে মায়া

এখনও কেন যে পিছে
চাহিছে কেবলি মিছে
চকিতে বিজলী আলো
চোখেতে লাগালো ধাঁধা।

[পা]
II । মা মা পদপা মদা । পপা মা পা দা । দপা - সা ণা -া । -দা -া -া -া I
এ খ নো - - - গে ল না - আঁ - ধা - - - - র
দপা মা মপদপা মপা । পমা জরা রসা রা । জা -া মাঃ পঃ । মা -পা পদা -া । II
এ খ নো - - র হি ল - বা - ধা- - - - -
। ধা ধা ধা -া । ধা ধা ধা -া । ণা ধা র্সণা -া । া -া -দা -পা I
এ খ নো - মা • ণ - ত্র - স্ত- - - - - -
পা পা পা -া । পা পা পা -া । মা -পা দা -া । া -া -া -া । II
জী ব নে - হো ল না - শ - - ধা - - - - -

। মা মা মা -া । পা ণা -া ণা- । ণাঃ সণঃ র্সা -া । া -া -া -া I
ক বে যে - ভূ - - খ জ্ব - লা - - - - -
এ খ নো - কে ন যে - মি - ছে - - - - -
ণা ণর্রা র্রা -া । র্রা র্রা র্রা র্সা । র্রা র্সর্রা র্জ্ঞা -া । া -া র্রা র্সা I
হ বে রে -া বি জ য় - মা - মা- - - - - -
চা হি ছে -া কে ব লি - পি - ছে - - - - -
র্সা র্ঋা সা -া । ণা ণর্সা ণা ধা । ধা পধা র্সণা -া । া -া দা পা I
ঝ লি বে - অ রু - ণ রা - - গে- - - - - -
চ কি তে - বি জ - লী - আ - - লো - - - - -
পা পা পা -া । পা পা পা মা । পা মপা দা -া । া -া -া -া । II
নি শী থ - রা তে র - কাঁ - দা - - - - -

চো খে তে - লা গা লো - ধাঁ - ধা - - - - -
। গা গা গা -া । গা গা গা মা । রগা মা মা -া । া -া -া -া I
এ খ নো - নি জে রি - ছা- - য়া - - - - -
গা মা পা -া । পা পা পা মা । পা ণা ণা দা । া -া -া -া I
র চি ছে - ক ত যে - মা - য়া - - - - -

কাশীতে সন্তরণ-প্রতিযোগিতা

শ্রী সুনীলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

কাশীর 'হেল্‌থ্ ইউনিয়ন্' সমিতির উদ্যোগে গঙ্গাবক্ষে গত ৬ই জুন "১৬ বৎসর বয়স্ক পর্য্যন্ত স্থানীয় বালকদিগের পাঁচ মাইল সন্তরণ-প্রতিযোগিতা" (দ্বিতীয় বার্ষিক) ও পরদিন "প্রাদেশিক ১৩ মাইল সন্তরণ-প্রতিযোগিতা" (প্রথম বার্ষিক) হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় দিন 'ওয়াটার্-পোলো', 'হেডার্' প্রভৃতি জল-ক্রীড়ার প্রতিযোগিতারও ব্যবস্থা হইয়াছিল।

উভয় দিনই অসংখ্য জন-সমাগম হইয়াছিল। অহল্যাবাঈ ও নিকট-বর্ত্তী ঘাটসমূহে এবং গঙ্গাবক্ষে ছোট বড় অসংখ্য নৌকায় অন্ততঃ দশ সহস্র লোক সমবেত হইয়াছিল। নদীতীরের বাড়ীগুলির ছাদ, জানালা, বারান্দাগুলিও নর-নারীতে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। নদীতীরে বহুদূর পর্য্যন্ত স্থানে-স্থানে ভীড় জমিয়াছিল। সম্মুখে সুনীল গঙ্গাবক্ষে প্রাঙ্গণের ন্যায় স্থানের পূর্ব্ব উত্তর দুই দিক ঘিরিয়া কাশীনরেশের ও মহাজনদিগের সুবৃহৎ সুন্দর সুসজ্জিত শ্রেণীবদ্ধ তরণীসমূহ এক অপূর্ব্ব শোভার সৃষ্টি করিয়াছিল। কাশীর মহারাজ কুমার সাহেব বাহাদুর, অনারেবল্ রাজা মতিচাঁদ সি-আই-ই, রাজা জগৎকিশোর আচার্য্য, কাশীর ডিষ্ট্রিক্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিষ্টার এল্, ওয়েল্ প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

স্থানীয় বালকদিগের সন্তরণ-প্রতিযোগিতার সীমা রামনগর প্রাসাদ-ঘাট হইতে কাশীর অহল্যাবাঈ ঘাট পর্য্যন্ত (প্রায় ৫ মাইল) নির্দ্দিষ্ট ছিল। ৬ জন হিন্দুস্থানী ও ২৬ জন বাঙ্গালী বালক এই প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। এই ৩২ জনের মধ্যে ২৬ জন নির্দ্দিষ্ট ঘাটে পৌঁছিতে পারিয়াছিল। প্রথম পাঁচ জনের নাম :—

১ম—হৃদয়চন্দ্র দাস (হেল্‌থ্ ইউনিয়নের সদস্য)
বয়স ১৪ বৎসর, সময় ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট

২য়—রমাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
" ১৩ ", " ১ ", ১৫ " ২৪সেঃ

৩য়—শ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য
" ১৫ ", " ১ ", ২০ ", ২ "

৪র্থ—শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
" ১৫ ", " ১ " ৪২ "

৫ম—সুধীরকুমার মুখোপাধ্যায় " ১৫ বৎসর, " " ১ " ৫০ "

হৃদয়চন্দ্র দাস গত বৎসরও এই প্রতিযোগিতায় প্রথম হইয়াছিল। স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক ও অন্যান্য পুরস্কার এই কয়টি বালককে দেওয়া হয়। যাহারা শেষ পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে সব-চেয়ে ছোট এই চারিটি বালককেও পুরস্কার দেওয়া হইবে :—

বলাইলাল দাস সরকার	বয়স	৬	বৎসর
তারকনাথ গাঙ্গুলী	"	৭	"
কানাইলাল দাস সরকার	"	৮	"
রামনাথ মেহ্‌রোত্র	"	১০	"

তের মাইলের প্রাদেশিক প্রতিযোগিতায় ২২ জন প্রতিযোগীর মধ্যে ৬ জন হিন্দুস্থানী ও ১৬ জন বাঙ্গালী ছিলেন। ৭ই জুন দ্বিপ্রহর ১২টা ৫১ মিনিটে তাহারা টিকৃরী ঘাট হইতে রওনা হয়। ২২ জনের মধ্যে মাত্র নিম্নলিখিত ৮ জন নির্দ্দিষ্ট অহল্যাবাঈ ঘাটে পৌঁছিতে পারিয়াছিল :—

১ম—কেশবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (হেল্‌থ্ ইউনিয়নের সদস্য),
সময় ৪ ঘণ্টা ৪ মিনিট

২য়—নারায়ণ দাস	"	৪	"	১১	"
৩য়—বি, এন্, পণ্ডে	"	৪	"	২৭	"
৪র্থ—দেবেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	"	৪	"	২৮	"
৫ম—ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়	"	৪	"	২৯	"

৬ষ্ঠ—পুষ্করচন্দ্র বাগচী, (বয়স ১২ বৎসর),
সময়, ৪ ঘণ্টা ৫০ মিনিট

৭ম—বীরেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়
৮ম—মাণিকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

প্রতিযোগীদের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ পুষ্করচন্দ্র বাগচীর বয়স মাত্র ১২ বৎসর; সে ৬ষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া সকলকেই বিস্মিত করিয়াছে। ৮ম প্রতিযোগী মাণিক চক্রবর্ত্তীর একটি হাত নাই বলিলেই চলে, সুতরাং তাহার পক্ষে যাওয়া এবং পাঁচ ঘণ্টারও কম সময়ে এত দূর আসা যথেষ্ট বাহাদুরীর বিষয়। রাজা মতিচাঁদের প্রদত্ত তিন বৎসরের রানিং কাপ্ ও রাজা জগৎকিশোর আচার্য্যের প্রদত্ত স্বর্ণপদক প্রথম প্রতিযোগীকে দেওয়া হয়। দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ এবং ৬ষ্ঠ প্রতিযোগীকেও পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে, অবশিষ্ট তিন জনকেও পুরস্কার দেওয়া হইবে।

এই প্রতিযোগীদিগের প্রায় সকলেই আসিয়া পৌঁছিবার পরে "হেডার্"এর প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। প্রায় ৩০ ফিট্ উচ্চ মঞ্চ হইতে প্রতিযোগীগণ নানাপ্রকার কৌশল ও নিপুণতার সহিত গঙ্গাবক্ষে লাফাইয়া পড়িতে লাগিল। ছয় বৎসরের বলাইলালকেও সেই উচ্চ মঞ্চ হইতে লাফাইতে দেখিয়া দর্শকগণ বিপুল করতালি দেন। জিতেন্দ্র-নাথ ভট্টাচার্য্য হাত-পা-বাঁধা অবস্থায় 'সমারসল্ট' দিয়া লাফাইয়া সাঁতরাইয়া তীরে আসে। হরেন্দ্রদেব ভট্টাচার্য্য (হেল্‌থ্ ইউনিয়নের সদস্য) প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। রামনগর ষ্টেটের পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ মিষ্টার পিল্‌ডিচ্ এই প্রতিযোগিতার বিচারক ছিলেন।

ইহার পরে 'ওয়াটার্ পোলো ম্যাচ' আরম্ভ হয়। এক দিকে "বাঙ্গালী-টোলা টিম্-"এ সাতজন বাঙ্গালী যুবক এবং অপর দিকে "রামমূর্ত্তি ব্যায়ামশালা টিম্-"এ সাতজন হিন্দুস্থানী যুবক ছিলেন। প্রথমে হিন্দুস্থানীরা এক গোল্ দেন; কিন্তু পরে বাঙ্গালীরা দুই গোল্ দিয়া পুরস্কার লাভ করেন। কেশব চক্রবর্ত্তী, যে ১৩ মাইলের প্রতিযোগিতায় প্রথম হইয়াছিল, সেও মাত্র এক ঘণ্টা বিশ্রামের পরেই এই খেলায় অবতীর্ণ হয়। প্রফেসর মোহনলাল 'রেফ্রি' ছিলেন।

কাশীর মহারাজ কুমার সাহেব বাহাদুর পুরস্কার বিতরণ করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত ও বাধিত করিয়াছেন।

এই উপলক্ষ্যে কাশীতে এক অভিনব আনন্দ ও উৎসাহের সৃষ্টি হইয়াছিল। এইজন্য 'হেল্‌থ্ ইউনিয়নের' সদস্যগণ—এবং কাশীর জন-সাধারণও—আমাদের সমস্ত সাহায্যকারীদিগের নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ—বিশেষরূপে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ললিতবিহারী সেন রায় ও শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস মহোদয়গণের নিকট, যাঁহাদের অশেষ পরিশ্রম ও যথেষ্ট অর্থসাহায্য ব্যতীত কাশীর ন্যায় স্থানে এই উৎসব এরূপ সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হওয়া কখনই সম্ভবপর হইত না।

বর্ত্তমান নেপাল

ডাঃ সুরেশচন্দ্র দাশ গুপ্ত, এল্-এম্-এস্

ভারতবর্ষের অনেকের, এমন-কি শিক্ষিত লোকদেরও অনেকের, নেপাল সম্বন্ধে অতি অদ্ভুত-সব ধারণা আছে। বিশেষ-স্পষ্ট ধারণা কাহারও নাই। ইঁহাদের মতে নেপালে মাত্র দুই শ্রেণীর লোক আছে। প্রথম শ্রেণীর লোকেরা ভয়ানক ধনী—এবং তাহারা মাঝে মাঝে তাহাদের কুবের ভাণ্ডারের সামান্য-কিছু ব্যয় করিবার জন্য ভারতবর্ষে শুভাগমন করিয়া থাকে। ২য় শ্রেণীর লোকেরা গুর্খা—তাহারা ভারতবর্ষের পল্টনে এবং অন্যান্য নানা-স্থানে গুর্খাদের পাঠাইয়া থাকে। এই গুর্খারা অতি ভীষণ লোক এবং কাহারো সহিত সামান্য-রকমের মতদ্বৈধ হইলেই তাহারা আপনা-আপনির মধ্যে গলা কাটাকাটি করিতেও কসুর করে না। নেপালে যাওয়া সম্বন্ধেও এইসমস্ত লোকদের এইপ্রকার অস্পষ্ট এবং অদ্ভুত নানা-প্রকার ধারণা আছে। ইহাদের ধারণায় নেপাল যাইবার পথ অনতিক্রমনীয় বলিলেই হয়। পথঘাট এমনসকল স্থানের উপর দিয়া গিয়াছে যে সামান্য পদস্খলন হইলেই পথিককে কয়েক হাজার ফীট নীচে মৃত্যুর মুখে পড়িতে হইবে। পথে নানাপ্রকার বন্যজন্তুর সংখ্যাও বড় কম নহে। বাঘ গণ্ডার ইত্যাদি ভীষণ জন্তুরা নাকি সকল সময়েই পথের ধারের জঙ্গলে, পথিকের ঘাড় মট্‌কাইবার জন্য ওৎ পাতিয়া বসিয়া থাকে। এইসমস্ত ভীষণ-ভীষণ বিপদ্ অতিক্রম করিয়া যদিই বা কোনো পথিক তাহার পিতৃপুরুষের পুণ্যে নেপাল রাজ্যে গিয়া পৌঁছায়—তখনও কিন্তু তাহার বিপদ শেষ হয় না। সেখানের রাজ-সরকার নাকি ভয়ানক কঠিন এবং নির্ম্মম। খেয়াল হইলেই যে কোনো বাহিরের লোককে

প্রোজ্জ্বল নেপালাতারাধীশ মহারাজা চন্দ্র সামশের জং বাহাদুর রাণা, জি সি বি, জি সি এস্ আই; জি সি ভি ও, ডি সি এল, অনারারি জেনারেল, ব্রিটিশ আর্‌মি; অনারারি কর্ণেল ৪নং গুর্খা পল্টন; থং-লিন্-পিম্মা কোকাং-ওয়াং-সিয়াং; গ্র্যাণ্ড অফিসার দিলা লিজন্ দ'অনার; প্রাইম্-মিনিষ্টার অ্যাণ্ড মার্শাল, নেপাল

পশুপতিনাথ মন্দিরের দৃশ্য

পাকড়াও করিয়া মাটির নীচে কারাগারে জন্মের মত আবদ্ধ করিয়া রাখিবে। নেপাল এমনই ভয়ানক স্থান। যাক, এখন কাল্পনিক নেপালের কথা ছাড়িয়া দিয়া সত্যকার নেপালের কথা আরম্ভ করা যাউক।

নেপাল ভারতবর্ষের উত্তরে অবস্থিত। নেপালের উত্তরে তিব্বত, দক্ষিণে বেহার এবং যুক্তপ্রদেশের উত্তরের জেলাগুলি। পূর্ব্বে সিকিম এবং দার্জ্জিলিং, এবং পশ্চিমে আল্মোরা ও নৈনিতাল। পূর্ব্ব সীমানা হইতে পশ্চিম সীমান্ত পর্য্যন্ত নেপাল ৪৫০ মাইল। চওড়ায় নেপাল ১৫০-১৬০ মাইল। সমগ্র নেপাল ৫৪,০০০ বর্গ মাইল ব্যাপিয়া অবস্থিত। নেপালের লোক সংখ্যা ৫,৬০০,০০০ অর্থাৎ প্রতি বর্গ মাইলে ১০০ জন করিয়া লোকের বাস। গুর্খা এবং নেওয়ার (রাজধানীতে ইহাদের প্রাধান্য সর্ব্বাপেক্ষা বেশী) ছাড়া নেপালে আরো কয়েকটি জাতি বাস করে, যথা—মাগার, গুরুং, লিম্বু, কিরাতি, ভুটিয়া এবং লেপ্‌চা। ইহাদের প্রত্যেকের নিজের-নিজের বিশেষ ভাষা আছে।

নেপালের প্রাচীন কালের কোনো বিশেষ ইতিহাস নাই। প্রাচীন কালের যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা উপকথার ভিতর দিয়া। গৌড় এবং কাঞ্চী হইতে রাজারা দেব এবং দানবদের সহিত মিলিয়া বহুকাল নেপালে রাজত্ব করেন। তাহার পর গুর্জ্জর হইতে আহীররা আসিয়া নেপালে রাজত্ব করে। আহীরদের পর পূর্ব্ব দিক্ হইতে কিরাতগণ আগমন করে। কিরাত-বংশের সপ্তম রাজা কুরুপাণ্ডব-যুদ্ধে, পাণ্ডবদের সাহায্য করিবার সময় মারা যান। অশোক এই কিরাতদের রাজত্বকালে নেপাল আগমন করেন। ইহার পর সোম-বংশীয় এবং সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়গণের পালা। এই সময় শঙ্করাচার্য্য নেপালে আগমন করিয়া নেপালের তৎকালীন হিন্দুধর্ম্মের বহু সংস্কার করেন। ইহাদের পর নোয়াকোট হইতে ঠাকুরগণ নেপাল অধিকার করেন। খৃঃ ৭ম শতাব্দীর মাঝখানে অংশুবর্ম্মণ নেপালের রাজ-সিংহাসনে বসেন। নবম শতাব্দীতে নান্যদেব নেওয়ারদের নেপালে লইয়া আসেন। এই নেওয়ারগণ মঙ্গোলিয়ান্ জাতির শাখা। নেওয়াদের নামানুসারে 'নেপাল' নামের উদ্ভব হয়। একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গালাদেশের বিজয়সেন নেপাল জয় করেন। ১৩২৪ খৃঃ অব্দে অযোধ্যার হরিসিংদেব তরাই-প্রদেশের সিমরাউনগড়-নামক স্থানে আসিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করেন এবং ক্রমে ক্রমে সমগ্র নেপাল-উপত্যকার প্রভু হইয়া উঠেন। ১৪শ শতাব্দীর শেষে আমরা জয়স্থিতি মল্লকে নেপালের রাজ-গদীতে দেখিতে পাই।

এই সময় আলাউদ্দীন চিতোর জয় করেন। চিতোর হইতে একদল রাজপুত নেপালের দক্ষিণে গোর্খা-নামক স্থানে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। এই প্রদেশের নাম হইতেই গুর্খা নামের জন্ম হইয়াছে। এই গুর্খাদের
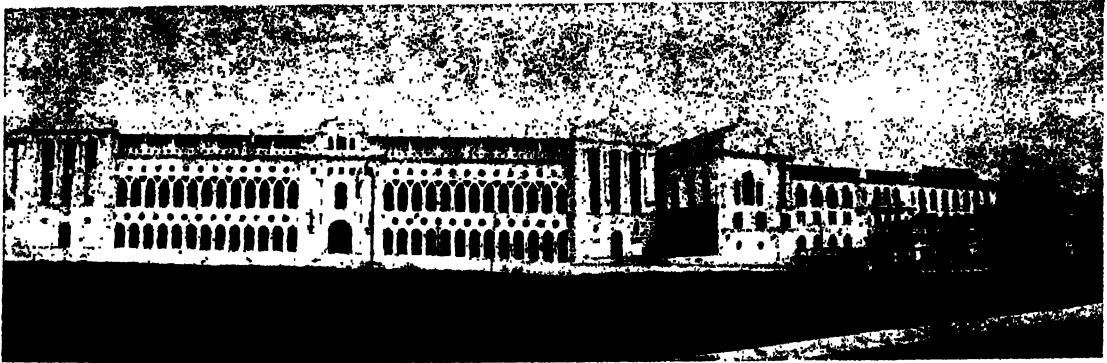
নেপাল-রাজের রাজপ্রাসাদের পূর্ব্ব দিক্

একজন, পৃথ্বী নারায়ণ শা, ১৭৬৮ খৃঃ নেপাল জয় করেন। তখন নেপালের নাম ছিল কান্তিপুর। পৃথ্বীনারায়ণ শা নেপালের প্রথম গুর্খা নৃপতি এবং জয়প্রকাশ মল্ল নেপালের শেষ নেওয়ার রাজা। পৃথ্বীনারায়ণের বংশধরেরা আজও নেপাল শাসন করিতেছেন। নেপালের বর্ত্তমান রাজা, মহারাজাধিরাজ ত্রিভুবন বিক্রম শা বাহাদুর জং বাহাদুর সমসেরজং বর্ত্তমান মহারাজার পূর্ব্বে, সিংহ প্রতাপ শা, রাণা বাহাদুর শা, গ্রীবান্-যুদ্ধ শা, রাজেন্দ্র-বিক্রম শা, সুরেন্দ্র-বিক্রম শা এবং পৃথ্বী বীর-বিক্রম শা, এই কয়জন গুর্খা নৃপতি নেপালে রাজত্ব করেন।

নেপালের রাজধানীর নাম কাঠমণ্ডু। কাষ্ঠ মণ্ডপ হইতে কাঠমণ্ডু হইয়াছে। কথিত আছে যে, এই সহরে একসময় একটি সমগ্র বাড়ী একটিমাত্র গাছের কাঠ দিয়া তৈয়ার হয়। ইহা হইতেই কাষ্ঠ-মণ্ডপ বলিয়া এই সহর খ্যাত হয়।

কাঠমণ্ডু ৪৭৫০ ফুট উচ্চে অবস্থিত। ইহার চারিদিকে উচ্চ পর্ব্বত-শ্রেণী। চারিদিকেই অতি নিকটে-নিকটে পর্ব্বত থাকাতে নেপালে কোনো বড় নদী নাই। তিনটি নদী কাঠমণ্ডুকে প্রায় বেষ্টন করিয়া আছে। দুই মাইল দূরে শঙ্খমূলনামক স্থানে এই তিনটি নদীর সঙ্গম-স্থল। ইহা অতি অপূর্ব্বস্থান। সহর হইতে তিন মাইল দূরে মনোহরা নামক একটি নদী আছে। এই ছোটো নদী কাঠমণ্ডুর পূর্ব্বদিকে।

কাঠমণ্ডুর ঘরবাড়ীগুলি অতি ঘনভাবে নির্ম্মিত। এক-একটি পাড়া বা বস্তির পরেই অনেকখানি করিয়া খোলা জায়গা আছে। এই খোলা জায়গাগুলি হইতে চারিদিকে যাইবার রাস্তা বাহির হইয়াছে। সহরের লোকসংখ্যা অত্যধিক-পরিমাণে বাড়িয়া যাওয়াতে ধনী লোকেরা সহরের বাহিরে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিতেছেন। এইপ্রকারে কাঠমণ্ডু সহরের পরিধি ক্রমশ বাড়িয়া যাইতেছে। নেপালের বর্ত্তমান মহারাজা সিংহ দর্বার নামক প্রকাণ্ড প্রাসাদ নিজের ব্যবহারের জন্য সহরের বাহিরে নির্ম্মাণ করেন, কিন্তু পরে ইহা তিনি নেপালের প্রধান মন্ত্রীদের বাসস্থানের জন্য দান করিয়াছেন। যখন যিনি প্রধান মন্ত্রী হইবেন, তখন তিনি এই প্রাসাদে বাস করিবার অধিকার লাভ করিবেন। এই-রকম আরো কতকগুলি রাজপ্রাসাদ এবং অন্যান্য প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড হর্ম্ম্য আছে। মহারাজা যে প্রাসাদে বাস করেন, তাহার নাম নারায়ণহিত্তি দর্বার

হনুমান ঢোকা প্রাসাদের মাঠের দুইটি মন্দির

(*Narainhitty Durbar*) এই প্রাসাদের বিস্তীর্ণ হাতার মধ্যে একটি চিড়িয়াখানা এবং একটি পশুশালা আছে। এই-সমস্ত প্রাসাদগুলি নতুন কায়দামাফিক্ তৈয়ার করা হইয়াছে। নেপালেও এখন দেখা যাইতেছে যে পাশ্চাত্য
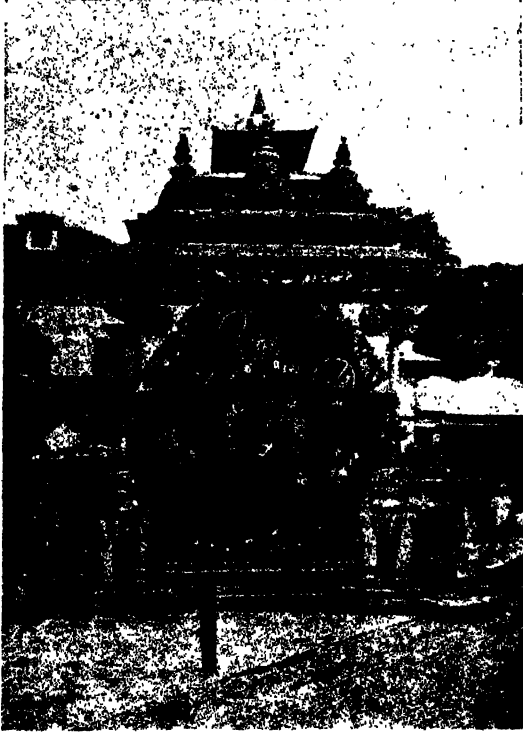
কালভৈরব

আদবকায়দা সকল দিকেই ক্রমশ পূর্ব্ব আদবকায়দার স্থান দখল করিতেছে। বড়-বড় প্রাসাদগুলির পাশেই ছোটো ছোটো পুরানো ধাঁচের নির্ম্মিত ঘরবাড়ীগুলিকে দেখিলেই মনে হয় যেন তাহারা লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া রহিয়াছে। সহরের মাঝখানে একটি ক্লক্-টাওয়ার আছে। ইহার কাছাকাছি কলেজ-বাড়ী, ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী ভীমসেন থাপা নির্ম্মিত প্রকাণ্ড মনুমেণ্ট্ ইত্যাদি আছে। ব্রিটিশ্ এন্‌ভয় এবং লিগেশন্ সার্জ্জন ও তাঁহার কর্ম্মচারীদের থাকিবার বাসস্থানও সহরের মাঝখানে আছে। শ্বেতাঙ্গ এবং ভারতীয় অতিথিশালা বাগমতী নদীর তীরে দক্ষিণে অবস্থিত।

সহরের মধ্যে অসংখ্য হিন্দু মন্দিরাদি আছে। পশু-পতিনাথের এবং সহরের তিন মাইল দূরে বাগমতীর তীরে অবস্থিত গুহেশ্বরীর মন্দিরই সব মন্দিরগুলির মধ্যে প্রধান। নেপাল-উপত্যকায় অনেকগুলি বৌদ্ধ স্তূপ এবং মূর্ত্তি প্রভৃতি পাওয়া যায়। এইসমস্ত স্তূপাদির মধ্যে শম্ভুনাথ ও বুদ্ধনাথই প্রধান। এই দুইটি দেখিতে ব্রহ্মদেশের প্যাগোডার মতন।

বর্ত্তমান সময়ে নেপালের নানাদিকে নানাপ্রকার উন্নতি হইয়াছে। বর্ত্তমান মহারাজা চন্দ্র সামশের জং বাহাদুর রাণা (G. C. B., G. C. S. I., G. C. V. O., etc, etc.,) নেপালের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্ম অনেক পরিশ্রম করিতেছেন। নেপালের উন্নতির সম্পর্কে ভূতপূর্ব্ব জেনারেল্ ভীমসেন থাপা এবং মহারাণা জং

বৌধনাথ—নেপালের বুদ্ধ মন্দির এবং নেপালে অবস্থিত তিব্বতীদের আড্ডা

বাহাদুরের নাম না করিলে অন্যায় হইবে, কারণ এই দুই জনের বিজ্ঞতা এবং সাহসের জন্ম বর্ত্তমান নেপাল অনেক-কিছুই লাভ করিয়াছে। জং বাহাদুরের শাসনকালেই, ১৮৫৪ খৃঃ অব্দে তিব্বতীয়েরা নেপালের সহিত সন্ধি করে

ব্রিটিশ্‌ রাজদূতের বাড়ী
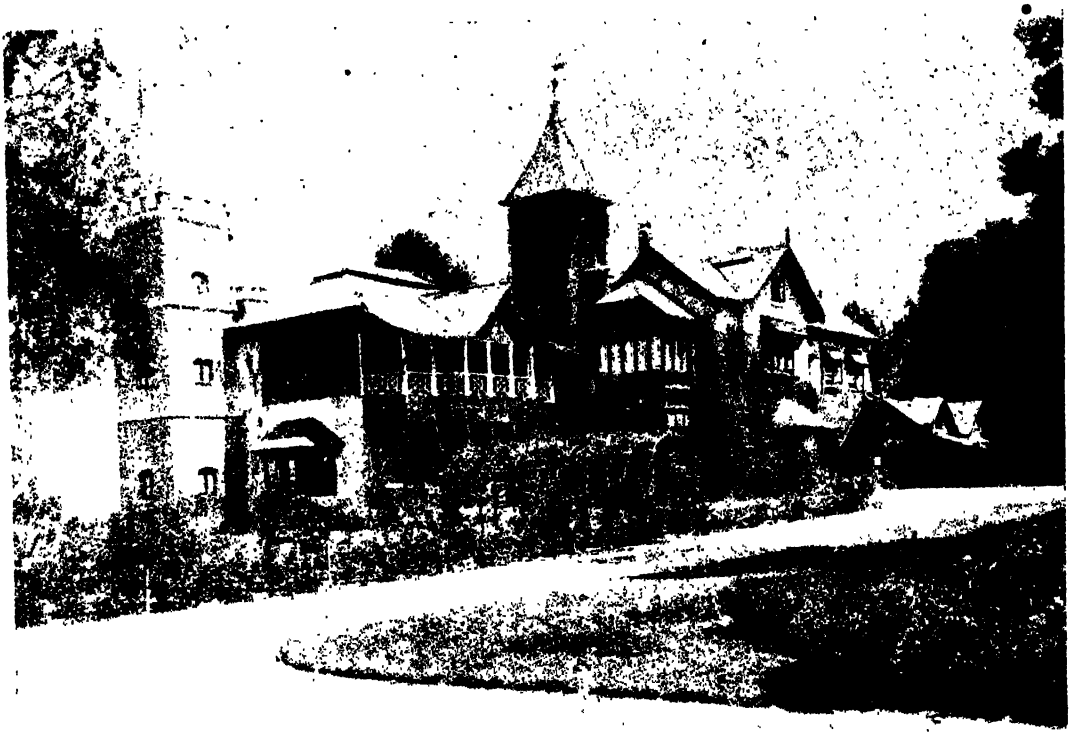
এবং নেপালকে বার্ষিক ১০,০০০ টাকা কর দিতে রাজি হয়। এই সময় হইতেই নেপালের একজন রাজপ্রতিনিধি তিব্বতের রাজধানী লাসাতে থাকিবার অধিকার লাভ করে। জং বাহাদুরের সময় হইতেই নেপালের প্রধান মন্ত্রীরাই কার্য্যত রাজা হইয়া উঠেন, এবং তাঁহাদের পদবী মহারাজা হয়।

নেপালে সকলেরই প্রবেশাধিকার আছে। শিবরাত্রি উৎসবের সময় নেপালে, ভারতবর্ষের বহুদূর প্রান্ত হইতে অনেক যাত্রী আগমন করিয়া থাকে। এই উৎসবের সময়-ব্যতিরেকে অন্য সময় নেপালে প্রবেশ করিতে একটি নাম-মাত্র পাস্‌পোর্ট্‌ অর্থাৎ ছাড়পত্র লইতে হয়, ইহার জন্য অবশ্য কোনো প্রকার মূল্য বা ফি দিতে হয় না।

কাঠমণ্ডু-সহরে মাড়োয়ারী কাপড় ব্যবসায়ী, বেহারী গাড়ী-নির্ম্মাতা, মুসলমান দোকানদার ইত্যাদি নানা দেশের নানা লোককে প্রচুর-পরিমাণে দেখা যায়। বহু পূর্ব্বে যে-সকল বাঙ্গালী এবং মৈথিলীরা নেপালে আসিয়া বসবাস করিয়াছিল, তাহাদের বংশধরেরা আজিও নেপালে ব্রহ্মোত্তর এবং দেবোত্তর উপভোগ করিতেছে।

নেপালের বর্ত্তমান যুগ স্তার্ বীরের সময় আরম্ভ হয় এবং বর্ত্তমান মহারাজার আমলে নেপাল এই যুগের পূর্ণ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। রাজ-সর্‌কারের সকল বিভাগকেই নানা-প্রকার সংস্কার করিয়া বহুল-পরিমাণে উন্নত করা হইয়াছে। এমন কোনো বিভাগ নাই, যেখানে মহারাজার চোখ পড়ে নাই। পুরানো অনেক আইন কানুনাদি পরিবর্ত্তন করিয়া নেপালে উপযোগী নতুন নতুন আইনের চলন হইয়াছে। এ-বিষয়ে নেপাল যুগ-ধর্ম্মকে অবহেলা করে নাই, বা পিছাইয়া পড়ে নাই। বিচার এবং শাসন-বিভাগে অনেক সংস্কার হইয়াছে। একটি হাইকোর্ট স্থাপন করা হইয়াছে, এই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিজ্‌ এক্‌সেলেন্সি কমাণ্ডিং জেনারেল্‌ ধর্ম্ম সামশের
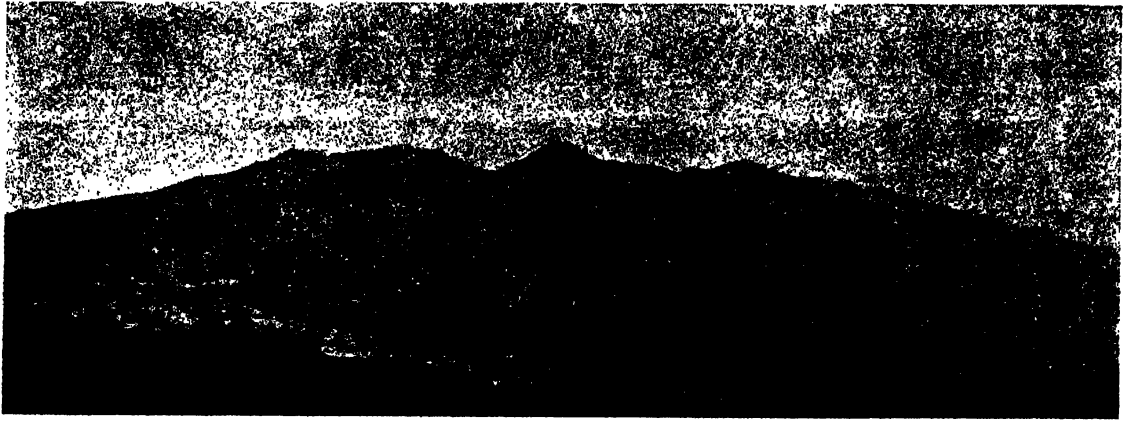
ব্রিটিশ রাজদূতাবাস হইতে পর্ব্বতের দৃশ্য

জং বাহাদুর রাণা (His Excellency Commanding General Dharma Shum Shere Jung Bahadur Rana) ভারতবর্ষের হাইকোর্টের ফুল্ বেঞ্চ্ কোর্টের অনুকরণে কাউন্সিল্ অব্ ভরাদ্‌রস্ (Council of

নারাতাপোলা ভাটগাঁয়োন মন্দির পাঁচতোলা

Bharadars) স্থাপন করা হইয়াছে। এই কাউন্সিলে রাজপরিবারের প্রধানেরা, চৌতুরিয়াগণ, করদ রাজাগণ, প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারিগণ এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ থাকেন। শেষ বিচার ইংলণ্ডের প্রিভি কাউন্সিলের মতন "নিক্‌সারি"তে হয়।
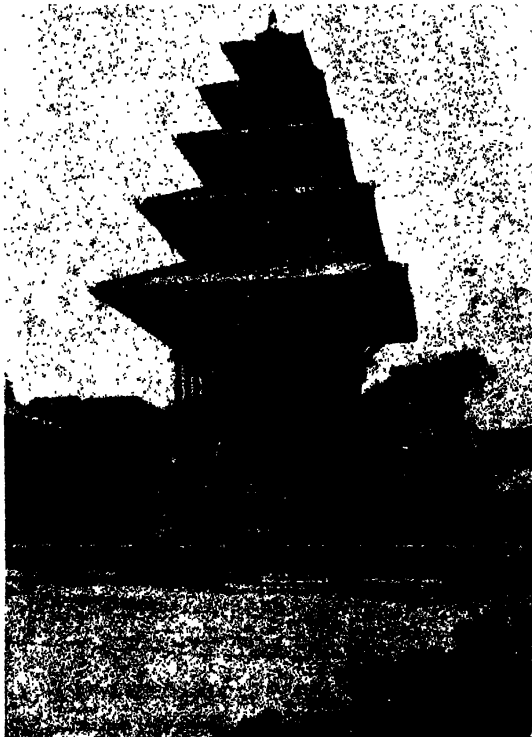
নেপাল-রাজের একটি এক্‌সিকিউটিভ্ কাউন্সিল্‌ও আছে। পুরানো রাজকর্ম্মচারিগণ এবং দেশের কয়েকজন বিশেষ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ইহার সভ্য। প্রয়োজনীয় বিল্, নতুন আইন-কানুন এবং বিশেষ কোনো কাজের জন্য মোটা টাকা খরচের অনুমতি এই কাউন্সিলের কাছে পাশ করাইয়া লইতে হয়। এই কাউন্সিলের সভাপতি হিজ্ অনার সুপ্রদীপ্ত মান্যবর জেনারেল স্যার তেজ সামশের জং বাহাদুর রাণা (His Honour Supradipta Manyavara General Sir Tez Shum Shere Jung Bahadur Rana, K. C. I. E., K. B. E).—এইসমস্ত ছাড়া নিম্নলিখিত অফিসগুলিও নেপালে আছে :—

মুল্‌কি আড্ডা, মুল্‌কি বন্দ্‌বস্ত, মদেশ বন্দ্‌বস্ত, ভন্‌সার (শুল্ক-বিভাগ), মুন্‌সি-খানা (ফরেন্ অফিস্), রকম বন্দ্‌বস্ত, কুমারি চৌক্ (Accountant General Office) মুল্‌কি-খানা (কোষাগার), পুলিশ, টাঁক্‌শাল, এবং রেজিস্ট্রেশন্ বিভাগ।
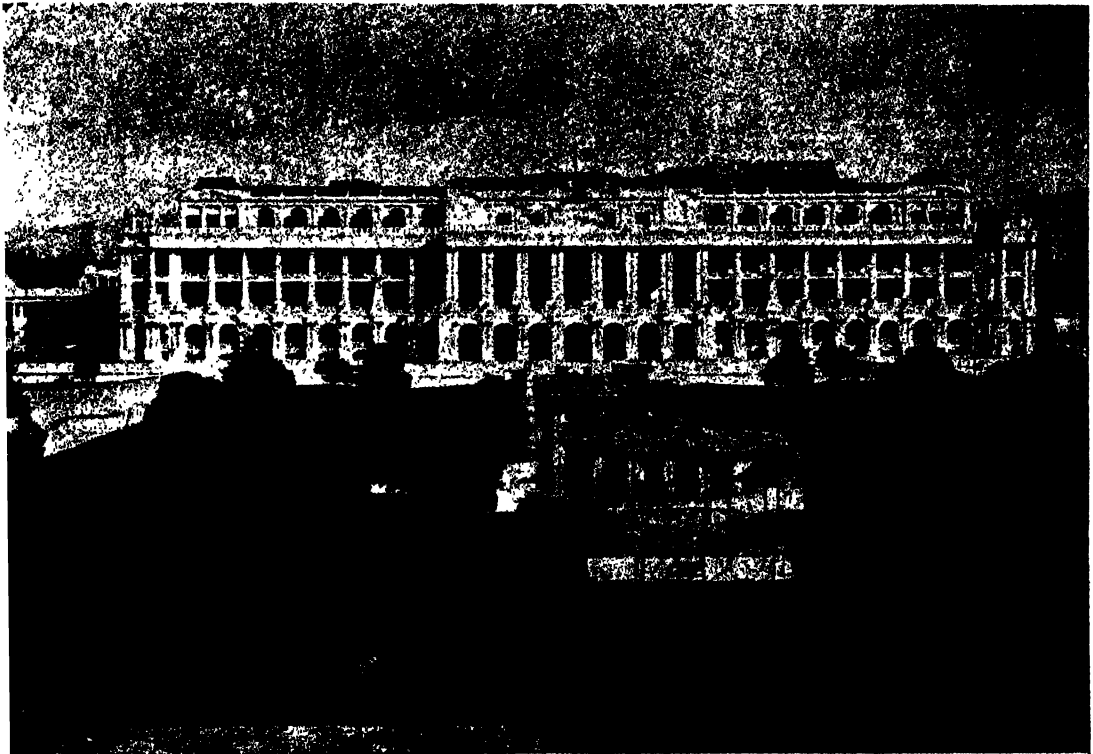
সিংহ দরবার

সুবা মুরলীধর ভগত মহারাজার হোম্ সেক্রেটারী। সর্দ্দার মুরলীধর উপরেতি বি-এ, এল্-এল্-বি, আইন বিভাগের এবং খারিদার যোগজা মণি আচার্য্য এম্-এ, ডাক-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী। হিজ্ হোলিনেস্ ধর্ম্মাধিকার বাদ গুরুজী তারকরাজ রাজগুরু পণ্ডিতজী (His Holiness Dharamadhicar Bada Guruji Taraka Raj Raj-Guru Panditji) সকল-প্রকার ধর্ম্ম-কার্য্যের এবং ধর্ম্ম-অনুষ্ঠানের কর্ত্তা। সকল-প্রকার প্রধান ধর্ম্মানুষ্ঠানে তিনিই পৌরোহিত্য করেন।

কাজি প্রধান অসামরিক কর্ম্মচারী। তাঁহার নীচে সর্দ্দার, মীর সুবা, সুবা খারিদার, দিত্ত বিচারী, মুখীয়া, বাহিদার, নৌসিন্দ এবং করিন্দরের স্থান।

নেপালে খুনী এবং গোহত্যাকারীর প্রাণদণ্ড হয়। কিন্তু ব্রাহ্মণ এবং স্ত্রীলোকের কোনো অপরাধেই প্রাণদণ্ড হয় না।

মোটের উপর নেপাল রাজ-সরকারকে Patriarchal বলা যায়। মহারাজা সকলের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে নজর রাখেন এবং সকলেই সকল-রকম ব্যাপারে তাঁহার মতামতকেই মাথা পাতিয়া মানিয়া লয়।

সমর বিভাগ

নেপালরাজ্যের প্রধান সেনাপতির নাম হিজ্ এক্সেলেন্সি সুপ্রদীপ্ত মান্তবর জেনারেল স্যার ভীম সামশের জং বাহাদুর রাণা (His Excellency Supradipta Manyavara General Sir Bhim Shum Shere Jung Bahadur Rana K. C. S. I, K. C. V. O.)। নেপালের সামরিক বিভাগ ইংরেজদের সামরিক বিভাগের আদর্শে গঠিত। পুরাকালের পল্টনের জবড়জং উর্দ্দী বাদ দিয়া এখন তাহার স্থানে খাকী শার্ট্ এবং হাফ্-প্যাণ্টের ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে। সৈন্তদের বেতন বৃদ্ধি করা হইয়াছে এবং তাহাদের নিয়মমত চাঁদ-

গোসাইথান পর্ব্বত (নেপালের সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র স্থান কাকনি হইতে যেমন দেখা যায়)
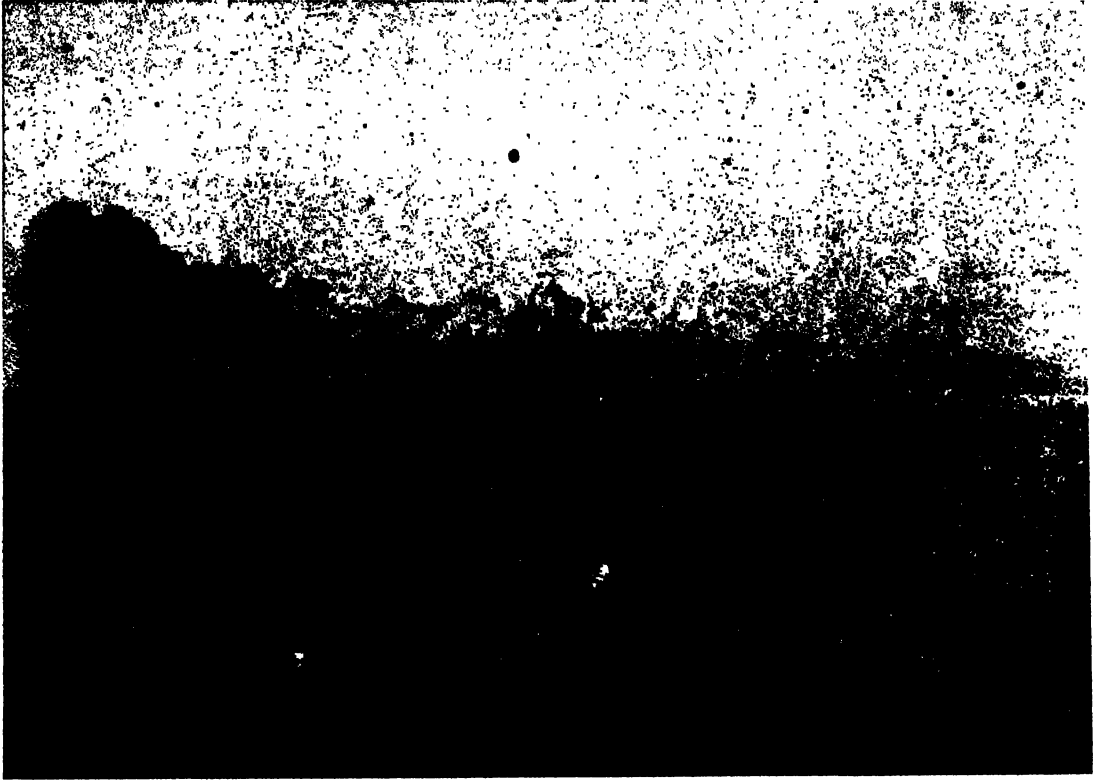
মারির বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। সামরিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এইখানে "অফিসার্" অর্থাৎ সেনানায়কদের শিক্ষা দেওয়া হয়। সামরিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নাম মান্যবর কর্নেল ভৈরব সাম্ শের জং বাহাদুর রাণা সি-আই-ই।

ইম্পিরিয়াল্ গেজেটিয়ার পাঠে জানা যায় যে নেপালের মোট সৈন্য-সংখ্যা ৪৫,০০০ হাজার। ইহার মধ্যে ২,৫০০ গোলন্দাজ। ইহা ছাড়া "রিজার্ভ ফোর্স্" কিছু আছে। ১৯০৮ সালে পল্টনের সংখ্যা এইপ্রকার ছিল। বর্ত্তমানে এ-বিষয়েও কিছু উন্নতি হইয়াছে আশা করা যায়। পাঁচ বছর শিক্ষা লাভ করিবার পর যে পল্টনে কিছুকাল কাজ করিতেই হইবে এমন কোনো বাধ্যতামূলক নিয়ম নাই। যে-সমস্ত লোক পল্টনে পাঁচ বৎসরকাল শিক্ষা লাভ করিয়া ঘরে ফিরিয়া যায়, তাহারাই নেপালের বিশেষ ভরসার স্থল। সামরিক ব্যাণ্ড্ও নেপালের আছে।

গত মহাযুদ্ধের সময় নেপালরাজ তাঁহার সমস্ত বাহিনী ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সাহায্যার্থে দান করিয়াছিলেন। মহারাজার ২য় পুত্র সুপ্রদীপ্ত মান্যবর স্যার্ বাবর সাম শের জং বাহাদুর রাণা এই পল্টনের দলের নায়ক হইয়া গিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে নেপালী পল্টন আফ্রিদিদের বিরুদ্ধে মহা বিক্রমের সহিত লড়াই করিয়াছিল। এই বীরত্বের পুরস্কারস্বরূপ নেপালী পল্টনের সকলেই পদক এবং অন্যান্য সামরিক পুরস্কার লাভ করে। ইহা ছাড়া ভারতগবর্ণমেণ্ট্ নেপালকে বার্ষিক ১০ লক্ষ টাকা দিবার বন্দোবস্তও করিয়াছেন।

ভারতে যেসমস্ত গুর্খা পল্টন আছে, তাহারা আসল গুর্খা নয়। তাহাদের বেশীর ভাগ গুরুং এবং মাগার। ইহাদের অনেকেই ভারতবর্ষে বসবাস করিতেছে। অনেক-রকম অকর্ম্ম-কুকর্ম্ম ইহারা করে, কিন্তু দোষ গিয়া পড়ে আসল গুর্খাদের উপর।

শিক্ষা-বিভাগ

নেপালে ১৮৮০ সালে প্রথম ইংরেজি হাইস্কুল স্থাপিত হয়। ইহা কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছিল। ১৯১৮ খৃঃ ত্রিভুবনচন্দ্র-কলেজ স্থাপিত হয়। এই কলেজে কেবলমাত্র আই-এ ক্লাশ ছিল। গত বৎসর এই কলেজে বি-এ ক্লাশ খোলা হইয়াছে। এই কলেজে অনেক ভারতবাসী অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন।

৩০ বৎসর পূর্ব্বে নেপালে মাত্র ১ জন বি-এ পাশ লোক ছিল। এখন ১ শতেরও বেশী গ্রাজুয়েট নেপালে হইয়াছে। ৫ জন নেপালী ছাত্র বিবিধ বিষয়ে এম্-এ পাশ করিয়াছে। তিন জন এম-বি পাশ করিয়াছে। অনেকে রুড়্কি এবং শিবপুর হইতে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করিয়াছে। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের বহু স্থানে বহু নেপালী ছাত্র বিবিধ বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিতেছে। ৬ জন ছাত্র জাপান হইতে ইঞ্জিনিয়ারিং, মাইনিং, কৃষি, বিস্ফোরকাদি ব্যাপার সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করিয়া দেশে ফিরিয়াছে। তাহারা এখন দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছে।

নেপালের প্রধান মন্ত্রীর বাস ভবনের প্রধান দরজা

নেপালে কোনো মেয়ে-স্কুল নাই, কিন্তু গৃহস্থ এবং ধনী ঘরের শতকরা একজন মেয়েও অশিক্ষিতা নয়। বড় ঘরের মেয়েদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষারও প্রচার হইতেছে। সঙ্গীত এবং নানাপ্রকার শিল্পকলার শিক্ষারও প্রসার হইতেছে।

রাজ্যের বহু স্থানে অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে। এইসকল বিদ্যালয়ে গরীব ছেলেরা বিদ্যালাভ করে। নেপালের সকল বিদ্যালয়ই অবৈতনিক। এই সম্পর্কে আর-একটি কথা বলা অসঙ্গত হইবে না—নেপালে ভূমিকর এবং বাণিজ্যশুল্ক ছাড়া আর কোনো-প্রকার কর বা খাজনা নাই। এমন-কি আয়-করও নাই।

দশ বৎসর পূর্ব্বে গুর্খালি ভাষার উন্নতি সাধন করিবার জন্ম "গুর্খা-ভাষা-প্রকাশিনী সমিতি" নামে একটি সঙ্ঘ স্থাপিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে বহুশত পুস্তক নেপালী ভাষায় অনূদিত হওয়ায় নেপালী ছাত্রদের নিকট বিবিধ বিদ্যালাভ সুলভ হইয়াছে।

চিকিৎসা-বিভাগ

চিকিৎসা-বিভাগের ডিরেক্টার এবং ইনস্পেক্টার অব্ হস্পিট্যাল্স্ উভয়েই নেপালী। কাঠমণ্ডুর বীর হাঁসপাতালের প্রধান চিকিৎসক ডাঃ কে এল্ গুপ্ত। একজন এম্-বি নেপালী চোখের-ডাক্তার আছেন। মহিলা হাঁসপাতালের চার্জ্জে আছেন ডাঃ মিস্ এইচ্ সেন, এম্-বি Bacteriological Laboratoryর সরঞ্জাম-আদি খুব চমৎকার। কিছুদিন পূর্ব্বে X-Ray Building নির্ম্মাণ শেষ হইয়াছে। ইহার জন্ম বিলাত হইতে যন্ত্রপাতি আসিয়াছে। এইখানের চার্জ্জে কাপ্তান কাইজার জং নিযুক্ত আছেন। ইনি কলিকাতার কলেজে শিক্ষা শেষ করিয়া দেরাদুনে X-Ray-বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা লাভ করেন।

সমগ্র নেপালে ১৮টি হাঁসপাতাল এবং ১৪টি দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। সম্প্রতি একটি মেডিকেল স্কুল খোলা হইয়াছে।

মহারাজা স্যার্ জংবাহাদুরের প্রাসাদ, থাপাথালি

পথঘাট ইত্যাদি সব-কিছুই করিতেছে। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস পাব্লিক্ ওয়ার্ক্স্ ডিপার্টমেণ্টের চার্জ্জে আছেন। রক্সৌল হইতে নেপাল পর্য্যন্ত একটি মোটর চলিবার মতন সড়ক নির্ম্মিত হইতেছে। ভারতবর্ষ এবং ইংলণ্ড হইতে বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার আসিয়া এই রাস্তা তৈয়ার করিতেছেন। বর্ত্তমানে কাঠমণ্ডু হইতে ১৮ মাইল দূরে ভীমফেদি পর্য্যন্ত মোটর চলাচল হইতেছে।

পথিকদের বাসের জন্য রাস্তাময় অনেক বিশ্রামাগার তৈয়ার করা হইয়াছে। রাস্তাঘাট সুগম করিবার জন্য অনেক কাঠের পুলও তৈয়ার করা হইয়াছে।

বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের বন্দোবস্ত হওয়াতে নেপালে সংক্রামক রোগের প্রকোপ কমিয়াছে। নেপালের প্রথম Water Works, "বীর-ধর", ১৮৯২ খৃঃ অব্দে হয়। তা'র পর আরও কয়েকটি হয়। স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য নানা-রকম প্রচেষ্টা নেপালে চলিতেছে।

সহর হইতে সাত মাইল দূরে ফারপিং নামক স্থানে প্রধান Hydro-Electric Power-House বসানো হইয়াছে। বর্ত্তমান মহারাজা ইহা করিয়াছেন। এখন সমস্ত সহর, বিশেষ করিয়া বড় বড় রাস্তা এবং চৌমাথা-গুলি বৈদ্যুতিক আলোতে শোভিত হইয়াছে। পাউয়ার হাউস্ একজন শ্বেতাঙ্গের চার্জ্জে আছে, তাঁহার অধীনে আরো কর্ম্মচারী আছে।

দুইটি রোপ রেলওয়ে (Rope Railway) চালাইবার বন্দোবস্ত হইতেছে। একজন শ্বেতাঙ্গ ইহার কর্ম্মকর্ত্তা। ছোটো রেলওয়েটি প্রায় হইয়া আসিয়াছে, বড়টিও বোধ হয় আগামী বৎসর হইতে চলিবে। এই দুইটি rope railway চলিতে আরম্ভ করিলে তরাই হইতে নেপালের মধ্যে শস্যাদি আনয়ন এবং যাত্রীদের গমনাগমন বিশেষ সহজ-সাধ্য হইবে। ইহার জন্য মহারাজা ২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ

ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ

এই বিভাগেও অনেক কাজ হইতেছে। কিছুকাল পূর্ব্বে নেপালের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার একজন বাঙ্গালী ছিলেন, বর্ত্তমানে এই পদ একজন নেপালী লাভ করিয়াছেন। এই বিভাগের দুইজন বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি—কর্নেল কুমার সিং রাণা এবং কর্নেল কিশোর নরসিং রাণা। এই দুইজন আমেরিকা এবং ইংলণ্ডের অনেক Engineering Association-এর honorary সদস্য। ইঁহারা এখন যেমনভাবে কাজ চালাইতেছেন, এইরূপে আর কিছুকাল করিতে পারিলেই নেপালে আর কোনো বিদেশী ইঞ্জিনিয়ারের দরকার হইবে না। বর্ত্তমানে ভারতীয়েরা নেপালে কেবলমাত্র শিক্ষা-বিভাগে, চিকিৎসা-বিভাগে এবং ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে চাকরী পাইতে পারে। একজন নেপালের বাসিন্দা বাঙ্গালীকে নেপাল-সিবিলসার্ভিসে গ্রহণ করা হইয়াছে। ভবিষ্যতে তিনি প্রদেশ-বিশেষের শাসন-কর্ত্তা হইতে পারেন।

পূর্ব্বে নেপালের কাঠমণ্ডুতে পয়ঃপ্রণালীর বিশেষ কোনো বন্দোবস্ত ছিল না। বর্ত্তমানে একটি মিউনিসিপালিটি হইয়াছে। সরকারী এবং বেসরকারী সদস্যেরা মিলিয়া ইহার কাজ চালায়। সরকারী সদস্যের মধ্যে একজন বাঙ্গালী ডাক্তার আছেন। এই মিউনিসিপ্যালিটি

করিয়াছেন। এই rope railway নিয়মমত চলিতে আরম্ভ করিলে নেপালে খাদ্যদ্রব্যের দাম খুব কমিয়া যাইবে, কারণ আম্‌দানি বেশী হইবে।

ব্যবসা-বাণিজ্য

এখন আর নেপাল হইতে কাঁচা চামড়া রপ্তানি হয় না। নেপালেই ট্যানারি খোলা হইয়াছে—সেইখানেই কাঁচা চামড়া ট্যান্ করিয়া কাজে লাগানো হয়। একজন ভারতীয় বিদেশ হইতে শিক্ষালাভ করিয়া আসিয়া নেপালে ট্যানারির কাজে লাগিয়াছেন।
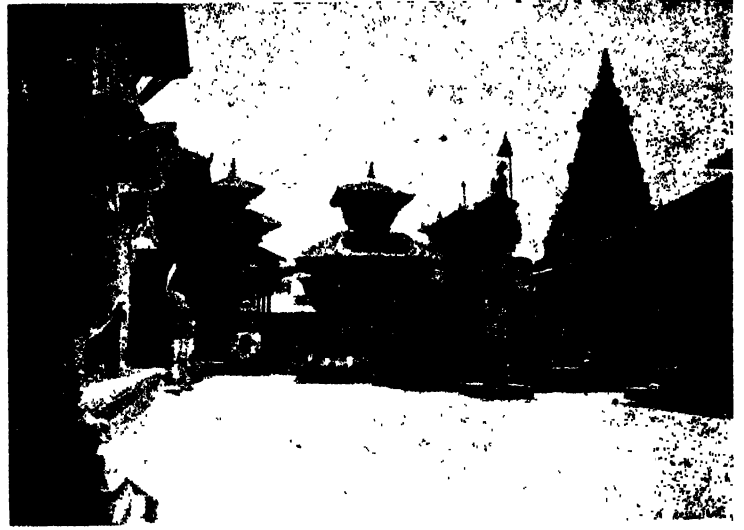
ভাটগাঁও দরবারের সামনের দৃশ্য

টেলিফোনও বসিয়াছে এবং ইহার সাহায্যে নেপালের সহিত বাহিরের জগতের অতি নিকট সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। কিছুকাল পূর্ব্বে নেপাল হইতে ভারতবর্ষে খবরের আদান-প্রদান করিতে অন্তত তিন দিন লাগিত, এখন ৬ ঘণ্টারও কমে হয়। তাড়িৎ শক্তি ব্যবহার যখন একবার আরম্ভ হইয়াছে, তখন নেপালে যে অতি সত্বর নানাপ্রকার কার্‌খানার প্রবর্ত্তন হইবে, এ আশা দুরাশা নয়। ইতি মধ্যেই Electro-plating, পালিশ করা, ছাপাখানা, এবং সোডালেমনেডের কল, শস্যাদির খোসা-ছাড়ানো কল ইত্যাদি তাড়িতের সাহায্যে নেপালে চলিতেছে।

নেপালের অনেক স্থানে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষি-কার্য্যও আরম্ভ হইয়াছে, এবং তাহার ফলও ভালোই হইতেছে। একটি প্রকাণ্ড খাল কাটা হইতেছে। এই খাল কাটা শেষ হইলে নেপালের চাষীদের অনেক সুবিধা হইবে। ইতি মধ্যেই খাল কাটার কাজে ১৪ লক্ষ টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে।

নানা-প্রকার ধাতুর খনির আবিষ্কার নেপালী খনিজ-তত্ত্ববিদ্ করিয়াছেন। একজন বাঙ্গালী ভূতত্ত্ববিদ্ একটি প্রকাণ্ড কয়লার খনি আবিষ্কার করিয়াছেন। এই খনি হইতে কয়লা তুলিবার আয়োজন হইতেছে। কাজ আরম্ভ হইলে পর নেপালের সমৃদ্ধি বিশেষ বৃদ্ধি পাইবে। এই কয়লার খনির আবিষ্কারে নেপালের একটি প্রধান অভাব ঘুচিবে।

নেপালের কামান তৈয়ারী করিবার কার্‌খানা এবং সরকারী অস্ত্রাগার নেপালী কর্ম্মচারীর অধীনেই আছে। সম্প্রতি, জাপান-প্রত্যাগত কর্নেল ভক্ত বাহাদুর বস্‌নেইত নামক একজন ইঞ্জিনিয়ার তাঁহার নিজের প্রথামত একটি হাউইট্‌জার কামান নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই কামান ২০০০ গজ দূরের লক্ষ্য ভেদ নিশ্চয়রূপে করিতে পারে।

পুলিস এবং জেল-বিভাগের অনেক উন্নতি করা হইয়াছে। অনেক শিক্ষিত যুবক পুলিশের কাজে প্রবেশ করিতেছে। জেলখানার কয়েদীদিগকে নানা-প্রকার শিক্ষাপ্রদ কর্ম্মে লাগাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

মহারাজার পৃষ্টপোষকতায় ১৩২৩ সালে পশুপতি মেডিক্যাল্ হল্ অ্যাণ্ড্ জেনারেল ষ্টোর ("The Pashupati Medical Hall and General Stores") নামে একটি যৌথ কারবার ৫০,০০০ টাকা মূলধন লইয়া খোলা হইয়াছে। এই কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টার একজন বাঙ্গালী। বোর্ড্ অব্ ডিরেক্টারের চেয়ার্‌ম্যান্ সার্ তেজ সাম শের জং বাহাদুর রাণা।

নেপালে অনেক মুসলমানের বাস। তাহারা পুরুষ-

পরম্পরায় এখানে নানা-প্রকার ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া বাস করিতেছে। কাঠমণ্ডুতে দুটি মসজিদ আছে।

নেপালে দাসত্ব প্রথা বহুকাল হইতেই চলিত ছিল। বর্ত্তমান মহারাজা অনেক-প্রকার নতুন আইনাদি এবং নিজের বহু অর্থ ব্যয় করিয়া এই প্রথা উচ্ছেদ করিয়াছেন।
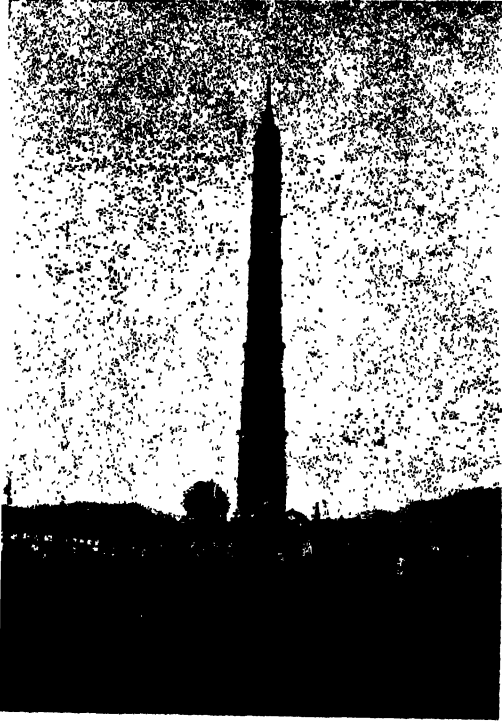
ভীমসেন থাপা নির্ম্মিত ধারারা বা মিনার

মহারাজার দান-ধ্যানও প্রচুর। "পুওর হাউস্" অর্থাৎ গরীবদের বাস করিবার গৃহ মহারাজা অনেকগুলি নির্ম্মাণ করাইয়াছেন।

১৯১৮ খৃঃ অব্দে মহারাজা নেপালের বিশেষ সম্মানযোগ্য ব্যক্তিদের জন্য দুইটি উপাধির সৃষ্টি করিয়াছেন (১) The Star of Nepal ইহা ৪ ভাগে বিভক্ত। আর-একটি সামরিক, ইহার নাম "Nepal Pratap Bardhaka".

ভারতবর্ষে নেপাল-রাজের একজন প্রতিনিধি আছেন। মহারাজা নগর ত্যাগ বা প্রবেশের সময় ১৯টি তোপ পান।

১৯২৩ খৃঃ নেপালের সহিত ইংরেজদের কাঠমণ্ডুতে একটি সন্ধি হইয়াছে। এই সন্ধি-অনুসারে নেপাল পৃথিবীর যে-কোনো দেশ হইতে অস্ত্র আমদানি করিতে পারিবে। তবে অস্ত্রাদির পরিমাণ ভারতবর্ষের পক্ষে বিপদ্‌জনক না হয় ইহা দেখিতে হইবে।

নেপালের চল্‌তি ভাষা গুর্খালি। ইহার সহিত হিন্দীর সামান্য মিল আছে এবং ইহা দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত হয়।

নেপালের চলিত মুদ্রা 'মহর'—দুই মহরে একটি নেপালী টাকা হয়। এক মহরের দাম আমাদের দেশের ।৵৫ পয়সা। সোনার মুদ্রার নাম আস্‌রাফি। নেপালের টাঁকশালেই টাকা তৈয়ার হয়। ভারতবর্ষের মুদ্রাও নেপালে চলিত।

নেপালের হিন্দু এবং বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা তাহাদের শব দাহ করে। তাহারা ভারতবর্ষের লোকদের মতনই অনেক বিষয়ে চলে।

নেপাল-নৃপতির কোনো-প্রকার বাজে চাল-চলন নাই। "সামান্য ভাবে জীবন যাপন এবং উচ্চ চিন্তাই" তাঁহার জীবনের লক্ষ্য, রাজ্য শাসন সম্বন্ধে তাঁহার মত—পূর্ব্ব-কালের যা শ্রেয় তাহা রক্ষা করা এবং বর্ত্তমান যুগের যাহা শ্রেয় তাহা গ্রহণ করা। মহারাজার এইপ্রকার উদার মতাবলম্বনের জন্যই নেপালে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের এই চমৎকার সংমিশ্রণ দেখা যায়।

বামুন-বাগ্দী

শ্রী অরবিন্দ দত্ত

একাদশ পরিচ্ছেদ

মহেশ্বরী এযাবৎকাল দেশের বাড়ীতে যান নাই। শৈলবালা, বলাই ও গোকুল তাঁহার সঙ্গে কলিকাতাতেই বাস করিতেছিল। যে-গৃহ হইতে কানাইলালকে সঙ্গে করিয়া বাহির হইয়াছিলেন, কানাইকে না লইয়া সেখানে ফিরিতে তাঁহার মন কিছুতেই সায় দিত না।

সুখেন্দু কয়েকবার আসিয়া তাঁহাদের দেখিয়া-শুনিয়া গিয়াছেন। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যেও মহেশ্বরী আপনাকে সুস্থির করিতে পারেন নাই। তন্দ্রার মতন একটা আব্‌ছায়া আসিয়া তাঁহার চক্ষুদু'টি হইতে কানাইলালকে ঢাকিয়া ফেলিতে চাহে, কিন্তু নিরাশ্রয় বালকের পৃথিবীব্যাপী নির্য্যাতন ও দুঃখের চিত্র তাঁহার মন ও প্রাণকে এমন অধিকার করিয়া বসিয়াছিল যে, কোনো বিপরীত শক্তিই আর সেখানে আসিয়া বাসা বাঁধিবার অবসর পাইতেছিল না।

মহেশ্বরী গাড়ী করিয়া প্রায়ই ষ্টেশনে যাইতেন। এ যেন তাঁহার একটা তীর্থস্থান হইয়া উঠিয়াছিল। কোনোদিন বলাই, কোনোদিন বলাই এবং শৈল উভয়েই তাঁহার সঙ্গে থাকিত। যখন যেখান হইতে যে গাড়ীখানা ছাড়িত ও যেখানা যেখানে আসিয়া দাঁড়াইত তিনি সেইখানে যাইয়া জন-স্রোতের প্রতি চক্ষুদু'টি নিবদ্ধ করিয়া থাকিতেন। সূর্য্যের শেষ রশ্মি গঙ্গাবক্ষে আসিয়া লীন হইয়া গেলে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তিনি বাসায় ফিরিতেন।

তিনি মাঝে-মাঝে কালীবাড়ীতেও পূজা দিতে যাইতেন। পথে কানাইলালের সন্ধান ও মঙ্গল যত কামনা করা যায় কোনোটাই বাকি রাখিতেন না। এক-দিন দ্বারপাণ্ডাকে কিছু অতিরিক্ত দক্ষিণা দিয়া তিনি কিছুকালের জন্য মন্দিরটি নির্জ্জন করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি নয়নাশ্রুতে দেবীর পদতল ধৌত করিয়া দিয়া শেষে প্রার্থনা জানাইলেন, "মা, আমার কানাইকে এনে দাও, আমি তাকে সংসারে চল্‌তে ফির্‌তে শিখিয়ে দিই।"

এইরূপ প্রার্থনা শেষ করিয়া মন্দিরের বাহিরে আসিলে চারিদিক্ হইতে ভিক্ষুকেরা আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তিনি সকলকেই কিছু-কিছু দিয়া সন্তুষ্ট করিলেন। একটি বালকের উপর তাঁহার দৃষ্টি সমধিক আকৃষ্ট হইল। বালকটির হাবভাব, প্রার্থনা সমশ্রেণীর লোকের অপেক্ষা উন্নত। তাহার চক্ষুদু'টি দিয়া জল ঝরিতেছিল। সে নীরবে শুধু দক্ষিণ হস্তখানি মহেশ্বরীর দিকে সঙ্কোচে আগাইয়া ধরিয়াছিল। মহেশ্বরীর জন্য যেখানে ঘোড়াগাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল, তিনি তাহাকে সেই পর্য্যন্ত লইয়া আসিলেন, এবং কতই প্রশ্ন করিলেন। তিনি সংক্ষেপে শুধু এইটুকু জানিতে পারিলেন যে, তাহার বাপ-মা কেহই নাই। সে এখানে এক বাবুর বাড়ীতে থাকিত। তাঁহারা কলিকাতা ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার সময় তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। মহেশ্বরী তাহাকে গাড়ীতে তুলিয়া লইলেন। অন্ন-বস্ত্রাদি দিয়া মাসাধিক কাল প্রতিপালন করিবার পর এক-দিন দেখিতে পাইলেন, বালকটি তাঁহার অন্তঃকরণ বিচলিত করিয়া দিয়া কোথায় প্রস্থান করিয়াছে। পথের কুড়ানো ছেলে দিয়া হারানো ছেলের শোক মিটিল না।

এতদিন পরেও কানাইলালের সন্ধানে বলাই সমান-ভাবে নিযুক্ত ছিল। সে একটুও অবসাদ বা বিরক্তি অনুভব করে নাই। একদিন সে একখানি সংবাদপত্র হাতে লইয়া হাঁপাইতে-হাঁপাইতে আসিয়া কহিল, "বড় মা, দেখত, এ আমাদের কানাই-দা নয়?"

মহেশ্বরী কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। শুধু চঞ্চল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া একবার বলাই-এর মুখের দিকে, একবার সংবাদপত্রের দিকে চাহিতে লাগিলেন। খবরের কাগজে হঠাৎ কানাই কোথা হইতে কেমন করিয়া আসিল বুঝিতে পারিলেন না।

বলাই কহিল, "দেখ, ঘাঁটালে এক কানাইলাল মজুমদার কি ক'রে একটি রমণী ও একটি শিশুকে আগুনের মুখ থেকে রক্ষা করেছেন—আর সমস্ত বাজারটা আগুনের গ্রাস থেকে বাঁচিয়েছেন।"

এই বলিয়া সে সংবাদপত্রখানি মহেশ্বরীর হাতে দিয়া সেই স্থানটি দেখাইয়া দিল। শৈলও কাগজের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। এবং পড়িয়া দেখিয়া বলিল, "এ যেন আমাদের কানাই ব'লেই বোধ হচ্ছে।"

মহেশ্বরীর চক্ষুদু'টি দিয়া তখন ধারা বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। তিনি কোনো কথাই বলিলেন না। শৈল কহিল, "রমাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী কাগজে লিখেছেন। তাঁর কাছে একখানা চিঠি লিখ্‌লে হয় না?"

মহেশ্বরী কিছুকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "তা'তে হয়ত হিতে বিপরীত হবে। বুঝ্‌তে পার্‌ছ না, সে অভিমান ক'রে ব'সে আছে। আমরা খোঁজ পেয়েছি জান্‌তে পার্‌লে হয়ত সেখান থেকে পালাবে। খবর নিয়ে আনাবার হ'লে সে কি এতদিনে আপনি খবর দিতে পার্‌ত না?"

"তবে কি কর্‌বেন?"

"কি আর কর্‌ব, আমাকেই যেতে হবে।"

পরদিনই মহেশ্বরী গোকুলকে সঙ্গে লইয়া ঘাঁটাল রওনা হইলেন। কলিকাতায় থাকিবার আর তাঁহার কোনো আগ্রহ ছিল না। শৈল এবং বলাইও তাঁহার পিছু লইল। তাঁহারা কোলাঘাট পর্য্যন্ত রেলে আসিয়া ষ্টীমারে উঠিলেন। ষ্টীমারখানি রাণীচকে পৌঁছিলে তাঁহারা সেখানে নামিয়া খাওয়া-দাওয়া করিয়া সেখানে হইতে নৌকাযোগে ঘাঁটাল রওনা হইলেন।

এদিকে কানাইলাল যখন ঘাঁটালে পথে-পথে ঘুরিয়া তিন দিন উপবাস করিল, এবং মহামায়ার বাতাসের সংস্পর্শে সমস্ত ঘাঁটাল সহরটি জুড়িয়াই আছে, এইরূপই যখন তাহার মনে ধারণা জন্মিল, তখন সে সেস্থান ত্যাগ করিয়া যাইবার জন্ম নদীর তীরবর্ত্তী বাঁধের রাস্তা ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু তিন দিনের অনাহারে তাহার পা-দু'খানা মাটির সঙ্গে জড়াইয়া আসিতে লাগিল।

সংসারের এই সাহারায় পথযাত্রীর নিকট চারিদিকে ধূ ধূ বালুকা ভিন্ন যখন আর কিছুই প্রত্যক্ষ হইল না, তখন কে যেন ধীরে ধীরে তাহার অন্তরের কপাটটি খুলিয়া দিল; এবং তথায় এক বৃহত্তর জগৎ রচনা করিয়া মধ্যস্থলে এক চিরপরিচিতা মহীয়সী নারীকে অঙ্গুলি-সঙ্কেতে দেখাইয়া দিয়া বলিয়া উঠিল,—ঐখানেই গতি—ঐখানেই মুক্তি—ঐখানেই ভেদের মধ্যে ঐক্য। কানাই-লাল দুই বাহুদ্বারা আপনার বক্ষঃস্থল চাপিয়া ধরিয়া যখন সেই প্রেমময়ী মাতৃমূর্ত্তিকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিতে গেল, তখন রিক্ততায় তাহার হাত দুইখানি শিথিল হইয়া আবার স্খলিত হইল। সে অবসন্ন দেহে এক বৃক্ষমূলে বসিয়া পড়িল। কিছুকাল সেইভাবে বসিয়া থাকিবার পর তাহার মন যখন স্থির হইয়া আসিল, তখন সে ভাবিতে লাগিল, কেন সে তাহার একমাত্র স্নেহের বন্ধন এবং আকর্ষণ ছিন্ন করিতে ব্যগ্র না হইয়া দেশের বাড়ীতে ফিরিয়া গেল না? কেন মাতার চরণে দীন সন্তানের মতন দাঁড়াইয়া আপনাকে জয়ী করিয়া মাতাকে পরাজয় স্বীকার করাইল না? মায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া কে কবে আপনাকে জয়যুক্ত করিতে পারিয়াছে? সে তাড়াতাড়ি করিয়া গণপতির সঙ্গে ঘাঁটাল চলিয়া না আসিলে হয়ত মহেশ্বরীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইত। শান্তির শ্বশুর-বাড়ীতে তিনটি রাত্রি অতিবাহিত না করিতেই যিনি তাহাকে আনিবার জন্ম লোক ও নৌকা পাঠাইয়াছিলেন, তিনি তাহাকে পথের মাঝে হারাইয়া কি যখন-তখন চলিয়া যাইতে পারেন? হয়ত তাঁহার সেতুবন্ধ যাওয়াই ঘটে নাই। তিনি যখন তাহাকে যে-স্থানে খুঁজিয়াছেন, সে তখন অন্ম স্থানে খুঁজিয়াছে, এইরূপে হয়ত দেখা-সাক্ষাৎ হয় নাই। অপেক্ষা করিয়া থাকিলে অবশ্যই মিলিত হইতে পারা যাইত। যে-যাতনায় সে ছিন্ন ভিন্ন হইতেছে, সে-যাতনায় তাঁহাকে না জানি কতখানি কাতর করিয়া তুলিয়াছে। এইরূপে মর্ম্মন্তুদ চিন্তায় যখন তাহার চক্ষু-দু'টি সাত সমুদ্রের জল শোষণ করিয়া লইয়া রহিয়া-রহিয়া আবার নেত্রপথেই বাহির করিয়া শেষ করিল, তখন তাহার দেহের ক্লান্তি কিছু দূর হইয়াছে। সে আবার উঠিয়া দাঁড়াইল, চলিবার জন্ম পা বাড়াইল। কিন্তু

মহেশ্বরীকে পাইবার পথ ভিন্ন সে ত আর কোনো পথই ধরিবে না। সে আবার সেইখানে বসিয়া পড়িল। বৃক্ষের গুঁড়িটা ঠেস্ দিয়া সে কিছুকাল চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিল। মহেশ্বরীর অম্লান-স্মৃতি আবার তাহার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে একান্ত মুগ্ধ ও বিভোর করিয়া তুলিল। তাহার অন্তরের বেদনা, সুর, তান ও লয়ের সহিত মিশ্রিত হইয়া বাতাসের গায়ে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল,—

মা, আমায় একলা করেছ ভবে।
পথ-মাঝে, ঘন সাঁঝে, দূরে ঠেলেছ যবে॥
(ওমা) ছেড়েছ যে রণে চিনিতে পারিনে
মানব দানবে—
(তব) চরণে চরমে সমাধি-সাধনে
(আমার) সেই ত সময় হবে॥

বেদনার এই অস্পষ্ট উচ্ছ্বাস বাতাসের সঙ্গে মিশিয়া দূরে মহেশ্বরীর নৌকার উপর ভাসিয়া-ভাসিয়া আসিয়া তাঁহার কর্ণে সুস্পষ্টভাবে বাজিয়া উঠিল। মহেশ্বরী নৌকার দ্বারপথে মুখ বাড়াইলেন। তাঁহার চক্ষু হইতে মুক্তার ঝুরির মতন কয়েক বিন্দু জল নদীর জলের সহিত যাইয়া মিশিল। তিনি মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "শৈল, কে গায়?"

অজানা স্থানে মহেশ্বরীর অসঙ্গত প্রশ্নটা যে কেবল একজনকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইল, শৈল তাহা বুঝিতে পারিল। কিন্তু এই জনহীন প্রান্তরের পথে এরূপ মনে করিবার সে কোনো হেতুই দেখিল না। সে বলিল, "পথে ঘাটে কোথায় কে গাচ্ছে তার কি কিছু ঠিক আছে, মা?"

সঙ্গীতটি এবার আর-একটু সুস্পষ্ট হইল। কে যেন সন্ধানে-সন্ধানে মহেশ্বরীর নাগাল পাইয়া তাহার এই বহুদিনের আমন্ত্রিতকে বাতাসের হস্তে তাহার শেষ কথাগুলি পরিবেষণ করিতে লাগিল,—

থেকে থেকে কা'র স্মৃতি আসে ভেসে
বাতাসে গরবে—
কলঙ্ক লাগিয়া কলঙ্ক কিনেছ মা
তুমি মা নীরবে॥
কে আমি—কেন এ পান্থ-নিবাসে
আঁধারে কি র'বে—
চিরদিন কি মা, সুগভীর শ্বাস
বক্ষ ভরি' র'বে॥

মহেশ্বরী কহিলেন, "শুধু গান নয়, প্রাণের কথা যেন টেনে টেনে বের করছে। তোমরা একবার দেখ্‌লে পার্‌তে।"

শৈল কহিল, "মাঝ-গাঙ দিয়ে চলেছে, অকারণ এখন কূলে ভিড়্‌তে গেলে দেরি হয়ে যাবে, মা। চারিদিকে মাঠ আর জঙ্গল—এখানে সে আস্‌বে কি কর্‌তে? ও আর-কেউ হবে বোধ হয়।"

ক্রমে সে গীতধ্বনি মহেশ্বরীর কর্ণে অস্পষ্ট হইয়া মিলাইয়া গেল,—

(আমায়) দিতে কি যন্ত্রণা করিছ মন্ত্রণা
মরণ-উৎসবে—
(ও মা) তোমারি নন্দনে নিবিড় বন্ধনে
বেঁধেছ কেন তবে॥

মহেশ্বরী স্তব্ধ হইয়া ডাঙার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। নৌকাখানি কানাইলালকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল।

* * *

তাঁহাদের নৌকা ঘাঁটাল আসিয়া পৌঁছিলে বলাই ও গোকুল কানাইলালের সন্ধানে বাহির হইয়া গেল। তাহারা খোঁজ করিয়া প্রথমত হরপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীর নিকট পৌঁছিল। তিনি তাহাদের সঙ্গে একটি লোককে দিয়া কানাইলাল যে-মহাজনের কুঠীতে কাজ করিত তথায় পাঠাইয়া দিলেন। মহাজন বলিলেন, "কানাই-বাবু আমার এখানে কাজ করেন। আজ তিন দিন তিনি কাজে আসেননি। গণপতি মিত্রের বাড়ীতে তিনি থাকেন। সেখানে গেলে দেখা পেতে পারেন।"

তার পর তাহারা সেখানে আসিয়া শুনিল যে, কানাই আজ তিনচার দিন বাসায় যায় নাই। কোথায় আছে, তাঁহারা বলিতে পারেন না।

গণপতি তখন বাড়ীতে ছিলেন না। নলিনীই বাড়ীর মধ্য হইতে এই কথা শুনাইয়া দিল। কানাই দা'র খোঁজে দল বাঁধিয়া এমন করিয়া কাহারা আসিয়াছে ভাবিয়া সে

ব্যাকুল হইল; আবার তাহারা কানাই দা'র যে আপনার জন ইহা বুঝিয়া অনেকখানি নিশ্চিন্তও হইল।

তাহারা তখন নিরাশ হইয়া নৌকায় ফিরিল এবং মহেশ্বরীকে সকল কথা বলিল। মহেশ্বরী স্তব্ধ হইয়া বসিয়া শুনিলেন। এত কাছে আসিয়াও মিলিল না; ভবিতব্য বুঝি তাকে এম্‌নি করিয়াই দূরে সরাইয়া রাখিবে। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, "তিন-চার দিনের কথা যখন—তখন হয়ত সে এই সহরেই আছে। খেয়ে দেয়ে দুই খুড়ো-ভাইপো আবার সন্ধান ক'রে দেখো।"

আহারাদি শেষ করিয়া বলাই ও গোকুল আবার বাহির হইয়া পড়িল। যাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিল, দেখিল তাহারা প্রায় সকলেই কানাইলালকে চিনে। কেহ বা দুইদিন আগে দেখিয়াছে; কেহ বা বলিল, তিনদিন হইল তাহার একটি ছেলেকে চিকিৎসা করিতে সে তাহাদের বাড়ীতে গিয়াছিল। কেহ সেই অগ্নিকাণ্ডের কথাই বলিল। কিন্তু তাহার বর্ত্তমান অবস্থিতির কথা কেহই বলিতে পারিল না। সমস্ত সহরটি যখন তন্ন-তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করা শেষ হইল, তখন সন্ধ্যাকালে তাহারা নৌকায় ফিরিল। পরদিন প্রাতঃকালে নৌকার ধারে একটি বালককে খেলিতে দেখিয়া মহেশ্বরী তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করায় সে কহিল, "কানাই-বাবুকে খুবই চিনি। তিনি আমার স্কুলের মাহিনা-পত্তর দিয়ে থাকেন।"

মহেশ্বরী ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এবার কোন্ তারিখে মাহিনা দিতে তোমাদের বাড়ীতে গিয়েছিলেন?"

"বাড়ীতে যান্ না। আরও ছেলেরা তাঁর নিকট বেতন পায় কি না? তিনি প্রতি মাসে ঐ তারিখে স্কুলে গিয়ে আমাদের প্রধান শিক্ষকের হাতে সকলেরই বেতন একসঙ্গে দিয়ে এসে থাকেন।"

"সকলের বল্‌ছ—স্কুলের সকল ছাত্রই কি তাঁর নিকট বেতন পায়?"

"না। যারা পড়াশুনার খরচ চালাতে পারে না, তারাই পায়। শুধু আমাদের স্কুল নয়। এখানে যে-ক'টি স্কুল-পাঠশালা আছে, সব ক'টিরই গরীবের ছেলেরা তাঁর কাছে কিছু-কিছু পায়।"

মহেশ্বরীর চক্ষু সজল হইয়া আসিল। তিনি বলিলেন, "কোথায় গেলে তাঁর দেখা পাবো বলো দেখি?"

"তিনি থাকেন গণপতি-বাবুর বাড়ীতে। আর বাজারে এক মহাজনের ঘরে কাজ করেন।"

মহেশ্বরী বলিলেন, "সে-সব জায়গা আমরা দে'খে এসেছি—কোথাও পাইনি।"

বালক কহিল, "তিনি আবার ডাক্তারিও করেন। কখন্ কার বাড়ী থাকেন, কিছু ঠিক নেই।"

মহেশ্বরী আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডাক্তারি করেন?"

"হাঁ। খুব ভালো লোক তিনি। পয়সাকড়ি কা'রও কাছ থেকে নেন্ না। এখানকার সকলেই তাঁকে খুব ভালোবাসেন। সেদিনকার আগুনের কথা জানেন না? তিনি না থাক্‌লে ঐ যে অতবড় বাজারটা দেখ্‌ছেন, সমস্তই পু'ড়ে ছারখার হ'য়ে যেত।"

মহেশ্বরীর প্রাণ আলোড়িত হইয়া উঠিল। তিনি বালককে নৌকার উপর ডাকিলেন। বালক আসিলে তিনি পুত্রবধূকে বলিলেন, "শৈল, একে কিছু খেতে দাও।"

শৈল বালককে কিছু জলযোগ করাইল। মহেশ্বরী তাহার কাছে ঘেঁষিয়া আসিয়া বসিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাঁর বয়স কত হবে বলো দেখি?"

বলাইকে দেখাইয়া সে কহিল, "ঐ বাবুটিরই মতন।"

"গায়ের রং?"

"ফর্শা। কেন আপনারা তাঁকে দেখেননি?"

"দেখেছি। আমরা এখানে নূতন এসেছি। তুমি আর কারও কথা বল্‌ছ কি না, তাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছি।"

বালকটি বলিল, "আর কার কথা বল্‌ব? কানাই-লাল মজুমদার ত, এ সহরসুদ্ধ লোক সবাই তাঁকে চিনে।"

মহেশ্বরী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

বালক জিজ্ঞাসা করিল, "আমি এখন যাই?"

মহেশ্বরী বলিলেন, "একটু বোস। তাঁকে তুমি কতদিন আগে দেখেছ বলো ত, বাবা?"

"এই ত চার-পাঁচ দিন আগে দেখেছি।"

"আচ্ছা! আগে যে-রকম দেখেছ, এখনও কি সেই-রকমই আছেন? শরীর-টরির খারাপ হয়নি?"

বিস্মিত বালক বলিল; "একটু খারাপ হয়েছে ব'লেই বোধ হয়। সেদিন মাঠের ধারে অনেকক্ষণ বসেছিলেন, মনও সেদিন খুব খারাপ দেখেছিলাম। আমি এখন যাই, বাড়ীতে একটু কাজ আছে।"

বালক চলিয়া গেলে মহেশ্বরী কাঁদিয়া ফেলিলেন। শৈল তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। একটু সুস্থ হইলে মহেশ্বরী কহিলেন, "সে এ-সহর ছেড়ে চ'লে গেছে' কি না তোমরা খেয়ে স্কুল-পাঠশালাগুলিতে একবার খবর নেবে। যদি সন্ধান না পাও, রমাপ্রসাদ-বাবু ও মহাজনের নিকট ব'লে আস্বে যে, সে এলে কল্‌কাতায় আমাদের যেন একটা সংবাদ দেন। ঠিকানা রেখে এস। আর একথা কানাইকে বল্‌তে নিষেধ ক'রে দিও। বোলো,—বাড়ীতে মা'র সঙ্গে ঝগড়া ক'রে এসেছেন।"

বলাই ও গোকুল পুনরায় সন্ধানে বাহির হইল। কিন্তু বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিল। মহেশ্বরীর সাম্‌নে যাইতে তাহাদের ভরসা হইতেছিল না। কিন্তু যাইতে হইল, নিষ্ফল চেষ্টার কথাও বলিতে হইল। তার-পর নৌকাখানি রাণীচক অভিমুখে ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

মহেশ্বরী আর একটি কথাও বলিলেন না। কিন্তু কপালের করাঘাতটা যখন অন্তরের মধ্যেই বাজিতে থাকে, তখন যত অন্তরেই সে বাজুক না কেন, মুখ ও চোখ হইতে তাহার ছাপ্‌টা লুকাইয়া রাখিতে পারা যায় না। শৈল বসিয়া-বসিয়া তাহার শ্বশ্রূর হৃদয়ের তাপ অনুভব করিতে লাগিল। তিনি নৌকার এককোণে বসিয়া নদীর জলের দিকে অন্যমনে চাহিয়া রহিলেন।

নৌকাখানি ঘাটাল-সহর ত্যাগ করিয়া অনেকটা পথ আসিলে গোকুল একবার ডাঙ্গায় উঠিল। সে ফিরিবার সময় দেখিল, একটি লোক গাছের তলায় অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া আছে। সে নৌকায় আসিয়া সে-কথা বলিতে বলাই ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া ডাঙ্গায় যাইয়া উঠিল; এবং দ্রুতপদে গোকুলের সঙ্গে সেই গাছতলায় যাইয়া দেখিল, লোকটি মাটির দিকে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া আছে, হাত-দু'খানি মাথা বেড়িয়া থাকায় মুখখানি ঢাকা পড়িয়াছে। বৎসরাধিককাল চিন্তায়-চিন্তায় কানাইলালের দেহ অত্যন্ত শীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তথাপি বলাই দেখিল, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমস্তই যেন তাহার কানাই-দা'রই মত। সে তখন আনন্দে অধীর হইয়া দৌড়াইয়া নৌকার নিকটে আসিল, এবং মহেশ্বরীকে ডাকিয়া কহিল, "বড় মা! ঠিক যেন কানাই-দার মত—তুমি বেরিয়ে এস, শীগ্‌গিরি এস, দেখ্‌বে।"

মহেশ্বরী তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া ছুটিয়া চলিলেন। তাঁহার পরিহিত বস্ত্রখানি অঙ্গের কোথায় রহিল—কোথায় রহিল না—জ্ঞান নাই। শৈলও পশ্চাৎ-পশ্চাৎ চলিল।

প্রাণে যাহার ক্ষুধা জাগিয়া আছে, তাহার কি বস্তু নির্ণয় করিতে বিলম্ব হয়? দূর হইতেই মহেশ্বরী শীর্ণ বালকের দেহ দেখিয়া আকুল হইয়া উঠিলেন। তিনি মাটির উপর বসিয়া-পড়িয়া কানাইলালের নিদ্রাচ্ছন্ন মুখ-খানি ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন।

কানাইলালের তখনও নিদ্রা ভাঙ্গে নাই। দুই-তিনটি রাত্রি সে গাছতলায় একরূপ অনাহার ও অনিদ্রায় যাপন করিয়াছিল। মহেশ্বরী দেখিলেন, তাহার চক্ষু কোটরগত; মুখমণ্ডল বিবর্ণ এবং নিদারুণ ক্ষুধার জ্বালায় তাহার দেহের সমস্ত সৌন্দর্য্য শুকাইয়া তাহাকে কাঙাল ভাগ্য-হীনের মত বিশ্বের করুণ দৃষ্টির কেন্দ্র করিয়া তুলিয়াছে!

মহেশ্বরী তাহার মস্তকে হাত বুলাইতে-বুলাইতে ডাকিলেন, "কানাই!"

কানাই চক্ষু মেলিল। দেখিল করুণা ও শুচিতার মূর্ত্তিমতী প্রতিমা—অনাথ-জননী—তাহার মহেশ্বরী-মা সারা সংসারের স্নেহ চক্ষে লইয়া তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া আছেন। কানাইলাল চক্ষু মুদ্রিত করিল। হায়! হায়! এমন বিশ্ব-জননীকে দুই হস্তে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া সে আজ স্বেচ্ছায় সঙ্গীহারা পথহারা হইয়া পড়িয়াছে। মূর্খ সে এমন মা'র উপর অভিমান করিয়াছিল। কানাই-লাল পুনরায় যখন চক্ষু মেলিল, তখন অশ্রুধারা তাহার গণ্ডদেশ সিক্ত করিয়া সমুদ্রের মত বহিয়া যাইতেছিল। আনন্দে লজ্জায় বেদনায় তাহার অন্তর মথিত হইয়া উঠিতেছিল।

মহেশ্বরী কহিলেন, "ছিঃ! ছিঃ! এত অভিমান তোমার?"

নয়নাশ্রুর মধ্য দিয়া একটা স্নিগ্ধ অনুযোগ যেন কানাই-লালের দুই চক্ষুর উপর ফুটিয়া-ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। তাহার বেদনার ভিতর, লজ্জার ভিতর এখনও অভিমান উঁকি দিতেছিল।

মহেশ্বরী তাহার অশ্রু মুছাইয়া দিতে-দিতে কহিলেন, "অবোধ ছেলে! মায়ের উপর অভিমান—এ যে অতি লোভের চূড়ান্ত পুরস্কার! এতে কি শুধু মায়ের প্রাণ জ্বলে? নিজেও যে ভাজা-ভাজা হ'তে হয়।"

কানাই এবার কথা বলিল। কহিল, "তুমি আমায় ফেলে চ'লে যেতে পার্‌লে। একা—এই পথের মাঝখানে—" তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। মহেশ্বরীর ক্রোড় হইতে মস্তক লইয়া সে আবার মাটির দিকে মুখ গুঁজিয়া পড়িল।

"তা'র প্রতিশোধ বুঝি এম্‌নি ক'রে দিতে হয়? একবার দেখ্‌তেও ত হয় যে কেন গেল?"

কানাই শুষ্কমুখে সেইরূপ মুখ গুঁজিয়াই কহিল, "তুমি যেতে পার—আর আমি পারিনে?"

মহেশ্বরী কহিলেন, "শোন্ শৈল! একবার কথা শোন্; আমি ত বেশী দূর যাইনি—আর তুই যে—যাতে বুকখানা খালি হয়, ততদূরে চ'লে এলি?"

কানাই কহিল, "না—বেশী দূর যাও-নি! সেতুবন্ধ বুঝি কম পথ, সে ত ভারতবর্ষটা ছেড়ে।"

মহেশ্বরী কহিলেন, "ভারতবর্ষ ছেড়ে গেলেও আমি যে তোরই কাছে ছিলাম। কিন্তু তুই যে পৃথিবী ছেড়ে যাবার আয়োজন করেছিস্?"

কানাইলালের শরীরের দিকে চাহিয়া মহেশ্বরীর চক্ষু-দু'টি জলে ভরিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "ক'দিন খাস্‌নি? নে—নৌকায় চল্। আর কথা-কাটাকাটিতে কাজ নেই। এখন আগে মুখে জল দিবি চল্।"

কানাইলালের চক্ষু দিয়া ঝলকে-ঝলকে জলের ধারা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। সে বলিল, "আমি যাব না—"

মহেশ্বরী কহিলেন, "যাব না কি রে? তবে কোথায় যাবি?"

"যেখানে ইচ্ছে।"

"এই ইচ্ছেটা যতদিন তোমার না যাবে, ততদিন দুঃখ ঘুচ্‌বে না।"

কানাইলাল কহিল, "ঘুচুক—না ঘুচুক, তোমার তাতে কি?"

মহেশ্বরী হাসিয়া কহিলেন, "আমার যে কি—তা' মনে-মনে বেশ জানিস্। নে—এখন মান রাখ্—নৌকায় চল্। কিছু খেয়ে আগে সুস্থ হ'—তারপর ঝগ্‌ড়া করবি।"

বলাই কানাইলালের হাত ধরিয়া কহিল, "কানাই-দা! কি আবোল-তাবোল বকছ? বড়-মার কি সেতুবন্ধ যাওয়া হয়েছে নাকি? তুমি যেমন পাগল, তাই বিশ্বাস করলে। আজামশাই ত যত গোল বাধালে। আস্‌ছে-আস্‌ছে ব'লে নাম্‌তে দিলে না। তারপর বড়-মা কেঁদে-কেটে পরের ষ্টেশনে নেমে পড়্‌লেন। কল্‌কাতায় এসে কত খোঁজা-খুঁজি—তুমি যে লম্বা দিয়েছ তা' কি আর পাবার যো ছিল? এই এক বছরের মধ্যে আমরা কেউ দেশে ঘরে যাই-নি—কেবল প'ড়ে-প'ড়ে তোমারই খোঁজ করছি।"

কানাই উঠিয়া বসিল। বলাইকে জড়াইয়া ধরিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সে কহিল, "বলা, আয় ভাই, চেয়ে ভাখ্ আমার চারিদিকে—আমি কতটা একলা হ'য়ে পড়েছি! ছোট মা—"

এই বলিয়া সে শৈলবালার পদতলে লুটাইয়া পড়িল।

শৈলবালা কহিলেন, "ছিঃ! বাবা; আমাদের এমন ক'রে কাঁদাতে আছে? তুমিও পর হওনি—আমরাও হইনি। কপালে দিন কতক ভোগ ছিল, তাই হ'য়ে গেল। চল বাবা! নৌকায় চল।"

কানাইলাল মহেশ্বরীকে দেখাইয়া কহিল, "ওই বুড়ীর কাছে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ, ক্ষমা করতে পেরেছে কি না! আর তোমরাও আমাকে—"

মহেশ্বরী দুঃখের সহিত হাসিয়া কহিলেন, "হাঁরে পাগ্‌লা! এখানে ক্ষমা ছাড়া যে কিছুই নেই। কিন্তু তুই যে-রকম কাঁদিয়েছিস্, তাতে কষে-কষে তোর পিঠে পাঁচ বেত মারা উচিত।"

কানাইলাল কহিল, "তা ত তুমি কতই পার? তাই

পিঠে একটা বেত পড়্‌তে দেখে ক'দিন খাওয়া-নাওয়া ত্যাগ করেছিলে।"

মহেশ্বরী কহিলেন, "আমি মার্‌তে যাব কেন? মার্‌বার লোক এবার জোগাড় কর্‌ছি। এবার এমন বন্ধনে বেঁধে ফেল্‌ব, যাতে এক'পাও নড়্‌তে না পারিস্।"

কানাই এবার হাসিল। কহিল, "তুমি যে-বন্ধনে বেঁধেছ মা, তা'র উপর আর কেউ বন্ধন আঁটতে পার্‌বে না।"

মহেশ্বরী কহিলেন, "সেইটে বুঝি এবার প্রমাণ করে' দিলি?"

কানাই কহিল, "আমি কি প্রমাণ কর্‌তে পারি, মা? তুমিই বেঁধেছ—তা'রই জোরে আজ আবার কাছে পেয়েছ। ছিঁড়্‌তে গিয়েও ফির্‌তে হ'ল।"

মহেশ্বরী কহিলেন, "যা', আর বাচালতা কর্‌তে হবে না। শৈল, যাও ত, মা! লুচি-সন্দেশ কি আছে—ওকে আগে খেতে দাও।"

সকলে নৌকায় উঠিলে নৌকা তীর ছাড়িয়া চলিল।

কলিকাতায় আসিলে কানাই বলিল, "আমি দিন-কতক এখানে থেকে সহরটা দেখে-শুনে যাব।"

তাহাই স্থির হইল। একদিন সে মহেশ্বরীকে কহিল, "বড়-মা, ঘাটালে আমার এক বোন্ আছে—নাম নলিনী। তারা বড় গরীব। আমার একটা প্রধান কর্ত্তব্য হয়েছে তার বিয়ে দেওয়ান। কি হ'বে, বড়-মা?"

"তারা কি বামুন?"

"না। মিত্র।

মহেশ্বরী একবার চমকিয়া উঠিলেন। কে এ মেয়েটি? কিন্তু কানাইএর মুখের দিকে চাহিয়া মনের প্রশ্ন মনেই চাপিয়া গেলেন।

মহেশ্বরী তাঁহাদেরই গ্রামে একটি পাত্র স্থির করিয়া উভয়পক্ষের অভিভাবকগণের সহিত পত্র-ব্যবহার করিতে লাগিলেন। কথাবার্ত্তা স্থির হইলে দুই পক্ষেই পাত্র ও পাত্রী সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় মহেশ্বরীর বাসা-বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সুখেন্দুও আসিলেন। নলিনীকে দেখিয়া মহেশ্বরীর মনটা আবার কাঁদিয়া উঠিল। এই যে ঠিক উপযুক্ত হ'ত; কিন্তু উপায় নাই। পরকে দিয়া মুখ বুজিয়া থাকিতে হইবে। তারপর নির্দ্দিষ্ট দিনে সম্পূর্ণ মহেশ্বরীর ব্যয়েই শুভকার্য্য নিষ্পন্ন হইল। কানাই একা দশ জনের কাজ করিল। মহেশ্বরী বর ও বধূকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। নলিনীর কৃতজ্ঞ চক্ষু-দু'টি কানাইলালের প্রতি সজল হইয়া উঠিল। সে মিষ্ট করুণ হাসিতে চক্ষু-দুটি ভরিয়া বার-বার কানাই-দাকে দেখিল, কিন্তু আগের মত তেমন করিয়া গল্প করিতে পারিল না। হাসিয়া-কাঁদিয়া অধীর হইয়া নীরবেই সে কানাই-দার কাছে বিদায় লইয়া শ্বশুর-গৃহে চলিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

মনোব্যাকরণ *

ডাঃ শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু, ডি-এস্‌সি, এম্-বি

Psycho-analysis কথাটা আজকাল অনেকের মুখেই শোনা যাইতেছে। ইংরেজী দৈনিক সংবাদপত্রগুলি খুলিলেই এ সম্বন্ধে কিছু না কিছু লেখা প্রত্যহই নজরে পড়ে। বাঙ্গালা সংবাদ-ও মাসিকপত্রগুলিতেও Psycho-analysis-এর আলোচনা থাকে। এ ছাড়া মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসের ত ছড়াছড়ি আছেই। প্রতি কথাতেই লোকে এখন মনস্তত্ত্বের দোহাই দিয়া থাকে। এক এক সময়ে এক-একটা কথা সাধারণকে পাইয়া বসে। কিছুদিন পূর্ব্বে 'বৈজ্ঞানিক' কথাটাও এইরূপ আমাদের ঘাড়ে চাপিয়াছিল।

* যাদবপুর বেঙ্গল টেক্‌নিকেল ইন্‌ষ্টিটিউটে পঠিত।

তখন সকল বিষয়েই 'বৈজ্ঞানিক' আলোচনা, 'বৈজ্ঞানিক' কারণ-অনুসন্ধান, 'বৈজ্ঞানিক' ইতিহাস-রচনা—ইত্যাদি শোনা যাইত। 'বৈদ্যুতিক' কথাটাও এইরূপ প্রচারিত হয়। টিকতে 'বৈদ্যুতিক' শক্তি, জীবনে 'বৈদ্যুতিক' প্রভাব, ইত্যাদি খুবই শোনা যাইত। সেদিনও এক সংবাদপত্রে ছুঁৎমার্গের 'বৈদ্যুতিক' ব্যাখ্যা দেখিলাম। উপস্থিত 'মনস্তত্ত্ব' কথাটারও এই অবস্থা হইয়াছে। পলিটিক্সে 'মনস্তত্ত্ব', ধর্মে 'মনস্তত্ত্ব', বিশ্বপ্রেমে 'মনস্তত্ত্ব', সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতায় 'মনস্তত্ত্ব',—শুনিতে শুনিতে কান ঝালাপালা হইয়া যাইতেছে।

টিকির মধ্যে বিদ্যুৎ দেখিতে না পাইলেও বৈদ্যুতিক শক্তিকে যেমন অগ্রাহ্য করা চলে না, সেইরূপ অনেক বিষয়ের 'মনস্তত্ত্ব' অসার হইলেও আসলে মনস্তত্ত্ব জিনিষটা অগ্রাহ্যের বিষয় নহে। 'মনস্তত্ত্ব' কথাটা খুবই ব্যাপক। Psycho-analysis যে একমাত্র মনস্তত্ত্ব, তাহা নহে। পরীক্ষামূলক মনোবিদ্যা (Experimental Psychology), অনমন-বিদ্যা, ইত্যাদি অনেক বিষয়ই মনোবিদ্যার গণ্ডীতে পড়ে। Psycho analysis এক প্রকার মনোবিশ্লেষণ, তবে মনোবিশ্লেষণ (Psychological analysis) বলিলে সচরাচর যাহা বুঝায়, তাহার সহিত Psycho analysis এর কিছু পার্থক্য আছে। আমি কোন একটি কাজ করিলাম, কিংবা হঠাৎ আমার মনের কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিল। কেন এরূপ করিলাম, কেনই বা মানসিক পরিবর্ত্তন ঘটিল, ভাবিয়া দেখিলে অনেক সময় তাহার সদুত্তর পাওয়া যাইতে পারে। আজ হঠাৎ মন খারাপ হওয়ায়, কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখি যে কিছু টাকা লোকসান দিয়াছি এবং তাহারই জন্য মানসিক অবসাদ আসিয়াছে। এই যে কারণ-অনুসন্ধান, ইহা একপ্রকার মনোবিশ্লেষণ। এরূপ ক্ষেত্রে মানসিক ব্যাপারের কারণ আমাদের মনের মধ্যে পরিস্ফুট আকারেই থাকে, এবং ইচ্ছা করিলে সহজেই তাহা ধরা যায়। মনোবিশ্লেষণ বলিলে সাধারণতঃ এইরূপ কারণ-অনুসন্ধানই বুঝায়। কিন্তু সময় সময় আমরা এমন-সব কাজ করি, যাহার সন্তোষজনক কারণ নির্দ্দেশ করা কঠিন। তখন অগত্যা মানিয়া লইতে হয় যে, অজ্ঞাত কারণেও আমাদের মন বিচলিত হইতে পারে, এবং অজ্ঞাত প্রবৃত্তির বশেও আমরা কাজ করিতে পারি। একজন অপরিচিত লোককে দেখিয়া মনে কেমন একটা বিদ্বেষভাব জাগিল। কেন জাগিল, অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়াও তাহার কারণ নিরূপণ করিতে পারিলাম না। এরূপ অবস্থায়, এক অজ্ঞাত কারণই যে আমার মনের পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে,—একথা মানিয়া লইতে বোধ হয় কাহারও আপত্তি হইবে না। Psycho-analysis এই অজ্ঞাত কারণের সন্ধান বলিয়া দেয়। অনেক সময় আমরা কোন কাজ করিয়া তাহার একটা কারণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকি, কিন্তু ধীরভাবে বিচার করিয়া দেখিলে হয় ত বুঝা যাইবে যে, সেই কারণটিই যথেষ্ট নহে। এ স্থলেও আমরা অজ্ঞাত কারণের অস্তিত্ব মানিতে পারি। রাস্তায় চলিতে চলিতে এক ব্যক্তির সহিত হঠাৎ ঈষৎ ধাক্কা লাগিল। আমি ভীষণ চটিয়া তাহাকে বেদম প্রহার দিলাম। জিজ্ঞাসা করিলে হয় ত বলিব যে লোকটার অভদ্রোচিত ব্যবহারই আমার রাগের কারণ। কিন্তু ঘটনাস্থলে কোন দর্শক উপস্থিত থাকিলে তিনি বলিতেন যে, এত সামান্য কারণে এতটা রাগ স্বাভাবিক নহে। অতএব আমার রাগের মূলে কোন অজানা কারণ রহিয়াছে মনে করাই যুক্তিসঙ্গত। সাধারণ মনোবিশ্লেষণ জ্ঞাত কারণ লইয়া ব্যস্ত, কিন্তু Psycho-analysis অজ্ঞাত কারণ অনুসন্ধানে নিযুক্ত। অবশ্য Psycho analyst জ্ঞাত কারণের প্রভাব মানেন না,—একথা বলিলে ভুল হইবে। সাধারণ মনোবিশ্লেষণের সহিত এই পার্থক্যের জন্য Psycho analysis-এর একটি নূতন নামকরণ আবশ্যক। আমরা আপাততঃ ইহাকে 'মনোব্যাকরণ' বলিব। 'ব্যাকরণ' অর্থে বিশ্লেষণ। মনোব্যাকরণের নানা উপায় আছে। অজ্ঞাত কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে সোজাসুজিভাবে যাওয়া চলে না, কাজেই কেহ যদি অজ্ঞাত কারণের বশে কোন কাজ করেন, তাঁহাকে সোজাসুজি প্রশ্ন করিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। এক ব্যক্তি আমার প্রতি যথেষ্ট মৌখিক সৌজন্য দেখাইয়া থাকেন, অথচ দেখি কার্য্যতঃ তিনি ক্রমাগতই আমার অনিষ্ট করিয়া আসিতেছেন। এক্ষেত্রে তাঁহার মুখের কথা বিশ্বাস না করিয়া, তাঁহার ব্যবহার দেখিয়া তাঁহার মনে আমার প্রতি বিদ্বেষ আছে মনে করিলে

পাহাড়ী ছেলে
শিল্পী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর,
শান্তিনিকেতন

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

বিশেষ অভাব হইবে না। এইরূপ ব্যক্তিগত ব্যবহার, ভুলভ্রান্তি, মুদ্রাদোষ প্রভৃতি বিশেষভাবে আলোচনা করিলে অজ্ঞাত কারণের সন্ধান মিলিতে পারে। স্বপ্নেও মনের অনেক অজ্ঞাত প্রদেশের সন্ধান পাওয়া যায়। এ-বিষয়গুলির বিশদ আলোচনা পরে করিব।

মনোব্যাকরণ-বিদ্যা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। কি করিয়া ইহা সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয়, তাহার ইতিহাস বড়ই কৌতূহলোদ্দীপক।

সিগমুণ্ড্ ফ্রয়েড্ (Sigmund Freud) ভিয়েনা শহরের একজন চিকিৎসক। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের কথা। ফ্রয়েডের বয়স তখন ২৪ বৎসর। তিনি সবেমাত্র ভিয়েনায় স্নায়বিক রোগের চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন। ভিয়েনায় তখন সুচিকিৎসক বলিয়া জোসেফ্ ব্রয়ারের (Joseph Breuer) নামডাক খুব বেশী, ফ্রয়েড্ তাঁহারই সহযোগীরূপে কাজ করেন। ব্রয়ারের হাতে সে-সময় হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্ত একটি স্ত্রীলোকের চিকিৎসার ভার ছিল। ইউরোপের বড়-বড় চিকিৎসক রোগিণীকে সুস্থ করিতে পারেন নাই। স্ত্রীলোকটি একদিন ব্রয়ারকে জানাইল যে, মনের সব-কথা খুলিয়া বলিলে বোধ হয় তাহার ব্যাধির প্রতিকার সম্ভব হইতে পারে। ব্রয়ারের সম্মতি পাইয়া রোগিণী তাহার ইতিহাস বলিতে সুরু করিল। তাহার বিবরণে অনেক অবান্তর কথা থাকিলেও চিকিৎসক সব-কথাই মন দিয়া শুনিতে লাগিলেন। ব্রয়ারের হাতে তখন অনেক রোগী, কাজেই একজনের নিমিত্ত অধিক সময় দেওয়া চলিল না। রোগিণীর কথা ফুরাইতেও চায় না দেখিয়া তিনি প্রত্যহ কিছু কিছু শুনিতে লাগিলেন। রোগিণী অকপটে তাঁহাকে সব-কথাই বলিতে লাগিল। চিকিৎসকের সহানুভূতি পাইয়া, তাঁহার উপর রোগিণীর শ্রদ্ধা-ভক্তি দিন দিন বাড়িতে লাগিল। যে সব কথা চিকিৎসকের শুনিবার প্রয়োজন হয় না, অথবা যাহা বলা অসঙ্গত, ঘরের এমন অনেক কথাও ব্রয়ারকে শুনিতে হইল। আশ্চর্য্যের বিষয় রোগিণী যতই মন খুলিয়া কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিল, ততই তাহার ব্যাধিরও উপশম হইতে লাগিল এবং দিনকয়েকের মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিল। এই অদ্ভুত আরোগ্যলাভের কথা ব্রয়ারের নিকট ফ্রয়েড্ শুনিতে পাইলেন। তাঁহারা পরামর্শ করিলেন, ভবিষ্যতে এই প্রণালীতে বায়ুরোগের চিকিৎসা করিবেন।

ক্রমে দেখা গেল, রোগীর বাল্যজীবনে এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটে যাহা মনে করিতে লজ্জা ও ঘৃণার সঞ্চার হয়। এই-সকল ঘটনা রোগীর মন হইতে মুছিয়া যায়, কিন্তু চিকিৎসকের কাছে জীবন-কাহিনী বলিতে বলিতে তাহা ক্রমে ক্রমে রোগীর মনে আসে, এবং চিকিৎসকের সহানুভূতি ও উৎসাহ পাইলে রোগী লজ্জা ও কষ্ট বোধ করা সত্ত্বেও চিকিৎসককে তাহা জানাইতে পারে। খুব খানিকটা কাঁদাকাটির পর মনের রুদ্ধ শোক যেমন প্রশমিত হয়, তেমনি চিকিৎসকের কাছে মনের গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিবার পর রোগীর মনেও শান্তি আসে, আর তাহার রোগও অল্পে অল্পে সারিয়া যায়। ক্রমে ব্রয়ার ও ফ্রয়েড্ দেখিলেন যে, পুরাতন ঘটনা রোগীর স্মৃতিপথে জাগরূক হইলেই রোগের শান্তি হয় না। ঘটনাগুলির স্মৃতির সহিত মনে লজ্জা ঘৃণা, দুঃখ কষ্টেরও উদ্রেক হওয়া দরকার। কতকগুলি দুঃখদায়ক ভাব মনে রুদ্ধ থাকিয়া রোগের সৃষ্টি করে, এবং সেগুলি কোন উপায়ে মন হইতে বাহির করিয়া দিতে পারিলেই রোগেরও শান্তি হয়। ভুক্ত দুষ্পাচ্য খাদ্য উদরে জমিয়া থাকিলে যেমন পেটের অসুখ হয়, এবং জোলাপ দিয়া বাহির করিয়া দিলে যেমন সে অসুখ সারিয়া যায়, তেমনি মনের রুদ্ধ আবেগগুলি চিকিৎসার দ্বারা বাহির করিতে পারিলেই রোগী সুস্থ হয়। এইজন্য তাঁহারা এই চিকিৎসার নাম দিলেন—মানস রেচন চিকিৎসা (Cathartic treatment).

এই উপায়ে কিছুদিন চিকিৎসা করিবার পর ফ্রয়েড দেখিলেন, মনের গুপ্ত কথা রোগীর নিজেরই জানা না থাকায় সেগুলি মনে পড়িতে অনেক সময় লাগে। তিনি তখন সাব্যস্ত করিলেন রোগীকে সংবেশিত (hypnotize) করিলে তাহার মনের রুদ্ধভাবগুলি ধরা সহজ হইবে। এইভাবে চিকিৎসা চলিতে লাগিল। কিছুদিন চিকিৎসার পর ফ্রয়েড আর এক অসুবিধায় পড়িলেন,—এমন অনেক রোগী আসিতে লাগিল যাহাদের সংবেশিত করা অসম্ভব, অথবা সংবেশিত অবস্থাতেও যাহারা সকল কথা মনে আনিতে পারে না। ফ্রয়েড্

সংবেশন-বিদ্যা (hypnotism) শিক্ষা করিয়াছিলেন—বিখ্যাত ফরাসী-চিকিৎসক ব্যের্ন্‌হাইমের (Bernheim) নিকট। সংবেশিত (hypnotized) অবস্থায় রোগী যাহা কিছু করে, জাগিয়া উঠিবার পর কিন্তু তাহার আর সে-সব কিছু মনে থাকে না। কিন্তু ফ্রয়েড্ লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, জাগ্রত অবস্থায় এইরূপ লুপ্তস্মৃতি উদ্ধারের জন্য ব্যেরন্‌হাইম্ একটি উপায় অবলম্বন করিতেন। যে ব্যক্তির লুপ্তস্মৃতি উদ্ধার করিতে হইবে, হাত দিয়া তাহার কপাল ঈষৎ চাপিয়া যদি বারবার বলা যায় যে সংবেশিত অবস্থার সব ঘটনা তাহার মনে পড়িবে, তবে বাস্তবিকই বিস্মৃত ঘটনাগুলি তাহার স্মৃতিপটে ভাসিয়া উঠে। ফ্রয়েড্ তাই ঠিক করিলেন, রোগীকে সংবেশিত না করিয়া ব্যেরনহাইমের প্রক্রিয়া-মত বাল্যকালের লুপ্তস্মৃতি জাগাইবার চেষ্টা করিবেন। তিনি রোগীকে শোয়াইয়া তাহার কপালে হাত রাখিয়া বলিলেন—আমি তোমার কপালে ঈষৎ চাপ দিতেছি, তোমার পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিবে। প্রথমতঃ রোগী জানাইল তাহার কোন কথাই মনে আসে না। ফ্রয়েড্ বলিলেন,—যে কথাই তোমার মনে উঠুক, অকপটে বলিয়া যাও। এইরূপে রোগীর কাছ হইতে যে-সব কথার সন্ধান পাওয়া গেল, তাহা প্রথমে অসংলগ্ন বোধ হইলেও দেখা গেল, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তাহার মধ্যে লুপ্তস্মৃতির ইঙ্গিত আছে। এই-রূপেই অবাধ-অনুবন্ধ-ক্রমের (Free Association Method) উৎপত্তি। ক্রমে রোগীর স্বপ্নের দিকে ফ্রয়েডের দৃষ্টি পড়িল। তাঁহার মনে হইল, গতজীবনের অনেক ঘটনার আভাষ রোগীর স্বপ্নে পাওয়া সম্ভব। তখন তিনি অবাধ-অনুবন্ধ-ক্রমের সাহায্যে রোগীর স্বপ্ন-বিশ্লেষণে নিবিষ্ট হইলেন।

অবাধ-অনুবন্ধ-ক্রম ও স্বপ্ন-বিশ্লেষণের সাহায্যে মনোজগতের নূতন রাজ্য আবিষ্কৃত হইল। দেখা গেল যে মনের নানা স্তর আছে; কোন কোন ভাব মনের উপরের স্তরেই থাকে, ইহাদের অস্তিত্ব সহজেই ধরা যায়; কোনটি বা আর একটু নীচের স্তরে থাকায় ধরা কিছু কঠিন; কোনটি বা মনের অতি গভীর প্রদেশে থাকায় কখনই সোজাসুজিভাবে ধরা পড়ে না; কেবলমাত্র অনুমানের দ্বারা তাহার অস্তিত্ব বুঝিতে হয়। বিভিন্ন স্তরের মানসিক ভাবগুলির প্রকৃতিও বিভিন্ন প্রকারের। যেটি অপেক্ষাকৃত উপরের, সেটি নীচের ভাবের তুলনায় সামাজিক হিসাবে কম অন্যায়; যেটি নিম্নস্তরের তাহা অতীব ঘৃণণীয়। ফ্রয়েড্ দেখিলেন, যে ভাবগুলিকে আমরা অবৈধ বা অন্যায় বলি, নির্ব্বাসিত অবস্থায় মনের অজানা রাজ্যে তাহারা বসবাস করিতেছে। সুন্দর মানব-শরীরের মধ্যে যেরূপ নানা প্রকার ক্লেদ থাকে, পবিত্র মনের অন্তরালেও সেইরূপ আমাদের সকলের মধ্যেই ঘৃণণীয় ভাব-সমূহ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

এই ঘৃণণীয় প্রবৃত্তিগুলি নির্ব্বাসিত হইয়া মনের অন্তস্তলে নিশ্চেষ্ট অবস্থায় থাকিলে আমাদের কোনই ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল না। কিন্তু এই রুদ্ধ প্রবৃত্তিগুলি সর্ব্বদাই আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করে এবং আমাদিগকে তদনুযায়ী কার্য্যে লইয়া যাইতে চায়। সমাজ, ধর্ম্ম ও নীতিজ্ঞান প্রহরীর ন্যায় এই-সকল দুষ্ট ইচ্ছাকে সর্ব্বদাই বাধা দেয় ও মনের উপরে আসিতে দেয় না। চোর যেমন প্রহরীর ভয়ে দিনের আলোয় স্বরূপে দেখা দেয় না, কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে ও ছদ্মবেশে চুরি করে, এই ঘৃণণীয় ইচ্ছাগুলিও সেইরূপ নানারূপ ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া মনের প্রহরীকে এড়াইয়া বাহিরের মনে দেখা দেয়। বিশেষ বিচার ভিন্ন তখন তাহাদের স্বরূপ বুঝা যায় না। নানা প্রকার মানসিক ব্যাধির মূলে এইরূপ রুদ্ধ প্রবৃত্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে। রুদ্ধ প্রবৃত্তিগুলি কেবল যে মনের রোগের আকারেই প্রকাশ পায় তাহা নহে; নানা প্রকার সামাজিক রীতি-নীতি আচার-ব্যবহারে, শিল্পকলায়, যুদ্ধ-বিগ্রহে, দান-ধ্যানে ও অন্যান্য সৎকার্য্যের মধ্যেও তাহাদের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্তই মনোব্যাকরণ-বিদ্যার আলোচনার বিষয়।

নষ্টচন্দ্র

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

ধনিষ্ঠার প্রায়শ্চিত্ত সঙ্গোপনে সাঙ্গ হ'য়ে গেল। বাড়ীর পরিজনেরা কেউ সন্দেহও করলে না যে এটা একটা প্রায়শ্চিত্ত-ব্যাপার ; ধনিষ্ঠা নিরন্তর একটা-না-একটা পূজা-ব্রত করতেই আছে, এও তারই একটা মনে করে' কারো মনেই কোনো কৌতূহল জন্মেনি। ব্রাহ্মণেরাও যারা ভোজন করে' গেল তারাও উপলক্ষ্য সম্বন্ধে কোনো কৌতূহল প্রকাশ করেনি, কারণ এমন সৌভাগ্য আজকাল তাদের প্রায়ই ঘটে' থাকে।

পাছে গৌরীর অসাবধানতায় ধনিষ্ঠাকে আবার প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, এবং বারম্বার প্রায়শ্চিত্ত লোকের কাছ থেকে গোপন করে' রাখতে না পারা যায় এই ভয়ে গৌরীকে নজরবন্দী করে' রাখবার ব্যবস্থা করা হয়েছে— চার চার জন দাসী সারা দিন তাকে চোখে চোখে রেখে পাহারা দিয়ে ফেরে ; গৌরী যেখানে যায় তারা সঙ্গে-সঙ্গে লেগে থাকে, গৌরী গণ্ডি-ডিঙোবার উপক্রম করলেই তারা পথ আগলে দাঁড়ায় এবং খেলা দিয়ে খেলনা দিয়ে কোলে তুলে ভুলিয়ে-ভালিয়ে তাকে তার নির্দ্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে ফিরিয়ে আনে ; গৌরী ঘুমিয়ে থাকলেও দাসীরা তার কাছে পাহারা দিয়ে বসে' থাকে, সে যেন অতর্কিতে ঘুম থেকে উঠে কোনো অনাচার ঘটিয়ে না বসে।

গৌরী শিশু হ'লেও বেশ স্পষ্টই বুঝতে পারছিল যে তার বাবা আর মার স্নেহ-যত্ন অসীম হ'লেও তার স্বচ্ছন্দ-বিহারের চারিদিকে নিষেধের সীমা তাকে আবদ্ধ করে' রেখেছে। একদিকে স্নেহের প্রশ্রয়, অপর দিকে নিষেধের বাধা, এই দুই বিরুদ্ধশক্তির মাঝখানে পড়ে' গৌরীর স্বভাব সংগঠিত হ'তে লাগল। গৌরী শান্ত, স্বল্পবাক্, চাপা, অথচ অভিমানিনী হ'য়ে বড় হ'য়ে উঠতে লাগল।

গৌরীর জন্যে কলকাতার সাহেবের দোকান থেকে সাড়ে পাঁচ শ টাকা দাম দিয়ে বড় একখানা ঠেলা-গাড়ী কিনে আনা হয়েছে। এই নূতন গাড়ীতে চড়ে' গৌরী বেড়াতে বেরিয়েছে ; একজন চাকর তার গাড়ী ঠেলে নিয়ে চলেছে, আর তার সঙ্গে আছে একজন দরোয়ান, গৌরীর খাস ঝি চার জনের একজনকে এবং পাহারাদারদের উপরও পাহারা দিবার জন্যে হুঁশিয়ার মাধবীকেও ধনিষ্ঠা পাঠিয়ে দিয়েছে। যেমন গাড়ীর সাজসজ্জা বহুমূল্য, তেমনি গাড়ীর আরোহীর সাজসজ্জাও বহুমূল্য সুসজ্জিত ও সুন্দর। গৌরীর সামনে গাড়ীতে কতকগুলি দামী পুতুল, ছোটো একটিন দামী বিস্কুট ও এক শিশি লজঞ্চুষ দেওয়া হয়েছে—রাস্তায় গিয়েও গৌরীর যেন কোনো বিষয়ে অভাব না হয়। গৌরী রামধনুর মতন সাতরঙা রেশমী ছাতা মাথায় দিয়ে গাড়ীতে চলতে-চলতে কৌতূহলী দৃষ্টিপাত করে' চারিদিকে দেখছিল আর অন্যমনস্কভাবে কখনো বা একখানা বিস্কুট ও কখনো বা একটা লজঞ্চুষ মুখে দিচ্ছিল। ক্রমাগত বিস্কুট আর লজঞ্চুষ খেতে খেতে গৌরীর তৃষ্ণা পেয়ে গেল। সে মাধবীকে বললে—মাধবী, আমি জল খাব।

জমিদারণীর পালিতা কন্যার ইচ্ছা প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে দাসী চাকর দারোয়ান সকলেই ব্যস্ত হ'য়ে উঠল—বাড়ী থেকে এত দূরে এখন জল পাওয়া যাবে কোথায় ?

মাধবী ভোলাবার স্বরে বললে—বাড়ী ফিরে গিয়ে জল খেও, লক্ষ্মী দিদিমণি, কেমন ?

গৌরী আপত্তির স্বরে বলে' উঠল—আমার বড্ড তেষ্টা পেয়েছে যে !

শান্ত গৌরীর স্বভাব ক্রমাগত বাধা ও নিষেধ সয়ে'

সয়ে' এমন মৃদু ও ভীরু হ'য়ে উঠেছিল যে, তাকে আর-একবার নিষেধ করলে প্রবল তৃষ্ণাও সে দমন করে' থাকতে পারত, কিন্তু মুনিবের আদুরে মেয়েকে একবারের বেশী বাধা দেবার সাহস চাকর-দাসীদের হ'ল না; তারা জলের সন্ধানে ব্যস্ত হ'য়ে উঠল।

গাড়ী-ঠেলা চাকর নফর মাধবীকে বললে—এখানে ত কোনো ভদ্দর লোকের বাড়ী নেই; এই ক'খানা বাড়ীর পরে চক্কত্তী-মশায়ের বাড়ী; সেখান থেকে জল নিয়ে একটু খাইয়ে দাও না।

মাধবী চিন্তিত হ'য়ে বললে—খাইয়ে ত দেবো, কিন্তু কিসে করে' খাওয়াব?—ওরা কি গেলাস-বাটিতে একে জল খেতে দেবে?

গৌরীর ঝি বললে—মাটির ভাঁড় খুরি যদি না পাওয়া যায়, তা হ'লে আমি হাতে করে'ই খাইয়ে দেবো।

গৌরী এখন বাংলা কথা একটু-একটু বুঝতে পারছিল; সে তার পরিচারিকাদের কথাবার্ত্তা অল্প-স্বল্প বুঝতে পেরে স্তব্ধ হ'য়ে গেল, সে কারণ বুঝতে না পারলেও এইটুকু আজকাল বুঝতে পারছিল যে, সে সকলের থেকে স্বতন্ত্র, লোকের তাকে ছুঁতে নেই, তার সর্ব্বত্র যেতে নেই, তার নিজের বাসন ছাড়া অন্যের বাসনে তার খেতে নেই, অন্যের বাসনে খেলে সেই বাসন ছুৎ হ'য়ে যায়, ফেলে দিতে হয়, তার উচ্ছিষ্ট ছুঁলে লোকের নাইতে হয়। পরিচারিকাদের কথা শুনে তার পিপাসা দূর হ'য়ে গেল, কিন্তু শান্ত স্বল্পভাষিণী গৌরী মুখ ফুটে পরিচারিকাদের বলতে পারলে না তার আর জল খাবার দরকার নেই, সে চুপ করে' বসে' রইল।

চক্রবর্ত্তীদের বাড়ীর সামনে গৌরীর গাড়ী দাঁড় করিয়ে মাধবী বাড়ীর ভিতরে গেল। তখন চক্রবর্ত্তী-গৃহিণী পাঁচী নাম্নী কন্যার চুল বেঁধে দিচ্ছিল; সে মাধবীকে বাড়ীর ভিতরে আসতে দেখেই পরম সমাদরের স্বরে বলে' উঠল—এসো মাধী-দিদি, এসো। আজ না জানি কার মুখ দেখে উঠেছিলাম তাইতে তোমার দর্শন পেলাম! আজ আমার কি ভাগ্যি!

মাধবী বললে—অমন কথা বোলোনি দিদি, ওতে যে আমার পাপ হবে। সারাদিন কাজের ঝঞ্ঝাটে থাকি, এমন একটু সময় পাই না যে এসে তোমাদের ছীচরণ দর্শন করি।

চক্রবর্ত্তী-গিন্নি পাঁচীর চুলের বিনুনি ফিরিয়ে খোঁপা বাঁধতে-বাঁধতে বললে—এসো, বসো।

মাধবী—আর বসব না দিদি, আমাদের কি ছাই বসবার সময় আছে? মেম্-দিদিমণিকে নিয়ে আজ এই দিকে বেড়াতে এসেছিলাম…

চক্রবর্ত্তী-গিন্নি ব্যস্ত হ'য়ে বলে' উঠল তোদের বিবির বাচ্চাটি কোথা? একদিনও ত তাকে চোখে দেখলাম না। একদিন তাকে আনতে পারিস্?

মাধবী বললে—সে ত তোমাদের বাড়ীর দরজায় গাড়ীতে বসে' আছে, তার জল-তেষ্টা পেয়েছে…

মাধবীর কথা সমাপ্ত হবার অপেক্ষা না করে'ই চক্রবর্ত্তী-গিন্নি মেয়ের খোঁপা-বাঁধা ছেড়ে এক ছুটে বাড়ীর দরজার কাছে গিয়ে উঁকি মেরে গৌরীকে দেখতে লাগল। সঙ্গে-সঙ্গে পাঁচীও মার কাছে ছুটে গিয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হাঁ করে' অবাক্ হ'য়ে গৌরীর দিকে তাকিয়ে রইল; তার আধ-ফেরানো অসম্বদ্ধ খোঁপাটা চলকে কাঁধের উপর ঝুলে' পড়েছিল, কিন্তু সেদিকে মা বা মেয়ে কারো লক্ষ্যই ছিল না।

দু'জন লোক বাড়ীর ভিতর থেকে ছুটে এসে কৌতূহলী দৃষ্টিতে অবাক্ হ'য়ে তাকে দেখছে, এতে গৌরী অত্যন্ত অস্বস্তি অনুভব করছিল; সে মনে-মনে বলছিল—"এরা চলুক, এখান থেকে আমাকে নিয়ে চলুক, আমি জল খেতে চাই নে, জলতেষ্টা আমার পায় নি।" কিন্তু সে মুখ ফুটে একটি কথাও বলতে পারছিল না, সে একবার করে' দর্শিকাদের দেখছিল আর পরক্ষণেই দৃষ্টি নত করছিল।

মাধবী চক্রবর্ত্তী-গিন্নির কাছে ফিরে এসে বললে—মেম্ দিদিমণির তেষ্টা পেয়েছে, তাই তোমাদের বাড়ীতে একটু জল খাওয়াতে নিয়ে এসেছি।

মাধবীর এই কথা কানে না তুলে চক্রবর্ত্তী-গিন্নি বললে—তোরা মেম-সাহেব ছোঁয়া-নাড়া করে' সব জয়জয়কার করছিস্ ত?

মাধবী প্রতিবাদ করে' একটু গর্ব্ব-মিশ্রিত স্বরে বললে

—আমাদের রাণী-মাকে কি তোমরা তেম্‌নি পেয়েছ? তাঁর আচার বিচার নিষ্ঠা কত!

চক্রবর্ত্তী-গিন্নি প্রতিবাদ করে' বলে' উঠ্‌ল—আরে রেখে দে তোর আচার বিচার! সেই গপ্পে বলে না—আহা মা-ঠাক্‌রুণের কি নিষ্ঠে!—তাই আর কি!

মাধবী ঈষৎ ক্রুদ্ধস্বরে বলে' উঠ্‌ল—তোমারা কি আমাদের রাণী-মাকে তেম্‌নি ভাবো?

চক্রবর্ত্তী-গিন্নি মুচকি হেসে বল্‌লে—দেশসুদ্ধ লোক যা ভাবে তার আর কথায় কাজ কি? বড়লোক বলে' লোকে ভয়ে—

মাধবী চক্রবর্ত্তী-গিন্নির কথায় বাধা দিয়ে বল্‌লে—ও সব কথা থাক্‌। একটু জল দাও, দিদিমণিকে খাইয়ে নিয়ে যাই।

চক্রবর্ত্তী-গিন্নি জিজ্ঞাসা কর্‌লে—তোদের সঙ্গে গেলাস-বাটি কিছু আছে? তোদের মতন ত আমরা মেলেচ্ছর এঁঠো নিয়ে ঘট্‌ঘটাতে পার্‌ব না—আমরা গরীব মানুষ, আমাদের জাতের ভয় আছে।

মাধবী বিরক্ত হ'য়ে বলে' উঠ্‌ল—জাতের ভয় শুধু তোমাদেরই নয়, আমাদেরও আছে; মেম-দিদিমণির ঘর বিছানা বাসন চাকর দাসী সব আলাদা; চাকর-দাসীরাও ছোঁয়া-নাড়ার পর নেয়ে-ধুয়ে তবে নিজেরা খাওয়া-দাওয়া করে। মাটির নতুন শরা-টরা কিছু-একটা থাকে ত তাইতে করে' জল দাও।

চক্রবর্ত্তী-গিন্নি ভাঁড়ার-ঘরে গিয়ে একখানা নূতন শরা নিয়ে ধুয়ে জল ভ'রে' নিয়ে এল! ছোঁয়া যাবার ভয়ে জলভরা শরাখানি মাধবীর সাম্‌নে দূরে রেখে দিয়ে সে হেসে বল্‌লে—আজকাল শরার দামও বড় আক্রা হ'য়ে গেছে—এক পয়সায় দুখানা বই শরা পাওয়া যায় না। তোমাদের রাণীমাকে বোলো আমার শরার দাম পাঠিয়ে দিতে খাজাঞ্চিকে যেন হুকুম দেন।

মাধবী জলের শরা তুলে নিয়ে যেতে যেতে বলে' গেল—তা বল্‌ব।

চক্রবর্ত্তী-গিন্নি মুখ সিঁটকে বল্‌লে—ইস্‌! বড়লোকের ঝি-মাগীদেরও দেমাগ্‌ দেখ না! ওরা মনে করে ওরাও এক-একজন যেন এক-একটি নবাব কি বেগম—আয় পাঁচী, তোর চুলটা জড়িয়ে দিই। উনি এখনি আহারী থেকে আস্‌বেন, ওঁর জল-খাবার তৈরী কর্‌তে হবে।

মাধবীর মন চক্রবর্ত্তী-গিন্নির উপর বিরক্তিতে ভরে' ছিল, সে বাড়ী ফিরে গিয়ে চক্রবর্ত্তী-গিন্নির সব কথা-ধনিষ্ঠাকে বল্‌তে একটুও দেরী কর্‌লে না।

ধনিষ্ঠা নীরবে সব কথা শুনে অনুত্তেজিত অথচ দৃঢ় স্বরে শুধু বল্‌লে—তুই চক্রবর্ত্তী-গিন্নিকে জিজ্ঞাসা কর্‌লি-নে কেন, যে তার বাড়ীর সমস্ত জিনিস কার দেওয়া আর কার পয়সায় কেনা?

ধনিষ্ঠা সেখান থেকে উঠে নিজের আপিস-ঘরে চলে' গেল এবং সে নিজের নাম ছাপা কাগজ তিনখানা টেনে নিয়ে সদ্যশেখা বড় বড় অক্ষরে প্রথম কাগজখানায় লিখ্‌লে—

শ্রীযুক্ত ম্যানেজার-বাবুর সমীপে নিবেদন—

শ্রীযুক্ত সাধনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে আমি কল্যকার তারিখ হইতে বরখাস্ত করিলাম। নোটিসের বদলে এক মাসের বেতন তাঁহাকে অগ্রিম দিয়া কর্ম্ম হইতে বিদায় দেওয়া হউক।

শ্রী ধনিষ্ঠা দাসী

দ্বিতীয় কাগজখানিতে ধনিষ্ঠা লিখ্‌লে—

খাজাঞ্চির প্রতি—

আমার পালিতা কন্যা শ্রীমতী গৌরী দেবীকে জল খাইতে দেওয়ার জন্য একখানা শরার দাম মবলগে আধ পয়সা (৶২॥) শ্রীযুক্ত সাধনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী-মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী সুধন্যা দেবীকে অবিলম্বে পাঠাইয়া দিয়া রসিদ লওয়া হউক।

শ্রী ধনিষ্ঠা দাসী।

তৃতীয় কাগজখানিতে ধনিষ্ঠা লিখ্‌লে—

শ্রীযুক্ত কার্‌কর্‌মার প্রতি—

আমি গ্রাম-ভোজন করাইতে চাহি। সম্ভব হইলে কালই। ইহার আয়োজন করিয়া গ্রামের সমস্ত স্ত্রী-পুরুষকে যেন নিমন্ত্রণ করা হয়—কেবল শ্রীযুক্ত সাধনচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ হইবে না—ভবিষ্যতেও কখনো যেন ভ্রমক্রমেও তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করা না হয়।

শ্রী ধনিষ্ঠা দাসী।

তিনটি হুকুম লেখা হ'লে ধনিষ্ঠার টেবিলের উপরের ডাক-ঘণ্টা আজ বড় জোরে কড়া আওয়াজে বেজে উঠ্‌ল।

দু'জন চাকর দু'দিক থেকে দৌড়ে এল।

ধনিষ্ঠা তাদের একজনের হাতে হুকুম তিনখানা দিতে-দিতে বল্‌লে—কাছারীর ছুটি এখনো বোধ হয় হ'য়ে যায়-নি। এই তিনখানা চিঠি চট্‌ করে' নিয়ে গিয়ে ম্যানেজার-বাবুকে দিয়ে আয়।

চাকর চিঠি নিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল।

এই হুকুম তিনখানি পেয়ে অনল অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে গেল। সে সাধনকে ডেকে সেই হুকুম তিনখানি দেখ্‌তে দিয়ে ব্যস্ত হ'য়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—চক্রবর্ত্তী মশায়, ব্যাপার কি?

সাধনের মুখ শুখিয়ে এতটুকু হয়ে গিয়েছিল, সে বল্‌লে—আজ্ঞে আমি ত কিছু জানিনে, আমি ত সারাদিন কাছারীতেই আছি; আমার স্ত্রীর কোনো অপরাধে আমার উপর এই দণ্ডাদেশ হয়েছে।

অনল বুঝ্‌তে পার্‌লে গৌরীকে নিয়ে এই গণ্ডগোলটির সৃষ্টি। গৌরীকে উপলক্ষ্য করে' কারো কোনো অনিষ্ট হ'লে তার জন্যে লোকে তাকেই দায়ী কর্‌বে এই ভেবে অনল বল্‌লে—আমি কর্ত্রী-ঠাকরুণকে বলে' কয়ে এই আদেশ প্রত্যাহার করাতে চেষ্টা কর্‌ব......

সাধন ব্যাকুল হ'য়ে হাত জোড় করে' বল্‌লে—দোহাই আপনার ম্যানেজার-বাবু, আমাকে রক্ষা করুন, ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণো গতিঃ; আমার এই চাক্‌রিটুকু গেলে ছেলেপিলে নিয়ে......

অনল চিন্তান্বিতভাবে বল্‌লে—আমাকে বেশী কিছু বল্‌তে হবে না, আমিও গরীব, অভাবের কষ্ট যে কী ভয়ানক তা আমি জানি। আমার যথাসাধ্য আমি আপনার জন্যে চেষ্টা কর্‌ব। তবে এইটুকু মনে রাখ্‌বেন যে, আমিও চাকর, কর্ত্রীর হুকুম পালন কর্‌তে বাধ্য।

সাধনের মুখের উপর একসঙ্গে ক্রোধ অবিশ্বাস আর বিদ্রূপের ছায়া পতিত হ'ল, সে বল্‌লে—আপনি যা বল্‌বেন তাই হবে, আপনি জোর করে' বল্‌লে রাণী-মা আপনার কথা ঠেল্‌তে পার্‌বেন না।

অনল গম্ভীরভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লে—আমি ত আপনাকে বলেইছি যে আমার যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি হবে না।

সাধন আরো কি বল্‌তে যাচ্ছিল, তাকে বাধা দিয়ে অনল বল্‌লে—আমাকে আর-কিছু বল্‌বার আপনার দর্‌কার নেই। আমি এখনি অন্দরে যাচ্ছি......

অনল অন্দরে গিয়ে দেখ্‌লে পড়ার নির্দ্দিষ্ট জায়গায় ধনিষ্ঠা আর গৌরী বসে' আছে, ধনিষ্ঠার সাম্‌নে ইংরেজি বই এবং গৌরীর সাম্‌নে বাংলা বই খোলা আছে দেখে অনলের মনে হ'ল তারা দুজনে দুজনকে পাঠের সাহায্য কর্‌ছিল, অনলকে আস্‌তে দেখেই তারা থেমেছে। অনলকে আস্‌তে দেখেই তারা দুজনে হাসিমুখে তার দিকে তাকালে; অনলও হাসিমুখে এগিয়ে এসে তার নির্দ্দিষ্ট আসনে বস্‌ল। অনল বসে'ই বল্‌লে—পড়া আরম্ভ কর্‌বার আগে একটু বিষয় কর্ম্ম আছে, সেটুকু সেরে ফেল্‌লে হয়।

বিষয়কর্ম্ম যে কি তা কতকটা বুঝ্‌তে পেরে ধনিষ্ঠা মুখ রাঙা করে' বল্‌লে—কি বলুন।

অনল গৌরীর দিকে ফিরে বল্‌লে—মা গৌরী, তুমি একটু খেলা করে' একটু পরে এসো, আমাদের এখন একটু অন্য কাজ আছে।

ধনিষ্ঠার মুখ আরো লাল হ'য়ে উঠ্‌ল, সে মুখ ফিরিয়ে সেখানে উপস্থিত গৌরীর দাসীকে চোখের ইঙ্গিত করে' গৌরীকে সেখান থেকে নিয়ে যেতে বল্‌লে।

গৌরী চলে' গেলে অনল বল্‌লে—আমি সাধন-বাবুর কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলাম।

ধনিষ্ঠা মাথা নত করে' বইয়ের পাতা উল্টাতে-উল্টাতে মৃদুস্বরে বল্‌লে—কি বলুন।

অনল বল্‌লে—সাধন এমন কি অপরাধ করেছে যার জন্যে বেচারার চাক্‌রি যায়? আপনার হুকুম দেখে আমার অনুমান হচ্ছে গৌরীকে নিয়ে একটা-কিছু কাণ্ড হয়েছে। গৌরীর জন্যে কারো অনিষ্ট হ'লে লোকে আমাকে দায়ী ও দোষী কর্‌বে। সুতরাং আমার জন্যে গৌরী-সংক্রান্ত অপরাধগুলি আপনাকে অনুগ্রহ করে' মার্জ্জনা কর্‌তে হবে।

ধনিষ্ঠা মাথা নীচু করে' থেকেই মৃদু অথচ দৃঢ় স্বরে বল্‌লে—গৌরী কি শুধু আপনারই, আমার কেউ নয়?

অনল লজ্জিত হ'য়ে বল্‌লে—গৌরী সম্পূর্ণই আপনার। কিন্তু লোকে অন্তরের সম্পর্ক অপেক্ষা জন্মগত সম্পর্কটাকেই বড় করে' দেখে,—যার জন্যে বামুনের ছেলে মূর্খ হয়ে'ও পূজ্য হয়, আর শূদ্রের ছেলে সুপণ্ডিত হ'য়েও উচিত সম্মান লাভ করে না।

ধনিষ্ঠা কিছুক্ষণ চুপ করে' থেকে মাথা তুলে বল্‌লে—সেই চিঠি তিনখানা আমাকে ফেরৎ পাঠিয়ে দেবেন, আমি ভেবে চিন্তে যা হয় কর্‌ব।

অনল পকেট থেকে সেই তিনখানা হুকুম বার করে' ধনিষ্ঠার সাম্‌নে রাখ্‌লে।

ধনিষ্ঠা হুকুম তিনখানির মধ্য থেকে সাধনকে বরখাস্ত করার হুকুমখানি তুলে' নিয়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করে' ছিঁড়্‌তে ছিঁড়্‌তে বল্‌লে—কেবল আপনার খাতিরে সাধনকে তার চাক্‌রিতে বহাল রাখ্‌লাম; কিন্তু আর-দুটি হুকুম আমি প্রত্যাহার কর্‌তে পার্‌ব না, আপনি আমাকে প্রত্যাহার কর্‌তে অনুরোধ কর্‌বেন না।

অনল ধনিষ্ঠার দৃঢ়তা দেখে আর-কিছু অনুরোধ কর্‌তে পার্‌লে না, সে নীরবে অবশিষ্ট হুকুম দুখানি তুলে' পকেটে রাখ্‌লে।

শিক্ষক ও ছাত্রী উভয়ের মনের উপরেই অপ্রীতিকর চিন্তার ছায়াপাত হওয়াতে সেদিনকার পাঠ তেমন জম্‌ল না।

সাধনের প্রতি দণ্ডাদেশের খবর পরদিন সমস্ত গ্রামময় ছড়িয়ে পড়্‌ল। ভূতের ভয়ে গা যেমন ছম্‌ছম্‌ করে সমস্ত গ্রাম তেম্‌নি একটা অব্যক্ত ভয় ও বিরক্তিতে ছম্‌ছম্‌ কর্‌তে লাগ্‌ল।

দিন দুই পরে গ্রামের সমস্ত স্ত্রী-পুরুষকে যেদিন নিমন্ত্রণ করা হ'ল সেদিন একেবারে উত্থানশক্তিরহিত দু-একটি রোগী ছাড়া আর সকলেই নিমন্ত্রণ রক্ষা কর্‌তে এল,—যাদের শরীর অসুস্থ, নিমন্ত্রণ খেলে পীড়া-বৃদ্ধির আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও তারা না এসে থাক্‌তে পার্‌লে না, পাছে তাদের না-আসাটা সাধনের প্রতি সহানুভূতি বলে' বিবেচিত হ'য়ে তাদেরকেও সাধনের দলভুক্ত করে' ফেলে—পীড়া-বৃদ্ধির আশঙ্কার চেয়ে জমিদারণীর রোষের উৎপীড়ন-বৃদ্ধির আশঙ্কা তাদের কাছে প্রবলতর হ'য়ে উঠেছিল।

(ক্রমশঃ)

সত্যের জয়*

শ্রী অমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

আকাশ আঁধার আজি ঘনকৃষ্ণ মেঘে,
প্রলয়ের বহ্নি হানে পাংশুল দামিনী,
উৎকণ্ঠিত হংসরাজি সংশয় উদ্বেগে
আর্ত্তরবে খোঁজে নীড়; নির্ম্মম যামিনী
করাল তামসে হায় গ্রাসে দশদিশি।

জাগো ওগো বোধিচিত্ত, দুর্য্যোগে দুর্দ্দিনে
এই তব সাধনার এল সুসময়,
গিরিতটতলে একা চলো পথ চি'নে
নির্জ্জন নিভৃত ধ্যানে করো পরাজয়
মোহঘোরে অন্ধকার এই মহানিশি!

* "থেরগাথা" হইতে (Saunders-এর অনুবাদ অবলম্বনে)।

অন্নচিন্তা

অ-শিক্ষিত ভদ্র গণ্‌লে বেকার ও পেটভাতায় চাকরের দল বিপুল দেখা যাবে। বহু-বহু ভদ্র আছেন, যাঁরা বিদ্যামন্দিরে প্রণামী দিতে পারেন নাই, তাঁরা নীরবে অর্দ্ধাশনে দারিদ্র্যপাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'রছেন। গ্রামবাসী যাঁরা পারছেন, তাঁরা গাঁ ছেড়ে শহরে যাচ্ছেন, বস্ত্রের আবরণে মলিন ও ক্ষীণ দেহ আর ঢাকতে পারছেন না।

অন্যদিকে, যারা 'ইতর' নামে খ্যাত, তারাও যে সকলে সুখে আছে, তাও নয়। এরাই দেশের কারু ও কার্ম্মিক। এদের কর্ম্মের অভাব ছিল না; কিন্তু দুর্দ্দৈব এই, বাহির হ'তে লোক না এলে বাঙ্গালা দেশ অচল হয়ে থাকত। কলিকাতায় পা দিলেই মনে হয়, কলিকাতা বাঙ্গালা দেশ নয়। জেলার শহরে গেলেও দেখি, কায়িক-কর্ম্মে ও শ্রমসহিষ্ণুতায় বাঙ্গালী পরাভূত হচ্ছে।

যে-সকল কারু ও কার্ম্মিক শহরে ও শহরের কাছে বাস ক'রছে, তাদের সাংসারিক অবস্থা ভাল হয়েছে। হয়েছে বটে; কিন্তু সেটা কর্ম্ম-সামর্থ্যের গুণে নয়, অ-বাঙ্গালীর সহিত সংগ্রাম বাধে নাই বলে হয়েছে। যেখানে সংগ্রাম বেধেছে, সেখানে বাঙ্গালীকে হঠে আসতে হ'চ্ছে। অনেকের রোজগার বেড়েছে, কিন্তু স্থিতি হ'চ্ছে না। চওড়া ফিন্‌-ফিনা ধুতি ও গেঞ্জি ও কোটে মদে ও জুয়ায় টাকা উড়ে যাচ্ছে। 'হঠাৎ বাবু'র কাঁচা পয়সা সহজে জীর্ণ হয় না। গ্রামে যাদের দুই এক বিঘা চাষ আছে, তারা বরং ভাল। কৃষির উৎপন্নের সঙ্গে বেতন যোগ হ'য়ে মোট আয় বৃদ্ধি হয়েছে, সঞ্চয়-প্রবৃত্তিও আছে। যারা কৃষি-জীবী, কৃষিকর্ম্মই এক সম্বল, অত্যাপাত না ঘ'টলে, তারাও একরকম করে খাচ্ছে। কিন্তু সঞ্চয় নাই বলে একটু অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টি, অমনই হাহাকার।

এই সকল 'ইতর' লোকের অবস্থা দেখে হঠাৎ মনে হতে পারে, 'ভদ্র' বেকার-সমস্যার এই ত পূরণ চোখের সামনে রয়েছে। 'ভদ্রেরা' চাষ করুন না, হাতুড়ী দিয়ে লোহা পিটুন না, মাথায় মোট নিয়ে কুলির কর্ম্ম করুন না। যাঁরা এই উপদেশ দেন, তাঁরা ভুলে যান ভদ্রেও এই কর্ম্ম ক'রলে ইতরে কি কর্ম্ম ক'রবে? ভদ্র কতক কর্ম্ম করেন না বলেই ইতরের অবস্থা ভাল হয়েছে, কর্ম্মপটুতা হেতু নয়। দ্বিতীয়তঃ গ্রামবাসী অধিকাংশ ভদ্রের জমি আছে, কিন্তু কৃষাণ অভাবে কৃষি হ্রাস হ'চ্ছে। যে কৃষিকর্ম্মে পোষায়, তা একজনের কায়িকশ্রমে নয়। তৃতীয়তঃ 'ভদ্র' তাঁরা, যাঁরা পুরুষানুক্রমে কায়িক শ্রম করেন নাই, এখন ক'রলে সমাজে মান থাকে না, নিন্দা হয়। অনেক উপদেশক কিন্তু এ কথা ভ্রমেও কানে তোলেন না, মনে করেন দেশটা বুঝি আমেরিকা একটু ব'লবার অপেক্ষায় বসে ছিল। যাঁরা অন্নচিন্তায় কাতর, তাঁরা মূর্খ হ'লেও নির্ব্বোধ নন। ঘরের আনাচ-কানাচ হাতড়েও কিছু না পেয়ে জড়বুদ্ধি হ'য়ে পড়েছেন।

উচ্চশিক্ষিত বেকারের প্রতিও এই উপদেশ শুনে আসছি—"বাপু হে, চাকরি চাকরি করিও না, চাষ কর, ব্যবসা বাণিজ্য ধর।" কিন্তু চোরা যে ধর্ম্মের কাহিনী শোনে না, সে কি তার দুষ্টামি? দেখছি, উপদেশটা হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে। এর অনেক কারণ আছে। প্রথম কারণ, যাঁরা উপদেশ দিচ্ছেন, তাঁরা লেখা-পড়া শিখে লেখা-পড়ার কর্ম্মই ক'রছেন, কখনও ক্ষেতে গিয়ে রোদে তেতে জলে ভিজে কোদাল ধরেন না, সিন্দুকের মতন দোকানঘরে চটের উপর বসেন না, কিম্বা হাটে-হাটে গাঁয়ে-গাঁয়ে ধান ও পাটের দর চর্চ্চে বেড়ান না। আমি চাকরি ক'রব, কিন্তু তুমি ক'রবে না, যেহেতু চাকরি খালি নাই, এই যে যুক্তি সেটা কটূক্তি। তা ছাড়া, লেখা-পড়ার চাকরও ত চাই, নইলে সংসার অচল। চাকরির উমেদারও চাই, নইলে ভাল মন্দ বাছতে পারা যায় না। বড়লাটসাহেব চাকর, ভারত-সেনাপতিও চাকর; হাইকোর্টের জজ চাকর, আর মুদীর দোকানের কেষ্টাও চাকর। তফাৎ এই, বেতনের ও মানের। বেতনেরও তত নয় মানের যত। কুলীর সর্দ্দারি করলে অনেক রোজগার হয়, কিন্তু মান নাই। মারোয়াড়ী মোটরেই চড়ুন, আর টাকার গদীতেই বসুন, মানীর মান পান না। মান সেখানে, যেখানে প্রভুত্ব আছে, বেতন যতই হ'ক। বাহুবলে বলার্থীর মধ্যে, ধনবলে ধনার্থীর মধ্যে প্রভুত্ব ঘটতে পারে, কিন্তু নৃপত্ব ও বিদ্বত্ব কদাচ তুল্য নয়। লেখাপড়ার কর্ম্ম, বিদ্বানের কর্ম্ম, মানের কর্ম্ম। কেবল ধন উপাস্য নয়; ধন ও প্রাণ অপেক্ষা মান কাম্য। আদালৎ তার সাক্ষী।

এই যে প্রবৃত্তি, মানরক্ষার ও মানবৃদ্ধির ইচ্ছা, এটা বঙ্গদেশ নয়, ভারতখণ্ড নয়, পৃথিবীর সর্ব্বত্র, বর্ব্বর ও সভ্য, সকল মানুষকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি দমন করে সন্ন্যাসী হ'তে গেলে নূতন করে সৃষ্টি ফাঁদতে হবে। বিলাতে কি অভিজাতি নাই? 'ভদ্র' ও দোকানদারের মানের প্রভেদ নাই? আমেরিকায় প্রেসিডেন্টের পুত্র মাথায় মোট নিয়ে যেতে পারেন কারণ সেখানে ব্রাহ্মণ নাই শূদ্র নাই, লাট নাই, লাটাও নাই। কিন্তু এ দেশ ত আমেরিকা নয়। কেবল মাথায় মোট বইবার বেলা আমেরিকা, আর বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের বেলা ভারত? তাই কি ছাই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম আছে? বামুনের ছেলেকে আদালতেরপেয়াদা হ'তে দেখলে বুঝি, বর্ণাশ্রমধর্ম্মে দিন চলে না।

এই সুযোগে সমাজসংস্কারপ্রার্থী বলেন, বালাই গেছে, দেশটা পশ্চিমের কাছাকাছি হ'চ্ছে। কিন্তু যদি টাকার গরবে বিদ্যার গৌরব ভুলতে হয়, তা হ'লে পশ্চিমের দিকে না গেলেই ভাল ছিল। পশ্চিমের রক্তচ্ছটায় চোখ ধরে গিয়েই ইতর ভদ্র সবার অন্নচিন্তা দারুণ হ'য়ে পড়েছে। ইস্কুল কলেজের ছেলেদিগকে রাখলাম বিলাতী উদ্যানের মনোহারী নিকুঞ্জে; এখন ব'লছি বাইরে এস! শেখালাম বিলাতী মতিগতি; এখন বলছি—টেরি কাটা, মোজা পরা, বাবু সাজা চলবে না! কায়িক শ্রম, প্রাণধারণের নিমিত্ত কায়িক শ্রম, যাকে চৌদ্দ পনর বছর করতে দিই নাই, সে এখন কেমন করে করবে? কাজেই সে বণিকের দোকানে লেখাপড়ার কাজ করছে।

আরও কথা আছে। বৃত্তিমাত্রেই পাদবিশিষ্ট। চাকরি একপাদ, একা স্বশরীরে হাজির হ'তে পারলেই বৃত্তি চলতে থাকে। আর কোনও বৃত্তি একপাদ নয়। কোনটা দ্বিপাদ, যেমন মহাজনি, ধন ও বুদ্ধি থাকলে করতে পারা যায়; কোনটা ত্রিপাদ, যেমন কৃষি ও বাণিজ্য, ধন জন মন বা বুদ্ধি থাকা চাই।

আসল কথা এইখানে। বিদ্যাহেতু শিক্ষিতের গৌরব আছে, কিন্তু যে বুদ্ধির কথা বলছি সে বুদ্ধি নাই। ছবছর বয়স হ'তে বিশ বছর তক, যাকে কেবল লিখতে পড়তে শেখালাম, লেখাপড়ার কর্ম্মেরই যোগ্য

কর্‌লাম ; যাকে এই সব বৃত্তির সহিত পরিচিত করাই নাই, যাকে সে বৃত্তিই দিই নাই, সে সাঁতার না শিখে কেমন করে জলে ঝাঁপ দিতে পার্‌বে ?

এই অভিযোগ খাড়া করে কয়েকজন বিজ্ঞ দোষ দিলেন, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্তাদের। তাঁরা এমন আড্ডা খোলেন কেন, যদি চাকরি জোটাতে না পার্‌বেন ? যেন গিরিমেন্ট্ ছিল ছাত্রদের খোর পোষের ভার বিশ্ববিদ্যালয়কে নিতে হবে ! ধমকে চমকে কর্তারা কিন্তু ভয় পেলেন ; বল্লেন ইস্কুলে বৃত্তি শেখানা হবে, কলেজে বাণিজ্য-বিদ্যার ডিগ্রি দেওয়া যাবে। আশ্চর্য্যের কথা কেহ ভাব্‌লেন না, সরস্বতীর মন্দিরে লক্ষ্মীর পেচক পশ্‌লে দুজনের একজনকে পলায়ন কর্‌তেই হবে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য হ'ল বিদ্যা-প্রতিষ্ঠা। আর, বৃত্তি শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল, অর্থ উপার্জ্জন। বিদ্যা ও প্রয়োগ-কৌশল এক ত নয়। যে বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রবেশপথে রেখা চিত্র পরীক্ষা ক'র্‌তে পার্‌লেন না, তাঁরা বৃত্তিশিক্ষার কি পরীক্ষা কর্‌বেন, ভেবে পাই না। বসালাম ময়দার কল, এখন লোকের কথায় তাতে শুরকী ভাঙ্গ্‌তে গেলে, না পাব ময়দা না পাব শুরকী, কলটাই ভেঙ্গে যাবে। বিশ্ববিদ্যালয় বৃত্তি শেখাচ্ছেন না, তা নয়। উকীলি, ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারি শেখাচ্ছেন। কিন্তু সে নিমিত্ত স্বতন্ত্র স্থান আছে, বিপুল অর্থব্যয়ও হ'চ্ছে। বিদ্যালয় অন্য বৃত্তিও শেখাচ্ছেন। লেখা-পড়ার বৃত্তিও বৃত্তি। কেরাণী ও মাষ্টার, হাকিম ও উকীল, পত্রসম্পাদক ও লেখক, লাটের মন্ত্রী ও সভাসদ,—এঁরা আগাছার মতন আপনই জন্মেন নাই।

তথাপি, জীবনসংগ্রামে বাঙ্গালীর পরাভব দেখ্‌তে পাচ্ছি। এই পরাভব দুই প্রকারে দেখ্‌তে পাই। অন্য ভারতীয় সহিত প্রতিযোগিতায় যে পরাভব, সেটা স্পষ্ট। আর অন্নচিন্তায় যে আর্ত্ততা, সেটা অস্পষ্ট। মনে করি যেন বাঙ্গালী ছাড়া স্বদেশী বিদেশী কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী বাঙ্গালা দেশে নাই। তা হ'লেই কি বাঙ্গালীর কর্ম্মসামর্থ্য বেড়ে যেত, ধন উপার্জ্জনের শক্তি বাড়্‌ত, না অকালমৃত্যু হ'তে রক্ষা পেত, না জীবনকে উৎসবময় করে রাখ্‌তে পার্‌ত ?

দেখ্‌ছি, অনেক বাঙ্গালী শৌর্য্যে ও বীর্য্যে, শ্রমে ও ব্যবসায়ে, ও অন্য বহুবিধ গুণে মহত্ত্ব লাভ করেছেন। যখন বাঙ্গালীরই মধ্যে আদর্শ পাচ্ছি, তখন উত্থানের সম্ভাব্যতা স্বীকার ক'র্‌তে হবে।

কিন্তু যখন দেখি অগণ্য বাঙ্গালী আদর্শের ধার দিয়াও যায় না, বক দূরে পড়ে আছে, তখনই মনে চিন্তা হয়, দোষ স্বভাবজ হ'য়ে গেছে, নানা দিকে নানা প্রতীকার চিন্তা ক'র্‌তে হবে, গোরু-হারালে-গোরু পাওয়া যায় মার্কা-মারা ওষুধের সাধ্য নয়। এই দোষ গ্রাম্যজনের চোখও এড়ায় নাই। তারা বলে, বাঙ্গালী তালপাতার সিপাই, বাতাসে হেলে, সোজা দাঁড়াতে পারে না। যদি দৈবক্রমে আগুনের ফুল্‌কি গায়ে পড়ে, অমনই দাউ-দাউ করে জ্বলে ওঠে। কিন্তু সে ক্ষণমাত্র তালপাতার আগুন থাকে না।

আমরা তাল-পাতা বটি, তেল জল মাখিয়ে রাখ্‌তে পার্‌লে মন্দ দেখাই না। কিন্তু মেষ নই, আজ্ঞানুগামিতা আমাদের কোষ্ঠীতে নাই। যদি সংহতি-শক্তি থাক্‌ত, তা হ'লে এই তাল-পাতা অসাধ্য সাধন ক'র্‌তে পার্‌ত, মদমত্ত হাতীকেও ধর্‌তে পার্‌ত।

এই যে বাঙ্গালী প্রকৃতি, এর গোড়া কোথায় ? যখন দেখি, শিক্ষিত বাঙ্গালী এই বিপুল ধরিত্রীতে কর্ম্মক্ষেত্র খুঁজে পান না, স্ব-স্থ হ'তে পারেন না, এক মুঠা অন্নের তরে ভিখারীর বেশে দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তখন বুঝি মনের বোঝা নিজের বাঁধা, কর্ম্ম কর্‌বার সামর্থ্য নাই, নিজের সামর্থ্যে বিশ্বাস নাই। অতএব কর্ম্ম-সামর্থ্য বাড়াতে হবে বিশ্বাস জন্মাতে হবে। যে কায়িক শ্রমে পরাভূত হয়, সে মানসিক শ্রমেও পরাভূত হয়, মন বইতে চাইলেও শরীর বইতে চায় না, একাগ্রতা থাকে না, বহুকালব্যাপী কর্ম্ম সাধ্য হয় না।

এই অবস্থার তিন কারণ মনে হয়। (১) দেশজ, (২) জন্মজ (৩) উপার্জ্জিত।

দেশ বল্‌তে জলবায়ু-সম্বলিত ক্ষেত্র। যে ক্ষেত্রে মানুষ বাস করে, তার প্রভাব মানুষের চরিত্রে প্রকাশিত হয়। জঙ্গলদেশের মানুষ দারুণ হয়, পাহাড়ে দেশের মানুষ শ্রমপটু হয়, উষ্ণ ও আর্দ্রদেশের মানুষ অলস হয়, ইত্যাদি। বাঙ্গালী-চরিত্রের সুকুমার ভাব যে দেশের গুণে স্থায়ী হ'য়ে আছে তাও স্বীকার কর্‌তে হবে। প্রাচীনকালের আর্য্যেরা সেকালের বাঙ্গালীকে বিহঙ্গম বলে গেছেন। কি দেখে বলেছিলেন কে জানে। হয়ত লঘুগতি ক্ষীণদেহ দেখেছিলেন।

দ্বিতীয় কারণ, জন্মজ। পিতামাতার ও পূর্ব্বপুরুষের দোষগুণ সন্তানে সঞ্চারিত হয়। আমাদের প্রাচীন মনস্বীরা এই দেখে সু-জন সৃজনের জন্য যে কত দিক ভেবেছিলেন তা স্মরণ কর্‌লে আধুনিক পাশ্চাত্য সু-জন্ম বিদ্যাকে মাথা নোয়াতে হবে। কিন্তু তাঁহাদের উপদেশ কেহ শুন্‌লে না মান্‌লে না। পশ্চিমদেশেও শুন্‌ছে না মান্‌ছে না। লোকে বুঝ্‌লে সকলকে বিবাহ কর্‌তেই হবে নইলে পিতৃপুরুষের পিণ্ডলোপ। বুঝ্‌লে না যে-সে পুত্র দ্বারা নরক হ'তে ত্রাণ হয় না। তাঁরা চারিবর্ণ দেখে চারি বর্ণ স্বীকার করে গেলেন। পরে ঘট্‌ল চারি বর্ণের চারি কুড়ি জাতিভাগ, চারি কুড়ির চারি কুড়ি 'ঘর' ভাগ। তাঁরা বল্‌লেন সবর্ণ বিবাহ যদিও শ্রেষ্ঠ, অনুলোম বিবাহও ক'র্‌তে পার। লোকে বুঝলে, বর্ণ ও জাতি এক, জাতি ও ঘর এক। তাঁরা মৌলিক হ'তে কুলীন উৎপাদনের তরে কুলীনের লক্ষণ দিয়ে গেলেন। লোকে আধুনিক বিজ্ঞানের 'বিশুদ্ধ রেখা' (pure line) বুঝ্‌লে না, উত্তম সঙ্কলন হ'ল না ; অশুদ্ধ বিশুদ্ধ মিশে গেল। অতএব না প্রাকৃতিক না ব্যবস্থানু-গত, বিবাহ হ'ল না, ঘুণধরা কাঠে ঘুণ বাড়্‌তে লাগ্‌ল। যতোধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ—এই সত্য ভুলে গিয়ে সন্তানে কি ধর্ম কি গুণ থাকলে সে জয়ী হবে, সে ভাবনা কারও হ'ল না। কিন্তু দেশের হাওয়া বদ্‌লাবার নয়, সমাজবিধিও সহজে পরিবর্ত্তিত হয় না, কাজেই উপার্জ্জিতের প্রতিই লক্ষ্য রাখ্‌তে হবে।

গোড়ার কথা আবার ভাবি। জীবন-সংগ্রামে বাঙ্গালী অযোগ্য হ'য়ে পড়্‌ছে শিক্ষিত, আশিক্ষিত, অশিক্ষিত, ভদ্র-অ-ভদ্র সবাই। দুদশ-জনের কৃতিত্ব দেখে একটা রয়ের (race) কৃতিত্ব বুঝ্‌তে পারা যায় না। বরং ক্রম দেখে বুঝি, এরণ্ডের অরণ্যে আরও ক্রম জন্মিতে পার্‌ত। অসামর্থ্যের কারণ দেহের বলের অভাব ও শিক্ষার দোষ।

কৃশ দেহেও বল থাক্‌তে পারে, আর স্থূল দেহও দুর্ব্বল হ'তে পারে। অতএব দেহ দেখে বলাবল নির্ণয় ক'র্‌তে পারা যায় না। আয়ুর্ব্বেদে বলবানের লক্ষণ উক্ত আছে, সে লক্ষণ, চেষ্টা-পটুতা। চেষ্টা—কায়িক কর্ম্ম, সে কর্ম্ম শরীর দ্বারা সাধ্য। যে কায়িক কর্ম্মে পটু, সমর্থ, সে বলবান। যে শুতে পেলে ব'স্‌তে চায় না' ব'স্‌তে পেলে উঠ্‌তে চায় না, যার মুখ ম্লান, শরীর বিবর্ণ, যার তন্দ্রা ও নিদ্রা সর্ব্বদা, তাকে বলবান্ ব'ল্‌তে পারা যায় না। কারণ বলের এমনই গুণ, মানুষকে নিশ্চেষ্ট হ'তে দেয় না। তখন উৎসাহ অধ্যবসায় নিরালস্য আপনই আসে। সুস্থ ব্যক্তিরও লক্ষণ কতকটা এই। তার শরীরানুরূপ কর্ম্মসামর্থ্য থাকে, তার ইন্দ্রিয় ও মন প্রসন্ন থাকে। যার না থাকে, তাকে আমরা রোগা, অর্থাৎ রুগ্ন বলি।

গণ্‌তিতে বাঙ্গালী সাড়ে চারি কোটি, কিন্তু ক'জন স্ব-স্থ এবং

ক'জন ' বলবান ? নারী, বালক, বৃদ্ধ বাদ দিলে যে-যুবা থাকে, তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখলেও ক'জন ? নগরবাসী দেখলেও চলবে না। গ্রামবাসী দেখতে হবে। কলিকাতায় যে সব ছাত্র কলেজে, তারা দেশে মধ্যবিত্ত ও ধনী ভদ্র শ্রেণীর সন্তান। বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে নিরীখ করা হয়েছে, দেখা গেছে শতকে বাটি সত্তর জনের দেহ রুগ্ন। অধেক কুঁজো হ'য়ে দাঁড়ায় আর মাত্র আটজন সংহত-গাত্র। বাকি নিরানব্বই জন কি কর্ম্মের যোগ্য ? বাঙ্গালী টানা-পাখার নীচে চেয়ারে হেলান দিয়ে কেরাণী হ'তে ভালবাসে, তার একটা কারণ এখানে। বাঙ্গালীর যে সংহতি-শক্তি নাই, তারও একটা কারণ এখানে। বলবান্ পরস্পর মিলতে পারে; দুর্ব্বল পারে না। একাকী প্রাণপতিক তালয় ভাণ্ডর চালাতে চায়। দুষ্টবুদ্ধি আশ্রয় ক'র্য়ে পরকে ফাঁকি দিয়ে নিজে বড় হ'তে চায়। এ কথা সত্য, বাঙ্গালী মেলেরিয়ার জর্জ্জর। দু পুরুষ ধর্য়ে এই দারুণ ব্যাধি ভোগ ক'রলে বলবীর্য্য কত থাকবে ? বিপদ এই, কার্য্য ও কারণ এক হ'য়ে গেছে, বলহানির কারণ মেলেরিয়া, মেলেরিয়ার কারণ বলহানি।

আশা এই, অভ্যাস দ্বারা শক্তি বাড়াতে পারা যায়, ব্যায়াম দ্বারা বল লাভ ক'রতে পারা যায়। ব্যায়াম দ্বারা শরীরের লঘুতা হয়, কর্ম্ম সামর্থ্য বৃদ্ধি হয়, দেহ সুঠাম হয়, আর রোগও দৃঢ়গাত্রকে সহসা আক্রমণ করতে পারে না। ব্যায়াম ও খেলা এক নয়। ফুটবল, ক্রিকেট কিংবা হাডুডুডু, নুনকোট প্রভৃতি খেলার গুণ আছে। কিন্তু ব্যায়ামের চারি গুণ ক্রীড়াতে নাই। ইস্কুলে যে চলন (drill) ও চার-কর্ম্ম (scouting) শেখানো হ'য়, তারও গুণ আছে, বিনয় লাভ হয়। কিন্তু ব্যায়ামের ফল হয় না। বি-আয়াম—দেহের যাবতীয় অঙ্গ প্রসারিত করা। প্রসারণের পর সঙ্কোচন। যে অঙ্গ যেমন সরু যেমন মোটা হ'লে শরীর সুন্দর হয়, সুঠাম হয়, তা ব্যায়াম দ্বারা হ'তে পারে, ক্রীড়া দ্বারা নয়। ব্যায়ামের এক রূপ মল্লক্রীড়া বা কুস্তি। ইহার প্রধান লক্ষ্য আত্মরক্ষা। বাহু দ্বারা, লাঠি দ্বারা, অসি দ্বারা, যাহা দ্বারা হউক, ব্যায়ামের লক্ষ্য আর মল্লক্রীড়ার লক্ষ্য এক নয়।

বাল্যকালে দেখেছি গ্রামে-গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় আখড়া ছিল। সে আখড়ায়, ভদ্র ইতর, সকলকেই দেখতে পেতাম। কিন্তু মেলেরিয়ার পর হ'তে আখড়া-টাখড়া সব উড়্যে গেছে। তখন প্রাণ নিয়ে টানাটানি, জ্বরের কোঁ-কোঁ-রবে বাহুর অস্ফোট ডুব্যে গেল। এখন সামান্য চোরের ভয়ে লোকে দরজায় খিল আঁটে, তখন ডাকাত পড়লে ধ'রতে দৌড়াত। পুরীতে এখনও পঞ্চাশটা আখড়া আছে, পাণ্ডাদের শরীর দেখলে বুঝি সেগুলায় এখনও চাবি পড়ে নাই। চাবি দিবার জো নাই, পাণ্ডারাই যাত্রীর রক্ষক। পূর্ব্বকালে শত্রুর আক্রমণ হ'তে তাঁরাই মন্দির রক্ষা করতেন। কিন্তু আর বুঝি সে দিন থাকছে না। একদিকে মেলেরিয়া ঢুকছে, অন্যদিকে ছেলেরা ইস্কুল কলেজে পাঠ পড়তে আরম্ভ কর্য়েছে। এ এক আশ্চর্য্য কথা, ইংরাজী ইস্কুলে ঢুকলে মতি আর পূর্ব্বপথে চলে না। গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে দেশের কি ঘোর পরিবর্ত্তন হয়েছে, তা স্মরণ হ'লে স্তম্ভিত হ'তে হয়। আজ যদি বিদ্যাসাগর নব্য হ'য়ে জন্মিতেন, একখান বাঁশ নিয়ে দামোদরের বানে ঝাঁপিয়ে প'ড়তে কদাপি পারতেন না।

বলহানির আরও এক কারণ ঘটেছে। পূর্ব্বকালের দুধ ঘি নাই, মাছ মাংস নাই, যেন শনির দৃষ্টিতে অন্তর্হিত হয়েছে। সে তোজা নাই, পাবু খেলেও অবল হ'চ্ছে। শাগ-ভাত-মুড়ি—পশ্চিমবঙ্গের গ্রামবাসীর নিত্য খাদ্য হ'য়েছে। পূর্ব্ববঙ্গ এখনও ভাল আছে, পুষ্টিকর ও বলকর অন্ন এখনও পাচ্ছে। আমার বিশ্বাস, এই খাদ্যগুণে পূর্ব্ববঙ্গের ওজস্বিতা ও উদ্যম দেশের মুখ রক্ষা ক'রছে। সেন্‌সস্ রিপোর্টেও আমার যুক্তির সমর্থন আছে। পশ্চিমবঙ্গে প্রজাক্ষয় হ'চ্ছে; সারা বঙ্গে যে কিছু বৃদ্ধি, সে পূর্ব্ববঙ্গের কল্যাণে।

কি দুঃখ! শক্তিসাধকের দেশ শক্তিহীন হ'চ্ছে! ক্রমশঃ নিরামিষাশী হ'য়ে প'ড়ছে, কিন্তু নিরামিষাশীরা বলকর ও পুষ্টিকর দুধ ঘি পাচ্ছে না। কেবল ভাত ও ডালের জলে জীবন রক্ষা হ'তে পারে, কিন্তু এই পর্য্যন্ত। ঘিয়ের নাম নাই, তেলও না থাকার মধ্যে। লোকে জানে না, কিসে কি হয়, একটা খাদ্য ক'মলে তার কি পরিবর্ত্ত ধ'রতে হয়। আর কত অগণ্য নরনারী দুবেলা পেট ভর্য়ে নুন-ভাতও পায় না, তা ধনশালী কলিকাতাবাসীর কল্পনাতেও আসবে না। এক বেলা ভাত ডাল, আর বেলা ডাল রুটি খেতে ব'ললে দেশকে উপহাস করা হবে। তথাপি জানি, পশ্চিমা দরিদ্র লোকেও ডাল রুটি খায়। এমন কি ভারতীর প্রধান খাদ্য ভাত নয়, রুটি। কেবল বাঙ্গালা দেশ নিয়ে ভারতের পূর্ব্বভাগে ভাত প্রধান খাদ্য। সে যা হ'ক, ব্যায়ামের সঙ্গে-সঙ্গে খাবার দেখা উচিত। কৃশ ও ক্ষুধিতের ব্যায়াম নিষিদ্ধ। ক্ষুধার্ত্ত হ'লে, প্রকৃতি বলেন, বিশ্রাম কর; যদিও ইস্কুলে ইস্কুলে এই বিধি নিত্য ভাঙ্গা হ'চ্ছে। আহারের পর, প্রকৃতি বলেন, বিশ্রাম কর। কিন্তু কে সে আজ্ঞা পালছে, খেয়েই সকলে বিদ্যাস্থানে ও কর্ম্মস্থানে ছুটছে। সে বিদ্যায় কি হবে, যদি লাভ করতে অগ্নিমান্দ্য জন্মে, বাড়ন্ত মুখে শরীর ভেঙ্গে যায় ? দুবেলা ইস্কুল কলেজ স্বচ্ছন্দে চলতে পারে; চ'লছে না, যেহেতু যাঁরা চালিয়েছেন, তাঁরা দুবেলা ইস্কুলে যান নাই।

সুস্থ থাকবার নিমিত্ত আনন্দ-উৎসবের কি প্রয়োজন, তা এখন যুক্তি দ্বারা বুঝতে হ'চ্ছে। কলেজের উচ্চ শ্রেণীর এক ছাত্র একবার আমায় জিজ্ঞাসা করেছিল, তৃষ্ণা কাকে বলে। সে লক্ষণ দিয়ে মিলাতে চায়, তার তৃষ্ণা পায় কি না। আনন্দ উপভোগ সম্বন্ধেও আমাদের অবস্থা অস্বাভাবিক হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, লোককে বুঝাতে হ'চ্ছে, আনন্দ চাই। ইন্দ্রিয় ও মনের স্ফূর্ত্তি না থাকলে স্বাভাবিক মানুষের বাঁচাই কঠিন। দেশে বহু উৎসব ছিল, হিন্দুর জীবনই উৎসবময়; দুর্গাপূজা শ্যামাপূজা প্রভৃতি পূজা পূর্ব্বকালের যজ্ঞ। কিন্তু সে ঘটা গেছে, উৎসাহ গেছে, যজ্ঞের হোমমাত্র আছে। এর এক কারণ অর্থাভাব; প্রধান কারণ, ইংরেজী শিক্ষিতেরা এখন সমাজ-শাসক, যাঁরা মনে করেন উৎসবে যোগ দেওয়া কুসংস্কার। আরও শোচনীয়, তাঁরা আনন্দ উপভোগের সামর্থ্য হারিয়েছেন। থিয়েটার হ'লে মন্দ নয়, কিন্তু উপলক্ষ্য কই ? বারোয়ারী বারো ভূতের কাণ্ড! এখন শিখেছেন, "দরিদ্র নারায়ণ"! আত্মারাম না হ'য়ে নারায়ণ দেখছেন, দরিদ্রে! বর্ত্তমান শিক্ষার এ কি পরিণাম! বিদ্যা-আয়তনের ভিত না বদলালে রক্ষা নাই।

অন্নচিন্তা লঘু করতে হ'লেও ভিত বদলাতে হবে। কিন্তু সে'ত অল্প কথায় ব'লবার নয়। সাত আট বৎসর পূর্ব্বে 'প্রবাসী' পত্রে তিন প্রবন্ধে শিক্ষার ধারা পরিবর্ত্তনের কথা লিখেছিলাম। সূত্রটা সেখানে আছে, এখানেও আছে। বিদ্যালয় চাই, বিশ্ববিদ্যালয় চাই; সে সবে লক্ষ লক্ষ বালক ও যুবা কাতারে কাতারে প্রবেশ করুক। কিন্তু যারা পূজারী, তারাই করুক; অন্যে গেলে অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হয়। কারণ এরা সন্ন্যাসী নয়, ভেকধারী। যে সকল ছাত্র বুদ্ধিমান, মেধাবী ও শ্রমশীল, তারাই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের যোগ্য। এমন ছাত্র শতকে পাঁচ জন মেলে কি না, সন্দেহ। এদিকে পড়াতে হবে, দক্ষিণা নিয়ে নয় দরকার হ'লে বেতন দিয়ে পড়াতে হবে, এদের জন্য রাজকোষ উন্মুক্ত রাখতে হবে, যত কাল চাইবে তত কাল পালন ক'রতে হবে। কারণ দেশে বিদ্বান্ চাই, পণ্ডিত চাই। এরা পরে চাকরি করুক, কি বাণিজ্য করুক, যে কর্ম্মই করুক তাতেই দেশের মুখ উজ্জ্বল হবে।

শিক্ষার ব্যয় বহু লাভে পূরণ হবে। পূর্ব্বকালে এমনই করো ব্রাহ্মণ জন্মেছিলেন। আর এক শ্রেণী আছে, যাদের অন্নচিন্তা নাই, লক্ষ্মীর কৃপায় চাকরির উমেদার হতে হবে না, এরাও কলেজে যাবার যোগ্য। এখানেও দেশের স্বার্থ দেখ্‌ছি। অনেকে বিলাতী ব্যসনে মত্ত হবে বটে, কিন্তু এমন লোকও পাব যাদের ধন ও বিদ্যায় গুণে দেশের নানাদিকে হিত হ'তে পারবে।

এই দুই শ্রেণী ছাড়া, যাকে অন্নচিন্তা করতে হবে, তাকে প্রথম হ'তে শ্রমসহিষ্ণু আত্মনির্ভরশীল ব-হু কর্‌তে হবে। এর অর্থ এমন নয় যে সে মূর্খ থাক্‌বে, অবিনীত হবে। চাকরো, কারু, কলাজীবী বা বণিক হতে গেলে যে বিদ্যাচর্চ্চা কমাতে হবে, তা নয়। বর্ত্তমান শিক্ষার কিন্তু এই হচ্‌ছে। দোকানী জাহাজের খবর রাখ্‌ছে না, উকিল মকদ্দমা ছাড়া কথা কন না, হাকিম বড় হাকিমের মেজাজ ছাড়া আর কিছু লক্ষ্য করেন না। অবশ্য বহু বহু ব্যতিক্রম আছে। তথাপি বল্‌তে পারি জীবিকা উপার্জ্জন ছাড়া আরও কিছু আছে, যা নইলে জীবন অপূর্ণ থাকে। মানব জমীন্ যে কত পতিত আছে, তার সংখ্যা হয় না।

ইস্কুল, কলেজ, হোষ্টেল, প্রভৃতি নামগুলি তুলো দিয়ে দেশী নাম রাখা আবশ্যক হয়েছে। বোধ হয় এখন কোনও শিক্ষক বাঙ্গালা ভাষায় বিদ্যাভ্যাসের বিরোধী নন। শুন্‌ছি নাকি শিক্ষকের ধুতি চাদরে বাঙ্গালী হয়ে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করার হুকুম নাই। আপাদকণ্ঠ বস্ত্রাচ্ছাদিত না হ'লে যে শিক্ষণ-কর্ম্মে বিঘ্ন হয়, তাত নয়। ইংরেজ শিক্ষক তাঁর দেশের পোষাক পরেন, আমরাও আমাদের দেশের পরব। শিক্ষা-বিভাগের আইনে যদি আমাদের ধুতি পরা নিষেধ থাকে, তা হ'লে অবিলম্বে তার রদ হওয়া উচিত। বেশভূষা, চা'ল-চলন, ভাব-ভঙ্গি, ক্ষুদ্র বিষয় নয়। কৃত্রিমতার আবরণ দেখ্‌তে দেখ্‌তে মানুষ কৃত্রিম হ'য়ে পড়ে, নিয়মের দোহাই দিয়ে আত্মরক্ষা করে। ইংরেজী ভাষা শেখাতে যদি ইংরেজ সাজ্‌তে হয়, জাপানী শেখাতে জাপানী সাজ্‌তে হয়, তা হ'লে দেশকে ছোট করো ভাষাটাকেই বড় করো তুলি। ইস্কুল কলেজের হোষ্টেলের দেশী নাম, মঠ। তফাৎ এই, মঠ চলে ধার্ম্মিকের দানে, হোষ্টেল চলে ছাত্রের দক্ষিণায়। যদি হোষ্টেলকে মঠ বলি, মঠের নিত্য নৈমিত্তিক বিনা আপত্তিতে চ'ল্‌তে পারবে। মঠের ছাত্রদের চাকর নাই, বহু স্থলে পাচকও নাই। ধনীর ছেলে যদি নিজের কাপড় নিজে কাচ্‌তে, নিজের বাসন নিজে মাজ্‌তে, হাট বাজার গিয়ে দ্রব্যাদি বয়ে আন্‌তে না পারে তা হ'লে মঠে তার না আসাই উচিত। এই ভাব কিন্তু এ দেশী নয়। আমাদের দেশে ছাত্রের আদর্শ, ব্রহ্মচারী। এই আদর্শ হঠাৎ পরিবর্ত্তন করাতে ছাত্রের চরিত্র দেশের বিসদৃশ হ'য়ে পড়েছে। সে আসন-আহ্নিক নাই, সে ব্যায়াম নাই, সে উৎসব নাই, সে আত্ম-সংযম ও আত্মমান নাই। ইস্কুল-কলেজে দুই এক ঘণ্টা 'নীতি' উপদেশ দিয়া ছাত্রদিকে 'মানুষ' কর্‌বার প্রয়াস, নিতান্তই হাস্যকর। মঠের নীতিতেই ছাত্রেরা মানুষ হয়ে ওঠে। এই হেতু সকল ছাত্রকে মঠে থাক্‌তে হবে ; নিকটে বাড়ী কি বাড়ীর গাড়ি থাক্‌লেও মঠে থাক্‌তে হবে।

বিদ্যালয় অবশ্য বিদ্যালয় থাক্‌বে। শিক্ষার ক্রম প্রথম হ'তে প্রাচ্য ক'র্‌তে হবে ; ইংরেজী শিক্ষা ছাত্রের বারো বছর বয়সের পর আরম্ভ ক'র্‌তে হবে। শিক্ষার প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ক্রম আছে। ইদানী বি-টি পাশ হয়ে শিক্ষকেরা বুঝ্‌ছেন, দুই ক্রমে আকাশ-পাতাল প্রভেদ, পশ্চিমদেশের বহু শিক্ষা-বিদ্যাবিৎ বালচরিত্র লক্ষ্য করো সে দেশের সনাতন বৃদ্ধশিক্ষা তুলো দিয়ে বালশিক্ষা প্রচলিত করেছেন। বালশিক্ষা-ক্রমই প্রাচ্যশিক্ষাক্রম। এই ক্রম সকল অন্ত ক্রম বিকল। তথাপি, ব'ল্‌তে দুঃখ হয়, ক্রমের সূত্রটা ছেড়ো অনেকে কাঁচের পুঁতি কুড়িয়ে বেড়ান। বিদ্যালয়ে বৃত্তিশিক্ষা চ'ল্‌বে না, রথ দেখা আর কলা বেচা কখনও এক সঙ্গে চ'লে না। তেমনই কলা-শিক্ষাও চ'ল্‌বে না, কিন্তু কলার সূত্রশিক্ষা, বিদ্যার নিমিত্ত কর্ত্তব্য। কণ্ঠে হ'ক, যন্ত্রে হ'ক গীতের যেমন স্বরগ্রাম আছে, যাবতীয় কলারও তেমন আছে। এটা যন্ত্রবিদ্যা (mechanics) নয়, কর-শিক্ষা (manual training)। শুনেছি, বঙ্গদেশে মাত্র কয়েকটা ইস্কুলে কর-শিক্ষা আরম্ভ হয়েছে। যদি চিত্র-লেখনের তুল্য বাহ্যবস্তু বিবেচিত না হ'য়ে মানব-প্রকৃতির সহিত কর-শিক্ষার সম্বন্ধ স্পষ্ট উপলব্ধ হয়, তা হ'লে এই শিক্ষা সার্থক হবে, অন্যথা কালক্ষেপ মাত্র।

উচ্চ বিদ্যালয়ে, কলেজেও দেখা গেছে, বালশিক্ষাক্রম সফল হয়, বৃদ্ধশিক্ষাক্রম চর্ব্বিতচর্ব্বণ মাত্র। কিন্তু চর্ব্বিতচর্ব্বণে আমরা এত দক্ষ হয়েছি যে আখের ক্ষেতে আখ ভেঙ্গে চিবাতে গেলে দাঁতই ভেঙ্গে যায় ; যেখানে যাই, সেখানেই থোড়-বড়ি-খাড়া। খেয়ে খেয়ে ছেলেদের অরুচি জন্মে, তারা ঘড়ীর ঘণ্টা গণ্‌তে থাকে, ছুটি পেলে মুখ বদ্‌লাতে ঘরে দৌড়ে। কিন্তু পালাবার জো নাই, অষ্ট বাঁধনে অষ্টাঙ্গ বাঁধা আছে, না শিক্ষকের না ছাত্রের হাত পা মেল্‌বার জো আছে। ছাত্রেরা চৌদ্দ পনর বৎসর কারা ভোগ করো পাকা কয়েদী হ'য়ে যায়, মুক্তির পরোয়ানা পেলেও ঘরে যাবার পথ খুঁজে পায় না। পোষা পাখী পিঁজরা ভুল্‌তে পারে না, ঘুরো ঘুরো পিঁজরার কাছে আসে। চাকরি, সেই পিঁজরা, ছাতু আছেই আছে। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় বলেছিলাম অনেক জায়গায় অনেক হাঁড়ীতে থোড়-বড়ি-খাড়ার ডাল্‌না রান্না হ'চ্‌ছে, নূতন হাঁড়ীতে একটু নূতন ব্যঞ্জন রান্না হ'ক, বালক্রমে প্রয়োগ হ'তে বিদ্যায়, মূর্ত্ত বিজ্ঞান হ'তে অমূর্ত্ত বিজ্ঞানে যাবার পথ খোলা হ'ক। কথাটা কর্ত্তাদের মনে লাগে নাই। কারণ এর মানে সীমালঙ্ঘন। গণ্ডীর মাহাত্ম্য লোপ, জাতি নাশ। আমার হাঁড়ীর ডালনা তুমি খাবে, তোমার হাঁড়ীর ডাল্‌না আমাকে খেতে হবে ! সৃষ্টিঠাকুর দুদ'শ দিন নাই উঠুন, কিন্তু বিহার-ওড়িষ্যাবাসী বাঙ্গালা দেশে যাবে, আর বাঙ্গালাবাসী বিহার-ওড়িষ্যায় আস্‌বে, টাকার জন্য যেতে আস্‌তে পারে, কিন্তু বিদ্যার জন্য যাবে আস্‌বে ? দেশভক্তেরাও ব'ল্‌লেন, সে যে প্রলয়-কাণ্ড। এই সকল রুদ্ধগবাক্ষ অচলায়তন উৎপাটিত না হ'লে কোনও প্রদেশের শিক্ষা-সমস্যার সমাধান হবে না।

অথচ কলা-শিক্ষার ব্যবস্থা ক'র্‌তে গেলে এই প্রলয়কাণ্ড না ঘটিয়ে গতি নাই। জেলার শহরে দু-চারিটা বিদ্যালয় থাক্‌তে পারে, কিন্তু কলা-শিক্ষালয় একটা বই দুটা থাক্‌তে পারে না, একটা কলা বই দুটা কলা শেখানা যেতে পারে না। ব্যয়বাহুল্য ভাব্‌ছি না, ভাব্‌ছি শিক্ষিতের অন্ন। মনে করি যেন কোথাও কামারের কাজ শেখানা হ'চ্‌ছে, বছর বছর বিশ পঁচিশ দক্ষ কামার তৈয়ার হ'চ্‌ছে। কিন্তু পরে খাবে কি ? গোলাম খানা, উকীলখানার বিরুদ্ধেও ত এই অভিযোগ।

অথচ দেখ্‌ছি, অকর্ম্মণ্য অ-শিক্ষিত কারু স্বচ্ছন্দে গ্রামে থেকেই অন্নচিন্তা লঘু ক'র্‌তে পেরেছে। এরা যে জীবনসংগ্রামে টিকো আছে, তা তাদের নিজের গুণে নয়, কর্ম্মসামর্থ্যে নয়, লোকের দয়ায় নয়, প্রকৃতির নিষ্ঠুরতায় ও আমাদের নির্ব্বুদ্ধিতায়। যে দেশে মুড়ি-মুড়কির সমান দর, সে দেশে মুড়কি দুর্ল্লভ। কর্ণিক হাতে নিলেই যে রাজমিস্ত্রী হয়, আর বিকালবেলা একটা চক্‌চকে টাকা হাতে পায়, তার শিক্ষায় প্রয়োজন কোথায় ? এইরূপ সকল কর্ম্মেই। আমরা গুণীর আদর ক'র্‌তে শিখি নাই, তাই গুণহীনে দেশ ভরো গেছে।

অথচ কারুর কর্ম্মসামর্থ্য বাড়াতে হবে ; কেবল মাথার সামর্থ্য বাড়ালে হাত পঙ্গু প্রাপ্ত হবে। কারুর কর্ম্মসামর্থ্য ও দক্ষতা বাড়াবার অভিপ্রায়ে দুশাঁচটা কারুশিক্ষালয় (Industrial school) স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু সে সব অভাবের পর পূরণ নয়, কারুকরি

শিক্ষার্থীর ইচ্ছায় নয়, কাজেই জলপানি যুগিয়ে চালাতে হ'চ্ছে। প্রথম প্রথম এতে দোষ নাই; কিন্তু শিক্ষিতকে দেখ্যে অন্তে শিখতে আস্ছে না কেন? অতএব ব'লতে হবে, উদ্দেশ্য সাধু বটে, কিন্তু কল্প প্রশস্ত নয়। পৃথক শিক্ষালয়ের সময় এখনও আসে নাই, পৃথক শিক্ষাশালা আমাদের দেশের কল্পও নয়। এখানে একটা দৃষ্টান্ত দিই। বর্ত্তমানে এম্-ই ইস্কুলগুলা প্রায় উঠ্যে যাচ্ছে। কোনটা উচ্চ ইংরেজী ইস্কুলে পরিণত হচ্ছে, কোনটা কম বেতনে উচ্চ ইস্কুলের নীচের ধাপ হয়েছে। কারণ ইস্কুলে ঢুক্লেই কর্ম্ম-তীর্থে যাবার ট্রেনের টিকিট কাটা হয়। দরিদ্র যাত্রী পাসেঞ্জার ট্রেনে ওঠে, ধিকি ধিকি যায়, থার্ড ক্লাসে কষ্ট খুব, কিন্তু ভাড়া কম। তীর্থের গরিমা শুনেছে, কিন্তু কর্ম্ম ভুগে নাই। এ সকল যাত্রীর নিমিত্ত চাই ধর্ম্মশালা: শিক্ষালয় সে ধর্ম্মশালা। শিক্ষালয়, বিদ্যালয় বটে, আরও কিছু। গ্রামে শিক্ষালয়, চারি পাশের গ্রামের ছেলেরা আসে। বার বছর বয়স পর্য্যন্ত বিদ্যালয় ও শিক্ষালয়ে শিক্ষা সমান হবে। তার পর প্রভেদ। বিদ্যালয়ের যোগ্য ছাত্র বিদ্যালয়ে যাবে, শিক্ষালয়ের যোগ্য ছাত্র সেখানে থাক্বে। দেখ্তে হবে, চারি পাশের গ্রামে কোন্ কারুর অভাব আছে। প্রথমে তার কর্ম্ম শেখাতে হবে। কতকগুলি আমাদের সর্ব্বদা আবশ্যক হয়, যেমন গৃহনির্ম্মাণ। গৃহনির্ম্মাণ একার দ্বারা হয় না। পূর্ব্বকালে চারি ভাগ ছিল, এবং যদিও চারি ভাগের সবাই শিল্পী নাম পেত, প্রত্যেকের নাম ও কর্ম্ম পৃথক ছিল। প্রথম শিল্পী স্থপতি, যিনি গৃহ স্থাপনা (plan) করেন। তিনি স্থাপনা কর্ম্মের যোগ্য, সর্বশাস্ত্রবিৎ, ধার্ম্মিক, গণিতজ্ঞ, চিত্রজ্ঞ, সর্ব্বদেশজ্ঞ, পুরাণজ্ঞ, সত্যবাদী, মৎসরাদিরহিত। এইরূপ স্থপতি ভুবনেশ্বরের মন্দির স্থাপনা করেছিলেন, যে-সে কারুর দ্বারা হয় নাই। তার পর সূত্রগ্রাহী, স্থপতির পুত্র বা শিষ্য, গুণে প্রায় তুল্য, স্থপতির মতিগতিপ্রেক্ষক হ'য়ে মান উন্মান প্রমাণাদি নির্ণয় ক'রতেন। তদনুসারে তক্ষক কাষ্ঠাদি স্থূল বা সূক্ষ্ম ক'রতেন। তার পর মৃৎশিলা কাষ্ঠাদি সম্মেলনপটু বর্দ্ধকি গৃহ নির্ম্মাণ করতেন। এই চতুষ্টয় বিনা দেবালয়, মনুষ্যালয়, কোন গৃহ নির্ম্মিত হ'ত না। প্রাসাদশিল্প হ'ক, কুটীরশিল্প হ'ক, যে শিল্পই হ'ক, একটা বিদ্যা, বাস্তু বিদ্যা। এখন সে বিদ্যা লুপ্ত হ'তে চল্যেছে, অথচ নিত্য প্রয়োজনীয়। এইরূপ, কামারের কর্ম্ম। বহুগ্রাম আছে সেখানে দুই এক ক্রোশের মধ্যে কামার নাই, যদি বা আছে, হাতুড়ে। এইরূপ, অভাব দেখ্যে যদি কলাশিক্ষা দেওয়া হয়, শিক্ষিতেরা অক্লেশে আত্মমান রক্ষা ক'র্তে পার্বে, অন্তে অন্য বৃত্তি শিখ্তে প্রবৃত্ত হবে, চাকরির মোহও কাট্তে থাক্বে।

যেখানে তাঁত ব্যবসায় আছে, পিতল কাঁসার ব্যবসায় আছে, যেখানে যে ব্যবসায় আছে, সে-সে ব্যবসায়ের বিদ্যা শেখালে ছাত্রের সহজে পটুতা হবে, ব্যবসায়ে যোগ দিতে প্রবৃত্তি হবে, পরে তা সফলও হবে। যেখানে পণ্য আছে, সেখানে ব্যাপার কর্ম। মারোআড়ী কত সহজে ব্যাপার করে, আমরা আশ্চর্য্য হই। তারা যে পাঠশালায় প'ড়্বার সময় ব্যাপার কর্তে শেখে, সে বার্ত্তা রাখি না। তার পক্ষে ব্যাপার করা নূতন নয়। কে না দেখ্যেছে, যে ছেলে দোকানে বসে, সে বড় হয়ে অক্লেশে দোকানী হয়। এম-ই ইস্কুল, ইস্কুল; ছেলেরা আস্বে, বিদ্যা অর্জ্জন ক'র্বে, সঙ্গে-সঙ্গে বৃত্তিজ্ঞানও ক'র্বে। শুনেছি, এমন ইস্কুল আছে, পাদ্রী সাহেবেরা করেছেন। ক্রমে এই কল্পনা উচ্চ ইংরেজী ইস্কুলে চালাতে হবে, ক্রমে কলেজেও চল্তে পার্বে।

এখানে একটা কথা উঠ্বে। এ সব শেখাবার টাকা কোথায়, শিক্ষক কোথায়? বাস্তবিক যদি অট্টালিকা না হ'লে কিংবা অমুক কোম্পানীর যেকি না পেলে শিক্ষালয় হবে না মনে হয়, তা হ'লে টাকা নাই, হাত পা গুটিয়ে কুবেরের মুখপানে চেয়ে থাকলেও নাই। যদি সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ স্থপতি নইলে শিক্ষালয়ের স্থাপনা হ'তে পারে না মনে হয়, তা হ'লে বাস্তবিক শিক্ষকও নাই। শিক্ষক গড়্যে নিতে হ'বে, বিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে বেছে নিতে হবে। শিক্ষক যে অনেক চাই, তাও নয়। কারণ এক একটা বৃত্তি দু চারি বছর মাত্র এক শিক্ষালয়ে চল্তে পার্বে, তার পর বদ্লাতে হবে। জেলার শহরে নানা বৃত্তি চল্ছে, বিলাতী কলের জিনিসে বাজার ভর্যে আছে। সেখানেও দু চারি বছর পরে কলা বা বৃত্তি বদ্লাতে হবে। মনে করি যেন একটা জেলায় উপস্থিত দশটা বৃত্তি শেখার প্রয়োজন আছে। মনে করি যেন সকল প্রয়োজন সমান, টাকাও অল্প। তখন দশ জন শিক্ষক স্ব স্ব সাজ নিয়ে দু চারি বছর ছাড়া শিক্ষালয়ে শিক্ষালয়ে শিখিয়ে বেড়াবেন। কি করে সাবান কর্তে হয়, কিংবা জুতার কালী কর্তে হয়, সে সব কলা গ্রামিক নয়। গ্রামে যা ছিল বা লুপ্তপ্রায়, আগে তাকে রক্ষা করি; প্রথমে ক্ষেম তার পর যোগ।

গ্রামে ও নগরে কত যুবা কারু ও কার্ম্মিক আছে, শিক্ষা অভাবে কর্ম্মপটুতা নাই, দক্ষতা নাই। কেহ কেহ এদের নিমিত্ত নৈশ বিদ্যালয় করেছেন, অশেষ যত্নে পাঠ পড়াচ্ছেন। কিন্তু শিক্ষা শব্দের অর্থে লেখা-পড়া বুঝ্যে ঠিক পথ ধর্তে পারেন নাই। কর্ম্মে দক্ষতা জন্মাবার এ পথ নয়। কর্ম্ম ধর্যে বিদ্যায় পঁহছিয়ে দিলে বালক্রমে শিক্ষা হবে, সে বিদ্যা স্থায়ী হবে। অশিক্ষিত মাত্রেই বালক, বয়স যতই হ'ক। তাদের পক্ষে আগে ক্ষেত্র, পরে ক্ষেত্রতত্ত্ব; আগে শব্দজ্ঞান, পরে বানান; আগে বানান, পরে লিখন। অতএব নৈশবিদ্যালয় নাম তুল্যে দিয়ে শিক্ষালয় রাখ্লে ভাল হয়।

এখানে অন্নচিন্তা শেষ করি। কারণ এ চিন্তা শেষ হবার নয়। যাবৎ মানুষ, তাবৎ চিন্তা থাক্বে, কখনও লঘু হবে কখনও গুরু হবে। গুরু হলেই লঘু হবে, প্রকৃতি দ্বারা হ'ক মানুষের দ্বারা হ'ক। দেখা গেল একটি কারণে দাস্যবৃত্তি আমাদের অবলম্বন হয় নাই। এই বৃত্তি কারও প্রিয় নয়। বাঙ্গালী স্বভাবতঃ বিহঙ্গম; যেখানে বিহঙ্গম আছে, কার সাধ্য তাকে পিঁজরায় পোরে? না খেতে পেয়ে শুখিয়ে থাক্বে, কুলি হতে পার্বে না, বাড়ীর চাকর হতে পার্বে না। যেখানে খাওয়ায় বদ্ধ হয়েছে, সেখানেও পোষ মানে নাই, পালাবার তরে ছটফট কর্ছে। আমাদের নন্দনেরা নিন্দার্হ নয়; নিন্দার্হ আমরা, বৃদ্ধেরা। কে তাদিকে বাবু করেছে? কে বাপু বাপু বল্যে দুলাল কর্যে তুল্যেছে? কে বাঙ্গালীকে আনন্দ হ'তে বঞ্চিত করেছে? কে পশ্চিম দেশের মোহনমন্ত্রে মুগ্ধ হয়েছে?

বলের অভাবে, চেষ্টা-পটুতা নাই। এই অভাবে লেখাপড়ার কাজেও অবসাদ আসে। ক্ষুর দিয়া কাঠ কাটতে পারা যায় না, কাটারী কুড়াল চাই। ক্ষুর-ধার বুদ্ধি যার, সে যে বলহীন, কর্ম্মসামর্থ্যহীন, 'তেতো' হ'য়ে থাকে, সেই ত আশ্চর্য্য। দেশ বদ্লাবার নয়, জল বদ্লাবার নয়, কিন্তু শিক্ষা দ্বারা দেহের ও মনের বল আন্তে পারা যায়।

(ভারতবর্ষ, আষাঢ় ১৩৩২) শ্রী যোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি

সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালী এঞ্জিনীয়র—নীলমণি মিত্র

শ্রী জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস

দুইশত বৎসর পূর্ব্বের কথা। বর্ত্তমান কলিকাতা ছিল তখন তিনখানি বড় বড় গ্রাম—সুতানুটী, কলিকাতা, গোবিন্দ-পুর। তাহার আশে-পাশে ছিল দুইতিনখানি ছোটো ছোটো গ্রাম। সেইসকল গ্রামের ভিতর ও চতুর্দ্দিক্ জঙ্গল ও জলায় পূর্ণ ছিল। এখন যাহা গড়ের মাঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ, তখন তাহার অধিকাংশ ভাগই বর্ষার সময় বিলের মতো দেখাইত। চৌরঙ্গি ও তাহার পূর্ব্বদিকের স্থান জঙ্গলাবৃত, শিয়ালদহের নিকট পর্য্যন্ত স্থান লোনা বাদা এবং চাঁদপাল ঘাট হইতে খিদিরপুর পর্য্যন্ত তটভূমি প্রায় জঙ্গলময় ছিল। উত্তরে সুতানুটী ১৮৬১ বিঘা জমি; তাহার উত্তর সীমা ছিল বাগবাজার খাল বা মার্হাট্টা ডিচ্, পূর্ব্ব সীমা মার্হাট্টা ডিচ্ এবং আপার সার্কুলার রোড; পশ্চিমে গঙ্গা ও দক্ষিণ সীমা বড়বাজার ও টাঁকশাল হইয়া সার্কুলার রোড, দক্ষিণে গোবিন্দপুর ১০৪৪ বিঘা জমি বর্ত্তমান ফোর্ট্ উইলিয়ম্ দুর্গের দক্ষিণপূর্ব্ব দিকে ময়দানের উপর অবস্থিত ছিল। কলিকাতা ১৭০৪ বিঘা জমি, সুতানুটী ও গোবিন্দপুরের মধ্যবর্ত্তী গ্রাম ছিল। পলাশীর যুদ্ধের পর বৎসর অর্থাৎ ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে ফোর্ট্ উইলিয়ম্ দুর্গ নির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়া ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে উহা সম্পূর্ণ হয়। এই দুর্গ নির্ম্মাণের ও তৎসংলগ্ন একটি ময়দানের প্রয়োজন হওয়ায় গোবিন্দপুর গ্রামের অধিবাসীদিগকে উঠিয়া যাইতে হয়। তাহার ফলে কতক লোক কলিকাতা, কতক সুতানুটী এবং অবশিষ্ট লোক অন্যত্র চলিয়া যায়। এই সময় বাসুদেব মিত্রের দুই পুত্র রুদ্রেশ্বর ও কাশীশ্বর গোবিন্দপুরে বাস করিতেন। রুদ্রেশ্বর ভবানীপুরে এবং কাশীশ্বর কলিকাতা কুমারটুলিতে আসিয়া বাস স্থাপন করেন। যাহা এক্ষণে কাশীমিত্রের ঘাট নামে কলিকাতার আবালবৃদ্ধবনিতার বিদিত, সেই ঘাট এই কাশীশ্বর মিত্র মহাশয় মৃতদেহ দাহের জন্য নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়া অমরত্ব লাভ করেন। এই মিত্র বংশে ৺সুখময় মিত্র মহাশয়ের চারিপুত্রের মধ্যে তৃতীয়, আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালী এঞ্জিনীয়র স্বর্গীয় নীলমণি মিত্র মহাশয়ের জন্ম হয়। তিনি ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ডায়মণ্ডহারবারের অন্তর্গত তৎকালীন সমৃদ্ধ বরদা গ্রামে মাতামহালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। জ্ঞাতিদিগের সহিত মোকদ্দমায় পৈতৃক বিষয়সম্পত্তি সমস্ত নষ্ট হওয়ায়, সুখময় মিত্র মহাশয় স্ত্রী-পুত্রদিগকে বরদা গ্রামে রাখিয়া স্বয়ং জনৈক আত্মীয়ের নিকট ভবানীপুরে বাস করিতে থাকেন। নীলমণিবাবু বরদা গ্রামের পাঠশালায় বিদ্যাশিক্ষা করিয়া পাটীগণিত ও শুভঙ্করীতে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। গ্রামের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ অঙ্কবিদ্ বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা পরম ধার্ম্মিক উদার-প্রকৃতি ও নিরীহ ছিলেন। জননীও ধর্ম্মপ্রাণা ভক্তিমতী, দানশীলা ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। পুত্র শৈশব হইতেই জনকজননীর সদ্গুণাবলীর অধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি সপ্তমবর্ষ বয়সে দিবসে গুরু মহাশয়ের নিকট রামায়ণ-মহাভারতের গল্প শুনিতেন, এবং রাত্রিতে বাড়ীর স্ত্রীলোকদের নিকট সেইসকল অবিকল বলিতেন। তিনি গুরুমহাশয়ের নিকট হিসাবপত্র ও জমিদারিসংক্রান্ত বিষয় ভাল করিয়া শিখিয়াছিলেন। তাহার ফলে বার বৎসর বয়সেই তিনি একজন পাকা মুহুরি হইয়া উঠিয়াছিলেন। বাল্যকালে নীলমণিবাবু নিরীহ ভাল মানুষটি ছিলেন। তাঁহার ছিপছিপে হাল্কা দেহ লইয়া তিনি সাঁতার কাটিতে ও দৌড়িতে বিলক্ষণ পারিতেন এবং বহুদূর হাঁটিয়াও ক্লান্ত হইতেন না।

তখন কলিকাতায় ইংরেজী বিদ্যালয় সবে স্থাপিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট্ ও উইল্সন-সাহেব-প্রমুখ সংস্কৃতজ্ঞ য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ কর্তৃক সংস্কৃত শিক্ষার প্রচলন

প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যুগপ্রবর্ত্তক রাজা রামমোহন রায়ের ইংরেজী শিক্ষা-প্রচলন চেষ্টা জয়যুক্ত হওয়ায় হিন্দু কলেজ শিক্ষা-কমিটি এবং স্থানে-স্থানে ইংরেজী ও বাঙ্গালা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে; তখন রাজা রামমোহন রায়, রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর এবং ডেভিড্ হেয়ার, ডাক্তার ডফ্ প্রমুখ সাহেবগণ শিক্ষাবিস্তারের জন্ম সমূহ উদ্যমসহ কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। একদিকে ডফ্ সাহেবের শিক্ষা ও সংস্রবের ফলে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র ঘোষ, গোপীনাথ নন্দী, এবং আনন্দচন্দ্র মজুমদার খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করায় হিন্দুসমাজে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে, অধ্যাপক ডিরোজিওর শিক্ষা ও সংস্রবে শিক্ষিত যুবক-সমাজে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে—তাঁহার ছাত্রগণের রীতিনীতি ধর্ম্ম ও নৈতিক জীবন, ও শিক্ষার পরিণাম দেখিয়া হিন্দুসমাজ প্রমাদ গণিতে আরম্ভ করিয়াছে; অন্যদিকে রাজা রামমোহন রায়ের অভ্যুদয়ে নব্য বঙ্গ যখন রাজনীতি চর্চ্চা ও নূতন বাঙ্গালা সাহিত্যরূপ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া উজ্জল ভবিষ্যতের আশায় উৎফুল্ল, এমনই সময় বালক নীলমণি ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সে (১৮৪০ খৃষ্টাব্দে) ভবানীপুরে পিতার নিকট আসিয়া লণ্ডন মিশনরী স্কুলে ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ করেন। তিনি পাঠ্যাবস্থাতেই (১৮৪২খৃঃ) শ্যামবাজারনিবাসী বাবু ভৈরবচন্দ্র সরকারের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী পদ্মাবতীর পাণিগ্রহণ করিয়া শ্বশুরালয়ে অবস্থিতি করিয়া তথা হইতে ডফ্ সাহেবের কলেজে ভর্ত্তি হন; এখানে তিনি প্রতিবৎসর দুইতিন ক্লাশ করিয়া প্রমোশন পাইয়া শীঘ্রই উচ্চ সাহিত্য ও দর্শনাদির শ্রেণীতে উন্নীত হন। কলেজের সকল শিক্ষকই নীলমণিকে ভালবাসিতেন। গণিতাধ্যাপক স্মিথ্ সাহেব দমদমায় থাকিতেন। তিনি প্রায় প্রত্যহ কলেজের ছুটির পর নীলমণির সঙ্গে হাঁটিয়া কথা বলিতে-বলিতে শ্যামবাজার পর্য্যন্ত যাইয়া গাড়ীতে উঠিতেন। নীলমণিও শিক্ষকগণকে অত্যন্ত ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহাদের কথা বলিতে-বলিতে তাঁহার চক্ষুতে জল আসিত।

নীলমণি যখন ডফ্ কলেজের তৃতীয় শ্রেণীতে পাঠ করেন, তখন প্রথম শ্রেণীর অঙ্কশাস্ত্রের (Higher Mathematics) একটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা হইয়াছিল। অধ্যাপক ডাক্তার স্মিথ্ তাঁহাকে প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদের সহিত ঐ পরীক্ষা দিতে বলেন। প্রথমে তিনি স্বীকৃত হন নাই, কিন্তু সাহেব পুনঃপুনঃ বলায় পরীক্ষা দেন। প্রশ্নপত্রে ৩২টি অঙ্ক ছিল, তন্মধ্যে তিনি ৩১টি করিয়া বাকী অঙ্কটির প্রায় অর্দ্ধেক করিতে-করিতে অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া চলিয়া আসেন। যেদিন পরীক্ষার ফল বাহির হয় সেদিন ক্লাসে স্মিথ্ সাহেব বলেন, "নীলমণি তুমিই পুরস্কার পাইয়াছ; প্রথম শ্রেণীর যে-ছাত্র দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে সে ২৫টি অঙ্ক করিয়াছিল।" ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি ডফ্ কলেজের শেষ পরীক্ষার সকল বিষয়ে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া পারিতোষিক লাভ করেন। ঐবৎসর দুর্গাপূজার সময় তাঁহার মাতৃ-বিয়োগ হয়। পর বৎসর তিনি কর্ম্মের চেষ্টা করেন। কিন্তু হস্তাক্ষর ভাল নহে বলিয়া কোথাও কাজ পান নাই। তাঁহার শিক্ষকগণও ভাল চাকরি জোগাড় করিয়াছিলেন, কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা অন্যরূপ বলিয়া হস্তাক্ষরই তাঁহার কেরানীগিরির পথে কণ্টকস্বরূপ হইয়া ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ করিয়া দিয়াছিল। নীলমণিবাবুর জন্য বহু চেষ্টা করিয়া ডফ্ সাহেব অবশেষে হার মানিয়া তাঁহাকে রুড়কী এঞ্জিনীয়ারিং কলেজে প্রবেশ করিবার পরামর্শ দেন ও চেষ্টা করেন। নীলমণিবাবুর পূর্ব্বে এই কলেজে ভর্ত্তি হইবার জন্য কোন বাঙ্গালী ছাত্র আবেদন করেন নাই। সেই সময় ডফ্ সাহেবের চেষ্টাতেই এই কলেজের বর্জ্জন-নীতির বাঁধ ভগ্ন করিয়া নীলমণিবাবুই বাঙ্গালী ছাত্রগণের এখানে প্রবেশের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেন।

তিনি ১৮৫১ অব্দের মার্চ্চ্ মাসে রুড়কী কলেজে ভর্ত্তি হন। যথানিয়মে তথাকার প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া তিনি মাসিক চল্লিশ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। সে-সময় বাবু উমাচরণ ঘোষ নামে জনৈক বাঙ্গালী গাঙ্গের খাল-বিভাগের হেড্ ক্লার্ক্ ছিলেন। নীলমণিবাবু প্রথমে তাঁহারই বাড়ীতে ছিলেন। পর বৎসর হায়দারাবাদ-প্রবাসী স্বনামখ্যাত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় তাঁহার সহপাঠী হইয়া তাঁহার সহিত উমাচরণ-বাবুর বাড়ীতেই কয়েক মাস অতিবাহিত করেন। পরে দুই জনেই কলেজের ব্যারাকে বাস করেন। কলেজের প্রিন্সিপাল কাপ্তেন জে, আর, ওল্ড্ফীল্ড-

নীলমণি-বাবুকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, কিন্তু অন্যান্য প্রায় সকল শিক্ষকই বিশেষত সার্ভে শিক্ষক ওয়াকার্ সাহেব তাঁহার প্রতি ভাল ব্যবহার করিতেন না, এমন-কি সাহেব তাঁহাকে ময়দানে জরিপ শিক্ষা দিতেন না। কিন্তু নীলমণি-বাবু তাহাতে ভগ্নমনোরথ না হইয়া সহাধ্যায়ীদের মধ্যে যাঁহারা ভালরূপ অঙ্কশাস্ত্র জানিতেন না তাঁহারা কলেজের ছুটির সময় তাঁহার নিকট অঙ্ক শিক্ষা করিতে আসিলে তিনি অতি যত্নের সহিত তাহা শিক্ষা দিতেন এবং তিনিও এই সুযোগে শিক্ষকগণ সেইসকল ছাত্রকে যাহা-যাহা শিখাইতেন তাহা তাঁহাদিগের কাছে জানিয়া লইতেন। তিনি প্রিন্সিপাল-সাহেবেরও সাহায্য কতক-পরিমাণে পাইয়াছিলেন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে বাৎসরিক পরীক্ষায় যখন তিনি সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া সর্ব্ব-প্রথম ও অন্যান্য পারিতোষিক লাভ করেন, তখন সকলেরই দৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হইয়াছিল। তিনি ৬৬৪ নম্বর পাইয়াছিলেন। তৃতীয় বৎসরে কমিটি পরীক্ষা দিবার নিয়ম ছিল। ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে পরীক্ষার্থীরা তখন মাসিক ১০০৲ টাকা বেতনে সব্-অ্যাসিস্টান্ট্ সিভিল্ এঞ্জিনীয়রের পদ পাইতেন। এই পরীক্ষার কয়েক মাস পূর্ব্বে নীলমণি-বাবুর পিতার সাংঘাতিক পীড়ার সংবাদ আসিলে তিনি প্রিন্সিপালের নিকট সেই কয়মাস পূর্ব্বে পরীক্ষা দিবার অনুমতি প্রার্থনা করেন, যাহাতে পরীক্ষা দিয়া তিনি পিতাকে দেখিতে যাইতে পারেন। অনুমতি পাইয়া তিনি একাকীই সেই পরীক্ষা দেন, কিন্তু রুড়কী ত্যাগের পূর্ব্বেই পিতার মৃত্যুর সংবাদ পান। যথাসময়ে কমিটি পরীক্ষার ফল বাহির হয়। তিনি সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া গবর্ণমেণ্ট-কর্ত্তৃক বিশেষ পারিতোষিক-স্বরূপ কতকগুলি ইঞ্জিনীয়ারিং-বিষয়ক মূল্যবান্ পুস্তক উপহার পান।

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার কিছুদিন পরে নীলমণি-বাবু কেনাল বিভাগের কার্য্যশিক্ষার জন্য গাঙ্গের খালে কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৮৫৪ অব্দের মার্চ্চ মাসে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া যান। তখন হইতে বিলাতের লোকের মতন স্বাধীন ইঞ্জিনীয়ারিং ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া দেশবাসীর পথপ্রদর্শক হন, এই ইচ্ছা তাঁহার মনে উদয় হয়। কিন্তু তৎপূর্ব্বে কিছু দিন গবর্মেণ্টের চাকরি স্বীকার করেন। তিনি প্রেসিডেন্সী বিভাগের আর্কিটেক্টের সহকারী পদে কার্য্য করিয়া ১৮৫৮ অব্দে অ্যাসিস্টান্ট্ এঞ্জিনীয়ার পদে উন্নীত হন। পর বৎসর তাঁহার উপরিতন কর্ম্মচারী ভবানীপুরের St Pauls' Cathedral মেরামতের জন্য তাঁহাকে এস্টিমেট্ করিতে বলিলে তিনি তাহা প্রস্তুত করিয়া দেন এবং বলেন গির্জ্জার চূড়া ও ছাদ যেরূপ ফাটিয়াছে তাহাতে উহা নূতন করিয়া নির্ম্মাণ না করিলে প্রবল ঝড়ে তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে; কিন্তু উপরওয়ালার আদেশ-মতন কেবল ভাল করিয়া মেরামত করিতেই বাধ্য হন। মেরামত হইবার কিছুদিন পরে একদিন অত্যন্ত ঝড়বৃষ্টি হইলে নীলমণি-বাবুর পূর্ব্ব অনুমান-মত চূড়া ও ছাদের কিয়দংশ পড়িয়া গিয়া একজন মানুষ মারা যায়। গবর্মেণ্ট এবিষয়ে কৈফিয়ৎ তলব করিলে উপরিতন কর্ম্মচারীরা

স্বর্গীয় নীলমণি মিত্র
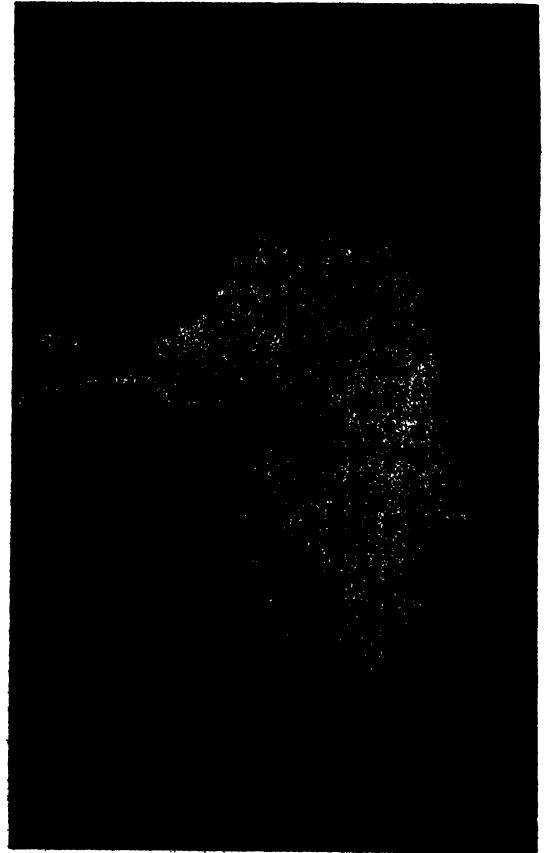
নীলমণি-বাবুর স্কন্ধে সকল দোষ চাপাইবার চেষ্টা করেন। তখন নীলমণি-বাবু চীফ্ এঞ্জিনীয়রকে এইসম্বন্ধীয় সকল চিঠিপত্র দেখাইয়া বুঝাইয়া দেন যে দোষ তাঁহার নহে, তাঁহার উপরিতন কর্ম্মচারীদের। উপরওয়ালাদের সম্ভ্রম (prestige) নষ্ট হওয়ার ভয়ে মামলা তখন চাপা পড়িয়া যায় এবং চীফ্-এঞ্জিনীয়র তাঁহাকে বলেন, "আপনি বরাবর খুব ভালরূপ ও সন্তোষজনক কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন, সেইজন্ত পুরস্কারস্বরূপ আপনাকে মাস-কয়েকের জন্ত ঢাকার এক্‌জিকিউটিভ এঞ্জিনীয়রের পদে বদলী করিব এবং পরে আপনাকে আবার এখানে আনিব। নীলমণি-বাবুর বুঝিতে বাকী রহিল না যে এই বদলীর অর্থ উপরওয়ালাদের দোষদর্শনরূপ গোস্তাকীর জন্ত ভদ্রভাবের শাস্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিন্তু তাঁহার স্তায় স্বাধীন-প্রকৃতি কর্ম্মদক্ষ ব্যক্তি এরূপ অবিচার নীরবে সহ্য করিবার পাত্র ছিলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ কর্ম্মত্যাগপত্র দাখিল করেন। তখন তাঁহার মতন বিশ্বাসী ও ভাল এঞ্জিনীয়র না থাকায় গবমে‍ণ্ট তাঁহার কর্ম্মত্যাগ পত্র প্রথমে কিছুতেই গ্রহণ করিলেন না, শেষে উহা গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের নিকট প্রেরিত হইলে নীলমণি-বাবু বড়লাট বাহাদুরকে লিখেন যে আর তাঁহার চাকরি করিবার ইচ্ছা নাই; য়ুরোপে যেমন অনেকে স্বাধীন এঞ্জিনীয়ারিং ব্যবসায় করেন, সেইরূপ এ-দেশে তিনিও প্রথম কার্য্য আরম্ভ করিবেন এবং তাঁহার দেশের লোক পরে যাহাতে তাঁহার প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করে, তজ্জন্ত বিশেষ চেষ্টা করিবেন। এইরূপ পত্র লেখার পর তাঁহার কর্ম্মত্যাগ মঞ্জুর হয়।

নীলমণি-বাবু যখন প্রথম রুড়কী হইতে এঞ্জিনীয়র হইয়া আসেন, তখন অনেকেই বলিয়াছিলেন যে তিনি রাজমিস্ত্রীর সর্দ্দারি শিক্ষা করিয়া আসিয়া এখন রাজমিস্ত্রীর সর্দ্দার হইয়াছেন। সে-সময় তাঁহারা বুঝেন নাই যে এমন দিনও আসিবে যখন এই সর্দ্দারির জন্ত লোক লালায়িত হইবে। তিনি কর্ম্মত্যাগের পূর্ব্বেও কোনো কোনো বন্ধু-বান্ধবের বাটী নির্ম্মাণ মেরামতাদি করিয়াছিলেন। এক্ষণে স্বাধীন কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া মহানগরীর শ্রী ফিরাইয়া দিবার অন্ততম কারণস্বরূপ হইলেন। পাইকপাড়ার রাজাদের "বেলগাছিয়া ভিলা" নামক বাগানবাটী মেরামৎ, বিল্‌-এ উদ্যাননির্ম্মাণ, পাইকপাড়ার নূতন অন্দরমহল নির্ম্মাণ এবং বেলগাছিয়া পাঠ্যশালার নির্ম্মাণও তিনি স্বীয় পরিকল্পনানুসারে করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রোপলিটন্ ইন্‌স্টিটিউসনের বাটী, বহুবাজারস্থ সায়ান্স্ এসোসিএশনের বাটী, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ বাটী, মোহনবাগানে কীর্ত্তিচন্দ্র মিত্রের বাটী, বাগবাজারে ৺নন্দলাল বাবুর সুবিশাল সৌধ, মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রাসাদ এবং "এমারেল্ড্ বাউয়ার" প্রভৃতি বহু-বিখ্যাত অট্টালিকা এবং কলিকাতা ও বঙ্গের নানাস্থানের বহু ধনী মধ্যবিত্ত ও সামান্ত গৃহস্থের ও সর্‌কারী এবং সাধারণের অসংখ্য গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। চন্দননগরের 'রত্তন লজ,' পানিহাটির বাবু নরেন্দ্রনাথ দত্তের স্নানের ঘাট প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অনেকেই জানেন না যে মাহেশের বিখ্যাত লৌহরথ নীলমণিবাবুরই পরিকল্পনানুসারে ও তত্ত্বাবধানে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজ, স্কুল, বিজ্ঞানসভা প্রভৃতি যে-সকল সাধারণ অট্টালিকা তাঁহার দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল, তজ্জন্ত তিনি পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন নাই। সায়েন্স্ এসোসিয়েশনের বাড়ী, তাহার লেক্‌চার থিয়েটার ও লেবরেটরী প্রভৃতির পরিকল্পনা ও তত্ত্বাবধানের জন্ত তিনি যে কেবল পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন নাই, তাহাই নহে; তজ্জন্ত তিনি এক সহস্র টাকা চাঁদাও দিয়াছিলেন। এইসকল কার্য্যে তাঁহার সময় ও শক্তি বিলক্ষণ ব্যয় এবং ক্ষতিস্বীকার করিয়াও তিনি নানা জনহিতকর কার্য্যে যোগদান করিতেন ও তাহার প্রবর্ত্তন করিতেন। তিনি কাশীপুর মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস্‌চেয়ারম্যান, দমদমা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনর, দমদমা ও শিয়ালদহের অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, ফ্যাকাল্টি অব্ এঞ্জিনীয়ারিংএর মেম্বর, সায়েন্স্ এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতাদিগের অন্ততম ও তাহার এক্‌জিকিউটিভ কমিটির সভ্য, এঞ্জিনীয়ারিং এসোসিয়েশনের প্রেসিডেণ্ট্ এবং হিন্দু হোষ্টেল কমিটির ট্রাষ্টী ছিলেন। তিনি উপরিউক্ত যে-কার্য্যের সংস্রবে আসিয়াছিলেন তাহারই উন্নতিসাধন করিয়া গিয়াছেন। নূতন রাস্তা বাহির করা, জলনিকাশের জন্ত ড্রেনের-

বন্দোবস্ত করা, বাড়ীগুলির এসেস্‌মেণ্ট্ করা প্রভৃতি কার্য্য তিনি নিজে করিতেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দেই তিনিই প্রথমে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের জন্য স্নানাগার নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এক নম্বর ওয়ার্ডের শ্যামস্কোয়ার উঁহারই কৃতিত্বের নিদর্শন। কলিকাতায় জলের কল ও ড্রেনেজ্ হইবার সময় তিনি সুপরামর্শ দিয়া মিউনিসিপ্যালিটির সাহায্য করিয়াছিলেন এবং জলের মেন্ পাইপ্ বসাইবার কালে তিনি, বাক্‌লি সাহেব এবং ক্রস্ সাহেব পরিদর্শক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে হ্যারিসন সাহেব নূতন আইন করিয়া বসতবাটীর ট্যাক্স অত্যধিক হারে বৃদ্ধি করিলে তিনি তাহার প্রতিবাদ করেন এবং স্বয়ং প্রায় পাঁচ শত বাড়ীর এসেস্‌মেণ্ট্ করেন। তিনি, বাবু পশুপতিনাথ বসু ও ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ বন্ধুগণের সাহায্যে করদাতার সভা প্রতিষ্ঠা করিয়া এ-বিষয়ে ঘোর আন্দোলন করেন, যাহার ফলে হ্যারিসন্ সাহেব এসেস্‌মেণ্ট্ সম্বন্ধে নীলমণিবাবুর মতই গ্রহণ করেন।

বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কারুশিল্প শিক্ষার প্রচলনের উৎসাহ দেখা যাইতেছে, নীলমণিবাবু বহুপূর্ব্বে সেই শিক্ষা এদেশে প্রচলনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। "এল্‌বার্ট টেম্পল্ অব্ সায়েন্স" (Albert Temple of Science) নামে যে টেক্‌নিক্যাল্ স্কুল স্থাপিত হইয়াছিল, নীলমণিবাবুই তাহার প্রধান প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি তাঁহার জন্মস্থান বরদা-গ্রামে শৈশবে শিক্ষার সুযোগ পান নাই, তাহা তাঁহার স্মরণ ছিল। তিনি সেই অভাব দূর করিবার জন্য তথায় একটি মধ্য-ইংরেজী স্কুল স্থাপন করেন। ১৮৯৪ অব্দে তিনি তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বর্গারোহণের পর মেট্রোপলিটন্ ইন্‌ষ্টিটিউসনের শ্যামপুকুর ব্রাঞ্চ্ স্কুলটি খরিদ করিয়া লইয়া তাহার "শ্যামবাজার বিদ্যাসাগর স্কুল" নাম দিয়া বন্ধুর স্মৃতি রক্ষা করেন। তিনি টালার নর্থ সুবার্বন্ স্কুলের প্রতিষ্ঠাতৃগণের অন্যতম ছিলেন। দরিদ্র পাঠার্থীরা অনেকেই তাঁহার সাহায্য লাভ করিয়া উত্তর কালে কৃতী হইয়াছেন। বহু অধ্যাপক সন্তানদেরও পাঠের সাহায্যের জন্য তিনি খরচ দিতেন। স্ত্রীশিক্ষার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন।

প্রৌঢ় বয়সে নীলমণিবাবু সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত মধুপুর নামক স্থানে বাড়ীঘর নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বর্ত্তমান বাঙ্গালী উপনিবেশের পত্তন করেন। ম্যালেরিয়া-পীড়িত বঙ্গদেশের সহিত তুলনায় এখানকার স্বাস্থ্যকর জলবায়ুর উপকারিতা উপলব্ধি করিয়া নীলমণি-বাবু মনে করেন, রোগীরা যদি এখানে বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে আসেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহারা রোগমুক্ত হইয়া যান। এই ভাবিয়া তিনি স্বাস্থ্যনিবাসের উপযোগী কয়েকখানি ভাড়াটিয়া বাড়ী নির্ম্মাণের সংকল্প করেন, তাহারই ফলে ১৮৮৮ অব্দে "বটতলা" নামক দুইখানি বাড়ী, পরবৎসর "কাঁটালতলা" নামে আর-একখানি বাড়ী, ১৮৯৯ অব্দে "বড়-দোতালা বাড়ী" এবং "পিয়ারাতলার বাড়ী" নামে দুইখানি ভদ্রাসন নির্ম্মিত হয়। নীলমণি-বাবুকে এইরূপ গৃহনির্ম্মাণ করিতে দেখিয়া তাঁহার বন্ধুবান্ধবদিগের অনেকেই এখানে বাড়ী করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এখানে মধুপুরে চতুর্দ্দিকেই বহু বিশিষ্ট এবং সাধারণ গৃহস্থ বাঙ্গালীর বাড়ী নির্ম্মিত হইয়া এস্থান একটি বিস্তৃত বাঙ্গালী উপনিবেশে পরিণত হইয়াছে। এইরূপে নীলমণি-বাবু যেমন প্রথম বয়সে রুড়কী এঞ্জিনীয়ারিং কলেজে বাঙ্গালী ছাত্রের প্রবেশের পথ প্রদর্শক হইয়াছিলেন, উত্তর কালে তদ্রূপ মধুপুরে উপনিবেশ স্থাপন-বিষয়ে বাঙ্গালীদের পথ-প্রদর্শক হইলেন।

নীলমণি-বাবু কৃশকায় হইলেও তাঁহার স্বাস্থ্য খুব ভালই ছিল। ১৮৯০ অব্দের শেষ ভাগে ৬২ বৎসর বয়সে তাঁহার ম্যালেরিয়া জ্বর হইবার পর হইতে তিনি ঘন ঘন মধুপুরে থাকিতে আরম্ভ করেন। ১৮৯৪ অব্দের ২৫ জুন তিনি শেষ মধুপুরে যান এবং কিছুদিন পরে তাঁহার পৃষ্ঠ-ব্রণ হয়। এই অবস্থায় তিনি বরদাতে একটি দেবমন্দির এবং অতিথিশালা বা অনাথ-আশ্রম তৈয়ার করিবার জন্য দেড় লক্ষ ইট প্রস্তুত করান। কিন্তু রোগের বৃদ্ধি হওয়ায় তিনি কলিকাতায় চিকিৎসার জন্য গমন করেন। তাঁহার প্রস্রাবে চিনির আধিক্য দেখা দেয়। অবশেষে সকল চিকিৎসা ব্যর্থ করিয়া ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ২রা আগষ্ট্ তারিখে এই অক্লান্তকর্ম্মী পরহিতব্রতী কর্ম্মময় জীবনের অবসান হয়।

নীলমণি-বাবু যেমন মনস্বী তেমনি তেজস্বী ছিলেন। তাঁহার স্বাধীনচিত্ততা, ও তেজস্বিতার পরিচয় তাঁহার কর্ম্মত্যাগের সময় আমরা পাইয়াছি, আরও দুই একটি ঘটনায় তাহা পরিস্ফুট হইবে। একবার দমদম ক্যাণ্টন্‌মেণ্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেট্ হেষ্টিংস্ সাহেব সকল অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর হুকুম জারি করেন যে, প্রত্যেক শনিবারে বেলা ১১•টার সময় তাঁহাদের কাছারি করিতে হইবে। নীলমণি-বাবু তখন ভাইস্‌চেয়ার্‌ম্যান্ ও অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট্; তিনি উক্তরূপ আদেশ পাইবামাত্র পদত্যাগপত্র দেন। ম্যাজিষ্ট্রেট্ তাঁহার পদত্যাগ-পত্র গ্রহণ না করিয়া স্বীয় আদেশ উঠাইয়া লন এবং এই ঘটনার পর হইতে উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব জন্মে।

নীলমণি-বাবু অনাড়ম্বর সরলপ্রকৃতির লোক ছিলেন। বাক্-চাতুর্য্যে আত্ম-প্রকাশের অভ্যাস তাঁহার ছিল না। তাঁহার অন্তর্নিহিত গুণাবলী এবং প্রতিভা তাঁহার প্রতি কার্য্যে ফুটিয়া উঠিত। তিনি বিলাত হইতে এঞ্জিনীয়ার হইয়া আসেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার সমসাময়িক বহু উচ্চদরের সাহেব এঞ্জিনীয়ারকেও তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইতে হইয়াছে। তিনি যখন শ্যামবাজার ১০০ নম্বর বাটিতে বাস করিতেন সেই সময় একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। পূর্ব্বে কলিকাতা হইতে বিলাতী ডাক জাহাজে যাইত। ডাক লইয়া যাইবার পূর্ব্বের দিন জাহাজের কলকারখানা ঠিক আছে কি না দেখিবার জন্ত জাহাজখানিকে একবার কিছুদূর ঘুরাইয়া আনা হইত। একদিন এইরূপ জাহাজ যাইবার পূর্ব্বদিন তাহাকে চালাইবার জন্ত অনেকে অনেক চেষ্টা করিয়াও কল না চলায় ম্যাকিণ্টস্ বার্ণ্ কোম্পানীর জেটি মেরামত-কার্য্যে নিযুক্ত এঞ্জিনীয়ার এবং অন্তান্ত কয়েকজন সাহেব এঞ্জিনীয়ার চালাইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু বহু চেষ্টাতেও না পারিয়া একজন সাহেব এঞ্জিনীয়ার শ্যামবাজারে আসিয়া নীলমণি-বাবুকে সমস্ত বলেন। তিনি সাহেবের সহিত জাহাজে গিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া কলগুলি দেখিতে লাগিলেন। জাহাজে ষ্টিম্ ঠিক করাই ছিল, তিনি অনেকক্ষণ পরে এক স্থানে জাহাজ না চলিবার কারণ বুঝিতে পারিয়া সেই স্থানটি কিরূপ করিতে হইবে তাহা জাহাজের দুইজন গোরা নাবিককে বুঝাইয়া দিলেন। সেইস্থানে তাহারা বড় বড় হাতুড়ী ও ছেনি দিয়া চার-পাঁচবার আঘাত করিবামাত্র জাহাজ চলিতে আরম্ভ করিল। তখন জাহাজস্থিত সকলে আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। অন্তান্ত এঞ্জিনীয়াররা নীলমণি-বাবুর যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এমন ঘটনা তাঁহার জীবনে আরও ঘটিয়াছিল, যাহাতে তিনি কত বড় এঞ্জিনীয়ার ছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কলিকাতায় ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে তাঁহার পরিকল্পনানুযায়ী এত অধিক সংখ্যক বাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছিল, যে তাঁহার স্বর্গারোহণের পর বৎসর ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ২৬ জানুয়ারী তারিখে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কন্‌ভোকেসন্ উপলক্ষে তৎকালীন ভাইস্‌চ্যান্সেলার সার্ এলফ্রেড্ ক্রফ্ট্ (Sir Alfred Croft) বলিয়াছিলেন—"To the residents of Calcutta, it may be said *si monuentum requires circumspice* (If you seek his monument look round you). The mansions of many of the wealthy inhabitants of Calcutta and other important buildings of public character, bear witness to the originality and success of his ideas."

মিত্র-মহাশয়ের একখানি তৈলচিত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হাউসে রক্ষিত হইয়াছে। তাহারই প্রতিলিপি এই প্রবন্ধ মধ্যে প্রদত্ত হইল। যাঁহারা পুরুষকারের বলে দারিদ্র্যকে জয় করিয়া জগতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, যাঁহারা হৃদয়-মনের বলে এবং নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের প্রভাবে জীবন-সংগ্রাম-ক্ষেত্রে সকল হীনতা ও দীনতাকে দলন করিয়া চিত্তের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া চিরদিন মস্তক উন্নত রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন, যাঁহারা নিঃস্বার্থ পরহিতৈষণা এবং সৌজন্য-বিনয়াদিগুণে সর্ব্বশ্রেণীর জনসাধারণের প্রীতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া গিয়াছেন, বঙ্গজননীর সুসন্তান স্বর্গীয় নীলমণি মিত্র মহাশয় তাঁহাদের অন্যতম।

"অকাল-বোধন"

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

(১)

নববিবাহিতা ননদ যখন শ্বশুরবাড়ী হইতে জোড়ে ফিরিয়া আসিল তখন পঙ্কজিনীকে তাহার নিজের ঘরটি কিছুদিনের জন্ত এই নবদম্পতিকে ছাড়িয়া দিতে হইল, কারণ বাড়ীতে ঘরের অভাব। কর্তার বন্দোবস্ত হইল সদর ঘরে। ছোট যে ভাঁড়ার-ঘরটি ছিল তাহারই জিনিষপত্র সরাইয়া পঙ্কজিনী নিজের পুত্রকন্তাদের এবং দেবরটির সংস্থান করিয়া লইল।

কোলের ছেলেটি এই পরিবর্ত্তনের কারণ বুঝিতে না পারিয়া মার গলা জড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আমাদেল্ ঘলে ছুলে না কেন মা?"

"—তোর পিসি তাড়িয়ে দিয়েছে।"

"—বাবাকেও তালিয়ে দিয়েতে?"

"—হ্যাঁ, দিয়েছে বই কি?"

"—কেন?"

আড়ি পাতিবার সময় উৎরাইয়া যাইতেছিল। ছেলের কানের উপর ঘুমপাড়ানির লঘু আঘাত করিয়া জননী বলিল—"নে ঘুমো দিকিন তুই এখন, বকর্ বকর্ কর্‌তে হবে না,—ঐ: আয়তো রে হুমো—"

সমস্ত দিনের দৌরাত্ম্য-ক্লান্ত শিশু অমন পিসিমার স্বভাবের এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনের কথা, "হুমোর" অলৌকিক চেহারা এবং কীর্ত্তিকলাপের কথা এবং দিবসের হাসিকান্নার দুই-একটা আধবিস্মৃত কথা ভাবিতে-ভাবিতে মায়ের কোলে নিদ্রায় এলাইয়া পড়িল। একটু পরেই পাড়ার কয়েকজন যুবতীর চুড়ীর ঠুন্‌ঠুন্, কাপড়ের খস্‌খসানি এবং চাপা গলার ফিস্‌ফিসানিতে ঘরের পাশের হাওয়াটা কৌতুকচঞ্চলতায় জীবন্ত হইয়া উঠিল। পঙ্কজিনী কোলের ছেলেটিকে আরও দু'একটা নরম আঘাত দিয়া দিল; ঘরের অন্তান্ত ঘুমন্ত মুখগুলির উপর চক্ষু বুলাইয়া লইল; তাহার পর চাপা স্বরে অনিচ্ছার আভাস মিশাইয়া বলিল, "জুটেছিস্ পোড়ারমুখীরা? বলিহারি সখ্ তোদের, কোথায় একটু চোখ বুজ্‌ব, না—" বলিতে-বলিতে খিড়কির দরজাটার অর্গল খুলিয়া দিল।

একজন ভিতরে আসিতে-আসিতে নথের ঝাঁকি দিয়া বলিল—"নাঃ; সখে আর কাজ কি? তোমার কত্তার কাছে গিয়ে ভাগবৎ দীক্ষা নিগে যাই। বলি হ্যাঁ, তাঁকে বাড়ীর বাইরে করেছ তো? নইলে আমাদের মতলব টের পেলে এই রাত দুপুরে ডাকাত পড়া কাণ্ড ক'রে তুল্‌বেন 'খন।"

এই সম্মিলনীটিতে বয়সে বোধ হয় পঙ্কজিনীই সব-চেয়ে বড়, তাই সে সলজ্জ গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিল—"দেখিস্, বেশী বাড়াবাড়ি করিস্-নি কিন্তু সব। এই দেড় দিন গাড়ীতে এসে হা-ক্লান্ত হ'য়ে আছে দু'টিতে একটু ঘুমুনো দরকার।"

এই সহানুভূতিতে একটি তরুণী নরম পর্দ্দাতেই খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল; অপরের গা ঠেলিয়া বলিল—"দিদি ভুলে গেছে সব; ঘুমের জন্তেই ওদের মাথা ব্যাথা বটে—" ইহাতে দলটির একপাশে কয়েকজনার মধ্যে একটু টেপা হাসি, অর্থপূর্ণ চাহনী, এবং দু'একটা অন্তবিধ বয়সসুলভ ইসারার বিনিময় হইয়া গেল। যাহারা এ চপলতাটুকুর মূল কোথায় বুঝিল না, তাহারা কপট বিরক্তির সহিত মত দিল---এ'সব ছ্যাবলাদের সঙ্গে কোথাও যাইতে নাই!

অমনি ছ্যাবলাদের দলের একজন হঠাৎ ভারিক্কি হইয়া বলিল, "তাই না তাই, দু'চক্ষের বালাই সব—"

এই ছলাটুকুতে সকলেই হাসিয়া উঠিল। পঙ্কজ ঠোঁটে হাসির একটু রেশ টানিয়া রাখিয়া বলিল, "পোড়ার মু—খ, রঙ্গ নিয়েই আছেন।"

ইহারা যতই আনন্দ-মুখর হইয়া উঠিতেছিল পঙ্কজিনীর উৎসাহটা যেন ততই শিথিল হইয়া আসিতে-

ছিল। ইহারা সকলে মিলিয়া হঠাৎ ঘরটার মধ্যে পূর্ব্ব-যৌবনের এমন একটা রসহিল্লোল তুলিল যে যৌবন-সীমাগতা এই নারীর ইহাদের মধ্যে নিজেকে নিতান্ত খাপছাড়া বলিয়া বোধ হইল। যদি চিন্তার ক্ষমতা থাকিত তাহা হইলে ফুটমান কলিটির পাশে, যে-ফুলটি ফোটা শেষ করিয়া দুই-একটি দল হারাইয়া বৃন্তসংলগ্ন রহিয়াছে সেও বোধ করি এই রকমই ভাবিত। একেবারে তাহার সমবয়সী গোছের কেহই ছিল না সেখানে—তাহার পাতান "গোলাপ" পর্য্যন্ত নয়; কেন যে ছিল না পঙ্কজ তাহার কারণ নিজের মনকে নিজেই দিল—তাহারা সব নিজেদের ৭।৮।১০ বৎসরের পুত্রকন্যা লইয়াই ব্যস্ত, এই-সব লঘুতার কি আর অবসর আছে? একজনকে প্রশ্ন করিল, "কৈ, গোলাপ এল না রে ছোট বৌ?" উত্তর পাইল, "তাঁর শরীরটা তেমন ভাল নয়।"

সেই মুখরা মেয়েটা একটু পিছনে সরিয়া গিয়া এক-জনের ঘাড়ে মুখ গুঁজিয়া বলিল, "মোটে দুদিনের ছুটিতে গোলাপের ভোম্‌রা বাড়ী এসেছে—"

কে তাহার গাল দু'টা টিপিয়া ধরিল, বলিল, "মুয়ে আগুন, রস যে ধরে না আর—তোমার ভোমরারও শিগ্‌গীর আসা দর্‌কার হ'য়ে পড়েছে।"

পঙ্কজিনী হঠাৎ বলিল—'তা' সব দাঁড়িয়ে রইলি যে?...যা ক'র্‌তে এসেছিস্ ক'র্‌গে।"

একজন বলিল, "বাঃ, আর তুমি?"

"নাঃ, আমি আর না; তোদের সব দোর খুলে দিতে উঠেছিলুম।"

সে গেলই না। বিছানায় গিয়া শুইল এবং উঠানের ওপার হইতে যখন মাঝে-মাঝে ভ্রান্ত মলের শিঞ্জিনী এবং রুদ্ধ হাসির তরল ঝঙ্কার ভাসিয়া আসিতে লাগিল সে খোকার মাথায় হাত বুলাইতে-বুলাইতে কি ভাবিয়া সরমে সঙ্কুচিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

(২)

বাড়ীটা কয়েকদিন ধরিয়া পাড়ার কৌতুক-রহস্যের কেন্দ্র হইয়া রহিল। রাত্রে যুবতীদের রঙ্গরস, সকালে ছোট মেয়েদের যৌবাঘা, এবং মধ্যাহ্নে গুলের-কৌটা-হাতে-ঠান্‌দিদিদের তামাক-গুঁড়ার মতই ঝাঁঝাল রসিকতা—এ সবের মধ্যেই পঙ্কজিনীকে সহায়িকা হইয়া থাকিতে হইত। ফলে, প্রথম প্রথম তাহার এই নবদম্পতির উপর যে স্বাভাবিক করুণার ভাবটি ছিল তাহাও তিরোহিত হইয়া ইহাদিগকে বিদ্রূপলাঞ্ছিত করিবার ইচ্ছাটা প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। তাই সকালবেলা স্বামীর পূজার জন্য চন্দন ঘসিবার সময় সে দুষ্টামির হাসি হাসিতে-হাসিতে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের উপদ্রবের নব-নব প্রণালীতে তালিম দিতে লাগিল; রাত্রে আড়ি পাতিবার সুবিধার জন্য দুয়ার জানালা যাহাতে বাহির হইতে খোলা যায় তাহার উপায় করিয়া রাখিতে লাগিল এবং মধ্যাহ্নে প্রবীণারা যখন নূতন বরটীকে ঘিরিয়া আসর জমাইয়া বসিত তখন সেও পাশ হইতে ফোড়ন দিতে লাগিল, "ঠাকুর জামাইয়ের আজকাল ওই রকমই গোলমাল হচ্ছে;—নিজে পান খান না, অথচ সকালে ঠোঁটের ওপর রাঙা ছোপ লেগে থাকে; আর বিছানা থেকে উঠ্‌লে মুখে নয় একটু সিঁদুরের দাগ, নয় কোনোখানে সোনার আঁচড়—সেতো রয়েছেই—"

ইহার উপর কেহ বোধ হয় তাহাকেই খোঁচা দিয়া বলিল, "মর্, তোর কথার ভাবে বোধ হয়, সারা সকালটা নাতজামায়ের চাঁদ মুখটির দিকেই হাঁ করে' চেয়ে বসে' থাকিস্—"

সে উত্তর দিত, "তা একটু থাকি বই কি; জানি দুপুরবেলা দশটি রাহুতে মুখটি নিয়ে কাড়াকাড়ি লাগাবে যে।"

এই রকমই হইতে লাগিল। মোট কথা, শান পড়িলে অস্ত্রখানিকে লইয়া কেবল যেমন চোপ বসাইতে ইচ্ছা করে, ক্রমাগত চর্চ্চার ফলে পঙ্কজের রহস্য-বিদ্রূপের প্রয়োগ-সম্বন্ধে সেইরকম একটা প্রবল ইচ্ছা দাঁড়াইয়া গেল। মাঝে পড়িয়া নাকাল হইতে লাগিল এই লাজুক বরটি।

মনটা পঙ্কজের তারল্যে ছলছল করিতে লাগিল। সে, নেহাৎ কোলে-পিঠে করিয়া মানুষ করা বলিয়া ননদের সহিত ঠাট্টা করিত না, কিন্তু আজকাল তাহার বিদ্রূপের একটা ঝাপটা সে-বেচারিকেও বিব্রত করিতে লাগিল।

হঠাৎ যেন নিজের 'বয়সের ভার' ছাড়িয়া পঙ্কজিনী খানিকটা নীচে নামিয়া পড়িল।

কিন্তু স্বামী তাহার মাঝে-মাঝে রসভঙ্গ করিয়া দিত। জমাট মজলিসের মধ্য হইতে তাহাকে ডাকিয়া লইয়া কখন বলিত, "নেও, নেও, ঢের হয়েছে, আমার বেদান্ত-দর্পণের পাতাটা যে খুঁজ্‌তে বলেছিলুম, মনে আছে?"

পাতাটা চার মাস যাবৎ নিরুদ্দেশ। পঙ্কজিনী বোধ হয় বলিয়া ফেলিত, "কথাটা ঠিকই মনে আছে, কিন্তু পাতাটা বাড়ীতে নেই।"

স্বামী গম্ভীরভাবে বলিত, "আমি জানি এই বাড়ীতেই আছে; তা'র হাত-পা গজায়নি যে—"

"কিন্তু হাত-পা আছে এমন ছেলেপিলে ত ফে'লে দিয়ে আস্‌তে পারে?"

"যেখানে মেয়েমানুষ এমন লঘুচিত্ত সে-বাড়ীতে ছেলেপিলেরা সবই কর্‌তে পারে। আমি বলি রঙ্গরস ছেড়ে একটু খুঁজ্‌লে ভালো কর্‌তে; যত সব—" সরোষে প্রস্থান।

একদিন মধ্যাহ্ন-বৈঠক হইতে পঙ্কজের জরুরী তলব হইল। "ব্যাপার কি?"—বলিয়া সে একটু বিরক্ত-ভাবেই স্বামীর সাম্‌নে দাঁড়াইল এবং বলিল, "তোমার কি একটু আক্কেল নেই? ও-পাড়ার-ঠাকুরুণ-দিদি কি বল্‌লেন জানো?"

"কি?"

"হ্যাঁ, তোমায় আমি সেই কথা বলিগে। আক্কেল খুইয়ে যখন-তখন ডাক্‌লে ত বল্‌বেই।"

"আহা বলোই না, অন্তত আমার আক্কেল বজায় রাখ্‌বার জন্যেও ত বলা উচিত।"

কথাটা পঙ্কজের মনটা আলোড়িত করিতেছিল; সে ঈষৎ হাসিয়া রাগতভাবে বলিল—"কেন,—বল্‌লে বরের যে বড় আটা হয়েছে দেখ্‌ছি—কি ঘেন্নার কথা বল্‌দিকিন! এই বয়সে—সবার সাম্‌নে…"

স্বামী কপট গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিল, "…তা বলেছেন ঠিকই…এই বয়সে বুড়ো বরকে ছেড়ে কোথায় অন্ত…"

"…চুপ করো বল্‌ছি, আস্পদ্দা!…" বড়-বড় চোখ দুটো আরো বড় করিয়া পঙ্কজিনী স্বামীকে থামাইল; তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল, "…নেও, কেন ডাকৃছ বলো; দেরি হ'য়ে যাচ্ছে ওদিকে…"

"একজন অবধূত পদার্পণ করেছেন; মস্ত বড়…"

পঙ্কজের হাসি-হাসি মুখটা মুহূর্ত্তে অন্ধকার হইয়া গেল। সে বিরক্তভাবে বলিল "…তা আসুন, আমার অত ঘি-ময়দা নেই…তা ভিন্ন বাড়ীতে একটা জামাই-এর খরচ আছে।"

"…সে সংসারের খবর আমিও খুব রাখি। তা ব'লে সাধু ফকির একজন দয়া ক'রে এসেছেন…"

"কেতাত্ত ক'রেছেন; বলো, চ'লে গেলে বেশী দয়া করা হবে…", বলিয়া পঙ্কজ চলিয়া যাইতেছিল; স্বামী কহিল, "…আর শোনো…"

না ফিরিয়া পঙ্কজ উত্তর দিল…"কী?…আমি শুন্‌তে চাই নে।"

"রাত্রে হরি কথা কইবেন, তা'রও উদ্‌যুগ-টুদ্‌যুগ…"

'ওসব কিছু হবে-টবে না, ব'লে দিলুম এক কথা।" —পঙ্কজ উঠান ছাড়িয়া রকে উঠিল।

"আর একটা কথা, শুন্‌চ?"

পঙ্কজ আবার না ফিরিয়া উত্তর করিল, "না, শোন্‌বার দর্‌কার নেই।"

"তোমার গিয়ে বিনোদকেও ডেকে দাও; বাজে ফষ্টিনষ্টি ছেড়ে একটু সদালাপ শুন্‌বে 'খন।"

"তুমি একলাই শোনো গিয়ে, বিনোদের ভাগ বসাবার দর্‌কার নেই।"

তখন এই তত্ত্বান্বেষী পুরুষটি নিজেই দুইপা আগাইয়া ভগ্নীপতিকে ডাকিয়া যাহাতে তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতির সুবিধা হয় সেইজন্য সন্ন্যাসীর নিকট আনিয়া বসাইল এবং সেদিনকার মতন সেই অনাধ্যাত্মিক সভাটিও উঠিয়া গেল।

মাত্র দু'একটা উদাহরণ দেওয়া গেল, কিন্তু এইরকম রসভঙ্গ প্রায়ই ঘটিত। পঙ্কজিনী বর্ষীয়সীদের বিদ্রূপবাণে জর্জ্জরিত হইয়া স্বামীর উপর ঝাল ঝাড়িত, "আচ্ছা, কেন তোমার এমন ধরণ বলো দিকিন্। দু'দণ্ড ব'সে একটু আমোদ আহ্লাদ করে, তা'তে তোমার গায়ে ফোস্কা পড়ে?"

স্বামী তখন একটি লেক্‌চার জুড়িয়া দিত, বলিত,

ওই, ওইখানেই তোমাদের সঙ্গে মেলে না আমার। এখন দেখ্‌তে হবে তোমরা যে অসার বাক্যালাপকে আমোদ বল্‌ছ, সেটা ঠিক আমোদ কি না। সেটা নির্ণয় কর্‌তে হ'লে আগে বুঝ্‌তে হবে শুদ্ধ আমোদের স্বরূপটা কি। তা হ'লে দেখা যাক্‌ শঙ্করাচার্য্য এ-সম্পর্কে—"

যাঁরা পঙ্কজিনীকে চিনিয়াছেন তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন এ-বক্তৃতা কখনও শেষ হইত না। শুধু স্ত্রীলোকেই পারে, এমনভাবে মুখখানা ঘুরাইয়া লইয়া পঙ্কজ হন্‌-হন্‌ করিয়া চলিয়া যাইত, বলিত—"ক্যামা দাও, ঢের বক্তিমে হয়েছে,—যত সব অসৈরণ—"

স্বামী, স্ত্রীর আধ্যাত্মিক উন্নতি-সম্বন্ধে হতাশ হইয়া একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিত; বলিত, "ঐ ত মুস্কিল, মেয়ে-মানুষের মন, ঠিক জায়গায় আস্‌তে-আসতে আবার কেমন বিগ্‌ড়ে যায়।"

(৩)

যেদিন যাওয়ার কথা ছিল তাহার আগের দিন পঙ্কজের ননদ অসুখ করিয়া বসিল, সুতরাং যাত্রা স্থগিত হইয়া গেল। স্বামী চটিয়া বলিল, "কেবল অনাচারে এটি হয়েছে, এর জন্যে কে দায়ী জানো?"

পঙ্কজ হাসিয়া বলিল, "জানি বইকি—" কিন্তু সে শেষ করিবার পূর্ব্বেই তাহার উত্তরটি কি হইবে আন্দাজ করিয়া তাহার স্বামী তাড়াতাড়ি বলিল, "ঠাট্টা রাখো, তোমাদের জন্যেই হয়েছে এটি; রাত-দুপুর পর্য্যন্ত হুড়্‌দুম্‌ ক'রে ঘুমে ব্যাঘাত জন্মানো। আমি তখনই পই-পই ক'রে বারণ কর্‌তুম; তা গরীবের কথা বাসি না হ'লে ত আর—"

পঙ্কজ একটু সঙ্কুচিতভাবে বলিল, "হাঁ, এ-বয়সে রাত জাগ্‌লে নাকি আবার অসুখ করে?"—বলিয়া একটি সলজ্জ কুটিল হাসির এমনই একটি সঙ্কেত করিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিল যে তাহার আচার-শুদ্ধ মনেও বহু পুরাতন স্মৃতির একটি অসংযত সৌরভ ক্ষণিকের জন্য জাগিয়া উঠিল। সেই তাহারাও দু'টিতে যখন অনর্থক উদ্দেশ্যহীন আলাপে কত বিনিদ্র রজনী অক্লান্ত-ভাবে কাটাইয়া দিত—যখন গ্রীষ্মের রাত্রি উত্তাপ হারাইয়া আর শীতের রাত্রি শৈত্য হারাইয়া কোথা দিয়া যে চলিয়া যাইত—সেইসব দিনের কথা। এখন দু'একটা ঘটনা বেশী করিয়া মনে পড়ে—এক শ্রাবণের রাতে পঙ্কজ অভিমান-ভরে পাশ ফিরিয়া শুইয়াছিল, হাজার মিনতিতেও কথা কয় না, ফিরে না;—তা'র পর হঠাৎ একটা মেঘের ডাকে মুহূর্ত্তে ফিরিয়া সে তাহার বুকে ভয়ে মিশিয়া গিয়াছিল। স্বামী বধূকে বলিয়াছিল, "তোমার চেয়ে বাজও কোমল—সে আমার কাত্‌রানি শুন্‌লে।"

......স্বামী কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য নিষ্ঠা, সংযম প্রভৃতি দশবিধ সোপানের কথা ভুলিয়া, অনেক দিন পরে স্ত্রীর মুখের পানে চাহিয়া যৌবনের সেই বিহ্বল হাসি একটু হাসিল এবং এই ভাবের আমেজে আর-একটা কি শাস্ত্র-বিরুদ্ধ কাজ করিবার জন্য মুখটা বাড়াইয়া হঠাৎ নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইল ও হাসিয়া বলিল, "দিন-দিন ব'য়ে যাচ্ছ তুমি।"

স্ত্রীও শুধু একটু হাসিল, তাহার পর বলিল, "ঠাকুর-ঝিকে ত আর কয়েক দিন পাঠানো যাবে না, কিন্তু ঠাকুরজামাই আর থাক্‌তে চান না যে।"

"ও বোধ হয় ভাব্‌ছে শ্বশুরবাড়ীতে আর কত দিন কাটাবো, তা আমি বুঝিয়ে বল্‌ব'খন। কাছে-পিঠে নয় ত যে আবার দু'দিন পরে এসে নিয়ে যাবে।"

প্রতিদিনই উপশম হইবার আশা দিয়া অসুখটা ১০।১২ দিন পর্য্যন্ত বিস্তার করিল এবং তাহার পর রোগিণীটিকে এমনই নিস্তেজ করিয়া দিয়া গেল যে, তাহার আর উঠিয়া চলা-ফেরা করিবার সামর্থ্য রহিল না। দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন প্রাণটি নেহাৎ নিরাশ-ভাবেই এই শুষ্ক দেহের অবলম্বন ধরিয়া ঝুলিতেছে।

লাজুক বরটি বড় মুস্কিলে পড়িয়া গেল। জোড়ে আসিয়া আর অধিক দিন থাকাও যায় না, অথচ নূতন বালিকা-বধূটির জন্যও প্রাণটি নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িল। বাড়ীতে গিয়া ৫।৭ দিন অন্তর শ্যালকের এক-আধখানা চিঠির উপর ভরসা করিয়া সে যে কি করিয়া থাকিবে তাহা ভাবিয়া পাইল না। এই ত এইখানেই দিনের মধ্যে কতবার করিয়া খবর পাইতেছে এবং কাছে বসিবার সুযোগও বৌদিদি যথেষ্ট করিয়া দিতেছেন, কিন্তু তাহাতেও ত উৎকণ্ঠার অন্ত

নাই,—চোখের আড়াল হইলে আর প্রাণে সোয়াস্তি নাই।

এ-অবস্থায় যখন শ্যালক আসিয়া হিন্দুদের বৈবাহিক আচার-ব্যবহার, স্ত্রী-পুরুষের শাস্ত্রসম্মত প্রকৃত সম্বন্ধ, এবং অন্যান্যের প্রতি শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য প্রভৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিয়া একটি সারবান্ উপদেশ দিয়া বলিল তাহার থাকাটা একান্ত প্রয়োজন, এবং পাড়ার প্রবীণাদের দ্বারাও যখন সেই কথাই বলাইল, এবং তাহার উপর আবার যাইবার কথা তুলিতে শ্যালকজায়া যখন তাচ্ছিল্যভরে হাসিয়া জানিতে চাহিল—বৌয়ের সম্মুখে মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে কি না—তখন বেচারা যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। ইহার পরে যাহা সামান্য একটু দ্বিধা ছিল তাহা নিঃশেষ হইয়া গেল বধূটি যখন বড়ই অভিমানভরে ঠোঁট-দু'টি কাঁপাইয়া বলিল, "তা যাবে বই কি; আমি আর তোমার কে?"

একথার পরেও কে চলিয়া যাইতে পারে জানি না; কিন্তু সে থাকিয়া গেল। বাড়ীতে লিখিয়া দিল, তাহার নিজেরই শরীর খারাপ, কিছুদিন যাওয়া চলিবে না…তবে ভাবিবার কিছুই নাই। নববধূটির মায়ায় আটকাইয়া রহিল। সত্যকথাটুকু লিখিতে যেন কেমন-কেমন বোধ হইতেছিল। এখানে বৌদিদিকে বলিয়া দিল, "বাড়ীতে আর চিঠি দেওয়ার দরকার নেই, আমি সবকথা লি'খে দিয়েছি," এবং বধূকে বলিল, "সেখানে গিয়ে যেন সবকথা ফাঁস ক'রে দিও না; বড্ড লজ্জায় পড়্তে হবে তা হ'লে।"

বধূটি ছোট্ট মাথাটি দুলাইয়া বলিল, "তা ব'লে তোমার অসুখ করেছিল এমন অলুক্ষুণে মিছে কথা বল্তে পার্ব না।"

ইহাতে নবপরিণীত যুবকটি একটা অপরিসীম তৃপ্তি অনুভব করিল এবং বধূর মুখের খুব কাছে মুখটি লইয়া গিয়া আবেগভরে কহিল, "মিছে কথা আর কি? মনের অসুখ কি অসুখ নয় শৈল? আমি যে কী অসুখে রয়েছি কি বুঝ্বে তুমি? এর চেয়ে তুচ্ছ শরীরের অসুখ যে—" ইত্যাদি অনেক কথা যাহা না লিখিলেও স্ত্রী-পুরুষ সকলেই আন্দাজ করিয়া লইতে পারেন।

মোদ্দা কথাটা হইতেছে সে মাসখানেক থাকিয়া গেল। কলেজের পার্সেন্টেজের কথা হিসাব করিল বটে, কিন্তু পার্সেন্টেজের জন্য যেমন এপর্য্যন্ত কোনো ছাত্রেরই জীবনের প্রিয়তম কাজটিতে বাধা পড়ে নাই, সেইরূপ তাহারও পড়িল না—সে মনে-মনে এই সুদীর্ঘ মানবজীবনের যৌবনের অচিরস্থায়ী দিনগুলার পার্সেন্টেজ এবং তাহারও মধ্যে আবার নবপরিণয়ের এই স্বল্পাবিষ্ট দিনগুলার পার্সেন্টেজ কষিয়া ফেলিল। ফলে যতদিন পর্য্যন্ত না বধূটি আরোগ্য লাভ করিয়া সক্ষম হইয়া উঠিল, সে আর তাহার কাছছাড়া হইল না।

যখন বধূকে নিজের মুখে কহিতে শুনিল যে, আর তাহার বিশেষ কোনো কষ্ট নাই, তখন শ্যালক-জায়ার নিকট আর্জ্জি পেশ করিল, "বৌদি, এবার যেতে হচ্ছে—একটা দিন-টিন—"

পঙ্কজ গালদুটি ভার করিয়া বলিল, "তা কি দিয়ে আর রুকে রাখ্ব ভাই; রোক্বার যা তা ত সঙ্গে চল্ল; কিন্তু এখনও বড্ড কাহিল নয়?"

"না আর তেমন কাহিল কি? শরীর বেশ সেরে উঠেছে—।" পঙ্কজ চাপা-হাসির সহিত হঠাৎ ঘাড়টা কাৎ করিয়া গালে তর্জ্জনীটা টিপিয়া বলিল, "ওমা তাও ত বটে, আজকাল ঠাকুরঝির শরীরের কথা আর আমরা কি জান্‌ব?"

বেচারা বরটি লজ্জিত হইয়া পড়িল। হাসিয়া বলিল, "এইজন্যেই আপনার কাছে বল্‌তে সাহস হয় না বৌদি; কিন্তু ঠাট্টা রেখে দাদার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে একটা দিনটিন দেখুন। আর তাও বলি, দাদারও শরীরটা বাইরে প'ড়ে থেকে-থেকে খারাপ হ'য়ে গেছে; ওটা ত আর ঠাকুরঝির শরীর নয় যে পরেই ভালো তদারক কর্‌বে।"

যে-বিদ্রূপ অন্তরের কথাটির সহিত মিলিয়া যায় তাহার আর ভালো জবাব জোগায় না। সলজ্জ সঙ্কোচের সহিত পঙ্কজ শুধু বলিল, "এই যে মুখ ফুটেছে"—বলিয়া তাড়াতাড়ি সে সেস্থান পরিত্যাগ করিতে যাইতেছিল, এমন-সময় বেদান্তদর্পণের সেই পাতাটা পাওয়া গিয়াছে কি না প্রশ্ন করিয়া স্বামীটি সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

১০ বৎসরের বালকের মা পঙ্কজ নিজেকে সামলাইয়া

লইতে পারিল না। নন্দাইয়ের এই ঠাট্টাটুকুর পরেই স্বামীকে সাম্‌নে পাইয়া, নূতন বধূটির মতনই সরমে রাঙা হইয়া ত্বরিত-পদে ঘরের ভিতর আশ্রয় লইল।

(৪)

ননদটি আজ চলিয়া গিয়াছে।

পঙ্কজের মনটা সমস্ত দিন বড় ছোটো হইয়া আছে। ছোটো কন্যার মতন মানুষ-করা ছেলেমানুষ ননদটি বুকের মাঝখানটা এমন খানিকটা শূন্যতা সৃজন করিয়া গিয়াছে যে, সেটা আর কিছু দিয়াই পূর্ণ করা যায় না। কেবলই মনে হইতেছে—"আহা এ'টি ও বড় ভালোবাসিত; আহা বড় ছেলেমানুষ; আহা কিছু শেখে নাই সে—"

বাড়ীটিও দু'দিন হাস্যকলরবে অধিকতর পূর্ণ হইয়া হঠাৎ যেন নির্ব্বাণ-শিখা প্রদীপটির মতন মলিন হইয়া গিয়াছে। নূতন-পরিচিত যুবকটি—যে কৌতুক-আলাপের মধ্য দিয়া ছোটো ননদিনীর পার্শ্বে তাহার হৃদয়ে একটি স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছে, তাহার কথাও বড় বেশী মনে হইতে লাগিল। তাহাকে লইয়া কখন কি অত্যাচারটি করা হইত, প্রবহমান দিনটির প্রহরে-প্রহরে মনে পড়িয়া মনটাকে আকুল করিতে লাগিল। বিকাল বেলাটায় আর সে বাড়ীতে থাকিতে পারিল না। প্রতিবেশীর বাড়ীতে গিয়া বিগত ২০।২৫ দিনের খুঁটিনাটি সব আলোচনা করিয়া ভারি-মনে কাটাইয়া দিল।

স্বামী বাড়ী ছিল না। নূতন রাস্তা, তাহাতে আবার রেলে কয়েকটা বদলি আছে, সে ভগ্নীপতিকে খানিকটা আগাইয়া দিতে গিয়াছে। কাল সন্ধ্যার পূর্ব্বে ফিরিবে না। চাকরটা পর্য্যন্ত সঙ্গে গিয়াছে।

পঙ্কজ সকাল-সকাল ছেলেমেয়েদের আহার করাইয়া শুইয়া রহিল, সেদিন নিজের ঘরে গিয়া শুইতে ইচ্ছা হইল না। শুইয়া, ননদ-নন্দাইয়ের চিন্তার পাশে আর একজনের চিন্তাটা আসিয়া উদয় হইল,—সেটা স্বামীর—বড় অগোছাল বেহিসেবী মানুষ, ঘর ছাড়িয়া খুব কমই বাহিরে যায়—।

পরদিন বৃক্ষন করিয়া বয়লোর গোছাইতে, পুরানো রাস্তার চালাইবার পূর্ব্বে একবার সংসারটাকে দেখিয়া লইতে কাটিয়া গেল। সকলের মধ্যেই যেন পঙ্কজের মনে হইতে লাগিল, স্বামীর জন্য এতদিন যথেষ্ট করা হয় নাই। আজ যে হঠাৎ এত দরদ কোথা হইতে উদয় হইল সে বুঝিতে পারিল না, বুঝিবার চেষ্টাও করিল না। শুধু যেখানে-যেখানে পারিল স্বামীর জন্য প্রচুর ত্যাগ স্বীকার করিয়া, নূতন বন্দোবস্তটা যতদূর পারিল নীরন্ধ্র করিয়া দাঁড় করাইল, এমন-কি, ঘর দুয়ার গোছাইতে-গোছাইতে, ননদ-নন্দাইয়ের কথা ভাবিতে-ভাবিতে তাহার ইহাও মনে হইতে লাগিল, "আহা, এই ভালে যদি ওর সেই বইয়ের পাতাটা পেয়ে যেতুম; কতবার সে বলেছে—গা করা হয়নি—"

কবে দুটো রূঢ় কথা বলিয়াছে, কবে একটা আবেদন-অনুরোধ হেলায় অগ্রাহ্য করিয়াছে—নন্দাই থাকিবার সময় আমোদ-প্রমোদে বাধা পাইয়া কবে একটু অবহেলা-বিরক্তি দর্শাইয়াছে, সমস্ত আজ তাহার মনের মেঘে এপার-ওপার করিয়া এক-একটা বেদনার বিজুলিরেখা টানিয়া দিতে লাগিল। সন্ধ্যার সময় স্বামী আসিবে; কত দিনের বিরহিণীর মতন পঙ্কজ সূক্ষ্ম যত্নের সহিত অভ্যর্থনার আয়োজন করিয়া রাখিতে লাগিল। ঝকঝকে করিয়া মাজা গাড়ুটা টাট্‌কা জলে পূর্ণ করিয়া, পাটকরা গামছায় ঢাকা দিয়া পা-ধোওয়ার জায়গায় রাখিয়া দিল। আল্‌নায় আহ্নিক করিবার গরদের কাপড়টি এবং তাহার পর পরিবার থান-কাপড়টি মিহি করিয়া কোঁচাইয়া টাঙাইয়া রাখিল। যখন যেটি দরকার হাতের কাছে করিয়া গোছাইয়া রাখিল। বহুদিনের অনাদৃত, স্বামীর আদরের পাত্রী মেজ মেয়েটিকে পর্য্যন্ত ফিটফাট করিয়া ধুইয়া-মুছিয়া সাজাইয়া রাখিল। সন্তানের মুখে বক্ষের শুন্য উজাইয়া দিয়াও প্রসূতির যেমন অতৃপ্তি থাকিয়া যায়, সেইরূপ তাহারও যেন হাজার করিয়াও আশ মিটিতেছিল না।

তাহার পর সে বিছানা রচনা করিবার জন্য খাটের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। হঠাৎ শরীরে কিসের যে একটি প্রবাহ খেলিয়া গেল—পঙ্কজের সমস্ত শরীরটা রোমাঞ্চে শিহরিয়া উঠিল। নবদম্পতির সদ্যত্যক্ত গৃহে বিলাসের মোহ এখন লিপ্ত হইয়া আছে। ফুলের ও এসেন্সের মিশ্রিত মৃদু-গন্ধে ঘরটি আমোদিত। শয্যায় মাথার দিকের এক

ভোজ

শিল্পী—টি কেশব রাও

অন্ধ্র জাতীয় কলাশালা
মুসলিপত্তন
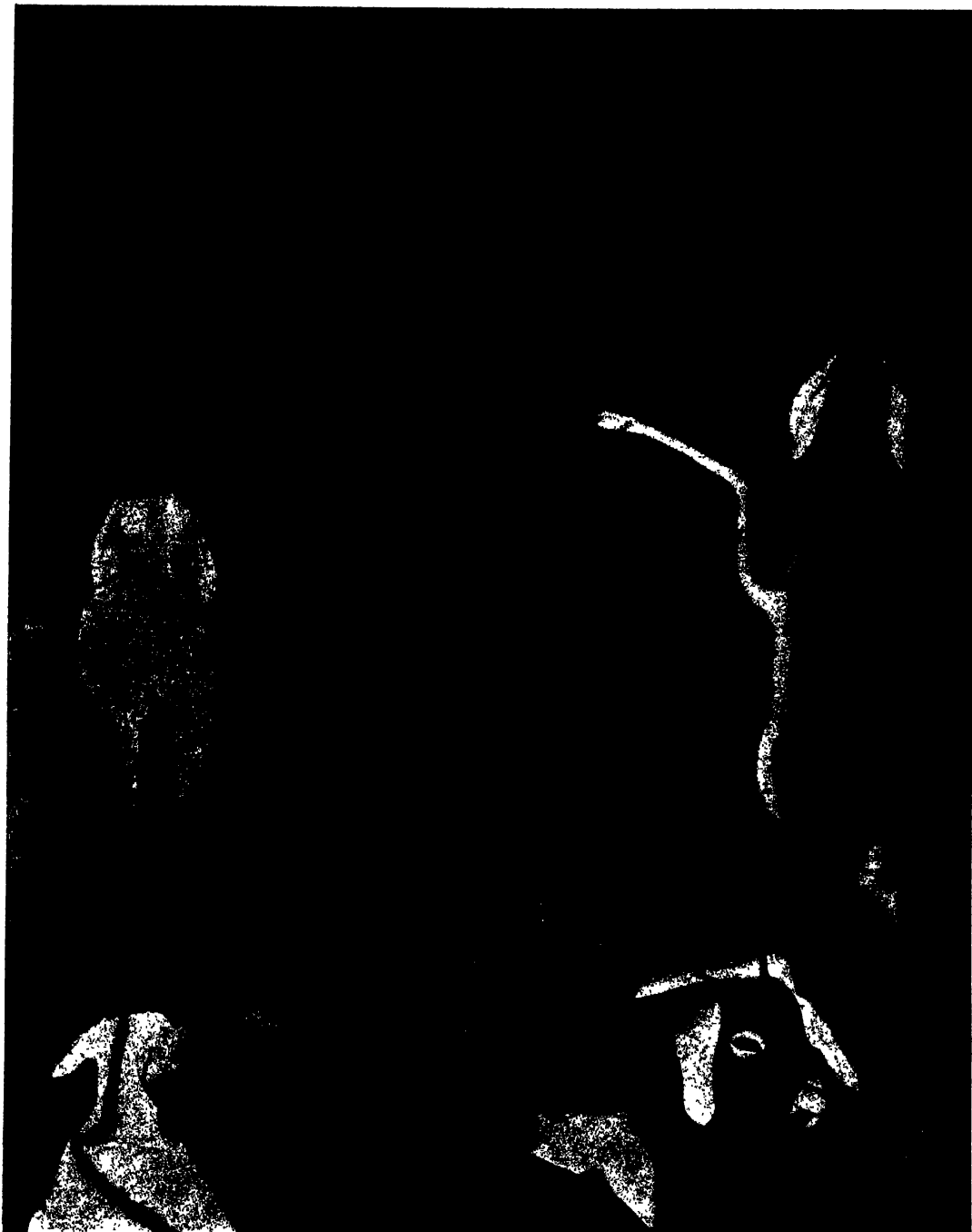
প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

কোণে একটা গন্ধ তীব্র হইয়া উঠিতেছিল, কুতূহলী হইয়া চাদরের কোণটা উঠাইয়া সে দেখিল, একটি বকুলের মালা সন্তর্পণে কুণ্ডলী করিয়া রাখা। পঙ্কজ একটু হাসিয়া সেটা বাহির করিয়া লইল। তাহার পর অন্তদিকে চাহিয়া অন্য-মনস্কভাবে মালাটা দুই হস্তের অঙ্গুলীর মধ্যে জড়াইয়া, খুলিয়া আংটির মতন পরিয়া, আবার মণিবন্ধে বলয়ের মতন পরিয়া, খেলা করিতে লাগিল।

আজ যৌবনের সায়াহ্নে পঙ্কজের প্রথম যৌবনের কথা মনে পড়িয়া গেল। এই সেই গৃহ—এইরকম গন্ধেরও রেশ মাথার মধ্যে যেন ঘনাইয়া উঠিতেছে—তাহাদেরও ঘর আলো করিয়া নিশ্চয় এমনি ফোটা ফুলের মেলা তখন বসিত, আর তাহার পায়ের কাঁচা আল্‌তাও কি এম্‌নি করিয়া যেখান-সেখান রাঙাইয়া দিত না? দিত নিশ্চয়, কিন্তু কই তখন ত সে এত কথা বোঝে নাই। জীবনে তখন যে-বসন্ত আসিয়াছিল, তাহার অভ্যর্থনার কলগীতি ত তেমন করিয়া গাওয়া হয় নাই। স্বামী কতটুকু কদর করিয়াছিল কে জানে—এখন ভালো করিয়া মনে পড়ে না। আর এই ত ভোলানাথ স্বামী—এর কাছে নিজেই যখন নিজের যৌবন-সম্পদকে ভালো করিয়া পরিচিত করিয়া দিতে পারে নাই, তখন কি আর যথাপ্রাপ্যটুকু পাওয়া গিয়াছিল?

আজিকার গৃহিণী পঙ্কজিনী সেদিনকার পনের বৎসরের বধূ পঙ্কজিনীকে সখীর মতন বক্ষের মধ্যে চাপিয়া ধরিল। অন্তর তাহার ব্যর্থতার বেদনায় মথিত হইয়া উঠিল। তাহার পর ধীরে-ধীরে একটা কথা—যা এতক্ষণ বোধ হয় বাষ্পাকারে মনের মধ্যে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল—স্পষ্ট হইয়া উঠিল। বামহস্তে-জড়ানো বকুলের মালাটা দক্ষিণ-হস্তে আবেগভরে চাপিয়া ধরিয়া বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া পঙ্কজ ভাবিল—এখনও কি সে-ভুল শোধ্‌রানো যায় না?—একদিনের জন্যও নয়—এক মুহূর্তের?

একবার একটু সাম্‌লাইয়া লইয়া ভাবিল, কেন হইল এমন-টা? তাহার একটা স্পষ্ট উত্তর খুঁজিয়া পাইল না বটে, তবে বিগত সংক্ষ বাসটা ব্যাপিয়া, ননদ-নন্দাই, পাড়াপড়শী আর সখীবৃন্দ লইয়া যে হাস্য-কলরবে কাটানো গিয়াছে, তাহারই স্মৃতি মনের মধ্যে স্বপ্নের আবেশে জাগিয়া উঠিল, আর তাহার পর এটা অন্তত বেশ বুঝিতে পারিল যে, মনটা পূর্ব্ব হইতেই শিথিল হইয়া পড়ুক আর নাই পড়ুক আজ এই পূর্ণ গৃহের মধুময় স্মৃতি তাহাকে পূর্ণভাবেই অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে—আজ আর তাহাদের আকাঙ্ক্ষার উপর সংযম নাই, তা সে যতই বিসদৃশ হোক না কেন।

পঙ্কজিনী গিয়া আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইল। প্রথমটা নিজের প্রতিচ্ছবি দেখিয়াই বালিকাটির মতনই লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। তবে, এ-ভাবটা রহিল না। ক্রমে সে যত্ন করিয়া কবরী বাঁধিল; মুখটি ভালো করিয়া মুছিয়া কপালে একটি খয়েরের টিপ পরিল; তুলিয়া রাখা কানের দুল-জোড়া বাহির করিয়া কানে দুলাইয়া মাথার কাপড়ে ঢাকিয়া রাখিল; পায়ে আল্‌তা দিল; অধর-ওষ্ঠও রঞ্জিত করিতে যাইতেছিল, কিন্তু কি ভাবিয়া আর করিল না—আয়নার নিজের ছায়াটিকে চোখ রাঙাইয়া বলিল—"মরণ আর কি, বড় বাড় যে!"—তাহার পর সীমন্তে মিহি করিয়া সিঁদুরের রেখা টানিয়া দিয়া সুন্দর মুখখানিকে হেলাইয়া-দুলাইয়া আর্শিতে নিজেকে একটু ভালো করিয়া দেখিয়া লইল। একটা ভালো কাপড় পরিবার ইচ্ছাও হইল; কিন্তু পুত্রকন্যা-দেবরের মধ্যে নিতান্ত বাধ-বাধ ঠেকিতে লাগিল। তবে, একখানি ভালো কাপড় ট্রাঙ্ক হইতে বাহির করিয়া আল্‌নায় স্বামীর পিরানের নীচে লুকাইয়া রাখিল—সময় বুঝিয়া পরিবে। তাহার পরে বহুদিনের ছাড়া শয্যাটি প্রাণের সমস্ত দরদ দিয়া রচনা করিয়া, তাহার এ-সমস্ত আয়োজনের দেবতার জন্য অন্তরের কাতর প্রতীক্ষা লইয়া সংসারের কাযে আন্‌মনা হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

*　　*　　*　　*

এদিকে তাহার দেবতাটি যখন বহুদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া ছোটো ভগ্নীটিকে বিদায় দিল, তখন তাহার শান্ত সমাহিত চিত্তেও যাবার একটা তীব্র আঘাত লাগিল। ইহার আগে যে-মুখ সে কখনও অশ্রুসিক্ত হইতে দেখে নাই অশ্রুজলে-ভরা বিদায়কালীন সেই ছোটো মুখটি তাহার মনে বিষাদের একটা মৌন ছবি আঁকিয়া দিল যাহা সে শাস্ত্রের কোনো বচন দিয়াই মুছিয়া ফেলিতে পারিল না। ইহাতে

অন্ত কোনো অবোধ মানবকে বোধ হয় সংসারের আপনজনগুলির কাছে নিবিড়তর করিয়া টানিয়া আনিত; কিন্তু এই সতর্ক মুক্তিকামীকে আরও সন্ত্রস্ত করিয়া আরও দূরে সরাইয়া দিল। সে ভাবিল এটা কিছু নয়, "তাঁর" একটা পরীক্ষা মাত্র। যে ভববন্ধন হইতে ত্রাণ পাইতে চাহে, তাহাকে এই অগ্নি-পরীক্ষায় উৎরাইয়া যাইতেই হইবে—নহিলে সমস্ত সাধনাই পণ্ড!

সেইজন্ত শাস্ত্রও যখন এই মিথ্যা অবিদ্যাজাত মায়ার নিকট পরাস্ত হইল, সে স্থির করিল একেবারে বাড়ী না গিয়া, রাস্তায় ২।১ দিবস গুরুগৃহে থাকিয়া বিক্ষিপ্ত মনটা সুস্থির করিয়া লইবে। আর অনেকদিন গুরুদেবের চরণ-দর্শনও ঘটে নাই; যখন এতটা আসাই গিয়াছে, তখন এ সুবিধাটুকু ছাড়াও উচিত নয়! তাই ফিরিবার পথে সে আর বাড়ী পর্য্যন্ত নিজের টিকিট করিল না। শুধু চাকরটাকে পাঠাইয়া দিল, আর বলিয়া দিল, "ব'লে দিস্, যদি গুরুদেবের সঙ্গে আবার গঙ্গাস্নানটা সেরে আস্‌বার ঝোঁক হয়ত চাই কি আরও দুই-একদিন দেরি হ'য়ে যেতে পারে। আর দেখিস্, মেয়েটাকে যেন না বেশি বকে-টকে—"

* * * *

পঙ্কজ সমস্ত আয়োজন নিখুঁত করিয়া শেষ করিল; সকাল-সকাল সংসারের কাজকর্ম্ম সারিয়া লইল এবং আর-সকলের আহারাদি পর্য্যন্ত মিটাইয়া, ছোটো—সেই দুরন্ত ছেলেটিকে বুকে চাপিয়া আবেশ-শিথিল-চরণে শয়নগৃহে প্রবেশ করিল।

এইসময় দেবর আসিয়া খবর দিল—"দাদা আজ আর এলেন না, বৌদি; দুখীরাম একলা ফি'রে এসেছে।"

পঙ্কজ শূন্যদৃষ্টিতে দেবরের পানে চাহিয়া রহিল—কোনো কথাই কহিতে পারিল না। দুখীরাম নিজেই আসিয়া বলিল—"হাঁ, তেনার মনটা বড় খারাপ দেখ্‌লাম বৌমা, বোধ হয় গুট্‌ঠাকুরের সঙ্গে তিথি-টিথি সেরে আস্‌বেন ৫।৭ দিন পরে; গুট্‌ঠাকুরও বোধ হয় পায়ের-ধূলো দেবেন একবার—"।

অগ্রগামী ত্রিবাঙ্কুর

শ্রী হরেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কয়েক বৎসর আগে ত্রিবাঙ্কুরের নাম বড়-একটা শুনা যাইত না। আজকাল এমন কাগজ প্রায় নাই যাহাতে ঐ ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্যটির কথায় আলোচনা নাই। ত্রিবাঙ্কুর দ্রুতগতিতে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। তাই স্বতই মনে হয়—আধুনিক ভারতে ত্রিবাঙ্কুরের স্থান কোথায়?

শিক্ষা-বিস্তার:

শিক্ষাবিষয়ে ভারতবর্ষের অন্ত সব প্রদেশকে পিছনে ফেলিয়া ত্রিবাঙ্কুর যেন লাফাইয়া-লাফাইয়া অগ্রসর হইতেছে। ত্রিবাঙ্কুরের মোট লোকসংখ্যা ৪,০০১,৩৯৩; তার ভিতর ৯৬৮,১৩৩ জন লেখাপড়া জানে। পাঁচ বছরের কমবয়স্ক শিশুদিগকে বাদ দিলে প্রতি হাজারে ২৭৯ জন অধিবাসী লিখিতে ও পড়িতে পারে। প্রতি ১৭ জন শিক্ষিত অধিবাসীর মধ্যে ১২ জন পুরুষ ও ৫ জন নারী পাওয়া যায়। নিম্নে অন্তান্ত দেশের সঙ্গে তুলনা করিয়া শিক্ষাবিষয়ে ত্রিবাঙ্কুরের স্থান দেখানো হইতেছে—

প্রদেশ বা দেশীয়রাজ্য		পাঁচ বৎসরের কমবয়স্ক শিশুদিগকে বাদ দিয়া হাজার করা—		
		ব্যক্তি	পুরুষ	স্ত্রী
ত্রিবাঙ্কুর	...	২৭৯	৩৮০	১৭১
ব্রহ্মদেশ	...	৩১৭	৫১০	১১২
কোচিন	...	২১৪	৩১৭	১১৫
বরদা	...	১৪৬	২৪০	৪৪
কুর্গ	...	১৪৪	—	—
দিল্লী	...	১১২	—	—
আজমীর-মারোয়ার	...	১১৩	১৮৫	২৬
বাংলা	...	১০৪	১৮৮	২১
অন্যান্য প্রদেশ ও দেশীয়রাজ্য		একশতেরও কম।		

(আদমসুমারি, ১৯২১)

পুরুষ ও নারী শিক্ষিতের একত্রে হিসাব করিলে সমগ্র ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের ভিতর শিক্ষাবিষয়ে ত্রিবাঙ্কুরের স্থান দ্বিতীয় সত্য, কিন্তু কেবল নারীশিক্ষার কথা ধরিলে দেখা যায় ত্রিবাঙ্কুরের স্থান প্রথম। প্রাচীন রীতি-অনুসারে ব্রহ্মদেশে এখনও ধর্ম্মমন্দিরে অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা প্রচুর-পরিমাণে আছে। এই কারণেই বোধ হয় পুরুষদের শিক্ষায় ব্রহ্মদেশ এত অগ্রসর। কিন্তু
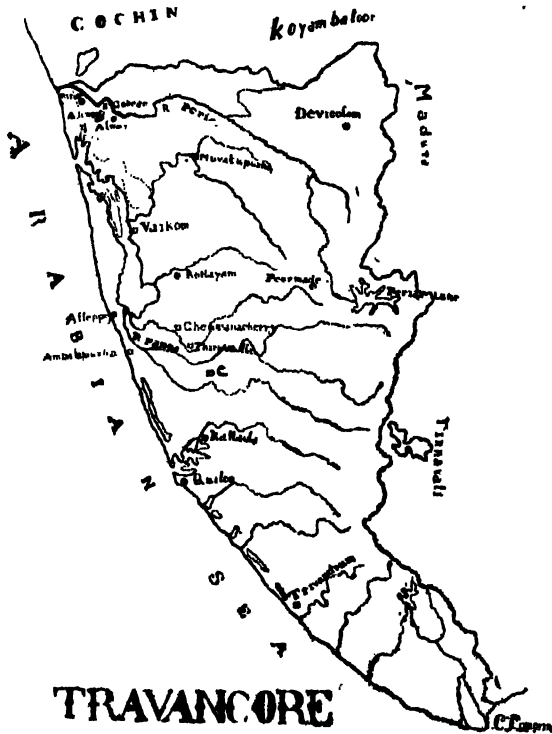
ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের মানচিত্র

ব্রহ্মদেশে উচ্চশিক্ষিতের সংখ্যা তত বেশী নাই। স্কুল-কলেজে অতি অল্প ছাত্রই পড়িয়া থাকে। কেবল উচ্চশিক্ষিতের সংখ্যা ধরিলে ছেলেদের শিক্ষায়ও ত্রিবাঙ্কুর প্রথম স্থান লাভ করিবে, সন্দেহ নাই।

ত্রিবাঙ্কুরের বিদ্যালয়গুলির বিশেষত্ব এই যে তথায় বিশেষভাবে কার্য্যকরী বিদ্যাই শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। বিবিধ শিক্ষাবিস্তারের জন্য অর্থসাহায্য করিতে ত্রিবাঙ্কুরের রাজা ও প্রজা উভয়েই মুক্তহস্ত। দেওয়ান শ্রীযুত ভি, পি, মাধব রাও, সি, আই, ই—ত্রিবাঙ্কুরে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন করিয়াছেন। মাননীয় রাজা রাজবর্ম্মা এম্‌-এ, বি-এল্‌, বোম্বে ও মধ্যপ্রদেশের অনুকরণে দুই বেলা স্কুল বসিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রথম শ্রেণী ৭।০টা হইতে ১২॥০টা পর্য্যন্ত এবং দ্বিতীয় শ্রেণী ১॥০টা হইতে ৪॥০টা পর্য্যন্ত কাজ করে। দৈনিক পাঁচ ঘণ্টা করিয়া সপ্তাহে সর্ব্বসমেত ২৫ ঘণ্টা স্কুলের কাজ হয়। প্রতিদিন প্রথম দুই ঘণ্টায় (প্রতি ঘণ্টা ৪৫ মিনিটে) অঙ্কশাস্ত্র ও সাহিত্য শিক্ষা দেওয়া হয় এবং বাকী তিন ঘণ্টায় (প্রতি ঘণ্টা ৩০ মিনিটে) অন্যান্য বিষয় পড়ানো হইয়া থাকে। প্রজারা বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চাহিতেছে।

ত্রিবাঙ্কুরের মহারাণী—ইনি বর্ত্তমান নাবালক রাজার অভিভাবিকা
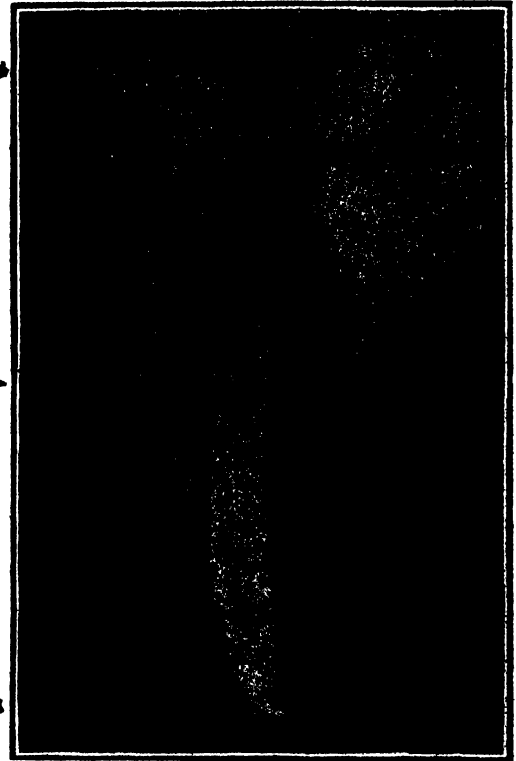
ত্রিবাঙ্কুরের পরিমাণ ৭৬২৫ বর্গমাইল। এই ক্ষুদ্র রাজ্যে ৮টি প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ, একটি "ল" কলেজ ও একটি ট্রেনিং কলেজ আছে।—স্বর্গীয় মহারাজ শ্রীমূলাম্‌ থিরুণালের নামানুসারে স্থাপিত "শ্রীমূলাভিজ্ঞাজয়" বিদ্যালয়টির নাম এখানে উল্লেখযোগ্য।

এই বিদ্যালয়ের রাজপ্রাসাদ-তুল্য ভবন রাজধানী ত্রিভান্দ্রামের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিয়াছে। বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ যাহাতে দরিদ্রেরাও করিতে পারে তজ্জন্য বাৎসরিক দুইলক্ষ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা আছে।

১৯২৩-২৪ সালের রিপোর্টে দেখা যায়—ত্রিবাঙ্কুর স্বাস্থ্য, শিল্প, শিক্ষা প্রভৃতি সকল বিভাগেই আশানুরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছে। আলোচ্যবৎসরে শিক্ষাবিভাগের বিশেষত্ব এই যে মহারাজার কলেজকে কলা ও বিজ্ঞান এই দুই স্বতন্ত্র শাখায় বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ সর্ব্বসমেত গত বৎসর ৭টি ছিল—৪,০১০ এবং মোট ছাত্রসংখ্যা ৪,৫২,৯১১ হইতে ৪,৭৪,২৫৬ হইয়াছে। সরকারী ও বেসরকারী, অনুমোদিত ও স্বতন্ত্র, সাহায্যপ্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত প্রভৃতি একত্রে হিসাব করিলে দেখা যাইবে বিদ্যালয় ও ছাত্রসংখ্যা উভয়ই বৃদ্ধি পাইয়াছে। গড়ে প্রতি ১·৯ বর্গ-মাইলে এবং প্রতি ৯৯৯ জন অধিবাসীর মধ্যে একটি করিয়া স্কুল আছে। কিন্তু পূর্ব্ববৎসর প্রতি ১·৮৭ বর্গমাইলে এবং প্রতি ৯৮৩ অধিবাসীর মধ্যে একটা করিয়া বিদ্যালয় ছিল। ইহার কারণ এই যে অনেকগুলি বেসরকারী বিদ্যালয় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্ববৎসরে অনুমোদিত বিদ্যালয়-

শ্রীমুনাজিনজেম বিদ্যালয়
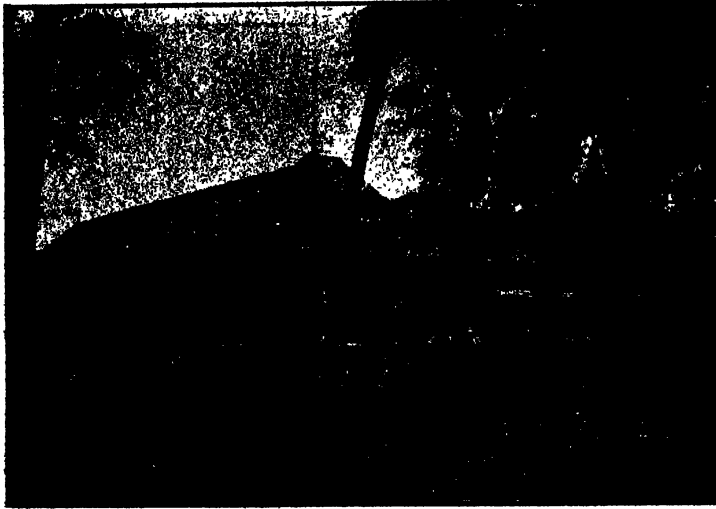
এইবার ৮টি হইল এবং মোট ছাত্রসংখ্যা ২২৭২ হইয়াছে। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের মোট ব্যয়ের ১৮·১ অংশ শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হইয়াছে। ইহাতে দেখা যায় পূর্ব্ববৎসর হইতে শতকরা ৬·৯৭ বেশী ব্যয় হইয়াছে।

শিক্ষাবিভাগের বিবরণে ত্রিবাঙ্কুরের সর্ব্বতোমুখী উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায়। সরকারের অনুমোদিত বিদ্যালয় ৩,২৯৪ হইতে ৩,৪২৬ এবং ছাত্রসংখ্যা ৪,২৭,১৪৩ হইতে ৪,৫৪,৬৬৫ হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরের বিবরণে ৯৭টি বিদ্যালয় এবং ২৪,৯৬২টি ছাত্র বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয়গুলির একত্র হিসাব করিলে আলোচ্য বৎসরে ৪,০৭৭ হইতে গুলিতে মোট অধিবাসীর শতকরা ১০·৬৬ জন পড়িত, এবার শতকরা ১১·৩৫ জন পড়িতেছে। মোটামুটি হিসাবে প্রত্যেক স্তরেই বিদ্যালয় ও ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

স্ত্রী শিক্ষায়ও ত্রিবাঙ্কুর যথাযোগ্য স্থানলাভ করিয়াছে। পূর্ব্ববৎসরে অনুমোদিত বালিকাবিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪১৭ ছিল, এবার ৪২৭ এবং ছাত্রীসংখ্যা ১,৪৪,৫৩৫ হইতে ১,৫৫,০২৩ হইয়াছে। ২০৮ জন বালিকা বিবিধ কলেজে পড়িতেছে।

বর্ত্তমানে প্রতি ২·২৩ বর্গ মাইলের মধ্যে এবং মোট অধিবাসীর প্রতি ১,১৬৯ জনের মধ্যে একটি করিয়া সুস-

কারী স্কুল আছে। ১৯২৪ সনে দেবীকুলম্ এবং পীড়ামিড অঞ্চলের মাত্র ৭টি গ্রাম ব্যতীত সর্ব্বত্রই স্কুল হইয়াছে। উক্ত সালে শিক্ষাবিভাগের মোট ব্যয় ৩৫,২১,৪৯৭৲ টাকা হইয়াছে। অবশ্য গৃহাদি-নির্ম্মাণ ও আধা-সরকারী শিক্ষার ব্যয় ইহাতে ধরা হয় নাই। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের বাৎসরিক মোট ব্যয়ের ৩৮,৬৪,৭২৯৲ টাকা অর্থাৎ ১৯'৮ অংশ শুধু শিক্ষাবিভাগের উন্নতিকল্পেই ব্যয়িত হইয়াছে। ইহা হইতে দেখা যায়, গড়ে প্রতি অধিবাসীর শিক্ষার জন্য ৮৶০ আনা ব্যয় করা হইয়াছে। কিন্তু বৃটিশভারতে প্রতি অধিবাসীর জন্য প্রতি টাকায় বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থে মোট ৭,৩১,০৬৭৲ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। শিক্ষা-বিভাগের জন্য উন্নত দেশী রাজ্যগুলির মধ্যে কে কিরূপ ব্যয় করিতেছেন তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল। সাধারণ ব্যয় ও প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় পৃথক্‌ভাবে দেখানো হইল।

রাজ্য	রাজস্ব লক্ষ	শিক্ষার জন্ত মোট ব্যয় লক্ষ	প্রাথমিক শিক্ষার জন্ত ব্যয় লক্ষ
ত্রিবাঙ্কুর	২০০	৩৫	১৯
কোচিন	৬২	১০	৫'৩০
মহীশূর	৩৪৪	৪৫	১৩
বরদা	২২১	৩০	১৭
যোধপুর	১২৫	২'১৪	১৪

হিন্দু-মহিলা-মন্দির

মাত্র ০'৭৫ অংশ শিক্ষাবিভাগে ব্যয়িত হইয়া থাকে।

১৯২৪ সালে ত্রিবাঙ্কুরে মোট ছাত্রী-সংখ্যা ১,৫৫০২৩ হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অল্পসংখ্যক বালিকা স্থানাভাবে বালকদের স্কুলেই পড়িতেছে। আরও কতকগুলি বালিকা-বিদ্যালয়ের জন্য চেষ্টা করা হইতেছে। পুলয়, পরয়, মুসলমান এজ্‌হাভ, মালয়ব্রাহ্মণ প্রভৃতির জন্য বিশেষ-বিশেষ স্কুলও যথেষ্ট আছে। ত্রিভাণ্ড্রামের রিফর্ম্মেটরী স্কুলে কৃষিশিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ১০৪২ জন ছাত্র আয়ুর্ব্বেদ ও তাঁত বোনা শিক্ষা করিতেছে। সংস্কৃত চতুষ্পাঠীও অসংখ্য আছে। শুধু বিবিধ বে-সরকারী

মোটামুটি হিসাবে দেখা যায়, যে-দেশে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যত বেশী টাকা ব্যয় করা হয়, সে-দেশ তত বেশী পরিমাণ শিক্ষাবিস্তারে অগ্রসর হইতেছে।

সমাজ-সেবা—

ত্রিভাণ্ড্রামে "হিন্দু-মহিলা-মন্দির" নামে একটি অনাথ-আশ্রম স্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে বহু অনাথ বালক-বালিকা এবং বিধবা মহিলার থাওয়া ও থাকার বন্দোবস্ত আছে। অতি সামান্য ঘটনা হইতে এই মহৎ কার্য্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়। ১৯১৮ খৃঃঅব্দে স্বর্গীয় মহারাজের ষষ্টিতম জন্মোৎসবের উদ্বৃত্ত তহবিল ১১৬৲ টাকা লইয়া কয়েকজন

সম্ভ্রান্তবংশীয়া মহিলা মাত্র ১২ জন অনাথ বালক-বালিকা লইয়া আশ্রমটি স্থাপন করেন। আশ্রমবাসীদের মধ্যে নায়ার, অম্বালাবাসী, বেল্লল, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চজাতিও অনেক আছেন।

প্রথম বৎসরেই মহারাজের সরকার হইতে ৪৮০৲ টাকা এবং "অনাথ রাম আয়ার দাতব্য ভাণ্ডার" হইতে বাৎসরিক ১১০৲ টাকা আয়ের একটি অংশ উক্ত মন্দিরের সাহায্যার্থে দান করা হয়। আশ্রমের পাকাবাড়ী নির্ম্মাণের জন্ম ত্রিবাঙ্কুর দরবার প্রায় চারি বিঘা জমি দান করিয়াছেন। একটি সমবায় সমিতিগঠন করিয়া এই আশ্রমটিকে "শ্রীমুলম্ যষ্ঠীপূর্ত্তী স্মারক হিন্দু মহিলা মন্দিরম্" নামে রেজিষ্টারি করা হইয়াছে। আশ্রমের কার্য্যকরী সমিতির সভাপতির পত্নী শ্রীমতী পিরমণ তাম্পী সহস্রাধিক টাকা ব্যয় করিয়া আশ্রমে একটি সুন্দর কূপ খনন করিয়া দিয়াছেন। মন্দিরের সম্পাদিকা শ্রীমতী কে চিন্নামা অক্লান্ত পরিশ্রম-সহকারে জনসাধারণের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া সুদৃঢ় দুইটি পাকাবাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আরও একটি বাড়ী তৈয়ার হইতেছে।

হিন্দু অনাথ বালক-বালিকা ও মহিলার প্রতিপালন ও শিক্ষার সুব্যবস্থা করাই এই আশ্রমের মুখ্য উদ্দেশ্য। ত্রিভাণ্ড্রামের ও মফঃস্বলের ছাত্রীদের জন্ম "ছাত্রীনিবাস" খোলা হইবে। সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারার্থ শিল্প বিদ্যালয়, পুস্তকালয় ও পাঠাগার শীঘ্রই স্থাপিত হইবে। দেশী-ভাষার সঙ্গে-সঙ্গে ইংরেজী শিখিবারও সুব্যবস্থা থাকিবে।

আশ্রমবাসীদের সংখ্যা এখন প্রায় ৮০ হইয়াছে। ৭ জন মেয়ে উত্তমরূপে সুতাকাটা শিক্ষা করিয়া আশ্রম ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহারা বেশ সদুপায়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। অপর দুই জন মহিলা বিবাহ করিয়া আশ্রম ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে এক-জন বি-এ শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছেন।

১৯২৪ সালে জুলাই মাসের ভীষণ বন্যায় ত্রিবাঙ্কুরের যথেষ্ট ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও সামাজিক হিসাবে একটু লাভই হইয়াছে বলিতে হইবে। অস্পৃশ্য জাতির ছায়া-স্পর্শেও উচ্চবর্ণের জাতি যায়, এরূপ কুসংস্কারাচ্ছন্ন অনেক সমাজ দক্ষিণ ভারতে আজও আছে। বন্যার সময়ে, বিবিধ যুবক সংঘের উদ্যোগে স্থানে-স্থানে কেন্দ্র করিয়া জনসাধারণের মধ্যে খাদ্য ও বস্ত্র বিতরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। তখন বিপদে পড়িয়া প্রায় সকল জাতিই একত্রে আহার ও বিহার করিয়াছেন, অথচ, তাঁহারা জাতিচ্যুত হন নাই। "ভাইকোম সত্যাগ্রহ" অস্পৃশ্য জাতির প্রতি নির্ম্মম ব্যবহার রহিত করিবার জন্যই আরম্ভ হইয়াছিল। সত্যাগ্রহীদের আশা পূর্ণ হইয়াছে।

"ভাইকোম সত্যাগ্রহের" একটা সুমীমাংসার জন্য মহাত্মা গান্ধী ত্রিবাঙ্কুর গিয়াছিলেন। ত্রিবাঙ্কুরের লোক-সংখ্যার একটা তালিকা মহাত্মা বাহির করিয়াছেন তাহা নিম্নে দেওয়া গেল :—

জাতি		সংখ্যা
ব্রাহ্মণ	...	৬০,০০০
অন্যান্য উচ্চজাতীয় হিন্দু		৭,৮৫,০০০
অস্পৃশ্য হিন্দু	...	১৭,০০,০০০
খৃষ্টিয়ান	...	১১,৭২,৯৩৪
মুসলমান	...	২,৭০,৪৭৩
অ্যানিমিস্ট	...	১২,৬৩৭
অন্যান্য ধর্ম্মের লোক	...	৩৪৯
	মোট	৪০,০১,৩৯৩

মোটামুটি প্রায় ৪১ লক্ষ লোক ত্রিবাঙ্কুরে বাস করেন, ইহাদের মধ্যে অস্পৃশ্য এবং খৃষ্টানরা একত্রে সংখ্যায় যদিও বেশী। কিন্তু তাঁহারা অতি দরিদ্র। মহাত্মার উপদেশ-অনুসারে নিম্নপ্রাইমারী বিদ্যালয়গুলিতে সুতাকাটা বাধ্যতামূলক করিবার জন্য ত্রিবাঙ্কুর দরবারে একটি প্রস্তাব হইয়াছে। ইতিমধ্যেই তাঁত-বোনা, সুতাকাটা, রংকরা প্রভৃতি বিষয়ে গ্রামে-গ্রামে তত্ত্বাবধান করিবার জন্য কতিপয় বিশেষজ্ঞকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধীর শুভাগমনের স্থায়ীচিহ্নস্বরূপ "বয়নবিভাগ" নামে ত্রিবাঙ্কুরে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ হইয়াছে। এই বিভাগের উপযুক্ত পাকা বাড়ীও নির্ম্মিত হইতেছে। সম্প্রতি বয়ন-বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা অতি অল্পই আছে। গৃহশিল্পের মাল সরবরাহ করিবার জন্য ত্রিভাণ্ড্রামে ও নাগরকৈলে দুইটি কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে।*

* ত্রিবাঙ্কুরের মতন উন্নত-দেশেও জাতিসংগঠনের পক্ষে মারাত্মক অন্তরায় রহিয়াছে। ১৯২২ সালে ত্রিবাঙ্কুরের মোট আয় ১,৯৬,৭০,১৩০৲ টাকার মধ্যে আবকারী ২৬,৮২,৩৬৭৲ টাকা—আফিং গাঁজা

ব্যবস্থাপক-সভা ও নারীর অধিকার—

নারীশিক্ষায় ও নারীর সম্মানে ব্রহ্মদেশসমেত সমগ্র ভারতের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করার সঙ্গে সঙ্গে ত্রিবাঙ্কুর যে মহিলারত্ন লাভ করিয়াছে তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে এখানে দুই-একটি কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক

শ্রীমতী পুনেন লুথুম

হইবে না। শ্রীমতী পুনেন্ লুথোম্ গত সেপ্টেম্বর মাসের ২৩শে তারিখে ত্রিবাঙ্কুররাজ্যের আইন-পরিষদের একজন সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন। ভারতের অন্য কোনো মহিলা ইতিপূর্ব্বে এ-সম্মান প্রাপ্ত হন নাই। এই উচ্চশিক্ষিত মাহিলা যে শুধু ত্রিবাঙ্কুরকে সভ্য জগতের সম্মুখে দাঁড় করাইয়াছেন তাহা নহে, ইনি সমগ্র ভারতেরও গৌরব-স্থল সন্দেহ নাই। তাঁহার প্রতিভাব্যঞ্জক মুখশ্রী ও সুগঠিত কর্ম্মক্ষম দেহ লোকের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আকর্ষণ করিয়া থাকে; আইন-পরিষদে তিনি স্থানলাভ করায় ত্রিবাঙ্কুর-বাসীরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছে। এই সুনির্ব্বাচনের জন্য মহারাণীকেও তাহারা সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ দিতেছে।

ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান শ্রীযুক্ত টি রাঘবিয়া সি-এস্-আই

ত্রিবাঙ্কুর যেন সত্যসত্যই আজ নারীপ্রতিভার পরীক্ষা-মন্দিরের দ্বারে দাঁড়াইয়া আমাদিগকে ঐতিহাসিক যুগের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। একদিকে স্বয়ং মহারাণী সেথু লক্ষ্মীবাই নাবালক মহারাজার অভিভাবিকা-রূপে রাজ্য পরিচালনের গুরুভার আপন স্কন্ধে লইয়াছেন, অন্যদিকে বিদুষী পুনেনের দায়িত্বও কম নয়। শ্রীমতী পুনেনের পিতা ডাক্তার ই, পুনেন ত্রিবাঙ্কুরের রাজবৈদ্য ছিলেন। শ্রীমতী পুনেন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যোগ্যতার সহিত বি-এ উপাধি লাভ করিয়াছেন। স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারে তাঁহার ঐকান্তিক যত্ন ও আগ্রহ আছে। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এফ্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি মহারাজার ছেলেদের কলেজে বি-এ পড়িবার অনুমতি চাহিলে, প্রথমত তাঁহার আবেদন অগ্রাহ্য করা হয়। স্কটল্যাণ্ডবাসী এক সাহেব তখন উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ

৩,১১,৬৩৫্ টাকা ছিল এবং তামাক সিগারেট ১৭,০০,২৯৮্ টাকা—মোট, ৪৬,৯৪,৩০০্ টাকা মাদকদ্রব্য হইতে পাওয়া গিয়াছে। আশার কথা এই যে, এই তিনটি গুরুতর সমস্যা মহারাণীরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। এসময়ে জনমতের বিরুদ্ধে একজন বিদেশীকে (মিঃ ওয়াটস্) দেওয়ানপদে নিযুক্ত করিয়া মহারাণী কতদূর কৃতকার্য্য হইবেন বলা যায় না।

ছিলেন। তিনি স্ত্রীশিক্ষায় বিশ্বাস করিতেন না। অনেক চেষ্টার পর তিনি উক্ত কলেজ হইতেই বি-এ উপাধি লাভ করিলেন। মালাবার প্রদেশের মহিলাদের ভিতর তিনিই সর্ব্বপ্রথম উক্ত সম্মান লাভ করেন। অতঃপর, মহারাজার নিকট হইতে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য বৃত্তি পাইয়া তিনি লণ্ডন যাত্রা করেন। তথায় ক্রমে ছয় বৎসর অধ্যয়ন করিয়া ডাব্‌লিনের 'রটণ্ডা' বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিশেষ কৃতিত্বের সহিত এল্‌-এম্‌ উপাধি লাভ করিলেন। তাঁহার অসাধারণ প্রতিভায় আকৃষ্ট হইয়া লণ্ডনের কেহ-কেহ তাঁহাকে সে-দেশের কোনো উচ্চ পদে নিযুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু, তিনি তাঁহার ভারতীয় ভগ্নীদের মুখ চাহিয়া সে সম্মান প্রত্যাখ্যান করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। দেশে আসিয়াই তিনি মহারাণীর 'দরবার চিকিৎসক' নিযুক্ত হইয়াছেন। "মহিলা ও বালকবালিকা হাঁসপাতালে"র তত্ত্বাবধানের ভারও তাঁহার উপরেই ন্যস্ত করা হইয়াছে। ৺মহারাজার আন্তরিক যত্নে হাঁসপাতালের একটি সুবৃহৎ নূতন পাকা-বাড়ী হইয়াছে। আসবাবপত্র এবং যন্ত্রাদিও প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত হইয়াছে। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই শ্রীমতী পুনেনের কার্য্যদক্ষতায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমে লোকের বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে জনসাধারণের উপকারার্থেই হাঁসপাতালের সৃষ্টি হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে লোকের এ বিশ্বাস ছিল না। এমন-কি আজকাল বহু মুসলমান ভদ্রমহিলাও নিঃসঙ্কোচে উক্ত হাঁসপাতালের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন। হাঁসপাতালের আশ্চর্য্যরকম উন্নতি দেখিয়া পরিদর্শকেরা পুনেনের অধ্যক্ষতার ভূরি-ভূরি প্রশংসা করিতেছেন। রাজকীয় "মহিলা ও বালক-বালিকা হাঁসপাতালে"র সর্ব্বপ্রধান পদে অধিষ্ঠিত হওয়াতে আইন-পরিষদেও তিনি একটি প্রধান বিভাগের সভ্যপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। স্বনামখ্যাতা পুনেনের অসামান্য প্রতিভা ভবিষ্যতে আরও প্রসারলাভ করিবে, আশা করা যায়।

ত্রিবাঙ্কুরের আদর্শ-অবলম্বনে বৃটিশভারতে ও অন্যান্য দেশীরাজ্যে মহিলা-প্রতিভার সম্যক্ বিকাশ-সাধনের সুযোগ প্রদত্ত হইলে, দেশে একটা নব-প্রেরণা আসিতে পারে।
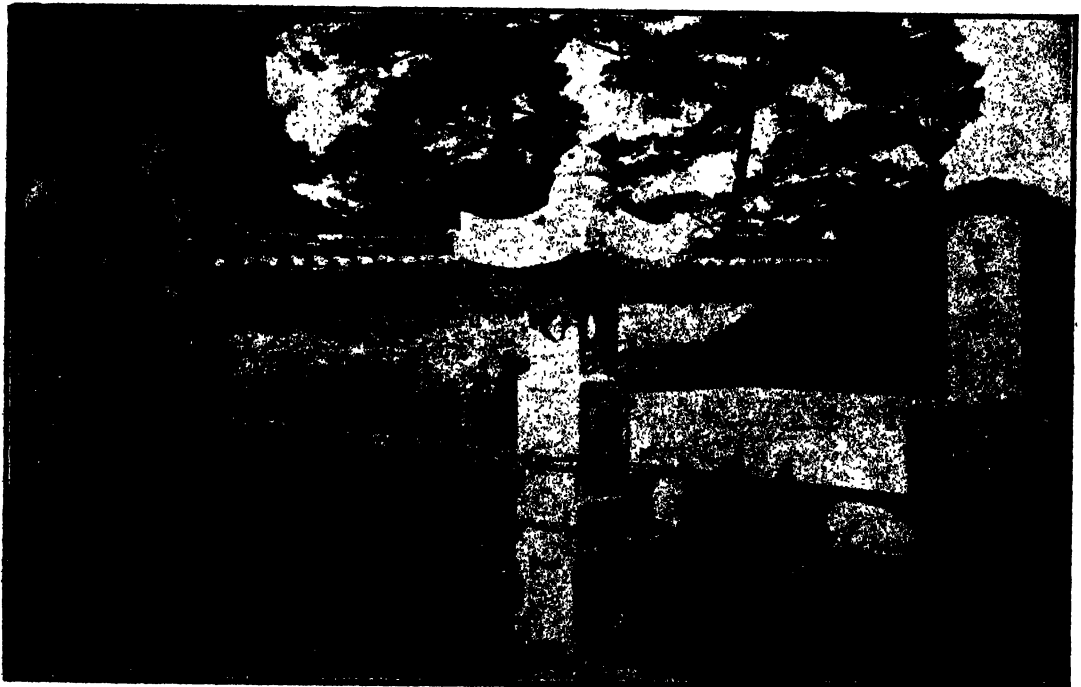
চোখের জোর—

ছবিতে দেখুন—সাধারণ একটা চাবুক লইয়া একজন লোক একটি সিংহকে কেমন সামনে লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ইনি জন্তুর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা হিংস্র জন্তু ব্যাঘ্রকেও বশ করিতে পারেন। এই-প্রকার পশু বশ করা কার্য্যটি মানুষ তাহার মনের এবং চোখের জোরে করিতে সক্ষম হয়। ছবিতে যাঁহাকে দেখিতেছেন ইনি নিউইয়র্ক সহরের একটি ব্যাঙ্কের প্রেসিডেণ্ট, পশু বশ করা ইঁহার পেশা নহে। ইঁহার হিংস্র পশু বশ করার বিষম সখ্ আছে। এই ভদ্রলোকের নাম চার্লস্ বিল্। মিঃ বিলের একটি পশুশালাও আছে। এই পশুশালাতে নিম্নলিখিত জন্তুগুলি আছে:—বাঘ ২, সিংহ ৩, হাতী ৩, নেকড়ে বাঘ ৬, জাগুয়ার ১, বাঁদর ২।

চোখের দৃষ্টির জোরে বনের সিংহ বশ হইয়াছে

মিঃ বিল্‌কে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়, "আপনি কেমন করিয়া পশু বশ করেন?" উত্তরে তিনি বলেন যে "পশুচরিত্র বুঝিবার ক্ষমতা এবং পশুদের প্রতি ভালোবাসার দ্বারাই ইহা করা যায়। কিন্তু বিজ্ঞান ইহা অপেক্ষাও আরো গভীর কারণ দিয়াছে। ডাঃ চার্লস রাস্ নামক একজন চিকিৎসকের মতে মানুষের চোখে একপ্রকার তীব্র বৈদ্যুতিক শক্তি আছে। এই তড়িত শক্তি এত বলবান্ যে, যদি, একটি ৬০° কোণ করিয়া একটি তারের coil ঝোলানো থাকে, এবং তাহার দিকে তীব্রভাবে একদৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকা যায়, তবে তাহা কিছুক্ষণ পরেই আস্তে-আস্তে দুলিবে। লোক-বিশেষে এই শক্তির কম-বেশী হয়। যাহার এই শক্তি বেশী সে অতি সহজেই অন্য মানুষ বা পশুকে চোখের দ্বারা বশ করিতে পারে। চোখের জোর খুব বেশী থাকিলে অতি অল্পকাল মধ্যে অতি হিংস্র জন্তুকে বশ করা যায়।

মিঃ বিলের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহার মধ্যে চুম্বকের মতন আকর্ষণী শক্তি আছে। মিঃ বিল্ বলেন যে, "বাল্যকালে অনেক ছেলে যেমন ডাকটিকিট সংগ্রহ করে, আমি সেই-প্রকার পশু সংগ্রহ করিতাম—আমার একটিও পশু ছিল না, এমন কোনো দিনের কথা আমি মনে করিতে পারি না।

"বাল্যকালে প্রথমে আমি মাছ পুষিতাম। তাহার পর ক্রমে-ক্রমে কুকুর, বিড়াল, কাঠবিড়ালি ইত্যাদি বশ করিয়াছিলাম। কিন্তু এইসকল প্রাণীদের বশ করিলে আমি আর শেষে কোনো আনন্দ পাইতাম না। আমি বড়-কিছু করিতে চাহিতাম।

"তা'র পর আমি একজন পশু-বশকারীর সহিত আলাপ করিলাম, এবং তাহার সাহায্যে দুইটি ভালুক-বাচ্চার অধিকারী হইলাম। এই-প্রকারে ক্রমে-ক্রমে আমি চিতাবাঘ, কুমীর, হায়েনা, ইত্যাদি অনেক-প্রকার জন্তুর মালিক হইলাম। শেষে আমার পশুশালা এত বড় হইয়া-গেল যে, আমি নিউ যার্সি সহরের একস্থানে বৃহৎ করিয়া আমার পশুশালা স্থাপন করিলাম।"

কেমন করিয়া চোখের দৃষ্টির দ্বারা তারের coil দোলানো যায় তাহা পরীক্ষা করিবার যন্ত্র

মিঃ বিলের পশুগুলি এতবেশী পোষ মানিয়াছে যে, তিনি তাহাদের দ্বারা বায়স্কোপের ছবি তুলিবার এবং অন্যান্য লোকরঞ্জন অনেক কার্য্যে তাহাদের সহজেই নিযুক্ত করিতে পারেন। মিঃ বিলের মতে, পশু বশ করিবার প্রণালী শিক্ষা করিবার বিষয় নহে, ইহা আপনাআপনি মানুষের মধ্যে জন্মায় এবং উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইলে বৃদ্ধি পায়। বেশীর ভাগ পশুকেই ধাপ্পা দিয়া বশ করা যায়। এবং যতদিন ধাপ্পা বজায় রাখিতে পারা যায়, ততদিন পশুর নিকট হইতে কোনোপ্রকার বিপদের আশঙ্কা থাকে না।

ডাঃ রাস্ বলেন, মানুষ কোনো পশুর চোখের দিকে একদৃষ্টে থাকিলে, মানুষের চোখ হইতে বিদ্যুৎপ্রবাহ পশুকে অভিভূত করিয়া তাকাইয়া ফেলে এবং সে মানুষের বশ হইয়া যায়।

ডাঃ রাস্, ইহা কোনো জন্তুকে বশ করিয়া তাহাকে নানা-রকম খেলা দেখাইতে বাধ্য করিয়া, প্রমাণ করেন নাই—প্রমাণ করিয়াছেন, চোখের দৃষ্টির শক্তির দ্বারা একটি ঝোলানো দ্রব্যকে দোলাইয়া।

ইহা প্রমাণ করিবার জন্ত একটি যন্ত্র বিশেষভাবে তৈয়ার করা হয়। যন্ত্রটি এমনভাবে নির্ম্মাণ করা হয় যে, হাওয়া বা অন্ত কোনো কিছুর দ্বারা ইহার মধ্যস্থিত coilএর দুলিবার কোনোপ্রকার সম্ভাবনা ছিল না। একটি কাচের চিম্‌নির মধ্যে এই তারের coil রাখা হয়। চিম্‌নির উপরে একটি রেশমি সূতা দিয়া coil টি বাঁধা ছিল। কয়েলএর কিছু উপরে উত্তর-দক্ষিণ মুখী অবস্থায় ছিপির সঙ্গে একটি চুম্বকখণ্ড বাঁধা ছিল। coilএর দুইপ্রান্ত পূর্ব্ব-পশ্চিমমুখী ছিল। coil কতখানি দোলে তাহা মাপিবার জন্ত coilএর নীচে একটি মাপযন্ত্র ছিল। চিম্‌নির একপাশে একটি ছিদ্র ছিল, এই ছিদ্র দিয়া চোখের দৃষ্টি সোজা coilএর উপর গিয়া পড়িত।

চার্ল্‌স্ বেল্ চোখের দৃষ্টির জোরে বনের হিংস্রতম জন্তু বাঘকে বশ করিয়াছেন

ডাঃ রাস্ এই যন্ত্র হইতে একটু দূরে দণ্ডায়মান হইয়া co.l এর দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকাইতে লাগিলেন—এক সেকেণ্ড্, দুই সেকেণ্ড্, তিন সেকেণ্ড্...কোনো রকম ফল হইল না, কিন্তু পাঁচ সেকেণ্ড্ তাকাইয়া থাকিবার পর coil উত্তর-দক্ষিণমুখী হইয়া দুলিতে লাগিল...ক্রমে coilএর দুই প্রান্ত উত্তর-পশ্চিমমুখী হইয়া গেল এবং উপরিস্থিত চুম্বকের প্রান্তদ্বয় প্রায় পূর্ব্ব-পশ্চিমমুখী হইয়া গেল। কিন্তু coil হইতে দৃষ্টি ফিরাইবা মাত্র coil এবং চুম্বক পূর্ব্ব-অবস্থা প্রাপ্ত হইল।

বিখ্যাত জন-নেতারা কি-প্রকারে বহু লোককে তাঁহাদের ক্রীতদাসের মতন করিয়া রাখেন, তাহার কারণ এইপ্রকারে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। তাঁহাদের চোখের মধ্যে অত্যধিক পরিমাণে তাড়িত শক্তি আছে এবং এই শক্তির দ্বারা তাঁহারা দুর্ব্বল-মনঃশক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিদের অতি সহজেই অভিভূত করিয়া ফেলিতে পারেন।

মিঃ বেল্ বলেন যে-কোনো হিংস্র পশুকে তাহার শক্তির পরিমাণ তাহার কাছে অজ্ঞাত রাখিতে হয়। পশু যদি কোনো রকমে জানিতে পারে যে তাহার শক্তি তাহার মানুষ-প্রভু অপেক্ষা বেশী, তাহা হইলে তাহার ফল বিষম হইতে পারে। এমন দেখা গিয়াছে, বহু বছরের পোষা বাঘ বা সিংহ হঠাৎ তাহার প্রভুকে হত্যা করিয়াছে। ইহার কারণ এই যে, পশু-শিক্ষকের চোখের জোর কোনো কারণে ক্রমে-ক্রমে কমিয়া গিয়াছে, এবং অবশেষে তাহার শক্তি এত অল্প হইয়া গিয়াছে যে তাহার পশুকে বশে রাখা অসম্ভব। চোখের তাড়িতশক্তি বিকীরণ করিবার ক্ষমতা কমিয়া যাইবামাত্র অভিভূত পশুর মোহ কাটিয়া যায়, এবং সে তাহার পূর্ব্ব বন্ধ প্রকৃতি কতকপরিমাণে ফিরিয়া পায়।

ডাঃ রাসের এই মত এখন একেবারে সন্দেহের বাহির হয় নাই, কিন্তু যে-বিষয়কে লোকে এতকাল জাদু বলিয়া মনে করিত, তাহা এতদিনে বিজ্ঞানের মহলে আসিয়া পড়িল।

বন্যজন্তুর ফোটো তোলা—

বন্দুক এবং পিস্তলের বদলে, ক্যামেরা এবং ফ্ল্যাশ-লাইটের সাহায্যে মেজর্ র‍্যাডক্লিফ্ ডাগমুর্ আফ্রিকার বিষম জঙ্গলের মধ্যে কতকগুলি ভীষণ বন্যজন্তুর ফোটো তুলিতে সক্ষম হইয়াছেন। কেবলমাত্র, দুইবার তাঁহাকে নিজের প্রাণ বাঁচাইবার জন্ত পিস্তল ব্যবহার করিতে হইয়াছে। মেজর ডাগ্‌মুর এইসকল জন্তুদের নিহত শিকারের সন্ধান করিয়া, তাহার

ফ্ল্যাশলাইট্‌যুক্ত ক্যামেরা—ইহার সাহায্যে গভীর জঙ্গলে বন্যজন্তুদের ফোটো তোলা যায়।

নিকট হইতে সামান্য দূরে ক্যামেরা এবং ফ্ল্যাশলাইট লইয়া অপেক্ষা করিতেন। তাহার পর শিকারী জন্তু যখন শিকার আহার করিবার জন্ত প্রত্যাবর্তন করিত, তখন মেজর ডাগমুর হঠাৎ তাহার উপর ফ্ল্যাশ-

ফ্ল্যাশ লাইটে তোলা বনের সিংহের ফোটো

লাইট ফেলিয়াই ক্যামেরার সাহায্যে তাহার ছবি তুলিয়া লইতেন। শিকারী জন্তু হঠাৎ সামনে আলো দেখিয়া থতমত খাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িত, এবং একটু পরেই পলায়ন করিত।

—

উৎকট সখ—

ছবিতে দেখুন মেমসাহেব অভিনব উপায়ে ধূমপান করিতেছেন। মাথার টুপীর সঙ্গে সিগারেট-হোল্‌ডার বেশ ভালো করিয়া আঁটা আছে—হোল্‌ডার হইতে মেমসাহেবের মুখ পর্য্যন্ত রবারের নল আছে—এই নল দিয়া

টুপীর সামনে লাগানো সিগারেট হোল্‌ডার

মেমসাহেব আরামে ধূমপান করিয়া থাকেন। বিছানায় শুইয়া বই পড়িবার সময়, মোটরে ভ্রমণকালে কিম্বা তাস-খেলার সময়ে এই উপায়ে ধূমপান করা বিশেষ সুবিধা-জনক।

গতি-বেগের সীমা—

বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক মানুষ নিত্যনূতন যন্ত্রের আবিষ্কারে আপনার গতিবেগ বৃদ্ধি করিয়াই চলিয়াছে। দুইশত বৎসর পূর্ব্বে ঘণ্টায় ১০০ মাইল বেগ মানুষের কল্পনাতীত ছিল কিন্তু এখন মানুষ অবলীলা-ক্রমে ঘণ্টায় ২০০ মাইল ছুটিতেছে—অবশ্য যন্ত্রযোগে। মানুষের এই গতি কি উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিবে, না প্রকৃতি ইহার কোনো সীমা নির্দ্দেশ

লেফ্‌টেনাণ্ট্ অল্ উইলিয়াম্‌স্ এরোপ্লেনে ঘণ্টায় ২৬৬'৫৯ মাইল বেগে উড়িয়াছেন—মানুষের গতির ইহাই শেষ সীমা বলিয়া মনে হয়

করিয়াছেন—এই প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদয় হয়। মানুষের গতিবেগের একটা সীমা আছে, বিজ্ঞান এই সন্দেহ করিতেছে। ঘণ্টায় ১০০০ মাইল কিম্বা তদূর্দ্ধ বেগ-সম্পন্ন বিমানপোত বা অন্ত কোনোপ্রকার যন্ত্রের আবিষ্কার অসম্ভব না হইতে পারে, কিন্তু মানুষের দেহে গতিবেগ সহ্য করার শক্তির সীমা আছে। অত্যধিক বেগে চালিত হইলে মানুষের দেহ-যন্ত্র নানা-ভাবে বিকল হয়, এমনকি মৃত্যু পর্য্যন্ত অসম্ভব নহে। গতি সামান্ত রকম বাড়িলেই শিরোঘূর্ণন, বমনোদ্রেক প্রভৃতি আমরা প্রায়ই লক্ষ্য করিয়া থাকি, সুতরাং গতিবেগের যে সীমা আছে, তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। নিউইয়র্কের বিজ্ঞানবিদ্ Major L.H Bauer বলিয়াছেন যে, অত্যধিক

টমি মিল্‌টন্ রেসিং কারে ২৩'০৭ সেকেণ্ডে মাইল দৌড়িয়াছেন—এত বেগে এপর্য্যন্ত আর কেহ মোটরকারে দৌড়ায় নাই

বেগে চালিত হইলে মানুষের হয় কোনো স্থায়ী অনিষ্ট কিম্বা মৃত্যু ঘটিবে। মানুষের গতিবেগের সীমা কোথায় তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা সম্ভব না হইলেও সীমা যে আছে ইহা নিশ্চয়। Lieut Al Williams, U.S.N বিমান-বিহার অভিজ্ঞতায় ঘণ্টায় ২৬৬·৫৯ মাইল গতিকে দেহ-যন্ত্রের ক্ষতিকর বলিয়া বুঝিয়াছেন, সুতরাং উহার কাছাকাছি কোনো গতিকে মানুষের গতির সীমা বলিয়া ধরা যাইতে পারে। ২৬৬·৫৯ মাইল বেগে তাঁহার বিমান-পোত চালনা করাতে বাহিরের প্রচণ্ডগতি ও শরীরাভ্যন্তরের রক্তের গতির পার্থক্য ঘটাতে তিনি মুহ্যমান হইয়া পড়েন। মস্তকের রক্ত সমস্ত দেহে সঞ্চারিত হইয়া মস্তক রক্তশূন্য হয় এবং তিনি দারুণ শৈত্য অনুভব করেন, সুতরাং যন্ত্র-সাহায্যে গতিবেগ যতই হউক না কেন দেহের বেগ সহ্য করার একটা সীমা আছে। নিম্নতর জীবজন্তুর গতিবেগ সহ্য করার ক্ষমতা মানুষ অপেক্ষা অধিক, এইজন্য দেখা যায় ভালো রেসের ঘোড়া শ্রেষ্ঠ দৌড়-বাজের তিনগুণ বেগে ছুটিতে পারে। শ্রেষ্ঠ সন্তরণকারীর চরমবেগ মৎস্যের সন্তরণ-বেগের তুলনায় কিছুই নয়।

—

মানুষের চেহারার সহিত তাহার প্রকৃতির সম্পর্ক—

বিশেষ এক-একপ্রকারের চেহারাওয়ালা লোকের প্রকৃতি বিশেষ এক-একপ্রকারের হয়, ইহা আজ পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রমাণিত না হইলেও, শীঘ্রই হইবে, এরূপ আশা করা যায়। আমেরিকার ডাঃ ড্রেপার নামক একজন চিকিৎসক ৪০০ জন রোগীর শরীর নানা-রকম-ভাবে পরীক্ষা করিয়া বলিতেছেন যে, মানুষের চেহারা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া তাহার প্রকৃতি নিরূপণ বিশেষ শক্ত ব্যাপার নহে। মানুষের মুখের বিভিন্ন অংশের মাপজোকের উপর তাহার মনের অনেক-কিছু ব্যাপার নির্ভর করে। তাহার শরীরের গঠন পরীক্ষা করিয়া তাহার কোন্ রোগ হইবার বেশী সম্ভাবনা তাহাও নির্ণয় করা যায়।

গিল্‌বার্ট্‌ কিথ্‌ চেষ্টার্টন্‌
মোটাসোটা এবং নরম-হাতওয়ালা লোকে সাধারণত পরিহাসরসিক হয়

ডাঃ ড্রেপারের মতানুযায়ী শরীর পরীক্ষা করিয়া অনেক-প্রকার অভিনব ফল ইতিমধ্যেই লাভ করা গিয়াছে। ইহার সাহায্যে এখন ডাক্তারদের রোগ নির্ণয় করিয়া রোগীর ঔষধ ব্যবস্থাও সহজ হইবে বলিয়া মনে হয়। ডাক্তারেরা ইতিপূর্ব্বে মানুষের দেহ পরীক্ষা করিবার সময় ডাঃ ড্রেপারের আবিষ্কৃত বিষয়গুলির বিষয় কোনো-প্রকার বিবেচনা করিতেন না। ডাঃ ড্রেপার নিম্নলিখিত প্রাচীন প্রবাদ-বাক্যগুলিকে সত্য বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন।

১। ক্ষুদ্র মুখে দুইটি চোখ অত্যন্ত তফাৎ যদি কারো হয়, তবে সে সাধারণত সুগায়ক এবং সু-অভিনেতা হয়। অনেক বিখ্যাত গায়ক-গায়িকা এবং অভিনেতার মুখ এবং চোখ এইপ্রকার ছিল। যেমন এথেল বা ব্যারিমুর; ক্যাথারিন্ কর্নেল ইত্যাদি।

২। মোটা এবং নরমহাতওয়ালা লোক পরিহাস-রসিক হয়। চেস্টার্টন্ ইহার উদাহরণ।

৩। পুরুষ যদি নারী-স্বভাবযুক্ত হয়, তবে সে খুব চালাক্ হয়। যে নারী পুরুষ ভাবাপন্ন সে বিষয়কর্ম্মকুশল হয়।

৪। প্রকাণ্ড বিপুলকায় ব্যক্তি খামখেয়ালী এবং সুরসিক—উদাহরণ অ্যাব্রাহাম লিন্‌কন্।

মানুষের চোখ এবং জ্রর দূরত্বের-নিকটত্বের অর্থ আছে। যেসমস্ত লোকের চোখ জ্রর তুলনায় বেশী উচ্চ, সেইসকল লোকের বাত আছে কিম্বা হইবে, এইরূপ বলা যাইতে পারে। যে-সমস্ত লোকের চোখ ধূসর, তাহারা সাধারণত রক্তহীনতা এবং যক্ষ্মা ছাড়া অন্য সকল-প্রকার ব্যাধিতে সহজেই আক্রান্ত হয়। যেসমস্ত লোকের gail-bladder সংক্রান্ত রোগাদি হয়, তাহারা সাধারণত স্থূলদেহ, গোল-মুখো, এবং তাহাদের চোখ অতি কাছাকাছি।

যাহার gastrio ulcer আছে, তাহার মুখ পাৎলা এবং কীলকাকৃতি। তাহার পুষ্টিকর আহারাদি বিশেষ জোটে না।

দুষ্ট-রক্তহীনতা-গ্রস্ত লোকের মুখ ছোটো, কিন্তু অত্যন্ত চওড়া এবং চোখ-দুটি অত্যন্ত তফাতে অবস্থিত।

যে সমস্ত লোকের মূত্রাশয়ের ব্যাধি আছে, তাহাদের মধ্যে শতকরা ৮৬ জনের, এবং যাহাদের শরীরে অত্যন্ত রক্তাভাব, তাহাদের শতকরা ৭০ জনের আঁচিল বা জড়ুল নাই।

যক্ষ্মারোগ-গ্রস্ত পুরুষ রোগীদের মধ্যে অধিকাংশই বেশ লম্বা-চওড়া দেখিতে। যেসমস্ত লোকদের মূত্রাশয়প্রদাহ হয়, তাহাদের বেশীর ভাগেরই মাথা অত্যন্ত সরু হইয়া থাকে।

এইসমস্ত বিভাগ যে একেবারে নির্ভুল তাহা নয়। কিম্বা যে-সমস্ত লোকের দেহের মুখের গঠন বিশেষ কোনো-একপ্রকার রোগীর মতন, তাহার যে ঐ রোগ হইবেই এমন কোনো নিয়ম নাই। তবে তাহার ঐ রোগ হইবার সম্ভাবনা, অন্য-প্রকার গঠনওয়ালা লোক অপেক্ষা বেশী, ডাঃ ড্রেপার এই কথা বলিতেছেন। তবে ইহাতে এই লাভ হয় যে, যে-কোনো লোক তাহার দেহের গঠন ইত্যাদি ভালো করিয়া পরীক্ষা করাইয়া বিশেষ-কোনো রোগ হইবার ভয় থাকিলে তাহার জন্য সাবধান হইতে পারে। এইসমস্ত আবিষ্কার যে নূতন বা খুব চমকপ্রদ তাহা

ইভা গ্যালিন্। ক্যাথারিন্ করনেল। এস্টল উইন্ডেভ্। এথেল বারিমুর।

ক্ষুদ্রাকৃতি মুখ—কিন্তু চক্ষুদুটি বেশ তফাতে—এইরকম ব্যক্তিরা সঙ্গীতজ্ঞ এবং ভালো অভিনেতা হয়

এব্রাহাম লিন্কন্। যোসেফ্ চোটএ। ডি উল্‌ফ্ হপার্। উইল্ রজাস্।

প্রকাণ্ড rangy ব্যক্তিরা সাধারণত খামখেয়ালী—এবং অতি রসজ্ঞ হয়

ডাঃ ড্রেপার বলেন না, তবে চিকিৎসকেরা এতদিন এইসকল ব্যাপার ধর্ত্তব্যের মধ্যেই আনিতেন না, এখন হইতে তাহা আনিতে পারেন।

এই প্রথার চিকিৎসা শিক্ষা করিবার জন্ত এখন ডাঃ ড্রেপারের কাছে নানা দেশ হইতে লোক আসিতেছে। এখন পর্য্যন্ত কেবলমাত্র মানুষের শরীর-গঠন তত্ত্ব লইয়াই পর্য্যবেক্ষণ চলিতেছিল, কিন্তু ক্রমে Physiology, মনস্তত্ত্ব, এবং immunology লইয়াও পর্য্যবেক্ষণ আরম্ভ হইবে। তখন এই ব্যাপারের আরো উৎকর্ষ লাভ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

ডাঃ ড্রেপার গত নয় বৎসর ধরিয়া এই বিষয়ে পরীক্ষা কার্য্য চালাইতেছেন। কিন্তু তিনি যেখানে এই মূল্যবান্ পরীক্ষা-কার্য্য করিতেছেন, সে স্থানটি বৈজ্ঞানিক কাজ-কর্ম্মের পক্ষে মোটেই অনুকূল নয়।

সেকালের সংস্কৃত কলেজ

শ্রী হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন

(২

বিদ্যাভূষণ-মহাশয়ের পর শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের কথা বলিতেছি। তিনি আমাদিগকে ভারবি পড়াইতেন। তাঁহার শিক্ষাপ্রণালী অতি সুন্দর ছিল। তিনি সুশ্রী গম্ভীরপ্রকৃতি পুরুষ ছিলেন। বিদ্যাসাগর-মহাশয় যখন বিধবাবিবাহ প্রথা প্রচলিত করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন শ্রীশ বিদ্যারত্ন মহাশয় প্রথম বিধবা-বিবাহ করেন। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার পূর্ব্ববিবাহিত পত্নী পরলোক গমন করিয়াছিলেন।

পূজ্যপাদ তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় আমাদিগকে রঘুবংশের ৯ম সর্গ পর্য্যন্ত পড়াইয়াছিলেন—একথা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। বাকী অংশ অর্থাৎ ১০ম সর্গ হইতে শেষ ১৯শ সর্গ আমার পিতৃদেব ৺গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় পড়াইয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষাপ্রণালী অতি মনোহারিণী ছিল। রঘুবংশের সীতার বনবাসের শ্লোকগুলি পড়াইবার সময় তিনি ক্রন্দন না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। পড়াইতে-পড়াইতে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া যাইত এবং অনেকক্ষণের পর উচ্ছ্বসিত আবেগ সংবরণ করিয়া পুনর্ব্বার পাঠ আরম্ভ করিতেন। বিদ্যাসাগর-মহাশয় প্রতিবৎসর যে বার্ষিক রিপোর্ট লিখিতেন, তাহাতে তিনি পিতৃদেবের অধ্যাপনার যথেষ্ট প্রশংসা করিতেন। তিনি বাল্যকালে অতি দরিদ্রাবস্থায় সংস্কৃত কলেজে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। প্রথমে তথায় লাইব্রেরিয়ানরূপে নিযুক্ত হন। পরে অধ্যাপক-শ্রেণীতে উন্নীত হইয়া ক্রমে 'এম-এ'র অধ্যাপক পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। তিনি দীর্ঘাকৃতি ও সুশ্রী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার হৃদয় সতত করুণার্দ্র ছিল। একবার তিনি কিঞ্চিৎ জমি বিক্রয় করিয়া ১০,০০০৲ লাভ করেন। সেই অর্থে তিনি তৎক্ষণাৎ দরিদ্রদিগকে বিতরণার্থ একটি 'ফণ্ড' স্থাপন করেন। অধুনা ঐ 'ফণ্ড' ২৫,০০০৲ টাকায় পরিণত হইয়াছে। বিস্তৃত বিবরণ তাঁহার জীবনীতে দ্রষ্টব্য।

রঘুবংশপাঠ শেষ হইলে মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় কুমারসম্ভব ও মেঘদূত পড়াইতেন। তিনি অতি সুশ্রী ও রসিক পুরুষ ছিলেন। একটি ঘটনা মনে পড়িতেছে তাহা না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না। সংস্কৃত কলেজের উত্তর দিকে কোন ভদ্রলোকের বাড়ী ছিল। ঐ ভদ্রলোক একদিন বিদ্যাসাগর-মহাশয়কে বলেন,—"মহাশয়! সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদিগের জন্য আমাদের স্ত্রীলোকেরা ছাদের উপর উঠিতে পারেন না। ছাত্রেরা সর্ব্বদা আমাদের বাড়ীর দিকে তাকাইয়া থাকে।" সংস্কৃত কলেজের উত্তরদিকের দোতালায় যে ঘর ছিল, মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় ঐ ঘরে ছাত্রদিগকে পড়াইতেন। সুতরাং ঐ ঘরটি উক্ত ভদ্রলোকের বাটীর দিকে ছিল। বিদ্যাসাগর-মহাশয় উক্ত ভদ্রলোকের কথা শুনিয়া মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়কে বলিলেন—"মদন, ছেলেদের বারণ করিয়া দিও, যেন ওদিকে না তাকায়।" তাহা শুনিয়া তর্কালঙ্কার-মহাশয় উত্তর দিলেন, "দেখ বিদ্যাসাগর, বসন্তকাল পড়িয়াছে; মেঘদূত পড়ানো হইতেছে, আর পড়াইতেছেন কে? না, স্বয়ং মদন। এস্থলে কাহার মন না চঞ্চল হইবে?" এই কথা শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় অতীব তুষ্ট হইলেন। কিন্তু ছুতার ডাকাইয়া ঐদিকের খড়খড়িগুলি স্ক্রু দিয়া এমন বন্ধ করিয়া দিলেন, যে, ছাত্রেরা আর খুলিতে পারে নাই। মদনমোহন তর্কালঙ্কার শিশুশিক্ষা ১ম, ২য়, ও ৩য় ভাগ লিখেন, এবং বাসবদত্তা বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ করেন। তিনি সংস্কৃত কলেজ হইতে পরে বহরমপুরে জজ-পণ্ডিত হইয়া যান। কেহ-কেহ বলেন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ হইয়াছিলেন।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার-সম্বন্ধে আরও দুইটি গল্প এখানে না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। প্রথমটি তাঁহার

আধ্যাত্মিক বিষয় সম্বন্ধীয়; দ্বিতীয়টি সম্পূর্ণ পারিবারিক। প্রথমটি এই, মদনমোহন নাস্তিক ছিলেন, ভগবান্ মানিতেন না। বিদ্যাসাগর-মহাশয় যে কি মানিতেন তাহা আমাদের বোধগম্য হইত না। পিতৃদেব গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন আস্তিক ছিলেন। যখন মদনমোহন বহরমপুরে থাকিতেন তখন একবার সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তখন তিনি দুইজন প্রাণের বন্ধুকে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় এই দুইজন তাঁহার প্রাণের বন্ধু ছিলেন। মদনমোহন মৃত্যুশয্যায় শয়ান হইয়া পিতৃদেবকে বলিয়াছিলেন—"গিরিশ, তুই বেশ আছিস্; পীড়ার সময় একজনকে ডাকিয়া কিছু সান্ত্বনা পাস্। আমি কিন্তু বরাবর বলিয়া আসিয়াছি, ভগবান্ বলিয়া কেহ নাই; কাজেই এখন যে কাহাকে ডাকিয়া প্রাণ শীতল করিব জানি না।" তাঁহারা উভয়ে তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া চলিয়া আসিলেন। দ্বিতীয়টি এই—তৎকালে বন্ধুত্ব কত গাঢ় ছিল, তাহার দৃষ্টান্ত। মদনমোহন বিদ্যাসাগরের অপেক্ষা বয়সে কিছু বড় ছিলেন; তজ্জন্য মদন-পত্নী বিদ্যাসাগরকে "ঠাকুর-পো" বলিয়া ডাকিতেন। বিদ্যাসাগরও তাঁহাকে "বৌদিদি" বলিয়া ডাকিতেন। মদন-পত্নী কিছু প্রগল্‌ভা ছিলেন। একদিন বিদ্যাসাগর-মহাশয় কলেজ হইতে মদনের বাসায় গিয়া বলিলেন, "বৌদিদি, বড় ক্ষুধা পাইয়াছে; কি খাইব?" মদন-পত্নী তখন মাধ্যাহ্নিক আহার করিতে বসিয়াছিলেন। তিনি কহিলেন, "কেন ঠাকুর-পো! এই ভাত আছে খাও না।" বিদ্যাসাগর-মহাশয় তৎক্ষণাৎ অম্লানবদনে তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া একপাত্র হইতে হাম্ হাম্ করিয়া ভাত খাইতে লাগিলেন। এমন-সময় মদন আসিয়া বলিলেন, "আরে, কি কর, বিদ্যাসাগর। সকল মহাপ্রসাদ খাইও না, আমি খাইব কি?" এই কথা শুনিয়া তাঁহার পত্নী ভাতের থালাখানি হস্তে লইয়া উঠিয়া বলিলেন, "এই লও, মহাপ্রসাদ খাও।" মদন সেই থালা চাটিতে লাগিলেন। এই গল্পটি আমার পিতৃদেব আমার মাতৃদেবীকে বলিয়াছিলেন। আমি আমার মাতৃদেবীর নিকট শুনিয়াছিলাম। মদন-বাবুর পরলোকান্তে জজ-পণ্ডিতদের পদ উঠিয়া যায়।

কারণ, শ্যামাচরণ সরকার মহাশয় যে ব্যবস্থাদর্পণ রচনা করেন, তাহা দেখিয়া জজ সাহেবেরা হিন্দু-ধর্ম্মের বিচার করিতেন। এবং তিনি নিজে Mahammadan Law সংগ্রহ করেন। তাহা দেখিয়া জজগণ মুসলমান ধর্ম্মের বিচার করিতেন। সুতরাং জজ-মৌলবীর পদও উঠিয়া যায়।

পরে তারাশঙ্কর তর্করত্ন কাদম্বরী পড়াইতেন। তিনি কাদম্বরী গ্রন্থের বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। ঐ গ্রন্থখানি বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এর বাঙ্গালার উপযুক্ত পাঠ্য। তারাশঙ্কর খর্ব্বাকৃতি ও সুপুরুষ ছিলেন। তিনি মিষ্টভাষী ও লোকপ্রিয় ছিলেন।

প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর নামে একজন হরিনাভিবাসী দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ নিম্নশ্রেণীতে ১ম ও ২য় ভাগ ঋজুপাঠ পড়াইতেন। তিনি অত্যন্ত রসিক লোক ছিলেন। তিনি বলিতেন,—"ছেলেরা কাসেজে [খাবার] খায়, তা ত নয়; তাহাদিগকে কালে যে খায়।" তিনি একটি ন্যাক্‌ড়ার গোলা হাতে রাখিতেন; যদি কোন ছাত্র গোল করিত, ঐ গোলা ছুড়িয়া তিনি মারিতেন, এবং বলিতেন, "এই গোলা খাও।" গোলা খাইয়া ছাত্র চমকিয়া উঠিত; তখন তিনি হাস্য করিতেন। তিনি অন্যান্য অধ্যাপক-মহাশয়দিগের সহিত তামাসা ফষ্টিনষ্টি করিতেন। তৎকালে ভাড়াটিয়া গাড়ীতে স্প্রিং ছিল না, দড়ী দিয়া চারিধারে বাঁধা থাকিত। শনিবার দেশে যাইবার সময় ৩।৪ জন একত্র হইয়া রাজপুর ও হরিনাভিতে যাইতেন। এস্‌প্লানেড্ মাঠে গিয়া সকলে একত্র হইতেন। ঐখানে ভাড়াটিয়া গাড়ীতে চড়িতেন। বিদ্যাভূষণ-মহাশয়, আমার পিতৃদেব, প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর ও রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন এই চারি জনে এক গাড়ীতে যাইতেন। শেষোক্ত পণ্ডিত-মহাশয় ফোর্ট্ উইলিয়ম কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক ছিলেন। তিনিও রাজপুরবাসী দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। গাড়ীতে উঠিবার পূর্ব্বেই প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিতেন, "ওহে, পাষাণ ভাঙ্গিয়া উঠ।" অর্থাৎ দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় একটু মোটা ও ভারী লোক ছিলেন। যেদিকে তিনি বসিতেন সেদিকে প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর মহাশয় বসিতেন না; এবং বলিতেন, "যদি দড়ী ছেঁড়ে, তবে 'কুঁপো কাৎ'

হইবে, এবং আমিও ঐ সঙ্গে 'চিৎপটাং' হইব।" এই-জন্য তিনি বিদ্যাভূষণ-মহাশয় যেদিকে বসিতেন, প্রাণান্তেও সেদিকে বসিতেন না। পথে যাইতে-যাইতে তিনি রসিকতা করিয়া সকলকে হাসাইতেন; সুতরাং কেহই পথশ্রম জানিতে পারিতেন না।

এই ত গেল শিক্ষকগণের বৃত্তান্ত। এক্ষণে ছাত্রগণের বৃত্তান্ত কিছু লিখিতেছি। তৎকালে গুরুভক্তি অত্যন্ত প্রবল ছিল। আমরা শিক্ষক মহাশয়কে প্রণাম করিয়া বেঞ্চিতে বসিতাম। এবং পাঠ শেষ হইলে তিনি যখন চলিয়া যাইতেন, তখন আবার প্রণাম করিতাম। ছাত্র-দিগের মধ্যে একটি অতি সুন্দর সহানুভূতি ছিল। কোন ছাত্র পীড়িত হইলে তাহার বাসায় গিয়া দিনরাত্রি তাহার সেবা করিতাম ও ঔষধ ও পথ্য ব্যবস্থা করিয়া দিতাম। স্বর্গীয় জগবন্ধু বসু এম্-ডি মহাশয় সংস্কৃত কলেজের ছাত্র-দিগকে বড় ভালবাসিতেন, এবং বিনা বেতনে তাহা-দিগকে চিকিৎসা করিতেন। কেহ পীড়িত হইলে প্রত্যহ তাহার বাসায় গিয়া তাহাকে দেখিয়া আসিতেন। কোন শিক্ষকের বাড়ীতে যদি বিবাহ হইত, তাহা হইলে আমরা গিয়া তাঁহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতাম। কোন ছাত্র মারা গেলে আমরা তাহাকে স্কন্ধে করিয়া লইয়া সৎকার করিয়া আসিতাম।

এক্ষণে সংস্কৃত কলেজের প্রাসাদটির বিষয় কিছু বলিব। মধ্যস্থলে উচ্চস্তম্ভবিশিষ্ট দ্বিতল বাড়ীটিতে সংস্কৃত কলেজ ছিল। তাহার পূর্ব্বদিকে দোতালায় বিদ্যাসাগর-মহাশয়ের বসিবার ঘর ছিল। ঠিক পশ্চিমদিকে দোতালায় সাট্‌ক্লিফ্ সাহেবের ঘর ছিল। মধ্যস্থলে গম্বুজের মধ্যে হেয়ার সাহেবের প্রস্তরমূর্ত্তি ছিল। এক্ষণে ঐ মূর্ত্তি প্রেসিডেন্সী কলেজের দক্ষিণস্থ মাঠের পূর্ব্বধারে স্থাপিত হইয়াছে, এবং কাকাদি পক্ষিগণ পুরীষ ত্যাগ করিয়া ঐ পবিত্র মূর্ত্তিকে কলুষিত করিতেছে। মধ্যস্থিত কলেজ-প্রাসাদের পূর্ব্বদিকের একতালা ঘরগুলিতে হিন্দু স্কুল ছিল। এবং পশ্চিমদিকের ঘরগুলিতে প্রেসিডেন্সী কলেজের আফিস ছিল, এবং ফার্ষ্ট্‌ ইয়ার ক্লাস বসিত। সর্ব্ব পশ্চিম দিকের হল-ঘরে একটি গ্যালারি ছিল। তথায় সেকেণ্ড ইয়ার ক্লাস বসিত। প্রাসাদের দক্ষিণে গোলদীঘী ছিল। ঐ গোলদীঘী এক্ষণে চতুষ্কোণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঐ দীঘীর দক্ষিণে হেয়ার সাহেবের গোর ছিল; এক্ষণেও আছে। এই পশ্চিম দিকের গ্যালারির ছাত্রেরা একবার এক কীর্ত্তি করিয়াছিল, তাহা বর্ণনা না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। আমি তখন কলেজের পাঠ শেষ করিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজের অন্যতম শিক্ষক হইয়াছিলাম। একদিন গিয়া দেখি সেকেণ্ড্ ইয়ারের ছাত্রগণ বড় বড় ম্যাপের দণ্ডগুলি ছিঁড়িয়া লইয়া উহার অগ্রভাগে আপনাদের চাদর বাঁধিয়া পতাকারূপে স্কন্ধে করিয়া ২৫।৩০ জন গোলদীঘীর চারিধারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তন্মধ্যে "কমলাকান্ত" নামে একটি অত্যন্ত জ্যাঠা অথচ প্রিয়ভাষী ছাত্র প্রধান সেনাপতি ছিলেন। ঐদিন প্যারীচরণ সরকার মহাশয়ের পড়াইবার বার ছিল। তিনি শ্রেণীতে আসিয়া ছাত্রদিগকে না দেখিয়া, দক্ষিণ দিকের বারাণ্ডায় গিয়া দাঁড়াইলেন। এবং যখন ঐ দল নিকটে আসিল, তখন কমলাকান্তকে ডাকিয়া বলিলেন, "আজ কি তোমরা পড়িবে না? ক্লাসে আসিয়া বসো।। কমলাকান্ত উত্তর দিল, "মহাশয়! আমরা 'ক্রুসেড'-করিতেছি আপনি গতকল্য ক্রুসেড-পড়াইয়াছিলেন, আমরা তাহাই কাজে করিতেছি। আমাদিগকে গোলদীঘী ৭ পাক ঘুরিতে হইবে, ৪ পাক হইয়াছে, আর ৩ পাক হইলেই আমরা ক্লাসে যাইব।" প্যারী-বাবু অত্যন্ত সদাশয় লোক ছিলেন। তিনি বলিলেন, "তোমরা ম্যাপগুলি ছিঁড়িয়া গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি করিয়াছ।" কমলাকান্ত উত্তর করিল, "গবর্ণমেণ্টের ঢের টাকা আছে, আবার নূতন করিয়া লইবে।" সাট্‌ক্লিফ্ সাহেব শুনিয়া হাস্য করিয়া-ছিলেন। আজকাল হইলে কমলাকান্তের জরিমানা হইত। কিন্তু তিনি কমলাকান্তকে ডাকাইয়া পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তোমরা এ কাজ করিলে কেন?" তাহাতে কমলাকান্ত উত্তর দিয়াছিল, "মহাশয়, ক্রুসেড্-কার্য্য অতি পবিত্র। সুতরাং উহা আমরা করিয়াছি। ঐ কাজ করিয়া আমরা আপনাদের খৃষ্ট-ধর্ম্মে যে আমাদের ভক্তি আছে তাহা জানাইয়াছি।" সাট্‌ক্লিফ্ সাহেব তাহা শুনিয়া কমলাকান্তের পৃষ্ঠে ২।৪ চাপড় দিয়া বলিলেন, "যাও, আর করিও না।" পাঠক

দেখুন তৎকালে প্রিন্সিপ্যাল ছেলেদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিতেন। এই কমলাকান্ত বি-এল্ পাশ করিয়া হাইকোর্টে ওকালতি করিতে-করিতে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল।

প্রেসিডেন্সী কলেজের থার্ড্ ইয়ার ও ফোর্থ্ ইয়ার এই দুইটি ক্লাশ আলবার্ট্ হল নামক দোতালা গৃহের উপরিতালায় ছিল, এবং কেমিকেল ল্যাবরেটরি নীচের তালায় ছিল। আমাদের আমলে পেড্‌লার কলিকাতায় আগমন করেন নাই; অন্য-এক সাহেব কেমিষ্ট্রী পড়াইতেন। আমি বি-এ পড়িবার সময় থার্ড্ ইয়ারে কেমিষ্ট্রি লইয়াছিলাম। কিন্তু ফোর্থ্ ইয়ারে কনিক্‌স্ লইয়াছিলাম। তৎকালে ফিজিক্‌স্ ও কেমিষ্ট্রি একত্র ছিল। আমার মনে পড়ে লাফিং গ্যাস্ খাইয়া খুব হাসিয়াছিলাম। এক্ষণে সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল-সম্বন্ধে কিছু বলিব। আমরা যখন এণ্ট্রান্স্ পড়িতাম তখন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-মহাশয় কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। তিনি ক্রমে বর্দ্ধমান বিভাগের ইন্‌স্পেক্টর্-অব্-স্কুল্‌স্ হইয়াছিলেন। তখন তাঁহার বেতন ৭০০৲ টাকা ছিল। তিনি কেন ঐ চাকুরি ত্যাগ করেন, তাহার কারণ তাঁহার জীবনচরিতে বর্ণিত হইয়াছে। আমরা শুনিয়াছিলাম বিদ্যাসাগর-মহাশয়ের সহিত শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর-সাহেবের মতের অনৈক্য হওয়াতে তিনি স্বয়ং চাকুরি ত্যাগ করেন। ঘটনা এই, বিদ্যাসাগর-মহাশয় যখন বর্দ্ধমান বিভাগের ইন্‌স্পেক্টর্-অব্-স্কুল্‌স্ ছিলেন, তখন পাঁচখানি গ্রামে পাঁচটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি ডিরেক্টর সাহেবের সঙ্গে মৌখিক পরামর্শ করিয়া ও তাঁহার মৌখিক অনুমতি পাইয়া ঐ বিদ্যালয়গুলি স্থাপিত করেন। ৩।৪ মাস পরে যখন ঐসকল বিদ্যালয়ের পণ্ডিতেরা স্ব-স্ব বেতনের জন্য বিল করিয়া পাঠান, তখন বিদ্যাসাগর-মহাশয় ঐ বিলগুলি ডিরেক্টর-সাহেবের নিকট লইয়া গেলেন, এবং টাকার মঞ্জুরি চাহিলেন। ডিরেক্টর-সাহেব কহিলেন, "আমি কি তোমাকে কোন লিখিত আদেশ দিয়াছিলাম।" বিদ্যাসাগর-মহাশয় কহিলেন, "না, আপনি কোন লিখিত হুকুম দেন নাই বটে, কিন্তু আপনি আমাকে মৌখিক হুকুম দিয়াছিলেন।" ডিরেক্টর-সাহেব বলিলেন, "লিখিত আদেশ না হইলে কোন কার্য্য হইতে পারে না, অতএব এ-টাকা মঞ্জুর করিতে আমি পারিব না।" বিদ্যাসাগর-মহাশয় কহিলেন—"আমি আপনার মৌখিক আদেশ, লিখিত-আদেশ-স্বরূপ মনে করিয়া কার্য্য করিয়াছি।" ডিরেক্টর-সাহেব কহিলেন—"ইংরেজ-রাজত্বে লিখিত আদেশ-ব্যতিরেকে কোন কার্য্য হয় না।" বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, "যদি সাহেবের মৌখিক আদেশ কিছুই নহে এরূপ হয়, তবে আমি তাদৃশ রাজ্যশাসনে থাকিতে ইচ্ছা করি না। আমরা হিন্দু আমরা মুখে যাহা বলিব তাহা কার্য্যেও করিব, ইহা আমাদের মত।" এই বলিয়া তিনি চাকুরি ত্যাগ করিলেন, এবং পণ্ডিত মহাশয়দিগের প্রাপ্য টাকা নিজ হইতে দিলেন।

বিদ্যাসাগর-মহাশয় কলেজের কার্য্য ত্যাগ করিলে পর গবর্ণমেণ্ট্ প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিহাসাধ্যাপক ই, বি, কাউয়েল্ নামক সাহেবকে সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল করেন। কাউয়েল্ সাহেব বিলাত হইতে কিঞ্চিৎ সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন—"আমি ম্যাক্স্‌মুলার সাহেবের ছাত্র।" সংস্কৃত কলেজে আসিয়া তিনি মহেশ ন্যায়রত্ন ও গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করেন। আমার পিতৃদেব তাঁহাকে কাদম্বরী পড়াইয়াছিলেন আর মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন তাঁহাকে ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন। ন্যায়রত্ন মহাশয়কে তিনি ৫০৲ টাকা বেতনে সহকারী অলঙ্কারাধ্যাপকরূপে সংস্কৃতকলেজে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পরে ঐ ন্যায়রত্ন মহাশয় নিজ ক্ষমতায় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন এবং একহাজার টাকা পর্য্যন্ত বেতন পাইয়াছিলেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় কাউয়েল্ সাহেবকে বিনা বেতনে পড়াইয়াছিলেন; সেইজন্য কৃতজ্ঞতাস্বরূপ কাউয়েল্-সাহেব তাঁহাকে সংস্কৃত কলেজে চাকুরি দিয়াছিলেন। কাউয়েল্ আমাদিগকে ফার্ষ্ট্ ইয়ার ও সেকেণ্ড ইয়ারে ইতিহাস পড়াইতেন, কিন্তু ৪টার পর (অর্থাৎ কলেজের ছুটি হইলে) তিনি আমাদিগের সঙ্গে বসিয়া অঙ্ক কষিতেন। তিনি অঙ্ক কষিতে অত্যন্ত ভালবাসিতেন; বিশেষতঃ বীজগণিত বড় ভালবাসিতেন। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব সম্বন্ধে তিনি একখানি ইংরেজি নাটক

লিখিয়াছিলেন। তাঁহার যে Smith's History of England ছিল ঐখানি তিনি সাদা কাগজ দিয়া interleaf করিয়া বাঁধাইয়াছিলেন। আমার হাতের লেখা ভাল ছিল দেখিয়া তিনি আমাকে ঐ নাটকখানি তাঁহার পুস্তকের মধ্যে লিখিয়া দিতে বলেন। আমি ঐ কার্য্য করিয়া দেওয়ায় তিনি আমাকে বড়ই প্রশংসা করিয়াছিলেন; এবং বিলাতে গিয়াও আমাকে যে পত্র লিখেন তাহাতে ঐ কথা উল্লেখ করিয়া ধন্যবাদ দিয়াছিলেন। তিনি যেরূপ সদাশয় ছিলেন তাঁহার পত্নীও তদ্রূপ ভদ্রমহিলা ছিলেন। তিনি বেথুন কলেজে ইংরেজী পড়াইতেন; এবং বৈকালে গাড়ী করিয়া সংস্কৃত কলেজে আসিয়া স্বামীর জন্য অপেক্ষা করিতেন। তাঁহার সন্তানসন্ততি হয় নাই। এজন্য সংস্কৃত কলেজের ছোট ছোট ছেলেদিগকে বড় ভালবাসিতেন; এবং তাহাদিগকে পয়সা দিতেন। তিনি পয়সার হরির লুট করিতেন, অর্থাৎ গাড়ীতে বসিয়া মুঠো করিয়া পয়সা ছড়াইয়া দিতেন, ছেলেরা আহ্লাদপূর্ব্বক কুড়াইয়া লইত। তিনি প্রত্যহ এই কাজ করিতেন। পরে সন্ধ্যার সময় যখন স্বামী যাইবেন, তখন তাঁহার সঙ্গে বাসায় যাইতেন।

ই, বি, কাউয়েল্ সাহেব যখন প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন, তখন সংস্কৃত কলেজের একটি ঘটনা বর্ণনা করিবার যোগ্য মনে করিয়া তাহা লিখিতেছি। ১৮৫৭ সালে যখন সিপাহী বিদ্রোহ হয়, তখন সংস্কৃত কলেজ-বাটীতে কতকগুলি গোরা সৈনিক আসিয়া বাস করেন। সুতরাং বৌবাজারের দুইটি গৃহে সংস্কৃত কলেজ উঠিয়া যায়। ঐ দুইটি গৃহ গবর্ণমেণ্ট্ ভাড়া লইয়াছিলেন। পরে যখন বিদ্রোহ শেষ হয়, তখন আমরা আবার সংস্কৃত কলেজ-গৃহে ফিরিয়া আসি। সেইবৎসর বার্ষিক পরীক্ষার পর যে পারিতোষিক-দান-কার্য্য সম্পন্ন হয়, সেইসময় কাউয়েল্ সাহেব যে সংস্কৃত শ্লোকটি রচনা করিয়া পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে লিখিয়া দিলাম।—

বিদ্যালয়ঃ স্বালয়মেত্য সাম্প্রতং
প্রসিদ্ধকীর্ত্তির্ভুবনে ভবিষ্যতি।

(শেষ-চরণ-দুইটি আমার মনে নাই) পাঠক! দেখুন, কাউয়েল্ সাহেব কিরূপ সংস্কৃত জানিতেন।

কাউয়েল্ সাহেবের বিলাত গমনের পর মাননীয় প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। তিনি ফার্ষ্ট্ ইয়ারে ও সেকেণ্ড্ ইয়ারে ইংরেজি সাহিত্য ও অঙ্ক শিক্ষা দিতেন। তিনি এরূপ সদাশয় লোক ছিলেন, যে, ছাত্রগণ তাঁহাকে পিতৃবৎ সম্মান করিত। তাঁহার সম্বন্ধে একটি ঘটনা বর্ণন না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। আমরা তখন প্রেসিডেন্সী কলেজে বি-এ পড়িতে যাইতাম। তখন সংস্কৃত কলেজে বি-এ ক্লাশ হয় নাই আমার মধ্যম ভ্রাতা শ্রীনাথ (পরে ডাক্তার) ও বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায় নামক দুইজন বিখ্যাত ছাত্র সেকেণ্ড্ ইয়ার ক্লাসে পাঠ করিত। কোন কারণে গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে উক্ত প্রসন্নবাবুর মনান্তর হয়। তাহাতে তিনি আপনাকে অপমানিত মনে করিয়া সংস্কৃত কলেজের চাকুরি ত্যাগ করেন। গবর্ণমেণ্ট্ দুইজন প্রেসিডেন্সী কলেজের এম্-এ পাস্ ছাত্রকে উক্ত সংস্কৃত কলেজে পাঠনার্থ নিযুক্ত করেন। তাঁহারা ছয় মাস মাত্র পড়াইয়াছিলেন। এমন সময় উড্রো-সাহেব যিনি প্রেসিডেন্সী বিভাগের ইনস্পেক্টর-অব্-স্কুলস্ ছিলেন, কিছুদিনের জন্য শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর হইয়াছিলেন। তিনি প্রসন্ন-বাবুকে খুব ভালবাসিতেন। প্রসন্নবাবু চাকুরি ত্যাগ করাতে তিনি দুঃখিত হইয়া একদিন সংস্কৃত কলেজ দেখিতে আসেন। ফার্ষ্ট্ ইয়ার ক্লাসে গিয়া দেখেন সেখানে একজন এম্-এ পড়াইতেছেন। তিনি ঐ এম্-এ-কে কহিলেন "You may walk out" ঐ কথাতে ঐ এম্-এ ক্লাস ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। উড্রো-সাহেব গিয়া দেখেন, তথায় বীরেশ্বর পড়িতেছে। সাহেব বীরেশ্বরকে বড় ভালবাসিতেন এবং নিজ ব্যয়ে তাহাকে বিলাতে পাঠাইতেও ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার মাতা তাহাকে বিলাতে যাইতে দেন নাই। বীরেশ্বর সেই বৎসর সংস্কৃত কলেজ হইতে এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছিল। সে পূর্ব্বে হাবড়ার জেলা স্কুলে পড়িত এবং বিখ্যাত ছাত্র ছিল। এই কারণে উক্ত সাহেব তাহাকে ভালবাসিতেন। উড্রো-সাহেব চেয়ারে বসিয়া বীরেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমারা যে এম্-এ পাশ শিক্ষকের নিকট পড়িতেছ, উনি ভাল পড়ান না প্রসন্নবাবু ভাল পড়াইতেন?" আমরা শুনিয়াছিলাম, বীরেশ্বর নাকি বলিয়াছিল, "উক্ত

শিক্ষককে প্রসন্নবাবু বিশ বৎসর পড়াইতে পারেন। সাহেব বলিলেন, "তোমরা প্রসন্নবাবুকে চাও?" বীরেশ্বর বলিয়াছিল, "সাহেব, আমরা একশ চাই।" এই কথা শুনিয়া সাহেব চলিয়া যান, এবং প্রসন্নবাবুকে পত্র লিখিয়া সংস্কৃত কলেজে আসিতে বলেন। সাহেব বলিয়াছিলেন, যে ছয় মাস break of service হইয়াছে তাহা আমি মঞ্জুর করিয়া দিব। এই কড়ারে প্রসন্নবাবু যেদিন সংস্কৃত কলেজে আইসেন সেইদিন আমাদের মনে হয়, ছাত্রেরা নিজ ব্যয়ে হরির লুট বাতাসা ছড়াইয়াছিল এবং এরূপ আনন্দকোলাহল করিয়াছিল, যে, সন্নিহিত বাড়ীর লোকেরা স্তম্ভিত হইয়াছিল। এই ঘটনা দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে, যে, প্রসন্নবাবু সাতিশয় লোকপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বিদ্যাসাগরের দলের লোক। বিদ্যাসাগরের ন্যায় সদাশয় ও উদারচেতা ছিলেন। তাহার একটি উদাহরণ দিব। তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা ডাক্তার ৺সূর্য্যকুমার বাসায় আসিয়া একদিন চাকরদিগকে গালাগালি দিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিতেছেন শুনিয়া প্রসন্নবাবু বলিলেন, "ওরে সূযি, একটু ভালো করিয়া ডাক্ না; ওরা ভদ্রবংশের কায়স্থ সন্তান; অবস্থা মন্দ বলিয়া তোর বাড়ীতে চাকরি করিতে আসিয়াছে। তাই বলিয়া কি ওদের সঙ্গে ঐরূপ ব্যবহার করা উচিত। মনে কর্ দেখি, আজ যদি তোর অবস্থা ঐরূপ হইত, তবে তুই কি ঐরূপ ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইতিস্?" সূর্য্যবাবু বলিলেন, "দাদা, ভগবান্ আমাকে ষাঁড়ের ন্যায় গলা দিয়াছেন; আমি পেশেন্টের বাড়ী আস্তে কথা কহিব, এবং বাসায় আসিয়াও যদি ঐরূপ আস্তে-আস্তে কথা কহিব, তবে আমার যে উচ্চ গলা দিয়াছেন ভগবান্, তাহার ব্যবহার কখন্ করিব?" প্রসন্ন-বাবু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "তুই আমার সহিত যখন কথা কহিবি তখন ঐরূপ উচ্চ গলায় কথা কহিস্, আমি তাহাতে রুষ্ট হইব না; কিন্তু ঐসকল ভদ্রসন্তানদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করিস্।" আমি স্বকর্ণে এই কথাগুলি শুনিয়াছিলাম। প্রসন্নবাবুর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অক্ষয়কুমার সর্ব্বাধিকারী আমার সতীর্থ ছিল; সুতরাং আমি তাহার সহিত পাঠ চাহিবার জন্য তাহাদের বাসায় যাইতাম।

Ward Institution নামক প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ খ্যাতনামা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় শুঁড়াস্থিত রাজা জনমেজয়ের পুত্র ছিলেন। তিনি তৎকালীন সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের উপর অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন। তাহাদিগকে "মূর্খ বর্ব্বর" প্রভৃতি নামে নানা গালি দিতেন। একদিন ভাগ্যক্রমে আমি কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। ঐ পথে মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সহিত আমার দেখা হইল। আমি দেখিলাম—তিনি ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় দুইজনে বায়ুসেবনার্থ পথে ভ্রমণ করিতেছেন। আমাকে দেখিয়া ন্যায়রত্ন-মহাশয় মিত্র মহাশয়কে খুব চীৎকার করিয়া বলিলেন (কারণ, মিত্র-মহাশয় অত্যন্ত বধির ছিলেন)—"রাজেন্দ্র-বাবু আপনি সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদিগকে অত্যন্ত গালাগালি দেন। এই ছাত্রটি কিন্তু সেরূপ গালাগালির ছাত্র নহে।" ইহা শুনিয়া রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় হঠাৎ দাঁড়াইলেন, এবং আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—"আমি সংস্কৃত কলেজের প্রায় পনর আনা ছাত্রকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম; তাহারা কেহই তাহার উত্তর দিতে পারে নাই।" তাহা শুনিয়া আমি কহিলাম—"প্রশ্নটি কি শুনিতে পারি কি?" তাহাতে তিনি কহিলেন—"অস্তি দাক্ষিণাত্যে জনপদে পদ্মপুরং নাম নগরম্ ইত্যাদি বিষ্ণুশর্ম্মা হিতোপদেশে লিখিয়াছেন। দাক্ষিণাত্যে শব্দটি কিরূপে সিদ্ধ হইল? পাণিনি ব্যাকরণে লিখিত আছে, 'দক্ষিণদেশীয় লোক', তবে এখানে কিরূপে জনপদের বিশেষণ হইল?"—তাঁহার এই কথা শুনিয়া আমি কহিলাম—"আজ্ঞা হাঁ, পাণিনিতে আছে "দক্ষিণাপশ্চাৎপুরসস্ত্যক্" অর্থাৎ দক্ষিণা, পশ্চাৎ ও পুরস্ শব্দের উত্তর ত্যক প্রত্যয় হয়, লোক বুঝাইতে। অর্থাৎ দাক্ষিণাত্য অর্থাৎ দক্ষিণ-দেশীয় লোক। পশ্চাৎ হইতে পাশ্চাত্য ও পুরস্ হইতে পৌরস্ত্য শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে, সকলগুলি লোকবাচক। তবে এখানে অর্থাৎ "দাক্ষিণাত্যে জনপদে" এই স্থলে ক্ষ প্রত্যয় করিয়া অর্থাৎ দাক্ষিণাত্য+ক্ষ=দাক্ষিণাত্য, অর্থাৎ দক্ষিণ দেশীয় লোক-সম্বন্ধীয়, অর্থাৎ যেস্থলে দক্ষিণ-দেশীয় লোকেরা বাস করেন—এইরূপ অর্থ করিতে হইবে। নতুবা জনপদের বিশেষণ হইতে পারে না।" আমি এই কথা

বলাতে রাজেন্দ্রবাবু বলিলেন,—"তবে আপনি এক আনার মধ্যে হইলেন।" আমি কহিলাম, "আপনার অনুগ্রহ।" এইরূপ আলাপের পর তিনি মধ্যে-মধ্যে আমাকে ডাকাইয়া পাঠাইতেন, ও নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন। আমিও যথাশক্তি উত্তর দিতাম। তিনি খুব সন্তুষ্ট হইতেন। আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া আমার পিতার প্রেসে ("গিরিশ বিদ্যারত্ন যন্ত্রে") অনেকগুলি এসিয়াটিক সোসাইটির সংস্কৃত পুস্তক ছাপিতে দিয়াছিলেন।

সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরীতে "সমস্যাকল্পলতা" নামক একখানি হস্তলিখিত পুস্তক দেখিতে পাওয়া যায়। ঐখানি আমার পিতৃদেবের হস্ত-লিখিত। অক্ষরগুলি যেন মুক্ত-সাজানো। ঐ গ্রন্থে দেখা যায়, যে তৎকালীন কলেজের পণ্ডিতগণ প্রায় সকলেই সমস্যাপূরণ করিয়া শ্লোক লিখিতেন। বিদ্যাসাগর-মহাশয়, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয়, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়, আমার পিতৃদেব গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়, তারাশঙ্কর তর্করত্ন মহাশয়, মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় ইত্যাদি পণ্ডিতগণের নাম ঐ পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়। আমার পিতৃদেব প্রথমতঃ সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরীর পদ প্রাপ্ত হন, পরে নীচের পণ্ডিতের পদ পান। তখন তাঁহার বেতন ছিল ৩০ টাকা মাত্র। ক্রমে তিনিও প্রধান পণ্ডিতের পদ পাইয়াছিলেন; এবং ১৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত বেতন হইয়াছিল। তাঁহার পর জগন্মোহন তর্কালঙ্কার নামে একজন সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ঐ লাইব্রেরীর পদ পাইয়াছিলেন। আমরা ঐ লাইব্রেরী হইতে পুস্তক লইয়া পড়িতাম এবং পাঠ শেষ হইলে উহা ফিরাইয়া দিতাম; সুতরাং আমাদের প্রায়ই পুস্তক ক্রয় করিতে হইত না। পূজ্যপাদ তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় প্রায় সমস্ত পুস্তকই লাইব্রেরী হইতে লইয়া টীকা করিয়া ঐগুলি ছাপাইয়াছিলেন। যখন "সংস্কৃত-যন্ত্র" নামক একটি ছাপাখানা বিদ্যাসাগর-মহাশয়, মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও আমার পিতৃদেব গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন এই তিন জনে একত্র হইয়া সৃষ্টি করেন, তখন তাহাতে রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, ভারবি ও মাঘ ছাপা হয়। তারাশঙ্কর পণ্ডিত মহাশয় কাদম্বরী ছাপান। মদনমোহন বাসবদত্তা ছাপান। ছাপানো কার্য্যে অর্থাৎ পুস্তক edit করা সম্বন্ধে সকলেই মিলিত হইয়া করিতেন। তবে তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ই অধিকাংশ ভার লইতেন। কিছুদিন পরে মদনমোহন তর্কালঙ্কার বহরমপুরে চলিয়া গেলেন এবং আমার পিতৃদেব "গিরিশ বিদ্যারত্ন যন্ত্র" নামক পৃথক্ একটি ছাপাখানা করিলেন। সুতরাং "সংস্কৃত যন্ত্র" নামক ছাপাখানাটি কেবল বিদ্যাসাগরের রহিল।

আমি যখন (১৮৬৯ ইং সালে) প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রথম চাকুরি পাইয়াছিলাম, তখন মধ্যে-মধ্যে উঁহাদিগের সহিত দেখা করিবার জন্য সংস্কৃত কলেজের মালীর ঘরে আসিতাম। কারণ তখন প্রেসিডেন্সী কলেজের 'ফাষ্ট্ ইয়ার ও সেকেণ্ড্ ইয়ার ক্লাস-দুইটি সংস্কৃত কলেজের পশ্চিম দিকে বসিত; ফাষ্ট্ ইয়ারটি একটি ঘরে বসিত, এবং সেকেণ্ড্ ইয়ার গ্যালারিতে বসিত। আর তখন আমার দিনে এক ঘণ্টা বই কার্য্য ছিল না। সুতরাং আমার যথেষ্ট অবকাশ ছিল। একদিন মালীর ঘরে আসিয়া পণ্ডিতগণের যে বিচার শুনিলাম, তাহার সারমর্ম্ম যতদূর মনে আছে, তাহা লিখিতেছি। কেবল সংস্কৃতজ্ঞ কতকগুলি পণ্ডিত বলিতেছেন—এইচ, এইচ, উইলসন্ সাহেব যখন প্রথম সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করেন তখন তাঁহার মত ছিল এই সংস্কৃত কলেজে কেবল সংস্কৃত কাব্য-শাস্ত্র, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, স্মৃতি, দর্শন, আয়ুর্ব্বেদ ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের পাঠনা হইবে, ইহাতে ইংরেজি পড়া হইবে না। তদনুসারে তিনি জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, ভরতচন্দ্র শিরোমণি, জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, নাথুরাম শাস্ত্রী ও মধুসূদন গুপ্ত এই কয়েকজন অধ্যাপক কলেজে নিযুক্ত করিয়া যান। নাথুরাম শাস্ত্রী ও মধুসূদন গুপ্ত কালগ্রাসে পতিত হইলে তাঁহাদের পদে আর নূতন লোক নিযুক্ত হয় নাই। কারণ ঐ শাস্ত্রদ্বয় পড়িবার ছাত্র অতি অল্প ছিল। গবর্মেণ্ট্ তাহা দেখিয়া ঐ দুইটি পদ উঠাইয়া দেন। অবশিষ্ট অধ্যাপকগণ স্ব-স্ব সংস্কৃত শাস্ত্র পড়াইতেন, তাঁহারা কেহই ইংরেজী জানিতেন না। উইলসন্ সাহেব ভাবিয়াছিলেন—সংস্কৃত কলেজটি গবর্ণমেণ্ট্ স্থাপিত একটি চতুষ্পাঠী হইবে; ইহা বিশ্ববিদ্যালয়ের

অন্তর্ভূত হইবে না। লাহোরে এইরূপ পৃথক্ সংস্কৃত কলেজ আছে। উইল্‌সন্ সাহেবেরও ইচ্ছা ছিল কলিকাতায়ও এইরূপ হইবে। ইহা শুনিয়া ইংরেজী-নবীশ পণ্ডিতগণ বলিলেন—কেবল সংস্কৃত পড়িলে মনুষ্য পণ্ডিত হয় না; ইংরেজি শিক্ষাও চাই। পূর্ব্বোক্ত কেবল সংস্কৃত পণ্ডিতগণ বলিলেন—দুই নৌকায় পা দিলে কোনটি কার্য্যকর হয় না—অর্থাৎ দুইটিতেই বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ হয় না; "অম্লচাকা" হয় মাত্র। পক্ষান্তরে প্রাচীন টোলের ন্যায় সংস্কৃত কলেজে যদি কেবল সংস্কৃত পড়া হয়, তাহা হইলে লোক সংস্কৃত শাস্ত্রে খুব পণ্ডিত হইতে পারে। দেখ—কাণা ভট্ট শিরোমণি টোলে পড়িয়া অসাধারণ পণ্ডিত ও গ্রন্থকর্ত্তা হইয়াছেন। অতএব সংস্কৃত কলেজে ইংরেজি না পড়ানোই ভাল। ইংরেজি-নবীশ পণ্ডিতগণ বলিলেন—আজি কালি কিন্তু ইংরেজি না জানিলে চাকুরি জুটে না। কাজেই ছেলেদের ইংরেজি শিখিতে হয়। ইহা শুনিয়া কেবল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলিলেন—চাকুরি হয় না সত্য কিন্তু যথার্থ সংস্কৃতজ্ঞ হইতে হইলে কেবল সংস্কৃত চর্চ্চা করাই উচিত; নতুবা পল্লবগ্রাহী হইতে হয় এবং কোন গভীর তত্ত্বযুক্ত গ্রন্থ লিখিতে পারা যায় না। জগতের সকলেই যদি পল্লবগ্রাহী হয়, তবে শাস্ত্রের চর্চ্চা ক্রমে হীন হইয়া পড়ে, উৎকর্ষের দিকে আর যায় না। তাহা জগতের পক্ষে বিশেষ ক্ষতির কথা। অতএব সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী পড়ানো নিষ্প্রয়োজন। তাহা হইলে কালে কোন-কোন ছাত্র কাণা ভট্টশিরোমণির ন্যায় পণ্ডিত হইতে পারিবেন; এবং তাহা হইলে আমরা পরম রত্নও পাইতে পারিব। ইংরেজি-নবীশ পণ্ডিতগণ বলিলেন—ওহে দেশকালপাত্র বিবেচনা করিয়া কার্য্য করা উচিত। এখন যেরূপ কাল পড়িয়াছে—ইংরেজি না শিখিলে চলিবে না। ডাক্তারি বল, ওকালতি বল, আর যাহাই বল, সকল কাজেই ইংরেজি চাই। এজন্য সংস্কৃত কলেজে যে ইংরেজি পড়াইতেছে, তাহা ভালই হইতেছে। ইহাতে কেবল সংস্কৃত পণ্ডিতেরা বলিলেন—কোন ব্যক্তির যদি ৩।৪ টি পুত্র হয় তন্মধ্যে যদি একজন কেবল সংস্কৃত শিক্ষা করে, অবশিষ্ট যদি ইংরেজি শিক্ষা করে, তাহা হইলে ত চলিতে পারে, আমরা ত বড় পণ্ডিত পাইতে পারি। ইংরেজিনবীশ পণ্ডিতগণ বলিলেন—কেবল সংস্কৃতজ্ঞ পুত্রের আর্থিক অবস্থা ইংরেজি জানবান্ পুত্রের অবস্থা অপেক্ষা হীন হইলে সংসারে বিষম গোলযোগ হইবার খুব সম্ভাবনা। তখন কেবল সংস্কৃতজ্ঞ পুত্র মনে-মনে বড়ই অনুতাপ করিবেন—কেন আমি ইংরেজি পড়ি নাই। আমি এইরূপ পণ্ডিতগণের বিচার শুনিয়া বাটীতে আসিলাম।

রূপ ও আলাপ

শ্রী গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

গত জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও ভাদ্র সংখ্যাতে ভৈরব-রাগ ও তাহার রাগিণী ছয়টি এবং প্রত্যেকের ধ্রুপদ দেওয়া হইয়াছে। এবার মালকৌশ রাগ, তাহার রাগিণী এবং ধ্রুপদ পর-পর প্রকাশিত হইবে। এই সংখ্যায় কেবল মালকৌশ রাগ দেওয়া হইল। যথা:—

মালকৌশ—রাগের ধ্যান।

যোদ্ধৃরূপঃ স্থিতো বীরো
লোহিতঃ খড়্গহস্তকঃ।
হেমন্তে গীয়তে রাগো
মালকৌশ-সমাহ্বয়ঃ॥

ভাবার্থ—যোদ্ধবেশ, লোহিত বর্ণ হস্তে খড়্গ এবং হেমন্তকালে এইরাগে গাইতে হয়।

মালকোশ—আলাপ ।

* ঔড়ব জাতি ।
প, ধ ও নি কোমল ।
ম—বাদী ।
নি—সংবাদী ।
র ও প-বিবাদী ।

অস্থায়ী ।

সা মা -। মা জ্ঞা -। মা -। মা মজ্ঞা -মা দা ণা ণা -। দা মা ।
তে ০ ০ না ০ ০ ০ নে তো ০ ০ ম্ না ০ ০ ০ ০

মজ্ঞা মজ্ঞা মা -। সা -। সা -। -। র্সা ণ্‌া দ্‌া -। ণ্‌া- -। -।
তে ০ ০ ০ ০ ০ রি ০ ০ রে না ০ ০ ০ ০ ০

ম্‌া ণ্‌দ্‌া সা -। সা -। -। ণ্‌দ্‌া ণ্‌া সা মা -। -। -।
তো ০০ ০ ম্ না ০ ০ তে রে নে রি ০ ০ ০

জ্ঞা মা ণা দা মা -। -। মজ্ঞা মজ্ঞা মা -। সা -। সা সা সা
রে ০ ০ না ০ ০ ০ তো ০ ম্ তে রে না

* "মধ্যমাংশ নি সংবাদী র প বিবর্জ্জিত স্বরঃ
ঔড়বজাতিবিজ্ঞেয়োমালকৌশিকসংজ্ঞকঃ
ভাবার্থ—ম বাদী নি সংবাদী র ও প বিবাদী
ঔড়ব জাতি মধ্যে পরিগণিত ।

গত জ্যৈষ্ঠ প্রবাসীতে ভৈরবের ম—বাদী ও প—সংবাদী বলাতে কোনও ব্যক্তি আপত্তি লিখিয়াছিলেন অর্থাৎ প—সংবাদী কেন হইল ? কিন্তু সংবাদীর প্রকৃত অর্থ না জানিয়া আপত্তি করা ভাল হয় নাই। সঙ্গীতরত্নাবলীর মতে—

"স্বামিবদ্বদনাদ্বাদী স রাগপ্রতিপাদকঃ ।
বাদিনা সহ সংবাদাৎ সংবাদী মন্ত্রিতুল্যকঃ ।
মুখে তস্যানুবদনাদনুবাদী চ ভৃত্যবৎ ।
তথা বিবাদাত্তৈনৈব বিবাদী বৈরিবদ্ভবেৎ ॥"

অর্থাৎ বাদী সুর রাজার ন্যায়, সংবাদী সুর মন্ত্রীর ন্যায়, অনুবাদী ভৃত্যের ন্যায় এবং বিবাদী-সুর বৈরী অর্থাৎ শত্রুবৎ ।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে—রাগরাগিণীর মধ্যে যে স্বরটির প্রাধান্য দৃষ্ট হয়, তাহার নাম বাদী বা অংশ বাদীর সহগামী যে স্বর তাহার নাম সংবাদী এবং অবশিষ্ট স্বরসকল অনুবাদী নামে অভিহিত হয়। অতএব বাদী সুরটি অন্যান্য স্বরাপেক্ষা অধিক ব্যবহার হয় এবং উহাপেক্ষা কম সুর সংবাদী এবং বাকি সুরসকল অনুবাদী। কোনো রাগে র বাদী হইলে পা সংবাদী এবং গ—বাদী হইলে ধ—সংবাদী ইহা উত্তম নিয়ম বটে, কিন্তু সকল রাগে তাহা হইবার উপায় নাই। এক্ষণে কেহ আপত্তি করিতে পারেন, যে, সা—কে সংবাদী ধরা দোষ কি ? কিন্তু ষড়্‌জ সকল সুরের আদি সুর, সকল রাগেই সমানভাবে ব্যবহার্য্য, সুতরাং ষড়্‌জ সুরকে বাদী সংবাদী ধরা যাইতে পারে না এবং নি—কে যদি সংবাদী ধরা যায় তাহা হইলে অত্যন্ত অসঙ্গত হয়, কারণ ম-কে ষড়্‌জ স্থির করিলে তখন নি—প হয় না উহা কড়ি-ম হয় সুতরাং নি-কে সংবাদী ধরা যাইতে পারে না, যিনি এ-সম্বন্ধে আপত্তি করিয়াছেন তিনি লিখিয়াছেন আমার গুরুর নিকট ভৈরবরাগের ম-বাদী ও নি-সংবাদী শিক্ষা করিয়াছিলাম, এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি কোনো নি কোমল না স্বাভাবিক ? স্বাভাবিক হইলে ত হইবে না এবং কোমল হইলেও হইবে না, কারণ মালকোশে কোমল নি-বাদী হইতে পারে, উহাতে স্বাভাবিক 'নি' নাই, কিন্তু ভৈরবে কোমল নি খুব কম ব্যবহার হয়, সুতরাং উহাকে সংবাদী বলা যাইতে পারে না, বিশুদ্ধ ভৈরব রাগ র ও ধ কোমল যুক্ত ঠাটই প্রকৃত; যাহা সামান্য কোমল 'নি' ব্যবহার হয় উহা এইরূপ স্থানে যথা :—মা না দা পা, তদ্ভিন্ন নহে অর্থাৎ ম হইতে নি এর অন্তর অধিক হওয়াতে ঐ নি স্বাভাবিক একটু কড়া শুনায়; সেইজন্য কোমল লাগানো মাত্র নচেৎ নহে। এমন অনেক রাগ আছে যাতে কোমল নি লাগে না, অথচ ঐরূপভাবে সামান্য স্থানে গাইতে-গাইতে ব্যবহার হওয়াতে দুই নি বলিয়া চলিয়া আসিতেছে, যথা :—কামোদ নটমল্লার ইত্যাদি ইহারাও স্বাভাবিক ঠাটের রাগিণী। যাক এক্ষণে ভৈরবে কোন্ হিসাবে নিকে সংবাদী বলা হয় ? আপত্তি-কারক লিখিয়াছেন, আমার গুরু ম বাদী ও নি সংবাদী বলিয়াছিলেন অর্থাৎ 'বাবা বলেছেন চণ্ডী' এইসব সঙ্গীত গুরুদের এবং ছাত্রদিগের যে পুনরায় নূতন করিয়া শিক্ষা করা উচিত ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

সণ্‌া সণ্‌া জ্ঞা সা -া II
তে না ০ তো ম্‌

অন্তরা।

মজ্ঞা মা পদা পা -া -া মা পদা র্সা -া র্সা -র্া -া র্সা র্সা
তা০ ০ না ০ ০ ০ তে ০০ ০ ০ না ০ ০ নে তে

র্সপা র্সা র্মা -া র্জা মা র্জা র্সা া -া র্সপা র্সা পা দা মা -া
রি০ ০ ০ ০ ০ ০ রে না ০ ০ তা০ ০ না ০ ০ ০

মজ্ঞা মা দা পা দা র্সা পা দা া -া মজ্ঞা মজ্ঞা
তে০ ০ না ০ ০ ০ নে তে রে ০ না ০

মা -া সা -া সা সা সা সণ্‌া সণ্‌া জ্ঞা সা -া II
০ ০ ০ ০- তে রে না তে না ০ তো ম্‌

সঞ্চারী।

মজ্ঞা মজ্ঞা মা -া মা জ্ঞাসা -া ণ্‌া সা
তা০ ০০ ০ ০ নে তে • ০ না -

পদা পা -া সা মা -া মা জ্ঞা মা দা মা জ্ঞা
০০ ০ ০ তো ০ ০ ম্‌ না ০ ০ ০ ০

মা দা পা দা মা জ্ঞা মা পদা র্সা -া পা দা মা -া
তে ০ ০ না ০ ০ নে ০০ ০ ০ তে রি ০ ০

দজ্ঞা মা -া জ্ঞা সা -া II
রে০ ০ ০ না ০ ০

আভোগ।

র্সা পদা মা -া জ্ঞা মা দা পা র্সা -া -া -া
তে না০ ০ ০ নে তে তে রে না ০ ০ ০

পদা পা জ্ঞা র্সা -া সপা পদা দমা মজ্ঞা
তে ০ ম্‌ না ০ তে০ না০ রি০ রে০

মা দা পা র্সা -া র্সা র্সা র্সা র্সা র্মর্জা র্মা -া
না ০ ০ ০ ০ নে তে তে রে না০ ০ ০

মা -া -া মজ্ঞা পা দা মা মজ্ঞা মজ্ঞা মা -দা
তো ০ ম্‌ না ০ ০ ০ তে০ ০০ ০ ০

সা সা সা সা সা সণ্‌া সণ্‌া জ্ঞা সা -া II
০ না তে রে না তে না ০ তো মৃ

ধ্রুপদ ।

মালকোশ—চৌতাল ।

স্বরূপ-বর্ণন ।

বৈরন* নিধন লগে সাজত মালকোশ রাগ,
য়হ সম নেক বীর দেখত নাহি জগপর।
শীষ কীরট শোহত গরে মুক্ত মাল
ঐসে নয়ন বিশাল উর সুঢ়ঙ্গ বর।
অঙ্গ লোহিত বরণ হাত খড়্গ ধারণ
জো দেখে অচরজ† হোয় সব গুণ সাগর।
কহত নায়ক গোপাল যহ রাগ অত গভীর ;
জো নেক‡ গুণী হোয়, সো গাবে শুধকর ॥

নায়ক গোপাল
(বলগরামী) ।

অস্থায়ী ।

০ ৩ ৪ ১ • ২ ০ ৩
জ্ঞা -া । সা ণ্া । দ্া ণ্া । র্সা -মা । মা মঃ । মা -া । জ্ঞা মা । দা ণা ।
বৈ ০ র ন ০ নি ধ ০ ন লে গে ০ সা ০ জ ত

৪ ১ ০ ২ • ০ ৩ ৪
দা দা । মা জ্ঞা । মা জ্ঞা । সা সা । সা সা । -া মা । মা জ্ঞা ।
মা ল কো • শ রা ০ গ য় হ ০ স ম ০

১ ৩ ২ ০ ৩ ৪ ১ ০
মা -দা । ণা দা । র্সা র্সা । র্সা । । ণঃ দা । ণা দা । মা জ্ঞা । মা জ্ঞা ।
নে ০ ক বী ০ র দে ০ খ ত না হি জ গ ০ প

২
সা সা ॥
০ র

অন্তরা ।

১ ০ ২ ০ ৩ ৪
মজ্ঞা মা । দা ণা । র্সা র্সা । র্সা -া । -া র্সা । -া র্সা ।
শী ০ ষ কী র ট শো ০ ০ হ ০ ত

১ ০ ২ ০ ৩ ৪
র্সা ণা । দা র্সা । র্সা র্সা । র্ণা -া । দণা দণা । দা র্সা ।
গ রে ০ মু ০ ক্ত মা ০ ০০ ০০ ল ০

১ ০ ২ ০ ৩ ৪
মা -া । মা মা । মা জ্ঞা । মা দা । ণদা । । র্সা র্সা ।
ঐ ০ । সে ন । য় ন । বি ০ ০০ শা ০ ল

* বৈরণ—শত্রুগণ । † অচরজ—আশ্চর্য্য । ‡ নেক—উত্তম ।

জ্ঞা র্সা । ণা দা । মা জ্ঞা । মা দা । র্সা ণা । দা মা ।
ঔ ০ ০ ০ ০ র স্থ ০ ০ ঢ ০ ক

১ ০ ২
দা জ্ঞা । মা জ্ঞা । সা সা ॥
ব ০ ০ ০ ০ র

রী ।

১ ০ ২ ০ ৩ ৪
মা -া । -া মা । জ্ঞা জ্ঞা । মা দা । ণা দা । মা জ্ঞা ।
অ ০ ০ ঙ্গ ০ লো হি ০ ত ব র ণ

১ ০ ২ ০ ৩ ৪
মা দা । ণা ণা । দা দা । মা জ্ঞা । মা জ্ঞা । সা সা ।
হা ০ ত থ ড় গ ধা ০ ০ র ০ ণ

১ ০ ২ ০ ৩ ৪
সা -া । ণ্‌া দ্‌া । ণ্‌া দ্‌া । ম্‌া দ্‌া । -া ণ্‌া । সা সা ।
জো ০ দে খে অ চ র জ ০ হো ০ য়ে

১ ০ ২ ০ ৩ ৪
সা সা । মা -া । মা মা । মা জ্ঞা । মা জ্ঞা । সা সা ॥
স ব ০ ০ গু ণ আ ০ ০ গ ০ র

ভাগ ।

১ ০ ২ ০ ৩ ৪
জ্ঞা মা । দা ণা । র্সা র্সা । র্সা -া । -া র্সা । -া র্সা ।
ক হ ত না য় ক গো ০ ০ পা ০ ল

১ ০ ২ ০ ৩ ৪
র্সা র্মা । -া র্মা । -া র্মা । র্মা র্জ্ঞা । র্মা র্জ্ঞা । র্সা র্সা }
ষ হ ০ রা ০ গ অ ত গ ভী ০ র

১ ০ ২ ০ ৩ ৪
র্মা -া । -া মা । -া মা । মা দা । ণা দা । র্সা র্সা
জো ০ ০ নে ০ ক গু ণী ০ হো ০ য়

১ ০ ২ ০ ৩ ৪
র্সা র্সা । ণা দা । মা জ্ঞা । মা মা । দা দা । ণা ণা ।
সো ০ ০ ০ ০ ০ গা ০ ০ ০ ০ বে

১ ০ ২
দা মা । জ্ঞমা জ্ঞা । সা সা ॥
গু ধ ০০ ক ০ র

চীনের চিঠি

শ্রীকালিদাস নাগ

আজ চীন দেশে নাম্‌ব। ভোরে 'ডেকে' এসে দেখা গেল জাহাজ সমুদ্র ছেড়ে ইয়াঙ-সি-কিয়াঙ্‌ নদীর উপর দিয়ে চলেছে, কত রকমের ঔৎসুক্য জমা হয়ে মনটাকে অস্থির করে' তুল্‌ছে, ক্রমশঃ চোখে পড়ল দূরের তটভূমি—সাদা বালুচর বৈচিত্র্যহীন চীনেম্যানের মুখের মতনই বর্ণহীন বাহুল্য-বর্জ্জিত। আশ্চর্য্য এই জাতটির মুখ! জাহাজ থেকে নেমে অবধি নানা জিনিষ দেখ্‌ছি, কিন্তু সবচেয়ে মনকে আকর্ষণ কর্‌ছে চীনের মুখ। সে মুখ কি বল্‌ছে? তা'দের না জেনেও অনেক জাতের মুখের দিকে চেয়েছি—তারা কি বল্‌তে চাইছে আভাসে বুঝেছি, কিন্তু চীনের বেলায়, শুধু কথার ভাষা নয়, চোখের ভাষা, চালের ভাষাও যেন আমাদের কাছে হেঁয়ালী ঠেকে! আমরা ভাবি এক, চীনে যেন বলে আর! ভাবা গিয়েছিল টিকিধারী চীনে চূড়ান্ত গতানুগতিক—হঠাৎ একদিন দেখা গেল চীনে টিকি উড়িয়ে বেশ খানিক এগিয়ে ছুটে এসেছে। লোকে ভেবেছিল, চীনের শাসনতন্ত্রে সম্রাটের আসন বুঝি অটল। হঠাৎ কোথা থেকে কেমন করে' চীনে যে গণতন্ত্রের গোড়াপত্তন করে' বস্‌ল বোঝাই গেল না।

চীনে গুহার ভারতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষু—নন্দলাল বসু অঙ্কিত

চীনা পরিবারের গৃহিণী—নন্দলাল বসু অঙ্কিত

এম্‌নি করে' বার বার আমরা দেখ্‌ছি চীনের মুখ, আমাদের চেনা হয়নি ; নিজেদের অনেক মনগড়া দাবী-দাওয়া, অনুযোগ, অভিযোগ আমরা চীনের ঘাড়ে চাপিয়ে আস্‌ছি, আর চীন নির্ব্বিবাদে সে-সমস্ত ওল্‌টাপালট করে' দিয়ে নিজের খোস-খেয়ালের ভরে নিজের পথটি ধরে'

ভবিষ্যতের ইতিহাসকে মধুর অথবা নিষ্ঠুর পরিহাসে উদ্‌ভ্রান্ত করে' চল্‌বে !

তাই চীনের মুখের দিকে চেয়ে রহস্য যতই ঘনিয়ে আস্‌তে দেখ্‌ছি, ততই মনটা সেই রহস্য ভেদ কর্‌তে উন্মুখ হ'য়ে উঠ্‌ছে। সাঙহাই বন্দরে জাহাজ লাগ্‌তেই দেখি চীনে ডিঙ্গির এক বিপুল বাহিনী যেন বন্দরকে ছেয়ে ফেলেছে, ছোট ছোট নৌকার উপর মাল চড়িয়ে তীরে নিয়ে যাবে ;

চণ্ডু-হোটেল-ওয়ালা চীনা—নন্দলাল বসু অঙ্কিত

সেকালের চীনা-পণ্ডিত—নন্দলাল বসু অঙ্কিত

পুরুষরা মাল বোঝাই কর্‌ছে, নৌকার উপর এক মেয়ে রান্না চড়িয়েছে, একহাতে রাঁধবার খুন্তি, অন্যহাতে দাঁড় ; পিঠে একটি শিশু কাপড় দিয়ে বাঁধা ! সমানে তিন দিকে তাল দিয়ে যাচ্ছে একা—আশ্চর্য্য কর্ম্মঠ এই নিম্নশ্রেণীর চীনে মেয়েরা। সেই নৌকার টলমলানির মধ্যে সংসার-যাত্রা বেশ চলে' যাচ্ছে—পুরুষ খানিক খেটে হাঁড়ির কাছে এসে দাঁড়াল, মেয়েটি তার হাতে একটা বাটি দিয়ে তার মধ্যে হাঁড়ির ভিতরকার খানিক পদার্থ তুলে দিলে। পুরুষ ভোজন শেষ করে' আবার কাজে ছুট্‌ল, যেন শ্রান্তি-আলস্য কি এরা জানে না। পিঠ-বাঁধা খোকাটা পিট্‌পিট্‌-করে' চাইছে আর আবাঁধা হাত-পা নেড়ে যেন এখন থেকেই কাজের পাঁয়তারা কস্‌ছে। তার চেয়ে একটু বড় ছেলেটা তার চেয়ে বিশগুণ ভারী দাঁড়টা ছোট্ট হাতের মধ্যে টিপে ধরে' ছপ্‌ছপ্‌-করে' জল টান্‌ছে, দেখে যেন বিশ্বাস

চীনা মা, গরীব ঘরের—নন্দলাল বসু অঙ্কিত

বেশ মানায়, কিন্তু মেয়েদের এক্ষেত্রে কেমন যেন বেখাপ্পা লাগে ; আমাদের দেশে খাটিয়ে মেয়ের মুখেও নারীত্বের একটা কমনীয়তা দেখ্‌তে পাই, সেটা চীনে মজুরনীদের না পোষাক-পরিচ্ছদে, না ভাবে-ভঙ্গীতে মেলে! সর্ব্বাঙ্গে যেন একটা পরুষতা ছেয়ে গেছে। বিশেষতঃ কাটাছাঁটা কোর্ত্তা,পায়জামা, উৎকট চুল বাঁধা, কালো নীল পোষাক—সবটা মিলে যেন চক্ষুশূল হ'য়ে দাঁড়ায়—মনটা ব্যথিত হ'য়ে ফিরে ফিরে তাকায় সেই আমাদের দেশের শাড়ী ঘাগরার দিকে, যা নানা ছন্দে রঙে নানা স্তরের মেয়েদের সাজ নারীত্বের বৈচিত্র্যে সুন্দর করে' রেখেছে। সবচেয়ে আমাদের আঘাত করে চীনে রমণীদের এই বেশভূষার অবনতি; অতীত কালে যে মোটেই এরকম ছিল না—চীনের স্ত্রীপুরুষ পোষাক-পরিচ্ছদে যে উচ্চ অঙ্গের সৌন্দর্য্য বোধ ও রুচির পরিচয় হয় না। দাঁড়টা হাত থেকে ফস্‌কে গেলে বানরের মতন লাফিয়ে আবার ধরছে। কাজটা যেন খেলা—খাটুনী যেন স্বভাব এ জাতের। আমাদের কুলীদের আধ্যাত্মিক হাইতোলা আর ফুটপাথের উপর অনন্তশয়নের কথা মনে পড়্‌তেই ভারত ও চীনের মধ্যে মস্ত একটা পার্থক্য প্রকট হ'য়ে উঠ্‌ল। তীরে নেমে দেখ্‌ছি চীনে কুলী মোট নিয়ে চলেছে, কেউ নিয়েছে মাথায়, কেউ ঠেলা-গাড়ীতে। একজন কুলী হাত-গাড়ীতে যে-মোট ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে তার আয়তন দেখেই আমাদের কুলীরা হাই তুলে বল্‌বে "সকলই মিথ্যা শুধু হরিনাম সত্য"। চীনে মুটে যে বোঝা অকাতরে মাথায় বয়ে নিয়ে চলেছে, সেটা দেখ্‌লে আমাদের দেশের মুটের পতন ও মূর্চ্ছা অবশ্যম্ভাবী।

চীনে কুলী মজুর যেন শ্রমশক্তির প্রতিমূর্ত্তি। পুরুষদের

চীনা-হিন্দু পণ্ডিত—নন্দলাল বসু অঙ্কিত

রবীন্দ্রনাথ ও চীনের রাজ-কবি

সহরের পথে কিন্তু মধ্যে মধ্যে আর এক ছাঁচের মুখ চোখে পড়ছে। মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের পোষাক বেশ-একটু ওরি মধ্যে পরিপাটী; পরণের কাপড় কালো হ'লেও একটু রেশমের জলুস্—একটু হাল্কা নীল রঙের আভাস দিচ্ছে, গৃহস্বামী ধীর গতিতে চলেছেন শান্ত গম্ভীর মুখে; পিছনে গৃহিণী চলেছেন, পোষাকে একটু বাহারের আমেজ—মুখে চোখে একরকমের কমনীয়তা আছে, অথচ ঠিক তার ধাতু-প্রত্যয় যেন আমাদের জানা নেই! বাঁধা পা মুক্তি পেয়েছে গণতন্ত্রের কৃপায়, কিন্তু পা যেন এখনও তেমন
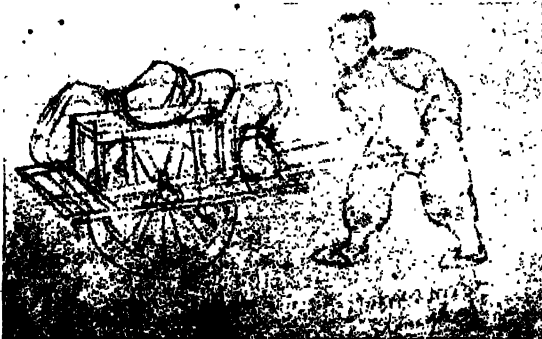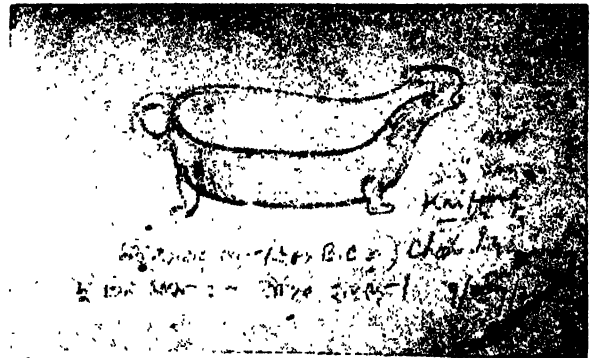
দিয়ে এসেছে, তার অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে এদের প্রাচীন ভাস্কর্য্য ও চিত্র-কলায়। সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে তাঙ্ (Tang) সাম্রাজ্যের সময় পরিচ্ছন্নতা ও কলা-কুশলতার যে শিক্ষা চীনের কাছ থেকে জাপান পেয়েছে, তার নিদর্শন আজও জাপানকে গৌরবান্বিত করে' রেখেছে, কিন্তু সেই সুষমা-সৌষ্ঠবের আদি-উৎস চীনের আজ কি দুর্দ্দশা! সন্দেহ হয় যেন সেই আদিম সভ্যতার ক্ষেত্রের উপর একটা বিজাতীয় বর্ব্বরতার বাণ ডেকে সব ধ্বংস করে' গেছে।

চীনা ঠেলা গাড়ী—নন্দলাল বসু অঙ্কিত

চীনা পুজোপকরণ—নন্দলাল বসু অঙ্কিত

বশে আগোন; চলার মধ্যে পায়-তারাটা যেন বেশী স্পষ্ট, ছন্দ এখনও জাগেনি। নিম্নশ্রেণীর মেয়েদের মত শিশুকে পিঠে না বেঁধে, বুকে করে' নেবার অভ্যাস এদের আছে; মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের, আমাদের দেশের মত পর্দ্দার বালাই নেই, অবাধে সর্ব্বত্র এরা চলা ফেরা করে। গৃহিণী ছেলেদের নিয়ে চলেছেন…পথে চীনে রসুইকরা নানা জিনিষ বেঁধে বাঁক-কাঁধে ফেরি করে' চলেছে… অন্যান্য দেশের মত এখানে ফেরি-ওয়ালার "হাঁক" নেই, তার জায়গায়

চীন রাজমহলে রবীন্দ্রনাথ
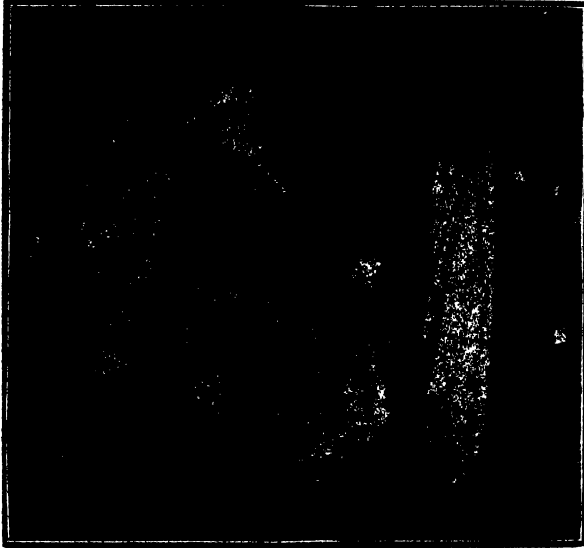
চীনা অভিনেতা ও রবীন্দ্রনাথ

সাঙ্কেতিক আওয়াজ আছে; কাঠের বা লোহার কাটি দিয়ে ঠুকে যে-যে তালে আওয়াজ করে সেটা থেকে ছেলে-বুড়ো বুঝ্তে পারে কোন্ জিনিষ বেচ্ছে। পিছনে একটা আওয়াজ হতে চেয়ে দেখি একদল ছেলে চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে, বাঁকের মধ্যে 'ভ্রাম্যমাণ হোটেল' থেকে 'সোইয়া' সিম সিদ্ধ মাংস ইত্যাদি লোভনীয় জিনিষ খেতে চায়; ছেলেদের মা দর-

মধ্যবিত্ত চীনা দম্পতি—নন্দলাল বসু অঙ্কিত
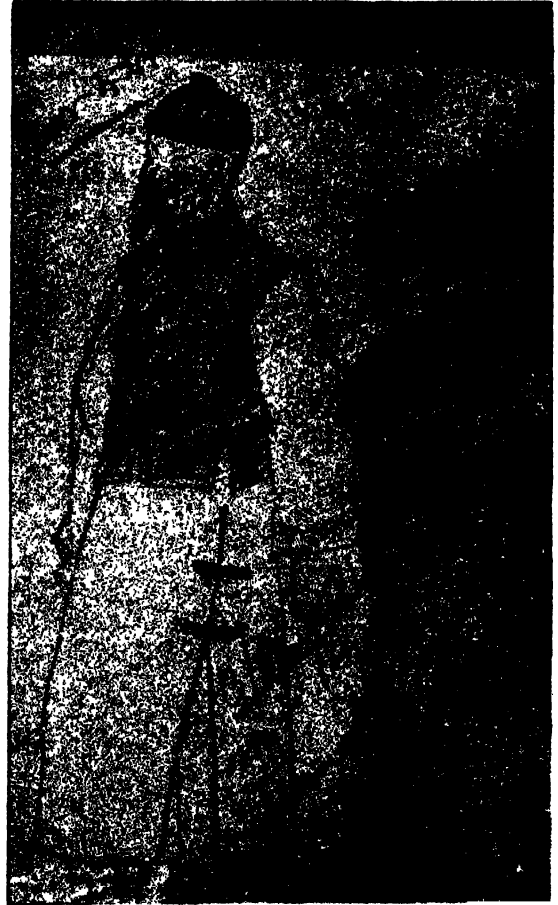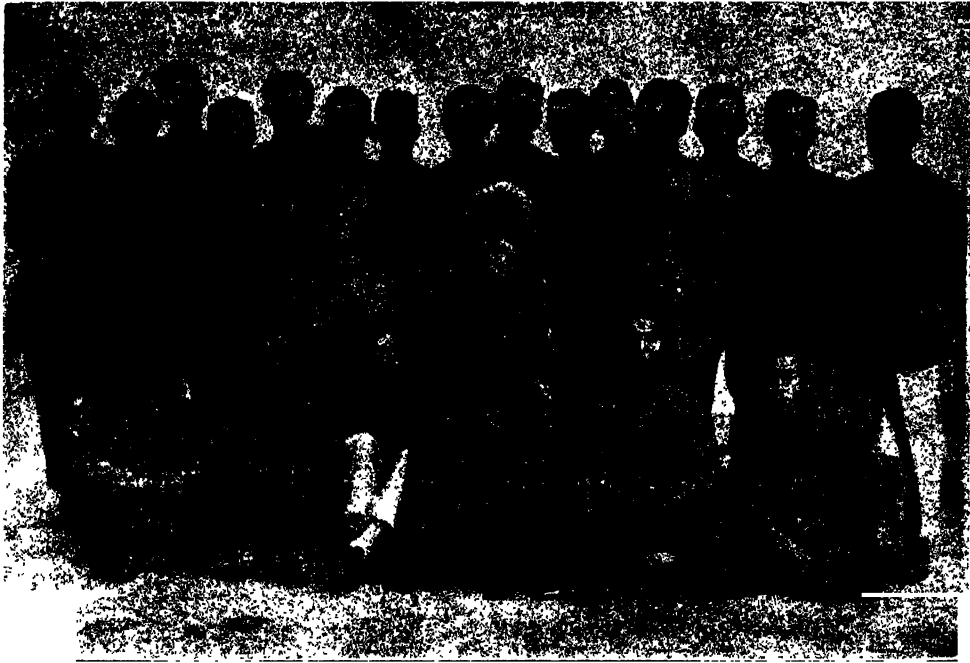
চীনা ছাত্র-সঙ্ঘ ও রবীন্দ্রনাথ

দস্তুর করে' কিনে দিচ্ছেন আর তারা মনের আনন্দে খাচ্ছে। এম্‌নি করে' চীনের রাস্তায়-রাস্তায় স্থাবর অথবা চলন্ত হোটেলে মধ্যাহ্ন বা সান্ধ্য ভোজন সেরে মানুষ কাজ-কর্ম্ম করে' যায়। প্রত্যেক বার বাড়ী গিয়ে খাবার বালাই নেই।

এদেশে একালের স্কুল-কলেজে পড়া ছেলে-মেয়েদের মুখে একটা নতুন ভাব, নতুন জিনিষ দেখবার, বুঝবার, আয়ত্ত করবার আগ্রহ অসীম; এই দিক্‌টা কাছে এসে না

চীনা সিংহ—নন্দলাল বসু অঙ্কিত

দেখ্‌লে বিশ্বাস করা শক্ত, চীন যে চিরস্থবির এই ধারণাটাই যেন সাধারণের মনে পাকা হ'য়ে গিয়েছে। কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথের চারদিকে যে তরুণ চীন-দল সমবেত হয়েছিল, তাদের মধ্যে প্রাচীন ও নবীনের একটা বড় রকম সংঘর্ষ অথবা বোঝাপড়া যে আরম্ভ হয়েছে, তা প্রতিপদে আমরা অনুভব করেছি; এদের আধুনিক শিক্ষার উপর পাশ্চাত্য প্রভাব পুরোদমে চলছে; শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি প্রায়ই পাশ্চাত্য পাদ্রীসঙ্ঘের হাতে; আধুনিক নাট্যশালায় এমন-কি চিত্রকলায়ও পাশ্চাত্য শিল্পকলার ছাপ পড়ছে; রাজনৈতিক ক্ষেত্রের ত কথাই নাই। সুতরাং উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ভারতের নব্যশিক্ষিতের দল যেমন একটা নকল-নবিশীর অধ্যায় আমাদের ইতিহাসে লিখে এসেছে, নব্য চীনও আর এক রকমে সেই অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে চলেছে। এই উলট-পালটের যুগে বিচার করা সহজ, কিন্তু বোঝা কঠিন; কারণ খুঁতগুলো প্রকট, কিন্তু স্থায়ী সঞ্চয়টা স্পষ্ট নয়; ঐতিহাসিক ছন্দবোধ বজায় রেখে চীনের সঙ্গে একাত্ম হ'য়ে যদি কেউ দেখ্‌তে পারেন, তবেই এসমস্তার মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করা সম্ভব হবে। তুরস্ক থেকে চীন-জাপান পর্য্যন্ত প্রাচ্যখণ্ডে যে বিরাট্ ঐতিহাসিক নাট্যের অবতারণা হয়েছে, কবে কোন্ অজ্ঞাত সূত্রধার তার

নান্দীবাচন করে' গেছেন, কত বিচিত্র অঙ্ক-গর্ভাঙ্কের বিন্যাসের, কত রুদ্র বীভৎস শান্ত করুণ রস-সঙ্গতিতে তার অনাগত ইতিহাস মুখরিত হ'য়ে উঠ্‌বে কে জানে? শুধু জানি দু'হাজার বছর পূর্ব্বে এক যুগ সন্ধিতে চীন এই ভারতের মুখের দিকে চেয়েছিল এবং ভারত মাতা তাঁর মৈত্রী-কল্যাণ-বিজ্ঞান-ভিক্ষু সন্তানদের চীনে পাঠিয়েছিলেন; আজ আর-এক যুগসঙ্কটে চীন আবার ভারতের দিকে চাইছে। ভারত-গৌরব রবীন্দ্রনাথের নিমন্ত্রণে কত বড় ঐতিহাসিক সম্ভাব্যতার সিংহদ্বার খুলে গেল তা ভবিষ্যতই প্রকাশ কর্‌বে। তাঁর অনুগ্রহে যে-সব জিনিষ দেখ্‌বার সৌভাগ্য হয়েছে, তার কিছু কিছু আভাস দেবার ইচ্ছা রইল।

সাঙহাই, এপ্রিল ১৯২৪

আফ্‌গানিস্থানের প্রবাদ-বাক্য

শ্রী বীরেশ্বর বাগ্‌চী

বেকন (Bacon) বল্‌তেন, কোন জাতির প্রতিভা, রসজ্ঞান এবং ধাত বুঝতে হ'লে সকলের আগে তাদের প্রবাদবাক্যগুলি পড়্‌তে হয়। নীচে আফ্‌গান জাতির কতকগুলি প্রবাদ-বাক্য দেওয়া গেল। এ থেকে তাদের প্রকৃতি-পরিচয় অনেকটা পাওয়া যাবে বোধ হয়।

"বন্ধু যদি চোর হয় তবে নিজের গাধাটাকে শক্ত করে' বেঁধে রাখ্‌বে।

"পাখী খাবার জিনিষ সহজেই দেখ্‌তে পায়, কিন্তু ফাঁদ দেখ্‌তে পায় না।

"মাথার উপরে খোলা তলওয়ার না দেখ্‌লে আল্লার কথা মানুষের মনে পড়ে না।

"অনেকগুলো কালো জিনিষের মধ্যে একটা শাদা জিনিষকে খুব বেশী শাদা দেখায়।

"মা বাঘিনী হ'লেও নিজের সন্তানের মাংস খায় না।

"গাধা বুড়ো হ'লেও মালেকের বাড়ী চেনে না।

"যে ঝগড়া-বিবাদ-প্রিয় সে একসাথে দুই বিয়ে করে।

"নিজের বুদ্ধিটাকেই মানুষ সবচেয়ে বড় ভাবে।

"খেঁকশিয়ালী নিজের ছায়াকে অত্যন্ত বড় মনে করে।

"পাঁকের ভিতরে স্থির হ'য়ে যে দাঁড়িয়ে থাকে সেই বেশী ডুবে যায়।

"এই মাত্র যে আকণ্ঠ পোলাও খেয়েছে ক্ষুধার্ত্তের মর্ম্ম সে কি বুঝ্‌বে?

"মুরগী না ডাক্‌লেও রাত পোহায়।

"যে-ঘাস ষাঁড়ে খায় তাতেই আবার গাধার কাণ কাটে।

"মেঘ দেখ্‌তে কালো হ'লেও তার জল শাদা।

"মুসাফিরের দুনিয়াই হচ্ছে সরাইখানা।

"নিজের পেট পরের খাবার জিনিষ দিয়ে বেশী বোঝাই ক'রো না।

"যার বগলে কোরাণ সেও পরের ষাঁড় দেখে লোভ করে।

"ক্ষ্যাপা কুকুর নিজেকেও কাম্‌ড়াতে ছাড়ে না।

"সামান্য একটা পেঁয়াজও ভালোমুখে মানুষকে দিতে হয়।

"ভালুকের বন্ধুত্ব আঁচড়-কামড়ের নিমিত্তই হ'য়ে থাকে।

"যে ভালোবাসে সেই পরিশ্রম করে।

"চোখ দুটো বড় হ'লেও আমরা দেখ্‌তে পাই ছোট ছোট দুটি তারকার ভিতর দিয়ে।

"বর্শার আঘাত সাংঘাতিক হ'লেও সহজে সারে, কিন্তু মানুষের জিহ্বার আঘাতে মনে যে ঘা হয় তা কখনো সারে না।

"বেকুবের বন্ধুত্ব ভালুকের আলিঙ্গনের তুল্য।

"গাধার বন্ধুত্ব, লাথি খাওয়ার হেতু ভিন্ন আর কিছুই নয়।

"যে ভোগ করে বাস্তবিক পক্ষে ধন তারি—যে সঞ্চয় করে, পাহারা দিয়ে রাখে, তার নয়।"

বর্ত্তমান সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের নাটক

অনেক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-প্রণীত "কর্ম্মফল"-নামক একটি গল্প প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি তিনি তাহাকে নাটকের আকার দিয়া "প্রবাসী"তে ছাপিতে দিবেন, বলেন। পরে "গৃহপ্রবেশ" রচিত হয়। তখন তিনি "কর্ম্মফল" ও "গৃহপ্রবেশ" এই দুটির মধ্যে একটি বাছিয়া লইতে বলেন। তদনুসারে "প্রবাসীর" জন্য "গৃহপ্রবেশ" নির্ব্বাচিত হয়। এই কারণে, "প্রবাসীর" আশ্বিন-সংখ্যায় "কর্ম্মফল" বাহির হইবে, এইরূপ বিজ্ঞাপন দেওয়া সত্ত্বেও তাহার পরিবর্ত্তে "গৃহপ্রবেশ" প্রকাশিত হইল।

এবিষয়ে নানা কাল্পনিক কথার প্রচার হইতেছে বলিয়া, প্রকৃত কথা আমরা যতটুকু জানি ও যতটুকু পাঠকদিগকে জানান দরকার, লিখিলাম।

—

নারীদের ভোট দিবার অধিকার

ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনে, পুরুষদের যেরূপ যোগ্যতা থাকিলে তাঁহারা ভোট দিতে পারেন, নারীদের সেইরূপ যোগ্যতা থাকিলে তাঁহারাও ভোট দিতে পারিবেন, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সম্প্রতি এইরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। অন্য কোন-কোন প্রদেশে ইহা আগেই হইয়া গিয়াছিল, বাংলা দেশে পরে হইল।

নারীরা অধিকার ত পাইলেন; কিন্তু এই অধিকারের সদ্ব্যবহার করিবার মত খবরাখবর রাখিবার ক্ষমতা ও সুযোগ তাঁহাদের না থাকিলে, ইহা হইতে যথোচিত সুফল পাওয়া যাইবে না।

ইংলণ্ডে সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইল স্ত্রীলোকেরা পার্লেমেণ্টের সভ্য নির্ব্বাচন করিবার অধিকার পাইয়াছেন। তাহার আগে কেবল পুরুষেরাই পার্লেমেণ্টের সভ্য নির্ব্বাচন করিতে পারিতেন। বহু পূর্ব্বে, পুরুষদের মধ্যে যাঁহারা সভ্য-নির্ব্বাচনে ভোট দিতে পারিতেন, তাঁহাদের সংখ্যা খুব কম ছিল। নূতন নূতন সংস্কার-আইন (রিফর্ম্-য়্যাক্ট্) দ্বারা ক্রমশঃ অধিকতরসংখ্যক পুরুষ এই অধিকার প্রাপ্ত হন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের সংস্কার-আইন পাস্ হইবার পর রবার্ট্‌লো (ভাইকৌণ্ট্ শেরব্রুক্) বলেন, "আমাদের মনিবদিগকে আমাদের শিক্ষিত করিতে হইবে" ("We must educate our masters")। তাঁহার কথাগুলি এই আকারেই সচরাচর উদ্ধৃত হইয়া থাকে; কিন্তু তিনি বাস্তবিক বলিয়াছিলেন, "It was necessary to induce our future masters to learn their letters," অর্থাৎ "আমাদের ভবিষ্যৎ মনিবদের মনে বর্ণমালা শিখিবার প্রবৃত্তি জন্মাইতে হইবে।" যাহা হউক, তাঁহার বক্তব্য যে-কথা দ্বারাই ব্যক্ত হউক, তাহার উদ্দেশ্য একই। তিনি ইহাই বলিতে চাহিয়াছিলেন, যে, যাহারা পার্লেমেণ্টের সভ্য নির্ব্বাচন করে, শেষ পর্য্যন্ত তাহারাই দেশের কর্ত্তা হইবে। কারণ তাহাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিরাই দেশের আইন করিবে, ট্যাক্স্ ধার্য্য করিবে, রাজস্ব কোন্-কোন্ কাজে ব্যয় হইবে তাহা স্থির করিবে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতির বিস্তৃতি ও উন্নতির ব্যবস্থা করিবে, যুদ্ধ ও সন্ধিতে মত দিবে, ইত্যাদি। যাহাদের প্রতিনিধিদের হাতে এত ক্ষমতা, প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবার মত জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেচনা ও খবরাখবর তাহাদের থাকা উচিত। নিরক্ষর লোকদের কোনই বুদ্ধি নাই, ইহা কেহ বলিবে না। কিন্তু সকল সভ্য দেশের ব্যবস্থাপক সভায় যে-সকল বিষয়ের আলোচনা হয়, তাহা বুঝিতে হইলে, এবং সেই-সব বিষয়ে কোন্-কোন্ প্রতিনিধি ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন করিলেন, কেইবা ভ্রম করিলেন, তাহা বুঝিতে হইলে

যত সংবাদ রাখিতে হয়, এবং রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি বিষয়ে ন্যূনকল্পে মোটামুটি যতটুকু জ্ঞান থাকা দরকার, লেখাপড়া না জানিলে তত খবর রাখা ও তত জ্ঞান লাভ করা সাধারণ নির্ব্বাচকদিগের পক্ষে অসম্ভব। এই কারণে ভাইকৌণ্ট্‌ শেরব্রুক ঠিক্ কথাই বলিয়াছিলেন, যে, ১৮৬৬ সালের বিলাতী সংস্কার-আইন অনুসারে যত ইংরেজ পুরুষ ভোট দিবার অধিকার পাইয়াছিলেন এবং যাঁহারা পরোক্ষভাবে ইংলণ্ডের মনিব হইবেন, তাঁহাদের লিখনপঠনক্ষম হওয়া দরকার।

ভাইকৌণ্ট্‌ শেরব্রুকের কথা কেবল কথাতেই পর্য্যবসিত হয় নাই। ১৮৭০ সালে বিলাতে যে এডুকেশ্যন্ য়্যাক্ট্ বা শিক্ষা-আইন পাস্ হয়, তাহাতে (আমাদের দেশের মিউনিসিপ্যালিটী ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড্ প্রভৃতির মত) বিলাতী স্থানিক কর্ত্তৃপক্ষদিগকে তাঁহাদের এলাকার মধ্যে শিক্ষা অবশ্য দাতব্য করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। অর্থাৎ তাঁহাদের এলাকার মধ্যে স্কুলে যাইবার বয়সের প্রত্যেক বালক-বালিকাকে শিক্ষা দিতে তাহাদের পিতামাতা বা অপর অভিভাবক বাধ্য, এইরূপ নিয়ম করিবার ক্ষমতা তাঁহাদিগকে দেওয়া হয়। ইহার ফলে ইংলণ্ডে শিক্ষা খুব বিস্তৃতি লাভ করিতে থাকে।

আমাদের দেশে ছয় বৎসর পূর্ব্বে কতকগুলি পুরুষ ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচনের অধিকার প্রাপ্ত হন। কিন্তু দেশে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য বিশেষ চেষ্টা নূতন করিয়া কিছু হয় নাই। এখন আবার অনেক স্ত্রীলোকও ভোট দিবার অধিকার পাইলেন। স্ত্রীলোকদের মধ্যে শিক্ষার অবস্থা পুরুষদের চেয়েও খারাপ। ১৯২১ সালের সেন্সস্-অনুসারে বাংলাদেশে ৫ বৎসর ও তদূর্দ্ধ বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে হাজারে ১৮১ জন লিখনপঠনক্ষম এবং ঐ বয়সের স্ত্রীলোকদের মধ্যে হাজারে ২১ জন লিখনপঠনক্ষম। লিখনপঠনক্ষম ব্যক্তিমাত্রকেই শিক্ষিত বলা যায় না; অথচ শুধু একটু লিখিতে-পড়িতে পারে, এরূপ বালিকাদিগকেও গণনার মধ্যে আনিয়া বঙ্গে শতকরা দু'জন মাত্র স্ত্রীলোককে লিখনপঠনক্ষম বলিয়া ধরা হয়।

যে-দেশে শিক্ষার অবস্থা এইরূপ, সেখানকার অধিকাংশ পুরুষ-নির্ব্বাচক ব্যবস্থাপক সভায় আলোচিত অধিকাংশ বিষয়ের খবর রাখিতে ও বুঝিতে এবং এরূপ আলোচনা করিবার উপযুক্ত প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে সমর্থ, ইহা বলা যায় না। নির্ব্বাচিকারা নির্ব্বাচকদের চেয়ে অধিকতর সমর্থ হইবেন, তাহাও বলা যায় না। অথচ নির্ব্বাচক ও নির্ব্বাচিকাদের সংখ্যাবৃদ্ধি খুব প্রার্থনীয়, সুতরাং দেশের মধ্যে শিক্ষাবৃদ্ধি কিরূপে হয়, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদের মধ্যে শিক্ষাবৃদ্ধি কি প্রকারে হইতে পারে, তাহার বন্দোবস্ত হওয়া খুব দরকার।

একটা কোন কথা উঠিলেই, অনেক সময় আমরা বিলাতের সঙ্গে তুলনা করিয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার ও আত্ম-প্রসাদ লাভ করিবার চেষ্টা করি। মনে করুন সামাজিক দুর্নীতির কথা আলোচনা করিতে গিয়া কেহ বলিলেন, যে, সামাজিক পবিত্রতা রক্ষা করিতে হইলে আমাদের এই সামাজিক প্রথার পরিবর্ত্তন আবশ্যক। অমনি একদল লোক বলিয়া উঠিবেন, বিলাতে সামাজিক অপবিত্রতা আরো বেশী। যেন বিলাতের লোকেরা নরকের কীট বলিয়া প্রমাণিত হইয়া গেলেই ইহা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, যে, আমরা প্রত্যেকেই স্বর্গের দেবতা!

বিলাতের নির্ব্বাচকেরাও অনেকে ঠিক্ বুঝিয়া-সুঝিয়া পার্লেমেণ্টের সভ্য নির্ব্বাচন করিতে পারে না, জানি; কিন্তু সেটা গুণ নয়, অযোগ্যতা। সুতরাং সেই অযোগ্যতা আমাদের দেশে থাকিলে তাহাও অযোগ্যতা, গুণ নয়। এই অযোগ্যতা আমাদিগকে দূর করিতে হইবে।

বিলাতের পার্লেমেণ্টের যেরূপ ক্ষমতা আছে, আমাদের দেশে ব্যবস্থাপক সভাগুলির সেরূপ ক্ষমতা নাই, ইহা সকলেই জানে। সুতরাং পার্লেমেণ্টের সভ্যগণের নির্ব্বাচকেরা যে-অর্থে বিলাতের কর্ত্তা, আমাদের দেশের ব্যবস্থাপক সভা-সভ্যগণের নির্ব্বাচকেরা সে-অর্থে দেশের কর্ত্তা নহে। কিন্তু বর্ত্তমানেও ব্যবস্থাপক সভার কিছু ক্ষমতা আছে, এবং ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই আরো বাড়িতে-বাড়িতে ব্যবস্থাপক সভাগুলি পার্লেমেণ্টের সমতুল্য হইয়া উঠিবে। অতএব ভাইকৌণ্ট্‌ শেরব্রুকের ভাষায় কেহ একথা আমাদের দেশেও বলিলে ভুল হইবে না, যে,

দেশের ভবিষ্যৎ মনিব ও কর্ত্তাদের মনে অক্ষর শিখিবার প্রবৃত্তি জন্মাইয়া তাহার সুযোগ প্রদান অবশ্য কর্ত্তব্য।

—

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার গত বৈঠক

নারীগণকে ভোটের অধিকার প্রদান ব্যতীত আরও অনেক বিষয়ের আলোচনা বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আগষ্ট মাসের অধিবেশনে হইয়াছিল। তাহার কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি।

—

সভাপতি নির্ব্বাচন

ভারতশাসন-সংস্কার-আইন-অনুসারে ব্যবস্থাপক সভাগুলির প্রথম সভাপতি সর্ব্বত্র গবর্ণ্মেণ্ট মনোনয়ন ও নির্ব্বাচন করেন। মনোনীত সভাপতিদের কার্য্যকাল শেষ হওয়ায় এখন উক্ত আইন-অনুসারে সর্ব্বত্র ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ সভাপতি নির্ব্বাচন করিতেছেন। বাংলা দেশে কুমার শিবশেখরেশ্বর রায় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন; স্বরাজ্যদলের সভ্য ডাঃ আবদুল্লা অল্‌মামুন সুহ্রাবর্দ্দী ছয় ভোটে হারিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে সভাপতির কার্য্যের জন্য কে যোগ্যতর ছিলেন, জানি না; কিন্তু ডাঃ সুহ্রাবর্দ্দীর পাণ্ডিত্য-খ্যাতি অধিক, ইহা অনায়াসে বলা যায়।

স্বরাজ্যদলের লোকেরা, ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিয়া গবর্ণ্মেণ্টের সব কাজে অবিরত বাধা দিবেন, এই অঙ্গীকার করিয়া নির্ব্বাচিত হন। তাঁহাদের এই বাধা-প্রদান-নীতি অনেক দিন হইল পরিত্যক্ত হইয়াছে। এক্ষণে তাঁহারা সর্‌কারী চাকরীও লইতেছেন। পূরা অসহযোগ হইতে তাঁহারা এপর্য্যন্ত এত দূর আসিয়াছেন; আরো কত দূর যাইবেন, তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত।

এজন্য আমরা তাঁহাদিগকে দোষ দিতেছি না। সহযোগিতা করিলে অধর্ম্ম হয় না, অসহযোগিতা করিলেও অধর্ম্ম হয় না। কৌন্সিল বর্জ্জন করিলে অধর্ম্ম হয় না, কৌন্সিলে প্রবেশ করিলেও অধর্ম্ম হয় না। কৌন্সিলে বাধা প্রদান করিলে অধর্ম্ম হয় না, না করিলেও অধর্ম্ম হয় না। অবস্থাবিশেষে উভয় প্রকার আচরণই ন্যায্য হইতে পারে। বক্তব্য কেবল এই, যে, স্বরাজ্যদলের লোকেরা যেন ভাণ না করেন, যে, তাঁহাদের নীতি অপরিবর্ত্তিত আছে, এবং তাঁহারা নির্ব্বাচকদিগকে যে আশা দিয়া নির্ব্বাচিত হইতে পারিয়াছিলেন, সেই আশা পূর্ণ করিবার চেষ্টা এখনও করিতেছেন।

ইহাও তাঁহাদিগকে মনে পড়াইয়া দেওয়া অনুচিত হইবে না, যে, যখন শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহাদের অভিপ্রায়-মত কাজ করেন নাই, তখন তাঁহারা তাঁহাদের কাগজে ও তাঁহাদের প্ররোচনায় আহূত সভায় তাঁহাকে সভ্যপদ ত্যাগ করিতে আদেশ করেন। এখন তাঁহারা নিজেই তাঁহাদের নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে ঘোষিত অভিপ্রায়-অনুসারে কাজ করিতেছেন না; পদত্যাগের ব্যবস্থাটা এখন নিজেদের প্রতি প্রয়োগ করিলে সুসঙ্গত হয় না কি? না, মাকড় মারিলে ধোকড় হয়?

—

অনিলবরণ রায় ও সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র

শ্রীযুক্ত অবনীশচন্দ্র রায় প্রস্তাব করেন, যে, রাজবন্দী শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায় ও সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্রকে জেল হইতে আনাইয়া ব্যবস্থাপক সভার আগামী অধিবেশনে রাজানুগত্যের শপথ করিতে দেওয়া হউক। সর্‌কার পক্ষ ইহার খুব বিরোধিতা করা সত্ত্বেও খুব বেশী ভোটে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বে-সর্‌কারী পক্ষের একটা যুক্তি এই ছিল, যে, যখন গবর্ণ্মেণ্ট রায় এবং মিত্র মহাশয়দিগকে নির্ব্বাচিত হইতে দিয়াছেন, তখন তাহার দ্বারা তাঁহাদিগকে সভ্যের কাজ করিতে দিবার অঙ্গীকারও পরোক্ষভাবে করা হইয়াছে,—অন্ততঃপক্ষে পরোক্ষভাবে গবর্ণ্মেণ্ট সেই আশা সর্ব্বসাধারণের মনে জাগাইয়াছেন; অতএব এখন সেই অঙ্গীকার পালন করা বা সেই আশা পূর্ণ করা গবর্ণ্মেণ্টের কর্ত্তব্য। গবর্ণ্মেণ্ট-পক্ষ হইতে এই জবাব দেওয়া হয়, যে রায় ও মিত্র মহাশয়দিগের সভ্যপদপ্রার্থী হওয়া ও নির্ব্বাচিত হওয়ায় বাধা দিবার অধিকার গবর্ণ্মেণ্টের ছিল না, সুতরাং তাঁহাদিগকে নির্ব্বাচিত হইতে দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু তাঁহারা রাজবন্দী, রাজবন্দীদিগকে কৌন্সিলে আসিয়া শপথ করিতে দেওয়া সর্ব্বসাধারণের হিতসাধক নহে। রায় ও মিত্র মহাশয়দিগকে

মুক্তি দিলে কিম্বা কৌন্সিলে আসিতে দিলে সার্ব্বজনিক অহিত না হইয়া হিতই হইবে বলিয়া আমরা মনে করি। সুতরাং সরকারী যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করি না।

কিন্তু গবর্ণমেণ্টের কৌশলটা হয়ত স্বরাজ্যদল বুঝিতে পারেন নাই। কৌন্সিলে গবর্ণমেণ্ট বিরোধী সভ্যের সংখ্যা যত কম থাকে, সরকারের পক্ষে ততই সুবিধা। এইজন্য, গবর্ণমেণ্ট অনিল-বাবু ও সত্যেন্দ্র-বাবুকে নির্ব্বাচিত হইতে দিয়াছেন এই উদ্দেশ্যে, যে, তাঁহারা ত বন্দীই থাকিবেন, সরকারের বিরুদ্ধে ভোট দিতে কৌন্সিলে আসিতে পাইবেন না। এই প্রকারে গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান কৌন্সিলের জীবিতকালের জন্য নিজের বিরোধী দলের সভ্য-সংখ্যা কার্য্যতঃ দুইজন কমাইয়া দিয়াছেন।

স্বরাজ্যদলের একটা উদ্দেশ্য ছিল, দেশের লোক অনিল-বাবু ও সত্যেন্দ্র-বাবুকে নির্দ্দোষ এবং শ্রদ্ধেয় ও বিশ্বাসযোগ্য মনে করে, ইহা প্রমাণ করা। তাঁহাদের নির্ব্বাচন দ্বারা সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। তাহার পর যখনই তাঁহাদিগকে গবর্ণমেণ্ট শপথ করিতে দিলেন না, তখনই তাঁহারা সভ্যপদ ত্যাগ করিয়া অপর দু'জন স্বরাজী সভ্যের নির্ব্বাচনের সুযোগ করিয়া দিলে ঠিক্ চা'ল হইত। এখনও যদি তাঁহারা পদত্যাগ করেন, এবং তাঁহাদের স্থানে অন্য দু'জন স্বরাজী সভ্য নির্ব্বাচিত হন, তাহা হইলে কৌন্সিলে স্বরাজীদের দল পুরু হইবে, এবং গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ভোট দিবার দু'জন লোক বাড়িবে।

—

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন

একটা আইন করিয়া বৎসরে সাড়ে পাঁচ লাখ টাকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকারী সাহায্য দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সাহায্য ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের মঞ্জুরী-সাপেক্ষ হইবে না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়-সম্বন্ধে যে-প্রভেদ আছে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীর ফী এবং ছাত্রদত্ত বেতন হইতে যত আয় হয়, ঢাকার তত হয় না। কলিকাতার স্থায়ী আয়ের জন্য প্রদত্ত অনেক টাকা (endowment) আছে যাহা ঢাকার নাই। পুস্তক বিক্রয় হইতে কলিকাতার আয়, ঢাকার নাই। সুতরাং ঢাকাকে বাঁচিতে হইলে সরকারী সাহায্যের উপর যতটা নির্ভর করিতে হইবে, কলিকাতাকে ততটা নহে।

অন্যদিকে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে, যে কলিকাতাকে ঢাকা অপেক্ষা অনেক বেশী ছাত্রের শিক্ষার ও পরীক্ষার বন্দোবস্ত করিতে হয়, এবং ঢাকা অপেক্ষা কলিকাতায় অধিকতরসংখ্যক বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া হয়। সুতরাং কলিকাতার আয় যেমন বেশী, টাকার দরকারও তেম্‌নি বেশী। অতএব সরকারী সাহায্যের দরকার কেবল ঢাকারই আছে, কলিকাতার নাই, অথবা ঢাকার প্রয়োজনটা স্বতঃসিদ্ধ, কলিকাতার প্রয়োজনটা অনুসন্ধান ও বিবেচনা-সাপেক্ষ ইহা আমরা স্বীকার করি না। কাহার কত টাকা প্রয়োজন, তাহার উভয় স্থলেই অনুসন্ধান ও বিবেচনা সাপেক্ষ।

এই কারণে আমরা মনে করি, কলিকাতার কত টাকা প্রয়োজন, তাহা বিবেচনা করিবার জন্য যেমন কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল, ঢাকার প্রয়োজন নির্ণয়ের জন্যও তেম্‌নি কমিটি নিয়োগ করিয়া তাহার রিপোর্টের অপেক্ষা করা উচিত ছিল।

দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, গরীব বাংলা দেশে সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা কম টাকা নহে বলিয়া, ইহার ব্যয়ের আলোচনা একেবারে ব্যবস্থাপক সভার অধিকার-বহির্ভূত করিয়া দেওয়া উচিত হয় নাই। ব্যয়ের আলোচনা করা ব্যবস্থাপক সভার একটা বিশেষ অধিকার। ইহা আমরা জানি যে, অনিশ্চয়ের মধ্যে কাজ হয় না; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় এক বৎসর আছে, পর বৎসর না থাকিতে পারে, এঅবস্থায় ভাল অধ্যাপক পাওয়া কঠিন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, সমগ্র বাংলা দেশের প্রাথমিক হইতে কলেজের শিক্ষার জন্য যে সরকারী টাকা ব্যয় হয়, তাহাও ত প্রতি বৎসরই ব্যবস্থাপক সভায় মঞ্জুর করাইয়া লইতে হয়; সমগ্র দেশের এই শিক্ষা কি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত শিক্ষা অপেক্ষা কম প্রয়োজনীয়? সমস্ত দেশের শিক্ষার টাকা মঞ্জুর করার কাজটা যখন ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের সুবিবেচনার উপর ফেলিয়া রাখা চলিয়াছে, তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আবশ্যকটা তাঁহারা নামঞ্জুর

করিয়া দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিবেন, মনে করিবার কারণ কি আছে? এতদিন ত ঢাকার টাকা ব্যবস্থাপক সভাই মঞ্জুর করিয়া আসিতেছিলেন, ভবিষ্যতে করিবেন না মনে করিবার কারণ কি ঘটিয়াছে? একবার ব্যবস্থাপক সভা সরকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক কর্ম্মচারীদের বেতনের টাকা মঞ্জুর করেন নাই; তথাপি গবর্ণমেণ্ট ত এরূপ আইন করেন নাই, যে, বিদ্যালয় পরিদর্শক কর্ম্মচারীদের বেতন বাবতে যত টাকার প্রয়োজন তাহা ব্যবস্থাপক সভার ভোটের জন্য পেশ্ না করিয়াই প্রতিবৎসর বজেটে বরাদ্দ করা হইবে? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যকারিতার আলোচনা ব্যবস্থাপক সভার অধিকারের সম্পূর্ণ বাহিরে লইয়া যাওয়ায় পরোক্ষভাবে অপব্যয়ের, আলস্যের ও অযোগ্যতার প্রশ্রয় দেওয়া হইবে বলিয়া আশঙ্কা হয়।

আমাদের বিবেচনায়, ঢাকার সরকারী সাহায্য সম্পূর্ণ-রূপে ব্যবস্থাপক সভার মর্জির উপর ফেলিয়া না-রাখা একান্ত আবশ্যক মনে হইয়া থাকিলে, উহা তিন বা ঊর্দ্ধ-পক্ষে পাঁচ বৎসর অন্তর ব্যবস্থাপক সভায় আলোচিত হইবে, এইরূপ নিয়ম করা উচিত ছিল। সাড়ে পাঁচ লক্ষের প্রত্যেকটি টাকা না হইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্ব লুপ্ত হইবে, ইহা নিশ্চয়ই সত্য নহে। সুতরাং যত টাকা না হইলে ঢাকা টিকিবেই না, তাহা পাঁচ বৎসরের জন্য মঞ্জুর করিয়া, বাকী টাকাটা বৎসর-বৎসর ভোটের অধীন করিলেও ভাল হইত।

ঢাকায় বৈজ্ঞানিক পরীক্ষামন্দির, ছাত্রাবাস প্রভৃতি নানা বিষয়ে উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত হইয়াছে। উহার জন্য অনেক অর্থব্যয়ও হইয়াছে। উহা প্রতিষ্ঠিত করিবার পূর্ব্বে উহা যে আদর্শ অনুসারে স্থাপিত ও পরিচালিত হইবে বলিয়া প্রকাশ করা হয়, আমরা তাহার সমালোচনা করিয়াছিলাম। প্রতিষ্ঠা যখন হইয়াছে এবং অর্থব্যয়ও হইয়াছে, তখন উহা বাঁচিয়া থাকিয়া ক্রমশঃ দোষত্রুটিনির্মুক্ত হইয়া দেশের কল্যাণের কারণ হউক, ইহা শিক্ষিত ও চিন্তাশীল বাঙালী মাত্রেই চাহিবেন। উহার প্রাণবধ করিবার ইচ্ছা কাহারও নাই, ইহাই ধরিয়া লওয়া উচিত।

—

হাবড়ার সেতু বিল

গঙ্গার উপর হাবড়ার যে ভাসমান সেতু আছে, তাহা পুরাতন হওয়ায় ও বর্ত্তমান প্রয়োজনের অনুপযোগী হওয়ায় একটি নূতন সেতু নির্ম্মাণের কথা অনেক বৎসর হইতে হইতেছে।

যেরূপ সেতু নির্ম্মাণের কথা হইতেছে, তাহার ব্যয় অত্যন্ত বেশী ধরা হইয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। অনেক দিন হইল, ইংলণ্ড-প্রবাসী বিখ্যাত এঞ্জিনীয়ার ডাঃ বীরেন্দ্রনাথ দে এ-বিষয়ে ফর্ওয়ার্ড কাগজে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া দেখান, যে, সরকারের অনুমোদিত-প্রকারের সেতু পৃথিবীর অন্যত্র প্রস্তাবিত হাবড়া-সেতুর অনুমিত ব্যয় অপেক্ষা অনেক কম ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে।

হাবড়া সেতু বিল সিলেক্ট্ কমিটির হাতে গিয়াছে। এ বিষয়ে স্যার্ প্রভাসচন্দ্র মিত্রের প্রস্তাব বিবেচনার যোগ্য। তাঁহার মতে সেতুর ব্যয় আড়াই কোটি অপেক্ষা অধিক হওয়া উচিত নহে, এবং এই ব্যয়ের কিয়দংশ ভারত গবর্ণমেণ্টের দেওয়া উচিত। কলিকাতা বন্দর হইতে ভারত গবর্ণমেণ্ট্ মোটামুটি পনের কোটি টাকা বাণিজ্যশুল্ক পাইয়া থাকেন। এই টাকাটা অবশ্য কেবল কলিকাতা বা বাংলাদেশের লোকেরা দেয় না। কিন্তু অনেকটা দেয়। হাবড়ার সেতু ভাল হইলে কলিকাতার বাণিজ্যের সুবিধা হইবে, এবং ভারত গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্যশুল্কের আয়ও বাড়িবে। সুতরাং প্রভাসবাবুর কথাটা অযৌক্তিক নহে।

—

যশোর জেলার নদীর সংস্কার

যশোর জেলার ভৈরব ও অন্যান্য নদীতে আবার যাহাতে আগেকার মত স্রোত বহে, যাহাতে উহাতে আগেকার মত নৌকাদির সাহায্যে যাত্রী ও মালবহনের কাজ সুশৃঙ্খলার সহিত চলে, জলসেচন দ্বারা কৃষির উন্নতি হয়, নদীগুলির এরূপ সংস্কার একান্ত আবশ্যক। বস্তুতঃ যশোর খুলনার জীবন-মরণ নদীগুলি সংস্কারের উপর নির্ভর করিতেছে। নদীগুলির সংস্কার না হইলে ম্যালেরিয়া নিবারিত হইবে না, এবং ম্যালেরিয়া নিবারিত না হইলে ঐ-দুটি জেলার উন্নতি না হইয়া ক্রমশঃ অবনতিই হইতে থাকিবে।

—

আফিং সম্বন্ধে-প্রশ্ন

মদ আফিং প্রভৃতি সম্বন্ধে কোন কথা উঠিলেই গবর্ণমেণ্ট্ বলেন, আবগারী রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে, তাঁহারা আবগারী শুল্কের হার খুব উচ্চ করিয়া মাদক দ্রব্য সকলের ব্যবহার কমাইতেই ইচ্ছা করেন। অথচ বাংলাদেশে আফিঙের কাটতি-সম্বন্ধে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্নের উত্তরে মিঃ এমার্সন বলিতে বাধ্য হন, যে, বাংলার আটটি জেলায় জাতিসংঘের (লীগ্ অব্ নেশ্যন্সের) নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অপেক্ষা বেশী আফিং বিক্রী হয়। জাতিসংঘ বিশেষজ্ঞদিগের দ্বারা অনুসন্ধান করাইয়া স্থির

করিয়াছিলেন, যে, চিকিৎসা ও বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনের জন্ম আফিঙের যে ব্যবহার, তাহাই বৈধ ব্যবহার, এবং এই বৈধ ব্যবহারের জন্ত প্রতিবৎসর দশহাজার মানুষের নিমিত্ত ছয় সের আফিং যথেষ্ট। বঙ্গের আটটি জেলায় ইহা অপেক্ষা বেশী আফিং খরচ হয়; কলিকাতার ত খুবই বেশী।

—

আমোদের উপর ট্যাক্স

সিনেমা ও থিয়েটারের প্রত্যেক বিক্রীত টিকিটের উপর গবর্ণমেণ্ট্ যে ট্যাক্স আদায় করিতেন, তাহা উঠাইয়া দিবার জন্ত একটি প্রস্তাব ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত হইয়াছে।

মানুষের বিশুদ্ধ আমোদের প্রয়োজন আছে। থিয়েটার ও সিনেমার দ্বারা আমোদের সঙ্গে শিক্ষা দেওয়াও অসাধ্য বা অসম্ভব নহে। যে অভিনয় ও বায়োস্কোপ প্রদর্শনী হইতে মানুষ এইপ্রকারে লাভবান্ হয়, তাহা যত সস্তা হয়, ততই ভাল। কিন্তু দুঃখের বিষয় বায়োস্কোপে যে-সব ফিল্ম্ দেখানো হয়, তাহা সেন্সরের অনুমোদিত হইলেও, অধিকাংশ ফিল্ম্‌কে নির্দ্দোষ বা হিতকর বলা যায় না। থিয়েটারগুলিতে অভিনেত্রীরা যে-শ্রেণী হইতে গৃহীত, তাহাতে তাহার নৈতিক হাওয়াও ভাল হইবার কথা নহে। সুতরাং যে-প্রকার সিনেমা ও থিয়েটার সস্তা হওয়ায় আমরা পক্ষপাতী, কলিকাতার গুলি সেরূপ না হওয়ায়, জনসাধারণের কল্যাণের জন্ত ট্যাক্স উঠিয়া যাওয়া দরকার হইয়াছে, বলিতে পারি না।

—

মুসলমান ওয়াক্‌ফ্ ও হিন্দুদের দেবোত্তরাদি সম্পত্তি আইন

মুসলমান ও হিন্দু সমাজের অনেক লোক ধর্ম্মকর্ম্মের জন্ত অনেক সম্পত্তি দিয়া গিয়াছেন, এবং এখনও দিতেছেন। অনেকস্থলে এইসব সম্পত্তির অপব্যবহার হইয়া থাকে। মাস্রাজে হিন্দু সমাজের ধর্ম্মার্থে প্রদত্ত সম্পত্তির সুব্যবহারের জন্ত আইন হওয়ায় সুফল ফলিতেছে। তিরুপতি মন্দিরের দেবসেবা-আদি সমুদয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া চল্লিশ লক্ষ টাকা জমিয়াছে। তা ছাড়া দেবসেবা-আদির ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া বার্ষিক দশ লক্ষ টাকা আয় হইবে। এইসমস্ত টাকার সাহায্যে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত ও পরিচালিত হইবে। বাংলা দেশেও মুসলমানদের ধর্ম্মার্থে প্রদত্ত সম্পত্তির সদ্ব্যবহারের জন্ত একটি এবং হিন্দুদের জন্ত একটি আইন হওয়া উচিত।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকারী সাহায্যদান

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বার্ষিক তিন লক্ষ টাকা দেওয়া হউক, মোটামুটি এই মর্ম্মের প্রস্তাব বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত হইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পোষ্ট্‌গ্রাডুয়েট্ বিভাগের পুনর্গঠনের জন্ত যে কমিটি নিযুক্ত হয়, তাহার অধিকাংশের মত সেনেটে অধিকাংশ সভ্যের মত-অনুসারে গৃহীত হয়। তাহার পর সেনেট, যে-সব অধ্যাপকের কার্য্যকাল শেষ হইয়াছিল, তাঁহাদিগকে আরও চারি মাসের জন্ত নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই চারি মাস সেপ্টেম্বর মাসে শেষ হইবে। সেনেট এই সঙ্গত আশা করিয়াছিলেন, যে, চারি মাসের মধ্যে বাংলা গবর্ণমেণ্ট্ স্থির করিতে পারিবেন, তাঁহারা তিন লক্ষ টাকা দিবেন, না তার চেয়ে কম টাকা দিবেন। ইতিমধ্যে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার মতও গবর্ণমেণ্ট্ ও দেশের লোকে জানিতে পারিয়াছেন।

আমরা অবগত হইলাম, গবর্ণমেণ্ট্ এপর্য্যন্ত কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই, এবং সেপ্টেম্বরের মধ্যে পারিবেনও না; হয়ত আরও ২।১ মাস পরে পারিবেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে টাকা দেওয়া উচিত কি না, উচিত হইলে কত টাকা দেওয়া উচিত, তাহার আলোচনা আমরা এখানে করিতেছি না। আমরা কেবল ইহাই বলিতে চাই, যে, হাঁ না একটা উত্তর দিবার পক্ষে চারিমাস সময় যথেষ্ট অপেক্ষাও বেশী। ইহার মধ্যে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত না হইয়া গবর্ণমেণ্ট্ অত্যন্ত অন্যায় করিয়াছেন। শুধু অন্যায় নয়, প্রকারান্তরে গবর্ণর লর্ড্ লিটনের প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গও হইতেছে। তিনি একাধিকবার বলিয়াছেন, স্যার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কীর্ত্তি পোষ্টগ্রাডুয়েট্ শিক্ষা-বিভাগ রক্ষার জন্ত তাঁহার গবর্ণমেণ্ট্ টাকা দিবেন। যতই বিলম্বে হউক, যে-কোন সময়ে এই টাকা দিলেই অঙ্গীকার পালিত হইবে না। কেহ যদি একটি অট্টালিকা রক্ষার জন্ত টাকা দিব বলেন, এবং ইমারতটি ভাঙিয়া যাইবার পর টাকার থলি লইয়া উপস্থিত হন, তাহা হইলে তাঁহাকে কেহ সত্যনিষ্ঠ বলিবে না। বঙ্গে দ্বৈরাজ্য নাই, সুতরাং শিক্ষামন্ত্রীও নাই। অতএব লর্ড্ লিটন বলিতে পারেন না, যে, বিলম্বের ও প্রতিজ্ঞাভঙ্গের জন্ত মন্ত্রী দায়ী। "আমি নাচার," বলিবার তাঁহার কোন উপায় নাই।

শুনা যাইতেছে, গবর্ণমেণ্ট্-পক্ষ হইতে এইরূপ ইঙ্গিত করা হইয়াছে, যে, অধ্যাপকদের কার্য্যকাল আপাততঃ আরো মাস-দুই বাড়াইয়া দেওয়া হউক। অধ্যাপকের

কাজ পাথরভাঙা, সুর্কিভাঙা, কুলী-মজুরের কাজের মত নহে, যে, ঘণ্টা হিসাবে বা দিন হিসাবে ঠিকা বন্দোবস্ত করা চলিবে। ইহাতে একাগ্রতার সহিত কতকটা নিশ্চিন্ত-মনে অধ্যয়ন ও চিন্তার দ্বারা প্রস্তুত হওয়া দরকার। কিন্তু মানুষকে এক-মাস দু-মাস তিন-মাসের জন্য নিযুক্ত করিলে, তাঁহাদের সে একাগ্রতা, নিশ্চিন্ততা ও অধ্যয়নাদির দ্বারা প্রস্তুত হইবার সুযোগ ঘটিতে পারে না। কোন কোন স্কুল-কলেজ-সম্বন্ধে আগে শুনা যাইত যে, উহাদের কর্ত্তৃপক্ষ কোন-কোন অধ্যাপক ও শিক্ষককে গ্রীষ্মের দীর্ঘ ছুটির আগে ছাড়াইয়া দিতেন, পরে আবার নিযুক্ত করিবেন কি না, তাহাও ঠিক করিয়া বলিতেন না। এরূপ ব্যবহার গবর্ণমেণ্ট্ এবং বিবেচক বেসরকারী লোকেরা নিন্দনীয় মনে করিয়া আসিতেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে বহু অধ্যাপকের নিয়োগ প্রতিবৎসর একবৎসরের জন্য করিতেন, ইহার নিন্দাও বারবার শুনা গিয়াছে। স্যাড্‌লার কমিশনও শিক্ষাদাতাদিগের চাকরীর স্থায়িত্বের উপর শিক্ষার উন্নতি নির্ভর করে জোর করিয়া বলিয়াছেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট্ এখন নিজেই নিন্দনীয় ব্যবস্থা অনিবার্য্য করিয়া তুলিয়াছেন ও তাহার প্রশ্রয় দিতেছেন।

গবর্ণমেণ্ট্ একটা কিছু মীমাংসা যথাসময়ে না-করায় একদিক্ দিয়া অপব্যয়ও হইতেছে। ইহা খুবই সম্ভব, যে, গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রত্যাশিত টাকা না পাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ অযোগ্য বা অনাবশ্যক কোন-কোন কর্ম্মচারীকে পুনর্নিযুক্ত না করিয়া ব্যয়-সংক্ষেপ করিবেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট্ নিশ্চয় করিয়া একটা কিছু না বলায়, কর্ত্তৃপক্ষ সকলেরই চাকরী ২।৪ মাসের জন্য বজায় রাখিয়া চলিতেছেন, এবং অযোগ্য বা অনাবশ্যক লোকদের বেতনটা বাজে খরচ হইতেছে। সরকারী টাকাই হউক, বা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজের টাকাই হউক, বাজে খরচটা নিন্দনীয়; গরীব দেশে তাহা অধর্ম্ম।

গবর্ণমেণ্ট্ টাকা দেন বা না দেন, কম দেন বা বেশী দেন, অযোগ্য ও অনাবশ্যক লোক রাখা উচিত নয়। এইজন্য, আমরা মনে করি, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের সাহস-সহকারে এরূপ লোকদিগকে আগেই ছাড়াইয়া দেওয়া উচিত ছিল, এবং এখনও ছাড়াইয়া দেওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের অনুমান হয়, যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ নিজেদের গলদ জানেন এবং ইহাও জানেন, যে, এই লোকগুলিও ভিতরের কথা জানে। এই কারণে, তাঁহারা সরকারী সাহায্য সম্বন্ধে একটা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত হাত গুটাইয়া বসিয়া আছেন; এখন কতকগুলি লোককে বেকার অবস্থায় ফেলিলে তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের দোষোদ্ঘাটন করিবে, এবং তাহাতে তাঁহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইতে পারে। গবর্ণমেণ্ট্ বেশী টাকা না দিলে কর্ত্তৃপক্ষ অযোগ্য ও অনাবশ্যক লোকদিগকে অনায়াসে বলিতে পারিবেন, "কি করি বলুন, মশায়, টাকা পাওয়া গেল না; কাজে-কাজেই আপনাদের চাকরী গেল।" কিন্তু কোন-না-কোন সময়ে তাঁহাদিগকে কর্ম্মফল ভুগিতেই হইবে। অন্য সমালোচনার কথা ছাড়িয়াই দিলাম। কিন্তু আমরা যখন অধ্যাপক-বিশেষের সাহিত্যিক চুরি অনেক বহির অনেক পৃষ্ঠার ফোটোগ্রাফের সাহায্যে প্রমাণ করিলাম, তখনও জেদ এবং আশ্রিত-বাৎসল্য-বশতঃ সেব্যক্তির উন্নতিই করা হইল।—যাক্ সে-কথা। কাহারও শাস্তি ঘটাইতেই হইবে, আমাদের এরূপ কোন জেদ নাই। কিন্তু ইহাও আমরা চাই না, যে, কতকগুলি অযোগ্য ও অনাবশ্যক লোক আছে বলিয়া, যোগ্য ও দরকারী লোকেরাও কষ্ট পান ও লাঞ্ছিত হন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকারী সাহায্য দেওয়া হইবে কি না, দেওয়া হইলে কত দেওয়া হইবে, তাহা নির্দ্ধারণে যে বিলম্ব করা হইতেছে, তাহার মধ্যে চাতুরীর অনুমানও অনেকে করিতেছেন। পরচিত্ত অন্ধকার; সুতরাং বাস্তবিক বিলম্বটা ইচ্ছাপূর্ব্বক করা হইয়াছে ও হইতেছে কি না, নিশ্চিত বলা যায় না। কিন্তু চাতুরী অসম্ভব নহে।

এখন শিক্ষামন্ত্রী কেহ নাই। শিক্ষা-বিষয়টার ভার আছে স্যার্ আবদুর রহিমের উপর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে স্থায়ীভাবে বার্ষিক সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা সরকারী সাহায্য দিবার জন্য যে আইন প্রণীত হইয়াছে, তাহার ভার ছিল, স্যার্ আবদুর রহিমের উপর। এ-কথাটা তিনি বেশ ভাল করিয়াই বুঝেন, যে, তিনি যদি আগে হইতেই প্রকাশ করিতেন, যে, গবর্ণমেণ্ট্ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে টাকা দিবেন না, কিম্বা অল্প টাকাই দিবেন, তাহা হইলে ঢাকাকে বৎসর-বৎসর সাড়ে পাঁচ লাখ টাকা স্থায়ীভাবে দিবার নিমিত্ত আইন পাস্ করাইতে তাঁহাকে সম্ভবতঃ কিছু বেগ পাইতে হইত। কলিকাতাকে সাহায্য করা সম্বন্ধে কোন কথা না বলাতেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-বিলের সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক হইয়াছিল। কিন্তু যদি তর্কবিতর্কের পূর্ব্বেই একথা জানা পড়িত, যে, চারি মাসের মধ্যেও গবর্ণমেণ্ট্ কলিকাতা-সম্বন্ধে কোন নির্দ্ধারণ করিবেন না, তাহা হইলে ঢাকা বিলের বিরোধিতা নিশ্চয়ই আরো বাড়িত। এইজন্য অনেকে স্বভাবতঃই অনুমান করেন, স্যার্ আবদুর রহিম চতুরতা-সহকারে আগে ঢাকার টাকাটা মঞ্জুর করাইয়া লইয়াছেন,

তাহার পর এখন বলিতেছেন, কলিকাতা-সম্বন্ধে কিছু নির্দ্ধারণ গবর্ণমেণ্ট চারি মাসেও করিতে পারিবেন না!

কলিকাতা-সম্বন্ধে নির্দ্ধারণে বিলম্বের আরও একটা কারণ আছে বলিয়া কেহ-কেহ সন্দেহ করেন। সেটা অমূলক সন্দেহ হইতে পারে, কিন্তু প্রকাশ করিয়া রাখা ভাল। ইহা সকলেই জানেন, কলিকাতার পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট বিভাগে যাঁহারা কাজ করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেক যোগ্য লোকও যথেষ্ট বেতন পান না; অর্থাৎ তাঁহাদের মত বিদ্বান্ ও অভিজ্ঞ এবং কোন-কোন স্থলে তাঁহাদের চেয়ে কম বিদ্বান্ ও অভিজ্ঞ লোকেরা অন্য কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং সর্কারী ইম্পীরিয়্যাল ও প্রাদেশিক শিক্ষাবিভাগে তাঁহাদের চেয়ে বেশী বেতন পান। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এরূপ লোকদিগকে যদি সেপ্টেম্বর মাসের পর বেকার হইতে হয়, এবং যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরূপ লোকের দর্কার থাকে, তাহা হইলে ঢাকার জন্য তাঁহাদিগকে পাওয়া সহজ হইবে। আগেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরীর আপেক্ষিক অস্থায়িত্ব এবং বেতনের অল্পতা হেতু কেহ-কেহ ঢাকা বা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে চলিয়া গিয়াছেন। ঢাকার জন্য সস্তায় ভাল লোক পাইবার লোভ থাকা কি অসম্ভব?

এরূপ অবস্থার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মোটেই দায়ী নহেন, বলা যায় না। কলিকাতার যেরূপ আয় শিক্ষার বিষয়ের সংখ্যা সেইরূপ রাখিয়া সমুদয় শিক্ষককে উপযুক্ত বেতন দিলে ভাল হইত। গবর্ণমেণ্ট সাহায্য করিবেন, কিম্বা কোন-না-কোন দিক্ হইতে টাকা আসিবে, এরূপ আশা করিয়া নানা বিষয় ও উপবিষয় শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করিতে গিয়া, তদুপযুক্ত যথেষ্ট টাকা না থাকায় অপেক্ষাকৃত কম বেতনে অনেক লোক রাখিতে হইয়াছে। তা-ছাড়া আশ্রিত-প্রতিপালন, দলবৃদ্ধি প্রভৃতি উদ্দেশ্যেও কেহ-কেহ নিযুক্ত হইয়াছেন। ফলে, অনেকেই যোগ্যতা-অনুসারে বেতন পান না এবং সুবিধা পাইলেই অন্যত্র চলিয়া যান।

শুনিলাম, স্যার্ আবদুর রহিম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আফিসে মধ্যে-মধ্যে চিঠি লিখিয়া এরূপসব তথ্য সংগ্রহ করিতেছেন, যাহাতে কলিকাতাকে টাকা কম দিবার কারণ প্রদর্শন করা সহজ হইতে পারে, কিম্বা নিজের সম্প্রদায়ের লোকদিগকে টাকা পাওয়াইবার সুবিধা হইতে পারে।

• কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে গবর্ণমেণ্টের টাকা দেওয়া উচিত কি না, এবং উচিত হইলে কত দেওয়া উচিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদয় আয়ব্যয় পরীক্ষা না করিয়া তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু আয়ব্যয় পরীক্ষা করিবার মত কাগজপত্র আমাদের নিকট নাই।

তবে, ঢাকার সম্বন্ধে যে-কথা বলিয়াছি, কলিকাতার সম্বন্ধেও তাহাই বলিতেছি;—যাহা দেওয়া হইবে, তাহা একেবারে ব্যবস্থাপক সভার আলোচনার বহির্ভূত করিয়া না দিয়া তিন বা পাঁচ বৎসরের জন্য দেওয়া কর্ত্তব্য। ঐ সময় অতীত হইলে আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যকারিতা পরীক্ষা করিয়া পুনর্ব্বার কয়েক বৎসরের জন্য সমান বা বেশী বা কম টাকা মঞ্জুর করা যাইতে পারে।

—

বঙ্গে সংস্কৃত পালি আরবী ও ফারসীর উচ্চশিক্ষা

সংস্কৃত, পালি, আরবী ও ফারসীর চর্চ্চা আমাদের দেশে হওয়া যে একান্ত বাঞ্ছনীয়, তাহা নূতন করিয়া বুঝাইবার আবশ্যক নাই। এইসকল ভাষায় লিখিত নানা-বিষয়ক পুস্তক হইতে সারোদ্ধার করিতে হইলে উচ্চতম শিক্ষার প্রয়োজন। এইরূপ শিক্ষার কেন্দ্র যত বেশী হয় ততই ভাল বটে; কিন্তু সাবেক-ধরণের কতকগুলি পণ্ডিত ও মৌলবী সংগ্রহ করিয়া উচ্চতম শিক্ষার কেন্দ্র বাড়াইয়া বিশেষ কোন লাভ নাই। পণ্ডিত ও মৌলবীর প্রয়োজন আছে; কিন্তু তাঁহারা আধুনিক প্রণালীতে অন্যান্য দেশের সাহিত্যদর্শনাদির সহিত তুলনা দ্বারা তত্ত্বনির্ণয়ে নিপুণ ও অভ্যস্ত না হইলে, পাশ্চাত্য বিদ্বানেরা প্রাচ্য নানা ভাষা ও সাহিত্য হইতে যেসকল তত্ত্ব আবিষ্কার ও সংগ্রহ করেন আমাদের দেশের বিদ্বানেরা তাহা পারিবেন না। সংস্কৃত, আরবী, পালি, ফারসী প্রভৃতিতে সুপণ্ডিত অথচ পাশ্চাত্য বিদ্বান্‌দের মত তত্ত্বনির্ণয়ে পারদর্শী লোকের সংখ্যা আমাদের মধ্যে বেশী নাই; এবং সেরূপ লোক শিক্ষকরূপে পাওয়া ব্যয়সাপেক্ষ। এইজন্য ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়কে যেমন আরবী ও ফারসীর কেন্দ্র করা হইয়াছে, সেই ব্যবস্থা কায়েম রাখিয়া তাহারই চেষ্টা করা ভাল, এবং কলিকাতাকে সংস্কৃত ও পালি চর্চ্চার কেন্দ্র রাখিয়া তাহাকে পুষ্ট করিবার চেষ্টা করা ভাল। উপযুক্ত লোক ও অর্থ বেশী পাইলে উভয় বিশ্ববিদ্যালয়কেই দ্বিবিধ সভ্যতার উচ্চতম অধ্যয়ন-কেন্দ্র করা যাইতে পারে, নতুবা নহে।

—

বঙ্গের আয় ও ব্যয় বৃদ্ধি

বাংলা দেশের স্বাস্থ্যের, কৃষির, শিল্পের, বাণিজ্যের এবং শিক্ষার উন্নতির জন্য যত সর্কারী ব্যয় হওয়া উচিত,

তাহা হয় না। কোন-কোন দিকে সরকারী ব্যয় কমানো যায়, এবং তাহা কমাইয়া উক্ত সর্ব্ববিধ হিতকর ও আবশ্যক কাজের জন্য কিছু অধিক টাকা ব্যয় করা যায়। কিন্তু কেবল তাহার দ্বারা প্রয়োজনীয় হিতকর কাজের নিমিত্ত যথেষ্ট টাকা পাওয়া যাইবে না। আমরা আগে একবার দেখাইয়াছি, যে ভারতবর্ষের বড় প্রদেশগুলির মধ্যে, বাংলা দেশের সরকারী মোট আয় এবং জন প্রতি সরকারী আয় সকলের চেয়ে কম। অথচ বাংলার অধিবাসীর সংখ্যা সকলের চেয়ে বেশী, এবং ইহা সর্ব্বাপেক্ষা অস্বাস্থ্যকর ও পণ্যশিল্পে অনুন্নত বলিয়া এই প্রদেশে লোকহিতকর কার্য্যে ব্যয় খুব বেশী করা উচিত।

বঙ্গের সরকারী আয় বাড়াইবার নানা উপায় হইতে পারে। বাংলা হইতে ইন্‌কম্‌ট্যাক্স্‌ বা আয়কর যত আদায় হয়, অন্য কোন প্রদেশ হইতে তত হয় না। বাংলা হইতে পণ্যশুল্কও (কাষ্টমস্‌ ডিউটি) খুব বেশী আদায় হয়। এই দুইদিকের আয় ক্রমেই বাড়িয়া চলিতেছে। কিন্তু এগুলি ভারত গবর্ণমেণ্ট লইয়া থাকেন, আর বাংলার জমির খাজনাটা বাংলা গবর্ণ্‌মেণ্ট্‌ পান; কিন্তু উহার সম্বন্ধে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থাকায় উহা ক্রমবর্দ্ধনশীল নহে।

অনেকে বলেন, জমির উন্নতিবশতঃ ফসলের পরিমাণ ও আয় যতই বাড়ুক না কেন, জমিদারকে সেই সেকালে যত খাজনা দিতে হইত, এখনও তাহাই দিতে হয়, অথচ জমীদার রায়তের নিকট হইতে ক্রমশঃ বেশী আদায় করিতে পারেন। ইহাও অন্যায়, যে, চাষারা খাটিয়া মরে, তাহারা সারাটা জীবন দুঃখেই কালযাপন করে, আর জমিদারেরা আলস্যে বিলাসব্যসনাদিতে কালক্ষেপ করে। ইহাও দেখানো হয়, যে, কোন উকীল ব্যারিস্টার বা সওদাগর টাকা জমাইয়া কলকারখানা তেজারতি বা বাণিজ্যে তাহা খাটাইলে উহার আয়ের উপর ইন্‌কাম্‌ট্যাক্স্‌ ধার্য্য হয়, কিন্তু সঞ্চিত টাকায় জমিদারি কিনিলে জমিদারির আয়ের উপর ইন্‌কাম্‌ট্যাক্স্‌ লাগে না।

বাংলার ভূমির বন্দোবস্ত সম্বন্ধে সংস্কারের প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। বর্ত্তমান ব্যবস্থায় যাহাদের স্বার্থসিদ্ধি হইতেছে, তাহারা ও তাহাদের দলের লোকেরা সংস্কার চায় না। কিন্তু যদি নূতনবিধ বন্দোবস্ত দ্বারা ভূমি হইতে সরকারী আয় বাড়ে, তাহা হইলেও লোকহিতকর কার্য্যে সেই বর্দ্ধিত আয় প্রযুক্ত না হইতে পারে, কারণ, দেশ আমাদের নয়, ইংরেজদের, আয়ব্যয়ের মালিক আমরা নহি, তাহারা। সরকারী আয় বাড়িলে তাহারা প্রথমে তাহাদের পক্ষে সুবিধাজনক বিষয়েই খুব ব্যয় বাড়াইবে।

কোন দেশ বিদেশীর হস্তগত থাকাটা অস্বাভাবিক ব্যাপার। এই অস্বাভাবিকতা দূর না হইলে সরকারী আয় বাড়িলেও আমরা তাহার সম্যক্‌ ফলভোগ করিতে পারিব না। সেইজন্য, যদিও কৃষকদের পরিশ্রমের ফল তাহারা যথেষ্ট-পরিমাণে ও স্থায়ীভাবে পায়, তাহার উপায় আইন দ্বারা এখনই করা উচিত বলিয়া আমরা মনে করি, তথাপি জমিদারির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পরিবর্ত্তন করিবার আগে স্বরাজ বা আত্মকর্তৃত্ব লাভ আবশ্যক মনে করি। সরকারী আয়ের টাকা কোন্‌ বিভাগে কত খরচ হইবে, তাহার ব্যবস্থা করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা যখন দেশের লোকের হস্তগত হইবে, তখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরিবর্ত্তন করিয়া সরকারী আয় বাড়ানো উচিত কি না, বিবেচিত হইতে পারিবে। অবশ্য কথাটা এরূপভাবে বলিলে প্রভাবশালী জমিদারশ্রেণীকে স্বরাজলাভ-চেষ্টার বিরোধী করিয়া তুলিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। তাহা হইলেও আমাদের যাহা মত তাহা বলিলাম।

ইন্‌কাম্‌ট্যাক্স্‌ ও পণ্যশুল্কের টাকাটা ভারতগবর্ণমেণ্টের হাত হইতে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বাংলা গবর্ণ্‌মেণ্টের হাতে আনিবার চেষ্টা এখনই করা উচিত। কারণ, এই টাকাটা ভারত গবর্ণ্‌মেণ্টের হাতে বর্ত্তমান সময়ে থাকায় তাহা হইতে অপব্যয় ও অতিব্যয় হইতেছে। বাংলা গবর্ণ্‌মেণ্টের হাতে উহা আসিলে এই অপব্যয় বাড়িবে না; বরং উহার অন্ততঃ কিছু অংশ লোকহিতকর কাজের জন্য পাওয়া যাইতে পারে।

লোকহিতকর কাজেরও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আছে। তাহার কোন্‌ বিভাগে কত সরকারী টাকা ব্যয় করা উচিত, তাহা স্থির করিবার মালিক দেশের লোকেরা নহে। এইজন্য ভিন্ন-ভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে টাকার ভাগটা কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা আমরা খবরের কাগজে নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিলেও, কার্য্যতঃ ঐরূপ ভাগ বাঁটোয়ারা করাইবার ক্ষমতা দেশের লোকের নাই।

একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। চিন্তাশীল নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন, যে, যে-প্রদেশে শতকরা ১৮ জন পুরুষ ও দুই জন স্ত্রীলোক লিখন-পঠনক্ষম, সেখানে জাতিবর্ণধর্ম্মনির্বিশেষে বালিকা ও বয়স্থা স্ত্রীলোকদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য শিক্ষাবিভাগের বরাদ্দ টাকার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী অংশ খরচ হওয়া উচিত; তাহার পর বালক ও প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বেশী ব্যয় হওয়া উচিত। এইকারণে যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বার্ষিক সাড়ে পাঁচলাখ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বার্ষিক তিনলাখ টাকার দাবি গবর্ণমেণ্টের নিকট উপস্থিত করা হয়, তখন স্বভাবতঃই এই ন্যায্য প্রশ্ন উঠে, যে, প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কি যথেষ্ট

ব্যয়ের বরাদ্দ করা হইয়াছে ? কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায়, যে, ঢাকা ও কলিকাতাকে সাড়ে আটলক্ষ টাকা যদি গবর্ণমেণ্টের খাজাঞ্চিখানা হইতে দিতে না হয়, তাহা হইলেই ঐ সাড়ে আটলক্ষ টাকা প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বরাদ্দ টাকার যোগ করা হইবে না, প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ঐ পরিমাণ অতিরিক্ত ব্যয় হইবে না। ব্যয় হয়ত হইবে, কনষ্টবল ও হেড্ কনষ্টবলদের মশারির জন্য এবং সবইন্‌স্পেক্টরদের জন্য মোটের সাইকেল এবং ইন্‌স্পেকটর প্রভৃতিদের মোটর গাড়ীর নিমিত্ত। এই-জন্য, একদিকে আমরা যেমন প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বেশী টাকা বরাদ্দ করিতে বলিব, অন্যদিকে তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নিমিত্ত ন্যায্য সাহায্যও চাহিব : প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যত দিন না যথেষ্ট টাকা ব্যয় করা হইতেছে, ততদিন ঢাকাকে বা কলিকাতাকে টাকা দেওয়া স্থগিত থাকুক, তাহা বলিব না। কিন্তু ইহাও বলিব না, যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যত টাকা চায়, ততই দিতে হইবে ; ন্যায্য ও পরিমিত ব্যয়ের বন্দোবস্ত হইলে আপাততঃ যত টাকার দরকার হইতে পারে, কেবল তাহাই দিবার সমর্থন করিব।

—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার-সমস্যাটি জটিল। আমরা এই বিষয়টির আলোচনা অনেক দিন হইতে করিতেছি এবং ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র নানা দোষের উল্লেখ করিয়া সংস্কারের প্রয়োজন দেখাইয়াছি। কিন্তু সকলের চেয়ে দরকারী সংস্কার ইহার সেনেট সীণ্ডিকেট প্রভৃতির গঠন-ব্যবস্থায় সংস্কার। গণতন্ত্রের কোন দোষ নাই, এমন নয় ; কিন্তু মোটের উপর, এবং দীর্ঘকালপ্রসূত ফল বিবেচনা করিলে, গণতন্ত্র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট শাসন ও কার্য্য-নির্ব্বাহের প্রণালী আর নাই। এইজন্য, সেনেটের অধিকাংশ অর্থাৎ ন্যূনকল্পে শতকরা আশীজন সদস্য কলি-কাতা বিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটদিগের দ্বারা তিন বৎসর অন্তর অন্তর নির্ব্বাচিত হওয়া উচিত। নির্ব্বাচনের বৎসরের ন্যূনকল্পে পাঁচ বৎসর আগে যাঁহারা গ্রাজুয়েট্ হইয়াছেন, তাঁহারা নির্ব্বাচক হইবেন। তাঁহাদের একটা তালিকা প্রস্তুত করিবার ও রাখিবার ব্যয় গবর্ণ্মেণ্ট্ দিতে পারেন, কিম্বা উক্ত গ্রাজুয়েট্‌দিগের নিকট হইতে এই উদ্দেশ্যে বার্ষিক একটাকা করিয়া ফী লওয়া যাইতে পারে।

বিলাতে ও অন্যসব গণতন্ত্রশাসিত দেশে একটা নির্দ্দিষ্ট কালের পর ব্যবস্থাপক সভার নূতন সভ্য নির্ব্বাচিত হওয়া চাইই, তাহার পূর্ব্বেও হইতে পারে। বিলাতে কোন পার্লেমেণ্ট্ সাত বৎসরের চেয়ে বেশী দিন টিকিতে পারে না ; কোন-কোন পার্লেমেণ্ট্ দু-একমাসমাত্র স্থায়ী হইতে পারে। কিছুকাল অন্তর-অন্তর নূতন পার্লেমেণ্ট্ হওয়ার সুবিধা এই, যে, একটা পার্লেমেণ্টের কোন ভুলচুক দোষ বা কোন কর্ত্তব্যে অবহেলা হইলে, পরবর্ত্তী পার্লেমেণ্ট্ দ্বারা তাহার প্রতিকার হইতে পারে, তা-ছাড়া, কোন মানুষ বা মানুষের দল দেশহিতের জন্য আবশ্যক সকল-বিষয়ে দৃষ্টিসম্পন্ন বা মনোযোগী হইতে পারে না ; এই-জন্য নূতন-নূতন মনুষ্যসমষ্টির দেশহিত করিবার সুযোগ পাওয়া উচিত।

দেশের বিস্তৃততর কাজের মত বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজও দীর্ঘকাল ধরিয়া একই বা প্রায় একই সভ্যসমষ্টির দ্বারা, প্রায় একই দলের লোকদের দ্বারা হইলে অনেক-রকম দোষ, ভুলচুক অবহেলা ঘটে। এইজন্য মধ্যে মধ্যে সকল সভ্য নূতন করিয়া নির্ব্বাচিত হওয়া আবশ্যক।

দেখা যাইতেছে, যে, দশবিশ বৎসর ধরিয়া একই দলের লোকদের দ্বারা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ চলিতেছে। ইহাতে নানা-প্রকার দোষ ঘটিতেছে। মধ্যে-মধ্যে একশত বা দেড়শত সভ্যের (পূর্ণসংখ্যা যেরূপ নির্দ্দিষ্ট হইবে) নূতন নির্ব্বাচন হইলে অনেক দোষের সংশোধন হইবার উপায় হইবে।

কিন্তু আমরা ইহা মনে করি না, যে, গঠন-প্রণালী ও শাসন-প্রণালী বদ্‌লাইলেই আপন-আপনি কলের মত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কাজ ঠিকমত চলিতে থাকিবে। বস্তুতঃ, সমিতি যে-কোন-রকমেরই হউক, তাহার কাজে যাঁহারা অধিক বুদ্ধি, জ্ঞান ও পরিশ্রম প্রয়োগ করিবেন, তাঁহাদেরই চেষ্টা ফলবতী হইবার সম্ভাবনা ; অমুক-অমুক ব্যক্তির প্রাধান্য কেন হইল, শুধু ইহাই বার-বার বলিলে সে-প্রাধান্য নষ্ট হইবে না, কোন-প্রকার সংস্কারও হইবে না।

টাকা এবং বিনা-কৈফিয়তে সেই টাকা খরচ করিবার ক্ষমতা হাতে থাকিলে অপব্যয় হইতে পারে, এবং অন্যান্য দোষও ঘটিতে পারে। সম্প্রতি কিছুকাল আমরা কলি-কাতা হইতে দূরে থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের খবর কমই পাই। কিন্তু আগে-আগে অনেক অপব্যয়ের কথা আমরা শুনিতাম, এবং তাহার বিষয় কখন-কখন লিখিতাম। এখনও সম্ভবতঃ অপব্যয় হইয়া থাকে। অপব্যয়-নিবারণের একটা উপায় টাকার আমদানি কমাইয়া দেওয়া ; এইজন্য, মিতব্যয় যাহাতে নিশ্চয়ই হয়, সেইরূপ বন্দোবস্ত না করিয়া, স্থায়ী বার্ষিক সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা করা সমীচীন নহে। কিন্তু, যে-কারণেই হউক, আগে হইতে যে-টাকা ঘাট্‌তি পড়িয়াছে এবং যাহা দিতে গবর্ণমেণ্ট্ অঙ্গীকার-বদ্ধ, তাহা অবিলম্বে দেওয়া উচিত। গত মার্চ্চ মাসে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় স্থির হয়, যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে এককালীন দুই লক্ষ টাকা দিতে হইবে।

ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, যে, গবর্ণমেণ্ট এপর্য্যন্ত এই টাকা দেন নাই। কারণ, লর্ড লিটন মিষ্ট কথা যতই বলুন, হয় অঙ্গীকার পালনটা অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া তাঁহার জ্ঞান নাই, কিম্বা তিনি অকেজো ও শক্তিহীন লোক।

টাকার টানাটানি হইলেই আপনা-আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার হইবে না। টাকার টানাটানি কয়েক বৎসর ধরিয়া চলিতেছে, অথচ সংস্কার হইতেছে না। বস্তুতঃ, বিশ্ববিদ্যালয়ের যাঁহারা কর্ত্তা, টাকার টানাটানিতে তাঁহাদের প্রভুত্বে ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যে কোন বাধা পড়িতেছে না; সুতরাং তাঁহারা সংস্কার-চেষ্টা কেন করিবেন? টাকার অভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে-সব অধ্যাপক-আদি কর্ম্মচারী কষ্ট পান, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই যোগ্য লোক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের দোষ-ত্রুটি ও অপকর্ম্মের জনক নহেন বা তজ্জন্য প্রধানতঃ দায়ীও নহেন। সংস্কার করিবার ক্ষমতাও তাঁহাদের হাতে নাই।

গবর্ণমেণ্ট যে টাকা দিতেছেন না, তাহা সংস্কার-ইচ্ছা হইতে নহে। সম্ভবতঃ তাহার কারণ নানা। প্রথমতঃ গবর্ণমেণ্ট উচ্চশিক্ষা ভালবাসেন না; দ্বিতীয়তঃ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশী-লোকদের প্রাধান্য ভালবাসেন না; তৃতীয়তঃ বিশ্ববিদ্যালয়কে উপবাসী রাখিয়া এরূপ সর্ত্তে টাকা লইতে বাধ্য করিতে চান যাহাতে প্রতিষ্ঠানটি গবর্ণমেণ্টের মুঠার মধ্যে আসে। পরিমিত ও ন্যায্য ব্যয় যাহাতে হয়, এরূপ ব্যবস্থা করিয়া তবে বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকারী সাহায্য করা উচিত, আমরা এই মর্ম্মের কথা আগে-আগে অনেকবার বলায় এইরূপ ভুল ধারণা হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে, যে, আমরা যেন গবর্ণমেণ্টের টাকা দিবার অনিচ্ছার এবং প্রতিষ্ঠানটিকে শৃঙ্খলিত করিবার সমর্থন করি। বস্তুতঃ আমরা চাই, বিশ্ববিদ্যালয়ের গণতান্ত্রিক শাসন, গবর্ণমেণ্টের দ্বারা শাসন নহে।

আগে দেখাইয়াছি, টাকার টানাটানি হইলেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার হইবে না। টাকার টানাটানির জন্য বরং বিশ্ববিদ্যালয়ের কতকগুলি দোষ ঘটিয়াছে। আমরা সবাই বলি, যে, অনেক বৎসর ধরিয়া বিস্তর অযোগ্য ছাত্রকে পাস্ করা হয়, এবং তাহা করিবার চেষ্টায় অধিকাংশ ছাত্র প্রথম শ্রেণীতে পাস্ হয়। ইহার কারণ পাস্‌টা সস্তা হইলে পরীক্ষার্থী বাড়ে ও ফীর টাকাটা বাড়ে। শিক্ষার মত সাত্ত্বিক ব্যাপারে এই দোকানদারী বুদ্ধি সাতিশয় নিন্দনীয়।

আর-একটা দোষ এই ঘটিয়াছে, যে, টাকার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ-পাঠ্য পুস্তক সঙ্কলন করিয়া বিক্রী করিতেছেন, কিন্তু সঙ্কলিত জিনিষগুলির নির্ব্বাচন এবং পুস্তকের মুদ্রাঙ্কন যেমন হওয়া উচিত তাহা হইতেছে না। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। ইণ্টারমীডিয়েট্ পরীক্ষার জন্য যে গদ্য-রচনা-সংগ্রহ ছাপানো হইয়াছে, তাহাতে ছাপার ভুল অনেক আছে। সন্দর্ভ-আদির নির্ব্বাচনও ভাল হয় নাই। নিকৃষ্ট, অধ্যাপনার অনুপযুক্ত বা চলনসই কোন্-কোন্ লেখা নির্ব্বাচিত হইয়াছে, তাহা না বলিয়া অন্যরকম একটা প্রবন্ধের উল্লেখ করিতেছি। "য়্যাট্‌ল্যাণ্টিক্ মান্থলী" হইতে "সায়েন্স্" অর্থাৎ "বিজ্ঞান" নামক যে প্রবন্ধটি নির্ব্বাচিত হইয়াছে, তাহা বিজ্ঞান না জানিলে বুঝা যায় না, বুঝানোও যায় না। ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপকেরা উহা পড়াইবেন। সব বা অধিকাংশ কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপকেরা কি বিজ্ঞানের গ্র্যাডুয়েট্, না ইণ্টারমীডিয়েট্ শ্রেণীর সব বা অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী বিজ্ঞান জানে? আলোচ্য প্রবন্ধটি ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য যে-সব বৈজ্ঞানিক যন্ত্র, ছবি ও বহির দরকার তাহা কি সব কলেজে আছে? কেবল টাকার লোভ করা ভাল নয়; এমন উপযুক্ত ও কর্ত্তব্যপরায়ণ লোকের দ্বারা পুস্তক সঙ্কলন করানো উচিত, যিনি প্রবন্ধগুলি নিজে আদ্যোপান্ত পড়িয়া ও বুঝিয়া সঙ্কলন করিবেন।

টাকার টানাটানি হইতে আরও কোন-কোন দোষের উদ্ভব হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিলাম না। অবশ্য, বিশ্ববিদ্যালয় গবর্ণমেণ্টের টাকার ভরসা না রাখিয়া, নিজের অল্প আয়-অনুযায়ী ব্যয়ের ব্যবস্থা করিলে টাকার টানাটানি হইত না। অধ্যাপনার বিষয়ের অতিবৃদ্ধি বা শিক্ষক-সংখ্যার অতিবৃদ্ধি ঠিক হয় নাই; আয়বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে উভয়দিকে বৃদ্ধি ঘটিলে ভাল হইত। এখনও অযোগ্য ও অনাবশ্যক লোকদের কার্য্যকাল ফুরাইয়া গেলে তাঁহাদের পুনর্নিয়োগ করা উচিত নয়। কিন্তু যে-সকল বিষয় শিক্ষা দিবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষক, পুস্তক ও সরঞ্জাম-উপকরণ-আদি সংগৃহীত হইয়াছে, বা হইতে পারে, বিশেষ বিবেচনা না করিয়া তাহার অধ্যাপনা বন্ধ করিয়া দিবার পরামর্শ দিতে পারি না। যেমন ধরুন, নৃতত্ত্ব। ভারতবর্ষ ইহা শিখিবার ও শিখাইবার প্রশস্ত ক্ষেত্র। ইহার অধ্যাপনা উঠাইয়া না দিয়া যোগ্য অধ্যাপক নিযুক্ত করাই উচিত। যে-বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা ভাষা অধীত হয়, তথায় নিশ্চয়ই ভাষা বিজ্ঞান (ফিললজি) ও স্বরবিজ্ঞান (ফোনেটিক্স্) শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা উচিত। একান্ত অর্থাভাব ঘটিলে কোন্-কোন্ বিষয় বাদ দিতে হইবে, তাহা বিবেচনা-সাপেক্ষ।

আর-একদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার দরকার। সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতির জন্য বিশ্ববিদ্যালয় যত টাকা খরচ করিয়া আসিতেছেন, বিজ্ঞানের জন্য তত করিতেছেন না। কৃষিবিদ্যা, খনিজ-বিজ্ঞান, প্রভৃতির দিকেও যথেষ্ট মন দিতেছেন না। ইহা বাঞ্ছনীয় নহে।

—

ছাত্রহিত চেষ্টা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্র-হিতসাধন কমিটি আছে। তাহার অধীনে ১৯২০ সালের ২৮শে মার্চ্চ ছাত্রদের স্বাস্থ্য-পরীক্ষা-বিভাগের কাজ আরম্ভ হয়। তখন হইতে এই বিভাগ কলিকাতার ১১টি এবং সহর-তলীর দুটি কলেজ পরিদর্শন করিয়াছেন। ১৯২৪ সালে কমিটি কলিকাতার দুটি কলেজ দ্বিতীয়বার পরিদর্শন করেন। ১৯২৪ সালের রিপোর্ট ১৯২৪ সালের ১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৯,০৫৬ জন ছাত্রের পরীক্ষা হইতে লব্ধ তথ্যের উপর লিখিত।

বর্ত্তমান বৎসরের এবং পূর্ব্ব-পূর্ব্ব বৎসরের রিপোর্ট-গুলিতে স্বাস্থ্য-ছাড়া অন্তবিষয়ক এমন বিস্তর তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে, যাহা সমাজ-বিজ্ঞান ও নৃতত্ত্ব-বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু-দের কাজে লাগিবে। আফিসের কর্ম্মচারী-বৃদ্ধি, প্রধান কর্ম্মচারীর বেতন-বৃদ্ধি, পরীক্ষক-ডাক্তারদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি, পরীক্ষার নিমিত্ত আরও যন্ত্রাদি সংগ্রহ প্রভৃতি যে-যে দিকে সেক্রেটারীগণ অধিকতর অর্থ-সাহায্য চাহিয়াছেন তাহা দেওয়া উচিত।

আলোচ্য রিপোর্টে বলা হইয়াছে, যে, শারীরিক বা স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় কোন-না-কোন খুঁত আছে, এরূপ ছাত্র শতকরা ৬৭·৫ জন। ইহা খুবই দুঃখের বিষয়। কিন্তু ইহাতে ভয় পাইলে কিম্বা নিরাশ হইলে চলিবে না। অন্যান্য দেশে সমর্থ বয়সের লোকদের স্বাস্থ্য এরূপ খারাপ দৃষ্ট হইলে তাহারা নিশ্চেষ্ট থাকে না; প্রতিকারের চেষ্টা সর্ব্বপ্রযত্নে করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইংলণ্ডের কথা বলি। গত মহাযুদ্ধের প্রায় শেষ-সময়ে সৈন্য-সংগ্রহের জন্য ১৯১৭ সালের ১লা নবেম্বর হইতে ১৯১৮ সালের ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত ২৪,২৫,১৮৪ জন লোকের শরীর পরীক্ষা করা হয়। ইহাদের প্রত্যেক নয় জনের মধ্যে তিন জন সুস্থ ও যুদ্ধোপযোগী এবং বাকী ছয়জন অনুপযুক্ত এবং কোন-না-কোন রকমের খুঁতবিশিষ্ট ছিল। অনুপযুক্তের হার, শতকরা ৬৬·৬, প্রায় আমাদের ছাত্রদের মত। এই যে অনুপযুক্ত ছয় জন, ইহাদের বিশেষ বর্ণনা নীচে উদ্ধৃত করিলাম।

Two were upon a definitely infirm plane of health.

Three were incapable of undergoing more than a moderate degree of physical exertion, and might be described as physical wrecks.

The remaining one was a chronic invalid with a precarious hold on life.

এখানে উল্লেখ করা উচিত, যে, পরীক্ষিত সওয়া-চব্বিশ লক্ষ ইংরেজ সবাই যুবা-পুরুষ ছিল না; অনেকে প্রৌঢ় ছিল।

বিস্তর ইংরেজের স্বাস্থ্য এইরূপে অসন্তোষজনক প্রমাণ হওয়ায় ইংরেজরা হাল ছাড়িয়া দেয় নাই। স্বাস্থ্যের উন্নতির চেষ্টাই তাহারা করিতেছে। আমাদেরও তাহাই করা উচিত।

বিশ্ববিদ্যালয় কেবল খুঁৎ আবিষ্কার করিয়াই নিশ্চিন্ত নাই; প্রতিকার-চেষ্টাও করিতেছেন। এ-বিষয়ে সর্ব্ব-সাধারণের স্বাস্থ্য-কমিটিকে আর্থিক ও অন্যান্য উপায়ে সাহায্য করা কর্ত্তব্য। কলেজ ও স্কুল-সকলে ব্যায়াম-প্রবর্ত্তনের চেষ্টা বিশ্ববিদ্যালয় করিতেছেন। অর্দ্ধাশন ও অনশনে অপুষ্ট শরীরে ব্যায়াম যে হিতকর না হইয়া অহিতকর হইতে পারে, ব্যায়াম-সমর্থকেরা তাহা জানেন। তজ্জন্য তাঁহারা ছাত্রদের আহারের ব্যবস্থাও করিতে চান। কিন্তু সর্ব্বসাধারণে তাঁহাদের সহায় না হইলে তাঁহাদের চেষ্টা সফল হইতে পারে না।

ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য-পরীক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতির চেষ্টা তাহাদের শৈশব ও বাল্যকাল হইতেই হওয়া উচিত। প্রাথমিক হইতে আরম্ভ করিয়া সব বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য-পরীক্ষা হওয়া চাই, এবং অসুস্থতার প্রতিকার হওয়া চাই।

অবশ্য একথা ঠিক্, যে, দেশের সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি না হইলে বালক-বালিকাদের স্বাস্থ্যের পূর্ণ উন্নতি হইতে পারে না। কিন্তু ইহাও সকলেই জানেন, যে, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যেরূপ সাবধান থাকা উচিত, তাহারা তাহা থাকিতে পারে না—সেরূপ জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতা তাহাদের নাই। এইজন্য বয়োবৃদ্ধেরা যাহা নিজেদের জন্য নিজেরাই করিতে পারেন, শিশুদের জন্য অপরকে তাহা করিয়া দিতে হয়। শৈশব হইতে সকলের স্বাস্থ্যের নিয়মিত পরীক্ষা হইলে ও দোষ-সংশোধনের ব্যবস্থা হইলে জাতীয় স্বাস্থ্যের অনেক উন্নতি স্বভাবতঃই হইতে থাকিবে।

পুষ্টিকর খাদ্য যথেষ্ট-পরিমাণে না পাইলে স্বাস্থ্য ভাল হইতে পারে না জানি, এবং দারিদ্র্যবশতঃ দেশের অধি-কাংশ লোক যথেষ্ট-পরিমাণে পুষ্টিকর আহার্য্য-দ্রব্য পায় না, তাহাও জানি। কিন্তু অনেক পিতামাতা যদি বিবেচক হন, তাহা হইলে তাঁহারা ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েকে সাজাইবার জন্য যাহা খরচ করেন, তাহার কতক-অংশ পুষ্টিকর খাদ্যের জন্য ব্যয় করিলে তাহারা এখনকার চেয়ে বলিষ্ঠ হইতে পারে। ইস্কুল-কলেজের যে-সব ছেলে পিতামাতার নিকট হইতে দূরে মেসে বাস করেন, তাঁহাদেরও, পড়াশুনার জন্য খরচ ব্যতীত, বেশীর ভাগ খরচ পুষ্টিকর খাদ্যের জন্য করা উচিত। ফ্যাশনেবল্ পোষাক, ও আমোদ-প্রমোদের খরচ তাহার পর। সিগারেট প্রভৃতি ত সেবন করাই উচিত নয়। মোট কথা, স্বাস্থ্য যে

অত্যাবশ্যক, ইহা যে অমূল্য ধন, এই জ্ঞান ছাত্রদের জন্মিলে অনেক ছাত্রই অন্যদিকে ব্যয়-সংক্ষেপ করিয়া পুষ্টিকর খাদ্যে ও স্বাস্থ্যরক্ষার অন্যান্য উপায় অবলম্বনে যথেষ্ট টাকা খরচ করিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের, কলিকাতাস্থ প্রত্যেক কলেজের ও প্রত্যেক উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে খাদ্যতত্ত্বজ্ঞ সুচিকিৎসকদিগের পরামর্শ-অনুযায়ী পুষ্টিকর খাদ্যের—ন্যূনকল্পে জলখাবারের—বন্দোবস্ত হইতে পারে কি না, ভাল করিয়া বিবেচনা করা উচিত। ময়রার দোকানের দুর্মূল্য অথচ অনিষ্টকর খাবার এবং চায়ের দোকান ও "ক্যাবিন"-গুলার অপকৃষ্ট পানীয় ও খাদ্যে অর্থব্যয় করিয়া ছাত্রদের দৈহিক, এবং কখন-কখন মানসিক, অবনতি হইতে দেওয়া উচিত নয়।

রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর

মহারাষ্ট্রের রাজধানী পুনায় ৮৮ বৎসর বয়সে আচার্য্য স্যার্ রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া চরিত্র, ধীশক্তি, প্রতিভা ও পরিশ্রমদ্বারা বিদ্যা-অর্জ্জন-পূর্ব্বক সামাজিক প্রতিপত্তি ও রাজ-সম্মান লাভ করিতে সমর্থ হন। তিনি প্রথমে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক এবং পরে কলেজ-অধ্যাপক হইয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষাদান-প্রণালী উৎকৃষ্ট ছিল এবং শিক্ষা দিবার প্রভূত শক্তিও ছিল। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। বাংলাদেশে যেমন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ব্যাকরণের উপক্রমণিকা, ব্যাকরণ কৌমুদী এবং ঋজুপাঠ রচনা করিয়া সংস্কৃত শিক্ষার পথ সুগম করিয়া দিয়াছিলেন, মহারাষ্ট্রে তেম্‌নি তিনি ছাত্রদিগকে সহজে সংস্কৃত শিক্ষা দিবার নিমিত্ত গ্রন্থাবলী রচনা করিয়াছিলেন। এই-সকল বহি আমরা আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশেও ব্যবহৃত হইতে দেখিয়াছি। বাংলাদেশে যেমন রাজেন্দ্রলাল মিত্র পাশ্চাত্য রীতি-অনুসারে প্রত্নতত্ত্ব-অনুসন্ধানের পথ প্রদর্শন করেন, মহারাষ্ট্রে রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর সেইরূপ প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় ও দেশের প্রাচীন ইতিহাস-রচনায় পথ-প্রদর্শক ছিলেন। এই কারণে তিনি স্বদেশে ও পাশ্চাত্য পণ্ডিত-মণ্ডলীর মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

তিনি ভারতবর্ষের প্রাচীন ব্রহ্মজ্ঞানের পরম অনুরাগী ছিলেন। তিনি মনে করিতেন, ধর্ম্মবিষয়ে উপনিষদের যুগে ভারতবর্ষের যে উন্নত অবস্থা ছিল, এখন তাহা হইতে অধোগতি হইয়াছে। তিনি বোম্বাই প্রেসিডেন্সির প্রার্থনা-সমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান আচার্য্য ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ ও প্রার্থনা-সমাজের অনেক আচার্য্য অনেক সময় বাইবেলের উক্তি অবলম্বন করিয়া উপদেশ দিয়া থাকেন। রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর উপনিষদাদি

রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর

সংস্কৃত শাস্ত্রের বচন এবং তুকারাম প্রভৃতি মহারাষ্ট্রীয় সাধুদের পদাবলী অবলম্বন করিয়া উপদেশ দিতেন। তাঁহার উপদেশগুলি অতি সরল ও মর্ম্মস্পর্শী। তাঁহার মুখাবয়ব ও ব্যবহার, তাঁহার আন্তরিক কোমলতা ও ভক্তি-প্রবণতার পরিচায়ক ছিল না। তিনি বাস্তবিক অতি দীনাত্মা ছিলেন। নিজের পরিজনবর্গকে লইয়া যখন তিনি উপাসনা করিতেন, তখন তাঁহার ভক্তিভাব ও অকিঞ্চনতা বিশেষরূপে পরিস্ফুট হইত। একাকী যখন

তিনি তাঁহার নির্জন কক্ষে ঈশ্বর-চরণে আত্ম-নিবেদন করিতেন, তখন অনেক সময় গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত তাহাতেই নিযুক্ত থাকিতেন; তখন কেহ তাঁহার অগোচরে তাঁহার কক্ষদ্বারে উপস্থিত থাকিলে শুনিতে পাইতেন, তিনি অনুতাপের আতিশয্যে শিশুর ন্যায় রোদন করিতেছেন। মরাঠী ভাষায় তাঁহার উপদেশগুলিকে প্রার্থনা-সমাজের লোকেরা অতি মূল্যবান্ মনে করেন, কিন্তু তিনি স্বয়ং সেগুলিকে বালকের উক্তি মনে করিতেন।

সমাজ-সংস্কার-বিষয়ে তিনি যাহা ন্যায্য মনে করিতেন, তাহা স্বয়ং করিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না। বহু বৎসর পূর্ব্বে যখন তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা বিধবা হন, তখন (এবং এখনও) মহারাষ্ট্রে ব্রাহ্মণকুলে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত ছিল না। কিন্তু তিনি প্রবল বাধাসত্ত্বেও কন্যার আবার বিবাহ দিয়াছিলেন। তিনি বাল্যবিবাহের বিরোধী ছিলেন। স্ত্রীশিক্ষার তিনি পরম অনুরাগী ছিলেন, এবং নারীদিগকে উচ্চ শিক্ষা দিবার দৃষ্টান্ত তিনি নিজের পরিবারে প্রদর্শন করেন। তাঁহার বংশে দুইটি মহিলা গ্রাজুয়েট হইয়াছেন। পুনাতে অধ্যাপক ঢোণ্ডো কেশব কার্ব্বে মহাশয় যে মহিলা-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, তিনি তাহার অন্যতম উৎসাহদাতা ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

তিনি অবনত ও তথাকথিত "অস্পৃশ্য" জাতি-সকলের উন্নতিকামী ছিলেন। ঐসকল জাতির উন্নতিবিধানার্থ মহারাষ্ট্রে যে "ডিপ্রেস্‌ট্ ক্লাসেজ্ মিশন্" আছে, তাহার সহিত তাঁহার যোগ ছিল। তিনি একবার অস্পৃশ্যতা-বিরোধী কন্‌ফারেন্সের সভাপতি হইয়া সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তিনি জন্মগত জাতিভেদের বিরোধী ছিলেন, যদিও জাতিভেদ-প্রথা বহু পুরাতন বলিয়া হঠাৎ উহা ভাঙিয়া দেওয়ার সমর্থন করিতেন না। কিন্তু তাঁহার নিজের ব্যবহারে তিনি জাতি মানিতেন না। তিনি সকলকেই স্পর্শ করিতেন, সকলের সঙ্গে ভোজন করিতেন, সকলের রান্না খাইতেন।

রাজনৈতিক আন্দোলনে তিনি সচরাচর যোগ দিতেন না; কিন্তু প্রয়োজন বোধ করিলে পশ্চাৎপদও হইতেন না। বহু বৎসর পূর্ব্বে যখন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী মহাশয় দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের লাঞ্ছনার কথা এদেশে প্রচার করেন, তখন তাহার প্রতিবাদ করিবার জন্য পুনায় যে সভা হয়, লোকমান্য টিলক মহাশয়ের পরামর্শ-অনুসারে গান্ধী ভাণ্ডারকরকে তাহার সভাপতি হইবার নিমিত্ত অনুরোধ করেন। তিনি স্বীকৃত হইয়া তাহাতে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। টিলক প্রভৃতি নানা রাজনৈতিক ও সামাজিক দলের লোক এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। আর-একবার যখন মাদক-নিবারিণী সভার উদ্যোগে এক সভা আহূত হয়, ভাণ্ডারকর তাহার সভাপতি হন। লোকমান্য টিলকের চেষ্টায় এই সভা আহূত হইয়াছিল এবং উহার সহিত তাঁহার যোগ ছিল বলিয়া অন্যদলের নেতা গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লে মহাশয় ইহাতে যোগ দেন নাই। কিন্তু সভার উদ্দেশ্য ন্যায়ানুমোদিত ছিল বলিয়া ভাণ্ডারকর দলের বিচার না করিয়া উহার সভাপতি হইয়াছিলেন। টিলক সমাজ-সংস্কারক ছিলেন না, ভাণ্ডারকর সমাজ-সংস্কারক ছিলেন।

ভাণ্ডারকর মহারাষ্ট্রে ঐতিহাসিক গবেষণার পথ-প্রদর্শক বলিয়া এবং তাঁহার পাণ্ডিত্যের ও কৃতিত্বের স্মৃতি রক্ষার নিমিত্ত তাঁহার জীবিতকালেই রাজনৈতিক দলাদলি বিস্মৃত হইয়া সকল দলের মহারাষ্ট্রীয়েরা পুনায় ভাণ্ডারকর রিসার্চ্ ইন্‌স্‌টিটিউট্ (ভাণ্ডারকর গবেষণা-প্রতিষ্ঠান) স্থাপিত করিয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠান হইতে মহাভারতের অনেক পুঁথি সংগ্রহ করিয়া ও তাহার নানা পাঠ আলোচনা ও তুলনা করিয়া একটি বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশ করিবার চেষ্টা হইতেছে।

—

ব্যবস্থাপক সভায় বড়লাটের বক্তৃতা

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে বড় লাট লর্ড্ রেডিং যে প্রারম্ভিক বক্তৃতা করেন, তাহাতে ভারতশাসন-প্রণালীর সংস্কার বা পরিবর্ত্তন-সম্বন্ধে নূতন কথা কিছু নাই। তিনি ও তাঁহার উপরওয়ালা ভারতসচিব বিলাতে যাহা বলিয়াছিলেন, একটু অপেক্ষাকৃত মোলায়েম্ ও জোলো ভাষায় তাহারই পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে।

তাঁহার বক্তৃতা পড়িলে আমলাতন্ত্রের চিন্তার গতি-বিধির একটা বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। চিত্তরঞ্জন দাশ ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর উল্লেখ লাট সাহেব

ঠিক একটি বাক্যে শেষ করিয়াছেন ; অর্থাৎ তাঁহারা যে-দরের মানুষ ছিলেন, বড় লাটের মতে মাথা-পিছু আধখানা বাক্য (সেন্টেন্স্) তাহার পক্ষে যথেষ্ট। সে-বাক্যে তিনি বলিয়াছেন, যে, তাঁহাদের মৃত্যুতে ভারতবর্ষ শোকাবিষ্ট হইয়াছে। তাঁহার নিজের বা গবর্ণ্মেণ্টের মনের ভাবটা কিরূপ হইয়াছে, তাহা অবশ্য প্রকাশ পায় নাই। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে অনেক স্বদেশবাসীর নিন্দাভাজন হইয়াও গবর্ণ্মেণ্টের কাজ করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই সেবার জন্যও লর্ড্ রেডিং প্রতিদানস্বরূপ মৌখিক দুটা কথা বলাও দরকার মনে করেন নাই।

কিন্তু ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব ইংরেজ সেনাপতি লর্ড্ রলিন্সনের মৃত্যুর উল্লেখ এবং তাঁহার প্রশংসা-কীর্ত্তন লাট-সাহেব উচ্ছ্বসিত ভাষায় একটা দীর্ঘ প্যারাগ্রাফ ধরিয়া করিয়াছেন। সেনাপতির মৃত্যুকে লাট-সাহেব নিজের, নিজ গবর্ণ্মেণ্টের, ভারতবর্ষের এবং সমগ্র সাম্রাজ্যের ক্ষতি * বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। চিত্তরঞ্জন দাশ ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে অন্ততঃপক্ষে ভারতবর্ষের কি কোনই ক্ষতি হয় নাই ? যত ক্ষতি হইল এক-জন বেতনভোগী সেনাপতির মৃত্যুতেই ?

ভারতীয়দিগের মধ্যে যাঁহারা গবর্ণ্মেণ্টের সেবা করিয়া আমলাতন্ত্রকে খুশী করিতে চান, তাঁহারা এই ব্যাপারটি হইতে ইচ্ছা করিলে কিছু শিক্ষা লাভ করিতে পারেন। অন্য লোকদের রাজ-পুরুষদের নিন্দাপ্রশংসায় উদাসীন থাকাই স্বাভাবিক।

বড়লাট ভারতবর্ষের কৃষির উন্নতির জন্য বৃহৎ একটা আয়োজনের আভাস দিয়াছেন। তাহা হইতে একটা ফলের উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী—কয়েকজন ইংরেজ বিশেষজ্ঞের মোটা মাহিনা-প্রাপ্তি, এবং সম্ভবতঃ কিছু বিলাতী চাষের যন্ত্রের কাট্তি-বৃদ্ধি। চাষীদের একটুও উপকার হইতে পারে না, বলিতেছি না। কিন্তু তাহাদের উপকার করা একমাত্র বা প্রধান উদ্দেশ্য হইলে প্রথমে তাহাদের মধ্যে দেশভাষায় সাধারণ শিক্ষার ও কৃষিশিক্ষার বিস্তার প্রয়োজন, এবং গ্রাম্য অঞ্চলের স্বাস্থ্য ভাল করা আবশ্যক। কৃষিবিষয়ক গবেষণার ফল ইংরেজী ভাষায় লিখিত রিপোর্টে থাকিলে তাহা কেমন করিয়া কৃষকদের সহজে অধিগম্য হইবে ? দেশভাষায় লিখিত হইলেই বা নিরক্ষর কৃষকেরা কেমন করিয়া তাহা জানিবে ? আদর্শ কৃষিক্ষেত্রের পরীক্ষার ফল অবশ্য মুখে-মুখে অল্পসংখ্যক কৃষক জানিতে পারে বটে ; কিন্তু উন্নত কৃষিপ্রণালীর জ্ঞানবিস্তার, শিক্ষার বিস্তার ব্যতিরেকে কখনই সম্ভব সহজে ও সস্তায় হইতে পারে না। কৃষির উন্নতির জন্য জমির খাজনা, সেট্ল্মেণ্ট্ প্রভৃতি বিষয়ক আইনেরও পরিবর্ত্তন আবশ্যক। চিরঋণী চাষীদের ঋণগ্রস্ত অবস্থার উচ্ছেদের এবং সহজে অল্পসুদে অল্পকালের জন্য ঋণ পাইবার বন্দোবস্তও হওয়া চাই।

ভারতবর্ষের মুদ্রাসম্বন্ধীয় সকল বিষয়ের বিচার করিবার নিমিত্ত একটি রাজকীয় কমিশন নিয়োগের কথা লাট-সাহেব তাঁহার বক্তৃতায় জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, যে, যাহাতে বিষয়টি স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে পরীক্ষিত হইতে পারে, তাহা সুনিশ্চিত করিবার জন্য যত্ন করা হইয়াছে। কমিশনের সভ্য নির্ব্বাচনে আমরা এরূপ কোন যত্নের প্রমাণ পাইলাম না। বরং স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার যাহাতে না হয়, সভ্যনির্ব্বাচন সেই-প্রকারের হইয়াছে। কমিশনের দশজন সভ্যের মধ্যে ছয় জন ইংরেজ। ইংরেজরা আগে নিজেদের দেশের স্বার্থ দেখিবে। টাকা ও পাউণ্ডের বিনিময় কি হারে হইবে, তাহা স্থির করিতে গিয়া তাহারা আগে দেখিবে ব্রিটিশ বাণিজ্যের সুবিধা কিসে হয়, তাহাতে ভারতবর্ষের শ্রীবৃদ্ধি না হইলে তাহাদের কিছুই আসিয়া যায় না। দেশী চারিজন লোকের মধ্যে অধ্যাপক কয়াজী সরকারী চাক্‌রে ; স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় গবর্ণ্মেণ্টের মুখাপেক্ষী ; স্যার্ দাদাভয় মধ্যে-মধ্যে দুর্লোকায় পা দেন, এখন ত রাষ্ট্রীয় পরিষদের সভ্যনির্ব্বাচনের সময় আসন্ন দেখিয়া তিনি গবর্ণ্মেণ্টের সাহায্য পাইবার বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন ; কেবল স্যার্ পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাসকে স্বাধীনমতাবলম্বী বলা যাইতে পারে।

—

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতির পদের জন্য স্বরাজ্য-দলের একজন সভ্য উমেদার ছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা পান নাই ; ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতির পদ একজন স্বরাজী পাইয়াছেন। তাঁহারা সরকারী চাকরী লইবেন, আমরা বহু পূর্ব্বে এই অনুমান ব্যক্ত করিয়াছিলাম। চাকরী লওয়ার জন্য আমরা তাঁহাদিগকে দোষ দিতেছি না ; কেবল ইহাই বলিতেছি, যে, তাঁহারা দেশের লোকের কাছে যে-নীতি ও কার্য্য-প্রণালী উপস্থিত করিয়া নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, তাহার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পরিবর্ত্তন হয় নাই, এই ভাণ যেন তাঁহারা না করেন।

—

*"...to mention the loss which has befallen me and my Government, nay more, India and the empire, in the sudden and tragic death of the late Lord Rawlinson",

আদালত-অবমাননা বিল্

আদালত-অবমাননা বিল্‌টা ব্যবস্থাপক সভায় পেশ্ হইবার পর প্রথম সুযোগেই তাহার প্রাণবধ করা উচিত ছিল; কেননা উহার উদ্দেশ্য ভারতীয়দের, বিশেষতঃ সংবাদপত্রের স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার হ্রাস বা প্রায় লোপ করা। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় স্বরাজ্য দলের যত সভ্য আছেন, তাঁহারা স্থির করেন, যে, উহার বিরোধিতা করিবেন। কিন্তু কার্য্যকালে তাঁহাদের দলপতি পণ্ডিত মোতীলাল নেহ্রু আদালত-অবমাননার সংজ্ঞাটি বাদ দেওয়া হইবে, এই সর্ত্তে বিল্‌টি সিলেক্ট্ কমিটিতে পেশ্ করার পক্ষে ভোট দেন এবং স্বয়ং সিলেক্ট্ কমিটির মেম্বর হন। অবশ্য তাঁহার এরূপ করিবার যথেষ্ট কারণ থাকিতে পারে। আমরা কেবল ইহাই বলিতে চাই, যে, ইহা স্বরাজীদের ঘোষিত অবিরত বাধা প্রদান নীতির অন্যতম দৃষ্টান্ত নহে।

দমন-আইন রদ বিল্

ভারতীয় রাষ্ট্র-পরিষদে মান্দ্রাজের শ্রীযুক্ত রামদাস কতকগুলি (সবগুলি নহে) দমন-আইন রদ করিবার জন্য একটি বিল্ উপস্থিত করেন। রাষ্ট্রপরিষদের অধিকাংশ সভ্য "বিজ্ঞ", "সম্ভ্রান্ত" ও ধামাধরা। সুতরাং বিল্‌টি নামঞ্জুর হইয়াছে। বলা বাহুল্য, গবর্মেণ্ট্ বিল্‌টির সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন; কারণ, আমলাতন্ত্রের মতে সকল-রকমের দমনোপায় না থাকিলে দুর্দ্দান্ত ও দুর্দ্ধর্ষ ভারতীয়দিগকে আইন ও সুশৃঙ্খলার এবং শান্তির মর্য্যাদা ও মূল্য হৃদয়ঙ্গম করানো যায় না।

মাদকের ব্যবসার নিবারণ

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত নরসিংহ চিন্তামন কেল্‌কারের এই প্রস্তাব অধিকাংশের মতে গৃহীত হইয়াছে, যে, ভারত গবর্মেণ্টের আবগারী নীতির চরম উদ্দেশ্য এই হইবে, যে, যথাসম্ভব সত্বর ঔষধ ও বৈজ্ঞানিক প্রয়োজন ভিন্ন অন্য-প্রকার ব্যবহারের জন্য সুরা আফিং প্রভৃতি মাদকদ্রব্যের উৎপাদন আমদানি বিক্রয়াদি বন্ধ করিতে হইবে। এই প্রস্তাবের বিরোধীদের মধ্যে সকলেই বা অধিকাংশ সভ্য ইংরেজ, এইরূপ শুনিয়াছি। গবর্মেণ্ট্ এই প্রস্তাব-অনুসারে কাজ না করিতে পারেন। কিন্তু আশা করি, গবর্মেণ্টের কোন প্রতিনিধি জেনিভার জাতিসঙ্ঘে বা অন্যত্র এই মিথ্যা কথা আর বলিবেন না, যে, ভারতীয়েরা বা তাহাদের নেতারা আফিং বা অন্য মাদকদ্রব্যের অবৈধ ব্যবহারের বিরোধী নহে।

—

বিদেশে স্বদেশের কথা জানানো

সাক্ষাৎভাবে সভ্য জগতের লোকদের নিকট হইতে স্বাধীনতা লাভ ও রক্ষা বিষয়ে কোন সাহায্য না পাইলেও বিদেশের লোকদিগকে নিজের দেশের ঠিক্-ঠিক্ অবস্থার সংবাদ জানাইয়া রাখায় লাভ আছে। ইহা আমরা ভাল করিয়া না বুঝিয়া থাকিলেও আরবেরা বুঝিয়াছে। সেই

প্রিন্স্ হাবিব লুৎফুল্লাহ

জন্য কিছুদিন পূর্ব্বে আরবের প্রিন্স হবীব লুৎফুল্লাহ্ এবং আরবীয় প্রতিনিধিদল আমেরিকা গিয়াছিলেন। ঐ দলের নেতার নাম মন্‌সেনিয়ার্ জোরী। প্রিন্স্ লুৎফুল্লার বক্তব্য আগষ্ট্ মাসের মডার্ণ রিভিউ কাগজে বিস্তারিত উদ্ধৃত হইয়াছে।

আরবীয় মিশনের সভাপতি মন্‌সেনিয়ার জোরী। ইনি সম্প্রতি ওয়াশিংটনে অবস্থিতি করিতেছেন

আফগানিস্থানের আমির আমানুল্লাহ্‌ খাঁ এবং তাঁহার খসমুন্‌সী ফরাসী ভাষার-ব্যাকরণ শিক্ষা করিতেছেন

বিদেশের সহিত যোগরক্ষার সুবিধা হইবে বলিয়া আফ্‌গানিস্তানের আমীর আমানুল্লাহ্‌ খাঁ ও তাঁহার খাস্‌ মুন্‌শী ফরাসী ভাষা শিখিতেছেন।

ফ্যাশন্‌-মাহাত্ম্য

যাহা ফ্যাশন্‌-দুরুস্ত, তাহাকে যে সুন্দর হইতেই হইবে, এমন নহে; তাহা কিম্ভূতকিমাকারও হইতে পারে। ডব্‌লিনের কাপ্তেন একৃলিস্‌ একটা সখের পোষাকের নীচে ইংরেজদের পূর্ব্বপুরুষদের আনুমানিক পোষাক পরিয়া গিয়া প্রথম পুরস্কার পাইয়াছেন। তাহার

কাপ্তান একৃলিস্‌ এই অসভ্য-বেশ পরিধান করিয়া একটি ফ্যান্সি-ড্রেস্‌ নাচে গিয়াছিলেন এবং প্রথম পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন

ছবি এখানে দেওয়া গেল। ইহা আমেরিকার নিউইয়র্ক-টাইম্‌সে বাহির হইয়াছিল।

—

মার্কিন-মহিলাদের যুদ্ধশিক্ষা

পুরাকালে কোন কোন দেশে নারীরা আত্মরক্ষা ও স্বদেশ-রক্ষার জন্ত যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহা নারীদিগের পক্ষে প্রশংসার কথা হইলেও, যে-পুরুষেরা তাঁহাদের শত্রুপক্ষীয় ছিল তাহাদের পক্ষে উহা গৌরব-জনক নহে; যোদ্ধ্রী নারীদের স্বদেশী পুরুষদের মধ্যে দেশরক্ষা বা নারীর সম্মান রক্ষার জন্ত যথেষ্ট পুরুষের অভাবও গৌরবজনক নহে।

আমেরিকার সিন্‌সিনাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী বন্দুকধারীর দল চাঁদমারি অভ্যাস করিতেছেন

আজকাল শান্তির সময়েও আমেরিকার অনেক স্ত্রীলোক যুদ্ধ শিখিতেছেন। তাঁহাদের দেশে কি পুরুষ নাই? না, প্রত্যেক বিষয়ে পুরুষের মত না হইলে নারীর গৌরব হয় না? নারীরও পুরুষের সাম্যের মানে এ নয়, যে, নারী ও পুরুষে কোন প্রভেদ থাকিবে না; ইহার মানে এই, যে নারী ও পুরুষ কতকটা পৃথক্ প্রকৃতির হইলেও সমতুল্য হইবেন। নারী নরহত্যা-কার্য্যে ব্রতী হইবেন, ইহা যে বিধাতার ইচ্ছা নহে, তাহা তাঁহাদের দৈহিক ও মানসিক প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলেই বুঝা যায়। তাঁহারা মহত্তর কার্য্যের জন্ত সৃষ্ট। নারীরা যে কখন-কখন যুদ্ধ করিয়াছেন, তাহা ব্যতিক্রম-স্থল, এবং তাঁহারা তাহা অগত্যা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অগত্যা যাহা করিতে হইয়াছে, সখ করিয়া তাহা শিক্ষা করা সামাজিক বিকৃতির লক্ষণ।

—

জনতার উপর গুলিবর্ষণ-সম্বন্ধীয় বিল্

১৯২১ সালে শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী রাষ্ট্র-পরিষদে একটি প্রস্তাব এই উদ্দেশ্যে উপস্থিত করেন, যে, যাহাতে জনতা ভঙ্গ, দাঙ্গা নিবারণ ইত্যাদি ওজুহাতে বিশেষ প্রয়োজন না থাকিলে গুলি চালানো না হয়; কিন্তু উহার "সম্ভ্রান্ত" সভ্যদের অধিকাংশের মতে উহা অগ্রাহ্য বিবেচিত হয়, কিন্তু গবর্মেণ্ট ইহার কিয়দংশ একটি বিলের আকারে উক্ত পরিষদে পাস্ করান। উহাকে আইনে পরিণত করিবার জন্ত উহা ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করা হইলে শ্রীযুক্ত রঙ্গাচারিয়ার উহার সংশোধনার্থ একটি বিল উপস্থিত করেন। তখন-হোম্‌ মেম্বর্ স্যার্ উইলিয়ম্ ভিন্সেণ্ট গবর্মেণ্টের বিলটি প্রত্যাহার করিয়া মিঃ রঙ্গাচারিয়ারের বিলটি বিবেচনা করিবেন, বলেন। তাহার পর উহা কিছুদিন চাপা ছিল। গত বৎসর সিমলায় রঙ্গাচারিয়ার মহাশয় আবার উহা ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করেন। গবর্মেণ্টের বিরোধিতা সত্ত্বেও উহা অধিকাংশ সভ্যের মতে সিলেক্ট্ কমিটির নিকট যায়। সিলেক্ট্ কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। উহার ইউরোপীয় সভ্যেরা অবশ্য নিজেদের স্বতন্ত্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

বিলের ব্যবস্থাগুলি খুব আবশ্যক ও যুক্তিসঙ্গত। কোন বেআইনী জনতা অন্য-কোন উপায়ে ভাঙিয়া দিতে না পারিলে তবে বন্দুক ব্যবহৃত হইবে। গুলিচালানো উচ্চতম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ-অনুসারে হইবে; সেরূপ কেহ ঘটনাস্থলে উপস্থিত না থাকিলে পুলিস্ বা ফৌজী কর্ম্মচারী হুকুম দিতে পারেন এবং তাহার পর উহা নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেট্‌কে জানাইতে হইবে। গুলি চালাইবার পূর্ব্বে জনতাকে যথোচিতরূপে সতর্ক করিতে হইবে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ঘটনাটির বৃত্তান্ত নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেট্ বা অন্য উচ্চতম রাজকর্ম্মচারীকে পাঠাইতে হইবে। বন্দুকের গুলিতে আহত যে-কোন ব্যক্তি কিম্বা গুলিতে হত যে-কোন ব্যক্তির অভিভাবক বা আত্মীয় গুলিকারীর বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ করিতে পারিবেন।

পুলিস্ বা সৈনিক কর্ম্মচারীদের খেয়াল বা আতঙ্ক-বশতঃ বিস্তর নরহত্যা গত কয়েক বৎসরের মধ্যে ও তাহার পূর্ব্বে হইয়াছে। কেহ সরকারী চাকর্যে হইলেই বা শান্তিরক্ষক বা দেশরক্ষক নামে অভিহিত হইলেই, একান্ত প্রয়োজন না থাকিলেও তাহার মানুষ মারিবার অধিকার থাকিবে, ইহা অত্যন্ত অন্যায় ও অযৌক্তিক রীতি। গবর্মেণ্ট-পক্ষ মনে করেন, যে, এবিষয়ে বিলের অনুরূপ কোন আইন করিলে দাঙ্গা নিবারণ বা দমন দুঃসাধ্য বা অসম্ভব হইবে, এবং কখন-কখন পুলিস্ ও সৈনিক কর্ম্মচারীদিগকে উত্তেজিত জনতা টুক্‌রা-টুক্‌রা করিয়া ফেলিবে। আমরা তাহা মনে করি না। ভারতীয় জনতা প্রায়ই নিরস্ত্র থাকে, তাহারা ইংরেজ জনতার সমান দুর্দ্দান্ত ও হিংস্র নহে। সুতরাং ইংলণ্ডে যখন রায়ট্ য়্যাক্‌ট্ নামক আইন থাকা সত্ত্বেও দাঙ্গা-হাঙ্গামা দমন করা সাধ্যাতীত বিবেচিত হয় না, তখন এখানেই বা দুই-চারিটা ন্যায্য নিয়ম করিলে কেন তাহা অসম্ভব হইবে? সাবধান থাকিলে ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও পুলিস আগে হইতেই বেআইনী-জনতা ও দাঙ্গা-হাঙ্গামার সম্ভাবনার খবর পাইবেন, এবং যথেষ্ট সশস্ত্র দলবল লইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন। তাহা হইলে তাঁহাদের কোন বিপদ্ ঘটিবে না। কিন্তু যদিই বা কখনও কালে-ভদ্রে তাঁহারা বিপন্ন হন, তাহা সাতিশয় দুঃখের বিষয় হইলেও অকারণ জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ড অপেক্ষা তাহা অধিকতর শোচনীয় ব্যাপার হইবে না। তাহাতে এই একটা শুভ ফলও হয়ত ফলিতে পারে, যে, আমলাতন্ত্র নিজেদের লোক মরিলে বুঝিতে পারিবেন, যে, মরাটা নিতান্তই উপভোগ্য মজার জিনিষ নয়। সরকারী লোকদিগকে যেমন করিয়াই হউক নিরাপদ্ রাখিতে হইবে এবং বেসরকারী লোকদের প্রাণের প্রতি বিশেষ-কিছু মায়া মমতা দেখাইতে হইবে না, এই মনোভাবটাই দূষণীয়। প্রাণের মূল্য সকলেরই সমান। অধিকন্তু সরকারী লোকেরা জনসাধারণের সেবক বলিয়া আপনাদের প্রাণসংশয় হইলেও বেসরকারী লোকদের প্রাণরক্ষা করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য। তাঁহারা কখন-কখন ইহা করিয়াও থাকেন। গত মহরমের সময় আমরা কলিকাতায় ইহার একটা প্রমাণ পাইয়াছি। আমাদের আফিসের সামনে একজন খুব বলিষ্ঠ হেড্‌কন্‌ষ্টেবল্‌কে কতকগুলা লোক আগুন, ছোরা, সোডার বোতল প্রভৃতির দ্বারা জখম করে। হেড্‌কন্‌ষ্টেবল্ ইচ্ছা করিলে অন্ততঃ পাঁচ ছয় জন লোককে একাই ভূমিশায়ী করিতে পারিত; তা-ছাড়া সাধারণ পোষাকপরা তাহার সঙ্গীও ছিল। কিন্তু আত্মরক্ষার জন্যও প্রহার করিবার হুকুম তাহার না থাকায় তাহাকে মার খাইতে হইয়াছিল। য়্যাম্বুল্যান্স্ না-আসা পর্য্যন্ত লোকটির শুশ্রূষা আমাদের আফিসে হওয়ায় আমরা এই ঘটনার বিষয় অবগত হই।

—

সম্মতি-আইন

গবর্মেণ্টের পক্ষ হইতে আইন করা হইয়াছে, যে, বালিকাদের সম্মতির বয়স অতঃপর তের হইবে। ইহা সন্তোষজনক না হইলেও পূর্ব্বে যে বার বৎসর নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহা অপেক্ষা ইহা কিঞ্চিৎ ভাল।

যাঁহারা বলেন, যে, সামাজিক বিষয়ে বিদেশী গবর্মেণ্টের আইন করা উচিত নয়, তাঁহাদের কথার ভিত্তিগত মূলনীতির সমর্থন আমরা করি। কিন্তু সমাজ যদি নিজে নিজের দোষ সংশোধন করিতে না পারে, সংশোধনের

চেষ্টাও না করে, তাহা হইলেও কি বালিকাদের প্রতি অত্যাচারের কোন প্রতিকার আইন দ্বারা করিতে হইবে না, এবং তদ্দ্বারা জাতীয় অধোগতি-নিবারণ-চেষ্টা করিতে হইবে না? যাঁহারা সামাজিক বিষয়ে গবর্মেণ্টের হস্তক্ষেপের বিরোধী, তাঁহারা যদি স্বয়ং বালিকাদের বিবাহের বয়স বাড়াইবার চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কথার জোর বাড়িত। কিন্তু তাহা তাঁহারা করেন না।

—

বিবাহের বয়সনির্দ্দেশক আইন

শ্রীযুক্ত হরবিলাস সর্দা বালক ও বালিকাদের বিবাহের ন্যূনতম বয়স এবং শ্রীযুক্ত রঙ্গলাল জাজোদিয়া বালিকা-বিবাহের ন্যূনতম বয়স নির্দ্দেশের জন্য যে-যে বিল প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতে বয়স বড় কম রাখা হইলেও, মন্দের ভাল হিসাবে আমরা তাহার সমর্থন করিতেছি।

—

শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী

শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী এক সময়ে 'ভারতী'র সম্পাদিকা ছিলেন এবং মহিলা-শিল্পাশ্রম প্রতিষ্ঠা ও পরিচালন করিয়া অনেক বিধবা নারীর সদুপায়ে জীবিকানির্ব্বাহের উপায় করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ষীয়সী মাতা শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী এখনও জীবিত রহিয়াছেন। হিরণ্ময়ী দেবীর অকাল-মৃত্যু আরও দুঃখের বিষয় হইয়াছে। তবে তিনি যে সধবা অবস্থায় স্বামী পুত্র কন্যা রাখিয়া যাইতে পারিলেন, তাহা তাঁহার পক্ষে সন্তোষের বিষয় হইয়া থাকিবে।

পূজার ছুটি

আগামী ৫ই আশ্বিন (২১শে সেপ্টেম্বর) হইতে ১৯শে আশ্বিন (৫ই অক্টোবর) পর্য্যন্ত প্রবাসী-কার্য্যালয় পূজা-উপলক্ষে বন্ধ থাকিবে। ঐসময়ের মধ্যে কোনো চিঠি-পত্র-আদি আসিলে তাহার ব্যবস্থা ছুটির পর করা হইবে। কার্ত্তিকের প্রবাসী ছুটির পর যথাসময়ে বাহির হইবে।

৯১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রী অবিনাশচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।